নবনীতা দেবসেন

গল্পসমগ্র

(৪ খন্ড একত্রে)

বাংলাবুক.অর্গ

গল্পসমগ্র

অখণ্ড

নবনীতা দেবসেন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সুপ্রকাশিনী
৮বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

GALPASAMAGRA (1 - 4)

Collected short stories of NABANEETA DEVSEN
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone 2241-2330/2219-7920 Fax (033) 2219-2041
email deyspublishing@hotmail.com
₹ 130.00

ISBN 81-295-0029-9

প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৪, বৈশাখ ১৪১১
দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০১১, মাঘ ১৪১৭

প্রচ্ছদ গৌতম রায়

১৩০ টাকা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

শব্দগ্রন্থন অরিজিৎ কুমার, লেজার ইম্প্রেশনস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৪

মুদ্রক সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

নির্দিষ্ট খন্ড পড়তে চাইলে , আপনার
পছন্দের খন্ডের উপরে ক্লিক করুন :

গল্পসমগ্র - ১

গল্পসমগ্র - ২

গল্পসমগ্র - ৩

গল্পসমগ্র - ৪

গল্পসমগ্র

১

নবনীতা দেবসেন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সুপ্রকাশিনী
৮বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

সূচি

মঁসিয়ো হুলোর হলিডে

মঁসিয়ো হুলোর হলিডে ৩
প্রজেক্ট চর্মচটিকা ১০
প্রাণবিন্দুবাবুর খরগোশ ২০
ডক্টর দেবসেনের বিদেশ যাত্রা ২৮
মেসোমশায়ের কন্যাদায় ৪৫
অলৌকিক রত্নভস্ম এবং নন্দকাকু ৬১
অপারেশন ম্যাটারহর্ন ৮৭

গল্পগুজব

গদাধরপুর উইমেন্স কলেজ ১০১
মিরাক্ল ১০৫
জোবান সুজিকি ১১৮
এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট ১৩৫
খেসারৎ ১৪৬
চোখ ১৫২
সুটকেস ১৫৫
জগমোহনবাবুর জগৎ ১৬১
জীবে দয়া ১৮৬

ভালোবাসা কারে কয়

হাওয়া-ই-হিন্দ ২০১
টাংরী কাবাব ২৪০
দাদামণির আংটি ২৫০
সেদিন দুজনে ২৭৬
চক্রবর্তী রাজশেখর, H.O.D.H.S. ২৯৫
চোর-ধরা ৩০৪
মহানায়ক সুরজিৎদা ৩১২
ভালোবাসা কারে কয় ৩২৬

তিনকন্যার হাতে

নন্দনা

অন্তরা

রাধারাণী

আদরনীয়াসু

মঁসিয়ো হুলোর হলিডে

"জীবে দয়া করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

আমি একবার, একটিবারই মাত্র, ঈশ্বরের সেবায় লেগেছিলাম। কালীপুজোর তখনও দিন পাঁচ-ছয় দেরি, একদিন রাত্তিরে খেয়েদেয়ে মেয়েদের ঘুম পাড়াতে গিয়ে শুনতে পেলুম ঠিক কানের কাছেই বেড়াল কাঁদছে। বেড়াল! আমাদের বাড়ি তো ইঁদুরের স্বপ্নপুরী—এখানে বেড়াল কাঁদবে কোত্থেকে! ভূতটুত নয় তো! ভূতেরা যে মাঝে মাঝেই বেড়াল সেজে দেয়ালের ভেতর থেকে কাঁদে—একথা পো-সাহেব লিখে রেখে গেছেন। কান্না ক্রমেই বাড়ছে। নাঃ, এ ভূত নয়, সাক্ষাৎ কোনো জলজ্যান্ত-হুলো। ঘরে ঢুকলো কখন! আলো জ্বাল-আলো জ্বাল খোঁজ খোঁজ ধর ধর তোলপাড় তন্নতন্ন। নাঃ, বেড়াল বেরুলো না, উলটে দুই মেয়ে উঠে পড়ে মহা হুটোপাটি জুড়ে দিলে। বড় বললে—"জানলার বাইরে," ছোট বললে—"ঘুলঘুলির ভেতরে", আমার তো মনে হচ্ছে তোশকের তলায়। এদিকে ঘরখানা দোতলায়, জানলার বাইরে ফাঁকা আকাশ ধুধু অন্ধকার হু-হু বাতাস। বাইরে বেড়াল কোথায় থাকবে! আর ঘুলঘুলিতে যদিও চড়াইপাখির সংসার, তাতে বেড়াল ঢোকবার ফাঁক নেই। তবু কান পেতে শুনি—সত্যিই তো। জানলার বাইরে, ঘুলঘুলির দিক থেকেই কান্নাটা আসছে। ঘুলঘুলির ওপরে একটা কার্নিশ আছে বটে।

কিন্তু ওখানে বেড়াল আসবে কোত্থেকে? ছুট ছুট ওপরে। তিনতলার বারান্দা থেকে ঝুঁকে পড়ে দেখি, তাই তো কার্নিশে একডেলা অন্ধকার জট পাকিয়ে আছে, আর তারই মধ্যে দুটো বিশ ক্যারেটের পাথর জ্বলছে। "কে ওখানে!" বলতেই কান্না বন্ধ হয়ে গেল। উলটে এক প্রবল ধমক এলো—"এ্যায়াও।" কী সর্বনাশ! মেসোমশাই যে। মেসোমশাই সিমলিপালের সেই পোষা বাঘিনী খৈরীর ঠিক উলটো। সাইজে বলো, সেকসে বলো, স্বভাবে বলো। রং মিশমিশে কালো। আসুরিক বলশালী। সম্পূর্ণ বন্য উদ্দাম, স্বেচ্ছাচারী। সাইজে লেজসমেত পৌনে তিন ফুট মতো হবেন। ইয়া কেঁদো! চলাফেরা করেন, ওহ যেন আলেকজাণ্ডার! সে কী স্টাইল! দেখলেই মনে হয় পিছনে একগাদা সৈন্যসামন্ত আসছে, দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছেন। আমরা তাঁর সামনে পোক তো নই, পোক। প্রত্যেকদিন ফিক্সড টাইমে এসে সামনের বাড়ির অ্যালসেশ্যান পীজারকে 'এ্যায়াও' বলে দাঁত খিঁচিয়ে তার দৈনিক বরাদ্দ মাংসটুকু খেয়ে যান।

সীজারের দিনকে দিন হাড় বেরিয়ে পড়ছে। সেদিন কলতলায় হুমমম "ফৌওসস" বলে টিনের চাল থেকে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের রাঁধুনীকে বেদম ভয় পাইয়ে দিয়ে তার চোখের সামনেই জ্যান্ত মাগুর মাছটাকে মেরে তুলে নিয়ে গেছেন।

আমাদের কারুর মনেই সন্দেহ নেই, যে উনি রয়্যাল বেঙ্গল কুলীন কুটুম্ব। তা, মেসোমশাই এই অজায়গায় এলেন কী করে! কখন থেকে! রাঁধুনী তখন কাঁচুমাচু মুখে জানালে—পরশুদিন যখন মেসোমশাই আবার মাগুর মাছ ধরতে ছাদে এসেছিলেন, তখন বিনু ঝি আর রাঁধুনী দুজনে মিলে তাঁকে এমনি এক রামতাড়া মেরেছে—যে তিনি সত্যিই "পালাতে পথ পাননি", যেদিকে দু'চোখ যায় ঝাঁপ দিয়েছেন। নেহাত কপালগুণে পড়েছেন কার্নিশে। রাঁধুনী তাকে উদ্ধার করতে পারেনি, ভয়ে কাউকে কিছু বলেওনি। কিন্তু কেষ্টর জীব, তাই তাকে দুবেলা দুধে ভেজানো রুটি আর মাছের কাঁটা উৎসর্গ করেছে। সেই খেয়ে তিনি গত দুদিন ধরেই ওই কার্নিশে নিঃশব্দে কালাতিপাত করেছেন। এখন অরুচি ধরেছে। এবং বন্দীদশার ভয়ে সারাদিন বাদে "সোচ্চার" হয়েছেন।

ওকে তো নামাতেই হয়। শিবু বললে, "কুছ পরোয়া নেই, মাসিমার ডবলবেডের মশারিটা আমরা উঠোনে চারজনে চারকোণা ধরে দাঁড়াই, আর দিদি আপনি ওকে ঝুলঝাড়ুটা দিয়ে ঠেলতে থাকুন। সার্কাসের কায়দায় আমরা ওকে মশারির চালে লুফে নেবো।"

মা বললেন, "না বাপু, ও সেই পঞ্চাশ সালের মশারি, অত উঁচু থেকে পড়লে অমন দশ সেরি বেড়ালের ভার সইবে না। বেড়ালও যাবে মশারিও যাবে। তার চেয়ে নতুন বেডকভারটা ধর।" আমি ভয় পেলুম, ঠেলাঠেলিতে বেড়াল যদি বেডকভারের বাইরে পড়ে যায়! তার চেয়ে মইটা নামিয়ে দিই, বেড়াল তো গরু নয়, দিব্যি গাছে উঠতে পারে। উঠে আসুক নিজে নিজে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। মই নামিয়ে দিয়ে আমরা ঘরে এসে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছি। "বলিছে দেওয়াল ঘড়ি টিক টিক টিক।" কিন্তু বেড়াল আর ওঠে না। বেড়াল কেবলই কাঁদে। ইনিয়ে বিনিয়ে সে কি মরাকান্না। বিনু ঝি শাস্ত্র আওড়ালে—এ কান্না নাকি বাড়ির পক্ষে ভয়ানক অমঙ্গলের—এক্ষুনি বন্ধ করা দরকার। মা বললেন, ভয়ে ওর বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। ওর এখন ওপরে ওঠার টেকনিকই মনে নেই। ওকে কোলে করে তুলতে হবে। এখন এ কি আমাদের পোষা বাঘ-সিংহী? যে কোলে করে তোলা যাবে? এ হলো আদ্যিকালের হিংস্র পশু, বুনো হুলো। এর জন্যে চাই বাঘা উদ্ধারকর্তা —কোনো হিংস্রতর জীব। শিবু বললে—"ও বাবা! তেতলার কার্নিশে? আমি? মাথা ঘুরে পড়েই যাব।" বিনু ঝি হুকুম করলে রাঁধুনীকে নামতে। রাঁধুনী বলে—"বিনুদিদি, তার চেয়ে তুমিই যাও।" শুনেই বিনুদিদির ফোকলা মুখে ভয়ানক চালভাজা ছোলাভাজা ফুটতে লাগলো দেখে আমি বললুম—"থাক থাক, আমিই নামছি।" এ আর এমন কি? আমি হলুম একদার ম্যাটারহর্নের অভিযাত্রী, আমি কি ডরাই কভু

সামান্য কার্নিশে? কোমরে আঁচল জড়িয়ে এলোচুলে শক্ত করে ঝুঁটি বেঁধে আমি তো একসেকেণ্ডে রেডি। এবং স্টেডি। 'গো' বললেই নেমে পড়ব। কেবল যদি মেসোমশাই আঁচড়ে কামড়ে দেন তাই একটা কম্বল দেওয়া হোক, তাই সুদ্ধু ওকে জাপটে ধরব। বলবামাত্র দুপাশ থেকে গোঁ-গোঁ শব্দে আমাকেই সবেগে জাপটে ধরলো আমার দুই সাহসী কন্যা।—"না। মা নামবে না।" গালগলা ফুলিয়ে যত বোঝাই—"আরে মা কি যে সে? আমি হলুম গিয়ে..." তত তারা বলে—"না, মা যাবে না। মা পড়ে যাবে।" যত বলি—"সেই যে মনে নেই, সেবার যে রেইনওয়াটার পাইপ বেয়ে তিনতলায়"—মেয়ে বললে—"এ তো পাইপ নয়, এ কেলোহুলো। তোমাকে ঠেলে ফেলে দেবেই।" কী করি? জ্যান্ত কাঁঠাল গাছের মতো নিরুপায় দাঁড়িয়ে রইলুম। দুহাত ধরে দুই মেয়ে ঝুলতে লাগলো। মেসোমশাই এখন খুব করুণ সুরে কান্নাকাটি করছেন। মাছের কাঁটা শুঁকেও দেখছেন না। মেসোমশায়ের লক্ষণ সত্যি ভালো নয়। কী করি? বসতবাড়ির ভেতর, এই বছরকার সময়ে, একটা জ্যান্ত জীবকে তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরতে দিতে পারি না? বাড়িতে পুঙ্গব বলতে তো কেবল শিবু আর রাঁধুনী। রাত দশটা বেজে গেছে। কোথায় যাই? কাকে পাই? হঠাৎ মনে হলো—আরে, পাড়াতেই তো রয়েছে—দমকল আপিস। সেদিনই কাগজে পড়েছি বেড়ালদের নাকি ভার্টিগো হয়, বম্বেতে একটা ফ্যাকটরীর ছাদ থেকে দমকল ডেকে বেড়াল নামাতে হয়েছে। শিবু দৌড়ালো দমকল আপিসে। ফিরলো মুখ হাঁড়ি করে।—"আপনি বলে দেখুন দিদি, আমি বললে আসবে না।" "ওদের ফোন নম্বর?" "দিলো না।"

গভীর রাতে দমকল মেন অপিসের ফোন বেজে উঠলো। কাতর স্ত্রীকণ্ঠে অনুনয় এলো—আপনাদের অমুক রাস্তার দমকল অফিসের ফোন নম্বরটা একটু দিতে পারেন দয়া করে?—"কোথায় আগুন লেগেছে?" "আগুন নয়, অন্য একটা বিশেষ জরুরী কাজে"—"কাজটা কী?"—"মানে আমাদের কার্নিশে না, ইয়ে পড়ে গেছে"—"কে পড়ে গেছে? কোথায় পড়ে গেছে? দেখুন, জলে ডোবার কেস আমরা আর করি না।"

(নেপথ্যে শিবুর আকুল উপদেশ—দিদি, বলুন পোষা, পোষা না বললে আসবে না)—"জলে ডোবেনি, কার্নিশে পড়ে গেছে।" "কতবড় বাচ্চা?"—

(নেপথ্যে শিবু—বলুন, পোষা) "মানে,—ভীষণ পোষা কি না।" "কি বললেন? পোষা বাচ্চা?"—"বাচ্চা কে বললে? বেড়াল।" "দেখুন, এটা দমকলের অফিস। এটা বেড়াল ধরবার অফিস নয়।"—"না না, সে তো বটেই, সে তো বটেই, আপনারা যে কত ব্যস্ত থাকেন তা কি জানি না? কিন্তু ধরুন, দুদিন ধরে এই বেড়ালটা, মানে বেজায় পোষা কিনা, একটা আন-অ্যাপ্রোচেবল কার্নিশে পড়ে আছে, আমরা উদ্ধার করতে পারছি না। এখন মরণদশায় এসেছে"—"খুবই দুঃখের কথা, কিন্তু বেড়ালের জন্য দমকলকে ব্যস্ত করা উচিত নয়। মানুষ যদি পড়ে যেত, তা এক্ষুনি

ছুটে যেতাম।"—"কিন্তু অন্য দেশে তো যায়। দমকলই তো যে-কোনো দুরবস্থায় একমাত্র উপায়।"—"সে বিলেতের কথা ছাড়ুন মশাই। এটা বিলেত নয়।" "বিলেত কেন?—বম্বেতেই তো হয়। সেদিন কাগজ পড়েননি? একটা ছাদে উঠে একটা বেড়াল —শেষে পাড়ার লোকেরা দয়া করে দমকল ডেকে—"

"সে হয়তো চিমনি-টিমনি ব্লক করেছিল। দয়া-মায়া ছাড়াও কোনো জরুরী প্র্যাকটিক্যাল কারণ ছিল নিশ্চয়"—"দাদা, আপনারা একটু দয়াই করুন, হিন্দুবাড়িতে বেড়াল মারতে নেই, জানেন তো এতে খুব অলক্ষণ হয়, নিজেই নামতুম, মই নামিয়েছি, কিন্তু মেয়েরা কেঁদে খুন হচ্ছে, আমাকে নামতে দিচ্ছে না"—"দেখুন দিদি, এটা আমাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। এই কালীপুজোর মুখে, ধরুন কোথাও বিরাট একটা আগুন লাগলো, আর তখন আমাদের ছেলেরা আপনার কার্নিশে বেড়াল নামাচ্ছে—সেটা কি উচিত? কত কি এমার্জেন্সি হতে পারে এত বড় শহরে"—"মশাই, বম্বে কি মফঃস্বল শহর? লণ্ডন, নিউইয়র্ক কি পাড়াগাঁ? তাদের দমকলরা যখন পারে...তাছাড়া আমাদের রাস্তার আপিসে তিন চারটে গাড়ি বসে থাকে, একসঙ্গে কখনোই সবকটাকে বেরুতে দেখিনি ইহজীবনে—"

—দমকল আপিসের রাস্তায় আপনার বাড়ি?

—একেবারে পাশেই—

—তবে চলেই যান না? কিংবা ভাইটাই কাউকে পাঠিয়ে দিন—

—ভাই তো গিয়েছিল, ওরা বলেছে বড় অফিসের হুকুম চাই—

—দেখুন—আমার পক্ষে এমন একটা অর্ডার অফিশিয়ালি দেওয়া সম্ভব নয়। আপনি জিজ্ঞেস করে দেখুন যদি পার্সোনালি একটা ফেভার করেন কেউ—ওঁদের ফোন নম্বরটা হচ্ছে—

—অজস্র ধন্যবাদ। অজস্র ধন্যবাদ।

—হ্যালো, এটা কি অমুক রাস্তার দমকল অফিস?

—হ্যাঁ। বলুন? আবার উপরের আলোচনার পুনরাবৃত্তি। এই অফিসারের কর্তব্যনিষ্ঠা আরো প্রগাঢ়।—দেখুন, বেড়ালের জন্য আমি আমার ছেলেদের প্রাণ-সংকট করতে পারব না।—ছি ছি, প্রাণ-সংকটের কথা ওঠে কেন? আগুন তো নয়—বিড়ালই তো। তায়...পোষা।

—দিদি, ধরুন, একটা ছেলে যদি পা ফসকে পড়ে যায়? মানুষ বাঁচাতে গিয়ে মরলে সেটার মানে হয়। তা বলে একটা তুচ্ছ বেড়ালের জন্যে—

—বালাই ষাট। মরবে কেন? কার্নিশটা বেশ চওড়া, তাছাড়া ওতে শ্যাওলাও নেই। কিন্তু বেড়ালকে তুচ্ছ বলা...(মেসোমশাই কী বস্তু তা তো আপনি জানেন না।)—জানি জানি, পোষাপ্রাণী সন্তানতুল্য হয়ে যায়, কিন্তু একটা ছেলের যদি পাও মচকায়, আমি তো তারও রিস্ক নিতে পারি না? আপনিই বলুন, একটা বেড়ালের জন্যে—...ওই শুনুন! শুনতে পাচ্ছেন? মরণ কান্না? ইতিমধ্যে রিসিভারটা হেঁচড়ে

BanglaBook.org

জানলার ধারে নিয়ে গিয়েছি—ওই আর্তনাদ আর কতক্ষণ শুনবো বলুন দেখি? পাগল হয়ে যাচ্ছি তো।

—কী? শুনতে পাচ্ছেন?—হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে বৈকি? আপনার অবস্থা আমি খুবই বুঝতে পারছি। কিন্তু—

—মশাই, ঝট করে কেউ দমকল ডাকে? মেয়ে হয়ে? এতো রাত্তিরে? শেষ পন্থা হিসেবেই না আপনাদের বিরক্ত করা? চোখের সামনে, ভিটের ওপর, ষষ্ঠীর জীবটা...দিদি, আমি, মানে, আপনি ঠিক বুঝছেন না। এর জন্যে অফিশিয়াল অর্ডার দেওয়া সম্ভব নয়—

—তবে আনঅফিশিয়ালিই দিন না? হিউম্যানিটারিয়ান গ্রাউণ্ডসে? আমিই তো নামছিলুম, নেহাত আমার মেয়েদুটো ভারি ভীতু, আর মা বেজায় নার্ভাস প্রকৃতির...নইলে আমি কখন তুলে ফেলতুম—ইতিমধ্যে আমার চোখে সত্যি জল এসেছে।—খবরদার শাড়ি পড়ে নামতে যাবেন না, ভয়ানক রিস্কি—না নেমেই বা করব কি, আপনাদের ওখানে তো কোনো মহৎপ্রাণ, উদার হৃদয়, জীববৎসল তরুণ নেই, যিনি জীবে দয়া করে—সত্যি বলতে কি দিদি তেমন মহৎপ্রাণ, উদার হৃদয়, কি জীববৎসল কেউই হয় না আজকাল, তবু আমি বলে দেখছি একবার, অবিশ্যি মনে হয় না, জীবে দয়ার দিনকাল কি আর আছে দিদি? ইতিমধ্যে টেলিফোনে সজোরে কেলোহুলোর মরণ ক্রন্দন এবং আমার চাপা ফোঁসফোঁস—অধীর হয়ে ও-পক্ষ বললেন, ঠিক আছে, দিন তবু ঠিকানাটা একবার। কোন বাড়িটা? ওঃ, ও তো দু মিনিটের পথ।

মিনিট কুড়ি কেটে গেছে। রাত গভীরে। ক্ষুধায় মরণাপন্ন মার্জার এখন প্রায় মানুষের গলায় একরকম শব্দ করে উঠছে। দমকল আসবে না বোঝা গেছে। আপত্তিরত মেয়েদের ঠেলে ফেলে দিয়ে কার্নিশে নামতে উদ্যত হয়েছি। মা বললেন, শাড়িটা নয়, বরং একটা পেন্টুলুন পরে নাম—সেই পরম দৃশ্য দেখবার ভয়ে, এতক্ষণ জীবে দয়ায় যা হয়নি, তাই হলো। রাঁধুনী বামুন কাতরভাবে বলে উঠল—থাক থাক দিদি, আমিই নামছি। কে বলে শিভালরির দিন গেছে? যেই না নামা, অমনি নাটকীয় টাইমিং-এ একটা দমকলের গাড়ি এসে থামলো নিচে, সমবেত কণ্ঠের কলরব উঠলো —"লোক নেমেছে! লোক নেমেছে!"

—কম্বল জড়িয়ে জড়ভরত মেসোমশাইকে সদ্য তুলে দেওয়া হয়েছিল আমার কোলে—ঠং ঠং করে হঠাৎ দমকলের ঘণ্টাটা বেজে গেল কেমন করে, আর দুদিন ধরে স্নায়ুতাড়িত হতবুদ্ধি মরণাপন্ন বেড়ালের তাতে কী যে হলো, সে তড়াক করে লম্ফ দিয়ে উঠে কম্বল ভেদ করে বেরিয়ে ঝপাং করে আবার ঝাঁপিয়ে পড়লো তিনতলার জানলা গলে অন্য এক সুদূরতর কার্নিশে। এবারে ঘরোয়া মইয়ের নাগাল ছাড়িয়ে। ঘরে এবং রাস্তায় সমস্বরে হা হা রব উঠল—হায় হায়! গেল গেল! আবার গেল!

তারপর?

অবিলম্বে ঝুপঝাপ নেমে পড়লেন, একজন-দুজন নন, পাঁচ সাতজন স্মিতানন, মহৎপ্রাণ, উদারহৃদয়, জীববৎসল তরুণ কর্মী, ত্রিতল মই উঠে গেল ঊর্ধ্বপানে চক্ষের নিমেষে, রেডি, স্টেডি, তারপর সেই মৌল প্রশ্ন! কে উঠবে? এ তো আগুন নয়, এ যে...ইতস্তত ভাব দেখে আমি বললুম—আমিই উঠে পড়ি বরং। মুখ থেকে কথাটা পড়েছে কি না-পড়েছে অমনি ধড়ফড় করে উঠে গেছেন যে কেউ একজন দোতলা পর্যন্ত। তারপর মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করলেন—আঁচড়ে-কামড়ে দেয় না তো? বললুম...কি জানি, ভয়ানক নার্ভাস হয়ে আছে তো? বরং একটা মোটা তোয়ালে জড়িয়ে ধরাটাই সেফ হবে...বলতে না বলতে ঝুল বারান্দাগুলো থেকে ঝপাঝপ দুচারটে টার্কিশ তোয়ালে পড়লো। ভদ্রলোক মই থেকেই কায়দা করে একটা লুফে নিয়ে ওপরে উঠলেন। এদিকে তেতলার কার্নিশের মতো বেড়ালোচিত স্থানে হঠাৎ মানুষ দেখে হুলোমশাই সন্দিগ্ধচিত্তে ছুটোছুটি শুরু করে দিলেন এ-মাথা থেকে ও-মাথা। সে কি উত্তেজনা। একেবারে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল খেলার মতো। ক্রমাগত চিয়ার্স উঠছে রাস্তা থেকে। চললো বেড়ালে-মানুষে চোর পুলিশ খেলা। তারপরে —পড় পড় পড় পড়বি চাপা ধপ, ধর ধর ধর ধরবি হলো খপ্। পাঁচা-ফাটানো হাততালির মধ্যে তখনি কপাস করে লোডশেডিং হয়ে গেল। অমনি চারিদিকে রব উঠলো: সাবধান! সাবধান! আর নিচে ঝলসে উঠলো পাঁচ-সাতটা জোরালো দমকলের টর্চলাইট।

অন্ধকারে দৈববাণীর মতো, শূন্য থেকে বিজয়গর্বে সমুজ্জ্বল কণ্ঠে উদ্ধারকর্তা ঘোষণা করলেন—ধরেছি দিদি, কিচ্ছু ভাববেন না, বাছাধনকে আপনার কোলে না দিয়ে আর ছাড়ছি না বাবা। হুঁ হুঁ। ভীষণ ভয় পেয়ে আমি তাড়াতাড়ি বললুম, থ্যাংক ইউ ভাই, ওকে বরং ওই পাঁচতলার ছাদটাতেই ছেড়ে দিন—মানে—তাই কখনো হয়? নামতে নামতে নায়ক বললেন—সে কাজটি আমি করছি না মশাই। রাস্তায় তখন মহতী জনসভা। রাত দেড়টা, তাতে কি হয়েছে? রিটায়ার্ড রিকশাওলা, বাড়িমুখো ভিখিরি, নিষ্কর্মা পাহারোলা, ব্যতিব্যস্ত কুকুর, ঝিমন্ত ষাঁড় ও রগুড়ে বাচ্চা-বুড়োয় উঠোন ছাপিয়ে রাস্তা ভরপুর। প্রত্যেক বাড়ির বারান্দা ও জানালা থেকে মোমবাতির আলো উদ্বেগ এবং উপদেশ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সব বাচ্চারা ফ্রীডম পেয়ে গেছে জেগে ওঠার, পাখি ডাকার মতো কলরব হচ্ছে। এরই মধ্যে হঠাৎ এতক্ষণ পরে, চোখ কচলাতে কচলাতে আবির্ভূত হলেন আমাদের নতুন প্রতিবেশী ব্যোমকেশবাবু। ব্যাপারটা টের পেয়েই তিনি ঘুমভাঙা ভারী গলায় বলে উঠলেন —ও বুঝেছি, এ সেই প্রকাণ্ড ভয়ংকর, কালো কুচকুচে...আর যায় কোথায়? আমি মরিয়া হয়ে তৎক্ষণাৎ ব্যোমকেশবাবুর আধাঘুমন্ত বাঁ-হাতখানা খামচে ধরেছি, আর সঙ্গে সঙ্গে বিষম জোরে কেটেছি এক রামচিমটি। আমি তো জানি কী সর্বনেশে বাক্য উনি উচ্চারণ করতে চলেছেন—সেই...কালো কুচকুচে অতি বদরাগী, হামলাবাজ, বেজায় পাজি হুলোটা? যেটা রোজ আমাদের মাছ দুধ খেয়ে যাচ্ছে?—না, সেই

BanglaBook.org

বাক্যটি এই মুহূর্তে, এই পবিত্র জীবে-দয়ার পটভূমিতে, ওঁকে বলতে দেওয়া অসম্ভব। সেই সর্বহারা নিঃসীম অন্ধকারে, চরাচরব্যাপী বেনিয়মের মধ্যে, দমকলের তিনতলা জোড়া স্বর্গের সিঁড়ির নীচে, এ হেন আশাতীত অত্যাকস্মিক আক্রমণে ব্যোমকেশবাবু দিশাহারা হয়ে পড়লেন। যে-কোনো কারণেই হোক, তাঁর আর বাক্যস্ফূর্তি হলো না। বেড়াল বগলে নেমে এসে হাস্যবদন হিরো বললেন—ধরুন দিদি। আপনার সাধের পুষ্যি। ব্যাটাকে দুদিন ধরে বন্ধ করে রাখুন দিকি, আবার না পালায়—চোরের মতো শেষ চেষ্টায় বললুম—ওকে উঠোনেই ছেড়ে দিন না,—পাগল হয়েছেন? ফের কোন স্বর্গরাজ্যে লাফ মারবে, ফের পাড়াসুদ্ধ তোলপাড়? নিন ধরুন আপনার দস্যি ছেলে—টার্কিশ-তোয়ালে জড়ানো সদ্যোজাত সন্তানকে যেমন বাড়িয়ে দেন ওস্তাদ ডাক্তার, আর অনভ্যস্ত হাত বাড়িয়ে যেমন তাকে সন্তর্পণে গ্রহণ করেন অতি-নার্ভাস নবীন পিতা—তেমনি সন্ত্রস্ত হৃদয়ে বাঘের মেসো হুলোমশাইকে যথাসাধ্য কৃতজ্ঞ মুখে আমি সভয়ে বুকে সাপটে ধরলুম। পারফেক্ট টাইমিং দিয়ে এই সময়েই ইলেকট্রিসিটি ফিরল। হৈ-হৈ করে উঠল উপস্থিত পাবলিক। আর আমি ছুট লাগালুম। ইচ্ছে, উঠোনের কোণটা ঘুরেই মেসোকে পথে ছেড়ে দেব, লোকচক্ষুর অন্তরালে। ব্যোমকেশবাবুর দিকে চাইবার সাহস ছিল না, তাঁর সঙ্গে আমার এখনও ফর্মাল পরিচয় হয়নি, সবেমাত্র এ-পাড়ায় এসেছেন ওঁরা। ছুট তো লাগিয়েছি, কিন্তু তোয়ালের ভেতরে মঁসিয়ো হুলো তখন টাইফুনের মতো উত্তাল হয়েছেন, কোণটা ঘুরতেই তোয়ালে ভেদ করে নখদন্তসমেত নিষ্ক্রান্ত হলেন এবং সবলে আমার হাতে আঁচড়ে এবং কামড়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে নেমে মুহূর্তেই অদৃশ্য। হাত থেকে ঝুঁজিয়ে রক্ত পড়ছে —সে লজ্জা মোটা তোয়ালেতে লুকিয়ে ফেলে কলুই পর্যন্ত জড়িয়ে বেড়ালের মতো করে ধরে একগাল কৃতার্থ হেসে অশ্রুছলছল চক্ষে আমি ভাগ্যক্রমে এ দৃশ্য দেখতে না পাওয়া সবলমতি দমকল বাহিনীকে কৃতজ্ঞ কান্নায় গদগদ গলায় তখন বলছি —"আপনারা এই অবোলা প্রাণীর জন্যে যা করলেন, এর জন্যে ঈশ্বর আপনাদের শতগুণ করে"...বলতে বলতে হাতের যন্ত্রণায় ও চোখের জলে আমার বাক্যরোধ হয়ে গেল। রীতিমতো টাচড হয়ে তরুণটি বললেন—"ছিছি, এজন্যে ধন্যবাদের কি আছে দিদি, গেরস্থঘরের পুষ্যি, সে তো ছেলেপুলেরই সমান"—ঠং ঠং করে ঘণ্টা বেজে গেল, ঝটপট গাড়িতে লাফিয়ে উঠলেন উদারহৃদয়, মহাপ্রাণ, জীববৎসল তরুণের দল, লাল-টুকটুকে পক্ষীরাজটি যেন উড়ে বেরিয়ে গেল একগাড়ি সত্যিকারের রাজপুত্র পিঠে নিয়ে।

হুলোমশাই তখন পাশের বাড়ির পাঁচিলে বসে কৃতঘ্নচিত্তে গোঁফে তা দিচ্ছেন। আর ব্যোমকেশবাবু? তখনও হতবাক, মধ্যরাত্রের ফাঁকা উঠোনে, একা। বাঁ হাতের ফুলো জায়গায় ডানহাত বোলাতে বোলাতে অতি বিচিত্র দৃষ্টিতে একবার হুলোমশাইকে আর একবার আমার দিকে তাকাচ্ছেন। তাঁর সেই অভিব্যক্তির কাছে মার্সেল মার্সোর মূকাভিনয়ও নস্যি।

অনেকগুলো ইনজেকশন নিতে হয়েছিলো আমায়। 'পোষাপ্রাণী'টির মায়ার চিহ্ন এখনও হাতের মাংসে বিদ্যমান। আর সেই থেকে কেন জানি না হুলোমশাইও যেমন, ব্যোমকেশবাবুও তেমন আমাদের বাড়িটাকে বিষবৎ পরিহার করে চলেন, অথচ ঈশ্বরের সেবায় সেই একবারই মাত্র লেগেছিলুম আমি।

[নীতিকথা দমকলকে অকারণে বিরক্ত করবেন না। করলে হাতে-নাতে তার প্রতিফল পাবেন। "ধর্মের কল" ইত্যাদি মনে থাকে যেন]।

প্রজেক্ট চর্মচটিকা

আর যাই করুন আপনারা, খবর্দার চামচিকে পুষবেন না। চামচিকেরা বড্ড দুর্ধর্ষ, বেপরোয়া, বিশ্বাসঘাতক, অবিমৃষ্যকারী, নেমকহারাম, স্বার্থকেন্দ্রিক, কৃতঘ্ন এবং কুপোষ্য প্রাণী। একেই তো ইঁদুর না পাখি তার নেই ঠিক। দিব্যি চকচক করে মায়ের দুধ খায় আবার কুচকুচ করে ফলটল খায় দাঁত বসিয়ে। ওদিকে পালক-টালকহীন চামড়ার ন্যাড়া ন্যাড়া ডানা মেলে চটাং চটাং করে উড়ে বেড়ায় আমাদের মাথার ওপরে। যেমন রূপ, তেমনি গুণ, কোনোটারই জাতকুলের বিচার হয় না। চামচিকের চেয়ে তিমি মাছ পোষাও ঢের ভালো। এইজন্যেই তো ভিমি সংরক্ষণের একটি সমিতি আছে পৃথিবীতে, কিন্তু চামচিকের জন্য নেই। এবং না থাকাই উচিত। মানুষের কত মমতা সুন্দরবনে 'প্রজেক্ট টাইগার' পর্যন্ত আছে ব্যাঘ্র-সংরক্ষণ সমিতি। (অথচ বাঘেরা কেউ কেউ যখন 'প্রজেক্ট ম্যান' গড়ে তোলে...তাদের উদ্দেশ্য 'মনুষ্য সংরক্ষণ' হয় না)। মানুষের বুকে অশেষ মমতা।

একবার ওই মমতাপরবশ হয়েই আমাদের বাড়িতে 'প্রজেক্ট চর্মচটিকা' অর্থাৎ চামচিকে সংরক্ষণ সমিতি খোলা হয়েছিল। 'চর্মচটিকা' মানে কিন্তু 'চামড়ার চটি' নয়। কেন যে নয়, তা আমিও বুঝি না)। ওয়ানম্যান কমিশন। অর্থাৎ আমিই চেয়ারম্যান, আমিই মেম্বার, আমিই সেক্রেটারি। আজ আপনাদের কাছে সেই সমিতিরই কার্যনির্বাহের ধারাবিবরণী পেশ করছি। উদ্দেশ্য, জগৎবাসীকে সতর্ক করে দেওয়া চামচিকে হইতে সাবধান। মমতা করতে গেলেই ওরা আপনাকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি করে ছেড়ে দেবে। ওঃ! কী বিপদেই ফেলেছিল আমাকে! যেমন বাড়িতে, তেমনি কলেজে...প্রাণ ওষ্ঠাগত করেছিল ওই চামচিকে। বেশ ক'বছর আগের কথা, কিন্তু এখনও ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়।

BanglaBook.org

আমার দোষ, আমি মাঝে মাঝে এধারে ওধারে চামচিকে কুড়িয়ে পাই। ভদ্রলোকেরা পথেঘাটে কী কী জিনিস কুড়িয়ে পান? হয় বেশ গাব্দাগোব্দা বাঘসিংগির বাচ্চা, এলসা কি খৈরীর মতন, নইলে রোগা মিষ্টি পাখির ছানা-টানা, কিংবা অসহায়া অবলা নারী, নিদেনপক্ষে মনিব্যাগট্যাগ। আর আমি কী কী কুড়িয়ে পাই?...বাসা-ভাঙা কাগের ছানা, খসে-পড়া চামচিকের বাচ্চা, গাড়িচাপা-পড়া খোঁড়া বেড়াল, পিচুটিপড়া, লোম-ওঠা, টেকো কুকুরছানা। একবার অবিশ্যি ইয়া মোটা ল্যাজওলা একটা কাঠবেড়ালির ছানাও পেয়েছিলুম। সে মাত্র একটিবারই। কিন্তু চামচিকে? দু'দুবার। দু'জায়গায়। দু দুটো ছানা-চামচিকে এত জায়গা থাকতে ঠিক আমারই পায়ের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ধুলোয় লুটোপুটি যায় কেন? প্রথমটাকে পেলুম কলেজ যাবার পথে, বাসস্টপে বকুলতলায়। প্রথমে ভেবেছি ধুলোকাদামাখা একটা ছেঁড়া বেলুনের টুকরো বুঝি, বাতাসে নড়াচড়া করছে। হঠাৎ দেখি, না তো? এ তো বাতাসে নড়া নয়। এ অন্যরকম নড়াচড়া। তখন নিচু হয়ে বসে দেখি...ও মা! ইনি যে মিনি-চামচিকে? ইঞ্চিখানেকের মধ্যেই তার ছোট্ট ছোট্ট মুণ্ডু, ধড়, ডানা, থাবা সব কিন্তু আছে, মায় নখ সুদ্ধু। আহাহা, তাকে কুড়িয়ে না নিয়ে পারে কেউ? বেচারা জ্যান্ত যে! এক্ষুনি পথের কুকুর-বেড়ালের ফুচকা-ভেলপুরীতে পরিণত হবে। কী করি? অগত্যা কলেজ যাওয়া স্থগিত রইল, জীবে দয়া করা নিশ্চয় বেশি জরুরী। রুমালে জড়িয়ে বেচারা চামচিকেকে সযত্নে বাড়িতে নিয়ে এলুম। পরদিন, বললে বিশ্বাস করবেন না, আমাদের হলদে ঘরের কোণে (আমাদের বাড়িতে ঘরগুলোর নাম রাখা হয়েছে মেঝের রং-এর নামে হলদে ঘর, লাল ঘর, সবুজ ঘর ইত্যাদি)। আলনার পাশে বাবার জুতোর মধ্যে রহস্যজনকভাবে দ্বিতীয় চর্মচটিকার আবির্ভাব ঘটল। দেখতে পেলুম কিন্তু আমিই আগে। বাবা জুতোয় পা-টি একবার ঢোকালে তাঁর এবং চামচিকে শিশুর কী যে দশা হতো, ভাবতেই গায়ে কাঁটা দেয়। ঘরের ভেতরে যে কোত্থেকে চামচিকের ছানা এল, তা কেউ জানে না। ঘুলঘুলিতে তো চড়াইগিন্নির চাঁদের হাট। তাঁদের কিচিমিচিতে সদাই ঘর মুখরিত। কিন্তু এটা কোত্থেকে এল? কে আনল?

গোলমালটা বাধলো খাওয়ানো নিয়ে। এরা কি সোজা পুষ্যি, চর্মচটিকা বলে কথা। এ কি আপনার বাঘসিংগি পেয়েছেন যে "আঃ আঃ তুউউ"...করলেই ল্যাজ নাড়তে নাড়তে দৌড়ে আসবে, হাত থেকে দুধুভাতু খাবে? নো স্যার। এরা খাস ভ্যাম্পায়ারের ডিরেক্ট বংশধর, এদের পোষ মানাবে কার সাধ্যি? এত তো সার্কাস দ্যাখেন, চামচিকের সার্কাস কেউ দেখেছেন কখনো? হুঁ বাবা, সেটি পাবেন না। লায়নটেমার হয়, গোখরো সাপ পর্যন্ত দাঁত না ভেঙে খেলানো যায়, কিন্তু চামচিকে-টেমারের কথা কেউ শুনেছে? তিমি মাছ পোষা কি সোজা? চামচিকেও ঠিক তিমি মাছের মতো। কেন? কেননা তিমিও ম্যামাল, চামচিকেও তাই। তিমিও অবসেশনগ্রস্ত ঘোর মানসিক রুগী, ভুল করে নিজেকে মাছ বলে ভাবে অথচ মোটেই মাছ নয়

সে, তবু জোর করে জলে বাস করে, এবং সমুদ্রে সাঁতার কেটে বেড়ায়। চামচিকে বেচারীও অবসেশনগ্রস্ত প্রবল মানসিক রুগী, মনে মনে নিজেকে পাখি ভাবে, যদিও সে পাখি নয়, ডিম পাড়ে না, পালক পর্যন্ত নেই, তবুও জোর করে হাতদুটোকে ডানা বানিয়ে উড়ে বেড়াবেই। তিমি যেন হাফ-জলহস্তী হাফ-মাছ, চামচিকে যেন হাফ-পাখি হাফ-ইঁদুর। বকচ্ছপের মতো, জীবজগতে এভলিউশনের মাঝরাস্তায় ওরা পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির করুণ শিকার। ইঁদুরও ওদের আপনার ভাবে না, পাখিও না। ওদিকে তিমি আর চামচিকে যে স্বজাতি-স্বঘর সেকথাই বা ওদের কে বোঝাবে? ওদের নিজেদেরই জ্ঞাতগোত্র কিচ্ছু খেয়াল নেই। ম্যামাল হিসেবে দুজনেরই হওয়া উচিত স্থলচর প্রাণী, কিন্তু মনের ভুলে একজন জলচর আরেকজন খেচর হয়ে গেছে। হয়ে কিন্তু দিব্যি সুখেই আছে। এ হেন বেয়াড়া জন্তু পোষা কি মুখের কথা? অবশ্য ক্যালিফর্নিয়ার মেরিনল্যাণ্ডে দুটো পোষা ক্ষুদে জাতের মিনি-তিমি আছে, শুশুকদের সঙ্গে মিশে মিশে ওরাও আজকাল খেলা দেখায়। কিন্তু কোনো ওয়ানডারল্যাণ্ডেই চামচিকের খেলা দেখানো হয়নি। আমি সেই চামচিকে পুষতে গিয়েই অতো কষ্ট পেলুম। হ্যাঁ, আপনারা আমাকে বলতে পারেন...“কেনই বা পুষতে গেলেন? কেউ কি আপনাকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল, লক্ষ্মীটি, যাও তো একটু চামচিকে পোষো গে, নইলে কিন্তু মনে ভীষণ দুঃখ পাব? নাকি কেউ আপনাকে অভিশাপ দিয়েছিল —অনুতাপে দগ্ধ হবি, চামচিকে পুষে মরবি?” কেউ না কেউ না। দায়টা সব আমারই। অমন কচি নধর কালো-কালো দুটি ডানাযুক্ত ইঁদুরছানা, ঠিক যেন রবারের তৈরি পুতুল, কুড়িয়ে পেলে আপনিও না পুষে পারতেন না। ওরা, অত কালো কুচ্ছিত বলেই, যেন ওদের ওপর বড্ড মায়া পড়ে যায়। যেমন মায়া পড়েছিল আমার ওই কাগের ছানাগুলোর ওপরে। উঃ, কী কুচ্ছিত। কী কুচ্ছিত। সাধে কি ওদের বাঝ-মা ওদের বাসা থেকে ফেলে দিয়েছিল?

মায়া মানেই পোষা। পোষা মানেই পরিশ্রম। উপরন্তু মায়ের বকুনি। যেমন ধরুন...প্রথম দিন প্রথম বাচ্চাটাকে আনার পরে। যেহেতু সে তখন একেবারেই কচিবাচ্চা, চুমুক দিয়ে খেতে জানে না...চুমুক দেবেই বা কিসে? সমগ্র জীবটিই তো আমাদের হাতের কড়ে আঙুলের সমান। অতএব মানুষ বাচ্চার বোতলে ওদের দুধ খাবার প্রশ্ন নেই। নিপ্পলটাই ওর দেহের সমান বড়। তাই আমি একটা চায়ের প্লেটে অল্প দুধ ভালো করে ছেঁকে ঢেলে, নরম গোলাপী তুলোর সলতে পাকিয়ে সেই সরু সলতে ওই দুধে ভিজিয়ে নিয়েছি, তারপর ফর্সা রুমাল দিয়ে কুচকুচে এবং কিঁচকিঁচে চামচিকের বাচ্চাকে সাবধানে চেপে ধরে সেই দুধের সলতে তার ক্ষুদে মুখখানার চারপাশে একমনে বুলিয়ে যাচ্ছি ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুখ মোছানোর মতো...কেননা শ্রীমুখখানি তাঁর এতই ক্ষুদ্র এবং এমন ঘোর কালো যে খাবার ফুটোটি অর্থাৎ হাঁ-টি যে কোন অঞ্চলে অবস্থিত তাই আবিষ্কার করতে পারিনি। এক সময়ে কালো আলপিনের মাথার মতো দুটি চকচকে বিন্দু আমার নজরে এল। আন্দাজ

BanglaBook.org

কবলুম ঐ দুটো হলো চোখ। সেক্ষেত্রে হাঁ-টা হবে একটু নিচে, মাঝামাঝি। কিন্তু নাকের ফুটো কৈ। এই পরম দুর্ভাবনার মুহূর্তে যখন শত চেষ্টাতেও দুধের সলতে গ্লাস চামচিকের হাঁ-য়ের একটা সংযোগ ঘটাতে পারছি না...সেই দুঃসময়ে পান চিবুতে চিবুতে মা-জননীর অকুস্থলে আবির্ভাব।

—খুকু, ওখানে কি কচ্চিস রে? কলেজ যাসনি?

—না মা। এই চামচিকে...

—সে কিরে! কলেজ না গিয়ে চামচিকে নিয়ে খেলা করচিস?

—খেলা নয় মা, খাওয়াচ্ছি।

—এঃ হে, ম্যাগোঃ, ওই খাবার টেবিলেও চামচিকে তুলেচিস নাকি? ওটা না আমাদের খাবার জায়গা? খুকু!

—খাবারই তো খাচ্ছে।

—খাবারই তো খাচ্চেন? ঐ বিশ্রী ময়লা রাস্তার চামচিকেটাকে নিয়ে একেবারে খাবার টেবিলে? ওরে, তোর কি ঘেন্নাপিত্তি নেই?

—এতে ঘেন্নার কি আছে মা? খাচ্ছে তো দুধ...

—আবার দুধ নষ্ট করা হচ্ছে?

—বা, দুধ না দিলে হয়? ও ও-তো ম্যামাল, আমাদেরই স্বজাতি...

—দূর দূর! আমার স্বজাতি কক্ষনো নয় চামচিকে। (মা ঝনঝনিয়ে দুহাত নাড়েন বিরক্তিতে চুড়ি বাজিয়ে) তোর স্বজাতি অবিশ্যি হতেই পারে। যেমন তোমার রুচি বুদ্ধি...

বেগতিক বুঝে আমি সুর পালটে ফেলি।

—দ্যাখো না চেয়ে মা, আহা বেচারী কতোটুকুনি প্রাণী, চোখটোকও ফোটেনি বোধহয়। দুধের সলতেটা পর্যন্ত দেখতেই পাচ্ছে না...

চোখ কি তোমারই ফুটেচে মা? দুধের গেলাসটা কি তুমিই কখনো দেখতে পাও? তাছাড়া দৃষ্টি থাকলে কি কেউ ঐরকম বিচ্ছিরি কুচ্ছিরি জিনিসটাকে ঘরে এনে তোলে? গুণনিধি। গুণনিধি...। শিগগির টেবিল ক্লথটা ডেটলে কেচে দাও, আর এই নোংরা জন্তুটাকে নিয়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে এস। ছি ছি ছি...

এবার আমার রাগ হয়ে যায়।

—কেন অমন ছি ছি করছ মা? নোংরা জন্তু মোটেই নয়...মন্দিরের ভেতরেই তো ওরা বাসা বেঁধে বাস করে। দেখলুম না আমরা? রামেশ্বর, মাদুরা, পুরী, ভুবনেশ্বর, সব জায়গায়। ঠাকুরের পাশেই থাকে ওরা। ওদের তো কেউ তাড়িয়ে দেয় না? অথচ তুমি কেন...

—তাই থাকুক না বাবা, ঠাকুরের পাশে, পুরী-টুরীতে গিয়ে, এটা তো দেবমন্দির নয় মা, এটা মানুষের বাড়ি।

—এ বাড়ি বুঝি মন্দিরের চেয়ে বেশি পবিত্র? কেন তবে লোকে মন্দিরে শুদ্ধবস্ত্রে

BanglaBook.org

যায়, জুতো খুলে ঢোকে? সেখানেও যদি চামচিকে অ্যালাউড হতে পারে, তবে তুমি কেন...

—এটা তো মন্দিরের মতো অতটা পবিত্র ঠাঁই নয় বাছা যে ঝুলটুল ঝাড়া হবে না, চামচিকেরা বাসা বেঁধে ঝুলে থাকবে ছাদের গা থেকে? এ হলো গেরস্থের সংসার—ঐ যে। ঐ যে। আরে আরে। মা। মা! ধরেছে। ধরেছে। সলতে ধরেছে। এই যে সলতে এঁটে গিয়েছে মুণ্ডুতে—উঃফ কী বুদ্ধিমান!

—ঈশ! বুদ্ধিমান না আর কিছু! বলতে বলতেই মা প্লেটটা লক্ষ করে প্রায় কেঁদে ফেললেন—

খুকু! ওটা আমার চায়ের কাপের পিরিচটা বলে মনে হচ্ছে না? ওরে—শেষটায় চামচিকের এঁটো বাসনে তোরা চা খাওয়াবি আমাকে?

এই তো অবস্থা বাড়িতে। পরের দৃশ্য কলেজে। ইতিমধ্যে নাম্বার-টুও এসেছেন। আমার রাস্তা থেকে তুলে আনা পুষ্যিদের খবরদারি রাগারাগি করতে-টরতে হলেও মা-ই করেন। কিন্তু চামচিকেদের বেলায় মাকে রাজী করানো মহা মুশকিল হয়ে দাঁড়াল। না, "ওই নোংরা, কালো কুচ্ছিত, আর হিংস্রমূর্তি" প্রাণীদের মা তুলোয় করে দুধ খাওয়াতে পারবেন না। অতটুকু বাচ্চাদের "হিংস্রমূর্তি"টা যে কোথায় তা মাকে কে বোঝাবে! বাবা অবিশ্যি বার দুই আমার পক্ষ নিয়ে—"আহা মেয়েটা অত করে বলছে" বলে বাক্য শুরু করেছিলেন, ঠাণ্ডা গলায় মা দেওয়ারই—"তাহলে তুমিই খাওয়াও না"—বলায় আর তৃতীয়বার মুখ খোলেননি। আমিই 'একা কুম্ভ' হয়ে ওদের রক্ষাকার্যে নেমেছি।

ছোট একটা বিস্কুটের টিনে খবরের কাগজ বিছিয়ে ওদের বাসা করে দিয়েছি। নিশ্বাস নেবার জন্যে ঢাকনিতে পেরেক ঠুকে ফাঁকরা করে তৈরি হয়েছে ঘুলঘুলি। তেমন কিছু ঝামেলা নেই, কেবল খিদে পেলেই উদ্দাম কিঁচকিঁচ শব্দ জুড়ে সারা বাড়ি মাথায় করে। অতটুকু শরীরে এতজোর গলা। মা কেবলই বলেন—"অতিষ্ঠ করে মারলে এগুলো। দেবো একদিন টিনসুদ্ধ ডাস্টবিনে ফেলে। বাড়ি তো নয়, এমনিতেই একটা চিড়িয়াখানা এটা। কুকুর-বেড়াল-কাঠবেড়ালী, পালে পালে খরগোশ, ঝাঁকে ঝাঁকে লাল মাছ, খাঁচা খাঁচা চিনিয়া মুনিয়া বদ্রীগড়...বাবাবে, এততেও মেয়ের আশ মিটল না, আবার চামচিকেও জুটল? এমনিতেই লোকে বলে বাড়িতে চিড়িয়াখানার গন্ধ। নাঃ, বাড়িখানা আর মানুষ বসতের যুগ্যি রইল না। একমাত্র সন্তান যেন জগতে কারুর আর হয়নি—এ তো গান্ধারীর সংসার হয়ে দাঁড়িয়েছে"—এক-একদিন সত্যি সত্যি চামচিকেগুলো ভয়ানক বিরক্ত করে—জানি না ওদের কী যে হয়, বড্ড বেশী বেশী চিকচিক করে। সেদিন মার মাথা ধরেছিল খুব, চামচিকেরা চেঁচানোয় তা আরো বেড়ে গেল। মা রেগেমেগে বললেন—"যাক খুকু আজ কলেজে বেরিয়ে, দিচ্ছি তোমাদের বিদায় করে। গুণনিধি।"

ওই "গুণনিধি" ডাকেই আমার বুকের ভেতর রক্ত শুকিয়ে গেল। আমি জানি

এবার কি হবে। অস্থির হয়ে উঠলে মা ঐভাবে গুনিয়াভাইকে (আমাদের ঠাকুর, প্লাস ঝি, প্লাস নায়েব, প্লাস গার্জেন, প্লাস দারোয়ান, প্লাস জন্তুদের জমাদার, প্লাস জন্তুদের জহ্লাদ) ডাকে। তার পরেই গুনিয়া আমার আনা খোঁড়া বেড়াল, প্যারালাইজড কুকুর ইত্যাদিকে রিকশা করে বন্দেল রোডে জন্তুদের হাসপাতালের উঠোনে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসে। শেষটায় এমন হলো যে গুনিয়াভাইকে হাসপাতালের চৌহদ্দির মধ্যে দেখলেই ওখানকার ডাক্তার নার্স কম্পাউণ্ডার জমাদার সকলে মিলে পেন্সিল, পেপারওয়েট, টুথব্রাশ, ঝাঁটা, লাঠি, ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ—যে যা হাতে পায় তাই নিয়েই রৈ রৈ করে ক্ষেপে তেড়ে আসে..."সর্বনাশ। আবার কিছু রুগী ছাড়তে এসেছে রেঃ!" এই বলে। কিন্তু চামচিকেদের কপালে বন্দেল রোড নেই। ওরা, বেশ বোঝা গেল, ডাস্টবিনেই যাবে। অর্থাৎ কুকুর বেড়ালের পেটে। তা তো হতে দেওয়া যায় না। অগত্যা চামচিকের টিনটা ঝোলাব্যাগে ভরে বইখাতার সঙ্গে কলেজে নিয়ে যাওয়াই নিরাপদ মনে করলুম। আলাদা একটা সিগারেটের টিনে রইল দুধে ভেজানো এক ডজন তুলোর সলতে। ক্লাসের ফাঁকে এক সময়ে খাইয়ে আনবো।

আমি কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলাম কৃষ্ণের জীব হয়ে ওরা এরকম বিশ্বাসঘাতকতা করবে? মানুষ ছাড়া আর কোনো পোষা প্রাণী যে কৃতঘ্ন হতে পারে, তা কে জানতো।

খুব মন দিয়ে আমরা তখন ইয়োরোপের রোমান্টিক কবিতা বিষয়ে জ্ঞান সংগ্রহ করছি, হেনকালে ক্লাসের মধ্যে মৃদু কিঁচকিঁচ শব্দ।

স্যার এদিকে তাকান ওদিকে তাকান, চোখ সরু করে ঘুলঘুলির দিকে তাকান, কোনো হদিস পান না! এদিকে কিঁচকিঁচ শব্দ আর মৃদু থাকছে না। ক্রমে ক্রমে প্রবল হয়ে উঠল। স্যার এবারে শব্দভেদী দৃষ্টি আমার দিকেই নিক্ষেপ করতে লাগলেন। অথচ আমি তো ভেন্ট্রিলোকুইস্ট নই, শব্দটার উৎস স্পষ্টতই আমি না। স্যারের জোড়াভুরু যতই প্রশ্নচিহ্নের আকৃতি নিতে থাকে...চশমার নিচে, গোঁফের তলায়, আমার বন্ধুদের চোখ আর ঠোঁটগুলো ততই চাপা হাসিতে চকচক করতে থাকে। তারা তো জানে এ শব্দ-শৃঙ্গার উৎস কোথায়। চিকচিক্কারে অস্থির হয়ে ঠিক করলুম ক্লাসের শান্তিবিধানের জন্য ওদের একটু দুধ খাওয়ানো দরকার। নিশ্চয় তাতে চুপ করবে। ক্লাসকে বড্ড ডিসটার্ব করছে ওরা। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। সেকেণ্ড বেঞ্চে বসে আছি, দরকারী কাজটা সেখানে গোপনে সেরে নেওয়া কিছুই না। খুবই সোজা। প্রণালীটা এইরকম—(১) ঝোলাব্যাগ থেকে সিগারেটের টিন বের করে (২) তা থেকে দুধে ভেজানো তুলো বের করে (৩) ঝোলাব্যাগ থেকে চামচিকের টিন বের করে (৪) একটি ঢাকনি ফাঁক করে (৫) তার ভেতরে ওই দুধের সলতেটা গুঁজে দিতে হবে। এখন ওরা নিজেরাই দিব্যি খেতে শিখেছে তুলো চুষে চুষে। খাইয়ে দিতে হয় না।

প্রথম কর্মটি, অর্থাৎ ঝোলাব্যাগ থেকে সিগারেটের টিন বের করা, নির্বিঘ্নেই

BanglaBook.org

সমাধা হলো স্যারের চোখের অন্তরালে। এবারে যেই ঢাকনিটা খুলে তুলো বের করব, বিশ্বাসঘাতক ঢাকনি হাত ফসকে মেঝেয় পড়ে গেল ঝন্‌ঝন ঝনাৎ। তার পরমুহূর্তেই ট্যাং-ট্যাং-ট্যাং...ট্যাং করে মহাউল্লাসে কাঁসরঘণ্টা বাজাতে বাজাতে চাকার মতো গড়িয়ে চলল কোণাকুণি মেঝে পেরিয়ে সোজা স্যারের দিকেই। স্যারের টেবিলের নিচে দিয়ে গলে গিয়ে পিছনের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে কাৎ হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। স্যার বই থেকে মুখ তুললেন। আমি বইতে মুখ নামালুম। কাতর। উদ্বিগ্ন।

—কী হলো? কী পড়ল ওটা?

—কিছু না স্যার।

—কিছু না মানে? কী পড়ল শব্দ করে?

—ঢাকনিটা, স্যার।

—কিসের ঢাকনি?

—টিনের।

—সে তো শব্দেই মালুম হচ্ছে। টিনটা কিসের?

—সিগারেটের।

স্যারের ভুরু জট পাকিয়ে গেল।

ঘরে দু'মিনিট শোকপালনের স্তব্ধতা। তারপরেই স্যারের কণ্ঠস্বরটি একেবারে অচেনা হয়ে এসে কানকে আঘাত করল—

—আই সী। ক্লাসের ভিতরেই আজকাল সিগারেটের টিন...

—আরে না না স্যার...ছি ছি ছি...য্যাঃ...তাই কখনো হয়? সিগারেট কেন হতে যাবে, ওটা তো তুলোর টিন। বলে ফেলে নিশ্চিন্ত হই। কিন্তু তুহিনশীতল একটি কণ্ঠ ভেসে আসে, হাড়ের ভেতরে কাঁপুনি জাগিয়ে দেয়—

—সিগারেট কেন হবে, তুলোর টিন? ডিড ইউ সে, তুলো?

—এ্যাঁ, হ্যাঁ, না স্যার, মানে, ঠিক তুলো নয়, আসলে ওটা হচ্ছে দুধের টিন।

যাক বাবা, সত্যি কথাটা জানিয়ে দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। কিন্তু স্যার যেন হঠাৎ হিমশৈল হয়ে আর্কটিক ওশ্যানে ডুবে যান। কেবল চুড়োটুকুই ভেসে আছে, বাকীটুকু সমুদ্রের গভীরে। খুব শান্ত গলায় ধীরে ধীরে কেটে কেটে বলেন—

সিগারেট মানে তুলো তার মানে দুধ? ক্লাসে ওটা দুধের টিন? টেল মী নবনীতা, হোয়াট ডু ইউ থিংক আই অ্যাম? অ্যান ইডিয়ট?

—ছি ছি ছি, এসব কী বলছেন স্যার? বিশ্বাস করুন দুধেরই তুলো। দুধের তুলো সিগারেটের টিনে। হেমকালে নেপথ্যে প্রবল কীঁ-ই-ঈ-চ কীঁই-ঈ-চ। স্যার চমকে ওঠেন।

—অমিয়, বেশ কিছুক্ষণ এই শব্দটা পাচ্ছি। কিসের শব্দ ওটা বল তো?

আমিই তাড়াতাড়ি বলে উঠি—ও কিছু না স্যার।

—তুমি চুপ করবে কাইগুলি? অমিয়, বল তো কিসের শব্দ ওটা?

BanglaBook.org

অমিয় চুপ। সমস্ত ক্লাস নিস্পন্দ। কপাল থেকে ঘামের ফোঁটাটি টেবিলে ঝরে পড়লে, তারও প্রতিধ্বনি উঠবে। এমন সময়ে নিস্তব্ধতা চিরে খুব জোরে অধীর শব্দ হয়—

—কীঁঈ ঈচ, কীঁ-চ কীঁ—চ...

স্যার অস্থির হয়ে পড়েন—"কিসের শব্দ? কিসের শব্দ ওটা?"—আমি আর থাকতে পারি না।

—এই ছানাতেই শব্দ করছে স্যার। এই যে এখানে আমার কৌটোর মধ্যে। একটু দুধ দিলেই থেমে যেত স্যার।

—"ছানার শব্দ? টিফিন কৌটোর মধ্যে ছানা অমন শব্দ করছে? দুধ দিলে সেটা থামত?"

স্যার খুব গম্ভীর হয়ে যান।—লুক হিয়ার ইয়ং লেডি, দিস ইজ অ্যান এডুকেশন্যাল ইনসটিটিউশন। অ্যাণ্ড দেয়ার শুড বি আ লিমিট টু এভরিথিং।

মনে মনে যেন শুনতে পেলুম—'এটা কি নাট্যশালা?' চোখের জল অতিকষ্টে আটকে রাখতে রাখতে আকুলকণ্ঠে ব্যাখ্যা করি—"এ ছানা সে ছানা নয় স্যার। এ চামচিকের ছানা—"

—চামচিকে? এই সদ্য তৈরি নতুন বিলডিঙে চামচিকের বাসা? কখনো চামচিকে থাকতে পারে এখানে? এখনও চুনকাম শেষ হয়নি—

—আছে স্যার, আছে। (নেপথ্যে কীঁঈঈচ)।

—কে শব্দ করছো, হাত তোলো। হাত তোলো বলছি, তিন মিনিট সময় দিচ্ছি।

কোনো হাত উঠল না। কিন্তু স্যারের হুঙ্কার চীৎকারে কীচকীচ আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গেল।—"থ্রি-মিনিটস ওভার কীঁ-চ কীঁ-চ হাত তুললে না কেন?"

—ওদের যে হাতই নেই স্যার।—আমি বলে ফেলি।

—উইল ইউ কীপ কোয়ায়েট? ফর হেভেন্স সেক।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল চিকচিকা। এবারে স্যার কান খাড়া করে শব্দ সন্ধান করেন।

—তোমরা কি বলতে চাও এ ঘরে সত্যি সত্যিই চামচিকে ঢুকেছে?

স্যারের ফর্সা মুখ রাগে লাল। কথা সরছে না। বয়সে বড়ো বলে তরুণই এ ক্লাসের সর্দার পোড়ো। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে—

এবারের মতো নবনীতাকে মাপ করে দিন স্যার, ছেলেমানুষ না বুঝে একটা দোষ করে ফেলেছে, আর করবে না। আস্তে করে স্যার বললেন, না বুঝে? না বুঝে নিজে আওয়াজ করে বলছে চামচিকের ছানা? না বুঝে ক্লাসের মধ্যে টিন পেটাচ্ছে?

এবার ক্লাসসুদ্ধ প্রতিবাদ করল, ও টিন বাজায়নি স্যার, ঢাকনিটাই তো পড়ে গেল।

BanglaBook.org

প্রণবেন্দু বললে, খাঁটি চামচিকের বাচ্চাই ডাকাডাকি করছে, ভালো করে শুনুন —নকল নয়।

—সত্যি সত্যি এখানে চামচিকে হয়েছে নাকি? স্যার এবারে মনে হয় বিশ্বাস করলেন। সন্দেহ ভঞ্জন করতে ভবানীদাকে ডাকেন—ভবানীদা এ ডিপার্টমেন্টের বেয়ারা এবং গার্জেন।

—ভবানী, এই ক্লাসরুমে নাকি একটা চামচিকে ঢুকেছে?

—এট্টা না ছার, দুইডা। এক্কেরে দুগ্ধ পোইষ্য। এই এত্তুটকু দুইডা। সস্নেহ হেসে ভবানীদা আমার দিকে তাকায়, যেন আমিই এত্তুটকুনি দুগ্ধপোষ্য চামচিকে। স্যার অবাক হয়ে ভবানীদা যে ইংরিজি জানে না সেটা ভুলে যান—

—ইউ মীন টু সে দেয়ার ইজ আ ফ্লিটার মাউস...

ফ্লিট? ফ্লিট দিয়া কী অইব? ফ্লিট দিলে তো চামচিকা যায় না। আর এ দুইডা তো দিদিমণির ব্যাগেই আছে। ওনার পোইষ্য পুত্র।

তরুণ বলে—ফ্লিট নয়, ফ্লিটারমাউস। যাক বাবা, একটা নতুন নাম শেখা হলো। চামচিকের ইংরিজি কি কেউ জানতে?

স্যারের গলার স্বর এখন বদলে গেছে। এমনিতেও স্যার খারাপ নন, বেশ ভালোমানুষই। তবে খামখেয়ালী।

—নবনীতা, তোমার কাছে চামচিকে আছে?

—আছে স্যার।

—সব সময় তুমি হ্যাণ্ডব্যাগে চামচিকে নিয়ে ঘুরে বেড়াও?

—সব সময় না স্যার। আজই কেবল। মা কিনা বলছিলেন ওদের ফেলে দেবেন, সেই ভয়ে—আমার চোখের জল আর রাখা যাচ্ছে না, গলা বুজে গেল।

—ক্লাসের ছেলেরা তখন—"কই? কই? দেখি দেখি কই চামচিকে? কোথায় চামচিকে? একটু দেখি স্যার? একবারটি দেখব স্যার?" ইত্যাদি বলে বেজায় হট্টগোল বাধিয়েছে। পড়ার বারোটা বেজে গেছে। স্যার অনুমতি দিলেন—

—ও. কে, লেট আস সী দেম। ভয়ে ভয়ে কম্পিত হস্তে ঝোলা থেকে বিস্কুটের কৌটো স্যারের টেবিলে রাখা হয়। এবার খোলা হবে। অল্প ফাঁক করতেই হঠাৎ জোরসে ডানা ঝটপটিয়ে তেড়ে বেরিয়ে এল ক্ষুধার্ত দুটো হতকুচ্ছিত ভূতের মতো প্রাণী, বীভৎস আওয়াজ করতে করতে সারা টেবিলে হামা টেনে গড়িয়ে বেড়াতে লাগল কালো কালো ডানা ছড়িয়ে।

সেই ভয়াবহ দৃশ্যে ক্লাসসুদ্ধ আঁতকে উঠল, সমবেত নিশ্বাসটানার আঁক করে একটা কোরাস আর্তনাদ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্যারের চেয়ার ঠেলবার কাঁচক্যাচাৎ শব্দ হলো—তিনি চেয়ারসুদ্ধ স্লিপ করে পিছিয়ে সড়াৎ করে গিয়ে দেয়ালের সঙ্গে ঠেকে গেলেন।

—গুড গ্রেশাস। হোয়াট আ সাইট। ফেলে দাও, এক্ষুনি ফেলে দাও। এই

BanglaBook.org

নাকি কোনো তরুণী মেয়ের হ্যাণ্ডব্যাগে রাখার জিনিস? অ্যাঁ?

ভয়ানক চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে ক্লাসের মধ্যে, সবাই যে যার জায়গা ছেড়ে উঠে স্যারের টেবিলের চারিপাশে জড়ো হয়ে চামচিকের ছানা দেখছে, এমন সময়ে ঘণ্টা পড়ে গেল। আমিও বাঁচলুম স্যারও বাঁচলেন। বেরুবার সময়ে তর্জনী তুলে আমাকে বলে গেলেন—আর কোনোদিন ওসব বিশ্রী জিনিস আনবে না। এক্ষুনি ফেলে দাও ওগুলো।

আমি ততক্ষণে আর চোখের জল চাপতে পারিনি। একঘর বন্ধুর সামনে হাপুস নয়নে ক্রন্দনে যত লজ্জা, তত অপমান—প্রেস্টিজ বলে কিছু রইল না। অতঃপর ঝোলাঝুলি কৌটোবাটা গুটিয়ে চক্ষু মুছে স্বগৃহে চম্পট, সেদিনের মতো ক্লাসে ইস্তফা। প্রতিজ্ঞা করলুম, এই অকৃতজ্ঞ জন্তুদের আর কোনোদিন কোথাও সঙ্গে করে নিয়ে যাব না।

কলেজের করুণ কাণ্ডকারখানা শুনে মারও দয়া হলো। মা ওদের খাবার দাবার দিতে রাজী হয়ে গেলেন। দিনে দিনে চিকা আর ফ্লিটার দিব্যি বেড়ে উঠল, বিস্কুটের টিনে আর আঁটে না, খাঁচায় ট্রান্সফার করা ঠিক হলো। পাকা কলা, পাকা পেয়ারা এইসব খায় এখন। ভাবছি ওদের গলায় দুটো কলার পরানো যায় কিনা, বেশ রংচঙে দেখে। সময়ে একদিন কলেজ থেকে ফিরে দেখি, যেখানে ওদের বাক্সটা থাকতো সেখানে পরিষ্কার কাগজ পাতা। ফাঁকা। কী হলো? খাঁচায় চলে গেল নাকি? কে ঢোকাল?

জিগ্যেস করতেই মা হৈ-হৈ করে উঠলেন

—ওরে বাবারে, খুকু, তোর পুষ্যিরা আজ আমাকে অ্যাটাক করেছিল। যেই ঢাকনাটা খুলেছি খেতে দেব বলে, অমনি দুজনে ডানা ঝটপটিয়ে তেড়ে এল। আমি তো হাত থেকে টিন-ফিন ফেলে দিয়েছি ভয়ে, আর অমনি চটপট উড়ে পালিয়ে গেল দুটোতে। যতই যত্ন কর, চামচিকে বলে কথা। ওরা কখনো পোষ কি মানে? দুঃখু করিস না তুই।

আমিও বুঝলাম, ম্যামাল হয়েও যে উড়ে বেড়ায়, যার ডানা আছে কিন্তু পালক নেই, সে কখনো বিশ্বাসী হতে পারে? আর এমন কৃতঘ্ন প্রাণীকে সংরক্ষণ করেই বা কী লাভ? মাকে যে আঁচড়ে-কামড়ে দেয়নি সেই রক্ষে।

আমাদের বাড়িতে প্রজেক্ট চর্মচটিকার সেইদিনই মহাপরিনির্বাণ ঘটে গেল।

এর পরেও কি আপনারা কেউ চামচিকে পুষতে চাইবেন? ওরা সত্যি-সত্যিই মনুষ্যেতর, অর্থাৎ মানুষের চেয়েও ইতর প্রাণী। জগতে যা দুর্লভ।

BanglaBook.org

প্রাণবিন্দুবাবুর খরগোশ

খরগোশ পোষা সহজ নয়। চাঁদের নাম শশধর। চাঁদের বুকে বিধৃত আছে যে জীব, তার মতো প্রমিনেন্ট আর কে? স্বয়ং ঈশ্বর তার ফোটো তুলে ফ্রেমে বাঁধিয়ে, লাইট ফিট করে, আকাশে টাঙিয়ে রেখেছেন। খরগোশ কি আর এই পৃথিবীর যোগ্য জীব? আজকের কবি তো তার উদ্দেশেই গেয়েছেন—"ঠোঁট দেখলেই বুঝতে পারি...এ পৃথিবী বিদেশ তোমার!" খরগোশ, বিশেষ করে অবিবাহিত একা খরগোশ—সত্যি সত্যি এক আশ্চর্য জীব। সে তো অন্য খরগোশ দেখতে পায় না, ডেজার্ট আইল্যাণ্ডে বেড়ে ওঠার মতো, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির মতো, সে ইনোসেন্ট থাকে। দ্যাখে কেবল কুকুর-বেড়াল, কাক-চড়ুই, গাড়ি-টেলিফোন, আর মানুষ। আর নিজেকে কখনো ভাবে এটা, কখনো বুঝি ওটা। ওদের কথা ভেবেই তো শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হয়েছে—"আত্মানং বিদ্ধি," know thyself ইত্যাদি। কিন্তু খরগোশ কি শাস্ত্র জানে? জানে না। তাই ওরা—এই গৃহপালিত, নিঃসঙ্গ, স্বজাতিচ্যুত, আত্মপরিচয়হীন খরগোশেরা—সর্বক্ষণ একটা অস্তিত্ববাদী সমস্যায় জর্জরিত হয়। অথচ জোড়া-খরগোশ পোষার মতো সাহস ক'জনের থাকে?

গরু পুষলে গরু দুধ দেয়, কুকুর পুষলে কুকুর বাড়ি পাহারা দেয়, বেড়াল পুষলে বেড়াল ইঁদুর তাড়িয়ে দেয়—খরগোশ পুষলে? খরগোশ আরো খরগোশ দেয়। এত খরগোশ দেয় যে শেষ পর্যন্ত খরগোশের বাড়িতেই মানুষরা বাস করতে থাকে। তাই জোড়া খরগোশ পোষা বড় ডেনজারাস। আর একা-খরগোশ পুষলেই সে একটা নিউরোটিক কেস হতে বাধ্য। হয় সে পাগল, নয় সে জিনিয়াস। নিউরোটিক পাগল খরগোশ আমি জীবনে অনেক দেখেছি। কিন্তু জিনিয়াস খরগোশ দেখেছি মাত্র একটিই।

জগতের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রাতঃস্মরণীয় সেই খরগোশ হলেন কবি প্রাণবিন্দুবাবুর পোষা খরগোশ 'সোনা'। তাঁর বয়স এখন সাত। এই সাত বছর ধরে তিনি যে কত কীর্তিই করলেন—তার সঠিক হিসেব বউদিও দিতে পারবেন না। বউদির নয়নমণি হলেন প্রথমে এই খরগোশ—এবং তারপরেই নেক্সট প্রাণবিন্দুবাবু। কবি হলেও, প্রাণবিন্দু লোক খারাপ নন—কেননা তিনি ভীষণ বেশি কুঁড়ে। মাছের কাঁটা বেঁদি বেছে না দিলে শুধু ঝোল দিয়েই ভাত খান, নস্যিটা নিয়ে ভুঁড়ি থেকে গুঁড়োটুকু ঝাড়েন না, কথাবার্তা খুবই কম বলেন (তাই পরনিন্দাও করা হয়ে ওঠে না), কেননা তাতেও কিছু কায়িক পরিশ্রম হয়ই, জিভ নড়ে, ঠোঁট নড়ে, চোয়াল নড়ে। তাঁর খরগোশ ঠিক এর বিপরীত। সে সদা-সর্বদাই নড়ছে। তার সূক্ষ্ম নাক নড়ছে, লেজ নড়ছে, চক্ষুতারকাদুটি নড়ছে, খুদে খুদে পায়ের সরু সরু আঙুলগুলো নড়ছে, তার সর্বাঙ্গ সর্বক্ষণ নড়নশীল। কর্মচঞ্চল, সদাসক্রিয় এই দুর্দান্ত শশকের তুল্য কুকুর-বেড়াল কি গরু-ছাগল কেন, ওরাংওটাং, গরিলা, ডলফিন, চামচিকে কিছুই আমি দেখিনি।

আপনি ভাবছেন বুঝি খরগোশ অকর্মণ্য? খরগোশ বাড়ি পাহারা দেয় না? এই খরগোশ দেয়। প্রাণবিন্দুবাবুর বাড়িতে একদিন গেলেই বুঝবেন। প্রথমে খরগোশই আপনার কাছে আসবে। রক্তচক্ষু মেলে, গোলাপী নাসিকা কুঞ্চিত করে, অতিথির আদ্যোপান্ত সে ঘুরে-ফিরে নেচে-কুঁদে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে পর্যবেক্ষণ করবে। যতক্ষণ না আপনি হয় ভয় পাচ্ছেন, নয় আদর করছেন। ভয় পেলে, ফাইন। নো প্রোবলেম। সেটাই তো সে চায়। তাতে তার অহং তৃপ্ত হয়, ইগো-র স্যাটিসফ্যাকশন ঘটে। ভয় পেয়ে "বাপরে-মারে-গেছি রে" করলেই সে খুশি হয়ে স্থানত্যাগ করবে। কিন্তু "ওমা, কী মিষ্টি," বলে যদি কোলে নেন? সর্বনাশ। অমনি সে কুটুশ করে আপনাকে কামড়ে দিয়ে পুটুশ করে পালিয়ে যাবে। কেননা আপনার আদর খাওয়া নয়, আপনাকে ভয় খাওয়ানোই তার উদ্দেশ্য। তখন সে নিজেকে অ্যালসেশিয়ান কিংবা বুলডগ ভাবছে। এই কারণেই তো প্রাণবিন্দুবাবুর বাঁ তর্জনীর নোখসুদ্ধ প্রথম কড়টি আলগা ঝুলে পড়েছিল বছর কয়েক আগে। সেই এই খরগোশের প্রথম এক্সপেরিমেন্টাল কামড়। নটা স্টিচ দিতে হয়েছিল হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রাণবিন্দুবাবুকে। আর ওরকম হয় না অবশ্য। কেননা বউদি নেলফাইলটা দিয়ে উকো ঘষে ঘষে ওর থোঁতা দাঁত ভোঁতা করে দিয়েছেন। নিজের ভুল বুঝতে পেরে সে আর বাড়ির কত্তাকে কক্ষনো কামড়ায়নি। তারপর থেকে কেবল বাইরের লোকদেরই কামড়ায়। তা বলে ভোঁতা দাঁতেও সে দিব্যি ভেলকি খেলাতে পারে। সেবারে যখন কলকাতায় খুব ডেঙ্গু হচ্ছিল, বাড়িতে অতিথিপত্তর তেমন আসছিল না কিছুদিন, ও তখন কামড় প্র্যাকটিস করতে করতে গোটা রেফ্রিজারেটরটাই বিকল করে ফেলেছিল। এত্তোবড়ো টেন কিউবিক ফিট জর্মন মেশিন, যেটা ছজন কুলি মিলেও নড়াতে বেগ পায়, অতটুকু প্রাণীর সেটা ভাঙতে মাত্র দশ মিনিট সময় লাগলো। ডেভিডের যেমন গোলিয়াথকে মারতে। কী, বিশ্বাস হলো না? প্রাণবিন্দুবাবুকে ফোন করে জেনে নিন (৭২-২০২৫ নম্বরে) সত্যি কিনা। একটা আস্ত রেফ্রিজারেটর নষ্ট করতে একটা খরগোশ অনায়াসেই পারে। রেফ্রিজারেটরের যেমন হৃৎপিণ্ড ধুকপুক করে, তেমনি তার একটি ল্যাজও লটকানো থাকে যে দেয়ালে! প্লাগের সঙ্গে। বউদির আহ্লাদী সোনামণি কামড়ে কামড়ে সেই তারটাকে কিমা বানিয়ে ফেলেছিল। আসলে সেই সময়টা দিয়ে কিছুদিন সোনা নিজেকে কুকুর না ভেবে "উই আর ইঁদুরের" সগোত্র বলে ভেবেছিল। ওকে ফ্রিজের পেছনে খুটখুট করতে দেখেছে সকলেই, কিন্তু কেউ কল্পনাও করেনি ওখানে কী ধরনের সাংঘাতিক সাবোটাজ কার্য সংঘটিত হচ্ছে। অবশেষে অপরাধী ধরা পড়লো। কুচি কুচি তার মেঝেময় ছড়ানো, ঠিক যেন খরগোশে কপিপাতা কুচিয়েছে। কোথায় ধমক লাগাবেন, তা নয়, বউদি খরগোশ কোলে করে হাপুস নয়নে কাঁদতে বসলেন..."ভাগ্যিস তখন লোডশেডিংটা ছিলো। নইলে ওরে আমার ছোট্ট সোনাটারে, ওরে আমার বুদ্ধু বোকাটা রে, এতক্ষণে তুই কোথায় থাকতিস? এই অলুক্ষুণে সব্বোনেশে এ. সি. এরিয়ায়? একি আমার ডি. সি.

কারেন্ট বাপের বাড়ি, ভবানীপুর, যে মনের সুখে ইলেকট্রিকের তার কুচোবি?" আর সেই দস্যি খরগোশ? সে ব্যাটা দিব্যি "বড্ড বেঁচে গিয়েছি বাবা" মুখটি করে গুটিশুটি কোলের মধ্যে বসে রইলো, যেন কিছুই করেনি।

এহেন খরগোশের আর ত্রিভুবনে অসাধ্য কী আছে? যার কল্যাণে লোডশেডিংটাও একটা ধন্যবাদের বস্তু হয়ে ওঠে?

জিনিয়াস হলেই যা সাধারণত হয়ে থাকে, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এ খরগোশ লোক মোটেই ভালো নয়। নিজের প্রতি পরম আত্মবিশ্বাস সত্ত্বেও সোনা বড় পর-অপকারী, হিংস্র এবং হিংসুটেও। তাছাড়া রাগী। এবং লোভী এবং পরের ব্যাপারে তার অতিরিক্ত কৌতূহল। সব-কিছুতেই গোলাপী প্রকম্প্র নাকটুকু গলানো চাই। আবার অভিমানীও আছে। উপরন্তু তার সাংস্কৃতিক রুচি অরুচিও টনটনে। কেবল সে যে জাতে আসলে খরগোশ, এইটাই তার জানা নেই। ফর্ম্যাল নাম যদিও 'সোনা', ঐ নামকে সে মোটেই পাত্তা দেয় না। যতই ডাকুন, "সোনামণিটা কই?" ভবি ভুলবে না। কিন্তু যদি বলেন..."খরগোশটাকে তো দেখছি না?" অমনি পড়ি কি মরি করে সোনা হাজির। ওর ধারণা, 'খরগোশ' ওর ব্যক্তিগত পরিচয়, ওরই একান্ত নিজস্ব নাম। খরগোশ বলে যে একটা জাতি আছে প্রাণিজগতে, এ সংবাদ ওকে কেউ দেয়নি। বউদি অবশ্য খরগোশকে খরগোশ বলে ডাকে, বা কবিকে কবি বলে ডাকা বা খঞ্জকে খঞ্জ বলা, পছন্দ করেন না।

অবশ্য সোনার নামটা সোনা না হয়ে বিচ্ছু হলেই যথাযথ হতো। বিচ্ছু বলে বিচ্ছু।

একে একে বলি।

এত হিংসুটে খরগোশ আমি আর দেখিনি। বাড়িতে কোনো বাচ্চা এলে বউদি তাকে কোলে নিলে আর রক্ষে নেই। খরগোশও ছুটে এসে কোলে উঠে জুড়ে বসবেই। তবে কেন জানি না, ছোটদের ও ক্ষ্যামাঘেন্না করে কামড়ায় না। শুধু কি চোখে দেখেই হিংসে? কানে শুনেও। টেলিফোনে কথা বলেন? খরগোশ অমনি টের পাবে। সে হয়তো আপনমনে বারান্দায় টবে উঠে ডালিয়া ফুলের নিচু ডালের কুঁড়িগুলি কুচিয়ে খাচ্ছিল...পড়ি কি মরি করে ছুটে আসবে ফোন করা হচ্ছে বুঝতে পারলেই। আর ফোনযন্ত্রের ওপরে ঝপাৎ করে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে 'ডু অর ডাই' স্টাইলে। ফোনযন্ত্রের সঙ্গে বউদির যোগাযোগ সে একদম সইতে পারে না। খরগোশকে আগে মোড়াচাপা দিয়ে রেখে, তবে ফোন করতে হয়। নইলে খরগোশ ফোনটাকে সবেগে আক্রমণ করে। আঁচড়ে কামড়ে নিজেরই নাকমুখ ছেঁচে ফেলে। ফলে ফোনের জন্যেই একটা খাঁচা বানিয়ে দিতে হয়েছে। খরগোশের কোনো খাঁচা নেই।

হ্যাঁ, ছেলেবেলায় অবশ্য ছিল। অনেকদিন ধরে চেষ্টা করেও যখন তারের জাল কাটতে পারলো না তখন অভিমানের চোটে জালে নাকটি ঘষে ঘষে রক্তগঙ্গা করলো। দুঃখে গদগদ হয়ে বউদি ওর জন্যে পাটকাঠি দিয়ে স্পেশাল খাঁচা বানিয়ে দিলেন।

BanglaBook.org

সেই ভেলভেটের মতো নরম কাঠিতে নাক ঘষলেও রক্ত পড়বে না। খরগোশ তো এদিকে ভীমভবানী, গোবরবাবু। পাটকাঠির খাঁচা পেয়ে সে দু মিনিটেই খাঁচা-টাঁচা ভেঙে বেরিয়ে বিজয়ী বীরের মতো মার্চ করে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলো। যেন প্রেসিডেন্সি জেল ভেঙে বেরিয়েছে!

সেই থেকে সোনা ছাড়াই থাকে। রাত্রে বউদির খাটে উঠে ঘুমোয়। ইদানীং ফোনের প্রতি তার হিংসে এত বেড়েছে যে ফোনের সময়ে সে যে অপকম্মোটি করে, সেটি লেখনযোগ্য নয়। ফোন বাজলেই হলো অথবা ডায়াল ঘোরানোর শব্দ হোক, অমনি খরগোশ দৌড়ে এসে বউদির শ্রীচরণে গরম গরম এক চামচ চরণামৃত ঢেলে, আরো দৌড়ে পালিয়ে যাবে। এই হচ্ছে তার শেষ অহিংস প্রতিবাদ—এবং দৃষ্টি আকর্ষণের শেষ পদ্ধতি। ধর্না ঘেরাও ফেল করলে ছাত্র-শ্রমিকরাও এ পদ্ধতিটা হয়তো ট্রাই করবেন ভবিষ্যতে। একে জিনিয়াস ছাড়া কীই-বা বলা যায়?

সোনার কল্পনার শেষ নেই। বিকেলে চারটে বাজলেই সোনা চায়ের টেবিলে ঘুরঘুর করতে থাকে। প্লেটে করে তাকে একটু চা ঢেলে না দিলে সে প্রাণবিন্দুবাবুর কাপের ওপরেই হামলে পড়ে। জানে কিনা, যে তিনি মানুষটি কড়ে...অত কষ্ট করে খরগোশ-টরগোশ তাড়িয়ে চা খাবার মতো পরিশ্রমে অপারগ প্রাণবিন্দুবাবুর চা-টি খেয়ে নিয়েই সে সোজা আলমারির কোণে চলে যায়। এবং তারপরেই ফুলঝাড়ু খাওয়ার খচর মচর শব্দ হতে থাকে সেখানে। চা দিয়ে ফুলঝাড়ু খাওয়ার ওর একটা শৌখিন অভ্যেস। নেশাই বলা যায়। নেশায় মানুষ কি না করে? নেশার কবলে পড়ে মানুষই মানুষের সর্বনাশ করে ফ্যালে, আর এ তো সামান্য খরগোশ। ও যে নেশার ঘোরে মানুষের সর্বনাশ করবে এ তো সোজা কথা। লোকে কেবল মদের নেশার কথাই শোনে...কিন্তু চায়ের নেশাও যে কতদূর সর্বনেশে হতে পারে, আমরা তা বুঝলুম এই খরগোশকে দেখে। প্রাণবিন্দু-বউদির ছোট বোনের অত চমৎকার সম্বন্ধটি ভাঙলো কেন? এই নেশাড়ু খরগোশের জন্যেই তো।

মেয়ে দেখতে এসেছিলেন পাত্রের কাকা-কাকিমা আর দিদি। বউদি, বউদির বোন, প্রাণবিন্দুবাবু, সকলেই উপস্থিত আছেন, আমরাও রান্নাঘরের কাছাকাছি ঘুরেফিরে উপস্থিত আছি, যেহেতু প্রাণবিন্দুবাবুর মা, জেঠিমা সেই ঘরে খুব ব্যস্ত, নানারকম প্রাণমাতানো দরকারী গন্ধ বেরুচ্ছে। খাওয়া-দাওয়া গল্প-গুজব বেশ জমেছে, এমন সময়ে বউদির বিয়ের দান-এ পাওয়া শৌখিন বিলিতি টী-সেটে সোনার বর্ণ চা এলো। পাত্রের কাকা চায়ের কাপটি মুখে তুললেন, কাকিমা চা হাতে নিয়ে গল্প করছেন, ঠিক মুখে তুলবেন, এমন সময়ে সোনা কোথা থেকে তেড়ে এসে ভীমবিক্রমে তাঁর কাপের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়লো। মোড়াচাপা দিয়েই রাখা হয়েছিলো তাকে...এই অসময়ে তার বেরুনোর কথা নয়। কিন্তু তালেগোলে কে কখন মোড়াটা সরিয়ে ফেলেছে। আর যায় কোথায়? সোনা সোজা চায়ের টেবিলে। খরগোশের এই ব্যাঘ্র ঝম্পনে বরের কাকিমার হাত থেকে বিলিতি কাপ মেঝেয় পড়ে ঝনঝন

BanglaBook.org

করে ভেঙে গেল। ভাঙবার আগে খানিক চা ছলকে পড়ল পাত্রের দিদির ঢাকাই জামদানিতে।

সঙ্গে সঙ্গে তিন দফা প্রচণ্ড হায়-হায় হা-হা রব—আর এক দফা ঝর্ণার মতো খিলখিল হাসি শোনা গেল। আমরা দরজার কাছে দৌড়ে এলুম। কী ব্যাপার?

ব্যাপার চাররকমের এক = বউদি তাঁর বিয়ের বিলিতি কাপ ভাঙার দুঃখে ডুকরে উঠলেন (পাত্রপক্ষের সামনে এটা ভুল ট্যাকটিস হয়ে গেল)।

দুই = পাত্রের দিদি তাঁর ঢাকাই জামদানিতে চা পড়ে দাগ লেগে যাবার শোকে বিলাপ করে উঠলেন।

তিন = পাত্রের কাকিমার পায়ে গরম চায়ের প্রবল ছ্যাঁকা লাগলো বলে তিনি যন্ত্রণায় কাতরে উঠলেন।

এবং চার = পাত্রীটি নিতান্তই ছেলেমানুষ, হঠাৎ এই খরগোশের কীর্তিকলাপে, এবং ত্রিমূর্তির কোরাস-হা-হুতাশে সে খিলখিল করে হেসে লুটিয়ে পড়লো টেবিলের ওপরে। আর তাকে কিছুতেই থামানো গেল না। হাসতে হাসতেই সে ঘর ছেড়ে দৌড়ে পালিয়ে এলো আমাদের কাছে। আর সোনা? লাফিয়ে লাফিয়ে ব্যস্তসমস্তভাবে প্রত্যেকের কাপ থেকে নিরপেক্ষভাবে চা চেখে বেড়াতে লাগলো। যেন সে মকাইবাড়ির মহামান্য টী টেস্টার। বলাবাহুল্য শাঁসালো সম্বন্ধটা সেই যে ভেঙে গেল, চায়ের কাপের সঙ্গে সঙ্গে—আর জোড়া লাগলো না।

এহেন সর্বনেশে ধানীলঙ্কা খরগোশ কী না পারে? জার্মান ফ্রিজ, বিলিতি কাপ, বাঙালীর ঘটকালি এসব তো সে চকিতেই ভাঙতে পারে, কিন্তু দোতলা থেকে পড়ে গিয়েও নিজের মাথাটি ভাঙে না। অথচ পুপলুর অত সুন্দর বিলিতি খরগোশটা তেতলা থেকে পড়ে গিয়ে মরেই গেল। ও ছিল ক্ষীণজীবী। আর সোনা, ক্ষণজীবী। খরগোশদের ভি. আই. পি. সে।

—সোনা হলো খরগোশদের বিদ্যেসাগর, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ।

একবার প্রাণবিন্দুবাবুদের বাগানে জোড়া কেউটে ধরা পড়েছিল। বৌদি দোতলার বারান্দা থেকে সাপ-মারা দেখছেন, সোনাও রেলিঙে চড়ে সাপ-মারা দেখতে গেল। এবং বেশি ঝুঁকতে গিয়ে মোটা শরীর, ক্ষুদে ক্ষুদে সামনের পা নিয়ে তাল সামলাতে না পেরে ঝপাং করে সাপ-মারা ভিড়ের ঠিক মধ্যিখানে, কালসর্পের মুখের সামনে গিয়ে পড়ল। বউদি 'গেল গেল' বলে আর্তনাদ করে চোখ বুজলেন। চোখ খুলে দেখলেন সোনা তাঁর পাশে। যেন খোদ হুডিনি কিংবা পি. সি. সরকার। আবার যথাপূর্বম রেলিঙে উঠে এসে বাগানে সাপ-ঠ্যাঙানোর দৃশ্য দেখছে মন দিয়ে। একই পোজ। যেন কিছুই ঘটেনি। অথচ খরগোশ তো আর বিড়াল নয়, তবু দোতলা থেকে পড়েও তার কিছু হলো না! এই আজব দৃশ্যে কেউটে সাপ দেখার চেয়েও বেশি করে গায়ে কাঁটা দিয়েছিল আমাদের। কেউটেরাও ঐ শক-এর জন্যই বোধহয় এক-একঘায়েই খতম হয়ে গেল।

BanglaBook.org

এই সোনার নন-কনফরমিস্ট জৈব প্রকৃতির দাপটে সারাটা পাড়া সরগরম। বাচ্চারা দিলে, সে চকোলেট খায়। চিকলেট খায় না। বড়োরা দিলে, সে হুইস্কি খায়। তবে একচুমুকের বেশি না। মাতলামিও করেনি কখনো। রাম-বিয়ার ছোঁয় না। মাছ-মাংসে অবশ্য একদম রুচি নেই সোনার। একবারই কেবল প্রাণবিন্দুবাবুর মাগুর মাছের ঝোল থেকে বেড়ালের দেখাদেখি বেগুনটা তুলে খেয়েছিল, এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে। গাঁদালপাতাটা বাদ দিয়ে। আর ওসব ছোঁয়নি। সাধারণভাবে আমরা সবাই তো জানি যে খরগোশরা মূকপ্রাণী, অবোলাজীব, বোবা জানোয়ার। সাত চড়ে 'রা' কাড়ে না। একদিন ঐ কুঁড়ে প্রাণবিন্দুবাবু ছুটে ছুটে এলেন আমাদের বাড়িতে—অসম্ভব উদ্বিগ্ন, বিচলিত। কী ব্যাপার? না বউদি বাড়ি নেই—ইতিমধ্যে, খরগোশ ওঁর টেবিলে উঠে নতুন লেখা কবিতাটা খাচ্ছিল, কবিমশাই আর না পেরে বিরক্ত হয়ে হাতের টিপে ধরা নস্যির গুঁড়োটাই ছুঁড়ে ওকে মেরেছেন। ফলে খরগোশ ঠিক মানুষের মতো গলায় বিকট আর্তনাদ করে উঠেছে। প্রাণবিন্দুবাবু ওকে এই একই অপরাধের জন্য আগে আগে বেশ কয়েকবার কলম ছুঁড়ে, খাতা ছুঁড়ে এবং একবার নস্যির ডিবে ছুঁড়ে মেরেছেন (অবশ্যই বউদির আড়ালে), তাতে ওঁর কলমের নিব ভেঙেছে, খাতার বাঁধন আলগা হয়ে গেছে এবং রুপোর ডিবেটা তুবড়ে গেছে। কিন্তু খরগোশের কিস্যু হয়নি। খরগোশেও যে শব্দ করতে পারে, এমন কথা প্রাণবিন্দুবাবু কস্মিনকালেও শোনেননি। সোনার তীক্ষ্ণ আর্তনাদে ভীষণ ভয় পেয়েছেন তাই। আবার সেই সপ্তাহেই গ্লোবে না লাইট হাউসে ওরা একটা ভূতে-পাওয়ার ইংরিজি সিনেমা দেখে এসেছেন। প্রাণবিন্দুবাবু যদিও জানেন মানুষদের ভূত নেই, বা থাকলেও কিছু এসে যায় না—তবু কি জানি, খরগোশদের বেলায় তো কিছু বলা যায় না। খরগোশদের প্রেতচর্চা তো কোনো মানুষেই করেনি। এই খরগোশ কি তবে 'পজেসড'? একি ভূতে-পাওয়া খরগোশ? এই স্বর কি প্রেত-আরোপিত কণ্ঠ? একে কি ওঝা ডেকে ঝাড়ানো উচিত? অনেক ভেবে-চিন্তে শেষকালে আমি ওঁকে বললুম—"মূকং করোতি বাচালম" শ্লোক শোনেননি? তবে অতো ভয় কিসের? —ওটা ভূতে পাওয়া নয়—ওটা আসলে ভগবানে পাওয়া। পরমানন্দ মাধবের কৃপা হয়েছে সোনার ওপর। 'ভর-হওয়া' বলে না? ওর বোধহয় তাই হয়েছে। যখন মনে হলো এই ব্যাখ্যাটা প্রাণবিন্দুবাবুর কবিমনে প্রায় ধরেছে, ঠিক এমনি সময়ে বাজার করে বৌদির প্রত্যাবর্তন। ব্যাপার শুনে একটুও না চমকে বউদি চোখ পাকিয়ে বললেন—"আহা হা, মরে যাই। সোনার অমন কচি নাক, তাইতে ঐ কড়া নস্যির ঝাঁঝ গেলে হেঁচে দেবে না বেচারা? একটু হাঁচবারও যো নেই? অমনি ভূত-ভগবান নিয়ে টানাটানি শুরু করেছো?"—সাপের হাঁচি যেমন বেদেয় চেনে খরগোশের হাঁচি বউদিতে।

শুধু কি তাজা কবিতাতেই সোনার রুচি? উঁহু, আরো আছে। সোনার কালচারাল অ্যাকটিভিটির দিকটা মোটেই ফ্যালনা নয়। প্রাণবিন্দুবাবু আর্ট ক্রিটিক, ছবির কদর

আছে ওঁর কাছে। বাড়িভর্তি ওরিজিন্যাল ছবি ঝুলছে। সোনার ওদিকে আজকাল তেমন নজর নেই। আগে ছিল, যথেষ্টই। একবার একজন অল্পবয়সী শিল্পী তাঁর কিছু ছবি রেখে গিয়েছিলেন প্রাণবিন্দুবাবুর কাছে বেচে দেবার ব্যবস্থা করতে। সোনারই দৌলতে তার দুটি ছবি প্রথম দিনেই বিক্রি হয়ে যায়। সোনার খুবই পছন্দ হয়েছিলো। মাটন রোলের মতো করে গোটানো ছবিদুটি সুস্বাদু লেগেছিল—প্রাণবিন্দুবাবু যখন ধরে ফেললেন, তখন আর তাঁর ছবিদুটো কিনে নেওয়া ভিন্ন গতি ছিল না, উচ্ছিষ্ট ছবির ছিবড়েয় টেবিলের তলা ভরে উঠেছে। সেই থেকে, ছবি-টবি থেকে সোনাকে দূরে দূরে রাখা হয়।

কিন্তু গান-বাজনায় সোনার উৎসাহ এখনও অপরিসীম। বউদি কোন বইতে যেন পড়েছিলেন লাল-চোখো খরগোশরা বধির হয়। সোনার চক্ষু রক্তবর্ণ হলে কি হবে, সে মোটেই বধির নয়। সেই থেকে বউদি আর ছাপার হরফে কিছু লেখা দেখলেই সেটাকে অবিশ্বাস করেন। রেকর্ডের ভোক্যাল অর্থাৎ মানুষে গাওয়া গান সোনা মোটে সহ্য করতে পারে না, কিন্তু যন্ত্র-সঙ্গীত শুনতে খুব ভালোবাসে। যতক্ষণ রেকর্ড চলবে, হিজ মাস্টার্স ভয়েসের ছবির মতো গ্রামোফোনের সামনে হিঠাসহকারে পিছন ফিরে বসে থাকবে, সোনা, সমাধিস্থ হয়ে। যেন ভবতারিণীর সামনে রামকৃষ্ণদেবের মূর্তি। প্রাণবিন্দুবাবু আর বৌদি দুজনেই এই দৃশ্যটি অতিথিদের দেখিয়ে মজা পান। "একটা মজা দেখবেন?" বলে গ্রামোফোনে যাহোক একটা বাজনা লাগিয়ে দেন—রবিশংকর অথবা পাবলো কাসালস যাই হোক, অমনি সোনা যেখানেই থাকুক ছুটতে ছুটতে এসে যোগাসনে বসে যাবে। কিন্তু অতিথির অবাক হবার আরো কিছু বাকী আছে—মাঝপথে ঐ বাজনা তুলে নিয়ে, প্রাণবিন্দুবাবু ম্যাজিশিয়ানদের মতো পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে বলেন—"এবার দেখুন!" তারপর ভোক্যাল লাগান। সাইগল যেই বলেন—"একটুকু ছোঁওয়া লাগে", অমনি শিউরে উঠে একলম্ফে সোনা পগার-পার। অবশ্য এ ব্যাপারে শচীনকর্তা, কি লতা মুঙ্গেশকর, বব ডিলান, কি মরিস শেভালিয়ের সবাই সোনার কাছে সমান। হয়তো এমন হতে পারে যে যন্ত্র থেকে যন্ত্রসঙ্গীত বেরুচ্ছে এটা তার কাছে স্বাভাবিক লাগে, কিন্তু যন্ত্র থেকে অদৃশ্য মানুষের কণ্ঠস্বর বেরুচ্ছে—এতে তার ভয় করে। তা কারণটা যাই হোক, স্পষ্টতই সঙ্গীত বিষয়ে সোনার স্বকীয় মতামত আছে। নস্যি ঝাড়তে ঝাড়তে প্রাণবিন্দুবাবু মৃদুমন্দ হাস্য করেন আর বলেন—"ওর বেশ পছন্দ আছে। কী বল?" বউদি তাই শুনে চায়ের কাপে চামচ নাড়তে নাড়তে বলেন—"যততো আদেঁখলেপনা!"

দুদিন হলো প্রাণবিন্দুবাবুর চশমাটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বউদি খুঁজছেন, কেষ্ট খুঁজছে, ঠাকুর খুঁজছে, ঠিকে-ঝিও খুঁজে গেল, আমরাও যে-ই যখন যাচ্ছি, যে যেমন করে পারছি সারা বাড়িটা ঘেঁটে-ঘুঁটে চশমা খুঁজছি।—কতো কি হারানো-জিনিস বেরিয়ে পড়লো, না দেওয়া ইলেকট্রিক বিল, পাঁচ বছর আগে আমাদের বাড়ি থেকে ধার করা তিনখানা গল্পের বই, প্রাণবিন্দুবাবুর ঠাকুর্দার হিসেবের খাতা—

কিন্তু চশমা আর বেরোয় না। চশমাবিহনে প্রাণবিন্দুবাবু বিনা খরচেই চোখে দার্জিলিং দেখছেন। চারদিকে মেঘ মেঘ কুয়াশা কুয়াশা মনে হচ্ছে। প্রথম বউদিই লক্ষ্য করলেন —খরগোশ দুদিন ধরে মাঝে মাঝেই ভারী কেবিন ট্রাঙ্কের পিছনে সরু হয়ে হয়ে গলে ঢুকে যাচ্ছে। কেন রে বাবা? কী হচ্ছে ওখানে? ঐ দুরমুশ ট্রাঙ্কের পিছনে হাতও যায় না, চোখও যায় না, কেবল ওই সর্বনেশে খরগোশই যেতে পারে, ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে। কেষ্টতে আর ঠাকুরে মিলে ট্রাঙ্কটা টেনে হিঁচড়ে সরালো। সরাতেই সেখান থেকে পাঁই পাঁই করে ছুটে বেরুলেন—কে? একদলা ধবধবে পশমের বল, সোনা। কিন্তু সিংগল খরগোশে তো বাসা বাঁধে না? ব্যাপার কী? কী করছিল ওটা ওখানে? ট্রাঙ্কের পিছনে জমে থাকা ধুলো ময়লা ঝুলের স্তূপের মধ্যে প্রাণবিন্দুবাবুর চশমার খাপ। হংকং থেকে আনা সিল্ক-ব্রোকেডের তৈরি খাপটাকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে খরগোশ লুকিয়ে লুকিয়ে নিষ্ঠাভরে কুচি কুচি করছিল। চীনে ব্রোকেড বোধহয় খেতে ভালো! কী ভাগ্যি, ভোঁতা বলে চশমা পর্যন্ত তখনো দাঁত পৌঁছায়নি। তারপর বউদি একটা হাঁক পাড়লেন—"সোওনা—হ", কেউ এল না। বৌদি বললেন, "নচ্ছার খরগোশটাকে একেবারে ছুঁড়ে ফেলে দেব হাওড়ার ব্রীজ থেকে—আমাকে জ্বালিয়ে মারলে এই খরগোশ।" অমনি সাদা বিদ্যুতের মতো একটা কিছু খাটের তলা থেকে বেরিয়ে "শশব্যস্তে" বারান্দায় পালালো। বউদিও ছুটলেন পিছু পিছু। "আয়, আজ তোরই একদিন, কি আমারই একদিন!" খরগোশ একবারটি কেবল মুখ ফিরিয়ে বৌদির দিকে চাইল—সেই লাল চোখ ভর্তি কেবল অভিমান—তারপর ঝপাৎ করে ঝাঁপ দিল। বৌদি হায় হায় করে উঠলেন। কিন্তু ততক্ষণ খরগোশের সুইসাইড করা কমপ্লিট।

হলে কি হবে, রাখে কেষ্ট, মারে কে? ঠিক তখনই নিচে শাড়িতে মাড় দিয়ে দুজনে দুকোণ ধরে টানটান করে ঝেড়ে নিচ্ছেন কাকিমা আর জ্যেঠাইমা। সোনা গিয়ে পড়লো ঠিক সেই শাড়ির মধ্যিখানে। যেন দোলার ওপরে জগন্নাথ! তারপরই একলাফে মাটিতে। তারপর কে জানে কোথায় উবে গেল। একেবারে জেমসবণ্ডের মতন।

চশমা খোঁজার পালা শেষ হয়ে অতএব ও-বাড়িতে শুরু হলো খরগোশ খোঁজার পালা। সত্যি! গেল কোথায় ব্যাটা? তিনদিন কেটে গেল। প্রাণবিন্দুবাবু ঘন ঘন নস্যি নিয়ে জামাকাপড় নস্যিবর্ণ করে ফেলেছেন। বউদি শয্যা নিয়েছেন। আমরা ও-বাড়ি গেলে চা-টা কিছু পাচ্ছি না। আমি ভাবছি এবারে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবো —"সোনা, যেখানেই থাকো, ফিরে এসো, বউদি তোমাকে হাওড়ার ব্রীজ থেকে ফেলে দেবেন না—।" এমন সময়ে কেষ্ট একদিন সকালে ছাদে গিয়ে দ্যাখে ছাদভর্তি খরগোশের সদ্যকৃত প্রাতঃকৃত্য। যেন গোলমরিচের বন! তারপরেই দ্যাখে চিলেকুঠুরির গোল নর্দমা দিয়ে সোনা তড়বড়িয়ে ঘরের মধ্যে পালালো।

ছুটতে ছুটতে নিচে এসে খবরটা ঘোষণা করে দিতেই শয্যাত্যাগ করে কপিপাতা

BanglaBook.org

হাতে বউদি ছাদে ছুটলেন। খরগোশের বিষ্ঠা দেখে কোনো মানুষের কখনো এত আনন্দ হতে পারে তা আমার ধারণা ছিল না।

—এই তো! আমার সোনা এইখানেই আছে! সোনা। সোনা।

সোনা মোটেই বেরুলো না। তার বুঝি মান-অভিমান নেই? অগত্যা চিলেকুঠুরির তালা খুলে ঢোকা হলো। কিন্তু জিনিস-পত্তরে এমনই ছাদ পর্যন্ত ঠাসা সেই ঘর, যে তার ভিতর থেকে একমুঠো একরত্তি একটা খরগোশকে খুঁজে বের করা ফেলুদারও অসাধ্যি!

দু ঘন্টা বাদে বউদি যখন কপিপাতা আর চায়ের কাপ হাতে নিয়ে কান্না কান্না গলায় বললেন—"বাছা আমার তিনদিন কিছু খায়নি—শুকিয়ে রয়েছে! হায়রে! খরগোশটাকে আর বোধ হয় ধরে রাখতে পারলুম না"—অমনি লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এল সোনা। এসেই সোজা বউদির কোলে। তার মুখময় প্রচুর তুলো লেগে আছে। অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মতো দেখাচ্ছে। চিলেকুঠুরিতে তোলা একাট্টা বালিশ বিছানাগুলো তিনদিন ধরে খেতে খেতে ও তখন ক্লান্ত। অরুচি ধরে গেছে। এখন বউদির হাতের গরম গরম এক কাপ চা নইলে আর চলছে না। আর তারপরই চাই প্রাণবিন্দুবাবুর হাতের টাটকা দু পীস কবিতা। আ—হ!

BanglaBook.org

ডক্টর দেবসেনের বিদেশ যাত্রা

আচ্ছা, ছোট একটা প্রাণের কথা আমাকে গোপনে বলবেন? কাগজটা মেললে যেই চোখে পড়ে কেউ "বিশেষ আমন্ত্রণে এতদিনের জন্য বিদেশ যাত্রা করিয়াছেন", অমনি বুকের ভেতরে একটা বিশ্রী জ্বালা জ্বালা ভাব হয় না? অন্তত যৎসামান্যও? এই সব বিশিষ্ট আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের ছবিও ছাপা হয় মাঝে মাঝে। রাগী-রোগা-বদহজমী-গান্ধী টুপি কিংবা ট্যারা-টেকো-টাইবাঁধা হাসি হাসি—ইত্যাদি। তলায় আবার ব্রাকেটে কখনো কখনো কীসব রহস্যময় নম্বরও লেখা থাকে A-1234 ইত্যাদি। (লক্ষ করে দেখেছি সিরিয়াল নম্বরটা সর্বদাই 'A'-তে আটকে থাকে, কদাচ 'B' হয় না)। জগতের যাবতীয় হরিদাস পালেরাই এখন "প্রসিদ্ধ ব্যক্তি", যদিও তাঁদের নাম তাঁদের পাশের বাড়ির লোকেদের পর্যন্ত জানা নেই। এঁরাই অনবরত "বিশেষ আমন্ত্রণে বিদেশ যাত্রা" করেন। কী আর বলব লজ্জার কথা, এই শ্রীমতীও সেই অধম যাত্রীদের একজন। নাঃ, বিদেশ যাত্রার আর মান সম্মান রইল না।

শুনেছি নাকি আমন্ত্রণকর্তা যদি কেজিবি কিংবা সিয়া হন, তাহলে ভ্রমণটা

নির্ঝঞ্ঝাটে সারা হয়। কিন্তু যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকে কনফারেন্সে যায়-টায়? তাদের দুঃখু-কষ্টের বাপ-মা নেই। যেসব 'ঢাউস' ভ্রমণ কাহিনী আমরা পড়ি (চোদ্দ দিনে চব্বিশ ফর্মা) তাতে এসব অকাব্যিক দিকগুলো লিখে, জায়গা নষ্ট করা হয় না। সেখানে কেবলই জয়ধ্বজা আর পুষ্পবৃষ্টি। আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে তো প্রতি পদক্ষেপেই অক্ষয় প্রেমের প্রস্ফুটন। দিব্য বিভায় উদ্দীপ্ত সেসব কাহিনী পড়ে আপনারাও হয়তো আমার মতোই মোহ-মাৎসর্য ইত্যাদি রিপুতাড়িত হয়ে বৃথা যন্ত্রণা ভোগ করেন। কেননা আসল খবরগুলো কেউ জানতেই পারে না। তাই ঠিক করেছি পিওর হরিদাস পালেদের বিদেশ যাত্রার একটা বাস্তব চিত্র আপনাদের কাছে পেশ করব। খাঁটি নির্ভেজাল সত্য তথ্য মশাই। ট্রুথ ইজ লাইভলিয়ার দ্যান ফিকশন। অনেকগুলো দরকার নেই, ডক্টর দেবসেনের যে-কোনো একটা ট্রিপের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ একবার শুনলেই ওই বুক-জ্বালা-করা ব্যারামটা একেবারে সেরে যাবে। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। এর পরে স্বস্তিপূর্ণ গৃহাবস্থানের সাত্ত্বিক আরাম উপলব্ধি করবেন দেহে মনে, কাগজের "বিদেশ যাত্রা" সংবাদ আপনার শান্তিভঙ্গ করতে পারবে না, কথা দিচ্ছি।

১

শুরুটা ঠিক কীভাবে করব বুঝতে পারছি না। সেবারের ফ্রান্সে যাব কানাডায় যাবার বেলাটায় বলি। বেশি বেশি ভ্রমণ, তাই বেশি বেশি দুর্ঘটনা। সালটা ১৯৭৩, কানাডায় কম্পারেটিভ লিটারেচার কনফারেন্স, প্যারিসে ওরিয়েন্টালিস্টস কংগ্রেস, আর লণ্ডনে রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির একশ ষাট বছর পূর্তির সেমিনার। প্রথম দুটিতে ডক্টর দেবসেন আমন্ত্রিত বক্তা হয়ে। তৃতীয়টিতে শ্রোতা হবার নিমন্ত্রণ।

যাবার ঠিক পাঁচদিন আগে, যখন সব স্থির, ভিসা-টিসা হয়ে গেছে, পেপার-টেপার তৈরি, হঠাৎ পাসপোর্টটা হারিয়ে গেল।

ব্রিটিশ হাইকমিশনে একটা ফর্ম ভরতে দিয়েছে, কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে সবাই সেই ফর্ম ভরছি এক-একজন করে। হাতের পাসপোর্টটা আমার ঠিক পিছনের ভদ্রলোকের হাতে একবার ধরতে দিলুম, যতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লিখছি। এমন সময় কানে এল আমার নাম ডাকা হচ্ছে, অমনি আমি ফর্মটর্ম সুদ্ধ শাঁ করে Entrance লেখা দরজা দিয়ে সবেগে ঢুকে গেলুম। কাজ চুকে যেতে Exit লেখা দরজা দিয়ে বেরিয়ে, দে-দৌড় সোজা যাদবপুর। তক্ষুনি এম.এ. ফাইন্যাল ইয়ারের ক্লাস। পড়াতে পড়াতে আচমকা মনে পড়ল— "আমার পাসপোর্ট?" ঘণ্টা পড়তে তখনও, তারপরেও পুরো পনের মিনিট দেরি। সেই শেষ পনেরো মিনিট যেন দ্রৌপদীর শাড়ি হয়ে উঠল। অফুরন্ত কাল। শ্রীরাধিকা যেন কেঁদে বলে গেছেন একে ডেকে —হে পিরিয়ড, তুমি পোহায়ো না, হে ঘণ্টা, তুমি বাজিয়ো না। ঘণ্টা যখন শেষ অবধি বাজল, আমি ছুটে গেলুম ফোনের ঘরে। না, ব্রিটিশ হাইকমিশনে আমার পাসপোর্ট জমা পড়েনি।

BanglaBook.org

তার পরের দুদিন ধরে বিশুদ্ধ বকুনি। শুভার্থী আত্মীয়-স্বজন বললেন—"ছি ছি ছি, জানো না আজকাল স্মাগলিঙের জন্য কী রকম পাসপোর্ট চুরি যাচ্ছে? আর তুমি কিনা চোরের হাতে ওটা ধরিয়ে দিয়ে এলে?"—বন্ধুরা টিটকিরি দিল —"তুই তোর যোগ্য কর্মই করেছিস। তোর কাছে এর চেয়ে অন্য আর কী আশা করা যায় বল? টিকিটটাও কাউকে গছিয়ে আসিসনি তো, ভালো করে ভেবে দ্যাখ।" কেবল মা বললেন—"যে যাই বলুক, ও হারাবে না। ঠিক পাবি। তুই বাক্স গুছো।" তিন দিনের দিন বি. ও. এ. সি. এয়ারলাইন্স থেকে ফোন এল, তাদের এক যাত্রী ওটি ওদের হাতে জমা দিয়ে বিলেত চলে গেছেন। যৎপরোনাস্তি ধন্যবাদ দিয়ে পাসপোর্ট ফেরত আনতে গেলুম।

সেখানে গিয়েও বকুনি আর বকুনি। প্রত্যেক কর্মচারীই এসে কোনো-না-কোনো অজুহাতে একবার করে আমাকে দেখে যাচ্ছেন; পাসপোর্ট-দাত্রী এমন কলির কর্ণকে কে না দেখতে চায়? সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেই একটা করে "ফ্রী ফ্রেণ্ডলি অ্যাডভাইস" দিতে ছাড়ছেন না, এমন কি চা দিতে এসে বেয়ারাটি পর্যন্ত বলে গেল—"দিদিমণি, আপংকরু পাসঅ পরঅটঅ কিমিতি ভুলি গলা পরা?" চোরের ওপর লোকে যেমন হাতের সুখটা মিটিয়ে নেয়, পাসপোর্ট-খুইয়ের ওপর তেমনি জিভের ঝালটা ঝেড়ে নেয় সবাই। অন্তর্নিহিত ভাবখানা: এমন একটা গুড ফর নাথিং জরদ্গবকে পাসপোর্ট দেওয়াই বা হয় কেন, তারা বিদেশেই বা যায় কেন? জগতে এত শত স্মার্ট লোকেরা যেতে পাচ্ছে না যখন? একেই বলে অবিচার।

২

যাক, পাসপোর্ট তো পাওয়া গেল, নেক্সট হারাতো আমার দ্বিতীয় পেপারটি। একটু আগেই টাইপিস্ট দিয়ে গেছেন। সারাবাড়ি তোলপাড়, খুঁজতে খুঁজতে আমার ক্লাস সিক্সের অঙ্কের খাতা পর্যন্ত বেরিয়ে পড়ল কিন্তু পেপার বেরুল না। তখন মা বললেন—"রাফ কপিটাই নিয়ে যা, ওখানেই টাইপ করিয়ে নিবি।" রওনা হচ্ছি, এমন সময়ে পিকোলো আমার মেয়ে, দুই হাতে একটি ছেঁড়া খাম উঁচু করে তুলে, "দেব না, দেব না" বলতে বলতে ছুটে এল। 'স্প্যান'-এর ঐ ছেঁড়া খামে ভরেই আমার পেপারটি দিয়ে গেছেন টাইপিস্ট। বাজে কাগজ বলে বুঝতে পেরে বাড়ির কাজের লোকটি ওটাকে পুরনো কাগজের স্তূপে নিক্ষেপ করেছিল। যাক, সেকেণ্ড ক্রাইসিস ওভার। এবার দুর্গা দুর্গা বলে রওনা। সারা প্লেনে আকুলচিত্তে জপ করতে করতে চললুম হে মা সরস্বতী, কনফারেন্সের আগে যেন পেপারদুটো হারিয়ে না যায়। বিদেশে বড্ড বেইজ্জতি হবে মা।

৩

থার্ড এবং ফোর্থ ক্রাইসিস বম্বেতে। বম্বেতে আমার এক বন্ধু পতিসমেত আমার সঙ্গে এয়ারপোর্টে দেখা করতে এলো। তাদের মহা অভিমান—"এতদিন পরে দেখা,

BanglaBook.org

বম্বেতে কেন একটা দিন হল্ট করে গেলে না?" আমারও খুব আফসোস হতে লাগলো। সত্যি। কেন যে সময় নিয়ে এলুম না! হাতে একটা দিন? এত ভালোবেসে কেই-বা আমাকে ডাকবে? জীবনে তো আন্তরিকতার সুযোগ বেশি আসে না। যে করে হোক পরের বারে বম্বেতে থামতেই হবে। এদিকে প্লেন ছাড়বার সময় হয়ে এল তবু কেন যেতে ডাকছে না? খোঁজ করতে গিয়ে শুনি অদ্য যাত্রা নাস্তি। যান্ত্রিক গোলযোগ। কাল ভোর পাঁচটায় আসতে হবে। আমার এ খবর শুনে একটুও দুঃখু হলো না—বরং আনন্দ হলো—যাক, ঈশ্বর আছেন। আমার বন্ধুরা ঠিক যা প্রার্থনা করছিল, তাই পূরণ হলো। একগাল হেসে ছুটে এসে ওদের সুখবরটি দিলুম —"যাক ভাই, তোমরা ভালোবেসে যা ইচ্ছে করেছিলে তাই হলো। চলো, এবার তবে তোমাদের বাড়ি যাই। লাকিলি প্লেনটা খারাপ হয়ে গেছে।" —খবর শুনেই যেন বন্ধুর মুখে দপ করে লোডশেডিং হয়ে গেল। জিভ থেকে সরস্বতীও বিদায় নিলেন। বিব্রত স্বরে বন্ধুর স্বামী তোতলাতে শুরু করলেন— "না, মানে হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, যেতে চাও তো চলো না, তাতে আর কি হয়েছে, তবে, ঐ আর কি..." —তার পরের কাহিনী ঠিক কিন্তু ভ্রমণ বইতে যেমনটি লেখা থাকে, তেমনটি হলো না। যা হলো তা বলবার নয়। (ভোলবারও নয়)।

৪

পরদিন ভোর পাঁচটায় এয়ারপোর্টে হাজিরা। বাকস জমা দিয়ে কাস্টমসে ঢুকেছি। দেশ ছাড়বার সময়ে সঙ্গের বিলিতি জিনিসের একটা এক্সপোর্ট ক্লিয়ারেন্স করিয়ে নিয়ে যেতে হয়। আমার হাতে ছিল একটা বিলিতি ঘড়ি। সেটার কাগজ সই করতে করতে ভদ্রলোক বললেন—"আপনার হাতের ঐ আংটিটার জন্য ক্লিয়ারেন্স নিয়েছেন?" —আংটি? তাইতো। হাতে একটা আংটি আছে বটে! কিন্তু ওটা তো বিলিতি নয়, নতুনও নয়—বারো বছর ধরে পরে রয়েছি। —এখন হঠাৎ আবার ক্লিয়ারেন্স কেন? ভদ্রলোক বললেন—"না মশাই, ওটা হীরে, শেষে ফিরে এলে ডিউটি লেগে যেতে পারে।" —তারপরে তর্জনী তুলে দেখালেন—"গয়নার জন্য ঐ কাউন্টার।" ডিউটি লাগা, শব্দটাতেই একটা জাদুকরী ভীতি আছে। আমি চটপট ঐ কাউন্টারে চলে যাই। কিন্তু সেখানে দুর্ধর্ষ এক কিউ। দেখা গেল কুয়াইটের বাসিন্দাদের বউরা সকলেই সোনায় মোড়া স্বর্ণসীতা। সেই ঠাসা গয়নার মূল্যায়ন চলেছে। অফিসার ভদ্রলোক ঘেমে-নেয়ে উন্মত্তপ্রায়। একে একে আমার প্লেনের যাত্রীরা সবাই বেরিয়ে গেলেন —এদিকটা ফাঁকা হয়ে গেল। আংটির দায়ে ও ডিউটির ভয়ে আমি বন্দী—ভদ্রলোক আর তাকান না। অবশেষে মরিয়া হয়ে আমি যখন যারপরনাই কাতর, তিনি তখন নজর দিলেন।

—"কী চাই?"

—"এই আংটিটি যদি—" নেড়ে চেড়ে উলটে পালটে সার্টিফিকেট লিখে দিলেন,

BanglaBook.org

চোদ্দশো টাকা। চো-দ্দ-শো! মুহূর্তেই আমার চলন-বলন পালটে গেল। চোদ্দশো টাকার এককুচি পাথর আঙুলে থাকলে যেরকমটি শোভা পায় ঠিক তেমনি পদস্থ চরণে দরজা দিয়ে প্রায় ভেসে বেরোই। যাতে আমাকে যেই দেখবে সেই বুঝবে —হ্যাঁ, এ-মেয়ের একটা ব্যাপার আছে বটে। (পরে জেনেছি মাত্র চোদ্দশো টাকা একটা ভালো হীরের পক্ষে মোটে কোনো দামই নয়)।

লাউঞ্জ গড়ের মাঠের মতো ফাঁকা দেখে বুকটা ধড়াস করে উঠল— সহযাত্রীরা কই? হঠাৎ শুনি দৈববাণীতে নিজের নাম ধ্বনিত হচ্ছে— ডক্টর দেবসেনকে এয়ার ইণ্ডিয়া ডাকছে। কাউণ্টারে গিয়ে টুপি পরা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছেলেটিকে যেই চোদ্দশোর উপযুক্ত ধীর গম্ভীর স্বরমাহাত্ম্যে বলেছি, "আমিই ডক্টর দেবসেন—" অমনি সে লাফিয়ে উঠে আমার কাঁধটা আচমকা খামচে ধরে বিনা সম্ভাষণে হিড়হিড় করে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগল গেটের দিকে। এয়ার ইণ্ডিয়ার এই অসংযত আক্রমণে আমি ক্রমে হতচকিত, তথা হতবাক এবং কারাটে-কুংফু কিছুই না জানায় আত্মরক্ষায় অপারগ হয়ে কাতর। এইবারে এক জব্বর গুঁতো মেরে লোকটি আমাকে একটা ছোট সাদা জীপে তুলে দিল এবং নিজেই জীপটা বোঁ বোঁ করে চালিয়ে নিয়ে চলল এয়ারপোর্টের নির্জন মাঠ-ঘাটের মাঝখান দিয়ে। দূর দিগন্তে পড়ানো বোয়িংটার পেটের দরজা বন্ধ। গায়ে সিঁড়ি ঠেস দেওয়া নেই। কেবল সামনে পাইলটের মই ঝুলছে। সেই কন্দর্পকান্তি যমদূত আমাকে হ্যাঁচকাটানে নামিয়ে এনে পৃষ্ঠদেশে বলদের পিঠে চাষা যেমন ঠেলা মারে তেমনি এক রামঠেলা লাগিয়ে ঐ মইতে উঠিয়ে দিয়ে গগনভেদী হাঁক পাড়ল, "হিয়ার শী ইজ।"

ওপরে উঠে দেখি জায়গাটা ককপিট। নানা সুইচবোর্ড, যন্ত্রপাতির পটভূমিতে সারি বেঁধে তিনজন কর্তাব্যক্তি সবিনয়ে দণ্ডায়মান —যেন আমাকেই গার্ড অব অনার দিচ্ছেন। দাঁতে দাঁত চেপে রহস্যময় হেসে ক্যাপ্টেন বললেন—"ডক্টর দেবসেন, আই প্রিজিয়ুম?" এটা তো আফ্রিকার জঙ্গল নয়, আমিও লিভিংস্টোন সাহেব নই। তাই অবাক গদগদচিত্তে প্রশ্ন করি—"হাউ ডিড য়ু নো?" একগাল তিক্ত মধুর হেসে কো-পাইলট উত্তর দেন—"বিকজ উই আর নিয়ারলি টু মিনিটস ডিলেইড ফর ইয়ু ম্যাম! দ্যাটস হাউ!" সর্বংসহা ধরিত্রী এতে দ্বিধা হলেন না, বরং আকাশকেই দ্বিখণ্ডিত করে আমাদের জেট প্লেন উড়ে গেল।

৫

দুটি পেপারের কল্যাণে দুটি হপ্তা ফ্রী। প্যারিসে প্রথম হপ্তাটি এবং কানাডায় শেষ হপ্তা রাজকীয় যত্নে কাটবে দুটি কনফারেন্সের কর্তৃপক্ষের আতিথ্যে। কিন্তু দুটির মাঝখানের যে তিনটি সপ্তাহ ফাঁকা আছে। ফার্স্ট পিরিয়ড আর লাস্ট পিরিয়ডে ক্লাস থাকলে, মাঝখানের নিরালম্ব ফ্রী পিরিয়ডগুলোর মতো, মহা ঝামেলা সৃষ্টি হয়েছে। এই তিন হপ্তার খরচ চলবে কী উপায়ে? এক বন্ধু ইউনাইটেড নেশন্সে

সদ্য কাজ পেয়ে মহৎ এবং উদার বোধ করছেন—তিনি একটি চেক লিখে দিলেন। এটি ভাঙিয়ে নিলেই মোটামুটি চলে যাবে। ইংলণ্ডের বন্ধুদের কাছে আর লস এঞ্জেলসে ছোট বোনের কাছে গিয়ে ভাগাভাগি করে সময়টা কাটাবো। ওটুকু খরচ ওরাই চালাবে।

এদিকে প্যারিসে পৌঁছে "শূন্যহাতে ফিরি হে নাথ পথে পথে"— সরকারের দেওয়া আট ডলার পথেই শেষ। ওই চেকটি প্যারিসে কিছুতেই ভাঙানো গেল না। ওটি ইউনাইটেড নেশন্সের বাড়ির যে ব্যাংকের চেক, কেবলই সেই ব্যাংকেই ভাঙানো যাবে। প্যারিসের বন্ধুবর্গ বললেন—"যাও, সোজা জেনিভা চলে যাও না। মাত্র পঞ্চাশ মিনিটের তো মামলা। ভাড়াও বেশি না।"

—সে কি? জেনিভা যাই কী করে? হাতে তো আছে শূন্য মানিব্যাগ আর দুখানি প্লেন টিকিট। প্যারিস-লণ্ডন, আর লণ্ডন-মন্ট্রিয়ল।

—"কেন, প্যারিস-লণ্ডনটাকেই প্যারিস-জেনিভা করে নেবে? তারপর টাকা পেলে জেনিভা-লণ্ডন টিকিটটা কিনে নেবে।" —তাই তো? এ তো খুবই সহজ ব্যাপার। যেমনি বুদ্ধি, তেমনি কাজ। চলো জেনিভা। পরের প্লেনেই। পঞ্চাশ মিনিট বাদেই পঞ্চম এবং মোক্ষম ক্রাইসিসটি উৎপন্ন হলো।

জেনিভায় সুরেন্দ্র-কৃষ্ণরা আছে, ভেবেছি নেমেই একটা ট্যাক্সি ধরে চলে যাব ওদের বাড়ি। কিন্তু বেরুতে গিয়েই মুশকিল বাধলো।

—"ভিসা? আপনার ভিসা কই?"

—"আরে? মনে ছিল না তো?"

—"সে কি! ভিসা নেই? তা হলে তো বেরুতে পারবেন না এয়ারপোর্ট থেকে!"

—"করে দিন না মঁসিয়, অনুগ্রহপূর্বক আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্যে একটা ট্রানজিট ভিসা?"

—"আগে আপনার টিকিট দেখান! এখান থেকে কোথায় যাচ্ছেন?"

—"লণ্ডন।"

—"কিন্তু জেনিভা-লণ্ডন টিকিট কই?"

—"এই দেখুন, এই চেকটা ভাঙাতে এখানে এসেছি, টাকা পেলে তবে তো টিকিট কিনবো। এক্ষুণি টিকিট পাব কোথায়?" ইমিগ্রেশন অফিসারের চোয়াল শক্ত হয়।—"ট্রানজিট প্যাসেঞ্জার মানে যার হাতে অনওয়ার্ড রিজারভেশন আছে। এটা তো টার্মিনাল টিকিট। ভিসা আপনি পেতে পারেন না।"

—"টার্মিনাল মানে? এই দেখুন দেড়হপ্তা পূর্বেই আমার লণ্ডন-মন্ট্রিয়ল চার্টার্ড ফ্লাইট রিজার্ভেশন রয়েছে। আমি কি থাকতে এসেছি?"

—"ওতে হবে না। জেনিভা-লণ্ডন টিকিট চাই।"

—"বলছি তো টাকা পেয়েই কিনবো। কালই।"

—"তা হয় না। তুমি বাছা এক্ষুনি প্যারিসে ফিরে যাও, নইলে মুশকিলে পড়বে।"

BanglaBook.org

—"বাঃ! টাকা কই, যে প্যারিসে যাব? টাকা থাকলে তো লণ্ডনেই চলে যেতুম।"

—"আরে বাবা তুমি জেনিভায় কেন এসেছো তা কি আমরা জানি না, মা শেরি?"

—"কেন এসেছি বলুন তো?"

—"প্রত্যেক গ্রীষ্মেই তো তুমি এখানে আসো, কলেজের ছুটি হলে রেস্তরাঁয় ঝি-গিরি করে উপরি দু পয়সা কামাতে। তোমাদের আমরা চিনি না? কিন্তু মাদমোয়াজেল—ভিসাটা যে—"

—এবার চোখে জল এসে গেছে—"কী! আমি আমি...ঝি-গিরি করতে এসেছি? মোটেই না। ইনফ্যাক্ট...আমি...তো...সরবনে কলেজ দ্য ফ্রান্সে বক্তৃতা দিতে এসেছিলাম।" একথা বলার সময়ে আমার গলা এমনই কাঁদো-কাঁদো করুণ হয়ে কেঁপে-টেপে গেল, যে আমার নিজের কানেই কথাটা বিশ্বাস হলো না।

—"বক্তৃতা?" ইমিগ্রেশন অফিসাররা হো-হো করে হেসে ওঠেন। —"ওরে —বক্তৃতা দিতে এসেছে রে! হাঃ হাঃ। কোথায়? রেস্তরাঁয় রেস্তরাঁয় বক্তৃতা, নাকি চার্চে চার্চে?" —আমার গায়ে আগুন ধরে যায়—

—"ইয়ারকি রাখুন। আমি সত্যিই আপনাদের এই অসভ্য দেশে থাকতে আসিনি।"

এবার ওদের মুখ একটুখানি গম্ভীর হয়।

—"নাকি? বেশ। বেশ। চলুন, রাগারাগি করে কাজ নেই, আজ লক-আপেই শুয়ে থাকুন তাহলে। কাল সকালে দেখা যাবে বক্তৃতা-টক্তৃতার কী ব্যবস্থা করা যায়—", ইতিমধ্যে পাসপোর্টটা উলটে পালটে একজন পুলিস দেখে নিয়েছে যে আমি সত্যিই বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টারি করি। সে এসে সবিনয়ে বলল—

"সরি প্রফেসর, মাফ করুন, ওদের কথায় কিছু মনে করবেন না, ফরেন স্টুডেন্টরা সত্যিই এ-সময়ে আসে কিনা ছুটিতে কাজ খুঁজতে..., তাই...ওরা ভেবেছে আপনিও হয়তো ফরেন স্টুডেন্ট—রাতটা অবশ্য লক-আপেই থাকতে হবে—কান্ট বি হেল্পড—একটু কষ্ট হলেও... আশা করি কালই সব ঠিক হয়ে যাবে—"

—"লক-আপ মানে? পুলিস লক-আপে? এই জেনিভাতে? কেন? আমার অপরাধটা কী?"

—"বিনা ভিসায় আপনি ট্রেসপাস করেছেন সুইটজারল্যাণ্ডে। এবং ইউ আর রিফিউজিং টু লীভ দ্য কান্ট্রি। ইল্লিগাল এন্ট্রির জন্য আপনাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।" বারে মজা! কোথায় এলুম ব্যাংকে, টাকা ভাঙাতে, আর আইন ভাঙার দায়ে যাচ্ছি কিনা জেলে! না, এ হতেই পারে না।

—"আমি আমার বন্ধুদের ফোন করতে চাই। ইউনাইটেড নেশন্সে।"

—"কর না।"

BanglaBook.org

—"পয়সা নেই।"

—"আমরা পয়সা দিতে পারব না।" হঠাৎ মনে পড়ল পুলিসে ধরলে সর্বদাই উকীলকে ফোন করার রাইট থাকে। কৃষ্ণাই তো ব্যারিস্টার। বাঃ।

—"আমি ল'ইয়ারকে ফোন করব।"

—"ল'ইয়ারকে? অফিসারদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি হয়।"

—"জেনিভায় তোমার ল'ইয়ার আছে?"

—"আছে বৈকি। এই নম্বর: ভেরসোয়া ৫৫-২৬-১৯; ডেকে দাও। কৃষ্ণা আহুজা প্যাটেল, বার অ্যাট ল'।" আমি গম্ভীর হই। গম্ভীর না হলে এরা মানবে না।

আমার ফোন পেয়ে প্রথমে কৃষ্ণা বেজায় খুশি। তারপরেই তো মাথায় হাত! —"আয়—ওয়ানডারফুল—কোত্থেকে? কদ্দিন পরে এলে! অ্যাঁ! কী সর্বনাশ! পুলিস লক-আপে?" —হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ল দুজনেই। —ইউনাইটেড নেশন্সের ডিপ্লম্যাটিক ছাড়পত্রের জোরে ইমিগ্রেশনের নিষিদ্ধ আঁচলের ভিতরে ঢুকে এসে ওরা আমার সঙ্গে দেখা করল। প্রথমেই মাতৃভাষায় কৃষ্ণা কিছু ধারালো, বাছাই করা খাস পাঞ্জাবী গালাগালি ছাড়ল একনিশ্বাসে, আগে থেকে ওদের খবর না দেবার জন্য এবং বিনা ভিসায় ন্যালাক্ষ্যাপার মতন বিদেশে আসার জন্য। অথচ ভ্রমণকাহিনীতে পড়েছি, বন্ধুদের আনন্দে বাক্যহারা হয়ে জড়িয়ে ধরবার কথা এসব ক্ষেত্রে। যদি ওরা এখন জেনিভায় না থাকত? কী হাল হতো আমার? তারপরে নিজেরা জামিন দাঁড়িয়ে আমাকে আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্যে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল অবশ্যি। আমার পাসপোর্টটা কেবল জমা রইল ইমিগ্রেশন পুলিসের থানায়। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আরেক প্রস্থ বকুনি, ও প্রচণ্ড আদরযত্ন হলো। ওদের বাড়ির নরম বিছানার গরম আরামে শুয়ে শুয়ে রাত্রে ভাবলুম, আহা, পুলিস লক-আপটা কেমন জানা হলো না। দিব্যি দেশে গিয়ে চাল মারা যেত।

৬

পরদিন ইউনাইটেড নেশন্সে চেক ভাঙাতে গিয়ে পুনরায় কেলেঙ্কারী। বিদেশে চেক ভাঙাতে হলে সর্বদাই সই প্রমাণ করতে পাসপোর্টের সঙ্গে মেলাতে লাগে। পাসপোর্ট জমা দিয়ে আসার সময় সেটা মনে ছিল না। ব্যাংক ম্যানেজার মশাই যেই শুনলেন আমার পাসপোর্ট পুলিস হেফাজতে, অমনি তাঁর হাসিমুখের ওপরে একটা বলী-রেখাবিলে দুশ্চিন্তার মুখোশ চড়ল, তিনি একটা বেল টিপলেন। সঙ্গে সঙ্গে দুজন সিক্রেট পুলিস মাটি ফুঁড়ে আমার দুপাশে উপস্থিত হলেন সবিনয়ে। কী মুশকিল! আবার পুলিস? সুরেন্দ্র কই? এরা আমাকে ভেবেছে কী? জালিয়াৎ? জোচ্চোর? বলে ও কৃষ্ণা!

পুলিসের কাছে আরেকবার নিজে জামিন দাঁড়িয়ে, শেষ পর্যন্ত আমার চেকটা

সেদিনই সুরেন্দ্র ভাঙিয়ে দিলে, তবে অতি কষ্টে। আর কোনো পরিচয়পত্র আইডেন্টিফিকেশন আছে কিনা জিজ্ঞেস করতেই আমি জোরে জোরে মাথা নাড়ি। না, নেই। সুরেন্দ্র জিজ্ঞেস করে —"কেন, তোমার ড্রাইভিং লাইসেন্স? সঙ্গে নেই?"

—"তাই তো! আছে, আছে। ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্সই সঙ্গে আছে।"

"ব্যাস! ওতেই হবে! বাঁচা গেল।" সুরেন্দ্র হাঁপ ছাড়ে। "ওতে ছবিও আছে, সইও আছে। আর, পাসপোর্টের ডিটেইলস ইমিগ্রেশনে ফোন করলেই চেক করে নিতে পারবেন আপনারা। তা ছাড়া আমি এখানে স্থায়ী চাকুরে, আমিও ওকে আইডেন্টিফাই করছি, জামিন হচ্ছি। এই মহিলা খাঁটি, জাল ব্যক্তি নন।"

নিশ্বাস ফেলে তক্ষুণি ছুটলুম জেনিভা-লণ্ডন টিকিট কিনতে, বাববাঃ—কী ফাঁড়া, কী ফাঁড়া! নিরীহ মাস্টার মানুষ বক্তৃতা করতে এসে শেষকালে বিদেশ বিভুঁয়ে থানা-পুলিস আর জেল-হাজত শুরু হলেই হয়েছিল আর কী? এক্ষুণি, পালাতে হবে এদেশ ছেড়ে, দুগগা, দুগগা! কী কপালই করেছি! মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদের মাঝখানে জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভ পেশ করতে এলুম, এসে কিনা কেবলই চুরি-জোচ্চুরি, জাল-জালিয়াতের দায়ে ধরা পড়ছি? আমার এই ছিঁচকে টাইপ চেহারাটাই হয়েছে যত পাণ্ডিত্যের পরিপন্থী। আর জীবনে আসছিনে বাবা বিদেশ বিভুঁয়ে বক্তৃতা দিতে। যে যতই ডাকুক। হ্যাঁ!

৭

কিন্তু পালাবো বললেই কী পালানো যায়? বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা বিশেষ আমন্ত্রণে বিদেশ যাত্রার বরমাল্যটি। পরবর্তী বছরটি নিপাতিত হলো কানাডার বিমানবন্দর মনট্রিয়লে পা দিয়ে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ওখানে নেমেই আমার প্লেন বদল করার কথা। যাবো সোজা যুক্তরাষ্ট্রে লস এঞ্জেলেসে। সেখানে সাতদিন ছোট বোনের কাছে কাটিয়ে, আবার মনট্রিয়লে আসবো সভা-টভা করতে। কিন্তু ঘটনা অন্যতর হলো।

জেনিভায় পেয়েছি ভিসা না করার কুফল, আর এ-যাত্রায় জুটলো উলটো বিপত্তি, সাত-তাড়াতাড়ি ভিসা করানোর কুফল। ভিসা পাবার ত্রিশ দিনের মধ্যেই ঢুকে পড়তে হয় মার্কিন রাজ্যে। আমার এসে পৌঁছুতে পৌঁছুতে ঠিক বত্রিশ দিন হয়ে গেছে। আর রক্ষে নেই। জগতের সব দেশেই তো এ-ব্যাপারে "শিবঠাকুরের আপন দেশ!" কি উন্নত, কি অনুন্নত, একুশে আইনের অভাব নেই কুত্রাপি।

আমেরিকার প্লেনে আমাকে উঠতেই দিল না। ইমিগ্রেশনে আটকে দিল। হা ঈশ্বর। আবার ভিসাবিহীন? এখানে তো সুরেন্দ্ররা নেই! ডক্টর দেবসেনের সব স্মার্টনেস মুহূর্তে উপে যায়।— "এবারে কি লক-আপে যেতে হবে তাহলে?" আমার

BanglaBook.org

বিনীত প্রশ্নে ভয়ানক অবাক হয়ে যান তরুণ ইমিগ্রেশন অফিসার।

—"লক-আপে? সে কি কথা? কী জন্যে?"

—"ভিসার যে মেয়াদ—মানে ট্রেসপাসিং হয়নি?"

"দূর, ওই মার্কিন ভিসা তো কালই করিয়ে নেবেন। দু' মিনিট লাগবে।"

খসখস করে একটা ঠিকানা, একটা নাম ও ফোন নম্বর লিখে আমার হাতে দেন—"সকালেই চলে যাবেন। আর এখানে ট্রেসপাসিং মানে? কানাডায় তো আপনার ঢুকতে বাধা নেই। বেআইনটা কোথায়?"

"ওঃ! তাই তো, এটা তো, এটা তো কানাডা! ঘুরতে ঘুরতে কি মাথার ঠিক আছে ভাই।" বোকা হাসি হেসে হাঁপ ছেড়ে অগত্যা রাত্রিবেলা চলে গেলুম সেই একটিমাত্র জানা ঠিকানায়, যেখানে কনফারেন্সের সময়ে এসে আমাদের থাকার কথা আট-দিন বাদেই। এছাড়া কিছু মাথায় এল না। ঠিকানাটা ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রাবাসের। সুপারিনটেনডেনট আণ্ডারওয়ার পরে বেরিয়ে এলেন, হাতে আবার এক টিন কোকাকোলা। পরিচয় দিতেই দৃশ্যত তাঁর মাথায় যেন বজ্রপাত হলো।

"সে কী? কম্পারেটিভ লিটরেচার কনফারেন্স? তার তো এখনও আটদিন দেরি আছে। ম্যাডাম, আপনি কি এখন থেকেই...? মানে এমনিতে এটা তো ছেলেদের হস্টেল? তাই...।"

হায়! এই কি কানাডার "বিশিষ্ট" অতিথিকে বরণ করার উপযুক্ত বাক্য? যার মানে যাই হোক, অবস্থাটা বুঝিয়ে বলতেই ঠাঁই পাওয়া গেল। কিন্তু "বিশিষ্ট ভ্রমণকারী" পর্যায়ের কার্যক্রম অনুযায়ী নয়, আমার তো সম্মেলন আশ্রয়টা মিলেছিল "সহায়হীনা নারী" পর্যায়ের কার্যক্রমেই। নারী-মুক্তি আন্দোলন তখনও এতটা চালু হয়নি, তাই। হলে কী হতো, বলা যায় না।

খুকুকে ট্রাংককল করে খবর দিতেই একচোট বকুনি খেলুম— "দিদিভাই, তোমার প্যাকেলটা কবে হবে? অতদিন আগে থেকে ভিসা করিয়ে রাখে কেউ? কী করে যে এতদূর এসে পৌঁছোলে!" তাও তো খুকু কিছুই জানে না। পাসপোর্টের কথাটা, পেপারের কথাটা। বম্বের পাইলটদের কথাটা, জেনিভা এয়ারপোর্টের পুলিস, ব্যাংকের সিক্রেট পুলিস—কোনো কথাই তো খুকুকে বলিনি।

৮

পরদিন সেই হোস্টেল সুপারিনটেনডেনট ছেলেটারই সহায়তায় ভিসা-টিসা সব হয়ে গেল। সন্ধ্যাবেলা লস এঞ্জেলেসের দিকে রওনা দিলুম। আমি নামতেই খুকু আর বন্ধু দৌড়ে এল—"বাববা রে। চব্বিশ...ঘণ্টা লেট? কই, তোমার বাক্স-প্যাটরা কই?"

—"তাই তো? আমার সুটকেস?" ওটা তো কালই চলে এসেছে, প্লেন থেকে

BanglaBook.org

প্লেনে সোজাসুজি, বিনা ডিসাতেই। ব্যাগেজ অফিসে খোঁজ নিয়ে দেখি বাকস আসেনি।

— "সে কী? এল না কেন?" ব্যাগেজ সুন্দরী বললেন—"রাত ঢের হলো। আজ বাড়ি যান। কাল এসে জেনে যাবেন বরং কেন আসেনি।"

—"বাঃ! 'আজ বাড়ি যান' মানে? কাপড় বদলাতে হবে না? কী পরে শোবো? দাঁত মাজবো কী দিয়ে? কোথায় গেল আমার স্যুটকেস?"

"সেজন্যে এই ওভারনাইট কমপেনসেশান নিয়ে যান না, দশ ডলার। কাল খবর নেবেন কী হলো বাক্সের।"

—"কী কইলেন? কত কইলেন?"

রুংকু হঠাৎ বাঙাল ভাষায় তীব্র ঝাপটে ওঠে। ব্যস্ত হয়ে মার্কিনী মেম বলে ওঠেন— "বেশ তো, দশে না পোষালে পঁচিশই নিন? ওটাই ম্যাকসিমাম।" বলে একটা ছাপা কাগজ টেবিলের এপাশে ঠেলে দিলেন। তাতে লেখা আছে— "ওভার নাইট কমপেনসেশান হিসেবে যাত্রীর পাওনা একসেট রাত্রিবাস; একসেট অন্তর্বাস; দুটো (বড়ো ও ছোট) তোয়ালে; একটা শার্ট; একসেট দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম; চিরুনী; চুলের বুরুশ; মাজন; দাঁতের বুরুশ; সাবান; পাউডার; একটা রুমাল; একটি টাই;এক জোড়া মোজা; যাত্রীর উক্ত বাবদে মোট পঁচিশ ডলার পর্যন্ত প্রাপ্য।" খুকু সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে—"তালিকাটি কি 'পাইওনীয়ার'-দের জন্যে তৈরি হয়েছিল? যখন প্রথম রেলটেল বসছিল?"

—"তার মানে?" সুন্দরীর ভুরু জট পাকিয়ে যায়।

—"মানে এই যুগে ওই তালিকা তো ওই টাকাতে ঠিক—"

ব্যাগেজ ক্লার্ক হেসে ফেলে বলেন—"আমরাও নিরুপায়, নিয়ম, নিয়মই, রাত্রিবাস আর মাজন বুরুশটা তো কিনতে পারবেন? নিয়ে নিন টাকাটা, কোম্পানি যখন দিচ্ছে।"

অগত্যা বাকসের বদলে পঁচিশ ডলার নিয়েই ঘরে যাই।

৯

পরদিন ক্রোদস-ক্রাইসিস। খুকু বা রুঙ্কুর কোনো জামাটামাই আমার হয় না। কী পরি? কিংকর্তব্যবিমূঢ় আমাকে নিয়ে ওরা মুশকিলে পড়ে যায়। আমার ভারী দক্ষিণী সিল্ক লস এঞ্জেলেসের ওই ভ্যাপসা বিদঘুটে গরমে পরে থাকা অসম্ভব। (স্ট্রোক হয়ে যাবে)। আমার কাছে টাকাকড়িও যৎসামান্য। খুকু-রিঙ্কু দুজনেই ছাত্রী, দু-জনের অবস্থাই 'টেনে-টুনে'। খুকু বললে—কুছ পরোয়া নেই। চলো "ফাইভ ডলার স্টোর্সে", সেটা স্যালভেশন আর্মির দোকান। ওদের সব ভিক্ষালব্ধ জিনিসপত্র ওখানে সস্তায় বিক্রি হয়। ছ্যো-ছ্যো-আনা ছে-আনা, যা-লেবে-তো-ছে আনা। অর্থাৎ পাঁচ পাঁচ ডলার। একটা ধোলাই-ঝোলাই শার্ট আর একটা ঢলঢলে বিপুল কোমর-ওয়ালা লিভাইস (ব্লু জীনস) কেনা হলো। কিন্তু বেল্ট? সেও পাঁচ? না বাবা, বেলটে কাজ নেই।

BanglaBook.org

যাকগে খুকু, ঘরে পাড়টাড়ও নেই রে?"

—"কী যে বল দিদি, এখানে পাড় থাকবে কী করে? সুতী কাপড় কেউ পরে?"

পাড় না থাকে দড়িটড়ি একটা যোগাড় করে নেব এখন, বলতে না বলতেই দেখি ফুটপাতে কেউ একটা কাগজের প্যাকিং খুলে ফেলে দিয়েছে, তার পাশেই একটি চমৎকার মোটাসোটা নাইলনের লাক লাইন দড়ি! বা, বা, ভগবানের কী সুব্যবস্থা। "এই তো! পেয়েছি, পেয়েছি!" —চীৎকার করে উঠলেন ডক্টর দেবসেন, আর্কিমিডিসের মতো মহোল্লাসে। তারপরেই ফুটপাতে ডাইভ দিয়ে পড়ে আবর্জনার পাশ থেকে ছোঁ মেরে দড়িটা তুলে নিলেন। তারপর থেকে পোশাক নিয়ে ভাবতে হলো না বাকী ছ-দিন। কোমরে দড়ি থাকলে পাছে জেল-পালানো কয়েদী ভাবে, তাই শার্টটা কেবল ওপরে ঝুলিয়ে রাখা হলো।

১০

সুটকেস উদ্ধারই লস এঞ্জেলেসে আমার প্রধান প্রোগ্রাম হয়ে দাঁড়ালো। হয়তো আরও টুরিস্ট স্পট ছিল শহরটিতে। আমি কেবল দেখলুম এয়ারপোর্টের ব্যাগেজ অফিসটাই। তারা অবশ্য আমার একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্য আনতে যথাসাধ্য চেষ্টা করলো, বহু বিচিত্র বাক্স-সমাচার সাপ্লাই দিয়ে।

প্রথম দিন লজ্জিত মুখে বললো: অত্যন্ত দুঃখিত, খবরটা এখনো পাইনি।

দ্বিতীয় দিন কড়া মেজাজে বললো: তোমার ব্যাগ তো লণ্ডনই ছাড়েনি এখনও, আমরা দেব কোত্থেকে?

তৃতীয় দিন পিঠ চাপড়ে বললো ব্যাগ মন্ট্রিয়লে এসে পৌঁছেছে। আর তোমার ভাবনা নেই। এইবারে এসে পড়বে।

চতুর্থ দিনে সান্ত্বনা দিয়ে বললো একদিন ডিলেইড হয়ে গিয়েছে, আনঅ্যাকম্প্যানিড তো, ওরকম হয়ে যায়। কালকেই আসবে। ডোণ্ট ইউ ওয়ারি।

পঞ্চম দিনে সকালেই একটা ফোন এলো—"ডক্টর দেবসেন?" ভদ্র, বিনীত, কবোষ্ণ পুং কণ্ঠ—"এয়ারপোর্ট থেকে বলছি। আপনার ঐ সুটকেসটার খবর পেলেন কিছু?"

"আপনারা পেয়েছেন?"

—"হ্যাঁ, ধন্যবাদ, আজই আসবে মন্ট্রিয়ল!"

—"মন্ট্রিয়ল থেকে? ও! আচ্ছা, একটা কথা ছিল—ওটা যে মন্ট্রিয়লেই আছে আপনি এ খবরটা পেলেন কোথায়?"

—"কেন? কাল আপনারাই তো বললেন—"

—"আমরা? মানে আমি? না-না, আমি নিশ্চয়ই বলিনি। আমাকেই তো আপনি এইমাত্র বললেন! আমার কাছে খবর তো অন্যরকম ছিল।"

BanglaBook.org

—"সে কি? অন্য খবরটা আবার কী রকম?"

—"আপনার বাক্স ভুল করে টরোন্টোতে নেমে গেছে!"

—"সুটকেস আবার ভুল করে নেমে যাবে কী? সুটকেসের কি ভুল করার ক্ষমতা আছে? ভুল তো কেবল মানুষই করে—শেক্সপীয়র বলেছেন।"

—"দেখুন ডক্টর, শেক্সপীয়র অনেক পুরোনো লোক, উনি যাই বলুন, কান দেবেন না। এখনকার দিনকালে সব পাল্টে গেছে। উনি এয়ারলাইন্সের ব্যাপার কিছুই জানতেন না। সুটকেসের এরকম ভুলভ্রান্তি হামেশাই হয়ে থাকে। এই সেদিনই একটা সুটকেস— তার জাপান থেকে ব্রাজিল যাবার কথা, টোকিও-টু-রিও, চলে এল নর্থ আমেরিকা, লস এঞ্জেলেস। এরকম ভুল খুবই স্বাভাবিক।"

—"তা সুটকেস নিতে কি আমাকে টরোন্টো যেতে হবে?"

—"ছি ছি, সে কি কথা। আমরা তো আপনাদের সেবাতেই সদা-সর্বদা! যাত্রীদের ঝামেলা বাধানো আমাদের পলিসি বিরুদ্ধ। আপনার বাক্স এসে যাবে। কাল-পরশু নাগাদ একটা ফোন করে দেখবেন।"

—"কালই আমি মন্ট্রিয়ল ফিরে যাচ্ছি। আমার পরশু থেকে কনফারেন্স শুরু। পরনে একটা ভদ্রস্থ পোশাক নেই আমার। আপনাদের যাত্রীসেবার ফলে।"

—"কেন, এখন কি পরে রয়েছেন?"

—"দশ টাকা দামের দু-খানা স্যালভেশন আর্মির ভিক্ষে পাওয়া শার্টপ্যান্ট। এটা পরে আন্তর্জাতিক সভায় পেপার দেওয়া যায় কি?"

—"সে তো বটেই! সে তো বটেই! নিশ্চয়ই না! ছি, ছি, কী কাণ্ড। কিনে ফেলুন!"

—"আপনারা তার টাকা দিলেন কই? আমাদের হাতে ফরেন এক্সচেঞ্জই নেই!"

—"ছি ছি, অতি বাজে সরকার তো আপনাদের? কিপ্টে, অবিমৃষ্যকারী, দেশবাসীর কথা চিন্তা করে না!"

—"অকারণে আমাদের সরকারকে গাল দিয়ে নিজেদের অকর্মণ্যতা ঢাকবার চেষ্টা করবেন না—বুঝলেন?"

—"অকর্মণ্যতা? দেখুন, আমরা সদাসর্বদাই যাত্রীদের সেবায় নিযুক্ত। নতুবা আপনাকে ফোন করছি কেন? বলুন, এই ফোনটা কে করেছে, আপনি, না আমি?

—"তা তো বটেই। সুটকেসটা কে হারিয়েছে? আমি? না আপনি? উল্টো-পাল্টা খবরগুলোই বা কে সাপ্লাই দিচ্ছে? আমি? না—"

—"দেখুন, লেটস বি ফ্রেণ্ডস। রাগারাগি বড়ই অস্বাস্থ্যকর। আপনিই তো বললেন শেক্সপীয়র বলেছেন ভুল মানুষ মাত্রই করে। আমরাও তো মানুষ, তাই না? উমম?" কবোষ্ণ কণ্ঠটি প্রগাঢ় রকম মানুষী হয়ে উঠছে দেখে আমি তাড়াতাড়ি বলি:

—"ঠিক আছে, যাবার আগে কাল একবার খোঁজ করব নিশ্চয়ই। নইলে বাক্সটা আসবামাত্রই মন্ট্রিয়লে পাঠিয়ে দেবেন—সেই ইনস্ট্রাকশনই লিখে রাখুন।"

BanglaBook.org

—"কালই আপনার হাতে বাক্স তুলে দেবার মহৎ সৌভাগ্য হবে আমাদের, —কথা দিচ্ছি আমি আপনাকে। দেখে নেবেন আপনি।"

পরদিন সারা সকাল ধরে এয়ারপোর্ট তোলপাড় করে ফেলে অনেক খুঁজে-পেতে নানা অফিসে ঠোক্কর খেতে খেতে শেষে ধূ-ধূ তেপান্তরের মধ্যস্থিত এক ব্যারাকঘরের গুমোট মালগুদোমে পৌঁছুই।

—"আপনারা কেউ ফোন করেছিলেন আমাকে?"

উত্তর না দিয়ে কর্মরত তিনমূর্তি চোখ তুলে কেবল আমাদের আপাদমস্তক নীরবে পর্যবেক্ষণ করেন। সেই নিরীক্ষার নিচে আমার শার্টের তলা থেকে লাক লাইন দড়িটা বাইরে ঝুলছে বুঝতে পেরে, চট করে আমি ওটা কোমরে গুঁজে নিই। এসবে আবার ইম্প্রেশন খারাপ হয়ে যায় কিনা! যথাসাধ্য গম্ভীরভাবে তাই এবারে উচ্চারণ করি:

—"আমিই ডক্টর দেবসেন।"

—"সুখী হলাম। তা কী করতে পারি আমরা আপনার জন্য?" নিরাসক্ত উত্তর আসে।

—"আমার সুটকেসটা কি কালকে টরোন্টো থেকে এখানে এসেছে?"

তিনমূর্তি একসঙ্গে মাথা নেড়ে জানালেন,—"সুটকেস? কোনো সুটকেস আসে-নি।" সত্যিই, ঘরভর্তি দেখা যাচ্ছে কেবল প্যাকিং বাক্স।

হঠাৎ তর্জনী উঁচিয়ে রুংকু চেঁচিয়ে ওঠে—"দিদিভাই, ওটা নয় তো?"

দেখি ঘরের এক কোণে, বড় বড় প্যাকিং বাক্সের মাঝখানে, চেড়ীবেষ্টিত সীতার মতো ধূলিমলিন, অযত্নলাঞ্ছিত, স্বজনবিহীন, একটি নীলাভ নাইলনের সুটকেস অসহায় পড়ে আছে। "ওই তো, ওই তো আমার সুটকেস!" সিকি মুহূর্তেই প্যাকিং বাকসোগুলির ওপর এক লম্ফে উঠে পড়ি, পড়ি-মরি করে সেগুলি মাড়িয়ে দুড়দাড় দৌড়ে পদভরে ধরণী কম্পিত করে, আকুলভাবে আপন বাক্সের বুকে সশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়েন ডক্টর শ্রীমতী দেবসেন।

ভাবখানা—"অনেক সাধায়ে অনেক কাঁদায়ে দরশ মিলালি মোরে, বঁধূ আর না ছাড়িব তোরে।" তাঁর মুখে হারামাণিক পাওয়ার দিব্যবিভা, সর্ব অঙ্গে দুর্গম গিরি কান্তার মরু লঙ্ঘনের বিমল জ্যোতি। আর গুদামঘরে প্রবল ধুলো উড়তে থাকে তাঁর আকস্মিক দাপাদাপির ফলে। প্রস্তরীভূত তিনমূর্তির একজন স্তব্ধতা থেকে কষ্টেসৃষ্টে নিজেদের উদ্ধার করে বলেন:

"কী আশ্চর্য, আপনি তো বললেন, টরোন্টো থেকে আপনার সুটকেস গতকাল আসার কথা। ওটা তো গত এক সপ্তাহ ধরেই এখানে মন্ট্রিয়ল থেকে এসে অবধি আনক্লেইমড পড়ে রয়েছে।"

শুনেও মনে আরাম হলো। আঃ! যেন মাতৃভূমিতে আছি। এই নাকি মার্কিন এফিশিয়েন্সি, যা প্রবাদে পরিণত? এ তো ঠিক আমার দেশের মতোই! মালের টিকিট নম্বর, ভাঙাচোরা, টোল-তোবড়ানো সব লক্ষণ মিলে গেল। এবার কাস্টমস

চেকিং হবে। বিপুল হাতব্যাগটা হাতড়ে কোথাও চাবি মিলল না। হাতব্যাগটা মেঝেয় উপুড় করে ঢেলে ফেলি। দেশ-বিদেশের খুচরো পয়সা, গলা-পচা লজেঞ্চুস, প্লেনে চুরি করা খুদে সাবান, অ্যানাসিন বড়ি, হাঁপানির বড়ি, ধুলো ধুলো এলাচ-সুপুরি, লিপস্টিক, চুলের কাঁটা চতুর্দিকে ছড়িয়ে যায়। চাবির চিহ্ন নেই। খুকু-রিংকুর চাবিগুলো সব একে একে ট্রাই করি। লাগে না। এবার কাস্টমসের তিনমূর্তি আসরে নামলেন। প্রথমে একগুচ্ছ পরচাবি নিয়ে। কিন্তু এইসা শক্তপোক্ত বৃটিশ গা-চাবি, মার্কিন পরচাবির কোনোটাতেই সুটকেস খুললো না। তারপর ওঁরা একটা চুলের ক্লিপ চাইলেন, এবং পটাং।

তারপর সাহ্লাদে শাড়ি-ব্লাউজ-শালের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়েন কর্তব্যপরায়ণ তিন সাহেব। এক সময়ে কোণ থেকে কী যেন বেরিয়ে পড়লো। দুটো ছোটো প্যাকেট, শাড়ির ভাঁজে ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আবহাওয়া পাল্টে যায়। হলদে সিলোফেনে মোড়া দুটো চার বাই তিন বাই দুই ইঞ্চি প্যাকেট, ভেতরে ঘন-কালচে ব্রাউন বস্তু—বেশ ভারী। ঘরে যেন এইমাত্র কারো মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়েছে। ছুঁচ পড়লেও শব্দ হবে। ব্যাপারটা কী?

বাণ্ডিল যিনি বের করলেন, তিনি ঝড়ের আগের আকাশ—নির্বাতনিষ্কম্প, মোটা সঙ্গীকে নির্বাক ইশারা, মোটা সঙ্গী এগিয়ে এসে প্যাকেট নিরীক্ষণ করেন। তিনি প্রবলতর গাম্ভীর্যে নিটোল হয়ে কালো সঙ্গীকে ইশারা করলেন। কালো সঙ্গী এসে এক নজরে জিনিসটি লক্ষ করেই নিশ্চিত, "দ্যাটস ইট!" ভয়াবহ নৈঃশব্দ্য। হাতঘড়ির টিকটিক শব্দ যেন মাইক্রোফোনে বাজছে, আমাদের দিকে তাকালেন তিনজন বিচারক, নেত্রপাতে মৃত্যুদণ্ড।

আস্তে আস্তে কথা বলেন বড়কর্তা—"এইবার বুঝে গেছি সুটকেস কেন আনঅ্যাকম্প্যানিড আসে। কেন আনক্লেইমড হয়ে মাল ট্রেন-গুদোমে পড়ে থাকে। কেন চাবি থাকে না কাছে। কেন এমন আলুথালু ভাব, মন্ট্রিয়ল না বলে টরোন্টো বলা হয় কেন? সাতদিন আগে না বলে বলা কেন হয় কাল, এইবার সব বুঝে গেছি!"

ভালো কথা, কিন্তু আমি তো বুঝিনি। এ আবার কীরকম কথাবার্তা! এবারে মোটাকর্তা প্রশ্ন শুরু করেন (একেই বোধকরি "জেরা" বলে)।

—"এটা কার মাল?"

—"আমার।"

—"পাসপোর্ট কই?"

—"এই যে।" নিয়ে খুব ভালো করে দ্যাখেন তিনজনে, উল্টে-পাল্টে। তারপর বুক পকেটে রাখেন একজন। (কেনরে বাবা)?

—"এ বস্তুদুটোও তোমার?"

—'নিশ্চয়ই—"

BanglaBook.org

—"দেখি", সবগুলোই হাতিয়ে নিয়ে পকেটে পুরে ফেলেন মোটাকর্তা। বড়কর্তা তর্জনী নির্দেশে প্যাকেটদুটি দেখান।

—"সুইটস।"

তিনজনে চোখাচোখি হয়। কালোকর্তা বলেন—"ওদের খবর দিই?"

মোটাকর্তা বলেন—"নিশ্চয়ই।"

বড়কর্তা বলেন—"শিট?"

মোটা বলেন—"শিওর। শিট।"

কালো বলেন—"ইয়াঃ, শিট।"

আশ্চর্য অসভ্য তো! তিন-তিনটে মেয়ের সামনে অকারণে মুখ খারাপ করা! কী শিট শিট করছে! আমার কথাটা বিশ্বাস হলো না? বুলশিট? গুল? "বিশেষ আমন্ত্রণে" এসেছি বাবু পরের দেশে; সেধে সেধে নয়; তার মানে কি পদে পদে এমনি আপমান?

রাগে ঝনঝন করে বলি—"অফকোর্স নট, সব সত্যি কথা, ওটা মিষ্টান্ন।"

আবার চোখোচোখি। স্বর্গীয় মোলায়েম হাস্য তিনটি মুখেই বিছিয়ে যায় নিঃশব্দে। তাতে হাড়ের মধ্যে হিম হিম ভাব হয়। সিনেমায় ভিলেনরা যেভাবে হাসে আর কি। আমার রাগ বেড়ে যায়।

—"নাও বন্ধ কর আমার বাকস, ঢের হয়েছে। আমার প্লেনের সময় হয়ে যাচ্ছে।"

—"এখন তো যাওয়া হবে না। আগে অন্য ডিপার্টমেন্টের লোকেরা আসুক। তোমাদের দেখাশুনো তারাই করবে। বাকস-টাকস আজ ছাড়ছি না। পাসপোর্টও রইল।"

এই সময়ে খুকু হঠাৎ যেন ক্ষেপে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, "নো, নো, নো গুড গ্রেশাস! ইটস নট শিট। ইটস নট শিট। ইটস... ইটস, ও দিদি, আমসত্ত্বের ইংরিজিটা...শিগগির...ওরা এগুলোকে গাঁজাটাজা চরস-টরস ভেবেছে। 'শিট' হলো মারিহুয়ানার স্ল্যাং—এই বোকাগুলো ভেবেছে তুমি বুঝি..."—হই হই করে হেসে উঠছি আমরা তিনজনে, ও হরি! তাই বল! এইজন্যে এত শিট-শিটুলি। তিনজনের এইজন্যে ওই গোমড়া আনন আর চোয়াড়ে বচন? হায় রে! এই তোমাদের কাস্টমসের ট্রেনিং?

এও ছিল "বিশিষ্ট অতিথি"র কপালে? ঝি-গিরির দায় থেকে শুরু করে শেষটায় গাঁজা চুরির দায়েও পড়লুম? হায়, নারকটিক্স স্মাগলিং। ঈদৃশ সসম্ভ্রম গূঢ়কর্ম কি আমাদিগের ন্যায় অগ্রপশ্চাৎ অবিবেচনাকারী ভেতো মাস্টারের ক্ষুদ্রবক্ষের পাটায় সম্ভবে? তোরা কী লোকও চিনিসনে বাছারা? গাঁজা না হয় নাই চিনলি। ওসব জিনিস যে একটুখানি পুড়িয়ে ছাই করে নাকে শুঁকে দেখতে হয় সেও জানিসনে? গন্ধেই তো টের পাবি কী বস্তু। ওদের ইনএফিশিয়েন্সিতে মুগ্ধ, দয়ার্দ্র, বিগলিত

BanglaBook.org

করুণা, জাহ্নবী যমুনা হয়ে বলি: "দিস ইজ নট ইওর স্টাফ, প্লীজ রিল্যাক্স, জাস্ট স্মেল ইট—"

একটি প্যাকেট ওদের হাতে তুলে দিই। কালোকর্তা শোঁকেন। ভুরু কুঁচকে যেন ধাঁধায় পড়ে যান, বলেন—"স্মেলস ফ্রুটি!" মোটাকর্তা শোঁকেন—গম্ভীর হয়ে বলেন, "পারফিউমড।" বড়কর্তা শোঁকেন, বজ্রগম্ভীরে বলেন—"ইয়াঃ! পারফিউমড।"

আমি রাগ করে প্যাকেটটা কেড়ে নিই, "দূর-ছাই, পারফিউমড হবে কেন, ম্যাংগো। ইটস রিয়্যাল ম্যাংগো। ম্যাংগো ক্যানডি"—বলতে বলতে পাতলা কাগজ ছিঁড়ে একপরত আমসত্ত্ব তুলে নিই এবং কামড় বসাই—"লুক, ইটস এভিডেন্টলি এডিবল।" আমসত্ত্বের সুরভিতে বিচলিত বোধ করে, "ছি! দিদি! কি রকম স্বার্থপরতা হচ্ছে ওটা?", বলতে বলতে খুকু আমার মুখ থেকে চট করে বাকিটা আমসত্ত্ব কেড়ে নেয় এবং "অ্যাণ্ড ইন ফ্যাক্ট ইটস মোস্ট ডিলি-শস!" বলে চোখ বুজে মুখে পুরে ফেলে। রিংকুটা ঠাণ্ডা মানুষ। ও অন্য প্যাকেটটা তুলে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে খুলে একটি পরত বের করে ধীরেসুস্থে চোষে, তারপর আরেকটিও বের করে। মোটাকর্তাকে বলে—"উড ইয়ু লাইক সাম?" মোটা তাকায় বড়র দিকে, বড় তাকায় কালোর দিকে। কিঞ্চিৎ দ্বিধার পরে কালোকর্তা মনে বল পায়। হাত বাড়িয়ে আমসত্ত্ব নেয়। "থ্যাংক্স" বলতেও ভোলে না। তারপর কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যালের সল্ট টেস্টিংয়ের মতো সন্তর্পণে একটুখানি জিবে ঠেকায়। প্রতীক্ষায় ঘরের বাতাস এত অধৈর্য, যেন নিশ্বাস ফেললেও টং করে শব্দ হবে।

তারপরেই দৃশ্যপটের ঐন্দ্রজালিক পরিবর্তন। মুখে শৈশবের স্বর্গীয় হাসি, চোখে প্রথম প্রেমের উজ্জ্বলতা, সর্ব অবয়বে টেনশন-মুক্তের তরল আরাম নিয়ে গুদোম ফাটিয়ে হেসে ওঠেন কালোকর্তা। সঙ্গে সঙ্গেই বাকী দুজনে হাত বাড়িয়ে খাবলে-খুবলে এক এক টুকরো আমসত্ত্ব খামচে ছিঁড়ে নেন এবং মুখে পুরে ফেলেন। প্রথম প্যাকেটটা ওদের মোক্ষম খাবার চলে যায়। অন্যটা আমি চট করে ব্যাগে ভরে ফেলি। কোণে ঠেলে নিয়ে গেলে খরগোশেও কামড়ে দেয়। তাই, রিংকু হঠাৎ —"খুকুরে—হ্যাংলা ব্যাটারা আমাদের আমসত্ত্ব যে রাখলে না"—বলতে বলতে সাহেবের থাবা থেকে এক ঝটকায় অন্য প্যাকেটটা ছিনিয়ে নেয়। তক্ষুণি খুকু বলে ওঠে—"দেখুন, আপনাদের মহামান্য নারকটিকস স্কোয়াডকে কিন্তু আমাদের এই অমূল্য ম্যাংগো ক্যানডি খাওয়াতে পারব না। পাসপোর্ট-টাসপোর্টগুলো এবার বরং দিয়ে দিন, দিদির ট্রেনের সময় হয়ে এসেছে।" সলজ্জভাবে আমসত্ত্ব চাটতে চাটতে ওদিকে তিন কর্তা আড়ে আড়ে তাকান, ঠারে ঠারে হাসেন। বিনয়ে দু'ভাঁজ হয়ে পড়ে, বড়কর্তা বলেন—"উই আর রিয়্যালি সরি। ইট ওয়াজ আ জেনুয়াইন মিসটেক।" ঝাঁকুনির চোটে আমার হাত প্রায় গুঁড়িয়ে যায়!

পরিশিষ্ট: এইবারে টের পেলেন তো হরিদাস পালেদের বিদেশ যাত্রা কেমন ধরনের হয়? প্রাণের আরাম? আত্মার শান্তি?

BanglaBook.org

ভার্জিনিয়ার ফরেস্ট রেনজার রয় সালিভ্যান ছ' ছ'বার বজ্রাহত হয়েও বহাল তবিয়তে বেঁচে থেকে বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টি করেছেন বলে পড়েছি। আর এই বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ বিদেশে যেতে গিয়ে শতবার বজ্রাহত হয়েও বহাল তবিয়তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এবং তারপরেই বরমাল্য ও করতালির অমর কাহিনীটি লেখা হয়ে যায়। এই যেমন ডক্টর দেবসেনেরটা এইমাত্র পড়লেন। যাত্রায় যত দুর্যোগই আসুক না কেন, এমনকী ভ্রমণটাও যদি ফসকে যায়, আপনার কপালে কাহিনীটি তাই বলে ফসকাবে না! হ্যাঁ! সেটি পাবেন।

[কিন্তু যে যাই বলুন দুর্ঘটনায় বাস্তবের কাছে কল্পনা দাঁড়াতে পারে না। এখানে বর্ণিত প্রত্যেকটি ঘটনা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, প্রতি ক্ষেত্রেই বহু সাক্ষী বর্তমান আছেন, যদিও, তাঁরা না-থাকলেই বেশি ভালো হতো]!

মেসোমশায়ের কন্যাদায়

BanglaBook.org

ভদ্রমহিলার পাতে মাছটা প্রায় দেওয়া হয়েই গিয়েছে, হাঁ হাঁ করে দৌড়ে এসে পড়লেন মেসোমশাই—

—"তুইল্যা ফ্যালাও, তুইল্যা ফ্যালাও!" পাতের ঠিক এক ইঞ্চি ওপরে তখন রুইমাছের পেটি ত্রিশঙ্কু—

—"ওনারে জিগাইসিলা?"

—"না তো।"

—"ওই তো দোষ। পরিবেশনের একটা রুলস আছে না? জিগাইয়া লইয়া তবে দিতে হয়। পয়লা কইতে হয়—'আপনি কি মাছ নিবেন?' মহিলা এই সময়ে বললেন—"হ্যাঁ।" মেসোমশাই সেটা কানে তুললেন না। আমাকে বললেন—"বল? রুটু বল? আপনি কি মাছ নিবেন?" মহিলা পুনরায় স্পষ্ট গলায় বললেন—"হ্যাঁ!" আমি আর না পেরে ঝুলন্ত মাছটা ওঁর পাতে দিয়ে ফেলি। মেসোমশাই যারপরনাই হতাশ মুখে বললেন—"আইজকালকার ইয়ংম্যানদের মেইন ডিফেক্ট তো এই! ঠিক যেইটা কইলাম তার অপোজিটটা করলা তো? না জিগাইয়াই দিলা। এইভাবেই ওয়েইস্টেজ হয়। সরকার তো এইটাই মানা করে। যেমন সৌম্য ডিসওবিডিয়েন্ট, তেমনই তার বন্ধু!" আমি এবারে আরো বোকার মতো, ভদ্রমহিলাকে প্রশ্ন করে বসি—

—"আপনি কি মাছ নেবেন?" মহিলা আবার বললেন—"হ্যাঁ!" মেসোমশাই অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়ে ওঠেন।

—"রাইট! জাস্ট লাইক দিস! জিগাইয়া লইয়া তবে সেনা পাতে দিতে হয়! দ্যাও দ্যাও ওনারে আরো দুইখান মাছ দাও দেহি —মনে হয় মাছটা উনি ভালোই খান। মাছ যারা ভালো খায়, তারা আবার অনেকেই খাসির মাংসটা তত ভালো খায় না।"

মহিলা বললেন—"আমি কিন্তু মাংস খেতেও ভালোবাসি।"

এবার জিভে একটা অধৈর্য শব্দ করে মেসোমশাই অভয় হস্ত উত্তোলন করেন—

—"আহাঃ আপনের কথা হয় নাই। জেনারেল ডিসকাশান হইতাসে। আপনের লাইগ্যা মাছ-মাংস সবই আছে, ভয় নাই, তাড়াহুড়া কইরা লাভ কি? অল ইন গুড টাইম। মাছটা খাইয়া লন, মাংসও ঠিকই পাইবেন। আরে ও সৌম্য, চিংড়িমাছটা এইধারে আনস নাই?" হাঁকতে হাঁকতে ব্যস্ত হয়ে অন্যদিকে যেতেই পথিমধ্যে মাসিমার সঙ্গে মুখোমুখি। ফুটন্ত কেটলির মতো মাসিমা বললেন—

—"কী বলছিলে তুমি? কী উচ্চারণ করলে এইমাত্র?"

—"কইতাসি যে চিংড়িমাছটা—"

—"চিংড়িমাছ? চিংড়িমাছ হয়নি, তা জানো না?" মেসোমশায়ের মাথায় হাওড়া ব্রীজ ভেঙে পড়ে।

—"হয় নাই? স্ট্রেইনজ। সেইদিন যে মেনু হইল?"

—"মেনু হলো, খাওয়াও তো হলো। খেলে না সেদিন ইয়া বড় বড় গলদাচিংড়ি? চিনুর পাকাদেখার দিনে? বিয়েতে চিংড়িমাছের কথা কবে হলো?"

"আলবৎ কথা হইসিল।"

—"কক্ষণো হয়নি।"

—"সার্টেনলি হইসিল।"

—"কখনো হয়নি। হয়নি। হয়নি।"

—"ইউ শাট আপ।"

—"কেন, কিসের জন্যে আমি শাট আপ? তুমিই বরং একদম মুখ খুলবে না আজকে! ছি ছি গুলিখোর-গাঁজাখোরের মতো কী বলতে কী যে বলছ! কী লজ্জা কি লজ্জা।"

—"ক্যান? লজ্জার হইলটা কী? শুনি? চিংড়িমাছ খাওয়াইতে না পারলেই লজ্জা? এইয়ার মধ্যে লজ্জার আছেটা কী?"

"লজ্জার এই যে, তোমার বাক্যি শুনে সকলে ভাবলো যে মেনুতে চিংড়ি থাকা সত্ত্বেও আমরা ইচ্ছে করেই এই ব্যাচে ওটা দিলুম না। এটাই ভাবলো সকলে। ছি ছি—"

—"অত ছি-ছি-য়ের কী আছে? মোটেই কেও তা ভাবে নাই। সকলেই জানে আমি সার্ভিস করি, সার্ভিস। বোঝলা? আমি কি বিজনেস করি, যে হোর্ডিং করুম? হোর্ডিং করা আমাগো নেচার না।"

BanglaBook.org

বোধহয় ঐ "হোর্ডিং করা" শব্দটাতে মাসিমার ইংরিজি হোঁচট খায়। তিনি বলেন—"ওসব জানি না বাপু, লোকে যা ভাবার তাই ভাবলো। বাস। সে তোমার নেচার যেমনই হোক।"

—"আরে, ভাবে নাই, ভাবে নাই। আর যদি ভাইবাই থাকে, আমি অহনই যাইয়া অগো কইয়া দিতাসি, যে, মশয়, আইজ কিন্তু চিংড়িমাছ হয় নাই।"

এই সময়ে বুড়োদা এসে মা-বাবার মধ্যস্থলে দাঁড়ান, বাফার স্টেট হয়ে। বুড়োদা মধ্যপ্রাচ্যে শাঁসালো চাকরি নিয়ে চলে গেছেন। বছর দুই বাদে এই তাঁর প্রথম ঘরে ফেরা। মাত্র তিন হপ্তার ছুটিতে, বোনের বিয়ে উপলক্ষে। প্রচুর সাড়া জেগেছে, আত্মীয় মহলে ("বুড়ার ঘড়িটা দেখসস?" "বুড়া কোন-দিকে?") রমরমা পড়ে গেছে। কিন্তু মেসোমশাই কিছুতেই ঠিকমতো বুড়োদাকে পাত্তা দিচ্ছেন না। যেন কোনোদিনই বাইরে যায়নি ছেলে, ভাবখানা এমনি। বুড়োদার সেটা সহ্য হচ্ছে না। তাই চান্স পেলেই তিনি বাবার কাছে জোর করে ইম্পর্ট্যান্স আদায় করছেন। বাবা-মায়ের মধ্যবর্তী হয়ে বুড়োদা বললেন:

—"থাক, বাবা, লেট ইট এনড় হিয়ার। ডোন্ট ক্রিয়েট আনেসেসরি কমপ্লিকেশনস।" অবশ্য বুড়োদা বিন্দু-বিসর্গও জানেন না বর্তমান সমস্যাটা কী। অথবা সমস্যা আদৌ আছে কি নেই।

—"বুড়া, তুমি থামো তো দেহি। কমপ্লিকেশন কি আমি বুঝি? নেভার। হেইডা যে করার সেই করসে। তোমার গর্ভধারিণী।" মাসিমা চোখ কপালে তুলে বিপুল এক হাঁ করতেই বুড়োদা তাঁর কাঁধটা খামচে ধরে সাদরে একটি গুল সার্ভ করেন —"চলো মা, ও ঘরে চলো, চিনু তোমায় খুঁজছিলো।" সাপের ফণায় মন্ত্রপড়া জল পড়লো। মাসিমা ছটফটিয়ে কনের কাছে চলে যান।

সৌম্যর বাবা, আমাদের পড়শী এই মেসোমশাইয়ের দেশ পূর্ববঙ্গে, আর মাসিমা খাস ঘটি। চল্লিশ বছর একটানা কলকাতায় বাস করার ফলে মেসোমশাই এখন নির্ভীকভাবে সর্বত্র এক জগাখিচুড়ি বাঙলাভাষা বলেন। কিন্তু তাতে মাসিমার মুখের মিঠে শান্তিপুরী বুলির নড়চড় হয়নি। পাড়ায় যখন ঘটিবাঙালের ঝগড়া হতো, চিনুদি আর মিতুন নিতো ঘটি পক্ষ; ওরা মামারবাড়ির আঁচলধরা মোহনবাগান সাপোর্টার —কিন্তু বুড়োদা আর সৌম্য বাপ-ঠাকুরদার বংশমর্যাদা রক্ষা করতে, ফরএভার ইস্টবেঙ্গল! সেই চিনুদির বিয়ে আজ! সৌম্য বলল—"রন্টু, তুই বাবাকে আজ একটু চোখে-চোখে রাখিস রে—আমি তো নানাদিকে ব্যস্ত থাকবো; বাবা ওদিকে ফিলড খালি পেলে হেভী কেলেংকারী করবেন।" এ কাজটা পাড়াসুদ্ধ সকলেরই অভ্যেস আছে। পাড়াতে যখনই কোনো সামাজিক কাজ হয়, কাউকে না কাউকে তখন মেসোমশায়ের দিকে 'চোখ' রাখতে হয়। মেসোমশাই কী করতে কী করে বসেন? আর আজ তো একেবারে চরম সামাজিক মুহূর্ত সমাগত—স্বয়ং মেসোমশায়েরই কন্যাদায়! অথচ মহামান্য কন্যাকর্তা হিসেবে মেসোমশাই নিজের ডিউটিটা সম্বন্ধে

BanglaBook.org

কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারছেন না। সম্প্রদান করবেন কনের জ্যাঠা, নিমন্ত্রণপত্রেও তাঁরই নাম। রান্না-বান্নার, 'খাওন-দাওনের' চার্জে আছেন কনের করিতকর্মা সেজকাকা। কেনাকাটার দিকটা সম্পূর্ণ দেখছেন কনের বড়লোক মামা-মাসীরা, বাড়িভাড়া, বাড়িসাজানো বুড়োদার, বিবাহের আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা কনের ছোটকাকা এবং কাকীদের দেখার কথা। রিসেপশানের দিকে আছেন কনের পিসিরা। উৎসব বাড়িতে মেসোমশাই কিছুতেই একটা নিজস্ব ভূমিকা খুঁজে পাচ্ছেন না। তাই বলে তিনি যে অলস, অক্ষম, অথবা এলিয়েনেটেড, অর্থাৎ কিনা পার্টিসিপেশনে নারাজ—তা একেবারেই না। অতএব চর্কীবাজির মতো সারা বাড়ি ঘুরে তিনি "কন্যাকর্তার যোগ্য" কাজ নিজেই যোগাড় করে নিচ্ছেন। এবং এখানেই সকলের উদ্বেগের কারণ।

আপাতত মেসোমশাই বিয়েবাড়ির ঘরে ঘরে ঘুরে ভাঙাচেয়ার, এবং ফরাসপাতানো ইন্সপেকশন করছেন। একটা ঘরের ফরাসের ওপরে গোটাকয়েক বাচ্চা আপনমনে খেলছিল। হেনকালে মেসোমশায়ের আকস্মিক প্রবেশ। ঢুকেই তিনি বাচ্চাদের বললেন—"তোমরা মনু, অই ঘরটায় বস গিয়া। ঐ ঘরে কিনা ফরাস নাই, দেখবা ক্যাবল চেয়ার আর শতরঞ্চ।" তারপর আমার দিকে চেয়ে চোখটা টিপে—

—"অ্যাতগুলো কাসসা বাসসা—দুই-চারিটা প্রসসাব কইরা দিলেই হইল?—বাস! সাধের বিয়াবাড়ি ফিনিশ!" এত্ত অপমান? মুহূর্তের মধ্যে বাচ্চারা সব উঠে অন্যত্র পালায়! বছর বারো-তেরোর ধুতি-পাঞ্জাবি—চন্দনকাঠের বোতাম-পরা দুটো পাকা ছেলে কিন্তু বাচ্চাদের সঙ্গে উঠে গেল না। মেসোমশাই তাদের বললেন— "তোমরাও মনু উইঠ্যা ঐঘরে যাও। এই ঘর ফর এডাল্টস ওনলি।" তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে, "পোলাপানগো কথা শুইন তো যায় না। প্রসসাব কইরা দিতে কতক্ষণ?" গোঁয়ার গোবিন্দ ছেলেগুলি এবারেও উঠে দাঁড়ালো না। একটা সম্মুখ সমরের প্রস্তুতি হব-হব দেখে আমি কেটে পড়তে চাইছি, এমন সময়ে হৈ-হৈ করে দই মিষ্টি এসে পড়লো। সামনেই মেসোমশাই।—"বাবু মিষ্টি কোথায় রাখবো?" মেসোমশাই গম্ভীর হয়ে বললেন—"সো-ও-জা উপরে তিন তলায় লইয়া যাও, স-ব অ্যারেনজমেন্ট করাই আছে। রুন্টু, তুমিও সাথে সাথে যাও।"

সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় উঠে দেখি সেখানে ছাদে প্যাণ্ডেল বাঁধা, ছাঁদনাতলা সাজানো হচ্ছে, মিষ্টি রাখার কোনো ব্যবস্থাই নেই। কিন্তু সেখানে অন্য সমস্যা—ছাঁদনাতলার জন্য কলাগাছ কিনতে ভুল হয়ে গেছে।

মিষ্টির ঝুড়িওলাদের নিয়ে আবার নিচে এলাম, মেসোমশাই সেখানে ভাঙা চেয়ারের ডাঁইয়ের পাশে একটি আস্ত চেয়ারে বসে আছেন। আমাদের মুখ দেখেই বললেন—"জাগাটা পাইলা না বুঝি? যাও তবে ভাড়ারেই লইয়া যাও।"

—"ভাঁড়ারটা কোনদিকে?"

—"সেইটাও আমারেই কইয়া দিতে লাগবো? এই বাড়িটা কি আমি প্ল্যান কইরা

বানাইসি? এইখানে তুমিও যেই, আমিও সেই। দুইজনাই আউট-সাইডার। এট্টু কমনসেন্স ইউজ করবা তো রুন্টু? কমনসেন্স লাইফে খুবই দরকার হয়। যাও, তোমার মাসিমারে জিগাও গিয়া।" মাসিমা যেন এখানে আউট-সাইডার নন। যদিও প্রত্যেকেই আজ সকালে একইসঙ্গে এ বাড়িতে প্রথম পদক্ষেপ করেছি। মিষ্টিওয়ালাদের নিয়ে আবার ওপরে উঠছি, মেসোমশায় আরেকজনকে ডাকলেন—

—"এই যে লম্বোদর শুইন্যা যাও।" গণেশ সৌম্যর আরেক বন্ধু। —"তুমিও যাও, গিয়া মিঠাইটা গার্ড দাও গা। তুমি তো মিষ্টান্নটা ভালোই বোঝ, এই ডিউটি তোমারেই ঠিক স্যুট করবো, ভাড়ারঘরের সামনাটায় খাড়াইয়া থাকবা, হাতে একটা ছড়ি লইয়া। কেও যান চুরি কইরা খায় না, মেকুর-বিরাল, কি পোলাপান—বি কেয়ারফুল, বোঝলা? খুব সাবধান। যাও!"

খানিক পরে একটা বাচ্চা ছেলে এসে বলল—"রুন্টুদা, তোমাকে গণেশদা শিগগির ডাকছে।" গিয়ে দেখি ভাঁড়ার ঘরে সারি সারি দই মিষ্টির হাঁড়ি-থালার সামনে করুণ বিষণ্ণ গণেশ ছড়ি-হাতে দণ্ডায়মান। যেন জ্বলন্ত জাহাজের ডেকের ওপরে কাসাবিয়াঙ্কা। একবার বাঁ পায়ে ভর দিচ্ছে, একবার ডানপায়ে। আমাকে দেখেই বলল—"যা তো রুন্টু, সেজকাকার কাছে, শিগগির একটা তালা নিয়ায়, এটা কি মানুষের কাজ? এতগুলো টাটকা মিষ্টির সামনে...এভাবে...মোস্ট ইনহিউম্যান সাইকিক টরচার!"

গণেশের নাম গণেশ নয়, ধ্যানেশ। বেচারী খেতে-টেতে একটু বেশি ভালোবাসে। এই বয়সেই দিব্যি একটি ভুঁড়ি বানিয়ে ফেলেছে বলে মেসোমশাই ওকে আদর করে ডাকেন "গণেশ।" সেটাই পাড়ায় চালু হয়ে গিয়েছে।

সেজকাকা তো শুনে অবাক।—"মিষ্টির সামনে ছড়ি হাতে লোক পাহারা? এ্যাঁ? এটা কি ক্ষেত, না খামার?" তালা মজুতই ছিল হাতে, সেজকাকা নিজে যখন তালা মারবার তোড়জোড় করছেন অর্থাৎ টেকনিকালি গণেশের ডিউটি অফ হয়ে গিয়েছে, সেই সূক্ষ্ম কয়েকটি মাত্র সেকেণ্ডের মধ্যেই লুকিয়ে গোটা চারেক সন্দেশ সটাসট সেঁটে ফেলল গণেশ। এত ফাইন এবং ফাস্ট ওয়ার্কার সচরাচর দেখা যায় না, এবং গণেশের মতে, এতে নীতিগত কোনো বিরোধও নেই।

এই সময়ে ওদিকে একটা গোলমাল শুনে ছুটে গেলাম।

—"আঃ হা—কলাগাছ আনে নাই তো হইসেটা কী?" মেসোমশায়ের গলা। —"চাইর চাইর খানা কলাগাছ দিয়া হইবোটা কী? জানবা যে আমাগো ফেমিলিতে ছাঁদনাতলায় কলাগাছ লাগে না, নেভার। আমাগো গুরুর মানা। বোঝলা? কলাগাছের পাইগা বাজারে গিয়া কাম নাই, সিধা ছাদে চইল্যা যাও, চাইর কর্নারে চারিখান ইটা লাগাইয়া দ্যাও। ব্যস! ফার্স্ট ক্লাশ।" উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে মেসোমশাই প্রায় কনভিন্স করিয়ে ফেলেছেন, গণেশ আর আমি ইট খুঁজতে যাব, এমন সময়ে সৌম্যর ছোটকাকা হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির, দুই বগলে চারটে কলাগাছ! —"এই যে, খোকন,

হে-ই যাইয়া কলাগাছ কিইন্যা আনছস? যেইটার দরকার নাই ঠিক সেইটাই! টোটালি আননেসেসারি ওয়েইস্টেজ!" বলতে বলতেই দ্রুত স্থানত্যাগ করছিলেন মেসোমশাই, কেননা ওদিক থেকে মাসিমার 'মঞ্চে প্রবেশ' ঘটছে। কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। মাসিমা মৃদু ডাক দিলেন—"কই? শুনছো?" আর না শুনে উপায় আছে? মেসোমশাই দাঁড়িয়ে পড়েন।

—"তুমি নাকি বলেছো ছাঁদনাতলায় কলাগাছ লাগাতে হবে না? তোমাদের গুরুর বারণ?"

—"আরে ধুর! কে কইল? আমি তো কইলাম 'ক্যান— কলাগাছে কামডা কী? এইডা কি মা দুর্গার পুত্রের বিবাহ, যে কলাগাছ না হইলেই ওয়েডিং ক্যানসেল? জামাই-বাবাজী কি গণেশ ঠাকুর? নাকি এইডা বৈষ্ণবের কালীপূজা? অরা পাঠার বদলি কলাগাছ বলি দেয়, থোড় দিয়া ভোগ রান্না করে কইরা শুনসিলাম। অগো লেইগ্যা কলাগাছ ইনডিসপেনসিবল। কিন্তু আমাগো ঘরে তো চিনুই আছে।" মাসিমা এবার বললেন—

—"হ্যাঁগা, তোমার জন্যে কি আমি গলায় দড়ি দেবো?" লম্বা জিভ কেটে মেসোমশাই তাড়াতাড়ি বলেন—"তুমি আর ফাঁস দিবা কাগেমে? তুমি নিজেই তো ফাঁস। আমি তো তোমারেই গলায় পইরা ফাঁসি লাগাইসি। দরির কি গলায় দরি হয়? হয় না!" এমন সময়ে একজন ভদ্রলোক মেসোমশাইকে বাইরে ডাকলেন। মেসোমশায়ের মুখটি মলিন হয়ে গেল।—"অহনই আইতাসি."—বলে উপরে উঠে গেলেন হন্তদন্তভাবে। যাবার আগে মাসিমার কান বাঁচিয়ে আমাকে সিঁড়িতে ডেকে এনে বলে গেলেন—"দ্যাখলা তো? খোজা ভাইরা। গাড়ি-ড্রাইভার ধার দিসে কিনা, তাই তখন থিক্যা কাজ নাই কাম নাই আমারে ডাইক্যা ডাইক্যা ক্যাবল ফালতু কথা কইতাসে। য্যান সেই আইজ কন্যাকর্তা। কতবড় ভি. আই. পি. লোক। হুঃ। আমি আর যামুই না নিচে!" বলে, সোজা ছাদে পালালেন, যেখানে কলাগাছ লাগানো হচ্ছে। খানিক বাদে আমিই ওপরে গেলাম মেসোমশাইকে ভাত খেতে ডাকতে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সৌম্যর বড়মামার সঙ্গে দেখা। পান চিবুতে চিবুতে উঠছেন। মেসোমশাই হঠাৎ ভদ্রতার অবতার হয়ে হাত জোড় করে বললেন— "খাওনদাওন ঠিকমতো হইসে তো?" সৌম্যর মামা ঢেঁকুর তুলে বললেন,—"ব্যবস্থা তো চমৎকার, কেবল ডালে নুনটা একটুখানি বেশি পড়ে গেছে, ওটা"—

"তাইলে আপনি এট্টু ঠাকুরগো লগে থাকলেই পারতেন? খাইবেন তো আপনারাই! ডাইলে লবণটা আপনের স্বহস্তে দিয়া দিলেই ঠিক হইতো!" হতবাক শ্যালকের মুখটি কালো করে দিয়ে বীরদর্পে মেসোমশাই নেমে আসেন।

কলকাতার বনেদী বড় ঘর সৌম্যর মামারবাড়ি। উদ্বাস্তু মেসোমশাইকে ভালো ছাত্র দেখে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন সৌম্যর দাদু। কিন্তু মেসোমশাই নিজের শ্বশুরবাড়িকে দুচক্ষে দেখতে পারেন না। তাদের অপরাধ, তারা একেই ধনী, তায়

BanglaBook.org

ঘটি।—"কলকাতার কায়েত তো," প্রায়ই বলেন তিনি মাসিমাকে—

—"তোমাগো প্যাটে প্যাটে প্যাঁচ। জিলাবীর প্যাঁচ। বোঝলা? ওইটারে তো ভদ্রতা কয় না, কয় কুটিলতা!" চান্স পেলেই তিনি শ্বশুরবাড়িকে ডাউন দ্যান। নিচে আসা-মাত্র আবার মাসিমার একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেলাম দুজনে। সাক্ষাৎমাত্রেই প্রেমালাপ। মেসোমশাই এবারে ট্যাকটিক্স বদল করেছেন। অফেন্স ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স।

—"এই যে আইলেন! তোমাগো লাইগাই যত না গোলমাল। খালি হই হই! খালি হই হই!"

—"আমি আবার হৈহৈইটা কী করলুম শুনি? গোলমালের রাজা তো তুমি? তোমার বাধানো গোলমাল সামলাতে সামলাতেই"

—"কী? কী বলেছো তুমি কৃষ্ণার ভাইকে?"

—"কী আবার কইলাম? কৃষ্ণার ভাইডা আবার কেডা?"

—"জান না? জান না তো অত কথা বলা কেন? কাজের বাড়িতে, একবাড়ি কুটুম-বাটুমের মধ্যে—ছি-ছি-ছি! কী লজ্জা, কী লজ্জা। ঘরে বসেছিল, তাকে তুমি বসতে দাওনি, ঘর থেকে জোর করে তাড়িয়ে দিয়েছ, আবার বলেছ কিনা ফরাসে নাকি হিসি করে দেবে?"

—"কে কইল? আরে—সমস্ত বাজে কথা। কী কইতে কী যে কয়। বাদ দ্যাও বাদ দ্যাও। আমি তুইল্যা দিমু ক্যান? আমি তো খালি কইলাম কাসসাবাসসা গিশগিশ করতাসে, কওন তো যায় না? প্রসসাব করা দিতে কতক্ষণ? ফরাসটা শ্যাষ কইরা দিত কি না, তুমিই কও? অ্যাকসিডেন্টালি, পোলাপানগো কথা কওন তো যায় না?"

"অ্যাকসিডেন্টালি? কৃষ্ণার ভাই ক্লাস এইটে পড়ে। সে অ্যাকসিডেন্টালি ফরাসে হিসি করে দেবে? এটা একটা কথা হলো? বেচারী কৃষ্ণা খুবই দুঃখ পেয়েছে, -তার ভাই তো আর জানে না তুমি কী বস্তু? নতুন কুটুম—ছিছি"—কৃষ্ণা সৌম্যর ছোটকাকীমার নাম, কাকার নতুন বিয়ে হয়েছে—এখনও বছর ঘোরেনি। মেসো-মশাই সত্যিই এবার লজ্জা পেলেন বলে মনে হলো।

—"আমি কী কইরা জানুম সে ছ্যামরা কুটুমবাড়ির পোলা? সবকয়ডা এণ্ডাগ্যাণ্ডাই তো আসে দেহি তোমার বাপের বাড়ি থিক্যা। আমি তাই—

—"ও আমার বাপের বাড়ির লোক ভেবে তুলে দিয়েছিলে? এবারে বোঝা গেল!"

—"না, না, না, ঠিক তাও না—একচুয়ালি—সইত্য বলতে কি—"

এমন সময়ে বুড়োদার আবির্ভাব, তাঁর দীর্ঘদেহ নিয়ে, বাবা-মার ঠিক মধ্যস্থলে। দুজনের চাইতেই একমাথা ওপর থেকে বুড়োদা বললেন,—"এটা কিন্তু খুবই সেলফ কন্ট্রাডিক্টরি কথাবার্তা হচ্ছে বাবা। প্রথমত, আমি স্পষ্ট শুনেছি যে তুমি বলেছিলে—" অমনি মাসিমা ফুঁপিয়ে ওঠেন—

BanglaBook.org

—"দেখলি তো বুড়ো, দেখলি তো, তোর বাবা কী করেন? আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারলেন চিরটাকাল।" মায়ের কাঁধে হাত রেখে বুড়োদা সস্নেহে বলেন, —"যাক গে, বাবার কথা বাদ দাও মা, চলো, এবার তুমি খেতে না বসলে—"

খেয়েদেয়ে সবারই একটু ভারী ভারী লাগছে, কিন্তু মেসোমশাই হালকা পায়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন এ-ঘর ও-ঘর, এ-বারান্দা সে-বারান্দা। একবার আমাকে ডাকলেন —"শোনো, রুন্টু, এইদিকে শুইন্যা যাও"—কোনো জরুরী কাজ আছে ভেবে যেই কাছে গেছি মেসোমশাই আমার কানে-কানে ফিসফিস করলেন—"যে-যার বউরে! বোঝলা রুন্টু? যে-যার বউরে!" আমার মুখের বিভ্রান্ত চেহারা দেখে এইবার দয়াবশে উক্তিটি প্রাঞ্জল করে দেন—"মেজো-ভায়রাও তার গাড়িটা দিসে, আরও একটা গাড়ি আমি রেইন্ট করসি। চিনুর মামাগুলা, সব শালারা ওই গাড়ি কইরা যে-যার বউরে আনাইতাসে। এভেরিওয়ান ব্রিংগিং হিজ ঔন ওয়াইফ। য্যান ওইজন্যই দ্যাশে কার-রেন্টাল-সিস্টেমটা চালু আছে। যতসব সেলফ-সেন্টারড ঘটি!"

এমন সময়ে সুন্দরী, সুবেশা, মোটাসোটা, এক মধ্যবয়সিনী ঘামতে ঘামতে এসে ধপ করে চেয়ারে এলিয়ে পড়ে আহ্লাদে-গলায় বললেন—"উঃ, বড্ড চা-তেষ্টা পাচ্ছে কিন্তু, জামাইবাবু!" সাধারণত সুন্দরী শ্যালিকার প্রতি ভগ্নীপতির যে মনোভাব থাকার কথা, এক্ষেত্রে তার ঘনঘোর ব্যতিক্রম দেখা গেল। মেসোমশাই গম্ভীর স্বরে বললেন—"ঠাকুরগুলিরে আর অহন আপসেট কইরা কাজ নাই, পয়সা দিতাসি, এই লও—" বলতে বলতে প্যান্টের পকেট থেকে একটি চকচকে আধুলি বের করে অন্তত তিন ছেলের মা, সম্ভ্রান্ত মহিলাটির দিকে বাড়িয়ে ধরলেন—"রাস্তা থিক্যা চা খাইয়া আস গিয়া। বেশিদূরে না। বাইরইলেই দ্যাখবা ফুটপাথে সার সার চায়ের স্টল। সার সার। সার সার।" মহিলার মুখের অবর্ণনীয় অভিব্যক্তি দেখেই তাড়াতাড়ি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমার হাত এগিয়ে গিয়ে আধুলিটা নিয়ে নেয়। নিলে কী হবে? খপ করে আমার হাতটি ধরে ফেলেছেন মেসোমশাই।—"রুন্টু, তুমি নিলা ক্যান? তোমারে তো দেই নাই? চা-টা খাইতে চায় মলিনা। মলিনার লগে দিসি!" আমি তাড়াতাড়ি ব্যাখ্যা করি। পয়সাটা আমি মেরে দিচ্ছিলাম না, ঐ মহিলার জন্য চা এনে দেব বলেই। উনি কী করে মিছিমিছি নিজে কষ্ট করে...ইত্যাদি। মেসোমশাই তৎক্ষণাৎ এক্সট্রীমলি আনন্দিত হয়ে উঠলেন—"খাড়াও, ইউ আর আ গুড বয়, রুন্টু। ভেরি কনসিডারেট। আরও দশ-পয়সা লইয়া যাও, দুই খুরি চা নিবা, তোমাগো একটা, অগো একটা। আর আমার লগেও একটা আইন্যা দিও।" এবার মলিনা মাসিমা হেসে ফেলেন।

..."আপনার আর আমার কি একটা খুরি থেকেই ভাগাভাগি? জামাইবাবু?" লজ্জা পেয়ে মেসোমশাই বলেন—"ওঃ হো, তিনজনার তিন খুরি চা! থ্রি কাপস!" বুড়োদা তখন ওদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন—"কী, চা আনা হচ্ছে নাকি" বলে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর রেখাদি, তারপর সৌম্য, তারপর শিবু—শেষকালে একটা বড় কেটলি

আর তিন টাকা নিয়ে সৌম্য আর আমি বেরুলাম। ফিরে দেখি অপরাধী-অপরাধী মুখ করে মেসোমশাই বসে বসে চা খাচ্ছেন, সুন্দরী শ্যালিকাকে সঙ্গে নিয়ে। ঠাকুররাই চা বানিয়ে ট্রে ভরে ভরে পাঠাচ্ছে! মেসোমশাই যারপরনাই লজ্জিত। কেটলিসমেত আমাদের দেখে বললেন—"রাইখ্যা দ্যাও রাইখ্যা দ্যাও। কাজে লাগবোই—পরে গরম কইরা খাইলেই হইবো। কি কও, মলিনা?" মলিনা মাসিমা কেবল হাসতে থাকেন। বিয়েবাড়িতে আর কে কবে মনে করে তিন টাকার ফুটপাথে কেনা চা গরম করে খায়?

ইতিমধ্যে দেশবিখ্যাত রূপচর্চাবিশারদ গোপকুমার এসে গেছেন, শুধু চুল বাঁধতেই যিনি পাঁচশো টাকা নেন—(এইসঙ্গে রাঁধতে বললে কত নিতেন কে জানে) এঁর আসাটা মেসোমশাই পছন্দ করেননি। তাই গলা তুলে বললেন—"আমাগো টাইমে তো মা-মাসিরাই চুল বাঁইধ্যা দিত। কিন্তু চিনুর মা তো তা দিবে না! অলস! তাই ফাইব হানড্রেড রুপিজ জলে ফ্যালাইল।" মাসিমা ধারেকাছেই ছিলেন। হৈ-হৈ করে এসে পড়লেন—"কে বললে আমি চুল বাঁধতে পারি না? তোমার ভাইয়েদের বৌভাতে কে বৌ সাজিয়েছিল? আমার ননদদের বিয়েতে কোন্ ভাঁড়াটে লোক এসে চুল বেঁধেছে, শুনি? এটা আলাদা। এ হলো চিনুর একটা স্পেশাল শখ। তা, এর খরচাও তো তোমার নয়, ওটা দিয়েছে আমার ভাই। তোমার তাতে এত গা-জ্বালা কিসের?"

—"আরে—যে-হালায়ই দিক না ক্যান ওটা কোনো কথাই না। কথাটা হইলো প্রিন্সিপলের। ওই পাঁচশত টাকা দিয়া তোমার আমার দুইজনারই চন্দনকাঠের চিতা হইতে পারতো জান?" কোত্থেকে বুড়োদাদার উদয়। পুনরায় ব্যাফল ওয়ালের মতো মাসিমাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বললেন—"খুবই ইললজিকাল কথা বললে কিন্তু বাবা। যদিও সাজসজ্জায় একরাত্রে পাঁচশো টাকা খরচ করাটা মর‍্যালি সাপোর্ট করি না, তবু আমি মনে করি, একজন জীবিত ব্যক্তির মনস্তুষ্টির জন্য পাঁচশো টাকা খরচ করাটা অনেক বেশি ওয়ার্থ হোয়াইল, এক মৃতদেহের পিছনে ঐ অর্থ ব্যয় করার চাইতে। তাছাড়া যখন পনেরো টাকাতেই বৈদ্যুতিক চুল্লীতে সিভিলাইজড উপায়ে একটা—"

—"পনেরো আর নাই রে বুড়া, হেই দিনকাল নাই। এই বাপেরে পুড়াইতে তোমার কিন্তু চল্লিশ টাকা লাগবো। আর তোমার মায়ের বেলায় নির্ঘাত আরো বেশি, ধাই দেন অন্তত পঞ্চাশ-ষাট তো বটেই"—এবার মাসিমা খুবই মুষড়ে পড়েন।—"ভালো! বাপব্যাটায় মিলে তোমরা আমার চিতার হিসেবটাই করো তাহলে আজকের দিনে"—মেসোমশাই পলকে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করেন—"তোমাগো লেইগাই তো এই কমপ্লিকেশন শুরু। ও গোকুলচন্দ্ররে আনলো কেডা? তোমাগো বড়লোক বাপের-বাড়ি থিক্যাই তো"— বুড়োদা আবার শুধরে দেন—"গোকুলচন্দ্র না বাবা, গোপকুমার।"

—"ওই একই হইল, যিনিই গোকুলচন্দ্র তিনিই হইলেন গোপকুমার, কোনো

ডিফারেন্স নাই"—

—"না, ডিফারেন্স তোমার কিছুতেই কি আছে, কেবল আমার বেলায় ভিন্ন। মুড়ি-মিছরি তোমার কাছে একদর—যত যন্ত্রনা সবই কেবল এই একটি জায়গায়" —বেগতিক বুঝে আমি বুড়োদার দাওয়াইটা অ্যাপ্লাই করি।

"মাসিমা, চিনুদি বোধহয় আপনাকে ডাকছিলেন।" কী কুক্ষণেই যে বললাম। বলবামাত্র মাসিমা দৌড়ে ও-ঘরে যান। এবং ততোধিক দৌড়ে প্রত্যাবর্তন করেন। রণং দেহি মূর্তিতে।

—"তোমাকে কে বলেছিল শত্রুতা করে মেয়েটাকে এক্ষুনি হরলিক্স আর দই গেলাতে? কেন খাইয়েছ? কেন ওর অতো দামী বেনারসীতে দই ফেলে দিলে তুমি? অত কষ্টের সাজগোজ নষ্ট করে দিয়েছ কিসের জন্যে? কে বলেছিল তোমাকে? কে?"

চিবুক উঁচু করে প্যান্টের দু পকেটে দুই হাত গুঁজে, মার্দানী ভঙ্গিতে একটু বাঁকা হয়ে দাঁড়ান মেসোমশাই। চেহারার মধ্যেই ডিফায়্যান্ট ভাবটা সুস্পষ্ট। যেন ফাঁসির মঞ্চে সূর্য সেন।

—"কইবো আর কেডা? আপন গর্ভধারিণী জননী যারে দেখে না, হিউজ নেগলেক্ট করে, তারে দেখবো তো বাপেই। ব্যাপার কী? না পাঁচশো টাকার সাজসজ্জা কমপ্লিট হয়ে যাবার পরে, সহসা উদ্ভাবিত হয়ে মেসোমশাই চিনুদিকে জোর করে হরলিক্স আর দই খাইয়ে বসেছেন নিজের হাতে। ফলে সেইসব সমুদ্রপারবর্তী অমূল্য কিসপ্রুফ লিপস্টিক, লিপগ্লস, লিপ-শাইনার, লিপ-লাইনার ইত্যাদি স্রেফ লেহ্য পেয় হয়ে গিয়ে, কনে সর্বস্বান্ত। ওষ্ঠাধরে এখন প্রধানত যাদবের দই লেগে আছে। হৃদয় হা হা করে উঠলেও বেচারা চিনুদি একঘর কুটুম্বের সামনে বাপের অবাধ্য হতে পারেনি।

—"এই হরলিক্স আর দইটুক এট্টু খাইয়া লও মা জননী, এ হইল গিয়া রোগীর পইথ্য, উপবাসের মধ্যে খাইলে দোষ হয় না। আহা, মাইয়াডার মুকখানি শুকাইয়া এই এত্তোটুক যে!" ফলে চিনুদির মুখ আরো বেশি শুকিয়ে খুবই করুণ হয়ে গেল। কিন্তু পিতার সেন্টিমেন্টাল অ্যাকশনে বাধা দেয়, এমন বুকের পাটা কোনো আত্মীয়ের ছিল না। যদিও প্রত্যেকেই পাঁচশো টাকার প্রসাধন অংশত খেয়ে ফেলা নিয়ে যৎপরোনাস্তি উদ্বেগে ভুগছিলেন। চিনুদির অসীম সহ্য। বুক ফাটলেও চোখ ফাটেনি—কেননা তাতে নয়নের টিয়ার প্রুফ-মাস্কারা এবং কপোলের ফিয়ারপ্রুফ 'ব্লাশার' পেইন্টও ধুয়ে যেতে পারতো, কে জানে?

খাওয়াবার সময় এক চামচ দই আবার কনের কোলে পড়ে গিয়েছে। পড়বামাত্র মেসোমশাই সেখানে একমগ জল এনে মুছেছেন। ফলে এখন কনের কোলের কাছে লাল বেনারসীর বেশ খানিকটা অংশ রং পালটে ঘোরতর খয়েরি এবং জরিটরি ভিজে ভারি হয়ে উঠেছে। চিনুদি ঠোঁট ফুলিয়ে সেইখানটা অনবরত ফুলের মালা

BanglaBook.org

দিয়ে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করছে। এই অবস্থায় আমি কেটে পড়াই ভালো মনে করি।

সন্ধে হয়ে গেছে, সৌম্য আর আমি একটা ঘরে ঢুকে সিগারেট খাচ্ছি। চারদিকে এত ফ্রি সিগারেট অথচ এমনই গুরুজনদের ভিড় যে না-লুকিয়ে খাওয়াটা সম্ভবই হচ্ছে না। হঠাৎ সেই ঘরেই মেসোমশাইয়ের প্রবেশ।—"রুন্টু, তুমি না ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার?" ভাগ্যিস আমার সিগারেটটা ততক্ষণে শেষ। "এখনও ফাইন্যাল পরীক্ষা হয়নি মেসোমশায়।"

—"ঐ হইল গিয়া একই কথা। বিয়াতো এখনও হয় নাই, তবুও তো চিনু অহনই কনেবউ। তুমি হইলা গিয়া কনে-এঞ্জিনিয়ার। বোঝলা? ইলেকট্রিকাল অ্যাপ্লায়েন্সগুলি তো বুঝ? রেকর্ড প্লেয়ারে তুমিই বস গিয়া। যাও। যত আনট্রেইনড লে ম্যানগো হাতে পইরা মেশিনটা শ্যাষ হইয়া যায় আর কি! ঘটিরা মেশিন-টেশিনের সাবজেক্টটাই বুঝে না,—ব্রেইনটা ডাল তো?" সৌম্যর মামাতো ভাইবোনেরা যে সারাদিন রেকর্ডপ্লেয়ারে শানাই লাগাচ্ছে, এটা এইমাত্র মেসোমশাইয়ের খেয়াল হয়েছে। —"আর শুন, বি কেয়ার-ফুল, রেকর্ড দুইখান অলটারনেইটলি লাগাইবা। অলটারনেইটলি, অর্থাৎ একবার এইটা, আরেকবার ওইটা। বোঝলা তো? সৌম্য কই?" —সৌম্য তখন দরজার পিছনে মেঝেয় ঘষে ঘষে সিগারেট নেভাতে দারুণ ব্যস্ত। ঘরময় ফরাসপাতা অথচ অ্যাশট্রে নেই। ফরাসে ছাই যাতে না পড়ে তাই অতি সতর্কতা অবলম্বন করেছি। ঘরের এককোণে ঢুকে একফালি ফাঁকা মেঝেয় ছাই ঝাড়া হচ্ছিল। কিন্তু মেসোমশাইয়ের চোখকে ফাঁকি দেবে কে?—"ঐ ধারে ধোঁয়ার মতন দেখতাসি না? ওহানে কেডা? সৌম্য নাকি?" সৌম্য কাশল। —"হুঃ। ঘরময় ছাই ঝারতাসো। অ্যাঁ? চাদরটা ময়লা করতাসো। অ্যাঁ, কামের বেলায় দেখা নাই, ক্যাবলই আকামা কামের রাজা?" বলতে বলতেই মেসোমশাইয়ের সবেগে নিষ্ক্রমণ এবং পরমুহূর্তেই কোত্থেকে একটি স্বাস্থ্যবান নতুন মুড়োঝাটা হাতে পুনঃপ্রবেশ।—"ছিঃ ছিঃ, যতত ছাইভস্ম ঝাইরা পরিষ্কার-ঘরটাকে দিল শ্যাষ কইরা" —গজরাতে গজরাতে তিনি ঝাঁটা বুলিয়ে বুলিয়ে ধবধবে ফরাস থেকে কাল্পনিক ছাই ঝাড়তে থাকেন। মেসোমশায়ের নিজের পায়ে অবশ্য যথেষ্টই ময়লা ছিলো। ফরসা চাদরে সেই ময়লা পায়ের ছাপ পড়তে লাগলো, অম্লান বরফে ইয়েতির পদচিহ্নের মতো। আপ্রাণ চেষ্টাতেও ঝাঁট দেওয়ার পুণ্যকর্ম থেকে মেসোমশাইকে নিবৃত্ত করতে পারা গেল না। ফরাসটাকেও পরিচ্ছন্ন রাখা গেল না।

ইতিমধ্যে একসঙ্গে অনেকগুলো গাড়ির হর্ন শোনা গেল, গেটে শাঁখ বেজে উঠলো, হুলধ্বনি হলো। অমনি, "—দেয়ার! দি বরযাত্র! দি বরযাত্র ফাইনালি অ্যারাইভড!!!" বলে চীৎকার করে উঠে মেসোমশাই ঝাঁটা হাতেই দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন। পেছন পেছন আতঙ্কিত সৌম্য আর আমি—"বাবা! ঝাঁটা! ঝাঁটা!" "মেসোমশাই, ঝাঁটা!

BanglaBook.org

ঝাঁটা।" বলতে বলতে ছুটি, কিন্তু সমবেত গোলমালে আমাদের কাতর আকুতি ডুবে যায়। কে কার কথা শোনে! মুহূর্তের মধ্যে হাস্যবদন প্রফুল্লকান্তি মেসোমশাই মুড়ো ঝাটা হাতে বরযাত্রী অভ্যর্থনায় সদর গেটে রেডি। এই ক্রিটিকাল মোমেন্টে মিতুন, সৌম্যর ছোট বোন ছুটে এসে বাবার হাত থেকে ঝাঁটা কেড়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল, এবং মেসোমশাইকে চাপা গলায় একটি ধমক লাগালো।

অমনি তাঁর মুখের হাজার পাওয়ারের হাসিটি দপ করে নিভে যায়, এবং মুড-মেজাজ খুবই খারাপ হয়ে যায়। মেসোমশাই এবার হাত জোড় করে, বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে, ঠিক শ্রাদ্ধসভার কর্মকর্তার মতো দাঁড়ান। গাড়ি থেকে বরযাত্রীরা নামতে শুরু করে। মেসোমশাই গম্ভীর। নির্বাক। জোড়হস্ত। শাড়িপরা, সুন্দরী মিতুন আর তার একটি কিশোরী বান্ধবী বেলফুলের মালা আর একটি করে গোলাপ বরযাত্রীদের উপহার দিচ্ছে। একটি মিষ্টি হাসি সমেত। স্মিতহাস্য সুদর্শন এক যুবক মিতুনকে নিচুগলায় কী যেন বলতেই, লজ্জায় লাল হয়ে মালা না দিয়ে মিতুন তাকে দুটি গোলাপফুল দিয়ে ফেলে। তৎক্ষণাৎ মেসোমশায়ের মুখ খুলে যায়।

—"দুইটা কইর‍্যা গোলাপফুল কারেও দিবা না, মিতুন। সব একটা একটা, ওয়ান ঈচ! বোঝলা? 'মালা দ্যাও।"

সপ্রতিভ যুবকটি বলে—"আমিও তো ঠিক তাই বলেছিলাম, মালা দিতেই তো বলছিলাম। উনি কিন্তু দিলেন না—" এবার মেসোমশাই ছোকরাটির দিকে ঘুরে দাঁড়ান। ব্যালে ডান্সের পিরুয়েৎ করার ভঙ্গিতে। এক মুহূর্ত রক্ত জলকরা চাউনি, তারপর বললেন— "আপনের এট্টু মিসটেইক হইয়া গেসে না? আইজ তো আপনের মালা পাওনের ডেইট না? আপনের ফ্রেইন্ডের।" তারপরে— "মিতুন, অমন যারে-তারে মালা দিবানা এই কইয়া দিলাম, হউক সে বরযাত্র, যতসব ফাজিল ছ্যামরা।" কুটুম্ব যুবকটি বিড়ম্বিত, মিতুন লজ্জিত, আমরা উদ্বিগ্ন, সৌম্য তাড়াতাড়ি গিয়ে ছেলেটির ক্রোধে ফুলন্ত পিঠে সৌভ্রাত্রের হাত রাখে। এবং ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক ভিতরে নিয়ে যায়। এবং অচিরেই অকুস্থলে বুড়োদার অভ্যুদয় ঘটে।

—"আবার তুমি কন্ট্রাডিকটারি কথাবার্তা বলছো বাবা? এই তুমি নিজেই বললে মালা দাও—মালা দাও, আবার এই বলছো মালা দিও না—মালা দিও না। মিতুন তো এতে একদম কনফিউজড হয়ে যাবে!"

মেসোমশাই চোখ তুলে মনুমেন্টের মতো উঁচু মধ্যপ্রাচ্যপ্রবাসী পুত্রের মুখের দিকে তাকান। তারপর তার বুকের গোলাপফুলটির দিকে। তারপর বলেন—"মিতুন, তোমার দাদার বুকের থিক্যা ওই গোলাপটা খইল্যা লও তো দেহি। যত ওয়েইস্টেজ।" ইতিমধ্যে বর-বরণ করতে কুলো-ডালা-শ্রী সমেত মাসিমাও গেটে উপস্থিত। চওড়া জরির দাঁতওয়ালা টুকটুকে লালপাড় দুধে-গরদের ঘোমটার নিচে তাঁর গোলগাল ফর্সা মুখখানি আধো-খুশিতে, আধো-কান্নাতে, উদ্বেগ উত্তেজনায় আশ্চর্য রঙীন। মাসিমার মুখের সেই লালচে আভার দিকে খানিক স্থির চোখে তাকালেন মেসোমশাই। তারপর বললেন—

BanglaBook.org

—"মিতুন, বুড়ার বুকের থিক্যা গোলাপফুলটা খুইল্যা লইয়া তোমার মায়ের খোপায় গুইজ্যা দাও তো দেহি।"

সেই মুহূর্তেই বর নিয়ে ঢুকলেন বরের পিসেমশাই। যিনি মেসোমশায়ের অফিসের ইনকামট্যাক্স অডিটার। চেনামুখটি দেখতে পেয়ে অকূলে কূল পাবার মতো পরম উল্লসিত মেসোমশাই বরের দিকে দৃকপাত মাত্র না করে বরের পিসেকে জড়িয়ে ধরে বললেন—"আরে —আসেন স্যার—আসেন, আইজ তো আপনেরই দিন!" উলু এবং শঙ্খধ্বনিতে মেসোমশায়ের মহৎ-উল্লাস চাপা পড়লো।

বরপক্ষ বড্ড বেশি ধনী। মেসোমশাই সেই কারণে একটু উদ্বিগ্ন। কিন্তু সেটা প্রকাশ করা চলছে না। কেননা বাড়ির আর সকলেই খুশি। বড়লোক হলেই বা। তারা লোক খারাপ নয়। একেবারে কিচ্ছু চায়নি। "হ্যাঁ, একটা বিয়ের মতো বিয়ে করেছে বটে চিনু! প্রেম তো কত লোকেই করে। বলতে গেলে প্রায় প্রত্যেকেই করে। কিন্তু এমন একটা বিয়ে ক'জনে পায়?" —অতএব বালিগঞ্জে ভালো পাড়ায় বিয়েবাড়ি ভাড়া নিয়ে, টুনিবালবের ঝর্ণাধারায় আর টাটকা ফুলের তৈরি রাজকীয় তোরণে রাজীমাৎ করে বাড়ি সাজানো হয়েছে। এই শখ এবং খরচ সব বুড়োদার। কিন্তু এই এলাহি ব্যাপারটা মেসোমশাই একদম পছন্দ করছেন না। তাঁর ইচ্ছে ছিল গড়িয়ায় তাঁর "নিজ বাসভবনে" ছাদে পাঁচশো বেঁধে যেমনভাবে সেদিনও তাঁর ছোটভায়ের বিয়ে হলো, তেমনি করেই মেয়ের বিয়ে দেন। "চিনুর বিয়ে" বলতে যে স্বপ্নটা তিনি চিরদিন দেখে এসেছেন তার সঙ্গে এসব কাণ্ডকারখানা ঠিকঠাক কিছুই মিলছে না। আজকের এই বিয়েবাড়ি তাঁর যেন নেহাত অচেনা। এর মধ্যে তাঁর ভূমিকাটা কোথায়? পাত্রও তাঁকে খুঁজতে হয়নি, চিনু নিজেই খুঁজে পেয়েছে। পণও নিচ্ছে না তারা একটি পয়সা, খাটবিছানা, দানসামগ্রী কিছুই নেবে না, রাখবার জায়গা হবে না নাকি তাদের। সবই আছে। কেবল নমস্কারী কাপড় তিপ্পান্ন পীস, আর আশীর্বাদে বরের একসেট হীরের বোতাম হলেই হবে বলেছিল —নইলে নেহাত আত্মীয়দের কাছে পাত্রের মুখ থাকে না, তাই। তাই সেই বোতামটা ছেঁটে ফেলে একটা হীরের আংটিতে রফা করে নিয়েছে চিনুই। (চিনুর মতো কনসিডারেট মাইয়া ওয়ার্ল্ডে কয়জনার হয়?) কিন্তু এতেই মেসোমশায়ের গচ্ছিত প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড উঠে গেছে, বন্ধুদের কাছে ধার হয়েছে। এখনও মিতুনের বিয়ে বাকি, সৌম্যর ডাক্তারি পড়া শেষ হয়নি। অথচ পাঁচশো টাকার খোঁপা, চার হাজারের ফুল এবং আলো (সে যে-হালায়ই দিউক না ক্যান), মেসোমশাইয়ের মাথার মধ্যে কেবলই এগুলো ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। সুতরাং বরযাত্রীরা যেই সভা-সাজানোর প্রশংসা করেছে, অমনি মেসোমশাই বলে ওঠেন—"তাইলে শোনেন স্যার, অই যে টুনিবালব আর ফুলের গেইট, তার দ্বারা কিন্তু বিয়াডা হয় নাই। তার জন্য প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড ভাঙাইতে হয় না। হ্যাঁ, মন্দ কি আর? ফেন্সী ব্যাপার, লাইট, ফ্লাওয়ার, এ সকল তো ভালোই! ঐ যে বাইবেলে কয় না, 'লেট হানড্রেড ফ্লাওয়ার্স ব্লুম—লেট দেয়ার

বি লাইট?'—সকলই সইত্য। কিন্তু পার্সে কুলাইলে তবে তো? মাও সে-তুং যে কইসেন না, চাইনিজ পিপলদের লগে—'কাট ইওর কোট একর্ডিং টু ইওর ক্লথ'? আমিও তাই কই! খাঁটি কথা!"

বরযাত্রীরা মেসোমশায়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্য শুনে বাকশক্তিরহিত হয়ে পড়েন। আমি কী করে যে ওঁকে সরিয়ে নেব, ভেবে পাই না। এরপর মেসোমশাই উদাস দার্শনিককণ্ঠে বলেন—"এইজন্যই তো ঠাকুর কইসেন—সর্বদা সমানে সমানে কাজ করা উচিত। পূর্ববাংলায় আমাগো এক প্রবচন আছে—উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে, যিনিই মধ্যম তিনি চলেন তফাতে। আমরা হইতাসি গিয়া সেই মধ্যম! বোঝলেন?" বরযাত্রীরা গম্ভীর হয়ে পড়লেন। তাঁরা ঠিক বুঝতে পারলেন না, তাঁদের উত্তম বলা হচ্ছে, না অধম বলা হচ্ছে। কিন্তু মেসোমশায়ের তাতে কোনো উত্তাপ নেই। এবার তিনি—"এক্সকিউজ মী, আমি একটু রিফ্রেশমেন্টের দিকটা দেয়খ্যা আসি" বলে উঠে গেলেন।

আসলে বরযাত্রীদের সঙ্গে কন্যাকর্তার ব্যাক্যালাপ ব্যাপারটার সঘন সামাজিক গাম্ভীর্য বিষয়ে মেসোমশাই পর্যন্ত সচেতন। এবং সেই কারণেই নার্ভাস হয়ে পড়লে কেউ কেউ যেমন তোৎলা হয়ে যায়, মেসোমশাই তেমনি নিজের কথা খুঁজে পান না। কেবলই কোট করতে থাকেন। কিন্তু কোটেশনের উৎসগুলো তখন সব গোলমাল হয়ে যায়। কোনটা প্রবাদ কোনটা মাও সে-তুং কোনটা বাইবেল কোনটা রবীন্দ্রনাথ, সে সমস্তই তখন ইমমেটিরিয়াল হয়ে যায় ওঁর কাছে। এই যেমন বিয়ের আগের দিনের দুপুরবেলা গড়িয়ার বাড়িতে। বিয়েবাড়ির হট্টগোলে বাড়ির কুকুরটি ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে এনতার তাড়া করেছিল লোকজনকে। তাড়া খেয়ে বাচ্চা চাকর কেঁদে ফেলেছে। মেসোমশাই তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত। উদ্বিগ্ন।

—"কী হইসেটা কী?"

—"কুকুর অ কামড়াইথিলা।"

—"একচুয়ালি কামড় দিসে কি?"

—"না, কিন্তু—"

—"না? তবে কানসিলা ক্যান?"

—"মোর নূতন লুগা ছিড়ি দিলা।"

—"ঈশশ—।" দুমিনিট—লুঙ্গির জন্য মৌন শোক। তারপর—

—"তুই অরে উল্টাইয়া মারলি না ক্যান?"

—"বাবু আপন মতে মনা করিথিলে। কহিথিলে কুকুরকু মারিলে মোর গোড়অ ভাঙ্গি দিবে—"

—"আরে থো—! আমি হেইটা কইসিলাম তুই অরে মিছামিছি খ্যাপাইতিস বইল্যা। কিন্তু ফোঁস করতে তো মানা করি নাই?"

—"ফোঁস? ফোঁস কঁড় বাবু?"

BanglaBook.org

—"আরে হেইটাও শোনস নাই? লাঠির ঘায়ে মর মর সাপটারে দেইখ্যা সেই যে গান্ধীজী কইসিলেন—আরে, তোরে কামড় দিতে মানা করছিলাম, কিন্তু ফোঁস করতে তো মানা করি নাই? মহাত্মাজীর সব থিক্যা ভেলুয়েবল অ্যাডভাইজ হইল এইটা। সর্বদা স্মরণে রাখবা। বোঝলা?"

তক্ষুনি বুড়োদা বললেন,—"বাবা ওটা কিন্তু মোটেই গান্ধীজী বলেননি, ওটা তো রামকৃষ্ণের কথা।" মেসোমশাইও ত্বরিতে জবাব দেন,—"আঃ—কথাটা যে হালায়ই কউক না ক্যান, কইসে তো? গ্রেট মেন থিংক এলাইক।"

বরযাত্রীদের কাছে ছুটি নিয়ে মেসোমশাই বললেন—"চল রুন্টু, ঠাকুরগো কামকাজ একটু ইন্সপেক্ট কইরা আসি?" হালুইকরদের কাছে উপস্থিত হয়ে যেই কন্যাকর্তার উপযুক্ত জলদগম্ভীর স্বরে গলা খাঁকারি দিয়ে—"মাছ ভাজাটা হইল কেমনি? দ্যাখাও তো দেহি—" বলা, অমনি বামুনের সাফ জবাব—"এখন ওসব হবে না। ফালতু ঝামেলা করবেন না। হ্যাঁ! শুনলে বাবু কিন্তু রাগ করবেন" রান্না-বান্নার চার্জে আছেন সৌমার সেজকাকা। মোটাসোটা, কর্মঠ, ভুঁড়িতে তোয়ালে বেঁধে উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন,সব চুল সাদা। মেসোমশায়ের ভুরুটি ঢুলেও পাক ধরেনি, নেহাত ছোকরা-চেহারা, পরনে স্কুলের ইউনিফর্মের মতো হাতপুরো সাদা শার্ট সাদা জিনের প্যান্টে গুঁজে পরা। উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই মুখে। (ধুতি পাঞ্জাবি কন্যা-কর্তাকে কিছুতেই পরানো যায়নি। ধুতি খুলে গিয়ে কেলেংকারি হবার ভয়ে। অবশ্য মুখে বলেন—ধুতি নাকি বিধবা মেয়েদের ড্রেস, পুরুষ মানুষের পোশাকই নয় মোটে)। হালুইকর ঠাকুর জানে সব বিয়েবাড়িতে ঢের ফালতু মাস্তান থাকে, তাদের প্রশ্রয় দিতে নেই। সে তো আর মেসোমশাইকে দেখেনি, চেনেও না। মেসোমশাই কিন্তু সত্যি রেগে গেলেন। —"দুলু! দুলু!", সেই কণ্ঠস্বরে সেজকাকা আক্ষরিক অর্থে দৌড়ে এলেন—

—"কী? হইল কী মেজদা?"

—"এই রাস্কেলটারে ক্যান বসাইছস? এ রাস্কেল আমারে বাবু দ্যাখাইতাসে, আবার কয় কিনা, 'ফালতু ঝামেলা করবেন না।' আমাগো মাইয়ার বিয়া, আর আমারেই কয় কিনা 'ফালতু?' গেট আউট! গেট আউট! অহনই আমি অন্য ঠাকুর ডাইক্যা আনতাসি। আমাগো গড়িয়ায় শয়ে-শয়ে হালুইকর পথে পথে ঘুরতাসে।" ঠাকুরটি অতি চালু পার্টি। মুহূর্তেই বুঝে ফেলেছে ব্যাপারটার তাৎপর্য— বিশাল এক লুচিভাজা ঝাঁঝরি হাতেই দৌড়ে এল তক্ষুনি, পেছু পেছু দৌড়োলো তার যোগাড়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট, দু হাতের অঞ্জলিতে কলাপাতায় মুড়ে একডজন মাছভাজার গরম গরম নৈবেদ্য নিয়ে।— "এবারকার মতো মাপ করে দিন বড়বাবু। অপরাধ হয়ে গেছে। আপনারই মাছের পীস রক্ষা করছিলাম আমি। বিয়েবাড়িতে কত ফালতু লোকও তো থাকে"

আবার সেই শব্দ—ফালতু? মেসোমশায়ের রাগ কমল না। মাছ ছুঁলেন না। স্তব্ধ। আস্তে করে দুলুবাবু ঠাকুরদের প্রমপট করলেন—"আরেকবার!" এবার দুই ঠাকুর

গলা মিলিয়ে কোরাসে বারবার আকুল হয়ে মাপ চাইতে লাগলো এবং মেসোমশাইকে মাছভাজা খাওয়ার জন্য কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো। তখন ওদের ক্ষমা করে দিয়ে মেসোমশাই নিজে দয়া করে খানছয়েক খেলেন আমাকেও গুণে গুণে ছখানাই খাওয়ালেন এবং—"দুলুরে, অ দুলু! শোনো, তুমিও অহনই খাইয়া লইও খানকয় মাছভাজা, ভাল পীস আর কিন্তু পরে পাইবা না!" বলে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে চলে যেতে যেতে বলেন—"হাঃ, আমার মাছের পীস রক্ষা করে কে? না হালুইকর ঠাকুর। যেই না poacher সেই হইল গিয়া gamekeeper, হাঃ!" তারপরেই মনে পড়ে গেল—"আহা, চিনুর মা-ডারেও দুইখান গরম মাছভাজা খাওয়াইলে হইতো!" যেমনি মনে পড়া অমনি কাজ—"রুন্টু, শোনো, রান্নাঘরে আমি যামু না, তুমিই যাও। দুলুর থিক্যা দু'খান মাছভাজা চাইয়া লও, নিয়া তোমার মাসিমারে খাওয়াও গা যাও। কইবা, আমি পাঠাইসি। বোঝলা? না খাওয়াইয়া আসবা না কিন্তু! ঠিক যেইডা আমি দেখি না হেই দিকের টোটাল কনফিউশন। আরে, চিনুর মায়েরে যে মোটেই মাছভাজা খাওয়ানো হয় নাই, হেইটাই বা দ্যাখে কে? যাও, যাও—" বলতে বলতে উনি দ্রুত লোক-খাওয়ানোর দিকটায় চলে গেলেন। আমি ছুটি মাসিমার জন্য মাছ-ভাজার ব্যবস্থা করতে। মাসিমা তো প্রথমে হাসলেন, তারপর এক ধমক দিলেন, মোটেই মাছভাজা খেলেন না। সেই ব্যর্থ দৌত্যের পরে গুনগুনিয়ে মেসোমশায়ের খোঁজে খাবার জায়গায় এসে দেখি চপ দেওয়া হচ্ছে। বরযাত্রীরা খেতে বসেছে। মেসোমশাই সৌম্যকে বলছেন—"বড়দের দুইটা কইরা, ছোটদের একটা। না চাইলে একদম রিপিট কইরো না। ওয়েইস্ট য্যান হয় না। বোঝলা?" এসব সৎশিক্ষা রান্নাঘর থেকেই পই-পই করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটি পরিবেশককে। কিন্তু মেসোমশাইকে চুপ করানোর প্রয়াস বৃথা। কানে কানে শেষটা ("এটা কিন্তু বরযাত্রীদের ব্যাচ, মেসোমশাই") বলে দিতেও তিনি ঘাবড়ালেন না।

—"আরেঃ, তয় হইসেডা কী? হউক না বরযাত্র, ওনারা তো আর পর না? আমার চিনুরই ঘরের মানুষজন—ওনারা শোনলেই বা দোষটা কোথায়? ওয়েইস্টিং ফুড ইজ আ ক্রাইম ইন ইনডিয়া—কী কন বেহাইমশায়?" বলে, যে শুভ্র কেশ শুভ্রবাস কাঁধে মুগার চাদর ভদ্রলোকের দিকে সপ্রেম দৃষ্টিক্ষেপ করেন মেসোমশাই তাঁকে দৃশ্যত যে-কোনো বিবাহেই বরকর্তার ভূমিকায় মানাতো বটে, কিন্তু আজ এখানে তিনি মোটে বরযাত্রীই নন, চিনুদির কলেজের প্রফেসর। 'বেহাই' —এই অনর্জিত প্রিয়সম্বোধনে বিব্রত প্রফেসর গুপ্ত হ্যাঁ-না দুইই হয়, এমন একটি হাসি দিলেন। ফলে, যথেষ্ট কুটুম্ব কর্তব্য হয়েছে মনে করে, হৃষ্টচিত্তে মেসোমশাই বরযাত্রীদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে নিচে নেমে আসেন।

নেমেই অফিসের এক সহকর্মী বন্ধুর সঙ্গে মুখোমুখি। আর অমনি —'খুলিল হৃদয়দ্বার খুলিল!'

—"বাঃ। সুধীরচন্দ্র যে, আইস্যা পড়সো তাইলে? শেষমেষ পৌঁসাইলা? যাক।

BanglaBook.org

তা-রপর? নিউজ কী? আইজ অফিসে গেসিলা? আমি তো এক্কেরে থ্রিজনার হইয়া আছি। মাইয়ার বিবাহ, কি য্যামন ত্যামন ব্যাপার? ওহ!" বলতে বলতে বেশ মৌজ করে মেসোমশাই বরযাত্রীদের ছেড়ে-যাওয়া একটা গদি আঁটা সোফায় জমিয়ে বসে হাঁক পাড়েন—"কই পানসিগ্রেটের ট্রেটা গেল কই?" ট্রেসহ একটি ছেলে এগিয়ে আসতেই, আবার— "কোকাকোলার চাবিটা কার কাছে?" এবার চাবিসহ আরেকজন সবিনয়ে উপস্থিত হয়। "একটার বেশি কারেও দিবা না। আর তাও ক্যাবল বরযাত্র। ভেরি এক্সপেনসিভ হইয়া গেসে। ওনলি ওয়ান ঈচ! তুমি নিজে কয়টা বোতল খাইলা, মনু? ওনলি ওয়ান তো? বা, বা, বেশ, বেশ। এইবার এইদিকে দুইটা বোতল আনোতো দেহি! ঠাণ্ডা দেইখ্যা।" বন্ধুকে কোকাকোলা দিয়ে বললেন, "আইজ লনডন নোটবুকটা পড়সিলা? কী কাণ্ড কও তো দেহি? কোথায় ছিল জেমস কাউলি, আর কোত্থিক্যা আইসে এই চান্দে, আব ঈ-তে। হেঃ।" তারপর নিজের বোতলে একচুমুক দিয়ে বেশ রিল্যাক্স করে বসে ভুরু পাকিয়ে বেদম উদ্বিগ্ন মুখে কন্যাকর্তা বললেন, তাঁর নিমন্ত্রিতকে—"বোঝলা সুধীর, ইংলণ্ডের প্রেজেন্ট পলিটিক্যাল সিচুয়েশনটা সত্যই ভেরি ক্রিটিকাল। অগো ইমিগ্রেশন পলিসিটা লইয়া আমাগো চিন্তার ঢের কারণ আছে—থাউজ্যাণ্ডস অব কালার্ড পিপলের ফিউচার—"

সেই মুহূর্তে ছাদের ওপরে চিনুদির ফিউচার নির্ধারিত হচ্ছে—জ্যাঠামশাই কন্যাসম্প্রদানে বসেছেন। শাঁখের শব্দ মেসোমশাইয়ের বিশ্বমানবিক উদ্বেগকে বিপর্যস্ত করতে পারলো না।

BanglaBook.org

অলৌকিক রত্নভস্ম এবং নন্দকাকু

হাঁপানির কল্যাণে আমার জগৎজোড়া হিতার্থী। আমার ঘরভরা শিশি-বোতল, খল-নুড়ি ছুঁচ-সিরিঞ্জ, যোগ-বিয়োগ, অম্বু-জম্বু শেকড়-বাকড় মাদুলি-কবচ, তৈল-ঘৃত, ধাতু-পাথর, বড়ি-গুলি, ধুলো-গুঁড়ো, তুকতাক। নেই কী? চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয়-ধার্য-ঘ্রেয়-ভিদ্য-ছিদ্য-মালিশ্য সর্বস্ব! এবং অধিকাংশই বিনামূল্যে প্রাপ্ত, ফ্রী সাপ্লাই। কে বলে তোমারে রুগী, অবান্ধব, একা? শুভার্থী ফিরিছে সদা তোমার পিছনে। সেই যে বীরবল বলেছেন না আমরা প্রত্যেকেই খানিকটা ডাক্তারি আর খানিকটা আইন জানি—এই মন্তব্যটির প্রথমার্ধ যে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি তা আমি জেনে গেছি। মর্মে মর্মে।

হাঁপানির অব্যর্থ দাওয়াই দেয় না কে? জিতন, আমাদের ধোপা, ফি-হপ্তায়

আমাকে বলে যায়—"দিদি, এইসা চলনে সে তো মর যাও গে! হমারা বাত তো সুনো। পানকা পত্তি লে-কে ভৈসাঘীউ ঔ গোলমির্চ গরম করকে উস পত্তিমে ডালকে সিনাপর মালিশ কর লো, হর-রাতকো, সোনেকা টাইমমে"—খুশিলাল, পাড়ার রিকশাওলা, আমি চড়লেই বলবে—"দিদিমুনিকো ইতনা খাঁসি। বহোৎ পরেশানি কো বাত। এক কাম করো, হর রোজ সুবা-সাম লৌসন খায়া করো, কাচ্চা লৌসন, একদম ঠিকঠাক হো যায়গা।" বাসে-ট্রামে আমার হাড় কাঁপানো হেঁপো কাশির ধাক্কায় অস্থির হয়ে সহযাত্রী-যাত্রিণীরা আমাকে অবিলম্বেই চিত্রকূট হায়দ্রাবাদে, কি পাহাড়পুরে, নিদেনপক্ষে মধ্যমগ্রামে পাঠিয়ে দিতে চান। সর্বত্রই হাঁপানির 'অব্যর্থ' ওষুধ পাওয়া যায়। সেসব 'সেবন' করাও খুবই সহজ। কোথাও চাঁদের আলোতে পায়েস রান্না করে খেতে হবে, কোথাও কাঁচা পুঁটিমাছ (নাকি চারা পোনা?) জ্যান্ত কপ করে গিলে ফেলতে হবে (হাঁপানির ওষুধটা সেই মাছই খাবে, আমি না)। কোথাও আস্ত চাঁপাকলা না চিবিয়ে খেয়ে নিতে হবে, তারপর থেকে কদলী সম্পর্কিত যাবতীয় দ্রব্য ভক্ষণ ও স্পর্শন নিষিদ্ধ। (অর্থাৎ কাকিমার কুকিং ক্লাসে শেখা বানানা ফ্রিটার্স এবং কাঁচকলার কোপ্তা, মামণির মোচাঘণ্ট, পিসিমার থোড় ছেঁচকি, কেরালার বানানা চিপস এসব তো ঘুচবেই, নেমন্তন্ন খাওয়াও চুলোয় গেল, কলাপাতার ছোঁওয়া খাওয়া বারণ—তাহলে ইলিশ মাছের পাতুরিটাই বা কিসে হবে? দূর, অমন সর্বনেশে ওষুধ কেউ খায়?) এতৎসত্ত্বেও আমি যথাসাধ্য প্রত্যেকের এনে দেওয়া ওষুধপত্তর, জড়িবুটি, মাদুলিকবচ—সবকিছুই দু' চারদিন সশ্রদ্ধায় মাথায় করে পালন করি। (নইলে তো আমি নেমকহারাম নরাধম—। অন্যের বিশ্বাস কষ্ট স্বীকারের মূল্য দিই না—সেক্ষেত্রে আমার মতো লোকের হাঁপানির যাতনা ভোগ করাটাই উচিত)। আমি যথাসাধ্য বিশ্বাস ও মনোযোগের সঙ্গে ট্রায়াল দিই কিন্তু কোথা দিয়ে যেন, কেমন করে যেন, কখন যেন—সব ভুল-ভাল হয়ে যায়। মাদুলিটা পরেই ভুল করে কারুর জন্য শোকে অধীর হয়ে শ্মশানে ছুটে যাই। (মাদুলির, আঁতুড়ে আর শ্মশানে যাওয়া সর্বদা বারণ)। ওষুধের কলাটা খেয়েই ভুল করে লোভে পড়ে বানানা মিল্ক শেক খেয়ে ফেলি, এইসব গড়বড় হয়ে যায় আমার। এগুলো মোটেই ইচ্ছাকৃত নয়। আলস্য আর অন্যমনস্কতার একটা ডেডলি কম্বিনেশন। আসলে নিয়ম মানা আমার স্বভাবে নেই। আমি বড্ড উড়নচণ্ডে, এলোমেলো।

নন্দকাকুর কিন্তু কিচ্ছুটি ভুল হয় না। তিনি নিবিষ্ট মনে, হুবহু, আগাপাছতলা 'লাগাতার' নিয়ম মেনে, একের পরে এক নিত্য নতুন হাঁপানির 'অব্যর্থ' বৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেণ্ট করেই চলেন। অ্যালো, বায়ো, হোমিও, আয়ুর্বেদীয়, চৈনিক, যৌগিক স-ব। কাকা-ভাইঝি একসূত্রে বাঁধা আছি, প্রথমত ফুসফুসে, সে সূত্রটা হাঁপানির। দ্বিতীয় সূত্র হৃদয়ের, অর্থাৎ কাকিমা। আমরা দুজনেই কাকিমার রীতিমতো প্রিয়পাত্র। (এবং সেটাও সোজা ব্যাপার নয়)।

নন্দকাকুর একসপেরিমেণ্টাল অ্যাজমো-লজিতে আমার আপত্তি ছিল না যদি

না তিনি সেগুলো তাঁর আদরের 'খুকু'র ওপরেও চালু করতে চাইতেন। আর, সবার সব উপদেশই নন্দকাকুর কাছে দৈববার্তা, সারমন অন দ্য মাউন্ট। তাঁর তুলনায় আমি একটা হতভাগ্য, অবিশ্বাসী, পাপীয়সী—কেননা আমার ভগবান হাঁপানির দাওয়াই দেন না—তিনি ব্যস্ত জন্ম-মৃত্যু, বন্ধন-মুক্তি, এই সমস্ত দেওয়া থোওয়ায়। নন্দকাকু চান বিশ্বের হাঁপানি রুগীদের একটা ইউনিয়ন বানাতে। নিদেনপক্ষে একটা বেরাদরি —ব্রাদারহুড—যেখানে 'সংবাদ বিচিত্রা' বুলেটিন বেরুবে, ঔষধ-চিকিৎসার দিশি-বিলিতি আধুনিকতম খবর সব বদলা-বদলি হবে। "জগতের যত হাঁপানি রুগী এক হও; তোমাদের হারাবার কিছুই নেই, হাঁপটি ভিন্ন।" নন্দকাকুর মধ্যে সর্বদা একটা মিশনারি স্পিরিট কাজ করে। আর হাতের কাছে অভাগা আছি কেবল আমিই। উনি যদিও ভবানীপুরে, আমি বালিগঞ্জে। তা সত্ত্বেও।

নন্দকাকুর বাড়িতে নিয়মিত কেলেঙ্কারিকাণ্ড হয়। আজ শুনছি সব রান্না হচ্ছে কাঠকয়লায়, একমাত্র কাঠের আগুন চলবে। কালকেই শুনছি ও-বাড়িতে কাঠের গুঁড়ো জ্বালিয়ে ধুনো দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ। আজ শুনছি রাত্রের খাওয়া আটটার সময় সারতে হবে, পাংচুয়ালি— কাল শুনছি রাত্রের খাওয়া সূর্যাস্তের পূর্বেই শেষ করা দরকার। কাকিমা স্বয়ং দুর্গা দুর্গতিনাশিনী, তাই পাগল হন না, কেবলই রোগা হন। এমন সময়ে নন্দকাকু একদিন লাফাতে লাফাতে এসে হাজির। সোজা তিনতলায়। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে।

—"বৌদি, খুকুকে এবার সারিয়ে দেবোই। আসল লোক পেয়েছি।"

—"আগে তো নিজেকে সারাও।" মার নির্বিকার উত্তর।

—"আমি তো আজকাল সেরেই গেছি। এই দেখুন।" বলেই নন্দকাকু জোড়া পায়ে লাফ দিয়ে পৌষমেলায় কেনা মোড়াটার ওপর টক করে উঠে পড়লেন। মোড়াটা থরথরিয়ে কাঁপলো। নন্দকাকুও। কাশির ঝোঁকে।

"আহা! আহা! পড়ে যাবে যে ঠাকুরপো।"

—"মোটেই পড়বো না। এই দেখুন!" নন্দকাকু মেঝেয় আরেক লাফ দেন। এবারে মায়ের শুকোতে দেওয়া কুলের আচারের বারকোষের ওপরে। তারপরে ঠাকুরপো-বৌদিদি সংবাদটা কেমন জমলো, সেটা উহ্যই থাকুক। আমি অকুস্থল থেকে কেটে পড়লুম সেই ফাঁকে।

ক পর্ব: ভেষজ-চিকিৎসা

কিন্তু কাটাতে পারলুম না। নন্দকাকু নাছোড়। কেননা ইনি নাকি অব্যর্থ কবিরাজ। নাম হেমচন্দ্র সেন। চেম্বার চৌরঙ্গি পাড়ায়, মিশন রো একসটেনশনে। যেতেই হলো শেষ পর্যন্ত। অবশ্য তখন আমি ফের হাইনেক জামা পরছি। (অর্থাৎ জামার তলায় সেজমার এনে দেওয়া হরিদ্বারের সাধুর অব্যর্থ মাদুলি বাঁধা)। আমার সঙ্গে গার্জেন হয়ে গেল শিবু, আমাদের পড়শী, এবং আমার ছাত্র। শিবুর ধারণা, দিদির সর্বদা

BanglaBook.org

একজন অ্যাডভাইসার সঙ্গে থাকা প্রয়োজন।

কবিরাজের চেম্বারে ঢুকতেই হাতে স্লিপ ধরিয়ে দিলে উর্দিপরা হিন্দুস্তানী দরোয়ান। ধবধবে সাদা দেওয়াল, তকতকে কাঠের মেঝে, একঘর হেঁপো-বেতো অপেক্ষমান রুগী। সবশেষে আমার নাম ডাকতেই পর্দা সরিয়ে ঢুকে পড়ি। সামনেই বেদীর ওপরে এক সহাস্য নরকঙ্কাল নিঃশব্দে আমাকে অভ্যর্থনা জানাল। দু পা পেছিয়ে আসতেই চোখে পড়লো সেক্রেটারিয়েট টেবিলের পেছনে একটি রক্তমাংসের (টাই বাঁধা) সহাস্য তরুণ। দেওয়ালময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আভ্যন্তরীণ ভয়াল গোপন দৃশ্যপট—শিরা-ধমনী, পেশী-অন্ত্র, হৃদয়-ফুসফুস ইত্যাদি। সভয়ে বলি—"আপনিই কবরেজমশাই?" "আজ্ঞে না, আমি ডাক্তার বোস, কবরেজমশায়ের অ্যাসিস্টান্ট।" মৃদু হাস্য করে তিনি দেওয়ালের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। আমিও তাকাই। একটা দলিল বাঁধানো রয়েছে, বিলেতের রয়্যাল কলেজ অফ সার্জিয়ন্সের ফেলো এই শম্ভুচরণ বোস। ভয়ে বুক চুপসে যায়। হাঁপানি বৃদ্ধি পায়। এই যদি হয় অ্যাসিস্ট্যান্ট, খোদ কবরেজ তাহলে কোন স্ট্যাটাসের হবেন? নন্দকাকু কিচ্ছুই বলে দেননি, একদম আনপ্রিপেয়ার্ড চলে এসেছি। কে জানে কত ফী? আজকাল তো কবরেজদেরও চৌষট্টি, একশো-আটাশ শুনতে পাই। ডাক্তার বোস কিন্তু চমৎকার মানুষ। খুব মন দিয়ে কেস-হিস্ট্রি শুনলেন, পাতার পর পাতা নোট নিলেন। তারপর তোয়ালেপাতা সরু গদি মোড়া বেঞ্চিতে আমাকে পেড়ে ফেলে, 'পরীক্ষা' শুরু করলেন। অর্থাৎ হাঁটুতে হাতুড়ি ঠুকে, পেটে গোঁত্তা মেরে, পিঠে থাবড়া কষিয়ে, চোখ খুঁচিয়ে, কান মুচড়ে, জিভ টেনে, হাতফাত দড়িদড়া দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলে সে এক নিদারুণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা চলল: যার ফলে আমার অন্তত দেড় বছর আয়ু কমে গেল। কাগজ টেনে খরখর করে রক্ত-কফ ইত্যাদি ইত্যাদি পরীক্ষা, বক্ষপঞ্জরের এক্স-রে ফোটো প্রভৃতির সরলবর্গীয় ব্যবস্থাপত্র দিয়ে দিলেন তিনি। তারপর চোখ বুজেই বললেন —"আঃ। এবারে এক কাপ চা হোক, কী বলিস?" বলেই চোখ খুলে উত্তরের আশায় কঙ্কালটির দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। আমরাও অবাক হয়ে প্রতিক্রিয়ার প্রত্যাশায় কঙ্কালমুখী, স্তব্ধ! কলকাতায় সব্বারই ভয়েস আছে। এও কিছু বলবে নাকি? ...কোণের টুলে বসা নীরব, অনড় বেয়ারাটি কেবল উঠে বেরিয়ে গেল, এবং একটু বাদে ফিরলো দু-হাতে চার গেলাস চা নিয়ে। আমাকে, শিবুকে, ডাক্তার বোসকে দিয়ে, নিজেও একটা গেলাস নিয়ে চুপচাপ টুলে গিয়ে বসলো। ডাক্তার বোসের এই 'ডেমোক্র্যাটিক হিউম্যান অ্যাপ্রোচ টু টী' আমার খুবই ভালো লাগলো। এ-ছাড়া চা পেয়ে আমি নিজেও কৃতার্থ। আলুলায়িত। কদাচ কোনো ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে এমনধারা আতিথ্য পাইনি। সেটা বলেও ফেললুম। ডাক্তার বোস কেবল সহজ হেসে বললেন—"আসলে আপনাকে দিয়েই শেষ কিনা, তাই। আটটা বেজে গেছে তো।"

—"তার মানে? কবরেজমশাই আসবেনই না আজ?"

—"আসবেন না মানে? তিনি তো পাঁচটায় এসেছেন।"

কোণের টুল থেকে মধ্যবয়স্ক বেয়ারাটি (যার পরনের ময়লা খাকী পেন্টুলুনের নিচেটা দড়ি দিয়ে টাইট করে জড়িয়ে পায়ের সঙ্গে বাঁধা, গায়ে হাতা গোটানো খদ্দরের শার্টের ওপরে মিলিটারি সবুজ হাতকাটা সোয়েটার, নাকের ফুটোয় একগুচ্ছ চুলের নীচে আশুতোষী গোঁপ, পায়ে ধূলি-ধূসর ঘোড়তোলা বুটজুতো—) চায়ের গেলাস থেকে চোখ তুলে মৃদু হাস্যে কহিলা গম্ভীরে—

—"আমিই হেমচন্দ্র। নমস্কার।"

4 OCT 2006

—"অর্থাৎ—"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

নেহাত বেয়ারা মনে করে এই লোকটিকে এতক্ষণ দেখেও দেখিনি। খুবই সম্ভ্রান্ত উচ্চারণ, রং তামাটে মেরে গেছে, বেশ সুপুরুষ। রাণী ভিক্টোরিয়া যেমন পুরুষ ভৃত্যদের সম্মুখেই পোশাক বদল করতেন, কেননা—"ওদের আবার নারী-পুরুষ কিসের?" আমাদের প্রত্যেকেরই বোধহয় ভেতরে ভেতরে তেমনি খানিকটা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দোষ আছে। নইলে এঁকে দেখিনি কেন এতক্ষণ? এইবার তড়াক করে লাফিয়ে উঠি, খানিকটা গরম চা চলকে সিলকের পাঞ্জাবিতে পড়ে, গেলাসসুদ্ধ হাত জোড় করে কাতরে উঠি—"সে কি! কবরেজমশাই? আপনিই? অথচ মোটে চিনতে পারিনি, ছি, ছি!" অভয় হাস্যে হেমচন্দ্র বললেন—"তাতে কি হয়েছে। এরকমই তো হয়ে থাকে। কেউই চিনতে পারে না। আমি অবশ্য খুব মন দিয়ে আগাগোড়া কেস-হিস্ট্রিটা শুনেছি। আপনার ডায়াস্টোলিক প্রেশারটাই যা কিঞ্চিৎ বেশি। তবে সেজন্য ভাবনা নেই। কমিয়ে দেব। আমার মায়ের কাছে চলে আসুন, মা ওষুধ দিয়ে দেবে। দারুণ, অব্যর্থ ওষুধ মায়ের।"

—"আপনার মাও বুঝি কবরেজি করেন?"—শিবু এবারে মুখ খুলল। "অবিশ্যি কবরেজি তো ফ্যামিলি ট্রেড। আপনার বোধহয় বাবা নেই?" সব কথায় কথা বলা চাই শিবুর। এবার ডাক্তার-কবিরাজ দুজনেই অট্টহাস্য করে ওঠেন। আমি শিবুকে চোখ পাকাই। কবরেজ বলেন—"নাঃ, বাবাটি থেকেও নেই। আসুন না আগামী শনিবার সকালে, মাকে স্বচক্ষে দেখে যাবেন। স্নানটা করেই আসবেন। খালি পেটে আসা বাঞ্ছনীয়। ওষুধ নেবেন তো।"

এবার ডাক্তারবাবু আমার হাতে একটা কার্ড গুঁজে দেন, তাতে একপিঠে লেখা কবিরাজ হেমচন্দ্রের নাম, এই চেম্বারের ঠিকানা, ফোন নম্বর, আর উল্টোপিঠে লেখা ৪২।১০৩বি, ধনপতি পতিতুণ্ড বাইলেনের ঠিকানা। একটা ছোট্ট নকশাও আঁকা আছে তাতে। যা বুঝলুম, গঙ্গার ওপরেই বাড়ি। ওয়াটগঞ্জের বাজারের দিকে।

"ভাঙাচোরা ইঁট বের করা একটা কালীমন্দির আছে, সেইখানেই আমি থাকি। হেম-কবরেজ বললেই রাস্তার লোকেরা বাড়ি চিনিয়ে দেবে।" এবারে উঠতে হয়। ভিজিটের প্রসঙ্গ তুলতেই কবরেজ জিভ কেটে বললেন—"ছি, আমি ভিজিট নিই

না। শুধু ওষুধের দামটা দেবেন, যখন ওষুধ পাবেন।"

—"আর ডাক্তার বোস?" শিবু আশায় উজ্জ্বল চক্ষে বলে ফ্যালে —"উনিও বুঝি ভিজিট নেন না?"

অমায়িক হেসে ডাক্তার বোস বললেন: "চেম্বারে কুড়ি, বাড়িতে গেলে চল্লিশ। কিন্তু হেমের রুগীদের জন্য কেবল ষোলো। এ তো চিকিৎসা ঠিক নয়, চেক আপ মাত্র। চিকিৎসা করবে হেম।'

নন্দকাকু ফোন করে ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন শনিবার ভোর পাঁচটায়, যাতে চান-টান করে ভোর ভোর যেতে পারি। কিন্তু কাকু সঙ্গে যেতে পারছেন না, অগত্যা শিবুকেই ধরতে হলো। ও-সব পাড়াতে একা একা না যাওয়াই নাকি ভালো। পাড়াটা সুবিধের নয়, বন্দরের কাছাকাছি। গিয়ে দেখি রাস্তায় এই সাতসকালেই ফুলুরি-জিলিপি বিক্রি হচ্ছে, মাছি ভনভন করছে জিলিপির থালার ওপর। বিক্রি হচ্ছে অবাঙালি সব ভুজিয়া, রেউড়ি, চা। গলির গলি তস্য গলি হচ্ছে ধনপতি পতিতুণ্ড বাইলেন। ভাগ্যে শিবু সঙ্গে ছিল। পথের প্রত্যেকটি মানুষই নয়নভরে আমাকে তাকিয়ে দেখছে —"দ্যাখ দ্যাখ মেয়েছেলেতে টেকশি চালায়"—এই মন্তব্যও কানে এসেছে। আঁকাবাঁকা গলিটার দু-ধারে দরজার সামনে নানা বয়সের, নানা গড়নের, নানান রূপসজ্জার মেয়েরা দাঁড়িয়ে দাঁতন করছে, চা খাচ্ছে, আর গল্প করছে। বেশ একটা রিল্যাকসড সকাল। কারুর কোনো তাড়া নেই। এ পাড়াতে কেউ আপিস যায় বলে মনে হলো না। মেয়েগুলির পরনে কত যে বিচিত্র সাজপোশাক, ছিটের কাপড়ের ম্যাকসি, নাভি বের করা প্যান্ট-স্যুট, সাটিনের সালওয়ার কামিজ—চুলে জরীর ফিতে, মুখে রং, রোলেক্সের শাড়ির ছড়াছড়ি। খুবই দরিদ্র দেহোপজীবিনীদের পাড়া এটা—নেপালী, বাঙালী, হিন্দুস্তানী নানা জাতি, নানা ধর্ম, হিন্দু-মুসলমান মিশ্রিত এলাকা বলেই মনে হলো। দেখেশুনে আমি একটু ঘাবড়ে গেলুম—প্রথমত, গলিটি অস্বাভাবিক সরু —একটা গাড়িও যাওয়া বেশ কষ্টের। দ্বিতীয়ত, সারি সারি মেয়েরা আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে, মেয়ে-দেখতে আসার মতন করে। শুধু দর্শনই নয়, আমাকে পরস্পরের কাছে প্রদর্শনও করছে এবং যে হাসাহাসিটা চলছে—সেও আমাকে নিয়েই, সন্দেহ নেই। তারা বলছে—"দ্যাখ, মজাটা দেখে যা, ব্যাটাছেলেটা দিব্যি বইসে আছে, আর মেয়্যাছেলেটা গাড়ি হাঁকাচ্ছে। বাবুটা দেখি মেয়্যা-ডেরাইভার রেখেছে।" শিবু তো লজ্জায় লাল, আমি বলে তার পরম শ্রদ্ধেয় দিদি, গুরুজন, তথা মাস্টারমশাই। বাঁদরের মতো লাল মুখে শিবু বলল—'ওসব কথায় যেন কান দেবেন না দিদি, যতসব বাজে বাজে মেয়েদের আজেবাজে কথা, ওদিকে তাকাবেনই না আপনি!"

কিন্তু না-তাকিয়ে উপায় নেই যে আমার। গলি-রাস্তাটি একেই সরু, কাশীর গলির মতো,তারই মধ্যে গয়লা গরু-মহিষ এনে দুধ দুইছে, খাটিয়া পেতে লোকজনেরা

শুয়ে-বসে চা-জিলিপি খাচ্ছে, শূয়োরের পাল ঘোঁৎঘোঁৎ করে চরে বেড়াচ্ছে, কিছু হাঁস-মুরগীও ঘোরাঘুরি ওড়াউড়ি করছে, ঠেলাগাড়ি কাৎ করা রয়েছে, খালি রিকশা ডাণ্ডা বের করে সিট উলটে পড়ে রয়েছে। তারই মধ্যে করপোরেশনের মেথর তার দু'চাকার ঠেলাগাড়ি নিয়ে ভ্রাম্যমাণ। আমাকে ঘণ্টায় দুই মাইল স্পীডে, খাটিয়া সরিয়ে, ঠেলা হটিয়ে, মেথরের গাড়ি বাঁচিয়ে, গরু-মহিষ কুকুর-শূয়োর তাড়িয়ে, হাঁস-মুরগীদের ভাগিয়ে, চা-ওলা দুধ-ওলা, জিলিপি-ওয়ালাদের কাছে করজোড়ে মার্জনাভিক্ষা করে পথ করে নিয়ে এগুতে হচ্ছে। তবে হ্যাঁ, হেম-কবরেজকে দেখছি সবাই চেনে। সবাই দেখিয়ে দিচ্ছে—"আরেকটু এগিয়ে যান, কালীমন্দিরের গায়েই বাসা।" কিন্তু কালীমন্দিরের দেখা নেই। ইতিমধ্যে গাড়ির পেছু পেছু গণ্ডা গণ্ডা বাচ্চা এবং শত শত নেড়ি কুকুর সশব্দে ধাওয়া করছে। ভোরের পাখির কূজনের সঙ্গে তাদের কলরব, গাড়ির হর্ন, শিবুর ক্ষণে মিনতি, এবং ক্ষণে হুঙ্কার—মিলেমিশে অপূর্ব এক শব্দব্রহ্মের সৃষ্টি হয়েছে।

এমতাবস্থায় কালীমন্দির এসে গেল। রাস্তাও সেইখানেই শেষ। গলার গায়েই ভাঙা-চোরা, চ্যাপ্টা-ইট বের করা, খুবই পুরোনো একটা ক্ষুদ্র মন্দির। তার চতুর্দিকে শুধু কাঁটাগাছ, আগাছা, আকন্দের ঝোপ। অনেকগুলো ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠলে তবে চাতাল মতন, এবং মন্দিরের প্রবেশপথ। গর্ভগৃহ অত্যন্ত অন্ধকার, তার অভ্যন্তর অদৃশ্য। কোনো দরজা নেই। ভিতরে আলোর চিহ্ন নেই। প্রতিমাও নেই বলেই সন্দেহ হয়। কেবল দুটি সবুজ বিন্দু জ্বলছে— পশুর চোখ। কোন পশু বোঝা যায় না—মন্দিরের দেওয়াল থেকেই বটবৃক্ষ বেরিয়ে উঁচু হয়ে উঠে মন্দিরকেই ছায়াবৃত করছে। আমি সিঁড়ির ওদিকে যাবার উপক্রম করতেই সাবধানী শিবু বলে—"যাবেন না দিদি, সাপ-খোপ থাকতে পারে।" এটা কল্পনাও করতে পারি না এর ভিতরে হেম-কবিরাজ কী উপায়ে বসবাস করতে পারেন। এ কী সম্ভব ? এমন সময়ে মন্দিরের পিছন থেকে স্বয়ং কবরেজমশাই উদয় হলেন—"এ-ই যে। আসুন আসুন।" একগাল হেসে আমাদের তিনি অভ্যর্থনা করে মন্দিরের প্রায় গায়ে লাগা যে পাকা ঘরটিতে নিয়ে গেলেন, তার দোর-জানালা সবই পাল্লা রহিত। টিনের চাল আছে, দাওয়ায় একটি বেঞ্চি পাতা। তার ওপরে একটি নধর কালো ছাগল শুয়ে আছে, বেঞ্চিরই খুঁটিতে বাঁধা। মেঝেময় ছাগলনাদি। স্বাগত জানিয়ে আমাদের ঘরে ঢুকতে ইঙ্গিত করলেন তিনি। শিবু আগে, না আমি আগে ইতস্তত করছি, (কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান) শেষে শিবুই শিভালরি দেখিয়ে ঢুকে পড়ল, (যা থাকে কপালে) শহীদের স্পিরিট নিয়ে। পিছন পিছন গম্ভীরভাবে আমি।

ঢুকেই চক্ষু বহরমপুরের ছানাবড়া। এটা কি কোনো মানুষের বাসস্থান ? মেঝে-ভর্তি ধুলো, বালি, শুকনো পাতা, ঘাস, খড়, কাঠের গুঁড়ো। ঘরে আর কোনো আসবাব নেই, শুধু একটি বেঁটে কাচের আলমারি, ঘরের ঠিক মাঝখানে রাখা, আর দেয়াল না-ঘেঁষে পাতা একটা কাঠের সরু তক্তাপোশ। দেয়ালে ইলেকট্রিক কানেকশন

BanglaBook.org

থেকে ছেঁড়া তার ঝুলছে। (লীলা মজুমদারের পিসি দেখলে বলতেন ইলেকট্রিসিটি 'লীক' করছে!) বালব নেই। তক্তাপোশে আজকের স্টেটসম্যান খোলা এবং একপাশে একটি পেতলের বালতি ও প্লাস্টিকের মগ, অন্য পাশে একটি ময়লা কম্বল ভাঁজ করে রাখা এবং একটি লণ্ঠন। খাটে ঠেস দেওয়া একটি কর্মভারাক্রান্ত সাইকেল। ধীরেসুস্থে কাচের আলমারি খুলে প্রথমে লণ্ঠনটি তুলে রাখলেন কবিরাজমশাই। তখন দেখলাম আলমারিতে একটি কুঁজো, একটি কাচের গেলাস, সাবানের কেস, মাজন-ব্রাশ-চিরুনি ইত্যাদি—এবং কিছু পুরোনো খবরের কাগজ। এবারে বালতি এবং মগও কাচের আলমারির নিচের তাকে তুলে রাখলেন কবরেজমশাই। সাইকেলটা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ঘরের বাইরে রেখে এলেন। আমরা দাঁড়িয়েই আছি। এবার কম্বলটির ভাঁজ খুলে তক্তাপোশে বিছিয়ে দিয়ে কবিরাজ বললেন—"বসে পড়ুন বসে পড়ুন!" —যেন ডানলোপিলোর গদি, কি কিংখাবের আসন পেতে দিলেন। আমি ধপাস করে বসে পড়ি, বাব্বা, এতক্ষণ যা মেহনত গেছে বাড়ি বের করতে! কিন্তু শিবু বসল না। শিবুর চোখেমুখে একটা স্পষ্ট, উদভ্রান্ত অবিশ্বাস।

ঘরে ঢোকার সময়ে অতটা খেয়াল করিনি। এবারে পুরোনো দিনের বাংলা নাটকে, রোমান্স, কিংবা রহস্যোপন্যাসের নায়ক-নায়িকার মুখের লটকবাক্যটি আমার বুকের মধ্যে উচ্চারণ করলেন আমার আত্মারাম—

—"আমি কোথায়?" ঘরের কোণে কোণে যে ঝুলকালির বটের ঝুরির মতো ঝুল, আর মাকড়সার জাল ঝুলছে শুধু তাই নয়, প্রচুর মাকড়সাও ঝুলন্ত। তারা কেউ ধ্যানস্থ, কেউ বুননরত, কেউ শিকারব্যস্ত। আমাদের সাড়া পেয়ে কেউ কেউ সরসর করে সরেও যাচ্ছে সসম্ভ্রমে।

ঘরে কদাচিৎ একটা মাকড়সা হলেই ভয়ে হুলুস্থুলু বাধাই, আর এখানে? এ তো দেখছি মাকড়সাদেরই বাড়িতে একটা উটকো মানুষ। চতুর্দিকে পানের পিকের ছোপ—তার মধ্যে একটা দারুণ এলিগ্যান্ট বিলিতি এয়ারলাইন্সের ক্যালেণ্ডার ঝুলছে অর্ধভুক্ত সিগারেট, বিড়ির টুকরোর সঙ্গে গাঁজার কলকেও মেঝেময় ছিটোনো। আর শিবু শিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখছে আর দেখছে। হিপ্নোটাইজড। একদিকের দেয়াল বেশ খানিকটা ভেঙে গিয়ে ছাদের কাছ থেকে পরোটার মতো গড়নের একটা ফোকর তৈরি হয়েছে। সেখানে থাক থাক ভাঙা ইটের ওপর বসে এক বিজ্ঞ কাক ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাদের পর্যবেক্ষণ করছিল। অথবা গৃহস্থ মাকড়সাদের। সেখানে নীল আকাশের দারুণ ব্যাকগ্রাউণ্ডে পেয়ারা গাছের সাদা ডাল, সবুজ কচিপাতা উঁকি মারছে, হাত বাড়ালেই পেয়ারা! ভুল করেও যেন দেয়ালে হেলান না-দিয়ে ফেলি —তাই 'কাঠ' হয়ে বসে আছি। শিবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত সন্তর্পণে বসেই পড়ে। তারপরেই তার দৃষ্টি ঘরের একটি কোণের দিকে আটকে যায়। শিবুর চমৎকৃত চোখ অনুসরণ করে আমারও চক্ষুস্থির। আরে? ঘরের ঐ কোণে যে বিশেষ জরুরী কিছু ঘটনা ঘটে চলেছে। অতীব করিতকর্মা শত শত ইঁদুর মেঝের একটা ফুটো

BanglaBook.org

দিয়ে উঠে এসে দৌড়ে দৌড়ে সারি বেঁধে সারাটা মেঝে পার হয়ে ঘরের অন্য এক কোণের ফুটোয় আত্মগোপন করছে। ব্যাপারটা সামান্য নয়। গুরুতরই। এরা নেংটি নয়, বেশ স্বাস্থ্যবান, দীঘল; ধেড়ে কিংবা মেঠো। কামড়ে দিলে রক্ষে নেই। ওদের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করে হেম-কবিরাজ বললেন—"ওরা অতি নিরীহ, ওপাশের কাঠের গোলায় ওদের বাসা।" বলে প্রতিবেশীসুলভ সৌজন্যে হাসলেন। কিন্তু আমি যা বুঝলুম, কাঠের গোলাতে ওরা হয়তো এককালে থাকতো, কিন্তু এখন আর থাকে না। দেখা যাচ্ছে এটাই ওদের পার্মানেন্ট বাসা। নাকি র‍্যাশনের দোকান? নাকি সিনেমার কিউ? কিন্তু এখানে র‍্যাশনই বা কোথায়? খাদ্যদ্রব্য তো কিছু দেখছি না, কাপড়-চোপড়ও নেই। একদিকের দেয়ালে একটা কুলুঙ্গিমতো, তাতে একটা ছেঁড়া শার্ট পর্দার মতো করে ঝোলানো, দুই হাতার মধ্য দিয়ে দড়ি টানা। অনেকটা ক্রুশবিদ্ধ যীশু বা কাকতাড়ুয়ার মতো। কিন্তু কলারের পিছন দিয়ে ধোঁয়া ভেসে আসছে। এতক্ষণে টের পেলুম ঘরে একটা হালকা সুগন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে। ধূপের?

এক মিনিট অন্যমনস্ক হয়েছি কি হইনি, "বাপরে মারে" বলে চেঁচিয়ে পা'দুখানা তক্তাপোশে তুলে ফেলি, খরখরিয়ে আমার বাঁ পা বেয়ে একটা শেখভোলা (অথবা উচ্চাকাঙ্ক্ষী?) আরশোলা উঠছিল।

"ও কিছু না"—হেম-কবিরাজ হেসে বলেন—"ওরা তো হার্মলেস।" ঘরময় আরো প্রচুর ছোটো-বড়ো-মেজো 'হার্মলেস' রাজত্ব করছে, দেখা গেল এবারে।

তক্তার তলায় একবার উঁকি দিয়ে নিয়ে শিবু বলল—"পা-টা গুটিয়েই বসে থাকুন দিদি", ঠোঁটে অদৃশ্যপ্রায় হাসির সংকেত। তাইতেই আমার বুক প্রায় শুকিয়ে গেল। সামনের দেওয়ালেই প্রায় ডায়নোসরের মতো বিপুলকায় এক টিকটিকি হঠাৎ খপাৎ করে একটা আরশোলা ধরে ফেলল। দেয়ালভাঙা ফোকর দিয়ে ফরফর করে উড়তে উড়তে দুটো যুদ্ধবাজ অথবা প্রেমিক কাক পরস্পরকে তাড়া করে ঘরে ঢুকে অন্য দরজা দিয়ে সবেগে বেরিয়ে গেল। শিবুর মুখে ডানার হাল্কা ঝাপ্টা মেরে। আমি আঁতকে উঠে দেয়ালে সেঁটে যেতে-যেতেই সন্ত্রস্ত শিবুই খেয়াল করিয়ে দেয় —"উঁহু? উঁহু! ওখানে মাকড়সা, দিদি।"

হেম-কবিরাজ আমাদের কাণ্ড দেখে হেসে উঠলেন—সেই হাস্যে কয়েকটা আরশোলা হার্মলেসলি এধার ওধার উড়ে গেল। কবিরাজ বলেন—"ওগুলো সবই নির্বিষ!" গায়ে যে-কোনো মুহূর্তে মাকড়সা, আরশোলা, কাক, ইঁদুর, টিকটিকি—যে কেউ এসে পড়তে পারে। ওরে বাবা রে! এ কোথায় এসে পড়েছি রে!

মুখে বোধহয় মনের অবস্থা কিছুটা প্রতিফলিত হয়েছিল। কবিরাজ বললেন —"চা চলবে?"

মুহূর্তেই বুকে বল পেলুম—"হ্যাঁ!"

—"লছমী।" কবাটহীন দোর দিয়ে মুখ গলিয়ে ডাক দিলেন কবিরাজমশাই। অমনি এক থুরথুরে বুড়োর উদয় হলো, মাথায় ধবধবে চুল, পরচুলোর মতো ঘন,

টিকিও আছে, পরনে খাটো ধুতি, খয়েরি আলোয়ান, হাতে লাঠি। চোখে ভীষণ পুরু লেন্সের নিকেল ফ্রেমের চশমা।

—"জী সরকার। ফরমাইয়ে।"—মুখে দাঁতের বালাই নেই।

—"চা হবে? তিনটে।"

—"জী হজৌর।" বলেই সে আলোয়ানের ভেতর থেকে শীর্ণ হাত বের করে, পাতে। কবরেজমশাই কিছু খুচরো ঢেলে দেন। বুড়ো বেরিয়ে যায়।

শিবুর সব কথায় কথা বলা চাই।

—"চা পাতা কিনতে গেল বুঝি? জলটা চাপিয়ে গেল না?"

—"তৈরি চা-ই কিনে আনতে গেল।"

—"অঃ। তাই তো? আপনার রান্নাঘর কোথায়?"

—"রান্নাঘর দিয়ে কী হবে, আমার মা তো কেবল ফল খায়। আমিও তাই ফলটল খাই। আর একবেলা ওই লছমীদের সঙ্গে খেয়ে নি।"

—"কী খান?"

—"কেন, লছমীরা যা খায়। কখনো চাপাটি, কখনো ছাতু। ভালোই খায় ওরা। হেলথ ফুড। আমার মাও মাছ মাংস খায় না তো, আমিও তাই খাই না।" হঠাৎ যেন জেগে উঠে শিবু প্রশ্ন করে—

—"আচ্ছা, আপনার মা রান্না করেন না?"

হোহো করে হেসে উঠে হেম-কবিরাজ বলেন— "আমার মা না রাঁধলে আপনাদের অন্ন জুটছে কেমন করে?"

এবারে শিবু টের পায় এ-ভাষা অন্যভাষা। এ-মা রামকৃষ্ণের মা, রামপ্রসাদের মা! শিবুর বাক্য হরে যায়। আমি বলি—

—"কই, দেখি কোথায় আপনার মা?"

—"ঐ তো।" কুলুঙ্গির গায়ে ঝুলন্ত সেই ক্রুশবিদ্ধ শার্টটা দেখিয়ে দেন হেম কবিরাজ।

আমরা স্তব্ধ।

তারপর উঠে গিয়ে শার্টটা পর্দার মতো তুলে ধরতেই দেখতে পেলাম অত্যন্ত সুশ্রী ছোটো কালীমূর্তি। সর্বাঙ্গে ফুলের গহনা। কবরেজ বলেন—"জিবটা সোনার।"

—"এসব ফুলের গহনা কে গাঁথে?"

"লছমীর বউ। ওদেরই ঘর এটা। আমাকে থাকতে দিয়েছে। মাকে তো মন্দিরে রাখা যাচ্ছিল না। কোথায়ই বা যাই মাকে নিয়ে? তিনশো বছরের পুরনো ঘর এখানে মায়ের। লছমীরও কি কম মায়া? ওরাও তো বংশানুক্রমে মায়ের সেবক।"

—"মানে? ও পুরুত নাকি?"

—"ঠিক সেভাবে নয়, মানে বাগানটা ওরাই দেখতো। আগে ছিল লেঠেল, এখন হয়েছে মালী! এসব সম্পত্তি দেবোত্তর করে গেছেন ঠাকুরদা। ঐসব বাড়িও

BanglaBook.org

আমাদেরই ছিল—", তর্জনীনির্দেশে বাগানের কিছু একতলা দোতলা পাকা বাড়িঘর দেখান তিনি। "ওগুলোও দেবোত্তর। যেমন এই মালীর ঘরটা পর্যন্ত। অথচ দেখলেনই তো মন্দিরের কী দশা।"

"শরিকরা কেউ সারায় না?" শিবু খপ করে বলে—"আপনারা বুঝি জমিদার ছিলেন?"

অট্টহেসে হেমচন্দ্র বলেন—"এখন হয়েছি কবিরাজ। লেঠেল থেকে ওদের মালী হবার মতন! —ঐসব বস্তিগুলো অবশ্য এখনও আমার কাকাদেরই সম্পত্তি।"

আমি আর পারি না। বলেই ফেলি

—"তবে আপনার এ দুর্দশা কেন?"

—"দুর্দশা মানে? আমি তো সন্নিসি মানুষ, মায়েতে-ছেলেতে দিব্যি আছি। একে আপনি দুর্দশা বলেন?"

কবরেজমশাই আঘাত পেয়েছেন মনে হচ্ছে। শিবু অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাচ্ছে দেখে আমি ঝটপট কথা পালটাই—"মানে ঘর-দোরে তো ঝাঁটপাট পড়ে না দেখছি, তাই—"

—"কে দেবে? লছমী তো ওই বৃদ্ধ, স্বচক্ষেই দেখলেন, আর ওর বউয়ের তো কোমর থেকে পক্ষাঘাত।"

—"এতসব পোকামাকড়ের মধ্যে বাস করা—"

—"মন্দ কী? ভালোই তো। একটা ঘরে যত গুলি প্রাণীর আশ্রয় হয়। এসেছে, আসুক না। থাকে, থাকুক না। আমার তো ক্ষতি করে না।"

—"যদি করে?"

—"কী আর করবে? করুক না।"

আমার এর পরে আর কিছু বলার থাকে না। শিবু তবুও বলে—"

—"যদি সাপখোপ আসতো?"

—"আসেই তো। বর্ষাকালে একজোড়া সাপও থাকে এঘরে!" তারপরে গর্বোজ্জ্বল নয়নে বলেন—"আমাকে ওরা একটুও ভয় পায় না!"

এর পরে শিবুরও কিছু বলার থাকে না। চা এসে পড়েছে। বড় বড় কাচের গেলাসে! চা ভালোই! খেতে খেতে আমি বলি

—"আলমারিটা তো প্রায় খালিই দেখছি। কুঁজো, বালতি, খবরের কাগজ এ-সবের জন্য তো আলমারি লাগে না। ওটা রাখা কেন?"

—"তাছাড়া ওটা ঘরের ঠিক মধ্যিখানেই বা কেন? দেয়াল ঘেঁষে কেন নয়?" বলে শিবু!

"দুটো পার্পাস সার্ভ করছে কিনা। এক—দেয়াল বেয়ে জল পড়ে বলে কিছুই দেয়াল ঘেঁষে রাখা যায় না। তক্তাপোশটাই দেখুন না। দ্বিতীয়—দরজায় কবাট তো নেই—এটা এমন অ্যাঙ্গেলে রেখেছি যে, আমি পুজো করলে বা ঘুমুলে পথ থেকে দেখা যায় না।"

BanglaBook.org

বলে বিজয়গর্বে হাসেন হেমচন্দ্র। চা শেষ করতেই গেলাসগুলো নিয়ে কবরেজমশাই পিছনের দরজা দিয়ে বেরোন। আমিও কৌতূহলী হয়ে পেছু পেছু যাই। বাগান। টগর, গাঁদা, জবা, সন্ধ্যামালতী, লেবুগাছ, পেয়ারা গাছ। একটা বেলগাছ। এলোমেলো ঘাস-ঝোপ। আরো দুটো ঘর, তালা মারা। একটা খোলা।

—"লছমীদের ঘরসংসার। এই আউটহাউসটা ওদেরই। আমার কোনো লীগাল রাইট নেই। ওদেরই দিয়ে গেছেন ঠাকুরদাদা। ওরা দয়া করে আমাকে রেখেছে।"

—"আপনাকে কোনো বাড়ি-টাড়ি দিয়ে যাননি?" শিবু প্রশ্ন করে।

—"নাঃ, বাবা খুব চালু লোক ছিলেন। ছেলেকে নয়, বউকে সম্পত্তির জীবনস্বত্ব দিয়ে গেছেন।"

—"বউ? আপনার বউ আছেন?"—মৃদু মৃদু হেসে নিরুত্তর থাকলেন কবিরাজ হেমচন্দ্র শিবুর ব্যাকুলতার পরিবর্তে। তারপর উঠে গেলেন পর্দাশার্টের পিছনে রাখা মা কালীর সামনে। ওখানটা দেখি, লম্বাটে নিচু ছাদের সুড়ঙ্গটাই, কুলুঙ্গি ঠিক নয়। মানুষ ঢুকতে পারে, হামাগুড়ি মেরে চলতেও পারে ভেতরে। ঠাকুরের পিছনে অনেক তাক। তাকভর্তি কাচের বৈয়ামে শেকড়-বাকড় রাখা। মস্ত মস্ত কয়েকটা খলনুড়ি। পেতলের হামানদিস্তে একটা। ঐখানেই তাহলে কবরেজের কারখানা। মস্ত পেতলের পিলসুজে পঞ্চপ্রদীপ জ্বলছে! আলোয় আলো করে রেখেছে ঘরটা। ঝুলটুল কিছু নেই। মেঝেও পরিষ্কার ঝকঝক তকতক করছে। হেমচন্দ্র যেন মনের ভাষা পড়তে পারেন। বললেন—

—"মায়ের থানটুকুনি রোজ দুবেলা নিজের হাতে ঝাড়পোঁছ করি, নিকিয়ে রাখি। ওষুধও ওইখানেই তৈরি করি কিনা। হাইজিনিক কনডিশন থাকাটা বাঞ্ছনীয়।"

—"আর ঠাকুরের ঐ সোনার জিব, এত ওষুধপত্র সমস্তই দিনরাত খোলা পড়ে থাকে? এমনি অরক্ষিত, আনপ্রোটেক্টেড? চোরে চুরি করে নেবে না?" শিবু অবাক বিস্ময়ে বলে—"দোর জানলা কিছুই তো নেই এ-ঘরের।"

—"চুরি?" অনেক ওপরতলা থেকে হাস্য করেন কবিরাজমশাই। —"চোরের প্রাণের ভয় নেই? মা আমার সদাজাগ্রত—ওঁর জিব চুরি করতে গেলে চোরের নিজের জিবটা খসে পড়বে না?" আরেকটু হাসলেন। —"আর ওষুধ? নিলেই বা কী? কাজে তো লাগাতে কেউ পারবে না? কে বুঝবে কোনটা কিসের ওষুধ? লেবেলিং আছে কোথাও? আমি চোখে চিনি স-ব। আর জানে মা। মাকে পেরিয়ে চুরি করতে যাবে, কোন ডাকাতের এত সাহস?"

শিবু এবার টপিক বদলায়।

—"আলমারিতে তো যত আজেবাজে জিনিস দেখছি। তা আপনার দরকারি জিনিসপত্তর থাকে কোথায়?"

—"দরকারি মানে?"

—"মানে, জামাকাপড়, টাকাকড়ি, বইটই—"

—"জিনিসপত্র আমার যা দেখছেন, তা ছাড়া আর কিছু নেই। টাকা সবই পকেটে, আর জামাকাপড় সবই গায়ে। আরেক প্রস্থ থাকে ধোপার বাড়িতে। সেটা এনে এটা দিয়ে দেব। সন্নিসি মানুষের আর কী চাই? বলুন?"

—"আপনি শোন কোথায়?" আমার প্রশ্ন।

—"কেন, এই তক্তায় শুই!"

—"বালিশ-বিছানা কই?"

—"লাগে না।"

—"মশারিও না?" বড় বড় ফড়িঙের মতো সাইজের মশা এই দিনেরবেলাতেই ঘরে উড়ছে।

—"নাঃ। মশারা আমায় পছন্দ করে না।"

—"শীত করে না আপনার?"—গঙ্গার কনকনে বাতাস এই ঘরের ভেতর দিয়ে হামেশাই শর্টকাট করে বাগানে যাচ্ছে। আমারই শালটা ভালো করে জড়িয়ে বসতে হচ্ছে।

—"এই তো কম্বলই রয়েছে। যাতে আপনাদের এখন বসিয়েছি? এটা গায়ে দিই।"

—"এইতেই শীত আটকায় আপনার?"

এবারে দুহাতের মুঠোয় গাঁজার ছিলিম ধরার মুদ্রা বানিয়ে হেমচন্দ্র মিটির মিটির হাসেন,

—"বাকীটা এইতে আটকে যায়! সে আপনি বুঝবেন না।"

হেনকালে ঘরে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটল। পরনে টকটকে লাল সিল্কের লুঙ্গি আর ঘীয়ে রং টেরিলিনের হাওয়াই শার্ট। পায়ে খড়ম। কপালে সিঁদুরটিপ। মুখময় অল্পস্বল্প দাড়িগোঁফ। ঢুকেই বললেন—"জয় হোক।" বেশ ভুঁড়ি আছে।

কবরেজমশাই এঁকে দেখামাত্র দৌড়ে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন। সেই অপরূপ দৃশ্যে আমার অঙ্গ শিহরিত হলো। এই ধূলিমলিন, পতঙ্গবহুল, অমার্জিত মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে কেউ? তারপর ছুটে এসে আমাকে অধীর আকুলতায় বললেন,

—"আপনাদের কী অসীম সৌভাগ্য। আমার গুরুদেবের দর্শন পেলেন। আমার সব শিক্ষাদীক্ষা এঁরই কাছে। ইনি অত্যন্ত উচ্চস্তরের তান্ত্রিক সন্ন্যাসী। আমার মতো ভেষজ চিকিৎসা অবশ্য গুরুদেব আর করেন না। উনি এখন স্রেফ রত্ন চিকিৎসায় আছেন। রত্ন চিকিৎসার স্টেজে আমি এখনও পৌঁছুতে পারিনি, তবে গুরুর ইচ্ছেয় আর মায়ের আশীর্বাদে আশা করি—একদিন—

—"অবশ্যই! অবশ্যই!" বললেন গুরুদেব।

হেমচন্দ্র—"সবই তোমার ইচ্ছা, প্রভু!" বলে কাতরে উঠলেন। তারপরেই আমার কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে ফিসফিসিয়ে বললেন—"চোখের দৃষ্টিটা নজর করেছেন একবার? ওঃ কী দৃষ্টি! ওইতেই টের পাওয়া যায় কোন লেভেলের সাধনা

BanglaBook.org

ওনার।" আমি অতি অভাগা, খুব কষে নজর করেও দৃষ্টিতে কোনো লেভেলের সাধনারই আন্দাজ পেলুম না। চোখদুটো একটু লাল লাল লাগল। ঘরে একটা মোদো গন্ধও পাচ্ছিলুম। টেরিলিন শার্টের খোলা বোতামের ফাঁকে রুদ্রাক্ষের মালা দেখা যাচ্ছিল, তার নধর ভুঁড়িটির কিয়দংশ, সেই ভুঁড়িতে ক্ষীরননীর ইশারা আছে—কিন্তু তান্ত্রিক তেজ, তপস্যা, বা কঠোরতা কোনোটারই চিহ্ন নেই।

গুরুদেব বসলেন না। ইঙ্গিতে ডেকে নিয়ে গেলেন হেম কবিরাজকে ঘরের বাইরে, আমাদের দিকে ফিরেও চাইলেন না, বাইরে থেকেই তিনি বিদায় নিলেন।

হেম কবিরাজ ঘরে ঢুকে এসে বললেন,

—"বিলায়েতের বাজনা আপনাদের কেমন লাগে?" এই প্রশ্নের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলুম না। উত্তর দিতে পারলুম না। কবিরাজই বললেন,

—"বিলায়েৎ বাজাচ্ছে পরশু আমাদের এক বন্ধুর বাড়িতে, আপনাদের পাড়াতেই, কেয়াতলাতে—চেনেন নাকি, ঝুনঝুনদাস বেগারওয়ালাকে? ওদের ওখানেই। গুরুদেব তাই খবর দিয়ে গেলেন। আপনারাও নিশ্চয় যেতে পারেন ইচ্ছে করলে —ফ্রী, বাই ইনভিটেশন ওনলি। লিমিটেড গেস্টস।"

—এই ভাঙা টিনের ঘরে, ইঁদুরের কিউ, আরশোলার ধ্বংস, কাকের প্রেমযুদ্ধ, টিকটিকি এবং মাকড়সার দ্বৈত বোঝাপড়ার মধ্যে হঠাৎ বিলায়েৎ এবং ঝুনঝুনদাস, প্লাস এই তান্ত্রিক গুরুদেব—সব মিলেমিশে আমি একেবারে তাজ্জব বনে গেলাম। আমার ভয়ানক তেষ্টা পেল।

—"একটু জল খাবো।"

—"নিশ্চয়ই!" কবরেজমশাই কাচের আলমারি খুলে তাক থেকে কুঁজো গেলাস নিয়ে জল ঢালতে লাগলেন—একটা কাগজ উড়ে পড়লো মাটিতে। তাকিয়ে দেখি, ওমা, এ যে মার্কিনী খাম! বিলায়েতের বাজনার চেয়েও তাজ্জবকি বাত! আমাকে জল দিয়ে চিঠিটা তুলে রাখতে রাখতে আবার যেন থটরীডিং করে কবরেজমশাই বললেন—

—"আমার স্ত্রীর চিঠি। ওরা থাকে শিকাগোয়।"

শিবুর চোয়ালটা ঝুলে পড়েছে, মুখটা অবশ্য ফাঁক হয়ে দাঁত ও জিভ দেখা যাচ্ছে, চোখের দৃষ্টি বর্ণনাতীত। কবরেজ আবার বললেন—

—"নাঃ, মেম নয়। বাঙালী বউ। বাবার পছন্দ করে আনা। বউয়ের কিন্তু আমাকে পছন্দ হয়নি। মেয়েটাকে নিয়ে শিকাগোয় চলে গেছে।"

—"কিন্তু শিকাগোয় কেন? উনি কী করেন সেখানে?"

—"কী আবার করবেন? এখানে থাকলে যা করতেন, তাই! রান্নাবান্না ঘর-কন্না।

এসব কথা বলবার সময়ে হেমচন্দ্রের মুখের পেশী বদল হচ্ছিল না, বরং আমরাই ক্ষণে ক্ষণে চমক লেগে মুখের আকৃতি বদল করে ফেলছিলাম।

BanglaBook.org

হঠাৎ কবিরাজের মুখে সম্পূর্ণ ভাব পরিবর্তন ঘটল—খুব কোমল আর গর্বিত হয়ে উঠল মুখের রেখাগুলো—

—"আমার মেয়েটা এবার কলেজে ঢুকবে। হাইস্কুল পাস করে গেল।" একটু থেমে,—"দশ বছর দেখি না মেয়েটাকে।" তাঁর চোখদুটো হঠাৎ যেন পাড়ি দিল সুদূর অতলান্তিকের ওপারে, যেখানে স্কুলের টুপির নিচে কালো চুলের থোকা ছড়িয়ে, হিমেল বিদেশী বাতাসে গলার রঙিন কম্ফর্টার উড়িয়ে, বুটজুতো আর ওভারকোট পরে একটি বাঙালী কিশোরী স্কুলে যাচ্ছে বরফ ভেঙে ভেঙে। একা।

আমরা চুপ করেই রইলাম। কিন্তু অরসিক শিবুটা এক সময় বলে বসল—

—"ওষুধটা তাহলে আজ দিচ্ছেন না? দিদি বেকার-বেকারই চান করে এত বেলা পর্যন্ত খালি পেটে—

হেমচন্দ্র যেন ঘুম ভেঙে উঠলেন। ভীষণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন সঙ্গে সঙ্গেই —"সে কি? কেন দেব না? ওষুধ তৈরি করে রেখেছি না?" বলেই কাচের আলমারি খুলে খবরের কাগজের ডাঁইয়ের নিচে থেকে একটা মোড়ক বের করে কপালে ঠেকিয়ে "মা, মাগো!" বলে আমাকে দিলেন। —"কালো সুতোয় বেঁধে আজই পরে ফেলুন, যেন ঠিক বুকের ওপরে পড়ে। তিন হপ্তা যত্নে রাখবেন। কোনো নিয়ম নেই অবিশ্যি।" তারপর ওখান থেকেই, যেন মাজিক করে, এক শিশি অ্যান্টিব্যাকট্রিনের মতো সবজে পদার্থ বের করে দিয়ে বললেন—"প্রত্যহ দুবেলা দুদাগ বুকে-পিঠে মালিশ সকালে-সন্ধ্যায়।"

আলমারি বন্ধ করতে করতে—"শেকড়, ছাল। তেল, কুড়ি। পঁয়তাল্লিশ। তবে এখন নয়। এক হপ্তা পরে। আগে ফল হোক। ফল না পেলে টাকা নিই না", বলেই একগাল হাসলেন।

শিবুও হাসলো একগাল। ওর চোখে মুখে মুগ্ধতা—এ কি মায়া, না মতিভ্রম? ফল না পেলে টাকা নেয় না এ কেমন ডাক্তার? ডাক্তার না দেবতা?

আর আমি? —"কোনো এক বিপন্ন বিস্ময়" তখন আমার "অন্তর্গত রক্তের ভিতরে" খেলা করছে। কারণ? কারণ ঐ কালো সুতো। আমার যে মাদুলি-তাবিজ পরতে-টরতে বড্ড লজ্জা করে। এসেছিলুম ওষুধ খেতে, এটা তো আয়ুর্বেদিক ওষধি, এ তো 'সেব্য' হবার কথা। যাকগে সেসব। অপ্রিয় প্রসঙ্গ। শেকড় পরা-না-পরা পরের কথা, আপাতত কৌতূহলটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়। আমি বললুম—

—"আপনার স্ত্রীকন্যার কোনো ছবি নেই?"

—"ছবি?" হেসে ওঠেন কবিরাজমশাই, দার্শনিক কণ্ঠে বললেন—"ছবি দিয়ে কী হবে? মানুষগুলোই যখন আছে, জীবন্ত। যেখানেই থাকুক, আছে তো।"

আমি চুপ করে যাই। দশ বছরে সেই মেয়ে কত বড়ো হয়ে গিয়েছে। সে কি আর সে-মেয়ে আছে?

এমন সময় শিবুটা বলে বসলো—

BanglaBook.org

"আচ্ছা, ওই যে আপনার গুরুদেব এসেছিলেন, উনি অমন অদ্ভুত পোশাক পরেন কেন?"

—"শার্ট তো? শার্ট উনি এতদিন পরতেন না। চাদরই জড়াতেন। ইদানীং ওঁর এক শিষ্য হংকং-এ চাকরি পেয়ে অনেকগুলো শার্ট দিয়েছে, না পরলে দুঃখ পাবে, তাই পরছেন। কিন্তু ওতে কিছু এসে যায় না। এহ বাহ্য! ওঁর দিব্যজ্যোতি এতে বিঘ্নিত হয় কি?"

—"আমি তো শার্টের কথা বলিনি। লাল সিল্কের অমন কটকটে লুঙ্গি পরে উনি"—

শিবুকে থামিয়ে দিয়ে হাঁ হাঁ করে ওঠেন কবরেজমশাই—

—"লুঙ্গি কোথায়? ওটা তো পট্টবস্ত্র। কী আশ্চর্য! তন্ত্র-সাধনায় পট্টবস্ত্র পরিধেয়, তাও জানেন না?"

আমি খুব লজ্জা পেয়ে যাই। পাটের ধুতি? মানে চেলি? শিবু স্টুপিড তাকে সিল্কের লুঙ্গি বললো! ছি ছি। শিবু কিন্তু অদম্য,—সে বললো—"আপনিও তো তান্ত্রিক। তবে আপনি কেন প্যান্ট-শার্ট পরে আছেন, পট্টবস্ত্র পরিধান না করে?"

আমি ভয়ে কাঁটা হয়ে যাই। আর কখনো যদি শিবুকে সঙ্গে এনেছি! কী যা-তা বলে যে!

"অমৃতং বালভাষিতম" গোছের ক্ষমার হাসি হেসে হেম-কবরেজ বলেন— "আমার কথা আলাদা। আমি আর তান্ত্রিক হলুম কোথায়? ওঁরা হলেন সিদ্ধপুরুষ।"

পাছে শিবু আবো তর্ক করে, আমি উঠে দাঁড়াই। খিদেও পেয়েছে জবর। বেলা বাড়ছে। আরশোলা এবং ইঁদুর বাঁচিয়ে অতি সাহসী ও সাবধানী পা ফেলে কোনোরকমে নোংরা ঘিঞ্জি গলিটায় বেরিয়ে এসে আরামের নিশ্বাস ফেলি আমি। আঃ। কী চমৎকার! কী পরিচ্ছন্ন দিগ্বিদিক!

তারপরেই দেখি, কেলেঙ্কারি! আমার দীন, ক্ষুদ্র গাড়ির পিঠে পিঠ ঘষছেন এক বিপুলকায় বৃষভ। সেই অতিকায় ঘর্ষণে গাড়িটা থরথর করে কাঁপছে, ভূমিকম্পের মতো। আর গাড়ির ঠিক পশ্চাতে, ছায়াময় তলদেশে এক স্নেহময়ী শূকরজননী চার-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছেন—সর্বাঙ্গে পাঁচটি-ছটি শূয়ার-কা-বাচ্চা দুধ খাচ্ছে। আহা, কী উন্নয়নশীল দৃশ্য। আহার, বাসস্থান, কী না আছে এদের। দো-ইয়া-তিন-বাস দরকার নেই। মাতৃতান্ত্রিক সুখী পরিবার। গাড়ির বনেটে, এবং ছাদে বৃহৎ সংখ্যক মনুষ্যশিশু নৃত্যগীতাদির দ্বারা সম্ভবত ঐ সুখী পরিবারের মনোরঞ্জনে ব্যাপৃত। অথবা শ্রদ্ধেয় বৃষভের।

পাশের ভাঙা মন্দিরের বাইরে রোদ্দুর এসে পড়েছে। কিন্তু অভ্যন্তর অন্ধকার। শিবু হঠাৎ সেইখানে গিয়ে হাততালি বাজিয়ে "হেট হেট" করতেই বিনীতভঙ্গিতে বেরিয়ে এলো একটি রোগা, ঘেয়ো কুকুর। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি রোঁয়াওঠা কুচোকাচা কুকুরছানাও। সস্নেহে ওদের দিকে তাকিয়ে হেম-কবিরাজ বললেন— "ক্ষেমঙ্করী।

BanglaBook.org

ওখানেই ওর আতুড়ঘর করে দিয়েছি। ওর জন্ম হয়েছিল অবশ্য আমার ঘরেই। ওর মায়ের নাম ছিল কনকলতা।" ক্ষেমঙ্করী হেম-কবরেজের পায়ে গা ঘষতে লাগল। সেদিকে নজর না দিয়ে কবরেজমশায় তখন ষাঁড়টির লেজ ধরে মোচড় দিচ্ছেন এবং ভয়ঙ্কর শব্দে "হ্যাট হ্যাট" করছেন। ষাঁড় নড়ছে না। ততক্ষণে বস্তির বাচ্চারা আপনিই গাড়ি থেকে নেমে পড়ে ষাঁড় এবং শূয়োর তাড়াবার পুণ্যকর্মে লেগে গিয়েছে। ষাঁড় এবং শূয়োর ফ্যামিলি না সরালে গাড়ি চলবে না। ষাঁড়ের নামটি শোনা গেল না, কিন্তু শূকরীটির নাম আছে—যে-সে নাম নয়, আনারকলি। এবং সে রাষ্ট্রভাষাভাষী। বাংলায় কথা বললে চলবে না, কোর্ট ল্যাংগুয়েজ চাই। বাচ্চারা বলতে লাগলো-—"হট যা, হট যা, হেই আনারকলি! হেট হেট, উঠ যা। আনারকলি, উঠ যা, চলি যা"—ইত্যাদি! সবই আনারকলি শুনতে পেল, কেননা উত্তরে সে কানদুটি নাড়ল, কিন্তু কর্ণপাত করল না। গা এলিয়ে চোখ মেলে শুয়েই রইল, জুলজুলিয়ে চেয়ে। ধর্মের ষাঁড়ও বিন্দুমাত্রও না ঘাবড়ে উল্টে এমনই এক শিং নাড়া দিলো যে হেম-কবিরাজও কয়েক পা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। দেখেশুনে এবারে শিবু বলল—"দিদি, গাড়িতে ঢুকে পড়ে বরং স্টার্ট লাগিয়ে দিন। নইলে এ-বাচ্চারা সহজে নড়বে না। একেবারে এম. এল. এ. হস্টেলের জমিদারি পেয়ে গিয়েছে।" শিবুর উপদেশ অনুযায়ী গাড়িতে উঠে স্টার্ট লাগাই এবং হর্ন বাজাই। সঙ্গে সঙ্গে এক বীভৎস দৃশ্যের অবতারণা হয়। পতাকার মতো লেজ উঠিয়ে, চার পা শূন্যে তুলে ষাঁড়বাবাজী হঠাৎ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে থাকেন। পথের ভিড় মুহূর্তে ফাঁকা। —রাস্তার ধারের মেয়েরা এখন অনেকেই চান করে ভিজে গামছা গায়ে জড়িয়ে ফিরছে—তারা আর্তনাদ ও ছুটোছুটি শুরু করে দেয়। এই আকস্মিক উপদ্রবে আনারকলিও উঠে পড়ে (অথবা গাড়ির এক্সহস্ট পাইপের গরম ধোঁয়ার ধাক্কা তাকে উৎপাটিত করে), বাচ্চাদের নিয়ে সে মা-গঙ্গার পবিত্র নিরাপদ কাদায় নেমে যায় ধীরে-সুস্থে। হেম কবিরাজ সগর্বে বলেন—"ওরা সবাই খুবই বাধ্য প্রকৃতির, এই বস্তিরই তো জানোয়ার ওরা!"

এবার বেরুনো।

গাড়ির পিছনের বাধা নাড়ানো গেছে, কিন্তু সামনে একটি উঁচু পাঁচিল। তাতে একলক্ষ ঘুঁটে। পাঁচিলের পাশ দিয়ে একটি সরু ইটবাঁধানো গলিপথ। অবশ্যই পায়ে-চলার। সেটির দিকে তর্জনী নির্দেশ করে কবরেজমশাই নিতান্ত আন্তরিকভাবে বললেন—

—"ওই রাস্তাটা দিয়ে বেরিয়ে যান, শর্টকাট হবে, সোজা বড়ো রাস্তায় পড়ে যাবেন।"

স্তম্ভিত শিবু বলে—"সে কি! ওইটুকুনি গলিতে গাড়ি ঢুকবে কেন?" রীতিমতো অফেনডেড গলায় কবরেজমশাই দুহাত প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে বলেন—

—"কেন, আমার গাড়ি তো ঢোকে? ঐ পথেই তো আমি রোজ চেম্বারে

যাই ?"

—"কী গাড়ি মশাই আপনার ?" বলে শিবু উত্তরের অপেক্ষায় থাকে। আমার চোখের সামনেই ঘরের দাওয়ার দেয়ালে ঠেস দেওয়া সাইকেল। কবিরাজ চোখ দিয়ে সেদিকে দেখিয়ে দিয়ে মিটির মিটির হাসেন। শিবু হাসে না। ব্যাজার মুখে বলে—"ওঃ। সাইকেল !" তারপর বলে—

"ব্যাক করা ছাড়া উপায় নেই দিদি, পুরোটা রাস্তাই ব্যাক করে বেরুতে হবে। শালা, এ গলির যা ফর্ম !"

তারপর শিবু, কবরেজ, এবং গণ্ডা পাঁচেক বাচ্চা সশব্দে রাস্তা ক্লিয়ার করতে করতে চলে, পিছনে পিছনে আমি অতি সাবধানে ব্যাক করতে করতে আসি, খাটিয়া, ঠেলা, রিকশা ইত্যাদি দেখে শুনে (ধাক্কা লাগলেই তো গেছি)। আমার সামনে সামনে গণ্ডা কয়েক কুকুর ঘেউঘেউ করতে করতে মহা উল্লাসে দৌড়য়। এ গলিতে আমার ইম্পর্টেন্স প্রচণ্ড ! এ যেন স্বয়ং গবর্নরের গাড়ি—সামনে-পেছনে এডিসির মোটর-বাইক, মাইক-ওলা পুলিশের গাড়ি ইত্যাদি। হেম-কবিরাজ হঠাৎ জানলার কাছে এসে গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে বলেন—"মোটর তো আসে না এখানে বড় একটা। বড় রাস্তায় গাড়ি রেখে ঐ গলি দিয়ে হেঁটেই আসে সবাই শর্টকাটে—গাড়ি দেখে তাই বস্তির লোকেরা খুব খুশি হয়েছে আর কি !"

খুশির প্রমাণস্বরূপ কয়েকটা মন্তব্য কানে এলো—"এটা আবার কেমনি টেকশি রে ? সামুনে দিকে যায় না, কেবলই পিছনবাগে যায় ?" উত্তর—

—"আরে, ফ্যালাইয়া থো। অরে দুইষ্যা কী হইবো ? হৈল গিয়া মাইয়া লোগটার দোষ—আগাইতে তো আর শিখে নাই, ক্যাবল পিছাইতেই শিখছে", শুনতে শুনতে মাথার মধ্যে একটা দিব্য দরজা খুলে গেল। কবিরাজী মানে "ক্যাবল" পিছাইতেই শিখছি না তো ? ফেলেই দেব নাকি শেকড়টা ?

খ-পর্ব: রত্ন-চিকিৎসা

ফেলা হলো না। নন্দকাকু ফেলতে দিলেন না। চলল আমার তেলমালিশ আর গলাবন্ধ হাইকলার জামাপরা। (আমার ধারণা যারাই হাইনেক ব্লাউজ পরে, তাদেরই গলায় কালো সুতোয় বাঁধা শেকড়-বাকড় থাকে)। কিন্তু হাঁপানি কমল কিনা বোঝা গেল না এক হপ্তায়, তাই টাকাও নিলেন না হেম-কবরেজ। চলুক আরো দু হপ্তা। তারপরে নেওয়া যাবে। আরো দু হপ্তা কাবার হবার আগেই নন্দকাকু হায় হায় করে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে এসে হাজির। হেম-কবিরাজ হাওয়া হয়ে গেছেন। পড়ে রয়েছে তাঁর ঘরভর্তি আশ্রিত প্রাণীরা, সাইকেলটা লছমী তুলে রেখেছে নিজের ঘরে, ডাক্তার বোসের চেম্বারে কেবলই কবিরাজী রুগীদের ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে। কিছুই নিয়ে যাননি সঙ্গে, মা-কালীটিকে ছাড়া। কালীকে নিয়ে কবিরাজ ফেরার।

—"গেলো কোথায় মানুষটা ?"

—"আর বলো কেন", নন্দকাকু নাক কুঁচকে বলেন, "ওসব কবরেজী-ফোবরেজি ওর নাকি সবই ফোবটোয়েন্টি, আসলে শেকড়-বাকড় যোগাতো ঐ বস্তিরই এক নেপালী বুড়ি। কবরেজ আসলে সে-ই। বুড়ি অকস্মাৎ পটল তুলেছে। তার মেয়েটা অন্যরকম ব্যবসা করে, গাছগাছালি চেনে না। বুড়ি নাকি নেপাল থেকেই ওষুধের সাপ্লাই নিয়ে আসত। হেমচন্দর তাই নেপাল ছুটেছেন। বুড়ির এক বোন আছে সেখানে, সেও আয়ুর্বেদ চিকিৎসা জানে। তারই খোঁজে গেছে।" এইসব তথ্য নন্দকাকু পেয়েছেন লছমীর কাছে, লছমীর বউ নাকি আছাড়ি-পিছাড়ি কাঁদছে। ঐ হেম-কবরেজই খেতে পরতে দিত বুড়োবুড়ীকে।

—"অতঃপর ?"

—"অতঃপর কুছ পরোয়া নেই", নন্দকাকু ঘোষণা করেন।

—"আমি তো যাচ্ছি নকুড়েশ্বরের কাছে। ভেষজ চিকিৎসা আর নয়, এবারে রত্ন-চিকিৎসা। অব্যর্থ ফল হয়। নকুড়বাবু অমন সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড কবরেজ নন, খুব পড়াশুনো করেছেন। মস্ত তান্ত্রিক। হেমচন্দ্রের গুরুদেব।"

—"হেম-কবরেজের গুরুদেব ? ফর্সা-লম্বা, ভুঁড়িওলা—অল্পস্বল্প গোঁপ দাড়ি, লাল লুঙ্গি, সরি, পট্টবস্ত্র, কপালে সিঁদুর ? সেই কি ?" বর্ণনা শুনেই নন্দকাকু সম্মোহিত। হুবহু, এই তো তবে চিনিস দেখছি। চল, ওঁর কাছে নিয়ে যাই তোকে। এই আসল লোক। সিদ্ধপুরুষ। সত্যিই সাধনা করেছেন। অলৌকিক রত্নচিকিৎসা কি সোজা ব্যাপার ? এতে রোগ সারবেই ! না সেরে যাবে কোথায় ?"

কিন্তু আমি কিছুতেই রাজী হলুম না। রত্নচিকিৎসা নামটাই আমার মনে ধরলো না, পকেটেও ধরবে বলে মনে হলো না। তাছাড়া ওই লোকটাকে দেখে আমার 'কাপুরুষ-মহাপুরুষ' ছবির মহাপুরুষকে মনে পড়ে গিয়েছিল। আমি বাবা কাপুরুষ আছি। ওর মধ্যে যেতে চাই না। তায় আবার অলৌকিক !

সাহসী নন্দকাকু কিন্তু যেতেই থাকলেন, ফলও হয়তো পেতে লাগলেন। আমি পুনরায় অ্যালোপ্যাথিতে ফিরে গেছি শুনে মর্মাহত হয়ে অভিমানে নন্দকাকু এ-বাড়িতে আসাই ছেড়ে দিলেন। তখন মা এক রোববার সকালে আমাকে ভবানীপুরে পাঠালেন নন্দকাকুর মান ভাঙাতে।

নন্দকাকু বাড়ি নেই। কাকিমা আমাকে দেখেই নায়েগ্রার মতো অঝোর ধারে ভেঙে পড়লেন— "এসেছিস খুকু ? দেখে যা স্বচক্ষে তোর কাকার কাণ্ড ! আমার জীবন শেষ করে দিলে।"

—"কে শেষ করলে ? কাকু ?"

—"কাকু, আর কাকুর ঐ ডাকাত, ঐ চোট্টা তান্ত্রিকটা। সে তোর কাকুকে ভেড়া বানিয়ে ফেলেছে।"

—"সে কি গো ?" আমার আর বাক্য-স্ফূর্তি হয় না।

—"ছাইভস্ম পুরে পুরে কী সব পুরিয়া বানিয়ে দেয়, আর দুশো-পাঁচশো এই

রেটে টাকা নেয়। টাকা নেয়, আর বলে কিনা—আমি বিনামূল্যেই রত্ন-চিকিৎসা করি। আপনি যা দিচ্ছেন তা শুধু রত্নের মূল্য—ওগুলো তো জহুরীর কাছে কিনতে হবে! ভেবে দ্যাখ জোচ্চুরিটা কেমন!"

"রত্নগুলো কোথায়? কোমরে পরেন না হাতে? তুমি যাচিয়ে নাও তো স্যাকরার কাছে?"

—"হায় ভগবান! তবে আর বলছি কী?" কপাল চাপড়ান কাকিমা।—"রত্নগুলোই তো খায়।"

"খায় মানে? পাথর আবার খাবে কি!" আমি থ!

—"খায় মানে পুড়িয়ে খায়। পুড়িয়ে ছাই করে খায় তো! আহা, কতো রত্নই যে ক'মাসে খেয়ে ফেললে তোর কাকা! আজ সেগুলো সব থাকলে আমার একটা সুন্দর জড়োয়ার সেট হয়ে যেতো।" কাকিমার গলা কান্না-কান্না হয়ে বুজে আসে।

—"সেও কি সম্ভব? পাথর কি পোড়ে?"

—"পোড়ে না? খুব পোড়ে। 'রত্নভস্ম' কথাটা শুনিসনি? 'স্বর্ণভস্ম,' 'মুক্তাভস্ম,' এইসব শব্দ শুনিসনি জীবনে?"

—"তা শুনেছি বটে। কিন্তু সত্যি সত্যি কেউ কি প্রেশাস স্টোনস—মানে মণিমুক্তো, হীরেজহরৎ পুড়িয়ে খেতে পারে কখনো?"

—"পারে না? খুব পারে। ওরে, হাঁপানির কষ্টের জন্যে মানুষ সব পারে। এই একটি কথায় কাকিমা আমাকে চুপ করিয়ে দেন।—"কী খাচ্ছেন তবে তোর কাকা নিত্যি মধুর সঙ্গে বেটে বেটে, গেল ক'মাসে?" কাকিমা বলেন—"বাড়িতে দুধ-ঘি ঢোকে না, মাছ-মাংসও প্রায় বন্ধই, নিজেদের জন্যে গুড়-চা, আর কতো বলব? টাকাকড়ি সব যাচ্ছে ওই রত্নচিকিৎসায়। এর চেয়ে গাঁজা-ভাং কি মদ-টদ খেলেও ঢের ভালো হতো। মণিমুক্তোর চেয়ে ঢের সস্তা পড়ত। ওরে, নেশার মতন করে হীরেজহরৎ খাওয়া কি আমাদের পোষায়? একি বেগুনপোড়া?"

'নেশা' শব্দটা টং করে ঘন্টা বাজিয়ে দেয় মাথার মধ্যে আমার। কে জানে কী দিচ্ছে রত্নভস্মের নাম করে? সত্যি সত্যি রত্ন পোড়াতে ওর বয়ে গেছে। সত্যিকার চুনিপান্না হাতে পেলে কেউ পোড়াতে পারে নাকি? কখখনো না। অন্য-কিছুর ছাই দেয় নিশ্চয়ই—কাঠ-কয়লা, কি ঘুঁটের। কিংবা তার চেয়েও দামী কিছুর, যাতে রুগীর নেশা ধরে যাবে। যাতে কবরেজী ছাড়তে না পারে।

—"কে জানে কী জিনিস গেলাচ্ছে কাকুকে—'রত্নভস্ম' বলে? হাশিশ? মারি-হুয়ানা? আফিং? কোকেন? নিদেনপক্ষে তুমি যা বললে সেই গাঁজা? ভাঙ? কি চরস?—যাতে নেশা ধরে যায় তেমনই কিছু খাওয়াচ্ছে মনে হয়।"

বলতে না বলতেই ডুকরে কেঁদে ওঠেন কাকিমা।—"ওরে। খুকুরে। ওসব তুই কী সর্বনেশে কথা বলছিস রে? ওরে! ওরা যে সব পারে, ওই হতচ্ছাড়া ডাকাত, চোট্টা হীরে-খেকো খুনে তান্ত্রিকরা!" তারপরেই খাড়া হয়ে বসেন—গলার স্বর পাল্টে

BanglaBook.org

যায়। এবারে গঠনমূলক চিন্তা। ক্রিয়ার কনস্ট্রাকটিভ অ্যাপ্রোচ।—"এই মুহূর্তে বন্ধ করতে হবে। এক্ষুনি। আজই। গাড়ি এনেছিস তো সঙ্গে? চল— যাচ্ছি আমি—"

রণং দেহি মূর্তিতে কাকিমা শাড়ি বদলাতে যান। যেন অর্জুন যুদ্ধে নামার আগে অস্ত্রসজ্জা করছেন। মুখ অবিশ্যি বন্ধ হয় না। আরো নানা মূল্যবান ইনফর্মেশন বেরিয়ে আসতে থাকে। অনর্গল। —"ছোড়দাকে তো জানিস, একেই গ্যাস্ট্রিক, তায় হার্ট ট্রাবল", কাকিমা বলেন, "ছোড়দাকেও জপিয়েছে তোর কাকা। নকুড়েশ্বর তো বুক-পেট দুটোরই ট্রিটমেন্ট করবার জন্যে হামলে পড়েছিল, কিন্তু আমার ছোড়দাটি তো আবার অন্যরকম লোক, সে বেঁকে বসল। 'আমার হার্টটি আমি কার্ডিওলজিস্ট ডাক্তার সুধীর সেনকে দান করেছি, ওটা ওঁর প্রাইভেট প্রপার্টি, ওদিকে খবর্দার নজর দেবেন না, আমার পেটটাকে বরং আপনি নিন।' শুধু পেট দেখতেই তান্ত্রিকটা মাসে একশো তিরিশ টাকা করে নিচ্ছিল, হপ্তায় হপ্তায় একপুরিয়া মাত্র ওষুধের জন্যে। কী যেন নাম, 'কাঞ্চনভস্ম' নাকি। হঠাৎ কী যে খেয়াল হলো ছোড়দার, ল্যাবোরেটরিতে ছাইটা পরীক্ষা করিয়ে আনল। কী পাওয়া গেল বল তো? কাঞ্চন-টাঞ্চন কিছুই নয় কেবল হতুকি আমলকি বয়ড়ার গুঁড়ো! সেই দেখেই পরশুদিন ছোড়দা পিয়নকে দিয়ে চিরকুট পাঠিয়েছে—'এর হাতে ঐ ত্রিফলা-চূর্ণ ওরফে কাঞ্চনভস্মটি (অর্থাৎ আমার উপার্জিত কাঞ্চনের ভবৎকৃত ভস্ম) দিবেন।' সেই পড়ে নাকি কবরেজের হাত-ফাত কাঁপতে লেগেছে। ব্যাটার জুচুরি ধরা পড়ে গেছে তো? পুরিয়া এনে দিয়ে পিয়নকে বলেছে 'টাকা পয়সা দিয়েছেন কিছু?' পিয়নও তেমনি ওস্তাদ। বলেছে, কই না তো? শুনে কাতর হয়ে নাকি কবরেজ বলেছে, 'তবু, কালীর জন্যে, যাহোক কিছু?' পিয়ন তখন পকেট থেকে ঠিক পাঁচসিকে পয়সা বের করে দিয়েছে মায়া করে। তাই দিয়েছে। তবেই ভেবে দ্যাখো—"

—"নন্দকাকু কি তারপরেও গেছেন?"

—"তবে আর শুনলে কী? পরশুদিনই এই কাণ্ড, তবুও উনি আজকে গেছেন।"

"খুবই অদ্ভুত! সত্যি। নিশ্চয় রত্নভস্ম বলে কোনো নেশার জিনিস খাওয়াচ্ছে"—বলতে বলতে আমরা রাস্তায় নেমে পড়ি।

নকুড়েশ্বরের বাড়ি কাকিমা ভালোই চেনেন দেখা গেল। বিরাট সাইনবোর্ডে লেখা আছে,

—"চাঁদসীর ক্ষত-চিকিৎসালয়।" আমি তো অবাক! কাকিমা ব্যাখ্যা করেন—

—"এটা ওর নয়, ওর বাপের ব্যবসা। দোরের পাশের ঐ ছোটো সাইনবোর্ডটা ওর।" সেখানে ঝকঝকে পেতলের ফলকে লেখা—

"তান্ত্রিক রত্নচিকিৎসক, পণ্ডিত নকুড়েশ্বর কাব্যতীর্থ, বি-এ বি-এল জ্যোতিষার্ণব।" এর কোন ডিগ্রিটা যে সরাসরি রত্নচিকিৎসার সঙ্গে জড়িত, সেটা বুঝতে পারলুম না। ভেতরে ঢুকেই দেখি মারোয়াড়ি গদির মতো ফরাস বিছিয়ে

সামনে ডেস্ক নিয়ে এক শক্তসমর্থ টাক মাথা বৃদ্ধ ফতুয়া ধুতি নিকেলের চশমা পরে বসে আছেন। সামনে খেরোর মলাট জাবদা খাতা কলম। পিছনে দেয়ালে তাক ভর্তি চীনেমাটির বইয়াম। তাতে বিবিধ লেবেল। কাকিমা বললেন—"ওর বাবা।" ভদ্রলোক হাসি মুখে আমাদের নমস্কার করে বললেন—"এই যে মিসেস চৌধুরী, আসুন। আপনার কত্তাও আছেন এখানে নকুড়ের ঘরে।" এই সকালেই বেশ কজন রুগী এসে বসে আছে এই ক্ষত-চিকিৎসকের সামনে। কাকিমা প্রতিনমস্কারপূর্বক, একটুও না হেসে গম্ভীর গলায় বললেন—"ডাক্তারবাবু, আপনার গুণধর ছেলেটি আমাকে সর্বস্বান্ত করে ছাড়বে।" আমার মাথায় লজ্জায় বজ্রপাত হলো। কিন্তু ক্ষত-ডাক্তারবাবু বেশ স্বাভাবিকভাবেই উত্তর দেন—

—"শুধু কি আপনাকেই? আমাকে সর্বস্বান্ত করছে না? ও-ছেলে সব্বাইকে সর্বস্বান্ত করে ছাড়বে।" দু'হাত উল্টে ঠোঁট উল্টে তিনি বললেন—"ছিল, ছিল এক-রকমের পাগল, তন্ত্রমন্ত্র পুজোআচ্চা নিয়ে, এখন হয়েছে আরেক রকম। কিছুতেই তো সে পারিবারিক ব্যবসাতে ঢুকল না। আমরা জ্যোতিষীও নই, তন্ত্রমন্ত্রও জানি না, বংশানুক্রমে চাঁদসীর ক্ষতচিকিৎসা করে আসছি। হেন ক্ষত নেই যা আমার বাবার হাতে সারতো না। আমার হাত অতটা পরিষ্কার না হলেও এই তো এই পায়ে—ক্যান্সার রুগীকে সুস্থ রেখেছি তিন বছর—" (সামনে আঙুল বাড়িয়ে যাকে দেখালেন তাঁকে রুগী বলেই মনে হলো না)।

—"ছেলে প্রথমে বললে উকীল হব। রুগী আছে—হলোও উকীল। কিন্তু তারপরে বললে সংস্কৃত পড়বো, হলো কাব্যতীর্থ। সেই থেকে চলল জ্যোতিষচর্চা, তারপরে, হলো তন্ত্রসাধনা—(আমাদের এই শ্মশান ধারে ঘর হয়েই ওই যন্ত্রণাটা হয়েছে।)—এখন তো আবার নতুন নেশায় ধরেছে"—

ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে ক্রমেই বিমর্ষতর হয়ে যেতে লাগলেন—"ওর মা গেল বছরে স্বর্গে গেছে, বেঁচে গেছে! ছেলেকে ইদিকে শনির দশায় পেয়েছে—শনির দশায়। ওই যে, শনি"—চোখের ইশারায় দরজা দেখিয়ে দেন তিনি।

ফর্সা, ঢ্যাঙা, রোগা টিংটিঙ (বহুরূপীর 'রক্তকরবীর' সর্দারের মতো চেহারার), একমাথা উস্কখুস্ক রুক্ষ পাকা চুল, গায়ে আধময়লা লক্ষ্ণৌর বাঁদিক খোলা পাঞ্জাবি আর ফর্সা চুড়িদার পাজামা—পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তরের মধ্যে বয়স—এক ব্যক্তি ঘরে ঢুকছেন। তাঁর মুখে কালোয়াতী গানের গুনগুন, আর এই সাতসকালেই মদের গন্ধ ভুরভুর। চোখে উদাস দৃষ্টি, অন্যমনস্ক।

ঢুকেই তিনি জড়ানো গলায় হাঁক পাড়েন—

—"নকুড়! নকুড়। নকুড়বাবু কি উঠেছেন?" তৎক্ষণাৎ পাশের ঘরের পর্দা সরিয়ে স্মার্টলি যিনি বেরিয়ে এলেন তাঁর পরনে বেগুনি রঙের ঘন্টা পেন্টুলুন আর ভুঁড়িচাপা হলুদ গেঞ্জী। তাঁর বাঁ কোণের পকেটে একটি ঘন নীল উটপাখি ঠ্যাং উঁচিয়ে, পাখা মেলে স্তব্ধ হয়ে আছে। অল্পস্বল্প গোঁপদাড়ি, দিব্যি ভুঁড়ি, কপালে সিঁদুর।

BanglaBook.org

—"আসুন, আসুন, কী সৌভাগ্য! এস. কে. যে। এত সকালে?" আহ্লাদে গলায় অভ্যর্থনা জানান নকুড়েশ্বর, সিঁদুর লেপা কপাল থেকে চুলের গুচ্ছ দেবানন্দের কায়দায় এক ঝাপ্টায় সরিয়ে। আমাদের অবিশ্যি দেখতে পেলেন না। কিন্তু এহ বাহ্য। সিদ্ধপুরুষ! বাবা ব্যক্তিটি ছাড়বার পাত্র নন কিন্তু!

—"আগে এঁদের দিকে নজর দাও বাবা নকুড়। এঁরাই আগে এয়েচেন।"

নকুড়েশ্বর অগত্যা আমাদের দেখেন। দেখে ম্রিয়মাণ হয়ে যান। "আসুন আসুন, মিসেস চৌধুরী।"— উত্তরে কাকিমা কটমটিয়ে তাকান মাত্র।

পর্দা সরিয়ে ঢুকে দেখি দিব্যি সোফাটোফা পাতা আধুনিক বসার ঘর। এককোণে একটা বেঁটে লোহার সিন্দুক বড় বেখাপ্পা দেখাচ্ছে। অন্যদিকে, এক বুকর‍্যাক ভর্তি আইনের বই, আরেকটি র‍্যাকে ন্যাকড়া জড়ানো পুঁথিপত্র কিছু। কালী-টালী, তন্ত্র-মন্ত্র জাতীয় কিছুই চোখে পড়ল না। কিন্তু কাচ বসানো সেন্টার টেবিলে হিন্দী ইংরিজি বাংলার যাবতীয় চিত্রল সিনেমা পত্রিকা ছড়ানো, এবং একটি সোফাতে স্পষ্টতই বিচলিত নন্দকাকু। কেননা, নন্দকাকুর ঠিক সামনেই, টেবিলের ওপরে সুতো বাঁধা একতাড়া পাঁচ টাকার নোট। ঢুকেই কাকিমার প্রখর দৃষ্টি সেইদিকে। নন্দকাকুর কাতর দৃষ্টি এবং আমার বিহ্বল দৃষ্টি সেইখানেই নিবদ্ধ; এবং নবাগত অতিথির উদাস দৃষ্টিও। কেবল নকুড়েশ্বরই ভিন্ন। তিনি উচ্ছ্বসিত,

—"তারপর? এস. কে. যে আজ সকালবেলাতেই?" তেপান্তর মাঠ পার হয়ে আসা ঝোড়ো বাতাসের মতো বুক কাঁপানো দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ঘরটি দিশি মদের গন্ধে পরিপূর্ণ করে এস. কে. বলেন,

—"দিস ইজ দি এনড! ইয়ে জিন্দগী হ্যায় বেওয়ফা—রাজুকে পুড়িয়ে এলুম। মানে, রাজনলিনীকে। অর্থাৎ আমার জীবনটাকেই চিতায় তুলে দিয়ে এলুম। ববাদীয়োঁকে আজীব রাস্তা হ্যায়! ইয়েস—আজকে আমার জীবনটা দুমড়ে মুচড়ে শেষ হয়ে গেল, নকুড়!"

কাগজে পড়ে এসেছি, প্রতিভাময়ী বর্ষীয়সী চিত্রতারকা রাজনলিনী দেবীর মৃত্যুসংবাদ। বয়স হলেও কর্মক্ষম ছিলেন চিত্রজীবনে। ঘরে মৌনতা বিরাজ করে। দু মিনিট হবার আগেই এস. কে. আবার কথা বলেন—

—"জানোই তো, রাজুই ছিল আমার সব। মানে,—রাজুর সঙ্গে আমার—সে তো আজকের কথা নয়, সেই নাইন্টিন থার্টি থেকে। বাংলা ছবির তখন গর্ভযন্ত্রণা চলেছে, মেয়ে পাওয়াই ভার, লাইনের মেয়ে ছাড়া। সেই সময়ে রাজুকে আমিই আবিষ্কার করি। মাই ওন ফাইনড! ওর মতো পবিত্র উদাস সরল শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ —" ওঁর চোখে নাকে জলধারা উথলে পড়ে (আমি মনে মনে শুনতে পাই: দানশীলা, তেজস্বিনী দয়াবতী)—নকুড়েশ্বর প্যান্টের পকেট হাতড়ে তাড়াতাড়ি নীল সিল্কের ইস্ত্রি করা রুমাল এগিয়ে দেন—দামী বিলিতি সেন্টের অভিজাত গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তাতে বাংলা মদের দিব্য সৌরভ চাপা পড়ে না। এস. কে. দয়া করে

BanglaBook.org

নকুড়েশ্বরের রুমালে ফোঁৎ ফোঁৎ নাক ঝাড়লেন।

ইতিমধ্যে কাকা-কাকিমা মুখোমুখি। "সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি" নন্দকাকু যেন সন্ত্রস্ত হরিণী। আর কাকিমা? খাস রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।—সে কী দৃষ্টি! আমি বেচারী ফেউয়ের ভূমিকায়। নকুড়েশ্বর এতক্ষণে সংবিৎ পেয়ে বললেন,

—"ইনিই বিখ্যাত ডিরেক্টর এস. কে. দত্তচৌধুরী, সাত্ত্বিকের সব ছবিগুলি যিনি ডিরেক্ট করেছেন। নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই?"

—"মানে?" নন্দকাকু প্রায় শিবুর মতোই আনাড়ি বাক্য বলে ফেলেন।

—"সাত্ত্বিকবাবু তো নিজেই তাঁর ফিল্মগুলি ডিরেক্ট করতেন।" নকুড়েশ্বর এবার মৃদু মৃদু হাস্য করেন। সবজান্তার হাসি।

"লোকে তাই ভাবে। আসল ঘটনা অন্য! আসল ঘটনা এই এস. কে.-র কাছে শুনুন। ইনিই ছিলেন সাত্ত্বিকের অল-ইন-অল।" এস. কে. সলাজ নয়নে তাকান, —অতটা বাড়িও না নকুড়, আমি ছিলুম সাতুর ডান হাত। এবং ডান হাত কী করতো, বাঁ হাত তা টের পেতো না, একেবারে সেই প্রিভিউয়ের দিনের আগে!"

—এবারে আমিও আপত্তি না করে পারি না।

—"কিন্তু সাত্ত্বিকবাবু তো মোটামুটি একগুঁয়ে লোক ছিলেন। মানে ওঁর ব্যাপার তো সবই খোলাখুলি, সবাই সব জানে, উনি যে অন্যের কর্তৃত্বি একদমই সইতেন না ছবির ব্যাপারে, সে কথা তো বিশ্বসুদ্ধু সকলেই জানি—", উদার হাস্যে দক্ষিণ হস্তটি বরাভয় মুদ্রায় উঁচু করে আমাকে থামিয়ে দিয়ে এস. কে. বলেন

—"থাক, থাক, আজ সাতু যখন নেই তখন ওসব কথা আর বলে কী হবে! এসব প্রাইভেট অ্যাণ্ড কনফিডেনশিয়াল ব্যাপার তোমার পাবলিক নলেজ করাই উচিত নয় নকুড়।"

—"মিস্টার চৌধুরী খুবই সদাশয় ব্যক্তি"—নকুড়েশ্বর বলেন।

—"ও, তাহলে তোমার নিজের খবরটা ওঁদের দিয়েছো?" রাজনলিনীর শোক ভুলে গিয়ে রীতিমতো উৎসাহের সঙ্গেই প্রশ্নটি করেন ভদ্রলোক। এবং এই ব্যক্তিগত সংবাদ-সংক্রান্ত প্রশ্নে স্পষ্টতই লজ্জা পেয়ে যান সিদ্ধপুরুষ মহাতান্ত্রিক নকুড়েশ্বর। কেমন নম্র-নম্র মুখ করে বলেন,

—"না! ও আর দেবার মতন খবর কি আর?"

—"দেবার মতন খবর নয়? বলো কি?" টেবিলে রাখা নোটের তাড়ার দিকে চেয়ে চেয়ে এস. কে. বলেন,

—"মিউজিক আর. ডি. বর্মণ! সেটা খবর নয়? অ্যাঁ?"

—"মানে?" নন্দকাকু ঠিক বুঝতে পারেন না।

"নকুড় তো ফিলিম করছে। ফ্যান্টাস্টিক স্ক্রিপ্ট বানিয়েছে। আর. ডি. বর্মণ তো খুশি হয়ে রাজী!"

এবারে কাকিমা জাগ্রত হন।

BanglaBook.org

ফিল্মের ব্যাপারে কাকিমার বেশ ইন্টারেস্ট আছে—

—"ডিরেক্টার নিশ্চয়ই আপনি?" এস. কে. সায় দিয়ে মাথা হেলান।

—"আর হিরো-হিরোইন কারা?" কাকিমার দ্বিতীয় প্রশ্ন।

—"বলো? নকুড়, বলে দাও? বলে দাও না কাকে তোমার হিরোইন করছো!" এস. কে. যতই উৎসাহ দেন, শ্রীমান নকুড়েশ্বর যেন ততই লজ্জায় কুঁকড়ে যান।

—"বলো না, বলো? লজ্জার কী? এ তো গর্বের কথা—বলো, ওঁদের বলে দাও, নকুড়,"—লজ্জায় লালচে হয়ে নকুড়বাবু বলেই ফেলেন—"শর্মিলা!" বাকিটা এস. কে. বলে দেন—"শর্মিলা কিনা বাংলা ছবিতে নামতে খুব ভালোবাসে। তাই।"

—"গল্প কার?" কাকিমা যেন ইন্টারভিউ নিচ্ছেন।

—"গল্প নকুড়ের নিজেরই লেখা, স্ক্রিপ্টও তারই। অসামান্য সেই স্ক্রিপ্ট, মানে, না পড়লে বিশ্বাস হবে না। এত এক্সাইটিং—নকুড়েশ্বরই লাইফস্টোরি বলতে পারেন, কিন্তু ওঃ! রাজুটাই যে চলে গেল! ওকেই তো ঠিক করেছিলুম হিরোর পার্টে। ওঃ রাজু। মাই সুইট চাইল্ড। মাই ডার্লিং রাজনলিনী!" হঠাৎ পুনরায় শোকটা উথলে উঠল এস. কে.-র। আমরা ছবিটবিতে রাজনলিনী দেবীকে পর্দার উপরেই দেখছি তাই যৌবনের এই আবেগের সঙ্গে ঠিক খাপ খাওয়াতে না পেরে অস্বস্তি বোধ করতে থাকি। নকুড়েশ্বরও অতিরিক্ত বিব্রত হয়ে পড়েন—"থাক থাক, ওকথা আর" —তিনি অপরাধীর মতো চোর চোর মুখে বলেন, যেন এই মৃত্যুর জন্য তিনিই দায়ী। কথা ঘোরাতে চান কাকিমাও, তাই প্রশ্ন করলেন—

—"আর হিরো? হিরো কে? ধর্মেন্দ্র নাকি? সেও তো শুনেছি বাংলা বইয়ে নামতে চায়"—কাকিমা নানান ফিল্ম পত্রিকার নিয়মিত পাঠিকা। এবারে নকুড়েশ্বর গোলাপ-ফুলটির মতো লাজ-রাঙা হয়ে ওঠেন। এবং তদ্দৃষ্টে অকস্মাৎ শোকার্তের ভূমিকা থেকে ইয়ারের ভূমিকায় চলে যান শ্রীযুক্ত এস. কে.। একটি চক্ষু টিপে গেয়ে ওঠেন "CS আমার গোপন কথা, শুনে যাও ও CSI খি"— তারপর হঠাৎ শোক এবং ইয়ার্কি উভয় রোল পরিত্যাগপূর্বক খুব সীরিয়াস হয়ে গিয়ে গম্ভীর গলায় বলেন— "হিরো নকুড়েশ্বর হিমসেলফ। দেখুন, লাইফ-স্টোরির ফিল্মে কিন্তু সেটাই বেস্ট। সাতুকে দিয়েও তো আগে তাই করিয়েছিলুম, শেষ বইটাতে মনে নেই? সাত্ত্বিকের লাইফ স্টোরি যেটা? জাঁ ককতো তো বার বার তাই-ই করেছেন। এমন-কী ত্রুফোও। 'ডে ফর নাইটে'? তবে নকুড়ের নামটা বদলে দিতে হবে। ভাবছি আমার নামটি কেমন।"

—"বেশ নাম। চমৎকার নাম"—বলতে বলতে হঠাৎ ঝুঁকে কাকিমা টেবিল থেকে খপাৎ করে নোটের বাণ্ডিলটা তুলে নেন— নন্দকাকুর দিকে তাকিয়ে বলেন— "এটা তো পশ্চিমের দোকানঘরগুলোর ভাড়াটা? তাই না? আজই দোসরা।" ভীত নন্দকাকু স্বীকারোক্তিতে মাথা নাড়েন। কাকিমা উঠে দাঁড়ান। ব্যাগ খুলে টাকাটা

প্রথমে ভরেন। নেক্সট মুভ হিসেবে পানের ডিবে বের করে মুখে বেশ খানিক পানজর্দা ঠাসেন, যাতে মনের বল বৃদ্ধি পায়। তারপর মুখটা উঁচু করে (যাতে পানের রস না গড়িয়ে পড়ে) সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলেন—

—"খাওয়াচ্ছেন তো টিকের ছাই আর হত্তুকির গুঁড়ো, ইদিকে হাজার দুয়েক অলরেডি গচ্চা গেছে। আজ আমি এসে না পড়লে আরো পাঁচশো যেতো। হুঁঃ। বাবুর ফিলিম করা হচ্ছে। ধীমান। ঐ ফিলিমের প্রযোজক কি আমরাই? বলি, টাকাটা যোগাচ্ছে কে? এই হতভাগা রুগীগুলো। না?" এবার নিচে নামল, এবং আঙুলটি এস. কে-র দিকে উদ্যত হলো—"ওই জুটেছেন আসল ফোর-টোয়েন্টি। যেই সাত্ত্বিকবাবু মারা গেছেন, অমনি তাঁর নামে যা-নয়-তাই বলা? আবার রাজনলিনী দেবীর নামেও মরণের সঙ্গে সঙ্গেই কেচ্ছা করা হচ্ছে। ইন্দিরা গান্ধী মরলে এ কী বলবে কে জানে। একখুনি পুলিস ডাকা উচিত।" তারপর স্বর পালটে—

—"আর বাছা নকুড়েশ্বর, তোমাকেও বলি। বুড়ো বাপের কথা-টথা একটু শুনলেও তো পারো। চাঁদসীর চিকিচ্ছে না করতে চাও, কোর্টেও তো বেরুলে পারতে? এ ব্যাটা বুড়ো জোচ্চোরের পাল্লায় পড়ে যে তুমিও গেলে। আমরাও গেলুম, বাপ। এটা যে কেলোর কীর্তি হচ্ছে। হ্যাঁ, সে ছিলো বরং পাগলা হেম-কবরেজ।" কাকিমার কণ্ঠে হঠাৎ গরম গরম মায়া ঝরে পড়ে—

—"ঘাস পাতা দিত বটে, কিন্তু পয়সারও খাঁই ছিল না মোটে। সে তবু একরকম। পাগলটা নাকি ওষুধ খুঁজতে খুঁজতে একেবারে নেপালে চলে গেচে।"

এবারে পরম বিস্ময়ে নকুড়েশ্বরের মুখ খুলে যায়—

—"নেপাল? হেম তো নেপালে যায়নি।"

—"তবে? লছমী যে বললে—", নন্দকাকুকে থামিয়ে দিয়ে নকুড়েশ্বর তাড়াতাড়ি বলতে থাকেন,

—"হেম তো গেছে তার শালার বাড়ি, ইউ. এস. এ.-তে। শিকাগোয় হেমের শালা রেস্টুরেন্ট খুলেছে, হেমের বউ সেখানে রান্না করে। বউ লিখেছে ওদেশে হিন্দুধর্মের খুব বাড়বাড়ন্ত, যোগ-যাগ তন্ত্র-মন্ত্র খুব চলছে, মায় ঝাড়ফুঁক পর্যন্ত। হেম তাই শিকাগোয় গেছে একটা কালীমন্দির খুলতে। ওখানে বাঙালীও ঢের, কালীবাড়ি একটা দিব্যি জমে যাবে।"

এক মুষ্টিতে নন্দকাকু, অন্য মুষ্টিতে আমি, বগলে ব্যাগ, কাকিমা দরজার দিকে ফরোয়ার্ড মার্চ করতে করতে পর্দার সামনে এসে আবাউট টার্ন করে ঘুরে দাঁড়ান। এস. কে. নীরব, উদাস চোখে টেবিলে নোটের তাড়ার শূন্য স্থানটির দিকে চেয়ে বসে আছেন। নকুড় উঠে দাঁড়িয়েছে উত্তেজনায়। কাকিমা নকুড়েশ্বরের দিকে চেয়ে একটি যথার্থই মিলিয়ন ডলার অ্যাডভাইস ঝাড়লেন—

—"দ্যাখো বাছা নকুড়েশ্বর—তুমিও আমেরিকাতেই চলে যাও না কেন? হলিউডে

BanglaBook.org

ছবি করবে, দেবানন্দ শশী কাপুরের মতন নাম করবে, আর হীরে-জহরৎ পুড়িয়ে খাবার ব্যবসাটাও ও-দেশেই জমবে ভালো। ওটা বোধহয় সায়েব ব্যাটারা খেতে শেখেনি এখনো।"

অপারেশন ম্যাটারহর্ন

তোমরা নিশ্চয়ই সেই জাপানী মহিলার নাম শুনেছো, শ্রীমতী তাবেই, যিনি এই বিশ্ব নারীবর্ষে এভারেস্ট শিখর জয় করলেন। কিন্তু তোমরা কি জানো, একবার দু'জন ভারতীয় ছাত্রী দুরারোহ ম্যাটারহর্ন শিখর বিজয়ে বেরিয়েছিল? ম্যাটারহর্ন আল্পসের একটি শৃঙ্গ। যেমনি উঁচু তেমনি খাড়াই—বিশেষত তার দক্ষিণমুখ পর্বতারোহীদের পক্ষে বশ মানানো প্রায় অসাধ্য। বছর তেরো চোদ্দ আগের কথা —দুটি ভারতীয় মেয়ে ঠিক করল তারা ম্যাটারহর্নের দক্ষিণমুখ জয় করবে। তারা কোনোদিন মাউন্টেনিয়ারিং শেখেনি বটে, কিন্তু তাদের সাহস ছিল খুব। কেম্ব্রিজে পড়তে গিয়েছিল দুজনে ভারতবর্ষের দুই কোণ থেকে। গিয়ে ভাব হয়ে গেছে। যেমনি মনে হওয়া অমনি ঈস্টারের ছুটিতে পিঠে হ্যাভারস্যাক ফেলে, হাতে স্লিপিং ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ল তারা দুজনে,—লক্ষ্য ম্যাটারহর্ন। সম্বল কষ্টেসৃষ্টে জমানো কয়েকটি পাউণ্ড, কিছু দেশের ডালমুট, কিছু ডিম, চীজ, রুটি, জেলি, এক শিশি ইনস্ট্যান্ট কফি। এছাড়া ম্যাপ, কমপাস, হুইসিল আর টর্চ তো আছেই। কিছু চুইংগামও।

ম্যাটারহর্নে চড়তে গেলে যেতে হয় ৎসেরমাট নামে একটা ছোট্ট পাহাড়ী গ্রামে। ৎসেরমাট-এ যেতে গেলে প্রথমে যাওয়া দরকার জেনিভা শহরে, ট্রেন ধরতে। রেণুকা আর নবনীতা তো খুব কষ্টেসৃষ্টে একটা ট্রেনে করে প্রথমে গেল লণ্ডন, তারপর লণ্ডন থেকে আরেক ট্রেনে ডোভার, তারপর জাহাজে চড়ে ডোভার থেকে ক্যালে (সেটা ফ্রান্সে), ফের ট্রেনে চড়ে ক্যালে থেকে লিয়ঁ—আবার ট্রেন বদলে লিয়ঁ থেকে জেনিভা (সেটা সুইটজারল্যাণ্ডে)। রেলগাড়ি বদল করে জেনিভা থেকে ৎসেরমাট চলল। পথে অনেকবার চীজ কিনল, রুটি কিনল, কলা কিনল। রেণুকা আবার মাছ-মাংস খায় না। সে তামিলনাড়ুর মেয়ে। অন্যজন বাঙালী।

জেনিভার ট্রেনটা সোজা ৎসেরমাট পাহাড়ে ওঠে না কিন্তু। পথে আবার একটা ছোট স্টেশনে এসে ফুরনিক্যুলার ট্রেনে চাপতে হয়। সেই শুঁয়োপোকার মতো খুদে খুদে ট্রেনগুলো পাহাড়ে চড়তে ওস্তাদ। তার চাকার গায়ে দাঁত-দাঁত কাটা শেকল পরানো, আবার রেললাইনেও দাঁত-দাঁত খাঁজকাটা, ট্রেন শেকল আর দাঁত দিয়ে

সেই লাইন কামড়ে কামড়ে খাড়া হয়ে পাহাড়ে ওঠে, খসে-টসে পড়ে যায় না। পথে প্রথমে গ্রাম ছিল, ক্ষেতখামার—আপেলবাগান ছিল, গরু-ভেড়া চরছিল, গয়লানীরা বেড়াচ্ছিল—দৃশ্য-টৃশ্য স্বাভাবিক ছিল। তারপর ক্রমশ কমতে লাগল ঘরবাড়ি, মানুষবসতির চিহ্ন। কেবল বাড়তে লাগল ঝর্ণা, আর ঝাউবন। আর বরফ। ট্রেনের গতি কমে এল। মাঝে মাঝে টানেলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে—অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে, ছাদ থেকে জলের ফোঁটা পড়ছে,—মাঝে মাঝে গ্লেশিয়ার পার হচ্ছে। মস্ত মস্ত ঠাসা বরফের নদীর নাম গ্লেশিয়ার—বহু শত সহস্র বছর ধরে এইসব বরফ জমেছে —এরা নদী,কারণ খুব আস্তে হলেও, এদের গতি আছে। বছরে যদি দুই কি তিন ইঞ্চি এগোয়, সেটা তাদের পক্ষে উদ্দাম গতিবেগ! মাঝে মাঝেই গাঢ় শ্যাওলার চাদর ঢাকা, মাঝে মাঝে গভীর, চওড়া খাঁজ, খোঁদল, ফাটল। কোথাও বা গর্ত। বরফের নদীর রং ঠিক সাদা নয়, কেমন স্বপ্নের মতো সবজে, নীল-মতন। হঠাৎ হঠাৎ অনেক সময়ে এইসব গ্লেশিয়ারের অংশ ধসে পড়ে গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন করে দেয়। 'তুষার ধস' এই ভয়ঙ্কর শব্দটি আল্পসের এইদিক পার্বত্য গ্রামে প্রবল ভীতিকর, অলুক্ষনে। ৎসেরমাটে সবাই 'স্কী' করতে যায়, বোঝা যাচ্ছে, নয়ত পাহাড়ে চড়তে। এছাড়া আর কেনই বা যাবে? এই ছোট্ট ট্রেনের ভেতরে দেয়ালে লম্বা লম্বা তাক তৈরি করা আছে। তাতে স্কী রাখা। আমরা দুজন স্কী করতে জানি না। পোশাক দেখলে অবশ্য বোঝবার উপায় নেই—এত যত্ন করে স্কী-পোশাক নকল করেছি। যত বরফ বাড়তে লাগল, তত আমার মনে হতে লাগল, ম্যাটারহর্নের দক্ষিণমুখ আমরা ম্যানেজ করতে পারব কি? "ভাই রেণুকা, ওটা এবার ছেড়েই দে বরং। যাই, গিয়ে দেখে-টেখে আসি। বড়ো বড়ো পর্বতারোহীরাই যা পারেন না, আমরা কি তা পারি? পাহাড়ে চড়ার আইনকানুনগুলোও তো ঠিক শেখা হয়নি আমাদের। তার চেয়ে বরং বাঁদিক থেকেই এবারের অভিযানটা চালানো যাক—যে-দিকটাতে স্বাভাবিক খাঁজ কেটে রেখেছেন ভগবান। ঈশ্বরের যদি ইচ্ছে হতো দক্ষিণ দিক দিয়ে লোকেরা ওঠে তাহলে কি উনি এদিকেই খাঁজ কাটাতেন না? কী হবে ভাই শুধু শুধু প্রকৃতির বিরুদ্ধতা করে?"—তোমরা মনে রেখো যে, তখনও ভারতবর্ষের মেয়েদের পর্বতারোহণের চল ছিল না। তাছাড়া আমরা দুজন পার্বতী নই কোনোরকমেই। দুজনেরই সমতলে জন্ম, সমতলেই মানুষ হয়েছি। কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারের আশা এবং উৎসাহ পর্বতপ্রমাণ আকাশচুম্বী।

ছোট্ট স্টেশন ৎসেরমাট-এ নামলুম মাত্র ক'জন যাত্রী। শুধু আমরাই ভারতীয়। নামতেই দেখি ক্রাচ-বগলে কয়েকজন লোক গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে। হাড়কাঁপানো শীতে হিহি করে কাঁপতে কাঁপতে গান গাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ক্রাচ কেন? একসঙ্গে এতগুলো খোঁড়া লোক? স্টেশনের সামনেই দেখি এক রাজসূয় কাণ্ড —কী সুন্দর একটা ঘোড়ার গাড়ি যাচ্ছে, কী তার রং, কী তার ঢং। অপু-দুর্গার রেল দেখতে ছোটার মতন, অগ্র-পশ্চাৎ বিস্মৃত হয়ে ম্যাটারহর্ন অভিযাত্রী-যুগল

BanglaBook.org

ঘোড়ার গাড়িটার পেছন পেছন ছুটলাম। যেন কোমরে ঘুনসি-বাঁধা আদুড়-গা অপোগণ্ড; কৌতূহলে এতই ডগমগ আমরা। না জানি কারা চড়েন এই গাড়িতে? এ দৃশ্য তো সুলভ নয় পশ্চিমী শহরে—একটা বরফমোড়া স্বপ্নরাজ্যে এটা বরং মানিয়ে গেছে। রথ থামল 'পোস্ট অফিস' লেখা একটা দরজার সামনে। ভেতর থেকে কোন রাজা-রাজকন্যে বেরুবেন, দেখব বলে আকুল নয়নে দাঁড়িয়ে আছি—প্রথমে নামল ক্রাচ। তারপর মানুষ। আরো ক্রাচ আরো মানুষ। নারী, পুরুষ, শিশু। সবার বগলেই ক্রাচ—ছোট্ট ক্রাচ, বড় ক্রাচ, বেঁটে ক্রাচ, লম্বা ক্রাচ। ইত্যাদি।

ব্যাপারটা কী? এত ক্রাচওলা লোক কেন— একি কেবল খোঁড়াদের দেশ? এই ম্যাটারহর্ন? রেণুকা কেমিস্ট্রিতে ফার্স্ট ক্লাস। খুব বুদ্ধি তার। সে বলল, "নিশ্চয় হটস্প্রিং-টিং আছে। রাজগীরের মতো।"—ও হরি, তাই বল! আমি এবার নিশ্চিন্ত হলাম। রাজগীরে যেমন লাঠি হাতে পঙ্গু লোকের ছড়াছড়ি, এও তেমনি। সুইটজারল্যাণ্ডের রাজগৃহ এটা। বরফ-নদীর নীচে হটস্প্রিং। ঈশ্বরের কী আশ্চর্য লীলা। প্রকৃতির কী অপ্রাকৃত ইন্দ্রজাল? আহা, এ গাড়িটা তাহলে খোঁড়াদের গাড়ি? কৌতূহল মিটল।—এবার গেলুম মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজতে।

ইয়ুথ হস্টেলে জায়গা নেই। একটাও হোটেল আমাদের বসবাসের যোগ্য নয়, কারণ সেখানে আধ-বেলা ঠাঁই নেবার মতনও রেস্ত আমাদের নেই। একটা পাঁসিয়নেটে গেলুম। এক গৃহস্থ মহিলা বাড়িতে ঘর ভাড়া দেন। এদেশে এটাই রীতি। তিনিও বললেন, জায়গা নেই। শুধু ছাদের ঘরটায় জায়গা আছে—কিন্তু খাট মাত্র একটা। আমরা যত বলি খাট-বিছানা চাই না, আমরা মেঝেতে দিব্যি স্লিপিং ব্যাগ পেতে শোব—মহিলা বলেন, "ওসব চলবে না, খাটে শোয়া চাই। একজন মাত্র থাকো, অন্যজন অন্যত্র পথ দ্যাখো।"—তাই কি হয়? আমরা শেষে বললুম, "দুজনেই ঐ ঘরে শোব।" উনি বললেন, "তাহলে আমাকে পুলিশে ধরবে।" আমরা বললাম, "একজনের ভাড়া নিন তাহলে। দুজনের নেবেন না। আপনি কাউকে ফ্রী থাকতে দিলে পুলিশের কী?"— আমাদের নাছোড়বান্দামি এবং আহ্লাদপনা দেখে শেষটা তিতিবিরক্ত হয়ে মহিলা বললেন, "যাও—যা খুশি করগে যাও, দুজনে মিলে এক বিছানায় ঠাসাঠাসি করে মর, আমি জানি না।"—আনন্দের চোটে তাঁকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করল—কিন্তু দুধ-ঘি-সর খেয়ে সুইস মহিলাদের বপু এমনই বিপুল হয়, যে সাহস হলো না। মহা আনন্দে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে আমরা ঘুপচি ঘরে উঠলাম। চিলেকোঠা—নানা দিক থেকে ছাদটা ঢালু হয়ে এসে দেয়ালে মিশেছে। ঘরে আলো জ্বলছিল না। প্রথমেই ঘুরে ঘুরে আবছা অন্ধকারে আলোর সুইচ খুঁজতে লাগলাম। এক একবার রেণুকার মাথায় ঠোক্কর লাগে, আর "আহা! আহা!" বলতে-বলতেই ঠাস করে আমারও মুণ্ডু ছাদে ঠুকে যায়—এমনিভাবে সুইচ খোঁজা চলল। দরজার বাঁয়ে, দরজার ডাইনে, খাটের এপাশে, খাটের ওপাশে, নাঃ নেই। সুইচ কোথাও নেই। তবু ভালো যে টর্চ আছে সঙ্গে। ক্লান্ত হয়ে খাটে বসলাম। সিংগল

BanglaBook.org

খাট। নরম তুলতুলে তোশকের ওপর দুধের ফেনার মতো চাদর টানটান পাতা। একটাই মাত্র কম্বল, ভাঁজ করা আছে। বিছানায় বিলেতের ধরনে চাদর গোঁজা নয়। রেণুকা দেখল, দরজায় ছিটকিনি—অর্থাৎ তালা নেই। হোয়াট? নো লক, নো লাইট? রেণুকার মুখ শুকিয়ে গেল। "তুইও যেমন! আমাদের আছেটা কী, যে চোরে নেবে? লক দিয়ে কী হবে?"— রেণুকা খুব চটে গেল।—"আছেটা কী? কেন, তুমি রামায়ণ পড়োনি? সীতাহরণের কথা জান না? ছেলেধরার কাহিনী শোননি কখনও?" বাঃ! —যত বলি, "ওরে রেণুকা, তুইও সীতা নোস, আমিও সীতা নই, তাছাড়া সে রামও নেই, সে-রাবণও নেই,"—কে শোনে কার কথা! "দ্যাখ রেণুকা, এতেই ভয়? ভুললে চলবে না, আমরা ম্যাটারহর্নের দক্ষিণাপথ অভিযাত্রী।" রেণুকা ধমক দিয়ে উঠল—"পাহাড়ের বিপদ আলাদা। তা বলে ঘরের বিপদে ভয় করবে না?" রেণুকার মাউন্টেনিয়ারিং-এর মুডটা নষ্ট হয়নি দেখে সান্ত্বনা পেলুম।

এদিকে পেট চোঁচোঁ করছে। খিদেয় নাড়ীভুঁড়ি হজম হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি কিছু ডিমসেদ্ধ রুটি জ্যাম খেয়ে বেশ খানিকটা জল খেলুম। ঝুলে গরমজল ছিল না, যে কফি গুলবো। থাক, জলটা হয়তো আদিতে হটস্প্রিংসের, কে জানে? নিশ্চয় খেলে শরীর ভালো হবে।—কী ঠাণ্ডা জল রে বাবা! জলটাও ঠাণ্ডা, হীটেড নয়। একটা হীটার আছে, পয়সা ফেললে জ্বলা উচিত, যেমন জ্বলে ইংলণ্ডের ভাড়াবাড়িতে। কিন্তু পয়সা ফেলব কোথায়? এই চিলেকুঠরিতে সত্যর সত্যিই তিন অবস্থা—হীটার আছে কিন্তু পয়সা ফেলার ব্যবস্থা নেই, যেমনিও জ্বলছে না। এটা ওটা টিপেটুপে দেখলুম, নাঃ, হীটার নট জ্বলন নট বাজছে। সুইচ নেই।—একেই পথশ্রমে শরীর অতিরিক্ত ক্লান্ত, তায় ঘর কনকনে ঠাণ্ডা, শুতে পারলে বাঁচি—কিন্তু রেণুকা অরক্ষিত কক্ষে কিছুতেই ঘুমোবে না। সে ঘরের একটিমাত্র চেয়ারে গ্যাঁট হয়ে বসে রইল—দরজা বন্ধ না হলে শোবে না। এ তো কলকাতা থেকে পুরী যাওয়া নয়, এ হচ্ছে ম্যাটারহর্ন অভিযান। সঙ্গে তো দেশের মতো বেডিং-ট্র্যাঙ্ক-বালতি-লণ্ঠন কিছুই নেই, যা দিয়ে দরজায় ঠেকা দেবে। শেষে টেবিলটাই টেনে এনে দোরে ঠেস দিয়ে, তার ওপরে চেয়ারটাকে তোলা হলো। নিচু সিলিংয়ে প্রায় ঠেকে যাচ্ছে। দেখে মনে হয় শুধু ছাদ থেকে দড়িটা বেঁধে ঝুলে পড়লেই হলো, যেন ফাঁসি-যাবার সব বন্দোবস্ত পাকা। রেণুকা এবার শুতে রাজি হলো। কিন্তু এখন সমস্যা কে খাটে, কে মাটিতে? কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান? এ বলে তুই খাটে শো। ও বলে তুই খাটে শো। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো দুজনেই খাটে শোব। কম্বলখানি টেনে নিয়ে কোটটোট মোজাটোজা সুদ্ধু দুজনে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়লুম—বুট দুটো খুলে রাখলুম দোরগোড়াতে। শুয়ে পায়ে স্লিপিং ব্যাগ দুখানি চাপা দিলুম—দিয়ে শুরু হলো ঠক-ঠকানি। রেণুকার সীতাহরণের ভয় কাটছে না, আমার নিমোনিয়ার ভয় ঢুকেছে। ঘুম হলো তা সত্ত্বেও। সকালবেলার আলোয় যেই জানলার চৌকো কাচগুলো জলরং হয়ে ফুটে উঠতে শুরু করল, আমি উঠে পড়লুম। উঠতে গিয়ে

মুখে কী একটা নোংরা সুতোর মতন ঠেকল। টেনে ছিঁড়ে ফেলতে গেছি যেই, অমনি টুক করে জোর আলো জ্বলে উঠল ঘরে।—ওটাই সুইচ। সিলিং থেকে ঝুলছে।

রেণুকাও উঠে বসল। দেখা গেল দরজায় টেবিল, টেবিলের ওপরে চেয়ার, তার ওপরে দুটো হ্যাভারস্যাক, তার নীচে দু-জোড়া বুটজুতো। আমাদের গায়ের ওপরে দুটো কোট, দুখানা স্লিপিং ব্যাগ। ঘরের দৃশ্য মোটামুটি এই। আর হীটারের পাশেও সিলিং থেকে ঝুলন্ত একটা ময়লা সুতো। সেটা টানবামাত্র হীটার গরম হতে শুরু করল। ঘরেই বেসিন। মুখ ধুয়ে বাসিরুটি চীজ কলা ডিমসেদ্ধ নিয়ে বসা হলো। ফরাসী রুটি বাসী হলেই ভয়ানক শক্ত হয়ে যায়। ভাঙা যায় না পর্যন্ত। ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে ভিজিয়ে নরম করে তাই খানিকটা খেলুম দুজনে... উপায় কী। পয়সা কম, খিদে বেশি। খেয়ে-দেয়ে ছেঁড়া কাগজ, রুটির গুঁড়ো, ডিমের খোলা, কলার খোসা, সবই সযত্নে পকেটে পুরে ফেলা হলো। কারণ খেতে-খেতেই নজরে পড়েছে দরজার গায়ে একটা নোটিশ টাঙানো:...ঘরের মধ্যে খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ। এখন কোণের টুকরিতে আবর্জনা ফেললেই ঝি এসে খপ করে ধরে ফেলবে। ধরলে নিশ্চয় জরিমানা হবে। জরিমানা হলে ম্যাটারহর্নে ওঠা হবে না তাই প্রমাণ লোপের প্রচেষ্টায় লেগে গেলাম দু'জনে। ভয়ে ভয়ে নীচে গেছি...কী জানি দেখে যদি বুঝতে পারে যে আমরা ঘরে খেয়েছি? মাত্র একটা পাতলা কম্বল দিয়েছে, আর ছিটকিনি দেয়নি কেন...এসব অভিযোগ করার মতন মনের জোর আর বাকী ছিল না,...নিজেরাই যেহেতু নিয়ম ভেঙেছি। আইন অমান্য করে নিজেরাই চোর হয়ে গেছি। রেণুকার মুখটা যদিও বেশ অপরাধী-অপরাধী দেখাচ্ছিল, তবুও দরজায় ছিটকিনি নেই কেন —এই মর্মে সে মৃদু অনুযোগ তুলতে গেল। অমনি মহিলা সোজা রাস্তা দেখিয়ে দিলেন। আর যায় কোথায়? তক্ষুনি আমাদের রাগ হয়ে গেল। পকেটের কলার খোসা-টোসার কথা ভুলে গিয়ে আমরা রেগে বললুম, চাই না থাকতে, একখানা মোটে পাতলা কম্বল, দোরে তালা নেই, তার আবার মেজাজ কত! শুনে মহিলা রাগ করলেন না, অবাক হয়ে গেলেন। "কম্বলটা তো অতিরিক্ত, ওটা একটা তো কী, অত মোটা লেপটা রয়েছে না?"

"লেপ? কোথায় লেপ?"

"কেন? বিছানায়?"

"কৈ কৈ, ছিল না তো? লেপ-টেপ কিছু ছিল না।"

"কিচ্ছু ছিল না? দেখাচ্ছি ছিল কিনা!" বলেই মহিলা থপ থপ করে বাড়ি কাঁপিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন। পিছন পিছন আমরাও। এসে দেখি উনি বড়ো বালিশটা তুলে তার তলা থেকে যেন ম্যাজিকে, দু' ভাঁজ করা লম্বা চওড়া, বিশেষরূপে স্থূলবপু একটা পালখের লেপ টেনে বের করলেন। সেটা বিছানা জুড়েই পাতা ছিল। ধবধবে ওয়াড় পরানো সেই নরম লেপের ওপরেই আমরা সারা রাত্রি চেপে শুয়ে থেকে শীতে কেঁপেছি। ইংলণ্ডে বিছানা করার ঢংটা অন্যরকম

BanglaBook.org

বলে ব্যাপারটা মোটে ধরতেই পারিনি অন্ধকারের মধ্যে! লেপকে লেপ বলে চিনিনি...তোশক ভেবেছি। মহিলা জীবনে এমনধারা উজবুক গাঁইয়া দেখেননি আমাদের মতো।...তিনি হেসে আর বাঁচেন না!

এবার রওনা, ম্যাটারহর্নের উদ্দেশ্যে। ম্যাটারহর্নে চড়ব বলে আমরা দুজনে প্রথমে গেলাম মুদির দোকানে। তাজা নরম রুটি কিনব, কলা কিনব...কিছু কার্বোহাইড্রেট ও ভিটামিনযুক্ত খাদ্য চাই। গায়ে বল না সংগ্রহ করে উঠব কী করে ম্যাটারহর্নের দক্ষিণাপথ বেয়ে? দু'খানা চকলেটও নিতে হবে। পর্বতারোহণে সব সময় চকলেট খেতে হয়, বইয়ে পড়েছি। চকলেট এনার্জি দেয়। চারিদিকে তুষার-রাজ্য, মাঝে মধ্যে দু' একজন ক্রাচবিহীন মানুষজন দেখলেই আমরা উৎসাহিত হচ্ছি..."দ্যাখ দ্যাখ, এর কিন্তু ক্রাচ নেই। আমাদের মতোই!" শীত প্রচণ্ড কিন্তু আমাদের কষ্ট হচ্ছে না। আপাদমস্তক পশমে ঢাকা...পায়ে পেল্লায় স্নো-বুট, হাতে ইয়া ইয়া চামড়ার দস্তানা, গায়ে স্কী-জ্যাকেট, পরনে স্কী-প্যান্টস, মাথায় গরম ফেট্টি বাঁধা, গলায় কাশ্মীরী স্কার্ফ। ধড়াচুড়োর কোনো অভাব নেই। আমি কেবলই খুব মনোযোগ দিয়ে রেণুকাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছি...আর ভাবছি, আমাকেও অমন স্কী-বিবিটি দেখাচ্ছে নিশ্চয়। একই তো পোশাক দুজনের। আদা তুষারে রোদ পড়লে চোখ ঝলসে যায়, তাই সানগ্লাস পরা নিয়ম। রেণুকার চোখে বিলিতি কালো চশমা...আমার যেহেতু একটা চশমা আছে, তার উপরে দু গুণ এঁটেছি ধর্মতলার সানগ্লাস। তাতে স্মার্টনেসও দু গুণ হয়। অক্সিজেনের টে-টুম্বুর আমরা আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে ম্যাটারহর্নের দিকে এগোচ্ছি। পা টিপে, কারণ বরফ খুবলে পথ যদিও কেটেছে, সে-পথ খুবই পিছল। দুজনকেই দিব্যি খোকা-মেম খোকা-মেম লাগছে, একমাত্র রসভঙ্গ করছে মাথার ফেট্টির নীচে থেকে ঝুলন্ত দুটো কালো বিনুনি। লেজের মতো দোদুল্যমান সেই বেণীর ডগায় দুলছে আমাদের এতোল-বেতোল দু'টি পাতি-খুকুর প্রাণ! সোঁদা গন্ধওলা দিশি-দেহাতী মন! আঃ, বেণীদুটো যদি না থাকত, কিংবা বগলে যদি ক্রাচ থাকত তাহলেই কেউ বলতে পারত না আমরা বিদেশী। বরফ ভেঙে হাঁটা বড়োই কষ্টকর কর্ম। ফুটপাথের দু পাশে কোমর অবধি উঁচু বরফের পাঁচিল, মাঝখানটা কুপিয়ে পরিষ্কার করা। কিন্তু অত্যন্ত পিচ্ছিল। রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া নেই, ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে, রোদ নেই। মন-খারাপ-করা মন-খারাপ-করা একটা আলো। তা হোকগে। আমরা বেরিয়েছি যে উদ্দেশ্যে তা থেকে বিচ্যুত হলে চলবে না। ম্যাটারহর্ন আমাদের ডাকছে। আসার আগে কেম্ব্রিজে যা কিছু ছবির বই, ট্যুরিস্ট অফিসে প্রাপ্তব্য সবকিছু কাগজপত্তর ভালো করে পড়ে ফেলেছি। ম্যাটারহর্ন অভিযানের প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। এবার ভালো সঙ্গী জুটলেই হলো। ঠিক উঠে পড়ব।

...কিন্তু ভাই রেণুকা, এই রাস্তাই যদি এত কঠিন, এত পিছল হয়, তাহলে ম্যাটারহর্নের গা বেয়ে কি আমরা উঠতে পারব? আমরা তো কিং-কং নই। টারজানও

BanglaBook.org

নই। পর্বতারোহণের বুটজুতোই আলাদা, তার নীচে কাঁটা মারা থাকে। আমাদের সে-সব নেই। পড়ে যাব যে ভাই। হ্যাঁ ভাই রেণুকা, এবারে ম্যাটারহর্নটা বাদ দিলে কেমন হয়? ডান-বাঁ দু দিকটাই তো বরফ দিয়ে ঢাকা। এ-জুতোয় কি হবে? ধুৎ তেরি! ভীরু বাঙালি কোথাকার। শুরুতেই কু গাওয়া?...রেণুকা ধমক দিতেই রাগ হয়ে গেল। ভীতু বলা? বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি! মন্বন্তরে মরিনি আমরা মাঝী নিয়ে ঘর করি! সেই আমাদের ভীতু বলা?...ঠিক হ্যায়। চালাও পানসি...ম্যাটারহর্ন! মনে মনে রাগলেও মুখে কিছু বলতে পারলুম না, কারণ আগেই চোখে জল এসে গেছে। রাগলে এই দুর্দশা হয় আমার। সুবিধা এই যে, রেণুকারও তাই হয়। মনে মনে আবৃত্তি করে নিলুম...দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে...লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার। পা যেন কিছুতেই পিছলে না যায়।...অবশেষে পৌঁছে গেলুম সেই জায়গায়,...যেখানে সকলেই বেড়াচ্ছে। অর্থাৎ কিনা ম্যাটারহর্নের পাদদেশে। অহো, কী দুঃসহ স্পর্ধা! ঠিক যেমনটি দেখেছি ছবিতে...তেমনি সিধে, খাড়া উদ্ধত, স্পর্ধিত গিরি-শৃঙ্গ ম্যাটারহর্ন। একটু ত্যাড়াব্যাঁকা এক বিপুল শিবলিঙ্গের মতন সাদা বরফে প্রোথিত হয়ে আছে...ধূসর আকাশ ফুঁড়ে। মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইলুম। তারপর খোঁজ নিয়ে জানলুম, আজ অভিযাত্রী দল যাবে না। আজ নাকি ব্যাড ওয়েদার, তাই শখের অভিযাত্রীদের আজ যাত্রা নাস্তি।

আহ! শুনে যেন বুক থেকে একটা ম্যাটারহর্ন পাহাড় নেমে গেল। ভাই রেণুকা, আজ তাহলে একটু দেখি-টেখি, বেড়াই-টেড়াই। কাল চড়ব, কেমন? কাল যখন রোদ্দুর উঠবে, হয়ত একটু বরফও গলবে, তখন উঠব, সেই বেশ হবে।...এত দূর পথশ্রমের ক্লান্তি আজও কাটেনি। এই ভালো হলো। আমরা কখন যে পথ ছেড়ে প্রশস্ত বরফের মাঠে নেমে পড়েছি তা টেরও পাইনি। এই মাঠে শিক্ষানবিশি চলছে —স্কী-ইং এবং স্কেটিং ছাত্রদের। বরফের মধ্যে কয়েকটি তাঁবুও খাটানো রয়েছে। এদের কী সহ্যশক্তি রে বাবা।

রং-বেরঙের পোশাকে স্কার্ফ উড়িয়ে চঞ্চল চপল গতিতে নেচে বেড়াচ্ছে অজস্র মানুষ—নারী, পুরুষ, শিশু। কেউ স্কীতে, কেউ স্কেটে। স্কেটিং-এর জন্য একটু শক্ত বরফ চাই, স্কীর জন্য চাই অনেকটা জায়গা, গ্লেশিয়ারই ভালো। মোহিত হয়ে আমরা এগোচ্ছি, এখানে ক্রাচ-ওলা কেউ নেই—আমাদের পা হাঁটু অবধি তুষারে ডুবে যাচ্ছে, একটা একটা করে টেনে বের করছি, ফের পদপাত করছি, ফের পদোদ্ধার করছি —বেশ অভ্যাস হয়ে এসেছে—যেন আজন্ম এভাবেই চলা-ফেরা করেছি গড়িয়াহাটে, কলেজ স্ট্রীটে। রেণুকার মোহিত দৃষ্টি কালো চশমা ভেদ করেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দুজনেরই নাক বেয়ে, চশমা বেয়ে, চিবুক বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টির জল গড়াচ্ছে। হঠাৎ দেখলাম রেণুকাটা সত্যি বড্ড কালো। এই সাদা তুষারের রাজ্যে সাদা চামড়ার লোকগুলির মধ্যে রেণুকাকে যেন তাল-ভঙ্গকারী লাগছে। এক সেকেণ্ড মাত্র। তার পরেই মনে পড়ল রেণুকাও নিশ্চয় আমাকে দেখে ঠিক ভাবছে, এঃ, নবনীতাটা

BanglaBook.org

বড্ডই কালো দেখছি!—তার মানে যতই স্কী-বিবিটি সাজি না কেন আমরা, রেণুকার মধ্যে ঢেউ তুলছে যে অগাধ রসম-সম্বর, আর আমার ভেতরে যে গজগজ করছে ঠনঠনের ঝোল-ভাত, সেটা বাইরে থেকেও বেশ দেখা যাচ্ছে। আমরা যে আলাদা, আমরা যে ভিন-দেশী সেটা কাউকে বলে দিতে হবে না, সেটা আমাদের গায়েই লেখা আছে। ভেবে একটু মুখ গোমড়া হলো—ভাবলুম: কালো জগৎ আলো। কেষ্ট কালো, কালী কালো, আমি-রেণুকাই বা কালো হব না কেন? শক-হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হলো লীন—সে দেহে একটু ঘনত্ব থাকবে না? এই তো ভালো—এমনি ট্যান চামড়া পাবার জন্যেই তো এই সাদা চামড়ারা মরে যাচ্ছে—আর এছাড়া রেণুকার মুখখানি খুবই মিষ্টি। বলা অবশ্য উচিত নয়, আমি ভাবলুম, কিন্তু আমার মুখটাও তো খুব একটা তেমন কিছু বিচ্ছিরি নয়—এইসব ভাবতে ভাবতে মনটা যেই প্রফুল্ল হয়ে উঠছে...অমনি কানে এল মার্কিন আওয়াজ—"হাই। তোমরা বুঝি পাকিস্তানী?"

"পাকিস্তানী হতে যাব কেন?" রেণুকা এক ধমক দেয়।

"সরি।" সড়াৎ করে স্কী চালিয়ে আধ মাইলটাক নিরাপদ দূরত্বে সরে গেল ছেলেটি। আমি বললুম,

"অমন করে না বললেই হতো। ওরা কিছু জানে না।"

"পাকিস্তান কি আগে হয়েছিল, না ভারতবর্ষটা আগে?—আগেই বলবে, পাকিস্তানী? কেন, আগে ভারতীয়টা মনে আসে না?"

"তবে কি তোমরা ভারতীয়?" চমকে উঠে দেখি স্কী চালিয়ে সে আবার ফিরে এসেছে।

"হ্যাঁ। তুমি বুঝি মার্কিনি?"

"হ্যাঁ। পশ্চিম জার্মানি থেকে বেড়াতে এসেছি। ছুটিতে।"

"তুমি কি হটস্প্রিং-এর জন্য এসেছ?" রেণুকা প্রশ্ন করে।

"হটস্প্রিং? এখানে হটস্প্রিং আছে নাকি, এই বরফের মধ্যে?"

"কী জানি? সেইরকমই তো মনে হচ্ছে।"

"আমি তো কখনো শুনিনি?" মার্কিন ছেলেটি বলে।

আমি তাড়াতাড়ি অন্য কথাটাও জিজ্ঞেস করি।

"তবে কি কোনো আশ্রম-টাশ্রম আছে? সাধু-সন্তের মন্দির? ভেল্কি-মিরাকল জাতীয় কিছু? আছে নাকি?"

আরো আশ্চর্য হয়ে গেল মার্কিন ছেলেটি।

"ভেলকি? সাধু-সন্তের মন্দির? তোমরা কি তীর্থযাত্রী?"

"আমরা বলে তীর্থের দেশ ভারতবর্ষ থেকে এসেছি, আমাদের খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, বিলেতে আসব তীর্থ করতে।" গঞ্জনা দিয়ে ওঠে রেণুকা।

"সরি, আমরা জানি, সব ভারতীয়ই হিন্দু কিন্তু—"

BanglaBook.org

মার্কিন ছেলেকে এক থাবায় থামিয়ে দিয়ে আমি বলি— "কে বলেছে সব ভারতীয়ই হিন্দু? জানো সেটা সেকুলার স্টেট? সেখানে সর্বধর্ম সমন্বয় ঘটেছে —হিন্দু-মুসলিম বৌদ্ধ-ক্রীশ্চান-পার্সি-জুইশ সব আছে।"

"জুইশও?" অবাক হয়ে বলে ছেলেটি, "আমিও জুইশ।"

"কিন্তু এখানে তীর্থস্থান আছে কিনা বললে না তো?" রেণুকা ভবী ভোলেনি, "কিংবা হট স্প্রিং?"

"আমি তো কই কখনো শুনিনি তীর্থ আছে বলে। কিন্তু কেন? তোমরা কি ভূতত্ত্বের ছাত্র—নাকি সমাজতত্ত্বের? একবার বলছ হট স্প্রিং চাই, একবার বলছ তীর্থস্থান চাই। লোকে তো এখানে ধর্মকর্ম করতে আসে না, আসে খেলাধুলো করতে। স্কী করতেই আসে। তোমরা কেন এসেছ?"

"আমরা এসেছি ম্যাটারহর্নে চড়ব বলে। কিন্তু এখানে এত বাতের রুগী কেন? এত পঙ্গু, বেতো রুগীর ভিড় দেখেই ভাবলুম হট স্প্রিং আছে, নয়তো কোনো মিরাকল।"

"বেতো রুগী কোথায় পেলে এতো?"

"কেন, পথে-ঘাটে, সর্বত্রই তো। সবার বগলেই তো দেখি ক্রাচ!" এবারে হাসির তোড়ে বরফ ফাটিয়ে দিলে মার্কিন ছেলেটি! "বাত— বেতো? পঙ্গু?" তার হাসি থামে না, এরা তো সবাই স্পোর্টসম্যান—কেউ স্কী করতে গিয়ে পা ভেঙেছে, কেউবা পিছলে পড়ে। আছাড় না-খেয়ে কেউ স্কী করতে শেখে কখনো? বেতো হবে কেন, এরা খেলোয়াড়! এরা মাউন্টেনিয়ার! বেতো! হা হা হা! ওঃ —তাই বলছো হট-স্প্রিং? হাউ অ্যাবসার্ড! মিরাকল! হাউ ক্রেজী!" হোহো হাসিতে আমাদের কলিজা ফাটিয়ে দিয়ে তিনি সড়াৎ করে স্কী চালিয়ে অন্তর্হিত হলেন। দূরে বিন্দু হয়ে মিলিয়ে গেল তাঁর নীল জ্যাকেট। হাসিটা প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো আমাদের কানে—এবং প্রাণে। এই বরফেও বুঝতে পারছিলুম আমাদের কান-ফান গরম হয়ে উঠেছে—রাগ, লজ্জা দুয়ে মিলে একটা বিশ্রী অনুভূতি। তায় পাগুলো সব দেবে দেবে যাচ্ছে নরম বরফে, টেনে হিঁচড়ে তুলে তুলে আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে সদর রাস্তার দিকে ফিরতে লাগলুম। কেউ কারুর দিকে তাকাচ্ছি না।

রাস্তার ওপর পৌঁছে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। আরামসে স্বাভাবিক নিয়মে যেই দুপা হেঁটেছি, "যাক বাবা বাঁচা গেল" ভেবেছি, অমনি ঘটল সেই অবিশ্বাস্য ঘটনা। সড়সড় সড়াৎ। বিনা-স্কীতে, বিনা-স্কেটে, আমি দিব্যি স্পীডের মাথায় আচমকা পাহাড়ী পথের ঢালু রাস্তায় অপসৃত হলুম। যেন স্পেস ক্যাপসুলের মধ্যে ঈজি-চেয়ারে বসে আছি—এমনি গা-এলানো ভঙ্গিতে, উপবিষ্ট শরীরে অনায়াসে পা দিয়ে শুকনো ডালপালার বেড়া ভেঙে একজনদের বাড়ির পিছনের উঠোনে ঢুকে যাচ্ছি দুর্নিবার গতিতে। দ্যাখ-না-দ্যাখ তাদের মুরগীর খাঁচার অভ্যন্তরে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে আছি। বিদ্যুৎ-চমকের মতো প্রথমেই মনে হলো—রেণুকাকে সাবধান করা দরকার।

—হুইসিল? ভাবামাত্র পিঠের ওপর আচম্বিতে জোড়া বুটের জোর ধাক্কা!—"বাবা গো! গেলাম!" সমস্বরে বললুম রেণুকা এবং আমি। "সো সরি!" আবার ডুয়েটে বলা। ইতিমধ্যে অভিমন্যুর মতো অবস্থা হয়েছে আমাদের। স্বাস্থ্য-উজ্জ্বল, পরাক্রান্ত এবং যুদ্ধবাজ মোরগকুল তথা রণচণ্ডী মুরগীসকল আমাদের সসৈন্যে আক্রমণ করেছে। তারা তেড়ে এসে 'ট্রেসপাসারদিগকে' যত্রতত্র প্রবল শক্তি সহকারে ঠুকরে দিচ্ছে—এবং ভীম বিক্রমে কক-কক-কক-কক আওয়াজে ভয়াল রণহুঙ্কার দিচ্ছে। মুরগীকে রাম-পাখি কেন বলা হয় সেদিন বুঝেছিলুম। যে-কোনো রাক্ষসসেনাকে তারা অবলীলায় হারিয়ে দিতে পারবে। দূর থেকে দেবতারা যেমন রামকে উৎসাহ দিতেন—এখানেও তেমনি খাঁচার বাইরে থেকে মুরগীদের শৌর্য, বীর্য, একাগ্রতা এবং ঐক্যবদ্ধতাকে উৎসাহিত করছিল একটি উতলা ব্যাঘ্রের মতো কুকুর। এই সমবেত তাণ্ডবের মধ্যে সতত ঠোক্করমান মুরগী ও মোরগ-সংযোগে আমরা দুজন দুঃসাহসিক পর্বত অভিযাত্রী—খাঁচার মধ্যে পা ছড়িয়ে হতভম্ব বসে আছি। চশমা ছিটকে পড়েছে বটে, কিন্তু ধর্মতলার সানগ্লাস ভাঙেনি। স্তম্ভিত রেণুকার মাথায় কিছু তুষার, কিছু উড়ো পালক। দেখে বুঝলুম আমারও দৃশ্য নিশ্চয়ই তথৈবচ! চারপাশের দিকে চেয়ে ব্যথা বিস্ময় ভুলে আমরা হড়বড়িয়ে হেসে ফেললুম।

হাসব না? এরকম দৃশ্য তো খুব চেনা আমাদের। ঠিক এইটে না হোক, এমন ধরনের কাণ্ডকারখানা তো লরেল-হার্ডিতে কতই দেখেছি! তফাত এই যে, ঘটনাটা সত্যি আর পাত্রপাত্রী আমরা নিজেরা! ব্যাকগ্রাউণ্ডে অচঞ্চল মহিমায় ম্যাটারহর্ন—আর ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকে গৃহপালিত পশুপক্ষীর মিলিত কূজন-গর্জন। কোনোরকমে সেই প্রবল পরাক্রম পক্ষীসেনার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করেছিলুম সেদিন। ভেঙে-যাওয়া বেড়াটি গলেই পালিয়ে এলুম গৃহস্থের আঙিনা থেকে, রণমূর্তি মুরগীদের দিকে বিষদৃষ্টি হানতে হানতে। কেবলই চোরাচাউনিতে দেখছিলুম এদের চিল্লা-চিল্লিতে গৃহকর্তা আবির্ভূত হলেন কিনা—নাঃ, কেউ দেখেনি। সরু পিচ্ছিল পাহাড়ী পথের ঢালু বেয়ে দেখা গেল অনেকটা যেন স্কী-চিহ্নের মতোই আমার ও রেণুকার সুদীর্ঘ পতন-চিহ্ন সদ্যটানা গতিময় রেখা হয়ে ফুটে আছে। দাগখানা দেখেই যেন কোমরটা ফের কনকন করতে লাগলো।

আমরা দুই বন্ধু এবার পরস্পরকে ক্রাচ করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পিছল বরফে পা গেঁথে পা গেঁথে অগ্রসর হলুম।

"কালই আমরা জেনিভায় ফিরে যাব, কী বলিস? এ জায়গাটা তো দেখা হলো।"

রেণুকা চুপ। "লেগেছে বেশি? মা থাকলে দু'ফোঁটা আর্নিকা খাইয়ে দিতেন। চল, দুকাপ হট চকলেট খেয়ে নিই।"

রেণুকা চুপ। চোখে জল।

"তখনি বলেছিলুম, প্রকৃতির বিরুদ্ধতা করা উচিত নয়। করার ইচ্ছেটাও করা

উচিত নয়। দেখলি তো?"

"আমাদের ম্যাটারহর্ন চড়া হলো না।"

খোঁড়াতে-খোঁড়াতেই ফুঁপিয়ে উঠল রেণুকা—"এত কষ্ট করে এসে, কেবল মুরগীর খাঁচাতে ঢোকা হলো!"

"দুঃখ করিস না রেণুকা—ম্যাটারহর্ন কি যার-তার কপালে থাকে?"

একটা কাফে-তে ঢুকে হট চকলেট খেতে খেতে আমরা ভাবলুম, আজ রাত্রেই জেনিভায় রওনা হব। বিদায় ম্যাটারহর্ন, বিদায় মুরগী-সকল!

হট চকলেট খেয়ে উঠে রাস্তায় বেরিয়েই মনে হলো, আকাশে বাতাসে যেন একটা আশ্চর্য তফাত। রোদ কি উঠেছে? না তো? বৃষ্টিটা কি ধরলো? তাও না। তবে? বেশ ব্যথা করছে কোমরটা—দুজনেই ক্রাচ ধরে আস্তে খুঁড়িয়ে হাঁটছি আর ভাবছি ব্যাপার কী? একটা নতুন আভা যেন ফুটে উঠেছে পথে-ঘাটে লোকজনের চোখে-মুখে। এই আভাটা আগে তো ছিল না? কী হয়েছে বল তো? রেণুকা, দেখেছিস, লোকেরা আমাদের দিকে একটা কেমন-চোখে তাকাচ্ছে?

রেণুকা এতক্ষণে পুরোনো আলো-আলো-গলায় কথা বলল। রেণুকা বলল, "ওরা কিনা বুঝেছে আমরাও ওদের মতোই স্পোর্টসম্যান— ম্যাটারহর্নে চড়তে গিয়ে আহত হয়েছি! তাই সম্ভ্রম করছে। এতক্ষণ বোধহয় ভেবেছিল কোনো উজবুক ট্যুরিস্ট-ফুরিস্ট হবে!"*

[*সর্বৈব সত্য ঘটনা। স্থান, কাল, পাত্র কোনোটিই কাল্পনিক নয়]।

গল্পগুজব

গদাধরপুর উইমেন্স কলেজ

'সন্ধেবেলায় কে ডেকে নেয় তারে!'

আচ্ছা, তোর মনে আছে গীতু, সেই পাঠচক্রের সেশনটা? অশোকতরুর সেই মুখ নামিয়ে গান: "ও আমার গোলাপবালা।" এখন তো অশোকতরু অন্য ঢঙে গান করেন। আর তোর মামাবাবুর বক্তৃতা হলো সে-সেশনে, স্বপ্ন বিষয়ে সেই যেরে, যেখানে আমি আমার জলের স্বপ্নটার মানে জিগেশ করেছিলুম? উনিও খুলে বলবেন না, আমিও না জেনে ছাড়ব না। এখন তো মানেটা জানি, উঃ এত হাসি পায় সেদিনকার কথা ভাবলে! মামাবাবুকে কী মুশকিলেই ফেলেছিলাম! সত্যি, গীতু তোরা যে কী করে থাকিস গদাধরপুরে! ওখানে তো আর এরকম পাঠচক্র-টক্র হয় না। বক্তা পাবি কোথা, গাইয়েই বা কই? সভ্য-সমাজের বাইরে একটা কলেজ বসিয়েছে কী করতে কে জানে। ওখানে লাইফ বলতে তো কিছুই নেই। থিয়েটার তো নেইই, ভালো সিনেমাও নিশ্চয় যায় না, একজিবিশন কি কনসার্টের তো প্রশ্নই ওঠে না, তেমন একটা রেস্তরাঁ কিংবা দোকানপাট পর্যন্ত নেই। কী করে আছিস বলতো? কী নিয়ে থাকিস? প্রেম-ট্রেমও তো হয় না অমন মফঃস্বলের মধ্যে। সবাই নিশ্চয় চোখ পাকিয়ে আছে। একগাদা মেয়ে-মাস্টার মিলে হস্টেলে থাকা, দেখিস বাবু, সাবধান, শেষটা লেসবস বানিয়ে ফেলিস না গদাধরপুরটাকে। এতো প্রায় জেলে থাকার মতনই কিনা। ফ্রীডম নেই কিছু। আচ্ছা, কী করিস রে তোরা ছুটির দিনে? কিংবা সন্ধেবেলায়? নদীর ধারটা পুরোনো হয় না? কাছাকাছি কোনো প্রপার শহর আছে? গাড়ি করে ঘুরে আসা যায়? গাড়িও নেই? কেন, কলেজের স্টাফ-কারে যাবি। তাও নেই? আশ্চর্য! যেমন জায়গা, তেমনি কলেজ! কী করতে যে আছিস ওই অজ পাড়াগাঁয়। কী করেই বা আছিস ওই অজ গাঁয়ে, চিরকাল শ্যামবাজারের পাঁচমাথায় বাস করে? খোঁচা লাগে না? বিয়েটিয়ের তো নামও করিস না। লাগিয়ে দিই একটা সম্বন্ধ? আমার এক ভাশুর ফিরেছেন বিদেশ থেকে, একটু বয়স্থা এডুকেটেড মেয়ে চান, নিজেও বহুকাল অ্যাকাডেমিক লাইনেই ছিলেন। তোর সঙ্গে বেশ মানাবে। না মশাই, অত মুচকি হাসির কিছুই নেই। বত্রিশ তো পার হলে, এরপর আর কবে বিয়েটা করবে শুনি? চিরটাকাল কেবল গেঁয়ো গাধাগুলোকে পিটিয়ে গোরু বানালেই চলবে? গদাধরপুরে মানুষ থাকে! ওটা কি একটা লাইফ হলো গীতু?

লাইফটা কী রকম বদলে গেল দ্যাখ! একসঙ্গে পড়তে পড়তে কত স্বপ্ন, কত প্ল্যান—তারপরে আমি শ্বশুরবাড়ি, আর তুই গদাধরপুর উইমেন্স কলেজ। কোথায় গেল লেখক হওয়া, কোথায় গেল নাটক করার স্বপ্ন। একদিক থেকে দেখলে অবশ্য তুই মন্দ নেই। বেশ ঝাড়া হাত পা। আমি? এটা ভালো থাকা হলো? ঘরসংসার ছেলেপুলে নিয়ে ন্যাতা-জোবড়া হয়েই কাটল দশটা বছর। একদম গবেট হয়ে গেছি। কে বলবে একদিন ডিবেটিং চ্যাম্পিয়ান ছিলুম। এখন যা কিছু ডিবেট সব আয়া বাবুর্চির সঙ্গে। কর্তা? হুঁ, তা হ'লেই হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আমার দেখাটা হচ্ছে কোথায়, যে ডিবেট করব? তিনি তো এই অফিস, এই ফ্যাক্টরি, এই ট্যুরে যাওয়া, অমুক পার্টিকে মীট করতে গ্র্যাণ্ড হোটেলে লাঞ্চ, তমুক পার্টিকে মীট করতে স্যাটারডে ক্লাবে ডিনার—এই কম্মই করে বেড়াচ্ছেন দশ বছর ননস্টপ। বউয়ের সঙ্গে বসে বসে ডিবেট করবার মতন তাঁর অত সময় নেই ভাই। দিনরাত ছুটোছুটি। একটু যদি বিশ্রাম পান,—তো সে ক্লাবে। বউয়ের আঁচল ধরা হলে কেউ জীবনে উন্নতি করে না, বুঝলে? কেন আমার জন্যে তো আয়া আছে ড্রাইভার আছে খানসামা আছে মালী বাবুর্চি ঠাকুরচাকরের ঘোর বৃন্দাবন একেবারে! অবার একটি কর্তাও চাই? সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না? একেই তো আমার বলে কত ফ্রীডম! যখন খুশি বেরোও, যেখানে খুশি যাও, যা খুশি কেনাকাটা করো, শ্বশুর শাশুড়ি-দেওর-ননদ কেউ ঘাড়ে নেই, যে-যার সে-তার। সবরকম সুযোগ সুবিধা রয়েছে, হাই সোসাইটির কনেকশনস রয়েছে, কত নেমন্তন্ন, কত পার্টি। আমার মুখে নালিশ শোভা পায় না ভাই। পায়? তুইই বল! ব্যাপারটা কি জানিস, ছোটবেলায় পড়েছিলি না, দোয়াত আছে, কালি নেই? আমার সংসারটা হচ্ছে ঠিক তাই। হাসছিস? ছাই বর্তে যেতে, তুমি আমার জীবন পেলে। জানিস না তাই বলচিস। সেই চিরাচরিত গল্প আর কি—এ সকল ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে বউদের হয় কোনো প্রেমিক যোগাড় করে পালিয়ে যাওয়া, নয়তো ভাগ্নে-টাগ্নে কিংবা ড্রাইভার-টাইভারের সঙ্গে লুকিয়ে-চুরিয়ে প্রেম করা। গল্পের বইতে তাই করে। যারা এসব কম্ম পারে না, তারা চার ইঞ্চি ঝুলের জামা পরে ফ্রেঞ্চ শিফন শাড়ি হাঁটু পর্যন্ত তুলে লেসের রুমালে নাক চেপে হপ্তায় একদিন বন্যাত্রাণে কিংবা কুষ্ঠাশ্রমে বেড়াতে যায়, আর বাকী ছ'দিন ধরে তারই জন্যে দু'বেলা মিটিংবাজী করে পার্ক হোটেলে। আর বাকীরা হয় দুপুরবেলা ক্লাবে গিয়ে অন্য গিন্নিদের সঙ্গে তাস খেলে আর জিন খায়, নয়ত আমার মতন খুঁজে খুঁজে পুরোনো বন্ধুদের বের করে, তুতিয়ে পাতিয়ে আড্ডা দিয়ে সময় ভরাতে চায়। আজকাল অবশ্য 'বুটীক' খোলার একটা রেওয়াজ হয়েছে, উপরি রোজগারও, সময়টাও কাটে।

—সময় যে আর ফুরোতে চায় না। বাচ্চারা তিনজনেই দার্জিলিঙের ইশকুলে আছে। এখানে কি রেগুলার পড়াশুনো হয়? আজ বনধ, কাল স্ট্রাইক। ওইখানে থাকলে ডিস্টার্বেন্স হবে না। তাছাড়া উনি বলেন হস্টেলে থাকলে নিজেরটা নিজে

করতে শিখবে! আমি যে এদিকে কী করি, গান? হ্যাঁ, আবার একটু আধটু ধরেছি ওটা — একটা স্পেশাল ক্লাসে জয়েন করেছি। নারে, পিয়ানোটা ছেড়েই দিয়েছি। ওটা তো কোনোদিনই তেমন ভালো লাগতো না। কেবল চালিয়াতির জন্যে শেখা ভালোবেসে আর স্কুলে পিয়ানো নেয় ক'জন? তোর সেতারের কথাটা একদম আলাদা। সেতার হলো তোর প্রাণ। তাও কি আর এতদিন থাকতো, যদি বিয়ে-থা করে সংসার পেতে বসতিস? নেহাত বনে-বাদাড়ে পড়ে আছিস, আর একা-একাটি আছিস, তাই এখনও সেতারটা বজায় রাখতে পেরেছিস। ভাগ্যিস তোর রেডিও প্রোগ্রামগুলো থাকে, তাই তো তবু কলকাতায় আসিস। নইলে কে আর পারতো বলো গদাধরপুরে গিয়ে গিয়ে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ টিকিয়ে রাখতে? অমন একটা গড়ফরসেকন প্লেস! রেডিও? অ্যাবসার্ড কথা বলিস না। আমি গাইব কি? আমার গান কি লোকসমাজে বের করবার মতন? ওই সময় কাটাতে নিজের মনের যা একটু গুনগুন করা। তোমার সেতারের সঙ্গে তার তুলনা হয়? আমি তো ভাই কোনোদিনই অরিন্দমদের মতন গাইতে পারতুম না!

আচ্ছা, তোর অরিন্দমের কথা মনে পড়ে, গীতু? সত্যি কী গলাটা ছিল ছেলেটার, না রে? এখন তো আর রেডিওতে প্রোগ্রাম করে না। অত বড় পোস্টে কাজ করছে, আই, টি, সি,তে ব্যুরোক্র্যাট হয়ে গেছে। পুরোপুরি বক্সওয়ালা বড়সায়েব। আমার কর্তা যেমন। অথচ দ্যাখ অরিন্দমের চেয়ে কত নিরেস গাইতেন উমাদি, অরিন্দম যখন এ-ক্লাস আর্টিস্ট, উমাদি তখন বি-স্টে। চর্চার গুণে সেই উমাদিরও এল. পি. বেরিয়ে গেল।

গানের লাইনটাই যে ছেড়ে দিল অরিন্দম। জুনিয়র এক্সিকিউটিভ পরীক্ষায় অত ভালো রেজাল্ট করল কিনা। এখন তো তিনি সিনিয়র এক্সিকিউটিভ। ভালো চাকরিটা পেয়েই মস্ত ক্ষতি হয়ে গেল ওর। হাসচিস তুই? ভালো চাকরি পেলে বুঝি লোকেদের ক্ষতি হয় না? খুব হয়। কত যে ক্ষতি হয়, তা যার ভালো চাকরি নেই, সে কখনো বুঝবে না। বেকারী যেমন, বড়ো চাকরিও তেমনি। কী করে যে মানুষকে নষ্ট করে ফ্যালে তা তো দেখতে পাও না। সে অন্যরকম সর্বনাশ। অরিন্দম যদি ওই চাকরিটা না পেতো, আমি ঠিক জানি এখন মস্তো বড়ো গাইয়ে হতো। কোনটা বেশী ভালো হতো ভাব?

—গীতু, তোর মনে আছে, সেবার রবীন্দ্রজয়ন্তীতে উমাদি আর অরিন্দমের গান—"সোনার হরিণ চাই?" অপূর্ব হয়েছিল। না?

অরিন্দমের "চিরসখা" তোর মনে পড়ে না, গীতু? উমাদির বোধহয় অরিন্দমের প্রতি একটা উইকনেস ছিলো—উমাদির সেই "বন্ধু রহো রহো সাথে" আমি কোনো-দিনই ভুলবো না। আমাদের সেই হেঁটে হেঁটে ফেরা, সায়েন্স কলেজ থেকে অরিন্দমকে তুলে নিয়ে সন্ধ্যাবেলায়, বালিগঞ্জের ফাঁকা ফাঁকা রাস্তা দিয়ে, পাঠচক্রের রিহার্সালের পরে? মনে পড়ে গীতু? কী করে হাঁটতুম রে অত? চৌরঙ্গীতে এসে, ট্রাম ধরে

BanglaBook.org

শ্যামবাজার। এখন তো একদম হাঁটতেই পারি না। তুই এখনও পারিস? তুই যে রোগা আছিস। তাই। আচ্ছা, আমরা দুজনেই অরিন্দমের গান অতো ভালোবাসতুম অথচ কোনো হিংসেহিংসি তো ছিল না? রেজাল্ট বেরুনোর পরে গঙ্গার ধারে সেই সন্ধেটা মনে পড়ে? অরিন্দমের "আমার এ-পথ" গাওয়া, আর তোর-আমার কান্না? মনে পড়ে, তোর কী রাগ আমার ওপরে, অরিন্দমকে যখন আমি 'না' বললুম? আচ্ছা, তুই অতো ক্ষেপে গেলি কেন বলতো? কী আশ্চর্য একটা বন্ধুতা হয়েছিল আমাদের তিনজনের। বেচারা উমাদি আমাদের তিনজনকেই হিংসে করতেন! উঃ! আবার সেই পুরোনো প্রশ্ন? অন্তত দুশোবার তো তোকে বলেছি কেন অরিন্দমকে 'না' বললুম। তোমার অত ইচ্ছে ছিল তো তুমি নিজেই কেন বিয়ে করলে না বাপু তাকে? বাঃ। আমাদের 'জুড়ি মিলেছিল' না ছাই। তোর ওটা একটা ফিক্সেশন। এই দশ বছর বাদেও একই কথা বলবি? কেন ওকে বিয়ে করলুম না?—কেন আবার। আমার ব্যারিস্টার বাবাটি অমন কেরাণী বাপের গাইয়ে-ছেলেকে পাত্র বলেই মানতেন না,—আমাদের সঙ্গে ওদের বাড়ির অবস্থা মিলতো না। আমি একভাবে মানুষ, ওরা অন্যভাবে। তখনও তো আর ঐ পরীক্ষাটা দেয়নি ও। কী করে জানবো বল যে দুটো বছর যেতে-না যেতেই অরিন্দমের এতখানি অবস্থা পালটাবে? যখন ও চাকরিটা পেলো, ততদিনে তো আমার বিয়ে হয়েই গেছে। অরিন্দম কিন্তু মাত্র গেল বছরে বিয়ে করল। দিল্লীতে। পাঞ্জাবি বৌ। শুনেছি নাকি খুব সুন্দরী। তুই দেখেছিস? না, আমিও দেখিনি। অরিন্দমকেই দেখিনি। সেই আমার বিয়ের রাত্তিরেই শেষ সাক্ষাৎ! ও কখনো আমাদের বাড়িতে আসেনি। আমার কর্তাকে তো মীটই করেনি! করলে অবশ্য জমত ভালো। কথাটা কি জানিস? ও যদি গানই ছেড়ে দিল, তাহলে ওকে বিয়ে করলেই বা কী তফাতটা হতো? এই একই হতো। আমার কর্তারও যেমনি, অরিন্দমেরও নির্ঘাত তেমনি—অফিস, ফ্যাক্টরি, লাঞ্চ, ডিনার, ট্যুর প্রোগ্রাম, ক্লাব, ককটেল! দেখতিস ঠিক সেই একই লাইফ হতো আমার। বরং কষ্ট আরেকটু বাড়তো। কেবলই মনে হতো: গান ছিল, গান নেই! একটা ব্যুরোক্রাটের সঙ্গে আরেকটার তফাত একখানা কাস্টম-মেড মার্সিডিজ গাড়ির সঙ্গে আরেকখানার যা—অর্থাৎ শূন্য, নিল।

—ধেৎ, সম্মান করব না কেন? নিজের স্বামী বলে কথা! সম্মান-টম্মান সবই করি, তবে কি জানিস, ওদের ওই জান-প্রাণ দিয়ে কেরিয়ার গড়াটাতে কেমন যেন ঘেন্না ধরে গেছে ভাই। ওদের এয়ারকনডিশনড অফিসের চেয়ার টেবিলগুলো যেমন ফ্যাশনেবল আর কমফরটেবল, ওদের লাইফগুলোও তাই—আর লোকগুলোও সব একজাতের।

একটাকে চিনলেই সবগুলোকে চেনা হয়ে যায়। যাই তো ক্লাবে। সবক'টা এক! সব ছাঁচে-ঢালা মানুষ রে। অরিন্দমের চাকরিটা তো ঐ ছাঁচের, সেও অমনিই হয়ে গেছে নিশ্চয়। এই আমার কর্তার মতোই। গান-টান তো আর কোথাওই গাইতে

শুনি না। ওর বউটার জীবনও আর দশ বছর বাদে ঠিক এই শ্রীমতীর মতোই হবে, তাকেও কলেজ-ফ্রেনডদের খুঁজতে বেরুতে হবে দেখিস। হ্যাঁ, তা যা বলেছিস! যদি দশ বছর টেকে! আজকাল তো এইরকমই হাল হয়েছে। এদের এই সোসাইটিটাই তেমনি! রুনুর লাইফটা কী হয়ে গেল দ্যাখ। সত্যি ভারি স্যাড। জয়ন্তী আবার বিয়ে করে ফেলেছে, এখন মিসেস মেহেরা হয়েছে। রুনুটা ওরকম পারবে বলে মনে হয় না। ও বি.এ. পড়তে ভর্তি হয়েছে শুনলুম!

হ্যাঁরে গীতু, তোদের ওখানে ফিলসফিতে কোনো ভেকেন্সি নেই! আমি কিন্তু ইন্টারেস্টেড। বাচ্চাদের তো দার্জিলিঙে পাঠিয়েছি, এখন আমার কাছে আলিপুরও যা, গদাধরপুরও তাই। এটা কি একটা লাইফ হলো? হয় ভীষণ হেকটিক, আর নয়তো বোরিং! বরং তোদের ওখানটাই বেশি রিফ্রেশিং হবে। আমার বায়োডাটা তো তুই জানিস গীতু। সত্যি একটু খোঁজ নিবি, গিয়েই? 'সিরিয়াসলি বলচি।' কি আশ্চর্য, হাসছিস? ওহ, কর্তার কথা ছাড়। তাঁর বেয়ারা বাবুর্চি সবই আছে। আমি তো একটা ফাউ। কর্তা বোধহয় টেরও পাবেন না মেমসাহেব কলকাতা মে, ইয়া গদাধরপুর মে! একমাত্র পার্টি দেবার সময়ে ছাড়া। বাজে কথা রাখ। আরেকটু কফি নে। এটা নতুন পারকোলেটর—ভালো কফি বানায়, না? ফ্রান্সের এক সাহেব দিয়েছেন কর্তাকে। শোন, সত্যি রে, ফিলসফিতে একটা চান্স হয় না তোদের গদাধরপুর উইমেন্স কলেজে? কি বললি? ওখানে বড় মশা? টিকতে পারব না? —তুইও আমাকে ঠাট্টা করচিস, গীতু?

BanglaBook.org

মিরাক্ল

ফিরতে ফিরতে দশটা বেজে গেল। সক্কলের আগে দুটো ফোন করতে হবে। ফেরবামাত্র। একটা খোকনের বাড়িতে, ওর দাদুঠাকুমাকে জানিয়ে দিতে হবে যে খোকন আজ বাড়ি ফিরবে না। বাপি, খোকন দু'জনেই হাসপাতালে রাত কাটাবে; বাচ্চুকে হসপিটালে রিমুভ করতে হয়েছে। বাচ্চুর অবস্থা ভালো নয়, লোক চিনছে না, দারুণ রাইগর হচ্ছে। ডাক্তারবাবু বাড়িতে রাখতে ভরসা পেলেন না। অনেক চেষ্টা চরিত্র করে মেজ জামাইবাবুর খ্র দিয়ে ওকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এলুম এইমাত্র। বাচ্চু বাপিদের সঙ্গে পড়ে, হোস্টেলে থাকে। জ্বর বাড়তে বাপি ওকে এ-বাড়িতে নিয়ে এসেছিল, কিন্তু এখানে রাখলে চলবে না। ডাক্তারবাবু ভয় পাচ্ছেন। জেনারেল ওয়ার্ডে রেখেও শান্তি নেই। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি

করানোর চেষ্টা করছেন। খোকনের দাদুকে ফোনটা করে দিয়েই ভক্তিব্রত মেসোমশাইকে ফোন করতে হবে। অতবড় ডাক্তার ভক্তিব্রত মেসো নিশ্চয়ই কিছু না কিছু করতে পারবেন। হার্টের অবস্থা নাকি অস্বাভাবিক, প্রেশার অবিশ্বাস্য নিচে নেমে গেছে। বাপির বন্ধু, বয়স কত আর? এই উনিশ-কুড়িই হবে। অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাবার সময়ে পালস ছিল না। বাচ্চুর আবার কলকাতায় কেউ নেই। লোকাল গার্জেন এক জামাইবাবু তিনি নামেই লোকাল; থাকেন বিরাটিতে। আর মাসের মধ্যে পঁচিশ দিনই কাটান ট্যুরে দিদিটি গিন্নিবান্নি গাঁইয়া মানুষ। খবর শুনে কেবল কেঁদেই ভাসাচ্ছেন!— জামাইবাবু এখন ট্যুরে। সবটা দায়িত্বই বন্ধুদের ঘাড়ে পড়েছে। তারাও তো ছেলেমানুষ। দেখি, ভক্তি মেসোকেই ধরতে হবে। রাত দশটার পরেই সেটা সুবিধে। আমিও তো খুব একটা এক্সপার্ট কেউকেটা নই, চাকুরে-মেয়ে বলে খানিকটা হালু-চালু, এই পর্যন্ত। ঠিক এই সময়টায় পাঁচদিনের জন্যে দুর্গাপুরে পাঠিয়েছে ওঁকে,—কী যে করি! খোকনের বাবা-মাও আপাতত দিল্লিতে, বাড়িতে কেবল বুড়োবুড়ি—দাদুঠাকুমা। খোকনের বাড়িতে ফোন করতে চেষ্টা শুরু করি—ওঁরা নিশ্চয়ই খুব উদ্বিগ্ন। খবরটা না দিলেই নয় যে নাতি আজ রাত্রে ফিরবে না।

ডায়ালের চেষ্টা করতেই বুঝলাম লাইনে জট। তোলবামাত্রই এক ভদ্রলোক বললেন,—"ফোরয়েট সিক্সয়েট জিরো টু ত্রি?" আমি বললুম—"না। রং নাম্বার। ছেড়ে দিন।" নামিয়ে রেখে আবার তুলে ডায়াল করি। আবার—"ফোরয়েট সিক্সয়েট সারি, ফোরসিক্সয়েট সিকস জিরো টু ত্রি?"

মনে অসহ্য উদ্বেগ তায় এই ইনডিসাইসিভ অ্যাপ্রোচ টু লাইফ অ্যাণ্ড ফোন নাম্বার্স—ভয়ঙ্কর রাগ হয়ে যায় আমার। বললুম—"আগে মনস্থির করুন তো দেখি? ঠিক নম্বরটা বেছে নিন। আসলে কোন্‌টা চান?" বলেই খেয়াল হলো, ভদ্রলোক সাতটা ফিগার বলছেন। ফোন নম্বরে সাতটা সংখ্যা তো হতেই পারে না। স্বগতোক্তি করে ফেলি,—"সাতটা ফিগার বলছে—পাগল নাকি?" গুরুগম্ভীর আরেকটা তৃতীয় গলা এবার ফোনের মধ্যে গুমগুম করে ওঠে—"ছেড়ে দিন দিদিমণি, পাগল নয়, ও ম্যাড্রাসী মাতালের কাণ্ড।"

—আজ্ঞে কী বললেন?

—বলচি—ওসব ম্যাড্রাসী মাতাল। ওদের কিচু জ্ঞানগম্যি আচে? বিশমিনিট ধরে এই চালাচ্চে। একেকটা নম্বর। আপনি তো এইমাত্তর লাইনে এয়েচেন।

আসামের সাম্প্রতিক কীর্তিকলাপের কল্যাণে আমি এখন দারুণ সর্বভারতীয়। উদার জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ প্রাণী। প্রচণ্ড ভীতি জন্মেছে বুকের মধ্যে টের পেয়েছি প্রাদেশিকতা মহাপাপ। কোমর বেঁধে লেগে পড়ি—এই মদ্রদ্বেষীকে শায়েস্তা করা দরকার।

—"কেন, বাঙালী মাতালদের বুঝি জ্ঞানগম্যি থাকে? তারা মাদ্রাজী মাতালদের চেয়ে উন্নত শ্রেণীর জীব?"

—আঃ হা কী মুশকিল! সব মাতালই যাচ্ছেতাই, সব মাতালই পাবলিক ন্যুইসেন্স। কি বাঙালী কি ম্যাড্রাসী। তবে ম্যাড্রাসী মাতাল আরো খারাপ। গম্ভীরভাবে উচ্চারণ করেন তিনি। আমিও খেপে যাই:—

—"কেন? কেন? শুনি?"

—কেননা ইদিগে তারা মাছ মাংস খাবে না, অথচ উদিগে মদ খাবে—ধাতে সইবে কেন? নিরিমিষ্যি সাত্ত্বিক আহারের সঙ্গে ওসব রাজসিক পানীয় চলে না, বুইলেন? কতায় বলে 'মদ্যমাংস'! মদ্য সইতে হলে মাংস চাই, প্রোটিন চাই—গায়ে বল চাই!

এই রে, সাত্ত্বিক-রাজসিক কী সব লজিক্যাল ইনকনসিস্টেন্সি দেখাচ্ছে! কিন্তু মূল বিষয় যখন প্রাদেশিকতার গন্ধযুক্ত, তখন যুক্তি মানেই দুর্যুক্তি। অ্যাবসার্ড অথবা সাউণ্ড—কোনোপ্রকার যুক্তিতেই প্রাদেশিকতাকে সাপোর্ট করা যায় না। অতএব ইতিহাস থেকে উদাহরণ খুঁজতে থাকি, কোথায় ভেজিটেরিয়ানরা বলশালী ছিল? — ডাইনোসর?—বৌদ্ধরাজারা?—হিটলার!

—কেন মশাই, হিটলার তো নিরিমিষ্যি খেত, সে কি শক্তিমান ছিল না?

—না। সে ছেলো অত্যাচারী। বলবান হওয়া আলাদা জিনিস। তাছাড়া সে ব্যাটা মদও খেত না। তাছাড়া সে ম্যাড্রাসীও ছেলো না, ছেলো কি?

—মাদ্রাজী এত অপছন্দ কেন আপনার?

—কে বলেচে? ম্যাড্রাসী ভাড়াটের মতন ভাড়াটে হয় না। ম্যাড্রসী বসের মতন বস হয় না। তাছাড়া, ইলেকশন থেকেও দেখে বুইতে পাচ্চেন, ম্যাড্রাসের হাতেই ইনডিয়ার ফিউচার, ওরা সব টক দই খেয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ক্লিয়ার ব্রেনে কারেক্ট পলিটিকাল পয়েন্টগুলো দেকতে পাচ্চে বুয়েচেন? সাধে কি আমাদের ম্যাড্রাসী প্রেসিডেন্ট, ম্যাড্রাসী বিদেশমন্ত্রী, ম্যাড্রাসী অর্থমন্ত্রী?

—কিন্তু ওঁরা সবাই তো ম্যাড্রাসী নন, দুজন অন্ধ্রের লোক।

—ওই একই হলো। দ্রাবিড় কালচার। বিন্ধ্যের ওপার। ম্যাড্রাসী মানে কি ম্যাড্রাসের লোক? ম্যাড্রাসী মানে সাউথ ইনডিয়ান। ইডলি-ধোসাকে কী বলবেন? ম্যাড্রাসী খাবার। সেটা কি কেবল ম্যাড্রাসেই খায়? না হোল সাউথ ইণ্ডিয়া?

—হাল্লো, সিকসয়েট ফোরয়েট—স্যরি,—ত্রিয়েট ফোরয়েট সিকস জিরো টু?—দ্বিধা-জড়িত প্রশ্ন আসে। অমনি ধমক!

—"আঃ। এগেন ডিস্টার্বিং? পুট ডাউন রিসিভার। গো টু বেড। স্লীপ! গিভিং অল রং নাম্বার্স আনডারস্ট্যাণ্ড? নো সেভেন ফিগার নাম্বার ইন ক্যালকাটা। প্লিজ ডিসকানেক্ট। যত্তোসব ইয়ে—হুঁঃ।"

—য়োক্কে য়োক্কে. স্যরি টু ডিস্টার্ব ইউ স্যার, গুড য়িভিনিং টুয়্যায়ল —সবিনয়ে ফোন নামানোর শব্দ হয়।—আমিও সগৌরবে ঘোষণা করি—

—দেখলেন কত ভদ্র? দ্রাবিড় কালচার বাংলার চেয়ে ঢের উন্নত কালচার।

—ওই এক মিনিট! এক্ষুনি আবার তুলবে। মাতালের আবার কালচার। হুঁঃ।

হঠাৎ আমার খেয়াল হয় ফোনটা তো করা হচ্ছে না খোকনের দাদুকে? একি কাণ্ড; আমিও কি মাতাল? ব্যাকুল হয়ে বলে উঠি—

—আপনিও এবারে ফোনটা প্লীজ একটু নামিয়ে রাখুন, আমাকে খুব জরুরী একটা কল করতে হবে। রাত হয়ে যাচ্ছে।

—আমারও খুব জরুরী। আপনিই নাবিয়ে রাখুন। আমি লাইনে এইচি আপনার ঢের আগে।

—প্লীজ! আমি দু' মিনিটে সেরে নেব।

—মেয়েছেলের ফোন দু'মিনিটে সারা হবে? হাসালেন।

—এটা সেরকম ফোন নয়। একটি ছেলেকে এইমাত্র হাসপাতালে ভর্তি করে এসেছি। সেই সম্পর্কে খবর দিতে হবে—সত্যি সত্যি ভীষণ আর্জেন্ট—বিশ্বাস করুন —আমার গলা আটকে যায়।

—ঠিক আচে ঠিক আচে বুজিচি বুজিচি—খটাশ করে ফোন ছাড়ার শব্দ হয়। আঃ বেশ ভদ্রলোক তো? এই তো ডায়ালটোন! সযত্নে খোকনদের নম্বরটা ঘোরাই।

—হ্যাল্লো!—সেই গুম গুম আওয়াজ।

—আঃ! আপনি কেন ধরলেন?

—ধরলুম কেন? আমার ফোন রিং করচে বলে—

—ওঃ—ছাড়ুন, ছাড়ুন, আপনি না ছাড়লে—

—ছাড়চি। ছাড়চি। আমি কি ইচ্ছে করে ধরেচি দিইচি নাকি? ভালো ঝঞ্ঝাটেই পড়িচি বাপু। নিন মোশাই করুন আপনার ফোন!

ঝনাৎ করে রিসিভার নামানোর শব্দ হয়। আবার ডায়ালটোন। খোকনের নম্বর ঘোরাই। দু'বার রিং করতেই—

—হ্যাল্লো।

—ফোর টু টুটু থ্রি টু?

—এখনো পাননি বুঝি?

—অ্যাঁ? আবার আপনি? ধুত্তোর ছাই—

—এ লাইনদুটো জড়িয়ে গ্যাচে মনে হচ্চে—ওটা আপনি আজ আর পাবেন না বোদায়।—

—পাই না-পাই আপনাকে ভাবতে হবে না! আপনি আগে নামিয়ে রাখুন তো? —বিনাবাক্যে ওদিকে শব্দ হয়—কট্টাস। ডায়ালটোন। ডায়াল করি—

—হ্যাল্লো—একটা সুদূর শব্দ আসে এবার।

—হ্যালো, খোকনের দাদু বলছেন? দাদু, নমস্কার। আমি বাপির বউদি। আমাকে চিনতে পারছেন তো?

BanglaBook.org

—নমস্কার। তা আর পাচ্চিনি ? খুব পাচ্চি চিনতে। রাগ করবেন না যেন বউদিদি, আমি—ইনঅ্যাডভারট্যান্টলি—

—অ্যাঁ ? আবার আপনি ? এখনো লাইনে আছেন ?

—মোটেই নেই। ফোন বেজেচে, রিসিভ করিচি। আর বলতে হবে না, ছেড়ে দিচ্চি।

—শুনুন, শুনুন, এবারে বাজলেও রিসিভ করবেন না।

—তা কখনো হয় ? আমি রিসেপশনিস্ট। ফোন-ধরা ফোন-করাই আমার কাজ।

—এই রাত সোয়া দশটার সময়ে কোন আপিসে রিসেপশনিস্ট বসে থাকে জানতে ইচ্ছে করে ?

—কোনো আপিসেই নয়। আপিসগুলো বেলা পাঁচটার পরে মহাশ্মশান।

—তাহলে ?

—আমি তো হোটেলে চাগরি করি। আটাশবছর ধরে এই হোটেলে চাগরি কচ্চি। নাইট ডিউটি। মানে টেন-টু সিক্স ফুলশয্যে। অথবা কণ্টকশয্যে। যাই বলুন।

—অ ! তা দয়া করে খানিকক্ষণ অন্তত ফোন ধরবেন না। আমি খবরটা দিয়ে নিই ? খুব আর্জেন্ট।

—না ধরলিই বা কী ? বাজচে তো এখেনে। খোকনের দাদুর বাড়িতে তো যাচ্চেই না। বুয়েছেন ? জট পাকিয়ে গ্যাচে লাইনে। কী খবরটা কী ?

—আর বলবেন না একটি ছেলেকে হাসপাতালে—

—ভর্তি করে এয়েচেন। তা তো শুনলুম। কেস্টা কী ? মিনিবাস ?

—না না। ভীষণ জ্বর বিকার— এনকেফালাইটিসের আশঙ্কা—

—সেই খবরটা খোকনের দাদুকে দিতে হবে ? যে আপনারা খোকনকে হাসপাতালে ভর্তি করে এয়েচেন ?—

—না না, খোকনকে নয়। বালাই ষাট। বাচ্চুকে। কিন্তু খোকন আজ রাত্তিরে ফিরবে না, ওরা সব বন্ধুরা মিলে হাসপাতালে রাত জাগবে —সে খবরটা না দিলে বুড়োবুড়ি দাদু-ঠাকুমার তো উদ্বেগেই—

—অ ! বাচ্চুকে ! কিন্তু আজগে ফোনে তো পাবেন না ! বাড়িতে খবর দিয়ে আসার মতন কেউ নেই ?

—কোথায় আর ? উনি দুর্গাপুরে গেছেন অফিসের কাজে, দেওর তো নিজেও হাসপাতালে রাত জাগছে। আছি কেবল ননদ আর আমি।

—আই সী !

একমুহূর্ত গম্ভীর নৈঃশব্দ্য। তারপর—

—খোকনের বাড়িটা কোতায় ?

—যোধপুর পার্কে। অনেক দূর।

—আপনি ঠিকানাটা দিন দিকিনি। খবরটা যদি পৌঁচে দেয়া যায়, দেকি চেষ্টা করে।

BanglaBook.org

আপনি দেবেন? আপনি এখন কোথায়?

—শ্যালদায়। এ হোটেলটা শ্যালদা ইস্টিশনের কাছে।

—পাগল নাকি? কোথায় শেয়ালদা কোথায় যোধপুর পার্ক! এত রাত্তিরে।—

—রাত বেশি হয়নি তো, স' দশটা মোটে। ট্রামবাস চলচে। দেকি কোনো ছোঁড়া-ফোঁড়াকে পয়সা দিয়ে যদি পাঠাতে পারি—দিন ঠিকানাটা দিন—

—না না, ওসব পাগলামি ছাড়ুন। আমি বরং দেখি সামনের বাড়ি থেকে যদি ফোন করা যায়।! আমাকে তো আরো গোটা দুই মেসেজ দিতে হবে কি না?

—কি? রিলাই কত্তে পাচ্চেন না। না?

—না না, তা কেন? আপনার কাইনড অফারের জন্যে অনেক ধন্যবাদ। সত্যি বলছি। দেখি, যদি—না পেরে উঠি তখন হয়তো...

সামনের বাড়ির কাকাবাবু-কাকীমা খুব ভালো লোক। প্রায় শুয়ে পড়ছিলেন, ভাগ্যিস আরো দেরি করিনি? যাক একবারেই লাইন মিলে গেল। খোকনের দাদু-ঠাকুমা সত্যিই খুব ভাবনায় পড়েছিলেন। একটা ডিউটি চুকলো। নেক্সট ভক্তিব্রত মেসোমশাই। তাকেও পাওয়া গেল এক ডাকেই। সব শুনে বললেন—"দাঁড়া, দেখি যদি দাশগুপ্তকে পাই, নইলে মণ্ডলকে ধরতে হবে। আমি একটু পরেই ফোন করে তোকে জানিয়ে দেব কদ্দূর কি পারা গেল।" ফোন ছেড়ে নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরলুম। ফিরেই মনে পড়লো—"ফোন করে জানিয়ে দেব" মানে? ফোন তো নষ্ট। ফোন তো জটপাকানো। শেয়ালদার সেই হোটেলের সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা। ওদিকে সামনের বাড়ির আলো নিবে গেছে। আবার গিয়ে বুড়োমানুষদের তুলে বিরক্ত করা যায় না। কাকীমা অসুস্থ মানুষ। এখন কী করি?

এদিকে আমাদের ফোনে তো সমানেই নানাবিধ অশরীরী শব্দ— দেয়ালাকরা শিশুর আধোফোটা হাসিকান্নার মতো—আধো আধো ক্রিরিরিং...রি রি রিং... হচ্ছে তো হচ্ছেই। হঠাৎ লক্ষ্য করলুম তিনবার করে বাজছে। আশ্চর্য তো, বাজা উচিত ছ-বার করে। ছোট ননদ রিংকুটা সদ্য কলেজে ঢুকেছে, অঙ্কের পোকা, চটপটে বুদ্ধি খেলে মাথায়, বললে—"ও বৌদি, নির্ঘাৎ সেই ভদ্রলোক ওয়াননাইন নাইন ঘোরাচ্ছেন এবার।—দেখই না ফোনটা তুলে।"

ফোন তুলতেই—হ্যালো, ট্রাংকবুকিং?

—আজ্ঞে না।

—তবে? ওয়ান নাইন নাইন?

—আজ্ঞে তাও না। আমাকে চিনলেন না? আমি সেই যে বাপির বউদি।

—ওঃ হো, আর আমি সেই শ্যালদার—

—আজ্ঞে বুঝেছি।

—আপনি কি পারলেন যোধপুর পার্কে খবরটা দিতে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা হয়ে গেছে। সামনের বাড়ি থেকে। থ্যাংকিউ।

—যাক বাঁচা গেল! এবার ছেড়ে দিন।

—আপনি এতরাত্তিরে কোথায় ট্রাংক বুকিং করছেন?

—আর বলেন কেন? হোটেলের চাগরি। বুক কচ্চি একটা ডিল্লির কল।

—ও বাবা। দিল্লি? তাহলে আর ভদ্রতাটা রেসিপ্রোকেট করা গেল না! স্যরি।

—তার মানে?

—মানে, আপনি তো যোধপুর পার্কে গিয়ে আমার মেসেজটা দিয়ে আসতে চেয়েছিলেন? আমি কিন্তু তার রিটার্ন দিতে দিল্লি গিয়ে আপনার মেসেজটা পৌঁছে দিতে পারছি না! এই আরকি!

গম্ভীর গলায় সীরিয়াস উত্তর হয়—না না, তা কী করে হবে। সে তো সম্ভবই নয়। তারচে, আপনি বরঞ্চ ফোনটা ছেড়ে দিন। তাহলেই হবে। এখন রিং শুনলেও ধরবেন না কিছুক্ষণ।

—তা কেমন করে হবে? আমি যে একটা ডাক্তারের কল এক্সপেক্ট করছি? ছটা টুংটাং বাজলেই আমি ধরব। তিনটে বাজছে শুনলে বরং আর ধরব না। আপনি চেষ্টা করুন —বলে আমি রেখে দি।

—টুং-টাং-টিং, ক্রিং-ক্রাং ক্রিং চলতেই থাকে। যেন আধোঘুমে আধোজাগরণে নিশি-যাপন করছে টেলিফোন। আমরাও ঘুমোতে পারি না। বিষ্ণু আর আমি খাটে শুয়ে জেগে থাকি, ওই বকমবাজ ডিলিরিয়াস ফোনের পাশে। কী জানি, যদি ফোনটা এসে যায়? হঠাৎ রিংকুর মস্তিষ্কে এক বিদ্যুৎপ্রবাহ চলে গেল।

—বৌদি, এক কাজ করলে হয় না?

ভক্তি মেসো যতবারই ফোনের চেষ্টা করবেন, প্রত্যেকবার তো শেয়ালদার ওই ভদ্রলোককেই পাবেন? ওই নম্বরেই যাবে নিশ্চয়ই আমাদের সব ফোন। ওদের কলগুলো, ফোন এখানে বাজছে। ওকেই বল না কেন, "রং নাম্বার" বলে নামিয়ে না রেখে, বরং আমাদের মেসেজটা নিয়ে রাখতে?

—আইডিয়াটা মন্দ নয়। খাসা, কিন্তু একজিকিউট করবি কেমন করে? ভদ্দল্লোককে পাবো কোথায়?

—কেন ট্রাংকবুকিং ঘোরাও? এই তো তিনটে করে রিং হচ্ছে। ঠিক কনেকশন হয়ে যাবে। গেরো বাঁধা আছে না?—

ননদিনীগর্বে বুকটা ক্যাশিয়াস ক্লে-র মতো চওড়া বোধ করতে থাকি। ডিরেকটারি খুলে ট্রাংক বুকিং নম্বর খুঁজে, সেইটে ঘোরাই। —হ্যালো?

হ্যালো—ট্রাংক বুকিং? গম্ভীর প্রশ্ন হয়।

—আজ্ঞে না। আমিই বলছিলুম, ঐ যে, বাপির বৌদি—

—বুজিচি! এখন আবার কাকে ফোন কচ্চেন?

—আপনাকেই খুঁজছিলুম আর কি!

—অ্যাঃ? রীতিমতো ভয়ের ছাপ ফোটে গলায়।

BanglaBook.org

—মানে ডাক্তারের সেই কলটা তো পাচ্ছি না, তাই ভাবছিলুম আপনাকে একটা কথা বলে রাখি—

অ। তাই! কণ্ঠস্বরে স্পষ্টত রিলিফ।—বলুন, কী বলচেন?

—আচ্ছা, থ্রি ফাইভ ফোর সিক্স জিরো থ্রিতে কোনো ফোন যদি আপনার লাইনে আসে—

হ্যাঁ-হ্যাঁ এয়েছেল তো? ঐ নম্বরে এক ভদ্দল্লোক দুতিন—

—ঐ! ঐ! ঐ হচ্ছেন ভক্তি মেসোমশাই, উনিই তো জানবেন ছেলেটাকে ইনটেনসিভ কেয়ারে ভর্তি করা গেল কিনা! ওই ফোনের জন্যেই আমরা বসে আছি।

—কিন্তু লাইন তো জড়িয়ে গ্যাচে! কল তো আপনি পাবেন না?

—সেই তো মুশকিল। তাইজন্যেই আপনাকে একটা অনুরোধ করব ভাবছি—

—বলুন!—অসামান্য ভদ্র শব্দ হয়।

—ফের যদি থ্রি-ফাইভ-ফোর সিক্স জিরো থ্রি-তে কোনো কল আসে, দয়া করে রং নম্বর বলে নামিয়ে রাখবেন না।

—কিন্তু ওটা তো আমাদের নম্বর নয়।

—জানি! জানি! কিন্তু ওইটেই তো আমাদের নম্বর? ফের যদি ফোন আসে, আপনিই দয়া করে একটু মেসেজটা নিয়ে রাখবেন? ডক্টর ভক্তিব্রত ভট্টাচার্য, ডিরেকটর, হেলথ সার্ভিসেস ফোন করবেন।

—ওঃ হো! তাই নাকি? কি সৌভাগ্য!

—আমাদের মেসোমশাই হন! বেশ গর্ব ফোটে গলায়।

—বা! বা! বেশ! বেশ!

—উনি যদি বুলটিকে চান,—

—আপনার নাম বুলটি?

—ঐ ডাকনাম আর কি, বুল্লা থেকে—

—আমার ভাইপোর নামও বুলু। বি-কম পড়চে।

—ওমা? তাই নাকি? বেশ মজা তো? বুল্লা, বুলু একই! তা, যা বলছিলুম, ভক্তিব্রত মেসোমশাই যদি—

—কিন্তু উনি আমাকে মেসেজটা দেবেন কেন? আমার লোকাস স্ট্যানডাই-টা কী? হু অ্যাম আই?

—লোকাস স্ট্যানডাই? সেসব থাকগে। এইভাবে তো কাজটা হতে পারে? আপনি কি ডক্টর বি. বি. ভট্টাচার্যি? ডিরেক্টর, হেলথ সার্ভিসেস? বুলটিদের লাইনটা জড়িয়ে গেছে—আমাকেই মেসেজটা নিয়ে রাখতে বলেছে। বাচ্চু কেমন আছে? ইনটেনসিভ কেয়ারে ভর্তি হলো কিনা?

BanglaBook.org

—বা—চ—চু কে—ম—ন আ—ছে। ই—ন—টেন—সিব হোলড অন প্লীজ কে-
—য়া—রে—

—ও কী? আপনি কী করছেন?

টেকিং ডাউন ইওর মেসেজ ম্যাডাম। হ-ল—কিনা। ব্যাস। এটাই তো রিসেপশানিস্টের কাজ। সারাক্ষণ তো এই কম্মোই কচ্চি। মেসেজ রাখা, আর মেসেজ দেওয়া। কল বুক করা আর কানেকশন দেওয়া। হ্যালো আর হোল্ড অন।

—ওঃ হো। স্যরি, আপনার দিল্লির বুকিংটা...

—ট্রাংকবুকিং ধরলে তো? নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোচ্চে সব।

—তারা ধরবে কেমন করে? বাজছে তো আমাদের বাড়িতে। তারা তো জানেই না আপনি ডাকছেন।

—তাও তো বটে! ওঃ।

যাচ্ছেতাই। যাচ্ছেতাই। সব্বোধ্বংসী মহাকালের কুনজরে পড়িচি মোশাই, দিদিমণি—সব ভেঙে পড়চে। পুরো কোলকাতা শহরটা চতুর্দিক থেকে ব্রেকডাউন কচ্চে। যেমনি রাস্তাঘাটের অবস্থা তেমনি ট্রাম-বাসের অবস্থা, তেমনি তেল চিনি ক্যারাসিন তেলের অবস্থা। যেমনি আমাদের হাসপাতাল, তেমনি ইলেকট্রিক সাপ্লাই, তেমনি আমাদের জলের ব্যবস্থা, রাস্তায় তো জঞ্জালের কাঁড়ি। এমনকী, গঙ্গানদীটা পজ্জন্ত নাকি বুঁজে যাচ্ছে শুনিচি। কী সব্বোনেশে কত্তা! মহাপাপের ফল। বুয়েচেন? একটা জাত অনেক পাপ কল্লে তবেই তাদের অমনটা হয়। একেবারে শেষ হয়ে যাবার আগে সভ্যতার এমনি অবস্থা হয়।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। তারপর বলি: তা যা বলেছেন। সত্যিই জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠছে কলকাতাতে। উম...আচ্ছা, আবার বলি? যদি থ্রি ফাইভ ফোর সিকস জিরো থ্রিতে কেউ—

—ফোন করে, তবে মেসেজটা রেকে নোবো। থ্রি—ফাইভ— ফোর—সিকস-জিরো—থ্রি—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন...

—মেসোমশাইয়ের নাম ভক্তিব্রত ভট্টাচার্য্যি, ডিরেক্টর, হেলথ সার্ভিসেস...

—ভ-ক্তি-ব্র-ত—মেসোমশাই...এই তো? ঠিক আচে। যিনি ফোন করুন, মেসেজ নিয়ে নোবো। আমি তো বসিই রইচি। কিন্তু আপনাকে খবরটা ফের দোবো ক্যামন কোরে?

—কেন? ওয়ান নাইন নাইন? ট্রাংক-বুকিং ? ফায়ার? অ্যাম্বুলেন্স? হাওড়া স্টেশন? যা খুশি ঘোরাবেন। যাই ডায়াল করুন আমাকেই তো পাবেন!

—তা বটে। যাচ্ছেতাই। যাচ্ছেতাই। হোল সিস্টেমটা ব্রেকডাউন কচ্চে মোশাই দিদিমণি। এখন যদি একটা কোনো এমারজেন্সি হয়—

—যদি মানে? আমার তো এমারজেন্সিই—

—সত্যি! কী কাণ্ড। শালাদের—স্যরি—

—যাক গে, ও নিয়ে ভেবে লাভ নেই, রেখে দিচ্ছি। গুড নাইট—

—গুড নাইট দিদিমণি, আমার অবিশ্যি এখন গুড নাইট নয় গুড আফটারনুন বলতে পারেন—টেন পি এম টু সিকস এ এম যখন ওয়ার্কিং ডে—

—সত্যি কী কষ্ট আপনার।

—কষ্ট আর কি! চাগরি। অব্যেস হয়ে গ্যাচে।

আপনি শুয়ে পড়ুন।

—কোনো খবর এলে আমি দিয়ে দোবো।

ঘণ্টাখানেক তন্দ্রা এসেছিল—আবার ফোনে তিনটি ট্রি-রি-রিং বাজতে লাগলো। অস্ফুট ইঙ্গিতের মতো। বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ড হাইজাম্প করে।

—হ্যালো!

—হ্যালো!

—ওঃ আপনি? পেলেন দিল্লি?

—ডিল্লি? নাঃ চেষ্টা কচ্চি। কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু। বুইলেন? কিন্তু আপনারটা এয়েছেল।

—এসেছিল? ভক্তিব্রত মেসোমশাই—

—আজ্ঞে হাঁ। রুগী ভালোই আচে। ইনটেনসিব কেয়ারে ভর্তি হয়ে গ্যাচে। ডাক্তার দাশগুপ্ত নিজে গে দেকে এয়েচেন এই রাত্তিরেই—তিনি বলেচেন রুগীর বয়েস কম, স্বাস্থ্য ভালো, দিব্যি ফাইট কচ্চে, ওষুদে অলরেডি রেসপনড করেচে—

—আপনাকে যে সত্যি, মানে কী যে বলব—

—আগে সবটা শুনে নিন, ধানাই-পানাইটা পরে হবে। ডক্টর ভটচায্যি মনে কচ্চেন সারভাইভ্যালের চান্স ভালই, তা সত্ত্বেও রুগীর আত্মীয়স্বজনদের খপর দিয়ে দেয়া উচিত—ওরা ভাবচে লক্ষণটা মেনিনজাইটিসের,—এখনো প্যাথলজিক্যাল টেস্টগুলো অবিশ্যি হয়নি, নেক-রিজিডিটি আছে, তাছাড়া ডিলিরিয়াসও—রুগীর বাপমাকে ইমিজিয়েটলি খবর দিতে বলেচেন।

—বাপ মা তো গৌহাটিতে।

—ট্রাঙ্ককল করুন। ফোন আচে?

—জানি না। কিন্তু ঠিকানা জানি।

—আর ফোন থাকলেই বা কি। এই ডিল্লির মতনই হবে। ফোনের যা অবস্থা! টেলিগ্রাম করুন।

—টেলিগ্রাম? এত রাত্তিরে কোথায় বেরুবো? দুটো বাজে বোধহয়—কাল সকালে করতে হবে।

—সকালের চেয়ে রাতেই তাড়াতাড়ি যাবে। দেরি করবেন না। দিন দিকি ঠিকানাটা? আর মেসেজটা দিয়ে দিন। আমি পাঠিয়ে দিচ্চি টেলিগ্রাম।

—আপনিই বা এত রাত্তিরে—ডেস্কের ডিউটি ছেড়ে—

—আমি যাবো ক্যানো? হোটেলের ছোঁড়াগুলো রয়েচে কী কত্তে? এইখেনেই ফর্ম রয়েচে—আর পাশেই টেলিগ্রাম আপিশ— হোলনাইট ওপেন। দিন, দিন, ঠিকানা আর মেসেজটা—কী লিকবেন? আগে তাদের নাম ঠিকানাটা বলুন—ফর্মটা বের করি দাঁড়ান। হ্যাঁ, রেডি। এইবার বলুন?...কই?...বলুন?...

—বলব?

—বলবেন না তো কি আমি হাত গুনবো? ছেলেটার বাপের নাম কি?

—সত্যেন বড়ুয়া!

—থাকে কোতায়?

—প্রফেসর্স কোয়ার্টার নম্বর ফাইভ, গৌহাটি ইউনির্ভাসিটি, গৌহাটি।

—বড়ুয়া? অসমীয়া? এখানে আচে যে বড়?

—ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ে।

—তার বেলায় বাঙ্গালী বুজি বদ নয়? হুঁঃ। —হুঁঃ। যত্তোসব পলিটিকসের বদমাইসি আসলে।

—হ্যাঁ। সাধারণ মানুষ তো রাজনীতিকের হাতের পুতুল।

—বলুন, কী লিকবেন এইবার? ঠিকানা লিকে নিইচি। আর্জেন্ট করবেন কিন্তু। নইলে যাবেই না। আসামে যে তাণ্ডব চলেচে। আর্জেন্ট কল্লেও যায় কিনা দেকুন। কলকাতার টেলিগ্রাম তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ আর্জেন্টই করুন। নিশ্চয়ই। এ আর বলতে?

—ছেলেটার নাম কী?

—বাচ্চু।

—তবে লিকুন—বাচ্চু সীরিয়াসলি ইল হসপিটালাইজড— কাম ইমিজিয়েটলি -তলায় নাম কী দেবেন?

—বাপি-ই দিয়ে দিন। আমার দেওর ওদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল গৌহাটিতে। ওঁরা চিনবেন।

—শুনুন, শুনে নিন ভালো করে, আবার পড়চি: আর্জেন্ট টেলিগ্রাম। সত্যেন বড়ুয়া প্রফেসার্স কোয়ার্টার নম্বর ফাইভ, গৌহাটি ইউনিভার্সিটি গৌহাটি। বাচ্চু সিরিয়াসলি ইল হসপিটালাইজড কাম ইমিজিয়েটলি। বাপি। এই ত?

—বাঃ, খুব ভালো হয়েছে। কিন্তু টাকাটা তো দেওয়া যাবে না?

—ওটা পরে হবে'খনে। এটার খচ্চা বেশি নয়। কত আর, গোটা দশেকের মধ্যেই হয়ে যাবে। আরো কম হবে। এখন নিচে নাম ঠিকানা দিতে হবে। কী লিকব? সেনডারস নেম অ্যাণ্ড অ্যাড্রেস!

—কিন্তু টাকাটা—

—পরে হবে। অত ভাবনার কিচু নেই। নাম ঠিকানাটা আগে দিন। টাকাটা পরে কখনো ওই দ্যাওরের হাত দে পাটিয়ে দিলিই চলবে। বলুন, কী দোবো নাম

BanglaBook.org

ঠিকানা? অবিশ্যি ফোন নম্বরটা দিলেও হয়! বাপি, কেয়ার অব কী লিখব?

—কেয়ার অব এন. কে. দত্ত, থ্রি ফাইভ ফোর সিকস জিরো থ্রি।

—এ-ন-কে-দত্ত—থ্রি-ফাইব...

—এবার আপনারটা বলুন?

—বলচি। লিকে নিন। খাতা পেনসিল আচে?

—আচে।

—বেশ। লিকুন—জি. পি. চন্দর, জ্ঞানপ্রকাশ চন্দর, থ্রি ফাইব ফোর টু এইট ওয়ান।

—হয়েছে? জি. পি. চন্দর, থ্রি ফাইব... হুঁ। হয়েছে। এবার ঠিকানা?

—ঠিকানা? চাগরির ঠিকানাটাই ঠিকানা। দিনের বেলায় মেস। রাত্তির বেলায় আপিশ। ও আপনি অতো বুজবেন না। বুজেও কাজ নেই। লিকুন, হোটেল শ্রীনিবাস—

—হোটেল শ্রীনিবাস...

—হোটেল শ্রীনিবাসটা হচ্চে হ্যারিসন রোডের ওপরিই, প্রায় শ্যালদার অপোজিটে —তিনতলা বাড়ি। সদ্য গোলাপী টালি লাগিয়েচে একতলার ভেতর স্কাইচে, বাইরের দ্যালেও। আপনার দ্যাওর ঠিক খুঁজে পাবে। আপনি এবারে একটু শুয়ে পড়ুন দিকিনি? এভাবে সারারাত্তির উদ্বেগের মদ্দে! আপনার টেলিগ্রাম আমি এক্ষুনি করিয়ে দিচ্চি।

—টাকাটা আমি বাপিকে দিয়ে কালই নিশ্চয়—হাসপাতালও তো ওই কাছেই—

—হবে, হবে। ছেলেটা ভগবানের দয়ায় বেঁচে উঠুক তো আগে? বিদেশ বিভূঁয়ে—

—আপনাকে কী যে বলবো মানে...আপনার মতো মানুষ...আজকের দিনে এমন মানুষ সত্যিই...মানে

গম্ভীর গলায় মৃদু হাস্য করেন জি. পি. চন্দর। এই প্রথম হাসি।

—এইটুকুনি তো মানুষ মানুষের জন্যে করবেই।

— এটুকু করবেই মানে? কেউ করে? কেউই করে না। সরে বসে একটু জায়গা পর্যন্ত করে দেয় না কেউ অন্যের জন্যে।

দেয়, দেয়। হোটেলে কাজ কত্তে কত্তে চুল পেকে গেল দিদিমণি, মানুষ কি কম দেকিচি? মন্দও যেমন দেকিচি, ভালোও তেমনিই দেকিচি। এটুকুনি মানুষ মানুষের জন্যে করেই থাকে। আপনি কর্চ্চেন না? দ্যাওরের বন্ধুর জন্যে? এবারে ছেড়ে দিন দিকিনি? একটু শুয়ে পড়ুন।

—ঘুম হবে কি? হাসপাতালের খবর-টবর আসে যদি?

—সে এলে তখন উটবেন। এলে তো আসবে এখেনে। ধরবো তো আমিই। আপনি শুয়ে পড়ুন গে।

—থ্যাংকিউ মিস্টার চন্দর... আপনাকে কী যে বলব।

—কিছুই বলতে হবে না বুলটি দিদিমণি, থ্রি ফাইভ ফোর টু এইট ওয়ানটুকু

BanglaBook.org

মনে রাখবেন, কোনো দরকার হলে মোটে সঙ্কোচ করবেন না। ইউ আর লাইক মাই ডটার, সুদ্ধু একটা ফোন করে দেবেন। লাইনের জটটা খুলে গেলে তো আর এরকম ডিরেকট সার্ভিস পাবেন না?

পরদিন সকালে বাপি যখন ফিরল, অসম্ভব উত্তেজিত। মুখ-চোখ লাল।

—বাচ্চু কেমন আছে?

—আগের চেয়ে ভালো। প্রেশারটা স্টেবিলাইজ করে গেছে। কিন্তু একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে বৌদি। একেই বোধহয় মির‍্যাকল বলে, এই সকাল সাড়ে ছটা সাতটা নাগাদ, একজন বুড়োমতো লোক, ধুতি-শার্টপরা, সব চুল সাদা। এসে বাচ্চু বড়ুয়ার বন্ধুদের খোঁজ করল,—একেবারে বাপি, খোকন নাম ধরে! তারপর আমার হাতে এই স্লিপটা দিয়ে—বলতেও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে আমার বৌদি—এই স্লিপটা দিয়ে বলল —"বড়ুয়াকে টেলিগ্রাম করা হয়ে গেছে। এটা তার রসিদ। তোমার বৌদিদিকে দিও।" মানে আমরা তো...একেবারে স্টানড। স্পেলবাউনড! বিফোর উই কুড বিকভার ফ্রম দ্যাট ডেজড স্টেট, হি ডিসাপিয়ার্ড। হাওয়া হয়ে গেল বৌদি। জাস্ট মিলিয়ে গেল। আর দেখতেই পেলুম না। কে লোকটা? কী করে জানল বাচ্চুর কথা? আমাদের কথা? আমাদের নাম? তোমার কথা? কেন কে পাঠালো টেলিগ্রাম? রিয়্যালি বৌদি, টু, থিংক অফ ইট...ও কি, তুমি হাসছো? জাস্ট লুক অ্যাট দিস চিট—অ্যাকচুয়ালি গেছে টেলিগ্রাম দেখেছো তো? বাট হু ওয়াজ হি? নোবডি নোজ হিম...সত্যিই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে বৌদি—এই দ্যাখো—

বাপি মুঠো করে আস্তিন-গোটানো পেশী-বহুল হাতটা সামনে এগিয়ে দ্যায়। লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে। আমি আর হাসি না।

এমনি সময়ে খোকনের ফোন এলো। তবে মানে লাইনের জট খুলেছে। খোকনও অসম্ভব উত্তেজিত।

—"শুনেছেন তো? বাপি বলেছে সব? কী স্ট্রেনজ একসপিরিয়েন্স...ভাবলেই গা শিরশির করে উঠছে, সত্যি বৌদি, দেয়ার আর মেনি থিংস ইন হেভেন অ্যাণ্ড আর্থ! দাদু তো শুনে বলছেন আর ভাবনা নেই, তোদের বন্ধু এ-যাত্রা বেঁচে গেল— আমি অবশ্য অতটা বলছি না, তবে ব্যাপারটা সত্যিই মির‍্যাক্যুলাস। একেই বোধহয় বলে টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি মিরাক্ল। না বৌদি? আচ্ছা, রিসীটটা আপনি হাতে নিয়ে দেখেছেন? ইটস আ রিয়্যাল রিসীট!"

ক্যান ইউ বিলিভ ইট? এমন যে হতে পারে—উত্তেজনায় খোকনের বাক্যি হরে যায়।

ভাগ্যিস রিংকুটা মর্নিং কলেজে বেরিয়ে গেছে? ফিরলেই বারণ করে দিতে হবে। জি. পি. চন্দরের কথাটা ছেলেদের কাছে কোনোদিনই ভাঙা চলবে না।

ওরা বড় দরিদ্র। বিশ্বাস বস্তুটির স্বাদ ওরা মোটেই পায় না। তার সুযোগই আসে না বেচারাদের জীবনে। এটুকু পেয়েছে, আহা, জমা থাকুক। সত্যিই তো,

মির‍্যাকুলাস ঘটনা মিস্টার জি. পি. চন্দর।

স্লিপটা যত্ন করে তুলে রাখি। শেয়ালদার অপোজিটে, গোলাপী টালি, হোটেল শ্রীনিবাসে নিজেকেই দেখছি যেতে হবে টাকাটা ফেরত দিতে।

জোবান সুজিকি

"বাপরে বাপ! আবার প্রেজেন্ট? নিজেকে ফিরিয়ে এনেছি এই যথেষ্ট"—দাদামণি চেয়ারে পিঠ এলিয়ে টেবিলে পা তুলে দিয়ে চুরুটে দেশলাইতে মন দেন। বৌদি ছাড়বার পাত্রী?

"ছি ছি ছি, লোকে বলবে কি? জাপানে ঘুরে এলে বারোদিন—একটা মাত্তর জাপানী পুতুল ছাড়া কিছু আনলে না? নাইলন শাড়ি, ইলেকট্রনিক ঘড়ি, ক্যালকুলেটার, ক্যাসেট রেকর্ডার, ক্যামেরা টিভি—লোকে কত কি আনে, নিদেনপক্ষে মুক্তোটুক্তো—কিছু না?"

"সব টাকা যে জোবানে চলে গেল।"

"তার মানে? জুয়ো খেলেছিলে নাকি?"

"দূর। জুয়ো খেলব কেন? ট্রাডিশনের জন্যে মূল্য দিতে হবে না? ট্রাডিশনের মূল্য দিতে গিয়ে কেবল কি ধনেই মরেছি? প্রাণেও মরছিলুম আরেকটু হলে।" চুরুট থেকে ধোঁয়া ছেড়ে বৌদির মুখখানা আবছা করে দেবার চেষ্টা করেন দাদামণি। কিন্তু বৌদির মুখ অত সহজে আবছা হবার নয়।

"প্রাণসংশয় হওয়া অতই সোজা? বললেই হলো? ধনসংশয়টাই সহজ, আর তোমার সেটা চব্বিশঘণ্টাই হচ্ছে।" গল্পের গন্ধ পেয়ে আমরা এখানে কথায় যোগ দিয়ে ফেললুম।—"সত্যি? বল, দাদামণি, বল না, কী হয়েছিল?"

"তোরাও যেমন! তোদের দাদামণি বলুক, আর তোরাই শোন। আমার ওসব ঢের শোনা আছে। যত গুলতাপ্পি বানাবে—"

—"না গো না, গুল নয়। তানাবেকে তো মনে আছে? সেই যে এসেছিল সেবারে, খৈতানের সঙ্গে?

"সেই নাকচ্যাপ্টা জাপানীটা? যে আমাকে অত সুন্দর পাখাটা দিয়ে গেল?"

"হ্যাঁ, সেই তানাবে। অত সুন্দর পাখা দিল, তবু তাকে নাকচ্যাপ্টা বলছ?"

"না তো কি শুকনাসা বলতে হবে?"

"সেই তানাবে ছিল সঙ্গে। গুল কিনা, তাকেই জিজ্ঞেস কোরো। আবার আসছে

BanglaBook.org

সে, জানুয়ারিতে।"

বৌদি এবারে একটু নরম হন।

"কী হয়েছিল কী, শুনি?" তাচ্ছিল্যভরে বললেও বোঝা যায় ভেতরে উদ্বেগ রয়েছে।

"কী হয়নি, তাই বরং জিজ্ঞেস করো। জোবান আর সুজিকি। জোবান আর সুজিকি আমাকে ধনেপ্রাণে শেষ করে দিচ্ছিল। আরেকটু হলেই। বড্ড বেঁচে গেছি। তোমারই ঠাকুরের দয়ায়। রোজ অত ফল-বাতাসা খাওয়ানোর একটা প্রতিদান তো আছে?"

বৌদি এবার বেশ নরম। খাটের একপাশে বসে পড়েন। আমরা তো আগেই খাটে গুছিয়ে বসেছি। দাদামণি সুরু করেন।

"তোরা তো জানিস তোদের বৌদি কী কিপ্টে। ওর ছেলেবেলার সেই ক্যামেরাটা সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল, ছবি তুলে আনতে। কেননা, ওটা দিয়ে ছবি তোলা খুব সোজা। প্রথমেই হলো কি, সেইটে গেল হারিয়ে।"

"অ্যাঁ"—বৌদি চেঁচিয়ে ওঠেন—"সেটা হারিয়ে এসেছো? আমার মা দিয়েছিলেন চেল্লিবছরের জন্মদিনে— কান্নায় গলা বুজে আসে বৌদির। আঁচল চোখে উঠে যায়। —দাদামণি ব্যাকুল—"আহা শোনোই না, এসে গেছে ক্যামেরা তোমার। হারিয়েছিল—পাওয়া গেছে। হয়েছে—?"

"তাই বল? এবার বল কী করে হারাল?" বৌদির চোখে জল, মুখে হাসি।

"তানাবেকে তো চেনো। কিন্তু তোশিওকে চেনো না। তোশিও-নো বিখ্যাত পণ্ডিত, সেও আসবে জানুয়ারির সেমিনারে। তখন দেখবে। তাদের দুজনের সঙ্গে যাচ্ছিলুম ইউয়াকি শহরে। পথে পড়ে কাজিওয়াতা। তোশিও-নোর ছেলেবেলার বাসা। সেখানে প্রচুর সামুরাই পরিবার বাস করে। মধ্যযুগীয় শহর। জাপানী ট্রাডিশনের খনি। তোশিও ভয়ানক ট্রাডিশন-পাগলা লোক, সেই আমার প্রধান গার্জেন ছিল ওখানে। সে আর তানাবে। ভালো ইংরিজি বলে, আমার দেখাশুনোর ভার তাদের ওপরেই ছিল। আমাদের সেমিনার চারদিনেই শেষ। তারপর টোকিও ছেড়ে চললুম উত্তর-পূর্ব জাপানের এই শহর ইউয়াকিতে। সেখানে একহপ্তার নেমন্তন্ন। কিন্তু তাদের কলেজ তখন বন্ধ। তাই তোশিও আর তানাবে ঠিক করেছিল আমাকে ক'দিন কেবল জাপান দেখাবে। জাপানের দীর্ঘ ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করাবে।"—দাদামণি ধোঁয়া ছাড়লেন।

"প্রথমটা, কাজিওয়াতা। নেমে দেখি হাতে ক্যামেরা নেই। সীটে রেখে এসেছি। ওদিকে ট্রেন তো সুপারসনিক গতিতে উধাও। স্টেশনমাস্টারের ঘরে গেলুম তানাবের সঙ্গে। সে বিশাল এক খাতা বের করে লিখতে লাগল— নাম? ঠিকানা? বয়স? পাসপোর্ট নম্বর?—"

"আমি তো হারাইনি, আমার ডিটেলে কী হবে?"—নিয়ম। ক্যামেরার নাম?

BanglaBook.org

বয়স? নম্বর? কটা ফিল্ম এক্সপোজড হয়েছে?"

সর্বনাশ। কুড়িটা, না উনিশটা; কিছুতেই মনে পড়ে না। কিন্তু ওটা জরুরী। ক্যামেরার বর্ণনা শুনে তানাবে বললে—"ওটা বরং ফেলে দাও। ও দিয়ে কী হবে? কত ভালো ভালো ক্যামেরা বেরিয়েছে, কিনে দেব তোমায়।"

"ও বাবা! আমার বউয়ের ক্যামেরা—"

"বউকে তুমি ভয় পাও?" অবাক চোখে তাকিয়ে তানাবে বলল।

"তুমি পাও না?"—তানাবে উত্তর না দিয়ে বলে—"এ-কথাটা তোশিও-নোর সামনে খবর্দার যেন বোলো না। তুমি কি জানো ও কেন গাড়ি চালায় না?"

"কেন? লাইসেন্স নেই বলে?"

"ডানহাত নাড়তে হবে বলে।"

"ডানহাত নাড়তে ওর অসুবিধা আছে?"

"নেই? ওরা খাস সামুরাই যে! ওর ঠাকুর্দা ঠাকুমা দাদামশাই দিদিমা চারজনেই সামুরাই বংশীয়। তাই।"

"তাই মানে?"

"সামুরাইদের ডানহাত চালানো মানেই তো তরওয়াল চালানো। এও জানো না?"

"তাই তো। তা তুমি তো গাড়ি চালাও।"

"আমি চালাবো না কেন? আমার তো কেবল দিদিমা সামুরাই বংশীয়া। বাকী সবাই চাষী। আমি দুহাত নাড়তে পারব না কেন?"

সত্যিই তো। চমৎকার লজিক।—"দুজনে তো একসঙ্গেই পড়াশুনো করেছ, একসঙ্গেই চাকরি করছ, অথচ তোমাদের মধ্যে এত তফাত?"

"তফাত থাকবে না? এটা জে ট্রাডিশনের কথা। ও সামুরাই। আমি কৃষক। এখন যদিও বেতন একই পাচ্ছি—তাতে ট্রাডিশন তো বদলায় না। ওটা হাজার বছরের ব্যাপার।" একটু থেমে তানাবে বলল—"তোশিওর বউ টোকিওয় কেন থাকে, জানো?"

"টোকিওতে থাকেন বুঝি? কেন?"

"কেননা তোশিও যখন ইউয়াকিতে চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করল, ওর বউ বলেছিল— 'তার মানে, টোকিও ছেড়ে চলে যেতে হবে?' ব্যস। সেই থেকে তোশিওর বউ টোকিওতে, আর তোশিও ইউয়াকিতে। বউ পায়ে ধরেছিল, তবুও তোশিও ওকে সঙ্গে নেয়নি। এত স্পর্ধা, স্বামীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে ইচ্ছে প্রকাশ করে? সেই শেষ। দশবছর তোশিও ইউয়াকিতে একা থাকে। বউ অনেকবার আসতে চেয়েছে—কিন্তু স্বামীর সেই এক কথা। 'থাকো তুমি তোমার টোকিওয়।' ওকে যেন তুমি বোলো না তোমার বউয়ের ক্যামেরার জন্যে তুমি এমন করছ।"

তোশিওর পাণ্ডিত্যের প্রতি আগেই আমার সম্ভ্রম ছিল, এখন তো আরো বেড়ে গেল। সত্যি, পুরুষসিংহ একেই বলে। এমন না হলে স্বামী? শৌর্য, বীর্য আছে,

BanglaBook.org

হ্যাঁ! সামুরাইয়ের রক্তই বটে। ঝাড়া ৪৫ মিনিট ধরে ক্যামেরার আইডেনটিফিকেশনের ব্যবস্থা হলো। ইউয়াকি স্টেশনে খবর দেওয়া হবে। সেখানে প্রমাণ দাখিল করলে ক্যামেরা মিলতে পারে।

কাজিওয়াতা শহরের লোকেরা খুবই দুঃখিত, সেখানে মার্কিনরা বোমা ফেলতে ভুলে গেছে বলে। বোমা না-পড়ার দরুন, ওদের দারুণ ক্ষতি হয়ে গেছে। মহা মুশকিলে পড়েছে তারা—অন্যসব শহরের দিব্যি উন্নতি হচ্ছে, ওদের বেলায় কচু। না রিমডেলিং না রেনোভেশন, না রিকনস্ট্রাকশন, নট কিচ্ছু। কোনোরকমের ডিভেলপমেন্ট প্ল্যানিং নেই। ফলে সামুরাই ঐতিহ্য ঘুণপোকার মতো কাজিওয়াতার ইটে-কাঠে জড়িয়ে আছে। ঐতিহ্যের হাত থেকে রেহাই নেই শহরবাসীর। —তোশিও অবশ্য এতে খুবই খুশি, তাকে তো আর এখানে থাকতে হয় না।—

তানাবের কথা থেকে যা বুঝলুম, তার সারমর্ম এই।

মুরাসাকি একবর্ণ ইংরিজি জানে না। সে হচ্ছে তোশিওর সম্পর্কে ভাই, তারাও ভগ্নাংশ-সামুরাই। কাজিওয়াতা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে সে-ই তার গাড়িতে। দিনের শেষে, মুরাসাকি জাপানীতে কিছু একটা বললো। যা শুনে তোশিও-তানাবে দুজনে কোরাসে গেয়ে উঠলো— "জোবান?" এবং দুজনেরই মুখ স্বর্গীয় উল্লাসে আলোকিত হয়ে উঠল। তোশিও বললে—"চলো, চলো, চাকলাবাকলাতি,এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি। মুরাসাকি আজ আমাদের একটা অসামান্য জিনিস দেখাবে। দারুণ ট্রাডিশনাল। জোবান!"

"সেটা আবার কী?

"স্পা!"

শহর থেকে বেশ দূরে। পাহাড়ের ঢালুতে, ছোটো সাদা দোতলা বাড়ি। গাড়ি থামতেই, এক রুক্ষমূর্তি জাপানী কোত্থেকে উদয় হয়ে গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে হাওয়া হয়ে গেল।

"ওকি? ওকি? গাড়ি নিয়ে চলে যাচ্ছে কেন?"

"ও ঠিক আছে। পার্কিং করছে।" তানাবে সান্ত্বনা দেয়, "এটা একটা বড় হোটেল। চলো ভিতরে যাই।"

দোতলা বাড়িতে ঢুকতেই দুটি সিল্কের কিমোনোপরা সুন্দরী মেয়ে এসে একশোবার কোমর ভাঁজ করে নত, নম্র, বিনয়ী ভাবে, বিনা অনুমতিতে আমাদের পা থেকে জুতো-মোজাগুলো কেড়ে নিয়ে অন্য একরকম মোজা আর ঘাসের চটি পরিয়ে দিয়ে চলে গেল। যাক—গাড়ি গেছে, এবার জুতোগুলোও গেল। কোথায় যে পার্কিং হতে চলে গেল কে জানে? এরা দেখছি একবার এলে আর ফেরবার পথ রাখে না। একশো কুড়ি টাকা দামের জুতোটি খুইয়ে, এই ঘাসের চটি পরে কলকাতায় ফিরলে, তোমাদের বৌদি আমাকে আর আস্ত রাখবে না। একেই তো ক্যামেরা গেছে! মনটা ভারী হয়ে রইল।

মেয়েদের সঙ্গে মুরাসাকির কথাবার্তা সব জাপানীতে হচ্ছে। তোশিও-তানাবে

BanglaBook.org

এসে বললে—"চল, সব ঠিক হয়ে গেছে।" সঙ্গে একটি জাপানী মেয়ে এল পথ দেখাতে। আমরা গিয়ে লিফটে চড়লুম। লিফট উঠছে তো উঠছে। স্পষ্ট দেখেছি ছোটমতন সাদামতন দোতলা বাড়িটায় ঢুকলুম, পাহাড়ের গায়ে—আর এই লিফট তো উঠল সোজা পাঁচতলা। আশ্চর্য কাণ্ড। নেমে একটা টানেলের ভেতর দিয়ে যেতে লাগলুম আমরা, আগে আগে কিমোনোপরা মেয়েটি তুরতুর করে খরগোশের মতো পায়ে হাঁটছে। টানেলে বিজলীবাতি ফিট করা। টানেল দিয়ে বেরিয়ে আরেকটা লাউঞ্জ। আরেকটা লিফট। এবার এটাতে ঢুকলুম। এটা উঠল চোদ্দতলা। আমি প্রশ্ন করা ছেড়ে দিয়েছি। তানাবে নিজে নিজেই বললে—"উনিশতলায় আমাদের ঘর। এটা একটা হোটেল। পাহাড়ের গায়ে গায়ে এদিকে ওদিকে বিলডিংগুলো, টানেল দিয়ে দিয়ে জোড়া। এক একটা বিল্ডিংয়ের এক একরকম হাইট। কোনোটা দোতলা, কোনোটা সাত, কোনোটা চোদ্দ। বুঝেছ তো এবার?"

—"তা বুঝেছি। জাপানী ব্যাপার, সবই জলের মতো সোজা।" ঘরে পৌঁছুলুম। জাপানী স্টাইল ঘর। একদিকটা পুরো মোটা মাদুরে মোড়া। জানলায় ভর্তি দেওয়াল, কাচের বদলে কাগজের সার্সি। অন্যদিকটা পাইনকাঠের প্যানেলিং। ঘরের মধ্যিখানে দারুণ একটা গালার কাজ করা ড্রাগন-ডাইনোসর-সাপ আঁকা অপূর্ব জলচৌকির মতন টেবিল। চমৎকার কাগজের লণ্ঠন জ্বলছে।

"এইটেই তোমাদের ঘর।" দেখিয়ে দিয়ে, কোমর ভাঁজ করতে করতে পিছু হেঁটে সেই সুন্দরী বেয়ারা বেরিয়ে গেল। মুরাসাকি-তোশিও-তানাবে গিয়ে ঝটপট ক'খানা রংচঙে কিমোনো চড়িয়ে এল কোত্থেকে। এবার তারা বসে পড়ল টেবিল ঘিরে। আমিও কোটটি খুলে রেখে যেই বসেছি গিয়ে, তোশিও বললে—"এভাবে বসা মানেই কিন্তু ট্রাডিশনের অপমান। ওঠো, আগে কিমোনো পরে এস।" আমি যেই শার্টপ্যান্টের ওপরে কোটের মতো কিমোনোটি পরে এসেছি, ঘরে যেন বোমা পড়ল। তানাবে বলল—"শোনো, চাকলাবাকলাতি (ওরা চক্রবর্তী ওইভাবেই বলে) কিমোনোটা ওভারকোট নয়। অন্যান্য জামাকাপড় খুলে ওটাকে পরতে হয়।" আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে শার্ট প্যান্ট খুলে রেখে কিমোনো পরে এলুম। তোশিও-তানাবে চোখা-চোখি করলে। দুজনেই মাথা নাড়লে। ভুরু কুচকে সরু চোখ প্রায় বুজে ফেলে বললে—"কিমোনোর নিচে কেবল ভগবানের তৈরি চামড়াটুকুই থাকবার কথা, তোমার কিমোনোর নিচে ওসব কী?"—"কিছুই না। গেঞ্জিইজের"— বলতেই তানাবে বলে উঠল—"ছি ছি ছি। কিমোনোর নিচে গেঞ্জিইজের? এ যে ব্লাসফেমি! না না, শিগগির যাও, খুলে এস। তোশিও ভীষণ আপসেট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। ওদের আবার সামুরাই-রক্ত, কথায় কথায় গরম হয়ে যায়। আমাদের মতো চাষাভুষো তো নয়। মুরাসাকিও দুয়ের তিন ভাগ সামুরাই।"—

কী আর করা, ভগবানের চামড়ার ওপর কিমোনো পরে, ওই জলচৌকির পাশে

BanglaBook.org

নতুন বৌয়ের মতো আড়ষ্ট হয়ে গুটিসুটি কোনোরকমে এসে বসলুম। দেখি দরজা খুলে গেছে। একের পরে এক খাঁদা বোঁচা পরমাসুন্দরী মেয়ে স্বপ্নের মতো কিমোনো পরে, অতিসুন্দর সব পাত্র বয়ে বয়ে ঘরে ঢুকছে। চারজন মেয়ে এসে বসল। টেবিল ভরে গেল খাদ্যে। সঙ্গে বেঁটে কুঁজোতে ভর্তি গরম গরম সাকে-মদ। খাবার-দাবারগুলো বেশিরভাগই কাঁচা। টেবিলে একটা উনুন মতনও রাখা হলো। তাতে কাঁচা মাংস নেড়ে চেড়ে পাতে দেয়। আর কাঁচা ডিম সদ্য ভেঙে বাটিতে ঢেলে দিয়েছে, তাতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে খেতে হয়। সেটা সস। মেয়েগুলো মিষ্টি-মিষ্টি হাসে। আর কিচিরমিচির করে। আর মাথাটি হেলিয়ে দুলিয়ে কেবলই কুচো-গেলাসে সাকে-মদ ঢেলে ঢেলে হাতে তুলে দেয়। আপত্তি করা ট্রাডিশন বিরুদ্ধ। হাঁটু মুড়ে বসে বসে দোজো-দোমো কীসব বলতে বলতে ওই মেয়েরা খুদে পেয়ালা কেবল ভরেই যাচ্ছে। আমরাও পেয়ালা খালি করেই যাচ্ছি। 'সাকে' খাবার আবার নিয়মকানুন আছে। কাপে ঢেলে তো দিব্যি আমার হাতে তুলে দিল। আমি যেই একচুমুক খেলুম, অমনি দেখি মেয়েটা আমার হাত থেকে খপ করে গেলাসটি কেড়ে নিয়েছে। নিয়ে নিজেই তাতে চুমুক দিচ্ছে। একি রে বাবা! কিছু বুঝবার আগেই আবার কাপটি আমার হাতে ফেরত চলে এসেছে। আমি একচুমুক দি, আর সেই মেয়ে একচুমুক দেয়। তারপর কাপটি ভরে দেয়। এরা হচ্ছে সাকে খাওয়ানোর সাকী, পেয়ালা ভরে দেওয়াই এদের কাজ। খাচ্ছি তো খাচ্ছি, সাকে খেতে খেতে শরীর গরম, বেশ নেশা হয়ে গেছে বুঝতে পারছি। আর কাঁচা আনাজ কাঁচা মাছ খেতে বিন্দুমাত্র অস্বস্তি হচ্ছে না। এমন সময়ে দেখি তোশিও-নো তার ডানহাতটা উপর দিকে তুলে ফেলেছে। কি সর্বনাশ। কেলেঙ্কারি কিছু ঘটবে নিশ্চয় এবারে। আর বাঁহাতটাকে বুক-পেটের মাঝামাঝি আড়াআড়িভাবে রেখেছে। বীরত্ব ফুটে বেরুচ্ছে ভঙ্গিতে। নিশ্বাস বন্ধ করে আছি।

দেখলুম কিছুই হলো না। বেঁটে বেঁটে মিঠে মিঠে মেয়েগুলো থালাবাটি তুলে নিয়ে পেছু হেঁটে হেঁটে গুটি গুটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তোশিও-নো হাতটি নামিয়ে নিয়েই, আবার ঝাঁকুনি দিয়ে তুলে ধরল। আমি ভাবলুম, এবার বোধহয় আমাদেরই গুটি গুটি পেছু হটে বেরিয়ে যেতে বলছে। কিন্তু, না। দেখি দরজা খুলে গেল। চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে মেয়েগুলি খুরখুর তুরতুর করে আবার ঘরে ঢুকছে। চায়ের নিয়মকানুন আলাদা। অত দোজো-দোমো করে সেধে সেধে চেপেচুপে খাওয়ানো নেই, পেয়ালা কেড়ে নিয়ে তেড়ে এসে চুমুক দিয়ে দেওয়াও নেই। সাকের বেলায় যেমন ছিল। নির্ভয়েই চা-পান-পর্ব শেষ হলো। তবে চা-টা জলপাই-সবুজ রঙের। আর বুনো কষা স্বাদের। খেয়ে ভুলেও মনে হয় না চা খেলুম। তায় দুধ চিনি কিছু নেই। চীনে চা'র মতো জুইফুল পর্যন্ত না। উপরন্তু সর্বক্ষণ উঁচু হয়ে হাঁটু ভাঁজ করে নীলডাউন ভঙ্গিতে বসে থাকা জাপানের সামুরাই ট্রাডিশন রাখতে গিয়ে আর বাঙালী কেরানী আমরা পারি? চা খাওয়া শেষ হতেই তোশিও-নো

এক্কেবারে সটান খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন—দুই পা ফাঁক করে দুই হাত আকাশে তুলে ইংরিজি 'এক্স' অক্ষরের মতো চেহারা করে তিড়িক্ তিড়িক্ করে দুবার লাফালেন মেঝের ওপরে—ঘরে বেশ ভাইব্রেশন জাগলো। মুখে ইংরিজিতে মিলিটারি সুরে অর্ডার করলেন—"নাউ টু দ্য বাথ!" অমনি তানাবে এবং সেই শহরের নীরব অধ্যাপক মুরাসাকিও একবার ঠিক ঐভাবে নেচে উঠল—

"টু দ্য বাথ! টু দ্য বাথ!" যেন যুদ্ধে যাচ্ছে। আমিও দেখাদেখি লাফাব বলে যেই উঠতে গেছি, উঠব কি, মুখ থুবড়ে পড়লুম মেঝের ওপরে। অতক্ষণ উপুড় হয়ে হাঁটু মুড়ে নীলডাউন হয়ে বসে থাকা।— দুটি পা জন্মের শোধ ঐ ভঙ্গিতেই রুদ্ধ হয়ে গেছে। ভাঁজ খোলে কার সাধ্যি! তা তিনবারের বার যেই পা সোজা হলো, অমনি তোশিও-র মতো করে দুবার ধুপ ধাপ লাফিয়ে নিলুম। লাফটা অত্যাবশ্যক। বোঝাই গেল। পাগুলো সোজা করবার জন্যে। মেয়েরা সব দোর ঠেলে বেরিয়ে খুরখুর তুরতুর করে হেঁটে আগে আগে যেতে লাগলো, পিছু পিছু মার্চ করে চলছি আমরা। প্রথমে তোশিও-নো, তার পিছনে তানাবে, তার পিছনে আমি। আমার পিছনে মুরাসাকি। রহস্যময় কাঠের তৈরি টানেল, আধো-আলো আধো-অন্ধকারে। এঁকে বেঁকে চলেছে তো চলেইছে পাহাড়ের বুকের মধ্যে। আমরাও মার্চ করতে করতে যাচ্ছি। একটা লিফটের কাছে এসে রাস্তাটা বৈঠকখানা হয়ে গিয়ে শেষ হলো। লিফটে উঠে স্পষ্ট দেখলুম বাইশতলার নিচে জি-ফ্লোর, তারও নিচে ও-ফ্লোর, সেই বোতাম টেপা হলো। অথচ আসার সময় সাদাচোখে স্পষ্ট দেখেছি, চোদ্দতলা উঠলুম। নামছি চব্বিশ তলা। এটা কেমন করে হচ্ছে?

সাকে-টা বড্ড বেশি হয়ে গেছে নাকি? খুব খুদে পেয়ালা বলে টের পাওয়া যায় না তেজটা কী প্রচণ্ড। ও-ফ্লোরে নেমে দেখি সামনেই এক সুবিশাল জলকুণ্ড। উঁহু, সুইমিং পুল না, কুণ্ড। কুণ্ডটা ভাগ ভাগ করা আছে, জলের নিচে চৌকো চৌকো দেওয়াল, তার ওপর দিয়ে জল চলাচল করছে। ওখানে পৌঁছে গিয়ে মেয়েরা বিদায় নিয়ে গেল। তোশিও-নো, তানাবে, মুরাসাকি খপাখপ তাদের কিমোনো খুলে ফেলে ঝপাং ঝপাং করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পরনে ভাগবতী চামড়া।

আমি আর কী করি? "যা থাকে কপালে" বলে আমিও চোখ বন্ধ করে কিমোনো খুলে সামনের কুণ্ডটায় ঝাঁপিয়ে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে বার্ড স্যাংচুয়ারির মতো কিচিরমিচির শুরু হয়ে গেল—তোশিও-নো ওদিক থেকে হেঁকে উঠলেন, "ওখানে নয়, এদিকে এস। ওটা হলো লেডিস কুণ্ড।" আমি তো পালাতে পথ পাই না —তাড়াতাড়ি উঠে পাশের কুণ্ডে ঢুকে পড়ি। শিগগিরই দেখলাম লেডিসরাও এসে কিমোনো খুলে ফেলে ঝপাঝপ ঝাঁপিয়ে পড়ছেন কুণ্ডে। এত স্ত্রী-পুং কুণ্ড ভাগাভাগির উদ্দেশ্য আর যাই হোক, স্নাতকদের লজ্জা নিবারণ নয়। কেননা মাটির ওপরে যা কিছু লিঙ্গভেদের বন্দোবস্ত তা কেবল মেঝের ওপরে লাইন টেনে। শুধুই তাত্ত্বিক ভেদ, থিওরেটিকাল ডিসটিংশন। পর্দা বা দেয়ালের মতো জাগতিক আড়াল-

আবডালের বালাই নেই। দেয়াল যা কিছু জলের নিচে। আর জল তো নয়, অগ্নিকুণ্ড। গন্ধকের হলদে ধোঁয়ায় বাতাস আবছা, দৃষ্টি অস্পষ্ট, ওটুকুই আব্রু। চোখের দৃষ্টি কেবলই ঝাপসা হয়ে যায়। চতুর্দিকে হলদে হলদে গন্ধকচূর্ণ জমে আছে পাথরের ওপরে। আর গন্ধকবাষ্পের কড়া গন্ধে নাক ভরপুর। অথচ এতটুকু শ্বাসকষ্ট নেই। জল এত গরম, যে মনে হলো একদম ঝলসে গেছি—এক লহমার মধ্যেই সাকে খাওয়ার যা যা কিছু নেশা সব ছুটে গিয়ে হাড়েমজ্জায় ঝনঝনে জ্ঞানগম্যি এসে গেল।

যখন তোশিও-নো জল ছেড়ে উঠলো, পেছু পেছু আমরাও উঠলুম ডাঙায়। কেউ কারুর দিকে সোজাসুজি তাকাচ্ছি না, আড়ে আড়ে। প্রত্যেকেই দেখছি প্রত্যেকের চেহারা ঠিক তেলে-ভাজা চিংড়ি মাছের মতন। লাল টকটক করছে। ভগবানের চামড়া। গন্ধকের ধোঁয়ায় অবশ্য সবাই কিছুটা আচ্ছন্ন। কিমোনো নিতে গিয়ে দেখি কিমোনো কখন হাওয়া হয়ে গেছে। অ্যাঁ! এবারে কি তবে বিনা কিমোনোতেই ফিরে যেতে হবে? আমি তো বসে পড়েছি প্রায় মাটিতে—এমন সময়ে দেখি মস্ত সাদা একটা তোয়ালে ছুঁড়ে দিচ্ছে কেউ অন্তরীক্ষ থেকে। প্রত্যেককে একটা। তোয়ালে লুফে নিয়ে গা মুছে তোয়ালে জড়িয়ে গুটিগুটি এগোচ্ছি, তোশিও বলল—"ওকি! ওকি! তোয়ালে রেখে যাও।"

তোয়ালে রেখে? তানাবে, মুরাসাকি ঝড়াঝঝড় তোয়ালে মাটিতে ফেলে দিলে। অন্তরীক্ষ থেকে ফর্সা কাচা কিমোনো এসে গেল তাদের হাতে। বেঁটেখাটো একরঙা কিমোনো—গতবারের মতন রংচঙে বড়সড় নয়। দেখাদেখি আমিও। তবু ভালো, যাহোক একটা জামা পরে যাওয়া হবে ঘরে। অন্তত। গেঞ্জি-ইজের প্রভৃতি তো অনেকক্ষণই হলো বিস্মৃত দিনের উপকথায় পরিণত হয়েছে। তবু স্বীকার করতেই হবে, শরীর বেশ চনচনে মনে হয়েছে এই গন্ধককুণ্ডের জলস্পর্শে। পাতালের আগুন থেকে উঠে-আসা-জল—সেকি সোজা ব্যাপার?

আমরা পুনরায় মার্চ করতে করতে গিয়ে লিফটে চড়লুম। এবার উঠলুম উনিশতলা। নাঃ—মাথাটা একেবারেই খারাপ হয়ে যাবে এবারে। আমার অবস্থা দেখে তানাবের মায়া হলো। ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে দিলো। এদের আসলে অনেকগুলো লিফট আছে, একেকটা একেক রকম লেভলে যাতায়াত করে। প্রত্যেকবার ভিন্ন ভিন্ন লিফটে চড়ছি বলে ভিন্ন ভিন্ন তলার হিসেব পাচ্ছি। পাহাড় কেটে কেটে ঘরবাড়ি তো একেক হাইটে এক এক তলা।

ঘরে এসে পৌঁছেই দেখি মাটিতে পাতা হয়ে গেছে চমৎকার বিছানা। ঠিক যেমন দেশের বাড়িতে বিছানা হয়। মেঝেয় একটি তোষক, তাতে সাদা ধবধবে চাদর মোড়া, দুটি বালিশ, তাতে সাদা ধবধবে ওয়াড় পরানো; একটি লেপ—তাতেও দুগ্ধ-ধবল ওয়াড়। বালিশের নিচে ফর্সা কিমোনো ভাঁজ করা। দেখেই আরাম হলো। পর পর চারখানা মাদুরে চারখানা বিছানা। শুয়ে পড়ব ভাবছি। কথাটা বলতেই

BanglaBook.org

তোশিও— "শোবে মানে? স্নান করতে হবে না?"

—"আবার স্নান? এতক্ষণ তবে কী করলুম—"

—"ওটাকে ধুতে হবে না? গা-ময় গন্ধকচূর্ণ বসে গেলে ঘা হয়ে যাবে যে!" বলেই লেফট-রাইট করে তোশিও বাথরুমে চলল। তানাবে আমাকে বললে—"যাও, তুমিও যাও, টু অ্যাট এ টাইম।"—এ আবার কিরকম নিয়ম রে বাবা? একা একা কি বাথরুমে যাওয়াও বারণ? বাথরুমে ঢুকে দেখি আশ্চর্য ব্যবস্থা। পাশাপাশি দুটি বিশাল স্টীলের বালতি। অর্থাৎ বালতির মতো আকৃতির টব। খালি। তার পাশে দুটি টেলিফোন। ঘরে ঢুকেই কিমোনো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তোশিও-নো ফোন তুলে কিছু কথাবার্তা বলল। দেখলুম এ-ঘরে থরে থরে পরিষ্কার তোয়ালে সাজানো আছে। বাঃ। এবং কিছু কিমোনোও। তোশিও দেখি টবের মধ্যে ঢুকে উবু হয়ে বসেছে। টবের কিনারা দিয়ে মাথাটি উঁচু হয়ে বেরিয়ে আছে। অন্য টবে আমিও বসলুম। হঠাৎ দেখি বালতি আপনা আপনি গরম জলে ভরে উঠছে। তলা থেকে জল উঠে গলা পর্যন্ত ভরেই থেমে গেল। আমাকে কোনো কল খুলতে হলো না, মগটগের তো বালাই নেই। জলে কেমন-কেমন গন্ধ?

—"এটা যে ওই স্পা থেকে। কুণ্ডের জল কিনা।" তোশিও বলল। আমি তো থ!

—ঘরেই আসে? তবে কেন অত কষ্ট করে চব্বিশ তলা ঠেঙিয়ে পাতাল-প্রবেশ, এবং সর্বসমক্ষে কিমোনো ত্যাগ? দিব্যি বন্ধ দরজার ভেতরে বালতি করে চলে আসছে যখন, প্রথমেই তো এখানে নেয়ে নিলে হতো।

—"দূর, তা কখনো হয়? ট্রাডিশন বলে একটা ব্যাপার আছে না? তোমার কিছু খেয়াল থাকে না, কুণ্ডস্নান একটা ট্রেডিশনাল কাস্টম? এখানে ওই জল পাইপে করে আনা হচ্ছে, তার কারণ ওই জল না হলে গা থেকে গন্ধকের গুঁড়ো উঠবে না।"—এক সময়ে ঐ জল আবার আপনা আপনি নেমে গেল, বালতি খালি হয়ে গেল। যেন ম্যাজিক। কোথা দিয়ে যে আসছে, কোথা দিয়ে যে যাচ্ছে, কিছুই টের পাচ্ছি না। জলটা যেন জ্যান্ত।

—"এবার ফ্রেশ ওয়াটার।"

—"সাবান? সাবান আছে?"

—"সাবান ব্যবহার করা ট্রাডিশনে নেই।"

—"আই সী। ফ্রেশ ওয়াটার এলেন। ফ্রেশ ওয়াটার গেলেন। দিব্যি ঝরঝরে লাগছে। লাফিয়ে উঠে পড়ছি, তোশিও-নো ডান হাত নেড়ে ফেললেন। আমার বাঁ হাতটি ডানহাতে বজ্রমুষ্টিতে ধরে এক ঝাঁকুনিতে ফের বসিয়ে দিলেন বালতিতে। "এইবারে আসল স্নান। এলিকশির অফ বাথ। এইবারে যে জলটা আসবে সেটা হচ্ছে পিওর কপার মিশ্রিত। বিশুদ্ধ তাম্রলিপ্ত জলে স্নান করলে তবেই তো গন্ধক-কুণ্ডে স্নানের পূর্ণ উপকারটা পাবে?"

BanglaBook.org

—জল আসতে শুরু করেছে। আপাদমস্তক কথাটার মানে বোঝা যাচ্ছে, পা থেকে জল উঠছে। আপাদস্কন্ধ উঠবে।—"গাউথামা বুদার নির্দিষ্ট প্রণালীতে এই রিচুয়াল বাথটা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ তো তোমাদের দেশেরই, 'অ্যাব্যা-গ্যায়ানা' বাথ। তোমাদের মন্দিরে এসব ব্যবস্থা নেই?" মনের আনন্দে ডুবতে ডুবতে তোশিও বলল। ও হবি! এর নাম অবগাহন? গৌতম বুদ্ধের প্রণালী?

"আমাদের দেশে এসব যন্ত্রপাতি এখনো পৌঁছয়নি। ডিভেলপিং কান্ট্রি। এখনও বানাতে শিখিনি।"

—"আড়াই হাজার বছরেও বানাতে শেখনি? তাজ্জব কথা!" থুপে থুপে গা মুছতে মুছতে তোশিও বলল। লজ্জায় চুপ করে যাই।

ঘরে ফিরেই চমৎকৃত। দেখি তানাবে-মুরাসাকি দুজনেই ঝাঁ চকচকে উলঙ্গ, তারাও পাশের বাথরুমে গিয়ে দ্বৈত-স্নান সেরে এসেছে। জোড়ায় জোড়ায় নাইতে হয় এখানে। আপাতত তারা গম্ভীর মুখে কিমোনো ভাঁজ করছে। বালিশের নিচে যত্ন করে কিমোনোটি রেখে তারা মিষ্টি হেসে শুভরাত্রি বলে শুয়ে পড়ল। আমার আর লজ্জা করবে কি।

—"এ জন্মের মতো আর হয়ে গেছে যা হবার।" এমন-কী লেডিস কুণ্ডে পর্যন্ত নেমে পড়েছি। আমি ফিসফিসিয়ে তোশিওকে বললাম।

—"এবার গেঞ্জি-টেঞ্জি ইজের-টিজেরগুলো পরে নিলে কি ট্রাডিশনের অবমাননা করা হবে?"

—"পরতে পারো কিন্তু কেন পরবে?" তারপর তানাবের দিকে লক্ষ্য করে বলল—"ওরা চাষাভুষো মানুষ। লজ্জা শরমের বালাই নেই, কিমোনো খুলে ফেলেছে। ছি ছি ছি!"

—"তুমি বুঝি কিমোনো পরেই ঘুমাও?"

—"দুর কিমোনো পরে কেউ ঘুমোয়? আমি লেপের নিচে ঢুকে খুলে রাখব। সেটাই সভ্যতা।"

ঘুম ভেঙে উঠে দেখি সবাই প্রস্তুত। জলচৌকিতে জাপানী ব্রেকফাস্ট চলে এল। কাঁচা মাছ, কাঁচা ডিম, গরম সুপ, গরম ভাত, পাঁপরভাজার মতন কুড়মুড়ে সবুজ শ্যাওলা ভাজা। শসার আচার। খেয়ে দেয়ে রওনা দিলুম। জুতোজামা রাখা ছিল যেখানে, সেখানে যেতেই ট্রেতে করে তত্ত্বের মতো সযত্নে সাজিয়ে বিল এলো। তোশিও-তানাবে, আমি এবং মুরাসাকি, সকলে মিলে বিল নিয়ে কিঞ্চিৎ কাড়াকাড়ি চলল— শেষটায় মুরাসাকিই দিয়ে দিলে। কেননা সেইটেই নাকি ট্রাডিশন। ওটা ওরই শহর, আমরা ওর অতিথি। জাপানী ভাষায় বিলটা লেখা ছিল, তাই কাড়াকাড়ি করলেও বিলটা যে কত তার বিন্দু-বিসর্গও আমি বুঝতে পারিনি। ছবির মতো সুন্দর বিল, হ্যাণ্ডমেড পেপারে তুলি দিয়ে আঁকা। যেন বাঁশের ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার জন্য।

জোবান থেকে কাজিওয়াতা। সেখানে মুরাসাকিকে বিদায় দিয়ে আমরা ট্রেনে

BanglaBook.org

উঠলুম, ইউয়াকি। ইউয়াকি স্টেশনে নেমে তানাবে মনে করিয়ে দিল—"হারানো ক্যামেরা পুনরুদ্ধার করবে না? বের কর তোমার কাগজপত্তর পাসপোর্ট কমপ্লেনের কপি।" এসব সময়ে তোশিও-নো অন্যমনস্ক হয়ে থাকে। এবম্বিধ তুচ্ছ ব্যাপারে মন দেওয়া সামুরাইদের যোগ্য নয়। তানাবে বলল,—"তুমি কাগজপত্র বের কর, আমি একটু মেনস রুম থেকে ঘুরে আসছি।"

—আমি স্টেশনমাস্টারের ঘরে ঢুকে "গুড ইভনিং" বলতেই সে বলে উঠল, —"কামেলা?" এবং ড্রয়ার খুলে তোদের বৌদির বক্স ক্যামেরাটি বের করে দিয়ে এক গাল হেসে বললে—"তু ওলদ। নিউ বাই।" আমি তাড়াতাড়ি বললুম — "আইডেন্টিফিকেশন? পাসপোর্ট নম্বর? এক্সপোজার নম্বর? পেপার্স?" স্টেশন-মাস্টার হেসেই কূল পায় না। গড়িয়ে গড়িয়ে হাসে।—"হোয়াত আইদেনতিফিকেশন? ইউ ইনদিয়ান। আই নো ইনদিয়ান লস্ত ওলদ কামেলা।" সত্যিই তো? আমার চামড়াই তো আমার আইডেনটিটি। এই সুদূর উত্তর-পূর্ব জাপানী মফঃস্বল শহরে আর কজন ভারতীয় এসে বক্স ক্যামেরা হারাচ্ছে? আর এর জন্যে কি না এত ঝামেলা কাজিওয়াতাতে— ঝাড়া পঁয়তাল্লিশ মিনিট গেছে ফর্ম ভরতে। বেরিয়ে দেখি তোশিও আর তানাবে কী সব পরামর্শ করছে। আমাকে বললে, "ক্যামেরা পেয়েছ তো? চলো, বাড়িতে গিয়ে সব কথা হবে।" কিসের পরামর্শ? গাড়িতে যেতে যেতেই প্রশ্ন করি। ব্যাপার কি? তানাবে বললে, "মুরাকামি যদিও বিলটা দিয়েছে, কিন্তু বিল হয়েছে বিরাট। ওটা কোনো একজনের স্কন্ধে ফেলে দেওয়া যায় না। এখন ওকে কীভাবে আমরা আমাদের অংশটা শোধ করতে পারি, ট্রাডিশন অনুযায়ী, তোশিওকে তাই জিজ্ঞেস করছি। আমরা চাষাভূষো লোক— আমরা অত আদব কায়দা জানি না তো? তিনজনে মিলে এক লক্ষ কুড়ি হাজার ইয়েন পাঠালেই হিসেবটা এক হবে, এইটুকু বলতে পারি আর কি।" (অর্থাৎ চার হাজার টাকা।) তোশিও-নো গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন—"চিঠি লিখতে হবে। লিখতে হবে —তোমার যত্ন-আত্তিতে এবং অতিথি সৎকারে আমরা তৃপ্ত। যারপরনাই খুশি হয়ে এই টাকাটা সেই বিমল আনন্দের প্রকাশস্বরূপ তোমাকে পাঠাচ্ছি।—ওনলি অ্যাজ এ টোকেন অব আওয়ার জেনুইন অ্যাপ্রিসিয়েশন"—অর্থাৎ বখশিশ? বন্ধুর আতিথ্যের শেয়ার দেওয়া মানে ট্রাডিশনের অবমাননা। কিন্তু বখশিশ? সামুরাইদের বার্থরাইট ওটা।

আবার চমৎকার হ্যাণ্ডমেড পেপারে ছবির মতো অক্ষরে তুলির মতো কলমে লেখা হলো সেই কিম্ভূত চিঠি। এবার সই করার পালা। বলাবাহুল্য, প্রথমেই তোশিও। তারপরে আমি, যেহেতু আমি চক্রবর্তী, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, যারা রাজ্য-শাসনও করত —সেহেতু সামুরাইয়ের পরেই জাতিগতভাবে আমার স্থান উচ্চে। সবার শেষে তানাবে। (ব্যাটা চাষা)—"আমি কি বাংলাতেই সই করব?" তোশিও বললে, "না! বাংলা কেন, কোনো ভাষাতেই তুমি এ চিঠি সই করতে পার না। কেননা এটা জাপানী

ভাষায় লেখা। এবং তুমি জাপানী পড়তে পার না। যে ভাষা তুমি পড়তে পার না, সে ভাষায় লেখা কোনো ডকুমেন্টেই আমরা তোমাকে দিয়ে স্বাক্ষর করাতে পারি না। সেটা বে-আইনী।" —তবে? এইমাত্র আমার অংশটা আমি শুধে দিয়েছি —যা কিছু বক্তৃতার দক্ষিণাস্বরূপ জুটেছিল, সবটা গেছে ট্রাডিশনের দয়ায়, জোবানের গন্ধকের বাষ্পে! এখন সইও করতে পারব না?—"তাহলে আমি কি তাকে আলাদা ইংরেজিতে চিঠি দেব?" এবারে তানাবে হাসল—"ও কি ইংরিজি জানে?" "তাই তো! তবে?"

—"তবে আর কি? তোমার নামটা আমিই সই করে দিচ্ছি জাপানী ভাষাতে। তাহলে আর কোনো গণ্ডগোল হবে না।" গুরুগম্ভীর রায় দিলেন সামুরাই তোশিও-নো। আমার বদলে—তিনি সই করলে সেটা যদি বে-আইনী না হয় তাতে আমার আর বলবার কিছুই থাকে না।

হাসিমুখে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। কেবল আমার মুখের হাসিটি উবে গেল। —"এত বেশি খরচ হলে আর কোনো ভালো জিনিসকেই কি ভালো লাগে?" —আশ্চর্য কথা—তানাবে-তোশিও দুজনেই আমার এ দুঃখটা কিন্তু দিব্যি বুঝতে পারলে। কি চাষা, কি সামুরাই বেশি খরচের দুঃখটা সবাই বোঝে।—"আমার গাড়িটার মতন হলো আর কি।" তোশিও বলে।

—"গাড়ি? তোশিও-নো, তুমি গাড়ি চালাও না শুনেছিলুম যে?"

—"গাড়ি চালায় না ঠিকই। তা বলে গাড়ি থাকবে না কেন? কোনো ইউনিভার্সিটি প্রফেসারের গাড়ি নেই, এটা লজ্জার কথা!" তোশিওর হয়ে তানাবেই উত্তর দেয়। —"যেমন তেমন গাড়িও নয় তোশিও-নোর। স্পেশাল অর্ডার দেয়া গাড়ি। দেখতে যাবে একদিন?"

—"বেশ তো। আজই চল না। গাড়িও দেখবে, চাও খাবে।" তোশিও নেমন্তন্ন করলে।

বিকেলে গেলুম। সত্যিই দারুণ গাড়ি। গ্যারাজ আলো করে আছে।

ভেতরে ছোট রেফ্রিজারেটর ফিট করা। তাতে বরফের ট্রেতে গোলগোল মাঙুরের মতো বরফ জমেছে। ছোট্ট কাবার্ডে দামী স্কচ, গেলাস সাজানো! গদির মতো কার্পেট মোড়া গাড়ির ভেতরটা। সামনে ড্যাশবোর্ডে ছোট টেলিভিশনে রঙিন জাপানী নাটক হচ্ছে। পাশে একটা কুলুঙ্গিতে কার্পেটের সঙ্গে রং মেলানো টেলিফোন। ঠিক খেলনার মতন। ছোট্ট।

—"ফোনটা সত্যিকারের?"

—"এখান থেকে বাড়িতে ফোন করতে পারো। করবে? নিউইয়র্ক অসলো সব পাওয়া যায়।"

আমি তো হাঁ। এমন গাড়িখানা, অথচ তোশিও অফিসে আসে ট্রেনে, বাসে? ব্যাপার কি? ওই ব্যাপার। গাড়ি চালানোর মতো নীচকর্ম সামুরাই করে না। কিন্তু

BanglaBook.org

শোফার রাখার মতো বেতনও বিশ্ববিদ্যালয় দেয় না। তার ওপর গাড়ির মেইনটেনেন্স খরচ আছে না? দু' দুবার পুরো কার্পেট, আপহোলস্ট্রি, ফ্রিজ, টিভি, বদলাতে হয়েছে না?

—"কেন? আউট অব ডেট হয়ে যায় বুঝি?" আমি ভয়ে ভয়ে বলি।

—"তা নয়। মানে বাড়িটা তো সমুদ্রের ধারে। দু'দুবারই টাইফুনে সমুদ্রে বান ডেকে, গ্যারাজসুদ্ধ গাড়ি জলের নিচে ডুবে গেছিল! তাই বদলাতে হয়েছে।"

—"এঞ্জিন আছে?" হঠাৎ কি মনে করে বলি।

—"নেই? বাঃ! তবে আর গাড়ি কেন? বাড়ি হয়ে যাবে তো। তানাবে, দেখিয়ে দাও তো স্টার্ট দিয়ে"— তোশিওর স্বরে আহত সম্মানের ছোঁয়া।

—"থাক, থাক। আর দেখাতে হবে না। এই গাড়িটা ব্যবহারে লাগে না এটা বড়ই দুঃখ কিন্তু?"

—"কে বললে কাজে লাগে না? এই তো কাজে লাগছে।" হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে তোশিও বলে। "দিব্যি ভালো একটুখানি জায়গা এয়ারকনডিশন করলেই চলে যায়, বেশ 'কোজি', এন্টারটেইন করার পক্ষে মন্দ কি?"

অর্থাৎ এটা ওর গাড়ি নয়, বাড়িই। ওর বৈঠকখানা আসলে। ভালো।

তানাবে বললে, "জোবানে বড্ডই খরচ হয়ে গেছে। ঢাকলাবাকলাতির জন্যে আমাদের একবার সুজিকিতে যেতেই হবে। চল, কালই সুজিকি যাই।" আমি হাঁ হাঁ করে বাধা দিই— "আর ভাই কোথাও যাব না। খুব ভালো লাগছে জাপানে। কিন্তু হাতে টাকা নেই। আরও তো তিন-চারদিন থাকতে হবে।"

—"টাকা লাগবে না। সুজিকি তো জাপানের মহারাজার অতিথিশালা। ৯০০ অব্দ থেকে এখানে মাত্র এক টাকা করে নামমাত্র সেলামী লাগে। খেতেও একটাকা। শুতেও একটাকা। চল, চল, খুব সুন্দর জায়গা। ট্রাডিশনাল অতিথিশালা কাকে বলে দেখে আসবে।" শুনে খুব উৎসাহ পেলুম। শহরে থাকলেই বরং খেতে শুতে ঢের বেশি খরচ। তার চেয়ে ওখানেই দু-তিনদিন কাটিয়ে আসা ভালো। তানাবে বললে —"কাল লাঞ্চের পরই বেরিয়ে পড়ব।"

গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে একটি ছোট টিলার ওপারে বনের মধ্যে কাঠের বাড়ি। চমৎকার প্যাগোডার মতো দেখতে। কাঠের থাম। দরজা। খিলেন। ঘরে বিরাট প্রদীপ জ্বলছে।—লালেতে কালোতে সোনাতে কাঠের ওপর গালার কারুকার্য করা বারান্দা। অপরূপ বারান্দা। পুরোনো বলে পুরোনো? বলে দিতে হয় না, যে ৯০০ অব্দের। বিদ্যুৎ নেই। সবকিছু সেই পুরোনো দিনের মতোই। খুব সম্ভ্রান্ত ঘরদোর। খুব ট্রাডিশনাল। তোশিও মহা তৃপ্ত।—"এখানকার খাদ্যও আধুনিক নয়। ৯০০ অব্দের মেনু অনুযায়ী রান্না হয় এখানে।" বাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করে এক থুত্থুরে বুড়ো আর তার থুত্থুরী বুড়ী পাহারা দেয় বাড়িটার। বেলা চারটেয় পৌঁছেছি।

BanglaBook.org

বুড়ী রাগ করে বললে—"এত বেলায় এলে, ডিনার দিতে দিতে রাত ৯টা হয়ে যাবে। তা যাক, এখন চা খাও।"

—"এরাও কি ৯০০ অব্দ থেকে আছে?"

—"তা বলতে পারো, এরা আছে নব্বুই বছর। কিন্তু এই কাঠুরের পরিবারই এই জায়গার ট্রাডিশনাল খবরদারি করে আসছে সেই ৯০০ অব্দ থেকে। পূর্বপুরুষের অধিকারক্রমে এরা চাকরি করে যাচ্ছে।"

—"বুড়ো মারা গেলে কী হবে? ছেলেপুলে আছে?"

—"আছে। শহরে চাকরি করে। বুড়ো মরলে তাকে এই বনে এসে এই কাজ নিতে হবে। কিন্তু সে নিতে চায় না। তার বউও।" হঠাৎ তানাবে থেমে গেল। তোশিও সূত্রটা তুলে নেয়—

—"তার বউও ঠিক আমার বউয়ের মতো খুব শহর ভালোবাসে। কিন্তু ছেলেটা আমার মতো নয়। তাই সেও শহরে থেকে গেছে বউয়ের কিমোনোর পিঠে ওবি হয়ে। যত মেনিমুখো ছেলে। হুঁ,"—নাক দিয়ে বিশ্রী শব্দ করে অবজ্ঞা প্রকাশ করা তোশিওর মুদ্রাদোষ।

—"মেয়েদের কথায় চলেছ কি প্রলয় অনিবার্য। মেয়েরা থাকবে মেয়েদের মতো। এই যে তানাবে, বৌকে চাবি দিয়ে রাখে—ঠিক করেন ওরা চাষা—ওদের সব ব্যাপার সোজাসুজি। এটা কিন্তু খুব প্রশংসার।"

—"এই কাঠের বাড়িটার কড়ি-বরগাগুলো দেখছো? এই যে দামী কাগজের লণ্ঠন? এই যে মাদুর?"—নির্বিকার গলায় ঠিক এই সময়ে তানাবে আমাকে রাজ-অতিথিশালার ঐতিহাসিক ঐশ্বর্য প্রদর্শন করতে থাকে। কড়িবরগা দেখব কি? তোশিওর কথা শুনে তো আমি হাঁ। শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ঐ তানাবে, সে কিনা বৌকে চাবি দিয়ে রাখে? অথচ বেশ তো সুস্থ স্বাভাবিক দেখায় ওকে! বেচারী বউয়ের অপরাধ সে পরমা সুন্দরী!

আশ্চর্য দেশ বটে জাপান! ছোট শহরে ইউয়াকিতে এই চলেছে, অথচ টোকিওতে দেখে এলুম একটা রেস্তরাঁ হয়েছে গিনজাতে, টোকিওর চৌরঙ্গী, যেখানে স্বাধীন মেয়েরা এসে নিয়মিত সন্ধ্যাবেলা তাদের পুরুষসঙ্গী ভাড়া করে নিয়ে যায়। ওটাও যে দেশে চলছে তোশিও-তানাবের বউশাসনের চাষী-সামুরাই ডিরেক্ট মেথডও সেখানেই চলছে। সত্যি, কী ভুলই যে করেছি জাপানী মেয়ে বিয়ে না-করে। তোদের বউদি তো পারলে আমাকেই চাবি দিয়ে রাখে, নেহাত আপিস যেতেই হয় তাই!"

—"তা, আনলে না কেন একটা জাপানী বউ ধরে? তবু তো লোকে দেখত একটা কিছু আনলো। চাবি দেব না আরো কিছু—যা গুণবান দাদামণিটি তোমাদের। এক্ষুনি আমি দাতব্য করে দিচ্ছি, দেখবি কেউ ওকে ভুলেও নেবে না। ঈঈশশ্" বৌদি ফোঁস করে উঠতেই দাদা বেগতিক বুঝে আবার গল্প ফেঁদে ফেলেন—

—"আমি স্তম্ভিত, ওদিকে তানাবে দিব্যি শান্ত মুখে বলে যাচ্ছে— "এই যে

BanglaBook.org

কাঠের জলচৌকিটা দেখছ, এটা তৈরি হয়েছে হিরোসাকিতে। বিখ্যাত মধ্যযুগীয় শিক্ষাকেন্দ্র। অবশ্য আপাতত আপেল চাষের জন্যই বিখ্যাত।"—"সামুরাইদের আড্ডা বলেও প্রসিদ্ধ ছিল ওটা"—তোশিও যোগ করে দেয়। কী স্বাভাবিকভাবেই না ওরা বউ-ত্যাগ, বউ-বন্দীর প্রসঙ্গ আলোচনা করে!

বিচ্ছিরি সবুজ চা খেয়ে বারান্দায় এসে বসলুম। চারিদিকে জাপানী জঙ্গল, তাতে চমৎকার সব জাপানী পোকামাকড় ডাকছে, পটে আঁকা ধানক্ষেত, গ্রাম আরো দূরে, প্রশান্ত মহাসমুদ্র দেখা যাচ্ছে। চোখ জুড়িয়ে যায়। ক্রমশ রাত হলো। ৯টার সময়ে খাবার এসে পড়ল। খাবার মানে একটা ভাতের ফ্যানের মতন সুপ, ওরা বলল বাকহুইট হচ্ছে খুব শক্ত দানার একরকম শস্য, গমেরই জাতভাই, তবে মানুষে আজকাল ওটা বড় একটা খায় না।—"মধ্যযুগের জাপানে খুব খেত। আজকাল কষ্ট করে যোগাড় করতে হয়।" —তোশিও জানালেন সগর্বে। "সেদ্ধ হতে পাঁচ ঘণ্টা লাগে।"—

—"প্রেশারকুকার নেই?"

—চাবুক মারলে যেমন কুঁকড়ে ওঠে মানুষে, তেমনি কুঁকড়ে গিয়ে তোশিও-নো বললেন, "চাকলাবাকলাতি। মাদার ইণ্ডিয়ারও তো গ্রেট ট্রাডিশন আছে? তবে তুমি কী করে বারবার ট্রাডিশনকে অবমাননা করছ? শুনছ এরা কত কষ্ট করে বাকহুইট যোগাড় করে...সেটা কি প্রেশারকুকারে রাঁধবে বাছা? ওটা কি মধ্যযুগের ট্রাডিশনাল বাসন? এখানে রান্নাবান্না সব হয় ৯০০ অব্দের নিয়মে। মেনু, রেসিপি সবকিছু ৯০০ অব্দের। তুমি সম্রাট হিরোহিতোর অতিথি!"

—ঐ সুপ বোলের পাশে দুটি ছোটো ছোটো নীলরঙের ডিম। "আমাদের বাড়িতে সেই যে কাকে একবার বাসা বেঁধেছিল, নীল নীল ডিম পেড়েছিল, মনে আছে? দেখতে অনেকটা সেইরকম।" দাদামণি থামলেন।

—"কিসের ডিম ছিল ঐগুলো? কাগের? এঃ, ছি ছি!" বৌদি মুখ বিকৃত করেন।

—"কোয়েলের—কোয়েলের ডিম, নিদেনপক্ষে পঁচাত্তর বছরের পুরোনো। ওখানে পঁচাত্তর কেন, দেড়শ বছর পর্যন্ত পুরনো ডিম পাওয়া যায়।

সেই ডিম ভেঙে গরম সুপে ফেলে গুলে দিতে হয়। মানে যার নাম চীনে রেস্তরাঁয় এগড্রপ সুপ। সেই সুপই প্রধান খাদ্য। এছাড়া ওই বাকহুইটের তৈরি একরকমের কেক, অখাদ্য (না-নোনতা, না-মিষ্টি), আর সবশেষে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মিষ্টিভাতের ডেলা, জলজ উদ্ভিদের সবুজ ফিতে দিয়ে বাঁধা। এই খাদ্য, সঙ্গে সাকে আছে অবশ্য। বুড়ি এসে হাঁটু মুড়ে বসে দোজো-দোমো করে সাকে খাওয়ালো, জোবানের সেই মেয়েদের মতন কায়দা করেই। যত্নের অভাব নেই।

খেয়ে দেয়ে পরিষ্কার করে পাতা বিছানায় শুতে যাচ্ছি—(এখানে বিছানা অন্য-রকমের, বালিশ আর দুখানা কম্বল, একটাকা ভাড়া)। বুড়ো এসে হাঁ হাঁ করে আটকালে,

হাতে একটা মস্ত তোয়ালে ধরিয়ে দিলে। কী ব্যাপার? তোয়ালে পেতে শোবো?

—"শোবে না—আগে স্নান করতে হবে"—তানাবে হাসতে হাসতে বলে—সম্রাট হিরোহিতোর নিয়ম। ৯০০ অব্দে উনি আইন করে গেছেন এখানে যে-পথিকরা আসবে, আগে স্নান, তবে তাদের শোওয়া। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এই নিয়ম।"

"বেশ।" স্নানের ঘরে চললাম। মস্তবড় ঘর। তাতে পাশাপাশি চারটে ডেকচি মাটিতে বসানো, জল ফুটছে। পাশে ঠাণ্ডা জলের বালতি, মগ সব আছে। একসঙ্গেই তিনজনের স্নান শুরু হলো। স্নান করতে করতে মনে হলো—জলটা কিসে ফুটছে? নিচে তো কৈ কোনো উনুন দেখছি না? তোশিওকে জিজ্ঞেস করতে তিনি মৃদু হেসে বললেন—"এখানে উনুন লাগে না।" আরেকটু হেসে তানাবে বললো—"উনুন নেই বলেই তো রান্না হতে অত দেরি হলো"—

..."আর সব রান্নাই কেবল সেদ্ধ? দেখলে না? এটাই ট্রাডিশন।"

এরা কি ধাঁধা বলছে? এদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? উনুন নেই, অথচ সেদ্ধ হচ্ছে, জল ফুটছে—ব্যাপারটা কী?

নাঃ, জাপানী ঐতিহ্য আমার বাঙাল ব্রেনের পক্ষে বেশী সূক্ষ্ম।

—"উনুন নেই তবে জল ফুটছে কেমন করে?" তোশিও-তানাবে পরস্পরের দিকে চেয়ে হাস্য বিনিময় করে—

—"ওই তো মজা! ৯০০ বছরের ঐতিহ্য!"

গা মুছতে মুছতে আমি চতুর্দিকে তাকাতে থাকি, কোনো পাইপ?

নাঃ। ব্যাপার কী? গরম জলের রহস্য কিছুতেই হলো না। ঘরে এসে শুয়ে পড়ে, তোশিও রয়ে সয়ে বললো—"আসলে এটা একটা আগ্নেয়গিরির গায়ে কিনা। ওই জলের পাত্রগুলো যে-ফাটলের ওপর বসানো, তাতেই জল আপনি ফোটে। রান্নাও হয় ফাটলের ওপর পাত্র বসিয়ে। ওপাশে বড় মুখটা আছে, কাল সকালে সব দেখতে। সেটা এখন একটা হ্রদ। কতরকমের পাখি আসে। অস্ট্রেলিয়ান পাখি, মঙ্গোলিয়ান পাখি, কোরিয়ান—প্যাসিফিক আইল্যাণ্ডের পাখি, বিউটিফুল দৃশ্য।

আর পাখি! আর বিউটি! আমার প্রাণপাখি তো উড়ে গেছে। ভলক্যানোর ওপরে শুয়ে শুয়ে চোখে ঘুম আসে? কিন্তু আমার বন্ধুদের ভয়ডর নেই। তারা নিশ্চিন্ত। তোশিও-তানাবের প্রচণ্ড নাক ডাকছে। তোশিওর সামুরাই স্টাইলে "ঢ্যারারাম ঢ্যারারাম ঢ্যাম"... তানাবের চাষাড়ে স্টাইলে..."সাঁই গুড় গুড় সুঁই"। কেবল আমারই চোখে ঘুমের বদলে সর্ষেফুল।

পর দিন সকালে ওরা লেক দেখতে গেল। আমিও গেলুম। শান্ত নীল জল-ভরা চমৎকার হ্রদ। কিন্তু হ্রদে একটিও পাখি নেই। পাখি কেন নেই? তোশিও ভুরু কুঁচকে খুব ভাবিত হয়ে পড়ল। "ছেলেবেলা থেকে এখানে আসছি...জীবনে কখনো এই হ্রদের পাখিহীন চেহারা দেখিনি। আশ্চর্য ব্যাপার!"

আজকাল ইকোলজিক্যাল চেঞ্জের ফলে নানারকম অদল-বদল হচ্ছে"—

BanglaBook.org

আমার সায়েন্টিফিক সান্ত্বনাবাক্য থামিয়ে দিয়ে তোশিও বলে ওঠে...“ট্রাডিশন ওসব আধুনিক ইকোলজির ধার ধারে না। বুঝলে?”

এবার সবিনয়ে তানাবে বলতে গেল—“কিন্তু পাখিরা কি সেটা জানে?—”

—“অবশ্যই জানে। তারা শত শত বছর ধরে আসছে এখানে। এটা তাদেরও ট্রাডিশন। আশ্চর্য! এটা কিন্তু আমার মোটেই ভালো লাগছে না।” আপন মনে বিড়বিড় করতে থাকে তোশিও। ইতিমধ্যে আমাকে কেউ একলক্ষ ইয়েন ঘুষ দিলেও আমি যে আর আগ্নেয়গিরির মাথায় বিশ্রামশালার আতিথ্য উপভোগ করতে পারবো না —তাতে ট্রাডিশন থাকুক আর চুলোয় যাক—এ ব্যাপারটা আমি তানাবেকে বেশ প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি। ফলত, লাঞ্চের আগেই আমরা—প্রাকৃতিক শোভা ছেড়ে, ঘিঞ্জি শহরে নেমে এসে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। সুজিকি রইল দুশো মাইল দূরে।

সেই রাত্রে আমাদের ইউয়াকি শহরে পরপর দুবার ভূমিকম্প হলো। কেউই অবশ্য প্রাণে মরেনি, তবে এবার বুঝলাম কেন জাপানে কাগজের জানলা হয়, কাঠের বাড়ি হয়। কিছু তেমন ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হলো না।

ইউয়াকি ছেড়ে যাবার পালা এবার। তোশিও-তানাবে সজল চক্ষে স্টেশনে এল বিদায় দিতে। বার দু-তিন কোমর ভাঁজ করে, সামুরাইদের পবিত্র ডানহাত এবং বাঁ হাত বাড়িয়ে তোশিও আমার দুই হাত ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিল—হাত আমার পুণ্য হয়ে গেল। ওদিকে চাষী তানাবের বিনয়নম্র কোমর ভাঁজ করা আর থামে না। “কলকাতায় দেখা হবে”—ট্রেন ছেড়ে দিল।

টোকিওতে এসে পরদিনই রেডিওতে বড় খবর—

“হাজার বছর পরে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি সুজিকি জেগে উঠেছে। আগুন, পাথর, লাভা, উদগিরণ করছে, লাভাস্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিলার নিচেকার গ্রামের মানুষেরা সব প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছে, ইউয়াকি শহর উদ্বাস্তুতে ভরে গেছে...

খুবই দুঃখের কথা সম্রাট হিরোহিতোর প্রতিষ্ঠিত নশো বছরের প্রাচীন রাজকীয় ধর্মশালাটি, ও তার বৃদ্ধ সংরক্ষকদম্পতি এই অগ্ন্যুদগারে ধ্বংস হয়ে গেছে।”

দাদামণি দম নিতে থামলেন। চুরুটের লম্বা সাদা ছাইটা ঝেড়ে নিয়ে, বৌদির দিকে সস্নেহ নয়নে চেয়ে বললেন—“এর পরেও কি তুমি বলবে, প্রেজেন্ট কেন আনিনি? নিজেকে যে ফেরত এনেছি এটাই একটা উপহারস্বরূপ হলো না? তোরাই বল?”

আমরা আর বলব কী, আমরা ভয়ে চুপ। এরকম একটা খবর যেন কাগজে পড়েছি বলেই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, পড়েছি। নির্ঘাত।

বৌদির পিঠের চাবিটা ঝনাৎ করে উঠল। বৌদি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—“পারোও বটে! যতো বাজে কথা। আসুক তোশিও-তানাবে। আমি ওদের জিজ্ঞেসা করবো জোবানটা বেশি ভয়ের জায়গা না সুজিকি। আর বউশাসন? তার ব্যবস্থাও ঠিক করবো। আসুক না তোমার সামুরাইরা একবার কলকাতাতে!”

এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট

অনেকদিন বাদে দেশে ফিরেছি, নেমন্তন্ন খেতে খেতেই প্রাণ যায়। বিদেশে থাকতে টেলিভিশনে দেখতুম ভারতবর্ষে বন্যা হচ্ছে, দুর্ভিক্ষ হচ্ছে, কিন্তু সশরীরে এসে তো দেখছি উলটো! কে বলে এ দেশে দারিদ্র্য আছে? আজ লাঞ্চ, কাল ডিনার, পরশু ককটেল, আজ এই ক্লাবে খাওয়ানো, কাল সেই ক্লাবে খাওয়ানো—একেবারে সাহেবী ব্যাপারস্যাপার। সাহেবরা চলে গিয়ে এখন দেশসুদ্ধ সবাই সাহেব হয়েছি। মধ্যবিত্তের ঐশ্বর্য ঢের বৃদ্ধি পেয়েছে মনে হচ্ছে। নেমন্তন্ন করলে আগে লোকে বাড়িতে ডেকে যা করে রেঁধেবেড়ে খাওয়াতো এখন সবাই সবাইকে বাইরে খাওয়ায়। আগে "খাওয়াদাওয়া" শব্দটার মানে ছিল: লুচি মাংস দই মিষ্টি। আর এখন? "খাওয়াদাওয়া" মানেই হচ্ছে হুইস্কি-সোডা-জিন-রাম। কোল্ড ড্রিংকের ব্যবস্থাই থাকে না অনেক সময়ে। মদ না খাওয়ালে সেটা মোটে "খাওয়ানো" বলে গণ্যই হলো না। আমি তো মাঝে মাঝে ব্যাগে করে নিজের জন্যে কোল্ড ড্রিংকের সাপ্লাই নিয়েই বন্ধুদের বাড়ি যাচ্ছি—অনেকে আমাদের কথা ভাবেই না কিনা। বাপরে বাপ। এত মদ বিলেতেও খায় না। যেদিনই নেমন্তন্নে যাই, খিদেয় আধমরা হয়ে পড়ি। খাবার পেতে পেতেই রাত কাবার। বাবুসাহেবদের শীধুপান আর শেষ হতে চায় না। এ কোন দেশী কলকাতা রে বাবা! এই লোকগুলোকেই তো আগেও চিনতুম, তারা তো ঠিক এমনটি ছিল না।

ছোটোপিসি বললে—"রোববার আমাদের বাড়িতে লাঞ্চ খাবি, তোর সঙ্গে আমাদের বন্ধুবান্ধবদের আলাপ করিয়ে দিতে ইচ্ছে।" বাড়িতে খেতে বলছে শুনেই উৎসাহ হলো। তা ছাড়া, ছোটপিসিরা শুনছি বিরাট বড়লোক—আলিপুরে (গুল্ড! অফ কোর্স!) চওড়া কাঠের পালিশকরা সিঁড়ি, মার্বেলের গাড়িবারান্দা, সবুজ লনওলা সায়েবী বাড়িতে থাকে। কেবল বসবার ঘরেই নাকি তিন-তিনটে এয়ারকণ্ডিশনর দুজন লোকের জন্য। বয়বাবুর্চি পাঁচজন। বাথরুম ছটা। উর্দিপরা পাগড়ী বাঁধা ড্রাইভার। গাড়িটা অবশ্য এয়ারকণ্ডিশনড নয়, তবে পাখা লাগানো। গেটে ভোজালী-আঁটা নেপালী দরোয়ান।

দরোয়ান অবশ্য ছোটপিসের ঠিক নিজস্ব নয়, অফিসের। আর ভোজালীটা দরোয়ানের। বাড়িটাও ছোটপিসের ঠিক নিজস্ব নয়। অফিসের। এয়ারকণ্ডিশনর গুলোও তাই। গাড়িটাও। গাড়ির অপূর্ব পাখাটাও। বয়-বাবুর্চি ড্রাইভার জমাদার কোনোটাই ছোটপিসের ঠিক নিজস্ব নয়, মায় তাদের উর্দিগুলো পর্যন্ত না। কেবল ছোটপিসিটি ছাড়া বাকি যা কিছু, সবাই ছোটপিসের অফিসের সম্পত্তি। রিটায়ার করলেই বাস! কোথায় বা কি ভূতের ফাঁকি মিলিয়ে যাবে ফট করে। তাই সময় থাকতে থাকতে এই বেলা একটু দেখিয়ে-চাখিয়ে নিতে না পারলে ছোটপিসিরই বা ভালো লাগবে কেন? "নিশ্চয়ই যাব" বলে কথা দিলুম।

কিন্তু কপালে নেই; কথা দিলে কি হবে! পর পর অতো নেমন্তন্ন খাবার ফলটি ফলল। রবিবার সকাল থেকেই পড়লুম। বেলা সাড়ে এগারোটায় ফোনে পাওয়া গেল ছোটপিসির বাড়ি— বেয়ারা ধরল এবং বলল "মেমসাব বাগবাজার মে।" বাগবাজারে আমাদের পুরনো বাড়ি। জ্যাঠামশাই এখনও ওখানে। আজ বাড়িতে খাওনদাওয়ান—এখন ছোটপিসি বাগবাজারে? মানে? "কখন ফিরবেন?"

—"সামকো লৌটেঙ্গে।"

আমি যত বলি—"হতেই পারে না, তোমাদের বাড়িতে আমার লাঞ্চের কথা।"

বেয়ারা তত সবিনয়ে বলে—"হাঁ জী, ইধর লাঞ্চ তো জরুর হ্যায় আপকা —লেকিন মেমসাব বাগবাজার মে।" চটেমটে আর ছোটপিসেকে ডাকলুমই না। দূর ছাই! আজ আমি যে যেতে পারছি না, সেটা বেয়ারাকেই জানিয়ে ফোন ছেড়ে দিলুম। ব্যাপার কিছুই বুঝলুম না। আমাকে খেতে নেমন্তন্ন করে ছোটপিসির বাগবাজারে চলে যাবার মানেটা কী?

আশ্চর্য! মানে বোঝা গেল পরদিন। ছোটপিসিই এসে হাজির, সেক্যুলের দিকে। অসুস্থ আমাকে দেখতে। এসে ছোটপিসি যে গল্পটা বলে গেল, আপনাদের হুবহু সেটাই বলছি। বিশ্বাস করা-না করা আপনাদের ব্যাপার। অতঃ ছোটপিসি উবাচ:

...তোকে তো লাঞ্চে ডাকলুম। তারপর তোর পিসের গেস্টদের লিস্টি দেখেই আমার মেজাজ টং হয়ে গেল। দেশ-বিখ্যাত ব্যক্তি একজন। এঁরা একসঙ্গে পদধূলি দিলে বাড়ির যে কী অবস্থা হবে তা ভালোই বুঝতে পারছি। পূর্ব অভিজ্ঞতা তো কম নেই। তার মধ্যে তুই এলে তোর কী অবস্থা হবে, তাও! এখন তোকেই বা বারণ করি কী করে? সুতরাং রান্নাবান্নার বন্দোবস্ত করে বাবুর্চিকে সব বুঝিয়ে দিয়ে আমি কেটে পড়লুম। সোজা ট্যাক্সি নিয়ে বাগবাজারে। যঃ পলায়তি স জীবতি। রাগ করিসনি। তোর কথা মনে করে আমার একটা দুঃখু দুঃখু ভাব হচ্ছিল ঠিকই কিন্তু তবুও বাড়িতে থাকতে সাহস হলো না। শুনলেই বুঝবি কেন হলো না।

লাঞ্চ কেন, চায়ের বেলাও পার করে দিয়ে, সাতটা নাগাদ তো ফিরলুম, কেননা রাত্রে ওর এক কোলিগের বাড়িতে আটটার সময়ে ডিনারের নেমন্তন্ন। নিচে থেকেই ভুরভুরে গন্ধ, আর রেকর্ডের বাজনা শুনতে পেলুম। বুঝলুম ব্যাপার সুবিধের নয়। ভেবে দ্যাখ তুই, সন্ধে সাতটা বেজে গেছে। আর অতিথিরা এসেছেন বেলা বারোটার আগেই। দারোয়ান বললে,—"মেমসাবলোগ সব ঘর চলা গয়া, লেকিন সাবলোগ কোই কোই হ্যায়।" স্ত্রীরা সবাই চলে গেছে, কিন্তু স্বামীরা কেউ কেউ আছে, জেনে রাখবি, এটা মহা দুর্লক্ষণ! এর নাম এক্সপেন্স একাউন্ট। সন্ধে সাতটার পরেও লাঞ্চ!

ভয়ে ভয়ে ওপরে উঠে ঘরের পর্দা তুলেই দেখি চিত্তির। ঘরের মধ্যিখানে কলকাতার বিখ্যাত চারটে মাতাল। একজনের হাতে উঁচু করে ধরা একটা বোতল —অন্যেরা সেইটে কেড়ে নেবার জন্যে ঝুলোঝুলি করছে। আর তোমার পূজনীয়

ছোটপিসে তাদের ঠিক মধ্যিখানে, গোপিনী পরিবেষ্টিত কেষ্টঠাকুরের মতো দাঁড়িয়ে। হাতে বাঁশির বদলে একটা গোল করে পাকানো বিজনেস স্ট্যানডার্ড নাকি ফিনান্সিয়াল টাইমস—কে জানে সেটা দিয়ে হন্যে হয়ে একে-ওকে মাঝে মাঝে দু' এক ঘা পেটাচ্ছেন। এই হচ্ছে ওঁর মাতালদের মারামারি থামানো—যেভাবে লোকে কুকুর-বেড়ালকে ট্রেনিং দেয়, অনেকটা সেইভাবে। কিন্তু মাতালরা তো আর কুকুর বেড়াল নয়, তারা ওতে শুনবে কেন? তাদের টেম করে কার সাধ্যি? ঘরের কোণে বড়ো হরি বেয়ারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখ হাঁ করে ঘুমোচ্ছে।

সন্ধে সাতটায় বাড়ি ঢুকে এই দৃশ্য দেখেই তো, আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল, রগ দপদপ করতে লাগল। আমাকে দেখেই তোর ছোটপিসে হঠাৎ কাতরে উঠলেন—"এই যে! এসেছ— এস! এস!—দ্যাখো তো, কী কাণ্ড!" যেন এইমাত্র নন্দনকানন থেকে পড়লেন—যেন জীবনে কখনো মাতাল দেখেননি। আমাকে দ্যাখামাত্র সমবেত মাতালদের প্রত্যেকের অভিমান ষোলকলায় উপচে উঠল।

—বৌদি! দেখুন না, ভটচায্যি কী করছে—

—কী করছে মানে? কে. পি. আমার হাত টেনে ধরে রেখেছে— ছাড়ছে না! —ছাড়ো বলছি,

—মিসেস রে, প্লীজ টেল সুরিন্দর টু লীভ মাই বটল—

—মিসেস রে, লুক অ্যাট দ্যাট রেচ; দেশাই—হি হ্যাজ গ্রাবড মাই বটল—

—বৌদি, কে. পি-কে বলুন তো, আমার হাত ছেড়ে দিক—

—কেন ছাড়বো? আগে সে আমাকে মাথায় বলুক!—বলো, "ছেড়ে দিন"—

—বলব না।

—ছাড়ব না।

পরিষ্কার যুক্তিতর্ক চলছে—কে বলে মাতালদের যুক্তি থাকে না? হঠাৎ দেখি মারামারি থামিয়ে মাতালরা গোল হয়ে সার বেঁধে এ ওর পেছনে পরস্পরের কোমর ধরে নাচতে শুরু করে দিয়েছে। সেই হারীত-লারিত-জারিতের ডায়াগ্রামের মতো। ব্যাপার কী? না আগের পপ মিউজিকের রেকর্ড পালটে গিয়ে হঠাৎ শুরু হয়েছে একটা পুরোনো হিন্দি গান—"পতলী কমর হ্যায়, তিরাছী নজর হ্যায়"— অমনি মাতালদের মেজাজও বদলে হাসিখুশি হয়ে গিয়েছে। ফোক ডান্স হচ্ছে। সকালে এদের পরনে ভালো ভালো পোশাকই ছিল মনে হয়, কিন্তু এখন সেগুলো ন্যাকড়ার মতো। ভেবে দ্যাখ, ধামসানো পোশাক পরা চারটে বিভিন্ন সাইজের লম্বা বেঁটে রোগা মোটা মাঝবয়েসী মাতাল গোল হয়ে থুপথুপিয়ে নাচছে—একজনের বগলে একটা বোতল। মাঝখানে আমার কর্তা।—তখনও করুণভাবে পাকানো খবরের কাগজ পেটা করে যাচ্ছেন অতিথিদের আর সেই নৃত্যের বৃত্ত থেকে বেরুতে প্রাণপণে চেষ্টা করছেন। কিন্তু ওরা ওঁকে বেরুতে দিচ্ছে না। এসব দেখতে ভালোই লাগছিল, এমন সময়ে গানটা ফুরিয়ে গেল—হঠাৎ শুরু হলো—"বোল রাধা বোল সঙ্গম হোগা

BanglaBook.org

কি নহী"—অমনি কী যে হলো, নৃত্যরত মাতালরা রে-রে শব্দের ঘুঁষি তুলে বোতল উঁচিয়ে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরে গিয়ে এ-ওকে উল্টোবাগে তাড়া করল। ফোক ডান্সটা এখন আর তেমন নিরীহ নেই, হেডহান্টিং নাগাদের মতো হিংস্র টাইপের দেখাচ্ছে--তোমার পিসেমশাই ভীতু মানুষ—তিনি এবার কাগজটা ফেলে দিয়ে—"উষা! আমাকে বাঁচাও!" বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। বিজনেস স্ট্যানডার্ড না ফিনান্সিয়াল টাইমস ওঁকে আর রক্ষা করতে পারছে বলে মনে হলো না। আমি আর কী করি? ইষ্টনাম জপ করে দুগগা বলে বডি থ্রো দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লুম মাতালদের সার্কেলের ঠিক সেন্টারটা লক্ষ্য করে। জানিসই তো আমার এই বিপুল ওজনটা কখনোই বৃথা যায় না। ঝাঁপ দিয়েই বাঁ কনুই দিয়ে পরপর দুজনকে আর ডান কনুই দিয়ে আর-দুজনকে বিরাশি সিক্কার চাবটি গোঁত্তা মারতেই তারা যেই দু'দিকে সরে গেল, তোর পিসেও সেই ফাঁকে ছুট্টে পালিয়ে গেলেন। ভেবেছিলুম ওতেই মাতালরা দাঁত ছিরকুটে উলটে পড়বে, কেননা শুনেছি মাতালদের গায়ে একদম নাকি শক্তি থাকে না। কিন্তু কি বলব তোকে, একটাও উলটে পড়ল না! একটুখানি টলে গেল মাত্র। তারপরেই আবার সার্কেলটা জোড়া লেগে গেল। পানা পুকুরের মতো। একবার দেখলুম আমিই তাদের কেন্দ্রমণি, তোমার ছোটপিসে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে নিচে পালিয়ে যাচ্ছেন, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হচ্ছে। আমার কনুইয়ের খোঁচায় মাতালরা একটা পড়ল না বটে কিন্তু ওই যে কোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুড়ো হরি বেয়ারা হাঁ করে ঘুমোচ্ছিল, সে হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, কাটা কলাগাছের মতো দপাস ক'রে উপুড় হয়ে সটান আছড়ে পড়ল কার্পেটের ওপরে। পড়েও তার ঘুম ভাঙলো না। এখন আমি এই বৃত্ত থেকে বেরুই কী করে? নেমন্তন্ন রয়েছে। হরির তো ওই অবস্থা, আর তোর পিসে পালিয়েছে। ভাবছি আবার গোঁত্তা মারবো, এমন সময়ে নিচে একটা হৈ চৈ উঠল। তার পরেই মনে হলো সিঁড়ি দিয়ে কেউ উঠে আসছে, তোর পিসের পায়ের শব্দ নয়। হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো একটি আলুথালু বাঙালী মেয়ে। হাউমাউ করে কাঁদছে, কোলে একটা কচি বাচ্চা। বাচ্চাটাও তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, তার মাও তাই। পেছন পেছন আরো একজন চেল্লাচ্ছে। সে আমাদের দারোয়ান।—"অন্দর মত যাইয়ে! অন্দর মত যাইয়ে। পয়লা তো সিলিপ দিজিয়ে— বলে। আর স্লিপ! কে শোনে কার কথা। মেয়েটা হাপুস নয়নে কাঁদছে আর বলছে..."ও মিস্টার ভটচায্যি। ও মিস্টার দেশাই!"...আর বাচ্চাটা বলছে..."মাঁ্যা..." আর করুণ গলায় দরওয়ান বলছে, "সিলিপ কাঁহা।"

এদিকে ঘরের দৃশ্য ভয়ানক। এই দুশো পাউণ্ডের আমায় ঘিরে মাতালদের সে কি বেদম নাচ...যেন কোনো বারব্রত, কি স্ত্রী-আচার পালন করা হচ্ছে।..."আয় আয় সহচরি হাতে হাতে ধরি ধরি নাচিবি ঘিরি ঘিরি গাহিবি গান।" ওদিকে..."ও মিস্টার ভটচায্যি। ও মিস্টার দেশাই।" মেয়েটা কেঁদেই চলেছে। কিন্তু ওদের গেরাহ্যি নেই। শেষে ডেসপ্যারেট হয়ে দিলুম একটা কনুয়ের গোঁত্তা ভটচায্যির পাঁজরায়। অমনি ভটচায্যি বললে..."কৌন হ্যায়?"

মেয়েটি বললে..."আমি তো মিসেস চ্যাটার্জী"...

..."কোন চ্যাটার্জী? সৌমিত্র না উত্তমকুমার?"

উত্তরে মেয়েটা আরো কাঁদে আর বলে..."কী আশ্চর্য! আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি তো আপনাদেরই মিসেস চ্যাটার্জী।" এবার ভটচায্যি হঠাৎ রেগে গেল..."তার মানে? আই হ্যাভ ওনলি মিসেস ভটচায্যি! ব্যাস হামকো কোই মিসেস চ্যাটার্জী উটার্জী নেহী হ্যায়!"..."ও মিস্টার দেশাই!..." এবার আমি দেশাইকে একটা রাম-গোঁত্তা মারলুম। তক্ষুনি দেশাই বলে উঠল..."হুইচ মিসেস চাটার্জী? মিসেস বি. কে.? মিসেস এস. এন.? মিসেস জে. সি.? কৌনসা?" মেয়েটা একেবারে হুহু করে কেঁদে ফেললো। "কী মুশকিল! আমি তো আপনাদের দুজনেরই পি. এ.? চিনতে পারছেন না? গত পাঁচ বছর ধরে রোজ ডিকটেশন নিচ্ছি? আমি তো আপনাদের স্টেনো হই"

"স্টেনো তো ইধার কিঁউ? অফিসমে যাইয়ে...ডিকটেশন উধার মিলেগা..."

—মেয়েটি এবার কাঁদতে কাঁদতে কার্পেটে লুটিয়ে পড়লো। দেখাদেখি ওর বাচ্চাটাও। "ডিকেটেশন চাইনে স্যার, আমি হেলপ চাই! আমার স্বামীর স্কুটার একসিডেন্ট হয়েছে—হাসপাতালে নিয়ে গেছে—

—"গুড! ফাইন! হসপিটালমে নিয়ে গেছে—তো? ব্যাস! সব কুছ ঠিক হয়ে যাবে!"

—"ও মিস্টার ভটচায্যি,—এই রাত্তিরে আমি অত টাকা কোথায় পাই— ইঞ্জেকশন —রক্ত—হা ভগবান—" এমন সময়ে অকস্মাৎ "ও হো! রুপাইয়া চাইয়ে? লিজিয়ে না— কিৎনা রুপাইয়া?" বলে মেজর মহেন্দর সিং নিজের পকেট থেকে এক তোড়া নোট বের করে ওকে দিতে গেল। হাত কেঁপে গিয়ে টাকাগুলো সব মেঝেয় ছত্রাকার হয়ে পড়ল কিন্তু মেয়েটি সেদিকে তাকিয়েও দেখল না। কেবলই হাত জোড় করে বাচ্চা কোলে করে অজ্ঞান অবুঝ বসদুটোর কাছেই অনুনয় বিনয় করতে লাগলো সে। আমি তাড়াতাড়ি বলি—"লজ্জা করবেন না, ওতে লাভ নেই। এরা সব পাঁড় মাতাল এখন,—যা পাচ্ছেন চটপট নিয়ে নিন—হরিব নুট যখন দিচ্ছেই" —এমন সময় হঠাৎ—"হরির নুট! হরির নুট!" বলে ভীষণ চেঁচাতে চেঁচাতে ভটচায্যি পকেট থেকে টাকাকড়ি বের করতে, আর কার্পেটের ওপরে ছড়াতে লেগে গেল। দেখাদেখি দেশাই আর কে. পি.ও নেচে নেচে 'হরিবোল' বলে আহ্লাদে চাদ্দিকে টাকা-পয়সা ছুঁড়তে শুরু করলে। —মেয়েটা তো থ! আমিই কষ্টেসৃষ্টে নিচু হয়ে কুড়োচ্ছি, এমন সময়ে 'হরির নুট' 'হরিবোল' ইত্যাদি শুনেই বোধহয়, শ্রীমান হরির লুপ্ত চেতনা জেগে উঠল। মাটিতে পড়ে থাকা অবস্থা থেকে লাফিয়ে উঠে এসে সেও পাল্লা দিয়ে টাকা কুড়োতে থাকে। কুড়িয়ে কাঁধের ঝাড়নে ঝেড়েঝুড়ে সেগুলো যত্ন করে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিতে লাগল হরি। এঘরের কর্মকাণ্ড দেখে মেয়েটা তো চুপ করেইছে, বাচ্চাটারও কান্না থেমে গেছে। মাতালদের নাচের বৃত্তও

BanglaBook.org

আপনাআপনি ভেঙে গেছে। আমি মুক্তি পেয়ে তাড়াতাড়ি ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটটা হাতে তুলে নিয়ে মেয়েটিকে বললুম—

—চলুন মিসেস চ্যাটার্জী, তাড়াতাড়ি নিয়ে চলুন দেখি কী করা যায়। এ টাকাগুলোই এখন রাখুন, আর আপনার সঙ্গে আমি গাড়িটা দিচ্ছি, ড্রাইভারই ওষুধপত্র কিনেটিনে দেবে, যা দরকার হেলপ করবে। এঁদের অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন —ওকে রওনা করে দিয়ে ওপরে এসে দেখি হরি আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছে —সব রেকর্ড ফুরিয়ে বাজনা বন্ধ।

আর তিন মাতালে মিলে লগবগ করতে করতে ফের লড়াই বাধিয়েছে সেই বোতলটা নিয়ে। চার নম্বর কে. পি. সিনহা বেচারী মোটা মানুষ, আর লড়তে না পেরে, রেফারী হয়ে গেছে। তোর পিসে অ্যাবসেন্ট। আমি তো ঢুকেই এক ঝটকায় বোতলটা কেড়ে নিলুম। অমনি রেফারী 'সুঁ' করে ভাঙা ভাঙা শিস দিয়ে বলে উঠল— "গেওওলল।"

—আর আমি দেখি হা ভগবান, এটা তো একটা খালি বোতল। এই নিয়ে এত লড়াই—এ মাতালগুলোর নরকেও ঠাঁই নেই, আমার বাড়িতে তো নয়ই।— তেড়ে-ফুঁড়ে '—হরি-ঈ-ঈ' বলে ডাকতেই হরি রক্তচক্ষু মেলে, আমার সুরে সুরে মিলিয়ে —'জী-ঈ-ঈ' বলেই তক্ষুনি চোখ বুজে ফেলল। চোখের ধিঙ্গি দেখেই বুঝলুম অত ঘুম কিসের। ব্যাটা নেশাখোর! এক ধমক মেরে মিলিটারি কায়দায় বললুম —"হরি জলদি!— সাবলোগকো আভি হঠাও! কুইক!" শুনে হরি চোখ বুজে বুজেই গুন গুন করে হাত নেড়ে বলে উঠলো, যেন বাগান থেকে গরু তাড়াচ্ছে কি ছাগল —"হে-ই! হেই হেট!' তারপর এক চোখ মেলে আমাকেই জিজ্ঞেস করলো —"গিয়া?" আমার মুখের চেহারাতেই বোধহয় উত্তর পেয়ে গেল।

—নেই গিয়া? আচ্ছা খতরনাক সাবলোগ? তারপরেই শিবনেত্র হয়ে বলতে লাগলো—জোরে জোরে—

—এঃ সাবলোগ, হঠ যা, হঠ যা! ঘর যা, ঘর যা! হুশ-শ-শ— খেপে গিয়ে আমি এবার হরিকে প্রচণ্ড ধমক লাগালাম—ও কী হচ্ছে কী? হরি? ভালো করে বলবি তো? হরি তখন ঘুঁষি পাকিয়ে ভালো করে বলতে লাগলো—

—"এঃ সসালে সাবলোগ, হঠ! হঠ!—ভাগ সালে ভাগ! ঘর যা! ঘর যা! এঃ—সসসালে সাবলোগ—" আমি আর না পেরে হরিকে হিড়হিড় করে টেনে অন্দরের বারান্দায় নিয়ে এসে বললুম, "বুদ্ধু, ওমনি করে নয়, হাত ধরে এমনি করে হঠাও!" বলেই, প্রেশারের ওষুধ খেতে ছুটলুম। একেই আমি ভারী মানুষ, তায় রাগলেই মাথায় রক্ত উঠে যায়— ঘাড় টনটন করছে, মাথা যেন সীসের মতো ভারী।— বাড়ি এসে অবধি মাতাল সামলাতে সামলাতেই আধমরা। ওষুধ খেয়ে স্নান করে সেজেগুজে পটের বিবিটি হয়ে ফিরে এসে দেখি অন্দরের বারান্দায় সার সার তিন মূর্তি পড়ে আছে। একজন আবার আরেকজনের কানে কানে কী সব বলছে। নিচু

হয়ে মুখের কাছে কান নিয়ে গিয়ে শুনি ফিসফিস করে বলছে—

—'মোর লাগি করিয়োনা শোক
আমার রয়েছে কর্ম
আমার রয়েছে বিশ্বলোক—'

সেই শুনে অন্যজন খুব জোরে ফোঁস করে ঘর কাঁপিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। ভালো করে চেয়ে দেখি এটা হচ্ছে হরি। আর হরির কানে নামতা পড়ার মতো করে কবিতা আওড়াচ্ছেন মিস্টার ভটচায্যি। ওপাশে একা শুয়ে নাক ডাকাচ্ছেন মিস্টার দেশাই।

ঘরে ঢুকে দেখি আরেক মনোহর দৃশ্য। ছ-ফুট লম্বা সুরিন্দর সিং চিৎ হয়ে ছোটো কোচের ওপরে শুয়ে আছে। লম্বা ঠ্যাংদুটো ভাঁজ করে হাতলের বাইরে শূন্যে ঝুলিয়ে। আর মোটা কে. পি. সিনহা মেঝেয় কার্পেটে উপুড় হয়ে আছে কচ্ছপের মতো। মাঝে মাঝে কুমীরের মতো মাথা তুলে বলে উঠছে : বাট, জামাইবাবু ওয়াজ আ পারফেকট জেন্টলম্যান! আর অমনি সুরিন্দর সিং জড়িয়ে জড়িয়েই ধমকে উঠছে—

"স্যো হোয়াট?" তোমার ছোটপিসে কিন্তু ঘরে-বাইরে, কোথাও নেই। কী করি? রাত তখন ঢের। দশটা বেজে গেছে। কখন আর খেতে যাব আমরা? অনেক করে বলেছে গুপ্তরা—না গেলে খুব খারাপ দেখাবে—যাওয়া উচিত। এদিকে এঁরা লাঞ্চে এসেছেন প্রায় দশ বারো ঘণ্টা হলো। বয়-বাবুর্চিদের ডিউটি অফ হয়ে গেছে। তারা সব বাড়ি চলে গেছে। কেবল গেটে আছে দারোয়ান, আর ঘরে হরি। হরি তো ভূমিশয্যায়। 'শেষের কবিতা' শুনছে।

অগত্যা দরোয়ানকেই গিয়ে বললুম—"যার যার ড্রাইভারকে বল, এসে যে-যার গুণমণি মনিবকে বাড়িতে নিয়ে যাক। আউর হরি কো কান পাকড়কে উঠা দো।

বাহাদুর পায়ে পায়ে হরির কাছে গিয়ে হরির অবস্থা দেখে লজ্জায় অস্থির হয়ে প্রথমেই তো জিব কেটে ফেলল। তারপরেই হরির কানটি ধরে লাগালে এক থাপ্পড়। অমনি হরি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বাহাদুরকেই বিশাল সেলাম ঠুকে বললে —"জী সাব! ব্রেকফাশ রেডি!"

দুত্তোর! ব্যাটা নেশাখোর। বাহাদুর আরেকটা থাপ্পড় কষাতেই হরির নেশা ছুটে গেল।—তখন হরি আর বাহাদুর মিলে, ড্রাইভারদের ডেকে এনে পরপর তিনটে মাতালকে তো কোনোরকমে নিচে নিয়ে গেল চ্যাংদোলা করে। কেবল হরি শুধু একবার ভুল করে বলে ফেলেছিল "রাম নাম সৎ হ্যায়"—কিন্তু বাহাদুরের ধমকে থেমে গেল তাড়াতাড়ি। মুশকিল বাধালো মেজর সুরিন্দর।—"স্কোয়াড আগে বাঢ় —খড়-বিচালি খড়-বিচালি"—বলে শুয়ে শুয়েই এইসা পা ছুঁড়তে লাগলো, তার ধারে-কাছে যায় কার সাধ্যি! তাকে ছোট সোফা থেকে নড়ানো গেল না।

এদিকে তোমার ছোটপিসেকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না—রান্নাঘর, বাথরুম

ওয়ার্ড্রোব, ক্লসেট, পর্দার পেছনে খাটের তলায়—কোথাও তিনি নেই। মহা দুশ্চিন্তায় পড়লুম। গেল কোথায় লোকটা? দরোয়ান লন-বাগান সমস্ত খুঁজে এল; সেখানেও নেই। আমার মনে কী ভীষণ অশান্তি বুঝতেই পারছিস! ফলে নিচে গিয়ে মাতালদের গাড়িতে তুলিয়ে দেওয়ার খবরদারিটাও আমাকেই করতে হলো!

ওরা তো তিনটেকে সারি সারি শুইয়ে রেখেছে সদর দালানে, ঠিক যেন ক্রিমেটোরিয়ামে মড়াদের কিউ। একে একে গাড়িগুলো সামনে এসে দাঁড়াবে আর মাননীয় অতিথিদের আড়কোলা করে তাতে তুলে তুলে দেওয়া হবে। হরি আর দরোয়ান রেডি। ড্রাইভাররা গেল গাড়ি আনতে।

প্রথমেই এলো দেশাইয়ের গাড়ি। দেখি তার পেছনে বুটটার ঢাকনি আলগা হয়ে উঁচুমতো হয়ে রয়েছে, ঢকঢক করে উঠছে-পড়ছে গাড়ি চললে। ড্রাইভার যেই ভালো করে বন্ধ করবে বলে ঢাকাটা তুলেছে অমনি কী হলো, ভাব দিকিনি? জ্যাক-ইন-দ্য-বক্সের মতো বুটের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন তোমার পূজ্যপাদ পিসেমশাই। ভালো জামা-কাপড় সব ভীষণ নোংরা, গাড়ির তেল-কালি-গ্রীজ মাখা। বেরিয়েই চিৎপাত হয়ে পড়ে থাকা তিন মূর্তিকে সামনে দেখে উনি চমকে উঠে — "মম্মার্ডার! মম্মার্ডার!" বলতে বলতে দৌড়ে সিঁড়ির তলায় ঢুকে পড়লেন। আগে তিন মাতালকে পার করে তারপর তোমার পিসেকে তো সিঁড়ির তলা থেকে টেনে বের করলুম। অমনি নিজের পকেট থেকে ইস্ত্রি-করা সেন্টমাখা সিল্কের রুমাল বের করে টাক থেকে মাকড়সা-সমেত মাকড়সার জাল-ফুল ঝাড়াতে ঝাড়তে তোমার পিসে খুবই সহজ গলায় বললেন—"কী গো? গুপ্তর বিয়ের অ্যানিভার্সারিতে যাবে না?"—গুপ্ত তোর পিসের কোলিগ—ওদের মধ্যে যেমন ভাব, তেমনি আবার একটু রেষারেষিও আছে; না গেলেই ঠিক দোষ ধরবে। দামী একটা প্রেজেন্ট কিনে রেখেছিলুম। এত কাণ্ডের মধ্যেও ঠিক ওর সেটা মনে আছে। এইসব সখের মাতালেরা কিন্তু ঠিকেয় ভুল করে না, বুঝলি?

—"আমি তো রেডি? কিন্তু রাত্তির এগারোটা কখন বেজে গেছে— এখন কেউ নেমন্তন্ন যায়?"—

—"খুব যায়", বলে উনি ঘরে চলে গেলেন। হাতমুখ ধুয়ে ফর্সা হয়ে পাটভাঙা পোশাক পরে এসে, ছোট সোফায় সুরিন্দরকে ঘুমোতে দেখে তোর পিসের সে কী আহ্লাদ। "আরে? সুরিন্দর বাড়ি যায়নি? বাঃ! চলো, চলো, ওকেও নিয়ে যাই গুপ্তর বাড়ি।" আমি বজ্রকঠিন হয়ে বললুম—"না! ওকে একদম ডিস্টার্ব করবে না! ও থাক যেমন আছে!" বলে সুরিন্দরের গায়ে তাড়াতাড়িতে টেবিল ক্লথটা চাপা দিয়ে রেখে নেমে গেলুম। ঘড়িতে তখন বারোটা বাজছে।

নিচে এসে দেখি ড্রাইভারও নেই, গাড়িও নেই। কোথায় গেল? বাহাদুর আমাকে ফিসফিসিয়ে বললে, সেই যে, মিসেস চ্যাটার্জিকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটোছুটি করছে! এখনও ফেরেনি। এক শিখ ট্যাক্সিওলা তার গাড়িতে দরজা খুলে ঠ্যাংদুটো বের

করে ঘুমোচ্ছিল ঠিক গেটের উলটোদিকে। বাহাদুর দৌড়ে গিয়ে তাকেই ধরে আনলো। সে নাকি ওদের বন্ধু। সর্দারজী তো এন্তার পাঞ্জাবি ভাষায় গাল পাড়তে পাড়তে মিটার ডাউন করলো। আমি উঠে বসলুম, বগলে প্রেজেন্ট। তোমার ছোটপিসেও উঠতে যাবেন, ঠিক এমন সময়ে আমাদের গাড়ি ফিরল। ড্রাইভার যেই নেমেছে উনি অমনি টপ করে লাফিয়ে তার সীটে উঠে বসলেন—আর বসতে না বসতেই হঠাৎ ঘড়ি দেখে— "ঈশশ ! কী ভয়ংকর লেট হয়ে গেছে— বলে স্টার্ট দিয়ে, শোঁ করে একাই বেরিয়ে চলে গেলেন। বাহাদুর আর ড্রাইভার হাঁ করে চেয়ে রইল। আমি তাড়াতাড়ি বললুম—"সর্দারজী। জলদি চালাও, জোরসে ! উস ডাকুকো পাকড়ো, মেরা হ্যাণ্ডব্যাগ লেকে ভাগ গিয়া।" কথাটা সত্যি। আমি মোটাসোটা মানুষ, শাড়ির কোঁচা-আঁচল সামলে, বগলে প্রেজেন্টের বাক্সো আঁকড়ে, ব্যাগটাকে আর ধরতে পারিনি, ওঁর হাতে দিয়ে ট্যাক্সিতে উঠেছিলুম। উনি আমার ব্যাগসুদ্ধই গাড়িতে উঠে হাওয়া।

আর যাবে কোথায়। মুহূর্তেই সর্দারজীর ঘুম উড়ে গেল। ডাকু পাকড়ানোর জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে সর্দারজী আমাকেও উড়িয়ে নিয়ে চলল। কখনো তোর পিসে আগে যান, কখনো আমরা আগে যাই— ওঃ সে কী দারুণ এক্সাইটমেন্ট, অনেকটা হিন্দি ছবির মোটর চেজ সিকোয়েন্সের মতো। যেন দেবানন্দ আর জিনৎ আসলে রেস দিচ্ছে। কিন্তু আলিপুর পাড়ার রাস্তাঘাট তো জানিসই—খাঁ খাঁ করছে। কেবল পথের কুকুরগুলো বেজায় চীৎকার জুড়ে তাড়া করলো আমাদের; অমন একটা সীন কিন্তু দর্শক বলতে ছিল শুধু ওরাই। এই যা দুঃখ্। যাক, চকিতেই গুপ্তদের বাড়িতে এসে গেলুম। উনি গাড়ি থামিয়ে যেই নেমেছেন, নামবামাত্তর সর্দারজীও —"ডাকু হ্যায় ! ডাকু হ্যায় !— পাকড়ো পাকড়ো" বলে বিরাট শোরগোল তুলে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে গিয়ে তোর পিসের গর্দান চেপে ধরেছে। ঘাড়টা ধরেই এক থাপ্পড়। উনি বেচারী মাথা ঘুরে পড়েই যাচ্ছিলেন, ভাগ্যিস আমি নেমেছিলুম। তাড়াতাড়ি ধরে ফেললুম। সর্দারজী তখন তোমার পিসেকে বজ্রমুষ্টিতে পাকড়ে, ওঁর হাত থেকে আমার ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে বলল—"শালা ডাকুকো আভি আলিপুর থানামে লে যানা হ্যায় ! চলিয়ে মেমসাব—

ইতিমধ্যে তোমার ছোটপিসেও সংবিৎ ফিরে পেয়ে সর্দারজীর কলার চেপে ধরে হুংকার দিলেন—ডাকু ? কোন শালা ডাকু হ্যায় ? তুম ? না হাম ? তুম খাবড়া মারকে হামারা ওয়াইফকো ব্যাগ ছিনতাই কর লিয়া—চলো, আভি চলো আলিপুর থানামে—সে কী কেলেংকারী ! দুজনেই দুজনকে আলিপুর থানাতে নিয়ে যাবে বলে টানাটানি, ট্যাক্সির মিটার এদিকে বেড়েই যাচ্ছে। আমি একবার সর্দারজীর হাত ধরে কাকুতি মিনতি করি, আর একবার তোমার পিসের হাত ধরে। কেউই কোনো কথা শুনবে না। যাক, শেষ পর্যন্ত সর্দারজীকে অতিকষ্টে শান্ত করা গেল। সর্দারজী যখন —"শালা বাংগালী লোককো তামাশামে গোলি মারো"—বলে গাল পেড়ে আমার ব্যাগটা

ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে টাকা নিয়ে চলে গেল, তখন হাঁফ ছেড়ে আমরা গিয়ে গুপ্তদের কলিং বেল টিপলুম। রাত একটা বেজে গেছে।

আশপাশের সব ফ্ল্যাটেই তখন বিয়েবাড়ির মতো আলো জ্বলে উঠেছে—বারান্দায় বারান্দায় লোকজন গিজগিজ করছে। গুপ্তরাই কেবল গহন ঘুমে অচৈতন্য। যতই টুংটাং করে বেল বাজাই, দরজা আর খোলে না। অবশেষে ধপাধপ দোর ঠ্যাঙাতে গুপ্তসাহেব "হু ইজ ইট" বলে দু-ইঞ্চি দোর ফাঁক করে উঁকি মারলেন—হাতে একটা বেঁটেখাটো লোহার ডাণ্ডা। পরনে হলদে বেগুনী স্লিপিং সুট। আমাদের দেখে তো খুবই খুশি। একগাল হেসে আহ্লাদে ডাণ্ডা নাড়তে নাড়াতে স্বাগত জানালেন—"বাঃ! তোমরা? এসে গেছ তাহলে? এসো! এসো! হাউ সুইট অফ ইউ! আমরা বোধহয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—", বলতে বলতে ডাণ্ডাটা দরজার কোণে গুঁজে রেখে ড্রেসিং গাউন পরে এলেন। এবং মহা যত্নআত্তি করতে শুরু করে দিলেন। তোর ছোটপিসে তো সঙ্গে সঙ্গেই আরেক প্রস্থ স্কচ আর সোডা নিয়ে বসে গেছেন। এদিকে রুমা, মানে মিসেস গুপ্ত আর আসে না। আমি আমার আপেলের জুসটি হাতে করে বসেই আছি! বসেই আছি! শেষে গুপ্ত এসে কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, "তুমি নিজে একটু চল তো উষা—রুমাকে আমি কিছুতেই কমফর্টেবল করাতে পারছি না, ও কেবলই বলছে—'ইয়ার্কি মেরো না, যাও', আমি যেই খাটের পাশে গিয়ে ডেকেছি, 'হ্যাপি অ্যানিভার্সারি, রুমা', অমনি সে উঠে বসে চোখ গোল গোল করে বললে—"এঁ্যা? তোমরা সত্যি সত্যি এসেছ? এই মাঝরাত্তিরে? কী মুশকিল! সরি, কী আনন্দ। ওঃ— থ্যাংকিউ। থ্যাংকিউ"—বলে সেতো হেসে প্রেজেন্টটা নিয়ে, খাট থেকে নামলো। তারপর বললো—"ও, তোমরা বুঝি অন্য কোথাও নেমন্তন্ন খেয়েদেয়ে এলে?"

শুনে আমি তো খাপপা।

—"অন্য কোথাও মানে? তোমাদের এখানেই তো আমাদের আজ নেমন্তন্ন?"

রুমা বললে—"সে তো আটটার সময়, আর বাড়িতে নয় তো, ক্লাবে! ক্লাবেই তো ডিনারে ডেকেছিলুম তোমাদের সবাইকে।"

আমি করুণ সুরে বললুম—"তাই নাকি? ভেরি স্যরি! আসলে আমাদের বাড়িতে আজ লাঞ্চ ছিল কিনা কয়েকজনের, তাঁরা এইমাত্র গেলেন।" রুমা চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল

—"লাঞ্চ? না ডিনার? কী যে বল!"

—"লাঞ্চই। —কিন্তু আমার যে বড্ড খিদে পেয়েছে ভাই রুমা? তোমার ফ্রিজে কী কী আছে, দেখি?"

ব্যাজার মুখে ফ্রিজ খুলে রুমা গড়গড়িয়ে বললে—"ডিম, বেকন, মুসুম্বী, দুধ, রুটি, চীজ, মাখন—"

—"দূর, আমরা কি ব্রেকফাস্ট খেতে এসেছি? তার চেয়ে বরং লুচি ভাজো, বেগুন ভাজো—"

চোখ কপালে তুলে রুমা বলল—"এ—খন? লুচি? ঘরে ময়দাই নেই? ঘি-ও নেই।"

মনে মনে বললুম—তা থাকবে কেন? কেবল স্কচ আর সোডাই আছে! যেটা যাবে এক্সপেন্স অ্যাকাউন্টে! সেই যে হরি বলেছিল না,—"ব্রেকফাশ রেডি!" সেটা যে এমনি সত্যি সত্যি ফলে যাবে তা কে জানত? যখন আমরা মাঝরাত্তিতে দুধ কর্নফ্লেক্স টোস্ট ডিম নিয়ে খেতে বসলুম, টেবিলে মাথা রেখে রুমা বেচারী ঘুমোতে লাগল। অথচ তার স্বামীকে একবার দ্যাখো? গুপ্তর এমনই ভাবখানা—যেন এমনটাই হবার কথা ছিল। এত ভদ্র। নিজেই কফি করে দিলেন রাত দুটোর সময়। হাসিমুখে। তোর পিসে অমন পারতেন?

তারপর আজ সকালে হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে "অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি" চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে উনি বললেন— "উষা? আমরা যখন গুপ্তর বাড়িতে গেলুম,তখন ড্রাইভার কোথায় ছিল?"—আমি ওঁকে সব ঘটনা বললুম। মিসেস চ্যাটার্জীর কথাটা শুনে ওঁর কী মন খারাপ। তক্ষুনি উঠে পড়ে—"যত্তো ব্যাটা মাতালের কাণ্ড!" বলে মুখ বেঁকিয়ে, বেড-টী পর্যন্ত না খেয়ে ড্রাইভারকে ডেকে সঙ্গে সঙ্গে সেই হাসপাতালে ছুটলেন তার খোঁজ করতে। সত্যি গরীবদুঃখীর প্রতি ওর ভারী মমতা কিন্তু জানিস?

উনি তো বেরুলেন, আমি ওঘরে গিয়ে দেখি সুরিন্দর নেই। ছোট সোফায় কেবল টেবিলক্লথটাই পড়ে আছে। আর টেবিলে একটা চিঠি চাপা দেয়া। তাতে লেখা "ডাজ এনিবডি নো, হোয়াট হ্যাপেনড টু মাই মানি?"

আটটা বাজতেই ভদ্রতার অবতার দেশাই ফোন করল—"গুড মর্নিং মিসেস রে, ডিড ইউ স্লীপ ওয়েল?" তারপর একটু আমতা-আমতা করে—"স্যরি অ্যাবাউট লাস্ট নাইট!" তারপর আরো আমতা-আমতা করে—"আই হ্যাভ এ ফানি ফীলিং ইউ নো? আচ্ছা, কাল ও-বাড়িতে মিসেস চ্যাটার্জী বলে কি কেউ এসেছিলেন?" এসেছিলেন শুনে দেশাই ফোনেই প্রায় কেঁদে ফ্যালে আর কি!—"সত্যি ছি ছি ছি, কী লজ্জা? কী লজ্জা! কোন হাসপাতাল বলতে পারেন? আমি এখুনি সেখানে যাচ্ছি— এর হে হে, হোয়াট আ শেম।"

তারপর, সোয়া আটটায়, ভটচায্যি।—"কি বৌদি নাকি? সত্যি বৌদি, কাল বড্ড অত্যাচার করা হয়ে গেছে আপনার ওপরে। ছোট ভাইটি বলে মাপ করে দেবেন!" আচ্ছা, ভটচায্যি ইস্কুলে ছোড়দার সঙ্গে পড়ত, আমার "ছোট্ট ভাইটি" হলো কী করে? সে যাকগে— "তারপরেই—দাদা কোথায়? এত ভোরেই বেরিয়েছেন? এ্যাঁ। হাসপাতালে? মিসেস চ্যাটার্জী? কী সর্বনাশ! তাহলে ওটা স্বপ্ন নয়? আমি তো ভাবছি একটা বাজে নাইটমেয়ার দেখেছি, ঈ-ঈ-ঈশ—ছি ছি ছি! কী কাণ্ড বলুন তো?

আই মাস্ট গেট দেয়ার ইম্মিডিয়েটলি! ধুত্তোর। শালা মদ আর জীবনে ছোঁব না। স্যরি বৌদি—এক্সকিউজ মি—আচ্ছা কোন হসপিটাল বললেন?"

সোয়া নটায় তোমার ছোটপিসে ফিরে এলেন। হরি চিরাচরিত গম্ভীর মুখে ট্রে নিয়ে হাজির, "সাব, ব্রেকফাশ রেডি।" উনি খেতে বসে বললেন—"চাটুজ্যের পো এ-যাত্রা বেঁচেই গেল মনে হচ্ছে। দেশাই আর ভটচায্যিকে ওখানে দেখলুম। খুবই কনসার্নড হয়ে ডাক্তার-নার্স ছুটোছুটি করছে।"

তোর পিসে অফিসে রওনা হয়ে গেলেন। সেই গাড়িতেই আমি তোর কাছে চলে এলুম। এবার বুঝে দ্যাখ দিকি, কালকে আমি বাগবাজারে গিয়ে বসেছিলুম কেন?

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো ছোটপিসির কাহিনী শুনছিলুম—জেগে উঠে তাড়াতাড়ি বললুম—"খুব বুঝেছি, ছোটপিসি!" তৃপ্ত হয়ে ছোটপিসি বললেন—"তা যাকগে, এ রোববার তো তোকে খাওয়ানো হলো না, সামনের শনিবার বরং ডিনারে—"

আমি হাঁ হাঁ করে বলে উঠলুম—"কিন্তু ছোটপিসি। আমি বোধহয় শুক্কুরবারই দিল্লি চলে যাচ্ছি—বরং সামনের বারে খাবো, কেমন?"

খেসারৎ

"হাই! মা! মা রে! মা গ!"

মা চুপ করেই থাকে। সুফল যে বুকের ওপরে আছড়ে পড়ে এত ডাকছে কানে শুনতেই পায় না। ওপাশে শুয়ে আছে লক্ষ্মী। মনে হচ্ছে সারাটা মুখ যেন সিঁদুরে মাখামাখি (ঠিক যেমন ছিলেক বিহার দিনকে)। লক্ষ্মীর পাশেই হাঁ করে আছে বড়কা। সুফলের ঠাকুদ্দা। এতদিনে গেল। (লিজের বউ খাইছোঁ, পুত খাইছোঁ, বুড়া ঢ্যার দ্যার করিছোঁ) ছেলের বউ নাতির বউ সুজনকে দু'বগলে নিয়ে। (সালো বড়কা মাঝি তীখির কোয়া ইবার সুমায় হৈল তুমার?) লক্ষ্মীর পেটের দিকে তাকায় সুফল। পেটটা অল্প উঁচু হয়েছিল। (গেল। উটোও গেল। সুফল ইবার যিথাক ইচ্ছা সিথাক যেইতো পারবেক। সুফলের বাঁধাবাঁধন লাই)।

"হা রে কপাল। কেনে এইসেঁছেলম মত্তে লুভে পইড়োঁ গ! টুগদি সবুর সইলেক লাই—হাই মা! তুর তস্ সইলেক লাই!"

ওদের গাঁ থেকে শহর অনেক দূর। সেখানেও হাসপাতাল আছে বটে, কিন্তু সুফল

দেখেনি। সুফলের হাসপাতাল দেখা এই প্রথম। যেমন কলকাতা শহর দেখাও এই প্রথম।

হাসপাতাল কী বিচিত্র ঠাঁই!

চতুর্দিকে কেবল মরা আর আধমরা মানুষ ভর্তি। আর সাদা জামা পরা জুতো পরা যমদূতের মতন সব মেয়ে-মরদ খটখট করে ঘুরছে। সবাইকে ধমকাচ্ছে। মাথায় সাদা ফেট্টি বাঁধা একটা মেয়ে-মানুষ এসে সুফলকে মায়ের বুক থেকে হটিয়ে দিল, আরেকটা মরদ এসে ফটাফট চাদর চাপা দিয়ে দিল তিনটে মানুষের ওপর। একেবারে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে। (এত গরম। বাপরে। জানপরাণ যায়, গা'র ছালটো যেন ছেইড়্যে, ইর ভিতরি চাদর চাপা?) একলা সুফলই রইল চাদরের বাইরে। সুফলের পরনে ফর্সা ধুতি। গায়ে ফর্সা গেঞ্জি। গলায় পেতলের মাদুলি। মাথায় ভিজে চুল পাট পাট করে আঁচড়ানো ছিল একটু আগেও। (সুফল এখুন যিথাকে ইচ্ছা সিথাক যেইতোঁ পারিস। ঘরকে যাবি? কার ঘরকে যাবি রে সুফল?) অমনি আরেকটা চাদরের তলায় ঢুকে পড়তে পারলেই সবচেয়ে ভালো হতো সুফলের এখন।

"লক্ষ্মী রে! হাই রে লক্ষ্মী! মোখে ছেইড়্যে তু কুথাক চললি রে!" সুফল হঠাৎ শানবাঁধানো মেঝের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে ঠাঁই ঠাঁই করে মাথা ঠুকতে আরম্ভ করে দেয়।

—"এই! ও কী হচ্ছে কী? মাথা ফেটে রক্তগঙ্গা হবি যে?" ডাক্তারবাবুটা এসে ধমক লাগায়। গেঞ্জীর কোণা ধরে টেনে তোলে।

"বাবু! মোর সব যেছেঁ, সব চইল্যে যেছে গ'! সহ্য করতে লারছি।"

"সব গেছে মানে? কী গেছে তোর?"

"মা যেইছেঁ, বউঠো যেইছেঁ, বউয়ের প্যাটের ছেইল্যাতো যেইছেঁ, বুড়া কত্তা যেইছেঁ—হারে মোর কপাল!" ঠাস ঠাস করে মাথায় থাপ্পড় মারে সুফল।—"হাই বাবু গ' আমি ঘরকে যাব কেমনি কর্যে গ'? গাঁকে যেইয়্যে পুড়া মুকখান দিখাব কেমনি কর্যে গ' বাবু? পুড়া ঘরকে যে জনমনিষি রইলেক নাই!"—সুর করে কাঁদতে থাকে সুফল। ছোকরা ডাক্তারবাবুটার মুখখানা কেমন যেন হয়ে যায়।

"দাঁড়া, দাঁড়া, চুপ কর। আগে আমায় বুঝতে দে। কে কে গেছে তোর বললি? মা? বউ?" বাবুটা কাগজ পেন্সিল বের করে।

মা যেছেঁ, বউটো যেছেঁ, বউয়ের প্যাটে ছেইল্যাটো যেছেঁ, বুড়াকত্তা যেছেঁ আমি জেন্যেঁশুন্যেঁ কুখুনো তো পাপ করি নাই—হাই বাবু গ'—মোর ঘরকে আর কেউ নাই রে বাবু—কেউ কুথাকে নাই কে নে রে আমার!" হাউমাউ কাঁদতে থাকে সুফল।

—"নাম কী তোর?"

—"সুফল মাঝি! অ বাবু, মোর কী হবেক রে—"

BanglaBook.org

—"চুপ কর—গাঁয়ের নাম কী তোর?"

—"গেরাম কুন্তঙ্গেরাম, থানা ইলমবাজার, জিলা বীরভূম—"

—"ওঠ, ওঠ—আয় আমার সঙ্গে—"

—"কুথাকে যেইতোঁ হবেক গ' বাবু? শ্মশান কে?"

—"সেসব এখন নয়। ঢের দেরি আছে শ্মশানের। চল্ তোর নামঠিকানা লিখিয়ে দিবি চল। শালা ড্রাইভারগুলোর ফাঁসি হওয়া উচিত। না আছে কন্ট্রোল, না হয় গাড়ির মেনটেনেন্স। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থেকেও রক্ষে নেই? ছি, ছি, ছি—"

তিনটে মড়ার মুখাগ্নি করা সোজা ব্যাপার নয়। মুখে আগুন মানে মায়া কাটানো। তা মায়াটা বেশ ভালোভাবেই কেটে গেছে এবার সুফলের। কত্তাবুড়া। মা, লক্ষ্মী। বেরিয়েছিল মোট চারজনেই। ঘর বন্ধ করে, ছাগল চরানোর ভারটা চাঁদু বধুনীর ওপরে দিয়ে।

"মিটিন আছেক। কইলকাথার ময়দানকে বড়িয়া মিটিন্। পার্টির দাদাবাবুরা গাড়িভাড়া দিয়্যে লিয়ে যাবেক, ভাত দিবেক, লিখরচায় কইলকাথা দেইখ্যে আসবি সব্বাই—গঙ্গাচ্ছান কইর্যে আসবি সব্বাই—", সিদুখুড়া বলেছিল। তারই কথায় এসেছে ওরা তেরোজন, ময়দানে মিটিং করতে আর ঐ সঙ্গে লিখরচায় কলকাতা শহর দেখে যেতে। মা বললে,

"মুন বুলছেক ইবার না হলি্য আর কুনুদিন হবেক নাই। মোর গঙ্গা দিখা হয় লাই রে সুফল। একটুস ডুব দিয়্যে আসথম?" লক্ষ্মী বললে,—

"মা যাবেক, তবে মোকেও লিয়্যে যাবি কিন্তুক, হঁ! বুল্যে দিলম! ইকা ইকাটি ঘরকে থাকব লাই।" তারপর আড়ালে আড়ালে গলায় বলেছিল।

"কইলকাথাক যেইয়্যে চিড়েখেনাটো দিখাবি, সুফল— বাঘ, সিঙ্গি, হাতী, বান্দর? ফুলটুসি সব দেইখ্যে এসেছেক রে?"

"বেশ, বেশ। সব হব্যে।" বড়কা মাঝি বলেছিল।

"পয়লা ইস্টিশানকে নেমোঁ গঙ্গাচ্ছানটো সেইর্যে লিব, তাপরে সিদা কালিঘাট। পূজাটো দিইয়্যে, চিড়েখেনাক লিয়্যে যাব তুদেরখে। তাপরে মিটিং। বাস। মিটিনকে যেইলিঁ তো পুরা শহরটো দেইখ্যে লিলি। মইদান মানুম্যাণ্টো, ভিক্টুরিয়া। আর ভীড় কী! বাপ গ'!"

অমন জমজমাট প্রোগ্রামটার কেবল শুরুটুকুই হয়েছিল। শেষটা অন্যরকম চেহারা নিল। ভোরবেলা ট্রেন থেকে নেমে প্রত্যেকেই গঙ্গাস্নান গঙ্গাপুজো করেছে। এখন ট্রামে চড়বে বলে দাঁড়িয়েছিল সবাই হাওড়ার পুলের উপরে। কলকাতা এসেছে, ট্রামে চড়তে হবে না? প্রথমে কালিঘাট। তারপরে চিড়িয়াখানা।

উঃ! কী শহর! গাড়িঘোড়ার দাপট কী! বড় শহর সিউড়িও দেখেছে সুফল মাঝি। তার সঙ্গে কোনো তুলনাই হয় না।

"গাড়িগুলান সব ঝেনে উদ্ধশ্বাসে দাঁদুড়ে আসছেক—", ভয় পেয়ে লক্ষ্মী বলে উঠেছিল—

"উঃ। জানটো লিয়্যে লিবেক নাকি? বাপ্ গ'!"

তাই হয়েছে। ঠিক তাই হয়েছে। ফুটপাতে দাঁড়িয়েছিল তেরোজন গ্রামের মানুষ ভোরবেলা স্নান সেরে। ব্রেক নষ্ট সরকারী বাস পাগলের মতো দুদ্দাড় করে ফুটপাতে উঠে এসেছে; সাতজনকে চাপা দিয়ে জানগুলো এক্কেবারে নিয়েই নিয়েছে। তিনজন সুফলেরই ঘরের মানুষ। বাকি চারজন ডোমপাড়ার। আরো তিনজন হাসপাতালে ভর্তি। বেঁচে গেছে সুফল, পঞ্চা, সিদুখুড়া। ওদের আর মিটিনে যাওয়া-হয়নি। (সুদ্ধা মা গঙ্গা আর হাওড়ার পুলটো আর হাসপাতাল। বাস। আর কুনুটা দেখলম লাই)!—"লক্ষ্মী রে! আই রে লক্ষ্মী! চিড়েখেনাক বিড়াতে যেইতোঁ বড্ড সাধ হইছিল রে তুর—।

—"আবার?" সাদা ফেট্টি বাঁধা ছুঁড়িটা এসে এক ঝাঁকি লাগায় সুফলের কাঁধ ধরে।

"থাকো থাকো ষাঁড়ের মতন চেঁচিয়ে ওঠো কেন? কাঁদতে হয় যাও বাইরে গিয়ে কাঁদো"—একটু থেমে বলে—"কান্নাই বা কিসের এত? তিনজন তো মরেছে? পুরো তিনহাজার পাবে। আমি অত টাকা পেলে বর্তে যেতুম, বুঝলে?"

—"দেশে ফিরে আরেকটা বিয়েসাদি করে ফেলিস"—সাদা ফেট্টি বাঁধা অন্য ছুঁড়িটা বলে। দুজনেই মুখ টিপে হাসে।

সুফল এদের কথার মানে বুঝতে পারে না। কী ভাষা বলছে এরা? এরা হাসছে কেমন করে? (ছামুতে ডাগর বউটো মইরে পইড়্যে আছেক, ইরা বুলে, গাঁকে যেইয়্যে বিহাশাদি কর? বুলে, তিনটো মইরেছ্যে তিনহাজার হবেক? ইরা কি পাগল? ভূতপিরেত মানবেক লাই?)।

দলের পাণ্ডা রবীন পোদ্দার, প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার। সেও পার্টির দাদাবাবু। সব ছুটোছুটি থানাপুলিস সে-ই করছে। মাস্টার ছিল তাই রক্ষে। কতগুলো কাগজেই যে টিপসই করিয়ে নিলো এরই মধ্যে সুফলকে দিয়ে। সিদু খুড়া সান্ত্বনা দিলে—

"টুকুস ভালো কথা, তুর মার জেবনের সুকসাধটো মিটা যেইছ্যে। গঙ্গাচ্ছান কইবে মইরেছ্যে, সিধা স্বগগকে পৌঁছাই যাবেক। হঁ! হইছে বটেক অপমিত্যু, কিন্তুক পুণ্যচ্ছানের ফল লাই? উরা কুখুনো ভূতিন-পেতিন হবেক লাই। এই বল্যে দিলম তুখে।" এই বিধানটা খুব মনের মতন হয়েছে সুফলের। এইটুকুই ভরসা। গঙ্গাচ্ছানটা টাটকা টাটকা করা আছে, মা-বউয়ের স্বর্গে যেতে দেরি হবে না। (আর যেমুন ঘাঘী মরদটো সাথে যেইছ্যে, বড়কা মাঝি! বুড়াকত্তা পথকেই মরুক, উর ঠাণ্ডা মাথাটো হবেক লাই)।

বুড়াকত্তার পেট-কাপড়ে পঞ্চাশটা টাকা বাঁধা ছিল। (আইব্বাপ! বুড়াকত্তা, তুর পাটে ইথ টাকা?) মায়ের আঁচলেও ডবল গেরো দেওয়া দুটো টাকা ছিল। হাতে ছিল কাঁকন-জোড়া। পুলিস সব খুলে এনে সুফলের হাতে তুলে দিয়েছে। কিছুই ছিল না কেবল লক্ষ্মীর ট্যাঁকে। গর্ভের সন্তানটুকু ছাড়া। তবে হাজার হোক নতুন

BanglaBook.org

বউ, নেই নেই করেও গা-ভর্তি গয়না তার। চকচকে কালো চামড়ার ওপর ঝকঝকে সাদা রুপো— বড্ড মানাতো বউটাকে। লক্ষ্মীর হাতের জোড়া বালা, গলার গোলাপ ফুলহার, কানের মাকড়ি, খোঁপার ফুল, পায়ের মল, মায় আঙুলের আঙট পর্যন্ত সব খুলে খুলে গুনে গুনে পুলিসরা যখন সুফলের হাতে তুলে দিচ্ছে, সুফল আরেকবার চীৎকার করে উঠল— "লক্ষ্মী রে! আই রে লক্ষ্মী! তুর জেবনের সকসাধ ত কিছুই মিটলেক লাই? তুর প্যাটের ছেইল্যার মুখনটুসও দেইখ্যে যেইত্যে লারলি তু—", রবীন মাস্টার ধমক দিলে,—"চুপ কর। এখন ভালো করে গুছিয়ে রাখ দিকিনি গয়নাগাঁটিগুলো, খবদ্দার বেচবি না এক্ষুনি!"

না, বেচবে কেন সুফল? এক্ষুনি তো হাতে বাহান্ন টাকা এসেছে সুফলের, বাহান্নখানা তাসের মতন। আরও যা আসবে শুনেছে তাতে মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে সুফল মাঝির। নিজেকে পাপী-পাপী মতন লাগছে কেমন, কথাটা মনে পড়লেই। (কিন্তুক সুফল মাঝির ইথে দুষটো কুথাকে? পাপটো কুথাকে মোর?) রবীন পোদ্দার খুব স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিয়েছে। (লিচ্চয় মিছা বুলেক লাই রবীন মাস্টার, সাঁচ্চা কথাই বুলছেক)। হিসেবপত্তর। বুড়ো ঠাকুর্দার জন্য এক হাজার, মায়ের জন্য এক হাজার, লক্ষ্মীর জন্য এক হাজার। মোট তিন তিন হাজার টাকার মালিক এখন সুফল। খেসারতি দেবে তাকে সরকার। একসঙ্গে তিনশো টাকাই চোখে দ্যাখেনি যে-লোক, সেই পাচ্ছে তিন হাজার। অত টাকা দিয়ে সুফল করবেটা কী? তিনখানা জ্যান্ত মানুষ তো আর কিনতে পারবে না? ভিখ্যে তো নয়, সাড়ে তিনখানা।

—"আর প্যাটের ছেইল্যাটো গেল যে? উটার লেগে খেসারতি দিবেক লাই সরকার?"

—"বড্ড লোভ তো তোর?" ঘেন্নাঘেন্না সুরে ধমকে উঠেছিল রবীন পোদ্দার —"যে ছেলে জন্মায়নি তার জন্যেও খেসারতি চাই?"

"চাই লয়? জন্মায় লাই সিটো কি তার দুষ। তার মাখে মইরে দিছেঁ বইলোই লয়?"

"ফের তক্কো?" অবাক চোখে তাকিয়েছিল রবীন পোদ্দার।

"তোদের প্রাণে কি মায়ামমতা নেই রে? মা-বউ গেল, বুড়ো ঠাকুদ্দা গেল, ঘর সংসার ফাঁকা ধুধু হয়ে গেল, আর তুই কষছিস টাকার হিসেব? ধন্যি জাত মাইরি তোরা। সত্যি!"

সুফলের হিসেব কষার সেই আরম্ভ। বাহান্নর আটটা টাকা বেরিয়ে গেছে শ্মশানেই। তিন তিনটে ঘরের জনের মুখে নুড়ো জ্বেলে দেওয়া কি সোজা কাজ? প্রস্তুতি চাই না তার জন্য?

—"যা যা, বাড়ি চলে যা, এখেনে থেকে আর কাজ নেই তোদের। পঞ্চা, সিদুখুড়ো, সামলেসুমলে সুফলকে দেশে নিয়ে যাও দেখি তোমরা—পরের ট্রেনেই

যাও।" ধমকে উঠেছিল রবীন পোদ্দার— "গুচ্ছের মদ গিলে শ্মশানেই মাতলামো শুরু করেছিস সুফল? লজ্জাও করে না তোদের? ছি ছি—"

—"সরকার খেসারতির ট্যাকাটো এখুন দিবেক লাই, মাস্টার? ট্যাকা লিয়্যে ঘরকে যেথম বেটে।"

—"ফের টাকার কথা? বলিহারি যাই বাবা। সে টাকা পেতে পেতে এখন অনেক দিন! হাতে হাতে পাবি নাকি? দেবে ঠিক সময়মতন। সব খুইয়েও খেসারতির বেলা ঠিক হুঁশটি দেখি টনটনে—"

তা হুঁশ টনটনেই বলতে হবে বই কি সুফল মাঝির। ট্রেনে চড়ে বসেই বিড়বিড় করে হিসেব কষতে শুরু করেছে।

—"তিনটো মনিষ মইরেছোঁ, তিন হাজার। একটো মনিষ মইরলেঁ এক হাজার। একটো মনিষ জন্মায়লাই, তাই উটোর কুনু খেসারতি লাই। সুদ্ধা যি-মনিষগুলান মিছা মিছা জন্ম লিয়্যে মিছামিছা মইর্যে যেইছেঁক— আঙুলের কড় গুণতে থাকে সুফল— "গোপলা মৈরেছে গেল সালকে রেলপুলিসের গুলি খেইয়্যা এক হাজার। লিতাই সিবার বানের জলকে ভেইসোঁ গেল, ভরপুয়াতি ছাগলটো চালকে উঠাই লিজ্যে উঠতে লারলেক, অজয়ের ওঃ কী মরণ সোঁত—হা রে লিতাই! এক হাজার। এক এক দুই। দাদী যেইছ্যে কালেরা হইয়্যা, এক হাজার। তিন হাজার। বাপ-জেঠা গেল একই দিনকে জমিনের দাঙ্গাক লাঠি খেইয়্যা—বাপ চার। জেঠা পাঁচ। পাঁচ হাজার। পাঁচ তিনকে আট। আর বুনদুটো তিনমাস পয়লা কয়লাখাদকে জলডুবি হইয়্যে মইরেছোঁ—শালো কন্টাক্টারের লালখাতাকে উদের নাম লিখায় লাই—সরকার বুনদুটার লেগে একডুনু ট্যাকাকড়ি দিবেক লাই—আট দুই দশ। আর প্যাটের ছেইল্যা মিনিমাঙনা, উর বিলা খেসারতি লাই, সিটো জন্ম লিতেই লারলেক! ঠিক কাথা! কি বুল খুড়ো, আমি কি কম বুড়লুক? আইববাপ। সিদা কাথা? দশ হাজার ট্যাকা পাইছিঁ বেটে, সরকার মোখে দশ হাজার ট্যাকা দিছ্যোঁক—বাপ এক। জেঠা দুই। দাদী তিন। গোপলা চার। লিতাই পাঁচ। দুটো বুন, শালফুল, নিমফুল। পাঁচ দুই সাত। বুড়াকত্তা আট। মা লয়। লক্ষ্মী দশ। মোর ঘরকে কি কম লুক মেইরেছ্যে সরকার? খেসারতি দিবেক লাই? প্যাটের বিটাটো ফাউ। হুঃ—পুরো দশ হাজার। ট্যাকাটা হাথে পেইয়্যা দেইখ্যো খুড়া পরথমকেই লক্ষ্মীকে সাঙ্গা কইর্যে ঘরকে তুলব আমি, আর শালো দীনু চৌধুরীর হাথ মুচড়ায়্যা জমিনটো কেইড়্যে লিব। মোর বাপজেঠা জান দিছ্যো উয়ার লেগে, কুনুদিনকে দীনু চৌধুরীর জমিন লয় সিটো —হুঁ,—" —চোখটা জ্বলে ওঠে সুফলের। সেদিকে তাকিয়ে ভয় পায় সিদু।

—"হায় হায় গ", সিদুখুড়ো ফিসফিসিয়ে পঞ্চাকে বলে— "শোকে-দুখে ছেইল্যাটার মাথা বিগড়ায়্যা যেইছ্যো গ'—হাই ভগমান"—

—"কেনে? মাথা বিগড়াইছে বুল কেনে?" দাবড়ে ওঠে পঞ্চা। মদ সেও

কম খায়নি।—"লেহ্য কথাই বুলছেক বেটে সুফল। পরপর ঘরটো খালি হইয়্যেঁ যৈছে নি উর? খেসারতি দিবেক লাই কেনে দরকার– মরে লাই? জুয়ান জুয়ান মেইয়্যাঁ মরদ মিছা মিছা মরে লাই উর ঘরকে? শালো কইলকাথাকে যেইয়্যেঁ মইরলে হাজার ট্যাকা আর গাঁওঘরকে মইরলে লবডংখ্য?" সিদ্ খুড়ো ভয় পেয়ে পাশের গাঁয়ের যাত্রীকে ডাকে—"আই মাঝি, ইরা বুলে কি? ছেইল্যাগুলান খেইপ্যে যেছেঁ নিকি?"

মেঝেয় থুথু ফেলে মুখ ভেংচে মাঝবয়সী লোকটি বলে—"তুমিও কি খেইপলে নিকি মাঝি? মদ খেইয়্যাঁ কী বুলতে কী বুলছেক, ধুস, উসব শুন কেনে?"

BanglaBook.org

চোখ

বীরুবাবু সকালবেলায় দোতলার বারান্দায় দাঁতন করছিলেন, এমন সময়ে সেই বিরক্তিকর হরিধ্বনি। কেওড়াতলার কাছাকাছি বাড়ি নেবার ফলটা এই হয়েছে যে একটা দিন যায় না মড়া না দেখে। ইচ্ছে না করলেও চোখ পড়লো নিচের দিকে, কেমন যেন চমকে উঠলেন। মৃতদেহের তো চোখ সাধারণত বোজা থাকে, না-বুজলে তুলসীপাতা চাপা দেওয়া থাকে। এই মুখটা—ঠিক যেন কোনো জীবন্ত লোক খাটিয়ায় শুয়ে তাঁর দিকে চেয়ে হাসছে। রোগাটে ছুঁচলো মুখ, ফর্সাই বলা যায়, সরু কালো গোঁফ ঠোঁটের ওপরে। ওপরের ঠোঁটটা অদ্ভুতভাবে একটু কাটা—ফাঁক দিয়ে একটা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। তার চোখদুটি মেলা। একটা চোখ আরেকটার চেয়ে বড়, যেন ওপরের পাতাটা নেই—পাথরের চোখের মতো—পুরো মণিটাই প্রায় দেখা যাচ্ছে। বীরুবাবুর বেজায় অস্বস্তি হলো। ব্যাটারা আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে লাল আলোর জন্যে—বীরুবাবুর মোটে ইচ্ছে না করলেও, নড়তে পারলেন না, দাঁড়িয়েই রইলেন বারান্দায় সেঁটে, ওই জ্যান্তমতন মরা মুখখানার দিকে চেয়ে। দেখতে-দেখতে কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হলো মুখটা?

নিশ্চয় দেখেছেন। কোথায়?...কোথায়? বাজারে কি? মাছওলা কোনো? সব্জীওলা? ট্রামে কি? কন্ডাক্টর? কোথায়? শ্যালদা লাইনে ট্রেনের ফেরিওলা নয় তো? নাঃ—এসব অদ্ভুত সংস্রব মনেই বা আসছে কেন তাঁর? মুখখানা খুব চেনা-চেনা লাগছে—অথচ কিছুতেই ঠাহর করতে পারছেন না কী জন্য চেনা। ভাবতে ভাবতেই আলো বদলালো, হরিধ্বনি দিয়ে ওরা চলে গেল। খাটিয়ায় শুয়ে ওঁরই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দুলতে দুলতে চলে গেল লোকটা। চেরা-ঠোঁটের ফাঁকে দাঁতটা যেন হাসছে।

বিশ্রী লাগছে সক্কালবেলাতে এই বিতিকিচ্ছিরি মড়ার মুখ দেখা। বীরুবাবু কলঘরে গেলেন মুখ ধুতে। চোখে বারবার জলছড়া দিয়ে যেন ওই বিস্বাদ অভিজ্ঞতাটাকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করলেন। মড়ার মুখে কত প্রশান্তি থাকে। মড়ার মুখে এমন ফিচেল-ভাব তিনি জীবনে দেখেননি। চা, খবরের কাগজের ফাঁকে ফাঁকেও বিতৃষ্ণার অনুভূতিটা যেন ফিরে আসতে লাগলো। তিনি থলি হাতে বাজারে বেরুলেন।

চেনা মাছওলা, চেনা আলুওলা, চেনা ফলওলা। বাজারে তাঁর সবাই চেনা। তবুও বীরুবাবু আজ প্রত্যেকের দিকে নতুন চোখে চাইতে লাগলেন—যেন কোথাও কিছু লুকিয়ে আছে। বীরুবাবু দুশো পার্শে বেছে নিলেন, পাঁচশো আলু, দেড়শো পেঁয়াজ, একশো ঢেঁড়স, চারটে মুলো, শাক তিন আঁটি—হঠাৎ দেখতে পেলেন। শাকউলি বুড়ির বাঁ চোখটার মণিতে যেন ঢাকনি নেই—ছুঁচলো মতন মুখখানা—বীরুবাবুর হাত থেকে শাক পড়ে যাচ্ছিলো, বুড়ি তাড়াতাড়ি তুলে দিল, আধুলি থেকে কুড়ি পয়সা ফিরিয়ে দিলে—অন্যদিকে চেয়ে অন্ধের মতো কোনোমতে পয়সাটা নিয়েই বীরুবাবু চলে এলেন।

শসা এক জোড়া,—মাথা ঠাণ্ডা করে বীরুবাবু ভাবছেন,—আজ বেসপতিবার, ছ'টা কলা, দুটো কমলালেবু নিতে হবে। গিন্নির লক্ষ্মীপুজোর বাই আছে। সংসারে তো লক্ষ্মী উথলে উঠছে! নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। তবু লক্ষ্মীপুজোর ফলটি চাই। বাতাসা চাই। বীরুবাবুর ভুরুটা কুঁচকে উঠলো। তিনি এসব পুজো-ফুজো-তে বিশ্বাস করেন না। তবু গিন্নিকে নিজের মনে থাকতে দেন। ছেলেপুলে হয়নি, —কিছু একটা নিয়ে থাকবে তো মনের তার না-হয় অফিস আছে। সন্ধ্যেবেলা নগেনবাবুর বৈঠকখানায় তাসের আড্ডা আছে। গিন্নি বেচারীর ওই সিনেমার কাগজ, কখনো একটা বাংলা ছবি, আর লক্ষ্মীপুজো, সত্যনারায়ণ—এই নিয়েই তো জীবন। ভাবতে ভাবতে গিন্নির প্রতি করুণায় মনটা আবার নরম হয়ে এলো বীরুবাবুর। আহা করুক একটু—শখ আহ্লাদ বলতে তো ওইটুকু। কলা কত করে?—লোকটা পিছন ফিরে টাঙাচ্ছিলো কলার কাঁদি—বললো—কোন কলাটা?— বলতে বলতে এপাশ ফিরলো। রোগাটে, ছুঁচলো মুখ, ওপরের ঠোঁটটা চেরা, ফাঁক দিয়ে একটা হলদে দাঁত বেরিয়ে আছে—সরু গোঁফে ঢাকা পড়েনি। বীরুবাবুর গলার ভেতরে নিশ্বাস আটকে এলো—তিনি বেমালুম ভুলে গেলেন। গিন্নি, বেসপতিবার, ফল, বাতাসা...ছিটকে সরে গেলেন ভিড়ের মধ্যে। কলাওলা অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। বীরুবাবু আপ্রাণ চেষ্টা করলেন মনের লাগামটা কষে ধরতে।

বাজারের জনস্রোতে কারুর দিকে চাইতেই ওঁর কেমন ভয় করতে লাগলো, যেন প্রত্যেকের মধ্যেই একটা চমক থাকতে পারে। কোনো-দিকে-না-তাকিয়ে হাঁটতে গিয়ে কার বুঝি পা মাড়িয়ে দিলেন—উঃ, দেখে চলতে পারেন না? পায়ে কি খুর বাঁধিয়ে রেখেছেন দাদা?— বীরুবাবুর যেন জ্ঞান ফিরলো—আহা, লাগলো? বলতে বলতে তিনি পাশে চেয়ে দেখলেন লোকটি নিচু হয়ে পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে

BanglaBook.org

মুখ তুলে তাকালো—বাঁ চোখ ভাবলেশহীন, বিস্ফারিত, ডান চোখে রাজ্যের বিরক্তি, সরু গোঁফের নিচে চেরা-ঠোঁটের ফাঁকে হলদে দাঁত যন্ত্রণায় খিঁচিয়ে রয়েছে—প্রায় আর্তনাদ করে উঠে বীরুবাবু দ্রুত সরে গেলেন। বাজার করা মাথায় উঠলো, বাড়ি পৌঁছুতে পারলে বাঁচেন। কেমন যেন দুর্বল লাগছে পা দুটো, মাথার ভিতরটায় গুমগুম আওয়াজ হচ্ছে, ব্রীজের ওপর দিয়ে রেলগাড়ি গেলে যেমন হয়, নিজের পায়ের ওপর যেন নিজের কন্ট্রোল নেই, বীরুবাবু ডাকলেন : এই রিকশা। রিকশাওলা পাদানিতে বসে ঝিমুচ্ছিলো, ডাক শুনে জেগে উঠলো। বিস্ফারিত বাম চোখে দৃষ্টি নেই—চেরা ঠোঁটের ফাঁকে—বীরুবাবু আর তাকাতে পারলেন না, আপনি বুজে গেলো চোখ—ছুটে গিয়ে পাশের ট্যাক্সিটার দরজা খুলে উঠে পড়লেন। আঃ! সীটে গা এলিয়ে দিয়ে কী আরাম।

সমস্ত শরীরে একটা অদ্ভুত কাঁপুনি হচ্ছে যেন—এই মুহূর্তে এই বসবার জায়গাটা না পেলে উনি নিশ্চয় রাস্তায় পড়ে যেতেন। মোটা আওয়াজে সর্দারজী জিজ্ঞেস করলো, কিধর যানা? বীরুবাবু ক্লান্ত গলায় নির্দেশ দিলেন। এতোই ক্লান্ত যে ড্রাইভার বিস্মিত হলো। বাড়িতে এসে নেমে তিনি ড্রাইভারকে এক টাকা বেশি দিতে গেলেন, খুচরোই সমস্যা। ড্রাইভার চোখ থেকে রোদের চশমাটা খুলে ফিসফিস শুনতে লাগলো। শুনে নিয়ে বীরুবাবুর দিকে চেয়ে বললে, বাস! ঠিক হ্যায়। বীরুবাবু দেখলেন সর্দারজীর দাড়িগোঁফের জঙ্গলের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে বাঘের মতো নিষ্পলক বাঁ চোখ—যেন পাথরের চোখ, চামড়া ঢাকা নেই। উর্ধশ্বাসে ছুটে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন। সিঁড়ির তলার পরিচিত স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারে পৌঁছে তাঁর যেন বুকটা ফেটে যেতে চাইলো। হাঁটুতে হাঁটু জড়িয়ে আসছে দেখে প্রথম ধাপটাতে বসে পড়লেন। বাইরে আওয়াজ পেলেন, স্টার্ট দিয়ে ট্যাক্সি চলে গেলো। বীরুবাবুর যেন ধড়ে প্রাণ ফিরলো—সঙ্গে সঙ্গে চোখ-দুটোও যেন ভিজে ভিজে হয়ে এলো, সেই বুক-ফাটা চাপটা যেন চোখ থেকে বেরুবার পথ পাচ্ছে। রুমাল বার করে চোখমুখ মুছলেন বীরুবাবু। এবারে ওপরে গিয়ে ভালো করে এক কাপ চা খেতে হবে। কী আশ্চর্য বিভ্রম!

বিভ্রম ছাড়া এটা কিছুই নয়। বীরুবাবু ভাবলেন, সকালে উঠেই প্রায় আধো-ঘুমের মধ্যে অমন বীভৎস মড়া দেখবার যা একখানা অভিজ্ঞতা চোখের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো—হয়েছে, আর কি যতসব অবচেতনের বজ্জাতি। যাকে বলে হ্যাল্যুসিনেশন! এই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণ জ্যান্ত কালী দেখতেন, শ্রীচৈতন্য সমুদ্রে দেখলেন জগন্নাথ মূর্তি—আর বীরুবাবু চতুর্দিকে মড়া দেখছেন। তাঁরা ছিলেন গিয়ে পুণ্যবান ব্যক্তি—আর সরকারী কেরানীর কপালে জ্যান্ত নরক ছাড়া কীই-বা জুটবে। বীরুবাবু ভাবলেন, খাওয়া-দাওয়াটায় একটু যত্ন নিতে হবে এবার। বেশি করে প্রোটিন ও ভিটামিন খাওয়া উচিত। দুধ তো বহুদিন বন্ধ। মাংস-ডিমও বন্ধ। হবে না? পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শরীরে রাসায়নিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়, তাই থেকেই

এসব স্নায়বিক রোগের উৎপত্তি। নার্ভাস ডিসঅর্ডার ছাড়া কিছু নয়। গোড়াতেই এর উচ্ছেদ দরকার। উনি আজই ডাক্তারের কাছে যাবেন। ভিটামিন বড়ি-টড়ি একটা কিছু খেতে হবে আরকি। বয়েস হচ্ছে। শরীরের বল, রস ফুরিয়ে আসছে। এখন বাইরে থেকে বলসঞ্চার করা দরকার। ফুড সাবস্টিট্যুশন দরকার ওষুধ দিয়ে। ভাবতে ভাবতেই বীরুবাবুর পায়ে বল এলো। তিনি সহজভাবে উঠে দাঁড়ালেন। থলি হাতে উপরতলায় উঠে গিয়ে কড়া নাড়লেন সিঁড়ির মাথায় থেমে।

গিন্নি এসে দোর খুলে দিলেন—কিগো, আজ এত দেরি? আমার তো ভাবনাই হয়ে গিয়েছিলো। যা দিনকাল!—বীরুবাবুর হাত থেকে থলিটা নিতে হাত বাড়ালেন গিন্নি।

—আর বোলো না! আজ এমন একটা অদ্ভুত—বলতে বলতে বীরুবাবু একমুহূর্ত থামলেন—ওকে এটা হঠাৎ বলা কি ঠিক হবে? এসব ব্যাপার মনের ভেতর ঢুকিয়ে না দেওয়াই ভালো—এমনিতেই যা ভীতু মানুষ—এসব আনক্যানি গল্প ওকে বলে কাজ নেই। অটোসাজেশন বলেও একটা জিনিস আছে। বীরুবাবু কথা ঘুরোনো ঠিক করে নিয়ে থলিটা গিন্নির হাতে তুলে দিলেন। দিতে দিতে দেখলেন গিন্নির বাঁ চোখের মণিটায় অকূল বিস্ফারিত দৃষ্টিহীনতা, চেরা ওপরের ঠোঁটের ফোকরে একটি হলদে দাঁত তাঁরই দিকে হাসছে। মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ চমকালো, সহসা পিছন দিকে হেলে পড়লেন। গিন্নির আর্তনাদের মধ্যে বীরুবাবুর দেহ সিঁড়ির ধাপে ধাপে গড়িয়ে পড়তে লাগলো নিচে। আরো নিচে।

[উপসংহার ডাক্তার এসে বলেছিলেন, স্ট্রোক। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে মৃত্যু। কতশত স্ট্রোকের পিছনে যে কি গল্প থাকে, আমরা কি জানতে পারি? বীরুবাবুর গল্পটাই তো তিনি বলে যেতে পারলেন না]।

BanglaBook.org

সুটকেস

চন্দন বাবার জন্যে বিলেত থেকে ঘড়ি আনলো, কিন্তু মার জন্যে কী যে আনবে ভেবে পেলো না। শেষে কী ভেবে একটা লাল-টুকটুকে, ছোটো দেখে হালকা ফাইবার গ্লাসের সুটকেস কিনলো। বাবা ঘড়ি পেয়ে মহাখুশি, এক স্নানের সময়েই যা ঘড়িটা খুলে রাখতে বাধ্য হন। আর মা গদগদচিত্তে সুটকেসটিকে একটা টুলের ওপরে, ফুল-তোলা কাপড় দিয়ে ঢেকে, সাজিয়ে রাখলেন।

চন্দনের ছোটো ভাই বুচকুন এখনও কলেজে পড়ে, মা-বাবার কাছে শুধু সেই

থাকে। আর থাকে সেজ বোন ইন্দিরা, ওখানে গার্লস স্কুলে পড়াচ্ছে। ছোটো বোনটা ক্লাসফ্রেণ্ডকে বিয়ে করে আগেই কলকাতায় চলে গেছে। দিদি-মেজদি তো বহুকাল শ্বশুরবাড়িতে। দিদির ছেলেই বুচকুনের সমান। চন্দনের চার দাদাও বিয়ে-থা করে নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছেন। দশ ছেলেমেয়ের মা হলে কি হবে সলাজনয়নী এখনো বেশ শক্ত আছেন, রান্নাবান্না নিজেই করেন। ক্ষেত্রবাবুর এই আটাত্তর হলো, বাঁ-চোখে ছানি পড়েছে, ভালো দেখতে পাচ্ছেন না আজকাল। চন্দন তাই চিঠিতে দরকারি অংশগুলো আনডারলাইন করে দেয়।

আপাতত চন্দনের দুটো চাকরি হয়েছে বার্নপুরে। এক ইঞ্জিনীয়ারিং, আরেক বোনের জন্যে ঘটকালি। বাবা-মায়ের মনে এখন প্রধান উদ্বেগ ইন্দিরা, যার বয়েস সাতাশ পুরেছে। গোটা শিলিগুড়ি শহরে নাকি সাতাশ বছরের অবিবাহিত কন্যা আর একটিও নেই। চিঠিতে চন্দন তাই নিয়ম করে পাত্রের খবর পাঠায়। সাধারণত খাঁটিই, মাঝে মাঝে অবশ্য কল্পিতও। কেননা চন্দন সার কথাটা বুঝে গেছে, বাবা-মাকে সবচেয়ে খুশি করতে পারে এই একটিই প্রসঙ্গ।

সেদিন চন্দনের চিঠিতে একটা চমৎকার সম্বন্ধ এলো—পাত্র এই শিলিগুড়িরই ছেলে, কাজ করে আসানসোলে, মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার। বাবা যদি সম্বন্ধটা পছন্দ করেন, তবে চন্দন কথা বলতে পারে ছেলের সঙ্গে। বাবা যাতে যোগাযোগ করতে পারেন পাত্রের বাবার সঙ্গে তাই শিলিগুড়ির ঠিকানাটাও পাঠিয়েছে চন্দন। ছানি-পড়া চোখে বাবা অধিকাংশ সময়েই আন্দাজে কাজ সারেন। তিনি আন্দাজে পড়লেন যে, চন্দন কথা বলে ফেলেছে পাত্রের সঙ্গে, এখন বাবা যেন কথাটা পাকা করেন পাত্রের বাবার সঙ্গে। বাবা ছাতাটা নিয়ে জুতোতে পা গলাতে গলাতে ডাকলেন,—"বড়বৌ, আমি একটু বেরুচ্চি। কথাটা পাকা করে আসি, ছেলের সঙ্গে কথাবার্তা যখন হয়েই গেছে। কাল বিকেলেই ওরা মেয়ে দেখে যাক।"

মা (ওরফে বড়বৌ) বললেন—"সে কিগো? পাকা কথা কি? চন্দন তো কোনো কথাই পাড়েনি এখনো। তুমি বরং যাও, পাওনা-থোওনা কে কিরকম চায় সব শুনে এসো, ঘরদোর দেখে এসো, মেয়ে দেখানো এক্ষুনি কী? ও পরে হবে। কালই দেখাতে হবে না।"

বাবার কেবল চোখেই ছানি নয়, কানেও একটু কম শোনেন মাঝে মধ্যে। তাই রাগটা ইদানীং বেড়েছে। বাবা রেগে বললেন—"মেয়ে দেখানো হবে না? বেশ আমি তাহলে চন্দনকে লিখে দিচ্ছি এ সম্বন্ধ ক্যানসেল, এখানে হবে না।"

—"আহা, আমি কি তাই বলেছি? আগে তুমি অন্য অন্য কথাবার্তা কয়ে নাও, ঘরটা কেমন বুঝেশুনে এসো, চন্দন ওখানে পাত্রের সঙ্গে কথা বলুক, তারপরে তো মেয়ে দেখাবে?"

কেবল আধখানা শুনতে পেয়ে বাবা বললেন—

—"ও! চন্দন পাত্রের সঙ্গে কথা বলবে, তারপরে হবে। আমি কেউ নই?

আমার কথা বলা চলবে না? বেশ, দেখাচ্ছি কেমন আমি কেউ নই। এই চললুম পাত্রপক্ষকে বারণ করে আসতে। দেখি এ বিয়ে কী করে হয়? বিলেত ফেরত বলেই ছেলের কথা বাপের কথার ওপরে উঠবে?"

বাবা জুতো পরে ছাতা বগলে ছিটকে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে থেকে মাও চেঁচিয়ে উঠলেন—

—"এ্যাঁ, বিয়ে ভাঙতে গেলেন? এতবড়ো রাগ? বাপ হয়ে মেয়ের এতবড়ো সব্বোনাশ করা? বেশ। আমিও চললুম তবে মাথাভাঙ্গা!"

চন্দনের মামাবাড়ি মাথাভাঙ্গার কাছাকাছি। রাগ করে কথায় কথায় গত পঞ্চাশ বছর ধরেই সলাজনয়নী বলে আসছেন—"এই চললুম আমি মাথাভাঙ্গা।" কিন্তু তারপরে কার্যটি আর এগোয়নি।

এগোয়নি, তার কারণ একাধিক। প্রথম কথা, শিলিগুড়ি থেকে মাথাভাঙ্গার কাছে ওই পাড়াগাঁয়ে যাওয়াই ছিলো এক বিপুল জটিলতা। যেতে হলে জলপাইগুড়ি হয়ে ট্রেন বদলে, অন্য ট্রেন ধরে তারপরে বাস ধরে, তারও পরে হাতি কিংবা ডুলি চড়ে, যেতে হতো। যদিও বা কোনো জাদুবলে মা একা একা এতকাণ্ড করতেনও, মস্ত একটা দ্বিতীয় বাধা ছিলো, তোরঙ্গ। চন্দনের বাড়িতে কেবল ধেড়ে ধেড়ে স্টীলের ট্রাংক আর কাঠের প্যাঁটরা ছাড়া বাক্সোই ছিলো না। সুটকেসের চল হয়নি চন্দনের বাড়িতে। তা, রাগ করে কি কেউ একখানা ধুমসো ভারি তোরঙ্গ মাথায় করে বাপের বাড়ি যায়? নাকি এক কাপড়ে ভিকিরির মতনই কেউ খালি হাতে বাপের বাড়িতে গিয়ে দাঁড়াতে পারে? এই গূঢ় সমস্যার কারণেই মা এতদিন "চললুম মাথাভাঙ্গা"টাকে কাজে পরিণত করতে পারেননি। পঞ্চাশ বছর পরে, এতদিনে সমস্যার সমাধান হয়েছে। মা ফুরফুরে হালকা বিলিতি সুটকেসে ভরে নিলেন ক'খানা ভালো দেখে ধোপ-দোরস্ত শাড়ি-সেমিজ, গুরুদেবের ফটো, জপের মালা, তেল সাবান গামছা, ফিতে চিরুনী আয়না আর জমানো হাতখরচের টাকাটা। ছোকরা চাকর পরমেশ্বরের হাতে এক টাকা চার আনা দিয়ে বললেন—"একটা সিনেমা দেখে আয়।" দোরে তালা লাগিয়ে দোরের চাবি, ঘরের চাবি প্রতিবেশিনীর আঁচলে বেঁধে দিয়ে এলেন —"ইন্দু ইসকুল থেকে এলেই তাকে দিয়ে দিয়ো—" বলে। বুচকুন তখনও কলেজে।

সোজা একটি রিকশা চড়ে মা গেলেন সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাসে। গত পুজোয় তাঁর দাদার ছেলেরা এসেছিলো—আজকাল দিব্যি টানা বাস হয়ে গেছে শিলিগুড়ি-টু-মাথাভাঙ্গা। চমৎকার নতুন টারম্যাকের রাস্তা হয়েছে। বদল-টদল করতে হয় না কোথাও। ওখানে নেমেও হাতি চড়তে, কি ডুলি নিতে হয় না। রিকশা করেই বাস স্ট্যাণ্ড থেকে বাড়ি যাওয়া যায়। দাদার ছেলেরা বার বার করে ডিরেকশান দিয়ে গেছে—মা তো প্রায় চোখ বুজেই পৌঁছে গেলেন দাদার বাড়ির দোরগোড়ায়। দাদা বুড়ো হয়েছেন, বৌদিও। কিন্তু স্বয়ং সলাজনয়নী দেবীকে দোরগোড়ায় একাকিনী সশরীরে সুটকেস হস্তে মজুত দেখে তাঁরা যেন আহ্লাদের চোটে খোকাখুকু হয়ে

পড়লেন। ভাইপো-ভাইঝি, নাতি-নাতনীদের মধ্যে উল্লাসের সাড়া পড়ে গেলো—এ যে রিয়্যাল অ্যাডভেঞ্চার।

এদিকে বুচকুন, ইন্দিরা আর তাদের বাবার চক্ষে ঘুম নেই, অন্নে রুচি নেই। রান্নাবান্না করে ইসকুল করতে ইন্দুর বেশ স্ট্রেন হচ্ছে, বাবা এদিকে পরমেশ্বরের রান্না মোটেই খাবেন না। চিঠির পরে চিঠি যাচ্ছে মাথাভাঙ্গা, জবাব আসে না। শেষে মামাবাবুই লিখলেন—"নয়ন এখন কিছুদিন এখানে থাকিবেক। উহার দেহ আগে আরও একটু সারিয়া উঠুক!"—

শুনে বাবা আর থাকতে পারলেন না, সেইদিনই বুচকুনকে মাথাভাঙ্গায় পাঠালেন। পরের বারেই। বুচকুন গিয়ে দ্যাখে মার শরীর দিব্যি ভালোই আছে। বুচকুনকে দেখে মা লজ্জা-লজ্জা হেসে বললেন— "এসেছিস? চল, যাই। এই দ্যাখ না এরা কি যেতে দেয়?"— বুচকুনকেই কি ছেড়ে দিলেন তাঁরা? মামামামী? কি ভাইবোনেরা? অতএব বুচকুনও রইলো।

এবারে ইন্দিরার চিঠি এলো—"মা, আমি আর পারছি না, বাবার মেজাজ ভীষণ খারাপ, দিনরাত্তির রাগারাগি করছেন। পরমেশ্বরকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন। আমার বড়ই খাটুনি পড়েছে। তোমরা কি ওখানেই থাকবে?"

বাবাই দোর খুললেন। মা লাজুক লাজুক মুখে অল্প হেসে প্রণাম করে বললেন —"সব ভালো তো?" বাবা জবাব দিলেন না। মা বললেন—"ইন্দু কোথায়?" যদিও জানেন ইন্দু তখন ইসকুলে। বাবা জবাব দিলেন না। মা ডাকলেন—"পরমেশ্ব-র!" এবার বাবা কথা বললেন—"নেই।" মা এটাও জানতেন।—"কবে গেল?"— অনেকদিন। এবারে আমিও যাবো।— তুমি কোথায় যাবে?— তা দিয়ে তোমার দরকার কি? তবে মাথাভাঙ্গাতে নিশ্চয় যাবো না। মাথাভাঙ্গার পবিত্র নাম এমন অশ্রদ্ধাভরে উচ্চারিত হতে দেখে মার তক্ষুনি মেজাজ খাপ্পা হয়ে গেলো। শক্ত গলায় মা বললেন—যেখানেই যাও, আমার সুটকেসটা নিয়ে যাওয়া হবে না। বাবা রহস্যময় হেসে উদাস সুরে বললেন —আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে সুটকেস লাগে না। এই কথাটিতে মা কিছুটা ঘাবড়ে গেলেন বলে মনে হলো। ভীতু-ভীতু অপ্রস্তুত চোখে বাবার কাছে ঘেঁষটে এলেন —কোথায় যাবে গা? বলো না? বাবা সুরুৎ করে কিছুটা সরে গিয়ে মার নাগাল বাঁচিয়ে বললেন—রাস্তার কাপড়চোপড়গুলো ছেড়ে এলে হতো না, সব ছোঁয়া ন্যাপা করবার আগে? মা কথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি কলঘরে চললেন।

রাত্রে খেতে বসে বাবা বললেন,—কাল সকাল সকাল পুজোটুজো সেরে তৈরি হয়ে নেবে। আমার সঙ্গে কোর্টে যেতে হবে। মার হাতের রুটিটা হাতেই রইলো, তাওয়ায় আর পড়লো না।

—"কোর্টে? আমি? আমি কেন কোর্টে যাবো? আমি বাপু সাক্ষী-টাক্ষী হতে

BanglaBook.org

পারবো না তোমাদের খুড়ো-ভাইপোর ব্যাপারে।"

জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে বাবার কী একটা মামলা চলছিল বহুদিন। জ্যাঠামশাই মারা গেছেন, ছেলের সঙ্গে চলছে। বাবা বললেন—"সে মামলা নয়। এ অন্য মামলা। ডিভোর্সের মামলা। তুমি যা ইচ্ছে তাই করবে আর আমি তাই সইবো ভেবেছো? আমি কালই তোমাকে ডিভোর্স করবো।" অম্লান বদনে মা বললেন—তা করো না। তার জন্যে কোর্টে কেন যেতে হবে? ডিভোর্সটা তো বাড়িতেই হতে পারে।—

—তোমাকে এই সুখবরটি কে দিলেন শুনি? জানো, ডিভোর্স মানে কি?

—খুব জানি। ওই সই করে সাক্ষী ডেকে বিয়ে ভাঙা তো? তা এ-বাড়িতে কেন হবে না?

—বাড়িতে এইজন্যে হবে না যে এটা আইনগত ব্যাপার।

—কেন? আইনের বিয়ে তো বাড়িতেই হয়। সে বুঝি দেখিনি? বন্দনাকে দিব্যি পুরুতমশাই বাড়ি বয়ে এসে সই করিয়ে বিয়ে দিয়ে গেলেন। এ ডিভোর্সের পুরুতমশাই ইচ্ছে করলেই বাড়িতে এসে— বাবা কাতরে ওঠেন— ডিভোর্সের পুরুত! আর পুরুত নয়, পুরুত নয়, সে লোকটা ছিলো গিয়ে রেজিস্ট্রার। কিন্তু ডিভোর্স তো রেজিস্ট্রারে করতে পারে না, ওটা উকিলের কাজ।

—অ! তা না হয় হলো, উকিল বুঝি আর বাড়িতে আসে না? আসুক সে-উকিল বাড়িতে।

—"না না, ও হয় না। কোর্টে যেতে হয়। জজের সামনে সওয়াল করতে হবে না?"

—সওয়াল করার কি আছে। এ কি চোর দায়ে ধরা পড়েছে কেউ? যতো বাজে কথা। বাড়িতেই হোক ডিভোর্স।

—"দ্যাখো বড়বৌ—বাজে বকবক করার না তো মেলা! বলছি ওসব বাড়িতে হয় না।"—মা এবার একটু আদুরে গলায় বললেন—

—"হ্যাগা, তা বাড়িতে যখন হবেই না, তবে কোর্ট-কাছারিতে কেন, তার চে' বরং কালীবাড়ি গিয়ে ডিভোর্স করলে হয় না? ছোটো খুকিরা তো কলকাতায় গিয়ে কালীবাড়িতেই নিজেরা বিয়ে করে নিয়েছে, অমনি কালীবাড়ির ডিভোর্সও নিশ্চয় হয় আজকাল? সে বরং ভালো।"

—"ও হোঃ! এই গোমুখ্যুকে নিয়ে আমি কী করি, কোথায় যাই। বলি বিয়ে আর ডিভোর্স দুটো জিনিস কি এক হলো?"

—"হলো না? গেরো বাঁধা আর গেরো খোলা। একটা হয়েছে ভগবান সাক্ষী রেখে, অন্যটার বেলায় বুঝি শুধু হাকিম-মুৎসুদ্দি হলেই চলবে? ভগবান চাই না? অমনি বললেই হলো?"

—"হা ভগবান। আমি আর কোনো কথা শুনতে চাইনে, কোর্টে কাল তোমায় যেতেই হবে বড়বৌ। সকাল সকাল তৈরি হয়ে নিয়ো, পুজো সারতে তিন ঘণ্টা

BanglaBook.org

লাগিয়ে দিয়ো না। ফার্স্ট আওয়ারেই পৌঁছুতে চাই।"

—"কোর্ট-মোর্টে যেতে আমার বয়েই গেছে। কেন মরতে কোর্টে যাবো? আমি এই পস্টাপস্টি বলে দিলুম, দ্যাখো উকিল যদি ঘরে আনতে পারো তো আমি ভালোয় ভালোয় ডিভোর্স হবো, নইলে তুমি যতো ইচ্ছে কোর্টে গিয়ে একা-একাই ডিভোর্স হওগে যাও। হুঁ!" এবারে বাবা রীতিমতো হুংকার দিয়ে ওঠেন—"বাঃ! একা-একা ডিভোর্স হওগে যাও! বলি—একা-একা কি বিয়েটা হয়েছিল, যে একা-একা ডিভোর্স হবে?"

—"কেন তুমি তো বললে এটা বিয়ের মতন নয়, অন্য ব্যাপার। আবার এখন কেন বলছো বিয়ের মতন?"

বাবা এবার আহতকণ্ঠে খেদোক্তি করলেন—"আহ মেয়েমানুষদের মুখ্যু কি আর সাধে বলেছে? নির্বোধ? বোধ-বুদ্ধি কিস্যু নেই?" আঁচল থেকে চাবির গোছাটা খুলে মেঝের ওপর ঝনাৎ করে ফেলে দিয়ে মা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন—"বেশ বেশ! মুখ্যু তো মুখ্যু! তা মুখ্যুকে নিয়ে ঘর করতেই বা কে বলেছে, ডিভোর্স করতেই বা কে বলেছে? আমি বলেছি? আমি এই চললুম মাথাভাঙ্গা। বসো ইন্দু আমার সুটকেসটা দে তো মা।"

ঠিক এই সময়ে পড়ার ঘর থেকে বুচকুন চেঁচিয়ে উঠলো—"ব্যাপারটা এখন মুলতুবি থাকুক মা—এসব নতুন আইন তোমরা কেউই ঠিকমতন জানো না—আমার পরীক্ষাটা এ-মাসে হয়ে যাক, তারপর আমিই সব খোঁজখবর এনে দেবো তোমাদের। কিচ্ছু ভাববেন না বাবা, আমিই সব বন্দোবস্ত করে দেবো। মেজজামাইবাবুর কাছে সব আইনকানুনগুলো জেনে এলেই হবে, কলকাতা থেকে। আপনারা কেবল বলে দেবেন সেজদি কোন পক্ষে সাক্ষী দেবে, আর আমি কোন পক্ষে। পরমেশ্বরটাকেও ডেকে আনা দরকার। কে জানে সে ব্যাটা কোন পক্ষে যাবে?"

—হুঁ যত্তোসব ইয়ে ছেলে হয়েছে আজকাল। সব কথায় কথা কওয়া চাই। সভ্যতা ভব্যতা কিছুই শেখাওনি তো ছেলেদের—যেমন মা, তেমনি ছেলে—বলতে বলতে বাবা উঠে পড়লেন, চটি ফটফটিয়ে কলে গেলেন আঁচাতে। মা বললেন —"ঠিক আছে, এখনকার মতন থাকলাম। বুচকুনের পরীক্ষাটা আগে হয়ে যাক। কিন্তু এই বলে রাখছি, পরীক্ষা যেদিন শেষ হবে সেদিনই আমি মাথাভাঙ্গায় চলে যাবো। সুটকেস আমার গোছানোই রয়েছে। হুঁঃ।"

বিলেত থেকে ফেরার পরে তিন মাসের মাথায় চন্দনের কাছে বাবার এই চিঠিটি এলো—

নিরাপদ্দীর্ঘজীবেষু,

বাবা চন্দন, তোমার মাকে বিলাইতী সুটকেস উপহার দিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে তুমি আমার খরচ ও অসুবিধা দুইটাই যৎপরোনাস্তি বৃদ্ধি করাইয়াছ। আরেক ঝামেলা করিয়াছে এই বাসরুট হইয়া। লাভের মধ্যে তোমার মা মাসের মধ্যে তিনবার সুটকেস

গুছাইয়া বাসে চড়িয়া মাথাভাঙ্গায় গোসা করিতে চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে শ্রীমান বুচকুনকেও কলেজ কামাই করিয়া হপ্তায় হপ্তায় মাথাভাঙ্গায় ছুটিতে হইতেছে। খরচের কথা বাদই দাও, ইহাতে বুচকুনের পড়াশুনার যারপরনাই ক্ষতি হইতেছে। তাল বুঝিয়া পরমেশ্বর হতভাগা বাজারে দোহাত্তা চুরি করিতেছে। ইন্দুমায়ের স্কন্ধে রান্নাবান্না সংসারের পাট এবং চাকুরি, সমস্তই আসিয়া পড়িয়াছে। ইহাতে ইন্দুর স্বাস্থ্য বেশ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। এভাবে চলিলে আর কেই বা উহাকে বিবাহ করিবে? আমাদিগের নাওয়া-খাওয়া সকলই মাথায় উঠিয়াছে, প্রাণে স্বস্তি নাই। বাড়িতে অশান্তির সীমা নাই। চূড়ান্ত অনিয়ম সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ অলক্ষুণে সুটকেস আমদানি করিয়া সংসারে ঘুণ ধরাইয়া দিয়াছ। আমার সুনিশ্চিত অভিমত এই যে, দুর্গাপূজার সময়ে আসিয়া তুমি অই বাহারী বিলাইতী সুটকেস অতি অবশ্যই ফিরাইয়া লইয়া যাইবা। ইহার কোনমতেই নড়চড় না হয়। (এই দু'লাইন লাল পেন্সিলে আনডারলাইন করা।)

আশা করি কর্মস্থলের এবং অন্যান্য সমস্তই কুশল। শ্রীভগবানের নিকটে তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করি। ইতি .৯ই আশ্বিন, ১৩৮২

আঃ শ্রীক্ষেত্রপ্রসাদ চক্রবর্তী।

পুনশ্চ: সুবিধা থাকিলে বরং তোমার মায়েব জন্য একটি ছোট দেখিয়া লোহার আলমারি কিনিয়া দিয়া যাইও।

BanglaBook.org

জগমোহনবাবুর জগৎ

কলকাতা এসেছি দিন কয়েকের জন্যে। কাকার কাছেই উঠব। কাকা বছর কয়েক হলো বাড়ি করেছেন নিউ আলিপুরে। একটু ভেতরদিকে, বাস থেকে নেমে রিকশা নিয়ে যেতে হয়।

দুপুর নাগাদ কাকার বাড়ির কাছে পৌঁছে দেখি বাড়ির সামনে মস্ত জটলা। আফটারনুনে রিটায়ার্ড রিকশাওয়ালা, বাকসো হাতে নাপিত, চাবির গুচ্ছ হাতে চাবিওলা, ছোট খুকির হাত ধরে বিস্ফারিত নেত্র অন্ধ ভিক্ষেওলা এবং অগুন্তি ঝাড়া হাত পা ভিড় করনেওলা—রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই দুপুর রোদে ঊর্ধ্বমুখী তপস্যা করছে। কারুর মুখে রা নেই। ব্যাপার কী?

কিছু দেখছে। কী দেখছে?

আরে সর্বনাশ। এ কী কাণ্ড?

কাকার বাড়ির পাশের উঁচু পাঁচিলে মই লাগিয়ে চড়েছেন পক্ককেশ এক বৃদ্ধ, তাঁর পরনে কেবল একটি আজানুলম্বিত গামছা, এবং একগুচ্ছ উপবীত। এবং হাতে একটি দীর্ঘ বাঁশ। বাঁশটা দিয়ে নিষ্ঠাভরে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে উনি আমার কাকার দোতলার ঘেরা বারান্দার একটি জানালার কাচের সার্সি ভাঙবার চেষ্টা করছেন।

কিন্তু ওঁর হাতের টিপ ভালো নয়। এবং জানলাটার খিল দেওয়া নেই বলে সেটা বাঁশের খোঁচায় সরে যাচ্ছে। রেজিস্ট্যান্স নেই, কাচও ভাঙা যাচ্ছে না।

এই রোমহর্ষক দৃশ্যে পথচারীদের মহা উৎসাহ এবং কারুর কোনো উদ্বেগ আপত্তি নেই। এমন-কী কাকার বাড়ি থেকেও কাক-পক্ষীটির সাড়াশব্দ হচ্ছে না। এই মহতী জনসভা ও তার সভাপতিকে দেখে বেশি কিছু ভাববার আগেই আমি শুনতে পেলুম রিকশায় বসে বসেই আমি বিকট চেঁচাচ্ছি:

—অ কাকা। অ কাকীমা। তোমরা কি সব মরে গ্যাছো নাকি? এই লোকটা যে তোমাদের জানলাদরজা সব ভেঙে ফেললে—

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দোতলার বারান্দায় দৌড়ে এলেন কাকীমা, ময়দা মাখছিলেন, দু'হাতে ভিজে ময়দার তাল আর দু'চোখে বিশ্বের বিস্ময়।

বেরিয়েই কাকীমা ফ্রিজ শট।

তারপর শুরু হলো স্লো মুভমেন্ট। এবং সাউনড।

প্রথমে সস্নেহে—খোকা এসে গেছিস? আয় ভেতরে আয়। তারপর বজ্রনির্ঘোষে —বলি ও জগমোহনবাবু। ওটা কী হচ্ছেটা কী, শুনি? বাঁশটা ফেলে দিন।

কাকীমার বাজখাঁই আওয়াজে কেঁপে উঠে জগমোহনবাবু, পাঁচিলের ওপর থেকে পড়তে-পড়তে বাঁশের সাহায্যে অতি চমৎকারভাবে ভারসাম্য সামলে নিলেন। দর্শকদের মধ্যে বাঃ বাঃ শব্দটা শোনা না গেলেও অনুরূপ ভাবখানা ফুটে উঠল। রাস্তায় যারা দড়ি-হাঁটার খেল দেখায় তাদেরও লজ্জা দিত জগমোহনবাবুর ঐ চকিত-চমকিত পটুত্ব।

জবাব না দিয়ে উনি বেশ আস্থার সঙ্গে পুনরপি স্বকর্মে মনোনিবেশ করলেন। কাকীমা এবার ধমক লাগাল:

—"নামুন বলছি এক্ষুনি পাঁচিল থেকে। পড়ে যাবেন যে। বাঁশটা ফেলে দিন।"

জগমোহনবাবু মূর্তিমান বিদ্রোহ। বাঁশও ফেলেন না, নামারও নাম নেই।

—তবে রে? দাঁড়ান তো, দেখাচ্ছি মজা—কাকীমা সবেগে ঘরে ঢোকেন এবং ময়দার তাল রেখে দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করেন। এবার বারান্দা থেকে ঝুঁকে পড়ে বাঁশের ডগাটা চেপে ধরে ফেলেন। বাঁশ ধরে টানাটানি শুরু হতেই পাঁচিলে-দাঁড়ানো জগমোহন বাঁশটি ছেড়ে দেওয়াই মনস্থ করেন এবং হাঁকেন— "হরি!"

অমনি জটলা থেকে একটি হাফপ্যান্ট পরা কিশোর ছিটকে চলে আসে পাঁচিলের সামনে। জগমোহন এবার হাঁকেন:

BanglaBook.org

—"মই!" ছেলেটা গিয়ে মই চেপে ধরে। বীরপদক্ষেপে জগমোহন নামেন। নেমেই বলেন—

"ও-কাচ আমি ভেঙে দেবুই!" ডান হাতে ঘুষি পাকানো। ঘুষির বদলে চোখ পাকিয়ে বাঁশটা তুলে নিতে নিতে কাকীমা বলেন—"ভেঙে দেখুন না একবার। অন্যের প্রপার্টি আপনি ভাঙলেই হলো?"

—"বলি বাঁশটা নিয়ে নিচ্ছেন যে? বাঁশটা কি আপনার প্রপার্টি?"

—"যারই হোক এটা দিয়ে আমার কাচ ভাঙা হচ্ছিল। এটা আপনার জরিমানা।"

—"জরিমানা মানে? কাচ তো ভাঙেনি? ভাঙলেও জরিমানা নেই। ওটা ভাঙা আমার রাইট।"

এবার কাকীমার আত্মবিশ্বাস টলে যায়।

—"অন্যের কাচ ভাঙা আপনার রাইট?"

—"বলি মাসটা কি? খেয়াল আছে কিছু?"

—"মাস দিয়ে কী হবে?"

—"হবে, হবে। কী মাস এটা?"

—"মার্চ মাস বোধহয়। নারে খোকা?"

—"মার্চ-ফার্চ নয় বাংলায় বলুন। কোন মাস?"

—"চৈত্র।"

—"তবে? জেনেশুনে চোতমাসে আপনি জানলা খুলে রাখবেন, আর আমার ভাঙবার রাইট নেই?"

"চোতমাসে জানালা খোলা যাবে না, কোন, পঞ্জিকায় এমন বিধান আছে শুনি?"

—"রসিকতা ছাড়ুন। বলুন দিকি চোতমাসে কী হয়?"

এবার কাকীমা স্পষ্টত মুশকিলে পড়েন। চৈত্র মাসে তো কতো কী হয়।

—"কী হয়? মেলা? চড়ক? গাজন? নীলের উপোস? গোষ্ঠ? বর্ষ শেষ উৎসব? রবীন্দ্রজয়ন্তী? কখনো কখনো দোলও হয়—" জগমোহনবাবু কেবলই মাথা নাড়েন।

শেষে বলেন—"আপনার মাথা আর মুণ্ডু। চোতমাসে কালবৈশাখী হয়। আর কালবৈশাখী হলেই আপনার ঐ জানলার কাচগুলো সব ভেঙে ভেঙে আমার প্রপার্টিতে পড়বে। আর আমরা আনপ্রিপেয়ার্ড ইনোসেন্টলি ঐ ভাঙা সার্সির টুকরোয় পা দিয়ে ফেলে রক্তগঙ্গা হবো। দেখতেই পাচ্ছেন আপনার ঝুলবারান্দার জানলার পাল্লা আমার গলির ওপরে খুলেছে। ও-জানালা আমি যদি ভাঙি, আমি লিগ্যালি ও-কে, বুয়েচেন? নইলে আর দিনদুপুরে, একগঙ্গা লোকের সুমুখে...হুঁঃ। শুনুন, নিজের প্রপার্টিতে এসে পড়া ফরেন জিনিস আমি নিশ্চয় ভেঙে দিতে পারি। যেমন গাছের ডালপালা।

BanglaBook.org

তেমনি জানলার পাল্লাই বা নয় কেন? ভেবেচিন্তে আগে থেকেই ভেঙে রাখলে আর পরে যখন-তখন কাচ ভেঙে হাত-পা কেটে উনডেড হবার ভয় থাকবে না। ওই দেখুন। প্রিপারেশন কমপ্লিট।" গলির দিকে আঙুল দেখালেন। চেয়ে দেখি গলিতে রেডকার্পেটের মতো করে চট বিছানো।

—"কাচ ভেঙে ওইতে পড়বে, ওইতে করেই গুটিয়ে নিয়ে গিয়ে কাবাড়িওলাকে বেচে দেবে। এবার বাঁশটা দিয়ে দিন। কাচটা ভেঙে ফেলি।" জগমোহনবাবু কনফিডেন্টলি হাত বাড়িয়ে দেন ওপরদিকে।

দুই চক্ষু কপালে তুলে, ময়দা মাখানো হাত গালে দিয়ে কাকীমা বললেন—

—"অ। বুঝিচি। কবে কালবৈশাখী উঠবে, তখন যদি আমার জানলা খোলা থাকে, তবে কাচ ফাটতেও পারে আর সেই ফাটল যদি বাড়ে তবে একদিন সার্সি ভেঙে যেতে পারে, আর সার্সি ভাঙলে সেই কাচের টুকরো আপনার গলিতে খসে পড়তে পারে, আর আপনি সেই ভাঙা কাচের ওপরে ইচ্ছে করে চোখ বুজে, জুতো খুলে হেঁটে-চলে বেড়িয়ে আপনার পা কেটে ফেলতে পারেন। তাই আগে থেকে সতর্ক হয়ে আপনি আমার নতুন জানলার সার্সিগুলো বাঁশ দিয়ে ভেঙে রাখছেন? বা, বেশ বেশ।

আজ বাদে কাল আপনার ছেলেটা বড় হবে, আমার মেয়ে তদ্দিনে বিদেশ থেকে ফিরতে পারে, আপনার ছেলে তার সঙ্গে ঘুরে-টুরে বেড়াতে চাইতে পারে, সে বড় কেলেংকারি হবে, আমিও বরং সাবধান হই। আপনার ছেলের হাত-পাগুলো এইবেলা ভেঙে রাখি? তখন আর কষ্ট করে গুণ্ডা-টুণ্ডা লাগাতে হবে না?"

গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে জগমোহনবাবু বললেন, "এই তো আপনাদের লীগ্যাল নলেজ না থাকার ফল। ভুল অ্যানালজি ভুল আরগুমেন্ট, সব ভুল। দুটো কেস মোটেই এক নয়। যা বললেন তেমন কেস যদি হয় তখন লীগ্যালি যা যা করার আমি তা করব। সে যাক। আপনাদের জানলাটা আমি ভাঙবই। আজ না হোক, কাল। দিনে না হোক, রাতে!"

—বলে গটমট করে বাড়িতে ঢুকে গেলেন জগমোহনবাবু। এতক্ষণ মই ঘাড়ে হরি অপেক্ষা করছিল, পেছু পেছু সেও ঢুকল।

কাকীমা একটু বাদে শপথ কঠিন স্বরে বলেন,

—"কী করে কেউ ভাঙে আমার জানলা, আমি দেখব। জানলাটা খুলবোই না।" আশ্চর্য! ও-বাড়ির জানলা থেকে জবাব চলে এল চটপট—"জানলা যদি নাই খোলে কেউ তবে আমিই বা ভাঙবো কেন? আমার প্রপার্টির ওপরে ইনফ্রিনজমেন্ট না হলে তো লীগ্যালি আমি অন্যের জানলা ভাঙতে পারি না?" জগমোহনবাবুর পেছনে হরিও উঁকি মারছে।

—"লীগ্যালি কখনো কেউই কারুর জানলা ভাঙতে পারে না"— এতক্ষণে আমি আসরে নামি। "আপনি তখন থেকে যা-তা বলছেন।"

BanglaBook.org

—"পারে মশাই পারে। ওসব আপনি বুঝবেন না, বড় জটিল তত্ত্ব। লীগ্যাল সেন্স ইজ নট কমনসেন্স বুঝলেন?" তারপর কাকীমার দিকে আঙুল দেখিয়ে—"উনি তো আরোই বুঝবেন না, একটি ঘোর অশিক্ষিত মূর্খ স্ত্রীলোক বৈ তো নন?" মুহূর্তের মধ্যে পিছন ফিরে দৌড়ে জানলা থেকে অন্তর্হিত হন জগমোহনবাবু, চট করে কাকীমাকে মন্দ কথাটি বলেই। পিছন পিছন দৌড়য় হরিও। জানলা ফাঁকা। কেবল একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিল পড়ে আছে।

এবার আমি ভয়ানক রেগে উঠি। ব্যাটা কাপুরুষ। কাকীমা কিন্তু রাগেন না! হেসে ফেলেন। এবং আমাকে টেনে ঘরে নিয়ে যান।

—"দূর দূর। ও-পাগলের সঙ্গে কথা বলে কী হবে খোকা? ওটা কি মানুষ? তবে জানলাটা সত্যি সামলে-সুমলে খুলতে হবে! পাগলাকে বিশ্বাস নেই। তুই না এসে পড়লে হয়তো আজই দিত ভেঙে।"

—"পাগলা মানে? এদিকে আইন-বুদ্ধিটা তো টনটনে। শেয়ানা পাগল।"

—"পাড়ার ছেলেরা ওকে পাগলা-জগাই বলে ক্ষ্যাপায়। আর ও তখন ছাতাটা তুলে ওদের মারতে ছোটে।"

কাকা স্নান করে বেরিয়েছেন। ব্যাপার বুঝে নিয়ে বললেন—

—"লোকটা কিন্তু সত্যি সত্যি উকীল। রিকশাওলা, ফিরিওলা, ইটপাতা নাপিত ওদের কী সব লাইসেন্স-টাইসেন্স করিয়ে দেয় কোর্ট থেকে। ওরা তো ওকে উকীলবাবু বলেই ডাকে। ও দিব্যি ফ্রী চুল দাড়ি কাটিয়ে নেয়। বাসস্টপ থেকে বাড়ি অবধি ফ্রী রিকশা চেপে আসে। এক ইমপসিবল কারেক্টার। জগমোহনবাবুর কাণ্ডকারখানা চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না রে খোকা। এই নিউ আলিপুর তল্লাটে ওরকম গামছা পরা বাড়িওলা, ফুটপাতের উকীল তুই আর দুটি পাবি না।"

সারাদিন কেবল জগমোহনবাবুর কীর্তিকলাপ শুনতে শুনতেই কেটে গেল। সত্যি সেলুকাস সাহেবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার মতন বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যক্তি। আমার কাকা মোটেই পরচর্চা করার টাইপ নন, কথাই বলেন তিনি অতি সামান্য। সেই কাকাই শুরু করলেন জগমোহন প্রসঙ্গ:

—"এই ফাঁকা প্লটটায় বাড়ি করে অবধি জগমোহনবাবু আমাদের পাড়াসুদ্ধ প্রত্যেকের পেছনে উড়িবেড়ি দিয়ে লেগেছেন। কেবল কি আমার সঙ্গেই? মোটেই না। ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পেছনে যে যেদিকে আছে প্রত্যেকের ওঁর সঙ্গে ঝগড়া। ওর সরু লম্বাটে একচিলতে জমি পড়েছে মাঝখানে, এধারে পাশাপাশি আমরা দু বাড়ি, আমি আর ডকটর ধর, ওপাশে সামনে দিকের ছোট প্লটে সেনগুপ্তরা, আর পেছন দিকের বড় প্লটে ঐ দশতলা বাড়ি উঠেছে আর ওর পেছনে পুরো উত্তরদিকটা জুড়ে আছেন হৈমন্তী দেবী, তোদের ফিলিম স্টার। জগাই প্রত্যেকটি বাড়ির সঙ্গে কিছু কিছু বাধিয়ে রেখেছে।

"তুই আজ স্বচক্ষে দেখলি, তাই। নইলে আমি যদি থানায় ফোন করে বলি,

BanglaBook.org

বেলা বারোটার সময়ে পাঁচিলে চড়ে বুড়ো জগমোহনবাবু বাঁশ দিয়ে খুঁচিয়ে ইচ্ছে করে আমার জানলার সার্সি ভাঙছেন, তুই কি মনে করিস পুলিস আসবে? ওর ওটাই মজা। এমন কাণ্ড করে চোখে না দেখলে, কানে শুনে কারুর বিশ্বাস হবে না। তোর কাকীকে জিজ্ঞেস কর, সব বলবে।"

কাকীমা বললেন—"কত বলব? কত শুনবি? কোনটা দিয়ে শুরু করব? এই ধর সেদিন সেনগুপ্তের মেয়ের বিয়ের ঘটনাটাই। গায়ে-হলুদ হচ্ছে, ছাদে মেয়েরা সবাই গেছি, কোথায় যেন ক্যাচর ক্যাচর করে একটা শব্দ হচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে। কিসের শব্দ? কিসের শব্দ? শেষে দেখা গেল জগাই এই ঠিক আজকের মতো মই নিয়ে পাঁচিলে চড়েছে, চড়ে, একটা কাটারি দিয়ে সেনগুপ্তের ম্যারাপের বাঁশের ডগাগুলো কুপিয়ে কুপিয়ে কাটছে। সেনগুপ্ত ছুটে গেল। 'ওকী মশাই! ওকী মশাই।'

জগা বললে—ওইসব বাঁশের ডগারা কেন ইললিগ্যালি জগার বাড়ির গলির মধ্যে বেরিয়ে রয়েছে? সেনগুপ্তের বাড়ির সীমানা পেরিয়ে? জগা তার বাড়ির সীমানার মধ্যে অন্যের বাঁশের খোঁচা বেরুনো কখনোই সহ্য করবে না। তাই বাঁশের একটা বেআইনী ডগাগুলোকে সে কেটেকুটে প্লেন করে 'লীগ্যাল' করে দিচ্ছে। খানিকটা করে বাঁশ যেই কেটে ফ্যালে অমনি টুকরোটার সঙ্গে হাতের কাটারিখানাও খসে পড়ে গলিতে। জগা নিজেও পড়ো পড়ো হয়। কিন্তু বুড়োর ব্যালান্স কী। ম্যারাপটা ধরেই সামলে নিচ্চে। আর গলির ভেতরে নিষ্পাবদ দূরত্বে মুণ্ডুটি বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রামভক্ত হনুমানের মতো ঐ হরি, জগার একমাত্র পুত্র। পড়ে-যাওয়া কাটারিটা ভক্তিভরে বাপের হাতে তুলে তুলে দিচ্ছে। কাটারিটা ভোঁতা হয়ে যেতেই রান্নাঘর থেকে মায়ের আঁশবটিটা এক ছুট্টে এনে দিলে। ওঃ! সেদিন জগাইকে থামানো না গেলে কী সর্বনাশই হতে যাচ্ছিল ভেবে দ্যাখ? এভাবে বাঁশ ছেঁটে দিয়ে প্যানডেলের পুরো ব্যালান্স আপসেট হয়ে যাচ্ছিল। বেশ কিছু দড়িদড়াও খুলে গেছিল, সব বাঁধন-টাধন আলগা হয়ে, বিশ্রী ব্যাপার।

"আরেকটু হলেই প্যাণ্ডেলটা ভেঙে পড়তো লোকজনের মাথার ওপরে আলো—পাখা-টাখা সুদ্ধু। কী কেলেঙ্কারী হতে যাচ্ছিল ভাব একবার? আমারই তো কান্না পেয়ে গেছল সেনগুপ্তের অবস্থা দেখে। দমকল ডাকবে, না পুলিশ ডাকবে, ভেবেই পাচ্ছে না—কী উপায়ে জগাকে আটকাবে।"

কাকা বললেন—"জগা যা করে সব সে আইন বাঁচিয়ে করে। ব্যাটা উকীল হয়েছিল যেন কেবল এইসব বেয়াক্কেলে বজ্জাতি করবার জন্যেই। উঃ! পাড়ার লোকের হাড়ে দুব্বো গজিয়ে দিলে।"

আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ি—"তারপর? তারপর? শেষ পর্যন্ত থামানো হলো কেমন করে ওকে?"

—"কেমন করে আবার? পাড়ার ছেলেরা মার-মার শব্দে তেড়ে এল যেই

হকিস্টিক নিয়ে, তক্ষুনি বাঁশ কাটা বন্ধ হয়ে গেল। সেই থেকে সেনগুপ্তের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি নেই।" বলে কাকা চুরুট বের করলেন।

—"মুখ দেখাদেখি কার সঙ্গেই বা আছে?" কাকীমা বললেন— "ওপাশের হৈমন্তী দেবীর ব্যাপারটাও বলো খোকাকে।" কাকা চুরুট ধরাতে ব্যস্ত ছিলেন—বললেন —"তুমিই বলো।"

—"হৈমন্তীদের সঙ্গে আরেক কাণ্ড।" কাকীমা মহোৎসাহে শুরু করলেন। হৈমন্তী তো ফিলিম স্টার, গর্বে তার মাটিতে পা পড়ে না, পাড়ার সব যেন লোক না পোক, কারুর সঙ্গেই যাতায়াত নেই। বাড়িটা মস্ত কম্পাউণ্ডে ঘেরা আর কম্পাউণ্ডের চারিদিকে উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের মাথার ওপর তারের জাল, আর সেই জালের গায়ে খুব সুন্দর কী একটা স্পেশাল ফুলের লতা লাগানো। যেমনি সুন্দর দেখতে, তেমনি মিষ্টি তার গন্ধ।

"হৈমন্তীদের বাড়িটাকে পুরো যেন বোরখা পরিয়ে রাখে ঐ লতার বেড়া। ডক্টর ধরের বাড়ির গায়েও ঐ কমন উত্তরের পাঁচিল পড়ে, জগার বাড়ির গায়েও। ধরসায়েবরা তো সবসময়ে ঐ ফুলের গন্ধের কথায় বলেন—'বিদেশী একটা রেয়ার ফুল, ফোকটে দিব্যি গন্ধটা এনজয় করতে পারছি— আমার হিংসেরই জয় মাঝে মাঝে।

"হঠাৎ হলো কী, হৈমন্তীর মালী দেখে জগার বাড়ির গায়ের লতাটা কেবলই ঝামরে পড়ছে, শুকিয়ে যাচ্ছে, ফুলসুদ্ধু লতা মরে মরে যাচ্ছে। শুকোতে শুকোতে ঐদিকের পাঁচিলের গা থেকে লতা খসে পড়তে লাগলো। হৈমন্তীদের বাড়ির আব্রু গেল ঘুচে। বাগানের পাটি-ফাটি সব দেখা যায় জালের ফাঁক থেকে। গাছে পোকা ধরলো, না কী যে হলো কিছুতেই বের করতে পারে না মালী। হৈমন্তী তো মালীর ওপরে খাপ্পা, প্রিভেসি থাকছে না তার বাড়ির।"

—"ফিলিম আর্টিস্টের রহস্যময়তা নষ্ট হয়ে গেলে আর রইল কি?" কাকা ফোড়ন কাটেন।

—"এদিকে জগার বউয়ের খুব মজা, সে তার মেয়েদের নিয়ে দোতলার ছাদে উঠে দূরবীন লাগিয়ে হৈমন্তীর বাড়ির ভেতরের কাণ্ডকারখানা দেখছে মনের সুখে। মালী বেচারাই পড়ল মুশকিলে—খুব ভাবনা তার। বেছে বেছে ঐটুকু অংশের লতাই বা মরে যাচ্ছে কেন? আবার নতুন লতা লাগিয়ে দিলে, আবার কদিন যেতে না যেতেই, যেই একটু বেড়েছে অমনি লতাটা ঘাড়-মুখ গুঁজে নেতিয়ে পড়লো। ব্যাপারটাও বোঝা গেল এবারে।

"জগা প্রতিদিন ইয়া বড়া এক কাঁচি নিয়ে ওই মইতে চড়ে, তারের বেড়ার এদিক থেকে কচকচ করে লতার গুঁড়িগুলো কেটে রেখে দিচ্ছে। গাছ মরবে না তো কি?

"ব্যাপার শুনে হৈমন্তীর সেক্রেটারি তো দৌড়ে এলো কোমর বেঁধে ঝগড়া

করবে বলে। সেক্রেটারিরই বা চাল কী? হাতে বিলিতি পাইপ, গলায় বাহারে বেনারসী টাই।

"জগা স্বীকার করলে, হ্যাঁ, সে রোজ দাড়ি কামানোর সময় নিয়ম করে লতাটা কেটে দেয়।"

—"কেননা ওতে এ-বাড়ির স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে। আলোবাতাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অতো উঁচু বেড়া দেওয়া বেআইনী কাজ। বেআইনী বেড়া জগা থাকতে দেবে না।"

—"কই অন্যেরা তো আপত্তি করেননি? ধরসায়েব তো এতবড় ডাক্তার, তিনি তো কই বলেননি যে লতাটা অস্বাস্থ্যকর?"

—"জগা বললে ধরসায়েব যাই বলুক, সেটা জগার বেলাতে প্রযোজ্য নয়। অনেকে তো ডাস্টবিনের খাদ্যও কুড়িয়ে খায়? তারা ওটা অস্বাস্থ্যকর বলে মনে করে না।"

—"ধরসায়েবের আলোবাতাস না লাগতে পারে। জগার লাগবে।"

তখন সেক্রেটারি বললে—কিন্তু ওটা তো উত্তর দিক—উত্তরে বাতাস না এলে এমন কি লোকসান হবে স্বাস্থ্যের দিক থেকে? আর আলোর কথাই যদি ওঠে, তবে পূবদিকটা অন্ধকার করে ওই যে দশতলা বাড়ি উঠেছে— কই সেটা কি জগা কাঁচি দিয়ে কেটে দিতে পারছে?

"এর উত্তর না দিতে পেরে জগা খেপে টং হয়ে বললে—বেরিয়ে যান আমার বাড়ি থেকে, ফের প্যানপ্যান করলেই কোর্টে কেস ঠুকে!"

"এই বলে ছাতিটা তুলে তেড়ে গেল হৈমন্তীর সেক্রেটারিকে।"

আমি খুব ইমপ্রেসড।—"বড়লোকের নোকরকে ছাতি তুলে তেড়ে যাওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয়। গাটস আছে বলতে হবে।" কাকা বলেন;

—"ও তো পাগলের গাটস। তেড়ে গেলে কী হবে? টাকার জোর যার তার সঙ্গে পারবে কেন? জগার 'কেস-ঠুকবো'-তে ঘাবড়ে না গিয়ে সেও দিয়েছে মুখের মতন জুতো। জগার বাড়ির অংশটুকুতে তাদের বেড়ার বদলে খাড়া কংক্রিটের দেওয়াল তুলে দিয়েছে বিশাল উঁচু করে। এখন সত্যি সত্যি আলোবাতাস আটকে গেছে বেচারার। ভাঙতেও পারছে না। বুঝছে ঠেলাখানা। অকারণে অন্যের সঙ্গে লাগতে যাওয়ার ফল।"

—"তবুও বিশ্বাস নেই কাকা", আমি বলি—"উনি যেমন মানুষ মনে হচ্ছে, একদিন দিলেন হয়তো ডিনামাইট বসিয়ে পাঁচিল উড়িয়ে। জেদ যদি চাপে।"

—"তা খুব ভুল বলিসনি খোকা।" কাকা নির্বিকার গলায় মন্তব্য করেন—"তাও জগা পারে। কিছুই ওর পক্ষে অসাধ্য নয়। ডকটর ধরের বাগানে তো আগুনের গোলা ছুঁড়ছিল ক'দিন আগেই।"

—"সে কি কাণ্ড!"

—"আর বলিস কেন? ভাগ্যিস উঠোনে কেউ ছিল না। কিন্তু ভিজে কাপড়

BanglaBook.org

শুকুচ্ছিলো! ভাগ্যিস ভালো করে নিংড়োনা হয়নি, ভিজে জবজবে ছিল তাই রক্ষে। যদি কাপড়গুলো শুকিয়ে যেতো তবে কী ঘটতে পারতো ভাব দিকিনি একবার? অগ্নিকাণ্ড হতে হতে বেঁচে গেছি সবাই। গায়ে গায়ে লাগোয়া সব বাড়ি।"

—"আগুনের গোলা? তার মানে?"

—"তার মানে বোঝা রীতিমতো শক্ত বাছা!"

কাকীমা পুনরায় আসরে নামেন।—"ধরগিন্নির কাপড়খানা পুড়ে এই এত বড় বড় গর্ত হয়ে গেছে। চুঁইয়ে চুঁইয়ে পুড়েছে, আগুন যে ধরে যায়নি, এই বাঁচোয়া। রান্নাঘরের জানলা দিয়ে আমিই প্রথম দেখতে পেলুম যে ধরদের উঠোনে বড় বড় আগুনের বল এসে পড়ছে। চেঁচামেচি করতেই ধরগিন্নি বারান্দায় বেরিয়ে দেখলেন জগা তার বাড়ির গলিতে দাঁড়িয়ে শুকনো পাতা কুড়িয়ে কুড়িয়ে গোল্লা পাকাচ্ছে, তারপর তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়াল টপকে এদিকে ছুঁড়ছে। ধরগিন্নি বললে—

—"একী কাণ্ড? একী হচ্ছে? একী সর্বনেশে ইয়ার্কি।"

—"ইয়ার্কি কে বললে? আপনাদের গাছের পাতা ঝরে ঝরে আমার ঘরদোর নোংরা করছে। তাই আপনার সাধের গাছের পাতা আবার আপনাকেই ফিরিয়ে দিচ্ছি।"

—"তা আগুনটা কেন?

—"ওটা দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে, একস্ট্রা। গাছটা এদিক থেকে আমি তো কেটে ফেলতে পারবো না, ওটা আপনাকেই কাটতে হবে।"

ধরগিন্নি বললেন—"কক্ষনো গাছ কাটবো না।"

জগা বললে:

"অবিলম্বে কাটুন। না যদি কেটেছেন, আর পাতা যদি আরও পড়েছে, তবে কিন্তু আমি ফের পাতার ডেলা পাকিয়ে ছুঁড়বো—এবারে বিকেলের দিকে। ঠিক কাচা কাপড় যখন শুকনো।"—

"বাপরে বাপ। কী লোক।" আমি না বলেই পারি না।—"ডকটর ধর কী করলেন?"

—"করবেন আবার কি? গাছটা সত্যি সত্যি কাটিয়ে ফেললেন। বলা তো যায় না, আগুন লাগিয়ে দিতে কতক্ষণ? যা ডেনজারাস ব্যক্তিটি। সেই থেকে ধরদের সঙ্গেও আদায়-কাঁচকলায়।"

—"কিন্তু ও যা চায় তাই পেয়ে যাবে? কুচক্রী আর পাগলাটে বলে?"

—"কোথায় আর পাচ্ছে? ওই তো হৈমন্তী মুখের ওপর দেড়তলা দেয়াল তুলে দিলে আলোবাতাস আটকে! আমরাও কি আর গ্যারাজটা তুলিনি?"

—"তার মানে?"

—"যখন গ্যারাজটা বানানো হচ্ছে...মানে তোর কাকার তো আগে গাড়ি ছিল না,"—কাকীমা শুরু করলেন,

BanglaBook.org

—"এখন গাড়িটা কিনেছেন, গ্যারাজও তৈরি করাতে হলো। ওমা। রাজমিস্ত্রিরা এসে আমাকে বললে, 'এক বাবু কাম সব গড়বড় কর দেতা হ্যায়, বহুত হল্লাগুল্লা করতা, কাম করনে নেহী দেতা।' কী ব্যাপার? গিয়ে দেখি, দু হাতে কোমরে গামছাটি চেপে ধরে জগাই ছুটে পালাচ্ছে। সদ্য-গড়া দেওয়ালটুকু লণ্ডভণ্ড ভাঙা। ইঁট সিমেন্ট সব ছরকুট্টে আছে। দেখে তো আমার মাথা গরম হয়ে গেল। এতবড়ো আস্পদ্দা? আমার বাড়িতে ঢুকে আমার দেওয়াল ভেঙে দেওয়া? এ আবার কোন আইনে চলে? তোর কাকাকে গিয়ে বললুম। কাকাও তেমনি। তিনি জগাকে গিয়ে বললেন—

—"কী মশাই? আপনি নাকি আমার গ্যারাজের দেওয়াল ভেঙে দিয়ে পালিয়ে এসেছেন?"

—"পালাবো কী জন্যে? দেখতেই পাচ্চেন আমি নিজের বাড়িতে বসে রয়েছি।"

—"আমার গ্যারাজ ভেঙে দিয়ে এসেচেন কি না?"

—"তা দিইচি।"

—"কেন, বলতে পারেন?"

—"ওটা ইললিগ্যাল কনস্ট্রাকশন। করপোরেশনকে খবরটা দিলে, ওরাই এসে ভেঙে দেবে। আমি বরং আপনার পয়সা বাঁচাতে আগেই ভেঙে দিচ্ছিলুম।"

—"আপনার মাথা। আপনার আইনের নিকুচি করেছে। নিজের তো গ্যারাজ করেননি, ওই আইনগুলো আপনার জানা নেই।"

—"খুনের সাজা কী, তা জানতে নিজে খুন করবার দরকার হয় কি?"

—"থামুন মশাই, কবে আইন পড়েছিলেন, সব ভুলে মেরে দিয়েছেন, পড়ুন গে আপনার লয়ের টেকসটবইগুলো আবার করে। আইনে বলে আমার বাড়িতে আমি এগারো ফুট পর্যন্ত উঁচু গ্যারাজ করতে পারি, বুঝলেন? যা পারি, তাই করচি। করবও। বেশি ঝঞ্ঝাট করলে পুলিশ ডাকবো।" নিজের বুকে টোকা মেরে জগা বললে— "পুলিশ? সেও এই আইনেরই চাকর, বুয়েচেন?"

পরদিন জগা একটা টিনের চেয়ার পেতে ওর দিকের গলিতে এসে বসলো। হাতে একটা এলুমিনিয়মের গজফিতের কৌটো। যেন আমাদের কনস্ট্রাকশন সুপারভাইজার। মিস্ত্রিরা দেওয়াল গাঁথে আর মাঝে মাঝে রোককো বলে লাফিয়ে এসে পিড়িং পিড়িং করে কৌটো থেকে স্প্রীংয়ের গজফিতে বের করে জগা এসে হাইট মাপে। এগারো ফুট হতে-না-হতেই—ব্যাস ব্যাস স্টপ-স্টপ করে সে কী চেঁচামেচি।"

কাকা এইবার যোগ দিলেন—

"শুধু কি তাই? ওই দেয়ালটুকু তুলতে আমার ডবল খরচা করিয়ে দিয়েছে। জগার জন্যে মিস্ত্রিরা দু'দিনের কাজ চারদিনে করে ডবল রোজ নিয়েছে। ওরা কাজ করবে কি, পাঁচিলের ওপাশে জগা ওঁৎ পেতে বসে আছে চেয়ার পেতে।

গলিতে যেই একটু বালিসিমেন্ট ঝরে পড়চে অমনি জগা চেঁচাচ্ছে—এ্যাইও।

BanglaBook.org

ইধার আও। আভী ময়লা সাফ করো। আমার গলি নোংরা হচ্ছে। মিস্ত্রিরা যত বলে এখন একটু অমন পড়বেই, দিনের শেষে গিয়ে একসঙ্গে সব ধুয়েমুছে দিয়ে আসবো,—তা চলবে না। জগা হোল ডে চেয়ার পেতে বসে দেয়াল মাপছে, আর এ্যাইও— করে চুনসুরকি তোলাচ্ছে ওর গলি থেকে। সে কী অত্যাচার, তোকে কী বলবো।"

কাকার মতো স্বল্পভাষী মানুষের মুখে এত কথা শুনে সত্যি সত্যি অবাক লাগছিল। কতটা তিতিবিরক্ত করলে তবে মানুষকে এতটা বদলে ফেলা যায়। চায়ের সময়ে সবাই বারান্দায় বসেছি—জগার বাড়ির দোতলার দিকে চোখ পড়ে গেল। দোতলাটা অদ্ভুত দেখতে। আধখানা সম্পূর্ণ হয়েছে, আধখানা হয়নি। কেমন খাপছাড়া মতন হয়ে, শ্যাওলা ধরে যাচ্ছে। ছাদটাতে বেখাপ্পা এ্যাজবেস্টস, আধখানা দেওয়ালের ইট বের করা, বাকী আধখানা প্লাস্টার করা। এখানে টিন, ওখানে ত্রিপল দিয়ে জোড়াতালি মারা এক কিম্ভূত চেহারা। অথচ একতলাটা বেশ সুন্দর।

—"আচ্ছা কাকীমা, অমন তালি-তাপ্পি মারা কিম্ভূত চেহারা কেন জগমোহনবাবুর দোতলার? অমন আধখ্যাঁচড়া হয়ে পড়ে রয়েছে কদ্দিন ধরে? ওটা উনি কি কমপ্লিট করবেনই না? ছ্যাৎলা ধরে যাচ্ছে যে।"

কাকা-কাকীমার একবার চোখাচোখি হলো। কাকা চুপ। কাকীমা ইতস্ততঃ করে বললেন—

—"ওকথা আর বলিসনি। সে এক বৃহৎ কেলেঙ্কারি।"

—"মনে পড়লে রাগও হয়, দুঃখুও হয়।"

—আশ্চর্য মানুষ বটে একটা, কাকা আবার ফেটে পড়লেন— "হোল ফ্যামিলিটাকে নষ্ট করছে।"

—"কেন কাকা?"

—"কেন আমি বলতে পারবো না, আমার ভাবলেই চড়চড় করে প্রেশার চড়ে যেতে থাকে। ও তোর কাকীর কাছে শুনিস।" বলে কাকা উঠে গেলেন। কাকীমার দিকে প্রশ্নসূচক চোখে তাকাতেই কাকীমা শুরু করলেন,

—"সত্যি, ব্যাপারটা এমন বিশ্রী না—তোর কাকা ওই প্রসঙ্গটাই সইতে পারেন না। ঐ যে ওপাশে দশতলা বাড়িটা দেখছিস না, ওইটে যখন উঠছে, জগমোহনের দোতলাটাও সেই সময় উঠছিল। ঝরঝর করে দিব্যি লিন্টেল অবধি উঠে গেল, এমন সময়ে একদিন রাত্তিরে পাড়ায় প্রবল হইচই। দশতলা বাড়ির দরওয়ানরা চোর ধরেছে।

"কী ব্যাপার? পাড়া সুদ্ধু ভেঙে পড়লো চোর দেখতে। তোর কাকাও গেসলেন। দরওয়ানদের ঘরে এক অপূর্ব দৃশ্য। বেঁটেখাটো এক নেপালী দরওয়ান দু হাতে জাপটে ধরে আছে বিপুল বপু জগা-গিন্নিকে। জগা-গিন্নি যেন পাথর। মুখে একটিও শব্দ নেই। মাথায় এক হাত ঘোমটা। হাতে এক বালতি সিমেন্ট। আর গলিতে

BanglaBook.org

সারবন্দী বালতি ভরে ভরে সিমেন্ট, বালি, চিপস সাজানো, আর নীচু পাঁচিলের মাথায় থাকে থাকে ইঁট রাখা। পাঁচিলের ওধারে জগা। নিজের উঠোনে দাঁড়িয়ে খুব লম্ফঝম্ফ করছে। পরনে গামছা। হাতে বালতি। এ-বাড়িতে না-এসেই চেঁচাচ্ছে—

"এ্যাইও। ছোড় দো আমার পত্নীকে। কার হুকুমে ওসকো পাকড়ায়া? কোন সাহসে তুম উসকো গায়ে হাত দিয়া? রাসকেল কাঁহাকা—আভী হাম কেস কর দেগা তোমাদের প্রত্যেকের নামে—"

এদিকে দরওয়ানরা জগার গিন্নিকে ঘিরে রেখেছে। মোটেই ছাড়ছে না। কেস করবে শুনে বাহাদুর বললে—

—"হাম থোড়াই বিবিজীকো আপকো ঘরসে পাকড়কে লায়া? উও আয়া কিঁউ হমারা ঘরপে?"

—"উনি তো তোমাদের টিউকল থেকে জল আনতে গেছেন—

—"ইতনি গহরী রাতমে? তো বালটিমে পানী নেহী, সিমেন্ট কিঁউ?"

—"রাত্তিরে অত দেখতে পায়নি।" জগা ডেসপারেট।

—দরওয়ানরা বললে রোজ রোজ এই কাণ্ড হচ্ছে। এইসব বালতি ভরে উনি পাঁচিলের ওপারে দিব্যি পাচার করেন। ইঁট সিমেন্ট চুন সুরকী সবকিছু। ওদিকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মেয়েরা জগমোহনবাবুর নেতৃত্বে। আর পাঁচিলে উঠে বসে এপার-ওপার করে, হরি তার বাবা-মাকে সাহায্য করে বালতি-চালাচালির কঠিন কর্মে। সে ঝুপ করে নেমে পালিয়েছে। ধরা পড়েছেন কেবল গজগামিনী জগমোহিনী।

—"হররোজ মাল চোরী হো রহা, কন্ট্রাকটর সাহাব হামলোগকো বহোৎ পরেশানী করতে হেঁ—লেকিন চোর নাহি পকড় যাতা—"

—"আঃ, চুরি কেন হবে?" জগমোহন হাঁক পাড়ে নিজের বাড়ি থেকে—"একে মোটেই চুরি করা বলে না।"

—"রাত মে ঘরকা অন্দর ঘুসকর চীজ উঠাকে ভাগনেকো ক্যা কহ যাতা হ্যায়, বাবুজী?"

—"এ্যাও। একদম চোপ। আভী ছোড় দো হামারা ওয়াইফকো। নইলে আমি এক্ষুনি পুলিশ ডাকবো— জগা ভাঙে তো মচকায় না। দরওয়ানরাও পুলিশ ডাকতে যাবেই। শেষে পাড়ার সবাই মিলে অতি কষ্টে জগার বউকে বাঁচালে।"

—"তবে যে কাকা বললেন জগমোহনবাবু সর্বদা আইন বাঁচিয়ে চলেন—এর বেলায় তো পুরোই বেআইনী কম্মোটি করলেন?"

কাকা ইতিমধ্যে ফিরে এসেছেন চুরুট ধরিয়ে।

—"বেআইনী হলে কি হবে? ব্যাটা ঘুঘু, নিজে ঠিক বেঁচে গেছে। সে তো এপাশে মোটে আসেইনি। চুরি করতে নিজে না এসে মোটা বউটাকে পাঠানো কেন?"

"যা বে-আইন পরে পরে। নিজে তো বমাল সমেত গ্রেপ্তার হয়নি? হয়েছে তার বউ। খুবই চালু লোক।"

—"কী পাজি দ্যাকো!" কাকীমা বলেন—"বউটাকে জেলে পাঠিয়ে নিজে দোতলা বাড়িতে থাকবার মতলব।"

—"তা কেন?" কাকা বাধা দেন। "অত সোজা নয়। ব্যাটা আরও কুটিল। বউকে পাঠানোর মধ্যে তার একটা অনুমান কাজ করছিল—এটা একটা চিরকেলে কৌশল। মহাভারতের যুগের। সেই শিখণ্ডী-ট্রিক আর কি। ঠিক ও যেটা আঁচ করেছিল, তাই হলো। যে-জন্যে ওর মোটা থপথপে বউকে দিয়েই চুরি করানো, চটপটে ছোকরা হরিকে দিয়ে নয়,— সেই প্ল্যানও ওর ফেল করল না। ব্যাটা কম চালু? আমরা পাড়ার কর্তাব্যক্তিরাই গিয়ে দশতলা বাড়ির মালিকদের ধরলুম—জগার বউ বেচারি গিন্নিবান্নি মানুষ, ছেলেপুলের মা, ওকে ধরে চোর বলে পুলিশে দিলে গোটা পাড়ার পক্ষেই বড় লজ্জার কথা হয়। একটা মিটমাট করে নেওয়া ভালো। ওরাও সেটা মেনে নিলে ভদ্রতাবশত। প্রতিবেশী বলে কথা। দরওয়ানগুলো হৈচৈ করে গিয়ে জগার বাড়ি থেকে ওদের সিমেন্টের থলে, চুনের কড়া, থাক থাক ইঁট, বস্তা বস্তা বালি সব ফেরত নিয়ে গেল। ফলে ওদের সাধের দোতলাটি আর কমপ্লিট হলো না।"

—"ওখানেই শেষ" কাকী বললেন—"উপসংহারটুকুও শোন। একদিন দেখি দুটো রাজমিস্ত্রী জগার গলায় জগারই ছাতার বাঁট লাগিয়ে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। প্রাপ্য শোধ করেনি। বলেছিল টাকার বদলে নাকি সিমেন্টের বস্তা দেবে—তাও দেয়নি। শেষ পর্যন্ত কিন্তু ওরা কিছুই করতে পারলে না—কেবল ওর ছাতাটা কেড়ে নিয়েই চলে যেতে হলো ওদের। যাবার আগে জগাকে রাস্তায় রীতিমতো ছাতাপেটা করে গেল। বউ বারান্দা থেকে চেয়ে চেয়ে দেখলে। বাধা দিলে না।"

রাত্তিরে খাবার পরে আমরা শোবার উদ্যোগ করছি, এমন সময়ে একটা উত্তেজিত তর্কাতর্কি শোনা গেল সরু মোটা দুরকম গলায়। মনে হলো জগমোহনের বাড়িতেই গোলমালটা চলছে।—"ও কী হচ্ছে কাকা-কাকীমা? জগমোহনবাবুদের বাড়িতেই মনে হচ্ছে?"

কাকীমা চুপ করে একটু শুনলেন কান পেতে, তারপর বললেন— "আজ কত তারিখ বল দিকি? মাসের শেষ কি?"

—"মার্চ মাস প্রায় শেষ হয়ে এল— চৈত্রের মাঝামাঝি।"

—"মার্চের শেষ তো?" কাকীমা উৎসাহের সঙ্গে বলেন,

—"চল খোকা তোকে একটা মজা দেখাচ্ছি, চল।"

কাকা ব্যস্ত হয়ে আপত্তি করতে থাকেন—"না না, ওসব ঠিক নয়, ওসব ঠিক নয়। তোমার যতসব মেয়েলী বুদ্ধি। খবদ্দার ও কুকম্মোটি কোরো না—"

কিন্তু কাকার কথায় কান না দিয়ে কাকীমা খড়খড়ি ফাঁক করে জ্বলজ্বল করে জগমোহনবাবুর ঘরের দিকে তাকিয়ে রইলেন—আমাকেও ডাকলেন। প্রতিবেশীর পবিত্র কর্তব্য যেমন, আমিও সেইমতো কাকীমার পাশে গিয়ে খড়খড়িতে বাধা ছেলের

BanglaBook.org

মতো নেত্র স্থাপন করলুম। কাকা যতই বারণ করুন, কাকীমা এবং আমি দুজনে একসঙ্গে ওঁৎ পেতে "কুকর্মটি" করছি দেখে দুঃখ পেয়ে কাকাই ঘর থেকে চলে গেলেন।

ও-বাড়িতে জানলা খোলা। ঘরে বাতি জ্বলছে। ভাগ্যিস লোডশেডিং নয়। সেক্রেটারিয়েট টেবিলের দু'পাশে দুজন দুই চেয়ারে। একজনের পরনে গামছা ও পৈতে। অন্যজনের মাথায় বড় করে ঘোমটা, মুখ দেখা যায় না। শাঁখা রুলি পরা মোটা-সোটা একখানি ফর্সা হাত টেবিলে রাখা, মুঠোতে একটি ফর্দ। অন্য হাতে হাত পাখা। ফিসফিস করে কাকীমা বললেন,

—"ঘরে ফ্যান নেই।"

—"বাজেট মিটিং। প্রত্যেক মাসে হয়।"

জগমোহনবাবুর টিয়াপাখি-নাকে নিকেলের গোল গোল হাফ চশমা, হাতে হেড এগজামিনারদের মতো মোটকা লালনীল পেন্সিল। ফর্দটা কেড়ে নিয়ে ঘ্যাঁচ করে একটা কী কেটে দিলেন। অমনি ঘোমটার নিচে থেকে বিদ্রোহী জেহাদ ঘোষিত হলো। বপুর তুলনায় অস্বাভাবিক কচি গলাতে।

—"হবে না, হবে না, ইয়ার্কি নাকি? ছেলেমেয়েদের দুধের হিসেবে টাকা কমানো চলবে না—"

—"টাকা নেই।"

—"তবে তোমার নস্যির টাকাটা ছেঁটে দেয়া হোক।"

—"ছেলেমেয়েগুলো তো ধেড়ে-দামড়া হয়ে গেছে, এখনো দুধ খাবে কি?"

—"তাহলে কি নস্যি নেবে?"

—"দুধ না খেলেই নস্যি নিতে হবে কেন? চা খাবে।"

—"চায়েও তো দুধ লাগবে।"

—"রটি দাও। রটি স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভালো। চাইনীজ জাপানীজ জাতগুলোর বড় হবার পেছনের সিক্রেট কী? ওই রটি। মাথা পরিষ্কার রাখে।"

—"বেশ, তোমাকে কাল থেকে তাই দেব। আমি কিন্তু বিনা দুধে চা খেতে পারব না।"

—"খেতে হবে—দুধ-চা খাও বলেই অত অম্বল হয়—" ঘ্যাঁচ। ফর্দে আরেকটা কী যেন কাটা পড়ল।

—"ওকী। ওকী। ওটা যে কেরোসিন? ওগো কেরোসিন বাদ দিলে চলবে কি করে?"

কয়লা পাওয়া যাচ্ছে না, এদিকে লোডশেডিং, সন্ধে থেকেই অন্ধকার—

—"সন্ধে সন্ধে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়বে সব। রাত্তিরে কোনো কাজ করবে না।"

—"হরির পড়া তৈরি করা আছে—"

BanglaBook.org

—"করতে হবে না। ভোরে উঠে প্র্যাকটিস করুক। চারটের সময়ে ফর্সা হয়ে যায়। হ্যারিকেন মোটে জ্বালবারই দরকার নেই। চোখের পক্ষে হার্মফুল।"

—"স্টোভ জ্বালবারও কি দরকার নেই? বললুম যে কয়লা পাওয়া যাচ্ছে না।"

—"কয়লা নেই, কাঠকুটো জ্বালো। স্টোভ জ্বালতে হবে না।"

—"মরণ। অত কাঠকুটোই বা পাব কোন চুলোয়? তোমার কি সুন্দরবনটা ইজারা নেওয়া আছে?"

—"পাড়ার প্রত্যেক বাড়িতে বাগান রয়েছে, গাদাগুচ্ছের গাছগাছালি লতাপাতার চোটে বাড়িতে আলোবাতাস বন্ধ, শুকনো পাতার জ্বালায় ঘরে টেঁকা যায় না,—আর বলছ কিনা কাঠকুটো পাবে কোথায়?"

—"তা কাঠকুটো যে চেয়ে নিয়ে আসবো তারও কি উপায় রেখেছো? পেত্যেকের সঙ্গে তো ঝগড়া। সেদিন এক কলসী জল চাইতে গেছল বড় খুকি ও-বাড়ির টিউকল থেকে—ওরা নাকি বলেছে—বাড়িতে আগুন দিয়ে, আবার জল চাইতে আসা হয়েছে। লজ্জাও করে না। আমাদের কেউ প্রস্তুত দেবে বাগানে?"

—"তাহলে আর উপায় নেই—রাস্তা থেকে ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে আনতে পাঠাও হরিকে—"

—"না। যাবে না হরি। হ্যাঁগো, তোমার কি লজ্জা করে না? বাড়িসুদ্ধ লোককে তো চোর করেছো—এবারে পথের ভিকিরিও করবে? রাস্তায় রাস্তায় কাগজ কুড়োতে যাবে ছেলেটা?"

—"না গেলে গুষ্টির পিণ্ডি রান্না করবে কি দিয়ে?"

—"কয়লা দিয়ে। এবং কেরোসিনের ইস্টোভ জ্বেলে। ও টাকা কমানো চলবে না। ও টাকা আমি কিছুতেই কমাতে দোব না। তুমি তো একটা বদ্ধ উন্মাদ—আমার বাপমা আমাকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিলে এর চেয়ে ভালো করতো—একটা ঝি রাখবে না, একটা চাকর রাখবে না—ইসকুল থেকে টেনে বের করে এনে মেয়ে তিনটেকে বিনা কারণে ঘরে বসিয়ে রেখেচো। বিয়ে দেবার নাম নেই, কলেজেও দেবে না—ছেলে-মেয়েগুলো সব ঝি-চাকর হয়ে গেল গো— ঘর মুছতে বাসন মাজতেই দিন যায় তাদের—এখন বলছো রাস্তায় কাগজ কুড়ুনী হতে?—হায় আমার কপাল?"

—"বিয়ে দেবার মতন টাকাটা কোতা? আর কলেজে পড়ে তো কেবল বিবি বনবে। তার চেয়ে এই ভালো।"

—"টাকা নেই? কিস্টে কোথাকার। টাকা নেই? মোটে একটা মাত্তর ছেলে, সবেধন নীলমণি হরি। সেই ছেলেটাকে পর্যন্ত একটা বাজে ইসকুলে দিয়ে ইহকাল বন্ধ হচ্ছে—"

BanglaBook.org

—"বাজে কেন হবে, চ্যারিটেবল ইনস্টিট্যুশন। অনাথ আতুরদের জন্যে তৈরি—"

—"আমার হরি কি অনাথ? নাকি সে আতুর? তুমিই আসলে একটি ঘোর বজ্জাত—স্যায়না পাগল বুঁচকি আগল—কই, নস্যির টাকার বেলায় তো কক্ষনো বাজেট কমতি হয় না?"

"ওই যে। ওই যে। নিজের বেলায় আঁটিশুঁটি পরের বেলায় দাঁত কপাটি—", মুখটি উঁচু করে জগমোহনবাবু তখন নস্যি নিচ্ছিলেন, খড়খড়িটা নামিয়ে দিতে দিতে কাকীমা ফিসফিসিয়ে বলেন,

—"এবারে মারামারি হবে। চ উঠে যাই। যত উন্মাদের কাণ্ড।"

—"জগা মারেও?" আমি চোখ কপালে তুলি।

—"জগা নয়। জগার বউ। হাতপাখার বাড়ি দু'চার ঘা দেয়। দিয়ে তবে দুধের টাকা, কেরোসিনের টাকা পাস করিয়ে নেয় বাজেটে। এই একই কাণ্ড প্রত্যেকবার। বউটার জন্যে কষ্টও হয়।"

একটু পরেই শোনা গেল দমাদ্দম শব্দ আর—"ও কে, ও কে। দুধ সাঁইতিরিশই রইলো। দুধ সাঁইতিরিশ, পরের আইটেমে চলে এসো।" জগার গলা।

—"পরের আইটেম কেরোসিন।" জগার বউ। তারপরেই আবার ধপাধপ আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গেই জগার স্বর—

—"অলরাইট। অলরাইট। কেরোসিন পাঁচ লিটার। নেকসট আইটেম। নেকসট আইটেম?"

—"নেকসট আইটেম মেয়ের বিয়ে। ফাগুনে দিলে না, চোত পড়ে গেল। বোশেখ মাসে দিতেই হবে—নইলে—"

ক্লান্ত স্বরে কাকীমা বলেন—"তোর কাকা সত্যি ঠিকই বলেছিল। না শোনাই উচিত। এ আর সহ্য হয় না। চল, চলে যাই। এবারে জগার পালা। জগা তড়পাবে, বউটা ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদবে— মেয়েদের জন্যে, সে বড় বিচ্ছিরি"— সত্যি সত্যিই আমরা উঠে গেলুম।

কিন্তু কাকীমার কথা ফললো না। গিন্নির কান্না শোনা গেল না। বাজেটসভার চেঁচামেচিও আর কানে আসছে না। ব্যাপার দেখে কাকা পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। মহা দুশ্চিন্তায় পড়া গেল। হলো কী? কাকা সমেত এবার আমরা তিনজনেই খড়খড়িতে ফিরে যাই। গিয়ে দেখি: গিন্নি হাতপাখাটি নাড়তে নাড়তে হাসি হাসি মুখে চেয়ে আছেন, ঘোমটা তুলে। আর জগমোহনবাবু পা নাচিয়ে নাচিয়ে লাল পেন্সিল দিয়ে কান চুলকোতে চুলকোতে বলছেন——"ওদের বাড়িতে একটা সোন্দরপানা ছেলে দেখলুম আজ! রিকসো থেকেই চেঁচাচ্ছিল— কাকী কাচ ভেঙে ফেললে, কাচ ভেঙে ফেললে! স্যায়না ছোঁড়া— জামাই করলে মন্দ হয় না!"

BanglaBook.org

পরীক্ষা

সর্বদাই হুহু করে মন, বিশ্ব যেন মরুর মতন। বন্ধুকে বন্ধু বলে মনে হয় না, শত্রুকে তেমন শত্রু শত্রু লাগে না। মানুষমাত্রেই সুদূর। মোহমুদগরই জগতে একমাত্র সত্য—একটু বদলে নিয়ে, কান্ত কান্ত কা তে কন্যা কিছুই ভালো লাগে না। মেয়ে যে কেবলই খেলে বেড়াচ্ছে! হয় আগাথা ক্রিস্টি, নয় ব্যাডমিন্টন, নইলে ঘুম। সারাদিন সারারাত ঘুম। পড়বে কখন? কিছু বলতে গেলেই তার দিদা বলেন, —"আহা, ও বড়ো দুর্বল। ঘুমুতে দে।" ঘুমতে ঘুমতে প্রিটেস্ট হয়ে গেল।

এই সময়ে চার নম্বর অঙ্কের স্যার চাকরি ছেড়ে দিলেন। এইট থেকে টেনের মধ্যে এই নিয়ে চারবার। অসিতবাবুর পর প্রদীপ। প্রদীপের পর শ্যামলবাবু। শ্যামলবাবু বহু চেষ্টা করেছিলেন। হাফ ইয়ারলির রেজাল্ট বেরুনোর পরই হাসপাতালে গেলেন। পেটে মস্তবড়ো আলসার। অপারেশনের পরে আবার সাহস করে পড়াতে এলেন, কিন্তু আমিই সাহস পেলুম না। শ্যামলবাবুর পরে অলোকবাবু। অলোকবাবু একদিন টাকাটা খামসুদ্ধ ফেরত দিয়ে বললেন—"ও টাকা আমি আর নিতে পারি না।" আমি তো থ। তিনি সবিনয়ে খাতা খুলে দেখালেন—"এই দেখুন খাতা। এত মাসে একটাও অঙ্ক কষাতে পারিনি। প্রত্যেকটা আমি নিজে কষেছি। নিজে অঙ্ক কষেছি বলে অন্যের কাছে টাকা নেব কেন?" ধরে-বেঁধে আধখানা মাত্র নেওয়ানো গেল, বাকিটা টেবিলে রেখে গেলেন।

দেখতে দেখতে টেস্টও হয়ে গেল। স্যার-বিহীনভাবেই। প্রিটেস্টে ইতিহাসে উনতিরিশ ছিল, টেস্টে হলো সাতাশ। তার মানে ফাইনালে হওয়া উচিত পঁচিশ, এইরকম নিউমেরিক্যাল প্যাটার্ন অনুযায়ী—মেয়ে জানালো রসিকতা করে—"দুই দুই করে কমছে।"—হাতে ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট।

—"কলেজে উঠলে কক্ষনো হিস্ট্রি নেব না; যা ট্রেচারাস সাবজেক্ট!"

—"কলেজে ওঠ তো আগে?"

—"সে উঠে যাবো।" র‍্যাকেটের ওপরে শাটলককটা শূন্যে নাচাতে নাচাতে উর্ধ্বমুখেই মেয়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

"উঠে যাবো" বললেই তো হলো না। পড়তে হবে। ইতিহাসের জন্য এক স্যারের বাড়িতে ওকে ধরে নিয়ে গেলো আরাধনা। টিউটর পাই কোথায়? টেস্টের পরে কেউই নতুন ছাত্র নেন না। শেষটায় আমার এক গুণ্ডা বোনপোকে যিনি পড়িয়ে শায়েস্তা করেছেন, পাসটাস করিয়ে কলেজেও গুঁজে দিয়েছেন, তাঁকেই ধরে আনা হলো। তিনি এসে জিজ্ঞেস করলেন, "দেখি সিলেবাসটা।" মেয়ে বললে, "দাঁড়ান, ফোন করে জেনে নিচ্ছি। আমার বন্ধুরা জানে।"

—"তুমি জানো না? লেখা নেই তোমার কাছে?"

—"ছিল তো, —হারিয়ে ফেলেছি। ফোন করি?"

—"অঙ্ক বইটা দেখি। কে. সি. নাগটা। ফোন পরে হবে।"

—"টেস্টের সময়ে স্কুলে ফেলে এসেছিলাম, আর পাইনি।"

—"দেখি, কলমটা আর খাতাটা দাও।"

—"বোন স্কুলে নিয়ে গেছে কলমটা। এই যে খাতা।"

—"বাঃ বাঃ বাঃ। বাড়িতে আর কলম নেই?"

—"থাকতেও পারে। এই নিন পেনসিল।"

—"এতটুকুনি? এ তো ধরাই যাবে না।"

—"দাঁড়ান, ম্যানেজ করে দিচ্ছি। পেনসিলটাকে এই ঢাকনিতে ফিট করে নিন, ব্যাস তাহলেই ধরা যাবে। এভাবে ছোট পেনসিলও কাজে লাগে।"

—"চমৎকার। একটা জিনিস শিখলুম।" এমন সময়ে চা-ডালমুট এলো।

—"এসব কে খাবে?"

—"আপনার জন্যে।"

—"এ তো বিষ। চা-ডালমুট দুটোই লিভার ড্যামেজ করে। আমি ওসব খাই না।"

—"দুধ? সন্দেশ খাবেন, স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।"

—"ইয়ার্কি হচ্ছে?"

—"সে কি? ইয়ার্কি হবে কেন? এই তো টেবিল দেওয়া রয়েছে। ওটা খাবেন না এটা খাবেন তা তো মা জানেন না? আগের স্যার চা-ডালমুট ভালোবাসতেন।"

নতুন স্যার বললেন, "আপনার মেয়ে তো যত্ন-আত্তি খুব করে, বুদ্ধি-সুদ্ধিও আছে। কিন্তু মহা ফাঁকিবাজ। আর আপনিও হয়েছেন যেমন, দিনরাত্তির লেখালিখি পদ্যফদ্য নিয়েই আছেন। অমন মেয়েকে নিজে না পড়ালে হয়?"

মরমে মরে গিয়ে মনস্থির করলুম। ইংরিজি বাংলা ছাড়া আমার আর কিছুই পড়ানোর ধৈর্য নেই। তাই বললুম, "বাংলা বইটা নিয়ে আয়।"

—"টাকা দাও।"

—"টাকা কেন?"

—"বই তো দোকানে।"

—"এটাও হারিয়েছিস?"

—"হারাবো কেন? কেনাই হয়নি এ-বছরে।"

—"হয়েছিল না?"

—"সে তো নাইনে কিনে দিয়েছিলে।"

—"সেটাই তো টেনের টেক্সট।"

—"নাইনের বই টেনে থাকে? তুমি যে কী!"

বই কিনে এনে ফোন।

BanglaBook.org

—হ্যালো, আরাধনা? বাংলার সিলেবাসটা কী রে? মা জিজ্ঞেস করছেন। হ্যাঁ, মার সঙ্গেই কথা বল।

খানিক পর—হ্যালো ভাস্কর? অঙ্কের পুরো সিলেবাসটা কী রে?

—"আরাধনাকেই তো জিজ্ঞেস করতে পারতিস। দুবার দুটো ফোন করবার কী দরকার ছিল?"

—"সে তুমি বুঝবে না। আরাধনা কী ভাবতো? আমি কোনো সিলেবাসই জানি না মনে করতো।"

—"সে তো জানিসই না।"

—"জানতুম তো। এখন না হয়ে ভুলে গেছি। দু'বছর ধরে কখনো মনে থাকে? মা, তুমিই বলো?"

পড়ানো চলছে। এপ্রিলে পরীক্ষা। আমার এক প্রিয় ছাত্রীকে টিউটর রাখলুম ফেব্রুয়ারী মাসে। ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি পড়িয়ে দিতে। একটা ছোট ভাই ফিজিওলজির ভালো ছাত্র ছিল। তাকে বললুম বায়োলজিটা দেখিয়ে দিতে। ছাত্রীটির সঙ্গে খুবই ভাব হয়ে গেল মেয়ের। আড্ডা, গল্পের বই এক্সচেঞ্জ, পরচর্চা। একটু একটু পড়াও দিব্যি চলতে লাগলো ফাঁকে ফাঁকে। কিন্তু এই মামা বেচারীর সঙ্গে তার পিঠোপিঠির মতো সম্পর্ক—নিত্যই যুদ্ধ।

বই নিয়ে বসাই হলো না। দুপক্ষ থেকেই অনবরত নালিশ। তবে দীপুমামা বাঁশীটা বাজায় ভালো। বায়োলজি শেখা না হোক, টেস্টের পরই মেয়ে "এ আর এমন কি" বলে হঠাৎ আড়বাঁশী বাজানো রপ্ত করে ফেললো। দিবারাত্রি বাঁশী বাজছে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করে। নীরোর বেহালার মতো। কিছু বললেই বলে,—"একটু রিল্যাক্স করছে।"

ইতিমধ্যে একদিন একটি বাউল আমার কাছে তার দোতারাটি বিক্রি করে গেল একশো টাকায়। আর যাবে কোথায়। কোথায় অঙ্ক, কোথায় ইতিহাস—দোতারা নিয়ে পড়লেন মেয়ে। দুদিনের মধ্যেই বাউলের দোতারাতে "হোয়্যার হ্যাভ অল দ্য ফ্লাওয়ার্স গন লং টাইম পাসিং" বাজতে লাগলো। ঠিক গীটারের স্টাইলে! সঙ্গে ছোট বোন গান গাইতে লাগলো। এবং মামার বাঁশী। সুন্দর একটা ফ্যামিলি কনসার্ট গ্রুপ তৈরী হয়ে গেল। অগত্যা দোতারা এবং বাঁশী নিয়ে মূর্তিমতী শিল্পশত্রুর মতো আলমারিতে তালাচাবী দিয়ে রাখলুম।

মেয়ে খুব সিভিলাইজড, নিয়মিত তিনখানা কাগজ পড়ে। ইন্দিরা, মোরারজী, চরণ বিষয়ে গভীর জ্ঞানী। ভুট্টোকে নিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করে। পরীক্ষার দিন সকালে বিশেষত টেস্টের সময়ে রেগুলারলি দেখেছি। ইদানীং দেখেছি খবরের কাগজ খুলে শিস দিতে দিতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়।—যাক, তবু পরীক্ষার ভাবনাটা মাথায় ঢুকেছে। এমন সময়ে মেয়ে একদিন কথা কয়ে উঠলো— "আজকাল বেড়ালছানারা আর ছানা নেই মা। ওদের দুধটা কমিয়ে মাছটা বাড়াতে হবে। নইলে

BanglaBook.org

ওদের গ্রোথ হবে না ঠিকমতন!"

—"ও! তুমি শিশ দিতে দিতে বেড়ালের ভবিষ্যৎ চিন্তা করছিলে? নিজের নয়?"

—"নিজের? নিজের কী চিন্তা?"

—"কোনো চিন্তা নেই?"

—"না, মানে কোন স্পেসিফিক চিন্তাটার কথা বলছো?"

—"পরীক্ষাটা"—হার মানা গলায় বলি।

—"সে—তো আছে-ই। জানো মা, বন্যা আর বিদ্যুৎ সঙ্কট essay আসছে।"

সেইজন্যে বিদ্যুৎ সঙ্কট নিয়ে গভীর ভাবনা হয়েছে মেয়ের। রাত ৮টা থেকে সকাল ৮টা ভাবছে। আলো নিবলেই ভাবতে শুরু করে— সকাল ২টো পর্যন্ত নিশ্ছিদ্র ভাবনা। মাঝে শতবার আলো ফিরলেও ডেকে তোলা যায় না।

সেদিন এক ভদ্রলোক এসেছেন আমার কাছে। কলকাতার বাইরে একটা সাহিত্য উৎসবে নিয়ে যেতে চান ১লা বৈশাখ। মেয়েরা পাশে এসে যথারীতি বসে আছে। চোখ গোলগোল করে শুনছে—তিনি কত যত্ন করে নিয়ে যাবেন টানা মোটরে, ওখানে কী কী দ্রষ্টব্যস্থান। যেই বললুম—"এখন তো যাওয়া অসম্ভব, পরীক্ষাটা হয়ে যাক",— অমনি মেয়ে বাধা দিয়ে ওঠে—"চল না মা, মজা না? কি সুন্দর। খুব ভালো লাগবে, চল না মা—"

—"আরে! পরীক্ষা না তখন?" আমি তো তাজ্জব!

—"কী পরীক্ষা? ও! তখন এম-এ চলবে বুঝি?" একেবারেই সরল চোখ। অসহ্য রাগ হয়। রাগ চেপে রাখা আমার স্বভাব নয়। তবু যথাসাধ্য দাঁতে দাঁত চেপে বলি—"কী পরীক্ষা? জানো না পয়লা বৈশাখ মানে চোদ্দই এপ্রিল। সতেরোই এপ্রিল থেকে কার পরীক্ষা?"

—"সতেরোই...? ওঃ হো! স্যরি স্যরি, বুঝেছি।" লজ্জায় একগাল হেসে ফেলে বলে, "স্কুল ফাইনাল! আমাদের তো?"

আমি মরিয়া হয়ে বলি—"এটা মার্চ মাসের সাত তারিখ। একমাস দশদিন মাত্র বাকী। এখনও জিজ্ঞেস করছো, কার পরীক্ষা মা? আমি কি বিষ খেয়ে মরব?"

সভ্যতাভব্যতা বিস্মৃত হয়ে জনসমক্ষে ইতরজনের মতো কাতরে উঠি। বেগতিক দেখে ভদ্রলোক—"আচ্ছা, নমস্কার। এবার তাহলে থাক। বরং সামনের বছরে—" বলে ছুটে পালিয়ে যান। খুব অপ্রস্তুত মুখে মেয়ে গিয়ে পড়তে বসে। বাঁহাত কুকুরের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে। তাতে পড়া ভালো হয়।

লক্ষ্মী এসে নালিশ করে—"বড়দিমণি রোজ রোজ নিজের দুধ আর সন্দেশটা মাস্টারমশাইকে খাইয়ে দিয়ে, নিজে চা-ডালমুট খাচ্ছেন।"

—"সে কি কথা?"

—"আমি রোজ দেখতে পাই বড়দিমণি পড়তে পড়তে ডালমুট চিবোচ্ছেন,

BanglaBook.org

আর মাস্টারমশাইয়ের গোঁফে সর।"

—অ। কাল থেকে দুজনকেই দুধ-সন্দেশ। চা-ডালমুট মোটে টেবিলে দিবি না।

তিন মাস আমি কোনো নেমন্তন্ন যাই না, সভা-সমিতিতে যাই না, লৌকিকতা বন্ধ। মেয়ে এদিকে শনি-রবিবার নিয়মিত টিভিতে সিনেমা দেখে, বেস্পতিবার চিত্রমালা দেখে, বন্ধুদের জন্মদিনে কার্ড আঁকে, দীর্ঘ দীর্ঘ ফোন করে। বুকফেয়ারে গেলে সময় নষ্ট হবে বলে আমি সন্ধেবেলায় না গিয়ে দুপুরবেলায় নিয়মরক্ষে ঘুরে এলুম। মেয়ে কিন্তু তিনদিন পরপর মাসিপিসিদের সঙ্গে সন্ধেবেলায় রাত দশটা পর্যন্ত বুকফেয়ারে বেড়িয়ে ঘুগনি খেয়ে এল! আমি উদ্বেগে অস্থির। আমার শুভার্থীরা আমার থেকেও বেশী অস্থির। সবাই আমাকে বকছেন। আমার মেয়ের জন্য সবার চিন্তার শেষ নেই।—"কেবল হিল্লিদিল্লি লেকচার মেরে বেড়ালে আর গপ্পোকবিতা লিখলে কারুর ছেলেপুলে মানুষ হয়? কেবল নিজের পড়া আর নিজের লেখা নিয়েই মত্ত। তার ওপরে আজ হাঁপানি, কাল হার্টের রোগ, পরশু হাই প্রেশার, অসময়ে যত ঝামেলা বাধিয়ে তুই-ই বরং ওকে আরো ডিসটার্ব করিস। মেয়েটা পড়বে কখন?"

সবই সত্যি। মেয়েটা সত্যি খুব সেবা করে। অবোলা কুকুর বেড়াল, রুগ্ন মা, ছেলেমানুষ বোন, বুড়োমানুষ দিম্মা প্রত্যেকের। আবার এও সত্যি যে সকাল থেকে সকাল পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টা ওর পেছনেই আছি। ভোরে পাঁচটায় অ্যালার্ম দিয়ে উঠি। উঠে মেয়েকে তুলে দিই। তারপর ঘুমিয়ে পড়ি। সাড়ে পাঁচটায় আবার উঠি। আবার মেয়েকে তুলে দিই। আবার ঘুমিয়ে পড়ি। ফাইনালি ৬টায় উঠে চা খেয়ে গায়ে জোর পেয়ে রণচণ্ডী মূর্তি ধারণ করি। আবার মেয়ে ওঠেন। গজগজ করতে করতে পড়তে বসেন। আশ্চর্য! পড়ে প্রধানত Test Papersটা। কেবলই মন দিয়ে প্রশ্নগুলো পড়ে আর হিসেব কষে। তার পড়ার ঘর থেকে টেবিল নামিয়ে এনে আমার ঘরে পেতেছি। দিনরাত প্রশ্ন ধরে আনছি আর টুকছি। প্রশ্ন ধরা মানে মেয়ের বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের খাতা চেয়ে আনছি, স্কুলে সাজেস্টেড প্রশ্নগুলো (আমার মেয়ে ওসব টোকে না, যদিও রোজই ক্লাসে উপস্থিত থাকে। শুনতে শুনতে নাকি লিখতে পারে না) টুকে নিচ্ছি। মায়েতে আর ছোটো বোনেতে খাতার পর খাতা ভরে ফেলছে—উত্তর না-জানা প্রশ্নের মালায়।

What is hydro-static paradox? What is blood? What is mitosis? What is Sannyasi Bidroha? What is $K_2Cr_2O_7$? এরপর বই দেখে দেখে উত্তরগুলোও লিখতে হবে। যদি মেয়ে না লেখে। উপায় কি?

সেদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি বিহারী দত্তকে, তাঁর সেই জাহাজে আমিও ভেসে যাচ্ছি। আমার শুভার্থী বন্ধুরা কী এসব ঘটনা জানেন? বিহারী দত্তের সমুদ্রযাত্রা? আমাকে উত্তর লিখতে হয়। আমাকে জানতে হয়।

boiRboi.blogspot.com

What did the Selfish Giant see ? How was Tenner rewarded ?

আমাকে পাগলের মতো ছুটোছুটি করে বোরিকতুলো, কাঁচি, ডেটল, ব্যাণ্ডেজ আরো পঞ্চাশ রকম টুকিটাকি কিনে আনতে হয়, একটা ভালো দেখে বক্স যোগাড় করে তাতে ধপধপে কাগজ আঠা আঁটতে হয়, তাতে লাল কাগজে রেডক্রস কেটে লাগিয়ে First Aid Box তৈরী করে দিতে হয়। এই বাক্সের জন্য দশ নম্বর মাত্র বরাদ্দ, আমাকে প্রত্যেকটা Practical খাতা ভাস্করের খাতা দেখে দেখে এঁকে দিতে হয়। আমি বিছানায় শুয়ে চোখ বুজলেই কতরকম প্যাটার্ন দেখতে পাই—কক্রোচ-এর এ্যালিমেন্টারি সিস্টেম, ফ্রগ-এর ইউরিনো-জেনিটাল সিস্টেম—ফীমেল টোড-এর রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম। এত কষ্টের মূল্য নাকি মাত্র দু নম্বর। তাছাড়া কিছুদিন হলো মেয়েকে ভাত খাইয়ে দিতে হচ্ছে। তার হাতটা জ্বলে গেছে। কেননা ওয়ার্ক এডুকেশনে সাবান তৈরি করেছেন তিনি। সে সাবানের সোজা পোটেন্সি ? একটা কাঠের ট্রেতে রাখা ছিলো। তাতেই ট্রেটাতে ঠিক শেতীর মতো ছোপ ধরে গেছে। এ সাবান কিন্তু গায়ে মাথার জন্যে। নীল, হলুদ, গোলাপী, লোভনীয় পাস্টেল রঙে, ফ্রী পাওয়া যায়। আমাদের বাড়িতে এখনও গোটা দশেক আছে। চাই ?

ওয়ার্ক এডুকেশনের জন্যে মেয়েরা না হোক আমাদের স্কুল ফ্যামিলির যেমন ওয়ার্ক তেমনি এডুকেশন হলো। মাটি মাখা, মাটি ছানা, মূর্তি গড়া কতকিছু আমি করতে পারি এখনও ! সেই মূর্তি থেকে প্লাস্টার অফ প্যারিসের ছাঁচটা শিবুই বানিয়ে দিয়েছে অবশ্য। সেই ছাঁচে ফেলে final মূর্তিটা বের করেছে মেয়ে নিজেই। দীপু ওটাকে স্প্রে-পেন্টিং করে দিয়েছে টুথপেস্ট-টুথব্রাশের ছিটে মেরে— ভাস্করের ইনস্ট্রাকশনে। মেয়ে বলছে, "চলবে ?"

পিঠে একটা বিশাল নম্বর আঁটা, ওর final পরীক্ষার ছাপানো রোল নম্বর।

—কিরে ? হয়ে গেল ?

—কথা বোলো না ! সময় নেই ! স্কুল পারফরম্যান্স খাতা লাগবে এক্ষুনি—কেউ কি দেখেছো খাতাটা কোথায় ?

মেজাজ একেবারে মিলিটারি। যেহেতু সবগুলো খাতায় সযত্নে বাহারী মলাট লাগানো আমারই বৈধ কর্তব্য, আমি তক্ষুনি মনে করতে পারলুম স্কুল পারফরম্যান্স খাতাটা কোথায় দেখেছি—এবং খাতা বগলে "থ্যাংকিউ" বলেই মেয়ে ছুটলো। রিকশার পেছন পেছন ছুটতে লাগলো বোনটি এবং মামাটি। রিকশা দাঁড়ালো না। বিকেলে ফিরে শুনলুম তারা ছুটতে ছুটতে স্কুল অবধিই গিয়েছিল—"ঢুকেই শুনি ঠিক দিদিরই রোল নম্বরটা ডাকা হচ্ছে। পি টি পরীক্ষার জন্য। দিদি তক্ষুনি দৌড়োতে দৌড়োতে হলে ঢুকে গেল। বগলে খাতা। আমাদের দিকে তাকালোই না।"

—"অমন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কেমন পি টির কায়দা দেখিয়েছে কে জানে !"

পরীক্ষার তিনদিন বাকি। মেয়ে এসে বললে—জানো মা, আরাধনাটা এত অন্যমনস্ক—অ্যাডমিট কার্ডটাই হারিয়ে ফেলেছিলো। অবশ্য এখন খুঁজে পেয়েছে।

—তোরটা আছে তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। আছে। জানো মা, অলকা লাহিড়ীর ব্যাপারটা আরো খারাপ। ধোপার বাড়িতে চলে গিয়েছিলো, কুড়মুড়ে হয়ে ফিরে এসেছে। কী হবে?

—তোরটা কই? বের কর তো?

—কী হবে বের করে? এই তো ড্রয়ারে।

—তবু, একবার দেখা না?

—এই দ্যাখো বাবা, দ্যাখো!—খুব কনফিডেন্টলি ড্রয়ার খুলেই মুখ শুকিয়ে এতটুকুনি! তারপরেই ড্রয়ার তোলপাড়! তারপর সারা বাড়ি তোলপাড়। মুহূর্তেই প্রবল মাস মোবিলাইজেশন ঘটে যায়। বাড়িসুদ্ধ প্রত্যেকেই প্রত্যেকটা আনাচ-কানাচ, বাক্স-ড্রয়ার, তন্নতন্ন করে ঘাঁটছে। ঘাঁটতে ঘাঁটতে যে যা খুঁজে পাচ্ছি নিয়ে নিচ্ছি। ছোট মেয়ে নিল একটা শক্ত ইরেজার, আমি পেলুম মর্চেপড়া কাঁচিটা, মা পেলেন একটা জর্দার ডিবে, শিবু পেল স্ক্রু-ড্রাইভারটা।—শেষ পর্যন্ত খবরের কাগজের ডাঁই থেকে বেরিয়ে পড়লো মেয়ের অ্যাডমিট কার্ড, আর মায়ের হারিয়ে-যাওয়া মাইনের চেকটা। পরীক্ষার ডামাডোলে খুঁজে পাচ্ছিলুম না, গত মাস থেকেই। কাউকে বলিনি। এখন কে কাকে বকবে? ডবল কেলেঙ্কারী। আমি দুটোই টপ্‌সেট আলমারিতে তুলে ফেলি। মেয়েকে যেই বলেছি—"অ্যাডমিট কার্ডটা না পেলে তুই কি করতিস?" অমনি আমার মা জবাব দেন—"বোর্ডে গিয়ে তোমাকেই ডুপ্লিকেট নিয়ে আসতে হতো। কিন্তু চেক না পেলে তুমি কী করতে?"

হোলনাইট প্রোগ্রামগুলো আমাদের মা-মেয়ের এখন যুগলবন্দী হয়ে গেছে। ঠিক লুচিভাজার প্রসেসে কাজ দ্রুত এগুচ্ছে। বেলা, ভাজা, খাওয়া। লুজশীটে আমি একটা একটা প্রশ্নের গরম গরম উত্তর লিখে এগিয়ে দিচ্ছি, আর শেষে লুফে নিয়ে একটা একটা প্রশ্নোত্তর কপাকপ গিলে ফেলছে।—হ্যাঁ। এগুলো সব আগেও লিখে দিয়েছিলুম—প্রিটেস্টের আগে। টেস্টের আগেও খাতাতেই। কিন্তু সেইসব খাতা এখন আর নেই। জন্মের শোধ কিছু হারিয়ে গেলে আমার মেয়ে বলে—"কোথাও মিসপ্লেসড হয়েছে।" মেয়ের শরীরে উদ্বেগ নেই। সত্যি "স্থিতধী" প্রাণী। দুঃখে অনুদ্বিগ্ন, সুখে বিগতস্পৃহ। মন্দ রেজাল্টেও ভীত নয়, ভালো রেজাল্টেও স্পৃহা নেই।

পরীক্ষার আগের দিন বাড়িতে বিজয়ার মতো জনসমাগম—ফোনের পরে ফোনে শুভেচ্ছা আসছে—প্রণাম, মিষ্টান্ন, উপদেশ, স্মৃতিচারণ, অ্যাডভান্স সান্ত্বনা, আগাম সহানুভূতি, ফ্রী। লাস্ট মোমেন্ট সাজেশ্যনস। পুরো দিনটাই গেল। অত শুভেচ্ছায় শেষ মুহূর্তে মেয়ের অমন লোহার নার্ভও ফেল করলো। মোটা মোটা চশমার কাঁচের পেছনে ভীতু জল চকচক করে উঠলো— সদ্য পঞ্চদশী হয়েছেন, ঠিক টেস্টের আগেই। খুবই গ্রোন-আপ ভাবছিলেন নিজেকে। এমন সময়ে দিম্মা কোলে নিয়ে বললেন—"ভয় কি রে? তোর মা আরো ফাঁকিবাজ ছিল, ঘাবড়াসনি তুই!"

মেয়ের মন ভালো করতে একটা নতুন ক্লিপবোর্ড কিনে তাতে নাম লিখে দিলুম। ওপরে শ্রীশ্রীসরস্বত্যৈ নমঃ লিখতে গিয়ে কী রকম একটু লজ্জা করলো। লিখলুম, "জয় বাবা ফেলুনাথ।" ফেলুদের নাথ তিনিই। মা সরস্বতীকে কেন আর কষ্ট দেওয়া?

পরীক্ষার দিন। ভোর চারটেয় উঠেছি। মেয়েও চারটেয় উঠেছে। আমি এখনও দ্রুত উত্তর লিখছি—কালকের সাজেস্টেড প্রশ্নের। মেয়ে অলস চোখ বোলাচ্ছে, বোরড মুখে। তুমি কার। কে তোমার। বোনও চারটেয় উঠেছে। কলমে কালি ভরছে, পেন্সিল কাটছে, ইরেজার, রুলার মোজা রুমাল এইসব গুছিয়ে রাখছে—জুতো পালিশ করছে, বোতলে জল ভরছে। দিম্মাও চারটেয় উঠেছেন। পরীক্ষার ভাত রেডি হচ্ছে, টিফিন তৈরি হচ্ছে। পোশাক প্রস্তুত। র‍্যাশন কার্ডের খাপ থেকে কার্ড বের করে ফেলে দিয়ে, অ্যাডমিট কার্ড ভরে দিলুম। যাতে ছিঁড়ে না যায়। মেয়ে চান করতে গেল। যেন গায়ে-হলুদের সকাল। বাড়িময় এমন তাড়া লেগেছে চতুর্থরাত্তির থেকে। মেয়ের চান হতে হতে মায়েরও চান হয়ে গেল—মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে মাও গরম গরম ভাত খেয়ে রেডি—পৌঁছুতে যেতে হবে তো? মায়ের গাড়ি যখন-তখন বিগড়ে যায়, তাই বিশ্বস্ত গাড়ি এসে গেছে অনেকক্ষণ, গাড়িতে আরেক প্রস্থ টিফিন, এবং মামীমা বসে।—কিন্তু মেয়ে কোথায়? রান্নাঘরে। কুকুর-বেড়ালের লাঞ্চ বেড়ে দিতে গেছেন। ধরে এনে দিম্মাকে প্রণাম করাতেই তিনি যাত্রা করার মন্ত্র জপ করে দিলেন নাতনীর মাথায় হাত রেখে। মেয়ে এবার দিম্মাকেও প্রণাম করলো। তার পরেই ছোট বোনকে—"ও কি দিদি? ও কী করছো?" বোনটি কুল-কুলিয়ে হেসে ফেলে। —"ওঃ স্যরি।" গাম্ভীর্য একটুও না হারিয়ে স্থিতধী দিদি বলেন—"লাইনে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? স্টুপিড?" দুজনে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছি, হঠাৎ আমি দৌড়ে আবার ওপরে উঠতে থাকি।

—আবার কোথায় যাচ্ছ মা?

—যাই, মাকে প্রণামটা করে আসি?

—"তুমি?" মেয়ে এবার গাম্ভীর্য হারিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে— "তুমি প্রণাম করবে? তোমার কি পরীক্ষা? পরীক্ষা তো আমার!"

অট্টহাসির রোলের মধ্যে তো দুগগা বলে রওনা হলুম। গেটে দু-চারজন, বারান্দায় দু-চারজন হাত নাড়তে লাগলো—মেয়ে যেন বিলেত যাচ্ছে।

পরীক্ষার হলে মেয়েকে পৌঁছে দেওয়া আরেক পর্ব। জগৎ পারাবারের তীরে মায়েরা করে খেলা। কিছু কিছু বাবাও আছেন। আমরাও তো একদিন পরীক্ষা দিয়েছি, মা তো ধারেকাছেও যেতেন না? বন্ধুরা বন্ধুরা মিলে চলে যেতুম, টিফিন বাক্স সঙ্গে নিয়ে— আজকালকার ছেলেমেয়েরা বেশি বেশি আদুরে হয়েছে। তারা বাপমার কথা কম শোনে, আদর-আহ্লাদ তত বেশি পায়। আমাদের কালে টিউটর থাকতেন একজন (যদি অ্যাট অল থাকতেন), এখন প্রতি সাবজেক্টে অন্তত একজন। যেসব

ছেলেমেয়েরা একা একা বটানিকসে-ডায়মণ্ডহারবারে চলে যেতে পারে, পরীক্ষার হলে তাদেরও কিন্তু প্রত্যেকদিন বাপ-মাকে পৌঁছে দিতে হবে। ফের দুপুরবেলায় অঞ্জলিতে টিফিন নিয়ে মা-বাবারা অফিস কামাই করে হত্যে দেন ইস্কুলের গেটে। বিকেলে ছুটতে ছুটতে পুনরায় হাজির, নীলমণিদের ফেরত নিতে। ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক। বাপ-মায়ের এই পুণ্যে যদি-বা ছেলেমেয়েরা তরে যায়! যাক, শুরু হয়ে গেল বড় খেলা।

পরের দিন সকালে, আজ অফ ডে। মেয়ে দরজা বন্ধ করে ফোন করছে। আমাদের বাড়িতে এটার চল নেই। আমি তো জোর করে ঢুকবোই ঢুকবো—গোপন ফোন চলবে না চলবে না!—অন্তত ষোলো বছর তো হোক? মেয়ে বিরক্ত হয়ে দরজা খুলে দিয়ে ফোনে ফিরে গেল।

—আছে? কী দেখলি? আছে তো? এই, প্লীজ একটু দিয়ে যাবি? আচ্ছা, থ্যাংকিউ থ্যাংকিউ। দশটার মধ্যে, কেমন? ফোন খতম।

—কী ব্যাপার রে?

—কিচ্ছু না। বায়োলজির বইটা। আরাধনার কাছে ছিল।

—কালই তো ইংরিজি আর বায়োলজি? কবে থেকে তোর বই ওখানে আছে?

—টেস্টের পর থেকেই। আচ্ছা মা, আমাকে তো ও কতোবার কতো খাতা ধার দিয়েছে। দেব না বই?

—এতদিন কী দিয়ে পড়লি?

—কেন খাতা? অন্য অন্য সব বই—কত তো বই আছে।

—কিন্তু ওটাই তো টেক্সট বইটা!

—ও কিছু না

তিনদিন পরে।

—"সকালে ফিজিক্যাল সায়েন্স, বিকেলে সংস্কৃত। এই সংস্কৃত খাতাগুলো টিফিনের সময়ে নিয়ে যেও ঠিক মা!" মনে করিয়ে দিল মেয়ে বেরুনোর সময়ে। গাড়ি থেকে নামতে নামতে দেখলুম ইস্কুলের সামনে আরাধনা দুলে দুলে সংস্কৃত পড়ছে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে।—"ও কি রে?" আমার মেয়ে যেচে জ্ঞান দিলেন—"এখনই সংস্কৃত পড়ছিস? এখন যেটা পরীক্ষা সেইটে পড়বি তো?" আরাধনা অবাক হয়ে তাকায়।

—"সেইটেই তো পড়ছি। এখন স্যান্সক্রিট না?"

—"কী?" আমি বিষম খাই। "এখন স্যান্সক্রিট? তবে যে বললে এখন ফিজিক্যাল সায়েন্স— সংস্কৃত বিকেলে?"

—"আবা-র?" আরাধনা আর্তনাদ করে ওঠে। "আবার তুই টেস্টের মতন করলি?" আমিও আর্তনাদে জয়েন করি। এবার স্থিতধী কন্যা আমাদের প্রতি সান্ত্বনা বাক্য উচ্চারণ করেন—"যাগগে মা— ওবেলা না-হয়ে এবেলায়। কী এসে যায়?

BanglaBook.org

দিনটা তো ঠিকই, স্যান্সক্রিট খাতাপত্তর আর আনতে হবে না।" স্থিতধী নাচতে নাচতে ভেতরে চলে যান। আমরা ব্যাকুল মা-বাপেরা ঘণ্টা পড়ার অপেক্ষায় হাঁ করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময়ে শুনি শূন্য থেকে দৈববাণী হচ্ছে: "মা! মা! এই দ্যাখো, আমরা কোথায়?" ভীষণ রোদে ভুরু কুঁচকে ঘাড় বেঁকিয়ে মুখ উঁচিয়ে দেখতে পাই—ঠাঠা রোদ্দুরে চিলের ছাদে দু-তিনটে ইউনিফরম পরা ঝাঁকড়া-চুল মূর্তি—একগাল হাসতে হাসতে হাত নাড়ছে, যেন এভারেস্টের চূড়োয় তেনজিং ইত্যাদি।

উপসংহার: এরপর নিশ্চয় স্কোরবোর্ডটা দেখতে চান? যেমন খেলোয়াড়, যেমন পিচ, তেমনি খেলা; আর তেমনই রেজাল্ট। হোল ফ্যামিলির অসামান্য টীমওয়ার্কের টোটাল স্কোরিং সাড়ে তিয়াত্তর পার্সেন্ট। দুটোমাত্র লেটার। তার একটা আবার বায়োলজিতেই। ঘরময় দৌড়ে দৌড়ে ধপধপ শব্দে একটা বল বাউন্স করতে করতে মেয়ে বলল—

—"মা, তোমাদের সত্তর, আমার সাড়ে তিন—এফর্টওয়াইজ। দিম্মাকে সেই প্রণামটা তুমি যদি করতে, স্টারই পেয়ে যেতুম নির্ঘাত।"

BanglaBook.org

জীবে দয়া

মা টেরেসা নোবেল পুরস্কার পেয়ে অবধি দেশে জীবে দয়ার ট্রেনিং শুরু হয়েছে। আমাদের এক প্রতিবেশী সেদিন দেখলুম একজন ভিখিরিকে ডেকে এনে ছেঁড়া লুঙ্গি দিচ্ছেন। সেজপিসেমশাই একজোড়া আস্ত স্যানডাল চটি দিয়ে দিলেন রিকশাওলাকে (গত বছর এক বেচারী চোর ও-বাড়িতে চুরি করতে ঢুকে, চটি জোড়া ফেলে পালিয়েছিল)। লতুবৌদি এক খাঁচা বদ্রীপাখি কিনে দিলেন ছেলেকে।— "যা দিনকাল পড়েছে, একটু মায়ামমতা প্র্যাকটিস করুক। প্রাইভেট টিউশন ছাড়া কিছুই তো শেখে না ছেলেপুলেরা, পাখিদের যত্ন করতে করতে যদি জীবে দয়া শেখে।"

জীবে দয়া করে যদি ক'লাখ টাকা ঘরে আসে, তো আসুক না, ক্ষতি কি? জীবে দয়ার যে এতটা আর্নিং পোটেনশিয়ালস আছে তা কি আগে জানা ছিল? যেমন রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাবার পরে কবিতার আর্নিং ক্যাপাসিটি সম্পর্কে আমাদের ধারণা পালটে গেল, আর গাদা গাদা ইংরাজি কবিতা লেখা হতে লাগলো।

কিন্তু আমাদের বাড়ির ব্যাপার স্যাপার আলাদা। এ-বাড়িতে প্রচণ্ডরকম জীবে দয়ার ট্র্যাডিশন—আমার মেয়েরা অষ্টাবক্র মুনির মতো জীবে দয়ার ট্রেনিং সমেত ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তাদের দয়ামায়ার অত্যাচারে বাড়িসুদ্ধু অতিষ্ঠ। কিছু বলতে গেলেই আমার মা বলেন, "বোঝো এখন নিজে আমার কষ্টটা! মা যেমন, মেয়েরা তেমনিই হয়েছে।" এর ফলে তাদের জীবে-দয়া বাধাবন্ধহারা হয়ে আরও দিগ্বিদিকে ধাবিত হয়। দিকের চেয়ে বিদিকেই বেশি। ওদের বুকে জীবে দয়া যত বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে আমার সংসারের অশান্তিও চক্রবৃদ্ধিহারে বেড়ে যাচ্ছে।—অথচ, মুশকিল এই যে, সংসারটাকে আমার কিছুতেই খুব সীরিয়াস ব্যাপার বলে মনে হয় না। মার সংসার ছিল আসল সংসার। আমারটা যেন খেলাঘর। সেই বাড়িঘর, সেই মা, সেই আমি, এবং আমার মেয়েরা—এবং গাদা গাদা পুষ্যি (যেমন আমারও ছিল)—নেই কেবল বাবা। বাবা ছিলেন—মায়ের সংসারের মাথা ছিল। আমার খেলার সংসারে কোনো মাথা নেই, তাই সংসার নিয়ে আমার মাথাব্যথাও নেই। যেমন রান্নাবাড়ি খেলছি--ঘরকন্নাটাকে কিছুতেই আমার বাস্তব বলে আর বিশ্বাস হতে চায় না। এ-সংসার যেন ভবসংসার —এর কাণ্ডারী সত্যি করে তিনিই, যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলাকার ব্রহ্মাণ্ডটিতে চালাচ্ছেন। আমার সংসারে আবাহনও নেই, বিসর্জনও নেই। আসা যাওয়া দুদিকেই খোলা আছে দ্বার।

ছেলেবেলায় আমি যখন কানাখোঁড়া কুকুর বেড়াল, ডানাভাঙা পাখি, বাসাভাঙা কাঠবেড়ালী, কাকের ছানা, এমন-কী চামচিকে পর্যন্ত ধরে এনেছি—মা কখনো কখনো সইতেন, কখনো গুনিয়াভাইকে দিয়ে পগারপারে ভাগিয়ে দিতেন। আমি পারি না। ফলে আমার সংসারে জীবজন্তু আসে, আসে, আসে। এবং থাকে, থাকে, থাকে। আমাদের নিজেদের যত কৌটো চলে লাগে, কুকুর বেড়ালদের চাল লাগে তার চেয়ে বেশি। নিজেরা মাছমাংস খাই না-খাই—কুকুরের হাড়, বেড়ালের মাছ চাই-ই।

মা মাঝে মাঝে ক্ষেপে উঠে বিদ্রোহ করেন। যখন অতিথিরা এসে দাঁড়িয়ে থাকেন সবগুলো কোচের গদিতে এক-একটা আদুরে বেড়াল রোঁয়া ফুলিয়ে ঘুমিয়ে থাকে। ঠেললেও ওঠে না। 'এহ বাহ্য', টুল, মোড়া, মাদুর পেতে অতিথিদের বসাই। যাবার সময়ে তাঁদের অনেক সময়ে খালি পায়ে যেতে হয়। জুতোগুলি এ-বাড়ির কুকুর ইতিমধ্যে চিবিয়ে রেখেছে। কেউ কেউ খালি পায়ে যেতে রাজী হন না, আমাদের জুতো পায়ে দিয়ে যান। প্রত্যেকটি পর্দা, চাদর, টেবিলক্লথ চিবোনো, ঝুল্লি ঝুলছে। প্রত্যেক চেয়ার টেবিল আলমারির পায়া চিবোনো এবড়ো খেবড়ো। প্রত্যেকটি চেয়ারের সমস্ত চামড়ার গদি ছিন্নভিন্ন, তুলো বেরুনো—ওতে বেড়ালরা নখে শান দেয়। সর্বত্র ওডোনিল ঝুলছে, প্রত্যেকটি ঘরেই তাজা, ফ্রেশ স্যানিটারি সুবাস। যেমন দামী হোটেলের বাথরুমে। (নইলে মনে হবে চিড়িয়াখানা)।

মা দুঃখে হাসেন। হাসবেন না? তিনি যখন গিন্নি ছিলেন, তখন সংসারে

লক্ষ্মীশ্রী ছিল। জীবে দয়া করতে-করতে কী বাড়ি কী হয়ে গেল লণ্ডভণ্ড।

কিন্তু এহেন বাড়িতে আরো জীবে দয়া করা সম্ভব। সেই স্কোপ এখনও আছে। বিশ্বাস হচ্ছে না? ঘটনাটা শুনুন, বিশ্বাস হবে।

অ্যানুয়াল পরীক্ষা চলছে। সন্ধেবেলায় হঠাৎ রাস্তায় একটা গণ্ডগোল। পড়া ছেড়ে লাফিয়ে উঠে মেয়েরা তো জানলায়। একটু পরে ছোট এসে বলল—"মা! মা! শিগগির এসো! একটা কুকুরছানাকে না, (কী সু-ঈ-ট, ছো-ওট্টো, এখনও চোখই ফোটেনি ভালো করে) দুষ্টু ছেলেগুলো ঢিল মারছে, পা দিয়ে লাথি মেরে বল খেলছে, এমন মাড়িয়ে দিয়েছে যে পেছনের দুটো পা কেমন লম্বা হয়ে গেছে!" এক্ষেত্রে দায়িত্বশীল সাংসারিক ভূমিকা কী হওয়া উচিত ছিল কে জানে, আমি তো আবাল্যের অভ্যেসে লাফিয়ে উঠেছি—

—"কই- কই? কোথায়? চল তো দেখি—"

—"দিদি ওদের বকে দিয়েছে। ছেলেরা পালিয়ে গেছে।"

—"আর কুকুরছানাটা?"

—"দিদির কোলে।"

—"আর দিদি?"

—"গেটে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে আনবে কি?"

মুহূর্তেই বুঝে ফেলি ব্যাপার। ঢোকেনি যখন, তখন নিশ্চয় সে গৃহে প্রবেশের যোগ্য নয়। সেবারে যখন কাকে ঠুকরে একদিনের গলে-যাওয়া, পেছনের পা-প্যারালাইজড় বেড়ালছানাটাকে এনে ওরা শোবার ঘরে খাটে শুইয়ে পরিচর্যা করেছিল, আমার মা কুরুক্ষেত্র করেছিলেন। এবারে সেই সাবধানতা নিয়েছে মেয়ে। মুহূর্তেই আমার কর্তব্য স্থির।—"খবরদার, ভেতরে আনা হবে না। ওই সামনে, সদর উঠোনে যে-কোণটায় একটু ঢাকামতন আছে, সেখানে রেখে দাও।"—"রাখি? থ্যাংকিউ! থ্যাংকিউ! মা, তুমি সত্যি খুব ভালো।" তারপরেই ছুটোছুটি।—"মা একটু দুধ? একটা সসার? বোরিক তুলো? ডেটল?"

আমি তো জীবনে মাকে থ্যাংকিউ বলেছি বলে মনে পড়ে না যদিও শ্বাস-প্রশ্বাসে আমার মায়ের কাছে কৃতজ্ঞতা। এরা বলছে, বলুক। বলতে বলতেই কৃতজ্ঞতা আসে হয়তো আজকাল।

রাত্রে খেতে বসে আলোচনা হচ্ছে দুই বোনে। দিদি বলছে—"ফ্রিজের দুধ দিসনি, একটু গরম করে দে, নইলে কিন্তু খাবে না।"

—"একটু মাংসের স্টু দেব, দিদি? তুলোর পলতেয় করে?"

—"ও ভীষণ উইক, ঠিক কুকুরের মতো ডাকতেও পারে না মা, বেড়ালছানার মতো ডাকে।"

—"বেড়ালছানাই নয় তো?" মা ফোড়ন কাটেন।

—"কী যে বল দিমা। আস্ত কুকুর। দিই স্টু?"

BanglaBook.org

—"পাগলা!" বড়মেয়ে বলে, "স্টু দেয় না। চোখই ফোটেনি, নুন খাওয়ালে মরে যাবে। বরং এক ফোঁটা ভিটামিন ড্রপ দিতে পারিস।"

—"খবর্দার এখন ভিটামিন দিস না।" মা হাঁ হাঁ করে ওঠেন— "সর্বনাশ হবে, পেটের অসুখ করবে যে। সদব উঠোন একেবারে নষ্ট করে ফেলবে।" তারপরেই যথানিয়মে—"আর তোমাকেও বলিহারি যাই খুকু। মেয়েদুটোকে কী নষ্টই করছিস। অ্যানুয়াল পরীক্ষার মধ্যে পড়শুনো ছেড়ে উঠে গিয়ে ঐসব নোংরা জিনিস ঘাঁটছে —ছি ছি!—"

—"মাদার টেরেসা তো কুষ্ঠরুগী ঘাঁটেন।" বড় মেয়ে উত্তর দেয়।

ছোট মেয়ে সগর্বে বলে,—"দিদি তো বড় হয়ে মাদার টেরেসা হবে। না দিদি।"

—"আর তুমি? সিস্টার নিবেদিতা?"

—"আমি? লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প!" এ বছরে ওদের টেক্সটে আছেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। ঝুপ করে আলো নিবে গেল। সারমেয়-জননী ব্যাকুল।

—"ওমা! দশটা বেজে গেল যে? এক্ষুনি ওকে দুধ খাওয়াতে হবে। চার ঘণ্টা হয়ে গেছে।"

—"হোক গে, অন্ধকারে নিচে যেতে হবে না।"

—"অন্ধকার তো কী? আমি টর্চ ধরে থাকবো।"

লেডি উইথ দা ল্যাম্প জবাব দেন। টেরেসা জুনিয়র দুধ, তুলো, টর্চ নিয়ে রেডি। শুশ্রূষাপার্টি লোডশেডিং উপেক্ষা করে ঘরে বেরিয়ে গেল। পিছন পিছন গেল চঞ্চলা আর লক্ষ্মী। যেন গায়ে-হলুদের তত্ত্ব যাচ্ছে। ওরা যাচ্ছে পাহারাদার হয়ে। খোঁড়া কুকুরছানাকে কোলে তুলে অতি যত্নে দুধ খাইয়ে, ওপরে এসে ডেটলে হাত পা ধুয়ে সে-পোশাক বদল করে, দুই দয়াবতী পড়তে বসলেন মোমবাতি জ্বেলে। এগারটায় আলো ফিরবে।

আজকাল বাড়িতে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ আবহাওয়া। অ্যানুয়াল পরীক্ষা বলে কথা! রাত্রে খাবার পরেও পড়তে বসা হয়। পৌনে বারোটার সময়ে মা তাড়া লাগাতে শুরু করেন—"বারোটা বেজে গেছে, উঠে পড়। আর পড়তে হবে না।" অবশেষে সাড়ে বারোটায় তাঁরা উঠে ফ্রিজ খুললেন।

—"মা, দুধ?" মা টেরেসার প্রশ্নের উত্তর দিই,—"আজ সকালে দু' বোতল দুধ কেটে গেছে। যা ছিল তোমার দশটার ফীডেই খতম।"

—"দুধ নেই? তা হলে কী খাবে ও?"

—"কিছু ভাবিস না। ঠিক হয়ে যাবে।" বোনকে সান্ত্বনা দেয় দিদি।—"দেশলাই আছে? দীপুমামা?" ঘুমন্ত দীপুমামাকে ঠেলা মেরে জিজ্ঞেস করেন তিনি।

—"যা যা; ঝামেলা করিস না। এত রাত্তিরে দেশলাই দিয়ে কী হবে? কারেন্ট এসে গেছে।"

pathagar.net

—"গ্যাস জ্বালবো।"

—"গ্যাস?" দীপুমামার একটা চোখ খুলে যায়। "কেন রে? চা হচ্ছে বুঝি?" দেশলাই বেরিয়ে পড়েছে বালিশের নিচে থেকে।

—"চা না। দিদি জল গরম করবে, নিউট্রামূল গুলবে।"

—"কে খাবে, নিউট্রামূল? এত গুডগার্ল কে হয়েছে?"

—"কেউ না। কুকুরছানা।"

—"এই মাঝরাত্তিরে নিউট্রামূল খাবে ব্যাটা কুকুরছানা? দে আমার দেশলাই ফেরৎ দে!"

—"খিদে পায় না তার? সেই দশটায় খেয়েছে।"

—"ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাবে নাকি? হোলনাইট প্রোগ্রাম? তার চেয়ে ওকে চা করে খাওয়া না বাপু? চা খুব নিউট্রিশাস ড্রিংক। আমিও একটু খেতুম।"

—"দুধ নেই।"

—"যাব্বাবা।"

রাতবিরেতে গ্যাস জ্বেলে জল গরম হয়। কাচের গেলাসে প্রচণ্ড সিরিয়াসলি চামচ নেড়ে ঠনঠনাঠন মহাশব্দ করে পাড়া জাগিয়ে নিউট্রামূল তৈরি হতে থাকে। সব ঘরে আলো জ্বলছে। যেন বিয়েবাড়ি। সবাই সজাগ, কাজের লোকেরাই কেবল যা নিদ্রাবিহ্বল। দুই মেয়ের সেবাসুন্দর মাতৃমূর্তি দেখলেও চোখ জুড়োয়। মধ্যরাত্রে কী প্রবল ব্যস্ততা। দীপুমামা বলেছে, "তুলোয় করে কত খাওয়াবি? ড্রপারে করে তাড়াতাড়ি খাবে।" তাই কালি ভরবার একমাত্র প্লাস্টিকের ড্রপারটি গরমজলে ধুয়ে ধুয়ে নিষ্কলুষ তথা স্টেরিলাইজ করা হচ্ছে। পরিষ্কার ড্রপারে টাটকা নিউট্রামূল নিয়ে হাতের উল্টোপিঠে ফোঁটা ফোঁটা ফেলে পরীক্ষা করা হচ্ছে, উষ্ণতা ঠিক সারমেয় শাবকের নরম জিভের যোগ্য কিনা। বড় মেয়েকে দেখে মনে হচ্ছে আঁতুড়ঘরের ডিউটিতে এক্সপার্ট নার্স। বোনটি একটু কম এক্সপার্ট। আয়া। ইনস্ট্রাকশন ফলো করে সে দিদির।

—"চল। সব রেডি? পোশাকটা বদলেছিস তো?"

—"কিন্তু এখন রাত্তির একটা। এত রাত্রে আমরা একা একা সদরের উঠোনে বেরুবো?" বোনের প্রশ্ন।

—"দীপুমামাকে ডাক।"

—"নো। নেভার।" দীপুমামা গর্জন করে। "চা করবার বেলায় পারলি না। আমি যেতে পারব না। একা একাই যা। ওখানে জ্যোতিবাবুর পুলিশরা বেড়াচ্ছে। ওরা দেখবে'খন।"

—"ঠিক আছে। চলরে, আমরা যাই।"

—"কি হচ্ছে কি! তোমাদের মার কি কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই? কুকুরছানা না খেয়ে থাকে থাকুক।" হায়ার অথরিটি থেকে ইনজাংশন জারী হয়ে যায়।

—"দীপুমামা, প্লীজ ওঠো, মা যাবেন না, দিম্মা বকছেন—" অগত্যা দীপু ওঠে।

— "হয়েছেও বাবা এক আজব বাড়ি। রাত্তির দুটোর সময়ে দুটো বাচ্চামেয়ের চোখে ঘুম নেই। কী? না—রাস্তায় কুকুর খাওয়াবে!—চল চল।" আর যাবে কোথায়! দীপুর গজগজানি থেকে শুরু হয়ে গেল মার লেকচার।— "খুকুরই আহ্লাদ দেবার কুফল এসব। তুমি ছেলেপুলে মানুষ করতে জানো না খুকু!" আমি দুড়দাড় করে পালিয়ে যাই, যাবার আগে বন্যার মুখে খড়কুটো ধরার মতো আউড়ে নিই—"রাত্তির একটা বেজে গেছে, মা—এটা কি বকুনি দেবার সময়?"

মাকে যুক্তিতে বাগ মানাবো তুচ্ছ আমি? ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়েকে?

—"যদি দুটো কচি মেয়ের পক্ষে, এই শীতের রাত্তিরে, মাথায় হিম ঝরিয়ে, সদর রাস্তায় হটর হটর করে বেরিয়ে গিয়ে পথের নেড়িকুকুরের রুগ্ন ছানা নিয়ে খেলাধুলো করবার পক্ষে সময়টা উপযুক্ত হয়, তাহলে তাদের গার্জেনকে বকবার পক্ষেই বা এটা সুসময় নয় কেন?"

আমি বারান্দায় পালাই। উঁকি মেরে দেখি বড় মেয়ে পাঁচিলের ধারে বসেছে সিঁড়িতে। কুকুরছানা কোলে করে দুধের বদলে মধ্যরাত্রের অমূল্য ভাঁসোঁসা গুলে, ড্রপারে করে খাওয়াচ্ছে। কোলে একটি ন্যাপকিন পেতে নিয়েছে। ওই ন্যাপকিনটা ফেলে দিতে হবে।

ছোট কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হুকুমের অপেক্ষায়। রকের ওপরে একটা সিগারেট জ্বলছে। অর্থাৎ দীপুমামাটি সেখানে। পাহারা দিচ্ছে আর জ্ঞানের বাণী উচ্চারণ করছে।

—"ওটার গায়ে গ্যামাক্সিন পাউডার দিয়েছিস তো? দিসনি? এবার দ্যাখ কি সর্বনাশ হয়। তোদের মাথায় রাস্তার কুকুরের পোকা চড়ে বসবে, সেই পোকা এসে উঠবে বাড়ির অন্য কুকুর-বেড়ালের গায়ে। তখন ঠেলা বুঝবি।"

—"যা তো টুমপুস, সেভিন পাউডারটা নিয়ে আয়! প্লীজ। কী সর্বনাশ।"

—"কোথায় আছে? এখন তো অনেক রাত্তির।"

—"এখন তবে থাক, কাল সকালে দিলেই হবে।" দীপু বলে।

—"বাঃ! ততক্ষণে যদি আমাদের মাথায়—"

দীপুমামা ফের সলিউশান দেয়।—"ওপরে গিয়ে বরং তোরা মাথায় সেভিন পাউডার মেখে শো। সকালে শ্যাম্পু করে নিবি।"

—"সকালবেলায় তো পরীক্ষা। কখন মাথা ঘষবো?"

আমি বারান্দা থেকেই স্থনকাল ভুলে চেঁচিয়ে উঠি—"খবর্দার! সেভিন দিবি না মাথায়। মানুষের মাথায় কখনো কুকুর-বেড়ালের পোকা হয়? অ্যাদ্দিন জীবজন্তু পুষছিস, এও জানিস না?"

এমন সময়ে টহলরত দুটি পুলিশ এসে দাঁড়ায় পাঁচিলের পাশে। উঁকি দিয়ে দেখে এত রাত্রে কী অঘটন ঘটছে এ-বাড়ির উঠোনে। কুকুরসেবা দেখে একজন

BanglaBook.org

পুলিশ সস্নেহে জিজ্ঞেস করে—"মর গিয়া?" ব্যাস, দুই বোনে একসঙ্গে বকুনি লাগায় —"কিঁউ মরেগা? দুধ পীতা দেখতা নেই?" ছোট যোগ করে দেয়—"ঠক ঠক করে কাঁপতা হ্যায়, দেখতা নেই?" পুলিশরা হেসে বলে যায়—"আবতক জিন্দা হ্যায়? তাজ্জবকি বাত!"

এমন সময়ে ছোট মেয়ে ওপরে মুখ তুলে বলে—"মা! একটা সোয়েটার দাও শিগগির।"

—"কেন রে? শীত করছে?"

—"আমি না, কুকুরছানার জন্যে। ও শীতে কাঁপছে।" পেছন পেছন দীপুমামার ফোড়ন—

—"ও বাইগার জগতের কোনো সোয়েটারে থামাতে পারবে না। ও হলো মরবার আগের কাঁপুনি।"

গুম গুম করে কিলের শব্দ এবং দীপুমামার গলায় 'বাপরে মারে'। তারপরে দেখি মেয়ে ওপরে চলে এসেছে—হাতে নিজের ছোটবেলার একটা লাল-নীল সোয়েটার নিয়ে নেমে যাচ্ছে। ওরই পুতুলখেলার বস্তু।—"এটা নিচ্ছি?"

—"নে! কিন্তু সোয়েটার তো ওকে পরাতে পারবি না। ওর আসলে শীত করছে ঠাণ্ডা সিমেন্টের মেঝেয় শুয়ে আছে বলে।"

—"পাপোশটা নিয়ে নেবো তাহলে, গেট থেকে?"

—"মোটেই নেবে না পাপোশ"—ও-ঘর থেকে মা বাধা দেন। ফাইনাল গলায়। জীবে দয়ার কারণে বাড়িসুদ্ধু সবাই জাগ্রত। ঘর দরজা খোলা। সব আলো জ্বালা।

—"তবে কী নেবো?"

—"গোটা কয়েক স্টেটসম্যান আর আনন্দবাজার ভাঁজ করে বিছানা পেতে দে। দিব্যি গরম হবে।"

—"ওই সোয়েটার পরা কুকুরছানাটাকেই কাল ইস্কুলে পাঠিয়ে দিস খুকু। তোর মেয়েদের পরীক্ষাগুলো দিয়ে-টিয়ে আসবে!" মা বলেন।

একটু পরে, ফের ডেটলে হাত-পা ধুয়ে, শোবার পোশাকে, কোলের কাছে শুয়ে বড়টি বললো—"কাল ওকে তুমি বন্দেল রোডের ভালো ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যাবে, মা? ওর পেছনের পা দুটোতে সেই বেড়ালছানার মতন প্যারালিসিস না হয়ে যায়—ভেঙেই গেছে মনে হচ্ছে।"

—"হবে হবে। এখন তো ঘুমো।"

সকালে উঠে নেজাল ড্রপের ড্রপারটা দিয়েই মেয়ের কলমে কালি ভরে দিলুম। পুনরায় সাড়ম্বর কুকুর-পরিচর্যার পর্ব সমাধা করে, তাঁরা পরীক্ষায় বেরুলেন।—"জিওমেট্রি বক্স যে পড়ে রইল"— আমি পেছন পেছন ছুটি। নির্বিকারভাবে ফিরে এসে জিওমেট্রি বক্স নিয়ে ছুটতে ছুটতে জীবে দয়াবতী রিকশায় ওঠেন গিয়ে। যেন এটাই নিয়ম।

BanglaBook.org

—"আমি দেড়টায় এসে ফের খাওয়াবো।"

—"দুগগা দুগগা! ভালো করে লিখিস।"

সেদিনই আমার ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরতে ফিরতে রাস্তার আলো জ্বলে গেল। বাড়ির সামনে এসে দেখি এক নাটকীয় দৃশ্য!

পাঁচিলের ওপরে একটি দীর্ঘ মোম জ্বলছে, তার পাশে গেটে হেলান দিয়ে একজন, পাঁচিলে কনুই ভর রেখে একজন, মাথা নত করে অ্যাটেনশন হয়ে মিলিটারি কনডোলেন্সের স্টাইলে আর একজন— একটি মৌন মিছিল স্তব্ধ দাঁড়িয়ে। দেখেই বুঝেছি কী হয়েছে।—দীপুই দৌড়ে আসে।

—"দিদি, সর্বনাশ হয়েছে। সেই ছানাটা—"

—"মরে গেছে তো? যাবেই, জানতুম।"

—"ও কি? অমন করে বলতে হয়? বাচ্চাদের খুব মন খারাপ—"

—"মা, এখনই গাড়ি তুলো না। একটু গঙ্গার ধারে যেতে হবে"—বড় বলে।

—"কিংবা পার্ক স্ট্রীটের সেমিট্রিতে"—ছোট বলে।

আমি সিধে গাড়ি গ্যারেজে তুলে দিই।

—"ওকি? যাবে না?"

—"ওই কুকুর নিয়ে? পেট্রল কে দেবে?" উঠোনের সেই কোণটাতে গিয়ে দেখি সিঁড়ির ওপরে একটি জুতোর বাক্সে স্প্যানের কাগজ বিছিয়ে শবশয্যা প্রস্তুত। ছোট্ট কফিন। কিছু ফুলদানি থেকে তোলা রজনীগন্ধার মঞ্জরী তার পাশে, আর চন্দনধূপ জ্বলছে। একগাদা খবরের কাগজের বুকে, মোমবাতির রহস্যময় মৃদু উদ্ভাসে, স্বয়ং একটি শোক সংবাদের মতো নিজেই নিজের অবিচুয়ারি হয়ে শুয়ে আছে ছোট্ট, অতীব খুদে একটি প্রাণহীন প্রাণী। তার গায়ে আমার মেয়ের রংচঙে সোয়েটার। খুব মায়া হয়। কিন্তু হতকুচ্ছিত। একেই ওরা বলেছিল "সুইট?" কেমন জামাই পছন্দ করে আনবে কে জানে? মোমবাতি, ধূপ, ফুল, কফিন সব রইল। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে কাগজগুলোর দুপাশে ধরে স্ট্রেচারের মতো তুলে ওকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে নামিয়ে দিলুম রাস্তায়, নর্দমাতে। ঠিক নাকবরাবর টুল পেতে বসে দুজন পুলিশ আমার কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করলেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গেটের বিপরীতেই এটা ঘটছে। মুদ্দোফরাসীতে মনে হলো আমার এতই নৈপুণ্য যেন এই কর্মই করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনভর বুঝি মড়া ফেলতে ফেলতে রপ্ত হয়ে গেছে কাজটা।

ওপরে এসে গা ধুয়ে কাপড় বদলে চা খেতে বসেছি, মেয়ে বললে—"ও কি ওখানেই থাকবে?"

—"তা কেন? ভোরবেলা জমাদার এলে নিয়ে যাবে। মন খারাপ করিস না, ও বাঁচত না রে।"

—"বাঁচলে তো হাঁটতে পারত না, সে ভীষণ কষ্টের বাঁচা হতো। ছানাটা মরে

বেঁচেছে।" মা সান্ত্বনা দেন। মেয়েরা কিছুই বলে না। চুপচাপ পড়তে বসে। ফের পরশুদিন পরীক্ষা। বেড়ালগুলো গিয়ে ওদের পড়ার বইয়ের ওপর চড়ে বসে। ওরা সরিয়ে দেয় না।

—"কই জমাদার তো নেয়নি, মা?"—সকালে উঠেই উঁকি মেরেছে।— "কিন্তু খবরের কাগজগুলো নেই।"

—"ঠিক চারটের সময়ে ঝাঁটার শব্দ পেয়েছি।" মা বলেন। "খবরের কাগজগুলো তখনই নিয়ে গেছে নিশ্চয়।" যে-গেট দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি বেরুবে, লাল নীল সোয়েটার পরা কুকুরছানা নর্দমায় শুয়ে রইল তার সামনেই। যেন দোলনায় ঘুমুচ্ছে।

—"এতগুলি গণ্যমান্য পুলিশের সামনেও ফেলে গেল? ধন্যি পৌরকর্মী!"

—"দশটার আগেই ক্লিয়ার করে দেবে, ভাবিস না"—দীপুমামার টিপ্পনী।—"চীফ মিনিস্টার বেরুবেন তো।"

দশটায় জ্যোতিবাবু যাত্রা করলেন। উঁকি মেরে দিপু বলল—

—"নেই। নিয়ে গেছে। যা বলেছিলুম।"

—"নেয়নি। ওই তো, সরিয়ে রেখেছে কেবল—"

—"এই তো ফুটপাতে, ঘাসের ওপরে—"

—"এই তো আমাদের বাড়ির গায়েই—"

—"এই তো আমাদের গেটের ধারেই—"

—"কত মাছি এসেছে, ঈশশ।"

মাছি? শকুন নয় তো? যাক বাঁচা গেল। ঐ সোয়েটারের দৌলতেই কিনা জানি না—এখনো যে কাক চিল শকুনিরা টের পায়নি তবুও রক্ষে।

ছোট বলে—"এখন কী হবে, ওখানেই থাকবে?"

বড় বলে—"তখনই বললুম গাড়ি তুলো না—শুনলে না তো—"

—"দ্যাখ, জীবে দয়া ভালো। কিন্তু আমিও তো একটা জীব? সারা দিনের শেষে ফেরামাত্র ওপরে উঠতে দেবে না, মরা কুকুর সৎকার করতে নিয়ে যেতে হবে? ভোর থেকে উঠে তোমাদের খাবার তৈরি, জামা ইস্ত্রি, কলমে কালি ভরা, জিওমেট্রি বক্স নিয়ে পেছু পেছু ছোটা—আমাকে তোরা পেয়েছিস কী?"

বকুনি খেয়ে মেয়েরা করুণ মুখে চুপ করে থাকে। তখন আবার বলতে হয় —"দেখি ওই জুতোর বাক্সটা কোথায়? এখন তো তাহলে গাড়িটা বের করতেই হয়—

—"ওই কুকুরের বাসি মড়া কি এখন ফুলের মালা দিয়ে গাড়িতে তোলা হবে?" মা বলেন।

"তা ছাড়া আর উপায় কী?"

"উপায় করপোরেশনে খবর দেওয়া।"

মা আমার সত্যিকারের জ্ঞানী মানুষ। কতকিছু জানেন। রাস্তায় কুকুর মরে

BanglaBook.org

পড়ে থাকলে কী করতে হয় তা জগতে কজনে জানে? আমার মা জানেন।

—"দি করপোরেশন অফ ক্যালকাটা, হেলথ ডিপার্টমেন্ট ডিরেক্টরি খুঁজে বের করে নে। ঠিকানা দিয়ে বল, মুদ্দোফরাস পাঠাবে। অরডিনারি জমাদারে মড়া ফ্যালে না, ওদের ওটা কাজ নয়।"

খুব সোজা ব্যাপার। মাত্র সাতবারের চেষ্টাতেই টু-থ্রি এক্সচেঞ্জ পাওয়া গেল। দুই মেয়ে হাঁটুতে চিবুক রেখে স্থির বসে আছে। উদ্বিগ্ন মাতৃমূর্তি। মা টেরেসা জুনিয়র। অ্যাণ্ড অ্যাসিস্টান্ট! অনেকক্ষণ ফোন বেজে গেল, বেজে গেল। তারপর একজন ধরলেন। মনে হলো না, নামানুযায়ী ইনিই হেলথ অফিসার।

—"কুত্তা মর গয়া? কাঁহা? জ্যোতি বসুকা ঘরকা সামনে? কওন জ্যোতি?"

"ওহো, চীফ মিনিস্টর? ঠিক ঠিক, আভী সাফাই হো জায়গা। ইয়ে সেন্ট্রাল অফিস হ্যায়—আপ ডিস্ট্রিক ক' অফিসমে ফোন কীজিয়ে— ফাইভ সিকস।"

—"লিখে নে, লিখে নে, শিগগির—"

এক মেয়ে কলম এগিয়ে দেয়, অন্য মেয়ে হাতের পাতায় চটপট লিখে নেয় ফাইভ সিক্স।—"ডিস্ট্রিক্ট 'ক' অফিস, টালা ব্রিজকো পাসমে বরানগর ওয়ার্ড এরিয়া হ্যায়।"

—বরানগর যেন বলল? ভাবতে ভাবতে ফোন ধরি।

—হ্যালো, 'ক' হেলথ অফিস? আজ্ঞে, চীফ মিনিস্টারের বাড়ির সামনে একটা কুকুরছানা কাল থেকে মরে পড়ে আছে।

—তা এখানে কেন? জ্যোতিবাবু কি এখানে থাকেন? বরানগর তাঁর কনস্টিট্যুয়েন্সি, তাঁর রেসিডেন্স নয়। এও জানেন না? এমন লোক এখনো আছে এ শহরে?

—আজ্ঞে? তা তো জানিই—আমি তাঁর বাড়ির সামনে থেকেই বলছি তো। হিন্দুস্থান পার্ক থেকে।

—তা এখানে কেন? এটা তো কাশীপুর—

—কিন্তু আমাকে তো করপোরেশন থেকে এই নম্বরই...

—আঃ হা—তাতে কি হয়েছে? মানুষমাত্রেরই ভুল হয়। ভুল করেছে। আপনি ফোন করুন ডিস্ট্রিক্ট 'খ'তে। ফোর টু...। এটা ভুল পাড়া। বুঝেছেন তো?

—লিখে নে, লিখে নে, ফোর টু...ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। খুব বুঝেছি।

—হ্যালো, ফোর টু...?

—হ্যাঁ, বলুন।

—চীফ মিনিস্টারের বাড়ির সামনে একটা মরা কুকুরছানা পড়ে আছে। দয়া করে যদি—

—চীফ মিনিস্টারের বাড়ি? অর্থাৎ হিন্দুস্থান পার্কে? ওখানে একটা কুকুরছানা মরেছে?

BanglaBook.org

—ভীষণ মাছি উড়ছে—হেলথ হ্যাজার্ড...

—বুঝেছি বুঝেছি। খুব মুশকিলের কথা। কিন্তু এটা তো ডিস্ট্রিক্ট 'খ'র অফিস। আমরা কী করতে পারি বলুন?

—আজ্ঞে দয়া করে যদি একটু সরিয়ে নেন—

—তা তো বুঝছি, মুশকিলটা কী জানেন, আপনারা তো আমাদের অফিসের আনডারে পড়েন না?

—পড়ি না? আমরা ডিস্ট্রিক্ট 'খ' নই? তবে আমরা কী?

—উদ্বেগের কিছু নেই। আপনি বরং ডিস্ট্রিক্ট 'গ'র অফিসে, ফোর ফাইভ-এ ফোন করুন। ওরা পারবে।

—লিখে নে! ফোর ফাইভ...মেয়ের হাতের খুদে চেটো উপচে পড়ে এখন কনুইয়ের কাছাকাছি লেখা হচ্ছে ফোন নম্বরের তালিকা।

—ফোর ফাইভ-এ ফোন করব তো?

—হ্যাঁ। করে ডিসিওকে চাইবেন। শুনুন, শুনচেন, যাকে-তাকে বললে দেরি হবে, সোজা ডিসিওকে চাইবেন। সঙ্গে সঙ্গে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। কিছু মনে করবেন না, এটা তো ভুল অফিস—মানে, আপনারা ভুল এরিয়া—বুঝেছেন।

—থ্যাংকিউ থ্যাংকিউ। লিখে নে, ডিসিও—বুঝেছি, আমরা ভুল এরিয়া।

—হ্যালো! ফোর ফাইভ? ডিস্ট্রিক্ট 'গ'র হেলথ অফিস?

—ইয়েস।

—সিডিও আছে? সিডিও?

—কে? কাকে চাইছেন?

(নেপথ্যে এদিকে মেয়েদের চীৎকার)—

—সিডিও নয় মা! সিডিও নয়! ডি সি ও। বল, ডি সি ও। এই যে, লেখা আছে—

—স্যরি! সি ডি ও নয়, ডি সি ও! উনি আছেন? ডি সি ও? (নেপথ্যে ফোনের ভেতরে আকুল প্রশ্নোত্তর শোনা যায়। "ডিসিও কে চাইছে। কী বলব? আছে, না নেই?")

—"আমি কি জানি? দেখে আয়। থাকলে বলবি আছে, না থাকলে বলবি নেই।"

—এইরকম বলব তো?

—আবার অন্যরকম কী বলবি? তুই সত্যি যাচ্ছেতাই—ইতিমধ্যে আর একজন ফোন ধরলেন—হ্যালো। কাকে চাই আপনার?

—ডিসিওকে।

—কেন— কী দরকার?

BanglaBook.org

চীফ মিনিস্টারের বাড়ির সামনের উল্টোদিকের ফুটপাতে একটা কুকুরছানা মরে পড়ে আছে।

—অ। তা আমাকে বলে কি হবে? ডিসিওকে বলুন।

—তাঁকেই তো চাইছিলুম।

—একটু ধরুন—

—হ্যালো। হ্যালো! শুনছেন?

—আবার কী হলো?

—আচ্ছা, ডিসিও মানে কী, বলতে পারেন?

—তাও জানেন না? আচ্ছা লোক তো? ডিস্ট্রিক্ট কনজারভেটরি অফিসার। ডি সি ও। বুঝেছেন? আপনারা ওসব বুঝবেন না, এই নিন— কথা বলুন।

—দাঁড়ান দাঁড়ান, কনজারভেটরি? না কনজারভেন্সি?

—ফের ঝামেলা? ওই একই হলো। ধরুন—

—হ্যালো। ডিসিও বলছেন? নমস্কার। নমস্কার। আমি বলছি হিন্দুস্থান পার্ক থেকে। (তখন চীফ মিনিস্টার ইত্যাদি...)

—"ওঃ। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে কুকুরছানা মরেছে? ঠিক আছে। কিছু ভাববেন না। এক ঘণ্টার মধ্যে ক্লিয়ার করিয়ে দিচ্ছি।"

—ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।

—কী আশ্চর্য, ধন্যবাদের কি আছে। এ তো আমাদের ডিউটি। এখুনি লোক যাচ্ছে।

ফোন নামাতেই মেয়েরা ঝাঁপিয়ে পড়লো।

—কেন তুমি সিডিও বলছিলে?

—কিসের ইনিশিয়ালস তা না জানলে আমার অমন অক্ষর মনে থাকে না —বিডিও এসডিও-র মতোই সিডিও বলেছি। বেশ করেছি।

—ওরা তোমাকে কী ভাবলো?

—আমাকে চেনেই না। তা ছাড়া আমি মরলে তো ওদের খবর দিলে চলবে না, হিন্দু সৎকার সমিতির নম্বরটা ফোনের খাতায় লিখে রেখে যাবো। যাও তো এক কাপ চা করে আনো দেখি। বাপস রে! এর থেকে গাড়িতে নিয়ে গেলেই হতো।

বলেছিলুম তো। এই বেলা বারোটায় চা?

—কেন? রাত দুটোয় নিউট্রামূল তৈরি করতে পারো—

—রাত দুটো নয়। একটা। ছোট মেয়ে শুধরে দেয়।

—আর অসময়ে খাওয়াবার ফলটাও তো চোখে দেখলে! বড় মেয়ে মন্তব্য করে।

—তোমাদের যত এনার্জি সব জীবজন্তুদের বেলায়— আমি কিছু বললে হাত পা নড়ে না—

BanglaBook.org

—ছি ছি মা, তুমি কুকুরছানাটাকে হিংসে করছো?

—তা করছি। আমি যখন বুড়ো হবো, তখন তোমাদের এই মনগুলো কোথায় চলে যাবে কে জানে?

—দিম্মা তো বুড়ো হয়েছেন। তোমার মনটা কি কোথাও চলে গেছে? এতক্ষণ ফোন করল কে?

এমন সময়ে ওপর থেকে মার গলা পেলুম—"খুকু! মেয়েদের নিয়ে ওপরে আয় দিকিনি এইমুহূর্তে। মুসম্বির রসগুলো পড়ে পড়ে তেতো হতে লাগলো—বেলা বারোটা বাজে! ভোর থেকে কেবল একটা মরা কুকুর নিয়ে নেত্য করছিস? আমি তো একটা বুড়ো মানুষ, আমার প্রতি কি তোদের দয়ামায়া হয় না রে?"

হুড়মুড়িয়ে ওপরে ছুটি পাল্লা দিয়ে তিনজনে—মা ক্ষেপে গেলে সর্বনাশ, জীবে দয়া বেরিয়ে যাবে প্রত্যেকের।

BanglaBook.org

ভালোবাসা কারে কয়

হাওয়া-ই-হিন্দ

"বার বার অত যাওয়াই বা কেন, বারবার বাক্সপ্যাঁটরাগুলো খোওয়ানোই বা কেন? একেবারে কলকাতা থেকে না বেরুলেই তো সবদিক রক্ষে হয়।"

এতবড়ো দুঃসংবাটা শুনে স্বয়ং মামণি যখন এহেন অকরুণ মন্তব্য করলেন তখন চোখের জল বাঁধ মানতে চাইল না। এতদিন ধরে বিদেশ-বিভুঁয়ে তো গুচ্ছের হেলাচ্ছেদ্দা সহ্য করতেই হয়েছে, স্বদেশে নিজের বাড়িতে ফিরে এসেও কিনা এই সমবেদনার নমুনা? নিম্নগামী চিরস্রোতা স্নেহেরই যদি এই চেহারা হয়, তবে অল্পস্বল্প রিপু/টিপু ক্রোধ-লোভ-মদ-মাৎসর্যের কারবার যেখানে আছে, যা নাকি লকলক করে উর্ধ্বগামী, বা সর্বত্রগামী, সেইসব সম্পর্কগুলোর তবে কেমনধারা চেহারা হবে? কে জানে!

একটা ব্যাপার একদম নিশ্চিত, যে আবার আমার সুটকেস হারিয়ে গেছে শুনলে এবারে কারুর কোনো দুঃখ হবে না, মুখে হয়তো কেউ কেউ বলবে—"ওমা, সত্যি? ঈশ, কি কাণ্ড! চুক-চুক-চুক—এয়ারলাইন্সগুলো আজকাল যা তা হয়েছে—" কিন্তু মনে মনে সকলেই ঐক্যতানে গাইবে—"বেশ হয়েছে। খুব হয়েছে! যেমন যাওয়া! গেছলে কেন? যাও না, আরও যাও?"—থাক, কাউকে বলে কাজ নেই। খুঁজে এনে তো দিতে পারবে না কেউই। বেশ, আমার ক্ষতি হয়েছে জানিয়ে তোমাদের ওটুকু উপকার করবো না আমি। কেনই বা মনের আহ্লাদ বাড়াবো আমি তোমাদের? তার চেয়ে, থাকো তোমরা মন-গড়া ভাবনা নিয়ে বসে।—"না জানি কত কি ফরেন ইম্পোর্টেড মালপত্তর নিয়ে এসেছে নবনীতা। ঈশশ... গুচ্ছ গুচ্ছ নাইলন শাড়ি, ডজন ডজন টেরিলেন শার্ট,...তাড়া তাড়া ব্লু জীনস...থলে থলে লিপস্টিক আর কার্টন ভরতি পারফিউম।" ভাবোই না তোমরা। দ্যাখোই না তোমরা মনশ্চক্ষে—আমার কাঁধের হাতব্যাগের থেকে বেরুচ্ছে গণ্ডা গণ্ডা ক্যামেরা, ক্যালকুলেটর, রেডিও, ক্যাসেট, টেপরেকর্ডার। ইলেকট্রনিক হাতঘড়ি, বোতল বোতল ব্রাণ্ডি-হুইস্কি-শ্যামপেন। বেশ! তাই হোক। যা ইচ্ছে করে তাই ভেবে নিয়ে কষ্ট পাও তোমরা, যারা হিংসুটে, যারা আমাকে ভালোবাসো না। আমার যে এদিকে পরনের শাড়িটি ছাড়া সর্বস্ব চলে গেছে মহারাজা এয়ারওয়েজের খপ্পরে, সেটি ফাঁস করে আমি তোমাদের প্রাণের আরাম আর আত্মার শান্তি বাড়তে দেব না, যাও।

BanglaBook.org

এইরকম নীচস্যনীচ কথাবার্তা ভেবে, মনস্থির করে ফেললুম, শীতল শয়তানের মতো এবার নিস্পৃহ থাকবো। যে যা বলবে, শুধু তারই জবাব দেব। সেধে কাউকেই আমার সুটকেস হারানোর দুঃখটা জানাবো না। যে স্নেহময়ী মামণি আমাকে এত ভালোবাসেন, আমার জন্যে আলাদা কত কাণ্ড করে বড়ি, আচার তৈরি করে দেন, তাঁরই যখন এরকম অনীহা! মনস্থির করবার খানিকক্ষণ পরেই রুনুদি এলেন।—

"কি রে? কবে ফিরলি? সাতদিন আগেই ফেরবার কথা ছিল না? একবার বিদেশ গেলে আর বাড়ি-টারি ফিরতে ইচ্ছেই করে না বুঝি?"

শুনলুম উত্তরে আমি বলছি—কাতর এবং উত্তেজিত গলায়, "দেরি হবে না? দেরি কি আর ইচ্ছে করে? ওদিকে আমার সব্বোনাশ হয়ে গেছে যে!"

"কী সর্বনাশ হলো আবার? সুটকেস হারায়নি তো? অ্যাঁ?" হাসতে হাসতে বলেন রুনুদি।

"হ্যাঁ। ঠিক তাই। দুটোই, রুনুদি।"

"দুটো মানে?"

"দুটো মানে দুটো সুটকেসই।"

"হারিয়ে গেছে?" মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে তাঁর।

"লণ্ডন টু নিউইয়র্কের মধ্যে।" আমি আরও গম্ভীর।

"প্লেনের ভেতর? দূরদূর। তুমি এসব নিশ্চয়ই বানাও। একই লোকের বারবার এরকম হতে পারে কখনও? নাও বের করো দিকিনি কী কী এনেছো আমাদের জন্যে।"

"তোমাদের জন্যে কী আর আনবো ভাই, নিজের পরনের শাড়িটা ছাড়া কিছুই তো সঙ্গে ছিল না—"

"সে তো প্রত্যেকবারেই শুনি। যত বাজে কথা। তা, কী করে পাওয়া গেল এ-যাত্রায়? পুজোসংখ্যার জন্য নতুন কোন গল্পটা বানিয়ে আনলে, বল শুনি?"

"যায়নি পাওয়া।"

"যায়নি? অ্যাঁ? সে কি কথা?" মুহূর্তেই রুনুদির মুখ সমব্যথায় ঝুলে পড়লো। নাঃ, সবাই মোটেই হিংসুটে হয় না। এই তো সমব্যথী পাওয়া গেছে।

—"মানে অফিশিয়ালি যায়নি।"

"কী কী ছিল ভিতরে? কাগজপত্তর ছিল কিছু? গয়নাগাঁটি?"

"নাঃ—সেসব ঠিক আছে। ব্রীফকেসটা তো হারায়নি? কাগজপত্তর আমি সর্বদা ব্রীফকেসে রাখি। আর গয়নাগাঁটি তো তেমন পরিই না।"

"তবু ভালো। তা কী কী গেল? কাপড়চোপড়?"

"কাপড়চোপড়, আর ইংলণ্ডে যা যা কিনেছিলুম, সব।"

"কী কী কিনেছিলি?"

BanglaBook.org

"অনেক ঘুরে অনেক খুঁজে কেনা একগাদা ভালো ভালো বই গেল। দালির রেট্রসপেকটিভ এগজিবিশন থেকে কেনা টেট গ্যালারীর স্যুভনির বইটাও গেল। রেয়ার জিনিস। কয়েকটা অফপ্রিন্টও গেল অন্যদের দেওয়া। যাবার সময় প্লেনে কেনা পারফিউমটাও।

"বই যায় যাকগে। বইপত্তর ঢের পাবি। ভালো কাপড় কী কী খোওয়া গেল? পারফিউমটার জন্য কষ্ট হচ্ছে। আহা রে!"

"সেই ব্রাউন টেম্পল শাড়িটা—"

"ঈ-শ। সেই টেম্পল—" দুঃখে রুনুদির বাকরোধ হয়।

"এর চেয়ে যদি আমাকেও ওটা দিয়ে দিতিস। আর? আর কী গেল?"

"তিনটে কাঞ্চিপুরম, একটা বাটিক (ফুলশয্যার সেই হলুদ রঙের, সুমনের সইকরা শাড়িটা)—একটা বেনারসী, দু'খানা কাশ্মীরী শাল—"

"ঈশ—এ-ত! তি-ন তিনটে কাঞ্চিপুরম? কত টাকা লোকসান হলো? বেশ ভালোরকম?"

ও কি? একটু একটু করে রুনুদির মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে যেন? হ্যাঁ, ঠিকই। মুখে স্পষ্টই আহ্লাদ।—

"আর বেনারসী? বেনারসী কোনটা গেল? ব্লু-টা নয়তো? অ্যাঁ? সত্যি? ব্লু-টাই?"—আনন্দে রুনুদির মুখে এখন আলো ঝলমল করছে। দেখে বুকে যেন ছোরা বসে গেল। ঈশ—রুনুদিও এরকম?

"আর ভেবে কী হবে রুনুদি, চলো ওপরে চলো—মামণি চমৎকার পাটিসাপ্টা করেছেন—"

"প্রসূনকে একবার বল"—রুনুদি পাটিসাপ্টা দিয়ে চা খেতে খেতে বলেন—"প্রসূন ঠিক পারবে হাওয়া-ই-হিন্দ থেকে তোর বাক্সো উদ্ধার করে দিতে।"

"প্রসূনকে কি বলিনি নাকি? ওই তো চেষ্টা-চরিত্র চালাচ্ছে যেটুকু সম্ভব! কিন্তু ব্যাপারটা খুব গোলমেলে।"

"তবে কি জগদীশকাকুকে একবার লিখবি? উনি তো ওখানেই রয়েছেন।"

"কত হাতী গেল তল, মশা বলে কত জল? এর ভেতর জগদীশকাকু কী করবেন শুনি? ওখানে থাকলেই বুঝি হলো? শুনবে তুমি ব্যাপারটা কদ্দূর গড়িয়েছিল? শুনলে তো আবার বিশ্বাস করতে পারবে না। আবার বলবে—'এই খালি খালি যতোসব গপ্পো বানাস।' কী না করেছি আমি সুটকেস উদ্ধারের জন্যে? গোড়া থেকে বলি তবে শোনো।"

কিন্তু আসল ক্ষতিটার কথা তো কাউকে বলতেই পারছি না। মুশকিল সেইখানে। বাক্স-বাক্স করে প্রাণটা বের করে ফেলছি কেন যে, আসলে তো কাঞ্চিপুরমও নয়, বেনারসীও নয়। এ ছটফটানি কিসের জন্যে, তা তো কেউ জানেই না। কোনো

BanglaBook.org

তালিকায় উল্লেখ নেই সেই হারানো বস্তুটার। উল্লেখ করা যাবেও না। এ হলো চোরের মায়ের কান্না]।

২

গণ্ডগোলটা হয়ে গেছে আসলে আগেই। নিউইয়র্কে প্লেনবদল করে লস এঞ্জেলেসে যাব। হাতে ঘণ্টাদুই সময়। লাগেজ কালেক্ট করে কাস্টমস চেকিং করে, অন্য বিলডিঙে গিয়ে প্লেন ধরতে হবে। এদিকে লাগেজ আর বেরোয় না! প্লেনে এক দাড়িওয়ালা বেহালাবাদকের সঙ্গে ভাব হয়েছিল, সে স্ট্যাটেন আইল্যানডে থাকে, বলেছিল আমাকে লস এঞ্জেলেসের প্লেনে মালপত্তর সুদ্ধ তুলে দেবে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে কখন যেন সে কেটে পড়ল। আরেক বৃদ্ধ দক্ষিণী, যাবেন মিনেসোটা, তাঁকে ধরলুম। অতবড়ো দুটো বাক্স নিয়ে অন্য এয়ার টার্মিনালে গিয়ে প্লেন ধরা মুখের কথা নয়। বহুক্ষণ সঙ্গ দিয়ে তিনিও শেষটা মার্জনা চেয়ে চলে গেলেন, নইলে তাঁর প্লেন ধরতে পারতেন না। এখনও আমাদের ফ্লাইটের বেশ কয়েকজনের মাল চাতালে আসেনি। এ কী রে বাবা? এমন তো হয় না? একটি শিখ ছেলে দেখছি ঘুরে ঘুরে যাত্রীদের সহায়তা করছে, হাওয়াই-ই-হিন্দ-এর পোষাকপরা। তাকেই গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম—"ব্যাপার কী? আমার প্লেন যে চলে যাবে? মাল কখন বেরুবে?" —শান্ত হয়ে যুবকটি বললো—"ক'টায় প্লেন?" টাইমটা শুনে সবিনয়ে জানালো—"ওটা আপনি মিস করেই ফেলেছেন। এখন ধরবার সময় নেই। তাছাড়া এখানে এখন আপনার কিছু করণীয় কাজকর্মও আছে। আপনি কি ভিক্টোরিয়া বাসটার্মিনাসে মাল জমা দিয়েছিলেন?"

ছেলেটি কি হাত গুনতে পারে? জানলো কেমন করে? "আজ্ঞে ঠিক তাই। কি করে বুঝলেন?"

"তাহলে আপনার মালপত্র আসেনি। ওইখানে কমপ্লেন্ট কাউন্টার খোলা হয়েছে। যান, ফর্ম ফিল আপ করুন আগে। তারপরেই নতুন ফ্লাইট বুক করতে ছুটবেন, মনে করে।"

আমাদের এই ফ্লাইটের মালের গোলমালের জন্যে বিশেষ কাউন্টারে ফর্ম দিচ্ছেন শাড়ি ব্লাউজ পরা একটি প্লাস্টিকের তৈরি ভারতীয় নারী। খুব গম্ভীর। একটু রুক্ষ। অথচ কী রংচং কী সাজসজ্জা। ক্ষণে ক্ষণে বেঁটে চুল ঝামরে তুলছেন কপাল থেকে ওপরে। যারাই বাসে করে হীথরো এসেছিলেন, ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে মাল চেক ইন করে, তাদের কারুরই মাল আসেনি। কিন্তু থেকে-যাওয়া মালগুলির তালিকা ও রসিদ নম্বর এসে গেছে টেলেক্সে। ছাপানো ফর্মে হারানো মালের জন্যে অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে। যাতে মাল লোকেট করা সহজ হয়। আমি একা নই। একসারি যাত্রী কিউ দিয়ে ফর্ম ভর্তি করছেন। এক ফরাসী দম্পতিও তাঁদের শিকাগো ফ্লাইট মিস করে ছটফট করছেন। ছুটে ছুটে যাচ্ছেন অন্য লোকদের মালপত্রের দিকে।

BanglaBook.org

আর ফিরে আসছেন কাঁদো কাঁদো মুখে। আমার দুটি মালের একটি টেলেক্স তালিকায় আছে। অন্যটির নো-পাত্তা। এটা কোনটা অবশ্য জানি না। কালো ছোটোটা না বড়ো বাদামীটা। কালোটা পার্থ'র। [বাদামীটাই আমার] মাত্র একটা বাক্স এনেছি অথচ দুটি নিয়ে যাওয়া যায়। ফ্রম দি ইউ. এস. এ. এবং টু দি ইউ. এস. এ. মাল আজকাল ওজন হয় না কেবল গুণতি হয়। টু প্লাস ওয়ান। পীস কনসেপ্ট। না ভিয়েৎনামের পীস নয়, মালপত্রের মাথাগুণতি অন্যের বাক্সপ্যাঁটরা নিয়ে যেতে অসুবিধা নেই। এভাবেই গতবারে অঞ্জলিদির বাক্সটা নিয়ে গিয়েছিলাম। এবারে পার্থ'রটা নিয়ে যাচ্ছি ইংলণ্ড থেকে, ভায়া আমেরিকা, কলকাতায় কিন্তু টেলেক্সে যেটার নম্বর নেই, সেটার জন্যে আমাকে আলাদা করে কমপ্লেন্ট ফর্ম ভরতে হলো—ও কমপ্লেন করা যে-সে লোকের সাধ্য নয়। ওই ফর্ম দেখেই লোকে বলবে, "থাক আমার বাক্সে দরকার নেই।" এমনিই জটিল। গোলমেলে। তার জন্য আলাদা এলেম থাকা চাই।—প্রথমে ৫/৬ রকমের সুটকেসের নকশা দেখানো হলো। ১০/১২ রকমের পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপগুণ চরিত্র চিত্রণের বর্ণনা পড়ানো হলো। এবার বল কোনটি তোমার? রূপগত বৈশিষ্ট্য, গুণগত পার্থক্য? বিশেষ চিহ্ন? তিল-জড়ুল? আমার যা বে-মালুম স্বভাব। প্রত্যেকটা বর্ণনাই মনে হয়— "ঠিক এইরকম আমারটাও।" কে আর কবে মাল-বিশারদ হবার জন্যে সুটকেসের রূপগুণ মুখস্থ করে রাখে? নিজেরটা আদিও বা জানি, পার্থ'রটা তো ভালো করে দেখিওনি। তার গুণাগুণ কিছুই মনে নেই, কালো, জিকাওলা, এবং আমারটার চেয়ে ছোটো, এটুকু ছাড়া। হাতল পাশের স্ট্র্যাপ আছে, কি নেই? থাকলে এদিকে, না ওদিকে? হাতলটা চ্যাপ্টা? না গোলালো? প্লেন? না কিরকিরে? সাইডপকেট আছে কি? ক'টা? তাতে জিপ? না বোতাম? চাকা লাগানো? চাকা একজোড়া, না দু জোড়া? "এ কি আমার পাত্রী পছন্দ করছি নাকি? এত খবর কে রাখে?" অমনি প্লাস্টিকের মহিলা এক ধমক লাগান—"নিজের বাক্স নিজেই জানেন না কেমন দেখতে, তো আমরাই বা জানব কী করে কোনটি আপনার?"

"আমার একটা বাক্সের রসিদ নম্বর তালিকায় নেই কেন?"

"আমি জানব কেমন করে? আমিই কি টেলেক্সটা পাঠাচ্ছিলাম লণ্ডন থেকে?"

"বাক্সটার কী হবে এখন?"

"সেটাই বা আমি জানব কোত্থেকে? আমার তো কাজ কেবল ফর্ম জমা নেওয়া। আচ্ছা জ্বালাতন করলে তো এরা? যত বাজে কথা!"

"কিন্তু, আমার বাক্স—"

"হায়ার অফিসারদের বল গে যা। এই দ্যাখো নাম ছাপানো আছে। এই ফোননম্বর। এখন যা, ভাগ। নে, সইটা কর। সই করে যা।"

কে বলেছে ইংরিজিতে "তুই" সম্বোধন নেই? ইনি যে ইংরিজিতে 'তুই' বলছিলেন, তা যে-কোনো ভারতীয়ই অনায়াসে বুঝতে পারত। ভয়ে ভয়ে দুটো

ছবিতে "যা থাকে কপালে" বলে টিক মার্ক দিয়ে ফর্ম সই করে দিলুম। ছোট্ট ছোট্ট চৌকো চৌকো অনেক খুপরি। ঠিক গ্রাফপেপারের মতন। ঢ্যাড়া আর টিক দিয়ে খসখস করে আধ মিনিটে ভর্তি করে দিচ্ছে মেয়েটাই। আমি তো ভালো করে পড়তেই পারছি না। চশমাটা ফিরে গিয়েই বদলাতে হবে। বড্ড খুদে হরফে লেখা। ফর্ম ভরতি করতেই ঘণ্টা উৎরে গেল।

৩

ফর্ম ভর্তি শেষ হতেই আমি কাঁদুনি শুরু করি। " অ মা-জননী, আমার লস এঞ্জেলেস যাবার কী হবে? বাক্সপ্যাটিরা সব তো গেল, কানেকটিং ফ্লাইটও মিস হয়ে গেছে--নেক্সট ফ্লাইটটা আমাকে ধরিয়ে দাও?"

মা-জননী খিচিয়ে ওঠেন—"আমাকে এসব বলে কী হবে? এটা কি ফ্লাইট বুকিংয়ের কাউন্টার, মাথায় কিছুই ঢোকে না দেখছি।"

"কোথায় যেতে হয় তাহলে?"

"কেন, ঐ তো সামনেই আর একটা কাউন্টার রয়েছে।"

"অ মশাই"—নতুন কাউন্টারে গিয়ে সুরু করতেই তিনি বলেন—"এ কাউন্টার বন্ধ হয়ে গেছে। বাইরের কাউন্টারে গিয়ে বলুন যা বলার।" এবার বেরিয়ে যাচ্ছি —অমনি কাস্টমসের লোকটি আটকায়—"বাক্স কই? ক্লিয়ারেন্স হয়েছে?"

"বাক্স? অল ক্লিয়ার ভাই। বাক্সই আসেনি। আমি এখন ট্র্যাভলিং লাইট।"

"অঃ। যান। আর কিন্তু ঢুকতে পাবেন না।"

"ঢুকবার দরকারও নেই।"

স্মার্টলি চলে যাই। কাস্টমসের এত সহজ ক্লিয়ারেন্স জীবনে হয়নি। বেরুচ্ছি, পেছন থেকে হঠাৎ কে বলল "বুকিং হয়ে গেছে তো?" সেই শিখ ছেলেটা।

"না, এই যাচ্ছি।"

"যান, যান, শিগগিরি—ওকি বাইরে কেন, এখানেই হলো না?"

"বন্ধ হয়ে গেছে।"

বাইরের কাউন্টারে কিউ। আমার টার্ন আর আসে না।

"অ মশাই, শুনছেন? আমি অমুক ফ্লাইটে লণ্ডন থেকে এসেছি, আমার তমুক ফ্লাইটে লস এঞ্জেলেস যাবার কথা, আমার লাগেজ আসেনি বলে ওয়েট করতে করতে ফ্লাইট মিস করে গেছি,—দয়া করে একটু—"

"ভেতরের কাউন্টার। ভেতরের কাউন্টার।"

"ওটা বন্ধ।"

"বন্ধ নয়। বন্ধ নয়। খোলা।"

"ওরাই পাঠিয়ে দিলে এখানে।"

"হতে পারে না। আবার যান। এখানে হবে না। নেক্সট প্লীজ?"

BanglaBook.org

যেদিক দিয়ে বেরিয়েছিলুম সে দরজা দিয়ে ঢোকা যাবে না। যেদিক দিয়ে ঢুকতে হবে, তাতে প্রচুর ঘুরতে হয়। ঘুরে ঘুরে যখন ঢুকলুম, ভেতরের কাউন্টারটাতে যেতে হলে আবার সেই কাস্টমসের দরওয়ানটিকে পেরুতে হবে। সে আটকে দিল।

"আবার কোথায় যাচ্ছেন?"

"টিকিট বুকিং করতে"—

"এই যে গেছলেন বুকিং করতে"—

"ওখানে হলো না"—

"এখন ঢোকা অসম্ভব—একবার বেরুলে—"

"তাহলে কী করব? ওরা বলছে ভেতরে যাও, আপনারা বলছেন বাইরে যেতে, আমি কী করি মশাই, পাগলা হয়ে যাব যে—কেন যে মরতে"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, যান তবে পাসপোর্টটা রেখে যান।"

পাসপোর্ট রেখে ফের "বন্ধ" কাউন্টারে দৌড়োই। কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষ ভেতরে দাঁড়িয়ে অবসর বিনোদন করছেন। গল্পসল্পের আমেজ, তাকালেই বোঝা যাচ্ছে।

"এক্সকিউজ মি, আমার লস এঞ্জেলেসের"...একসঙ্গে তিনজন হাওয়াই-হিন্দের উদিপরা স্ত্রী-পুরুষ আমাকে মারতে উঠলেন।—"ইংরিজি বোঝেন না নাকি? তখন থেকে এক কথা বলে বিরক্ত করছেন। বলছি না এ কাউন্টার বন্ধ? বাইরের কাউন্টারে যান?"

"ওরা বলল করবে না। ভেতরে পাঠিয়ে দিল। কেউ একজন প্লীজ করে দিন?"

"দেখেছ, দেখেছ, কী বদ? ইচ্ছে করেই ভেতরে ফেরৎ পাঠিয়েছে। দেখি কেমন করে ওরা কাজটা না করে? হবে না, যাও। বাইরে যান। এটা বন্ধ। আচ্ছা, এটাকে ঢুকতেই বা দিল কী করে? আশ্চর্য তো? ইনএফিশিয়েন্সির চূড়ান্ত হয়েছে। শুনুন! উই আর ক্লোজ। প্লীজ গো এলসহোয়্যার। আণ্ডারস্টুড?"

"হোয়্যার এলস?"

"টু দি আউটসাইড কাউন্টার। অ্যাজ উই হ্যাভ অলরেডি টোলড ইউ সেভারেল টাইমস।"—এবারে একটি স্বাস্থ্যবান লোক দাঁতে-দাঁত দিয়ে এমনভাবে শান্ত সুরে কেটে কেটে কথা বললো, যে রীতিমতো মর্মে মর্মে ভয় করলো। হিন্দি ছবির ভিলেনরা এভাবে শান্ত হয়ে কথা বলবার পরেই ঘুষি মারে।

পাসপোর্ট ফেরৎ দিয়ে সাহেব পুলিশটা হাসলো।

"ডান? নট ইয়েট? গুড লাক নেক্সট টাইম।"

৪

আবার সেই কিউ।

এবার কিউ ভেঙে গোড়ায় গিয়ে রেগেমেগে বলি: "ওরা বন্ধ। মিছিমিছি আমাকে দৌড় করালেন। লস এঞ্জেলেসের নেক্সট ফ্লাইটটা—"

BanglaBook.org

"ট্র্যাভলার্স লজ। ট্র্যাভলার্স লজে চলে যান, আপনাদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা আছে। একটা ট্যাক্সি নিয়ে নিন। কাছেই। কাল সকাল ৮টায় আসবেন। প্রচুর ফ্লাইট আছে।"

"কী? কোথায় যাব?"

"ট্র্যাভলার্স লজ মোটেল। খুব কাছেই।"

"ইয়ার্কি পেয়েছেন? আপনাদের দোষে একটা মালপত্র নেই, কনেকটিং ফ্লাইট নেই, লস এঞ্জেলেসে আমার বিজনেস অ্যাপয়েন্টমেন্ট মিস করে গেলাম—এখন থাকব গিয়ে মোটেলে?"

"খরচা আপনার নয়। চলে যান। একটু রেস্ট করুন। কাল সকালে—"

"খরচা যারই হোক। আমি কি সিধে মোটরে চেপে লনডন থেকে এলুম? হাওয়া-ই-হিন্দ কি মোটরগাড়ির টিকিট বেচেছিল? কিসের জন্যে মোটেলে যাব? ভদ্র এয়ারলাইনস এরকম অবস্থায় পড়লে ফাইভস্টার হোটেলে তোলে, শেরাটন-হিলটনে তোলে"—

"যান না আপনি শেরাটন-হিলটনে। নিজের পয়সায়। কে বারণ করছে—"

"কেন যাব? নিজের পয়সাতে তো সোজা লস এঞ্জেলেস যাচ্ছি—দয়া করে এক্ষুনি কনেকশনটা বুক করে দিন—এটা আপনার আবশ্যিক দায়িত্ব।"

"বুকিং দিন বললেই বুকিং দেয়া যায় না। এখন ইউনাইটেডে কোনো ফ্লাইট নেই।"

"না থাক। আমেরিকানে দেখুন। টি. ডবল্যু. এ. দেখুন—হাজারটা এয়ারলাইনস আছে"

"হাজারটা আর দু-হাজারটা যাই থাক, তাতে বুকিং নেই আপনার।"

"দোষটা আপনাদের। বুকিং চেঞ্জ করে দিন অন্য এয়ারলাইনসে।"

"যা হয় না—তা"—

"একশবার হয়।"

"জায়গা নেই।"

"কে বলল? জায়গা করে দিতে হবে।"

"জায়গা হবে না।"

"দেখুন, বাজে কথা বলছেন কেন? আমি তো দেখতেই পাচ্ছি আপনি খোঁজই নিচ্ছেন না। কনেকশন দেবার দায়িত্ব আপনার। আজ আপনাদের দোষেই আমি এখানে স্ট্র্যানডেড হয়ে গেছি।"

"দোষের ব্যাপার নয়। স্ট্র্যানডেড হবার দায়িত্ব আপনারও যতটা, আমাদেরও ততটা। কাউকে ব্লেম করা বৃথা।"

"আমার দায়িত্বটা কি রকম? হ্যাঁ, একটা অবশ্য দায়িত্ব আছে, ভুল করে হাওয়া-ই-হিন্দে এসেছি। মোটেলে আমি যাব না। একটা ফার্স্ট ক্লাস হোটেলে নিয়ে চলুন।

BanglaBook.org

এবং ওভারনাইট থাকার ক্ষতিপূরণটা দিয়ে দিন।"

"কিসের ক্ষতিপূরণ?"

"আমি নিয়ম জানি না ভেবেছেন? রাত্রিবাস, বাথরুমের স্লিপার, মাজন-সাবান-বুরুশ ইত্যাদি, তোয়ালে, সোয়েটার, একপ্রস্থ বিজনেস স্যুট—সবকিছুই আপনাদের দেবার কথা। এক্ষুনি। কই, দিন?"

[এরা যে লং ট্র্যাভলে সত্যি বেরোয় কী করে? হাতে একটা ওভারনাইট কেসও রাখেনি?] "কি? এখন চাইছেনটা কী? 'সাম ডো?' মালকড়ি? জেনে রাখুন এখন ওসব হবে না। কাল সকালে অ্যাকাউন্টস ওপন করলে আসবেন। অন্য লোকে ওসব ব্যাপার দ্যাখো। আমি না। কিন্তু কাল আপনাকে স্যুটকেসই দিয়ে দিচ্ছি আমরা।"

"ওসব লম্বা বাকা ছাড়ুন। আমি সব নিয়ম জানি। ক্ষতিপূরণ হাতে হাতে দেবার কথা। আগেও আমার বাক্স কি হারায়নি নাকি? সাত বছর আগে আমেরিকান এয়ারলাইনস ইন্টারনাল ট্রাভলেই পঁচিশ দিয়েছিল, রাত বারোটার সময়ে। এখন, ইন্টারন্যাশনালে রাত নটায় কেন দেবেন না শুনি? অন্তত পঞ্চাশ তো নিশ্চয়ই হয়েছে—ক্ষতিপূরণের নতুন অঙ্কটা সাত বছরে বেড়েছে নিশ্চয়?"

"ডলার কি গাছে ফলে ম্যাডাম? আর হাসাবেন না। যান, ট্র্যাভেলার্স লজে চলে যান—"

"একটা সস্তা স্লিপিং স্যুট বারো, সস্তা হাউসকোট আঠারো, চটি—পাঁচ ছয়, সস্তা মাজন সাবান বুরুশ চিরুণী—চার, আণ্ডার গারমেন্টসের চেঞ্জ এক সেট আঠারো, তোয়ালে প্রভৃতি দশ, বিজনেসসুট বাদই দিচ্ছি—কত হলো? ষাট-সত্তর? তাও তো অন দ্য স্পট মিনিমাম রিকোয়ারমেন্টসের তালিকা এতেই শেষ হয়নি—আরো আছে—"

"কেন বাজে বকছেন? অ্যাকাউন্টস বন্ধ হয়ে গেছে। শুনলেন না?"

"এটা অন্য অ্যাকাউন্ট। এত লোকের এত ব্যাগেজ আসেনি, একটা নতুন কাউন্টারই খুললেন, অ্যাকাউন্টেরও নিশ্চয় নতুন কাউন্টার খোলা হয়েছে। টাকা আমি চাই না, জিনিসপত্তরগুলো কিনে দিন। আর এগুলো রাখবার জন্যে একটা ওভার নাইট কেস। তিরিশ। এই ধরুন একশো মতন লাগবে।" ভদ্রলোক প্যান্টের দুই পকেটে দুই হাত ভরে, পাইপটা কামড়ে দাঁতের ফাঁকে হেসে বললেন, "ম্যাডাম, ইউ আর ওয়েস্টিং মাই টাইম। নট আ সেন্ট। নট আ ফার্দিং। আই ক্যান গিভ ইউ নাথিং। চাপ দিয়ে লাভ নেই। হাওয়া-ই-হিন্দ আপনাকে কিছুই কিনে দিতে বাধ্য নয়।" তারপর পাইপ সরিয়ে বলেন, "চলে যান, মোটেলেই তোয়ালে সাবান দেবে। বাকীগুলো ছাড়া এক রাত্রি দিব্যি চলে যায়। অ্যাটাচড শাওয়ার। হাউসকোট দিয়ে কী হবে? আর আমার তো শার্ট প্যান্ট পরেই দিব্যি ঘুম হয়। শাড়ি তো আরো কমফরটেবল গারমেনট।"

"আপনিই বরং এবার থেকে শাড়ি পরে কমফর্টেবলি ঘুমোবেন।—আমি এক্ষুনি লস এঞ্জেলেস চলে যেতে চাই, কনেকশনটা করে দিন। দেখি, বরং সেখানে গিয়ে যোগাড় করব ক্ষতিপূরণ।"

"কনেকশন নেই। আর দেরি করলে ট্রাভেলার্স লজেও বুকিং পাবেন না।"

"ঐ এ-বি-সি গাইডটা একটু দেখি তো?"

"নট ফর দ্য প্যাসেনজারস। স্যরি।"

"নিজেও কনেকশন করে দেবেন না? আমাকেও খুঁজতে দেবেন না? যত দেরি করছেন—তত ওদিকে রাত বেড়ে যাচ্ছে না?"

"না। ওটা পশ্চিম। ওখানে দেরিতে রাত হয়।"

ভদ্রলোক অন্য কাজে মন দেন।

নাঃ, আর 'আয়রণ উওম্যান' ইমেজ থাকছে না। এবার আমি কাতর হয়ে পড়েছি মনে মনে।

"কেন মিছিমিছি এত ঝামেলা করছেন ভাই, বলুন তো? লং জার্নি করে এসেছি, বাক্সটাক্স সব হারিয়ে গেছে, সামনে আরেকটা লং জার্নি, কেন বাজে ঝুট-ঝামেলা করছেন? দিন মশাই, কনেকশনটা করে দিন—" ঠিক তক্ষুনি, "একি! আপনি এখনও এইখানে?" একটি বিস্ময়বিদীর্ণ ধ্বনি কানের কাছে বাজলো।

৫

সেই শিখ ছেলেটি।

কেনেডি এয়ারপোর্টের এই ট্র্যাজিডিতে যে বারবার ভগবদ-প্রেরিত দূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে।

"এখানে কী করছেন? লস এঞ্জেলেসের প্লেন যে সব বেরিয়ে গেল—আরো দেরি করলে আজ যেতেই পারবেন না—ইশ! চলুন চলুন, দেখি সাড়ে ন'টা নাগাদ একটা ফ্লাইট আছে বোধহয়—কিন্তু আমেরিকানের না ইউনাইটেডের ঠিক মনে পড়ছে না—", কথা বলতে বলতেই, সামনের টেলিফোনের সুরেলা বোতামগুলো টিপতে থাকে ছেলেটা—"হ্যালো, ইউনাইটেড?" দু-চারটে কথা হয়, তারপরেই প্রচণ্ড একটা তাড়া পড়ে যায় আমাকে ঘিরে—হঠাৎ হাত থেকে ব্রীফকেসটা ছিনিয়ে নিয়েই ছেলেটা দৌড়তে থাকে। আমাকেও প্রায় বগলদাবা করে নিয়ে—"ছুট ছুট ছুট—সময় নেই একটুও—আমাদের অন্য টার্মিনালে যেতে হবে—পথে ট্যাক্সি ধরতে হবে—" বলতে বলতে সে আগে আগে ছোটে, পেছন পেছন কোঁচা ধরে হাইহিল খটখটিয়ে অত্যন্ত হাস্যকরভাবে আমিও ছুটি, চেঁচাতে চেঁচাতে।

"কিন্তু আমার কাছে যে ফরেন এক্সচেঞ্জ নেই—আগে ব্যাংকে, আগে ব্যাংকে—।"

"ব্যাংক পরে হবে—আগে প্লেন—।"

BanglaBook.org

কেনেডি এয়ারপোর্টের সব চোখ মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ায় এই অপরূপ শোভাময় যাত্রার দিকে। ছুটে বাইরে বেরিয়েই যে-কোনো একখানা লিমুজিন থামিয়ে চট করে ছেলেটা দোর খুলে আমাকে ঠেলে ভেতরে পুরে দেয়, নিজেও ঢুকে প্রায় আমার কোলের ওপর বসে পড়ে শোফারকে বলে—"ইউনাইটেড, জলদি" —লিমুজিনটায় অন্য কোন একটা এয়ারলাইনের নাম ছিল। শোফার হাসতে থাকে। পিছনের সীটে বসা তার যাত্রীরাও। ছেলেটার কানে হাসি-টাসি ঢুকছে না। উদগ্রীব হয়ে বসে আছে আমার ব্রীফকেসটা বগলে চেপে। "টিকিট বের করুন, টিকিট" —বলতে বলতে ইউনাইটেডের বাড়ি এসে যায়। নেমে, একগাল দেঁতো হেসে লিমুজিনওলাকে ধন্যবাদ দিয়েই সে আমাকে নিয়ে দৌড়ে ভেতরে ঢোকে—"সোজা এই পথে দৌড়ে যান, অমুক নম্বর গেটে গিয়ে টিকিটটা দেখান, আমি ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা করে আসছি—এই নিন ব্রীফকেসটা—।"

আমার মুখের অবস্থা দেখে তার কী মনে হয়, পিঠে হাতটা রেখে, মিষ্টি হেসে বলে—"সব ঠিক হো জায়গা। ডরনেকা কুছ নহী হ্যায়—আইল বি ব্যাক ইন আ মিনিট—।"

কান্নার স্বভাব কুকুর জাতীয়।

প্রশ্রয় পেলেই কান্না চোখের মাথায় চড়ে বসে।

ছুটলুম অমুক নম্বর গেটের দিকে।

বাপ রে বাপ। এয়ারপোর্ট বটে একটা! এক একটি টার্মিনালই এক একটা নেতাজী স্টেডিয়াম। একগেট থেকে আরেক গেটে যাওয়া মানে নেতাজী স্টেডিয়ামের এপাশ থেকে ওপাশ অবধি দৌড়ে পার হওয়া। বুড়োমানুষ হলে কী করতুম কে জানে?

হাঁপাতে হাঁপাতে যাকে টিকিট দেখালুম, সে হেসে বললে—"বিল্যাক্স। সীট খালি নেই। ওয়েটিংয়ে রাখছি তোমাকে। কেউ যদি নো শো হয় তখন যেতে পারবে।"

বসে আছি তো বসেই আছি।

এত তাড়াহুড়ো করে এসে কী লাভ হলো? প্লেনও বসে আছে। একে একে অন্য অন্য জায়গার প্লেনগুলো ছেড়ে দিল। ঘর এখন প্রায় খালি। মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করি—কিছু হলো?

সে হাসিমুখে বলে—এখনো না।

পাগড়ীর চিহ্ন নেই।

বুঝতেই পারি, পালিয়েছে। আমার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যখন দেখেছে হলো না, তখন লজ্জায় পালিয়েছে। এসে করবেই বা কী সে? জায়গা তো হলো না। এখন আমি কোথায় যাবো? ব্যাংকে। টাকা ভাঙাবো। ব্যাংক কি খোলা? তারপর ট্রাভলার্স লজে? নাকি বন্ধুবান্ধবদের ফোন করে দেখবো, কে কে আছে। এইটে

BanglaBook.org

সামারের মুশকিল, কেউই থাকে না শহরে।

এবার এঞ্জেলেসের ফ্লাইট ঘোষিত হলো। ডাক শুরু।

হলো না। আমার যাওয়া হলো না আজ। এটাই নিউ ইয়র্ক থেকে শেষ প্লেন। শিখ ছেলেটাও কেটে পড়ল? "ম্যানেজারের ঘরে যাচ্ছি" বলে চলে গেল। এটাতেই বড়ো বেশি মর্মাহত লাগছে। কেননা মুহূর্তের জন্যে ওকে মনে হয়েছিল, আমার স্বজন। মানুষ সত্যি আজকাল বড্ড সামান্য হয়ে গেছে, বড়ো তুচ্ছ।

এসে বলে তো যেতে পারতো, "স্যরি, পারলুম না?" আসলে কেউ কারুর জন্যে কেয়ার করে না। জগৎটাই এইরকম হয়ে গেছে। সবাই এক। ক্যালাস। স্বার্থ না থাকলে, কিছু করে না। হেনকালে এ কী হেরি?

ছুটন্ত একটি পাগড়ি। হাসিমুখে হাত নাড়ছে। সোজা কাউন্টারে গিয়ে কিছু বলল, তারপর আমার কাছে এসে আবার বলা নেই, কওয়া নেই, ব্রীফকেসটা ছিনিয়ে নিয়ে বলল, "—ভেরি স্যরি। কিছুতেই ব্যবস্থা করা যাচ্ছিল না। ফুললি বুকড —অবশেষে পেরেছি। যাক বাবা, লাস্ট ফ্লাইট ফ্রম নিউ ইয়র্ক আজ এটাই—।" ততক্ষণে আহ্লাদে ছেলেটাকে জাপ্টে ধরেছি আমি।

"আরে আরে করেন কি! করেন কি।"

তুমি কী করেছো, তা মুখে তো বলতে পারলুম না। আরেকটু হলেই ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছিল আমার। লাস্ট ফ্লাইট ফ্রম নিউ ইয়র্ক তো কেবল নয়, আরেকটাও খুব জরুরি ফ্লাইট ধরিয়ে দিয়েছো যে ভাই! যার গন্তব্য সুদূর বিস্তার, অনেক গভীরে, অন্তর্লীন ভবিষ্যতের মধ্যে সেই যাত্রা। তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা অশেষ।

"আপনাকে কেউ নিতে আসবে তো?"

"এসেছিল নিশ্চয়। আমার তিন বোন। ফিরেও গেছে নিশ্চয়।"

"তবে? এখন কী করা? পয়সা ভাঙানোরও তো আর সময় নেই। এটা তো আবার পৌঁছুবে গিয়ে ইন্টারনাল টার্মিনালে, সেখানে ব্যাংক খোলা না থাকতেও পারে।" সত্যি সত্যি চিন্তিত দেখায় তার তরুণ মুখ।

"এঞ্জেলেসে নেমে বাড়িতে ফোন করতে হলেও তো পয়সা চাই", পকেট থেকে একমুঠো খুচরো বের করে সে আমার হাতের মুঠোতে গুঁজে দিতে যায় —"এগুলো রেখে দিন—"

"কি মুশকিল, আমার দরকার নেই—।"

"যদি নেমে ফরেন কারেন্সি ভাঙাতে না পারেন? যাচ্ছেন মাঝরাতে। ব্যাংক বন্ধই হয়ে যাবে ততক্ষণে। এটা তো ইন্টারন্যাশনালে যাচ্ছে না—অত রাত্রে ট্যাক্সি করে একা মেয়েদের যাওয়াটাও লস এঞ্জেলেসে খুব নিরাপদ নয়। কেউ যদি নিতে আসতো—।"

"তুমিই একটা ফোন করে দাও না ভাই আমার বোনকে?"

"গ্রেট! সেই-ই শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। তিনঘন্টার মধ্যে নিশ্চয় খবরটা দিয়ে দিতে পারবো।

BanglaBook.org

দেখি নম্বরটা।" ফোন নম্বরটা হাতের পাতায় লিখে নিতে নিতে চোখ তুলে ছেলেটি বলে—"ডোন্ট ওয়ারি, যদি ফোনে আপনার বোনেদের নাও পাই, তবুও সামবডি উইল বি দেয়ার। আপনার নম্বরটা না পেলে আমার কাকাকেই বলে দেবো—কাকা-কাকীও লস এঞ্জেলেসে থাকে—নামটা ডাকটর দেও সেন তো? সামবডি উইল টেক চার্জ অফ ইউ দেয়ার অ্যাট দি এয়ারপোর্ট!" ধবধবে হাসে ছেলেটা—সিকিউরিটির দরজায় ঢুকতে ঢুকতে ওর হাত থেকে ব্রীফকেসটা নিই—শেষ মুহূর্তে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করি—"তোমার নাম কী ভাইয়া?"

"বেদী। বেদী ইন দি এয়ার ট্রাফিক..."

৬

নেমে দেখি ভগ্নীদ্বয় খেপে লাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সঙ্গে আবার খুদে ভগ্নীটি, বিনিও হাজির। নামবামাত্র প্রথম বাক্য—

"প্রত্যেকবার? প্রত্যেকবার সুটকেস হারিয়ে আসবে? ফ্যান্টাস্টিক!"

"ইচ্ছে করে হারিয়েছি নাকি? কিন্তু তোরা জানলি কী করে?"

"একমাত্র তোমারই অনবরত এমন হয়। এত লোক তো আসে, কারুর তো হারাচ্ছে না?"

"কেন? প্রসূনেরও তো হারিয়েছিল?"

"সেও তোমার মহারানী এয়ারওয়েজেরই দিল্লিতে।"

"পেয়ে তো গেছল শেষপর্যন্ত। অনেক ঝঞ্ঝাট করে।"

"তুমিও তো পাও পেশ অবধি। আমসত্ত্ব-টত্ত্ব সবসুদ্ধুই। কিন্তু বেড়ানোর মেজাজটা মাটি।"

"দুটোই গেছে রে এবার। দুটো বাক্স ছিল।"

"আমাদের আমসত্ত্ব ছিল?"

"ছিল।"

"বেদী বলে একটা লোক ফোন করেছিল নিউ ইয়র্ক এয়ারপোর্ট থেকে—বলল, তোমার বাক্স আসেনি বলে পর পর প্লেন মিস করেছ। জার্নি ডিলেইড—এই ফ্লাইটে আসছো, সঙ্গে ফরেন এক্সচেঞ্জ নেই—লোকটাকে বেশ ভালোমানুষ বলে মনে হলো—অতি অবিশ্যি এয়ারপোর্টে থাকতে বলল কাউকে।"

"এত কথা বলেছে ছেলেটা?"

"আরও বলে দিল তোমার কাছে কমপ্লেন্ট-ফর্মে নাম-ঠিকানা-ফোন-নম্বর সব দেওয়া আছে, নিউ ইয়র্কের হাওয়া-ই-হিন্দের অফিসে টেলিফোন করতে হবে—কলেক্ট কল করলে পয়সা লাগবে না, ফোনে খোঁজ নিতে হবে বাক্সোর কী হলো। এল কিনা।"

"আশ্চর্য তো! ছেলেটা কটা মিনিটই বা দেখেছে আমাকে?"

BanglaBook.org

"তারই ভেতর বুঝে নিয়েছে তুমি কী অপরূপা বস্তু। বয়স কত?"

"কার?"

"তোমারটা জানি। সেই বেদী ব্যক্তিটির?"

"কত আর? তোদের থেকেও ছোটো, খুবই ছেলেমানুষ—"

"তাই এখনও এতটা ওয়ার্ম আছে আর কি।"

"কিন্তু আরেকটাও লোক ছিল, বুঝলি? অতি পাজী, সে না—?"

"বয়েস কত?"

"এই পঁয়তাল্লিশ?"

"ওটা পেজোমিরই বয়েস, দিদি।"

সকালে উঠেই খুকু বললো, "দাও কমপ্লেন্ট ফর্মটা আর টিকিটটা। আগে কয়েকটা জেরক্স কপি করে নিই। এক্ষুনি তো দু' একটা হারিয়ে ফেলবে। তাহলেই সব গেল। মালের রসিদ দুটো আছে? তারও জেরক্স কপি করানো দরকার।"

রুক্ষু বললো, "দুখানা বাক্সই হারিয়ে এলে? নাঃ, তোমার সত্যি ঘুলেম আছে। চলো, কিছু দরকারী জিনিসপত্তর কিনে দি তোমাকে যা যা লাগে। এবারে আর অক্সফ্যামে বা স্যালভেশন আর্মিতে নয়, ভালো দোকানে চলো।"

জমানা বদল গয়া। গতবারে যখন বাক্স হারালো, তখন ওরা ছোটো। ছাত্র। কিছু পয়সাকড়ি নেই। আর এখন? মান্যগণ্য ভদ্রলোক। চাগরি বাগরি করছে, রোজগারপাতিও মন্দ নয়—সারি সারি ফুলন্ত ম্যাগ্নোলিয়া গ্র্যাণ্ডিফ্লোরার বীথিতে ছবির মতন লাল টুকটুকে বাংলো বাড়িটি নিজেদের পয়সায় কেনা। তাতে সিল্কের রুমালের মতন সবুজ একটুকরো ঘাসজমি পাতা, শ্যাওলামাখা পাথরের ফোয়ারা আঁটা। গ্যারাজে আবার দু' দু'খানা গাড়ি। অবশ্য মনীষার কাকুর মতন এখনও নয়। মনীষার কাকুর একটা গাড়ি বাইরে পড়ে থাকে। মনীষা বললো, "কাকু, সাদা গাড়িটা বাইরে কেন?"

"গ্যারাজে যে জায়গা নেই রে।"

"কেন? কী ভরেছো গ্যারাজে?"

"আবার কী? দামী গাড়িগুলো।"

"চেহারা দেখে ওটাও তো বেশ দামী গাড়ি বলেই মনে হচ্ছে। অমন লম্বা ফিনফিনে দেহ, আবার কনভার্টিবল ছাদ—কী গাড়ি ওটা?"

"ওটা? ক্যাডি।"

"অ্যাঁ? ক্যাডিলাক হচ্ছে গিয়ে তোমার শস্তা গাড়ি? অন্যগুলো তবে কী কী?"

"একটা মার্সিডিস, অন্যটা" একটু লজ্জা পেয়ে কাকু বলেন, "রোলস।" এখন, তাঁদের হলো গিয়ে 'ভ্যানডারবিলট' জীনসের কোম্পানীতে হংকং থেকে মাল সাপ্লাই-এর ব্যবসা। লণ্ডন-নিউ ইয়র্ক-প্যারিস।

আমার বোনেরা এখনও অতটা এগোয়নি। একজন মাস্টারী, আরেকজন

BanglaBook.org

এঞ্জিনিয়ারী করে। ছোটটার পড়াশুনো শেষ হয়নি। এখন, ওরা তো বললো দোকানে চল। কিন্তু আমি বললুম, "এক্ষুনি কী হবে কিনে?" আজকাল তো সবাই সব সাইজ পরে। তোদের জামাকাপড়েই ক'দিন চালিয়ে দিই। ততদিনে পেয়ে যাবো বাক্সোটাক্সো।"

"তবু হাতে পেয়েছো যখন কিছু, কিনে নাও।"

"কত দিলে?"

"কী দেবে?"

"কমপেনসেশন?"

"কিছু দেয়নি রে হাওয়া-ই-হিন্দ।"

"সে কী গো?"

"যাঃ! হতেই পারে না।"

"হয়েছে। কিছু দেয়নি।"

"হাওয়া-ই-হিন্দ কি খেপেছে?"

"না তুমিই খেপেছো?"

"ওরা খেপবে কেন? যদি না দিলেও চলে, তবে দেবে কেন? টাকাটা হয়তো নিজেরাই নিয়ে নেবে, প্রত্যেক প্যাসেনজারের নামে অ্যাকাউন্ট দেখাবে। প্যাসেনজারেরা কে আর লেগে থাকবে ওই টাকার জন্যে? লোকের টাইম কই?"

"দোষটা দিদিরই। তেমন করে চায়নি আর-কি।"

"তুমি ছেড়ে দিলে কেন? আদায় করে নেওয়া উচিত ছিল।"

"তোমার মতন গা-ছাড়া প্যাসেনজারদের প্রশ্রয় পেয়েই ওদের চোরামি চালাতে পারছে—"

"ওরে! দিল না রে, দিল না। সে বড় কঠিন ঠাঁই। চাইনি কি আর? অনেক করে চেয়েছিলুম। কিছুতেই দিল না। উলটে ট্র্যাভলার্স লজে পাঠিয়ে দিচ্ছিল আরেকটু হলেই—

"কোথায় পাঠিয়ে দিচ্ছিল?"

"ট্র্যাভলার্স লজে—"

"সেটা কী জিনিস?" রুক্কুর ভুরু কুঁচকে ওঠে।

"মোটেল—"

"মোটেলে কেন?" খুকুর মুখ হাঁ হয়ে যায়।

"হাওয়া-ই-হিন্দের প্যাসেনজারদের ঐখানে সস্তায় বেড অ্যাণ্ড ব্রেকফাস্টে পাঠিয়ে দেয়।"

রিনি অবিশ্বাসের হাসি হাসে। "যাঃ। মোটেলে? এয়ারলাইনস? দিদিটা যে কী বলে!"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ মোটেলে। আমাকেও দিচ্ছিল, কিন্তু আমি যাইনি।" খুকু হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে—"রুক্কু, বুঝেছিস ব্যাপারটা? আজকাল যে গাদা গাদা অশিক্ষিত গ্রাম্য ভারতীয় ইমিগ্রান্টস আসছে, তাদের জন্য এই ব্যবস্থা!"

"ভাগ্যিস যাওনি! বোকা পেয়ে দিদিকেও ঠেসে দিয়েছে তাদের মধ্যে। সবাইকে নিশ্চয়ই ওখানে পাঠায় না। কেবল বোকাদের। ঐভাবে পয়সা বাঁচায়।"

"তাই তো বলছি।"

"কিন্তু এ তো খুবই অন্যায়। একই ভাড়া সবাই দেবে, অথচ দু'রকম সার্ভিস পাবে? এ তো চিটিংবাজী—"

"এই প্লেনটা যদি না ধরতে পারতুম, এতক্ষণে ট্র্যাভলার্স লঞ্জে। তার ওপর ট্যাক্সিভাড়া যেত, এবং খাবার খরচ।"

"ভাগ্যিস প্লেনটা ধরতে পেরেছো—! টাকার জন্য ওয়েট করনি?"

"কিসের পরওয়া করু তুমি? ফুঃ—"

"ঠিক! কে চায় ও-ব্যাটাদের টাকা? চল, চল কী কী চাই, সব কিনে দিচ্ছি।"

"কিছু চাই না রে বলছি তো, তোদের পোশাকপত্তরেই আমার চলে যাবে ক'টা দিন—"

"দেখি তো দিদি, হাওয়া-ই-হিন্দের নিউ ইয়র্কের ফোন নম্বরটা—এক্ষুনি কমপ্লেন কর—"

"দিদিকে ফোন করতে দিস না খুকু, সব গুবলেট করে দেবে। তুই নিজে কথা বল—"

"সে আর বলতে? আমিই কথা বলছি, দাঁড়া—এই তো নম্বর, কলিং কলেক্ট —টু ওয়ান টু—"

৭

"হ্যালো, টু ওয়ান টু—ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স—লস এঞ্জেলেস থেকে বলছি, হারানো লাগেজ বিষয়ে—মিস্টার গিজদার আছেন? ও, গিজদারই বলছেন? এটা আপনার নিজস্ব নম্বর? ও। সুপ্রভাত। আমি ডক্টর সেন বলছি," অম্লান বদনে খুকু বললো, "অমুক ফ্লাইটে আমার দুটি কেস গতকাল—কমপ্লেইন্ট নম্বরটা চাই?"

"এই যে—"

"এক মিনিট? হ্যাঁ, ধরে আছি। কী বলছেন? আপনারা বাক্সটা পেয়ে গেছেন? বাঃ। পালোস ভের্দেসের ঠিকানায় পাঠিয়েও দেওয়া হয়েছে? ইউনাইটেড এয়ারলাইনসে খোঁজ নেবো? বাঃ, থ্যাংকিউ থ্যাংকিউ—শুনুন...হ্যালো? হ্যালো? হ্যালো?...উফ—দিলে কেটে, কথা শেষই হলো না। আচ্ছা লোক তো? অন্য সুটকেসটার কথা মোটে বলাই হলো না!"

"আগে একটাই তো আসুক?" রুক্কু সান্ত্বনা দেয়।

BanglaBook.org

"দেখি ইউনাইটেডে একবার ফোন করে।"

"হ্যালো? ইউনাইটেড? গুড মর্নিং। আপনাদের কার্গো ডিভিশনকে একটু—হ্যালো, গুড মর্নিং। আজ সকালে হাওয়া-ই-হিন্দ থেকে কি একটি বাক্স ডক্টর সেনের জন্যে পালোস ভের্দেসের ঠিকানায়—কী বলছেন? হাওয়া-ই-হিন্দ থেকে কোনো বাক্সই আসেনি? কোনো জরুরি মেসেজ? তাও না? ডক্টর সেনের জন্য—? কী বললেন? ডাক্তার-পেশেন্ট কারুর জন্যই কিছু নেই? ধন্যবাদ।"

"হলো তো? নো নিউজ। কি আশ্চর্য। সত্যি। সায়েবগুলো একদম পালটে গেছে, দেশটাই আর হেলপফুল নয়। চেনা যায় না আমেরিকান বলে।—হ্যালো মিঃ গিজদার? ইউনাইটেড বললো ওরা কোনো মেসেজ পায়নি হাওয়া-ই-হিন্দ থেকে। ভুল বলেছে? লজ এঞ্জেলেসে বাক্স পৌঁছে গেছে? বেলা দুটো থেকে পাঁচটার মধ্যে বাড়িতে থাকবো? এখানেই পৌঁছে দিয়ে যাবে? বেশ বেশ। ওঃ, থ্যাংকিউ। থ্যাংকিউ। কিন্তু অন্যটার কী হবে? মানে আমার আরেকটা বাক্সও তো বাকী আছে? নেই? সে কি কথা। [দিদি, নেই বলছে যে?] আরে আছে আছে। আমার কাছে রসিদ রয়েছে তো। নম্বর? এই যে, রসিদ নম্বর—দশ মিনিট পরে? আচ্ছা আচ্ছা, নিশ্চয় নিশ্চয়, আমার নম্বর? থ্রি ওয়ান টু জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ...হ্যাঁ হ্যাঁ বাড়িতেই আছি। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ।"

"দিদি, দুটো থেকে পাঁচটার মধ্যে তোমার লাগেজ পৌঁছে দিতে আসবে। ওই গিজদার খুব হেল্পফুল মনে হচ্ছে—ও নিজেই ফোন করে অন্য সুটকেসটার কথা জানাবে বলেছে। একটু খবর নিয়ে নিচ্ছে।"

দশ মিনিট কেন সারাদিনেই কোনো ফোন এল না। বাক্সেরও না। তিনদিনের মধ্যে না। খুকুর সঙ্গে রোজই ফোন হচ্ছে।

"কী? বললেই হলো? দেব না মানে? ট্রেস নেই? নো ট্রেস? তবে সেটার দায়িত্ব কার? আমার? বাঃ, আপনারও না? কী চমৎকার! তবে কি সুটকেসের নিজের?" খুকুর গলা উত্তপ্ত হতে থাকে—

"আমি একটা জরুরি কাজে এসেছি এখানে। সব নষ্ট হয়ে গেল আপনাদের জন্য। দেখুন মশাই, ওরকম বেলা দেখিয়ে কথা বলবেন না বলে দিচ্ছি—তিনদিন সারা দুপুর ২-৫ বাড়িতে বন্দী হয়ে আছি। ইউনাইটেড আবার জানিয়েছে, ওদের কোনো ফ্লাইটেই আপনারা কোনো মালই পাঠাননি। দে হ্যাভ রিসিভড নো মেসেজ ফ্রম ইয়ু। নো লাগেজ আইদার। হোয়াট? হুজ লাইং? আই অ্যাম মেকিং ইট অল আপ? আই অ্যাম বিইং প্যানিকি? আ নুইসেন্স? ফর নো রিজন?

"ওয়েল, মাই ডিয়ার মিস্টার গিজদাঘিচাং, লিসিন কেয়ারফুলি, আয়াম গোয়িং টু স্যু ইওর প্যান্টস অফফ ইউ। ইউ হিয়ার মি? ইউ ডোন্ট? আই সী।"

"ও কে, ইউ শ্যাল হিয়ার ফ্রম মাই লাইয়ার দেন। রাইট? [খটাস]। অতি পাজী লোক এই গিজদার।"

"ও কি! ও কি! খুকু! ওতে কী জীবনে আর বাক্সো ফেরত পাব ভেবেছিস? হয়ে গেল! যাঃ—জন্মের শোধ—", প্রায় কেঁদেই ফেলি।

"থামো তো দিদি। বাক্সো-বাক্সো করে লাইফ হেল করে দিচ্ছো। জীবনে বাক্সোটাই সব নয়। আত্মসম্মান সবচেয়ে আগে। ব্যাটা আমাকে অপমান করেছে, ব্যাটা অতি দুঃসাহসী। বলে কিনা—

"যাক গে, পাঁচটা তো এখনও বাজেনি"—রুক্ষু সান্ত্বনা দেয়, "এসে যেতেও তো পারে আজকে?"

"যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ"—বলেই আমি এক ধমক খাই—

"এখনও ইয়ারকি?"—সঙ্গে সঙ্গে সিরিয়াস কথা বলি:

"আর কোনোদিন হাওয়া-ই-হিন্দে চড়বো না।"

"হ্যাঁ, সেটা যেন মনে থাকে।"

"আসলে বাক্সোটায় আমার কিছু জরুরি জিনিস—"

"জরুরি জিনিস ব্রীফকেসে রাখোনি কেন?"

এর উত্তর নেই। সত্যিই ব্রীফকেসে রাখা উচিত ছিল।

৮

সেদিনও এল না। ছ'টা বেজে গেল।

রিনি ঠাণ্ডা মানুষ। চট করে মাথা গরম করে না রুক্ষুও। তারা দুজনে কনফারেন্সে বসল পরদিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে।

"অত ধমকাধমকি করলে হবে না, স্বার্থটা আমাদেরই।"

"মিষ্টি করে বলতে হবে। তাতে যদি উদ্ধার হয়।"

খুকু ধমক দেয়—"তুই নিজেই বলগে যা মধুর স্বরে। আমি আর পারব না। গিজতাঘিচাং ব্যাটা আমাকে বলে কিনা মিথ্যেবাদী? নিজে মাইল মাইল লম্বা মিথ্যে কথা বলছে—ব্যাটা চোর—"

আমি বলি, "বেশ তো রুক্ষুই কথা বল না একটু এবারে—"

"আমি বাবা অঙ্ক-কষিয়ে মানুষ, কথাবার্তা বলতেই পারি না। বরং রিনি বলুক—"

"বেশ তো, তোমরা যদি বল, আমিই না হয় একটু দেখি চেষ্টা করে—

"হাতি ঘোড়া গেল তল মশা বলে কত জল।"

এটাই লিমিট। রিনিটা একদম গুড়গুড়ে। খুকু রুক্ষুর চেয়েও অনেক বছরের ছোটো। সেও কিনা আমার চেয়ে নিজেকে বেশি এফিশিয়েন্ট বলে বিশ্বাস করে!

রিনিই ফোন করল এবারে, তার কচি গলায় "হ্যালো—ও? ইজ দ্যাট মিস্টার গিজদার? গুড মর্নিং মিস্টার গিজদার। হাও আর ইয়ু দিস মরনিং? স্যরি অ্যাবাউট ইয়েস্টারডে। মী? ওঃ, চিনতে পারছেন না? আশ্চর্য—ডক্টর সেন! ফ্রম লস এঞ্জেলেস।

BanglaBook.org

রিমেমবার? মাই ভয়েস? ও, ইয়েস। হাউ রাইট ইউ আর। হ্যাঁ, গলাটা বড্ড ভেঙে গিয়েছিল ক'দিন, ইন দ্য স্ট্রেস অ্যানড স্ট্রেইন অফ লিভিং উইদাউট মাই বিলংগিংস আই সাপোজ, তা, বাক্সোদুটোর কী হবে? একটা ব্যবস্থা করুন? ইউনাইটেড থেকে তো কালও দেয়নি। আজও বলছে কোনো বাক্সো বা মেসেজ আপনারা ওদের দেননি। অন্য বাক্সোটার খবর পেলেন? পাচ্ছেন না? ওটার জন্য তবে কমপেনসেশনটা দিয়ে দিন। কত? চল্লিশ ডলার? মাত্র? সেকি কথা। প্রতি কেজিতে বিশ ডলার?

কি বললেন, দু' কেজি? অন্য সুটকেসের ওজন ছিল দু কেজি। এটা আপনি কী বলছেন? বত্রিশ ইঞ্চির সুটকেস, খালি অবস্থাতেই ওজন অন্তত ছ' কেজি তো হবেই। এটা মালপত্রে ভর্তি ছিল।

—কী? মোট মালের ওজন লেখা আছে বিশ কেজি? একটাই আঠারো? যেটা পাঠিয়েছেন? অতএব অন্যটা দুই হতে বাধ্য?

পাগল হয়েছেন নাকি? বললেই হলো যা খুশি। এটা কি মগের মুলুক! আপনার উপরওলাকে ডেকে দিন। হবে না? ব্যস্ত? নামটা বলুন। এবার ফোন নাম্বারটা দিন। ঠিক আছে। গুডবাই। উঃ, কী অ্যাবসার্ডলি বজ্জাত এই লোকটা দিদিভাই।"

"কী? হলো? মিষ্টিমধুর সম্ভাষণে কাজ কিছু এগোলো?"

"একবার লোকটাকে আই শ্যাল স্যু ইওর পার্টিস অফফ বললে কি আর তাকে দিয়ে কাজ এগোয়?"

"বেশ তো আই শ্যাল কিস ইওর ফেস ক্রিমসন, বলেই দ্যাখ না।"

"আসলে লোকটা ভালো নয়। নইলে এত শত্রুতা করবে কেন? ওর লাভ কী হচ্ছে এতে? জাস্ট ম্যালিশাস ডিলাইট? আশ্চর্য সত্যি।"

এদিকে আমার যে ক্ষতিটা হলো, সে লোকসান তো চল্লিশ ডলারে অথবা চারশো ডলারেও মাপা যাবে না। কিন্তু একথাটা বলাও যাচ্ছে না কাউকেই—খালি বুক ভেঙে চোখে জল এসে যাচ্ছে, আর ওরা ভাবছে শাড়ির জন্যে দিদি কেঁদে ভাসাচ্ছে—

৯

"হ্যালো, ইউনাইটেড? সুপ্রভাত। ডক্টর সেন বলছি। আই বিলীভ দেয়ার ইজ আ সুটকেস ফর মি ফ্রম, হাওয়া-ই-হিন্দ—

"প্লিজ ডু নট বিলীভ ইন সাচ রিউমারস। আমাদের কাছে কারুর কোনো সুটকেস নেই—

"কিন্তু আমি যে শুনেছি ৮ই এসেছে? পাঁচ নম্বার ফ্লাইটে, নিউ ইয়র্ক থেকে—? প্লিজ একটু খুঁজে দেখুন না?"

"অনেক কিছুই শুনতে পাওয়া যায় জগতে ডক্টর সেন। গুজবে কান দিতে নেই। আর এই নিয়ে একশো তিরাশীবার আপনি আমাদের ফোন করলেন।"

BanglaBook.org

"দুঃখিত, খুবই দুঃখিত। কিন্তু একটু যদি খুঁজে দেখতেন?"

"যথেষ্ট খোঁজা হয়েছে। আপনি কি ভেবেছেন খুঁজে না দেখেই আমরা উত্তর দিচ্ছি? এতই দায়িত্বহীন আমরা?"

"না-না, তা-কেন, তা-কেন, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। নেই তা'হলে? কিছুই আসেনি বলছেন? আমি দুঃখিত। বা-ই।"

"আচ্ছা।"

"আচ্ছা দিদি এটা কী? সত্যি দিদি, এসে অবধি কেবল সুটকেসের ধ্যান-ধারণায় রইলে? কিছু দেখলে না, বেরুলে না, রোজ সকালে উঠে নিউ ইয়র্কে নিয়ম করে কালেক্ট কল করা, আর সারা দুপুর—'এই বুঝি বাক্সো আসে—' বলে ঘর আগলে বসে থাকা। রবার্ট ব্রুসের বড় বোন তুমি ভাই, তোমায় নমস্কার করি।"

"এই করে হপ্তা ঘুরে গেল, না পেলে একপয়সা কমপেনসেশন না একটাও বাক্সো। এর মানে কী?"

"এ-যাত্রা তোমার নিশ্চয় ত্রয়স্পর্শে যাত্রা ছিল। অযাত্রা।"

"সঙ্গে আচার, ডিম কি কলা এনেছিলে কি?"

"বেস্পতিবারের বারবেলায় লণ্ডন ছেড়েছিলে কি?"

"ইয়ারকি মারিসনি বলছি। প্রত্যেকের তো এলেম দেখলুম। কেউ কিছু পারলি? আমি ইচ্ছে করে ঘরে বসে আছি? আমার বাক্সো—"

"কে কী পারবে? হাওয়া-ই-হিন্দ তোমাকে যে-মোগলাই ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে, সেখানে আমরা তো কচুকাটা হয়ে যাচ্ছি—"

"বাপ্-বাছা করেও হচ্ছে না। শালা-শুয়োরের বাচ্চা বলেও হচ্ছে না। ওরা একেবারে চোখের চামড়াকাটা দিদি। তুমি বরং নিউ ইয়র্কে চলে যাও—"

"গিজদার নিশ্চয় সেই লোকটা, যাকে আমি এয়ারপোর্টে দেখেছিলুম। যে আমাকে প্লেনের কনেকশন পর্যন্ত দিচ্ছিল না, কেবল ট্র্যাভেলার্স লজে পাঠিয়ে দিচ্ছিল। সেই অতি পাজীটাই—"

"ওর বসের সঙ্গে তোমাকে কথা বলতে হবে। সত্যি সত্যিই পাওয়ারফুল পোস্টে যারা থাকে, তারা ছোট ব্যাপারে এমন হাতের সুখ করে নেয় না।"

"ফোন করেই দ্যাখো না। তুমি নিজেই কর এবার।"

"হ্যালো, গুড মরনিং। মিস্টার আইখমান? আমি আপনাদের এক প্যাসেঞ্জার, ডক্টর সেন, গত অমুক তারিখে...ফ্লাইটে হীথরো থেকে আসার সময়—"

"ও হ্যাঁ হ্যাঁ, সুটকেস আসেনি? আপনি এই নম্বরে—"

"মিস্টার গিজদারকে তো? তিনি খবর পর্যন্ত দিতে পারেননি আমার বাক্সোগুলো কোথায়।"

"তিনিই পারবেন। তিনি না পারলে আমিও পারব না, এটা তাঁরই ডিপার্টমেন্ট।

BanglaBook.org

দেখুন মালপত্র বিষয়ে আমার সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই, আমি বরং বলে দিচ্ছি মিস্টার গিজদারকে—"

"উনি একটাকে মোটে ট্রেসই করতে পারেননি, অন্যটা বলছেন পাঠিয়েছেন ইউনাইটেড মারফৎ লস এঞ্জেলেসে, কিন্তু ইউনাইটেড বলছে কিছু আসেনি। আমি কিছুই পাইনি। ওভার নাইট কমপেনসেশনটুকু পর্যন্ত নয়—আপনারা যে এতটা ইন-এফিশিয়েন্ট এবং আনহেলপফুল—"

"সেকি কথা? আপনি পঞ্চাশ ডলার নেননি?"

"দিলে তো নেব?"

"এক কাজ করুন। যা যা কিনেছেন তার রসিদগুলো সমেত লস এঞ্জেলেসের অফিসে চলে যান। সাতদিনের মতো হতে চলল এখনও নেননি? কী আশ্চর্য! তবে দেড়শর বেশি খরচা করবেন না। অবশ্য একটা সুটকেস তো পেয়েই গেছেন?"

তাহলে আর বলছি কী? পাইনি, পাইনি। একটাও পাইনি। দুটোই আপনারা হারিয়ে দিয়েছেন।"

"সেকি কথা? দাঁড়ান একমিনিট। একটু অপেক্ষা করুন।"

"এই যে, ডক্টর সেন, এখানে কথা বলুন।"

"হ্যালো।"

"দেখুন ডক্টর সেন, এই নিয়ে আপনি অন্তত টাইম আমাকে একই কথা বলতে ফোন করছেন। অকারণে মিস্টার আইংগারকে বিরক্ত করছেন। একটা, অর্থাৎ কালো সুটকেসটা আপনি পেয়ে গিয়েছেন, আমরা জানি।"

"কে বলল পেয়ে গিয়েছি? ইউনাইটেড বলেছে? আমাকে রসিদটা দেখাবেন! আমি তো পরশু নিউ ইয়র্কে যাচ্ছি, বলে আসবো আপনাদের অফিসে।—"

"আপনিই ডক্টর সেন কথা বলছেন?"

"অফ কোর্স। হু এলস?"

"হাউ মেনি পার্সনস আর মাস্কারেডিং অ্যাজ দিস ডক্টর সেন, আই ওয়ানডার? আপনাকে নিয়ে তিনরকম গলা হলো। একজন তো আমাকে মামলা করে সর্বস্বান্ত করে দেবে বলেছিল। আপনিই বোধহয়। নাকি আর কেউ? মোস্ট মিস্টেরিয়াস।"

"কি যে বলেন! অমন কথা কখনো আমি বলতেই পারি না। কিন্তু নো-ট্রেস বাক্সোটারই বা কী হবে?"

"ঐ বাক্সোটারই খোঁজে আমরা ছ'বার লণ্ডনে ফোন করেছি—সতেরোটা টেলেক্স পাঠিয়েছি। নো-ট্রেস। নো-ট্রেসের জন্যে চল্লিশ ডলার কমপেনসেশন। আর কালোটা তো অলরেডি ডেলিভারড অ্যাট ইওর রেসিডেন্স। ও কে? অল সেটলড?"

"আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে মিস্টার গিজদার। ইউ মাস্ট বি ক্রেজি।"

BanglaBook.org

"আয়াম নট! ইউ আর। ডক্টর সেন। আর ডক্টর জেকিল। হু-এভার উড মাইট বি। অ্যাণ্ড ইউ আর ড্রাইভিং আস ক্রেজি।" ঠং করে রিসিভার নামিয়ে রাখল নিউইয়র্ক।

১০

"আমাকে ডক্টর জেকিল বলল, খুকু। শুনছিস?"

"তুমি কার সঙ্গে কথা বলছিলে? আইখমানকে অমন গিজদার গিজদার বলছিলে কেন? তাই বলেছে।"

"গিজদারই তো কথা বলল।"

"সে কি? প্রথমে তো মনে হলো আইখমানই ধরেছিল।"

"ধরেছিল, তারপর গিজদারকে ধরিয়ে দিল তো।"

"যাচ্চলে।"

"তুমি নিজে নিউ ইয়র্কে না গেলে কিছু হবে না দিদি। ব্যাটারা যা তা করছে।"

"কিন্তু আমাকে যে ডক্টর জেকিল বলল।"

"ও কিছু না। কত কথাই বলে লোকে, সবকিছুতে মন দিতে নেই দিদিভাই। খুকুদি, আমি, তুমি—তিনজন মিলে কথা বলেছি কিনা, তাই ঘাবড়ে গেছে।"

"কিন্তু কালো বাক্সো যে 'ডেলিভারড অ্যাট ইওর রেসিডেন্স' বলল? কিছুতেই শুনল না আমার কথাটা।"

"বললেই তো হলো না? তুমি দুটো সুটকেসের জন্য কমপেনসেশন চেয়ে অ্যাপ্লিকেশন করে দাও। রাজা-কুমকুমদেরও বাক্সো হারিয়ে গিয়েছিল। ওরা সাত হাজার টাকা মোট ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলো।"

"সা-তা হাজা-র? বলিস কি?"

"তা আর এমন কী? দুটো সুটকেস, আটশো ডলার তো পেতেই পারে। শুনতেই অত।"

"আমিও পাবো?"

"নিশ্চয়ই।"

"কিন্তু টাকা কে চায়? আমি চাই বাক্সোটা।"

"ফের যতো।"

"বোকা কথা? দিদি?"

"ঐ টাকা দিয়ে তুমি অনেক বেশি শাড়ি কিনতে পারবে।"

"কিন্তু ওই শাড়িগুলো তো পাবো না? আমার ফুলশয্যার তত্ত্বের কাঞ্চিপুরম তিনখানা, সাধের বেনারসী শাড়িটা, একুশ বছরের জন্মদিনে পার্সেল করে বিলেতে পাঠানো মায়ের উপহার, আরেকটা শাড়ি শাশুড়িমায়ের, (হায়রে—আসল শোকের

BanglaBook.org

কথাটা তো বলতেই পারছি না, যে জন্য এত অস্থির হাহাকার। যে জিনিসটা ঐ বাক্সোর সঙ্গে হারিয়ে গেল সেটা শাড়ি নয়—কিন্তু তোদের বলা তো যাবে না। —তোরা ভাবছিস দিদির কী বিশ্রী শাড়ি-শাড়ি স্বভাব হয়েছে)।"

"এনেছিলে কেন গুচ্ছের দামী কাপড়-চোপড়?"

"তুমি কি ইন্দিরা গান্ধী?"

"খবর্দ্দার, এই ভুলটি আর করবে না।"

"কেবল নাইলন, আর জীনস। বুঝলে?"

"বাইরে কক্ষণো দামী কাপড় নিয়ে আসবে না।"

"দেশেও তো পরা যায় না কিছু, ট্রেনেও ডাকাতি, ট্যাক্সিতেও ছিনতাই। সত্যি আর পারি না। ভালো ভালো জিনিসপত্তর কখন পরবে লোকে?"

"পরবে না। ইন্দিরা গান্ধী হও, তখন পরবে। ততদিন নাইলন। চল, বাজারে।"

"চল—। যথা লাভ। রসিদগুলো তো জমা দিতে হবে।"

"তাছাড়া নিউ ইয়র্কে যাবার আগে পরনের জিনিসপত্তর কিছু কিনতেই হবে। ওখানে তো তোরা নেই? পরবো কী?"

"তাও তো বটে। ক'দিন থাকা তোমার নিউ ইয়র্কে?"

"তা পাঁচ-ছ' দিন তো বটেই।"

"তাহলে তো শ'দুই ডলারের জিনিসপত্র এমনিতেই লেগে যাবে। ওরা কত দেবে বললি? দেড়শো, না?"

"হাওয়া-ই-হিন্দ লেজ ডাউন দ্য রেড কার্পেট ফর ইউ।"

লস এঞ্জেলেসে অফিসে ঢুকতেই রংবেরঙের চমৎকার বিজ্ঞাপন। ঘামতে ঘামতে রশিদ-টশিদ নিয়ে জমা দিতে গেলুম যে ভদ্রলোকের কাছে, সেই সাহেবি ছদ্মবেশে পার্শি ছেলেটি সত্যি খুব ভদ্র। যথাসাধ্য সহানুভূতি প্রদর্শন এবং দুঃখ প্রকাশ করে বলল: "রেখে যান, যথাসাধ্য শীঘ্র বিল তৈরি করে চেক পাঠিয়ে দেব।" কিন্তু কোথায়? এখানে? না ইনডিয়াতে? বোনেদের ঠিকানাই দিয়ে দিই।

"এদের কাছে ধার করেছি। টাকাটা ফেরৎ দিয়ে দেবেন এদেরকেই।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। একজনকে অথরাইজ করে যান। তবে, কত টাকা যে দেবে, তা বলতে পারছি না। নিউ ইয়র্কের ওপর সবটা নির্ভর করে তো?"

"সে কি?"

"হ্যাঁ হাওয়া-ই-হিন্দ-এর মেন অফিস ওইটেই। আমি তো নগণ্য শাখামাত্র।"

"কি সর্বনাশ!"

"সর্বনাশের কী হয়েছে?"

"নাঃ। ইউনাইটেডের কাছে বাক্সের খবরটা পেলেন কিছু?"

"কিসের ইউনাইটেড?"

BanglaBook.org

"ইউনাইটেড এয়ারলাইনস। আপনারা ওদের কনট্যাক্ট করেননি আমার সুটকেসের জন্য?"

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"বুঝতে পারছেন না? শুনুন তবে। হাওয়া-ই-হিন্দ—আমার একটা সুটকেস নাকি ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের মাধ্যমে গত ৮-ই লস এঞ্জেলেসে পাঠিয়েছে এবং বলছে যে আপনারা সেটা আমাকে ডোর-টু-ডোর ডেলিভারি দিয়েছেন। এসব খবর আপনারাই কি দেননি মিস্টার গিজদারকে?"

"কেন দেব? এসবের অর্থ কী?"

"ইউনাইটেডে আপনাদের কোনো মালপত্তর আসেনি সম্প্রতি? নিউইয়র্ক থেকে?"

"না তো। আমার অজ্ঞাতসারে আসাটা হাইলি আনলাইকলি। আমিই তো এখানে ইনচার্জ। দাঁড়ান, তবুও একটু জেনে নিচ্ছি। মেরিলিন ডিয়ার, ইউনাইটেডে একবার খোঁজ নাও তো প্লীজ—ডক্টর সেনের"—

"কী হলো মেরিলিন? খোঁজ পেলে?"

"সারি, জামশেদ, ওরা কিছুই জানে না। কোনো বাক্সোটাক্সো আসেনি ওদের ওখানে—আমাদের এয়ারওয়েজ থেকে।"

"দেখলেন তো?" ছেলেটি কাঁধ ঝাকায়।

"আপনিই দেখুন। আপনি আজই জানালেন এটা মিঃ গিজদারকে। তিনি তো বলছেন বাক্সো পাঠিয়েছেন। সেটা নাকি বাড়িতে পৌঁছেও দেওয়া হয়ে গেছে। তাই তার জন্য আর কমপেনসেশন দেওয়া হবে না আমাকে। আর তার ওজন আঠারো বলে হারানো বাক্সোটার ওজন মাত্র দুই। কিছু বুঝলেন?" পার্শি ছেলেটির মুখে এবার নীরক্ত ভদ্রতার কঠিন মুখোশ। হাসিমুখেই সে বলল, "দেখুন, এটা আমার বোঝবার ব্যাপার নয়। ওটা মিস্টার গিজদারেরই বোঝার কথা।"

"যে আসে লংকায়, সে হয় রাজা।"

"এক্সকিউজ মি?"

"কিছু না। তুমিও ব্রুটাস।"

"ব্রুটাস? ব্রুটাস একেরমান? ইউনাইটেডের? ওকে চেনেন নাকি?"

"নাঃ। অন্য লোকের কথা বলছি। ঠিক আছে। চলি। থ্যাংকিউ।"

১১

শূন্যহাতে ফিরি হে নাথ পথে পথে। নিউইয়র্ক যাচ্ছি। বিষণ্ণবদনে তিনবোনই এসেছে আমাকে প্লেনে তুলতে। এসেও বকুনি দিচ্ছে।—

"দিদিভাই, তোমার এবারের আসাটা ঠিক আসাই হলো না কিন্তু।"

"কেবল সুটকেস-সুটকেস করেই কাটালে। একটা কিন্তু অস্বাভাবিক চেঞ্জ হয়েছে

BanglaBook.org

তোমার। এতটা জিনিসপত্র-সর্বস্ব মন যে তোমার কবে থেকে হলো? এমন তো একটুও ছিলে না আগে? মোস্ট মেটিরিয়ালিস্টিক অ্যাণ্ড বোরিং কম্প্যানি।"

"যাক না তোমাদেরও দু' বাক্সো 'সর্বস্ব' খোয়া! বিদেশ-বিভুঁইয়ে ব্রীফকেস বগলে ঘুরে বেড়াও না! দেখবো কেমন মোস্ট স্পিরিচুয়ালিস্টিক অ্যাণ্ড ইনস্পায়রিং পার্সোনালিটি হয়ে থাকো।"

একটা সুটকেস যা হোক কিনতে হয়েছে, কাপড়চোপড় সাবানগামছাও কিছু তাতে ভরতে হয়েছে, নিউ ইয়র্কের সাতদিন যাতে কেটে যায়। কিন্তু মনে শান্তি নেই। গেল। সেগুলো সব গেল। কেন যে সঙ্গে ব্রীফকেসে রাখলুম না? ওদিকে প্রকৃতপক্ষে নো-ট্রেসই হয়ে গেল পার্থ'র বাক্সোও। ওদেরই বা কী বলব।

সময়ের অনেক আগে পৌঁছেছি। আমেরিকান এয়ারওয়েজের টার্মিনালে অলস চোখে বসে আছি। চারদিকে চাইতে চাইতে হঠাৎ চোখে পড়লো ওদের অফিসঘরের বাইরে সারিবাঁধা ৭/৮টা সুটকেস।—ওগুলো কাদের রে? কেন আছে ওখানে? খোঁজ নিয়ে জানা গেল, কেউই জানে না ওগুলো কাদের। কেনই বা আছে। আনক্লেমড ব্যাগেজ পড়েই থাকে ওরকম। তারপর লস্ট অ্যাণ্ড ফাউণ্ড অফিসে জমা চলে যাবে।

"যদি আমারগুলোও ওরকম পড়ে থাকে কোথাও?"

"হতেই পারে। তবে হীথরোতেও নেই। জে. এফ. কে. তেও নেই। ওগুলো তো খোঁজা হয়েছে তন্নতন্ন করে।"

"যদি এখানেই পড়ে থাকে? এই এয়ারপোর্টেই? আর জীবনে পাওয়া যাবে না।"

"ওরা বারবার জোর দিয়ে বলছে একটা লস এঞ্জেলেসে পাঠিয়েছে—"

"দিদি, তুমি সত্যি গল্প লিখতে লিখতে বড্ড ইম্প্র্যাকটিকাল হয়ে গেছো। ওসব গল্পেই হয়। লাইফে হয় না। ওরা বলুকগে।"

"তবু ঘুরেই আসবি নাকি ইউনাইটেডের টার্মিনালটায় একবার? যদি ঐরকম আনক্লেমড পড়ে থাকে? ধর গিয়ে, দেখলুম আমার বাক্সোও একধারে পড়ে আছে ঐরকম?" ভয়ে ভয়ে যেই বললুম, অমনি খুকু-রুক্কু এই মারে তো এই মারে। "কী যে পাগলামি শুরু করেছো দিদিভাই। পড়ে থাকলে কি ওরা পাঠিয়ে দিত না? অতবার করে তুমি তাগাদা দিলে, আমরা অত অনুনয় বিনয় করলুম? থাকলে ওরা নিশ্চয় এতদিন পাঠিয়ে দিত। পড়ে থাকতে পারে না। এরা আমাদের মতন অত ক্যালাস নয়, এখনও কিছু সিভিক সেন্স, কিছু সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটির ট্রেস আছে ওদের চরিত্রে। নইলে এতদূর এগোতে পারত না।"—ভাগ্যিস রিনিটা ছোটো আছে। এখনও চাকরি-বাকরিতে ঢোকেনি। ওকে একটু সাধ্যসাধনা করতেই রাজী হলো ইউনাইটেডে নিয়ে যেতে। চিনিও না তো কোথায় কী? এয়ারলাইনের বাড়িগুলো সব দূরে দূরে আলাদা আলাদা। বেশ খানিকটা হাঁটতে হবে। খুকু-রুক্কু এখানে গার্জেনের রোলে। ওরা বলল, "আমরা তোমার পাগলামিকে বৃথা প্রশ্রয়

BanglaBook.org

দেব না। তুমি নিজেই ঘুরে এস। হাতে সময় আছে। যাও, মনের শান্তি করে এস।"

গিয়ে দেখি ইউনাইটেডেরও একটি ক্ষুদ্র কিউ রয়েছে আনক্লেমড ব্যাগেজের। ঠিক ওদের অফিসঘরের কাচের দরজা, কাচের দেয়ালের গায়েই ঠেশ দেওয়া আছে গোটা চার-পাঁচ সুটকেস। নানান সাইজের, নানা রঙের। একটা কালো। সাইজে পার্থ'র সুটকেসেরই মতন। অবিশ্বাসী চোখে এগিয়ে যাই। পায়ে পায়ে। অবশ্যই হতে পারে না, নিশ্চয়ই নয়, তবুও, দেখতে ক্ষতি কী? বাক্সোটার গায়ে দুটো লেবেল সাঁটা। একটা হাওয়া-ই-হিন্দ-এর। আরেকটা গ্রেট ব্রিটিশ এয়ারলাইনসের। আরও একটা ট্যাগ হাতলে বাঁধা। ইউনাইটেডের। তাতে লালকালিতে লেখা—immediate % RUSH—এবং আমার নাম, তথা লস এঞ্জেলেসের ঠিকানা। সঙ্গে তারিখ—৮ইয়ের। ৬ দিন হয়ে গেছে। রিনি এবং আমি চোখাচোখি করলুম, দুজনের চোখেরই ভাষা এক। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে স্বপ্নচালিত ব্যক্তির মতন এগিয়ে গিয়ে আমরা দুজনে সুটকেসটি হাতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে চলে এলুম। কেউই আমাদের কিছু বললে না। দুটি মহিলা চেকার ব্যাজার মুখে তাকিয়ে রইলেন দরজার দুই পাশে। কিছু প্রশ্নও করলেন না। ব্যাগেজের রসিদও দেখতে চাইলেন না। রিনি খুশি খুশি গলায় বলল,"দিদিভাই, চলো যাই আমরা আরও গোটাকতক বাক্সো-প্যাঁটরা তুলে আনিগে। সবগুলো তুলে নিলেও তো ওরা কিছুই বলবে না দেখছি।" "কী কাণ্ড বলতো? আমাদের যথাসর্বস্ব এতটা অসাবধানভাবে পড়ে থাকে? যে কেউ তো যখন খুশি তুলে নিয়ে যেতে পারে! আর কখনো ইনশিওর না করে ট্রাভেল করছি না।"

উদ্ধৃত সুটকেস হাতে যখন খুকু আর রুক্কুর সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ানো হলো, তখন তাদের মুখের জ্যামিতিক সারল্য দেখবার মতন। এমনও যে হয়, হতে পারে, এই বেগবান, সর্বশক্তিমান, এফিসিয়েন্ট ইউ. এস. এ.তে, এটা ওদের পক্ষে অভাবনীয়। RUSH লেখা, নাম ঠিকানা সমেত বাক্সো বসে রইল হপ্তাখানেক। কেউ জানলও না? বারবার নানাভাবে খোঁজ নিলুম, তারা প্রত্যেকবারই না দেখে মিছে কথা বলল। অম্লানবদনে ভুলভাল জবাব দিল। এমনকী একটা এয়ারওয়েজকে পর্যন্ত বাজে খবর দিল? সত্য সেলুকাস!

এবার বোনেরা পই পই করে শিখিয়ে দিল। নেকস্ট স্টেপে কী কী করণীয়।

"খবর্দার, তুমি ঘুণাক্ষরেও যেন ব্যাটা গিজতাঘিচাংকে জানাবে না যে কালো বাক্সোটা পাওয়া গেছে। তোমার পাগলামির জন্যেই ওটা কুড়িয়ে পেয়েছ। নেহাৎ বদ্ধ পাগল বলেই। আমাদের মতো নর্মাল লোকজন হলে ওভাবে লাস্ট মোমেন্ট ইললজিকাল অ্যাকশন একেবারেই নিত না—খুঁজতেও যেত না। পেতও না। তুমি সোজা নিউ ইয়র্কে চলে গেলে ওটা কি আর জীবনে পাওয়া যেতো? ওদের হাতে কোনো রসিদ নেই, কোনো প্রমাণ নেই, কে বাক্সোটা নিয়ে গেছে। ওদের অকারণ

হ্যারাসমেন্টের দাম এবারে তুমি তুলে নাও।

এবার ওদের তুমি খানিকটা হ্যারাস কর। সমানে দুটো সুটকেসই ক্লেম করে যাও। ওদের প্রমাণ করবার কোনোই উপায় নেই যে এটা কদাচ রিকভার করা হয়েছে। বুঝলে? খবর্দার ওদের বলে দিও না যেন যে এটা কুড়িয়ে পেয়েছ। ওরা বড়টাকে মাত্র দু'কেজি বলছে অন্যায় করে। অন্ততপক্ষে তো ওটা বিশ কেজি ছিল? অতএব এটার কথা আর বলো না। তাহলে বিশ কেজিই পাবে। নাকের বদলে নরুণ তো হোক।"

"কিন্তু দিদি তো পৌঁছেই আগে ঐ কথাটা বলে দেবে।" রিনি হতাশসুরে বলল।

"পেটে কোনো কথা থাকে ওর?"

১২

"এতবড় আস্পর্ধা? এমন কথা বলেছে? 'ডক্টর জেকিল' বলেছে? উপরন্তু বাক্সো না দিয়ে-টিয়েও বলে কিনা 'দরজায় পৌঁছে দেয়া হয়েছে'? নাঃ! সত্যি হাওয়া-ই-হিন্দ বড্ড পেয়ে বসেছে দেখছি।"

ইলুদি তো খেপেই গেলেন। বললেন, "দাঁড়াও! আমি কাপাদিয়াকে বলছি। ওরা দস্তুরী-মিস্তিরি থেকে গাদা গাদা টিকিট করে। হিন্দকে কাঁদিয়ে ছাড়বে।"

নিউ ইয়র্কে ইলুদি-সুহাসদাদের চেয়ে মা এমন ভারতীয় প্রায় নেই। ইলুদির বাবা ছিলেন বিখ্যাত গান্ধীবাদী—স্বাধীনতা সংগ্রামী। গুজরাটের সকল মানুষের শ্রদ্ধা কুড়িয়ে গেছেন। আর সুহাসদার চাকরি ইউনাইটেড নেশনসে বহুৎ বছর হলো।

"তোমার বোনেরা অ্যাবসলুটলি করেক্ট", বললেন সুহাসদা। "ঐ সুটকেস ফেরৎ পাওয়া সম্পূর্ণ ভাগ্যচক্র। তার ক্রেডিট হিন্দ-এর নয়। তাছাড়া হিন্দ তো তোমাকে মস্তবড় প্রতারণা করছে, বত্রিশ ইঞ্চি সুটকেসের ওজন দু কেজি ধরে নিচ্ছে! তুমি কেন ওদের 'নিজেদেরই রসে নিজেরা সিদ্ধ' হতে দেবে না? টিট ফর ট্যাট।"

"হ্যালো! মিস্টার গিজদার?"

"ডক্টর সেন, আই প্রিজিউম।"

"ঠিক ধরেছেন।"

"একটা আপনার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। অন্যটা নো-ট্রেস। চল্লিশ ডলার। ব্যাস। হয়ে গেল?"

"শুনুন মিস্টার গিজদার, আমি এখন নিউ ইয়র্কে।"

"কনগ্রাচুলেশনস। তাতে আমার কী?"

"আপনার কাছে আসব শিগগিরই।"

"তাতে এক্সট্রা কোনো লাভ হবে না আপনার, তবে হ্যাঁ, ঐ চল্লিশ ডলার

BanglaBook.org

হাতে করে ক্যাশ নিয়ে যেতে পারবেন।"

"ঐ চল্লিশ ডলার আপনাকেই দিলুম মিঃ গিজদার, কীপ ইট ইওরসেলফ। ইটস আ প্রেজেন্ট।"

"কী ভেবেছেন আপনি নিজেকে? প্রেসিডেন্ট অব ইনডিয়া?"

"কী ভেবেছেন আপনিই বা নিজেকে? প্রেসিডেন্ট অব দি ইউনাইটেড স্টেটস?"

"উই ও ইউ ওনলি ফর্টি ডলারস। নাথিং মোর।"

"আচ্ছা জেদী জানোয়ার তো! জন্মে দেখিনি বাপু।"

"যার সঙ্গে যেমন।"

"ঠিক আছে।"

"ঠিক আছে।"

"আপনাদের মতো অপরূপ পাবলিক রিলেশনস কিন্তু আর কোনো এয়ারলাইনসের নেই।"

"নেই তো নেই। আমরা কিছু লোকসানে চলছি না তার জন্যে। আপনার মতো যাত্রী না পেলে আমাদের কোম্পানি লাটে উঠবে না।"

"সত্যি? উঠবে না তো?"

"সত্যি! বিশ্বাস করুন ডক্টর সেন, আপনি একটি মাথাব্যথা ভিন্ন কিছু নন।"

১৩

সন্ধেবেলায় আমার সব জেরক্স-করা ডকুমেন্ট সমেত ইলুদি আমাকে দস্তুরী অ্যাণ্ড মিস্ত্রিরির বড়কর্তার বাড়ি নিয়ে গেলেন। সেখানে একটা ডিনার চলছিল। সকলেই প্রায় দস্তুরী অ্যাণ্ড মিস্ত্রিরির লোক। দু'জন বঙ্গসন্তান ইনক্লুডেড। ছোটখাটো একটি প্রবাসী ভারতবর্ষ। উঁচুতলার। মুহূর্তের মধ্যে ইলুদির কল্যাণে (নাকি রাই-হুইস্কি বার্বনের গুণে?) উপস্থিত নিমন্ত্রিতরা প্রত্যেকেই হাওয়া-ই-হিন্দ-এর অবর্ণনীয় আচরণে যারপরনাই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন।

"মোটেই ছেড়ে দেয়া হবে না। যা খুশি তাই করবে?"

"আপনাকে একা স্ত্রীলোক পেয়ে ওরকম শুরু করেছে—"

"দেখি, অমন করা বের করছি। মাসে প্রায় তিরিশটা ইন্টারন্যাশনাল টিকিট কাটি একমাত্র এই অফিস থেকেই আমরা? নো-ট্রেসকে কী-উপায় ট্রেস করা যাবে, দেখছি, দাঁড়ান না—"

নানারকম সান্ত্বনা পাচ্ছি। যত্ন করে গৃহকর্তা কাগজপত্তরগুলো নিলেন। কালই বাঁশ দেয়া হবে।

"হ্যাঁ, একটু বেগ দেওয়া হোক ওদের—সত্যি বড্ড বাড় বেড়েছে। সেবার আমারও ভেনেজুয়েলা থেকে জাপান যাবার পথে, বাক্সোটা দিলে হারিয়ে—"

BanglaBook.org

"আর আমার? রোম টু কোপেনহাগেন ঐটুকু ছোট্ট ট্রিপ, তার মধ্যেই বাক্সোটি আমার চলে গেল অস্ট্রেলিয়া। দু' হপ্তা পরে দেশে ফিরে পেলাম। ওঃ, বাইরে কী কষ্টেই না দিন কেটেছে। ঐ শীতের দেশে!—তবে খুবই ওদের ব্যবহার ভালো, ডাচ এয়ারলাইনস তো হাওয়া-ই-হিন্দ নয়..."

মুহূর্তেই বাক্সো হারানোর সরস কাহিনীতে জমে উঠলো ঘর। সরস কাহিনীই —কেননা সব বাক্সোই শেষটায় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছে। ট্রাজিক কেস ছিল না একটাও।

কাপাদিয়া পরদিন টেলিফোন করে বললেন, "আপনাকে ঐ বাক্সোটার জন্য ৪০ ডলারের বেশি কিছুতেই দেবে না। অন্য বাক্সোটার কথা বলব? ওটার জন্যই চেপে ধরা যাক। ওরা আপনাকে নির্লজ্জভাবে ঠকাচ্ছে।"

তা ঠকাচ্ছে। তাই বলে—? ভাবতেই আমার ভেতো বাঙালী পেটের মধ্যে হিহি করে ঠাণ্ডা বাতাস বইল। বাক্সোটা হাতে পেয়েও আবার তারই জন্যে টাকা চাইব?

না বাবা।

ও পারব না।

কাউকে শাস্তি-টাস্তি দিয়ে আমার কাজ নেই।

"নাঃ, থাকগে। ওটা তো পেয়েই গেছি।"

"কিন্তু ওরা তো দেয়নি? ওটার জন্য আপনি সহজেই কমপেনসেশন পাবেন কিন্তু। আমি বলছি।"

"নাঃ, থাক।"

BanglaBook.org

১৪

ইলুদি চটে লাল।

" 'নাঃ? থাকগে'? ওরা জোচ্চুরি করে জোরগলায় বিশ কেজিরটাকে দু' কেজি বলবে, চারশোর জায়গায় চল্লিশ ডলার দেবে, আর তুমি বলবে 'নাঃ থাকগে'? এ হতেই পারে না। এ তোমার অন্যায়টাকে সাপোর্ট করা। 'অন্যায় যে সহে' সেও দোষী। না, এবারে আমি নিশানকে বলছি, দাঁড়াও। দস্তুরী অ্যাণ্ড মিস্তিরি যদি না পারে, কোকাকোলা কোম্পানী তো পারবে?"

গড়গড় করে ছোট্ট সাদা টেলিফোনে কয়েকটা নম্বর ঘোরালেন ইলুদি।

"হ্যালো? নিশান?" তারপরেই শুরু হয় বিশুদ্ধ গুজরাতিতে আমার দুরবস্থা বর্ণনা। "ভাই নিশান, ওর বাবা আমার বাবার বন্ধু ছিলেন, ওর স্বামী আমার ছোটো বোনের ক্লাসমেট ছিল, ও নিজেও আমার ছোটো বোনের মতন, খুব ভালো মেয়ে, গল্প-কবিতা লেখে—ওর এমন হেনস্থা তুমি সহ্য করবে?"

নিশান পটেল বিখ্যাত ভি. আই. পি. লোক। দেশেও যেমন শক্তিমান ছিলেন, এখানেও তেমনি। আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে কোকাকোলা কোম্পানীর অধিনায়কত্ব তাঁরই।

দেশে থাকতে পুরো কোকাকোলা কোম্পানীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন। বড় সোজা কথা নয়! স্ত্রীটি শান্তিনিকেতনের মেয়ে। সুন্দরী, সুরুচি-সম্পন্না, রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারেন ভালো। নিশান নিজেও সাহিত্যে-শিল্পে উৎসাহী। ইলুদির তিনি ক্লাসমেট।

"নিশ্চয় করে দেবে তো? এই নাও, সব রেফারেন্স নম্বর-টম্বরগুলো। ফোনেই দিয়ে দিচ্ছি। রসিদ নম্বর এই.... কমপ্লেন্ট নম্বর এই..., আমার বন্ধুটির নাম এই...। দ্যাখো ভাই, উদ্ধার করে দাও। বাক্সোটার জন্যে অত না, যতটা জরুরি ওদের শিক্ষা দেওয়া। অকারণে ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়েছে মেয়েটাকে। শুধু শুধু ওকে অপমান করছে, গিজদার বলে একদম বাজে লোক। বত্রিশ ইঞ্চি মালভর্তি বাক্সোর ওজন জবরদস্তি করে বলছে, দু' কেজি। বুঝতেই পারছো, কী পাজি!"

ঠিক এমন সময় একটা টেলিফোন এল। ইলুদি বললেন—"তোমার ফোন।"

"কি, ডক্টর সেন? কী ভেবেছেন? ভেবেছেন দস্তুরী অ্যাণ্ড মিস্ত্রিকে দিয়ে বলালেই চল্লিশটা চারশো-তে তুলতে পারবেন? ও-গুড়ে বালি। চল্লিশের এক সেন্ট বেশি নয়। আমিও গিজদার। হুঁ। আপনার ফর্মে লেখা আছে ওজন মোট বিশ কেজি। আপনার যতই কানেকশনস থাকুক, আমার পক্ষে আছে আইন। বুঝলেন?" ঠাক করে রিসিভার নামিয়ে রাখল গিজদার! গুড্‌বাই বলল না। আমি তো 'হ্যালো' আর 'ইয়েস' ছাড়া কিছুই বলিনি।

ইলুদি বলল, "কে ফোন করল? সেই পাজি লোক? বেশ করেছো, কথা বলনি।"

"আমি বলিনি তো নয়, বলার চান্স দেয়নি।"

"সে যাই হোক। ওর সঙ্গে আর একটাও কথা নয়।"

আবার একটা ফোন এল।

"নিশান, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।" ইলুদি বললেন।

"নমস্কার। নবনীতা বলছি! হ্যাঁ, বলুন? বলুন? অ্যাঁ? বয়েস? হঠাৎ? ওটা পাসপোর্টেই তো আছে। ওরা? আমাকে কখনো দেখেনি। কেন বলুন তো?"

"পার্সোনাল কারণে? আমার বয়েসটা আপনিই জানতে চাইছেন, আপনারই পার্সোনাল কারণে? অ। কী? আমি ইলুদির ছোটো বোনের চেয়ে বয়সে ঠিক ক'বছরের ছোটো? আমি আপনার কথা ঠিক শুনছি তো? ঠিক?—মাত্র পাঁচ বছরের। কেন বলুন তো? কী বলছেন?—বেঁচে গেলেন? মানে? কী ব্যাপার বলুন তো? কিছুই বুঝতে পারছি না। এর সঙ্গে হাওয়া-ই-হিন্দের যোগ আছে কি? আছে? কী বলুন তো?"

"ওঃ। হাঃ হাঃ হাঃ। সত্যি? না না না ঠিক আছে, ঠিক আছে। থ্যাংকিউ, থ্যাংকিউ। আমি একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলুম। কিছু মনে করবেন না মিস্টার পটেল।"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। দেব ইলুদিকে? আচ্ছা রাখছি। থ্যাংকিউ।"

ইলুদির মুখের চেহারা অস্থির।

"কী বলছিল নিশান?"

"কিছু না। উনি বলছিলেন, আমার বয়স কত।"

"কেন? কী দরকার? হঠাৎ? মেয়েদের বয়েস দিয়ে নিশানের কী দরকার?"

"আমিও তো তাই ভাবছি। তা...উনি বললেন...

"অত হেসো না। আগে বলো কী ব্যাপার।"

"উনি প্রথমেই বললেন, 'আপনাকে মহারাজা এয়ারওয়েজে কেউ দেখেনি তো?' আমি বললুম—'না, কিন্তু কেন?' তখন উনি জানতে চাইলেন, অপুর চেয়ে আমি ঠিক কত বছরের ছোটো। মাত্র পাঁচ শুনে খুব নিশ্চিন্ত হলেন।"

"কেন? কেন? কেন?"

"উনি বললেন, আমি এক্ষুনি ওদের জেনারেল ম্যানেজারকে বলেছি, যে আপনি আমার পঁচিশ বছরের পুরনো বন্ধু। তারপরেই দুর্ভাবনা হবে—কে জানে আপনার বয়েস কত? অ্যাট অল পঁচিশ হয়েছে কিনা? অপুর থেকেও ছোটো যখন! তাই জানতে চাইছিলাম।"

"এ—ই, হাঃ হাঃ হাঃ—"

"এই!"

"নিশানটা যা ছেলেমানুষ রয়ে গেছে না, সত্যি? কে বলবে অতবড় চাকরি করছে।"

"উনিই ঠিক পারবেন, মনে হয়।"

"তা পারবে না? কোকাকোলা কোম্পানী যদি তেমন চাপ আনে, হাওয়া-ই-হিন্দ হাওয়া হয়ে যাবে। হুঁঃ...

"দেশে তো উল্টোটাই হলো। কোকাকোলাই তো—

আধঘন্টা বাদে আবার ফোন। আমিই ধরি।

"এই যে ডক্টর সেন। নেক্সট স্টেপটা কি পেন্টাগন?"

"তার মানে?"

"দস্তুরিকে দিয়ে হলো না, এবার দেখছি কোকাকোলাকে দিয়ে চাপ আনা হচ্ছে। ওসব ওপরওলাদের দিয়ে কিছুই হবে না। সাকুল্যে চল্লিশ ডলার আপনার কপালে নাচছে। যে যাই বলুক না কেন, আমি তাদের ঠিক বুঝিয়ে দেব। আইন আমার দিকে। যতই যার দড়ি-খিঁচবার শক্তি থাক না কেন। লাভ হবে না।"

"কোনো আইনেই মালভর্তি বত্রিশ ইঞ্চি চামড়ার সুটকেসের ওজন দু' কেজি হয় না, গিজতাঘিচাং। আমিও দেখে নেব।"

"সে তো বুঝতেই পারছি। আমার বসকে ধরা হয়েছে। এত বড় আস্পর্ধা।"

BanglaBook.org

"এর পরে যে কী করব, তা তো জানেন না।"

"এর পরে আপনি যাই করুন, পেন্টাগনকে দিয়ে বলান, আর হোয়াইট হাউসকে দিয়েই বলান, ইউ গেট ওনলি ফর্টি ডলারস। নট এ সেন্ট মোর, সী?"

১৫

"এত বড়ো কথা?"

এবার সুহাসদাও আর সইতে পারলেন না।

দাঁড়াও মজা বের করে দিচ্ছি। তুমি কবে যাচ্ছ? পরশু? তার দরকার নেই। যাওয়া ক্যানসেল কর। পরশুদিনই আমাদের বিদেশমন্ত্রী নিউ ইয়র্কে আসছেন। ইউ এন-য়ে তাঁর রিসেপশন আছে। তোমাকে আমি সেখানে নিয়ে যাব। সেখানে তুমি নিজেই তাঁকে প্রবলেমটা বলবে।—দয়া করে উনি যদি ওঁদের একটা ফোন করে দেন, দেখি কোন শালা হাওয়া-ই-হিন্দ তোমাকে চল্লিশটি ডলার ঠেকায়, দু-দুখানা মালভর্তি বাক্সো হারিয়ে দিয়ে।"

"একটাকে তো—"

"ওটা পাওয়া নয়। ওটা অ্যাকসিডেন্ট।"

"তবু—

"ফরগেট ইট।" কিন্তু সুহাসদা প্রকৃতপক্ষে বড়ই এভার-সৎ ভালোমানুষ বঙ্গসন্তান। শেষ পর্যন্ত "অধর্ম" করতে সাহস নেই। অতএব পাঁচ মিনিট পরেই —"ঠিক আছে। তোমার কথাই থাক। উই শ্যাল ওভারলুক দেয়ার শ্যাবি ট্রিটমেন্ট অফ দা ব্ল্যাক কেস, কিন্তু ব্রাউনটার জন্য বলতেই হবে বিদেশমন্ত্রী মশাইকে। হুঁ হুঁ, দেখি কেমন করে না দেয় বেটারা!"

সুহাসদার কথায় বাধা দেন ইলুদি: "কিন্তু নিশান তো বলেছে, ফলো আপ চালিয়ে যাবে। ল'-এর সাহায্য নিতে হলে তাও নেবে। ও বলছে, ঐ বাক্সোটাকে মাত্র দু' কেজি বলবার মধ্যেই ওদের মরণবাণ লুকিয়ে আছে। ওটা ইমপ্রবেবল একটা সিলি থিওরি। কেননা, নিশান সব দেখে বলল, ওদের কমপ্লেন্ট-ফর্মটাতেই বাক্সোটার বর্ণনায় আছে, ওটা দৈর্ঘ্য-প্রস্থে কত। তাতেই ৬/৭ কেজি ওজন অন্তত হয়। শূন্য হলেও। ভেতরে কী কী আছে, তারও তালিকা দেওয়া আছে। তারও ওজন ঠিক করে দেওয়া যাবে খুব সহজেই। নিশান বলেছে, হিন্দ-ব্যাটাদের আর কিছুতেই এসকেপ নেই। মিনিমাম চারশ ডলার ফর ঈচ কেস। তার ওপর পেনালটি ফর দা বদারেশন। মন্ত্রীকে এসবের মধ্যে জড়িয়ে কী হবে? মশা মারতে কামান?"

"সে নিশান যেটা করে করুক না? এখানে যা চলছে তা চলুক না? তা বলে নবনীতা এতবড় সুযোগটা ছাড়বে কেন, ওদের কড়কে দেবার? উনি তো ওর ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্টই পরিচিত—সেই যে লিখেছিল না ওর কুম্ভমেলার গল্পে? ও একবার মিনতি করে মন্ত্রীমশাইকে বললেই, উনি ভড়কে দেবেন নিশ্চয়—

BanglaBook.org

"যখন ওঁকে চিনতুম, তখন তো মন্ত্রী ছিলেন না। এখন কি চিনবেন? কে জানে!"

"খুব চিনবেন। দাও বুকিং ক্যানসেল করে।"

"গোল বাধালো হাওয়া-ই-হিন্দ। বুকিং ক্যানসেল করা গেল না। তাহলে আরও একহপ্তা বসে থাকতে হবে নেক্সট বেস্পতিবারের ফ্লাইটের জন্যে। রাও আমায় এককালে স্নেহ করতেন বলে 'বকে দাও' বললেই যে আজ তিনি কাউকে বকে দেবেন তার কোনোই ঠিক নেই।—তার জন্যে এত কাণ্ড করে থেকে যাব?"

"দেবে দেবে। কেন দেবে না? শুধু-শুধুই গোলমাল করছো তুমি। অকারণ বজ্জাতি করছে হাওয়া-ই-হিন্দ।"

"অথচ ওরাই আগে কত হেলপফুল ছিল।"

"দোষটা কোম্পানীর তো নয়। দোষটা হচ্ছে ইনডিভিজুয়াল-এর। বাক্সো তো হারাতেই পারে। তা বলে এই দুর্ব্যবহারটা করবে কেন?"

"চিটিংবাজীই বা চালাবে কেন?"

"না দিয়েছে অ্যাপলজি চেয়ে চিঠি, না দিয়েছে ক্ষতিপূরণ, প্রথম থেকেই ব্যবহারটা যা করছে—সেই মোটেলে পাঠানোর কথাটাও যেন রাওকে বলতে ভুলো না—

"দেশের নাম ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে—"

"সেটা দিচ্ছে বলে মনে হয় না। এই আচরণটা নিশ্চয় রিজার্ভড ফর দেশওয়ালী ভাইয়োঁ ঔর বেহেনোঁ। ফরেনারদের সঙ্গে ওদের রেড কার্পেটের সম্পর্ক। তখন আলাদা মূর্তি দেখবে ঐ গিজদারেরই।"

"যত ডাবল স্ট্যানডার্ড—এ শুধু ইনডিয়ার বৈশিষ্ট্য।"

"এবার মন্ত্রীমশাই এসে বাঁশটি দেবেন, তখন উচিত-শিক্ষা হবে গিজদার বাছাধনের।"

১৬

কিন্তু আমার লজ্জা করল।

ফ্লাইট ক্যানসেল করে একহপ্তা চাকরি কামাই করে, পরের বাড়িতে বসে থেকে কী করছি? নালিশ করে বালিশ পাচ্ছি! দূর! পাগল নাকি! ওই নিশানই যা করেন করুন। কাগজপত্র থাক। আমি চলে যাই। এতক্ষণে ব্যাপারটাকে তুচ্ছ বলে মনে হচ্ছে। ওই জিনিসগুলো যদি কোনোদিনই না থাকত?—মা'র ফিলসফিটা মনে করবার চেষ্টা করি। যাবার আগে গিজদারকে ফোন করে বলে যাব বরং কালো বাক্সোর গল্পটা। ওটা ভেতরে খোঁচাচ্ছে।—ওদেরও জানা দরকার ইউনাইটেড কত দায়িত্বহীন।

"হ্যালো। মিঃ গিজদার?"

"এখনও যাননি? এখনও এখানে? পেন্টাগন কী বলল?"

BanglaBook.org

"আপনি কি জানেন, আমার কালো বাক্সোটা এখন কোথায়?"

"আপনারই কাছে।"—গলায় অসীম ধৈর্য গিজদারের।

"কী উপায়ে এলো, ওটা আমার কাছে? সেটা জানেন কি?"

"আমরাই ডেলিভার করেছি আপনার দরজায়। মনে পড়েছে?"

"কে বলল আপনাকে এই খবরটা, গিজতাঘিচাং?"

"আমার কাছে সমস্ত কাগজপত্র মজুত আছে। বাজে বকবক করবেন না ম্যাডাম। আমরা ব্যস্ত।" খটাং করে রিসিভার নামানোর শব্দ হয়।

সত্যি কথায় কারুর প্রয়োজন নেই। একে বলার আর দরকার নেই, বাক্সোটা কী করে পেয়েছি। সত্য সেলুকাস! কী দায়িত্ববান এই কোম্পানি! দুটো বাক্সোর জন্যেই পূর্ণ মূল্য ক্ষতিপূরণ চাওয়াই এদের যোগ্য উত্তর হবে। বেশ তাই করবো। দেখাক গিজদার কী তার কাগজপত্র।

ইলুদি, সুহাসদা, কাপাদিয়া, নিশান পটেল, টুনুদা, এককালে তিনি আবার হাওয়া-ই-হিন্দেরই একজন কর্তাব্যক্তি ছিলেন—এখন অবসরপ্রাপ্ত, সবাই বললেন, থেকে যাও। বিদেশমন্ত্রী একবারটি বললে ওরা ঝেড়ে কাশতে বাধ্য হবে। হয় বাক্সো, নয়তো ভালোরকমের উচিত খেসারত অবশ্যই পাবে। কিন্তু আরও থাকতে আমি কিছুতেই রাজী নই। বাক্সো যাকগে চুলোয়। জীবনের মধ্যে অমূল্য সৌরভের জন্যে এই আয়াস, আয়াসেই তার সুরভি সব ধ্বংস করে দিচ্ছে।

কিন্তু এখন আমি আর বাক্সো চুলোয় যাক বললেই বা কী হবে? এটা রীতিমতো একটা জনগণের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ লড়াই মানের লড়াই। এ এখন চলছে—চলবে, স্টেজে চলে গেছে। অতএব, উঁহু, ছাড়া চলবে না। টুনুদা স্বয়ং ফিলডে নামলেন, "দিল্লীতে তো তুমি নামছই। সোজা চলে যাও—ট্যুরিজমের মন্ত্রীকে ধরগে। ওঁর একটা টেলেক্স তাগাদা এলে বিদেশমন্ত্রীর চেয়েও ভালো ফল হবে। উনিই ওদের খাস মনিব কিনা? আবার ভুলে যেও না যেন, কোন মন্ত্রী, তুমি যা ভুলো, খেয়াল রেখো—দিল্লিতে, ট্যুরিজমের মন্ত্রী। এ-ঠ্যালা সামলানো গিজদারের এলেমে কুলোবে না।"

এবার সবাই বললেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই সবচেয়ে সোজা হবে। সেটাই শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা।" অমনি কনফারেন্স বসল। সবাই মিলে আমার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে একটা স্বর্গের সিঁড়িও তৈরি করে দিলেন। কোথায় গিয়ে কাকে ধরলে কার কাছে যাওয়া যাবে। কোন ধাপে পা রেখে কোন বারান্দায় উঠলে শেষ অবধি ট্যুরিজম মন্ত্রীর মসনদের সামনে পৌঁছুব। খাতা খুলিয়ে ফোন নম্বর ঠিকানার পর ঠিকানা লিখিয়ে দিলেন বন্ধুরা মিলে। এই ব্যাপারে সমবেত টিউশন এতটা নিখুঁত হলো যাতে ডিস্টিংশনে পাস করা বিষয়ে সন্দেহ রইল না। দিল্লীতে মাত্র একদিনের মধ্যে কাজটি উদ্ধার হয়ে যাবেই। এবং তারপর, হিন্দ সামলাক ঠ্যালা!

১৭

প্লেনে বসে বসে মনে হতে লাগল: "নিয়ে নিলেই হতো চল্লিশ ডলার! শেষ পর্যন্ত তো কিছুই পাব না। আমার যা অলস স্বভাব, একদিন কেন, গোটা একমাস দিল্লিতে থাকলেও ঐসব মহান ব্যক্তি, যাঁদের নাম-ঠিকানা-ফোন নম্বরে আমার ডায়েরি ওঁরা ভরে দিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে না। মন্ত্রীপাকড়ানো আমার কম্মো নয়। ও বাক্সোটা জলেই গেল। দেখি, কলকাতা গিয়ে প্রসূন, কিংবা চাওলাকে ধরব।"

এসব ভাবতে ভাবতে, আর বীভৎস একটা নির্বাক সিনেমা দেখতে দেখতে (পয়সা দিয়ে হেডফোন নিইনি, তাই শুনতে হচ্ছে না) আর অল্প অল্প ঘুমোতে ঘুমোতে হীথরো এসে গেল। এখানে চার ঘণ্টা বিশ্রাম।

নেমেই ট্রানজিট লাউনজে গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের টেলিফোন করতে লাগলুম। হাওয়া-ই-হিন্দ-এও ফোন করে বাক্সো-হারানোর ডিটেলস দিলুম। ওরা বলল, হ্যাঁ, নিউইয়র্ক থেকে কয়েকটা টেলেক্স এসেছিল বটে কিন্তু বাক্সোটার কোনো-ট্রেস।

এবার মন খারাপ করে লাউনজেই ঘুরছি। নানান এয়ারলাইনসের ছোটো ছোটো কাউন্টার আছে এই ট্রানজিট লাউনজে।—হঠাৎ দেখি, হাওয়া-ই-হিন্দয়ের কাউন্টারে একটি স্বদেশী তরুণ ঠ্যাং টেবিলে তুলে নিজের মনে হ্যাডলি চেজ পড়ছে।

অমনি মনে হলো, যাই, ওকেই বলে দেখি। যেই ইউনাইটেডের মতন এখানেও যদি কোনো আনক্লেমড ব্যাগেজের গুচ্ছ পড়ে থাকে, আর আমার বাদামী ফেদার-ওয়েটটি যদি সেখানেই জমা পড়ে থাকে? কপাল বলে কথা। কিছুই তো বলা যায় না? ছেলেটি ব্যস্ত নেই যখন, তখন ওকে ধরতে দোষ কী?

সত্যি সত্যি, একটা কাজ পেয়ে সে ছেলেটা দেখি মহা খুশি। সিন্ধি ছেলে। এয়ার ট্রাফিকে কাজ করে। ঠিক যেমন নিউ ইয়র্কে বেদী। এখানে তেমনি এই, নিজহানী। কী চমৎকার ছেলে! আমার কমপ্লেন্ট ফরম আর টিকিট, দুটোই ভালো করে নেড়েচেড়ে, ঘেঁটে দেখে, বলল—"ওরা ওই 'বিশ কেজি' ওজনটা পাচ্ছে কোথায়? হীথরো-টু-নিউইয়র্ক তো মাল ওজন করা হয়নি?"

"তবে কেন বলছে, যে—

"ওটা তো মাত্র একটা সুটকেসের ওজন। কলকাতা থেকে তো একটাই এসেছিল হীথরো অবধি। সেটা বিশ কেজি ছিল। ও হিসেব দমদম-হীথরো সেকটরের। ওটা ক্যানসেলড। এখান থেকে গেছে দুটো। ওজন না-করা বাক্সো। চল্লিশ কেজি তো ধরাই যায়। একটা যদি আঠারো হয়, অন্যটা তবে বাইশ? তারও দরকার নেই। পীস-কনসেপ্টে একটা বাক্সো ত্রিশ কেজি পর্যন্ত ধরে নেওয়া যেতে পারে। ওজন যেহেতু করা হয়নি, আপনি ক্লেম হাজির করবেন ত্রিশ কেজির জন্য। পেয়ে যাবেন। কালোটা অবশ্য,—যখন লাকিলি পেয়েই গেছেন—আর না-ঘাঁটাই উচিত। তবে যেভাবে

পেয়েছেন সেটা মিরাক্ল ছাড়া কিছুই না।"

"ভাই নিজহানী, যদি কালোটার মতো বাদামীটাও পেয়ে যাই? মিরাক্ল তো বারবার ঘটে? আমি ছ'শো ডলার চাই না—বাক্সোটা চাই। ওই বাক্সে আমার খুব জরুরি একটা জিনিস আছে ভাই। একটু খুঁজে দেখবেন? এদিকে ওদিকে? যদি কোথাও পড়ে থাকে, ওই কালোটার মতন? দি গ্রেট ব্রিটিশ এয়ারলাইনসের বাসে চড়ে এয়ারপোর্টে এসেছি, তাদেরই কাউনটারে বাক্সো জমা দিয়েছি। হয়তো তাদেরই কোনো প্লেনে উঠে অন্যত্র চলে গেছে? কিংবা পড়ে আছে লস্ট অ্যাণ্ড ফাউণ্ড গুদামে? কিংবা আনক্লেমড কাউন্টারে?"

"আমি অবসর সময়ে খুঁজে দেখতে পারি পার্সোনালি। আমাকে বরং একটা তালিকা দিয়ে যান জিনিসপত্তরের। আর বাক্সোর বর্ণনা।"

"এই তো জেরক্সকপি আমার কমপ্লেন্ট ফর্মের, এবং টিকিটের। আপনি রেখে দিন না?"

"এই লিস্ট তো অকেজো। ইনডিয়ানদের সব বাক্সোতেই শাড়ি থাকবে, শাল থাকবে, জুতো থাকবে। ডিটেইলস কই? কী-রকম শাড়ি? দু' একটার বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দিন। সুমনের সই করা বাটিকের শাড়ি,লাল কাঁথারি শালের ড্রেসিং গাউন, বাদামী টেম্পলশাড়ি—যা যা মনে পড়ল বললুম। ছেলেটা অধৈর্য হয়ে বলে—

"এনিথিং স্পেশাল? সামথিং দ্যাট মে আইডেনটিফাই দিস কেস অ্যাজ ইওরস?"

"এনিথিং স্পেশাল?" বুকের মধ্যে ধড়ফড় করতে থাকে—ওকে বলবো? ওকে বললে ক্ষতি নেই। বলেই দি,—যদি এতে পাওয়া যায়?

"ইয়েস। দেয়ার ইজ সামথিং ভেরি স্পেশাল। একটা সিল্কের স্কার্ফে জড়ানো, একটা প্লাস্টিকের থলিতে ভরা আ বাঞ্চ অফ লেটার্স ইন বেঙ্গলি।" যার জন্যে এত হাহাকার—যার জন্যে এই অসীম চেষ্টা—সেই গোপন কথাটি শেষ পর্যন্ত নিজহানীকে বলে ফেলতে হলো। কেন এই বাক্সোর জন্যে মাথাকোটা। এ জীবনে যা আর ডুপ্লিকেটেড হবে না।

"বাঞ্চ অফ বেঙ্গলি লেটার্স...র‍্যাপ্ট ইন আ সিল্ক স্কার্ফ...গুড। ভেরি গুড। এতেই হবে। দেখি, কী পারি।" নিজহানী উপদেশ দেয়—"জীবনে আর এভাবে কদাচ নাম-ঠিকানাবিহীন বাক্সো নিয়ে ঘুরে বেড়াবেন না। ওপরে তো বটেই—বাক্সোর ভেতরেও একপ্রস্থ নামঠিকানা লিখে রাখবেন। ওপরেরটা অনেক সময় ছিঁড়েখুঁড়ে যায়। দেশের ঠিকানা রেখে যান। আমি খুঁজতে চেষ্টা করব। ঘাবড়াবেন না ম্যাডাম। হয় বাক্সো, নয়তো ত্রিশ কেজির ক্ষতিপূরণ, এ আপনি নিশ্চয়ই পাবেন।"

১৮

কেবল চিঠির অংশটা বাদ দিয়ে বিশিষ্ট বস্তুটি কী? না "এ বুক অফ বেঙ্গলি পোয়েমস" বলে গল্পটা রুনুদিকে বললুম।

BanglaBook.org

রুনুদি শুনে বলল—"সত্যি সত্যি তোর কপালেই ঘটেও বাপু! তা দুটোই হারিয়েছিস, এটা তো সত্যি নয়? ফেরত পেয়েছিস তো বাবা একটা! অবশ্য পার্থরটা না পেয়ে, নিজেরটা পেলেই ভালো হতো, কি বল? তা যেটা কিনলি হাওয়া-ই-হিন্দের পয়সায়, সেইটে কেমন দেখি?"

ইতিমধ্যে বেশ খানিকক্ষণ হলো দাদামণিও এসে পড়েছেন, রুনুদিকে নিয়ে যেতে।

নতুন বাক্সো দেখে রুনুদি বলল,—"ওমা। এই? এর চেয়ে একটু ভালো দেখে কিনতে পারলি না? পরের পয়সাতেও কিপটেমি? স্বভাব যাবে কোথায়!"

দাদামণি বললেন, "এবার থেকে যেখানেই যাবি, 'ক্যারি-অন-ফ্লাইট' ব্যাগ নিয়ে যাবি। আর তাতে কেবল নাইলন কাপড়।"

রুনুদি ফুটুনি কাটে, "আর ভালো কাপড়-চোপড় তো রইলও না বিশেষ। কুম্ভে কতগুলো ভালো কাপড় জলে চুবিয়ে শেষ করে আনলি, আর এখানে তো বাকীগুলো জন্মের শোধ ঘুচিয়েই এসেছিস।"

আমিই এবার পজিটিভ একটা স্টেটমেন্ট করি। "তবু লাভ এই যে শিক্ষাটা হলো!"

দাদামণি এক হুংকারে সেটা উড়িয়ে দেন "আর শিক্ষা। যাই হোক, অ্যাপ্লিকেশনটা করে ফেলো তাড়াতাড়ি। দেরিটা যেন করো না। মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা তো করলে না দিল্লিতে। করলেই ঠিক হতো। একটা চিঠি অন্তত দিয়ে দাও। তাইতেই হয়তো কাজ বেশি হবে।"

"দেখি।"

দাদামণি অধৈর্য হয়ে পড়েন। "দেখি দেখি করে দেরি করিসনি খুকু—অ্যাপ্লিকেশনটা করে দে। ঐ নিজহানী যেমনটি বলেছে, তেমনি করে।"

"করব।"

দাদামণি যাবার সময়ে বারবার তাড়া দিয়ে গেলেন—"করব করব নয়। এক্ষুনি অ্যাপ্লাই করে ফেলো।"

ঠোঁট উল্টে মামণি বললেন—"যা গেঁতো, ও আর করেছে অ্যাপ্লিকেশন। যদিও-বা লেখে, সেটা ওর টেবিলেই থাকবে। ডাকে আর যাবে না।"

১৯

কলকাতায় এলে যা হয়। কাজকর্মে, রোগে-রাগে-অনুরাগে বাক্সোটা উদ্ধারের চেষ্টা আর হলো না। মনে মনে ধরে নিলুম—যা গেছে তা গেছেই। চিঠির চেয়ে বড় জিনিসই তো চলে গেছে। আর চিঠির জন্যে কেঁদে কী হবে। এই উল্টোপাল্টা দুঃখ করা কাঁদুনি-গাওয়া এবং সহানুভূতি না-পাওয়াতেই গল্প শেষ হতো, যদি-না

BanglaBook.org

হঠাৎ একটা টেলিফোন আসতো হাওয়া-ই-হিন্দ থেকে। ফেরার পর মাস তিনেক হয়ে গেছে তখন।

"ডক্টর সেন? একটা মেসেজ এসেছে আপনার জন্য। মিঃ নিজহানীর কাছ থেকে।"

"কার কাছ থেকে?"

"মিঃ নিজহানী। লণ্ডনের।"

"তিনি কে?"

"হীথরোতে এয়ার ট্রাফিকে কাজ করেন—"

"ও হো, হ্যাঁ হ্যাঁ—বলুন, কী মেসেজ?"

"আপনার বাক্সোটা পাওয়া গেছে।"

"অ্যাঁ!"

"উনি পাঠিয়ে দিচ্ছেন, দু'তিনদিনের মধ্যেই পাবেন।"

"অ্যাঁ।"

"এলে আমরা আবার খবর দেব।"

"ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।"

"এ তো কর্তব্যমাত্র।"

BanglaBook.org

দু-দিনের মধ্যেই বাক্সো এসে গেলো। শীলমোহর করা অবস্থায়। আমাকে দমদমে গিয়ে কাস্টমস ক্লিয়ার করিয়ে আনতে হলো। ইনট্যাক্ট আছে। সব আছে। সেগুলোও কিছু এদিক-ওদিক হয়নি। নিজহানীর মুখখানা কিছুতেই মনে পড়ল না। কেমন দেখতে ছিল ছেলেটাকে? এ-বাক্সো কোথায় পেল সে? কী করে উদ্ধার করল? সেদিনই একটা কাজে করমণ্ডল এক্সপ্রেসে দক্ষিণে রওনা হচ্ছি। চিঠিপত্রের বাক্সো খালি করে ব্যাগে ভরে নিলুম। ট্রেনে উঠে দেখি, আরে দাদামণি যে! দাদামণিও যাচ্ছেন সঙ্গে ভুবনেশ্বর পর্যন্ত। চিঠিপত্রগুলো খুলতে খুলতে দেখি মহারাজার দুটো চিঠি এসেছে। একটি হাওয়া-ই-হিন্দ হীথরো থেকে, আরেকটি হাওয়া-ই-হিন্দ নিউ ইয়র্ক। দাদামণি বললেন—"হীথরোটাই আগে খোলো।" মোটাসোটা মোড়ক। নিজহানীর নিজহাতে লেখা লম্বা চিঠি। দাদামণি বললেন, "জোরে জোরে পড়, শুনি।"

"ম্যাডাম, আপনি হয়ত আমাকে চিনতে পারবেন না। কিন্তু আমি আপনার বাক্সের কথা ভুলিনি। ঐ দু' কেজির ব্যাপারটা মনে হলেই ভয়ানক রাগ ও লজ্জা হতো। এরকম লোকদের জন্যেই কোম্পানির নিন্দে হয়। তাই হাতে সময় থাকলেই আমি গ্রেট ব্রিটিশের এবং হাওয়া-ই-হিন্দের লস্ট প্রপার্টি আর আনক্লেমড ব্যাগেজ-এর ওয়্যারহাউসে ঘুরে আসতাম। একদিন দেখি একটা বাদামী বিলিতি কেস আপনার সেই বর্ণনামতো, চারটে দেশী ক্লাম্পস আঁটা তাতে। নাম লেখা আছে মিসেস কাপুর। কিন্তু তিনি ওটা রিফিউজ করেছেন। এসেছে টোকিও থেকে। আমি তখন আপনার

কাগজপত্তর নিয়ে গিয়ে ওটা খোলানোর ব্যবস্থা করলাম। খুলে দেখি হ্যাঁ, এই তো রয়েছে আপনার", ইয়ে, (একটু কেশে নিয়ে বলি): "বুক অব বেঙ্গলি পোয়েমস র‍্যাপ্ট ইন আ সিল্ক স্কার্ফ—" [খুব একটা মিথ্যে বলাও হয় না। যে-চিঠির গুচ্ছটি হারাতে বসেছিলুম, তা কি কবিতার চেয়ে আলাদা?] "ব্যস, আর সন্দেহ রইল না। টেলেক্সটা পাঠিয়ে দিলাম। আপনি খুবই ভাগ্যবতী। আমিও। যে আপনাকে সত্যিই সাহায্য করতে পারলাম। আপনি কখনও জাপান ও কানাডা গেছেন কিনা জানি না, কিন্তু আপনার বাক্সটি ভ্যাঙ্কুভার, টোকিও দুই-ই ঘুরে এসেছে। আশাকরি ঠিকমতো পাবেন সব কিছু। ইতিমধ্যে কি টাকাটাও পেয়ে গেছেন? পেলেও ক্ষতি নেই। স্যরি ফর দ্য ট্রাবল। প্রীতি নমস্কার নেবেন। আপনার, বিশ্বস্ত, নিজহানী।"

দাদামণিকে চিঠিটা পড়ে শোনাতে হলো পুরোটা। ভাগ্যিস ওঁর চশমা সুটকেসে! পড়তে চাইলেই তো হয়ে গিয়েছিল! দাদামণি বললেন—"জামাই করবার মতন যুবক। কিন্তু তোমার কন্যারা এখনও জামাই পাবার যোগ্য হয়নি এই যা দুঃখ। কী? কবিতার খাতাটা হারিয়েছিল বুঝি? তাই অত আপশোস? যাক, এবার অন্যটা পড়ো।" অন্যটা এসেছে আইখমানের কাছ থেকে। যিনি বলেছিলেন, আমি কিছু জানি না, গিজদারকে বলো। খুবই বিনীত চিঠি। খানদানি কাগজে, আই. বি. এম. টাইপরাইটারে, ছাপার হরফে।

"প্রিয় ডক্টর সেন,

আমরা খুবই দুঃখিত যে আমরা অনেক চেষ্টা করেও আপনার এত নম্বর (বাদামী) এবং এত নম্বর (কালো) সুটকেসদুটির কোনোটিকেই ট্রেস করতে পারছি না। এ দুটির জন্য যথাযোগ্য রীজনেবল ক্ষতিপূরণ নিশ্চয়ই আমরা দেবো। এ বিষয়ে দিল্লিতে অমুক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি। আপনার অসুবিধা সৃষ্টির জন্য হাওয়া-ই-হিন্দ যারপরনাই দুঃখিত। আশাকরি অবিলম্বেই সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে যাবে। ইতি। আন্তরিকভাবেই আপনার, ইত্যাদি।"

বুঝলুম একগুঁয়ে নিশান পটেল সত্যি সত্যিই হাওয়ার পশ্চাদ্ধাবন করেছেন। পেন্টাগনে কি বিদেশমন্ত্রকে যেতে হয়নি, বিশুদ্ধ কোকাকোলার বোতলই যথেষ্ট হয়েছে। কলকাতায় কে না জানে সোডার বোতলের মহিমা? ইলুদির জয় হয়েছে।

দাদামণি বললেন—"দাও এবার অ্যাপ্লিকেশনটা ঠুকে। ওদের ডান হাত কী করছে বাঁ হাত জানতে পারে না। হীথরো কী করছে জে. এফ. কে. যেমন জানে না, তেমনি দমদমে কী এলো, তা পালামে জানবে না। দাও, দু-খানার জন্যে ত্রিশ-ত্রিশ ষাট কেজি. ইনটু কুড়ি ডলার, ইজ ইকুয়ালটু বারোশো ডলার. এক্ষুনি অ্যাপ্লাই করে দাও। দেরি নয়। শালারা পাকা চোর। বাটপাড়ি করলে ক্ষতি নেই।"

বাটপাড়ি করবার বদ ইচ্ছেটা বোধহয় মাথায় ঢুকেছিল। নইলে ভগবান শাস্তি দিলেন কেন?

ব্যাঙ্গালোরে নেমেই ব্যাগসুদ্ধ চুরি হয়ে গেল। সে দু'খানা চিঠিও গেল, ফেরার

BanglaBook.org

টিকিটও গেল, সভার পেপারখানাও গেল। ব্যাগটা আর উদ্ধার হয়নি। কে দেবে? ব্যাঙ্গালোরে তো কোনো নিজহানী নেই, নিশান পটেলও নেই। এমনকী দাদামণিও না।

রুনুদি যখন ব্যাঙ্গালোরের গল্পটা শুনবে, কী বলবে কে জানে? আর মামণিই বা বলবেন কী?

দেশ, শারদীয় ১৯৮২

টাংরী কাবাব

BanglaBook.org

"আরে, পরীক্ষা যে দিলি, তা কী কী দেখে যাত্রা করেছিলি?"—চুরুট ধরিয়ে কুমারকাকা বলেন। বি. এ. পরীক্ষা শেষ হয়েছে, মনে সীমাহীন শান্তি। না, ভুল হলো। ঠিক সীমাহীন নয়। তিনমাসের মতো সুগভীর শান্তি। পরেরটা পরে দেখা যাবে। তার মধ্যে এ কী প্রশ্ন? রোববার সকালে হঠাৎ যেদিন কুমারকাকু এসে পড়েন সেদিনটা এক্সট্রা-স্পেশাল হয়ে যায়। কুমারকাকু সত্যি সত্যি রাজার ছেলে। এখনও ওঁদের দু'চারটে রাজপ্রাসাদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে উত্তরবঙ্গে, পূর্ববঙ্গে, এ-পাহাড়ে, সে-পাহাড়ে, এ-তীর্থে, সে-তীর্থে। কুমারকাকুর বাবা-ঠাকুর্দারা সবাই রাজত্বই করতেন। কুমারকাকু ঠিক সেটা পারেননি, ব্যারিস্টারি পাস করে একের পর এক নানারকমের চাকরি করেছেন, স্বদেশী করে জেলেও গেছেন, স্বদেশী ব্যবসা করে ডুবেও গেছেন, এখন একটা খুব ভালো মনের মতন চাকরি করেন। কাজটা যে ঠিক কী, আমি অতো জানি না, দিনরাত দিল্লি-টোকিও ঘুরে বেড়ানো, আর জাপানীদের সঙ্গে দহরম-মহরমটাই দেখতে পাই। ফিরে এসে নানারকমের গপ্পো বলেন। আধা-সাহেব, আধা-জাপানী, আধা-বাঙাল, আর পুরোটা মিলে অখণ্ড রাজপুত্তুর এই কুমারকাকা ঢুকলেই বাড়ির রং পালটে যায়। মা পর্যন্ত হাতের সব কাজ ফেলে রেখে এ-ঘরে এসে বসেন গল্প শুনতে। কুমারকাকার কথাবার্তার লেভেলটাই আলাদা।

"কী কী দেখে যাত্রা করেছিলি বল, আমি বলে দিচ্ছি কত পার্সেন্ট মার্কস পাবি। সবটা ডিপেনড করছে ঐ যাত্রা করার ওপরে।"

"কী আবার? ঐ বাবা-মাকে প্রণাম, ঠাকুরঘরে প্রণাম, দইয়ের ফোঁটা, রুমালের কোণায় পেসাদী ফুল—ব্যস।"

"ব্যস?"

"ব্যস। আর মাথার ওপরে মা ইষ্টমন্ত্র জপ করে দেন।"

"যা বাবা। মাত্র এই? তাহলে পারলুম না। এ তোমার মায়ের ইষ্টমন্ত্রজপের হাতযশ আর তোমার লাক। আমাদের সময়ে ছিল মোট উনিশটা শুভ জিনিস দেখে বেরুনো নিয়ম। আর কুড়ি নম্বর হচ্ছে পূজ্যপাদ প্রণাম। প্রত্যেকটাতে পাঁচ নম্বর। সবগুলো করতে পারলে একশোয়-একশো। কেউ মারতে পারবে না। আমরা কখনো যে একশোয়-একশো পাইনি তার কারণ কখনোই বিশটা একসঙ্গে হয়নি। তবে অনেকগুলোই হতো।"

প্রায়ই বাবা-মা জমিদারিতে গ্রামে থাকতেন, আমরা শহরে ইশকুলে পড়তাম। পরীক্ষার সময়ে মা রওনা করিয়ে দিতে পারতেন না, তাই আমাদের বাড়িতে যিনি গার্ডিয়ান টিউটর থাকতেন তিনিই এই ভারটা নিতেন। আমরা দুই ভাই পরীক্ষা দিতে বেরুবার আগে সারা বাড়িতে কেন পুরো পাড়া জুড়ে হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার শুরু হয়ে যেতো। আমাদের গার্ডিয়ান টিউটর ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, জানকীবল্লভ চক্রবর্তী, ভয়ানক কড়া শাস্ত্রজ্ঞ। ত্রিবেদী ছিলেন তিনি। শাস্ত্রের বিধান প্রত্যেকটি তিনি পই-পই করে মেনে চলতেন। নিজের জীবনেও যেমন মানতেন, তেমনি আমাদেরও জোর করে মানাতেন। যেদিনই আমরা পরীক্ষা দিতে রওনা হতাম, ঠিক তার আগেই একটা ভয়ঙ্কর গোলমাল লেগে যেতো বাড়িতে। মাস্টারমশাই একটি দীর্ঘ সংস্কৃত শ্লোক আওড়াতেন, আর বাড়িসুদ্ধ সবাই পেয়লা, গোমস্তা, বাবুর্চি-বামুন, দারোয়ান, মালী, সহিস, মাহুত প্রত্যেকেই অস্থির হয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াত। তারপর ক্রমশ রওনা হবার ব্যবস্থা একে একে কমপ্লিট হতো—প্রস্তুতি এবং রিহার্সাল শেষ হলে, তবে সদর খুলত। আমরা দুই ভাই ভাত খেয়ে চুল আঁচড়ে জুতোমোজা পরে পেনসিল কলম রুলার নিয়ে মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দোরগোড়ায় প্রথম পা-টি ফেলতাম। মাস্টারমশাই বলতেন—"রামপ্রসাদ!" রামপ্রসাদ আমাদের রাখাল এবং গোরুপালক। সে টানতে টানতে নিয়ে আসত একটি দুগ্ধবতী গোরু—এবং সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হতো বাছুরটাকে। সকাল থেকে তাকে দুধ খেতে দেওয়া হয়নি। ছাড়া মাত্র সে দৌড়ে গিয়ে বাঁটে মুখটি লাগাতো। এই দৃশ্যটাই শুভ। অমনি জানকীবল্লভ চক্রবর্তী নিশ্চিন্ত হয়ে বলতেন—"ওয়ান। ধেনুর্বৎস-প্রযুক্তা। একসেলেন্ট। এইবার দুই। রামপ্রসাদ।" রামপ্রসাদ ততক্ষণে গোরু-বাছুর সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গোরু কিঞ্চিৎ গোবরময় করে ফেলেছে সদরের পাশটা। সেই নিয়ে দরওয়ান রামপ্রসাদকে বকছে—এটা তো রিহার্সালে ছিল না। বকুনির মধ্যেই রামপ্রসাদকে ফিরতে হলো ষাঁড় সঙ্গে নিয়ে। কখনও মাঠের হালচাষের বলদ, কখনও-বা শিং না-ওঠা এঁড়ে বাছুর—কখনও রাস্তা থেকে ধর্মের ষাঁড় বিশ্বনাথকে—যখন যেটা হাতের কাছে পেতো, ধরে এনে, 'বৃষ' বলে চালিয়ে দিতো সে। পণ্ডিতমশাই তাতেই তুষ্ট। "টু। বৃষ। ফাইন। চৈতরাম। হাথী লাও। থ্রি।" চৈতরাম মাহুত, সে রেডিই ছিল লিলিকে নিয়ে। ঠাকুর্দার লিলি হচ্ছে ঠাকুর্দার প্রিয় হাতি। লিলি এসে শুঁড় তুলে

সবাইকে নমস্কার করত। আমরা শুঁড়ে টাকা গুজে দিতাম। সেটা নিয়ে সে আমাদের আশীর্বাদ করত। তারপর টাকাটা সোজা চৈতরামকে দিয়ে দিত। স্যার বলতেন—"থ্রি। গজ। ফিনিশড। এবার তুরগা। লক্ষ্মীচন্দ! লক্ষ্মীচন্দ্র সহিস।" সেও ওপাশে রেডি থাকত। চৈতরাম লিলিকে নিয়ে সবে যাওয়ামাত্র খটখট শব্দে ডার্কলেডিকে নিয়ে চলে আসত সামনে। বাবা তাঁর প্রিয় ডার্কলেডিতে চড়ে বেড়াতেও যেতেন, শিকারেও বেরুতেন। গ্রামে-গঞ্জে ট্রাভেলও করতেন। তখন নৌকো, ঘোড়া আর পাল্কিই ছিল আমাদের প্রধান ট্রান্সপোর্ট। লোক দেখাতেই থাকত মোটর। রাস্তা কৈ? ঘোড়াটিকে দেখা হয়ে গেলেই, স্যার এক নিশ্বাসে বলতেন, "ধেনুর্বৎসপ্রযুক্তাবৃষগজতুরগা।" আমরা ডার্কলেডির গলায় হাত বুলিয়ে দিতাম। স্যার বলতেন, 'বৃষগজতুরগা' হয়ে গেল। এবার নাম্বার ফাইভ। দক্ষিণাবর্ত বহ্নি। ওরে ডানদিকে একটা প্রদীপ জ্বেলেছিস?" এটা প্রত্যেকবার একরকম হতো না। কোনোবার উঁচু পিতলের দীপদানে ১০৮ শিখা জ্বালা হতো—কোনোবার বা শুকনো পাতা দিয়ে বাগানেই আমাদের ডানদিকে একটা ছোট বনফায়ার জ্বলত। স্যার বলতেন —"দক্ষিণাবর্ত বহ্নি? হয়েছে। ও. কে.। এখন নাম্বার সিক্স দিব্য স্ত্রী, পূর্ণকুম্ভা— ওরে, মাকে একটু ডেকে আন। জলভরা কলসী নিয়ে দিবি হাতে।" আমাদের সংসার স্ত্রী-হীন সংসার ছিল। কর্মচারী সকলেই পুরুষ। কেবল এই গার্ডিয়ান টিউটরের বর্ষীয়সী স্ত্রী, আর তাঁর বুড়ি ঝি একদিকে থাকতেন। তাঁর ছেলেরা বড় বড়, মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। মহিলা মোটেই অসুন্দরী নন। কিন্তু দিব্য-স্ত্রী বলতে কিশোরের চোখে যা ভেসে আসে, স্যারের গিন্নির সঙ্গে সেটা তো মেলে না? আমার তখন বয়স অল্প, কথাটা শুনে আমি বলেই ফেললাম—"কিন্তু স্যার, জ্যাঠাইমাকে...দিব্য-স্ত্রী?" স্যারের নির্দেশে জ্যাঠাইমা যখন জরির দাঁত দেওয়া লালপাড় কড়িয়াল শাড়ি, নাকে মস্ত ফাঁদি নথ, এক-গা গহনা, কপালে মস্ত সিঁদুর টিপটি পরে লাজুক হেসে সদরে এসে দাঁড়ালেন কাঁখে সোনার মতো ঝকঝকে পেতলের কলসিটি নিয়ে, তখন তাঁকে ঠিক মা দুগগার মতন দেখাচ্ছিল—এবং 'দিব্য-স্ত্রী' নন বলে মোটেই মনে হচ্ছিল না। তবু স্যার একটু ফিসফিস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমাদের কানে কানে বললেন—"এখন এমন দেখছিস তাই,—বয়েসকালে এই জ্যাঠাইমারই ছিল রে— দিব্যরূপই ছিল! সিক্স, সেভেন, দিব্য-স্ত্রী, পূর্ণকুম্ভা। কমপ্লিট। এবারে নাম্বার এইট। দ্বিজ।" নিজের পা দুটি জোড়া করে, পৈতেটি ছুঁয়ে দাঁড়াতেন। দ্বিজদর্শন শেষ। "আইটেম নাইন। নৃপ। বড়কর্তার ছবি।" অমনি জম্পৎ রাই, আমাদের বৃদ্ধ কর্মচারী, আমার ঠাকুর্দা মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরীর মস্ত ছবিটা দু-হাতে জাপ্টে এনে ধরতো চোখের সামনে। "ফাইন। আইটেম নাইন নিয়ে যাও—নৃপদর্শন শেষ। এবারের আইটেম টেন—গণিকা—ও. কে.—টেন কমপ্লিট, গণিকা হলো, এবার পুষ্পমালা— মালী!" দাদা এতক্ষণে কথা বলে—"কৈ স্যার? টেন কোথায় কমপ্লিট? গণিকা তো হলো না? গণিকা দেখতে হবে না স্যার?" আমি অবাক হয়ে বললুম—"কিন্তু,

BanglaBook.org

গণিকারা তো খারাপ স্যার? খারাপ জিনিস দেখতে আছে?" স্যার একটু মুশকিলে পড়লেন। দাড়িহীন গাল চুলকে নিয়ে প্রথমে দাদাকে উত্তর দিলেন—

"থাক, আইটেম টেন দেখে আর কাজ নেই। ওটা কেবল শ্রুত্বাই চালিয়ে নাও।" তারপর আমাকে জ্ঞান দিলেন—"ঠিকই বলেছ তুমি। এই বয়েসে গণিকা-টনিকা না দেখাই ভালো। যদিও গণিকাগৃহের দোরগোড়ার মাটি নিয়ে এসে পুজোর প্রতিমা তৈরি হয়। যাত্রারম্ভেও গণিকার মুখদর্শনে পুণ্য। তবু, সব কিছুরই যথাযথ সময় আছে—এখন ওটা শ্রুত্বার ওপর দিয়েই চলুক। নেক্সট—পুষ্পমালা। মালী! পুষ্পমালা, পতাকা কৈ? ইলেভেন, টুয়েলভ?" মালী অমনি গাঁদাফুলের মালা নিয়ে, আর হরনাথ বাগচি উল্টোদিক থেকে রঙিন ফ্ল্যাগের তৈরি মালা হাতে করে হাজির —আগেরদিন রাত্তিরে বসে বসে গঁদ, কাঁচি, রঙিন কাগজ আর সুতো নিয়ে গেঁথেছেন। —"ব্যস ব্যস—পুষ্পমালা, আর পতাকা।—বাবুর্চি?" বাঁয়ে বাবুর্চি অমনি একটা ডেকচি হাতে করে এসে দাঁড়ায়, তাতে টাটকা পাঁঠার মাংস, কাঁচারক্ত মাখা, দেখলেই গা গুলোয়। সদ্য ভাত খেয়েছি! "থার্টিন—সদ্য মাংস। বাঃ ঘি, ঘি কই? ঘৃতং বা? ফোর্টিন: ঠাকুর! ঘি নিয়ে এসো।" বলতে না বলতে উইনে বামুনঠাকুর এসে দাঁড়ায়, হাতে ঘিয়ের পাথরবাটি। গরম ঘিয়ের গন্ধে পেটটা ম ম করে...। কাঁচা-মাংসের স্মৃতিটা মুছে যায়। "—দধি, মধু, রজতং, কাঞ্চনং, শুক্লধান্যং—কই গো?" পাঁচটা জিনিস রুপোর থালায় যত্ন করে সাজিয়ে ধান, দই, মধু, রুপোর টাকা, সোনার গিনি সমেত সামনে এনে ধরে ঝি—একনজর সেদিকে তাকিয়ে নিয়ে আমরা স্যারকে, আর স্যারের স্ত্রীকে প্রণাম করি। স্যারের স্ত্রী দইয়ের ফোঁটা পরিয়ে দেন কপালে।—"টোয়েন্টি আইটেমস কমপ্লিট—যাত্রা শুরু। এইবার—ড্রাইভার!" হাঁক পাড়েন স্যার। সদর থেকে হাতি-ঘোড়া সব কখন সরে গেছে—ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে এগিয়ে আসে। টিউটর বিড়বিড় করেন, আর ভুরু কুঁচকে আঙুলের কড় গোনেন—"দেখি, কটা হলো—

ধেনুর্বৎসপ্রযুক্তা বৃষগজতুরগা
দক্ষিণাবর্ত বহ্নি দিব্য-স্ত্রী পূর্ণকুম্ভা।
দ্বিজনৃপগণিকা পুষ্পমালাপতাকা
সদ্য মাংস ঘৃতং বা দধিমধুরজতং
কাঞ্চনং শুক্লধান্যং দৃষ্টা শ্রুত্বা পঠিত্বা।
ফলমিহ মানবে গন্তুকাম। পূজ্যপদে প্রণাম।

যাত্রা সুফলা হোক। শিবমস্তু। জয়মস্তু।" বলতে বলতেই উঠে বসতেন গাড়িতে। গাড়ি এবার রওনা হতো আমাদের নিয়ে ইশকুলের দিকে। পিছনে চেয়ে দেখতে পেতাম বাড়ির সামনে ভিড়। বিশাল এক বিচিত্র শোভাযাত্রা— গোরু বাছুর ষাঁড় হাতি ঘোড়া—কী নেই। তার মধ্যে স্যারের স্ত্রী ও কলসীভরা জল, আগুন, ঠাকুর্দার

ছবি নিয়ে জম্পৎ রাই, মালা নিয়ে মালী, পতাকা নিয়ে হরনাথবাবু, কাঁচামাংসের ডেকচি নিয়ে খুদাবক্স বাবুর্চি, ঘিয়ের বাটি নিয়ে শংকর ঠাকুর, দধি মধু রজত কাঞ্চন ধান্যসমেত থালা নিয়ে সুভদ্রা ঝি। সবাই মিলে আমাদের আপ্রাণ শুভকামনা করছে। কেবল গণিকাটিকে দেখা যেত না। অন্যলোকেরা দেখতে পেত না, কিন্তু সে থাকতো আমাদের মনে মনে একটা অচেনা বিচিত্র ভয়মাখানো প্রবল কৌতূহল হয়ে।—অবিশ্যি না দেখলেও তো ক্ষতি নেই। দৃষ্টা না হোক, শ্রুত্বা; সেও না হোক, পঠিত্বা হলেও সমান পুণ্য! আমাদের শাস্ত্রকাররা খুবই কনসিডারেট লোক ছিলেন। কী বলিস? আর স্যার ছিলেন আবার নিদারুণ শাস্ত্রজ্ঞ।"—চুরুটে লম্বা টান দিয়ে কুমারকাকা বলেন, "তাঁর ছাত্র হলে কি হবে, আমাদের শাস্ত্রজ্ঞানটা আবার একেবারেই ঠিকমতন হয়নি। এই হিন্দুশাস্ত্রপাঠ নিয়েই আমার একবার দারুণ ঝামেলা হয়েছিল। তখন কোরিয়ান ওয়ার চলছে, আমি জাকার্তায়। একটা কাগজে পলিটিকাল করেসপণ্ডেন্ট, কোরিয়া থেকে বঙ্গে পর্যন্ত আমার এরিয়া। (ওই সময়ই তো এই জাপানী যোগাযোগটা হলো)। একবার দুটো বক্তৃতা দিতে বললে আমাকে জাকার্তায়, একটা জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন। প্রথম বক্তৃতাটির বিষয়বস্তু কোরিয়ার যুদ্ধ। কোনোই অসুবিধা হলো না বলতে। আমারই তো সাবজেক্ট। দ্বিতীয় দিন বক্তৃতা দিতে বললে, 'অন মন্দোদরী'। আমি তো ট্যারা। মন্দোদরীর উপরে বক্তৃতা? কী বলব? ওরা বললে—'আসলে এটা একটা ইনডিয়া-ইনডোনেশিয়া কালচারাল এক্সচেঞ্জের প্রশ্ন।'—মন্দোদরীর মন্দির আছে অনেক, ইন্দোনেশিয়ায়। মন্দোদরী সেখানে মহাসতী; সতীত্বের প্রতীক। আমি বেচারী ভীষণ মুশকিলে পড়ে গেলাম। আমার কেবলই মনে পড়ে যেতে লাগল, ছেলেবেলায়, দেশে, সাহেবালির কাছে শোনা মন্দোদরীর গপ্পোটা। সেটা বললে তো চলবে না!

সাহেবালি ছিল পাঠান বডিগার্ড, আমার বাবার। বাবাকে ছেলেবেলা থেকেই সে সামলাচ্ছে। ঠাকুরদার পলিসি ছিল—"পয়লা দর্শনধারী, পিছে গুণবিচারি।" প্রথমেই চেহারাটা কেমন, তার ওপর ঠাকুর্দা প্রচুর গুরুত্ব দিতেন। ফলে বাড়ির কর্মচারীরা সবাই কাজের হোক না হোক, দেখতে প্রত্যেকেই খুব টুকটুকে ফুটফুটে ছিল। সাহেবালি খান সবচেয়ে ভালো দেখতে। সাড়ে ছ'ফুট লম্বা, জোব্বাজাব্বা সব পেশোয়ারী, মাথায় লাল কুল্লা পাগড়ি, আরো এতখানি উঁচু হয়ে আছে—কোমরে ইয়াবড়া তরোয়াল ঝুলছে (ভারী কী!) জরির কোমরবন্দ থেকে, গোলাপী রঙের চামড়া, নীল চোখ, আমাদের সাহেবালিকে দারুণ পছন্দ ছিল। সারাক্ষণ ওর পিছু-পিছুই ঘুরঘুর করি। সন্ধ্যাবেলায় রোজ কর্মচারীদের গল্পের আসর বসে। কোনোদিন জম্পৎ রাই গল্প বলে, কোনোদিন হরনাথ বাগচি বলেন, কোনোদিন ঠুনোবুড়ো। এই ঠুনোবুড়োর যে বাড়িতে কী কাজ ছিল, কেন এবং কবে যে সে এসেছিল, তা আমরা জানতাম না। তখন সে থুথুরে বৃদ্ধ। তিনমাথা এক করে বসে থাকে, আর খুব ভালো ভালো গল্প বলে। আমরা ভাবতাম গল্প বলাই ঠুনোবুড়োর চাকরি।

BanglaBook.org

তার পৈতৃক নামও কেউ জানতো না। কিন্তু এক-একদিন শংকর ঠাকুর, কি ড্রাইভার হরিরামও এসে উড়িশা, বিহারের গল্প বলত আমাদের। সাহেবালি একদিন বললে —আজ সে গল্প বলবে। সাহেবালির ধারণা হয়েছে, আমরা বড় বেশি সাহেবি হয়ে যাচ্ছি, নিজের দেশের পুরাণ-টুরাণ শেখা হচ্ছে না। তাই সেটা সে নিজেই শেখাবে। —"রামায়ণের গল্প জানো?" আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। জানি, আবার জানিও না। রামসীতার গল্পটা কে না জানে? আমরাও ওটা মোটামুটি জানি, তবে ওর যে বহু ডিটেলস আছে যা আমরা জানি না, সে খবরও জানি। সাহেবালি আমাদের অনিশ্চয়তা দেখে খুব বিরক্ত হলো; এবং বলল—"আপনা দেশঘরকা কহানিয়াঁ সবসে পহেলে সুননা চাহিয়ে। এক বহুৎ বড়িয়া রাজা থা, উসকা নাম থা রাবণা। রাবণা রাজানে সুনা রামকো এক খুবসুরৎ জরু হ্যায়—বাস, উসনে জলদি গিয়া, ঔর রামাকো জরুকো উঠাকে আপনা প্যালেসমে লায়া। লেকিন রামা ভি বড়িয়া ফাইটার থা। উসকা মিলিটারি উলিটারি কুছভি নহী থা তো উসনে কা কিয়া? জঙ্গল কা ভল্লু-উল্লু বান্দর-উন্দর সব একসাথ করকে অ্যায়সা ট্রেনিং দে দিয়া, বাস ওহী লে কর রাবণাকো অ্যাটাক কিয়া। মার বি ডালা, খতম। রাবণাকো এক বেগম থী, মান্দোদুয়ারী। উসনে রামাকো গোড় লাগ গিয়া, ঔর কহা, রামা, হাম রাবণাকো প্যার নহী করতী, হাম তুমসে প্যার করতী হুঁ, তুম হামকো শাদি কর লো। রামানে তো বাৎ সুনাই নেহী, সীতা কো উঠা লেকর ঘর ভাগ রহা।—তব মান্দোদুয়ারী নে উসকা পিছে পড়া ঔর ফিরসে কহা: রামা, তুম হামকো শাদী কর লো। তব রামানে কহা—মান্দোদুয়ারী, মেরী প্যারী, মেরে পাস তো এক জরু হ্যায়। হাম তুমকো শাদি নহী কর সকতা—লেকিন—হাঁ, নিকাহ্ কর সকেঙ্গে।"—রাম মন্দোদরীকে নিকাহ্ করেছিল কিনা, শেষটা আর সাহেবালি বলতে পারেনি। এতদূর গল্প শুনেই হরনাথ বাগচি ক্ষেপে উঠে লাঠি তুলে ওকে মারতে গেলেন। ফলে গল্পের আসর ভেঙে গেল। ইন্দোনেশিয়ায় দ্বিতীয় লেকচারটাও আমার তাই স্থগিতই রইল। চিরদিনের জন্য।"

মা ইতিমধ্যে গরম গরম কাটলেট নিয়ে এলেন, তার গা থেকে মুরগীর ঠ্যাং বেরিয়ে আছে খোঁচা হয়ে, দেখেই কুমারকাকা বলেন, "টাংরী কাবাবের কথাটা মনে পড়ছে। বহুকাল আগের কথা। তখন আমাদের বাড়িতে পাঁঠার মাংস ছাড়া আর কোনো মাংস ঢোকে না। কুমড়ো বলি হতো পুজোর সময়, মহিষ-ছাগল কিছু না। অতি কষ্টে বাবা বাড়িতে পাঁঠার মাংসটা ঢোকালেন। তাও বাইরের বাড়ির উনুনে রান্না হতো। ভেতর-হেঁশেলে নয়। আমাদের গার্জেন টিউটর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, যেহেতু তাঁর আপত্তি। মুরগীর ডিমও রান্নাঘরে ঢোকানো বারণ, মুরগীর মাংস তো দূরস্থান। অথচ বাবা মুরগী খান, আমাদের চিকেন স্যাণ্ডউইচ প্রচুর খাওয়ান। কিন্তু বাড়িতে নয়। বাবা-মা কলকাতায় নেই, কিন্তু আমরা তখন আছি। বাধ্য হয়ে। দাদা পরের বছর

এন্ট্রেন্স দেবে। আগেকার সেই গার্ডিয়ান টিউটরের হেফাজতেই আছি। পণ্ডিত জানকীবল্লভ চক্রবর্তী। বাড়ি থেকে খানিকটা দূরেই মামারবাড়ি। বড়মামা রোজই খোঁজ নিয়ে যান। আমাদের জীবন সুনিয়ন্ত্রিত।"

"বাবা খুব কুস্তি পছন্দ করতেন। বসার ঘরে বাবার গম্ভীর সব ফ্রেমে বাঁধানো ফোটো ছিল, গোবরের সঙ্গে, বড়মামার সঙ্গে। ফলে আমাদের জন্যে রোজ ভোরবেলা কুস্তিগীর আসতো, কুস্তি শেখাতে। ভোর পাঁচটায় দিন শুরু হতো হুপহাপ করে কুস্তি দিয়ে। ছ'টায় স্নানের পর গার্ডিয়ান টিউটর সংস্কৃত বেদমন্ত্র, গীতা, শাস্ত্র-টাস্ত্র পড়াতেন। প্রথমে গায়ত্রী পড়িয়ে, কোশাকুশি নিয়ে জপ-টপ করিয়ে নিতেন। প্রত্যূষে শাস্ত্রপাঠের পরে ব্রেকফাস্ট। তারপর অঙ্ক স্যার। তারপর ইংরিজি স্যার। এইরকম সারাদিন চলত। গার্ডিয়ান টিউটরই সব রুটিন তৈরি করতেন, কোন টিচার কখন এসে কী পড়াবেন। সন্ধ্যাবেলা আমরা নিজেরাই পড়তে বসতুম। তত্ত্বাবধান উনি নিজে করতেন। এবং সংস্কৃত টেক্সট, যাবতীয় পাঠ্য তখনই আমাদের পড়াতেন। ব্যাকরণ, ট্রানস্লেশন ইত্যাদি। কলকাতায় থাকার কিছুদিন পরে আবিষ্কার করলুম সন্ধ্যাবেলায় আমরা দু'ভাই নিজেরাই বসে বসে পড়ি। ঠুমোকুড়ো আধঘুমন্ত হয়ে পাহারা দেয়। কিংবা সাহেবালি তরোয়াল নিয়ে পাহারা দেয়। সংস্কৃত পড়াই বন্ধ। এদিকে দাদার টেস্টও এসে গেছে। সন্ধেবেলায় কোনদিন আর স্যার বাড়িতে থাকেন না। স্যার যান কোথায়? সাহেবালিকেই বললুম—রোজ সন্ধ্যাবেলায় স্যার কোথায় যাচ্ছেন? জেনে দাও।'

শুনে সরল সাহেবালি বললে—"স্যারকো পুছো না?" বেশ! স্যারকে পুছতে তিনি বললেন—একটা জরুরি রিসার্চের কাজ করতে বেদান্ত সোসাইটির লাইব্রেরিতে যান। কাজটা শেষ হলেই আর যেতে হবে না। দাদা বলল, "বাজে কথা। স্যার অনেক রাত করে ফেরেন আজকাল। লাইব্রেরিতে অতক্ষণ থাকতে দেবে নাকি? হতেই পারে না।" ফের ধরো সাহেবালিকে।

এবার সাহেবালি ঠিক খবর এনে দিল। নিজেও কম বিচলিত হয়নি। স্যার নাকি প্রত্যেকদিন আমারই মামারবাড়িতে যান। সেখানে কোনোই বেদান্ত সোসাইটি নেই।

যদিও আমাদের মতো অতবড় তালুক মামাদের নেই, তবু মা যে আমাদের রাজকন্যা, এতে সন্দেহ ছিল না। দাদামশাই ধরণীকান্ত স্বদেশী করলে কি হবে, বড় হয়ে মামারা সবাই বিলেত গিয়ে বখে গেছেন। মামাবাড়ির বৈঠকখানা যেন একটা বিলিতি ক্লাব। যে যত খুশি বিলিতি মদ খাচ্ছে, তাস পিটছে, জুয়োয় টাকা হারছে এবং কষে মুরগী মাটন কাবাব রোস্ট খাচ্ছে। আমাদের মামাবাড়িতে বেড়াতে যাওয়া বারণ ছিল, এক "কাজের বাড়িতে" ছাড়া। সেই নিষিদ্ধ মামাবাড়িতেই কি না আমাদের বেদজ্ঞ পণ্ডিত প্রত্যহ যাচ্ছেন? রোজ রোজ ওখানে তাঁর কী এত কাজ? বড়মামার সঙ্গে ওঁর হিন্দু স্কুলের ক্লাস-ফ্রেন্ড হিসেবে ছোট থেকেই অবিশ্যি বন্ধুতা আছে, তা বলে এত? আমাদের সন্ধেবেলার পড়াশুনো মাথায় উঠেছে, সংস্কৃত

BanglaBook.org

ভুলেও গেছি। একদিন বড়মামা আসতেই দাদা বললে, "বড়মামা, স্যার আর আমাদের সন্ধেবেলায় পড়ান না। বেদান্ত সোসাইটি লাইব্রেরিতে রিসার্চ করতে চলে যান প্রত্যেকদিন। এতে আমাদের খুব ক্ষতি হচ্ছে, সামনেই পরীক্ষা। তার ওপর এত বৈদান্তিক পড়াশুনো করে স্যার বেজায় কনজারভেটিভ হয়ে যাচ্ছেন, হপ্তায় মাত্র একদিন মাংসরান্না হয়। কলকাতায় সবাই মুরগীর ডিম খায়, মুগরীও খায়, কেবল আমাদের বাড়িতেই সব বারণ। এত বামনাই কি আজকালকার দিনে কেউ করে? আপনি প্লিজ একটু ওঁকে বুঝিয়ে বেদান্ত সোসাইটি বন্ধ করুন—আমাদের টেস্ট পরীক্ষা সামনে। ওজনও কমে যাচ্ছে।"

"তাই তো? ডিম খেতে দেয় না? মুরগীও না? জানকীটা তো আচ্ছা গোলমেলে বামুন হয়েছে?" বড়মামা চোখ বড় বড় করে নকল রাগ করলেন। "নাঃ, ওকে তো বলতেই হবে দেখছি। ঠিকই বলেছিস, ঐ বেদান্ত সোসাইটি করে-করেই ওর মনটা আরোই পিছনদিকে চলে যাচ্ছে।" বড়মামা কিছুক্ষণ হাসি-হাসি মুখে চুপ করে ভাবলেন। তারপর বললেন, "তোরা দুজনে এক কাজ করবি। কালকে সন্ধের মুখে আমাদের বাড়ি চলে আসবি। বৈঠকখানায় পর্দার আড়ালে চুপটি করে লুকিয়ে বসে থাকবি। দেখবি কী হয়। খুব মজা হবে, দেখিস! আমাকে বলিস না।" আমরা তো বিকেল থেকেই নাচছি। স্যারকে না-বলে মজা দেখা—"সাহেবালি, নিয়ে চলো। বড়মামা বলেছেন।" কিন্তু গার্ডিয়ান টিউটরের অনুমতি ভিন্ন আমাদের কিছুতেই সাহেবালি নিয়ে যাবে না। বড়মামা তো একদম বারণ করেছেন স্যারকে বলতে। কী করি? মহা মুশকিল হলো।

গার্ডিয়ান টিউটরের অনুমতি ভিন্ন আমাদের বাড়ি থেকে এক পা বেরুনোর নিয়ম ছিল না। তা তিনি যখন বলেননি, তখন ড্রাইভারও নিয়ে যাবে না। এক সাহেবালিই ভরসা। সে বাবাকে মানুষ-করা বডিগার্ড বলে কথা। এখানে বাবা তাকেই আমাদের কাছে রেখে দিয়েছেন, বাবার কাছে আছে সাহেবালির ছেলে, গোলামালি। মামার বারণ আছে শুনে সাহেবালি খানিক কী যেন ভেবে নিয়ে বললে, "ঠিক আছে। কাপড়া লাগাও।"

আমাদের মামাবাড়িতে যেতে খুব ভালো লাগত। নিষিদ্ধ ছিল বলেই বোধহয়। আর দিদিমা ছিলেন বলে মামাবাড়িতে গেলে রাণী ভবানীর কালের অনেক গল্প দিদিমার মুখে শোনা যেত। পিতৃকুলে, মাতৃকুলে, আমরা দু'পক্ষেই কেমন করে যেন রাণী ভবানীর সঙ্গে জড়ানো। আমাদের বাড়িতে দু-হাজার কলসী গঙ্গাজল লাগতো বছরে। দিদিমাদের লাগতো আরেকটু কম। কিন্তু আমাদের উত্তরবঙ্গের বাস তো গঙ্গার ওপর নয়। খুব কষ্ট করেই প্রত্যেক বছর অন্যের জায়গা থেকে জল আনতে হতো। রাণী ভবানী, তাই, জামাইকে গঙ্গাজলের সুবিধার জন্য বহরমপুর মৌজাটি লিখে দিলেন। যদিও রাজা-জামাইয়ের অবস্থা মোটেই খারাপ ছিল না, তবু জামাইবাড়ি থেকে মেয়ে যখন লিখল, "এইসব অঞ্চলে তেমন ভালো রেশমী বস্ত্র পাওয়া যায়

BanglaBook.org

না," তার উত্তরে তখন রানী ভবানীর খাগের কলমে মোটামোটা করে লেখা একটা সই করা কাগজ এল, এই বলে যে, 'রেশমবস্ত্রের জন্য বগুড়ার ডামাজানী জামাতা বাবাজীবনকে মৌজা দেওয়া হইল'। ডামাজানী তখন বগুড়া সিল্কের ঘাঁটি, শ্রেষ্ঠ এণ্ডির কাপড় তৈরি হতো সেখানে। দিদিমা বলেন, "এমনি করে-করেই আমরা দিনে দিনে চন্দ্রকলার মতো বৃদ্ধি পেয়েছি। আর তাঁরা কমেছেন।"

দিদিমার কাছে গেলে আমাদের খুব ভালো লাগে। অথচ মা-মাসী কেউ সঙ্গে না গেলে ও-বাড়ি যাওয়া নিষিদ্ধ। মদে-মাংসে-জুয়ায় ওটা একটা বিলিতি ক্লাবহাউসের মতো হয়েছিল। ছোট ছেলেদের পক্ষে বিষবৎ। তবে এসব কাণ্ড হতো বারবাড়িতে। তারপর লন, বাগান পেরিয়ে অন্দরে দাদু-দিদিমার মহল। সেখানে একেবারে আলাদা আবহাওয়া। মামাবাড়িটা ছিল সাহেবপাড়ার মাঝখানে। আমরা মামাবাড়ি গিয়ে দিদিমার কাছে না গিয়ে বারবাড়িতে ঢুকছি, সাহেবালি তো মহা আপত্তি শুরু করেছে। ওখানে ছোটদের যাওয়া নিষেধ। আমি বললুম, "বড়মামাকে জিজ্ঞেস করে এস, যাও।" বড়মামার অনুমতি নিয়ে এলেই হবে না, দিদিমার মতও চাই। সাহেবালিকে শেষ পর্যন্ত রাজি করানো গেল। আমরা তো ফাঁকা বৈঠকখানায় ঢুকে বিরাট বিরাট ফ্রেঞ্চ উইনডোর সামনে বিশাল ভারী মখমলের পর্দার পিছনে লুকিয়ে বসে আছি। একসময়ে মাইফেল শুরু হলো। মশাদের খুব মজা। আমাদের বাগে পেয়ে মনের সুখে কামড়াচ্ছে। পাগলের মতন কেবল মশা মারছি, শব্দ না করে, আর মুগ্ধ নেত্রে 'নিষিদ্ধ দৃশ্য' দেখছি। অবশ্য ক্রমশ ঘরে এতই হৈ চৈ হুল্লোড় শুরু হয়ে গেল, যে চড়চাপড়ের তুচ্ছ শব্দ কারুর কানেই যেত না। মামারা তিন ভাই আছেন, তাঁদের মোসায়েবরা আছেন। কয়েকজন সাহেবও আছে। হুইসকি চলছে। ফ্ল্যাশ, রামি, ব্রিজ খেলা হচ্ছে। আর শামী কাবাব, টাংরী কাবাবের পাত্র আসছে তো আসছেই। আর তারই মধ্যে গলায় গরদের চাদর, মাথায় শিখা, পায়ে বিদ্যাসাগরী লাল চটি, আমাদের স্যারমশাই বসে বসে খুব ফুর্তিসে বেদান্ত সোসাইটির জরুরি রিসার্চ করছেন। দুইহাতে সুদীর্ঘ টাংরী কাবাব ধরে দাঁতে বসাচ্ছেন। টাংরী কাবাব জিনিস তো? মুরগীর ঠ্যাং দিয়ে তৈরি হয়। দেখে ফিসফিস করে দাদা আমাকে বললে, "চল, বেরুই। এই হচ্ছে দ্য রাইট মোমেন্ট।" আমি ভয় পাচ্ছি। এই তো শেষ মোমেন্ট নয়, তারপর তো বাড়ি যেতেই হবে। দাদা বললে, "ধুৎ, কিছু হবে না, ক্যাট বেড হ্যানডেড। টাংরী হ্যানডেড।" আমরা গুড়ি মেরে পর্দার পিছন থেকে বেরিয়ে স্যারের পিছনে গিয়ে ডুয়েটে ডাকলুম, "স্যার!" স্যারের হাত কেঁপে কাবাব পড়ে গেল। বড়মামাই ধরে ফেললেন। স্যার কিন্তু দারুণ স্মার্ট। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বলে কথা। আমরা মুখ খোলবার আগেই, "কার সঙ্গে এসেছ? দরওয়ান কেন তোমাদের বেরুতে দিয়েছে এত রাতে? ড্রাইভার কেন তোমাদের এনেছে? কার অনুমতিতে তোমরা এখন হোমওয়ার্ক না করে— দাদা বললে, "স্যার, আপনি নিজে কাছে না বসলে আমাদের হোমওয়ার্ক কে করাবে? তাই তো আপনাকে ডাকতেই এসেছি!" স্যারের সেই

BanglaBook.org

এক কথা। "কিন্তু দরওয়ান কেন? কিন্তু ড্রাইভার কেন—?" দাদা বললে, "আমরা হেঁটেই এসেছি।" কাবাবের গন্ধে ঘর ম ম করছে। স্যার খেতে-খেতে জেরা করছেন। "আমরাও একটা করে কি টাংরী কাবাব খেতে পারি স্যার?" আমি আর থাকতে না পেরে বলেই ফেললুম। চোখ কপালে তুলে স্যার বললেন, "কুক্কুট মাংস? মোটেই খাবে না। তোমাদের না উপনয়ন হয়েছে? তোমরা কুক্কুট মাংস স্পর্শমাত্র করবে না। ব্রহ্মচর্যের মধ্যে যত ম্লেচ্ছাচার।" বলে টাংরী কাবাবে মন দিলেন।

"আপনার উপনয়ন হয়নি স্যার?" দাদা বললে।

"আমার কথা আলাদা। আমি যা করি, তা ভেবেচিন্তেই করি। প্রথমত, আমি এখন ব্রহ্মচারী নই, গার্হস্থ্য আশ্রমে আছি। সেটা অনেক কম কঠোর। দ্বিতীয়ত, এটা রাজদ্বার। আমি রাজকুমার যামিনীকান্ত, রজনীকান্ত, রমণীকান্ত তিনজনের সামনে বসে আছি। রাজদ্বারে সবই মার্জনীয়। এমনকী ভিতরবাড়িতে স্বয়ং রাজা ধরণীকান্তও আছেন। মনে রেখো, রাজদ্বারে সব মার্জনীয়। তৃতীয়ত, অধিকারী ভেদ আছে। অধিকারী হওয়া চাই। আমি বেদজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ। অধিকারী বলেই এমন অনেক কিছু করতে পারি, যা ব্রহ্মচারী অবস্থায় তোমরা আপোগণ্ডরা এখনই পারো না। আমার হৃদয়ে শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠিত, আমি যাই খাই, যেখানেই যাই, অশুচি হই না, যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং—বুঝলে হে ছোকরাদ্বয়, টাংরী কাবাব আমার চলতে পারে, কিন্তু তোমাদের চলে না।"

"কিন্তু আমরাও তো রাজদ্বারে"—দাদা তবু কথা কয়।

"না, তোমরা মাতুলালয়ে।" স্যার দাদাকে মাটিতে মিশিয়ে দেন।

এবার বড়মামা এগিয়ে এসে আমাদের হাতে টাংরী কাবাব তুলে দিয়ে, হেসে বললেন, "এই নে। নে, তোদের অধিকারী করে দিলাম। আর তিনবার মনে মনে পুণ্ডরীকাক্ষ পুণ্ডরীকাক্ষ পুণ্ডরীকাক্ষ বলে নে, তোরাও ইন আণ্ড আউট শুচি হয়ে যাবি, ও-মন্ত্রসকলের জন্য। সবার বেলায়ই এক কাজ দেবে। কেন ভাই জানকীবল্লভ এদের এত কষ্ট দিচ্ছ? বারবাড়িতে বাবুর্চির কিচেনে মুরগীটা চালু করে দিলেই পারো এবার। মাংস তো হচ্ছেই। তাহলে তুমিও বাড়িতে বসেই রুচিমতন মুরগী খেতে-টেতে পারো—হুইস্কিতে তোমার তো আসক্তি নেই। তাসেও না।"

সাহেবালির সঙ্গে আমরা তিনজনেই ফিরলাম। হেঁটে। পরদিন থেকে স্যারের বেদান্ত সোসাইটির রিসার্চের পরিসমাপ্তি ঘটল। খুদাবক্স আমাদের বাড়িতেই টাংরী কাবাব তৈরি করতে লাগল, ব্রেকফাস্টে মুরগীর ডিমের পোচ খাওয়া চালু হলো এবং যথানিয়মে রোজ সন্ধ্যায় আবার আমরা সংস্কৃত পড়তে বসলাম।

BanglaBook.org

দাদামণির আংটি

কী কুক্ষণেই যে অতোবড়ো শান্তিনিকেতনী চামড়ার থলেটা এনেছিলুম। ওঃ! না-হয় সস্তাই হয়েছে ফুলকপি, তাব'লে এ্যাতো কিনতে হবে?

—হ্যাঁ, হবে। ফুলকপির সিঙাড়া, ফুলকপির ডালনা, ফুলকপি ভাজা, এ্যাতোরকম গুষ্টির পিণ্ডি হবে কিসে? মেনু অরডারের বেলায় তো বাদশাই চাল।

—তোমার ভাষাটা একটু বদলাও। এ-যুগে ওরকম প্রাইমিভ্যাল ল্যাংগুয়েজ আর চলে না। বুঝলে গিন্নি? একটু পালিশ চড়াও।

—আর ফিউড্যাল অরডারগুলো চলে, না? হ্যান রাঁধেগা, ত্যান রাঁধেগা, তারবেলা? বিয়ে তো করেছো একটা রাঁধুনিকে, দরকার কী ছিল ইংরিজি অনার্সের? শুনি? নো নীড...পালিশ তো ছিলই। সব উঠে গেছে—

—কী করবো, কুকিং অনার্স তো এখনো চালু হয়নি, হোটেল ম্যানেজমেণ্ট লেভেলে এখন যদি-বা। তোমাদের উইমেন্স লিব-এ এটা সমস্তই করা উচিত। মেয়েদের নিজস্ব জগৎ গড়ার ব্যবস্থা নেই—

—কে বলেছে নেই? নিউট্রিশানের অনার্স কেন হয়, হোমসায়েন্সে হয়। কিন্তু, এই সবই যে উইমেন্স লিব সেটা তোমাকে কে বলেছে? বরং এর উল্টোটাই।

—উইমেন্স লিব তাহলে কী? উইমেন্স ওয়ার্লড তো? তার মানেই কিচেন? —দ্য ওয়ে টু আ ম্যানস হার্ট ইজ থ্রু।

—নিকুচি করেছে কিচেনের। এক্ষুনি ছুঁড়ে ফেলে দোবো তোমার ফুলকপির থলি—কে চায় পুরুষের হৃদয়ে প্রবেশ করতে? নোংরা জায়গা, কেবল অ্যামবিশান দিয়ে ভর্তি, আর লোভ দিয়ে। তোমরা ভাবো মেয়েদের আর কাজ নেই, কেবল পুরুষের হৃদয়ে প্রবেশের জন্যে হন্যে হয়ে অলি-গলি খুঁজছে?—সে-সব দিন আর নেই গো—গন ফরেভার! ওইসা দিন ঔর নেহী আয়েগা—বুঝলে স্যার?

—এই ফুলকপির পাহাড় রান্না তোমাকে নিজেই করতে হবে জেনে-শুনেও তো কিনলে? কেন কিনলে? কেউ কি সেধেছিল? টেল মি দ্যাট। হু ফোর্সড য়ু। যত্তোসব।

বেশ করেছি। অসম্ভব সস্তায় পাচ্ছি, তায় রিকশায় চড়ে আসতেই হবে, রাত হয়েছে, তোমার পকেটে অতগুলো টাকা। পথে একটু বাজার করে নিলে ক্ষতি কী? বইতে তো হচ্ছে না।

—কিন্তু এই যে পায়ের কাছে কয়লার বস্তার মতন এক বিপুল, যতই কারুকার্য করা হোক, সঙ্গীর বস্তা—এতে জানিটা খুবই আনকমফর্টেবল—

—রোজ রোজ তো যাওয়া হয় না ওদিকে, এক হপ্তার বাজার যে হয়ে গেল, সেটা ভাবছো না?—জানি আনকমফর্টেবল তো এরপরে হেলিকপ্টারে বাড়ি ফিরো।

BanglaBook.org

গাড়ি তো একটা কিনতে পারলে না। পঁচিশ বছর ধরে শুনে গেলুম কিনছি কিনছি।

—ট্যাক্সি থাকতে গাড়ি কেনে কেবল মূর্খরা আর কালোবাজারিরা। পঁচিশ বছর আগে আমি মূর্খ ছিলাম। অবভিয়াসলি।

—আমিও। ট্যাক্সি তো জীবনেও ধরতে পারো না। ধরো তো কেবল রিকশা।

—ট্যাক্সিশালারা যেতে চায় না যে! রিকশাওলারা ভদ্রলোক, প্রপার জেন্টেলমেন। চাইলেই পাবে—এবার থলেটা তোমার পায়ের দিকে শিফট করছি। অনেকক্ষণ শিটিয়ে বসে বসে ডান পাটা কেমন মানকচুর মতন হেভী ফিল করছি—

—"এই রিকশা, রোককে"—কারা যেন চেঁচিয়ে উঠল রাস্তায়। সাঁ-করে হঠাৎ একটা মোটরসাইকেল পাশের গলি থেকে বেরিয়ে এল। আর থামা দূরের কথা, রিকশাওলা রেসের ঘোড়া হয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে শুরু করলে। দাদামণি অমনি অস্থির—

—আশ্চর্য তো। থামতে বলছে আর তুমি ছুটছো? নিশ্চয় দেয়ার সামথিং। এ্যাই রিকশা। রোককে! রোককে! সামবডি মাস্ট বি ইল। নিশ্চয় শালারা ট্যাক্সি পাচ্ছে না তাই রিকশা খুঁজছে, হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে কাউকে—নাও, এবারে বওগে তোমার একমণ সস্তার সব্জীর বস্তা—ইতিমধ্যে মোটরসাইকেল রিকশার সামনে এসে ব্যাঁকা হয়ে থেমেছে। রিকশাওলার না দাঁড়িয়ে উপায় নেই, কিন্তু রিকশা সে নামায়নি। চড়া গলায় বললে—কা মাংতা? কেয়া কাহে কো? পাসিঞ্জার হ্যায়—

—চুপ রও, উল্লু কাঁহাকা। ছুটতা ক্যা কিউঁ? বলতে বলতে আরোহী দু'জন মোটরসাইকেল গাছতলায় পার্ক করে নেমে এল। একজন দাদামণির পেটে একটা খোলা ভোজালি ধরল। অন্যহাতে সব্জীর থলেটা তুলে নিয়ে নিঃশব্দে মোটরসাইকেলের পার্শ্বস্থ ক্যারিয়ার-খাঁচায় ভরে দিল। তারপর বাঁ হাতটা পেতে বললে—"যা আছে দিয়ে দিন।" কালবিলম্ব না করে স্বয়ংক্রিয় অঙ্গুলি তুলে ইনোসেন্টলি দাদামণি সোজা বউদির দিকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন—"যথাসর্বস্ব ঐ ভ্যানিটি ব্যাগে দাদা। পকেটে কেবল প্রাণটি। অন্য ছেলেটি ইতিমধ্যে বউদির দিকে একটা বেঁটে নলপানা যন্ত্র তুলে ধরে বলছে—"গয়নাগাটি গা থেকে সব খুলে দিন বউদি— তার কথায় কর্ণপাত না করে কলোশ্বাসে বউদি চেঁচিয়ে উঠলেন—"ওগো, ওই বোধহয় সেই জিনিস না গো, পাইপগান না কী যেন বলে? কাগজে ওটার নাম সেই কবে থেকে পড়ছি—এ্যাদ্দিনে স্বচক্ষে দেখা হলো—এটাই তো পাইপগান, না ভাই?" বন্দুক-হাতে ভাইটি তার ফলে বউদির হাঁটুতে ঠাঁই করে হঠাৎ একটা ঠোক্কর মেরে বললে—"মেলা চেল্লাবেন না বউদি, দয়া করে—গয়নাগুলো খুলে দিন— এদিকে বউদির পাঁটি ঘা খেয়েই ডাক্তারী হাতুড়ি-পরীক্ষার মতো সাঁ করে লাফিয়ে উঠে ছেলেটার বুকে অটোমেটিক্যালি লাথি মেরে ফেলল, ফলে ক্ষিপ্ত ছেলেটি বউদির পায়ের হাড়ে, আরেক ঘা ঠাঁই করে মেরে বললে, "লাথি মারছেন? সাহস তো কম নয়?" স্বভাবসিদ্ধ উচ্চকণ্ঠে বউদি বললেন—"তোমার বন্দুকে গুলি নেই বোঝাই যাচ্ছে। থাকলে অমন

BanglaBook.org

রুলারের মতো ঠাঁই-ঠুঁই যত্রতত্র চালাতে না। আর ওটাকে বলে অটোমেটিক রিফ্লেক্স। এটাও পড়নি?" দাদামণির বুকে ভোজালি-ধরা ছেলেটা বাঁ হাত বাড়িয়েই বউদির ব্যাগটা কেড়ে নিলে এবার। পাইপগানওলা ছেলেটা যেই বউদির ঘড়িটা খুলতে হাত বাড়িয়েছে—"ছোঁবেন না বলছি—ছোঁবেন না বলছি, মেয়েছেলের গায়ে হাত দিলে এ্যাইসা শিক্ষা দিয়ে দেবো—" বলে বউদি বিনা নোটিসে হঠাৎ চিল চেঁচিয়ে উঠলেন—"ঘড়ি কি আমি নিজে খুলতে জানি না? ছিনতাইও করবেন, অথচ ঘড়িটা খুলতে দু-মিনিট ধৈর্যি নেই গা?" বউদি ঘড়ি খুলে ধীরে-সুস্থেই ছেলেটার হাতে দিলেন। এবং বললেন—"হাতের চুড়িও নকল, কানের ফুলও নকল, আর গলার মালাটা পুঁতির। চাই? পরে ধরে থাপ্পড়-টাপ্পড় মারলে কিন্তু ভালো হবে না! কেউ এত রাত্তিরে আপনাদের উবগার করবে বলে সোনার গয়না পরে বের হয় না রাস্তায়।" ছেলেটা বললে—"কোনো কথা না বলে হাতের চুড়ি কানের রিং—

—"ও ভাই, ব্যাগে আমার অ্যানুয়ালের নম্বরগুলো আছে, ঐ দরকারী কাগজগুলো বেছে নিতে দিন, কেমন? আপনাদের তো—

—"অতো কথা বলবেন না। কাগজপত্র সর্ট-আউট করবার সময় নেই।—চুড়ি খুলে দিন, আসল-নকল আমরা বুঝবো। মালাটা পুঁতির হলে চাই না।" ভোজালি ততক্ষণে দাদামণির বিয়ের ঘড়িটাও বাগিয়ে নিয়েছে, আর বুকপকেট থেকে পার্সটা তুলে নিয়েছে। রিকশাওলা বললে—"আবতো কাম্ভি সারে খতম? হামকো ছোড় দো। ভুখ লাগা,সাড়ে দশ বাজ গিয়া— তাকেও এক গোত্তা মেরে পাইপগান বললে —"আগে গেঁজে খোল। গেঁজে খোল। কে টাকা বের করে দে"—এবার ক্ষিপ্ত রিকশাওলা বললে—"বাবু, ইয়ে আপ কা ওর রহেঁ হ্যায়, হাম গরীব আদমি—হামকো পৈসা চোরি করনা ঠিক নাহী, আপলোক তো রইস আদমী" ভোজালী বললে— "আরে আরে, ওকে ছেড়ে দে—চ' আর দেরি করিস না, শেষে ওরা রাউণ্ডে এসে পড়বে"—গোবদা শান্তিনিকেতনী চামড়ার ব্যাগে ছদ্মবেশী সব্জির থলি, দু-দুটো ঘড়ি, দাদার পার্স আর বউদির হ্যাণ্ডব্যাগ নিয়ে ওরা গরর করে মোটরবাইকে স্টার্ট দিয়ে হাওয়া হয়ে গেল। মনে হলো, যাবার সময় কী যেন ছুঁড়ে ফেলল রাস্তায়।

২

ইতিমধ্যে সামনে এক বাড়ির দরজা খুলে গেল। আলোর ফ্রেমে এক ভদ্রমহিলাকে আলুথালু বেশে ছুটে আসতে দেখা গেল। তিনি চেঁচাতে লাগলেন। পিছু পিছু পাঞ্জামা-পরা এক ভদ্রলোক পাল্লা দিয়ে ছুটে, তাঁর আঁচল ধরে টানতে লাগলেন—"থামো! ওগো, থামো! কই যাও"—ভদ্রমহিলা চেঁচিয়েই চললেন—"চোর! চোর! ছিনতাই! ছিনতাই! পালালো! পালালো! পাকড়ো! পাকড়ো!" বউদিও সঙ্গে সঙ্গে গলা মেলালেন। রীতিমতো শোরগোল পড়ে গেল। হাল ছেড়ে, রিকশাওলা এবারে হাতলটা মাটিতে নামিয়ে, সরে গিয়ে ফুটপাথে বসে পড়ল। দু'হাতে মাথা চেপে ধরে আপনমনে

BanglaBook.org

বলল, "রাম! রাম! শালে ডাকু, বদমাস!"

বউদি বললেন—"শান্তিনিকেতনী থলেতে সব্জী আছে বুঝলে, ওরা ওটা নিত না। অল্পবয়সী ছেলে তো। বুঝতে পারেনি। ভেবেছে হয়তো কাপড়চোপড় কিনে নিয়ে যাচ্ছি"—

দাদামণি বললেন—"পার্সটার দাম সাড়ে সাত টাকা। আর ভিতরে ছিল সাড়ে পাঁচ টাকার মতন—যাক বাবা, তের টাকার ওপর দিয়ে গেছে। আমার টাকাটা কিন্তু ইনট্যাক্ট আছে, হিপপকেটে, সীটের সঙ্গে লাগোয়া। ভাগ্যিস রিকশাটা নাবায়নি! রিকশাওলার গুণেই টাকাটা বেঁচে গেল। সাধে বলি ওরা জেন্টেলম্যান।"

—"আর আমার বাবার দেওয়া ঘড়িটা? সেটা যে গেল?"

—"ওটার তো পঁচিশ বছর হয়েছিল। অনেকদিন ধরেই আমার একটা জাপানী কম্পিউটার ঘড়ি কেনার ইচ্ছে—নেহাত ওটা ছিল বলেই—"

—"ওঃ, তাহলে তো বিয়ের ঘড়িটা গিয়ে খুব খুশিই হয়েছো—কী বলো? আপদ গেছে—"

—"আজকাল বড্ড স্লো হয়ে যাচ্ছিল—তোমারটাও তো নিয়ে গেছে—তার বেলায় দুঃখ করছো না তো?"

—"কেন করবো? তুমি জাপান থেকে এনে দিয়েছো বলে বড়োমুখ করে যাকেই দেখাতে যাই, বলে, এরকম তো এসপ্ল্যানেডে চল্লিশ টাকাতে পাওয়া যায়। গেছে গেছে, আপদ গেছে। বাড়িতে আমার বিয়ের ঘড়িটা তোলা আছে। সোনার ঘড়ি।"

—"আর হ্যাণ্ডব্যাগ? ওতে কত ছিলো?"

—"হ্যাঁ! হ্যাঁ! ব্যাগ! ব্যাগ! টাকাকড়ি তো সব বাজার করতেই বেরিয়ে গেল —কিন্তু ইশকুলের অ্যানুয়েলের নম্বরগুলো সব ওতে ছিলো গো—ব্যাটাদের আমি অতো করে বললুম, বলে কি, পেপার্স সর্ট করবার নাকি সময় নেই!"

—"ওর তো রাফ কপি পাবে বাড়িতে। নম্বরের তো কপি রাখো—অমন কচ্ছো কেন? আর কী কী ছিল? টাকা তাহলে ছিল না? তবু ভালো—"

—"মানিব্যাগটাই তো বিলিতি—মিনি ম্যানচেস্টার থেকে—ওর মধ্যে নবনীতার আনা মার্কিনি লিপস্টিকটা ছিল, আর তারার দেওয়া জাপানী কমপ্যাক্ট—আহাহা—ও-সব জিনিস আর কোথায় পাবো গো?"

বউদির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে মহিলা বললেন, "দেখুনগে যদি ফেলে দিয়ে গিয়ে থাকে। ওরা অনেক সময়ে শুধু টাকাটা নিয়ে, ব্যাগটা ফেলে দেয়— দাদামণি তখুনি ছুটলেন—"চলুন, চলুন, দেখি"—ইতিমধ্যে আরেকটি দরজা খুলে গেল। একটি দীর্ঘ ভয়ংকরদর্শন বল্লম হাতে নিয়ে স্লিপিংস্যুটপরা এক ভদ্রলোক বেরুলেন। বেরিয়েই, ওপরে বারান্দার দিকে একপলক তাকিয়ে নিলেন। সেখানে দেখা গেল একসারি দর্শক। নারী-পুরুষ-শিশু কিছু বাদ নেই। প্রত্যেক তলার বারান্দাতে মানুষ ভর্তি।

BanglaBook.org

এরা এতক্ষণ ছিল কোথায়? বল্লম হাতে ভদ্রলোক বললেন—"ব্যাগটা ওইখানে ফেলে দিয়েছে। ঐ যে। আমরা বারান্দা থেকে দেখিচি।" ভেংচে উঠে বউদি বললেন —"দেকেচেন তো নামলেন না কেন নিচে? চেঁচালেন না কেন? এখন এসে কী হবে?"

—"নামতেই তো চেষ্টা করচি সমানে। আনআর্মড হয়ে তো নামা যায় না! চেঁচালে যদি আপনাদের কোনো ক্ষতি করে দেয়? গুলিটুলি মেরে দেয়? এই রমলার জন্যেই তো যত গোলমাল হলো।"

—বারান্দা থেকে উত্তর এল—"ওঃ, রমলার জন্যেই বুঝি গোলমাল? কে বললে যে, ছিনতাই হচ্ছে, দেখবে এসো? কে বললে নাগাল্যাণ্ডের বল্লমটা দেয়াল থেকে নাবিয়ে নিয়ে তেড়ে যাও?"

—"বল্লমটা তুমি দড়ি দিয়ে বেঁধে না রাখলেই তক্ষুনি আসা যেত। অ্যাবসার্ড যত বুদ্ধি! বেঁধে রেখেছে!"

—"দড়ি দিয়ে না-বেঁধে কেউ বসবার ঘরে ট্রাইবাল অস্ত্রশস্ত্র সাজিয়ে রাখে না। হাওয়া দিলেই ঘাড়ের ওপর পড়ে যায়। হুকে টাঙানো থাকে না। পুরুলিয়ার তীরধনুক তো রোজই পড়ে যেত।" এতক্ষণে খেয়াল কবি মস্ত একটা তীরধনুক হাতে করে বছর-বারোর একজন ছেলেও ওই বারান্দায় শূন্যে তাক করছে।—সেও বললে—"তীরধনুকটা সময়মতো মা নামাতে পারলেই আমি লোকদুটোকে এখান থেকেই খতম করে দিতে পারতাম। কিন্তু মা এমনই গেট বেঁধে রেখেছিলেন— যে সেটা খুলতে খুলতেই ডাকাত পালিয়ে গেল—।" নাগাদের বল্লম হাতে ভদ্রলোক আবার বললেন, "ঐ তো আপনার ব্যাগ।" এমন সময় দাদামণি, হঠাৎ কিছু মনে পড়ে গেল, এমনভাবে বললেন,—"আচ্ছা, তোমার চুড়ি, কানের ফুল সবই নকল ছিল, সত্যি? আমি তো ভাবতুম সোনারই। নাকি গুল মারছিলে?"

—"নাঃ। নকল। কেবল গলার মঙ্গলসূত্রটাই সোনায় গাঁথা। যেটা ওরা পুঁতির মালা বলে নিলে না।" বউদি সগর্বে গলার মালাটা ছোঁন। সস্নেহেও। দাদামণি কাতরে ওঠেন—"আংটি? তোমার আংটি কই? ওটা তো কমলহীরে।"

—"আছে আছে—গায়ে হাত দেবেন না বলে চেঁচাতে চেঁচাতে ওটাকে ব্লাউজের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলেছি।" বউদি মহান এক তৃপ্তির হাসি হাসেন। ওটাই যা এক দামী গয়না। দাদামণির ফুলশয্যের রাত্রের উপহার। যতই ঝগড়া করুন, বউদি ওটা হাত থেকে খোলেন না। হীরেটাকে ভেতরদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে পথে চলাফেরা করেন। ব্যাগটা নিয়ে এলেন ঐ ভদ্রমহিলা। ব্যাগটা খালি। ভেতরে কিচ্ছু নেই। তাড়াহুড়োতে চেনের ক্লিপটাও ছিঁড়ে ফেলেছে। তবু ব্যাগটা তো পাওয়া গেল! ভেতরে অবশ্য ম্যানচেস্টারের মানিব্যাগ নেই। বৌদি ব্যাগ বগলে করে বললেন—"হতচ্ছাড়ারা আমার বিদেশী লিপস্টিক, জাপানী কমপ্যাক্ট, সবগুলো নিয়ে নিলে? মায় অ্যানুয়ালের নম্বরগুলো পর্যন্ত? মানিব্যাগ যে নেবেই সেটা না-হয় বুঝি।"

BanglaBook.org

—"আর তোমার ফুলকপি-কড়াইশুঁটির জন্যে দুঃখু হচ্ছে না?"

—"বাজে বোকো না।"

—"চলিয়ে বাবুজী চলিয়ে—ঔর কুছ নাহি মিলেগা—" রিকশাওলা এবার উঠে দাঁড়ায়। ভদ্রমহিলা বললেন—"আপনারা পুলিশে এফ. আই. আর. করুন। এই নিয়ে এখানে অনেকবার ছিনতাই হলো। আমিই তো সেকেণ্ডবার দেখলুম। উনি কিছুতেই বেরুতে দিলেন না, নইলে ব্যাটাদের ঠিক আটকানো যেত। জাপটে ধরে রইলেন, এত বীরপুরুষ।" স্বামী ককিয়ে ওঠেন—"বেরুতে দিলেন না? না দিলে বেরিয়েছ কী করে?"

—"সে চোর পালালে বেরিয়ে কী লাভ? অন্যলোকে একটু চেঁচামেচি করলেও তো লাভ হয়? পালিয়ে যেত"—

বউদি বলেন—"হয়তো! আপনারা কিন্তু বল্লম খোলাখুলি না করে যদি ঐ দোতলা থেকেই একটু হাঁকডাক করতেন, 'চোর চোর' বলে চেঁচাতেনও তাহলেই ব্যাটারা পালাতো। ওদেরও তো প্রাণের ভয় আছে!"

—"আচ্ছা,এর পরের বারে তাই করবো"—দোতলার ভদ্রমহিলা জানালেন। —"ওপর থেকেই চেঁচাবো, যদি তাতে কিছু হয়। আমি তো খেয়েদেয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম, স্বচক্ষে সবটাই দেখেছি। একটা লোক ওঁর পার্সটা বের করে নিলে, সেই লোকটাই এঁর হ্যাণ্ডব্যাগও নিয়ে নিলে। আমাটা কেবল ভদ্রমহিলার হাঁটুতে ঠাঁই-ঠাঁই করে মারছিল—গয়নাগুলোর জন্যে—" শুনেই বউদি চেঁচিয়ে ওঠেন—"বাপ রে, হাঁটুতে আমার একেই আরথ্রাইটিস। খুব টনটন করছে"—

বউদিকে থামিয়ে দাদামণি বলেন, "এতটাই দেখেছেন? তবে আপনিও থানায় চলুন, সাক্ষী দিতে হবে তো?"—দাদামণি হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠতেই, স্লিপিংস্যুটের ভদ্রলোক বল্লম উঁচিয়ে বললেন—"পাগল নাকি? এত রাত্তিরে কে থানায় যাবে? ওর যত বেশি বেশি কথা বলা অভ্যাস।" বউদি ব্যাপারটা হাল্কা করতে বললেন —"তা, অল্পের ওপর দিয়েই গ্যাছে—ওঁর পকেটে ন'শো টাকা ছিল"—

—"আংটিটা কোথায়?" দাদামণি এক ধমক দেন।

—"এই যে"—বলেই বউদি জামার ভেতর হাত পুরে, আর কিন্তু আংটিটা খুঁজে পেলেন না। আঁতিপাঁতি খুঁজেও না। রিকশাতেও পড়েনি। তবে কি রাস্তায়? উপস্থিত কৌতূহলী ব্যক্তিবৃন্দ প্রত্যেকেই এবার পথের ওপর উপুড় হয়ে একমনে চাঁদের আলোয় কমলহীরের আংটী খুঁজতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। কে বলে বাঙালী পরের জন্যে করে না? কে বলে বাঙালীর ঐক্য নেই? রাস্তা খুবই স্বল্পালোকিত। যদিও লোডশেডিং নয়, তবু অন্ধকারই। ঠিক এইখানটাতে আবার একখানা গাছের ধাবড়া ছায়া। ঝিরঝিরে চাঁদের আলোয় আংটি খোঁজা রীতিমতো রোমাণ্টিক হয়ে দাঁড়ালো। তবুও ইনস্ট্যান্ট সার্চ পার্টি কাজে লেগে গেল। অনেকক্ষণ খোঁজ চলল। পরস্পরের দিকেও নজর আছে কড়া। অন্য কেউ না-পেয়ে যায়। কিন্তু পাওয়া

BanglaBook.org

গেল না। রিকশাওলাও খুঁজছিল, দাদা-বউদির সঙ্গে।

—"নকল গয়নাগুলোর সঙ্গে আপনি ওটাও নির্ঘাৎ দিয়ে দিয়েছেন"—

—"জামার মধ্যে আর ভরা হয়নি, হাতেই ছিলো মনে হয়"—

—"এফ. আই. আর-এ আংটিটাও মেনশন করে দেবেন"—

—"নিশ্চয়ই ওরাই নিয়ে গেছে। নইলে হীরের আংটি তো, এত খুঁজে ঠিকই পাওয়া যেত।" উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের মতের সঙ্গে দাদামণিরও মত অভিন্ন। বউদিই জীবনে প্রথমবার প্রায় নির্বাক।—"কিন্তু, কিন্তু আমি সত্যিই জামার মধ্যে"—দাদামণি এক ধমক লাগান—"বাজে কথা বোলো না, জামার মধ্যে হলে যাবে কোথায়?"

রিকশাওলা ক্লান্ত গলায় বললে—"বাবু, আব ক্যা করেগা? থানেমে যায়েগা? চলিয়ে"—

—"মোটেই না। আগে বাড়ি যাবো। আমার বেচারা ছেলেপুলেগুলো ভয়েই মরে গেল এতক্ষণে। এবং খিদেতেও। কে যাবে থানায়? আগে ওদের দুটো ভাত বেড়ে দিইগে যাই—চলো হে রিকশাওলা, পয়লে যিধার বোলা থা, ওই ঘরমে চলো।" বউদি রিকশাওলাকে ডিরেকশন দিয়েই পড়শীদের ধন্যবাদ দিতে থাকেন: "আচ্ছা ভাই! থ্যাংকিউ! থ্যাংকিউ! অনেক করলেন আপনারা—এই মাঝরাত্তিরে শীতের মধ্যে—বল্লম-টল্লম নিয়ে"—

—"কী আর করেছি, কিছুই তো করিনি। এ আর এমন কি, এ তো সবাই করে, নইলে মানুষ সমাজে আর বাস করবে কেন—এফ. আই. আর.-টা কিন্তু দাদা আজই করতে ভুলবেন না—ভেরি সরি, আমাদের পাড়ায় এসে আপনাদের ক্ষতি হয়ে গেল"—এইসব মধুর আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে রিকশাওলা দাদামণির বাড়ির দিকে ছুটলো।

৩

খাবার টেবিলে তুলকালাম বেধে গেল।—"রিকশাওলাকে দশটাকা দেবার কী হয়েছিলো, শুনি?"

—"ওরই জন্যে তো নশো টাকা বেঁচে গেছে। ও যদি রিকশাটাকে একবারও রাস্তায় নামাতো, তবেই ওরা আমাদের টেনে নাবিয়ে বডি সার্চ করতোই এবং টাকাটি পেয়ে যেতো—দারুণ নার্ভ এবং উপস্থিত বুদ্ধি ঐ রিকশাওলাটার"—

—"খুব সম্ভব দলেরই লোক—ষড় ছিলো কিনা কে জানে?"

—"বাজে কথা বোলো না। তাহলে রোককো বলতেই অমন ছুটতো না। রিকশাটি নাবিয়ে, পিটটান দিতো—নাঃ, সত্যিই তুমি বড্ডোই মীন-মাইনডেড।

"চলো এবার থানায় যাই। সত্যি, এফ. আই. আর. করতেই হবে। হলো তোমার কাঁটা চিবুনো? রাত বাড়ছে।"

BanglaBook.org

—"আগে অনুপদাকে বরং একটা ফোন করে দাও? আর বাচ্চুদাকে? ওদের তাড়া না খেলে থানা আঙুল নাড়বে?"

—"বাচ্চুকে করেছি। অনুপ বোসকে এসব ছোট ব্যাপার নিয়ে ঘাঁটানো চলে না, বুঝেছো? বাচ্চুকেও চলে না, তবে কিনা, সে ক্লাসফ্রেণ্ড।"

—"যদি খুন করে দিত? ছিলো তো পাইপগান, ভোজালি।"

—"তাহলে নিশ্চয় বলতুম। খুন তো করেনি। দিব্যি বহালতবিয়তে কাঁটা চিবুচ্ছ।"

—"করলে খুশিই হতে মনে হচ্ছে।"

—"তা বলতে পারি না। ইফ ইউ ওয়ান্ট মাই অনেস্ট ওপিনিয়ন, মাঝে মাঝে আমারই তো তোমাকে খুন করতে ইচ্ছে করে।"

—"আমারও। জেনে রেখো আমারও করে। নেহাৎ হিন্দুঘরের বিবাহিত স্বামী, তাই বেঁচে রয়েছো। মাছকাটা বঁটিটা আমার হাতেই থাকে। তোমার ঐ লেটার-ওপনার দিয়ে খুন হয় না।"

—"হয় হয়, তেমন কায়দা জানলে আলপিন দিয়েও খুন হয়।"

—"মা, তোমরা কাল বরং থানায় যেও। এখন দ্যাখো, আলপিন আর লেটার-ওপনার দিয়ে কদ্দুর কী হয়।"

—"তুই চুপ করে থাক দিকিনি খোকন। সব কথায় কথা।" এবার বাবলুও বলে।

—"রাত প্রায় বারোটা বাজে, মা। যাবে তো যাও। নিচের ব্যানার্জিকাকু কখন গাড়ি বের করে ওয়েট করছেন তোমাদের থানায় নিয়ে যাবার জন্যে। ওঁরাও তো শোবেন, নাকি?"

BanglaBook.org

৪

বুটপরা দু'পা টেবিলে। সামনে এক ভাঁড় চা। বাঁ-কানের ফুটোয় দেশলাইকাঠি ঘুরছে। এক চোখ খুলে ভদ্রলোক বললেন—"এগুলোকে কে এখানে ঢোকালে?" সেপাই কাঁপতে কাঁপতে বললে—"আমি ঢোকাইনি স্যার। অনেক বারণ করিছিলুম, জবরদস্তি ঢুকে পড়লো। এফ. আই. আর. করবেই। ছিনতাই কেস।"

—"হুঁ। নিকাল দো। এখন রাত বারোটা। কাল হবে।"

—বউদি হঠাৎ ফেটে পড়লেন, যেন আণবিক বিস্ফোরণ ঘটল। "ক্যানো, ইয়ার্কি পায়া? নিকাল দো? ক্যানো? সরকারি পয়সায় টেবিলে ঠ্যাং তুলে সরকারি পয়সায় চা খেতে খেতে ভারি তেল হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। ঠ্যাং নাবিয়ে ভদ্রলোকের মতন বসুন তো? ট্যাক্স-পেয়ার্স-মানিতে আপনি মাইনে পান। বুঝলেন? এবং ইউ আর অন ডিউটি নাউ। বুঝলেন? খাতা বের করুন। এফ. আই. আর. নিতে আপনি বাধ্য। নইলে আপনার নামেই এফ. আই. আর. করবো।" ভদ্রলোকের কানের ফুটোতে দেশলাই থেমে গেছে। সত্যিসত্যিই পা নাবিয়ে খাড়া হয়ে বসে, চিবিয়ে চিবিয়ে

বললেন—"এটা পুলিশ থানা। আপনাদের কেমন করে সিদে করতে হয় সেটা আমরা জানি। রঘু।" হুঙ্কারে একটুও ভীত না হয়ে বউদি বললেন, "আর আপনাদেরও কেমন করে সিদে করতে হয় সেটাও আমরা জানি। উঃ হু, কী হচ্ছে কী? অত জোরে চিমটি কাটে? জানো না আমার হাঁটুতে কীরকম ব্যথা? তার ওপরে হাঁটুতেই অতবার ব্যাটারা মারলে, পাইপগান দিয়ে—উহুহুহু—"

—"রঘুবীর! শুনতা নেহি?"

—"জী হুজুর।"

—"ইসকো নিকাল দো। নেহিতো লকআপমে—"

এবার দাদামণি অত্যন্ত ভদ্র, নিচু গলায়, প্রায় লজ্জা দেবার মতো সুরে প্রেমনিবেদনের মতো বললেন—"আপনিই কি এই থানার ও. সি.? আপনি এফ. আই. আর.-এর খাতাটা বের করবেন? আমরা ছিনতাই কেস রিপোর্ট করতে চাই।"

—"চান তো বেশ ভালো কথা। রাত বারোটায় ওসব হবে না। কাল সকালে আসবেন। এখন যান।"

—"ছিনতাইটা এখনই হয়েছে কিনা।"

—"ছিনতাই রাতে হবে না তো কি দিনের আলোয় হবে? ও আকচার হচ্ছে মশাই। ও নিয়ে মাথা ঘামালে থানাগুলো উঠে যেত।"

—"থানা তো উঠেই গ্যাচে যা বুঝছি—", বউদি ফের কথা বলে ওঠেন। —"আপনারা কি পুলিশ? অ্যাঁ? কুঁড়েমির পাহাড় এক-একজন। দেখলে গা গুলিয়ে ওঠে। নিন, খাতা বের করুন। কাল সকালে সবার আপিস আছে। এখানে বসে রগড় করবার সময় নেই আপনার মতন।"

ও.সি.-কে দেখে মনে হলো ভদ্রলোক নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। মিস্টার ব্যানার্জি হঠাৎ এই সময়ে বললেন—

—"আমি গাড়িতে গিয়ে বসছি। আপনারা কাজটা মিটিয়ে আসুন। শেষে গাড়িটাও চুরি হয়ে গেলে, এরা তো কিছুই করবে না। যা বুঝচি। যত্তোসব কেলোর কীর্তি। এ্যাদ্দিন শুনিছিলুম বটে থানাগুলোতে কীরকম কী হয়, এবারে চোখে দেখলুম। এ্যাদ্দিন বিশ্বাস করিনি।" শব্দ করে বেঞ্চিটা ঠেলে, ব্যানার্জিসায়েব, এমনিতে নেহাৎ শান্ত নিপাট ভালোমানুষ, ঘুম পেয়েছে না কী হয়েছে কে জানে, রেগে গটমট করে বেরিয়ে গেলেন।

—"কই, খাতা কই?" —খাতা বের না করেই ভদ্রলোক বললেন।

—"কোন রাস্তায় হয়েছিল?" দাদামণি গম্ভীর হয়ে উত্তর দিতে শুরু করেন।

—"অমুক রোডের সঙ্গে তমুক লেনের মোড়ে।"

—"কটার সময়ে?"

—"দশটা। সাড়ে দশটায়।"

BanglaBook.org

—"দশটায়। না সাড়ে দশটায়?"

—"দশটা পনেরো।"

—"কজন লোক ছিল?"

—"আমরা দুজন। আর রিকশাওলা।"

—"রিকশাওলা কই?"

এবার বউদি মুখ খোলেন।

—"সে চলে গেছে। সে খাবে না? শোবে না? ওকে জ্বালিয়ে লাভ কী?"

—"ধরে আনুন। মেইন উইটনেসকেই ছেড়ে দিয়েছেন?"

বউদি—"আপনারাই ধরে আনুন। আপনারাই পুলিশ। এবার খাতা বের না করলে একটা কথারও জবাব দেব না। একে. এফ. আই. আর. করা বলে না, লিখে নিচ্ছেন না কিছুই। গপ্পো মারছেন।"

—"সেটা আমি বুঝব।"

বউদি—"আপনি বুঝলে খাতা বের করতেন।"

—"কজন লোক ছিল?"

—"আমরা দুজন। আর রিকশাওলা। কবার বলব?"

—"সেকথা হচ্ছে না। ছিনতাই পার্টির আমারদের কথা—"

—"দুজন।"

—"পায়ে হেঁটে? না সাইকেলে? বয়েস কত? আপনি থামুন, ওঁকে বলতে দিন।"

—"মোটরসাইকেলে। বয়েস বেশি নয়। ত্রিশের নিচে।"

—"কোন মেক? কী রং?"

—"রাজদূত। ব্ল্যাক। যদ্দুর মনে হয়, ছায়া ছিল কিনা গাছতলায় তো?"

—"আঃ! কেন যে বকছো শুধু শুধু? দেখছ না কিছুই লিখে নিচ্ছে না?"

—"লেখা হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটা আপনাকে ভাবতে হবে না। প্রশ্নের জবাব দিন।" এমন সময় ফোন বাজলো।

৫

রঘুবীর ধরলো ফোনটা। তারপরেই দৌড়োতে দৌড়োতে এলো—ও.সি. বললেন, —"কে? বীরুবাবু তো? বলে দে এখন হবে না।"

—"না স্যার, আই. জি.!"

—"কক কেঃ?"

—"আই. জি.! কথা বলবেন স্যার। আপনার সঙ্গে।" মুহূর্তের মধ্যে তড়াক

BanglaBook.org

করে লম্ফ দিয়ে ও. সি. ফোনে। কথাবার্তা হলো। অল্প কিছুক্ষণই মাত্র। তারপরেই ম্যাজিক। ফিরে এসে টেবিলে সামনেই পড়ে থাকা একটা লম্বাটে বিলবুক টাইপের খাতা টেনে নিয়ে ও. সি. বললেন, গলায় বিনয় ঝরে পড়ছে, "নমস্কার! নমস্কার! আপনারাই কি ডক্টর চক্রবর্তী? আরে, আরে, কীঃ আশ্চর্য! আগে বলবেন তো? কী মুশকিল। রঘুবীর। চা লাও। চা খাবেন নিশ্চয়ই? গাড়িসে ওই বাবুকো বুলাও। গাড়ি পর ছট্টু সিংকো নজর রাখতে বোলো। এ্যাতো আজেবাজে লোক এসে সময় নষ্ট করে। বুইলেন না? আগেই তো খুলে বলতে হয় আপনি আইজির ফ্রেণ্ড? বলুন, বলুন কী ব্যাপারটা হয়েছিল। সত্যি এ শালাদের জ্বালায় একটু রাত করে আর পথে বেরুনোর উপায় নেই।" খাতা খুলে কলম বাগিয়ে বললেন—"অমুক রাস্তার মোড়ে, অতটার সময়ে একটা কালো রাজদূতে চড়ে দুজন কালপ্রিট, কত যেন বয়েস? হ্যাঁ, তিরিশের নিচে, কী কী নিলে? আরে সব্জীর থলে? হাউ স্ট্রেঞ্জ। এতদিন এত ছিনতাই হওয়া শুনিচি মশাই— ঘড়ি, চুড়ি, হার, হ্যাণ্ডব্যাগ, এসবই নেয়, সব্জীর থলে এই ফার্স্ট টাইম। হ্যাঁ সব্জীর থলে, ডিটেল চাই বা, আর কী? দুজনের দুটো ঘড়ি—কী কী মেক? ফেভার-লিউবা, আর ক্যাসিও? লেডিজ? না? আর? পার্স? কত ছিল? সাড়ে পাঁচ টাকা? ধুর মশাই, ওটা আবার একটা অ্যামাউন্ট হলো? হ্যাণ্ডব্যাগে? সামান্যই? কত ঠিক মনে নেই? জাপানী পাউডার-কমপ্যাক্ট, আর আমেরিকান লিপস্টিক, আর বিলিতি মনিব্যাগ ছিল? আর? অ্যানুয়্যালের মার্কস? সে যাগগে, আর? গয়নাগাটি কী কী নিলে? জেন যে গয়না পরে ঘুরে বেড়ান। ওঃ নকল? কানের ফুল, আর চুড়ি? আঁ কী বলছেন মশাই? কমলহীরের আংটি? রিয়্যাল? কোন আক্কেলে ওটা পরে ঘুরছিলেন পথে পথে? অ। সেন্টিমেন্ট। তা গেল তো? দেখি, যদি এইবেলা চেপে ধরলে উদ্ধার হয়। চলুন, সাইটেও একবার যেতে হবে। মোটরসাইকেলটা রাজদূতই ছিল তো? কী করে বুঝলেন অন্য কিছু নয়? কোথায় পার্ক করা ছিল? গাছতলায়? কী গাছ? জানেন না? বড় গাছ? ঝিরঝিরে পাতা? কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া? বাঁদরলাঠি, শিরীষ? যে-কোনো কিছু হতে পারে? ছায়া-ছায়া ছিল? তবে কেমন করে এত ডেফিনিট হচ্ছেন যে ওটা রাজদূত, ইয়াজদানি না? ছায়াতে গাছ চিনতে পারছেন না, অথচ মোটরসাইকেলের মেক পড়তে পারছেন?"

—"আহাঃ", দাদামণি এবার অস্থির—"আমাদের অফিসের একজন আমার কাছে খানিক ধার নিয়েছিল একটা রাজদূত কিনবে ব'লে। কেনার পর আমাকে প্রায়ই চড়াতো যে। রাজদূতটা আমি তাই চিনি" বলেই বউদির দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে নিলেন।

—"বেশ। সে লোকটার নাম-ঠিকানা? রাজদূতটার নম্বর কত?

—"আরে সেই লোকটা তো ছিনতাই করেনি। তার নাম-ঠিকানা দিয়ে আপনার কী হবে?"

"—এই যে বললেন রাজদূতটা চেনেন।"

"—মেকটা চিনি বলেছি। যেমন লোকে ফিয়াট চেনে, মারুতি চেনে, মার্সিডিজ চেনে। ওটা রাজদূত ছিল। নম্বর জানি না। কালো রঙ।"

—"লোকগুলো কেমন দেখতে?"

—"ভালো করে দেখিনি মশাই। সাধারণ চেহারা, তবে ভদ্রলোকের মতন দেখতে। কথাবার্তার টানেও মনে হলো লেখাপড়া শিখেছিল কোনোকালে।" এবার বউদি কথা বলেন—"আমি বলছি। চান তো লিখুন। কালো, শুটকোপ্যানা, মুখে বসন্তের দাগ, গায়ে নস্যিরঙ চাদর, সে ব্যাটা মোটরসাইকেলের পেছনে বসে চলে গেল। পরনে প্যান্টই ছিল, ঘন রঙ। অন্য ব্যাটাচ্ছেলের দিব্যি কার্তিকের মতন চেহারা, বেশ ফর্সাপানা, গোঁপ আছে, অল্প অল্প দাড়িও আছে। কালোরঙের লেদার-জ্যাকেট পরা, শাদাপ্যান্ট। ব্যাটারা কেউই হেলমেট পরে ছিল না। অথচ শুনেছিলুম নাকি মোটরসাইকেলে দুজনেরই হেলমেট পরা আইন? এইটারই মোটরসাইকেল মনে হলো, এটাই চালাচ্ছিল এবং আমার হাঁটুতে পাইপগান দিয়ে বারবার ঠোক্কর মারছিল। বেজায় রাগী। আলোয়ান গায়ে লোকটা ভোজালি হাতে হলেও অনেক ধীরস্থির। যা কিছু লুঠপাট অবিশ্যি সেই করেছে, ব্যাগ, পার্স, ঘড়ি-টড়ি। লেদার-জ্যাকেট কেবল গয়না-গয়না করেই মরছিল। বললুম নকল, তবুও নিয়ে নিলে। এমনই স্টুপিড। আংটিটা ঐ ফাঁকে কী গোলেমালে কখন যে ওদের কাছে চলে গেল, আমি লুকোতে চেষ্টা করেছিলুম ব্লাউজের মধ্যে। ঠিকমতো পেরে উঠিনি দেখছি।"

—"তা পারবে কেন? নকলগুলোর সঙ্গেই হ্যাণ্ডওভার করে দিয়েছ।"

—"চলুন, সাইটে যাই। পাড়ার লোকেরা সাক্ষী ছিল?

—"ছিল। প্রচুর। বারান্দা থেকে মজা দেখছিল, জানলা দিয়ে মজা দেখছিল, ডাকাতরা ভেগে যাবার পরে সবাই বেরিয়ে এল, সড়কি-তীরধনুক নিয়ে। যেন বনবাসী রাম-লক্ষণ-সীতা।"

—"সড়কি? তীরধনুক? কী বলছেন আপনি?"

—"ঠিকই বলছি। চলুন স্বচক্ষে দেখে চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করে আসবেন। এক মহিলা ছুটে আসছিলেন ডাকাতদের বাধা দিতে, কিন্তু তার স্বামী দুহাতে বউয়ের কোমর চেপে ধরে 'ওগো যেও না, ওগো যেও না', ব'লে চীৎকার করছিল।"

—"যাঃ। হতেই পারে না। মহিলা ছুটে আসছিলেন, আর ভদ্রলোক—

—"চলুন না, হতে পারে কি পারে না জেনেই আসবেন।" বউদির ইস্পাত স্বরে বিব্রত দাদামণি বাধা দেন—

—"না না, এখন কী করে যাবেন? রাত প্রায় একটা বেজে গেল। এখন তাঁদের বিরক্ত করা—"

—"পুলিশের ওসব টাইম-বেটাইম নেই বুঝলেন। রঘুবীর। চা কী হলো? ও, এই যে। নিন চা-টা খেয়েই চলুন যাই। ছোট্টু সিংকো বোলো, গাড়ি নিকালনা।

রামলাল আউর শম্ভু সাথমে চলেগা। সাইটমে যানা হ্যায়। সীরিয়াস কেস। জলদি করো।"

৬

খটাখট! খটাখট। খটাখট। দমাদ্দম।

—"কে? কে ওখেনে?" (স্ত্রীকণ্ঠ)

—"খুলো না বলছি। সাড়া দিও না। চুপ। চুপ।" (পুংকণ্ঠ)

—"সাড়া কেন দেব না? কে ওখেনে? দোর যে ভেঙে ফেলবে!"

—"খুলুন। খুলুন। পুলিশ।"

—"পুলিশ বলছে। খবদ্দার খুলো না। মিথ্যেকথা।" (পুং)

—"পুলিশই হও, আর ডাকাতই হও, দোর ভেঙে ফেলবার কী দরকার? কী চাই? এত রাত্তিরে হামলা কিসের?" (স্ত্রী)

—"দরজা খুলুন। ভয়ের কিছু নেই। পুলিশ।"

—"ভয়ের কিছু নেই, পুলিশ? পুলিশ মানেই ভয়ের কিছু।" (পুং)

—"আগে বলুন কোন থানা থেকে এয়েচেন, কী প্রয়োজন।" (স্ত্রী)

দমাদ্দম। দমাদ্দম। ঠাস। দড়াম।

—"ওরে বাপরে। তাইলে ভেঙেই ঢুকুন। আমি খুলব না।" (স্ত্রী)

এবার দাদামণি বললেন বউদিকে, "তুমি কথা বলে দেখ না? ওরা ভয়ে খুলছে না।" বউদি গলা খাঁকারি দিয়ে—"দিদি? আমরা। আমার মোটে ইচ্ছে ছিল না মাঝরাত্তিরে এভাবে আপনাদের বিরক্ত করা। পুলিশব্যাটারা শুনলে না। দেখুন না, জোর করে ধরে নিয়ে এসে হামলা কচ্চে। সেই ছিনতাই কেস।" দোর খুলে গেল। ভদ্রমহিলা। পেছন পেছন পুংকণ্ঠ—

—"একটাও কথা বলবে না। কোনো স্টেটমেন্ট দেবে না বলে দিচ্ছি. পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা—একেবারে সাইলেন্স।"

—"কী ব্যাপার?"

—"আপনি ছিনতাই করা দেখেছিলেন?"

—"ঠিক দেখিনি, তবে টের পেইছিলুম। যখন পালাচ্ছিল তখন দেখেচি। দুটো লোক। মোটরসাইকেলে চড়ে পালালো।"

—"সময় কত? তখন?"

—"এই দশটা-সাড়ে দশটা হবে।"

—"দশটা, না সাড়ে দশটা? ঠিক করে বলুন।"

—"থামুন মশাই। আমি কি ঘড়ি দেকিচি? ওই দশটা-সাড়ে দশটাই লিখে নিন। খেয়ে উঠে পান সাজছিলুম।"

—"সোয়া দশটা লিখে নিন না।" (পুংকণ্ঠ)

BanglaBook.org

—"মোটরসাইকেলের রঙ কী ছিল? নম্বর কত ছিল?"

—"কালোই তো রঙ মনে হলো। অন্ধকারে কী নম্বর দেখা যায়?

—"ছিনতাইকারীদের কেমন দেখতে?"

—"তারা কি আমার মেয়ের পাত্তর? যে যত্ন করে দেখব? ব্যাটারা হুশ করে বেরিয়ে গেল, পেছন থেকে দেখলাম। মুখটুকু দেখিনি। কালো-জ্যাকেট, শাদা পেণ্টুলুন। আরেকটার গায়ে চাদর।"

—"যাদের ছিনতাই করা হলো, তাঁরা ক'জন ছিলেন?"

—"স্বামী-স্ত্রী দুজন। বাজার করে ফিরছিলেন। বললেন তো বাজারের থলেটাও নিয়ে গ্যাছে। আশ্চয্যি!"

—"হেঁটেই ফিরছিলেন? স্বামী-স্ত্রী?"

—"না না। রিকশোতে। এই তো, ইনি আর উনি।"

—"জায়গাটা চিনিয়ে দিতে পারবেন? যেখানে ছিনতাই"—

—"কেন পারবো না? কতক্ষণ ধরে আংটি খোঁজা হলো সেখেনে।"

—"মানে?"

—"মানে, উনি বলছিলেন হীরের আংটিটা ওদের হাতে খুলে দেননি, কিন্তু সেটা ওঁর হাতেও নেই। যদি পড়ে গিয়ে থাকে, তাই আমরা সবাই খুঁজছিলুম রাস্তায়।"

—"পাননি?"

—"নাঃ। টর্চ ছিল না অবিশ্যি সঙ্গেরই।"

—"জায়গাটা একবার যদি কাইণ্ডলি—"

—"এত রাত্তিরে বেড়িও না বলছি— (পুং কণ্ঠ)

—"তবে তুমিই যাও।"

—"আমি তো শুয়ে পড়িচি।"

—"তবে বাকি কেন বেরুচ্চে? চলুন দেখিয়ে দিচ্চি।"

—"আর কে কে বেরিয়ে এসেছিলেন?"

—"ঐ তো ওইখেনে ফ্ল্যাটবাড়ির অনেকেই বেরিয়েছিল। একজন তো একটা বর্শা না বল্লম কী যেন অস্তর নিয়ে বেরুল। যেন যাত্রাপার্টি।"

—"শুনলেন তো? বউদি। সড়কি-বল্লম ছিল কিনা? শুধু তাই নয়। বারান্দায় তীরধনুকও ছিল। ছিল না?"

—"হ্যাঁ ছিল। এক ছোঁড়া তীরধনুক নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে হম্বিতম্বি করছিল।" মহিলা সায় দেন।

—"আপনার নাম? আপনার স্বামীর নাম? বাড়ির ঠিকানা?" শ্রবণমাত্র পুংকণ্ঠ মশারির অন্তরাল থেকে কঁকিয়ে উঠল।

—"দিও না। দিও না। কিছু দিও না। কিছু তুমি বলতে বাধ্য নও। বলবে

BanglaBook.org

আমার ল্যাইয়ারের পরামর্শ না নিয়ে একটা কথাও বলব না।"

—"আহা, কিছু ভয় নেই। আপনার নামতো মিসেস মিত্র—", ও. সি. বাড়ির বাইরে নেমপ্লেট পড়তে শুরু করে দেন। নাম-ঠিকানা আর গোপন করা গেল না। মহিলা বললেন—"চলুন চলুন, জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে ফিরে আসি। কাল সোমবার। আপিসের দিন। রাত বোধহয় দুটো বাজলো। তুমি শুয়ে থাকো। কড়া নাড়লে উঠে এসে দোরটা খুলে দিও দয়া করে।"

৭

জায়গা দেখাতে গিয়ে পুলিশ এতই চেঁচামেচি করলে, যে আবার প্রত্যেক বারান্দায় লোকজন বেরুলো। চেঁচিয়ে তাদের ডেকে পুলিশ বললে—"বল্লম নিয়ে কে নেমেছিলেন? শিগগির নেমে আসুন। বল্লমের লাইসেন্স আছে?" সমস্ত বারান্দা মুহূর্তে ফাঁকা হয়ে গেল।

—"রিকশো কোথায় ছিল?" বউদিকে প্রশ্ন করা হলো।

"এইখানে।"

—"আপনারা কে কোথায় বসেছিলেন? কে ডানে কে বাঁয়ে?"

—"উনি রাস্তার দিকে, আমি ফুটপাতের দিকে। ডাইনে-বাঁয়ে জানি না। নিজে হিসেব করে নিন।"

—"রিকশোর মুখ কোনদিকে ছিল? পূবে না পশ্চিমে?"

—"এইদিকে। পুব-পশ্চিম জানি না। ওসব আপনি বুঝুন।"

—"মোটরসাইকেল কোথা দিয়ে এল?"

—"ঐ গলি দিয়ে। এইখানে থামল। এই গাছের নিচে।"

পুলিশ ইতিমধ্যে বারান্দাবাড়িতে গিয়ে দমাদ্দম দমাদ্দম শুরু করেছে। দরজা খুললো, স্লিপিংস্যুটে কাঁপতে কাঁপতে ভদ্রলোক বেরুলেন। সঙ্গে স্ত্রী।

—"বল্লমের লাইসেন্স ছিল?"

ভদ্রমহিলা উত্তর দিলেন।

—"দেখুন, ওগুলো শো-পিস। উনি আগে তো নাগাল্যাণ্ডে পোস্টেড ছিলেন, তাছাড়া পুরুলিয়াতেও ছিলেন। নানারকম ট্রাইবাল জিনিসপত্তরই কিউরিও হিসেবে আমরা কালেক্ট করি। এও তারই একটা। এটা তো অস্ত্র নয়। ধার নেই। কেউ কখনো কিউরিওর লাইসেন্স করায়? আপনিই বলুন।" স্ত্রীর মাথা খুবই ঠাণ্ডা।

—"তবে ওটা নিয়ে নেবেছিলেন কেন, ডাকাত মারতে?"

—"সে বিপদের সময়ে লোকে তো হাতা-খুন্তি-ছাতা নিয়েও ছোটে—তার জন্যে লাইসেন্স লাগে?"

—"ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন! এমনই কাণ্ড করছে এই পুলিশগুলো যাতে পাড়াপড়শীরা আর ভুলেও অন্যের সাহায্যে না বেরোয়। যেন ওঁদেরই সব দোষ।

BanglaBook.org

ছিনতাইটাই গেল চুলোয়, বল্লমের লাইসেন্স নিয়ে পড়েছে। বলি, আগে তো জিজ্ঞেস করবেন ছিনতাইয়ের কথাটা, এত রাত্তিরে সেইজন্যেই তো এসেছেন? না কি?" বউদির চাঁছাছোলা স্পষ্ট গলা ঝনঝন করে রাত্তিরের হিমেল বাতাস কেটে বেজে ওঠে।—"এমন করলে আর কী ওঁরা সাক্ষী দেবেন? ওঁরাই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদর্শী—বারান্দা থেকে পুরোটা দেখেছেন—নেহাৎ সড়কি-বল্লমগুলো দড়ি দিয়ে দেয়ালের হুকে বাঁধা ছিল। খুলতে দেরি হয়ে গেল বলেই তাই সময় মতন নেবে এসে ডাকাতি থামাতে পারেননি—

"কী কী দেখেছেন? কে কে দেখেছেন? দুজনেই দেখলেন?"

—"আগে আমিই দেখতে পাই। তারপরে খোকাকে আর ওঁকে ডেকে এনে দেখালুম—কালো রঙের মোটরসাইকেলে করে দুটো লোক ঐ গলি থেকে বেরিয়ে রিকশা থামিয়ে এঁদের যথাসর্বস্ব কেড়ে নিলে।"

—"যথাসর্বস্ব কেড়ে নিলে, আর আপনারা চুপচাপ দেখে গেলেন? বাধা দিলেন না?"

—"দোতলা থেকে কী করে বাধা দেবো? ঝাঁপিয়ে পড়বো?"

—"চেঁচাতে পারতেন তো? তাতেই পালিয়ে যেতো।"

—"আর যদি গুলি করে দিতো ওঁদের? পাইপগান ছিল। ঐ ভদ্রলোকের পেটে তো চেপেই ধরেছিল। চেঁচালে যদি ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিতো?"

ভুঁড়ির প্রসঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠে দাদামণি বললেন—"রাত দুটো বাজে মশাই। শুতেটুতে হবে না? আপনাদের উইটনেসের তো সব কথাই মিলছে। আর কতক্ষণ? এবার এঁদের ছেড়ে দিন?"

—"আর দুটো প্রশ্ন। টাইম ক'টা ছিল?"

—"এই দশটা-সাড়ে দশটা?"

—"দশটা, না সাড়ে দশটা?"

—"ধরে নিন দশটা পনেরো।" এতক্ষণে স্বামী কথা বললেন।

—"লোকগুলোর পরনে কী ছিল?"

—"একটা লোক চামড়ার কোট পরেছিল, অন্যটার গায়ে র‍্যাপার জড়ানো ছিল। ডার্ক-রঙের।"

"বয়স কত হবে?"

—"বুঝতে পারিনি। এটা তিন নম্বর প্রশ্ন হয়ে গেল কিন্তু।" মহিলা বললেন।

—"হোকগে। তীরধনুক নিয়ে কে বেরিয়েছিল?"

—"খোকা, খোকা। আমার ছেলে। ইস্কুলে পড়ে। খেলনার তীরধনুক। সে এখন ঘুমুচ্ছে। খেলনারও লাইসেন্স চাই নাকি?"

বউদি-দাদামণি জানেন, খেলনা নয়। তবুও চুপ করে থাকেন। কার্যত খেলনাই তো। অস্ত্রও তো নয়। জানেই না এরা ট্রাইবালদের তীরধনুক কীভাবে ছুঁড়তে হয়!

BanglaBook.org

—"অঃ, তাই বলুন। বাচ্চাছেলের তীরধনুক? ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাই তো বলি, তীরধনুক, সড়কি, বল্লম এসব এল কোত্থেকে? আপনাদের নাম-ঠিকানাটা? ইনভেস্টিগেশনে—"

—"ইনভেস্টিগেশনটা কি হবে বল্লম আর তীরধনুক কোথা থেকে এল, সেই বিষয়ে?"—মহিলার কাটাকাটা কথা।

—"না, না, না, ওসব চুকেবুকে গেছে। এঁরা আই. জি.-র ফ্রেণ্ড—বুঝলেন না, আপনাদের কোনোরকম ভয়ের কিছু নেই। ফরম্যালিটির জন্যে নেম-অ্যাড্রেসটা তো চাই-ই। উইটনেস তো আপনারা? ছিনতাই কেসেরই ইনভেস্টিগেশন—

৮

সক্কালবেলাই বাচ্চুদার টেলিফোন। সঙ্গে সঙ্গে বউদি ডিটেলস দিয়ে দিলেন, কানে দেশলাইকাঠি থেকে শুরু করে বল্লমের লাইসেন্স পর্যন্ত। অর্থাৎ পুলিশের শ্রাদ্ধ করলেন, বাচ্চুদা অবিচলিত। হাস্য সহকারে বললেন, "থানা-টানায় ওরকম এট্টুআট্টু হয়ই। কাজের বেলায় ঠিকই করবে, যা যা করবার।—যাবো বিকেলের দিকে।"

দাদামণির গা-ম্যাজম্যাজ করছে। শুতে-শুতেই তিনটে বেজে গেছে। ফের সকালে উঠে বাজার করতে হয়েছে। কালকের দ্বিগুণ দামে। গা করকরও করছে। তাই দাদামণি আপিস না গিয়ে, এককাপ চা নিয়ে সোফায় শুয়ে আছেন। আজ বউদিও ইশকুলে যাননি, আসলে মনটাও খারাপ। যে আংটিটা ফুলশয্যায় বউদিকে পরিয়ে দিয়েছিলেন দাদামণি সেইটে আসলে দাদামণির ঠাকুরদাদা তাঁর নিজস্ব বউকে উপহার দিয়েছিলেন। ঠাকুমাই আদর করে বড়নাতির আঙুলে পরিয়ে যান নিজের বরের দেওয়া সোহাগের আংটিটি। বয়েস তো হচ্ছে, ছেলেরা বড় হয়ে গেছে। আজ দাদামণির ঠাকুমার দেওয়া আংটির জন্যে হু হু করে মন কেমন করছে। কীভাবেই জিনিসটা চলে গেল। কিছু শাকসব্জী আর আজেবাজে নকল গয়নার সঙ্গে। আশ্চর্য! ছেলেদের কপালে নেই আর-কি বংশের এয়ারলুম পাওয়া। ওর জন্যে আলাদা ভাগ্য করে আসা চাই!

এমন সময়ে ফোনটা গেল বিগড়ে।

হঠাৎ একটানা ক্র-র-র করে বেজেই চলল, যেন জেলের পাগলাঘণ্টি। কেমন একটা অশুভ সংকেতের মতো, দাদামণির শ্যালক বিদেশে—কোনো দুঃসংবাদ নয় তো? বুক ধড়াস করে উঠলো। যদি—ফোনটা ঠিক একটা ডেনজার সিগন্যালের মতো শব্দ করছে, বুক ধড়ফড় করানো। তবু, না ধরেও আর উপায় নেই।

—"একী বিতিকিচ্ছিরি শব্দ কচ্চে ফোনটা?" এবার বউদি স্বয়ং রান্নাঘর থেকে ছুটে এসেছেন, হাতে একটা সিম। ফোন দাদামণি ধরেই ফেললেন—"হ্যালো।"

—"হ্যাল্লো! হ্যাল্লো! লালবাজার বলছি! লালবাজার!"

BanglaBook.org

—"অ্যাঁঃ? লালবাজার? সর্বনাশ! কী হয়েছে?"

—"ডঃ চক্রবর্তী আছেন? ডঃ চক্রবর্তী? ডঃ চক্রবর্তী?"

—"আছি, আছি। কথা বলছি (খোকা-বাবলুর মুখগুলো চোখে ভেসে উঠেছে)।"

—"কমিশনার সাহেব কথা বলবেন। হোল্ড অন করুন। হোল্ড অন। এই যে।"

—"তারপর অনন্ত নৈঃশব্দ্য। অবশেষে একটি অশেষ মার্জিত কণ্ঠ ও-প্রান্তে শোনা গেল—

—"হ্যালো, ডঃ চক্রবর্তী? আমি অনুপ বোস বলছি। বলুন তো কী ব্যাপার? কাল রাত্রে আপনাদের নাকি আংটি, ঘড়ি, পার্স, হ্যাণ্ডব্যাগ সব ছিনতাই হয়ে গেছে?"

—"কি আশ্চর্য। কে বললে? বাচ্চু নির্ঘাৎ? সত্যি—"

—"না, না, এই আজকে সকালে আমার টেবিলে যেসব ফাইল এসেছে, সবচেয়ে ওপরেই আপনার ফাইলটা। ঠিক আছে। ডোণ্ট ওয়ারি, বেলা তিনটের সময়ে আসছি। দু'জনেই একটু থাকবেন কিন্তু।"

—"আপনি? নিজে আসবেন? তুচ্ছ ঘটনা, কী দরকার?"

—"না না তুচ্ছ নয়, মোটেই তুচ্ছ নয়, ইউর আ কোয়েশ্চেন অব ল অ্যাণ্ড অর্ডার—ওদিকটায় প্রায়ই ছিনতাই হচ্ছে, অলমোস্ট প্রতিদিনই—মাঝেমাঝে সরেজমিনে তদন্তে না গেলে হয় না, সাইটে একবার গিয়ে পড়াই দরকার এবারে—

—"বেশ বেশ। চলে আসুন। এসে পড়ুন। কিন্তু সত্যিই কি স্বয়ং পরিদর্শনের মতো জরুরি এ ব্যাপারটা?"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ, জরুরি—তিনটের সময়ে আসছি তাহলে? ও কে?"

—"ও কে!...অ গিন্নি! কমিশনার সাহেব আসবেনই তিনটের সময়ে। আটকানো গেল না।"

—"আটকাচ্ছিলে কেন? আসুন না অনুপদা।"

—"ছিনতাই কেসের জন্যে কমিশনারকে—বুঝলে না? খুন নয়, রেপ নয়, দাঙ্গাহাঙ্গামা নয়, এই তুচ্ছ ব্যাপারে মানে, একটু লজ্জা করছে এই আর কি—"

—"তুচ্ছ বলে তোমার মনটা খারাপ-খারাপ মনে হচ্ছে?"

—"খুনজখম-রেপ হলেই যেন খুশি হতে? নিদেনপক্ষে একটা দাঙ্গাহাঙ্গামা—

—"দাঙ্গাহাঙ্গামা তো ঘরেই টোয়েন্টিফোর আওয়ার্সই দেখছি, গিন্নি ওকথা হচ্ছে না। বলছি, তোমার অনুপদা আসবে, তোমাকেও বাড়িতে থাকতে বললে। তুমি আবার প্রাণের দুঃখ ভুলতে ম্যাটিনিতে অমিতাভ বচ্চনের খোঁজে বেরিয়ে যেও না যেন।"

—"যত্তো বাজে কথা।" বউদি নিজেই এবার দু'কাপ চা নিয়ে এসে বসলেন।

BanglaBook.org

আরেক কাপ চা দেখেই দাদামণির বলবৃদ্ধি হলো—

—"টেক কেয়ার, টেক কেয়ার গিন্নি—ভেবেচিন্তে কথা বলো—সুপারস্টার নিয়ে কথা।"

—"অত ভাবনাচিন্তার কী আছে। যত্তো ধুমধাড়াক্কা আর মারদাঙ্গা!"

"আঁহ আঃ!" দাদামণি সদ্য প্র্যাকটিস করা মার্কিনি কায়দা ছাড়লেন। "ওটি বোলো না গিন্নি, ইউ আর গিভিং অ্যাওয়ে ইওর এজ—ওটা বললেই ডেটেড হয়ে গেলে। কোনদিন বলবে ডগলাস ফেয়ারব্যাংকের কাছে কেউ লাগে না—

—"লাগে নাই তো। দেখেছিলে, 'থীফ অফ বাগদাদ'?"

—"উঃ" যন্ত্রণাতাড়িত মূর্তি দাদামণি বলেন, "আর বোলো না গিন্নি! আমাকে একটুও ইলিউশান রাখতে দাও। বলো ডাস্টিন হফম্যান!"

"—তিনটের সময়ে আসবেন মানেই চা খাবেন। তা, কী করবো? ফুলকপির সিঙাড়া, না কড়াইশুঁটির কচুরি?"

—"সেসব তো ছিনতাই হয়ে গেছে।"

—"বাজারসুদ্ধু তো ছিনতাই হয়নি। পকেটের ন'শ টাকাও ছিনতাই হয়নি। যাও, কিনে আনোগে। কজনের মতন তৈরি করবো? ছ-সাত জন না দশ-বারো জন? জনাকুড়ির মতোই করি কি বলো?"

—"কী করবে অত দিয়ে? আসবে তো কমিশনার, সঙ্গে নিশ্চয় ও.সি. আসবে আরও দু'চারটে, চামচা-কনস্টেবল আসবে কয়েকটা, তা ডজনখানেক লোক হয়েই যাবে। আমরাও আছি চারজন। ব্যানার্জিকেও খাওয়ানো উচিত, ওঁর গাড়ি করে অত রাত্তিরে—ঐ ধরো, বিশ বাইশ-ই ধরো—

—"কচুরি না সিঙাড়া? কড়াইশুঁটি, না ফুলকপি?"

—"তোমার যেটা তৈরি করতে সুবিধে—

—"দুটোই অসুবিধের। যাই হোক, কড়াইশুঁটির কচুরিই হোক, ওটা খোকা-বাবলু ভালোবাসে। আর বেশি করে নলেনগুড়ের সন্দেশ এনো।"

—"ভালো চা আছে তো ঘরে?"

—"তবু, আট্টু ভালো চা এনো। অনুপদা এই প্রথমবার আসছেন।"

—"তোমার মাসতুতো বোনের ভাসুর বলেই—"

—"সেজন্যে নয়। কমিশনার অফ পুলিশ বলে কথা। আর শোনো, বাচ্চুদাকেও আসতে বলে দাও। উনি ফোন না করলে পুলিশ ব্যাটারা নড়ে বসত না। উনিই আমাদের বল-ভরসা।"

—"পুলিশ আসছে ইনভেস্টিগেশনে। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন ছিনতাইটাকে টি-পার্টি দিয়ে সেলিব্রেট করছ। এমন মেতে উঠেছ, ঠিক যেন কোনো উৎসব হচ্ছে। যেন হীরের আংটি খোয়া যায়নি, বরং লটারি পেয়েছো। বিচিত্র বটে

BanglaBook.org

মেয়েমানুষের চরিত্র।"—দাদামণি থলে হাতে চটিতে পা গলান। মুখে যাই বলুন, পুরুষমানুষের চরিত্রও কিছু কম বিচিত্র নয়।

৯

ঠিক তিনটের সময়ে দরজার ঘণ্টি বেজে উঠল। দু'জন কনস্টেবল। সেলাম করে বললে—"কমিশনার সাহাবনে গাড়ি ভেজা।"

—"তিনি কোথায়?"

—"সাইট মে হ্যায়। আপ উধর চলিয়ে। মেমসাবকো ভি যানা হ্যায়।"

—"কে নিয়ে গেল, সাইটে? জায়গা দেখাল কে?"

—"ও. সি. সাহাবনে দিখায়া।"

সাইটে পৌঁছে দেখা গেল হৈহৈ কাণ্ড, রৈরৈ ব্যাপার। পুলিশের জীপ থেকে দাদামণিরা যেই ভূমিষ্ঠ হলেন, সাঁইত্রিশজন খাঁকি-পরা পুলিশ একসঙ্গে তাঁদের স্যালুট দিল। দাদামণি সমাজে বেশ মান্যগণ্য ব্যক্তি বটে, কিন্তু এ-রকমটি জীবনে কদাচ হয়নি। খুন নয়, রেপ নয়, দাঙ্গা নয়, ছিনতাই-এর সাইট পরিদর্শনে কমিশনার স্বয়ং এসেছেন, এও তো এই থানার জীবৎকালে অন্তত কখনো ঘটেনি। অনুপ বোস অসামান্য ভদ্রলোক, বাচ্চুদাও আছেন। এক কোণে দাঁড়িয়ে আপনমনে সিগারেট খাচ্ছেন। পরনে সিবিলিয়ান ড্রেস। ডিউটিতে নেই বোঝাই যাচ্ছে। অনুপবাবু বললেন যদিও সাইট দেখা হয়ে গেছে তবুও ফরমালিটির জন্য ওঁদের ডেকে আনা। একবার মিসেস চক্রবর্তীকে শুধু ক্রস-এগজামিনেশন করতে হবে। পাড়াপড়শী বলতে বল্লমধারী ভদ্রলোকের স্ত্রী ও সেই ডাকাত ধরতে ছোটা ভদ্রমহিলাও দেখা গেল দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের কর্তারা অফিসে। গিন্নিদের ক্রস-এগজামিনেশন হয়ে গেছে। না, কোনো অমিল পাওয়া যায়নি, থ্যাংক গড। তাঁরা খুবই চাল্ ব্যক্তি দুজনেই। পুলিশের পরোয়া করেন থোড়াই। দাদামণি বললেন, "সকলে মিলেই চলুন, একটু আমাদের বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন। একটু চা খেয়ে যাবেন। চারটে বাজে, ইটস টি-টাইম।" বল্লমধারীর স্ত্রী আসবেন না বললেন, ছেলের ইশকুল থেকে ফেরার টাইম। অন্য মহিলাটি বললেন, "চলুন, চা-টা খেয়েই আসি।" কমিশনার বারকয়েক গাঁইগুঁই করলেও বাচ্চুদার উৎসাহে রাজী হয়ে গেলেন। পুলিশ কমিশনার কখনও একা আসেন? সঙ্গে দু'জন বিভিন্ন ডি. সি., একজন ডি. সি. ডি. ডি., একজন ডি. সি. (সাউথ), একজন এ.সি. (সাউথ), আরেকজন এ.সি. (কে যে কোথাকার) এবং প্রচুর পুলিশ, জনতা। সেই ও.সি.-ও আছেন। মোট সাঁইত্রিশ জন। বউদি ফিসফিস করে দাদাকে বললেন —"অতজনের কচুরি হবে না তো? দশজনের মতন কচুরি কিনে আনো।" দাদামণি ফিসফিস করে বউদিকে বললেন—"সবাই খাবে না, ওতেই হয়ে যাবে'খন...

বাচ্চুদা আর অনুপবাবু বসে পড়বার পরে দেখা গেল ডি.সি.ডি.ডি. (সাউথ), এবং

BanglaBook.org

এ. সি.রা দু'জনে, এঁরাই কেবল বসলেন। কমিশনার সাহেব এবং আই. জি. সাহেবের সামনে বসে পড়া সহজ নাকি? মহিলা রান্নাঘরে চলে এলেন বউদিকে সাহায্য করতে। বাকিরা সবাই দাঁড়িয়েই রইলেন। কেউ কেউ ঘরে, আর অন্যেরা সকলেই করিডরে। কিছুতেই তাঁদের বসানো গেল না। স্বয়ং কমিশনার, আই. জি.—ছি ছি ছি—এঁদের সামনে বসে থাকা? বউদি আর মিসেস মিত্র (সেই মহিলার নাম মিসেস মিত্র) চা-কচুরি-সন্দেশ নিয়ে এলেন। কমিশনার, আই. জি. ও ডি. সি.রা চা-কচুরি নিলেন। এ.সি.-রা কিছুই নিলেন না। এদিকে বউদি আশপাশের ফ্ল্যাট থেকে খোকন-বাবলুকে পাঠিয়ে নানারকমের কাপডিশ চেয়ে আনিয়ে সাঁইত্রিশ কাপ চায়ের ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। তাছাড়া নিজেরাও ক'জনে আছেন, খান-চল্লিশেক চা হবেই। কেউ চা খাবেন না শুনে বউদি ক্ষেপে লাল। "সে কী মশাই? আজকের দিনে দুধ সস্তা না চিনি সস্তা? এত গুচ্ছের চা করালেন কিসের জন্য? খেতেই হবে চা। আপনাদের আইন যা হোকগে—প্রোটোকলের নিকুচি করেছে—।" অনুপ বোস অতীব ভদ্রলোক। তিনিও বললেন—"খান না মশাই খান, কেন লজ্জা পাচ্ছেন? চায়ের সময়ে চা পাচ্ছেন, খাবেন না এ কেমন কথা?"

এ.সি.-রা অতএব গুটিগুটি চায়ের কাপ তুলে নেন। বউদি এবার খোকন-বাবলু সমেত দণ্ডায়মান পুলিশদের চা খাওয়াতে এইসা প্রচণ্ড জেদাজেদি শুরু করলেন যে ক্রমে-ক্রমে প্রত্যেকেই বাইরে করিডরে বসে গিয়ে চা খেতে থাকেন। ঘরে কেবল এ. সি., ডি. সি.-গণ, আই. জি. আর কমিশনার। কমিশনার বললেন —"মিসেস চক্রবর্তীকে এবার একটু ক্রস-এগজামিন করতে পারি কি?"

—"কচুরি খেতে খেতে করতে পারেন। যেন ঠাণ্ডা হয়ে যায় না।" বললেন বউদি।

—"দিদি কি নিজেই করলেন? দারুণ হয়েছে কিন্তু!"

উচ্ছ্বসিত মিসেস মিত্রের কথার ওপরে হঠাৎ কথা বলে ওঠেন অনুপ বোস —তাঁরও উচ্ছ্বাস কম নয়—

—"থ্যাংকিউ মিসেস মিত্র। আপনাদের মতো সাহসী পাড়াপড়শী নেই বলেই এত ছিনতাই সহজ হয়েছে।"

—"কিন্তু আমাদের স্বামীদের তো দেখেননি? তাঁরা এখনও আপিসে। আঁচল ধরে টেনে না রাখলে ছিনতাইটা আটকানো যেত।"

লজ্জায় অনুপবাবু কথা পাল্টালেন—"মিসেস চক্রবর্তী, ঠিক ক'টা নাগাদ ঘটনাটা ঘটল? মনে পড়ে?"

—"এই দশটা-সাড়ে... দাদামণি চোখ পাকাতেই বউদি সামলে নেন—"স্যার, ঠিক সোয়া দশটায়।"

—"ডক্টর চক্রবর্তী, আপনার স্ত্রীকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করবো দয়া করে তাঁর মুখে কথা জুগিয়ে দেবেন না যেন। উই নীড হার ওন রেসপন্সেস।"

BanglaBook.org

—"আপনি তো আমার স্ত্রীকে চেনেন না। যদিও সম্প্রতি তিনি আপনার ছোটো ভাইয়ের মাসতুতো শ্যালিকা হয়েছেন। তাঁর মুখে কথা যুগিয়ে দেবার মতো ভাগ্য করে আমার জন্ম হয়নি। তিনি জিব নেড়েই ছিনতাই করতে পারেন। ভোজালি-বল্লম লাগে না।"

—"যতো বাজে কথা। তাহলে আর ছিনতাই হলো কেন? জিব নেড়েই তো ডাকাতদের তাড়িয়ে দিতুম।"

—"তারা তো তোমার হতভাগ্য স্বামী নয়।"

—"তা, হতভাগ্য স্বামীকেও তো তাড়াতে এখনো কৈ পারিনি। দিব্যি বহাল তবিয়তেই কড়াইশুঁটির কচুরি ওড়াচ্ছেন আর বউয়ের নিন্দে গাইছেন মনের আনন্দে। পঁচিশ বছর তো চেষ্টা কম করিনি।"

—অনুপ বোস যে কী করে পুলিশ হয়েছেন তা এক সরকার ভগবানই জানেন। স্বামী-স্ত্রীর এই নিঃশঙ্ক অসঙ্কোচ বিবাদে তাঁরই মুখ শরমে লাল হয়ে উঠল। তিনি কথা ঘোরাতে বললেন—

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। তা, মোটরসাইকেলটার কোন মেক ছিল?"

"সেই এককথা! রাজদূত; রাজদূত! উনি দেখেছেন, আমি অবিশ্যি চিনি না।"

—"চেনেন না?"

—"আমি মোটরসাইকেল, স্কুটার আর মোপেডের মধ্যে তফাৎই বুঝি না! তফাৎ আছে না কি কিছু?" নির্ভীক উত্তর।

—"আই সী!" অনুপবাবু হঠাৎই আর প্রশ্ন খুঁজে পেলেন না। তারপর বললেন, অনেক ভেবেচিন্তে:

—"গাছটা কী ছিল?"

—"আমি কি বটানিস্ট? না কি রাস্তার ধারের প্রত্যেকটা গাছপালার গায়ে আপনারা আজকাল লেবেল এঁটে রাখেন? এসব আজেবাজে প্রশ্ন কেন করেন? গাছ দিয়ে কী হবে বলুন তো? তবু গাছে ফুল থাকলেও যদিবা চেনা যেত। আপনিও তো এইমাত্র গাছটা দেখে এলেন। দিনের বেলায় কটকটে রোদে। কী গাছ বুঝলেন? বলুন তো কী গাছ?" আকর্ণ রক্তিম হয়ে অনুপ বোস অন্য প্রশ্ন করলেন—

—"অত রাত্তিরে হঠাৎ রিকশা করে ফিরছিলেন-ই বা কেন বাজার থেকে? জানেন তো ওতে ছিনতাই হবার চান্স থাকে।"

বউদি বললেন:

—"প্রথম কথা, বাজার থেকে ফিরছিলুম না। ফিরছিলুম বাপের বাড়িতে রুগী দেখে। পথেই সন্তায় পেয়ে বাজারটা করা হয়েছিল। আর দ্বিতীয় কথা, রিকশা করে ফিরবো না তো কি পুলিশের জীপে চড়ে ফিরবো? যাতে ছিনতাই না হয়? ওঁকে তো বলছিই একটা হেলিকপ্টার কিনতে; তা আর কেনা হচ্ছে কই? দেবো, আরেকটি কচুরি?"

BanglaBook.org

বোধহয় অনুপ বোস একটু বাকিহারা বোধ করছেন। তাই ঘাড় নেড়ে 'না' বললেন কি 'হ্যাঁ' বললেন ঠিক বোঝা গেল না। বউদি দুটো কচুরি দিয়েই দিলেন। এমন সময় দোরে কলিঙবেল। দাদামণি দোর খুলতেই তিনটি কিশোর ঘরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং কলকণ্ঠে বলে উঠল—"কী ব্যাপার কী, মেসোমশাই? চাদ্দিকে এত গুচ্ছের মামা যে? একগাদা খোচরও যেন দেখছি—যাঃ বাবা—ভ্যানতাড়া নিতে এসেছে তো? ওদের সঙ্গেই তো কমিশন সিস্টেম থাকে, মেসোমশাই! পুলিশকে বলে কী হবে? ওরা জীবনে ধরবে? বাবলু বলেছিল, আমরা খোঁজ নিয়ে এসেছি। পঞ্চাননতলা নয়, কেয়াতলাও না। ওদের সেদিনকে, মানে গতকালকে কোনো অ্যাকশনই ছিল না। যদ্দুর মনে হয় কাঁকুলিয়ার পার্টি"—

"এরা কারা?" হঠাৎ বাচ্চুদা চা সরিয়ে রেখে প্রশ্ন করেন। দাদামণি ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠেন, "ওরা? বাবলুর বন্ধু। ফুটবল কিনবে বলে চাঁদার পয়সা চেয়েছিল, সেই বিষয়ে কথা বলছে—

—"পঞ্চাননতলা, কেয়াতলা, কীসব যেন বলল?"

—"ফুটবল ক্লাব, ফুটলব ক্লাব। সব পাড়ায়-পাড়ায় ফুটবল ক্লাব থাকে তো? সেইসব ক্লাবের কথা বলছে। রে বাছাড়া, তোরা এখন খেলতে যা। আর দাঁড়িয়ে থেকে কাজ নেই, বরং পরে আসিস।"

ছেলেগুলো বেরিয়ে গেল। যাবার সময়ে ঘরে দাঁড়িয়ে আগাপাশতলা বিষনজর বুলিয়ে গেল পুলিশ কমিশনার, ডি. সি. আই. জি., এ. সি., সব্বার ওপরে। সে-নজরে শরীর বরফ হয়ে যায়।

BanglaBook.org

দরজার দুধারে দুজন কনস্টেবল ছিল। একজনের গোঁফ দুধে-ধোয়া শাদা, চামড়ায় এত আঁকিবুকি, যে মনে হয় চাকরিতে ঢোকার সময়ে দু-কুড়ি বছর কম লিখিয়েছিল। সে হঠাৎ মহাউল্লাসে হাত শূন্যে নেড়ে বলে উঠল—

—"বাবু! ইয়ে চিসকো পাকড়া হ্যায় না আপ, ইয়ে খাসবাস্ত বাতা দেগা। হমসে বড়িয়া খবর ভেজেগা উও। সবসে আচ্ছা সোর্স হ্যায়—ছিনতাই-পাল্টিকো বাবালোগসে ইনকো দোস্তি হোতা—আজকাল তো ছিনতাইপাল্টি গরমিণ্ট কার্টরমে বি বনতা—ট্যাবলিট খানেকো পৈসা উঠাতা হ্যায়, সারে ডাকুলোগ পরিলিখি বালোঁক-বচ্চো, আনপড় গরীব আদমি থোড়ী হ্যায় উও, ইয়ে যো বাবালোগ আয়া হ্যায় না, একদম সাচ্চা খবর বাতা দিয়া, কাল রাতকো ইয়া পঞ্চাননতাল্লামে ইয়া কেয়াতাল্লামে—কোঈবি একসান নাহী থা—থানাকো খবর বি ওহী হ্যায়—উসকো কুছ পৈসা দেয়া করো, ওহী পকড় দেগা মাল—

এবারে অফ-ডিউটি সিবিলিয়ান পোশাকের আই. জি. কড়াইশুঁটির কচুরি থেকে জেগে উঠে চেঁচালেন—

—"ফুটবল কিনতে এসেছে না ছাই! রামদেও। পাকড়ো পাকড়ো উসকো

—ভাগতা হ্যায়—উওবি ছিনতাই পার্টি—পাকড়ো—"

"হো সাকতা সাব, জরুর! লেকিন আব তো উসনে কুছ কিয়া নাহি—জী সাব —কৈসে পকড়ুঁ?"—রামদেও বিনীত হাতজোড় করে।

—"জ্বালিয়ে খেলে?" বউদি এবার ফিলডে নামেন—দুটো নলেনগুড়ের সন্দেশ আই. জি.র প্লেটে দিয়েই খিঁচিয়ে ওঠেন—"বাড়িতে কি লোকজন আসতে পারবে না? ওরা সবাই খোকন-বাবলুর বন্ধু।"

—"তবে তো খোকন-বাবলুকেও ধরতে হয়। হতেই পারে ওরা পাড়ার মাস্তানদের চেনে, তাব'লে ওরাও মাস্তান? আপনারাও তো সব চোর-ছ্যাঁচোড়দের চেনেন, আপনারাও কি চোর-ছ্যাঁচোড়?"

কমিশনার, বাচ্চুদার আকস্মিক কর্তব্যবোধে যত না বিচলিত, বউদির অকস্মাৎ এহেন "রূপ তেরা মস্তানা"— মূর্তি দেখে একেবারে ঘাবড়ে গেলেন। মরীয়া হয়ে কথা ঘোরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন রামভদ্দর অনুপ বোস। বইয়ের র‍্যাক থেকে একটা পেন্টিংয়ের অ্যালবাম তুলে নিয়ে বললেন—"ফ্রেঞ্চ ইমপ্রেশনিস্টস্! অদ্ভুত কালারের সেন্স ছিল সত্যি ওদের"—

অমনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন জাতীয় ঐতিহ্যবাদী বাচ্চুদা।

—"কেন? মধুবনী পেন্টার্সদের কালারের সেন্স নেই? সেও কি একেবারে আশ্চর্য নয়?" দাদামণি নিশ্চিন্ত হয়ে আড়চাউনিতে বউদিকে ইশারায় বললেন—"আরেক প্রস্থ চা হয় না?" বউদিও বিনাবাক্যে চক্ষুদ্বারা জানালেন—"না। মোস্ট ডেফিনিটলি হয় না।" ডাকাত ধরনেবালী মিসেস মিত্র এই বাক্যালাপ নির্বিবাদেই ফলো করতে পারলেন এবং সশব্দে রায় দিলেন—"চল্লিশ কাপ চা করবার পরেও যারা আবার বউকে চা করতে বলতে পারে, তারা ছিনতাইকারীদের চেয়েও সমাজের পক্ষে ভয়াবহ —তাদেরই পুলিশে দেয়া উচিত"—সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে আই. জি., কমিশনার, ডি. সি.-বৃন্দ এবং এ. সি.-বৃন্দ অবাক হয়ে আপত্তি করে বললেন—এমন ঐকতান ভূখামিছিলেও চট করে দেখা যায় না। "না, না, না, কে বলেছে ফের চা করতে? পাগল নাকি?" দাদামণি চোরের মতন বললেন—"না, এই মানে, আমিই একটু ভাবছিলাম যদি আরেকবার"—

এর ফল হলো টুপি মাথায় দিয়ে পকেটে হাত পুরে লম্বা হয়ে অনুপ বোস উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে সব্বাই। খটাখট স্যালুট করলো চোর-ধরা দুই সেপাই।

—"আচ্ছা, আজকে তবে চলি। থ্যাংকিউ। লালবাজারে যখন আইডেনটিফিকেশন প্যারেড হবে, কষ্ট করে তখন একবার যেতে হবে কিন্তু।"

—"নিশ্চয়। নিশ্চয়। গিন্নি যাবেন।" দাদামণি স্মার্টলি বলেন।

—"আপনাকেও যেতে হবে যে"—

—"কিন্তু আমি কি পারবো? আমি অত ভালো করে দেখিনি।" হঠাৎ দাদামণির স্মার্টনেস উধাও।

BanglaBook.org

—"খুব পারবে। লোকটা তোমার বুকে অতক্ষণ ভোজালি চেপে ধরে রইলো, আর তুমি তার মুখখানা ভুলে যাবে? আচ্ছা ক্যালাস মানুষ তো! আরেকজন তোমার ঠাকুদ্দাদার কমলহীরের আংটিখানা ছিনিয়ে নিলে। তাদেরকে চিনতে পারবে না? ডেনজারাস লোক বাপু তুমি।" বউদির এক ধমকেই শোনা গেল দাদামণি বলছেন —"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাবো।"

গণ্যমান্য পুলিশবাহিনী বেরুতেই, করিডরে সাঁইতিরিশজনের বুটে-বুটে স্যালুট। তারপরেও মজা ছিলো। নিচে নেমে যেই জীপে উঠতে যাচ্ছেন কমিশনার সাহেব, পার্কের গায়ে হেলান দিয়ে বিড়ি খাচ্ছিলেন, এমন কিছু আজেবাজে ফালতু লোক হঠাৎ অ্যাটেনশন হয়ে গিয়ে খটাখট স্যালুট মেরে দিলে। কমিশনার মৃদু হাসলেন, বউদি ও মিসেস মিত্র চোখাচোখি বিস্ময় বিনিময় করতেই দাদামণি নেহাৎ কৃপার চোখে তাকিয়ে তাঁদের জানালেন—

—"ওরা হচ্ছে প্লেনক্লোদসমেন। সাদাপোশাকের পুলিশ। এও বুঝতে পারলে না! এবার থেকে পাড়া পাহারা দেবে!"

১০

পুলিশের গাড়িগুলি চলে যেতেই বউদি পাড়াপড়শীর যত্ন-আপ্যায়ন ধুয়ে ফেরত দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ঠিকের লোক মেনকা এসেছে। ঘরবাড়ি ঝাঁট দিয়ে দিচ্ছে। একগাদা বুটজুতোর ধুলো হয়েছে বসার ঘরে। শোবার ঘর ঝাঁট দিতে দিতে মেনকা চেঁচালো—"বউদিদি!—ইটি আবার কী? অ, বউদিদি? এটাই তোমার আংটি লয়? এই তো আঁল্লার নেচে পইড়েছিলো?" বলতে বলতে বউদির ছাড়া-ব্লাউজ ইত্যাদির বাণ্ডিল আর কমলহীরের আংটিটা এনে হাজির করলো রান্নাঘরে। মেনকার হাতে হীরের আংটি দেখেই বউদির চোখমুখে ভয় আর শোক উথলে উঠলো। কোথায় গেল তাঁর সেই বাঘিনীর মূর্তি—কোথায় গেল সেই সদা-সর্বদার অনমনীয় কনফিডেন্স—যা নিয়ে তিনি ছিনতাইবাজদের পেছনে চেঁচাচ্ছিলেন—"অন্তত মার্কসগুলো দিয়ে যাবেন তো?"

বামালসমেত ধরা পড়া চোরের মতো অসহায় চোখে বউদি প্রায় কেঁদে ফেললেন—"সর্বনাশ! এখন কী হবে? ওগো, থানায় চলো। রিপোর্টটা এক্ষুনি বদলে আসতে হবে। আংটিটা ঘরের ভেতরেই পড়ে যে? পুলিশে তো মিথ্যে রিপোর্ট করা যেতে পারে না, এক্ষুনি চলো। জামাটামার খাঁজে তখন কোথায় ঢুকে গেছলো। কিছুতেই খুঁজে পাইনি, জামার সঙ্গেই কখন পড়ে গেছে। ওদিকে এফ. আই. আর. হয়ে গেছে।"

—"থামো দিকিনি!" দাদামণির গলায় এতক্ষণে সুন্দরবনের যোগ্য হুংকার এসেছে।

—"আরো মোটা হও। আরো ঘুমোও রোববার দুপুরে। এরপর মুখ দেখাবে

BanglaBook.org

কী করে? এফ. আই. আর. কেউ বদলায়? ও ঘড়ি-সজ্জী কিছুই পাওয়া যাবে না, আংটি তো নয়ই—এখন রিপোর্ট বদলাতে গেলেই বরং প্রচণ্ড ঝামেলা হবে—একেবারে কমিশনার পর্যন্ত এমব্যারাসড হবেন—স্রেফ চেপে যাও। কাউকে বোলো না, বাচ্চুদাকেও না—কীপ মাম এবং ও-আংটিটা আর পোরোই না। এই তোমার শাস্তি। ব্যাংকে রেখে এসো। খোকনের বউকে দিও।"

১১

গল্পটা এখানে শেষ হলেই ভালো হতো। কিন্তু তা হলো না। পরের দিনই দাদামণির ফোন ফের পাগলাঘণ্টির মতন বাজলো। তাঁকে লালবাজারে ডাকা হচ্ছে তিনশো দশটি ক্যাসিও ঘড়ি এবং একশো বাষট্টিটি ফেভার-লিউবা থেকে তাঁদের ঘড়িদুটিকে শনাক্ত করে নিতে। হীরের আংটিও আছে পাঁচটা। আসুন দাদা, দেখে যান। দাদামণি গেলেন। এবং একটি সস্তা ক্যাসিও ঘড়ি নিয়ে ফিরে এলেন। সবগুলোই একরকম। কিন্তু পঁচিশ বছরের নিত্যসঙ্গী সোনার ফেভার-লিউবাটি নিশ্চিত ওখানে ছিল না। (হীরের আংটিটাতো নয়ই)।

—"যাক! তবু তো একটা বস্তুও উদ্ধার হলো।" তৃপ্ত হেসে বলেছেন ডি. সি. ডি. ডি.।—"বাকিগুলোও পাবেন।"—দাদামণি তো জানেন ও-ঘড়ি দেখলেই বউদি ক্ষেপে লাল হয়ে উঠবেন। তাই ফিরেই বললেন:

—"বাবলু! খোকন। কে নিবি নিয়ে নে। এই এই এই ঘড়িটা ফেরৎ পাওয়া গেছে।" ছেলেরা ছুটে এলো। বউদি দেখেই মুখ ফেললেন—"এর চেয়ে যে-কোনো একটা ফেভার-লিউবা নিয়ে এলে না কেন?" খোকন-বাবলু দুজনেরই ওর চেয়ে ভালো ঘড়ি আছে। তারা উদার সুরে বললে—"বাবা, তুমিই এই ঘড়িটা ততদিন পরো যতদিন না নেক্সট জাপানে যাবার নেমন্তন্ন পাচ্ছো।"

পরদিন সকালের কাগজে দাদামণি দেখলেন:

—"উত্তর কলিকাতা হইতে তিনশত পঞ্চাশজন ছিনতাইকারীকে লালবাজারে লক-আপে ভরা হইয়াছে। সমাজবিরোধীদের অত্যাচার দৃঢ়হস্তে দমনের উদ্দেশ্যে কলিকাতা পুলিশের প্রশংসনীয় প্রয়াস।" বউদি বললেন—"বাঃ। দেখেছো? অনুপদার কাণ্ড?"

তার পরের দিন সকালের কাগজে চোখ রেখেই বউদি শিউরে উঠে দাদামণিকে দেখালেন—"ওগো, আরো সাড়ে চারশোজনকে ধরেছে—এবারে 'দক্ষিণ কলিকাতা হইতে'। তার মানে মোট আটশোজন ছিনতাইকারী ধরা পড়েছে। যাক! এবারে রাস্তাঘাটে হাঁটাচলা করা যাবে। বাচ্চুদাকে একটা থ্যাংকস দিতে হবে।" দাদামণি দাড়ি কামাচ্ছিলেন। হাত কেঁপে গেল। গালে শাদা ফেনার ওপরে রক্তের দানা ফুটে উঠলো।

"ককীঃ? আ-ট-শো? চলো, আজই বিকেলের ট্রেনে শান্তিনিকেতনে পালাই। বাক্স গোছাও। কুইক। বাঁচতে চাও তো পালাও।"

BanglaBook.org

—"কেন? হঠাৎ? এখন তো কোনো ছুটি নেই?"

—"সর্বনাশ হয়েছে...আট-শো ধরেছে? কেলেংকারি হবে! বুঝতে পারছো না কালকেই আইডেন্টিফিকেশন প্যারেড হবে! আটশোজন ছিনতাইকারীকে রোদে মুখ করে দাঁড় করিয়ে রাখবে। তাদের 'পরনে' সেই লেদার-জ্যাকেটও থাকবে না, সেই নস্যিরঙের র‍্যাপারও থাকবে না, সে-ভোজালিও থাকবে না, সে পাইপগানটাও থাকবে না, মুখে সে বুলিও থাকবে না, চোখে সে চাউনিও থাকবে না...কাউকে তুমি চিনতে পারবে না গিন্নি, বিশ্বাস করো, কাউকেই না। টোটালি কনফিউজড হয়ে যাবে। পালাও, গিন্নি, পালাও। ভুলভাল লোককে আইডেন্টিফাই করলে মহাপাপ হবে, আর ঠিকঠাক লোককে আইডেন্টিফাই করতে পারার প্রশ্নই উঠছে না! পুলিশের খপ্পরে একবার পড়লে আর রক্ষে নেই..."

পরদিন যখন দাদামণিদের টেলিফোনটা ফের পাগলাঘন্টির মতন বেজে উঠলো, লালবাজারী কায়দায়, তখন তাকে থামাবার মতো কেউই ছিলো না বাড়িতে। বেজে বেজে আপনিই সে থেমে গেল ক্লান্ত হয়ে।

পরিশিষ্ট: কী কী জানতে চান, বলুন? হ্যাঁ, বৌদি এখন আটটার মধ্যেই বাপের বাড়ি থেকে ফেরেন। তাঁর বাবা মা-ই আর তাঁকে ওপাড়ায় টিকতে দেন না সাড়ে সাতটার পর।

না, দাদামণির এখনও জাপান যাওয়া হয়নি। ক্যালকুলেটর, ঘড়িও কেনা হয়নি। ওই লালবাজারের ক্যাসিও ঘড়িটাও দারুণ সার্ভিস দিচ্ছে। (একবার ব্যাটারি বদলেছেন মাত্র)। ও, আংটিটা? ব্যাংকের ভল্টের মধ্যে তোলা আছে। সাবধানেই আছে।

সেটার কথা অবিশ্যি ভিক্টোরিয়ার মাঠে বসে বাদাম ছাড়াতে ছাড়াতে একফাঁকে পারমিতাকে বলেও রেখেছে খোকন। দারুণ পয়া আংটি। এয়ারলুম বলে কথা।

আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয় ১৩৯২

BanglaBook.org

সেদিন দুজনে

এক যে ছিলেন কত্তা, তাঁর ছিলো এক গিন্নি। কত্তাটি ফর্সা ধবধবে, লম্বা চওড়া —গিন্নিটি কালোকোলো, ছোটোখাটো। কত্তা স্বল্পভাষী, গিন্নি বাকিনির্ঝর। কত্তা যেমনই সভ্যভব্য, কেতাদুরস্ত, শান্তশিষ্ট, ভদ্রলোক—গিন্নি তেমনি ছটফটে, দুরন্ত, সভ্যতাবিবর্জিত,

বন্যপ্রাণী। দুর্ধর্ষ গিন্নিকে সামলাতে সামলাতে ভালোমানুষ কত্তার প্রাণ যায়-যায়। এহেন গিন্নিকে নিয়ে কত্তা সংসার পেতে বসলেন কোথায়? না সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার হয়ে সেই মার্কিন মুলুকে। গিন্নি সেখানে ছাত্রী, আর কত্তা সেখানে মাস্টার। অবিশ্যি, কত্তার বাড়িটাই গিন্নির পক্ষে ইশকুল। গিন্নি দিবারাত্র উল্টোপাল্টা কথাবার্তা বলে ফেলছেন। ভুলভাল কাজকম্মো করে ফেলছেন, আর কত্তা বেচারা সেগুলো কারেকট করতে করতে নাজেহাল!

যেমন ধরুন—একজন অতিথি এলেন চমৎকার একটি নতুন কোট গায়ে দিয়ে। আসবামাত্র গিন্নি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন—"আরে! আরে! এই কোটটাই বুঝি তুমি কিনেছ? বাঃ। অমুক দোকানের সেলে তো? আমিও এটা শো-উইণ্ডোতে দেখেছিলুম। নেব-নেবও ভেবেছিলুম—ইশ, কী সস্তাতেই দিচ্ছিল ওটা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিলুম না, কেননা উনি বললেন রঙটা বড্ড ক্যাটকেটে, বাঙালমার্কা—। তাই না গো?"

কত্তা গোড়া থেকেই টেবিলের তলা দিয়ে গিন্নির শ্রীচরণে সতর্কতামূলক মৃদু ঠোক্কর দিচ্ছিলেন। এবারে বোধহয় ততটা মৃদু আর রইল না। কেননা গিন্নি ককিয়ে উঠলেন—"উহ! ও কী হচ্ছে? লাগে না বুঝি? তোমার পায়ে শু-টু তো আর আমার পায়ে যে চটি?" অম্লানবদনে কত্তা বললেন—"ওহো, লেগে গেল নাকি? দুঃখিত।" কিন্তু গিন্নি তাতেই যে থামবেন, তাতো নয়।—"আহাহা, তখন থেকে ইচ্ছে করে ধাক্কিয়ে ধাক্কিয়ে এখন আবার বলছো—লেগে গেল নাকি? বা-রে মজা?"

এহেন ধর্মপত্নীকে জন্মের ভাত-কাপড় প্রমিস করে ফেলে কোন পতিদেবতার প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে না? কখন যে গিন্নি কী করে বসেন। একদিন পাশের বাড়ির ডিনারসেট ধার করে এনে এক বিখ্যাত ব্যক্তিকে কত্তাগিন্নি নেমন্তন্ন খাওয়াচ্ছেন, মহামান্য অতিথি বাসনের প্রশংসা করতেই গিন্নি মুখ খুললেন, "এটা অবশ্য আমাদের জিনিস নয়। খুব সাবধানে ব্যবহার করবেন কিন্তু। স্মিথের বৌয়ের কাছে ধার করে এনেছি কিনা। আমাদের কাচের ডিনারসেট তো নেই, গত সেটটা উনি যে সাতদিনেই ভেঙে শেষ করে দিলেন। যাতে ওঁকে বাসনটা না মাজতে দেয়া হয়। আমিও তেমনি। ছাড়বার পাত্র নই। হুঁ হুঁ বাবা, এমন আনব্রেকেবল প্লাস্টিকের সেট কিনেছি। দেখি এখন কেমন না-মেজে পারেন?"

গিন্নির বাগবিস্তারে কত্তাবেচারার মুখের চেহারাটি তখন ভেঙেফেলা কাচের বাসনের মতোই; আর অতিথিদের মুখের চেহারা? ততোধিক করুণ! তাঁদের মুখে আনব্রেকেবল প্লাস্টিকের হাসি।

২

এহেন কত্তাগিন্নি একবার এরোপ্লেনে চড়ে আকাশের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পাড়ি দিচ্ছেন, হেনকালে বাধিল প্রলয়। অর্থাৎ ঝড় উঠল। ওঃ, সে কী তুমুল ঝড়। যার মার্কিনী নাম বৈদ্যুতিক ঝঞ্ঝাবাত্যা (ইলেকট্রিক স্টর্ম)। যাত্রীরা প্রত্যেকে

যে যার পেটে কোমরবন্ধ এঁটে ভয়ে কম্পমান—এমনকী স্টুয়ার্টদের পর্যন্ত সীটে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে বেল্টবন্দী করে। প্লেনটা নাগরদোলার মতো খেল দেখাচ্ছে উপরে, নীচে, ডাইনে, বাঁয়ে। যেন স্বাধীনতা-দিবসে এয়ারফোর্সের শো দিচ্ছে। কখনো ঘাস-বিচালি, কখনো-বা দে দোল দোল। যাকে বলে—ভীষণ রঙ্গে ভবতরঙ্গে ভাসাই ভেলা। ঠিক তাই। জানলার বাইরে কালীপুজোর বাজীর মতন অঝোরে বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে—যেন ডিজনিল্যাণ্ডের কোনো বানানো দুর্যোগের জগৎ। মিশকালো আঁধার ছিঁড়ে-খুঁড়ে জানলায় বিদ্যুতের শিখা লকলক করে উঠছে। ক্যাপ্টেন সবিনয়ে এবারে জানালেন প্লেনের রাডারযন্ত্র অকেজো হয়ে পড়েছে অতিরিক্ত বৈদ্যুতিক চাপে—এখন ভগবানই ভরসা। একবার তো প্লেনটা এমনই ওঠানামা শুরু করলো যে সীটের মাথার ওপরে সরু তাক থেকে ব্রীফকেস, হ্যাটকেস ইত্যাদি ধুপধাপ নিচে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তখনকার দিনে ছোটো প্লেনে ওপরের তাকে ছোটো মালগুলো রাখতে দিতো। এখন অবশ্য আর দেয় না (ঠিকই করে)। এবারে প্লেনে মৃত্যুভয়ের হিম-শীতল আবহাওয়া ছড়িয়ে পড়ছে—গুনগুন করে ভ্রমরগুঞ্জনের মতো ইংরিজি প্রার্থনার মৃদুধ্বনি জমাট বাঁধছে বাতাসে। আমাদের কর্তাগিন্নিও বসে আছেন সেই প্লেনে। কর্তা একজন 'দায়িত্বশীল পুরুষ'। অতএব অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলেও সেটা চেপে রেখে 'ছেলেমানুষ' গিন্নির হাতটি নিজের শক্ত-মুঠোয় ধরে, নীরবে ভরসা যোগাচ্ছেন। মুখে বাক্য নেই। কামরার বাতাসে স্বরজাপ টানলেই টং করে টংকার হবে, এমনই ঝনঝনে টেনশন। এই সংকটময় মুহূর্তেও শ্রীমতী বকতিয়ার খিলজির মুখে কথার যেন শেষ নেই। কর্তার মুখে শুধু মোনোসিলেবিক উত্তর। "ওগো, উঁর কী ভীষণ ঝড়, না? হুঁ।"

—"আচ্ছা, আমাদের পাসপোর্টগুলো কোথায় গো?"

—"কেন?"

—"ঠিক আছে তো?"

—"পকেটে? বলো না? কোনখানটাতে আছে?"

—"আছে, আছে।"

—"আছে আছে মানে? কই? বের করো না? বুকপকেটে?"

—"ব্রীফকেসে।"

—"শিগগিরি বের করো না গো, লক্ষ্মীটি। খুব দরকার।"

—"কেন?"

—"আমারটা আমাকে দাও। তোমারটা তোমার কাছে থাক।"

—"কেন?"

—"কেননা প্লেনটা তো ঝড়ে পড়েই যাবে বলে মনে হচ্ছে।"

—"সেক্ষেত্রে আর পাসপোর্ট...!"

—"বাঃ? পাসপোর্টটা সঙ্গে থাকলে তবেই না ওদের ডেডবডি আইডেনটিফাই

করতে সুবিধা হবে? তোমারটা তুমি রাখো, আমারটা আমি। পুড়ে-টুড়ে তো ছাই হয়ে যাবো সব্বাই! ওরা চিনবে কী করে কে কোনজন? বাড়িতে খবরই বা দেবে কী করে? বিদেশ বিভূঁইতে অকালে মরছি। একটা খবর তো অন্তত..."

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ঘোর সংসারী লোকের হিসেবী সুরে গিন্নি কথাটা অসম্পূর্ণ রাখেন। এত উদ্বেগেও হেসে ফেললেন কত্তা। এবং ঝরঝর করে অনেকগুলো কথা বলেও ফেললেন একসঙ্গে, গিন্নির নিরেট নির্বুদ্ধিতায় চমৎকৃত হয়ে।

—"দূর পাগলি। মানুষ পুড়ে যাবে, আর পাসপোর্টগুলো বুঝি পুড়বে না? এমন কথা কে তোমাকে শেখালো? পাসপোর্ট বুঝি ফায়ারপ্রুফ মেটিরিয়ালে তৈরি হয়?"

—"ওহো, তাই তো?" গিন্নি এবার খুবই লজ্জিত, যারপরনাই অপ্রতিভ। "সত্যিই তো। আগুন লাগলে পাসপোর্টও তো পুড়েই যাবে। তবে? ইশ, কী বোকা আমি। ওই একটা ব্ল্যাকবকস না কী যেন, কেবল সেটাই পোড়ে না, শুনেছি। তা তারমধ্যে তো ঢোকা যাবে না। যাকগে, তার চেয়ে ওসব ভাবনা ছেড়ে দিয়ে আমি এখন বরং একটু ভগবানের নামই করি বাবা। কথায় বলে 'মরণকালে হরিনাম'। তাই করি। হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে।" তারপরেই কত্তার কী করণীয়, সেই বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েন গিন্নি। "কিন্তু তুমি তো আবার ভগবানে বিশ্বাস করো না। তুমি তাহলে কী করবে এখন?" গিন্নি ভুরু কুঁচকে ঠোঁট কামড়ে চশমা নাকে নামিয়ে খানিক ভাবলেন—"গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন" বলা যায়। তারপরে ইউরেকা বলার মতো আবিষ্কারের আহ্লাদে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন—"এক কাজ করো। তুমি বরং লিটল রেডবুকের বাণীগুলো মনে করো।" (ঐ বইটা ঠিক গিন্নির খুদে লাল পকেট-গীতাটার মতোই মিষ্টি দেখতে, হুবহু এক সাইজেরও)।

কত্তা এবার তেড়েফুঁড়ে ওঠেন—"আজেবাজে ইয়ারকি রাখো তো? ইডিয়েটের মতো যত রি-অ্যাকশনারি রসিকতা। একটুখানি চুপ করে থাকবে? এ্যাঁ? একটু সিরিয়াস হও, ফর হেভেনস সেক।" "হোল্ড ইয়োর টাং—এ্যাণ্ড লেট মী?...হুঁ হুঁ কী? লেট মী...'কী'?" চোখ গোল গোল করে, ফিক ফিক হেসে বোকা গিন্নী একা-একাই ইয়ারকি মারেন, বাইরে তখন অন্ধকার খানখান করছে, বিজলীর উদ্দাম ঝলক, বাতাসের গতি সাইক্লোনিক, গিন্নি বলছেন—"অবিশ্যি হেভেন্স সেক নয়, গডস সেক।" এবার বিরক্তিতে চোখ বুজে ফেলে কত্তা বলেন—"ইনকররিজিবল।"...কত্তার রাগে লাল মুখখানা দেখে গিন্নি এবার হাঁপ ছেড়ে নিশ্চিন্ত হন। যাক বাবা, এই তো কত্তার নরমাল ভোকাবুলারি ফিরে এসেছে, আতঙ্কটা তাহলে কেটেছে। হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে। গিন্নিই এবার কত্তার হাতটি মুঠোয় চেপে ধরেন। আকাশও কিছুটা সামলে ওঠে ইতিমধ্যে, আর কত্তাগিন্নির উড়োজাহাজ অচানক অন্য এক বিমানবন্দরে নেমে পড়ে ঝুপ করে। তক্ষুনি গিন্নি সুর পালটে ফেলে, "এই তো আমরা ফিলাডেলফিয়াতে এলুম, অথচ, হায়রে—ডনামারিয়ার সঙ্গে দেখাটা করা হলো

না!"—বলে কত্তার কানের কাছে অবিশ্রাম ঝিঁঝিট রাগিণীতে শোকগাথা গাইতে লাগলেন। অবশেষে "আমি ক্লান্ত প্রাণ এক"—স্টাইলে কত্তা এই সান্ত্বনাবাক্যটি উচ্চারণ করলেন—"নেকসট ইলেকট্রিক স্টর্মের সময়ে নেমে গিয়ে তোমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে গেলেই হবে।"—"এই বলে আমাকে তুমি ফাঁকি দিচ্ছ, হ্যাঁ।" বলে গিন্নি ঠোঁট ফোলালেন। ততক্ষণে 'অল এ্যাবোর্ড' হাঁক পড়েছে। ঝড় থেমে এসেছে, প্লেন উড়তে রাজী।

৩

কত্তাগিন্নি যখন সংসারটি সদ্য পাতছেন তখন নিত্যি-নিত্যিই কিছু-না-কিছু ক্রাইসিস উৎপন্ন হতো। গিন্নি রান্নাবান্না শেখেননি তখনও, কিন্তু কত্তাকে দুটি রেঁধে-বেড়ে দিতে হবে তো? নইলে আর গিন্নি কিসের? অতএব ভাতের ডেকচি উনুনে চড়িয়েই টেলিফোন।

—"ললিতা? ছেড়ে দেবো এবার?"

—"কী ছাড়বি এবার? সিনে ক্লাবের টিকিট?"

—"দূর! চালরে, চাল। ভাত হচ্ছে না?"

—"জল ফুটেছে?"

—"মানে?"

—"মানে জোরে জোরে ধোঁওয়া বেরুচ্ছে? জলটাতে কি বেশ বুদ্বুদ হচ্ছে? ঢাকনাটা নজর করে দ্যাখ দিকি, ওঠাপড়া করছে কিনা—

—"ওহো, সেই জেমস ওয়াট? ধর, দেখে আসছি।" ফোন নামিয়ে গিন্নি হাঁড়ি পরীক্ষা করতে ছোটেন। কত্তাগিন্নির পবিত্র সংসারধর্ম তখন এই স্টেজে।

গিন্নিমার ছোটোবেলায় দেশলাই জ্বালাতে খুব ভয় করতো। এখন রান্নাঘরে ঢুকে সেই ভয়টা একটু একটু করে কমে আসছিল। কিন্তু একটা ঘটনায় আবার গিন্নি পুনর্মূষিক হয়ে গেলেন। সেই গল্পটাই বলি। আগাগোড়া কাঠের তৈরি তিনতলা বাড়ি। খুব পুরোনো। পুরোনো ধরনের গ্যাসের উনুন সেখানে, এ-দেশের মতোই দেশলাই জ্বেলে ধরাতে হয় (পাইলট ল্যাম্প নেই)। সদ্য-বিবাহিত কত্তাগিন্নি "কপোতকপোতী সম উচ্চবৃক্ষচূড়ে" বাস করবেন বলে তিনতলার চিলেকুঠুরিটা অল্পস্বল্প টাকাতে ভাড়া নিয়েছেন। মাস্টারমশাই হলে কি হবে, কত্তার বয়সটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবার মতো —তাই মাইনেও বেশ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবার মতোই। তাই, ঘর সাকুল্যে মাত্র দেড়খানি। বড়ঘরটি পাঁচকোনা। পঞ্চম কোণে একটু রান্নার ব্যবস্থা আছে। এই ঘরটা গিন্নির দারুণ পছন্দ, কেননা ঘরের ঢালু ছাদ, অসম দেয়াল, এবং মেঝে প্রায়ই আশ্চর্য আশ্চর্য জায়গায় এসে পরস্পরের সঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ মিলেমিশে গেছে। বড়ো মজার, এবড়ো-খেবড়ো এই ঘরখানা—অদ্ভুত এলোমেলো তার গড়নপেটন। কখনো পুরনো হয়ে যায় না। কোণা-ঘুপচিতে ভরা। কত্তাটি লম্বা

BanglaBook.org

মানুষ, কিন্তু সাবধানী। তাই যখন-তখন যেখানে-সেখানে নেমে আসা ছাদে তাঁর উঁচু মাথা কদাচ ঠুকে যায় না, অথচ, ছোটোখাটো গিন্নির মাথাটি অনবরত ঠুকে-ঠুকে যেন আলুকাবলির ঠোঙা হয়ে গেছে। এতোই তিনি অন্যমনস্কা। হরেকরকম রঙের টিন আর বুরুশ কিনে মনের সুখে আশা মিটিয়ে ছাদে, দেয়ালে, যত্রতত্র এতোল-বেতোল রঙ করেছেন গিন্নি, আর তার সঙ্গে মিলিয়ে রঙ-বেরঙের কুশন কিনে এনে ঘরময় ছিটিয়েছেন আরামপ্রিয় কত্তা। ঘরখানাকে বড়োই সুখী-সুখী দেখায়। বড়ো হাসিখুসি।

জীবনের প্রথম সংসার। বড়ো যত্নে বড়ো আদরে দুজনে মিলে তাই দেড়খানি কামরা সাজিয়েছেন-গুছিয়েছেন মরা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড আসবাবপত্র আর জ্যান্ত কচি সবুজ গাছপালা দিয়ে। একটা গাছে মস্ত মস্ত চওড়া সবুজ পাতার বাহার—আরেকটা গাছে বেগুনী ফুল ফুটে আছে থোকা থোকা, একটা ক্ষুদে গাছে ক্ষুদে ক্ষুদে কমলালেবু টুনি-বালবের মতো জ্বলছে, আর একটা ছোট লঙ্কাগাছে লাল টুকটুকে লঙ্কা ঝুমঝুম করছে। বসার ঘরেই বাস। রান্না-খাওয়া, বাসনমাজা, পড়াশুনো, আড্ডা, আরাম—সব। আর আধখানা ঘরটাতে শোওয়া। প্রকৃত অর্থেই 'শয়নমন্দির' সেটা—জোড়া খাটটি ছাড়া আর কিছুই ও-ঘরে আঁটে না। অতি কষ্টে দেয়াল-আলমারির পাল্লাটা ফাঁক করা যায়। বাথরুমে একটা বাঘপেয়ে চটা-ওঠা বাথটাব আছে, যা কেবল জাংক ইয়ার্ডে আর মিউজিয়ামেই পাওয়া যায়। এখন সর্বত্র শাওয়ারের চল হয়েছে। আর বাথটাব মানেই টালি-পোর্সিলেনের রাজকীয় ব্যাপার। এমনি একখানা খুরোওলা বাথটাব দিয়েই দিব্যি বাড়িটার বয়স আঁচা যায়। গোটা বাড়িটাই খুব ছোট্টো, দু-কামরার। তিনতলার চিলেকামরায় আমাদের বঙ্গজ কত্তাগিন্নি থাকেন, আর তাঁদের ঠিক নিচে দোতলার ফ্ল্যাটে দুজন ষণ্ডাগুণ্ডা মার্কিনী ছাত্রের বাস। তারা একটু একটু লরেল-হার্ডির মতো। একজন দৈত্যাকৃতি, ইয়া সাড়ে ছ'ফুট লম্বা, অন্যজন বেঁটেখাটো, তারা একদম মিশুক নয়। দিনরাত্রি পড়াশুনো করে, আর ফাঁক পেলেই ভালো ভালো রাঁধে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে কত্তাগিন্নির ঘ্রাণেন অর্ধভোজনম হয়ে যায়। সবচেয়ে পুরোনো বাসিন্দা থাকেন সবচেয়ে নিচে, একতলায়, একা একা। এক খুনখুনে থুত্থুরে বুড়ি। তাঁর ফোকলা মুখের হাসিভরা 'গুডমর্নিং'টি গিন্নির বড়োই প্রিয়। বাড়িওলার নিজের বাসা চার্লস নদীর ওপারে, শহর বস্টনে। এই খেলনাবাড়িটি যতই ঝরঝরে হোক, কত্তাগিন্নির মনে দিব্যি ধরেছে, এবং পকেটেও!

সন্ধেবেলা কলেজ থেকে ফিরে কত্তাটি এককাপ গরম কফি আর একটি পড়ার বই হাতে করে, তিনতলার ছাদের আরামকেদারায় পা-এলিয়ে, পা দুটি দু-ডলার দামের টেবিলে তুলে দিয়ে, দেড় ডলার দামের স্ট্যাণ্ডিং ল্যাম্পটির আলোর তলায় গুছিয়ে বসেন। আর গিন্নি রান্নাঘরে অর্থাৎ তিনগজ তফাতে রান্নাবান্নার কোণটাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুটনো কোটেন কুটুর-কুটুর, বাসন মাজেন খুটুর-খুটুর, আর গড়গড় করে কথা বলেন। সারাদিন কলেজে কী হলো, সেইসব। কত্তা বই পড়তে-পড়তে

হুঁ-হাঁ করেন। কখনো কখনো ভুলভাল জায়গায় 'হুঁ' বলে ফেল্লেই সর্বনাশ—তক্ষুনি গিন্নি পিছন ফিরে তাকান।—"ওঃ, তুমি বই পড়ছো? কিছুই শুনছিলে না?" কত্তার অমনি ভয়ে বুক শুকিয়ে যায়। কিন্তু সে-সব স্বীকার করার পাত্র তিনি নন। —"শুনব না কেন? তুমি জিজ্ঞেস কর না? প্রশ্ন করে দ্যাখো কী জানতে চাও? শুনেছি কিনা বুঝতে পারবে।"

গিন্নিও ছাড়বার পাত্র নন—

—"বলো তো, আজ প্রফেসর হ্যারি লেভিন কার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন? এইমাত্র এটাই বললুম তোমাকে।"

—"কার সঙ্গে বলো তো?" অপ্রতিভ কত্তা শেষরক্ষা করতে পারেন না।

—"বলব না, যাও।"

—"দেখলে তো, কিচ্ছুই তার মানে শুনছিলে না!" অভিমানে গলা বুজে আসে, গিন্নি ঠোঁট ফোলান। কত্তার কফিও শেষ। অগত্যা বই নামিয়ে টেবিল ঠেলে কত্তাকে এবার উঠতেই হয়। সম্মুখে কর্তব্যপালনের গুরুদায়িত্ব। এখন আশু কর্তব্য: মানভঞ্জন।

পাঁচ মিনিট পরের দৃশ্য: গিন্নি আবার গুনগুনিয়ে গল্পো করছেন, কত্তা আবার ভুরু কুঁচকে বই পড়ছেন, আর হুঁ-হুঁ করছেন। সামনে নতুন কফির ধোঁয়া।

৪

সেদিনও এমনিই চলছিল। গিন্নি একসময়ে বললেন—"দেশলাইটা একটু দাও তো?" কত্তা তিনইঞ্চি দীর্ঘ বিশাল কিচেনম্যাচেস দিয়ে অনবরত চুরুটটাকে ধরাচ্ছিলেন। আজকাল আবার কফির সঙ্গে এটা নতুন জুটেছে। কত্তা সিগারেট ছেড়ে চুরুট খেতে শিখছেন, কেননা চুরুট কত্তার কচিকচি চেহারায় বেশ একটা ওজন এনে দেয়, বেশ ভারি-ভারিক্কি দেখায়, মুখে মোটকা একখানা চার্চিলী চুরুট গোঁজা থাকলে। কিন্তু ঝামেলাও কম নয়। একটু অন্যমনস্ক হলেই অভিমানী চুরুট নিভে যেতে চায়। কিছুতেই চুরুটটাকে একটানা জ্বলন্ত রাখার কায়দাটা আয়ত্ত হচ্ছে না কত্তার। তাই অনবরত ফস ফস করে দেশলাই জ্বালাতে হয়, অন্তত দশটা কাঠি লাগে —পরে চুরুট। গিন্নি চাইতে, অন্যমনে দেশলাইটা ছুঁড়ে দেন কত্তা গিন্নির দিকে। কিন্তু গিন্নি তো তখন পেছন ফিরে পেঁয়াজ কুচোচ্ছেন, আর থেকে থেকে চোখ মুছেন। খানিকটা জল পেঁয়াজের জন্যে, আর বাকিটা সাতসমুদ্দুর তেরোনদীর পারে ফেলে আসা দুটি বুড়োবুড়ির জন্যে।

—"আহা, সেই তো রাঁধতে শিখলাম। অথচ ওঁদের কোনোদিন রেঁধে খাওয়ানো হয়নি—কে জানে কবে পারবো"—গিন্নি এইসব ভাবছেন আর চোখ মুছেন, আর পেঁয়াজ কুচোচ্ছেন—মহামান্য দেশলাইয়ের শুভাগমন টের পেলেন না। আর—দেশলাই তো নয়, যেন স্বয়ং দুর্বাসা মুনি। বাপরে। প্রথমে ঠক—তারপরেই ফোঁসস। দুবার

BanglaBook.org

দুটি মৃদু শব্দ, একমুহূর্ত আগুনের ঝলসানি, গিন্নি পেছন ফিরে একঝলক তাকালেন, কত্তা বই থেকে একপলক চোখ তুললেন—অমনি 'দুমম'—বিস্ফোরণের একটা চাপা গর্জন হয়েই বিপুল ধূম্রজালে বিশ্বচরাচর সমাচ্ছন্ন। ঘরের ও-প্রান্ত থেকে একটি আর্তরব উঠলো—

—"এই তো আমি। পারফেক্টলি অলরাইট!"

"তুমি?" বলতে বলতেই রামভক্ত গিন্নি এক লম্ফে সরু টেবিলটা ডিঙিয়ে কর্তার বক্ষোলগ্না হন। গিন্নির বয়স কুড়ি-বাইশের বেশি না, স্বভাবটা ঠিক চড়ুই পাখির মতো চঞ্চল। কিন্তু নিজের সম্পর্কে তাঁর বদ্ধমূল ধারণা যে তিনি আস্ত একটি বোধিবৃক্ষ, তাঁর তুল্য শান্ত, মাথাঠাণ্ডা, তথা প্রত্যুৎপন্নমতি ব্যক্তি ত্রিভুবনে বিরল। ত্রিভুবনে দ্বিতীয় কেউই অবশ্য গিন্নির এই ওরিজিন্যাল ধারণাকে মদত দেন না। তাঁর আত্মীয়, গুরুজন, ইয়ার-বন্ধু কেউই না। বরং উলটে তাঁরা মনে করেন গিন্নি ট্যালা, ক্যাবলা, অকারণে মাথা গরম করেন, এবং কাণ্ডজ্ঞানশূন্যা, পাগল-ছাগলও বলে কেউ কেউ। বললে কি হবে, গিন্নি কিন্তু আত্মবিশ্বাসে অটল। অমন কাকে-কান-নিয়ে-যাওয়া প্রকৃতি তাঁর নয়। গিন্নি লোকের মন্দবচনে কদাচ কান দেন না। তিনি অনেকবার লক্ষ করে দেখেছেন, পদে-পদে মাথাটা গরম হলেও বিপদে-আপদে মাথাটা ঠিক ঠাণ্ডা হয়ে যায়। যেমন সেবার এরোপ্লেনের বিজলী-ঝঞ্ঝার মধ্যে? এবারেও তাই হয়। কত্তাকে সান্ত্বনা দিয়েই নেক্সট মুভ হিসেবে গিন্নি দৌড়ে নিজের ভারী ওভারকোটটি এনে ছুঁড়ে দেন আগুনে। অবশ্য আগুন-টাগুন দেখা যাচ্ছে না, ধোঁয়ায়-ধোঁয়া ঘর, দম আটকে আসছে। তবে কথায় বলে, 'যেখানেই ধোঁয়া আছে, সেইখানেই অগ্নি'। তারপর গিন্নির হাত ধরে টানতে টানতে কত্তা ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে পড়েন, যাবার আগে সাবধানে দোরগুলো সব টেনে দিয়ে যান—যাতে আগুনটা সারাবাড়িতে ছড়িয়ে না পড়ে। (যেন আগুনের অভ্যেস ভদ্রলোকের মতো দরজা দিয়ে বেরিয়ে কলিং বেল টিপে অন্যের বাড়িতে ঢোকে!) মুচমুচে পলকা কাঠের বাড়ি তো? জতুগৃহের দশা হতে সময় লাগবে না। চটপট অন্যান্য বাসিন্দাদের খবর দেওয়া দরকার। কিন্তু তার আগেই আগুনে পশমের কম্বল চাপা দেওয়া নিয়ম। পশমের কম্বল বাড়িতে একটাও নেই। সেন্ট্রাল হিটিং আছে বলে, এ-বাড়ির কম্বলগুলো সমস্তই নাইলনের। নাইলন তো বেশি বেশি জ্বালানি যোগায়। সেটা খেয়াল করে গিন্নি সে কম্বল না-ছুঁড়ে কোট ছুঁড়েছেন, যেটা কিনা পিওর উলের, এই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য সিঁড়ি দিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে গিন্নিকে একটু পিঠ চাপড়ে বাহবা না দিয়ে পারলেন না কত্তা। সেইসঙ্গেই বলে দিলেন—"দোতলায় গিয়ে কথাবার্তা যা বলবার সেটা আমিই বলবো কিন্তু।" কত্তার কাছে বাহবা পেয়ে গিন্নি খুব খুশি, তারই মধ্যে দুঃখু-দুঃখু প্রাণে একটু ভাবলেন, "আহা, অতো দামী কোটটা এতক্ষণে ছাই হয়ে যাচ্ছে—কিন্তু প্রশ্নটা যেখানে মানুষের জীবন-মরণের সেখানে একটা তুচ্ছ কোটের মরণ-বাঁচন নিয়ে ভাবলে চলবে কেন!"

BanglaBook.org

৫

দোতলায় নেমেই গিন্নি ভুলে ছাত্রদের বন্ধদুয়ারে দমাদম প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে গেলেন। বাড়ির জানলা-দরজা কেঁপে ওঠে ঝনঝনিয়ে। অমনি কত্তার মৃদু ধমক—"ছি, বাড়িতে কি ডাকাত পড়েছে? হাজার হোক ওদের সঙ্গে আলাপ নেই তো?" তিনি তো সামাজিক আদবকায়দাসম্পন্ন মার্জিত ভদ্রলোক? গিন্নি হলেনই বা বুনোপ্রাণী। কত্তা শত বিপদেও সৌজন্য হারিয়ে ফেলেননি।

কিঞ্চিৎ লজ্জা পেলেও গিন্নি বলতে ছাড়েন না—

—"আহা, ডাকাত না পড়ুক, আগুন তো লেগেছে? আমরা কি পাড়া বেড়াতে এসেছি নাকি?" অতিকায় দীর্ঘদেহ কিশোরটি দোর খুলে দেঁতো হাসলো—

—"হায়!" (হাহাকার নয় অবশ্য, প্রীতিসম্ভাষ।)

—"হ্যালো।" সহাস্যেই কত্তা বললেন।

—"ক্যান আই হেলপ ইয়ু?"

আরো হাসি।

কত্তাও আরো হাসেন। গিন্নি কেঁদে ফেলেন।

আর কি। ঘরে আগুন লেগেছে, সময় বহিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়—এই সংকটের মুহূর্তে হায়-হ্যালো করে লোকলৌকিকতা করে কেউ? এই কি ভদ্রতার সময়? গিন্নির মুখের চেহারাতেই বোধহয় এম. ও. এস. বার্তা লেখা ছিল। অথবা তাঁর দোর ঠ্যাঙানির ধরনে। সাহেব বাচ্চাটির নিজেই বললো—

—"ডু ইয়ু হ্যাভ এনি প্রবলেম?"

কত্তা ভদ্রতায় গলে গিয়ে বলেন—

—"ধন্য, ধন্য—ভয়ের যদিও কোনো কারণ নেই, কিন্তু —দো দেয়ার ইজ নো কজ ফর প্যানিক, বাট—"

অকস্মাৎ গোমড়া হয়ে গেল ব্যায়ামবীর ছেলেটার শ্মশ্রুগুম্ফহীন হাসিমুখ।

তারপর সাড়ে ছ'ফুট শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে মুখখানা কত্তার মুখের খুব কাছে নামিয়ে এনে ভুরু পাকিয়ে খিঁচিয়ে উঠলো—

—"প্যানিক? হোয়াই শুড আই প্যানিক, ম্যান?" কত্তাটিও দমবার নন। হলেনই বা পাঁচফুট সাড়ে দশ ইঞ্চি। হাস্যবদনে সংযতকণ্ঠে তিনি জবাব দেন—

—"দ্যাটস রাইট! ইউ শুড নট প্যানিক। বাট দেয়ার ইজ এ স্মল ফায়ার আপস্টেয়ার্স।" অর্থাৎ কিনা ভয়ের কিছুই নেই, বাড়িতে কেবল যৎসামান্য আগুন লেগে গেছে। এই সৌজন্যপূর্ণ সংবাদটি শোনবামাত্র ছেলেটার মুখের চেহারা পালটে যায়। ভয়ার্ত গলায় চেঁচিয়ে ওঠে :

—"কী বললেন? আগুন? ডিড ইউ সে আ ফায়ার? স্টীভি। স্টীভি। দেয়াজ আ ফায়ার আপস্টেয়ার্স। —এবং তৎক্ষণাৎ দমাদ্দম শব্দে ধরিত্রী প্রকম্পিত করে কাঠের সিঁড়ি প্রায় সে ভাঙতে-ভাঙতে ওপরে দৌড়তে থাকে। তার পেছন পেছন

BanglaBook.org

কত্তাগিন্নিও সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে ওপরে ঊর্দ্ধপানে ছোটেন। আর তাঁদের পশ্চাতে ছুটতে ছুটতে আসে স্টীভি নামক বেঁটে ছাত্রটি। তার হাতে একটা খুন্তি। সেও ডিনার রাঁধছিল মনে হয়। উঠে গিয়ে জোর দোর-ঠেলাঠেলি শুরু করেছে দৈত্যাকৃতি ছেলেটা—দোর আর খোলে না। এদিকে অজস্র ধোঁয়া বেরুচ্ছে তার ফাঁক দিয়ে। ছেলেদুটোর কাঁধের ধাক্কায় দোর যখন ভাঙো-ভাঙো, তখন সন্তর্পণে তাদের একটু ঠেলে সরিয়ে—"নাউ, প্লীজ লেট মী ট্রাই— বলে কত্তা এগিয়ে যান, এবং পকেট থেকে চাবিটি বের করেন।

—"ও-ও-হ"...বলে একটা কাতর হাল-ছাড়া শব্দ বেরোয় ছেলেদুটির মুখ থেকে এবং খুট করে দরজা খুলে যায়।

—"জাস্ট ইম্যাজিন, স্টীভি,—অল দা হোয়াইল হি হ্যাড দ্যাট কী...! এ্যাণ্ড...।" অপ্রস্তুত স্বরে কত্তামশাই কৈফিয়ৎ দেন—"আমাকে তো আপনারা সুযোগই দিচ্ছিলেন না খুলতে—আমি কি করব।"

গিন্নি ভেবেছিলেন ঘরে ঢুকে দেখবেন সিনেমায় দেখা অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্যের মতো ঘরময় লকলক করছে লাল-হলুদ আগুন, যাকে বলে 'নেলিহান অগ্নিশিখার খেলা', চেয়ার টেবিলগুলো পটপট শব্দে পুড়ছে—পর্দাগুলো দাউদাউ করে জ্বলছে আর ফোমের কুশনগুলো ধিকি-ধিকি।

আহারে—কমলালেবু গাছ আর লঙ্কা গাছটার জন্যে খুব মায়া হয় গিন্নির। —ওগুলো জ্যান্ত ফলন্ত জিনিস তো?

ওরই মধ্যে গিন্নি মনে মনে ভেবে নিচ্ছিলেন কেমন করে পাসপোর্টদুটো, কবিতার খাতাটা, আর কত্তার সখের টাইপরাইটারটি উদ্ধার করা যায়। গরীব মাস্টার-মানুষ, সদ্য কিনেছেন বড়ো সাধের যন্ত্রটি। ইনশিওর করানো হয়নি এখনো। সুখের কথা এই যে এগুলো সবই আছে শোবার ঘরের দেয়াল-আলমারিতে। কিন্তু আগুন পেরিয়ে সেখানে যাওয়া যাবে তো?

দরজা খুলে দেখা গেল সম্পূর্ণ ভিন্ন এক শান্তিময় দৃশ্য। একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণেশ হে। কেবল মেঝের একটাই জায়গা থেকে ঘোরতর ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে। সেখানে মোটা শতরঞ্চিটা ক্রমাগত পুড়ছে। খুবই 'লোকালাইজড ধোঁয়া'। ঠিক তার পাশেই কোটটা শান্ত হয়ে শুয়ে আছে পোষা কুকুরের মতো। ঘরে কোনোই শান্তিভঙ্গের লক্ষণ নেই। সব ঠিকঠাক। প্লেটে কুচো পেঁয়াজের পাশে গিন্নির ছুরি মজুত, টিপয়ে কত্তার কফির পাশে খোলা অর্থনীতির বই। খুদে কমলালেবু, লাল লঙ্কা হাসি-হাসি মুখে যে যার টাব থেকে কত্তাগিন্নিকে অভ্যর্থনা জানাল—'হায়।' আহ্লাদে গিন্নির চোখে জল এসে যায়।

আঃ, জীবন কত সুন্দর। ভগবান কত ভালো! কপালের ঘাম মুছে ছেলেদুটো বলল—"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কী বাঁচাটাই বেঁচেছেন। দয়া করে ভবিষ্যতে আর দেশলাই ছোঁড়াছুড়ি করবেন না, ওটি বড়ই বিপজ্জনক খেলা।—এদেশে কিচেনম্যাচেস

BanglaBook.org

সেফটিম্যাচেস হয় না।" কত্তা নাক কুঁচকে বললেন, "আমাদের দেশে কিন্তু সব দেশলাই-ই সেফটিম্যাচেস হয়।" ছেলেটি গিন্নির কোটটি মেঝে থেকে তুলে পি. সি. সরকারের মতো ঝেড়েঝুড়ে দেখালো যে এত আগুনেও তাতে একটি ফুটো পর্যন্ত হয়নি।

কোট পরীক্ষা করে নামিয়ে রেখে স্টীভি খুব গম্ভীর মুখে বলে—"নট শুড ইউ থ্রো ইওর কোটস ইন টু ফায়ার।" এই সময়ে দেখা গেল যে কোটের লাইনিঙটা নাইলনের। কত্তাগিন্নিতে চোরাই চোখাচোখি হয়। নেহাৎ কপালজোরেই আগুনে পড়েনি লাইনিঙয়ের দিকটা। ভাগ্যিস! কত্তাগিন্নি সেই ছেলেদের কিছুতেই চা-কফি-বিয়র-হুইস্কি-কোকাকোলা-সেভেন আপ, কারি-রাইস—কিছুই খাওয়াতে রাজী করাতে পারলেন না। নাঃ, এই গোবদা ছেলেদুটোকে মোটেই মিশুক বলা চলে না। পুরো এক বছরের মধ্যে কত্তাগিন্নির সঙ্গে তাদের সামাজিক যোগাযোগ হয়নি।

৬

সামাজিক যোগাযোগ হয়নি, কিন্তু অসামাজিক যোগাযোগ একবার একটা ঘটেছিল। এতই মনুষ্যসমাজ-বহির্ভূত সেই বিরল সাক্ষাৎ, যে উভয়পক্ষেই তা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। ঘটনাটি চেপে না রেখে বলে ফেলাই ভালো।

মার্কিন দেশের লোকেরা সাত তাড়াতাড়ি ডিনার খেয়ে নেয়, অফিস থেকে ফিরেই, ছ'টা নাগাদ। আর সূর্য ডোবেন তাঁরা যখন খুশি, রাত্তির আটটা, ন'টা, দশটায়। খুব দীর্ঘ গোধূলি। সেদিন বড় সুদীর্ঘ বাতাস বইছে, দেশে যাকে বলে দক্ষিণা বায়, মন রয় না রয় না রয় সখা রে, মন রয় না। যদিও তখন শীতকালই, কিন্তু বসন্ত এই আসে কি সেই আসে বলে দারুণ শাসাচ্ছে। আবহাওয়াটি বড়ো মনোরম। ললিতলতা লবঙ্গলতা। পরিশীলন কোমল সেই সময় সমীরণে মোটেই ঠাণ্ডার কামড় নেই, কত্তাগিন্নি ভাবলেন, "অহো, কি অপরূপ বসন্ত-সন্ধ্যা। আজ আর রেঁধে কাজ নেই। একটু বাইরে থেকে খেয়ে আসা যাক।" কত্তাগিন্নির এই ভাবনাটির মধ্যে অবশ্য বিশেষত্ব ছিল না। সপ্তাহে দু-একদিনই তাঁরা এরকম ভাবতেন। প্রত্যেকবার কারণগুলো ভিন্ন ভিন্ন তৈরি করে নিতেন। যথা: "আজ বড় সময় কম, অনেক পড়াশুনা আছে, রাঁধতে বসলে দেরি হয়ে যাবে," অথবা—"আজ হাতে ঢের উদ্বৃত্ত সময়, একটু ঘুরেফিরে খেয়েদেয়ে এলে কেমন হয়?" আসল কারণ দুটি। প্রথমত, গিন্নি সদ্য রান্না শিখছেন, তখনও ঠিক 'রন্ধনে দ্রৌপদী' হননি, একেকদিন রান্না ফেল করে যায়—মুখে তোলা যায় না। দয়ার সাগর কত্তা যদিও তা স্বীকার করতে চান না, তবু তখন ডিম-রুটি-বেকন দিয়েই ডিনারের ফাস্ট ব্রেক করতে হয়। দ্বিতীয় কারণটি আরো জোরালো, বাড়ির পাশেই দুটি যারপরনাই সস্তা খাবারের দোকান আছে—একটি গ্রীক, অন্যটি চীনে। দোকানদুটি প্রধানত দেউলিয়া, ভবঘুরে, ভিখিরিদের জন্য হলেও গরীব কত্তাগিন্নির মুখে সেই রান্না অমৃতসমান

BanglaBook.org

লাগতো। বিশেষ বিলটা যখন আসত। দোকানদুটি প্রায় পাশাপাশি। পাঁচ মিনিটের হাঁটা রাস্তা। গিয়ে, খেয়ে, ফিরতে ঘণ্টাখানেক। অতএব কত্তাগিন্নি আজ আর কেউই ওভারকোটের অতিরিক্ত ভারবহন করলেন না, এই আনন্দ-বসন্ত-সমাগমে। রাত তো হবে না, শীত পড়বার ঢের আগেই তাঁরা ফিরে আসবেন হালকা হৃদয়ে পলকা পায়ে। কুহু কুহু করে বেরিয়ে পড়লেন। কত্তার পকেটে পার্স আছে বলে গিন্নি তার অহং-থলিটিও নিলেন না। গুনগুন করে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে গাইতে গিন্নি বেরুলেন—কত্তার প্রাণে বেশি আনন্দ হলে আই. পি. টি. এ-র গান গাইতে থাকেন। দুজনে দু'রকম গান গাইতে গাইতে গ্রীক দোকানে ঢুকলেন।

সেখানে গ্রীক গান বাজছিল জ্যাক-বকসে। গিন্নি মেনু দেখতে দেখতে বললেন, "আহা, এখানে পয়সা ফেললে যদি রবীন্দ্রসংগীত হতো?"—"সেটা ভালো হতো না বিশেষ। বরং যদি 'পথে নামো সাথী' বাজতো কিম্বা 'ইন্টারন্যাশনাল"—বলে কত্তা একটা বিয়র অর্ডার দেন। গিন্নি একটা কোকাকোলা। তারপর গ্রীক ল্যাম্বরাইস স্যালাড। গজার মতো বাকলাভা। তুর্কী কফি।

পেটপুরে প্রাণভরে খেয়েদেয়ে বাড়িতে ফিরে এসে তিনতলায় উঠে, পরিতৃপ্তি সহকারে ক্লোভ এবং কার্ডামম চিবুতে চিবুতে কত্তাগিন্নি আবিষ্কার করলেন—সর্বনাশই সমুৎপন্ন হয়েছে। এবং এই সর্বনাশে এমনকী পণ্ডিতের অর্দ্ধেক ত্যাগ করার উপায় নেই। পুরোটাই পরিত্যাগ করতে হয়, অর্থাৎ এক্ষেত্রে ঘরবাড়ি ফ্ল্যাটে নো এ্যাডমিশান —কেননা কত্তার চাবিটি আছে তাঁর ওভারকোটের পকেটে, গিন্নির চাবি তাঁর বটুয়ায়। এবং কোট-বটুয়া দুটোই ঘরের ভেতরে থেকে গেছে। ঘরে চাবিবন্ধ। অতএব আপন ঘরে পরবাসী—ঢুকতে আর পারিনে। এখন ঘরে ঢুকতে হলে এতগুলো কাজ করতে হয় ১. বাড়িওয়ালাকে বস্টনে টেলিফোন করে একস্ট্রা চাবি প্রার্থনা করতে হবে। ২. সেটাও কোনো ফোন বুথে গিয়ে। ৩. তারপরে সে-ই বস্টনে ছুটতে হবে চাবিটি আনতে (যদি তৃতীয় চাবি থাকে। কেননা দুটি চাবিই দিয়ে দিয়েছিলেন তিনি)। ৪. ইদিকে গাড়ির চাবিও তো রয়ে গেছে ঘরের মধ্যে—ঘরের চাবিরই সঙ্গে। অতএব টিউব ট্রেনে করে বস্টনে যেতে হবে। এবং ৫. ততক্ষণে শীত বেশ জাঁকিয়ে নেমে পড়বে। বসন্তকালের শীত নিশাচর, রাত হলেই ঝপাং করে তিনি ঝাঁপ দিয়ে পড়েন জনমনুষ্যের ওপরে, বাঘের মতো। অথচ ওভারকোটগুলোও ঘরের মধ্যে বন্দী। এই শীতে নদী পেরিয়ে বিনা-কোটে বস্টন যাওয়া...। কত্তার ফর্সা মুখটি শুকিয়ে বাসি বকুলফুল। এখন পাঁচদাগ সমস্যা সামনে—প্রত্যেকটাই খাঁটি।—হায়! হায়! কী গণ্ডগোলটাই যে পাকিয়ে গেল আজকে এই আনন্দ-বসন্ত-সমাগমে!

হেনকালে গিন্নি লাজুক গলায় বেগনী-বেগনী মুখে কত্তাকে বললেন—"হ্যাঁগো, এদেশে রেইন-ওয়াটার পাইপ হয় না? আমি কিন্তু পাইপ বেয়ে উঠতে পারি।"

গিন্নির বাক্যংশ্রুত্বা চমৎকৃত কত্তার প্রথমে বাক্যরোধ হয়ে গেল। তারপরে সংবিত ফিরে পেয়ে তিনি ভাঙাগলায় বললেন—"সে কি!" তাতেই যথেষ্ট উৎসাহ পেয়ে

BanglaBook.org

গিন্নি উবাচ—"অবিশ্যি এসব বাড়ির তো ঢালু ছাদ! রেইন-ওয়াটার পাইপ নাও থাকতে পারে। তা না-ই-থাকলো। চিমনির পাইপ-টাইপ যা হোক কিছু একটা থাকবেই নিশ্চয়?" বলেই নিচে ছুটলেন সরেজমিনে তদন্ত করতে। কত্তা আর কী করেন? তিনিও নিচে চললেন, ছায়া ইব। যেহেতু কোনো সূক্ষ্ম বুদ্ধিদীপ্ত সমাধান সাপ্লাই করতে পারছেন না। আপাতত বিষয়টাই এমন স্থূল, আন-ইন্টালেকচুয়াল। অগত্যা গিন্নির সরল মোটা অ্যাপ্রোচটাই মেনে নেওয়া যাক।

বাড়ির পশ্চাদভাগে একটুখানি পোড়ো জমি। সেইখানে তিনটি ফ্ল্যাটের তিনখানি সুবৃহৎ আবর্জনা ভাণ্ড, মার্কিনী ভাষায় গারবেজ ক্যান, বসে আছেন কর্তাব্যক্তির মতো সারি সারি, সুগম্ভীর। এবং প্রায় অন্তঃসারশূন্যই, কেননা গতকালই পৌরসভার গাড়ি এক সপ্তাহের আবর্জনা কুড়িয়ে নিয়ে গেছে। পাইপের সন্ধানে গিয়ে আরেকটি বস্তু আবিষ্কার করে ফেলেছেন গিন্নি এদিকে। করে তিনি আহ্লাদে আত্মহারা, আরে বাঃ, সমস্যার সমাধান! সামনেই কিনা একটি—অতি দীর্ঘ লোহার মই! দেওয়ালে চমৎকার প্রলম্বিত। ঠিক কত্তাগিন্নির চিলেকোঠার শয়নকক্ষের বাতায়নই উৎসমূল। এবং সেই জানলা, নিচে থেকেই দেখা যাচ্ছে। আজ শীত কম বলে ছিটকিনি দেওয়া নেই, এক-তৃতীয়াংশ খোলা। অর্থাৎ ওটাকে ঠেলে আরেকটু ওপরে তুলে দিতে পারলেই ঘরে ঢোকাটা তুচ্ছ। (ইংরিজি সিনেমায় দেখা বিদেশী জানলাগুলি পাঠকদের স্মর্তব্য কুত্রাপি গ্রিল-গরাদের ঝামেলা থাকে না।)

পাইপের বদলে মই পেলুম টাক ডুমাদ্যা ডুম।

পরম উৎসাহে গিন্নি বললেন, কত্তাকে—"তবে আর ভাবনা কিসের? তুমিই উঠে পড়ো"—হাজার হোক গিন্নি এটুকু জানেন যে ভদ্রসমাজে পুরুষকেই প্রথমে 'পুরুষের ভূমিকায়' একটা চান্স দিতে হয়। এবং মই বেয়ে ওঠাটা ঠিক নতুন বউয়ের যোগ্য রোল নয়। সঙ্গে সঙ্গে সপ্রতিভ সুরে কত্তা বলেন, "সে তো উঠতেই পারি! এ আর কে না পারে? ফুঃ!" তারপর নিজের ঝাঁকড়াচুলে একটু বিলি কেটে নিয়ে ফের বলেন—"নো প্রবলেম। সহজপন্থা তো সামনেই। যে-কেউ উঠে পড়লেই হলো।" কিন্তু কার্যত মই স্পর্শ করার কোনোই লক্ষণ দেখালেন না। অধৈর্য গিন্নি এবার তাড়া লাগালেন—"কই, ওঠো?" বশংবদভাবে কত্তা বললেন—"এই উঠছি।" বলে গম্ভীরভাবে একবার বাঁদিক থেকে, আরেকবার ডানদিক থেকে সিঁড়িটাকে খুব যত্নসহকারে বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতায় পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করেন। ধীর, সুস্থির, বিলম্বিত লয়ে পায়চারিপূর্বক। যেন বাঘের খাঁচার ব্যাঘ্র।

সরু আঠারো ইঞ্চি চওড়া লোহার শিকের তৈরি মই। বিপজ্জনকভাবে সিধে উঠে গেছে স্বর্গের সিঁড়ির মতো। ঠিক কত্তাগিন্নির জানলা পর্যন্ত। হাতল-টাতলের বালাই নেই। দেয়াল থেকেও ফুটখানেক দূরে। এবং মাটি থেকে প্রায় একতলা উঁচুতে নেমে এসে হঠাৎ ফুরিয়ে গেছে। এর নাম 'ফায়ার এসকেপ'। বাড়িতে আগুন লাগলে এই মই বেয়ে বাইরে পালিয়ে আসতে হয়। শুধু নামবার জন্যেই

এই মই, ওঠবার জন্য নয়। বাড়িতে আগুন লাগলে, এই সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে শেষ ধাপ থেকে ওরাংওটাংয়ের মতো দুই হাতে ঝুলে পড়লে, পা মাটি থেকে খুব বেশি ওপরে থাকে না। তখন দুগগা বলে ঝুপ করে লাফালেই হলো। কিন্তু মাটিতে দাঁড়িয়ে ঐ সিঁড়িতে নাগাল পাবার কোনো উপায় সাধারণ মানুষের নেই। নতুবা চোরেরা যে রেগুলারলি ওঠা-নামা করবে! মার্কিন দেশে প্রত্যেক বাড়িতে এই লোহার সিঁড়ি আইনত অপরিহার্য। এবং জণীবাড়ির গিন্নির মতোই ধনীবাড়ির ফায়ার এসকেপের বেশ নধর, পুষ্ট, রেলিং-টেলিংওয়ালা দোহারা চেহারা হয়, আর গরীববাড়ির ফায়ার এসকেপার হয় রোগা, সরু, চিমসে। যেমন এইটে। এটার জন্ম হয়েছে যেন আইনের দৌলতে—নাম-কা-ওয়াস্তে। কাম-কা-ওয়াস্তে নয়।

কত্তার দ্বিধান্বিত দুশ্চিন্তিত পায়চারি দেখে গিন্নি ভাবলেন কত্তা নিশ্চয় ভাবছেন "অত ওপরে মইটা ফুরিয়েছে—এখন উঠি কী করে?" বুনোগিন্নির মাথায় চমৎকার দুর্বুদ্ধির বৈদ্যুতিক উদ্ভাস এসে গেল। তাঁর শরীরে তো ঘেন্নাবৃত্তি নেই। তিনি বল্লেন —"এসো আমরা একটা গারবেজ ক্যানের ময়লা আরেকটাতে ঢেলে নিয়ে খালি পাত্রটি উপুড় করে মইয়ের তলায় পাতি। তারপরে ওটার ওপরে চড়লে তুমি ঠিকই হাত পেয়ে যাবে মইতে। তুমি যা লম্বা!" বলে কত্তার পাঁচ ফুট সাড়ে দশ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যটিকে সপ্রশংস নয়নে বন্দনা করেন। আহা কী চেহারা—যেন শালপ্রাংশু। মহাভুজও কি নন? কত্তা তাতে ধন্য বোধ করলেও ডাস্টবিনে চড়বার কাজে খুব একটা উৎসাহ পেলেন বলে মনে হলো না। কিন্তু অধীর আগ্রহে প্রবলা সেই গিন্নিকে দমায় কে? অনতিবিলম্বেই একটা ময়লা ফেলার ড্রাম খালি করে ফেলে সেটা মইয়ের তলায় উলটিয়ে পাতা হয়ে গেল। মঞ্চ প্রস্তুত—এবার কত্তার তাতে উঠে পড়াবই অপেক্ষা।

হেনকালে গিন্নির অত্যুৎসুক আঁখিপল্লব এড়িয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে নিরুপায় কত্তা আমতা আমতা করে বলেই ফেলেন—"শোনো, একটা কথা তোমাকে বলা হয়নি।" গিন্নির মুখটি শুকিয়ে গেল। বলা হয়নি এমন কথা এখনও আছে? এই পাককা সাড়ে সাতমাস পড়েও? অর্থাৎ তিরিশ ইনটু সাত দু-শো দশ প্লাস পনেরো রাত্রি একাদিক্রমে গুঞ্জনের পরেও?

কত্তা অপরাধীর মতো মাটিমুখো হয়ে যা-থাকে-কপালে-সুরে বলে ফেললেন, —"আমার ভার্টিগো আছে।" বিমর্ষ গিন্নি এবার আঁতকে উঠলেন। "এ্যাঁ...?" গিন্নি অকাতরে কাতরে ওঠেন—যেন সিফিলিস—"সে কি গো? সে তো একটা ভয়ংকর হিংস্র মনের রোগ, যা খুনীদের থাকে। শুনেছি হিচককের 'ভার্টিগো' নামে একটা ছবিতে এক স্কামীস্ত্রী... কত্তাটি এবার হাঁ হাঁ করে ওঠেন—"ওরে নারে, খুনটুনের ব্যাপারই নয়, ভার্টিগো একটা তুচ্ছ অসুখ—অতি তুচ্ছ, অত্যন্ত সাধারণ, আ মোস্ট কমন প্রবলেম—যাতে ওপর থেকে নিচের দিকে তাকানো যায় না। দেশের বাড়িতে দ্যাখোনি, দেয়ালঘড়িতে বাবা দম দিতেন, ঠাকুর দম দিত, এমনকী মালীও দম

দিত, অথচ আমি কদাচ দিতাম না? আমি যে মইতে চড়তে পারি না। চড়লেই মাথা ঘোরে। বুক ধড়ফড় করে, বমি পায়, মনে হয় পড়ে যাব, অথবা লাফিয়ে পড়ি। এইজন্যেই তো তোমার সঙ্গে কুতুবমিনারে কিছুতেই চড়লুম না।"—"উঃ, কি সর্বনাশ। মনে হয় লাফিয়ে পড়ি?" গিন্নিই লাফিয়ে ওঠেন। কিন্তু গলা শুনে মনে হয় না সর্বনাশের গন্ধ পাচ্ছেন। লাফিয়ে গিন্নি একেবারে গারবেজ ক্যানের ওপরেই উঠে পড়েন। উঠে সোল্লাসে বলেন—"খবর্দার, তোমার মইতে চড়ে কাজ নেই। আট্টু হলেই সর্বনাশ হয়েছিল আর কি! এতো আমার ডালভাত। এ আমি ইজিলি চড়তে পারি।" গিন্নির গলায় স্পষ্ট রিলিফ। বিয়ের পরেই দল বেঁধে সবাই কুতুবমিনারে গিয়ে গিন্নির সত্যি বড্ড মনে কষ্ট হয়েছিল। জেদ করে কত্তা নিচে দাঁড়িয়ে রইলেন। একা-একাই। কিন্তু ওদিকে যে একটা ভীষণ সাজগোজ করা পাঞ্জাবী মেয়েও নিচে দাঁড়িয়েছিল! গিন্নি তাই মিনারে চড়ে মোটেও মনে শান্তি পাননি। আজ বুকটা যেন জুড়িয়ে গেল। এ-ই ব্যাপার ছিল তাহলে?

"সেই ব্যাপার নয়? তা-রা! জয় মা তারা (গিন্নি হঠাৎ মনে মনে তাঁর পিতৃদেবের মতো হুংকার দিয়ে ওঠেন) তারা ব্রহ্মময়ী মাগো। বাঁচা গেল।"

দেড়মাস আগেই কত্তাগিন্নির বিবাহের অর্ধবর্ষপূর্তি জয়ন্তী উৎসব হয়ে গেছে বটে কিন্তু দেখা যাচ্ছে "এখনও গেল না আঁধার"—এখনও কত কি জানা বাকি। পরস্পরকে ভালো করে চেনাই হয়নি। এই সংঘটমুহূর্তে গিন্নি প্রথম জানলেন তাঁর সর্বশক্তিমান কত্তা একটা জিনিস পারেন না—আর কত্তা অবগত হলেন যে গিন্নি সেইটে তো পারেনই, পরন্তু আরেকটা জিনিসও পারেন। গিন্নি জানলেন তাঁর কত্তা মইতে চড়তে অপারগ—এবং কত্তাও এই প্রথম জানলেন যে গিন্নিটি রেইন-ওয়াটার পাইপ বাইতে ওস্তাদ, দুজনে দেখা হলো, মধুযামিনী রে।

৭

হলে কি হবে, গিন্নির আঙুলের ডগাটুকুও পৌঁছোলো না মইয়ের শেষ ধাপ পর্যন্ত। পায়ের তো প্রশ্নই নেই। তখন পুরুষজাতির সম্মানরক্ষার্থে কত্তাও উঠে পড়লেন উলটোনো আবর্জনা-পাত্রের পৃষ্ঠদেশে। কত্তাকে দেখে উদ্বিগ্ন গিন্নির মনে একটি ছবি ভেসে এলো—"আচ্ছা, একটু একটু কিষ্কিন্ধার রাজার মতো দেখাচ্ছে না তো গো আমাদের?" কিন্তু কত্তা কেজো-মানুষ। ওসব নান্দনিক অপভাবনার তাঁর সময় নেই।

"—দূর! যত্ত উটকো ভাবনা।" বলে কত্তা ততক্ষণে গিন্নিকে দুহাতে শক্ত করে শূন্যে তুলে ধরেছেন এবং টারজানের মতোই অবলীলাক্রমে গিন্নির শাঁখা-নোওয়া পরা হাতদুটি মই ধরে ঝুলে পড়েছে। তারপর কত্তার স্বেচ্ছা-নিবেদিত স্কন্ধদেশে পদস্থাপনপূর্বক নববধূ মইতে পা তোলেন—অনেকটা প্যারালাল বারের কায়দায়। বীরপুরুষ কত্তামশাইয়ের মুখ ফসকে এই সময় একটি মৃদু অস্ফুট আর্তনাদ নিষ্ক্রান্ত হলো। গিন্নি তাড়াতাড়ি জিব কাটলেন—"এই-যাঃ, লাগলো তো? পায়ে চটি যে!"

BanglaBook.org

এমন সময়ে একটি ঝনঝন শব্দ শুনে কত্তাগিন্নির চোখ চলে যায় সামনের জানলার দিকে। একতলার বুড়িমার রান্নাঘরের জানলার পর্দা সরানো। সিঙ্কের সামনে বৃদ্ধাটি অবশ দাঁড়িয়ে—একহাতে বাসনমাজার বুরুশ, অন্যহাতের প্লেটটা পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল। পুরু লেন্সের তলা দিয়ে তাঁর চোখ দেখা যায় না, কিন্তু খুলে যাওয়া ফোকলামুখের গোল হাঁটি কাতলা মাছের খাবি খাওয়ার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। তাঁর দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গির মধ্যেই বিশ্বের বিস্ময় স্তম্ভিত।

গিন্নি এবারে একটু লজ্জা পান। সৌজন্যসূচক হাসি একটু করে ছুঁড়ে দিয়েই তিনি মই বেয়ে রাজমিস্ত্রির মতো স্বচ্ছন্দে উঠে যান—তারপর বুড়ির স্তব্ধ দৃষ্টির সামনে দুপাটি জরির চটি শূন্য থেকে পুষ্পবৃষ্টির মতো খসে পড়ে। কত্তা ক্ষমা-প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসেন একটু। পরমুহূর্তেই পুনরায় উর্ধ্বমুখে, দুই কোমরে দুই হাত, গিন্নির সশরীরে স্বর্গারোহণের পুণ্যদৃশ্য ধ্যানস্থচিত্তে নিরীক্ষণ করেন। গারবেজক্যানের ওপর থেকে নামবার কথাটা তাঁর মনেও পড়ে না। চেয়ে চেয়ে দেখেন, আর মনে মনে তারিফ করেন।—বাঃ! গিন্নি তো দিব্যি উঠছেন! পায়ে পায়ে তো মন্দ প্রগ্রেস হচ্ছে না। খাশা! ওকি! হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন? গিন্নির হলো কী? কত্তার ভুরু কুঁচকে যায়।

৮

ওদিকে গিন্নির এই হলো। মই দিয়ে দিব্যি উঠছিলেন উদবেড়ালের মতো তরতরিয়ে, সহসা সামনে পড়লো পর্দাসরানো দোতলার জানলা। ঘরে আলো জ্বলছে। বেঁটে স্টীভি চেয়ারে বসে নীচু হয়ে পা থেকে মোজা খুলছে, পরনে কেবল আণ্ডারওয়্যার। কাঁধে তোয়ালে। অবশ্যই স্নানে যাচ্ছে। এবং জানলার দিকে পিছন ফিরে সদ্যোস্নাত দৈত্যটি আয়নার সামনে বাহুমূলে সবেগে পাউডার মাখছে, পরনে কেবল জন্মসূত্রে প্রাপ্ত দু গজ দু ইঞ্চি অম্লান শাদাচামড়া। এমন সময়ে আয়নায় কিছু দেখে ভূত দেখবার মতো শিহরিত হলো সে, হাত কেঁপে উঠে পাউডারের পাফ পড়ে গেলো —মুখ থেকে শব্দও নির্গত হয়ে থাকবে, কেননা স্টীভি মুখ তুলে চাইল, দৃষ্টি বিস্ফারিত, ওষ্ঠাধর উন্মুক্ত, যেন দুজনকেই ভূতে পেয়েছে। তারা দেখলো দোতলার বাতায়নপথে নিষ্পত্র মেপল গাছের উঁচু ডগার ফাঁকে ধূপছায়া রঙ সন্ধ্যামেঘের গায়ে হেলান দিয়ে মহাশূন্যে উদিত হয়েছে তিনতলার গিন্নির সহাস্য বেগুনী বদনচন্দ্রিমা। একজন দেখলো সেটা আয়নায়, থালার জলে সূর্যগ্রহণ দেখার মতো, আর একজন দেখলো সোজাসুজি। এবং একেই কবির ভাষায় বলা হয়েছে 'বিপথি বিস্ময়'। দৈত্যাকৃতি কিশোরটি লজ্জায় হঠাৎ বসে পড়লো। এইভাবে যে দোতলার জানলায় উঁকি দিয়ে কেউ কদাচ তাদের নির্জনতা ভঙ্গ করতে পারে—এ তাদের—বন্যতম কিশোর -কল্পনারও বাইরে।

BanglaBook.org

অথচ গিন্নি বেচারী কী আর করবেন? এ তো আর ইচ্ছে করে নয়! তিনিই বা কেমন করে জানবেন যে এই নচ্ছার ছেলেরা অমন ধরাধামে ভূমিষ্ঠ হবার মতো তক্ষুনি চান করে বেরোবে! বিপন্নতার ঘোর কাটতে না কাটতে ছেলেদুটি দেখলো শাড়ির পাড়ে-ঘেড়া দুটি মোজাপরা শ্রীচরণ তরতর করে তাদেরই জানলার বাইরে দিয়ে অনন্ত উর্ধ্বলোকের দিকে উঠে গেলো।

যতক্ষণে তারা সামলে-সুমলে আত্মস্থ হয়ে জানলায় এসে কাঁচ তুলে চেঁচামেচি জুড়লো, "হে, হোয়াটস দা ম্যাটার," ততক্ষণে তিনতলার জানলা দয়া করে দ্বিধা হয়েছেন এবং গিন্নিও তাতে প্রবেশ করে ফেলেছেন। কেবল তখনও আনমন-মুগ্ধ-নেত্রে গারবেজক্যানের বেদীতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন কত্তামশায়। ওদের প্রশ্নের উত্তর, তিনি আপন পটভূমি বিস্মৃত হয়ে, স্বভাবসুলভ সম্ভ্রান্ত গলায় দেন—"নাথিং রিয়্যালি, উই আর জাস্ট লকড আউট।" শুনে বালকদ্বয় বিস্ময়সূচক আওয়াজ করল—"স্ত্রী-ঈ-ঈ-ঈ-ঈ। কিন্তু আপনি গারবেজক্যানের ওপরে দাঁড়িয়ে কেন? ওটা যে ভেঙে যাবে!" সহসা সচেতন হয়ে কত্তা তাড়াতাড়ি নেমে পড়েন, মুখে লাজুক হাসি। জো পেয়ে লম্বা ছেলেটা ধমকে ওঠে—

—"লকড আউট তো সকলেরই হয়, তাই বলে ঘরে ঢোকবার প্রকৃষ্টতম পন্থা কি এইটে? হা ঈশ্বর! আপনি নিজেই বা ওঠেন কেন? মেয়েদের কি একাজে পাঠানো ঠিক?"

বাঁটকুল স্টীভি অমনি ফোড়ন কাটে—

—"আপনার স্ত্রী যদি পড়ে যেতেন? অত লং ড্রেস পড়ে কেউ কখনও মই বেয়ে ওঠে? গুডনেস গ্রেশাস।"

কত্তা প্রাণপণে ভদ্রতার কানা আঁকড়ে চুপ করে আছেন। মার্কিনী জ্ঞান বিতরণ আর শেষ হয় না। কে আর স্নান করে বেরিয়েই অরক্ষিত অবস্থায় সন্ধের আবছায়ায় দোতলার খোলা জানলায় শূন্যে উড়ন্ত নারীমূর্তি দেখলে খুশি হয়? স্টীভি বলে —"এর চেয়ে আপনারা একটা ডুপ্লিকেট চাবি নিচেরতলায় বৃদ্ধা মহিলার কাছে জমা রাখেন না কেন? জগতে আর-সবাই যা করে? আমরাও যা করেছি?"

কত্তা কোনো উত্তর ভাববার আগেই ঠং-করে একটা চাবি শূন্য থেকে এসে পড়ল গারবেজক্যানের মাথায়। তারপরেই ছিটকে গিয়ে মাটিতে। কত্তা চটপট কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে ভরেন।

"স্ত্রী-ঈ-ঈ-ঈ"!! আবার বিস্ময়ে হতচকিত হয় বালকবৃন্দ। এবং লম্বুটা আরেক প্রস্থ ধমক লাগায়—

—"আচ্ছা, এটার কোনো প্রয়োজন ছিল কি? যদি ওপাশের ওই গারবেজ-ক্যানটার মধ্যে গিয়ে পড়তো চাবিটা? তখন চাবি উদ্ধার করতে আপনারা টিনসুদ্ধ ময়লা ঘাঁটতে বসে যেতেন কি? হুমম? তার চেয়ে আপনি টুকটুক করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলেই পারতেন? গিয়ে দোরে টোকা মারতেন, আপনার

BanglaBook.org

গিন্নি তো ভেতর থেকে দোর খুলে দিতেন? উড নট দ্যাট বি বেটার?"

কত্তাটি জাতে মাস্টার, সাহেবপুত্তুরদের জ্ঞান দেওয়াই তাঁর স্বধর্ম—তাছাড়া ছাত্রবয়সে দুর্ধর্ষ ডিবেটারও ছিলেন,—কিন্তু আজকে কী যে হয়েছে তাঁর? এই অর্বাচীন অপোগণ্ড ষণ্ডামার্কা বোকা-পাকা দুটো পুঁচকে ক্রুকাটকুলো আকাট-মুখ্যু আনডার-গ্রাজুয়েটের বোম বক্তিয়ারির উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না অমন দুর্দমনীয় উঠতি-পণ্ডিত কত্তামশাই। মনে মনে গাল দিতে থাকলেন। কিন্তু মুখে শব্দ যোগালো না—ওদেরই পক্ষে অকাট্য যুক্তি। কত্তা অযৌক্তিক এঁড়েতর্কো করতে পারবেন না একদম—সেটাতে গিন্নিরই মোনোপলি। কত্তা অগত্যা দুই পকেটে দু-হাত গুঁজে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে একটা সাবানকাচা হাসি হেসে ঊর্ধ্বমুখে তাকিয়ে বললেন:—"তাই তো!" আর ভাবলেন, সিগারেট কই, সিগারেট?

ইতিমধ্যে ওপরের জানলার ফাঁকে গিলোটিনের আসামীর মতো করে মুখটি বাড়িয়ে ব্যাপার-স্যাপার সযত্নে শ্রবণ-পর্যবেক্ষণ করছিলেন গিন্নি। স্বামী ভালোমানুষ কত্তাটিকে বাগে পেয়ে এই দুটো ত্যাঁদড় ছোকরা যা-নয়-তাই বকুনি দিচ্ছে? এ কি গিন্নি সইতে পারেন? সায়েব-গুণ্ডা বলেই পার পেয়ে যাবে? কক্ষনো নয়। তৎক্ষণাৎ গনগনে লাভার মতো, অগ্ন্যুৎপাতের মতো, অথবা রাগী ভগবান জেহোভার দৈববাণীর মতো—গিন্নি ওপর থেকে গরম গরম শব্দবৃষ্টি করতে থাকেন:

—"অযাচিত উপদেশের জন্য অনেক ধন্যবাদ—এবার থেকে নিশ্চয়ই শখ করে ফায়ার এসকেপ বেয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকবো বা আমরা—তবে চাবিটা কেন নিচে ফেলা হলো জানতে চাইলে, এই বলছি শুনে রাখো—যাতে উনি একতলার বৃদ্ধা মহিলার হাতে একেবারে চাবি জমা দিয়েই তবে ওপরে ওঠেন। জীবনে যাতে এরকম ভুল দ্বিতীয়বার না ঘটে। বুঝলে বাছারা? ও কে, কিডস? আরয়ু সাটিফায়েড?—"

দোতলার জানলা থেকে ডবল গিলোটিনের মতো দুই মুণ্ড বাড়িয়ে থাকা দুই ছেলে বাক্যসুধা শুনলো। কিন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে ওপরের দিকে চাইতে সাহস করলো না। সেই মুখ! সেই আলো-আঁধারিতে মুক্ত বাতায়নপথে দীর্ঘ মেপল গাছের নিষ্পত্র শাখার ফাঁকে সন্ধ্যা-মেঘের গায়ে হেলান দিয়ে মহাশূন্যে অভ্যুদিত সেই অলৌকিক বাদাম-রঙা মুখচ্ছবি—সেকি আরো একবার দেখা সম্ভব? (তারা তো আর রবীন্দ্রনাথ পড়েনি, প্রিয়ার ছায়াও যে আকাশে এক-একদিন ভাসে, তাদের সে তত্ত্ব জানা নেই)। ও বাবা! এতদশ্রুত্বা ছেলেরা নিচের দিকে চেয়ে চেয়ে ধরিত্রীর বুকে পীসফুলি অধিষ্ঠিত কত্তাকেই বলল:

—"তাই বলুন! ওয়েল, দ্যাট মেকস সেন্স। গুডনাইট।" এবং চটপট ঘরের মধ্যে মুণ্ড টেনে নিয়ে জানলা নামিয়ে ফেললো। কী জানি আবার যদি মই বেয়ে নেমে আসে?

BanglaBook.org

৯

বৃদ্ধার হাতে চাবিটি জমা দিয়ে, প্লেট-ভাঙার জন্য যারপরনাই দুঃখ জ্ঞাপন করে, অবশেষে নিজের ঘরে ঢুকে দু'ডলারের আরামকেদারায় গা এলিয়ে, পঞ্চাশ সেন্টের মাটির মগে করে গরম গরম কফি খেতে খেতে কত্তা ভয়ে ভয়ে কথাটা পাড়লেন: —"হ্যাঁগো, রমেশদের একটু ফোন করি? একটু আসতে বলি? বড্ড হুইস্কি খেতে ইচ্ছে করছে। স্ট্রেনটা তো বড়ো কম গেলো না।" চোখ পাকিয়ে অদম্যস্পর্ধা গিন্নি বললেন—"স্ট্রেনটা কার বেশি গেছে শুনি? আমি মই বেয়ে তিনতলা উঠলাম, আর হুইস্কি খাবে তুমি?" তারপর মিষ্টি হেসে কৃপাবর্ষণ করেন—"ঠিক আছে, ফোন করে দিচ্ছি।—বেশি রাত করা চলবে না। কিন্তু আজকে! কাল ভোরবেলা ক্লাস আছে।"

প্রশ্রয় পেয়ে আহ্লাদে গদগদ কত্তা কৃতজ্ঞচিত্তে দু'হাত তুলে গিন্নির মইতে চড়ার কৃতিত্বের অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে থাকেন। এক সময়ে তারই ফাঁকে টুক করে বলে ফেললেন:

—"আচ্ছা, তুমি চাবিটা সত্যি সত্যি বুড়িকে জমা দেবার জন্যেই নিচে ফেলেছিলে?"

এতক্ষণে নিজের প্রশংসা শুনে খুশিবিগলিত গিন্নি খলবলিয়ে উঠলেন—"আরে দূর! তুমিও যেমন? ছোকরাগুলোর চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা শুনে মাথাগরম হয়ে গেলো, তাই ওরকম বলে দিলুম। আসলে আমার মোটে মনেই ছিলো না যে এসব ইয়েল লক, ভেতর-বাইরে দুদিক থেকেই খোলা। আমি ভেবেছি তালাবন্ধ ঘরে আটকে পড়েছি—বাইরে থেকে না খুললে বুঝি...তাইতো তোমাকে চাবিটা ফেলে দিলুম—"

হঠাৎ একটু ঘনিয়ে এসে, গিন্নির ডাঁশা গোলাপজামের মতো চিবুকটি ছুঁয়ে গলাটা বিরাট খাদে নামিয়ে কত্তা বললেন:

—"যাতে আমি গিয়ে আমার বন্দিনী কন্যেটিকে উদ্ধার করি?"

কত্তার গলায় কী যে ছিল, অমন গেছোগিন্নির মুখখানি হঠাৎ নিচু হয়ে যায় —অমন বাক্যবাগীশ জিভে কেবল একটিই শব্দ যোগায়:

—"য্যাঃ।"

এক মিনিটের স্তব্ধতা।

তারপরেই গিন্নি টংটবিয়ে ওঠেন—

—"ওই বেল বাজলো বলে, এক্ষুনি রমেশরা এসে পড়বে কিন্তু, হ্যাঁ।"

অমৃত, শারদীয় ১৩৮৫

BanglaBook.org

চক্রবর্তী রাজশেখর,

H.O.D.H.S.

আর আধঘণ্টা বাদেই শেষ হবে পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীরা একমনে কলম ছোটাচ্ছে, রেসের মাঠে লাস্ট লেগ-এর দৌড়। আমি পাহারা দেবার নামে মাঝে মাঝে ঘুরে আসছি আর বাকি সময়টা বসে পরদিনের লেকচার তৈরি করছি। হঠাৎ দরজা খুলে গেলো। দীর্ঘ, সৌম্যমূর্তি, নুনমরিচ-রঙ ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি এবং ছাইরঙের সুটপরা এক বয়স্ক ভদ্রলোক ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঢুকলেন হলের মধ্যে। আমি ঠিক চিনতে পারছি না—কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। তিনি ঢুকেই—"বয়েজ অ্যাণ্ড গার্লস! টাইম ইজ আপ! গিভ আপ ইওর পেপারস—" বলেই একজনের খাতায় হ্যাঁচকা টান মারলেন। আমি ছুটে যাই, "হাঁ হাঁ করেন কি, করেন কি, ওদের লিখতে দিন। এখন তো মোটে তিনটে!"

ছেলেরা প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেছে। লেখা বন্ধ। চোখ বিস্ফারিত।

—"তিনটে? অর সাড়ে তিনটে?" তিনি হুংকার দেন।

—"তিনটে স্যার!" কোরাসে জবাব এল।

—"ও. কে. দেন। ক্যারি অন।" বলেই ভদ্রলোক একগাল হাসেন।

ছেলেরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে খাতাতে চোখ নামায়। কেউ কেউ আবারও মুখ তুললো তারপরে। এবার ভুরু কুঁচকে। লোকটা কোন বিভাগের কেউ নয়। তবে কি এই 'কনট্রোলার অব এগজামিনেশনস' নামক অদৃষ্টপূর্ব প্রাণী? ছেলেরা তাঁকে দেখতে পায় না।

আমি এবার যুদ্ধে নামি।

—"চলুন, বাইরে চলুন। এটা পরীক্ষার হল।"

উনি চোখ মটকে মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন। ছোট ছেলেরা দুষ্টুমি করলে যেমনটা করে। ফিসফিসিয়ে বললেন—'আপনিই নবনীতা তো?" গলার সুরে ষড়যন্ত্র।

—"আজ্ঞে হ্যাঁ—" একটুও যে ঘাবড়ে যাইনি, তা নয়, তবুও জোরসে বলি—"বাইরে গিয়ে কথা হবে—এখানে পরীক্ষা হচ্ছে— আমি দরজা খুলে ধরি। উনি না নড়ে বলেন —"আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি। অনেকক্ষণ বাইরে পায়চারি করতে করতে বোর হয়ে গেলাম। তারপর ঐ বুদ্ধিটা করে ঢুকে পড়েছি।" তিনি নিঃশব্দে মিষ্টি করে হাসলেন, ছেলেরা উচ্চৈঃস্বরে।

যারপরনাই রেগে গিয়ে আমি বলি—"একটা পরীক্ষা চলছে এখানে। দয়া করে সীন করবেন না। বাইরে চলুন। এখানে আপনার প্রবেশাধিকার নেই।"

—"কে বললে নেই? আমিও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। রীতিমতো সই করে মাইনে নিই। হুঁ।" বলতে বলতে উনি বেরিয়ে আসেন। পেছু পেছু বেরিয়ে এসে আমি বলি—"তবে তো আরো ভালো করেই জানেন যে পরীক্ষার হল-এ ঢোকা নিষিদ্ধ। ছেলেমেয়েরা কীরকম শকড হলো বলুন তো?"

BanglaBook.org

হো হো করে হেসে উঠে উনি বললেন, "নাঃ মশাই, আপনি নেহাৎ বালখিল্য আছেন এই লাইনে। ছেলেমেয়েরা কি শকড হয়? নো। নেভার। আপনি যাই করুন, ওরা তাতে শক পাবে না। ছাত্ররা হচ্ছে শক-প্রুফ মেটিরিয়াল।"

—"আপনি কেন এসেছেন? কোনো প্রয়োজন আছে কি?"

—"খুবই জরুরি প্রয়োজন। সেলিমাকে চেনেন?"

—"বাঃ! চিনি না? আমার খুব বন্ধু।"

—"সেলিমা মৃত্যুশয্যায়। জানেন?"

—"অ্যাঁ।"

—"হ্যাঁ।"

—"সেকি? কী হয়েছে ওর?"

—"সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে না।"

—"আপনি দয়া করে আমার ঘরে একটু বসুন। আমি ডিউটি শেষ করে আসছি। আপনি চা খাবেন? আমি আসছি, ভবানী। একটু চা করে দেবে এই ভদ্রলোককে? উনি আমার ঘরে বসছেন।"

—"চা হইব না।" ভবানীর সাফ কথা। "আমার সময় নাই। খাতা সিলাই আছে না? কফি হইতাছে। দিতে পারি।"

—"দ্যাটস ফাইন, থ্যাংকিউ!" বলে ভদ্রলোক আমার ঘরে ঢুকে যান। হ্যাঁ, ছেলেমেয়েরা সত্যিই শক-প্রুফ। তারা দিব্যি মন দিয়ে, মাথা গুঁজে লিখে যাচ্ছে। কিন্তু খাতা জমা দিয়েই হৈচৈ করে হেসে উঠলো ঘরসুদ্ধ সবাই—"উনি কে, দিদি? উনি কে?"

—"আমিও ওঁকে চিনি না।"

—"নির্ঘাৎ পাগল!"

—"হতেই পারে।"

পরীক্ষার খাতাপত্তর অফিসে জমা দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দেখি ব্ল্যাকবোর্ডে এক জটিল গ্রাফ আঁকা হয়েছে। ভদ্রলোকের একহাতে খড়ি, অন্য হাতে ঝাড়ন। তাঁর সামনে আমার দুই ছাত্রী ভীরু কপোতীর মতো ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছে। এবং জুলজুল করে চেয়ে রয়েছে ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে। উনি চার্টটির ব্যাখ্যায় রত আছেন বলে মনে হলো। আমাকে দেখে মৃদুহাস্যে নড করে আমারই ঘরে ঢুকতে আমাকে অনুমতি দিলেন। বক্তৃতা অবশ্য বন্ধ হলো না। মেয়েরা কাতর নয়নে এবার আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কী জানি কী উপায়ে এদের গ্রেপ্তার করেছেন ভদ্রলোক! সুদর্শন, সুন্দর উচ্চারণ, চমৎকার কণ্ঠস্বর, সম্ভ্রান্ত বেশভূষা, সব মিলিয়ে ব্যক্তিত্বটি রীতিমতো আকর্ষণীয় সন্দেহ নেই। মেয়েদুটিকে মোহিত করতে সময় লাগেনি প্রাথমিকভাবে। তারপরেই হয়েছে গোলমাল, আর ছাড়ান নেই।

BanglaBook.org

—"একসকিউজ মি, এদের সঙ্গে আমার একটু কাজ ছিলো। সেটা সেরে নিই?"

—"অফ কোর্স, অফ কোর্স। আপনার এই ইয়ং লেডিদের আমি একটু এন্টারটেইন করছি মাত্র। তবে এদের খুব একটা ইন্টারেস্ট দেখছি না। নন-অ্যানালিটিকাল মাইনডের এটাই দোষ। স্লাইটলি ডাল কিনা? সায়েন্সে এই ব্রেন চলতো না।" ভদ্রলোক ডাস্টারটি অল্প অল্প ঠোকেন। অল্প অল্প ধুলোর কুয়াশা ছড়ায়। আমি যারপরনাই বিব্রত। মেয়েগুলি চটে গেছে। নাকের ডগা লাল হয়েছে তাদের। টিউটোরিয়াল নিতে এসে এ কী বিপত্তি! যাবার সময়ে ভদ্রলোকের দিকে বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে গেলো দুজনেই। হাসতে হাসতে ভদ্রলোক বললেন—"কীরকম চটেছে দেখলেন তো? ওঃ! কী এক-একখানা কটাক্ষ ছেড়ে গেলো সব! ওই যে, ডাল বলেছি কিনা? অন্ধকে অন্ধ বলা দোষ, খোঁড়াকে খোঁড়া বলা দোষ, কিন্তু ডালকে ডাল বলাটা হলো মহাপাপ। দি আলটিমেট ইনসালট। সকলেই ব্রিলিয়ান্ট কিনা? সকলেই নিউটন-কোপারনিকাস। নিদেনপক্ষে বুদ্ধিজীবী।"

ততক্ষণে আমি জড়িয়ে গেছি ব্ল্যাকবোর্ডের প্যাঁচে। বিরাট জটিল এক গ্রাফ এঁকেছেন ভদ্রলোক। তার নিচে বাংলায় লেখা "হায়! ভূমণ্ডল!" ভুরু কুঁচকে গ্রাফের জট ছাড়াচ্ছি। ভদ্রলোক চুপচাপ নিরীক্ষণ করছেন।

—"বুঝলেন কিস্যু? মেকস সেন্স টু ইউ?"

—"বুদ্ধি বাড়াকমার হিসেব। বয়স অনুপাতে বুদ্ধির বৃদ্ধি।"

—"আজ্ঞে, ঠিক তাই। এটা কিন্তু আই.কিউ.-র ব্যাপার নয়—সেটা জানেন তো? এ আমার নিজস্ব চার্ট। ইন্টেলিজেন্স কোশ্চেন্ট-এর সঙ্গে যোগ নেই কোনো।"

—"জানি জানি। কিন্তু এর মানে কী? এটা এঁকেছেন কী করতে?"

—"একটা কথা বোঝাবো বলে। টু ইলাস্ট্রেট আ ফ্যাক্ট।"

—"কাকে বোঝাবেন বলে? স্বাতী-সুদক্ষিণাকে? না আমাকে?"

—"যে বুঝতে চায়, তাকে। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে যিনি চিন্তা করেন, তাঁকে। জীবনের গতিবিধি নিয়ে যাঁর চিত্তে দার্শনিক উদ্বেগের উৎপত্তি হয়, তাঁকে। এই গ্রাফ হলো সর্ববিদ্যার মূল। দাঁড়িপাল্লা। এই চার্ট দিয়েই আপনি জীবন ও জগতের প্রত্যেকটি কার্যকারণ মেপে ফেলতে পারবেন। এবং তার ফলেই, বুঝেও ফেলতে পারবেন। এবং বুঝে, ক্ষমাও করতে পারবেন। সো, এভরিথিং উইল ফল ইনটু প্লেস। দিস ডিলস উইথ দা বেসিকস।"

—"আচ্ছাঃ?"

—"বিশ্বাস হলো না?"

—"না না, মানে, ব্যাপারটা ঠিক—

—"অনুধাবন করতে পারছেন না? স্টাডি করুন, স্টাডি করুন। একটু মন দিয়ে স্টাডি করুন, নিজেই ধরতে পারবেন। ইটস ভেরি সিম্পল, রিআলি!" ভদ্রলোক চুপচাপ আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। আমি যৎপরোনাস্তি অস্বস্তি ভোগ করতে লাগলুম। টের পেলুম ক্লাসে যখন কোনো প্রশ্ন করে ছেলেমেয়েদের বলি—"চেষ্টা করো, নিজেরাই

BanglaBook.org

পারবে—" তখন তাদের কেমন লাগে। বুঝি, না-বুঝি মরিয়া হয়ে বলে দিই—"সিম্পল তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু এর সিগনিফিক্যান্সটা কী?"

—"গুড। দেখুন চার্টটাতে কী আছে। ও কী? চোখ পিটপিট করছেন কেন? ইমপেশেন্ট হবেন না, অধীর স্বভাব ভালো নয়। আপনার বয়েস কতো?"

—"আজ্ঞে?"

—"বলছি, আপনার বয়েস কতো হলো? যদিও জানি মেয়েদের বয়েস হয় না, এবং মেয়েদের বয়েস জিজ্ঞেস করতেও হয় না। কিন্তু চার্টটা যে বয়সানুপাতিক। তাই ওটা জানা অ্যাবসলুটলি এসেনশিয়াল। বেয়াদপি মাপ করবেন।"

—"ওই যে, আপনার চার নম্বরের কলামে দেখুন।"

—"ঠিক যা ভেবেছি তাই। আমার কত বলুন তো?"

—"আপনারও ওই চারের কলাম। থার্টি ফাইভ টু ফিফটি ফাইভ।"

—"আজ্ঞে না। আমি সিক্সটি। হাঃ। হাউ অ্যাবাউট দ্যাট?"

এবার সত্যিই অবাক হই। ভদ্রলোককে ষাট ভাবা শক্ত।

—"এ ভেরি ইয়াং সিক্সটি, ইয়েস। আই নো ইট।" ভদ্রলোক একটু হাসেন। যে হাসিতে যৌবন উঁকি দিয়ে যায়। "বাট উইথ অল দ্য ডিফেক্টস অফ মাই সিক্সটি ইয়ার্স। ইয়েস ম্যাডাম। ব্যাক টু দা চার্ট।"

আমার টেবিল থেকে ছাত্রীদের দেওয়া টিউটোরিয়াল খাতা তুলে নিয়ে রোল করে সেটা দিয়ে উনি ব্ল্যাকবোর্ডে পয়েন্ট করে ডেমনস্ট্রেশন শুরু করে দেন। ছাত্রী বলতে আমি একা।

—"এক নম্বর ঘর। এক থেকে বারো। লার্নিং পিরিয়ড। বারো বছর বয়েস পর্যন্ত মানুষ প্রতি মুহূর্তে নতুন কিছু শিখছে। বুদ্ধি কেবলই বাড়ছে। রাইজিং কার্ভ। ও. কে?"

—"ও. কে.।"

—"দু'নম্বর ঘর। বারো থেকে বিশ। এটাও লার্নিং পিরিয়ড। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি এই সময়ে উচ্চতম শিখরে পৌঁছোয়—পীক লার্নিং পিরিয়ড। অর্থাৎ এ জীবনে আপনার বুদ্ধি যতটুকু বাড়বার তা ওই বয়েসেই বেড়ে গেছে। যেমন বডি হাইট। বুঝলেন? একুশের পরে মানুষ যেমন লম্বায় বাড়ে না, বুদ্ধিতেও বাড়ে না। ফুলস্টপ। আঠারোতেই অবশ্য সাধারণত বুদ্ধির বাড় বন্ধ হয়ে যায়। এও রাইজিং কার্ভ।"

—"আই সী!" মনটা অন্ধকার হয়ে গেলো। হায়, কতো বছর হয়ে গেছে, আমার বুদ্ধি বাড়েনি। এদিকে আমার মেয়েদের বুদ্ধি তরতরিয়ে বাড়ছে। দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো।

—"দেখুন, দেখুন, প্রাণভরে দেখুন, পেট ভরে দর্শন করুন। বাট ইউ ক্যাননট চেঞ্জ ইট। ইহাই জীবজগতে মনুষ্য নামধেয় প্রাণীটির শারীরিক কানুন। মগজের কোষগুলো। বিশ বছরের পরে আরও বেশি কর্মতৎপর হয় না। যেমন ছিল তেমনিই থাকে। স্টেটাস কুও অবস্থায়। বুদ্ধি আর বাড়ে না বটে কিন্তু বুদ্ধি পাকে। অভিজ্ঞতার আগুনে পরিপক্ক হতে থাকে। ওভারকুকড হবার ভয় নেই কোনো।"

BanglaBook.org

—"বুঝেচি। এবার তিন নম্বরে চলুন।"

—"আঠারো-বিশ টু তিরিশ-পঁয়ত্রিশ হচ্ছে থার্ড কলম। ওই যে বললাম স্টেটাস কুও। বুদ্ধি বাড়ছেও না, কমছেও না। ক্রেডিট ডেবিট কিছুই নেই।"

—"তার মানে আঠারোতে আর পঁয়ত্রিশে তফাৎ নেই? তার মানে পঞ্চান্নতেও নেই। সবার বুদ্ধি সমান?"

—"আহা, সমান কে বলল? বুদ্ধি না বাড়ুক, বোধ তো বাড়ছে? মূল্যবোধ তো বদলাচ্ছে? দৃষ্টিকোণ পালটে যাচ্ছে। জীবনবোধ আকৃতি নিচ্ছে। বুদ্ধির মাপটা সমান, তার ব্যবহারটা তো সমান থাকছে না?"

—"হ্যাঁ, জাজমেন্ট আসে, মেচিউরিটি আসে, ভ্যালুজ তৈরি হয়—তা বলে বুদ্ধি মাপে বাড়ে না?"

—"নো ম্যাডাম। আয়্যাম সরি। ভবানী আছে? এক পেয়ালা চা—"

—"চা দেয়নি?"

—"কফি দিয়েছিল কিন্তু।"

—"ভবানী খাতা জমা দিতে গেছে। চা তো এখন..."

—"থাক থাক, ওতেই হবে। থার্ড আর ফোর্থ কলামে একই ব্যাপার।" ভদ্রলোকের এক কথা। "বুদ্ধি কমেও না, বাড়েও না। কিন্তু গোলমেলেটা বাধে ফিফথ স্টেজে। মগজের মাধ্যে ফিফথ-কলামনিস্টদের কাজকর্ম শুরু হয়ে যায়। মগজের কোষগুলো ক্ষয় পেতে থাকে, ভোঁতা হতে থাকে। পিটি, তাই নয়কি? বুদ্ধিই যদি কমে গেলো, মানুষের আর তবে রইল কী?"

—"তা যা বলেছেন। তবে বুদ্ধিটা কি একেবারে হুড়হুড় করে টোবাচ্চার জল বেরুনোর মতন কমে যায়? না আস্তে ধীরে—"

—"আস্তে-আস্তে। এ আবার বলবার কী আছে? এজিং ইজ আ লিঙ্গারিং প্রসেস। ইট টেক্স ইটস ওন টাইম। আপনারও হবে। তখন আপনি টের পাবেন না অবশ্য। প্রথম স্টেজ কিনা কনফিউশন। আলটিমেট স্টেজ সেনিলিটি।"

—"কিছু মনে করবেন না, আপনি বললেন, আপনি ষাট। অর্থাৎ ঐ ফিফথ কলামেই পড়েন। আপনিও কি ওই স্টেজটা, মানে কনফিউশনটা টের পান?"

—"আয়্যাম আ ভেরি ইয়াং সিক্সটি। আমি তো আগেই বলেছি আপনাকে?"

—"আমি ম্যাট্রিকে প্রথম হয়েছিলাম। পরাধীন ভারতে ম্যাট্রিকে প্রথম হওয়াটা মুড়ি-মিশ্রী ছিল না। আমার মনের এজিং প্রসেস উইল টেক টাইম।"

—"তা বটে। হতেই পারে।"

—"পড়েননি, সম্প্রতি সালভাদর দালি কী বলেছেন? বলেছেন—'যেহেতু আমি একটি জিনিয়াস সেহেতু আমার মৃত্যু নেই।' আমিও একটি জিনিয়াস। দালির মতো নাই-বা হলাম। তাই আমিও চট করে জরাগ্রস্ত হবো না। আই'ল রেজিস্ট ইট উইথ অল মাই স্ট্রেংথ ফর শ্যুয়ার।" ভদ্রলোক জানালা দিয়ে বাইরে চাঁপাগাছটার দিকে তাকান।

BanglaBook.org

—"আমি দালি নই। মরতে আমাকে হবেই।" মুখ খুব বিষণ্ণ, চিবুক বুক ছুঁয়েছে। ঠুকঠুক করে উনি ডাক্টারটা ঠুকছেন।

আমি তাড়াতাড়ি কথা ঘুরোই—"আচ্ছা, ওই স্তম্ভগুলোর নিচে ঘিঞ্জিমতো কথাগুলো কি? ব্যাখ্যা তো ওইগুলোকেই করতে বলছিলুম।"

—"ও হো, ওটাও তো সিম্পল। আপটু টুয়েলভ ওনলি লার্নিং প্রসেস। শিক্ষাগ্রহণ। বারো টু আঠারো-বিশ লার্নিং প্রসেস বটে কিন্তু ঐ সঙ্গে চ্যালেঞ্জিং এভরিথিং ইউ হ্যাভ লার্নট। রেবেলিং আগেনস্ট ইওর ঔন লার্নিং। এভাবে যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানকে ভেরিফাই করে নিয়ে তবেই না মর্ডান ম্যান জীবনে কনফিডেন্স পায়? ইটস হেলদি টু বি আ রেবল। বুঝেচেন?"

—"বুঝেচি।"

—"ঠাট্টা করলেন? ভেংচি কাটলেন?"

—"আজ্ঞে আমিও ঘটি।"

—খানিক নৈঃশব্দ্য।

তারপর বললেন—"পরের কলামটাতেই জীবনের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন; সংঘর্ষের, সংঘাতের শুরু। রিঅ্যাল কনফ্লিক্ট—

—"কোথায়? লিখছেন তো কম্প্রোমাইজ।"

—"সেই তো। অ্যাম্বিশান এবং কম্প্রোমাইজ। কম্প্রোমাইজ মানে কী?" হঠাৎ ভুরু পেঁচিয়ে ভদ্রলোক নিবিড়ভাবে আমার দিকে তাকালেন। আমি চুপ। উনিও চুপ। তারপর হঠাৎ মুখখানা নামিয়ে আমার কানের কাছে এনে বোমাফাটার মতো চেঁচিয়ে উঠলেন—"কম্প্রোমাইজ মানে ডি-ফি-ট!"

আমি বেচারী চমকে, শিউরে, কেঁপে-টেপে একাকার। তিনি খুশি হলেন। খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে দুই পকেটে দু'হাত পুরে হাসি হাসি মুখে বললেন—"আর ডিফিট মানে? পুনরায় স্খলন। অতএব বুঝে নিন, বিশ থেকে পঁয়ত্রিশেই মানুষ ঈভিলের কাছে হার মানতে এবং তার সঙ্গে মানিয়ে চলতে শিখে নেয়। বুঝলেন? যার অ্যাম্বিশান আছে, কম্প্রোমাইজ তাকে করতেই হবে। হবেই—

—"কিন্তু চতুর্থ কলামেই তো পরিস্থিতিটা বিশ্রীতম মনে হচ্ছে। লোভ, কৃত্রিমতা, অত্যাচার—এসব—

—"আপনার বয়েসটা এখন কতো বললেন?"

—"ওই তো ওইখানেই—

"থার্টি-থার্টি ফাইভ টু ফিফটি-ফিফটি ফাইভ তো? ইয়েস, ওয়ার্স্ট অ্যাফেকটেড পিরিয়ড ওটা—অ্যাম্বিশান থেকে লোভ, লোভ থেকে কম্প্রোমাইজ, কম্প্রোমাইজের অবশ্যম্ভাবী ফল হিপোক্রিসি এবং তার পরিণতি টিবানিতে। মানুষ এই বয়েসেই সবচেয়ে দ্রুত অধঃপাতে যায়। সব মূল্যবোধ হারিয়ে ফ্যালে। নীতিবোধ পুটপুট করে ভেঙে পড়তে থাকে ঝাঁটার কাঠির মতন। আমার স্ত্রীও এখন এই কলামেই রয়েছেন। দি মোস্ট

BanglaBook.org

ডেনজারাস ইয়ারস। লুক এ্যাট দি অনেস্টি কার্ভ, ওই যে সবুজ রেখাটা?"

—"আরে সবুজ চক পেলেন কোথায়?"

—"রাখতে হয়, বুঝলেন না? ভেরি ইউজফুল। সর্বদা সঙ্গে রাখতে হয়। বলতে বলতে উনি বিলিতি টুইডের জ্যাকেটের পকেটে হাত পুরে একমুঠো রঙিন চকখড়ি বের করে আনলেন।

—"এই তো আমি আপনার ছাত্রীদের প্রথমে এনজিনিয়ারিংয়ের একটা ছোট্ট ব্যাপার বোঝাচ্ছিলাম। এনজিনিয়ারিংও নয়, কোয়াণ্টাম মেকানিকস। এটা সবারই জানা উচিত —কিন্তু ওরা একদমই বুঝতে পারছিল না। তখন ওটা মুছে এটা এঁকে দিলাম। এটার জন্য কোনো মেণ্টাল ট্রেনিং লাগে না। তারপর, যা বলছিলাম—"

—"আমাকে এবার যেতে হবে। সাড়ে চারটে বেজে গেছে—একটা কাজ আছে গড়িয়াহাটে—"

—"হবে, হবে, সব হবে। আগে অনেস্টি-কার্ভটা বুঝবেন না? এটাই তো আসল। দেখুন, দেখুন, মানুষ কীভাবে নষ্ট হয়। জীবন কীভাবে পচে যায়—

—"বেশ তো, একটু যদি চটপট করেন—

"এই তো—ঐ যেটা আঁকা রয়েছে সেটা সাধারণ মানুষের অনেস্টি-কার্ভ। সাধারণ মানুষ আঠারো-বিশবছর বয়েস অবধি মোটামুটি সৎ থাকে। তারপরে পড়ে যায় উচ্চাশার ফাঁদে। আর শুরু করে নষ্ট হতে। পচন ধরে জীবনে। এই দেখছেন সততা রেখার অধঃপতন? তিরিশ থেকে পঞ্চান্নোয় ম্যাকসিমাম। তারপর থেকে ঐ একই থেকে যায়। এইবার দেখুন অন্যদের বেলায় কী হয়।" উনি আরেকটা রঙিন চক তুলে নিলেন। এবং যত্ন করে হিসেব করে আরেকটি রেখা আঁকলেন চার্টে।

—"এই হচ্ছে অনেস্টি-কার্ভ নাম্বার টু—সততা রেখা দুই নং—ব্যবসায়ী আর বুদ্ধিজীবীদের হিসেবটা দেখুন এবার। এদের নৈতিক অধঃপাত ঢের দ্রুতবেগে ঘটে এবং ঢের বেশিদিন ধরে চলতে থাকে। পঞ্চাশের কোঠায় থামে না, সত্তর-পঁচাত্তর পর্যন্ত অবারিত থাকতে পারে। এবং এরা সমাজের প্রচণ্ড ক্ষতিসাধনের ক্ষমতা রাখে। রাখে কিনা বলুন? বিজনেসমেন অ্যাণ্ড ইণ্টেলেকচুয়ালস।"

—"ঠিক কথা। অ্যাঁ? কী বললেন? ব্যবসায়ী আর?"

—"বুদ্ধিজীবী। ইণ্টেলেকচুয়ালস। মানে এই যে আপনি-আমি। সত্যজিৎ রায়। সুকুমার সেন। কী, বিশ্বাস হচ্ছে না? উই আর হার্মফুল পিপল। এবার দেখুন সততা রেখা তিন, শেষ কার্ভ। এটাই সমাজে যারা সবচেয়ে শক্তিমান লোক তাদের হিসেব, অর্থাৎ পোলিটিশিয়ান এবং জার্নালিস্ট। সাংবাদিক এবং রাজনীতিবিদদের অধঃপতন অন্তহীন। কখনো থামে না। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ এবং ততদিনই বাঁশ।" বলতে বলতে আরেকটি নতুন রেখা যত্ন করে আঁকছিলেন, যার দেখলুম অনন্ত অধোগতি। চার্ট থেকে বেরিয়ে লাইন বোর্ডের ফ্রেমে উঠে গেলো।—

—"এরাই সব্বার চেয়ে ভয়াবহ। আনস্ক্রুপুলাস। নীতিবোধের ধার ধারে না। বিবেক

BanglaBook.org

পর্যন্ত নেই। কী? এগ্রি করছেন না?"

—"আমার এগ্রি করা না, করার কী এলো-গেলো? আমি তো ওই এক নম্বর কার্ডের অন্তর্গত। যাদের কোনো ভালোমন্দের ক্ষমতা নেই। অল্পস্বল্প লোভ আছে।"

—"আজ্ঞে না। মাস্টার হওয়া অত সোজা নয়। সব শালা মাস্টার ইন্টেলেকচুয়াল মনে করে নিজেকে এবং যথেষ্ট ক্ষতি করার শক্তি রাখে। বললুম না এক্ষুণি উই আর হার্মফুল পিপল? এক নয়, সততা রেখা দু'নম্বরে পড়েন আপনি।" একটু থেমে সান্ত্বনার সুরে বললেন—"আমি অবশ্য আরো ডেনজারাস। আপনার চেয়ে ঢের বেশি কেপেবল অব হার্ম—ওয়ার্স্ট অব দ্য লট—বুঝলেন, শুধু তো মাস্টারই নই, আমি আবার একজন জার্নালিস্ট এবং পলিটিকসও করি।"

—"তাই নাকি? কী রকম? কী রকম?"

—"হিউম্যান সায়েন্স ক্রনিকল বলে আমি একটা ইন্ট্যারন্যাশন্যাল বুলেটিন বের করি। একসঙ্গে দিল্লি, নাইরোবি, ক্যানবেরা, অটোয়া, ডাবলিন থেকে বেরোয়। প্রত্যেক কন্টিনেন্টে অফিস আছে। আমিই চীফ এডিটর। আগে ওয়াশিংটন থেকেও বেরোতো। রেগন বন্ধ করে দিয়েছে। আমি তো ওকে কনটেস্ট করেছিলাম গত প্রেসিডেনশিয়াল ইলেকশনে ইনডিপেনডেন্ট ক্যানডিডেট হিসেবে। হেরে গেছি বটে কিন্তু আবার দাঁড়াচ্ছি। এবারে আমার জোর ঢের বেশি।" ভদ্রলোক বিনয়ী হেসে সাহেবী কায়দায় নিচু হয়ে 'বাও' করেন।

আমার যেন মাথায় কেউ হাতুড়ির ঘা মেরেছে। এক ঝটকায় যেন ঘুম ভেঙে গেলো। মগজের মধ্যে জোর একটা ঝাঁকুনি খেয়ে সতর্ক হয়ে নড়েচড়ে বসি। ঘড়ি দেখি। বইপত্তর গোছাতে শুরু করি।

—"প্রেসিডেন্ট রেগন জীবজগতের পক্ষে প্রচণ্ড ক্ষতিকর বস্তুপিণ্ড—আই মাস্ট ডেলিভার দি ওয়ার্লড ফ্রম হিজ ঈভিল গ্রিপস—বুঝলেন না?"

—"ঠিক কথা। কিন্তু আপনার অনেক দেরি হয়ে গেলো। আমাকেও এবার বেরুতেই হবে।"

—"না না, আমার দেরি কিসের? আমি তো এখন ভেকেশনে—আমার ফিরতে দেরি আছে।"

—"আপনি কোথায় থাকেন?"

—"এই যে, ঠিকানাটা রেখে দিন, প্রয়োজন হলে খবর দেবেন।" আমি বাধা দেবার আগেই সেই টিউটোরিয়াল খাতা থেকে চড়চড় করে একটা পৃষ্ঠা ছিঁড়ে নিলেন। এবং নিজের পকেট থেকে দামী কলম বের করে লিখতে শুরু করে দিলেন। গোটা গোটা হরফে ইংরিজিতে লেখা হলো: ডক্টর চক্রবর্তী রাজশেখর, H.O.D.H.S. । রাঁচি মহাবিদ্যালয়, কাঁকে, বিহার, ইণ্ডিয়া, এশিয়া। মৃদু হেসে কাগজটি আমার হাতে দিয়ে বললেন,—"বিহার বড়ো ভালো জায়গা বুঝলেন? বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে। শ্রীহরির বসন্ত বিহারের স্থান কিনা, তাই নাম হয়েছে বিহার। এ থেকেই বুঝে নিন জয়দেব

BanglaBook.org

বাঙালীও নয়, ওড়িয়াও নয়, বিহারী। একবার চলে আসুন না কাঁকেতে—জয়দেবের দেশ, ফাইন কান্ট্রিসাইড।"

—"আচ্ছা H.O.D.H.S. মানে কী?"

—"আশ্চর্য তো? H.O.D. জানেন না? হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট। আর সাহিত্য পড়ান H.S. জানেন না? অবাক করলেন, সত্যি!"

লজ্জা পেয়ে বলি,—" H.S. মানে কি হায়ার স্টাডিজ?"

—"আজ্ঞে না। আপনার মাথা।"

—"হেলফ সার্ভিসেস?"

—"আপনার মুণ্ডু।"

—"তবে কী?"

—"হিউম্যান সায়েন্সেস। হিউম্যান সায়েন্সেস জানেন না? অবিচারটা দেখুন একবার? ফিজিকাল সায়েন্স আছে, বায়ো-সায়েন্স আছে, সোশাল-সায়েন্স আছে, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স পর্যন্ত আছে, অথচ যার জন্যে এত সব সেই হিউম্যান সায়েন্সই নেই? নৃতত্ত্ব, অ্যানথ্রোপলজি মানে অবশ্য তাই, কিন্তু তার ব্যবহারটা হচ্ছে স্পেসিফিক অর্থে—জেনেরিক হেড নয় কোনো। বলুন দিকি লিটারেচার, ল্যাঙ্গুয়েজেস, ইয়োগা, মেডিটেশন, জ্যোতিষ, হিপনোটিজম, প্যারাসাইকোলজি এসব যাবে কোন হেড-এর তলায়? এইজন্যেই তো ইউ. জি. সি. এদের টাকা-পয়সা দিতে পারে না। বুঝচেন ব্যাপারটা?"

—"বুঝলুম।" উঠে পড়েছি। ঝোলা কাঁধে।

—"আগে অবিশ্যি পড়াতাম ইলেকট্রিকাল, কোলিগ ছিলাম আপনাদেরই। একটু প্রিম্যাচিওর রিটায়ারমেন্টের পর থেকেই রাঁচিতেই পোস্টেড। হিউম্যান সায়েন্সেস পড়াচ্ছি। আর এইসব রিসার্চ নিয়ে ব্যস্ত আছি। যেমন এই চার্ট-টা। আমার নতুন বইটা পেঙ্গুইন নিয়েছে।" কথা কইতে-কইতে ভদ্রলোক হাতের চকগুলো ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো করছিলেন। এবার ডাস্টারের পিঠ দিয়ে সেগুলো টেবিলের ওপর বাটনা বেটে পিষে ধুলো-ধুলো করতে লাগলেন। তারপর কথা বলা বন্ধ হয়ে গেলো। পূর্ণ মনোনিবেশ সহকারে ঝুঁকে পড়ে মুঠো-মুঠো খড়ির গুঁড়ো তুলে নিয়ে তিনি টেবিলময় লেপতে শুরু করে দিলেন। টেবিল ধূসর হয়ে গেলো। তাঁর জ্যাকেট খড়ির গুঁড়োয় মাখামাখি হয়ে যেতে লাগলো। আমার উপস্থিতি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে নিবিষ্টচিত্রে উনি টেবিলে চক মাখাতে থাকেন...চকের গুঁড়ো উড়তে থাকে হাওয়ায় চিতাভস্মের মতো, বাতাস ছেয়ে যেতে থাকে, দেখতে দেখতে ওঁর নাকে-মুখে-চুলে-চশমায়-গোঁফেতে-দাড়িতে-ভুরুতে দ্রুত চকের প্রলেপ পড়ে যেতে থাকে—ধুলোয় আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, ওঁর দৃষ্টি স্পষ্টতই উদভ্রান্ত—চকের গুঁড়ো দিয়েই উনি যেন জগতের সব অশুভ মুছে দেবার উদ্দেশ্যে বদ্ধপরিকর—আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলাম—"পাঁচটা বেজে গেছে। আমি যাচ্ছি।"

BanglaBook.org

মুহূর্তেই নিজেকে ফিরে পেলেন রাজশেখর চক্রবর্তী। হাতজোড় করে বললেন —"নমস্কার। আমিও চলি।"

বুঝতেই পারছি বলে লাভ নেই তবু মুখ থেকে বেরিয়ে এলো—"সেলিমার খবরটা?" হো হো করে অট্টহেসে উঠলেন ডঃ চক্রবর্তী। "হাউ গুড অফ ইউ টু রিমেম্বার ম্যাডাম। আপনাকে অযথা উদ্বিগ্ন করেছি বলে মাপ চাইছি। সেলিমা দিব্যি ভালো আছে। মোপেড কিনেছে। রোজ মোপেড চালিয়ে আপিসে যাচ্ছে।"

—"তবে যে বললেন—"

—"গুল। গুল দিলাম। ওটা তো আপনাকে টেস্ট করবার জন্যে।"

—"মানে?"

—"মানে আপনি কী মেটিরিয়্যাল সেটা আগে জানতে হবে না? খাঁটি না মেকি?"

—"অর্থাৎ—"

—"অর্থাৎ ছেলেবেলার বন্ধুকে যার মনে থাকে না, তার ভালোমন্দে যার কিছু এসে যায় না, তেমন লোকের সঙ্গে আমি সময় নষ্ট করতে রাজি ছিলাম না। তাই পরীক্ষা করে নিলাম।"

—"আই সী।" রাগে গা জ্বালা করছে।

—"যাক পাস করে গেছেন। থ্যাংকিউ"—বললেন রাজশেখর, "আজকালকার দিনে কে আর কার কথা ভাবছে বলুন? কেই বা কাকে মনে রাখছে? হিউম্যান সায়েন্সেস সবচেয়ে নেগলেকটেড ডিসিপ্লিন নয় কি? থিংস ফল অ্যাপার্ট, দি সেন্টার ক্যান নট হোলড—"

দীর্ঘ পা ফেলে সর্বাঙ্গ খড়ির গুঁড়োমাখা এক ধূলিধূসর প্রেতের শরীর আমার অফিস থেকে বেরিয়ে যায়।

নবকল্লোল, শারদীয়া ১৩৯৩

BanglaBook.org

চোর-ধরা

ইতুকে আপনি চেনেন। রেডিওতে তার গলা শুনতে পেলেই আপনার হাতের গ্রাস হাতেই থেকে যায়, একপায়ে জুতো পরে আপনি ভুলে অন্য পায়ে চটি গলিয়ে ফ্যালেন। আমার বোন ইতু এমনই গুণের মেয়ে। কিন্তু আমার বোনাইকে আপনারা

চেনেন না। তিনিও অনেক গুণের আধার। তাঁর নিজের বিশাল একটা আইন কোম্পানি আছে, যার তিনি ডিরেক্টর। অনবরত প্লেনে চড়ে হিল্লি-দিল্লী—ট্রম্বে-বম্বে চরকি ঘুরছেন। খুব রাশভারী, দিব্যি ধীর-স্থির দেখতে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে অস্থির, অধৈর্য, আর একটু রাগী। তবে হ্যাঁ, মনটা উদার। বেশ দিলখোলা, দরাজহস্ত। লোকটা খারাপ নয়। সব্বাইকে চাঁদা দেন, চাইলেই বিজ্ঞাপন দেন, এমনকী বিনা পয়সায় ইতুর রেকর্ড পর্যন্ত বিলিয়ে দেন ভক্তদের মধ্যে। শুধু কি তাই? নিজের সলিসিটরস্ ফার্ম, অথচ বিনা পয়সায় যে-কোনো লোককেই আইনের মারপ্যাঁচ বাৎলে দেন, আর চেনা বেরুলে তো কথাই নেই। কেস পর্যন্ত লড়ে দেবেন ফ্রী-তে। ইতুই তাঁর জীবনসর্বস্ব, নয়নমণি। উঠতে ইতু, বসতে ইতু, খেতে ইতু, শুতে ইতু। মানুষটি ইতুসর্বস্ব। এই জাঁদরেল ব্যারিস্টারকে কোমরে গুঁজে রেখে অনায়াসে ইতু সংসার করে, ছেলেপুলে সামলায়, ছাত্রছাত্রী সামলায় এবং নিজের গানকে দিনকে-দিন উন্নত করে। কিন্তু একা স্বামীটিকে নিয়ে তার যত ঝামেলা; পনেরোজন বেসুরো ছাত্র, তিনজন অবাধ্য কাজের লোক, কোয়ার্টার ডজন অপোগণ্ড সন্তান নিয়েও তার আদ্ধেক গোলমাল নেই। ইতু দশভুজার মতো ছুটে ছুটে সবদিক সামলায়।

আমি দিদি বটে, মুগ্ধনয়নে ছোটোর করিৎকর্ম দেখি, আর অবাক হই। সেদিন রোববার। সকালবেলা ইতুর বাড়ি গেছি। রোববার দিন সকালে গানের ক্লাস থাকে সব গাইয়ের, কেবল ইতুরই থাকে না। তার আরো দশটা সংসারের কাজ থাকে। সোমদেবের ছুটি, ছেলেমেয়েদের ছুটি। সেদিন সকালে গিয়ে দেখি বাড়িতে ভীষণ অবস্থা। বসার ঘরের একদিকে ডাঁই-করা কেবল কুশনের স্তূপ। চেয়ার, সোফা, কৌচ সব পালিশ হচ্ছে। নেপথ্যে ইতুর "পারবে না", "হবে না", "এখন থাক" এইসব শুনতে পাচ্ছি। খাবার টেবিলে ইতু বসে আছে, হাতে ধোবার খাতা। ধোবার পাওনা মেলাচ্ছে। ওহো, আজ যে দোসরা। মেঝেয় ধোবার পুঁটলি রয়েছে, নীটলি বাঁধা। ধোবাও খুব নীটলি বসে আছে। উবু হয়ে। মেঝেয় আরো একজন লুঙ্গিপরা লোক থলে হাতে বসে আছে। উবু হয়ে। ইতুই এলোমেলো চুলে হাউস-কোট চড়িয়ে, ভুরু কুঁচকে, আঙুলের কর গুনছে। ভাবলাম, যাই রান্নাঘরে বরং একটু চায়ের খোঁজ করিগে যাই। গিয়ে দেখি ঝটিকার বেগে রান্না হচ্ছে—সুখদা (যাকে সোমদেব আবার 'শুকতারা' বলে ডাকে) হঠাৎ ভয়ানক ব্যস্তভাবে নড়াচড়া করছে। সাধারণত সুখদা অত্যন্ত ধীরগতি। সুধীরা নামই তাকে ভালো মানাতো।

—"কী ব্যাপার, সুখদা? এত তাড়া কিসের?"

—"ঝাবুনি? এক্ষুনি আমাকে ঝেতি হবে—টেরেনের টাইম হয়্যে গেল—"

—"কোথায় যাচ্ছ?"

—"ঘরে গো ঘরে। লাতিটার ভাত লয়? বড় লাতি বলে কথা! পাঁচ পাঁচটা মেইয়্যার পরে এই ছেল্যে। উপোর তৈরি বালা নিইচি, ছোড়দিদি গইড়ে দেছে। আজ ঝাবো, তা ঝামাইবাবু এখনো বেরুলোনি—আমারো দেরি—"

—"আজকে সোমদেব কোথায় বেরুবে? আজ তো রবিবার।"

—"কি জানি ডিল্লি না ম্যাড্ডাস কোথায় ঝ্যান ঝাবে। মক্কেলের নোক গাড়ি নে এস্যে বসো আছে। সোঙ্গে নে ঝাবে। ঝামাইবাবু ছোড়দির ওপর চোটপাট কত্তিচে বাক্স গুইচে দেয়নি বলে, ইদিগে একটুকু আগে আগে বললে তবে তো গুইচে আকবে?"

—"তোমরা চা খেয়েছো, সুখদা?"

—"দিচ্ছি, দিচ্ছি। ঝেক্ষুণি আন্নাঘরে এয়েচো, তেক্ষুণি বুজিচি, চা! হাতটোক খালি হলিই দেবো। ধৈর্যি ধরো বড়দিদি!"

এই সুখদাকে আমার মাই ইতুর সঙ্গে দিয়েছেন। বিয়ের দিন থেকে আছে। আমাদের কুটুম বলে গেরাহ্যি করে না।—হঠাৎ ইতুর ঝাঁঝালো গলা এলো—"তুমি এখনো বসে আছো? বলছি আজকে কাগজ বিক্রি করা হবে না! তবু যাচ্ছো না? কী আশ্চর্য! বলছি আমার আজ সময় নেই? না, খগেনেরও সময় নেই। না, না, না, সুখদারও একদম সময় নেই। আচ্ছা জ্বালালে তো?"

আর যাবে কোথায়? খুন্তি হাতে করে সুখদা তেড়ে বেরুলো—"আও, ঝাও, বেশি ঝামালি কোরনি, কে তোমাকে ঢুকোলে ঘরের মদ্যি? খগেন! খগেন ছোঁড়ার কাণ্ড দ্যাকো?"

লোকটি সুখদাকেই যে ইতুর চেয়ে বেশি মান্য করে, সেটা স্পষ্ট বোঝা গেলো—থটে-টলে সুদ্ধু এতক্ষণে উঠে দাঁড়ালো, এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধীরে ধীরে প্রস্থান করলো লুঙ্গিপরা ব্যক্তিটি। ধোবাও উঠে পড়েছে। ধোবা তার পোঁটলা-পুঁটলি সামলে নিয়ে বেরুতে না বেরুতে এসে পড়ল গয়লা। এসব তেড়্যাঙ্গা দশতলা বাড়িতে চাঁদার অত্যাচার নেই, ভিকিরির অত্যাচার নেই, সেলস গার্লের অত্যাচারও ঢের কম। কিন্তু গয়লা, ধোবা, কাগজওলা—এরা তো আসবেই। কষ্ট করে এরা সারা মাস আসছে, এদের ন্যায্য পাওনা মেটাতে মাসে একটা সকাল এদের না দিলে চলবে কেন? ইতু মন দিয়ে যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ করতে লাগলো—"দিদি এসেছিস? আয় ভাই—তোর গেছোদাদা ভগ্নিপতির বাক্সটা গুছিয়ে দে না—"

—"ও বাবা, ও তুই করগে যা। আমি বরং তোর গয়লার হিসেবটা করে দিচ্ছি। দে, খাতা দে!"

—"ইতু! ইতু! ইতু! ইতু!"

—"ওই দ্যাখো! ষাঁড়ের মতো গর্জন শুরু হয়ে গেছে।"

—"এ বাক্সটা নয়, এ বাক্সটা নয়, অন্যটা! হলদেটা দাও! যাতে বাক্স ডেলিভারি নেবার জন্যে একঘণ্টা এয়ারপোর্টে আটকে থাকতে না হয়। হলদেটা ছোটো আছে, সঙ্গে নেয়া যাবে প্লেনের কামরায়।" পাজামা-পাঞ্জাবি ও একগাল ফেনা-সমেত সোমদেব এসে দাঁড়ালো চটি ঘষতে ঘষতে। হাতে দাড়ি কামানোর ক্ষুর। কাঁধে তোয়ালে।

BanglaBook.org

—"আচ্ছা, তুমি চানটা সেরে নাও না। আমার এক্ষুণি হয়ে যাচ্ছে।" সোমদেব গয়লার ওপর চোখ পাকায় এবার।

—"কৌন হ্যায় তুম? গয়লা? আভি নেহী। আভি ভাগো। বাদমে আও। দুপহরমে। তিন বাজে আও।"

—"না! না! তিন বাজে খবদ্দার আসবে না। আমি তখন একটু শোবো। এই তো হয়ে গেলো। দাঁড়াও। পয়সা লে-কে যাও। এই, এই—যেও না—রামদেব। ও রামদেব—" ইতু চেঁচায়।

—"সবুজ স্লিপিংসুটটা দিয়ে দিও। আর সুতির ড্রেসিংগাউনটা। শীত কমে গেছে।" সোমদেব চলে যায়।

—"আচ্ছা বাবা আচ্ছা। দিচ্ছি, দিচ্ছি। দুধের হিসেবটা আগে করে নিই—", রামদেব ফিরে এসেছে লাজুক পায়ে।

—"দিদি, ছোড়দি, এই লাও চা। আমারটা এবারে বুজিয়ে-সুজিয়ে আমাকে ছেড়ে দাও, আমি ঝাই—"

—"বাঃ! সুখদা সত্যিই সুখদা। চা হয়ে গেলো?"

—"একটু সবুর করো। তোমার হিসেব রেডি হয়েই আছে।" চায়ে চুমুক দিতে দিতে গয়লার হিসেব শেষ, সে যেই টাকাপয়সা নিয়ে চলে গেলো, ইতু সুখদাকে ডাকলো। সঙ্গে সঙ্গে তুতু-মিতুর আবির্ভাব।

—"মা! মা! আমরা দক্ষিণী-তে চললুম—"

—"আরে? খেয়ে যা।"

সজোরে ঘাড় নেড়ে ওরা বলে

—"খাওয়া হয়ে গেছে।"

—"কী খেলি? কখন খেলি?"

জুতো পরতে পরতে মেয়েরা কোরাসে উত্তর দেয়—

—"দুধ। আর জেমস। অনেকক্ষণ।"

—"জেমস? জেমস মানে ঐ গুল্লিগুল্লি চকলেট? ওটা একটা খাবার?"

—"কী করবো? সুখদিদি খাবার দেয়নি তো।"

—"সুখদিদির রান্না শেষ হয়নি যে।"

এবার মাসি হিসেবে আমি ফিল্ডে নামি।—"তাই বলে তোমাদের খাবার দেবে না! সুখদা!"—

ইতু কিন্তু সুখদাকে দোষ দেয় না—মেয়েদেরই বকে—

—"নিজে নিজে রুটি মাখন চীজ নিয়ে নিতে পারো না? এক-একদিন যদি অসুবিধে থাকেই! ফ্রিজে তো সবই আছে—নিজে হাতে বের করেও নিতে পারো না? এতো কুঁড়ে?" ইতু কথা বলতে বলতেই খাবারদাবার বের করে ফেলেছে, প্লেটও লাগিয়ে ফেলেছে, মেয়েরাও ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই রুটিতে মাখন লাগাতে শুরু করেছে। এবার ইতু ছুটলো শোবার ঘরে। বাক্স গুছোতে হবে।

BanglaBook.org

আমি দেখছি, আর মুগ্ধ হচ্ছি। এই সেই ইতু? মা ঠিক এই ভাষাতেই বকতেন আমাদের। আমরাও খাবার না খেয়ে, দুধ খেয়েই খেলতে পালাতুম। হিস্ট্রি রিপিটস ইটসেলফ।

বাক্স গুছোতে ইতুর বেশি সময় লাগলো না। বন্ধছন্দ করে বাইরে এনে রাখলো। সোমদেব যাবার সময়ে নিয়ে যাবে। অনবরতই তো সে বাইরে যাচ্ছে, ইতুর মুখস্থ হয়ে গেছে কী কী দিতে হবে। অটোমেটিক প্যাকিং সিস্টেম।

সবুজ স্লিপিংসুট ভিজে। লালটা দেয়া হলো।

—"সোমদেব ঠিক রেগে যাবে। যাকগে। স্লিপিংসুট নিয়ে কি কেউ মাথা ঘামায়? যত পাগলের কাণ্ড! দেখছিস দিদি?"

ইতিমধ্যে সুখদা দেখি ফর্সা ধুতিটি পরে বগলে চাদরটি নিয়ে এসে হাজির। ইতু এবার সুখদাকে নিয়ে পড়লো। দুই মেয়ে দক্ষিণীতে বেরিয়ে গেছে। ছেলে যায়নি, সে বারান্দায় বন্ধুদের সঙ্গে চেঁচিয়ে আড্ডা মারছে। গলা শুনতে পাচ্ছি। এটা ভালো লক্ষণ। আজকাল তো ছেলেরা যে যার দোর বন্ধ করে উচ্চগ্রামে বিলিতি মিউজিক চালিয়ে কী জানি কী গুজগুজ করে। ফুটবল খেলা নিয়ে তুমুল তর্ক, সিনেমা নিয়ে ফাটাফাটি ঝগড়া, এসব তো আজকাল দেখিই না। শুভটা এদিক থেকে ভালো। খেলাধুলো, চেঁচামেচি, সবই করে। ইতু সুখদাকে বোঝাচ্ছে—"এই যে ধরো তোমার নাতির রুপোর বালা, দু'গাছা, বুঝলে? এই যে, এই কাগজটা যত্ন করে তুলে রাখবে, ছেলেকে দিয়েও দিতে পারো—বুঝলে? এতেই সব হিসেব লেখা আছে—ওজন কতো, মজুরী কতো, কতটা রুপো আছে, সব। সবকিছু মিলিয়ে পড়েছে দেড়শো টাকা। আমার কাছে তোমার পাওনা ছিলো পাঁচশো। দেড়শো বাদ গেলে বাকি রইলো সাড়ে তিনশো। সাড়ে তিনশো এই ধরো। তিনটে একশো টাকার নোট এক্ষুনি তুলে রাখো। ট্যাঁকে অতটা গুজো না একসঙ্গে। যদি হারিয়ে যায়?" ইতুর হিসেবে বোরড হয়ে গিয়ে আমি একবার শুভর কাছ থেকে বারান্দায় ঘুরে এসে দেখি সুখদা রান্নাঘরে চলে গেছে। পিছু পিছু ইতুও ছুটেছে—এবং তার বক্তৃতা শোনা যাচ্ছে—

—"কাগজটা সেই ট্যাঁকেই রাখলে? বালার সঙ্গে মুড়ে ওটাও তোমার ঝোলাতে রাখা উচিত ছিলো। আর এই আলাদা খুচরোটা রাখো বাসভাড়ার জন্যে, এটা ট্রেনভাড়ার জন্যে। অতো টাকা যেন বের করবে না—"

উঃ—সুখদাকে নিয়ে ইতু যেন মেতে উঠেছে। কার যে নাতির ভাত, বোঝা দায় হয়েছে। সুখদা এবারে বললে—"হয়েচে, হয়েচে। সব বুজিচি, এই কি আমি পেরথম ঘরে যাচ্চি ছোড়দি? তুমি যেন আমাকে ছোটোছেলে ঠাউরেচো।"

—"কিন্তু তোমার সঙ্গে কেউ নেই, অতগুলো টাকা, পায়ে বাতের ব্যথা—আমার ভাবনা হবে না? সুখদা, দেখো ভালোয় ভালোয় ফিরে এসো বাপু সামনের রোববার। দেখছো তো আমার কী অবস্থা—"

—"সে আসবুনি? নিচ্চয় আসবো।"

ইতিমধ্যে একফাঁকে সোমদেব এ-ঘরে এসে হাত নেড়ে টা-টা করে চলে গেছে। তার মক্কেলের তরফে যে লোকটি ওকে নিতে এসেছিলো, সেও এলো সঙ্গে সঙ্গে। ঠিক চামচার মতো। পেছু পেছু এলো। আবার পেছু পেছু গেলো।

এবার ঠাকুর নমস্কার করে, রান্নাঘর বন্ধ করে, খগেনের কাছে বিদায় নিয়ে, শুভকে বলে-টলে, সুখদা খাবার ঘরে এসেই চীৎকার করে উঠলো।—

—"অ খগেন, আমার পোঁটলাটা কী করলি?"

—"তোমার পোঁটলা? তোমার পোঁটলা আমি কি করবো? সেই তো সক্কাল থেকেই এইখানে পড়ে আছে। বুড়ো হয়েচো বলেই এতো ভুলো হতে হয়? নিজের জিনিস নিজে খেয়াল করবে না—" বলে গজগজ করতে করতে খগেন ঘরে এসে টেবিলের ওপাশে গিয়েই অবাক!

—"আরে? নেই তো? গেলো কোথায় সুখুদিদির পোঁটলাটা?"

সবাই হতবাক। সত্যিই তো? সুখদা মাথা চাপড়ে কেঁদে উঠলো।—"হায়, হায়, হায়। কে নিয়ে পালালে গো আমার পোঁটলা।"

—"বুঝিচি! বুঝিচি। ওই খবরের কাগজওলাটার কাণ্ড! নিচ্চয় ওর থলেতে পুরে নিয়ে চলে গেছে। ওইখানেই তো বসেছিলো লোকটা।"

খগেন চেঁচিয়ে ওঠে..."সত্যি। লোকটা ঠিক ওইখানেই বসেছিলো। আর চুপচাপ বসেছিলো অনেকক্ষণ। ঐজন্যই, তাক খুঁজছিলো আর কি!"।"

ইতু একবার ধোবাকে নিয়ে ব্যস্ত, একবার গয়লাকে নিয়ে ব্যস্ত, কেউ তো ওকে মোটে দেখছিলোই না। নির্ঘাৎ ওই কেড়ে পড়েছে সুখদার পোঁটলা নিয়ে। পালিশমিস্ত্রি চুপচাপ কাজ করছিলো, এবার সেও যোগ দিলো—

—"কিন্তুক ও তো থলে খেলেই মিকো মোটে! মা, ধোপাটাই হয়তো ভুল করেছে। ওর দু'চারটে ছোটো ছোটো পোঁটলা ছিল তো ওখানে, অন্য অন্য ঘরের কাপড়ের বাণ্ডিল,—হয়তো বা তাদেরই সঙ্গে—"

—"না, না, সে কী করে হবে?" হাত পা নেড়ে নিজেই সুখদা বললে—"আমার তো পেলাস্টিকের পোঁটলা—হলদে রঙের। ঝিপ লাগানো। কাঁধে ঝুলোনোর দড়ি-দেওয়া 'বেগ'। ধোপা আমার বেগ লেবে কী ঝন্যি?"

চেঁচামেচিতে উৎসাহিত হয়ে শুভ ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিলো।

বললে—"হলদে? হলদে ব্যাগ? এইমাত্র দেখলাম একটা হলদে ব্যাগ বাবা ঐ কালো গাড়িতে তুলে দিলো।"

—"সেটা তো তোর বাবার নিজেরই ফ্লাইট ব্যাগ রে!"

—"দাদাবাবুর ব্যাগ? সে তো আমি কখন ওদের গাড়িতে দিয়ে এসেছি—আপনি যেক্ষুনি বের করে দিয়েছেন"—খগেন জানালো।

—"আমি স্বচক্ষে দেখলাম, বাবা নিজের হাতে এক্ষুনি একটা হলদে ব্যাগ—"

—"সর্বনাশ! তাহলে তোর বাবাই নিয়ে গ্যাছে রে সুখদার পোঁটলা—শুভ, ছোট ছোট—আমাদের ড্রাইভারকে ধর—এয়ারপোর্টেই চলে যা—এতক্ষণে হয়তো দিল্লিই চলে গেলো সুখদার নাতির বালা—অনেকক্ষণ তো বেরিয়ে গেছে ও—"

—"কে বললে অনেকক্ষণ? এতক্ষণ তো বাবা লাইব্রেরিতে ছিলো। এইমাত্র গাড়িতে উঠলো, আমরা দেখলাম।"

—"তবে যা খগেন, মোড়ের পানের দোকানে ছুটে যা—নিশ্চয় ওখানেই পাবি—কোথায় বেরুলেই আগে গাড়ি থেকে নেমে ওখানে পান কেনে—বেশ কিছু পান নিয়ে যাবে নিশ্চয় প্লেনের জন্যে—দৌড়ে যা—"

—"কিন্তু লিফটটা নেমে গেছে যে এক্ষুনি—আর তো আসবে না—"

—"যাগগে, তুই হেঁটেই যা বাবা খগেন—ও লিফট ফেরৎ আসার জন্যে দাঁড়াসনি—সুখদার নাতির বালাটা—", খগেন তবু গাঁইগুঁই করছে দেখে ততক্ষণে শুভ ছুটেছে সিঁড়ি বেয়ে—সাততলা দৌড়ে নেমে পানের দোকানে যাবে বাবাকে ধরতে। সঙ্গে সঙ্গে দুড়দাড় করে ছুটলো তার সাঙ্গপাঙ্গরা। মুহূর্তের মধ্যেই বাড়ি ফাঁকা। নিস্তব্ধ। কেবল দেয়ালঘড়িটা উদ্বেগে টিকটিক করে যাচ্ছে।

সুখদা তারই মধ্যে মৃদু মৃদু নাকিসুরে কেঁদে চলেছে—"হায়, হায়, হায়! ঝামাইবাবু কিনা আমার পোঁটলা নে' ডিল্লি চলে গ্যালো গো—আমার অ—র লাতিটার ভাতে ঝাওয়া হলুনি!"

—"কে বলেছে দিল্লি যাচ্ছে তোমার ব্যাগ?" ধমকে কাটে খগেন—"বাবু তো নিজের ব্যাগটাই প্লেনে হাতে নিয়ে উঠবেন, আর ঐ ব্যাগটা ওঁর নয় বলে যেই বুঝতে পারবেন, কিছুতেই নেবেন না। মক্কেলের গাড়িতেই পড়ে থাকবে। ও ব্যাগসুদ্ধ সব মাল সুখুদিদির খোওয়া গেলো।"

খগেনের ভাষা শুনে সুখদার শোক আরও উথলে ওঠে।—"আমি তো ট্যাঁকেই নিইছিলুম বালা আর টাকা সবই—ছোড়দিদি আমারে ঝোর করে পোঁটলাতে আখালে। আমি আখতে চাইনি—ওরে আমার অতগুলো ট্যাকা! আমার লাতির উপোর বালা দুখান!—হায় ভগবান! হায় কপাল!"

ইতু খুবই লজ্জিত। আমি এক ধমক দিই—

—"গেলে গ্যাছে। আবার হবে। জিনিসপত্তর কি যায় না? তোমার জামাইবাবুকে বোলো। রুপোর বালা গড়িয়ে দেবে, তিনশো টাকাও দিয়ে দেবে—এখন চুপ করো দিকি?"

ইতু তো বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। উদগ্রীব। সাততলা দৌড়ে দৌড়ে নামা তো সোজা নয়, শুভর দল যতোই জোরে নামুক। তারা আর পথে বেরুচ্ছে না। একটা কালো গাড়ি মোড়ের পানের দোকানের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে বটে—কিন্তু ওটাই ওর মক্কেলের গাড়ি কিনা কে জানে? নিজেদের গাড়ি তো নয়। ঈশ! গেলো সুখদার সর্বস্ব! কী জানি আরও কতো কিছু সম্পত্তি শখ করে জমিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো ওতে!

BanglaBook.org

বেচারী! মনিব নিজেই পুঁটলি নিয়ে ভেগেছে! এমন দুর্ভাগ্য ক'জনের হয়?

এমন সময় একটা প্রচণ্ড হুংকার কানে এলো। ঐ যে—শুভর দলবল রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। এবং সমস্বরে চেঁচাচ্ছে—"চিন্তামণিদা, গাড়িটা আটকাও।" চিন্তামণি পানওয়ালার নাম। চিন্তামণির সাদা মুণ্ডু পানের দোকান থেকে উঁকি মারলো। এবং পানের দোকানের ওপাশ থেকে হেঁটে এলো সোমদেব। এতক্ষণে ছেলেগুলো এমিল জ্যাটোপেকের মতো দৌড়ুচ্ছে। সাততলার ওপর থেকে আমরা দেখলাম: গাড়ির সামনে জটলা হচ্ছে। সোমদেব হাত পা নেড়ে ছেলেদের ওপর রাগারাগি করছে। মক্কেলের চর বেরুলো। বুট খুললো। শুভ ছোঁ মেরে বুট থেকে সুখদার ব্যাগ তুলে নিলো। এবং তারপরেও কিছু কথাবার্তা হলো। অতঃপর ড্রাইভার উঠলো, সোমদেব উঠলো, মক্কেলের চর উঠলো—সবাই উঠে পড়লো, গাড়ি চলে গেলো। সুখদার পোঁটলা-কাঁধে বিজয়-মিছিল করে শুভর দলবল বাড়ির দিকে আসতে লাগলো হেসে গড়াতে গড়াতে। তাদের সেই আহ্লাদে এবং অহংকারে রাস্তাটাই আনন্দে ঝলমল করে উঠলো—সরস্বতীপুজোতে রঙীন আলোর সারির মতনই সেই হাসির চমকানি।

বীরগর্বে ঝোলাটি এগিয়ে দিয়ে শুভ বললো—

—"এই নাও সুখুদিদি! হলো তো তোমার পোঁটলা উদ্ধার? হুঁহু বাবা, সোজা চোরের পাল্লায় পড়েছিলে? একেবারে দিল্লী পাচার করে দেবার তালে ছিলো—"

সুখদা লজ্জা লজ্জা হেসে শুভর গালটা টিপে দিয়ে (শুভকে প্রচণ্ড লজ্জা পাইয়ে দিয়ে) বললে—"ভাগ্যে আমার দাদাভাই ঘরেই ছেল? লইলে আমার লাতির ভাতে যাউয়াই হতুনি!" বাধা দিয়ে বেরসিক খগেন বললে—"চলো চলো, আর দেরি কোরো না। টেরেন পাবে না এর পরে।"

ওরা বেরুতে, নিশ্চিন্ত হয়ে আবেদ্যুর চায়ের জল চাপিয়ে খাটে উঠে পা গুটিয়ে আরামসে বসে ইতু বলল, "বাবাঃ, বাঁচা গেলো, কী কাণ্ড হতো বলো তো, না-পেলে? শুভ, তোর বাবা কী বললো রে তোদের দেখে?"

—"প্রথমেই রেগে গেলো। 'আবার কী চাই? ব্যাপার কী? তোমার মা পাঠিয়েছে নিশ্চয়ই?' যেই বলেছি—'সুখুদিদি পাঠিয়েছে, তার পোঁটলা নিয়ে তুমি দিল্লি চলে যাচ্ছো', বাবা তো ক্ষেপেই লাল—'আর ইউ কিডিং? ইয়ার্কি হচ্ছে? আমি আনবো সুখদার পোঁটলা? কেন? অ্যাম আই ক্রেজী? নাকি আমি ক্লেপটোমেনিয়াক? আমি কি চোর, না পাগল? কী ভাবিস তোরা আমাকে? অনেস্টলি! সুখদার ভিমরতি ধরেছে—' আমি তাও ইনসিস্ট করলাম, তখন রেগে-মেগে ড্রাইভারকে বললো, 'বুট খুল তো।' তখন ব্যাগও বেরুলো।"

—"তারপরে? তারপর কী বললে তোর বাবা?" ইতু উদগ্রীব। আমিও।

—"ব্যাগ দেখে তো বাবা একদম অবাক! কেবল বলে—'আরে? এটা আবার কোত্থেকে এলো? ধ্যাৎ, আমি কক্ষনো তুলে আনিনি—হাউ স্ট্রেঞ্জ!' শেষকালে মিনমিন করে বললে—'ঐ হলদে রঙটা দেখেই হয়তো,'...বাবা খুব লজ্জা পেয়েছে মনে হয়—"

—এবার ইতুর গর্জে ওঠার পালা—"লজ্জা পেয়েছে না হাতি! হলদে রঙটা দেখেই হয়তো? অ্যাঁ? একটা ধর্মতলার ফুটপাতের মাল, আরেকটা খোদ স্যামসোনাইটের ফ্লাইট ব্যাগ—দুটো এক হলো? এই বুদ্ধি নিয়ে যাচ্ছে মামলা লড়তে? আসুক তোর বাবা ফিরে—", কে বলবে এই গলাই আপনি রেডিওতে শুনে মূর্ছা যান?

নবকল্লোল, বৈশাখ ১৩৯৩

মহানায়ক সুরজিৎদা

"শ্রীমতী কোথায়? শ্রীমতী পাপীয়সী দেবী? হাই! ডার্লিং?" "—ছাড়বে না বলছি, বাড়ি ঢুকতে না ঢুকতেই শুরু হয়ে গেল? উঃ! ছেলেমেয়েরা কী শিক্ষাই যে হচ্ছে—"

চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে এসে দোর খুলে দেন পাপিয়াবৌদি।

সুরজিৎদার নাইট ডিউটি ছিল কাল। হাতের ব্রীফকেসটা টেবিলের ওপরে ফেলে দিয়ে একটা জুতো পা ছুঁড়ে দরজার সামনে, অন্যটা পা থেকে ঝেড়ে খাটের কাছে কোনোরকমে খুলে ফেলেই চিৎপটাং হয়ে খাটের ওপর শুয়ে পড়ে..."আ-আ—আহ্..." বলে একটা আরামের দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে, তারপর সুরজিৎদা চোখের কোণ দিয়ে বৌদিকে মিটির মিটির দেখতে থাকেন।

এভাবে জুতো খোলা বৌদির একদম পছন্দ নয়। তিনি খেপে যাবেন বলেই সুরজিৎদার এইগুলো করতে ভালো লাগে। পাপিয়াবৌদির সঙ্গে সুরজিৎদার খুনসুটি দেখলে কারুর বিশ্বাস হবে না সুরজিৎদার বেশ বড়সড় দুটো ইস্কুলে পড়া ছেলেমেয়ে আছে।

ঘুমঘুম চোখে পাপিয়াবৌদি কিন্তু রাগ করেন না। জুতো দুটি গুছিয়ে রেখে বলেন—"শুয়ো না, ওঠো, আগে মুখে চোখে জল দিয়ে পোশাকটা বদলে ফ্যালো, আরাম পাবে—ইস, কাল থেকে এই জামাকাপড় পরে আছ!"

"হবে, হবে, পরে হবে। আগে দু'কাপ চা করে ফ্যালো দিকি?" বলতে বলতে শয্যাশায়ী সুরজিৎদা একহাত বাড়িয়ে বৌদির কোমর ধরে হ্যাঁচকা টান দেবার চেষ্টা করেন।

বৌদিও কায়দা করে একপাক ঘুরে নাগাল এড়িয়ে হাসতে হাসতে রান্নাঘরে পালিয়ে যান—"ইস, ন্যাকা, মুখ ধোয় না, নোংরা, আবার বাসিমুখে বউকে আদর করা চাই—হুঁঃ, বয়েই গ্যাছে—!"

BanglaBook.org

জল চড়িয়ে দিয়েই সাবিত্রী বেরিয়েছিল। সুরজিৎদার ফেরার টাইম তার হিসেব করা। ট্রেতে বিস্কুট আর চা নিয়ে বৌদি ঘরে ঢুকতেই একটি কাপ তুলে নিয়ে সুরজিৎদা হঠাৎ উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েন। ভারী বেডকভারটি তুলে খাটের তলায় উঁকি মেরে বলেন—"এই যে মিস্টার মিত্তির! গুড মরনিং! এবারে বেরিয়ে আসুন, এই যে আপনার মরনিং টী রেডি হয়ে গেছে। আর লুকিয়ে থেকে কী করবেন, লেট যখন করে ফেলেছেন। থ্যাংকিউ ফর লুকিং আফটার মাই ওয়াইফ! কী? কী হলো? বেরুচ্ছেন না কেন? ডাক্তার ডাকতে হবে নাকি?"

"যাঃ, কী হচ্ছেটা কী? অসভ্য কোথাকার। আসেও বাবা মাথায়। কুবুদ্ধির ঢিপি!" অন্য কাপ চা-টা হাতে করে হাসতে হাসতে খাটের ওপর বসে পড়েন বৌদি —"বেশ হয় যদি মিত্তিরমশাই এসে পড়েন সত্যি সত্যি"—বলতে বলতেই দরজায় বেল বেজে উঠলো।

সুরজিৎদা তখনও মাটিতে উপুড়। চমকে গিয়ে মেঝে থেকে ঝটপট ভরাভর্তি চায়ের পেয়ালা সমেত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে, মেঝেয় এবং শার্টে চা ছলকে ফেললেন। বৌদি দোর খুলে দিলেন, ঘরে ঢুকলো সাবিত্রী। হাতে দুধের বোতল।

"যাক বাবা, বাঁচালে! আমি ভাবছি বুঝি সত্যি সত্যিই—" গা থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে সুরজিৎদা বলেন, "ওফ!"

"ওফ কী? বেশ হতো, বেশ হতো যদি সত্যি সত্যিই মিত্তিরমশাই আসতেন। এই যে তোমার বদ রসিকতা ওঁকে নিয়ে, বেচারা ঘুণাক্ষরেও যদি টের পেতেন, ক—বেই আমাদের তাড়িয়ে দিতেন—এত খারাপ কথা তুমি বল—

"খারাপ কথা মানে? আত্মবৎ মন্যতে জগৎ। ওঁর ক্ষেত্রে আমি থাকলে যা করতাম, আমি তাই বলি। উনি যে রাতবিরেতে চলে আসেন না, এটা তো ওঁরই বুদ্ধির দোষ—এমন সুন্দরী মেয়ে একা থাকলে—"

"একটা কাজ করো না? নাইট ডিউটিতে বেরুবার আগেই বলে কয়ে যেচে সেধে ছাপানো নেমন্তন্ন পত্তর দিয়ে ওঁকে ডেকে এনে এ-ঘরে মোতায়েন করে গেলেই পারো। তুমিও নিশ্চিন্তি, আমিও নিশ্চিন্তি—"

"ওভাবে বলে কয়ে কী আর রোমান্স হয়? আয়্যাম সরি পাপীয়সী দেবী, কিন্তু ব্যাচেলর বুড়ঢারা বেজায় ভীতু হয় আমি দেখেছি। রোমান্সের কোনো সেন্সই থাকে না ওদের। আমি তো বাবা ঠিকই করে রেখেছি যখন নিজের বাড়ি বানাবো, ভাড়াটের সঙ্গে চুক্তিই থাকবে, খোলাখুলি লীগ্যাল এগ্রিমেন্ট যে, ভাড়াটের বউয়ের সঙ্গে আমরণ প্রেম করার পূর্ণ অধিকার আমার থাকা চাই। এই রাইট না পেলে বাড়িভাড়া দেব না। ব্যস।"

"হ্যাঁ, ওই শর্তে রাজি হয়ে যে তোমার বাড়ি ভাড়া নেবে তার বউও দেখবে তেমনি তেমনি হিড়িম্বা রাক্কুসী হবে!"

BanglaBook.org

"হিড়িম্বা? হিড়িম্বা পেলে তো বর্তে যাবো গো? ওরা সব ট্রাইবাল বিউটি, ওদের মোটেই ফ্যালনা ভেবো না! পরমাসুন্দরী না হলে রাজার ছেলেকে ভোলাতে পারে?"

"কেন? হিড়িম্বা চাই কেন? আমাকে আর মনে ধরছে না?"

"আঃ—হাঃ! কী যে বলো? দ্রৌপদী কি সুন্দরী ছিলেন না? পড়েছ তাঁর বর্ণনা? অমন পদ্মগন্ধা রূপসী ঘরে থাকতেও অর্জুনের কী উলুপী, চিত্রাঙ্গদা, সুভদ্রা, টু নেম আ ফিউ—"

"ও, তুমি অর্জুন বুঝি? কবে থেকে অর্জুন হলে?"

"তবে কি আমি যুধিষ্ঠির? তুমিই বা কবে থেকে আমাকে যুধিষ্ঠির ঠাওরালে? ওঃ, এতবড়ো কমপ্লিমেন্ট ওয়ালর্ডে কেউ কারুর বউয়ের কাছে পায়নি, আয়্যাম সিওর—"

"যাও, তোমার সঙ্গে কথায় কেউ পারবে না—"

"আমি বাবা চিরকেলে রোমান্টিক হিরো! একটু-আধটু সুইট রোমান্স না হলে আমার দিনই চলে না। যতই সুন্দরী হও, নিজের বউকে নিয়ে তো আর রোমান্স হয় না! হয় কি? তুমিই বলো ডার্লিং? একটু রস না হলে জীবন চলে?"

"অ! আবার রসও চাই? রোমান্সও চাই? এই যে সারা গায়ে চা পড়ে চিটচিট করছে, তাতে তো বেশ একটা রসালো রোমান্স হলো। হলো না?"

"সাবিত্রী! সাবিত্রী! বোঝো ঠ্যালা! তোমার বৌদির মিষ্টিকথার চোটে আমার জামাকাপড় রসে চিটচিট করছে, মেঝেতে পিপড়ে থিকথিক করলো বলে! শিগগির ন্যাতা নিয়ে এসো দিকিনি—"

সুরজিৎদা এইরকমই। যতক্ষণ যেখানে থাকেন, চেঁচামেচি হৈ-হুল্লোড়ে সবাইকে মাতিয়ে রাখেন। আর বেরিয়ে গেলেই বাড়ি নিঃঝুম। নিশুত পুরী। করিৎকর্মা মানুষ না হয়েও সুরজিৎদা রেজাল্টের জোরে ইংরিজি কাগজে চাকরিটা যোগাড় করে ফেলেছিলেন এবং পাপিয়াবৌদিকেও। সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকুরিয়াতে তখন সদ্য বানানো এই বাড়ির দোতলা। এখানেই তাঁর দুটি ছেলে-মেয়ে জন্মেছে, বড় হচ্ছে। বাড়িওলা মানিক মিত্তির ব্যাচেলর মানুষ। বৃদ্ধা মাকে নিয়ে নিচে থাকেন। নিতান্ত ভদ্রলোক। বয়েসও হয়েছে। নানা সমাজকল্যাণ সংঘের সঙ্গে জড়িত। সময় পেলেই সুরজিৎদার সঙ্গে এসে আড্ডা মারার চেষ্টা করেন। আর সুরজিৎদার চুলদাড়ি পঞ্চাশ ছুঁলেও স্বভাব পঁচিশের কোঠা ছাড়ায়নি। হাতে ফাঁক পেলেই বউয়ের সঙ্গে খুনসুটি করে সময় কাটাতে চান, বউ পাত্তা না দিলে ছেলেমেয়েদের পেছনে লাগেন। মানিক মিত্তিরের সঙ্গে গল্পে তাঁর মন নেই। কিন্তু মিত্তিরমশাই সরল মানুষ, তিনি অতশত বোঝেন না। একা একা থাকেন, সুরজিৎদা ফিরেছেন টের পেলেই সময় নেই অসময় নেই, সুড়সুড় করে উনিও চলে আসেন সঙ্গ পাবার আশায়। পাপিয়াবৌদির বেশ

BanglaBook.org

মায়াই পড়ে গেছে এই ভালোমানুষ ভাসুর টাইপের ভদ্রলোকের প্রতি। কিন্তু সুরজিৎদা বিরক্ত। 'ব্যাটা বোর'! বলে আড়ালে গজগজ করেন।

সেদিনও গরম চায়ের পেয়ালাটি, খবরের কাগজটি, তাজা টাটকা সকালটি এবং পাপিয়াবৌদির হাসিমুখ যেই সুরজিৎদার কপালে একত্রে জুটেছে, তক্ষুণি মানিক মিত্তিরের গলাখাঁকারি শোনা গেল দরজার কাছে। হন্তদন্ত হয়ে ঢুকেই তিনি বললেন —"এই যে সুরজিৎবাবু, আছেন তাহলে? বাঁচালেন মশাই!"

সুরজিৎদার মুখ সঙ্গে সঙ্গে বিমর্ষ হয়ে পড়লো। বৌদি তাড়াতাড়ি মুখে হাসি এনে বলেন, "চা এনে দিই, মিত্তিরমশাই?"

"না, না, বউমা, এক্ষুণি চা খেয়ে এলুম। আজ আমি বড্ড বিপদে পড়ে এয়েচি বউমা, মালগোবিন্দপুরে, মানে ঐ চম্পাহাটির ওদিকে আর কি, একটা ক্লাবের বার্ষিক উৎসব, মানে অ্যানুয়াল ফাংশান আছে এই রোববার। সভাপতি না হয় ওই ক্লাবের প্রেসিডেন্টই হবেন, কিন্তু প্রধান অতিথিই যে পাওয়া যাচ্ছে না? আমাদের সুরজিৎবাবু তো সাংবাদিকতায় বেশ নাম করেছেন, কী বলো? টিভিতেও মাঝেমধ্যেই সাক্ষাৎকার নেন কত সব বিখ্যাত লোকেদের, সেই সূত্রে ওঁর নামটাও লোকে জেনে গেছে —ইংরিজি কাগজের রিপোর্টার হওয়াটা গাঁয়ে একটা বিরাট ব্যাপার—ভাবছি ওঁকেই ধরে নিয়ে যাবো। হাতের পাঁচ বলে কথা। না বলো না বউমা, উপরোধে লোকে তো ঢেঁকিও গেলে। এ তো কেবল প্রধান অতিথি হওয়া! তুমিই সুরজিৎবাবুকে রাজি করাও!"

প্রস্তাব শ্রবণে পাপিয়াবৌদির মুখ হাঁ। বাকরহিত।

"আপনাদের সভায়? ওঁকে? মানে-মানে চীফ গেস্ট?"

"হ্যাঁগো, হ্যাঁ, আর যে কাউকে পাচ্চিনি, আপত্তি আছে নাকি তোমাদের? এই উবগারটুকু করো বউমা!"

আপত্তি? এই প্রস্তাবে সুরজিৎদার সদাই স্মার্ট মুখেও হঠাৎ কেমন যেন বিব্রত ভাব এসে পড়েছে, খানিকটা 'কিন্তু-কিন্তু' আর খানিকটা অভাবিত খুশির ককটেল।

"না না। আপত্তির কী আছে? কিন্তু, আমি তো কখনো—মানে, জীবনে কখনো এসব প্রধান অতিথি-টতিথি তো—এসব ফরম্যাল অনুষ্ঠানে আমাকে কেন, আর কারুকে বরং—আবার বক্তৃতাও দিতে হবে নাকি রে বাবা?"

খুশির চোটে অজস্র বাক্য অসম্পূর্ণ রেখেও কোনোরকমে একটি বাক্য সম্পূর্ণ করতে পেরে সুরজিৎদা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। বৌদি হাসি চাপতে অন্যদিকে মুখ ফেরান।

"থ্যাংকিউ, থ্যাংকিউ! আপনাকে ধরিচি কি আর সাধে?" মিত্তিরমশাই সুরজিৎদাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বৌদির দিকে ফিরলেন। নেবা বিড়িটা আরেকবার ধরিয়ে নিয়ে বললেন—"সুরজিৎবাবু ছাড়া হাতে আর কেউই নেই বলে! আর বলো

BanglaBook.org

কেন? এক্সপিরিয়েন্সড় চীফ গেস্টরা কেউ কি এমন হুট করে আসবে? তাদের একটা প্রেস্টিজ আছে না?"

"তাহলে আপনাদের আগে থেকেই কাউকে ঠিক করা উচিত ছিল।" বৌদি একটু অপমানিত গলায় বলেন।

"করিনি কে বললে? কবি হেরম্ব চৌধুরীকে তো ঠিক করা হয়েছিল। ওদিকে ভুল করিনি বাবা! চীফ গেস্ট ফিক্স করে তারপরে তো অন্য প্রোগ্রাম! কিন্তু এমনই কপাল। কবি হেরম্ব চৌধুরীই যে বসিয়ে দিলেন, লাস্ট মোমেন্টে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেল করে দিলেন। রোববার ফাংশন, আর কাল বৃহস্পতিবারে বললেন, 'যেতে পারবো না'! ভেবে দ্যাখো কাণ্ডটা? আজ শুক্রবার। পরশুদিনের জন্যে কোনো ক্লাস ওয়ান প্রধান অতিথিকে অ্যাপ্রোচই করা যাবে না। দেয়ার ইজ নো টাইম! মান্যগণ্য অতিথিদের তো একটা মানসম্ভ্রম আছে? আগে থেকে দিনক্ষণ ঠিক করে ওঁদের এনগেজ করতে হয়। কত ব্যস্ত মানুষ সব!"

"হেরম্ব চৌধুরী কেন গেলেন না?" বৌদির ভুরু-পেঁচানো প্রশ্ন।

"প্রিন্সিপল-এর প্রশ্নে। উনি ভেবেছিলেন কেবল রবীন্দ্র-সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হচ্ছে, আসলে তো উৎসবটা হচ্ছে চারটে আইটেম একসঙ্গে জড়িয়ে। সেই বলেছি চারটে সাবজেক্ট নিয়েই একটু একটু বলা চাই, অমনি উনি ক্যানসেল করে দিলেন।"

"চা-রটে আইটেম?" সুরজিৎদাই মুখ খুললেন এবার, "কী কী আইটেম শুনতে পারি?"

"ও কিছু না! খুব সিম্পল! ঐ তো—রবীন্দ্র-সপ্তাহ, মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ দিবস, মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মজয়ন্তী আর ব্যায়ামাগারের প্রয়োজনীয়তা। দু'কথা বলা, এই তো ব্যাপার। ওঃ, আরও একটা বিষয় আছে। ভারতবর্ষে হোমোপ্যাথি চিকিৎসার দেড়শো বছর নিয়েও কিছু বলতে হবে ভাই—"

"ওরে ব্বাবা"—সুরজিৎদা-পাপিয়াবৌদির কণ্ঠে যুগলবন্দী বিস্ময়রাগিণী বেজে ওঠে।

"ওরে ব্বাবা মানে? হেরম্ব চৌধুরী না হয় কবি, তিনি এতসব নিয়ে বলতে না চাইতেই পারেন। কিন্তু সুরজিৎবাবু, আপনি তো সাংবাদিক, আপনাকে তো ভাই এর প্রত্যেকটাই কভার করতে হয়। অন গ্রাউণ্ডস অব প্রিন্সিপল আপনার কোনোই ওজর-আপত্তি থাকা উচিত নয়। বলো বউমা, উচিত কি?"

"কিন্তু—কিন্তু এতগুলো বিষয় একসঙ্গে উদযাপন না করলেই কি চলতো না? এগুলো একসূত্রে গাঁথা—"

"কী করে আলাদা উদযাপন করলে চলে, বলো বউমা? চাঁদা উঠবে কেন? যদি এটাকে মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ দিবস না বলি, গাঁ-গঞ্জের জনসাধারণ চাঁদা দেবে কেন? তারা রবীন্দ্রনাথ কী-বা বোঝে? আবার বৈশাখ-শ্রাবণ বাদ দিয়ে রবীন্দ্র-সপ্তাহটা গতবছর থেকে শীতকালেই করা ঠিক হয়েছে, ঐ গ্রীষ্মে কেউ গ্রামে আসতে চায়

না, ফ্যান-ট্যান নেই তো! হোমিওপ্যাথির ব্যাপারটা রাখতে হলো আমাদের ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ডক্টর ব্যানার্জির জন্যে। উনি গ্রামে প্রচুর গরিবলোককে বিনামূল্যেও চিকিৎসা করেন তো? দারুণ পসার জমেছে ভদ্রলোকের—বড় ছেলেকেও এখন প্র্যাকটিসে নামাচ্ছেন। ওটা রাখতেই হবে, সময়ে-অসময়ে মোটা চাঁদা দিয়ে উনিই রক্ষে করেন ক্লাবকে—আর কী? আর তো শুধু ব্যায়ামাগারটা? একটু বলতেই হবে তো ক্লাবটার চরিত্র বিষয়ে? এক এক করে বেশি হয়ে গেছে।"

"উত্তমকুমার এলেন কেমন করে?"

"ও বাবা, মহানায়ক উত্তমকুমারের নামেই তো সভাতে অডিয়েন্স হবে? লোকে আসবে কেন সভায়?"

"মল্লিকপুরে যেতে হয় কেমন করে? কদ্দুর ওটা এখান থেকে?"

"মল্লিক নয় বউমা, মালগোবিন্দপুর। চম্পাহাটি স্টেশনে নেমে ক'মাইল ইন্টিরিয়ারে—ওসব নিয়ে তোমাদের ভাবতে হবে না, বউমা। ছেলেমেয়েরাও যায় যেন। আমি তো যাবোই, কোনো অসুবিধাই হবে না। আমি ওদের গত দশবছর ধরে ফ্রেণ্ড, ফিলসফার অ্যাণ্ড গাইড কিনা?"

"তবু মানে—", পাপিয়াবৌদির মনের খুঁতখুঁতুনি যাচ্ছে না।

"ইয়েস বলে দাও বউমা, তাহলেই সুরজিৎবাবু যাবেন—ইয়েস তো? থ্যাংকিউ থ্যাংকিউ—কাল তবে ছেলেরা এসে নেমন্তন্নপত্র দিয়ে যাবে। পরশুই মিটিং, মনে থাকে যেন। সকাল দশটায়। ঘণ্টা দুই হাতে নিয়ে বেরুনোই ভালো। ট্রেনের কথা কিছু বলা যায় না।"

পরদিন তিনটি ছেলে এলো। চোঙাপ্যান্ট, উদ্ধবক্রা বুশশার্ট, হাতকাটা সোয়েটার, একগাল হাসি।

"জয়মাকালী বডি বিল্ডারস থেকে আসছি। সুরজিৎবাবু আছেন? কাল সোকালে গাড়ি নিয়ে আসবো আমরা। ঠিক আটটার সোময় তৌরি থাকবেন কিন্তু বৌদি। বাড়িসুদ্ধু সব্বাই যাবেন কিন্তু, সব্বার নেমতন্নো, হ্যাঁ। ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসবেন, ছেলেদেরই তো ব্যাপার।"

সুরজিৎদার পঞ্চাশ বছরের জীবনে এই প্রথমবার প্রধান আতিথ্য গ্রহণ। হোক না সেই ক্লাবের নাম 'জয়মাকালী বডি বিলডারস অ্যাসোসিয়েশন', তবু তো তারা ওঁকেই ডেকেছে? ছেলেমেয়েরও প্রচুর উৎসাহ—গ্রামে আউটিং হবে। রোববার যারা কিছুতেই বিছানা ছাড়তে চায় না, আজ, ভোরে উঠে তারা রেডি। বৌদির আগ্রহও মোটেই কম নয়। চুল বেঁধে লিপস্টিক মেখে রেশমী শাড়ি পড়ে ৮টার ঢের আগে বাড়িসুদ্ধু সবাইকে প্রাতরাশ খাইয়ে তিনিও রেডি। যে সুরজিৎদাকে ছুটির দিনে বেলা দুটোর সময়েও স্নানপর্বে পাঠানো যায় না আজ তাঁর স্নান, দাড়ি-কামানো সব সারা, আধহাত মুগার ধাক্কা দেওয়া শাড়ি-মার্কা ভাইফোঁটায় প্রাপ্ত ধুতি আর 'র' সিল্কের পাঞ্জাবি

BanglaBook.org

পরে বিয়ের শাল কাঁধে নিয়ে পামশু পায়ে তিনি বসে বসে একমনে একখানা খুদে টুকরো কাগজ পড়ছেন, রবিবারের খবরের কাগজ নয়। ঐ কাগজে তাঁর ভাবী বক্তৃতার পয়েন্টগুলি তিনি লিখেছেন। পাপিয়াবৌদি সাবিত্রীকে বারংবার লাস্ট মোমেন্ট ইন্সট্রাকশন দিচ্ছেন। বিকেলে ফিরবেন। দুপুরে বাড়িতে খাওয়া বন্ধ। রাঁধতে হবে না ভেবেই যেন বৌদির উৎসাহটা বেশি। ৮টা অনেকক্ষণই বেজে গেছে। ছেলেদের দেখা নেই। তবে কি? সুরজিৎদার উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে। এমন সময়ে—"গাড়ি এসে গেছে স্যার, রেডি তো, বোদি? চলুন, চলুন, বাচ্চারা কই?" বলতে বলতে দুটি ছেলে এসে পড়লো। মিত্তিরমশাইও বললেন—"চলুন, গাড়ি রেডি!"

রাস্তায় এসে দেখা গেল তিনটি সাইকেল রিকশা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেদুটো একটায় উঠলো। সুরজিৎদাকে নিয়ে মিত্তিরমশাই একটাতে, অন্যটাতে, পাপিয়াবৌদি ছেলেমেয়েকে নিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে উঠে পড়লেন। রিকশা চললো চাকুরিয়া স্টেশনে।

স্টেশনে নেমে রিকশাভাড়া মিটিয়ে দিল ছেলেরা। সুরজিৎদা খুবই আরাম বোধ করলেন। রিকশাওলাদের সঙ্গে তক্কাতক্কি না করেই সপরিবারে রিকশা চড়ে এই স্টেশনে আসা, জীবনে প্রথমবার এতবড়ো আরাম পেলেন। বৌদিকে একবার দেখে নিলেন। ভারি সুন্দরী বউ তাঁর সত্যি। ছেলেমেয়েদুটোও হয়েছে তেমনি। কুমোরটুলিতে অর্ডার দেওয়া প্রতিমার মতো মুখ। ছেলেটা ছোট, এখনো মেয়েলি দেখতে। নাঃ, বেশ প্রাউড হবার মতোই ফ্যামিলি তাঁর—প্রধান অতিথির যোগ্য ফ্যামিলি। কোমরে হাত বুলিয়ে একবার ওপর থেকেই দেখে নিলেন, ধুতির ওপরে পাপিয়া যে শক্ত করে একটা সায়ার দড়ি বেঁধে দিয়েছিল সেটা ঠিকঠাক আছে কিনা। উনি বেল্ট বাঁধার চেষ্টা করেছিলেন তাতে নাকি অনেক রিস্ক। আর যাই হোক, প্রধান অতিথির তো ধুতি খুলে গেলে চলবে না।

ক্লাবের ছেলেরা গেছে টিকিট কাটতে। মিত্তিরমশাই বকে যাচ্ছেন। সুরজিৎদা অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন। ট্রেনে করে অবশ্য প্রায়ই তাঁকে যাতায়াত করতে হয়। কখনো বালিগঞ্জে, কখনো শেয়ালদা, কখনো ক্যানিং, কখনো বারুইপুর। কিন্তু টিকিটঘরের দিকে কোনোদিন দৃষ্টিপাত করেননি। ছেলেগুলি টিকিট কেটে এনে সবিনয়ে বললে—"চলুন স্যার—আর দেরি নেই, ট্রেন এল বলে।"

সুরজিৎ ভাবলেন—জীবনে এই ফার্স্ট টাইম টিকিট কেটে এ লাইনে ট্রেনে চড়ছি! নাঃ, আজকে সত্যিই একটা ভেরি স্পেশাল ডে। অনেকগুলো 'জীবনে প্রথমবার' এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে।

ট্রেনে অবিশ্যি সেই একই ভিড়—তবে বসবার সীট পেতে কিছুমাত্র অসুবিধে হলো না। চোঙাপ্যান্ট ছেলেগুলি হালুম-হুলুম করে লোকজন সব হটিয়ে তাঁদের পাঁচজনকেই বসবার জায়গা তো করে দিলেই, নিজেরাও হাঁটু ফাঁক করে করে যথাসাধ্য জায়গা নিয়ে বসে পড়লো। ট্রেন চলছে, থামছে। বান্টি-বুলটু খুবই উত্তেজিত, জানলা

দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে—কী সুন্দর সুন্দর নাম সব গ্রামের, মল্লিকপুর, রাজপুর, কালিকাপুর, পিয়ালী—কত সবুজ গাছপালা, পুকুর, কলাবাগান, ধানক্ষেত, কুঁড়েঘর। বৌদিও মুগ্ধ। চম্পাহাটি না আসতেই উঠে পড়লো ছেলেরা। ট্রেন থামতে-না-থামতেই কায়দা করে ছেলেমেয়েদের সোজাসুজি কোলে তুলে, আর পাপিয়াবৌদিকে প্রায় কোলে করে এবং সুরজিৎদা-মানিকবাবুকে আলতো গোত্তা মেরে ট্রেন থেকে ঝেড়ে প্ল্যাটফর্মে ঠিকঠাক নামিয়ে ফেললে। প্ল্যাটফর্মে আবার রিকশা।

ঝোপঝাড়, ধানক্ষেত, কলাবাগান, এঁদোপুকুর, কলসী কাঁখে অবাক বধূ, ঘুনসিপরা বাচ্চারা, পশ্চাদ্দেশ-উন্মুক্ত জঙ্গলে উপবিষ্ট নিঃসঙ্কোচ কৌতূহলী গম্ভীর ভদ্রলোক, অনেকের মুগ্ধ দৃষ্টি সার্থক করতে করতে রিকশার কনভয় চললো। চম্পাহাটি তো নয়, মালগোবিন্দপুর। আরো ক'মাইল দূরে। বেশ রোদটা চড়া হয়ে উঠেছে মাথার ওপরে। "আপনাদের সব্বার নেমতোন্ন" বলেছিল ছেলেগুলো। দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চয়, দশটায় মিটিং যখন। কী কী খাওয়াবে, সুরজিৎদা ভাবতে ভাবতে যান। কত কথাই মানিক মিত্তির বলে যাচ্ছেন, ওই ব্যায়ামাগার ক্লাবের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি পলিটিক্যাল ফিলসফি। খরায়-বন্যায়-আর্তত্রাণে-নির্বাচনে-দাঙ্গায় এই ছেলেদের স্বতঃস্ফূর্ত জনসেবামূলক বিবিধ কর্ম-কৃতির ফিরিস্তি। আগে আগে কারা এসেছেন। কী অসামান্য যোগব্যায়ামের ক্লাস হয় এখানে। এই সেদিনও এসেছিলেন যোগ প্রয়োগে রোগারোগ্যের স্বামী শংকরানন্দ। শ্রদ্ধেয় বিষ্টু ঘোষমশাই, বিশ্বশ্রী মনোতোষ রায়, এঁরা তো বারবার এসেছেন, ক্লাবের কত রমরমা ছিল একসময়ে, কবিশেখর কালিদাস রায় এসে খাতায় তারিখ সমেত সই করে গেছেন।

এখানে নস্করদের জমিজমা ছিল প্রচুর। তারাই কলেজ ইস্কুল তৈরি করে দিয়েছেন পাশের গ্রামে। কীভাবে একবার এক নস্কর মন্ত্রীমশাই ধুতিটিকে শাড়ির মতন করে পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে বিধবা সেজে খুনীদের এড়িয়ে পালিয়েছিলেন, প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। তাঁকে কীভাবে বাঁচিয়ে দিয়েছিল গাঁয়ের মেয়েরা, সেই গল্প সাতখানা গ্রামের লোক এখনো করে—এইসব শুনতে শুনতে মাঠটা শেষ পর্যন্ত এসেই পড়ল। একটা চৌকোমতন স্টেজ বাঁধা হয়েছে। সামনে খটখটে রোদের মধ্যে ধূলিমলিন শতরঞ্চি পাতা। তাতে কিছু লোক বসে আছে। বালক-বালিকারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে খেলা করছে। সুরজিৎদার মনে হলো গাঁসুদ্ধই যেন রিকশার পেছু পেছু ছুটছে। বাচ্চারা ছুটছে, নেড়ীকুকুর ছুটছে—বেশ একটা জরুরি আবহাওয়া। রিকশার কনভয় দেখতে পাওয়া মাত্রই অন্তরীক্ষে তীব্র সিটি বেজে উঠলো। বেজে উঠলো বিউগিল, ড্রাম এবং বাঁশিও। মঞ্চের ওপাশ থেকে লাইন বেঁধে মাঠে বেরিয়ে এলো ড্রাম বাজাতে বাজাতে সাদা শার্ট আর খাকী হাফপ্যান্ট পরা ছেলের দল। একজনের হাতে ক্লাবের নাম লেখা সবুজ সাটিনের পতাকা। ক্লাবের ব্যাণ্ডপার্টি এসে বাজনা বাজিয়ে সসম্মানে প্রধান অতিথির পার্টিকে রিকশা থেকে রিসিভ করলে। বান্টিবুলটুকে ফিসফিস করে বললে, "কী গান বাজাচ্ছে বুঝেছিস?" বুলটু বললে

—"যিসকি বিবি মোটি। কিন্তু মা তো মোটেই মোটা নয়?" পাপিয়াবৌদি মুগ্ধ। একদিন নিজেদের জীবনেও যে এমনটা হবে, কে ভেবেছিল? একটা বাচ্চামেয়ে এসে সুরজিৎদার কপালে চন্দন তিলক পরিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল, সবাই চেঁচাতে লাগল —"ওকেও লাগিয়ে দে, ওকেও, ওকেও"—তখন সে মানিকবাবুকেও একটা চন্দনের টিপ লাগিয়ে দিলে।

"আহা-হা ওকে নয়, উনি তো আমাদেরই নিজের লোক। ওই ম্যাডামকে লাগা —যাচ্ছেতাই একেবারে—তখনই বলেছিলাম ববিতাকে দিসনি—" মেয়েটা বৌদির কপালে চন্দনের ফোঁটা লাগাতে এসেছিল, এবারে ভ্যাঁ করে কেঁদে দিয়ে পালিয়ে গেল। বৌদিও বেশ ইন্দিরা গান্ধী স্টাইলে নিচু হয়েছিলেন বাচ্চার হাতের টিপটা গ্রহণ করবার জন্যে, এবার সোজা হলেন। বাপ্টি-বুলটু হেসে দিল। সেই হাসির ভাষা—"হলো না তো? যাঃ, ফসকে গেল!"

বৌদি খুব অপমানিত হয়ে ওদের দিকে অগ্নিগর্ভ এক দৃষ্টি হানলেন। যেটা দেখে তাদের কেন, স্বয়ং সুরজিৎদারও সব হাসি মুহূর্তে উবে যায়। সদলবলে সুরজিৎদাদের নিয়ে গিয়ে প্রথমে বসানো হলো ক্লাবরুমে। টিনের ছাদওলা মাটির ঘরে কয়েকটা বেঞ্চি পাতা আছে। আর একধারে নানারকমের মুগুর বারবেল ডাম্বেল জড়ো করা। যত্ন করে বেঞ্চিতে বসিয়ে তাঁদের প্রত্যেককে নোংরা মতন কিন্তু ধোওয়া চায়ের পিরিচে দুটো করে ঠাণ্ডা, রোগা, ফ্যাকাসে, সাম্প্রতিক চেহারার চিমড়ে সিঙাড়া, আর দুটো ময়লা ময়লা রসগোল্লা, আর দুটো থিন অ্যারারুট বিস্কুট এনে দেওয়া হলো। তার সঙ্গে কাচের গেলাসে করে চা। সুরজিৎদা মহা আহ্লাদে খেতে লাগলেন। পাপিয়াবৌদি প্রবল দুঃখের সঙ্গে দেখলেন তাঁর দুই ছেলেমেয়ে যারা এমনিতে কিছুতেই কিছুই খেতে চায় না, তারা, এমনকী সেই থিন অ্যারারুট বিস্কুট যা তাদের দুচক্ষের বিষ, সেগুলো পর্যন্ত সোনামুখ করে চেটেপুটে খেয়ে নিচ্ছে। বৌদির মনে হলো—"ইস, কী লোভী দ্যাখো! বাপের তো ঐ ঠাণ্ডা সিঙাড়া খেলেই অম্বল হবে। আর ছেলেমেয়েদের আরো ভয়ের ব্যাপার হলো, ঐ বাসি রসগোল্লার রসে নির্ঘাৎ টাইফয়েডের জার্ম না থেকেই পারে না।"

বৌদি কিছুই ছুঁলেন না। শুধু চা। গরম চায়ে কোনো দোষ হয় না। গেলাসগুলো মোটামুটি পরিষ্কারই। চা শেষ হতেই তাঁদের সযত্নে স্টেজে নিয়ে যাওয়া হলো। দুটি চেয়ারে মানিক মিত্তির আর সুরজিৎদা, তৃতীয় চেয়ারে সেই ডাঃ ব্যানার্জি হোমিওপ্যাথ-কাম-ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। বৌদিকে আর বাচ্চাদের স্টেজের সামনে পাতা খানকুড়ি চেয়ারে গাঁয়ের জমায়েৎ হওয়া গণ্যমান্য অতিথিদের মধ্যে নিয়ে গিয়ে সসম্মানে বসানো হলো। শতরঞ্চিতে বাচ্চারা বসে চেঁচামেচি করছে। শতরঞ্চির পিছনদিকে কিছু মেয়ে, বউ, গিন্নিরাও বসেছে এসে। একপাশে কয়েকটি বাচ্চা মাটিতে ছক কেটে এক্কাদোক্কা খেলছে। তাদের হুল্লোড়ে বাপ্টি-বুলটুর কেবলই ওদিকে মন চোখ চলে যাচ্ছে। চেয়ার থেকে গম্ভীরভাবে উঠে গিয়ে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এক

কোণার দিকে হিসি করতে লাগলেন, মঞ্চেরই দেওয়ালের গায়ে। আহা, বুড়োমানুষ, আরো বেশিদূরে যাবার ধৈর্য ছিল না। অন্য কোনো আড়ালও নেই মাঠে। সুরজিৎদা মঞ্চ থেকে দেখেই সহানুভূতি সহকারে ভাবলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দেখলেন, পাপিয়াবৌদি ভুরু কুঁচকে খুব ডিসঅ্যাপ্রুভিং দৃষ্টিতে সেইদিকে তাকাচ্ছেন, আর বাপ্টি-বুলটু গা ঠেলাঠেলি করে হাসছে।

প্রথমেই সভাপতি, প্রধান অতিথি বরণ। এবার একটি কিশোরী মেয়ে এসে দুটি গাঁদাফুলের মালা পরিয়ে গেল সুরজিৎদা আর ডক্টর ব্যানার্জিকে। সঙ্গে সঙ্গে মালা খুলে সামনের চাদর ঢাকা দেওয়া টেবিলে রেখে দিলেন ডক্টর ব্যানার্জি এবং সুরজিৎদা। এটাই নিয়ম। মেয়েটা আরেকটু ছোট হলে তাকেই পরিয়ে দেওয়া যেত। শাড়িপরা মেয়ের বেলায় সেটা হয় না। দু'তিনটি মেয়ে এসে এবার টেবিলের পিছনে সারি বেঁধে দাঁড়ালো। একটি ভদ্রলোক টেবিলের ওপর একটা হারমোনিয়াম এনে রাখলেন। তারপর সমবেত সঙ্গীত শুরু হলো—"উঠ গো ভারতলক্ষ্মী—

অনেকদিন পরে গানটা শুনে ভালোই লাগলো সুরজিৎদার। গানের পরেই পুরস্কার বিতরণ—গত বছরের স্পোর্টসের। প্রধানত ব্যায়ামাগারই তাই বেশিরভাগ পুরস্কারই ব্যায়াম সম্পৃক্ত। যাঁরা পুরস্কার নিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের স্বাস্থ্য দেখলে মনে হয় না দেশে ব্যায়াম বলে কিছু আছে। প্রত্যেকেরই জীর্ণশীর্ণ দীনপ্রাণ মূর্তি দেখে সুরজিৎদার খুব মনে দুঃখু হতে থাকে। পুরস্কার বিতরণান্তে সেক্রেটারির লিখিত রিপোর্ট পেশ করা হলো। তারপর প্রধান অতিথির ভাষণ। সুরজিৎদা পকেট হাতড়ালেন। সেই নোট লেখা কাগজটা চাই। এ পকেট, ও পকেট, নাঃ—পাঞ্জাবির দুটোই মাত্র পকেট। কোনোটাতেই তো নেই। টেবিলেই ফেলে এসেছেন নির্ঘাৎ, সকালে যখন প্র্যাকটিস করেছিলেন স্পীচটা। খুব ঘাবড়ে গেলেও, ব্যাপারটা তো বেশ কয়েকবার ভাবা হয়ে গেছে। স্মার্ট সুরজিৎদা নিজেই নিজেকে বললেন—"ঘাবড়াও মাৎ, সুরজিৎ, ঠিকই উৎরে দেবে। ভুলো না, তুমি প্রায় পঁচিশ বছর সাংবাদিকতার লাইনে রয়েছ। যে-কোনো সাবজেক্টেই আধঘণ্টার মধ্যে একটা চলনসই ছাপার যোগ্য 'কপি' নামিয়ে দিতে পারো। আর এ তো সবই জানাশোনা বিষয়। আগে থেকে ভাবাও আছে। রবীন্দ্রজয়ন্তী, মহানায়ক উত্তমকুমার, ব্যায়ামাগারের উপকারিতা—এই তো? আর, আর, আরেকটা যেন কী? চতুর্থটা?"

সুরজিৎদার এই শীতকালেও অল্প অল্প ঘাম হতে থাকে—চতুর্থ আইটেমটা কী? যাকগে, শুরু করে না দিলেই নয় এবার। ঘোষণা হয়ে গেছে—সবাই উৎকর্ণ। গলাটা ঝেড়ে নিয়ে, "নমস্কার"-টা বলে নিয়ে, সুরজিৎদা শুরু করলেন রবীন্দ্রনাথকে দিয়েই। "আজ এই রবীন্দ্রজয়ন্তী সপ্তাহে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভালো, সুস্থ দেশ ও দশের পক্ষে উপকারী কবিতা কেবলমাত্র মস্তিষ্ক স্বাস্থ্যবান এবং হৃদয় তাজা থাকলেই লেখা সম্ভব। সেজন্যেই রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ হতে পেরেছিলেন। কেননা তিনি কবি হলেও প্রত্যেকদিন ভোরবেলা ছাদে গিয়ে পালোয়ানদের সঙ্গে কুস্তি প্র্যাকটিস করতেন,

যোগব্যায়াম করতেন। দেহকে দুর্বল করে মনকে সবল করা যায় না। আর কি কোনো ভারতীয় কবি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন? পাননি, কেননা দেহচর্চা ও মননচর্চার মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। সবল শরীর সুস্থ মানসিকতার আধার, বলিষ্ঠ কল্পনার জনক। তাই দেশের ব্যায়ামাগারগুলি জাতীয় সম্পদ।" এই বিষয়ে বেশ কিছুক্ষণ বলার পরে হঠাৎ ডাঃ ব্যানার্জি সভাপতি মশাই কাশলেন। আর তক্ষুনি ম্যাজিকের মতো সুরজিৎদার মনে পড়ে গেল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হোমিওপ্যাথি! তাই তো! সঙ্গে সঙ্গে কনফিডেন্সের প্রত্যাবর্তন—"রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলবার একাধিক কারণ ছিল। কবিগুরু কেবল কবিতাই লিখতেন না, দুঃখী, অসহায়, আর্ত মানুষের ত্রাণে তিনি চিকিৎসক হয়েও এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি স্বহস্তে শান্তিনিকেতনের বাসিন্দাদের হোমিওপ্যাথি এবং বায়োকেমিক ওষুধ দিতেন। এভাবে তিনি কত রোগীই যে আরোগ্য করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন। অতএব আমরা দেখছি যুগে যুগে পণ্ডিতরাই হোমিওপ্যাথির প্রকৃত গুণাগুণ চিনেছেন। তাঁদের চিকিৎসায় নিশ্চয় জ্ঞান, বুদ্ধি, বিশ্বাস, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা জগৎকে আন্তর্জাতিক সংহতির পথ দেখিয়েছে। ইংলণ্ডের লোক হলেও হানিম্যান (অডিয়েন্স থেকে পাপিয়ারোদি চেঁচালেন—'জার্মানীর! জার্মানীর!') সাহেব জার্মানী থেকে—"

সুরজিৎদা একটু ঘাবড়ে গেলেন দেখে বোদি প্রস্তুত করলেন, "আমেরিকা থেকে, আমেরিকা!" অমনি সুরজিৎদা শুরু করলেন, "জার্মানীর হানিম্যান অ্যামেরিকা থেকে যে ওষুধের প্রচার করলেন; আজ প্রায় দেড়শো বৎসর ধরে ভারতবর্ষে তা নিরলসভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই গরিব দেশের অর্থনীতি, শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কার, বিশ্বাস, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা, মানস-মানসিক, যোগবলে, রোগবিয়োগের সঙ্গে হোমিওপ্যাথি সত্যি অতি চমৎকারভাবেই খাপ খেয়ে গেছে।" এতদূর বলেই সুরজিৎদা ভাবলেন এবার মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের দিকে চলে যাওয়া উচিত।—"হোমিওপ্যাথি ওষুধের আরেকটা বিরাট গুণ, তার দাম বেশি নয়। আজকের এই অর্থনৈতিক মহাসংকটের দিনে, জীবন মানেই যখন জীবনসংগ্রাম, রুইমাছের দর ত্রিশ টাকা, চিংড়ি চল্লিশ, ট্যাংরা পর্যন্ত পঁচিশ টাকা, মানুষ খাবেই বা কী, পরবেই বা কী? বাঙালীজাতি ভাতে-মাছে মানুষ, মাছ তো ছোঁয়াই যায় না, ছুঁলেও তেলে ছাড়া অসম্ভব। তেলের দাম যে-রেটে বাড়ছে! বাড়ছে শাকসবজি, মশলাপাতি, সাবান, মাজন, নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীর দাম, বাড়ছে জর্দা সিগারেট দেশলাই কেরোসিনের দাম, সরকারী দুধের পর্যন্ত দাম বেড়ে যাচ্ছে, আর শিশুর খাদ্য! শিশুর টিনের দুধ বেবিফুড স্ক্যানডালের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি। এই মূল্যবৃদ্ধি অহেতুক, এই মূল্যবৃদ্ধি রুখতে না পারলে কালোবাজারীদের কালো হাত রোখা যাবে না। এবং দেশের উন্নতির পথে চিরন্তন অন্তরায় সরানো যাবে না। আসুন, আজ আমরা এই শুভদিনে সবাই মিলে শপথ গ্রহণ করি, যেমন করে পারি এই অহেতুক অগ্নিমূল্য

রোধ করবই (এখানে চটাপট প্রচুর হাততালি পড়ল)। এমনকী লাইফসেভিং ড্রাগসের পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি আর কালোবাজারী চলছে, হোমিওপ্যাথি সেদিক থেকেও রক্ষে, লাইফসেভিং ড্রাগ বলে আলাদা তার কোনো ওষুধ নেই, তাইজন্যই সেগুলি হঠাৎ হঠাৎ বাজার থেকে উধাও হয় না—"

এখানে সভাপতি হঠাৎ গলা খাঁকারি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুরজিৎদাও সুর পালটে নিলেন—"এই যে প্রাত্যহিক নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হয়েই চলেছে —অন্নবস্ত্র, জমিজমা, সিনেমার টিকিট, ট্রেন-ট্রাম-বাসের ভাড়া, বাড়িভাড়া, ওষুধের দাম (আই মীন অ্যালোপ্যাথিক), পাঠ্যপুস্তক, শারদীয় সংখ্যা, যা কিছু অপরিহার্য বাঁচার জন্যে স-ব।—এই অযৌক্তিক অপ্রাকৃত অন্যায় রোধ করার জন্য আজ যে ধরনের কঠিন মহৎ শক্তিধর মানুষদের থাকা দরকার ছিল, এদেশে আর তেমন কেউ নেই। দেশের বিরাট পুরুষরা আজ কোথায়? কোথায় মহাকবি রবীন্দ্রনাথ, কোথায় মহানায়ক উত্তমকুমার, কোথায় মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ? (বিশাল হাততালি পড়ল)। আজ যদি মহানায়ক উত্তমকুমার বেঁচে থাকতেন, তাহলে, তাহলে আজকের এই সভাতে হয়তো আমার বদলে আপনারা তাঁকেই দেখতে পেতেন। তিনি ছিলেন নিরভিমান নিছক ভালোমানুষ, নিরহংকার, নিঃশব্দ দেশপ্রেমিক—কত মানুষকেই যে তিনি নিঃশব্দে নীরবে অর্থ সাহায্য করেছেন, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি তা জানে। কত যে এই ধরনের ব্যায়ামাগারেও তাঁর অকৃপণ দান ছিল, ভবানীপুর পাড়া তা জানে। তিনি নিজেও নিয়মিত দেহচর্চা করতেন বেরিভিউ ক্লিনিকে গিয়ে। যোগব্যায়াম করতেন। তাই তো তাঁর ওই মধুর মোহিনী হাসিটি, ওই চিরতারুণ্য বজায় ছিল ষাট বৎসর বয়সেও। কিন্তু হায়, নিষ্ঠুর মৃত্যুর করাল গ্রাস তাঁকেও রেহাই দেয়নি! সঙ্গে সঙ্গে মুছে নিয়ে গেছে আমাদের আশা-আনন্দ, চোখের আলো, হৃদয়ের জ্যোতি। 'তোমার আসন শূন্য আজি হে বীর পূর্ণ করো' বলে আমরা আজ কাঁদছি।" (এখানেও প্রবল হাততালি)। গলাটা ঝেড়ে নিয়ে সুরজিৎদা নবোদ্যমে আবার শুরু করবেন, হঠাৎ দেখলেন মাঠে পাপিয়াবৌদি ঘনঘন ঘড়ি দেখছেন, আর ঠোঁট গোল করে করে বলছেন—"চল্লিশ মি-নি-ট—" ফলে সুরজিৎদা পাকা বক্তৃতাবাজদের মতোই বাক্য শুরু করলেন—"কিন্তু কাঁদলে তো চলবে না। আয়ু ফুরোলে আমরা কাউকে আটকাতে পারি না, কিন্তু জীবনকে দীর্ঘায়ত করতে পারি। ব্যায়াম চর্চা, আগেই বলেছি কেবলমাত্র পেশীকেই সবল করে না, দেয় সুস্থ মগজ, সবল মানসিকতা, তাজা হৃদয়বৃত্তিও। তাই তো বলি, জয়মাকালী বডি বিলডারস অ্যাসোসিয়েশন আজ যা করছেন, যেভাবে দেশের সেবা করছেন, তা তো কেবলমাত্র বডি বিলডিংই নয়, তাকে আমি বলবো নেশন বিলডিংয়ের কাজ। তাঁরা গড়ে তুলছেন সমগ্র দেশের ভবিষ্যৎ (এখানে প্রচণ্ড হাততালি) দেহ-মন-চরিত্র।"

এবার ধন্যবাদ জানিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে, মহাকবি, মহাযোগী, মহানায়ক ও হানিম্যান সাহেবকে প্রণতি জানিয়ে, মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার শপথ আরেকবার স্মরণ

করিয়ে দিয়ে নমস্কার করে বসে পড়লেন প্রধান অতিথি সুরজিৎদা। নেহাৎ মাঠ, তাই। "হল" হলে ফেটে যেত এমন হাততালি পড়ল। পাপিয়াবৌদির, বান্টি-বুলটুর মুখ গৌরবে উদ্ভাসিত। গলার কাছে মেরুন কাজকরা সাদা পাঞ্জাবি পাজামা পরা একটি ছেলে এসে টেবিলের হারমোনিয়াম নিয়ে দাঁড়িয়ে একটা গান ধরল মহানায়ক উত্তমকুমারের মৃত্যুঞ্জয়ন্তীর উদ্দেশে—"ইস ধরতীপর ঘোর অন্ধেরা—" বলে। আরেকটি নীল পাঞ্জাবি সাদা পাজামা পরা তারই মতো ছেলে দাঁড়িয়ে তবলা বাজাল। বেশ গাইল বটে, কিন্তু বেশি লোক ছিল না। শতরঞ্চি প্রায় খালি—রোদ চড়া হয়েছে। শুধু কয়েকটি উলঙ্গ বাচ্চা শতরঞ্চিতে এদিক ওদিকে ঘুমিয়ে পড়েছে। চেয়ারে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবৃন্দ অবিশ্যি সকলেই গম্ভীর মুখে তখনো স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত। এই সম্ভ্রান্ত অনুষ্ঠানের সম্ভ্রম রক্ষায় তাঁরা বিলক্ষণ অভ্যস্ত। এবার ডক্টর ব্যানার্জি সভাপতির অভিভাষণ (লিখিত) পড়লেন। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। এবার তো সভা শেষ। খাওয়া-দাওয়াটা এবারেই হবে নিশ্চয়। ভাষণান্তে স্বাগত সঙ্গীত হলো, "জনগণ", তখন সকলের মুখে আন্তরিক আহ্লাদ। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আসামী মুক্তি পেলে যেমনভাবে হাঁটে তেমনি পায়ে সুরজিৎদা মঞ্চ থেকে নেমে এলেন। গাঁদাফুলের মালাটা আনতে ভুললেন না। তাঁর প্রথম-প্রধান আতিথ্যের অমূল্য স্মৃতির সঞ্চয়। বৌদিও উঠে এসেছেন, বান্টি আর বুলটুর মুখে আসন্ন বায়ানাক্কার মেঘ জমতে শুরু করেছে—সকলেরই খিদে পেয়েছে খুব। ফাংশন দশটায় ছিল, আটটার আগে ব্রেকফাস্ট খেয়ে রেডি ছিলেন সবাই। দেড়টা বেজে গেছে, প্রায় দুটো বাজে। ভাগ্যিস রসগোল্লা সিঙ্গাড়াগুলো সময়মতো পেটে পড়েছিল। এখন খাওন-দাওনটা কোনদিকে যে হবে—সুরজিৎদা চারদিকে তাকিয়ে তেমন ধরনের কোনো লক্ষণই দেখতে পেলেন না। ধু ধু মাঠ। ভাত মাংস, কি মাছের ঝোলের গন্ধ হাওয়ায় নেই, শুধুই পাকা ধানের গন্ধ। শীতের শুকনো বাতাস।

পাপিয়াবৌদি এদিকে ওদিকে তাকিয়ে অনিশ্চিত গলায় বলেই ফেললেন—

"তাহলে—মিত্তিরমশাই—বেলা দুটো বাজে যে?"

মানিক মিত্তির যেন একটু লজ্জা পেয়ে গেলেন। হন্তদন্ত হয়ে তিনি সুরজিৎদার দিকে এগিয়ে এলেন, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন—"চলুন স্যার, চলো বউমা, বড্ডই বেলা হয়ে গেল, ছেলেমেয়েগুলোর সত্যি খিদেয় মুখ শুকিয়ে গেছে একেবারে"—অমনি ব্যায়ামাগারের সব ছেলেরাও হাজির—"থ্যাংকিউ স্যার, থ্যাংকিউ, দাঅরুণ বোলেছেন কিন্তু দাদা, ফাটিয়ে দিয়েছেন একেবারে—চার চারটে আইটেমকে এমন ফাইনভাবে একসঙ্গে গেঁথেছেন না? এ কোনো কবি সাহিত্যিকের কম্মো ছিল না! এ কেবল জার্নালিস্টেই পারে—অনেক ধন্যবাদ দাদা, আবার ডাকলে আসবেন তো? এই জো এদিকে, বৌদি, আপনাদের চম্পাহাটি যাবার গাড়ি এসে গেছে।" শূন্য রিকশার কনভয় সামনে। দেখেই হঠাৎ সুরজিৎদার মাথায় একটা চকিত বুদ্ধি খেলে গেল। এরা তাহলে দুপুরে খাওয়াচ্ছে না, সন্দেহ নেই।—"তোমরা আবার

BanglaBook.org

কষ্ট করে সেই চম্পাহাটি যাবে কেন ভাই? তার চেয়ে এদের রিকশভাড়াটা বরং এখানেই আগাম মিটিয়ে দাও, আর আমাকে রেলভাড়াটা আর ঢাকুরিয়ার রিকশভাড়াটা দিয়ে দাও—আমি, মিত্তিরমশাই—আমরা নিজেরাই চলে যাব। এই দুপুরে আবার কলকাতা যাতায়াতে অনেক সময় লেগে যাবে, তোমাদেরও নাওয়া খাওয়ার প্রচুর দেরি হয়ে যাবে, তার চেয়ে—"

ছেলেরা একটুখানি পরামর্শ করে নিয়ে সুরজিৎদার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। "আপনি যদি কিছু না মনে করেন স্যার, তাহলে এই পনেরোটা টাকা রাখুন, রেলভাড়া, আর ওপারের রিকশাভাড়া, এদেরটা এখানেই দিয়ে দিচ্ছি আর এই মিষ্টিটুকুন নিয়ে যান বৌদি, গাড়িতে খাবেন, অনেক বেলা হয়ে গেছে— বলে একটা তেলতেলে কাগজের বাক্সও ধরিয়ে দিলে ওরা পাপিয়াবৌদির হাতে। এবারে একটা রিকশা কম নেওয়া হলো। একটাতে সুরজিৎদা আর মিত্তিরমশাই, অন্যটায় বৌদি, বাচ্চাদের নিয়ে। বাচ্চারা এক্ষুণি মিষ্টির বাক্স খুলতে চায়। মাথার ওপর গনগনে রোদ্দুর। শীতকাল, তাই রক্ষে। এখন যে কোন হিসেবে রবীন্দ্রসপ্তাহ হয় বা ঈশ্বরই জানেন। তবে হ্যাঁ, ছেলেগুলি ভালো। অযত্ন করেনি। বৌদি আর বাচ্চাদের শীতকালেও ডাবের জল খাবার ইচ্ছে হয়েছিল, অর্থাৎ তেষ্টা পেয়েছিল। ওখানের পুকুরের জমা জলে কতরকমের বীজাণু কে জানে? ডাব সর্বদাই বীজাণুমুক্ত পানীয়। বৌদি বুদ্ধি করে চাইতেই ছেলেরা তক্ষুণি ডাব এনে দিয়েছিল। বৌদির তেমন খারাপ লাগেনি ছেলেদের। কেবল ওই লাঞ্চের ব্যাপারটাই যা এখন—দুপুরের খাওয়াটার ব্যবস্থা তো করে আসেননি বাড়িতে! বাণ্টি-বুলটু একটু হতাশ। আউটিং অথচ পিকনিকই হলো না, শুধুই বক্তৃতা হলো, এ আবার কী! তখন ও-রিকশায় মানিক মিত্তির বলছেন —"ছেলেরা দারুণ ইমপ্রেসড আপনার গভীর জ্ঞানের পরিধি দেখে। কত বিষয়েই যে আপনি জানেন। কত সহজেই যে লিংক-আপ করলেন এতগুলো বিচিত্র বিস্ময়, সত্যি মার্ভেলাস হয়েছে—কী উবগারটাই যে আপনি করলেন সত্যি সুরজিৎবাবু, বড্ড সামলে দিয়েছেন—

আর সুরজিৎদা? সুরজিৎদার কোলে গাঁদাফুলের মালা, মুখে মৃদুহাস্য। মনে মনে তিনি ভাবছেন—"মন্দ কি? এই ক্যানিং-লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনে তো টিকিট কাটতে হয় না। সে খরচ নেই। ঢাকুরিয়া স্টেশনে নেবেই দশ-বারো টাকার দিব্যি হিঙের কচুরি ভেজিটেবল চপ খেয়ে নেবো সবাই মিলে, দুটো রিকশার জন্যে তিন টাকা রেখে দিয়ে, নট বাড। যথা লাভ! প্রধান অতিথি বলে কথা! কে জানে এটাই এক দীর্ঘ কেরিয়ারের শুরু কিনা?"

নবকল্লোল, পৌষ ১৩৯১

BanglaBook.org

ভালোবাসা কারে কয়

জগতে যতই অপ্রেম বাড়ছে প্রেম নিয়ে বাড়াবাড়ি ততই বাড়বাড়ন্ত। 'প্রেম' এখন খুবই টপিকাল বিষয়। প্রায় 'সতী' কিংবা 'বধূহত্যার' মতোই। হয়তো পরস্পরের মধ্যে যোগও থাকতে পারে। 'প্রেমসংখ্যা' বেরুচ্ছে পত্রপত্রিকায়। বিশ্বপ্রেম ছড়িয়ে পড়ছে পেরেস্ত্রয়িকায়। বোফর্স কেলেংকারি মেটাতে না পারুন রাজীব গান্ধী দিল্লি-বোম্বাইতে দু'জোড়া প্রেমে তাপ্পি লাগিয়ে দিয়েছেন। রাজারাজড়ার ছেলেমেয়েরাও গরিবগুরবোদের মতোই ঝপাঝপ প্রেমে পড়ে যাচ্ছেন, কাশ্মীরের সঙ্গে যেমন গোয়ালিয়র। "তরুণ বিপ্লবী মুখ্যমন্ত্রী" প্রেমের ম্যাজিকে "তরুণ সংসারী মুখ্যমন্ত্রী" হয়ে নাড়ু খাওয়াচ্ছেন নিমন্ত্রিতদের। যেদিকে তাকাই প্রেমের ছড়াছড়ি। খবরের কাগজে প্রেম, দূরদর্শনে প্রেম। চিত্রহারে প্রেম, চিত্রমালায় প্রেম। যাত্রা থিয়েটারে প্রেম, পানমশালায় প্রেম, বিড়ি সিগারেটে প্রেম, লোহার আলমারিতে প্রেম, মশার ধূপে প্রেম, এমনকি গেঞ্জি আণ্ডারওয়্যারেও প্রেম। প্রেম বিনে বিজ্ঞাপন নেই। প্রেমের অর্থই বন্যায় ভাসতে ভাসতে আমরা মানিব্যাগ সামলাচ্ছি। এত প্রেম দশদিকে, অথচ যেই একজন সম্পাদক আমাকে একটি প্রেমবিষয়ক নিবন্ধ লিখতে আদেশ করলেন, আমার মনে হলো, জগৎ আলোবাতাস শূন্য হয়ে যাচ্ছে। প্রেম বিষয়টি সরল নয়, জটিল। প্রেম বিষয়টি খোলাখুলি ঢালাও আলোচনারও নয়, চুপচাপ, ফিসফাসেই তার শোভা। এখন যেন সবকিছুই কেমন খোলামেলা হয়ে যাচ্ছে। আদুড়-গা যেমন ফ্যাশন হচ্ছে, আদুড় মনপ্রাণও তেমনি যুগের ধর্ম হয়ে উঠছে। এরপর জগতে প্রেম বেচারী টিঁকবে কোথায়? সে বাঁচবে কেমন করে? তার একটু ছায়া চাই যে, একটু আড়াল চাই, একটু আঁধার, সে যে বিজন বিলাসী। প্রেমের নিবন্ধ? আমার তো মাথায় বজ্রপাত হয়েছে। প্রেম বিষয়টিকে কাগজেকলমে আমি, যতদূর সাধ্য পরিহার করে চলি। প্রেমের মূলতত্ত্বই হলো, যা বলকেও বোঝে, শতং করো, মা বলো। আর বলাই বাহুল্য কদাচ মা লিখ। অথচ সম্পাদকরা ঠিক সেটাই করিয়ে নেন।

শেষটা আমার মনে হলো, চ্যালেঞ্জটা ছাড়বো কেন? নিয়েই নিই। প্রেম বিষয়ে তিন পুরুষের জ্ঞানসঞ্চয় করে ফেলতে হবে—সম্পাদক বলেছেন তিন প্রজন্মে প্রেমের বিবর্তন নিয়ে প্রবন্ধ চাই। এও বলেছেন, ইচ্ছে করলে নিজদেরই পরিবারের তিন প্রজন্মের প্রেমকথা লিখতে পারি। হ্যাঁ, বাবা-মায়ের প্রচণ্ড প্রেম-বিবাহ হয়েছিল বটে সেকালে। সংবাদপত্রে দারুণ দামামা বেজেছিল। দাদু-দিদিমার, ঠাকুর্দা-ঠাকুমার প্রেমজ বিবাহ নয়, কিন্তু বিবাহজ প্রেমে শুনি দুই দম্পতিই প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়নি। আমার নিজের বিবাহটাও অবিশ্যি বেশ ঘনঘটার, "প্রেমের-বিয়েই" হয়েছিল, কিন্তু শেষ দৃশ্যে কিঞ্চিৎ লঘুক্রিয়া হয়ে গেছে। ওটা

নিয়ে আর ঢাক পেটানোর কিছু নেই। তবে আমার প্রজন্মের অন্য অনেকেরই অটুট, অমোঘ, অবিরল প্রেমের উদাহরণ আমার সামনে। হাতের ওপর হাত রেখে চলার অসহজ কর্মটি যাঁরা খুব সহজভাবেই করে চলেছেন। কিন্তু আমার পরের প্রজন্মটাই ঝামেলা করেছে। আমার মেয়েদের প্রেমজ বিবাহ বা বিবাহজ প্রেম কোনোটাই এখনও হয়নি, ফলে ওদের যুগচরিত্রটা ঠিকমতো আমার নজরে আসেনি এখনও। তাঁদের বধিবেন যাঁরা, তাঁদের কে যে এখন কোন গোকুলে বর্ধমান তা কি আমি জানি? না তাঁরাই জানেন?

কিন্তু আমেরিকা থেকে আমি একটা জরুরি কথা শিখে এসেছি: 'নো প্রবলেম'। কোনো সমস্যা নেই। সেইমতো কোমর বেঁধে নেমে পড়লুম ফিলডে। নো প্রবলেম। বাড়িতে যেই মেয়ের বন্ধুবান্ধব কেউ বেড়াতে আসবে, তক্কে তক্কে থেকে, ক্যাঁক করে চেপে ধরলেই হলো। তাদের প্রজন্মের কথা তাদের মুখেই শোনা যাবে। এবং সেটাই হবে নির্ভরযোগ্য তথ্য।

আমার পূর্বপ্রজন্মের কাছে তথ্য সংগ্রহের আশায় 'বাংলার ব্রাউনিং দম্পতির' কপোত-কপোতীর অবশিষ্ট অঙ্গ, কপোতীকে, অর্থাৎ আমার গর্ভধারিণীকে ধরেছিলুম। মা বললেন—"প্রেম শুধুই দেয়। চায় না কিছুই। কি স্ত্রী কি পুরুষ। দুয়ের বেলাই এক। দিয়েই আনন্দ। প্রেমকে বিনষ্ট করতে হলে বিয়ে করে ফেলা উচিত। সংসারের গরম বাতাসে রোমান্টিক প্রেমের সুকুমার তন্তুগুলি শুকিয়ে যায়। খসে পড়ে প্রেমের লজ্জাবস্ত্র। কেবল প্রেমহীন কর্তব্যের হিসেব নিকেশ, সামাজিক চুক্তির দেনাপাওনার জাবদা খাতা নিয়ে খাড়া থাকে বিবাহের দারোয়ান।—প্রেমকে যদি ধরে রাখতে চাও, বিয়ের মধ্যে টেনে নিয়ে যেও না। একটু দূরত্ব ভালো। স্বার্থহীন না হলে প্রেম থাকে না। বিয়ে মানেই স্বার্থ। দুটো পরস্পর বিরোধী। রাধা কি শ্যামের বউ ছিলেন? ছিলেন না। থাকতে পারেন না।"

ও বাবা! এ তো ভীষণ মডার্ন! এর চেয়ে আর আলাদা কী বলবে পরবর্তী প্রজন্ম? তবু বড় মেয়েকে গিয়ে ধরলুম। কলেজে পড়ছে। তরুণ-তরুণীরা এ বাড়িতে স্রোতের মতো আসে-যায়। ও জানবে।

"ধ্যাৎ তেরি।" মেয়ে তেড়ে এলেন।—"পারোও বটে মা তোমরা! আচ্ছা একটা জেনারেশন বটে! উপন্যাসে, গল্পে, যাত্রায়, সিনেমায়, কবিতায়, গানে—এতদিন কেবলই প্রেম চলছিল। এবারে প্রবন্ধেও প্রেমের প্রবেশ? সর্বনাশ করেছে। বল মা তারা, দাঁড়াই কোথা?" কচি মুখখানিকে সাধ্যমতো গোমড়া করে কন্যা বলেন —"জীবনে, জগতে, কতোকিছুই রোজ ঘটে চলেছে মা, যা প্রেমের চেয়ে অনেক বেশি জরুরি। সেইসব নিয়ে লিখলে পারো না? আমার অন্য কাজকর্ম রয়েছে, আমি যাই। তুমি বসে বসে প্রেম নিয়ে ভাবো।" বকুনি খেয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

যা বাবা। তাহলে এটাই এই জেনারেশনের অভিমত? প্রেম তুচ্ছতাচ্ছিল্যের

জিনিস? ভাবনাচিন্তারও যুগ্যি নয়? নাকি আরো অন্য মতামত, ভিন্নরুচির তরুণ-তরুণীও আছে? পড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে, তরুণ-তরুণীদের সঙ্গেই আমার চব্বিশ ঘণ্টা ওঠাবসা। কিন্তু সে তো বাইরে থেকে চেনা। চোখে যা দেখি, তাতে তো হামেশাই তাদের হাবভাব, চাউনি, অনেকটা প্রেমের মতোই দেখায়। সেসব কি তাহলে আমার চোখের ভুল? বা বোঝার ভুল? সেসব কি তাহলে প্রেম নয়, অন্য কিছু? সন্তোষকুমার ঘোষের সেই 'কবিতা' নয়, কিন্তু 'কবিতার প্রায়' যেমন, তেমনি এও কি ঠিক 'প্রেম' নয়, কিন্তু 'প্রেমের প্রায়' কোনো সম্পর্ক? কিন্তু যাই হোক, খোলসা করে বলবে তো কেউ আমাকে? একটা জিনিস বুঝেছি। আমাদের জেনারেশনেই স্ত্রী-পুরুষে 'বন্ধুত্ব' শুরু হয়েছিল। ছেলে-মেয়ে জুটি মানেই প্রেমিক-প্রেমিকা নয়। স্রেফ বন্ধু হতেই পারে। কিম্বা রাজনৈতিক সহকর্মী। কিম্বা ফটোগ্রাফি ক্লাব। মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাব। ফিল্ম সোসাইটি। কত রকমের 'কমন ইন্টারেস্টের' জন্য একসঙ্গে ঘোরে ছেলেমেয়েরা। দেখে কি বোঝা যায়?

এইরকম ভাবনাচিন্তা করছি, এই সময়ে হঠাৎ আমার এক প্রাচীন সহকর্মী উত্তেজিত হয়ে এসে জানালেন ফার্স্ট ইয়ারে ক্লাস নেবার সময়ে বাইরের করিডরে গীটার বাজিয়ে এমনই "জুলি আই লাভ ইউ" গান হতে লাগলো যে তাঁর সন্দেহ হলো ক্লাসেই হয়তো জুলি বলে কেউ থাকতে পারে। "জুলি বলে কেউ কি আছো? তাহলে বাইরে গিয়ে কথাটা সেরে এসো"—বলতে, জুলিয়েট ডিসুজা বলে গোয়ার মেয়েটি কাঁদোকাঁদো মুখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি ওকে সত্যি সত্যি চিনি না স্যার! আমি নতুন মেয়ে, সবে ভর্তি হয়েছি!" তখন মাস্টারমশাই উঁকি মেরে ছেলেটিকে দেখে চিনতে পারলেন। চেনা ছেলে স্বরূপ সরখেল। জিভ কেটে, "এই যে স্যার, গুড মর্নিং" বললে সে গীটার নামিয়ে, ডান হাতে সেলাম করে। পিছু পিছু বেরিয়ে এসে জুলিয়েট বললে—"আপনি কি আমাকে দাদার মতো ভালোবাসতে পারেন না? আমার সত্যিই কোনো দাদা নেই—বাট আই ডু হ্যাভ আ বয়ফ্রেণ্ড অ্যাট হোম।" স্বরূপ হাসাবদনে বললে—"হোয়াট আ শেম! কুছ পরোয়া নেই, সিস্টার! এভরিথিং উইল বি অলরাইট!" তারপর পিড়িং পিড়িং করে বাজাতে বাজাতে অন্যদিকে চলে গেল। আমার সহকর্মী রীতিমতো বিচলিত। "এসব কী কাণ্ড বলুন তো?" বাড়িতে এসে মেয়েকে বললুম।—"এসব কী হচ্ছে তোদের?"—"ওঃ স্বরূপ? স্বরূপের কথা বাদ দাও। ও একটা পাগলা। সেদিন দেখলুম করিডরে চেঁচাচ্ছে: 'ওরে ববি, ববি রে আমার, স্যান্সক্রিটের ঐ মেয়েটার নাম কী যেন?'—'মন্দাক্রান্তা?' ববি বলে দিল।—'হাঁ হাঁ, ভেরি ডিফিকাল্ট টু রিমেমবার—ওকে প্লীজ একটু প্রক্সি দিয়ে দে না? আমি জিওলজির মেয়েটাকে একটু অ্যাটেনড করেই আসছি—ওকে বল— —"কি আশ্চর্য!" আমি বাকরুদ্ধ। "আশ্চর্য কিছুই নয়। স্বরূপের দু'টা গার্লফ্রেণ্ড। ওপন সিক্রেট। সবাই হাসে। আর প্রশ্রয় দেয়। স্বরূপ দু'জনকেই বাই টার্ন সিনেমা দেখায়, আইসক্রিম খাওয়ায়। এই তো? আপত্তির কী আছে? লুকিয়ে

BanglaBook.org

চুরিয়ে তো কিছু করেনি। সবাইকে জানিয়ে শুনিয়েই ডেটগুলো ফিক্স করে। হি মীনস নো হার্ম। সবাই সেটা বোঝে।"

"তাহলে প্রেমটা করে কার সঙ্গে?"

"প্রেম আবার কি? মোটেই প্রেম নয়।"

"তাহলে বিয়ে? বিয়েটা করবে কাকে? ছ'টা মেয়ের মধ্যে?"

"এরা কেউই স্বরূপ পাগলাকে বিয়ে করবে নাকি? মেয়েগুলোর কি বুদ্ধি বিবেচনা নেই? দে আর হ্যাভিং ফান। ওর মোবাইকে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। ছ'জনেই ছ'জনকে চেনে। নো ওয়ান কেয়রস ফর হিম।"

"সে কি রে? মেয়েগুলোও এমনি হয়েছে আজকাল?"

"হবে না কেন? তাদের কেরিয়ার নেই? প্রেম করলেই চলবে? স্বরূপ যদি ভালো পাত্র হতো তাহলে অবশ্য অন্য কথা। তাহলে হয়তো একটু প্রবলেম হতো, হয়তো কেউ কেউ সিরিয়াসলি ভবিষ্যতের কথা ভাবতো, কিন্তু স্বাস্থ্য ইট হ্যাপেন্স, স্বরূপও সিরিয়াস নয়, ওরাও নয়। যে-যার মা-বাবার পছন্দ-করা বর-বউদেরই বিয়ে করবে বোধহয়। আমরা সবাই যে চালু পার্টি মা। আজকাল কেউ আর তোমাদের মতো বোকা নেই।" কেউ আর আমাদের মতো বোকা নেই শুনে তো আমার খুব দুশ্চিন্তা হয়ে গেল। ব্যাপারটা কী? বেশিরভাগ জোড়া-কে দেখে তো মনে হয় প্রেমিক-প্রেমিকাই? অবশ্য অনেক সময় বেড়ালটাও হয় না, তাও নয়। দিব্যি হাবভাব দেখে এবং কথাবার্তা শুনে মনে হয় দুটি ভাইবোন, অথচ আসলে তারা কিন্তু ডিক্লেয়ার্ড, রেডিস্টার্ড প্রেমিক-প্রেমিকা। এমন জুটি অন্তত আধ ডজন তো ভালোভাবেই চিনি যারা বিয়েও করে ফেলেছে, আজও তুই-তোকারি চালায়। আরও একজনকে জানি, যারা বিয়ে করেনি অথচ মনে হয়েছিল, করলো-বলে। অতএব এই প্রজন্ম বড়ই প্রহেলিকাময়। কে যে কার সঙ্গে কখন প্রেমের দ্বারা যুক্ত, তা হৃদয়ঙ্গম করা শক্ত। বন্ধুদলের অন্তরঙ্গ সদস্যরাই একমাত্র জানে। দৃশ্যত সকলেই সমান। 'একত্রে ঘোরাঘুরি' ছাড়াও আমাদের সময়ে কিছু টেল-টেল সাইনস ছিল। 'তুই' বা 'আপনি' থেকে 'তুমি'-তে সরে আসা তার মধ্যে প্রধান লক্ষণ বলে পরিগণিত হতো। এখন ওটাও মুছে গেছে। 'আপনি' মানেই যেমন শ্রদ্ধা-সম্মান দেখানো নয়, 'তুমি'ও তেমনি অন্তরঙ্গতার পরাকাষ্ঠা প্রমাণ করে না। আবার 'তুই' মানেই নয় ভাই-বোনের অনাবিল প্রীতি। আর প্রেম মানেই নয় বিবাহ। আমাদের সময়ে একটা কুকথা ছিল, "প্রেম করবো যেথা সেথায়, বিয়ে করবো বাপের কথায়।" কেবল বদ ছেলেরাই ঐ পন্থা অবলম্বন করে থাকে, এমনতর ধারণাও চালু ছিল। এখন দেখা যাচ্ছে কি ছেলে কি মেয়ে এটা অনেকেরই স্বাভাবিক কর্মপন্থা, প্রেম করাটা মোটে 'প্রেম'ই নয়, একরকমের বিনোদন মাত্র। উত্তেজনায়, আনন্দে সময় কাটানোর সহজ উপায়। "হ্যাভিং ফান।" ইংরিজি ইশকুল, বাংলা ইশকুল, যে-কোনো পটভূমি থেকে এসেই কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে এই ব্যাপারটি শিখে যাচ্ছে ছেলেমেয়েরা।

BanglaBook.org

প্রেমে-পড়া নয়। প্রেম-করা। আমার যেমন বেণী তেমনি রবে, চুল ভিজাব না। এঁদের এই প্রেম-করা মোটেই আমাদের সেই প্রেমে-পড়া নয়। এবং অবশ্যই নয় ইংরিজি 'লাভ-মেকিং'ও। একেবারে অন্য হালকাহালকা ব্যাপার। দিশি 'ফান'। মোটামুটি হার্মলেস। ইংরিজি ভাষাটা এই প্রেম-ভালোবাসার প্রসঙ্গে কিন্তু যারপরনাই দীনদরিদ্র। স্নেহমমতা, ভাব-ভালোবাসা, প্রেমকাম, সব এক। সব 'লাভ'। মা-বাবা, কুকুর-বেড়াল, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, ঠাকুর-দেবতা সবার সঙ্গে সবার একটাই শব্দের সম্পর্ক। কী গরিব, কী গরিব ভাষা রে বাবা! আর ওরাই নাকি ডিভেলপড নেশন?

সে যাই হোক, সাহেবদের দৈন্য সাহেবরা বুঝুক, আমি প্রেম বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের অধীর পিপাসায় কর্মযজ্ঞে অবতীর্ণ হই। হাতে-কলমে অবশ্য এখনই নয়। প্রথমে বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক আগ্রহ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, সাক্ষাৎকারভিত্তিক, পরিচ্ছন্ন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জ্ঞান সঞ্চয়। তবে হ্যাঁ, এলেবেলে হলে চলবে না। 'বিজনেস-লাইক' হওয়া দরকার। এই প্রজন্মটার মধ্যেই কেমন একটা 'বিজনেস-লাইক' ভাব আছে। কাঠখোট্টা, হিসেবী (কেমন-যেন)! এদের হ্যাণ্ডল করতে হলে এদের মতনই হতে হবে আমাকে। কাঠখোট্টা তো আছিই, কেবল হিসেবের ব্যাপারটায় কাঁচা। প্রথমে চাই সাক্ষাৎকারের বিষয়বস্তু।—প্রেম। তারপর প্রশ্নমালা। ওটা বরং একটু খোলামেলাই থাকুক। বাঁধাধরা লিখিত প্রশ্নমালা কেড বোরিং। এবার স্থানকালপাত্র ঠিক করে নিতে হবে।

স্থান, এই বাড়ি। কাল, যে-কোনো ছুটির দিন। পাত্র, আমার কন্যার বন্ধুর স্রোতের মধ্যে যে সামনে পড়বে সে-হ্যাঁ ছুটির দিনে ডজনে ডজনে আসে তারা। তাদের খালি-করা চায়ের কাপে ঘরবাড়ি ছেয়ে যায়।

যেই না রবিবার আসা অমনি আমিও রেডি। ভোরে উঠে স্নান করে খাতা বগলে ঘাপটি মেরে কলিংবেলের অপেক্ষায় কান পেতে রই। দুরুদুরু বক্ষ। কৃষ্ণের বাঁশির জন্য শ্রীরাধিকার আকুল প্রতীক্ষাও এই আমার কাছে তুচ্ছ! নিজেই গোলমালটা স্বয়ং পাকিয়েছি। পিকোর পরীক্ষার জন্য ভয়ংকরী মূর্তি ধারণ করে বন্ধুদের মার-মার-কাট-কাট শব্দে তাড়িয়েছি ক'দিন যাবৎ। বন্ধুর ফ্লোটা তাই একটু কমে গেছে। আহা তখন কি ছাই জানতুম, যে...?

তবে আজ ছুটির দিন। আজ নিশ্চয়ই আসবে ওর রেজিমেন্ট। কিন্তু কই? বেল তো বাজছে না? এমন সময়ে...বাজিল কাহার বীণা?

অবশেষে বেল বেজে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে, "পিকো আছে?" শোনবামাত্র আমার অন্তরাত্মায় বিদ্যুৎ খেলে যায়। এই তো সে! এসে গেছে। পরবর্তী প্রজন্মের প্রতিনিধি! এক্ষুনি চেপে ধরতে হবে। যেন ফসকে না যায়।

"কে? টুবলু? আয় বাবা আয়। হ্যাঁ, আছে পিকো। তা টুবলু, তুই প্রেম নিয়ে ইদানীং কী ভাবছিস?"

টুবলুর গোলগোল নাদুসনুদুস নধর মুখখানি যেন এক মিনিটে শুকিয়ে গেল।

BanglaBook.org

খুবই চলাকচতুর চটপটে ছেলে সে, প্রাইজ পাওয়া ডিবেটর, সুন্দর বলিয়ে কইয়ে, ফুর্তিবাজ, আড্ডাবাজ, হাসিখুশি ছেলে। টুবলুর শুকনোমুখ কখনো দেখিনি। তাকে নিরুত্তরও দেখিনি কখনো। খানিক চুপ থাকার পরে শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে চেটে নিয়ে টুবলু বেশ আস্তে আস্তে কথা বলল। টুবলু বলল—"মানে, নবনীতাদি, আমি কিন্তু...পিকোর কাছে"...গলা বুজে এল তার। গলা ঝেড়ে নিয়ে টুবলু বলল—"আমি ঠিক পিকোর কাছে, সেভাবে...কোনোদিনই...মানে আপনি হয়তো ঠিক জানেন না আমাদের মধ্যে কিন্তু ঐসব, মানে একটুও কিন্তু,...ক্ষীইই আশ্চর্জ!" টুবলু হঠাৎ চুপ করে গেল। যাকে বলে "চুপ মেরে যাওয়া" তাই। এবং টুবলুর উজ্জ্বল তরুণ মুখখানি বিষাদে স্পষ্টতই প্রাণশূন্য বিবর্ণ দেখালো। তারপর টুবলু আবার বললো—"প্লীজ! বিশ্বাস করুন, আমি কিন্তু কোনোদিনই পিকোর কাছে এইসব উদ্দেশ্যে—আমি ভাবতেই পারিনি... এতক্ষণে আমার কাছে ব্যাপারটা স্পষ্ট হলো। হাঁহাঁ করে শুধরে নিই নিজের ভুল। যদিও হাসি আটকাতে পারি না।

"ওরে, নারে, তোর সঙ্গে যে পিকোর প্রেম হয়নি তা তুইও যেমন জানিস আমিও তেমনি জানি—

তুচ্ছ বাক্য! কিন্তু কী বৈপ্লবিক তার শক্তি। মুহূর্তের মধ্যে টুবলুর অন্য ব্যক্তিত্ব এসে গেল। রীতিমতো চেঁচিয়ে উঠলো সাগ্রহে—শুধু আমি কেন? কারুর সঙ্গেই হয়নি! হবে কী করে? যা দজ্জাল কন্যাটি আপনার! বাপরে!"

"আহা! সে কথাও হচ্ছে না। কে তোর সঙ্গে প্রেম করছে-না-করছে সেসব পার্সোনাল ডিটেইলস আমি চাইছি না, আমি জানতে চাই প্রেম বিষয়ে তোর ধারণাটা কী? জেনারেলি? ইন থিওরি? অ্যাজ আ মেম্বার অব ইওর জেনারেশন?"

ইতিমধ্যে সিঁড়ির বাঁকে পিকো অবতীর্ণ হয়ে সস্নেহে টুবলুকে জানালো—"মাকে প্রেম বিষয়ে আর্টিকেল না গল্প কী যেন লিখতে হবে অথচ সেই বিষয়ে মা কিছুই জানেন না। একবার দিদ্মাকে, একবার আমাকে অসম্ভব বিরক্ত করছেন, ফর ইনফরমেশন, ফর ডেটা। তুই পারলে দু'একটা পয়েন্ট দিয়েই দে না বেচারীকে।" এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে টুবলুর অট্টহাস্য।

"প্রেম নিয়ে আর্টিকেল? আপনি?" যেন এর চেয়ে আজগুবি আর আবোলতাবোল জগতে কিছু হতেই পারে না। যেন আমার ত্রিভুবনে প্রেম নিয়ে কোনো অন্বেষণ থাকা অসম্ভব। হায় রে! যদি জানতিস! প্রেম বিষয়ে না হয় তাত্ত্বিক জ্ঞানটাই আমার কমসম, তা বলে প্রযুক্তিগত বিদ্যা কতটা, তা তো তোরা কেউ জানিস না? না হয় প্রেমের গল্পই আমি লিখি না, তা বলে কি প্রেমের গল্পরা আমার জীবনে ঘটে না? কিন্তু এ-সব কথা পত্রিকায় ছেপে না বলাই ভালো। কে আবার কী বুঝবে?

অতএব গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ছোটো করে গর্জে উঠি—"অত হেসে কাজ নেই। কাজের কথাটা বল। প্রেম বিষয়ে তোর কী ধারণা?"

BanglaBook.org

"ওহো, তাই তো, 'কাজের' কথাটা?" (টুবলু গলা খাঁকারি দেয়। আজকালকার ছেলেগুলো মহা শয়তান)—"ইয়ে, 'কাজের' কথাটাই তবে হয়ে যাক। অর্থাৎ প্রেম তো? প্রেম অতি ভয়ানক। অতীব ভয়াবহ বস্তু। বন্ধুবান্ধবরা প্রেম করা মানেই আমার ভয়ংকর খরচা বেড়ে যাওয়া। তাদের চা-অমলেটের জন্য সিনেমার টিকিটের জন্য ট্যাক্সিভাড়ার জন্য কেবলই ধার দিতে হয় (যেহেতু তাদের টিউশনি করার সময় থাকে না। আমি টিউশনি করি।) সেসব ধার কদাচ শোধ হয় না। তাছাড়া পড়াশুনোরও ভীষণ ক্ষতি হয়। বন্ধুরা এসে এসে অনবরত প্রেমের প্রগ্রেস রিপোর্ট শোনায়। বন্ধুরা জড়ো হয়ে পরস্পরের মধ্যে প্রেমের নোটস এক্সচেঞ্জ করে, রীতিমতো বুলেটিন বের করে, এবং আমার কাছে কেন জানি না, কেবলই উপদেশ চায়। সর্বদাই আর্জেন্ট পরামর্শ দরকার হয় তাদের। সবসময়েই একটা পিরিয়ড অফ এমার্জেন্সি চলে প্রেমে। আর আমার ভালো-লাগুক না-লাগুক খুব ধৈর্য ধরে সহানুভূতি নিয়ে সেইসব কাহিনী শুনতেই হয়। না শুনলে হয় হার্টলেস, নইলে হিংসুটে ভাববে। সাকসেসফুল প্রেমে কেস ততটা খারাপ হয় না আনসাকসেসফুলে যতটা। 'ব্যর্থ-প্রেম' হলে আর রক্ষে নেই। রাতের পর রাত সেও ঘুমোবে না, আমাকেও ঘুমোতে দেবে না। জানালায় টোকা মেরে পায়ের বুড়ো আঙুল নেড়ে ঘুম তাড়িয়ে ঘরে ঢুকে এসে দুঃখের পাঁচালি শোনাবেই। সব বন্ধুই ঐরকম। আমার পড়াও শেষ। ঘুমও শেষ। পয়সা তো শেষ আগেই হয়েছিলো। বন্ধুরা প্রেম করল, আমি ফেল করলুম, এ তো কাজের কথা নয়? নাঃ নবনীতাদি, প্রেম ইজ ভেরি ডেনজারাস। ভেরি হার্মফুল টু সোসাইটি। আনপ্রডাকটিভ—এক্সেপেট ইন আ হার্মফুল বায়োলজিক্যাল ওয়ে। প্রেম বড়ই সর্বনেশে, বড়ই ভয়ানক। বন্ধুরা প্রেমে পড়লেই যদি এই অবস্থা হয়, তবে নিজে যদি প্রেমে পড়ি? তাহলে তো প্রাণেই মারা পড়বো? ওরে বাবারে। কী ভয়ংকর জিনিস! আই উইশ টু হ্যাভ নথিং টু ডু উইথ ইট। পরে হবে। পাস-টাস করে গিয়ে।" দুটো করে সিঁড়ি টপকে ওপরে ছুটলো টুবলু, "পিকো!" "পিকো!" হাঁক দিতে দিতে।

টুবলু ওপরে গেছে। আমি ঘরে এসে নোট নিচ্ছি এমন সময়ে ফের বেল বাজবামাত্র আমার প্রাণে কী আনন্দ! রে! রে! করে ছুটে গেছি।

"কে রে? পিকোর বন্ধু নাকি রে? আয় আয়—

"নবনীতা দেবসেন আছেন?" দূর! ভুল লোক? অসম্ভব বিরক্ত গলায় বলি, "আছে। কেন?"

"একটু দরকার ছিল। একটা পত্রিকা থেকে এসেছি।" অগত্যা, "ওপরে আসুন।" একটি অল্পবয়সী ছেলে। পিকোর বয়সীই হবে। গ্রাম থেকে কবিতার লিটলম্যাগ বের করে। দিতে এসেছে। অভিমত চায়। কবিতাও চায়। উল্টেপাল্টে দেখলুম, অনেক প্রেমের কবিতা আছে।

"তুমি যে প্রেমের কবিতা লেখো, নিজে প্রেমে পড়েছো?"

"আজ্ঞে?"

"তোমারই তো নাম বললে অমুকচন্দ্র তমুক?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এটা তোমার লেখা তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তবে তো তুমি প্রেমে বিশ্বাসী?"

"আজ্ঞে?"

"তুমি তো প্রেমে বিশ্বাস করো দেখছি। এসব প্রেমের কবিতা তো তুমিই লিখেছো বললে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ! ভালো হয়েছে?"

"তোমার সঙ্গে প্রেম নিয়ে একটু কথা বলতে চাই।"

"আজ্ঞে কী বললেন?"

"বলছি, প্রেমে পড়েছো তো? প্রেমের অভিজ্ঞতা বিষয়ে আমি তোমার মতামতটা চাইছি। মন খুলে বলো দিকিনি?"

"প্রে...প্রেমের...আমার মতামত? আজ্ঞে আমি ঠিক, ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"আঃহা, এতে না-বোঝার কী আছে? আমি প্রেম বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করতে চাইছি। প্রেম বলতে তুমি কী বোঝো?"

"কী বুঝি? তার মানে?" ভয়ে তার মুখ শুকনো।

"তার মানেটাও বলে দিতে হবে? কবিতা তো দিব্যি লিখতে পেরেছো। আর প্রেম কী বস্তু বোঝো না? আমি তোমাকে বলে দেবো?"

"প্রেম? কী বস্তু? আপনি বলে দেবেন? আমাকে?"

"আরে, নাঃ। আমি নয়। তুমি, তুমি। তুমি বলবে। আমাকে। আহাঃ, এতে এত লজ্জা করবার কী আছে? আশ্চর্য! তোমার বয়েস কত?"

"আমার বয়েস কত? য্যাঃ। আপনার চাইতে অনেক কমই হবে। দিদি যে কী বলেন?" ছেলেটা কী বুঝলো কে জানে, লজ্জায় লাল হয়ে উঠে দাঁড়ালো। তক্ষুনি—"আমি বরং আজ উঠি, দিদি। কবিতাটা পরে বরং কখনো এসে—" কোনোরকমে, যেন প্রাণটা হাতে করে পালিয়ে বাঁচবার মতন দৌড়ে নিচে নেমে গেল চব্বিশ পরগণার গ্রাম থেকে আসা তরুণ কবি সম্পাদক। কি ভয়ানক শহুরে কবিনীর পাল্লাতেই না পড়েছিল সে আজ। এমন জানলে আসে কখনও? রামোঃ!...এতক্ষণে সবটা সরল হলো। বেশ বুঝতে পারছি গ্রামে গিয়ে সে কী গল্প করবে।...

"প্রেমের আলোচনা করতে চাইছিল! হ্যাঁ-হ্যাঁ, তবে কী আর বলছি? আমার সঙ্গেই। রসিয়ে রসিয়ে। কিছুতেই ছাড়বে না। ডবল বয়সী ভদ্রমহিলার লজ্জাশরম বলে কিছু নেই। আবার আমাকে বলছে, 'লজ্জা করবার কী আছে?' বলছে, 'মন খুলে বলো, প্রেম কী বস্তু!' এদিকে কেদারবদ্রী-কুম্ভমেলা লিখছে, পেটে পেটে এত? আমাকে একা বাড়িতে পেয়েই,...বলে, 'তোমার বয়েস কত?' মানুষ বড় আশ্চর্য হয়রে ভাই!"...বলে উদাস হয়ে যাবে। বলুকগে। তীর এখন বেরিয়ে গেছে। এর পরের বার থেকে সতর্ক হতে হবে। অমন খপাৎ করে ছেলেধরার মতন ধরলে, আর কাজের কথায় নেমে পড়লে চলবে না। ধীরে সুস্থে, রইয়ে সইয়ে। চা খাইয়ে।

BanglaBook.org

কবি-তরুণের দোষ নেই। দোষ আমারই।

আবার রিং। এবার অন্য স্ট্র্যাটেজি। সচেতন পদক্ষেপ।

"কে রে? সুদীপ? আয় আয়। বোস। কিরে, কাজকর্ম কেমন? হ্যাঁ, আছে পিকো। একটু ব্যস্ত আছে। বরং দশ মিনিট পরে যাস ওপরে। একটু চা খেয়ে যা নিচেই। ততক্ষণে বরং আমার সঙ্গেই একটু গল্প কর। হ্যাঁরে সুদীপ, এই যে তোরা এই বইপত্তর পড়িস, ছবিটবি দেখিস, ফিল্ম তুলিস, জীবন সম্পর্কে, বিশেষভাবে এই প্রেম সম্পর্কে তুই কী মনে করিস রে? মানে, ইন জেনারাল তোদের জেনারেশনটা কী ভাবছে? একটু খুলে বল তো বাবা? আমি ব্যাপারটা বুঝতে চাই।

সুদীপ কলেজ শেষ করে ফেলেছে। এদের চেয়ে সামান্য বড়ো। ফিল্মটিল্ম তোলে। বিদেশী বইপত্তর পড়ে, 'চট করে অবাক হই না' টাইপ। তার দৃঢ় বিশ্বাস, এই পার্থিব জগতে সে যথেষ্ট চালুপার্টি। 'রাফ-টাফ-মাচো' সুদীপ জামার বোতাম লাগায় নাভির কাছে, কলম গোঁজে হিপ পকেটে, মোটরবাইকে পাড়া কাঁপিয়ে বেড়ায়। যেন মোটেই ঘাবড়ায়নি, এমনভাবে সুদীপ একটা কাঠের চেয়ারে বসে পড়ে। এবং টেরচা চাউনিতে আমার দিকে তাকাতে থাকে। একে বলে 'মাপ নেওয়া', আমি জানি। অর্থাৎ 'মেজার' করা হচ্ছে 'সিচুয়েশন'-টাকে। হিন্দি সিনেমাতে ভিলেনই হোক, হিরোই হোক এমনি একটা সময়ে নিজেই নিজের দু'গালে বাঁ-হাত বুলোতে থাকে। তারপর ডান হাতে হঠাৎ ঘুঁষি মারে। ('শাহেনশাহ'তে অবশ্য উলটো।)

সুদীপ ঘুঁষি মারবে না, জানি।

আমিও ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করি। ভাবতে চাইছি নিচ্ছে, ভালো। ভেবেচিন্তে উত্তর দিক। আমিও তো তাই চাই। সুদীপ সিরিয়াস ছেলে। ভালো রোজগারপাতি করছে। পরিশ্রমী। বাইরে ভাবখানা যাই হোক, ছেলেটা আন্তরিক প্রকৃতির। রোজ নাকি বাড়ির বাজার করে দেয় মোটরবাইকে চড়ে। ওর মতামতে কাজ হবে।

সুদীপ গালে হাত বুলোয় না। দু'হাতে চেয়ারের দুটো কাঠের হাতল চেপে ধরে টেরচা চোখে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। বোতাম খোলা জামার মধ্যে থেকে তার ছ'টা পাঁজরাও আমার দিকে স্পষ্ট, এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে। রোগা হওয়ার সঙ্গে 'মাচো' ইমেজের যোগ নেই। ইন্টেলেকচুয়াল 'মাচো'রা রোগাই হয়। বড় বড় ভাসা ভাসা চোখে অপলকে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সুদীপ ঘাড় সোজা করে। নড়েচড়ে বসে। চোখ নামিয়ে এক মুহূর্ত কী ভেবে নেয়। তারপর মাথা তুলে বলে "প্রেম?" একটু ফর্সা করে হাসে। "ধুস। প্রেম দিয়ে কী হবে? আমি প্রেমে বিশ্বাসই করি না! ওসব প্রেমট্রেম আজকাল আর চলে না, নবনীতাদি, ওসব আপনাদেরই টাইমের জিনিস ছিল। এখন অবসোলিট হয়ে গেছে। গপ্পো-উপন্যাসে-ফিলিমেই শুধু পাবেন। লাইফে নেই। আমরা র‍্যাশনাল জেনারেশন। আমরা অবজেকটিভলি লাইফটাকে দেখি। লাভ-ক্ষতির অঙ্ক কষি। আমরা অ্যামবিশাস। কই? চা তো বললেন না? প্রেম ব্যাপারটা এখন ঠিক চলে না। কেরিয়ারটাই সবার আগে। আপনি বাঁচলে প্রেমের নাম। প্রেমের জন্য আমরা কেউ তো কেরিয়ার সাক্রিফাইস করবো না? না মেয়ে, না ছেলে। কেউ কিছুই স্যাক্রিফাইস করবো না—এখন সবাই স্বার্থপর। বুঝলেন তো নবনীতাদি এখন যে যার, সে তার। ছেলেমেয়ে সবাই সেলফ-সীকিং হলে আর প্রেমটা হবে কেমন করে? কে করবে? কার সঙ্গে করবে? প্রেমে কেউই আর বিশ্বাস করে না, এক বোকারা আর ন্যাকারা ছাড়া। ওটা আউটডেটেড

কনসেপ্ট এখন। আমাদের এটা প্রয়োজনভিত্তিক সোসাইটি। নবনীতাদি, এখানে বিনা প্রয়োজনের কোনো জিনিস চলে না।" সুদীপ আমার সামনেই একটা সিগারেট ধরিয়ে কেমন একটু জেনুইন মমতার সঙ্গে হাসলো। চা এসে গেছে।

আমি চা, আর অ্যাশট্রে এগিয়ে দিলুম। মনে মনে নোট করতে গিয়ে আমি বোকা হয়ে গেলুম—সুদীপ আসলে কী বললো? ও কি প্রেমে বিশ্বাস করে, না করে না?

নেক্সট যেই-না বেল বেজেছে আমিও ঠিক স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মতো দালানে ছিটকে এসেছি এবং ভাঙা গলাকে যথাসম্ভব মিষ্টি করে বলেছি—

"কে রে? পিকোর বন্ধু কেউ এলি নাকি রে?" ভয়ে-শীতল কচিগলায় কোরাসে উত্তর হলো নিচে থেকেই—

"ইয়ে, হেঁ-এঁ! মানে, না, না! আসলে আমরা টুমপার...মানে, আর কি, আমরা থাকতে আসিনি। কেবল এক মিনিট, এক্ষুনি চলে যাবো। একটা জরুরি কাজে। এই পিকোদির কাছে। শুধু এক মিনিটের জন্যে। সত্যি সত্যি।" কেউ উপরে এলো না। পিকো একদম পড়ছে না, সামনে পরীক্ষা, আমি চাই প্রায়ই বৈ-রৈ শব্দে ওর বন্ধুদের ভাগিয়ে দিই। বুঝতে পারি, এটা তারই ফলশ্রুতি। (আজকাল কেউ 'ফল' লেখে না। 'ফলশ্রুতি' লেখাই নিয়ম।) এই পার্টি তারই প্রতিক্রিয়ায় ভুগছে। অতএব আমি তাদের মধ্যে মনোবল সঞ্চার করতে চেষ্টা করি।

"ভয় কিসের? ওপরে আয় না! কে রে তোরা?" "পিকোদি বাড়ি আছে।" আস্তে আস্তে সিঁড়িতে শব্দ হয়। দুটি কচিমুখের আবির্ভাব ঘটে সিঁড়ির মাথায়। 'হে মাধবী-দ্বিধা-কেন-আসিবে-কি-ফিরিবে কি,-র মতো করে আমি বলি—"কি ব্যাপার? এত কিন্তু-কিন্তু কিসের? এই কি নতুন আসছিস? নাকি তোরা রিমঝিম? আর প্রতিম? আয় না ওপরে আয়, শুধু শুধু অত ভয় পাচ্ছিস কেন? বোস এখানে। (আমি আছি গিন্নি আছেন, আছেন আমার নয় ছেলে!) হ্যাঁ, পিকোদিকে ডেকে দিচ্ছি। আচ্ছা রিমঝিম-প্রতিম, তোরা কি এখনও প্রেমে বিশ্বাস করিস?" বলেই 'এখনও' কথাটা নিজেরই কানে খাপছাড়া লাগে।

"প্রেম?" সমস্বরে উচ্চারিত শব্দটি হাঁফ ছাড়ার মতো শোনালো। ততক্ষণে পায়ে পায়ে কাছে এসেছে দুটো ছেলে। একটার এখনও গোঁফদাড়ি গজায়নি তেমন, আরেকটার মুখভর্তি কচিকচি ঘাসপাতার মতো দাঁড়িগোঁফ। ক্ষুর চলেনি। বড়ো বড়ো চোখ। দুটো নেহাৎ ছেলেমানুষ ছেলে। কিশোর বলাই যথার্থ। একটা ওদের মধ্যে একটু বড়ো। সদ্য যুবা। রিমঝিমটা আমার ছোটো মেয়ে টুম্পার সতীর্থ। ছোটো মেয়ে এখন কলকাতার বাইরে পড়ছে। হস্টেলে থাকে। কুড়ি হয়নি।

"প্রেম? মাসি?"...শুধু এইটুকুনি বলেই ভয়ে-বলি-না-নির্ভয়ে-বলি মুখ করে হঠাৎ চুপ করে গেল দুজনে। এবং পরস্পর নিদারুণ চোখাচোখি করতে লাগলো।

"ভয় কি? বল না?" আমি যথাসাধ্য মাভৈঃ প্রদান করি। "তোরা প্রেমে বিশ্বাস করিস তো? অ্যাঁ? প্রেম নিয়ে ভাবনাচিন্তা করিস?" দাড়িওয়ালা মুণ্ডুখানি প্রতিম সজোরে নাড়ালো ডাইনে-বাঁয়ে। অর্থাৎ না। করে না। স্বল্প গোঁফের রেখা-ওঠা মুখখানি প্রবলভাবে হেলিয়ে কানটা একদিকের কাঁধের সঙ্গে ঠেকিয়েই ফেললো রিমঝিম। অর্থাৎ করে। খুব করে। আরে? এদের যে দেখি একযাত্রায় পৃথক ফল! ঠিক হ্যায়, আগে অবিশ্বাসীকেই 'হ্যাণ্ডল' করা হোক।

"প্রতিম? তুই বিশ্বাস করিস না প্রেমে? কেন? কী হয়েছে? তোদের না অ্যান্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপ্যাট্রা টেক্সট?"

"রেপ অফ দ্য লকও টেক্সট। তারপর, টেক্সটের মধ্যে"—প্রতিম অকস্মাৎ সিলেবাস নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে দেখে, তাড়াতাড়ি থামিয়ে দিই।

"থাক, টেক্সটের কথা থাক। তোর নিজস্ব ফিলসফিটা কী? জীবনদর্শন? প্রেমে বিশ্বাস নেই কেন রে? এই বয়েসে?"

"এই বয়েস বলেই। বড্ড টাইম কনজিউমিং। ভীষণ সময় নষ্ট হয়ে যায়।" প্রতিম আড়চোখে একবার রিমঝিমের দিকে তাকায়। রিমঝিমের চোখমুখে মোটেই সাপোর্টের চিহ্ন নেই। ভুরু কুঁচকে যুদ্ধং দেহি ভাবে চেয়ে আছে সে।

"এই স্টুডেন্ট লাইফে প্রেম করাটা ঠিক নয়। আগে পড়াশুনোটা শেষ করে নিয়ে, যখন হাতে সময় থাকবে"—প্রতিমের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হঠাৎ রিমঝিম বলল—"একদম রিটায়ার-টিটায়ার করে গিয়ে, তখন বরং প্রেমটা তুই করিস। বুঝলি প্রতিম? তখনই হাতে প্রচুর, অঢেল অনন্ত সময় থাকবে।" বেশ নিরীহভাবেই এটা বলল রিমঝিম।—"এখন তোর পড়াশুনো, তারপর তোর চাকরিবাকরি—"

"ইয়ারকি মারিস না, রিমঝিম। কী বুঝিস তুই প্রেমের? যা জানিস না সেই নিয়ে কথা বলবি না।" প্রতিম একটু রেগে গিয়ে সিরিয়াসলি বলে—"প্রেম তো করলেই হলো না? গার্লফ্রেণ্ডকে টাইম দিতে হয়, সমানে পারসিউ করতে হয়, জানিস? প্রেমের জন্য কিন্তু প্রচণ্ড সময় লাগে, নইলে প্রেম ছেতরে-মেতরে যায়। প্রেমে পড়লে পড়াশুনো, আড্ডা, থিয়েটার সবই মাটি। শুধু ওই একজন মেয়েকে নিয়েই সবটা সময় কেটে যায়। খেলা দেখা হয় না। অন্য, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিলেই গার্লফ্রেণ্ড চটে যায়। তাকে খাওয়াতে, তাকে সিনেমা দেখাতে, অনবরত ধারকর্জ করতে হয়, ফলে বন্ধুবিচ্ছেদ হয়ে যায়।—রোজ রোজ বাড়ি ফিরতে দেরি হয়, মা-বাবাও ক্ষেপে যায়—মহা প্রব্লেম। যেমন সময় নষ্ট, তেমনি পয়সা নষ্ট, —পড়াশুনোও ইনরমাসলি সাফার করে।—একদম কনসেনট্রশন থাকে না, পড়ায় কিছুতেই মনে বসে না—ওঃ সো ডিস্টার্বিং—নাঃ। প্রেম একদম ভালো না"—

"শুনে তো মনে হচ্ছে বেশ প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকেই কথা বলছিস। রিসেন্ট এক্সপিরিয়েন্স বলেই মনে হচ্ছে? তুই তো এ'বছর ড্রপ দিলি? না রে?"

"হি হি, এসব কী আন-এথিক্যাল প্রশ্ন? আউট অব সিলেবাস হয়ে যাচ্ছে যে। নো পার্সোন্যাল ইনফর্মেশন—আমি কেবল জেনারেল থিওরি দিচ্ছি!—আমার থিওরি ছাত্রকালের প্রেম খুব খারাপ জিনিস, করলেই সমূহ বিপদ—সব দিক দিয়ে লোকসান। কেবল যদি কেউ স্বরূপের মতন ভেরি স্পেশাল পার্সন হয়, উইকলি ডাইরি মেনটেন করে, লাইব্রেরি ওয়ার্ক, রেস্তরাঁ ওয়ার্ক, সবকিছু কাজকর্ম, হার্ট অ্যাণ্ড হেড, ডেইলি রুটিনে একদম ভাগ করে ফেলে, তবেই সম্ভব। নাঃ। ও একা স্বরূপই পারে। আমাদের মতো জনসাধারণের পক্ষে লে-মেনদের পক্ষে প্রেম ইজ নট প্র্যাকটিকেবল—নট আ প্র্যাকটিক্যাল প্রপোজিশন অ্যাট অল!"—

প্রতিমের মুখের কথা ছিনিয়ে নিয়ে রিমঝিম মেঠো বক্তৃতার সুরে বলে—"আমি কিন্তু মোটেই মনে করি না প্রেম শক্ত কিম্বা প্রেম খারাপ। প্রেম খুব ভালো জিনিস। আমি খুব প্রেমে বিশ্বাস করি—আমি খুবই প্রেম করতে চাই। কিন্তু আমাকে কেউই যে কেন প্রেম করতে চায় না—"

"সে তোর গোঁফদাড়ি বেরুলেই ঠিক দেখবি মেয়েরা দুড়দাড় প্রেমে পড়বে। আসলে এখনও তোকে ওরা বাচ্চা ভাবে—" নিজের কচি কচি দাড়িগোঁফের গায়ে হাত বুলিয়ে, দাম্ভিক হাস্য দেয় প্রতিম।—"কেন? কেন ভাববে বাচ্চা?" রিমঝিমের ক্রুদ্ধ উত্তর। —"ভাবলেই হলো? আমিও যে-ক্লাসে পড়ি, ওরাও তো সেই ক্লাসে, তবে?—তবুও আমি বাচ্চা? বললেই হলো যা হয় একটা কথা?" রিমঝিমের অভিমানে ভাঙা গলা বুজে আসে। বেশ তো মিষ্টি দেখতে রিমঝিমকে, কেন প্রেমে পড়ে না মেয়েগুলো? 'নওলকিশোরে'র সেই আইডিয়াটা আর বাংলার মাটিতেও চলছে না তাহলে? সব ব্যাম্বো? অমিতাভ আর মিঠুন?

"হবে রে, হবে রে, তোরও হবে," মূর্তিমতী সান্ত্বনার মতো এবার পিকোদি আবির্ভূত হয়, "বিশ্বাসে কৃষ্ণ পর্যন্ত মিলে যায়, আর তোর একটা প্রেম হবে না?" তাই কখনও হয়?"

"তোর সেই বেগুনি সোয়েটার পরা গুণ্ডা মেয়েটার সঙ্গেই হয়ে যাবে, দেখিস, একটু ধৈর্য ধর"—রহস্যময় হেসে প্রতিম বলে। "সবুরে মেওয়া ফলে! মেলা তড়বড় করিসনি!"—দৌড়ঝাঁপ করতে করতে তিনজনে মিলে ওপরে উঠে যায় এবার। "চলি, মাসি?"—আমার মাথা আবার গুলিয়ে যায়। এরা তবে কে কেমন ছেলে?

আপনারা ভাবতে পারেন মেয়েদের দেখা নেই কেন? কেননা মেয়েদের আমি প্রশ্ন করছি না। সম্প্রতি একটি নয়, দুটি মেয়েদের পত্রিকাতে কলকাতা ও যাদবপুরের ছাত্রীদের স্পষ্টবাদী সাক্ষাৎকারে তাদের মতামত পড়ে জেনে গিয়েছি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে ৯৯% প্রেমে উৎসাহী নয়। সবাই কেরিয়ারে উৎসাহী, যারা সাক্ষাৎকার দিয়েছে। প্রেমকে কেরিয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখছে তারা। অথবা একটি বিকল্প কেরিয়ার। প্রেম মানেই বিবাহ, বিবাহ মানেই কর্মজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা-বঞ্চিত জীবনযাপন। বেশিরভাগ সাক্ষাৎদাত্রী চায় মুক্ত জীবন, স্বাধীন উপার্জন, কর্মজীবন। প্রেমে, বিবাহে জড়িয়ে পড়তে রাজী নয় তারা। আরেকদল বিবাহোন্মুখ। তারা বিবাহের প্রতি আগ্রহী, কিন্তু প্রেমের প্রতি নয়। সবাই চায় নিরাপত্তা। ইতিমধ্যে, যদি ইচ্ছে করে তবে প্রেম-প্রেম-খেলায় ('হ্যাভিং ফান') তেমন আপত্তি নেই কয়েকজনের। কিন্তু প্রেমে-পড়া? নৈব নৈব চ। মেয়েরা 'প্রেম' থেকে পালিয়ে গিয়ে 'কেরিয়ার' বাঁচাতে চায়, তাই সে-'কেরিয়ারে' 'চাকুরি'ই হোক, আর 'বিবাহ'ই হোক। প্রেমটা মেয়েদের ক্ষেত্রে কেরিয়ারের বালাই হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ছেলেদেরও কি তাই নয়? ছেলেদের কথা শুনেও তো তাই মনে হচ্ছে আমার। এইসব ভাবতে ভাবতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, ব্রিটিশ কাউন্সিলের সামনে এক ছাত্রের সঙ্গে দেখা। খুব ব্রাইট ছেলে। একটা ফার্স্ট-ক্লাস পেয়েছে, আরেকটার জন্য তৈরি হচ্ছে। দেখবামাত্র আমার মুখ থেকে প্রশ্ন ছুটে গেছে—

"এই যে কুনাল! এক মিনিট দাঁড়াও তো? প্রেম কী জিনিস? একটা ডেফিনিশন দিতে পারো আমাকে?" সে-ছাত্রও সোজা পাত্র না। সুদীপেরই মতো, 'কিছুই আমাকে-অবাক-করে না' আঁতেলে টাইপ। ঝোলা গোঁফ। প্রশ্ন শুনে, যেন-এটাই-আশা-করছিল-এমনিভাবে বিনা বিস্ময়ে, বইখাতা বগলে পুরে প্রথমে কিছুক্ষণ, মিনিটখানেক হবে, উটমুখো হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইলো। ভাবছে। ভাবুক। ভেবেচিন্তে বলুক।

তারপর কুনাল তর্জনী তুলে বললো—

"ইলেকট্রিকের বালবের মধ্যে যে সূক্ষ্ম তারটা আছে, 'ফিলামেন'টা, যেটা কেটে যায় আর কি, দেখেছেন তো দিদি? প্রেম হলো ঠিক তাই। অথবা, ধরুন এই প্রদীপের সলতেটা। তা বলে কিন্তু মাইনড ইউ, প্রদীপের তেলটা, কিম্বা বালবের ইলেকট্রিসিটি, ওগুলো প্রেম নয়। ওটা আবার অন্য জিনিস। বুঝেছেন তো?" বেশ অন্তরঙ্গভাবে চোখ মটকালো ছাত্রটি। এবার আমার ঘাবড়াবার পালা।

"অন্য জিনিস? কী জিনিস বাবা? ঠিক বুঝিনি।"

আমার সরল প্রশ্নে প্রশ্রয়ের হাসি হেসে ছাত্র আমাকে বলে, "বোঝেননি? তাহলে আরেকদিন বুঝিয়ে দেবো দিদি, আজ হাতে সময় নেই, লাইব্রেরি বন্ধ হয়ে যাবে— ছুটতে শুরু করেই থেমে পড়ে, নাটকীয়ভাবে হাতজোড় করে জ্যাকি শ্রফ মার্কা গোঁফের তলায় নকল করে মিষ্টি হেসে কুনাল বলে—"আজি মোর দৈন্য করো ক্ষমা"—বলেই লাইব্রেরির দরজায় সেঁধিয়ে যায়। অদূরেই মনে হলো যেন একটি অপেক্ষমানা সালোয়ার-কুর্তা নড়ে উঠলো, একটি ওড়না দুলে উঠে কুনালের দিকেই এগিয়ে এলো বালবের ফিলামেন অথবা প্রদীপের সলতের মতো।

দূর হোকগে ছাই সম্পাদকীয় ফরমাশ। প্রেমের আবার এ প্রজন্ম-সে প্রজন্ম কি? কেবল বাজে কথা। প্রেম তো জন্মজন্মান্তর ধরেই। যে-কে সেই। প্রেম সব যুগেই প্রেম। প্রেম সব দেশেই প্রেম। আমিও যেমন। তিলোত্তমা আর চোদ্দপুরুষে কিছু তফাৎ নেই। যাঁহা শাজাহান, তাঁহা এলিজাবেথ টেলর, টাইপগুলো কেবল আলাদা, কেউ ম্যারাথন, কেউ রিলে রেস। ছোটে সবাই প্রাণপণে। যে যেটুকু রাস্তা পারে। বাবা-মা ছুটেছেন তাঁদের মতন। আমরা আমাদের মতন। এরা ছুটবে এদের মতন।

বাড়িতে ফিরতেই করুণাসিন্ধু হয়ে এসে পিকো নিজেই বললো—"মা, দিবাকর এসেছে। ভাটপাড়ার বামুন। ওকে নিয়ে তোমার স্পেসিমেন স্যাম্পলিং করবে না?"

"ও, দিবাকর এসেছিস? শোন বাবা," আমি বসে পড়ে জুতো খুলতে-খুলতেই বলি—"বল দিকিনি তুই প্রেম বিষয়ে কী ভাবিস?"

"কিস্যুই ভাবি না!" হাস্যবদনে দিবাকর বললে ধুতিপরা পা নাচাতে নাচাতে। "ভাববার আছেটা কী?"

"মানে?"

"মানে কক্ষনোই ভাবিনি। ভাববার কী আছে এতে?"

"প্রেমে বিশ্বাস করিস?"

"বাঃ, অবিশ্বাস করলেই হলো? এত কীর্তন, বৈষ্ণব গীতিকবিতা, মেঘদূত, গীতগোবিন্দ লেখা হয়ে গেল, রবিঠাকুর এত গান লিখলেন, অবিশ্বাস করলেই হলো? ফ্যাক্ট ইজ ফ্যাক্ট। ফ্যাক্ট থাকলেই ভাবতে হবে? পিপীলিকাভুকও তো ফ্যাক্ট। জগতে আছে—আমি কি তাই নিয়ে ভাবি?"

"কিন্তু প্রেম আর পিপীলিকাভুক—"

"থাকুক, তাতে আমার কি? আমার ওসব নিয়ে ভাবার টাইমও নেই, ইনক্লিনেশনও নেই।"

"তোদের তো বৈষ্ণববাড়ি।" ভয়ে ভয়ে বলি।

"তাতে কি হলো?" দিবাকর বলে। "বৈষ্ণববাড়ি বলে জীবহিংসা হয় না।

BanglaBook.org

নিরিমিষ্যি খাই। ব্যস। ঐ পর্যন্তই যা। প্রেম। জীবে প্রেম নিয়ে ভাবনা বলতে পারেন।"

"তোর বন্ধুবান্ধবেরা তো খুব ভাবে। উষা তো এনগেজড হয়ে গেল।"

"ওঃ উষা? উষার প্রেম? তাও জানেন না বুঝি? শুনুন তবে! উষা আর রমেশের ব্যাপারটা হচ্ছে সিম্পল! টিউশনের এম্পায়ারটা ভাগাভাগি হয়ে যাচ্ছিল। এ পায় ছ'হাজার, তো ও নিয়ে নেয় পাঁচ হাজার। তার চেয়ে বিয়ে করে ফেললে জয়েন্ট টিউটোরিয়াল হোম খুললে বিশ পঁচিশ হাজার তুলতে পারবে। তাই প্রেম। একে আপনি প্রেম বলবেন?"

আমি নির্বাক। আমাকে নির্বাক করতে পেরে দিবাকর খুব খুশি। বেড়ালের মতন গোঁফ নাচিয়ে হাসলো।

"এসব আপনি বুঝবেন না! এরা যে-যার বিজনেস ইন্টারেস্টে পারস্পরিক সন্ধি করে নেয়। আপনারা ভাবেন, প্রেম। এর বাবার টাকা দেখে, ওর বাবার নাম-যশ-প্রতিপত্তি দেখে, কারুর ফর্সা রঙ দেখে, আরেকজনের মার্কশিট দেখে— হুঃ, এই তো এদের প্রেমের সব উৎস। দূর। ওসব আবার প্রেমে পড়া নাকি? ওতে ভুলবেন না দিদি।" দিবাকর সাবধান করে দেয়, কচি গোঁফ নেড়ে, হলো বেড়ালের মতন।

"এ প্রেম সে প্রেম নয়। আপনারা যাকে প্রেম বলতেন। এ হচ্ছে অন্য মেজারমেন্টের। আমাদের যুগের আসলে মেটিরিয়ালটা আলাদা। ঐ হয় স্বার্থের হিসেব, আর নয় তো খেলা। প্রেম বলে কিছুই এখন প্র্যাকটিসড হয় না। যা হয় সেটা একটা পাসটাইম। প্রেম-প্রেম খেলা। লাইক ফ্রি আদার প্রেম। সময় কাটানোর প্রণালী। যেমন ক্রসওয়ার্ড পাজল। শব্দসন্ধান। শিকার। মৃগয়া। ক্রিকেট। তেমনি। উত্তেজনা আছে। হারজিৎ আছে। কংকোয়েস্ট-এর মজা আছে। সবই আছে। কেবল প্রেম নেই। ও আপনাদের সময়েই ফুরিয়ে গেছে। আমাদের যুগে ছিটেফোঁটাও নেই।"

"তুমি একটা এতবড় পণ্ডিতবাড়ির ছেলে হয়ে, দর্শনশাস্ত্রের ছাত্র হয়ে এমন বলছ? ছিঃ।"

"ছিঃ তো কি। যা বুঝেছি অনেস্টলি তাই তো বলবো? নাকি বানিয়ে বানিয়ে কাব্য করতে হবে?"

মন খারাপ হয়ে যায়। একের পর এক নবীন যুবক এসে প্রেমকে নস্যাৎ করে যাচ্ছে। বিশ্বের ভবিষ্যৎ তবে কী? আমার কাতরতা আর চাপতে পারি না। বলে ফেলি: "তোরা কী রে? যাকেই ধরি, সেই বলে প্রেমট্রেম সব বাজে কথা। তোদের জেনারেশনটাই—"

"আপনার যে গোড়ায় গলদ! আপনার স্যাম্পলিংয়েই ভুল হচ্ছে। র‍্যানডম তো হচ্ছে না। সবাই তো পিকোরই বন্ধু। কিছু একটা মিল না থাকলে বন্ধু হয়েছে কেন এরা? এটাই মিল। সবাই একরকম কথা তো বলবেই। আপনি বড় রাস্তার মোড়ে এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে এভ্রি থার্ড পথচারীকে ধরুন। সেই স্যাম্পলিং-এর রেজাল্টটা নির্ভরযোগ্য হবে। যদি সায়েন্টিফিক মেথড ফলো করতে চান।"

"আমি বড় রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে এভ্রি থার্ড পথচারীকে ধরব? ধরে জিজ্ঞেস করব—আপনি প্রেমে বিশ্বাস করেন? তারপর আমাকেই ধরে মারবে না তো তারা?

BanglaBook.org

নইলে সলিসিটিংয়ের জন্য পুলিশ আমাকে জেলে পুরে দেবে না?"

দিবাকর একটু লজ্জিত হয়। আঙুল কামড়ে চিন্তিত মুখে জানায়: "সেদিকটা অবশ্য আমার স্ট্রাইক করেনি।"

"তারপর, বরং ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে স্টুডেন্টদের মধ্যে একটা স্টেনসিল কেটে কোয়েশ্চেনেয়ার বিলিয়ে দিন—সেটাই ভালো হবে।"

"কেউ ফেরৎ দেবে না। কে কালেক্ট করবে? তুই করবি?"

"ওরে বাবা!"

"তবে? দ্যাখ তোদের মুখেই যত বড় বড় কথা। কেউ কোনো ভার নিতে চাস না।" বকতে-বকতেই টের পেলুম হঠাৎ আসল কথাটা বলে ফেলেছি। এটাই এদের এই প্রেম-বিমুখতার মূল কারণ। দায়হীনতার লোভ। নিদায়, নির্ভার, স্বাধীন, মুক্ত জীবন এদের কাম্য, কর্মময় হলেই ভালো, আলস্যময় হলেও ক্ষতি নেই (যতদিন ক্ষতি না থাকে)। প্রেম মানেই বন্ধন। মানেই দায়দায়িত্ব। হৃদয়ের, জীবনের! মর্মের, কর্মের। এরা জীবনে দেয়াল তুলতে চায় না।

এটা কি আদর্শবাদ? নাকি একেই বলে স্বার্থপরতা? প্রেমের মূলে আছে অংশগ্রহণ, 'শেয়ার' করা, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, হার-জিত—সব ভাগ করে নেয় প্রেম। এ প্রজন্ম বোধহয় ভাগ নেওয়াতে বিশ্বাসী নয়। সবাই যার-যার তার-তার। কে যেন বলেছিল না? যে যার সে তার? সুদীপ? না? না টুবলু? না প্রতিম? না দিবাকর? সবই একরকম শোনাতে শুরু করেছে আমার মনের মধ্যে এবারে। সত্যিই কি বদলে গেছে এই প্রজন্মে ভালোবাসার মূল্যবোধ?

ভাবছি, এমন সময়ে দিবাকর ফিরে এলো। নিচে নেমে এসে দিবাকর নিজেই বললো, "আপনি কি মন্দার সঙ্গে কথা বলেছেন? মন্দাকিনী রায়?"

"না তো?"

"বলে দেখবেন। অন্য একটা অ্যাংগেল পাবেন। ওই তো ওপরে বসে আছে। ডাকবো?"

"ডাকবো? তা, পিকো তো ওকে ডাকেনি?"

"ডাকবে কেন? আপনি তো মেয়েদের মতামত চাননি? এর প্রবল ওপিনিয়ন আছে!"

"এই কি কবিতা লেখে? কলেজ ম্যাগাজিনে লিখেছিলো, দান্তে আর বিয়াত্রিচে—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই সেই। মন্দা! মন্দা! নিচে আয়। ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে! ভালো স্টুডেন্ট কিন্তু!"

পরমা সুন্দরী একটি ছবির মতন মেয়ে এলো।

"কী পড়ো?" মিষ্টি হেসে মেয়েটি বললো,—"এম. এ. ফার্স্টইয়ারে ঢুকেছি।" গলাটিও মধুর।

"তুমি কি প্রেমে বিশ্বাস করো, মন্দা?"

একটুও না ঘাবড়িয়ে নাম ঠিকানা বলার মতো সহজে—"নিশ্চয়ই!" বেশ জোরের সঙ্গেই মন্দাকিনী জানায়।

"মানে?" আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল।

"মানে? আমি মনে করি প্রেমই সব। প্রেমের জন্যেই মানুষ বাঁচে। বাঁচতে

হলে তো একটা মোটিভেশন লাগে? কেউ টাকা রোজগারের জন্যে বাঁচে, কেউ নামযশ করবে বলে, আমি বাঁচি প্রেমের জন্যে।"

"প্রেম মানে? জীবে প্রেম? গান্ধীজী, বুদ্ধদেব..."

"না না, প্রেম মানে এমনি প্রেম। একজন মানুষের জন্যে আরেকজন মানুষের ব্যাকুলতা। তাকে কাছে পাওয়ার জন্য, তাকে চোখে দেখার জন্য, তার কণ্ঠস্বর শোনার জন্য, তার স্পর্শ পাবার জন্য—এইসব। দিবাস্বপ্নে, নিশাস্বপ্নে, সব সময়ে তারই কথা ভাবা। সেই প্রেম।"

"আই সী।" আমি কেমন কথা খুঁজে পাচ্ছি না। মন্দাকিনী অত্যন্ত স্পষ্টবাদিনী রোমান্টিক।

"হাতে এসে গেলেই কিন্তু গেল।" মন্দা বলে।

"অ্যাঁ, কী বললে?"

"বলছি, প্রেম যতদিন অপূর্ণতার মধ্যে, অতৃপ্তির মধ্যে, আকাঙ্ক্ষার মধ্যে থাকে ততদিনই প্রেম বেঁচে থাকে, বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর যেই প্রেমে প্রাপ্তি এল, তৃপ্তি এল, অমনি সুপ্তিও চলে আসে। তারপরে প্রেম শুকিয়ে যায়, ফুরিয়ে যায়। তখন জীবন খুব বোরিং।" মন্দা হাসে। এ তো একেবারে আমার মার কথাই বলছে! কোথায় জেনারেশন গ্যাপ?

"ঘুম থেকে উঠতেই ইচ্ছে করে না। যতদিন না আবার প্রেমের উদয় হচ্ছে।" মন্দা আরো জানায়।

"আবার উদয় হয়?"

"বাঃ! হবে না? প্রেম তো সূর্যের মতো। অনবরত অস্ত আর উদয়। উদয় আর অস্ত। পার্মানেন্টলি এমন সময় তো আসবে না, যখন সূর্য নেই। সেটা রাত্রি। রাত্রি কেটে যায়। প্রেমের ভোর হয়। প্রেমের সূর্যোদয় হয়। নতুন প্রেম আসে জীবনে।"

—"তুই বুঝি অনবরত প্রেমে পড়িস মন্দা?"

—"অনবরত। আমার তো প্রেমময় জীবন!"

হাসতে হাসতে মন্দাকিনী বলে—"শ্রীচৈতন্যদেবের টাইপের। মেরেছে কলসির কানা তাই বলে কি প্রেম দেব না? আমি সেই টাইপ। আপাতত দিবাকরদা কিছুতেই অ্যাটেনশন দিচ্ছে না সেটাই মুশকিল। বলুন তো একটু দিবাকরদাকে? বলছি এত করে—

"ও, এই ব্যাপার? দিবাকর!"

"মাপ করবেন, দয়া করে মন্দাকিনীর সঙ্গে প্রেম করতে আদেশ করবেন না। প্রেম আমার লাইন নয়। মন্দাকিনী আমাদের পাল্টি ঘর, চমৎকার মেয়ে, ছোড়দার সঙ্গে সম্বন্ধ করছি, হয়ে গেলে হয়ে যাবে। আমাকে কেন? ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি।"

আমিও মত বদলে ফেলি।

"তুমি বরং ওর ছোড়দাকেই—"

"ছোড়দা বিলেতফেরৎ, পাত্র ভালো, চাকরি করে, মাছ মাংস খায়, দেখতেও ভালো, মন্দার সঙ্গে ওকেই মানাবে।—তখন থেকে এটাই বোঝাচ্ছি ফের প্রেমের সূর্যোদয় হবে। এবারকার মতন এ সূর্যটাকে অস্তেই নামিয়ে দে!"

BanglaBook.org

আমিও বলি, "দিবাকর সুবিধের পাত্র হবে না। ছোড়দাই বেটার মনে হচ্ছে।"

মন্দাকিনী মিষ্টি হাসলো। প্রশ্রয়ের সুরে বলল: "ওভাবে তো হয় না? যতদিন দিবাকরদা এই...এরকম করবে, ততদিনই আমারও যে—"

"তার চে, দিবাকর তুই ওর প্রেমে পড়ে যা—তাহলেই চোঁচা পালাবে মন্দাকিনী! ওর সবই ওই রোমান্টিক অপ্রাপ্তি"—এবার পিকো গভীর উপদেশ দেয়। — "প্রাপ্তির একটু লক্ষণ দেখালেই মন্দা আর সেখানে নেই। ভয়ানক prude মেয়ে! মুখেই যত!" মন্দা মিষ্টি মিষ্টি লজ্জা লজ্জা হাসে।

অস্বীকার করে না। দিবাকর বলে, "দাঁড়া, তোকে কালই নিয়ে যাচ্ছি সায়েন্স কলেজে ছোড়দার ল্যাবে"—

আরেকটা দৃষ্টিকোণই বটে। মেয়েদের পত্রিকার সাক্ষাৎকারে এটা ছিলো না। না। এটা কি প্রেমে বিশ্বাস? না প্রেমে অবিশ্বাস? মোদ্দা কথাটা ঠিক ধরা গেল কি? ও কি আমাদের ছোটবেলার মতন...ও কি সত্যিই রবীন্দ্রনাথের গানের মতন...রিমঝিম এক প্রবল প্রেমিক, আর এই মন্দাকিনী আর এক। অতিবড় ঘরণীরা না পায় ঘর। মন্দার প্রেমে বিশ্বাসটাকে কিন্তু 'প্রেমে-অবিশ্বাস' বলেই সন্দেহ হতে থাকে আমার। ওই, যাকে দিবাকর বলছিল 'পাসটাইম', সেরকম লাগছে না কি মন্দার এই সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের ব্যাপারটা?

তা কেন? অনেকেই আছে প্রেমে বিশ্বাসী। আগের মতোই। রূপোলি যেমন। মস্ত ধনীর একমাত্র আদরিনী সন্তান, স্বেচ্ছায় নিম্নধাবিত্ত উদ্বাস্তু একান্নবর্তী পরিবারের এক দোকানীর বড় ছেলেটিকে বিয়ে করে যৌথপরিবারে খুবই শান্তিতে ঘরকন্না করছে। কে বললে প্রেম নেই? স্যাক্রিফাইস নেই? রূপোলিকে আমি দেখিনি? ওকে প্রশ্ন করতে হয়নি প্রেম সম্পর্কে ওর ধারণা কী। নওরোজকেও দেখেছি। ওই যে থাইরয়েডের অসুস্থতার কারণে স্থূলাঙ্গিনী কিন্তু বুদ্ধিমতী গুণবতী চৈতালীকে বিয়ে করলো। পাঁচবছর বাগদত্ত থাকার পর, বিলেত থেকে ফিরে এসে চৈতালীকে নিয়েই ঘর বেঁধেছে নওরোজ। ওরাও তো আমারই ছাত্রছাত্রী। সুদীপ-দিবাকরের প্রজন্ম। আর যাই হোক সাক্ষাৎকারে কেউ সত্যি কথা বলে না। খবরের কাগজকেও না, বন্ধুর মাকেও না, মাস্টারমশাইকে তো নয়ই। প্রশ্ন করে কিছু হবে না। চোখই একমাত্র সাক্ষী, চোখটাকে তীক্ষ্ণ করতে হবে। এই সুদীপকেই তো পাঁচবছর ধরে একটাই মিষ্টি মতন মেয়েকে মোবাইকে করে নিয়ে ঘুরতে দেখছি। সুদীপের গার্লফ্রেণ্ড। গার্লফ্রেণ্ড কাকে বলে এরা? এদের মুখের ভাষা, আর কাজের ভাষা আলাদা। দিবাকরকে ছেড়ে আমি ঘরে যাই। নোটবই খুলে প্রবন্ধ লিখতে বসি। সঞ্চিত ডেটা অ্যানালাইজ করে দেখি, আরে, মা-জননীর ঘোষিত মতামতের সঙ্গে স্বরূপের কর্মকাণ্ডের বা সুদীপের, কি দিবাকরের বজ্রনির্ঘোষের তো বিশেষ পার্থক্য নেই? কেবল মার স্টেটমেন্টটা পজিটিভ, ওদেরগুলো নেগেটিভ। দু'দলের বক্তব্যই মূলত 'প্রেম'-বিষয়ে এক—যথা: প্রেম অতি মূল্যবান, সূক্ষ্ম, দুরূহ, মহার্ঘ, সুকুমার, দুষ্প্রাপ্য। প্রেমকে হতে হবে নিঃস্বার্থ, নিষ্কারণ। প্রেম প্রয়োজনের চাপে বাঁচে না। প্রেম মূলহারা ফুল, ভাসে জলের 'পরে। হাতের ধরা ধরতে গেলে ঢেউ দিয়ে তায় দিই যে ঠেলে, ধরা দেবার ধন সে তো নয়—অধরা মাধুরী। মোটামুটি বিভিন্ন বিপরীত অ্যাঙ্গেল থেকে এই কথাই বলা হয়েছে। প্রেম অধরা মাধুরী।

BanglaBook.org

মা বলছেন প্রেমকে বাঁচাতে হলে বিয়ে কোরো না। এরাও আরেকভাবে সেটাই বলছে। এদের বক্তব্য: এই অতিবাস্তব অতিস্বার্থ সংঘাতময় জীবনে প্রেমকে ধর যাবে না। ধরতে যেও না। মানুষ বেঁটে হয়ে গেছে। প্রেম জিনিসটা আর আজকের পার্থিব মানুষের হৃদয়ের নাগালে নেই। যেমন বুকের মধ্যে ভগবানের নাগাল ন পেলেই লোকে বলতে থাকে ভগবানে বিশ্বাস করি না। অথচ যন্ত্রণা, অপমান, পরাজয়ের মুহূর্তে হাত বাড়িয়ে দৈবের নাগাল পেতে চায় অবিশ্বাসীও। এরাও তেমনি তাহলে খুব কি একটা ফারাক হয়েছে? বদল হয়েছে প্রেমের তত্ত্বে? বোধহয় না তত্ত্বটা একই আছে। তফাৎ হয়েছে প্রযুক্তিতে। প্র্যাকটিসটা বদলে যাচ্ছে। আমাদের প্রজন্ম আকছার 'প্রেমে-পড়ত'। 'প্রেম-করত' কম। এরা প্রেম করে, প্রেমে 'পড়ে' না। 'প্রেম'-কে ভয় পায়। দায়িত্বকে ভয় পায়। হালকা হয়ে বাঁচতে চায়। এমন সময়ে একটা ফোন এল।

এই ফোন, আর কলিং বেল। কলম ধরেছি-কি-ধরিনি, অমনি দুদিক থেকে এই সাঁড়াশি আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। আর যেদিন বোর হয়ে একা একা ঘরে বসে থাকি, সেদিন দুটোই নিস্তব্ধ! উঠে গিয়ে ফোন ধরি।

"হ্যালো, আন্টি? এনি নিউজ অব টুমপা?"

এই তো। সেধে এসে জালে ধরা দিয়েছে। আরো এক ধাপ নিচের প্রজন্ম, আমার ছোটো মেয়ের বন্ধু। রিমঝিমের সঙ্গে পড়ে। ছোটো মেয়ে কলকাতার বাইরে পড়ছে। আমি খপ করে ধরি:

"হ্যালো, গীতু? তুই প্রেম বিষয়ে কী ভাবছিস?"

"হোয়াট? আর ইউ সিরিয়াস?"

"ভীষণ। প্রেম বিষয়ে তুমি কিছু ভাবছো কি?"

"প্রেম বিষয়ে কী ভাবছি? ডিড ইউ সে দ্যাট?"

"আজ্ঞে হাঁ। প্রেমে বিশ্বাস করিস? না করিস না?"

"ও শিওর। আন্টি! হু ডাজন্ট?"

"সাম সে দে ডোন্ট!"

"দে ওনলি সে সো। ইভন দে ডু।" বলল গীতু সিং। এখনও কুড়ি হয়নি ওদের। "ইউ ডোন্ট বিলীভ দেম, ডু ইউ আন্টি? জগতে কেউ নেই যে সত্যি সত্যি প্রেমে বিশ্বাস করে না। নো ম্যাটার হোয়াট দে সে!"

"বলছিস তুই?"

"নিশ্চয়। পৃথিবীতে প্রত্যেকে প্রেমে বিশ্বাস করে। ডোন্ট ইউ?"

"আমি তো করিই।"

"তবে? তুমিই বরং নাও করতে পারতে। তোমার তো, এক্সকিউজ মাই সেইং দিস, কিন্তু তোমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সটা তো প্রেমের খুব ভালো হয়নি, উইথ আংকল রানিং আওয়ে উইথ অ্যানাদার লেডি? স্টিল তুমিও যদি প্রেমে বিশ্বাস করো, অন্যেরা কেন করবে না? দোজ হু সে দে ডোন্ট, লাই। খবরদার বিশ্বাস কোরো না। ইটস ফ্যাশনেবল টু সে দ্যাট। বুলশিট!"

"ল্যাংগুয়েজ, ল্যাংগুয়েজ!"

"হোয়াট, ল্যাংগুয়েজ? যত মিথ্যেবাদী, ওদের কথা কানে তুলো না। তুমিও যেমন!"

"তাহলে তুই বলছিস যারা বলে প্রেমে বিশ্বাসী নয় তারাও আসলে বিশ্বাস

BanglaBook.org

করে?"

"অফ কোর্স! দে আর ওনলি ওয়েটিং ফর ইট টু হ্যাপেন টু দেম! লুক, আন্টি! সবার জীবনে তো প্রেম আসে না? ইটস আ রেয়ার ইভেন্ট। তাই না? আ মেনি সপ্লেনডারড থিং। তুমিই বলো? ইউ আর দা পোয়েট!"

"আর তুই মনে হচ্ছে প্রেমে পড়েছিস?"

"কে বলল?"

"কে আবার বলবে? তুইই বলছিস! তোর কথাবার্তা!"

"ওয়েল? ইউ মে বি রাইট!" সলজ্জ মৃদুহাস্যের ঝংকার শোনা যায়।

"ছেলেটা ভালো তো?"

"আই থিংক সো।"

"প্রেমে বিশ্বাস করে তো?"

"হোয়াট ননসেন্স—তখন থেকে বলছি সব্বাই করে, এভরি ওয়ান, তোমাকে মুখে যে যাই বলুক, মনে মনে সক্কলেই প্রেমে বিশ্বাস করে আন্টি। কে-না-কে তোমাকে এসে গ্রেপস আর সাওয়ারের গল্প বলে দিল, আর তুমিও সেটা দিব্যি শুনে নিলে! ওসব গুল খেতে নেই! খেতে নেই! ইউ পিপল আর অ্যাবসার্ডলি গালিবল! সত্যি তোমরা বাবা-মায়েরা না,—অ্যাতো সিম্পল!"

"আমরা সিম্পল, গালিবল, আর তোরা পাকাবুড়ি?"

"কোয়াইট। লোকের মুখের কথায় কক্ষনো বিশ্বাস করবে না। কাজটা দেখবে। ট্রাস্ট ইওর কমনসেন্স, নট ইওর ইয়ার্স, যতসব আঁতুড়ামির কথা! কে? কে বলেছে? শুনি? নামটা বলো তো? দেখিয়ে দেবো মজা।"

গীতুর মুখখানা খুবই মিষ্টি, কিন্তু স্পষ্টবাদী। তাড়াক্ স্বভাব। একহাত লড়ে নিতে পারবে। সুদীপ, প্রতিম, দিবাকর, পিকো, কাউকেই তোয়াক্কা করবে না। কাউকে রেয়াৎ করবে না। যা গুণ্ডা মেয়ে গীতু! হঠাৎ একটা কথা বিদ্যুৎচমকের মতো আমার মাথায় খেলে গেল।

"আচ্ছা, গীতু, তোর কি একটা বেগুনীরঙের সোয়েটার আছে?"

"বেগুনী? মভ আছে। একটু লাইট বেগুনীর মতোই। কেন?"

"ও কিছু না। হঠাৎ এমনি মনে হলো।"

এমন সময়ে নিচে আবার রিং হলো। পিকো খোঁচা মারলো, "ওই নাও, ফোন ছাড়ো, হয়তো আবার তোমার কোনো শিকার এসে গেছে। যাও, ঝাঁপিয়ে পড়ো।"

সত্যিই একটি সুদর্শন তরুণ সরলবিশ্বাসে ওপরে উঠে এলো। একে আগে কখনও দেখিনি। লিটল ম্যাগাজিন, না পিকোর বন্ধু, ভাবছি, হঠাৎ পিকো চেঁচিয়ে ওঠে—

"শৈবালদা। শৈবালদা! মা ফোন ছাড়বার আগেই চটপট ওপরে পালিয়ে এসো, আমার মায়ের পাল্লায় পড়ে যেও না যেন! মা তোমাকে দেখলেই প্রেমের কথা বলতে শুরু করে দেবেন কিন্তু...মার দারুণ প্রেমরোগ হয়েছে।"

অপরিচিত তরুণের চোখের সেই উদভ্রান্ত দৃষ্টি আমি জীবনে কোনোদিন ভুলতে পারবো না।

দেশ, শারদীয় ১৩৯০

BanglaBook.org

গল্পসমগ্র

২

নবনীতা দেবসেন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পুস্তকপর্শিনী
৮বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

সূচি

নাট্যারম্ভ

মধ্যরাতের ভয়ঙ্কর	৩
অন্নাচার	১৩
বনলতার পুষ্যি	২৯
চাঁদগড়ার কারিগর	৩৬
ক্ষণপ্রভা	৫১
প্রেমচাঁদিনী	৬৭
আবার এসেছে আষাঢ়	৭৫
নাট্যারম্ভ	৮৮

বসনমামা ও অন্যান্য গল্প

স্পটলেস স্পটেড ডিয়ার	১২১
মেহেরুর টেলার্স (ক্যালকাটা নাইন)	১২৮
দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ	১৩৩
মূলতানী কামধেনু	১৩৭
ডিভাইন পাওয়ার অব এটর্নী বা যোগবিভূতি	১৪৪
দি নেস্ট	১৫০
গুনিয়া ভাই	১৫৪
ইয়াং সায়েবের গাড়ি	১৬০
চোর-চোর	১৬৬
মেজকাকিমার গল্প	১৭২
মেজদির কেচ্ছা	১৮২
মেসোমশায়ের কন্যাদায়	১৯০

সীতা থেকে শুরু

পর্ব এক পৌরাণিকী

মূল-বামাযণ ২১১
বাজকুমাবী কামবল্লী ২১৯
অমবত্বেব ফাঁদে ২৩০
সীতাব পাতাল প্রবেশ ২৩৭
অম্বোপাখ্যান ২৪৯
অভিজ্ঞানদুষ্মন্তম ২৫৯

পর্ব দুই মাতৃয়ার্কি

মাতৃযার্কি (অর্থাৎ বন্দে মাতবম!) ২৬৬
স্কেচ এক—বারো

পর্ব তিন আধুনিকী

এলিজাবেথান সিস্টেম ৩১২
পবভৃৎ ৩১৮
প্রোপ্রাইটাব ৩২২
মুখব নৈঃশব্দ্য ৩২৮

নাট্যারম্ভ

মধ্যরাতের ভয়ঙ্কর

মা বললেন, "খুকু, এ জিনিস চলতে পারে না। তুমি কিনা তোমার মেয়েকে খুন করবার সব ব্যবস্থা করে দিলে। কেন, চার চাকা চালালে কী দোষ ছিল?"

মেয়েকে তো লাইসেন্স করিয়ে দিয়েছি সেই কবেই। সে কিছুতেই চারচাকা ছোঁবে না, তো আমি কী করতে পারি? আর মোপেড কি তাকে আমি কিনে দিয়েছি? একুশ হয়েছে, অ্যাকাউন্ট থেকে নিজেই টাকাটা তুলে কিনে ফেলেছে, বলেছে চাকরি করে শোধ করে দেবে, একদিন না একদিন। আরে, আমারই কি ইচ্ছে মেয়ে খুন করি? মার ধারণা আমি যেমন মার সব কথা শুনে চলি, আমার মেয়েও বুঝি তার মায়ের কথায় তেমনি ওঠে-বসে। আরে জমানা বদল গয়া—এখন আমিই যে দুজনের কথাতেই উঠি-বসি। একবার আমার মায়ের কথায়, আরেকবার আমার মেয়ের কথায়, তা মা বুঝেও বুঝতে চান না। আসলে আমার বড় মেয়েটি প্রবল ব্যক্তিত্বশালিনী। তাকে বকুনি দিতে আমার প্রবলা গৃহধারিণীও সাহস পান না, তাই ঝিকে বকে নাতনিকে শিক্ষা দেবার চেষ্টা। ওদিকে ব্যক্তিত্ব ব্যাপারটিতে আমার বেশ কিছুটা ঘাটতি আছে। কাক-চিলেও ঠুকরে যায় সুযোগ পেলে, মা জননী, কন্যাকুমারী এদের তো কথাই নেই।

"কী বলে এই ডেঞ্জারাস রিস্ক তুমি নিলে? রাস্তাঘাটে গাড়ির ছড়াছড়ি। লাইসেন্স সব নামেমাত্র, ঘুষ খাইয়ে বের করা। কেউই আর জানে না গাড়ি চালানোর প্রকৃত আইনকানুন। যার যেমন খুশি চালাচ্ছে—তারই মধ্যে এই কচি মেয়েটাকে তুমি একা ছেড়ে দিলে—গাড়িঘোড়ার এই অরণ্যের মধ্যে। অরণ্যেও তবু আইনকানুন আছে, বন্যপশুও কিছু কিছু নিয়ম মানে—কলকাতার গাড়িঘোড়া কোনো নিয়মই মানে না। —সাইকেল যে কিছুতেই কিনে দিইনি তোমাকে ছেলেবেলায়, সে শুধু এইজন্যে আর তুমিই কি না আমার অমতে— মার বকুনি চলতেই থাকে। আমি রীতিমতো গাঢ় অভিমান বোধ করি। এ কী অন্যায় বলো দিকি, আমি যা করিনি, যে ঘটনার দায় কোনোমতেই আমার নয়—তার জন্যেও আমাকেই মা বকবেন। উল্টোদিকে মন ধাইতে শুরু। অতএব:

—"এমন কি আর ডেঞ্জারাস, মা? কত ছেলেমেয়েই তো মোপেড চালাচ্ছে। স্কুটার, সাইকেল, মোপেড এসব কি লোকে চালাচ্ছে না? আমি তো ভাবছি, পেট্রলের

BanglaBook.org

যা দাম বাড়ছে দিনকে দিন, এবার থেকে ওব মোপেডটা করেই কলেজে যাবো। মাত্র একজন লোকেব জন্য গাড়িটা চালানো বেশি বেশি এক্সপেনসিভ হয়ে যাচ্ছে।"

মার মুখে অভাবনীয় এক স্বর্গীয় আহ্লাদের বিচ্ছুরণ ঘটে—"তুমি? তুমি চালাবে মোপেড? নাঃ, তুমি চালালে ভালোই চালাবে—রাস্তাঘাটে গাড়ি চালানো তোমার অভ্যেস আছে—সেই ভালো। মেয়েকে বরং গাড়িটা দাও, তুমিই মোপেড নাও। মেয়েটা ছেলেমানুষ, গাড়ি বড়সড় জিনিস, চাব দেযালে ঘেবা থাকবে, সাবধান থাকবে। মোপেড বড্ডই খোলামেলা, কোনো আগল-বাঁধন নেই, ধাক্কা একবাব লাগল তো গেল।"

অর্থাৎ আমি গেলে মাব আপত্তি নেই তত, নাতনি না গেলেই হলো। গাড়ি বেশ বন্ধ দুর্গেব মতো. আব মোপেড যেন অশ্বারোহী। অরক্ষিত।

"মা? মা চালাবেন মোপেড?"

"হ্যাঁ। আব তুমি চালাবে মা'ব গাড়িটা।" দিম্মার সান্ত্বনা মোটেই পছন্দ হলো না মেয়েব। "না. আমাব গাড়ি চালাতে ভালো লাগে না দিম্মা। গাড়ি আমাব চাই না। তবে মা যদি চান মাঝে মাঝে আমার মোপেডটা ওঁকে ধার দিতে আমাব আপত্তি নেই, প্রোভাইডেড উনি ওটা নিযে কলেজে না যান।"

"কেন? কলেজে যাবে না কেন? কলেজেই তো যাবে। পেট্রল খরচা কমানোব জন্যে।"

"আচ্ছা দিম্মা—কী যে বলো না তুমি?" নাতনি হেসেই আকুল। "এখান থেকে যাদবপুর কতটা পেট্রল লাগে? আব এখান থেকে সেই সেন্ট্রাল এভিনিউ কতটা? আমাকে যে গাড়ি নিতে বলছিলে, তাব পেট্রল খবচটা কি ভেবেছিলে?"

—দিম্মা তাতেও অপ্রতিহত। "তুমি তাহলে মিনিবাসে যাবে। আর মা মোপেডে। আব যখন সবাই মিলে বেরুবে, তখন গাড়িও বেরুবে।"

—"বাবে, বাঃ। আমি বলে এত কষ্ট কবে মোপেড কিনলুম, হেলমেট কিনলুম, শাড়ি-গার্ড লাগালুম, সব মিনিবাসে কবে যাবো বলে। না। মোটেই না।" এবারে আমাকে প্রবেশ কবতেই হয়।

—"আবে বাবা, আমি আগে চালাতে শিখি! আমি তো মোপেড কখনও চড়িইনি, চালানো দূবের কথা। চালাতে যদি পারি তবে তা নিযে বেরুবো। কিন্তু কলেজে কেন যাওয়া বাবণ সেটা শুনি?"

"কেননা আমাব বন্ধুবা হাসবে।"

"হাসুক গে তোমাব বন্ধুবা, লোকে অমন কত হাসে! কোনো ভালো কাজই কবা যায না লোকে কী বলবে ভাবলে। মোপেড যদি চালাতে পারি, তবে সর্বত্র যাবো কিন্তু।"

"পারবে না কেন? না পারার কী আছে? খুব সোজা। অতি সহজ। গাড়ি

BanglaBook.org

চালানোর মতন নয়। অতরকম হাতেপায়ে বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম একসঙ্গে করবত করতে হয় না সারাক্ষণ, নাচ শেখার মতন। স্টার্টিংটাই কায়দা লাগে কেবল, একবার স্টার্ট করলে, চলতেই থাকে। প্যাডলও করতে হয় না। সাইকেলের চেয়েও সোজা। তুমি একবার দেখে নিলেই শিখে যাবে, মা। কিন্তু শিখে ফেলেই আমার গাড়িটা মোনোপলাইজ কোর না বাপু। মাঝে মাঝে চড়তে চেয়ে নিও।"

এই চেয়ে নেবার ব্যাপারটা আমার মনের মতো হলো না। কিন্তু আমি বললুম শুধু, "আগে তো শিখি।"

"চলো না, শিখবে? এখনই শিখিয়ে দিচ্ছি।" মেয়ে উদার সুরে আহ্বান জানায়। কিন্তু আমি কোথায় একপায়ে রাজি থাকব তা নয়, আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, "না, না। এখন থাক। এখন নয়। এখন ভর দুপুরবেলা, চাদ্দিকে লোকজন। সবাই দেখবে। রাত্তিরবেলা রাস্তাঘাট ফাঁকা থাকবে, তখন সেফটিও বেশি। তখন শিখব। লোকে দেখলে কী ভাববে।"

"এই না বলছিলে, লোকের কথা ভাবলে জীবনে কোনো বড় কাজই করা যায় না?"

"এটা তো তেমন কিছু বড় কাজ নয়, তুচ্ছ বিদ্যে, এর জন্য লোকের কথা ফেস করাটা নট ওয়ার্থ ইট। রাত্তিরে হবে এখন।"

হায়। রাত্তির তো হবেই। কখনও না কখনও। হলোও। মা বললেন—"খুকু, এই তো দিব্যি রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে গেছে। যা এইবেলা মেয়ের কাছে চট করে মোপেড চালানোটা শিখে নে বরং।" আমারও পছন্দ হলো কথাটা। বয়েস হয়ে, মা দিনে ঘুমোন, রাতে জাগেন। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও অনেক রাত্তির অবধি জেগে জেগে গুলতানি করি। রাত তখন সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। পথঘাট সত্যি ফাঁকা। বাড়িবাড়ি আলোও নিবে গেছে। প্রতিবেশীরা নিশ্চিন্ত নিদ্রায়। কারুকে বিব্রত করার ভয় নেই। নিচে নামলুম। সঙ্গে দুই কন্যা ও কানাই। ঝকঝকে কালো ঘোড়ার মতো নতুন তেজী মোপেড দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে। ছোটো মেয়ে সাইকেল দিব্যি চালায়, কিন্তু মোপেডে নিরুৎসাহ। ("ওরে ব্বাবা ও আমি পারব না।") বড় মেয়ে বলল—"এই দ্যাখো হ্যানডেল। এই হচ্ছে অ্যাকসেলারেটর, এই ব্রেক। দুটোই হাতে, পায়ের কিছুই নেই এতে। শুধু স্টার্টটা পায়ে করে। ওদিকে ঘোরালে অ্যাকসেলারেট করবে, এদিকে ঘোরালেই বন্ধ। এটা হচ্ছে ব্রেক। দেখে নাও। আর এই পায়ের কাছে এইভাবে এটাতে ঝাঁকি মেরে আর হাতে এইটে টিপে এই যে দেখে নাও, স্টার্ট করতে হবে। এটা কিন্তু শক্ত। ভালো করে দেখেছ?"

"গীয়ার-টিয়ার? কোনদিকে?"

"নেই। এটা গাড়ি নয়। এটা আসলে সাইকেলই। কেবল মোটরে চলে। প্যাডলও আছে, তেল ফুরোলে প্যাডল করে চলে। তবে একটু ভারী লাগে। এই যা। নাও এদিকে দ্যাখো—কী দেখছো অন্যমনস্ক হয়ে? এদিকে তাকাও।"

BanglaBook.org

"ওদের বাড়িতে একটা আলো জ্বলছে।"

"জ্বলুক, ওটা তো রোজই জ্বলে। ওটা ওদের সিঁড়ির আলো। স্টার্ট দেবার পরে, স্ট্যাণ্ডটাকে এই যে, এই জিনিসটা, আগে নামিয়ে দেবে। এমনি করে। এবার গাড়িটা চলবার উপযুক্ত হলো। প্রথমেই স্টার্ট দেবে, এমনি করে, বুঝেছো? তারপর —আমি আগে চালিয়ে দেখিয়ে দিই বরং—তুমি দেখে শিখে নাও। দ্যাখো এইভাবে চড়ে বসবে— মেয়ে তো ব্লু জিনস পরা, লাফিয়ে উঠে বসলো। আমি যতই উচ্চে তুলি না কেন শাড়িটা, কক্ষনো ওভাবে উঠে বসতে পারব না।

"স্টার্ট দেবার পরে গাড়ি স্ট্যাণ্ড থেকে নামিয়ে সিটে বসবে, একটু পরে উঠতে হয় এতে বুঝলে? গাড়ির মতো নয়, আগে উঠে বসে পরে স্টার্ট দেয় না—এমনি করে অ্যাকসেলারেট... মেয়ের গলা আর শোনা গেল না। প্রবল ভট-ভট শব্দের মধ্যে দূরে মিলিয়ে গেল। দ্যাখ না দ্যাখ ঐ মোড়ের কাছে পৌঁছে গিয়ে বাঁই করে ঘুরে আসছে। ফিরে এসে স্পীড কমিয়ে—"এই দ্যাখো, মা, এইভাবে ব্রেক কষছি—" বলতে বলতে মেয়ে আস্তে করে থেমে গেল। অন্ধকারে অবশ্য কিছুই দেখা গেল না। কেমনভাবেই বা সে স্টার্ট করেছিল ঐ গাড়ি, কেমনভাবেই বা সে অ্যাকসেলারেট করল, আর কেমনভাবেই ব্রেক কষছে। কিন্তু সেটা মুখ ফুটে স্বীকার করতে আমার বাধলো। ইতিমধ্যে আমাদের বাড়ির বকে রোজ শুয়ে থাকে একটা বিটায়ার্ড ঠিকে কাজের মেয়ে, রানী, সে মহা উৎসাহে উঠে এসেছে। আর উল্টোদিকের টিউবওয়েলে জল খাচ্ছিলেন এক বৃদ্ধ ভিখারি—হাতে বাটি, লাঠি, বগলে পুঁটলি। তিনিও এসে কানাইয়ের সঙ্গে বাতচিত শুরু করেছেন। দুর্গা বলে এগিয়ে যাই। প্রথমে আমি মেয়ের দেখাদেখি ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিতে চেষ্টা করি, কিছুতেই হয় না। মেয়েই স্টার্ট দিয়ে দিল। তারপর প্রায় হাঁটু অবধি শাড়ি উঠিয়ে "যা থাকে কপালে" বাঘের পিঠে জগদ্ধাত্রীর মতো তো অধিষ্ঠিত হলাম পাদপীঠে। পা বাস্তায়। ছোট মেয়েটা ভীতু। সরু গলায় "ওমা? মা? পড়ে যাবে না তো?" বলে উঠল। বড়টি সাহসিকা—'চুরুর তো। পড়বেন কেন? মা তো সাইকেল চালাতেন কলেজে। সাইকেল প্রতিযোগিতার তিন-তিনটে মেডেল আছে না?"

"হ্যাঁ তা থাক, কিন্তু শান্তিনিকেতনেই সেবার তো সাইকেলে চড়তে গিয়ে ধাঁই করে মা পড়ে গিয়েছিলেন, মনে নেই?"

ছোট মেয়ের দ্বন্দ্ব ঘুচতে চায় না।

"সে অনভ্যাসের দরুন। সাঁতার আর সাইকেল কেউ ভোলে না। জানিস?"

"—জানি। কিন্তু মা যে আলাদা। মা তো সেবার মহালয়ায় সাঁতার কাটতে গিয়ে গঙ্গায় ডুবেও যাচ্ছিলেন; আমরা স্বচক্ষে দেখেছিলুম না? অথচ মার তো লাইফ সেভিং সার্টিফিকেট আছে দিম্মার আলমারিতে। আছে না?"

আমি আর পারি না। "য্যায্যাঃ—যত্তোসব বাজে কথা। হঠাৎ ডুবব কেন? শাড়িতে পা জড়িয়ে ধরেছিল তাই। আর সাইকেল যে আজকাল চড়তে পারি না সেটা তো কেমব্রিজে সেই অ্যাক্সিডেন্টের পরে, সাইকোলজিকাল ব্লক থেকে।"

"কী অ্যাকসিডেন্ট, মা?" দুজনেই ব্যাকুল।

"ঐ যে, টিউটরের কাছে যাচ্ছিলাম তো. অন্যমনস্ক হয়ে চালাচ্ছি, হঠাৎ একটা পার্কড ভিহিকলের সঙ্গে একটা থেমে থাকা লাল, দোতলা বাসের সঙ্গে, ধাক্কা লেগে রাস্তায় পড়ে গেলুম। আর ঠিক সেইখানেই পুলিশ ব্যাটা ডিউটি দিচ্ছিল।...সেই থেকে কেমন ভয় ধরে গেছে। চলে আসার সময়ে আমার লাল টুকটুকে সাইকেলটা বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ পার্থ দাশগুপ্তকে দিয়ে এসেছিলুম। সে তখন ট্রিনিটিতে আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট ছাত্র। দেখা হলে জিগ্যেস করিস।"

"খুব হয়েছে। এখন এটা চালাও দিকি।"

"এই তো? এমনি করে তো? বেশ, একটু ঠেলে দে আগে, নইলে এগুবো কী করে?"

—"ঠেলবো কি গো? নিজে নিজে যাবে। স্টার্ট তো দিয়েই দিয়েছি, এবার দু'পাশে পা রাখো, হ্যাঁ,...ব্যাকটা তুলে নাও...হ্যাঁ...ব্যাঃ এবারে অ্যাকসেলারেট..."

বলতে না বলতেই গাড়ি তীরবেগে বেরিয়ে যায়। আমি সমেত। দু'পাশে দুই কন্যা প্রাণপণে ছুটছে, পিছনে পিছনে কানাই, তার পিছনে বাটি লাঠি পুঁটুলি বগলে বৃদ্ধ ভিখিরি, তিনিও খুবই জড়িয়ে পড়েছেন এই এক্সপেরিমেন্টে। আর রানী আমাদের বাড়ির সামনে রাস্তার ওপরে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে গলা চিরে চেঁচিয়ে চীয়ার-গার্লের কর্তব্য পালন করছে। চেঁচাচ্ছি অবশ্য আমরা সকলেই, কিন্তু ঠিক ঐকতানে নয়। যে যার স্বকীয়তা বজায় রেখে। একেই কি বলে হার্মনি?

বড় কন্যা—"ঠিক হচ্ছে মা, ঠিক হচ্ছে, চলতে থাকো"—

ছোট কন্যা—"ওরেব্বাবা মাগো পড়ে যেয়ো না যেন—দেখো বাবা। ওগো, মাগো, যেন পোড়ো না"—

কানাই—"অ দিদি। অ দিদি। অত জোরে ন-য—আস্তে করুন, আস্তে করুন—

ভিখিরি বৃদ্ধ—"ওগো তোমরা সবাই থামো না একটু।—তোমরা একটু থামো দিকিনি —আমার বৌদিদি ঠিকই চলে যাবে এখন দুগগাঃ দুগগাঃ—অত কথা বললে কি আর মাথার ঠিক থাকে কাউর"—

রানী—"ও মাগো, কী হবে গো? এ কী কাণ্ড গো? বাড়ির গিন্নি যে মপেডও চালাচ্চে গো"—

মোপেড—"ভটর ভটর ভ্যাট ভ্যাট ভ্যাট ভ্যাট"—

আমি—(মনে মনে ইষ্টমন্ত্র, আর মুখে)

—"ওরে ওরে নামবো যে রে—ওরে নামবো—ওরে থামবো কী করে—ওরে এটা যে থামছে না রে"—

BanglaBook.org

ছুটতে ছুটতে মোপেড-শিক্ষিকা দ্রুত ইন্সট্রাকশন দিতে থাকেন—

—"স্পীড কমিয়ে দাও, স্পীড কমিয়ে দাও, পা মাটিতে, পা মাটিতে ঠেকিয়ে দাও, মাটিতে পা ঠেকিয়ে—"

ছুটতে ছুটতে কাঁদো কাঁদো ছোট মেয়ে—"পা মাটিতে পা মাটিতে, অমা গো, পা মাটিতে মা—"

ছুটতে ছুটতে কানাই—

—"দিদি, দাঁইড়ে পড়ুন—পা মাটিতে নাবিয়ে ফেলুন, দাঁইড়ে পড়েন—নাবিয়ে দ্যান-পা-টা"

ছুটন্ত ভিকিবি—"বৌদিদি আপনিই লেবে পড়বে—তোমবা আব ওকে ঘাবড়ে দিওনি—বৌদিদি আপনিই লেবে যাবে খনি—তোমবা চেঁচানি থামালিই উনি লেবে পড়বে—"

উচ্চকিত বানী—"আব উদিগে যেয়ে কাজ নি গো দিদিমুনি—ডুব হয়েচে—উদিগপানে আব যেয়োনি—উদিগে গরু—গুতিয়ে দিবে, উদিগে গরু"—

...আব 'যেয়োনি'। হুঁ। যেয়ে তো পড়েইছি। একেবারে খাটালেব সামনে। ফুটপাতেব ওপবে গোল হয়ে বসে নিবীহ বিহাবী গয়লাবা ঢোলক বাজিয়ে গলা ছেড়ে ভোজপুবী বামাহো গাইছিল:

—"বোযি বোযি পাতিযা—লিখলবা বজমোতিযা—আববে বোযি বোযি"—তাবা প্রাণের আনন্দে আব ঢোলেব শব্দে আমার প্রাণঘাতী ভ্যাট ভ্যাট শুনতে পাযনি। সহসা উদিত হয়ে তাদেব জলসা থেকে ইঞ্চিখানেক দূবে ঠাশ করে গাড়িটাকে ফেলে দিযেই সার্কাসেব কাযদায় সাড়ে তিন হাত লম্ফ দিয়ে ওদেব উল্টোদিকে নেবে পড়লুম। সেও চমৎকাব স্পেস সেন্সেব প্রমাণ দিযে, গোববগাদা থেকে আধ মিলিমিটাব তফাতে। গাড়ি পপাত, গয়লাবা অনাহত, আমিও অনাহত। সবাই ঠিকঠাক। শাড়ি ঝাড়তে ঝাড়তে ভাবলুম—"অনেকটা সাইকেলেব মতোই"—ততক্ষণে হাঁপাতে হাঁপাতে আমাব বেজিমেণ্ট এসে পড়েছে। বীবগর্বে বলি—"বেশ সোজা। ঠিকই বলেছিলি, অনেকটা সাইকেলেব মতোই।"

বড় মেযে (সস্নেহে)—"দেখলে তো? এই তো বেশ চড়তে পেবে গেলে? গুড।"

বৃদ্ধ ভিকিবি—"কিন্তু বৌদিদি অতো ডাইনে-বাঁযে প্যাঁচ কষছিলেন ক্যানে? সিধে যেতে পাবেন নাকো? সিধে যাওযাই তো ভালো।"

কানাই, (সগর্বে)—"আব একটু প্র্যাকটিস কল্লিই সিধে যেতে পাববেন—ব্যালান্সটা এসে যাবে—প্রেথমবাবেই দিদি প্রায়ই শিখেই ফেলেছেন"—

ছোট মেযে, (সভযে)—"থাক, আব শিখে কাজ নেই। এই পর্যন্তই থাক। মা আব একটু হলেই গয়লাদেব চাপা দিযে দিচ্ছিলেন। নিজেও গোববগাদাতে পড়ে যাচ্ছিলেন, অল্প একটুব জন্যে, নেহাৎ বাই চান্স—"

BanglaBook.org

বানী (দূর থেকে, অদৃশ্য দেবতাদের নমস্কার করে)—

—"দুগ্গা—দুগ্গাঃ! অ বড়দিদি ছোড়দিদি, তোমাদের মা জননীকে এবার ডাকো —ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিইরে নে এসো বাছারা—আর মপেট চালিয়ে কাজ নি গো মায়ের—ঈ কী পেহাড়"—

বাইরে রাজ্যজয়ের মতো মুখের ভাব হলেও আমার বুকের ভিতর দুরু-দুরু। সেই যে দোলনচাঁপার ক্ষুদে ছেলেটি বয়েতে একটা সরু সাঁকো পার হতে হতে বলেছিলো না,—"আই অ্যাম নট অ্যাট অল আফ্রেইড,—কিন্তু মনে মনে বিসোন ভয়—" ঠিক সেই অবস্থা।

গয়লারা তো গানবাজনা বন্ধ করে প্রাণভয়ে, "হায় রাম!" বলে ঢোল ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে। গরুগুলো নেহাত খোঁটায় বাঁধা, কিন্তু তারা বহুদ্রষ্টা প্রাণী, ঠিকই বুঝেছে একটা কিছু ভয়ংকর কাণ্ডকারখানা সংঘটিত হতে চলেছে। একটা বেয়াড়া গরুর ভয় পেয়ে গিয়ে অকস্মাৎ গলা ছেড়ে কেঁদেই উঠলো—"হাম্বা-উ-উ"...কী লক্ষণে গরু রে বাবা।

নাঃ। এদিকটাতে সত্যিই আর প্র্যাকটিস করা যাবে না দেখছি। ইতিমধ্যে আমাদের দলে রাস্তা থেকে আরও একজন কর্তাব্যক্তি এ-পাড়ার প্রহরী সারমেয়টি, এসে যোগ দিয়েছেন। তিনি সবলে সরু ল্যাজ নেড়ে নেড়ে উৎসাহ দিচ্ছেন, আমি আত্মস্থ পদক্ষেপে, স্থিতধী-স্টাইলে মোপেডটি হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে আসছি, সঙ্গী সারমেয়ও ধীরপদে সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে আসছেন। মহাপ্রস্থানের স্মৃতি মনে না পড়ে উপায় নেই।

সে যাই হোক, এদিকটায় আর নয়। এবার বরং পূর্বদিকে, মাননীয় জ্যোতিবাবুর বাড়ির ওদিকটায় যাই। ওখানটায় খাটাল নেই, গয়লা নেই, গোবর নেই, গরু নেই, বাছুর নেই। শুধু ঘুমন্ত পুলিশ আছে কিছু। কেননা ওখানে জ্যোতিবাবুও নেই।

যেমনি ভাবনা তেমনি কাজ। আমাদের বাড়িটা যেহেতু তিনমাথার মোড়ে, তাই ভাবনা বহুমুখী। পশ্চিমে আর নয়, এবার পূব-দক্ষিণে। ও মোড়ে পৌঁছেই, হু-ই-শ—সামনে টানা ফাঁকা রাস্তা...চালাও পানসি বেলঘরিয়া। স্টীয়ারিং হ্যানডেল এবার ডাইনে-বাঁয়ে নয়, নাকের সিধে। এবারেই পারফেকশানে পৌঁছে যাবো। চমৎকার রাস্তা। একদম ফাঁকা।

কিন্তু এ কী হলো হঠাৎ? বাপরে মরে গেলুম, মরে গেলুম। ছ্যাঁক করে পায়ের তলে একটা গরম আগুনের ছ্যাকা কে যেন লাগিয়ে দিলে। ওমন আপনা আপনি হাত কেঁপে উঠে অ্যাকসেলারেটর ঘুরিয়ে ফেলেছি ছ্যাঁকার চোটে, সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় রবারটের স্টাইলে লাফিয়ে উঠে জ্যামুক্ত তীরের মতো নাকের সোজা ছুটলো আমার সপ্ত-ঘোড়ার বাহন, একেবারে পুষ্পকরথের মতো—মাটিতে না আকাশপথে তাও ঠিক বুঝতে পারছি না—কানে এলো পরিত্রাহি চীৎকার—সবার ওপরে আমারই গলা:

আমি—"আমি নামবো, ওরে আমি নামবো"

ছুটন্ত বড় কন্যা—"ব্রেক, ব্রেক, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকসেলারেটরটা উল্টোদিকে ঘোরাও—ব্রেক, ব্রেক।"

ছুটন্ত ছোট কন্যা—"অ মা মাগো, নেমে পড়ো মা, ব্রেক দিয়ে দাও মা, ব্রেক —মা গো অ মা"—

ছুটন্ত কানাই—"ব্রেক ডান হাতে, অ দিদি, ব্রেকটা ডান হাতে, দিদি, ব্রেক ডান হাতে"—

ছুটন্ত ভিকিরি—"ওরে মুখপোড়া তুই থাম না রে, বৌদিদি ঠিকঠাক বেরেক মারবে, তোরা থামলিই বেরেক মারবে, তোদেরকে চেঁচাতে হবে নে ব্যাটারা"—

বাড়ির সামনে দণ্ডায়মান রানী—"হায় হায় হায়—হয়ে গেল! এইবার ঠিক সব্বোনাশ হবে গো—হে মা দুগগা—হে মা দুগগতি নাশিনি—রক্ষে করো মা—"

ছুটন্ত কুকুর—"ঘৌ ঘৌ ঘৌ ভৌ ভৌ ছৌ ছৌ ছোঃ ছোঃ"

উড়ন্ত আমি—"ওরে এয়ে থামচেনারে—ওরে এয়ে থামচেই না—"

ছোট কন্যা—"হে ভগবান"—

ভগবান শুনতে পেলেন। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর বাড়ি 'ইলাবাস' আর শিল্পী সুনীলমাধব সেনের বাড়ির মাঝবরাবর ভগবান প্রচুর বালি ঢেলে রেখেছিলেন। যেন আমারই প্রতীক্ষায়। পাখির মতো উড়ে গিয়ে আমার মোপেড সেই ঐশ্বরিক বালুকাবেলায় সজোরে ঢুকে পড়লো। মোপেডসুদ্ধু আমি বালির মধ্যে নিঃশব্দে পড়ে গেলুম। চমৎকার চাঁদনি রাত। বালিতে শুয়ে শুয়ে মাথার ওপর চেয়ে দেখলুম, চাঁদের মুখখানা হাসি হাসি। নক্ষত্রের শ'য়ে শ'য়ে চোখ টিপুনি। কী গো? কেমন হলো? লাগলো কেমন? বেশ ভাই!

ততক্ষণে পাড়ার সবগুলো বারান্দাতেই আলো জ্বলছে। একটা অডিয়েন্স তৈরি হয়ে গেছে। প্রতিবেশীরা সবাই বাইরে। শুধু পুলিশেরা ভিতরে। সার্কাস দেখার উত্তেজনা বাতাসে খেলে বেড়াচ্ছে। প্রত্যেকেই উত্তপ্ত, প্রত্যেকেই বিজড়িত, প্রত্যেকেরই একটা পয়েন্ট-অফ-ভিউ আছে। দীপঙ্করটা থাকলে একটা ওপিনিয়ন পোল নিয়ে নিতো—ভাগ্যিস সে ব্যাটা অনুপস্থিত। পড়শীরা সকলে যার যতোটুকুন সাধ্য উদ্দীপনা যোগাচ্ছেন—সেই যখন একটি ছেলে ওই কেয়াতলার মোড়ে সাত-দিন টানা সাইকেল চালাবে বলে ঘোষণা করে তিনদিন একটানা সাইকেল চালিয়েছিলো—ঠিক তেমনি টেনস আবহাওয়া তৈরি হয়েছে। উত্তেজনায় উলটো সিগারেট ধরিয়ে সামনের বাড়ির দাদা বলছেন—"পিকো, তোর মাকে চার চাকাতেই মানায় ভালো"—নাইটির ওপর হাউসকোট চড়িয়ে বৌদি বলছেন, "টুম্পা, মোপেডটা মাকে ধরতেই দিস না।" বালি ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়াই। চতুর্দিকে সহানুভূতি চাঁদের আলোর মতো বয়ে যেতে থাকে।

"কী খুকুভাই? লেগেছে নাকি?"

—"একটু আধটু না পড়লে হয়? জলে না নামিলে কেহ শেখে না সাঁতার সাইকেল শেখে না কেহ না খেয়ে আছাড়"

BanglaBook.org

—"ঘাবড়াস না রে খুকু, আর ক'টা দিন প্র্যাকটিস করলেই তুই ঠিক তোর মেয়ের মতন চালাতে পারবি—"

"ও কিছু না, লেগেছে ভাবলেই লাগবে—মনে কর পড়িসনি।" কুকুরবন্ধুপী মহাত্মা বললেন—

"নাবদ নাবদ লাগলাগ দূর দূর ভাগ ভাগ ভৌ ওউ যাও যাও ঘরের মেয়ে ঘরে আও।" লাঠি-বাটি-পুঁটুলি সামলে সমানেই কানাইয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়েছেন বৃদ্ধ ভিকিরি। আমার এই পাবলিক রথসঞ্চলনে তিনি যারপরনাই বিমর্ষ। আমার মোপেড প্রশিক্ষণের যৌথ পরিশ্রম তো কম ক্লান্তিকর ছিল না। তিনি এখন কানাইকে ডেকে বলছেন—"ভাইটি একটু টিউকলটা পাম্প করে দেবে? টুকুনি জল খাবো।" দিদির কীর্তিতে সলজ্জ, নির্বাক কানাই, হাঁটু অবধি প্যান্ট গুটোনো। আমার মেয়ের মোপেড ঠেলে নিয়ে আসছে। দুই মেয়ে দুই পাশে ঘন হয়ে লেপ্টে এসে দুই কানে গুনগুন করে বলছে "বেশি লাগেনি তো? মাগো? বেশি লাগেনি তো?" আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি না খুঁড়িয়ে সহজভাবে, এবং গ্রেসফুলি হেঁটে বাড়িতে ঢুকে পড়তে। কপিলদের ক্যাচ লুফে আউট করে দেবার পরে ইমরান খান যেভাবে আস্তে হেঁটে সেদিন প্যাভিলিয়নের দিকে আসছিলেন (আহা আউট হয়েও কী গ্রেস, কী পয়েজ)—অনেকটা সেইভাবে একদিকে মাথা ঝুঁকিয়ে স্টাইলিশভাবে পা ফেলবার চেষ্টা করছি—পথের দু'পাশে চেনা-অচেনা উৎসাহী দর্শককুলের গার্ড অব অনারের মাঝখান দিয়ে। কিছু সদ্যোস্নাত বিকশোন্মুখীর পাশাপাশি গয়লারাও ও-মোড় থেকে হেঁটে এ-মোড়ে চলে এসেছে, তারিফ দেখতে। এমনকী মহামান্য পুলিশরাও আড়মোড়া ভেঙে উঠে এসেছেন। কেবল গরুগুলোই যা খোঁটা উপড়ে ছুটে আসতে পারেনি।

কান গরম, পা জ্বলে যাচ্ছে, কোনোরকমে যেন কিছুই হয়নি ভাব করে বাড়িতে এসে পৌঁছেই কাতরে উঠলুম—"বার্নল। বার্নল। আমার পা পুড়ে গেছে।"

—"পা পুড়ে গেছে? সেকি? রাত দুপুরেও বালিটা গরম ছিলো নাকি?"

—"কেটেকুটে যায়নি। পুড়ে গেল? সে আবার কি?" রানী কপাল চাপড়ে বললো—"পুড়বেনি? পুড়বেই তো। কলিকাল। দিনে দিনে আরো কতো কী চোক্ষে দেখবো কে জানে?"

কানাই বড় শান্ত ছেলে। ইতিমধ্যে গাড়িটি পরীক্ষা করে খুব গরম একটা জায়গা বের করেছে যেটা চামড়াতে ঠেকলে ছ্যাঁকা লাগবেই লাগবে। কিন্তু সেখানটা মোটেই চামড়াতে ঠেকার কথা নয়। আমার চড়ার গুণেই ঠেকে গেছে। কানাইয়েরও কখনো ছ্যাঁকা লাগেনি, পিকোরও নয়। ওরা তো দিব্যি নিরাপদে চালিয়েছে। ওদের নিঃশব্দ হাস্য আগ্রাহ্য করে মার কাছে চলে এলুম। খোঁড়াতে খোঁড়াতে। মা ঘরবন্দী মানুষ। বারান্দায় বেরুতে পারেন না। ওদিকে রাস্তায় যে কীদৃশ নৈশবিপ্লব ঘটে যাচ্ছে মা কিছুই টের পাননি। এক মুখ উজ্জ্বল হেসে মা আমাকে রিসিভ করলেন।

—"আয়। বোস। হলো শেখা?"

—"ওই একরকম।"

—"পারলি চালাতে?"

ঠিক এমন সময়ে কানাই এসে বললো:

—"দিদি, বার্নল।"

—"বার্নল? কেন রে, বার্নল কী হবে?"

—"পা পুড়ে গেছে দিদির।"

—"খুব লেগেছে, না মা? দেখি দেখি—"

—"আশ্চর্য। আমরাও চড়ি, কখনো পা পোড়ে না, তুমি পোড়ালে কেমন করে বলো তো?"

—"পা পোড়ালি কি না গাড়ি চালাতে গিয়ে? একি বান্নাবান্না? আশ্চর্য মেয়ে বাপু।"

—"ওই মোপেডের এগজস্ট পাইপে ছ্যাঁকা খেয়ে গেছেন।"

—"সেকি রে? খুকু? সত্যি।" কন্যার গাড়ি চালানোর চমৎকারিত্বে অপরিসীম বিশ্বাসী মা-বেচারীর দুই চোখে বিস্ময় বিস্ফারিত বেদনা। অর্থাৎ মার চোখ বলছে —"অ্যাদ্দিন কলকাতা শহরে গাড়ি চালিয়ে শেষে কিনা এ-ই?" গাড়ির এগজস্ট পাইপ থেকে যে পায়ে ছ্যাঁকা লাগতে পারে, মা মাকে সে ব্যাপারটা বোঝাই কী করে?

—"বেশি লাগেনি। একটুখানি ফোস্কা।" লজ্জিতভাবে বলি।

—"দেখি, দেখি? ও ব্বাবা। এ যে অনে—কখানি রে?" মা কিছুক্ষণ বিমর্ষভাবে চুপ করে থাকেন। মেয়েরা সযত্নে বার্নল লাগিয়ে দেয়। মা দ্যাখেন। ফার্স্ট এড শেষ হলে, মা ফোঁস করে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়েন। আমি তাড়াতাড়ি বলি— "ফোস্কাটা সেরে গেলেই আবার"—

—"থাকগে, যাকগে। ও আর হলো না। তোমার আর মোপেড চালিয়ে কাজ নেই মা, তুমি তোমার চার চাকার যন্তর নিয়েই থাকো। পিকো যেটা পারে, তুমিও সেটা পারবে, আমি এইটে ভেবেছিলুম।" মা মর্মাহত। অক্ষম সন্তানের উচিত সঙ্কোচেই আমি অনেকখানি মাথা ঝুলিয়ে দিয়ে চুপ করে থাকি। সত্যিই তো। পারিনি। মোপেড আমি চালাতে পারিনি। তবু সাহস করে বলে ফেলি:

—"পায়ে ছ্যাঁকাটা যদি না লাগতো মা—"

—"পিকোর কি ছ্যাঁকা লেগেছিলো?"

—"ও তো জিনস পরে।"

—"তোমাকে জীনস পরতে কে বারণ করেছিলো? যে দেবতার যা মন্তর।"

BanglaBook.org

—"যাঃ বাবা। মোপেডের জন্যে জীনস পরে শেষে যাদবপুরে? থাক মা, আমার ভাঙাচোরা গাড়িটাই ভালো!"

পরদিন কলেজে যাবো, গাড়ি বের করছি। রানী বকে বসে মুড়ি খাচ্ছে। আমাকে দেখে হেসে হেসে চোখ নাচিয়ে নাচিয়ে বললে:

—"এই তো, দিব্বি মাইনেচে এবারে। বলি। পায়ের সেই ফোস্কাটা আজগে আচে কেমনি? বুইলেনি গা দিদিমুনি, ঝার কম্মো তারে সাজে অন্যঝনের নাঠি বাজে। ঝো বয়সের ঝা।"

অজাচার

প্রথম দৃশ্য

BanglaBook.org

দাদামণির শোবার ঘর। ঢুকেই দেখলুম গলায় একটা মটকার চাদর ঝুলিয়ে আয়না-আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে নানারকম মুখভঙ্গি করে হেসে হেসে চোখ ঘুরিয়ে দাদামণি—"এসো দাদু? এসো দাদু?" বলছেন। আমাকে আয়নায় দেখতে পেয়ে একটু অপ্রস্তুত হাসে—"এই যে খুকু, আয় আয়। আমি কি বলে, ওই দাদুগিরিটা একটুখানি প্র্যাকটিস করে নিচ্ছিলুম আর কি। টুলুরা এক্ষুনি এসে পড়বে কিনা। গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি নাতিবাবুকে আনতে। দাদুগিরিটা, বুঝলি খুকু, ঠিক যেন যুৎসই হচ্ছে না—"

—"যুৎসই আর হবে কি করে? সাতচল্লিশ আটচল্লিশ বছরের ছেলেরা এখনো বোররার সকালে হাপ্পান্টি পরে রাস্তায় ক্রিকেট খেলে বেড়াচ্ছে। আর তুমি সাত তাড়াতাড়ি নাতি-টাতি ম্যানুফ্যাকচার করে ফেলে আহ্লাদে গদগদ। কৈগো বৌদি, এককাপ চা।"

—"আই অ্যাম অলওয়েজ আহেড অফ মাই টাইমস", দাদামণি বললেন, "কিন্তু নাতি বানানোর ক্রেডিটটা আমার নয়, মেয়ে-জামাইয়ের। তবে নাতিটা একটা দারুণ জিনিস হয়েছে। যাই বলিস। টুলু-বুলু কিন্তু এমন ট্যালেন্টেড ছিল না।"

—"তিন মাসেই ট্যালেন্টের এত কী দেখলে?"

—"বাঃ, ট্যালেন্ট নেই? আমাদের প্রত্যেকের মুখ চেনে। ফ্যারেক্স খায় না। চাঁপাকলা খায় না। থু থু করে ফেলে দেয়। সবরিকলা খায়। মুসুম্বির রস খায় না। কমলালেবুর রস চেটেপুটে খেয়ে নেয়। এর মধ্যেই মায়ের দুধের সঙ্গে বোতলের দুধ খাচ্ছে। ট্যালেন্ট নেই?"

—"টুলু-বুলুও যথেষ্ট বুদ্ধিমান, ব্রাইট ছেলে-মেয়ে।"

—"কোথায়? জানিস খুকু—বুলু আজ আমাকে কী অপমান করেছে? নাতিবাবুর মুখে বোতল ধরাটা একটু প্র্যাকটিস করবো বলে হর্লিক্সের বোতলে জল ভরে বুলুকে যেই না ডেকেছি, আফটার অল ওই তো কোলের সন্তান—'বুলা আয় তো বাবু, একটু শো তো দেখি আমার কোলে এসে'—অমনি কি বলবো, খুকু, যেন পেট্রল-বম্ব বার্স্ট করলো।—কী বললো জানিস? বললে:—'ডোণ্ট টক ননসেন্স, বাবা! কী, হচ্ছেটা কী? এখন আমি পড়ছি। আমাকে ডিস্টার্ব কোরো না, বলে দিলাম।' এমনিতে তো কখনোই "আমি পড়ছি" এই সেন্টেন্সের কনস্ট্রাকশন হতে দেখি না বাড়িতে। ভাবতে পারিস তোর মেয়েরা তোকে এরকম বলছে?"

—"খুব পারি। বাবার কোলে শুয়ে ক্লাস নাইনের ছেলে হর্লিক্সের বোতলে করে জল খেতে রাজী হয়নি কেন,—এ নিয়ে অভিযোগ ত্রিভুবনে একমাত্র তুমিই করতে পারো দাদামণি।"

এমন সময়ে বৌদি ঘরে এলেন। সরু কোমরে লাল ডুরে শাড়ির আঁচল জড়ানো। কাঁধের ওপর দিয়ে মোটা কালো বেণীটা সামনে এসে পড়েছে, কপালের সিঁদুরটিপ ঘামে লেপটে মুখখানা আরো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, আরো নিরীহ। মুখের চারপাশে উড়ো চুল, হাতে দু'কাপ ধোঁয়ানো চা। সাজলে গুজলে বিয়েবাড়িতে বৌদিকে নতুন বউ বলে ভুল করতেই পারে লোকে। মেয়ের বিয়েতেও এমনিই বিনুণী ঝুলিয়ে মাকড়ি দুলিয়ে লাফিয়ে বেড়িয়েছেন, এখন দিদিমা হয়েও নো চেঞ্জ। বেয়াল্লিশেই থার্ড জেনারেশনে উন্নীত হয়ে বৌদির বেশ অহংকার হয়েছে মনে হয়। এখনো বৌদি নিজের মেয়ের সঙ্গে শাড়ি-ব্লাউজ বদলা-বদলি করে পরেন, ছেলে-মেয়ের বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে হিন্দি ছবি দেখে, ফুচকা খেয়ে বেড়ান। বৌদিকে ঢুকতে দেখেই দাদামণি বললেন— "ওকি? ডুরে শাড়িটা ছেড়ে ফ্যালো। এখন থেকে তুমি শাদা জামা শাদা শাড়ি পরবে। আর আমাকে কেবল শাদা শাদা আদ্দির পাঞ্জাবী করিয়ে দেবে। আরও একটা জরুরি কথা। বিনা চাদরে কিন্তু রাস্তায় বেরুবে না।"

—"চাদর?" —বৌদি তো অবাক। মানে অ—বাক। তারপর বলেন—"কেন? চাদর কী হবে? এখন তো গ্রীষ্মকাল।"

—"শীত-গ্রীষ্মের কথা হচ্ছে না। যে বয়েসের যা। পাবলিক প্লেসে ঠাকুমাদিদিমাদের গায়ে চাদর মুড়ি না দিলে মোটে মানায় না। বুঝেছ? বি সেনসিবল।"

—"সেনসিবল? এই গরমে চাদর মুড়ি দেওয়াটা সেনসিবল?" বৌদির চোখ কপালে উঠলো। মেজাজও। খুব শান্ত গলায় বললেন, "তোমাকে না মানায়, তুমি বরং চাদর জড়িয়ে মানানসই হও গে যাও, আমার অত মানিয়ে কাজ নেই—আমি যেমন আছি তেমনই থাকবো।"

ঠক করে টেবিলে দু'কাপ চা নামিয়ে রেখে বৌদি বেরিয়ে যান।

আমাদের জন্য কাঁকড়া রাঁধতেই গেলেন নিশ্চয়। ছুটির দিনে দাদামণির বাড়ি

BanglaBook.org

যাবার প্রধান কারণ বৌদির রান্না। রান্নাঘর থেকে এবার বৌদির গলা শোনা যায়—"বাপ রে বাপ। নাতি যেন জগতে আর কারুর হয়নি, ওঁরই প্রথম।"

দ্বিতীয় দৃশ্য

দাদামণির বৈঠকখানা ঘর। দাদামণি কোলে তোয়ালে পেতে, বোতল ধরে নাতিকে দুধ খাওয়াচ্ছেন। বৌদি রান্নাঘরে। টুলুবুলুকে নিয়ে জামাইবাবাজী মর্নিং-শোতে সিনেমা দেখতে গেছে। আমি মনে মনে ধাই-মার ভূমিকায় দাদামণির ঔৎকর্ষ বিচার করছি. আর রান্নাঘরের চমৎকার সব উড়ে-আসা গন্ধে আমোদিত হচ্ছি। রেকর্ডে মেহেদী হাসানের গজল, শুনতে শুনতে নাতি দুধ খাচ্ছে।—"মেহেদী হাসানটা ওর খুব পছন্দ বুঝলি? বুলা ইংরিজি পপ-সং লাগালেই ও ডুকরে কেঁদে ওঠে। শালার কিন্তু খানদানি টেস্ট আছে।" দাদামণি সগর্বে বলছেন, এমন সময়ে হন্তদন্ত বসনমামার প্রবেশ। গায়ে কালো কোট, হাতে শোলার হ্যাট, পায়ে বুটজুতো।

—"আরে সুন্টু, শোনলাম তর নাকি নাতি হইসে? হেইযা নাকি নাতি? বাঃ বাঃ গ্র্যাণ্ড! টুলুর পোলাখান ত দেহি টুলুর বরের থিক্যাও হ্যাণ্ডসাম হইসে। হেল্লো, জেন্টেলম্যান। হাউ ডযু ডু? তা—তুমি খাও কী? কী খাওযাইতাসো বটলে কইব্যা? সুন্টু? বটলে কী বস্তু? বেবিফুড না তো?"

—"বেবিফুড না তো কী? বেবি বেবিফুড খাবে না তো কি শাম্পেন-কাভিযার খাবে, বসনমামা?" শুনে বসনমামা চমকে ওঠেন। দাদামণির শ্লেষ-টেশ গায়েই মাখেন না।

—"সর্বনাশ! কও কি? পইজনন...! পইজন-ন...! খাইসে, কি গেসে। ইংরাজী পত্রিকা-ঠত্রিকাগুলার কিসুই আর পড়স না তরা। হেই দিনকাইল কি আর আছে রে? যে বেবিফুড খাইযা ভীমভবানীর লাহান মাসকিউলার বডি হইবো? অহন তো সবই অ্যাডালটারেইটেড। সব ভেজাল, সব নকল। হেইযাও জানস না? তেতুলের বীচি আর ধুতুরা ফলের গুড়ার ফাইন মিকশ্চার। তিন বৎসর থিক্যা চশমা। গ্যালপিং মাইওপিয়া। বিশ বৎসরে ছানি। শ্লো পইজনিং কিনা? পঁচিশে টোটাল ব্লাইনডনেস। ত্রিশে পক্ষাঘাত অর্থাৎ পেরালিসিস। চল্লিশে শ্যাষ। অথবা সিনাইল। একিউট প্রোটিন ডেফিশিযেনসি হইয়া ব্রেইন ফাংশনিংডা নষ্ট কইরা দেয। আর এডিশনাল কমপ্লিকেশনস তো আছেই—আট থিক্যা দশে গেস্ট্রিক ট্রাবুলস বিগিন করবো, বিটুইন টেন টু ফোরটিন হরমোনাল কমপ্লিকেশনস—আর—"

—"এ মা গো! কী হবে তাহলে? এসব কী বলছেন গো বসনমামা?" আর্তনাদ করে বৌদি ছুটে এসেছেন রান্নাঘর থেকে। হাতে খুন্তি। দাদামণিও ভয় পেয়েছেন। নাতির মুখ থেকে বোতল সরিয়ে নিয়েছেন। নাতি রেগেমেগে বুথ সাহেবের বাচ্চা হয়ে গিয়েছে। মেহেদী হাসানকে গ্রাহ্য না করে পেল্লায় চেঁচাচ্ছে। একমাত্র ভীষ্মলোচন

BanglaBook.org

শর্মা ছাড়া তাকে আব কেউ এঁটে উঠতে পাববে না এখন। সেই চিৎকাব শুনে কেঁপে উঠে অগত্যা বসনমামা বললেন, "দিযা দে। দিয়া দে সুটু! এই টাইমের লেইগ্যা বটলটা দিযাই দে। বাপস। নাতির লাংস দুইখান কী।"

—কিন্তু দে বললেই তো দেওযা যায না। দাদামণিব বোতল ধবা হাত আব ওঠে না নাতিব মুখে। বেগে নাতি পা ছুঁডছে। দাদামণিবই নাতি বলে এখন বেশ তাকে চেনা যাচ্ছে। আব দাদামণিব মুখেব দিকে একপলক চেযেই তাঁব মনেব কথাগুলো আমি স্পষ্ট বুঝতে পাবছি। বিশে ছানি? বলে কি? চল্লিশে শেষ? দাদামণি নিজেই তো আটচল্লিশ। দিব্যি শত্রুর মুখে ছাই দিযে হু হু করে উন্নতি কবছেন। আজ জাপান কাল আলজিবিয়া পবশু কামচকাটকা—তবে কি একেই বলে সেনিলিটি? ...অবশেষে দাদামণিব বাক্য ফুটলো—

—"বসনমামাব এই প্যানিক সৃষ্টি কবাব স্বভাবটা আব গেল না। দূব দূর। প্রতিমা, তুমি যা কবছিলে, কবো গে যাও।" বৌদি গেলেন না। বললেন—"ভয দেখিয়ে বসনমামাব লাভ? শুধু শুধু ভযই বা দেখাবেন কেন?"

—"আমাদেব মামাকে তুমি বেশি চেনো? না আমি?"

—দাদামণিব এহেন দুর্বল বিতর্কে কান না দিয়ে বৌদি আকাশ থেকে পডলেন:

—"তাহলে কী হবে মামাবাবু? মাযেব তো দুধে কুলোবে না? নাতিবাবু খাবে কী?" বসনমানাব উত্তব বেডি ছিল:

—"ক্যান? দুধ? হক্কলে যা খায। গোদুগ্ধডা অহনই দিযা কাজ নাই, গুরুপাক। অবশ্যি গোদুগ্ধ নামে যা মাল বাজাবে পাওযা যায, হেইযা গুরুপাকও না, লঘুপাকও না। প্রপাব মিল্কই না—গরু ভঁইস পাইডাব মিল্ক সবকিছু গঙ্গাজলে মিশাইযা, ঘ্যাট পাকাইয়া গো-দুগ্ধ বইল্যা বিকায। ছাগদুগ্ধডাই যা আন-অ্যাডালটাবেইটেড আছে। ছাগদুগ্ধ পানে অমৃতপানেব ফল হয।"

—"ছাগলেব দুধ? হ্যাঁ হ্যাঁ শুনেছিলাম বটে ল্যাকটোজেনটা নাকি ছাগলেব দুধেব বেসিক কম্পোজিশনেব মতো কবেই তৈবি হয—"

—"মতো কইবা হইলে কি হইবে? হেইযা তো কালাবাজাবে অ্যাডালটাবেইটেড হইয়া তবে তোমাগো হাতে আসে। ফ্রেশ ছাগদুগ্ধ সংগ্রহ কর সুটু। ছাগদুগ্ধ হাড় শক্ত কবে, ব্রেইন শার্প কবে, কোষ্ঠ পবিষ্কার কবে। ছাগদুগ্ধেব গুণেব সীমা নাই —পিত্তকফেব কোপ নিবসন কবে. হজমশক্তি বর্ধন করে। বোঝলা বৌমা? ছাগদুগ্ধ দৃষ্টি, শ্রুতি, স্মৃতি. বুদ্ধি, বলবর্ধক। যক্ষ্মাকাশ. হাঁপকাশ, হৃদবোগ অবশ্য নিবাময কবে—"

—"আব ক্যানসাব সাবায না? কুষ্ঠবোগ নিবাময কবে না?"—দাদামণির বিদ্রূপ গ্রাহ্য না কবে বসনমামা কনটিনিউ কবেন—

—"শুন, বৌমা, ছাগদুগ্ধেব লাহান এমুন উপকাবী বস্তু শিশুদেব পক্ষে আর কিসুই নাই। গান্ধীজীর কথাডাই মনে কইবা দেখ—তিনি কী কইতেন? কইতেন

BanglaBook.org

—'আমাগো জীবনই আমাগো বাণী।' আমিও হেইডাই স্মরণ কবাইযা দিতাসি। ওনাব সাথে সাথে একপাল দুগ্ধবতী ছাগ সর্বত্র ট্রাভেল কইবা বেড়াইত, মনে নাই? বিনা ছাগলে উনি জাতিব জনক হইতেন কিনা সন্দেহ আছে! আমি বাবা বেইল কম্পানিব লোক, আমি সব জানি।" বসনমামা হাসলেন। অর্থপূর্ণ হাসি। —"বেগুলাবলি ঐ ছাগদুগ্ধডা খাইতেন বইল্যাই গান্ধীজী ক্যাবল কৌপিন পইবা শীতে-গ্রীষ্মে ঝাড়া আশিডা বৎসব দিব্য বাইচ্যা আছিলেন। মাথাডা ঠাণ্ডা বাইখ্যা ইংবাজেব বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা লড়াই চালাইতে পাবছিলেন। বোঝলা বৌমা?" বসনমামা টুপিটা টেবিলে বেখে বসলেন এতক্ষণে। বুট খুলতে খুলতে বললেন—"ছাগদুগ্ধের সাত্ত্বিক গুণ অসামাইন্যা। প্যাট, মাথা, শবীল শীতল বাখে। এই গবম দ্যাশে যেইডা কিনা অত্যাবইশ্যক। অর্থাৎ এসেইনশিযাল। গান্ধীজী হইলেন গিযা হেইযাব বেইস্ট এগজামপুল। কুল ট্যাম্পাব, ক্যালকুলেটেড ওযার্ডস—অমন ফাইন সেন্স, অমন ধীব বুদ্ধি পলিটিকসে আব তো কাবোবই দেখি নাই। মৃত্যুব মুহূর্তে পর্যন্ত ওনাব মাথা কী ঠাণ্ডা—খুঁজেডাবে ফার্স্টে গালি দিতেই নিসিলেন, কিন্তু নেক্সট মৌমেইন্টে পাবলিকের কথা স্মবণ কইবা, ব্যাস —বাস—ক্যাবল "হাবাম'টুক কইয্যাই চুপ। এক্কেবে ফুলস্টপ। ঈশ—দেখ দেহি, কী সেইলফ কনট্রোল। কী লাস্ট মৌমেইন্ট ক্যালকুলেশন। "হাবাম—" ছিল ইনকমপ্লিট অ্যাডজেকটিভ হইযা গেল গিযা 'হা—বাম।' কমপ্লিট ইন্টারজেকশন। এই উপস্থিত বুদ্ধিব মূলে কী? না,—ছাগদুগ্ধ।"—বসনমামা মাস্যাব কৌটো বেব কবলেন।

বৌদিব চোখেমুখে ততক্ষণে গভীব শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে। দাদামণি নাতি কোলে বাবান্দায পাযচাবি কবতে গেছেন বলে মুখ দেখতে পাচ্ছি না।

—"কিন্তু মামাবাবু, ছাগলেব দুধ এখন পাই কোথায?"

—"বাজভবনে।" বৌদিব প্রশ্নেব উত্তবে বারান্দা থেকে দাদামণিব গলা আসে। —"মেড ইন আফগানিস্তান। দেড লক্ষ টাকা দামেব ফবেন ছাগল পাবে। একটা চুবি গেছে—কিন্তু আবেকটা আছে। একটা ফোন কবে দ্যাখো না বাজ্যপালকে, তোমাকে দুধ বেচবেন কিনা।"

—"তোমাব সবটাতেই ঠাট্টা। যোগাড কবতে পাববে না তাই বলে দাও না?"

—"পাববে না? কে না জানে কলকাতা শহবে টাকা ফেললে বাঘেব দুধ পাওযা যায, আব ছাগলেব দুধ পাওযা যাবে না? কী যে ছেলেমানুষী কথা বলো না তুমি, প্রতিমা।" দাদামণি অন্যমনস্ক হযে নাতিব মুখে বোতলটা কখন ফেব গুঁজে ফেলেছেন; সেও শান্ত হযে ঘুমিযে পড়েছে। ঘরে এসে নাতিকে খাটেব ওপব সাবধানে নামিয়ে বেখে দাদামণি বৌদিকে বললেন:—"কবে চাই?" বসনমামা এটাতেও ইমপ্রেসড না হয়ে প্রশ্নটা অগ্রাহ্য কবে বললেন—"বৌমা, তোমাগো এবিযায ইশে নাই? আই মীন ছাগলওযালা? আর্লি মবনিঙে বাস্তায টুং-টাং টুং-টাং ঘন্টিব শব্দ পাও না?"

—"আছে! আছে।" বৌদি নেচে ওঠেন। "মনে নেই গো? টুলুবুলুবা ভোরবেলা কুকুর নিয়ে হাঁটতে বেরুলেই বাজা কী ভয়ানক তাড়া লাগায় ওই ছাগলগুলোকে? ছাগলওলাটা তো বেগেমেগে ছড়ি নিয়ে টুলুবুলুকেই তেড়ে আসে—" দু'হাত শূন্যে তুলে বসনমামা নেচে ওঠেন—"বাস। হেইডাই হইল তোমাগো এরিয়ার ছাগলওয়ালা। তুমি অবেই কন্ট্র্যাক্ট কর। মান্থলি কন্ট্রাক্ট কইব্যা, মাইপ্যা দুধ নিবা। জ্বাল দিয়া, এট্টুক পানি, ব্যস। হইযা গেল বটলে ভর্তি, দীর্ঘজীবন সুখ, শান্তি।"

তৃতীয় দৃশ্য

আমাদেব বাড়িব বাবান্দা। তখনো ভালো কবে ভোব ফোটেনি। কাকপক্ষীবও ঘুম ভাঙেনি ঠিক ভালোমতন, সূর্যঠাকুবেবও খোঁযাড়ি কাটেনি। আধো ঘুমে মনে হলো যেন পথ দিযে কারা চমৎকাব ভজন গাইতে গাইতে যাচ্ছে। তাই আবছা আধো-জাগবণেব অবস্থাতেই বাবান্দায বেবিযে এলুম স্বপ্ন না সত্যি জানতে। চমৎকাব দৃশ্য। ঠাণ্ডা নীলচে গোলাপী বাতাসে একদল মাঝবযসী স্ত্রী-পুরুষ মিছিল কবে ভজন গাইতে গাইতে পথপবিক্রমা কবছেন। একেই বোধহয় ব্রাহ্মমুহূর্ত বলে। গানে লীড দিচ্ছেন একটি মোটা দক্ষিণী মহিলা, আমাব চশমাবিহীন নজবে যাকে আশা ভোঁসলে বলে মনে হলো। গলাটিও খুব মিষ্টি। হঠাৎ দেখি মিছিলেব পেছু পেছু আপনমনে ছুটন্ত ও কে? দাদামণি না? দাদামণি তো—ও দাদামণি। দাদামণি! কোথায চললে এত ভোবে?" দাদামণি ছুটতে ছুটতে বললেন—"গুড মর্ণিং।"

—"তুমিও এই গুরুব শিষ্য হযেছো নাকি?"

চশমাব ফাঁকে, দাদামণি তাঁব বড বড চোখ তুলে মৃদু হেসে বলেন—"পা—গল। দি গ্রেটেস্ট চীট সাউথ অফ দি হিমালযাজ—" দৌড় কিন্তু বন্ধ হয না।

—"তবে?"

পবনে শাদা শর্টস, শাদা গেঞ্জি ভুঁড়িব সঙ্গে ঘামে এঁটে আছে, পাযে ধবধবে মোজা। কেডস জুতো। মুষ্টিযোদ্ধাদেব স্টাইলে হাতদুটো মুঠো বেঁধে, কোমবেব কাছে কনুই থেকে ভাঁজ কবে বেখেছেন। ছন্দে ছন্দে পা ফেলে ছোটার মতন ভঙ্গিতে দ্রুত হাঁটছেন দাদামণি, তালে তালে কনুইসুদ্ধ হাতদুটি এগুচ্ছে পেছুচ্ছে। একটা মুঠোয একটা ঠোঙা। ঠোঙায কোন খাদাবস্তু তা বোঝা যাচ্ছে না। হাঁপাতে হাঁপাতে দাদামণি উত্তব দেন—"একা একাই জগিং কবতে যাচ্ছিলুম—ওদেব পেযে জুটে গেছি—যা ছিনতাই,—দিনকাল ভালো না—বুঝলি তো?"

—"তোমাব কাছে ছিনতাইযেব মতো কী আছে? হাতে তো ঘড়ি নেই?"

—"পকেটে আছে। প্যান্টেব পকেটে। পার্সও আছে।" ছুটতে ছুটতে দাদামণি চেঁচিযে বলেন—মিছিল যেহেতু ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে, তাই বেশ জোবেই বলতে হয। আবো জোবে চেঁচিয়ে যোগ দেন—"পার্সে দু'শো টাকাও আছে"—একেই গান

চলছে, তায় দূরত্ব। না চেঁচালে শোনা যাবে না, তাই আমিও চেঁচাই—

—"ভোরবেলা এত টাকা দিয়ে কী করবে?"

—"দিনটা ভালো,—বায়না দিতে যাচ্ছি—"

—"কিসের বায়না?" মিছিল মোড় ঘুরছে। চীৎকার করে উত্তর দেয় দাদামণি—

—'ছা—গ—লে—এ—এ—র..."

চতুর্থ দৃশ্য

মাসখানেক পরের কথা। বাজার। হঠাৎ বৌদির সঙ্গে দেখা। বৌদির হাতে একঠোঙা ভিজে ছোলা। মুখেও নিশ্চয় চিবোচ্ছেন দু'চারটি, কেননা চোয়াল নড়ছে। তাঁর সামনে এক বুক পর্যন্ত গেঞ্জী গোটানো ছাগলওয়ালা, এবং অনেকগুলি ছাগল। ছাগওয়ালার মুখে যেমন দাড়ি, তার ছাগলগুলোরও ঠিক তেমনি দাড়ি। কে কে কার সঙ্গে ম্যাচ করে রেখেছে, দেখে বোঝবার উপায় নেই। বৌদি নিচু হয়ে একটি বিশিষ্ট ছাগলকে ছোলার ঠোঙাটা অফার করলেন। ছাগলটি ঢুঁ মেরে ঠোঙা ফুটো করে ছোলাগুলো রাস্তায় ছিটিয়ে ফেলে শূন্য ঠোঙাটায় মনোনিবেশ করলো। অন্যান্য ছাগলেরা মাটিতে ছড়ানো ভিজে ছোলা খেতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বৌদি বললেন:—"দূর দূর। এই বোকা ছাগলে চলবে না।"

—"ছাগল দিয়ে কী করবে, বৌদি?" যেন আমাকে দেখে খানিকটা ভরসা পেলেন বৌদি।

—"এই যে খুকু। দ্যাখ তো, ছাগলটা কী স্টুপিড?"

—"ছাগল তো স্টুপিডই হবে। তা ছাগলের বুদ্ধি দিয়ে তোমারই বা দরকার কী?"

—"আমার কেন হবে—তোমার দাদামণির খেয়াল। উনি ওঁর নাতিকে দুধ খাওয়াচ্ছেন। ছাগলের দুধ। এ-বাড়িতে রাজকুমারই নিয়মিত দুধ দিয়ে এসেছে" আমি মাঝখানে প্রশ্ন, "রাজকুমার কে?"

—"রাজকুমার মানে এই ছাগলওয়ালাটি। ওর কিন্তু শেয়ালদায় আমের গুদোমও আছে— জানিস তো? বড়লোক আসলে— চেহারা দেখে যা ভাবছিস তা নয় —যা হোক এতদিন তো দুধের ব্যবস্থাটা এখানেই হচ্ছিল, এবার নাতি বাপের বাড়ি ফিরে যাবে। উনি তাই সঙ্গে ছাগলসুদ্ধু দিয়ে দিতে চান—নাতির যাতে দুধ খেতে অসুবিধে না হয়—"

—"নাতির যাতে দুধ খেতে অসুবিধে না হয়, তাই ছাগলসুদ্ধু উপহার? বাঃ। এ যে দেখছি সেই সাবেকী স্টাইলের দাদামশাই-দিদিমার মতো কাণ্ডকারখানা করছো তোমরা। চমৎকার তো?" মুখে চমৎকার বললেও মনে মনে বলি দাদামণিটার সবটাতেই যেন বাড়াবাড়ি। নাতি যেন কারুর হয় না। সতেরো বছরে মেয়ের বিয়ে

BanglaBook.org

দিলে আঠারোয় তার বাচ্চা হতেই পারে এবং সেক্ষেত্রে অমন যুবতী দিদিমা সমেত ষণ্ডাগুণ্ডা দাদামশাই হওয়াটা বিচিত্র কিছুই নয়। দাদামণির ভাবটা যেন ওঁর আগে ত্রিভুবনে কোনো দাদামশাই জন্মায়নি। তবে একথা ঠিক, বৌদির ব্যাপারটা একটু আলাদা। পিঠে বেণী ঝুলিয়ে, কানে মাকড়ি দুলিয়ে ক'জন তরুণী দিদিমা ভিজে ছোলা খেতে খেতে ঠোঙাটা অফার করতে পারে রামছাগলকে?

—"বেজায় বোকা বাপু তোমার এই ছাগলটা, রাজকুমার।" গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বৌদি বলেন— "এটাকে দিয়ে সত্যিই চলবে না। ছোলা ফেলে দিয়ে ঠোঙা চিবোয়। ওর দুধ খেলে আমার নাতিবাবুও বুদ্ধু হয়ে যাবে। কি বলিস খুকু? ঠিক বলিনি?"

—"বাস বাস। উসকো ছোড দিজিয়ে মাঈজী। উও বুদ্ধুসে আপকা ক্যা কাম? ম্যৈঁ আপকো মেরী মুন্নিকো দে দুংগা। মুন্নি, মুন্নি, মুন্নিবাঈ সবসে আচ্ছী মুন্নিবাঈ—" হঠাৎ 'দেশ হামারা হিন্দুস্তানে'র সুরে ছাগলওয়ালা গান জুড়ে দেয়, আর সঙ্গে সঙ্গেই "ম্যাঁ এঁ এঁ এঁ" করে বেশ কচি কচি মিষ্টি গলায় একটা ধুয়ো শুনতে পেলুম। বৌদি অমনি খিলখিল করে হেসে ওঠেন। কথায় কথায় হেসে ফেলায় তাঁর জুড়ি নেই। রাজকুমারের গোঁপদাড়ির ফাঁকে চোখদুটি গৌরবে জ্বল জ্বল করে ওঠে — "দেখিয়ে মাইজি দেখিয়ে, ক্যায়সী প্যারী! আদতে মেরি মুন্নিকি আওয়াজ শুনিয়ে, কিতনী মিঠি বোলি! মেরে সাথ হরবক্ত বাত কর লেতী হ্যায় মুন্নি।"

বৌদি মুগ্ধ নেত্রে একমনে রাজকুমারের বক্তৃতা এবং ছাগলের মিঠি বোলি শুনছেন। এদিকে আমার কলেজের দেরি হয়ে যাচ্ছে। অগত্যা পরম গুণবতী ছাগলগণ এবং তাদের গদগদ গার্জেনের হাতে বৌদিকে একা ফেলে রেখে বাজার করতে এগোই। একবার তাকিয়ে দেখে নিই, গলাটা অত কচি হলে কি হবে, জব্বর দাড়ি আছে মুন্নিবাঈয়ের। আর গায়ের রঙটি তো একদম দাদামণির ফেভারিট ব্র্যাণ্ড— "ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট।"

পঞ্চম দৃশ্য

কয়েকদিন পরে। রাস্তা। দুপুরবেলায় ঠুনঠুন করে ঘণ্টি বাজিয়ে একটা রিকশা যাচ্ছে। তাতে দিব্যি আয়েশ করে বসে আছে চেক লুঙ্গি আর সানগ্লাস পরা সেই রাজকুমার ছাগলওলা, আর তারই পাশে, জড়োসড়ো হয়ে, নাকে রুমাল চেপে ধরে, নাক মুখ সিঁটকে এক কোণে সরে বসে আছেন বৌদি। পায়ের কাছে গম্ভীর, উদাস এবং বাশভারি এক ছাগল। সেই দাড়িওলা ব্ল্যাক-অ্যাণ্ড-হোয়াইট, মুন্নি। দাড়ি নাড়তে নাড়তে নিবিষ্টচিত্তে কলকাতার দোকানপাট দেখতে দেখতে যাচ্ছে। নাকে রুমাল ধরা অবস্থাতেই বৌদি আমাকে দেখতে পেয়ে একগাল হেসে হাত নেড়ে দিলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

ফের রাস্তা। আরো ক'দিন পরে। ভোরবেলা। দাদামণি আজ একাই জগিং করছেন। পরনে সেই গেঞ্জী আর হাফপ্যান্ট, পায়ে সেই মোজা আর কেডস। তেমনি ভুঁড়ির দু'পাশে দুই মুষ্টিবদ্ধ হাত গুটিয়ে ছন্দে ছন্দে ছুটছেন। খুব সিরিয়াসলি। চোখে চশমা নেই। আমি বারান্দায় ঝুঁকে ডাক পাড়ি:

—"অ্যাই দাদামণি, কোথায় যাচ্ছো?"

—"টুলুর বাড়িতে।" ছুটন্ত উত্তর পাই।

—"এভাবে হাপ্ল্যান্ট পরে বেয়াইবাড়ি যাবে?"

—"ওয়ার্ক হোয়াইল ইউ প্লে"—

—"পায়ে হেঁটেই নিউ আলিপুর অব্দি যাবে?"

—"নিউ আলিপুর ইজ নট ওভারসীজ—"

দাদামণি মোড় ঘুরে যান।

সপ্তম দৃশ্য

রবিবার। দাদামণির বাড়িতে খেতে বসেছি। ডাটা চিবোতে চিবোতে বৌদি বললেন—

—"সেদিন টুলুর বাড়িতে যাচ্ছিলুম রে, ছাগল পৌঁছে দিতে।"

—"সে তো বুঝেছি। তা, দুধ-টুধ দিচ্ছে সব ঠিকঠাক?"

—"দিচ্ছিল। তবে এখন একটু গোলমাল হয়েছে।"

—"আবার কি হলো?"

—"প্রথম প্রথম তো? রাজকুমারকে ছেড়ে তো আগে কখনো থাকেনি? তাই মুন্নি সারারাত্তির কাঁদছিল। তাতে টুলুর শ্বশুরমশায়ের ভয়ানক হাই প্রেশার হয়ে শরীরটরির খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এইসা করুণসুরে ব্যা ব্যা করে ডাকতো যে উনি ঘুমোতে পারতেন না। ছাগল থাকে সিঁড়ির তলার কুঠরিতে আর শ্বশুরমশাই থাকেন ঠিক তার সামনের রড ঘরে। বোঝ কী ঝামেলা।"

—"তারপর?"

—"তারপর ইনি গিয়ে বললেন ছাগলের তো খোলামেলায় থাকা অভ্যেস ছিল, এই চোরাকুঠুরিতে এসে নিশ্চয় ওর গরম হচ্ছে। শেষে টুলু মোড়ায় বসে বসে ছাগলকে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতে—তবেই সে থামলো।"

—"ছাগলকে হাতপাখা দিয়ে বাতাস? কী আরম্ভ করেছো তোমরা বৌদি?"

—"ছাগল না থামলে যে শ্বশুর যায় যায়? তাই ছাগলকে তো সেবা করতেই হবে। তারপর বোঝা গেল যে শুধু গরমই নয়, মশা। মশার কামড়ে মুন্নির সারা

BanglaBook.org

গা-টা দাকড়া দাকড়া ফুলে গেল। তোমার দাদামণি তক্ষুনি অর্ডার দিয়ে নেটের মশারি করিয়ে দিলেন, চারিপাশে ইঁট চাপা দিয়ে তাকে মেঝের ওপর স্বস্থানে এঁটে রাখার সুব্যবস্থাও হলো। ক'দিন দিব্যি ছিল। তারপর একদিন মুন্নি কী ভেবে আধখানা মশারিই চিবিয়ে খেয়ে ফেললে। পণ্ডিত সাধে বলেছে, ছাগলের বুদ্ধি।"

—"তাহলে, এখন?"

—"তারপর ওডোমস। সেও চলল না। দিনে এক ছাগলে দু' টিউব খরচা হয়ে যায়। কত আর ওডোমস লাগাবে? এবারে আমিই বুদ্ধি দিলুম গোয়ালের মতন ধুনো জ্বেলে সন্ধে দিতে, আর কচ্ছপধূপ জ্বালাতে। খুব কাজ দিলে। তার চেঁচানি বন্ধ হলো। কিন্তু দুধও।"

—"তাহলে? দুধ বন্ধ হলে কী করবে? কী খাওয়াবে?"

—"বন্ধ কেন হবে? ছাগলকে আরেকবার পাল খাওয়াতে হবে—তাহলেই দুধ দেবে।"

—"কী খাওয়াতে হবে? পাল? কেন, ছোলাটোলা আর খাচ্ছে না বুঝি?

—"পাল খাওয়ানো জানিস না?" বৌদির জোড়াভুরু কপালে ওঠে। গলা থেকে হতাশার নায়েগ্রা ঝরে পড়ে।

—"এত লেখাপড়া শিখেছিস, পাল খাওয়ানো মানে জানিস না?"

বাধ্য হয়ে স্বীকার করি—"নাঃ, ঠিক জানি না—মানে—জিনিসটা কী?"

—"শহুরে মানুষ, জানবিই বা কেমন করে? কিছুই তো দেখিস না, কিছুই শুনিস না।" —খুব ওপর থেকে দয়াময়ীর মতো বলেন বৌদি। নিজে যেন অজ পাড়াগাঁর এক বিজ্ঞ ব্যক্তি, সবই জানেন, সবই শুনেছেন, এরাবের মতো শহুরে অজ্ঞতার সকল দৈন্যকে মার্জনা করে দিচ্ছেন এমন গলায় বৌদি জানান—

—"পাল খাওয়ানো মানে হলো গরু ছাগলের বাঁটে যাতে দুধ আসে তার বন্দোবস্ত করা। বুঝলেন মেমসায়েব? যাতে তারা মা হতে পারে, সেই ঘটকালি করাকে বলে পাল খাওয়ানো।"

—"অ।" একটু লজ্জা পাই। ব্যাপারটা জানা উচিত ছিল।

—"কিন্তু তুমিই বা এতসব জানলে কি করে বৌদি?"

আমিও ছেড়ে কথা কইবার পাত্রী নই।

—"রাজকুমার বলেছে।" কিঞ্চিৎ লজ্জা বৌদির গলায়।

—"তাই বলো। তা সেসব ঘটবে কী উপায়ে? ঘটক কৈ? তোমাকে এখন ছাগলের জন্যে পাত্র খুঁজতে হবে নাকি? সম্বন্ধ চাইলে বোববারের আনন্দবাজারটা বেস্ট। অনেক পাত্র পাবে। বিজ্ঞাপন দিয়ে দাও।"

—"অত রসিকতার আর কাজ নেই। নিজের দ' দুটো মেয়ে পার করতে হবে মনে রেখো। এখন তারা ছোটো বটে, কিন্তু ভবিষ্যৎ পড়ে আছে।" বৌদি ভয় দ্যাখান। "ছাগলের ব্যবস্থা ছাগলওলাই করেছে। তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি তোমারটা ভাবো।"

—"ও, এইসব কারণেই তাহলে গেল হপ্তায় দাদামণিকে দেখলুম ভোরবেলা গেঞ্জি গায়ে ছুটতে ছুটতে নিউ আলিপুর যাচ্ছেন। বেয়াইবাড়ি কেউ অমন ড্রেসে যায়? তুমি বারণ কর না কেন?"

—"তোমার দাদা যান। আমার বারণ উনি শুনবেন?".

—"আচ্ছা জ্বালা হয়েছে তো ছাগল নিয়ে?" —"জ্বালা বলে জ্বালা? প্রাণান্তকর পরিশ্রম হচ্ছে। তোমার দাদাকে তো প্রায়ই এখন নিউ আলিপুরে যেতে হয় ছাগলের জন্যে। ভোরের সময়টাই সুবিধে।"

—"দুধ কেনই বা দিচ্ছে না? প্রথমে তো দিচ্ছিল?"

—"তা দিচ্ছিল। তারপর বন্ধ করল। লোকে বললে রোজ যে লোক দোয়ায়, সেই লোক না দুইলে অনেক সময় নতুন হাতে গরু ছাগলে দুধ দিতে চায় না। তারপর অনেক সাধ্যসাধনা করে রাজকুমারকেই ট্রাম ভাড়া দিয়ে প্রত্যেকদিন পাঠানো হতো, ভোরের ট্রামে নিউ আলিপুর গিয়ে দুধ দুয়ে দিয়ে আসার জন্যে। সে গিয়ে আদরটাদর করে দুধ দুইতে চেষ্টা করতো। প্রথম প্রথম তাতে কাজও হয়েছিল।"

—"তারপর?"

—"তারপর আর কি, তবুও বন্ধ করলে। ছাগলের ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করেছিলুম, কিন্তু তার আর দরকার হলো না। রাজকুমার কী উপায়ে যেন ছাগল নাড়ি-টাড়ি পরীক্ষা করে, নিজেই রোগ আবিষ্কার করেছে। বলছে নতুন করে পাল না খাওয়ালে সে ছাগল আর দুধ দেবে না। এখন তো সেইজন্যে ছাগল নিয়ে গেছে। রোজ দুধ দিয়ে আসছে অবশ্য নাতিবাবুকে।"

—"পাল খাওয়াতে পয়সা লাগে?"

—"তা তো লাগবেই। কিন্তু খরচ আমরা দিচ্ছি না, রাজকুমারই দিচ্ছে। ও কিন্তু অসম্ভব সৎ প্রকৃতির গয়লা। মুন্নির এমন অদ্ভুত দুর্ব্যবহারে ও নিজেও খুব লজ্জিত। বলেছে বদলে অন্য ছাগল এনে দেবে এবারে।"

অষ্টম দৃশ্য

দাদামণির বাড়িতে টুলু এসেছে। জামাই এবং নাতিবাবু সমেত। দাদামণি আপনমনে টাইপরাইটারে কর্মনিমগ্ন, কিছুতেই টুলুর বক্তব্য কানে শুনছেন না। শেষে টুলু চেঁচায় —"নতুন ছাগলটাও ভয়ংকর ঝামেলা করছে বাবা,—এই ছাগলটাকে হাতে করে গরম পাকিয়ে পান্তাভাত খাইয়ে দিতে হচ্ছে, শুনছ। এটাও অসম্ভব স্পয়েলট ছাগল। মুন্নিরেটিকে তো সারারাত হাওয়া করতে হয়েছিল মশা তাড়াতে? এটারও সুখের শরীর। শক্ত মেঝেয় চট বিছিয়ে দিলে শোয় না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চ্যাচায়। খড়ফড় দিয়ে গদি বানিয়ে তার ওপরে চট পেতে বিছানা হয়েছে। তবে ছাগল ঘুমিয়েছেন। ভাবতে পারো? সেটাতো মশারী চিবিয়ে খেয়েছিল? এটা কিছুই খায় না। আমি

BanglaBook.org

শ্বশুরমশাইকে ভাত খাইয়ে দিই. তিনি রুগীমানুষ। আমি ছেলেকেও খাইয়ে দিই, তিনিও অকর্মণ্য ভূত, আবার ছাগলকেও আমাকে খাইয়ে দিতে হবে? চাই না আমার অমন ছাগল। তুমি এক্ষুনি ফিরিয়ে নিয়ে এসো বাবা। আমার শ্বশুরমশাই খুব বিরক্ত হচ্ছেন কিন্তু। ছাগলকে এত টাইম এবং অ্যাটেনশন দেওয়া তাঁর একদম পছন্দ হচ্ছে না। হাতে গরস করে ছাগলকে ভাত খাওয়াই বলে সাতবার করে ডেটলে হাত ধুয়ে তবে ছেলেকে আর শ্বশুরকে খাওয়াতে হচ্ছে—"

"কেন, যে ভিটামিন ড্রপটা দিলেন ডক্টর সেন সেটা খাওয়াসনি?"

—দাদামণির শান্ত উত্তর। —"তাতে তো ছাগলের খিদেটা বাড়বে বলেছিলেন।"

—"ওঃ হ্যাঁ। সে তো ভুলেই গেছি। কেলেংকারি কাণ্ড। ভিটামিন ড্রপস বন্ধ করতে হয়েছে। সেসব খেয়ে তার ভাতে তো মোটেই রুচি বাড়লো না, উলটে এমন দুষ্টুমিখিদে হলো, যে ঘরের কোণে রাখা সমস্ত পুরনো স্লেটসম্যানগুলো আর কিছু পুরনো জুতো খেয়ে ফেললে। কেবল শিশিবোতলগুলো যা পেতে পারেনি। ওঃ, কি ভয়ংকর ছাগল। তাছাড়া বাড়িতে ঢুকেই বোটকা গন্ধে প্রাণ বেরিয়ে যায়। কেউ আর আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসে না, বাবা।"

—"কেন, বেস্পতিবারে? শনিবারে?"

—"তাও না। ওরা সবাই এখন মিলুবৌদিদের বাড়ি টিভি দেখতে যায়। টিভি তো থাকে বড় দালানে। বড় দালানে বসতে কার সাধ্য? এক আমরাই কেবল পারি, কেননা আমাদের নাকে দুর্গন্ধটা অভ্যেস হয়ে গেছে। ঝিও থাকতে চাইছে না, সিঁড়ির তলার ঘর পরিষ্কার করবার জন্যে তাকে দশটাকা মাইনে বাড়াতে হবে বলছে। সে কেন ছাগলনাদি রোজ রোজ ফেলবে? জমাদারকে তো মোটে এদিকে আসতেই দেবে না পিসিমা—সে খিড়কি দিয়ে চোরের মতন যায়-আসে, তার পক্ষে এখানটা পরিষ্কার করাই সম্ভব নয়। ফলে আমাকেই ছাগলের আয়া, ছাগলের জমাদার, এইসব হতে হচ্ছে। তুমি কি এইজন্যে আমাকে ছাগল প্রেজেন্ট করেছো?" টুলুর এবার স্পষ্টই চোখ ছলছল করে ওঠে। সর্বদাই হাসিখুসিতে ঢলঢল করছে কচি মুখখানা, দুষ্টু বুদ্ধিতে চঞ্চল চোখদুটো চকচকে, বিয়ের দিনেও যে-টুলু সকলের সঙ্গে ঠাট্টাইয়ার্কি করছিল,—সেই মেয়েকে প্রায় কাঁদিয়ে দিয়েছে ছাগলে। এবারে আমিও বলি—"না, না দাদামণি, এ হয় না. তুমি বসনমামার কথায় নেচে উঠে কী ভুলটাই যে করেছো। ভারতবর্ষসুদ্ধ মানুষ কি বিশে অন্ধ ত্রিশে প্যারালাইসড আর চল্লিশে সিনাইল হয়ে মরে যাচ্ছে? যত ভুলভাল খবর। এক্ষুনি ছাগলটা ফেরৎ দিয়ে দাও রাজকুমারকে।" টাইপরাইটার থেকে চোখ তুলে, চশমার কাচের ওপর দিয়ে তাকিয়ে দাদামণি গম্ভীরভাবে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নেড়ে বললেন—"সে হয় না। আমার একটা প্রেস্টিজ নেই ওর কাছে? কী যে তুই বলিস? শোনো টুলুমা, এই নাও দশটাকা। এবার থেকে ঝির দশটাকা বাড়তি মাইনেটা আমিই দেবো। তুমি কেন ছাগলনাদি সাফ করবে? আর গরস পাকিয়ে খাওয়ানোর ব্যাপারটা কী

BanglaBook.org

করে হ্যানডল করা যায় সেটাও ডক্টর সেনকে জিজ্ঞেস করে দেখি। ডোন্ট ওয়ারি মাই ডিয়ার, বিশ্বজগতের সমস্যাগুলির তুলনায় তোমার ছাগলের প্রবলেম কিছুই নয়। থিংক অফ আফগানিস্তান। থিংক অফ আলস্টার। তুচ্ছ ব্যাপারে মন খারাপ করতে নেই। এভরিথিং উইল বি অলরাইট। ঝিকেই আর দশটা টাকা দিয়ে দ্যাখো না, সেই ছাগলকে খাইয়ে দিতে রাজী হতে পারে। হোয়ার দেয়ার ইজ আ উইল দেয়ার ইজ আ ওয়ে।"

নবম দৃশ্য

সবে কলেজ থেকে ফিরে চা খাচ্ছি, উদভ্রান্ত মূর্তিতে বৌদি এসে উপস্থিত। সঙ্গে বুলু।

—"খুকু, তোর দাদার জন্যে কি আমি গলায় দড়ি দেবো?"

"কখনই না। কিন্তু হয়েছেটা কী?"

—"কী হয়নি তাই বল। সেই ছাগুলে কাণ্ডের চূড়ান্ত কেলেংকারি হয়েছে। এখন জামাই স্বয়ং কুকুরের চেন বেঁধে ছাগল নিয়ে এসে হাজির।"

—"জামাইবাবুর পিসিমা তাড়িয়ে দিয়েছেন ছাগলটাকে। জামাইবাবুর কী দোষ?" বুলু বলে, —"অতি নচ্ছার, ইমপসিব্‌ল ছাগল একটা। যা করেছে না—"

—"কী করেছে কী? আবার স্টেটসম্যান খেয়েছে?"

—"তার চেয়েও বেশি। যে দড়িটা দিয়ে খোঁটায় বাঁধা ছিল, সেই দড়িটা চিবিয়ে খেয়ে ফেলে পালিয়ে গেছে।"

—"বাঁচা গেছে। আর খুঁজিসনি ওটাকে। যাক চলে।"

—"খুঁজবে কি, সে তো বাড়িতেই ছিল। দড়ি-ফড়ি কেটে, সিঁড়ি দিয়ে স্ট্রেট দোতলায় উঠে গেছে, গিয়ে সামনেই পিসিমার পুজোর ঘরটা পেয়েছে। সেখানে ঢুকে সমস্ত ফুল, কলা, বাতাসা খেয়ে ফেলেছে, লক্ষ্মীর লালশাড়িটা পর্যন্ত আধখানা চিবিয়েছে, পিসিমার পুজোর কম্বলের আসনটা খানিকটা খেয়েছে—তারপর দিদির শোবার ঘরে গিয়ে বেঁটে আলমারিটায় চড়েছে। সেখানে বাচ্চার কাঁথা ভাঁজ করা ছিল, সেগুলো চিবিয়ে নষ্ট করেছে, দেয়াল থেকে সাঁইবাবা ক্যালেণ্ডারটা টেনে খেয়েছে, সেখান থেকে আলমারির মাথায় চড়ে, ভেন্টিলেটর থেকে চড়াইপাখির বাসার খড়গুলো টেনে টেনে আরাম করে খাচ্ছিল। আর নামতে পারেনি। পিসিমা ওপরে এসে পুজোর ঘরে ছাগলনাদি দেখেই তো খেপে পাগল। তারপর দ্যাখেন ফুল খেয়ে গেছে, প্রসাদ খেয়ে গেছে, আসন খেয়ে ফেলেছে, লক্ষ্মীর কাপড়টা পর্যন্ত খুলে নিয়েছে—ব্যস,...তারপরেই বাড়িসুদ্ধু হুলুস্থুলু! ছাগল কৈ? ছাগল কৈ? দিদিটাও এমনই কুম্ভকর্ণ, ওই ঘরেই বাচ্চা নিয়ে ঘুমোচ্ছিল, কিন্তু জানতেই পারেনি। ছাগল কৈ—হৈ হট্টগোলে ঘুম ভেঙে উঠেই দ্যাখে সামনে গড়রেজ আলমারির

মাথায় দাঁড়িয়ে ছাগলমশাই খড় চিবোচ্ছেন। দেখে দিদি তো হেসেই কুটিপাটি। তাতে পিসিমা আরোই খেপচুরিয়াস। শেষে জামাইবাবু নিজে এসে রাজকুমারকে ডেকে নিয়ে গেছেন। কুকুরের চেন কিনে, তাই দিয়ে ছাগলকে বেঁধে জবরদস্তি রাজকুমারের সঙ্গে রিকশা করে জামাইবাবুকে দিয়ে ছাগল ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন পিসিমা।"

—"অমন অলুক্ষুণে ছাগল বাড়িতে ঢুকতেই দেবেন না উনি আর। বলেই দিয়েছেন ফাইনালি।" বৌদি কাতর গলায় বলে ওঠেন।

—"তাতে তোমার গলায় দড়ি দেবার কী হলো?"

—"তোমার দাদামণি বলছেন, তাহলে আমরাই—

—"ওঃ নো। আমরা মানে? ছাগলটাকে কি পুষতে চাইছেন নাকি দাদামণি?"

—"ঠিক তাই। উনি ছাগলটাকে পুষতে চাইছেন। একেই বাড়িতে আলসেশিয়ান কুকুর, তার ওপর যদি রামছাগল আনেন—"

—"চাঁদ আর পুষুর কথাটা ভুলো না?" বুলু মনে করিয়ে দেয়। বৌদির আদরের হুলো আর পুষি। তাদের বছরে চারবার করে ফ্যামিলি বৃদ্ধি হয়।

—"ছাগলটা এখন কোথায়? রাজকুমারই নিয়ে গেছে না রেখে গেছে?"

—"রেখে গেছে। গ্যারাজে বাঁধা আছে। উনি যা ছাড়ছেন না। রাজকুমার তো রাজীই ছিল ফিরিয়ে নিতে।"

—"চলো। একটা রিকশা ডাক বুলা। এক্ষণি চলো, দেখি, ছাগল নিয়ে রাজকুমারের ডেরায় যাই। দাদামণির পাগলামি সত্যি সীমা ছাড়াচ্ছে।" বৌদি নিশ্চিন্ত হয়ে হাঁপ ছাড়েন।

"তাই চল খুকু। উনি এখনো ফেরেননি। এই বেলা দিয়ে আসি। একলা ঠিক মনের জোরটা পাচ্ছিলুম না। তাছাড়া ধেড়ে ছাগলটার গায়েও খুব শক্তি আছে।" "আচ্ছা বৌদি, ছাগলটা গডরেজের মাথায় চড়ল কেমন করে?"

—"ওরা পারে। পাহাড়ী ছাগল তো। বেঁটে আলমারী থেকে বইয়ের র‍্যাক, বইয়ের র‍্যাক থেকে গডরেজ। সিম্পল কাজ।" বলতে বলতেই হেসে গড়ায় বুলা, "ওর নাম দেওয়া উচিত স্যার এডমান্ড হিলারী। ব্যাটার যা স্ট্যামিনা, খুকুপিসি।"

দশম দৃশ্য

দাদামণি বাড়িতে। গেলাসে করে দুধ খাচ্ছেন দাদামণি। আগে কোনোদিন দেখিনি।

—"কী খাচ্ছো, দুধ?"

—"ছাগলের দুধ।"

—"তুমিও?"

—"আমিই। দিনে একসের। সঙ্গে জেলুসিল চারটে।"

—"কেন, হঠাৎ?"

BanglaBook.org

—"নইলে টাকা শোধ হবে না যে—"

—"কিসের টাকা?"

—"তোমার ছাগল ফেরতের। রাজকুমার বলেছে নগদ টাকা ফেরৎ দিতে পারবে না, দুধ দিয়ে শোধ করবে। সকালে নাতিবাবুকে দিয়ে আসে একসের। টুলুর শ্বশুর কিছুতেই দু'সের নিলেন না। একদম ফ্রী পাচ্ছেন তবুও নয়। কোনো বিজনেস সেন্স নেই লোকটার। ইস্কুলমাস্টার ছিলেন তো? আমায় বল্লেন—আপনার নাতিকে খাওয়াচ্ছেন খাওয়ান। কিন্তু আমরা কেন মশাই আপনার পয়সায় দুধ খাবো?"

—"সে তো ঠিকই বলেছেন।"

—"বেশ, ঐ ঠিক বলার ফলে আমাকেই খেতে হচ্ছে। বুলাও খাবে না, প্রতিমাও না। ওদের নাকি গন্ধে গা গুলিয়ে আসে। টাকাটা উশুল করতে হবে তো?"

—"কত করে উশুল হচ্ছে?"

—"আটটাকা করে কিলো। দু'কিলো পাব ডে। হিসেব করে এখনো আরো পাঁচশো টাকা শুধতে হবে ওকে। আরও ক'দিন লাগবে? এই একমাসে আমার ওজন বেড়েছে তিন কিলো। পুরো ন'মাস জগিং করলে তবে কমবে।"

—"নিউ আলিপুরে দুধ পৌঁছে দিচ্ছে কে? রাজকুমার নিজেই যাচ্ছে?"

—"নাঃ। এ-বাড়িতেই দু'সের দিয়ে যায়। হুগুকে দিয়ে রোজ ও-বাড়িতে পাঠিয়ে দিই। নো প্রবলেম। ডেলি ট্রামভাড়া চল্লিশ পয়সা। তোর বৌদি তো ক্ষেপে লাল। বসনমামাকে দেখলেই অন্য ঘরে চলে যায় ঝনাৎ করে চাবি বাজিয়ে।"

—"মোটেই না।" ঝনাৎ করে চাবি অন্তরালে বেজে ওঠে। আলনা গোছাতে গোছাতে বৌদি বলেন—"বসনমামার কোনো দোষ নেই। তিনি তো একবারও ছাগল কিনতে বলেননি? সেবারে রঞ্জনদের গরু কিনিয়েই তাঁর খুব শিক্ষা হয়ে গেছে। এটা একা তোমার দোষ। তুমি বললে নিউ আলিপুরে ছাগল নেই, বড়লোকদের পাড়া। বসনমামা তো বললেন সব পাড়াতেই 'লোকাল গোট মিল্ক' পাওয়া যায়। ছাগল নেই এমন কোনো মিউনিসিপাল এরিয়াই নেই কলকাতাতে। তুমি কি শুনলে? ছাগল-টাগল কিনে আধিখোতা শুরু করে দিয়ে—এখন আর শেষরক্ষে করতে পারছো না।" —শূন্য দুধের গেলাসটি নামিয়ে রেখে দাদামণি নিবাত-নিষ্কম্প। নিঃশব্দ।

—"সত্যি, খুকু, এক্সট্রা ঝামেলা বাধাতে তোমার দাদামণির জুড়ি নেই। ওঃ। আমাকে তো সারাজীবনই জ্বালাচ্ছেন, এবার মেয়েজামাইকেও জ্বালাতে শুরু করেছেন।"

—"যাকগে যাক, ওসব কথা থাক। বৌদিভাই, এবার এককাপ চা করোতো —ছাগলের দুধ দিয়ে, দেখি খেয়ে।"

একাদশ দৃশ্য

দাদামণির বাড়িতে সানাই বাজছে। ভিয়েন বসেছে। লোকে লোকারণ্য। বৌদি

BanglaBook.org

বিনুনী নাচিয়ে বেড়াচ্ছেন। দাদার গলায় মটকার চাদর। ছাদে মস্ত ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে।

নাতিবাবুর আজ অন্নপ্রাশন।

টুলু লাফাতে লাফাতে এসে বলল— "আঃ। কী আনন্দ আজ বলো তো খুকুপিসি? ফ্রীডম। মুক্তি।"

—"কিসের ফ্রীডম আবার?"

—"বা রে? বুবাই না আজ থেকে ভাত মাছ গরুর দুধ খাবে? আর ওকে ছাগলের দুধ খাওয়াতে হবে না। বাববাঃ। আমার শ্বশুরেরও শরীরটা সারবে এবার। উঃ। একটা ফাঁড়া কেটে গেল।"

—"কেন? ফাঁড়া কিসের?"

—"ফাঁড়া নয়? একেই ব্লাডপ্রেশারে প্যারালাইজড রুগী, তায় দিনরাত ছাগল ছাগল করে রেগে কাঁই হয়ে থাকছিলেন—শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছিল শ্বশুরমশায়ের। উনি নেতাজীর সঙ্গে ইস্কুলে পড়তেন কি না? ওই ছাগলদুধটুধ ওঁর দুচক্ষের বিষ।" টুলু চোখ গোলগোল করে বললো—"আমাকে দিনরাত্তির কী বলেন জানো তো? গান্ধীজীর ফ্যামিলি লাইফ হ্যাপি ছিল না। গান্ধীজী কি আধে অহিংস, ওঁর ভিবিলিটি ছিল না, গান্ধীজীর মাথাজোড়া চকচকে টাক ছিল, সেইসব। উনি মোটেই চান না নাতি গান্ধীজীর মতো হয়।"

—"তা কেনই বা হবে? এমন মনেই বা করবেন কেন? আচ্ছালোক তো তোর শ্বশুর? ছাগলের দুধ খেলেই যদি লোকে গান্ধীজী হয়ে যেতো।—হুঁ। অ্যাবসার্ড!"

—"কিন্তু বুবাইয়েরও যে মাথাজোড়া চকচকে টাক? একদম গান্ধীজীর মতোই। শ্বশুরমশাই বলেন এসব ছাগদুগ্ধের ফল। বুবাইয়ের যে একদমই চুল গজাচ্ছে না খুকুপিসি? এরপর যদি ওর ভিবিলিটিও না গজায়?" কাতরভাবে সরল চোখদুটো মেলে ধরে টুলু।

—"চোপ।" ওপাশ থেকে চাদর গলায় দাদামণি আচমকা ধমকে ওঠেন— "কাঁথায় শুয়ে ফ্যাশিস্ট কথাবার্তা বলতে বারণ করবি তোর শ্বশুরকে—ছাগদুগ্ধের ফল।—গান্ধীজীর জীবনের কী জানেন উনি? গান্ধীজী তোর শ্বশুরের কাছে মৃত্যুর আগে কনফেশন করে গেছেন? যতো ফ্যাশিস্ট কথা! ভিবিলিটি ছিল না। অহিংসা বিকোয়ার্স মোর ভিবিলিটি—বুঝলি?—বলবি তোর শ্বশুরকে। বুঝলি খুকু, এই যে আমি বেগুলাবলি ছাগলের দুধ খাচ্ছি, বেশ টের পাচ্ছি গান্ধীজীর ইনার স্ট্রেংথের সোর্সটা কোথায় ছিল।" বসনমামা পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, বললেন—

—"হকল বেপাররে পলিটিকাল কালার দিতে নাই সুন্টু, বয়স হইতাসে, এট্টু নিউট্রাল হইতে শিখবা। বৌমাকে কও গা পাতা লাগাইতে, বেলা দুইডা বাইজ্যা যায়।"

BanglaBook.org

খেতে গিয়ে দেখি দাড়িওলা রাজকুমার বসে আছে, টেবিলিনের শার্ট প্যান্ট পরে। হাতে ঘড়ি। বৌদি ফিসফিস করে বললেন—"দেখেছিস খুকু, রাজকুমার নাতিবাবুকে কী প্রেজেন্ট করেছে? স্টিলের কাপডিস। ওগুলো দিয়ে 'দুধুয়া ছোড়কে আর তো চায় পী লো'—বললো। সত্যি, ওরও কি কম ঝঞ্ঝাট গেল। বেচারী।"

বনলতার পুষ্যি

বনলতা মানুষের চেয়ে জীবজন্তুর কাছেই বেশি সহজ। কবিদের ভাষায়, 'এই পৃথিবী এক আজব চিড়িয়াখানা', জগতে অনেকেই 'কুকুর-বেড়ালের মতো বাঁচতে বাধ্য হয়', বনলতার বেলায় মানেটা সেরকম ব্যঞ্জনাপূর্ণ নয়। ভাইবোন নেই বলে সে সত্যি-সত্যি একগাদা জন্তু-জানোয়ার ঘেঁটে বড় হয়েছে। তার বাবার আবার মাঝে মাঝেই দেওয়ালকে নানারকম কথাবার্তা বলবার অভ্যেস আছে। মানবেন্দ্র কবি। সময় সময় তিনি দেওয়ালকে বলেন, "—মায়াদেবীরও একটা ট্রেনিং দরকার হয়, নইলে ওনলি চাইলডের সেলফ-সেন্টারড হয়ে যাবার ভয় থাকে।" মা সেটা শুনতে পান বলে গজগজ করতে-করতে হলেও জীবজন্তুর অত্যাচার সয়ে নেন মেয়ের মুখ চেয়ে।

বনলতা আশৈশব দেখছে তার বাবা সকলেরই অটোগ্রাফ খাতায় লিখে দেন "—শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" অথচ বাড়িতে তিনি দেওয়ালকে প্রায়ই বলেন— "মানুষের চেয়ে জন্তু জানোয়ার ঢের ভালো। তারা ভালোবাসতে জানে।" ফলতঃ, বনলতা ধরে নিয়েছে, বাড়ির বাইরে সবার উপরে মানুষ সত্য, আর বাড়ির ভেতরে মানুষের চেয়ে জীবজন্তু ঢের ভালো।

তাই, সে নিজের মাকে সংসারে কিছু সাহায্য করে না বটে কিন্তু কুকুরদের নাওয়ায় খাওয়ায়, বেড়ালদের আঁতুড় তোলে, পাখিদের খাঁচা পরিষ্কার রাখে, ছোলা-কাউনদানা, দুধ-মাছ, মাংস-হাড্ডি, সবকিছুর যোগাড় করে। ভাইবোন-শূন্য বাড়িতে বনলতার সঙ্গী-সাথীর অভাব নেই। তপোবনে শকুন্তলার মতো, প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ তারও আছে একটা, এই জীবজন্তুদের মাধ্যমে।

জ্ঞানোন্মেষের আগে থেকেই কুকুরদের সঙ্গে বনলতার ঘনিষ্ঠ সংযোগ। প্রমাণ একটি মুভী ফিল্ম। একটি বিরাট প্র্যামে ফ্রিলদেওয়া টুপি মাথায় একটি বাচ্চা বসে আছে, বিশাল লোমশ একটি কুকুর চেন দিয়ে প্র্যামের হাতলে বাঁধা। পীচ বাঁধানো চকচকে রাস্তা দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে সেই কুকুর দৌড়ুচ্ছে। অর্থাৎ বনলতাকে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে। টুপির তলায় বনলতাকে প্রথমে দেখা গেল, ভয়ে সিটিয়ে, পেল্লায়

এক হাঁ করে, চোখ বুজে (সম্ভবতই পাড়া কাঁপিয়ে) কাঁদছে—পরের শটেই দেখা যাচ্ছে কোনো অজ্ঞাত কারণে প্রচণ্ড হাততালি বাজাতে বাজাতে দুলে দুলে ফোকলা মুখে হাসছে নির্ভীক হাসি। অর্থাৎ ওইটুকু সময়ের মধ্যেই সেই জন্তুর সঙ্গে তার বোঝাপড়া হয়ে গেছে।

আরো প্রমাণ, হামাগুড়ি দিতে শিখেই, বনলতা নাকি খাটের নিচে ঢুকে, সেই বিশাল কুকুর ডিউকের ঘুমন্ত থাবা মুঠোয় তুলে মুখে পুরে দিয়েছিলো। সেই থেকে হামাগুড়ি দেওয়া বাচ্চা দেখলেই ডিউক প্রাণভয়ে ছুটে পালায়। সেই ছ'মাস বয়সেই বনলতা প্রথম "নিউজ" করেছিলো, যদিও সে খবরের কাগজে বেরোয়নি।

তারপর থেকে নানাভাবে নানা জীবজন্তু নিয়ে "নিউজ" করেছে, কাঠবেড়ালী, কচ্ছপ, এমনকী চামচিকে পোষা পর্যন্ত বাদ দেয়নি। কাগজে অবশ্য কোনোটাই বেরোয়নি।

জন্তু এন্তক পশুপক্ষী নিয়ে যার কারবার, নিশ্বাসে প্রশ্বাসে যার বেড়ালের লোম কুকুরের পোকা কাকাতুয়ার পালক, কুকুর বেড়ালবিহীন ন্যাড়া সংসারকে তার ঘর সংসার বলে মনেই হয় না। পুরী কি দার্জিলিং তার কাছে দু'দিনেই দুঃসহ হয়ে ওঠে প্রতিপালিতদের জন্য দুশ্চিন্তায়। সেই হেন বনলতাকে যখন কলেজের ম্যাটিনে আইডল ইন্দ্রনীল বিয়ের প্রস্তাব দিল, তখন বনলতার জীবনে একটা প্রবল সমস্যার উদয় হলো। ইন্দ্রনীল খৈতান বড় ব্যবসায়ীর আদুরে পুত্রই নয়, পরন্তু রীতিমতো বুদ্ধিমান, সুসংস্কৃত ছেলে। তবে আবার সমস্যাটা কী? সমস্যা এই যে, বিয়ের প্রস্তাবের সঙ্গে সে একটা লেজুড় এঁটে দিল। একটা শর্ত। জন্তু জানোয়ারকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। ইন্দ্রনীল যে-সংসারে থাকবে, সেটা নোয়ার আর্ক নয়। সেখানে খেচর-ভূচর-জলচর যাবতীয় জীবজন্তু নিষিদ্ধ। "নো অ্যানিম্যালস, মাই ডিয়ার। নো ফিশেস, নো বার্ডস, নো রেপটাইলস। আই ওয়ান্ট এ পিওরলি হিউম্যান রেসিডেন্স ফর আওয়ারসেলভস।"

যদিও ইন্দ্রনীলকে স্বামী পাওয়া মানে সবচেয়ে গ্ল্যামারাস স্বামীটি পাওয়া—নেক্সট ওনলি টু উত্তমকুমার—তবুও বনলতা মনস্থির করতে পারে না। তিনদিন সময় চেয়ে নেয়। চিন্তা করতে হবে। সারাজীবন বলে কথা। কুকুর বেড়াল ছাড়া কি বাঁচতে পারবে? পিওরলি হিউম্যান রেসিডেন্স কি সত্যি সত্যিই তেমন সুবিধের, জানাতে হবে, বনলতা ভাবলো। আগে তাঁদের মতামতটা নেওয়া যাক।'

শর্ত শুনেই কবি মানবেন্দ্র চমকে উঠলেন।

"—এ তো সেই 'পগলা বাতমে বিল্লী কাটা' গল্পের চেয়েও ভয়ঙ্কর শোনাচ্ছে রে! হ্যাঁগা, শুনেছো? দিনকাল কতো বদলে গেছে? আমরা বিয়ের মন্তর পড়েছি কনেকে বর বলছে, 'আমার প্রতি যেমন, আমার প্রতিপালিত জনেদের প্রতি, আর আমার গৃহপালিত পশুদের প্রতিও ঠিক তেমনি সুনজর দিও। সবাইকে নিয়ে এই গৃহের গৃহলক্ষ্মী হও'—কত চমৎকার ফিলজফি বল দেখি? আর আজকালকার

ছেলেদেব সেলফিশ ফিলজফি দেখলে? কেবল আমি আব তুমি। আশ্রিত মানুষ তো দূবেব কথা, এমনকী পশুপক্ষীকেও ভালোবাসতে পাববে না। একলা আমাকে অ্যাটেনশান দাও। কী সর্বনেশে কথা?"

"—সর্বনেশে কথা আবার কী?" স্বর্ণলতা আপত্তি কবেন।

"—সে ছেলে হযতো জীবজন্তু ভালোবাসে না। সবাই কি আব তোমাদেব মতো বিদঘুটে প্রকৃতিব।"

"—ঠিক বলেছ মা," বনলতা জানায: "ব্যাপাবটা ঠিক সেলফিশনেস নয বোধহয। আসলে ও জন্তুজানোযাবদেব একদম পছন্দ কবে না। চিডিযাখানাতে বেডাতে যেতে চায না কিছুতেই।"

"—চায না?" কবি বাবা মাথা নাডেন "—সেটাও তো ভালোকথা নয মা? আই 'পট দিস অ্যাজ আ ডেনজাব সিগন্যাল। ইযং কাপলদেব পক্ষে জাযগাটা খুবই আইডিযাল, কলকাতায।" বাবাব কথায লজ্জা পেলেও, কনভেন্টা ইন্দ্রনীলেব পক্ষে সাফাই গায। —"আসলে কি জানো বাবা, ওবা তো জীবজন্তু পোষেনি বাডিতে কখনো। ও বলে চিডিযাখানায বিশ্রী গন্ধ। কুকুবকে ভয পায। বেডালকে ঘেন্না কবে। অনভ্যেসেব দোষ আব কি?"

কবি মাথা নাডেন। গম্ভীব গলায বলেন—"হুঁ। এ তো ব্যাড সাইন মা —জীবজন্তু যাবা ভালোবাসে না, তাবা আসলে মানুষকেও ভালোবাসে না। তাবা হার্টলেস। নো। এখানে বিযে কবা ঠিক নয। তাছাডা ওবকম কনডিশন কবে নেওযাটা তো আবোই আপত্তিকব। একজনেব শখসাধকে হুমকি..."

"—বাঃ। বেশ কথা তো?" স্বর্ণলতা সুপুবি কুচোনো বন্ধ কবে গালে হাত দেন। —"আমাব কথাটা কি ভুলে গেলে? কনডিশন কবে নিইনি বলেই তো আজ আমাব এই হেনস্থা। যা দু'চক্ষে দেখতে পাবি না, তাই নিযেই সংসাব। আমি কি জীবনে কখনও কুকুব-বেডাল ভালোবাসি? তাব মানেই কি আমি হার্টলেস? যত হার্ট সব কি শুধু তোমাব আব তোমাব কুকুবদেব বুকে? আমাব দযামাযা নেই?"

কবি মানবেন্দ্র জিব কেটে গোঁফ দুলিযে হাঁ হাঁ কবে ছুটে এলেন—"ছি ছি, সে কি কথা। কে বললে তোমাব দযামাযা নেই? দু'চক্ষে দেখতে না পাবলেও জীবজন্তুদেব প্রতি তোমাব অসীম সহ্য। নইলে আব আমাব মতন একটা বুনো জন্তুকেও কেষ্টব জীব বলে এতকাল পুষছো?" জিব কেটে ঘোমটা টেনে ছুটে পালানোব স্বভাব স্বর্ণলতাব নয। তাই তিনি তাব বদলে সুপুবি কুচোনোয চোখ নামালেন— মুখে বললেন—"আহাহা, কথাব ছিবি কি। তাও আবাব বিযেব যুগ্যি মেযেব সামনে।" জিৎ হযেছে বুঝতে পেবে মানবেন্দ্র গদগদকণ্ঠে বললেন—"সবাই কি আব তোমাব মতো? কুকুববেডাল না হয নাই ভালোবাসলে, তবু তাদেব কন্নাটা তো পোযাচ্ছো? তাছাডা ফুল তো ভালোবাসো? গান তো ভালোবাসো? তোমাব কথাটা আলাদা স্বপ্ন।"

BanglaBook.org

স্বর্ণলতার খুব ইন্দ্রনীলকে পছন্দ। অমন সুন্দর জামাই পেলে কে না খুশি হয়? একমাত্র কবিটবির মতো আকাট বোকালোকরা ছাড়া? তিনি বললেন— "কে তোমাকে বলেছে সে ছেলেও যে আলাদা নয়? জীবজন্তু তো শতকরা নব্বইজনই ভালোবাসে না, আমি মনে করি ওটা খুবই হেলদি সাইন। তার মানেই এই নয়, যে— সে গানও ভালোবাসে না, ফুলও ভালোবাসে না। জিজ্ঞেস করে দেখেছো মেয়েকে?"

মায়ের কথা শুনেই বনলতার মুখটি ম্লান হয়ে এল, আর তার বাবার মুখ ঝলমলিয়ে উঠলো।

"—ঠিক কথা।" তিনি হেঁকে উঠলেন—"হ্যাঁরে, ইন্দ্রনীল কি ফুল ভালোবাসে?"

"—ফুল?" —বনলতা ঢোক গিলে "—ফুল মানে, এই ধরো গোলাপটোলাপ? নূরজাহানের হাতে যেমন থাকে।" মনে মনে আকুল হয়ে ভাবতে থাকেন কবি, ফুল মানে আর কী কী হতে পারে। তক্ষুনি মনে পড়ে যায়—"হৈমলীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধম..."—অথবা পদ্ম-টদ্ম? কিম্বা কুঁদফুলের মালা? এনে দেয় কিছু? ভেবে দ্যাখ তো?"

বনলতা ভাবে—"নাঃ। ওসব দিয়েছে বলে তো মনে পড়ছে না।"

"—হুম। বাগান-টাগান ভালোবাসে?" বনলতা ভ্রূ কুঁচকে চিন্তা করে জবাব দেয় —"একবার হর্টিকালচার বাগানে যেতে চেয়েছিলুম, ডালিয়াফুল দেখতে। ইন্দ্র বলেছিল—"আন ইন্টেলিজেন্ট নেচার ইজ নট ইন্টারেস্ট মি।" শুনে কবি মানবেন্দ্র আবার চুপ করে গেলেন। প্রস্তুতবৎ। "—হুম।" দু মিনিট নীরবতা পালন। ফুল না ভালোবাসার শোকে।

তারপরেই মন খারাপটা ঝেড়ে ফেলে হাঁক পাড়েন—"ও, কে। কাম টু দ্য নেক্সট পয়েন্ট। গান। গান গাইতে পারে? তোকে গান গেয়ে শোনায়?"

—"গান? কই শুনিনি তো গাইতে। পারে না বোধহয়।"

"—তা বেশ। নিজে গাইতে না পারুক" (মানবেন্দ্রও পারেন না), "গান শুনতে তো ভালোবাসে? গানের জলসা-টলসায় যায়? সদারঙ্গ? রবীন্দ্রসদন? কলামন্দির? দেখা হয়?"

"—জলসায়? নাঃ। দেখা হয়নি তো কখনো। কেবল যেবার কলেজ থেকে বন্যাত্রাণের জন্যে চারিটি শো করেছিলুম সেবারে ও গিয়েছিল। ফ্রান্সানের গোড়ায় বন্যাত্রাণের বিষয়ে যে স্পীচটা ছিল, সেটা ওই দিয়েছিল। কিন্তু গানের সময়ে ছিল না।"

"—ছিল না মানে?"

"—মানে, উঠে চলে গিয়েছিল। ও বাংলা গান সহ্য করতে পারে না।"

"—আই সী। হুম। যাকগে। দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ইমমেটিরিয়াল, বুঝলি, ইটস

BanglaBook.org

দ্য মিউজিক দ্যাট ম্যাটাবস। বাংলা না হোক, অন্য গান তো ভালোবাসে? হিন্দি, তামিল, ইংবিজি, উর্দু, ফ্রেঞ্চ? এনিথিং?"

তালে তালে মাথা নেড়ে বনলতা বলে— "কি জানি? জানি না। কে জানে?"

"—ঘবে গ্রামোফোন নেই? কিম্বা টেপ বেকর্ডাব? ক্যাসেট? বেকর্ড শোনে না?"

"—বেকর্ড বাজাতে তো কই দেখিনি, তবে হ্যাঁ ট্রানজিস্টব রেডিও একটা শোনে দেখেছি। বেডিওটা সবসময়েই খোলা থাকে। তাই তো পুলক ওকে বলে বেডিও-অ্যাকটিভ". বলেই বনলতা হেসে ফেলে।

কবি মানবেন্দ্র হাসেন না। যাবপবনাই সীবিযাস মুখে চোখ তোলেন —"বুঝলুম। ওতে হবে না। বেকর্ড শোনে না বলছিস? মোটে অভ্যেসই নেই বেকর্ড কেনাব? কোনো গানই শোনে না? হুম?" ভ্রূকুটিল চোখে দুই ঠোঁট টিপে মেঝেব দিকে তাকিযে দু' আঙুলে টেবিল বাজাতে শুরু কবেন তিনি।

অবস্থা সঙ্গীন দেখে স্বর্ণলতা আবাব কথা যুগিযে দেন।

"—তা গান না হোক, বাজনা? নিশ্চযই বাজনা-টাজনা বাজায কিছু? সেতাব-টেতাব? ছেলেদেব ভেতব আজকাল তো খুব চল হযেছে।"

কবি মানবেন্দ্রব মুখ সঙ্গে সঙ্গে পুনরুদ্দীপিত।

"—ঠিক। ঠিক। কোযাইট কাবেক্ট। ভোক্যাল না হোক, ইনস্ট্রুমেন্টাল?—সেতাব? সবোদ? বাঁশিটাশি? নো? ওকে—পিযানো? ভাযোলিন? নো? ওকে...তবলা? গীটাব? নো? ...এমনকী হার্মোনিযামও নয? যাঃ ববাবা।" ...প্রতিটি বাদ্যযন্ত্রেব নাম উচ্চাবণেব সঙ্গে সঙ্গে ছন্দে ছন্দে নঞর্থকভাবে ঘাড নেড়ে চলেছে বনলতা, আব ক্রমশ কমে আসছে কবি মানবেন্দ্রব কণ্ঠস্ববেব তেজ। মৃদু থেকে মৃদুতব হযে শেষে দীর্ঘ-নিশ্বাস হযে মিলিযে গেল তাঁব স্বব। তাবপব বললেন —"তাহলে বাদ দিযে দে। সবকিছুতেই ফেল।"

"কিন্তু কবিতা?" পানেব খিলি মুডতে মুডতে শেষ বক্ষাব চেষ্টা কবেন স্বর্ণলতা। —"অনেকেই তো মিউজিকেব চেযে পোযেট্রি বেশি পছন্দ কবে। তুমিই তো বলেছ, কবিতাব আবেদন বেশি ইন্টালেকচুযাল? ইন্দ্র তো অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পেযেছে, হযতো সে গানেব বদলে কবিতাই বেশি পছন্দ কবে।"

"—বাইট।" নবোদ্যমে লাফিযে ওঠেন কবি মানবেন্দ্র।

—"মিউজিক বেশি ইন্দ্রিযগ্রাহ্য ব্যাপাব, কবিতাই বেশি সেবেব্রাল। হ্যাঁবে খুকী, ইন্দ্র কী তোকে কবিতা পডে শোনায?"

"—পডে শোনাযনি, তবে কবিতাব বইটই উপহাব দিযেছে জন্মদিনে।"

"—বাস বাস বাস। তাহলেই হলো। ভালোবেসে কবিতাব বই দিযেছে যখন সেই যথেষ্ট। তাব মানেই সে নিজেও ভালোবেসে কবিতা পডে।"

"—পডে কি?" বনলতা একটা খাপছাডা প্রশ্ন বাখে। "আমি ঠিক জানি না, বাবা। কখনো তো দেখিনি পডতে।"

BanglaBook.org

"—না পড়লে আর কবিতার বই দিল কি করে তোকে? কী যে বলিস তুই!"

"—দিয়েছে তো আমি চেয়েছি বলে। জিজ্ঞেস করেছিল তো জন্মদিনে কী চাই? তখন আমি বললুম—"

"—কবিতার বই চাই। এই কথা বললে?"

"—ঠিক তাই।"

"—গুড গ্রেশাস। আজকালকার ছেলেরা সারপ্রাইজও দেয় না? বলে কয়ে উপহার? তা কী কী বই দিয়েছে? অন্তত দেখা যাক তার চয়েসটা কেমন।"

"—চয়েস তো আমারই। কী কী বই চাই, লিস্ট করে দিতে বলেছিল তো।"

"—বাঃ। চমৎকার। সেটুকুও নিজে খাটবে না। নাঃ, চলবে না। নট ওয়ান পজিটিভ পয়েন্ট সো ফার। স্বপ্ন, তোমার এ-জামাই আর হলো না। আশা ছাড়ো। সুপাত্র নয় মোটেই। কুকুর ভালোবাসে না, গোলাপ ফুল ভালোবাসে না, বড়ে গোলাম ভালোবাসে না, রবীন্দ্রনাথ ভালোবাসে না—সে আবার একটা পাত্র নাকি?"

অপরাজেয় স্বর্ণলতা নির্বিকার গলায় বলেন: "—তা না বাসুক, তোমার মেয়েকে তো ভালোবাসে? আমার কাছে সেইটেই যথেষ্ট।"

"—দূর দূর। একটা বাজে লোকের ভালোবাসা দিয়ে কী হবে? খুকী—" মানবেন্দ্র রায় দেন, "—আই সাজেস্ট ইউ বিজেক্ট হিম।"

বনলতা কিন্তু চলে যায় না। বসেই থাকে। বসে বসে মাথা নিচু করে আঁচলের কোণটা আঙুলে জড়াতে থাকে। কিছুক্ষণ সেই দৃশ্য নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করেন কবি মানবেন্দ্র। তারপরে বলেন—।

"—বাপের তো ব্যবসা আছে বুঝলুম। ছেলে নিজে কিছু করে?"

"—বিলিতি তেল কোম্পানিতে চাকরি করছে।"

"—যেমন স্বভাব তেমনি কর্ম। খুব অর্থলি ক্যারেক্টার। তৈলাক্ত চরিত্র বলে মনে হয়।"

"—মোটেই না।" ফোঁস করে ওঠে বনলতা—

"খুব স্ট্রেট ফরোয়ার্ড। শুনলেই তো আমাকে কিরকম বলেছে। 'হয় কুকুর বেড়াল, নয় ইন্দ্রনীল'— ওটা বুঝি তৈলাক্ত ক্যারেক্টারের লক্ষণ হলো?"

"—তা অবিশ্যি ঠিক কথা।" কবি মানবেন্দ্র মাথা নেড়ে স্বীকার করে নেন মেয়ের জিৎ। ফের কিছুক্ষণ মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। কী যেন ভাবেন। ...তারপর বলেন:

"—হ্যাঁরে খুকী, তুইও কি ছেলেটাকে ভালোবাসিস?"

আঙুলে আঁচলের কোণ জড়াতে জড়াতে বনলতা ঘটাৎ করে ঘাড় কাৎ করে দেয়। কান দুটি বেগুনী।

BanglaBook.org

"—বাসিস তো?"

"—হুঁ।"

"—হুঁ?"

গাঁক গাঁক করে হেঁকে ওঠেন কবি মানবেন্দ্র, "হুঁ?—তবে আবার এত কথা কিসের জন্যে? এসব কনসিডারেশন তো ভ্যালিড ফর অ্যাবেঞ্জড ম্যারেজেস ওনলি। এটা তো দেখা যাচ্ছে লাভ ম্যারেজের কেস। লাভ ইজ ব্লাইনড। চোখে গান্ধারীর মতো সাতপুরু ব্যাণ্ডেজ বেঁধে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়া। লাভ থাকলে অগ্নিকুণ্ডই অমৃতকুণ্ড হয়ে যাবে। আর না থাকলে, পুড়ে মরবে। এই তো সহজ হিসেব। লাগিয়ে দে প্যাণ্ডেল।"

"—কিন্তু বাবা..."

"—কিন্তু কিসের? এখনো ভালোবাসা ইজ আনসার্টেন?"

"—তা নয়, বলছিলুম, জীবজন্তু ছাড়া কি সত্যি সত্যি আমি বাঁচতে পারবো বাবা? যে-বাড়িতে চিনিয়া মুনিয়া কিচির মিচির করছে না, কক্কাতুয়া ময়না বোল পড়ছে না, বেড়ালছানারা পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করছে না, বাড়ি ঢোকবামাত্র কোনো কুকুর এসে গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আকুলি বিকুলি ওয়েলকাম করছে না, সেইরকম বাড়িতে কি থাকা যায়?"

"—যায় রে যায়।" কবি মানবেন্দ্র গোঁফে মোচড় দিয়ে হাসলেন। —"খুব যায়। চিরকাল কি আমার বাড়িতেই এত জীবজন্তু ছিল? দেখবি, ঠিক মুনিয়াপাখির মতোই কূজন গুঞ্জন করবে, নাইবা হলো মুনিয়া, ময়নার মতোই বুলি পড়বে, যদিও ময়না নয়, পায়ে পায়েও দিব্যি ঘুরঘুর করবে, নাই বা হলো বেড়ালছানা, আর ঝাঁপিয়ে পড়ে আকুলি বিকুলি ওয়েলকাম? সেও হবে। ও কম্মোটি কুকুররা ছাড়া আর কেউ কি করতে পারে না নাকি? তোর মাকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখ ঠিক বলেছি কিনা?

"—কি, হচ্ছে কী।" ধমকে ওঠেন স্বর্ণলতা আড়াল থেকে—" মেয়ের সঙ্গে বাপের কথাবার্তার রকম-সকম কি ওই? লোকে শুনলে বলবে কী? ছি, ছি, ছি।"

"বাঃ। ওকে বুঝিয়ে দিতে হবে না? দেখবি খুকী—কিছুরই অভাব হবে না, পাখিকে পাখি, বেড়ালছানাকে বেড়ালছানা, কুকুরকে কুকুর অল-ইন-ওয়ান। স্পষ্ট দেখতে পাবি, দিব্যি চেন বগলসে বাঁধা আছে, খাঁচার ভেতরে ভরা আছে—দাঁড়ের ওপরে বসে আছে—যখন যেমনটি মানায়—একই অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে...এই দেখছিস তো আমাকে—"

"—মরে যাই। থামো তো দেখি?" কৌটোভরা পানটি এগিয়ে দিতে দিতে এক ধমক লাগান স্বর্ণলতা। সে-ধমকে মানবেন্দ্রর মিচকে হাসি মোছে না, কিন্তু বনলতা দৌড়ে পালায়।

BanglaBook.org

আষাঢ় মাস পড়তেই কবি মানবেন্দ্রর বাড়িতে সানাই বেজে উঠলো। নতুন পুষ্যি এসে গেছে বনলতার।

চাঁদগড়ার কারিগর

"কলকাতায়? তা খুব বেশিদিন না। এই মাস পাঁচ ছয় হবে। বাপ রে বাপ, কলকাতায় এসে যেন বেঁচেছি। আর কিছুদিন দিল্লিতে থাকতে হলে আমি যেতাম পাগল হয়ে আর জনাথান বোধহয় মরেই যেত—" একটি তসরের পাঞ্জাবী পরা নাদুশনুদুশ সাহেবের কনুই থেকে ঝুলতে ঝুলতেই গৃহকর্তা দত্তমশাইয়ের দেশলাই থেকে সার্কাসের কায়দায় ঠোঁটের সিগারেটটা ধরিয়ে নেয় মেয়েটি। তারই ফাঁকে বসে ঝর্ণার মতো আলাপ। উন্নত পেটটি সগৌরবে আসন্ন শুভদিনের ঘোষণা করছে।

—"আজ চাণক্যপুরী কাল জোড়বাগ পরশু মহারানীবাগ—ওফ, পার্টি যেন বন্যা ডেকে যাচ্ছে বছর-ভোর। অথচ পরিতাপের বিষয় এই যে সর্বত্র একই মুখ একই আলোচনা, আর মুখ তো নয় মুখোশ, আলোচনা মানে পরচর্চা, একটা প্ল্যাস্টিকের পৃথিবী।" ধোঁয়া ছেড়ে মেয়েটা বলে—"আমি ইরিনা ওয়েন। কল মি রিনা। ফ্রম কেরালা, অ্যানড ওয়াশিংটন। অ্যানড যু?" এবার দত্তমশাই পরিচয় করিয়ে দেন—

—"স্যার—দিস ইজ নবনীতা, আ বেঙ্গলী পোয়েট।"

—"নব-নী-তা? জানো তো, সাউথে নবনীতম মানে কী? ফ্রেশ ক্রীম। কবিত্বের সঙ্গে বেশ মেলে—", বলেই হাসতে থাকে ইরিনা। কথায় কথায় হাসি ওর।

—"নর্থেও নবীনতম মানে ফ্রেশ ক্রীম। তবে আমার সঙ্গে মেলে না। আমার নাম ব্রাউন ব্রেড কিংবা ওয়াইলড বাইস হলে বেটার হতো।" খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে ইরিনা। "এই তো, এই তো কবির মতন কথাবার্তা শুরু হয়ে গেছে। শুনলে জনাথানের খুব ভালো লাগবে। জনাথান?" —নাদুশনুদুশ সাহেবটি তখন নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পানীয়ের টেবিলের দিকে চলে গেছে। আমি কথা ঘোরাতে বলি—"পার্টির নামে আমারও প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। ঠিকই বলেছো, একই অবাস্তব মুখের মিছিল, একই অবাস্তব হাসি, অবাস্তব বাক্য, তুচ্ছতা, ক্লান্তি, বিষাদ, কলকাতাও তাইই ইরিনা।"

—"না না না,কলকাতা মোটেই তা নয়, আমায় জনাথান বলেছে। কলকাতা অন্য ব্যাপার। ইট ইজ আ লিভিং সিটি। এখানকার পার্টিতে কত ধরনের মানুষ মীট করছি আমরা, লেখক, নাট্যকার, শিল্পী, অভিনেতা, শিক্ষাবিদ—এই আজকের

পার্টিতেই দ্যাখো না, কত লেখক, গাইয়ে, অধ্যাপক। দিল্লির ডিপ্লোম্যাটিক পার্টিগুলো সব অন্যরকম, একমাত্রিক। ঠিক ওয়াশিংটনের মতো। নেহাৎ দেহাতী মেয়ে বলে প্রথম প্রথম আমার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল ঠিকই। মনে হলো এই তো স্বর্গ, এত হালকা জীবন, রং রস রূপ গন্ধ—কতরকম সাজপোশাক—ভালো ভালো মদ—ভালো ভালো খাবার—নেশার মতো ফুরফুরে কথাবার্তা—দিব্যি চলছিল—হঠাৎ একদিন ক্লান্তি এল। সীসের মতো ভারী হয়ে উঠল, দুর্বহ হয়ে উঠল এই অর্থহীন পার্টি জীবন। ভাগ্যিস ঠিক তখনই জনাথান কলকাতায় বদলিটার ব্যবস্থা করে নিল।" বলেই একগাল যুঁইফুলের মতো হাসি হেসে দিল মেয়েটা। ঘন নীল কর্ডুরয়ের প্যান্টের ওপরে ম্যাচ করা লক্ষ্ণৌ কুর্তা, সব চুল টেনেটুনে পিছনে উঁচু করে ঘোড়ার ল্যাজ-স্টাইলে বাঁধা। দীর্ঘ, রুক্ষ, ঘন কালো চুল। বিশাল খোঁপা হতো, বাঁধলে। যেমন চুল তেমনি চেহারা। স্বাস্থ্যবতী একটা চকচকে বাদামী ঘোড়ার মতোই জোয়ান তরতেজী কালো শরীর; বড় বড় চঞ্চল চোখদুটি কৌতুকে ঝকঝক করছে, বেশ একটা মিষ্টি মিষ্টি ভাব আছে মুখময়। খুব ছটফটে আর তেমনি মিশুক—এমন একটা মায়া আছে ওর মধ্যে, যে সারাক্ষণ চোখ টেনে রাখে এত লোকের মধ্যেও। তসরের পাঞ্জাবী গায়ে নাদুশনুদুশ সাহেবকে ওর পাশে বড্ডই শান্তশিষ্ট দেখাচ্ছে। দু'হাতে ভরা গেলাশ হাতে ফিরে আসছেন ভদ্রলোক—"অ্যানড হিয়ার কামস মিস্টার জনাথান ওয়েন —গ্যেস হু?"

—"হার হাইনেসের চির বিশ্বস্ত ভৃত্য, আর কে?" হঠাৎ কোমর থেকে নিচু হয়ে বাও করে নাটকীয়ভাবে একটি গেলাশ ইরিনার দিকে বাড়িয়ে দেন ভদ্রলোক, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এক গাল হাসেন। হাসবামাত্র তার সারা মুখে ঝলমল করে ওঠে উষ্ণতা—আর আমার বুকের মধ্যে আরেকবার খুশির ঘন্টা পড়ে—এই তো, আরেকটা আমাদের নিজের লোক।—ইরিনা আমাকে দেখিয়ে বলে:

—"মীট নবনীতা, আ বেঙ্গলী পোয়েট।"

—"আ পোয়েট? উ-হ..." সাহেবের চোখমুখে যে স্বর্গীয় আহ্লাদের উদ্ভাস ফুটলো তা যদি কৃত্রিম না হয় তবে নিশ্চয় যথেষ্ট গর্ব হওয়ার কথা আমার।

—"আ পোয়েট।" সাহেব যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে। "হাউ মার্ভেলাস। দিস ইজ হোয়াই আই লাভ ক্যালকাটা। উই নেভার মেট আ পোয়েট ইন ডেলহী। ডিড উই, ডার্লিং?" ডার্লিংয়ের বদলে আমিই উত্তর দিয়ে ফেলি।

—"সে কি কথা। দিল্লি তো কবিতে ভর্তি। হিন্দি, উর্দু, পাঞ্জাবী, ইন্দো-অ্যাংলিয়ান, বাংলা, ইউ নেম ইট অ্যানড ডেহলী হ্যাজ ইট।"

—"হতে পারে, বাট দে হিড দেমসেলভ্স ফ্রম মি। অথচ কলকাতায় এসে অলরেডি কতজন সাহিত্যিককে মীট করেছি। ডেফিনিটলি ক্যালকাটা ইজ আ ডিফারেন্ট স্টোরি অলটুগেদার—ইট হ্যাজ মোর মীনিং ফর আস—তাই না বিনা?"

—"আমি তো ঠিক তাই বলছিলুম নবনীতাকে।"

BanglaBook.org

—"এক্সকিউজ মি লেডিজ, তোমাদের সঙ্গে আমি গল্প করতে চাই, কিন্তু ঘরের মধ্যে সত্যিই আর থাকতে পারছি না আমি, দম আটকে আসছে সিগারেটের ধোঁয়ায —একটু বারান্দায় চল না, সবাই মিলে ফ্রেশ এয়ারে বসি?"

—আমারও মাথাটা ধরে যাচ্ছে গরমে,—"চল, বাইরেই যাই ইরিনা—" বাইরে এসে আমরা একটা গোল টেবিলের ধারে বসি। "ঠাণ্ডা বাত বয়ে যাচ্ছে এখানে।" ছাইদানটা টেনে নিয়ে ইরিনা বলে—

—"কলকাতায় এসে জনাথান হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। আমার অবশ্য প্রথমটা একটু নোংরা ময়লা ভাঙাচোরা এরকম লাগছিল—কিন্তু এখন বুঝে গেছি কলকাতা ওকে কী দিয়ে কেন এমন করে মাতিয়ে রেখেছে। ইটস দ্য পিপল।"

—"শুধু তাই নয়—আরো আছে রিনা। ইট হ্যাজ ক্যারেকটার। এত করে রিনাকে বলি, চল, রিনা লেটস গো ফর আ ওয়াক ইন দিস ম্যাজিক সিটি—তা যাবে না। কিছুতেই গাড়ি ছাড়া এক পা নড়বে না।"

—"তো কী করব? জীবনে গাড়ি চড়িনি তো আগে? এখন শোফার ড্রিভন সি. সি. লেখা গাড়িতে বসে মেমসাহেব হয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াই—এ সুখ ছেড়ে কোন দুঃখে গোবর, ডিজেলের কাদা, ফলের খোসা, আর ইউরিনের পুকুরের মধ্যে পা দিয়ে হাঁটতে যাব বল? উনি হাঁটার জন্যে পাগলা। ড্রাইভারের সঙ্গে তো ওঁর ঝগড়াই হয়ে গেল এই নিয়ে।"

—"ড্রাইভারেরই দোষটা ছিল—"

—"মোটেই না। সে তার ডিউটি করবে না?"—

—"ব্যাপারটা কী?"

—"কিছুই না।" জনাথান উত্তর দেয়— "আমি হেঁটে অফিসে যাব, ড্রাইভার কিছুতেই অ্যালাউ করবে না। আমি তার বস, না সে আমার বস? কে কার কথা শুনবে? ছোকরা প্রবল গোঁয়ার—"

"আর তুমি বুঝি গোঁয়ার নও? শোনো নবনীতা, অফিস শুরু ন'টায়। কাছেই আমাদের কোয়ার্টার। দু' মিনিটের পথ, হাঁটলে সাত-আট মিনিট, ড্রাইভার ন'টা বাজতে পাঁচে আসত। উনি হেঁটে যাবেন বলে ন'টা বাজতে দশে বেরুতে লাগলেন যাতে ড্রাইভার পৌঁছবার আগেই পালাতে পারেন।"

—"ড্রাইভারও তেমনি। সে পৌনে ন'টায় এসে ঠিক আমাকে ধরল। আমি আর কী করি? অগত্যা ন'টা বাজতে কুড়িতে বেরুলুম। ড্রাইভার তখন সাড়ে আটটায় এসে হাজির।"

—"ড্রাইভার সাড়ে আটটায় আসতে লাগল, উনি তার পরদিন সোয়া আটটায় বেরুলেন। পরদিন ড্রাইভার আটটায় এল এবং ভয়ানক ঝগড়াও করল। সে অনেকদূরে থাকে, আন্দুল না কোথায় যেন। সেখান থেকে তিন মাইল হেঁটে তাকে ট্রেন ধরতে হয়। শীতকালে অত ভোরে আসতে তার খুব কষ্ট। কিন্তু যেহেতু সাহেবকে অফিসে

BanglaBook.org

নিয়ে যাওয়াই তার কাজ, সেটার জন্যে সে মাইনে পাচ্ছে, সেটা না করলেও তো তার মন ওঠে না।" —আমি তো শুনে অবাক।

—"শুধু পাঁচ-সাত মিনিটের হাঁটা নিয়েই এত কাণ্ড? দিলেই তো হয় হাঁটতে। গাড়ি করে অন্যত্র যাতায়াত করবেন, যখন দূরপাল্লায় কাজ থাকবে।"

—"তাও যে যাবে না। সেন্ট্রাল অফিস ব্রাঞ্চ অফিস, সর্বত্রই হেঁটে হেঁটে যাবে, রোদ নেই জল নেই। আর বলবে, 'পায়ে হেঁটে না বেড়ালে একটা জায়গার সঙ্গে চেনাশুনোই হয় না'।" —আমিও ইরিনাকে বললুম—

—"তুমি রাগ করলে কি হবে,—উচিত কথাই তো বলেছেন জনাথান। হাঁটার মতো কিছু নেই। হুশ করে গাড়ি করে উড়ে বেরিয়ে চলে গেলে, আসল শহরের সবই তো থেকে যাবে অধরা।" এবার জনাথান নিজের পক্ষ সমর্থন করতে এগোয়—

—"আমার সত্যি বড্ড ভালো লাগে এই কলকাতার পথঘাট দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে। কত আশ্চর্য সব গলিঘুঁজি, কত আশ্চর্য সব বিশাল পুরোনো বাড়ি—কত যে অভাবনীয় সব গন্ধ—"

—"সি. এম. ডি. এ-র এবং মেট্রো রেলের অত্যাচারে চতুর্দিকে তো গর্ত —হাঁটেন কী করে?"

—"সাবধানে হাঁটতে হবে বইকি। একটা দারুণ সম্মোহিনী মায়া আছে এই শহরের। আমি তো হেঁটে যাই একটা বিচিত্র মিশ্র সুগন্ধের মিছিলের মধ্য দিয়ে। আমি খুব ফরচুনেট যে কলকাতা দেখলাম।"

—"জনাথান বলে," ইরিনা যোগ দেয়—"পাশ্চাত্য সভ্যতার বাইরে একটা বর্ণহীন অ্যান্টিসেপটিক কেমিক্যাল গন্ধ আছে, কেমন একটা ধাতব স্বাদ লেগে আছে ওখানকার বাতাসে। আর কলকাতা? এখানে এখনও আছে প্রকৃতির গন্ধ, বেঁচে থাকার গন্ধ, জ্যান্ত জীবন্ত সব গন্ধ—কখনো গরমাগরম পকৌড়া ভাজার গন্ধ নাকে আসবে, কিম্বা জিলিপি বসে ফেলছে কোনো দোকানে—জিবে জল আসবেই—

—"কোথাও বা পাকা আনারস কাটা হচ্ছে, ফলের সুগন্ধে বাতাস ম-ম, কোথাও বা একটা আমের কি পেয়ারার ঝুড়ি নামাচ্ছে, আঃ কী সুরভী—কখনও কারুর রান্নাঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে নাসারন্ধ্রে একঝলক অজানা কোনো ভারতীয় রান্নার তেল বা ঝাল-মশলার গন্ধ ঢুকে যায়—জিবে জল এসে যায় আমার।" জনাথান বলে,—"তোমার মনে হয় না, নবনীতা? গন্ধের যেন উৎসব।"

"—শুধু কি খাদ্য? কখনো বা ফুলের দোকান পার হচ্ছো, তাজা টাটকা ফুলের তীব্র সৌরভে গলি ভরা, কখনো হয়তো বইপাড়া দিয়ে যাচ্ছো, টাটকা আঠার গন্ধ, নতুন বইয়ের গন্ধ, তাজা কাগজের গন্ধ—কখনো কাপড়ের পাড়ায়, কাপড়ের গাঁঠরি নামাচ্ছে, ওঃ, নতুন কাপড়ের গন্ধ—ওঃ, ইনক্রেডিবল সিটি। কেউ তার জানলা দরজায় খসখস টাঙিয়ে, তাতে জলছড়া দিচ্ছে, তার সুবাস, কখনো কোনো মন্দির পার হয়ে যাচ্ছো, হঠাৎ নাকে আসবে ধূপধুনোর মিষ্টি পবিত্র গন্ধ, চন্দন সুরভি

BanglaBook.org

—শঙ্খঘণ্টার শব্দ—শব্দই বা কত ধরনের—উঃ। রাতে একরকম, দিনে একরকম, ট্রামের একরকম, বাসের একরকম, রিকশার একরকম,"—এবার হাসতে হাসতে ইরিনা যোগ করতে থাকে।

—"ট্রাক লরীর এক রকম, প্রাইভেট গাড়ির এক রকম, ট্যাক্সির আরেক রকম"—

জনাথান আবার খেই ধরে নেয়, "এরই মধ্যে কোকিল কুহু কুহু করছে, গরু মহিষ হাম্বা হাম্বা করছে, কুকুরের ভৌ ভৌ, বেড়ালের ম্যাঁও, কাকের কা-কা, চড়াইপাখির কিচির-মিচির", ইরিনাও ছাড়বার পাত্রী নয়—

—"কলতলায় মানুষ ঝগড়া করছে, এ-বাড়িতে হোলনাইট বাচ্চা কাঁদছে, ও-বাড়িতে হোল-ডে গিন্নি চ্যাঁচাচ্ছে"—জনাথানও ছাড়ে না—

—"ওখানে ক্লাসিকাল গানে গলা সাধতে বসেছে কেউ, এখানে ইংরিজি গান বাজিয়ে হাঁকতে হাঁকতে যাচ্ছে ফেরিওয়ালা—মোটমাট ভীষণভাবে বাঁচা হচ্ছে চারিদিকে—ফিরিওয়ালাদের ফিরি করার জিনিসই বা কতরকমের ? কত বিচিত্র ? কী ভালো লাগে আমার।"

—"হ্যাঁ, শুধুই তাই ? আর ভিকিরির বৈচিত্র্য ভালো লাগে না ? ভিকিরিদের হাঁকডাক ? গানবাজনা ? আর রহস্যময় শব্দ ? পথে কলার খোসা ? গোবর ? আর থুতু ? বস্তির ছেলেদের প্রাতঃকৃত্য ? আর ঢাকনি খোলা ম্যানহোলের সারপ্রাইজ ? সাফ না করা রাশিকৃত জঞ্জালের স্তূপ ? তার সুগন্ধ ?—"

—"সেও আছে, সেও আছে, সেও তো থাকবেই। খেয়াল করে হাঁটতে হবে, আর ইয়ু'ল এনড আপ ইন ট্রাবল, নইলে অন্যগুলো চোখে পড়বে কেন— আফটার অল কতদূর যে গরীব এই দেশটা। ভাবতে গেলে মাথাই খারাপ হয়ে যায়।— আবার এখানেই ধনীর ঐশ্বর্য প্রদর্শনের সীমা নেই। এত রুচির আর হৃদয়ের অভাবও চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। কী নিষ্ঠুর আড়ম্বর!"

—"তুমি কি কবিতা লেখো, জনাথান ?"

—"কবিতা ? নাঃ, আমি কিছুই লিখি না। বিনাও ঠিক এই প্রশ্নই করেছিল আমাকে—কাঠমাণ্ডুতে। আশ্চর্য, তোমরা ভারতীয় মেয়েরা। কবিতা না লিখলে কি সেনসিটিভ হওয়া যায় না ?"

—"তা না, সেনসিটিভ হলে অনেকসময় কবিতা না লিখে পারা যায় না এইটুকু আর কি। কাঠমাণ্ডুতে এই প্রশ্নই করেছিল বিনা ? কেন, হঠাৎ কাঠমাণ্ডুতে কেন ? এত জায়গা থাকতে ? কী কবিত্বটা করেছিলে সেখানে ?"

—"কাঠমাণ্ডুই তো আসল জায়গা। ইট ইজ হোয়্যার ইট অল হ্যাপেনড।" উজ্জ্বল রহস্যময় চোখে ইরিনার দিকে তাকায় জনাথান। সেই দৃষ্টিপাতে একটু যেন বিচলিতই হয় ইরিনা—ব্যস্ত হয়ে বলে—

—"এই রেঃ, সর্বনাশ করেছে। জনাথান তার প্রিয় বিষয়টি এনে ফেলেছে। আর রক্ষে নেই। এখন শোনো বসে কাঠমাণ্ডুতে কী হয়েছিল।"

BanglaBook.org

—"কেন? কী হয়েছিল সেখানে? আমি তো শুনতেই চাই। যদি না তোমাদের কোনো প্রাইভেট ব্যাপার হয়।"

—"খুবই প্রাইভেট ব্যাপার। অত্যন্ত প্রাইভেট। কিন্তু জনাথান খুব ভালোবাসে এটা সবাইকে বলে দিতে।"

—"একা আমারই ফেভারিট টপিক বুঝি? তোমার নয়? বেশ। তবে থাক। আমি বলব না।" জনাথানের গলা ভারী হয়ে বুজে আসে। আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

—"বলি ব্যাপারটা কী? আমি তো শুনতেই চাইছি—সেই বলুক না কেন? যদি অতিরিক্ত কৌতূহল প্রকাশ করা হয়ে না যায়,—তবে, বলেই ফ্যালো", —"বলই না—" হাসতে হাসতে ইরিনা বলে স্বামীকে। "বলে ফেল", কিন্তু জনাথান থেমেই থাকে।

—"গল্পটা কী— কী হয়েছিল কাঠমাণ্ডুতে?" আমি অধীর হয়ে পড়ছি।

—"না, থাক। বলব না। রিনা হাসছে।"

স্পষ্টই অভিমান ফুটে ওঠে জনাথানের চোখেমুখে অথচ ইংরিজিতে নাকি অভিমানের প্রতিশব্দ নেই। কেন নেই?

মানভঞ্জনেরও প্রতিশব্দ নেই। তাই হয় তো ইরিনার মানভঞ্জনের প্রণালীটা বেশ ওরিজিনাল মনে হলো: "না বললে তো বলেই গেল। বেশ, আমিই বলে দিচ্ছি। হলো তো? দুটো গল্প কিন্তু এক নয়। আমার গল্পটা আর জনাথানের গল্পটা একদম আলাদা, কেবল শেষটুকুতে মিল আছে। দুটো দুরকমের গল্প।"

—ব্যাগ খুলে লম্বা বিলিতি সিগারেট আর লাইটার বের করে ইরিনা আমাকে অফার করে। —"খাবে না? কেন? গুড গার্ল বুঝি? আমি বাপু খাব। আগে ছিলাম দিশি মেম, খেতাম শস্তা সিগারেট। এখন হয়েছি আসলি মেম, খাই দামী সিগারেট।"

—"কিন্তু দুটোই ইকোয়ালি ইনজুরিয়াস টু ইওর হেলথ রিনা, বিশেষত এখন।" জনাথান মিনতির সুরে বলে। জনাথান ধূমপান করে না।

—"কম-কম করেই খাচ্ছি বাপু, তবে একদম বন্ধ করতে বোলো না।" স্বামীকে উলটে মিনতি জানিয়ে ইরিনা আমাকে বলে—"এই বিলিতি সিগারেটের ব্যাপারটা যে কী মোহময়, তা জনাথানকে বোঝানো যাবে না। চিরকাল মিশনারীদের ঘরে মানুষ হয় নান, নয়ত নার্স, নয়ত প্রাইমারি স্কুল টিচার হব—চিরদিন খেটে খাব। নিম্নমধ্যবিত্তই থেকে যাব, নেহাৎ হরস্কোপের জোর না থাকলে স্বামী-সংসারও হবার কথা নয়—সেই আমি কিনা বিদেশী ডিপ্লোম্যাট স্বামী যোগাড় করে হররোজ বিলিতি সিগারেট খাচ্ছি! এ সৌভাগ্যের কাহিনী যে সিনডারেলার গল্পকেও হার মানায়, সেটা ওকে কে বোঝাবে?"

—"আই ডোন্ট এগ্রি।" জনাথান বলে— "তুমি কেন সিনডারেলা হবে? আমি কি প্রিন্স? বাবা ছিলেন সেন্ট লুইস শহরের কসাই— মা দক্ষিণের চীনেবাদাম খেতের চাষীর মেয়ে—নেহাৎ ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিলুম তাই আমারও আজ এইখানে আসা—"

BanglaBook.org

—"জনাথানের গল্পটা একদম আলাদা, নবনীতা। তুমি আমারটাই শোন তাহলে।" গেলাশে চুমুক দিয়ে ইরিনা বলে—"নার্স ছিলুম, কাঠমাণ্ডুর মিশনারী হাসপাতালে, আর জনাথান ওখানেই কাজ করছিল একটা সমাজসেবী সংস্থায়। —প্রায়ই দুঃস্থ রুগীদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে আসত, সেই সূত্রেই চেনাশুনো। কী জনাথান? বাকীটা তুমি বলবে?' —

জনাথান চশমার ফাঁক দিয়ে দুষ্টু চোখে তাকিয়ে হাসে।— "নো ডার্লিং। ক্যারি অন। আমারটা বড় বেশি রোমান্টিক। তোমারটাই ভালো। ওতে আমাকে বেশ ভিলেনের মতো দেখায়। আমি বরং ততক্ষণে খালি গেলাশগুলো আর একবার ভরে আনি গে'। কে কী খাচ্ছিলে?"— গেলাশ কুড়িয়ে নিয়ে জনাথান চলে যায়। ইরিনা সেদিকে তাকিয়ে বলে—

—"এখন তো পারফেক্ট জেন্টেলম্যান। কিন্তু জনাথান সাহেব তখন একেবারেই পাগলা ছিল। কে ভেবেছিল ও হবে ডিপ্লোম্যাট?"

—"পাগলা মানে?"

—"মানে? এই ধর...আচ্ছা দাঁড়াও, উদাহরণ দিচ্ছি কয়েকটা—কত আর বলব? পাগলামির তো গোনাগুণতি নেই। এই আমাদের কোর্টশিপটাই ধর না।" সিগারেটের ছাই ঝেড়ে গলাটিও ঝেড়ে নিয়ে গুছিয়ে বসে ইরিনা।

—"প্রথমে একদিন নেমন্তন্ন করল, চায়ে। আমি তো আহ্লাদে ডগমগ! হায় হায়—এত ভাগ্যও আমার হয়েছে? শাদা চামড়ার সাহেব আমাকে ডেট করতে চেয়েছে? আমার বেস্ট ড্রেসটা পরে নিলুম (যেটার দাম ছিল তিরিশ টাকা)। যথাসাধ্য সেজেগুজে তো বেরুলুম। বুক ধুকপুক করছে। না জানি কোন ফার্স্ট ক্লাস রেস্তরায়, কোন ফাইভস্টার হোটেলে চা খাওয়াবে? নাকি নিজের আস্তানাতেই নিয়ে যাবে? প্রথম শক, বাইরে বেবিয়ে দেখি, গাড়িটাড়ি নেই। কাঠমাণ্ডুতে তুমি গেছ তো? যাওনি? তাহলে বলে রাখি শোনো—কাঠমাণ্ডুর পথঘাট কেবল বিদেশী গাড়িতে-গাড়িতে ছাওয়া। হিপিদের পর্যন্ত প্রায়ই বাসের মতন একরকমের গাড়ি থাকে—আর ভদ্র সাহেবমেম কেউই নেই, যার গাড়ি নেই। বেরিয়েই জনাথান হাঁটতে শুরু করলে। পথে কত রিকশা, কত ট্যাকসি দেখা গেল, ভ্রূক্ষেপও করলে না। হাঁটছি তো হাঁটছিই, অবিশ্যি জনাথান নানারকম গল্প করছিল—শুনতে শুনতে হাঁটার কষ্টটা গায়ে লাগছিল না। ঘণ্টাখানেক জোর কদমে চড়াই উৎরাই ভাঙবার পরে—আমরা একটা গলিতে এলাম। না, রানীপোখারি, কি মহারাজগঞ্জ নয়, বা—দরবার স্কোয়ারও নয়—একদম বাজে পাড়া ফ্রীক স্ট্রীটের গা থেকে বেরুনো গরীব সরুমতন গলি। সেখানে একটা ক্ষুদে বিশ্রী ঝোপড়িতে শতচ্ছিন্ন চটের পর্দা তুলে তো তিনি ঢুকে পড়লেন। আমাকেও সযত্নে ঢোকালেন। ভেতরে কিছু বেঞ্চি আর টুল পাতা। মহা সমাদরে সেইখানে বসালেন। অন্ধকূপ মতন ঘরের বাতাসে মাছি ভনভন্ করছে, টেবিল তো মাছিতে থিকথিক,কালো। আমার গা ঘুলিয়ে উঠতে লাগলো। কান্না পেতে

banglabook.org

লাগলো। এত মাছি আমি কোথাও দেখিনি, কাঠমাণ্ডুতেও নয়, কেবালাতেও না। আমি কেবল দু'হাত নেড়ে মাছিই তাড়াতে থাকলুম—কথাবার্তা কখন যেন বন্ধ হয়ে গেল। সমানে মুখের সামনে হাত নাড়ছি। নইলে চোখের পাতা পর্যন্ত খুলে রাখা কঠিন। হঠাৎ শুনি গদগদ গলায় সাহেব বলছে—"তুমি বুঝি নাচ জানো? কী সুন্দর তোমার হাত নাড়ার ভঙ্গি। কী এলিগ্যান্ট, কী এক্সপ্রেসিভ। জাস্ট লাইক দ্য ভারতনাট্যম মুদ্রা-জ। কমিউনিকেশন বাই জেশ্চাবস্।" আমি শুনে চটেমটে বললুম—" তোমার মুণ্ডু, বুদ্ধু সাহেব। এ হচ্ছে সাবহিউম্যান মুদ্রা, কেননা জেশ্চাবেব দ্বারা আপাতত আমি শুধু কমিউনিকেট করতে চাইছি মাছিদের সঙ্গেই—এবং সে কর্মেও খুব একটা সাফল্য লাভ হচ্ছে না!" তখন এই বোকা বলে কি জানো?

—"ওঃ! আব ইউ বাই এনি চান্স আনকম্ফর্টেবল হিযার?" এও আবাব বলতে হবে? ওই ঝোপড়ির মধ্যে কম্ফর্টের যা সব বন্দোবস্ত তাতে মাছিরা আর জনাথান ছাড়া আর কারুকেই কম্ফর্টেবল হবার উপায় নেই। হায় রে প্রাগ্রস। কী আর বলব! সায়েব তখন নিজেই বলল—"হ্যাঁ, মাছিটা অবশ্য এখানে একটু বেশিই, কেন যে এরা ফ্লীট স্প্রে করে না, জানি না। স্প্রেটা আমি এক পরেব দিন নিযে আসব সঙ্গে। কী কবি বলো? কাঠমাণ্ডুব বেস্ট আলুর চাট যে এবাই বানায। আমি সব দোকানে ঘুরে ঘুবে তুলনামূলক বিচার করে দেখেছি। তোমাকে নিযে বেরিয়েছি যখন, আই শুড অফাব ইউ ওনলি দ্য ভেরি বেস্ট! এবা কী একসেলেন্ট টী বানায়, এখুনি দেখবে।" তা, অবশ্য কথাগুলো সত্যিই। দারুণ আলুর চাট আব চা দিল ওবা, আব টুলগুলো রাস্তায বেব করে নিয়ে আমরা রাস্তাতেই বসে বসে খেলুম, মাছির উপদ্রব সেখানে কম ছিল। বাইরে এসেই জনাথান বলল—"তুমি কি গাঁজাব গন্ধ সহ্য কবতে পাবো? তাহলে অবশ্য ভেতবের ঘরটায় গিয়ে বসতে পাবি। সেখানে মাছির উপদ্রব নেই, কিন্তু কিছু হিপি আছে।" —আমি তো সাহেবের জ্ঞানবুদ্ধির ঠেলায হাঁ। তখন হাসপাতাল কোয়ার্টার্সে ফেববার জন্যে প্রাণ অস্থিব হযেছে। ফেববাব সমযে আমি বললাম, "আমাকে আব পৌঁছে দিতে হবে না—আমি একটা রিকশা ধরে চলে যাচ্ছি।" খুব রাগ হচ্ছে তখন। এতদিনে যদি বা একটা গোবা সাযেব জুটলো, যে নাকি হিপি নয, সে কিনা হাডকিপ্টে? ইবিনাব সামনে ভর্তি গেলাশটি এগিযে দেন এবার হাড়কিপ্টে সাহেব, গোলগাল মুখে গদগদ হাস্য। আমার সামনে আমাব গেলাশটিও বাখেন।

—"তারপর?" বলে, আয়েশ কবে নিজেবটি নিযে স্ত্রীর উল্টোদিকেব চেয়ারে বসেন।

—"তারপর ঝামেলা বাধালো এক রবিবারে। যেদিন আমাকে প্রথমবাব ডিনারে নেমন্তন্ন করলো। আমি স্পষ্টই জিজ্ঞেস কবলাম—ঝোপড়িতে নয তো? হিপি পাড়ায় নয় তো? মাছি থাকবে না তো?" ও তো হেসেই উড়িযে দিল আমাব ভয় ডব —"আরে না না এবার একেবাবে অন্য পাড়ায় নিযে যাব।" বেশ। আবাব সেই

তিরিশ টাকার ড্রেসটি পরে, চুলটুল শ্যাম্পু করে, নাইলন স্টকিংস আর নতুন স্টিলেটো হীল্‌সের জুতোজোড়া পায় দিযে যথাসাধ্য ফিটফাট মেমবিবিটি সেজে তো বেরুলুম। গায়ে ভুর ভুর করছে বম্বেতে তৈরি ইভনিং ইন প্যারিস। সে সেন্ট এখন আব পাওযা যায না। আবাব হাঁটা। হাঁটছি তো হাঁটছি। ভুল করেছি স্টিলেটো হীলস পরে। ও জিনিস পায় দিয়ে পাহাড়ী পথে হাঁটার যে কী কষ্ট, আর কী ডেঞ্জারাস, সে না-হাঁটলে টের পাবে না। হাঁটতে হাঁটতে সাহেব বলল—"আজ তোমাকে দারুণ একটা সারপ্রাইজ দেবো।" এবাবে গিযে পৌঁছুলুম এক মধ্যবিত্ত নেপালী রেসিডেনশিযাল পাড়ায। এক বিরাট বাড়ির ভাঙামতন দবজায় কড়া নাডতেই নেপালী কর্ত্তাগিন্নি এসে খুবই আদর কবে ঘরে নিযে গেল আমাদের। গল্পগাছা কবে ছাং-টাং খাইয়ে শেষ পর্যন্ত মহা যত্নে মাটিতে বসিযেই পেতলের থালায ভাত ডাল আর আলুর সব্জী খেতে দিলে। ওঃ, আমার কী মন খারাপ। আমবা একে কেবালাব লোক, তাও ক্রিশ্চান, ওসব নিরিমিষ্যি আহাবেব ধাব ধারি না। মাছ মাংস ছাড়া মুখে ভাত ওঠে না। কিন্তু সাহেব কী খুশি, কী পবিতৃপ্তি করে খেতে লাগলো, যেন অমৃত! এ কী কিপ্টে রে বাবা, বন্ধুব ঘাড়ে ডিনারের খবচটা সেবে নিলে? খেতে খেতে সাহেব বললে—

—"জানো ইরিনা, আমবা কাব বাডিতে খেতে বসেছি? ইনি একজন পুরস্কারপ্রাপ্ত নেপালী সাহিত্যিক। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পবিবাব, বংশানুক্রমে এঁরাই রাজবাড়ির গৃহশিক্ষক —ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ে নেপালী ভাষা ও সাহিত্য পড়ান—কত বড় মানুষেব সঙ্গে আলাপ কবিযে দিলুম দ্যাখো। খুব ভালো সারপ্রাইজ নয়?" "হ্যাঁ, আমি তখন খুবই সারপ্রাইজড হচ্ছি, ঠিকই, কিন্তু তাই দিযে ঠেলে তো ভাত নামানো যাচ্ছে না? এমন সমযে সাহিত্যিকের মিষ্টি গিন্নি জিজ্ঞেস কবল, 'তুমি কি ডিম খাও?' আমি তো তক্ষুণি ঘাড নেড়ে দিয়েছি—'হ্যাঁ!' অবিলম্বে অন্তত চারটে ডিম দিযে ভাজা বিশাল অমলেট এসে গেল, খাওয়াটিও দারুণ জমে গেল। তাবপবে অনেকক্ষণ কড়া তামাক আর নেপালী মদ খেতে খেতে দিব্যি আড্ডা। লেখক লোকটি সত্যি খুব ইন্টারেস্টিং। এতদিন নেপালে কাজ কবছি অথচ কোনো নেপালী গৃহস্থ পবিবাবে নেমন্তন্ন খাইনি, পাগলা সাহেবেব কল্যাণে সেটা হয়ে গেল।"

—"ইনি তো হাফ সন্ন্যাসিনী ছিলেন, হয তো ফুল সন্ন্যাসিনীই হযে যেতেন আমি যদি না সমযমতো ঝাঁপিযে পড়ে বাধা দিতাম। এই একটা ব্যাপাবে যীশুখৃষ্টকে হাবিয়ে দিয়েছি বাপু। আরেকটু হলেই আমার বউ যীশুর বউ হযে যাচ্ছিল আর কি।"

—বলেই কালো বউকে জাপটে ধরে সশব্দে তার গালে একটি শাদা চুমু খায় সায়েব।

—"যাও! কী হচ্ছে?" ধমকে ওঠে কালো বউ—"এটা কি ওয়াশিংটন?"

—"ওয়াশিংটন বুঝি চুমু খাবার দেশ? চল তবে আমরা ওয়াশিংটনে ফিরে

যাই।"

—"বড্ড পাগলামি করছো সত্যি। ভালোই হতো যীশুর বউ হলে। সেইজন্যেই তো প্রস্তুত হচ্ছিলুম বাল্যকাল থেকে। মিশনারীদের খেয়েপরে মানুষ হলে লোকে মিশনারীই হয় প্রধানত।"

—"খুব ঠকান ঠকিয়েছি তাহলে তোমার মিশনারীদের কি বল? কিন্তু চটেছে বলে তো মনে হলো না কেউ? দিব্যি আশীর্বাদ করল সব?"

—"চটবে কেন? যেভাবে বিয়ে হলো, সে তো কল্পনার অতীত। সবাই কত খুশি হয়েছে আমার এই সৌভাগ্যে।"

—"সৌভাগ্য বলে মানছো তাহলে?"

—"নিশ্চয়ই। একশোবার। হাজারবার। মহা সৌভাগ্য।"

—"বিয়েটা কোথায় হলো? কাঠমাণ্ডুতেই?"

—"বল, বিনা, বল নবনীতাকে, কীভাবে বিয়েটা করলুম? সে দারুণ ব্যাপার। জমজমাট কাণ্ড!"

—"দূর", ইবিনা তার স্বামীর উৎসাহে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে বলে—"সে খুব লম্বা গল্প। কোর্টশিপের গল্পটা তো শুনতে পাচ্ছ, কম কী একসাইটিং। বিয়ে তো আরো ভয়ংকর। তবে মিশনারীরা তো মনে করেছিল আমি হয়তো চিরকুমারীই থাকব, তাই বিয়ে হচ্ছে বলে সবাই আহ্লাদে আটখানা। নইলে গল্প এমন কিছুই না।"

—"তার চেয়ে বরং জনাথান আমাকে কীভাবে প্রপোজ করল, সেই গল্পটা বলি, শোনো। স্বভাবে এই মানুষটি এতই অধীর যে কোর্টশিপের মোটে সময়ই দিল না। প্রথমদিনে চা, দ্বিতীয়দিনে ডালভাত, তৃতীয়দিনেই প্রপোজাল। আগে কিছুদিন বেশ যে ঘোরাঘুরি হবে, মন জানাজানি হবে, রোমান্টিক আলোছায়ার খেলা চলবে —তা নয়। গোড়াতেই বিয়ের কথা পেড়ে বসল।"

—"তাহলে? নো রোমান্স অ্যাট অল? হায় হায়"—

—"না না। রোমান্স টোম্যান্স হলো সবই, তবে আঙুলে এইটে ওঠার পরে।" একটি গর্বিত অনামিকা তুলে দেখায় ইবিনা। তাতে একটি সিংগল কমলহীরে ঝকঝক করছে, তার পাশেই মোটাসোটা বেড দেওয়া ওয়েডিং ব্যানড। দুটি দাম্ভিক অলংকার ঐ সতেজ বাদামী আঙুলে বড় সুন্দর মানিয়েছে। এতক্ষণে খেয়াল করি ইবিনার কানেও দু'টি বড়-সড় হীরে ঝকমক করছে। আমার নজর লক্ষ্য করে, নিজের দুই কানে দুহাত ছুঁইয়ে ইবিনা হাসে—

—"ওয়েডিং প্রেজেন্টস। ফ্রম দি ব্রাইডগ্রুম অফকোর্স.—হু এলস?"

—"বাঃ। খুব সুন্দর, সত্যি। আচ্ছা, কী করে তোমার কাছে প্রপোজ করল জনাথান?" —সিগারেটে টান দিয়ে, একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো ইবিনা—"সেইটেই তো বলছি। পরের সপ্তাহে বলল— সেবারে লোকের বাড়িতে নেমন্তন্নে তোমার মন

BanglaBook.org

ভরেনি। চল এবারে অন্নপূর্ণা হোটেলে।" এক-হপ্তা পরে ডিনার-ডান্সের নেমন্তন্ন রইল। অন্নপূর্ণাই সবচেয়ে বড ফাইভস্টার হোটেল ওখানে। শুনেই তো আমি দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়লুম। তাহলে ঐ তিরিশ টাকার জামাতে আর চলবে না। এ-বারে তো একটা ইভনিং গাউন চাই। আপনিই ইবিনার পরনের কর্ডুরয়ের প্যান্টের দিকে নজর পড়েছিল। এটাও তো একটা ডিনার পার্টি, বড়-ঘরে নাচও চলছে। একটু আগেই তো নিজের স্বামীর সঙ্গে একরাউণ্ড নেচে নিল ইরিনা, সবরকম লৌকিকতার নিয়ম ভেঙে। যে-যার আপন আপন স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে নর্তন-কুন্দন করবে —বিলিতি সামাজিক নৃত্যের এটা নিশ্চয়ই মূল উদ্দেশ্য নয়। আমার দৃষ্টি নজর করেই ভাবনাটা পড়ে ফেললে ইরিনা— "এখন আমরা কত লিবারেটেড—এখনকার কথা ছেড়ে দাও, এমনি ট্রাউজার্সের ওপর তসরের পাঞ্জাবী ঝুলিয়ে তখন ডিপ্লোম্যাটিক কাজের কথা ভাবা যেত?" —স্বামীর দিকে কটাক্ষ করে ইরিনা বলে—"সেদিন রীতিমতো ডিনার জ্যাকেট পরে হাজির হয়েছিলেন এই ভদ্রলোক—গলায় বো-টাই বেঁধে। দেখাচ্ছিল অবশ্যই খুবই সুন্দর। আমিও ইতিমধ্যে একটি আর্ট সিল্কের ইভনিং গাউন করিয়ে নিয়েছি, সেই রূপোলী স্টিলেটো হীলের জুতোর সঙ্গে যাবে, এমন একটা ম্যাচিং শালও কিনে ফেলেছি, আর ভাবছি কি নিদারুণ সেকসি দেখাচ্ছে আমাকে, কি অপরূপ রূপবতী। অর্ধ-শিশি ইভনিং ইন প্যারিস ঢেলেছি গায়ে, আর মুখে অনেক কিউটিক্যুরা পাউডার। হস্টেলের অন্য নার্সরা সবাই বলল দারুণ দেখাচ্ছে। সবাই তো মহা একসাইটেড—হোটেল অন্নপূর্ণায় বেড়াতে যাবার সাধ্য কারুরই নেই —কিন্তু সাধ প্রত্যেকেরই আছে।"

—"আবার হেঁটে তো?"

—"না না, এবারে হেঁটে নয়। এবারে রিকশাও নয়—ট্যাকসি। পোশাকের গুণে। ঐ-সব ধরাচুড়ো পরে না যায় রাস্তা দিয়ে হাঁটা, না যায় রিকশাগাড়িতে চড়া। অবশ্য ফ্রীক স্ট্রীট হলে আমার পোশাকটা তবু চলে যেত, হিপিরা তো হামেশাই দিনদুপুরে নাইট গাউন পরেই ঘুরে বেড়ায়—কিন্তু ওর ডি. জে. টা যেত না। ও জিনিস কোনো ফর্মাল ডাইনিং হলের বাইরে কোথাও মানায় না যে।

অন্নপূর্ণায় ঢুকে তো চক্ষু চড়কগাছ। এ কি স্বপ্নলোক— কোথাও দেখিনি এমন পালিশ করা মোম-চকচকে মেঝে, অথবা এতখানি কার্পেট ঢাকা ফ্লোর এরিয়াও। এতগুলো সাহেব-মেম, আসলী মেম, আসলী সাহেব—জনাথানের মতো, আমার মতো নয়—তাদের পরনে সেসব বিলিতি কাটের পোশাক পরিচ্ছদই আলাদা, তাদের হাঁটাচলাই আলাদা, প্রতিটি পদক্ষেপে গরম-গরম কনফিডেন্স ফুটে বেরুচ্ছে—তাদের চুলের কায়দা কত, তাদের প্রতিটি নড়াচড়া, সিগারেট-ধরা, কি গেলাশ-ধরা, হাসি, কথা, কত কালচারড, কত মার্জিত—কত ফ্যাশনেবল। যেন অন্য জগৎ, অন্য পৃথিবী। যেন একগাছা ফরাশী ছাঁটের পুডল আর পেডিগ্রিওলা অ্যালসেশিয়ানের মধ্যে একটি মাংগ্রেল নেড়ির মতো করুণভাবে শোভা পাচ্ছি আমি। আমার সস্তা কাপড়ের সস্তা

BanglaBook.org

ছাঁটের উৎকট জামায় আমার সস্তা সেন্টের উগ্র গন্ধ, আমার অমার্জিত ভাবভঙ্গি, অনভিজাত হাঁটা-চলা—সব যেন দশগুণ বেড়ে উঠে আমাকেই দংশন করতে লাগলো। আমি ঠিক যেন সংযের মতো। এতো সেলফ কনশাস জীবনে ফীল করিনি কখনও। ভাবলুম,—একটু ড্রিংক করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

তারপর বেশ কয়েক-পাত্র বিলিতি শেরি খেয়েও কিছুতেই রিল্যাক্স করতে পারছি না দেখে ভাবলুম—একটু নাচতে শুরু করলেই ঠিক হয়ে যাবে। তারপর বেশ কয়েক রাউণ্ড নেচেও কিছুই ঠিক হলো না। ক্রমশই মুষড়ে পড়তে লাগলুম। আমার কান্না পেতে লাগলো। ডান্স-হল যেন জেলখানার মতন পিষে ফেলছে, পালাবার জন্যে প্রাণ আইঢাই—"

—"এ কিন্তু তোমার বড় অন্যায় কথা বাপু", আমি মন্তব্য না করেই পারি না এবার—"ধারায় নিয়ে গেলেও দোষ, মাছি ভন-ভন,—বন্ধুর গেরস্তবাড়িতে নিয়ে গেলেও, দোষ, ডাল-ভাত চচ্চড়ি, আবার ফাইভস্টার হোটেলে নিয়ে গেলেও দোষ? বড্ড বেশি বড়মানুষী? —তাহলে ও তোমাকে নিয়ে যাবেটা কোথায়?" একগাল হেসে হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দেয় ইরিনা—

—"সেটাই তো বলছি, জনাথান আমাকে নিয়ে কোথায় গেল!" মোটা ঘোড়ার ল্যাজের গুচ্ছটা বুকের ওপর ফেলে নাড়াচাড়া করতে থাকে ইরিনা—চুলটা যেন আঁচলের মতো দেখাচ্ছে—ইরিনার কি একটু একটু লজ্জা করছে এবার?

—"নাচছি বটে, কিন্তু মুখটা নিশ্চয় শুকিয়ে গিয়েছিল, আমার। কেননা নাচের মধ্যেই ফিসফিস করে জনাথান হঠাৎ বললো, চল, গিয়ে বাইরের খোলা ব্যালকনিতে দাঁড়াই। এই এখন যেমন, সেই আর কি? আমি তো বাঁচলুম। তক্ষুনি রাজি। ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালুম। মাথার ওপর আকাশ, বাইরেটা খুব শান্ত, ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে, নাচঘরের বাজনার শব্দ এখানে মৃদু। সুদূর; আলোরও জোর নেই, যে-জন্যে আকাশের চাঁদটা দেখতে কোনোই বাধা হচ্ছে না। জনাথান বললো—"দ্যাখো চাঁদটা আজ কী আশ্চর্য—"

"সত্যিই চাঁদটা তখন খুব অদ্ভুত দেখতে ছিল। কীরকম অসমান গড়নের, এবড়ো-খেবড়ো, আঁকাবাঁকা। চারদিকে উড়ন্ত ধোঁয়ার মতো কালো মেঘের হিজিবিজি —আর তার ফাঁকে একফালি অপুষ্ট চাঁদ। তার রংও কীরকম ভুতুড়ে। গা ছমছম-করা সিঁদুরে-লাল টাইপের। —ভোঁতা ছুরিতে কেটে দেখা পাকা কুমড়োর ফালির মতো দেখাচ্ছে। চাঁদটা দেখিয়ে ও বললো—'দেখেছো কী সুন্দর একটা অর্ধসমাপ্ত চাঁদ? মনে হচ্ছে না কি, যে এখনও সৃষ্টির সবকিছু গড়ন-পেটনের কাজকর্ম ফুরোয়নি? সৃষ্টিকর্তা একটু বিড়ি খেতে উঠে গেছেন?"

"শুনে গায়ে কাঁটা দিল আমার। সৃষ্টির প্রথম দিনগুলোর কথা তো এমনি করে ভাবিনি কখনও?"

এবার জনাথান বললো—"দূর এমন অসামান্য একটা আধ-গড়া চাঁদ দেখে

BanglaBook.org

ফেলবার পরে, সৃষ্টিকর্তার খাস স্টুডিও থেকে কি আর ঐ বদ্ধঘরের আর্টিফিশিয়াল ঝিন্‌চাকে ফেরা যায়? তুমি কি ব্যাংকোয়েটের খানা খেতে না পেলে খুব দুঃখ পাবে? এবং এরপরে ক্যাবারেনৃত্যটি না দেখলে তোমার কি জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে?"

—আমি বললুম—"না না, মোটেই না।"

—"তবে চলো, আমরা বেরিয়ে পড়ি"—ও বললো, "ওই দ্যাখো কী অদ্ভুত ঘনসমুদ্রের মতো গভীর কালো আকাশ, তারা নেই—কেমন শাদা-কালো দু'রকমের মেঘ উড়ুক্কু মাছের মতো উড়ে যাচ্ছে—আর চাঁদটা—একটা ভাঙাচোরা দ্বীপের চর যেন সদ্য জেগে উঠছে—চলো ইরিনা চলো, নাগরকোট চলে যাই, কাল ভোরে দু'জনে একসঙ্গে সূর্যোদয় দেখে, তারপর ফিরে এসে ঘুমোব। যাবে?" —জনাথান আমার হাতদুটো চেপে ধরেছে। আমি তো অবাক। এত সুন্দর সুন্দর কথা আমি জীবনে কখনো কারুর মুখে শুনিনি, সামান্য নার্স বলে কথা। সাহিত্য-টাহিত্যও পড়িনি তেমন কিছুই, মিলস অ্যাণ্ড বুন-এর রোমান্স ছাড়া—আমার জীবনটাই যে জলজ্যান্ত মিলস অ্যাণ্ড বুন হয়ে দাঁড়াবে তা কে জানত? আমি বলতে লাগলুম—"বাইরে রাত্রিবাস? ও-বাবা সে পাববো না। হস্টেলের সুপারের থেকে পারমিশন নিয়ে আসা হয়নি—মিশনারী হাসপাতাল বলে কথা।" তখন জনাথান বললো "বেশ, নাগরকোট না হয় আরেকদিন হবে, চল আমরা বাগমতী নদীর ধারে যাই।"

হঠাৎ জনাথান এবার আপনমনেই যেন কথা শুরু করল—"পিছনে পড়ে রইল ব্যাঙ্কোয়েট, তার চর্বচোষ্য লেহ্য পেয় নিয়ে, পড়ে রইল নাচঘর আর তার উদ্দাম বাজনা, দামী পারফিউমের গন্ধ মাখানো ছবি-ছবি সব মেয়েরা, আমরা বেরিয়ে এসে হাঁটতে লাগলুম। হোটেল অন্নপূর্ণার দ্বারপালের অবাক চাউনি আমাদের গায়েই লাগলো না—ইভনিং গাউনের আর ডিনার জ্যাকেটের সং-সাজা অবস্থাতেই আমরা হাঁটতে হাঁটতে শহর পেরিয়ে পাহাড়-নদী-জঙ্গলের কাছে পৌঁছে গেলাম। খুব ডেলিকেট একটা নির্জনতা ছিল সেখানটাতে। যেন অল্প জোরে শব্দ হলেই খান খান হয়ে ভেঙে পড়বে ঐসব ছায়া-ছায়া গাছপালা, বাঙা-ভাঙা চাঁদ, মেঘ-ওড়া কালো আকাশ; —দূরে পশুপতিনাথের মন্দিরের চুড়োটা। বাগমতীর কুলকুল আর ঝোপের পতঙ্গদের ঝিনঝিন শব্দে ঝিম-ধরানো একটা অলৌকিক পরিবেশ—মৃদু জ্যোৎস্না এখানে ওখানে মাটিতে আলো-ছায়ার জাল বিছিয়ে ওঁৎ পেতে চুপচাপ পড়ে আছে, ডালপালার ফাঁক দিয়ে এসে,—ঠিক যেন নিষাদের ফাঁদ। বাগমতীর তীরে নেমে একটা মস্ত বড় পাথরে বসলুম আমরা।"

—"ঐরকম জায়গায় সবচেয়ে বেখাপ্পা ছিল আমাদের পোশাক,—কিন্তু সেসব কথা তখন মনেই ছিল না আমাদের," —আবার ইরিনা খেই তুলে নেয়—"আমার সত্যি সত্যিই মনে হচ্ছিল বুঝি সৃষ্টির প্রথম সপ্তাহ এখনো সমাপ্ত হয়নি—।"

জনাথান আমাকে বলল—"দ্যাখো তো ইরিনা, চাঁদটা এবারে অনেকটা যেন

মোলায়েম হয়ে এসেছে না? অতটা তো এবড়ো-খেবড়ো দেখাচ্ছে না আর! কারিগর ফিরে এসে উকো দিয়ে খানিক ঘষাঘষি করেছেন মনে হয়।" ভালো করে চেয়ে দেখলুম সত্যি চাঁদটার অত রাগী লালচে রংও নেই, উড়ো-মেঘ কিছু সরে গিয়ে, ধারের খোঁচা খোঁচা ভাবটাও খানিকটা মিলিয়ে গেছে—এখন অনেকটা ভদ্রস্থ দেখাচ্ছে। কয়েকটা তারাও উঁকি দিচ্ছে। আবার আমার হাত ধরে জনাথান বলল— "বুঝতেই পারছ, সৃষ্টিকর্তার সব কাজকর্ম এখনও শেষ হয়নি। সেই কারণেই এখানে আসা, —খুব জরুরি একটি কর্তব্য বাকী রয়ে গেছে তাঁর—কই, এবার আমার দিকে একটু তাকাও দেখি, বলছি জরুরি কথা আছে। ওই বিশ্রী হোটেলে এই জরুরি কথাটা মোটেই বলা যেত না। —শোনো এবার মন দিয়ে—আমাকে বিয়ে করবে তুমি, ইরিনা?" ইরিনা থামলো। জনাথানের দিকে পূর্ণ-দৃষ্টিতে চাইল। জনাথানের মুখে মৃদু হাসি, পেটফুলো বৌকে আধখানা জড়িয়ে ধরে তার মাথায় নিজের মাথাটি ঠেকালো আদর করে। তারপর যে-যার গেলাশে ঠোঁট ঠেকিয়ে দীর্ঘ চুমুক লাগালো। স্মৃতির সম্মানে?

—"আর পরের কথাটা? তারপরের কথাটা বুঝি বলবে না?" —জনাথান বলল। দেখি চশমার ফাঁকে সেইরকম মিটির মিটির হাসছে।

—"তুমি না বললে এ অংশটা তবে আমিই বলে দিই? ঐরকম একটা ডেলিকেট স্তব্ধতা, একটা ডেলিকেট আলো-আঁধার। ঐ ঝিম-ধরানো একঘেয়ে মৃদু কুলকুল ঝিনঝিন শব্দলহরী, প্রকৃতিতে একটা ঘোর ধরিয়ে দিয়েছে, গাছে নদীতে পাথরে মানুষে মিশে মিশে যাচ্ছে, ঠিক এমনি সময়ে বনের মধ্যে একটা রাতপাখি খুব জোরে ডেকে উঠল। কী তালকাটা, বেসুরো কর্কশ সেই চিৎকার, ঠিক বাচ্চার কান্নার মতো শোনালো—আর এই সাহসিকা ঘাবড়ে গিয়ে ওরে বাপরে বলে সবলে জাপটে ধরলো সামনে যে লোকটা ছিল তাকেই। অর্থাৎ এই শর্মাকেই। আর আমি তো বাবা চালু ছেলে, অমন সুবর্ণসুযোগ ছাড়তে হয়? দিলাম সুন্দর করে একটা বিউটিফুল চুমু—"

—"আমার জীবনের সর্বপ্রথম চুম্বন।"

ইরিনা বলল এবং তারপরেই বিপিট কোয়েশ্চেন—"কী আমাকে বিয়ে করবে তো?" আমি ঘাড় নাড়লুম, "হ্যাঁ। এই বাগমতী সাক্ষী, এই চাঁদ সাক্ষী, হ্যাঁ। করব, করব।"

শুনে জনাথান বলল—"বাঃ, গ্র্যাণ্ড, ঐ যে দ্যাখো, যা বলেছিলুম, চাঁদ-গড়া এবার পুরোপুরি শেষ।" "তাকিয়ে দেখি সত্যিই তো? কুমড়োর ফালি কোথায়? এ যে টুসটুসে মধু ঝরানো পাকা খরমুজা? বৈদ্যুতিক যন্ত্রে স্লাইস করা ইমপোর্টেড হানিডিউ মেলন?"

—"তারপর?"

—"তারও পর চাই তোমার? তারপর একটু অন্যরকম লিভিং ইন সিন ফর

টু ইয়ার্স—আমাকে তো ফিরে যেতে হলো দু'মাস পরেই। ওই অ্যাসাইনমেনটে বিদেশে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। বছর দুই আমাদের ঘোরতর প্রেম হলো—রীতিমতো প্রিম্যারিটাল লাভ—কল ইট সিন অর কল ইট রোম্যান্স—অ্যাজ ইউ প্লীজ—"

—"কিন্তু আসল কথাটাই তো বলছ না। 'সিন বাই করেসপনডেন্স' হচ্ছিল আমাদের। কেননা 'লিভিং টুগেদার'টা অন্য লোকেরা তো বুঝতে পারছিল না? দৃশ্যত একজন ফিবে গেছে ওয়াশিংটনে, আরেকজন পড়ে আছে কাঠমাণ্ডুর মিশনারী হাসপাতালে। অথচ বাই করেসপনডেন্স দারুণ রকম প্রিম্যারিটাল লাভ চলছে—"

তিনজনেই প্রাণ খুলে হেসে উঠলুম এবারে—

—"তারপর?"

—"তারপব দু'বছর বাদে একদম কোড ডিপ্লোমাটিক আঁটা এক দীর্ঘ শাদা বিদেশী গাড়ি এসে হাসপাতালের গাড়িবারান্দাটা জুড়ে দাঁড়ালো। ব্যস্, মাননীয় রাজপুত্রব এসে আমাকে তাঁর ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে হাওয়া।"

—"সোজা দিল্লি হয়ে ওয়াশিংটন।" জনাথান মুখ গোমড়া করে বলে—"সে তো না হয় হলো, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আমাব এত কষ্টে ফাঁদ পেতে ভারতীয় কনে ধবা, সেই গুড়েই তো বালি? ডাউরির আশায যাও-বা ধরলুম শিকারটা—তা পাই-পয়সাও পণ জুটল না। কেন? আমার কি বরপণের যোগ্যতা নেই? একটা মার্বল প্যালেস, গোটা দুই গ্রাম, এটুকুও কি আমি পেতে পারতাম না? অন্তত একটা বাইসিক্ল আর একটা ট্রানজিস্টার? আমার ভাইভার তো এগুলো ছাড়া আরো পেয়েছে। সোনার আংটি, হাতঘড়ি, ইভন শুজ অ্যাণ্ড বেডিং।"—

—"সে তো আমার চেয়ে উঁচু জাতের গো? বর্ণহিন্দু তো সে? আমি তো নেটিব খ্রীস্টান। হীনস্য হীন, দীনস্য দীন,—ভারতবর্ষে আমার কোনোই জাতপাত নেই। ভয়ানক গরীব আমরা। আমাকে মানুষ করবার মতোও সামর্থ্য ছিল না আমার বিধবা মায়েব।

—তাই না মিশনাবীদের হাতে সমর্পণ কবেছিলেন? তুমিও যেন বোকার মতো সিলেকশন করেছ? ঠকবেই তো। তো, চল না, আমরা মায়ের কাছে গ্রামে যাই? সম্পত্তি বলতে মায়ের আছে তো শুধু তিনটে মাদী শূয়োর, একটা ছাগল। একটা মোরগ, গোটা কয়েক মুরগী, আর তাদের পাহারাদাব একটা কুকুর। যদি চাও মার কাছ থেকে ডজনখানেক শূয়োরছানা আর গোটা কয়েক মুরগী পণ নিয়ে নিতে পারো এক্ষুনি—"

ঠিক এমন সময়ে রাস্তায় ভঁপ্পর ভঁপ্পর ভোঁ...করে তাশাপার্টির ব্যানড বেজে উঠলো—"জিসকি বিবি মোটি—"

—সঙ্গে সঙ্গে কথা বন্ধ, কান খাড়া। মুহূর্তের মধ্যে টেবিল ঠেলে সরিয়ে জনাথান উঠে পড়ে রেলিঙের ধারে ছুটলো। ঝুঁকে দাঁড়িয়েই মুখ ঘুরিয়ে বৌকে ডাকল—"এস, এস, রিনা, শিগগির দেখে যাও, কী সুন্দর।"

BanglaBook.org

—"দেখলে তো? কেমন পাগল? দ্যাখো একবার—", বলে ইরিনা ঘাড় নেড়ে চোখের ইঙ্গিতে স্বামীব ছেলেমানুষী দেখিয়ে দিয়ে প্রশ্রযের হাসি হাসে। হাসতে হাসতে উঠেও পড়ে, এগিয়ে গিয়ে স্বামীর কোলটি ঘেঁষে দাঁড়ায়। পায়ে পায়ে পেছু পেছু যাই আমিও। একটু দূবত্ব রেখে দাঁড়াই বেলিঙে ভব দিয়ে।

মস্ত শোভাযাত্রা যাচ্ছে। প্রথমেই লাল জরিদার ঝলমলে পোশাক পবা ব্যান্ড-পার্টি। রোগাবিবি-মোটাবিবির গান বাজাচ্ছে সদর্পে। তাবপর বিপুল আলোকমালাব জ্যামিতিক সব ত্রিকোণ ঘাড়ে করে দলে দলে গরীব লোক হেঁটে যাচ্ছে, তাব পেছনে একদঙ্গল দিব্যালঙ্কারভূষিতা, মাল্যচন্দনচর্চিতা, রংচঙে হিজড়ে যাচ্ছে নাচেব নামে শ্রীহীন অঙ্গভঙ্গি কবতে কবতে, তাদেব পিছনে কিছু গম্ভীব পুরুষ, আর হাসিখুশি নারীরা গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে—মধ্যে ঘোড়ায় চেপে সুটপবিহিত বব, ববের মুখখানি দেখা যায না, ফুলেব ঝালরে ঢাকা, তার পিছনে আরো কিছু লোকজন, আরো আলোব মালা, সবশেষে জনশূন্য ফাঁকা মোটরগাড়িব সারি।

—"বাঃ!" —শুনতে পেলুম জনাথান বলছে: —"ওযেডিং শুধু তো ডাউরি নয়? এটাও তো তবে ফসকে গেছে? এই ঘোড়ায় চড়া, এই ফুল, এই আলো, গান-বাজনা, নাচটাচ?"

—"বললুম তো, ভুল ঘবে বিয়ে কবেছ যে? ঘবতে একটি মারবাড়ী বউ, পেতে এইরকম দারুণ অভ্যর্থনা—"

—"যাক গে, আমাদেব বিযেব সিলভার জুবিলিতে, বুঝলে বিনা, আমরা ঠিক এইরকম উৎসবের ব্যবস্থা করবো—"

—"ততদিনে নাতি হযে যাবে যে?"

—"নাতিসমেতই ঘোড়ায় চড়ে তোমার কাছে আসবো—ডোণ্ট ইউ ওযাবি ডার্লিং! চাঁদ কি একবাবই গড়েন ঈশ্বর? সাবাজীবন ঐ একটাই পবিশ্রম কবে যাচ্ছেন দৈনন্দিন। রোজ ভাঙছেন, বোজ গড়ছেন— চাঁদ-গডাব কাজটা এখনো সম্পূর্ণ হযনি তাঁব—"

আমি সবে এলুম রেলিং থেকে।

ক্ষণপ্রভা

"তিনশো ইউনিট—ব্যস। এক পা বেশি এগিয়েছো কি আর দেখতে হবে না। এক মাস অন্ধকার। পেনালটি। বুঝলে গিন্নি? তিনশো ইউনিটেব বেশি হলেই কেটে দেবে লাইন।" বিনোদবাবু কাগজখানা গিন্নির নাকের ডগায় নাড়তে নাড়তে বললেন। মালতী

BanglaBook.org

মন দিয়ে কুটনো কুটতেই থাকেন।

—"শুনচো? ফ্যান ঘুরিয়ে কুটনো কোটা চলবে না।" বিনোদ সুইচ অফ করে দিলেন।

—"যত অসম্ভব কথা।" অবশেষে মালতীর জবাব এলো। "তিনশো মানে? পাগল নাকি? বৈঠকখানায় তিনটেতেই তো তিনশো। তারপর তোমার ঘরে ষাট, খোকার ঘরে ষাট, খাবার ঘরে ষাট। এতেই তো হচ্ছে তিন ছয় আঠারো, মানে একশো আশি,—আর তিন শোয়, চার শো আশি এখানেই হয়ে গেল। তারপর রান্না ঘরে চল্লিশ আর দুটো বাথরুমে চল্লিশ চল্লিশ আশি—একশো কুড়ি, ছ'শো,—সিঁড়িতে টিউবরাতি, খুকুর ঘরে টিউবরাতি, ঠাকুরঘরে টিউবরাতি—কে জানে বাবা কত, ছাদে পঁচিশ, গেটে, বারান্দাদুটোয়, লোকজনদের ঘরে, ওদের বাথরুমে, পিছনের সিঁড়িতে, ল্যানডিঙে, দূরদূর—উন্মাদ-পাগল হয়ে গেছে নাকি ইলেকট্রিক কোম্পানি? তার ওপর ফ্যান, ফ্রিজ, গীজার, রেডিও, টিভি, ইস্ত্রি, আভেন—এসবেও তো খরচা আছে? মাত্র তিনশো—হাজার দেড়েক তো লাগবেই, কি দু' হাজার—"

—"আঃ হাঃ—মুখ্যুমি কোরো না তো গিন্নি? ইউনিট মানে ওয়্যাট নয়। তুমি দিচ্ছ ওয়্যাটের হিসেব, ওরা ধরছে ইউনিটের। দুটো আলাদা। এই দ্যাখো—দিব্যি হিসেব লিখে দিয়েছে পরিষ্কার বাংলাকাগজে—একটি এসি পাখা, দিনে বারোঘণ্টা, সাড়ে একুশ ইউনিট, একটি ডিসি পাখা সাতাশ। ভাগ্যিস আমাদের ডিসি নেই—একটা চল্লিশ ওয়্যাটের আলো, —ঐ তোমার ঠাকুরঘরে, খুকুর ঘরের সাধের টিউবরাতি আর ল্যানডিঙের বাতিগুলো সমস্তই চল্লিশ—ছয় ইউনিট করে প্রত্যেকটা—"

—"মাত্র চল্লিশ? অথচ অত আলো হয়? তবে আমাদের ঘরে ষাট পাওয়ারের আলো কেন? সব বদলে দাও, সবই টিউবরাতি করে দাও না"—"চুপ করো। তা হয় না। একটা টিউবের, আর একটা বালবের দামটার তফাৎ ভেবে দেখো। আজকাল দুটোর লাইফ প্রায় একই হয়েছে—"

—"ডিসি পাখা সাতাশ বললে? তার মানে ভবানীপুরের পাখায়—"

—"বেশি খরচ। হ্যাঁ। এরপর বাপের বাড়ি গেলে, যতই গরম হোক, দয়া করে যেন ফ্যানটি চালিও না। একটা মাঝারি ১৬৫ লিটার ফ্রিজ দিনে চোদ্দ ঘণ্টা চললে পঞ্চাশ পয়েন্ট চার ইউনিট, একটা রেডিও—ঐ যে—" বিনোদ পুত্রের ঘরের দিকে আঙুল দেখাল, ইংরিজি সুর ভেসে আসছে—"দিনে ৪ ঘণ্টা চললে মাসে পাঁচ ইউনিট। আর চব্বিশ ঘণ্টা চললে তার ছ'গুণ—পাঁচ ছয় তিরিশ—"

—"এক ইউনিটও নয়। খোকা তো ব্যাটারিতে চালায়। ওতে ইউনিট ওঠে না। তোমার ধেড়ে রেডিওতেই উঠবে বরং।"

আলু ছাড়াতে ছাড়াতে মালতী নিশ্চিন্ত। ছেলের রেডিও মনের সাধে গাইছে। ধেড়ে রেডিও এবার খবর পড়বে।

—"আর খুকুর ঘরে যেটা চলে? সেটাও কি ব্যাটারি?"

—"সেটা তো টেপ রেকর্ডার। ছোট্ট। ওতে আর কত উঠবে? তোমার রেডিওর চেয়ে কম নিশ্চয়।"

—"ওটাও যদি ব্যাটারিতে চালান যায়, তবে তাতেই যেন চালায়। খুকুকে বলে দেবে, ইলেকট্রিকে ওসব লাকশারি এখন চলবে না। ব্যাশনিং মানেই অস্টিয়ারিটি প্রোগ্রাম—"

—"একটু গান বাজনা শুনবে, তাতেও বাগড়া দিচ্ছ তুমি? এমনিতে তো বাড়ি থেকে বেরোয়ই না—যা কুঁড়ে মেয়ে। অন্যেরা কত সিনেমা থিয়েটারে যায়—"

—"ছেলেমেয়ের হয়ে ওকালতি কত্তে কত্তেই তো বুড়ো হয়ে গেলে গিন্নি। ভুবনের মাসির অবস্থা হবে তোমার। সৎকাহিনী পড়েও তোমার শিক্ষা হয় না?"

—"না। হয় না। যত পাগলের কাণ্ড।"

টুপ করে নাক বেয়ে এক ফোঁটা ঘাম বঁটির ওপর পড়লো। মালতী দেখলেন। বঁটি আঁচলে মুছলেন। ওপর দিকে চাইলেন। "লোডশেডিং?" ফ্রিজের দিকে চাইলেন। না তো? দিব্যি চলছে। "তবে? পাখা বন্ধ কেন?"

তাঁর স্বর কিঞ্চিৎ উদ্ভ্রান্ত শোনালো। বিনোদ সান্ত্বনা দেন।

—"পাখাটা আমিই বন্ধ করেছি। এই সকাল সন্ধ্যায় পাখার দরকার নেই। একটু সেলফ কন্ট্রোল দরকার। খোকা খুকুর ঘরের পাখাদুটো খুলে নিতে হবে। এখনকার মতন।"

—"তারপর? তারা শোবে কোথায়? রাম, পাখাটা চালিয়ে দে তো। তোর বাবু খুব ঘামছেন।"

—"শোবে? যেখানে শোয় সেইখানেই। রাম, পাখা চালাতে হবে না।"

—"বিনা পাখাতে ওরা ঘুমুবে কী করে? ঘুম হবে?"

—"আমাদের কালীঘাটের বাড়িতে পাখা কবে এল, মনে আছে? গিন্নি? তার আগে ঘুমুতুম না আমরা?"

—"সে আলাদা কথা। ওদের তো অভ্যেস অন্যরকম হয়েছে।"

—"কিছুই আলাদা নয়। লোডশেডিং হয় রাত দুটো পর্যন্ত। তোমার ছেলেমেয়ে কি তখন জেগে থাকে?"

—"সেও আলাদা ব্যাপার। একেবারে পাখা খুলে নিলে ওরা পড়াশুনো করবে কী করে? শরীর টিকবে কেন?"

—"শরীরের নাম মহাশয়। যা সওয়াবে তাই সয়। বেশ, পড়াশুনোর সময়ে না হয় আলোপাখা খুলবে—একটা ঘরেই বসুক তবে দু'জনে। রাম, পাখাটা বন্ধ কর। বারণ করলুম, তবু খুললি?"

—"থাক না একটু। বড্ড গরম যে এখানটাতে।" দরদর ঘামতে ঘামতে মালতী বললেন।

—"উহুঁ। ওনলি টু ফ্যানস্ অ্যাট ওয়ান্স।" তারপর স্ত্রীর ঘর্মাক্ত চেহারা একনজর

BanglaBook.org

দেখে বিনোদ রায় বদল করলেন। "বেশ, তাহলে যা, দাদাবাবুর ঘরের পাখাটা বন্ধ করে দিয়ে আয়।" রাম নাচতে নাচতে চলে গেল। পরমুহূর্তেই খোকার হুংকার শোনা যায়। "এখুনি তো ঘর ঝাঁট পড়ল একবার—আবার পাখা বন্ধ কেন?"

—"বাবুর হুকুম।" রাম খুবই খুশি।

—"যত বাজে কথা। দে খুলে শিগগিরি। ইয়ার্কি হচ্ছে?"

"আমি জানিনি—বাবুর হুকুম"—রাম মুচকি হাসে—

"বাবা, তুমি নাকি আমার ঘরের পাখা বন্ধ করে দিতে বলেছ রামকে?" দৌড়ে এ-ঘরে এসে অবিশ্বাসী চোখে প্রশ্ন করে খোকা।

—"হ্যাঁ। ইউ আর অলরেডি ইউজিং দ্য রেডিও।"

—"তার সঙ্গে পাখার কী?" খোকাকে রীতিমতো বিভ্রান্ত দেখায়।

—"ওয়ান ইলেকট্রিকাল অ্যাপ্লায়েন্স অ্যাট আ টাইম। আজকের কাগজ পড়েছো?"

—"এখনও দেখিনি। কেন, কী হয়েছে?"

—"বিদ্যুৎ এখন থেকে র‍্যাশনড।"

—"কিন্তু খোকার রেডিওটা তো ব্যাটারিতে চলে। বললুম না একখুনি? ওটা তো বিলেই উঠছে না। কিছু যদি মনে থাকে তোমার।"

—"তা বটে। নেভারদিলেস। সাবধানে থাকাই ভালো। প্রথমে ওয়ার্নিং। তার পরে একসপ্তাহে নো ইলেকট্রিসিটি। তার পরের বার এক মাস। এবং সঙ্গে সঙ্গে জরিমানাও। তাই প্র্যাকটিস করা ভালো।"

—"এমনি করে করবে ফ্যান অফ করে দিয়ে?"

—"খোকা, ইউ আর ওলড ইনাফ টু আনডারস্ট্যান্ড দ্য প্রবলেম। আমি রিটায়ার্ড। রান্নাঘরে, সিঁড়িতে, আচ্ছা সিঁড়িও না হয় কাট করে দিচ্ছি—তোমার মার ঘরে, বসবার ঘরে লোকজন এলে অন্ততপক্ষে একটা—এসব আলো তো জ্বলবেই? তোমাদের দু'ঘরে দুটো করে আলো জ্বলে, দুটো পাখা চলে। ওটা একটা-একটা করে দাও। তুমি আর বোন একসঙ্গে পড়বে। আমি বাড়িতে না থাকলে, তোমার মাকেও ওঘরেই চালান করে দেবো, তাঁর সেলাই বোনা, পাঁজিটাজি, ম্যাগাজিনট্যাগাজিন সবসুদ্ধু। ব্যাস। আরো কমে গেল। অ্যানাদার ফ্যান লেস।"

—"এই খেয়েছে। একা রামে রক্ষা নেই সুগ্রীব দোসর? ঘরভর্তি লোকজন একে খুকু, প্লাস মা? পড়ার তাহলে দফা গয়া। কিন্তু রেস্টিকশন কি এতই বেশি, বাবা? ক'টা পাখা, ক'টা আলো অ্যালাউড?"

—"শুধু তো আলোপাখা নয়? ফ্রিজ আছে। ইস্ত্রি আছে। আভেন আছে, গীজার আছে, হীটার, মিক্সার, পার্কুলেটার, তোমাদের স্টিরিও, রেডিও, কী নেই? ইস্ত্রি, গীজার, হীটার মিক্সার, আভেন, স্টিরিওর প্লাগগুলো হাজার বারোশোর কম নয়, প্রত্যেকটাই ষাট ইউনিট।"

BanglaBook.org

—"কিন্তু ফ্রিজটা তো লাগবেই। ফিফটি পয়েন্ট ফোর ইউনিট, দিনে চোদ্দ ঘণ্টা চললেই।" এবার মালতী কথা কন:

—"কেন? ওটাও খুলে দাও না। আগে তো আমাদের ফ্রিজ ছিল না! খোকা জন্মানোর বছরেই কেনা হলো। পাখা খুলে নেবার চেয়ে ফ্রিজটা খুলে রাখাই ভালো। নিশ্চয় ঢের বেশি বিদ্যুৎ খায়। অতবড় যন্তর। ওটা দরকার নেই।"

—"তা খায়। কিন্তু খুলে রাখলেই ফ্রিজ নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া গরমে দুধ, মাছ, মাংস সব পচে যাবে। রোজ রোজ আমাকে বাজারেও যেতে হবে। অনেক রকম অসুবিধে।"

—"তাই বলো? রোজ রোজ বাজারে যেতে ইচ্ছে নেই। এবারে বলো আসল কথাটা? বাড়িতে থাকলেই ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঠাণ্ডা জল চাই কার? এতবড় গেলাস ভর্তি করে? ফ্রিজ ছাড়া চলবে না কার?"

—"নাঃ, ফ্রিজটা চালুই রাখতে হবে। আর পাম্প। ওটাও বন্ধ করা যাবে না। তিনতলা বাড়ি। আর সব বন্ধ বুঝলে?"

—"কেন যাবে না, ভারী দিয়ে জল তোলাও। ওতে লাইন কেটে দেবার ভয় থাকবে না, খরচা যতই হোক না।"

মালতীর মুখ সিরিয়াস।

—"আর ভাড়াটের জলের কী হবে?" বিনোদবাবু সত্যি চিন্তিত।

—"ভারীকে দিয়ে জল দেওয়াও ওদেরও।"

—"কন্ট্রাক্টে তো সেটা নেই। ওদের জন্যে পাম্পটা চালাতেই হবে। ব্রীচ অফ কন্ট্রাক্ট করা চলবে না তো? বিদ্যুৎ থাকলে, পাম্প চালাতেই হবে।"

রাত্রে খেয়ে বাবা-মার ঘরে আলোপাখা জ্বেলে চারজনে বসেছে। বিনোদের হাতে খাতা।

—"শোনো, কেবল রুটিনটা পালটে ফেললেই সব সিম্পল হয়ে যাবে। ভোর চারটেয় আলো হয়ে যায়। ৪টেয় বেশ ঠাণ্ডাও থাকে। তখন উঠে যে যার ঘরে গিয়ে পড়তে বসবে। ৮টার মধ্যে পড়া তৈরি হয়ে যাবে। আলোও চাই না, পাখাও চাই না। তারপর যদি পাখার প্রয়োজন হয়, পাখা খুলে দু'জনে একসঙ্গে খাবার টেবিলে গিয়ে বসবে। তোমাদের মাও ৪টের সময়ে উঠে পুজো করে নিয়ে কুটনো কুটে দেবেন। আমিও সেখানে বসেই চা খাব, কাগজটাগজ পড়ব। অল আনডার ওয়ান ফ্যান। তোমরা বেরিয়ে গেলে আমরা কর্তাগিন্নি একটা ফ্যানের নিচেই থাকব, দালানেই হোক, বা ঘরেই। রাত্তিরে আজ আর হয়ে উঠলো না। কালকে থেকেই নতুন ব্যবস্থা। মেঝেয় ঢালা বিছানা হবে—তোমরা দু'ভাইবোন এই ঘরেই শোবে—"

—"মেঝেয়? এই তো ব্রঙ্কাইটিস থেকে উঠলো খোকা—"

—"বেশ তোমার খোকা-খুকু খাটে শোবে, আমি আর তুমি মেঝেতে। বেশ পুরু বিছানা পেতে—"

BanglaBook.org

—"বাবা মেঝেয়?" খোকা হেসে উঠলো— "শুলে আব তুমি উঠতে পারবে? হাঁটু ভাঁজ হবে?"

—"খুব উঠতে পাববো। হাঁটুব বাবা ভাঁজ হবে। দেখবি। ঘবটা বড আছে, দেযার শুডন্ট বি এনি হেলথ প্রবলেম—ছ'টা ভেন্টিলেটার আছে, চাবটে জানলা —আগে তো চারজনে একখানা বড খাটেই শুতুম যখন তোমরা ছোট ছোট। এই উইকেই দুটো সোফা কাম বেড কিনে ওই ধেডে সোফাটাকে বিপ্লেস কববো, যাতে বাত্রে কাউকে মেঝেয না শুতে হয—"

—"কিন্তু বাবা?"

—"বলো।" বিনোদ খুব গম্ভীব।

—"অন্যদের বাডিতে তো আলো জ্বলছে। আমাব বন্ধুদেব বাডিতে তো এবকম ব্ল্যাকআউট করেনি কেউ? দাদা বলছিল তিনটে ইউনিটে নাকি সব নবমাল কাজ চলেই যাবার কথা—এক এযাবকণ্ডিশনাব, কি লিফট—এসব থাকলে অন্য কথা। এতটা অস্টিযাবিটিব নাকি এখনও দবকাব নেই?"

—"তোমাব দাদা ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিযাবিং পডতে যাবে, কিন্তু এখনও এ-বাডিব মালিক হচ্ছি আমি। এখনও ফুল বেসপনসিবিলিটি এই বৃদ্ধেব। আমি যেটা ভালো বুঝেছি, কবছি। ডু নট ইন্টাবফিযাব।"

—"কিন্তু আমাব যে আর তিন সপ্তাহও নেই বাবা? সামনেই পার্ট ওযান।"

—"তাতে কী হয়েছে?"

—"এই সমযে পড়াব জাযগা, পড়ার অভ্যেস—সবকিছু ডিস্টার্ব কবলে অসুবিধে হবে না? বেজাল্ট গুবলেট হযে যাবে।"

—"তোমাব দাদাবও সেমেস্টাব টেস্ট এসে গেছে। কই, সে তো কিছু বলছে না।"

—"দাদা কী বলবে? দাদা তো হস্টেলে চলে যাচ্ছে—বন্ধুদেব কাছে থেকে পডবে এই ক'দিন। এখানে তুমি বলেছ আমি ওব ঘবে পডবো, তাই।"

—"খুকু ভযংকর ডিস্টার্ব করে। আমি পডি বাত জেগে, ও পডে ভোবে উঠে। সাবাবাত পডেটডে আমি যেই একটু শোবো, ও তখন উঠে পডতে বসবে। কেমন কবে আমবা একসঙ্গে পডবো? তাছাডা ও চালায বাংলা গান, আমি ইংবিজি।"

—"ব্যাস, তাহলে তো চুকেই গেল ল্যাঠা। খোকা শুচ্ছে না। এখন তোমার আব অসুবিধে কী, খুকু? স্টাডি অ্যাজ ইউজুযাল। নিজেব ঘবেই পডবে। নো ডিস্টার্বেন্স। বাত্রে কেবল এখানে এসে শোবে। অল সেটলড।"

—"এখানে আমাব ঘুম হবে না, বাবা।"

—"কেন? হোযাটস বং উইথ দিস রুম?"

—"তোমরা নীল আলো জ্বেলে রাখো সারাবাত।"

—"এখন থেকে আব জ্বলবে না। নো বেডল্যাম্প।"

BanglaBook.org

—"ও বাবা", মালতী চেঁচিয়ে ওঠেন, "ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘরে আমি ঘুমুতে পারবো না। তুমি রাত্তিরে তিনবার উঠবে, আমিও উঠি, টর্চ-ফর্চ খুঁজে পাই না, ঘরে একটুখানি আলো না এলে আমার ঘুমই হবে না।"

—"নাইটল্যাম্পে জিরো পাওয়ারের বালব থাকে বাবা, ওতে কোনো খরচ বাড়বে না।" খোকা মধ্যস্থতা করতে গিয়ে ধমক খায়—

—"কিন্তু ওটা জ্বললে, তোমার বোন অন্যঘরে শোবে, একটা আস্ত পাখা তাতে ঘুরবে—সেটা তো জিরো পাওয়ার নয়। আশি ওয়াট। আটঘণ্টা। হিসেব করো।"

—"দুটো পাখা চললে এমন কিছু ক্ষতি হবে কি? বাবা?"

—"হবে।"

—"খোকা তাহলে হস্টেলেই চলে যাক? এই তোমার মত? ঠিক পরীক্ষার মুখে মুখে? নিজের বাপমা বেঁচে থাকতে?"

—"আহা, হস্টেলেই পড়াশুনোটা বেশি ভালো হয়, আর ওদের ওখানে লোডশেডিংও নেই, পাওয়ার ব্যাশনিংও নেই। বন্ধুদের সঙ্গে পাবে তো যাক না থেকে ক'টা দিন, পরীক্ষা পর্যন্ত। ক্ষতি কি? নাথিং নিউ। নাথিং স্পেশাল।"

—"তুমি তাহলে ছেলেটাকে তাড়ালেই বাড়ি থেকে? নেহাৎ মেয়েটা মেয়ে বলেই তাই পারছে না। পারলে ও-ও চলে যেত।"

—"বেশ। তাহলে অলটারনেটিভ অ্যারেঞ্জমেন্ট হোক। তোমার ছেলে ঘরেই থাকুক। মেয়েও তার ঘরে থাক। নো বেসটিক্যানস। গিন্নি তুমিই বরং খুকুর ঘরে গিয়ে শুয়ো। আমি খোকার ঘরে। টু ফ্যানস—লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টস। ও. কে.?"

—"আমার ঘরে? বাবা শোবেন? কি সর্বনাশ।" খোকার মুখ দেখে খুকু খিলখিল করে হেসে ওঠে। মালতী মুখে পানের ওপর আঁচল চাপা দেন। বাবা ঘরে থাকলে বেশ হবে। খোকার সিগারেট খাওয়াটি এবার খতম।

—"কেন? তোমাদের বাবা কি কিং-কং? এতে সর্বনাশের কী আছে?"

—"না না, সেজন্যে নয়। বলছি, আমি তো রাত জেগে পড়বো, তুমি তার মধ্যে ঘুমুবে কেমন করে, বাবা? বড় আলোটা জ্বলবে তো।"

—"বাজনাও বাজবে নাকি? হোলনাইট গান বাজাতে বাজাতে পড়া তৈরি হবে? ডিস্কো মিউজিক?" খোকা চুপ করে থাকে। একটু পরে বলে—

—"বাজনা না হয় বাজাবো না। কিন্তু আলো? নীল আলোতে তো পড়তে পারবো না।"

—"বেশ বেশ। আমরা কর্তাগিন্নি এঘরেই যেমন ওই শোবো। ফ্যান না চালিয়েই শোবো। আমাদের ফ্যান ছাড়া শোবার অভ্যেস আছে।"

—"ও বাবা। ও' অভ্যেস অনেকদিন আর নেই গো—পাখা ছাড়া আমি শুতে পারবো না, বাপু! জানোই তো আমার কী সাংঘাতিক গরম বাতিক।"

—"বেশ। তুমি খুকুর ঘরে শুয়ো। আমি এখানে একা একাই—"

—"গবমে পচবো।" এই তো? তাবপর প্রেশার হাই হযে যাবে, ওষুধ আনো, ডাক্তাব আনো, পথ্যি বদলাও—উদ্বেগের চূড়ান্ত করো। ওসব হবে না বাপু, ঘুমের সময়ে পাখাটি চাই। প্রত্যেকের।"

—"ঐ নীল বাতিটাকে নিয়েই যা মুশকিল। মা, আমাকে সেই এযার ইনডিযাব দেওয়া কালো কাপড়েব চশমাটা দিও—দাদা দাদাব ঘবেই থাক—আমি ববং কাপড়েব চশমাটা চোখে বেঁধে তোমাদেব ঘবে এসে শোবো।"

—"তাব কী দবকাব? একটা টেবিল ল্যাম্প কিনে, তাতে জিরো পাওযাব বাল্ব লাগিয়ে নিলেই, নো প্রবলেম—"

—"কী ব্যাশন হলো জানি না বাপু, তোমাদেব বাবা তো তুমুল কাণ্ড শুরু করে দিলেন। অন্য বাড়িতে কাকপক্ষী টেব পেল না। আব এ-বাড়িতে? কুরুক্ষেত্তব বেধে গেল—"

—"সোফা কেনো, ল্যাম্প কেনো—"

—"বাম! অ বাম! রাম?"

—"কি হলো? পিসিমা এযেছেন?"

—কী কবিচিস বে হতভাগা? পড়ে মবব যে যে। জ্বাল, শিগগিবি আলোটা জ্বাল—"

—"বাতি নি। আমাব হাত ধরেন—"

—"লোডশেডিং তো নয? বেলটা তো দিব্বি বাজলো।"

—"বাতি নি। ইলিকটিরি বাসুন বাবা সব বাতি খুল্যে দেছেন।"

—"সিঁড়ির বাতিও খুলে দিযেছে কি রে ব্যাটা। মানুষ উঠবে কী কবে ঘুটঘুটে অন্ধকাবে? চারতলা অব্দি নিঝুমপুরী তৈবি করিচিস যে রে—এটা কি গোরস্তান?"

—"আমি জানিনি,—বাবু বাল্বু খুল্যে নেছেন।"

—"কখনো খুলে নেযনি সিঁড়িব আলোটা। বিনু। বিনু।"

—"বাস। এই তো এইস্যে গেচেন উপ্রে।"

—"কী কাণ্ড? দালানেব আলোটাও জ্বালাসনি কেউ? সাতটা বেজে গেল।"

—"বাবুব মানা।"

—"মালতী? বৌ। অ বৌ। কোতা গেলি? এসব বাম কী বলচে?"

—"কে? দিদি? আসুন দিদি আসুন। আব বলবেন না। আপনাব ভাই আমাকে জ্বালিযে খেলেন। ভাগ্যিস আপনি এলেন, দিদি। গীজাব বন্ধ, ইটাব বন্ধ, স্টোভে চা হচ্ছে, আভেনে বান্না বন্ধ, গ্রামোফোন শোনা বন্ধ, খুকুব হোযাবড্রাগাব বন্ধ, ভিজে চুলে কলেজ যাচ্ছে—ইনভার্টাব বন্ধ, লোডশেডিংযে প্রেশাব বেড়ে মাথার যন্ত্রণায় মবে যাচ্ছি আমি—"

—"এসব কী বলচিস রে বৌ? সত্যি?"

—"ঠিক বলচি দিদি। সব সত্যি।"

BanglaBook.org

—"বিনুটা চিরকালই একটু ছিটগ্রস্ত, কিন্তু এখন যে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে রে?"

—"না না, দিদি বিটায়ার্ড মানুষ তো? একটু ভাবতে তো হবেই ওঁকে, মেয়ের বিয়ে বাকি, ছেলের এডুকেশন বাকি—"

—"বিয়ে তোমার ছেলেমেয়ে দু'জনেরই এখনও বাকি, এডুকেশনও ছেলেমেয়ে, উভয়েরই বাকি। 'মেয়ের বিয়ে' 'ছেলের এডুকেশন' এরকম বলতে নেই বৌ। শুনলেও গা জ্বলে যায়। ওসব আমাদের মা ঠাকুমারা বলতেন। রাম? পাখাটা খুলে দে। দুটো আলোই জ্বেলে দে। সিঁড়িতে আর দালানে। বাপ রে। এই কি আমার বাপের বাড়ি? এ যে অন্ধকূপ। বিনু কৈ?"

—"একটু বেরিয়েছেন। বসুন, দিদি। একটু জল এনে দিই।"

—"কোথায় গেছে বিনু?"

—"সেই সম্বন্ধটা বিষয়ে কথাবার্তা কইতে। দেখতে আসবে বলছিল, তার দিনক্ষণ—"

—"এ সেই আমেরিকা থেকে একমাসের জন্যে যে ছেলে আসচে বিয়ে করতে? ফটো দেখে তো পছন্দ করেছিল, তাই না?"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ সেই সম্বন্ধটাই—"

—"তা আগেই মেয়ে দেখাবার কী আছে? ছেলে আসুক, আমরা ছেলেকে দেখি? তবে তো?"

—"ছেলের তো শুনছি আজকালের মধ্যেই এসে পড়ার কথা। একসঙ্গেই ছেলে-দেখা, মেয়ে-দেখা হবে এ-বাড়িতে।"

—"তা ভালো। রাম! সিঁড়িতে আলোটা জ্বেলেচিস তো? তোর বাবু বাড়ি এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে না যায়। বিনু যা উটমুখো ছেলে।"

—"বিনু।"

—"কি?"

—"আলোটা জ্বেলে দে।"

—"আলো? এই দিনের বেলাতে?"

—"দিনের বেলা হলেই বা। যা বাদলা করেছে, অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, তুই কাগজটা পড়চিস কী করে? আমার তো বইটার সব অক্ষর ঝাপসা —শত চেষ্টাতেও আমি যে বইটা পড়তে পারছি না?"

—"আর একটু চেষ্টা করতে হবে। 'যে জন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি, আশু গৃহে তার জ্বলবে না আর নিশীথে'—"

—"তোমার গৃহে তো এমনিতেই রাত্তিরে আলো জ্বলে না। ঘোর অন্ধকার। ঐ সিঁড়িতে আমি কালকে পড়ে মরেই যেতুম আর একটু হলে। রাম ভাগ্যিস হাতটা

BanglaBook.org

ধরলে। সিঁড়ির আলোটি অতি অবিশ্যি করে জ্বেলে রাখবে রোজ সন্ধে থেকে। তোমার নিজের বয়েসও কিছু কমের দিকে যাচ্ছে না, বিনু। একবার হাড়গোড় ভাঙলে—"

—"সেটা না হয় করা যাবে। তা বলে এখন, ঘরের মধ্যে দিনের বেলায় আলো জ্বেলে—"

—"এই রইল তোর বই। এবার কি ফ্যানটাও অফ্ করে দিবি?"

—"দিলে মন্দ হয় না। যা বাদলা বাতাস আসছে। ঠাণ্ডাও লেগে যেতে পারে তোমার।"

—"তুই কি বাড়িসুদ্ধু সব্বাইকে পাগলা করে দিবি বিনু? ছেলেটা বোর্ডিঙে চলে গেল, মেয়েটা সন্ধে পর্যন্ত লাইব্রেরিতে পড়ে থাকে—বৌটার গরমে সারাদিন প্রেশার চড়ে মাথা ধরে আছে—বাড়িতে লোকজন এলে তাদের ঘোর অন্ধকূপ সিঁড়ি দিয়ে হুমড়ি খেতে খেতে উঠতে হয়, এ জন্যে কেউ তো তোকে আদর্শ নাগরিক বলবে না, বিনু, লোকে যে তোকে হাড়কেপ্পন বলবে রে? মেয়ের বিয়ে দিবি কী করে?"

—"উপায় নেই দিদি। তিনশো ইউনিট—"

—"খুব উপায় আছে। শোন ইস্ত্রিটা কি বন্ধ করলেই নয়? গীজার, হীটার ওভেন না হয় বেশি খরচার ব্যাপার—প্লাগগুলো খোলাই রইল। কিন্তু ইস্ত্রির প্লাগটা লাগিয়ে দিলে হতো না?"

—"কেন? অসুবিধেটা কী হচ্ছে? ধোপাকে দিয়ে সব ইস্ত্রি করিয়ে আনছে তো বাণ্ডিল বাণ্ডিল।

—"ইস্ত্রির ধোপা সময় মতন ফেরৎ দেয় না। এই তো আজ মেয়েটা লাইব্রেরিতে গেল গরমের মধ্যে সিলকের কাপড় পরে—। অথচ ইস্ত্রিরিতেই তোদের দৈনিক বেরিয়ে যাচ্ছে পাঁচ সাত টাকা—ঐ সিলকের শাড়িটা যখন আবার ইস্ত্রি করে তুলে রাখবে, তখন একটাকা লাগবে।"

—"সে কি গো? দৈনিক পাঁচ-সাত টাকা ইস্ত্রিতে?"

—"হ্যাঁ। নইলে কী বলছি? বামই বোধহয় সমস্ত করে দিত? তাই টের পেতে না কতটা পয়সা বাঁচছে প্রত্যেকদিন।"

—"ছেলেমেয়েগুলোকেও দেখেছি বটে ঘষাঘষ ইস্ত্রি ঘষছে কলেজে বেরুনোর আগে—"

—"তবে? মালতীর সে ট্রেনিংও তো নষ্ট হচ্ছে। নিজের কাজ নিজে না করিয়ে বাবুয়ানির অভ্যেস করাচ্ছ ছেলেমেয়েকে।"

—"ঠিক আছে ঠিক আছে। ইস্ত্রির প্লাগটা দেব'খন লাগিয়ে।"

—"আর সিঁড়ির আলো ক'টা।"

—"আর সিঁড়ির আলোটাও। একটা। তিনটে নয় কিন্তু!

—"বেশ বাবা তাই সই। মেয়ে দেখানোর তারিখ কবে ঠিক হলো?"

—"রোববার সকালে। আলো জ্বালবার ঝামেলা নেই। বেশ প্রাকৃতিক আলোতেই দেখে যাবে।"

BanglaBook.org

—"তবু ভালো যে হুটপাট্ করে পাখাগুলো সব খুলে ফেলতে পারিসনি প্লাগ আব বালবেব মতন।"

—"আরে? বা, বা, পেতলপালিশ সব শেষ? ফুলদানিটা ঘষে ঘষে সোনাব মতন কবে ফেলেছিস যে বে? নাঃ, বাম আমাদেব কাজেব ছেলে।"

—"তা বলে ওতে বজনীগন্ধা বাখলে চলবে না, শ্রাদ্ধবাড়ি শ্রাদ্ধবাড়ি মনে হবে—অত বজনীগন্ধা আনিযেছ কেন? গোলাপ ফুল ছিল না? গ্ল্যাডিযোলি—"

—"তোবও যেমন কথা, খোকা। শ্রাদ্ধবাড়ি মনে হবে কেন? বজনীগন্ধা নামটাতে কি শ্রাদ্ধ গন্ধ, না ফুলশয্যের বজনীব গন্ধ, শুনি? বজনী—গন্ধা—"

—"ফেব ছেলেপুলেব সঙ্গে ঠাট্টা দিদি? নাঃ, আপনাকে নিযে আব পাবা যায না। যেমন ভাই, তেমনি বোন। দেখুন তো একটু পুডিংটাব কী অবস্থা? একটুখানি বাকি ছিল। ওটা সেব কবে, মুরগীটা আবাব ঢোকাবো আভেনে। আপনাব ভাই বাড়িতে পা দেবাব আগেই সব সেবে ফেলতে হবে তো।

—"ছেলেপুলে আবাব কী? প্রাপ্তে তু ষোডশবর্ষে, জানিস না? অ খোকা, বাথরুমে গীজাবেব প্লাগটা লাগিযে দিইচিস তো বে? বেসিনে হাত ধুতে গিযে যেন হট-কোল্ড দু'বকমেবই জল বেরুচ্চে দেখতে পায়।"

—"এই গবমে হটওযাটাব দিয়ে কী হবে পিসিমণি—"

—"হটওযাটাব দিযে ওদের কিছুই হবে না, শুধু তোমাব বোনটি যে কতদূব আবামে আযেশে অভ্যস্ত সেটাই স্বচক্ষে দেখে যাবে তাবা। বিলেতে থাকে বলে পাত্তবটি যেন মনে কবে না সে একটা কেউকেটা হযেচে। এখানে, মেযেব বুড়ো বাপেব ঘবেও সববকমেব বিলিতি আবাম-আযেশেব বন্দোবস্তই মজুত বযেছে। এইটে তাদেব দেখা দবকাব। ওই গাঁকগাঁক গ্রামোফোনটাব প্লাগটা এঁটেচিস? যাতে এ-ঘরে ও-ঘবে একসঙ্গে গান বাজে?"

—"স্টিবিওর অ্যামপ্লিফাযাবটা? হ্যাঁ, পিসিমণি।"

—"দে না একটা ভালো গান লাগিযে দে না। তোদেব হিন্দিমিন্দি নয, একটা ভালো অতুলপ্রসাদ কি ববীন্দ্রনাথ। শাওন গগনে ঘোব ঘনঘটা।"

—"কিংবা, বঁধু নিদ নাহি আঁখিপাতে?"

—"অ্যাঁ? পিসিব সঙ্গে এয়ারকি? বলি সব কটা বাল্ব লাগিযে দিইচিস তো? আকাশে যা ঘনঘটা কবে মেঘ ছেয়ে এসেচে, সকাল বেলা হলে কি হবে দালান, সিঁড়ি, সব তো অন্ধকার। এ-ঘবেও সব ক'টা আলো জ্বেলে দিতে হবে। নইলে মেযে দেখায় বিঘ্ন ঘটবে।"

—"কেন? আলো দিয়ে কী হবে? বেশ তো বোমান্টিক 'বরিষণ মুখরিত' অ্যাটমসফিযাব। আঃ। দারুণ গন্ধ বেরুচ্ছে তো বান্নাঘব থেকে? মা, মুবগীটা বেশী করে কবছো তো? ওদেব যেন সবটা খাইয়ে দিও না আবার। খুকু! খুকু, তোব পুডিং একেবারে যাচ্ছেতাই হয়েছে। অমন চেহারা যাব, তাব সোযাদ কেমন হবে

বোঝাই যাচ্ছে। গেল। ঐ পুডিং দেখলেই কিন্তু সঙ্গন্ধ কেঁচে গেল—"

—"চুপ কব দিকিনি? যত অকথা কুকথা। দিদি, এদিকে দেখুন তো একটু, পাত্রেব ঠাকুমা আসছেন। তাঁর নিরামিষ জলখাবাবটা—"

—"যাচ্ছি, যাচ্ছি, খোকা—হারমোনিযাম, তবলা, তানপুরো সব আগে থেকে বের করে ঝেড়েপুঁছে রাখো। তখন যেন টানা-হেঁচড়া করতে যেও না। পাত্তর শুনিচি ভালো গান গায়। পাত্তবেব গান শুনতে চাইব কিন্তু আমবা। ভুললে চলবে না, আমরাও তো ছেলে দেখছি এইসঙ্গেই। —খুকুব সাজ তো দেখি আব শেষই হচ্ছে না মা? কী মাখাচ্ছে এত?"

—"এই হলো বলে। না না না, আজকাল ওসব বেশি কিছু মাখায় না। চোখ আঁকে, ভুরু তোলে, চুল বেঁধে দেয়, ঠোঁটেও এঁকে দেয় দেখেছি তুলি দিযে—তা খুকুকে তো ওব কাকী সাজাচ্ছে—অত কিছুই কবছে না।"

—"দবকাবও নেই। মেয়ে আমাদেব রূপসী।"

—"মা, কফিটা একদম টাটকা গ্রাইণ্ড কবে ফেলেছি, দাবুণ সুগন্ধ বেরিযেছে। এবাবে পার্কোলেটারে জলটল ভরে বেডি করে রাখছি, তুমি শুধু খেতে দেবার আগে সুইচ অন কবে দেবে। বুঝেছ?"

—"তুই নিজেই ওটুকু কবিস বাবা, আমাকে পাঁচদিক দেখতে হচ্ছে।"

—"ও, কে, ও, কে—কফিব ইনচার্জ আমিই বইলুম—"

—"এই যে আসুন, মুকুয্যেমশাই, এদিকে—এই হচ্ছে আমাব গবীবখানা—কই গো কোথায সব? ওবে অ খোকা। অ রাম। দিদি! খুকু। মালতী। এই যে এঁবা সবাই এসে গেছেন, পাত্তবপক্ষেব পাঁচজন। তোমরা বেডি তো? একি? এতগুলো আলো কে জ্বাললে? ল্যানডিঙেব এই আলোগুলোতে বাল্ব লাগালে কে? বাম। খোকা। আই ওযান্ট টু নো হু হ্যাজ ডান ইট?"

—"আসুন মাসিমা আসুন, নমস্কাব, নমস্কাব, আমি হলুম বিনোদেব দিদি, এই যে আপনাবা এদিকে আসুন। এই হচ্ছে আমাব ভাজ, মালতী, মেয়েব মা। এ আমাদেব খোকা, মেয়েব দাদা, ভালো নাম বাপ্পাদিত্য, ইলেকট্রিক্যাল এনজিনিযাবিং পড়ছে—বসুন মুকুয্যেমশাই, এই যে মাসিমা এইটেতে বসলে আপনাব হযতো সুবিধে হবে। আব তুমিই বুঝি অভিজিৎ? বাঃ, সোনার চাঁদ ছেলে। এটি বুঝি তোমাব বন্ধু? নাম কী বাবা? অমল? বাঃ বেশ, বেশ, আপনিই নিশ্চয় অভিজিতেব মামাবাবু? আপনাদেব আসতে কোনো কষ্ট হযনি তো? না বিষ্টি শুরু হযেচে।"

—"অ্যাবে, এঘবে একসঙ্গে তিনখানা আলো? হানড্রেড ওয়্যাট ঈচ। সিঁড়িময় আলো। দালানে আলো। কে, কে জ্বালালে দিনের বেলায এত আলো—কতবার বলিচি, 'যে জন দিবসে মনেব হবষে?' ওফ—সুইচ দেম অফ। সুইচ দেম অফ ইমিডিয়েটলি।" লাফিযে উঠে বিনোদবাবু একসঙ্গে বৈঠকখানার তিনটে আলোই

BanglaBook.org

নিবিয়ে দেন। ঘরে গভীর অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাইরে ঘোর ঘনঘটা। পাত্রপক্ষ গহন আঁধারে নিমজ্জিত। সেই আঁধার, সেই মেঘ গুরু গুরু বৃষ্টির ঝঙ্কার ভেদ করে বিনোদবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা যায়—"এইভাবে চললে পাওয়ার ব্যাশনিং ইজ বাউনড টু ফল থ্রু। সবকার কখনই পেরে উঠবে না, ইনডিভিজুয়াল যদি তার দায়িত্ব পালন না করে টুওয়ার্ডস দি সোসাইটি—"

—"বেশ বাবা— ঘাট হয়েচে, অন্যায় হয়েচে। সিঁড়ির আলো সব নিবিয়ে দিয়েচে। এবার এঁদের দিকেও একটু মন দাও। অতিথির প্রতিও তো তোমার কিছু দায়িত্ব আচে, না নেই? মেয়ে দেখাবে বলে ডেকে এনেচো, তারপরে ঘর অন্ধকার করে লুকোচুরি খেললে এঁরা তো মনে করবেন, যে তোমার মেয়ে খুত্রো। আলোগুলো জ্বেলে দে, রাম।" রাম আলো জ্বালে না। খোকা এসে আলো জ্বেলে দেয়।

—"এবার বরং কফিটা আনুক। অ খুকুমা খুকুমা, কফিটা নিয়ে এসো তো মামণি। খুকুই কিন্তু আপনাদের পাত্রী। আমরা অত মধুমতী মধুমতী বলতে পারি না।"

কাকিমা পর্দা তুলে ধরলেন। কফির ট্রে হাতে ছিপছিপে, মিষ্টি খুকু সলজ্জ মুখে সতর্ক পায়ে প্রবেশ করলো। সত্যি, খুবই সুন্দর দেখাচ্ছে সবুজ শাড়িতে। ট্রেতে ধূমায়িত পার্কোলেটার, আর কফিসেট সাজানো। পিছন পিছন কাকিমা এলেন। নিঃশব্দে গোঁফ কাঁপাতে কাঁপাতে শিকারী বেড়ালের মতন বিনোদবাবু কী যেন শুঁকছেন বাতাসে। হঠাৎ ফেটে পড়লেন।

—"তাই বলি, কিসের গন্ধ? বেশ গ্রাউন্ড কফির মতন মনে হচ্ছে? অথচ আমি তো প্লাগ খুলে দিইচি। এখন দেখচি পার্কোলেটারও চালু করা আছে। কে? প্লাগগুলো লাগালে কে? লাগালে প্লাগ? গ্রাইণ্ডারের? পার্কোলেটারের? দেবেই। এবারে কানেকশন কেটে দেবেই। কেউ রুখতে পারবে না। জ্যোতি বোসও নয়।"

—"আঃ বিনু, ওসব কথা আজকে থাক না, দেখচো বাড়িতে কাজ—..."

—"থাক না? কেন থাকবে? তোমরা সবাই ক্যালাস— শেষটাতে মরবে তো এই বিনোদ চক্কোত্তিই—

—"বিনু, একটা দিনের মামলা, প্লাগ না হয় তুমি আবার খুলে দিও—"

—"মামলা একদিন দু'দিনের নয় দিদি, এটা একটা মেন্টাল অ্যাটিট্যুডের প্রশ্ন। কি বলেন মুকুয্যেমশাই, তাই নয়কি? এ ল্যাক অফ সিভিক রেসপনসিবিলিটি। নাগরিক দায়িত্বজ্ঞানের অভাব। ছেলেপুলেরা কী শিক্ষা পাবে এসব দেখলে?"

কাকিমা কফি ঢেলে দেবেন কিনা বুঝতে পারছেন না। টেবিলে পার্কোলেটার বসে আছে। কাপ সব শূন্য। এই সময়ে মালতী ঘরে এলেন। আরো ট্রে নিয়ে পিছন পিছন রাম। তাতে মুরগীর কাবাব রোস্ট, প্যাটিস, পুডিং, নানারকম ভালোভালো জিনিস। মালতীর হাতে আলাদা একটি ট্রেতে নিরিমিষ জলখাবার। এবং একটি কেক।

BanglaBook.org

সুগন্ধে ঘর ভরে উঠলো। টেবিলে সব নামিয়ে একে একে প্লেটে সাজাতে লাগলেন মালতী। পাত্রপক্ষের চোখেমুখে অপার মুগ্ধতা স্পষ্ট। সেটা পাত্রী দেখে, না খাবার-দাবার দেখে, বোঝা শক্ত। পাত্রপক্ষ মুখে অবশ্য বলছেন,— "কী কাণ্ড কী কাণ্ড, এতসব করবার কী দরকার ছিল? ছি ছি ছি।..."

—"এই যে মাসিমা, এই কেকটা খুকু তৈরি করেছে। একেবারে নিরিমিষি, এতে ডিম নেই।" ঠাকুমাকে কেক কেটে দিতে দিতে মালতী বলেন। ঠাকুমাও একগাল হেসে—"বা, বা। ডিম ছাড়া কেক? মেয়ে নিজে করেছে? চমৎকার। কিন্তু মা, আমি তো অবেলায় কিছুই খাইনে। আমার ডিশখানা বরং তুলে নিয়ে যাও।" বলে প্লেট ঠেলে দেন। মালতী যারপরনাই বিমর্ষ।

—"একটু কফি?"

—"বরং একটু নেবুর জল করে দাও মা, ঘরে নেবু আছে তো? কফিটফি আমি খাইনে।"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ—" কাকিমা তক্ষুনি রান্নাঘরে ছোটেন। মালতী প্লেটে খাবার তুলে দিচ্ছেন, খুকু প্লেটগুলি হাতে হাতে তুলে দিচ্ছে, পিসিমা যত্নআত্তি করছেন। বিনোদবাবু অবশেষে পাত্রের পিতা এবং মাতুলের প্রতি কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিতে আরম্ভ করেছেন। পাত্র আর তার বন্ধু লজ্জায় খুকুর সঙ্গে কথা না বলে খোকাকে তার পড়াশুনো নিয়ে প্রশ্ন করছে। খুকু পাত্রের বাবা, আর মামার হাতে প্লেট তুলে দিল। বিনোদবাবু বিদ্যুৎ র‍্যাশনিং, লোডশেডিং ও ইলেকট্রিসিটি বিল নিয়ে আলোচনা করতে করতে হঠাৎ রূপোর রেকাবিতে খাদ্যদ্রব্য দেখতে পেলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন—

—"রূপোর ডিশগুলো এখনো ঘরে? কবে বলিচি ব্যাংকের ভল্টে রেখে এসো গে? চাও কী তোমরা? ডাকাতের হাতে জবাই হতে চাও? যাকে তাকে এত রূপোর বাসন দেখিয়ে বেড়ানোর কী হয়েছে। দিনকাল কী পড়েচে জানো না?"

—"ব্যাঙ্কেই তো থাকে বারোমাস। আজকে বাড়িতে একটা বিশেষ কাজ, উৎসবের দিনেও ব্যাভার করবে না? তাহলে শখ করে গড়িয়েচিস কেন?"

দিদির বকুনিতে মুহূর্তমাত্র দমে গেলেও বিনোদ আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলেন প্লেটে রাখা বস্তুগুলি দেখে।

—"ও কী ও? পু-ডিং? মুরগীর কাবাবরোস্ট মনে হচ্ছে? প্যাটিস? কে...ক? মানে, আভেন? আভেনও চালু করেছে? হয়ে গেল। হ-য়ে-গে-ল। এখানেই হয়তো একশো আশি ইউনিট—গ্রাইন্ডার, পার্কোলেটার, আভেন! কেন, উনুন কি ছিল না? গ্যাস? কেরোসিন? রোজরোজ তো তার সাপ্লায়ের জন্যে প্রাণ ওষ্ঠাগত করে দিচ্চো, আর বাড়িতে কাজকম্মের বেলা আভেন?"

—"আর বিলু—"

BanglaBook.org

—"নো। দিদি, তুমি প্রশ্রয় দিও না। কেন মুরগীর দোপেঁয়াজা, লুচি কি করা যেত না? "প্যাটিস না করে চপ? পুডিঙের বদলে হালুয়া, চমচম, পানতুয়া, লবঙ্গলতিকা, —কত কী তো হয় বিজয়ার সময়—সেসব করতে পারতে না?"

বলতে বলতে নিজেবই কী যেন সন্দেহ হয় বিনোদবাবুব—গলার সুব পালটে যায়—"অঃ, বুঝিচি, খুকিকে বুঝি এসব শেখানো হয়নি? সে ওই কুকিং ক্লাসে গিযে যত বিলিতি ছাইভস্ম বান্না শিখেছে? এইসব আজেবাজে যত খাবার, যাব জন্যে আভেন নইলে চলবে না?" বলতে বলতে উত্তেজিত হযে বিনোদবাবু এক হ্যাঁচকাটানে পাত্রের বাবাব হাত থেকে বেকাবিটা টেনে নিযে মালতীর চোখেব সামনে আন্দোলিত কবতে থাকেন। এই টানাহ্যাঁচডায প্যাটিস কার্পেটে পডে যায। খোকা বাগ চাপতে ঘব ছেড়ে বেবিযে গেছে। খুকু কান্না চাপতে বিপন্ন, বিষণ্ণ, ভীতু-ভীতু চোখে চেয়ে চুপটি করে দাঁডিযে আছে। কচি মুখখানি এই বিপর্যয়ে আরো মিষ্টি দেখাচ্ছে। পাত্র আডচোখে কেবলই দেখে নিচ্ছে। মাথা নিচু করে বসে আছেন মালতী। আব ধবা পডা চোরেব মতো ভ্যাবাচ্যাকা পাত্রপক্ষ নিষিদ্ধ রেকাবি হাতে ধবে, তাতে নিষিদ্ধ খাদ্যদ্রব্য নিয়ে প্রস্তবীভূত। যেন স্ট্যাচু খেলা। খাবাব স্পর্শ কবতে সাহস পাননি কেউই। পাত্রেব বন্ধু হাসি চাপতে রুমাল বের কবেছে। পিসিমা এবার ধমকে উঠলেন:

"কী, হচ্ছে কি বিনু? তুই কি কাউকে খেতে দিবিনি আজকে? ছোটবউ, কফিটা ঢাল দিকি। কেউই তোমাকে সং নাগরিক বলবে না। বিনু, বলবে ক্ষ্যাপা পাগল। মালতী, যা. ওঁদের একটু খাবারে হাত লাগাতে বল? আজকে বান্না তো যা হবার তা হয়েই গেছে, বিনু যা যা বললে সেসব খেতে আরেকদিন আসতে হবে কিন্তু আপনাদের মুকুয্যেমশাই। খুকু আমাদেব দিশি রান্নাও সবই জানে, জানবে না কেন? ছেলে বিলেতে থাকে বলে বলেছিলুম বিলিতি খাবার কবতে।"

নতুন এক প্লেট খাদ্য পাত্রের বাবার সামনে হাতে তুলে দিতে দিতে মালতী চাপা গলায় বলেন—

"একটু মুখে দিন দয়া করে, ওঁর কাণ্ডকারখানাতে কিছু মনে করবেন না, বড্ড সরল মানুষ, মনে-মুখে এক—"

পাত্রের বাবা বুদ্ধিমান লোক। ঝাঁকরা আশুতোষী গোঁফের তলায় হাসছেন বলে সন্দেহ হয়। প্লেট টেনে নিয়ে বললেন—

—"না না, মনে করব কেন, উনি তো সব ঠিক কথাই বলছেন।" তারপরে ঘরের কোণে রাখা তবলা, হারমোনিয়াম, তানপুরাব দিকে তাকিয়ে বলেন—"খাওযাটা আগে চুকিয়ে নিই, তাবপব ববং একটু গানবাজনা হবে. কি বলেন চক্কোত্তিমশায়? অভিজিৎ বেশ ভালো গজল গাইতে পারে।"

খাওয়াদাওয়া শুরু হতেই বিনোদবাবু অন্য মানুষ।

—"কৈ গো। আমার প্লেটটা কৈ? মালতী, মুকুয্যেমশাযের জন্যে আরেকটু

কাবাবরোস্ট, অ মামাবাবু, মানে বাঁড়ুয্যেমশাই আপনার জন্যে দুটো প্যাটিস দিক? পুডিং কই, পুডিং? বাবা অভিজিৎ, আব অভিজিতের বন্ধু, কী যেন নাম তোমার, লজ্জা কবে খেও না যেন, তাহলে নিজেবাই ঠকবে—মাসিমা যে শববৎ চাইলেন শববৎ কই, শরবৎ? রাম?"

হাঁকডাকেব চোটে রাম এক-ট্রে জলেব গেলাশ নিয়ে ঢুকে পড়ে। পিসিমা বলেন —"শরবৎ খাওয়া হয়ে গেছে। তোমাব কি সেসব দিকে নজব ছিল?" প্রস্তবমূর্তি ভেঙে এবাব খুকু জলেব গেলাশ হাতে হাতে এগিয়ে দেযা শুরু কবে। জলপানেব ঘটা দেখে বোঝা গেল অতিথিরা কতদ্রব তৃষ্ণার্ত ছিলেন, মরুভূমির যাত্রীদেব মতো জল খেতে লাগলেন সবাই। পাত্র বুঝি এতক্ষণে খুকুকে একটা কিছু বললেন। খুকু মৃদ হেসে জবাব দিচ্ছে, বিনোদবাবু হঠাৎ তেড়ে উঠলেন,

—"বাম! বাম!" তাঁব প্লেট শূন্য। হাত ধোযা সাবা। একটু ঢেকুর তুলে বললেন —"মইটা কোথায? মইটা দেখি!" —অবাক মালতী বলেন:

—"মই? এখন মই দিযে কী হবে?"

—"মইটা তো পাশেব বাড়িতে চেযে নিযে গেছে।"

—"তাহলে এই টুলেই চলবে। খুব শক্ত আছে।" মালতীব প্রশ্নেব উত্তর না দিযে বিনোদবাবু বলে চল্লেনঃ —"কে এখানে সবচেযে লম্বা? বামব্যাটা তো আমাব চেযেও বেঁটে। খোকা? মুকুয্যেমশাই, আপনাব হাইট কত? খোকার চেযে লম্বা কি? এইতো অভিজিৎ-এব দিব্যি টলমিলাই আছে, সিক্সফুটাব বোধহয, না?" বলতে বলতে খপাৎ কবে একটি প্রীতিপূর্ণ থাবা বসালেন পাত্রেব কাঁধে। সদ্য কফিব কাপটি মুখে তুলছিল সে।

—"কফি শেষ তো? বেশ বেশ। এবাব চলো তো বাবা আমাব সঙ্গে একটু, দালানের ওই বালবগুলো খুলে দেবে, আব সিঁড়িতে একখানা বাদ দিযে বাকি দুটো। বুঝলে না বাবা, এটা পযসাকড়িব ব্যাপাব নয়, পাওযার সেভিং-এব প্রশ্ন—"

বলতে বলতে বিনোদবাবু গিযে পটাপট কবে বৈঠকখানাব আলো তিনটে নিবিযে দিযে বলে ওঠেন—"এই তো, দিব্যি দেখা যাচ্ছে। যাচ্ছে না কি? ক্লিযার ভিশন। আমি তো মুকুয্যেমশাইকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।" তাবপর ঘবের আবেক কোণে ছুটে গিযে ভারি পেতলেব ফুলসুদ্ধ ফুলদানিটা নামিযে বেখে বোমান পিলারেব আকৃতিব মোটা মেহগনিব উঁচু টুলটা নড়াতে চেষ্টা কবে ব্যর্থ হয়ে পার্শ্ববর্তী যুবক-দুটিব দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ কবলেন। হাঁ হাঁ করে খোকা ছুটে আসবার আগেই পাত্র এবং পাত্রের বন্ধু টুলটি টেনে হিঁচড়ে সবাতে শুরু কবে দিয়েছে—খোকা এসে হাত লাগায়। —"এই দালানে নিযে চলো—", আর্মি কমাণ্ডাবের মতো গাম্ভীর্যের সঙ্গে বিনোদবাবু নির্দেশ দেন— "দালানেবটা আগে। বুঝলে বাবাবা, যে দেশের মানুষদেব নাগবিক দাযিত্ববোধ নেই, সেই দেশেব ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকাব..."

BanglaBook.org

প্রেমচাঁদিনী

হ্যাঁ, হতো যদি রবীন্দ্র-নজরুল-শরৎচন্দ্র, বছরের-যে-সময়ের-যেটা, বক্তা একটা না একটা ঠিকই যোগাড় হয়ে যেত। আমাদের যার যেরকম সোর্স, সে যাকে ধরতে পারি, ধরে আনি। সে এরিয়া যাই হোক, ফুটবল, ক্রিকেট, গল্প-কবিতা, যাত্রা-সিনেমা, পলিটিক্স-প্রফেসারি—এভরিথিং ইনক্লুডেড। বিখ্যাত হলেই হলো। আমাদের পাঠাগার-পাঠচক্রের বয়েস উনত্রিশ, কোনো দলাদলি নেই। একবছর নববর্ষ উৎসবে মোহনবাগানের প্লেয়ার আনলাম প্রধান অতিথি, পরের বছর বসন্ত উৎসবে ইস্টবেঙ্গলের প্লেয়ার। (অবশ্য সেই একই লোক, ধীরেনদার শালা)। এই তো গত বছরেই স্বাধীনতা উৎসবে সভাপতি এলেন সি পি এম, প্রধান অতিথি এলেন কংগ্রেস-ই ; কৈ কোনোই অপ্রিয় ঘটনা তো ঘটেনি? দিব্যি একসঙ্গে এলেন, একসঙ্গে বক্তৃতা দিলেন, একসঙ্গে চা-সিঙাড়া খেয়ে এক গাড়িতে বাড়ি গেলেন।

গোলমালটা বেধেছে এবারেই। কেননা বাজোরিয়াজী, যাঁকে আমরা পাঠাগারের নতুন সভাপতি নির্বাচন করছি (ঐ উঁচু একতলাসমান পাঁচিলঘেরা সাততলা সবুজ বাড়িটা ওঁদেরই) তিনি আমাদের মোটা চাঁদা দিয়ে বলেছেন মুনশি প্রেমচাঁদ নামক হিন্দুস্থানী রাইটারের শতবর্ষ উদযাপন উৎসব করতে হবে। সেই উপলক্ষ্যে অনেকগুলি হিন্দি বইও দিয়েছেন পাঠাগারকে। উৎসবের প্রোগ্রামও তৈরী। বাজোরিয়াজীই প্রিসাইড করবেন। তবে প্রেসিডেনশিয়াল স্পীচের বদলে তিনি একটি স্বরচিত কবিতা পড়বেন, প্রেমচাঁদের ওপরে। এছাড়া একটি প্রধান অতিথিও চাই মূল বক্তা হিসেবে, ডক্টরেটের প্রতি ঝোঁক। বাকীটা আমাদের ওপরে। খাওয়ার মেনুটাও ভালো হয়েছে এবার। কিন্তু প্রেমচাঁদের ওপর ভালো বলতে পারে এমন পণ্ডিত লোক পাই কোথায়? আমাদের দাসনগর কলোনীর লোকেদের সোর্স খুব বেশি নয়। মেসোমশাই সেক্রেটারী। আমাদের অবস্থা কাহিল, প্রধান অতিথি পাওয়া যাচ্ছে না। দিকে দিকে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেছে।

এমন সময়ে সৌম্যই মুখরক্ষা করলো। ওদের অফিসের সেমিনারে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। ডক্টর কক্কড়, কথায় কথায় প্রেমচাঁদ বিষয়েও আলোচনা করছিলেন —দারুণ কালচারড লোক। জানেন না হেন বিষয় নেই। দিল্লিতে প্রেমচাঁদ ইন্টারন্যাশনাল সেমিনারে কোন কোন দেশবিদেশের লোকেরা এসেছিলেন, সেকথা উনি গল্প করছিলেন। মার্কিন দেশে উনি কিছুদিন ভারতীয় সাহিত্য পড়িয়েছেন —আপাতত বিরাট এক কোম্পানীর পি-আর-ও। সংস্কৃত সাহিত্যের পি-এইচ-ডি। বাজোরিয়াজীর সাধ মিটবে। অতিকষ্টে তাঁকে রাজী করিয়েছে সৌম্য। ভদ্রলোক এত ব্যস্ত, সেদিনও আরেকটা মিটিং আছে, তবু কষ্ট করে আসবেন বলেছেন। সৌম্য বলল টীব্রেকের সময়ে আলোচনা হচ্ছিল, উনি বললেন সত্যজিৎ রায়ের সবগুলো

BanglaBook.org

হিন্দি ছবির মধ্যে প্রেমচাঁদের গল্পটাই শ্রেষ্ঠ। আরো বলেছেন নার্গিস কেমন করে ভুলে গেলেন যে শতরঞ্জ কে খিলাড়ীতে রাজৈশ্বর্য দেখানো হয়েছে, ভূতের রাজা আর শুণ্ডির রাজার গল্পেও রাজারাজড়ার কাণ্ড, এমনকী সত্যজিতের রিসেন্ট ভেনচারেও যত হিরে, তত রাজা। বললেই হলো কেবল পভার্টি দেখায়?

উনি বাংলাতেই বলতে রাজী হয়েছেন, চমৎকার বাংলা বলেন। কথায় কথায় বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ কোট করেন। দারুণ লোক। বহুকাল আমেরিকায় ছিলেন কিনা?

একত্রিশে জুলাই। পাঠচক্রের উত্তেজনা টঙে। ফরাসটরাস বিছোনো হয়েছে, রজনীগন্ধার মালা, ফুলের তোড়া, ধূপ, হারমোনিয়াম, সমস্ত রেডি। এমন কি প্রেমচাঁদের একটি বাঁধানো ছবি পর্যন্ত (রাজোরিয়াজীর কল্যাণে প্রাপ্ত) প্রস্তুত। উদ্বোধন সঙ্গীত থেকেই এবারের বৈশিষ্ট্যটা ফুটে উঠেছে। এ তো নেতাজী-নজরুল নয়। কি অতুলপ্রসাদ-রজনীকান্তও নয়, প্রেমচাঁদ বলে কথা। তিনি নাকি কেবল উর্দু আর হিন্দিতে লিখতেন। তাই উদ্বোধন সঙ্গীত হচ্ছে উর্দুতে। আমরা চেয়েছিলুম —"চৌধরীকা চাঁদ হো" গাওয়া হোক। প্রেমচাঁদের সঙ্গে বেশ লাগসই হতো; "যো-ভি-হো-তুম খুদাকে কসম লা-জওয়াব হো"টাও একদম মানানসই হতো। তবুও সে-গান ক্যানসেল করে দিয়ে একটা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক গান—"সারে জাহাঁসে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হমারা হ্যায়" গাওয়া হচ্ছে। অকেশানের সঙ্গে যার কোনোই রেলেভন্স নেই। প্রোগ্রাম ছোট্টো। প্রথমেই ওয়েলকাম, এবং প্রেমচাঁদ-প্রশস্তি কবিতা পাঠ করবেন রাজোরিয়াজী। তারপর ডক্টর কক্কড়ের স্পীচ। শেষে মেসোমশাইয়ের ধন্যবাদ-জ্ঞাপন। অবশ্য এখানেই শেষ নয়। এটা প্রথম অংশের সমাপ্তি। তারপর আছে "ওকাউরি কথা।" আর মাঝখানে আছে বিশ্রাম। অর্থাৎ চা, সিঙাড়া, রসগোল্লা, ডালমুট; ভেজিটেবল চপ। একমাত্র ত্রুটি, ফিল্মটা তেলুগু বলে সবার মন খারাপ। হিন্দি হলেই বেস্ট হতো।

ঠিক পাঁচটায় রাজোরিয়াজীর গাড়ি থেকে ডক্টর কক্কড় নামলেন। দারুণ স্মার্ট লোক, সত্যি। অত মোটা, অথচ লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটেন, বাঘের মতো পা ফেলেন। ভুঁড়ি তেমন কিছু বেশিও নয়। পরনে আকাশ-নীলরঙের কড়কড়ে সাফারি-সুট। চোখে লোডশেডিং নীল চশমা। হাতে পাইপ। খুব ফর্সা রং, টাকের রংটা আরো ফর্সা, কেননা কালো চুলের বর্ডার ঘেরা। সকলকে নড করতে করতে ঢুকলেন। সায়েবের মতো হাবভাব।

রাজোরিয়াজী তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে, সভার উদ্দেশ্য নিবেদন করে, প্রেমচাঁদের গলায় মালা পরিয়ে সভা শুরু করলেন। তারপর নিজের প্রশস্তিপদ্যটি পাঁচালীপড়ার মতো শুরু করে পাঠ করলেন। প্রথম স্ট্যানজাটা এইরকম—

"—মুনশি প্রেমচন্দ যুগ যুগ জীও।
ভারতকে নাম উঁচু রাখিও।

হাওযামে আওয়াজ উঠতা হ্যায 'প্রেমচন্দ'।।
সাবে জগভব চলতা হ্যায আনন্দ।।
জুরমানা গোদান জিসনে কিযা।
ও হী হমাবা প্যাব লে লিযা।।
মুনশি প্রেমচন্দ জগকা প্রিয়।
দুনিযাকে দিলদাব, যুগ যুগ জিও।।"

ইত্যাদি। বেশ লম্বা, কিন্তু ভাবি সুন্দব কবিতা। বাংলা কবিতাব চেযেও বোঝা সহজ। খুব হাততালি পড়ল। তাবপব উঠলেন মূল বক্তা। হাতেব পাইপ টেবিলে বেখে, দু'টি হাতে টেবিলে ভব দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালেন। —"নমস্তে। ফ্রেণ্ডস, ক্যালকাটানস এ্যাণ্ড কান্ট্রিমেন, লেনড মি ইওব ইযার্স—" বলে একটু থামলেন, একটু হাসলেন, তাবপব সুব বদলে, নেতাজীব স্টাইলে বললেন— "এ্যাণ্ড আই শ্যাল গিভ ইউ মুনশি প্রেমচন্দ।" অডিযেন্স মন্ত্রমুগ্ধ। নিবাতনিষ্কম্প বাজোবিয়াজী। স্বভাবতই, শিক্ষিত লোক আব কাকে বলে! স্টেজে মেসোমশাযেব দিকে তাকিযে দেখি তিনিই শুধু কেমন-কেমন একটা চোখে চাইছেন। একটু যেন বিব্রত, একটু কনফিউজড। কেন? ওহো, তাইতো, বক্তৃতা তো দেবার কথা ছিল বাংলায়। শুরু হযেছে ইংবিজিতে। তাই নিশ্চয সেক্রেটাবি বিচলিত। কিন্তু যাক, ত্রিশ সেকেণ্ডেব বিবতির পরেই ঝাড়া বাংলায বক্তৃতা শুরু হযে গেল। সবাই নিশ্চিন্ত।

—"আপনাদেব পাঠাগাব আজ মুনশি প্রেমচন্দেব জন্মশতবর্ষ জয়ন্তী উৎসবে যে আমাকে আমন্ত্রণ কবেছেন, এজন্য আমি অত্যন্ত সুখী হযেছি। তিনি কেবল হিন্দি লেখকই ছিলেন না, তিনি সাবা বিশ্বেব। যেমন শেক্সপীযব, যেমন টলস্টয, যেমন শবৎবাবু, যেমন ববিবাবু, যেমন ওমব খৈযাম, যেমন কনফুশিযাস। তেমনিই প্রেমচন্দ ছিলেন সত্যেব পূজাবী। গবীবেব দোস্ত। ববিবাবুব মতোই প্রেমচন্দও তাঁব সব লেখায বলে গিযেছেন—'সোবাব উপ্রে মানুস সতিয তাহাব উপ্রে নাই।' শেক্সপীযাবেব মতন প্রেমচাঁদও বলেছেন—'ম্যান ইজ বর্ণ ফ্রী বাট ইন চেনস এভ্রিহোয়্যাব', বলেছেন, 'দিস ওযার্ল্ড ইজ আ স্টেজ'।" উনি নিশ্বাস ফেলতে থামলেন, আমবা চুপ। ঝড়েব বেগে বাংলায বক্তৃতা দিযে চলেছেন ডক্টব কক্কড। আমবা কি পাবতুম হিন্দিতে এমন বলতে?

—"আপনাদেব কাছে প্রেমচন্দেব কথা আব কীইবা বলবো, আপনাবা তো শবৎবাবুকেই জানেন। শবৎবাবুকে জানলেই প্রেমচাঁদ আব প্রেমচাঁদকে জানলেই শবৎবাবুকে চেনা যায। একই জিনিসেব এপিঠ আব ওপিঠ। দুজনেবই জীবনেব motto ছিল 'গবীবী হঠাও'। আপনারা তো জানেনই যে শবৎবাবু ভাগলপুবওযালা, হিন্দুস্তানী তাঁর ভালোই জানা ছিল। ঐসমযটায় প্রেমচন্দেব সঙ্গেও তাঁব গভীব দোস্তি হযেছিল। শবৎচন্দ্রের অনেকগুলি গল্পই যে প্রেমচন্দেব লেখা, তা কি আপনারা জানেন? তেমনি প্রেমচাঁদেরও দু'একটি গল্প আসলে শবৎবাবুব। ওঁরা দুজনে প্রথম

জীবনে একই লিটল ম্যাগাজিনে বিনা নামে গল্প লিখতেন। তাব কতগুলো পরে শবৎবাবুর নামে চলে গেছে, কতগুলো প্রেমচাঁদের নামে থেকে গেছে। কখনো কখনো ওঁবা আবার নিজেদেব মধ্যে বন্দোবস্ত কবে নিতেন কে কোনটা লিখবেন। ধরুন, সেই যে পিতাপুত্রেব আলুপোড়া খাবাব কাহিনী, পাশেব ঘরে 'বহু' মরছে। আরো দু'জন লোক উপস্থিত ছিলেন সেই ঝোপড়িতে। আলুপোড়া খাওযাব সময়ে দারুণ গাঁজাও টেনেছিল বাপ-বেটাতে। আব ওদেব গাঁজাব সাথী ছিলেন এঁবা দুই বন্ধু, প্রেমচন্দ ও শরৎচন্দ্র। সেদিন প্রেমচন্দ বললেন এ-গল্পটা বরং আমিই লিখে ফেলি, শবৎ? তুমি এটা আমায ছেড়ে দাও। শবৎবাবু বললেন—বহুৎ আচ্ছা। কিন্তু তাহলে সেই যে তোমাদেব জমিদাবেব পুকুবের বড মাছ দুটোব গল্পটা তুমি বলেছিল, সেটা তবে আমি লিখি? প্রেমচাঁদ বললেন—বহুৎ আচ্ছা।' দুজনেই ঠিক করেছিলেন বিধবা মেযে বিযে কববেন। প্রেমচাঁদ বিধবা শিববানী দেবীকে বিযে কবেছিলেন। শবৎচন্দ্র কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাবেননি। তাই তিনি ব্রহ্মদেশে পালিয়ে গিযেছিলেন। সেই থেকে দু'জনেব পথ দু'দিকে ভাগ হযে গেল।" ডক্টব কক্কড একটু হেসে বললেন—'আপনাবা ভাবছেন এসব খবর আমি কী কবে পেলাম? শিববানীই আমাব জ্যেঠিমা। তাঁব প্রথম বিবাহ হযেছিল আমাব স্বর্গত জ্যেঠাব সঙ্গে।" ডক্টব কক্কড় বিশ্রাম নিতে থামলেন। আমবা মুগ্ধ। স্তব্ধ। এতগুলো নতুন কথা একসঙ্গে শুনতে পাবো কে ভেবেছিল। কিছুই তো জানি না। আমবা দাসকলোনী ববীন্দ্রপাঠাগাবেব সদস্যরা এমনিতেই বিশেষ বাইবেব জিনিস পড়িনি। প্রেমচাঁদ বিষযে দূরেব কথা, শরৎচন্দ্র বিষযেও তো দেখছি অর্ধেক খবর রাখতুম না। কোনো শরৎ-বিশারদ-শবৎ-বিশেষজ্ঞ-শবৎ-বৈবাহিক এসব খবর দেননি।

"সাহিত্যের মূল কথা কী?" ডক্টর কক্কডেব গূঢ প্রশ্নে অডিয়েন্স চুপ। —"সাহিত্যেব মূল কথাটা কী?" গর্জন কবে উঠলেন এবাবে ডক্টব কক্কড। অডিয়েন্স নির্বাক। ধীরেসুস্থে এবাব নিজেই নিজেব প্রশ্নেব উত্তব দেবেন বক্তা। তাই হলো। স্বব নবম কবে বক্তা বলেন— "সাহিত্যেব মূলকথা হচ্ছে সাফাবিং।" সুব পালটে আবাব বলেন— "সাফফাববিং...। লিটাবেচাবের এই সাবটল ডেফিনিশন আছে অ্যাবিস্টটলেব পোযেটিক্সে। এ সম্পর্কে একটা গ্রীক কিংবদন্তী মনে পড়ছে। একদিন এক তরুণ ফিলসফাব, ডেসকাবটিস তাব নাম, চৌবাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে হাপুস নযনে কাঁদছিলেন। যে যাচ্ছে, সেই জিজ্ঞেস কবছে : কাঁদছো কেন, কী হলো তোমাব, ডেসকাবটিস? ডেসকাবটিস উত্তব দেন না। শুধু কাঁদেন। শেষে প্লেটো চেপে ধবতে, বললেন— "আই ডু নট নো হোযেদাব আই একজিস্ট অব নট। ডু আই একজিস্ট? অব ডোণ্ট আই? টু বি, অব নট টু বি..." তখন প্লেটো বললেন— 'হোযাই, শিওবলি ইউ ডু একজিস্ট। বাট অ্যাজ আ বিফ্লেকশন অফ আ রিফ্লেকশন অফ দ্য...', ডেসকাবটিস আবাব হাহাকাব কবে কেঁদে উঠলেন। তখন এলেন অন্যান্য গ্রীক মহাপুরুষেবা। সবাই তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। ডেসকাবটিসেব সেই এক কথা।

—'বাট হোয়্যার ইজ দ্য প্রুফ? তার প্রমাণ কই? আমার যে অস্তিত্ব আছে তার প্রমাণ পাব কি করে?'

আর্কিমিডিস বললেন— "একটব জলে নেমে পড়ে দ্যাখো কতটা জল উপচে পড়চে, সেইটে হলো তোমার ওজন। সেইটেই তোমার প্রমাণ যে তুমি আছো।"

ডেসকারটিস বললেন— "এহ বাহ্য!" আলেকজান্দার তাঁর পায়ে এক বামচিমটি কেটে বললেন— "এই যে তোমাকে চিমটি কাটছি, তোমার লাগছে তো? এই তোমার অস্তিত্বের প্রমাণ।" ডেসকারটিস বললেন—"এহ বাহ্য।"

ইউক্লিড ঘস ঘস করে কয়েকটা লাইন কেটে, সঙ্গে সঙ্গে একটা থিওরেম লিখে দিয়ে বললেন— "এই দ্যাখো তোমার অস্তিত্বের প্রমাণ— কিউ, ই ডি" ডেসকারটিস বললেন— "আউট-অব-ডেট। দূর এসব কোনো প্রমাণই নয়। আমি আরো গূঢ় প্রমাণ চাই।" এমন সময়ে ডেসকারটিসের ছেলে (পরে সে সকরাটিস নামে প্রসিদ্ধ হয়) এসে বললে— "বাবা, তুমি এত ভাবো কেন বলো তো? আর তো কেউ এত ভাবে না?" তখনই বেরুল ডেসকারটিসের সেই প্রখ্যাত দার্শনিক উক্তি— "আই থিংক দেয়ারফোর আই একজিস্ট—" "কোগিটো আরগস সাম" —"দি প্রুফ অফ হিউম্যান একজিসটেন্স।" দম নিতে থামলেন ডক্টর কক্কড।

অডিয়েন্স বজ্রাহত। তাহলে ভেতরের গল্পটা এই? আমরা তবে 'কোজিটো এরগো সুম'টা ভুল জেনে এসেছি—অপভ্রংশ ভাষায়? ভাগ্যিস—ডক্টর কক্কড না বলে দিলে কোনোদিনই ঠিকটা জানা হতো না?

—"ডেসকারটিস তো আনন্দে নাচতে নাচতে চলেছেন। এমন সময়ে পথে দেখা সোফিয়াক্লিসের সঙ্গে। প্রসিদ্ধ গ্রীক ট্রাজিডিয়ান সোফিয়াক্লিস বললেন— "ডেসকারটিস, আমি তোমার সঙ্গে একমত নই। ইউ মে একজিস্ট বিকজ ইউ থিংক—বাট আই একজিস্ট ফর এ ডিফারেন্ট রীজন। তুমি চিন্তা কর, —এটাই তোমার অস্তিত্বের প্রমাণ বলে মনে করছ, কিন্তু আমি তো চিন্তাই করি না, তা বলে কি আমি একজিস্ট করি না? আই ড নট থিংক, আই সাফার। আই সাফার, দেয়ারফোর আই একজিস্ট।"

ফিসফিস করে সৌম্যকে বলতে গেলুম— "এটা বুঝি সোফোক্লিসের কথা? আমি তো জানি..."—"চুপ কর", এক ধমকে সৌম্য আমায় চুপ করিয়ে দেয়। "কানের কাছে ব্যাজর ব্যাজর করিস না, ভালো করে শুনতে দে।"

ডক্টর কক্কড বললেন— "জগতের সকল মানুষের হয়ে শেষ কথা বলে গেছেন সোফিয়াক্লিস। আই সাফার দেয়ারফোর আই একজিস্ট।" প্রেমচন্দেরও মূলকথা তাই, সাফারিং এবং একজিস্টেন্স ইন্টার ডিপেনডেন্ট। পরস্পর নির্ভর। —"সুফরিসাস আরগস সাম।" এফেক্টের জন্য থামলেন। —"এটা আবার কি? কখনো শুনিনি তো?" ফিসফিস করতেই সৌম্য আমায় বকল— "গ্রীক। চুপ করবি, স্টুপিড?" ডক্টর কক্কড আবার শুরু করেন :

BanglaBook.org

"প্রেমচন্দ স্পোক ইন আ লো ভয়েস, তিনি মানুষের কানের মধ্যে কথা বলতেন না, বলতেন মন বুকের মধ্যে। চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ করলেই হৃদয়ে পৌঁছুনো যায় না। এ বিষয়ে এমার্সনের গল্পটা সবচেয়ে ভালো। র‍্যালফ ওয়ালডো এমার্সন একবার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের বক্তৃতা শুনতে গেছেন। এমার্সন আর থোরো তো বনেজঙ্গলে কুটির বেঁধে ট্রানসেনডেনটাল মেডিটেশান চর্চা করেন (ঐজন্য ওঁদের ট্রানসেনডেনটাল ফিলসফার বলা হয়) ধ্যান-ধারণা জপতপে দিন কাটে, তাঁরা কখনো এত লোকজন দেখেননি। প্রেসিডেন্টের স্পীচ, চতুর্দিকে বড় বড় মাইক্রোফোন, বিরাট বিরাট স্পটলাইট, টিভি ক্যামেরাজ ক্লিকিং আওয়ে, জার্নালিস্টদের দৌড়োদৌড়ি, এমার্সন তো কাণ্ড দেখে খুব ঘাবড়ে গেছেন। প্রেসিডেন্ট যখন ডায়াস থেকে নেমে এসে জিজ্ঞেস করলেন— 'মিস্টার এমার্সন, আমার বক্তৃতা কেমন লাগল?' তখন সদা সত্যবাদী ঋষি এমার্সন বললেন— 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, স্যার, ইওর স্পীচ থানডারড সো লাউডলি, আই কুড হিয়ার নাথিং', রুজভেল্ট তো শুনে একদম স্পীচলেস। দার্শনিকের যোগ্য উত্তরই বটে।" —ককড একটু থেমে, বলতে লাগলেন — "আজকের সমাজ সচেতন লেখকদের বেলায় আমিও তাই বলি, দে থানডার সো লাউডলি, রীডার্স হিয়ার নাথিং। কিন্তু মুনশি প্রেমচাঁদ তার ব্যতিক্রম ছিলেন। হি স্পোক নট উইথ এ ব্যাঙ বাট উইথ এ হুইস্পার। ঠিক ইলিয়টের মতন। আর তেমনই ছিলেন শরৎচন্দ্র। তাঁরা কি মার্কসিস্ট? হ্যাঁ এবং না। কেননা তাঁরা তার চেয়েও বড়। তাঁরা হিউম্যানিস্ট। তাঁরা কি ন্যাশনালিস্ট? হ্যাঁ এবং না। যেহেতু তাঁরা সত্য অর্থে তার চেয়েও বড়। তাঁরা যে ইন্টারন্যাশনালিস্ট। তাঁদের কি বলব রিয়্যালিস্ট? হ্যাঁ এবং না। কেননা তাঁরা তো ন্যাচারালিস্টও বটেন। মুনশি প্রেমচাঁদ তবে কী? কিভাবে তাঁকে ডিফাইন করবো? তিনি আসলে একটি বিরাট প্যারাডক্স। এ গ্রেট ইনিগমা। ঠিক শরৎচন্দ্র যেমন, জগতের সব মহৎ শিল্পীই তাই। প্যারাডক্স। ইনিগমা। রবীন্দ্রনাথও তাই টলস্টয়ও তাই। ইনিগমা।

"গালিব বলেছেন— 'সাজ তো হাজির হ্যায় মগর আওয়াজ কহাঁ গঈ? জস-বাত তো হাজির হ্যায় মগর আলফৎ কাহাঁ গঈ?' আমিও বলি বাজনা তো আছে, সব কই? কথা না হয় বইল, কিন্তু বর্ণমালা কই? প্রেমচন্দের জন্মশতবর্ষ তো এল, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে বলতে পারি, আমাদের এমন ভাষা কই? তাই একটা ছোটোখাটো নিজের লেখা সরল কবিতা দিয়েই বক্তৃতা শেষ করছি:

—মুনশি, যব জগমে আয়ে
জগহসে তুম রোয়ে।
এইসা করকে চলি হো মুনশি
তুম হসে জগ রোয়ে।।—

থ্যাংকিয়ু। দ্যাটস অল। নমস্তে।"

ঘর ফেটে পড়লো। তালি থামতে চায় না। অসাধারণ। উত্তমকুমারের শোকে

আমরা এমনিতেই বড্ড মনমরা ছিলাম, কিন্তু ডক্টর কক্কড় আমাদের সম্মোহিত করে অতবড় শোকও ভুলিয়ে দিয়েছেন। পকেট থেকে গোলাপী রুমাল বের করে ঘাড় গলা টাক কপাল মুছলেন। সৌম্য তাড়াতাড়ি জলের গেলাস এগিয়ে দিল; মৃদু হেসে জলপান করলেন। তারপর পাইপটি ধরানোয় মন দিলেন। আমরা ধন্য। কৃতার্থ। সৌম্য গর্বিত চোখে অন্যমনস্ক হয়ে থাকতে চেষ্টা করছে। (ভাবখানা এ আর এমন কি। এমন কতজনকে আনতে পারি আরও)। ধন্যবাদ দিতে উঠলেন মেসোমশাই। সৌম্যর বাবা। (তাঁরই কন্যাদায়ের গল্পটা আপনারা অন্যত্র আগে শুনেছেন)।

মেসোমশাই উঠে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ খুব গম্ভীর ভাবে চুপ করে রইলেন। উনি ওঁর জগাখিচুড়ি বাঙালভাষার জন্য একটু সঙ্কোচ বোধ করছেন বলে মনে হলো।

তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে বক্তব্য শুরু করলেন। —"মাননীয় সভাপতি, মাননীয় প্রধান অতিথি, এবং সমবেত বন্ধুগণ, আইজ আমাগো বড়ই আনন্দের দিন। প্রসিদ্ধ হিন্দুস্থানী লেখক প্রেমচন্দের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সভাপতি মহাশয় আমাগো মেলা পয়সা দিসেন। এবং এই লেইগ্যাই এই সভা ডাকা সম্ভব হইছে। তেনারে অনেক ধইন্যবাদ। এই উপলক্ষে সিনেমা এবং যে জলখাবারের বান্দোবস্তও সম্ভব হইসে, হেইজন্যও সভাপতি মশায়রে ধইন্যবাদ দিতাসি। আইজ মাননীয় প্রধান অতিথি মশয় আমাদিগে বাশি বাশি নূতনকথা শুনাইসেন। কারুর প্রেমচন্দই না, শরৎচন্দ্রর সম্পর্কেও আমাগো জ্ঞান অত্যন্ত স্বল্পই ছিল, বুঝা গেসে। প্রেমচন্দর লগে যে শরৎচন্দ্রের ফ্রেইণ্ডশিপ ছিল, তাগো জয়েন্ট বন্ধুজর থিক্যাই যে শরৎচন্দ্র গল্পগুলি পাইসেন, তেনার কিছু গল্প যে হিন্দির থিক্যা অনুবাদ, এইযাও আমাগো জানা ছিল না। মাননীয় প্রধান অতিথি সাহিত্যের ডক্টর, তদুপরি প্রেমচন্দর দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রথম স্বামী তেনার সাইক্ষাৎ জ্যাঠা হইতেন, কাজে কাজেই ওনার কথা বিশ্বাস না করানোর কিসুই নাই। নিচ্চয় সম্যকজ্ঞান আবং প্রমাণপত্র, হক্কলই তেনার নিকট মজুত আছে। আমার এই বিষয়ে কোনোই বেসিক নলেজ নাই, হাতেও কোনো প্রুফ নাই। তাই ওনার কথার উপর মন্তব্য করা আমার সাজে না। হেইযা যাই কউক গা, গল্প সে না গল্পই। গল্পের মতো কইরা লাইটলি নিলেই হইল।

তা প্রধান অতিথির লেইগ্যা আমিও একখান স্পেশাল গল্প বলি, শোনেন। তুলসীদাস গঙ্গাতীরে বইস্যা রামায়ণ রচনা করতাসিলেন, হেনকালে কক্কড় সাহেব আইস্যা কইলেন: 'পণ্ডিতজী, আমি প্রেমচন্দেরে নিয়া এক পইদ্য বানাইসি, শোনবেন?' তুলসীদাস কইলেন—'কও, শুনি। কী লেখসো?' কক্কড় শোনাইলেন —'মুনশি যব জগমে আইযো' প্রভৃতি। শুইন্যা তুলসীদাসের এমনই লোভ ধইর্যা গেল যে, 'মুনশি'র জাগাতে 'তুলসী' বসাইয়া নিজের নামেই এট্টা পইদ্য বানাইয়া ফ্যালাইলেন তিনি। হেইডা আমাগো অফিসের দারোয়ানের মুখে প্রায়ই শুনা যায়। ভদ্রতায় মানুষে ঢেঁকি পজ্জন্ত গেলে, আর তুলসীদাসের এইটুক উইকনেস তো হালকা বেপার। হেইডা ভদ্রতা কইর্যা খুবই গেলা যায়। সিম্পুল টাস্ক।

কিন্তু স্লাইট কনফিউশন বাধসে ডেইট লইয়া। পোলাপানগো হিস্ট্রির লেসন গুবলেট হইয়া যায় পাছে, তাই এট্টু ক্লিয়ার কইব্যা লই বরং। কী কন? প্রধান শিক্ষক, প্রধান অতিথি, প্রধানমন্ত্রী এনাবা সব মুখ ফস্কাইয়া যাই ক'ন, বাসসা-কাসসা-গুলান হেইডাবেই শাস্ত্রবাইক্য বইল্যা ধইব্যা লয়। তাই কইতাসি, কি থিওডর, কি ফ্রাঙ্কলিন যেই রুজভেল্টই হউক, দুইজনাব একজনাও মনীষী এমার্সনকে দ্যাহে নাই। এমার্সন তো নাইন্টিনথ সেনচুরির, এনাবা হইলেন টুয়েন্টিয়েথ। তিনজনাই অবশ্যি মার্কিন দ্যাশের, তিনজনাই মহাপুরুষ, তিনজনাই স্বর্গত। কিন্তু মর্ত্যে অন্তত এমার্সন-রুজভেল্ট সাক্ষাৎকার হয় নাই। আর টিভি ক্যামেরা, কি রুজভেল্ট, কি এমার্সন, কারও ভাইগ্যেই টিভি-দর্শন ছিল না। এমার্সনের বনজঙ্গলে তো বিজলীবাতিই জোটে নাই। তবে এইযা ঠিকই যে এমার্সন যদি আইজ এই সভায় বইস্যা এই বক্তৃতা শোনতেন তাইলে ওই কমেন্টই করতেন। তাইতে কারো সংশয় নাই। তা যাক, গল্প তো গল্পই।

প্রধান অতিথি মশয়রে বহু ধইন্যবাদ, নানা গল্পে গল্পে সময়টা চমৎকার কাইট্যা গেসে। প্রাচীন গ্রীক ফিলসফার সক্রাটিসের বাবা ডেসক্রাটিসের গল্পডা শুইন্যা আমার একজনা ফরাসী দার্শনিকের কথা স্মরণে আইস্যা গেল। হেইডা অবশ্যি বেশি প্রাচীন কালের কথা না। তিনশত বৎসর পূর্বে ফরাসী দ্যাশে রেনে ডেকার্ত কইব্যা এক গণিতবিদ আছিল। হেইযাও কইসিল— 'আই থিংক দেয়ারফর আই একজিস্ট।' হিব্রুতে না জাপানীতে; লাতিনে না ফরাসীতে কোন ভাষায় যে কথাডা কইসিল, অতশত আমার জানা নাই, তবে এক্সপ্রেশনডা হইল গিয়া এই—'কোজিটো এরগো সুম', আমি চিন্তা করি অতএব আমার অস্তিত্ব আছে। রেনে ডেকার্ত যে দার্শনিক ডেসক্রাটিসের কথাই ব্যাবাক ইকো করসে, এ প্রসঙ্গ আমার সইত্যই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। আমরা জানি কথাটা বুঝি অরিজিনালি ওনারই কপিরাইট। আমেরিকার কথা জানি না, আমাগো ইনডিয়াতে হেইডাই অহন কমন নলেজ। যাই হউক, আইজ আমরা সইত্যই বিপুল জ্ঞান লাভ করসি। ডক্টর কক্কড়রে আন্তরিক ধইন্যবাদ, বেশ আমোদ-প্রমোদের মাধ্যমে জ্ঞান বিতরণ করসেন বইল্যা। অহন বিরতি। চা-জলখাওয়ারের পর মৃণালবাবুর ফিল্ম—'ওকাউরি কথা'। শুইন্যা আসছি হেইডা নাকি প্রেমচাঁদেরই কাহিনী থিক্যা লইসেন। কিন্তু কি জানি আইজ তো দেহি হক্কলই নূতন, হক্কলই কিঞ্চিৎ প্যারাডক্সিকাল। আইজ যা শোনলাম, স্টোরিডা হইতেও পারে প্রেমচাঁদ, কিন্তু শরৎবাবুও হওয়া কিসুই বিচিত্র না। যেমন 'পথের দাবী'। হইতে পারে শরৎচন্দ্র, প্রেমচাঁদ হইলেও আশ্চর্যের কিছু নাই। হক্কলই ইনিগমা। স্বচক্ষে দেইখ্যা লইয়া তবেই আমাগো সদস্যবৃন্দ ডিসাইড করবেন শরৎ, না প্রেম, হেইয়া কোন চাঁদিনী। (বোঝলে হয় অবশ্যি, ছবি তো আবার জানি তেলুগু না তামিল।) আইচ্ছা, পুনর্বার ধইন্যবাদ। নমস্কার।"

BanglaBook.org

ডক্টর কক্কড আর চা-খেতে থাকতে পারলেন না, তাঁর অন্যত্র জরুরি মিটিং ছিল। মেসোমশাই একসঙ্গে দুটি রসগোল্লা মুখে পুরে হেসে হেসে—অতি-গম্ভীর-মূর্তি রাজোরিয়াজীকে বললেন— "আপনের প্রশস্তিডা চমৎকার হইসে। কিন্তু প্রধান অতিথি যেইভাবে বিগিন করসিল না, আমি তহনই ওয়ারিড হইয়া পড়সি। 'ফ্রেইণ্ডস ক্যালকাটানস এণ্ড কানট্রিমেন কণ্ডনের সাথে সাথেই যে 'আই কাম টু বেরি প্রেমচাঁদ, নট টু প্রেইজ হিম' অংশডাও ফলো করে কি না? একজন দেশবরেইণ্য জিনিয়াস মহাত্মার লেইগ্যা আইজ শতবার্ষিকী জন্মোৎসব, আইজ এট্টুক হ্যাপি বিগিনিং হইলে তবেই সে না ফিনিশিংডা ঠিক হইত?"

আবার এসেছে আষাঢ়

BanglaBook.org

"একি কাণ্ড! এ যে একেবারে থার্ড ক্লাস ওয়েটিং রুম বানিয়ে ফেলেছিস অমন দারুণ বৈঠকখানাটাকে?"— ঘরে ঢুকতে ঢুকতে দাদামণি থমকে দাঁড়ান। এই দৃষ্টিটাকেই রবীন্দ্রনাথ বোধহয় বলেছেন 'নিমেষহত'। নিশ্বাস বন্ধ করে চোখ বুলোতে থাকেন ঘরময়। দৃষ্টিটা যেন পুলিশ সার্জেন্টের হাতের টর্চলাইটের মতো থেমে প্রত্যেকটা জিনিস চেঁচেপুছে স্পর্শ করে যায়—আর লজ্জায় আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত (সংস্কৃতে বলে পা থেকে মাথা) ভারি হয়ে উঠতে থাকে। দাদামণির নজর ফলো করে আমিও ঘরটা নতুন চোখে দেখছি। ঝকঝকে ইতালীয় মার্বেল পাথরের মেঝে, কালো মার্বেল আর মাদার অব পার্ল বসিয়ে বর্ডার দেওয়া। —সেই মেঝের ওপরে থাকার কথা সোফা-কৌচ-কার্পেটের—সাধারণত এ-ঘরে তারাই থাকে— কিন্তু এখন আছে? (১) একগাদা লেপ তোশক, বেডকভারে পুঁটলি বাঁধা —পুঁটলির ফাঁক দিয়ে ময়লা মশারি উঁপছে পড়ছে বাইরে। (২) তিনটি বিশাল পুঁটলিতে বহু বাতিল হওয়া জামাকাপড়—মাদার টেরিজা, রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবাশ্রমের জন্য রাখা। (৩) সেক্রেটারিয়েট টেবিলটা খুলে ফেলে তার ন্যাড়া ড্রয়ারগুলো পাশাপাশি দাঁড় করানো। তার ওপরে কিছু তাকিয়া, কুশন, আর ছ'সাতটা ব্রাকফাইল। টেবিলের মাথাটা বইয়ের তাকের গায়ে হেলান দেওয়া। তার ওপরে একটা শার্ট ঝুলছে। শার্টের ওপরে বেড়ালটা ঘুমোচ্ছে। আরামে। (৪) মেঝেয় একটা বিরাট বারকোশের ওপরে কয়েকটা তেলরঙের টিন, টার্পিন তেলে ভেজানো বুরুশ, বোতল, শিরিষ কাগজ, পুটিং-এর তাল। (৫) চতুর্দিকে সাতআটটা প্লাস্টিকের শপিং ব্যাগে ভরা দরকারী কাগজপত্র, খেলনাপাতি, চিঠিপত্র, ফটো। (৬) একধারে

শিশিবোতল (খালি)। (৭) একধামা সাদা গম। (৮) একটা বিশ লিটাবেব বৈযামে কেরোসিন। (৯) ঘবেব মাঝখানে একখানা গদি—তাতে খাতা, বই, কলম, চাবি, চশমা। (১০) যে খাটেব গদি, সেই খাটটিব কাঠেব অংশগুলি খুলে উল্টোদিকের দেয়ালে হেলানো। তা থেকে ভিজে তোয়ালে ঝুলছে। (১১) মেঝেব ওপবে হার্মোনিয়ামেব বাক্স। তার ওপরে টিভি। তাব ওপরে একটি কাচেব বাটিব মধ্যে দুটো তাজা বেলফুলেব গোডে মালা সুবভি ছডাচ্ছে। (১২) একটি কার্পেটেব ওপবে বানীর মতো সগৌববে অচল টেলিফোন এবং তাব পদতলে, মোসাহেবেব মতো, ভুটানী সাবমেযী কুতুল বসে আছে। কার্পেটটা আবাব উলটো পাতা। (১৩) বইযেব তাক কিছু খালি করা হযেছে —মেঝেয বইযের স্তূপ—তাবই ওপবে ইতস্ততঃ যামিনী বায, গোপাল ঘোষ, সুনীলমাধব সেন, দেবীপ্রসাদেবা শুযে আছেন, অজস্র রেকর্ড দ্বাবা পবিবৃত হযে। (১৪) দুটি বিবাট স্টিবিও স্পীকাব মেঝেব ওপবে পাশাপাশি বাখা। তাব ওপরে কিছু শূন্য চাযেব কাপ ও জলেব বোতল। একপাশে অযত্নে পড়ে আছে তার বেকর্ড চেঞ্জাবটা—তাব ওপরে দুটি আম। এক প্লেট ঝুবিভাজা।

—"ছি। ছি। ছি।"—দাদামণিব ক্ষোভে দুঃখে বাকরোধ হযে যায়। "কবেছিস কি। এ যে বন্যার্তদেব শিবিব।" হাতেব ছাতাটা দিযে মেঝেব কোণটা দেখালেন, যেমন ডেমনস্ট্রেটববা দেখায ছডি দিয়ে— "এসব কী? ঘরদোব ঝাঁটপাট দেওযাব পাট কি তুলে দিযেছিস?"

ঘবভর্তি কুতুলেব লোমেব সাদা সাদা জল উডছে। যত্রতত্র চুনবালি। দেওযাল ও ছাদ থেকে খসে-পডা। ঝুলেব টুকবো ইতিউতি উডে বেডাচ্ছে প্রজাপতিব মতো, পাখাব বাতাসে ডানা মেলে।

—"ঈসস—চোখে না দেখলে, বিশ্বাস হতো না যে এ ঘবটার এই মূর্তি কবা যায়। কবা সম্ভব!"

—লজ্জায মাথা ঝুলিযে বসে আছি।

—"নাঃ, তুই আব ভদ্দরলোক হলি না, খুকু! সংসাবী জীব আর হলি না! দেখেছিলি, খবরেব কাগজে বেগম অব আউধের ছবি? কেমন গুছিযে বানীব মতোই সংসার করছেন নিউ দিল্লিব প্ল্যাটফর্মে? বেয়ারা, বাবুর্চি, ছেলে-মেযে, ৬টা শিকাবী কুকুর, ফুলেব টব, পার্সিয়ান কার্পেট, চাইনিজ ভাস, সব সমেত। যে বানী হয সে প্ল্যাটফবমকেও প্রাসাদতুল্য কবে নিতে জানে। আর যে স্বভাব-ভিকিরি সে প্রাসাদকেও প্ল্যাটফরম বানিয়ে ফ্যালে। ছোঃ।"

প্রথমে দাদামণিব লেকচাবটি হজম কবি। তাবপর ঝাঁজিয়ে উঠি।

—"দেখতে পাচ্ছো না? বাড়িতে মিস্ত্রী লেগেছে? ঘরে সোফা কৌচ নেই, শোবার ঘর, ভাঁডাব ঘর, স্টাডি, সব ঘরের জিনিস এই ঘরে জড়ো কবা? সব-কিছু মেঝেতে নামানো? খাট টেবিল সবই খোলা? সবকিছু পুঁটলি বাঁধা? এমনিভাবে বুঝি আমি থাকি? এই একটি ঘরই নেয়নি—বাকি সবগুলো ঘবই যে মিস্ত্রিরা নিয়ে

BanglaBook.org

নিয়েছে। গুছিয়ে রাখবই বা কী করে, রেখেই বা কী হবে? আবার তো তুলতে হবে যথাস্থানে? এটা তো টেমপোরারি—"

—"নিয়ে নিয়েচে? নেবে কেন? কেন নেবে? তুমি দেবে তবে তো নেবে? তুমি দিলে কেন?"

—"ওরা সব ঘরে কাজ শুরু করে দিলে একসঙ্গে।"

—"বলি, একসঙ্গে সব ঘরে মিস্ত্রী লাগানোর কথা কে করে শুনেছে? তুই দিয়েছিস কেন ঢুকিয়ে? একখানা ঘর করবে, সব শেষ করে সাজিয়ে দেবে, তারপর আরেকখানা ঘর। এ আবার কেমন ধারা কাজের ছিরি?"

—"আমি কী করব? রহমানকে কন্ট্রাক্ট দিয়েছি। সে যেমনভাবে করবে তেমনি-ভাবে হচ্ছে তো। সে একসঙ্গে দু-তিনটে ঘর করছে। আমরা আর সাজিয়ে তুলতে সময় পাচ্ছি না। একে একে সবাই এই বড় ঘরে এসে জমছে। ভাঁড়ার ঘর, শোবার ঘরগুলো, স্টাডি, সবই বেএক্তার হয়ে আছে যে।"

—"শোবার ঘর সব ক'টায় কাজ হচ্ছে?"

—"কাজ হয়ে গেছে। কিন্তু সব আলো পাখা নষ্ট হয়ে গেছে তো। ও ঘরগুলোতে শোয়া যাচ্ছে না। এ-ঘরে আলো পাখা ঠিক আছে।"

—"আলো পাখা নষ্ট হয়ে গেছে তো? কেন গেল?"

—"বলতে পারি না। হয়েছে এটুকু জানি। রহমান বলছে ব্রাশের টানে অমন হয়েই থাকে?"

—"মোটেই হয়েই থাকে না। তোমাকেও পেয়েছে গাধা। তোদের ইলেকট্রিক মিস্ত্রী নেই?"

—"এনেছিলাম। সে বলল ঘড়াঞ্চি ছাড়া পাখা সারবে না। ঘড়াঞ্চি ওর কাছে নেই—অন্যত্র কাজ হচ্ছে। সেখানে আছে।"

—"ঘড়াঞ্চিওয়ালা আর কোনো মিস্ত্রী নেই পাড়ায়?"

—"নাঃ, আর অন্যরা সব মইওলা পার্টি। মইতে হবে না।"

—"তা শুচ্ছিস কোথায়? এ ঘরেই? খাট তো খোলা। এই মেঝের গদিতে তো একজন মাত্র—বড়জোর দু'জন—"

—"ঐ ফোলডিং খাটে আরেকজন। আর মাদুরের ওপর ডানলোপিলো পেতে আরেকজন, ঐ কর্নারে। ভাগ্যিস ঘরটা বড় ছিল।"

—"এই ঝুলকালি-চুনবালির মধ্যে মাটিতে শুস কী করে? ঝাঁটপাট বন্ধ কেন? ঝ্যাটা নেই তোদের?"

—"ঝ্যাটা থাকবে না কেন? ঝি নেই। কাজ ছেড়ে দিয়েছে।"

—"দেবে না? ঘরদোরের যা ছিরি? থাক? ও তো পাগল হয়ে যাবে।"

—"সে বলেছে মিস্ত্রিরা না বেরুলে সে আর ঢুকবে না। তাই নিয়মিত সাফাই হচ্ছে না। ওই মজুরদেরই দুটো করে টাকা দিয়ে ঘরটর মুছিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু রোজা

BanglaBook.org

করছে বলে সব দিন ওরা বেশি খাটতে চায় না। কাল মোছেনি। কাল আগে আগে চলে গেছে। আজকে ঈদ কিনা। আজ ওরা ছুটি করেছে।"

—"আজ ঈদ, প্লাস বথ! কোথাও না কোথাও কেলেঙ্কারি হবেই মনে হচ্ছে। দু'চারটে ভালোরকম হাঙ্গামার স্টোরি আজ না হলেই নয়।" ঘরের সুদূর কোণে একমাত্র চেয়ারটি দখল করে বসে কাগজ পড়তে পড়তে দীপু এতক্ষণে পরিতৃপ্ত সুরে কথাটা বলল, পায়ের কাছে মেঝেভর্তি সিগারেটের ছাই, দেশলাইকাঠি, পোড়া সিগারেটের টুকরো, শূন্য প্যাকেট। হাত-খানেক দূরেই শূন্য অ্যাশট্রে-টি ঝকঝকে হাসছে। দাদামণি দেখলেন। এবং হুঙ্কার ছাড়লেন।

—"ওঠ ব্যাটা হিপ্পি! তোল সিগারেটের টুকরো। কেন, ঐ অ্যাশট্রেতে ছাই ফেলতে পারো না? পাশেই রয়েচে?"

জগতে সবই নশ্বর, ছাইই বা কী, ছাইদানিই বা কী—এমনি একখানা মুখের ভাব করে দীপু পা দিয়ে টুকরোগুলো একত্র করতে থাকে। দেখে দাদামণি খুশি হন। তারপরেই ভুরু কুঁচকে যায়। কান খাড়া করে শুনতে থাকেন। কোথায় একটা ঘস ঘস ঘস ঘস শব্দ হচ্ছে। অনন্ত।

—"ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকটাও তো মন্দ দিসনি? ও কিসের শব্দ?"

—"পালিশ মিস্ত্রী। বাথরুমের পাথর পালিশ করছে।"

—"পা-লিশ?" দাদামণি হেসে ফেলল। "বাড়ির তো এই অবস্থা, এর মধ্যে পালিশ?"

—"না না, বাথরুম রিপেয়ারিং পেন্টিং কমপ্লিট। পালিশ হলেই এর ঘর শেষ। পঞ্চু এসেছে, ওর তো ঈদ নেই।"

এমনি সময়ে, ঠিক মাথার ওপরে অকস্মাৎ ঠঠাং ঠঠাং করে একটা বিকট শব্দ শুরু হয়। প্রচণ্ড শব্দ। বাড়ি কাঁপে।

—"ও বাবা!" দাদামণিও দৃশ্যত কেঁপে ওঠেন। "ওটা আবার কীরে? কী পেটাচ্ছে ওটা? লোহার কিছু?"

—"ও কিছু না। ট্যাংকটা ভাঙছে বোধহয়।"

—"ও কিছু না? ট্যাংকটা ভাঙছে বোধহয়? কিসের ট্যাংক? কে ভাঙছে? কার হুকুমে ভাঙছে?" দাদামণি ক্ষিপ্তপ্রায়।

—"মানে ঐ জলের বড় ট্যাংকটা খুব পুরনো হয়ে ফুটো ফুটো হয়ে গিয়েছিল তো? ওটা বদল করেছি। এক পুরনো লোহাওলা সেটা কিনেছে। সে-ই এসেছে ট্যাংকটা কেটে টুকরো করে নিয়ে যাবে বলে।"

—"ওহ্! তাই বল। যাই বলিস খুকু বাড়িটাকে সত্যি সত্যি ইস্টিশানে পরিণত করেছিস। ভদ্দরলোকে থাকতে পারে এতরকম শব্দের মধ্যে? কাকিমাকে কি ভয়ঙ্কর কষ্ট দিচ্ছিস ভেবে দেখেছিস? ভাগ্যিস আর নিচে নামতে পারেন না—এ ঘরটা দেখলেই সিওর হার্টফেল, কিংবা সেরিব্রাল! ওই বীভৎস আওয়াজেও আয়ুক্ষয় হচ্ছেই

BanglaBook.org

—সাউণ্ড পলিউশান একেই বলে—", বলতে বলতেই চোখ পড়ল ঘরের আরেক কোণে—"অ্যাঁ? যামিনী রায়, সুনীলমাধব—সব মাটিতে ফেলে রেখেছিস? তোল তোল, তুলে রাখ—কাকাবাবুর যত্নের এসব জিনিস তুই ধ্বংস না করেই ছাড়বি না দেখছি—" বলতে বলতে নিজেই তুলতে শুরু করেন ছবিগুলো। "জানিস, আমেরিকায় এ ছবির এখন কত দাম?" তার পাশেই একটা তেতলা রথ—কাগজের শেকলের মালায় অর্ধসজ্জিত। বাকী শেকল, কাঁচি, আঠা, রঙিন কাগজ সমেত ভূলুণ্ঠিত। কারিগরগণ বোধহয় অন্য কোনো দুষ্কর্মের টানে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন আপাতত। মোমবাতি, কাঁসর প্রস্তুত।—"ওঃ, আজ রথ। বিষ্টি হবেই। আকাশও সেজে আসছে। আমি ঘরেই আছি, বিষ্টি নেমে গেলে মুশকিল হবে। নে, ঘরদোর গুছিয়ে রাখ—আমি চারটে পাঁচটা নাগাদ ফিরে যেন সব টিপটপ দেখি। ভালো করে চা খাওয়াবি তখন— যেমন হঠাৎ এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন দাদামণি। আজকাল দুর্গাপুরে বদলি হয়েছেন—এবার বেশ মাস তিনেক বাদে এলেন।

দাদামণি বেরুতেই ঝাঁটা ঝাড়ন নিয়ে লেগে পড়ি চুনবালি কুকুরের লোম সাফাইয়ে। গোপাল ঘোষ, যামিনী রায়দের তুলে রাখি স্টিরিও, পোকারদুটোর মাথায়। কাপড়িশ বোতল-টোতল ট্রেতে করে সরিয়ে ফেলি। টুকরোটাকরাগুলো যথাসাধ্য তুলে ট্রে ভরে ভরে গুছিয়ে রাখি। জুতোটুতো সরিয়ে দিই। গমের ঝুড়ি আর কেরোসিনের টিন রান্নাঘরেই পাঠাতে হবে—তার আগে জানলাগুলো বন্ধ করি। প্রচণ্ড বৃষ্টি নেমেছে। দাদামণি না ভিজে যান। রাস্তায় রথই বা টানবে কেমন করে? আমার পক্ষে অবিশ্যি ভালোই হলো বৃষ্টিটা হয়ে—জলছাদটা এত খরচ করে যে ফের পেটানো হলো—পড়ার ঘরে জল পড়া বন্ধ হলো কিনা সেটার একটা পরীক্ষা হয়ে যাবে। পড়ার ঘরটা বৃষ্টির জলের চোটে অব্যবহার্য হয়ে গিয়েছিল। বহমান বলেছে তিরিশ বছরের মধ্যে আর জল পড়বে না, পড়ার ঘর এমনই বিপেয়ার করেছ।

জানালা-টানালা বন্ধ করে ফের নজর করে দেখলুম এত ঝাঁটপাট দিয়ে ঝেড়েঝুড়ে গুছিয়েও ঘরটাকে থার্ডক্লাস ওয়েটিং রুম থেকে সেকেণ্ড ক্লাস ওয়েটিং রুমেও উন্নীত করা যায়নি। অতগুলো ধ্যাবড়া বড় বেডকভার জড়ানো পুঁটলি, মেঝেভর্তি বই, খোলা খাট, খোলা টেবিল, খোলা স্টিরিও সিস্টেম, দু'খানা ধামা, এসব যাবে কোথায়? হারমোনিয়ামের ওপর টিভি সেট? তার ওপরে গোড়ে মালা? যাকগে যাক। আর পারি না।

পুজোর লেখা সব বাকি। আজ মিস্ত্রী নেই—এই ফাঁকে কাগজ কলম নিয়ে মেঝের গদিতে উপুড় হই। একটা বড় গল্প আধখানা লেখা হয়ে পড়ে আছে। বাইরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। কড়কড়াৎ বাজ পড়লো কোথায়। সীজনের প্রথম বড় বৃষ্টি। শব্দটা খুব ভালো লাগছে। ট্যাংক কাটা বন্ধ রেখে মিস্ত্রী নেমে গেছে নিচে। পঙ্ক অবিশ্যি ঘষে যাচ্ছে।—তার শব্দকে ছাপিয়ে উঠেছে বৃষ্টির ঝমঝম। এই সময়ে এককাপ চা হলে হতো।

BanglaBook.org

—"ঝর্ণা? এককাপ চা হবে নাকি? ঝর্ণা?"

এই বাক্যের সোনার কাঠিতে হেঁটমুণ্ড দীপু প্রাণ পেয়ে জেগে উঠেই চেঁচাতে শুরু করে—"ঝর্ণা। ঝর্ণা। চা। চা!", সিঁড়িতে ঝর্ণার মাথা দেখা যায়। একগাল হেসে বলে—

—"চা হবে নে—আন্নাঘরে তুলকেলাম?" সদাহাস্যময়ী ঝর্ণা বুড়ো আঙুল দেখায়।

—"মানে? রান্নাঘরে তুলকালাম। কেন?"

—"জল পড়তেচে, গো জল। আন্নাঘর জলে থৈথৈ কত্তেচে—চাল আটা তেল চিনি সোব ঘেঁটেঘুঁটে একাক্কার"—দুই হাত নেড়ে শূন্যে গ্লোবাকৃতি করে ঝর্ণা।

—"সেকি? কী করে হলো?"

—"কে জানে, কী করে হলো। আমরা তো জিনিস সরাতিই টাইম পাচ্চিনি—এই বাটি বসাই তো ঐখেনে জল পড়ে—ওখেনে থালা পাতি তো সেইখেনে ঝঝঝর করে জল—আমরা খালি ছুটোছুটি করে থালাবাসন পাড়তিচি আর ঘর পুচতিচি—একেবারে বোকা বাইনে দেচে। এ্যাকোন চা-টা হবে নে। আগে এট্টু সামাল দিয়ে নি।"

—"তা সামাল আর দিচ্ছো কোথায়? দিচ্ছো তো লেকচার"—দীপু বলে।

—"মা তো বলেচে, আজ বিষ্টিতে খিজড়ি আর হবে? তাই ভগমানই আন্নাঘরে আবনা আবনি খিজ্‌ড়ি এঁধে একেচেন—দ্যাকো গে যাও।"—

দীপু এবার বলে, "বাজে বোকো না। রান্নাঘরে আবার জল পড়বে কী করে? জল তো পড়ে পড়ার ঘরে।"

—"সে ঘর তো শুকনো খটখট কত্তেচে—এ লোতন ফুটো গো—আগে ছেলনি।"

—"জল পড়ছে তো চা করতে কী হয়েছে? আশ্চর্য।" দীপু আর একটা যুক্তি খাড়া করতে চেষ্টা করে ঝর্ণার কাছে বকুনি খায়।

—"উদিকে নংকাকাণ্ড হচ্চে—বলে কিনা, কী হয়েছে। তুমি নিজেই চা করে দ্যাকো না?"

—"যা না দীপু, দ্যাখনা একবার ব্যাপারটা কী?"

—"যাচ্ছি, যাচ্ছি। বাব্বা। এককাপ চাও চাইবার উপায় নেই। অমনি সংসারের একটা কাজ ধরিয়ে দেবে।" বলে দীপু টিভির ওপর পা তুলে দিয়ে—জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলে—"ইস দিদি—বাইরেটা কী সুন্দর হয়েছে—", এবং উদাস গলায় গান ধরে—"মেঘছায়ে সজলবায়ে—" ওপরে যাবার লক্ষণ দেখায় না।

সত্যিই বাইরেটা ভারি মোহময় হয়েছে তো? সামনের কদম গাছটাতে বৃষ্টি যেন মণিমাণিক্যের মতো ঝকঝক করছে—মেঘমেদুর আবছা ঝাপসা আলোর মধ্যেও কী উজ্জ্বল ওর সবুজ রংটা—কে বলে আমাদের আদরের কলকাতা মুমূর্ষু?

—"মা! মাগো! কী মজা! কী মজা! দেখবে এসো দিম্মার বারান্দায় নদী হয়েচে—", নাচতে নাচতে টুম্পা এল। হাতে স্প্যানের মলাটে বানানো নৌকো।

BanglaBook.org

—"নদীতে কত জল—ankledeep-এর চেয়েও বেশি, আমার প্রায় Kneedeep জল—দিদি নৌকো ভাসাচ্ছে। এটা নিয়ে সাতটা হবে,—দিম্মা বলেছেন সপ্তডিঙ্গা।"

—"ওগুলো সব গিয়ে নালীর মুখ বুজিয়ে দেবে—এত বৃষ্টির মধ্যে নৌকো তো ভাসবে না, বৃষ্টি থামলে।"

—এত বৃষ্টি কোথায়? কমে গেছে তো? ভাসছে তো"—বলতে বলতে টুমপা নৌকা সমেত পালায় তেতলায়। পরমুহূর্তেই তার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ শোনা যায়—

—"মা! মা! দেখবে এসো—কী মজা! দিম্মার ঘরের মধ্যেও কি সুন্দর জল ঢুকছে—flood-এর মতন—

তার পরেই মায়ের সেবিকা পুতুলের আর্তনাদ।

—"ও দিদি! ও কানাই! কী হবে? ঘরে যে জল ঢুকছে! ঝাঁটা? ঝাঁটা কোথায়?"

—"সমস্তই তোমাদের নৌকো ভাসানোর প্রতিফল!"

মূর্তিমতী অবসিকা হয়ে ব্যাঘ্রগর্জনে এবং ব্যাঘ্রঝম্পনে তেতলায় ধাবিত হই। এবং ঝাঁটা হস্তে জলভরা বারান্দায় ঝাঁপিয়ে পড়ি। কানাইই বা অমন কাব্যিক বাক্যবন্ধকে বাস্তবায়িত করার সুযোগ ছাড়বে কেন? 'আছেহাতে এল কানাই'—সেও হাঁটু অবধি লুঙ্গি উঠিয়ে ঝাড়ু নিয়ে নেমে পড়ে টুমপার নদীতে। দুজনে মিলে বুজে যাওয়া নর্দমার ঝাঁজরিকে আক্রমণ করি। এই মিস্ত্রী খেটেছে তো? চুনবালি সব ঢুকেছে বোধহয়—একগাদা ভিজে কাগজের নৌকোর শব তোলা হয়—ম্লানমুখে পিকো-টুমপা ঘরের মধ্যে দণ্ডায়মান—তাদের দিম্মা সান্ত্বনা দিচ্ছেন—"সপ্তডিঙ্গা মাধুকরী ডুবেই থাকে দিদি—কিন্তু আবার ঠিক ভেসে উঠবে দেখো।" কিন্তু ওরা কিছুই শুনছে না। নর্দমার খনিগর্ভ থেকে কানাই একে একে শণের নুড়ো, দেশলাই-কাঠি, ইঁটের কুচি, শুকনো ফুলের মালা—এই জাতীয় প্রচুর বস্তুরাজি উদ্ধার করছে। আস্তে আস্তে জলটা দিব্যি নামতে শুরু করলো। আমিও ঝাঁটা ফেলে, নিশ্চিন্ত হয়ে রান্নাঘরের 'তুলকালাম' পরিদর্শনে যাই।

ছাদের মাঝখান দিয়ে জল পড়ছে। মেঝেয় আমার একটা ধোয়া শাড়ি ব্লটিং পেপারের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। চারিদিকে থরে থরে থালাবাটি কাপডিশ বিছোনো। তার মধ্যে বৃষ্টির জল ধরা হচ্ছে। আমার সাধের জাপানি ছাতাটি কায়দা করে মিটসেফের সঙ্গে আটকে, তার নিচে বসে একা একাই বেধড়ক বাগাবাগি করে মিস্ত্রীদের চতুর্দশপুরুষ উদ্ধার করতে করতে বাটনা বাটছে ঝর্ণা। রান্না করবার টেবিলের তলায় গ্যাসরিংটি নামিয়ে তার নিচে সঙ্গোপনে রান্না চড়ানো হয়েছে। ভয়ে চায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করে, নিঃশব্দে কেটে পড়াই মঙ্গল মনে করে পা টিপে টিপে সরে আসি—পরিস্থিতি আয়ত্তাধীন। নিচে গিয়ে লেখাটা ধরতে হবে।

নিচে এসে ঘরে ঢুকতে গিয়ে পায়ে যেন জলের মতোই কী ঠেকলো। আরে, এঘরে আবার জল আসবে কী করে। বোতল ভাঙলো নাকি? নজর করে দেখি

BanglaBook.org

বড় খাটের পালিশ করা খোলা অংশগুলি ভিজিয়ে দাপটে জলস্রোত আসছে। কোথা থেকে আসছে? দুটো জানলাই তো বন্ধ? জানলার ওপর বইগুলো তো শুকনো? তবে তো জানলা দিয়ে নয়। ভাঙা কাচ-টাচ দিয়ে আসা অসম্ভব ছিল না—তবে সদ্য কাচ সবই সারানো হয়েছে—তবে? ঐ তো জলটা ধেয়ে আসছে বইয়ের র‍্যাকের তলা দিয়ে কুলকুলিয়ে। কাপড়ের পুঁটলির গা বেয়ে। কার্পেট ভিজিয়ে—কুতুল উঠে গদিতে চড়ে বসেছে—টেলিফোন উঠে সরে যেতে পারেনি, তাই ভিজে যাচ্ছে। সর্বনাশ। এত জল কোত্থেকে আসছে?

কুতুলটাও আশ্চর্য। সত্যি। উঠে গেছে, অথচ একটুও ঘেউ ঘেউ করেনি। করবেই বা কেন? জল তো চোর নয় ডাকাতও নয়, যে ঘরে ঢুকলে কুকুরকে চেঁচিয়ে তার জানান দিতে হবে? জল তো আউট অব সিলেবাস। কিন্তু একটু আগেও তো জলটল ছিল না? এই তো ওপরে গেছি বারান্দা সাফ করতে—এর মধ্যেই এত জল এল কী করে। বৃষ্টি তো কমেই গেছে! দীপুটাই বা কোথায়? চুপচাপ এর মধ্যে বসে আছে? দেখছে না?

—"দীপু!" হাঁকটি ছাড়ি, প্রায় কাপালিকদের মতো। কিন্তু কোথায় দীপু? চেয়ার খালি। বাড়িতে চায়ের সুবিধে হবে না বুঝে তিনি নিশ্চয়ই পাড়ার দোকানে গেছেন। আশ্চর্য ছেলে। সংসারসুদ্ধু চুলোয় যাক, তার দৃষ্টিপাত নেই। চা-সিগারেট হলেই হলো।

—"পিকোলো! টুমপা! কানাই! ঝর্ণা! কুতুল! শিগগিরি নেমে আয়। শিগগিরি! নিচের বৈঠকখানা ভেসে গেল জলে—আমি আমার সংসারের টোটাল ম্যান পাওয়ার ব্যবহার করতে চেষ্টা করি—প্রত্যেকটি মানুষকে মোবিলাইজ না করলে ও সংকটের মোচন অসাধ্য।

—"জল? বৈঠকখানায়? ও-মা! কী মজা!"

—"কই? কই? কই? সত্যি বলছ তো?"

মহোল্লাসে কলরোল করতে করতে দন্ত বিকশিত করে দুই কন্যা লাফাতে লাফাতে এসে পড়ে। ঠাস ঠাস করে দুই থাপ্পড় কষাতে ইচ্ছে করল আমার। এটা যে সমূহ বিপদ, ওরা তা বুঝতে পারছে না? মজা পাচ্ছে? মেঝেভর্তি আমাদের যাবতীয় ভূসম্পত্তি—বই, রেকর্ড, এবং অন্যান্য সবই যে মুহূর্তের মধ্যে জলমগ্ন ও বিনষ্ট হবে, এই ঘরে যে বান ডেকেছে—ওরা কিছুই টের পাচ্ছে না—নির্বোধ শিশু কাঁহাকা। জলের উৎস সন্ধানে তার গতিপথ অনুসরণ করে পাশের ঘরে উপস্থিত হই—কাপড় ঢাকা খাট, কাপড় ঢাকা গডরেজ আলমারির মাঝখানে দিয়ে বাঁশের ভারার তলা দিয়ে বিপুল ক্রমবর্ধমান জলরাশি খবরের কাগজ ঢাকা দেওয়া ট্রাংক সুটকেস ড্রেসিং টেবিলের তলা ভিজিয়ে ছুটে এসে আমার পদসেবা করে, সানন্দে আমাকে অভ্যর্থনা জানায়। উৎস, নর্দমা। কোণের নর্দমাটি দিয়ে বাইরের বেনওয়াটার পাইপের প্রবল জলকল্লোল অনায়াসে দোতলার শয়নকক্ষে অনুপ্রবেশ করছে। মাথার

BanglaBook.org

ওপর তিনতলার বারান্দায় কানাই তখনও সিংহবিক্রমে ঝাঁটা নিয়ে জলযুদ্ধ চালাচ্ছে, তার সম্মার্জনী-ঝংকার শুনতে পাচ্ছি।

মুহূর্তেই ঘটনাটি পরিষ্কার হয়ে যায়। যত জল আমরা ওপর থেকে ঠেলে দিচ্ছি, সব জল বেগে পালিয়ে এসে আমারই শোবার ঘরে শেলটার নিচ্ছে। কোনো বিশেষ কারণে জল একতলায় নামতে পারছে না। কি সর্বনাশ। প্রথমে ওপর থেকে জল নামা রুখতে হবে।

—"কানাই। ও কানাই। ঝাঁটা বন্ধ কর, ঝাঁটা বন্ধ কর"— বলতেই কানাইয়ের আরো জেদ চেপে গেল। সে তো নিচের সমস্যা জানে না। আমি যত চেঁচাই —"ঝাড়ু থামা"—ও তত বলে—"আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না দিদি, এই তো আর একটুখানি—জল সব সাবাড়।" তার বোধ চেপেছে, বারান্দা সে নির্জলা করবেই।

—"অ পুতুল। অ ঝর্ণা। প্লিজ কানাইকে থামাও। বারান্দার জল বারান্দাতেই থাকা ভালো, ও জল নাবিয়ে কাজ নেই—জলটা থাকুক, জলটা থাকুক, নর্দমা বুজিয়ে দাও—বরং নর্দমার মুখে ন্যাতা গুঁজে দাও—", শুনে কানাই ভাবলে দিদির মাথা খারাপ হয়েছে, সে আরো জোরে ঝাঁটা চালায়। নিজের কানকে অবিশ্বাস করে পুতুল ও ঝর্ণা নিচে আসে এবং ব্যাপার দেখেই রান্নাঘরে দৌড়োয়—নাঃ, এ ন্যাতা-বালতির কেস নয়—এ কেলোর কীর্তি,—ওয়ার ফুটিংয়ে এক মোকাবিলা করতে হবে—যে যা পাবে, থালা বাসন নিয়ে, বালতি ডেকচি নিয়ে হাজির। টমপা পিকো সমেত কাঁসি নিয়ে কড়া নিয়ে মেঝের জল ছেঁচে বালতি ডেকচিতে তোলা হতে লাগলো—কুতুল হঠাৎ জেগে উঠে ঘরে এত লোক এত হৈচৈ দেখে, বেধড়ক চেঁচাতে শুরু করলে —হট্টগোল শুনে পালিশ মিস্ত্রী পঞ্চু ছুটে এল, এবং অবস্থা দেখে বললে জালিটা ভেঙে না ফেললে জল বের করা যাবে না। বলেই কোথা থেকে একটা লোহার রড এনে ঝাঁজরিটা ভাঙতে শুরু করে দিলে। আমি চেষ্টা করছি একবার গদিটা টেনে সরাবার—রেকর্ডগুলো ভাগ্যিস জলের যাত্রাপথে নেই—ঘরের অন্যপাশে আছে —একবার লেপ তোশকের পুঁটলিটা নড়াতে চেষ্টা করছি—করতে কিছুই পারছি না —পুতুল দুই হাতে ঝাঁটাটা ক্রিকেট ব্যাটের মতো বাগিয়ে ধরেছে—দু'হাতে জল পেটাচ্ছে, তার চেষ্টা জলটাকে বই আর গদির দিক থেকে সরিয়ে দরজার দিকে পাঠাবার—যে যার পজিশন নিয়ে নিয়েছি। ঝর্ণা দরজার কাছে, দীপুর একটি জীনস জিভছোলার মতো করে দু'টো পা দু'হাতে ধরে ছেঁচে ছেঁচে ঘরের সব জল নিয়ে সিঁড়িতে ফেলছে।

এতক্ষণে কানাইও নিচে এসেছে। এসেই আধোভিজে লেপ তোশকের গন্ধমাদনটা ও-ঘরের খাটে তুলেছে। স্টিরিও স্পীকারদুটো গদির ওপর তুলেছে। ও-ঘরে খাটের নিচে থেকে স্যুটকেসগুলো বের করে শুকনো জায়গায় রাখছে- -আর বলছে—"য্যাতো ঢাকন সবই উপ্রে আর য্যাতো জল সবই নিচে—এ্যার বেলাইতি ছুটকেশ সব ভিজ্যে গেল গাঃ।"

হঠাৎ জল ছেঁচা ফেলে টুমপা কেঁদে উঠলো—"আমাব রথ। আমার রথ একদম ভিজে গেল—ওমা! আমাব বথ।" আর পিকো চেঁচাচ্ছে—"মা! মা! স্টিবিও! স্টিবিও!"

স্টিবিওর মা কী কববে? অতবড জিনিসটাকে কানাই দুই হাতে তুলে, হঠাৎ লক্ষ্মণেব ফলধবা অবস্থায পডল—সেটাকে নামানোব জাযগা নেই—বিন্ধ্যপর্বতেব মতো কুঁজো হয়ে অনন্ত অপেক্ষায বয়ে যায় কানাই। প্রত্যেকেই আমবা চেঁচাচ্ছি, প্রত্যেকে প্রত্যেককে নির্দেশ এবং উপদেশ দিচ্ছি একই সঙ্গে, এবং মা ওপব থেকে অনববত তাঁব ঘণ্টিটা এক নাগাডে বাজিযেই চলেছেন পাগলা ঘণ্টাব মতো, আব বলছেন—"ওবে—তোরা সবাই কোথায গেলি? ওপবে কেউ নেই কেন? বাবান্দায যে এখনো অনেক জল বযে গেল।"

এদিকে দোতলায তো প্রত্যেকেব কাসাবিযাংকাব অবস্থা। কারুবই স্টেশন ছেডে নডবাব উপায নেই—মা বেচাবী কিছুই টেব পাচ্ছেন না।

ইতিমধ্যে একতলায তিনটে অধৈর্য ডোরবেল বাজলো। কেউই সাডা দিতে পাবছে না। ওদিকে পঞ্চু ঝাঁজরি ভেঙে ফেলে সর্বনাশ কবেছে। "ফুলিযা ফুলিযা ফেনিল সলিল গরজি উঠিছে বিপুল বোষে"। বিনা বাধায় দ্বিগুণ বেগে ঘবে জলপ্রবেশ ঘটছে। আবাব বেল। আবার! আবাব! এবার ঝাঁটা হাতে পুতুল ও সানকি হাতে পিকোলো উঁকি দিল। নিচে ধোপদুরস্ত দু'জন ভদ্রলোক, অভিযোগনিবত ভদ্রলোক। আমাদেরই নিচেব তলাব বাসিন্দাবা।

—"আমাদেব ঘরে আপনাদেব জল ঢুকছে। একটু যদি জলটা না সামলান, তবে—"

—"স্বচক্ষে দেখে যান জল সামলানো হচ্ছে কি হচ্ছে না—", ওপব থেকে উত্তব যায।

তাঁবা স্বচক্ষে দেখতেই আসছিলেন, কিন্তু অত্যুৎসাহী ঝর্ণা অতো না বুঝে আবেক ক্ষেপ জল ঝাডে—এবং নাযাগ্রাব মতো জলপ্রপাত হঠাৎ সিঁডি বেযে নেমে তাঁদেব হাঁটু অবধি সিক্ত কবে দেয। দোতলায সিঁডি বেয়ে জল নেমে একতলাব দবজাব তলা দিযে ওঁদেব ঘবে ঢুকছে। চৌকাঠ না থাকাব কুফল।

—"দবজাব নিচে দুটো বস্তা লাগিয়ে নিন!" এবাবে আমিই চেঁচাই—"সিঁডিব নিচে আছে।"

নিচেব ভদ্রলোকবা যথার্থই ভদ্র, এবং বুদ্ধিমান। মুহূর্তেই বুঝে নেন, এটা সংকটজনক মুহূর্ত—এবং সঙ্গে সঙ্গে রেসকিউ পার্টিতে যোগ দেন। অর্থাৎ দৌড়ে নিচে গিয়ে বৃষ্টিব মধ্যে উঠোনে বেবিযে রেনওয়াটাব পাইপটি পবিদর্শনে লেগে যান। উপুড হয়ে চিৎ হযে উঠোনে শুযে নানাভাবে নল খোঁচাখুঁচি করে তাঁদের ডায়াগানোসিস হলো—"নল তো জ্যাম। একেবাবে অনেকদূর পর্যন্ত। একেবারে কংক্রিট হয়ে গেছে—মিস্ত্রীবা ভেতবে সিমেণ্ট ফেলেছে নিশ্চয়ই—অতএব পাইপ ভর্তি হয়ে গিযে জলটা দোতলায় ঢুকছে।" এবার শুরু করলেন নলটি ভেঙে ফেলার ব্যর্থ

BanglaBook.org

প্রচেষ্টা। তাই দেখে আমার মনে পড়ে গেল—আরে। লোহাওয়ালা কোথায় গেল? সেই যে ট্যাংক ভাঙছিল? তার তো যন্ত্র আছে।

লোহাওয়ালা বকে বসে বিড়ি খাচ্ছিল। বেণীর সঙ্গে মাথা না হোক, মাথার সঙ্গে বেণী—ট্যাংকের সঙ্গে বেনওয়াটার পাইপও পাবে শুনে মহা উৎসাহে সে ছেনি-হাতুড়ি নিয়ে লেগে পড়ল, ঠঠাং, ঠঠাং, ঠঠাং...কিন্তু তার আগেই—যুবক পঞ্চুর বড়ের অবিরাম ধাক্কার কাছে পঞ্চাশ বছরের পুরনো বেনডটি আত্মসমর্পণ করল। আর কত সইবে? পঞ্চু সমানেই খুঁচিয়ে যাচ্ছে—তার দৃঢ় ধারণা এখানেই কিছু জমে আছে—তার খোঁচানোর চোটে মর্চে ধরা লোহার নলটি গর্ত হয়ে গেল, এবং দোতলার ওপর থেকে দুটো নল দিয়ে নোংরা জল কিছু ইট-পাটকেল-শনের নুড়োসমেত প্রবল ধারায় নিচে কর্মরত পরোপকারী ভদ্রলোক এবং লোহাওয়ালার মাথায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি ভয়ে কাঁটা। ছি ছিঃ—কী কাণ্ডটাই হয়ে গেল। কিন্তু মানুষের মন ভারি আশ্চর্য বস্তু—ভিজে যাওয়া মানুষগুলির কণ্ঠ দিয়ে যে উল্লাসধ্বনি নির্গত হলো—সেটা রবি শাস্ত্রীর ছক্কা মারার সময়েই মানায়। পঞ্চুকে দেখাচ্ছিলও রবি শাস্ত্রীর মতো।

জল ঢোকা বন্ধ। এবারে বিল্যাক্স করে আমরা অর্থাৎ দোতলার জলকর্মীবৃন্দ ঘরের জল, বারান্দার জল, সিঁড়ির জল, যাবতীয় জল সাফ-সুতরো করতে থাকি। আমার হাঁটুর কাছে কাপড় তোলা। হাতে নারকোল ঝাঁটা। একমনে ঘরের জল ঝাঁট দিচ্ছি। ওয়ারফুটিং থেকে এবারে গার্হস্থ্য পর্যায়ে নেমে এসেছে কর্মের জাতীয় চরিত্র। এবার শুনতে পাই পাগলা ঘন্টির সঙ্গে সঙ্গে শয্যাবন্দী মা চেঁচাচ্ছেন—"ওরে। ভাত পোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে যে?—ওপরে কি কেউ নেই?"

ঝর্ণা জিভ কেটে ছুটলো ওপরে। হঠাৎ আমার কানের কাছে—

—"দিদি!"

—"কে রেঃ—"। চমকে উঠি। দুটি ছেলে।

—"আমরা এসেছিলাম মধুকৈটভ থেকে—এবারে আমাদের পুজো সংখ্যাটা—"

—"আজ থাক, বুঝলেন? এখন খুব ব্যস্ত—"

—"যদি একটা প্রেমের কবিতা—এটা শুধুই প্রেমের কবিতার সংকলন—"

—"আজ থাক ভাই, আরেক দিন, কেমন? এখন ভাবতে পারছি না—দেখতেই তো পাচ্ছেন—"

—"ও-ঘরে জল ঢুকে গেছে বুঝি? কী করে ঢুকল?"

—"আরেক দিন সব বলব—রোববার সকালে আসবেন—।"

আপনমনে ঝাঁট দিতে থাকি। ছেলেদুটি চলে যায়। প্রেমের কবিতাই বটে।

—"দিদি!"

—"আবা-র?"

—"আমি শওকৎ। ঈদ মুবারক।"

BanglaBook.org

—"ওঃ"—

শওকতের পরনে ধবধবে নতুন পোশাক—হাতে একটা কাগজের বাক্স। খাবারদাবার আছে বলে মনে হয়। মিষ্টি? কাবাব? যাই থাকুক—এই কি তার সুযোগ্য সময়?

—"ঈদ মুবারক শওকৎ। স্যরি, আমি আজ একটু—"

—"এটা ধরুন দিদি—পিকো-টুমপার জন্য একটু পেস্ট্রি।"

—"কেমন করে ধরবো? হাতে তো ঝাঁটা। দেখছো না বাড়ির কী অবস্থা?"

দেখবে না কেন? কিন্তু শওকৎ বড় ভদ্র ছেলে। খানদানী পরিবার তাদের। সে এসব কেলেঙ্কারির মুহূর্তগুলি দেখেও দেখে না। যেন এটাই আমার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা—এই সিঁড়িতে জলপ্রপাত, এই হাতে ঝাড়ু নিয়ে, হাঁটু বের করে অতিথি আপ্যায়ণ। যেন কিছুই হয়নি। সবই যথাযথ আছে। ইংরেজী এবং লখনউয়ী ভদ্রতায় এখানে একটা মিল আছে।

হঠাৎ যেন বাতাসে গন্ধ পেয়ে দুই মেয়ে হঠাৎ উদয় হয়। হাঁটু অবধি গোটানো ভিজে জীনসে একজন, আর যত্রতত্র ভিজে ন্যাকড়ার মতো ফ্রকে আরেকজন। দু'জনেরই হাতে পুষ্পপাত্রের মতো ধরা দুটি সানকি। তাতে নোংরা জল। শওকতের হাতে বাক্স দেখেই লোভী টুমপা চকচকে চোখে প্রশ্ন করে, "কী গো? শওকৎ-মামা? বাক্সে কী আছে?"

শওকৎ যেন বেঁচে যায়। বাক্স বাড়িয়ে ধরে সে বলে—"কিছু না, সামান্য পেস্ট্রি। নে, তোরা খেয়ে ফ্যাল—"

অমনি ঘাড় কাৎ করে কোঁকড়াচুলভরা মাথাটা এগিয়ে আকাশ-পাতালব্যাপী একটি হাঁ করে টুমপা। "দাও।"

তার মুখে ফেলে দিতে হবে। এটা সম্ভব নয়। পিকো ভদ্রভাবে বলে—"ওই টেবিলে রাখো। ওটা শুকনো জায়গা। আমরা পরে নিচ্ছি। তুমি ওই চেয়ারটাতে বসতে পারো। ওটা বোধহয় শুকনো চেয়ার। আজ বাড়িতে যা কাণ্ড। বাপরে—

—"হামতুমম...এক কামরেমে বন্ধ হো"—নিচে উচ্চৈঃস্বরে গান গাইতে গাইতে চা-প্রীত চিত্তে দীপুর প্রবেশ। অবং আর্তনাদ। —"একী। সিঁড়িতে এত জল কেন? কানাই। কানাই। ন্যাতা আর বালতি নিয়ে আয়। এত জল এলই বা কোত্থেকে—" বলতে বলতে ওপরে এসে দীপুর চক্ষুস্থির।

"সর্বনাশ। বই? রেকর্ড? সব ভিজে গেল নাকি? স্টিরিওটা? টিভি? সব তুলে রেখেছো তো?"

—"গেছে। সব গেছে। তুই যা ফুটপাথের দোকানে গিয়ে চা খা ততক্ষণ। ঘরে যে জল ঢুকছে, খবরটাও তো দিবি? ছিলি তো এই ঘরেই।"

—"জা-জানলে তো দেব? আগে তো ঢুকছিল না। ঢুকল কখন? ইস। হেভি কেলো করে রেখেছো দেখছি?"

BanglaBook.org

—"আমি? আমি কেলো করেছি?"

—"না, না, মানে কেলো হয়ে রয়েছে।"

—"কেলোর তুই আর দেখলি কী?"

এখন ঝর্ণা, পুতুল ঘর মুছছে, কানাই সিঁড়ি মুছছে, ঐ জলেই ফিনাইল গুলে নেওয়া হয়েছে, সবাই হাসি হাসি মুখে—তত বেশি ক্ষতি হয়নি যতটা হতে পারতো। এটাই যদি রাত্রে হতো? যখন সবাই ঘুমিয়ে? পর্দা, তোয়ালে, ফ্রক, ইজের যা কিছু হাতের কাছে পাওয়া গেছে সবই তখন ব্যবহার করা হয়েছে ঘরের জল শুষে নেওয়ার মহৎ উদ্দেশ্যে। একমনে কানাই সিঁড়ি মুছছে যেটা দিয়ে, সেটা দীপুর পাজামা। দীপু দেখেও চিনতে পারলো না।

—"ওকি! ওকি! সর্বনাশ করেছে—", বলে সে লাফিয়ে পড়ে তুলে নিলো ভিজে চুপচপে একটা চার্মসের প্যাকেট। "ঈশশশ।" —বাসা থেকে খসে পড়া মৃত পক্ষিশাবকের মতো ব্যর্থ প্যাকেটটিকে আদর করে আবার ফেলে দেয়।

বৃষ্টি ধরে গেছে। লাজুক লাজুক একটু হলুদ রোদও উঠেছে। পুতুল বসে গেল ভিজে পুঁটলিগুলো নিয়ে। ঘরে ঘরে সর্বত্র মেলে দেওয়া হতে লাগলো ছেঁড়া, ভিজে, বাতিল কাপড়-চোপড়ের রাশি। মা চেঁচাচ্ছেন। "ওকি রে খাটের বাজুতে ভিজে কাপড় দিল কে? তুলে নে! তুলে নে। পার্লিশের আসবাবে জল ঠেকাতে নেই—" মা যদি জানতেন নিচের খাটটা কেমনভাবে জলসিক্ত হয়েছে আজ। —মেঝেয় বিছিয়ে দেওয়া হলো ভিজে বইয়ের রাশি। "পাখা খুলে দে।" পাখা ঘুরলো না। লোডশেডিং। ঈদ প্লাস বর্ষা। তবুও লোডশেডিং? ওঃহো। নিচে তো শওকৎ বসে আছে।

—"শওকৎকে চা মিষ্টি দে তো, পিকো।"

—"শওকৎমামাকে চা মিষ্টি দাও তো, ঝর্ণাদি।"

অরণ্যদেবের ঢাকরাদকদের মতো নির্দেশটি বিলে হয়ে গেল। কিন্তু আমিও অরণ্যদের নই, ঝর্ণাও নয় অরণ্যের অধিবাসী। সে সাফ সাফ বলে দেয়—

"আমি কাউকে চা মিষ্টি দিতে পারবুনি বাপু। অগ্রে আমাকে কাপড় ছাড়তে হবেনি? সর্বো অঙ্গ ন্যাতাজোবড়া? ভিজে ঢোল? চা দাও বল্লেই হলো?"

—"থাক থাক দিদি। আমার আজ চা খেতে ইচ্ছে নেই—আমি বরং যাই —পরে একদিন আসবো—" শওকৎ উঠে দাঁড়ায়। এই বাড়িতে এই মুহূর্তে সম্ভাব্য শওকৎ বড্ড বেশি বেমানান।

—এতক্ষণে মনের মতো ভূমিকা পেয়ে দীপু এগিয়ে আসে। "চলো, চলো, শওকৎ, আমরা বরং ধীরেনের দোকানে গিয়ে ঈদ স্পেশাল চা খেয়ে আসি—এ-বাড়ি থেকে এখন কাটিয়া পড়াই মঙ্গল—গুড লাক দিদি। ঈদ মুবারক।"

শওকৎও ভদ্রতা ভুলে হেসে ফেলে, পা বাড়ায়।

বারান্দায় ভিজে কার্পেট ঝুলছে। চতুর্দিকে ভিজে কাপড়। ঘরবাড়ি ঝকঝক

তকতক করছে। চুনবালি ঝুলকালি সব ধুয়েমুছে পরিষ্কার। আমরা সবাই পরিষ্কার শুকনো কাপড় পরে চুলটুল বেঁধে আদা-চা খেতে খেতে গল্প করছি। বিদ্যুৎ এসে গেছে। পাখা ঘুরছে। বই শুকোচ্ছে। তবু বুকের সেই ধড়ফড়ানিটা কমছে না কিছুতেই। এখনো বুকের মধ্যে হাতুড়ি, এমার্জেন্সি-কালোচিত উদ্বেগ। কিছুক্ষণ আগের ঘরের মধ্যে উচ্ছ্বসিত জলরাশিটার দৃশ্য ভুলতে পারছি না।

নিচে বেল বাজলো। পাটভাঙা পাজামায়, ফর্সা গেঞ্জিতে, টেরি-কেটে চুল আঁচড়ে, শ্রীমান কানাই দরজা খুলে দিল। গুন গুন গুন গাইতে গাইতে।

—"উফ কি বৃষ্টি। কি বিষ্টি। কাজকম্ম আজ কিছু হলো না।" বলতে বলতে ওপরে এসে পড়লেন দাদামণি। বৈঠকখানা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে দাদামণি বললেন —"কি রে? রথ সাজানো কমপ্লিট?"

শুকনো মেঝেয় থেবড়ে বসে টুমপা তখন রথের গা থেকে ভিজে কাগজ খুলছে, আর নতুন কাগজ কাঁচি আঠা নিয়ে পিকো বসে গেছে নতুন মালা-শেকল তৈরি করতে।

চারিদিকে তাকিয়ে দাদামণি উচ্ছ্বসিত—

—"বাঃ! এ যে ম্যাজিক রে! এই দেখে গেলুম ঝুলকালি চুনকালি, আর এর মধ্যেই যে দিব্যি ফেসলিফটিং হয়ে গেছে। পরিষ্কার ঝকঝকে মেঝে—সিঁড়ি থেকে ঘর পর্যন্ত যেন ধুয়ে মুছে রেখেছিস। এই তো চাই। কে বলে খুকু সংসারী হয়নি?" বলতে বলতে দাদামণি চেয়ারে মেলে রাখা দুটো ভিজে বাতিল ব্লাউজের ওপরে বসে পড়লেন।

BanglaBook.org

নাট্যারম্ভ

প্রথম অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য

"মা, এই যে, পুপসিকে দেখতে চেয়েছিলে? পুপসি, এই যে, আমার মা।"

একহাতে কালো হেলমেট, অন্য হাতে ডেনিম জ্যাকেট, কাঁধে ভারী ক্যামেরার ব্যাগ—সব সামলে পুপসি নিচু হয় ববির মাকে প্রণাম করতে। বন্দনা দু'পা পিছিয়ে যায়। "থাক থাক। হয়েছে।" পিছোবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু এটা তো ইচ্ছাকৃত পদক্ষেপ নয়। বন্দনা নিরুপায়। কোনোটাই স্বেচ্ছাকৃত পদক্ষেপ নয়। এই যে পুপসিকে দেখতে চাওয়া সেটাই কি আর স্বেচ্ছাকৃত? নেহাৎ না দেখলেই আর চলছিল না, তাই চাওয়া। বিশ্বসুদ্ধ প্রত্যেকে দেখেছে। আত্মীয়স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী, ববির

অফিসের কোলীগরা, কেউ বাকী নেই। পথেঘাটে, বেস্তরাঁয়, নন্দনে, অ্যাকাডেমিতে, মিটিঙে মিছিলে সর্বত্র দু'জনে জোড় বেঁধে পরিদৃশ্যমান। হরি তো হ, সমস্ত বন্দনাদেরই চেনা লোকেদের সামনে। একমাত্র বন্দনাই দেখেনি। রবিও না। তাই আজ নেমন্তন্ন করেছে। রবি বন্দনাকে জানিয়েছে এই মেয়েকেই সে জীবনসঙ্গিনী করতে চায়। আর তো না দেখে উপায় নেই। তাই ডাকা।

পুপসি নামটাও যেমন বিতিকিচ্ছিরি, অনেকটা পেপসি কোলার মতন, ওর ভাবভঙ্গিও ঠিক তেমনি। ছোট করে ছাঁটা প্রায় ছেলেদের মতন চুল, কালো টী শার্ট আর ব্লু জীন্স পরনে, পায়ে সুতী মোজার সঙ্গে কাদাটে ময়লামতন গোব্দা একজোড়া বিশ্রী ন্যাকড়ার জুতো। রবিরও আছে ঠিক ঐ জিনিস। দাম নাকি চারশো-পাঁচশো টাকা—কী যে দরকার অমন যাচ্ছেতাই চেহারার বস্তু অত দামে কেনবার তা বন্দনা বোঝে না। ঐ দামে চমৎকার চামড়ার জুতো হয়ে যায়। দু'খানা মোটরবাইকে চড়ে ভটভট শব্দে পাড়া কাঁপিয়ে রবি আর পুপসি প্রেম করে বেড়াচ্ছে। বন্দনা আর রবিরও তো বাপু প্রেম করেই বিয়ে? কই এমন হতচ্ছাড়া বেহায়াপনা তো ছিল না? চুপিচুপি, কেউ যাতে না দেখতে পায়, কাকপক্ষীতে না টেরটি পায়, এমনিভাবে লুকিয়ে চুরিয়ে দেখা করতো। তবেই না প্রেমের মজা? আর এরা? এদের প্রেমের দাপটে দেশসুদ্ধু লোক অস্থির। কেবল রবি কেন জানি না পুপসিকে এই তিন বছরে একবারও বাড়িতে আনেনি। ধরার ডেকে পাঠিয়েছেন বন্দনা।

বন্দনা পিছিয়ে গেল, পুপসিও আর ছেড়ে এল না, প্রণামের ভঙ্গি করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একগাল হাসল, যেন কী অপরূপ কীর্তিটাই না করেছে সে বন্দনার ছেলেটিকে হাত করে।

—"হয়েছে, হয়েছে। বোসো।" বলে বন্দনা সোফা দেখায়। ইতিমধ্যেই পুপসি ব্যাগ রেখে বন্দনাদের পেটমোটা মিনিবেডালটাকে কোলে তুলে নিয়েছে এবং অদ্ভুত সব ভাষাতে তার সঙ্গে বাক্যালাপ শুরু করেছে। মিনিও নেহাৎ বিশ্বাসঘাতিনীর মতো, আরামে গুরগুর শব্দ করছে।

—"কি রে? বোস। মা বসতে বলছে না?" আরেকবার ধাক্কা লাগে বন্দনার। রবি পুপসিকে 'তুই' বলল। তাদের সময়ে 'তুই' বলা মানেই 'বন্ধুত্ব' ছিল আর 'তুমি' মানেই 'সংশয়জনক' অবস্থা। তবে হ্যাঁ, পাড়ার দাদারা অনেক সময়ে তুই-তোকারি করলেও প্রণয়দৃষ্টিতে তাকাতো বটে। কিন্তু রবি তো দাদা নয়, সমবয়সী। বরং কদিনের ছোটই হবে। পুপসি ধপ করে বসে পড়ল। সুন্দর কাচের টেবিলে পেসের শোভাটা না দেখেই তার ওপরে ধ্যাবড়াবড় হেলমেটটা চাপিয়ে দিল। তারপর পাশের আসনটা থাবড়ে রবিকে বলল, "তুইও বোস?" বন্দনার আর অবাক হবার কিছু নেই। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে অবিশ্যি মেয়েটাকে খুব একটা খারাপ দেখতে নয়। একটা আলগা চটক আছে। বয়েসের একটা লাবণ্য তো থাকবেই। মোটা চশমার আড়ালে হলেও, চোখদুটি বেশ। ঝকঝকে, হাসিভরা। না, হাসিটা সত্যিই মিষ্টি। দাঁতও

বেশ সাজানো। রংটা যদিও চাপার দিকেই বলতে হবে (বন্দনা টকটকে ফরসা), নাকও খুব একটা টিকোলো নয়, তবে হাতের আঙুলগুলো লম্বা লম্বা আছে, নোখগুলো পরিষ্কার করে কাটা, রং মাখানো নয়। চশমার ওপর কোঁকড়াচুল ঝামরে পড়ছে, অর্থাৎ যতটুকুনি চুল আছে। ছেলেদের মতো করে ছাঁটা চুল বন্দনা দু'চক্ষে দেখতে পারে না। এইই ছিল তাদের কপালে? এই নাকি মুখুজ্যেবংশের বড় বউ? পরনে কালো স্কার্ট, আর রং-ওঠা ব্লু জীনসের পেন্টুলুন? অন্তত আজ একটা শাড়ি পরতে পারতো না? হাত শূন্য। কানে ফুটো নেই। মুখে রংটং নেই। ঠিক রবিও যেমন, এই মেয়েও তেমনি। ঘেমো, ক্লান্ত চেহারা। সারাদিন আপিস করে এসেছে। রাত ন'টার সময়ে। রবি স্নান করে ঘরে এল।

—"বাবা, পুপসি।" পুপসি আবার প্রণাম করতে উঠে দাঁড়ায়। নীচু হয়। রবি সরে যায় না। মাথায় হাত দেয়। "থাক থাক" বলে মুখে। রবির ঠোঁটে পাইপ, পরনে পাজামার ওপর কমল মিত্র টাইপের ড্রেসিং গাউন। পুপসি স্পষ্ট চোখে চেয়ে দ্যাখে। লম্বা, সুপুরুষ পুরুষ একজোড়াগোঁফ। এই রবির বাবা? রবি তো রোগা, বাতাসে ফিনফিন করছে। একমুখ দাড়িগোঁফ চুলটুল মিলিয়ে একশা। বড় বড় চোখ দু'খানাই শুধু দেখা যায়। রবি একটা সোফায় বসে পড়ে বলে, "বোসো। সো? হাউ ডিড ইওর ডে গো?" বলেই খুদে কীসব যন্তরপাতি বের করে পাইপটা খোঁচাখুঁচি শুরু করে রবি। ওটা ওর খুব সুবিধে। বন্দনা কী করবে? একটা বোনাও নেই ছাই হাতে, যা গরম। "আমি যাই বরং তোমাদের খাবার গরম করি, রাত হয়ে গেছে ফিরতে দেরি হয়ে যাবে তোমার।" বলে বন্দনা উঠে পড়ে।

"—এখুনি খাওয়া কী? এই তো এলাম?" চটপট বন্দনার ছেলের প্রেমিকার উত্তর॥

—"কোয়াইট রাইট! এখুনি খাওয়া কী? তোমার ভালো নাম কী পুপসি?" রবি বলে॥

—"কারুবাকী। কারুবাকী দাশগুপ্ত।"

—"বা। বা। বা। হুম।" আর কথা নেই। ঘর স্তব্ধ। পাখা ঘুরছে। আপনমনে মুখে পাইপ কোলের মিনির সঙ্গে বাক্যালাপ চালিয়ে যায় কারুবাকী দাশগুপ্ত। অবশেষে রবি বলে:

—"তোমার বাবা—"

"কেন টেলিফোনে। ন্যু জার্সিতে। আমার মা এখানে। পড়ান।"

—"বেশ। বেশ। বাঃ। তোমরা কত ভাইবোন?"

—"আমি একা।"

—"একা? ওনলি চাইলড? আই সী।" রবিকে কিঞ্চিৎ দুশ্চিন্তিত দেখায়। পাইপটা মুখে গুঁজতে চেষ্টা করে সে।

—"রবির চেয়ে বেশি স্পয়েল্ট নই।" ঘরে অ্যাটম বোমা ফেলার মতো বলে দেয় পুপসি, এক মনে বেড়াল আদর করতে করতে। "এ্যাই যে, পুসিমিনি,

তুই অবশ্য সবচেয়ে বেশি স্পয়েল্ট।" এবার বন্দনা এগোয়। "তা বটে। রবি খুব অলস।"

—"তোমরা তো পাম এভিনিউতে থাকো?"

বাজে প্রশ্ন। পুপসি উত্তর দেওয়ার দরকার মনে করে না।

—"রাত বাড়ছে, ওকে তো একা একা ফিরতে হবে অতটা রাস্তা? আমি খাবার দিয়ে দিচ্ছি। এ্যাতো দেরি করে এলি।" সঙ্গে সঙ্গে রবির চটপট উত্তর এল—

—"আগে এলেই বা কী হতো? বাবা তো এই এলেন।"

—"তুমি রান্নাবান্না জানো পুপসি?" টেবিল সাজাতে সাজাতে বন্দনা জিজ্ঞেস করে।

—"ঐ একটু আধটু—কাজ চালানোর মতো। আমি হেলপ করবো?" তিড়িং করে উঠে পড়ে পুপসি। "আমি টেবিলটা সেট করে দিচ্ছি। তুমি খাবারটা গরম করো। রবি, এদিকে আয় তো?" তুমি! এই তো প্রথম দেখা। এখনি তুমি? কী গায়ে পড়া মেয়ে রে বাবা, ভাগ্যিস তিন বছর ধরে এ বাড়িতে তেড়ে আসেনি।

টেবিল বেশ পাকা হাতেই সাজিয়ে ফেলল। দিব্যি গল্প করে আড্ডা মেরে হাসি ঠাট্টা করে খেল, যেন কত জন্মের চেনা। এসব মেয়েরা আশ্চর্য বেহায়া। জানে তো "এরাই আমার শ্বশুর শাশুড়ী হবেন" একটা লজ্জা সংকোচ ভয় নেই।

খাওয়াটা খুবই কম। ঐ আচারটাই যা চেয়ে নিয়ে খেল, আর আলুভাজাটা। মাছটা খেয়ে জিজ্ঞেস করলো— "মাছটা বুঝি সর্ষে, নারকোলের দুধ দিয়ে করেছো?"

রবির সঙ্গে খুব জমে গেছে পলিটিক্স নিয়ে আলোচনা। রবির হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে গলে গেছে। অথচ প্যান্ট পরা, গেঞ্জী গায়ে, হেলমেট হাতে, নোংরা ন্যাকড়ার জুতো পায়ে, ছেলেদের মতো মুড়িয়ে চুলকাটা মেয়েকে মুখুজ্যেবাড়ির বড় বউ করতে রবিরই ঘোর অমত ছিল। থাকাটাই স্বাভাবিক। কি জানি, এই ব্যবহারটা ও মন থেকে করছে, না ভদ্রতা করছে। বন্দনা অতশত বোঝে না। কোম্পানির অফিসারদের নানারকম কৃত্রিম ভব্যতার অভ্যেস থাকে। বন্দনার ওসব ধাতে নেই। ওর মন যা চায় না ও তা কিছুতেই করতে পারে না। হঠাৎ খাবার টেবিলে যেন যুদ্ধ বেধে গেল। প্রচণ্ড তর্ক লেগে গেছে বুশ আর সাদ্দামকে নিয়ে। রবি একদিকে। পুপসি আরেক দিকে। রবি বাবার মুখের ওপর কথা বলে না। রবি চুপ। পুপসি মুখে মুখে তর্ক করছে—রবি একদম তর্ক সহ্য করতে পারে না। বন্দনা থামাতে চেষ্টা করবে কি? বন্দনার ভয় করছে। ফের হঠাৎই তর্কটা শেষ হয়ে গেল। যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল। আবার হাসিঠাট্টা। গল্প। যাক। বাঁচা গেছে। এখন মেয়েটা বাড়ি গেলেই তো হয়। রাত এগারোটা বাজে। রবি নিশ্চয়ই বলবে —"পৌঁছে দিয়ে আসি।" অর্থাৎ ফিরতে সেই রাত বারোটা। কিন্তু না, মেয়েটা

বাজী হলো না ববিকে সঙ্গে নিতে। বলল, —"কিস্যু ভাবনা করিস না। হুশ করে চলে যাবো। পৌঁছে ফোন করে দেবো।" তা, হুশ করেই গেছেন তিনি। পনেরো মিনিট যেতে না যেতে ফোন এসে গেল। রাত্রে শুয়ে ববি বলল, "না, মেয়েটা বেশ ব্রাইট আছে।" বন্দনা বলল "একটু-আধটু রান্নাও জানে, মাছটা খেয়ে বলতে পারলে, কী মশলায় রাঁধা।"

প্রথম অঙ্ক : দ্বিতীয় দৃশ্য

শমিতা বেল বাজালো। বন্দনা খুলল।

—"নমস্কার। আমি কারুবাকীর মা—শমিতা দাশগুপ্ত।"

—"আমি বন্দনা মুখার্জী। আসুন, ভিতরে আসুন।" আঙুলে গাড়ির চাবি, চটি ঘষতে ঘষতে শমিতা ঢুকল। বন্দনা নিজের বাড়িতে ওর চেয়ে ঢের বেশি পরিচ্ছন্নভাবে গুছিয়ে একটা সিল্কের শাড়ি পরে আছে। শমিতার পরনে একটা চটকানো ডুরে শাড়ি। খোঁপাটা একপাশে খানিকটা খুলে ঝুলছে। চোখে চশমা। ঘেমোকপালে একটা বড় কুমকুমের টিপ। গয়নাগাঁটির বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই, হাতে কানে গলায় যেখানে যা থাকার। কাঁধে দুটো প্রকাণ্ড থলি। একটা বোধহয় এককালে বেশ দামী ভ্যানিটি ব্যাগই ছিল, এখন চামড়ার বস্তার মতন দেখাচ্ছে। অন্যটা বস্তাই। চটের ঝোলাভর্তি কাগজপত্র। ঢুকেই একগাল হাসল শমিতা। মেয়ের মতো, মায়েরও দেখি বেশ বিনা কারণে হাসার অভ্যেস। রবিকে ডাকে বন্দনা। পাঞ্জাবি পাজামা পরা, ভদ্র, স্নান-করা ববি বেরিয়ে আসে। "নমস্কার, নমস্কার। বসুন?" বোঝা গেল, মাকে দেখে ববিও আশ্বস্ত। তবু ভালো। মেয়ের মতন চুলছাটা প্যান্টপরা নয়। বলা যায় না। ডিভোর্সির বউ বলে কথা। অনেককাল নাকি বিলেতে ছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে মাস্টারি করে, আবার কবিতা লেখে। প্রেমে পড়বি তো পড় ববি এমনই মেয়েকে পাকড়ালো, যার সবরকমের 'দোষ' আছে। একে তো অসবর্ণ বিয়ে, বদ্যির সঙ্গে বিয়ে এ-বংশে আগে হয়নি। মেয়ের ইঞ্জিনিয়ার বাপের আবার দুটো বিয়ে। ছাত্রাবস্থায় প্রথম বউ নাকি জার্মান মেয়ে ছিল। ডিভোর্সের পর এই বিয়ে। মেয়ের দিদিমারও নাকি দুটো বিয়ে। তারা আবার ব্রাহ্ম। বালবিধবার বউয়ের শ্বশুরই নাকি বিয়ে দিয়েছিল দ্বিতীয়বার। সে বালবিধবাই হোক, আর যাই হোক, বিয়েটা তো হয়েছে দু'বারই। আত্মীয়স্বজন তো ছেড়ে কথা কইবে না। মেয়ের মা কেমন হবে, মনে মনে বেশ উদ্বেগই ছিল। তা, ভয়ের কিছু আছে বলে দেখে তো মনে হচ্ছে না। দেখতে শুনতে স্বাভাবিকই, কেবল একটু খ্যাপাটে আছে বোধহয়। জীবনে প্রথমবার আলাপ করতে আসছে হবু বেয়াইবাড়িতে। কবি বলেই কি এমন আলুথালু হয়ে আসতে হয়। বেয়াইবাড়িতে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে আসবে তো?

—"এই নিন। মাছের কচুরি। আপনারা মাছের কচুরি খান তো?" বস্তা থেকে

একটা টিফিন বাক্স বের করল শমিতা। বন্দনাকে দিল। রবি বলল, "হুইস্কি, রাম, কিছু চলবে? বীয়ার?"

—"নাঃ। ওসব ভালো লাগে না। থ্যাংক ইউ। শরবৎ হবে এক গেলাস? বাপ রেঃ যা গরম!" —"নিশ্চয়ই!" বন্দনা উঠে গেল শরবৎ করতে।

—"তা, বলুন এবারে—আপনারা কিছু ভাবলেন?" শমিতার সোজাসুজি প্রশ্নের উত্তরে রবি ভুরু কুঁচকোলো।

—"আমরা? আমরা আবার ভাববো কী? আপনিই তো মেয়ের মা। আমরা তো আশা করছিলুম আপনিই যোগাযোগ করবেন। তাই তো করবার কথা।"

—"কথা আবার কী?" শমিতা চোখ পাকায়। —"এটা কি সম্বন্ধ করে বিয়ে হচ্ছে, যে 'ছেলের-বাড়ি—মেয়ের-বাড়ি' এসব থাকবে? দেখুন ভাই, সম্বন্ধ করলে আমি কিন্তু কখনোই আপনার ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ করতুম না। অতটুকুনি ছেলে। যতই সে ব্রিলিয়াণ্ট হোক, সবেমাত্র কাঁচা চাকরিতে ঢুকেছে, শরীরস্বাস্থ্য এতো তালপাতার সেপাই—মেয়ের চেয়ে পুরো সতেরো দিনের ছোটো। সম্বন্ধ করে এমন কচি পাত্র কেউ যোগাড় করে? আরেকটু বয়স্ক, আরেকটু পাকা চাকরিতে এস্ট্যাব্লিশড পাত্র খোঁজে লোকে। শক্তপোক্ত, পরিণত তাই না? যদিও এই ছেলেটাকে আমরা ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছি, ওর গুণের শেষ নেই, তবু ওকে ঠিক 'পাত্র' 'পাত্র' মনে হয় না। আর সম্বন্ধ করলে আপনিও নিশ্চয় ঘটক লাগিয়ে আমার মেয়েটিকে খুঁজে বের করতেন না ঘরের বউ করবার জন্যে। একে তো আপনার ছেলের সমানবয়সী, তায় ছেলেদের মতন ভাবভাব। চুলছাঁটা, প্যাণ্ট পরা, দিন নেই রাত নেই মোটর সাইকেলে গাঁক গাঁক করে শহর চষে ফেলছে। চাকরিটাও এমনই, যে রিপোর্টিং করতে আজ এখানে কাল ওখানে যত্রতত্র ছুটতে হয়। তায় আমরা বদ্যি, আপনারা ব্রাহ্মণ। আমার মায়ের আবার বিধবা-বিয়ে হয়েছিল। ওর বাবারও একটা ডিভোর্স হয়েছিল—বাঙালীসমাজে এমনটি তো খুব লোভনীয় সম্বন্ধ নয়? বলুন? সম্বন্ধ করলে আপনিও আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতেন না, আমিও আপনার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতুম না। এতে সন্দেহ নেই। তবে সম্বন্ধটা তো পাত্রপাত্রীই করেছে। সো লেট আস মেক দ্য বেস্ট অফ আ ব্যাড সিচুয়েশন—কী বলো ভাই বন্দনা? তুমিই বলছি, আমি বয়েসে বড়ই হবো।" বন্দনা আবার বলবে কী? দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে রবির সঙ্গে গলা মিলিয়ে হেসে ফেলেছে সেও।

—"অ্যাবসলিউটলি।" রবি বলে হাসতে হাসতে, "উই হ্যাভ নো চয়েস। আফটার অল, উই আর ইন দ্য সেম বোট, সিসটার। আমাদের ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ যখন এক, আমাদের স্বার্থও তখন অভিন্ন।"

—"আসুন, তবে দিনটা ঠিক করে ফেলি। কবে, কোথায়, কীভাবে আশীর্বাদ হবে। আশীর্বাদ-কাম-এনগেজমেণ্ট। ওদের প্লাস আমাদের বাগদান।"

রবির মুখ গম্ভীর হয়। সে ধীরে ধীরে বলে:

BanglaBook.org

—"দেখুন, আমি কিন্তু আমার ঠাকুরদাকে ডাকতে চাই। সোজা কথা।"

—"তা ডাকুন না। ডাকবেন বইকি? এ আর"—

—"ঠাকুরদাকে?" শমিতাকে থামিয়ে দেয় বন্দনা। "তোমার ঠাকুরদাকে? রবির আশীর্বাদ? তিনি তো করেই—রবির জন্মের আগেই" —কথা শেষ না করে রবির দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে বন্দনা। শমিতা হঠাৎ হেসে ওঠে।

—"ওহো, বুঝেছি বুঝেছি, নান্দীমুখ, বৃদ্ধি, এইসব বিচ্যুয়ালসের কথা বলছেন তো? পূর্বপুরুষদের আহ্বান, হেন তেন? দূর! ওসব আবার আশীর্বাদে কী? ও তো বিয়ের সময়ে হয়। স্বর্গত গুরুজনদের জন্য এখানে কোনো স্লট নেই। ডাকলেও তিনি আসবেন না।"

সামান্য ঘাবড়ালেও রবি মচকায় না।

—"আমাদের কিন্তু হিন্দুবিবাহ চাই। আপনারা নাকি ব্রাহ্ম?"

—"আমার মা বাবা ব্রাহ্ম ছিলেন—আমরা ব্রাহ্ম নই। কিন্তু হিন্দু রিলিজিয়াস বিচ্যুয়ালসে বিশ্বাসীও নই। রেজিস্ট্রি বিয়ের পক্ষপাতী আমরা।"

"রেজিস্ট্রি তো করতে হবেই। কিন্তু হিন্দুবিবাহ না হলে বিয়ে হবে না। এই বলে দিলাম।" শমিতা ওতে দমে না।

—"আমাকে বলে কী হবে? আমার তো বিয়ে হচ্ছে না, যাদের বিয়ে, তাদের বলবেন। আপনার ছেলেকে বলুন, বউকে বলুন। আপনি দয়া করে শুধু অত হিন্দু-হিন্দু করে চেঁচাবেন না! এক্ষুনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের লোকজন চলে আসবে—এখন দিনকাল ভালো নয়—সাবধানে কথাবার্তা বলতে হয়।"

—"তা আশীর্বাদের দিন ঠিক করার কী হলো?" বন্দনা খেই ধরিয়ে দেয়।

—"দিন ঠিক হয়ে যাবে। আগে নীতিটা ঠিক করে নিচ্ছি।" রবি উত্তর দেয়।

—"নীতি?" শমিতা হেসে ওঠে ঝরঝরিয়ে।

—"এসব বিষয়ে আমার কোনোই নির্ধারিত নীতি নেই। এসব হচ্ছে ব্যক্তিগত নীতির ব্যাপার। যারা বিয়ে করবে তারা বুঝবে। বিয়ে না করলেও আমার কোনো আপত্তি নেই।" শমিতা মহানন্দে জানায়। "দিল্লি-বম্বেতে আজকাল ছেলেমেয়েরা আকছার বিয়ে না করে লিভ টুগেদার করছে। বিয়ে-থা হয়ত পরে করে। কলকাতাতে ওসব চলে না অবশ্য, লোকে ছ্যা ছ্যা করবে। আমি ওটা নিয়ে মাথা ঘামাই না —ইটস দেয়ার লাইফ, দে শুড ডিসাইড হাউ টু লিভ ইট।"

বন্দনা শিউরে ওঠে। ও বাবা, মেয়ের কবি মা কী ভীষণ ভীষণ সব কথাবার্তা বলছে। দেখলে মনে হয় নিরীহ। বন্দনার আর রবির খুবই আপত্তি আছে এইসব দুর্নীতিতে। লিভ টুগেদার আবার কী? ছিঃ। যতসব অসভ্যতা। বিলেত থেকে আমদানি করা বেহায়াপনা। আর শমিতারও বলিহারি যাই। তুই মা হোস, কোথায় সুবুদ্ধি দিবি, তা না—লজ্জা করল না এসব কথা বলতে? বন্দনা বিষয়টা পালটাতে তাড়াতাড়ি বলে, "আমরা কি তাহলে নতুন বছরের পাঁজি নিয়ে শনিবার সন্দেবেলা আপনাদের

BanglaBook.org

বাড়ি যাবো? আশীর্বাদের দিনটা স্থির করে ফেলতে? কালই ঠাকুরমশাইকে খবর দিচ্ছি।"

—"ঠাকুরমশাই? আশীর্বাদেও আবার পুরুত লাগে নাকি? আমাদের তো লাগেনি? শুধু গুরুজনেরা ছিলেন।"

—"আমাদের লেগেছিল। তাছাড়া কাদের বাড়িতে আগে হবে? ছেলের না মেয়ের?"

—"দু' বাড়িতে দুবার করে কী হবে? একসঙ্গে সেরে দিলেই হয়। ছেলেমেয়ের দু'বাড়ি থেকে একই লোকেরা তো আশীর্বাদ করবেন পাত্রপাত্রীকে। দু'বার করে নেমন্তন্ন খাইয়ে কী হবে? দু'বার ঝামেলা। দু'বার ধরে সময় নষ্ট।"

—"বাঃ! এটা দারুণ সাজেস্ট করেছেন তো মিসেস দাশগুপ্ত? বেশ একটা নিউট্রাল জায়গা ঠিক করে ফেলা যাক—কতো তো বিয়েবাড়ি ভাড়া দেয়—"

—"ঠিক আছে, সেটা আমি ব্যবস্থা করবো" শমিতা বলে—"লোক তো কম করেও শ' দেড়েক হবেই, দু'বাড়ির যখন?"

—"কেটারার আমি পাঠিয়ে দেবো"— হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠে রবি বলে। "সেদিন আমার শালার বাড়িতে দারুণ রেঁধেছিল—" হঠাৎ উৎসবের হলুদ আলোটা ঝলসে ওঠে ঘরের বাতাসে।

—"আশীর্বাদে ছেলে পাজামা পরলে হবে না, ধুতি পাঞ্জাবি পরা চাই। আজকাল দেখছি খুব পাজামার চল হয়েছে বিয়েবাড়িতে।"

—"পাজামা-পরা বের করে দেবো না?" রবি বলে। "বলে দেখুক না? ধুতি আমি নিজে হাতে পরিয়ে দেবো, বেল্ট লাগিয়ে দিলেই হবে। হুঃ, পাজামা পরবে!"

বন্দনা শমিতার দিকে চেয়ে হাসে, ইঙ্গিতে রবিকে দেখিয়ে বলে,—

—"বাগী আছে। ছেলে বাবাকে খুব ভয় পায়—যা বলবার সব আমাকে বলে। আপনার মেয়ের কথাও বাবাকে বলেনি, আমাকে।" শমিতা কলকল করে ওঠে।

—"আমার মেয়েও বাগী আছে। আমি খুব ভয় পাই। তুমিও কিন্তু সামলে চোলো বাপু। আজকাল তো বউদেরই দিন। আমাদেরই হয়েছে মুশকিল। শাশুড়িকেও ভয় পেয়েছি, আবার বউকেও ভয় পেতে হবে। আমরা মাঝের জেনারেশন তো চেপ্টে গেছি।"

—"ঈঈঈকা।" বন্দনা বলে। "বউকে আমি ভয় পাই নাকি? দেখবেন ওকে ঠিক বারণ করে দেবো, আশীর্বাদের দিন জীনস পরলে চলবে না। হুঁ। ঐটুকু তো মেয়ে।"

—"ঐটুকু মানে? ধানী লংকা। আজকালকার সবগুলো বাচ্চা ধানী লংকা।"

—"এরা তো বড়ো হয়ে গেছে। বাচ্চা নেই, ধানী লংকাও নেই, পাহাড়ী লংকা হয়ে গেছে। সিমলাই মির্চ। ঝাল নেই, কেবল গন্ধ আছে।" রবি হা হা হাসে।

—"সে হলুম আমরা। ওরা অন্য বস্তু। বন্দনা, ভালো চাও তো সামলে খেয়ো।

BanglaBook.org

যা বুঝছি, তুমি নেহাৎ ভালোমানুষ।"

—"আশীর্বাদের দিন ওদের কিন্তু অফিস গেলে চলবে না। ছুটি নিতে বলে দিতে হবে।" বন্দনা আবার বলে। শমিতা মীমাংসা করে দেয়:

—"রবিবার, গোধূলি লগ্নে আশীর্বাদ করলেই তো হয়। সামনে ইলেকশন। ওরা দু'জনেই খবরের কাগজে কাজ করে, ছুটি কি পাবে? রবিবার খুব ভালো দিন—শনিবার বিকেল আরো ভালো দিন— আর সমস্ত গোধূলি লগ্নই সুলগ্ন। তখন ঐ কনে-দেখা আলোটা ফুটে ওঠে—ঐ সময়টা আশীর্বাদের পক্ষে আইডিয়াল লগ্ন—"

—"না না ওভাবে হয় না। পাঁজি চাই পাঁজি।" রবি শমিতার উচ্ছ্বাসে ছিপি এঁটে দেয়। "শনিবার সন্ধ্যায় আসছি পাঁজি নিয়ে। দু'দিন সবুর করুন। এভরিথিং উইল বি সেটলড। নতুন বছর তো পড়েনি, পাঁজি কেনা হয়নি এখনও।"

দ্বিতীয় অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য

মেয়ের বিয়ে বলে কথা। দুগগা দুগগা বলে শমিতা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। শিবুকে পাঠিয়ে একটা বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত হাফ পঞ্জিকাও কিনিয়ে ফেলেছে সাড়ে সাত টাকা দিয়ে। কিন্তু কিনে এনে দেখেছে সেটি বিশুদ্ধ গ্রীক। সিদ্ধান্ত নেবে কী আদ্যোপান্ত কিছুই বুঝতে পারছে না। সবই সাংকেতিক 'ব্রাডশ' বা প্লেনের এবিসি গাইডের মতো। পড়তে জানা চাই। পি এইচ ডি করার সময়ে শমিতাকে পাঁজি পড়তে শেখানো হয়নি। শনিবার সন্ধেবেলায় বন্দনা এসে শমিতাকে তার টিফিনবাক্স ফেরৎ দিল।

—"এটা ফেলে এসেছিলেন। এতে কিছু প্যাটিস আছে" গুছিয়ে বসে, এদিক ওদিক তাকিয়ে, রবি বলল:

—"আ স্মল প্রবলেম। পাঁজিতে দেয়ার্স নো স্পেশাল মেনশন অফ আশীর্বাদ এনিহোয়্যার। গৃহপ্রবেশ, সীমন্তোন্নয়ন, কুষ্মাণ্ডভক্ষণ, গর্ভাধান, অলাবুভক্ষণ নিষিদ্ধ, সমস্তই ডিটেল আছে। আশীর্বাদ নেই। না থাক, আপনাকে দুটো চয়েস দিতে পারি — নাট্যারম্ভ? না বীজবপন?"

—"মানে?" দু'হাতে প্যাটিসের বাক্স, শমিতা বোকার মতো চেয়ে থাকে।

—"মানে আশীর্বাদই বলুন এনগেজমেন্টই বলুন এটা তো জীবননাটকের শুরু? এই অকেশনের সবচেয়ে কাছাকাছি যায় যেসব অকেশন তার মধ্যে 'নাট্যারম্ভ' একটা আর 'বীজবপন' একটা। কোনটা নেবেন? সিম্বলিকালি দুটোই চলবে।"

—"বীজবপনটা একটু আর্লি হয়ে যাবে না?" শমিতা একটু চিন্তা করে বলে। "তার চেয়ে নাট্যারম্ভই—" বন্দনা গম্ভীরমুখে শুনছে। রবি পাঁজি উলটোচ্ছে। এবার প্রশ্ন করে:

—"বেশ, নাট্যারম্ভ। নেক্সট, অমৃতযোগ, না সোনায় সোহাগা?"

BanglaBook.org

—"সোনায় সোহাগা আবার কী?"

—"ঐ যে ঐরকম শুনতে একটা ডাবলব্যারেলড শুভযোগ—অমৃতযোগ, আর, আর, আ, এই যে—মণিকাঞ্চন যোগ? কোনটা চান? নাকি দুটোই নেবেন?"

—"দুটো একসঙ্গেও আছে?" বন্দনা সোৎসাহে প্রশ্ন করে। শমিতাও স্বাদ পেয়ে গেছে মজাটার।

—"দুটো যদি পাওয়া যায় তো দুটোই থাকুক না?" লোভীর মতো বলে শমিতা। "ক্ষতি কী?" দিন স্থির হয়ে গেল। সুন্দর একটি রবিবার। 'নাট্যারম্ভ' আছে, বিকেলবেলায় 'অমৃতযোগ'ও আছে, আবার মণিকাঞ্চনও আছে। শমিতা আর বন্দনা এবারে নিমন্ত্রণের তালিকা প্রস্তুত করবে। আর কেটারারের খাদ্যতালিকা। রবি দেখবে ঘরভাড়া ডেকরেটর আলো ইত্যাদি। খরচ সব আধাআধি। চমৎকার।

পরদিন সকালেই ফোন। রবি। উদ্বিগ্ন।

—"মিসেস দাশগুপ্ত? স্যরি। হবে না।"

—"হবে না মানে?"

—"ঐদিন আশীর্বাদ হবে না।"

—"হবে না। কেন হবে না?"

—"এই ধরুন, বন্দনা বলবে?"

—"শমিতাদি? ঠাকুরমশাই বললেন ঐদিন আশীর্বাদের লগ্ন নেই।"

—"তবে যে তোমরা বললে আশীর্বাদের লগ্ন বলে কিছু হয় না?"

—"ভুল বলেছি। হয়, অনাত্মকে লেখা থাকে। আমরা পড়তে পারিনি। ঠাকুরমশাই চার-পাঁচটা দিন দিয়েছেন। বেছে নিন।"

—"নাট্যারম্ভ চলবে না?"

—"নাঃ।"

—"অমৃতযোগ? মণিকাঞ্চন যোগ?"

—"ঐ সমস্ত আছে। আটাশ, উনত্রিশ, দোসরা, পাঁচুই—"

—"ফোনে এসব হয় না। তোমরা কাল চলে এসো।"

—"বেশ। কাল হবে না। ও ট্যুরে যাচ্ছে। পরের বেস্পতিবার।"

দ্বিতীয় অঙ্ক : দ্বিতীয় দৃশ্য

শমিতা এবার নিউ জার্সিতে ফোন করল। পুপসির বাবার মতটাও জানা দরকার। তাঁকে তো আসতে হবে আশীর্বাদ করতে।

পুপসির বাবা এসব ঠাকুরমশাই-টশাই শুনলে ক্ষেপে ভূত হয়ে যাবেন। হাফ সাহেব মানুষ। বৈজ্ঞানিক। প্রায় চল্লিশ বছর পশ্চিমে আছেন। পুপসির প্রণয়ীর সঙ্গে তাঁর অবশ্য আলাপ পরিচয় হয়েছে।

BanglaBook.org

শমিতা ব্যাখ্যা করল যথাসাধ্য বেখেঢেকে, কেন আশীর্বাদের লগ্নটা ঠিক হয়নি। ওইটেই বাকী। ওদিক থেকে পুপসির বাবার গলায় উদ্দীপনা:

—"লগ্ন? নো প্রবলেম। আমি ঠিক করে দিচ্ছি।"

—"তুমি? তুমি লগ্ন ঠিক করবে? তোমার কাছে পাঁজি থাকে? যা তা কথা বোলো না।"

—"আমার ডায়েরিতে phases of the moon আছে— বুঝলে? তাতে পূর্ণিমা থাকে— পূর্ণিমা মানেই শুভলগ্ন," কিছুক্ষণ স্তব্ধতা, তারপর—সোৎসাহে—"এই তো আটাশে, মঙ্গলবার full moon —ঐদিনই লাগিয়ে দাও—অবশ্য ওটা ব্লু মুন নয় —বেশ তো বৈশাখী পূর্ণিমা—কী এটা তো বৈশাখ মাসই? মে মাসে পঁচিশে বৈশাখ হয় না?" —শমিতাও নেচে ওঠে

—"বৈশাখী পূর্ণিমা? গ্রান্ড। তার মানে ওটা বুদ্ধপূর্ণিমা। ছুটির দিন। রবিবারের মতই হলো। দ্যাখো ওদের ঠাকুরমশাই মানেন কি না?"

—"মানবে না মানে? খুব মানবে? আমি ফ্লাইট বুক করেছি। ওদের বলে দাও। আটাশে, আগামী বৈশাখী বুদ্ধপূর্ণিমার শুভলগ্নেই আশীর্বাদ। ন অন্যথা।"

বন্দনা শুনে বললে, "আটাশে? হ্যাঁ, আটাশেও আছে। ঠাকুরমশাইও তো আটাশে বলেছিলেন।" রবি বললে— "ওয়ান্ডারফুল! লাইফ ইজ সো সিম্পল।"

শমিতা বললে, "দ্যাখো তো বন্দনা, ঐদিন 'নাট্যারম্ভ' আছে কিনা? ওটা আমার বড্ড পছন্দ হয়েছিল—" পাঁজিতে দেখা গেল সত্যি সত্যিই সেদিন নাট্যারম্ভও রয়েছে। আর কি? বেজে উঠল কাড়ানাকাড়া।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় অঙ্ক : তৃতীয় দৃশ্য

বুকে বল নিয়ে বন্দনা বলে ফেলল, "পুপসি, তোমাকে কিন্তু কান ফুটো করতে হবে। আমি তোমাকে যে-সব গয়না দিয়ে আশীর্বাদ করব, তাতে আমার শাশুড়ির একটা ঝুমকো আছে— ফুটো না হলে পরবে কী করে?" "কেন?" পুপসি বলল, "ওতে ক্লাসপ এঁটে নেব।" বন্দনা অটল—"সোনার জিনিস ওভাবে পরা চলবে না। কোথায় টুক করে খসে পড়ে যাবে। ওটা আমার শাশুড়ির গয়না। কানে ফুটো করতে হবে। বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ।"

কানে ফুটো? যত পৈশাচিক, বর্বর কাণ্ডকারখানা। গয়না কে পরতে চায়? না। করবে না পুপসি কানে ফুটো। তাতে আশীর্বাদ না হয়, না হবে।

—"ওমা সে কি? এত ভয় পেলে হয়?" শমিতা বলে ফ্যালে। "একটুও লাগবে না, দেখিস। আমার ছাত্রী অনুরাধার একটা gun আছে, কানে যন্ত্র দিয়ে ফুটো করে গয়না সেঁটে দেয়, staple করার method, কানে লাগেও না, কান পাকেও না। ভয়ের কিছু নেই।"

—"ভয় পাচ্ছি কে বললে? নৈতিকভাবে আপত্তি আছে। বিশ্রী বার্বারিক প্র্যাকটিস।"

—"নীতিটা বড়বড় ব্যাপারের জন্য তুলে রাখ বরং। কানের ফুটো নিয়ে নীতির লড়াই করতে হবে না। শ্বশুরবাড়ি বলে কথা। ছোট ছোট ব্যাপারগুলো মেনে নিতে হয়। বড় ব্যাপারে নীতির প্রশ্ন উঠলে, তখন আপত্তি কোর। এটা অতি তুচ্ছ ব্যাপার। এটা মেনে নাও।"

—"তারপর, কানে পাঁচড়া হবে। দগদগে ঘা হয়ে রস গড়াবে, আশীর্বাদের দিনে নকল টেপা-দুলও পরাতে পারবে না, তখন বুঝবে মজা।" মেয়ে বলে।

—"সে দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। ঘা হবে না। হলেও সারিয়ে দেব। চল, এক্ষুনি চল। ছ' হপ্তা লাগে কান সারতে। টায়টোয় ছ' হপ্তা পেয়ে যাবে। প্লীজ এটা নিয়ে ঝামেলা কোর না।" কানের কানপাশা stapled হয়ে গেল মুহূর্তেই। আশীর্বাদের জন্য প্রথম প্রস্তুতি। বন্দনাকে ফোনে জানাল শমিতা। "হয়েছে। কানে ফুটো।"

—"বাঃ। তবে কেন বলছিলে মেয়ে রাগী? ভয় পেতে হবে? মেয়ে তো লক্ষ্মী।"

—"হ্যাঁ, লক্ষ্মী বটে। বেরুবে, গুণপনা সবই দেখবে। লোক ভালোই, কিন্তু লক্ষ্মী নয়।"

বন্দনা এসে পড়ল, মেয়ে নিয়ে শাড়ি কিনতে যাবে। দিব্যি লক্ষ্মী মেয়ের মতোই একবেলা একটু তাড়াতাড়ি ফিরল পুপসি। শমিতা অবাক।

—"বাঃ। শাশুড়ির জন্যে তো দিব্যি তাড়াতাড়ি ফেরা হয়। মা বললে রাত বারোটার আগে ছুটি মেলে না। পুজোর কাপড় জীবনে কিনতে যাও না।"

—"কী? হিংসে হচ্ছে? ছি মা। হিংসে করে না। তুমিই তো বললে এসব তুচ্ছ ব্যাপারে নীতির লড়াই করতে হয় না। শাড়ি কেনা অতি তুচ্ছ ব্যাপার।"

বেশ গোটাকতক শাড়ি কিনল বন্দনা। শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজপিসও আছে, জামা করতে দেওয়া হল। পুপসিও দিব্যি বিনাবাক্যব্যয়ে নিজের দর্জিকে গিয়ে হাতাওয়ালা ব্লাউজের মাপ দিয়ে এল। এবার জুতো। জমকালো একখানা বেনারসী শাড়ি হয়েছে। তার জন্যে জরির চটি চাই। ম্যাচিং হতে হবে তো? কিন্তু মেয়ে যাবেই বাটা-তে। নর্থস্টার কিনবে। যা কাজে লাগবে, তাই কেনা ওর মত।

—"না। আমি কিছুতেই তোমাকে ওই বিশ্রী নোংরা ন্যাকড়ার নর্থস্টার কিনতে দেবো না।" বন্দনা অনড়। "চটিই কিনতে হবে। লাল, জরির চটি। তত্ত্বে সাজানো হবে।"

বাটার দোকান থেকে শেষ পর্যন্ত কেনা হলো কী? লিপস্টিক, পাউডার, কাজল, ব্লাশার, ক্রীম, শ্যাম্পু দোকানে এসমস্তই আছে। কিন্তু জরির চটি নেই। সেটার জন্য ফুটপাতে কিনতে যেতে চাইছিল পুপসি। বন্দনা শুনল না, "অন্য দোকানে চলো।"

BanglaBook.org

"শুধু শুধুই কিনছ। ও আমি জীবনে পরব না। জবি-ফরি।"

"পরতে তো বলিনি? তত্ত্বে সাজিয়ে দিতে হবে তো?" বন্দনারও সাফ জবাব। "লোকে দেখলে বলবে কী?"

"ওই বেনারসী শাড়িটা যে তুমি কিনলে, ওটা আশীর্বাদে পরবো না?"

"ওমা সেকি? ওটা পরবে কেন? ওটা তো তত্ত্বে সাজিয়ে দেবো? আশীর্বাদের দিন তোমাদের বাড়ির শাড়ি পরতে হয়।"

—"অঃ। বাড়ির শাড়ি? তার মানে মার শাড়ি।"

—"মার শাড়ি কেন পরবে? মাকে বলবে, তোমাকে নতুন শাড়ি কিনে দেবেন।"

—"তার মানে আরেকদিন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা? ইমপসিবল। আজকেই দু'জনের একসঙ্গে বেরুনো উচিত ছিল। দোকানে তো কত শাড়ি ছিল। আরেকখানা নিয়ে নিলেই ল্যাঠা চুকে যেত। কিন্তু শাড়ি কি না পরলেই নয়?"

—"মানে? প্যান্ট নয়, বেশ গর্জাস একটা সালওয়ার কুর্তা পরলে হয় না? মুভমেন্ট অনেক ইজি"—

—"মুভমেন্টের দরকারটা কী? চুপটি করে আসরে বসে থাকবে। নড়বে না। সালওয়ার পরে বিয়ে হয়েছে কখনও বাঙালী মেয়ের? বেনারসী চাই।"

—"বিয়ে তো হচ্ছে না? হচ্ছে এনগেজমেন্ট।"

—"সে যাই হোক। সামাজিক অনুষ্ঠানে ওসব কুর্তাফুর্তা চলবে না। শাড়ি পরতে হবে। বেশ জমকালো শাড়ি।"

পুপসি শেষ চেষ্টা করে।

"শাড়ি খুলে গেলে জানি না কিন্তু।"

—"খুলবে না। মাকে বলবো, পিন করে দেবে।"

"পিন করলে ছিঁড়ে যাবে।"

—"গেলে যাবে। আবার হবে।" বন্দনাও মরিয়া। যতই জেদী বউ হোক, সে ছাড়বে না। ভয় পাবে? ঈশ। সে না শাশুড়ি?

তৃতীয় অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য

—"মাটিতে শুয়ে পড়। মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়। হাতটা গলিয়ে দে, যদ্দুর যায়—" বড়মাসি ইন্সট্রাকশন দিচ্ছেন ভূলুণ্ঠিত শমিতাকে। ভুঁড়ির জন্যে নিজে যেহেতু পারছেন না। শমিতা হাত গলিয়ে গলিয়ে নানারকম বাক্স বের করছে। মার গয়না। ঠাকুমার গয়না। নিজের বিয়ের গয়না। বাবার ঘড়ি-আংটি, কর্তার ঘড়ি-আংটি-বোতাম। "ঐ তো, ঐ তো, তোর কর্তার বোতাম। ঈশ, পালিশ করার আর টাইম নেই। দেখি, যদি একটা চটকা লাগিয়ে দিতে পারি।" গর্তটা থেকে বাক্সর পর বাক্স

BanglaBook.org

বেরুচ্ছে। বাক্সর পর বাক্স খোলা হচ্ছে। কনেকে কী পরিয়ে সাজানো হবে স্থির হচ্ছে। শমিতা নিজের গয়নাও যদি কিছু না পরে, ভালো দেখাবে কেন? বড়মাসি সব বেছে-টেছে ঠিকঠাক করে দেবেন। শমিতার কাজ শুধু মাটিতে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে টেনে টেনে বাক্স বের করা।

—"অত্যন্ত বিশ্রী এই ভোল্টটা নিয়েছিস।"

—"সেবার ওখানে জল ঢুকে যাবার পরে এইখানে সব সরিয়ে নিতে হলো।" এই সময় ঐ ঘরে আরেকজন উটকো লোকের আবির্ভাব হলো। লোকটা ঠিক পাশেই এসে দাঁড়ালো শমিতাদের। ওখানেই ওর ভোল্টটা। শমিতা শুয়ে শুয়েই মুখটা তুলে টেবিয়ে টেবিয়ে দেখতে চেষ্টা করলো। খুবই অস্বস্তিকর শারীরিক পজিশন এটা। মন্দিরে মানায়। কিন্তু এটা ব্যাংক।

ঐ লোকটার অবস্থাও বিপরীত রকমে সঙ্গীন। খুব একটা লম্বা লোক নয়। তার ভোল্টবাক্সটা আবার অনেকটা উঁচুতে। ডিঙি মেরে মেরে অতিকষ্টে বাক্স বের করছে। পাশেই একটা ট্রলি টেবিলে রাখছে। আবার ডিঙি মেরে উঁকি মেরে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে আরেকটা বাক্স। "ইচ্ছে করলেই বড়দি ওই টেবিল থেকে লোকটার অন্য বাক্সটা নিয়ে নিতে পারে"—শমিতা ভাবল।

—"কোনো প্রিভেসি নেই। কোনো সিকিওরিটিও নেই। যাচ্ছেতাই।" হঠাৎ বলেও ফেলল কথাটা সে বেশ জোরেই।

—"যা বলেছিস শমি"—বড়মাসি ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকান। যেন ওরই দোষ। ও কেন ঢুকেছে। শমিতা বোঝে ভদ্রলোকের দোষ নেই। তারও তো কাজেই ঢোকা। তবু রাগ হয়। লোকটা দেখতে বেশ ভদ্র, নিরীহ, সভ্যভব্য। ভয়ের কিছু নিশ্চয়ই নেই। তবু, যদি দুষ্টু লোক হয়? এই মাটির নিচের ঘরে—নিভৃতে শমিতাদের খুন করে রেখে গেলে? অতগুলো গয়নার বাক্স। লোকটার সামনেই খোলা ছাড়া উপায়ও নেই। তিনটের সময় বন্ধ হয়ে যাবে। ভেতরে কেন যে পুলিশ থাকে না? যাক, লোকটার কাজ শেষ হয়ে যায় বেশ তাড়াতাড়িই। সে বাক্স বন্ধ করে হঠাৎ একগাল হাসে। তারপর হাত জোড় করে বলে—"আপনিই তো শমিতা দাশগুপ্ত? আমি হচ্ছি ববির ছোটমামা। বন্দনার ছোড়দা। এখানে আপনি যে-উদ্দেশ্যে, আমিও সেই উদ্দেশ্যে।" হাসিমুখে নমস্কার করেন ভদ্রলোক।

—"ববির ছোটমামা!" (ছি ছি, কী ভাবল।)

—"নমস্কার। নমস্কার। আর ইনি পুপসির বড়মাসি।" আমার বড়দি। শমিতা শয়ান অবস্থাতেই সাধ্যমতো ভদ্রতা করার চেষ্টা করে। কিন্তু বড়মাসি স্মার্ট লোক।

—"কিছু মনে করবেন না ভাই। আপনাকে তো চিনি না? তাই ভেবেছিলাম কে না কে। বাইরের লোকের সামনে এতগুলো গয়না—"

—"তা তো বটেই, তা তো বটেই"—

—"তাহলে, মঙ্গলবার সন্ধেবেলা দেখা হবে?" বলে বড়মাসি একটা ফাইনাল

BanglaBook.org

হাসি হেসে দেন। শমিতা তো সেই মুহূর্তে এমনিতেই "মাটিতে মিশিয়ে" শুয়ে আছে—লজ্জায় লোকের যা করবার চাইবার কথা। নতুন করে করার কিছু ছিল না।

বাড়ি ফেরার পথে শেষ পর্যন্ত—

—"বড়দি? অত ভারী ঝাড়লণ্ঠন ঝুমকো তো নিচ্ছিস, কিন্তু পুপসির কানে তো রস গড়াচ্ছে। এখনও নিমকাঠি। কান তো সারেনি।" শমিতা বলেই ফ্যালে।

—"চমৎকার। কানে নিমকাঠি পরে মেয়ে সেজেগুজে আসনে বসবে?"

—"ধরো দু'খানা বেশ কচিকচি নিমপাতাসুদ্ধু কাঠি, বেশ আর্টিস্টিক করে যদি লাগানো যায়?"

—"কনে পাতাসুদ্ধু নিমের ডাল পরবে কানে?"

—"আহা, শান্তিনিকেতনে যেমন ফুলের গয়না পরতেন না সুধীরাদি? তেমন কিছু যদি, নিমপাতা দিয়ে—"

—"সোনা। সোনা পরাতে হবে। সোনা। ওসব ডালপালা চলবে না। এক্ষুনি গিয়েই একটা মাকড়ি পরিয়ে দিচ্ছি। মারকিউরোক্রোম লাগিয়েছিস? যত্তো পাগলের কাণ্ড।"

তৃতীয় অঙ্ক : দ্বিতীয় দৃশ্য

—"ওরে ব্লাউজগুলো আনিয়েছিস? ওদের বাড়িতে পাঠাতে হবে।" শমিতার হঠাৎ মনে পড়েছে।

—"কিসের ব্লাউজ?"

—"ঐ পুপসির শ্বশুরবাড়ি থেকে যে শাড়িগুলো দিচ্ছে তার সঙ্গের ব্লাউজপিসগুলো সব দিয়ে গেছে, জামা করিয়ে দিতে।"

—"অনেকগুলো শাড়িও দিচ্ছে নাকি? এই যে শুনলাম জড়োয়ার সেট দিচ্ছে—"

—"সেও দিচ্ছে। তার ওপর দেখলুম তো বেশ কয়েকটা ব্লাউজ করাতে দিলে—"

—"বেশ কয়েকটা ব্লাউজ? ওরা তবে তত্ত্ব করছে? বেশ কয়েকটা ব্লাউজ মানেই বেশ কয়েকটা ট্রে।"

—"তা হবে।" শমিতার নিশ্চিন্ত উত্তরে বড়মাসির গা জ্বলে যায়। গলায় উদ্বেগ নিয়ে বড়মাসি বলেন:

—"আর আমরা?"

—"আমরা মানে?"

—"বাঃ। ওরা তত্ত্ব করবে, আমাদের তত্ত্ব?"

BanglaBook.org

—"আশীর্বাদে আবার তত্ত্ব কী? আমাদের ওসব তত্ত্বফত্ত্ব নেই। আমরা বিয়েতে তত্ত্ব করবো।"

"বা, বা। দু'পক্ষের লোকজন আসবে, একসঙ্গে দু'পক্ষের আশীর্বাদ হবে, বরপক্ষ থেকে থালা থালা তত্ত্ব আসবে, আর কন্যেপক্ষ ভোঁ ভাঁ? তাই কখনও হয়? খুব খারাপ দেখাবে।" শমিতার বড়দি মুখঝামটা দেন। শমিতা তাতে ঘাবড়ানোর পাত্রী নয়।

—"দেখাদেখির কী আছে? ওদের ইচ্ছে হয়েছে ওরা দিচ্ছে।"

—"তোমার ইচ্ছে হয়নি, তুমি দিচ্ছো না। এই তো? সেইটাই বলছি। অন্যলোকেও ঠিক তাই বলবে।"

—"ইচ্ছে হবে না কেন? এই তো এই টাইটা বের করেছিলুম দোর বলে। বোতামের সঙ্গে, আর ঘড়ির সঙ্গে। তা মেয়েই দিতে দিচ্ছে না। দ্যাখো কী সুন্দর টাই?"

—"টাই? হঠাৎ টাই কেন?"

—"খাস বেনারস থেকে আনা। বেনারসী সিল্ক ব্রোকেডের টাই। পুপসির বাবাকে আমাদের বিয়ের সময়ে আমার বেনারসের সেই ব্যাচেলর জ্যাঠশ্বশুর দিয়েছিলেন দু'খানা। তারই একখানা তুলে রেখেছিলাম। চমৎকার দেখতে। এয়ারলুম বলে কথা।"

—"পঁচিশ বছর তুলে রেখেছিলি?"

—"সাতাশ। একদম নতুন আছে। চকচকে।"

—"টাই দিলে সঙ্গে সুটও দিতে হয়। বুঝেছ?"

—"তা কেন? এই যে বোতাম দিচ্ছি, কৈ ধুতিপাঞ্জাবি তো দিচ্ছি না?"

—"কিসের জন্যে দিচ্ছ না? দেওয়াই তো উচিত।"

—"জীবনেও ধুতি পরবে না ও-ছেলে, দিয়ে নষ্ট করে কী লাভ? ধুতি এখন শাড়ির চেয়ে দামী।"

—"তবে বোতাম দিচ্ছিস কেন? বোতাম কিসে পরবে?"

—"ছেলের বাবা তো বারণই করেছিলেন। বলেছিলেন ছেলেকে একটা ইলেকট্রিক টাইপরাইটার দিতে। জার্নালিস্ট মানুষ। কাজে লাগবে। ঘড়ি ওর আছে। বোতাম পরে না।"

—"সে তো বেশ ভালো হতো। বেশ নতুন জিনিস। যেটা কাজে লাগবে।"

—"ধুৎ। দু'হাতে করে ধানদুব্বোর সঙ্গে ছেলের মাথায় টাইপরাইটার তুলে দেবো নাকি? আশীর্বাদী? তাই কখনও হয়? তাছাড়া পুপু বেঁকে বসলো।"

—"বেঁকে বসলো?"

—"বললো, তাহলে ওকেও ইলেকট্রিক টাইপরাইটার দিয়েই আশীর্বাদ করতে হবে। ও-ও পেশাদার জার্নালিস্ট। ওও তো শাড়ি গয়না পরে না। ওরও ওইটেই

BanglaBook.org

বেশি কাজে লাগবে। দু'জনে একই চাকরি করে, ছেলের বেলায় একরকম, মেয়ের বেলায় অন্যরকম চলবে না।"

—"তারপর ?"

—"তখন ওঁরা বললেন, 'আপনার যা খুশি তাই দিয়ে আশীর্বাদ করুন, আমরা তা বলে টাইপরাইটার দিয়ে বউকে আশীর্বাদ করতে পারবো না।' তাই পুপুর বাবা বিলেত থেকে জামায়ের ঘড়িটা আনবেন। আর বোতামটা—পুপু বলেছে, পুপুই কুর্তায় পরবে।"

—"শমি, তোর শ্বশুরবাড়িতে তত্ত্ব থাক না থাক আমাদের তত্ত্ব সাজাতেই হবে। নইলে বড্ড খারাপ দেখাবে রে।"

—"আজ বাদে কাল কাজ। এখন তত্ত্বের ব্যবস্থা করবো কী করে ? দেবোটাই বা কী ? ধুতি পাঞ্জাবি তো জঞ্জাল।"

—"জঞ্জাল দিবি কেন ? ছেলে যা পরবে তাই দে।"

—"টী শার্ট আর ব্লু জীনস ?"

—"তা কেন ? তুমি বাছা স্যুট দাও। ওরা বেনারসী দিচ্ছে। আমি আজই মাস্টারকে খবর দিচ্ছি, দু'দিনে বানিয়ে দেবে। তুমি শুধু ছেলেকে ধরো মাপের জন্যে। আর স্যুট-লেংথটা কিনে আনো। যাও ফোন করো, ছেলেকে পাকড়াও। এক্ষুনি।" বড়মাসির ছাড়ান নেই। শমিতা ছুটল ফোন করতে। তক্ষুনি। সন্ধে ৮টার সময় মাস্টারকে এনে ফেলবে বড়দি।

—"হ্যালো। মিস্টার মুখার্জি ? আজ সন্ধে আটটায় রবিকে একবার পাঠিয়ে দেবেন ? স্যুটের মাপ দিতে হবে।" ওপারে যেন বিজলীর শক লাগে। রবি শিউরে উঠেছে, বোঝা গেল।

—"স্যুট ? রবিকে স্যুট দেবেন আপনারা ? ক্ষেপেছেন ? আমার বিয়েতে তিনখানা স্যুট পেয়েছিলুম। তিরিশ বছর ধরে বছর বছর শুধু রোদে দিচ্ছি আর ন্যাপথলিনে জড়াচ্ছি। মাথা খারাপ ? খবরদার না। কোম্পানির কাজেই স্যুট পরতে লাগে না, তো জার্নালিজমে।"

—"তাহলে ? কী দেবো আমরা তত্ত্বে ?" শমিতা হাহাকার করে ওঠে।

—"ও, তত্ত্বে ? শার্টপ্যান্ট, শার্টপ্যান্ট।"

—"শার্টপ্যান্ট ? বেশ দেখি মাস্টারকে বলে যদি করে দেয়। শার্ট কি এত তাড়াতাড়ি—"

—"করাবেন কেন ? পিকাডিলি ! পিকাডিলি। ওখানে সব রেডিমেড পাওয়া যায়, একঘণ্টা সময় দিলেই সব ফিটিং করিয়ে দেবে। ফার্স্ট ক্লাস সার্ভিস। তালপাতার সেপাইদেরও ফিট করিয়ে দেবে।"

—"পিকাডিলিটা আবার কোথায় ?"

BanglaBook.org

—"চলুন আমি নিয়ে যাচ্ছি—ববি এখনও বাড়িতে আছে, পিকাডিলি আধঘণ্টার মধ্যে খুলে যাবে—"

—"ওখানে কি স্পোর্টসজ্যাকেটও"—

—"স-ব। স-ব। কিন্তু অত দেবেন কেন? কিচ্ছু দরকার নেই। 'তত্ত্ব' বলে কাতরে উঠলেন, তাই ভাবলুম নিয়ে যাই। অত দেবেন না, অত দেবেন না, ডোন্ট স্পয়েল হিম। এ যে জামাইআদর শুরু করে দিলেন।"

—"জামাই তো?" শমিতা এবার হুড়মুড়িয়ে হেসে ফ্যালে। "সত্যি মিস্টার মুখার্জি, আপনি না।—"

তৃতীয় অঙ্ক : তৃতীয় দৃশ্য

বড়মাসির বড় আনন্দ। শার্ট, প্যান্ট, জ্যাকেট, বাঃ। দিব্যি তত্ত্বের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—এর সঙ্গে গেঞ্জী, ইজের, জুতো, মোজা, রুমাল, বেল্ট, তোর সেই বেনারসী টাইটা, তেল, সাবান, শেভিং সেট, ওডিকোলোন, চিরুনি বুরুশ—চমৎকার। বড়মাসির আনন্দ ধরে না।

—"আয়্যাম সারি টু স্যে দিস, কিন্তু মাগো, তোমার বেনারসী টাইটা কিন্তু চলবে না।" দুঃখিত গলায় পুপসি বলে। "—আজকাল ওই টাই কেউ পরে না। তাছাড়া বড্ড ঝকমকে। ব্রোকেড টাই কেউ পরে?"

—"পরে না? বেনারসী সিল্ক ব্রোকেড?"

—"বরং ওটা বিয়েতে দিও। তত্তদিনে হয়তো ওইটেই ফ্যাশন হয়ে যাবে। কে বলতে পারে?" পুপসি সান্ত্বনা দেয়।

—"এবার তবে ছেলের টয়লেটের জিনিসগুলো কিনে ফ্যাল? জুতো, মোজা, রুমাল টুমাল পুপসি আর ববি গিয়ে কিনে আনুক বরং—"

—"সেই ভালো"—নাচতে নাচতে পুপসি ববিকে ফোন করতে থাকে।

—"ছেলের টয়লেটের জিনিসগুলোও গড়িয়াহাট থেকে আজই কিনে নেবো কি?"

—"প্রথমেই শ্যাম্পু চাই। ববির চুলগুলো বাপু বড্ড কাগের বাসা হয়ে থাকে" —বড়মাসি বলেন, "শিবু লিখে নাও—শ্যাম্পু, ওডিকোলন, ট্যালকম পাউডার, চিরুনি বুরুশ, তেল সাবান, শেভিং সেট, শেভিং ফোম, আফটার শেভ—"

—"ও কী? ও কী?" পুপু ফোন ধরেই হেসে গড়িয়ে পড়ে। "শেভিং সেট দিয়ে কী হবে? আফটার শেভ? ববির তো একমুখ দাড়িগোঁফ।"

—"তা হোক। দিতে হয়।"

—"মোটেই না। তার চেয়ে বরং একটা ডিওডোর‍্যান্ট দিও। ছেলেকে আশীর্বাদ করতে এসে লোকে যাতে পালিয়ে না যায়।"

—"বেশ। শিবু, লেখো. ওডোনিল।"

—"ওডোনিল?" শিবু আপত্তি করে।

—"সে কি বড়দি? সে তো বাথরুমের জন্যে। মানুষের জন্যে আলাদা"—

পুপসির হাসি আর থামে না। "বড়মাসি, তোমরা ওটা ছেড়ে দাও দিকি? এবার আমিই বাবাকে ফোন করে দিচ্ছি—বিলেত থেকে টয়লেটের জিনিস নিয়ে আসবেন —ওখানে অনেক কিছু মেলে—"

শিবতোষ এসে পড়লো আশীর্বাদের ঠিক আগের দিন। সবাই মিলে বসে গেল তার বাক্স ঘাঁটতে। বাঃ। চমৎকার ঘড়িটা তো? কী অপূর্ব টাইগুলো বাবা? প্রসাধনদ্রব্যও প্রচুর—শমিতার লিস্টি ধরে কিনেছে শিবতোষ। কিছুই ভোলেনি। শ্যাম্পু, সাবান. ডিওডোর্যান্ট. ওডিকোলোন. ট্যালকম, এমনকী একটা পুরুষমানুষের পারফিউম পর্যন্ত এনেছে বুদ্ধি করে। কই কই দেখি, কী আনলে?" মহা উৎসাহে ছুটে যায় শমিতা।

—"ও মা! এগুলো সব দিশি গো?"

—"দিশি কী? সমস্ত নিউ ইয়র্কে কেনা।" শিবতোষ আশ্চর্য হয়ে যায় শমিতার নির্বুদ্ধিতায়।

—"কিন্তু এগুলোই তো দিনরাত গড়িয়াহাটে দেখি। অন্য কোনো বিলিতি কোম্পানি কি ছিল না? এ তো এখানে পাওয়া যায়।" শিবতোষ যারপরনাই মর্মাহত। সে নিজে প্রসাধনদ্রব্য ব্যবহার করতে অভ্যস্ত নয়।

—"ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি ওলড স্পাইস খুব নামকরা বিলিতি কোম্পানি, এখন তুমি বলছো দিশি? এগুলো দিশি?"

—"সত্যিই তো খুব নামকরা কোম্পানি, বাবা"—পুপসি ছুটে আসে বাবাকে রক্ষা করতে।

—"দেশেরগুলো সব নকল। ভেজাল। মা কিচ্ছু জানেন না। খালি শিশিতে দিশি জিনিস ভরা। তুমি মার কথা শুনো না তো? খুব ভালো কোম্পানি ওলড স্পাইস।" শিবতোষের মুখ আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বিদেশে থাকে বলে কি সে শ্বশুর হতে জানে না?

চতুর্থ অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য

জাহাজ থেকে এসে পড়েছেন ছেলের কাকা, টবি, নেভাল কম্যাণ্ডো, সময়মতন ছুটিটা জুটে গেছে। ব্যাচেলর মানুষ, দাড়িগোঁপভর্তি মুখ। গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন একধারে—যখন তত্ত্ব সাজানোর ফাইনাল লিস্ট হচ্ছে। —"সবই এসে গেছে। এখন বাকী শুধু চিরুনী, বুরুশ, মোজা, রুমাল—"

BanglaBook.org

—"আর একটা দাঁড়ি আঁচড়ানোব চিরুনিও লিখে নি।" ছেলেব কাকা বলে ওঠেন।

—"আর একশিশি দাড়িব আতর, একশিশি লাইসিল। ব্যাস, তবেই টযলেটেব ট্রে পারফেক্ট।"

বডমাসি লিখে নেন—"দাড়িব চিরুনি, দাডির আতর, লাইসিল।"

শিবুমামা ব্যাগ নামিয়ে ফ্যানেব নিচে মোডাটা টেনে নেন।

—"এই নাও। চিরুনি, বুরুশ মোজা, রুমাল, দাড়ি আঁচড়াবাব চিরুনি কেউ দিতে পাবল না। একটা দাডিওলা দোকানদাব এইটে দিল। একদিকে সরু, একদিকে চওড়া। বলল এটা দিয়ে দাডি, ভুরু, দুটোই আঁচড়ানো যাবে। বড়বাজাব থেকে আতর এনেছি। দাড়িব জন্য আলাদা কোনো ব্রাণ্ড নেই। গোলাপী, জেসমিন, হাজাবটা গন্ধ। মাথা খারাপ হবাব যোগাড। এইটে এনেছি। কিন্তু সাজিযে দেবে কিসে? বিশ্রী দেখতে তো শিশিটা। আব এই নাও লাইসিল।"

শিবুমামাব বক্তৃতা থামতে না থামতে বাঘেব মতো ঝাঁপিযে পডল পুপসি।

—"তোমবা সত্যি সত্যি তত্ত্বে লাইসিল সাজিয়ে দিচ্ছো? তোমাদেব কি মাথা খাবাপ? তোমবা জানো না লাইসিল উকুনেব ওষুধ? এতে ববিকে অপমান কবা হয। ওবা তবে তত্ত্বে তোমাদের মেযেকে দাদের মলম সাজিযে দিক? ঠাট্টাও বোঝো না?" শিবুমামা স্তব্ধ। বড়মাসিব এতক্ষণে মুখ খোলে।

—"এ আবাব কী ধরনের ঠাট্টা? আমি কী করে বুঝবো—"

"যাগ গে যাক, দেখি আতরটা কেমন? আঃ কী সুন্দব গন্ধ। তত্ত্বে-ফত্তে দিযে কাজ নেই, ও-বাড়িতে চলে যাবে। কবে বিয়ে হবে তার ঠিক নেই, ততদিনে ওই আতব উবে যাবে! চাকরিবাকরিব ঠিক নেই, তোমরা বিয়ে বিয়ে করে নেচে উঠলে। দেখি, আতবটা আমাকে দাও—"

—"নেচেছি কি সাধে মাগো?" বডমাসিব পষ্ট কথা। "—তোমবা যা নাচানাচি শুরু কবেছিলে তাতে বাপমাযেব আব না নেচে উপায ছিল না যে?" পুপসি পালিযে যায। "লাইসিলটা বাথরুমে থাক", বড়মাসি বায় দেন। "চিরুনিটা তত্ত্বে যাক।"

চতুর্থ অঙ্ক : দ্বিতীয় দৃশ্য

বডমাসি মেঝেতে বাবু হযে বসেছেন। সামনে নানান সাইজের ট্রে। সেলোফেন কাগজ, বঙিন ফিতে, জরিব টুকবো, পুবোনো বাখী, শোলাব ফুল, নাইলনেব ফুল, পাতা, রাংতা, কাঁচি, আঠা, মার্বেল পেপাব, লেসেব টুকবো, ভীষণ ব্যস্ততা ঘবময় —ট্রাউজার্স আব জ্যাকেট ছাড়া সব এসে গেছে। এক ঘণ্টায ফিটিং হবাব কথা ছিল। কিন্তু ববি কষ্ট কবে তুলতে যেতে পারেনি বলে দোকান বন্ধ হযে গেছে।

ওই ট্রে দুটো লাস্ট মোমেন্টের জন্যে থাকবে। "লাস্ট মোমেন্ট" ব্যাপারটা ভীষণ জরুরি এ-বাড়িতে। তত্ত্ব সাজানো চলছে।

একডালা ফল-মেওয়া যাবে—ছোট্ট ছোট্ট রঙিন চুপড়ি এসেছে। ডালাতে সাজানো হবে সুশ্রী পাঁচরকম ফলের চুপড়ি—আর একথালা মেওয়া। বাদাম পেস্তা কিসমিস আর সঙ্গে ছেলের (মেয়েরও) প্রিয় খাদ্য, চকোলেট। এটাও বাবা এনেছেন বিলেত থেকে।

হঠাৎ বড়মাসি চেঁচিয়ে ওঠেন, "শমি!—ছ'টা ট্রের জন্যে ঝট করে ছ'টা কবিতা লিখে দে তো ভাই? ছেলের বাড়ি থেকে যতো যাই সাজাক, কবিতা তো লিখে দিতে পারবে না? আমরা কবিতা সাজিয়ে দেবো তত্ত্বে"—বলতে বলতে হঠাৎ এই আবিষ্কারে বড়মাসির স্বরেই প্রকাণ্ড রকম গৌরব বৃদ্ধি পায়। নাঃ, এখানে বরপক্ষ জিততে পারবে না। যত যাই দিক। তত্ত্বে নানারকম কারুকলা হয়। আজকাল তো তত্ত্ব সাজানোর প্রফেশনাল আর্টিস্ট ভাড়া পাওয়া যায়। আগে মা-মাসি ঠানদিরা তত্ত্ব সাজাতে এক্সপার্ট ছিলেন। এখন সবই স্পেশালাইজেশনের যুগ। তবে হ্যাঁ বড়মাসিকে একজন এক্সপার্টই বলা যায়। লোকে তাঁকে ডেকে নিয়ে যায় বাড়ি বাড়ি তত্ত্ব সাজাতে। কবিতা দিয়ে তত্ত্ব সাজানো কি সোজা মাথায় আসে? সঙ্গে সঙ্গে কাগজকলম নিয়ে ওরই মধ্যে মহোৎসাহে শমিতা বসে যায়। —"কবিতা হবে না, তবে ছ'টা ছড়া হতে পারে, বড়দি"—"ওই হলো"—বড়মাসির ওতেই কাজ চলে যাবে।

খুশি মনে শমিতা কলম কামড়ায়, বড়মাসি কাঁচি চালান। কানাই আরেকবার চা দিয়ে চলে যায়—

—"দিদি, কেটারার এসেছে।"

—"ওই তো বললুম—"

—"কোল্ড ড্রিংক কারা সাপ্লাই দেবে? ওরা না আমরা?"

—"আমরা! আমরা। কল্যাণ চাকরি করে তো থামস আপেই—অনেক সস্তায় পাচ্ছে সে—"

—"ওকে বলে দে, আমরা। আমরা।" লোক মারফৎ নিচে প্রতিধ্বনি চলে গেল কেটারারের কানে,—"আমরা। আমরা।"

—"দিদি, কেটারার জিজ্ঞেস করছে—পানের ব্যবস্থা করেছেন তো? লিস্টে পান লেখা আছে। কিন্তু সেটা ওরা নাকি সাপ্লাই দেয় না। মিষ্টিও যেমন দেয় না।"

—"দেয় না বুঝি? সব্বোনাশ। শিগগির ছুটে যা, চিন্তামণির দোকানে বলে আয়।" শমিতা সমাধান দেয়।

"চিন্তামণি পারবে। ওই যে আমার জন্যে যেমন পান করে, মিঠেপাতা, এলাচ, সুপুরি, চমনবাহার—তাই করুক না? পানে গুচ্ছের জ্যাম-জেলি দিতে হবে না। তিনশ পান বলে দে। ঠোঙা দেয় যেন। আর কিছু দেবে পানে?"

BanglaBook.org

—"ছানা দিতে পারে।"

পাত্রের কাকা সেখানেই দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাচ্ছেন।

—"খুব হেলথ ফুড ফ্যাড হয়েছে। আজকাল পানে ছানাটা খুব চলছে দিল্লি বম্বেতে। পান-পনীর।"

—"পান-পনীর? সে আবার কেমন খেতে?"

—"গ্র্যাণ্ড। হেলথ ফুড স্টোরে তো পাওয়া যায়। খাননি?"—এবার পাত্রের কাকার মুখের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকেন বড়মাসি। "পান-পনীর? না বাবা, সেসব আমরা খাইনি।"

—"সে কি কলকাতায় চলবে? তার চেয়ে আমার মনে হয় ওই মিঠে পানই ভালো। পান-পনীর থাক।" ছড়া লিখতে মগ্ন শমিতার এতক্ষণে টনক নড়ে।

—"পান-পনীর? কে? কে বলেছে কথাটা? কার মগজে জন্মেছে? ওঃ আপনি? তাই বলুন। তত্ত্বে লাইসিল ঢুকিয়েও হয়নি, আপনি এখন পানটা ধ্বংস করতে এসেছেন। সত্যি মিস্টার মুখার্জি, কেন যে আমার দুর্বুদ্ধিটা হলো একসঙ্গে উৎসব করার? শিবু, তোকেও বলিহারি—পানে ছানা কেউ দেয়? তুইই বা শুনছিস কেন ওর বাজে কথা—যতো কুবুদ্ধি দুষ্টবুদ্ধি নষ্টবুদ্ধি।"

ছেলের কাকা টবি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃদুমৃদু হাসে। হাসি দেখেই শমিতা রাগে ফেটে "ও, আপনিই? আপনি এখানে কি করছেন? এখানে আপনার কি দরকার? যান বাড়ি যান। বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করুন।"

—"ঐ যে, কোটারার। তারপর আসবে ডেকরেটর। ইলেকট্রিকের লোক। আপনাকেই তো সবাইকে অ্যাটেণ্ড করতে হবে। তাই এলাম। আপনাকে হেলপ করছি। দাদা পাঠিয়ে দিলেন।"

—"হেলপ করছি? এর নাম হেলপ? এক্ষুনি শিবু পানে ছানা অর্ডার দিয়ে দিচ্ছিল। এটা কি ইয়ার্কি মারার সময়? আচ্ছা মানুষ মশাই আপনি।"

—"মেয়ের বিয়েতে অমন একটু আধটু হয়েই থাকে।"

—"বিয়েটা কি কেবল আমার মেয়ের? অ্যাঁ?"

—"নো, নো, অফ কোর্স নট। বিয়ে আপনার মেয়ের, আর আপনার জামাইয়ের।"

—"আর আপনার তবে কে? আপনাদের কিছু নয়?"

—"নিশ্চয়ই! আমরা তো খেতে আসবো। নইলে খাবেটা কে?"

—"তবে তাই আসবেন। এখন বাড়ি যান দিকিনি? উঃ"—

—"দাদা বলেছেন, যাও, মিসেস দাশগুপ্তকে"—

—"হেলপ করো। উঃ—যেমন দাদা"—

—"ঐ যে দাদা নিজেই এসে গেছেন।"

—"এই যে। এই যে। মিস্টার মুখার্জি কী একখানি ভাইকেই পাঠিয়েছেন—"

BanglaBook.org

—"করেছে? করে ফেলেছে? ওযাণ্ডারফুল।"

—"কি করবে? করবেটা কী?"

—"ঐ যে ডেকরেটারদের সঙ্গে গিয়ে দেখবে কোথায় কী হচ্ছে—ক'টা টেবিল, ক'টা চেয়ার গুনে নেবে—সি ই এস সি'র মিটারটা"—

—"মুণ্ডু করেছেন। এখানে বসে বসে সব গোলমাল পাকাচ্ছেন—" ছেলের কাকা মিটিমিটি হাসেন. বিন্দুমাত্র বিচলিত মনে হয় না তাঁকে।

—"কী রে শমি? কদ্দূর এগোলো?"

যাক শমিতার বড় জা তাহলে এসে পড়েছেন। শরীরটা ভালো ছিল না, উনি শেষ পর্যন্ত আসতে পারবেন কি না বর্ধমান থেকে. তারই ঠিক ছিল না। শমিতার আনন্দ ধরে না।

—"এসেছো? দিদিভাই? এসো এসো—এই যে এঁরাই হলেন আমাদের নতুন কুটুম—এই যে, ইনি আমার ভাসুর, আর ইনি আমার খুড় ভাসুর"—আহ্লাদে ডগমগ শমিতা উথলে ওঠে। কিন্তু বড় জা স্তম্ভিত হয়ে যান। তারপর বলেন:

—"কী বললি? তোর—ভাসুর?"

—"স্যরি, শ্বশুর।" শমিতা কি একটু ঘাবড়ে যায়?

—"তোর শ্বশুর? শমি?"

—"না, না, মানে, আমাদের জামায়ের।"

—"তোর জামায়ের শ্বশুর? ওঃ বুঝেছি। চল দিকিনি, ওপরে চল। তোর বোধহয় ঘুমটুম হচ্ছে না ঠিকমতন।"

অগত্যা রবিই এগোয়।

—"অদূর ভবিষ্যতে পুপসির শ্বশুর হবো এমন একটা চান্স আছে। আপনি?"

—"নমস্কার, বেয়াইমশাই। আমি পুপুর জ্যাঠাইমা। আর আপনি?"

টবি এতক্ষণ চুপচাপ লক্ষ্মীছেলের মতো একধারে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার কথা বলতে পেয়ে বেঁচে যায়। গম্ভীর মুখে টবি বলল—

—"ঐ যে শুনলেন? খুড়-ভাসুর? আমি হচ্ছি একজন খুড়-ভাসুর।"

—"খুড়-ভাসুর আবার কী? জন্মে শুনিনি এসব শব্দ।" ছোকরাকে এক ধমক লাগান জ্যাঠাইমা। "কার খুড়-ভাসুর আপনি?"

—"লজিক্যালি ঠিকই আছে। আমি যদি কারুর ভাসুর হই, তবে আমার ছোটভাই খুড় ভাসুর হতেই পারে। তাই না?"

রবি আন্তরিকভাবেই সাহায্য করার চেষ্টা করে।

—"ওটা খুড়শ্বশুর হবে"—সামলে নিয়ে শমিতা এতক্ষণে প্রুফ কারেক্ট করে দেয়।

—"পুপসির হবু খুড়শ্বশুর?" বড় জার মাথা ডিটেলে খুবই পরিষ্কার।—"তাই বল।"

BanglaBook.org

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"তা, ওঁদেব জলটল কিছু দিয়েছিস? বসুন আপনারা। বৈঠকখানা ঘরে—"

—"না না, ওবাও যে হোস্ট—দিদি, জযেন্ট সেলিব্রেশন হচ্ছে না? এনগেজমেন্ট-কাম-আশীর্বাদ, দুই পক্ষ একসঙ্গে জযেন্টলি, মনে নেই?" শমিতা ব্যগ্র হযে মনে কবিয়ে দেয। "সব খবচে হাফ অ্যানড হাফ।"

—"খুব মনে আছে। কিন্তু এই বাড়িটা কার? ওঁদের? না তোমাব? না হাফ এ্যাণ্ড হাফ? এখন ওঁবা তোমাব বাড়িতে এসেছেন। তুমি ওঁদেব বসাও। কুটুম বলে কথা। শববৎ টরবৎ দাও। চিবদিনেব পাগলি বযে গেলি? মেযেব বিযে দিতে চললি—তবু বুদ্ধিটা পাকল না।"

—"বসাবেন কী। এতক্ষণ ঝগডা কবছেন"—'খুড ভাসুর' কমপ্লেন কবেন চটপট।

—"ঝগডা কববো না? উনি এক্ষুনি ছানা দিযে পান সাজাতে অর্ডাব দিচ্ছিলেন দিদিভাই—জ্বালিযে মাবলেন উনি আমাকে—কেবল খ্যাপাচ্ছে—"

—"ভালই হযেছে। তোব একটা বেযাই-কাম-দ্যাওর জুটলো—ওটাব তো অভাব ছিল—"

BanglaBook.org

চতুর্থ অঙ্ক : তৃতীয় দৃশ্য

ট্রে সাজানো প্রায কমপ্লিট। চমৎকাব দেখাচ্ছে। শমিতা নিজেব ছডা পডে নিজেই মোহিত। বডদিব এই আইডিযাটা দারুণ কিন্তু। এবাব চান কবতে পাঠাতে হবে একজন একজন করে। দুটো বাজে।

—"দিদি, নিচে আপনাব কাছে লোক এসেছে"।

—"কিসের লোক?" বলতে বলতে শমিতা নিচে নামতে থাকে। জিজ্ঞেস করাব চেযে গিযে দেখতে সময কম লাগে। ঝোলাঝুলি নিযে একটা দাডিওলা ছোকবা। বাঁচা গেল। এসে গেছে।

—"ওঃ, আপনি? আপনি তো ইলেকট্রিশিযান। তা, এত দেবি যে? চলুন, চলুন, আরো দুটো ফ্লাডলাইট লাগবে। ওই মড়াব-মতন-দেখানো-শাদা জোবালো আলোগুলো আমার দু' চক্ষেব বিষ। হাজার ওয়াটেব ঐ একটার বদলে ঘবে দুটো পাঁচশোর—"

"আজ্ঞে, আমি 'নন্দিনী' পত্রিকা থেকে এসেছিলাম। ঐ যে ইন্টাবভিউ নিযে গেছে পরশু? আমি ওরই ফোটোগ্রাফাব।" শমিতা ঘাবডায না। সময বড্ড কম।

—"ওঃ ফটোগ্রাফ? নিন। নিযে নিন।"

—"আপনি একটু তৈরি হবেন না?"

—"তৈরি? তৈরির কী আছে? দেখছেন তো আমার মরবার সময় নেই।"

—"আপনার চুলটা—"

—"ওতেই হবে।" (শমিতা কি ফিলাস্টার?)

—"কাপড়টা একটু গুছিয়ে—"

—"হাফ। হাফ ছবি নিন।" (শমিতা প্র্যাকটিক্যাল)।

—"আপনার হাতে কি ওটা থাকবে?"

শমিতা এবার তাকায়। হাতে? ওঃ। তত্ত্বে সাজানোর জন্যে নিয়ে যাচ্ছিল। দু' পাটি মস্ত মস্ত সোয়েডের বুটজুতো খুব যত্ন করে শমিতা দু'হাতে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে আছে। তার ভেতরে একটা রাংতার লাঠিতে একটা মিকিমাউসের মুণ্ডু আঁকা কাগজের টুপি। সেই টুপিতে পালকের মতো একটা ছড়া গোঁজা মিকিমাউসের গোলগাল কান ফ্যানের বাতাসে পতপত করে নড়ছে। অত্যন্ত কৃত্রিম বিনয়ের মুখ করে তরুণ ফোটোগ্রাফারটি হাসি চেপে দাঁড়িয়ে ক্যামেরা তাক করছে।

শমিতা হেসে ফ্যালে। জুতোজোড়া টেবিলে নামিয়ে দু'হাতে খোঁপাটা ভেঙে আবার জড়িয়ে নেয়। শাড়িটাকে গুছিয়ে ভদ্রভাবে টেনে নেয় গায়ে। "ক্লিক"। "ক্লিক"। "ক্লিক।"—থ্যাংকিউ।—অসময়ে বিরক্ত করলাম বলে খুবই দুঃখিত।" বলে ছেলেটা ক্যামেরা গুছোতে থাকে।

—"না না তাতে কী!"—বলতে বলতে শমিতা দৌড়ে ওপরে উঠে যায়। ট্রেতে জুতোটা নামানো মাত্রই কানাই ডাকতে আসে।

চতুর্থ অঙ্ক : চতুর্থ দৃশ্য

"দিদি, নিচে আবার লোক।"

—"আবার কে এল? এবার ঠিক ইলেকট্রিকের"—

—"না, ইলেকট্রিকের নয়। নাম বলছে না, বলছে চেনালোক নয়। এক মিনিট কথা আছে।"

"উঃ। তাকে বলে দিতে পারলি না, আজ সময় নেই?" শমিতা ফুঁসতে ফুঁসতে নিচে নামে।

—"শমিতা দেবী আমি আপনার লেখার"—

—"থ্যাংকিউ থ্যাংকিউ। মাপ করবেন আজকে আমার একেবারে সময় নেই—"

—"আমি আপনাকে গত বারো বছর ধরে"—

—"অনেক ধন্যবাদ। আমার মেয়ের কালকে আশীর্বাদ, বুঝলেন? একদম সময় নেই"—

BanglaBook.org

—"চিঠিপত্রে আমাদেব দীর্ঘদিনেব পরিচয। আমাব নাম সুশান্ত বায।"

শমিতা চিনতে পেবেছে। হ্যাঁ। অজস্র চিঠি লেখে। কী উপাযে পালাবে সে? এত, এতবছর বাদে কিনা আজই? হায বে।

—"দেখুন, আজ আমি বডই বিব্রত. বুঝলেন? আপনি আবেকদিন আসুন —আজ আমাব একদমই—"

—"সময নেই? আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনাব একটা ঘডিব খুব দবকাব। আপনাকে একটা কিছু উপহাব দিতে আমাব বড ইচ্ছে, আপনাকে চিঠিতে তো জানিযেছি আগেই—এখন মনে হচ্ছে একটা ঘডি—"

—"না না, আমাব কিচ্ছু চাই না। কিচ্ছু উপহাব চাই না আমাব"—শমিতা অসহায বোধ কবে। এমন সমযে ক্রুদ্ধ শিবুমামাব আবির্ভাব।

—"এই যে. এসে গেছেন দেখছি। এখন ক'টা বাজে জানেন?"

—"কথাব দবকার নেই। কাজেব কথা বলুন। আপনি তো ফুলেব লোক? তবে শুনুন ফুল যা বলেছিলাম, তাব চেযে মনে হচ্ছে কিছু বেশিই—"

—"আমি যদিও ঠিক ফুলেব লোক নই তবে ফুলেব লোক হতেই পাবি। এখন আমি আপনাদেব ঘডিব লোক। আচ্ছা আপনাদেব ঘডি কত লাগবে?"

শিবুমামাকে বিভ্রান্ত দেখায।

—"ফুলেব লোক নন? সাবি। ভেবি সাবি। কিন্তু ঘডিব লোক মানে কী?"

—"শিবু, শিবু, তুই ওপবে যা ভাই. ঘডিব ব্যাপাব তুই বুঝবি না।" শমিতা আর্তনাদ করে ওঠে। "একদম সময নেই।"

—"না বোঝবার কী আছে?" শিবুমামা বলেন।

—"ঘডিব সেলসম্যান তো? জামাইযেব জন্যে আমাদেব ঘডি কেনা হযে গেছে ভাই। থ্যাংকিউ, আব লাগবে না।"

—"নাঃ, আমি তাও নই। বং গেস। ট্রাই আগেন।" সুশান্ত বাযেব চোখ মিটিমিটি হাস্য কবে। কিন্তু শিবুমামাব হাসি পায না।

—"তবে আপনি কি কবেন? জীবিকা নির্বাহেব জন্য? এখানে ঘডি-ঘডি কচ্ছেন কেন?"

—"আমি ইঞ্জিনিযাব। সবকাবি চাকবি কবি। আপনি কী কবেন জীবিকা নির্বাহেব জন্য? ফুলের লোকেব পথ চেযে বসে থাকা ছাডা।" সুশান্তব অমাযিক প্রশ্নে শিবুমামা হঠাৎ ক্ষিপ্ত হযে ওঠেন।

—"দেখুন ভালো চান তো কেটে পড়ুন, দিদিব এখন ঠাট্টা ইযার্কিব সময নেই—"

—"সময নিয়েই তো কথা হচ্ছিল। ঘডিব প্রসঙ্গ তাই উঠেছে। কাল আশীর্বাদটা ক'টার সময়?"

BanglaBook.org

—"তাতে আপনার কী মশাই?"

শমিতা তাড়াতাড়ি মধ্যস্থতা করে—

—"আশীর্বাদ সন্ধেবেলাতে—কিন্তু এখানে হচ্ছে না"—

—"তবে আমি আজই কোনো সময়ে এসে দিদির ঘড়িটা দিয়ে যাবো—"

—"ঘড়ির কোনো দরকার নেই ভাই"—

—"আপনার সময়ের প্রচণ্ড অভাব, ঘড়ি দরকার"—।

—"ঘড়ি? দিদির ঘড়ির অভাব? ক'টা ঘড়ি চাই? ওঃ ঘড়ি-ঘড়ি করে তখন থেকে..."

"—কে আপনাকে ঘড়ি দিতে বলেছে মশাই?" এমন সময়ে অফিসফেরৎ দীপুমামার আবির্ভাব। হাতে সিগারেট, ঠোঁটে শিস। কাঁধে ঝোলা। চোখে চশমা।

—"ঘড়ি? কার ঘড়ি? কে কাকে ঘড়ি দিচ্ছে শিবুদা? আমার ঘড়িটা যে সেদিন কোথায় হারিয়ে ফেললাম। একটা ঘড়ি আমার খুব দরকার। ও, এই যে! আপনিই বুঝি ঘড়ি দিচ্ছেন? তা বেশ, দিন দিন, আমাকেই দিন।" হাত বাড়িয়ে দেয় দীপু —সঙ্গে সঙ্গেই সুর করে গান ধরে "ঘড়ি ঘড়ি মেরা দিল ধড় কে, কিঁউ ধড় কে, কায ধড়কে"...গানটা শুনে সুশান্তর মুখের চেহারা পালটে যায়। শমিতা ইতিমধ্যেই কেটে পড়েছে। সুশান্ত বলে—"বাঃ, এই তো চাই। সারাজীবন আমি আপনাকেই খুঁজছি।"

এইবার দীপুর মুখে সন্দেহ জাগে।

—"আমাকে? না মশাই না। ভুল অ্যাড্রেসে এসেছেন। সে নহি নহি। গে নহি নহি।"

—"গে হবার কী দরকার মশাই? পাগল তো বটেন? পাগলের সঙ্গে পাগলের যে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব পূর্ণচাঁদের মায়ায়, আর মহুয়ার নেশায় সম্ভব"—

—"মহুয়া? মহুয়া বললেন?" দীপু সচকিত হয়ে বলে।

—"কানাই। ও কানাই, দু'কাপ চা! চলুন মশাই বারান্দায় চলুন। এখানে কথা হবে না।" শিবুমামা গজগজ করতে করতে নিচে যান—।

—"যত পাগল জুটেছে। বলে—'ঘড়ি নেবেন, ঘড়ি?' ওঃ বক্সে করো'— অন্য ফুলের লোক ধরতে হবে। শিবুমামা ছোটেন। কাণ্ডকারখানা যা হচ্ছে, বলার নয়। তায় ছেলের কাকাটি আর এক বিচ্ছু। দিচ্ছিল সব গড়বড় করে।

—"এই প্যাকেটটা আবার কী? এটা কার প্যাকেট?" বড়মাসি চেঁচাচ্ছেন।

—"ওটা একটা লোক এসে দিয়ে গেল। বলল দিদিকে দিয়ে দিতে।" বিন্দু বলে।

—"কে লোক? কী আছে এতে?"

—"ঘড়ি।" কানাই উত্তর দেয়।

BanglaBook.org

"লোকটা বলে গেছে এতে দুটো ঘড়ি আছে। দুটোই দিদির জন্যে। এক এক সময় এক একটা পরবেন। খেয়ালখুশি মতন।"

—"দুটোই পুপসিকে?" বড়মাসি একটু বিভ্রান্ত।

—"না না, দিদিমণিকে।" বিন্দু কারেক্ট করে দেয়—"পুপদিদির মাকে দিয়েছে।"

—"কিন্তু আশীর্বাদ তো পুপসির।"

—"আশীর্বাদের সঙ্গে যোগ নেই। লোকটা বলে গেল, দিদি নাকি অনেক তুকতাক জানেন। ওর অনেক উপকার করেছেন। তাই। কৃতজ্ঞতা জানাতে।"

—"তুকতাক জানে? আমাদের শমি? তাই কৃতজ্ঞতা জানাতে? হায় কপাল! কই, কী ঘড়ি? দেখি?" নির্দয় হাতে বড়মাসি প্যাকেট খুলে ফ্যালেন। দুটিই টাইটান। গ্যারান্টির কাগজপত্তর সমেত। হাজার দেড়েক মতো লেগেছে দুটো মিলিয়ে। তিনটি চিঠি আছে ভিতরে। একটা দীপুমামাকে। ঝাড়গ্রামের কোয়ার্টারের মাপ, ট্যাপ সমেত নেমন্তন্ন। যে কোন শুক্লপক্ষে। আরেকটা পুপসিকে। আশীর্বাদ। আরেকটা শমিতাকে। তুকতাকের জন্যে ধন্যবাদ। দুটো ঘড়িই তার একার জন্যে। বাজেটে যেহেতু দুটোই কুলোলো, তাই। বড়মাসি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

—"যত্তো উন্মাদ পাগলের কাণ্ডকারখানা। এখন শমি এই ঘড়ি নিয়ে কী করবে?"

শমিতা এসে ঘড়ি দেখে প্রায় কেঁদে ফেললে। "ছি ছি! এখন আমি কী যে করি? এ-পাগলা যে সত্যি সত্যিই ক্ষ্যাপা বড়দি? পরে দীপুর ঐ ম্যাপটা দেখে দেখে ঝাড়গ্রামে গিয়ে ঘড়ি ফেরৎ দিয়ে আসতে হবে। খবর্দার পুপু, ও-ঘড়িতে তোমরা হাত দেবে না। ওগুলো কিন্তু আমাদের নয়।"

দুটো ঘড়ির একটা ছেলেদের, একটা মেয়েদের। শিবুমামা বললেন, "আশীর্বাদে একটা রবিকে, একটা পুপুকে দিয়ে দাও, চুকে যাক ল্যাঠা। ওর বোধহয় সেটাই মনের ইচ্ছে। নইলে দুটো দিল কেন?"

বড়মাসি বললেন, "সেই যদি ইচ্ছে হবে তাহলে সেইটে বললেই পারতো? শমিকে দিলে কেন?" দীপুমামা এসে ঘড়ি দেখে নির্বাক। তারপর বললে—"একটা তুমি রেখে দাও দিদি। দুটোই ফেরৎ দিও না। দুঃখ পাবেন ভদ্দরলোক।"

—"অন্যটা আমাকে দিয়ে দাও—এই তো বলছিস?" বড়মাসি টিপ্পনি কাটেন।

—"নাঃ। তা বলিনি। অন্যটা ওকে ফিরিয়েই দিতে হবে। সত্যিকারের পাগল। হুঁঃ, কতরকমই মানুষ আছে পৃথিবীতে।" তারপরেই গেয়ে ওঠে—"হায় দিল—মুশকিল—জীনা য়াঁহা—ওরে কানাই রে, এককাপ চা করবি বাবা?" চটি ফটফট করে দীপু রান্নাঘরে চলে যায়, সম্ভবত দেশলাই চুরির অসৎ উদ্দেশ্যে।

শমিতা যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছে। তারই ভেতর খেয়াল করে ঘড়িদুটোকে আলমারিতে তুলে রাখে। তারপরেই ছোটে—"ওরে? কুলপির জন্যে বরফ আনা

BanglaBook.org

হয়েছে? বাবু? বাবু ফিরেছে মিষ্টি নিয়ে? ও যখন তেওয়ারীতে কুলপি আনতে যাবে, তখনই তোরা কেউ বরফটা আনিয়ে রাখবি।"

পঞ্চম অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য

গাড়ি থেকে পুপসি নামলো যখন, চেনা যাচ্ছে না। শাড়িতে গয়নায় চন্দনে ঝুমকোয় কমপ্লিট করে। না, কোনো দোকানে করে সাজাতে মেয়েকে নিয়ে যায়নি শমিতা। মাসে-মাসিতে-জেঠিতে মিলেই যা পেরেছে সাজিয়েছে। দোকানে করে সাজানো ওর ভালো লাগে না। একবার শমির এক বন্ধুর ভায়ের বিয়ের দিনে, দল বেঁধে 'করবী'-তে চুল বাঁধতে গিয়ে ভারী করের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। সেও চুল বাঁধতে গেছে। ঝুটি-করে-চুল-বাঁধা সেই অপ্রস্তুত করেকে দেখে আবধি শমি ঠিক করেছিল—নেভার। —পুপসি নামতেই হুলুধ্বনি, শাঁখ বাজলো। মেয়ে আসতে একটু বিলম্ব হয়েছে। ছেলের বাড়ির পুরুতমশাই ছেলের আশীর্বাদ শুরু করে দিতে ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলেন। ধুতিপাঞ্জাবিতে শোভিত ববিকে চেনা যায় না। ছেলের বাবা মা কাকা মামা সবাই উপস্থিত। মেয়ের বাবাও অলরেডি প্রেজেন্ট। কিন্তু মেয়ের বাবা রাজি হননি। রাজি হননি কেননা আশীর্বাদে কনের পিতার 'জেশচার'টাই যে করা হবে না তাঁর। ঘড়ি বোতাম কিছুই তো ওখানে নেই। সব মেয়ের মার সঙ্গে আসবে। পুরুত বললেন মন্ত্রের সঙ্গে ধানদূর্বাই যথেষ্ট। মেয়ের বাবা বললেন, যেহেতু উনি মন্ত্র পড়বেন না, ধানদূর্বো তাই যথেষ্ট নয়। তাছাড়া মেয়ের মা-ই উপস্থিত নেই। এত খেটেখুটে সব ব্যবস্থা সে করেছে, সে থাকবে না।?

—"কিন্তু লগ্ন যে পেরিয়ে যাচ্ছে?"

—"ধুত্তোর লগ্নের নিকুচি করেছে—"

উদ্বিগ্ন ছেলের বাবার কানে কানে মেয়ের বড়মামু বলেন—"একটি কথার দ্বিধা থরোথরো চূড়ে/ ভর করেছিলো সাতটি অমরাবতী/ একটি নিমেষ দাঁড়ালো অভ্র জুড়ে/ থামিলো কালের চিরচঞ্চল গতি।" এসব লগ্ন কদাচ পার হয়ে যায় না মশাই, ওদের আগে আসতে দিন। একা একা কি এনগেজমেন্ট জমে?"

—"মণিকাঞ্চনযোগ পেরিয়ে যাচ্ছে—অমৃতযোগ অবিশ্যি আছে কিছুক্ষণ" — ব্যস্ত হয়ে পুরুতমশাই জানান।

—"অমৃতই তো আসল মশাই, মৈত্রেয়ীর কথাটা মনে করুন না? মণিতেই বা কী হবে আর কাঞ্চনেই বা কী হবে। যেনাহং নামৃতস্যাম তেনাহং কিমকুর্য্যাম? মণি, কাঞ্চন এসব তো বাহ্য"—ভুল সুধীন্দ্রনাথ থেকে অশুদ্ধ উপনিষদে চলে যান বড়মামু, আর কব্জির ঘড়ির দিকে গোপনে ব্যস্ত দৃষ্টিপাত করতে থাকেন। ইতিমধ্যে হুলুধ্বনি। শঙ্খধ্বনি।

ছেলের বাবা-মা-কাকা-মামাদের আশীর্বাদ প্রথমে হলো।। নির্বিঘ্নেই হলো। কাকা

কোনো গণ্ডগোল করেনি। কেবল রবি মেয়ের হাতে গয়নাটা পরাতে পারেনি, বন্দনার সাহায্য লেগেছে। এবার মেয়ের বাড়ির পালা। মেয়ের বাবা বললেন মন্ত্র তিনি পড়বেন না, তবে বাবা হিসেবে একটা আশীর্বাদী জেশচার করতে চান ঘড়িটা ছেলের হাতে পরিয়ে দিয়ে। শিবতোষ সস্নেহে রবির হাতটি টেনে নিয়ে দেখে, সেখানে আরেকটা ঘড়ি আছে। ওটা পরে আসার কথা ছিল না। ভুল করে পরা হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি ঘড়িটা খুলে রবি পকেটে ভরে ফ্যালে। ফাঁকা কব্জিতে কৃতজ্ঞচিত্তে শিবতোষ ঘড়িটা পরিয়ে দেয়। রবি প্রণাম করে। ধানদূর্বা দিতে দিতে শিবতোষ খেয়াল করে ছেলের হাতে water resistant লেবেলটা সেঁটে গেছে। সময়মতন ওটা খোলা হয়নি। ওটা ওঠানোর কথা ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ সব আলো নিবে গেল। লোডশেডিং। "ভয় নেই—জেনারেটর আছে"—শিবুমামার গলা। "পুপসি, গয়নার বাক্সগুলো দেখিস" —বড়মাসির গলা।

—"রূপোর জিনিসগুলো সামলে"—শমিতার ভাঙা গলা। হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠে। দেখা যায় কনে দুই হাত দু'পাশে ছড়িয়ে আগ্রাণ গয়নার বাক্সগুলো সামলাচ্ছে। বর রূপোর দীপদানটা চেপে ধরে আছে। পুরুতমশাই রূপোর থালাটা আগলে আছেন। একমুহূর্তে সবাই অট্ট হাসি হেসে ওঠে। দৃশ্য বটে।

এবার মেয়ের মায়ের পালা। তাঁর কপাল ভালো। Water resistant মার্কামারা জামাই ক'জনের ভাগ্যে জোটে? তিনি বসতেই পুরুতমশাই বললেন, "আপনিও তো মন্ত্র বাদ?" শমিতা বলে—"না। আমি মন্ত্র পড়ব।" ঠাকুরমশাই চন্দনে একটা রজনীগন্ধার বৃন্ত চুবিয়ে ওর হাতে দেন। উনবার যে মন্ত্র পড়ান, তাতে যে আশীর্বাদের কী আছে তা শমিতা বুঝতে পারে না। "ওঁ সুবাসিত ভব" আবার কেমন ধারা আশীর্বাণী? যাঃ। সেই যে পুপসি বলেছিল তত্ত্বের সময়ে ডিওডোর‍্যান্ট কেনার কথা, শমিতার সেইটে মনে পড়ে যায়। শমিতা ধানদূর্বো নিয়ে, প্রাণভরে বাংলায় মনে মনে আশীর্বাদ করতে থাকে—"ভালো থেকো বাছারা, বেঁচে থেকো, শান্তিতে থেকো, আনন্দে থেকো, তোমাদের এই ভালোবাসা, এই বিশ্বাস, যেন কোনোদিন ফুরোয় না।" বলতে বলতে ধানদূর্বো বোতামের বাক্স সবই সে রবির মাথায় রেখে দেয়। পুরুতমশাই বাক্সটা নামিয়ে, খুলে, ছেলের হাতে তুলে দেন।

এবার মেয়েকে আশীর্বাদ। কি জন্মদিনে, কি বিজয়ায়, কি পরীক্ষার সময়, মেয়েই আগে মাকে প্রণাম করে, তার উত্তরে মা আশীর্বাদ করেছেন। এবারের প্রণালীটা বিপরীত। মেয়ে চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে আছে। মাকে আগে আশীর্বাদ করতে হবে। মা পুরুতের দিকে তাকান। মন্ত্রের আশায়। মন্ত্র বলে আশীর্বাদ করতে হবে। কিন্তু মন্ত্র? ঠাকুরমশাই চুপ করে আছেন। মেয়েকে আশীর্বাদের কোনো মন্ত্র টন্ত্র বলছেন না। শমিতা হাঁটু গেড়ে বসে। চন্দনের বাটিতে কড়ে আঙুলটা ডুবোয়। মনে মনে ভাবতে থাকে—এবার কী করা? আঙুলটা কখন মেয়ের কপালে ঠেকে গেছে। হঠাৎ শোনে মেয়েই মাকে হেলপ করছে। পুপসি গুনগুনিয়ে মন্ত্র বলে

দিচ্ছে—"মেয়ের কপালে দিলুম ফোঁটা যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা/ মেয়ে যেন হয় লোহার ভাঁটা—" যারপরনাই কৃতজ্ঞচিত্তে শমিতাও বলতে থাকে: "মেয়ে যেন হয় লোহার ভাঁটা।" ঠাকুরমশাই হঠাৎ আপত্তি করে ওঠেন—"আরে, আরে ওটা কী বলছেন? ওটা নয়, ওটা নয়, বলুন—"

বাইরে তখন ভরা পূর্ণিমার জোয়ার ডেকেছে। টুনিবাল্বগুলো লতায় পাতায় মিষ্টি হাওয়ায় হেলেদুলে ঝিকিমিকি চোখ টিপে বলছে, "পুসিসোনা ভালো থেকো, ববিবাবু ভালো থেকো"— চরাচরপ্লাবী জ্যোৎস্নায় আহ্লাদে ঢলঢল লেকের জলের শামুকগুলো হেসে গলাগলি করে বলছে, "পুপসি, সুখী হও, ববি, সুখী হও", আর বৃদ্ধপূর্ণিমার পূর্ণচাঁদ ওদের ওপরে অজস্র জ্যোছনার ধানদূর্বো ছড়াচ্ছে। তার যেটা চিরকালের 'জেশচার'।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বসন্‌মামা
ও অন্যান্য গল্প

স্পটলেস স্পটেড ডিয়ার

রঞ্জনের বসনমামাকে দেখেছেন? আমিও দেখিনি। তবে জানি। রঞ্জনকে যে জানে, রঞ্জনের বসনমামাকেও তার না জেনে উপায় নেই। রেলগাড়ির গার্ড তিনি, ছোট্টো খাট্টো মানুষটি, কালো কোট সাদা পেন্টুলুন, বুট-মোজা, নাকের ডগায় নস্যি আর আগায় নিকেলের চশমা, মাথায় অল্পস্বল্প চুল, অথবা অল্পস্বল্প টাক (যে যেদিক থেকে খুশি ভাবতে পারেন।) এই বসনমামা রঞ্জনদের বাড়িতে ভি. এস. পি.; যখনই আসেন, বাড়িটাকে উথাল পাথাল করে দিয়ে যান। ভি. এস. পি. মানে 'ভেরি স্পেশাল পার্সন'। রঞ্জন অবিশ্যি নিজেও যদুমদু নয়। সেও এক জন ভি. ভি. এস. পি—কবিতায় সে প্রেমিকার বর্ণনা লেখে—'টেলিফোনের মতো কালো'। তার পায়ে একবার বোতলফটফটি রোগ হয়েছিল। পায়ে সোডার বোতল দড়ি দিয়ে বেঁধে ঘটাং ঘটাং ঘোরাতে ঘোরাতে সে কলেজে এল। মাস্টারমশাইরা জিজ্ঞেস করতে বলল পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা—বোতলফটফটি অসুখ করেছে। ওটাকে সারাবার জন্যই পায়ে বোতল বেঁধে বেড়াতে হচ্ছে, ও রোগের এটাই একমাত্র টোটকা। সেই শুনে চ্যাটার্জি স্যার ওকে আরেকটা টোটকা দিয়েছিলেন—সাতদিনের জন্য লিখিতভাবে সাসপেনড করে। তাতেও এই রোগটা বেশ সারে দেখা গেল। আর একবার ওদের বাজপেয়ী স্যারের ক্লাসে রঞ্জন বাঁ হাত দিয়ে বুক পকেট থেকে ডাল-ভাত বের করে গেরাস পাকিয়ে খাচ্ছিল, আর ডান হাতে বিদ্যুৎগতিতে ক্লাস নোট লিখছিল। বাজপেয়ী স্যার আরো মন দিয়ে ওর ভাত-খাওয়া দেখবেন বলে পুরো দুমিনিট লেকচার দেওয়া বন্ধ রেখে চুপ করেছিলেন। তখনও অতি-মনোযোগী রঞ্জন বিদ্যুৎবেগে নোট লিখেই গিয়েছিল ডাল-ভাত খেতে খেতে। এই রঞ্জনের যখন-তখন প্রাণে হঠাৎ ফূর্তি জাগে। আর জাগলেই সে ঘটাৎ করে তক্ষুনি রাস্তায় উগরাজি খায়। তার ফলে কোঁকড়া চুলে প্রায় কাগজের কুচি আমের খোসা বিড়ির টুকরো লেগে গেলেই রঞ্জন তক্ষুনি চটপট উবু হয়ে বসে রাস্তার ধারে হাইড্র্যান্টের পবিত্র গঙ্গাজলে 'ওম দেবী সুরেশ্বরী সুরধুনী গঙ্গে' বলে চট করে মাথাটাকে ধুয়ে শুদ্ধ করে ফেলে। পকেটে সিগারেটের পয়সা ফুরিয়ে গেলেই, রঞ্জন জামাটা খুলে উবু হয়ে হেঁটে ফুটপাতের লোকদের তাড়া করে ইনিয়ে বিনিয়ে ভিক্ষে করতে থাকে। পনেরো মিনিটেই পয়সাটা উঠে আসে। কেউ কিছু বললে রঞ্জন বলে—

'নবানাং মাতুলক্রম, জান না? আমি তো আমার বসনমামারই নেফিউ।'

যে মাতুলের কল্যাণে রঞ্জনের এহেন গুণপনা, সেই বসনমামা হলেন রঞ্জনের মৃতদার হাবাণ জ্যাঠার অতি আদুরে ছোটো শালা। রঞ্জনের বাড়িতে তাঁর একটা পার্মানেন্ট ঠাঁই হয়ে গিয়েছে। কলেজে এসে রঞ্জন যেদিনই বলে 'আজ বাড়িতে কেলেংকারি কাণ্ড।' সেদিনই আমরা বুঝে নিই বসনমামা এসেছেন। তারপর রঞ্জন গল্প শুরু করে।

আপনারা আমাকে দোষ দেবেন না, বসনমামার গল্পগুলো যদি বিশ্বাস না হয়, তো রঞ্জনের দোষ। এসব তো আর আমার গল্প নয়। রঞ্জনের। বসন্তমামা আমার মামাও নন। রঞ্জনের। তবে ঘটনাগুলো সত্যি এবং সত্য সর্বজনের সম্পত্তি এ অধিকার অবিসংবাদিত। কেবল বসন্তমামা আপনি যেখানেই থাকুন—দয়া করে এ গল্পটা পড়বেন না। সুখের বিষয়, রঞ্জন এখন কলকাতাতে নেই—ব্যাঙ্গালোরে। নইলে ওকেও বারণ করতাম।

একদিন বসন্তমামা এসে বললেন—'বিরাট এক্সিডেন্ট হইয়া গেল—ট্রেন লইয়া যাইতেছিলাম গোমো। আংগুল কাইট্যা দুই খান।' —'সেকি! সেকি! সেকি!' বাড়িশুদ্ধু লোক মুহূর্তে সে ঘরে জড়ো হয়ে গেল—'দেখি! দেখি!' বুড়ো আঙুলের গোড়ার কাছটা দেখালেন বসনমামা, হাতের পাতাটি উঁচিয়ে। সত্যিই স্টিচের দাগ রয়েছে।

'কী করে হল, কী সর্বনাশ!'

—'হইল! যেমুন কইর‍্যা হয়। জানলার ধারে বইস্যা আছি, মেইল ট্রেইন, কাজ নাই হাতে। চান্দনী রাইত, ফুরফুর করতাছে বাতাস, চান্দ টান্দ দ্যাখতাছি, কফি-চা খাইতাছি, এট্টা পোয়েট্রিক্যাল মুড আইয়্যা গেছে। সাডেনলি আইল ল্যামপোস্ট। মাইরল ধাক্কা! শাটার পইর‍্যা গেল হাতের উপর। রক্ত গঙ্গা বইয়্যা গেল। দিলাম চেইন টাইন্যা। কিন্তু মেইল ট্রেনের ড্রাইভার তো হুড়হুড়াইয়া গেল চইল্যা সাত মাইল। ড্রাইভারের কামরায় সিধা চইল্যা গিয়া কইলাম—স্টপ ইট। থামাও ট্রেইন। ব্যাক ইট। কর ব্যাক। খাস অ্যাংলো ড্রাইভার তো, ইংরাজী ছাড়া কিসুই বুঝে না। ওলড ফিংগার লষ্ট। বুড়া আংগুল কাইট্যা লাইনে পইর‍্যা গেছে। পিক আপ ফিংগার। ড্রাইভার খুব সৎ লোক—তৎক্ষণাৎ ব্যাক কইরা চইল্যা আসল সাত মাইল, হেই ল্যামপোস্টের ধারে। নামলাম লম্ফ দিয়া। শালার টর্চে কুলায় না এমুন ঘুরঘুইট্যা আঁধার। জ্বালাইলাম লণ্ঠন। লাইনের ধারে হঠাৎ ড্রাইভারেই কইল—'হুব রে। হুব রে। ফিংগার ফাউনড। লং লিভ দি ফিংগার!' দৌড়াইয়া গিয়া দেখি, বাঃ। লাইনের ধারে পইর‍্যা আমার সাধের বুড়া আংগুল টিক টিক টিক টিক করতাছে। টিক টিক। টিক টিক! য্যান ডাকতেছে। '—কই আঙ্গুল উঠাও?'

উঠাইলাম আংগুল। লাগাইলাম দৌড়। তিন মাইল দৌড়াইয়া একদম সিধা সদর হসপিটাল। সিঁড়িতে পৌঁছাইয়াই 'জয়হিন্দ' বইল্যা আছড়াইয়া পড়লাম ফিট হইয়া। মুঠায় আংগুলডা কিন্তু শক্ত কইরা ধইরাই আছি! এদিকে সিঁড়ি তো রক্তে ভাইস্যা

BanglaBook.org

যায়। য্যান হুড্ডু ফলস। ক্যাবোল হেইডা দেইখ্যাই দুইডা নার্স সেন্সলেস হইযা পডল।

জ্ঞান যখন ফেবল দেখি নার্সবা হক্কলে আমারে ডাকতাছে 'মিষ্টাব ফিট' কইবা। পৈতৃক নামডা তো আব কইতে টাইম পাই নাই। আগেই ফিট হইযা গেছি।

মবগ্যান সাহেব হইল আমাগো জিলা ডাক্তার। খাস অ্যাংলো। দুই টুকবা আংগুল মুহূর্তের মধ্যে জোড়া লাগাইযা একখান কইর‍্যা দিল। ওঃ, কী সেই সুই, মেজদি। গুণসূচেব লেইগ্যা মোটকা একখান সুই। ফটফট কইবা দিল আংগুল সিলাইযা। সেই থিক্যা মরগ্যান সাহেব আমারে কী নামে ডাকেন কন তো দেহি? 'মিষ্টার সেপাবেট'। সদব হসপিটালেব নার্সবা অহনও আমাবে কয—'মিস্টাব ফিট', আব ডাক্তাবে কয, 'মিস্টাব সেপাবেট'।'

এমন সমযে হাবাণজ্যাঠা বললেন, 'কিন্তু বসন্ত, তোমাব বুড়ো আঙুলেব পিছনে তো কোন স্টিচেব দাগ দেখছি না? পুবোটায তো কই সেলাই পডেনি, পিছন দিকটা তো আস্তই বযেছে।' বসনমামা খুব রাগ-বাগ মুখ কবে বললেন—'আংগুলটা ছিন্ন হইযা গ্যালে কি ভাল হইত জামাইবাবু? পুবাটা সিলাইলেই আপনি খুশি হইতেন? আংগুলডা আস্তই আছে দেইখ্যা আপনেব তো গ্লাডই হওযা উচিত, খুশি হইবেন তা না, উলটাইযা দোষ ধবতেছেন—'কই বসন পুবাটা কাইটা ফ্যালাও নাই ক্যান'?'

মঞ্জুটা বোকা, সবসমযে গোলমাল কবে। সে বলে ফেলল—'পুবোটাই যদি না কাটলো, তবে 'মিস্টাব সেপাবেট' নাম দিল কেন তোমাকে সাযেব ডাক্তাব?' আব সন্টুটা পাজি। সে বলল—'তাহলে তুমি সাত মাইল মেলট্রেন ব্যাক কবিযে এনে বেললাইনেব ধাব থেকে কী কুড়িযেছিলে তখন, বসনমামা? যেটা টিকটিক টিকটিক কবছিল?' চোখ পাকিযে গলায ভযাবহ সুব এনে বসনমামা বললেন—'আবে, য্যায্যা—সন্টুটার বড্ডই ফুটানি হইছে দেখি? ক্যাবোল বডদেব মুখে মুখে কথা? এক্কাব চাঁটাইযা বডি-মুণ্ড সেপাবেট কইবা দেমু তোমাব। অকালকুষ্মাণ্ড। যাক, মেজদি, শোনেন একটু এইদিকে। বাসায় আমবা কযজন? আপনি, আমি, সেজদা, জামাইবাবুব কথাডা আলাদা, বঞ্জু, মঞ্জু সন্টু—মোট ছয। ছযজনাব জন্যে ছয দ্বিগুণে, বাবো, আব ধবেন জামাইবাবুব জন্য চাব—ষোলোটা। আব সদা-পচা-মেস্ত্রীব জন্যও যদি একটা একটা কইব্যা ধবি—আহা বাতদিন আইস্যা বান্নাঘবে বইস্যা থাকে তো—ষোলো প্লাস থ্রী, হইল উন্নিশটা, আর ওযান ফাউ—বিশ। বাস। না, ষোলো না, মেজদি—বিশ। বিশখান টোটা দ্যান দেহি মেজদি, বিশটা ঘুঘু আইন্যা দিমু। আমাব টিপ তো জানেনই। এক্কেবে সেই বাল্মীকীব ব্যাধ—আব বসন্ত এই বটব্যাল। ইণ্ডিযা নাম্বার ফাইভ ছিলাম নাইন্টিন ফর্টি সিক্সে। ওযালটাব টমসন ছিল ওযান, পাতৌদি টু, গোয়ালিযব থ্রী, মিস মে ফোব, বসন্ত ফাইভ। দিনকাল গেসে বটে। হুঃ। যাক—

টোটা দিবেন বিশটা, ঘুঘু পাইবেন বিশখান। ব্যস। সিধা হিসাব। অখন থিক্যাই রুটি বানাইতে থাকেন। আর গরম মশল্লা আদা পিঁয়াজ পিষিযা বাইখেন। বিশখান ঘুঘুব গবম মশল্লা। পিঁযাজ বগুনই প্রায কিলো দুয়েক লাইগা যাইবো। রঞ্জু-মঞ্জু-

সন্টু। সদা পচা-মেস্তীরে অহনই কিস্যু কইস না। মঞ্জু তুমি মায়েব সাথে লাইগ্যা পড়— মশল্লা পিষিয়া দাও আব আটা মাইখ্যা দাও। সন্টু-রঞ্জু, বড় বড কযডা ব্যাগ ল' দেখি, ব্যাগ লইয়া আমাগো সাথে সাথে আয। ঘুঘুগুলান ভইব্যা আনবি। মেজদি জামাইবাবুবে ক'ন যাইয়া—বিশখান টোটা, বিশটা ঘুঘু। জামাইবাবু টোটা দিতে এত ভয় কবেন ক্যান কন তো দেখি? এই ঘুঘু মাইরবাব ছরবা দিযা কি হিউম্যান মাবা যায়? নো, নেভার। স্বযং দাবোগা হইযা গুলিগোলায় এত ভযডা কিসেব লেইগ্যা?'

অনেক ঝোলাঝুলিব পবে বঞ্জনেব জ্যাঠামশাযেব কাছ থেকে পনেবোটা টোটা পাওযা গেল। জ্যাঠামশাই বললেন, 'বিশখানা ঘুঘুব দরকার হবে না। সাতটা পাখি হলেই অনেক হবে। বাকিগুলো থাক এক্সট্রা।' বসনমামা কেবল গম্ভীব হযে বললেন —'ও কে।'

'ফিপটিন টোটাজ, ফিপটিন ঘুঘুজ। নো মোব, নো লেস। অ্যাজ ইউ সো, সো ইউ বীপ। আর চইল্যা বঞ্জু-সন্টু। প্রত্যেকেব দুইটা কইব্যা। জামাইবাবু ইনক্লুডেড। অনলি টু।' সাড়ম্ববে আদা পেঁযাজ বাটা হতে লাগলো, রুটি গডা হতে লাগলো, বেলাও বাড়তে থাকলো—রুটিতে রুটিতে বান্নাঘর উপচে পড়লো, ঘুঘু আব আসে না। শেষে দুটো ভাতে-ভাত বেঁধে বেলা তিনটেয় বাড়ির লোকদের খাইয়ে দিলেন মা।

বঞ্জু-সন্টু-বসন্তমামা ফিরলেন, বেলা তখন পড়ে এসেছে। বাডির সামনে পাট ক্ষেতেব পিছনে সূর্য অস্ত যাচ্ছেন, আকাশ লাল। মঞ্জু-বাবা-সদা-মেস্তী-প্রত্যেকেই বাগানে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। দাওয়ায় জ্যাঠামশাই, রঞ্জনের মা-বাবা। এমন সমযে পাটক্ষেতের আলের ওপারে বসন্তমামার শোলাব হ্যাট দেখা গেল।

ক্রমশ পুরো বসন্তমামা, কালো কোট, সাদা পেন্টুলুন, বন্দুকসমেত। ক্লান্ত,গম্ভীর। পিছনে রঞ্জু-সন্টুব হাতে চাবটে পেটফোলা ব্যাগ—ভযংকর ফুলে আছে। বাঃ। বাডিতে ঢুকে বসন্তমামা বিনা বাক্যে সোজা হাত পা ধুতে চলে গেলেন, বন্দুকটা জ্যাঠামশাযেব কোলেব ওপবে আলগোছে নামিযে বেখে। মেস্তী-মঞ্জু-সদা-পচা ব্যাগেব ওপবে ঝাঁপিযে পডল।—ক'টা? —ক'টা? সাত, দশ? নাকি পনেরোটাই? উত্তবে সন্টু শুধু বলল —মা, খিদে পেযেছে কিন্তু. খেতে দাও। আব বঞ্জু বলল—উঃ কী কাদা রে বাবা।

দুজনেব পাযেই হাঁটু পর্যন্ত কাদা।

—এত কাদা কী কবে মাখলি?

—ঝিলেব ধারে ঘুবে ঘুবে—

—ঝিলেব ধারে ঘুঘু কি রে?

—ঘুঘু না, হাঁস।

—হাঁসও এনেছিস বুঝি? কতগুলো?

—নাঃ। হাঁসগুলো খুব চালাক। ভারি পাজি।

BanglaBook.org

—আব ঘুঘু? কটা ঘুঘু পেলি?

—ঘুঘুও নেই। নেই মানে ঘুঘুই নেই কোথাও।

—চাষীবা বলল এ তল্লাটে ঘুঘু হয না।

—ঘুঘু পাসনি মোটে?

—ঘুঘু পাসনি? সমবেত আর্তনাদ হয।

—কী এনেছিস তাহলে? তিতিব? কাদাখোঁচা?

—পাটপাতা।

পাট-পাতা! পুনবায সমবেত আর্তনাদ নির্গত হয।

—ক্যান? পাইটপাতা শুইন্যা অমন কাতবাইযা ওঠলা ক্যান? পাটপাতা কিছু খাবাপ খাবাব? খাইছস কখনও? বসন্তমামা হ্যাটকোট খুলে বেখে লুঙ্গি পবে এসে বসলেন। শোনেন মেজদি—এই লইযা আইলাম পাইটপাতা। চমৎকাব কচি কচি টাটকা তাজা পাইটপাতা আনছি, একেবে 'গাবডেন ফ্রেইশ' যাবে কয়—এইবাব বাইন্ধেন গিযা—মশল্লা তো সব পেযাই আছে. এই অকাল কুষ্মাণ্ডগুলাবে একবাব দ্যাখাইযা দ্যান দেহি পাইটপাতা কী রূপ সুখাইদ্য! —আইজকাব মেনু হইল: পাইটপাতাব ঘণ্ট. পাইটপাতাব ডাইল, পাইটশাক ভাজা, পাইটপাতাব ঝোল, পাইটপাতাব ঝাল. পাইটপাতাব ডালনা. পাইটপাতাব বডা. পাইটপাতাব কালিযা আব পাইটপাতাব টক —ব্বাস। কমপ্লিট। খাইযা দ্যাখ ব্যাটাবা, ফ্রেশ ভেজিটেবুলেব স্বাদ কী। ও বস্তু তোবা তো জন্মেও খাইস নাই। আব মেজদিব হাতেব পাইটশাক। আহা স্বর্গেব দ্যাবতাবাও খাইতে নাইম্যা আসে।

জ্যাঠামশাই ইতিমধ্যে এসে পড়েছেন অকুস্থলে—তা মেজবউমা যতই ভাল বাঁধুন পাঁচব্যাগ পাটপাতা খেলে কেবল দেবতাবাই স্বর্গ থেকে নেমে আসে না —মানুষবাও স্বর্গে উঠে যায। অ্যাজ ইউ সো. সো ইউ বীপ—পনেবোখানা টোটা খসিযে তোলা পাটশাক—ও কি হজম কবা সোজা কথা. মাই ডিযাব ব্রাদাব-ইন-ল?

পাটপাতাব ফিস্ট দেবাব হপ্তাখানেকেব মধ্যেই বসন্তমামা হৈ হৈ কবে আবাব এসে পড়লেন। সদব থেকেই প্রবল হাঁক—মেজদি। মেজদা। কই সব? জামাইবাবু। বঞ্জু-মঞ্জু-সণ্টু। সদা-পচা-মেন্তী। কাবে আনছি দ্যাখ। মেজদি, দ্যাখেন। কী আনছি আপনেব লেইগ্যা! হরিণশিশু। আহা, এতটুকু মা-হাবা শাবক. বনে বনে পথ হাবাইযা ঘুবতাছিল। আমি কইলাম—'ব, তোবে মাযেব কোলে লইযা যাই।' ধবেন মেজদি. হবিণ শাবকেবে কোল দ্যান। মাতৃহীন মৃগশিশু অবোলা প্রাণী। দুগ্ধ পোইযা। সব্বাই ছুটে এসে ঘিবে দাঁড়িযেছে বসন্তমামাকে।

কই হবিণশিশু? কোথায় হবিণছানা?

—এই তো।

কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে বসন্তমামা ছোট্ট একটি হবিণছানা বেব কবেন

BanglaBook.org

—'জুউলাজিক্যাল সারভে-র ফিলডওয়ার্ক পার্টি উড়িষ্যার ফরেস্টে যাইয়া বনে বনে হরিণ তাড়া করতাছিল। একপাল হরিণকে অন্য বনে তাড়াইয়াই দ্যাখে এই শিশুটা আছে পইব্যা। কী আর করে? ফ্যালাইয়াও তো যাওন যায় না, আনতাছিল সাথে কইব্যাই। জু-গারডেনে দিবার লেইগ্যা। আমারই ট্রেইনে! আমি দেইখ্যা কইলাম —আহা মা-হারা-হরিণশাবক—আমারে দ্যান, আমাগো মেজদির প্রাণে বড় দরদ—আর বাসায় বেশ জমিনও আছে। পোলাপানগো খেলার সাথীও হইবো, শকুন্তলার মত। লইয়া আসলাম ব্যাগে কইব্যা। সিধা আপনের বাসায়।' সবাই অসম্ভব খুশী। হারাণজ্যাঠাও একবার হাত বুলিয়ে গেলেন। মাতৃহীন হরিণশাবককে ভাল না বাসবে এ হেন চামার কে আছে ভুবনে? কাকীমা বললেন—দুগ্ধ পোষ্য বাচ্চা, গরুর দুধ খাবে তো? নইলে হরিণের দুধ কোথায়?

—আরে খাইবো খাইবো—ফিডিং বটলে দিবেন, ঈষদুষ্ণ কইর‍্যা।

—খৈরী বাঘটাও তো খাইত। বাঘে যদি গরুর দুধ খায় হরিণে খাইবো না ক্যান? এই বয়সে বাঘেরও যা, হরিণেরও তাই। দুধের বেলায় বোঝলেন মেজদি, বাঘে-হরিণে ফারাক নাই।

—দুধ ছাড়া কিছু—?

—হ' তাও দিবেন। কচি তৃণ, আর পদ্মমধু। কচি কচি তৃণ তো বাগিচাতেই পাইবেন, দূর্বা হইলেই ভাল আর পদ্মমধুড়া কাশ্মীরে ভাল হয়। আইচ্ছা, আমিই আইন্যা দিমু'খনে। (গ্রামোদ্যোগেও পাওয়া যায় অবইশ্য)। আর যদি পদ্মমধু নাই হয়, তাইলে আসামের কমলামধুও ভাল। আমাগো নিমের মধুড়াও খারাপ না। নিম খুব স্বাস্থ্যকর। মধুড়া খাঁটি হইলেই হইল, ব্যাস। কোন ফুলের মধু হেইডাতে ইনফ্যাক্ট অধিক পাট্রিকুলার না হইলেও চলে। তবে কচি তৃণটা কম্পালসারি। দুধের সাথে। জন্মদিনে সন্টুকে 'বুক অব অ্যানিম্যালস' দিয়েছেন তার মাসী। তাই সন্টু বলল —এটা কোন জাতের হরিণ, বসন্তমামা? সন্টুর ইন্টারেস্টটা স্পেশালাইজড।

—ইনডিয়ান স্পটেড ডিয়ার। নাম শোনস নাই? চন্দনবিন্দুর মতো ছিট ছিট পিঠ? মারীচ যে স্বর্ণমৃগ হইছিল না। ছবি দ্যাখছস তো, হেইডা ছিল ইনডিয়ান স্পটেড ডিয়ার। এইরাও তাই।

মঞ্জুটা সর্বদা যা করে, তাই করল—কিন্তু স্পট কই? চন্দনের ফোঁটার মতো দেখা যাচ্ছে না তো?

—দ্যাখবা, দ্যাখবা। বড় হইতে দ্যাও? গরু কি শিং লইয়া জন্মায়? পাখি কি পালক লইয়া জন্মায়? তুমি কি ঐ বেণীডা লইয়া জন্মাইছিলা? বড় হইলে হরিণের স্পট হয়।

বসন্তমামার ঘুঘু না-মারার লজ্জা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল। মাতৃহীন মৃগশিশু নিয়ে মেতে উঠল ছেলেবুড়ো সব্বাই। কচি তৃণ, ফিডিং বটলে ঈষদুষ্ণ গরুর দুধ, খাঁটি মধু—সবই যোগাড় হয়ে গেল। বাগানে খেলে বেড়ায় ইনডিয়ান স্পটেড ডিয়ার।

BanglaBook.org

আপাতত অবশ্য স্পটলেস। মূক প্রাণী। দুদিন গেল। সতু গয়লার ছেলেটা এসে বলল—এটাকে কবে আনলেন? 'আঃ আঃ চুক চুক' বলে হাতের একগোছা খড় এগিয়ে দিল। মঞ্জু ধড়ফড় করে ছুটে এল—ওকি! ওকি! খড় দিতে নেই, খড় দিতে নেই—

—কেন? দিতে নেই কেন?

—ও তো ইনডিয়ান স্পটেড ডিয়ার, ও কেবল পদ্মমধু দিয়ে কচি তৃণ আর কুসুম কুসুম গরম দুধ খায়।

—ইনডিয়ান কী হয়?

—স্পটেড ডিয়ার।

—তার মানে কী?

—তার মানে হরিণ।

—হ—রি—ণ? — সতুর ছেলে হাঁ হয়ে যায়। তারপরে বলে—খাঁটি তো ভেবেছি বুঝি—কী আশ্চর্য। হরিণছানাটাকে ঠিক—। আমি তো আগে কখনো হরিণছানা দেখিনি, তাই ভেবেছি বুঝি। এমন সময়ে দেখা গেল মৃগশিশু নিজেই খড়ের আঁটি টেনে নিয়ে খড় খেতে শুরু করে দিয়েছে। দেখেই মঞ্জু ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপরে—

—ছিঃ ছিঃ খায় না। খায় না। অসুখ করবে যে—দাপাদাপিতে হরিণ ছানার নরম শরীরে বোধ হয় ব্যথা লেগে গেল। মঞ্জুর তো ওজনটি কম নয়। ছানাটা কঁকিয়ে উঠল—

—বব্যা। —এ্যা। —এ্যা।। আর সতুর ছেলে চেঁচিয়ে উঠল। —ছাগলছানা। ছাগলছানা। যা ভেবেছি তাই। হরিণ না আরও কিছু।

শুনেই মঞ্জু মর্মবিদারক এক কান্না জুড়ল—এবং মা-হারা মৃগশিশু তাকে সান্ত্বনা দিলো—'ব্যা-এ্যা-এ্যা,' 'ম্যাঁ-অ্যা-অ্যাঁ'—

পরদিন বসন্তমামা এলেন। হাতে মধুর শিশি।

—'কই, গেলা কই সব? মৃগ শিশুগ্যা কই? মৃগশিশু আইজ আছে কেমন? খাইতাছে কী? এভেরিথিং অলরাইট?' গোমড়া মুখে রঞ্জন বেরিয়ে এল—তোমার স্পটলেস স্পটেড ডিয়ারের কথা বলছ? ভালই আছে।

—পদ্মমধু লইয়া আইলাম। খাঁটি কাশ্মীরী মাল। কচি তৃণ, ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ—সন্টু উত্তর দিল—সব, সব খেয়েছে। খড়টড়ও দিব্যি চেয়ে চেয়ে খাচ্ছে। মধু আর লাগবে না মনে হয়। ইতিমধ্যে মঞ্জু ঝড়ের মতো এসে বলল—

—হরিণছানা, না ছাই। বিচ্ছিরি ব্যা ব্যা করছে—

—কী? কী কইলা? বসনমামা মঞ্জুর মতোই মর্মাহত হন। ধীরে ধীরে হাতের মধুর শিশিটা পকেটে ভরে রাখেন। ওষুধ কিনে ছুটে ছুটে হাসপাতালে এসে রোগীর মৃত্যু সংবাদ পেলে লোককে যেমন দেখায়, তাঁকেও তেমনি দেখাল।

BanglaBook.org

—ব্যা ব্যা করতাছে হবিণশিশু? মাই গড!! তাবপব মুখে আব বাক্য সবল না তাঁব। নিঃশব্দ কাতব বসন্তমামাকে ঘিরে ক্রমশ রঞ্জু, সন্টু, মঞ্জু, সদা, পচা, মেন্টী, কাকীমা, কাকাবাবু, হাবাণ জ্যাঠা—সবাই মিলে মা-হাবা মৃগশিশুব এই ব্যাকবণ নিযে একসঙ্গে ভযানক বেগে প্রচণ্ড উচ্চ গ্রামের আলোচনা শুরু করে দেন। শুনতে শুনতে, বসন্তমামা হঠাৎ মাথা থেকে হ্যাটটা খুলে নিযে তাতে জোবে চাঁটি লাগিযে ফটাফট টেবিল চাপড়ানোব মত শব্দ কবে বললেন—বাস! বাস! —ঢ্যাব হইসে। নাউ স্টপ। নো কমপ্লেইনিং। ওকে, হবিণশিশু ভাল না লাগে তো কাইট্যা খাও! ফিনিশড? মেজদি—আইজ বাতেই বানাইয়া ফ্যালান, শত্রুর শ্যাষ বাখতে নাই। হবিণশিশু হইযা ব্যা কইবা দিসে। ব্যাটা বেইমান।

BanglaBook.org

মেহেবুব টেলার্স

(ক্যালকাটা নাইন)

বঞ্জন এসে বলল—'বাব্বাঃ, যা বিশ্রী কেলেংকাবি হতে চলেছিল আজ। উঃ! আবটু হলেই থানায নিয়ে যেত।'

'কী বে, কী হয়েছে?'

'বসনমামাব কাণ্ড! সেই যে গত সপ্তাহে যে কোটেব কথা বলেছিলাম না,তাবই জেব মিটল আজ।'

গত সপ্তাহে বঞ্জন বলেছিল বটে একটা কোটেব ঘটনা। তাবপব থেকেই খুঁজছিল ক্যালকাটা নাইনটা কোথায।

'পেলি না কি ক্যালকাটা নাইন?'

'পেলাম না? ওঃ, সে কী পাওযা! মেহেবুব টেলার্সও পেযেছি।'

আমি ববং বঞ্জনেব গল্পটা গোডা থেকেই বলি। ঠিক ও যেমন কবে বলেছে, তেমনি।

'বসন্তমামাব গায়ে সেদিন দেখি এক কালো কোট। গার্ডের ইউনিফর্মে রোজ যেমন কোট পবেন প্রায তেমনিই, কেবল এটার বোতামঘরায, পকেটে, আব হাতাব মুখে জবিব কাজ কবা। অনেকটা বাজা-বাজডাব মতো, বা ব্যাণ্ডপার্টিব লোকেদেব মতো। ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠলেন।

'রঞ্জু-মঞ্জু-সন্টু! কই সব? দেইখ্যা যা, কো-ট! সদা-পচা-মেন্টী! আয় এই দিকে, কো-ট!'

সদা-পচারা পাশের বাড়িব। ওবা ছিল না, বঞ্জু-মঞ্জু-সণ্টু দৌড়ে এলো তিনজনে।

'কই কোট? কোট কই?'

বসনমামা ফ্যাশন মডেলেব মত কোমবে দুই হাত বেখে ঘুবে নিলেন গোড়ালিতে ভর দিযে। ঘূর্ণি থামিযেই ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন কবলেন—

'দ্যাখছস? দারুণ না? পাক্কা ইংলিশ কোট। গোবা সাহেবেব কোট বইল্যা কথা।'

তাবপব কোটেব তলাব দিকটা দু আঙ্গুলে তুলে বললেন।

—'কাপডখান দ্যাখ একবাব। খাইস বিলাতী টুইড। এক্কেবে হীটাব ফিট কবা। কাঞ্চনজঙ্ঘাব গাযে পবাইযা দিলে কাঞ্চনজঙ্ঘা গইল্যা যায়। ছুইযা দ্যাখ একবাব। হাত লাগাইলেই লণ্ডন বেডাইবাব সুখ হয।'

আমবা সবাই অমনি একসঙ্গে ঝুঁকে পড়ে একটু কোটটা ছুঁলাম। কম্বলেব মতো কুটকুটে। এই নাকি লণ্ডন?

তাবপব ব্যাযামবীবেব মতো দুই হাত নিজেব দুই কাঁধে বেখে মাসল দেখানোব ভঙ্গিতে বললেন।

'পুট দ্যাখ পুট। এক্কেবে পাবফেক্ট।'

ঠিক যেন বলছেন—'দ্যাখ কী বাইসেপস, দ্যাখ কী ডেলি দ্যাখ হাতে আমাব।'

'আব সেন্ত?' বলে ডান হাতটা সামনে দিকে ঘুষি মাবাব ভঙ্গিতে বাড়িযে দিলেন স্যাৎ কবে। —'দ্যাখ সেন্ত দ্যাখ।'

আমবা সবাই অমনি একটু পিছিয়ে গেলাম একসঙ্গে। মঞ্জুটা বলে ফেলল —'ওখানে আবাব সেন্ত কোথায? সেন্ত তো ঘাড়ে না কাঁধে কোথায যেন হয।'

'ওই একই হৈল।' বসনমামা একটু লজ্জা পান বোধ হয।

'যাঁহা বাযান্ন তাই হৈল গিযা তেপান্ন, যাবে কয হাতা হোই তাবেই কয সেন্ত। তুই আমাবে টেইলাবিং টার্মস শিখাস? দুই দিনেব বৈবাগী ভাতেবে কয অন্ন। ওঃ—'

বসনমামা বেগে যাচ্ছেন দেখে মঞ্জু বলে, 'সবি, আব বলব না।'

খুশি হযে বসনমামা আবাব শুরু করেন 'কী কইতাসিলাম? ওঃ হ্যাঁ, সিলাই। সিলাই দ্যাখছস? সুইসুতাব কামডা কী ফার্স্টক্লাশ? আব পকেট দ্যাখছস? পকেট আব বুতামঘব? এক্কেবে জবিদাব কাশ্মীবী শাল। ফাইন এমব্রযডাবি, বোঝলা? এইযা সহজ কাম না! পযসা লাগে। আব দ্যাখায কী? হাইক্লাশ। য্যান নিজামেব সিপাই।'

কিছুক্ষণ ড্রামাটিক এফেক্টেব জন্য চুপ কবে থেকে বসনমামা বলেন—

'এইবাবে ঝুলটা দ্যাখ। পাবফেক্ট ঝুল। জাস্ট আপটু থাই।' হাত দিযে টেনে টুনে কোটটা খানিকটা নামান বসন্তমামা। বলেন—

'ওঃ কী ফিটিং! য্যান বাঘের গাযে বাঘেব চাম। অল পাবফেক্ট।'

আমাদের কিন্তু কেমন কেমন লাগে। মনে হয একটু ছোটই হযেছে। হাতদুটোও কেমন খাটো খাটো। খুশিতে ভাসতে ভাসতে বসনমামা কিন্তু এবাব বোতামে ঢলে যান।

BanglaBook.org

'বুতাম দ্যাখছস? বুতাম? ভাল কইব্যা দেইখ্যা ল'। জার্মানীর বুতাম। চামড়াব। হিটলাব যে ইহুদিব চামড়া দিয়া বুতাম বানাইত? সেই স্টাইল। অবশ্যই ইহুদিব চামড়াব না। বিন্ধ্যপর্বতের নীল গাইয়েব স্কিন।'

মঞ্জু বলল—'চামড়ারই নয় বসনমামা, প্লাস্টিক।'

'চামড়াই না বসনমামা, প্লাস্টিক।' বসনমামা মঞ্জুকে ভেংচে ওঠেন। 'তর কানটাও তাইলে প্লাস্টিক? দেখুম নাকি টাইন্যা?'

মঞ্জু দুইহাতে কান ঢেকে দূবে পালায়। তৃপ্তি বোধ কবে বসনমামা বলেন—

'মাইয়াডাব এট্টা ধ্যাও চ্যাও নাই। চামড়ারে কয় পেলাস্টিক।...

...এইবার ল্যাপেল দ্যাখ। কতোটা চওড়া। এমুন চওড়া ল্যাপেল আইজকাইল কেউ দ্যাখতেই পাযনা। হে-ই ফর্টিথ্রিতে যখন প্রিন্স অব ওযেলস ইনডিয়া ভিজিটে আইসিল তখনই ফেশন হইসিল চওডা ল্যাপেল কোট। অহন এতটা কাপডই বা খরচা কবে কোন শালা? এই কাটই বা জানে কোন টেইলব? কলাবটা দ্যাখ এইবাব।'

একহাতে কলাবটা উঁচু করে ধবে অন্যহাত পকেটে ঢুকিয়ে ঘবের এধার থেকে ওধাব স্মার্টলি একবাব মার্চ করে এলেন গুজস্টেপে।

'রয়্যাল কাট—এই কাটেবে কয রয়্যাল কাট।'

সন্টু হঠাৎ বলে ফেলল—'ফর্টিথ্রিতে প্রিন্স অব ওয়েলস কে ছিল বসনমামা? ফিফটিথ্রিতে তো দ্বিতীয় এলিজাবেথ রাণী হলেন?' এবং মঞ্জু বলল—'ফর্টিথ্রিতে যুদ্ধ হচ্ছিল, তখন ইনডিযাতে তো কোনো রাজা আসেইনি।'

'শাটাপ। ফুটানি মাইরলে এক থাবড়া দিয়া পিঠ ফ্যাইড়া ফ্যালাইমু। যা বাইবাইযা যা সব। অপোগণ্ডেব দল। মেজদি! ক্যাবল আপনেই শোনেন কোটেব কাহিনী।

স্টার্চ-দ্যাওযা হোযাইট পেন্টুলুনেব উপব এই কোটখান চড়াইযা, হ্যাট মাথায দিযা হাতে ফ্ল্যাগটা লইযা যখন গোমো স্টেশনেব এই মাথা থিক্যা ওই মাথা পর্যন্ত পাযচাবি করুম না মেজদি, পেসেনজাববা কইবো ইওবোপীয়ান গার্ড যাইতাসে বুঝি। সেইসব টাইম তো অবা দ্যাখেই নাই। অবা আব এই কোটেব মর্ম বুঝবো কী কইব্যা।'

বসনমামা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পিছন ফিবে বসার জন্যে চেযাব টেযাব কিছু খুঁজলেন।

মা বলে ফেললেন—

'ও বসন্ত, তোমাব কোটেব পিছনে যে ফুটো?'

'ওঃ, এটা? গুলিব ফুটা। গুলিব। এইটা ফ্রিডম ফাইটেব কালেব কোট তো? ওঃ—মেজদি, কী দিনই গেসে গিযা। পনপন কইব্যা ছুটত্যাসি পথে, পিছে পুলিশ লইয্যা—শনশন কইব্যা ছুটত্যাসে গুলিব ঝাঁক—বনবন কইব্যা ঘুইব্যা পড়ত্যাসে মানুষগুলান সটাসট উনডেড হইয্যা—আব তাগো বুকের বক্তে কালা পিচের পথ বাঙ্গা হইযা যাইত্যাসে—'

BanglaBook.org

হঠাৎ মঞ্জু বলল 'লোকেদেব পিঠে গুলি লাগলে 'বুকেব বক্ত' কেন বলে বসনমামা ?'

এই বে ! আবাব প্রশ্ন ! মঞ্জুটাকে বাঁচাতে সন্টু তাড়াতাড়ি বলে ওঠে--'তুই থাম দিকি মঞ্জু। জানিসনা শুনিসনা সবতাতে কথা। আচ্ছা বসনমামা, তোমাব পিঠে যে-গুলিটা লেগেছিল সেইটেব—'

'আমাব পিঠে গুলি লাগবো ক্যান ? যাইট ! গুলি লাগুক গিযা আমাব শত্রুগো পৃষ্ঠে।' কিন্তু মঞ্জুকে বক্ষে কববে কোন দাদা ! আবাব মঞ্জু বলল, 'কিন্তু তোমাব কোটেব ফুটোটা তো পিঠেব দিকে ?' ওব কথাটায থাবা মেবে বলে উঠল সন্টু 'তোমাব কি তবে বুকেই গুলি লেগেছিলো বসনমামা ?'

অদমা মঞ্জুকে থামায কে ? মঞ্জু চটপট বলে দেয উল্টোকথাটা 'তবে যে তুমি বললে পেছনে পুলিশ নিযে তুমি ছুটছিলে ? পেছন থেকে বুকে কেমন কবে গুলি লাগবে ?' ভীষণ বেগে গিযে বসনমামা জিবে-টাগবায চক্ক চক্ক কবে শব্দ কবে বলে উঠলেন—'আঃ হা ! আমাব বক্ষে গুলি লাগাইযা তোমাগো কামডা কী শুনি ? আমাব দেহে গুলিই বা লাগবো ক্যান ? আমি কোথায কইতাসি চিবস্মবণীয শহীদ ফ্রীডম ফাইটাবগো কাহিনী, আব তোমবা কও কেবলই আমাব কথা। আমি কি শহীদ ?'

সন্টু চুপ কবে যায। কিন্তু মঞ্জু চুপ কবে না 'কিন্তু কোটেব ওই ফুটোটা'—

'আঃ। কোটে ফুটা ত' আমাব কী ? তার কথা আমাবে জিগাও ক্যান ? কোটেব ফুটা কোটেব ফুটা।' বসনমামা বিবক্তমুখে জানলা দিযে বাইবে তাকিযে থাকেন। এই উত্তবে কাবও মুখে আব কোনো কথা যোগায না। চমৎকৃত হযে চুপ কবে যাই প্রত্যেকে। এমনকি মঞ্জুও। সকলেই মনে মনে একটা যুৎসই প্রশ্ন ভাবছি, এই বিচিত্র উত্তবেব মানেটা কী কবে জেনে নেওযা যায ? এমন সমযে কখন হাবাণজ্যাঠা ঘবে ঢুকেছেন।

জেঠিমা মাবা গেছেন সেই ক-বে ! তাব এই অতিআদুবে ছোট ভাইটি জ্যাঠাবও অতি আদবেব। সেই সূত্রেই আমাদেব মামা বসনমামাকে দেখেই খুব খুশি হযে হাবাণজ্যাঠা জিগেস কবে বসলেন—'বাঃ ! বেড়ে জবিদার কোট ত ? —কোথাস বানিযেছ বসন্ত এমন কোটখানা ?'

'এই তো জামাইবাবু ল্যাখাই আছে'—চট কবে হেসে দিযে, পিছু ফিবে চেযাবেব মত হযে আধো-বসে পড়েন বসনমামা।

কলাবটা উল্টে ফেলে তলা থেকে একটা লেবেল দেখান। সঙ্গে সঙ্গে মুখস্থ আউড়ে যান—'দ্যাখেন, ল্যাবেল দ্যাখেন, মেহবুব টেইলার্স, ক্যালকাটা নাইন।'

'ক্যালকাটা নাইনটা আবাব কোনদিকে ?'

'তা জানে কেডা ? আমি তো বেলেব গার্ডমানুষ। অ্যাড্রেস আপনে বরং পোস্ট অফিসের পিওনরে জিগান গিয়া। আমি জানি স্টেশনের খবর। বাস।'

BanglaBook.org

'সেকি? তোমার দর্জি, তুমি জাননা কোন্ পাড়া?'

'আমাগো দরজি কেডায় কইল? আমাগো দরজি তো যতীন বাবু, বাহাব টেইলার্স, ক্যালকাটা টুযেণ্টিনাইন।'

'তাহলে এই কোট?'—'

অধৈর্য হয়ে বসনমামা বলেন—'আহাঃ এতো কোট কোট করেন ক্যান? কোটের আমি জানি কী?'

'—মানে?'

'—মানে, কোট কি আমার?'

'—তবে কার কোট?'

'—হেইডাই বা আমি জানুম কী কইব্যা?' এবার হাবাণজ্যাঠা স্পষ্টত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন।— 'তার মানে?' মা, সন্টু, মঞ্জু, সক্কলে মিলে কোরাসে হাবাণজ্যাঠার সঙ্গে গলা মেলাই।

'—তার মানে?'

'—তার মানে?'

'—তার মানে?'

'—আঃ হা। আমি তো এইডা আইজই কুড়াইয়া পাইলাম। কে জানি ফেলাইয়া গেছিল। গার্ডের কামরায়। তা ফাটা ফুটা পুরানা কোট, ওইযা আর ফিরাইয়া নিবে কেডা? তাই ভাবলাম আমিই কোটটা পরি। গরম আছে বেশ। দ্যাখেন, হাত দিয়া দ্যাখেন জামাইবাবু?'

বলে বসনমামা একটু লাজুক হাসেন।

'কই মেজদি, চা হইল?'

এত পর্যন্ত ঘটেছিলো গত সপ্তাহে। রঞ্জন বলল 'তারপরে আজকে কি হলো জানো নবনীতাদি? বললে বিশ্বাস করবে না। এক বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছিলাম আমরা, হঠাৎ চমকে দেখি গলির মুখে একটা ছোট্ট দোকান তাতে সত্যি সত্যি সাইনবোর্ডে লেখা—'মেহবুব টেলার্স, ক্যালকাটা নাইন।' তিনজন দর্জি একটা গ্যারাজে বসে বসে পা-মেশিনে মশারি সেলাই করছে। নীল নীল নাইলন নেটের স্বপ্নের মতো সব মশারিতে ঘরের মেঝে ভর্তি।

আমি দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে ফেলেছি—'আপনারা কি কোটও বানান?'

চিকনের শাদা টুপি মাথায়, মেহেদী লাগানো দাড়ি নেড়ে বুড়ো দর্জি গোল গোল বাইফোকাল লেন্সের নিকেলের চশমা দিয়ে তাকালেন। তারপর বললেন—'না তো। ক্যানো বলুন দিকি?'

'—মানে কোটের গায়ে আপনাদের লেবেল দেখেছি—'

বুড়ো দর্জি হাফপ্যাণ্টপরা ন্যাড়া মাথা সদ্য পৈতে-হওয়া সন্টুকে একবার ভালো করে দেখে নিলেন। তারপর ফোকলা মুখে অপূর্ব এক হাসি হেসে বললেন—

BanglaBook.org

'—কোট তৈবি কবিনা বটে, তবে লেবেল লাগিযে দি।'

'—তাব মানে?'

'—মানে চোবা বাজাব থেকে কোট নিযে এলে, আমবা তাব লেবেলটা পালটে দি আবকি। আগে ছিল একটাকা পাব লেবেল, এখন হযেছে পাঁচ টাকা।' তাব পবে বুড়ো দর্জি নাকি নতুন দাড়ি গোঁপ ওঠা বঞ্জনেব আপাদমস্তক লক্ষ্য কবে, ওব হাতে ঝোলানো কলেজেব ব্লেজাবটাব দিকে তাকিযে, হাত বাড়িযে একটা চোখ টিপে নিচুগলায বলেছিল—'কেন খোকা? আছে নাকি কোট? বেশতো, নিযে এসো, তিনটাকায কবে দিচ্ছি। এ লাইনে পেবথম কাজ বলেই মনে হচ্ছে?'

'—বাপবে বাপ। চোবই ভেবে নিযেছিল ওবা আমাদেব, নবনীতাদি। আবটু হলেই হযত পুলিশে ধবত। বসনমামাবও যেমন কাণ্ড। কোত্থেকে প'বে এসেছেন এক চোবেব ফেলে-দেওযা কোট।' বঞ্জন হাঁপাতে থাকে, আমি হাঁ কবে থাকি। ধন্যি বসন্তমামা। ধন্য তাঁব কোট।

BanglaBook.org

দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ

এবার পুজোব ছুটিতে আমাদেব বঞ্জন অনেকদিন পবে এসেছিল। বেশ গোঁফদাড়ি গজিয়েছে দেখলুম। আরো কিছু খবর দিয়ে গেলো বসন্তমামাব। বঞ্জন বলল:

"সেদিন বিজযা দশমী।

বসন্তমামা হন্তদন্ত হযে ঢুকলেন, ঢুকেই, এক হাঁক পাড়লেন—

"সন্টু-মন্টু-রঞ্জু। এই বাইখ্যা গ্যালাম মহাশঙ্খ। আমি যাইত্যাসি স্নানে। হাত দিবা না কেও। এই কইযা দিলাম। শঙ্খে হাত দিলেই হাত কাইট্যা ফ্যালাইমু। হ। এইয়া যেই-সেই শঙ্খ না। দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ। ডাইনদিকে প্যাঁচ বোঝলা? অবডিনাবি শঙ্খ গুলান কেমুন হয় খ্যাল আছে? লেফট সাইডেড, স-ব লেফট সাইডেড।"

তাকিয়ে দেখি বসনমামাব হাতে এক বিবাট শঙ্খ। সত্যিই বেশ অসামান্য অসামানা দেখতে। হাত উঁচু কবে গোড়ালি তুলে শাঁখটা বসনমামা যত্ন কবে জানলাব মাথায কুলুঙ্গীব তাকে উঠিয়ে বাখলেন। তাবপব মাকে ডাকলেন চেঁচামেচি কবে:

—"মেজদি। যত্ন কইব্যা তুইল্যা বাখেন, আপনেব লেইগ্যাই আনসি। গেসিলাম গোপালপুর-অন-সী। আঃ সে কী ফাশ ক্লাস সী বিসর্ট। য্যান সাউথ অফ ফ্রানসে যাইযা পড়সি পথ ভুইল্যা। সী সাইডে, মানে সমুদ্রের কূলে কূলে বঙ্গিন ছাতায় ছাতায় ছত্রাকার। প্লেন থিক্যা দেখায় য্যান শত শত মন্টি কলব ঝিনুক পইর‍্যা

আছে। আব ছাতির নিচে? ছাতির নিচে নিচে ক্যাবল ম্যাম আর সাহেব। সাহেব আর ম্যাম। মেমগো আবাব লাজলজ্জা নাই—বড়ই বেশরম। সাহেবগুলা তাও মন্দের ভালো। তাই বইল্যা আমিই কি কম? কী কন মেজদি? আমিই কি কম যাই? আমিও বইস্যা পড়লাম ছাতির তলায গাও এলাইয়া —দিলাম দুই পাও টেবুলে তুইল্যা। আ-হ। নাকেব ডগায সবুজ গগলস ঝুলতাসে, মনে মনে একটা-অস্ট্রেলিযান টিউন হামিং কবতাসি—এই টিউনটা সমুদ্রে স্কাইলাব ভাইঙ্গা পডাব সময় দারুণ পপুলার হইসিলগা অস্ট্রেলিয়ান নেভীতে—আব কোলের উপব এট্টা বংচঙ্গা ইংবাজী নবেলেব পাতা উল্টাইযা উল্টাইযা যাইত্যাসি, কতকটা আউট অব মাইণ্ড—মানে কতকটা অন্যমনস্ক হইয়া আব কি—এমন সমযে আইল এক ষণ্ডাগণ্ডা অস্ট্রেলিযান সাহেব। পবনে এইটুকু একখান কালা মতন গেঞ্জীব জাঙ্গিযা—মোরাবজীব গঙ্গাসাগব স্নানেব জাঙ্গিযাডাব থিক্যাও ছোটই হইব তো বড না—আব এই বড় একখান দেহ—শ্বেত হস্তীব লেইগ্যা শাদা মাংসেব পাহাড—

এই সমযে মা বললেন—"স্নানে যাবে না, বসন্ত?"

বসনমামা বললেন—"এই যাই মেজদি—"

কিন্তু আমবা তখন অদম্য হযে উঠেছি।

—"এখন না বসনমামা এখন না, আগে বলে যাও কী হলো—তাবপব সেই সাহেব—?" —বসনমামা এবাব চৌকিতে পা তুলে বসলেন। তাচ্ছিল্যেব ভঙ্গিতে হাতটা উল্টে আব ঠোঁট বেঁকিযে বললেন—

—"অইব আবাব কী? কিসুই না। সাহেব আইয়া আমাবে কইল—"গুড মবনিং ছাব।' আমিও মুখ থিক্যা পাইপটা নামাইযা নড কইবা সিরিযাসলি কইলাম—"গুড মরনিং সাব" —কিন্তু পাও নামাইলাম না। দেইখ্যা সাহেব কইল—"আমি কি বসতে পাবি? মে আই সিট ডাউন?"

আমিও কইলাম,—"বস না বস, তুমি আমাগো দ্যাশেব অতিথি বইল্যা কথা। সিট ডাউন, সিট ডাউন।" সাহেব তো আমাব ইংলিশ শুইন্যা এককেবে হকচকাইযা গেসে। কইল "তুমি কী গানটা গাইসিলা? চিনা চিনা কইব্যা শুনা যায?" আমি মৃদু হাইস্যা কইলাম "সাহেব আপন দ্যাশেব জাতীয় সঙ্গীত চিনো না? এইটা তোমাগো সমুদ্রে স্কাইল্যাব পতনেব সমযকাব গান—" সাহেব তখন এত খুশি, নীল নীল চক্ষু দিযা নীল নীল পানি গডাইযা পডে— কয "বাঃ ঠিক! এইযা আমাগো দ্যাশেবই গান বটে! আমাগো দ্যাশেব ভাটিযালী সঙ্গীত!" সাহেব কয়—"আমি তো নাবিক, আমাগো বক্তে এই গান খেলা কইব্যা বেডায়। কিন্তু তুমি ইণ্ডিযান হইয়া এই গান শিখলা কী কইর‍্যা?" আমি বলি—"সাহেব, আমি নাবিক নই, কিন্তু বাঙ্গালদ্যাশেব পোলা, আমরা হইলাম পানির পোকা— পানির বেপাবে আমাগো লগে তুমি পারবা না—" যেইনা কইসি, সাহেবটা খটাং কইর‍্যা বাজী ধইর‍্যা বসল—"বেট? চল, ডুব সাঁতাব দেই, দেখি কে কী তুইল্যা আনতে পাবে সাগরের তল থিক্যা।" আমিই

BanglaBook.org

কি ছাড়ি? কইলাম— "হোয়াই নট? ক্যান কাটুম না ডুবসাঁতাব?" সাহেব কইল — "ও কে পার্টনার। কামান, সুইম। সুইম।" আমিও তৎক্ষণাৎ "গড ইজ গুড, জয় মা কালী।" কইয়া পরনের তৌলিয়াখানই দিলাম ছুঁইড়্যা সমুদ্রের তরঙ্গে, তারপর —"চল সাহেব, ধরি গিয়া" —বইল্যা ঝাঁপ দিয়া পড়লাম জলে। মারলাম এক ডুব।

"ও। সে কী গহীন গাঙ। ডুবত্যাসি, ডুবত্যাসি, ডুবত্যাসি—তলকূল আর মিলে না। শ্যাষে একেবারে অতলে যাইয়া দেখি, গুচ্ছ গুচ্ছ প্রবাল, আর মাদার অফ পার্লের শুক্তিগুলার লগে খেলা করতাসে আমার সাধের তৌলিয়া। সে কী বিউটি তোমরা বোঝবা না। হেলিয়া দুলিয়া যেন লুকোচুরি খেলতাসে। মস গ্রীণ জলজ উদ্ভিদের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারতাসে আমার হলুদ তৌলিয়া। আর তৌলিয়ার লগে খেলা করে কে? কেডা খেলে? কইত্যা পার? এই সন্টু, তুই না ক্লাশে ফার্শটি বয়, তুইই ক—কেডা খেলে?"

সন্টু ঘাবড়ে গেল। ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়ল। ভয়ে ভয়ে। ছোট হলেও মগুটা চিবকেলে সাহসী। সে বলল—"কে খেলছিল বসনমামা? মৎস্যকন্যা?"

—"আরে ধুর। বসনমামা এক হাত নাড়াতেই মগু খতম। "মৎস্যকইন্যা হইলে কি আর আমারে দেইখ্যাও ওয়েট করত? করত না। নিঘাত পলাইত। আরেঃ, মৎস্যকইন্যারা যে বড় লাজুক হয়। বোঝলা না? অগো লাজুক না হইয়াই উপায় নাই।"

এই সময়ে আবার মা ব্যস্ত হয়ে বললেন—"বসন্ত, তুমি স্নান করতে যাবে না?" বসনমামা বললেন—"আরেঃ—যাম যামু, স্নানের ডিসকাশনই তো করতাসি। অবগাহন স্নান। এইয়া আপনের কল খুইল্যা টুপুর টাপুর গোছল না। হুঁ। তারপর সমুদ্র তলে যাইয়া দেখি, আমাগো তৌলিয়ার লগে খেলা করতাসে—এই, এই বিরাট শঙ্খগগ্যা। অঃ হো। সে কী ব্রাইটনেস মেজদি। রাশি রাশি মণি-মুক্তার জ্যোতিরে মলিন কইর‍্যা দিতাসে এইয়ার অমলিন শুভ্রতা। সপ্তসিন্ধুর রত্নরাজি যেন শরমে মুখ লুকাইতাসে বালুর শয্যায়। আর জলমধ্যে শতদল পদ্মফুলের মতো সগৌরবে শোভা পাইতাসে—এই শঙ্খ। বাসস। লইয়া আইলাম তীরে। ভুস কইর‍্যা ভাইসা উইঠ্যাই দেখি সাহেব। লাল নীল ছাতির নিচে বইস্যা বইস্যা বড় বড় শ্বাস ছাড়তাসে। আমারে দেইখ্যা কইল— "ওফ! তুমিই দ্যাখাইলা বটে। বিনা অক্সিজেনে জলের তলে পাক্কা বিশ মিনিট?" আমি কইলাম—"এই দ্যাখো সাহেব—পদ্মাপারের প্র্যাকটিস। কই তুমি কী তুইল্যা আনসো দ্যাখাও দেহি? তৌলিয়া তো ধরতে পার নাই জানিই।"

সাহেব কয়—"মাই গড! হোয়াট সী। হোয়াট ওয়েভ।" এই উত্তাল তরঙ্গিত বঙ্গোপসমুদ্রে তো উহারা নামে নাই। ব্যাটার পাঁচ মিনিটেই দম ফিনিস। সমুদ্রবক্ষ থিক্যা কিসুই তুলিতে পারে নাই। আমার হাতের শঙ্খ দেইখ্যা তো সাহেবের চক্ষু স্থির। কয়—"এইয়া আবার কী— হোয়াট ইজ দিস?" ওইয়ারে বুঝাইবার লেইগ্যা তো শঙ্খে লাগাইলাম এক ফুঁ। উ-রি-ব্বাস! এই যে মেজদি শোনেন। এই কইয়্যা

BanglaBook.org

দিলাম হৌল ফ্যামিলিরেই জযেন্ট ওয়ার্নিং দিযা দিলাম—এই শঙ্খে ফুঁ দিবেন না। নেভাব। উফফ। শা-বাশ..সে কী ভোঁ। বাপ রে বাপ। সেই থিক্যাই আমি এই ডাইন কানটাতে স্লাইটলি কমতি শোনতাসি। বঞ্জু, মঞ্জু, সন্টু শুইন্যা দ্যাখো, সদা-পচা-মেন্ত্রীবেও কইযা দিবা—শঙ্খে কেও য্যান কদাচ ফুঁ দিতে যাইও না। সর্বনাশ হইব। ভেবি ভেবি ডেনজাবাস!

"যাইতাসিল এক মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ দূব দিযা। পেন্টিংযেব লাখান দেখা যায। যেই না দিসি শঙ্খে ফুঁ, অমনি গেসে থামিযা। হ, ঐ যুদ্ধ জাহাজ। গেসে থামিযা। সে কী বিবাট শব্দ। সমুদ্রেব জলে ব্রেইক টানসে ত? নিঃশব্দে পিচেব পথেই দোতলা বাস ব্রেইক টাইনলে কত না শব্দ কবে, আব সদা কলকল সমুদ্রে সাত তলা জাহাজ ব্রেইক দিসে—তাব যা শব্দ—ওঃ। জাহাজ তো গেল মধ্য সমুদ্রে স্থিব হইযা, আমাব শঙ্খনিনাদে ভয় পাইযা। তখন আমাবেই সিচুযেশন সেইভ কবতে হইল। চিৎকাব কইর‍্যা কইযা দিলাম—"অল ক্লিযাব। ভয় নাই। স্টেইন্স হিযাব।" হুডাহুডি কইব‍্যা পকেট থিক্যা বাইব কইব‍্যা, দিলাম এই শাদা রুমালডা নাইড্যা" বসনমামা পকেট থেকে নস্যি-ঝাড়া ময়লা ব্রাউন রুমালটা বের কবলেন। মঞ্জু বলে উঠল: —"বাবে? তখন তোমার পকেট কোথায বসনমামা? তুমি তো তখন তোযালে পবে—"

বসনমামা বেগে গিযে বললেন—"মঞ্জুডাব হইসে বডই চিটপিটানি স্বভাব—বডদেব সব কথায কথা কওন চাই। তবে আব কিসসু কমু না। যাঃ। তাব-পর, সাহেব তো আমার শঙ্খের কাণ্ডেণে এক্কেবে পাগল। ক্যাবলই কয়—

—"ওঃ। গ্র্যাণ্ড। গ্র্যাণ্ড। দি গ্রেইট ইণ্ডিযান সী-সাইবেইন। হাউ মাচ?"

"আমি তো স্ট্রেইট কইযা দিলাম—দিমু না সাহেব, এইযা হৈল গিয়া দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ, এ আমাগো বড লক্ষ্মীমন্ত দ্রব্য—এ আমি তোমারে বেচুম না।" সাহেব খালি কয়—"প্লীজ হাউ মাচ? ওয়ান থাউজ্যাণ্ড? টু থাউজ্যাণ্ড? ও কে, —থ্রি?"

আমাব মুখে একই বাইক্য! মাথা নাডতাসি আব ওনলি কইতাসি: "নো সাব। নট ফব সেইল। এইযা আমাগো মেজদিব লেইগ্যা লইযা যামু—বড পয়মন্ত শঙ্খ—"

একটু থেমে বঞ্জন বলল, "আমবা তো ততক্ষণে আশ্চর্য হযে জানলাব মাথায কুলুঙ্গিব খোপে সুরক্ষিত নট ফব সেল দক্ষিণাবর্ত শঙ্খেব দিকে মন্ত্রমুগ্ধেব মতো একদৃষ্টে তাকিযে আছি, বসনমামাও আমাদেব তাকানোটা তাকিয়ে দেখছেন স্নেহ-মুগ্ধ হযে, এমন সময়ে ভীষণ গোলমাল কবতে কবতে একপাল ছেলে ঢুকলো ঘরে।

"জানিস বঞ্জন, কী কাণ্ডই হযেছে প্যানডেলে?"

"ঠাকুব বিসর্জন দেওযা যাচ্ছে না। পুরুতমশাই বেগে কাঁই—বড়দাদেব যাচ্ছেতাই করছেন—"

"বিরাট কেলেঙ্কারী—"

BanglaBook.org

"তুলকালাম কাণ্ড। প্রতিমার অঙ্গহানি হয়েছে।"

"প্রতিমার হাত থেকে না—"

"কে যেন শাঁখটা—"

"চুরি করে নিয়েছে—"

"সেটা না পেলে বিসর্জনই আটকে থাকছে—"

মা অবাক হয়ে বললেন, "কিন্তু ও গুলো তো মাটির শাঁখ হয়, ও শাঁখ চুরি করবেই বা কে, আর কেনই বা করবে?"

এমন সময়ে বসনমামার গলায় যেন কড়কড়াৎ করে বাজ ডাকলো:

—"আঃ —অই তো বইসে। লইয়া যা না তগো ছাদার মাথা শঙ্খ—" নিতান্ত অশ্রদ্ধার সঙ্গে মাথার পিছন দিকে বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে কুলুঙ্গীর দিকে দেখিয়ে দেন বসনমামা। বিরক্ত কণ্ঠে বলেন—"যতত সব লেইট লতিফ—আমি মনে করি বিসর্জনটা হইয়াই গেছে বুঝি। এখন ক্যাবল লবীর অপেক্ষা। পেনডেলে একটি জনপ্রাণীও নাই? ছিঃ।" তারপরে মাকে বললেন—"কই মেজদি, গামছাডা দিয়েন, নানডা সাইব্যা আসি। ওঃ, ভাবি তো একখান মাটির শঙ্খ, হেইয়া না পাইলে নাকি প্রতিমা বিসর্জনই হইতো না। যা-তা একখান ব্লাফ ঝাইড়লেই হইল? আমি বুঝি না ওইযাগো প্যাঁচ?"

আমি বললাম—"বঞ্জন, এটা নিশ্চয় বসনমামার সত্যি ঘটনা নয়। এটা তুমি বানিয়েছ। এ কখনো সত্যি হতে পারেই না।"

বঞ্জন বলল— "বাঃ? আমি বানাতে পারি বলে বিশ্বাস হয়, আর বসনমামা বুঝি বানাতে পারেন না?" বলে বঞ্জন গোঁপের ফাঁকে মুচকি হাসলো।

মূলতানী কামধেনু

বঞ্জন একটু পাগল। বঞ্জনের বসন্তমামা আরো একটু পাগল। হারাণজ্যাঠার অতি আদরের ছোট শালা তিনি। জ্যাঠাইমা মারা গেলেও রঞ্জনদের বাড়িতে তাঁর চিরস্থায়ী প্রবল প্রতাপ। প্রত্যেকবার এলেই একটা হৈ-হট্টগোল পাকিয়ে যান। সেদিন বঞ্জনরা ভাত খেতে বসেছে, বসন্তমামা ঢুকলেন। এক নজর থালার দিকে তাকিয়েই ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, "খায় কী? ভেজিটেবুল? অঃ! ঐতে কিসু না-ই।"

রঞ্জনের মা বললেন, "থাকবে না কেন? কত ভিটামিন..."

"আরে ধুর। হউক গিয়া ভিটামিন। ঐ ভিটামিন তো ঘাসেও প্রচুর। ঘাসই

খাওয়াইয়েন না ক্যান তাইলে পোলাপানগো— গ্রোয়িং চিলড্রেনের লেইগ্যা প্রোটিন চাই, প্রোটি-ন। আব চাই ক্যালশিয়াম। ক্যালশিযামে হাড় শক্ত করব—ব্যালান্সড ডাযেট দ্যান পোলাগো।"

"কেন, মাছও তো খাচ্ছে। মাছমাংসে তো প্রোটিন থাকে শুনি। এই তো কাতলামাছেব মুড়ো দিযে মুডিঘণ্ট করেছি।"

"আবে ধুর। কাতল মাছ? কাতল মাছে প্রোটিন? ওই মাছে কিসুই নাই। ঐগুলান কি আব মাছ আছে মেজদি? মাছ অহন ক্যাবোল তিন প্রকারেব—কই, মাগুব, সিংগি। ব্যস।"

"আর রুই-কাতলা বুঝি মাছ নয়? ব্যাঙ?"

"শোনেন মেজদি, শোনেন। মাছ বইল্যা যেই বস্তুডা কিইন্যা আনেন, কোলড স্টোবেজেব মাল, হেইডা হইল বিষ। বিষ। পিযর পইজন।"

"বিষ মানে?" রঞ্জনেব মাযের একটু ভয়-ভয় গলা।

"বিষ মানে মাবক দ্রইব্য। যা খাইয়া দেহেব একটাও উপকাব নাই, অপকার আছে হাজারখান। ঐ মাছ খাইযা মিত্যু পজ্জন্ত হইতে পাবে। বিচিত্র কিছুই নাই। হে-ই ফর্টিথ্রি-তে তৈযাবি কোলড স্টোবেজ তো? ত্রিশ চল্লিশ বৎসবের পুবানা মাছও থাকা অসম্ভব না। গোবা সৈনাগো লেইগ্যা বানাইছিল, কিন্তু অবা তো মাছই খাইত না!"

"সে কী ভাই? তিরিশ চল্লিশ বছরের মাছ? সত্যি বলছ?" রঞ্জনেব মাযেব গলায ভয আব চাপা থাকে না। বসন্তমামা এবাব তক্তপোশে পা গুটিযে গুছিযে বসেন। সান্ত্বনায দক্ষিণ হাতে অভয়মুদ্রা কবে বলেন, "সইত্য না তো কি মিথ্যা কইতাসি? তবে ভয নাই। ভয পাইবেন না মেজদি, জগতে হেলথ-ফুড অখনও আছে। দুধ। দুধ খাওযাইবেন। খাঁটি দুধ নিজেই একটা কমপ্লিট ডাযেট। দুধ খাওযাইলে পোলাপানগো হেলথ ফনফনাইযা বাইড্যা যাইব।" বলতে-বলতে ডান হাতটা মিস্টাব ইনডিযা স্টাইলে ভাঁজ কবেন। কালো কোটেব স্লিভেব তলায গুলি ফোলে কিনা দেখা যায না।

মা বলেন, "কেন, দুধ তো খায।"

"বতল? বতলেব দুধ তো? সে নামেই দুধ। ইনসাইড স্টোবিডা শোনেন মেজদি। ও দুধ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুধই না, পাউডার, পাউডাব। সযাবীনেব পাউডাব। হেইযাও তো ভেজিটেবুলই হইল? লিকুইড ভেজিটেবুল জুস। আমি কইতাসি দুধেব কথা। পিটুলিগোলাব কথা আপনে কইতাসেন। ফলস তৃপ্তি পাইযা লাভডা কী, কইতে পারেন? সয়াবীনের চচ্চড়ি কইরা খাওয়াইবেন। একই হইব। চীপার পড়ব।"

কাকিমা এই চাঞ্চল্যকব আবিষ্কাবে এতই অবাক, কিছুই বলতে পাবেন না। অবাক চোখে চেযে থাকেন বসন্তমামার দিকে।

বসন্তমামাই আবাব নৈঃশব্দ্য ভাঙেন। "খাঁটি দুধ খাওয়াইযেন, ব্রেইন খুলব।

BanglaBook.org

আহা খাইতে পায় না, তাই তো এমুন অবস্থা। স্কুলে বৎসব-বৎসব ফেইল করতাসে বসিয়া বসিয়া।"

এবারে মা বিরক্ত হন মৃতা বডজা'র আদুরে ছোটভায়েব ওপবে। "ফেল কববে কেন? বালাই ষাট। বছব-বছব তো ফার্স্ট হয়ে ক্লাসে ওঠে ওবা।"

"আঃ, ওই হইল আর কি। কিন্তু চাইয়া দ্যাহেন চ্যাহাবাগুলি কেমুন? দেইখা দাঁতকপাটি লাইগ্যা যায়। সাব সাব বসাইয়া থুইছেন—য্যান এনাটমি ক্লাসেব স্কেলিটন।"

এবার মা'র মুখ অসম্ভব ম্লান আর বসনমামাব গলা অসম্ভব গম্ভীর হযে যায়। "দিদি, টাইমলি কেযাব না লইলেই কিন্তু সর্বনাশ। দুধ খাওযাইযেন, দুধ।"

"বলছি তো, দুধ খাওযাই নিযমিত।"

"আহা আমিও কইলাম তো. ঐ দুধ দুধই না, পিযব ভেজিটেবুল। গরু কিনবেন সাইক্ষাৎ ভগবতী। আইজই দেইখা আইলাম গো-হাটায। হেই সকল গরু তো যাযেন না আপনাবা, দ্যাখবেনই বা ক্যামনে? অ-সা-মা-ই-ন্য! আহা, কী রূপ। এইযা উঁচা শবীব—য্যান মহাদেবেব বৃষ, আব লেজখান কী। য্যান চামবীগাই—পিঠেব মাছি তাডাইতাসে, কী গ্রেসফুলি—য্যান মন্দিবে দেবদাসী চামর ঢুলাইতাসে। আব চক্ষু? কাজলপরা, টানাটানা, উদাস-উদাস, ভাবুক-ভাবুক। আর শিং দুইখান? এ-ই বড-বড—" দুই হাত ওডিশি নাচেব মতো মাথাব ওপবে তুলে ভযানক এক বেড কবে দেখান বসনমামা, "বাইসনেব শিং দিদি, যেন পেযাবাগাছেব শাখা—মূলতানী গরু তো? কালই পাটনা থিক্যা আইনা পৌঁছাইসে। —ড্যাম চীপ—মাত্র তিনশো ট্যাহা। নিবেন নাকি?"

বিকেলেব মধ্যে সববাই বাজি। পবদিন গরু কিনতে যাওযা হল। সত্যি—দেখবাব মতো গরু। ঠিকই বলেছিলেন বসনমামা। কী স্বাস্থ্য। এ গরু মূলতানেব সুলতানী খানা না খেযে হযনি। এই লম্বা শিং, সত্যিই যেন পেযাবাগাছেব ডাল, কী উঁচু বাপবে বাপ। গলায লাল ট্যাসলে সোনাব মতো ঘুন্টিব মালা বাঁধা, আহা, কী রূপ। ঘাড ঘোবাচ্ছে, যেন খোদ মহাবানী ভিক্টোবিযা। আব চোখ? সকলেই মন্ত্রমুগ্ধেব মতো গুটিগুটি গরুব সামনে। বসনমামা হন্তদন্ত হযে এসে পডলেন। "আঃ হাঃ! ও কী কবেন জামাইবাবু? ঐদিকে কই যাইতাসেন? ওই গরু না, ওই গরু না। ওইটা তো গরুই না মোটে। দ্যাখতাসেন না—বলদ? দ্যাখবেন তো চক্ষু মেইল্যা? জোডাবলদ ঐ দিকে, আব গাইবাছুব এইদিকে। নাউ, চুজ। কোনটা নিবেন? গরু চাই? না বলদ?" বসনমামা নিজেব বসিকতায নিজেই হেসে কুটিপাটি হযে টানতে টানতে যেদিকে নিযে গেলেন, প্রথমে সেখানে কোনো গরুই দেখা গেল না। একগাদা মহিষ। তাবপরে লক্ষ কবা গেল একপাশে একটি বেঁটে, বোগা, খযা-খযা, লালচে-কালচে, করুণ, হ্যাংলা ও ম্রিযমাণ গরু, যাব প্রত্যেকটা পাঁজবা গোনা যাচ্ছে। হয তাব শিং ওঠেনি, নয তাব শিং ভাঙা—অর্থাৎ গরু না বাছুব সেটাও ঠিক বোঝা

যাচ্ছে না। —টেরিয়ে টেরিয়ে এদিকে তাকাচ্ছে বাগী-বাগী গোল-গোল, পাগল-পাগল চোখে, —আর মুখময় নোংরা ফেনা তুলে বিশ্রীভাবে জাবর কাটছে। ওটার ধারে-কাছেই যেতে ইচ্ছে করে না। বসনমামা ওখানেই নিয়ে গেলেন সকলকে।

"সাইক্ষাৎ ভগবতী! কামধেনু মেজদা, কামধেনু! এইযার গুণের তুলনা পাইবেন না—রূপ দেইখা ভুলব তো ইডিয়টে। বাঁট থিক্যা দুধ অঝোর ধারে ঝাইরা যায়। বাঁটে পিতলের নিপিল পরাইয়া দিবেন দুধ সামাল দিতে। ভিটামিন, প্রোটিন, ক্যালশিয়াম, ফসফরাস। বোঝলেন মেজদা? কমপ্লিট ডায়েট।"

বাড়িতে আনা হল গরু। রঞ্জনের মা বললেন, "এঃ! এই গরুর কথাই বলেছিলে? তুমি যে বললে এই অ্যাতো উঁচু গরু? মূলতানী না কী যেন—"

"আঃ হা এইটাই তো মূলতানী! মূলতানে কি ক্যাবল উঁচা-উঁচা গরুই হয়? সব দ্যাশেই তো ঢ্যাঙা-খাটো আছে। নাকি? মূলতান থিক্যা আইত্যাসে তো, ট্রাকে কইরা—ঝাঁকাইতে-ঝাঁকাইতে এইযার দেহে আর কিসু না-ই। বাকিটা তো কম না —এইবার খাইয়া-দাইয়া ফের উঁচা হইবো খনে—"

রঞ্জন বলল, "তুমি যে বললে ইয়া-ইয়া শিং? কই বসনমামা, এর তো শিংই নেই?"

"তোমরা চাওড়া কী? কও ত দেহি স্পষ্ট কইরা। শিং ধুইয়া জল খাইতে হয় তো চল, হেই উঁচা বলদটারেই নিয়ে আসিগা—শিং ধুইয়া জল খাও। আর দুধ খাইতে হয় তো এইটারে দ্যাখ। নম্র মধুর স্বভাব, সাইক্ষাৎ সুরভি, কামধেনু। দুধের গাঙ্গে দুধ ভাইস্যা যায়। যাযেন মেজদি, যাযেন, জলদি সিন্দুরডা লইয়া আইসেন, ভগবতীরে বরণ কইরা গৃহে তুলতে হয়—"

সিঁদুর-কৌটো হাতে গুটিগুটি অগ্রসর হবামাত্রই বিনা শিংয়ের গরু ঢুঁ মারতে তেড়ে এল। হুড়মুড় করে পালিয়ে এলেন মা, চোখেমুখে ভীতি। আর কেউই এগোয় না দেখে সিঁদুর-কৌটোটা চেয়ে নিলেন বসনমামাই। বুক চিতিয়ে দাঁড়ালেন। হাতে কৌটো। "আরে দ্যান মেজদি, দ্যান—আমারেই দ্যান। যদিও এসব বরণ-ঠরন করা আমাদের ঠিক সাজে না—মাইয়ালোগেরই কাম।" তারপর বীরদর্পে গরুর দিকে এগোলেন। "আইসো মা লক্ষ্মী, আমাগো ঘরে আইসো! দ্যাখেন মেজদি। এই লইলাম সিন্দুর! এই লাগাইলাম কপালে।" বলবামাত্র বিজলী-চমকের মতো কী একটা ঘটে গেল, মুহূর্তের মধ্যে বসনমামা অদৃশ্য। সেই 'সোনার কেল্লা'য় কামু মুখার্জী যেমন বলেছিলেন—'ভ্যানিশ', তেমনি। ব্যাপারটাও প্রায় একই। কামধেনুর বামগুঁতো তাঁকে পেড়ে ফেলেছে উঠোনে। সিঁদুর-কৌটা ছিটকে পড়েছে একদিকে, নিকেলের চশমা আর একদিকে। আর মাঝখানে বসনমামা গড়াচ্ছেন। গরু ওদিকে ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা স্টাইলে লেজটি তুলে খটাখট খটাখট গ্যালপ করে ধুলো উড়িয়ে সোজা গেটের দিকে ছুটেছে। ভাগ্যিস দড়িটা লম্বা ছিল, তাই হারানজ্যাঠা ধরে ফেললেন। "সিঁদুর পরানো ব্যাপারটা তাহলে বাদই দিয়ে দিই, কী বলো বসন্ত?" বসনমামার

BanglaBook.org

গা থেকে ধুলো ঝেড়ে দিতে দিতে মা সসঙ্কোচে বললেন। বসনমামা উত্তর দিলেন। "তাই থাকুক মেজদি, ফর দি টাইম বিইং। মা লক্ষ্মীর আমার দেখি স্বভাবটা একটু লাজুক আছে।"

গরু প্রথমে বাঁধা হল বাড়ির সামনের আঙিনায়। দশ মিনিটের মধ্যেই জেঠিমার নিজের হাতে পুঁতে যাওয়া সাদা পঞ্চমুখী জবাগাছের মাথাটা আর বঞ্জনের বাবার শখের লতানে আমের গাছের ডগাটা মুড়িয়ে খেয়ে ফেললে, তদুপরি মঞ্জুর দোপাটিগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দিলে। পাড়াসুদ্ধ সাড়া পড়ে গেল, "কী সর্বনেশে গরু রে বাবা। সরাও, সরাও, হটাও, হটাও।"

অগত্যা গরু এল পেছনের উঠোনে। এসেই সে বেদীর তুলসীগাছে গিয়ে মুখ দিল। হাঁ হাঁ করে উঠে ওকে তৃতীয়বার সরিয়ে দেওয়া হল কুয়োতলার পাশের সরু জমিটুকুতে। ওখানে যারামাত্র দ্যাখ না দ্যাখ, তারে হারাণজ্যাঠার গামছা শুকোচ্ছিল, আরাম করে খেতে শুরু করে দিয়েছে। এ কী হ্যাংলা, ছাগলপানা গরু? একে কোথায় রেখে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে? খুব শক্ত খোঁটাতে খুব ছোট্ট দড়িতে প্রায় ফাঁসি দেবার মতো করে বেঁধে রাখা হল। বসনমামা দূর থেকে তাকিয়ে মুখে বললেন, "ছি। অত কঠোর বন্ধন দিতে নাই। গীতা-ভগবতী বইল্যা কথা।" কিন্তু বাঁধন আলগা করারও কোনো লক্ষণ দেখালেন না।

বিকেলে সতু গয়লা এল দুধ দুয়ে দিতে। অমনি বসনমামার রূপ পালটে গেল। ঠিক যেন আর্মি কম্যাণ্ডার। পকেটে হাত গুঁজে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে হাঁক পাড়লেন "বঞ্জু-মঞ্জু-সন্টু। পচা-সদা-মেন্টী। অ্যাটেইননশনন। লাইন বাইন্ধ্যা খাড়াইয়া যাও। কই, মেজদি, প্রত্যেক চাইলডের হাতে হাতে পোয়া-বাটি দিয়া দ্যান, পোয়া-বাটি, একেক বেলায় পাশসের কইরা ...কামধেনু বইল্যা কথা।"

পাড়াপ্রতিবেশীর বাচ্চারাও সব এসে লাইন দিয়ে দাঁড়াল। যেন পঞ্চাশ সালের লঙ্গরখানার দৃশ্য। সেই সঙ্গে কাচ, পেতল, এলুমিনিয়াম, কাঁসা, স্টেনলেসের প্রদর্শনী। সবারার হাতে গ্লাস, কাপ, মগ, বাটি, জামবাটি, কাসি, ডেকচি, সসপ্যান, টিফিনকৌটা। যে যা পেয়েছে এনেছে, কামধেনুর দুগ্ধ খাবে। কৌতূহলী বাপ-মায়েরাও এসে আশেপাশে দাঁড়িয়েছেন। বসনমামা একটা বাটি করে একপো তেল এনে সতুর হাতে সসম্মানে তুলে দিলেন। গবর্নরের হাতে যেমন করে বন্যাত্রাণের ৫০১ টাকা চাঁদা দেওয়া হয়, অনেকটা সেই স্টাইলে। অত দুধ দুইতে হবে, বেশি বেশি তেল লাগবে না, বাঁট নরম রাখতে? অধীর আগ্রহে সবাই চেয়ে আছে। ঠোঁট উলটে সতু বলল, "গরুটার দুধ কোথায়? এ তো মিনিট দুয়েকেই ফুরিয়ে যাবে।" গেলও তাই। মোট এক গেলাস দুধ হল।

বসনমামা চুপ। পুরো একমিনিট উঠোন জুড়ে গভীর স্তব্ধতা। কারুর মুখে শব্দ নেই। সতু গয়লা কটমটিয়ে বসনমামার মুখের দিকে চেয়ে আছে—আর বসনমামা সতুর দিকে। আর উপস্থিত দর্শকবৃন্দ একবার এর দিকে আর একবার ওর দিকে।

কাপ-গ্লাস-মগ ধরা হাতগুলো নেমে এসেছে। বাতাস সীসের মতো ভারী। হঠাৎ বসনমামা উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে ওঠেন, "বুঝছি। বুঝছি। প্রবলেমটা হইল গিয়া কনসেনট্রেশনেব। মেজদি লইয়া আইসেন কলসী, মিশান জল! এই দুধ, কামধেনুর দুগ্ধ। ক্ষীরের মতো ঘন। কনসেনট্রেটেড মিল্ক! ওই সয়াবীন খাওয়া পাকস্থলীতে এমন আনডাইলুটেড কাউজ মিল্ক তো ডাইজেস্টই হইব না। কাইলই ভেটারিনাবি সার্জেনেরে লইয়া আসুম, গরুরে ইনজেকশন দিয়া যদি দুধডা কিঞ্চিৎ পাতলা কবতে পারে। আইজ ববং এককাপ কইরা জলে এক চামচ কইবা দুধ—এই কনসেনট্রেশন থাকুক।"

তাই খেল বঞ্জু-মঞ্জু-সন্টু-পচা-সদা-মেন্টী। সক্কলে! এককাপ জলে একচামচ কনসেন্ট্রেটেড কাউজ মিল্ক। খাবার সময়ে বসনমামা উত্তেজিত হয়ে চেঁচাতে লাগলেন টি. ভির বিজ্ঞাপনের ব্যাকগ্রাউনড-ভয়েসের মতো—"পিযব প্রোটিন, মেজদি, ভিটামিন, ক্যালশিয়াম, ফসফবাস! কামধেনুর দুগ্ধ পিয়র অমৃত—বোঝলেন মেজদি, অমৃত বেশি-বেশি খাইতে নাই। বিন্দুতেই সিন্ধু পবিমাণ!"

পরদিন রাত না পোহাতে দেখা গেল রঞ্জনদের গেটে একজন লোক সাইকেলে ঘন্টি মাবছে। সাইকেল থেকে বেশ কযেকটা বালতি ঝুলছে, তাব গা খালি, হাঁটু পর্যন্ত খাটো ধুতি। ট্রিং ট্রিং কবে ঘন্টি মাবে আর "হেইঃ বাবুঃ" বলে হাঁক পাড়ে। রঞ্জন বেরুল।

"কাকে চাই?"

"গায কিধার ভইল বা? সুই লগানে আযা।"

"সুই?"

"হাঁহাঁ, সুই। নিনজিশান। দুধকা ওয়াস্তে।"

"আপনিই কি ভেটিরিনারি সার্জন?"

"কেয়া ভিটিবিনিটিবি? মেরে পাস ছে-ঠো ভৈস ঔব চাবঠো গাযে ভইল —মুঝকো ভিটিরিনিটিবিসে কেযা কাম? গাযকো সুই লগানা হ্যায় কি নেহী?"

গরুব ঠ্যাং বেঁধে-ছেঁদে দিব্যি সুই লাগিয়ে দুধ দুয়ে দিয়ে গেলেন 'ভিটিরিনিটিরি' গযলা। আবাব সেই পোয়াটাক দুধ হল। এবেলা আর পাড়ার কেউ কামধেনুব দুগ্ধ খেতে আসেনি, মা বাড়ির বাচ্চাদের হবিণঘাটার দুধেব সঙ্গেই ওটা মিশিযে খেতে দিলেন। ওভালটিনেব মতো।

বিকেলে সতু গযলা এল না। তাব কামধেনু দুইবার সময় নেই। অগত্যা তেলেব বাটি নিয়ে বসনমামা নিজেই বসলেন দুধ দুইতে। গায়ের ব্যথাটা এবেলা কিছু কম আছে। কিন্তু সুই লাগানোর বিঅ্যাকশনেই কিনা কে জানে, কামধেনু আজ ভযানক বেগে উঠেছে। তাব হাবভাবে ক্রোধটাই প্রকাশ পাচ্ছে বেশি করে। কেবল গাঁক গাঁক করে বিশ্রী একটা আওয়াজ করছে, আর ট্যারাচোখ দুটো পাকিযে পাকিয়ে কী একরকম করে চাউনি দিচ্ছে, যেটা মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছে না।

BanglaBook.org

হাবাণজ্যাঠা বললেন, "থাক বসন্ত, এবেলা আব দুধ দুইতে হবে না। একটু ববং জমুক। কাল সকালে তোমাব ডাক্তাব এসে দুযে দেবে এখন।"

বসনমামা সেটা শুনবেন? "কী যে ক'ন না আপনে, জামাইবাবু। দুধ দোবেলা না দুইযা নিলে চলব?" তাবপব তৈলাক্ত হাতে বাঁটে হাত দেবামাত্রই গরু জোড়াপাযেব লাথিতে বসনমামাকে শূট কবে পেনালটি কর্নাবেবও বাইবে পাঠিযে দিল ড্রেনে। বঞ্জু-সন্টু-পচা-সদা সবাই মিলে ধবাধবি কবে তাঁকে তুলে প্রথমে নিযে গেল কুযোতলায; বেশ কবে গা ধুইযে, সোজা খাটে। আব হাবাণজ্যাঠা ছুটলেন ডাক্তাবখানায। মা বসন্তমামাকে আবনিকা খাইযে বললেন, "না ভাই বসন্ত, এব চেযে হবিণঘাটাই ভাল ছিল। এ বড অলুক্ষুনে গরু।"

শুযে-শুযে কুঁই কুঁই কবে বসনমামা বললেন, "ছি! মেজদি, ছি! অমন কইবা বলে না—মা ভগবতীবে কুবাক্য কইতে নাই, ভগবতী কুপিতা হইতে পারেন।"

মা ভগবতী ইতিমধ্যে দড়ি আলগা কবে পবম কুপিত একখানি বদনচন্দ্রিমা জানলা দিযে ঘরেব মধ্যে গলিযে দিযে বসনমামাব কচি কলাপাতা বঙেব লুঙ্গিটা আলনা থেকে টেনে নিযে চপব-চপব কবে চিবিযে চলেছেন। দেখতে পেযেই মঞ্জু চেঁচিযেছে, আব তিনিও চটপট লুঙ্গিসুদ্ধ মুখটি বের কবে নিযেছেন। এখন গরুব মুখ থেকে লুঙ্গি কেড়ে নেয কে? কাব এত সাধ্যি! এব চেযে বাঘেব মুখ থেকে হবিণ কেড়ে নেওযাও সোজা। সে কী ভযাবহ রুদ্র মূর্তি। কুপিতা বলে কুপিতা? মাথা নিচু কবে সিংহেব মতো ফুঁসছে, আর থেকে-থেকে লেজটাকে পতাকার মতো উঁচু কবে, ঘুবে ঘুবে গোববছড়া দিচ্ছে সাবা উঠোনময। তাব ধাবে কাছে এগোনো যাচ্ছে না। লুঙ্গি খেতে খেতে বাত্তিব হয়ে গেল। গরুব ফোঁসফোঁসানি কমল না। অন্ধকাবে চোখ দিযে যেন সবুজ আগুন ঠিকবে বেরুতে লাগল। গরুব ভযে অস্থিব হযে মা দুর্গানাম জপতে জপতে দোব-জানলায খিল দিযে শুলেন। বাতবিবেতে কে জানে কী ঘটে?

ভোব হতে না হতেই ট্রিং ট্রিং ঘন্টি বাজিযে ভেটেবিনাবি সার্জন বালতি সমেত হাজিব। কিন্তু গরুব দেখা নেই। সামনেব বাগান, পিছনেব উঠোন, এপাশেব গলি, ওপাশেব জমি গরুখোঁজা খুঁজে অবশেষে সার্জন সাযেব শান্তকণ্ঠে বায দিলেন, "এ বাবু, আপকা গায ভাগল বা।"

দেখা গেল লোহাব খোঁটা উপড়ে, পাঁচফুট উঁচু সলিড ইঁটেব পাঁচিল টপকে বাত্তিব বেলায় গরু হাওযা। চিহ্ন বলতে কেবল কযেক কুচি লুঙ্গি পড়ে আছে। আর কিছু ফুয়েল। নাঃ, মূলতানী গরুই বটে, সন্দেহ নেই আব। মেন্তী বলল মহা খুশি হযে, "এই গরুটাকে নিযেই ইশকুলে নার্সাবি বাইম পড়াচ্ছে আমাদেব, জানো কাকিমা? দ্য কাউ জাম্পড ওভাব দ্য মুন!"

হাবাণজ্যাঠা সসংকোচে শ্যালকেব ঘুম ভাঙালেন, "বসন্ত ও বসন্ত, ইযে হযেছে,

তোমার কামধেনু তো পাঁচিল টপকে পালিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তিনশো টাকা—"

আরামে হাঁপ ছেড়ে মা বললেন, "বেশ হয়েছে, আপদ গেছে। টাকা যায় যাক দাদা, প্রাণটাও যেত যে। সাক্ষাৎ ভগবতী তো নয়, সাক্ষাৎ মহিষাসুর। বাব্বাঃ।"

বসনমামা পাশ ফিরে শুয়ে হাই তুলতে তুলতে বললেন, "যাইতে দ্যান জামাইবাবু, যাইতে দ্যান। 'যাইতে দ্যাও গেল যারা।' বোঝলেন মেজদি, দুষ্টু গরুর চাইতা শূন্য গোহাল ঢের ভাল। ফার বেটার।" তারপর পাশবালিশ জাপটে চোখ বুজে বললেন, "এইবার কুকুর পোষেন জামাইবাবু—কুকুর। বড়ই প্রভুভক্ত জীব। ম্যানস বেস্ট ফ্রেইনড। এই গরুর মতো বেইমান জাত ওয়ার্ল্ডে নাই।"

দাড়ি কামাতে কামাতে হারাণজ্যাঠা আড়চোখে একবার দুষ্টু হেসে শ্যালকের ম্লান মুখটি দেখেন, তারপরে বলেন, "কেন, হর্সও তো ভাল। হর্স ইজ এ নোবল অ্যানিমাল।"

শুনেই বসনমামার একচোখ খুলে যায়। বলেন, "তা কইসেন কথাডা মন্দ না। হর্সকে সইত্যই নোবল অ্যানিমাল কওন যায়।" তারপরেই দুই চক্ষু মেলে হঠাৎ নতুন উৎসাহে পেল্লায় হাঁক পাড়েন, "বঞ্জু-মঞ্জু-সন্টু। পচা-সদা-মেন্তী। ঘোড়ায় চড়বা নাকি? টগবগাবগ-টগবগাবগ পক্ষীরাজ? স্কুলে যাবা? রোজ-রোজ ঘোড়ার পিঠে কইব্যা? লাইক দি প্রিন্স অব ওয়েইলস? বাগানে তো জায়গার অভাব নাই। সইত্য-সত্যই এই ভাংগা ঝড়ঝড়া বাসগুলান শিশু-স্বাস্থ্য একেবারে বটেন কইব্যা দ্যায়, ফিনিশ কইব্যা দ্যায়, মেজদি।"

BanglaBook.org

ডিভাইন পাওয়ার অব এটর্নী বা যোগবিভূতি

"বসন্তমামা এবারে সত্যি সত্যি দারুণ একটা কোয়ার্টার পেয়েছেন দেখলাম, শালবনের মাঝখানে।" বঞ্জন জানালো।

"ব্যাঙ্গালোর থেকে গোমো গিয়েছিলি? ওটা কলকাতার পথে পড়ে?"

"অফিসের কাজেই গোমোর দিকে গিয়েছিলাম, ভাবলাম মামামামী-তুতুমিতুকে দেখে যাই। বাব্বাঃ যা জবর ঠাণ্ডাটা পড়েছে ওখানে। বাড়িটা কিন্তু দারুণ। ঘুরে এসো একবার।"

"কেমন আছেন ওঁরা?"

'একটা নভেলটি দেখলাম এবারে। মামামামীতে প্রলয়ঙ্কর ঝগড়া হচ্ছে। বসনমামার গুলতাপ্পি বসনমামী আর সহ্য করছেন না। নারীমুক্তির বাতাস লেগে

মামী এখন হককথা শোনাতে আরম্ভ করেছেন। যতই হককথা বলেন, ততই দেখি নাহক যুদ্ধ বাঁধে। একেবারে লংকাকাণ্ড চলেছে বাড়িতে।"

"সে কি রে? মামী তো—মানে, মামী কী করেই বা"—

"কীরকম শুনবে? বলছি। এই ধরো, আমি যাবামাত্র বসনমামা জানালেন আগের বাড়ির চেয়ে ঠাণ্ডাটা এবাড়িতে বেশি হবার কারণ এবাড়িটা শালবনের মধ্যে। বনেজঙ্গলেই শীত বেশী পড়ে। আগের বাড়িটা ছিল ফাঁকা মাঠের মধ্যে। তাই ঠাণ্ডা কম পড়ত। একথা শুনেই বসনমামী বললেন—'বাজে কথা রাখো। ফাঁকামাঠে কনকনে বাতাস বয়ে যায় কোথাও বাধা পায় না, ঠাণ্ডা সেখানেই ঢের বেশি।' আর যাবে কোথায়? বসনমামা একেবারে খেপচুরিয়াস! শুরু করলেন—'আছিলা তো কইলকাতা শহরে, শীত-গ্রীষ্মের তুমি জানোটা কী? গাছ বাইয়া বাইয়া শীত নামে তা জানো? আমি জানি। আমি নিজ চক্ষু দিয়াই দ্যাখসি, যখন সেই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে সার্ভিস করতাম, গাছ বাইয়া বাইয়া, গাছ বাইয়া বাইয়া গুড়ি গুড়ি শীত নামতে আছে, আউটারস্টেইস হইতে এই আর্থে। গাছই টাইন্যা শীত নামায়।' সঙ্গে সঙ্গেই মামী বললেন, 'তবে মরুভূমিতে রাত্তিরে অতো শীত নামে কী করে? সেখানে কটা গাছ।' বসনমামা বললেন—'তয় না মাইয়ামানষের বুদ্ধি। ডেজার্ট ক্লাইমেইট। ডেজার্ট ক্লাইমেইট, ডেজার্ট হইল গিয়া অন্য কথা। গাছ নাই বইল্যা শীতও হেইখানে নামে না, শীত ওঠে। বালুকণার থিক্যা বাষ্পাকারে শীত উইঠ্যা আসে, ইন্নার স্পেইস হইতে। ফরেস্টে শীতের ডাউনওয়ার্ড মুবমেইন্ট আর ডেজার্টে আপওয়ার্ড। বোঝলা? এট্টা নামে আউটার স্পেইস থিক্যা, অন্যটা উঠে ইনার স্পেইস থিক্যা। তুমি আর কী বোঝবা সাইন্স? বলদাছাতা?' মামী তাতে না দমে বললেন—'কিন্তু সুমেরু কুমেরুতে? গাছও নেই, বালুকণাও নেই, তবে ঐ দোর্দণ্ড শীতটা আসে কোথা থেকে? ওখানে শীত নামে, না ওঠে? তোমার পাজিতে কী বলে?' বিরক্ত বসনমামা এবার বলেন, 'তুমি কি গাড়ল? এইটাও জানোনা যে মেরু অঞ্চলে শীত উঠেও না, নামেও না, থাকে? ওই দ্যাশে শীত আসেও না যায়ও না। থাকে। হেইডাই হইল শীতের পার্মানেন্ট রেসিডেন্স। হেইখানেই শীত গজায়। আবং দিকে দিকে সার্কিউলেইট করে। —একদিন তুতুমিতুর ম্যাপটা লইয়া বইস্যা সব ফ্যাক্টস অ্যাণ্ড ফিগার্স এক্সপ্লেইন কইরা দিমু অনে। স্কুলে জিওগ্র্যাফি পড় নাই?' মামী—'ধুৎ যত্তো বাজে কথা।' বলে চুল বাঁধতে বসেন।

নেক্সট, কর্নাটকে হাতী আছে কি না এই প্রসঙ্গে বসনমামা বললেন—'হাতী এনিমেল হিসাবে মন্দ না। ক্যাবল লেজে অণুমাত্র হাত লাগলেই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে এই যা। ক্ষিপ্ত হইয়া চাট মারে, আর হাতীর চাট যে খায়, তারে আর অন্নজল খাইতে হয় না।'

শুনেই মামী আপত্তি জানালেন, 'দূর দূর। হাতীতে আবার চাট মারে নাকি?

হাতী কি দুধেল গাই? না ঘোড়া? হাতীতে কক্ষনো চাট মারে বলে কেউ শোনেনি।'

বসনমামা শান্তগলায় বললেন—'তুতুর মা, হাতী হইল এক বিশাল প্রাণী। যেমন কি না ভারতবর্ষ। তুমি অবে একপ্রকার জানো, আমি আর একপ্রকার জানি। এইরকম তো হইতেই পারে। পারে না? সেই অন্ধ, কালা, আর খঞ্জের কাহিনী শুন নাই? অন্ধ, কালা, আর খঞ্জ গেল যাদুঘরে হাতী দেখনের লগে। যাইয়া হইসে কি, শালা অন্ধ তো শুঁড়টা চ্যাইগ্যা ধরসে, ধইরা ভাবতাছে হস্তী হইল বুঝি বরাবের নলের তুল্য, দীর্ঘ, নরম, সর্পবৎ—আর কালা? কালাডা, কালাডা ভাবে কি...' কালার প্রসঙ্গে এসে হোঁচট খেয়ে যান বসনমামা, তারপরেই সামলে নেন, 'কালা অন্য এক ডিফারেন্ট ভিউ দিল, আর খঞ্জের হইল গিয়া আরও এক, থার্ড ওপিনিয়ন। অন্ধ, কালা আর খঞ্জের তো ফিলজফি অব লাইফ এক হইতে পারে না, সুতরাং অগো হস্তীদর্শনও ভিন্ন ভিন্ন হইবেই। ঠিক কি না কও? আমাগো সিচুয়েশনও অনুরূপ—তুমি হইলে গিয়া তুতুমিতুর মা, ফেমিনাইন, আমি অগো বাবা, মাসকুলাইন—দুই জনার ভিউ তো এক হইতেই পারে না। ঠিক কি না তুমিই কও?'

'যতো পাগলের কাণ্ড।' বলে মামী বেগে ঝনাৎ করে চাবিটা পিঠে ফেলে আপনমনে গজগজ করতে করতে রান্নাঘরে চলে গেলেন।

তখন এমনিতেই মামীর দুশ্চিন্তা যাচ্ছিল, পোস্টাল স্ট্রাইকে অনেকদিন বাপের বাড়ির চিঠি পাচ্ছিলেন না। তারই মধ্যে বসনমামা সিম্প্যাথি জানাতে গিয়ে বলে বসলেন—

'নাঃ, তুতুর মা, আগের দিনকালই ছিল ভাল, বানরের পায়ে পত্র বাইন্ধ্যা, ছাইড্যা দিত যুদ্ধের টাইমে—আর বাতাসে উইড্যা, সরি শূন্যে লম্ফ দিয়া সেই বানর ঠিকই মেসেজ পৌঁছিয়া দিত। আমাগো পি-এণ্ড-টি-এর যা অবস্থা, অগোও উচিত বানরের মেসেঞ্জার সার্ভিস এভেইল করা।'

হেসে ফেলে মামী বললেন, 'এত শিগ্গির ভীমরতি ধরলে বাকি জীবন চাকরি করবে কেমন করে? একটু আগে বললে অন্ধ, খঞ্জ আর কালার হস্তীদর্শন, আবার বলছো বাঁদরের পায়ে চিঠি বেঁধে উড়িয়ে দেবার গল্প। ওটা পায়রা হবে।'

এই হাসিটা বসনমামার একেবারেই সহ্য হলো না। ক্ষেপে অস্থির হয়ে উনি অপিসে বেরিয়ে গেলেন পানটান না নিয়েই। যাবার সময়ে বললেন, 'উঃ গিন্নি তো না, উকীল। উকীল। তুমি বরং কোর্টে যাইয়া সওয়াল করো, ভালোই পয়সা পাইবা বোঝলা তুতুমিতুর মা? মাইয়া মানুষের এত মুখরস্বভাব ভাল না। আমি ফিরমই না আর এই পোড়াঘরে। লাইনেই গলা পাইত্যা দিমু আইজ—হ। তুমি ইনসুর‍্যান্সটা লইয়া বেনারসী কিনতে পারবা।'

'হ্যাঁ ওইটাই তো বাকী আছে। বেনারসীটা না কিনলেই চলছে না।' বলে মামী লুচিভাজা কন্টিনিউ করেন।

আমিই উদ্বিগ্ন হয়ে মামীকে ঠেলতে থাকি, 'অ মামী। মামা যে বললেন ফিরবেন

BanglaBook.org

না? অ মামী! মামা যে বললেন লাইনে গলা পেতে দেবেন?'

'বলুক গে,' মামী খুন্তী নেড়ে বলেন, 'অমন রোজই বলে। তুই খা। আর দুখানা লুচি নিবি?'

এদিকে সন্ধ্যে হয়ে গেল। বসনমামা আপিস থেকে ফিরলেন না। মামী দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে রুটি বেলছেন, সেঁকছেন, গল্প করছেন। আমি অস্থির।

'অ মামী, বসনমামা যে ফিরলেন না?'

'ফিরবে, ফিরবে, ক্ষিধে পেলেই ফিরবে। ধোঁকার ডালনা হচ্ছে জানে তো।'

রাত নটা নাগাদ শীতে কাঁপতে কাঁপতে বসনমামা হাজির। ঢুকেই ডানহাতে নিজের গলাটি চেপে ধরে বাঁহাতে মামীর সামনে বাড়িয়ে দিয়ে ধরাগলায় বললেন, 'মাফলার!'

মামী দৌড়ে ওঘর থেকে মাফলার এনে দেন। বসনমামা রুদ্ধকণ্ঠে বলেন 'ডেটল! গরমজল! গামছা!'

তুতুমিতু দৌড়োদৌড়ি করতে থাকে। কী ব্যাপার? কী ব্যাপার?

বসনমামা বললেন—'নুন গরম জল। আদা-চা। দুই পীস বিস্কিট।'

আস্তে আস্তে সব পরিষ্কার হলো। অফিস ফেরৎ বাজারে না গিয়ে আজ বসনমামা অন্ধকারের পর লাইনে মাথা দিতেই গিয়েছিলেন এবং দিয়েওছিলেন। ঘণ্টাখানেক পরেও যখন কোনো ট্রেনের নামগন্ধ নেই, তখন উনি উঠে এসেছেন। কিন্তু এই শীতের রাতে অতোক্ষণ হিমশীতল লোহার রেলের ওপর গালগলা পেতে রেখে গলায় মোক্ষম ঠাণ্ডা লেগে গেছে। স্বরভঙ্গ, গলায় ব্যথা ও কাশি শুরু হয়েছে। এছাড়া রেললাইন ব্যাপারটাই অত্যন্ত নোংরা। মাথাটা অতোক্ষণ ঐ ডার্টি প্লেইসে রেখে দিয়ে বসনমামা খুব বিচলিত। ডেটল-গরমজলে স্নান না করলে অন্য যে কোনো অসুখ ওঁর হয়ে যাবেই।

মামী ছুটলেন আরও গরমজল চড়াতে। গলায় মাফলার জড়িয়ে, নুনজলে গার্গেল করে, ডেটলে হাতমুখ ধুয়ে দুটো বিস্কুট দিয়ে গরম গরম আদা-চায়ে চুমুক দিতে দিতে তৃপ্ত বসনমামা বললেন—'দেখলা তো বনজন, ম্যারিড লাইফে কত জ্বালা! ডোণ্ট গেট ম্যারিড! স্বাধীনতা হীনতায় কে মরিতে চায়রে কে মরিতে চায়।'

মামী আবার কারেক্ট করতে আসছিলেন—আমি ছুটে গিয়ে বাধা দিলাম।' —বঞ্জন এতদূর বলে, নিজেই এককাপ চা চাইল। তারপরে দেয়ালের রামকৃষ্ণ ক্যালেণ্ডারের দিকে চেয়ে বলল, 'পরেরদিন সকালে দেখি বসনমামার ঘরে কুলুঙ্গিতে এক কালীঠাকুরের ছবি, তাতে বসনমামা ফুলচন্দন দিয়ে ধূপ জ্বেলে দিচ্ছেন। আমি তো ট্যারা! মামীমাই লক্ষ্মীপুজো করেন দেখেছি। বসনমামা তো এসবের ধার দিয়ে যেতেন না। কালীঠাকুর আবার কবে আমদানি হলো? আমি বলেই ফেললাম, 'মামা, তুমি আবার পুজো ধরলে কবে থেকে?' 'তগো মামী আগে স্টার্ট করসিল বটে কিন্তুই আমিই ফার্স্ট হইয়া গ্যালাম।' মামার মুখে বিশ্বজয়ীর হাসি—মামা বললেন,

'মনে আছে তো তব? সেই যে, বিশপের সেই প্যারাবোলাটা? কচ্ছপ আর খরগোশের সেই নিমন্ত্রণ. কে আগে লম্বা গলা বাড়াইয়া কলসী থিক্যা মাছের ঝোল খাইতে পারে? খাইল গিয়া খরগোশ, যদ্যপি কচ্ছপের গলা। —এও হইল গিয়া সেই কাহিনী। সাধনমার্গে বহুৎ দূর এডভান্স কইরা গেছি কি না?' আমি আর ঈশপ প্রসঙ্গে না গিয়ে, শুধু বললাম, 'আরে তুমি সাধক নাকি?'

'অল্প।' লাজুকমুখে বসনমামা উত্তর দেন।

'তুমি সাধনা টাধনা করো, সত্যি, সত্যি?'

'গোপনে।'

'কদ্দিন করছো?'

'লং টাইম। লং প্র্যাকটিস। সাধনা তো প্র্যাকটিসের ব্যাপার।'

'সাধনার তো কীসব স্তর-টর আছে শুনেছি—তুমি এখন কোন স্টেজে আছো?'

'ফেইজ নাম্বার থ্রি। ফাইনাল স্টেইজটা সংসারে বইস্যা হয় না। শ্মশানে যাইতে হয়।'

'ও বাবা! সে কি শবসাধনা-টাধনা নাকি? ওসব কুকর্ম-কাজ নেই বাপু। তা এখন তুমি কী কী স্তর পার হয়েছো? মোট ক'টা স্তর আছে?'

'ফেইজ চাইরটা। আর স্তর হইল তোমার টোয়েন্টি টুয়েন্টি নাইন। উনত্রিশটা। আমি ক্রস করসি একুশটা।'

'এ-কু-শ? বাপরে! তো, সেগুলো কী কী?

'শোনবা? শুইন্যা, বোঝবা কিছু? প্রেমপত্রের লাইনে পড়াশুনা করসো কিছু? করো নাই? শুইন্যা ফল নাই তাইলে। আমি অহন অবধি শিখছি—মারণ, উচাটন, বজ্রদংশন, বেচক, কুম্ভক, অর্ধকুম্ভক—জলের উপর দিয়া গমনাগমন, হিপ্নটিজিম, মেসমেরিজিম, নিহিলিজম—এইডা অদৃশ্য হইয়া যাওনের উপায়,—আসনসিদ্ধাই, ব্যসনসিদ্ধাই—কয়ডা হইল? বদ্ধপ্রাণায়াম, মুক্তপ্রাণায়াম, ভুজঙ্গপ্রয়াত, অগ্নিভুক, বায়ুভুক, ঈশ্বরের সহিত কথোপকথন এইযারই নাম সোউল কালচার, এইটা মার্কিন দ্যাশে খুব চলে. যোগবিভূতি আর ই-এস-পি। সোউলকালচার স্টেইজটা আমি বিগত আঠাশে জুন তারিখেই কমপ্লিট করছি—আর যোগবিভূতি? সেও হইয়া গেছে তোমার গিয়া উনিশে আগস্ট—অহন আছি ই-এস-পিতে। আর বাকী ক্যাবল লাস্ট এণ্ড ফাইনাল ফোর্থ ফেইজ তাইতে আটটি স্টেইজ আছে—একই গ্রুপের অষ্টক সাধনা, তারে কয় ডিভাইন পাওয়ার অব এটর্নি। হেইডা পাওয়া হইয়া গেল, তো বাস! তুমিই রামকৃষ্ণ, অরবিন্দের লহ নমস্কার হইয়া গ্যালে।'

'বাববাঃ। এত? আচ্ছা বসনমামা, যোগবিভূতি ব্যাপারটা কী— আমাকে দেখাবে?'

'হইবো, হইবো। দ্যাখবি অনে। তাড়াটা কীযের?'

'যোগবিভূতি তোমার বশ হয়ে গেছে?'

'হয় নাই? জলবৎ। জলবৎ!'

BanglaBook.org

'প্লীজ বসনমামা। যোগবিভূতি দেখাতেই হবে। আচ্ছা, ব্যাপারটা ঠিক কী বলো তো? ম্যাজিক ট্যাজিক?'

'সিম্পিল। এই, যেমুন ধর তুমি এট্টা ধানী লংকা লইয়া কচাকচ কচাকচ চিবাইলে, তোমার কিছুই হইলো না। কিন্তু যার যোগবিভূতি নাই, সে চিবাইলে জ্বলনে মুখ-প্যাট থিক্যা রক্ত বাইবাইবে। আর যোগবিভূতি সম্পন্ন ব্যক্তি? অবিচল।'

'বসনমামা, যোগবিভূতি দেখাও, প্লীজ। আমি যোগবিভূতি কক্ষনো দেখিনি।'

'দেখামু অনে। লাঞ্চটাইমে বিমাইনডার দিগা দিস। ও কিছুই না। সিম্পল।'

দুপুরে বসনমামা আর আমি পাশাপাশি দুটো পিঁড়িতে খেতে বসেছি। সামনে ভাতের থালা। আমি মনে করিয়ে দিলাম, 'বসনমামা, যোগবিভূতি?'

বসনমামা হাঁকলেন—'তুতুমিতু! উঠান থিক্যা ধানীলংকা তুইল্যা আনো তো মনা? এক ডজন?'

তুতুমিতু অমনি ছুটলো চুপড়ি হাতে। মুহূর্তের মধ্যে ঝালসবুজ একচুপড়ি ধানীলংকা নিয়ে হাজির। তারপরেই ছুটলো হাত ধুয়ে ফেলতে। আমি তো দেখেই ভয়ে কাঁটা। এতগুলো চিবোবেন— কি সর্বনাশ।

বসনমামা বললেন, 'দ্যাখবা? যোগবিভূতি? দেইখ্যা লও মনোযোগ দিয়া। এই লইলাম দুইডা লংকা—এই দিলাম মুখে—এই আমি চিবাইলাম—কচাকচ। কচাকচ। যেন আইসক্রিম—ইহারেই কয় যোগবিভূতি। বোঝলা? খুব কঠিন!'

লংকা চিবুতে চিবুতে এই কথাগুলো বলা হয়েছিল। তার পরেই যেন কেমন-কেমন হয়ে গেল সব। বসনমামার জিভ জড়িয়ে উচ্চারণ অস্পষ্ট হয়ে গেল, চোখ লাল হয়ে উঠল, দৃষ্টি অপ্রকৃতিস্থ, মুখভঙ্গি অস্বাভাবিক হয়ে পড়ল। নেক্সট স্টেজে চোখ থেকে অবিরল জল ঝরতে লাগলো। কোনো রকমে বসনমামা তখনও বলে চলেছেন, 'এইবার—এই লইলাম এক মুষ্টি অন্ন, এই ভইরা দিলাম মুখগহ্বরে—এই চিবাইলাম।... তারপর একঘটি জল—এ্যাঃ এ্যাইভাবে...ঢকঢক কইরা গিলিয়া ফ্যালাইলাম...এইবার ফাইনাল স্টেইজ... চক্ষুমুদিয়া পদ্মাসনে স্থির হইয়া বসবা, বইসা ঠিক এইভাবে মুক্ত প্রাণায়াম করবা অর্থাৎ মুখ হাঁ কইরা বাতাস টানবা, ছাড়বা, টানবা...ছাড়বা, ...হুস-হাস হুস-হাস ...এই হইত্যাসে তোমার বিয়্যাল যোগবিভূতি'

বলতে বলতে তাঁর কানদুটোও টকটকে লাল হয়েছে, তুতুমিতুও ততক্ষণে গলা ছেড়ে 'ওগো বাবাগো তোমার কী হলো গো' বলে ডুকরে কেঁদে উঠেছে, আর মামী একবাটি দুধের সর এনে বলছেন, 'শিগগির এটা খেয়ে নাও তো, জিভে ননীর প্রলেপ দিলে জ্বালাটা বন্ধ হয়ে যায়—'

এক চোখ বন্ধ, তা থেকে অবিশ্রাম জল ঝরছে, অন্য চোখটা একটু খুলে বসনমামা মামীর হাত থেকে বাটি নিয়ে বললেন, 'বাকী ক্যাবল লাস্ট ফেইজ—ডিভাইন পাওয়ার অব এটর্নী—'

BanglaBook.org

দি নেস্ট

বঞ্জন ঢুকতেই আমি উল্লসিত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "কী রে, কেমন বেড়ালি গোমো? বসনমামাব বাড়ি?"

"আব বোলো না নবনীতাদি, বসনমামাব ব্যাপার!"

আমি উৎসাহিত। এই শুরু হয়ে গেল আবেকখানা বসনমামার গল্প। বঞ্জন বলতে পাবে আমাব চেয়ে ঢেব ভাল করে তার মামার ব্যাপার-স্যাপার।

একদিন বসন্তমামা এসেই শুরু করলেন, "বাংলো পাইসি, বাংলো। কোয়ার্টাব। ও মেজদি, শোনেন, আমাগো দৈন্যদশা ঘুচাইসে বেইল কোম্পানি—আপনের বৌমাগো লইযা গেসি গোমো। ওঃ, ইলাহী কাণ্ড, প্রাসাদোপম গৃহ, বোঝলেন মেজদি? ইনডিযান কোযার্টাব খালি নাই, ইউবোপীযান কোযার্টার্স দিযা দিসে। আর চিন্তা নাই। বঞ্জু-মঞ্জু-সন্টু, যাইস অখন, দেইখ্যা আসিস, কোয়ার্টার্স কাবে কয়। পাঠাইয়া দ্যান মেজদি পোলোপানগুলারে—হেলথডা ফিরাইয়া আসুক— ওঃ, যা চ্যাহারা হইসে এক-একখান—মনে হয পঞ্চাশেব মন্বন্তর থিক্যা সুভেনির বাখছেন ঘবে—তাকান যায না—কাঠি-কাঠি হাত-পা—ওঃ, দেখবি গিযা তুতুমিতুব কী স্বাইস্থ্য—দেখিস নাই তো, মামাত ভাইবোন দুইডাবে কোনোদিন—বোঝলেন মেজদি, খাইযা-দাইযা স্বাইস্থ্যডা ফিবাইযা আসুক—গায়ে গত্তি লাগাইয়া দিবাবি খনে—তদেব মামি বন্দনে দ্রৌপদী, আর ঘবে তো চড়ুইপাখিব মতো মুবগিব দৌরাত্ম্য। ধব, কাট, খাও। ধর, কাট, খাও। বাস। যত না মানুষ, তত মুবগি। পালকেব পাহাড হইসে কোযার্টার্সেব পিছনে। আব যত মুবগি তত ডিম। আব সে কী কোয়ার্টাব, পেলেইশিযাল বিলডিং মেজদি, থাইক্যাও সুখ, দেইখ্যাও সুখ। বঞ্জু-মঞ্জু-সন্টু। শোন, ডাইবেকশন দিযা দেই —মন দিয়া শোন। গোমো স্টেশনে নাইম্যা, ধববি বিকশা। শত শত বিকশা লাইন দিযা খাডাইযা আছে পেসেনজাবের লেইগ্যা। বলবি—'বসন্ত বটব্যালকা বাংলোমে চলো —দি নেস্ট।' বাস। আব কিসুই কইতে লাগব না। চডবি বিকশায়। সিধাই লইযা যাইব। বঞ্জু-মঞ্জু-সন্টু, কনসেনট্রেইট কইবা শুইন্যা ন্যাও—ইস্টেশন থিক্যা বাইরইযাই অনন্তবিস্তার বাস্তা লাল সুবকি বিছান, বাঙ্গামাটিব পথ—সিইধা চইল্যা যায় দিগন্তেব পানে—দুই পাশে ফলেব বাগান, ফুলেব বাগিচা, ইউকালিপটাসেব বনানী। আব শালবীথিকা—আব ক্যাকটাসেব জঙ্গল। আব তার ফাঁকে ফাঁকে ফুইট্যা আছে সব বিশাল বিশাল বাংলো-বাডি, ধনীলোকেব বসতবাটী, বিচম্যানস বেসিডেনশিযাল কোযাবটাবস। তাবই একটা হইল 'দি নেস্ট'। মানে আমাগো বাসস্থান, মানে কোযার্টার্স আর কী। সামনেই লোহাব আলপনা-দেওযা গেইট, শ্বেতপাথরেব ফলকে নাম লাখা আছে—"

মঞ্জু বলল, "বসন্ত বটব্যাল?"

বসনমামা চোখ পাকালেন, "না, ল্যাখা আছে 'দি নেস্ট'—গেইটটা ঠেলা দিলেই খুইল্যা যায়, আব গেইট বরাবর গারডেন পাথ—গাবডেন পাথ বুঝ? গাবডেন পাথে বিকশাসুদ্ধা ঢুকবা না কিন্তু, অল ভিহিকলস প্রহিবিটেড. সাইকেল বাদ। গারডেন পাথে সাবধানে পা ফ্যালবা, নুড়িপাথরগুলান আনটাইডি হইয়া যায না য্যান—ইউরোপীযান কোয়ারটারস—ভেবি ভেবি কেযাবফুল। ঢুক্যাই দ্যাখবা ফাউনটেইন। মার্বেল পাথরেব ফাউনটেইনে টগবগ টগবগ কইবা জল বাইযা পডতাসে পবীর মাথার কলস থিক্যা। জল সেইখানডায পড়ে, হেইডা আবাব গোল চৌবাচ্চাব মত, তাইতে হরেক রঙেব বিলাযতি গোল্ড ফিশ খেইল্যা বেডাইতাসে। গোল্ডফিশ খেলে, আব বোদে-জলে চোখে ঝিলিক মাবে—য্যান ইন্দ্রধনু। বেইনবো। হেই ফাউনটেইনেব সাইডে দুইডা ফুটফুইট্যা শিশু খেলা কবতাসে (আমাবই বাচ্চা দুইডা আব কী), হুরীপরীব লেইগ্যা চাহাবা (তুতুমিতু আর কী) এট্টা তুলাব কুকুব লইযা। তুলাব না কিন্তু! রিয়্যাল, বিলায়তি পেট ডগ—ফোব হানড্রেড রুপিজ! ভয় নাই, কামড দিব না। ডেন্টিস্ট দিযা দাঁতগুলি ভোঁতা কইবা দিসি। মেজাজি চিন্তা নাই, চিন্তা নাই। ট্রেইনে বসাইয়া দিবেন, সিইধা গোমো স্টেশনে নাইমা বিকশায বইস্যা ক্যাবল কওনেব অপেক্ষা—'দি নেস্ট'। বাস। বঞ্জু-মঞ্জু-সন্টু তবা যাইস নিশ্চয, ছুটি হইলেই!"

বসন্তমামাকে বিশ্বাস কবে এমনিতে এতবার ডেকেছে বঞ্জনেবা, সেই যে 'মূলতানী কামধেনু' কেলেঙ্কারি, 'স্পটলেস স্পটেড ডিয়ার' নিযে আবেক কেলেঙ্কাবি, 'দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ' নিয়ে কী ঝামেলা পাডায, তাবপব 'কোটেব' জন্যে প্রায পুলিসেই তো ধবছিল—বঞ্জনদের তাই সাহস হচ্ছিল না। কিন্তু কেমন যেন সত্যি-সত্যি মনে হচ্ছিল বাডির ব্যাপারটা এবাবে। এভাবে কেউ নেমন্তন্ন কবতে পাবে, সত্যি না হলে?

মঞ্জুটা কিন্তু কিছুতেই বাজি হল না। কিন্তু বঞ্জন আব সন্টু একদিন ট্রেনে চডে বসল। সিধে গোমোয গিযে নামল। সত্যি, গাদা-গাদা বিকশা ছিল স্টেশনে। একটায উঠে বসে সন্টু বলল, "বসন্ত বটব্যালকা বাংলোমে চলো।"

সে হাঁ করে তাকিযে বইল মুখেব দিকে।

"বসন্ত বটব্যালকা বাংলো নেহি জানতা?"

বিক্সাওযালা মাথা নাডল, "নাহি জানতা বাবু।"

এবাব রঞ্জন বলল, "দি নেস্ট জানতা? দি নেস্ট?"

এতক্ষণে একগাল হেসে প্যাডল কবতে শুরু কবে দিল বিকশাওযালা। 'নতুন বদলি হযেছেন তো, তাই বসনমামাব নামটা এখনো চেনে না এবা' ভেবে নিল বঞ্জু-সন্টু।

সত্যিই অনন্তবিস্তার রাস্তা, রাঙামাটিব পথ, দু'পাশে শালবন, ইউক্যালিপটাস-বাগান, বডলোকদেব বাগানবাডি, ফুলেব বাগান, ফলেব বাগান, ফণিমনসাব ঝোপ, ঠিকঠাক মিলে যেতে লাগল বসন্তমামাব বর্ণনা। এক সময়ে এসে পডল 'দি নেস্ট'।

BanglaBook.org

নাঃ বসন্তমামা এবারে গুল মারেননি। মঞ্জুটা বোকা, সন্দেহ করে করে কিছুতেই এল না। সত্যিই, লোহার আলপনা দেওয়া গেটটা ঠেলতেই খুলে গেল। ঢুকেই চোখ জুড়িয়ে যায়।

সত্যি সত্যি শ্বেতপাথরের প্রাসাদের মতো বাড়ি। চারদিকে জাফরি কাটা দালান। চমৎকার কেয়ারি-করা ফুলবাগানের মধ্যিখানে খেলনার মতো বসানো, যেন একটা ছোটখাটো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। এই তো। এই বাড়ির কথাই তো বলেছেন বসনমামা। সুরকির পথে দু'পা এগুতেই গোলাপ ফুলের গন্ধে প্রাণ ভরে গেল। আঃ। গারডেন-পার্থই বটে।

সামনেই ফোয়ারা। ঐ তো শ্বেতপাথরের পরী মাথায় কলসি ধরে আছে, আর কলসি দিয়ে জল ঠিকরে পড়ছে নীচের গোল চৌবাচ্চায়। রঞ্জু-সন্টু এগিয়ে গেল। গোল্ডফিশ দেখতে। কই, রোদে-জলে রামধনু রঙ ঠিকরে পড়ছে কোনখানে? এমন সময়ে একটা সাদা কুকুর নিয়ে খেলতে খেলতে ফুটফুটে দুটো বাচ্চা বেরিয়ে এল ফোয়ারার ওপাশ থেকে। কুকুরটা যেন তুলোর তৈরি একটা পুতুল—কুকুর না বেড়াল ঠিক বোঝা যায় না। নেহাত খিউ-খিউ করে ডাকছে, তাই কুকুর বলে বিশ্বাস হয়।

"ফোর হান্ড্রেড রুপিজ।" সন্টু বলল রঞ্জুর কানে-কানে। বাচ্চা দুটোও ঠিক পুতুলেরই মতো। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। কোঁকড়া কোঁকড়া ঝাঁকড়া সোনালি চুল গালে মুখে ঝাঁপাঝাঁপি করছে, নীল চোখ—ধবধবে ফর্সা, যেন সাহেব বাচ্চা। এই তাদের বসনমামার তুতু-মিতু? বাঃ। রঞ্জু-সন্টু স্তব্ধ। বসনমামার মেয়েরাই ওদের আগে দেখতে পেল। দেখেই একসাথে হেসে দিল। বড়টা হাত নেড়ে ডাকল, "হা-ই।" ঠিক যেন সাহেবের মতো উচ্চারণ।

"আমাদের এক্সপেক্ট করছিল মনে হয়।" রঞ্জন বলল সন্টুকে। তারপর ওরাও হেসে বলল, "হা-ই।"

সন্টু বলল, "বাপ রে। বসনমামার বাচ্চাগুলো নিশ্চয় সাহেবদের ইস্কুলে পড়ে। এইটুকু বয়সে এমন প্রোনান্সিয়েশন?"

রঞ্জন বলল, "মঞ্জুটা আসেনি ভালই করেছে। এখানে কেমন যেন বাঙাল-বাঙাল ঠেকছে নিজেদের।"

সন্টু বলল, "ইউরোপীয়ান কোয়ার্টার্স কিনা, তাই।"

মিষ্টি বাচ্চা দুটো কুকুর নিয়ে এদিকে আসছে দেখে ওরাও পায়ে পায়ে এগোতে থাকে তাদের দিকে। কেবল মুখের হাসিটা একটু ক্যালেনডারের ছবির মতো ফিক্সড হয়ে থাকে সন্টু-রঞ্জুর ঠোঁটে। ভেতরে-ভেতরে কেমন একটা অস্বস্তি দানা বাঁধতে থাকে। এমন সময়ে পিঠের ওপরে এক প্রবল থাবড়া, সঙ্গে বসন্তমামার হুঙ্কার, "আরে-আরে-আরে! কী আনন্দ—কী আনন্দ—কী আনন্দ! সন্টু-রঞ্জু—আইস্যা পড়ছস? মঞ্জু কই? সদা-পচা-মেন্তী? অরা আসে নাই? চল চল—"

রঞ্জনদের ধড়ে প্রাণ এল। বাব্বা। একসঙ্গে বলে উঠল দুজনে, "বাঃ কী সুন্দর

তোমার মেয়েরা বসনমামা?"

"হ্যাঁ, চল ঐদিকে চল--" বসনমামা তাড়া লাগান।

বঞ্জনরা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল জুনিয়ারের দিকে এগোতে থাকে। বসনমামা হাত ধরে হ্যাঁচকা টানেন, "আঃ হা, ঐদিকে কই যাও? ঐদিকে না, ঐদিকে না। এইদিকে আসো, এইদিকে—"

কে জানে কোনদিকে এনট্রান্স? গারডেন পাথটা দুভাগ হয়ে একটা রাস্তা বাগানের পিছন দিকে চলে গেছে। ওরা সেইটে নেয়। পেছন দিকে বুঝি এনট্রান্স? হবেও বা। ওরা অন্যদিকে বেঁকে যায়। পরীর বাচ্চা দুটো হাত নেড়ে নেড়ে হাসতে থাকে দূর থেকে "বাই-বাই" করে না "আয়-আয়" করে—কে জানে?

বঞ্জন বলে, "তুতুমিতুরা আসবে না?"

বসনমামা বললেন, "আঃ। তাড়াতাড়ি কিয়ের? অ্যাঃ? আইব, আইব। টাইমলি আইব।"

হাঁটতে হাঁটতে প্রাসাদ পার হয়ে যায়।

সন্টু বলে, "এনট্রান্সটা ঠিক কোনদিকে বসনমামা? গোটা বাড়িটাই তো পেরিয়ে গেল।"

"আঃ। আইব, আইব। তাড়াতাড়ি কিয়ের শুনি?"

বঞ্জন বলে, "বাচ্চারা তো কই এল না বসনমামা?"

বসনমামা এবার বললেন, "কাগো কথা কও? ওই নীলচক্ষুগুলান? ঐ গুলো হইব আমার তুতুমিতু? ওই বিড়ালচক্ষু কেয়াকেশ? ছোঃ। ওইগুলান আমার মাইয়া নাকি? ম্লেচ্ছ। ম্লেচ্ছ। সব কয়ডাই ম্লেচ্ছ। আমেরিকান ছ্যামড়ির পোলাপান। অন্য বাড়িডায় থাকে।"

সামনেই প্রবল ধোঁয়ার পাঁচিল। বঞ্জু-সন্টু দাঁড়িয়ে পড়ে। মনে হয় বাগানে আগুন লেগে গেছে। সন্টু বলে, "মালীরা বোধহয় শুকনো পাতা জ্বালাচ্ছে—না বসনমামা?"

বসনমামা অন্যমনস্কভাবে বলেন, "ওই হইবখনে কিসু একটা।"

এমন সময় ঐ ধোঁয়ার পাঁচিল ভেদ করে আস্ত আস্ত পাস্তভূতের জ্যান্ত ছানা বেরিয়ে এল একজোড়া। তাদের নাকে সর্দি, চুলে জট। ছুটে এসে তারা বসনমামার হাঁটু জড়িয়ে ধরে "বাবাঁ বাবাঁ" বলে, নাকি সুরে নাচতে থাকে। তাদের পেছু পেছু তালপাতার পাখা হাতে উদিত হন তাদের মা। তোলা উনুনটাকে এখন বেশ দেখা যাচ্ছে। ঐটুকুনি জিনিসের এমনি ধোঁয়ার জোর? ক্রমশ ওরা ধোঁয়া পেরিয়ে এল। পিছনে 'কোয়ার্টার্স' উদ্ভাসিত হল। লাল ইটের তৈরি মিলিটারি ব্যারাকের মতো পাশাপাশি ছ-সাতখানা ঘর, দালান। প্রত্যেকটির সামনে বাগানে একটা করে উনুন ধরানো হচ্ছে। কয়েকটা খাটিয়া ইতস্তত ছড়ানো। একটি খাটিয়ায় বসে একজন গুঁফো ব্যক্তি খৈনি ডলতে ডলতে মন খুলে 'রামা-হো' গাইছেন। ওপাশে একটি

টিনের ছাউনি দেওয়া জালের খাঁচা ভর্তি মুরগি ঠাসা। মুরগির ক্যাচরম্যাচর, ভোজপুরী 'বামা-হো' আর তুতু-মিতুর 'বাঁবা! বাঁবা!' ছাপিয়ে ঝলসে উঠল বসন্তমামির গলা, "তুতুমিতু! একেবারে চুপ! নইলে গলা কেটে ফেলব!" ওদিকে কান না দিয়ে বসন্তমামা রঞ্জনের কনুইটা ঠেলে বললেন, "মুরগি দ্যাখছস? মুরগি? কইসিলাম না, যত মানুষ তত মুরগি? ওই দ্যাখ। ঠিক কিনা?" তারপর মামিকে বলেন, "শুনছ, চাইয়া দ্যাখো কাগো ধইরা আনসি—আমাগো রঞ্জু-সন্টুগো। তুমি অবশ্যি আগে আগে দ্যাখ নাই—দিদিমণির—"

বসন্তমামি শুধু একজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "নাই বা দেখলাম আগে। খুব বুঝেছি। তোমার সেই মরা দিদির জ্যান্ত দেওরপোর দল তো? তা, এঁদের ক'দিন থাকা হবে?"

তার পরদিন সবুজ ফ্ল্যাগ নাড়তে নাড়তে যে ট্রেনটাকে বসনমামা খবরদারি করে হাওড়া নিয়ে এলেন, সেই ট্রেনের গার্ডের কামরাতে রঞ্জু-সন্টুকে বসে থাকতে দেখা গেল ম্লানমুখে।

সেই থেকে রঞ্জন আর বসনমামার গল্প বলে না।

BanglaBook.org

গুনিয়া ভাই

আমি মানুষ হয়েছি কোন আয়া নয়, গুনিয়া ভাইয়ের কোলে। আমাকে অ-আ লিখতে পড়তেও শিখিয়েছিল সে-ই। বাংলায় নয়, উড়িয়ায়। গুনিয়া ভাইই ছিল আমাদের ছোটদের একচ্ছত্র হিরো। সংসারের গৃহিণী এবং সচিব।

তক্কো করিসনি বলচি তাঁতিবউ। পনেরো বলিচি ওই পনেরো। আর একটা পয়সাও নয়। ভদ্দলোকের এক কতা!

মতি-তাঁতিনীরও এক কতা—মা-ঠাগরোন!—দিম্মার চেয়ে আরেক কাঠি গলা তুলে চেঁচাচ্ছে তাঁতিবউ। বউ মানে সেও দিম্মার সমবয়সীই হবে। নাকে সবুজ পাথরের নাকছাবি, পাকা চুলে তেল-সিঁদুর, লালপাড় কাপড়ে দিব্যি সেজে-গুজে আসে। —ঐ ঝা বলে দিইচি, তাই। স'পাঁচ ট্যাকা জোড়া হিসেবে খোকার দু' জোড়া ধুতি, আর খুকির কাপড়খানা তিন ট্যাকা বারো আনা। ব্যস। পাই-পয়সাও আর কম হবেনি। হ্যাঁ

মহা উৎসাহে আমরা নাতি-নাতনিরা সব দালানে ভিড় করে ঝগড়া দেখছি। মনে মনে সব্বাই হিসেব কষে ফেলেছি, বুঝে গেছি যেমন আমাদের দিম্মাটি অঙ্কে

ওস্তাদ তেমনিই তাঁতিবউ। কিন্তু দিম্মার সামনে মুখ খুলব, এত দুঃসাহস কারুর নেই।

এমন সময়ে খুন্তি-হাতে, গামছা-কাঁধে, এক টোপলা পান ঠাসা গালে, ফর্সা ধুতিটি হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে, ধবধবে বোগা পিঠে মাজা পৈতেটি ঝলমলিয়ে গুনিয়া ভাইয়ের আবির্ভাব হল রান্নাঘর থেকে। লাল টুকটুকে ঠোঁটে একগাল হেসে বলল, কী হেইছে? কী হেইলা কী? কঁড হলা? এত্তে পাটি করুছ কাঁইকি মতিদিদি?

চারানা বাদ দিতে চাইচে কত্তামা—তাঁতিবউ বলে—চারানা কেন, পাই-পয়সাও ছাড়বুনি। বাবা। বাজারে আগুন নেগেচে।

আচ্ছা, আচ্ছা, সব হেব্বে। পাঞ্চ টংকা চারি আনা কিবি দুইজোড়া ধুতি, আউ, তিনঅ টংকা বারো আনা গুট্টে শাড়ি। বাস? তমকু কত্তামা কেত্তে দিউছি? পুরা পন্দরো? আচ্ছা, মু দেখুছি, কিচ্ছি চিন্তা নাহি, মু সব্বুঁ ঠিকঅ করি দেবি। গজরাতে গজরাতে তাঁতিবউ ততক্ষণে তার পুঁটলি বেঁধে ফেলেছে। ওদিকে দিম্মার তাকিয়ার নিচে থেকে গোল ঝকঝকে পেতলের টিফিন-বাক্সটাও বেরিয়েছে। বাক্সটা খুলে দিম্মা ফর্সা কাপড়ে বাঁধা খুচরো টাকার পুঁটলিটা বের করলেন। একটা কর্পের নোট আর গুনে গুনে পাঁচটা রুপোর টাকা গুনিয়া ভাইয়ের হাতে দিতে দিতে তাঁতিবউকে শাসালেন, তোর বড্ডো আস্পদ্দা হয়েছে তাঁতিবউ, চারানা পয়সার জন্যে পুরান খদ্দের ছেড়ে দিচ্চিস। আসিস পুজোর সময়ে, দেখবো কে তোর কাপড় কেনে? আজই আমি অন্য তাঁতির ব্যবস্থা কচ্চি, দাঁড়া।

গুণনিধি ঠাকুর তাঁতিবউকে নিয়ে দালানের ওধারে গিয়ে বলে, এই নিয়, ধুতি দুই জোড়া সাড়ে দশ, আউ শাড়ি তিন টংকা তিন সিক্কা, চৌদ্দ টংকা চারি আনা। মিলিলা হিসাব?

তাঁতিবউ গুনল—স' পাঁচ স' পাঁচ, সাড়ে দশ। দু'জোড়া ধুতি। সাড়ে দশ আর তিনে—সাড়ে তেরো। আরও বারো আনা, মানে তিন সিকে। তেরো টাকা আর পাঁচ সিকেতে হল মোট চোদ্দ টাকা চারানা—

ঘাড় কাৎ করে হেসে তাঁতিবউ বলল, হ্যাঁ ঠাকুর, ঠিকই মিলেছে।

তবে তিন সিক্কা ফিরৎ দে।

দুবুনি তো কি? মেরে দোব? মতির কাছে ও সব পাবেনি। হুঁ—তাঁতিবউ ঝনাৎ করে তিনটে সিকি ফেলে দিলে মার্বেলের মেঝের ওপরে।

গুনিয়াভাই কুড়িয়ে নিয়ে নিজের ট্যাঁকে গুঁজল দুটো আর একটা এনে দিদিমাকে বলল, নিয়, চারি আনা ঘুরাই কিবি আনুচি, ছড়া কম বদমাস? দিতেই চাহে না। বলে দিম্মার পান সাজার থালার ওপর ঝনন করে রাখলে সিকিটা।

গুণনিধির গুণপনায় মুগ্ধ হয়ে দিম্মা বললেন, বাঃ। আবার? আরো চারানা? সেই চারানা তো ছাড়লেই, আবার আরও চারানা ফিরিয়ে দিলে? বলিস কি গুণো? ফোকলা গালে ভুবনমোহিনী হেসে দিম্মা বলেন, তুই সত্যি পারিসও বাপু। তোর কাছে কেউ ট্যাঁ-ফোঁটি করতে পারে না। এই নে, এই চারানাটা তুই-ই রেখে দে। তোকেই পান খেতে দিলুম।

একগাল হেসে গুনিয়া দিম্মাকে বিরাট এক পেন্নাম ঠুকে, সিকিটা তুলে নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল।

বেড়ালের পিঠে-ভাগের মতন মীমাংসার কায়দাটা আমরা ছোট্টরা সব্বাই দেখলেও কেউ কিচ্ছুই বললুম না। কেননা জানি, ওই পয়সা থেকে আমাদেরই নকুলদানা চীনেবাদামের সাপ্লাই আসবে। আর, ওঃ—যে অশান্তিটা হচ্ছিল সকাল থেকে। এই ব্যবস্থায় দিম্মার কথাও রইল, তাঁতিবউয়ের কথাও রইল, সবাই খুশি। এই হল আমাদের গুনিয়াভাইয়ের প্রধান গুণ। মুশকিল আসানের রোলে সত্যি তার জুড়ি ছিল না। সারা পাড়ার ছোটদের একচ্ছত্র গার্জেন এই গুনিয়া। অমন একজন মুশকিল আসান ছিল বলেই বোধ হয় আমরা পড়তুমও নানা জাতের নিত্যি নতুন মুশকিলে।

রাস্তায় খেলতে খেলতে কোন বাড়িতে ফুটবল পড়েছে, কাচ ভেঙেছে, রেগে উঠে তারা ফুটবলটা ছাড়ছে না। ডাকো গুনিয়াভাইকে। সে গিয়ে হাতে পায়ে ধরে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ছেলেদের হয়ে অনেকবার ক্ষমা চেয়ে ফুটবল ফেরত এনে দেবে। কোন বাড়ির ছাদের এরিয়েলে ফার্স্ট ক্লাস একখানা ঘুড়ি আটকে আছে, তারা পাড়ার ছেলেদের পাত্তা দিচ্ছে না। গুনিয়াভাই যাবে। ছাদে উঠে ট্যাঙ্কে চড়ে যেমন করে হোক ঘুড়িটা ঠিক ছাড়িয়ে আনবে ছেলেদের জন্যে।

ছোট ভাইয়ের আংটি জোর করে নিজের আঙুলে গলিয়ে, বাচ্চুর আঙুল ফুলে উঠে হাতের অবস্থা সঙ্গীন। গুনিয়াভাই ছুটল বাচ্চুকে নিয়ে স্যাকরার বাড়িতে। তাদের যন্ত্রপাতি দিয়ে আংটিটাকে কাটিয়ে আঙুলকে বিপদমুক্ত করতে। বাচ্চুর মা তো কৃতজ্ঞতায় আশীর্বাদ করে আংটিটাই গুনিয়াকে দিয়ে ফেললেন।

বাঁদর নাচ দেখতে দেখতে হঠাৎ কি বাঁদুরে দুর্বুদ্ধি, বাঁদরীটা তেড়ে এসে কটাস করে কামড় বসিয়ে দিয়েছে মুন্টির পায়ের গোছে। বাড়ির বড়রা অফিসে —কী হবে এখন? যদি ধনুষ্টংকার হয়? মুন্টির মায়ের কান্না জুড়ে দেওয়া দেখেই অমনি গুনিয়াভাই মুন্টিকে কাঁধে করে ছুটল। দুপুরবেলায় ডাক্তারখানা বন্ধ হলে কী হবে, জোর করে শ্রীহরি ফার্মেসির ডাক্তারকে ঘুম থেকে তুলে, তার দোকান খুলিয়ে, কী একটা অ্যাসিড দিয়ে ওই দাঁত বসানোর জায়গাটা পুড়িয়ে, বিষমুক্ত করে দিয়ে একটা ইঞ্জেকশন লাগিয়ে মুন্টিকে বাড়িতে নিয়ে এলো। দু'হাতে গোলাপী রঙের দু-দুটো বুড়ির চুল খাচ্ছে—মুন্টির চোখে জল, ঠোঁটে হাসি, গুনিয়াভাইয়ের কাঁধে লাল ফ্রক পরে বসে আছে, যেন মুটের ঝাঁকায় মা লক্ষ্মী। বীরগর্বে গুনিয়ার সে কী মার্চ করে পাড়ায় ফেরা!

পাড়ার বড় বড় মেয়েরা আমাকে বহুবিধ প্রশংসা বাক্যে ভুলিয়ে গাছে উঠিয়ে কাঁচা আম, জামরুল পেড়ে খেত অনেক দিনই। তারপর এক সময়ে খেজুর পাড়ানো শুরু করলে। আমি তো অহংকারে মটমট করছি। আমার মতন গাছে উঠতে কেউ পারে না। খেজুর গাছে তো ছেলেরা পর্যন্ত চড়তে চায় না, খেজুর পেকে থোকা থোকা ঝুলে থাকে ক্লাবের মাঠে। বড় দিদিদের তেলে ভুলে, যেদিন বুক হাত

ছুড়ে, নতুন ফ্রকের বুক ছিঁড়ে সগর্বে তিনটে খেজুর হাতে বাড়ি এলুম, বেগেমেগে গুনিয়াভাই ছুটল ক্লাবে। এইসা দাঁত খিঁচিয়ে উড়িয়ায় তাদের শাসিয়ে এলো, যে বড় মেয়েরা যেন পালাতে আর পথ পায় না। সেই থেকে আর কখনো ওরা খেজুর গাছে চড়তে বলেনি আমাকে।

মুখুজ্যেদের বাঁধুনীর ছেলে মন্টুর বুদ্ধিটা কম। তার গেঞ্জী প্যাণ্ট খুলে নিয়ে তাকে বিছুটির ঝোপে ঠেলে ফেলে গড়াগড়ি দিইয়েছে পাড়ার কয়েকজন ছেলে, কেঁদেই আকুল হচ্ছে বেচারা মন্টু—শুনেই গুনিয়াভাই ছুটল। যে ক'জন দুষ্টু ছেলে এর পাণ্ডা ছিল, প্রত্যেকের জামা খুলে গায়ে বেশ করে বগড়ে বিছুটি ঘষে দিয়ে এলো।

নে, দ্যাখ বেটারা একটু নেচে-কুঁদে কেঁদে-ককিয়ে। দ্যাখ, কেমন লাগে—

ছেলেদের বাপ-মা'রা রেগে গেলেও, কিছুই বলতে পারলেন না। একে তো ছেলেরা দোষ করেছে, তাছাড়া গুনিয়াভাইকে যে কিছু বলা যায় না। কখন যে কার কোন দুঃসময়ে কী কাজে লাগবে? দুষ্টু ছেলেদের শাস্তিটা তো অন্যায্যও হয়নি। বটব্যাল সায়েবের বাড়িতে প্রচুর কাঁচা আম হয়েছে। বটব্যাল একা মানুষ, বাড়িতে ছেলেপুলে নেই, পাড়ার ছেলেদের ঢুকতে দেন না, পাছে বাগান নষ্ট করে দেয় বলে। ধরো গুনিয়াভাইকে। বটব্যালকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ধুতির কোঁচড় ভর্তি কাঁচা আম এনে ছোটদের মধ্যে বিলি করলে গুনিয়াভাই। তেমনি বাগচী বাড়ির পেয়ারাও। খেতে চাও? বেশ তো পাঁচিল ডিঙিয়ে অমন জোর করে ভেতরে ঢুকো না। কেবল গুনিয়াভাইকে একবার বল। সে গেলে বাগচীগিন্নি নিজেই চুপড়ি ভরে ডাঁশা পেয়ারা তুলে দেবেন তার হাতে। গুনিয়াভাইয়ের মত এমন 'গুডউইল' দুনিয়ায় কম লোকেরই কপালে জোটে।

শুনেছি, আমার জন্মের সময়ে আমাদের বাড়িতে ইলেকট্রিক মোটরের পাম্প ছিল না, হ্যাণ্ডপাম্পে করে জল উঠত তিনতলায়। গুনিয়াভাই নাকি এই জল তোলবার একটা চমৎকার উপায় বের করেছিল। পাম্পটা দেখতে ঠিক টিউবওয়েল-এর মতন। হাতলটা ঘ্যাচাং ঘ্যাচাং করতে হয়। কিন্তু নল দিয়ে জল পড়ে না। জলটা তার বদলে ওপরে উঠে যায়। পাম্পটা ছিল আমাদের উঠোনে, বিজার্ভারের পাশেই। খিড়কি-দোরের গা ঘেঁষে। ঠিক তার সামনেই দেড়তলার ঘরে গুণনিধির নিজস্ব রাজভবন। জানালাটা খোলা থাকা মানে রাজ্যপাল বাড়িতে আছেন, আর বন্ধ মানে নেই।

কলকাতা শহরে গুণনিধির দেশের লোক গিজগিজ করছে, যত পান-বিড়ির দোকানদার, যত কলের মিস্ত্রী, মালী, রাঁধুনী বামুন, নাপিত, বেয়ারা, পিয়ন—দলে দলে উড়িষ্যাবাসীরা আসত গুনিয়াভাইয়ের কাছে। সারাদিন বাবার কাছে যত সাক্ষাৎপ্রার্থী আসেন, গুনিয়ার ভিজিটরের সংখ্যা তার চেয়ে কম নয়। গুনিয়া তাদের সকলকে বলে রেখেছিল—

খবরদার বেল টিপবি না। রিং করলে বাড়ির সবাই জেনে যাবে, আবার আমার

কাছে বন্ধু এসেছে। তোরা বরং খিড়কি-দোরে গিয়ে ভাঙাচোরা টিউবওয়েলটা খটাং খটাং করিস, ওই শব্দ পেলেই আমি ছুটে চলে আসব।

জলের অভাব ছিল না; সারাদিন ধরেই হাতলটা ঘটাং ঘটাং হত। গুনিয়া রান্না করতে করতে শুনতে পেয়ে হাসি হাসি মুখে চুপ করে থাকত। সাড়া দিত না। মিনিট দশেক বাদে উঠে গিয়ে জানালা দিয়ে উঁকি দিত—বলত, আরে, কৌ রে? নাটিয়া? মু এবে যাই পারিবিনি, দ্বিটার সম্যে টাইম মিডিব।

গুনিয়ার পরোপকারের নেশার জন্যে তার বাজারে খুব দাব ছিল। একজনের কাছ থেকে ধার নিয়ে আরেকজনেক দানধ্যান করবার বিশ্রী স্বভাবটার জন্যে অনবরত মা'র কাছে বকুনি খেত গুণনিধি। এইজন্যে দিবারাত্রি তার কাছে পাওনাদারের অশ্রান্ত আনাগোনা। কেউ আসে ধার চাইতে, কেউ বা আসে শোধ করতে। এই দু'রকমের ভিজিটারদের দৌলতে গুনিয়ার স্পেশাল কলিং বেল সারাদিনই বাজত, আর তিনতলার টাংকে জল উপচে পড়ত।

গুনিয়া অর্থলোভী ছিল না, কিন্তু যশে তার খুবই লোভ ছিল। মা'র ভাঁড়ার ঘর থেকে লুকিয়ে চালটা ডালটা সরিয়ে প্রায় দরজা হতে পাড়ার ডোমেস্টিক হেল্পারদের রেকার ভাতা সাপ্লাই করত সে। মা ধরে ফেলতে পারলেই স্মার্ট গুনিয়াভাই একগাল হেসে, সটান মাটিতে শুয়ে পড়ে যাত্রার ঢঙে মা'র দুই পা জড়িয়ে ধরত —তুমি তো মা অন্নপূর্ণা। কত বড়লোকদের বিয়েবাড়ে নেমন্তন্ন করে খাওয়াচ্ছ রোজ রোজ। না হয় দুটো দিন গরীবের পেটে দু'মুঠো অন্ন দিলেই—ওদের আশীর্বাদে খুকুভাইয়ের মঙ্গল হব মা—

পা ছাড়... পা ছাড়... উঃ, কি যন্ত্রণা—মা'র তখন হয়েছে মহা মুশকিল—সঙ্কোচের একশেষ। মাকে বিব্রত করাই গুনিয়ার উড়ে-যাত্রার উদ্দেশ্য। গুনিয়ার কাঁধে চড়েই আমি ছেলেবেলায় উড়ে-যাত্রা দেখতে গেছি; তাই ঢংটা চেনা।

এই যশের লোভেই গুনিয়াভাইকে প্রায়ই নানা ঝঞ্ঝাটে পড়তে হত। চাল মারাটা ছিল তার স্বভাবসিদ্ধ। চালিয়াতির জোরেই গুনিয়া পাড়ার সব গৃহভৃত্যদের সর্বাধিনায়ক, গিন্নিদের একচ্ছত্র মন্ত্রণাদাতা এবং ছেলেমেয়েদের গণ-অভিভাবক হয়ে উঠেছিল।

নানা ভাবে অন্যের উপকার করা গুনিয়ার নেশা, তাতে নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও। লোকে ধন্য-ধন্য করবে, ওতেই তার সবচেয়ে আনন্দ। গুনিয়ার মস্ত গর্ব ছিল, তার মতন দারুণ বাজার করতে আর ত্রিভুবনে কেউ পারে না। এর জন্য যে কোন কষ্ট স্বীকারে রাজী ছিল গুনিয়া। একবার হল কি, রোববার সকালে বৈঠকখানায় কথা হচ্ছে, পোনা মাছের বাজারদর আগুন, আট টাকা সের হয়েছে। পঁচিশ বছর আগেকার কথা। গুনিয়াভাই চা দিতে ঢুকে সে-কথা শুনতে পেয়ে বলে উঠল, আঠঅ টংকা— কৌ ষড়া কহিচি? বড়া মিছ্যা কথা কহিচি পরা? মু পাঞ্চঅ টংকা করি আনি দব।

BanglaBook.org

গুনিয়ার কথা শুনে কাকাবাবুর রাগ হয়ে গেল। তিনি রোজ নিজেই বাজার করেন। মিথ্যে কথা মানে? প্রথমে শালা, তারপরে মিথ্যাবাদী সম্ভাষণে কার বুক আহ্লাদে ফুলে ওঠে? খচাৎ করে পকেট থেকে কড়কড়ে দশ টাকার নোট বের করে দিয়ে কাকাবাবু গুনিয়াকে বললেন, বেশ তো, গুণনিধি, তুমি আমাকে দু'সেরের একটা পোনা মাছ এনে দাও দিকিনি?

দিয়, মতে দসঅ টংকা দিয়। মু আনি দউটি—বলে ঝটকা মেরে টাকাটা ছিনিয়ে নিয়ে, ধুতিটা একবার ঝেড়ে নিয়ে, পৈতের ওপর গেঞ্জী চড়িয়ে, থলে হাতে, গুনিয়াভাই তক্ষুণি ডাঁটসে বেরিয়ে গেল। খানিক বাদেই একটা টাটকা চমৎকার স্বাস্থ্য সমুজ্জ্বল প্রায় দু' সেরি রুই মাছ হাতে ঝুলিয়ে ফিরে এলো। কাকাবাবুর চোখ রাণাঘাটের ছানাবড়া, আর গুনিয়া? গুনিয়ার চোখ-মুখে নাসাগ্রা ফলসের মত প্রবল গর্ব আর আত্মতৃপ্তি উছলে পড়ছে। রুই মাছ হ্যাণ্ডওভার করে দিয়ে, গুনিয়াভাই ছোটখাট একটা বক্তৃতা দেয় বৈঠকখানায় সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে—যার মূল বক্তব্য আপনারা দর করতেও জানেন না, মাছও চেনেন না। নইলে কেউ কখনো আট টাকা দরে পাঁচ টাকার মাছ কিনে আনে? বাবার বন্ধুমহলে গুনিয়ার অসামান্য ক্ষমতা নিয়ে আরো একবার ধন্য-ধন্য পড়ে গেল। কেবল সবাই চলে যাবার পরে মা বললেন—গুণনিধি, তুমি আজকে মাইনে থেকে পাঁচ টাকা যে আগাম নিলে, সেটার হিসেব আমি গণেশবাবুকে মাছ খাওয়ানো বাবদ খরচা বলে লিখে রাখি? গুনিয়াভাই স্কুল পালিয়ে ধরা-পড়া বাচ্চা ছেলের মত লজ্জিত মুখে বলল, মিছ্যা কথা কহিবিনি মা। সাতঅ টংকা লাগিলা। মা জানেন লেগেছে আট টাকাই। কিন্তু ও সব টাকাকড়ির আসল হিসেবের মধ্যে গুনিয়াভাই যাবে না কিছুতেই।

ওদিকে বাবা আরেক অসংসারী—এবার বাবাই বাধালেন ঝামেলা। সব্বাইকে ডেকে ডেকে বলতে লাগলেন, তোমরা যে যখন বেশি করে মাছ কিনবে, গুণনিধিকে বোলো, খুব শস্তায় এনে দেবে। আট টাকার মাছ পাঁচ টাকাতে। ফলে বাবার বন্ধুবান্ধবরা প্রায়ই মাছ কেনবার জন্যে গুনিয়াভাইকে অগ্রিম টাকা গছিয়ে দিয়ে যেতে লাগলেন। গুনিয়াও মাছের সাপ্লাই দিতে লাগল মহানন্দে।

মা টের পেয়ে আকাশ থেকে পড়লেন—নাঃ। গুনিয়া, এ চলতে পারে না। তোমার পয়সায় তোমার বাবুর বন্ধুরা রোজ রোজ মাছ খাবেন, আর আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব, তা হয় না। আমি এবারে ওঁদের বলে দেব।

গুনিয়াভাই প্রায় কেঁদে পড়লো। মা'র কাছে এবার প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে যায় বুঝি!—কিচ্ছি কহিবার হবনি মা, কিচ্ছি কহিবার নাহি। মু সব্বু মেনেজ করি নেবি --কালি সব্বু ফিটফাট হেই যিব পরা।

পরদিন বাবার বন্ধুদের চা দিতে বৈঠকখানায় নামিয়েই গুনিয়াভাই কপাল চাপড়ে হাহাকার করে কেঁদে উঠল—এতদিনের চেনাশুনো মাছওলাটা, হায়রে তার সেই দেশোয়ালী ভাইটা, কলেরা হয়ে হঠাৎ এক রাত্তিরেই মারা গিয়েছে! আর কোন

দিনও আট টাকার মাছ পাঁচ টাকাতে পাওয়া যাবে না তাই। বাবুদেরও সুখের দিন ফুরুল। জীবন বড় অনিত্য!—

ইয়াং সায়েবের গাড়ি

ঠাকুর্দাদার এক বন্ধু ছিলেন, লম্বা দাড়িওলা বুড়ো সাহেব। পাদরি নন, কিন্তু তাঁর জীবনটা ঠিক পাদরিদের জীবন যেমন হওয়া উচিত, তেমনি ছিল। বিয়ে করেননি, সারাটা দিন কাটাতেন বস্তিতে। গরিব লোকদের ওষুধ বিলিয়ে, খাবার বিলিয়ে, বাচ্চাদের দুধ বিলিয়ে বুড়োদের চাদর কম্বল, এমন কি বিড়ি পর্যন্ত ইয়াং সায়েব নিজে থেকেই দিয়ে যেতেন। ইংরেজরা আমাদের দেশকে শোষণ করে যে পাপ করেছে, উনি একাই নিজের পকেট থেকে সময় ও টাকা এবং বুকের ভেতর থেকে ভালবাসা ঢেলে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চেষ্টা করতেন।

ঠাকুর্দাও তো বস্তির লোকদের মিনিমাগনা চিকিৎসা করতেন (বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ছিলেন তিনি), সেই সূত্রেই হয়তো তাঁর ভাব জমেছিল ইয়াং সায়েবের সঙ্গে। ভোরবেলা দু'জনে একসঙ্গে হেদোয় হাঁটতেন। ইয়াং সায়েবের বিরাট বিলিতি কুকুরটা আগে-আগে ছুটত। সন্ধ্যেবেলা অনেকসময়ে দু'জনে দাবা খেলতে বসতেন বৈঠকখানায়। ইয়াং সায়েব চমৎকার বাংলা বলতেন। তাই আমরা ওঁকে ভয় পেতুম না।

আসতেন একটা ছোট্ট টু-সীটার কনভার্টিবলে চড়ে। লোকে বলত "ইয়াং সায়েবের ডিবে"। গাড়িটার গড়ন সত্যিই অনেকটা পানের ডিবের মতন, রংটাও ছিল রুপোলি। কনভার্টিবলের ছাদটা কালো ক্যানভাসের। গাড়ির ঘাড়ের কাছে গলার চাদরের মতন ওটা ভাঁজ করাই থাকত চিরকাল, রোদে-বর্ষায় সেটাকে কেউ উঠতে দেখেনি। গাড়িটা চালাতেন সায়েব নিজেই। আর গাড়ির যাত্রী ছিল একটিই মাত্র। পিছনের ছোট্ট অর্ধচন্দ্রাকার সীটে গম্ভীর হয়ে সোজা বসে থাকত নিউটন। সোনালি রঙের দীর্ঘ লোমে ভরা বিরাট বিট্রিভার। ইয়াং সায়েবের পিছু-পিছু বস্তিতে-বস্তিতে ঘুরত যখন, নিউটনকে দেখাত যেন একটা বাঘের মতন। তেজী কী! বস্তির বাচ্চারা একটা ঢিল পর্যন্ত মারতে সাহস করত না নিউটনকে। আমরা কেউই ঠিক জানি না কবে ইয়াং সায়েব ঠিক কী কাজের জন্য প্রথম কলকাতায় এসেছিলেন। কোনো কোম্পানির কাজেই, না ব্যক্তিগত প্রয়োজনে। কিন্তু একদিন তাঁর কলকাতার কাজ ফুরোল। অবসর নিয়ে দেশে যাবার সময় হল। ইয়াং সায়েব রিটায়ার করলেন।

ঠাকুর্দাকে এসে বললেন, ভয়ানক সমস্যা হয়েছে। নিউটনকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। বিলেতের কুকুর এখানে নিয়ে আসা যায়, কিন্তু এখানে এলেই তার জাত যায়। সে কুকুরকে আর এ-জন্মে বিলেতের মাটিতে ফিরতে দেওয়া হয় না। তার প্রবেশ নিষেধ। কে জানে এখান থেকে কোন রোগবালাই নিয়ে যাবে? অতএব, হুড খোলা গাড়ির পিছনের সীটে খোলা হাওয়ায় দটি কান ভাসিয়ে দিয়ে বেড়াত যে নিউটন, ইয়াং সায়েবের সঙ্গে তার স্বদেশে ফিরে যাওয়া আর হবে না। নিউটনকে অন্য কারুর হাতে দিয়ে যাওয়াও ইয়াং সায়েবের পছন্দ হল না, কে জানে তার ঠিকমতন যত্ন হবে কিনা? তার চেয়ে সায়েব তার ডাক্তারকে দিয়ে নিউটনকে জন্মের মতন ঘুম পাড়িয়ে দেবেন, ঈশ্বরের কোলে আর তার অযত্নের ভয় নেই।

জামাকাপড়, বইপত্তর, আসবাব, বাসনকোসন, সামান্য সংসার যা কিছু তাঁর ছিল, বস্তিতে সমস্তই বিলিয়ে দিয়ে, সায়েবের মনে পড়ল, গাড়ির কথা। গাড়ি হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব? বস্তিতে তো তার উপযুক্ত রক্ষক নেই।

ছোট্ট পানের ডিবের মতন গাড়ি, স্টীয়ারিংয়ে ঝুঁকে পড়ে চালাচ্ছেন বুড়ো সায়েব, সাদা চুল সাদা দাড়ি বাতাসে উড়ছে। পিছনে বসে আছে সোনালি নিউটন। সোনালি কান, সোনালি লোম বাতাসে উড়ছে। এ-পাড়ার অতি পরিচিত দৃশ্য। ডাক্তার দিয়ে গাড়িকে ঘুম পাড়ানো যায় না, তাই অতি প্রিয় গাড়িটি যাবার দিনে ইয়াং সায়েব তাঁর প্রিয় বন্ধুকে সমর্পণ করে জাহাজে গিয়ে উঠলেন। ঠাকুর্দাকেই দানপত্র করে গেলেন গাড়ির চাবিটি। গাড়ি পার্ক করা রইল রাস্তায়, আমাদের বাড়ির দোর-গোড়ায়। চকমেলানো উঠোনের ভেতরে অনেক জায়গা থাকলে কী হবে, গাড়ি ঢোকানোর মতন রাস্তা তো নেই।

ইয়াং সায়েব চলে গেলেন, তাঁর গাড়ি পড়ে রইল পথে। আমাদেরই বাড়ির সামনে। ঠাকুর্দা, বাবা, কাকা, কেউই গাড়ি চালাতে জানেন না। বুড়ো রহিম কোচোয়ান অবশ্য জানে, কিন্তু সে তো অন্য রকমের গাড়ি। বাইরে পড়ে-পড়ে অত সাধের গাড়ি রোদে-জলে নষ্ট হতে লাগল। আর সেই দেখে পাড়ার লোকেরা হায়-হায় করতে লাগল প্রতিদিন। বাবা তখন ঠাকুর্দার অনুমতি নিয়ে পাশের গলিতে ভবানীবাবুর লোহালক্কড়ের দোকানের (যার সামনে 'ভওয়ানী এঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস' লেখা সাইনবোর্ড টাঙানো) ভেতরে তুলে রেখে দিয়ে এলেন ইয়াং সাহেবের গাড়ি। তবু তো ঢাকা জায়গায় থাকবে। যাক। এবারে ঠাকুর্দাও নিশ্চিন্ত, পাড়ার লোকও। আর ভবানীবাবুর বাচ্চাদের তো পোয়াবারো। আমাদের গাড়িটার ভেতরে বসে বসে কত কিছুই তারা খেলা করে। আমরা মাঝে-মাঝে রাস্তা দিয়ে যেতে-যেতে উঁকি মেরে খবর নিয়ে যাই। দিব্যি খেলাঘর হয়েছে ওদের। আমাদের একটু-একটু হিংসে হয়। যার ধন তার ধন নয়কো, নেপোয় মারে দই।

কিছুদিন বাদে আমাদের সাহেবি মেজোমামা এলেন দিল্লি থেকে। মেজোমামা গাড়ি-পাগলা লোক। এসেই খোঁজ করলেন, "কই, কই, ইয়াং সায়েবের গাড়িটা

কোথায় গেল জামাইবাবু?" তক্ষুনি 'ভওয়ানী এঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কসে' পাঠিয়ে দেওয়া হল মেজোমামাকে। ঘণ্টা কয়েক বাদে নাচতে-নাচতে এলেন মেজোমামা—"চলবে, চলবে—গাড়ি ইজ ইন ফাইন কনডিশন—দুটো দিন সময় দিন জামাইবাবু, আই শ্যাল টেক ইউ ফর আ ফাইন লং ড্রাইভ।"

দু'দিন ধরে ঘাড় গুঁজে ভবানীবাবুর মিস্ত্রিদের নিয়ে কী সব যেন করতে লাগলেন মেজোমামা, গাড়ির কাজকর্ম। তারপর বাবা গিয়ে ঠাকুর্দার অনুমতি চাইলেন, মেজোমামা কি ইয়াং সায়েবের গাড়িটা চালাতে পারেন? ঠাকুর্দা তো খুব খুশি। নিশ্চয়, নিশ্চয়। কাজে লাগাই তো ভাল। এ কি সোনা যে সিন্দুকে তোলা থাকবে? না ঘরের বউ যে অন্দরমহলে তোয়াজ করে বসিয়ে রাখবে? যন্ত্রপাতি হল হাত-পায়ের মতন, সদাসর্বদা চালু রাখতে হয়। তবে ঠাকুর্দাকে চড়তে যেন বোলো না কেউ। ঠাকুর্দা ওই 'কুকুরের সীটে' বসে পাড়া বেড়াতে রাজি নন। "নিজে চালাতে জানলে চড়তুম।"

তা ঠাকুর্দা না যান, আমরা রাজি। আমরা পাঁচভাই এবং তিন বোনই রাজি। "অল ইন গুড টাইম" মেজোমামা হাত তুলে বললেন, "ডোন্ট রাশ, টু বাই টু যাবে সব, ট্রিপ বাই ট্রিপ।"

ও হরি, এটা তো টু-সীটারই। "পেশেন্স প্লীজ।"

অবশেষে ভবানীবাবুর দোকানের সামনে গাড়ি একদিন রাস্তায় নামল। মেজোমামা ড্রাইভার। তাঁর পাশে ঘেঁষে বড়দা। পিছনে, ছোট্ট অর্ধচন্দ্রাকৃতি কুকুরের সীটে ঠাসাঠাসি করে সগর্বে বসে আছি মেজদা আর আমি। পরের ট্রিপে মণি-শুভো-অভু-খুকুরা যাবে—ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। বড়-থেকে ছোট, এভাবে টার্ন আসবে। তারপর যতই চাবি ঘোরানো হয়, গাড়ি কেবল ঘোঁত-ঘোঁত করে; নড়ে আর না। ব্যাটারিতে পবিত্র জল, গাড়িতে তেল, জল, মবিল, চাকায় বাতাস, কোথাও কিচ্ছুর অভাব নেই। গাড়ি তবু স্টার্ট নিল না। আমাদের মুখ চুন। মেজোমামা বললেন, "নো প্রবলেম, বসে বসে জং ধরেছে, জাম হয়ে আছে যন্ত্রপাতি—ঠেলা মারলেই গড়িয়ে যাবে। চলবেই।"

সত্যি। ভবানী এঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কসের কালিঝুলি মাখা কয়েকজন ষণ্ডামার্কা কুলি-মজুর এসে "হেঁইয়া" বলে ঠেলা দিতেই অমনি গোঁ-গোঁ করে গাড়ি স্টার্ট নিল। তারপর সত্যি-সত্যি চলতে লাগল ইয়াং সায়েবের গাড়ি। আহ্লাদে দোকানের লোকেরা হৈ-হৈ করে হাততালি দিয়ে উঠল, আমরাও জোরসে চেঁচালুম, মেজোমামা সকলকে সগৌরবে হাত নাড়তে-নাড়তে এগিয়ে চললেন; যেন বিশ্বপরিক্রমায় বেরুচ্ছেন একচাকার সাইকেলে।

আমরা গলি থেকে বেরিয়ে, আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে, বড় রাস্তার দিকে যাব। তার জন্য আগে থেকেই নানান প্রস্তুতি হয়েছে। ঠাকুর্দা, বাবা, কাকা ফুটপাতে নেমে ফতুয়া পরে, চটি-টটি পায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অনেকক্ষণ। দোতলার

BanglaBook.org

ঝুলবারান্দায় পিসিমার দল এসে ভিড় করেছেন। এমন কী, ঠাম্মা আর কর্তামাকে বারান্দায় এনে, মাদুর বালিস দিয়ে আরাম করে বসানো হয়েছে। মেঝেয় বসে-বসেও লোহার রেলিঙের ফাঁক দিয়ে পথের গাড়ি-ঘোড়া দিব্যি দেখা যায়। এ-বাড়ির ইতিহাসে সর্বপ্রথম নিজস্ব মোটরগাড়িটি আজ রাস্তায় নামছে। 'শুভ মহরবত' উৎসব, নাকি 'উদ্বোধন'? প্রথম পথপ্রবেশ সোজা কথা? সবাই মহা উত্তেজনায় প্রতীক্ষমাণ। দুর্গা শ্রীহরি, দুর্গা শ্রীহরি। ভালয় ভালয় উতরে দিও ঠাকুর।

গাড়ি চলবামাত্রই প্রচুর হাততালি পড়ল। এ-হাততালির ক্রেডিট অবশ্য আমাদের নয়, তবু গর্বে আমাদের বুক ফুলে উঠল। ক্রমশ গলি থেকে বেরিয়ে মোড় ঘুরে গাড়ি আমাদের বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়ল। ইন্দিরা গান্ধী রাস্তা দিয়ে গেলেও এই গলিতে এমন ভিড় হবে না। এখন আমাদের বাড়ির সামনে পাড়ার লোকজন সবাই জড়ো হয়েছেন, কী তীব্র গভীর উৎসাহ! মোড়ের পার্মানেন্ট ছেলেদের মধ্যেও মনোযোগের একটা স্বতন্ত্র আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে। খুব আস্তে-আস্তে গাড়ি বাড়ির দিকে এগোচ্ছে। আমাদের চুলগুলো কুকুরটার লম্বা কানের মতোই বাতাসে লুটোপুটি করছে। আমরা সগৌরবে ঘাড় স্টিফ করে রাস্তা-টাস্তা দেখছি। হুডখোলা গাড়ি, খুব আরামের। "হাওয়া খেতে বেরুনো" কথাটার মানে বোঝা গেল এতদিনে। গাড়িটা যেই বাড়ির সামনে এল, আত্মীয়দের চোটে আমরাও চেঁচালুম, মেজোমামাও চেঁচালেন, গাড়ি দেখামাত্র ফুটপাতে কিউ করে দাঁড়ানো আমাদের ভাইবোনেরাও হৈ-হট্টগোল শুরু করল। মেজোমামা গাড়ি চালাতে-চালাতেই দিব্যি স্মার্টলি বিলিতি সিনেমার নায়কদের কায়দায় হাত নেড়ে "ওয়েভ" করতে লাগলেন দর্শকদের দিকে। উজ্জ্বল মুখে ঠাকুর্দা, বাবা এবং কাকা সজোরে সাদা-সাদা রুমাল নাড়তে লাগলেন তার উত্তরে। দারুণ উত্তেজিত অবস্থা সারা পাড়াটার। আমরা বাড়ির সামনে দিয়ে যারপরনাই অহংকৃত মুখে পাস করবার সময়ে হঠাৎ দোতলার বারান্দা থেকে মাঙ্গলিক ফুল-বেলপাতার এক পুঁটলি উড়ে এসে আমাদের মাথায় ঝুপ্স করে পড়ল। মা-কাকিমারা পর্যন্ত বারান্দায় উল্লাসে হৈ-হৈ শুরু করে দিয়েছেন। নতুন গাড়িটাকে নতুন বরের মতই বরণ করে ঘরে নেওয়া হচ্ছে। কী রিসেপশন!

গাড়ি যখন মোড় ছাড়িয়ে বড় রাস্তার দিকে চলেছে, হঠাৎ বাবা চেঁচিয়ে মেজোমামাকে বললেন, "বড়রাস্তা অবধি যেও না নির্মল, এখানেই গাড়িটা ঘুরিয়ে নাও—

"হবে, হবে।" মেজোমামা সান্ত্বনার ভঙ্গিতে হাত নাড়েন। গাড়ি চলতেই থাকে।

এবার ঠাকুর্দার গলা এল, "ভাঙা গাড়ি নিয়ে বড়রাস্তায় যেও না নির্মল, ঘুরিয়ে ফ্যালো—"

"হবে, হবে।" মেজোমামা হাসিমুখে ফের হাত নাড়েন, গাড়ি চলতেই থাকে। চলতেই থাকে। থামার কোনো লক্ষণ নেই, যেন গড়িয়ে দেওয়া মার্বেল। আমরা মহা খুশি। বুকের মধ্যে নিঃশব্দ লাউডস্পীকারে "চল চল চল। ঊর্ধ্বগগনে বাজে

মাদল, নিম্নে উতলা ধরণীতল, অরুণপ্রাতের তরুণদল" গান হচ্ছে। এমন সময়ে গম্ভীর স্বরে মেজোমামা বললেন, "স্কোয়াড, ডু নট প্যানিক। মন দিয়ে শোনো। আমি যেই বলব 'স্কোয়াড, জাম্প অফফ; অমনি তোমরা তিনজনেই গাড়ি থেকে ঝপাঝপ ঝাঁপিয়ে পড়বে, বুঝলে? ওপরে হুড নেই, লাফাতে কিচ্ছু অসুবিধে হবে না। আর বাঁদিকের দরজাটাও খুলে দেব।"

"কিন্তু কেন লাফ দেব মেজোমামা?" ট্রামলাইন আর দূরে নয়, স্পষ্ট ট্রাক, ট্যাক্সি, দোতলা বাস যাতায়াত করছে পঞ্চাশগজের মধ্যে। অবাধ্য হুপিং কাশির মতন, ইয়াং সায়েবের নস্যির ডিবের মতন গাড়িটা চলছে তো চলছেই, কিছুতেই থামছে না।

মেজোমামা বললেন, "ব্রেকটা নেই কিনা।"

ততক্ষণে ভয় পেয়ে গেছি। ঠাকুর্দা, বাবা দুজনেই পিছনে ডুগেটে চেঁচাচ্ছেন, "বড় রাস্তাটা অ্যাভয়েড করো নির্মল, ওখানে বড় ঝামেলা।"

মেজোমামা আপনমনেই স্বগতোক্তি করলেন, "ব্রেকটা থাকলে অবিশ্যি অনেক সুবিধা হয়—তবে না থাকলে আর কী করা? যাক, ওই দূরের লাল পাঁচিলটার গায়ে আমি খুব লাইটলি একটা ধাক্কা দেব, আর বাঁদিকের দরজাটা খুলে তোমরা সব বাইরে লাফিয়ে পড়বে। কিন্তু এখনই নয়—আমি যখন বলব 'ওয়ান, টু, থ্রী —স্কোয়াড জাম্প অফফ... সেই তখন। এবার স্কোয়াড, গেট রেডি—"

সামনেই শুরু হচ্ছে মহেশ গাঙ্গুলিদের আম বাগান। সেই টানা লম্বা লাল ইটের বেঁটে পাঁচিলটার দিকে মেজোমামা খুব আস্তে করে সাবধানে এগিয়ে গিয়ে একটা ক্যালকুলেটেড টু মারলেন, বেশ আলতো করে। "নো অফেন্স টু এনিবডি।"

কিন্তু বিলিতি গাড়ি বলে কথা। তার তেজই আলাদা। মুহূর্তেই পাঁচিল ফুটো করে একটা ল্যাংড়া আমের গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা মেরে, তবে গাড়ি থামল।

"স্কোয়াড, জা-ম্প অফফ—" বলে চেঁচিয়ে, একমাত্র মেজোমামাই লাফিয়ে পড়েছেন গাড়ি থেকে। ডানদিকের দরজা খুলে। বাঁয়েরটা আর খোলেননি। আমরা কেউ লাফাতে পারিনি। উলটে বড়দা গুটি-সুটি শুয়েই পড়েছে। মেজদা আবার আমাকে আপ্রাণ জোরসে জাপ্টে ধরেছিল ভয়ের চোটে। লাফার কী। চোখ বন্ধ করে যে যার কোলের ভেতরে মাথা নামিয়ে ফেলেছিলুম তিনজনে। কারুর কিছু হয়নি অবশ্য—কেবল গায়ে ঝুরঝুর করে কিছু চুনসুরকির বৃষ্টি হয়েছে। কী ভাগ্যি, পাঁচিলটা কোমর পর্যন্ত। মহেশ গাঙ্গুলির আমবাগানে নাকটি, আর ফুটপাতে লেজ (অন্তর্গত আমরাও ফুটপাতের অংশেই), কোমরে পাঁচিলের অর্ধ-চন্দ্রহার পরে পার্বতীর মতো সলজ্জ দাঁড়িয়ে রইল ইয়াং সায়েবের ডিবে—ন যযৌ ন তস্থৌ। স্ক্রীন ভেঙে চুরমার। কিন্তু আমাদের কোনো ক্ষতি হয়নি, এককুচিও ভাঙা কাচ গায়ে পড়েনি কারুর। বীর-গর্বে মেজোমামা বললেন, "এর নাম হচ্ছে ফাইনার টাচেস। বুঝলি? —কার ব্রট আনডার ফুল কনট্রোল, উইদাউট এনি হার্ম টু দ্য প্যাসেঞ্জারস।" যাত্রী

কেন, স্ক্রীনটি ভিন্ন গাড়িব নিজেবও কোনো ক্ষতি হযেছে বলে মনে হল না। বাকিটা বেশ তো অক্ষতই দেখাচ্ছে। প্যাটন ট্যাঙ্কেব মতো শক্ত-পোক্ত।

মহেশ গাঙ্গুলিব বাগানেব মালি কিন্তু 'ফাইনাব টাচেস'টা মোটেই বুঝল না। তেড়ে এসে ভযানক মুখভঙ্গি কবে প্রচণ্ড বেগে তেজী ভাষায সে আমাদেব চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধাব কবতে লাগল। তাব মধ্যে সাক্ষাৎ দুই পুরুষ ঠাকুর্দা এবং বাবা-কাকা অবিলম্বেই সেখানে উপস্থিত হলেন। ঠাকুর্দা ব্যস্ত হযে বললেন, "গাড়িব ব্রেকটা কখন গেল, নির্মল?"

"ব্রেক তো যাযনি, তাঐ-মশাই?"

"তবে গাড়ি থামছিল না কেন?"

"ব্রেক ছিল না বলে।"

"মোটে ছিলই না? নো ব্রেকস অ্যাট অল?"

"ন্নাঃ।"

এবাবে বাবা মুখ খুললেন। "অমন গাড়ি তুমি বাস্তায বেব কবলে কী বলে, নির্মল? আব বাচ্চাদেবই বা চড়ালে কেমন কবে?"

"কিন্তু আমি তো ওদেব প্রিপেযাব কবেই নিযেছিলুম। আব ইচ্ছে কবেই তো বেছে-বেছে এই পাঁচিলেব গায লাইটলি গ্রেজ কবিযেছি। এটা কারুব বেসিডেন্সও নয, দোকানপাটও নেই, বাস্তাও ব্লক করবে না। অসুবিধেটা কী হযেছে জামাইবাবু?"

বাবাবও একই কথা। "বিনা ব্রেকে তুমি গাড়ি বাস্তায বেব কবলে কী বলে?"

"আবে, ব্রেক দিযে কী হবে? আমরা তো দেখছিলুম যে গাড়িটা ঠিকঠাক চালু হবে কি না। গাড়িটা ঠিকঠাক থামবে কি না, এটা তো দেখা উদ্দেশ্য ছিল না? বলুন? লেট আস বি লজিক্যাল।" মেজোমামা স্মার্টলি প্যান্টেব পকেটে হাত গুঁজে অল্প ঘাড বেঁকিযে, গ্রেগবি পেকেব মতো দাঁড়ান। মুখে হাসি।

"লজিক্যালই বটে।" এ-লোককে নিযে বিতর্ক অসম্ভব। বাবা তাঁব শ্যালকটিকে ভাল কবেই চেনেন। তিনি ক্রুদ্ধ ঠাকুর্দাকে বুঝিযে-সুজিযে আমাদেব সঙ্গে বাড়ি পাঠিযে দিলেন। কাকাকে পাঠালেন মিস্ত্রি ডাকতে। মেজোমামা বাবাব সঙ্গে-সঙ্গে বইলেন, হেলপ দেবাব জন্যে, না লজিক বোঝাতে, ঠিক জানি না।

পুত্রেব বড়কুটুম্ব বলে কথা। দারুণ চটে গেলেও ঠাকুর্দা মেজোমামাকে কিছুই বললেন না। বাবাও চুপ কবে গেলেন। মালিকে প্রচুব প্রণামী দিযে এবং তক্ষুনি বাজমিস্ত্রি ডেকে পাঁচিলটা মেবামত কবিযে তবে ছুটি পেযেছিলেন বাবা। হৈ-হৈ কবে পথে লোকজন তো আগে থেকেই যথেষ্ট জমেছিল। তাদেব দিযে ঠেলিযে বাবা গাড়িটাকে আবার ভবানীবাবুব সেই লোহালক্কডেব দোকানেই তুলে দিযে এলেন। ঠাকুর্দাব মনটা খাবাপ হযে গেল। আমাদেবও। ইযাং সাযেবেব গাড়ি আমাদেব সইল না। ঠাম্মা বললেন, "গাড়ি চড়বার জন্যে আলাদা কপাল কবে আসতে হয়।" ঠোক্কবটা মাকে, যেহেতু গোলমাল বাধিযেছেন তাঁবই ভাইটি। কোথায় ভেবেছিলুম এক-এক দিন এক-একটা নতুন-নতুন জাযগায় বেড়াতে যাব। জাদুঘর, চিড়িয়াখানা, শিবপুর,

BanglaBook.org

মল্লিকবাড়ি. টু বাই টু, ট্রিপ বাই ট্রিপ। মেজোমামা থাকতে-থাকতে শিখেও নেব গাড়ি চালানোটা। সব ভেস্তে গেল। কিছুই হল না। মেজোমামারই সামান্য ত্রুটির জন্যে সব নষ্ট। ব্রেকটা ঠিক করিয়ে নিলেই তো হত। কিন্তু শুভলগ্নটি কেটে গেল।

ভবানীবাবুই নতুন ব্যাটারিটা ধার দিয়েছিলেন পুরনোর বদলে। দুটোই ফেরত নিয়ে নিলেন এইবারে। হরিয়া রিকশাওলা তার গাড়ির জন্যে সামনের সীটখানা চেয়ে নিয়ে গেল খুলে। সেই দেখে ভবানীবাবু পিছনের গদিটাও খুলে নিয়ে বেঞ্চিতে পেতে রাখলেন, খদ্দেরদের বসানোর জন্য। "ঘুঘুল...ঘু...ঘু..." হর্নটি মেজোমামার খুব প্রিয় বলে ঠাকুর্দা ওটা খুলে মেজোমামাকেই প্রেজেন্ট করলেন. তাঁর দিল্লির গাড়ির জন্যে।

ইয়াং সায়েবের গাড়ির কথা প্রায় ভুলেই গেছি, এমন সময় পাড়ার আটাকলের হিন্দুস্তানী মালিক, ওই রামস্বরূপ তেওয়ারিজি. পঁচিশ টাকাতে গাড়ির আস্ত ইঞ্জিনটা কিনে নিয়ে গেলেন. আটা পেষাইয়ের কলটা চালাবেন বলে। হার্ট ট্রান্সপ্লান্টের কায়দায় এক অর্থে ইয়াং সায়েবের গাড়ি কিন্তু এখনও জীবিতই আছে আমাদের পাড়ায়। গম ভাঙিয়ে ঘরে-ঘরে আটা ময়দা সাপ্লাই করছে সে নিত্য নৈমিত্তিক।

ঠাকুর্দার কাছে প্রতি বড়দিনে ইয়াং সায়েবের কার্ড আসে—'গাড়ি কেমন চলছে?'

সত্যবাদী ঠাকুর্দা এর একটা জবাব বানিয়েছেন, অনেক ভেবেচিন্তে। ঠাকুর্দা প্রত্যেকবারই এই উত্তরটি তাঁর বন্ধুকে নিশ্চিন্ত চিত্তে লেখেন, "শুনে সুখী হবে যে, নানাভাবে তোমার প্রিয় গাড়িটি এখনও এ-দেশে যথার্থই সমাজসেবার কল্যাণকর্মে লাগছে।"

BanglaBook.org

চোর-চোর

রোববার সকালে সবাই মিলে মণিদার বাড়িতে গুলতানি হচ্ছে, এমনি সময়ে দাদুভাই এসে হাজির। হাতে এক থলে ভর্তি কচি কচি কষটে আম। দাদুর বাগানে ফার্স্টক্লাস ল্যাংড়া হয়। সেগুলো এমনি কাঁচায় তুলে ফেললেন? হায়। হায়। ঝড়ঝাপটা কিছুই হয়নি যে আপনি ঝরে পড়বে। দাদুর কি মাথাখারাপ হলো? দাদু বললেন:

—"আর বলিসনি, যা কেলেংকারী হয়েছে পাড়াতে। কাজ নেই আমার ল্যাংড়া আম খেয়ে। কাঁচা আমের ফটিক ঝোলই খেয়ে নে। শেষে কি ফাঁসি যাবো. আম খেতে গিয়ে?"

—"ফাঁসি? নিজের বাগানের আম নিজে খাবে, এতে তোমায় ফাঁসি দিচ্ছে কে?"

—"আবার কে? মহামান্য সরকারী বিচারশালা। পাশের বাড়ির কেসটা তো শুনলি? কর্নেল বাসুর কী হলো?"

—"সেই গেল বছরে তোমাদের পাড়ায় কী সব যেন হয়েছিল, না?"

—"কী-সব-যেন নয়, খুন। খুন হয়েছিল। এই আমের জন্যে। পাড়ার ছেলেরা রোজ রাত্তিরে আমবাগানে দৌরাত্মি করতো, একটা আমও রাখতো না। বারবার বারণ করেছে বুড়ো, ছোঁড়ারা কথা শোনেনি। গাছ ভেঙে তচনচ। তারপর এক রাত্তিরে এক ব্যাটা বাঁদর ছেলে এসে পটকা ফাটিয়েছে—আর কর্নেল বাসুকে কী সব থ্রেটন করেছে, ইনসালটিং অঙ্গভঙ্গি করেছে, শেষে এইসা খেপিয়ে দিয়েছে যে মিলিটারী বুড়ো ছুটে গিয়ে ঘর থেকে রাইফেল নিয়ে এসে মাস্তানটিকে শুট করে বসেছে। ছেলেটা পাঁচিলের ওপরেই শট ডেড। তারপর থানা-পুলিশ-কোর্ট কাচারি, ম্যানসলটারে দিচ্ছিল ঠেলে পাঁচবছর, বুড়োর উকীল "সেলফ-ডিফেন্স" বুঝিয়ে সুজিয়ে বুঝি এক বছর করেছে। ছেলেটা ওর বাড়ির পাঁচিল ডিঙিয়ে ভেতরে এসেছিল, কোমরে গোঁজা ইয়া বড় ছুরি, পুলিশ ডেডবডিতে ছুরিটা পেয়েছে। সেইজন্যেই বেঁচে গেল বুড়ো। নইলে হতো ফাঁসি কি যাবজ্জীবন। বুড়োমানুষ, এক বছর জেল খাটতে গেল তো? ওদিকে একটা ইয়াং ম্যানের প্রাণটা চলে গেল শুধু শুধু। ওয়েস্টেড। দেখে শুনে আমি শিক্ষা পেয়ে গেছি বাবা। আমারও বাগানে প্রচুর আম—সারাদিন রাত্তির ধরে মাস্তান ছেলেদের দৌরাত্মি। কারুর সন্তানকে আমি মারতেও চাইনে, নিজেও মরতে চাইনে, আমও খেয়ে কাজ নেই। ঢের খেয়েছি, যখন সময়কাল ভাল ছিল। কলা, আম, কিছুই আর পাকতে দেওয়া যাবে না। পাড়ার ছেলেরা কার্নিশ দিয়ে দিয়ে চলে আসছে বাড়ির ভেতরে—বাইরের চোরে আর কী কুকীর্তি দেখাবে? সেদিন রাত্তিরবেলায় দেখি কার একটা হাত, জানলার গরাদে,—আমি— "কে! কে!" করে যেই চেঁচিয়েছি অমনি ধপাস করে কে পড়ে গেল বাইরে, সঙ্গে সঙ্গে হাউমাউ করে কান্না—আমি আর বাইরে বেরুইওনি, দেখিওনি কে পড়ল, কে কাঁদল। তার পরদিনে ঘুম থেকে উঠে শুনি পাড়ার দুটো ছেলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে দরওয়ানকে ঘুম থেকে ঠেলে তুলেছে—বুকে ছুরি ধরে বলেছে—"গেট খুলে দাও শিগগির—আমরা বেরুব।" কার্নিশ বেয়ে ঢুকেছিল, কিন্তু পড়ে গিয়ে পা জখম হয়েছে। জখম পা নিয়ে আর কার্নিশের ওপর চড়তে পারেনি, —একটা ছেলে অন্য ছেলেটার ঘাড়ের ওপর পড়ে, দুটোই বেশ জখম। কী কাণ্ড বল দেখি? প্রতিবেশীর ছেলে সব, কিছু বলতেও পারব না।"

—"দরওয়ান ঘুমুচ্ছিল কেন, দাদুভাই?"

—"ঘুমুবেনা তো কি জেগে থাকবে? যতক্ষণ আমি জেগে থাকবো, জেগে জেগে দরওয়ানকে পাহারা দেব, ততক্ষণ সেও জেগে থাকবে, জেগে জেগে বাড়ি

পাহারা দেবে। সে যে সারাদিন টুলে বসে খৈনি টিপবে, রিকশাওয়ালাদের সঙ্গে আড্ডা মারবে, আর পাড়ার ঠিকে ঝিদের সঙ্গে বসালাপ করবে, তাতে বুঝি ক্লান্তি নেই? বাস্তিরে যেই আমি শুয়ে পড়ব, অর্থাৎ ঘরের বাতিটি যেই নিববে, অমনি আমার দরওয়ানও গোঁফে তেল দিয়ে শুয়ে পড়ে।"

—"তুমি জানো? তবে ওকে রাখো কেন? শুধু শুধু?"

—"আমি জানি, কিন্তু চোরেরা তো জানেনা যে ও ঘুমোয়? তারা দ্যাখে ইয়া গোঁফওলা, মোটা লাঠি হাতে বিরাট ভোজপুরী দরওয়ান গেটে বসে থাকে। দেখে ভয়ে আর এ বাড়ি আসেনা।"

—"তোমাকে বলেছে। চোরেরা ঠিকই জানে কোন বাড়ির দরওয়ান ঘুমোয়। —আচ্ছা দাদু, সুলতানকে ছেড়ে রাখোনা কেন?"

—"ছেড়ে রাখি, আর বেচারী মরুক? যা লোভী কুকুর তিনি। আগেই তো চোরেরা ওকে বিষমাখানো মাংস খাইয়ে মেরে দেবে রে? না বাঁধা থাক, তার চেয়ে চেন বাঁধাই থাক, আর চেঁচাক।"

—"ভালো। দরওয়ান ঘুমোবে, বিলিতি অ্যালসেশিয়ান বাঁধা থাকবে আর আমার দাদু ল্যাংড়া আম কাঁচাই তুলে নিয়ে ফটিক ঝোল রেঁধে খাবেন। ভালো। তুমি যেন কী রকম, দাদুভাই।"

—"কিন্তু দ্যাখ, গিরিডিতে আমাদের মহলানবীশ মশাইয়ের চেয়ে আমি অন্তত ভালো আছি দিদু। তিনি তো রিটায়ার করে নিজের বাড়িতে থাকতেই সুযোগ পেলেন না। কলকাতায় এসে বাড়ি ভাড়া করে থাকেন।"

—"কেন?"

—"ওই ফলচোরের দৌরাত্মিতে। আবার কেন। ওঁদের বাগানে গরমকালে প্রচুর আম হয়, লিচুও হয়। আর ভয়ঙ্কর চুরিও হয়। ওঁর দরওয়ান আবার খুব বিবেকবান —সারারাত ধরে মশাল জ্বেলে হৈ-হল্লা করে চোর তাড়ায়। ব্রহ্মজ্ঞানী মহলানবীশের এত অশান্তি সহ্য হয়না। উনি দরওয়ানকে বললেন—এবার থেকে সে গ্রীষ্মের তিনমাস বাড়ি চলে যাবে, অ্যানুয়াল লীভে। ছুটি কাটাতে উনিও কলকাতায় চলে আসেন, যাতে চোরেরা নির্বিঘ্নে কাজটাজ সারতে পারে। বেশ চলছিলো, কিন্তু তারপরেও আবার ঝামেলা বাঁধতে লাগলো। পুজোর ছুটিতে চেঞ্জাররা সব আসে। তখন ওঁর বাগানে খুব আতা হয়। আর পেয়ারা পাকে। চেঞ্জারদের উৎপাতে দরওয়ান পুনরায় ভয়ঙ্কর হৈ চৈ আরম্ভ করে দিলে। মহলানবীশ এতই ভদ্রলোক, চোরদের ডিস্টার্ব করবার ভয়ে উনি এখন শীতেও গিরিডি যান না, গ্রীষ্মেও গিরিডি যান না।"

মণিদা বলে উঠলেন—"দাদুভাই, তোমার মহলানবীশের চেয়ে আমার শ্বশুরমশাই কিছু কম যান না। দেওঘর বেড়াতে গিয়ে সে বছর কী কেলেংকারী। রুবি এদিকে নেই তো? শুনলে চটে যাবে।"

—"নেই, নেই, বৌদি রান্নাঘরে। বলো, মণিদা বলো। কী হয়েছিল দেওঘরে?"

BanglaBook.org

—"শোবার আগে রোজ রোজ উনি নিয়মিত আমাদের কাউকে ডেকে বলতেন —'একটু দ্যাখো দিকিনি খাটের তলাটায় টর্চ ফেলে, কেউ লুকিয়ে নেই তো? আমার আবার কোমরে বাত, নিচু হতে পারিনে।' তারপর আমরা লাইন ক্লিয়ার সিগন্যাল দিলে তিনি গিয়ে মশারীতে ঢুকতেন। পাশেই থাকতো লণ্ঠন। সায়েন্সের প্রফেসার বলে কথা। কী সব হিসেব করে দেখেছেন যে বিশেষ বিশেষ অ্যাঙ্গেলে লণ্ঠনটা দুলিয়ে-দুলিয়ে দেখলে, খাটের নিচেয় কোনো জিনিস থাকলে ওদিকে দেয়ালের গায়ে তার ছায়া ফেলা যায়। রাত দেড়টা নাগাদ ওঁকে নিয়মিত একবার বাইরে যেতে হতো। তখন উনি আগে লণ্ঠনটা উসকে দিয়ে খাটের পাশে দোলাতেন। দুলিয়ে দুলিয়ে দেখতেন দেয়ালে চোরের ছায়া পড়ছে কি না। পড়ছে না দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে তবে পা দুটি নামিয়ে চটি গলাতেন। বেরুবার সময়ে বাইরে হুড়কো টেনে দিতেন, যাতে কেউ ঢুকতে গেলে শব্দ হয়। একদিন আমরা ওঁকে জিজ্ঞেস করলুম, ওঁর এত চোরের ভয় কেন, সঙ্গে তো তেমন দামী কিছুই নেই। শ্বশুরমশাই মুচকি হেসে বললেন—'চোরে চুরি করবে, তাতে আমার কী? আমার ভয় অন্য। সে যদি খাটের নিচে ঢুকে বসে থাকে, আর আমি পা দুটি নিচে নামালেই যদি টেনে ধরে? চোরে হঠাৎ পা ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে আমাকে আছাড় খাওয়াবে, এ আমার সহ্য হবেনা বাপু, আমি কোমরে বাতের রুগী।'

তখন আমরা বললুম—'কিন্তু চোর আপনার পা ধরে টেনে জানান দেবে কেন যে সে ঘরে ঢুকেছে? আপনি বেরুলেই সে অনেক আনন্দে চুরি করবে। তারপরে আপনি ফিরে এসে শুয়ে পড়লে, সে চুপিচুপি পালিয়ে যাবে।' শ্বশুরমশাই একগাল বিকৃতার হাসি হেসে বললেন—'এসব তো লজিকের কথা। চোরের কি লজিকের জ্ঞান আছে? সে তো সর্বদা প্রাণভয়ে ভীত, টেনশনের শিকার, সে কী করতে কী করে ফেলবে তার কিছু ঠিক আছে? মানুষ জেগে উঠেছে টের পেলে চোরের কি আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে?'

একদিন ওঁকে পরীক্ষা করার জন্যে আমি আর স্বপন, আমার শালা, একটা যৌথ প্ল্যান করলুম। স্বপন খাটের তলায় নিচে ঢুকে থাকবে, আমি দেখে বলবো 'খাটের তলায় কেউ নেই বাবা।' তারপর বাপ শুয়ে পড়লে খানিক বাদেই ছেলে পাঁচড়া করে জানান দেবে। তখন শ্বশুরমশাই কী করেন, সেটাই আমাদের দ্রষ্টব্য। ও দিকে কিছু বলা হলো না, সে রাগড়া দেবে বলে। শ্বশুর তো শুয়েছেন। একটু বাদেই খাটের নীচে খচ মচ শব্দ। শ্বশুর লণ্ঠনটা বাড়ালেন, যথারীতি সায়েন্টিফিকালি দোলাতেও লাগলেন এবং দেয়ালের গায়ে ছায়া পড়লো, খাটের নিচে গুটিশুটি মেরে থাকা মানুষের।

শ্বশুর গলা-খাঁকারি দিলেন।

খাটের তলায় তার ছেলেও গলা-খাঁকারি দিল।

শ্বশুর তখন বললেন—'এই যে চাবীটা ফেলে দিচ্ছি, ট্রাঙ্কের ডান-দিকে টাকাকড়ি

আর কাপড়চোপড়। বাঁদিকে আমার ফাইলপত্র গোছানো আছে, ওতে যেন হাত দেবেন না। আমি একটু বেরুচ্ছি। দোর খোলাই রইলো, কাজ সারা হলেই আপনি চলে যাবেন, যাবার আগে লণ্ঠনটা নিবিয়ে দিয়ে যাবেন। আমার হাতে টর্চ থাকছে। তাহলেই আমি বুঝবো, আপনি আর এ ঘরে নেই। এখন আমি চটি জুতো পরতে পা-টা নামাচ্ছি। আপনি দয়া করে আমার পা ধরে টানবেন না যেন, এই মাত্র একটাই বিকোয়েস্ট।' গম্ভীরভাবে শ্বশুরমশাই চাবী ফেলে দিয়ে, পায়ে চটি গলিয়ে বাইরে চলে গেলেন। তারপর টর্চ হাতে করে অনেকক্ষণ পিছন ফিরে উঠোনে দাঁড়িয়ে রইলেন, চোরকে চুরি করবার টাইম দিতে। এক সময়ে ঘরে উঁকি মেরে দেখলেন লণ্ঠন নেবানো। তিনি এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ঢুকে দোর বন্ধ করে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। সকালে উঠে দেখেন তার চাবীও বালিশের তলায়, ট্রাঙ্কও বন্ধ। কিছুই চুরি যায়নি। তখনই কিন্তু তাঁর নার্ভাস ব্রেকডাউনের মতন ভয়ানক অবস্থা হলো। তবে কি সবটাই স্বপ্ন? খাটের নিচে, কেউ গলা-খাঁকারি দেয়নি? দেয়ালের ওই ছায়াটাও কি তবে তাঁরই কল্পনার? উনি কি তবে চোরকে চাবী ছুঁড়ে দেননি? অথচ স্পষ্টই মনে পড়ছে, চাবীটা ছুঁড়লেন। লণ্ঠনটাই বা নেবালো কে তাহলে? লণ্ঠন তো নেবানো হয়েছিল নিশ্চিত।

তবে কি চোর নয়? ভূত?

এই বয়সে নতুন করে ভূতে বিশ্বাস করতে হবে? না—এ আরো ভয়ানক ভাবনা। শ্বশুরমশাই সত্যি অসম্ভব চঞ্চল হয়ে পড়লেন। ওঁর অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গিয়ে আমি আর স্বপন তাড়াতাড়ি কনফেস করে ফেললুম—সত্যি সত্যি কোনোদিন চোর এলে উনি কী করবেন সেটা জানতে ইচ্ছে হয়েছিল বলে আমরা এই কুকর্মটি করেছি। উনি কিন্তু একটুও রাগ করলেন না। খুব হাসলেন, উপভোগ করলেন। একটা ক্রাইসিস নিজেই বা কী ভাবে ফেস করবেন জানতে পেরে নিজের ওপরেও তখন খুব প্রীত উনি। বারবার বলতে লাগলেন,—'নাঃ, বিপদে যে আমার মাথাটা এখনও ঠিকই থাকে সেটা স্বীকার করতে হবে বৈকি।'

"তোমরা কেবল এইটাই প্রমাণ করলে যে বিপদে আমার বাবা তোমাদের মতন বুদ্ধি হারান না।" চা নিয়ে বাবাকে সাপোর্ট করতে করতে রুবি বৌদির প্রবেশ। বৌদি শেষটুকু শুনেই ধরতে পেরেছেন পুরো ব্যাপারটা কী। মণিদার দিকে চোখ পাকিয়ে বললেন—

—"বাবার নামে লাগানো হচ্ছে? আমি তবে তোমার নিজের কথাটা বলে দিই? ভূপালে তুমি কী করেছিলে?"

—"কী? কী করেছিল মণিদা ভূপালে?" সকলেরই প্রবল কৌতূহল, প্রচণ্ড উৎসাহ, কী জ্ঞানস্পৃহা। দাদুরও উৎসাহ আছে বলে মনে হলো—"মণি আবার কী করেছিলো, ডাকাতি নাকি? ওখানে তো সবাই ডাকাত!"

—"ডাকাতি, না আরও কিছু। ওর নিজের কি চোরের ভয় বাবার চেয়ে কিছু

কম নাকি? কলকাতায় থাকলে ওর নাকি ভয় করে না। কলকাতায় যেন চোর নেই। কিন্তু কলকাতার বাইরে একদিনের জন্যে গেলেও তিনি চোরের ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকেন। কোথাও কোনো বাংলোয় রাত কাটালে তো আমার প্রাণান্ত। সারারাত ধরে সবকটা জানলা দরজা কেবলই টেনে টেনে ডাবল চেকিং হচ্ছে। ভূপালের বাড়িটায় মোট এগারোটা দরজা ছিল বাইরে বেরুনোর। তোমাদের মণিদার কষ্ট বুঝতেই পারো। মাঝরাত্রি পর্যন্ত পড়াশুনো করে তারপর শোবার আগে ওঁকে ঘুরে ঘুরে এগারোটা দরজাই রোজ হুড়কো টেনে 'ডাবলচেকিং' করে তবে শুতে হয়। আবার একবার করে টানলেই হবে না, তিনবার করে খিল ধরে টেনে দেখা চাই। ব্যাপারটায় আমার তিতিবিরক্ত লাগতো। আমি আধখানা ঘুমিয়ে উঠে শুনতুম হুড়কো টানাটানি হচ্ছে। রোজই বারণ করি, শোনেন না। বলবেন:

—'নাঃ, এ বাবা মধ্যপ্রদেশ, এখানে সব চম্বলের ডাকাতগুলো ঘোরাফেরা করছে —কবি, খুব সাবধান' —এমনিভাবে রাতের পর রাত। একদিন মাঝ রাত্তিরে যেই 'খিল চেকিং' করতে গেছেন হঠাৎ একটা খিল কব্জাসুদ্ধুই উপড়ে ওঁর হাতে খুলে এলো। দোর আর বন্ধই হয়না। ঠাণ্ডা বাতাসে ঘরে কাঁপুনি যেতে লাগলো। মহা মুশকিল। উনি তো আমাকেই ডাকাডাকি শুরু করেছেন। 'ওঠো, কবি, উঠে ব্যবস্থা কিছু করে দাও।' একেই শীতের রাত্তির, তায় এই হুড়কো টানাটানি আমার দুচক্ষের বিষ—আমি কেন উঠবো? আমি পাশ ফিরে শুয়ে লেপমুড়ি দিয়ে বললুম—'কী আর হবে, এখন সারারাত দোরে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো—তোমার লেপটা বরং নিয়ে যাও—মুড়িসুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে কম কষ্ট হবে। রোজ বলি তো? খিল তো মানুষ নয়, আমার মতন, যে রোজ রোজ তোমার অত্যাচার সহ্য করবে?'

এইখানে মণিদা বললেন,—"আহা থাক না ওসব পুরনো কাসুন্দী"—

—"থাকবে কেন? তার পরেরটাও শুনুক ওরা? তার পরেরটাই বা বাদ থাকবে কেন?"

—"কী হয়েছিল? তার পরে কী হয়েছিল?"

—"তোমাদের মণিদা তখন দোরের মুখে রেখে দোর বন্ধ করবেন বলে একখানা আলমারী টেনে আনতে গেলেন। ওইরকম ব্যায়ামকরা শরীরে আলমারী টেনে আনাটা কিছুই নয়। কিন্তু আলমারীটা ছিল আমার যত তোলা কাচের বাসনে ভর্তি। যেই হিচড়ে টানা—অমনি সব দামী বাসনকোসন পড়ে গিয়ে ঝন ঝন করে ভেঙেচুরে কেলেংকারী শব্দ শুরু হয়ে গেল। মেঝের ওপর মালভর্তি আলমারী টানারও তো শব্দ আছে? পাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা ঘুম-টুম ভেঙে হৈ হৈ করে উঠল—'চোট্টা! চোট্টা! ডাকু! ডাকু!' —রাস্তা দিয়ে পাহারাওলা যাচ্ছিল, সেও এসে পড়ল, 'কৌন হ্যায় রে—ক্যা হুয়া রে'—ওদিকে তোমাদের ভাইপোটির ঘুম ভেঙে উঠে ভীষণ বিরক্ত হয়ে গিয়ে গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিলো। গণ্ডগোলে রাস্তার নেড়িকুত্তারা ভয়ানক ঘেউ ঘেউ করতে লাগলো—তোমাদের মণিদা তখন

সেই প্যাণ্ডিমোনিয়ামের মধ্যে প্রতিবেশীদের সবাইকে বোঝাচ্ছেন যে খিলটা চেকিং করতে গিয়ে খুলে এসেছে মাত্র, আর কিছুই হয়নি।"

—"আর তুমি নিজেরটা বললেনা? কাচের বাসন ভেঙেছি বলে আমাকে, কী প্রচণ্ড হেনস্তাটাই করেছিলে সকলের সামনে?"

—"তা বলবোনা?" বউদি কাঁদো কাঁদো —"তোমরাই বলো বিয়েতে আমার বাবার দেওয়া সেই অমন দামী জার্মান ডিনার সেটটা? উনিই তো সেটার আদ্ধেক ভেঙে ফেললেন সেদিন, আর ও-সেট কমপ্লীট হবে না। আর জাপানী সেই রঙিন কফি সেট, যেটা তোরা জাপান থেকে এনে দিয়েছিলি—সেটাও মাত্র তিনটে কাপ আছে। একটাও প্লেট নেই—সব উনি শেষ করেছেন। ফিনল্যাণ্ডের সররৎ সেট খতম। তোরাই বল, চোরে এসে এর চেয়ে আর বেশি কী ক্ষতি করে যেতো আমার?"

এবার দাদুভাই হাসিহাসি মুখে বললেন,—"তবেই দ্যাখ, লাঙে আমের চেয়ে ফটিক ঝোলই ভাল। ঠিক বলিনি দিদু?"

BanglaBook.org

মেজকাকিমার গল্প

মেজকাকিমার অনেক গল্প। কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি। এই কালকেরটাই আগে বলা যাক। ছোটকাকু অফিস থেকে দুপুরে লাঞ্চ খেয়ে বাড়ি আসেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করছেন, "মেজবৌদি, আমার কোনো চিঠি এসেছে?"

মেজকাকিমা বললেন, "চিঠি? তা তুমি আসছো না, আসছো না, আমি তো রান্নাবান্না সেরে তোমার জন্যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, দেখি পিয়ন আসে কি তুমি আসো, এমন সময় পাশের বাড়ির সোমার মায়ের দেখা পেলুম। সোমার মায়ের খবর তো জানো? তার ভায়ের চোখে অপারেশন হয়েছে, ম্যাড্রাসে গেছে। সেই সময়েই আবার তার মায়ের হলো হার্ট অ্যাটাক। সেও হাসপাতালে। বেচারী একলা ভেবে ভেবে অস্থির। ম্যাড্রাসে ভায়ের খবর নেবে, না পি. জি-তে মাকে দেখতে যাবে, সে এক বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। তা সোমা অবিশ্যি খুব শক্ত মেয়ে, ছেলেবেলা থেকে পিতৃহীন হলে লোকে অমনি শক্ত হয়ে যায়। সে বললে, মা, তোমাকে ম্যাড্রাসের কথা ভাবতে হবে না, তুমি পি. জি-তেই যাও। কী সুবুদ্ধি, ভেবে দ্যাখো একবার ঠাকুরপো? অতটুকুনি মেয়ে, কলেজে পড়ছে মাত্তর। তারপর সোমার মা তো চলে গেল, আমি ভাবলুম সোমার জন্যে তো পাত্তর দেখা উচিত এবার।

মেয়ে বেশ বড় হয়ে গেছে। রাস্তা দিয়ে উমেশবাবু যাচ্ছিলেন। দেখেই মনে হলো উমেশবাবুর চার ছেলের তো এখনও বিয়ে হয়নি। বিলেতে, না আমেরিকায়, খড়গপুরে না দুর্গাপুরে, কোথায় না কোথায় যেন ছেলে চারটেই দূরে দূরে সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কোনোটা পড়ছে, কোনোটা বা চাকরি করছে। কে যে কেমন পাত্তর হয়েছে, ঠিক জানি না। উমেশবাবুকেই বরং ডেকে জিজ্ঞেস করি। তা উমেশবাবু তখন পোস্টাপিসে যাচ্ছিলেন বিলেতের না আমেরিকার চিঠি ডাকে দিতে। তাঁকে বলে দিলুম ঐ সঙ্গে আমার জন্যেও খান দুই পোস্টকার্ড এনে দিতে। বললুম, দাঁড়ান, তিরিশটা পয়সা নিয়ে যান, তা উনিও দাঁড়াবেন না, আমিও ছাড়বো না। ঐ কত্তেকত্তে ছেলেরা কে কী কচ্চে, কে কী পড়চে সেসব জিজ্ঞেস করতে ভুলেই গেলুম। বয়েসের দোষ আর কী, তা উমেশবাবু—"

ছোটকাকু ডাল শেষ করে চচ্চড়ি মাখতে মাখতে বললেন, "মেজবউদি, আমার কি কোনো চিঠি এসেছে?"

"সেই কথাই তো বলচি, তা পিয়নেরও দেখা নেই, তোমারো দেখা নেই, বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলুম মাথায় তেলটা মেখে নিই। তা তেলের যা অবস্থা হয়েছে। জবাকুসুম-ক্যাম্বারাইডিন তো মাখিইনি, একদম প্লেন নারকেল তেল। তাতেই কী খর্চা, কী খর্চা। মাঝে মাঝেই ভাবি, দূর ছাই চুলে তেল দেওয়া ছেড়েই দেবো। তা পাকা-কাঁচা যাই হোক চাট্টিখানি চুল তো আছেই মাথায়, তেল না দিলে মাথা যেন ফেটে যায়, বাগ করে দু'দিন তেল না মাখলেই প্রেসার চড়ে যায়। সে আরেক কেলেঙ্কারী। তা আজকাল সিংহী মার্কা বদল করে প্যারাসুট মার্কা কিনছিলুম, এখন আবার সেটাও বদল করে—"

এবার মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে কাকু বললেন "মেজবৌদি, আমার কোনো চিঠি এসেছে?" চিরপ্রশান্ত চিরসুস্থির ছোটকাকু ধৈর্যভরেই প্রশ্ন করেন।

"আহা-হা, সেই কথাই তো হচ্চে। এতটুকুতে এত অধৈর্য হলে চলবে কেন? ওই চিঠির কথাই তো হচ্চে। তা, আমি ভাবলুম পিয়নের তো দেখা নেই, বরং তেলটা একটু চাঁদিতে ঘষেই নিই, তারপর তেল মাখতে মাখতে দেখি, কি সব্বোনাশ। ও-বাড়ির চাঁদুর ছেলেটা ন্যাড়া ছাদে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। ওরে বাবা রে—এই ন্যাড়া ছাদে ঘুড়ি ওড়ানোর মতন এতদূর ডেনজারাস খেলা আর নেই। আমি তো অমনি চেঁচাতে শুরু করেছি। অ চাঁদু! অ চাঁদু! তোর ছেলে যে পড়ে মোলো রে। কী কচ্চিস? আগে ছেলেকে নামা। তা চাঁদু বাড়ি ছিল না, সকালবেলায় এই সময়ে অবিশ্যি সে থাকে না কোনোদিনই, তার তো রোজই আপিস—সেই সুযোগেই ছেলেটা ছাদে উঠেছে, তাদের ইস্কুল সব বন্ধ কিনা? গরমের ছুটি দিয়ে দিয়েচে এর মধ্যেই —ইস্কুলগুলো যে ক'টা দিনই বা খোলা থাকে, আর কটা দিন বন্ধ—"

"মেজবউদি?" ছোটকাকু কাঁচা আমের ফাঁক ঝোলে চুমুক দিয়ে গোঁফ ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন "আমার কি কোনো চিঠিপত্তর এসেছে?"

BanglaBook.org

"আহা, চিঠির কথা বলছি না তো কী কথা বলছি আর? ভাবলুম তেলটা যখন মাখা হয়ে গেল, একেবারে গামছাটা নিয়ে, কাপড়-চোপড় নিয়েই নিচে কলতলায় নাবি. তোমার ডাকবাক্সটাও দেখা হবে, চানটাও সারা হবে—এমন সময়ে সাবির টেলিফোন এলো। সাবির শাশুড়ি যায়-যায় জানোই তো? সাবিদের বাড়ি টেলিফোন নেই. খবর যা কিছু আমার এখানেই দেয়। আমি তখন কী করি? কেমন করে সাবিকে ডেকে পাঠাই? ঘরে তো কেউই নেই, তখন বললুম—তা খবরটা বরং আমাকেই দিয়ে দাও. দুপুরবেলা যখন ছোটঠাকুরপো ভাত খেতে আসবে তার হাতে সাবিকে খবর দিয়ে দেবো। তা, হাতে তেল নিয়ে ফোন ধরা যদি বা যায়, কলম ধরা বড়ই শক্ত। তখন সাবির দেওরকে বললুম. ধর. তেল হাতটা ধুয়ে আসি।"

দইয়ের বাটিটা নামিয়ে রেখে ছোটকাকু বললেন. "মেজবৌদি. আমার কি কোনো চিঠি—

"আহা, শোনই না সবটা, এত অধীর হলে কি সংসারে চলে? আপিসের কাজকর্ম করোই বা কেমন করে তোমরা? তাড়াতাড়ি তেলহাত ধুয়ে সাবির দেওর যা যা বললে সব একখানা কাগজে লিখে নিলুম। সেই চিঠি লিখে ওকে বললুম, ছোটঠাকুরপোকে দেবো—সে ঠিক ভাত খেয়ে আপিসে যাবার পথে সাবিকে দিয়ে যাবে তার শাশুড়ীর খবরটা। চিঠি চিঠি করে যে পাগল করে দিচ্ছো, তা সেই চিঠির কথাই তো বলছি। শুনলে তো?"

ছোটকাকু হাত ধুয়ে মেজকাকিমার হাত থেকে মশলা নিয়ে খেতে খেতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললেন, "তাহলে. মেজবউদি, সাবির চিঠিটাই দিয়ে দাও। যাবার পথে দিয়ে যাচ্ছি।"

"সে কি আর আছে? রান্না দিয়ে তক্ষুণি মনমোহন ছুতোর মিস্তিরি যাচ্ছিল, সে তো সাবিদের পাশের বাড়িতেই কাজ করছে। তার হাতে পাঠিয়ে দিয়েছি। তখন তখনই পেয়ে গেছে। ওসব খবর ফেলে রাখতে হয়?"

ছিটকিনি খুলতে খুলতে ছোটকাকু বললেন, "তাহলে আজকে সকালের ডাকে আমার কোনো চিঠি আসেনি?"

মেজকাকিমা পিছু পিছু গেছেন দেওরকে এগিয়ে দিতে। ফস করে জ্বলে উঠলেন. "কে বললে আসেনি? আমি কি বলেছি একবারও যে তোমার কোনো চিঠি আসেনি? কেন আসবে না চিঠি? আমি পিয়নকে দেখতে পাইনি বলেই যে চিঠি আসবে না তেমন কি কোনো নিয়ম আছে? এই তো তোমার দু'খানা পত্তর এসেছে। এই দরজার কাছেই টেবিলের ওপর খবরের কাগজ চাপা দিয়ে তুলে রেখেছি. পাছে উড়ে যায়।"

খবরের কাগজের গোছা তুলে বীরদর্পে মেজকাকিমা দুটি খাম এগিয়ে দিলেন ছোটকাকুর হাতে।

BanglaBook.org

(২) অতিথিসৎকার

কেউ যদি কড়া নেড়েছে তবে তার আর রক্ষে নেই। অমনি মেজকাকিমা চেঁচাবেন, "বউমা, বউমা, মিষ্টি আনো, শরবৎ করো, অতিথিনারায়ণকে অমনি ফেরাতে নেই।" তারপর তো দরজা খোলা হলো। মেজকাকিমা ছুটে এসে মোড়া পেতে দিয়ে পাখা খুলে বলবেন, "কাকে চাই আপনার?" যদি অচেনা হয়, তবু—"বউমা, শরবৎ করো, মিষ্টি আনাও।" তিনি হয়তো কোনো সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ। ভাব দেখে লজ্জা পাচ্ছেন। এখন অতিথি বলতে সব বাড়িতেই এঁরাই প্রধান। এরোপ্লেনের সুটকেস, ইলেকট্রিকের ঝাঁটাবালতি, গ্যাসের উনুন, বাসনকোসন, তেল, সাবান, খাবার-দাবার, কী না আনেন এঁরা? এমনকি অন্তর্বাস পর্যন্ত। মেজকাকিমার সব কিছুই দেখা চাই। শোনা চাই। তারপর অতিথিকে মিষ্টির থালা দিয়ে শরবৎ খাইয়ে জিনিসপত্র কিনে, বিদায় করা চাই। জিনিস লাগুক না লাগুক মেজকাকিমা কিনবেনই। যদি না বড্ড বেশি দামী হয়। শ'খানেকের মধ্যে হলে তাকে খালি হাতে ফিরতে হবে না এই বাড়ি থেকে। মেজকাকিমার কল্যাণে বাড়ি খেলো-সাবানে, জোলো ফিনাইলে, বেফিট অন্তর্বাসে, স্যানিটারি ন্যাপকিনে, শ্যাম্পুতে, পাউডারে, ম্যাগিতে, বোনভিটাতে ভর্তি। অতিথিকে ফেরাতে কষ্ট হয় মেজকাকিমার। এত রোদ্দুরে আহারে লোকের দোরে দোরে ঘুরছে, ওদের বুঝি কষ্ট হয়? কিছু না কিনলে চলবে কেন? আজ দরকার নেই? কাল হবে। যারে রাখো সেই রাখে। মেজকাকিমার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। বড়বউদির মতো এমন পুত্রবধূ জগতে হয় না। বড়বউদির সহ্যের সীমা নেই। ভালোবাসার অন্ত নেই। আমরা অধৈর্য হয়ে যাই, বউদি শুধু হাসেন। দাদার মৃত্যুর পর থেকে বড়বউদি একদম একা। দিনের বেলাটা ইস্কুলে পড়ান, বাকি সময়টা মেজকাকিমাকে নিয়ে। মেজকাকিমা তাঁর অতিথিদের গলা নীচু করে বলেন —"বড়বউমা আবার একটু কৃপণ আছে, ছোট্ট ছোট্ট গেলাসে শরবৎ দেয়, আটআনা দামের রসগোল্লা আনায়, তবু দেয় তো। আমার মেয়ে হলে? ও বাবা, এ যদি সন্ধ্যারানী হতো, কিছু দিতোই না। এই দিচ্চি মা দিচ্চি মা করেই সন্ধ্যে উৎরে দিত। তোমরা চলে যেতে। চিরকাল কি কেউ জলখাবারের লোভে লোভে বসে থাকতে পারে?" তখনও জলখাবারের আশায়-বসে-থাকা, অথবা জলখাবার-খেতে-ব্যস্ত অতিথিরা এই অতি স্পষ্ট কথোপকথনে যারপরনাই অস্বস্তি বোধ করেন, কিন্তু অনুপায়। না খাইয়ে ছাড়বেনও না মেজকাকিমা। লৌহভীমচূর্ণ করার মতো যত্ন তাঁর। "হ্যাঁ, সন্ধ্যা হলে বলত, 'মা, তোমার সবটাতে বাড়াবাড়ি। এসেছে জিনিস বেচতে। তোমার আত্মীয় নয়, কুটুম্ব নয়, জ্ঞাতপুত কেউ নয়, তাকে মিষ্টির থালা ধরে দেবার কী দরকার।' আমি বলি, কী দরকার সেটা তুই কি বুঝবি রে সন্ধ্যা? বুঝি আমি আর বোঝে তারা। আমার এতেই পুণ্যি। অতিথি, অতিথি। কী জন্যে

এসেছে, চাঁদা চাইতে না সাবান বেচতে. সে আমার জেনে কাজ নেই, যেই এ বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবে, সেই নারায়ণ, তাকে সেবা করা অবশ্যকর্তব্য।" বক্তৃতার পর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শুধু শরবৎ খেয়ে চলে যান, মিষ্টির থালায় হাত দেন না অতিথিরা। এতো গেল অচেনা অতিথিদের বেলায়। যখন সত্যি চেনা লোক. মেজকাকিমা উচ্ছ্বসিত। "এসো, এসো বউমা. খাবার সাজাও, বুলু-বাচ্চু এসেছে. বউমা. খাবারটা সাজাতে কত দেরি করছো। বুলু-বাচ্চুকে আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে। বউমা খাবার থালাগুলো তুলে নাও. বুলু, বাচ্চুকে হাত ধোবার জল দাও, ওরা এবার চলে যাক. ভীষণ ঝড় উঠবে মনে হচ্ছে আর বসে কাজ নেই।" অথবা. বুলুর বাচ্চা ছোট, বাড়িতে রেখে এসেছে আর কতক্ষণ বসবে এখানে। অথবা বাচ্চু রাস্তায় গাড়ি পার্ক করে রেখেছে, কেউ না চুরি করে নিয়ে যায়। ওদের ছেড়ে দাও ট্রামবাসে ভীষণ ভিড় হয়ে যাবে এবার, ওদের এক্ষুণি না গেলে নয়। অথবা কার্তিক মাসের কাঁচা হিম লেগে যাবে মাথায় আরও দেরি করে গেলে। অথবা বুলুর মায়ের শরীর ভাল নয়, বেশিক্ষণ বাড়ির বাইরে থাকা উচিত নয় ওর অথবা এই বেলা না গেলে রোদটা আরও চড়ে যাবে ওরা বরং বেলাবেলি চলে যাক—মেজকাকিমার ঝুড়িতে ওজরের সংখ্যা অফুরন্ত। ঋতুমাফিক রোদ আসা, হিম লাগা, ঠাণ্ডা লাগা, ঝড়, বিষ্টি, চোর-ডাকাত, নয় তো বাড়িতে মা, শ্বশুর, ছেলেপুলে. নয় তো চাকরি-বাকরি, নয় তো, গাড়িতে ভিড়, শেষ অবধি গাড়ি চুরির ভয় পর্যন্ত দেখান মেজকাকিমা। আত্মীয় বন্ধুদের খাওয়া হলেই আর এক মিনিটও নয়, তক্ষুনি বিদেয় করা চাই। বসতে দেন যতক্ষণ খুশি কেবল সেলসগার্ল-সেলসম্যানদের। ওরা তো 'বেড়াতে' আসেনি, 'কাজে' এসেছে। ওদের কথাই আলাদা। সত্যি কথাই তো।

(৩) পয়া-অপয়া

"এই যে, এই কাপড়টা আর পরবো না বউমা, তুলে রাখো"—মেজকাকিমার হাতে ফর্সা কালাপেড়ে শান্তিপুরী ধুতি একটি। মেজকাকিমা বললেন. "বড় বিশ্রী কাপড় এখানা বউমা, এটা পরে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম, ওপাশে একখানা রিকশা উল্টে বিয়েবাড়ির বাসনকোসন সব রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ল। কি কাণ্ড বলো দেখি? ওই বাড়ুয্যেদের বাড়ির বিয়ের ভিয়েন বসছে, তার জন্যেই যাচ্ছিল মনে হয়। আসলে হয়েছে কি, একটা গাড়ি একটা কুকুরকে প্রায় চাপা দিচ্ছিল, যেই গাড়িটা এদিকে হঠাৎ সরে এসেছে, অমনি এই বাসনভর্তি রিকশাটা উলটে পড়ল। কেউ কাউকে

ধাক্কা মারেনি। সব আপনি-আপনি, সব এই কাপড়খানার জন্যে। সেদিনই এটা তুলে রাখা উচিত ছিল। মনে আছে, সেদিন এইটে পরে ভাত খাচ্ছিলুম, আর বিন্দুর মা পা হড়কে পড়ে গেল কলতলাতে?" বড়বউদি কিছু বললেন না। তবে আর ওই আলমারিটাতে জায়গা কুলোচ্ছে না। ঠাসা হয়ে আছে অপয়া শাড়িতে। তা দিয়ে বাসনও কেনা চলবে না। অপয়া বাসন হয়ে যাবে সেসব। পরাও চলবে না। মেজকাকিমা চেনেন যে। প্রত্যেকটা কাপড় তাঁর মনে থাকে। এত অপয়া শাড়ি কি আর একদিনে জমেছে? তা নয়, পঁচিশ বছর ধরে জমছে। মেজকাকা মারা যাবার দিন থেকেই। সেই প্রথম অপয়া শাড়ি বাছা শুরু হলো। যেটা পরা অবস্থায় মেজকাকার মৃত্যু ঘটল। তারপর থেকেই অপয়া ঘটনা বড্ড বেড়েছে। "পাশের বাড়ির মেয়েটা যে গলায় দড়ি দিয়েছে শ্বশুরবাড়িতে ফিরে গিয়ে, সেই খবরটা এই কাপড় পরে শুনতে পেলুম। এটা বড্ড অপয়া।" —"এই কাপড়টাই পরেছিলুম যেদিন পদ্মপুকুরে সেই ভীষণ মারামারিটা হলো।" —"এই কাপড়টা আমি পরেছিলুম যেদিন মিত্তিরদের কর্তা-গিন্নিতে বেদম ঝগড়া হয়েছিল—গিন্নি বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন চিরদিনের জন্যে। শেষে মিত্তিরমশাই নিজে গিয়ে বহু সাধ্য-সাধনা করে দশ দিনে ফেরৎ আনলেন।"-এরকম কত কত!

"এই কাপড়টা পরা অবস্থায় ছোটখোকার বউয়ের প্রথম বাচ্চাটা নষ্ট হবার খবর পেয়েছিলুম।"

"এই কাপড়টা পরা অবস্থায় বুলুর ছেলের ডিভোর্সের খবর শুনলুম", "এটা পরেছিলুম যেদিন রামু ধোপা ট্রাম চাপা পড়েছিল", "এই কাপড়টা পরা অবস্থাতেই সেজ ঠাকুরপোর চাকরি যাবার খবর এল।"

"এই কাপড়টা পরেছিলুম যখন রেডিওতে ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুসংবাদ দিলে।"

এমনি, নেহরুর মৃত্যুসংবাদের শাড়ি, উত্তমকুমারের মৃত্যুদিনের শাড়ি, ভোলাদ্বীপ-উড়িষ্যার চরে প্রবল বন্যা হবার দিনের শাড়ি, ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার শাড়ি, 'কণিষ্ক' প্লেন বিপর্যয়ের শাড়ি, বিশুর ঠাকুমার পা পিছলে পড়ে কোমর ভাঙবার দিনের শাড়ি, পাড়ার ভূতো কুকুর চাপা পড়বার দিনের শাড়ি, দ্বিজুর বাবাকে পুলিশে ধরবার দিনের শাড়ি, শুভেন্দুর বাড়িওয়ালার হুজ্জতি করার দিনের কাপড়, প্রতিমার ফেল করার দিনের, ফেলুর শ্বশুরের হার্ট অ্যাটাক হবার রাত্তিরের, বেঁটে শিবুর নামে হুলিয়া বেরুনোর দিনের, ফুলবাগানের বাড়িতে চুরি হবার দিনের, দেওঘরের বাড়ি বিক্রি হয়ে যাবার দিনের, সরোজের বউয়ের পালিয়ে যাবার দিনের, কুমারের বাপের পক্ষাঘাত হবার দিনের। এরকম অজস্র মন্দ দিন-রাতের স্মৃতিতে ভর্তি মেজকাকিমার অপয়া শাড়ির আলমারিটা। বড়-বউদি মাঝে মাঝে পুরনো দুটো-একটা চুপিচুপি বের করে বিলিয়ে দেন আমাদের। আমরাও চুপিচুপি ছাপিয়ে নিয়ে পরি। নইলে জায়গায়

BanglaBook.org

আটবে কেন? অপয়া ঘটনা তো জগৎজুড়ে রোজই ঘটছে। কানপুরে তিনটে কচি কচি মেয়ের গলায় দড়ি দেবার দিনের শাড়িটাও ওতে উঠে গেছে। সকালবেলা উঠেই কাগজে ঐ ছবি দেখার পরও সে কাপড় কি আর পরা সম্ভব? যে-কোনো মানুষের পক্ষেই?

(৪) ঝড়-বাদলে আঁধার রাতে

জগতে কিছু কিছু মানুষ রেডিও-অ্যাকটিভ হন। সুবীর যেমন। মেজকাকিমাও খুব রেডিও-অ্যাকটিভ প্রাণী। চব্বিশ ঘণ্টা রেডিও শুনতে ভালবাসেন। চিরটাকাল। গ্রামাফোন? হ্যাঁ, তা মন্দ কি? তবে রেডিওর মতন নয়। এই রেকর্ড লাগাও রে, পিন লাগাও রে, ওসব পঞ্চাশটা ঝনঝাট নেই রেডিওর। চাবি ঘোরাও আর গান শোনো। শুধুই কি গান? সংবাদ, আবহাওয়ার খবর, ধর্ম আলোচনা, নাটক, যাত্রা, কী নেই! রেডিও একখানা ঘরে থাকলে আর ঘরে মানুষ লাগে না। মেজকাকিমা ঘুমিয়ে থাকলেও রেডিওর চলা চাই। ছ'টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত, অক্লান্ত রেডিও চালক মেজকাকিমা। কখনও 'ক', কখনও 'খ', কখনও 'বিবিধ ভারতী', কখনও 'ঢাকা' চাবি ঘুরিয়ে দিব্যি এদিক-সেদিক শোনেন। প্রায়ই শুনি ইংরিজি ঝিনচাক বাদ্যি বাজছে রেডিওয়, আর মেজকাকিমা তাকিয়া মাথায় ফুরুর ফুরুর নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন, রেডিওটি মাথার কাছে নিয়ে। যখন থেকে ট্রানজিস্টার চালু হয়েছে, গাঁয়ে-গঞ্জের রাখাল বালকরা শুনেছি একটি করে ট্রানজিস্টার হাতে ঝুলিয়ে গরু চরাতে যায়। আর মেজকাকিমাও ট্রানজিস্টারটি সমেত রান্নাঘর, স্নানের ঘর সর্বত্রই বিচরণ করেন। সর্বভূতে আকাশবাণীর সাহচর্য মেজকাকিমার পক্ষে অত্যাবশ্যক। তিনি রেডিওর অত্যাগসহন সঙ্গী এবং রেডিওর মতিবুদ্ধি মতোই তিনি জীবনযাপন করেন।

সেদিন বাড়িতে ঢুকেই দেখি মেজকাকিমা দরজা জানলা বন্ধ করছেন। ভারি সুন্দর একটা হালকা ফুরফুরে মিষ্টি বাতাস বইছিল। এরকম বাতাসকেই বোধহয় 'মলয় পবন' বলে, আমি মেজকাকিমাকে বারণ করি দরজা জানলা বন্ধ করতে। এত সুন্দর হাওয়াটা বন্ধ করে দেবার কোনো মানেই হয় না। গম্ভীর মেজকাকিমা বললেন, "এখন মিষ্টি হলে কি হবে, ও যে প্রচণ্ড লোকসান সঙ্গে নিয়ে আসছে বাবা।"

"মানে?"

"মানে, প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত্যা আসছে। তুমিও বাড়ি চলে যাও। আর এখানে থেকো না।"

"যাব মানে? এই তো এলুম।"

"কিন্তু এত ঝড়-বাদলে বাইরে থাকলে তোমার শাশুড়ী ভাববেন। তুমি বাড়ি যাও।"

"কোথায় ঝড়-বাদল? শুকনো তো!"

"আসছে। ভয়ঙ্কর ঝড় আসছে।"

"মোটেই আসছে না। বাইরে পরিষ্কার আকাশ, খটখটে। আমি তো এই এলুম বাইরে থেকে।"

"রেডিওতে বলেছে। সতর্কবাণী দিয়েছে. তুমি জানবে কোত্থেকে? তোমরা তো রেডিও শুনবে না। প্রবল বান ডেকেছে। এখানেও এলো বলে।"

"কোথায় বান? অন্ধ্রে? না বাংলাদেশে?"

এই দুটো দেশকে প্রতিবছর সমুদ্র একবার করে মার দিয়ে যায়। শয়ে শয়ে পশুপাখি. ঘরবাড়ি সমেত মানুষ মরে।

"অন্ধ্র আর চাটগাঁ ছাড়া কি আর দেশ নেই? প্রচণ্ড বন্যা হয়েছে চীনে। চীন তো আমাদের গায়ের ওপর। চীনে ঝড়-ঝঞ্ঝা মানেই সেটা কলকাতাতে এসে পড়লো বলে!"

মেজকাকিমা দ্রুত হাতে জানলা বন্ধ করতে থাকেন, চীনের ঝড় থেকে সাবধান হওয়া দরকার।

বড়বউদি চুপিচুপি বলেন, 'চীন তো ভালো। হনলুলুতে ঝড় হয়েছিল রেডিওতে শুনেই তো মা ছাদ থেকে সমস্ত ভিজে কাপড় তুলে ফেললেন। আর ফ্লোরিডাতে সেই যে একটা সাইক্লোন এসেছিল তার নাম ওরা দিয়েছিল 'সোনিয়া'। তাই থেকে মার কী ধারণা হয়েছে কে জানে? রেডিওতে 'সোনিয়া' নাম উচ্চারণ হলেই দৌড়ে গিয়ে জানলা দরজা বন্ধ করেন।"

টেলিভিসনটাকে মেজকাকিমা এখনও মেনে নিতে পারেননি। টেলিভিসনের ঘরে উনি ঢোকেনই না। কেবল 'রামায়ণ' হলে শুধু ওটা দেখতেই ইদানীং যাচ্ছেন। টি. ভি.-কে রেডিওর সতীন বলে মনে করেন মেজকাকিমা। টি. ভি.-র ওপরে মনে মনে তাই তাঁর রাগ। টি. ভি. এসে রেডিওর যেন মান-মর্যাদা নষ্ট করেছে। ছোটকাকুর মতো বড়বউদিও মেজকাকিমাকে স্নেহের প্রশয় দেন। তাঁর সব অযৌক্তিক কাণ্ড-কারখানাই মেনে নেন। আর হাসেন। আশ্চর্য মানুষ বউদি।

BanglaBook.org

(৫) ত্রিফলা

মেজকাকিমা খুব ভক্তিমতী। মেজকাকিমার ইচ্ছে আমরাও সকলে ভক্তিমতী হই। কিন্তু কাউকেই মানাতে পারেননি। এমনকি ওঁর ওই অদ্বিতীয় স্বেচ্ছাসেবিকা 'ওয়ান উওম্যান ভলান্টিয়ার ফোর্স' বড়বউদিকেও না।

রাত্রে সাড়ে সাতটা আটটার মধ্যে খেয়েদেয়ে খোলা রেডিওর পাশে শুয়ে মেজকাকিমা ঘুমিয়ে পড়েন। আর এগারোটায় রেডিও বন্ধ হলেই উঠে পড়েন। বড়বউদি ততক্ষণে স্কুলের খাতা-টাতা দেখে সবে এসে শুয়েছেন। মেজকাকিমাকে রাত্রে দেখতে হয়, পাশে একজনের না শুলেই নয়। ওঁর বয়স যদিও সত্তর হয়নি, কিন্তু হার্টটা ভালো নয়। দুবার অ্যাটাক হয়ে গেছে। পেসমেকার বসানো আছে। সে আরেক গল্প। ঘুম থেকে উঠেই মেজকাকিমা ঘড়ি দেখেন। তারপর ডাকেন, "ও বউমা? বউমা? ঘুমোলে? বলি ঘুমোলে নাকি? ঘুমোলে?"

বড়বউদি বলেন, "কি মা? কিছু বলছেন?"

"না মা, না। কিচ্ছু বলিনি। বলছি ঘুমোও। ঘুম তোমার দরকার। সারাদিন খেটেখুটে আসো। বাড়িতেও তো বুড়ি শাশুড়ীটাকে নিয়ে তোমার বিশ্রাম নেই। ঘুমোও মা, ঘুমোও। ঘুম না হলে তোমার শরীরে দেবে কেন? এত কাজ মানুষে পারে? ঘরে খাটনি, আবার বাইরে খাটনি। বিশ্রামের সময় বলতে তো এই রাতটুকুনি। তা না ঘুমোলে কি চলে মা? তাই বলছি ঘুমোও। ঘুমিয়ে পড়ো। ঘুম মানুষের দেহে খাদ্য, পথ্য, ওষুধের মতই জরুরী। ওটা তোমার দরকার।"

বড়বউদি চুপ করে শুয়ে থাকেন। উত্তর দেন না।

"অ বউমা। বউমা! বলি সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? অ্যাঁ? এ যে দেখি সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছে! তেষ্টা পেয়েছে, অ বউমা, জল খাবো।"

অকস্মাৎ মেজকাকিমা মরিয়া হয়ে ওঠেন।

বউমা যে ঘুমোননি, তাও প্রমাণ হয়ে যায়। বউদি উঠে পাশের টেবিল থেকে পাথরের গেলাসটি শাশুড়ীর হাতে তুলে দেন। মেজকাকিমার হাতের কাছেই ছিল গেলাস ভর্তি জল। জল খেয়ে তৃপ্ত হয়ে মেজকাকিমা বলেন, "নাও, শুয়ে পড়ো। ঘুম তোমার দরকার।"

বউদি হাসতে হাসতে শুয়ে পড়েন। একসময়ে ঘুমিয়েও পড়েন, মেজকাকিমার মুখে নানান গল্প শুনতে শুনতেই। মেজকাকিমা ঘুমোন না—দাদার ছেলেবেলার গল্প করেন বউদির কাছে। মেজকাকিমার ওই একই ছেলে ছিল। আর একটি মেয়ে আছে। বম্বেতে থাকে। তার ছেলেবেলার গল্পও শুনতে হয় বউদিকে। তারপর ভোর তিনটে বাজতেই ঘড়ি ধরে, "অ বউমা! বউমা! উঠে পড়ো, ওঠো, ওঠো, শীগগির

BanglaBook.org

বাথরুমে যাও। হিসি করে এসো, নইলে শরীর খারাপ হবে যে। এতক্ষণ বাথরুমে না গিয়ে থাকতে হয়? শরীরের বিষ শরীরে বসে যাবে যে? ওঠো? বাথরুমে যাও। কিডনি শেষ হয়ে যাবে। যাও বাথরুমে যাও।"

"আপনি যাবেন মা? চলুন, আমি আলো জ্বেলে দিচ্ছি।"

"আমি তো যাবোই। সে কথা হচ্ছে না। আমি বলছি তুমি যাও। এই যে তোমার একটানা ঘুমুনো, বাথরুমে না গিয়ে, এটা কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয় একটুও। খুব খারাপ অভ্যেস।"

মেজকাকিমার অনুরোধমাফিক বড়বউদির স্বাস্থ্যরক্ষার প্রথম পর্ব শেষ হয়। বউদি ফের ঘুমোতে যান।

চারটে বাজে দেয়াল ঘড়িতে। মেজকাকিমা ডাকেন, "অ বড়বউমা, বড়বউমা। ওঠো মামণি ওঠো, চাট্টে বেজে গেল যে— বড়বাইরে ফিরে আসবে না? এর পর যে অনিয়ম হয়ে যাবে। শরীর শুদ্ধি না করলে কি চলে মা? যাও, বড়বাইরে যাও। চারটে বেজে গেছে।"

মেজকাকিমার একেবারে কড়া নিয়ম। বড়বউদির ইচ্ছে-অনিচ্ছে, বা শারীরিক প্রয়োজন, তাঁর বাথরুম যাবার কোনো ভিত্তিই হতে পারে না। এ ব্যাপারে মেজকাকিমার ঘড়ি দেখাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। এতেও বউদির হাসি মোছে না।

বাথরুম থেকে এসে বউদি আবার শুতে চেষ্টা করেন। মেজকাকিমার নাম হওয়া উচিত ছিল 'কমলি'। উনি 'নেহি ছোড়েগী'। ঠিক পাঁচটার সময়ে মেজকাকিমা উঠে কাপড় ছেড়ে শুদ্ধ বস্ত্র পরে ধূপ জ্বেলে ঘণ্টা নেড়ে নেড়ে ধূপ নেড়ে নেড়ে, ঘরময় দেয়াল ভর্তি টাঙানো ক্যালেণ্ডার থেকে বাঁধানো অপূর্ব সব দেবদেবীর ছবিতে এবারে আরতি করতে শুরু করেন। হেঁটে হেঁটে ঘরময় ঘুরে ফিরে মন্ত্র পড়তে পড়তে।

"অ বউমা, বউমা। ওঠো। ওঠো। শাঁখটা ধরো। বাজাতে হবে না, কেবল ধরে ধরে এমনি নাড়লেই হবে। যাও, বাসি কাপড়টা আগে ছেড়ে এসো। তারপর শাঁখটা নাড়াও। এই ব্রাহ্মমুহূর্ত বড় জাগ্রত মুহূর্ত। এই সকালে দেবতাদের আরতির সময়ে সবাইকে উপস্থিত থাকতে হয়। ওঁরা সব সশরীরে এসে পুজো নেন। এই সময়টাই স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্যের, দেবতার সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের প্রকৃষ্ট সময়। এই মুহূর্তটা ঘুমিয়ে নষ্ট করতে নেই মা, উঠে পড়ো। দ্যাখো কি সুন্দর সূর্যি উঠবে এবার। ছাদে যাও। ছাদে গিয়ে পুবমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলো 'ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং'—ওঠো বউমা? ও কি? পাশ ফিরছো কেন? অ বউমা? ওঠো?"

পিঠে জোরসে ঠেলা খেয়ে বড় বউদি ঘুমচোখে এইবারে বলেন, "এই যে উঠছি। উঠছি মা। আপনার ত্রিফলাটা ভেজানো আছে, এই আমি উঠেই দিচ্ছি।"

হঠাৎ আশ্চর্য পটপরিবর্তন হয়। নরম সুরে মেজকাকিমা বলেন, "ত্রিফলা? আবার তুমি ত্রিফলা ভিজিয়েছ? কোবরেজ মশাই বুড়ো হয়েছেন, কি বলতে কি বলেছেন—আমি বলেছি, না, আমি ত্রিফলা খাই না, ত্রিফলা খাবো না আমি।"

"না মা, তা হয় না। কবিরাজ মশাই রাগ করবেন।"

"তুমি শোও তো ততক্ষণ। চোখে এক ফোঁটা ঘুম নেই মেয়ের। ভোর হতে না হতে উঠে পড়ে আমার পেছনে লেগে গেছো? 'মা, ত্রিফলা খাও'। শুধু শুধু এক্ষুনি ওঠবার কোনো দরকার নেই। তোমার তো মরনিং ইস্কুল নয়, বউমা? তুমি বরং আর একটু রেস্ট নাও। বিশ্রাম করো। আরেকটু ঘুমোও দিকিনি, বউমা। ঘুমটা খুবই জরুরী। তোমার শরীরের পক্ষে ঘুমটা খুবই দরকার।" বলতে বলতে মেজকাকিমা একা একাই ছাদে পালান।

বড় বউদি মৃদু হেসে পাশ ফিরে শুয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েন। এখন দু' ঘণ্টা নিশ্চিন্ত। সেই সাতটায় সুরবালা আসে। এসে চা তৈরি করে। চান করে, পুজো করে, চা খেয়ে কাগজ পড়ে একেবারে তারপরে মেজকাকিমা এসে চায়ের কাপ হাতে আদর করে বউদিকে তুলবেন, "বউমা! অ বউমা? ওঠো, ওঠো, চা খাও। আর কতক্ষণ ঘুমোবে? তোমার ইস্কুলের বেলা হয়ে গেল যে?" মেজকাকিমার রেডিওতে তখন লোকসঙ্গীত চলবে। ত্রিফলার টাইম ওভার।

BanglaBook.org

মেজদির কেচ্ছা

আমাদের ভবানীপুরের পাড়াতে এবাড়ি-ওবাড়িতে খুব যাতায়াত। তোমাদের বালিগঞ্জ নিউ-আলিপুরের মতন নয় বাপু। বিয়েবাড়িতে যাচ্ছি, ধরো আমার তেমন ভাল শাড়ি নেই, তাতে কি? সামনের বাড়িতে নতুন বউ এসেছে, অনেক ভাল শাড়ি, একটা চেয়ে নিয়ে পরে যেতে কোনই বাধা নেই। শাড়ি তো আমি খেয়ে ফেলব না? ছিঁড়ে খুঁড়ে কিংবা দই-কালিয়া মাখিয়ে নষ্টও করব না—বয়েস হয়েছে যথেষ্ট। আমাদের পাড়ায় এসবের চল আছে। তোমার বাড়িতে হঠাৎ অতিথি এসে পড়েছে—ঘরে কিছু নেই, আমার ঘরে যা আছে, চটপট সেই নারকোল নাড়ু নিমকি দিয়ে তুমি চা দিয়ে দিলে তোমার অতিথিকে। ধরো কর্তাগিন্নি সিনেমায় যাচ্ছি—শাশুড়িমা বাড়িতে নেই—দেওরের কাছে গেছেন। আমার বাচ্চারা তোমার বাড়িতে ঘুমিয়ে রইল। দিব্যি ফেরার পথে আমরা ওদের তুলে সঙ্গে করে নিয়ে বাড়ি গেলুম। না, ফ্ল্যাট বাড়ি না হলে কী হবে— এবাড়ি-ওবাড়ি ভাব আছে। তোমরা ফ্ল্যাটবাড়িতে একসঙ্গে থাকো। অথচ এ ওর মুখ দেখো না, নাম জানো না। আমাদের ভবানীপুর, কালীঘাট ঢের ভাল পাড়া। মানুষের সঙ্গে মানুষের দেখাশুনো হয়, কথাবার্তা হয়, সুখে দুঃখে খোঁজখবর নেয় সবাই। পাড়ার লোকেরা দূর-পর নয়।

সুবিধে যেমন আছে অসুবিধেও যে নেই একেবারে, তা বলব না। শাশুড়ি

যদি দেওরের বাড়িতেও থাকেন, তবু, সামনের বাড়ির জ্যাঠাইমা তো আছেন? গুরুজনের নজরের বাইরে থাকা চলে না। "বৌমা!" বলে হাঁক পাড়বার কেউ না কেউ আছেনই। আমার যখন নতুন বিয়ে হয়ে এ বাড়িতে আগমন হল, সে অনেককাল আগের কথা, তখন ঠিক সামনের বাড়িতে আমার শাশুড়ির এক "প্রাণের বন্ধু" ছিলেন। শাশুড়িমা তাঁকে 'মেজদি' বলে ডাকতেন। কেন 'মেজদি' তা জানি না। মেজদির বয়েস নাকি শাশুড়িমার চেয়ে বেশি ছিল, কিন্তু মেজদিই অনেক বেশি চটপটে ছিলেন। (তাঁর উকিল স্বামী বেঁচে, এবং জমজমাট পসার ছিল তখনও যদিও তিনি মেজদির চেয়েও বয়েসে অনেক বড়।) আমার বিয়ের কিছু আগেই আমার শ্বশুর পরলোকগমন করেছেন। তাঁকে কখনও চোখে দেখিনি। শাশুড়িমার থান-পরা বিষণ্ণ মূর্তিই আমি প্রথম থেকে দেখছি। এদিকে মেজদির কপালে মস্ত বড় গোল সিঁদুর-টিপ, চওড়াপাড় শাড়ি, বেম্পতিবারে আলতা-পরা পা, একগাল পান, একগাল হাসি, আর সিঁথেভর্তি লম্বা-চওড়া সিঁদুর। মেজদিকে আমরাও মেজদি ডাকতুম। আমার স্বামী তাঁকে ছোটবেলা থেকে 'মেজদি' বলেই ডেকে এসেছেন, আমারও আর মাসিমা-টাসিমা বলা হয়নি। মেজদির নাম আহ্লাদী হলেই বেশি মানাতো —এক-গা সোনার গয়না, দিনরাত্তির পাড়াসুদ্ধ ঝামরামিয়ে বেড়াচ্ছেন, ভয়ডর নেই। মেজদির স্বামী, জামাইবাবুর (তাঁকে আমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই 'জামাইবাবু' ডাকতাম) অনেক টাকা রোজগার, তিনি দুঁদে উকিল ছিলেন।

অত বয়েস হয়েছে, তবু মক্কেলের কমতি নেই। বারান্দাতে পর্যন্ত বেঞ্চি পাতা ছিল, মক্কেলদের ঘরের মধ্যে আঁটত না। মেজদির তিন মেয়ে, দুই ছেলে। ছোটছেলে বিলেতে ডাক্তার। বড় ছেলে-বউ এক নাতনি, দুই নাতি সমেত তাঁদের কাছেই থাকত। মেজদির সঙ্গে বউয়ের বিন্দুমাত্র অশান্তি ছিল না। বউই সংসার দেখত, বউই গিন্নি, মেজদি শুধু হাসিমুখে পাড়া বেড়াতেন আর নাতি-নাতনিদের সঙ্গে আড্ডা দিতেন। নাতি-নাতনিদের সঙ্গে মেজদির বয়েসের খুব একটা তফাত আছে বলে মনে হত না। যেমন গলায় গলায় ভাব, তেমনি ঝগড়া বেঁধে যেত মাঝে মাঝে। বউমাকে গিয়ে মেটাতে হত। এমনিতে অবিশ্যি মেজদির পাড়ার ছোটদের সঙ্গে খুব ভাব। মেজদি তো গপ্পো বলতে ওস্তাদ কিনা। বুড়ো-বুড়ির গপ্পো, কানা-কানির গপ্পো, বোবা-বুবির গপ্পো, ন্যাড়া-নেড়ির গপ্পো, চড়াইকত্তা-চড়াইগিন্নির গপ্পো, তোতা-তুতির গপ্পো, পিঠেগাছের গপ্পো। "আশিমণ ময়দার দো-বোট খায়া"—। পাড়ার বাচ্চারা মেজদিকে একবার পেলে, আর ছাড়তে চায় না। আমারও খুব ভাল লাগত মেজদিকে। মেজদি যা-তা কাণ্ডকারখানা করতেন, এবং একেবারেই অনায়াসে। মেজদির বরটি মেজদিকে ভীষণ আহ্লাদ দেন—পাড়ায় এমন একটা কথা চালু ছিল। ছেলে-বউয়ের কাছেও তিনি প্রবল প্রশ্রয় পেতেন, সেটা চোখেই দেখতুম। আহ্লাদী দুলালী বলতে যা বোঝায় মেজদি ছিলেন ঠিক তাই। মেজদির স্বামীর বয়েস তখন নব্বুই বছর। কিন্তু মেজদির মোটে চুয়াত্তর। হাসিখুশি মেজদি মোটেই বুড়ি হননি।

কপালের দু'পাশে কিছু কোঁকড়া কোঁকড়া সাদা চুল ছাড়া, মেজদির মধ্যে বার্ধক্যের কোন লক্ষণই ছিল না। ওই নামেই যা চুয়াত্তর। একপিঠ কালো চুল, ঝলমলে হাসি, চমকিলি চোখ, যুবতীর সমান মেজদি জামাইবাবুকে "আপনি-আজ্ঞে" করতেন। আমাদের বাবা-মাদের মধ্যে কাউকেই এটা করতে দেখিনি, তাই খুব অবাক লাগত। তখন নতুন নতুন বিয়ে হয়েছে আমার। বয়েস নিতান্তই অল্প। কৌতূহলের চোটে একদিন মেজদিকে তো জিজ্ঞেসই করে ফেললুম—"মেজদি, আপনি জামাইবাবুকে আপনি-আজ্ঞে করেন কেন? অসুবিধে হয় না?" শুনে মেজদি প্রথমে খানিকটা হেসে নিলেন। তারপর হাতের রুপোর বাটাটি খুলে একটা জর্দা-পান মুখে গুঁজে, সুগন্ধ ছড়িয়ে ধীরে সুস্থে বললেন—"সে দুঃখের কথা তোকে কী বলব! শুনবি? তবে শোন। বিয়ে তো হল। চাঁদের আলোর মতন ফুটফুটে মেয়ে ছিলুম, তোদের চেয়েও ঢের ছেলেমানুষ—চোদ্দ বছরের মেয়ে তিরিশ বছরের বুড়ো বরের সঙ্গে বিয়ে হল। না, না বুড়োর সেই প্রথম বিয়ে। দোজবরে নই। উকিল হয়ে গুছিয়ে বসে নিয়ে, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রোজগার করতে শুরু করে দেবার পরে, তবে না কত্তার খেয়াল হল, এত টাকা দিয়ে করবটা কী, যদি সংসারই না রইল। তখন দ্যাখ-দ্যাখ শিগগির পাত্রী দ্যাখ। তিরিশ বছরের বরকে কে আর মেয়ে দেবে? বিধবা মায়ের শেষ মেয়েটা ছাড়া, আর কাকেই বা পাবে সে? তবে হ্যাঁ, বুড়োর কপাল ভাল ছিল, বল? বউটা মন্দ পায়নি। অবিশ্যি আমিও বলব বাপু, বুড়ো শিবঠাকুর বরটি আমারও কপালে জুটেছেন ভালই। ওই নন্দীভৃঙ্গী, অর্থাৎ মক্কেল, আর বউ। বউ আর মক্কেল। এই দুটি নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিলেন। মোটেই বারমুখো নন। বরঞ্চ একটু বেশি ঘরকুনো। কোর্টে বেরুনো ভেন্ন আর কোথাও বেরুবেন না। এক আমার মা যতদিন ছিলেন, শ্বশুরবাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে যেতে খুব ভালবাসতেন। আমার মার মতন রান্নার হাত খুব কম লোকের হয় কিনা। ব্যাস। মাও চলে গেলেন, উনিও আর কোথাও যাবেন না। আমার বড় বড় দিদি সব কত ডাকতো, আদর করে—তার বেলা গা করতেন না। কেবল কাজ। কেবল কাজ। এখন তো আমার এক ছোড়দি ছাড়া কেউ বেঁচে নেই। ছোড়দি নেমন্তন্ন করেও না, তার শরীর মন ভাল না।"

"মেজদি। আপনারও ছোড়দি আছে? আপনি তাহলে মেজবোন নন?"

—"দূর, আমি কেন মেজবোন হব? আমি তো সবার ছোট।"

—"তবে সবাই আমরা আপনাকে মেজদি বলি কেন?"

—"তোরা কেন বলিস আমি তা কেমন করে জানব বল? বরং তোর শাশুড়িকে জিজ্ঞেস কর। তোদের জামাইবাবুটি মেজভাই— আমাকে তো উনি 'মেজবৌ' বলেই ডাকেন, শুনিসনি? তোর শাশুড়ি হঠাৎ নতুন বউ হয়ে এসে আমাকে 'মেজদি' বলে ডাকতে শুরু করে দিলে। সেই ডাক শুনে শুনেই বাকিরা সব্বাই! এমনকি তুই সুদ্ধু। তোর ছেলেও তাই ডাকবে।" ভবিষ্যৎ ছেলের প্রসঙ্গে নতুন বউয়ের

যতটুকু লজ্জা পাওয়া উচিত, তা পেয়ে, আমি আবার বলি—"কিন্তু আপনি কেন? আপনার বরকে 'আপনি' বলেন কেন সেটা কিন্তু এখনও বললেন না।"

—"ও, বলিনি বুঝি? তা, যেটুকু বলেছি, তাই থেকেই তুই বুঝে নিতে পারলি না? তবে কেমন বি-এ পাশ তুই? ইশকুলের চোদ্দ বছরের মেয়ে, হঠাৎ একটা তেবিশ বছরের কত্তারেক্তি উকিল মানুষকে তুমি-তুমি করে কথা কইতে পারে? পারে কি? তুই-ই বল। তুই পারতিস? বরই হোক আর যেই হোক। আমি তো তাকে চিনতুম না। বাড়ির ছোট মেয়ে, হঠাৎ অন্য বাড়িতে গিয়ে অতবড় দামড়া অচেনা লোকটাকে গায়ে পড়ে 'ওগো-হ্যাঁগো তুমি কি কচ্চো গো' বলতে পারে? ফলে এ-জীবনে আমার আর ওগো-হ্যাঁগো বলাই হল না। 'এই যে', 'শুনুন', 'শুনচেন', বড় জোর 'ও মশাই' পর্যন্ত। ছেলেপুলে বড় হবার পর এখন 'কত্তামশাই' বলেও ডাকি। তা, তুইই বল। কাজটা কি আমার ঠিক হয়নি? বলি, দায়টা কার ছিল? বয়েসে যে বড় তার, না আমার? যার বাড়িতে আমি নতুন এসেছি, তার, না আমার? দায়টা কার ছিল?"

—"মানে?"

—"মানে? তবে খুলেই বলি শোন। আমারও কি দুঃখু নেই? উনিই তো আমাকে আদর করে, চিবুকটি ধরে, কোলে বসিয়ে একদিন কানে কানে বলবেন —'হ্যাঁগো, তোমার-আমার যে-সম্পর্ক, তাতে কি অমন দূর-পরের মতন আপনি বলা মানায়? তুমি আর আমাকে অমনি আপনি-আজ্ঞে কোর না তো? এবার থেকে তুমি বলবে। কেমন?' বল তুই, এটা কি ওঁরই বলা কর্তব্য ছিল না? আমিও ঘাড় নেড়ে 'তুমি-তুমি' করতুম। উনিই নিজে থেকে যদি আমাকে 'তুমি' বলতে কোন দিনও না বলেন, তবে আমি কেমন করে সেধে 'তুমি' বলব ওঁকে? ষোলো বছরের বড়ো গুরুজন মানুষটাকে? ওঁরও তো রসকষ কিছু কিছু থাকতে হয়? বউয়ের মুখে 'ওগো, হ্যাঁগো, আর দুটি ভাত নেবে গো?' শুনতেও তো সাধ হয়? তা নয়, ওর প্রাণে কোনই শখ সাধ হল না 'হ্যাঁ কত্তামশাই, আপনি কি আর দুটো ভাত নেবেন' এই শুনেই তার আনন্দ। বউয়ের মুখ থেকে এমন শুকনো-শুকনো কাঠ-কাঠ কথা শুনে কত্তার নিজের প্রাণে কোনই দুঃখু নেই। বউ তো নয়, যেন বাঁধুনীবামুন কথা কইছে। আমার তো নিজের কানেই কেমন কেমন ঠেকত। কিন্তু জীবন কেটে গেল, 'তুমি' বলতে আর উনি বললেনই না। তাই যেই বড়বউমা এল ঘরে, আমি ওকে বলে দিলুম—'দ্যাখো বউমা— আমার শুনে শুনে তুমিও যেন আমার ছেলেকে আপনি-আজ্ঞে কোর না বাপু। স্বামী-স্ত্রীতে ওরকম ডাক শুনতে বড্ড বিচ্ছিরি শুকনো-শুকনো লাগে।' অবিশ্যি মেজবউমার বেলা অন্য কথা। তার শিক্ষাদীক্ষা তার দেশের মতন, আমাদের সঙ্গে ঠিকমতন খাপ খায় না। যদিও সে-মেয়ের চেষ্টার অন্ত নেই। তাকে কিছুই শেখাতে পড়াতে হয়নি। মেম বলে কথা? মেমসাহেবদের আপনি তুমি নেই—সব সময়ে 'হানি' আর 'ডার্লিং' মুখে

BanglaBook.org

লেগেই আছে—"মেজদি হেসে গড়িয়ে পড়লেন।

—"বউয়ের আদিখ্যেতায় ববং ছেলের গোড়ায় গোড়ায় খুব লজ্জা কবত, আমিই বললুম— লজ্জা কিসেব? ওটা হচ্ছে তোদেব ইংবিজিতে 'ওগো-হ্যাগো'—তাই নয়? ছেলেবও এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। দেশে যখন আসে, সেও দেখি ডার্লিং বলছে। ছোটবেলায় সত্যি আমার দুঃখু ছিল রে, ববেব সঙ্গে দুটো মিঠে বুলি কানে কানে কে না বলতে চায়? তা কপালে থাকলে তো?" মেজদিব চোখ উদাস হয়ে গেল। এটা বড় দেখা যায় না। তাই তাড়াতাড়ি বললুম—

"আচ্ছা—যদি জামাইবাবু এখন আপনাকে 'তুমি' বলতে পাবমিশান দেন? আপনি পাববেন?" মেজদিব ফর্সা নাক আস্তে আস্তে লাল হয়ে উঠল। মেজদি আস্তে আস্তে মাথাটি ডাইনে-বাঁয়ে হেলিয়ে তেমনি বাইবেব দিকে চেয়ে থেকেই বললেন—

"এখন? এখন... নাঃ—পাবলেও, বলব না।"

সেদিন মেজদিব বাড়িতে গেছি, হঠাৎ দেখি হুড়মুড়িয়ে মেজদি জামাইবাবুব টেবিলে এক বাক্স সন্দেশ নিয়ে হাজিব—আমাকে ফিসফিস করে বললেন—"যা তো বলু, চট করে এক গেলাস জল গড়িয়ে নিয়ে আয় তোর জামাইবাবুব জন্যে"—বলেই আমাব হাতে জামাইবাবুব বড় রুপোব গেলাসটা ধরিয়ে দিলেন। তাবপব জামাইবাবুর মুখেব কাছে দুটি বড় বড় হলদে-গোলাপি সন্দেশ ধবে, তেমনিই ফিসফিস করে বললেন— "এই যে নিন? নিন? দু'চাবখানা এইবেলা মেরে দিন দিকিনি, টপাটপ মুখে ফেলে? খুব ভাল সন্দেশ দিয়েছে বাপু আপনাব মক্কেল"—মেজদিব এমন আকস্মিক ফিসফাস ষড়যন্ত্রী টাইপেব হাবভাবটি দেখে দুঁদে উকিলও ঘাবড়ে গেলেন। জামাইবাবুব মুখেব চেহাবা দেখে কষ্ট হল। ভীষণ অবাক হয়ে গিয়ে উনিও ফিসফিসিয়ে মেজদিকে বললেন—"বউমাকে বাক্সটা দাও গে, জলখাবাবেব সঙ্গে তো দেবেই —এত তাড়াব কী আছে?" একটি হাত ঘুবিয়ে, মেজদি ব্যাজাব মুখ কবে বললেন —"আববেঃ? সে তো ভা-গে-ব? তখন গুনে গুনে দুটিমাত্র দেবে কিন্তু, বলে দিচ্চি আব চাইলেই বলবে, 'বাবা, আপনাদেব বয়েস হয়েছে এখন বেশি মিষ্টি খেতে নেই'—তাব চেয়ে এইবেলা দুটো এক্সট্রা পাচ্ছেন, খেয়ে তো নেবেন? কীবকম বে-আক্কেলে মানুষ বে বাবা? এমনি করে আপনি মামলা চালান? দেখি দেখি হাঁ— ? হাঁ দেখি?"...জামাইবাবু হাঁ কবলেন। আমি জল আনতে চলে গেলুম।

আবেকদিন। লোডশেডিং হয়েছে। ঘোব অন্ধকারে মেজদি চাবি-গয়না ঝুমঝুমিয়ে এসে হাজিব। হাতে টর্চ। —"দ্যাখ না? তোদেব জামাইবাবুটাব রসকষ কিছুটি নেই। এত মন খাবাপ লাগছে। একটা শখও যদি মেটাতেন।"

—"কেন, কী হল আবাব?"

—"হবে আব কী? অন্ধকাবে বসে আছেন, আজ কী ভাগ্যি—মক্কেল নেই। বাস্তায় কোনো আলো নেই। বললুম—'এই যে শুনচেন? বলি শত্তুরের মুখে ছাই

BanglaBook.org

দিয়ে আপনারও একানব্বুই, আমারও পঁচাত্তর হয়ে গেল, এ জীবনে একটা দিনও তো হাত ধরাধরি করে পার্কে বেড়ানো হল না। আজকালকার ছেলেমেয়েরা তো সাঁঝবেলাতে হরদম হাত ধরে ঘুরছে দেখতে পাই। এইবেলা বরং রাজি সুদ্ধু ঘুটঘুটে অন্ধকার, কেউ কিচ্ছুটি দেখতে পাবে না, চলুন না মশাই, আমরা দুজনে হাত ধরাধরি করে একটু ওই পার্কে বেড়িয়ে আসি? আপনার মক্কেলরাও দেখতে পাবে না—খোকার ছাত্রছাত্রীরাও দেখতে পাবে না, নাতি-নাতনিদের বন্ধুরাও দেখতে পাবে না—চলুন না বাবা একটু রাস্তায় হাত ধরাধরি করে দুজনে মিলে হেঁটে বেড়িয়ে আসি? আপনার কি প্রাণে একটুও শখসাধ হয় না?' প্রথমে উনি তো হেসেই গড়ালেন—যেন কতই একটা ছেলেমানুষী কথা বলেছি। তারপর বললেন—'মেজবউ, অন্ধকারে বেরুলে আমরাও যে পথে কিছু দেখতে পাব না। এই বয়সে হোঁচট খেয়ে যদি পড়ে যাই, কোমরটি মট করে ভেঙে যাবে, আর এ জীবনে জোড়া লাগবে না। রাস্তাঘাটে কত খানাখন্দ, গর্ত, ইঁটপাটকেল, ঠেলাগাড়ি, রিকশা, কুকুর, অন্ধকারে হাঁটা সোজা নয়। শুধু যে আমাদের কেউ দেখবে না তাইই তো নয়? আমরাও যে হাতিঘোড়া কিচ্ছুটি দেখতে পাব না গো? টর্চ নিলে তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে না, আর টর্চ না নিলে দুজনে মিলে পথে হোঁচট খাব। তার চেয়ে এস, বরং ঘরেই হাত ধরাধরি করে বসে জানলা দিয়ে রাস্তা দেখতে থাকি দুজনে। থাকগে, লণ্ঠনটা জ্বেলে কাজ নেই।' সে কি সম্ভব? বউমা লণ্ঠন নিয়ে এল বলে। 'জ্বালতে হবে না' বলা যায়? ওর যত অসম্ভব কথা। হোঁচট। টর্চ নিয়েও হাত ধরাধরি করা যায়। যায় না? রাগ হয়ে গেল। আমি বললুম 'বয়েই গেছে আমার আপনার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে মক্কেলদের পথ চেয়ে হা-পিত্যেশ করে অন্ধকারে ওঁত পেতে বসে থাকতে। আমি চললুম বুলুদের বাড়িতে'।"

মেজদির জন্যে আমার সত্যি খুব কষ্ট হল। মেজদি ভুল করে সত্তর বছর আগে জন্মেছেন। যেদিন ওঁদের নিমগাছের ডালে মেজদির নাতনির জন্যে দড়িতে পিঁড়ি বেঁধে দোলনা টাঙিয়ে দেওয়া হল, নাতনিকে কোলে নিয়ে সবার আগে মেজদিই বসে গেলেন দোলনায় দুলতে আর বউমা শাশুড়িকে দোল দিতে লাগল। সে দৃশ্য আমরা সবাই দেখেছি, মেজদিকে চিনি বলে কেউই অবাক হইনি। অথচ বয়েসে অনেক কম আমার শাশুড়িকে ওই দোলনায় বসে দোল খাচ্ছেন এটা কল্পনা করতেও অসুবিধে হয়। মেজদি মেজদিই। তাঁর নিজস্ব একটা ব্যাপার আছে। বছর দুয়েক আগের কথা—চৈত্রমাসের সেল হচ্ছে, মেজদি সেলে সস্তাচ্ছরের জন্য ৬ খানা চওড়াপাড় নতুন শাড়ি কিনেছেন—প্রত্যেকটা খুব সুন্দর। পয়লা বৈশাখের আগেই এদিকে বিপর্যয় ঘটল বাড়িতে—জামাইবাবু হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। করোনারি থ্রম্বোসিস। বউমাকে ডেকে মেজদি বললেন—"বউমা! তোমার শ্বশুর তো চললেন এখন। এই যে ৬ খানা নতুন শাড়ি কেনা হল? কবে আর পরা হবে? এ গিন্নিবান্নি বুড়ো বয়েসের শাড়ি তোমাকেও মানাবে না। বরং এবেলা ওবেলা

করে পরেই ফেলি সবগুলো?" বউমা আর কী বলবে—"তাই পরুন"—ছাড়া? বাড়িভর্তি লোকজন, ডাক্তার হাসপাতালের আয়া, মেয়ে জামাইরা সবাই এসে পড়েছে, বিলেত থেকে ডাক্তার ছেলেও এসে পড়ল, পাড়াপড়শীরা সারাদিন ছুটোছুটি করছি, জামাইবাবু অজ্ঞান অচৈতন্য—তাঁকে অক্সিজেনে রাখা হয়েছে, মেজদির নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই—প্রচণ্ড টেনশন—কিন্তু তারই মধ্যে ঠিক মেজদি এবেলা-ওবেলা/ওবেলা-এবেলা করে তিনদিনে ছ'খানা নতুন কোরা শাড়ি ঝটাপট পরে ফেললেন। বলাবাহুল্য খুবই অদ্ভুত দেখাল কাজটা। ইতিমধ্যে ঈশ্বরের দয়ায় জামাইবাবুও আস্তে আস্তে সামলে উঠলেন। মেজদি বললেন—"বউমা? সব নতুন শাড়ি তো ভেঙে ফেলেছি। ১লা বৈশাখে কী পরব? যাও দিকি, আর একখানা কিনে আনো। লালপেড়ে। সম্বচ্ছরের দিনে সধবা মেয়েমানুষকে নতুন কাপড় পরতে হয়। নইলে সংসারে অমঙ্গল।" বউমা ছুটল নতুন কাপড় কিনতে। সেরে ওঠার মাস খানেক মাস দেড়েক পরেই আবার জামাইবাবু চেম্বারে এসে বসলেন।

যেমনি মেজদি, তেমনি জামাইবাবু। অতবড় অসুখের পরও যথেষ্ট বিশ্রাম না নিয়েই কাজে লেগে গেলেন বলে ছ'মাস যেতে না যেতে জামাইবাবু আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ছেলেবউ, মেয়েজামাই, এমনকি মেজদি পর্যন্ত তাঁকে কিছুতেই বিশ্রামে রাখতে পারেননি। এবারে দ্বিতীয় অ্যাটাক—বাড়িতে রাখা চলল না, জামাইবাবুকে এবার নার্সিং-হোমে দিতে হল। ঘর-নার্সিংহোম মেজদি সারাদিন ছুটোছুটি করছেন। বলতে নেই মেজদিরও তো বয়েস খুব কম নয়। স্ট্রেন হচ্ছে বাড়িসুদ্ধ সকলেরই। মেজদির হাবভাবে কিন্তু হতাশার চিহ্ন নেই। শুধু চুলটা একটু রুক্ষসুক্ষ, চোখটা একটু চঞ্চল এই পর্যন্ত। নয় নয় করেও তাঁর বয়েস এখন উনআশি হয়েছে, জামাইবাবুর পঁচানব্বুই। দু'জনেই দেহে-মনে সচল আছেন এই যা। মেজদির চুলের শুভ্রতা খানিক বেড়েছে, কয়েকটা কুঞ্চন দেখা দিয়েছে গালে-গলায়, এই পর্যন্ত।

"তোদের জামাইবাবু তো আরাম করে শুয়ে আছেন হাসপাতালে, আর আমারই হয়েছে জ্বালা"—বললেন মেজদি। "নাওয়া-খাওয়া না হয় চুলোয় যাক, তাতে ক্ষতি নেই। পুজো-আচ্চা পর্যন্ত চুলোয় গেছে। অথচ ঠাকুরকেই তো ডাকতে হয় এখন। এই পঁচানব্বই বছরের বুড়ো যদিবা হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফিরে আসে, সে তো ডাক্তারের গুণে নয়, ঠাকুরের আশীর্বাদে। তাই না? তা ঠাকুরঘরে ঢুকতেই রাত ন'টা দশটা বেজে যাচ্ছে। তখন ঠাকুরের ঘুম পেয়ে যায়। কী যে বলি, ঘুমোতে ঘুমোতে গোপাল কিছুই শোনে কিনা কে জানে?"—মেজদির অতি আদুরে এক গোপাল ঠাকুর আছেন, তিনি রুপোর খাটে সোনার ছাতা মাথায় দিয়ে সোনার নাড়ু খান। অর্থাৎ মেজদিদিরও ওপরে আর-এককাঠি। আহ্লাদে নন্দদুলাল। মেজদি তাঁকে ডেকে কী যে বলেন, জানি না। তবে আমাকে ডেকে একদিন বললেন —"শোন বুলু। তোকে একটা জরুরি কথা বলে রাখি। তোদের জামাইবাবু গত হলে আমি কিন্তু আর আমার চওড়াপাড় কাপড়গুলো পরব না। তোর জামাইবাবুর

BanglaBook.org

পুরনো ধুতিগুলোও পরব না। আমার ছটা ফাইন থান চাই। খোকাকে আমি সোজাসুজি বলতে চাই না—ওকে মনে করে তুই বলবি যে, আমি তোকে বলে রেখেছি, চওড়াপেড়ে শাড়ি-পরা বুড়ি বিধবা দেখতে আমার ভালো লাগে না। নকন পেড়ে ধুতি পরা বিধবাও বিতিকিচ্ছিরি লাগে। বেশি বয়েসে বিধবা হলে বাঙালি মেয়েদের থান-কাপড়েই মানায়। যে বয়েসের যেটা ফ্যাশান। বুঝলি না? মনে করে কিন্তু বলবি খোকাকে যেন কিনে রাখে—তোর জামাইবাবুর এটা তো সেকেণ্ড অ্যাটাক। ছিয়ানব্বই হতে চলল। যদিও বা এবার সেরে ওঠেন, থার্ড অ্যাটাকেই নির্ঘাৎ যাবেন। তখন যদি শোকে তাপে আর গোলমালের মধ্যে কাপড়চোপড়ের মতো তুচ্ছ কথাটা আমার বলতে মনে না থাকে? তাই তোকে আগেভাগেই বলে রাখলুম। আর শোন বউমাকে বলবি আমাকে যেন মাছফাচ ধরায় না অশৌচের পরে। আশি বছর বয়সে বিধবা হলে মাছ-মাংস খাওয়া কেবল লুভিষ্টিপনা ছাড়া কিছু নয়। সারাজীবন ঢের মাছমাংস খেয়েছি। সেসব বুড়ি বিধবার দাঁত নেই অথচ মাংস খায়, আমার মনে হয় তারা সারা জীবন খেতে পায়নি। হ্যাঁ অল্পবয়সে বিধবা হতুম যদি, সে এক কথা ছিল। কিন্তু বয়েস তো এখন আশি? সাধ আহ্লাদ বাকি থাকার দিন নেই।"

"আশি তো আপনার হয়নি, মেজদি। আর বিধবাও তো আপনি হননি। দুটোরই দেরি আছে। দেখুন—জামাইবাবু সেরে উঠবেন নিশ্চয়। খুবই ভালো ডাক্তারের হাতে রয়েছেন। আচ্ছা মানুষ তো। আপনাকে আশি বছরে যে বিধবা হতে হবেই—এটা কে বলেছে?" আমি প্রায় ধমকেই ফেলি মেজদিকে। তারপর যোগ করি—"আর সাধ আহ্লাদ? আপনার না থাক, আমাদের আছে, দাঁড়ান না আপনার আশি বছরের বার্থডে করব আমরা, ব্যাণ্ডপার্টি বাজিয়ে, বাস্তায় প্রসেশন করে: ঘাড়ে করে রঙিন আলোর স্ট্যাণ্ড জ্বালিয়ে, আপনাকে আর জামাইবাবুকে হাত-ধরাধরি করিয়ে হাঁটিয়ে পার্কে ঘুরিয়ে নিয়ে আসব—আসুক অঘ্রান মাস—তবে তো আশি হবে? আর বৈধব্য অনেক দূরে, মেজদি, শুধু শুধু অত অলুক্ষণে কথা বলবেন না তো।"

"অলুক্ষণে কথা? বটে?" বলেই মেজদি দুষ্টু হেসে আমার কানেকানে গোপন কিছু বলবার জন্যে মাথা নিচু করে এগিয়ে এলেন। কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন—"কেন এত অলুক্ষণে কথা বলছি বল তো? তবে শোন। ছাতা নিয়ে বেরুলে যেমন বিষ্টি পড়ে না, তেমনি আমার কেমন মনে হয়, গোপালের কানের কাছে অত থান-কাপড়ের গপ্পো করলে, কি জানি, হয়তো আর বিধবা হতে হবে না। বুঝলি বোকা? ঠকাচ্ছি, ঠাকুরকে এমনি মিছিমিছি করে ঠকাচ্ছি রে—" মেজদি হেসে গড়িয়ে পড়লেন।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গোপালঠাকুর মেজদির কথা ঠিকই শুনতে পান। এযাত্রাতেও জামাইবাবু সেরে উঠে নার্সিংহোম থেকে বাড়ি ফিরে এলেন—মেজদি আহ্লাদে হালকা হয়ে যেন ঠিক চাঁদের জমিতে নীল আর্মস্ট্রং—ওজনহীন হয়ে উড়ে বেড়াতে লাগলেন। উড়তে উড়তে একদিন সেই নববর্ষের লাল কস্তাপেড়ে ধনেখালিটা পরেই

BanglaBook.org

ভবসন্ধেবেলায় মেজদি স্নানের ঘরে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়লেন।

অতএব ছখানা ফাইন থান কেনবার জরুরি কথাটা তাঁর ছেলেকে মনে করিয়ে দেবার দায়িত্ব আমার ঘাড় থেকে নেমে গেল!

মেজদি চলে গেলেন কার্তিক মাসে, আর অঘ্রান মাসের এক রাত্তিরে হিমের মধ্যে জামাইবাবু একা একা লোডশেডিংয়ের অন্ধকারে টর্চ ছাড়াই হঠাৎ রাস্তায় কী করতে যে বেরুলেন, কে জানে? মাঝখান থেকে খানাখন্দে পড়ে গিয়ে ডান পা খানা ভেঙে ফেললেন। বেচারি! সেই যে জামাইবাবু নার্সিংহোমে গেলেন, এবারে আর তাঁকে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা গেল না।

—বলি, আনবেটা কে? মিছিমিছি থান-কাপড়ের গুলগপ্পো শুনিয়ে গোপালঠাকুরকে ঠকানোর কেউ ছিল না যে!

BanglaBook.org

মেসোমশায়ের কন্যাদায়

ভদ্রমহিলার পাতে মাছটা প্রায় দেওয়া হয়েই গিয়েছে, হাঁ হাঁ করে দৌড়ে এসে পড়লেন মেসোমশাই—

—"তুইল্যা ফ্যালাও, তুইল্যা ফ্যালাও।" পাতের ঠিক এক ইঞ্চি ওপরে তখন রুইমাছের পেটি ত্রিশঙ্কু—

—"ওনারে জিগাইসিলা?"

—"না তো।"

—"ওই তো দোষ। পরিবেশনের একটা রুলস আছে না? জিগাইয়া লইয়া তবে দিতে হয়। পয়লা কইতে হয়—"আপনি কি মাছ নিবেন?" মহিলা এই সময়ে বললেন—"হ্যাঁ।" মেসোমশাই সেটা কানে তুললেন না। আমাকে বললেন—"বল? রুন্টু বল? আপনি কি মাছ নিবেন?" মহিলা পুনরায় স্পষ্ট গলায় বললেন—"হাঁ।" আমি আর না পেরে ঝুলন্ত মাছটা ওঁর পাতে দিয়ে ফেলি। মেসোমশাই যারপরনাই হতাশ মুখে বললেন—"আইজকালকার ইয়ংম্যানদের মেইন ডিফেক্ট তো এই। ঠিক যেইটা কইলাম তার অপোজিটটা করলা তো? না জিগাইয়াই দিলা। এইভাবেই ওয়েইস্টেজ হয়। সবকার তো এইটাই মানা করে। যেমন সৌম্য ডিসওবিডিয়েন্ট, তেমনই তার বন্ধু!" আমি এবারে আরো বোকার মতো, ভদ্রমহিলাকে প্রশ্ন করে বসি—

—"আপনি কি মাছ নেবেন?" মহিলা আবার বললেন—"হ্যাঁ।" মেসোমশাই অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়ে ওঠেন।

—"বাইট। জাস্ট লাইক দিস। জিগাইয়া লইয়া তবে সেটা পাতে দিতে হয়। দ্যাও দ্যাও ওনারে আরো দুইখান মাছ দাও দেহি—মনে হয় মাছটা উনি ভালই খান। মাছ যারা ভাল খায়, তারা আবার অনেকেই খাসির মাংসটা তত ভাল খায় না।"

মহিলা বললেন—"আমি কিন্তু মাংস খেতেও ভালোবাসি।"

এবার জিভে একটা অধৈর্য শব্দ করে মেসোমশাই অভয় হস্ত উত্তোলন করেন—

—"আহাঃ আপনার কথা হয় নাই। জেনারেল ডিসকাশান হইতাসে। আপনের লাইগ্যা মাছ-মাংস সবই আছে, ভয় নাই, তাড়াহুড়া কইরা লাভ কি? অল ইন গুড টাইম। মাছটা খাইয়া লন, মাংসও ঠিকই পাইবেন। আরে ও সৌম্য, চিংড়িমাছটা এইধারে আনস নাই?" হাঁকতে হাঁকতে ব্যস্ত হয়ে অন্যদিকে যেতেই পথিমধ্যে মাসিমার সঙ্গে মুখোমুখি। ফুটন্ত কেটলির মতো মাসিমা বললেন—

—"কী বলছিলে তুমি? কী উচ্চারণ করলে এইমাত্র?"

—"কইতাসি যে চিংড়িমাছটা—"

—"চিংড়িমাছ? চিংড়িমাছ হয়নি, তা জানোনা?" মেসোমশায়ের মাথায় হাওড়া ব্রীজ ভেঙে পড়ে।

—"হয় নাই? স্ট্রেইনজ। সেইদিন যে মেনু হইল?"

—"মেনু হলো, খাওয়াও তো হলো। খেলে না সেদিন ইয়া বড় বড় গলদাচিংড়ি? চিনুর পাকাদেখার দিনে? বিয়েতে চিংড়িমাছের কথা কবে হলো?"

"আলবৎ কথা হইসিল।"

—"কক্ষনো হয়নি।"

—"সার্টেনলি হইসিল।"

—"কখনো হয়নি। হয়নি। হয়নি।"

—"ইউ শাট আপ।"

—"কেন, কিসের জন্যে আমি শাট আপ? তুমিই বরং একদম মুখ খুলবে না আজকে। ছি ছি, গুলিখোর-গাঁজাখোরের মত কী বলতে কী যে বলছ। কী লজ্জা কী লজ্জা।"

—"ক্যান? লজ্জার হইলটা কী শুনি? চিংড়িমাছ খাওয়াইতে না পারলেই লজ্জা? এইযার মধ্যে লজ্জার আছেটা কী?"

—"লজ্জার এই যে, তোমার বাক্যি শুনে সকলে ভাবলো যে মেনুতে চিংড়ি থাকা সত্ত্বেও আমরা ইচ্ছে করেই এই ব্যাচে ওটা দিলুম না। এটাই ভাবলো সকলে। ছি ছি—"

—"অত ছি-ছি-যের কী আছে? মোটেই কেউ তা ভাবে নাই। সকলেই জানে

BanglaBook.org

আমি সার্ভিস করি, সার্ভিস। বোঝলা? আমি কি বিজনেস করি, যে হোর্ডিং করুম? হোর্ডিং করা আমাগো নেচার না।"

বোধহয় ঐ 'হোর্ডিং করা' শব্দটাতে মাসিমার ইংরিজি হোঁচট খায়। তিনি বলেন —"ওসব জানি না বাপু, লোকে যা ভাবার তাই ভাবলো। বাস। সে তোমার নেচার যেমনই হোক।"

—"আরে, ভাবে নাই, ভাবে নাই। আর যদি ভাইবাই থাকে, আমি অহনই যাইয়া অগো কইয়া দিতাসি যে, মশয়, আইজ কিন্তু চিংড়িমাছ হয় নাই।"

এই সময়ে বুড়োদা এসে মা-বাবার মধ্যস্থলে দাঁড়ান, বাফার স্টেট হয়ে। বুড়োদা মধ্যপ্রাচ্যে শাঁসালো চাকরি নিয়ে চলে গেছেন। বছর দুই বাদে এই তাঁর প্রথম ঘরে ফেরা। মাত্র তিন হপ্তার ছুটিতে, বোনের বিয়ে উপলক্ষে। প্রচুর সাড়া জেগেছে, আত্মীয় মহলে ('বুড়ার ঘড়িটা দেখসস?' 'বুড়া কোন-দিকে?') রমরমা পড়ে গেছে। কিন্তু মেসোমশাই কিছুতেই ঠিক মত বুড়োদাকে পাত্তা দিচ্ছেন না। যেন কোনোদিনই বাইরে যাননি ছেলে, ভাবখানা এমনি! বুড়োদার সেটা সহ্য হচ্ছে না। তাই চান্স পেলেই তিনি বাবার কাছে জোর করে ইম্পর্ট্যান্স আদায় করছেন। বাবা-মায়ের মধ্যবর্তী হয়ে বুড়োদা বললেন:

—"থাক, বাবা, লেট ইট এনড হিয়ার। ডোন্ট ক্রিয়েট আননেসেসারি কমপ্লিকেশনস।" অবশ্য বুড়োদা বিন্দু-বিসর্গ জানেন না বর্তমান সমস্যাটা কী। অথবা সমস্যা আদৌ আছে কি নেই।

—"বুড়া, তুমি থামো তো দেহি। কমপ্লিকেশন কি আমি করি? নেভার। হেইডা যে করার সেই করসে। তোমার গর্ভধারিণী।" মাসিমা চোখ কপালে তুলে বিপুল এক হাঁ করতেই বুড়োদা তার কাঁধটা খামচে ধরে সাদরে একটি গুল সার্ভ করেন —"চলো মা, ওঘরে চলো, চিনু তোমায় খুঁজছিলো।" সাপের ফণায় মন্ত্রপড়া জল পড়লো। মাসিমা ছটফটিয়ে কনের কাছে চলে যান।

সৌম্যর বাবা, আমাদের পড়শী এই মেসোমশাইয়ের দেশ পূর্ববঙ্গে, আর মাসিমা খাস ঘটি। চল্লিশ বছর একটানা কলকাতায় বাস করার ফলে মেসোমশাই এখন নির্ভীকভাবে সর্বত্র এক জগাখিচুড়ি বাঙলাভাষা বলেন। কিন্তু তাতে মাসিমার মুখের মিঠে শান্তিপুরী বুলির নড়চড় হয়নি। পাড়ায় যখন ঘটিবাঙালের ঝগড়া হতো, চিনুদি আর মিতুন নিতো ঘটি পক্ষ; ওরা মামারবাড়ির আঁচলধরা মোহনবাগান সাপোর্টার —কিন্তু বুড়োদা আর সৌম্য বাপ-ঠাকুর্দার বংশমর্যাদা রক্ষা করতে, ফরএভার ইস্টবেঙ্গল। সেই চিনুদির বিয়ে আজ। সৌম্য বলল—"রুন্টু, তুই বাবাকে আজ একটু চোখে-চোখে রাখিস রে—আমি তো নানাদিকে ব্যস্ত থাকবো, বাবা ওদিকে ফিলড খালি পেলে হেভী কেলেংকারী করবেন।" এ কাজটা পাড়াশুদ্ধ সকলেরই অভ্যেস আছে। পাড়াতে যখনই কোনো সামাজিক কাজ হয়, কাউকে না কাউকে তখন মেসোমশায়ের দিকে 'চোখ' রাখতে হয়। মেসোমশাই কী করতে কী করে বসেন?

BanglaBook.org

আর আজ তো একেবারে চরম সামাজিক মুহূর্ত সমাগত—স্বয়ং মেসোমশায়েরই কন্যাদায়। অথচ মহামান্য কন্যাকর্তা হিসেবে মেসোমশাই নিজের ডিউটিটা সম্বন্ধে কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারছেন না। সম্প্রদান করবেন কনের জ্যাঠা, নিমন্ত্রণ পত্রেও তাঁরই নাম। রান্না-বান্নার, 'খাওন-দাওনের' চার্জে আছেন কনের কবিতকর্মা সেজকাকা। কেনাকাটার দিকটা সম্পূর্ণ দেখছেন কনের বড়লোক মামা-মাসীরা, বাড়িভাড়া, বাড়িসাজানো বুড়োদার, বিবাহের আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা কনের ছোটকাকা এবং কাকীদের দেখার কথা। রিসেপশানের দিকে আছেন কনের পিসিরা। উৎসব বাড়িতে মেসোমশাই কিছুতেই একটা নিজস্ব ভূমিকা খুঁজে পাচ্ছেন না। তাই বলে তিনি যে অলস, অক্ষম, অথবা এলিয়েনেটেড, অর্থাৎ কিনা পার্টিসিপেশনে নারাজ—তা একেবারেই না। অতএব চর্কিবাজির মতো সারা বাড়ি ঘুরে তিনি "কন্যাকর্তার যোগ্য" কাজ নিজেই যোগাড় করে নিচ্ছেন এবং এখানেই সকলের উদ্বেগের কারণ।

আপাতত মেসোমশাই বিয়েবাড়ির ঘরে ঘরে ঘুরে ভাঙা চেয়ার, এবং ফরাসপাতানো ইন্সপেকশন করছেন। একটা ঘরের ফরাসের ওপরে গোটাকয়েক বাচ্চা আপনমনে খেলছিল। হেনকালে মেসোমশায়ের আকস্মিক প্রবেশ। ঢুকেই তিনি বাচ্চাদের বললেন—"তোমরা মনু, অই ঘরটায় বস গিয়া। ঐ ঘরে কিনা ফরাস নাই, দেখবা ক্যাবল চেয়ার আর শতরঞ্চ।" তারপর আমার দিকে চেয়ে চোখটা টিপে—

—"অ্যাতগুলো কাসসা বাসসা—দুই চারটা প্রসসার কইরা দিলেই হইল—বাস। সাধের বিয়াবাড়ি ফিনিশ।" এও অপমান? মুহূর্তের মধ্যে বাচ্চারা সব উঠে অন্যত্র পালায়। বছর বারো-তেরোর ধুতি-পাঞ্জাবি—চন্দন কাঠের বোতাম-পরা দুটো পাকা ছেলে কিন্তু বাচ্চাদের সঙ্গে উঠে গেল না। মেসোমশাই তাদের বললেন—"তোমরাও মনু উইঠ্যা ঐ ঘরে যাও। এই ঘর ফর এডাল্টস ওনলি।" তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে, "পোলাপানগো কথা। কওন তো যায় না। প্রসসার কইরা দিতে কতক্ষণ?" গোঁয়ার গোবিন্দ ছেলেগুলি এবারেও উঠে দাঁড়ালো না। একটা সম্মুখ সমরের প্রস্তুতি হব-হব দেখে আমি কেটে পড়তে চাইছি, এমন সময়ে হৈ-হৈ করে দই মিষ্টি এসে পড়লো। সামনেই মেসোমশাই।—"বাবু মিষ্টি কোথায় রাখবো?" মেসোমশাই গম্ভীর হয়ে বললেন—"সো-ও-জা উপরে তিন তলায় লইয়া যাও, স-ব অ্যারেনজমেন্ট করাই আছে। রুন্টু, তুমিও সাথে সাথে যাও।"

সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় উঠে দেখি সেখানে ছাদে প্যাণ্ডেল বাধা, ছাঁদনাতলা সাজানো হচ্ছে, মিষ্টি রাখার কোনও ব্যবস্থাই নেই। কিন্তু সেখানে অন্য সমস্যা—ছাঁদনাতলার জন্য কলাগাছ কিনতে ভুল হয়ে গেছে।

মিষ্টির ঝুড়িওলাদের নিয়ে আবার নিচে এলাম, মেসোমশাই সেখানে ভাঙা চেয়ারের ডাঁইয়ের পাশে একটি আস্ত চেয়ারে বসে আছেন। আমাদের মুখ দেখেই বললেন—"জাগাটা পাইলা না বুঝি? যাও তবে ভাড়ারেই লইয়া যাও।"

BanglaBook.org

—"ভাঁড়াবটা কোনদিকে?"

—"সেইটাও আমাবেই কইযা দিতে লাগবো? এই বাড়িটা কি আমি প্ল্যান কইরা বানাইসি? এইখানে তুমিও যেই, আমিও সেই। দুইজনাই আউট-সাইডার। এট্টু কমনসেন্স ইউজ কববা তো রুন্টু? কমনসেন্স লাইফে খুবই দরকার হয়। যাও তোমাব মাসিমাবে জিগাও গিযা।" মাসিমা যেন এখানে আউট-সাইডার নন। যদিও প্রত্যেকেই আজ সকালে একইসঙ্গে এ বাড়িতে প্রথম পদক্ষেপ কবেছি। মিষ্টিওযালাদেব নিযে আবার ওপবে উঠছি, মেসোমশায় আবেকজনকে ডাকলেন—

—"এই যে লম্বোদব শুইন্যা যাও।" গণেশ সৌম্যব আবেক বন্ধু। —"তুমিও যাও, গিযা মিঠাইটা গার্ড দাও গা। তুমি তো মিষ্টান্নটা ভালই বোঝ, এই ডিউটি তোমারেই ঠিক স্যুট কববো, ভাডাবঘবেব সামনাটায খাডাইযা থাকবা, হাতে একটা ছডি লইযা। কেও যান চুবি কইবা খাযনা, কুকুব-বিবাল, কি পোলাপান—বি কেযারফুল, বোঝলা? খুব সাবধান। যাও।"

খানিক পবে একটা বাচ্চা ছেলে এসে বলল—"রুন্টুদা, তোমাকে গণেশদা শিগগিব ডাকছে।" গিযে দেখি ভাঁডাব ঘবে সাবি সাবি দই মিষ্টিব হাঁড়ি-থালার সামনে করুণ বিষণ্ণ গণেশ ছডি-হাতে দণ্ডাযমান। যেন ক্ষুব্ধ জাহাজের ডেকের ওপবে কাসাবিযাঙ্কা। একবাব বাঁ পাযে ভর দিচ্ছে একবার ডানপাযে। আমাকে দেখেই বলল —"যা তো রুন্টু, সেজকাকাব কাছে, শিগগিব একটা তালা নিয়ায়, এটা কি মানুষেব কাজ? এতগুলো টাটকা মিষ্টিব সামনে এভাবে...মোস্ট ইনহিউম্যান সাইকিক টবচাব।"

গণেশেব নাম গণেশ নয়, ধ্যানেশ। বেচাবী খেটে-টেটে একটু বেশি ভালবাসে। এই বযসেই দিব্যি একটি ভুঁডি বানিযে ফেলেছে বলে মেশোমশাই ওকে আদব কবে ডাকেন "গণেশ"। সেটাই পাডায চালু হযে গিযেছে।

সেজকাকা তো শুনে অবাক।—"মিষ্টিব সামনে ছড়ি হাতে লোক পাহারা? এ্যাঁ? এটা কি ক্ষেত, না খামাব?" তালা মজুতই ছিল হাতে, সেজকাকা নিজে যখন তালা মাবাব তোডজোড কবছেন অর্থাৎ টেকনিকালি গণেশের ডিউটি অফ হযে গিযেছে, সেই সূক্ষ্ম কযেকটি মাত্র সেকেণ্ডেব মধ্যেই লুকিয়ে গোটা চাবেক সন্দেশ সটাসট সেঁটে ফেলল গণেশ। এত ফাইন এবং ফাস্ট ওযার্কার সচবাচব দেখা যায না, এবং গণেশেব মতে, এতে নীতিগত কোনো বিবোধও নেই।

এই সমযে ওদিকে একটা গোলমাল শুনে ছুটে গেলাম।

—"আঃ হা—কলাগাছ আনে নাই তো হইসেটা কী?" মেসোমশায়ের গলা। —"চাইব চাইব খানা কলা গাছ দিযা হইবোটা কী? জানবা যে আমাগো ফেমিলিতে ছাঁদনাতলায় কলাগাছ লাগে না, নেভাব। আমাগো গুরুর মানা। বোঝলা? কলাগাছেব লাইগ্যা বাজাবে গিযা কাম নাই, সিধা ছাদে চইল্যা যাও, চাইর কর্নাবে চাইরখান ইটা লাগাইযা দ্যাও। ব্যাস। ফার্স্ট ক্লাশ"—উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে মেসোমশাই প্রায়

BanglaBook.org

কনভিন্স করিয়ে ফেলেছেন, গণেশ আর আমি ইঁট খুঁজতে যাব, এমন সময়ে সৌম্যর ছোটকাকা হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির, দুই বগলে চারটে কলাগাছ।—"এই যে, খোকন, হে-ই যাইয়া কলাগাছ কিইন্যা আনছস? যেইটার দরকার নাই ঠিক সেইটাই! টোটালি আননেসেসারি ওয়েইস্টেজ!" বলতে বলতেই দ্রুত স্থানত্যাগ করছিলেন মেসোমশাই, কেননা ওদিক থেকে মাসিমার 'মঞ্চে প্রবেশ' ঘটছে। কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। মাসিমা মৃদু ডাক দিলেন—"কই? শুনছো?" আর না শুনে উপায় আছে? মেসোমশাই দাঁড়িয়ে পড়েন।

—"তুমি নাকি বলেছো ছাদনাতলায় কলাগাছ লাগাতে হবে না? তোমাদের গুরুর বারণ?"

—"আরে ধুর! কে কইল? আমি তো কইলাম 'ক্যান—কলাগাছে কামড়া কী? এইডা কি মা দুর্গার পুত্রের বিবাহ, যে কলাগাছ না হইলেই ওয়েডিং ক্যানসেল? জামাইবাবাজী কি গণেশ ঠাকুর? নাকি এইডা বৈষ্ণবের কালীপুজা? অরা পাঠার বদলি কলাগাছ বলি দেয়, থোড় দিয়া ভোগ রান্না করে শুনসিলাম। অগো লেইগ্যা কলাগাছ ইনডিসপেনসিবল। কিন্তু আমাগো ঘরে তো চিনাই আছে।" মাসিমা এবার বললেন—

—"হ্যাঁগা, তোমার জন্যে কি আমি গলায় দড়ি দেব?" লম্বা জিভ কেটে মেসোমশাই তাড়াতাড়ি বলেন—"তুমি আর ফাঁস দিবা ক্যামনে? তুমি নিজেই তো ফাঁস। আমি তো তোমারেই গলায় পইরা ফাঁসি লাগাইসি। দরিব কি গলায় দরি হয়? হয় না!" এমন সময়ে একজন ভদ্রলোক মেসোমশাইকে বাইরে ডাকলেন। মেসোমশায়ের মুখটি মলিন হয়ে গেল।—"অহনই আইতাসি,"—বলে উপরে উঠে গেলেন হন্তদন্তভাবে। যাবার আগে মাসিমার কান বাঁচিয়ে আমাকে সিঁড়িতে ডেকে এনে বলে গেলেন—"দ্যাখলা তো? মেজো ভাইরা গাড়ি-ড্রাইভার ধার দিসে কিনা, তাই তখন থিক্যা কাজ নাই কাম নাই আমারে ডাইক্যা ডাইক্যা ক্যাবল ফালতু কথা কইতাসে। য্যান সেই আইজ কন্যাকর্তা। কতবড় ভি আই পি লোক। হুঃ। আমি আর যামুই না নিচে!" বলে, সোজা ছাদে পালালেন, যেখানে কলাগাছ লাগানো হচ্ছে। খানিক বাদে আমিই ওপরে গেলাম মেসোমশাইকে ভাত খেতে ডাকতে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সৌম্যর বড়মামার সঙ্গে দেখা। পান চিবুতে চিবুতে উঠছেন। মেসোমশাই হঠাৎ ভদ্রতার অবতার হয়ে হাত জোড় করে বললেন—"খাওনদাওন ঠিকমতো হইসে তো?" সৌম্যর মামা ঢেকুর তুলে বললেন,—"ব্যবস্থা তো চমৎকার, কেবল ডালে নুনটা একটুখানি বেশি পড়ে গেছে, ওটা"—

"তাইলে আপনি এট্টু ঠাকুরগো লগে থাকলেই পারতেন? খাইবেন তো আপনারাই! ডাইলে লবণটা আপনের স্বহস্তে দিয়া দিলেই ঠিক হইতো।" হতবাক শ্যালকের মুখটি কালো করে দিয়ে বীরদর্পে মেসোমশাই নেমে আসেন।

কলকাতার বনেদী বড় ঘর সৌম্যর মামার বাড়ি। উদ্বাস্তু মেসোমশাইকে ভাল

ছাত্র দেখে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন সৌম্যর দাদু। কিন্তু মেসোমশাই নিজের শ্বশুরবাড়িকে দুচক্ষে দেখতে পারেন না। তাদের অপরাধ, তারা একেই ধনী, তায় ঘটি।—"কলকাতার কায়েত তো," প্রায়ই বলেন তিনি মাসিমাকে—

—"তোমাগো প্যাটে প্যাটে প্যাঁচ। জিলাবীর প্যাঁচ। বোঝলা? ওইটারে তো ভদ্রতা কয় না, কয় কুটিলতা।" চান্স পেলেই তিনিই শ্বশুরবাড়িকে ডাউন দ্যান। নিচে আসা মাত্র আবার মাসিমার একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেলাম দুজনে। সাক্ষাৎ মাত্রেই প্রেমালাপ। মেসোমশাই এবারে ট্যাকটিকস বদল করেছেন। অফেন্স ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স।

"এই যে, আইলেন। তোমাগো লাইগাই যত না গোলমাল। খালি হই হই। খালি হই হই।"

—"আমি আবার হৈহৈটা কী করলুম শুনি? গোলমালের রাজা তো তুমি? তোমার বাধানো গোলমাল সামলাতে সামলাতেই...কী? কী বলেছ? তুমি কৃষ্ণার ভাইকে?"

—"কী আবার কইলাম? কৃষ্ণার ভাইডা আবার কেডা?"

—"জান না? জান না তো অত কথা বলা কেন? কাজের বাড়িতে, একবাড়ি কুটুম-বাটুমের মধ্যে—ছি-ছি-ছি। কী লজ্জা, কী লজ্জা। ঘরে বসেছিল, তাকে তুমি বসতে দাওনি, ঘর থেকে জোর করে তাড়িয়ে দিয়েছ, আবার বলেছ কিনা ফরাসে নাকি হিসি করে দেবে?"

—"কে কইল? আরে—সমস্ত বাজে কথা। কী কইতে কী যে কয়। বাদ দ্যাও বাদ দ্যাও। আমি তুইল্যা দিমু ক্যান? আমি তো ক্যাবল কইলাম কাসসাবাসসা গিশগিশ করতাসে, কওন তো যায় না? প্রসসার কইরা দিতে কতক্ষণ? ফরাসটা শ্যাষ কইরা দিত কি না, তুমিই কও? অ্যাকসিডেন্টালি, পোলাপানগো কথা কওন তো যায় না?"

"অ্যাকসিডেন্টালি? কৃষ্ণার ভাই ক্লাস এইটে পড়ে। সে অ্যাকসিডেন্টালি ফরাসে হিসি করে দেবে? এটা একটা কথা হলো? বেচারী কৃষ্ণা খুবই দুঃখ পেয়েছে, —তার ভাই তো আর জানে না তুমি কী বস্তু? নতুন কুটুম—ছি-ছি"—কৃষ্ণা সৌম্যর ছোট কাকীমার নাম, কাকার নতুন বিয়ে হয়েছে—এখনও বছর ঘোরেনি। মেসোমশাই সত্যিই এবার লজ্জা পেলেন বলে মনে হলে।

—"আমি কী কইরা জানুম সে ছ্যামরা কুটুমবাড়ির পোলা? সবকযডা এণ্ডাগ্যাণ্ডাই তো আসে দেহি তোমার বাপের বাড়ি থিক্যা। আমি তাই—"

—"ও, আমার বাপের বাড়ির লোক ভেবে তুলে দিয়েছিলে? এবারে বোঝা গেল।"

—"না, না, না, ঠিক তাও না—একচুয়ালি—সইত্য বলতে কি—"

এমন সময়ে বুড়োদার আবির্ভাব, তাঁর দীর্ঘদেহ নিয়ে, বাবা-মার ঠিক মধ্যস্থলে।

BanglaBook.org

দুজনের চাইতেই একমাথা ওপর থেকে বুড়োদা বললেন,—"এটা কিন্তু খুবই সেলফ কন্ট্রাডিকটরি কথাবার্তা হচ্ছে বাবা। প্রথমত, আমি স্পষ্ট শুনেছি যে তুমি বলেছিলে—" অমনি মাসিমা ফুঁপিয়ে ওঠেন—

—"দেখলি তো বুড়ো, দেখলি তো, তোর বাবা কী করেন? আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারলেন চিরটাকাল"। মায়ের কাঁধে হাত রেখে বুড়োদা সস্নেহে বলেন, —"যাক গে, বাবার কথা বাদ দাও মা, চলো, এবার তুমি খেতে না বসলে—"

খেয়েদেয়ে সবারই একটু ভারী ভারী লাগছে, কিন্তু মেসোমশাই হালকা পায়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন এ-ঘর ও-ঘর, এ-বারান্দা সে-বারান্দা। একবার আমাকে ডাকলেন —"শোনো, কুন্টু, এইদিকে শুইন্যা যাও"—কোনো জরুরী কাজ আছে ভেবে যেই কাছে গেছি মেসোমশাই আমার কানে-কানে ফিসফিস করলেন—"যে-যার বউরে। বোঝলা কুন্টু? যে-যার বউরে।" আমার মুখের বিভ্রান্ত চেহারা দেখে এইবার দয়াবশে উক্তিটি প্রাঞ্জল করে দেন—"মেজো-ভাগরাও তার গাড়িটা দিসে, আরও একটা গাড়ি আমি বেইন্ট করসি। চিনুর মামাগুলা, সব শালারা ওই গাড়ি করিয়া যে-যার বউরে আনাইতাসে। এভেরিওয়ান ব্রিংগিং হিজ ঔন ওয়াইফ। য্যাম্ ওই জন্যই দ্যাশে কার-রেন্টাল-সিস্টেমটা চালু আছে। যত সব সেলফ-সেন্টার্ড ঘটি।"

এমন সময়ে সুন্দরী, সুবেশা, মোটাসোটা, এক মধ্যবয়সিনী, ঘামতে ঘামতে এসে ধপ করে চেয়ারে এলিয়ে পড়ে আহ্লাদে-গদগদ বললেন—"উঃ, বড্ড চা-তেষ্টা পাচ্ছে কিন্তু, জামাইবাবু!" সাধারণত সুন্দরী শ্যালিকার প্রতি ভগ্নীপতির যে মনোভাব থাকার কথা, এক্ষেত্রে তার ঘনঘোর ব্যতিক্রম দেখা গেল। মেসোমশাই গম্ভীর স্বরে বললেন—"ঠাকুরগুলিরে আর অহন আপসেট কইরা কাজ নাই, পয়সা দিতাসি, এই লও"—বলতে বলতে প্যান্টের পকেট থেকে একটি চকচকে আধুলি বের করে অন্তত তিন ছেলের মা, সম্ভ্রান্ত মহিলাটির দিকে বাড়িয়ে ধরলেন—"রাস্তা থিক্যা চা খাইয়া আস গিয়া। বেশিদূরে না। বাইরাইলেই দ্যাখবা ফুটপাতে সার সার চায়ের স্টল। সার সার। সার সার।" মহিলা মুখের অবর্ণনীয় অভিব্যক্তি দেখেই তাড়াতাড়ি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমার হাত এগিয়ে গিয়ে আধুলিটা নিয়ে নেয়। নিলে কী হবে? খপ করে আমার হাতটি ধরে ফেলেছেন মেসোমশাই।—"কুন্টু, তুমি নিলা ক্যান? তোমারে তো দেই নাই? চা-টা খাইতে চায় মলিনা। মলিনার লগে দিসি।" আমি তাড়াতাড়ি ব্যাখ্যা করি। পয়সাটা আমি মেরে দিচ্ছিলাম না, নিচ্ছি ঐ মহিলার জন্য চা এনে দেব বলেই। উনি কী করে মিছিমিছি নিজে কষ্ট করে...ইত্যাদি। মেসোমশাই তৎক্ষণাৎ এক্সট্রীমলি আনন্দিত হয়ে উঠলেন—"খাড়াও, ইউ আর আ গুড বয়, কুন্টু। ভেরি কনসিডারেট। আরও দশ-পয়সা লইয়া যাও, দুই খুরি চা নিবা, তোমাগো একটা, অগো একটা। আর আমার লগেও একটা আইন্যা দিও।" এবার মলিনা মাসিমা হেসে ফেলেন।

—"আপনার আর আমার কি একটা খুরি থেকেই ভাগাভাগি? জামাইবাবু?" লজ্জা পেয়ে মেসোমশাই বলেন—"ওঃ হো, তিনজনার তিন খুরি চা! থ্রি কাপস।"

বুড়োদা তখন ওদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন—"কী, চা আনা হচ্ছে নাকি" বলে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর বেখাদি, তারপর সৌম্য, তারপর শিবু—শেষকালে একটা বড় কেটলি আর তিন টাকা নিয়ে আর আমি বেরুলাম। ফিরে দেখি অপরাধী-অপরাধী মুখ করে মেসোমশাই বসে বসে চা খাচ্ছেন, সুন্দরী শ্যালিকাকে সঙ্গে নিয়ে। ঠাকুরবাই চা বানিয়ে ট্রে ভরে ভরে পাঠাচ্ছে। মেসোমশাই যারপরনাই লজ্জিত। কেটলিসমেত আমাদের দেখে বললেন—"ব্যাইখ্যা দ্যাও বাইখ্যা দাও। কাজে লাগবোই—পরে গরম কইরা খাইলেই হইবো। কি কও, মলিনা?" মলিনা মাসিমা কেবল হাসতে থাকেন। বিয়ে বাড়িতে আর কে কবে মনে করে তিন টাকার ফুটপাতে কেনা চা গরম করে খায়?

ইতিমধ্যে দেশবিখ্যাত রূপচর্চা-বিশারদ গোপকুমার এসে গেছেন, শুধু চুল বাঁধতেই যিনি পাঁচশো টাকা নেন—(এই সঙ্গে বাঁধতে বললে কত নিতেন কে জানে) এঁর আসাটা মেসোমশাই পছন্দ করেননি। তাই গলা তুলে বললেন—"আমাগো টাইমে তো মা-মাসিরাই চুল বাঁইধ্যা দিত। কিন্তু চিনুর মা তো তা দিবে না। অলস। তাই ফাইব হানড্রেড রুপিজ জলে ফ্যালাইল।" মাসিমা ধারে কাছেই ছিলেন। হৈ-হৈ করে এসে পড়লেন—"কে বললে আমি চুল বাঁধতে পারি না? তোমার ভায়েদের বৌভাতে কে বৌ সাজিয়েছিল? আমার ননদদের বিয়েতে কোন ভাড়াটে লোক এসে চুল বেঁধেছে, শুনি? এটা আলাদা। এ হলো চিনুর একটা স্পেশাল শখ। তা, এর খরচাও তো তোমার নয়, ওটা দিয়েছে আমার ভাই। তোমার তাতে এত গা জ্বালা কিসের?"

—"আরে—যে-হালায়ই দিক না ক্যান ওটা কোনো কথাই না। কথাটা হইলো ওয়েইস্টেজের। ওই পাঁচশত টাকা দিয়া তোমার আমার দুইজনারই চন্দন কাঠের চিতা হইতে পারতো জান?" কোত্থেকে বুড়োদার উদয়। পুনরায় ব্যাফলওয়ালের মতো মাসিমাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বললেন—"খুবই ইললজিকাল কথা বললে কিন্তু বাবা। যদিও সাজসজ্জায় একবারে পাঁচশো টাকা খরচ করাটা মর‍্যালি সাপোর্ট করি না, তবু আমি মনে করি, একজন জীবিত ব্যক্তির মনস্তুষ্টির জন্য পাঁচশো টাকা খরচ করাটা অনেক বেশি ওয়ার্থ হোয়াইল এক মৃতদেহের পিছনে ঐ অর্থ ব্যয় করার চাইতে। তাছাড়া যখন পনেরো টাকাতেই বৈদ্যুতিক চুল্লীতে সিভিলাইজড উপায়ে একটা—"

—"পনেরো আর নাই রে বুড়া, হেই দিনকাল নাই। এই বাপেরে পুড়াইতে তোমার কিন্তু চল্লিশ টাকা লাগবো। আর তোমার মায়ের বেলায় নির্ঘাত আরো বেশি, বাই দেন অন্তত পঞ্চাশ-ষাট তো বটেই"—এবার মাসিমা খুবই মুষড়ে পড়েন। —"ভালো! বাপব্যাটায় মিলে তোমরা আমার চিতার হিসেবটাই করো তাহলে আজকের দিনে"—মেসোমশাই পলকে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করেন—"তোমাগো লেইগ্যাই তো এই কমপ্লিকেশন শুরু। ও গোকুলচন্দ্ররে আনলো কেডা? তোমাগো বড়লোক বাপের

বাড়ি থিক্যাই তো"— বুড়োদা আবার শুধরে দেন—"গোকুলচন্দ্র না বাবা, গোপকুমার।"

—"ওই একই হইল, যিনিই গোকুলচন্দ্র তিনিই হইলেন গোপকুমার, কোনো ডিফারেন্স নাই"—

—"না, ডিফারেন্স তোমার কিছুতেই কি আছে, কেবল আমার বেলায় ভিন্ন। মুড়ি-মিছরি তোমার কাছে একদর—যত যন্ত্রণা সবই কেবল এই একটি জায়গায়" —বেগতিক বুঝে আমি বুড়োদার দাওয়াইটা অ্যাপ্লাই করি।

"মাসিমা, চিনুদি বোধহয় আপনাকে ডাকছিলেন।" কী কুক্ষণেই যে বললাম। বলবামাত্র মাসিমা দৌড়ে ও ঘরে যান এবং ততোধিক দৌড়ে প্রত্যাবর্তন করেন। বরং দেহি মূর্তিতে।

—"তোমাকে কে বলেছিল শত্রুতা করে মেয়েটাকে এক্ষুনি হরলিক্স, আর দই গেলাতে? কেন খাইয়েছ? কেন ওর অতো দামী বেনারসীতে দই ফেলে দিলে তুমি? অত কষ্টের সাজগোজ নষ্ট করে দিয়েছ, কিসের জন্যে? কে বলেছিল তোমাকে? কে?"

চিবুক উঁচু করে প্যান্টের দু' পকেটে দুই হাত গুঁজে মাস্তান ভঙ্গিতে একটু ব্যাঁকা হয়ে দাঁড়ান মেসোমশাই। চেহারার মধ্যেই ডিক্টেটর ভাবটা সুস্পষ্ট। যেন ফাঁসির মঞ্চে সূর্য সেন।

—"কইবো আর কেডা? আপন গর্ভধারিণী জননী যারে দেখে না, হিউজ নেগলেক্ট করে, তারে দেখবো তো বাপেই।" ব্যাপার কী? না পাঁচশো টাকার সাজসজ্জা কমপ্লিট হয়ে যাবার পরে, অহেতুক স্নেহ-প্লাবিত হয়ে মেসোমশাই চিনুদিকে জোর করে হরলিক্স আর দই খাইয়ে এসেছেন নিজের হাতে। ফলে সেই সব সমুদ্রপারবর্তী অমূল্য কিসপ্রুফ লিফস্টিক, লিপগ্লস, লিপশাইনার, লিপ-লাইনার ইত্যাদি স্রেফ লেহ্য পেয় হয়ে গিয়ে, করে সর্বস্বান্ত। ওষ্ঠাধরে এখন প্রধানত যাদবের দই লেগে আছে। হৃদয় হা হা করে উঠলেও বেচারা চিনুদি একঘর কুটুম্বের সামনে বাপের অবাধ্য হতে পারেনি।

—"এই হরলিক্স আর দইটুক এট্টু খাইয়া লও মা জননী, এ হইল গিয়া রোগীর পইথ্য, উপবাসের মধ্যে খাইলে দোষ হয় না। আহা, মাইগাডার মুকখানি শুকাইয়া এই এত্তোটুক যে!" ফলে চিনুদির মুখ আরো বেশি শুকিয়ে খুবই করুণ হয়ে গেল। কিন্তু পিতার সেন্টিমেন্টাল অ্যাকশনে বাধা দেয়, এমন বুকের পাটা কোনো আত্মীয়ের ছিল না। যদিও প্রত্যেকেই পাঁচশো টাকার প্রসাধন অংশত খেয়ে ফেলা নিয়ে যৎপরোনাস্তি উদ্বেগে ভুগছিলেন। চিনুদির অসীম সহ্য। বুক ফাটলেও চোখ ফাটেনি—কেননা তাতে নয়নের টিয়ার প্রুফ-মাস্কারা এবং কপোলের ফিয়ারপ্রুফ 'ব্লাশার' পেইন্টও ধুয়ে যেতে পারতো, কে জানে? খাওয়াবার সময় এক চামচ দই আবার কনের কোলে পড়ে গিয়েছে। পড়বামাত্র মেসোমশাই সেখানে একমগ জল এনে মুছেছেন। ফলে এখন কনের কোলের কাছে লাল বেনারসীর বেশ খানিকটা

BanglaBook.org

অংশ বং পালটে ঘোরতর খয়েরি এবং জরিটরি ভিজে ভারি হয়ে উঠেছে। চিনুদি ঠোঁট ফুলিয়ে সেইখানটা অনবরত ফুলের মালা দিয়ে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করছে। এই অবস্থায় আমি কেটে পড়াই ভাল মনে করি।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে, সৌম্য আর আমি একটা ঘরে ঢুকে সিগারেট খাচ্ছি। চারদিকে এত ফ্রি সিগারেট অথচ এমনই গুরুজনদের ভিড় যে না-লুকিয়ে খাওয়াটা সম্ভবই হচ্ছে না। হঠাৎ সেই ঘরেই মেসোমশাইয়ের প্রবেশ।—"কন্টু তুমি না ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার?" ভাগ্যিস আমার সিগারেটটা ততক্ষণে শেষ। "এখনও ফাইন্যাল পরীক্ষা হয়নি মেসোমশায়।"

—"ঐ হইল গিয়া একই কথা। বিয়াতো এখনও হয় নাই, তবুও তো চিনু অহনই কনেবউ। তুমি হইলা গিয়া কনে-এঞ্জিনিয়ার। বোঝলা? ইলেকট্রিকাল অ্যাপ্লায়েন্সগুলি তো বুঝ? রেকর্ড প্লেয়ারে তুমিই বস গিয়া। যাও। যত আনট্রেইনড লে ম্যানগো হাতে পইরা মেশিনটা শ্যাষ হইয়া যায় আর কি। ঘটির ভোল্টেজ-টেশিনের সারজেক্টটাই বুঝে না,—ব্রেইনটা ডাল তো?" সৌম্যর মামাতো ভাইবোনেরা যে সারাদিন রেকর্ডপ্লেয়ারে শানাই লাগাচ্ছে, এটা এই মাত্র মেসোমশায়ের খেয়াল হয়েছে। —"আর শুন—বি কেয়ার-ফুল, রেকর্ড দুইখান অলটারনেইটলি লাগাইবা। অলটারনেইটলি, অর্থাৎ একবার এইটা, আরেকবার ওইটা। বোঝলা তো? সৌম্য কই?" —সৌম্য তখন দরজার পিছনে মেঝেয় ঘষে ঘষে সিগারেট নেভাতে দারুণ ব্যস্ত। ঘরময় ফরাসপাতা অথচ অ্যাশট্রে নেই। ফরাসে ছাই যাতে না পড়ে তাই অতি-সতর্কতা অবলম্বন করেছি। ঘরের এককোণে ঢুকে একফালি ফাঁকা মেঝেয় ছাই ঝাড়া হচ্ছিল। কিন্তু মেসোমশাইয়ের চোখকে ফাঁকি দেবে কে?—"ঐ ধারে ধোঁয়ার মতন দেখতাসি না? ওহানে কেডা? সৌম্য নাকি?" সৌম্য কাশল। —'হুঃ। ঘরময় ছাই ঝারতাসো। অ্যাঁ? চাদরটা ময়লা করতাসো। অ্যাঁ, কামের বেলায় দেখা নাই, ক্যাবলই আকামা কামের রাজা?" বলতে বলতেই মেসোমশাইয়ের সবেগে নিষ্ক্রমণ এবং পরমুহূর্তেই কোত্থেকে একটি স্বাস্থ্যবান নতুন মুড়োঝাঁটা হাতে পুনঃপ্রবেশ।—"ছিঃ ছিঃ, যতত ছাইভস্ম ঝাইরা পরিষ্কার-ঘরটাকে দিল শ্যাষ কইরা" —গজরাতে গজরাতে তিনি ঝাঁটা বুলিয়ে বুলিয়ে ধবধবে ফরাস থেকে কাল্পনিক ছাই ঝাড়তে থাকেন। মেসোমশায়ের নিজের পায়ে অবশ্য যথেষ্টই ময়লা ছিলো। ফরসা চাদরে সেই ময়লা পায়ের ছাপ পড়তে লাগলো, অম্লান বরফে ইয়েতির পদচিহ্নের মতো। আপ্রাণ চেষ্টাতেও ঝাঁট দেওয়ার পুণ্যকর্ম থেকে মেশোমশাইকে নিবৃত্ত করতে পারা গেল না। ফরাসটাকেও পরিচ্ছন্ন রাখা গেল না।

ইতিমধ্যে একসঙ্গে অনেকগুলো গাড়ির হর্ন শোনা গেল, গেটে শাঁখ বেজে উঠলো, হুলুধ্বনি হলো। অমনি, "—দেয়ার! দি বরযাত্র! দি বরযাত্র ফাইনালি অ্যারাইভড!!!" বলে চীৎকার করে উঠে মেসোমশাই ঝাঁটা হাতেই দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন। পেছনে

পেছন আতঙ্কিত সৌম্য আর আমি—"বাবা! ঝাঁটা! ঝাঁটা!" "মেসোমশাই, ঝাঁটা! ঝাঁটা!" বলতে বলতে ছুটি, কিন্তু সমবেত গোলমালে আমাদের কাতর আকুতি ডুবে যায়। কে কার কথা শোনে। মুহূর্তের মধ্যে হাস্যবদন প্রফুল্যকান্তি মেসোমশাই মুড়ো ঝাঁটা হাতে বরযাত্রী অভ্যর্থনায় সদর গেটে বেড়ি। এই ক্রিটিকাল মোমেন্টে মিতুন, সৌম্যর ছোট বোন ছুটে এসে বাবার হাত থেকে ঝাঁটা কেড়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল, এবং মেসোমশাইকে চাপা গলায় একটি ধমক লাগালো।

অমনি তাঁর মুখের হাজার পাওয়ারের হাসিটি দপ করে নিভে যায়, এবং মুড-মেজাজ খুবই খারাপ হয়ে যায়। মেসোমশাই এবার হাত জোড় করে, বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে, ঠিক শ্রাদ্ধসভার কর্মকর্তার মতো দাঁড়ান। গাড়ি থেকে বরযাত্রীরা নামতে শুরু করে। মেসোমশাই গম্ভীর। নির্বাক। জোড়হস্ত। শাড়িপরা, সুন্দরী মিতুন আর তার একটি কিশোরী বান্ধবী রেলফুলের মালা আর একটি করে গোলাপ বরযাত্রীদের উপহার দিচ্ছে। একটি মিষ্টি হাসি সমেত। স্মিতহাস্য সুদর্শন এক যুবক মিতুনকে নিচুগলায় কী যেন বলতেই, লজ্জায় লাল হয়ে মালা না দিয়ে মিতুন তাকে দুটি গোলাপফুল দিয়ে ফেলে। তৎক্ষণাৎ মেসোমশায়ের মুখ খুলে যায়।

—"দুইটা কইর‍্যা গোলাপফুল কারেও দিবা না, মিতুন। সব একটা একটা, ওয়ান ঈচ। বোঝলা? মালা দ্যাও।"

সপ্রতিভ যুবকটি বলে—"আমিও তো ঠিক তাই বলেছিলাম, মালা দিতেই তো বলছিলাম। উনি কিন্তু দিলেন না—" এবার মেসোমশাই ছোকরাটির দিকে ঘুরে দাঁড়ান। ব্যালে ডান্সের পিরুয়েৎ করার ভঙ্গিতে। এক মুহূর্ত রক্ত জলকরা চাউনি, তারপর বললেন—"আপনের এট্টু মিসটেইক হইয়া গেসে না? আইজ তো আপনের মালা পাওনের ডেইট না? আপনের ফ্রেইণ্ডের।" তারপরে—"মিতুন, অমন যারে-তারে মালা দিবানা এই কইয়া দিলাম, হউক সে বরযাত্র, যত সব ফাজিল ছ্যামরা।" কুটুম্ব যুবকটি বিড়ম্বিত, মিতুন লজ্জিত, আমরা উদ্বিগ্ন, সৌম্য তাড়াতাড়ি গিয়ে ছেলেটির ক্রোধে ফুলন্ত পিঠে সৌভ্রাত্রের হাত রাখে এবং ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক ভিতরে নিয়ে যায় এবং অচিরেই অকুস্থলে বুড়োদার অভ্যুদয় ঘটে।

—"আবার তুমি কন্ট্রাডিকটারি কথাবার্তা বলছো বাবা? এই তুমি নিজেই বললে মালা দাও—মালা দাও, আবার এই বলছো মালা দিও না—মালা দিও না। মিতুন তা এতে একদম কনফিউজড হয়ে যাবে।"

মেসোমশাই চোখ তুলে মনুমেন্টের মতো উঁচু মধ্যপ্রাচ্যপ্রবাসী পুত্রের মুখের দিকে তাকান। তারপর তার বুকের গোলাপফুলটির দিকে। তারপর বলেন—"মিতুন, তোমার দাদার বুকের থিক্যা ওই গোলাপটা খুইল্যা লও তো দেহি। যত ওয়েইস্টেজ।" ইতিমধ্যে বর-বরণ করতে কুলো-ডালা-শ্রী সমেত মাসিমাও গেটে উপস্থিত। চওড়া জবির দাঁতওয়ালা টুকটুকে লালপাড় দুধে-গরদের ঘোমটার নিচে তাঁর গোলগাল ফর্সা মুখখানি আধোখুশিতে, আধো কান্নাতে, উদ্বেগ উত্তেজনায় আশ্চর্য রঙীন।

মাসিমার মুখের সেই লালচে আভার দিকে খানিক স্থির চোখে তাকালেন মেসোমশাই। তারপর বললেন—

—"মিতুন, বুড়ার বুকের থিক্যা গোলাপফুলটা খুইল্যা লইয়া তোমার মায়েব খোপায় গুইজ্যা দাও তো দেহি!"

সেই মুহূর্তেই বর নিয়ে ঢুকলেন বরের পিসেমশাই। যিনি মেসোমশায়ের অফিসের ইনকামট্যাক্স অডিটার। চেনামুখটি দেখতে পেয়ে অকূলে কূল পাবাব মতো পরম উল্লসিত মেসোমশাই বরেব দিকে দৃকপাত মাত্র না করে ববের পিসেকে জড়িয়ে ধরে বললেন—"আবে—আসেন স্যার—আসেন, আইজ তো আপনেরই দিন!" উলু এবং শঙ্খধ্বনিতে মেসোমশাযের মহৎ উল্লাস চাপা পডলো।

বরপক্ষ বড্ড বেশি ধনী। মেসোমশাই সেই কারণে একটু উদ্বিগ্ন। কিন্তু সেটা প্রকাশ কবা চলছে না। কেননা বাড়িব আর সকলেই খুশি। বড়লোক হলেই বা। তাবা লোক খারাপ নয। একেবাবে কিচ্ছু চাযনি। "হ্যাঁ, একটা বিয়েব মতো বিযে কবেছে বটে চিনু! প্রেম তো কত লোকেই করে। বলতে গেলে প্রায প্রত্যেকেই করে। কিন্তু এমন একটা বিযে ক'জনে পায়?"—অতএব বালিগঞ্জে ভাল পাড়ায বিয়েবাড়ি ভাডা নিয়ে, টুনিবালবেব ঝর্ণাধাবায আর টাটকা ফুলের তৈবি বাজকীয তোরণে বাজীমাৎ কবে বাড়ি সাজানো হযেছে। এই শখ, এবং খবচ সব বুড়োদাব। কিন্তু এই এলাহি ব্যাপারটা মেসোমশাই একদম পছন্দ কবছেন না। তাঁব ইচ্ছে ছিল গড়িযায তাঁর "নিজ বাসভবনে" ছাদে প্যাণ্ডেল বেঁধে যেমনভাবে সেদিনও তাঁর ছোটভাযেব বিযে হলো, তেমনি করেই মেয়ের বিয়ে দেন। "চিনুব বিয়ে" বলতে যে স্বপ্নটা তিনি চিবদিন দেখে এসেছেন তার সঙ্গে এসব কাণ্ডকারখানা ঠিকঠাক কিছুই মিলছে না। আজকের এই বিয়েবাড়ি তাঁব যেন নেহাত অচেনা। এর মধ্যে তাঁব ভূমিকাটা কোথায়? পাত্রও তাঁকে খুঁজতে হযনি, চিনু নিজেই খুঁজে পেয়েছে। পণও নিচ্ছে না তাবা একটি পয়সা, খাটবিছানা, দানসামগ্রী কিছুই নেবে না, বাখবাব জাযগা হবে না নাকি তাদেব। সবই আছে। কেবল নমস্কাবী কাপড তিপ্পান্ন পীস, আর আশীর্বাদে বরেব একসেট হীরের বোতাম হলেই হবে বলেছিল —নইলে নেহাত আত্মীয়দেব কাছে পাত্রেব মুখ থাকে না, তাই। তাই সেই বোতামটা ছেঁটে ফেলে একটা হীবেব আংটিতে বফা করে নিয়েছে চিনুই। (চিনুর মতো কনসিডাবেট মাইযা ওয়ার্ল্ডে কযজনাব হয?) কিন্তু এতেই মেসোমশায়ের গচ্ছিত প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড উঠে গেছে, বন্ধুদেব কাছে ধার হয়েছে। এখনও মিতুনেব বিযে বাকি, সৌম্যর ডাক্তাবি পডা শেষ হয়নি। অথচ পাঁচশো টাকার খোঁপা, চাব হাজাবের ফুল এবং আলো (সে যে-হালায়ই দিউক না ক্যান), মেসোমশাইয়ের মাথার মধ্যে কেবলই এগুলো ঘুবে ঘুরে যাচ্ছে। সুতবাং বরযাত্রীরা যেই সভা-সাজানোর প্রশংসা কবেছে, অমনি মেসোমশাই বলে ওঠেন—"তাইলে শোনেন স্যার, অই যে টুনিবালব

BanglaBook.org

আব ফুলের গেইট, তার দ্বারা কিন্তু বিয়াডা হয় নাই। তার জন্য প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড উঠাইতে হয় নাই। হ্যাঁ, মন্দ কি আর? ফেন্সী ব্যাপার, লাইট, ফ্লাওয়ার, এ সকল তো ভালই। ঐ যে বাইবেলে কয় না, 'লেট হানড্রেড ফ্লাওয়ার্স ব্লুম'—লেট দেয়াব বি লাইট?"—সকলই সইত্য। কিন্তু পার্সে কুলাইলে তবে তো? মাও সে-তুং যে কইসেন না, চাইনিজ পিপলদের লগে—'কাট ইওব কোট একর্ডিং টু ইওব ক্লথ? আমিও তাই কই। খাঁটি কথা।"

বরযাত্রীবা মেসোমশাযেব পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্য শুনে বাকশক্তিরহিত হয়ে পড়েন। আমি কী কবে যে ওঁকে সবিযে নেব, ভেবে পাই না। এর পব মেসোমশাই উদাস দার্শনিককণ্ঠে বলেন—"এইজন্যই তো ঠাকুর কইসেন—সর্বদা সমানে সমানে কাজ কবা উচিত। পূর্ববাংলায আমাগো এক প্রবচন আছে—উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমেব সাথে, যিনিই মধ্যম তিনি চলেন তফাতে। আমবা হইতাসি গিযা সেই মধ্যম। বোঝলেন?" বরযাত্রীরা গম্ভীব হযে পডলেন। তাঁবা ঠিক বুঝতে পারলেন না, তাঁদেব উত্তম বলা হচ্ছে, না অধম বলা হচ্ছে। কিন্তু মেসোমশাযের হাতে কোনো উত্তাপ নেই। এবার তিনি—"এক্সকিউজ মী, আমি একটু বিফ্রেশমেণ্টের দিকটা দেযখ্যা আসি" বলে উঠে গেলেন।

আসলে বরযাত্রীদেব সঙ্গে কন্যাকর্তাব বাক্যালাপ ব্যাপাবটাব সঘন সামাজিক গাম্ভীর্য বিষযে মেসোমশাই পর্যন্ত সচেতন এবং সেই কারণেই নার্ভাস হযে পডলে কেউ কেউ যেমন তোৎলা হযে যায় মেসোমশাই তেমনি নিজের কথা খুঁজে পান না। কেবলই কোট কবতে থাকেন। কিন্তু কোটেশনেব উৎসগুলো তখন সব গোলমাল হযে যায। কোনটা প্রবাদ কোনটা মাও সে-তুং কোনটা বাইবেল কোনটা ববীন্দ্রনাথ, সে সমস্তই তখন ইমমেটিরিযাল হযে যায় ওঁর কাছে। এই যেমন বিযেব আগের দিনের দুপুববেলা গডিযাব বাডিতে। বিযেবাড়িব হট্টগোলে বাডিব কুকুরটি ভীষণ ঘাবড়ে গিযে এনতাব তাডা কবেছিল লোকজনকে। তাডা খেযে বাচ্চা চাকব কেঁদে ফেলেছে। মেসোমশাই তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত। উদ্বিগ্ন।

—"কী হইসেটা কী?"

—"কুকুবঅ কামড়াইথিলা।"

—"একচুয়ালি কামড দিসে কি?"

—"না, কিন্তু—"

—"না, তবে কানসিলা ক্যান"?

—"মোর নতুন নুগা ছিডি দিলা।"

—"ঈশশ—।" দুমিনিট—লুঙ্গিব জন্য মৌন শোক। তাবপব—

—"তুই অবে উল্টাইযা মাবলি না ক্যান?"

—"বাবু আপনি মতে মনা কবিথিলে। কহিথিলে কুকুরকু মাবিলে মোব গোডঅ ভাঙ্গি দিবে—"

—"আরে থো—। আমি হেইটা কইসিলাম তুই অরে মিছামিছি খ্যাপাইতিস বইল্যা। কিন্তু ফোঁস কবতে তো মানা কবি নাই?"

—"ফোঁস? ফোঁস কঁড় বাবু?"

—"আবে হেইটাও শোনস নাই? লাঠিব ঘায়ে মব মর সাপটারে দেইখ্যা সেই যে গান্ধীজী কইসিলেন—আরে, তোবে কামড় দিতে মানা কবছিলাম, কিন্তু ফোঁস করতে তো মানা কবি নাই? মহাত্মাজীর সব থিক্যা ভেলুয়েবল অ্যাডভাইজ হইল এইটা। সর্বদা স্মরণে বাখবা। বোঝলা?"

তক্ষুনি বুড়োদা বললেন,—"বাবা, ওটা কিন্তু মোটেই গান্ধীজী বলেননি, ওটা তো বামকৃষ্ণেব কথা।" মেসোমশাইও ত্ববিতে জবাব দেন,—"আঃ—কথাটা যে হালায়ই কউক না ক্যান, কইসে তো? গ্রেট মেন থিংক এলাইক।"

বরযাত্রীদেব কাছে ছুটি নিযে মেসোমশাই বললেন,—"চল রুন্টু, ঠাকুরগো কামকাজ একটু ইন্সপেক্ট কইবা আসি?" হালুইকবদেব কাছে উপস্থিত হয়ে যেই কন্যাকর্তাব উপযুক্ত জলদগম্ভীর স্ববে গলা খাঁকাবি দিযে—"মাছ ভাজাটা হইল কেমনি? দ্যাখাও তো দেহি—" বলা, অমনি বামুনেব সাফ জবাব—"এখন ওসব হবে না। ফালতু ঝামেলা কববেন না। হ্যাঁ। শুনলে বাবু কিন্তু রাগ কববেন" রান্না-বান্নার চার্জে আছেন সৌম্যব সেজকাকা। মোটাসোটা, কর্মঠ, ভুঁড়িতে তোযালে বেঁধে উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন, সব চুল সাদা। মেসোমশায়ের একটি চুলেও পাক ধরেনি, নেহাত ছোকরা-চেহাবা, পরনে স্কুলের ইউনিফর্মেব মতো হাতপুরো সাদা শার্ট সাদা জিনের প্যান্টে গুঁজে পরা। উদ্বেগেব চিহ্নমাত্র নেই মুখে। (ধুতি পাঞ্জাবি কন্যাকর্তাকে কিছুতেই পবানো যায়নি। ধুতি খুলে গিয়ে কেলেংকারি হবাব ভয়ে। অবশ্য মুখে বলেন—ধুতি নাকি বিধবা মেয়েদের ড্রেস, পুরুষমানুষের পোশাকই নয় মোটে!) হালুইকব ঠাকুব জানে সব বিযেবাড়িতে ঢের ফালতু মাস্তান থাকে, তাদের প্রশ্রয দিতে নেই। সে তো আব মেসোমশাইকে দেখেনি, চেনেও না। মেসোমশাই কিন্তু সত্যি বেগে গেলেন।—"দুলু। দুলু।" সেই কণ্ঠস্ববে সেজকাকা আক্ষরিক অর্থে দৌড়ে এলেন—

—"কী? হইল কী মেজদা?"

—এই বাস্কেলটাবে ক্যান বসাইছস? এ বাস্কেল আমারে বাবু দ্যাখাইতাসে, আবাব কয কিনা ফালতু ঝামেলা কববেন না। আমাগো মাইয়াব বিযা, আব আমারেই কয় কিনা 'ফালতু'? গেট আউট। গেট আউট। অহনই আমি অন্য ঠাকুর ডাইক্যা আনতাসি। আমাগো গড়িযায শয়ে-শয়ে হালুইকর পথে পথে ঘুবতাসে।" ঠাকুবটি অতি চালু পার্টি। মুহূর্তেই বুঝে ফেলেছে ব্যাপাবটার তাৎপর্য—বিশাল এক লুচিভাজা ঝাঁঝরি হাতেই দৌড়ে এল তক্ষুনি, পেছু পেছু দৌড়ালো তার যোগাড়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট, দু' হাতের অঞ্জলিতে কলা পাতায় মুড়ে একডজন মাছভাজাব গরম গরম নৈবেদ্য নিয়ে।—"এবারকাব মতো মাপ কবে দিন বড়বাবু। অপরাধ হয়ে গেছে। আপনারই

মাছের পীস রক্ষা করছিলাম আমি। বিয়েবাড়িতে কত ফালতু লোকও তো থাকে" —আবার সেই শব্দ—ফালতু? মেসোমশায়ের রাগ কমল না। মাছ ছুঁলেন না। স্তব্ধ। আস্তে করে দুলুবাবু ঠাকুরদের প্রম্পট করলেন—"আরেকবার।" এবার দুই ঠাকুর গলা মিলিয়ে কোরাসে বারবার আকুল হয়ে মাপ চাইতে লাগলো এবং মেসোমশাইকে মাছভাজা খাওয়ার জন্য কাকুতি মিনতি করতে লাগলো। তখন ওদের ক্ষমা করে দিয়ে মেসোমশাই নিজে দয়া করে খানছয়েক খেলেন, আমাকেও গুনে গুনে ছখানাই খাওয়ালেন এবং—"দুলুরে, অ দুলু। শোনো, তুমিও অহনই খাইয়া লইও খানকয় মাছভাজা, ভাল পীস আর কিন্তু পরে পাইবা না। বলে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে চলে যেতে যেতে বলেন—"হাঃ, আমার মাছের পীস রক্ষা করে কে? না হালুইকর ঠাকুর। যেই না poaecher সেই হইল গিয়া gamekeeper, হাঃ!" তারপরেই মনে পড়ে গেল—"আহা, চিনুর মা-ডারেও দুইখান গরম মাছভাজা খাওয়াইলে হইতো।" যেমনি মনে পড়া অমনি কাজ—"কন্টু, শোনো, রান্নাঘরে আমি যামু না, তুমিই যাও।" দুলুর থিক্যা দু'খান মাছভাজা চাইয়া লও, নিয়া তোমার মাসিমারে খাওয়াও গা যাও। কইবা, আমি পাঠাইসি। বোঝলা? না খাওয়াইয়া আসবা না কিন্তু! ঠিক যেইডা আমি দেখি না হেই দিকের টোটাল কনফিউশন। আরে, চিনুর মায়েরে যে মোটেই মাঝভাজা খাওয়ানো হয় নাই, হেইটাই বা দ্যাখে কে? যাও, যাও—" বলতে বলতে উনি দ্রুত লোক-খাওয়ানোর দিকটায় চলে গেলেন। আমি ছুটি মাসিমার জন্য মাছ-ভাজার ব্যবস্থা করতে। মাসিমা তো প্রথমে হাসলেন, তারপর এক ধমক দিলেন, মোটেই মাছভাজা খেলেন না। সেই ব্যর্থ দৌত্যের পরে পুনরায় মেসোমশায়ের খোঁজে খাবার জায়গায় এসে দেখি চপ দেওয়া হচ্ছে। বরযাত্রীরা খেতে বসেছে। মেসোমশাই সৌম্যকে বলছেন—"বড়দের দুইটা কইবা, ছোটদের একটা। না চাইলে একদম বিপিট কইরো না। ওয়েইস্ট য্যান হয় না। বোঝলা?" এসব সংশিক্ষা রান্নাঘর থেকেই পই-পই করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটি পরিবেশককে। কিন্তু মেসোমশাইকে চুপ করানোর প্রয়াস বৃথা। কানে কানে শেষটা ("এটা কিন্তু বরযাত্রীদের ব্যাচ, মেসোমশাই") বলে দিতেও তিনি ঘাবড়ালেন না।

—"আরেঃ, ভয় হইসেডা কী? হউক না বরযাত্র, ওনারা তো আর পর না? আমার চিনুরই ঘরের মানুষজন—ওনারা শোনলেই বা দোষটা কোথায়? ওয়েইস্টিং ফুড ইজ আ ক্রাইম ইন ইনডিয়া—কী কন বেহাইমশায়?" বলে, যে শুক্লকেশ শুভ্রবাস কাঁধে মুগার চাদর ভদ্রলোকের দিকে সপ্রেম দৃষ্টিক্ষেপ করেন মেসোমশাই —তাঁকে দৃশ্যত যে-কোনো বিবাহেই বরকর্তার ভূমিকায় মানাতো বটে কিন্তু আজ এখানে তিনি মোটে বরযাত্রীই নন, চিনুদির কলেজের প্রফেসর। 'বেহাই'— এই অনর্জিত প্রিয়সম্বোধনে বিব্রত প্রফেসর গুপ্ত হ্যাঁ-না দুইই হয়, এমন একটি হাসি দিলেন। ফলে, যথেষ্ট কুটুম্ব-কর্তব্য হয়েছে মনে করে, হৃষ্টচিত্তে মেসোমশাই বরযাত্রীদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে নিচে নেমে আসেন।

BanglaBook.org

নেমেই অফিসের এক সহকর্মী বন্ধুর সঙ্গে মুখোমুখি। আর অমনি —'খুলিল হৃদয়দ্বার খুলিল!'

—"বাঃ। সুধীরচন্দ্র যে আইস্যা পড়সো তাইলে? শেষমেষ পৌসাইলা? যাক। তা-রপব? নিউজ কী? আইজ অফিসে গেসিলা? আমি তো এক্কেরে প্রিজনাব হইয়া আছি। মাইয়ার বিবাহ কি য্যামন ত্যামন ব্যাপাব? ওহ।" বলতে বলতে বেশ মৌজ করে মেসোমশাই বরযাত্রীদের ছেড়ে-যাওয়া একটা গদি আঁটা সোফায় জমিয়ে বসে হাঁক পাড়েন —"কই পানসিগ্রেটের ট্রেটা গেল কই?" ট্রেসহ একটি ছেলে এগিয়ে আসতেই, আবার—"কোকাকোলার চাবিটা কার কাছে?" এবার চাবিসহ আবেকজন সবিনয়ে উপস্থিত হয়। "একটার বেশি কারেও দিবা না। আর তাও ক্যাবল ববযাত্র। ভেরি এক্সপেনসিভ হইযা গেসে। ওনলি ওয়ান ইচ! তুমি নিজে কয়টা বোতল খাইলা, মনু? ওনলি ওয়ান তো? বা, বা, বেশ, বেশ। এইবার এইদিকে দুইটা বোতল আনোতো দেহি! ঠাণ্ডা দেইখ্যা"—বন্ধুকে কোকাকোলা দিয়ে বললেন, "আইজ লনডন নোটবুকটা পড়সিলা? কী কাণ্ড কও তো দেহি? কোথায় ছিল জেমস কাউলি, আর কোত্থিক্যা আইসে এই চান্সে, আর ঈ-তে। হেঃ।" তারপর নিজের বোতলে একচুমুক দিয়ে বেশ রিল্যাক্স হয়ে বসে ভুরু পাকিয়ে বেদম উদ্বিগ্ন মুখে কন্যাকর্তা বললেন তাঁর নিমন্ত্রিতকে—"বোঝলা সুধীর, ইংলণ্ডের প্রেজেন্ট পলিটিক্যাল সিচুয়েশনটা সত্যই ভেরি ক্রিটিকাল। অগো ইমিগ্রেশন পলিসিটা লইয়া আমাগো চিন্তার ঢের কারণ আছে—থাউজ্যাণ্ডস অব কালার্ড পিপলের ফিউচার—"

সেই মুহূর্তে ছাদের ওপরে চিনুদির ফিউচার নির্ধারিত হচ্ছে—জ্যাঠামশাই কন্যাসম্প্রদানে বসেছেন। শাঁখের শব্দ মেসোমশাইয়ের বিশ্বমানবিক উদ্বেগকে বিপর্যস্ত করতে পারলো না।

BanglaBook.org

সীতা থেকে শুরু

ভণিতা

এই বইয়ের গল্পগুলি সবই মেয়েদের নিয়ে। 'সীতা থেকে শুরু' নামের কিঞ্চিৎ ভণিতা দরকার। মহাকাব্য পড়তে পড়তে আমার কেবলই মনে হতো, এই বীর্য-বাহুবলসর্বস্ব পুরুষমানুষের যুদ্ধকাব্যের জগতে নারীর ঠাঁই বড় করুণ। সে লক্ষ্মীই হোক আর অলক্ষ্মীই। সীতাই হোক বা দ্রৌপদীই, তাড়কাই হোক বা শূর্পনখা, যেন দুঃখ পেতেই তাদের জন্ম। তাদের দুঃখের মূল্যেই মহাকাব্যের নায়কদের বীরোচিত গুণাবলী প্রমাণিত হয়। এভাবেই কয়েকটি গল্প লেখা হয়ে গিয়েছিল (আরো হয়তো হবে) মহাকাব্যের মেয়েদের ঘিরে। ধ্রুপদী কাহিনীর অন্তর্গত কোন রদবদল হয়নি, কেবল কিছু কল্পিত ঘটনা যুক্ত হয়েছে। আবার কাহিনীর নিজগুণেই তা বিযুক্ত হয়ে গেছে। নতুবা মহাকাব্যের কাহিনীর গতিপ্রকৃতি বদলে যেতে পারতো। গল্পগুলি শুধু পাঠকের মনে এক-একটা বিকল্প সম্ভাবনার রং ধরিয়ে দেয় মাত্র। এ বইয়ের প্রথম পর্ব 'পৌরাণিকী'তে এরকম ছ'টি কাহিনী আছে। যা হলেও হতে পারতো।

তৃতীয় পর্ব 'আধুনিকী'। এতে রয়েছে আজকের শহুরে মেয়েদের জটিল বন্ধুর জীবনের যাত্রাপথ নিয়ে পাঁচটি কাহিনী। এতে ঘটনার চেয়ে ভাবনার অংশই হয়তো বেশি। নারীহৃদয়ের অনুভূতির দিকটিই বোধহয় নারীজীবনের সিংহভাগ দখল করে থাকে।

আর এই দুই পর্বের মধ্যে সেতুবন্ধের মতো রয়েছে মধ্যবর্তী দ্বিতীয়পর্ব, 'মাতৃয়ার্কি'। 'মাতৃ+ইয়ার্কি' অথবা 'মাতৃয়ার্কি' দুটোই ধরতে পারেন। এক প্রবল প্রতাপান্বিতা কিন্তু শয্যাশায়িতা বিধবা মা, তাঁর বিবাহবিচ্ছিন্না চাকুরে মেয়ে, আর দুটি ইস্কুল কলেজ পড়ুয়া নাতনি—তিন প্রজন্মের নারীর এক মাতৃতান্ত্রিক সংসার। পুরুষবিহীন একক নারীর ঘরসংসার মাত্রেই যে বিবর্ণ, মলিন, 'সুখহীন নিশিদিন' হয় না, উজ্জ্বল, মননশীল, ব্যস্ত, মায়াবী, হাসি-ঝলমলেও হতে পারে, তারই ছোট্ট ছোট্ট বারোটি চিত্র এখানে রইল। আমার মা গল্পগুলি পড়ে রাগ করতে পারেননি, যদিও তাঁকে নিয়েই সব ইয়ার্কি, কেননা এতে একটি চিত্রও কাল্পনিক নয়। প্রথম ও তৃতীয়পর্বে যেমন সবই কাল্পনিক পরিস্থিতি।

গল্পগুলি রচনার অথবা প্রকাশের ক্রম অনুসারে সাজানো হয়নি। আমি যে-কোনো লেখাই লিখে ফেলে রাখি, অনেক কাটাকুটির পর হয়তো ছাপতে দিই,

BanglaBook.org

মূল-রামায়ণ

"সেই সত্য, যা বচিবে তুমি।
ঘটে যা, তা সব সত্য নহে।"

সুগ্রীব বললেন, "সার্থক তুমি হবেই। তোমাব গতি জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সর্ব বিঘ্ন অতিক্রম কবে। তুমি নীতিজ্ঞ, বলবুদ্ধিবীর্য, কোনোটাতেই তোমার তুলনীয় কেউ আমাদেব মধ্যে নেই। হে বানবকুলশ্রেষ্ঠ, আমি নিশ্চিত, তুমি পূজনীয়া সীতাদেবীর সংবাদ নিযে ফিববেই, চাইকি তাঁকে উদ্ধারও করে আনতে পারো।"

হনুমান বিনীত হেসে বললেন, "মহারাজ! এ আপনাব অতিবঞ্জন মাত্র। যাই হোক, আমি শ্রীবামচন্দ্রেব মনে শান্তি বিধানের নিমিত্ত এই মুহূর্তেই সীতা অন্বেষণে বেরুচ্ছি, কিন্তু আমাব একটা পরিচয়পত্র চাই তো? সীতাদেবীর কাছে আমার লোকাস স্ট্যানডাইটা আমি প্রমাণ করবো কেমন করে? একটা আইডেনটিটি কার্ড জাতীয় কিছু—যদি অযোধ্যাধিপতি দিতে পারেন। কিষ্কিন্ধ্যার আই. ডি. কার্ডে সীতাদেবীব কাছে কাজ হবে কি?"

শ্রীরামচন্দ্র এতক্ষণ মন খারাপ করে চুপচাপ বানবদের আলোচনা শুনছিলেন। লক্ষ্মণ তো অতি কষ্টে প্রবল গালমন্দ করে সুগ্রীবকে টেনে এনেছেন রানীদের মহল থেকে। সময় বয়ে যাচ্ছে। সীতা-উদ্ধাবে বেরুনোই হলো না। হনুমানের কথা শুনে রামচন্দ্র নিঃশব্দে মধ্যমা থেকে রাম-নামাঙ্কিত, সূর্যবংশেব চিহ্ন-সংবলিত, বহু-মূল্য বত্নখচিত অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়টি খুলে নিয়ে পবনপুত্রেব দিকে বাড়িযে ধবলেন। "এই অঙ্গুরীয় সীতার অতি পরিচিত। এটি নিয়েই বিবাহেব পব তিনি আংটি-খেলা খেলেছিলেন বাসবন্ধবে।"

হনুমান আংটি মাথায ছুঁইযে বিরাট এক সেলাম কবে বললেন, "তবে আজ্ঞা করুন, রওনা হই?"

রামচন্দ্র ও সুগ্রীব একসঙ্গে বললেন, "শুভমস্তু, সফল হয়ে এসো মহাবীর!"

সুগ্রীবের রাজসভা থেকে একলম্ফে হনুমান বনমধ্যে উপস্থিত হলেন। অঙ্গদ সেখানে বানর সেনাপতিদের লম্ফনেব মাপ নিচ্ছিলেন।

সম্পাতি বলেছেন সীতা আছেন শতযোজন দূবে সমুদ্রপারে লঙ্কাদ্বীপে দক্ষিণ সমুদ্রের মাঝখানে। বাবণরাজা তাঁকে হরণ করে নিজ রাজ্যে নিযে গেছেন। নীল,

মৈদ, সুহোত্র, জাম্ববান—প্রত্যেকেরই লংজাম্পের স্প্যান কত, অঙ্গদ জানতে চাইলেন —শতযোজন লাফিয়ে পাবাপার দুবাব কবতে কে পারবেন? দেখা গেল কেউ দশ-বিশ, কেউ আশি-নব্বুই—শতযোজন আব কেউই পারেন না। তখন মহাবীব হনুমানকেই ভযে ভযে অনুবোধ কবা হলো। তিনি পবনপুত্র। সহস্র যোজনও তাঁব কাছে তুশ্চ। হনুমান সঙ্গে সঙ্গে বাজী। অঙ্গদকে দেখালেন অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয নিযে তিনি প্রস্তুত হযেই এসেছেন। জাম্ববান বযস্ক, জ্ঞানী, তিনি বললেন, "দেখবেন, অভিজ্ঞান অঙ্গুবীয যেন মাছেব পেটে চলে যায় না!"

হনুমান মৃদু হাস্যপূর্বক উত্তব দিলেন, "আমি কি বিবহবিধুবা, অন্যমনা, গর্ভবতী আশ্রমবালিকা, জাম্ববান, যে আংটি তিমি-তিমিঙ্গিলে গিলে ফেলবে?"

বযোবৃদ্ধ বানবদেব নমস্কাব কবে, আকাশেব সূর্যচন্দ্র, পবনদেব, অগ্নি, বরুণ, ধরিত্রী, সমুদ্র ও শ্রীবামচন্দ্রকে প্রণাম কবে হনুমান তো বেড়ি হতে লাগলেন। বেড়ি হওযা মানে সমুদ্র লঙ্ঘনেব যোগ্য আকৃতি ধারণ করতে হবে তো। তিনি শ্বাসরুদ্ধ কবে যোগবলে ফুলতে শুরু কবলেন। ফুলতে ফুলতে তাঁর আকৃতি হলো ঠিক রকেটের মতো, তখন তিনি "জয় বামচন্দ্র" বলে শূন্যে ঝাঁপ দিযে পড়লেন।

কিন্তু মহেন্দ্র পর্বত তো কেপ কেনেডি নয যে রকেটেব টেক-অফ কবা সহ্য কবতে পারবে! সেই প্রবল ইমপ্যাক্টে চড়চড় করে মহেন্দ্র পর্বতেব বৃক্ষরাজি সমূলে উৎপাটিত হয়ে হনুমানেব পিছু পিছু শূন্যে ধাবিত হলো। পাথব ফেটে উষ্ণস্রোত উচ্ছ্রিত হলো, শিলাখণ্ড উৎক্ষিপ্ত হলো। শুনো, "হেঁইও" বলে তো হনুমান শূন্যে ভেসে গেলেন। সেই সুমহান দৃশ্য দেখে দেব-দানব-গন্ধর্ব-কিন্নব-মুনি-ঋষি সকলে "কেয়াবাৎ। কেয়াবাৎ!" বলে হাততালি দিয়ে পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন। অঙ্গদ ও অন্যান্য বানববৃন্দ তখন মহানন্দে ফুল কুড়োতে শুরু করলেন। আকাশ থেকে বর্ষিত সেই ফুলের নাম আকাশকুসুম।

হনুমান তখন অনুকূল পবনেব আশ্রয়ে (অর্থাৎ স্নেহময পিতৃক্রোড়ে) নিশ্চিন্ত নির্ভার উড়ে গিয়ে হু-শ কবে সোজা লঙ্কাদ্বীপের উপকূলে নামলেন। পাসপোর্ট ভিসাব ব্যাপার তখনও ছিল, কিন্তু নামটা আলাদা। লঙ্কার দ্বাররক্ষা করতেন শ্রীমতী লঙ্কাদেবী। তিনিই লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং লঙ্কাব রক্ষয়িত্রী। তাঁব সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী না হয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করা অসাধ্য। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে তিনিই লঙ্কাব ইমিগ্রেশন অফিসার।

বিবাশী সিক্কাব এক হনুমানী থাপ্পড়ে লঙ্কাদেবীকে মুহূর্তমধ্যে ভূলুণ্ঠিতা করে হনুমান শিস দিতে দিতে লঙ্কায ঢুকলেন। গালে হাত বুলুতে বুলুতে লঙ্কাদেবী টের পেলেন এবার লঙ্কাব শেষের দিন সমাগত। কিন্তু তিনি কাউকে সতর্ক করতে পারলেন না, কেননা তাঁর ওযাকিটকি ছিল না। ক্যাসাবিয়াংকাব মতো, তিনি নিজের স্টেশনেই ফিক্সড হয়ে রইলেন।

স্বর্ণলঙ্কায় ঢুকে হনুমান বিস্ময়ে হতবাক, রুদ্ধশ্বাস। শিস পর্যন্ত বন্ধ হয়ে মুখ হাঁ হয়ে গেল। কিষ্কিন্ধ্যা নগবীর ধনদৌলত কম নয়, কিন্তু স্বর্ণলঙ্কার সঙ্গে তুলনীয়

একমাত্র ইন্দ্রসভা, আর ময়দানব নির্মিত পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদ। তার কোনোটাই হনুমান দেখেননি। তিনি তো রাজবাড়ি দেখার আগে, রাস্তাঘাট, পার্ক আর মালটিস্টোরিড 'বিমান'গুলি দেখেই পরমাশ্চর্য। সোনার তৈরি ঘরবাড়ি—কী তার এলিভেশন, কী তার আর্কিটেকচারাল একসেলেন্স। হনুমান ভুলেই গেলেন তিনি কেন এসেছেন। নিজেকে টুরিস্ট মনে করে তিনি হালকা মেজাজে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এমন সময় রাজপ্রাসাদের সামনে এসে, তিনি একলাফে পাঁচিল ডিঙিয়ে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হলেন। এবং সীতার খোঁজ শুরু করলেন।

রাবণের প্রাসাদ দেখে স্বর্গবাসী দেবতাদেরই মাথা ঘুরে যায়। তো বনবাসী হনুমান। কী উদ্যান, কী ফোয়ারা, কী কুঞ্জবন, কী নাচঘর, কী দীর্ঘ ডাইনিং হল, কী উজ্জ্বল সভাকক্ষ, কী স্বপ্নমদির শয়নমন্দির। আর কী সব পরমা রূপবতী সঙ্গিনী পরিবৃত হয়ে মহাবল মহাগুম্ফধারী দশমুণ্ড রাবণরাজা, তাঁর বিশটি উদয়সূর্যনিভ বিশাল গোলাকার মদমত্ত রক্তচক্ষু অর্ধনিমীলিত করে গভীর নিদ্রামগ্ন। স্বপ্নেও তাঁর চক্ষুতারকা ডাইনে-বামে ছুটোছুটি করছে না—তিনি এতই অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। তাঁর বিশটি হাত বিশটি নিদ্রিত সুন্দরীর গলায় মালার মতো জড়ানো। হনুমান মুগ্ধনয়নে দেখছেন। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হলো অকৃতদার সচ্চরিত্র রানরদের পক্ষে ঘুমন্ত নারীদেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করা অনৈতিক, তবু তিনি বিস্ময়ে দেখলেন স্বর্ণপুত্তলী রূপসী যন্ত্রমানবীরা বিশাল সব রত্নখচিত মুক্তার ঝালরযুক্ত পাখা নিয়ে সারারাত্রি সারি সারি অগুন্তি রানীদের বীজন করে চলেছে রাবণরাজা সুখমত। যদিও চতুর্দিকে উন্মুক্ত বাতায়নপথে মলয়বাতাস বয়ে আসছে পুষ্পচন্দনের গন্ধ মেখে বাগান থেকে।

আরে, রাবণরাজার ঠিক বাঁপাশে ঐ সোনার খাটে ও কে ঘুমিয়ে? ওই তো সীতাদেবী। কী তাঁর স্বর্ণবর্ণ, কী তাঁর শ্রাবণমেঘের মতো কুঞ্চিত কেশভার রত্নজালে শোভিত, কী তাঁর অঙ্গের গঠন, কী পেলব তাঁর আঙুলগুলি, প্রতিটি আঙুলে রত্নাঙ্গুরীয় ঝলসে উঠছে, দেহের সর্বত্র উপযুক্ত রত্নালঙ্কারের শোভা, বেশবাস একটু অবিন্যস্ত হয়ে পড়েছে, কেননা বোঝাই যাচ্ছে তিনি প্রমত্তা অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েছেন, ঘরময় সোনার পানপাত্র ছড়িয়ে আছে, তাঁর টুকটুকে লাল ওষ্ঠাধর অল্প ফাঁক হয়ে আছে, মুক্তোর মতো দাঁত দেখা যাচ্ছে দু'চারটি। মুগ্ধনয়নে দেখতে দেখতে হনুমান ভাবলেন বেশ তো আছেন সীতা এখানে। তিনি কি আর বনে-বাদাড়ে ফলমূল ভোজন আর কুশাসনে শয়ন করবার জন্যে ফিরতে চাইবেন? মহারানী কমাদেবী বা তারাদেবী হলে নিশ্চয় থেকেই যেতেন। কে জানে অযোধ্যা কেমন? যতই ভালোমানুষ হোন, যতই নারায়ণের অংশে তাঁর জন্ম হোক, রামচন্দ্র তো এক জটাজুটবাঁধা চীরবসনপরা গৃহী, সন্নিসিটাইপের রাজ্যহীন রাজা—রাবণরাজার মতো জম্পেশ চেহারা তাঁর নয়। মাত্র একটাই মাথা। দু'খানা মাত্র হাত। রাবণের ব্যক্তিত্ব কী। আহ! ঘুমন্ত অবস্থাতেও দৃপ্ত পৌরুষ যেন ফেটে বেরুচ্ছে। জ্যোতির মতো অহংকার নিঃসৃত হচ্ছে তার নিদ্রিত ভ্রূভঙ্গে, দাম্ভিক ওষ্ঠের ঈষৎ বঙ্কিম রেখায়, উদ্ধত চিবুকে, পরিপাটি গোঁফে,

জুলপিতে। রাম তো কেঁদেই ভাসাচ্ছেন—হা সীতা। যো সীতা। কবে। নেহাতই হনুমান রামভক্ত এবং সৎ লোক, তাই রাবণভক্ত হয়ে পড়লেন না, কিন্তু মনে মনে ভাবলেন, সীতা কি আর ফিরবেন। তারপর মনে পড়লো, অবশ্যই রাবণ লোক ভালো নয়। পরের বউকে চুরি করে আনে যে, সে চোর এবং বদমায়েস। সীতাদেবীকে তো সবাই বলে সতীলক্ষ্মী, ইচ্ছে করেই শ্বশুরগৃহের বিলাসবাসন ত্যাগ করে সেধেই স্বামীর সঙ্গে বনে এসেছিলেন। তবে কি কোথাও হিসেবে ভুল হচ্ছে হনুমানের? লক্ষ্য করে দেখলেন, যে-নারীকে তিনি সীতাদেবী মনে করছেন তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে বেশ কটি সন্তানের মা হয়েছেন—চিবুকে, নাকের পাশে, চোখের কোণে বিলাসী জীবনের ও বয়সের ছাপ ধরতে শুরু করেছে, যদিও রূপযৌবনে ভাঁটা পড়েনি। কিন্তু সীতাদেবী তো বেশ ক'বছর বনে বনে ব্রহ্মচর্য পালন করে বেড়াচ্ছেন, তৃণশয্যায়, ফলমূলে জীবনধারণ করছেন। তাঁর রূপে মেদবাহুল্য থাকবে না বরং কৃশাঙ্গী হওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া তিনি এখনও সন্তানধারণ করেননি। তাছাড়া সীতা যদি গহনা এতই ভালোবাসবেন তবে তিনি বনময় সব অলঙ্কার ছুঁড়তে ছুঁড়তে এসেছিলেন কেন, পথনির্দেশ দিতে? নাঃ, মানুষের নীতিবোধ অন্য, সীতাদেবী হয়তো রুমাদেবী তারাদেবীর মতো না হতেও পারেন। হঠাৎ মদ্যপান করে রত্নালংকারভূষিতা হয়ে নর্মলীলা করতে রাবণের পাশে শুয়ে পড়বেন দশরথের পুত্রবধূ, জনকদুহিতা সীতা, এটা ঠিক নয়। মানুষদের সমাজে মেয়েদের সতীত্ব নিয়ে বড্ডো কড়াকড়ি, ইচ্ছে করলেও চট করে সাহস পাবে না মেয়েরা পরপুরুষ গমন করতে।

অনেক ভেবেচিন্তে হনুমানের মনে হলো—নাঃ, এই রূপবতী আর কেউ হবেন হয়তো, সীতাদেবী নন। এঁর মুখে শোকতাপ উদ্বেগ দুর্ভাবনার ছাপ নেই, শুধুই পরিতৃপ্তি! ইনি হয়তো পাটরানী মন্দোদরীই হবেন।

তখন হনুমান প্রাসাদ ত্যাগ করে বেরুলেন। ভাবলেন, যাই, একটু বনে-উপবনে ঘুরে ফলমূল ভোজন করে আসি, ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে বেশ। লম্পঝম্প তো কম করিনি। শত যোজন বলে কথা! এই বলে তিনি ফলের বাগানে ঢুকে মনের সুখে ফলপাকুড় পাড়ছেন আর খাচ্ছেন। পাড়ছেন আর খাচ্ছেন। ইচ্ছেমতো এদিক ওদিক খোসা ফেলছেন, বীচি ফেলছেন, আঁটি ফেলছেন, ডাল ভাঙছেন, পাতা ছিঁড়ছেন। যথাসাধ্য নোংরা করছেন, নষ্ট করছেন রাবণরাজার সাজানো বাগান।

হঠাৎ দেখেন একটু দূরে লাল ফুলে ফুলে রাঙা হয়ে রয়েছে এক অপূর্ব অশোকবন। হনুমান এক লম্ফে অশোকবনে উপস্থিত হলেন। খাবার জন্যে নয়, বাঁদরামির জন্যে। গোছা গোছা ফুলপাতা ছিঁড়ে অশোকবন ধ্বংস করতে লাগলেন। সীতা মিলুক না মিলুক রাবণের বনসম্পদ তো নষ্ট হোক!

হঠাৎ দেখেন অশোকগাছের ছায়ায় চীরবাসপরা এলোচুলে এক দেবীমূর্তি। কিন্তু তাঁর পা মাটি ছুঁয়ে আছে এবং তিনি অঝোরে অশ্রুবিমোচন করছেন। দেখে দেখে হনুমানের চোখ ফেরে না। কী জ্যোতির্ময়ী রূপ তাঁর। উপবাসে কৃশাঙ্গী, চুলে তেল

নেই, রুক্ষ কেশ। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলে লাল, অঙ্গে গহনা নেই। আবে! ওই তো দেবীমূর্তির একপায়ে নূপুর। অন্য নূপুরটি হনুমান বামেব কাছে দেখেছেন।

আহ্লাদে হনুমান কিচিরমিচিব কবে উঠলেন। এবং মহোল্লাসে অশোকগাছেব ডাল থেকে ধপাধপ লাফ দিয়ে দিয়ে মাটিতে পডতে লাগলেন বারংবাব। সেই হুপ হুপ শব্দ সীতা তো কান্না বন্ধ করে অবাক চোখ তুলে তাকালেন। অমনি হনুমানে একলাফে তাঁব সামনে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কবে বললেন, "মা জননী। আমি আপনাব স্বামী শ্রীরামচন্দ্রের সেবক হনুমান। আপনাকে পতিগৃহে ফিবিযে নিযে যেতে এসেছি। দযা করে আপনি আমাব স্কন্ধে আবোহণ করুন। আমি এক লহমায শত যোজন অতিক্রম কবে রাবণের পুষ্পকবথেব চেযে ঢেব দ্রুতবেগে আপনাকে শ্রীবামচন্দ্রেব পদতলে উপস্থিত কবে দেবো।"

সীতা তো হনুমানের কথাবার্তা শুনে হাঁ। বলে কি বাঁদবটা? ক্ষ্যাপা বাঁদব নাকি? কামডে দিলেই ধনুষ্টঙ্কার, জলাতঙ্ক, আবো কী কী হবে কে জানে? ওবে বাবা। এক তো ছিল ক্ষ্যাপা রাক্ষসের অত্যাচাব। তায আবাব ক্ষ্যাপা বাঁদব? নাকি এ বাবণ ব্যাটাবই নতুন কারসাজি? যেমন সাধু সেজে এসেছিল সেবাবে। অমনি চোখ মুছে ভুরু কুঁচকে ভীষণ রেগে সীতা বললেন, "হ্যাট। হ্যাট। যাঃ! ভাগ। পাজী রাক্ষস। আবাব জ্বালাতে এসেছিস। ও মাগো! এবাবে বাঁদব সেজে এসেছিস? তোব মাযাতে আমি আব ভুলি? হায় পতি শ্রীরামচন্দ্র! হায দেবর লক্ষ্মণ। তোমবা কোথায?"

তখন হনুমান মৃদু হেসে বললেন, "হে দেবি। বৃথা বিভ্রান্ত হবেন না। আমি যথার্থই বানরী অঞ্জনাব গর্ভজাত, পবনপুত্র শ্রীহনুমান। এই দেখুন, এই অঙ্গুরীযটি আপনি চিনতে পাবেন?"

আংটি হাতে কবে সীতা আহ্লাদে হাপুস নয়নে কাঁদতে বসলেন। এব নাম আনন্দাশ্রু। হনুমানও সৌজন্যবশত তাতে যোগ দিলেন। খানিক আনন্দাশ্রুপাতেব পব সীতা রাম-লক্ষ্মণেব কুশল প্রশ্ন কবলেন।

সৌজন্যবিনিময সাঙ্গ হলে হনুমান বললেন, "মা জননী! আব বিলম্ব নয। চেডীদের নিদ্রাভঙ্গ হলে বৃথা যুদ্ধে কালক্ষেপ কবতে হবে। ভয নেই, আমাব ঘাডটি ধবে শক্ত হযে পিঠে বসুন। শ্রীবামচন্দ্র বড়ই অস্থিব হযে বযেছেন। আপনাব জন্য উদ্বেগে তাঁব স্নানাহাব নেই, নিদ্রা-বিশ্রাম নেই—শুধু একবাব কবে লক্ষ্মণকে ধমকাচ্ছেন আর একবাব কবে হাহাকাব কবছেন। বেশি দেবি কবলে তাঁব মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটাও অসম্ভব নয।"

সীতাদেবী তাই শুনে কালবিলম্ব না করে গাছকোমব বেঁধে, "তবে চলো, বৎস হনুমান" বলে উঠে বসলেন। হনুমানও যোগবলে পুনবায় বকেটাকৃতি হযে, "হেইওঃ" বলে টেক-অফ করলেন।

হনুমানের সেই অমানুষিক উল্লম্ফনে যে প্রচণ্ড বাযবীয সংঘর্ষ হলো আকাশে

BanglaBook.org

বাতাসে, সেই এলোমেলো বায়ুচাপের ফলে স্বর্ণলঙ্কায় অকস্মাৎ আগুন ধরে গেল, অশোকবৃক্ষগুলি উৎপাটিত হয়ে শূন্যে ছুটলো, ভিত্তিপ্রস্তর নড়ে গিয়ে সাততলা বিমান বিলডিংগুলি শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হলো, লঙ্কানগরীতে হাহাকার পড়ে গেল। কেউ বুঝতেই পারলে না কী হয়েছে। কেউ বলে ভূমিকম্প, কেউ বলে উল্কাপতন, কেউ বলে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি জাগ্রত হয়েছে, নাকি কোনো অস্ত্রকারখানায় বিস্ফোরণ ঘটেছে? লঙ্কায় তো অন্তর্ঘাতমূলক কাজকম্মো হয় না, সেখানে সবাই সুখী। রাবণ রাজত্বে কারুর দৈন্য-দারিদ্র্য-দুঃখ-তাপ নেই। যা কিছু অন্যায় অত্যাচার সব অন্যদের রাজত্বে গিয়ে করে আসেন প্রজাপালক রাজা রাবণ।

এদিকে হনুমান তো নিজের চারিপাশে মায়াময় বাষ্পজাল বুনে নিয়েছেন যাতে মা-জননী সীতাদেবী দৃশ্যমানা না হন। তারপর মুহূর্তমধ্যে সমুদ্র পার হয়ে তিনি এসে মহেন্দ্র পর্বতে অবতরণ করলেন। শত যোজন তাঁর অকল্পনীয় রেখাঙ্ক কাছে কিছুই নয়। মহেন্দ্র পর্বতের চূড়ায় তাঁকে বিদায় দিয়ে মহাবল বানরগণ তখনও ফিরে যাননি। তাঁরা এরই মধ্যে হনুমানকে প্রত্যাবর্তন করতে দেখে আহ্লাদে আটখানা হয়ে কিলকিলা রব শুরু করে দিলেন। অত্যুজ্জ্বল বাষ্পজালে আচ্ছাদিতা সীতাদেবীকে দেখা যেতে তো তাঁদের উল্লাস শতগুণ বৃদ্ধি পেলো এবং তাঁদের চীৎকারে মহেন্দ্র পর্বতের সব পক্ষিকুল বন ছেড়ে উড়ে গেল, ছোটো ছোটো জীবজন্তুরা ভয় পেয়ে ইতস্তত ছুটোছুটি করতে লাগলো এবং বৃহৎ জন্তুরা গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হলো। বানররা পরস্পরের দীর্ঘ লাঙ্গুল চুম্বনপূর্বক নৃত্যগীতে মেতে উঠলেন। আকাশপথে আবার দেব-দানব-গন্ধর্ব-কিন্নর ইত্যাদি ইত্যাদি আবির্ভূত হয়ে পুষ্পবৃষ্টি করলেন। যুবরাজ অঙ্গদ তখন বানরদের ধমকে বললেন, "চন্দনকাঠের পালকি বানাও।" সেই পালকি করে সীতাকে নিয়ে বানররা শোভাযাত্রা করে সুগ্রীবের সভায় শ্রীরামচন্দ্রের সন্নিকটে চললেন। অহো! সে কী মধুর মিলনদৃশ্য। বাল্মীকি তা লিখে রাখেননি বলে জগজ্জন সেই স্বর্গীয় শোভার বর্ণনা থেকে চিরবঞ্চিত থেকে গেছে।

রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে ঘিরে বানরগণ তখন প্রচণ্ড আনন্দ উৎসবে মত্ত—তাঁরা ইতিমধ্যে মধুবন ধ্বংস করে মধুপান করে সকলেই পানোন্মত্ত হয়ে এসেছেন এবং রামচন্দ্র সে অপরাধ ক্ষমাও করে দিয়েছেন—নিজের গলার বহুমূল্য রত্নমাল্যটি রামচন্দ্র হনুমানের কণ্ঠে পরিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন, "হে বানরকুলশ্রেষ্ঠ! আজ থেকে আপনি অমর হলেন।" তারপর সীতাকে রাম অঙ্কে তুলে বসিয়ে, তাঁর কপাল থেকে রুক্ষ চূর্ণ অলক যত্নে সরিয়ে দিয়ে, তাঁর গোলাপ-পাপড়ির মতো কর্ণকুহরে মাঝে মাঝে কী সব অশ্রুত মৃদু গুঞ্জন করছেন, যা শ্রবণের ফলে সীতা আহ্লাদে শিহরিত হচ্ছেন এবং তাঁর গল গণ্ড সবই রক্তিম হয়ে উঠছে—

লক্ষ্মণ অবিশ্যি এসব কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না, কেননা তিনি তো সীতার পা'দুটি ছাড়া কিছুই দেখেন না। তিনি অন্য নূপুরটি যথাস্থানে পরিয়ে দিচ্ছেন—

হেনকালে, সেই মধুময় মুহূর্তকে দীর্ণ বিদীর্ণ করে একটি বল্মীকের স্তূপ সহসা নড়ে উঠলো। এবং তদভ্যন্তর থেকে ক্রোধোন্মত্ত বাল্মীকিমুনি নির্গত হয়ে যৎপরোনাস্তি রোষকষায়িত রক্তলোচনে কটুভাষণে শ্রীরামচন্দ্রকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। বাল্মীকি বললেন—"ধিক ধিক দাশরথি, রাজীবলোচন, রামরূপী লক্ষ্মীপতি শ্রীনারায়ণ। এই কি আপনার উচিত কাজ হচ্ছে? মনুষ্য অবতার হয়ে জন্মেছেন বলেই কি মানুষী সংস্কার আপনার দৈবচরিত্রের এতই গভীরে প্রবেশ করেছে যে আপনি বিস্মৃতই হয়েছেন, আপনার মনুষ্যজন্ম নেবার উদ্দেশ্যটা কী ছিল? রাবণের দ্বারা সীতাহরণ করানোরই বা উদ্দেশ্যটা কী ছিল? কেঁদে কেটে একশা হয়ে শেষকালে কিনা একটা বাদরকে দিয়ে সীতা উদ্ধার করিয়ে এনে আহ্লাদে আটখানা হয়ে সাত তাড়াতাড়ি প্রেমকূজন শুরু করেছেন? বলি, এবারে রামরাবণের যুদ্ধ তবে হবে কেমন করে শুনি? সেই কৃত যুগ, ত্রেতা যুগ দুই যুগ ধরে যে-মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি চলেছে স্বর্গে-মর্তে-পাতালে, যার জন্যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে দশ মাথা (চার প্লাস এক প্লাস পাঁচ) এক করে প্ল্যান করতে হয়েছে, সেই যুদ্ধটারই তো মুখে ছাই-ভাত করে ছেড়ে দিয়েছে এই ব্যাটা অতিপক্ক, ওভারস্মার্ট বাঁদর। ধরিত্রী যে রাবণের পাপে ডুবুডুবু। এখন ধর্ম সংস্থাপনই বা হবে কেমন করে, আমিই বা রামায়ণ লিখব কী নিয়ে?"

রাম লজ্জায় অধোবদন দেখে মুনি এবার সীতাকে নিয়ে পড়লেন—"আর আপনাকেও সত্যি বলিহারি যাই মা সীতাদেবী। সুলক্ষণা রাজকন্যা রাজবধূ হয়ে, একটা সামান্য মুখপোড়া হনুমানের গলা ধরে ঝুলে পড়তে আপনার লজ্জা-ঘেন্না হলো না? পরপুরুষের স্পর্শে আপনার কি পাপের ভয়ও করলো না? নাকি সে-সব রাক্ষসের খপ্পরে পড়ে—

সীতাদেবী তো রামচন্দ্রের মতো ভালোমানুষ নন—তিনি আগুনের মতো ফোঁস করে উঠলেন—

"মুখ সামলে কথা বলবেন ঋষিমশাই। জানোয়ারের আবার পরপুরুষ কী? বাঁদর কি মানুষ? পিতৃগৃহে কত অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণ করেছি কেবলমাত্র ব্যায়ামের উদ্দেশ্যে, তাতে পাপ হয়নি—শ্বশুরগৃহে কত হস্তিপৃষ্ঠে ভ্রমণ করেছি বায়ুসেবনের উদ্দেশ্যে, তাতেও পাপ হয়নি, আজ আমি বানরপৃষ্ঠে শত্রুগৃহ থেকে পলায়ন করেছি, এবং স্বামীর কাছে প্রত্যাগমন করেছি—তাতেই পাপ হয়ে গেছে? কেন? আমি বল্মীকের মধ্যে চাপা পড়িনি বলেই কি আমি নীতিজ্ঞা নই? অযোনিজা কন্যাকে সামান্যা রমণী ভাববেন না মুনিবর। একটু সাবধানে বাগবিস্তার করবেন, মনে রাখবেন আমারও জন্ম লক্ষ্মীর অংশে। আজ যে-হনুমানের কাঁধে আমি চড়েছি তিনি আমার পুত্রবৎ। আমাকে জননী সম্বোধন করেন। হায় সংস্কার! আজ উইপোকার কল্যাণে আপনি মুনিঋষি বনে গেলে কি হবে, ছিলেন তো সেই চোর-ডাকাতই—মনের মালিন্য আপনার কাটেনি মুনিবর। অঙ্গার শতধৌতেন ইত্যাদি।"

সীতার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধমক খেয়ে বাল্মীকি কী বলবেন ভেবে পেলেন না, রাগে তাঁর রাগবোধ হয়ে গেল। তিনি তোতলাতে শুরু করলেন। রামচন্দ্র দেখলেন সর্বনাশ। মহাকবি যদি তোতলা হয়ে যান, তবে তো আদিকাব্য রচনাই হবে না। তিনি তাড়াতাড়ি ব্যাকুলস্বরে বলে উঠলেন—"থাক থাক ওসব কথা! তাহলে, সীতা, বলো তো দেখি, এখন কী করি? সত্যিই তো আমারই কথা ছিল তোমাকে উদ্ধার করতে গিয়ে রাবণকে সবংশে নিধন করে স্বর্গে মর্ত্যে পাতালে সনাতন ধর্ম পুনঃসংস্থাপন করার। রাবণের পাপে সৃষ্টি ডুবুডুবু। এখন কী হবে? কসমিক অবডার নষ্ট হতে চলেছে —সব যে ভণ্ডুল হয়ে গেল।"

ধনুকের মতো ভুরু দুটিকে খড়গের মতো বক্র করে সীতা বললেন—"ভণ্ডুলের কী আছে আর্যদেব? ওই উইপোকামুনির কথা ছাড়ুন তো আপনি নাথ। সব ঠিক করে দিচ্ছি—একটু ভুল না হয় হয়েই গেছে, তা বলে সেটা সংশোধন করা যাবে না কেন? মহেন্দ্র পর্বত আর অশোকবন তো এইখান থেকে এইখানে। উঠলুম আর নাবলুম। চোখের পলকে পৌঁছে যাবো। চলো তো বৎস হনুমান। আরেকবারটি তোমার পিঠে চড়ে বসি। আলসে চেড়িগুলো নিশ্চয়ই এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি। তাড়াতাড়ি যাবেন কিন্তু প্রভু। অকারণ দেরি করবো না যেন দেবর লক্ষ্মণ। চলো বৎস ফিরে যাই। হুঁঃ।" বলে সীতা বাল্মীকির দিকে অবজ্ঞার চাউনি দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

"যথা আজ্ঞা মা-জননি। জয় হোক শ্রীরামচন্দ্রের।" বলে সর্বশক্তি সংহত করে আরো একবার যোগ-বলে স্পেসরকেটাকৃতি হয়ে হনুমানজী আকাশে উড্ডীন হলেন। এবার শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্য উপস্থিতির কারণে গাছপাথর সবকিছু স্বস্থানেই রইলো। বানরগণ উড্ডীয়মান হনুমানের দিকে সাদা রুমাল নেড়ে বলতে লাগলেন, "শুভ হোক যাত্রাপথ।"

বাল্মীকি দাঁতে দাঁত চেপে সব দেখলেন। আর মনে মনে বললেন—"বড্ডো তেজী মেয়েমানুষ, না? আচ্ছাঃ, আমিও মহাকবি বাল্মীকি। দেখে নেবো। স্বামীর কোলে বসে বসে মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনা? হবে। হবে।—তোমার কী হাল করি, তুমি দেখো। একেবারে আমার সেই ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চীর অবস্থা করে ছেড়ে দেবো। কলম যার হাতে, ভবিষ্যৎ তার হাতে।"

তারপর তো সবাই জানি সীতার কী কী হয়েছিলো।

BanglaBook.org

রাজকুমারী কামবল্লী

সীতা স্নানে গিয়েছিলেন। লক্ষ্মণ ফল-পাকুড় তুলে এনে ধুয়ে কেটে পদ্মপাতায় বেড়ে রাখবেন—সীতা এলেই তাঁরা দুপুরবেলা খেতে বসবেন। রামচন্দ্র তাঁর নীলকমলের মতো চোখদুটিকে আকাশছোঁয়া ঘন বৃক্ষরাজির মাঝে মাঝে ঝলসে-ওঠা সূর্যের দিকে নিবদ্ধ করে বেলা কত বোঝবার চেষ্টা করছিলেন। স্নানে গেলে সীতার সময়ের জ্ঞান থাকে না, তিনি জলে ভেসে বেড়ানো হাঁসদের সঙ্গে সাঁতার কাটেন। জলের তলায় খেলে বেড়ানো মাছেদের সঙ্গে ঠাট্টাতামাশা করেন, বনের জীবজন্তু গাছগাছালি, মাছ, ব্যাঙ সকলের সঙ্গেই তাঁর ভাব কিনা? "আমিও ধরিত্রী মাতার সন্তান, ওরাও।" সীতা ওদের ভাষা বুঝতে পারেন। গাছের ভাষা, ফুলের ভাষা, পাখির ভাষা, মাছের ভাষা। কিন্তু রাম তো সভ্য সুন্দর রাজপুরুষ। তিনি জানেন রাজসভার ভাষা। বনের ভাষা তিনি জানেন না, তাঁর ভাই লক্ষ্মণও জানেন না। সীতা না এলে খাওয়া হবে না, এদিকে দুই ভাইয়েরই জঠরাগ্নি জাগ্রত হয়েছে। লক্ষ্মণের বড় অভ্যেস, দাদা বৌদিকে আগে খেতে দিয়ে তারপরে নিজে খাবেন। অথচ এটা যদি বন না হয়ে অযোধ্যা হতো? তাহলে রাম-লক্ষ্মণকে বেড়ে দিয়ে, সীতা খেতেন সবার শেষে। কিন্তু বনের নিয়ম আলাদা। এখানে রাজধানীর নিয়ম চলে না। রামচন্দ্র এখানে বানপ্রস্থে আছেন, তাঁরা না-গৃহস্থ, না-সন্ন্যাসী। তরুণ তপস্বীর পোশাক তাঁদের, কিন্তু তেমন ঘোর তপস্যা কিছু করছেন না, সত্যি বলতে কি, মৃগয়া-টিগয়াও করেন। হাতে ধনুর্বাণ আছে। রাক্ষস খোক্কসদের তাড়াতেও ধনুর্বাণ দরকার, বাঘসিংহের হাত থেকে রক্ষা পেতেও ধনুর্বাণ চাই, মাঝেমধ্যে মাংস খাবার ইচ্ছে হলেও তো তীর-ধনুক লাগে। দণ্ডক অরণ্য জায়গাটি বড় চমৎকার। ছায়া-মায়া, মায়ামায় সবুজ। ফুলে ভরা লতাকুঞ্জে ছাওয়া, পদ্মভরা হ্রদ আছে কত। গাছের মৌমাছির চাক থেকে মধু ঝরে ঝরে পড়ে, পাতায় করে ধরে নেওয়ার অপেক্ষা। বনবাসী রামচন্দ্রের খাওয়াদাওয়া মন্দ হচ্ছে না। ফলও ফলে আছে বটে হরেক রকমের। যেমন স্বাদ, তেমন গন্ধ, তেমনি সুদৃশ্য। অযোধ্যার জীবনের চেয়ে এখানটা অনেক শান্তিপূর্ণ, অনেক নিশ্চিন্ত। রাজসভার কুটিলতা জটিলতা নেই, নগরের হট্টগোল নেই। লক্ষ্মণ, সীতা, রামচন্দ্র, সুখেই আছেন। রাজালোভ তাঁদের কারুরই ছিল না, লক্ষ্মণ একটু অধৈর্য, একটু রগচটা, মাঝে মাঝে রাক্ষস-টাক্ষস, দত্যি-দানবদের সঙ্গে ঝগড়া করে বসেন। তাছাড়া—বলতে নেই, কৈকেয়ীমাতার ইচ্ছেয় তাঁরা ভালোই —হঠাৎ রামচন্দ্রের চিন্তার স্রোতে ধাক্কা লাগলো। তাঁর সামনে এক অপরূপা সুন্দরী নারী এসে দাঁড়িয়েছেন। কোথা থেকে এমন চকিতে উদয় হলেন ইনি? কই, একে তো আসতে দেখিনি? কোন পথে এলেন? নাকি আমি এতই অন্যমনস্ক ছিলাম যে নজর করিনি? তেরো বছর পার হয়ে গেছে, আর একটা বছর বাকি। তাই

BanglaBook.org

রামচন্দ্র অতীত ভবিষ্যৎ ভাবছিলেন। কিন্তু এই নারীর রূপের দিব্য বিভা যে-কোনো ভাবনার বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে। এ নিশ্চয় কোনো অপ্সরা, স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে, রাম-লক্ষ্মণের তপস্যাভঙ্গ করতে। ভারি তো তপস্যা। তার আবার ভাঙাভাঙির কী আছে? ইন্দ্রের সবতাতেই বাড়াবাড়ি। তিনি কি জানেন না যে রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার, তাঁর ইন্দ্রের সিংহাসনে ডিমোটেড হয়ে যাবার কোনোই বাসনা নেই? অকস্মাৎ স্বর্গ থেকে হুরী পরী অপ্সরী পাঠিয়ে দিলেই হলো? একটা সময় অসময় নেই? এই ঠিক দুপুরবেলা খালি পেটে সীতার জন্য অপেক্ষা করছি এমন সময়ে হঠাৎ সুপথ থেকে চ্যুত করে কুপথে ফুসলিয়ে নিয়ে যাবার জন্য —হঠাৎ সেই সুন্দরী বললেন, "হে শ্যামল শোভন মহীরুহের মতো সতেজ, বসন্ত ঋতুর মতো উজ্জ্বল মুখশ্রী, বজ্রের মতো শক্তিমান পুণ্য দেহের অধিকারী শ্রীরামচন্দ্র! হে রাজীবলোচন, দীর্ঘবাহু, যেহেতু মাটিতে আপনার ছায়া পড়ছে, আপনি যেহেতু মেঝে স্পর্শ করে বসে আছেন, সেহেতুই শুধু বোঝা যাচ্ছে যে আপনি দেবতা নন, মরমানব মাত্র। কিন্তু আপনার এই দেবদুর্লভ রূপের তুলনা পৃথিবীতে আপনি কেবল একা আমারই মধ্যে পাবেন। আপনার সঙ্গে মিলন পরিকল্পনা করেই আমার জন্ম দেওয়া হয়েছিলো। তাই আপনাকে দর্শনমাত্র আমি স্বামী রূপে গ্রহণ করেছি, হে রাম, আপনার প্রেমে আমি জরজর। আমাকে গ্রহণ করে দয়া করে ধন্য করুন। আমি অনন্যপূর্বা, কুমারী কন্যা!"

রামচন্দ্র দেখলেন। যেন আকাশ থেকে খসে পড়া স্থির বিদ্যুৎলতার মতো স্বর্ণবর্ণা একটি তন্বী তরুণী, তার পদ্মফুলের মতো আনন থেকে সরলতা এবং মাধুরীর দিব্য বিভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে চন্দ্রকিরণের মতো—ময়নাপাখির চোখের মতো টানা টানা দুটি চোখে তার শাণিত তরবারির মতো ধার, ময়ূরের মতো গর্বিত ভঙ্গিতে সে দাঁড়িয়ে আছে, তার কথা থেকে যেন মধু ঝরে পড়ছে আর সুরভি ছড়িয়ে পড়ছে। উজ্জ্বল—ঠিক যেন স্বর্গের আলোকলতার মতো। কল্পতরুর মতো পুরুষের ইচ্ছাপূরণের আধার তার সর্বশরীর। বনবাসী শ্রীরামচন্দ্রের দেহে গোপন রোমাঞ্চ হলো। তিনি সহসা কাম-শিহরিত হলেন। এত রূপ, এত আকর্ষণ, এ কী নশ্বর শরীরে সম্ভব? রামচন্দ্র বললেন—"হে কন্যা, তুমি কে? তোমার নাম কী? তোমাকে দেবলোকবাসিনী বলে মনে হয়। তোমার পরিচয় কী? এই ঘোর অরণ্যে তোমার মতো রূপবতী তরুণী একা একা কেমন করে এসে পড়তে পারে?"

তরুণী উত্তর দিলেন—"আমি কামরূপী, ব্রহ্মার প্রপৌত্রী, বিশ্রবার কন্যা, লঙ্কাপতি রাবণ, ধনপতি কুবের, মহাবলী কুম্ভকর্ণ, মহাজ্ঞানী বিভীষণ এঁরা সবাই আমার দাদা হন। আমি প্রভাবশালিনী, স্বচ্ছন্দগামিনী, আত্মপ্রতিষ্ঠ, স্বাধীনা। আমার দীর্ঘ তপস্যালব্ধ বলের ফলে আমি যেমন চিরযৌবনা, আমি তেমনিই অজেয়া। আমি সর্বত্রই একাকিনী বিচরণ করতে পারি, কেননা স্বেচ্ছায় দুর্বল না হলে দেব দানব যক্ষ রক্ষ মানুষ বা পশু কেউই আমার বল হরণ করতে পারে না। কায়মনোবাক্যেই আমি কুমারী,

BanglaBook.org

সেখানেই আমার শক্তির মূল।" কামবল্লীর মধুর বাক্য ও মধুরতর রূপে বিমুগ্ধ রাম বললেন—"কিন্তু রাক্ষসীরা রূপহীনা হয়। তুমি রাক্ষসী হয়ে এত রূপ কী করে পেলে? তাছাড়া স্ত্রীলোকের দেহে তো বল এবং রূপ একত্রে থাকে না? বলবতী হলে সে করালদর্শনা হবে। নতুবা মোহিনী।" কামবল্লী জলস্থলে রোমাঞ্চ তুলে মৃদু হেসে বললেন—"হে দিব্যকান্তি, মহাবল রামচন্দ্র, আমার তপস্যার ফলেই আমার এই দিব্যশ্রী এবং এই অলৌকিক বলপ্রাপ্তি ঘটেছে। শুধু আপনাকে লাভ করার আশাতেই আমার তপস্যা। স্বামী, এতদিনে আপনি এসেছেন। আমার বিলম্ব আর মোটে সইছে না প্রভু, আপনার দীর্ঘবাহুতে আমাকে গ্রহণ করে ঐ বলিষ্ঠ উরুতে আমাকে বসিয়ে ধন্য করুন। তীব্র কামজ্বরে আমি পীড়িতা।" শুনে একটু বিচলিত সুরে শ্রীরামচন্দ্র বললেন—"হে কন্যা আমি তো মানুষ মাত্র। তুমি দেবতাদেরও কাঙ্ক্ষিতা। কিন্তু তোমাকে আমি গ্রহণ করি কী উপায়ে? আমি সচ্চরিত্র পুরুষ বিবাহ না করে কোনো নারীকে যে আমি অঙ্কশায়িনী করতে পারি না।" কামবল্লী বললেন—"ওঃ এই? আমিও তো সতী নারী, আমিও কি আপনাকে বিয়ে না করে আর রূপে চেয়েছি? এই যে শতযোজনগন্ধা পারিজাত কুসুমের মাল্যদুটি আমার হাতে কেন আছে? গান্ধর্ব বিবাহ করে আমরা এখানেই মিলিত হবো।"

রামচন্দ্র মালাবদল করে বিয়ের কথাটা দু'মিনিট চিন্তা করে বললেন—"কিন্তু তা কী করে হয়? তুমি ব্রহ্মার নাতনি ব্রাহ্মণী আমি সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় পুরুষ। স্ত্রীরত্ন দুষ্কুলাদপি বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণী বিবাহ ঠিক নয়। ক্ষত্রিয় হয়ে এ-কর্ম আমি পারি না।"

আকুলস্বরে তরুণী জবাব দেন—"কিন্তু আমার জননী তো রাজকন্যা এবং ভাইরা তো ক্ষাত্রধর্ম পালন করেন, তাঁরাও রাজা। এক্ষেত্রে আপনার বাধা কিসের? আমি তো নিজেকে ব্রাহ্মণী বলে জানি না। আমি তো মৃগয়া করি, আমি ক্ষত্রিয়াই। আসুন, যুবরাজ।"

শ্রীরামচন্দ্র তরুণী রাক্ষসীর বাকচাতুর্যে আরও মোহিত হয়ে পড়লেন। তার সাহচর্য শ্রীরামকে বনের মধ্যে যেন রাজসভার নাগরিক আবহাওয়া স্মরণ করিয়ে দিলো। কিন্তু সংযম পালনে অভ্যস্ত, চতুর এবং চতুর্বর্ণজ্ঞানী শ্রীরামচন্দ্র বললেন—"কিন্তু রাক্ষসদের সঙ্গে আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, হাবভাব, রুচিটুচি কিছুই তো মেলে না। রাক্ষসরা নরমাংসভুক, তারা চণ্ডস্বভাব"—শূর্পণখা তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন—"কিন্তু আমি তো বহুকালই তাদের আশ্রয় ত্যাগ করেছি, তাদের সাহচর্য এড়িয়ে চলেছি। তবেই তো তপস্যা করা সম্ভব হয়েছে। এই রূপ এই জ্যোতি কি অমনি অমনি লাভ করেছি? কেবল বিভীষণের মতো ধর্মপ্রাণ শুচিস্বভাব রাক্ষসদের সঙ্গেই আমার যোগাযোগ। হে রামচন্দ্র, বৃথা ভাবনা করে সময় নষ্ট করবেন না। আমাকে কোলে নিন, শীগগির।" অগত্যা রামচন্দ্র বললেন—"নশ্বর মানুষ হয়ে আমি কোন সাহসে নরভুক রাক্ষসীকে বিয়ে করি? রাগ হলে, দাম্পত্য-কলহ হলে তুমি তো

BanglaBook.org

আমাকে চিবিয়ে খেয়েই ফেলবে ঘাড় মটকে?" তখন তাঁর মুক্তোর মালার মতো দাঁতে বিদ্যুতের মতো হাসির ঝিলিক দিয়ে সুন্দরী শূর্পণখা বললেন—"এই দন্তরুচিকৌমুদী কি কাঁচামাংস চিবুনোর উপযুক্ত বলে মনে হচ্ছে? এই পেলব পদ্মমৃণালের মতো বাহু কি আপনার ঘাড় মটকাতে পারে?" রামচন্দ্র মাথা নেড়ে বললেন—"কী জানি বাবা. তোমরা রাক্ষসী, ইচ্ছারূপিনী। ইচ্ছা করলেই মূলোর মতো দাঁত, কুলোর মতো নখ, আগুনের মতো চোখ বের করে, সিংহের মতো গর্জন করে আমাকে মুহূর্তেই মাংসপিণ্ডে পরিণত করতে পারো। আমি নশ্বর মানুষ, বনবাসী ব্রহ্মচারী, আমি কি তোমার দৈববলের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবো? তারপর ধরো যদি বিয়ের খবর পেয়ে তোমার মহাবলী রাক্ষসদাদারা তেড়ে আসেন? ওরে বাবা।" অস্থির কামবল্লী বললেন—"হে রামচন্দ্র! 'ওরে বাবা' বাক্যাংশ আপনার মুখে মানায় না। তাছাড়া ওইজন্যই তো তাড়া দিচ্ছি। চটপট বিয়েটা সেরে ফেললে আর ভয় নেই। দাদারা চাইবেন না তাঁদের বোন বিধবা হোক।" শ্রীরামচন্দ্র বললেন—"তার চেয়ে বরং তাঁদেরই ডেকে আনো। তাঁরা তোমাকে আমার হাতে ধর্মমতে সম্প্রদান করুন।" কামবল্লী বললেন—"হায় রাম! হায় রাম! আপনি কেন বুঝতে পারছেন না আমার দাদারা কদাচ স্বেচ্ছায় আমাকে আপনার হাতে সম্প্রদান করবেন না? কিন্তু একবার বিবাহ হয়ে গেলে আমার জীবনে তাঁরা কোনো অনিষ্টও ঘটাবেন না। এ-বিবাহে আপনি রাক্ষসকুলের জামাই হয়ে নিশ্চিন্তে রাজত্ব করতে পারবেন। রাবণের ভয়ে স্বর্গের দেবতারাও কাঁপেন। তাঁরাই আমার দাদার প্রাসাদ ঝাঁটপাট দেন, বাগান করেন, পাকশালে রান্না করে দেন। রাবণের দাসদাসী দেবতারাই। হে রাম, আসুন পুণ্যকর্মটা সেরে ফেলি।" রাম বললেন, "কিন্তু কেউ সম্প্রদান না করলে—এভাবে গান্ধর্বমতে—এটা কি ঠিক গ্রাহ্য হবে অযোধ্যানগরীতে?" তখন কামবল্লী বললেন—"হে রামচন্দ্র, আমি তো অবলা, পুরুষশাসিতা. তুচ্ছ মানুষী নই। আমি সবলা, স্বাধীনা. মুক্ত রমণী। অন্যে আমাকে সম্প্রদান করবে কেন? আমি নিজেই নিজের অধিকারিণী। আসুন. এই পারিজাত কুসুম আমার দাদা কুবেরের বাগানে ছাড়া ফোটে না. এর সুগন্ধ তিন ভুবনে ছড়িয়ে পড়ে। এই দিব্যমালা আমাকে পরিয়ে দিন। আপনার এত দ্বিধা আমি বুঝতে পারছি না। কবিতা ও বণিতা স্বয়মাগতা হলে সুখদা হয়, এ কি আপনি জানেন না?"—এই বলে সোনার নূপুর ঝমঝমিয়ে দিব্যমালা হাতে কামপীড়িতা কামবল্লী নয়নের ধনুকে জ্যা-রোপণ করে মদনবাণ ছুঁড়লেন ও রামের দিকে ধেয়ে গেলেন।—"এসো, প্রভু এসো, আমার আর বিলম্ব সইছে না।"

রামচন্দ্র মদনবাণে আহত হয়েও আত্মরক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছেন। হায়। শ্রীরামচন্দ্র যদি অর্জুন হতেন, তাহলে তাঁকে এই সমস্যায় জর্জরিত হতে হতো না। কিন্তু তিনি রাম অবতার। সীতা ভিন্ন আর দ্বিতীয় নারীকে তাঁর জীবনে ঠাঁই দেবার উপায় নেই। অথচ কামশরে তিনিও কি কিঞ্চিৎ উৎপীড়িত নন? স্বেদবিন্দু

কি তাঁর শ্যামল শরীরেও কণ্টকের মতো ফুটছে না? শরীরের সব লোম কি খাড়া হয়ে ওঠেনি? রোম-হর্ষণ কি একেই বলে না? এই ঘোর অরণ্যে সময় যেন কাটতে চায় না। এই অতিরূপসী কন্যাটির সহজ সপ্রতিভতায়, সারল্যে এবং মানুষীদের মধ্যে অদৃষ্টপূর্ব দুঃসাহসে রাম বিমোহিত হয়ে পড়েছেন। কামবল্লীর সঙ্গে কথা বলতে তাঁর খুব ভালো লাগছে। ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে সময়টা দিব্যি কাটছে। সীতা স্নান থেকে ফেরেননি। লক্ষ্মণের ফল কোটা শেষ হয়নি। লক্ষ্মণ তাঁর নিজের কুটিরের দাওয়ায় বসে পেছনে ফিরে, নিজের মনে ফলমূল ছাড়াচ্ছেন, পদ্মপাতায় সাজাচ্ছেন। তিনি কামবল্লীকে দেখতেও পাননি, রামচন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্তাও শুনতে পাননি। এসব কাণ্ডকারখানার কিছুই তিনি জানেন না। তাঁর গৌরবর্ণ পেশীবহুল পিঠ, সিংহের মতো সরু কোমর আর কোঁকড়া চুলে ভরা বলিষ্ঠ ঘাড় দেখা যাচ্ছে।

এমন সময়ে সীতা স্নান সেরে ফিরলেন কলসীতে জল নিয়ে। এটাও লক্ষ্মণই আনেন সাধারণত। সীতার পেছু পেছু হেলতে দুলতে এলো মধুরকণ্ঠী একঝাঁক হাঁস, তাদের ন্যাড়া ছানাদের সারি সঙ্গে নিয়ে। সীতাও হংসগামিনী। হাঁসেরাও তাই। সীতা খেয়ে উঠে তাদের ফলমূলের রুচি দেবেন তাই তারা এসেছে।

কামবল্লী শূর্পণখা সীতার কথা জানতেন না। তাঁকে দেখেই বুঝলেন ইনি রামের স্ত্রী এবং রামের সকল দ্বিধার কারণ। অনেক তপস্যা করে শূর্পণখা যে দিব্য রূপলাবণ্য অর্জন করেছেন, সীতা জন্মসূত্রেই সেই সৌন্দর্যের অধিকারিণী। শূর্পণখা বুদ্ধিমতী, তিনি বুঝতে পারলেন, সীতা স্বাভাবিক নিয়মেই সেইসব গুণেও মণ্ডিতা, যা শূর্পণখাকে তপস্যা করে পেতে হয়েছে। শূর্পণখার প্রচণ্ড ঈর্ষা হয়ে গেলো। সিক্ত বল্কলে, সদ্যোস্নাত সীতার পূর্ণযৌবন ষোলোকলায় প্রস্ফুটিত। রাম যে এতক্ষণ তাঁর সঙ্গে রঙ্গরসিকতা করছিলেন মাত্র, শূর্পণখাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার কোন ইচ্ছাই যে তাঁর ছিল না, সেকথা বুঝতে আর দেরি হলো না রাজকুমারী কামবল্লীর। তিনি তখন কামপীড়িতা এবং প্রণয়ে কাতর, রামের এহেন প্রবঞ্চনায় তাঁর যন্ত্রণা দ্বিগুণ বর্ধিত হলো। অরণ্যমধ্যেও এত সুন্দরী স্ত্রী যাঁর, তিনি শূর্পণখাকে নিয়ে তাহলে এতক্ষণ তামাশা করছিলেন? শূর্পণখার হৃদয় কেঁপে উঠলো। প্রথমে তাঁর ইচ্ছে করলো এক ঢোকে সীতাকে গিলে ফেলতে। কিন্তু সীতার চোখে যে সারল্য এবং বিস্ময় বিস্ফারিত—শূর্পণখা তার স্বরূপ চিনতে পারলেন। তিনি বুঝলেন, শুধু শূর্পণখাকেই নয়, সীতাকেও প্রতারিত করেছেন শ্রীরামচন্দ্র, এতক্ষণের রহস্যালাপে কালযাপনের সঙ্গিনী হিসেবে শূর্পণখাকে ব্যবহার করে।

সীতা শূর্পণখাকে দেখে খুবই অবাক এবং রামের চোখমুখের ভাব দেখে তাঁর বুঝতে বাকি রইলো না যে রাম রীতিমতোই বিমুগ্ধ হয়েছেন। সীতা যদিও শূর্পণখাকে রাক্ষসী বলে চিনতে পারেননি, তাঁর সঙ্গী হাঁসের ঝাঁক কিন্তু ঠিকই চিনেছে। তারা রাক্ষসী দেখে ভয়ে কেঁপে প্যাক-প্যাক করে চেঁচিয়ে হৈলাঠেলি করে হু-হুশ করে পালিয়ে গেলো। কিন্তু বাচ্চাগুলো উড়তে শেখেনি, তারা প্রাণভয়ে সীতার কাছেই

BanglaBook.org

আশ্রয় চাইলো। তারা সীতাকে বললো—"ঐ রাক্ষসীর কাছ থেকে তুমিই মায়ের মতো আমাদের রক্ষে করো।" সীতা তখন বুঝতে পারলেন, এই রূপসীটি আসলে রাক্ষসী। তিনি হাঁসের ছানাদের বুকে তুলে নিলেন বটে, কিন্তু নিজেই ভয়ে অজ্ঞান হবার যোগাড়। সীতার ভয় দেখে রাম শূর্পণখার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করা ছেড়ে, সীতাকে জড়িয়ে ধরে কুটিরে নিয়ে গেলেন। আর রামচন্দ্র সীতাকে জড়িয়ে ধরেছেন দেখে শূর্পণখার মনে তীব্র মাৎসর্য-যন্ত্রণা হলো। তিনি দশাটা সইতে পারলেন না। দৌড়ে পাশের কুটিরে লক্ষ্মণের কাছে ধেয়ে গেলেন। তক্ষুনি, ঠিক তক্ষুনি অমনিই একটি কঠিন বাহুর কোমল আলিঙ্গনের জন্য শূর্পণখার দেহমন দুই-ই তৃষিত হয়ে উঠলো। তিনি করজোড়ে লক্ষ্মণকে অনুনয় করলেন—"রে রূপবান রাজপুত্র, আমার দিকে একবার চেয়ে দেখো। দেখো আমি সুন্দরী, সুলক্ষণা ও তরুণী। রাজকুলনারী কামবল্লী আমার নাম। আমি তোমার প্রেম প্রার্থনা করি।" ততক্ষণে লক্ষ্মণের ফল কোটা হয়ে গিয়েছিলো। তিনি পেছন ফিরে শূর্পণখার চোখ-ঝলসানো রূপ দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। শূর্পণখাও তা টের পেলেন। কিন্তু লক্ষ্মণও রাজসভার মানুষ, রামেরই মতো। তাঁরা অনেক সাজানো-গোছানো সভাসুন্দর আলাপ শুনতে অভ্যস্ত। এমন সোজাসুজি আসল কথায় চলে আসতে কাউকেই দেখেননি।

শূর্পণখা আবার বললেন—"তোমার দাদার নাকি বৌ রয়েছে। তুমি তো একা, সঙ্গিনী রহিত। আমি অভিজাতবংশীয়, কুমারী কামবল্লী আমার নাম। ব্রহ্মার নাতনী, বিশ্রবার কন্যা লঙ্কাধিপতি রাবণ, ধনপতি কুবের, নিদ্রাবীর কুম্ভকর্ণ, ধর্মবীর বিভীষণ, এঁরা সকলেই আমার দাদা। আমিও তাঁদের মতোই মহাবলী। আমার যে এই রূপ যৌবন—এ চিরন্তন, অনশ্বর। কেননা আমি কঠিন তপস্যাবলে এই বর অর্জন করেছি। আমি কোনদিন জরতী হব না। হে পরম রূপবান রাজপুত্র, তুমি দয়া করে আমাকে গ্রহণ কর।" কিন্তু লক্ষ্মণ তখনও হাতে ছুরি নিয়ে কাটা ফলের পাতার সামনে প্রস্তরমূর্তির মতো 'থ' হয়ে রইলেন। এই মহিলা অপ্সরী, না দেবী, না রক্ষিনী, যক্ষিনী, ভূতনী, প্রেতিনী, টের না পাওয়া পর্যন্ত তিনি স্বাভাবিক হতে পারছিলেন না। এবার বুঝলেন রাক্ষসদের বোন যখন, তখন রাক্ষসীই। কিন্তু তিনি কিছু বলার আগেই শূর্পণখা অধীর হয়ে আবার বললেন—"আমি একাই এক অক্ষৌহিণী সৈন্যের সঙ্গে যুঝতে পারি। তোমাদের সকল যুদ্ধবিগ্রহে আমি সহায় হতে পারবো। কেননা আমি অস্ত্রবিদ্যাতে পারদর্শিনী। তোমার আমি সুযোগ্যা সহধর্মিণী হবো। তোমার দাদার ললিত লবঙ্গলতা বউটির মতো আমি ভয়ে অচেতন হয়ে পড়বো না কখনও। আমি অমিতবিক্রমা, এবং নির্ভীক, কিন্তু স্বভাবগুণে আমি প্রণয়কুশলীও বটে। যদিও আমি এখনও অনন্যাপূর্বা, কুমারী। হে রাজপুত্র, তুমি শুধু চোখ তুলে একবার চেয়ে দেখো আমার এই হরিণের মতো চোখদুটি, আমার এই পূর্ণকলসস্তনযুগল, আমার গভীর রহস্যময় নাভিকুণ্ড, আমার এই মসৃণ উরুর ভাঁজ—"

লক্ষ্মণের অনেকক্ষণ খুব খিদে পেয়ে গেছে। আর বেশিরভাগ পুরুষ মানুষের

BanglaBook.org

মতো, লক্ষ্মণেরও খিদে পেলে আর মাথার ঠিক থাকে না, কিঞ্চিৎ কাণ্ডজ্ঞানের অভাব ঘটে। তায় আজ দুপুরে ফলাহার, মাছমাংস নেই। ফলমূল শাকসবজী রাম-সীতার অত পছন্দ হলে কি হবে, লক্ষ্মণের পছন্দ অন্যরকম, তিনি ভালবাসেন ভাতপাতে একটু হরিণের মাংসের ঝোল, একটু পাখির মাংসের পাতুরী, কি দুটো টাটকা মাছ ভাজা। লক্ষ্মণের স্বভাবটাও যেমন ক্ষত্রিয়োচিতো, রাগী রাগী, খেতেও ভালবাসেন তেমনি রাজসিক আহার।

শূর্পণখা যদি খাওয়া দাওয়া মিটে যাবার পরে এসে লক্ষ্মণের কাছে তাঁর আবেদন পেশ করতেন, তাহলে কী হতো কে জানে। কিন্তু আপাতত, এর চেয়ে মন্দ সময় আর তিনি বাছতে পারতেন না। লক্ষ্মণ এবার ফেটে পড়লেন। একে তো সীতা আজ স্নানে খুবই দেরি করেছেন। তায় রাম আজ নিজেও শিকারে যাননি লক্ষ্মণকেও যেতে দেননি। তাঁর আলস্যবোধ হচ্ছিল, দুই ভাইয়ে বসে পাশা খেলেছেন। এবং লক্ষ্মণ হেরেছেন। একেই সেজন্য মেজাজ খারাপ। তায় পেটে খিদে। এবং দুপুরের খাওয়াটা মনের মতন নয়। তারমধ্যে এ আবার কী উটকো বিপদ? এক বেহায়া রাক্ষসী রাজকন্যে এসে জ্বালাতন শুরু করেছে। লক্ষ্মণের মাথা চড়াৎ করে গরম হয়ে গেল। এবং তাঁর মুখে মধুর ভাষণ এল না। অবিশ্যি লক্ষ্মণ তাঁর কটুবাক্যের জন্য সুপরিচিত। তিনি বল্লেন—"হে অজ্ঞাতকুলশীলা রমণী, আপনি যা বললেন আমি শুনলাম। আপনি খুবই সুন্দরী ও বাকপটিয়সী। এই দণ্ডকারণ্যে প্রায় ১৩ বছর আছি আমি কিন্তু আপনার মতো কোন রূপসী যুবতীকে এখানে একাকিনী বিচরণ করতে দেখিনি। বিশ্রবাটি কে, আমি জানি না, কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই মানবী নন। এতই যখন যুদ্ধপটিয়সী, তখন ভূত প্রেত রক্ষ যক্ষ কিছু একটা হবেন। সে আপনি যে-ই হোন, রামচন্দ্রের, সীতাদেবীর এবং আমার, কারুরই আপনাকে দিয়ে কোন দরকার নেই। এখনই আমরা মধ্যাহ্ন ভোজনে বসবো। আপনি বরং ভালয় ভালয় চলে যান। বেশি ঝামেলি করবেন না, ভাল্লাগছে না।"—কামপীড়িতা তরুণী রাক্ষসীর রাম-লক্ষ্মণের রূপদর্শনে তখন করুণ অবস্থা, তিনি বললেন—"হে লক্ষ্মণ, আপনি সক্ষম, সমর্থ, যুবক। আপনি পুরুষ। আপনি আমার অভিলাষ চরিতার্থ করুন। আমি কামপীড়িতা, রতিচঞ্চলা হয়ে আপনার কাছে এসেছি। দয়া করে আমাকে প্রত্যাখ্যান করবেন না। রতিপ্রার্থিনীকে প্রত্যাখ্যান করা পাপ। জানেন না?" ক্ষুধার্ত লক্ষ্মণ এ-কথায় হঠাৎ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন।—"তবে রে টেটিয়া স্ত্রীলোক। এই খিদের মুখে রতিপ্রার্থিনী? আপনার স্বভাবটা তো বড্ডই খারাপ দেখছি। এইসব অসভ্য কথা আমাকে বলতে আপনার লজ্জাও করছে না? ছি ছি ছি ছি, এসব কথা কদাচ কোন রমণী কি কোনো পুরুষকে সেধে সেধে বলে? অ, আপনি নিশ্চয় রাক্ষসকুলের বারাঙ্গনা হবেন—। না, না, আমাদের কাছে অর্থ নেই। আপনি ভাগুন, কেটে পড়ুন—চলে যান"—শূর্পণখা কানে আঙুল দিয়ে বললেন—"ছিঃ ছিঃ লক্ষ্মণ। আমি ধনলিপ্সু কামব্যবসায়ী নই। আমি রাজঐশ্বর্যবতী, স্বাধীনা। যদিও মুনিকন্যা,

BanglaBook.org

কিন্তু আমি যে রাজকুমারীও বটে। বৃথা আমাকে এভাবে অপমান করবেন না।" শুনে লক্ষ্মণ মুখ ভেংচে বললেন—"মুনিকন্যা! হ্যাঃ! রাজকুমারী!! বললেই হলো? তবে আপনার আচার ব্যবহার এত নিকৃষ্ট কেন? সাধারণী সামান্যা নারীর সহজাত আত্মসম্ভ্রম, লজ্জা শরম, আত্মসংযম, এসব কিছুই তো আপনার নেই। অভিজাত কন্যার যোগ্য আচরণ দূরে থাক। সেধে সেধে অপরিচিত পুরুষকে প্রণয় নিবেদন করতে সঙ্কোচ হলো না? অযোধ্যায় আছেন আমার ধর্মপত্নী উর্মিলা, আপনার চেয়ে তিনি অজস্রগুণ রূপসী ও সুশীলা। আপনার চক্ষুলজ্জাও নেই।" মরীয়া শূর্পণখা বললেন—"প্রণয়ে যখন ধমনীর রক্ত গরম কটাহে তেলের মতো টগবগ করে ফুটছে, তখন লোকলজ্জার প্রশ্নই ওঠে না রাজপুত্র। আর প্রণয় নিবেদনের মধ্যে আত্মসম্ভ্রম বিসর্জন দেবার কথা আসে কেন? রাজপুত্রেরা তো রাজকন্যাদের হামেশাই প্রণয় নিবেদন করছেন। তাঁরা তাতে লজ্জাও পান না, অসম্মানিতও হন না, লোকচক্ষুর ভয়ও করেন না? আমিও তো রাজকন্যা।" অবাক হয়ে লক্ষ্মণ বললেন—"আরে রে? এর যে দেখি গোড়ায় গলদ। রাজপুত্রে আর রাজকন্যায় গুলিয়ে ফেলছে। রাজপুত্র তো আরও অনেক কিছুই করতে পারে। আপনি তো নারী। আপনি—"

—"নারী তো কী হয়েছে? আমি একাই এক অক্ষৌহিণী সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করে জিততে পারি। আমি কি আপনাদের ওই ক্ষীণজীবী মানুষী? পৃথিবীর উচ্চতম রাক্ষসবংশে আমার জন্ম, আমি স্ববলে স্বাধীনা, স্বচ্ছন্দগামিনী, প্রবল প্রতিপত্তিশালিনী। যথেচ্ছারূপিণী। ইচ্ছে করলেই এক্ষুনি সিংহী হয়ে আপনাকে খেয়ে ফেলতে পারি, কালসর্প হয়ে দংশন করতে পারি। কিন্তু এসব কিছুই না করে, পদ্মগন্ধ দেবদুর্লভা, জ্যোতির্ময়ী নারী হয়ে আপনার প্রেম প্রার্থনা করছি। আপনি রাজী হচ্ছেন না কেন? আপনার সেই সুশীলা স্ত্রীটি তো এখানে নেই, তিনি সেই অযোধ্যায়। তিনি জানতেও পারবেন না। আসুন, আসুন গান্ধর্বমতে আমরা বিয়ে করি। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না, প্রচণ্ড কামজ্বরের তাড়নায় আমার সর্বদেহ স্বেদসিক্ত ও কম্পিত হচ্ছে, জ্বলে যাচ্ছি, জ্বলে যাচ্ছি—আপনার সুশীতল আলিঙ্গনে আমাকে অবিলম্বে শান্ত করুন। কী বলিষ্ঠ আপনার বাহুদ্বয়, কী উদার আপনার কপাটবক্ষ, সিংহের মতো সরু আপনার কোমর, কী সুন্দর ঘন কালো আপনার কোঁকড়া চুলের ঝুঁটি, আর আপনার শঙ্খের মতো কণ্ঠ"—

"থাম, থাম, রাক্ষুসী, ঢের হয়েছে বেহায়াপনা। য্যা য্যাঃ—ভাগ। যদি সত্যি কুমারী হোস, তবে বাপঠাকুর্দার যথেষ্ট লজ্জার কারণ হয়েছিস, এবার ঘরে ফিরে যা, বাপ-দাদাদের গিয়ে তোর কামজ্বরের কথা শোনা, তারা হাকিম ডাকবে। আর যদি বিবাহিতা হোস, তাহলে এক্ষুনি স্বামীর কাছে গিয়ে তোর প্রণয়পীড়ার খবর বলগে যা। হুঁঃ! কামজ্বর। স্ত্রীলোকের আবার কামজ্বর। ওটা কেবল পুরুষের অস্বাচ্ছন্দ্য বুঝলি, পৌরুষজনিত ব্যাধি। ঠিক ব্যাধিও বলবো না, বংশবৃদ্ধির জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া। নারীর আবার ওসব কী? তোর দিব্যি গতর আছে, যা গিয়ে

BanglaBook.org

আমসত্ত্ব দে, বড়ি দে, আচার পাপড় তৈরি কর, কামজ্বর সেরে যাবে। আর যুদ্ধ কৌশল জানিস, তবে যা না বালিকাবিদ্যালয়ে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দে, যোগব্যায়াম শিক্ষা দে, আত্মরক্ষার কৌশলাবলি শিক্ষা দে—জীবনটাকে কাজে লাগা। তা নয় এসেছিস খিদের সময় বাগড়া দিতে। প্রণয় করতে এসেছেন। ঈশ! আহ্লাদ কত! দূর হ বেটি রাক্ষুসী কোথাকার—"

শূর্পণখা অপমানে চোখে অন্ধকার দেখলেন। রাক্ষসবংশীয়া হলেও তিনি প্রকৃতই সুন্দরী, এবং অমিত তেজস্বিনী, তায় রাজকুমারী। একে তো প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেনই তায় এত অপ্রার্থিত জ্ঞানের কথায় শূর্পণখা ক্ষেপে গেলেন। ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি আকাশ পাতাল প্রমাণ হাঁ করে, লক্ষ্মণকে নয়, রাম-সীতাকে কপাৎ করে গিলে ফেললেন, তাঁদের কুটির-টুটির শুদ্ধ। গিলে ফেলে বললেন, "দেখলি তো আমার ক্ষমতা? আর এবার তোকে কুচি কুচি করে কেটে নুন দিয়ে চেখে চেখে খাই।" তাঁর সেই হিমালয়প্রমাণ রাক্ষসী শরীর দর্শন করে লক্ষ্মণ সত্যি সত্যি ঘাবড়ে গেলেন। এ কিরে বাবা? রাম-সীতা সত্যি সত্যি এই রাক্ষুসীর পেটে চলে গেলেন যে? এখন তো একে হত্যা করাও সমস্যা। এর যে পেটের মধ্যে রামসীতা। মারতে গেলে তাঁদের যদি ক্ষতি হয়? লক্ষ্মণ তখন মাথা ঠাণ্ডা করে রাক্ষসীর হাঁটুতে হাত বুলিয়ে, অতি মিষ্টস্বরে তাঁকে তুষ্ট করে বললেন—হে প্রিয়তমা, সুন্দরীতমা, তুমি আমার উজ্জ্বল উদ্ধার। তুমি যা চাও, তাইই হবে। শুধু তোমার এই ভয়াল, করাল রূপ আমি সহ্য করতে পারছি না। প্রেয়সী, এই ক্রোধ সংবরণ করো—দয়া করো। দয়া করে ফিরিয়ে আনো তোমার সেই দিব্যকান্তি, সেই দেবীদুর্লভ রূপ। একটু আগে আমি যা কিছু তোমাকে বলেছি নাকি সবই খিদের মুখে প্রলাপ বাক্যস্বর, ভুল। হে কন্যা, তুমি সত্যিই অলোকসামান্য—কিন্তু আমার দাদাবৌদিদের তোমার পেট থেকে আগে উগরে না দিলে, আমি কী করে এখন তোমার সঙ্গে প্রেম করবো? ওঁরা দু'জন তোমার পেটে বসে থাকলে তো আমার ওঁদের সঙ্গেও অতি গর্হিত সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যাবে।—ওঁদের বরং তুমি আগে বের করে ফ্যালো। তারপর তোমার পূর্বরূপ ধারণ করে আমার কুটিরে পায়ের ধুলো দাও।" বলেই লক্ষ্মণ এক দৌড়ে নিজের কুটিরে পালিয়ে গেলেন। শূর্পণখার কুলোর মতো নখে তখন ছুরির মত শাণ ঝলসাচ্ছে, যেন এক একটা বিশাল ইস্পাতের কোদাল—ঘূর্ণমান অগ্নিগোলকের মতো চোখ থেকে অগ্নিবাণ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আর নিশ্বাস থেকে আসছে একরকম মারণ গ্যাসের সঙ্গে প্রেতপুরীর পচা দুর্গন্ধ। সেখানে একমুহূর্তও টেঁকা মারাত্মক। পালিয়ে গিয়ে তাঁর পর্ণকুটিরের ঘাসের দেয়ালের ফাঁক দিয়ে লক্ষ্মণ দেখলেন, শূর্পণখা যেমন কপাৎ করে রামসীতাকে গিলে ফেলেছিলেন, ঠিক তেমনই কপাৎ করে তাঁদের অনায়াসেই উগরে দিলেন। রামসীতা মাদুরে বসে হেসে হেসে কাটাকুটি খেলছেন। যেন কিছুই টের পাননি। "পারেনও বাবা দাদাবৌদি।" লক্ষ্মণ ঠোঁট উলটে বলে ফেললেন। তারপর কুটির থেকে নির্গত হলেন। কামবল্লীর অঙ্গ থেকে তখন আবার পদ্মের সৌরভ ছড়িয়ে পড়ছে, দুই চোখে মদিরার স্বাদ, চন্দ্রানন

থেকে শুক্লাচতুর্দশীর জ্যোৎস্না উৎসারিত হয়ে দ্বিপ্রহরের বনভূমিকে সন্ধ্যার মতো মাদকতাময় করে তুলেছে। প্রেমের তীব্র উন্মাদনায় এবং আশাপূরণের আশ্বাসে তাঁকে আগের চেয়েও ঢের সুন্দরী দেখাচ্ছে। লক্ষ্মণ এই দুর্দান্ত রূপের দিকে যেন চেয়ে থাকতে পারছিলেন না। তবু, কোনপ্রকারে কম্পিত হাতে তিনি কামবল্লীকে কোলে তুলে নিলেন।

কিন্তু কোলে ওঠার পূর্বে মোহিনী কামবল্লী লক্ষ্মণের কাছা-কোঁচা ঝেড়ে ঝুড়ে 'সুরক্ষা-যাচাই' করে নিলেন, কোথাও কোন অস্ত্র গোপন করা আছে কি না? লক্ষ্মণের কোমরে তরবারি ছিল।—"প্রণয়ে তো এ অস্ত্রের প্রয়োজন নেই রাজকুমার। সে যুদ্ধের অস্ত্র অন্যজাতের।" বলে, এক মাদকতাময় হাসিতে কামবল্লী মাত্র দুটি আঙুলে লক্ষ্মণের তরবারিটি শতটুকরো করে ফেললেন এবং হাতের পারিজাত পুষ্পের মালার একটি লক্ষ্মণের গলায় পরিয়ে দিলেন। অন্যটি তুলে দিলেন তাঁর হাতে। তারপরে লক্ষ্মণের অঙ্কশায়িনী হয়ে তার ঠোঁটের দিকে নিজের তৃষিত ওষ্ঠাধর তুলে ধরলেন। তাঁর হরিণ নয়নদুটি পরম বিশ্বাসে বুজে এলো। বিমোহিত লক্ষ্মণ শূর্পণখাকে চুম্বন না করে পারলেন না। কিন্তু চুম্বনরত অবস্থায়, তাঁর মাথা হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল। লক্ষ্মণ স্পষ্ট বুঝলেন, 'প্রাণ' যায় যায়রে, মুক্তির এই শেষ সুযোগ। "দাদাগো" —বলে চেঁচিয়ে উঠেই মরিয়া লক্ষ্মণ হঠাৎ ক্যাঁচাৎ করে শূর্পণখার তিলফুলের মতো নাকটি দাঁতে করে কামড়ে ছিঁড়ে নিলেন। হায়রে! কে যে রাক্ষস, আর কে যে মানুষ।

কিন্তু দাদাকে ডাকার দরকার ছিল না।

শূর্পণখা তাঁর তপস্যালব্ধ দৈববলের ফলেই অজেয়া ছিলেন। দৈববলের নিয়ম স্বেচ্ছায় দুর্বল না-হলে, তাঁর বল কেউই হরণ করতে পারে না। কিন্তু তিনি লক্ষ্মণের প্রেমে দুর্বল হয়ে স্বেচ্ছায় রাক্ষসী শরীর ত্যাগ করে সামান্য নারীদেহ ধারণ করেছিলেন। ওই মালাদানের মুহূর্তে, ওই চুম্বন ভিক্ষার লগ্নে, তাঁর দেহে রাক্ষসীর দুর্মদ শক্তি ছিল না। সেই দুর্লভ সুযোগেই লক্ষ্মণ তাঁর তিলফুলের মতো নাকটি এক কামড়ে কেটে নিয়ে থু-থু করে ফেলে দিলেন। শূর্পণখা যন্ত্রণায় রক্তাক্ত হয়ে কেঁদে উঠলেন।—"হায় লক্ষ্মণ! প্রেমিক হয়ে আজ তুমি আমার এ-কি সর্বনাশ করলে? আমি যে এই জন্মের মতো প্রেমবঞ্চিতা হয়ে গেলাম! হায় বোধহীন যুবক, আমি এই জীবনে আর কখনও প্রেম করতে সাহস পাবো না। কোনো পুরুষকে কি বিশ্বাস করা যাবে না? এমন কী যখন তুমি তার অঙ্কশায়িনী, তখনও নয়? আমি তোমার কী ক্ষতি করেছিলাম লক্ষ্মণ, যে তুমি আমাকে চিরদিনের মতো প্রেমহীনা, বলহীনা, দীনপ্রাণা করে দিলে?"

শূর্পণখার আকুল কান্নায় অস্থির হয়ে সীতা দৌড়ে এলেন। বল্কলের আঁচল ছিঁড়ে তার ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার চেষ্টা করলেন। এবং দেবর লক্ষ্মণকে যারপরনাই কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করতে লাগলেন।—"প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, এ তো এই নারী-

BanglaBook.org

জীবনের অঙ্গ, ভগ্নী কামবল্লী. এতে ভেঙে পড়তে নেই।" বলে তাকে সান্ত্বনাও দেবার চেষ্টা করলেন।—সীতা ধরিত্রীকন্যা, বনের ওষধি চিনতেন। ছুটে গিয়ে কী এক উদ্ভিদ তুলে এনে, শূর্পণখার ক্ষতে লাগালেন। যন্ত্রণা কমলো এবং রক্ত বন্ধ হলো। শূর্পণখা তখন সীতাকে বললেন—"এই স্বামী, এই দেবরটি. এরা কিন্তু তোমার লোক মোটেই ভালো নয়. সীতা। এরা কেউ তোমার উপযুক্ত নয়। তোমার স্বামী আমার রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, আমার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করেছিলেন, যখন তুমি স্নানে গিয়েছিলে। একবারও তোমার কথা আমাকে জানাননি। তিনি আমাকেও যেমন প্রতারণা করছিলেন, তোমাকেও তো তেমনি প্রবঞ্চনা করছিলেন। আর লক্ষ্মণ কীরকম নীচতা করতে পারেন তুমি স্বচক্ষেই দেখলে। ভগ্নী. চলো. তোমাকে লঙ্কায় নিয়ে যাই। স্বর্ণলঙ্কায় মেয়েরা অনেক বেশি স্বস্তিতে আছে, আমাকে দেখেই বুঝতে পারছো, আমরা কত স্বাধীন। প্রকৃতির কত কাছাকাছি। তুমিও প্রকৃতির কন্যা। অযোধ্যানগরী তোমার জায়গা নয়। অরণ্য বনানীই তোমার ভালো। চলো তুমি আমার সঙ্গে, যে-কোনো রাক্ষসভাইকে বিয়ে করে অনেক সুখী হবে।" সীতা দুই কানে হাত চাপা দিয়ে শিউরে উঠে বললেন—"পাগলী, তোমার ক্ষতস্থানের তীব্র যন্ত্রণায় মাথা খারাপ হয়ে গেছে—আমি তো রাক্ষসী নই, আমার এ-জীবনে আর দ্বিতীয় স্বামী সম্ভব নয়।—তুমি যাও, তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে যাও, এরা তোমার আরও কিছু ক্ষতি করে দেবার আগে, পালিয়ে যাও, কামবল্লী।" কিন্তু সীতার হাতটি নিজের হাতে ধরে কামবল্লী চুপ করে তাঁর মুখপানে চেয়ে রইলেন। তাঁর চোখে কি জল? সীতা অপ্রস্তুত স্বরে তাড়াতাড়ি বললেন—"আবার যেন রাগ করে বিপুলমূর্তি ধরে আমার দেওরকে খেয়ে ফেলো না ভাই। দেবর লক্ষ্মণ তোমার অশেষ ক্ষতি করেছেন ঠিকই, কিন্তু আমি তার হয়ে তোমার চরণ স্পর্শ করে মার্জনা ভিক্ষা করছি। মানুষের সব চেয়ে বড় গুণ ক্ষমা। তুমি ওকে ক্ষমা করে দাও!" অশ্রুপূর্ণ চোখে অদ্ভুত এক হাসি ফুটিয়ে তাঁর রক্তাক্ত বিক্ষত মুখ বিকৃত করে শূর্পণখা বল্লেন—"ক্ষমা? আমি তো মানুষী নই? ক্ষমা আমার দ্বারা হবে না। ভয় নেই সীতা. নিজের দোষেই আমি দৈবশক্তি হারিয়ে ফেলেছি। তপস্যালব্ধ অমিত বিক্রম থেকে প্রেমের দুর্বল মুহূর্তে আমি বিচ্যুত হয়েছিলাম স্বইচ্ছায়। এখন আমি সামান্য রাক্ষসী রাজকন্যা —স্বাধীন ইচ্ছারূপিনী, স্বচ্ছন্দগামিনী, কিন্তু দৈববলে বলবতী নই। তুমি আমার মতো ভুল কোরো না, মুগ্ধ হয়োনা. ভগ্নী সীতা। এই স্বামী, এই দেবর, এরা কেউই নির্ভরযোগ্য নয়। এরা তোমাকে তোমার দুঃসময়ে পরিত্যাগ করবে। মহাবীর লক্ষ্মণ তাঁর অঙ্কশায়িতা, আত্মসমর্পিতা, কামমুগ্ধা এক নারীর অঙ্গহানি করলেন বিনাদোষে। কিন্তু রামচন্দ্র তো ভাইকে ভর্ৎসনা করলেন না? অর্থাৎ তিনিও এইরকমই তঞ্চকতা করার স্বাভাবিক ক্ষমতা রাখেন। তোমার সঙ্গেও তিনি একদিন এমনই কিছু আচরণ করলে, অবাক হোয়ো না।"

রামমুগ্ধ সীতা, বেচারী মানুষী সীতা, দূরদর্শিনী রাক্ষসীর কথা হেসেই উড়িয়ে

দিলেন। বল্লেন—"ভগ্নী, তুমি অসুস্থ। তাই প্রলাপ বকছো, তোমার এখন বাড়ি গিয়ে অবিলম্বে নাকের ক্ষতের কবিরাজী চিকিৎসার প্রয়োজন।"—"শল্য চিকিৎসায় এক্ষুনি নতুন নাক লাগিয়ে দিতে পারবেন লঙ্কার নিপুণ চিকিৎসকেরা। তুচ্ছ নাকটার থাকা-না-থাকা কোনো কথাই নয়।" শূর্পণখা অবজ্ঞার সঙ্গে সীতাকে বললেন, "এতক্ষণ তুমি আমার পরিচর্যা করলে, শুশ্রূষা করলে, আমিও তাই তোমাকে যথার্থ শুভবুদ্ধি দিয়ে যাচ্ছি। ভগ্নীর প্রতি ভগ্নীর যা কর্তব্য। জীবনে যদি সুযোগ আসে, এই প্রতারক রামচন্দ্রকে পরিত্যাগ করতে দ্বিধা কোরো না। নতুবা নিজেই ঠকবে।"—বলতে বলতে শূর্পণখা রূপ বদল করে একটি ঝলমলে কিন্তু নাকভাঙা মাছরাঙা পাখি হয়ে রঙিন ডানা মেলে উড়ে গেলেন লঙ্কাদ্বীপের অভিমুখে।

সীতা মৃদু হেসে একটুক্ষণ তাঁর যাত্রাপথের দিকে চেয়ে থেকে কুটিরে ফিরলেন। সেখানে তখন লক্ষ্মণ কলাপাতায় ফলার বেড়ে দিচ্ছেন, আর বৌদির শ্রবণের অন্তরালে দাদার সঙ্গে যুবকোচিত হাস্যপরিহাস করছেন, সদ্য অঙ্গহীনা রাক্ষসীর যৌবনযন্ত্রণা এবং তার চিকিৎসা বিষয়ে। বাইরে থেকে দুই রাজপুত্রের রঙ্গরসিকতায় প্রাকৃতরুচির পরিচয় পেয়ে সীতার কর্ণস্থল লাল হয়ে উঠলো। মর্মাহত সীতা কুটিরদ্বারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর ওষ্ঠাধর ঈষৎ ফাঁক হলো এবং কম্পিত হতে লাগলো, ভ্রূ কুঞ্চিত হতে লাগলো। সহসা অসহায় বোধ করে সীতা কামরূপীর শেষ কথাগুলি স্মরণ করতে চেষ্টা করলেন।

BanglaBook.org

অমরত্বের ফাঁদে

সীতা অশোকবনে বসে সরমার সঙ্গে কড়ি খেলছিলেন। ওদিকে রাম-রাবণে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলেছে। সীতার মুখে নিরুদ্বেগ শান্তি, তিনি জানেন শ্রীরামচন্দ্রের জয় অনিবার্য; রাবণরাজার সবংশে নিধন অবশ্যম্ভাবী, এই আশায় তাঁর দুই চক্ষু উজ্জ্বল। হর্ষোৎফুল্ল বচনে সীতা সরমার কাছে রামের গুণগান করছিলেন। অকস্মাৎ প্রবল কোলাহল করতে করতে একদল ভয়ঙ্করী চেড়ী সেখানে উপস্থিত হলো। একজন বললে—"এই জানকী! খেলচিস কি? ওঠ, ওঠ, তোর জন্যে পুষ্পকরথ আসচে, তাতে চড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যা। ওঃ! সেখানে যা একখানা দারুণ দৃশ্য দেখতে পাবি না... ফার্স্ট ক্লাস"—আরেকজন বললে—"বড্ড যে স্বামীর গর্বে মটমট করছিলে? এইবার? এবারে কে তোমাকে রাবণরাজার দাসী হওয়া থেকে বাঁচায় দেখি। স্বামী, দেওর, দুটো লোকই তো পটল তুলেচে। এত করে যখন রানী হতে বললুম তখন তো রাজি হলে

না, এইবার ঠেলা বুঝবে।"

সীতা নির্ভয়ে বললেন—"তোমরা খলস্বভাবা চেড়ী—মিথ্যা ভাষণই তোমাদের চরিত্র। রামচন্দ্রকে পরাজিত করতে পারে এহেন শক্তি ইহজগতে কারোরই নেই।" বলে কড়ির চাল দিলেন।

চেড়ীরা রেগে গিয়ে বললে—"হাঃ, যুবরাজ ইন্দ্রজিৎ স্বর্গের ইন্দ্রকেও হারিয়ে ভূত করে দিয়েছে, ভুলে গেছিস? তার ক' মিনিটই বা লেগেছে রোগাপটকা রাম-লক্ষ্মণকে আচ্ছা করে নাগপাশের প্যাঁচ কষতে? দ্যাখ গে যা দু'ভাই কেমন অক্কা পেয়েছে। চিৎপটাং হয়ে পড়ে আছে, যেন মায়ের কোলে ঘুমোচ্ছে।"

সীতা গ্রাহ্য না করে বললেন—"তোমাদের দুর্বাক্য শ্রবণেও মহাপাপ; আমি তোমাদের কুকথায় মোটেই বিশ্বাস করি না। শত ইন্দ্রজিৎও মহাবলী মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের কাছে বালকণাবৎ।"

শুনে চেড়ীরা বললে—"যা না বাপু, স্বচক্ষে দেখেই আয় না। কী সুন্দর জিব বের করে কাৎ হয়ে পড়ে রয়েছে দু'ভাই—মড়া সেজে ওদের দারুণ মানিয়েছে কিন্তু, এটা বলতেই হবে কি বল?" বলেই মন্দচরিত্রা চেড়ীরা খলখল হাসা জুড়ে দিলে। তখন সরমার হাতটি ধরে জানকী সত্যি-সত্যিই মূর্ছা গেলেন। কিন্তু নাকে লঙ্কাপোড়া দিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই চেড়ীরা তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনলে। এবং "হায়, হায়, পতি গরবে গরবিনী সীতারানী এবার তো তোকে আমরা চপ কাটলেট করে খাবো।"—"যদি না রাবণ তোকে আগে খায়"—"যদি না রাবণরাজার সৈন্যসামন্তরা তোকে নিয়ে লোফালুফি খেলে—" "যদি না তোর হাত পাগুলো ভাগাভাগি করে রাবণরাজার নাতি-নাতনিদের চুষতে দেয়" ইত্যাদি বলে খ্যাপাতে লাগলো।

সীতা আবার জ্ঞান হারালেন। ধমকে-ধামকে দুষ্ট চেড়ীদের থামিয়ে সীতার সম্বিৎ ফিরিয়ে এনে সরমা তখন বললেন—"হে জানকী, আপনি একবার স্বচক্ষে দেখেই আসুন না কেন ব্যাপারটা কী? মহাবীর রাম-লক্ষ্মণ কি এত সহজে প্রাণ হারাতে পারেন? আপনি বৃথা ভয় পাবেন না, আমি যাচ্ছি যথার্থ সংবাদ আনতে।" উদ্বিগ্নপদে সরমা চলে গেলেন। ত্রিজটা তখন এসে সীতার হাত ধরলেন, বললেন—"কথাটা মন্দ নয়, পুষ্পক যখন এসেছে, তখন একবার রণস্থলে উপস্থিত হওয়াই তো ভালো।" অতঃপর সীতা আর ত্রিজটা রাক্ষসী পুষ্পকরথে আরোহণ করে আকাশে অদৃশ্য হলেন। পুষ্পকরথ মনোবৎ বেগবান—মুহূর্তেই সীতা চমকে উঠলেন—কোথায় অশোকবনের সেই নিভৃত শান্তি? এ যে রণভূমি। কিন্তু কই, এখানে তো যুদ্ধ হচ্ছে না। একদিকে রাক্ষস শিবিরে রাবণসৈন্যরা মহাউল্লাসে জয়োৎসবে মত্ত। গীত-বাদ্যে, পান-ভোজনে লিপ্ত। আর একদিকে বানরসেনারা ছিন্নভিন্ন, বিনষ্ট। সীতা দেখলেন, রাম-লক্ষ্মণ চেতনাহীন, প্রাণলক্ষণহীন, রক্তাক্ত শরীরে, বর্মশূন্য হয়ে, সর্বাঙ্গে শরবিদ্ধ অবস্থায় ধূলিতে পতিত। তাঁদের তূণীর দূরে নিক্ষিপ্ত, ধনুও হাতে নেই। তাঁদের সর্বশরীর যেন ঘন চোরকাঁটায় ভরা মাঠের মতো তীরে তীরে আচ্ছন্ন এবং তাঁদের দু'জনকে

মোটা-মোটা বিষাক্ত সাপ দিয়ে দড়ির মতোই আঁটসাঁট শক্ত করে বেঁধে ফেলা হয়েছে। হায় হায়, তাঁদের দু'জনকেই যে যথার্থ শবতুল্য দেখাচ্ছে—জানকী একেবারে ভেঙে পড়লেন, বৃদ্ধা ত্রিজটা রাক্ষসীর কাঁধে মাথা রেখে কাঁদতে কাঁদতে সীতা বলতে লাগলেন—"হায় হায়। দশরথাত্মজ! এই কি তোমাদের উচিত হলো? এখন আমাকে কে রক্ষা করবে? এই হতভাগ্য রাক্ষসের দেশেই আমার নবীন যৌবন বৃথা ব্যয় হবে? তবে যে জ্যোতিষীরা বলেছিলেন, আমি রাজরানী হবো? রাজগণক যা যা গণনা করেছিলেন তিনি কি মিথ্যা গণেছিলেন? হায় রাম। হায় লক্ষ্মণ। কুলস্ত্রীর যে-লক্ষণ থাকলে তার স্বামী রাজাধিরাজ হয়, তার বংশ যজ্ঞশীল উত্তরপুরুষে ধন্য হয়, আমার দেহে যে সেই সকল লক্ষণই বিদ্যমান। সামুদ্রিকশাস্ত্রে বলেছে মেয়েদের করচরণে পদ্মচিহ্ন থাকলে তার ফল বৃথা হতে পারে না, সে-মেয়ে রাজসিংহাসনে স্বামীসহ অভিষিক্ত হবেই—আমার তো হাতে পায়ে দিব্যি পদ্মচিহ্ন রয়েছে। হে ত্রিজটা, সে কি তবে মিথ্যে হলো? রাম, তুমি মৃত্যুবরণ করে যে সব শাস্ত্রকেই মিথ্যা করে দিলে?"

ত্রিজটা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—"আহা, জানকী, অত উতলা হচ্ছেন কেন, রাম-লক্ষ্মণের দেহ যতই শরবিদ্ধ থাক, মুখ দু'খানিতে জীবনের সব লক্ষণই স্পষ্ট। আমার মনে হয়, ওঁরা মরেননি।"

সীতা বললেন—"ত্রিজটা, তোমার কথাই যেন সত্যি হয়! কিন্তু—রাম-লক্ষ্মণ দু'জনেই যে মৃতবৎ ধূলি-লুণ্ঠিত হয়ে আছেন? বানরগণ প্রস্তরবৎ স্থির, অবনত মস্তক, এরা যে শোকেই নির্বাক, স্তব্ধ? হায় হায়, মা কৌশল্যার কী হবে, মা সুমিত্রার কী হবে? উর্মিলা ভগ্নীরই বা কী হবে? তবে কি জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী গণৎকারেরা মিথ্যা বলেছেন—? যেহেতু আমার চুলগুলি সূক্ষ্ম ঘন নীল এবং সমান; ভুরুদুটি জোড়া; এবং জঙ্ঘা রোমশূন্য ও সুগোল; দাঁত সঘন ও সমান; যেহেতু আমার ললাট ঈষদুচ্চ; হাত পা চোখ নাক সব যথাযথ মাপমতন; আমি নিম্ননাভি এবং নিবিড়স্তনী, এবং যেহেতু আমার গায়ের লোম যৎসামান্য এবং নরম, আমার হাসি মৃদুমন্দ—এইসব লক্ষণ দেখেই স্ত্রী-লক্ষণ বিশেষজ্ঞেরা আমাকে মহাসুলক্ষণা, লক্ষ্মীস্বরূপিনী, রাজরাজেশ্বরী, পুত্রবতী এবং অবিধবা হবো বলেছেন, হে রাম, তুমি যে মারা গিয়ে তাঁদের সে-সকল বাক্যই মিথ্যা প্রমাণিত করলে। আমি জানি শ্রীরামচন্দ্র আমার চেয়ে বেশি কাউকেই ভালোবাসেন না, আমি জানি আমিই তাঁর নয়নের মণি, তাঁর ধমনীর শোণিত, তাঁর ফুসফুসের বায়ু। সেই রামই যখন মৃত, তখন আমি আর মুহূর্তমাত্রও জীবিত থাকতে চাই না—এই রূপ-যৌবনই আমার কাল হলো—", বলে সীতা পুষ্পকরথ থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে গেলেন। ত্রিজটা রাক্ষসী তাঁকে জাপটে ধরে বললেন—"আহাহা ও কি, জানকী? এত বিচলিত হলে চলবে কেন? ধৈর্য ধরুন, আমি রাক্ষসী, আমি প্রাণহীন শব আর জীবিত প্রাণীর তফাত বুঝতে খুব পারি। রাম-লক্ষ্মণ অস্ত্রাঘাতে অচৈতন্য মাত্র, মৃত নন।

BanglaBook.org

তাঁদের মৃত্যু ঘটলে বানরদল এভাবে শান্ত থাকতো না, তারা শোকার্ত হাহাকার করে ভয়ে ছুটোছুটি করতো। রণক্ষেত্রের রূপই অন্য হতো। আমি বলছি, মহাবলী রাবণ আপনাকে মিথ্যা সংবাদ দিয়েছেন, আপনি অবিধবা। ওই দেখুন, ওই তো রামচন্দ্র ঘনঘন শ্বাস ফেলছেন, ওই তো চোখ মেললেন—"

ঠিক তখনই রামচন্দ্র সত্যি-সত্যিই পদ্মপলাশনেত্র মেলে চাইলেন। যদিও তাঁর সর্ব অঙ্গ ঘোর নাগপাশে আবদ্ধ এবং শত শত তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ, তবু মহাবলী শ্রীরামচন্দ্র চোখ মেলে লক্ষ্মণকে মৃতবৎ শয়ান দেখেই উঠে বসলেন এবং অশ্রুপাতপূর্বক করুণ স্বরে বিলাপ করতে লাগলেন। রাম বললেন—

"হায়, হায়, ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ। এ যে তুচ্ছ লাভের আশায় সুমহৎ ক্ষতি হয়ে গেল। আজ যদি তোমাকেই হারালুম তবে আমার সীতাকে নিয়ে কী হবে? প্রাণে বেঁচেই বা কী হবে? আমি কোন মুখে মা সুমিত্রার সামনে দাঁড়াবো? হায় হায়। সীতা গেছে যাক গে, অমন কত সীতাই আমার হবে, যদি কপালে বউ থাকে; কিন্তু লক্ষ্মণ ভাইটি তো আর হবে না? পিতা মহারাজ দশরথ তো কবেই মৃত। মা সুমিত্রা নিশ্চয়ই আমাকে অভিসম্পাত দেবেন, আমার জন্যেই আজ তিনি পুত্রহীনা। উর্মিলাও আমাকে অভিশাপ দেবেন, আমার জন্যই তিনি পতিহারা। হায় জানকী, তোমার জন্যই আজ আমাদের পরিবারের এই দুরবস্থা। তুমি বাইরের মেয়ে, পর। তোমাকে বাঁচাতে গিয়ে আজ আমি ঘরের ছেলেকে হারালাম। বউ গেলে নতুন বউ হয়, এটা কোনো ব্যাপারই নয়, কিন্তু পিতার অর্গলাভের পর কনিষ্ঠ ভ্রাতা গেলে নতুন ভ্রাতা তো আর পাওয়া যায় না। হায় জেদি জানকী, তুমি কেন উর্মিলার মতো লক্ষ্মী বাধ্য মেয়ে হয়ে ঘরে রইলে না? বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করবার ভয়ে আমার সঙ্গে বনে পালিয়ে এলে, এসে অবধিই এই দেবর লক্ষ্মণের অক্লান্ত সেবা পেয়েছ, পায়ের ওপর পা-টি তুলে বসে থেকেছ। ফলমূল আনা, রান্নাবান্না করা, সবই যে করেছে, সেই লক্ষ্মণ ভ্রাতাই আজ নেই। তুমি তো সীতা নিষ্কর্মা সুন্দরী, হায় রে তোমায় নিয়ে আমার কী লাভ? কেন আমি তোমাকে উদ্ধারের অপচেষ্টা করতে গেলুম? তোমার জন্যেই আজ আমি ভ্রাতৃহারা দুর্ভাগা—হা রাম। তুমি নীচ। তুমি কুকর্ম করেছ। ধিক তোমাকে, শত ধিক। তুচ্ছ নারীর মোহে পড়ে তুমি ভাইকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছ। নিবিড়স্তনী, নিম্ননাভি, কোমলরোমা, উচ্চ ললাট, নীল কেশরাজি এবং সুগোল জঙ্ঘাবতী জানকী তাঁর মৃদু-মন্দ হাসো আমাকে এতই মোহিত বিহ্বল করেছিলেন যে, তাঁর ছলনায় ভুলে আমি তাঁকে সুলক্ষণা ও জগতে দুর্লভা মনে করতুম—হায়। আজকে ঠিক বুঝেছি, তাঁর মতো দুর্লক্ষণা এই শ্রীলঙ্কার কোনো রাক্ষসীও নয়—হায় লক্ষ্মণ ভাইটি, একবার চোখ মেলে চাও—আমি সীতা-উদ্ধার ত্যাগ করে তোমাকেই কোলে নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করবো। চতুর্দশ বর্ষের বেশি আর দেরি নেই—ছলাকলাময়ী সীতা চুলোয় যাক, ভাইটি আমার একবার চোখ মেলুক—হে ঈশ্বর।"

—এতদূর শোনবার পরে শ্রবণে অসহ্য হতে ত্রিজটা বললেন—"জানকী—চলুন, আমরা এবার চলে যাই। সব তো শুনলেন? স্বকর্ণে এই বাক্যগুলি শ্রবণের পরেও কি আপনি রামচন্দ্রের সংসারে ফিরতে চান? তার চেয়ে রাবণেরই পত্নীত্ব গ্রহণ করুন—তিনি এরকম দুর্বল চরিত্র পুরুষ নন।" উত্তর না পেয়ে ত্রিজটা দেখলেন, সীতা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। তিনি আরো দেখলেন, গরুড় তাঁর বিশাল ডানা মেলে উড়ে আসছেন—ফলে আকাশে ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, প্রবল বেগে বাতাস বইছে, সমুদ্র বিক্ষুব্ধ এবং অরণ্য আন্দোলিত, এমন কী পর্বত পর্যন্ত প্রকম্পিত হচ্ছে—ত্রিজটা তাড়াতাড়ি পুষ্পক নিয়ে অশোকবনে ফিরে এলেন।

সীতা চোখ মেলে বললেন—"হায় রামচন্দ্র!" ত্রিজটা এবং সরমা তাঁর দু'পাশে ব্যজন করছিলেন। সীতা বললেন—"আমি কোথায়?"

সরমা বললেন—"আপনি এখনও অশোকবনেই, জানকী।"

ত্রিজটা বললেন—"চলুন, এবার বরং আপনাকে আমরা রাবণসভায় নিয়ে যাই। অথবা, দাঁড়ান, বরং রাবণের রথই আসুক, সাজসজ্জা, বস্ত্রভূষণ, চূয়াচন্দন নিয়ে। আপনার যথার্থ প্রেমিক যে কে, তা আজ আমরাও জেনেছি, আপনিও চিনে গেছেন। একজন আপনাকে লাভের আশায় সবংশে নিধন হতেও পশ্চাদপদ নন। ভ্রাতা কেন, পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রদের মৃত্যুও তাঁকে আপনার প্রতি বিমুখ করে না। আরেকজন? আরো দুই ভ্রাতা বিদ্যমান থাকতেও মাত্র একটি ভাইয়ের জন্য তিনি আপনাকে স্বেচ্ছায়, সানন্দে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। হে সীতা, এর পরেও কি আপনি সেই প্রেমহীন বিবাহবন্ধনে ফিরে যেতে চান?"

সীতা দুই কানে হাত চেপে বললেন—"ত্রিজটা, তুমি স্তব্ধ হও। তোমার বাক্য আমার হৃদয় অগ্নিশলাকার ন্যায় দগ্ধ করছে। আমি এসব কথা সহ্য করতে পারছি না। রণক্ষেত্রের রাম কদাচ আমার স্বামী নন।"

ত্রিজটা অবাক হয়ে বললেন—"অর্থাৎ? তিনি তবে কে?"

সীতা বললেন—"রাবণরাজা নিশ্চয় মায়া দ্বারা কোনো মিথ্যা রামচন্দ্র সৃষ্টি করে তাঁর মুখ দিয়ে ওইসব কুবাক্য বলিয়েছে যাতে আমি বিক্ষুব্ধ হয়ে রাবণের পত্নী হই। আমার রামচন্দ্রের প্রিয় বাক্যগুলি, তাঁর মৃদু-মধুর হাস্য, তাঁর প্রেমমদির দৃষ্টি, সবই যে আমার স্মৃতিকে নিত্য অলংকৃত রেখেছে! ওই কর্কশভাষী, কটুবাক, অশ্রুকাতর, কাপুরুষ, অপ্রেমী, রক্তাক্ত, পাশবদ্ধ ভূলুণ্ঠিত ব্যক্তিটি মোটেই আমার স্বামী নন। তোমরা আমাকে এক মায়াদৃশ্য দর্শন করিয়েছ। শুনেছি রামকে মায়া-সীতা দেখিয়েছিলে, এবার সীতাকেও মায়া-রাম দেখানো হলো।" বলতে বলতে সীতার চোখ প্রেমময় হলো, সীতা সাশ্রুনেত্রে বললেন—"হে প্রিয়! মুহূর্তের জন্যও আমি যে তোমাকে সন্দেহ করেছিলাম, তোমার প্রেমে বিশ্বাস হারিয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে ব্যথিত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম, সেই অপরাধের জন্য আমাকে তুমি ক্ষমা করো। আমি জানি তুমি লক্ষ্মণ-টক্ষ্মণ সকলের চেয়ে সীতাকেই বেশি ভালোবাসো। কতবার

'প্রাণাধিকে' বলে সম্বোধন করেছো। তুমি তো অনৃতবাক সামান্যজন নও। বৃদ্ধা ত্রিজটা, তুমি আমাকে বিভ্রান্ত কোরো না—এ সবই ক্রুর রাবণরাজার ছলাকলা, আমি বুঝেছি।"

শুনে ত্রিজটা আর সরমা চোখোচোখি করলেন। তাঁদের চক্ষু বিষাদপূর্ণ অশ্রুতে আচ্ছন্ন হলো। ত্রিজটা বললেন—"হায়, জানকী, নিয়তিকে বাধা দেবে, কার সাধ্য? প্রেমহীন, তৃপ্তিহীন, শান্তিহীন, রাজসম্মানহীন, রিক্ত, ব্যর্থ জীবনেই তোমার যখন এত আসক্তি, কে তোমায় রক্ষা করবে? তোমার গণৎকারেরা যা বলেছেন সবই মিলে যেতো, যদি তুমি প্রেমশূন্য রামচন্দ্রের বদলে প্রেমিক রাবণকেই তোমার স্বামিত্বে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিতে। কিন্তু তুমি মোহমুগ্ধা। তুমি স্বকর্ণে শুনেও বিশ্বাস করতে পারছো না যে, স্বামী জীবনে তোমার চেয়েও আর কারুকে বেশি ভালোবাসেন। এই অহং-ই তোমার পতন, এই অহং-ই তোমাকে অনেক দুঃখ দেবে।"

ক্রুদ্ধা, রক্তনয়না সীতা ত্রিজটাকে তৎক্ষণাৎ তিরস্কার করে উঠলেন—"দেয় তো দেবে। তোমার তাতে কী? আমার স্বামী আমাকে ভালোবাসেন কি না, সেটা আমি বুঝবো। প্রগলভা রাক্ষসী, তুমি আমার দাসী, দাসীর মতোই থাকবে। গুরুজনের মতো উপদেশ দিতে এসো না।"

সীতার কটুবাক্য শুনে ত্রিজটা অশ্রুমোচন করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। সরমা কিন্তু সীতাকে ভর্ৎসনা না করে পারলেন না।

—"ছিঃ সখী। এই নিতান্ত প্রাকৃতজনের মতো বাক্য আপনাকে মানাচ্ছে না। বর্ষীয়সী ত্রিজটা আপনারই শুভার্থিনী। এটুকুও শুভাশুভের বোধ কি আপনার বাকি নেই?"

এই কথায় সম্বিত এবং লজ্জা পেয়ে সীতা বললেন—"শোকে দুঃখে আমি কী বলতে কী বলেছি, তোমরা আমাকে মার্জনা করো সখি সরমা। কিন্তু ওই রাম-লক্ষ্মণ যে ইন্দ্রজালে নির্মিত মায়ামূর্তি ছিলেন না তার প্রমাণ কী? ইতিপূর্বেও বিদ্যাজিহ্ব আমাকে রামচন্দ্রের কাটামুণ্ড এবং কোদণ্ড দেখিয়ে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করেনি কি? তাতে বিফল হয়ে এটা নির্ঘাৎ কুবুদ্ধি রাবণের কোনো নতুন কৌশল।"

এবার সরমা আর অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। জানকীকে বক্ষে ধারণ করে সরমা সাশ্রুবচনে বলতে লাগলেন—"হায় সখি জানকী। এই কথা বলতে আমারই হৃদয় দীর্ণ-বিদীর্ণ হচ্ছে—আজ আপনি রণক্ষেত্রে যা প্রত্যক্ষ করেছেন, এবং যা আপনার শ্রুতিগোচর হয়েছে, তা নিতান্তই নির্মম বাস্তব। রাক্ষসের মায়াজাল নয়। হে সরলা সীতা, কঠোর বাস্তব অনেক সময়েই মায়ার চেয়েও অবিশ্বাস্য। এই নরজীবনে প্রতি মুহূর্তেই আমরা নূতন শিক্ষালাভ করি। আপনি মন শক্ত করুন।"

সরমা যে মিথ্যা বলেন না, সীতা তা জানতেন। সরমার কথা শুনে সীতা মৃতবৎ স্তব্ধ হয়ে ভূমিতে পড়ে রইলেন। যেন মাতা বসুমতীর কাছে সহনশক্তি প্রার্থনা করলেন। বুঝি মর্মর প্রতিমা। নয়নে অশ্রু নেই। চেড়ীরা পর্যন্ত সেই

BanglaBook.org

দৃশ্যে ভীত স্তব্ধ নিঃশব্দ হয়ে গেল।

এইভাবে যে কতক্ষণ কেটে গেলো কে জানে? এক-একটি মুহূর্ত যেন এক-এক যুগের মতো দীর্ঘ।

বহু, বহুক্ষণ পরে জানকী উঠে বসলেন। অস্তসূর্যের ন্যায় রক্তবর্ণ তাঁর মুখ। সীতা বললেন—"ত্রিজটা, অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করো। আমি প্রবেশ করি। জ্যোতিঃশাস্ত্র মিথ্যা। প্রেম মিথ্যা। সতীত্ব সাধনা মিথ্যা। এই পুরুষশাসিত সমাজে নারী ক্রীড়নক মাত্র। তার হৃদয়ের কোনো মূল্য নেই। এই পৃথিবীর জীবন আর আমার কাম্য নয়।" বলে সীতা নিজেই পর্যাপ্ত কাঠকুটো সংগ্রহ করে অগ্নিসংযোগ করলেন। ত্রিজটা এবং সবমা নির্বাক দ্রষ্টা, তাঁরা যেন স্থাণুবৎ। বাধা দেবারও শক্তি নেই। সীতা সৃষ্টিকর্তাকে প্রণাম জানিয়ে যেই না অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে যাবেন, অমনি স্বর্গ থেকে হুশ করে একটি ঢেঁকি নেমে এলো, তাতে নারদমুনি।

নারদ সবলে সীতাকে বাধা দিয়ে, মধুর বাক্যে বললেন—"হে দেবি! নিবৃত্ত হোন। এখনই মরবেন কেন? শ্রীরামচন্দ্রের কোনো দোষ নেই। দোষ সবই কবি বাল্মীকির। কাব্যের খাতিরে তিনিই রামচন্দ্রকে দিয়ে এই সকল কুবাক্য উচ্চারণ করিয়েছেন। ওগুলি আপনার শ্রবণের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়নি। পুরুষমানুষ মাত্রেই পত্নীর আড়ালে-আবডালে অমন কত কথাই বলে থাকে। সে সবই যদি আজ জগতের পত্নীদের শ্রুতিগোচর হতো তবে সংসারে একটিও দম্পতি একত্রে বসবাস করতো না। আপনি ওসবে কর্ণপাতও করবেন না। তাছাড়া, শোকের বশে তো মানুষ কতই ভুল বকে। প্রলাপবাক্যে কান দিতে নেই। শোকের মুখে যাই বলুন, রামচন্দ্র অবিলম্বেই আপনাকে উদ্ধার করতে আসছেন। রাবণবধের বিলম্ব নেই। দেবি! যমজপুত্রের জননী যদি হতে চান, তবে ধৈর্য ধরুন। অযোধ্যার রাজমহিষী যদি হতে চান, তবে ধৈর্য ধরুন। ভারতভূমির পবিত্র আদিকাব্যের মহানায়িকা হয়ে চিরজীবী যদি হতে চান, তবে ধৈর্য ধরুন। শুধু মনে রাখবেন, যে সয় সে রয়।"—এই বলে নারদ মৃদু-মধুর হাস্য করলেন। নারদমুনির চতুর স্তোকবাক্যে প্রলুব্ধা হয়ে পুনরায় মোহমুগ্ধা সীতা অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করার ইচ্ছা থেকে নিবৃত্ত হলেন এবং নিজের অজ্ঞাতসারেই দীর্ঘতর এক দহনজ্বালার মধ্যে প্রবিষ্ট হলেন।

আগুন নিবিয়ে সীতা আবার সবমার সঙ্গে কড়ি খেলতে বসলেন।

রণক্ষেত্রে তখন গরুড়ের কৃপায় রাম-লক্ষ্মণ পরিপূর্ণ তেজে দীপ্যমান। "সীতার উদ্ধার কিংবা আত্মার সংহার" বলে জ্বালাময়ী স্লোগান দিতে-দিতে রামচন্দ্র দ্বিগুণ উদ্যমে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

সেদিকে চেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাল্মীকি নারদকে বললেন—"ধন্যবাদ মুনিবর, আরেকটু হলেই রামায়ণ লেখা ঘুচে যাচ্ছিল আর কী! উঃ, কী কঠিন মেয়েদের চরিত্র! অতি জটিল!" মুচকি হেসে নারদ বললেন—"জটিল আর কোথায়? নারীর

জীবন কত নিরানন্দ, কত ফাঁপা, তা জেনেও তো সে অমরত্বের ফাঁদে পা দেয়—! নারীও পুরুষের মতোই নিজেকে ছলনা করে—কিংবা পুরুষের চেয়েও বেশি। রাম তাঁকে ভালোবাসেন না, তা জেনেও তো সীতা মহাকাব্যের নায়িকা হবার লোভ সংবরণ করতে পারলেন না? জীবনে কঠিন দুঃখের মূল্যেও তিনি শিল্পের অমরত্ব ক্রয় করতে রাজি।"

নারদের উত্তরে ধবধবে সাদা দাড়ি জটা চুলকে বাল্মীকি মহাকবি বললেন —"মুনিবর, মরজগতে যশোলাভই যে প্রবলতম রিপু—এ আমিও হাড়ে-হাড়ে টের পাই। সীতার আর দোষ কি। সে তরুণীমাত্র।"

সীতার পাতাল প্রবেশ

BanglaBook.org

কলাপাতাতে আরেকটু পায়েস ঢেলে দিতে দিতে খবর শুনে চোখ কপালে উঠলো, খোঁপা থেকে বল্কলের আঁচল খসে পড়লো। সীতা বললেন—"বাছারা, তোমরা সর্বনাশ করেছো। কাদের যজ্ঞের ঘোড়া ধরেছো? এক্ষুনি সৈন্যসামন্ত নিয়ে তেড়ে আসবে। বাল্মীকি আশ্রমে নেই, কী হবে?"

লবকুশ অবজ্ঞায় ঠোঁট উলটে বললে—"হবে আবার কী? অশ্বমেধের ঘোড়া ধরলেই যুদ্ধ হবে। এ আর না জানবার কী আছে? তা বলে সে ঘোড়া আশ্রমের গাছপালা খেয়ে ফেলবে?" দু'জনেরই ঠোঁটের ওপর স্নিগ্ধ শ্যামল গোঁফের রেখা, নিয়মিত শ্রমে পুষ্ট পেশি, কাকপক্ষ কেশ আশ্রমবালকের চূড়ায় বাঁধা। দুটি চোখ তো চোখ নয়, যেন নীল পদ্মফুল। দীর্ঘ, সতেজ, বর্ষার কচি দেবদারু গাছের মতো চেহারা। সীতা মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখলেন ঠিক এইরকমই দূর্বাদলশ্যাম একটি কিশোর অনায়াসে হরধনু ভেঙে ফেলেছিলেন জনকরাজার সভাগৃহে। এদের চরিত্রে যুদ্ধবিগ্রহকে ভয়ডর নেই।

তবু সীতা তাদের বোঝাতে বসলেন—"যুদ্ধ ভালো নয় বাছারা। তোমরা আশ্রমিক। তোমাদের যুদ্ধে কী কাজ? ও ঘোড়া তোমরা ছেড়ে দাও। ওতে অশান্তি আসবে।"

বড় বড় চোখ আরো বড় করে লব বললো—"ব্যাটা ঘোড়ার এত সাহস। বাল্মীকিমুনির অত প্রিয় পারিজাত গাছটা আরেকটু হলেই খেয়ে ফেলেছিল। পনস তো খেয়েইছে। নাঃ, মুনিবর আমাদের ওপর আশ্রমরক্ষার ভার দিয়ে গেছেন, ওকে আমরা ছাড়বো না। থাকুক ও শাল্মলী গাছে বাঁধা। দেখি, পৃথিবীর কোন রাজা এসে ওকে ছাড়াতে পারে।"

কুশ বললো—"তুমি ভেবো না মা, ও ঘোড়াব জন্য ভাববার কিছু নেই, আমরা ওকে ঠিক খাবার-দাবার দেবো। কিন্তু ছাড়বো না।"

সীতা জানেন এরা ইক্ষ্বাকুবংশের ছেলে। কারুর কোনো সদুপদেশ শোনা এদেব স্বভাব নয। বদ উপদেশ বরং শুনতে পাবে। সীতার অনেক কথা মনে পড়ে যেতে লাগলো। তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে আশ্রমেব কর্মে মন দিলেন। লবকুশ ভোজনান্তে নদীব ধাবে খেলতে চলে গেল। লবকুশের খেলা মানেই তো অস্ত্র অভ্যাস। সীতার ভালো লাগে না। কেন এত যুদ্ধ! কেন এত অস্ত্র! তিনি মাতা ধরিত্রীর সন্তান, যুদ্ধবিগ্রহে তাঁব চিবদিনেব বিরাগ। ঘোর বিতৃষ্ণা। শস্যবোপণ. বীজবপন, হলকর্ষণ এসব হলো মানুষকে বাঁচিযে বাখাব দিক। জীবনের শিল্প। আব অস্ত্রসজ্জা. অস্ত্রশিক্ষা. অস্ত্র তৈবি কবা, এবং যুদ্ধ—এ হলো ঠিক তাব বিপবীত। মৃত্যুব শিল্প। যুদ্ধে সীতাব ঘেন্না ধবে গেছে। লবকুশেব এই নিত্যনৈমিত্তিক যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলাও তাঁব একদম ভালো লাগে না। কী আশ্চর্য এই বক্তকণিকাস্থ অদৃশ্য শক্তিব চবিত্র গঠনেব ইন্দ্রজাল। যতই তাদেব আশ্রমে বেখে আজন্ম মুনিঋষির সৎসঙ্গে মানুষ করা হোক না কেন, যতই শাস্ত্রপাঠ করুক না কেন, বীণা বাজিযে কাব্যগীতি গাইতে শিখুক না কেন—সেই তারা নিজে নিজেই অস্ত্র বানিয়ে ফেলেছে, অস্ত্রচালনা শিখেও ফেলেছে নিজেবা নিজেরা খেলতে খেলতে। অলস অবসব সময়ের বিনোদন হিসেবে মারাত্মক সব অস্ত্র আবিষ্কাব কবে বসে আছে দুই বালক। সীতাব দৃঢ বিশ্বাস যুদ্ধবিলাসী নশ্বর মানুষের মৃত্যুযন্ত্রণা দেখে আমোদপ্রমোদ কবতে অভ্যস্ত অমব দেবতারা ওদেব গোপনেও কিছু অস্ত্রশস্ত্র দিযেছেন। কুশ যা হয বেড়া-বাণটা আবিষ্কার কবেছে, কিন্তু লবেব মহাবিষ্ণু বাণ? ও তো অমনি অমনি আসেনি? লবকুশ অস্ত্রগুলি বাড়িতে আনে না। নদীব তীরে গাছের কোটবে লুকিয়ে বেখে আসে। বেড়ালেব মাছ খেযে গোঁফ মুছে আসাব মতো। কিন্তু সীতা সবই জানেন. দিনে বাতে দু'ভাইয়ের অনেক মুগ্ধ গল্প তাঁর কানে যায। সব গল্পই অস্ত্রবিষযক, শাস্ত্রবিষযক তো নয। সীতা বোঝেন. ক্ষত্রিয়-রক্ত তার আপন কাজ করে চলেছে। সীতাব খুব খাবাপ লাগে। রত্নাকর বাল্মীকি যদি ডাকাতি ছেড়ে মহামুনি হতে পাবেন স্বেচ্ছায, এ-ছেলেবা আশ্রমে জন্ম নিযে আজন্ম সাত্ত্বিক জীবন যাপন করেও স্বভাবচরিত্রে সাত্ত্বিক হলো না, হলো সেই মহাক্ষত্রিয়. রাজসিক? সীতা মনেপ্রাণে যুদ্ধবিবোধী। যুদ্ধে তাঁব পবম ঘৃণা। সীমাহীন মৃত্যু, তলহীন নীচতা দেখেছেন তিনি শ্রীলঙ্কায়। ছেলেরা একদিন স্নানটান করে এসে খেতে বসেছে, লব বললো—"আজ যা মজা হযেছে না মা. এক ব্যাটা রাজা এসেছিল ঘোড়া ছাড়িযে নিতে। তাকে আচ্ছা শাস্তি দিয়েছে কুশ। দুই অক্ষৌহিণী সৈন্য সমেত সে ভো-কাট্টা!" সীতাব হাত কেঁপে খানিক অন্ন মাটিতে পড়ে গেল। সীতা লবকুশকে কোনো প্রশ্ন করলেন না। কযেকদিন বাদে খেতে বসে ছেলেরা হেসে গড়াচ্ছে দেখে সীতা জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? লবকুশ জানালো আরো দু'জন রাজা এসেছিল সেই অশ্বমেধেব ঘোড়াটা ফেরত নিতে, সব্বাই

খতম। চিৎপটাং হয়ে পড়ে আছে। "যেমন আশ্রমের শান্তি বিঘ্নিত করা। এবার চার অক্ষৌহিণী সৈন্যসমেত সবাইকে জবাই করেছি।"

সীতার চোখের একফোঁটা নোনা জল মিষ্টান্নের পাত্রে মিশে গেল। সীতা বললেন —"তোমরা তাহলে কেবল এইই করছ? কেবল মারামারি। দাঙ্গাহাঙ্গামা? শাস্ত্রপড়া, রামায়ণ গান এসব কোথায় গেল? পুজো-আচ্চা?"

—"সে-সব তো ভোরবেলায় করি, ব্রাহ্মমুহূর্তে। রোদ ওঠার পর অন্য খেলা।"

সীতা ভেবেছিলেন বাঘের বাচ্চা বুঝি নিরামিষাশী হবে। তা কি হয়?

—"মা। মা। দেখবে এসো, তোমার জন্য কী ধরে এনেছি।" পুত্রদের সমবেত চিৎকারে সীতা হাতের কাজ ফেলে রেখে ব্যাকুল হয়ে ছুটে এলেন। অদূরেই বীভৎস যুদ্ধ হচ্ছে, তিনি তা জানেন। আকাশ ছেয়ে গেছে বাণে বাণে। হুঙ্কার, টংকার আর মরণোন্মুখ জন্তু আর মানুষের শেষ চিৎকারে আশ্রমের শান্ত বাতাস নারকীয়। সীতা জানেন বলে লাভ নেই। ছেলেরা দু'দিন বাড়ি ফেরেনি, খেতে আসেনি, শুতে আসেনি। সীতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন ওদের মঙ্গলের জন্য। তিনি জানেন তাঁর পুত্রেরা দীর্ঘায়ু হবে। তাদের প্রাণভয়ে তিনি ভীত নন। তাঁর ভীতি পুত্রদের এই যুদ্ধপ্রীতিতে। যুদ্ধশেষে স্নান করে বস্ত্র পরে ছেলেরা বাড়ি এসেছে, এবারে খেতে বসবে। মা ছুটে এলেন জল নিয়ে, গামছা নিয়ে, কণ্ঠস্বরে বোঝাই যাচ্ছে এবারও তারাই বিজয়ী। ঘোড়া ছাড়েনি। কী জেদ। কী জেদ। এতটুকু-টুকু ছেলের! কিন্তু কার ছেলে দেখতে হবে তো?

বাইরে আসামাত্র তাঁর চক্ষু স্থির হয়ে গেল। নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেল, চরণ অচল, এবং হৃৎপিণ্ডও নিস্তব্ধ হয়েছে বলে তাঁর নিজের মনে হলো। সীতার মনে হলো তিনি পড়ে যাবেন।

"এই দ্যাখো মা, একটা ভাল্লুক আর একটা হনুমান ধরে এনেছি তোমার জন্যে। কী প্রাণ ব্যাটাদের মা। সব্বাই মরে গেল, এরা কিন্তু মরেনি। মূর্চ্ছা গেছে মাত্র। মূর্ছাভঙ্গ হোক, তারপর এদের আমরা পুষবো। ভারি মজার ভাল্লুক আর হনুমান এরা মা—প্রায় মানুষের মতোই।" সীতা একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন পুত্রদের পদতলে পতিত মহাবীর হনুমান আর মহাবল জাম্বুবানের দিকে। তারপর কেঁদে ফেলে বললেন, "ওরে, এ তোরা কাদের বেঁধে এনেছিস? ইনি হনুমান, আমার প্রথম পুত্র। তোদের বড় দাদা। আর ইনি জাম্বুবান। অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্রের এঁরা চির অনুগত ঘনিষ্ঠ সহচর। এ কী অবস্থা করেছিস এঁদের? তাড়াতাড়ি জল আন, পাখা আন"— সীতা হনুমানের মাথাটি কোলে নিয়ে সন্তানস্নেহে জল ঢালতে শুরু করলেন।

খানিক পরে হনুমান চোখ মেলেই তো তাঁর চক্ষুস্থির। লম্ফ দিয়ে উঠে পড়ে সোজা মাটিতে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। "সীতা মা। কতদিন পরে! এ তোমার কেমন চেহারা

হয়েছে মা?" আনন্দাশ্রুর বান ডাকলো। জাম্বুবানও উঠে বসেছেন। প্রণামান্তে দুজনই বললেন—"চলুন, দেখি, ছেলেদুটি রামচন্দ্রের কী অবস্থা করেছে।" সীতা যেন নিজেই এবার মূর্ছা যাবেন। রামচন্দ্র?

কোথায় তিনি? "কই পুত্রগণ, তোমরা তো আমাকে বলোনি রামচন্দ্র রাজার কথা—তিনি যে স্বয়ং এসেছেন—", সীতার অনুযোগ শুনে তাচ্ছিল্যভরে ছেলেরা বললে—"নিজে এসেই বা কোন লাভটা হলো? ঘোড়া কি নিতে পেরেছে? উল্টে নিজেই মূর্ছা গেছে। এই দ্যাখো না মা, সেই রাজার কেয়ূর-কুণ্ডল, তার ধনুর্বাণ তার রত্নমুকুট—সব খুলে নিয়েছি।" একটি একটি অতি পরিচিত বস্তু দেখেন আর সীতা আর্তনাদ করে ওঠেন। "ওরে ও বাছারা, তোরা কি সর্বনাশ করেছিস—শিগগির ফিরিয়ে দে—"।

বলতে বলতেই ছুটলেন যুদ্ধবিধ্বস্ত আশ্রম প্রাঙ্গণে। হনুমানও ছুটছিলেন, জাম্বুবান তাঁর লেজ ধরে টেনে আটকে রাখলেন।

"যাচ্চলে। এ তো বেড়ে মজা। মা এদের সব্বাইকে যে চেনেন? দেখিগে ব্যাপারখানা", বলতে বলতে লবকুশও মার সঙ্গে চললো।

অচৈতন্য রামের তো দেহে প্রাণ ছিলই। সীতা তাড়াতাড়ি বাল্মীকিকে টেলিপ্যাথিতে ডেকে পাঠালেন চিত্রকূট থেকে। এই ব্যবস্থা করাই ছিল। তখনকার দিনে টেলিফোন টেলিগ্রাফ টেলিপ্রিন্টার না থাকলেও টেলিপ্যাথির চল ছিল খুবই। কিন্তু চিত্রকূট বহুদূর—মনোরথে উড়ে আসার রাস্তা নয়। দিনদুয়েক লেগে যাবেই আসতে। রামনাম জপতে জপতে সীতা চললেন যুদ্ধক্ষেত্রে। না জানি কী দৃশ্য তাঁর দৃষ্টিগোচর হবে।

অনেকদিন যাবৎ সীতা আশ্রমবাসিনী। এখানে বসবাস করতে করতে তাঁর কতগুলো অন্তর্দৃষ্টি খুলে গিয়েছে। চিরকালই লাজুক, স্বল্পভাষিণী, সীতার সব আলাপ-আলোচনা নিজেরই সঙ্গে। মনে মনে। শ্রীলঙ্কায় অশোকবনে যেমন সখী সরমা ছিলেন, এখানে ঠিক তেমন কেউ নেই, বন্ধু শুধু বাল্মীকি। বৃদ্ধ হলেও সীতার সঙ্গে কিছুটা নিয়মিত সময় ব্যয় করেন তিনি। তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করতে করতে সীতার বদ্ধ ধারণা হয়েছে, প্রথম থেকেই রক্ষণশীল অযোধ্যাবাসীরা কোনকালেই তাঁকে সহজভাবে গ্রহণ করেনি—কেননা সীতার জন্মের ঠিক নেই। লক্ষ্মণপত্নী উর্মিলার জন্ম রাজা জনকের অন্তঃপুরে। রেশমের শয্যায়। কিন্তু 'সীতা' প্রকৃতির সন্তান। জন্মমুহূর্তে মাথার ওপরে আকাশ ছিল তাঁর, পিঠের নিচে মৃত্তিকা। লোকে বলে হলকর্ষণের ফলে জন্ম সীতার। এ তো সহজ কথা। নারীমাত্রেই ক্ষেত্র। আর যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার নামই কর্ষণ। পুরুষ নারীকে কর্ষণ করে বীজ বপণ করে তার গর্ভে। উৎপন্ন ফসলের নাম সন্তান। সীতা ক্ষেত্রজা—ক্ষেত্রে তাঁর জন্ম। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে, সত্যি কথাটা কেউ জানে না, একমাত্র জনকরাজা ছাড়া। সত্যি সত্যি তো ক্ষেত্রে মানুষ ফলে না। সত্যি সীতা বহুদিন বনে বনেই খেলেছেন, ফলমূল

BanglaBook.org

আহারেই তাঁর রুচি বেশি। জীবনে কটা দিনই বা তাঁর রাজকুমারের সঙ্গে রাজভোগ খেয়ে প্রাসাদে কেটেছে? সীতা ভাবেন দেবী বসুমতী সহসা কেনই বা জনকরাজার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক গড়তে যাবেন? তিনি অপ্সরা নন, কিন্নরীদের মতো চপলস্বভাবা নন। সীতা আজকাল তাঁর জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে মাঝে মাঝেই গভীরভাবে চিন্তা করেন। ক্ষেত্রে কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েটিকে জনকরাজা হঠাৎ এত মূল্য দিলেন কেন? সীতা জনকদুহিতা জানকী এতে কোনো সন্দেহ নেই তাঁর—জনকরাজার চুল যে অকালে একটি দীর্ঘ তেরছা রেখার মতো একইঞ্চি চওড়া অংশে পাক ধরেছিল, এখন সীতার চুলের ঠিক সেই অংশটিই অবিকল জনকরাজার মতো করেই পেকে উঠেছে। বাল্মীকি বলেছেন এটা নাকি বংশানুক্রমিক ব্যাপার। কিন্তু সীতার মা বসুমতী দেবী কে? নিশ্চয় এমন কেউ, যাঁর সৌন্দর্য জনককে পাগল করেছিল? কিন্তু যাঁর নিম্নবর্ণ তাঁকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যেতে দেখনি। শূদ্রাণী, চণ্ডালনী, যে-কোনো কিছুই হওয়া সম্ভব। উর্মিলার মতো নিশ্চিত নয় সীতার জন্ম। পিতা বিবাহের সময়ে উর্মিলাকে —"আমার দ্বিতীয় কন্যা" আর সীতাকে—"একে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা বলে পরিচয় দিয়ে থাকি"—বলে সভাতে উপস্থিত করেছিলেন, সীতা তখন বালিকা হলেও তফাৎটা তাঁর কানে লেগেছিল। এজন্যেই কি রামচন্দ্র সীতা সর্বসমক্ষে অগ্নিপরীক্ষায় সফল হবার পরেও নিন্দুকের কথায় কান দিয়ে পাঁচমাস গর্ভবতী পত্নীকে বিনাদোষে বনবাসে দিলেন, এবং জীবনে কখনও খোঁজ নিলেন না গর্ভস্থ শিশুর জন্ম হলো কিনা? ইক্ষ্বাকু বংশের আসন্ন সন্তান ধরাধামে অবতীর্ণ হলো কিনা? তবে কি শ্রীরাম চাননি যে সীতার গর্ভে ইক্ষ্বাকুবংশের ধারা রক্ষিত হোক? সীতা নিজে যে কোন গর্ভে জাতা, তারই যখন ঠিক নেই। একাকিনী বনে বসে বসে সীতার আজকাল এইসব কথা মনে হয়। অযোধ্যা থেকে চলে এসে ভালোই হয়েছে। বসুমতীর কন্যা, মানে পৃথিবীর সন্তান, প্রকৃতির কন্যা। প্রকৃতির সন্তান তিনি, প্রকৃতিতেই ফিরেছেন। দশরথ কিংবা জনকের মর্মরমণ্ডিত স্বর্ণখচিত রাজপ্রাসাদ তাঁর নয়। এই তরুচ্ছায়া, এই পুষ্পবন, এই নদীতট, এখানেই সীতার প্রকৃত ঠাঁই।

—"এই যে, মা, ঐ দ্যাখো রাজার অবস্থা। ধুকছে।"

সীতা চেয়ে দেখলেন।

সীতা চেয়ে রইলেন।

রক্তাক্ত মূর্ছিত প্রৌঢ় রামচন্দ্র লতাগুল্মের মাঝখানে পড়ে আছেন। বর্মহীন, মুকুটহীন, অস্ত্রহীন, মুদিতচক্ষু, অসহায়। ব্যাকুল হয়ে সীতা বললেন, "যাও যাও লবকুশ, কলসী ভরে জল আনো, এক্ষুনি এঁর শুশ্রূষা করা দরকার। ইনিই অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র।" বলতে বলতে সীতা অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। তাঁর মনে পড়ে গেল সেই রমণীয় উদ্যান। চন্দন অগুরু মধুক পারিজাত লোধ্র কদম্ব কী না ছিল সেখানে। যেন জগতের সব ফুল, সব ফল, সকল ভ্রমর গুঞ্জন আর বিহঙ্গকাকলিতে উজ্জ্বল বিমুগ্ধ সেই উদ্যানের দীঘিটির জল ছিল কাজলকৃষ্ণ। তারই

BanglaBook.org

মণিময় সোপানে তরুণী সীতা একদা যুবক রামের অঙ্কশায়িনী হয়েছিলেন। অদূরে কুসুমাস্তীর্ণ তৃণভূমিতে হরিণ-হরিণী ক্রীড়ারত ছিল। এই ভূমিতলে মূর্ছিত অর্ধবৃদ্ধ রাজপুরুষটি তখন তরুণ প্রেমিক। ইন্দ্র যেমন শচীর ওষ্ঠে সোমরস তুলে দেন, রামচন্দ্রও সীতার হাত ধরে তেমনি যত্নে মৈরেয় মদ্য পান করিয়েছিলেন। পানোন্মত্তা কিন্নরীরা অপ্সরীরা নৃত্যগীতাদির দ্বারা তাঁদের নন্দিত করেছিল। তার পরেই সীতার গর্ভলক্ষণ ধরা পড়ে। সেই আনন্দ চূড়ান্ত। সেই আনন্দ শেষ। সীতা বল্কলে চক্ষু মার্জনা করলেন। রামের দেওয়া চন্দ্রকান্তমণির হার দিয়ে তিনি স্নেহভরে হনুমানকে আশীর্বাদ করেছিলেন স্বামীর অনুমতি নিয়ে। সীতা দেখেছেন, অচৈতন্য হনুমানের কণ্ঠে আজও সেই মণিমালাটি শোভা পাচ্ছে। স্বামী শ্রীরাম সীতাকে বিস্মৃত হয়েছেন, কিন্তু সন্তান হনুমান তাঁকে মনে রেখেছে। সেও যে প্রকৃতির সন্তান, পবন আর অঞ্জনার প্রণয়ের ফসল। সে তো সামাজিক মনুষ্য নয় রামের মতন। আর হনুমানও, মহাবল, মহাবীর হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধবিগ্রহে আনন্দ পান না। তিনি নিজেই অনায়াসে সীতাকে উদ্ধার করে এনে রামরাবণের যুদ্ধটা প্রায় বন্ধই করে ফেলেছিলেন। কাব্যের ইতিহাস উলটে যাচ্ছিল আরেকটু হলেই। ফলমূলভোজী হনুমানকে সীতা সত্যি সন্তানস্নেহ করেন। তিনি জানেন বীর হনুমান মৃত্যুহীন, জাম্বুবানও তাই। তাই তাঁদের অচৈতন্য দেখেও সীতা ততটা বিচলিত হননি। তিনি এও শুনেছেন বাল্মীকির মুখে যে স্বীয় পুত্রের কাছে রামের পরাজয় বিধির লিখন। সেই লিখনই ফলেছে আজ। স্বামী নির্ঘাত চিনে নিয়েছেন লবকুশ তাঁরই ঔরসজাত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কেউ নেই যে রামচন্দ্রের চৈতন্যহরণ করতে পারে। এসব জানেন বলে সীতা এদিকে নিশ্চিন্ত, তবু হিন্দুপত্নীর কর্তব্যবিধি অনুযায়ী তিনি উদ্বিগ্ন ইত্যাদি হচ্ছেন। আজ বহুবৎসর পরে তাঁর অভ্যন্তরে যেন গুড়গুড় শব্দ করে একটি যুগযুগান্তের সুপ্ত আগ্নেয়গিরি ক্রমশ জেগে উঠছে। মনে মনে সীতা অনুভব করতে পারছেন আসন্ন ভূমিকম্প।

না, লবকুশ নয়। জাম্বুবান আর হনুমান বিশাল জলভাণ্ড বয়ে আনলেন। লবকুশ তাঁদের পিছনে পিছনে হাসাহাসি করতে করতে আসছেন। তপস্বিনী সীতাকে রামচন্দ্রের শিয়রে দেখে জাম্বুবান, হনুমান পুনরায় আভূমি প্রণিপাত করলেন। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁরা বললেন—"মা, তোমাকে এবার ঘরে ফিরতেই হবে।" অনেক অশ্রুপাতের মধ্যে, অনেক অনুনয়ের মধ্যে রামের অঙ্গে জলসিঞ্চনের কর্মটি সযত্নে চলতে লাগলো। যথাকালে রামচন্দ্র উঠে বসে লবকুশকে দেখে বললেন—"আমি কোথায়?" উত্তরে শুনলেন—"আপনি মহামুনি বাল্মীকির আশ্রমে বন্দী।" রাম এবার স্পষ্ট নেত্রে চেয়ে দেখলেন বীর্যবান নবদূর্বাদলশ্যাম কিশোরদুটির দিকে। যমজ ভাই দুটি, বালক রামের হুবহু প্রতিমূর্তি। রাম সবই বুঝলেন। আরামের দীর্ঘশ্বাস পড়লো তাঁর। আঃ। যাক। যজ্ঞাশ্ব তাহলে ঠিক মানুষের কাছেই এসে পৌঁছেছে। অশ্বমেধ যজ্ঞে বাধার প্রশ্ন নেই, ইক্ষ্বাকুবংশের রাজকুমারের হাতেই অশ্ব ধরা পড়েছে। রাম বললেন—"বাছারা, তোমাদের বীরত্বে আমি মুগ্ধ। তোমরা আশ্রমবাসী বালক কিশোরমাত্র, দুজনে মিলে

ক'দিনের মধ্যে শেষ করেছো ছিয়াত্তর অক্ষৌহিণী সৈন্য—কোটি কোটি হস্তী অশ্ববথ —এবং ইক্ষ্বাকুবংশের চারজন রাজা আজ তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত। তিনজন নিহত। তোমাদের ভাগ্যবান পিতার নামটি আমি শুনতে চাই।" সীতা ইতিমধ্যে কখন সরে গিয়েছেন বৃক্ষরাজির অন্তরালে।

হেসে লবকুশ বললেন—"আমাদের পিতার নামে আপনার কাজ নেই, বরং নিজের ইষ্টদেবের নাম করুন, আপনাকে আজ কেউ রক্ষা করতে পারতো না। কেবলমাত্র মাতৃবাক্য অনতিক্রম্য, তাই মায়ের আদেশে আমরা আপনার প্রাণ ফিরিয়ে এনেছি। এবং আপনার সাগরেদদেরও ছেড়ে দিয়েছি। যত রাজ্যের জাম্বুবান-হনুমানদের নিয়ে আপনার সেনাদল, এমন তো বাবা জন্মে দেখিনি, কেবল রামায়ণ গানেই যা শুনেছি। হায় হায়, এই নাকি ইক্ষ্বাকুবংশের বীরত্ব? ঘোড়া ছাড়াতে যেই আসছে, সেই হেরে যাচ্ছে? আমরা বীর নই। আপনারাই অক্ষম।"—রামচন্দ্র অবাক হয়ে পুত্রদের কথা শুনছিলেন। ঠিক যেন কিশোর বয়সের ভরত-শত্রুঘ্নদের কণ্ঠ। নির্বাসিতা অপাপবিদ্ধা সীতার জন্য তাঁর প্রচণ্ড মন কেমন করে উঠল। রাজ্যশাসন কী প্রচণ্ড কঠোর কর্ম। জেনেশুনে পাঁচমাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে তিনি পরিত্যাগ করেছেন, মুখ ফুটে বিদায়টুকু পর্যন্ত নেননি। দেননি কোন কৈফিয়ৎ। অবিকল স্বর্ণসীতা গড়ে দিয়েছেন বন্ধুবর বিশ্বকর্মা (একটা কথা রামকে ভাবায়—বিশ্বকর্মা কেমন করে যে জানলেন সীতার রামবক্ষের তিলটির কথাও, তা রাম আজও বোঝেন না।।) তারই দিকে চেয়ে-চেয়ে এতবছর তো কেটে গেল। দ্বিতীয়া রমণী তাঁর জীবনে আসতে দেননি। তবু, রাম এত বৎসরের অদর্শনে সীতার জন্য আকুল হয়ে পড়লেন। হনুমান জাম্বুবান ইতিমধ্যে পুনরায় জল আনতে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে শ্রীরামচন্দ্রকে উজ্জীবিত দেখে উল্লাসে আত্মহারা হয়ে বৃক্ষশাখায় উঠে তা থেকে পুনঃ পুনঃ লাফ দিয়ে মাটিতে পড়তে লাগলেন হনুমান। আর জাম্বুবান আনন্দের বেগে আশ্রমের একটি মৌচাক ভেঙে মধুপান করে ফেললেন। মৌমাছিরা ক্ষিপ্ত হয়ে চতুর্দিকে ছুটলো। তারা সম্মুখবর্তী রামকেই আক্রমণ করতে দলবদ্ধ হয়ে উড়ে আসছে দেখে সীতা আর লুকিয়ে থাকতে পারলেন না। ছুটে এসে তিনি মিষ্ট-কঠোর ভাষায় মৌমাছিদের শাসন করলেন। মৌমাছিরা আশ্রমবাসিনী সীতার পোষ্য। তারা ফিরে গেল। শ্রীরামচন্দ্র চমকে উঠলেন। দেখলেন মধ্য সূর্যের মতো পূর্ণ দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়েছে সীতার যৌবন। রাম সীতার জন্য অন্তরে অন্তরে কামনা অনুভব করলেন। তাঁর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হলো। তিনি দৃষ্টি আনত করলেন। সীতাই এগিয়ে এসে প্রণাম করে বললেন—

—"প্রভু, একটু ভালো বোধ করছেন তো?" মরীয়া হয়ে জাম্বুবান-হনুমান সমস্বরে বলতে লাগলেন—"প্রভু! আর নয়, ঢের হয়েছে। পরের কথায় কান দেবেন না, এবার সীতা মা জননীকে ঘরে নিয়ে চলুন। আপনার এই দুই অমিতবিক্রম পুত্র, ইক্ষ্বাকুবংশের সর্বোত্তম দুটি সন্তানকে নিয়ে তিনি আর কতকাল আশ্রমবাসিনী হয়ে থাকবেন বল্কল পরিধান করে, ফলমূল ভোজন করে? প্রভু, রথ, অশ্ব সবই

তো গেছে। বরং আমরা গিয়ে অযোধ্যানগরী থেকে নতুন সুসজ্জিত রথ, অশ্ব আনছি, আপনারা সপরিবারে ফিরে চলুন। আপনি আমাদের কারো সঙ্গে পরামর্শ না করেই তো এমন মহান বিভ্রান্তির মধ্যে চলে গিয়েছিলেন, এবারে বন্ধুদের সৎবাক্যে কর্ণপাত করুন প্রভু। নিন্দুকের মন্দবাক্যে নয়। সীতামায়ের জন্যই আমরা সবাই আজ এত তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়েছি. সীতামায়ের করুণার কথা কে না জানে। বনের মৌমাছি পর্যন্ত তাঁর বশ। কেবল আপনিই কেন যে—"

চকিতেই সচেতন হয়ে রাম বললেন—"তোমরা কি পাগল হয়েছো? ভরত, শত্রুঘ্ন, লক্ষ্মণ আজ মৃত। আমি একা ফিরবো অযোধ্যাপুরীতে? তাও সীতা এবং আপন পুত্রদের নিয়ে? দেখে মনে হবে কী? না না। আমি ওসব পারবো না। আমি এখনই অদূরে সরযূনদীতে প্রাণ বিসর্জন দেবো। তোমরা বরং সীতার পুত্রদের নিয়ে যাবে তো নিয়ে যাও। আমার আপত্তি নেই। তবে হ্যাঁ, অযোধ্যার মূল সিংহাসনে বসিও না যেন। ভরত, শত্রুঘ্ন, লক্ষ্মণ সকলেরই তো দুটি করে পুত্র আছে, ভরতই যুবরাজ। ভরতের পুত্ররা অযোধ্যায় বসুক। এদের অন্য কোথাও, কোশল-টোশলে—"

সীতা এই সময়ে ধীর শীতল কণ্ঠে বললেন—"থাক, মহারাজ। আমার পুত্ররা এখনও আশ্রমের পাঠই শেষ করেনি। তারা এখনই রাজপাটে বসবে না। আপনি, হনুমান ও জাম্বুবান স্নান করে আসুন, অন্ন মিষ্টান্ন ভোজন করে বিশ্রাম করুন। তারপর যদি সতী হই, তাহলে আমার এই স্পর্শেই দেবর লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, ভরত সসৈন্যে পুনর্জীবিত হবেন। আপনার শোকের কারণ নেই। তবে ততক্ষণে বাল্মীকিকে এসে পড়তে দিন, একসঙ্গে এত অক্ষৌহিণী সেনা জীবিত হলে কী হবে, সেটা আশ্রমাধিপতি স্বয়ং না এলে ঠিক করা যাবে না।" বলে ধীরপদে সীতা চলে গেলেন। রামচন্দ্র নিঃশব্দে সেই হংসগামিনীর গমনপথের দিকে চেয়ে রইলেন। স্বর্ণসীতা যে কত মিথ্যা সান্ত্বনা, তাঁর কাছে সে সত্য প্রকট হয়ে উঠলো। তিনি আরো টের পেলেন, এ সীতা সোনার নয়, লোহার। সীতা আর মাটির মানষী নেই।

বাল্মীকি বললেন "রামচন্দ্র, আপনার সেনাপতিরা এবং ভ্রাতা শত্রুঘ্ন তো সৈন্য সামন্ত রথ অশ্ব সমেত অযোধ্যা রওনা হলেন কিন্তু লক্ষ্মণদের যে সীতাকে না নিয়ে আশ্রম ছেড়ে যেতে রাজী নন? তিনি সীতার পদতলে মূর্ছিত হয়ে 'মা, মা' বলে অশ্রুবিসর্জন করছেন।"

রামচন্দ্র বললেন "বেশ, তবে আপনিই বলুন, সীতাকে কি নিয়ে যাবো? লক্ষ্মণ তো চিরকালই একগুঁয়ে। এতদিন বনবাস করার পর, সীতাকে ফের রাজপুরীতে নিয়ে গেলে সেই তো আবার প্রজারা গণ্ডগোল করবে। আপনি মশাই সবই তো বোঝেন স্যার। নইলে আমার কি ভালো লাগে নিঃসঙ্গ রাজপ্রাসাদে একাকী স্বর্ণসীতাটি নিরীক্ষণ করে দিবারজনী নির্বাহ করতে। সীতাকে কি আমি স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়েছিলাম? সেই সমস্যা তো আজও আছে।"

বাল্মীকি বললেন—"হনুমান, জাম্বুবানও সীতার পদতলের ভূমিতে সলাঙ্গুল প্রলম্বি হয়ে ওই একই আরজি পেশ করছেন।" রাম বললেন—"কি আশ্চর্য। আমারই পার্ষদবৃন্দ আমাকে একবার অনুমতিপ্রার্থনা করলে না?" বাল্মীকি বললেন—"কিন্তু ভরত? তিনিও যে অনড় হয়ে বৃক্ষতলে বসে আছেন, লবকুশকে কোলে নিয়ে। সীতাকে না নিয়ে তিনিও অযোধ্যায় যাবেন না। এখন আমি কী করি? সামান্য কবি মাত্র, আমি রাজা-রাজড়ার কী ব্যবস্থা করতে পারি? আপনিই বরং চলুন, আপনি রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, আপনার রাজ্যে কেউ বিধবা হয় না, কেউ সন্তানহারা হয় না, আপনার ক্ষমতাই আলাদা। দেখুন কী করবেন। সতীত্বতেজে সীতাই আপনার হস্তীঅশ্বসৈন্যসামন্ত প্রত্যেকের এবং তিন ভ্রাতার প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন। অযোধ্যাপুরীর মানুষ সেটা মানবে বৈকি। কৃতজ্ঞতা নেই?" শ্রীরামচন্দ্র দীর্ঘকাল চিন্তা করলেন। তারপর উঠে ধীর পায়ে সীতার সমীপে উপস্থিত হয়ে গম্ভীর গলায় বললেন—"সীতা, তবে চলো। লবকুশকে নিয়ে তোমার স্বস্থানে ফিরে চলো। তুমি রাজকন্যা, রাজবধূ, রাজরানী। এই আশ্রম তোমার স্থান নয়। ইক্ষ্বাকুবংশধরদের যোগ্য স্থানেই তারা এবার মানুষ হোক। চলো সীতা, স্বগৃহে চলো।"

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন হনুমান, জাম্বুবান। ভরত বৃক্ষতলে নড়ে বসলেন। লক্ষ্মণ সীতার পদতল ছাড়লেন না। সীতা স্তব্ধ হয়ে রইলেন। নতমুখে পায়ের নখ দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটতে লাগলেন। তারপর বললেন—"পিতা বাল্মীকি। মহারাজ রামচন্দ্রের উদার আহ্বানের জন্য আমি কৃতার্থ। কিন্তু আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন। এখন আপনার কিঞ্চিৎ সেবাশুশ্রূষার প্রয়োজন। এতদিন আমাকে কন্যাবৎ প্রতিপালন করলেন, আমার সন্তান জন্ম, সন্তান পালন সবই আপনার কৃপায় সম্ভব হয়েছে। এখন আপনাকে পরিত্যাগ করে রাজভোগের আশায় আমি চলে যাবো না। মহারাজ রামচন্দ্রকে বলুন—তিনি বরং লবকুশকে নিয়ে যান। এই আশ্রম সত্যিই তাদের মতো ক্ষত্রিয়শিশুর স্থান নয়। তারা বড় অস্ত্র ভালোবাসে।"

বাল্মীকি বলে উঠলেন—"সেকি কথা, সীতা মা? স্বামীগৃহে যাবে, সেটাই তো স্ত্রীর ধর্ম? বৃদ্ধ পিতাকে সকল কন্যাই ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হয়। ও নিয়ে ভেবো না, আমার বারোশো শিষ্যই আমাকে দেখবে। তুমি রামের সঙ্গে যাও। আমার তাই ইচ্ছা।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সীতা বললেন—"পিতা। স্বামী আমাকে ভালোবেসে তো ফিরিয়ে নিতে আসেননি। তিনি যাঁদের সত্যি ভালোবাসেন, তাঁদের চাপে পড়ে এই কথা বলছেন। আপনি আমাকে ওঁর সঙ্গে যেতে বলবেন না। ভরত, লক্ষ্মণ, হনুমানদের ইচ্ছার কাছে হার মেনে ওঁর এই আমন্ত্রণ, তাও কি আপনি টের পাচ্ছেন না? এতে ওঁর নিজস্ব সায় নেই।"

বাল্মীকি বললেন—"কারণ যাই হোক, মুখে যখন বলেছেন তখন সেইটাই সব। তুমি মা, স্বামীর সঙ্গে যাও। এখনও তোমার উজ্জ্বল মধ্যযৌবন, জীবন অনেক

BanglaBook.org

বাকি। কেন মা বৃথা এখানে কৃচ্ছ্রসাধনে কাটাবে, তুমি রাজার দুলালী।"

সীতার চক্ষে একঝলক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বললো। সঙ্গে সঙ্গে মুক্তাফলের মতো চকচকে গালে একবিন্দু অশ্রুও গড়িয়ে পড়লো। তিনি বললেন—"রাজার দুলালীরা কি তপ্তকের ঘর করে? পিতা, আমার স্বামী প্রবঞ্চনা করে আমাকে গৃহহারা করেছিলেন। অন্তঃসত্ত্বা পত্নীকে মালঞ্চের মধুর মলয়ে (পিতা, এই বাক্যটি ক্ষমা করবেন) সপ্রণয়ে কোলে বসিয়ে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, 'সীতে, তোমার কী খেতে ইচ্ছে করে?' আমি বলেছিলাম—'আমার এখানকার কোন কিছু খাদ্যেরই অভিলাষ নেই। সেইসব বনবাসের দিনের জন্য আমার মন কেমন করে। ছায়াঘন শান্ত কুটির, সেই মুনিপত্নীদের স্নেহ, সেই সুমিষ্ট ফলমূল, শীতল নির্ঝরিণীর অমৃতজল—আশ্রমের দিনগুলিকে আরেকবার স্পর্শ করতে ইচ্ছে করে'।—স্বামী সস্নেহে বলেছিলেন, 'তাই হবে।' সেই সাধের সুযোগ নিয়ে পরদিন সুমন্ত্র আর দেবর লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে আমার স্বামী আমাকে একবস্ত্রে বনবাসে পাঠালেন। নিজে সঙ্গে তো এলেনই না রাজকার্যের দোহাই দিয়ে, রাজসভার ব্যাঘাত হবে এই দোহাই দিয়ে আমাকে বিদায় পর্যন্ত নিতে দিলেন না। রাজ্যের নিন্দুকদের সভায় ডেকে এনে দিনের পর দিন আপন ধর্মপত্নীর নামে মিথ্যানিন্দা যিনি সোৎসাহে শ্রবণ করেন, এবং সেই মতে জনপ্রিয়তার লোভে নির্দোষের শাস্তি বিধান করেন, সেই স্বামীর ঘর করতে আপনি আমাকে বলবেন না।

"জনপ্রিয়তার লালসায় শ্রীরামচন্দ্রের ধর্মাধর্মজ্ঞান ছিল না। তিনি বিনা অপরাধে আমাকে প্রবঞ্চনাপূর্বক অযোধ্যাপুরী থেকে নির্বাসন দিয়েছিলেন। আমার গর্ভে তাঁর সন্তান ছিল, সেকথা জেনেশুনেই। এমন স্বামীর ঘর করতে আপনি আমাকে বলবেন না। অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ পত্নীকে যিনি স্বমহিমায় জনসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন না, বরং ভীরুর ন্যায় নির্বাসন দিয়ে মন্দজনের নিন্দাবাক্যকেই জয়ী করেন, সেই দুর্বল, প্রবঞ্চক, অসাধু প্রেমিকের অন্নবস্ত্র আশ্রয় আমার আর আকাঙ্ক্ষিত নয়। পিতা, আমাকে আপনি মার্জনা করুন। লবকুশ যাক, নিজেরা পুত্রের অধিকার বুঝে নিক। আমি আশীর্বাদ করছি ইক্ষ্বাকুবংশ চিরজীবী হোক। ভ্রাতা ভরত, লক্ষ্মণ, পুত্র হনুমান, জাম্বুবান, আমাকে তোমরা ক্ষমা করো। রাজপ্রাসাদ নয়, আশ্রমের এই সাত্ত্বিক জীবনই আমার পছন্দ। আমি বসুমতীর সন্তান, এই আকাশ-বাতাস, তৃণভূমি-তরুমূলেই আমার জন্ম, এই সীতার স্বস্থান।"

সীতা রামচন্দ্রের সঙ্গে একটিও বাক্যবিনিময় করলেন না।

অযোধ্যাপুরীতে পৌঁছেও রামচন্দ্রের কান অপমানে রক্তবর্ণ হয়ে রইল। মাকে ছেড়ে লবকুশও আসেনি। তবে বাল্মীকি কথা দিয়েছেন, অশ্বমেধের যজ্ঞ যখন হবে, তখন সপুত্রক সীতাকে নিশ্চয় আনবেন। রামচন্দ্র বুঝলেন ঘরে তাঁর স্বর্ণসীতা, আর আশ্রমে আছেন এক মর্মর সীতা, যাঁকে নিজস্ব সিদ্ধান্ত থেকে একচুল নড়ানো যাবে না।

BanglaBook.org

প্রবঞ্চক, তঞ্চক, জনপ্রিয়তা-লোলুপ, অধার্মিক, দুর্বল চরিত্র, নির্দয়, কী না বলেছেন সীতা সেদিন রামচন্দ্রকে। এক রাবণ ভিন্ন রামচন্দ্র জীবনে কারো কাছে সমাদর ভিন্ন গালি পাননি। সেই রাবণকে তিনি হত্যা করেছিলেন। সবংশে নিধন করেছিলেন। সীতার জন্য নয়, সূর্যবংশের নামরক্ষার জন্য। প্রেম যখন প্রতিহিংসায় পরিণত হয় তখন তার চেহারা অতি বীভৎস। অপমানিত হয়ে রামচন্দ্র রুদ্ধদ্বার কক্ষে দু'তিনজন ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টার সঙ্গে গোপনতম আলোচনায় বসলেন। লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন পর্যন্ত ঘুণাক্ষরে টের পেলেন না।

যজ্ঞকাল উপস্থিত। দেশসুদ্ধ মুনিঋষির সঙ্গে বাল্মীকিও এলেন, সঙ্গে সীতাদেবী নেই। দুপাশে বীণাযন্ত্র হাতে লবকুশ। রামচন্দ্র বললেন—"কই, সীতাকে তো আনলেন না।" বাল্মীকি বললেন—"সীতা এসেছেন, তিনি সভাস্থলে আসেননি। প্রয়োজনমতো যজ্ঞস্থলীতে উপস্থিত হবেন। স্বর্ণসীতা নয়, এবার সত্য সীতাকে নিয়েই আপনার যজ্ঞকর্ম সম্ভব হবে। কিন্তু যজ্ঞান্তে তিনি আমার সঙ্গে ফিরে যাবেন, লবকুশকে আপনার কাছে রেখে। এই শর্তেই তাঁকে আসতে রাজি করিয়েছি।"

রামচন্দ্র বললেন—"সীতাকে একবারটি সভায় আনবেন না? এই যে আমার পাশের স্বর্ণসিংহাসন চিরকালই শূন্য রইল, সীতা একবার তাতে উপবেশন করে অযোধ্যার রাজসভা উজ্জ্বল করবেন না? লবকুশ যখন রামায়ণ গাইবে, অন্তত তখন সীতা বরং সভায় এসে বসুন।" বাল্মীকি সম্মত হলেন।

সীতা সভায় প্রবেশ করলেন, যেন রাজগৃহে অকস্মাৎ অগ্নি প্রজ্বলিত হলো। সভার আলো শতগুণ দীপ্ত হয়ে উঠলো। উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ দাঁড়িয়ে উঠে আপনিই সীতার বন্দনাগান গাইতে শুরু করলেন। অন্তঃপুরিকারা ছুটে বেরিয়ে এলেন সীতাসন্দর্শনে। কৈকেয়ীর চোখে দরবিগলিত অশ্রুধারা। রামচন্দ্র স্বয়ং উঠে দাঁড়িয়ে ইন্দ্র যেমন শচীর হাত ধরে স্বর্গের সিংহাসনে বসান, তেমনি সীতাকে তাঁর পাশে সোনার সিংহাসনে বসালেন। সীতার পরনে রাজবেশ নয়—আশ্রমবাসিনীর পট্টবস্ত্র। মুখে সৌম্য স্মিত হাসি, চোখে অসীম করুণা। যেন জগত্তারিণী। লবকুশ সাতদিন ধরে রামায়ণ গান করলেন, প্রতিদিন সীতা এসে রামচন্দ্রের পাশে নিঃশব্দে বসলেন। শেষদিনে বেশ সহজ সুরে রামচন্দ্র বললেন—"সীতে, আমার প্রজারা বলছে যজ্ঞের পুণ্যকর্মে তোমাকে গ্রহণ করবার আগে দয়া করে যদি আর একবার অগ্নিপরীক্ষাটা দিয়ে নাও—এতবছর তুমি একা একা বনের মধ্যে ছিলে"—এই ভীষণ বাক্য শ্রবণে অন্তঃপুর থেকে ছুটে এলেন কৌশল্যা সুমিত্রা কৈকেয়ী--"পুত্র! তুমি কি উন্মাদ হয়েছ?"

ছুটে এলেন ইক্ষ্বাকুকুলের বধূরা, কন্যারা, সখীরা, দাসীরা—

রাজমাতা কৌশল্যা গম্ভীর স্বরে বললেন—"এ অপমান অসম্ভব। এ পরীক্ষার প্রশ্ন ওঠে না। এতে বাল্মীকি মুনিরও অপমান। তিনি কন্যা-স্নেহে সীতাকে রক্ষা

করেছেন। প্রমাণস্বরূপ রামের হুবহু প্রতিমূর্তি দুই পুত্রও যদি যথেষ্ট না হয়—অত অশ্বহস্তী সৈন্যসামন্ত এবং সর্বোপরি ভরত শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ যে পুনর্জীবন লাভ করে আজ অযোধ্যাপুরীতে ফিরেছে, তাও কি প্রমাণ নয়? পুত্র রামচন্দ্র, তুমি কি আজ সহজ যুক্তিও বিস্মৃত হয়েছ? ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্ম এসকল জ্ঞানে তোমার তুল্য কেউ নেই—তুমি স্থির হয়ে চিন্তা করো, কী ভয়ানক কথা এইমাত্র উচ্চারণ করলে।"

রামচন্দ্র অধীর কণ্ঠে বলেন—"মাতা, আপনি অন্তঃপুরে যান। যা বোঝেন না তা নিয়ে বৃথা বাক্যব্যয় করবেন না। এ হলো রাজকার্য, এর রাজনীতির কূটচাল, জননী, আপনার বোধগম্য হবে না। আমার অনুরোধ, আপনি কিছু বলবেন না রাজকার্য পরিচালনা বিষয়ে। আমাকে মার্জনা করুন।"

জটিল করুণ হাস্যসহকারে কৌশল্যা বললেন—"পুত্র, আমি দেখতে পাচ্ছি অযোধ্যার অন্তকাল সমাগত। যে দেশে স্ত্রীর আদর নেই, সে দেশকে দেবতারা অনাদর করেন। এ শাস্ত্রবাক্য তোমারও জানা।" সীতা ক্রোধে অপমানে কাঁপছিলেন—আকুলকণ্ঠে তিনি বললেন—"পিতা বাল্মীকি, আমাকে আশ্রমে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন—এক মুহূর্তও আমি এই সভাগৃহে থাকবো না—যে অযোধ্যার মানুষ আমাকে এত অবমাননা করেছে, আমি অভিসম্পাত দিচ্ছি সেই অযোধ্যা শ্মশান হয়ে যাবে—যে জনপ্রিয়তার জন্য আজ রাম তাঁর ধর্মপত্নীকে অবমাননা করলেন, সেই জনতা ইঁদুরের মতো সরযূর জলে ঝাঁপিয়ে মরবে। রামরাজ্য শেষ হয়ে যাবে অযোধ্যাপুরী জনশূন্য করে—আমি যদি প্রকৃতিমায়ের সন্তান হই, যদি সতী হই—হে মা বসুন্ধরা"—সীতার বাক্য শেষ হলো না।

রামচন্দ্রের বাঁদিকে একটি ক্ষুদ্র বোতাম ছিল। বিশ্বকর্মার অপূর্ব সৃষ্টি। তিনি বোতামটি টিপে দিলেন, স্বর্ণসিংহাসন সমেত সীতা রসাতলে নেমে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে উপরের মর্মরবেদী আবার যেমন-কে-তেমন জুড়ে গেল। সভাস্থ সকলে একবাক্যে চীৎকার করে উঠলো—"জয় সতীলক্ষ্মী সীতামায়ের জয়। জয় ইক্ষ্বাকুবংশের জয়।"

রাম মৃদু হাসলেন দু'জন পার্ষদের দিকে তাকিয়ে। তারপরেই বুক চাপড়ে কেঁদে উঠলেন—"দে, দে, বসুধা, আমার সীতাকে ফিরিয়ে দে, নইলে তোর চারভাগই আমি জল করে ফেলবো—একভাগ স্থল আর রাখতে দেব না—", সভায় বিষম হট্টগোল। কান্নার রোল শুরু হয়ে গেল। ওদিকে স্বর্ণসিংহাসন সমেত সীতাদেবী কিছু টের পাবার আগেই প্রাসাদনিম্নস্থ সুড়ঙ্গ দিয়ে সরযূর তীব্র ঘূর্ণ্যমান স্রোতে মিশে গেলেন।

BanglaBook.org

অম্বোপাখ্যান

"না, অম্বা, আমাকে মার্জনা করো। আর আমি তোমাকে গ্রহণ করতে পারি না। তুমি ভীষ্মের কাছেই ফিরে যাও। ভীষ্ম যখন সবলে তোমাদের হরণ করে নিয়ে গেলেন, কই, তখন তো তোমার কণ্ঠস্বর শুনিনি। দিব্যি তিনবোনে হাত ধরাধরি করে জনাকীর্ণ স্বয়ংবরসভা পরিত্যাগ করে ভীষ্মের রথে আরোহণ করেছিলে। অম্বা, তখন কি আমার অস্থির হৃদয় তোমার মনে পড়েনি? আমার চোখের সামনেই তুমি ভীষ্মের সঙ্গে চলে গিয়েছিলে, অম্বা। কই, সেই সভাস্থলে তো প্রতিবাদ জানাওনি।" শাল্বরাজ অস্থির আঙুলে হাতের স্বর্ণাভ সহস্রদল পদ্মটি ছিন্ন করতে করতে রুদ্ধকণ্ঠে বলতে লাগলেন —"তখন তো বলোনি, 'ভীষ্ম—আমাকে ছেড়ে দাও, আমি শাল্বরাজার বাগদত্তা বধূ?' বলোনি, কেননা তখন বুঝতে পারোনি যে বিয়েটা ভীষ্ম নিজে করছেন না, বিয়ে দিচ্ছেন তাঁর অপ্রাপ্তযৌবন ছোটভাই বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে। বীর্যশুক্রা হতে খুব শখ হয়েছিলো বোধহয়? গায়ের জোরে, সাহস ফলিয়ে, একশো রাজার মাঝখান থেকে একসঙ্গে তিন কন্যাকে যিনি হরণ করে আনতে পারেন সেই মহান দেবব্রতর অঙ্গ স্পর্শ করতে পেয়ে ধন্য হয়ে গিয়েছিলে। অম্বা, তোমার কি স্মরণে নেই, যে আমিই একমাত্র রাজা, স্বয়ংবরসভা থেকে ভীষ্মের রথের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলাম, সগর্জনে 'থামো, ভীষ্ম থামো', বলে হুঙ্কার করতে করতে যুদ্ধ দিয়েছিলাম, কিন্তু ভীষ্মের বাণে আমার হতভাগ্য সারথি, আমার তেজী অশ্বগুলি সবই বিনষ্ট হলো। ভীষ্ম সেদিন কোনো রাজাকেই প্রাণে মারেননি। আমাকেও না। কিন্তু রথহারা নিরুপায় আমি মধ্যপথে থেমে যেতে বাধ্য হই—অম্বা, সেই সংকট মুহূর্তে তুমি কি ভীষ্মকে স্পষ্ট জানাতে পারতে না, 'দেবব্রত, আমাকে মুক্তি দিন। ঐ শাল্বরাজ আমার প্রণয়ী।' তুমি তা বলোনি অম্বা। তোমার দৃষ্টি তখন ভীষ্মের ক্ষাত্রতেজে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হতভাগ্য শাল্বর কথা তোমার মনেও পড়েনি। আমি নিশ্চিত জানি, অম্বা, সেই মুহূর্তে তোমার হৃদয় মন প্রাণ, এই যৌবনমদমত্ত শরীর, সর্বস্ব ভীষ্মের প্রতি ধাবিত হয়েছিল। নতুবা স্বয়ংবরসভাতেই তো তুমি বাধা দিতে পারতে, আপত্তি জানাতে পারতে। তা তো নয়, বাধা দিয়েছো কখন? না বিবাহসভায়। যখন পাত্রকে দেখলে দুর্বল বিচিত্রবীর্য, তখন শাল্বকে মনে পড়লো। তখন পুরাতন প্রেম পুনর্জাগ্রত হলো। কিশোর বিচিত্রবীর্যের পত্নীত্ব না চেয়ে তুমি বললে, 'হে ভীষ্ম, আমাকে মুক্তি দাও, আমি শাল্বর কাছে যাই'—উঁহু, অত সোজা নয়, অম্বা, শাল্বরাজ বালকের হাতের মোদক নন যে যখন যেমনভাবে তাঁকে চাইবে, তখুনি পাবে।"

এখন অম্বা কিছু বলতে চাইলেন। কিন্তু শাল্ব বললেন, "তাছাড়া লোকেই বা বলবে কি? অন্যপূর্বা কন্যা তুমি, অপরে চুরি করে নিয়ে গেছে যাকে, তাকে কোনো

ভদ্রলোক কুলবধূ করে নিয়ে আসে? আমাদের রাজবংশের একটা মানসম্মান নেই?"

"কিন্তু, শাল্ব এসব তুমি কী বলছো? আমরা তো ঈশ্বরের চোখে বিবাহিত. আমি তো গোপনে তোমার সঙ্গে মাল্যবদল করেছি। রাবণ ধরে নিয়ে যাবার পরেও রামচন্দ্র কি সীতাকে নিয়ে ঘর করেননি? শুধু আমরা এখনও সংসারই পাতিনি. এই যা। এখনও আমার পিতা কিছুই জানেন না।—তাছাড়া মহান ভীষ্ম যে মিথ্যাভাষী নন, একথা সকলেই মানেন। তুমি তাঁকেই বরং জিজ্ঞেস করো। আমাদের তিন ভগ্নীকেই তিনি কন্যার মতো আচরণে স্নিগ্ধ করেছেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে বিবাহ দেবেন বলে প্রথম থেকেই তাঁর আচরণ পিতৃসুলভ. কামশূন্য ও স্নেহপূর্ণ ছিল। শাল্ব. তুমি খুব ভুল করছো. আমি তোমার ছিলাম. তোমারই।"

অম্বাকে থামিয়ে দিয়ে শাল্ব বললেন,—"সুন্দরী. এ আমি বিশ্বাস করি না। বৃদ্ধ হলেও যুবাপুরুষের চেয়েও যৌবনতেজে দৃপ্ত ভীষ্ম যখন তোমাদের তিন ভগ্নীকে বলপূর্বক হরণ করেছিলেন. তাঁর স্পর্শে পুরুষের স্বাভাবিক কামনা ছিল না? এ কখনও সম্ভব? চির কৌমার্যের ব্রত এক জিনিস, আর কামনা বাসনা থেকে চিরমুক্ত হওয়া আর এক। তিনি তো বায়ুভুক, বনবাসী, কৃশাঙ্গ তপস্বী নন, ক্ষত্রিয়পুরুষই।"

"কিন্তু বিশ্বাস করো শাল্ব," অম্বা অস্থির হয়ে বলেন—"আমি তোমারই আছি. তোমারই আছি। আমি নারী, সভামধ্যে রাজাদের সেই তুমুল কলহে আমার ভয় করেছিলো। ভীষ্ম যখন বলপ্রয়োগে আমাদের হরণ করেন তখন ভয়ে আমাদের মতিস্থির ছিলো না। পরে শান্ত অবস্থায় প্রথম সুযোগেই আমি ভীষ্মের কাছে সবিনয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছি। তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি। উদার হৃদয় ভীষ্ম তো আমার ইচ্ছার উপর বলপ্রয়োগ করেননি? শ্রবণমাত্রই আমাকে সযত্নে তোমার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।"

শাল্ব কুটিল হাস্য করলেন।

"সেই যত্নটার কথাই তো বলছি।"

"ছিঃ. শাল্ব," অম্বার ক্রুদ্ধ স্বর ফেটে পড়লো—

"নীচব্যক্তির ন্যায় বাক্য বোলো না। ভীষ্ম আমাদের প্রতি নির্লোভ ছিলেন। বলপূর্বক হরণ করতে হলে যেটুকু বাধ্যকারী অঙ্গস্পর্শ করা একান্ত আবশ্যক তার অধিক কিছুই তিনি করেননি। আমাকে বিশ্বাস করো. শাল্ব।"

শাল্ব বললেন, "তোমাকে বিশ্বাস করা আমার সাধ্য নয়। তুমি যাও. অম্বা।"

এবারে অস্থির হয়ে অম্বা বলেন. "শাল্ব, প্রেমিক আমার, স্বামী আমার, এখন আমাকে পরিত্যাগ করলে ত্রিভুবনে কোথায় আমার স্থান হবে? পিতা কাশীরাজও আমাকে নেবেন না। আমি তবে আজই. এখনই, ওই নদীজলেই আত্মহত্যা করবো. তোমার সম্মুখে"—

হাহা করে হেসে শাল্ব রথে উঠলেন। রথের মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে

বললেন : "তাই যাও, মবো। মবাব অধিক অবমাননা তো তোমাব হযেইছে। বীর্যশুল্কা হবাব শখ হযেছিলো, কেবল হিশেবে মেলেনি। তাই এসেছো। বিচিত্রবীর্যকে শাল্বেব চেযে বীর্যবান, উন্নততর পুরুষ বলে মনে ধবেনি। মাত্র এই তো? যদি দেবব্রত নিজেই আজ তোমাকে গ্রহণ কবতেন, তবে তুমি আমাব কাছে ফিবতে না.—অম্বা। তোমাব চোখে আমি স্পষ্ট দেবব্রতব প্রতিচ্ছাযা দেখতে পাচ্ছি। তোমাব সর্বাঙ্গে কুমাব দেবব্রতব প্রতি মোহান্ধতা পাতলা ওডনাব মতো জডিযে আছে। সেই মোহ আমাব কাছ থেকে তোমাকে জন্মেব মতো বিচ্ছিন্ন কবে ফেলেছে। তোমাব দেহে মনে চিবদিনেব মতোই দেবব্রতব বাহুবল, তাব ঔদার্য, তার স্নেহমমতা, তাব পৌরুষ, এক অমোঘ কুযাশাব মতো, জলজ উদ্ভিদেব মতো লেপ্টে থাকবে। আব কোনোদিনই এই শাল্ব তোমাব চোখে জগতেব শ্রেষ্ঠ পুরুষ হযে প্রতিভাত হবে না। জগতেব একমাত্র কাম্য পুরুষ তো হবেই না। এমন অবস্থায আমি তোমাকে আব গ্রহণ কবতে পাবি না, অম্বা। তোমাকে বলপূর্বক স্পর্শ কবে, তোমাকে হরণ করে, তোমাব শবীবেব কৌমার্য যদিও ভীষ্ম নষ্ট কবেননি কিন্তু তোমাব মনের সেই একনিষ্ঠতা বিনষ্ট কবে দিযেছেন—এতে আমাব সংশয নেই। অম্বা, তুমি আমাব নযনেব সামনে থেকে দূব হও। তোমাকে দেখলেই আমাব প্রতিটি লোমকূপে অপমান আব অভিমান দাবাগ্নিব মতো প্রজ্জ্বলিত হযে আমাকে দগ্ধ কবছে। আমাব পৌরুষ, আমাব প্রেম, সবকিছুকে মিথ্যা কবে দিযেছে দেবব্রতব স্পর্শ—তুমি তা কোনোদিনই ভুলতে পাববে না। তুমি চিবকাল আমাদেব দুজনকে তুলনা কববে, আব মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে ভীষ্ম কেন তোমাকে গ্রহণ কবলেন না এই ভেবে।—সেই জীবন আমাব পক্ষে দুঃসহ—তুমি যাও, তুমি এক্ষুনি চলে যাও, আমি তোমাকে সহ্য কবতে পাবছি না। তুমি বামচন্দ্রেব কথা তুলেছিলে, তিনিই তো সীতাকে বলেছিলেন না— 'নেত্রবোগীব সম্মুখে দীপশিখাব মতো তুমি আমাব তীব্র নেত্রপীডাব কাবণ হচ্ছো'—আমিও তোমাকে তাই বলছি, অম্বা। বিদায হও, আব কদাচ আমাব ধাবেকাছে এসো না, বাঁচো কিম্বা মবো। আমাব কাছে তুমি মৃতই—যেদিন ভীষ্ম তোমাকে অপহবণ কবেছেন সেইদিন থেকেই আমি জানি অম্বাব মবণ হযেছে। হীন প্রেতাত্মা হযে তুমি আমাব ওপবে আব উপদ্রব কোবো না"—বলতে বলতে শাল্ব তাঁব বথ ছুটিযে দিলেন।

অম্বা আব অশ্রু সংববণ কবতে পাবলেন না—দ্রুত ছুটে গেলেন নদীতীবে। ঝাঁপ দেবাব জন্য দুহাত আকাশে তুলে, স্বচ্ছ জলে নিজেব ছাযা দেখতে পেলেন। অনিন্দ্যসুন্দবী অম্বা নিজেব অভিমানিনী রূপদর্শনে নিজেই বিমোহিতা হলেন। আত্মহননে তাঁব মাযা হলো। এত রূপ, এত যৌবন, এই প্রাণ—শাল্বব মতো নিষ্ঠুব, ভীরু, প্রেমহীন, ঈর্ষুক, অবিশ্বাসী, আত্মবিশ্বাসশূন্য পুরুষেব জন্য কেন তিনি বিসর্জন দিতে যাবেন? অম্বা নদীতীবেব বৃক্ষছাযায বসলেন। একটু শান্ত হযে ভাবা দবকাব।

সদ্য বৃষ্টি হযে গেছে। সজীব শ্যামল বনানীব বর্ষণসিক্ত গন্ধটি অম্বাব নাকে এলো।

চারিদিকে কচি সবুজের মেলা, ভিজে মাটির স্পর্শেও জননী পৃথিবীর মমতার ছোঁয়া। ভরা নদী টলটল করছে কূলেকূলে, যেন যৌবনগর্বিতা নারী। অম্বার আবার নিজের কথা মনে পড়লো। না, কক্ষনো না। শাল্বর জন্য আত্মহননের প্রশ্ন নেই। কিন্তু এখন কোথায় যাওয়া? কী করা? বর্ষার বনের একটা নেশা আছে, চারদিক থেকে প্রকৃতি যেন জীবনের ফাঁদ পেতেছে আজ অম্বাকেই ধরবার জন্যে। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়েছে, আকাশে মেঘ-ছেঁড়া চাঁদ উঁকি দিয়েছে। অম্বা বসেই থাকেন।

ভাবতে ভাবতে রাত্রি গহন হলো। এই সময়ে সেখানে কয়েকজন যক্ষ যক্ষিণী জলকেলি করতে এলেন। তাঁদের উচ্ছল জলকেলি, তাঁদের লজ্জাহীন প্রণয়লীলা দেখে অম্বার মনের দুঃখ দ্বিগুণিত হলো। তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললেন।

কান্নার শব্দ শুনে বিচলিত হয়ে যক্ষ ও যক্ষিণীরা লীলা বন্ধ করে তীরে উঠে এসে খুঁজে দেখলেন। দেখেন এক পরমাসুন্দরী কন্যা একাকিনী বালুতটে বসে বসে অঝোরে রোদন করছেন। যক্ষিণীরা তাঁকে স্নেহভরে সান্ত্বনা দিতে এলে, অম্বা অকপটে তাঁদের সব কথা খুলে বললেন। যক্ষিণীরা মন দিয়ে শুনে বললেন, "অম্বা, এখন নিবিষ্ট মনে, শান্ত হয়ে ভেবে দ্যাখো তো সত্যি সত্যিই তুমি কাকে চাও? শাল্বর প্রতি তুমি এখনও কি অনুরক্ত, নাকি ভীষ্মকেই চাও? যদি শাল্বকে চাও, তাহলে কিন্তু আমরা মায়া প্রয়োগে তার মন বদল করে দিতে পারি। দেবো কি? ভেবে বলো।"

অম্বা তখন কঠোরভাবে চিন্তা করতে শুরু করলেন। শাল্বর কঠিন বাক্যগুলি, যা তাঁকে বিষাক্ত তীরের মতো বিদ্ধ করেছিলো, অম্বার মনে মনে প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো। অম্বা মনকে শুদ্ধ করে, শান্ত করে, নিরপেক্ষ করে চিন্তা করলেন, কাকে তিনি চান।

যে-শাল্বকে তিনি একদা একান্তে কায়মনোবাক্যে ভালোবেসেছিলেন এবং আত্মসম্প্রদান করেছিলেন যাঁর কাছে পিতা কাশীরাজের অজ্ঞাতসারে, সেই অখণ্ড আত্মনিবেদনের মনোভাব কি তাঁর এখনও আছে? এত তীব্র অবমাননার পরেও? এই নির্দয় অমানুষিক প্রত্যাখ্যানের পরেও? যে-হরণে অম্বার কোনো অংশই ছিল না, যে-হরণকে বাধা দিতে পারেননি স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত মহাবল রাজন্যবৃন্দও, সেই হরণের জন্য শাল্ব অম্বাকেই দোষী করছেন। ভীষ্মর কাছে সত্য কথা বলে, তাঁর কাছ থেকে মুক্তি চেয়ে নিয়ে অম্বা যে ছুটে ফিরে এসেছেন শাল্বর কাছে, সেই গভীর প্রণয়ের সত্যকে শাল্ব বিশ্বাসই করলেন না। ভীষ্মের প্রতি তাঁর তীব্র অসূয়া—ভীষ্মের তুল্য শৌর্য শাল্বর নেই, নাইবা থাকলো, শৌর্যবীর্য দেখেই কি শাল্বকে ভালোবেসেছিলেন অম্বা? কিন্তু শাল্ব তাঁর প্রেমের সম্মান দিলেন না। এই দুর্বলচিত্ত, যে প্রেয়সী নারীকে অপমান করে, অর্থাৎ আত্মাবমাননাকারী, আত্মবিশ্বাসহীন, পৌরুষহীন, প্রেমহীন, বিশ্বাসহীন রিক্ত মানুষটিকে অম্বা আগে কোনোদিনই দেখেননি।

BanglaBook.org

এই শাল্বকে তিনি চেনেন না। একে ভালোবাসাও সম্ভব নয়, সম্মান করাও না, এর সঙ্গে ঘর-সংসার পাতা অসম্ভব। না, অম্বা আর শাল্বকে ফিরে চান না।

অম্বা জানুর ওপরে চিবুক রেখে ভাবতে ভাবতে রাত্রি প্রভাত করে ফেলেন। উষাকালে যক্ষ-যক্ষিণীরা বলে গেলেন,—"আবার দেখা হবে, সখি, আজ পূর্ণিমারাত্রি। পুনরায় নৈশ জলকেলি হবে। অম্বা, আজই তুমি কিন্তু মনস্থির করে ফেলো।" যক্ষেরা বললেন, "কেঁদো না, সুন্দরী, তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে।" বলে যক্ষ-যক্ষিণীরা অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সেই রাত্রে নিঃসঙ্গ, নিরন্ন, নিরম্বু, বিনিদ্র, অম্বা বৃক্ষতলে বসে বসেই শাল্বর কথা ভাবা বন্ধ করলেন। না, শাল্ব নয়। আর শাল্বকে চাই না অম্বার, এই যুবকের তাঁর হৃদয়েশ্বর হবার যোগ্যতা নেই। কখনও যে ছিল—সেটা ভেবেই অম্বার আশ্চর্য লাগে। এই পুরুষই তাঁর প্রাণাধিক ছিল? একেই তিনি স্বামিত্বে বরণ করেছিলেন? এরই জন্য তিনি প্রাণত্যাগেও প্রস্তুত ছিলেন? কুলত্যাগ তো সামান্য কথা। অম্বা অবাক হয়ে যান। মানুষ মানুষকে এত অল্প চেনে? অম্বাকেও যেমন শাল্ব বিন্দুমাত্র চিনতে পারেননি এতকাল বিভ্রান্ত হয়ে অবিচার করেছেন—অম্বাও তো তেমনি শাল্বকে বিন্দুমাত্র চিনতে পারেননি, এতকাল? বিভ্রান্ত হয়ে আত্মনিবেদন করেছেন। মনস্থির করে ফেলে অম্বা আঁচল সামলে উঠে বসলেন। নদীকূলের শীতল বাতাসে বুকভরে নিশ্বাস নিলেন, জলে নেমে অঞ্জলি ভরে জলপান করলেন, স্নান সারলেন, বনে ইতস্তত বিচরণ করে মিষ্ট ফল আহরণ করে ক্ষুধা নিবারণ করলেন। ঈশ্বর চতুর্দিকে তাঁর সৃষ্ট জীবদের জন্য কত সুব্যবস্থা করে রেখেছেন, আর অম্বার একটা ব্যবস্থা হবে না? ঈশ্বর করুণাময়। অম্বা যদি শাল্বর প্রতি অবিশ্বস্ত না হয়ে থাকেন, তাহলে জীবনও তাঁকে নিশ্চয় সুবিচার দেবে। মনের চরম দুর্যোগ মিলিয়ে এল, শান্তি পেলেন অম্বা।

এবার ভাবতে বসলেন, কর্তব্য কী? রাত্রে যক্ষ যক্ষিণীগণ এলে তাঁদের বলবেন, "না। শাল্বকে চাই না।" কিন্তু ভীষ্ম? ভীষ্মকে কি তাঁর চাই? যক্ষ যক্ষিণীরা সেই বিষয়ে কিছুই বলেননি কিন্তু। অম্বা ভীষ্মর শান্ত মুখচ্ছবি, তাঁর উদার বিশাল বক্ষপট, দীর্ঘবাহু দুটির বলিষ্ঠতা স্মরণ করছেন, এমন সময়ে সহসা তাঁর অঙ্গে গাঢ় রোমাঞ্চ হলো। অম্বা গোপনে লজ্জা পেলেন। এবং বুঝলেন, প্রণয়ী শাল্ব হয়তো ভুল বলেননি, সত্যিই মনের গহনে ভীষ্মের প্রতি তাঁর কোনো দুর্বলতা জন্ম নিয়েছে। ভীষ্মের তুল্য বীর তিনি সত্যিই দেখেননি। কিন্তু ভীষ্মের তুল্য নির্লোভ, নিষ্কাম, প্রায়-সন্ন্যাসী পুরুষও তাঁর এই অদীর্ঘ জীবনকালে চোখে পড়েনি। তিন বোনকে বলপূর্বক হরণ করলেও তাঁর করস্পর্শে কামগন্ধ ছিল না। চোখে লোভ ছিল না, বাক্যে নিষ্ঠুরতা ছিল না। তাঁর আচরণে স্নিগ্ধ মমতার সঙ্গে রাজন্যসুলভ মর্যাদা আর পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর নারীত্বকে তিনি সম্মান করেছেন, কিন্তু কামনা করেননি। কনিষ্ঠ ভ্রাতার বধূদের প্রতি জ্যেষ্ঠের যেমন আচরণ করা কর্তব্য সেইমতো আচরণই তিনি করেছেন,

BanglaBook.org

আর যেই মুহূর্তে অম্বা তাঁকে শাল্বর কথা প্রকাশ করে বলেছেন, সেই মুহূর্তেই ভীষ্ম সস্নেহ হাস্যে বলেছেন—"রাজকন্যা, তুমি মুক্ত, তোমার কাঙ্ক্ষিত পতির সঙ্গে মিলিত হয়ে সুখী জীবন যাপন করো।" ভীষ্মই স্বয়ং তাকে রথ দিয়ে শাল্বের রাজপ্রাসাদে পৌঁছে দিয়েছেন, যাতে পথে কোনো বিপদ-আপদ না ঘটে তাঁর।

ভীষ্মের আচরণে প্রণয় ছিল না, নারীপুরুষের মধ্যে যে বিশেষ এক ধরনের অদৃশ্য টানাপোড়েন তৈরি হয় চোখে-চোখে, কথায়-কথায়, লঘু স্পর্শে, স্নায়ুতে, শিরাতে, ত্বকে, প্রকৃতি আপনাআপনি যে একটা অদৃশ্য সূত্র বুনতে থাকে—ভীষ্মের সঙ্গে তাও ঘটেনি। ভীষ্ম ছিলেন একেবারেই জিতেন্দ্রিয়। বাসনাশূন্য। অম্বার জন্য তাঁর হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততর হয়নি। অম্বার দেবীতুল্য রূপও তাঁকে স্পর্শ করেনি। ভাবতে ভাবতে অম্বার মনে মনে অভিমান জমতে শুরু করে। অম্বার অভিমান ক্রমশ গোপন কামনায় পরিণত হয়। তার শরীরের শিরা ধমনীতে ছড়িয়ে পড়ে দপ-দপ করে জ্বলতে থাকে। অম্বা বুঝতে পারেন যুবতী নারী হিসেবেই তিনি পুরুষ ভীষ্মের বিশেষ মনোযোগ কামনা করেন, তাঁর স্পর্শদ্বারা চিহ্নিত হতে চান। এই ব্রহ্মচারীর দাম্ভিক ব্রহ্মচর্য না মোচন করলে যেন অম্বারই নারীত্বের চরম অপমান। ভীষ্মের উদাসীনতা অম্বার উত্তাল যৌবনের উদ্ধত অপমান। অম্বার মনে হলো ভীষ্মের কামমোহিত দৃষ্টি না পেলে তাঁর এই দুর্লভ সৌন্দর্য ব্যর্থ। যে কোনো উপায়ে ভীষ্মকে জয় করতে তিনি মরীয়া হয়ে উঠলেন। বুদ্ধিমতী অম্বা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন তাঁর দেহমন আর শাল্বরাজের প্রতি নিবেদিত নয়। ভীষ্মকেই তিনি চান। দেহে, মনে, আত্মায় তিনি এখন ভীষ্মের সঙ্গে মিলনে ব্যাকুল। এ জীবন, এ যৌবন তাঁর অর্থহীন, মিথ্যা হয়ে যাবে, যদি তিনি ভীষ্মকে প্রেমিক হিসেবে না পান।

ভীষ্মের রূপবান, বীর্যবান, শান্তিদীপ্ত মহৎ রাজমূর্তি তার চোখে ভাসতে লাগলো। সভামধ্যে তিন ভগ্নীকে হরণ করার মুহূর্তের সেই তীব্র দৃপ্ত চেহারা, আর অম্বাকে প্রত্যর্পণ করার সময়ের স্নিগ্ধ, মায়াময় রূপ, দুইই তাঁকে সমানভাবে প্রলুব্ধ করতে লাগলো।

অম্বা ভীষ্মের প্রণয়কামনায় অস্থির হয়ে পড়লেন। সন্ধ্যা হলো। পূর্ণচন্দ্র উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যক্ষ যক্ষিণীরা জলে নামলেন। অম্বা করজোড়ে সকাতরে তাঁদের কাছে জানালেন : "—শাল্ব নয়, আমি ভীষ্মেরই প্রণয়কাঙ্ক্ষিণী। হে অমর বন্ধুবৃন্দ, আপনারা দয়া করে ভীষ্মকে রাজী করান।"

এক মুহূর্তের জন্য কি চন্দ্র তাঁর জ্যোৎস্না সংবরণ করলেন? ভরা নদীও কি তাঁর স্রোত স্তব্ধ করলেন? যক্ষ যক্ষিণীর প্রণয়কলরোল স্থগিত হলো। একমুহূর্ত মাত্র। তারপরেই যক্ষ স্থূণাকর্ণ বলে উঠলেন, "—ভাবিনী, আমাদের ক্ষমা করো। তোমার এই অনুরোধ রক্ষা করা আমাদের ক্ষমতার বাইরে। গঙ্গাপুত্র দেবব্রত এক ভীষণ ব্রহ্মচর্যের ব্রতধারী—তাঁকে কোনো অপ্সরা, কোনো দেবীও টলাতে পারবেন না, তুমি তো মানবীমাত্র। মহাত্মা ভীষ্মের প্রণয় শুধু সত্যের সঙ্গে। তাঁর পিতার

জন্য তিনি এক বিষম ব্রহ্মচর্যের শপথে স্বেচ্ছাবন্দী। তাঁর জীবনে কোনো নারীর স্থান হবে না। তুমি অন্য যে-কোনো পুরুষকে প্রার্থনা করো। বলো অম্বা, তুমি কাকে চাও। যাকে চাইবে, তাকেই আমরা এনে দেবো, কেননা জগতে কেউই মানুষী দুর্বলতার বাইরে নন। শুধু ভীষ্মই মুক্ত। ভীষ্মকে প্রার্থনা কোরো না।"

অম্বা দুই হাতে দুই কান চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন, "আপনারা দয়া করে স্তব্ধ হোন, আমি আর কাউকেই চাই না—শুধু ভীষ্ম, আমি চাই ভীষ্মেরই প্রণয় —আপনারা যদি না পারেন, আমি নিজেই যাবো তাঁর কাছে। তাঁর পায়ে ধরে প্রণয়ভিক্ষা করবো—তিনি ভিখারিনীকে তো বিমুখ করতে পারবেন না।"

স্থূণাকর্ণ শান্তস্বরে আবার বললেন—"মানিনী, মান কোরো না। আমরা তোমার সুহৃদ, তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাতেই এই কথা বলছি—যদি ভবিষ্যতে কোনোদিন প্রয়োজন বোধ করো, এই বৃক্ষের নিচে এসে 'স্থূণাকর্ণ' বলে আমাকে ডেকো,—আহ্বান করলেই আমি তোমাকে সাহায্য করতে আসবো। কিন্তু ভীষ্মের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ আমাদের সাধ্য নয়, তোমারও সাধ্য হবে না। বৃথা চেষ্টা না করে তুমি বরং আমাদের কথা শোনো। ভারতে এত রথী মহারথী আছেন, যে-কোনো একজনকে প্রার্থনা করো, আমরা এনে দিচ্ছি।"

অম্বা রুষ্ট হয়ে বললেন, "—থাক। আমি নিজে যাবো বলেছি, নিজেই যাচ্ছি।" বলে তিনি দ্রুত হাঁটতে শুরু করলেন। অরণ্যের বৃক্ষরাজির পাতায় পাতায় দীর্ঘশ্বাস বেজে উঠলো। অম্বার কানে তা পৌঁছোল না। অরণ্য তাঁর পায়ে লতাগুল্ম জড়িয়ে দিয়ে অম্বার পথ আটকাতে চেষ্টা করলো, অম্বা সে-সঙ্কেত বুঝতে পারলেন না। অরণ্য তখন নিষ্ঠুরভাবে অম্বার পায়ে কাঁটা বিঁধিয়ে দিয়ে তাঁকে থামাতে চাইলো, যাতে মনোকষ্ট থেকে তাঁকে বাঁচানো যায়, যাতে জন্মজন্মান্তরের যন্ত্রণা থেকে তাঁকে রক্ষা করা যায়। কিন্তু অম্বা রক্তাক্ত পায়েই ছুটে চললেন। যে স্বেচ্ছায় দুঃখের পথ বেছে নেয় তাকে কি যক্ষরক্ষ অরণ্যপ্রকৃতি কেউ রক্ষা করতে পারে? অম্বা নিজের দুর্ভাগ্য নিজের হাতে গড়ে নিলেন।

রাত্রি গহন। সব কাজ সেরে, প্রাসাদের মুক্ত অঙ্গনে বৃদ্ধ অশ্বত্থের বেদীমূলে ভীষ্ম আহ্নিকের জন্য সবে বসেছেন, এইবার শয্যাগ্রহণের প্রস্তুতি। এমন সময়ে অম্বা ছুটে এলেন। পূর্ণচন্দ্র তাঁর চন্দ্রাননে উদ্ভাসিত, বেণীমুক্ত দীর্ঘ কেশরাশি এবং আকুল উতল স্বর্ণাঞ্চল রাত্রির বাতাসে উড়ছে, বাসি স্থলপদ্মের মতো গোলাপী তাঁর গাল, অশোকপুষ্পের মতো রক্তিম ওষ্ঠাধর অল্প বিস্ফারিত, তাঁর দুই চক্ষু ভীষ্মের দিকে, যেন দুটি মধুপানরত স্থির ভ্রমর। সেই জ্যোৎস্নাবিধুর অঙ্গনে, দক্ষিণী বাতাসে, একটি ভাসমান ভোরের স্বপ্নের মতো, অলৌকিক দৈবদৃশ্যের মতো, প্রণয়ব্যাকুল অম্বা এসে ভীষ্মের পদস্পর্শ করে চরণপ্রান্তে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর চোখ নিবদ্ধ রইলো ভীষ্মের চোখের দিকে।

BanglaBook.org

মহাবল ভীষ্মের বুকের মধ্যে উষ্ণ শোণিত ছলাৎ করে আছড়ে পড়লো, বিশাল সিন্ধুতীরে যেমন লবণাক্ত ফেনিল কল্লোল। এক পলকের জন্য বুঝি তাঁর নাড়ীর গতি রুদ্ধ হলো, তাঁর কানে সহস্র ভ্রমরের গুঞ্জন ঝিমঝিম করে উঠলো, কানে, চোখে, গালে, এক গূঢ় অভূতপূর্ব উষ্ণতা অনুভূত হলো, যেন জ্বরতপ্ত বোধ করে ভীষ্ম আহ্নিকের চেষ্টা বন্ধ করলেন।

আকাশ থেকে গ্রহনক্ষত্রেরাই কেবল দেখলেন, কেমনভাবে ভীষ্ম অম্বার মুখের দিকে চেয়ে আছেন।

দুজনের স্থির চোখে বুঝি কয়েকটি জন্ম কেটে গেল। কেউ কোনো কথা বললেন না। অম্বাই শেষে রুদ্ধকণ্ঠে ডাকলেন—"প্রভু?"

ভীষ্ম নীরব।

"প্রভু, আমাকে গ্রহণ করে ধন্য করুন।"

ভীষ্ম নির্বাক।

"প্রভু, জন্মজন্মান্তরেও আমি আর অন্য কারুরই হবো না। আপনি কৃপা করে আমাকে গ্রহণ করে দীনাকে কৃতকৃতার্থ করুন, প্রভু।"

ভীষ্ম নিঃশব্দ।

"প্রভু? অন্তত মাত্র একটিবারের জন্যও আমাকে গ্রহণ করে আমার নারীজন্ম সার্থক করুন প্রভু। মাত্র একবার?"

এবার ভীষ্মের অধরোষ্ঠ কেঁপে উঠলো। প্রবলে নিজেকে সংবৃত করে তিনি বললেন—"ওঠো নারী, যা অসম্ভব তা প্রার্থনা কোরো না। শাল্বকে পরিত্যাগ করে আমার কাছে কেন এলে?"

"কেননা আমি আর শাল্বর প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে পারিনি। তিনি অসূয়াপরবশ হয়ে আমার প্রতি মিথ্যা সন্দেহ প্রকাশ করে আমায় প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাঁর বিশ্বাস আপনিই আমার কাম্য পুরুষ।"

"তার সে বিশ্বাস তো ভুল নয়। তুমি যা বলছো তাতেই তো শাল্বের সন্দেহ প্রমাণিত। হে মুগ্ধা নারী, তুমি শাল্বকে মিথ্যা অভিযুক্ত করছো, তিনি সত্য বাক্যই বলেছেন। তুমি তাঁর প্রতি যথার্থ অনুরক্ত হলে আমার কাছে এভাবে আসতে না।"

"আমি প্রথমে শাল্বের দ্বারা রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছি। অপমানিত হবার পরেই ছুটে এসেছি প্রভু। তার আগে, কাল সারারাত, আজকে সারাদিন বসে বসে শুধু ভেবেছি, আমি কাকে চাই। শাল্ব যে ব্যবহার করলেন তার পরেও তাঁকে আর তো প্রার্থনা করা যায় না। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে পারিনি। প্রভু, অন্তরাত্মায় এখন আপনিই আমার একমাত্র আশ্রয়। আমাকে বিমুখ করবেন না। আপনি ফেরালে আমি কোথায় যাবো?"

"কেন? তোমার তো গৃহ রয়েছে অম্বা—চলো, তোমার দুই প্রিয় ভগ্নীর সঙ্গে তুমিও বিচিত্রবীর্যের রানী হবে। যদিও শাল্বর মনোনীত পত্নীর সঙ্গে বিচিত্রবীর্যের

BanglaBook.org

বিবাহ দেওয়া আমার অনুচিত—তবু এখন তোমার অবক্ষণীয়া দশা ঘোচাতে সেটাও করতে আমার আপত্তি নেই।"

—"ওঃ, করুণা? থাক"—ক্রোধে, অভিমানে অম্বার মুখভাব পরিবর্তিত হলো। কঠোরস্বরে অম্বা বললেন,—"প্রভু? আপনার চোখে কি তবে আমি ভুল দেখেছি? ওই আয়ত দুই চোখ কি ক্ষণেকপূর্বেই আমাকে প্রার্থনা করেনি? আপনি ঈশ্বরের নাম নিয়ে আমাকে বলুন—'না, অম্বা, তোমাকে আমি একমুহূর্তের জন্যও কামনা করিনি।' বলুন?"

ভীষ্ম মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপরে ধীরে ধীরে বললেন,—"আমার পিতার সুখের জন্য আমি চির কৌমার্যের ব্রতে অঙ্গীকৃত আছি। অম্বা, আমাকে তুমি মার্জনা করো। কোনো নারীকেই গ্রহণ করার অধিকার আমার নেই। তুমি সুন্দরী, তুমি মোহময়ী, ক্রোধ ও ক্ষোভ তোমাকে আরো রূপবতী করেছে, হে যুবতী, তোমাকে অবমাননা করা মোটেই আমার ঈপ্সিত নয়, কিন্তু যা দেওয়া আমার অসাধ্য তা আমি কেমন করে দিতে পারি?"

এবারে অম্বা মৃদু বঙ্কিম হাস্য করে কিঞ্চিৎ বিকৃত, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে বললেন: "জীবন যখন ভিক্ষা দিতে পারলেন না প্রভু, মরণটা দেখে আমিই ছিনিয়ে নেবো। কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না। জন্ম জন্ম ধরেও আমি কঠোর, কঠোরতম তপস্যা করবো। আমাদের মিলন হবেই, প্রেমে না হোক ঘৃণাতে, জীবনে না হোক, মরণে"—

ভীষ্ম এবারে এক মধুর, গভীর, স্নিগ্ধ হাসি হাসলেন। দক্ষিণহস্ত অম্বার দিকে সস্নেহে প্রসারিত করে দিয়ে প্রশান্ত স্বরে বললেন,—"তথাস্তু। তাই হোক, অম্বা। তোমার কথাই সত্য হোক। শুভাননা, শোনো, তোমাকে সন্তান দেওয়া আমার সাধ্য নয়, কিন্তু মিলনের ইচ্ছা তোমার পূর্ণ হবে। প্রণয়ে যা সম্ভব হলো না, শত্রুতায় সেটাই সম্ভব। প্রেমিক হিসেবে তোমার কাছে আজ আত্মনিবেদনে আমি অসমর্থ, অম্বা, কিন্তু শত্রু হিসেবে একদিন আমি তোমার কাছেই আত্মসমর্পণ করবো। জীবনে না পেলেও মরণে তুমি আমাকে তোমার স্ববশে আনতে পারবে। একমাত্র তুমিই, অম্বা।"

অম্বা মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইলেন। পরিচ্ছন্ন, রজতশুভ্র দৈববাণীর মতো ভীষ্মের মধুর গম্ভীর স্বর ধ্বনিত হলো সেই শীতল নৈশ বাতাসে —"অম্বা, আমার জীবনে আর কোনো নারী নেই, শুধু তুমি। শুধু তুমিই আমৃত্যু আমার জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে থাকবে। এমন কী মৃত্যুর সহস্র বৎসর পরেও অম্বার নাম ভীষ্মের নামের সঙ্গে একত্রে উচ্চারিত হবে। তুমি আমার উত্তরপুরুষদের মুখে মুখে ঘুরবে। অম্বা, তুমি ভীষ্মকে জয় করতে চেয়েছিলে, তুমি ভীষ্মকে জয় করবে। আমি তোমার হবো।"

সেই শান্ত স্নিগ্ধ নিশাকাশ বিদীর্ণ করে অম্বা হঠাৎ কেঁদে উঠলেন—"এ কী হলো প্রভু? এ আমি কী বললাম? এ আমি কী চাইলাম? আমি চেয়েছিলাম আপনার

BanglaBook.org

প্রণয়, চেয়েছিলাম আপনার সন্তান, আর চেয়ে নিলাম ধ্বংস! বিনষ্টি! মৃত্যু! আমার কি মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়েছে প্রভু? পুনঃপুনঃ প্রত্যাখ্যানের অপমানে আমি কি দানবী হয়ে গেছি?" অম্বা এক ছুটে অরণ্যে ফিরে এসে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। কিন্তু ঝাঁপ দিলেই কি আর মৃত্যু আসে?—ঐ সময়েই যক্ষ স্থূণাকর্ণ তাঁর যক্ষিণীকে নিয়ে চন্দ্রালোকে নদীকূলে বিচরণ করছিলেন। অম্বাকে জল থেকে তুলে আনলেন দুজনে। জল থেকে উঠে এসে বোরুদ্যমানা অম্বা বললেন—"আমি আর এ জীবন রাখতে চাই না বন্ধু, আমি একটা ভয়ঙ্কর কথা আজ উচ্চারণ করে ফেলেছি। আর মহামতি ভীষ্ম স্নেহভরে আমার সেই কুকথাতেই সম্মত হয়ে বর দিয়ে ফেলেছেন। এখন আমিই তাঁর মৃত্যুর কারণ হবো। তাঁর আগেই আমি তাই মৃত্যুবরণ করতে চাই।"

স্থূণাকর্ণ হেসে বললেন—"মৃত্যু তো চাইলেই আসে না, অম্বা। কেবল ভীষ্মের বেলাতেই মৃত্যুও ইচ্ছার দাস। ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু বর আছে। তাঁকে হত্যা করা তোমার সাধ্য নয়, যদি না তিনি নিজের ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেন। তুমি এ নিয়ে বৃথা দুশ্চিন্তা কোরো না। ভীষ্ম দীর্ঘায়ু হবেন, তিনি স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করবেন। তাঁকে হত্যা করা নশ্বর-অনশ্বর কারুরই সাধ্য নয়।"—

"কিন্তু ভীষ্মের কথা কি ব্যর্থ হবে?"

যক্ষ স্থূণাকর্ণ তখন মুহূর্তের অন্তর্ধানে ভবিষ্যৎ দেখে নিলেন। তারপর বললেন, —"অম্বা, ভীষ্মের কথা মিথ্যা হবে না। তাঁর স্বেচ্ছামৃত্যুতে তুমি হবে নিমিত্তমাত্র। দায় তোমার নয়। পরজন্মে তুমি হবে দ্রুপদরাজার কন্যা, কিন্তু কিছুকাল পরেই তুমি পুত্রে পরিণত হবে, এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্মের নিজস্ব মৃত্যুকামনায় সহায়তা করবে। ঘটনা সবই নিয়ন্ত্রণ করবেন ভীষ্ম স্বয়ং। শত্রু নয়, অম্বা, তুমিই হবে ভীষ্মের শেষ বন্ধু, তিনি যখন মৃত্যুকে পেতে চাইবেন, একমাত্র তোমার সাহায্যেই তাঁর পক্ষে তা পাওয়া সম্ভব হবে। তুমিই হবে তাঁর মুক্তি। তাঁর শান্তি।"

"আর মৃত্যুর পরে? আমরা মিলিত হবো তো? স্বর্গে হোক অথবা নরকে?"

স্থূণাকর্ণ হাসলেন—"নরক? ভীষ্মের প্রাপ্য আছে অক্ষয় স্বর্গবাস। আর ধর্মযুদ্ধে অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু তোমাকেও স্বর্গে নিয়ে যাবে। তোমাদের মিলন নির্ধারিত আছে অমরাবতীতে, মর্ত্যধামে নয়।"

এইবারে স্থূণাকর্ণের মুখের স্মিত হাসিটি অম্বার মুখেও প্রতিফলিত হলো। যক্ষ-যক্ষিণী দুজনে আকাশে মিলিয়ে যাবার পরেই তিনি ভরাবর্ষার প্রফুল্ল নদীজলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে এই জন্মটির অন্ত ঘটালেন পরজন্মকে দ্রুততর করার আকাঙ্ক্ষায়।

•

স্থান, কুরুক্ষেত্র। যুদ্ধের দশম দিন। অর্জুনের রথ তীব্রগতিতে ধাবিত হচ্ছে ভীষ্মের রথের দিকে, দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডী ধনুর্বাণ হস্তে অর্জুনের ঠিক সামনে। পিতামহ ভীষ্ম এবং অর্জুন দ্বৈরথে পরস্পরের সম্মুখীন। বৃদ্ধ ভীষ্মের সঙ্গে তরুণ শিখণ্ডীর দৃষ্টির

BanglaBook.org

মিলন হলো। ভীষ্ম মৃদু হাস্য করলেন। শিখণ্ডীর চোখে কি অশ্রু? অর্জুন দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধনুকে শরসংযোজন করলেন। শিখণ্ডী পরপর নয়টি বাণ ছুঁড়লেন ভীষ্মের বক্ষ লক্ষ করে। নয়টিই বিদ্ধ হলো।

অর্জুনের শরাঘাতে রথ থেকে পতিত হতে হতে ভীষ্ম তাঁর অস্ত্রহীন দক্ষিণহস্ত বরাভয়মুদ্রায় শূন্যে অল্প তুললেন। মুখে প্রশান্ত স্মিতহাসি।

আঃ স্বস্তি। আঃ মুক্তি। স্বজনহননের চরম যন্ত্রণার শান্তি। সুদীর্ঘ দায়বহনের পরিসমাপ্তি।

রাত্রি গভীর হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্ম শরশয্যায় একাকী শয়ান। তাঁর তপ্ত ললাটে শীতল করস্পর্শ করে মৃদুস্বরে কেউ ডাকলেন,—"প্রভু?"

ভীষ্ম বললেন, "এসেছো? এসো।"

"আর কত দেরি, প্রভু?"

'শুধু সূর্যের উত্তরায়ণের অপেক্ষা।"

আগন্তুক নিঃশব্দে ভীষ্মের হাতটি নিজের হাতে তুলে নিলেন। চমকে উঠলেন ভীষ্ম।

"এ কী? তুমি আর পুরুষ নও?"

"না প্রভু। বন্ধু স্থূণাকর্ণ তাঁর ঋণ দেওয়া পৌরুষ ফেরৎ নিয়েছেন। কিন্তু আমি সেকথা গোপন রেখেছি প্রভু, শিবিরেও কেউ তা জানে না। এই যুদ্ধে যে আমাকে অস্ত্রাঘাতে প্রাণ বিসর্জন দিতেই হবে, তবেই না অমরাবতীতে স্থান পাবো আপনার কাছাকাছি।"

ভীষ্ম অম্বার কোমল হাতে মৃদু চাপ দিলেন। নক্ষত্রের আলোয় তাঁর অধরের তৃপ্ত হাসিটি অম্বার মুগ্ধ চোখ এড়ালো না। সেই দৃশ্য দেখে স্বর্গের দেবতারা স্মিত-মধুর হাস্য করলেন। মহাশূন্যে গ্রহনক্ষত্রবৃন্দ আলোকবৃষ্টি করে আনন্দ প্রকাশ করলেন।

আর অন্ধকারের অন্তরালে সূর্যদেব উত্তরায়ণে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হলেন।

BanglaBook.org

অভিজ্ঞানদুষ্মন্তম্

দুষ্মন্ত বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। চাঁদের আলোয় যেন ধুয়ে যাচ্ছে দিকবিদিক। আকাশ মাটি মিশে একাকার। চমৎকার। 'উদাসী-বিদেশী-স্বগৃহে আবাসী' জাতীয় মুখ করে মহারাজ বারান্দার রেলিং-এ ভর দিলেন। চোখ ছড়িয়ে দিলেন দিগন্তে। এই ক্ষুদ্র

ঝরোকাটি সবচেয়ে উপরের মহলে। এই মহলে কোনো স্ত্রীলোক থাকে না। দুষ্মন্তের বয়স্য বিদূষকের মহল এটা। ঝরোকা থেকে অন্তত হংসপদিকার গানটা শোনা যাবে না। উঃ! প্রাণ খালি করে ছেড়ে দিলে? কী এনার্জি, কী গলার রেনজ।—যেখানেই দাঁড়ান না কেন, হংসপদিকার প্যানপ্যানানি থেকে রেহাই নেই। ঠিক শুনতে পাবেন।

একা কি হংসপদিকাটি? দুষ্মন্তের একটিই মাত্র দোষ। একটু বেশি বেশি প্রেমে পড়েন। বড্ড রোম্যান্টিক স্বভাব। আর রূপের প্রতি শিল্পীসুলভ মোহ। দুষ্মন্তের প্রাসাদে আর কোনো মহল বাকি নেই, কোনো মহলে আর কোনো কামরা বাকি নেই, যা তাঁর একজন না একজন পরিত্যক্ত পত্নীতে ভরা নয়। এই কারণেই সেবারে বিদূষক পরামর্শ দিয়েছেন, "এবার থেকে মহারাজের যা করবার বাড়ির বাইরেই করবেন, বাইরেই রেখে আসবেন। বাড়িতে স্থানসঙ্কুলান হচ্ছে না। আরেকটি প্রাসাদ প্রস্তুত করা দরকার। ততদিন অলমিতি বিস্তরেণ।" তাই, যখন কণ্বমুনির আশ্রমে সেই নির্বোধ মাতৃপিতৃপরিচয়হীন রূপসী কন্যাটির সঙ্গে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেললেন, বিদূষক শক্ত হাতে তাঁকে পথপ্রদর্শন করে বাড়ি ফিরিয়ে এনেছিলেন। সেই কন্যা ছাড়াই তিনি প্রাসাদে ফিরে এসেছেন। এসেই প্রচার করেছেন তাঁর পাঞ্জছাপের অঙ্গুরীয়টি মৃগয়ায় গিয়ে হারিয়েছে। কেউ খুঁজে পেলে শতমুদ্রা পুরস্কার। ঘোষণা শুনে কেবল মহারানী চন্দ্রাবতী ঠোঁট টিপে একটু হেসেছিলেন। চন্দ্রাবতী তাঁর বড়রানী, পাটরানী, প্রথমা পত্নী।

দশবৎসরকাল চন্দ্রাবতী একলা থাকেন। কেননা, রাজা অপুত্রক বলে, প্রায়ই বিবাহ করেন। নিত্য নবীন শয্যাসঙ্গিনীর খোঁজে তাঁর প্রাণে শান্তি নেই, হৃদয়জ্বালাও আর মেটে না। চন্দ্রাবতীর এতেই আপত্তি। সেবার কণ্বমুনির আশ্রমে কী ঝামেলাটাই না বেধেছিল। কে ভেবেছিল কণ্বমুনির স্বভাব এত আধুনিক? বালিকার গর্ভসঞ্চার যদি হয়েও থাকে, তার ফলে তাকে আত্মহত্যায় উদ্বুদ্ধ না করে, অথবা বনেই আশু বানপ্রস্থ গ্রহণের সুপরামর্শ না দিয়ে, তিনি যে দুই ছোকরাকে সঙ্গে দিয়ে তাকে রাজসভায় পাঠিয়ে দেবেন, তা কে কল্পনা করতে পেরেছিল? রাজসভায় এসে আসন্নপ্রসবা গাভীর মতো নির্ভরশীল দুই চোখ মেলে সেই মেয়ে তাঁর দিকে তাকাচ্ছিল। স্ফীতোদরা, শীর্ণ, নীরক্ত হাত-পা, বনবালাদের অনভ্যস্ত হাতের গ্রাম্য প্রসাধনের ফলে রাজসভায় তাকে দেখাচ্ছিল হাস্যকর। অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করে ধমক দিয়ে তাদের রাজসভা থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছিলেন সেদিন দুষ্মন্ত, চিনতে-না-পারার ভান করে। মেয়েটা জংলী, সরলভাবে ভাবল অঙ্গুরীয় হারিয়ে ফেলেছে বলেই তাকে রাজা চিনতে পারছেন না। কোনো অভিযোগ না করেই ফিরে গেল।

সবাই অবিশ্যি অমন হয় না। সেই যে মৎসজীবীদের মেয়েটি তেড়ে এসেছিল তার পাড়ার সবকটা ষণ্ডাগুণ্ডা ছেলেকে নিয়ে—তাকে তো ঘরে রেখে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন রাজা দুষ্মন্ত। সে মেয়েও এখন হংসপদিকার মতো গান করে, আর

BanglaBook.org

মাছ ধরার জাল বোনে। পর পর দুটি মৃত শিশুর জন্ম দিয়ে তার কিঞ্চিৎ মাথার গোলমাল হয়েছে। বাঁচা গেছে।

দুষ্মন্তের এখন মন খারাপ। মন খারাপ রাজনটী রূপবতী লোলাপাঙ্গীর জন্য। লোলাপাঙ্গীর মা অতি চতুরা। সে কিছুতেই মেয়েকে রাজার খপ্পরে পড়তে দিচ্ছে না। মেয়ে আবার খুব মাতৃভক্ত। দুষ্মন্তের মনে লোলাপাঙ্গীর প্রতি আনলিমিটেড প্রেমের সঞ্চার হয়েছে। যুবতীটি যেমন রূপে, তেমনি গুণেও তুলনাহীনা। ভালো নাচে, ভালো গায়, ভালো বীণা বাজায়, শাস্ত্র নিয়ে তর্ক করতে পারে, কাব্য নিয়ে আলোচনা করতে পারে, আর এইসব নারীরাই তো শোনা যায় বাৎস্যায়নের শাস্ত্রেও সুদক্ষা হয়ে থাকে। কিন্তু হায়, সেই বিষয়টাই আর দুষ্মন্তের জানা হচ্ছে না, লোলাপাঙ্গীর মায়ের চতুর বিঘ্নসঞ্চারের ফলে। এই চরাচরবিস্তৃত রজতচন্দ্রালোকে দুষ্মন্তের প্রাণে লোলাপাঙ্গী-বিরহ প্রবল হয়ে উঠল, তিনি প্রাসাদশিখর থেকে নেমে চললেন সারথি অশ্বমেধের খোঁজে। পথেই দেখা বিদূষকের সঙ্গে। এ মহলটা তাঁরই। বিদূষক বললেন —"লোলাপাঙ্গীর ভাবনা ত্যাগ করুন মহারাজ। ওর মা ওকে বিবাহের জন্য প্রস্তুত করছে, অতি চতুর মহিলা, আপনি ওদের জানেন না। নটীদের জাতটাই আলাদা।" দুষ্মন্তের অহঙ্কারে আরেকটু ঘা লাগলো। কী? আমি ওদের জানি না? কেন, ওরা আমার প্রজা নয়? তাঁর জেদ চড়ে গেল।

একদিন লোলাপাঙ্গী দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর বাতায়নে, দেখলেন একটি পরমাসুন্দরী আশ্রমবালিকা ক্লান্তচরণে দুটি তরুণ সূর্যের মতো সুদর্শন আশ্রমিক যুবার সঙ্গে অশ্রুমোচন করতে করতে পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। মেয়েটি আসন্নপ্রসবা। লোলাপাঙ্গী তাদের তাড়াতাড়ি ডেকে এনে ঘরে বসালেন। ফল-মিষ্টান্ন দিয়ে শীতল জলপান করতে দিলেন। পাখার হাওয়া দিয়ে তাদের পথশ্রম মোচন করতে বললেন দাসীদের। তারপর শুনলেন মেয়েটির নাম শকুন্তলা, সে কণ্বমুনির মানুষ করা মেয়ে। প্রকৃতপক্ষে অপ্সরী মেনকাদেবীর কন্যা। লোলাপাঙ্গীর মা শলভা নিজেও এই মেনকারই কন্যা —শকুন্তলা যেমন ঋষি ও অপ্সরীর মিলনের ফলে জাত, লোলাপাঙ্গীর মা তেমনি উজ্জয়িনীর মহারাজ এবং মেনকার সঙ্গমজাত কন্যা। শলভা শকুন্তলার সহোদরা ভগিনী —অর্থাৎ শকুন্তলা লোলাপাঙ্গীর ছোটমাসি। এই পরিচয় আবিষ্কার করে, এবং সরলা আশ্রমবালা শকুন্তলার দুরবস্থা দেখে নাগরিকা শলভার মনে যেমন মায়া-মমতা হলো, তেমনি রাগও হলো রাজার ওপরে। শলভা বললেন—"বোন, তুমি কিছুকাল অপেক্ষা করো। আয়সা দিন নেহী রহেগা। তোমার স্বামীগৃহে তোমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত না করতে পারলে আমার নাম শলভা নয়। কুছ ফিকর মত করো।" এই বলে শকুন্তলাকে নিজের কাছে রেখে লোলাপাঙ্গীর মা শারদ্বত শার্ঙ্গরবকে আশ্রমে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। শকুন্তলা যথাসময়ে পরম সুলক্ষণযুক্ত পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন শলভার গৃহে। তারপর তিনি পুত্রসমেত শকুন্তলাকে গহন বনের মধ্যে ঋষিদের কাছে এক

BanglaBook.org

উদ্ধার-আশ্রমে জমা করে দিয়ে এলেন। শিশুর পিতার নাম রেজিস্ট্রি খাতায় লিখিয়ে এলেন মহারাজা দুষ্মন্ত। মাঝে মাঝে খবর নিতে যান। শকুন্তলা কেবলই বলেন —"কই দিদি, মহারাজ তো এখনও এলেন না?" প্রত্যেকবার রাজনটীর মা মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাপ্টা-ঝুমকো-সিঁথি-সাতনরীতে ঝমঝমাঝম শব্দ তুলে গেয়ে ওঠেন— "আয়েগা, আয়েগা, আয়েগা আনেওলা। ইতনা জলদি কিঁউ? বহিন, তুম ঘাবড়াও মৎ—হম তেরা সঙ্গ হ্যায়। বে-ফিকর হো যাও।"

বসন্তকাল। পিক-কূজনে দুষ্মন্ত মদনজ্বালায় অস্থির হয়ে পড়েছেন। এমনই এক ঘোর-লাগা বসন্ত প্রভাতে মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে মহারাজ নটী লোলাপাঙ্গীকে পুষ্পশোভিত উপবনে তৃণশয্যায় লীলায়িত ভঙ্গিতে চিঠি লিখতে দেখলেন। রাজা উপস্থিত হয়ে তৎক্ষণাৎ তার কাছে হৃদয় নিবেদন করলেন। কী ভাগ্যি, মা শলভা কাছাকাছি ছিলেন না বলেই বোধহয়, লোলাপাঙ্গীও রাজার প্রণয়বাক্য গ্রহণ করলেন। মহারাজার আহ্লাদ দেখে কে? তিনি সাবধানে আরো খানিকক্ষণ নিরীহ প্রণয়লীলা চালিয়ে তাড়াতাড়ি আসল কথাটা পাড়লেন—"সুন্দরি। নিশাকালে আমি তোমার দর্শন প্রার্থনা করি।" মোহিনী লোলাপাঙ্গীর আজ হয়েছে কী? বসন্তের মধুর বাতাসে তিনিও কি ভুললেন? তিনি যে এ প্রস্তাবেও রাজি। সময় ঠিক হলো, মধ্যযাম। রাজা একা, ছদ্মবেশ ধারণ করে যাবেন, লোলাপাঙ্গীর বাতায়নে টোকা দেবেন, তিনবার। লোলাপাঙ্গী নিজের শিরোমণিটি রাজার হাতে সমর্পণ করলেন। দাসীর হাতে ওটি দিলেই দাসী দরোজা খুলে দেবে। এবারে শূন্যে মধুর বিদায়-চুম্বন ছুঁড়ে দিলেন দুষ্মন্তকে লোলাপাঙ্গী —এক যবন শ্রেষ্ঠীর কাছে এই বাযবীয় প্রকাশটি শিক্ষা করেছেন। দুষ্মন্ত মুগ্ধ নয়নে রাজনটীর দিকে চেয়ে কয়েক পা পিছু হটে, অগত্যা প্রাসাদে ফিরে গেলেন আনন্দের ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে।

আগ্রহ তাঁর অধীর অতি।

রজনী মধ্যযামিনী। মহারাজকে ছদ্মবেশ ধারণ করতেই হবে। কেননা পাড়াটা ভালো নয়। রাজনটী হলেও থাকেন তো তিনি নটীদের পল্লীতেই—সেখানে রাতভোর হৈচৈ, আলো। মত্ত নাগরিকের ভিড়, বিদেশী সৈনিক আর শ্রেষ্ঠীদের আনাগোনা, এমন কী ক্ষমতাসীন অমাত্য, রাজপুরুষদেরও অনবরতই সে পাড়ায় যাতায়াত। দুষ্মন্তকে সবাই চিনে ফেলুক এটা কাম্য নয়। বিদূষকের সাহায্য নিয়ে দুষ্মন্ত অতি যত্নে নিজেকে এক যবন শ্রেষ্ঠীর মতো করে সাজালেন—দর্পণে দাঁড়িয়ে "চমৎকার" বলে পিঠ চাপড়ালেন নিজেরই। বিদূষক বললেন—"সত্যিই মহারাজ, চেনা যাচ্ছে না। এখন লোলাপাঙ্গী নিজে চিনতে পারবে তো?" মহারাজ বললেন—"বিদূষক, বয়স হয়ে তোমার সাধারণ জ্ঞান কি লুপ্ত হয়েছে? লোলাপাঙ্গীর দাসী আমাকে দরজা খুলে দেবে, এবং তার চেনা নির্ভর করবে আমার চেহারার ওপর নয়—অভিজ্ঞানের ওপর।

এই সেই অভিজ্ঞান।" বলে, মহারাজ তাঁর বয়স্যকে একটি শিরোমণি দেখালেন, বৈদূর্যের তৈরি, জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে।

মাঝরাতে লোলাপাঙ্গীর বাতায়নে টোকা মারতে গিয়ে মহারাজ দুষ্মন্ত দেখলেন আগেই বাতায়ন খুলে উঁকি মারছে দেহাতী একটি কিশোরী দাসী। অধৈর্য প্রেমিক বললেন—"দোর খোলো গো, দোর খোলো। আমি এসেছি।" দাসী রাজাকে বললে —"তু কৌন রে?" উত্তরে মহারাজ মুঠো খুলে লোলাপাঙ্গীর অভিজ্ঞান শিরোমণিটি দেখালেন। সঙ্গে সঙ্গে কী যেন ঘটে গেল। "—ডাকু। ডাকু।। পাকড়ো। পাকড়ো।।" বলে চীৎকার করেই দাসী ঠাশ করে পাল্লা বন্ধ করে দিয়েছে—আর অমনি অন্ধকার থেকে দুটো ষণ্ডাগুণ্ডা, গুঁফো, নেংটিপরা পহেলবান বেরিয়ে এসে মহারাজকে "হেইও" বলে মাটিতে ঠেশে ধরেছে—। শুধু কি তাই?—"মার শালাকো। মার শালাকো।" বলে চেঁচিয়ে পাড়া ফাটিয়ে ফেলেছে। একজন তাঁর হাত মুচড়ে বৈদূর্যমণিটি কেড়ে নিয়েছে, এবং চেঁচাচ্ছে "মিল গিয়া মিল গিয়া একঠো চোরকা মাল মিল গিয়া।" অন্যজন ততক্ষণে রাজামশাইয়ের বুকে উঠে বসেছে এবং তাঁর দাড়ি টানতে টানতে পরিষ্কার যবন ভাষায় বলছে—"কী হে বাছাধন। বের করো এবারে বাকি মালকড়ি সব? নিকালো যো কুছ লিয়া, আভি নিকালো।" বলতে বলতে জামার ভেতরে হাত গলিয়ে বাইরে টেনে এনেছে মহারাজের রাজচক্রবর্তী রত্ন উপবীত, যার কোণে তাঁর অভিজ্ঞান-রাজ-অঙ্গুরীয়টি সযত্নে গ্রন্থিবদ্ধ করা রয়েছে। হাজার হোক বারাঙ্গনাপল্লী তো, ওটি আঙুলে পরিধান করে প্রকাশ্যে সেখানে যাওয়াটা মহারাজ শোভন মনে করেননি। ততক্ষণে রাজকীয় পিঠে বেশ কয়েকটি কিল ঘুষি পড়েছে আর কর্ণকুহরে যা মধুবর্ষণ হচ্ছে তা বলার নয়, চতুর্দিকে কৌতূহলী জনতার ভিড়, রাজা দুষ্মন্ত চোখ বুজে মনে মনে সীতার মতো বলছেন,—"হে ধরণী, দ্বিধা হও।" এমন সময়ে লোলাপাঙ্গীর মা পালোয়ানদের ধমকে উঠলেন—"ওরে বুড়বক। করিস কি, করিস কি, থোড়াবহুৎ গড়বড় তো হো গিয়া কুছ—জরুর। যবনের বুকে কেউ কখনো যজ্ঞোপবীত দেখেছিস? আর এ তো রাজ-উপবীত? ইনি নিশ্চয় কোনো ছদ্মবেশী রাজা-রাজড়া হবেন—ছি ছি। ক্যা শরম-কি বাত—ছোড় দো, ছোড় দো, আভি ছোড় দো উনকো"—বলতে বলতে যেই শলভা দুষ্মন্তের যবনসাজটি টেনে খুলে ফেলেছেন, সঙ্গে সঙ্গেই রাজার পদতলে পড়ে ক্ষমাও চাইতে শুরু করেছেন —"হে রাম। তৌবা তৌবা। গুড গড। একসকিউজ মি। অপরাধ নেবেন না মহারাজ। দাসীটি বালিকামাত্র—এবং দেহাতী, মহামহিমান্বিত মহারাজকে সে চিনতে পারেনি। আমাদের অসীম সৌভাগ্য আজ আপনি এসেছেন। দুর্ভাগ্যবশত আজই আমার ঘরে এক চোরও এসেছিল, এবং সে আমার রত্ন পেটিকাটি নিয়ে গেছে। যেহেতু লোলাপাঙ্গীর আর আমার বৈদূর্যমণি দুটি জোড়ামানিক, তাই দাসী ভুল করেছে —ভেবেছে এটাই বুঝি আমার—" এই সময়ে হন্তদন্ত হয়ে লোলাপাঙ্গী এসে পড়লেন —"চলুন মহারাজ, গৃহমধ্যে বিশ্রাম নেবেন। ছি ছি, আমি যারপরনাই লজ্জিত এবং

মর্মাহত। আপনি পরিশ্রান্ত, বিপর্যস্ত, আপনার শুশ্রূষার প্রয়োজন আছে। এই দাসদাসীদের বুদ্ধিহীনতাকে আপনি আমার মুখ চেয়ে মার্জনা করুন। ওদের কঠোর শাস্তি দেবেন না যেন প্রভু। ওদের ভুল হয়েছিল।"

আর শাস্তি কে কাকে দেয়। চোরের দায়ে ধরা পড়ে দুষ্মন্ত তখন চোখে সরষে-ক্ষেত দেখছেন। ষণ্ডাগুণ্ডা লোকদুটি মুহূর্তেই আশপাশের ভিড় হটিয়ে রাস্তা ফাঁকা করে দিয়েছে যদিও, তবু মহারাজ লজ্জা রাখবার জায়গা পাচ্ছেন না। হাঁটতে গিয়ে দেখলেন সোজা করে পা-ও ফেলতে পারছেন না। দেহের চাইতেও মনেই চোটটা লেগেছে বেশি। রাজা লোকজনের মাঝখানে এত অপমানিত জীবনে কখনো হননি। শলভার এবং লোলাপাঙ্গীর সেবায় তিনি সকালের আগেই সুস্থ হয়ে উঠলেন. এবং শলভা নিজের রথে সারথিকে দিয়ে মহারাজকে প্রাসাদে পাঠিয়ে দিলেন সূর্যোদয়ের আগেই।

দুষ্মন্ত স্নান করতে গিয়ে সভয়ে আবিষ্কার করলেন, অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়টি উপরীতে বাঁধা নেই। সর্বনাশ করেছে। এখন উপায় কী? তাড়াতাড়ি বিদূষককে পাঠালেন শলভার গৃহে। দুই থলি স্বর্ণমুদ্রা সমেত। শলভা খুব যত্ন করেই অতিথি সৎকার করলেন, তারপর আলবোলার ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—"কেয়া আফসোসকি বাত। লেকিন, ইসমে, বিদূষকবাবু, ম্যায় তো লাচার জী। হাঁ, আংটি একটা আমি কুড়িয়ে পেয়েছি বটে, ঠিকই, কিন্তু ও দিয়ে আমি কীই বা করবো, তাই আমার ছোট্টো নানহেমুনহে বোনপোটিকে উপহার দিয়ে দিয়েছি। সে খেলা করবে বলে। আপনি ওর কাছ থেকে চেয়ে নিন। আংটিটা যে এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ও তো ম্যাঁ সচমুচ নহী সমঝা।"

শুনে বিদূষকের তো মাথায় হাত। শলভার কাছ থেকে উদ্ধার-আশ্রমের ঠিকানা নিয়ে বিদূষক প্রাসাদে ফিরলেন। রাজার সারথিকে প্রথমে বললেন রথ প্রস্তুত করতে। তারপর দুষ্মন্তকে গিয়ে বললেন,—"এ আমার একার কর্ম নয়। আংটি উদ্ধার করতে হলে,—মহারাজ, আপনি নিজেও চলুন। এসব মুনিঋষিরা লোক সুবিধের হয় না। যদি না দিতে চায়?"

রাজা কয়েক থলি স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে বিদূষকের সঙ্গে আশ্রমের খোঁজে বের হলেন। রথ বনের গভীরে প্রবিষ্ট হলো। অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় অচিরেই ফেরৎ না পেলে রাজ্যের যাবতীয় রাজকার্য স্থগিত থাকবে।

আশ্রমের ঠিকানায় পৌঁছে বিদূষক দেখেন পরমাসুন্দরী এক আশ্রমকন্যা বৃক্ষমূলে বসে আছেন, কোলে একটি রাজচক্রবর্তী শিশু। তারই ক্ষুদ্র মুঠির মধ্যে দুষ্মন্তের অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় শোভা পাচ্ছে। পদশব্দ পেয়ে কন্যা মুখ তুললেন। বিদূষক দেখলেন, শকুন্তলা।

রাজাকে দেখে শকুন্তলা অবাক হলেন না, তিনি রাজার আশাতেই বসেছিলেন।

কিন্তু আকস্মিক শকুন্তলাকে দেখে রাজা যারপরনাই বিস্মিত। তাঁকে চিনতে একটুও দেরি হলো না। এত সুন্দরও মানুষে হয়? আর এই মেয়েকেই কিনা তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন? তাঁকে কি ভূতে ধরেছিল? শকুন্তলা উঠে মহারাজকে প্রণাম করলেন। গলাটা ঝেড়ে নিয়ে দুষ্মন্ত শর্টে আশীর্বাদ সেরে বললেন—"থাক-থাক। তা, ইয়ে, কি বলে, হ্যাঁ, শকুন্তলা, তুমি আমার অঙ্গুরীয়টি পেয়েছিলে তো?"

শকুন্তলার বিশাল দুটি সরল চোখ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লো—"আপনি কোন অঙ্গুরীয়ের কথা বলছেন, মহারাজ?"

"কেন, যেটি আমি শলভার হাতে রাজপুত্রের জন্য পাঠালাম?"

"এটাও তবে আপনারই দেওয়া? আমি ভাবলাম দিদিই বুঝি—"

"বোকা মেয়ে।" দুষ্মন্ত শকুন্তলার মাথাটি নেড়ে দিয়ে পবিত্র হেসে বলেন —"তোমার দিদি এটি পাবেন কেমন করে? আমি নিজে না-দিলে? রাজবংশের শিলমোহর বলে কথা। ও কি যে-সে আংটি? নাও, ছেলেকে নাও, আংটিটা নাও, রথে ওঠো—ব্যস। আর কিছু নিতে হবে না"—শকুন্তলা সলজ্জভাবে বললেন—"ঋষিমশাইকে প্রণাম করে, অনুমতিটা নিয়ে আসি?" বিদূষক বলে ওঠেন—

"সাবধান কিন্তু মা-জননী, অঙ্গুরীয়টি যেন আবার রাজকুমার না গিলে ফ্যালেন। পেট কেটে তো আর বের করা যাবে না। ওদিকে আমাদের মহারাজ আবার একটু ভুলো আছেন,—জানেনই তো।"

দুষ্মন্তের শাশুড়ি মেনকা তখন আকাশপথে যাচ্ছিলেন, ইন্দ্রের আদেশে আরেক মুনির তপোভঙ্গ করতে। শলভা আর শকুন্তলার কাণ্ড দেখে মৃদু হাসলেন।

BanglaBook.org

মাতৃয়ার্কি

[অর্থাৎ বন্দে মাতরম!]

মেয়েরা দু'জাতের। একদল মাতৃতান্ত্রিক বাই নেচার, এঁরা সংখ্যালঘু কিন্তু শক্তিতে লঘু নন মোটেই। বাকিরা পিতৃতান্ত্রিক, অবলা। এঁদের কল্যাণেই জগতে পুংশাসিত সমাজে নারীর আজ এই দুরবস্থা। প্রথম জাতের মেয়েতে জগৎ পরিপূর্ণ থাকলে 'উইমেন্স লিব্ মুভমেন্ট'-এর প্রয়োজন হত না। কেননা তাঁরা বাল্যে পিতাকে, যৌবনে পতিকে এবং বার্ধক্যে পুত্রকে অনায়াস-অঙ্গুলি সঞ্চালনে পদানত রাখেন। শুধু পুরুষজাতি কেন তাবৎ মনুষ্যসমাজ তথা সরীসৃপরা বসুন্ধরা তাঁদের অবিসংবাদিত প্রভুত্ব মেনে নেয়। এঁরা এঁদের জীবনের সব কিছুকেই অনায়াস স্বাযত্ন-শাসনে রাখেন। দ্বিতীয় কোনো শক্তির তোয়াক্কা করেন না। বধূবেশে রাজায়ে কিঙ্কিনী রাসবঘরে প্রবেশ করলেও মুকুট মাথায় রাজদণ্ড হাতে সিংহাসনারূঢ় হয়ে সেখান থেকে আবির্ভূত হন সম্রাজ্ঞীর বেশে। সুলতানা রিজিয়া, কি ঝাঁসীর লক্ষ্মীবাঈ, রানী রাসমণি, কি রানী ভবানী, বা আমার গর্ভধারিণী, এঁরা সব এই জাতের। আমাদের চেয়ে একেবারে অন্য মেটিরিয়ালে তৈরি। মা প্রায় কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করেন না। সমাজ, অথবা সরকার তাঁর কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। এমন কি চন্দ্রসূর্যও না। সৌর নিয়ন্ত্রিত চব্বিশটি ঘণ্টার বাঁধা ছককে মা এখন আর গ্রাহ্য করেন না। যখন খুশি ঘুমোন যখন খুশি জাগ্রত থাকেন, কোন্ বই পড়ছেন, সেটা কতটা ইন্টারেস্টিং তারই উপর নির্ভর করছে অন্যান্য যাবতীয় জাগতিক প্রয়োজন। ঘড়ির কাঁটাকে মা থোড়াই কেয়ার করেন।

"আমি কি ঘড়িটা কিনেছি, না ঘড়িটা আমাকে কিনে নিয়েছে? কে কার মালিক?"

সুতরাং ঘড়ি ওঁর ক্রীতদাস।

মহাকাল ওঁর ক্রীতদাস। সজ্ঞানে তার ইচ্ছানুসারে উনি চলতে রাজি নন।

ভারতবর্ষে নাকি গণতন্ত্র চালু। এ বাড়িতে ঘোর রানীতন্ত্র। আগে একজন রাজামশাই ছিলেন, তিনিই ছিলেন মহারানীর মুখ্য প্রজা। আর গৌণ প্রজা ছিলাম আমি। এখন রাজামশাই নেই, মহারানী আছেন, আর আছেন তাঁর দুই সখী, দুটি খুদে রাজকন্যে। ট্রেনিং পিরিয়ড চলছে তাঁদের, আপাতত অ্যাপ্রেন্টিস আছেন। এঁরা রাজদণ্ড হাতে নিয়েই জন্মেছেন, তাই এঁদের নাচারাল ওয়ানডার বলা যায়। তিনজনের কিন্তু মোট প্রজা মাত্র একটিই। আমি। গৌণ বলতেও আমি, মুখ্য বলতেও আমি।

আমি আবার প্রজা বাই নেচার। প্রজা বাই বার্থ। বশংবদ, প্রভুভক্ত।

স্কেচ এক

নামেও রানী, কাজেও রানী। শুধু কি চন্দ্র-সূর্য? মৃত্যুকেও কি কেয়ার করেন তিনি? ওঃ নো। কাল ব্যাপারটাকেই তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন। জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন। এটা বোঝা গেল এবারকার বড়ো অসুখে। যখন নাকে অক্সিজেনের নল আর হাতের শিরায় গ্লুকোজের ছুঁচ গোঁজা, পাশে দাঁড়িয়ে খটখটে সাদা টুপি মাথায় নার্স, আর জোর করে হাসি-হাসি মুখে হৃৎকম্পমান আমি—ডাক্তারবাবু সেইরাত্রের চতুর্থ ইঞ্জেকশনটি সদ্য দিয়ে উঠছেন,—একটা মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল। চোখ যদিও বন্ধ, মা গুনগুন করে ক্ষীণ স্বরে কী যেন বলছেন। বাগবিস্তারের ক্ষমতা মার মোটেই ছিল না তিনদিন। তাই সব্বাই আগ্রহের সঙ্গে মুখের কাছে কান নিয়ে ঝুঁকে পড়লুম.—কী বলছেন? মা বলছিলেন, বেশ ভাব দিয়েই, "আমি পরাণের সাথে খেলিব আজিকে মরণ খেলা। নিশীথবেলা। সঘনবরষা গগন আঁধার, হের বারিধারে কাঁদে চারিধার—ভীষণরঙ্গে ভবতরঙ্গে ভাসাই ভেলা।" আমাদের ডাক্তারবাবুটিও আজকের মানুষ নন, মারই বয়সী—সেকালের গোল্ডমেডালিস্ট বলে কথা। তিনিও কান পেতে শুনলেন, এবং একগাল হেসে বললেন—"উহুঁ। ওসব বললে শুনবো কেন? আমরা তবে আছি কি কীর্তে? এমারজেন্সী ডিক্লেয়ার করেছি, রাস্তায় আর্মি নামিয়ে দিয়েছি। ওসব মরণখেলাধুলো একেবারে বন্ধ। এখন জীবনখেলা। এখনো ভাঙেনি, ভাঙেনি মেলা, নদীর তীরের মেলা। এ শুধু আষাঢ় মেঘের আঁধার, এখনো রয়েছে বেলা। বুঝলেন?"—মৃদু হাসির রেখা ফুটলো ঠোঁটে, চোখ একটু খুললো।

"'ক্ষণিকা' তো? কিন্তু এই কবিতাটা 'ক্ষণিকা'র তুলনায় তেমন ভালো নয়।" মিনমিন করে, হাঁপাতে হাঁপাতে মন্তব্য করেন যাই-কি-না-যাই রুগী।

—আপনি এই অবস্থায় এত বকবক করবেন না তো"—নার্সটি হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠে বাধা দেন।

ঠোঁটের হাসি মুছে যায়। রুগী ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানান —"কাব্য-আলোচনাকে যে-অর্বাচীন বলে বকবক করা, সে শুশ্রূষার কী জানে? ডাক্তারবাবু, একে সরিয়ে নিয়ে যান।"

—"হাঁ হাঁ। ওকে তো নিয়ে যাবোই, আপনি আগে সেরে উঠুন—তারপর।"

—"আর সেরে ওঠা। এই ঘুম চেয়েছিলো বুঝি—"

—"থামুন তো আপনি? ও কবিতা এখন নয়।"

—"কেন নয়? কি জানেন ডাক্তারবাবু, মর্মে মর্মে টের পেয়েছি, অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়, আরো এক বিপন্ন বিস্ময় আমাদের অন্তর্গত—"

—"থাক থাক এখন জীবনানন্দ নয়। রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ। বুঝলেন?" ডাক্তারবাবু বাধা দেন।

—"যা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ, আর গীতা। আর জীবনানন্দ। এই কি জীবনে যথেষ্ট নয়? বলুন ডাক্তারবাবু?"

—"বাস। বাস। চমৎকার। কেবল এর সঙ্গে একটু অক্সিজেন, একটু গ্লুকোজ, আর একটু অ্যান্টি-বায়োটিকস। জীবনানন্দটা বরং এখন থাক। সেরে উঠে হবে, কেমন? কাল সকালে আবার আসবো।"

মা নার্সের দিকে মৃদু অঙ্গুলি সঞ্চালন করে বলেন—"এঁকে সঙ্গে নিয়ে যান।"

কপালগুণে নার্সটি বুদ্ধিমতী। মানুষও ভালো। রোগতিক বুঝে বলে উঠলেন —"স্যরি মাসিমা। আমার খুব ভুল হয়েছে। বকবক নয়, কাব্য-আলোচনা। আর এমনটি হবে না। আমরা কাঠখোট্টা মানুষ, অত কি জানি?"

রুগী সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা করে দেন নার্সকে—ক্ষীণ গলায়, থেমে থেমে বলেন —"এই তোমাদের মতন আজকালকার ছেলেমেয়েরা—কেবল লেখাপড়াই শিখছে —নামকাওয়াস্তে। শিক্ষিত তো হচ্ছে না। এই যে আমাদের ডাক্তারবাবু, উনি হলেন —প্রকৃত শিক্ষিত—কত কবিতাই যে ওঁর মুখস্থ। বলো দিকিনি, বন্দে-মাতরম—মানে কী?"

—"মানে? মানেটা ঠিক—স্যান্সক্রিট বোধহয়—এ স্লোগান আর কি... জয় হিন্দ যেমন—মানে দেশের জয় হোক।"

—"তোমার মাথা। লিটারাল মীনিং মায়ের বন্দনা করি। বল দিকি গানটা কার লেখা।"

—"রবিঠাকুর?"

—"হল না"—মা অক্সিজেনের নলসুদ্ধু মাথা নাড়াতে যাচ্ছেন দেখে নার্স তাড়াতাড়ি মাথাটা চেপে ধরে বলে—"আমি ঠিক জানি না মাসিমা, আপনিই বলে দিন, কিন্তু আর কথা বলবেন না—এতে খুব স্ট্রেন হচ্ছে আপনার—এই শেষ—"

—"আনন্দমঠ পড়েছ?"

—"হ্যাঁ-অ্যাঁ।"

—"কার লেখা?"

—"বঙ্কিম।"

—"পড়নি। ওতেই আছে। জগদীশ ভট্টাচার্যের বইটা দেখো, গানটার সব খবর পাবে।"

তিনমাস বাদে, মাকে সুস্থ করে, চলে যাবার সময়ে নার্সটি বলে গেলেন। পঁচিশবছরের নার্স-জীবনে এমন আজব রুগী আর তিনি পাননি। যে চামচে দিয়ে তরল দ্রব্য ছাড়া কিছু খেতে পারছে না, ফাউলার্স বেড়ে হাতল ঘুরিয়ে খাটশুদ্ধ উঠিয়ে বসিয়ে না দিলে উঠে বসার পর্যন্ত ক্ষমতা নেই, অক্সিজেন, গ্লুকোজ আর ইঞ্জেকশনের ফাঁকে ফাঁকে সে আপনমনে খালি কবিতা আওড়ায়, আর নার্সের পড়া ধরে। তাজ্জব কাণ্ড!

BanglaBook.org

স্কেচ দুই

ফোন বাজলো।

—হ্যালো, হ্যাঁ নবনীতা বলছি। কে? মল্লিকমশাই?

—শুটিং হপ্তাখানেক বাদে শুরু? হ্যাঁ তা পারব বোধহয়। পরশু ভোরবেলা আমাদের একটা একসকারশনে কলকাতার বাইরে বেরুতে হচ্ছে, তিনদিন বাদেই ফিরব, তারপরে তো?

ওঃ না, মাকে এখনো কিছু বলা হয়নি, খুব অসুস্থ ছিলেন তো, তার মধ্যে আজই বলব।—নাচতে নাচতে মার কাছে যাই।

—দারুণ একটা চান্স পেয়েছি মা—

—কিসের?

—ওয়ার্ল্ড ফেমাস হবার। বিখ্যাত চিত্র পরিচালক মল্লিকমশাই তাঁর নেক্সট ফিল্মে আমাকে নিয়েছেন। তোমার তখন খুব বাড়াবাড়ি অসুখ তাই বলা হয়নি।

—নায়িকা?

—না না, এমনি একটা ছোট সাইডরোলে, কিন্তু খুব সুন্দর রোলটা।

—পার্শ্বচরিত্রে? আমার মত নেই।

—ও আবার কী কথা?

(চিন্তিত স্বরে) ফিল্ম লাইনটা—এখনও টালমাটাল। আটের স্বর্গে পৌঁছুবে—না—পণ্যের সাম্রাজ্য মেলবে বোঝা যাচ্ছে না। ওটা লাইন—তার পার্শ্বচরিত্রে এখনও বাণিজ্যেরই বাহন মনে হয়। না, না ও হবে না।

—এত আধুনিক হয়েও তুমি এরকম বলছ মা? এটা আমি আশা করিনি—

মা একটু থেমে থেকে, আবার প্রশ্ন শুরু করেন—কিসের রোল? চরিত্রটা কেমন?

—মৃত্যুপথযাত্রিণী শয্যাশায়ী একটি বউয়ের। আমাকে বিছানা ছেড়ে উঠতেই হবে না—শুয়ে শুয়ে সে খুব বইপত্র পড়ে। আর মানুষজন ভালোবাসে। মল্লিকমশাই চমৎকার ডেসক্রাইব করেছেন মা—বেশ ম্যাচিওর কিন্তু সেনসিটিভ ফেস—চেহারা হবে বেশ রুগ্ন রুগ্ন, অথচ তারই মধ্যে প্রচুর ওয়ার্মথ আর ভাইভ্যাসিটি লেগে থাকা চাই, আর থাকবে একটা অদ্ভুত সেলফ কনফিডেন্স, মৃত্যুকে পরোয়া না করার।

—এই সমস্ত কি তোমার মধ্যে আছে?

—হ্যাঁ, স-ব। মল্লিকমশাই বলেছেন, আমার মধ্যে সব আছে। মুখে মৃত্যুর ছায়া পড়েছে অথচ চোখে হাসিটি লেগেই আছে।

—মুখে মৃত্যুর ছায়া? আমার মেয়ের?

BanglaBook.org

—সত্যিতে না। অভিনয় তো।

—তুমি অভিনয় পারো?

—আমি তো ওঁকে বল্লুম কী করে হবে বলুন, একে কখনো অভিনয় করিনি, তার ওপরে আমার বাঁদিকের ভোকাল কর্ড খারাপ হয়ে গেছে আট বছর হলো, ভয়েসটা ঠিক নেই, তায় প্রচণ্ড হাঁপানি, যখন তখন টান উঠে যায়—

—শুনে তিনি কী বললেন?

—শুনে? মল্লিকমশাই শুনে টুনে খুব খুশি হয়ে বললেন আমার নাকি এগুলো সবই প্লাস পয়েন্ট। ধরো যদি শুটিংয়ের সময়ে হঠাৎ গলাটা বসে যায়, কিম্বা কাশির দমক ওঠে, কি হাঁপ ধরে, তবে তো খুবই ভাল, বেশ ন্যাচারাল হবে—আমাকে একদম অভিনয় করতেই হবে না—

—ন্যাচারাল হবে? তারপর ন্যাচারাল ডেথটা দ্যাখাতে পারলে তো আরো ভালো? সেটা বলেনি? আহাহা মুখে মৃত্যুর ছায়া।—আমার এই রোগাকণ্ঠ মেয়েটাকে, উঃ। আচ্ছা, ওদের কি মনে মায়া মমতা নেই রে? যত অলক্ষুণে কাণ্ড!

—তাতে কী হয়েছে মা? এতো শুধু অভিনয়—

—বেশ, অভিনয়ই যদি হবে তবে রুগীকে ধরে এনে রুগীর ভূমিকায় নামানো কেন? তাহলে তো বর-কনে ধরে এনে বর-কনের ভূমিকায়, খুনী ধরে এনে খুনীর ভূমিকায় নামাতে হয়। অভিনয় শিল্পটা তবে আছে কী করতে? ভাল ভাল অভিনেত্রীর ছড়াছড়ি টালিগঞ্জে—

—সে কথা আমিও বলেছিলাম মা। উনি বললেন, কিন্তু অভিনেত্রীদের চেহারায় যে আবার লাবণ্য-টাবন্য আছে। ওঁর দরকার মোটামুটি কাঠকাঠ চেহারা —লাবণ্যহীন—

—কী? আমার মেয়ের চেহারা লাবণ্যহীন? কাঠকাঠ? রোগে ভুগে ভুগে নাহয় একটু শুকিয়েই গেছে মুখখানা। তাবলে তাকে কিনা লাবণ্যহীন বলা? বাবা খুকু, —শোনো যা বলি। লোভ করতে নেই মা। ওপথে পা বাড়িও না। শুধু শুধু কেন সেধে সেধে নিন্দে কুড়োবে মা? অভিনয় তো তুমি পারো না। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহ—

এইবারে খেয়াল হলো। মল্লিকমশাইয়ের চমৎকার অফারটি পেয়ে অবধি চোখ বুজলেই মানসনেত্রে দেখছিলুম কাগজে ছবি—শ্রেষ্ঠ পার্শ্বভূমিকাভিনেত্রীর পুরস্কার নিচ্ছেন নবনীতা দেবসেন—সিনেমার পত্রিকাগুলোতে মৃত্যুপথযাত্রিণী আমার রঙীন স্টিল ফোটো, বাসেট্রামে লোকমুখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা—

—থার্টি সিক্সে জেনিফার কাপুরের পরে এই নবনীতা সেন দেখালো বটে অভিনয় কাকে বলে। এসব কিছু না হয়ে, ঠিক উল্টোটাও তো হতে পারে। —এদিকটা মোটে স্ট্রাইকই করেনি। বাসে ট্রামে শোনা যাবে—আচ্ছা নবনীতা সেনের কাণ্ডটা একবার দেখলি? কী লোকটাই না হাসালে বল তো? কেন যে মানুষের হঠাৎ

BanglaBook.org

হঠাৎ এমন ভীমরতি হয়, পুরো বইখানা ঝুলে গেছে ওর জন্যে—

মা বললেন—পাঁচজনের পাঁচকথায় কান দিতে নেই বাবা। ওতে ক্ষতি হয়। একমনে নিজের কাজটি করে যাও। ওই ভদ্রলোককে টেলিফোন করে আজই বলে দাও—মা তোমাকে পারমিশন দেন নি—

—গেল। শেষ হয়ে গেল আমার নক্ষত্রভাবনা। গুটিগুটি কোণের দিকে এগুচ্ছি, মা বললেন —খুকু, তোমার নাড়ীছেঁড়া ধনেরা গেলেন কোথায়? এ বিষয়ে মতামত দিতে এলেন না যে বড়ো? সব ব্যাপারেই তো তাঁরা আগে বক্তব্য রাখেন—

—তারা ইশকুলে চলে গেছে।

—টিফিন কী দিলে?

—স্যানডুইচ বোধহয়—লক্ষ্মী দিয়েছে।

—বোধহয়? কেন, বোধ হবে কেন? নিশ্চিত জান না কেন? এমন কিছু দুর্বোধ্য ব্যাপার? ফিল্মে নামার নামেই এই? তবেই বুঝে দ্যাখো নামলে কী অবস্থা হবে তোমার।

হল না। ওয়ার্লড ফেমাস হওয়া হল না। আমার কান, বার্লিন, ম্যানিলা সবগুলো ফেসটিভাল হাতের মুঠো থেকে ফসকে গেল। বানীমার এক হুকুমে। আমি ঠিক জানি মল্লিকমশায়ের ঐ ছবি ওয়ার্ল্ড হিট হবেই। অমন গল্প। অমন চরিত্র। বেশ। হোক হিট। তখন মার মনে আফশোস হবে। ঠিক হবে। বেশ হবে।

BanglaBook.org

স্কেচ তিন

ফর্সা মুখের চারিধার ঘিরে জ্যোতির্মণ্ডলের মতো ধবধবে চুল একমাথা ফুলে ফেঁপে আছে, গোলাপী ঠোঁট, বলিরেখাটেখা পড়েনি কুত্রাপি, দূরে দেখবার বেশি পাওয়ারের চশমার ফাঁকে বুদ্ধি ঝকঝকে চোখ—এখনো চালশে টালশে লাগে না, বিনা চশমায় বই পড়তে পারেন, (ওসব আমাদের পক্ষেই যা অপরিহার্য পরনির্ভরতা) পরনে ফর্সা সিল্কের নাইট গাউন, পায়ের ওপর গরদের চাদর-চাপা দেওয়া, হয় ইজিচেয়ারে বসে বই পড়ছেন নয় খাটে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। পায়ের কাছে শাদা কটকী চটি। যদিও নড়াচড়ার শক্তি অতি সামান্য। গতবারের অসুখের ধাক্কায় পায়ের টালমাটাল অবস্থা। বানীমা ইজিচেয়ারে বসে মনোযোগ সহকারে বিশাল এক পেতলের ফুলদানীতে লেবু ঘষছেন। নাইট গাউনে সেই নোংরা রস পড়ছে, দাগ হচ্ছে খেয়াল নেই। এমন সময়ে কাপের মধ্যে ঘটাঘট চামচ নাড়তে নাড়তে ছোটকনো, অর্থাৎ ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের প্রবেশ।

—দিম-দিম, এই নাও তোমার মহান শক্তিদাতা, শিগগির খেয়ে ফ্যালো, অলরেডি ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। পেছু পেছু ওষুধের ছোট্ট রেকাব নিয়ে জলসমেত মাদার টেরেসা অথবা মেয়ে-পুলিশ (বড়কনো এই দুটোর একটা হবেন, ডাকাত ধরবেন চম্বলে

গিয়ে, অথবা—) এসে পড়েন। এসেই পুলিশী ধমক—

—দিম্মা। তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। এদিকে তো স্টেবয়েড আর ভ্যাসোডায়লেটর-এর ওপর ভরসা, তাইতে এত গায়ে জোর হয়েছে, যে ওই ধুম্বো ফুলদানী—ঈশ, যদি পায়ের ওপরে পড়ে যায়?

—জামাটা তো গেছেই। ছোটকন্যের অ্যাডিশান।

—তোমরা যদি সাফ না করো ফুলদানীটা তাহলে কাউকে তো সাফ করতে হবেই? গান্ধীজী তো স্বহস্তে প্রিভি পরিষ্কার করতেন আশ্রমের—

—ইন-করি-জিবল। সত্যি দিম্মা, তুমি না, ইন-করি-জিবল। ফুলদানীতে হাত থেমে যায়। চোখে একটা অনেক দূরের আলো ঝলসে ওঠে—

—কী বললি? কী শব্দটা বললি ওটা? ইন-করি-জিবল? তোদের দাদুও আমাকে বলতেন, ইন-করি-জিবল। অথচ শব্দটার মানেটা কোনোদিন জেনে নেয়া হয়নি। কী মানে রে?

—দাদুও বলতেন তো? তবেই বোঝো কতদূর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট শব্দটা তোমার ক্ষেত্রে। ওর মানে হচ্ছে যাকে করেক্ট করা দুঃসাধ্য, যেমন তুমি। বুঝলে?

—পাণ্ডবরা কোন বনে বনবাসে গেলেন?

—মানে?

—মানে, কেবল স্টেবয়েড আর ভ্যাসো অ্যাক তমুক আর ইনকরিজিবল বলতে পারলেই তো হল না? ইংরিজি শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি মানেই তো শিক্ষিত হওয়া নয়। জ্ঞানভাণ্ডারটার কী অবস্থা, তাই দেখছি। এটা একটা এলিমেন্টারি প্রশ্ন। পাণ্ডবরা কোন বনে বনবাসে গেলেন?

—দণ্ডকারণ্য?—ছোটকন্যের ভীতু ভীতু উত্তর।

—দূর বোকা, সেটা তো রামায়ণের বন রে! বড়কন্যে শুধরে দেন।

—তবে কি পঞ্চবটি? ছোটকনো আবার বলেন।

—সেও রামায়ণে, স্টুপিড। তুমি চুপ কর। দিদির ধমকে বোন চুপ করেন, কিন্তু দিম্মার মায়া হয়। উৎসাহ দেবার চেষ্টায় বলেন—

—বেশ তো, তবে রামায়ণই হোক না? রাবণের বাবার নাম কী?

—রাবণের বাবা? পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি।

—রাবণের বাবা তো একজন মুনিঋষি ছিলেন...

—বেশ, বুঝলুম। কোন-মুনি? তার নাম কী?

—বিশ্ব.... বিশ্বা... বিশ্বামিত্র? না না বৈশ্বানর? না, সরি সরি, ওটা তো অগ্নি.... বৈশ্য, বৈশ্য দাঁড়াও বলছি—বলছি...

দিম্মার ফর্সা মুখ নাতনীদের পাণ্ডিত্যহীনতার বেদনায় আরো পাণ্ডুর হয়ে যায়।

—হ্যাঁরে, ইশকুলে কি তোদের কিছুই শেখায়নি বাছা? শুধু শুধুই গালে চড় মেরে টাকা নেয়?

BanglaBook.org

—বিশ্বৈঃশ্রবা।—হঠাৎ বোমার মতন বড়কন্যে বিস্ফোরণ ঘটায়। মুখচোখ আহ্লাদে জ্বলজ্বল করছে। ছোটকন্যেও হাততালি দেয়—হ্যাঁ হ্যাঁ, বিশ্বৈঃশ্রবা। এবার ঠিক মনে পড়ে গেছে।

যেন এক্ষুনি কেউ তাঁর গালে একটা থাপ্পড় মেরেছে, এমনি একটা যন্ত্রণাময় মুখভঙ্গিতে দিম্মা। দু'হাত তুলে বলে ওঠেন—ওরে চুপ কর ভাই চুপ কর। ওটা তোরা উচ্চৈঃশ্রবার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছিস। বিশ্রবা, বিশ্রবামুনি। পুলস্ত্যমুনির পুত্র। তাই রাবণকে পৌলস্ত্যেয়, বৈশ্রবস ইত্যাদি নামে ডাকা হয় দেখিসনি? যাকগে যাক, এবার বল রাবণের মায়ের নাম কী?

—মন্দোদরী।

—এঃ ছি ছি তুই যে কী ভুলভাল বলিস। মন্দোদরী কি রাবণের মা? না ইন্দ্রজিতের মা? রাবণের রানী।

—ওঃ সরি সরি, ইন্দ্রজিতের মা। আসলে, আই মেন্ট ইন্দ্রজিতের মা।

—আচ্ছা, দিদি, রাবণের মায়ের নাম কি রামায়ণে আছে? —ক—কখনো তো শুনিনি? শুনেছি কি আমরা, দিদি?

—শুনেছি নিশ্চয়ই, রামায়ণ মহাভারত এটসেট্রা আর ফুল অফ এনডলেস বংশকুলজীস। তবে স্টোরিতে তো ওর কোনো ইম্পর্টান্ট রোল নেই। সাম রাক্ষসী হবে, আর কি। নিকষা, ত্রিজটা, কি বৃকোদরী জাতীয়—

—না। কেকসী বিশুদ্ধা রক্ষকন্যা ছিলেন না, তাঁর মা ছিলেন পরম রূপবতী এক গান্ধর্বী, বুঝলে? যাকগে। ওসব কথা থাক। আজ সত্যি মনটা বড্ড খারাপ হয়ে গেল ভাই। তোমরা এত এত কুইজ করছ। এত এত জেনারেল নলেজ বই পড়ছ আর নিজের দেশের পৌরাণিক গল্পের বেলায়—প্রহ্লাদ কে ছিলেন জানো? হিরণ্যকশিপু? অথচ মেডুসা কে ছিল জানো, জেসন জানো, ল্যাবিরিনথ, থিসিয়াস —সব জানো—

দু মিনিট স্তব্ধতা। পুরাণকালের তিরোধানে শোকপালন। ঘরসুদ্ধ সবাই লজ্জিত এবং অনুতপ্ত।

মা নিজেই স্তব্ধতা ভাঙেন—আচ্ছা ভাই, তোমাদের খুব ছেলেবেলাতে যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ গাইতে শিখিয়েছিলুম কিছু মনে আছে? সমস্বরে উত্তর হয় এবারে: —আছে, দিম্মা। বলব? 'গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী সবার উপর। লক্ষ্মীসহ তথায় আছেন গদাধর'—আরো বলব? আরো মনে আছে অনেকখানি—

—থাক। আর বলে কী হবে? ওটা তো ব্যর্থ। ও তো লোকদেখানো শেখা। ভেতরে তো যায়নি। মূলে হা-ভাত। যার মূল নেই, তার মূল্যও নেই।

—অর্থাৎ অমূল্য বস্তু। না, দিম্মা? কন্যে মুখ টিপে হাসছেন।

—রসিকতা করে লাভ নেই। কাম্যকবন বলতে পারোনি মনে রেখো। বিশ্রবা বলতে পারোনি। কৈকসী না, প্রহ্লাদ না, হিরণ্যকশিপু না,—তোমাদের এই ইশকুলের

BanglaBook.org

শিক্ষা—সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়। সব ঝুট। এটা কার কথা? কোত্থেকে বললুম? জানি বলতে পারবে না।

—মেহের আলির কথা তো।

—বাঃ? জানিস? মেহের আলি কিসে আছে?

—ক্ষুধিত পাষাণে।

—ক্ষুধিত পাষাণ কিসে আছে?

—গল্পগুচ্ছে। কোন খণ্ড তা বলতে পারব না কিন্তু।

—তোরা গল্পগুচ্ছ পড়েছিস? কত খণ্ড পড়েছিস?

—আমি তিনটে, দিদি হয়তো আরো...

—আমাদের বাড়িতে তো তিনটেই আছে—

—তিন খণ্ডই পড়িচিস ভাই? বেশ, বেশ, এবারকার মতন কাম্যকবন না পারাটা মাপ করে দিলুম। বিশ্বেশ্বরাও মাপ—হবে, হবে, তোদের আস্তে আস্তে হবে। ভাগ্যিস, "রচনাবলীতে আছে" বলিসনি—

—দিম্মা, ওষুধগুলো খেয়ে নাও, আর হরলিকস তো জুড়িয়ে জল হয়ে গেল —এই নাও ধর ওষুধ—

মা ওষুধ মুখে দিচ্ছেন, এমন সময়ে সিঁড়িতে দাপুর হেড়ে গলায় সদ্য হারডা জিলায় শুনে আসা "বিষকন্যা" যাত্রার পার্ট শোনা গেল—ছুঁসনে পাগোল।" তারপর সুর করে গান ধরলো—"ছুঁ—স সনে পা-গো-ল। ও যে বিস এর বড়ি-ঈ ঈ—"

ব্যস। মার চোখমুখে দুর্দান্ত দুষ্টুমি ঝলমল করে ওঠে। মা ওষুধসুদ্ধ হাত নামিয়ে দেন।—ওই যে, শোনো, ডেলফির অব্যাকল। দৈববাণী হচ্ছে। এসব আজ আর খাবো না, হ্যাঁ ভাই? এগুলো থাক? বিষের বড়িগুলো? কেবল ঠাণ্ডা হরলিকসটুকু খেয়ে নি, কেমন?

—ওমা, সেকি কথা দিম্মা? ওই অব্যাকল ঝুট হ্যায়। না, ওসব শুনবো না, শিগগির খাও

এর পরে ঘটে গণতান্ত্রিক দেশে মেয়ে-দারোগার হাতে মহারানীর অসহায় আত্মসমর্পণ।

স্কেচ চার

শোবার ঘর তো নয়, যেন নহবৎখানা। বাড়িতে জমজমাট বমবমাট কাণ্ড। যুগলবন্দী সানাই বাজছে। এঘরে আমি, ওঘরে মা। যন্ত্র লাগে না আমাদের, ফুসফুসেই বিল্ট ইন তারসানাই। ধুলো, ধোঁয়া, ফুলের রেণু যাহোক কিছু সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে ঘা দিলেই হলো, এওলিয়ান হার্প বেজে উঠবে শাঁই শাঁই করে। বাড়ির যাবতীয় বালিশ, তাকিয়া,

BanglaBook.org

কুশান আমাদের দুজনের পিঠে গোঁজা। বাড়ির আর সকলের বিনা বালিশে শোওয়া এবং বিনা কুশানে বসা অভ্যেস হয়ে গেছে। খানিক আগেই কম্পাউন্ডারবাবু এসে সটাসট দু ঘরে দু খানা করে ডেরিফাইলিন ডেকাড্রন সুই মেরে দিয়ে গেছেন, ডবলফোড। ফলম: আমার শরীর অনেকটা ভালো বোধ হচ্ছে. উঠে গুটি গুটি মার কাছে এসেছি। পিঠে হাত বুলোচ্ছি।

—একটু ভালো বুঝছো মা?

—তুমি আবার কেন উঠে এলে? শোওগে যাও।

—একটা জিনিস খুঁজছি। তোমার কাছে কি—

—আবার কী হারালি খুকু? শুয়ে শুয়ে? বড্ড বে-খেয়ালী হয়েচিস বাপ্—

—তোমার কাছে একটা সরস গল্প হবে. মা? (বলেই ফেলি।)

—কী? কী? হবে?

—একখানা সরস গপ্পো? একটু মনে করে দ্যাখো না প্রীতি বাবার সঙ্গে. কোনো কৌতুককর ঘটনা-টটনা কিছুই ঘটেনি কি? একটু ভাবো না. মা?

—ইয়ার্কি? ইয়ার্কি হচ্ছে? আমার সঙ্গে? আমি না তোমার মা?

—সত্যি গো মা, ইয়ার্কি নয়, এক্ষুনি একটা প্লট না পেলে—এই সময়ে ঘরে মেয়ে-পুলিশের আবির্ভাব হয়।—

—মা। ফের তুমি হেঁটে বেড়াচ্ছ? এই তোমার কমপ্লিট বেড রেস্ট? চলো, এক্ষুনি শোবে চলো।

—হ্যাঁ. হ্যাঁ—

—শুইয়ে ফ্যাল। শুইয়ে ফ্যাল। ধরে নিয়ে যা। ধরে নিয়ে যা। মা উৎসাহ দেন। যেন খেলার মাঠের দর্শক।

শুয়ে পড়েছি। ওঘরে আলো জ্বেলে মেয়েরা পড়তে বসেছে। কি সৌভাগ্য। তারপরে কী মনে করে. ডাকি —ছোটো মানুষ?

—উঁ?

—কী পড়ছো?

নৈঃশব্দ্য অপার।

—গল্পের বই?

—হুঁ।

—ওতে হাসির গল্পটল্প আছে কিছু?

—না তো। ডিটেকটিভ। ন্যানসি ড্রু।

—ওঃ।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে-পুলিশের তীক্ষ্ণ মন্তব্য আসে বুলেটের মতো—এবং অন্তর্ভেদী তদন্ত শুরু হয়।

—কেন? যদি থাকতো, তাহলে তুমি কী করতে? টুকতে?

BanglaBook.org

—ন্নাঃ, মানে, মাথাটা একেবারে ফাঁকা তো? ওষুধে ওষুধে—

—যতই ফাঁকা হোক, অন্যের কাছে আইডিয়া ধার করতে হবে না তোমাকে —জাস্ট লুক ইনটু দ্য মিরর, ইউল ফাইনড ইনাফ মেটিরিয়াল দেয়ার—তুমিই নিজেই যথেষ্ট অ্যাবসার্ড, মা।

—দ্যাখো সবাই যে যার বাবা মাকে অ্যাবসার্ড মনে করে, বুঝলে? এটাই ওয়ার্লড অবডার। আমি যেমন আমার মাকে ইনক্রেডিবলি অ্যাবসার্ড মনে করি—মা নিজে ভাবেন তিনি প্রচণ্ড প্র্যাকটিকাল—কিন্তু...

ওঘর থেকে সাড়া উঠলো।

প্রথমে গলা খাঁকারি। তাতেই হাত পা হিম। তারপরে—"খুকু।" এখনো ওই আওয়াজে নাড়ীর ভেতর পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। হাত থেকে আচারের শিশি পড়ে যাবার ঝনঝনাৎ বুকের মধ্যে বাজতে থাকে।

—আজ্ঞে।

—কথা কইছ কেন এত? কাকে লেকচার দিচ্ছ?

—বড় মেয়েকে।

—পিকলু পাখি!

—উঁ?

—এখন কেন মাকে অত কথা বলাচ্ছো ভাই?

—কী করব? মা যে সবস গল্প লিখতে চাইছেন।

—এই মাঝরাত্তিরে? এই রোগ বালাইয়ের মাঝখানে?

—এই মাঝরাত্তিরেই। এই অসুখবিসুখের মধ্যেই।

—ছি ছি ছি। তোমার মায়ের মাথাটা এবারে বিগড়ে গেছে ভাই। মাথা খারাপ না হলে কেউ... এক কাজ কর। এই গীতাটা ওঁকে দিয়ে এসো তো ভাই। আমার টেবিল থেকে নিয়ে যাও।

—গীতা? কেন দিস্মা. গীতা দিয়ে কী হবে?

—গীতা পড়লে মাথাটা ঠাণ্ডা হবে। দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা, সুখেষু বিগতস্পৃহ. বীতরাগ ভয়ক্রোধ তবেই না স্থিতধী হওয়া যায়? তোমার মাকে যে স্থিতধী হতেই হবে ভাই। এই চপলবিশ্বে নইলে সে টিকতে পারবে না। রোগে রোগে মেয়েটার মাথাটা—

—মমাঃ। হঠাৎ পাঁজর ফুঁড়ে চীৎকার বেরোয় আমার।

—কি বাবা?

—আমার মাথায় কিস্যু হয়নি—গীতাফিতা খবদ্দার পাঠাবে না আমাকে—ওসব পারব না এখন পড়তে—

—ছি বাবা, গীতাফিতা বলতে নেই। মেয়েরা শিখবে। কেন পড়বে না বাবা? টেবরিস্টরাও পড়তেন।

BanglaBook.org

—পড়ুন গে। আমি চাইছি মুডটাকে লাইট করতে।

—এই কি মুড লাইট করবার বয়েস, মা?

—তাবলে কি এটা গীতাপাঠের বয়েস, মা?

—গীতাপাঠের কোনো বয়েস নেই খুকু। গীতা যখন অর্জুনকে শোনানো হয় তখন তিনি গঙ্গাযাত্রী ছিলেন না। যৌবনেই মনের জমি সবচেয়ে উর্বর থাকে খুকু—

—এত কথা বোলো না মা, কষ্ট হবে তোমার।

—তুমিই বরং কথা না বলে চুপ করে থাকো—গান্ধীজীর মতো হপ্তায় একদিন মৌন পালন করলে ভালো হয়।

—তুমি এত কথা বোলো না মা।

—আমার কথা আলাদা, আমার এক পা শ্মশানে।

—আমারও তো তাই। একই তো ওষুধ খাচ্ছি দুজনে।

—ছিঃ, মায়ের সামনে ওকথা বলতে নেই। যতই সত্যি হোক কথাটা। যা তোমার শরীরের অবস্থা তুমিই যাও কি আমিই যাই—আমার যা ভাগ্য, হয়তো তুমিই বেসে জিতে যাবে। সেও আমাকে দেখতে হবে—

মা বেশ হাঁপিয়ে পড়েছেন এত কথা বলে। ওঘরে মেয়ে-দারোগা ওঘরে যায়। বড় আলো নিবিয়ে নীল আলো জ্বেলে দেয়।

—এবার কে কাকে কথা কওয়াচ্ছে দিম্মা?

—সবি ভাই সবি। তোমার মায়ের মৌন প্র্যাকটিস করতে বলছিলুম—

—আগে তুমি মৌন হও তো দেখি। এই নাও ঘুমের ওষুধটা খেয়ে ফ্যালো চটপট। একটাও কথা বলবে না আর। কত সরস আলোচনাই হচ্ছে। কে আগে শ্মশানে যাবে—তার রেস—মায়েতে মেয়েতে।

—দুগগা দুগগা। শয়নে পদ্মনাভঞ্চ। তোর মা গীতাটা পড়লে নিজেরই উপকার করতো। নির্বোধ মেয়ে। সরস গল্প ভাবছে। দূর দূর। ওসব গল্প লিখে কী হবে? গভীরে যাও। প্রবন্ধ লেখো। কবিতা লেখো। শান্তি পাবে।

—দিম্মা, এই যে তোমার ফ্লাস্কে চা রইলো।

—চা? দীপু ফিরেছে? রাত এখন ক'টা?

—এখন দীপুমামা কোথায়? আজ তো ফিরতে এগারোটা।

—তাহলে ঠিক আছে। আর কোনো ব্যাপারে আমি দীপুকে সন্দেহ করি না, কেবল এই দুটো ব্যাপারে দীপুর প্রতি আমার সন্দেহ গভীর। আমি জানি সে দুর্বলতাকে জয় করার শক্তি ওর নেই।

এবারে আমাদের কান খাড়া হয়। গভীর সন্দেহ? বলি, ব্যাপারটা কী? দীপুটাকে তো আলা-ভোলা নিরীহপ্রাণী বলেই জানি এতদিন? এ আবার কীরে বাবা? উঠে বসি।

BanglaBook.org

—কেন মা, দীপু আবার কী করলো?

—দুটো ব্যাপারে ও আমার আস্থা হারিয়েছে খুকু। দুটো ব্যাপারে ও আমাদের সংসারের পক্ষে সংশয়ভাজন। বিশ্বাস করা উচিত নয়।

শুকনো গলায় কোনোরকমে বলি—

—কীসে কীসে মা?

—এক ওই ফ্লাস্কের চা। দুই : রান্নাঘরের দেশলাই। দুটি জিনিসে ওর অপরিসীম দুর্বলতা। সে দুর্বলতা জয় করবার মত মনোবল ঈশ্বর বেচারীকে দেননি। দীপু ফেরেনি, তার মানে চা ফ্লাস্কেই আছে, গরমও আছে। ফিরে থাকলে কমে যেত। কমে গেলেই জুড়িয়ে যেত। এই আরকি। আর দেশলাই।

—আর দেশলাই?

—দেশলাইগুলো ও কেবলই রান্নাঘর থেকে নিয়ে চলে যায়। যখনই বাঁধুনী চেঁচায় তক্ষুনি আমি বলি, যাও দীপুর ঘর থেকে নিয়ে এসো। পেলেই একটা না একটা ঠিকই পেয়ে যায়। এর নাম চোরের ওপর বাটপাড়ি।

—ঠিক। ছোটো কন্যে বলে ওঠেন। আমাদের বলপেনগুলো দীপুমামা রোজ আপিসে নিয়ে গিয়ে হারিয়ে আসে, এবার থেকে তাহলে আমিও ওর বলপেনগুলো নিয়ে নেব। হ্যাঁ দিম্মা? ঠিক হবে? চোরের ওপর বাটপাড়ি।

বিব্রত গলায় দিদিমা বলেন—না বাবা, দেশলাই আর কলম কি এক হলো? একটা খরচ হয়ে যাবার জিনিস, আর একটা রেখে দেবার। দেশলাই নিলে দোষ নেই।

—রান্নাঘরের দেশলাই নিলেও না?

—একটু একটু, বেশি না। কলম নিলে দোষ নয়।

—তোমরা চুপ করবে? ঘুমের ওষুধ কাজ করবে না এত কথা বললে। দারোগা এবার টেরেসার ভূমিকায়।—গুডনাইট দিম্মা। গুডনাইট।

—গুডনাইট। গীতাটা তোর মা পড়লে না তাহলে? পড়বে, আপনিই পড়বে। দিন পড়ে রয়েছে।

স্কেচ পাঁচ

মাকে ঘুমের ওষুধ খাওয়ালে কি হবে? কপালে ঘুম থাকলে তো? তাওয়াং ঘুমোতে দিলে না। তাওয়াং হচ্ছে আমার আদরিনী তিব্বতী সারমেয়ী যাকে ট্রাকে, প্লেনে, পদব্রজে নানা উপায়ে কোলে কাঁখে করে তিব্বত-ভারত সীমান্তের নির্জন প্রকৃতি থেকে ছিনিয়ে এই কলকাতায় নিয়ে এসেছি। এনে, নিজের কবর নিজেই খুঁড়েছি। টেক্সটাইল টেস্টিং অ্যাণ্ড ফার্নিচার সাম্পলিং হয়ে উঠেছে ওর প্রধান হবি। ওর কাছে ভাত-মাংসের চেয়ে প্রিয় পর্দা আর বেডকভার। হাড়ের চেয়ে দন্তরুচিকর

BanglaBook.org

হলো চেয়ারের হাতল, টেবিলের পায়া। চার-পাঁচ বছর বয়েস হয়েছে, এখনো বদভ্যাস ঘোচেনি। ওই কাঠ আর কার্পাসের ভেজিটেরিয়ান টনিকেই ওর গায়ে অসীম শক্তি, ধরে রাখা যায় না। বছরের পর বছর এত ক্ষতি সহ্য করা কঠিন বলে নেহাৎই ছাপোষা অর্থনৈতিক কারণে ও বেচারীকে বেঁধে রাখতে হয় অধিকাংশ সময়ে। এদিকে ও কার্নিশে কাক বসতে দেখলে, বা রাস্তিরে রাস্তায় পুলিশ পায়চারী করতে দেখলে প্রবল চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। কিন্তু ওর বাছবিচার আছে। সব কাককে দেখলে ও চেঁচায় না, সব পুলিশকেই ধমকায় না। দু'-একজন কাক, দু'-একজন পুলিশের গায়ের গন্ধ ওর অ্যাপ্রুভাল পায় না—তাদের ধারে কাছে আসতে দেখলেই শুরু করে দেয় চেঁচানি। রাত্রে অমন করলে ওকে ঠাঁই বদল করে দিতে হয়, যাতে অমনোনীত পুলিশদের হেঁটে বেড়ানো ওকে আর দু চক্ষে দেখতে না হয়।

সেদিন রাত্রে মাকে ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো মাত্রই তাওয়াং হঠাৎ মড়াকান্না শুরু করলো। ব্যাপারটা কী? এতো ধমকধামক নয়? পথেঘাটে পুলিশও দেখা যাচ্ছে না। কাক তো নয়ই। তবে? তেষ্টা পেয়েছে? জল দিতেই এক পায়ের ঠেলা দিয়ে পাত্র উলটে দিলে। বারান্দায় জল গড়িয়ে নদী বইলো। তবেই পেট ভরেনি? খিদে? এই নে, বিস্কুট খাবি? খেয়েদেয়ে একটু চুপ কর্ খাঁ। তাওয়াং বিস্কুট স্পর্শও করলো না। মড়াকান্না চলছে—চলবে মনে হলো। ব্যাপার কি? গায়ে হাত বুলোলে চুপ করে থাকছে অবশ্য। হাত তুলে নিলেই কুই কুই, আর যেই চলে এলুম, ফের চীৎকার। বাড়িসুদ্ধু যারপরনাই বিচলিত—মা বেচারীর ঘুমের ওষুধ খেয়েও যদি ঘুম না হয়, তাহলে খুব শরীর খারাপ পড়বে। মেজাজ তো খারাপ হবেই। এমন সময়ে মার গলা ফুটলো —বৃদ্ধ বয়সে শুনেছি মেয়েরা নাকি পুত্রের অধীনে বেঁচে থাকে? আমার পুত্র নেই। আমি সেই অপরাধে কুকুর-বেড়ালের অধীন হয়েছি। চোখের ঘুম, পাতের অন্ন কেড়ে নিচ্ছে কুকুর-বেড়ালে। এই তো দেখছি পুন্নাম নরক। এর চেয়ে যে ওলড পীপলস হোম ঢের ভালো।

এত বড়ো অপমান? দুই মেয়ে এবার ছুটে গেল তাওয়াংয়ের দিকে।

—জল খাবি না, বিস্কুট খাবি না, বারান্দায় যাবি না, তুই চাস কী? হলো কী তোর? দুষ্টু কোথাকার—আমরা সবে এলেই ভৌ-ঔ করে আকুল হয়ে কেঁদে উঠছিস?

ওদিকে মা তখন বলে চলেছেন —ওর কী দোষ? ও তো ওয়াইলড নেচার ছেড়ে প্রথম মানুষের কাছে এসেছে। এই বন্ধনের মধ্যে ও কোনো সুখ পায় কী? স্বার্থপরের মতো ওকে ওর মা-বাপ-ভাই-বোন, ওর খোলা মাঠঘাটের খেলা, ওর ঠাণ্ডা বরফের দেশের আরাম থেকে বঞ্চিত করে, কেড়ে এনে, এখানে ঘুপচিতে শেকল বেঁধে একলা ফেলে রাখা। কী, না আমাদের শখ। না আছে ওর খেলবার সঙ্গীসাথী, না স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। কাঁদবেই তো। কাঁদবে না? আমি হলে তো বুক চাপড়ে চাপড়ে কাঁদতুম—তোদের নিষ্ঠুরতার সীমা নেই—তোরা নাকি অ্যানিমাল-

লাভার? ছোঃ, তোরা সব সেলফিশ জায়াণ্ট—একটু বেড়াতে নিয়ে যাবি না কুকুরটাকে, একটু খেলা করবি না ওর সঙ্গে—

—বেড়াতে কে নিয়ে যাবে ওকে? জায়াণ্ট তো ও নিজেই। ঐটুকু গায়ে কী জোর! এক হ্যাঁচকা টানে উল্টে ফেলেই দেবে তো রাস্তার ওপরে। রোজ রোজ মোটা চেন ছিঁড়ে ফেলছে দাঁতে কেটে, দেখছ না? চেন ছাড়া ওকে নিয়ে পথে বেরুনোর প্রশ্ন নেই। আর চেন বেঁধে ওকে নিয়ে বেরুলেও কেলেঙ্কারি। শুধু কি কুকুর দেখলেই ছুটে যাবে? গাড়ি দেখলেও ছুটে যাবে, রিকশা দেখলেও ছুটে যাবে, ছোট ছেলেপিলে দেখলেও ছুটে যাবে—বেড়াল দেখলেই তাড়া করবে—চেন বাগিয়ে ওর দৌড়ের সামিল হতে পারি হেন শক্তি আমার নেই। আমার মেয়েদেরও নেই। আর দীপুটা তো বহুদিন বলেই দিয়েছে—ওসব তার দ্বারা হবে না, সে কনফার্মড অ্যানিমাল হেটার। অর্থাৎ জীবজন্তু ভয় পায়।

কথায় কথায় রাত বাড়ছে। মা শোবেন কখন? হঠাৎ খেয়াল হলো, কুকুরকান্না থেমে গেছে। আলো নিবিয়ে দি। —মা, ঘুমোতে চেষ্টা করো একটু। আমি ওঘরে গিয়ে পড়তে বসি। —অনেক রাতে শুতে গিয়ে দেখি বিছানায় একজন নেই। সেকি, ছোট কন্যে কোথায় গেলেন? খোঁজ খোঁজ খোঁজ। ও লক্ষ্মী, ও যশোদা, টুম্পা কোথায় গেল? পড়ার ঘরে নেই, বাথরুমে নেই, নীচে নেই, ছাতে নেই, বারান্দায় নেই, এ-ঘর ও-ঘর সে-ঘর কুত্রাপি নেই। ঘুম ভেঙে উঠে বসে তার দিদি বললে —সেই যে তাওয়াংকে আদর করছিলুম, আরপর আর ওকে দেখিনি তো। আমি উঠে এলুম, ও বসে রইলো মোড়া পেতে।

এখনও কি সে সেখানেই বসে থাকতে পারে? অসম্ভব কথা। যা চঞ্চল মেয়ে। হেনকালে যশোদা দিদি বলে উঠলো—"অ দিদি, দ্যাখবে এইসো তোমার মেইঞে —এখেনে—

ছুটে গিয়ে দেখি অপরূপ দৃশ্য। মোড়া পেতে বসে লোহার রেলিঙে হেলান দিয়ে, মেয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। বুকে কুকুর জড়ানো। বোগা মেয়ের কোলের মধ্যে আরামসে মাথাটি গুঁজে, মোটকা কুকুর তাওয়াং চমৎকার ভাত-ঘুম মারছেন, সুরুৎ সুরুৎ করে বাঁশির মতো শব্দে নাক ডাকছে তাঁর। ভাবলুম বলি—মা, দেখে যাও, কী অবহেলায়, অযত্নেই না আছে বনের প্রাণীটি।

ছোটো কন্যেকে তুলে আনা হলো। যা থাকে কপালে। এবার তাওয়াংয়ের আরাম নষ্ট হয় হোক। ঘুম ভেঙে যেতে আধখানা চোখে টেবিয়ে টেবিয়ে সে আমাদের দিকে তাকালো বটে, কিন্তু না, আর কান্না জুড়ে দিলে না। গুটিশুটি মেরে ঘুমিয়ে পড়লো আবার।

টুম্পা ঝাঁকড়া মাথাটি নেড়ে নেড়ে বললো—আমি ঠিক জানি, কী হয়েছিল ওর। নিশ্চয়ই নাইটমেয়ার দেখেছিল মা। আমি রাত্রে নাইটমেয়ার দেখে ভয় পেলে তুমি বুকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকো তো, আমি সেইটে মনে করে ওকে বুকে

জড়িয়ে ধরে বসে রইলুম, দেখলে তো ঠিক থেমে গেল কান্না।

পিকো এবার মন্তব্য শুরু করে—ও বোধহয় তখন তিব্বতের স্বপ্ন দেখছিল, ইয়েতিরা ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে বোস্ট করে খাচ্ছে—

—ইশ যতো বাড়াবাড়ি। মেমসায়েব হয়েছেন সব। কুকুরের আবার দুঃস্বপ্ন' হুঁ—কুকুরেরও নাইটমেয়ার।

গজগজ করতে করতে দীপুও নেমে এসেছে। ঠোঁটে না জ্বালা সিগারেটের ফাঁকে—'যত শৌখিন মধ্যবিত্ত বিলাসিতা'—সোজা বাল্লাঘরের দিকে চলে গেল—'এই কুকুর-বেড়ালের দৌরাত্ম্যিতে'— সেন্টেন্সের মাঝখানে বাল্লাঘরের দরজাটি খোলামাত্রই হাঁকডাক করে এক লাফে পিছিয়ে এলো ক'পা—ঠোঁট থেকে সিগারেট খসে পড়ে গেছে—কে? কে ওখানে? কে যেন এক ধাক্কা মারলে ঠিক বুকের ওপরে—

—আবার কে? এই তো, লেটুস পালাচ্ছে—লক্ষ্মী বলে।

—চুরি করে পাত কুড়োনো খেতে গিয়ে শাস্তি হয়েছিল, বন্ধ হয়েছিল বাল্লাঘরে। আপনি দোর খোলামাত্র লাফ মেরেছে পালাবার জন্য—তা ওজন আছে বেশ—অত মোটা হলো তো? আপনি ভেবেছেন কেউ বুকে ঢেলা মেরেছে—

—তম উদিকে যাচ্ছিলেনই বা কেন, এত আত্তিরে দ্যাশালাই ট্যাশালাই—? যশোদাদিদি যোগ করে। মুখ টিপে হেসে।

—অনেক রাত হয়েছে, ইয়ার্কি না মেরে শুয়ে পড়ো তো সব! বলে ধমক লাগিয়ে, সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে যশোদাদিদিকে আগাতা দেশলাইটি ফেরৎ দিয়ে দীপু ওপরে পালিয়ে যায়।

—দেখছো তো মা, দিম্মা যা বলেন, সব ঠিক। দেশলাইয়ের ব্যাপারে দীপুমামা একদমই আনরিলায়েবল—বলতে বলতে টুম্পা বুকের মধ্যে ঘেঁষটে আসে।

গুডমর্নিং দিম্মা। এই নাও, তোমার হরলিক্স। এই যে তোমার ওষুধ, আর—এই নাও, 'দেশ'।

কাগজ? কাগজগুলো কই? এতবলা হলো এখনো কাগজ দিলে না? মা ওষুধ এবং হরলিকসে দৃকপাত মাত্রও না করে সরলে দেশটা ছিনিয়ে নিলেন—শুধু দেশ? মেয়েরা উত্তর দেয় না। মা আবার শুরু করেন—তোমরা যে আজ সাক্ষর হয়েছো, এ আমার মহাদুর্ভাগ্য। একটা কলম হাতে পাইনে, একটা বই যেখানে রাখি সেখানে থাকে না—এবার কাগজগুলো পর্যন্ত পড়া বন্ধ করে দি। আজ বাজেট স্পীচ বেরুবে—কাল থেকে আমি কাগজের জন্যে আছি—আর এত বেলা পর্যন্ত চারটে কাগজের একটাও এ-ঘরে ঢুকল না?

দিদির পেছনে পেছনে বোনও এসেছে পায়ে পায়ে। চোরের মত মুখ হয়েছে দুই বোনের।

আমিও অবাক। সত্যিই তো—কাগজগুলো গেল কোথায়?—লোকটা এখনো

আসেনি নাকি? নাঃ, এই তো 'দেশ' এসেছে। তবে? আজ কি কাগজ বেরোয় নি? নাকি হকাররা বেশি দামে বেচে দিয়েছে? দুই বোন মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। উত্তর নেই।

—কাগজগুলো কী হল? আসেনি? না, এক একজন এক একটা করে পড়বার নাম করে এক একঘরে ছড়িয়ে ফেলেছ?

—দুই বোনে মাথা নাড়ে। না। নেয়নি।

—বাক্য যে হরে গেছে দেখছি। তোমরা কি মূকবধির?

—কাগজ আসছে দিম্মা। এক্ষুনি এসে যাবে মনে হয়।

ছোটকন্যে অবশেষে বলেন। সিঁড়িতে ধুপধাপ জোর শব্দ হচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে দীপু ঢোকে। বগলে খবরের কাগজ।

—এই যে। চারটে কাগজ কিন্তু পাওয়া গেল না। এত বেলায় আর পাওয়া যায় নাকি? আজ বাজেট বেরিয়েছে—আগে বলবি তো?

মা অতোশতো শোনেন না, কেবল কাগজ ও দীপুকে একত্র দেখেন। এবং শুরু করেন —অ। তুমি। তুমিই পড়ছিলে তাহলে চারটে কাগজ একসঙ্গে? এই হচ্ছে জার্নালিজম করার বিষফল। কম্পারেটিভ স্টাডি হচ্ছিল বোধহয়?

—আমি না। আমি না। যাঃ বাবা। লোকের উপকার করতে নেই দেখছি—আমিই তো বরং কিনে আনলাম এই কাগজগুলো বাজার থেকে। কাগজ কি আমিই পড়তে পেয়েছি আজ? তাদের উপর বেড়ালের দল প্রাতঃকৃত্য করে রেখেছিল যে। একসঙ্গে চারটে কাগজই নষ্ট করেছে।

—সেকি? চারটেই? আজ না বাজেট বেরুবে—কী কী কমল—

—ওদের কী দোষ?

শুরু হয় বেড়ালদের দুই উকীলের ওকালতি.—গেট খুলতে দেরি করেছিল যে। ওরা বেরুতে না পেরে—তাই—বাধ্য হয়েই

—তা বলে বাজেটের ওপরে প্রাতঃকৃত্য. ছি ছি ছি... অবশ্য বাজেট জেনেই বা কী লাভ হবে? ও তো গরীব লোকের বাজেট নয়—ও দেখাও যা, না দেখাও তাই। দেখলে মনে হবে না-দেখা ছিল বে ভালো—

—এই দুখানাই পড়ো না মা, যা পেয়েছে, চারটে নাইবা হল—

—দে তাই দে। অবিশ্যি দুটো চারটেয় এসে যায় না। প্রকৃতপক্ষে সবই সমান। সবই ওঁছা। ওঁছা খবর. ওঁছা ভাষা। অথচ আগে এরকম ছিল না। এখন রুচির গতি নিম্নমুখী. কাগজের আর দোষ দেব কি? যেমন পাঠক তেমনি কাগজ—

হরলিক্সের গ্লাস নামিয়ে রেখে. মা কাগজ মেলে ধরতে ধরতে বলেন—বুঝলি খুকু, আমরা সবাই গত জন্মে মহাপাপ করেছিলুম, তাই কুকুর-বেড়ালের দাসত্বে জীবনযাপন করছি—কি ঘরে, কি বাইরে। সব সমান, স-ব সমান। ওঁছা।

BanglaBook.org

স্কেচ ছয়

আমরা সন্ধের শোয়ে সিনেমা দেখে, চীনে খেয়ে ফিরেছি। সারা পাড়া অন্ধকার। ডোরবেল বাজলো না। ধাক্কাধাক্কি যত করি, ওপরে কুকুর ততই চেঁচায়। কেউ দোর খোলে না। গাড়ি গ্যারাজে তুলে দিয়েছি। কী করা?

বড় কন্যা বললেন—এগারোটার পরে ফিরলে ঠিক হত। চল আরেকবার চক্কর মেরে আসি। লোডশেডিংয়ের মধ্যে দিম্মা কিছুতেই দরজা খুলতে দেবেন না। আমরা তো কেউ বাড়ি নেই।

আবার গাড়ি বের করা হল। ছোটকন্যা নেচে উঠলেন—এবারে বেশ আইসক্রীম খেতে যাওয়া হচ্ছে?

দীপু বললে, না, না পাঞ্জাবী চা।

আমি বললুম, পান ছাড়া আর কিছু খাবার মতন পয়সা বাকী নেই। —আলো জ্বলতে, এগারটার পরে ফিরে আমাদের কোড-সিস্টেমের বেল বাজালুম। বারান্দা থেকে যশোদা উঁকি মারলে—কে? দিদি? অ—

ওপরে এসে হম্বিতম্বি জুড়বো, তার আগেই যশোদা বললে—দিদি, ছাদে মানুষ পড়েচে।

—তার মানে?

"ছাদের উররে ঝপাৎ করে কী সব পড়ে গেল, ঘরে নোক ঢুকেছেল। আঁধারির মদ্যি। নেচে কিন্তুক নারেনি। মনে হয় এ্যাতখনে চইল্যে গেচে। ঝা নেবার নে'।

শুনেই দীপু আর রঞ্জন দুই দুঃসাহসী ডাকু-ধরিয়ে টেবিল থেকে কাঁচা-চামচ খাবলে তুলে নিয়ে বীরদর্পে সশস্ত্র সেজে ওপরে চলল।

মা ঘর থেকে চেঁচাতে লাগলেন, ওভাবে যাসনি, ওভাবে যাসনি ওদের কাছে ভোজালি থাকে—

শান্ত গলায় যশোদা বলে, উররে কেউ নি, মা। আমি আর নুক্কী দেক্যে এইচি এইমাত্তর। আলো জ্বেইল্যে।

বীরবৃন্দ নেবে এসে একই সংবাদ পরিবেশন করলেন। দুই মেয়ে ওসবে কান না দিয়ে বেড়াল-কুকুরের ডিনার দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। দেখা গেল একজন কম। লেট্যুস নেই। কিন্তু বেরুল কোথা দিয়ে? আমরা তো সব দিক সীল করে দিয়ে বেরিয়েছি। দৌদৌভায়ের বাড়ি ডাকাতি হবার পর থেকে পাড়ায় সবাই খুব সাবধান। যদিও এ বাড়িতে ডাকাতির সম্ভাবনা মিনিমাম, কেননা খাতা-বই কিম্বা আসবাবপত্তর কেড়ে নিতে ডাকাত পড়েছে কোনো বাড়িতে, এখনো এদেশে এমন ঘটনা শোনা যায়নি।

—তবু, সাবধানের মার নেই।—মা বললেন, সে কথা তো ডাকাতরা জানে

BanglaBook.org

না যে এ বাড়িতে বই ছাড়া নেবার মতো কিছু নেই? আজ ভীষণ ব্যাপার হয়েছে। অন্ধকারের মধ্যে একটা লণ্ঠন জ্বেলে ওরা গল্পসল্প—আমি চেষ্টা করছি একটু ঘুমোতে, ছাদের ওপরে ঝপঝপাস করে কী যেন পড়ে গেল প্রচণ্ড শব্দে। ব্যস। বুঝেছি, রেইনওয়াটার পাইপ বেয়ে লোক উঠেছে সম্ভবত. তারপরে অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে কিছু ফেলে দিয়েচে। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওদের দিয়ে তিনটে ঘরের দোরগুলোতে সবগুলো ছিটকিনি বন্ধ করিয়ে দিয়ে, বসে রইলুম। বাইরে থেকে যা নেবার নিকগে। ঘরগুলো তো আটকানো থাক। আর কুকুরের কী চিৎকার! কিন্তু সেও তো বন্ধ। তার কাছে গিয়ে তাকে নিয়ে বাইরে ছেড়ে দেবে, এমন তো কেউ নেই বাড়িতে। অবিশ্যি কুকুরকেও ওরা মেরে ফ্যালে। দোরগুলো বন্ধ করে দিয়ে আমি ভাবলুম পুলিশে টেলিফোন করি। তারপর ভাবলুম তার চেয়ে তাড়াতাড়ি হবে যদি বারান্দা থেকে জ্যোতিবাবুর গেটের পুলিশদের চেঁচিয়ে ডাকা যায়। ওরা কি আর হেলপ করবে না? কিন্তু ওপরে আর শব্দটব্দ হয়নি। পায়ের শব্দও শোনা যায়নি আর —তারপরেই আলো জ্বলে উঠল। হয় ওরা নেমে গেছে, নয় ওপরে লুকিয়ে আছে। ডেঞ্জারটা কেটেছে কিনা জানি না। যশোদা যাই বলুক।

উদ্বিগ্ন হয়ে মেয়েরা এসে বললে—লেটুস কই? লেটুসকে তো দেখছি না? বেরুবার সময়ে সবাইকে গুণে গুণে বাড়িতে পুরে রেখে সব দোরটোর বন্ধ করে গেছি। বারান্দায় বেরিয়ে যেই-না ডাকা, লেটুস! লেটুস! নিচে গ্যারাজের টিনের চালে উত্তর এল—"ম্যাও।" দেখি লেজ ফুলিয়ে ভারি সুন্দরী হলুদ রঙের সেই গার্লফ্রেণ্ডের গা ঘেঁষে বসে আছে লেটুস। মুখ তুলে আমাদের ডাকে সাড়া দিল —"ম্যাও।"

—বেরুল কী করে?

—এখনো তো সব দিকই বন্ধ।

—আমরা যখন ঢুকলুম তখন তো ওকে বেরুতে দেখিনি?

—বুঝেছি? বুঝেছি। মেয়েরা চেঁচিয়ে হেসে ওঠে।

—"দিম্মা, তোমাদের ডাকাত ধরা পড়েচে এইবার। লেটুসটা তো হুলোবেড়াল নয়, সত্যি সত্যিই ডাকাত একটা। গার্লফ্রেন্ডের ডাক শুনলে ও আর থাকতে পারে না. নিশ্চয় ছাদে ওঠে, সেখান থেকে নিচে টিনের চালে ঝাঁপ দিয়েছে। এই কাণ্ড ওকে আগেও আমরা করতে দেখেছি। না মা? সেই যে একদিন মাঝরাত্তিরে?

—উফ। এই লেটুসের প্রেমের জ্বালায় তো আর টেঁকা যাবে না পৃথিবীতে। একবার ব্যর্থ প্রেমে দেবদাস হয়ে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে কেবল ঊর্ধ্বমুখে মড়াকান্না কাঁদত. মনে আছে? এখন আবার সফল প্রণয়ী হয়ে যা ভয়ানক সব অ্যাক্রোব্যাটিকস জুড়েছে, ওফ। মাসিমার যে হার্ট অ্যাটাক হয়নি—

দীপুর কথা মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে মা বলেন—সফল প্রণয়ী হতে গেলে অ্যাক্রোব্যাটিক্স সবাইকেই জুড়ে দিতে হয়, বাবা। ষোলো বছরের ছেলে রাম যদি হরধনু ভঙ্গ করতে পারে, লেটুস তো কেবল ঝাঁপ খেয়েছে। তোমরা যে কে কী

BanglaBook.org

করবে, সেও তো আমরা দেখবো, সময় আসুক।

ইতিমধ্যে মেয়েরা গিয়ে দরজা খুলেছে এবং রূপসী প্রণয়িণীকে অনায়াসে টিনের চালে একলা ফেলে রেখে লেটুস এক লাফে ঘরে এসে তার ডিনারের প্লেটে মন দিয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে মা বললেন—এটাও ফ্যাক্ট অফ লাইফ, বাবারা। দেখে শেখো। এটা নেক্সট স্টেপ।

স্কেচ সাত

মা। মাগো। সর্বনাশ হয়েছে।

—আবার কী হলো, তোমাদের সব এতই ক্ষুদ্র, বাবা, যে ক্ষণে ক্ষণেই দেখি বিনাশ পাচ্ছে। কি, মেয়েদের বেড়ালছানা হারিয়ে গেছে বুঝি?—বই থেকে চোখ তুলে মা প্রশ্ন করেন।

—গরম কাপড়ের ট্রাংকে কেবল খবরের কাগজ ভরা। একটাও শাল নেই। সোয়েটার নেই কিছু নেই আমার।

—অন্য কোনো ট্রাংকে রেখেছিলে বোধহয়। খুঁজে দ্যাখো। গেল বছরের কথা তো? আদ্দিন মনে থাকা সম্ভব নয়। তোমার যা স্মৃতির অবস্থা।

—অন্য ট্রাংক নয়। এতেই ছিল। এতেই রেখেছিলুম। এর মধ্যে এত খবরের কাগজই বা কে পুরলে? কখন পুরলে?

—কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যে তোমার শালটালগুলো নিয়ে গেছে। জানে বাক্সটা নাড়লে-চাড়লে হাল্কা লাগলে আগেই খোঁজ পড়বে। ভার থাকলে শীত পড়ার আগে কেউ খোঁজ করবে না।

—কি সর্বনাশ। নিশ্চয় রমলা মা। ওই করেছে এটাও, বাসন আর কাপড়গুলো তো ওই নিয়েছে স্বীকারই করে গেল। এটা তো বললে না।

—ও সেধে তোমাকে সবটা বলবে কেন, মা? ও কি চার্চের কনফেশন কিউবিকেলে ঢুকেছিল? যাকগে থাকগে, ওসব ভাবনা ছেড়ে দাও। আর কোথাও কিছু নেই?

—মানে?

—মানে, তোমার তাড়া থাকলে আমার আলমারী থেকে একটা শাল নিয়ে যাও না—যা গেছে তা নিয়ে সময় নষ্ট করে অবোধে। গতস্য শোচনা নাস্তি। ও তো আর বিকভাব করতে পারবে না। সেটা সম্ভব হলে বরং ভাবা চলতো। এত দেরিতে বিকভাবি অসম্ভব। বছর ঘুরে গেছে।

—মাগো, তোমার মনে কষ্ট হচ্ছে না? আমার অতগুলো শাল অতগুলো সোয়েটার—

—ওগুলো গেছে যাক গে। মনে করে নাও গরীবকে দিয়েছ। শীতবস্ত্র দানে

BanglaBook.org

মহাপুণ্য হয়। তোমারও পুণ্য হচ্ছে। গরীবের গায়ে উঠেছে সেসব অ্যাদ্দিনে। এমনিতে তো দিতে না। তোমার আবার হবে।

—হবে না, মা হবে না। ওসব শাল কেনবার ক্ষমতাই আর আমার হবে না, মা। গরীবে ওর মূল্য কিছুই বুঝবে না সে। কোয়ালিটির শালকরও আর নেই, ও জিনিস তৈরিই হয় না আর—

—কেন উলটোদিক থেকে ভেবে দুঃখ কচ্চিস খুকু? বরং এইভাবে দ্যাখ—মনে কর ওগুলো কোনোদিনই তোর জিনিস ছিল না। পরের জিনিস ধার করে গায় দিচ্ছিলি, ফেরৎ দিয়ে দিয়েছিস, ব্যস—তাহলেই আর দুঃখ নেই। আমার যখন সব গয়না নিয়ে অর্জুনঠাকুর পালিয়ে গেল, আমি এই রকমই ভেবেছিলুম। যে ক'দিন ভোগ করেছিস, সেইটেই যথেষ্ট। তোর পাওনার অতিরিক্ত সেটা। এইভাবে ভেবে নে।

—আমি অমন করে ভাবতে পারব না।

—তাহলে দুঃখু পাও। মর্তের কষ্টে মুখ বগড়ে মর। ভালোবুদ্ধি দিচ্ছিলুম, নিলে না তো? আমি তো তোমার বাবার বেলাতেও এমনি করে ভাবি—ভগবানের জিনিস, ভগবান ফেরৎ নিয়েছেন। আমি যে অতগুলো বছর ওকে কাছে পেলুম, সেটাই আমার মহাভাগ্য। অলওয়েজ পজিটিভ থিংকিং করবি। সব সময়ে সব জিনিসের পজিটিভ দিকটাই শুধু দেখবি। তোর বাবারই কথা এটা। তাহলেই সদানন্দ থাকতে পারবি। এই দ্যাখনা—শাল চুরির পজিটিভ দিক কী কী? এক নম্বর—গরীবগুলোর গায়ে গরম কাপড় উঠলো। তোর পুণ্য হলো। দু নম্বর—ওগুলো অনেকদিন পরেচিস, এবারে নতুন শাল কেনবার সুযোগ হলো। তিন নম্বর—ওভাবে চাবি না দিয়ে ট্রাংক খুলে ফেলে রাখতে নেই, এই শিক্ষাটা হলো। জীবনে সব শিক্ষার জন্যেই একটা মূল্য দিতে হয় তো? চার নম্বর—একগাদা খবরের কাগজ পেলি—ওজন করিয়ে বেচে দে, অন্তত একখানা আলোয়ান তো হয়ে যাবে?

স্কেচ আট

সন্ধেবেলায় চিত্রমালা হচ্ছে, ঘরের মধ্যে হেমামালিনী নাচছেন। লতা গাইছেন, মা ইজিচেয়ারটা টেলিভিশানের উল্টোদিকে (এ বাড়িতে টিভি বলা বারণ, ওটা নাকি অমার্জিত) ঘুরিয়ে বসে বই পড়ছেন। কানে তুলোর প্লাগ গোঁজা। মুগ্ধ দর্শক বাড়ির কাজের লোকেরা এবং কন্যাদ্বয়। মা খবরের সময়ে এদিকে ঘুরে বসবেন, কানের তুলো খুলবেন। মা ঘরবন্দী বলে মাকেই উপহার দেওয়া হয়েছে যন্ত্রটা। কিন্তু মা ওটাতে খবর ছাড়া প্রায় কিছুই দেখেন না। আর চেনাজানা লোকের প্রোগ্রাম। অথচ ঘর ভর্তি হয়ে যায় ঠিকে-ঝিয়ের ফ্যামিলি অ্যাণ্ড ফ্রেণ্ডস-এ, রোজ সন্ধেবেলায়। কলকাতার মধ্যবিত্ত পাড়ার প্রত্যেকটা টিভি সেটই কমিউনিটি সেট। সরকার থেকেই

খরচটা দেওয়া উচিত মনে হয়। মা তাঁর ঘরে এত লোকজনের ভীড় একদম পছন্দ করেন না। অথচ জমায়েত দর্শকের জীবনের কথা চিন্তা করে মুখে কিছু আপত্তিও জানাতে পারেন না। অতএব পিছন ফিরে কানে তুলো গুঁজে বই হাতে যথাসাধ্য যেন অন্যঘরে আছেন এমন একটা ভাব করেন। খবর শুরু হলেই ওরা পালায়, আর মা চেয়ারটি ঘুরিয়ে বসেন। খবরপড়া শেষ হতেই সেদিন মা বললেন,—রঞ্জন, তুমি তো ইঞ্জিনিয়ার। বলো দেখি, খবর পড়া শেষ করেই পাঠক বা পাঠিকাটি কেন আমাদের দিকে চেয়ে অমন মুচকে হাসিটি হাসে?

—কী জানি মাসিমা... ইঞ্জিনিয়ার রঞ্জন তার পড়া বলতে না পেরে ইতস্তত করে।—দীপুকে জিজ্ঞেস কোরো। তার জানা উচিত। ও তো জার্নালিস্ট।

মা বলেন —'খবর পড়ার শেষে ওই মুচকি হাসির মানে হচ্ছে, 'কী? কেমন টুপি পরালুম?' কেননা সবই তো মিথ্যে খবর। বানানো খবর। ওরা তা জানে। ঘোর মিথ্যা, অর্ধসত্য, আর অদরকারি তথ্য। এই তিনের মিশ্রণে সংবাদ তৈরি হয়। বুঝলে? দীপুকে জিজ্ঞেস কোরো, ওর স্বীকার করা উচিত।

সেদিন কে যেন দুঃখ করছিলো, এতরকমের সব সাহিত্য পুরস্কার, মা কেন, কোনোটাই পাননি। পাবেনই বা কেন? সবাইকেই তো চটিয়ে রেখেন উল্টো গান গেয়ে। যখন যে সিংহাসনে, তখন মা তার বিপরীতে। সেবার বিদ্যাসাগরের মুণ্ডছেদনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে নিয়ে যাওয়া হলো কিছু রগচটা, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে। মা-র বিধবাবিবাহের জন্য ওই ভদ্রলোকই ধন্যবাদার্হ। মাকেও তাই নিয়ে গিয়েছিলেন সভাকর্মীরা। আশা ছিল, মা বিদ্যাসাগরের পক্ষে কথা বলবেন। মা গিয়ে বললেন —ছেলেরা তো বিদ্যাসাগরের শিরশ্ছেদ করতে চায়নি, চেয়েছে একটা যুগের অন্ত। প্রাচীন একটা সমাজের, একটা বিশ্বাসের, একটা বদ্ধমূল ধারণার ওরা শিরশ্ছেদ করতে চেয়েছে। বিদ্যাসাগর যে ব্রিটিশ লিবারেল মানবতাবাদের প্রতিভূ, তারই উচ্ছেদ ঘটিয়ে এক নতুন জাতের মানবতাবাদের পত্তন চায় ওরা—আজ বিদ্যাসাগর বেঁচে থাকলে তিনিও মত বদলাতেন—মাকে আর টেনে নামানো যায় না মঞ্চ থেকে।

স্কটিশ যদিও আমার কলেজ নয়, কোনো মধুর স্মৃতিও জড়িয়ে নেই, তবু স্কটিশের ল্যাব পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে খবর পড়ে ক্ষতির শোকে আমি তো কেঁদেই ফেললুম। কে জানে কতদিনে আবার ওইরকম ল্যাবটা তৈরি করা যাবে। মা বললেন--এ তো ওদের করতে হবেই। পুরো বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা, প্রাচীন ক্ষয়িষ্ণু শিক্ষাপদ্ধতিটাকেই আজ ওরা পুড়িয়ে ফেলতে চাইছে। ল্যাবরেটরিটা তো তুচ্ছ, সিম্বলমাত্র। ওই শিক্ষাব্যবস্থায় সারা দেশের ভবিষ্যৎ উড়েপুড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তার বেলা? অমানুষ তৈরি হচ্ছে, তার বেলা? তার বেলায় তো কাঁদতে দেখিনি তোমায়?

BanglaBook.org

আবার ওদিকে ইন্দিরা গান্ধী যখন এমারজেন্সি ঘোষণা করলেন, আমরা তো সব ক্ষেপে লাল, মা বললেন—ইন্দিরা ঠিকই করেছে। দেশটা স্রেফ উচ্ছন্নে যাচ্ছিল। একটা শক্ত হাতে হাল ধরা দরকার হয়ে পড়েছিল।—এবং এখনও তাই-ই বলে যাচ্ছেন—আমাদের দরকার এমারজেন্সি ডিক্লেয়ার করা, নইলে এসব ব্যাঙ্ক ডাকাতি বন্ধ হবে না, সব যোগসাজস, সব যোগসাজস।

একদিকে এই, অন্যদিকে আবার চলে মাঝে মাঝে বঙ্কিমী ভাষায় গালমন্দ। তার ঝঞ্ঝাটও কম নয়। বাইরে ফচকা খেয়ে এসে একদিন কিছুতেই রাত্রে কিছু খেতে পারছি না। মা এদিকে আমাদের মুখে রুচবে বলে স্পেশাল ফ্রায়েড রাইস করিয়ে রেখেছেন। শেষে যখন বাধ্য হয়ে স্বীকার করতেই হলো ফুচকার ব্যাপারটা, মা বললেন—ছিঃ! মা হয়ে পদে পদে এরকম অবিমৃষ্যকারিতার শিকার হলে সন্তানরাই বা কী শিখবে? চরিত্রবলই জীবনে সবচেয়ে জরুরী, খুকু। যে-কোন ক্ষুদ্র প্রলোভনে এভাবে বিচলিত হয়ে পড়লে, জীবনের বৃহত্তর প্রলোভনের ক্ষেত্রে নিজেকে রক্ষা করবে কী ভাবে?—এই বক্তৃতার ফলশ্রুতিতে, অথবা শ্রুতিফলে বলাই ঠিক—রাঁধুনী ও ঘরের কাজের মেয়েটি হাতের কাজ ফেলে সোৎসাহে খাবার টেবিলের কাছে চলে এলো এবং এই উচ্ছৃঙ্খল, চরিত্রবলহীন, অবিমৃষ্যকারিণীর দিকে তৃণাদপি তাচ্ছিল্যপূর্ণ দৃষ্টিপাত করতে লাগলো। আমি মরমে মরে গেলুম। তারা তো ফুচকা খাওয়ার ব্যাপারটা মোটে জানেই না।

BanglaBook.org

স্কেচ নয়

ভোর রাতে ট্রেন ধরতে হবে। একটু বাইরে যাচ্ছি, তিনদিনের আউটিং। দলসুদ্ধ সবাই হাওড়ায় মীট করবে। ব্যাগবাক্স নিয়ে মার সামনে এসে দাঁড়াই। বাইরে অন্ধকার। দু'একটা কাক জাগছে।—মা, প্রণাম করি, পা দেখি। আমি বেরুচ্ছি।

মা আলো জ্বেলে শালমুড়ি দিয়ে ফ্লাস্ক থেকে গরম চা ঢেলে খেতে খেতে মৌজ করে রাতভোর ইজিচেয়ারে বসে বসে বার্ট্রান্ড রাসেলের জীবনী পড়ছেন। শুনতে পেলেন না।

—দেখি, মা, পা-টা বাড়াও, বেরুচ্ছি। সময় হয়ে এল।

অন্যমনস্কভাবে চটিসুদ্ধ একটা পা বাড়িয়ে দিয়ে মা বলে উঠলেন—

—খুকু, এখানটা শোন, কী চমৎকার, এই লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারটার বিবরণ। জানিস, উনি গোর্কি আর ট্রটস্কির সঙ্গেও দেখা করেছিলেন। কথায় বলে—আহা ফিলজফার, জাগতিক জ্ঞানশূন্য—কিন্তু রাসেলের জীবনী পড়লে বুঝবি তা মোটেই নয়। লোকচরিত্রে অসামান্য জ্ঞান। আশ্চর্য অ্যানালিসিস করেছেন লেনিন-ট্রটস্কির চরিত্রের। এই পড়ছি, শোন— প্রায় দশমিনিট ধরে লেনিনের বুদ্ধি, আদর্শবাদ, ট্রটস্কির

রূপ, গোর্কির মূল্যবোধ বিষয়ে বাসেলের মতামত মা পড়ে শোনান। শুনে, আমি বলি—মাগো, এবারে কিন্তু যেতে হবে।

—যাবি, যাবি। একটা জরুরী কথা শুনে যা। কাল রাত্রে আমি এইটেই ভেবে ঠিক করেছি। আমার ডিসিশানটা শুনে যাবি না?

—কিসের ডিসিশান?

—বার্ট্রান্ড রাসেল। মাও সে তুঙ। পাবলো পিকাসো। আর চার্লি চ্যাপলিন। কেবল এই চারজন। আমি অনেক ভেবে দেখেছি। শুধু এদেরই আমি আলাউ করি।

—কিসে মা? তাড়াতাড়ি কর, ট্রেন—

—ওঁদের মনের বিরাটত্বের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো মাত্র একজনের পক্ষে সম্ভব না হতেও পারে। কিন্তু তার বদলে পৃথিবীকে ওঁরা অনেক দিয়েছেন। এইসব মহান ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যবিত্ত মূল্যবোধগুলি প্রয়োগ করতে যাওয়া ভুল। ওঁরা চারজন—

—এতো গেল অন্যান্য কথা। কী যেন ডিসিশান নেয়ার কথা বলছিলে না? চটপট সেটা বল, ট্রেন—মা আমার ইন্টেরাপশন গ্রাহ্য করেন না—তাই বলে আমাদের ঘরের আটপৌরে ছেলেমেয়েদের তো ওঁদের উদাহরণ দেখিয়ে যা খুশি তাই করতে দেয়া চলে না? ব্যক্তিগত পার্থক্য চিরকালই থাকবে—

—তোমার আলোচ্য বিষয়বস্তুটা কী মা?

—বিষয়? একাধিক নারীকে পত্নীত্বে বরণ করার নৈতিকতা—

—ওঃ! এইটা বলতে দাঁড় করালে? ট্রেনটা যে—

—ঠিক তাও নয়। ভাবছি এলিজাবেথ টেলরের কথা। তার এতবার বিয়ে করার মধ্যে একটা উচ্ছৃঙ্খল তৃষ্ণার্ততা আছে। আমি এর কোনো বৃহত্তর নৈতিক যুক্তি দেখি না।

—মাগো, এটা ফিরে এসে বরং—

—মাও, রাসেল, চ্যাপলিন, পিকাসো—এদের শক্তির কাছে সারা পৃথিবী ঋণী। চিরদিনের জন্য ঋণী। এঁরা যা দিয়েছেন তা শাশ্বত, তা চিরন্তন—এদের কথাই আলাদা। এঁরা প্রত্যেকে এক-একটা জীবনদর্শনের প্রতীক। দুঃখের বিষয়, এলিজাবেথ এই প্রাথমিক সারিতে পড়ে না।

—এটা তুমি ঠিকই বলেছ। আই এগ্রি।

—তাই ওর বেলায় পাঁচবার স্বামী-বদল আমি মোটেই আপ্রুভ করতে পারি না। এটা অসংযম, লাম্পট্য ভিন্ন কিছু নয়। যদিও তিনবার একই স্বামী।

—এবার যাই মা? ব্রীজ? এর পরে ট্রেন পাবো না।

—একটা না পেলে আর একটা পেয়ে যাবে। মানুষে-মানুষে সম্পর্ক আগে, না ট্রেন আগে? এটা খুব জরুরী বিষয়। যেতে যেতে এ নিয়ে ভেবো।

BanglaBook.org

হাওড়া যখন পৌঁছুলুম ট্রেন চলে গিয়েছিল। আমাদের দলবলের চিহ্নমাত্র ছিল না। হাওড়া থেকে ফিরে এলুম। মা তখনও রাসেলের জীবনী পড়ছেন। আমাকে দেখে বললেন—ওরা চলে গেছে? যাকগে। মন খারাপ করিসনি, ওই স্টেশন খুঁজলে দেখতিস তোর মতন আরো অন্তত দশজন লোক তাদের ট্রেন ধরতে পারেনি। কারুর হয়তো ছেলের বাড়াবাড়ি অসুখ, কারুর হয়তো বিয়ের লগ্ন ফসকে গেল.—তোর তো কেবল পিকনিক।—যশোদা, দিদির জন্যে চালটা নিয়ে নিও—আয় খুকু, বোস। শোন, এইখানটা পড়ে শোনাই

—এই লেডি অটোলাইন মোরেলের কাছে লেখা রাসেলের চিঠিটা; কী সুন্দর, তোর মন ভালো হয়ে যাবে—আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি। ওর সঙ্গে ভগবদবিশ্বাস নিয়ে যখন রাসেলের বাধলো, সেইখানটা যে কী অপূর্ব. এই পড়ছি শোন—যশোদা, আমাদের দু'কাপ কফি করে দিয়ে যাও তো—আশ্চর্য মেয়ে ছিলেন এই লেডি অটোলাইন মোরেল...

BanglaBook.org

স্কেচ দশ

—হ্যাঁ খুকু. খোকার বাড়ির খবর শুনেচিস? ভোর ছ'টার সময়ে ডাকাত পড়েছিল, ভোজালি দিয়ে পৈতেটা কেটে, চাবি নিয়ে নিয়েছে। সিন্দুক খুলে চার হাজার সাতশো কুড়ি টাকা. তিনটে পার্কার পেন, একটা টর্চ—কি খুকু? শুনচিস তো? নাকি এখনও সরস গল্প ভাবচিস? ওসব বাজে ভাবনা ছেড়ে দাও মা. সিরিয়স হও। গভীরে যাও। কবিতা লেখো. কবিতা।

—শুনছি, শুনছি। ডাকাত পড়েছিল তো? সে তো জানি।

—তার উপদেশটা কী, বুঝেছ?

—কিসের উপদেশ? ডাকাত পড়ার?

—রবিকে ধরে নিয়ে গেছে। আর ছাড়েনি। বলছে যোগসাজস ছিল ডাকাতদের সঙ্গে। গৃহভৃত্যরাই আজকাল সবচেয়ে ভীতিপ্রদ হয়ে উঠেছে। সেদিন লেকটাউনে. কাগজে পড়লি তো.—

—সতেরো বছরের পুরোনো চাকর তো? হ্যাঁ. পড়েছি, তাকেও তো ধরেছে পুলিশে—

—হ্যাঁ. ধরেছে, কেননা তার গ্রাম. থানা. নাম. ঠিকানা সব ছিল। না থাকলে ধরতো না, মনিবের মাথা ফাটিয়ে সর্বস্ব লুঠপাট করে, হাওয়া হয়ে গিয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে মনের ফুর্তিতে দিন কাটাতো। এর উপদেশটা কী?

—কী?

—এ বাড়িতে যারা কাজ করছে তাদের ফোটোগ্রাফ, বায়োডেটা, আর

ফিংগারপ্রিন্ট এখনই থানায় জমা দিয়ে আসতে হবে।

—তাহলে লোকজন আর থাকবে না।

—না থাক। পুলিশ বারবার নোটিস দিচ্ছে। এটা বেসিক সিকিওরিটির প্রশ্ন। নাগরিক সচেতনতার প্রশ্ন।

—হ্যাঁ, তা, ঠিকানা-টিকানাগুলো দিয়ে এলেই হবে।

—সঙ্গে ফোটো চাই। হরিকে বলো ফোটো তুলে দিক।

—ছবিটবি তুলতে বললেই সব পালাবে—ভীষণ ভয় পেয়ে যাবে, মা।

—বেশ, তাহলে চুপি চুপি ফোটো তোলা হোক, মুখের নয় ফিংগারপ্রিন্টের। বড়দিদিমণি, ছোড়দিদিমণি, শোনো, শোনো, একটা দরকারি কথা আছে। রান্নাঘরে মসলা ছড়িয়ে রাখতে হবে, আর ড্রেসিংটেবিলে পাউডার। যেই তাতে ওদের ফিংগারপ্রিন্ট পড়বে, দীপু, দীপু কৈ? দীপুর তো অনেক ফোটোগ্রাফার বন্ধু আছে, নইলে আমাদের সুমনই আছে, ডেকে আনবি, ফিংগারপ্রিন্ট তুলে ফেলবে—চুপিচুপি—মা ফিসফিস করে ষড়যন্ত্র আঁটেন।

—আচ্ছা, দিম্মা,—বড়কন্যে হেসে ফেলে—ওভাবে কখনও ফিংগারপ্রিন্ট তোলা যায়? নিয়ম আছে না?

—তাহলে... আচ্ছা, অন্য উপায়ও আছে। এবার মাইনে দিয়েই সব টিপসই নিয়ে নেব, তাহলেই দিব্যি ফিংগারপ্রিন্ট ঘরে এসে যাবে? হুঁ হুঁ বাবা—

—বা রে—ওরা কি বোকা নাকি?—ছোটকন্যে বলেন—এতবছর তুমি কিচ্ছু সই-টই নিলে না, এখন হঠাৎ নিলে ওরা বুঝি কিছু সন্দেহ করবে না?

এতক্ষণে সাহস সংগ্রহ করে আমিও যোগ করি—ওসব ছেড়ে দাও মা, এই সময়ে লোকজন পালালে বড্ড মুশকিলে পড়বো। তুমি-আমি দুজনেই এখন বিছানায়—ওদেরই ভরসায় সংসার চলছে—

—তোমার সংসার ওদের ভরসায় চলতে পারে, কিন্তু আমার নয়। আমার ভরসা ঈশ্বর। ওরা নিমিত্ত মাত্র। একটা কিছু আমাদের জমা দিতেই হবে পুলিশে। ঠিক করে ফ্যালো, ফিংগারপ্রিন্ট না ফোটো—

—আচ্ছা দিম দিম—মহারানীর গলা জড়িয়ে বড় সখী বলেন—কী ছেলেমানুষী হচ্ছে বলো তো? তোমার চেয়ে পুরো ষাট বছরের ছোটো হয়েও আমি যেটা বুঝতে পারছি, চৌষট্টি বছরের ছোটো হয়ে বোনও যা বুঝতে পারে—এটুকুনি বুঝছ না, এখন হঠাৎ ফিংগারপ্রিন্ট নিতে গেলে—

—দূর দূর—কী আজেবাজে বকচিস।—মা হেসে ফেলেন এইবার। ষাট-চৌষট্টি—যাতা একটা বলে দিলেই হলো? কী যে অঙ্কের মাথা হয়েছে না তোদের, অথচ তোদের বাবা এত অঙ্কে পটু। ...হুঁ, ষাট-পঁয়ষট্টি—কী যে বলে। যত সব আজগুবি কথা—

—আজগুবি? তোমার থেকে আমার বয়েসের তফাৎ ষাট বছরের নয়? আর

BanglaBook.org

বোনের সঙ্গে চৌষট্টি বছরের? শুনে দ্যাখো—উনিশশো তিন থেকে উনিশশো তেষট্টি—নবেম্বর থেকে অক্টোবর...

—তিন থেকে... তেষট্টি? মা যেন একটা ঘোরের মধ্যে কথা বলেন এবারে। যেন স্বপ্নের মধ্যে—

—সত্যিই তো। তিন... থেকে তেষট্টি—ষাট বছরই তো। এতো বয়েস হয়ে গেছে আমার? সংসারের ভেতরে কেউ যে কারুর চাইতে ষাট বছরের বড়ো হয়, হতে পারে, এটাই যে কেমন বিশ্বাস হচ্ছে না আমার...ষা-ট মানে তো... উঃ—অনে—ক বচ্ছর রে। রানীমার বিস্ফারিত দুটি নয়নে ছ' বছরের শিশুর বিস্ময়, আর ষাট বছরের উপরে ওঠা বিষাদ—হঠাৎ লুকোচুরি খেলতে থাকে।

স্কচ এগারো

মা খাটে বসেই পান সাজছেন। পুরী থেকে হরিবাবু পাণ্ডা এসেছেন। কার্তিকপাণ্ডার ছেলে বলে মা যাঁকে উল্লেখ করেন।

—নমস্কার মা। প্রসাদী গজার প্যাকেটে ফুলে আছে কাপড়ের থলেটা হরিবাবুর হাতে। মা-র কাছে এসে বসলেন মোড়াতে। প্রতিবছর এই সময়টায় আসেন। মা হাত তুলে নমস্কার করলেন। তিনি হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। কেউই কাউকে স্পর্শ করতে সাহস করেন না দেখা গেল। কী পদ, কি মস্তক। মা মুখ তুলে হাসলেন। হরিবাবুও। দুজনের মুখেই পান।

—তারপর ঠাকুর, বলো, কী খবর জগন্নাথের?

—জগডনাথঅ কভু খারাপ থাকে? ভল্ল অছি।

—আর তুমি?

—মু ভল, মা। সানু বহিনটাই কিছি গড়বড় করিলা।

—কী আবার হল?

—কিচ্ছিতে সসুরঘরক বহিব নাই। পালাই আসিব পরা? বাপা নাহি। এব্বে মু একেলা। তিনোটি পিলা-ঝিয় সব্বু নেই কিবি বাপাঘরকু অসি ঠিয়ে যিব্ব। বাস। দুই মাসঅ, চারি মাসঅ, বৎসর ভোরঅ ঠিয়ে যিব্ব, সসুরঘরক মনঅ নাহি মা। যেত্তেবার মু তাঙ্কু রখি দেই আসিবি, ছ'টি মাসঅ পুরিবে নাহি ঠি-ক পলাই কিবি চালি আসিব।

—সত্যি তো? ঘুরে ঘুরে পালিয়ে আসে কেন মেয়েটা? মারধোর করে বোধহয়।

—মু কিমিতি জানিবি পরা? খালি কহিবে—ভাই, মু সেইটি রহি পারিবিনি, মু মরি যিবি। সাতঅ বৎসর পুরি গলা মু পাঞ্চ হাজার টঙ্কা পণঅ দেই কিরি বাহা দউচি, মা, জোঁই বি পুজারী-বাড়ুণ, মোর বহিনটাই পাজি। মন দেই কিরি সসুরঘর করে না। মতে কহুচি,—সসুরটা জুড়াতন করুচি।—তাঙ্কর তিনোটি পিলাকু মু পালিবি

কিমিতি পবা? তোব সসুবটা পাজি ত মু কঁড কবিবি? পাঞ্চ হজাবঅ দেই নাহি? সোনা দেই নাহি দসঅ ভবি? সাইকেল বি দউচি পবা? সতীনঅ ঘরঅ নুযে, বুঢা ববঅ নুযে। সব্বু অছি। ঘবঅ, বরঅ, পিলা।—আপুনি কহন্তু মা, আউ মু তাঙ্কু কাঁহিকি বখিবি মো পাখে? বাপাঘরকু?

—সত্যি তো—কন্যা সম্প্রদান হয়ে গেলে পব সে কন্যাকে ঘবে ফিবিযে আনবে কেন? ঠিক কথা। গোত্রান্তব হযে সে এখন অন্য ঘবেব বউ। তাদেব বংশধব হবে, তাবা বুঝুক ঠেলা। আমবা ঠিক এতটা লজিক্যাল হওযা পেবে উঠি না। ইচ্ছে কবলেও পাবি না। এই দ্যাখো না আমাব মেযেকেও তো বিযে দিযে গোত্রান্তব কবেছিলুম। তবু সে ফিবে এসে ঘবে বসে আছে। দু'দুটো মেযেসুদ্ধু। কী কবব বলো? তা মেযেবা কি কখনওই আসে না বাপেব বাড়ি?

—আসিব না কাঁহিকি? কামঅ পড়ি গলে আসে। বহুব অসুখঅ হেলে, দাদীব কিচ্ছি হেলে, ভাইবহুব পিলা হেলে, তেব্বে আসিব। কামঅ সারিকিবি ঘবকু চালি যিব্ব। এমিতি বুলিবাকু আসে নাই।

—তা তো ঠিকই। তা তো ঠিকই। এমনি বেড়াতে আসবে কেন? কাজ কবতেই তো মেযেব জন্ম। শ্বশুববাড়িতেও খাটবে। বাপেব বাড়িতেও এসে খেটে দিযে যাবে। বিশ্রামটা কববে চিতায উঠে। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ এক। কোন ভেদ নেই। সর্বত্র একই কাহিনী। কি ঠাকুব? এ-সব কথা বলতে বলতে মাথা গবম হযে যাবে—তুমি ববং মন্দিবেব কথা বলো। পুজো-আচ্চা কেমন চলছে?

—ভলই চালিছে। সব্বু ভগবানবে ইচ্ছা, মা। বাধামাধব যাহা কবিবে। মু নিমিত্তমাত্র। আউ কী কহিবি?

—ঠিক তাই। তুমিও যেমন নিমিত্ত, ঠাকুব, স্বযং বাধামাধবও তাই। সেও তো নিমিত্ত মাত্রই। আসল হলেন গিযে বিজনেস। বিজনেস যাহা কবিবেন। কী বলো ঠাকুব? বিজনেস সবাব ওপবে কিনা?

—বাঃ। মা কঁড কহিছন্তি পরা। বামঅ। বামঅ।

—মা ঠিক কথাই বলছে ঠাকুব! বিজনেসই সবাব বড ভগবান। সে তুমিও কী, আব আমিও কী। নইলে পৃবীর ফুবফুবে বাতাস ছেড়ে তুমি আব তোলা তুলতে আসো কলকাতায? এই পচা গবমে, বর্ষায, ঘামে, ভিড়ে, হ্যাঙ্গামে? এখানেও আজকাল তোমাদেব মতন তোলা তোলবাব বেওযাজ হযেচে, ঠাকুব। পাণ্ডা আছে। এক এক পাটিব এক এক ঘব যজমান। ঘব মানে এই দোকনঘব আব-কি। বাজাব, হকাব, এদেব পাণ্ডাব খাতা হযেচে।

—মা কঁড কহিছন্তু? মু বুঝি পারলানি—পৃবী পাণ্ডা এইঠি হব কিমিতি?

—সে থাক। ও-কথা যাকগে। মেযেদেব কথা বলো। জামাইগুলি কেমন হযেচে সব? যুগ্যি পাত্তব তো?

—ভল্ল, মা, ভল। জামাই সব্বু ভল হউচি।

BanglaBook.org

—লেখাপড়া জানে?

—সব্বু গ্রাজুয়েটঅ। তিন নম্বব এম.এ. পাস করি গলা। ইতিহাসঅরে।

—বাঃ বাঃ! কদ্দুর পড়িয়েছিলে মেয়েদের? গ্রাজুয়েট?

—বি.কম পাস কবি গলা। আপঙ্কর নাতিনী বি.কম. পাস করিলে, মা?

—নাঃ। তা আব কবলে কই? তাব বি.কম. পাশেব এখনও দু'তিন বছব দেরি আছে। তোমার চাবটি মেয়ের প্রত্যেকেই বি.কম পাশ?

—হঁ মা। আউ পুঅ বি এব্বে বি. কম. পড়ুচি। ফাস্ট ইয়াব।

—বেশ বেশ। বেশ বেশ। জামাইবা কী করে?

হবিঠাকুব বললেন, বড় জামাই কটকে। পি. ডব্লু. ডি.-তে অফিসাব। মেজ জামাই ভুবনেশ্বরে, স্টেট ব্যাঙ্কেব ক্লার্ক। তিন নম্বব জামাই প্রফেসব. পুবী কলেজে। কাছেই থাকে। আসে-যায (থাকে না অবশ্যই)।

—বাঃ বাঃ। খুব ভালো কথা। চার নম্বব জামাইটি কী করে?

—সানু ঝিঅর বাহা হেই নাই, মা. ঢেনকানালে হাই ইস্কুলেবে পঢায়।

—সে কী কথা? কেন দাওনি বিয়ে?

—পণ পন্দর হজার ডিমান্ড করিলা। বড ছিটার বেলাবে পাঞ্চ-পাঞ্চ হজাব লাগিলা. তিন নম্বরের বেলাবে দসঅ। চাবি নম্বর পন্দর চাহুচি। বেট বটি যাউছি।

—ও বাবা। এত টাকা পণ তুমি দিয়েছ? তা, তুলতে পাববে তো? বেট অবশ্য বাড়তিই।

—কি, মা? কঁড় কহিলা?

—বলছি এত টাকা সবটা তুলতে পাববে তো? ছেলে তো চারটে নেই, একটা মোটে।

ঠাকুর এক গাল হেসে বললেন—তা ঠিক। সব্বু পাবিবিনি—এই পন্দব হাজাব, কি পচ্চিস। পঙাঘবকু আসিবে পর সে কন্যা? কুড়ি হজার দবনি? মু এত্তে দউচি। মতে দেবাকু হব কুড়ি-পচ্চিস। হঁ! মু কহি দউচি।

—কী বললে ঠাকুব? ভালো শুনি না কানে আজকাল—তুমি ছেলেব বেলা কত পণ নেবে বললে—?

—কুড়ি হজার। সানু ঝিঅব পণ পন্দব হজার দেইকিবি. পিলাব বেলাবে বিস হজাব নেই নব। নবনি কাঁহিকি? মু পঁইতিশ হজার দেই নাই? পাঞ্চ, পাঞ্চ, আউ দসঅ, আউ পন্দর। মোট পঁইতিশ।

—তা তে বটেই, তা তো বটেই। তুমি পঁইত্রিশ হাজার মেয়েদেব বেলায পণ দিযে তার থেকে বিশ হাজাব ছেলেব বেলায় পণে তুলে নেবে। এ তো খুবই স্বাভাবিক হিসেব। কিন্তু ঠাকুব, তখন যে আমি তোমাকে পুলিশে দেবো।

—কঁড কহিলা? মা?

BanglaBook.org

—মা বলছে যে তোমাকে মা তখন পুলিশে দেবে। যেই তুমি ছেলের বিয়েতে পণ নেবে না হরিঠাকুর, অমনি আমি এখানে পুলিশে খবর দেব।

—কাঁহিকি? কাঁহিকি?

—কেননা ওই কর্মটি ঘোরতর অপকর্ম। ঘোর বে-আইনি। পণপ্রথা দেশ থেকে উঠে গেছে ঠাকুর। পণ নেওয়া পণ দেওয়াও বে-আইনি। তোমাকে অবিশ্যি আমি এখুনি জেলে দিতে পারি।

—জেলরে? মতে? কাঁহিকি দব? আ-হা। মা যে কী কহিছন্তি। ঠট্টা কবিলে পরা?

—মোটেই ঠাট্টা কবিনি ঠাকুর। ঠিকই শুনেছ। জেলে। তুমি পণ দিয়েছো কেন? শুধু তোমাকে নয়, তোমাব প্রত্যেকটা জামাইকে এক্ষুনি জেলে দিতে পাবি। ব্যাঙ্কাব, প্রফেসাব পি.ডব্লু.ডি-র অফিসাব সব কটা নিশ্চয়ই জেনেশুনেই পণ নিয়েছে, আব শিক্ষিত যখন। চোট্টাকে ওড়িয়াতে কী বলে ঠাকুর?

—চোবঅ কহিছন্তি পবা, চোবাবি কহিছন্তি।

—তোমাব সব্বুকটি জামাই চোবা হলা। বুঝলে?

—ছি ছি, না মা। চোবা নাহি। পণপ্রথা তো যুগযুগান্তবেব নিয়মঅ। হিন্দু বিবাহেব রীতি। ব্রাহ্মণেব কন্যাদান বিনাপণরে আউ কিমিতি হব, মা? মতে কহি দিযন্তু?

—বেশ তো ঠাকুব। কোর্টে গিযে সেই কথা বোলো। আমি তো এখনই খবব দিচ্ছি একটা ভুবনেশ্বরের থানাতে, একটা কটকেব থানাতে, একটা পুবীতে। কেস ঠুকে দিচ্চি।

—আপুনি? আপুনি কাঁহিকি কেস কবিবে? পণমু দউচি পবা।

—এ হচ্ছে জনস্বার্থেব কেস বুঝলে? যে কেউ স্যুট ফাইল কবতে পাবে। আমিও পাবি। এই কলকাতা থেকেই তোমাব জামাইদেব পুলিশে দিতে পাবি। বুঝলে ঠাকুব? দেশেব আইনকানুনেব অনেক উন্নতি হযেছে। গণতন্ত্র এখন প্রবল আকাব, গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধাব।

—মা, মু বুঝি পারিলি নাহি।

—না বুঝবার কী আছে? পণপ্রথা দেশেব খুব ক্ষতি কবছে ঠাকুব। যে পণ দেয়, সেও পাপী। মন্দ নিযমটাকে চালিযে নিযে যাচ্ছে বলে। আব যে লোক পণ নেয় সে তো মহাপাপী। তাই তোমাব জামাইদেব যত কড়া শাস্তি হবে—ধবো, তাদেব হবে দশ বছর করে জেল, তোমাব কিন্তু অতটা শাস্তি হবে না। ধবো, এই দু'বছব কবে। প্রত্যেক মেযেব বেলায়। জেলখাটায শাস্তিব ওপবে অবিশ্যি জরিমানাও হবে। সেও মন্দ নয। পণের কাছাকাছিই যাবে।

—বাঃ। মা, ঠট্টা...

—কে বললে? এটা কি ঠাট্টার কথা? না তোমাব সঙ্গে আমার ঠাট্টাব সম্পর্ক? ভালো কথা বলছি শোনো, ছেলেব বিযেতে পণটা নিযো না ঠাকুব। আব ছোট

BanglaBook.org

মেয়ের বিয়েতেও পণ দিয়ো না। ওতে মেয়ের অপমান হয়। গ্রাজুয়েট মেয়ে। চাকরি করছে। মাসে কত করে পাচ্ছে?

—সাড়ে পাঞ্চসং টংকা মিড়ছি। কম নুয়ে।

—সাড়ে পাঁচশো টাকা? তবু তুমি পণ দেবে? কেন দেবে ঠাকুর? মেয়ে তো মাসে মাসেই কিস্তিতে কিস্তিতে পণ দিচ্ছে। সুদসুদ্ধ আঠাশ মাসেই পনেরো হাজার শুধে দেবে সে। খবর্দার পণ দিয়ে বিয়ে দিয়ো না। এবং নিজে পণ নিয়ো না। এতে অধর্ম হয়। ভগবানের লাইনে আছ, ধর্ম-অধর্ম নিয়ে পাপ-পুণ্য নিয়ে একটু ভাবতে হয়। পুরী জগন্নাথের পাণ্ডা তোমরা। তোমরা যা আচরণ করবে সারা দেশ তাই করবে। কখনও কি ভেবে দেখেছ—

—কিন্তু মা, আপুনি বুঝি পারিবেন না বেপার—

—বুঝতে তোমাকেই হবে, ঠাকুর। ব্যাপার খুব গুরুতর। এখন কিন্তু নিয়ম-কানুন খুব কড়াকড়ি হয়েছে। যে লোকটা পনেরো হাজার চেয়েছে তাকে খবদ্দার মেয়ে দিও না। পরে আবার বেশি টাকা চাইবে। নানান গোলমাল করবে। কেরোসিনের কেসও হয়ে যেতে পারে। অবিশ্যি তোমাদের আবার ভয় কী ঠাকুর? তোমাদের হাতে তো পোষা গুণ্ডার দলই আছে। দাও না বেশ করে পাত্রের বাপকে বাম-ঠেঙানি। পণ নেওয়ার কথা ভুলে যাবে।

—আইঃ। মা... কঁড কহিছন্ত? গুণ্ডা কৌঠি পাইবি?

—কেন? মন্দিরেই পাবে? তা, ছেলেটা করে কী? কোথাকার ছেলে?

—সেবি ঢেনকানালে ইস্কুলরে পঢ়ায়।

—ওই একই ইশকুলে? মেয়ের সঙ্গেই নাকি?

—হঁ মা। হাইস্কুলকে সায়ান্স টিচার, সেটা এম. এসসি. পাস।

—তবে তো প্রেমই মনে হচ্ছে।

—সে হেই পারে। অসম্ভব নুয়ে। আজিকাড়ি ইমিতি বহুত হউচি মা। উড়িষ্যারে বি হয়। কলিকাতারে, আউ বম্বইরে যেমিতি—

—তা তো হবেই। তা তো হবেই। সব ওই সিনেমার দোষ। কিন্তু, ঠাকুর—ছেলের জাতি কী? ব্রাহ্মণ তো?

—জাতি গোত্র ঠিকঅ অছি। সিটি বা পণ্ডা ঘরর সন্তান। সদবাম্ভনঅ।

—তাহলে? তাহলে আর ঝামেলা কিসের? লাগিয়ে দাও। ওরা নিজেরাই রেজিস্ট্রি করে নিক। তুমি তারপর ধুমধাম করে হিন্দু বিয়ে দিয়ে দাও। পণের প্রশ্নই উঠবে না।

—উঠিবে। উঠিবে। মা। মো পাখরে ঠিক উঠিবে।

—কেন উঠবে, শুনি? এ তো লাভ ম্যারেজ? পণ নিলে পুলিশ গিয়ে বাপের হাড়গোড় ভেঙে দেবে না? ছেলেরও। হুঁ।

—ছি, ছি, মা। লর মেরিজ রেজিস্টিরি বাহা, ভল নুয়ে। এক পাণ্ডাপুঅ এক

মেথবানীবে বেজেস্টাবি লবমেবিজ কবিলা, সব্বু পণ্ডা মিলিকিবি তাঙ্কু একঘবিকিযা কবি দেলে। দেলে কঁড হব? তাঙ্কুব কিচ্ছি হেলা নাহি, দুইজনা নুআ দ্বিতল ঘবঅ বনাই কিবি দিব্বি ফুর্তিবে বহিলে। আউ কী?

—সে কি, একঘবে হযে গিযে দোতলা বাড়ি তৈবি কবে ফেলেছে?

—হেব্বে না কাঁহিকি? মেথবানীটা ভল নুযে। গুট্টে মেথবানী হেই কিবি তু এত্তে বটিযা কপসী কাঁহিকি? সবকাবি নুগা দুকানে ভল সার্বিস কবুচি। দিনকে দিন হিন্দু ধবম ভাসি যাউছি মা। তাঙ্কব এব্বে বচ্চা হেলে, সে বচ্চাব জাতি কঁড হব? পণ্ডাপুঅব মেথব পিলাপন হব?

—তা কেন? পাণ্ডাব ছেলে পাণ্ডা হবে। বামুনেব ছেলে শাস্ত্রবেব মতে বামুনই হয।

—আই মা। মেথবানীব গর্ভবে পণ্ডা হব? ছি ছি।

—কেন হবে না? গর্ভে কী এসে যায? স্ত্রীবত্ন দুষ্কুলাদপি। শোনোনি? কুরুক্ষেত্রেব বাজাদেব জন্ম তো জেলেনীব গর্ভে। সত্যবতীব জাত কী ছিল? ঘটোৎকচেবই বা জাত কী ছিল? ওসব নিযে ভেবো না, ঠাকুব। এখনকাব আইনে মেথবানীব সন্তানেব ব্রাহ্মণ হওযা কেউ ঠেকাতে পাববে না, ববং দেখবে বামুন হলেই অসুবিধে হচ্ছে। জাত তুলে একদম কথা কইবে না, ঠাকুব। পুলিশে ধবে নিযে যাবে।

—না মা। মু আউ কহিবিনি। সবকাবি আইন বড জববদস্তি হেলা। পৃথীব দেবদাসী-প্রথা বি উঠাই দিলা—এব্বে লাস্ট গুট্টে বুঢ়ি দেবদাসী মবিলে, আউ প্রথাবক্ষা হবনি। সব্বু নষ্ট।

—দেবদাসীপ্রথা আব বেখে কাজ নেই ঠাকুব, যেমন পণপ্রথাও আব বেখে দরকাব নেই। পণ দেবাব প্রশ্নই ওঠে না। ছেলেব বাপকে ঠেঙাতেও হবে না। ছেলেব বাবা তোমাব কিছুই কবতে পাববে না। তুমি বিযেটা বিনা পণেই দিযে দাও, জয জগন্নাথ বলে।

—সে বি পণ্ডা অছি, মা। পাত্রবঅ বাপা।

—অঃ। তাই বলো। সেটাই তবে ঝামেলা? তাব মানে তাবও প্রাইভেট গুণ্ডাবাহিনী আছে? আই সী। তা, তাব মেযে নেই? অবিবাহিত?

—অছি। তিনোটি ঝিঅ। পাঢালিখা কবুচি।

—তাদেবই একটাব সঙ্গে বদলাবদলি কবে নাও না ববং তোমাব ছেলেব সঙ্গে? কেউ কাকুব কাছে ববপণ নিযে না। কেমন? হতে পাবে না?

—সেটি হেই পাবে। সেইটি মন্দ নুযে।

—ব্যস। সেইটিই কববে। এ-কথাব আব নডচড নেই। নো-পণ। বদলাবদলি। নইলে আমি কিন্তু পুলিশে খবর দিযে রাখছি। ঢেনকানালেব বাজবাড়িব সব্বাই আমাদেব বন্ধুলোক। এতটা অধর্ম আমি কবতে দেবই না। একেই তো তোমবা

BanglaBook.org

ফক্কিকারি চালিয়ে দিব্যি বিজনেস গুছিয়ে নিচ্ছ, আবার পণ দেয়া-নেয়াও করবে, উনিশশো তিরাশিতে? উঁহু—জেনেশুনে সেটি হতে দিচ্ছি নে। মহাপাপ হবে। ঠাকুর, চা খাবে তো? খুকু, ঠাকুরের জন্যে আর আমার জন্যে দু'কাপ ভালো করে চা—

—আউ মু চা-পানি কিচ্ছি খাইবিনি. মা, মু এব্বে ঘরকু যাউছি। পরসাদ নেই কিরি মতে ছাড়ি দিযন্তু।

—প্রসাদ? বেশ, দিচ্ছ দাও। ওসব পেসাদ-ফেসাদে আমার আর বিশ্বাস নেই, ঠাকুর। আবার এসো. সামনের বছর যদি থাকি. দেখা হবে। কিন্তু পণ যদি নিয়েছ. আমি থাকি বা না থাকি, ঠিকই টের পাব কিন্তু বলে দিচ্ছি। স্বর্গেই থাকি আর—

—না না. এতে তাড়াতাড়ি মা স্বরগকু যিব্ব কাঁই?

—বেশ. স্বর্গে যদি নাও থাকি, ধর যদি নরকেই থাকি. বা মর্তেই থাকি—পুলিশে খবরটি ঠিকই পৌঁছে দেব।—এ হল জনস্বার্থের মামলা। শেষ জিত ধর্মের হবেই। বুঝলে না? (ফিসফিস করে) আরে, আমিও যে ধর্মেরই ধ্বজাধারী—আমিও তো পাণ্ডাই। ঠাকুর—শোনো বলি। আমাদের ধর্মটা শুধু একটু হাত বদলে যাজকদের হাত থেকে ধর্মাবতারদের কাছে চলে এসেছে—মন্দির থেকে কোর্টে। এখন ধর্ম মানে জাস্টিস। বুঝতে পারছ? আমরা ঈশ্বরবাড়ির সবাই সেই ধর্মের পাণ্ডা। সবাই যে উকিল ব্যারিস্টার জজ ম্যাজিস্ট্রেট। ভগবান ইদানীং এখানেই বসবাস করছেন কিনা—। মন্দিরে মন্দিরে যা মারামারি গুণ্ডামি দলাদলি খুনোখুনি—ও কি! ও কি! উঠে যাচ্ছ যে বড়—তোমার খুকুমাটা নিয়ে যাও? ওটা না নিয়ে পালালে তো চলবে না—বংশের যেটা বেওয়াজ—অকল্যাণ হবে যে! অ ঠাকুর—

স্কেচ বারো

—আচ্ছা খুকু. বলতো দিকি. জগতে সবচেয়ে সুখী কে? আই বেট, তুই বলতে পারবি না।

—জানোই যখন, তখন জিজ্ঞেস করছো কেন মা? তোমার নাকে অক্সিজেনের নল। হাতে গ্লুকোজের ছুঁচ। এখন না হয় বকবকপী ধর্মের বোলটা তুমি নাই নিলে? রেস্ট নেওয়া উচিত নয় এখন?

—তার মানে তুই উত্তরটা জানিস না। এই তো? জানতুম. পারবি না।

—আমি তোমার মতন ধীমতী নই মা। ইনফ্যাক্ট তোমার চেয়ে বেশি কেন তোমার সমান বুদ্ধিমান লোকও আমি জীবনে খুবই কম দেখেছি। ভূ-ভারতে কেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তোমার জুড়িটি নেই।

—মেলা তেলাসনি বাছা। তবে এই প্রসঙ্গে যে 'বুদ্ধিমান' শব্দটি ব্যবহার করলে তাতে আমি খুব আনন্দিত। 'বুদ্ধিমতী' যে বললে না, এটাই তোমার বুদ্ধির প্রমাণ।

BanglaBook.org

—থ্যাংকিউ।... কিন্তু ঠিক কোন কারণে বলছ এটা?

—সেটাও যদি তোমাকে বানান করে বলে দিতে হয় মা তবে আমারই হিসেবে ভুল ছিল। আর তোমার ভুল ছিল স্রেফ ব্যাকরণের লিঙ্গভেদে। 'উইমেন্স লিব' বিষয়ে তুমি অজ্ঞ মনে হচ্ছে। সে যাক গে, আমার প্রশ্নের জবাব কই?

—কোন প্রশ্ন?

—আরে। এর মধ্যেই ভুলে গেলে? এটা একটা রেকর্ড টাইমের মধ্যে ভুলে যাওয়া কিন্তু। নাঃ. জগতে বুদ্ধিই সবচেয়ে জরুরি বস্তু নয় দেখেছি।

—নয়ই তো। স্মৃতিও খুব জরুরি। প্রশ্নটা ছিল কী? খেই ধরিয়ে দাও।

—ঐ যে, জগতে সবচেয়ে সুখী কে?

—তার উত্তর তো করেই—

—আহাঃ। সেটা তো মহাভারতের উত্তর। যুধিষ্ঠিরের দিনকাল পালটে গেছে তো. এখন ঐসব পচা পুরনো উত্তর চলবে না। তোমরা নতুন যুগের মানুষ—নতুন জবাব খুঁজে দাও। শাকান্নে এখন বড়জোর ক্ষুন্নিবৃত্তি হতে পারে, সুখ কিন্তু হয় না। নতুন যুগের নতুন উত্তর চাই।

—পুরনো প্রশ্নের নতুন উত্তর?

—প্রশ্নটা চিরন্তন। সংকটজনক পরিস্থিতি যেমন চিরন্তন হলেও সংকট মোচনের পন্থাটা তো চিরকালই এক হয় না—যুগে যুগে বদলায়, এটাই জগতের নিয়ম। ইতিহাসের ধারা। ধর্ম বলো, দর্শন বলো, রাজনীতি বলো, এরা তো যুগ যুগ ধরে এটাই করে আসছে। পুরনো প্রশ্নের নতুন উত্তর যোগানো। প্রশ্নটা একই থাকে, শুধু যুগে যুগে, দেশে দেশে, সভ্যতা বিশেষে, সময় বিশেষে এবং চিন্তাবিদ বিশেষে জবাবটা পালটে পালটে যায়। যেমন ধরো মূল্যবোধের প্রশ্ন। প্রশ্ন তো পালটায় না, উত্তরই পালটায়। তাই নয় কি?

—তাই বটে। কিন্তু মা, তোমার—

—আচ্ছা, আরো সহজ করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। তুমি তো, বাবা, একটু মোটা আছো। এই ধরো না কেন আমার অসুখের কথাটা। আসলে এই যে অসুখটি আমার হয়েছে এটি তো ঠাণ্ডা লেগে বুকে সর্দি বসে জ্বর. কাশি. ইত্যাদি? এ নির্ঘাৎ মনুষ্যপ্রাণীর চিরকালই হয়ে আসছে। আজ বীজাণু পরীক্ষা করে একে ব্রঙ্কোনিমোনিয়া বলছে। আগে অন্য কিছু বলতো। চরক-সুশ্রুত নির্ঘাৎ কোনো সংস্কৃত নামে এই রোগের ওষুধ লিখে গেছেন. গ্রীস রোমের চিকিৎসকরা আরো কোনো অন্য ট্রিটমেন্টের বন্দোবস্ত করেছেন, আরব মিশরের হাকিমরাও মস্ত মস্ত পণ্ডিত ছিলেন. তারা আবার আরেক রকম প্রেসক্রিপশন দিয়ে গেছেন নিশ্চয়ই। সবেতেই এই রোগটা সেরে যেত। বুঝলে কথাটা?

—বুঝলুম। নতুন বোতলে পুরনো মদ নয়, পুরনো বোতলে নতুন মদ।

—ওসব মদের বোতলের উপমা ছেড়ে দাও। ওটা এখানে অপ্রযোজ্য। অভ্যস্ত

BanglaBook.org

উপমা দিয়ে সব কিছু বুঝে নেবার টেন্ডেনসিটাও ছেড়ে দাও। ওটা অল্পবুদ্ধির লক্ষণ। অশিক্ষিত এবং শিশুরা এটা করে থাকে।

—মা, তোমার কথা বলতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। একটু বিশ্রাম নিলে ভাল হত না?

—চিরবিশ্রাম তো নিতেই হবে মা। আশি বছরে ব্রঙ্কোনিমোনিয়া মানেই চিরবিশ্রামের সুষ্ঠু আয়োজন। তা তোমরাই তো সে বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছো মা। নাকে নল, শিরায় ছুঁচ, একেবারে আসুরিক যুদ্ধের বন্দোবস্ত করেছ। এ যাত্রায় মনে হচ্ছে চিরবিশ্রাম আর হল না। এ শীতটাকেও হারিয়ে দিলুম। বৃদ্ধবৃদ্ধারা শুকনোপাতার মতন, শীতকালেই বেশি ঝরে যায়। তা, আমি বোধ হয় ডালেই ঝুলে রইলুম।

—চুপ করো, চুপ করো, ডোন্ট টেম্পট প্রভিডেন্স। মা।

—অঃ। ইংরিজিতে কুসংস্কার প্রকাশ করছো? মার গায়ে যাতে 'নজর' না লেগে যায়? বেশ বেশ। ইংরিজিতে বললে কানে তেমন ঠেকে না নাবে? এই জন্যেই তবে 'ইংরাজি শিক্ষা'? কুসংস্কার ট্রানস্লেশন করবার জন্যে। উত্তরটা কিন্তু দিলে না। স্মুথলি এ্যাভয়েড করে যাচ্ছ।

—আমি জানি না উত্তর। জগতে সবচেয়ে সুখী কে? কে জানে? অন্তত আমি যে নই এটুকু বলতে পারি।

—ইয়ার্কি মেরো না। চিন্তা করো।

—জগদগুরু শঙ্করাচার্য চতুষ্টয়? অথবা মার্গারেট থ্যাচার? কিংবা ন্যান্সি রেগন? যাদবপুরে মমতা ব্যানার্জি, দিল্লিতে সোনিয়া গান্ধী, বম্বেতে অমিতাভ বচ্চন, হিন্দুস্থান পার্কে তুমি। অন্ধ্রে এন-টি-আর, চাঁদে শশক? কী জানি মা, মনস্থির করতে পারা শক্ত। আচ্ছা, বলছি। জগতে সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি, সত্যজিৎ রায়। সবচেয়ে গ্ল্যামারাস অন্তত। আফটার মেরিলিন মনরো। হয়েছে উত্তর?

—যতসব ছোট্ট কথা। কত বড় প্রশ্নের কত ছোট্ট উত্তর। শোনো, আমি বলে দিচ্ছি, জগতে আজকের দিনে যে কোনো লোকের পক্ষেই সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি হওয়া খুবই সহজ। সেটার জন্য অত মহৎ ব্যক্তি হতে হবে না এবং সেই সহজ সুখটি আহরণ না করে মানুষ সেধে সেধেই নিজের জীবনকে দুঃখে জর্জরিত করে তোলে। অযথা টেনশন সৃষ্টি করে জীবন বিপন্ন করে ফেলে। স্প্রে-টা দাও সিস্টার।

—আপনি একটু বিশ্রাম করে নিন মাসিমা। দিদি, আপনি নিচে যান। মাসিমা বড্ড বেশি কথা বলছেন। শরীর খারাপ হবে—

—দিদি নিচে যাবে না। তুমিই নিচে যাও। আমার এখন নার্সিং দরকার নেই। আমার কম্প্যানি দরকার। ওটাও খুব জরুরি।

—ঠিক আছে মা—আমিও থাকি, আর সিস্টারও থাকুক। তুমি বরং একটুক্ষণ কথা না বলে মৌনীবাবা হয়ে কথা শোনো। তাহলেই উনি কিছু বলবেন না।

—ছিলুম তো মৌনী এই কটা দিন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও। বাধ্যকরী শোনবার মত

BanglaBook.org

কথা কে বলবে যে শুনব? সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি কে তুমিই শুনে রাখো। সেই সুখীতম, যার সমস্ত ইনকামট্যাক্স পুরোপুরি নিঃশেষে শোধ করা অভ্যাস। যার ব্যক্তিগত কোনো ঋণ নেই। সবকারের কাছেও কোনো ঋণ নেই। সেই ব্যক্তিই সবচেয়ে সুখী। আমি মরলে ডেথডিউটি পুরো দেবে। যদি লাগে। ফাঁকি দেবার চেষ্টা কোরো না।

—ও। আচ্ছা। তুমিই সব দিয়ে থুয়ে যাও না উকিল ডেকে, হিসেব করে?

—তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি ব্যাপারটা ধরতে পারলে না, অথবা ইনকামট্যাক্স দাও না বা দিতে চাও না। অবিশ্যি তোমার যা ইনকাম, সম্ভবতই ট্যাক্সেবল নয়।

—তা কেন, আমাদের তো মাইনে থেকেই কেটে নেয়।

—আমরা তো রাস্তা তৈরি, টিউবওয়েল বসানো বা হাসপাতালের উন্নতি এসব ব্যক্তিগতভাবে করি না, করার শক্তিও রাখি না। কিন্তু যথাযথ টাকা দিলে, জানি, আমার সামান্য রোজগারও দেশের উন্নয়নের কিছু কাজে লাগছে। কত সুখ এই চিন্তায়। ভাবো, কত শান্তি।

ভাবলুম। কিন্তু এও তো পুরনো উত্তরই। ফালতু।

—মা, ট্যাক্সের টাকার কিন্তু সদ্ব্যয় হয় না—অপব্যয়ই বেশি হয়, সরকারি লোকেরা নিজেদের পিছনেই খরচ করে। চুরি অনন্ত।

—হোক অপব্যয়। তুমি-আমি যা খরচ করব সবটাই তো নিজের পেছনে, সবটাই তো অপব্যয়, সেসব সত্ত্বেও যেটুকু উদ্বৃত্ত হবে চক্ষুলজ্জা বাঁচাতেও সরকারি মহল যেটুকুনি দেশের কাজে লাগাবেন, সেটুকুই পুণ্য, এখন আমার পাপপুণ্যের ধারণাটা বদলে গেছে, ছেলেবেলার মত নেই। ধর্ম থেকে সমাজের দিকে চোখটা ঘুরে গেছে। আর নঙর্থ থেকে সদর্থের দিকে।

—কীরকম? কীরকম?

—এসব প্রশ্ন করবেন না দিদি। আরো কথা বলবেন মাসিমা তাহলে। কাল সারারাত ধরে আমাকে বলেছেন পাপ কী আর পুণ্য কাকে বলে। এদিকে এখনও দিনের সিস্টার এল না—কখন যে আসবে?

—না আসুক। দিনমণি তো এসেছেন। তোমার ডিউটি শেষ। তুমি যাও। তুমি আর আমাতে মনোনিবেশ কোরো না তো, বারান্দায় যাও। ওই দ্যাখো রাস্তায় কিসের শব্দ—শোনো।

খুকু, পাপ আর পুণ্য দুটোই আসলে নিতান্তই সমাজ-সম্পৃক্ত, সমাজ-উদ্ভূত ধারণা। আধ্যাত্মিক বা ভগবত-বিষয়ক কোনো ব্যাপারই নয়। অম্বুবাচী-একাদশী-গরুর মাংসটাংসের সঙ্গেও যুক্ত নয়। সমাজের প্রতি ব্যক্তির আচার আচরণ কেমন, তাই দিয়েই নির্ধারিত হবে কোনটা পুণ্য, আর কোনটা পাপ। যাতে সমাজের আর সকলের

BanglaBook.org

মঙ্গল, উন্নতি—সেইটেই পুণ্য, আর উল্টোটা হচ্ছে পাপ। অর্থাৎ যাতে সমাজের সকলের অমঙ্গল, অবনতি ঘটে—সেই কর্মই অপকর্ম, পাপকর্ম। বুঝলে? ব্যক্তিকে সর্বদা এটা মনে রাখতে হবে। পাপ ব্যক্তি করে, ক্ষতি সমাজের হয়।

—হুঁ। পোপও বলেছিলেন এমনি কথা—

—পোপ যাই বলুক, শুনতে চাই না। কোন পোপ? পোপ বলে কেউ নেই, নম্বর কি?

—আলেকজাণ্ডার পোপ, মা। কবি।

—ও। নাম শুনেছি। পোয়েটস কর্নারে সমাধিস্থ কি? নাইন্টিন ফিফটিতে—আচ্ছা খুকু, দ্বাদশ জনকে তোমার মনে আছে? ভেটিকানে?

এখন তো বোধহয় পোপ পলের রাজত্ব চলছে, না? ৬ নং না ৫ নং? পোপ জন দি টুয়েলফথকে তুমি যে ভাটিকানে গিয়ে স্বচক্ষে দেখেছিলে, হোলি ইয়ারে, তোমার মনে আছে কি? অবশ্য খুব ছোটো ছিলে।

—আছে মনে একটু একটু। বড্ড ভিড় ছিল। উনি তো বারান্দায় বেরিয়ে হাত নাড়লেন। লাল-সাদা জামা ছিল গায়ে।

—ভিড়ের কারণ যুদ্ধের পর ঐ প্রথম হোলি ইয়ার। ক্যাথলিকরা সারা পৃথিবী ভেঙে এসে জড়ো হয়েছিল রোম শহরে। তুমি খুকু খুবই সৌভাগ্যবতী। ওটা খুব জরুরি 'দর্শন' ছিল। অনেক মৃত্যুর পর।

—তা আর বলতে? নেক্সট রোমে যাই অলিম্পিক্সের বছর, সোজা ইণ্ডিয়াকে হকি খেলে জিততে দেখে এলাম। এখন তো কেবলই হারে। একমাত্র ওয়ান ডে ক্রিকেটে ছাড়া। সবেতে হার।

—কেবল হালকা কথা। কত বড় বড় মহৎ মানুষকে তুমি চোখে দেখেছো—সেসব লিখে রেখেছো কোথাও? ডাইরি রাখতে এত করে অভ্যেস করালুম ছোটবেলায়। বড় হয়েই ছেড়ে দিলে। দুর্ভাগ্য।

—তুমি তো মা আমার চেয়েও বেশি বেশি করে বিখ্যাত সব মানুষদের দেখেছো। তুমিও তো লিখে রাখোনি। কতকাল আগে ছেড়ে দিয়েছো ডায়েরি লেখার অভ্যাস। কেন ছাড়লে?

—কিছুই থাকে না। আমিও খুব ভাগ্যবতী। সে কথাও ঠিক। দেশ-বিদেশের অনেক গুণীমানী মানুষের সান্নিধ্য পেয়েছি জীবনে। কিন্তু এহ বাহ্য। কিছুই থাকে না। লিখেই বা কী হবে?

—মা, আমাকে তুমি একটাও শিশির ভাদুড়ীর নাটক দেখাওনি। এ দুঃখ কিন্তু আমার কখনো যাবে না।

—কে বলল দেখাইনি। তুমি সীতা দেখেছ। অযথা অভিযোগ করার স্বভাব ভাল না।

—যাঃ সত্যি? সত্যি বলছো মা? আমি সীতা দেখেছি?

BanglaBook.org

—সত্যি। আমাদেরই বরং তুমি দেখতে দাওনি। এত ডিস্টার্ব করেছিলে যে উঠে আসতে বাধ্য হই আমি। তারপর থেকে কোনো থিয়েটারে তোমাকে নিয়ে যাইনি, একেবারে শম্ভু-তৃপ্তির সময়ের আগে। ততদিনে একটু মানুষের মতন হয়েছো। চুপ করে বসে দেখতে। তোমার স্বভাব যে বড়োই অমার্জিত ছিল বাবা। প্রাকৃতজনোচিত। এখনো আছে।

—মা, তুমি গিরিশ ঘোষকে দেখেছো?

—"সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল"—নাঃ, আমার আর গিরিশ ঘোষকে দেখা হয়নি। তবে তাঁর ছেলেকে দেখেছি। দানিবাবুকে। দানিবাবুই কি কিংবদন্তি হিসেবে কম যান? আতুতুতু করে আধো আধো বুলিতে কথা কইতেন। ঠিক তেমনি করেই মঞ্চে অভিনয়ও করতেন—দানিবাবু কেন, আমরা আবার স্বয়ং অমৃতলাল বসুকেও দেখেছি—

—ঈস-স—বসরাজ?

—হায়রে তখন কিছু জ্ঞানই ছিল না। জানতুম না মোটে কী জিনিস দেখছি। কাকে দেখছি। ঠিকমতো মূল্য দিতে পারিনি সেসব অভিজ্ঞতার।

—থাক থাক, অত কথা বলে কাজ নেই। আরেকদিন শুনবো।

—আরেকজনকে দেখেছিলুম।

—বিবেকানন্দকে?

—তাঁকে তে দেখিনি, তবে সিস্টার নিবেদিতাকে আমরা দেখেছি। তাছাড়া আমি হয়ে, সারদা দেবীকেও দেখেছি। শ্রীমা আর কি। তাঁকে দেখার ভাগ্য হয়েছিল।

—সে কি? এতদিন বলোনি কেন? এত বড় একটা কথা চেপে যাচ্ছিলে?

—বলবার কী আছে? কী হবে বলে?

—কোথায় দেখলে? দক্ষিণেশ্বরে?

—না, অন্য জায়গায়। বাগবাজারে। উদ্বোধনে।

—উদ্বোধনে? ওখানে তুমি কেন গিয়েছিলে মা? সারদা দেবীকে দেখতে?

—নিবেদিতা স্কুলে ভর্তি হতে গিয়েছিলুম। চপলা দেবী নামে একজন বালবিধবা মহিলা নিবেদিতা স্কুলে ভর্তি হয়ে শিক্ষিকা হয়ে, বোর্ডিংয়ের সুপারিন্টেনডেন্ট ও শিক্ষয়িত্রী হয়েছিলেন। উনি খুব স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহী ছিলেন। চপলা দেবীর কাছে গিয়েছিলুম। সেখানে গণেন মহারাজের সঙ্গে দেখা হল। তিনি যাচ্ছিলেন উদ্বোধনে শ্রীমার কাছে। আমি তখন ১৫-১৬ বছরের মেয়ে। গণেন মহারাজ যাচ্ছেন শুনেই আমিও যাব বলে নেচে উঠলুম। খুব ঔৎসুক্য উদ্দীপনা ছিল। ওই গণেন মহারাজই শ্রীমার কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সর্বত্র অবাধ গতি ছিল। খুব পরোপকারী মহৎ মানুষ ছিলেন। নন্দলাল বসুর ছবি নিজে সেধে নিয়ে গিয়ে ধনীদের বাড়িতে বিক্রি করে দিতেন। আজকাল তেমন গণেন মহারাজের নাম শুনি না কোথাও। অথচ এককালে—

BanglaBook.org

—মা, সারদামণিকে তোমার কেমন লাগলো?

—আমি তখন ছোটো তো—কীই বা বুঝি, আমার মনে হয়েছিল সারদামণি গ্রাম্য সরল সাধারণ গিন্নি। ঘরকন্না, নিজের ভাই, ভাইপো-ভাইঝিতে তাঁর মন ছিল। তাঁর মধ্যে লোক ঠকানোর, বং চড়ানোর, মিথ্যের বা কৃত্রিমতার কোনো ব্যাপারই ছিল না। তাঁর সরলতা ও সততা ছিল অসামান্য। যজমানই হলো ভাত-ভিত্তি বামুনদের। তিনি সেটাই বুঝতেন, তাই তাঁর মন্ত্রশিষ্যদের প্রতি অগাধ স্নেহ ছিল। অন্যদের দিকে ততটা মন দিতেন না বোধ হয়। অন্তত আমি তো তাই দেখেছিলুম। একেবারেই অকৃত্রিম, সোজা মানুষ। লোক-দেখানো কিছুই করতেন না। সেজন্যে তাঁর প্রতি খুবই শ্রদ্ধা হয়েছিল, পরে। প্রথমে কেমন একটা ধাক্কা লেগেছিল।

—ধাক্কা? কেন মা?

—তখন তো আমরা সদ্যকিশোরী, ব্রাহ্মসমাজ প্রভাবিত, নাগরিক স্মার্টনেসের মোহে বিমোহিত। তখন ওঁকে মনে হয়েছিলো গ্রাম্য। ওঁর অকৃত্রিমতাকে গ্রাম্যতা মনে হয়েছিলো। সেটা ঠিক নয়। এখন বুঝতে পারি।

—সে তো রামকৃষ্ণদেবকেও গ্রাম্য মনে হয় শ্রীমার লেখা থেকে। ওঁরা গ্রামের লোক, গ্রাম্যই তো ছিলেন। তাতে হয়েছেটা কি? এটাই তো স্বাভাবিক। তাই না?

—তোমাদের এখন যেমন গাঁ নিয়ে মাতামাতি—কেননা শহর এখন পুরনো হয়ে গেছে, ফোক সং, ফোক টেল, ফোক ডান্স, ফোক কালচার। আমাদের সময় তো তেমন ছিল না। তখন কলকাতা শহর নিয়েই আসল মাতামাতির যুগ। নাগরিকতা তখনও নতুন। বুদ্ধদেব বসুদের লেখা পড়ে বোঝো না? এখন মহাশ্বেতার কল্যাণে গ্রাম, উপজাতি এরা সবাই মান্যগণ্য হয়েছে। তখন ঠিক তা ছিল না—জানিস।

—কেন? তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ এরা সবাই তো গ্রাম-জীবন নিয়েই লিখেছেন। শরৎচন্দ্রও তো তাই।

—তবুও, গ্রাম্যতাটা আলাদা করে গুণের কিছু ছিল না। জীবনের অঙ্গ ছিল। এখন তোমাদের কীসব ব্যাক টু নেচার না ব্যাক টু ভিলেজ, ব্যাক টু দি রুটস না কীসব শহুরে কায়দা হয়েছে না—তখন তো তা ছিল না। এখন যে জিনিস যতটা গ্রাম্য, ততই তার কদর শহুরের কাছে।

—আচ্ছা মা, সারদামণিকে কেমন দেখতে ছিল? ছবিতে যেমন দেখি, তেমনি সুন্দর?

—ঠিক তেমনি সুন্দর। খুব সুন্দর শ্রীময়ী, লাবণ্যময়ী, গেরস্থ বউ যেমন হলে চোখে ভাল লাগে তেমনি। বেশ স্নেহময়ী মাতৃমূর্তি ছিলেন। হয়তো আনন্দময়ী মার মতন ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন না। আনন্দময়ী মাকে অল্প বয়সে তো দেখিসনি।

—তুমি দেখেছিলে বুঝি?

—তা দেখেছি। কিন্তু সারদামণির মতই তিনিও মাতৃমূর্তি ছিলেন, এমন-কি অল্প বয়সেও।

BanglaBook.org

—মাসিমা, আপনি এখন ওষুধটা খেয়ে নিয়ে এবার একটু বিশ্রাম করুন। এত কথা বলবেন না—

—থাক মা, সত্যি এখন আর কথা বলে কাজ নেই—ওষুধটা খেয়ে চুপচাপ থাকো কিছুক্ষণ।

—কেন? তোদের আরাধ্যা দেবী আগাথা ক্রিস্টির সঙ্গেও তো আমি বেশ দশবারো দিন ছিলুম। হেলসিংকিতে। দাও ওষুধ? কই, দাও। আগাথা চেন স্মোকার।

—হ্যাঁ? সত্যি? আগাথা ক্রিস্টি? তিনি তোমার সঙ্গে কি কথা বললেন?

—বেশি না। উনি কেবলই ফ্রেঞ্চ বলছিলেন কিনা সকলের সঙ্গে। আমি যদি-বা কষ্টে-সৃষ্টে দু ছত্তর ইংরিজি বুঝতে পারি, ফরাসি তো গোমাংস। তাই বেশি কথাবার্তা হয়নি। তাছাড়া...

—তাছাড়া?

—তাছাড়া উনি বেজায় অহঙ্কারী মহিলা ছিলেন, অন্য মেয়েদের খুব একটা পাত্তা দিতেন না। ঐ যে একের পর এক সিগারেট খেয়ে যাচ্ছেন, আমারও দেখতে ভাল লাগতো না। অবশ্য তাঁরও ঠিক এশীয়-টেশিয়দের সঙ্গে কথা বলতে, কালা আদমিদের সঙ্গে মেলামেশাতে বিশেষ উৎসাহ ছিল না। এক ওই, হোচিমিন-এর সঙ্গে, ফ্রেঞ্চে একটু-আধটু কুশল বিনিময় ছাড়া।

—কে? হোচিমিন বললে কি? মা?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ ইন্দোচায়নার, এখন যেটা তো বলিস ভিয়েৎনামের, কবি এবং বিপ্লবী নেতা হোচিমিন রে।

—একটু একটু ঘনাদার মত শোনাচ্ছে কিন্তু মা। কিছু মনে কোরো না। একটু নয়, ভীষণ।

—তাহলে শুনিসনি, কে সেধেছে?

—সত্যি সত্যি হোচিমিন? মা? অ মা?

—এর পরে তোকেই তোর নাতিনাতনী বলবে—অ্যাঁ? সত্যি সত্যি মহাত্মা গান্ধীকে দেখেছিলে? কুইন এলিজাবেথকেও দেখেছিলে? অ্যাঁ—রবি ঠাকুরকেও? সত্যি সত্যি সত্যজিৎ রায়কে চিনতে? তখন তুইও ঘনাদা হয়ে যাবি। সত্য তো মিথ্যার চাইতেও বেশি অবিশ্বাস্য রে।

—অ। বেশ। তাহলে বলো, আগাথা ক্রিস্টি হোচিমিনের সঙ্গে ফ্রেঞ্চে গল্পগুজব করতেন সিগারেট টানতে টানতে, আর তুমি কি করতে সেখানে?

—কিছুই বুঝতুম না, আর খুব বোদ্ধার মতন মুখ করে বসে থাকতুম। তোর বাবার সঙ্গে গল্প করতুম। ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড রাগ হতো। নাঃ, আগাথাকে কিন্তু একদমই ভালো লাগেনি আমার—ভয়ানক উন্নাসিক—

—আমার কিন্তু খুব ভাল লাগে, মা। ভীষণ।

—বড্ড দাম্ভিক। অবশ্যই দাম্ভিক হবার যোগ্যতা সে রাখে। তবুও। হোচিমিন

BanglaBook.org

কিন্তু ঠিক তার বিপরীত। তিনিও তো কিছু কম জরুরি মানুষ নন। নানান দিক থেকে। আজকের যুগে দেখতে গেলে, ঢের বেশি জরুরি, ইতিহাসে।

—মাগো? হোচিমিন তোমার সঙ্গে কথা বলেছেন?

—করো। আমাদের খুব ভাব হয়েছিল। উনি লাজুক স্বভাবের। কিন্তু অমিশুক নন। আর কি চোখ। কি দৃষ্টি। সত্যি, খুকু, এত সুন্দর চোখ—যেন করুণা ঝরে ঝরে পড়ছে। ঠিক মুনিঋষিদের মত দেখতে রে—মানুষের প্রতি মমতা, করুণা যেন উপচে পড়ছে—এমনি চোখের দৃষ্টি ছিল তার—কখনো কখনো কবিগুরুর চোখেও অমন মায়াময় দৃষ্টি দেখেছি আমরা, আর কখনো কখনো গান্ধীজীর চোখেও। কিন্তু হোচিমিনের চোখ সর্বদাই ওইরকম। আর হাসিটা কি বলব—

—কেমন? হাসিটা কেমন? হাসতেন খুব?

—ঠিক একটা শিশুর হাসি যেমন হয়। হঠাৎ হঠাৎ হেসে ফেলতেন। গান্ধীজীর ফোকলা মুখের হাসির মতো। উনি অবশ্য ফোকলা ছিলেন না। রোজই আমরা বিকেলে একসঙ্গে চা খেতুম। উনি চাইতেন এশীয়রা সবাই একসঙ্গে ঘোরেফেরে, একসঙ্গে থাকে-টাকে। এখন যে তোরা থার্ড ওয়ার্লড-টোয়ার্লড বলিস, তখন তো অতশত শব্দের খেলা তৈরি হয়নি। তখন সবে ভিয়েৎনামের যুদ্ধ শুরু হয়েছে। সেই বছরেই দেখা—তখন পৃথিবীটা অন্য রকম চরিত্রের লোকে ভরা ছিল। ইলিয়া এরেনবুর্গ বলেছিলেন—

—তাঁকে আবার কোথায় পেলে?

—তাঁকে তো তুমিও দেখেছো পরে দিল্লিতে? এশিয়ার লেখক-সমাবেশে? মনে নেই?

—ঠিক মনে পড়ছে না।

—তুমিই তাঁকে বলেছিলে তাঁর তিন বন্ধু না কী যেন বই পড়েছো। আমি তো তাঁর কিছুই পড়িনি। আমাদের প্রথম দেখা হেলসিংকিতে। উনিও ছিলেন। পীস কংগ্রেসে।

—মা, আমার কিছু মনে নেই।

—অতি দুর্ভাগা মেয়ে মা তুমি। তোমার কি শলোকভকেও মনে নেই?

—শলোকভ? মানে কোয়ায়েট ফ্লোজ দ্য ডন?

—হ্যাঁ, ধীরে বহে ডন মিনি লিখেছেন।

—আমার তাঁকে কী করে মনে থাকবে মা, আমি কি তোমাদের সঙ্গে রাশিয়া গেছি? আমাকে তোমরা নিয়ে যাওনি—

—অভিযোগ কোরো না, অভিযোগ করতে নেই। কলকাতায় এসেছিলেন শলোকভ। তোমায় কি সেই সভায় নিয়ে যাইনি তা হলে?

—নিশ্চয়ই না। তাহলে আমার ঠিক মনে থাকতোই।

—এরেনবুর্গের কথাটা মনে আছে। তুমি অটোগ্রাফ খাতায় সইও করে নিয়েছিলে এরেনবুর্গের। খুঁজে দেখো, শলোকভই আমাকে চামড়ার ওই বাদামী রঙের বইয়ের

BanglaBook.org

মলাটটা দিয়েছিলেন সোনালি এনগ্রেভিং করা—তুমি যেটা কেবলই নিয়ে নেবার চেষ্টা করতে।

—যেটা শলোকভের দেওয়া উপহার।

—তোমাকে তখনই একাধিকবার বলা হয়েছে সে কথা। আজই যেন প্রথম শুনলে এরকমভাবে কথা বোলো না।

—ভুলে গেছি মা।

—কোন দিন মাকেও ভুলে যাবে।

—ওঃ হো, সত্যি তো? শ্রীমার কথাটা চাপাই পড়ে গেল—মা, সত্যি! কারটা শুনবো, কার কথাটা তুলে রাখবো?

—ভাগ্যিস অসুখ করেছিল, তাই তো কাছে এসে বসলি দু' মিনিট। না বসলে শুনবি কেমন করে?

—কী করবো মা—সময় হয় না যে মোটেই। বলো, মা. শ্রীমার কথাটা বলো।

—ওই তো। আমি তখন খুবই ছোটো। যদিও বাল্যবিধবা পড়াশুনোয় ভীষণ আগ্রহ বলে শ্বশুরবাড়ি বাপের বাড়ি উভয় পক্ষই আমাকে ইস্কুলে পড়াতে রাজি হলেন। নিবেদিতা স্কুল তখন মেয়েদের খুব ভাল ইস্কুল। কিন্তু সেখানে নাকি বিবাহিত মেয়ে নেয় না—থাকগে ওসব কথা।

—মা, বড্ড জ্বালাতন করছো কিন্তু। যেই শুরু উঠছে, অমনি—বলো দিকিনি শিগগিরি কী হলো—

—হবে আর কী? হলো না।

—তোমাকে ওঁরা নিতে রাজি হলেন না?

—তা নয়, রাজি হবেন না কেন?

—তবে?

—মিথ্যে বলবো না. কেউই নিতে অমত করেননি।

—তবে যে বললে হলো না?

—আমিই রাজি হলুম না।

—কেন মা? কেন? এত বড় সুযোগ—

—এখন মনে পড়লে ভীষণ কষ্ট হয় রে। তাই তো মনে করি না। ছেলেমানুষী ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের মাশুল গুনছি সারা জীবন। বিদ্যে হলো না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ পড়লো না। কতো কিছু জানার ছিলো যথাযথ শিক্ষার অভাবে জানা হলো না।

—মাগো, তুমি কেন রাজি হলে না?

—সে কথা থাক না।

—না না. থাকবে না।

—আপনি ওকে আর উত্তেজিত করবেন না দিদি। বাকিটা পরে শুনবেন।

—না না, উত্তেজিত করার কি আছে? এখনই বলছি আমি। এখনই শুনে রাখুক ও। ওর মায়ের নির্বুদ্ধিতার কাহিনী। ব্রাহ্মসমাজ তো স্ত্রীশিক্ষা প্রসারেই সাহায্য

BanglaBook.org

করেছে চিরকাল। কেবল এই একটিই ব্যতিক্রম আমি। আমার ক্ষেত্রে স্ত্রীশিক্ষা আটকে গেল ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে।

—সে কি? কেমন করে? ওরা বাধা দিলেন?

—তা, একটু দিলেন বইকি।

—যাঃ।

—বিশ্বাস হচ্ছে না তো? বাইরের বাধাই কি জীবনে সব? অধিকাংশ বাধাই তো ভিতরের রে। দেখা যায় না। অথচ অনতিক্রম্য।

—তা বটে। কুসংস্কার যেমন। অদৃশ্য হাত-কড়া।

—ঠিক। মার্জিত রুচির বিষয়ে বাড়াবাড়িও এমনই এক সংস্কার। এক আভ্যন্তরীণ বাধা। যা ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব আমার ভিতরে আপনি গড়ে দিয়েছিলো। সেটা সরিয়ে আমি তোমার শ্রীমার কাছাকাছি পৌঁছতে পারিনি। ছোট মেয়ে ছিলুম, বুদ্ধিশুদ্ধি পাকেনি। এক কুসংস্কার ছাড়িয়ে উঠতে গিয়ে অন্য এক কুসংস্কারের আওতায় পড়ে গিয়েছিলুম। সংস্কারমুক্ত হতে পারিনি। রুচির ওই সংস্কার, আমি ওটাকে কুসংস্কারই বলব, তখন আমাকে শ্রীমাকে বুঝতে বাধা দিয়েছিল। আমারই ওখানে ভর্তি হতে ইচ্ছে করল না তখন।

—কেন? কি হয়েছিল?

—কিছুই নয়। আমরা এ-পাশের ঘরে ওয়েটিং রুমে ওয়েট করছি। মা আছেন ও-পাশের ঘরে। কারুর সঙ্গে কথা বলছেন। আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। প্রণাম করলুম। শ্রীমা আশীর্বাদ করলেন। "ওমা একদম কচি মেয়ে তো—আহা রে। এ বয়সে বেওয়া?"

তারপরেই বললেন, "ওরা কি আমার যজমান?"

আমার সঙ্গীরা বললেন—"না। নয়।"

—"তাহলে ওরা এখন পাশের ঘরে অপেক্ষা করুক। আমি আগে আমার যজমানদের সঙ্গে কথা কয়ে নি। তারপরে ওদের সঙ্গে কথা হবে।" বাস ওতেই হয়ে গেল।

—মানে?

—মানে একে তো ওই 'বেওয়া' শব্দ। তারপরেই ওই 'যজমান' শব্দ। গ্রাম্য শব্দ কানে লাগলো। পুজোর পুরুতদেরই তো যজমান থাকে—বাঁধা ঘর। দিব্যাত্মা মহামানবী কেন ওই কথা বলবেন? হঠাৎ এই প্রসঙ্গটা মনে হতেই আর নিবেদিতা ইস্কুলে পড়বার উৎসাহটা রইল না। মার্জিত রুচির ফলস অহঙ্কারে বাধলো। ঐ যে উনি আমাকে যজমান নই বলে একটু অবহেলা করলেন, তাতেও অহঙ্কারে ঘা পড়লো। এখন বুঝতে পারি উনি ঠিকই করেছিলেন। দীক্ষিত শিষ্যদেরই উনি 'যজমান' বলেছেন। আর সত্যিই তো তাদের দাবি আগে। কিন্তু ঐ 'যজমান' আর 'বেওয়া' আমার অন্ধকার ভবিষ্যৎ শীলমোহর করে দিলে। তাই বলছি ব্রাহ্মসমাজী মার্জিত ভাষার প্রতি অযথা শ্রদ্ধা ও দিশি গ্রাম্য ভাষার প্রতি অযথা অশ্রদ্ধাই আমার

BanglaBook.org

পড়াশুনো হতে দেয়নি। ইস্কুলে ভর্তি হবার সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিয়েছি, সেটাই আমার আসল পাপকর্ম হয়েছে। আমার উচিত ছিল না অমন অন্যায় জেদ করা। অহঙ্কারের শাস্তি হয়েছে।

—তোমার গার্জেনরাই বা কী রকম? তাদেরই উচিত ছিল উল্টো জেদ ধরে তোমাকে ভর্তি করে দেওয়া।

—অত মাথা ঘামাতেনই না ছেলেমেয়ের পড়াশুনা নিয়ে তখনকার বাপ-মা। তাঁরা পড়ায় মত দিয়েছিলেন, এই যথেষ্ট। আমিই ভর্তি না হওয়ায় সবাই যেন বেঁচে গেলেন। খুশিই হলেন আমার ওপর। বোর্ডিংয়ে অবশ্য থাকতে দিতেও রাজি ছিলেন না কেউ।

—আশ্চর্য।

—কিছুই আশ্চর্য নয়। যে প্রথাটা যেমনভাবে চলে।

—'যজমান' আর 'বেওয়া' মাত্র এই দুটো শব্দ অ্যালার্জি হয়ে তুমি জীবনের মতো ইস্কুলে ভর্তি হলেই না? এটা ভীষণ খারাপ কথা।

—জানি। তোর মেয়েদের এ গল্পটা কোনোদিন যেন বলিসনি। যা জেদী একেকজন। বড়টি তো একটি মেয়ে-পুলিশ—জাঁদরেল মেয়ে বটে। ওদের এই গল্প কখনো করবে না।

—অতি অবশ্যই করবো। ঐরকম জেদ ধরে বড়দের কথা না শুনলে কী হয় তারা জেনে রাখুক। তাদেরও ধারণা ঠিক তোমারই মতো, যে তাদের মা-টি নির্বোধ। কিছু বোঝে না। তারা কিন্তু মহা চালাক, সর্বজ্ঞানী। ওই করে জেদ ধরেই ফোর্থ সাবজেক্ট পরীক্ষা দিলে না। কতো ক্ষতি হলো, দেখেও এখন আবার জেদ ধরেছে —দ্যাখো।

—ফের কমপ্লেন? কমপ্লেন কোরো না খুকু। বড্ড বদ অভ্যেস। কিছু লোকের কেবল ঘ্যানঘ্যান করা স্বভাব হয়ে যায়। স্বামী আদর করছে না, শাশুড়ি অত্যাচার করছে, ছেলেমেয়েরা কর্তব্য করছে না বা এই এই কুকর্ম করছে—ওফ, খুব বোরিং। তুমি বাছা ওরকম হয়ো না। বি ভেরি কেয়ারফুল, স্বভাবটাকে সচেতন প্রয়াসে নির্মাণ করতে হয়। অমন ম্যায়সা-কে-ত্যায়সা চালালে হয় না। বলো দিকিনি, ম্যায়সা-কে-ত্যায়সা কার বই? কি বই? নভেল, নাটক, প্রবন্ধ না গল্পের?

—এই শুরু হলো তো পরীক্ষা করা? তবে তুমিও শোনো মা, কিছু কিছু লোকের বড্ড বদ অভ্যাস থাকে। কেবল প্রশ্ন করা আর উত্তর ধরা। মাস্টারির স্বভাব একদম ভাল নয়। ওফ—খুব বোরিং এবং ভয়াবহ। অমন করলে কিন্তু তোমার কাছে কেউই আসবে না মা। আমিও না। আমি এখন চললুম। ঐ তোমার দিনের সেবিকা এসেছে—ওই থাকুক—গুড বাই—

—পারলি না তো? হেরে গেলি তো? ল্যাজ তুলে পলায়ন?

—হারজিৎ আবার কি? একবার বললে জগতে সবচেয়ে সুখী কে বল দিকিনি। একবার বলছো, "ম্যায়সা-কে-ত্যায়সা" কার লেখা বই, কী বই। এটা না হয় আমি

BanglaBook.org

জানি, এর পরেরটা তো নাও জানতে পারি? আগেই পালাই।

—জানিস? কী বই? কার বই?

—আমাদের টেক্সট। সুবীর পড়ায়। তাই জানি।

—তুই পড়েছিস?

—এবার কি টেক্সচুয়াল কোয়েশ্চেনস করবে?

—আচ্ছা থাক। যা. কোথায় যাচ্ছিলি, যা। তোদের যুগটাই ফাঁকির আর ফোকরের যুগ। ফোকরের আর ফোকটের।

—যাচ্ছি চাকরি করতে। জ্ঞান দিতে।

—শ্রম বিনা জ্ঞান হয় না। আমাদের যুগটা পরিশ্রমের যুগ ছিল। সলিড জ্ঞান ছিল লোকেদের। তোদের সব ফাঁপা। ফাঁকা। মাঃ পালা। ভাগ। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য—

—মা. তুমি সেরে উঠেই একটা আত্মকথা লিখে ফেলবে? প্লিজ? পুলিনকাকু কত করে বলে গেছেন—

—বিনোদিনী দাসীর মতো?

—তা কেন? রাসসুন্দরী দেবীর মতো।

—দেখলি তো? তোরা উইমেন্স লিবারেশন করিস অথচ ভাবনার বেলায় সেই পুরুষের মতো মেয়েদের সঙ্গে মেয়েদেরই তুলনা করিস। কই বলতে পারলি না তো 'জীবনস্মৃতি'র মতো? কি গান্ধীজীর অটোবায়োগ্রাফির মতো? আর বিনোদিনীর মতো বলতেই অমনি বললি 'তা কেন'? কেন নয়? বিনোদিনীর জীবনই তো বেশি মূল্যবান. শিল্পী-জীবন।

—যা ব্বাবা। তার চেয়ে রথী ঠাকুরের মতো আমিই বরং একটা 'মাতৃস্মৃতি' লিখতে শুরু করি।

—কেন? আমি কি রবীন্দ্রনাথ? খবর্দার ওসব কীর্তি করবি না। লোক হাসাবি না। তোর বাবা অল্প বয়সে খুব সুন্দর ছবি আঁকতেন। কিন্তু আমি ওঁর কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, যে উনি বৃদ্ধবয়সে ছবি আঁকায় ফিরে যাননি। অনেক লেখককেই তো দেখলুম কিনা? বুড়ো বয়েসে একটা রবীন্দ্রনাথ-কমপ্লেক্স দাঁড়িয়ে যায়।

—বাবা আমাকে ছোটবেলাতে ছবি এঁকে চিঠি দিতেন—তোমার কাছেই তোলা ছিল তো মা? সেগুলো কোথায়? কী সুন্দর চাইনিজ ইংকে আঁকা।

—আছে কোথাও। স্মৃতিতে থাকাই আসল। মেটিরিয়াল বস্তুগুলো দিয়ে কী হবে। মেটিরিয়াল বস্তুরা অনেক জায়গা নিয়ে নেয়. জায়গা ফুরিয়েও যায়। বস্তু ধ্বংস হয়ে যায়। স্মৃতি অনশ্বর। কিন্তু স্মৃতির ভাণ্ডার অনন্ত। ওটাই ভবে রাখ. সেই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে।

—আমাদের বাড়ির সব ফার্স্ট এডিশনের বইগুলো তো ক্রমশ স্মৃতির ভাণ্ডারেরই ধনেই পরিণত হয়ে যাচ্ছে মা।

—যাকগে. কী হবে ফার্স্ট এডিশন জমিয়ে। তখন পাগলের মত এসব জিনিসের মূল্য দিয়েছি। এখন, চলে যাবার সময়ে আর দিই না।

—তবে কাকে মূল্য দেবে?

BanglaBook.org

—কেন? যা দেখলি, যা পড়ালি তাই দিয়ে জীবনটাকে, প্রতিদিনের বাঁচাকে কতটা সমৃদ্ধ করতে পারলি। সেটাই সবচেয়ে দামী, সেটাই আসল। তোর জানা দিয়ে তোর দেখা দিয়ে জগতের আর সব মানুষের কতটা উন্নতি, কতটা উপকার করতে পারলি, সেটাই প্রধান. বুঝলি? সব জন্তু-জানোয়ারই নিজের জন্যে আর নিজের অপরিণত শাবকদের জন্যে খাদ্য আহরণ করে বেঁচে থাকে। এতে বাহাদুরীর কিছু নেই। জন্তুরা তার জন্যে কারোর বাহবা চায় না। ছেলেমেয়ের কাছে কৃতজ্ঞতা আশা করে না। কিন্তু মানুষ চায়। সেই তো মজা। আচ্ছা, বল তো—

—আমি চললুম।

—না না, দাঁড়া। আজকাল এই তোদের ফ্ল্যাটে বাস করা স্বামী-স্ত্রী-সন্তানের মনুষ্য পরিবারের সঙ্গে গুহায় বাস করা সিংহ-সিংহিনী-শাবকের পরিবারের কিংবা গাছের ডালে বাস করা কাক-কাকিনী-শাবকদের তফাৎটা কি? কী তফাৎ? বলো আমাকে।

—পারব না। চললুম। ভীষণ দেরী হয়ে যাচ্ছে আমার, যাচ্ছি এবার মা।

—কোথায়? শাবকদের জন্য খাদ্য আহরণ করতে?

—যদি বলো, তাই।

—যাও বাছা, কীটপতঙ্গ ধরে আনো। জৈব ধর্মের সেবা করো। তোমাদের এই অর্থ উপার্জন তো আহার-নিদ্রা-মৈথুনের সঙ্গেই একাত্মক। প্রাণধারণের জন্য অবশ্যকরণীয়। এতে মনুষ্যত্বের ছায়া নেই। পশুরাও কমটি করে থাকে।

—তাহলে মানুষের করণীয় কি? অর্থ উপার্জন না করা?

—ফের বোকার মতো কথা। জীবনধারণের জন্যে করণীয় যা তার ওধারেও কিছু করা চাই তো? মানুষ-জন্ম যখন পেয়েছো? কেবল জৈবকর্মে কালহরণ না করে সৃজনমূলক কিছুতে মন দাও।

—তাতে পেট চলবে না মা।

—কেবল পেটের চিন্তা না করে একটু অন্তরলোকের দিকে মন দাও এবারে।

—মাসিমা, আপনার অক্সিজেনের নলটা খসে পড়ছে—একটু কাত হন এদিকটাতে।

—আঃ, কেবল শরীরের কথা। শোনো খুকু মা, একটু অধ্যাত্মচিন্তার চেষ্টা করো।

—বিকেলবেলা ফিরে এসে করবো মা। এখন একদম সময় নেই, স্নান করা হবে না।

—ওঃ, বহিরঙ্গের স্নানে আর কতটুকু পরিষ্কার হবে মা? অন্তরলোক প্রক্ষালন করতে হবে। তোমরা যে যুগে জন্মেছো, কল্মষপদ বাজার মতন কেবল পাদুটোই নয়, সর্বাঙ্গই তোমাদের পোড়া কালো—ও তো স্নানে সাফ হবার নয়—কই স্প্রেটা কোথায়? ও বাবা, মেয়ে-পুলিশ যে?

—দিম্মা, এই যে কমপ্ল্যান—দিম্মা। আর একটাও কথা নয়, চটপট খেয়ে ফ্যালো। তারপর একদম চুপ। এবারে আমি এসে গেছি কিন্তু—ব্যস! এ তোমার মেয়ে পাওনি! হ্যাঁ।

BanglaBook.org

এলিজাবেথান সিস্টেম

সিগারেটটা ধরাতে ধরাতে ছোড়দা বললেন—এলিজাবেথকে মনে আছে? ওর একটা বাচ্চা হয়েছে সম্প্রতি। বাস্কেটে শুইয়ে সঙ্গে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মহা খুশি।

—তা-ই? বাঃ। কবে বিয়ে হলো? শুনিনি তো?

—বিয়েই হলো না তো শুনবি কি?

—বয়ফ্রেণ্ড আছে তো? আজ না হোক কাল বিয়ে হবে।

—বয়ফ্রেণ্ড ছিলই না তার কখনও।

—তবে? আর্টিফিশ্যাল ইনসেমিনেশন।

—ধুৎ, সে তো গরুর হয়।

—এখন মানুষেরও হয়—টেকনিক্যাল টার্মটা হয়তো আলাদা। ব্যাপারটা এই—স্পার্ম ব্যাঙ্ক থেকে ব্যবস্থা করে নেয় মেয়েরা। এলিজাবেথও করেছে। বিয়ে-থা'র ঝামেলায় যায়নি।

—বাঃ, কি দারুণ খবর! বাচ্চা-কাচ্চার শখ মেটাতে আর জীবনভোর একটা স্বামী পোষবার ঝক্কি পোয়াতে হবে না। এদেশে যে কবে এমনটি চালু হবে? আমি আহ্লাদে ফেটে পড়ি।

—চালু করে দিলেই হলো। স্পার্ম ব্যাঙ্ক ছাড়া কি বাচ্চা হয় না? ছোড়দা তাঁর পত্নীর দিকে একপলক তাকিয়ে নেন।

—সে অনেক ঝামেলা। কে শুরু করবে ওসব?

—কিস্যু ঝামেলা নয়—ছোড়দার উৎসাহ দেখি প্রচুর।—আমাদের ছেলেমেয়েরা চালু করে দিলেই চলে যাবে। তোমারও পাত্র খোঁজার ঝামেলা নেই, 'পণ দেব কি দেব না'-র নৈতিক চাপ নেই, ওদিকে আমারও পাত্রী দেখে বেড়ানো নেই, 'পণ নেব না যৌতুক নেব'-র সমস্যা নেই, সবচেয়ে বড় কথা বধূহত্যার বন্দোবস্ত করার মত ঝামেলাটাও থাকবে না—বধূই নেই, তো বধূহত্যা। হৈ-হৈ করে হেসে ওঠেন ছোড়দা। যেন বধূহত্যাটা খুব একটা মজার ব্যাপার। বউদি কিন্তু হাসেন না।

আমি বলি—আমার অবশ্য ওসব প্রবলেম নেই। আমি পাত্রও খুঁজতে বেরুবো না, পণও দেব না। পাগল হয়েছো? একটা শাড়ি কিনে দিলে যাদের পছন্দ হয়নি বলে পরে না তাদের বর এনে দেব?

BanglaBook.org

—তা বটে, সুখের মুহূর্তে তোমার এই বৌদিদি কখনও বলে না, হ্যাঁ। বাবা দিয়েছিলেন বটে, একটা বিয়ে। কিন্তু কিছু গড়বড় হলেই শুনতে পাই শ্বশুরমশাইকে গালি দিচ্ছে, হ্যাঁ। বাবা দেখেছিলেন বটে একটা পাত্র।

ছোড়দার কথায় বউদি ভ্রূভঙ্গি করেন। কিছু বলেন না। হাতের বোনা তেমনি চলতে থাকে। ছোড়দা যত বাকপটু, বউদি তত মিতভাষিণী।

—এই এলিজাবেথান সিস্টেমটা সত্যি ভালো কিন্তু। আমি না বলেই পারি না—ঘরের মেয়ে দিব্যি ঘরেই রইলো। ওদিকে নাতি-নাতনির সুখও হলো। বিয়ে-থা দেবার পরিশ্রম নেই, সামাজিকতার ধাক্কা নেই, শ্বশুরবাড়িকে তোয়াজ করা নেই, একেবারে আত্মার আরাম, প্রাণের শান্তি। দারুণ ব্যবস্থা?

—মেয়েদের কেবল যত্ন করে স্বনির্ভর করে দেওয়া। ব্যস। ছোড়দা সোৎসাহে যোগ দেন—যাতে খেটে খেতে পারে, নিজের সন্তান নিজেই পালন করতে পারে। তোমার সেখানেই দায়িত্ব শেষ। এরপর মেয়েরা মন দিয়ে কেরিয়ার গড়বে, আর ঠিক সময় বুঝলেই টুকটুকে ফুটফুটে নাতি-নাতনি এনে মা-বাবাকে প্রোজেক্ট করবে। এক্সেলেন্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট।

—সত্যি। কি আরাম না ছোড়দা? মেয়েরা ঘরেই থাকবে, বুড়ো হয়ে বাপ-মা'র দেখভাল মেয়েদের মত আর কে করবে? ছেলের বউ নেই বলে অভাব বোধ হবে না। আর যাদের ছেলের বউ আছে তাদেরও আর সেই বউয়ের মুখ চেয়ে থাকতে হবে না। মেয়েই দেখবে। বুড়ো বয়সের উদ্বেগটা অনেকখানি কমে যাবে।

মুখভর্তি ধোঁয়া ছেড়ে ছোড়দা বলেন—যা বলেছিস। মেয়েদের সময়ও বাঁচবে অনেকটা। স্বামীর খিদমৎ খাটতেও হবে না, দেশের এনার্জি সেভিং হবে। সমাজের অন্য জরুরী কাজে লাগবে সেটা।

—সবদিক থেকে সুবিধে ছোড়দা। বেচারা মেয়েগুলোকে আর অচেনা পরিবারের সঙ্গে কষ্টেসৃষ্টে মানিয়ে নিতে হবে না, দেশে বউ পোড়ানো বন্ধ হয়ে যাবে। আমিও জবড় করে উঠি।

—পণ-দৌরাত্ম্যও মিটে যাবে, ভাব কত ভালো, ডিভোর্সও হবে না, খোরপোশের মামলা হবে না, শাশুড়ি-বউ ঝামেলা হবে না, চিরকাল ছেলেগুলো মায়ের আঁচল ধরে বসে থাকবে আর মায়েরা মনের সুখে শান্তিতে সংসার করবে।

—'নয়া প্রজন্ম'ও আটকে থাকবে না, সময় হলেই মেয়ে নাতি-নাতনি এনে কোলে তুলে দেবে। আঃ। কি আরাম। কতো রিল্যাক্সড হয়ে যাবে পৃথিবীর চেহারা। আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি।

—ছেলেদেরও খুব মজা—আর বউয়ের মন রেখে ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতে হবে না—মজাসে মুক্তপক্ষ জীবন, স্বাধীন।। বলেই ছোড়দা বৌদির দিকে আড়চোখে চেয়ে নেন। বৌদি এতক্ষণ মন দিয়ে বুনেই যাচ্ছিলেন। এবার বোনা নামিয়ে গলাটি তুললেন—বিয়ে-থা উঠিয়ে দিলে বুঝি ছেলেদেরও খুব আরাম? তুমি তো আচ্ছা

লোক? মেয়েদের মা-বাবার কোলে নাতি-নাতনি আসবে, নবনীতার মেয়েরা ঘরে থাকবে, ওকে দেখাশুনো করবে—খুব ভালো কথা। নিজের কথাটা কি ভেবে দেখেছো? তোমার মেয়ে নেই। দুটো ছেলে। আমার-তোমার কি হবে? ছেলেদের তো খুব ফ্রীডম, খুব আরাম, দায়িত্বহীন 'মুক্তপক্ষ জীবন'—কিন্তু তাদের বাবা-মা? তাদেরও কি আরাম হবে এতে? ঘরে বউ না এলে?

—হবে না? ওই তো বললুম, সারা জীবন তোমার আঁচলের তলায় 'মা-মা' বলে বসেই থাকবে। বউ-টউয়ের ঝঞ্ঝাট হবে না সংসারে।—বৌদি বলে ওঠেন —বাঃ। নাতি-নাতনি? কেবল নবনীতাই নাতি-নাতনি নিয়ে মজা করবে? মেয়ের মা বলে? কেন, আমারও বুঝি ইচ্ছে করে না নাতিকে আদর করতে? বৌদি একটু আহ্লাদে কণ্ঠে বলে। আরও বেশি আহ্লাদে গলায় ছোড়দা বলে ওঠেন—কবে বুঝি? স্বামীকে আদর করে সেটা মেকাপ হয় না? মাঝে মাঝে নাতি ভেবে নিলেই পারো। দুদিন বাদে Second childhood তো হবেই।

—আসলে তুমিই চিরকাল ছোকরা সেজে থাকতে চাও। শশীকাপুর আর সিপ্পির মতন। স্বর কঠিন।

—আরে? হঠাৎ বেচারী শশীকাপুর আর সিপ্পি এর মধ্যে আসে কেমন করে? বলতে যদি দেবানন্দ, তবেও বুঝতাম। ছোড়দা হাঁ-হাঁ করে ওঠেন, বড্ড ইরেলেভেন্ট কথা—

—কেন? কাগজে পড়োনি? নাতি হয়েছে বলে আনন্দে শশীকাপুর সারারাত্তির মদের দোকানে গিয়ে মৌজসে খানাপিনা নাচা-গানা চালিয়েছে, সকালবেলা একেবারে মাতাল। সিপ্পিরও নাতি হয়েছে, তাই সিপ্পিও ঠিক ওই কাণ্ডই করেছে—সারারাত হুল্লোড়, সকালবেলায় মাতাল। ছাই! ওসব আমি ঠিক বুঝেছি। তালে ঠিকই আছে দুজনে।

—মানে? মাতাল হয়নি আসলে?

—মাতাল হবে না কেন? মাতাল হওয়াটা কী এমন কঠিন কর্ম? কেন মাতাল হলো, সেইটে হচ্ছে কথা। নাতি হবার আহ্লাদে, না ছাই। 'শোকে উন্মত্ত' বলে না? ঠিক তাই—'দাদু' হবার দুঃখে।

—দুঃখে?

—না তো কি? ওসবে বোম্বাই-কলকাতায় তফাৎ নেই। নাতি মানেই তো তিন জেনারেশন বয়েস বাড়া। তাই না? তাতে শোক হবে না? কোন পুরুষমানুষটা বুড়ো হতে চায়? সারারাত হুল্লোড় করে জগৎকে দেখিয়ে দিচ্ছে, যৌবন এখনও যায়নি। এখনও হুজ্জতি করতে পারি, ছোঁড়াদের মতই।

—আরেব্বা? সবলা অবলা বলেই তোমাকে জানতুম, পেটে পেটে এত? এতকাল ঘর করছি, টের পাইনি মোটে? দ্যাখ, তোর বৌদিকে দ্যাখ একবার। চিনতেই পারছি না!

BanglaBook.org

—পাববে কেন? সে চেষ্টা কি করেছো কখনও?

—করিনি মানে? সেই চেষ্টাতেই তো সাবাজীবন নিযুক্ত আছি—রহস্যময়ীব রহস্য উদ্ধার করাব কাজে প্রাণমন সমর্পণ কবেছি বত্রিশ বছব—ভোব থেকে বাত পর্যন্ত—

—নাকি? তাই বোজ ভোবে উঠে লেকে চক্কব লাগাও? যাতে আমাকে চিনতে সুবিধে হয়? না যাতে নিজেব ভুঁড়িব সাইজ কমে? চুলে যে কলপটি লাগাও, সেও নিশ্চয আমাকে চিনতে? হুঁ, বুঝি না ভেবেছ? খালি এক চিন্তা—বযেস যেন বেড়ে না যায়। তাই তুমি চাও না তোমাব ছেলেরা বিয়ে করুক। তোমাব ইচ্ছে ওবা চিবকাল 'ছেলে' হযেই থাকুক, 'বাবা' আব হতে হবে না। তাহলে তোমাকেও ঠাকুদ্দা হবার গেবন্তাবী পোজিশনটা আব নিতেই হবে না।

—ওবে বাবা। এত কুটিলতাও ছিল তোমাব মধ্যে?—ছোড়দা শিহবিত হন।

—থাকবে না কেন? তোমাদের মত কুটিলদেব সঙ্গে ঘব কবতে হয় না? আমি সত্যি কথাটা বলছি, আমিই কুটিল, না, তুমি শাক দিযে মাছ ঢাকোচ্ছ, তুমি কুটিল? দেশ থেকে বিযেব পর্বপাটই তুলে দিতে চাইছো, যাতে নিজেকে বেশিদিন ছোকবা বাখা যায়। ওই জগিং, ডাযেটিং, কলপেব সঙ্গে এইটেও এক-গোত্রব। ছোটো-ছোটো 'বাবা' হযে থাকব ভাই চিবকাল। 'ঠাকুদ্দা' হব না। নাতি-নাতনি হলে অসুবিধে।

—কেন, ঠাকুদ্দা হলেই বা ক্ষতি কি? আজকালকাব ঠাকুদ্দা সব ইযাং হয, বুঝেছো, আগেব মতন বুড়ো হয না।

—যতই ছেলেমানুষ হোক, বয়েস তো কারুব গায়ে লেখা থাকে না—নাতি-নাতনিব গাযেই ওটা লেখা থাকে, বুঝলে? এই তো দ্যাখো না সিদ্ধার্থশঙ্কব বাযকে। নাতি-নাতনির বালাই নেই, টুকটুকে লাল টি-শার্ট পবে, লাল জুতুযা পাযে খোকাটি হযে ঘুবে বেড়াচ্ছেন। আব জ্যোতিবাবুকে দ্যাখো? নাতনিপরিবৃত হযে, শাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে, গুরুগম্ভীব মূর্তি কবে ঘুরছেন। করবেনটা কি? ঠাকুদ্দার একটা ডিগনিটি আছে না? শশীকাপুববা তো সেটাবই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কবল। তোমাব বিদ্রোহ আবো গোলমেলে, ইনডিভিজুযালেব নয। সাবা সমাজেব চেহাবায হাত পড়বে। ছেলেব বিয়ে বন্ধ।

—বা বে বাঃ। এমন লেকচাব দিতে পাবো তুমি? 'সমাজেব চেহাবা'? গ্র্যাণ্ড, শোনো ওসব বযেস-টযেস নিযে পুরুষমানুষ মাথা ঘামায না, ওসব মেযেদেব এবিযা। তাছাড়া মেযেব বিয়ে বন্ধতে তোমাব আপত্তি হলো না, ছেলেব বিযে বন্ধব বেলাতে ক্ষেপে উঠেছ। এটা বোঝা খুবই কঠিন।

—একটুও কঠিন না। বিযে না হলেও মেযেবা ইচ্ছেমতন 'মা' হতে পাবে। বিযে না করলে কোন ছেলেব কি 'বাবা' হবাব উপায আছে? বিযে বন্ধ কবলে ছেলেবা আজন্ম 'ছেলে'ই থেকে যাবে, 'বাপ' আব হবে না। তোমবাও 'ঠাকুদ্দা' হওয়া থেকে বেঁচে যাবে।

—তার মানে? বিযে না কবে মেযেবা যদি 'মা' হতে পারে, তাহলে বিযে

না করে ছেলেরাই বা কেন 'বাবা' হতে পারবে না শুনি? যতসব যুক্তিহীন মেয়েলি এঁড়েতর্কো কেবল। একই কয়েনের দু'পিঠ তো? ছোড়দা রেগে উঠেছেন দেখেও বৌদি চটেন না।

—মেয়েলি বলো আর এঁড়েতর্কোই বলো, সবই অনর্থক। এঁড়েগরুরা কি মেয়ে? এঁড়েতর্কো মেয়েরা করে না, তোমার মত এঁড়েগরুতেই করে। বুদ্ধিশুদ্ধি খাটাবে না, কথার পিঠে কথা দিয়ে তাস খেলবে কেবল। বলি, ভেবে দেখেছো কি, কয়েনের একটা 'হেড', একটা 'টেল'? মেয়েরা হেড, তোমরা টেল।—ছোড়দাকে এবার রীতিমতো বিভ্রান্ত দেখায়।

—তুমি কি নিও-ফেমিনিস্ট নাকি? মেয়েরা হেড, ছেলেরা টেল বলছো? হেঁয়ালি ছেড়ে সোজাসুজি বলো দেখি কী বলছো?—আমি চুপ করে গেছি। এখন দাম্পত্যকলহ চলছে—আমার নাক গলানো ঠিক নয়। তবে খুব মন দিয়ে শুনছি। এবং বৌদিকে যদ্দিন চিনি, তার চেয়ে বিশ বছর বেশি চেনা ছোড়দার সঙ্গে। তবু বৌদির কথাবার্তাই অনেক বেশি অর্থপূর্ণ মনে হচ্ছে—যদিও এই হেড-টেলটা ঠিক বুঝিনি আমিও। ফেমিনিস্ট, নিও-ফেমিনিস্ট—এসব শব্দ উচ্চারিত হচ্ছে শুনেও আমি চুপ করে থাকি। বৌদি একাই লড়তে পারবেন, বুঝে গেছি। ছোড়দা আবার চেঁচান:

—বিয়ে না করে মেয়েরা মা হতে পারলে বিয়ে না করে ছেলেরাও বাবা হতে পারবে। একশোবার পারবে। জীবজগতে বিয়ে হয়? বাঘ বাবা হয় না? কাগ বাবা হয় না?

—বাঘের কথা আর কাগের কথা এক নয়। তাছাড়া তারা ঠাকুদ্দাও হয় না। তুমি তো এলিজাবেথের কথা, আর আমাদের ছেলেমেয়েদের কথা বলছিলে। বাঘ আর কাগ এতে কোত্থেকে এল? এঁড়েতর্কো কে করে? আসল কথায় এসো।

—আসল কথা? বেশ। আসল কথা এই যে, মেয়েরাও যেমন ছেলেরাও তেমনিই। বিয়ে না করে মা, আর বাবা হতে পারে। ইকোয়াল অপারচুনিটি আছে।

—আজ্ঞে না, সেটি হবার নয়, বিয়ে না করেও মেয়েরা মা হতে পারে, কিন্তু ছেলেরা বাবা হতে পারে না। ঘরে একটা জলজ্যান্ত বাবা বসে না থাকলেও মেয়েরা দিব্যি নিজে নিজে 'মা' হতে পারে। কিন্তু ঘরে একটা জলজ্যান্ত মা হাজির না থাকলে কোন ছেলে কি আপসে 'বাপ' বনে যেতে পারে? পারে কি? তুমিই বলো। বলতে নেই, বাপ মরে যাবার ন'মাস বাদেও মা হতে পারে কেউ। মা মরে যাবার ন'দিন পরেও কি কেউ বাবা হতে পারবে?—অকাট্য যুক্তি দিয়ে বৌদি চুপ করে যান। আমিও। ছোড়দা ধোঁয়া ছেড়ে অন্যদিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক নির্বাক থাকেন। বৌদিই কথার খেই ধরেন আবার—

—ওই তো, নবনীতার মেয়েরা। ওরা তো ইচ্ছে করলেই এলিজাবেথের মতোন, ভগবান না করুন, আপনা-আপনি মা হয়ে বসতে পারবে। সমাজে পাঁচটা সাক্ষী প্রমাণ থাকবে, যারা বলবে যে হ্যাঁ, এর পেটেই বেড়েছে, এর পেট থেকেই ভূমিষ্ঠ

BanglaBook.org

হয়েছে এই বাচ্চাটা। আমরা দেখেছি। কিন্তু তোমার ছেলেরা? টুলু কি বুলু যদি আজ বাবা হয়, তার সাক্ষী প্রমাণ কোথায়? বাচ্চাটা প্রকৃতপক্ষে টুলুরই, সেটার সাক্ষী দেবে কে? তার বউটি ছাড়া?

ছোড়দা নিস্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন বৌদির দিকে। বৌদি আবার বলেন—

—বুঝেছো এবার, বুদ্ধুরাম? বাচ্চার বাবার সমাজে একটাই মাত্তর সাক্ষী, একটাই, তার বউ। মায়ের একটা মুখের কথার ওপরে বাবার বাবাত্ব টলমল করছে। আর তো কেউ জানে না প্রকৃত বাবাটি কে?

অবাক হয়ে পত্নীকে মুগ্ধনয়নে অবলোকন করতে থাকেন ছোড়দা—বুঝতে পারেন, ভাষণ এখনও সমাপ্ত হয়নি। তাঁর চোখে প্রশ্ন ফুটে থাকে। মুখে কথা ফোটে না। এতক্ষণে আমি বলেই ফেলি কথাটা—

—সত্যিই তো? এই যদি কেউ এখন তোমাকে বলে, যে টুলু-বুলুর বাবা তুমি নও, অন্য কেউ, তাদের কাছে তুমি কেমনভাবে প্রমাণ করবে ছোড়দা, যে তুমিই ওদের জন্মদাতা? অনেক ডাক্তার-বদ্যি ল্যাবরেটরি-পরীক্ষা, আইন-আদালত করতে হবে। কিন্তু আমিই যে পিকো-টুলোর মা, সেটা কেউ অপ্রমাণ করতে পারবেই না—ছোড়দার আর সহ্য হয় না, বাধা দিয়ে বলেন, তা খুব জানি—তোমার বউদিকে জিজ্ঞেস করলেই সবাই জানতে পারবে—

—এগজ্যাক্টলি সেইটাই আমিও বলছি। বৌদি হৈ-হৈ করে হেসে ওঠেন, আমি যদি সাক্ষী না দিই, তোমার কিন্তু কোনই প্রমাণ নেই যে ওরা তোমার সন্তান। জগতে কোন বাপেরই থাকে না। বংশরক্ষা তো ছেলেরা করে না, করে বউই। বউ না হলে চলে? বউ না এলে বংশরক্ষা হবে কি করে? কে যে কার বংশধর, সেটা বউ ছাড়া আর কে-ই বা বলে দেবে?

বৌদি আবার বোনাটা তুলে নেন। আমি আর ছোড়দা চোখ চাওয়া-চাওয়ি করি। কিন্তু আলোচ্য বিষয়টি আর উত্থাপন করি না। আমার মহাভারতের কথা মনে পড়ে যায়। কুরু-পাণ্ডবের বংশরক্ষা তো এই এলিজাবেথান সিস্টেমেই হয়েছিল বলতে গেলে। এখনই ওটা এ-সমাজে চলবে না বোধহয়। হয় অনেকটা এগোতে হবে, নয় অনেকটা পিছোতে।

—ছোড়দা, ওসব এলিজাবেথান সিস্টেম এদেশে এখন চলবে না, ভাই। বৌদি খুব একটা ভুল বলেননি। তুমি বরং ছেলের বিয়ের জন্য রেডি হও, টুলুকে প্রায়ই একটা রোগা মতন মিষ্টি মেয়ের সঙ্গে রাস্তাঘাটে দেখি আজকাল!

BanglaBook.org

পরভৃৎ

—না বাপু, তোমার মাথার যন্ত্রণা সারাতে আমি এক্ষুনি বাবা হতে পারবো না। আগে রজনী আর রমেন পাশ করে বেরুক। ততদিনে স্কেলটাও বেড়ে যাবে। ছেলেপুলে হয়নি বলে মাথার যন্ত্রণা হয়, একথা বাপের জন্মে শুনিনি। চটে-মটে সৌমেন বেরিয়ে এসেছিল ডাক্তারখানা থেকে। অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে সরমা। নানা রকম চিকিৎসা হয়েছে, ব্রজেন ডাক্তারের ধারণা ছেলেপুলে না হলে ও-মাথাব্যথা যাবে না।

মেঘে মেঘে বেলা হয়েছে সরমার। বিয়ে হয়েছে কি আজ? সেই বাইশ বছর বয়েসে এম. এ. পাশ করেই। সেই থেকেই চলেছে ইস্কুলে চাকরি। দুজনের রোজগার না হলে সংসার চলবে না। শাশুড়ি নেই, শ্বশুরের পেনশন পঞ্চাশ টাকা। দুই কচি দেওর, দুই ননদ ইস্কুল-কলেজে। দিনরাত পরিশ্রম করে সংসার টেনেছে সরমা আর সৌমেন। বাচ্চা-কাচ্চা হবার কথাই ছিল না। ছোট দেওর রমেন তখন মাত্র সাত বছরেরটি।

সারাদিন বাচ্চা ঠেঙিয়ে বাড়ি এসে একদম ভাল লাগার কথা নয় আবারও বাচ্চাকাচ্চার কথা ভাবতে। কিন্তু সরমার কী যে স্বভাব। নিজের একটি বাচ্চার সখ তার প্রচণ্ড। সৌমেন ধমক দিত, ঘাড়ে দুদুটো অবিবাহিত বোন, দু'দুটো ইস্কুলে পড়া ভাই, তুমি কি পাগল হলে? ওদেরকেই মানুষ করো না নিজের ছেলেমেয়ের মতন করে?

তাই করেছে সরমা। পনের বছর ধরে। ইতিমধ্যে শ্বশুরের পাট চুকেছে। তাঁর পেনশান খতম, তাঁর র‍্যাশনকার্ড বাতিল। তাঁর নাতির মুখ দেখে যাওয়া হয়নি।

ইস্কুলে যেতে হবে ভাবলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আজকাল বাড়ি থেকে বেরুতেই ইচ্ছে করে না সরমার। নাকে-মুখে দুটি গরম ভাত গুঁজে ছাতি বগলে ছোটা। ইচ্ছে করে পান মুখে দিয়ে দুপুরবেলায় পাখা খুলে, মাদুরে শুয়ে শুয়ে সিনেমার বই পড়তে। আর থারড়ে থারড়ে একটা বাচ্চাকে ঘুম পাড়াতে।

স্বামী-স্ত্রী আর রমেন বাদে বাড়ি খালি হয়ে গেছে, রজনী সজনীর বিয়ে হয়ে গেছে, শোভেনের দুর্গাপুরে চাকরি হয়ে গেছে, সৌমেনের স্কেলও বেড়েছে। হয়নি কেবল সরমার ইস্কুল-ছাড়া। মাস গেলেই সাড়ে চারশো টাকা বন্ধ হয়ে যাবে। অতটা সাহস হয় না। সারাদিন একশো গণ্ডা অন্যের বাচ্চা ঠেঙানো। আর মা-গুলো কী ন্যাকা। উঃ। ছুটির ঢের আগে থেকে গেটে এসে ভীড় করবে, হাহা হিহি গুলতানি আড্ডা, দেখলে গা জ্বলে যায় সরমার। কোনো কাজ নেই, কেবল বাচ্চা পৌঁছনোর নাম করে পথে পথে ঘোরা। অথচ সরমার তো ইচ্ছে করে, সারাদিন ধরে কেবল একটাই বাচ্চা নিয়ে ঘরের মধ্যে বসে থাকতে।

BanglaBook.org

বাড়ির ঠিকে ঝিটা পর্যন্ত জানত, এতগুলো দেওর ননদদের একটা গতি হয়ে গেলেই বৌদিদির বাচ্চা হবে। তাঁর ছেলেপুলেদের মানুষ করতে হচ্ছে বলেই যে বৌমার ছেলেপুলে হওয়া বন্ধ এটা শ্বশুরমশাইও জানতেন। এবং জানতেন বলে মনে মনে বৌমার কাছে 'চোর' হয়ে থাকতেন। থাকতে থাকতে একদিন তাঁর খালাসের হুকুম এসে গেল।

সজনীর বিয়ে, শোভেনের চাকরির পরেও সৌমেন রাজী হয়নি। কিন্তু বছর তিনেক হল রজনীরও বিয়ে হয়ে গেছে। অবশেষে সৌমেনের কোনো যুক্তিই আর খাটল না।

রমেন সদ্য কলেজে ঢুকেছে। তার বেরুনোর জন্য অপেক্ষা করতে হলে সরমার আর ছেলেপুলে হবে না। সাফ কথা বলে দিল সরমা, প্রাণের ভয় বলেও তো একটা জিনিস আছে? বুড়ি হয়ে মা হওয়া অনেক বেশি রিস্কি। এখনই তো সে বুড়ি হয়ে গেছে। সৌমেন অনেক তর্ক করল—তেত্রিশে আবার বুড়ি হয় কেউ? আঠাশে বিয়ে হল তো সজনীরই।—কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে গেল। একটা শর্তে। চাকরি কিন্তু ছাড়া চলবে না। দুঃখিত হলেও সেটা মেনে নিয়েছে সরমা। দেখা যাবে পরে। বাচ্চাটা হোক তো আগে।

সেও হয়ে গেল দু' বছর। এখনও তো কই সরমার বাচ্চা এল না। চেষ্টার কোনোই ত্রুটি করে না তারা। ব্রজেনডাক্তার সবরকম পরীক্ষা করিয়ে বলেছেন কারুর কোনো দোষত্রুটি নেই শরীরে। দুজনেই সমর্থ, সক্ষম, নির্দোষ। চিকিৎসার কিছু নেই। তবে? তবে কেন হচ্ছে না?

তাবিজ, মাদুলি, শেকড়বাকড়, এমন-কি তুকতাকও করে দেখেছে সরমা। সৌমেনেরও মনে একটা চাপা উদ্বেগ হয়েছে এতদিনে। 'পুরনো-বাসি-বরকে নিয়ে তোমার আর মন উঠছে না—' এসব কথা বলে হালকা করলেও, বেশ বোঝা যাচ্ছে সরমার চেয়েও বেশি টেনশন হচ্ছে সৌমেনের মধ্যে।

কিরকম যেন দোষী-দোষী ভাব করে থাকে। মুখে যদিও চোটপাট করে—'এত মন দিয়ে ভগবানকে ভজনা করলে তিনিও সশরীরে এসে পড়তেন, তোমার সন্তানের ভজনা করা অতি কঠোর তপস্যার ব্যাপার।' ক্রমশ সৌমেন কিন্তু পালটে যাচ্ছে। হঠাৎ হঠাৎ চটে যায়। মেজাজটা খারাপের দিকে যাচ্ছে। আবার একসঙ্গে দু'ডজন রজনীগন্ধা নিয়ে হঠাৎ আপিস থেকে ফেরে। কেমন একটা 'ঘুষ' দেবার মতন ভাব যেন। আজকাল নিজেকে খুব খারাপ লোক বলে মনে হয় সরমার। বর ফুল এনে দিচ্ছে ভালোবেসে, সেটাকে 'ঘুষ' বলে মনে হবে কেন সরমার? আগে দেয়নি বলে? আগে দেয়নি কেন না, তখন শ্বশুর ছিলেন, ভাইবোনেরা ছিল, লজ্জাটজ্জা করত। এখন দিচ্ছে, সে তো ভালো কথা। খুশির কথা। সরমার এত অস্বস্তি কেন হচ্ছে তাতে? সরমা নিজেই নিজেকে চোখ রাঙায়।

BanglaBook.org

তবু, কেবলই ওর মনে হয়, সৌমেন ইদানীং বদলে যাচ্ছে। অথচ বদলটা কিছু মন্দ নয় সরমার পক্ষে। যেমন, সেদিন মাসপয়লায় হঠাৎ একটা সবুজ-সাদা ডুরে ধনেখালি এনে হাজির। সুন্দর শাড়িটা দেখে কোথায় আহ্লাদ করবে, তা না, সরমার মনটা দপ করে খারাপ হয়ে গেল। জোর করে মুখে হাসি এনে বললে, 'বাঃ। কী সুন্দর! কিন্তু কেন বলতো? হঠাৎ কী মনে করে?' কথাটা নিজের কানেই কুশ্রী শোনাল সরমার।—'কী আবার? সেলে দিচ্ছিল, ফুটপাথে ঢেলে শাড়ি বেচছে। তাই ভাবলুম, কোনদিন তো কিছু দেওয়া হয় না তোমাকে—' সৌমেনের কথায় লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করছিল তার। সত্যিই তো, সজনী-রজনীকে বাদ দিয়ে হঠাৎ বৌয়ের জন্যে কাপড় আনলে বড্ড খারাপ দেখায়। এইজন্যেই জীবনেও তার জন্যে আলাদা করে কাপড় আনা হয়নি সৌমেনের। এখন বাড়িতে কেবল ও একা, তাই শখটা মিটিয়েছে। এতে সন্দেহের কী আছে? নাঃ, সরমার সত্যি বয়েস হয়ে যাচ্ছে। সব কিছুতেই মন্দ দেখছে সে। স্বামীর মনোযোগ পেয়ে কোথায় আনন্দ হবে, তা না, ভয়ে সিঁটিয়ে যাচ্ছে। ভেতরে ভেতরে সব সময়েই কেমন একটা প্রশ্ন-উত্তরের ব্যাপার চলছে, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পালা চলছে। বাচ্চা নেই বলেই নিশ্চয় এইসব খুঁতখুঁতুনি। আসলে, সৌমেনকে মাঝে মাঝে চিনতে অসুবিধে হচ্ছে তার। মাইনের স্কেল বেড়েছে, ছোট সংসারে খরচাও কমেছে, তবু, এতটা দরাজ হাতের লোক সৌমেন নয়।

বিছানাতেও তার ধরনধারণ অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। বাচ্চা জন্ম দেবার চেষ্টায় কি এতদূর চারিত্রিক বদল হয়?

যে সৌমেন অনেক বড় লেখকের লেখাকেও 'অশ্লীল' বলে বাড়িতে ঢুকতে দিত না, সেই সৌমেন আজকাল কোত্থেকে সব নোংরা ছবির বই বাড়িতে নিয়ে আসছে। অবশ্য সরমাকে দেখাবে বলেই আনে, কিন্তু সরমা ওদিকে চাইতে পর্যন্ত পারে না। খারাপ খারাপ ছাইপাঁশ ছবি দেখে দেখে সন্তানধারণের আইডিয়াটাই খুব বাজে লাগে সরমার। অতি কষ্টে সে-বই বাড়িতে আনা বন্ধ করেছে সে, 'রমু দেখতে পেলে আমি গলায় দড়ি দোব' বলায় কাজ হয়েছে।

আর বিছানায় এসেও সৌমেন কেমন পাগলামি করে ইদানীং। বাচ্চার জন্যে কি পাগল হয়ে গেল নাকি লোকটা? ঝোঁক তো বেশি ছিল সরমারই—সৌমেনের কোনোদিন বাচ্চার সখ নেই, অতিকষ্টে রাজী করিয়েছে তাকে। কিন্তু এ কী হলো? বেশি বেশি উগ্র, নির্লজ্জ আদরে আদরে যেন বিপর্যস্ত করে ফেলেছে সরমাকে। নতুন বিয়ের ঠিক পরে-পরেও এতটা উদগ্র লোভ তার দেখেনি সরমা।

অথচ সরমার শরীরটা-তো তখনই ঢের বেশি লোভনীয় ছিল। এত আগুন ছিল কোথায় এ্যাদ্দিন? এ কি কেবল বাড়িতে লোকজন কমে যাবার ফল? কী একটা অচেনা ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে সৌমেন আর সরমার মধ্যে। সরমা ধরতে পারছে না। সবই ভালো, অথচ! স্বামী বেশি বেশি আদর করছে এতেও যদি স্ত্রী ভুরু

BanglaBook.org

কুঁচকায়, তবে দোষটা কার?

সরমার মাথার যন্ত্রণার রোগটা ইতিমধ্যে কখন যেন উধাও হয়েছে। নতুন একটা রোগ হয়েছে এখন। মনে হয় বুকের মধ্যে গলার নলিতে একটা ব্যথা আছে, খুব আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে, বুকের মধ্যে থেমে থেমে, ধাক্কা দিয়ে দিয়ে নামছে তো নামছেই। গলার নিচে বুকের কাছে এই নতুন ব্যথাটা মাঝে মাঝেই হচ্ছে সরমার।

অবশেষে গেল মাসে অঘটনটি ঘটেছে। ব্রজেন ডাক্তার কালই সেই বহু প্রত্যাশিত খবরটি দিলেন—'ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন বৌমা, এখন ভালোয় ভালোয় কটা মাস কেটে গেলেই হয়।' কালীবাড়িতে পুজো দেবে ঠিক করেছিল সরমা। কিন্তু শনিবারে সৌমেনের অফিসের থিয়েটারের রিহার্সাল। সে যেতে পারবে না কালীঘাটে। রমেন বলেছে নিয়ে যাবে বৌদিকে। কালীঘাটের শনিবারের ভীড় কি সোজা ব্যাপার?

সরমার সমস্ত শরীর-মন একটা অদ্ভুত শান্তিতে ভিজে রয়েছে। অবশেষে। পনেরো বছর বাদে তিনি আসছেন।

কালীঘাটের দিকে যেতে-যেতেই খবরটা দিল রমেন। বেচারা খুবই বিচলিত, বেশ ঘাবড়ে গিয়েছে।

—'এইবেলা ঠেকাতেই হবে ব্যাপারটা বৌদি। যত অফিস ক্লাবের থিয়েটারে পার্ট করে, আর স্রেফ বদমাইসি করে বেড়ায়। অতি পাজী মেয়ে বৌদি—রুন্টু, দুলাল ওদেরই পাড়ার মেয়ে। হালতুর দিকে থাকে। ওরা ভালোমতই চেনে ওকে। তুমি দাদাকে বারণ কর বৌদি।'

শুনেও না শোনার মতো চুপ করে থাকে সরমা। উদ্বেগের চেয়ে যেন নিশ্চিন্তই হয় বেশি। ভীষণ জটপাকান একটা গেরো যেন এইমাত্র খুলে দিল রমেন।

এতদিনকার সব কিছু অস্বস্তি, যা কিছু খাপছাড়া ব্যাপার, সৌমেনের সব অচেনা, বেখাপ্পা আচরণগুলো এবারে সুন্দর ভাবে খাপে খাপে বসে যাচ্ছে।

কঠিন একটা ধাঁধার সরল সমাধান হয়ে গেল এইমাত্র।

তারপরেই যেন বজ্রপাত হয়। সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে যায় সরমার। এই সন্তান তাহলে কার?

ওই যে নতুন সৌমেন, নির্লজ্জ, কামুক, লোভে অধীর, চোরের মতো, অপরাধীর মতো। স্ত্রীকে ঘৃষ এনে দেওয়া যে সৌমেন সেই কি সরমার স্বামী? শয্যায় ওই উন্মত্ত উদগ্র যে কামনার প্রকাশ হচ্ছে ইদানীং, তার লক্ষ্য সরমা নয়। অন্য কেউ। যার রুচিপ্রকৃতির সঙ্গে এই উগ্রতা, নগ্নতা, জান্তবতা মিলে যায়, অথচ যাকে শয্যায় পায় না সৌমেন। এই শিশুটি যখন জন্ম নিচ্ছিল সরমার জরায়ুতে, তখন সৌমেনের চোখে ছিল কার স্বপ্ন? কার প্রাপ্য বীজ সৌমেন নিরুপায় হয়ে গুঁজে দিয়েছে

BanglaBook.org

সরমার রক্তকণিকায়? কাদের স্বপ্নের শিশু এখন বাড়ছে সরমার জরায়ুতে? কাদের সন্তান এখন লালনপালন করবে সরমা তার রক্তে-মাংসে?

গলার মধ্যে অদৃশ্য সুপুরিটা আবার বুক চিরে চিরে নামতে থাকে হৃৎপিণ্ডের দিকে। ব্যথা দিয়ে দিয়ে, সময় নিয়ে নিয়ে একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মতো নামতে থাকে সরমার ভিতরটা পুড়িয়ে দিতে দিতে।

পুজো দিয়ে ফেরার পথেই মন ঠিক করে ফেলে সরমা।

আজই কাগজে দেখেছে বিজ্ঞাপন। 'সাকশন পদ্ধতিতে বিনা যন্ত্রণায় মাত্র দু মিনিটে'—সেটাই ঠিক হবে। এসব তো আজকাল আইনসিদ্ধ হয়ে গেছে।

ভগবান জানেন, ভগবানের চোখে সেটাই ঠিক হবে। পনেরো বছর ধরে অন্যের বাচ্চাদের প্রাণ ঢেলে মানুষ করেছে সরমা; ঘরে বাইরে। তাই বলে সারা জীবন করবে না। সংসারে পরের বাচ্চা মানুষ করা, ইস্কুলে পরের বাচ্চা মানুষ করা, আর আপন রক্ত-মাংসের ভেতরে পরের বাচ্চা মানুষ করা এক নয়।

চিনতে পারার পরেও আর নিজের বাসায় কোকিলের ছানাকে পোষে না, এমন-কি কাকপক্ষীও। সরমা মন ঠিক করে নেয়।

BanglaBook.org

প্রোপ্রাইটার

ভিড়ের মধ্যে টালমাটাল হয়ে দরজার এককোণে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াবার ঠাঁইটুকুনি পেয়ে যেন বর্তে গেল মিতা। বাসে ওঠার অভ্যেসটা তার নষ্ট হয়ে গেছে, আর এই ঝরঝরে প্রাইভেট বাসগুলো দেখলেই তার ভয় করতে থাকে, মাঝে মাঝে মিনিবাসে চড়াটা তবু খানিকটা শিখে গেছে আজকাল।

পনেরো বছর পরে কলকাতা যেন অন্য একটা শহর। এত ভিড়, এত ধুলো, এত আবর্জনা আর এত রুক্ষতা চারিদিকে। কারখানাটা এমনই এক পাড়াতে, ট্যাক্সি, মিনি কিছুই মেলে না। গাড়িটা না থাকলে এই প্রাইভেট বাস ভিন্ন উপায় নেই।

সামনের দরজা দিয়ে উঠেছে, লম্বা লেডিজ সীটটা ভর্তি। মোটা মহিলাটি মানুষ ভালো, নিজে থেকে হাত বাড়িয়ে মিতার ব্যাগটা টেনে নিয়ে কোলে রাখলেন। এবার দেয়ালে ঠেকো দিয়ে খানিকটা জুত করে দাঁড়াতে পারলো। ব্যাগটা চেয়ে নিয়ে ভাড়াটা বের করে রাখতে হবে এক ফাঁকে। সামনের আয়নাতে হঠাৎ নিজের মুখটা দেখতে পেয়ে বেশ খুশি-খুশি অবাক লাগলো মিতার। নাঃ, তেমন ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, মলিন দেখাচ্ছে না তো? যা পরিশ্রম গেছে এতক্ষণ কারিগরদের সঙ্গে।

বিদেশ থেকে তাঁরা ফ্যাশন ডিজাইনস পাঠাবেন, আর দিশি কারিগরদের সেই ডিজাইন বোঝানো কি সোজা কর্ম? এখানে কারিগরি সস্তা, চামড়াও সস্তা, যত্ন নিয়ে কাজটা করাতে পারলে ব্যাবসা জমে যাবেই। মিতা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করায়, বিদেশের নামী কোম্পানিকে সাপ্লাই দেয় সে। কৃষ্ণানকে দেখার আগে পর্যন্ত মিতার ধারণা ছিলো সাউথ ইন্ডিয়ানরা ব্যাবসা করে না, চাকরি-বাকরিতে প্রবল উন্নতি করাই তাদের বৈশিষ্ট্য। কৃষ্ণান এই ধারণা ভেঙেছেন। তাঁর এক্সপোর্টের ব্যাবসা জমজমাট। কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে খাটে মিতাও। আশ্চর্য ধীর স্থির প্রকৃতি কৃষ্ণানের, গত পনেরো বছরে তেমন ঝগড়াঝাঁটি স্মরণেই আসে না মিতার। অথচ কতরকম অদলবদলের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। মালটিন্যাশনাল কোম্পানির বিসেপশনিস্ট থেকে মিতা নিজেই আজ কতগুলো কোম্পানির ডিরেক্টর। ক্যামাক স্ট্রিটের দশতলায় প্রশস্ত পেন্টহাউস তার। না, বাসে তাকে চড়তে হয় না। নেহাৎ গাড়িটা কারখানায় তাই। অন্য গাড়িতে মা গেছেন বড়মাসীকে দেখতে। না, কৃষ্ণান তার কোনো কষ্ট রাখেননি। মেয়েটা পড়ছে কার্সিয়ঙের কনভেন্টে, এই গোর্খাল্যাণ্ড নিয়ে তার বাবার উদ্বেগের শেষ নেই। রোজ দু'বেলা ফোন করছেন কৃষ্ণান, আর বলছেন "তুমি যাও, গিয়ে রমিকে ফেরৎ আনো"—কেন রে বাবা? ইশকুল ভর্তি আরো তো মেয়ে রয়েছে? এত আদিখ্যেতা কিসের? তাছাড়া রমি তো বাঙালিও নয়। তার ভয়টা কী? জামাইয়ের সঙ্গে শানাইয়ের পোঁ ধরেছেন বাবা মাও। কি করে বোঝাবে তাঁদের যে এই সময়ে পড়াশুনো ডিস্টার্ব করলে ক্ষতি হয়ে যায়? এখানে এসে নতুন করে অন্য ইশকুলে ভর্তি করা স্বপ্ন কল্পনার তুল্য। রমি মেয়েটা মিষ্টি, কিন্তু বেশ শক্তপোক্ত আত্মনির্ভরশীল হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই একা একা একটাই হোস্টেলে থাকার লাভ এটা। মিতা যে বাবা মার সঙ্গে সমানেই ঘুরে বেড়াতো নিত্যি বদলি হয়ে, দশবারোটা ভিন্ন ভিন্ন ইশকুলে পড়েছে, তাতে ওর ক্ষতি হয়েছে অনেক। এটা কাকে বোঝাবে? রমির সে-ক্ষতি হতে দেবে না সে।

মনে মনে ভাবতে ভাবতে বাসের ভিতরের দেওয়ালে, ঠিক তার চোখের সামনেই যে সারিবদ্ধ ইংরিজি হরফগুলো ক্যাটকেটে হলদে রং দিয়ে লেখা আছে সেদিকে আলগা ভাবে চোখ ফেলে রেখেছিল মিতা। রমি যেমন "ঠোঙা ভরা বাদামভাজা খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না" তেমনি অক্ষরগুলোকে মিতা দেখছিল, কিন্তু পড়ছিল না।

হঠাৎ সমস্ত শরীরের ভিতর, গভীর, গভীর থেকে একটা কাঁপুনি উঠলো তার। সারা গায়ে কাঁটা দিল।

ওটা কী?

ওখানে কী লেখা? বাসের দেয়ালে?

কার নাম ওটা?

লেখাগুলো এক মুহূর্তেই যেন নাচতে নাচতে ভাসতে ভাসতে ঝাপসা হয়ে

banglabook.org

মিলিয়ে যেতে শুরু করে দিল।

মন শক্ত করে. চোখ স্পষ্ট করে, আরেকবার তাকালো মিতা। পড়বার চেষ্টা করলো। ওই তো।

ওই তো স্পষ্টই লেখা আছে। একটা নোটিসের মতো।

শ্রী শুভাশিস মজুমদাব বি. এসসি.
১৩২/২ সি গোবিন্দ ঘোষাল লেন
ভবানীপুব, কলকাতা ২৬।

প্রথমে নাম

তাবপব ঠিকানা।

হ্যাঁ, সেই ঠিকানাই।

ওই নামে তো কতো লোকই থাকতে পাবে।

কিন্তু ওই ঠিকানাতে?

ওই ঠিকানাতে ওই নামেব মাত্র একটি মানুষই পৃথিবীতে থাকা সম্ভব। শুভমিতাব শুভ আব দেবাশিসের আশিস মিলিযে যার নাম বাখা হয়েছিল শুভাশিস।

পনেরো বছব আগে তাব বয়েস ছিল ন' বছর। শাদা শার্ট, খাকি হাফপ্যান্ট পবে লাফাতে লাফাতে ইশকুলে যেতো। একদিন ইশকুল থেকে ফিরে আব তাব মাকে খুঁজে পায়নি।

কেমন আছে সে। কতো বড়ো হয়েছে এই বাসখানার মালিক? এখন কেমন দেখতে হয়েছে তাকে? মিতাব গলায় ঢেলা জমে, বুকেব মধ্যে মুচড়ে মুচড়ে একটা ব্যথা ক্রমশ জেগে উঠতে থাকে—পনেবো বছর ধবে চাপা দিযে বাখা একটা ক্ষতস্থান যে এখনও এমন কাঁচা ছিল, কে জানতো? এখনও এত রক্ত ঝরতে পারে, কে জানতো?

শুভাশিস মজুমদাব।

ব্রাউনপেপারে মলাট দিযে প্রত্যেকটা নতুন পাঠ্যবইয়েব ওপর কত যত্ন করে লিখে দিতো তার নামটা তাব মা।

"তোমাব শুভ. আর আমাব আশিস এই দুইয়েব সম্মিলিত মঙ্গলে মিলিযে যা প্রচণ্ড কল্যাণ হযে যাবে না ছোকরাব—মাথায় অ্যাটম বম পড়লেও কিছু হবে না"—বলে অট্ট হেসেছিল দেবু। সদোজাত শিশুর মাথায অ্যাটমবোমা পড়ার বসিকতাটা মোটেই ভালো লাগেনি শুভমিতাব—"চুপ কবো তো? যতো কুকথা!" এক ধমক লাগিয়েছিল সে।

সেই শুভাশিস।

—শুভাশীস নয়, শুভাশিস। সবাইকে বানানটা শিখিয়ে দিতো দেবু। শুভা হেসে লুটিয়ে পড়তো। গোবিন্দ ঘোষাল লেনের আধো-অন্ধকার ঘবে যখন সে ক্লান্ত শরীবে ফিরতো. আস্তাকুঁড়ের পচা মাছেব আঁশ আর মরা বেড়ালছানা এড়িয়ে বকের মত

BanglaBook.org

লম্বা লম্বা পা ফেলে, যে-বাচ্চাটা ছুটে এসে "মা" বলে জড়িয়ে ধরতো, অন্ধকার ঘরটাতে এক মুহূর্তেই রোদ্দুর ছড়িয়ে দিতো যার হাসি-কথা, সেই শুভাশিস।

ওই ঠিকানা তো ভুল হবার নয়। দেবুর ঠাকুর্দার তৈরি চকমিলানো উঠোনের বাড়ি। এখন কমতে কমতে মাত্র ক'খানা ঘর, একটু করে দালান, এক চিলতে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। শরিকের বাড়ি। দেবুর ঠাকুর্দার বিয়ে করার নেশা ছিল। তিন বউ। সতেরোটি জীবিত পুত্রসন্তান। মিতার বাবা মার ওটাতেই আপত্তি ছিল। নাতিরও যে স্বভাব ঠাকুর্দার মত হবে না, তা কে বলতে পারে? তবু মত দিয়েছিলেন। উপায় ছিল না। মেয়ের জেদের কাছে হার মানতেই হল। মালটিন্যাশনাল কোম্পানির কনিষ্ঠ কেরানি, কবি দেবাশিস মজুমদারকেই বিয়ে করে ফেলল শুভমিতা দাশগুপ্ত, অনেক চেনাশোনা যোগ্যতর পাত্রকে নিরাশ করে। না, দেবুর বাবা মা তাকে অনাদর করেননি। দেবুর ছোট দুই বোন আনন্দে অস্থির হয়ে পড়েছিল সুন্দরী বউদিকে পেয়ে। দেবুর দাদা বউদি একটু দূরে দূরেই থাকতেন, বউদির সঙ্গে তার ভাব হয়নি বিশেষ, দশ বছর ঘর করেও দুই জা দুই বোনে পরিণত হয়নি। ওদের ভাগে ঘর মোটে চারটে। দুই ভাই দুই বউ নিয়ে বড় দুই ঘরে থাকে। বাবা রাত্রে বসার ঘরে শোন। মা দুই মেয়েকে নিয়ে ছোট ঘরটায়। সেখানেই তার পুজোর সরঞ্জামও। হ্যাঁ, বারোয়ারি ঠাকুরবাড়ি একটা আছে ছাদের ওপর মার্বেলের চিলেকোঠায়। কিন্তু সব বউয়েরই ঘরে ঘরে নিজস্ব ঠাকুর। যেমন প্রত্যেকের উনুন আলাদা, রান্নাঘর "ভিন্ন" হয়েছে, তেমনি পুজোর ঘরও। ঠাকুরও যার যার তার তার।

শুভমিতা মফঃস্বলের মেয়ে। ইঞ্জিনিয়ার বাবার বদলির চাকরি, ঘুরে বেড়িয়েছে সারা ভারতবর্ষ। জয়েন্ট ফ্যামিলির অভিজ্ঞতা তার কোনদিনই ছিল না। শ্বশুরবাড়িতে এসে মুহূর্তে মুহূর্তে মোহভঙ্গ হতো। চাবী বন্ধ ঠাকুরঘরটি তার অন্যতম। বৃহস্পতিবার করে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়ে লক্ষ্মী পুজো হয়। প্রতিদিন ভাড়া করা পুরুত এসে ফুল বেলপাতা বদলিয়ে ঠাকুরকে জল আর এলাচদানা দিয়ে যান তালা খুলে, সেটুকু বউরা কেউই দেয় না। কি আশ্চর্য। এতগুলি বউ এ-বাড়িতে। শুভমিতা না হয় চাকুরে বউ, ইচ্ছে থাকলেও তার সময় নেই। অন্যেরা? সারা পাড়াতেই যেন মিতার আসা যাওয়া, চলাফেরা, সাজপোশাকের রেজিস্টার আছে—সবাই সব টুকে রাখে তাতে, আর ত্রুটি ধরে। আর এই বড় বাড়িটাতে তো ঘরে ঘরে তার নামে হিসেবের জাবদা খাতা আছেই। নোংরা বস্তিটা পেরিয়ে যেতে আসতে প্রথম প্রথম বড্ড ঘেন্না করতো। খোলামেলা পরিচ্ছন্ন সব রাস্তায় মফস্বলী কোয়ার্টারে মিতা বড় হয়েছে। তার হাঁটাচলায়, নাকে রুমাল চাপা দেওয়ায় সেই অনভ্যাসের অস্বস্তি প্রকাশ পেয়ে যেত। পাড়ার লোকেরা সেটা ক্ষমাসুন্দর নজরে দেখতো না।

রোজ রোজ সকালবেলা নতুন বউ সিল্কের ছাপা শাড়িটা পরে, নখে-ঠোঁটে রং মেখে, ঘাড়ছাঁটা মেমের মতো চুলটি ফুলিয়ে বরের পাশাপাশি হেসে হেসে আপিস যাচ্ছে, এ দৃশ্য সে-রাস্তা মানুষজন চোখে দেখেনি তার আগে। মধ্যবিত্ত

বাড়িতে নিয়ম করে পর্দা তুলে বউরা দেখতো, রকে বসে বুড়োরা দেখতো, বস্তির সামনে, কলতলায়, কয়লার দোকানে সর্বত্র মেয়ে-পুরুষ হাঁ করে চেয়ে দেখতো এই বেহায়া বউটাকে। এইভাবে চলল সাত বছর। তার মধ্যে শুভাশিস এলো, ইশকুলে ভর্তি হলো, ননদদের বিয়ে হয়ে বাচ্চা-কাচ্চা হয়ে গেল, শ্বশুর মারা গেলেন, এবং কৃষ্ণান এলেন দেবুর নতুন ওপরওয়ালা অফিসার হয়ে। চাকরিতে দেবুর তেমন কিছু উন্নতি না হলেও জীবনে খুব একটা মস্ত বড় বদল হয়েছে। ইদানিং তার কবিতা পত্রিকা, লেখালিখি নিয়েই থাকে সে। সমস্ত মনপ্রাণ তার পড়ে আছে সেখানেই। অফিস কোন ছার, ঘরেও তার মন বসে না। বাড়িতে থাকেই না বলতে গেলে। শুভা আর শুভাশিস দু'জনেই এখন গৌণ হয়ে গেছে "শিল্পের' মহান দাবির কাছে। একসঙ্গে অফিস থেকে ফেরা করেই বন্ধ হয়ে গেছে। কবিসাহিত্যিক বন্ধুরা বেজায় নাকি মদ খায়, তাদের সঙ্গে থাকলে একটু আধটু খেতেই হয়। দেবু যখন ফেরে তখন পা ঠিকঠাক পড়ে না। মিতার ঘেন্না করে, অথচ মিতা মদ খাওয়া ঢের দেখেছে। তাদের বাড়িতেই তো বাবার কতো পার্টি হয়েছে। কই—কেউ তো মাতাল হয় না? বমি করে না? সবাই দিব্যি পার্টির শেষে হাসিমুখে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি চলে যায়, দেবুই কেবল টলতে টলতে মাঝরাতে ফিরে বমি করে উঠোন ভাসায়। সেই উঠোন বালতির জল ঢেলে ধুয়ে দেয় মিতা। সকালে জ্ঞাতিরা যাতে দেখতে না পায়। জলেরও কষ্ট আছে বাড়িতে টিউবওয়েল থেকে ধরতে হয়। চৌবাচ্চার জলটা যথেষ্ট নয়। বাড়িসুদ্ধ কুলোয় না। দেবু দিনকে দিন যেন অবুঝ হচ্ছে। মদের ঝোঁকে কাজে ফাঁকি দিচ্ছে, ফাঁকি দিয়ে অফিসে বকুনি খাচ্ছে, বকুনি খেয়ে বেশি মদ খাচ্ছে, মদ খেয়ে কাজে আরও ফাঁকি দিচ্ছে। এত যে ভালবাসার লেখালিখি—ক্রমশ তাও মাথায় উঠলো, অত সুন্দর কবিতা ত্রৈমাসিক "কবিকাহিনী" উঠে গেল শেষ পর্যন্ত। এ কোন দেবাশিস? শুভা চিনতে পারে না। মান অভিমান দূরে থাক, ভালো করে বোঝাতে গেলেও কানে তোলে না—পরদিন থেকে কথা বন্ধ করে দেয়। মা বোঝাতে গেলে ধমকে উঠবে। দাদা বাঁকা বাঁকা কথা বললে সামনে যা পায় তাই তুলে মারতে যাবে। শুভাশিস কেঁদে উঠতো প্রথম প্রথম। বউদি নাকী গলায় ঝংকার দিত। মা ছুটোছুটি করে ঝগড়া থামাতেন। ক্রমশ এমন হলো, আর শুভাশিস কাঁদে না, বাড়ি থেকে বেরিয়ে পালিয়ে যায়। মা নিঃশব্দে কাঁদেন। বউদি নিজের বরকে জাপটে ধরে ঘরে নিয়ে যায়। মিতা শুভাশিসকে খুঁজে আনতে বেরোয়। দেবু চেঁচাতে চেঁচাতে ঘুমিয়ে পড়ে।

এই যখন নিত্যি রাত্তিরের ব্যাপার, সেই সময়ে একদিন শুভমিতা গিয়ে কৃষ্ণানকে ধরলো। "স্যার! আপনি ওর বস, আপনি ওকে বারণ করুন। বাড়িতে টাকা দেয়া তো দূরে থাক, বসবাস করাও কঠিন করে তুলেছে দেবু—ওকে ডাক্তার দেখান স্যার, যাই হোক কিছু করুন। আমাদের বাঁচান।"

না, বাবার কাছে যায়নি শুভমিতা। বাবা তখনও রিটায়ার করেননি, দুর্গাপুরে

পোস্টেড। কলকাতার কাছেই ছিলেন। বাবা মাকে বলে লাভ নেই। তাঁরা কষ্ট পাবেন, দেবু তাদের কথা শুনবে না। মা উলটে কেবল মিতাকেই দশকথা শুনিয়ে দেবেন —"তখনই তোমাকে বারণ করেছিলাম মিতা। ওসব বনেদি ঘর মোটেই ভাল না —বনেদি ঘরে আমার দারুণ ভয় আর দারুণ ঘেন্না—" না, মিতা ওসব শুনতে চায় না। তার চেয়ে ওই শান্ত, ভদ্র, দক্ষিণী অফিসারটিকেই ধরা ভালো—যে দেবাশিসের ইমিডিয়েট বস। ওপর থেকে চাপ এলে দেবু ঠিকই কড়কে যাবে। বসের কথা প্রাইভেট কোম্পানিতে না শুনে উপায় নেই।

তারপরের ইতিহাস অন্যরকম। বছর দুয়েকের মধ্যে শুভমিতা ও-বাড়ি ছেড়ে লেক রোডের প্রশস্ত দোতলা ফ্ল্যাটে উঠে এল।

কৃষ্ণান শুভমিতার সুব্যবস্থা করতে পেরেছেন, পারেননি দেবাশিসের অভ্যাস বদল করতে। ডিভোর্স পাকা হবার পর মিতার রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হয়ে গেছে কৃষ্ণানের সঙ্গে। কিন্তু শুভাশিসকে সঙ্গে আনা গেল না। সে রয়ে গেল হবু বাবার কাছে, গোবিন্দ ঘোষাল লেনেই। আটবছর পূর্ণ হয়ে যাবার পর হিন্দুবিবাহ আইনে ছেলের বাবার কাছেই থাকার কথা। মা অনধিকারী। কৃষ্ণান খুব চেষ্টা করেও শুভর জন্য মিতার মন খারাপ যখন কাটাতে পারলেন না, তখন বম্বেতে ট্রান্সফার হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। বম্বে, বাঙ্গালোর, বম্বে। পাঁচবছরের মধ্যে কলকাতায় আর ফেরাই হল না মিতার। বাইরে থেকে শুভাশিসকে রোজ চিঠি লিখতো, জন্মদিনে নতুন জামা পাঠাতো পার্সেলে, পুজোতে টাকা। সেসব ফেরৎ আসেনি বটে কিন্তু প্রাপ্তিসংবাদে কোনো চিঠিও আসেনি কখনও। বম্বেতেই জন্মেছে পারমিতা। ঘরে-অফিসে নানান কাজের চাপে, কমে যেতে যেতে একদিন থেমেই গেছে শুভকে চিঠি লেখা, কখন যেন বন্ধ হয়ে গেছে তাকে টাকা পাঠানো, দেবু কিছুতেই ছেলেকে যোগাযোগ রাখতে দেয়নি মিতার সঙ্গে। একপক্ষ থেকে আর কতদিন চেষ্টা চালানো যায় সম্পর্ক রক্ষার?

বম্বে, বাঙ্গালোর, বম্বে। তারপর হঠাৎ ইয়েমেন। আর্লি রিটায়ারমেন্ট নিয়ে চাকরি ছেড়ে গালফ কান্ট্রিতে প্রচুর মাইনের চাকরি নিয়ে চলে গেলেন কৃষ্ণান। মেয়েকে কার্সিয়ঙে ভর্তি করে, দাদু দিদিমার অভিভাবকত্বে রেখে দিয়ে। ফিরেছেন প্রচুর ধনী এবং পাকা ব্যবসায়ী হয়ে। অনেকগুলো ব্যবসায়ে কৃষ্ণানকে অনবরত ঘুরে বেড়াতে হয়: আজ বম্বে, কাল লণ্ডন, পরশু ইয়েমেন, তরশু সিঙ্গাপুর। তবু শুভমিতা এখন সুখে আছে এবং শান্তিতেও। গোবিন্দ ঘোষাল লেনের কথা ওর মনেই ছিল না। বাবা রিটায়ার করে সল্ট লেকে বাড়ি করেছেন। তবু মেয়ের এই ক্যামাক স্ট্রিটের দশতলার ফ্ল্যাটে মাঝে মাঝে এসে থাকতে ভালোই লাগে। মেয়েকে তো বেশির ভাগই একা থাকতে হয়। জামাই ঘোরেন বিশ্বময়। নাতনি থাকে পাহাড়ে। না, শুভাশিসের সঙ্গে যোগ নেই তাঁদেরও। দেবু একেবারেই ছেঁটে দিয়েছে শুভমিতার পরিবারকে শুভাশিসের জীবন থেকে।

BanglaBook.org

বম্বের অফিস থেকেই মিতা খবর পেয়েছিল ডিভোর্সের পর 'দেবদাস' না হয়ে গিয়ে, উলটে, আস্তে আস্তে মদ ছেড়েই দিয়েছে বরং দেবাশিস। এখন নাকি দুটো বইও বেরিয়েছে বাজারে কবি দেবাশিস মজুমদারের। বুক ফেয়ারে একটা দোকানে চোখে পড়লেও কেনেনি শুভা। কিনবে না। সে জানতে চায় না দেবাশিস কি লিখছে। কি ভাবছে।

শুভা নয়, মিতা। বাবার মিতা, দেবুর শুভা হয়ে গিয়েছিল। এখন কৃষ্ণানের কাছে আবার মিতা। শুধু মিতা।

—"টিকিট?"

এক ঝাঁকুনিতে শুভমিতাকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনে কনডাকটারের প্রসারিত তালু। ভদ্রমহিলার কোল থেকে ব্যাগটা নিতে নিতে আরেকবার তাকিয়ে দ্যাখে —প্রোপ্রাইটার শুভাশিস মজুমদার।

পনেরো প্লাস নয়ে কত হয়? চব্বিশ বছর? বাঃ। এবারে আর চিঠিপত্র নয়, নিজে চলে যাবে শুভমিতা। গোবিন্দ ঘোষাল লেনকে আর ভয় করছে না। দেবাশিস এখন আর সরিয়ে রাখতে পারবে না শুভকে। শুভকে জানানো দরকার যে এই বাসটা ছাড়া আরেকটাও জলজ্যান্ত সচল সম্পত্তির প্রোপ্রাইটর সে।

BanglaBook.org

মুখর নৈঃশব্দ্য

কী ভীষণ শব্দ করে বাজ পড়ছে, বিদ্যুৎ-এর জিব লকলকিয়ে উঠছে, থেকে থেকেই চেটে নিচ্ছে আকাশের রস। আকাশ ঝেঁপে ভরসন্ধে ঘনিয়ে এসেছে ঠিক দুপুর-বেলায়। যখনই এমন ধড়াস করে দামাল ঝড় এসে পড়ে, বৃষ্টির সঙ্গে ঝুটোপুটি করতে করতে ঘর-দোর ভিজিয়ে দিয়ে যায়, তোমার জন্যে তখন মন কেমন করে। তোমার জন্যেও তখন মন কেমন করে। আর তোমারও জন্যে। মানুষের মন কখনোই মনোগ্যামাস নয়। মন-কেমন-করার কোনো মনোগ্যামি নেই। অথচ, বিশ্বাস করো তোমরা, তোমাদের প্রত্যেকের জন্যেই আমার বুকের মধ্যে মোচড় দেয়। তোমরা পাঁচজনে পাঁচরকম ভাবে আমাকে কষ্ট দাও। কেউ জানো না, তোমরা কে-উ জানো না। সন্তর্পণে লুকিয়ে রেখেছি। তোমাদের এই গণতন্ত্র যে মোটেই গণতন্ত্র নয়, এ যে যৌথ সাম্রাজ্য, তা কোনোদিনও জানতে দেবো না, কাউকেই না। এ রাজ্যের সবটা জমি আমি একা চাষ করি। আর সবটা ফসল তোমরা ক'জনে ঘরে তোলো। অথচ তাও তোমাদের জানার মধ্যেই নেই।

তুমি যখন আমার দিকে তাকাও, তোমার তীব্র, গহন অভিমানের দৃষ্টি দিয়ে যখন আমাকে বিদ্ধ করো, আমি চোখ নামিয়ে নিই। স্বভাবত আমি নম্র, স্বভাবত অপ্রগলভা। এমন-কি লাজুকই। চট করে কথা ফোটে না আমার, জিবের আগায় এসে সব জট পাকিয়ে যায়। অথচ মনে মনে আমি কত বাচাল। সারাক্ষণই তো কথা বলি। তোমাদের সকলের সঙ্গেই কথা বলি। রাগ, দুঃখ, অভিমান এমন-কি প্রণয়ের কথাও। তোমাদের সবার সঙ্গেই। অথচ তোমাদের প্রত্যেকের অভিমানের অন্ত নেই আমার ওপর। আমি ঠাণ্ডা। আমি হিম। আমি তোমাদের প্রণয়বাক্য শুধু শুনে যাই। চুপ করে থাকি, সাড়া দিই না। কী জানি কী ভাবো তোমরা আমাকে। ভাবো নির্জীব। ভাবো নিরুৎসাহ। আমার মন সব সময়ে কথার উত্তরে কথা কয়, আমার মুখ থাকে বোবা হয়ে। যে শুনতে পাবার সে কি শুনতে পায় না? পাবে না কোনোদিন?

সে কি তুমি? তুমি সবার চেয়ে পাগল, সবার চেয়ে রাগী, নিঃসঙ্গ, আর সবার চেয়ে দুঃখী। তোমার বয়েস তোমাকে ঠেলছে তোমার সামাজিক দায়িত্বের দিকে, আর তোমার মন তোমাকে টানছে অন্য এক বিদিকে—যেখানে তুমি এখনো ষোলো বছরের অবাক চোখে মেয়েদের মনের সামনে থমকে দাঁড়াও। প্রত্যেকটি উষা তোমার কাছে নতুন, পবিত্র—প্রতি রাত্রি আনে যন্ত্রণা, আর প্রতীক্ষা। তোমার দিন যেমন, তোমার রাত্রিও তেমনি—নীরন্ধ্র, পরিপূর্ণ। কর্মব্যস্ত, নয়তো মর্মব্যস্ত। তোমার মতো তাজা তরুণ ওরা কেউ না, কেউ নয়, এমন-কি ঙ পর্যন্ত না। তোমার যন্ত্রণা ফুটে বেরোয় তোমার তীব্র চাহনিতে, তোমার অকারণ ক্রোধে, তোমার মান-অভিমানে। তুমি প্রচণ্ড ঈর্ষুক—অকারণ ঈর্ষায় তুমি জীর্ণ, বিদীর্ণ হও—নিজের বয়স ভুলে প্রায়ই আমাকে খোঁটা দাও। বয়স! তোমার আবার বয়স! অবরুদ্ধ বয়ঃসন্ধির শিকার তুমি—কুড়ি পার হতে পারোনি কোনোদিন। তোমার দুটি পুত্রই এখন বাবার সমবয়সী হয়ে উঠেছে। খ, গ, ঘ তো বটেই, এমন কি উনিশ বছরের ঙ-ও তোমার চেয়ে পরিণত, হিসেবি,—তোমার পায়ের তলার মাটি তোমার ঝগড়ুটে স্ত্রী, তোমার দুই নয়নের মণি তোমার পুত্রদুটি। অথচ চিরটাকালই তুমি পথের নেশায় পাথেয় করেছ হেলা। অন্যরা কেউ তোমার মতো না। ওরা বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। ওরা গুছোতে জানে। কেবল খ ছাড়া। খ অন্যরকম। খ গুছিয়ে নিতে চায় না তা নয়, কিন্তু ঘোঁৎ-ঘাত জানে না। পারেও না। আত্মবিশ্বাস নেই যে খ'র—খ কনুইয়ের গুঁতো মারতে শেখেনি, জীবনে এগোবে কেমন করে। সবেতেই খ-র রুচিতে বাধে। ওর অহংকারটা বিপরীতমুখী—কাজ গুছোতে অহংকারে বাধে। খ পিছিয়ে থাকে, হাত বাড়ায় না কোনোদিকে। তোমার মধ্যে জোর আছে। এখনও গোঁ আছে ব্রহ্মপুত্রের মতো—এখনও বান ডাকানোর ক্ষমতা আছে তোমার উদ্দাম নাড়িতে। অথচ ইচ্ছে করলেই তুমি শান্ত হতে পারো। সেখানে উঠে আসে তোমার মধ্যে লুকিয়ে থাকা বাকি বছরগুলো, ওইখানে এসে কাঁধ লাগায় অর্ধশতাব্দীর অভিজ্ঞতা। খ'র মধ্যে

জোর কম। সে যেমন কাড়তে জানে না, তেমনি ভেসে গেলে ভাসান ঠেকাতেও জানে না। খ আমার মতোই লাজুক। আমার ওপরেই ছেড়ে রাখে সব। অথচ আমি জানি এই ধরনের মানুষরা যেই পায়ের নিচে মাটি পায়, অমনি চেঙ্গিজ খান। দুর্বলের অত্যাচার সবলের অনাচারের চেয়েও বেশি কষ্টদায়ক। খ এতটুকু পেলেই আর ছেড়ে দেবে না। লুটে-পুটে ভরিয়ে নিতে চাইবে নিজের অপুষ্ট সর্বস্ব। আঁকড়ে ধরবে —ডুবন্ত মানুষে যেমন আঁকড়ায়, তাতে যদি তুমিও ডোবো, ডুববে। তবু ছাড়বে না। আঁকড়ে ধরবে না কেবল গ। গ খেলোয়াড়। তুমি খেলোয়াড় নও। তুমি প্রেমিক। খ-কে প্রেমিকের পার্টে মানায় না, কিন্তু ছাপোষা স্বামীর পার্টে দিব্যি মানাবে—বেবীফুড, র‍্যাশনের থলি হাতে ওকে সহজেই ভাবা যায়। ভাবা যায় না গ-কে, কিংবা তোমাকেও। তুমি তো পঁচিশবছর ধরে স্বামীর পার্টে ধেড়িয়ে আসছ। আর গ? গ তো ওস্তাদ খেলোয়াড়। সে অলরাউণ্ডার। স্ট্রাইকারও হতে পারে, গোলকীপারও হতে পারে। —তার মনে সীমার ধারণাটা খুব স্পষ্ট—ভূমিকাগুলো চমৎকার অভ্যেস হয়ে গেছে —সর্বদা অনুশীলনের দ্বারা নিজেকে ফিট রাখে, রোজ নিয়ম করে মাঠে নামে। রোজ জোটে তার নতুন প্রেমিকা—তা বলে স্বামীর ভূমিকায় সে মোটেই বেখাপ্পা নয়। সেখানেও সে জয়ী, সার্থক খেলুড়ে।

তোমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের মতো সফলতার সীমায় পৌঁছেছ। তবুও কোথাও রয়ে গেছে একটা ফাঁক—সেখানে আমার জায়গা।—খ আমার পাণিপ্রার্থী —মোটামুটি যোগ্যতা তার আছে—বিশ্বস্ত, সৎ, উপার্জনশীল। তুমি কি সৎ? আমার সঙ্গে সৎ। কিন্তু তোমার স্ত্রীর সঙ্গে? তুমি কি বিশ্বস্ত? তুমি কি নির্ভরযোগ্য? তোমার স্ত্রীর কি রাতের পর রাত একা কাটে না, চোখের জলে ডুবে কাটে না? মাসের পুরো মাইনে তুমি রেসের মাঠে উড়িয়ে দিয়ে আসো, স্ত্রীর গহনা বাজি ধরে তাস খেলো। সন্তানজন্মের মুহূর্তে স্ত্রীকে হাসপাতালে রেখে দিয়ে নিজে বেশ্যাপাড়ায় থেকেছো বলে অহংকার করো। তোমার মন্দপনার তুলনা হয় না। কলসীর কানার মতো তীক্ষ্ণ, হিংস্র প্রণয়ে তুমি আমাকে রক্তাক্ত করে দাও, আমার স্নায়ু ক্ষতবিক্ষত করে দাও। কিন্তু আমাকে তুমি ঘর দিতে পারবে না। সেখানে তোমার দোরে ট্যাড়াচিহ্ন। তুমি আমাকে দিতে পারবে শুধু বুনো ঘোড়ার মতন কিছুটা নেশা-ধরানো দৌড়। তুমিই বরং আশ্রয়ের প্রত্যাশী—খ যেমন। খ হাত বাড়াতে পারে না, অথচ নিজেকে ছিঁড়েও নিতে পারে না—ত্রিশংকুর মতো ঝুলে আছে নো-ম্যানস ল্যাণ্ডে। খ আর আমি দুটো রেল লাইনের মতন চিরদিন প্যারালাল চলব—সমান্তরাল জীবনে—যদি না কোনো জংশনে পৌঁছুই। ওর সঙ্গে প্রণয় হয় না—ওকে দেখলে বুকের রক্ত ছলকে ওঠে না কিন্তু বুক ভরে যায়। তোমার দিকে চাইলে কিংবা গ-এর স্বরটুকু শুনলেও আমার শরীরের মধ্যে তাড়াহুড়ো পড়ে যায়, কিসের একটা ব্যস্ততা লাগে, একটা প্রস্তুতি শুরু হয়। আর ঙ? তোমারই ভাগ্নে—তাকে তুমি আড়ালে "উত্তীয়" বলে আমাকে খ্যাপাও। কিন্তু সে আদতেই উত্তীয় নয়। কোনোদিন হবেও না। কারো

জন্যেই নয়। এই উনিশ বছরেই সে দিব্যি হিসেব শিখে ফেলেছে। প্রাণ নিতে শিখেছে, প্রাণ দিতে নয়।

কেউ কেউ হয় শিকার, কেউ হয় শিকারী। খ হল শিকার। কিন্তু গ-এর মতই ঙ হচ্ছে জাত-শিকারী। আর তুমি? তুমি আমার মতন। কখনো শিকার হও, কখনো বা শিকারী। আমার সঙ্গে ঙ-র সম্পর্ক তোমরা কেউ বোঝ না। ঙ নিজে কী যে বোঝে তা সেই জানে। তার প্রাত্যহিক দর্শনেচ্ছা, তার আকুলতা, তার নরম চাউনি —যাই বলুক না কেন আমি তাতে কান দিইনে। কিন্তু আমার মন কেমন করে। ঙ-র কচি গলার পাকা কথা শুনতে, তোমার পাকা গলার কচি কথা শুনতে, গ-র ভরাট গলার মিঠে বুলি শুনতে, খ-র লাজুক তোতলামির স্বল্প কথা শুনতে —আমার খুব ভালো লাগে। আমার খুব মন কেমন করে। গ-র মতন করে কথা বলতে তোমরা কেউ পারো না, কেউ না। সে বাকচাতুরীতে ওস্তাদ—কথার পরে কথা সাজিয়ে তাজমহল গড়তে পারে সে। তুমি পারো কেবল চিঠি লিখতে। আর তোমার চেয়েও ভালো চিঠি লিখতে পারেন তোমার ভাগ্নেটি—ঙ। ও কবি। দেখো—তার একদিন খুব নাম হবে। সাহিত্যকে তো তোমরা মূল্য দাও না।—দেখো একদিন সাহিত্যই তোমাদের সবাইকে ছাড়িয়ে যাবে। তুমি যেমন চিঠিতে পাগল করতে পারো, তেমনি পাগল করে গ-র কথা, আর ঘরে স্পর্শ। স্পর্শ? হ্যাঁ, সেও তো অনেকদিন হলো। খ-র শান্ত উপস্থিতিতে পাগল করার মতো কিছু নেই—কিন্তু ঙ যখন চুপ করে চেয়ে থাকে, ওর চাউনির মধ্যেই একটা কী যে জিনিস আছে, আমি ওকে না ছুঁয়ে পারি না। যে হাতে তুলে কিছুই নেবে না, তাকে তো হাতে তুলে কিছু দিতে হয়। ঙ চুরি ডাকাতি করে না, গ-এর মতো, কিংবা তোমার মতো। গ-র আছে লোভীপনা। আর তোমার হলো দস্যুবৃত্তি। পুরুষের পরম আত্মবিশ্বাস ("আমার মতো প্রেমিক আর কে আছে ভুবনে?") আমার মেয়ে বন্ধুদের নাকি ভালোই লাগে, কিন্তু আমার ভালো লাগে না। গ সুপুরুষ, সে ধনী, হাইকোর্টে এখন বোধহয় তার মতন পশার আর কারো নেই—চতুর, বিচক্ষণ, পরিশ্রমী সে। মদে ডুবে থেকেও মাতাল হয় না, প্রণয়িনী পরিবেষ্টিত রাত্রিযাপনের পরে বাড়ি ফিরে গ বউয়ের কোমর ধরে শূন্যে দু'পাক ঘুরিয়ে বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে উদ্দাম প্রেম করে। তার আদরের ঠেলায় বৌয়ের সব মান-অভিমান বাষ্প হয়ে উবে যায়। ভয়ানক মাপ চায়। পায়ে ধরে। বৌয়ের কান্নার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও কাঁদে। তার ওপর রাগ করে থাকা যায় না। বৌও পারে না, সহকর্মীরাও পারে না, প্রণয়িনীরাও পারে না। একনিষ্ঠতার বড়াই সে করে না—তার লুকোছাপা নেই। ক্লাবে, কোর্টে, বাড়িতে, সর্বত্রই সে তার উদ্দাম প্রাণশক্তির জোয়ার বইয়ে দেয়। সারাদিন কোর্টে প্রচণ্ড খাটুনির পর বাড়ি এসে ছেলেমেয়েদের পিঠে নিয়ে ঘোড়া হয়ে ঘরময় হামাগুড়ি দেয়। গ ভুলেও চিঠি লেখে না। তার আছে টেলিফোন। 'শতং বদ মা লিখ' পলিসিতে বিশ্বাসী, আইনজীবী সে। এক প্রচণ্ড ঝড়ের রাত্রি শেষে তার ফোন এসেছিল—

এই আজকের মতোই সৃষ্টি ডোবানো বৃষ্টি পড়ছিল সেই সময়ে—"কী, ঘুম ভাঙালাম? কী সুন্দর ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে, তাই তোমার জন্য মন কেমন করল। তোমাদের বাড়ির সামনে কি নৌকো চলছে? কী করছিলে? স্বপ্ন দেখছিলে? নিশ্চয় রঙীন স্বপ্ন? —তুমি তো একটা মুনিয়া পাখি, নিশ্চয় পাখিদের স্বপ্ন দেখছিলে? নাকি ঝর্ণার? নাকি গোলাপবাগানের? তুমি কি কোনোদিন আমার স্বপ্ন দেখবে না, সোনা? আমি যে এদিকে রোজ তোমাকে স্বপ্ন দেখি! ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েও, জেগে-জেগেও। তোমার চোখ দেখি, তোমার ঠোঁট দেখি, তোমার বুক—এ্যাই, দেখি তো চোখ দু'খানা একবার? এই তো দেখতে পাচ্ছি—রাগী-রাগী ফুলো-ফুলো। পরনে শাদা রাত্রিবাস। হল না? এই যাঃ। তবে? তবে তুমিই বল। নীলশাড়ি? মেঘের সঙ্গে মিলিয়ে? হলো? দেখলে তো, কেমন পারি? তুমি তো তবুও করুণা করো না সুন্দরী। এই দ্যাখো না খালি বাড়িতে একা একা পড়ে আছি—আজ রবিবার, কোর্ট নেই, দু'দিন হলো মনিলাও বাপের বাড়ি গেছে—একটু এসো না? আসবে প্লীইজ? লক্ষ্মীটি? সোনাটি?"—এইরকম করে ডাকবে। আমি যাইনি। সেও জানতো আমি যাবো না। হয়তো আমার আগে আরো দু'জনকে, আর পরেও অন্তত সাতজনকে ওই একই ভাষায় ফোন করেছে, আহ্বান জানিয়েছে, আদর করেছে। নিজেও তো কই আসেনি। হয়তো আর কাউকে নিয়ে ক্লাবে গিয়েছিল। একদিকে তো বউ অন্ত প্রাণ—আবার এদিক-ওদিকে প্রেম-ট্রেমও করা চাই।

তোমারও তাই। সেই ঝড়ের দিনে তুমিও ফোন করেছিলে। "কী করছ? যাই করো, বন্ধ করো। কোথাও বেরিও না। আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসছি। তোমাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে, এক্ষুনি দেখতে চাই"—পাঁচ মিনিটও হয়নি, কড়া নড়ে উঠল। কাকভেজা ভিজে তুমি এসেছিলে। ঘরের মধ্যে ঢুকেই চেষ্টা করেছিলে আমাকে জড়িয়ে ধরতে। যথারীতি পিছলে গিয়ে তোমাকে এড়িয়ে আমি বসে পড়লাম চৌকিতে —ব্যস্ত হয়ে পড়লাম তোমার ভিজে জামাকাপড় নিয়ে। ও-ঘর থেকে বাক্স খুলে বের করে আনলাম ঘ-র পাজামা, পাঞ্জাবি। তুমি ছুঁলে না।—"ছিঃ। আমি পরবো ওর জামা?"—আমি কিছুই বলতে পারলাম না। তোমার এই অযথা পাগলামি, এই শুচিবাই আমি বুঝি না। গামছা এনে চুল মুছে দিলাম—তুমি শান্ত হয়ে আমার হাতে আত্মসমর্পণ করলে, আস্তে আস্তে বুকের ওপর হেলিয়ে দিলে মাথাটা। আমি সংযত রাখলাম নিজেকে প্রাণপণে—যদিও ইচ্ছে করছিল—যাই ইচ্ছে করুক না কেন, ট্রেনিংপ্রাপ্ত নার্সের মতো আমি নিজেকে সুদূর রেখে তোমার চুল শুকিয়ে দিলাম, জানতে দিলাম না ওই মুহূর্তে তুমিই ছিলে সম্রাট। রুমালে চশমার কাচ মুছতে মুছতে তুমি চোখ তুললে, অবুঝ শিশুর চোখ—যা ওই কাঁচাপাকা পরচুলোর নিচে বড়ই বেমানান।—আমি চায়ের জল বসাতে ভেতরে গেলাম, নাকি চোখের জল মুছতে? বাইরে-ভেতরে সমানভাবে তখন ঝড়ের মাতামাতি। ওই ঝড়ের সন্ধ্যায় খ-ও এসেছিল। জল জমে যানবাহন তখন বন্ধ—সে এল হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট জলকাদায়

BanglaBook.org

মাখামাখি করে—ভবানীপুর পর্যন্ত হেঁটে তিন মাইল পথ। এসে লাজুকভাবে শুধু বলল—"চলে এলাম!"—আমার মায়া হচ্ছিল ওর প্যান্টের অবস্থা দেখে—মুখে আর কী বলবো। "কফি খাবে?"—"খেতে পারি।" ঘ তো কিছুই করে না, কেবল চেয়ে থাকে। আর এই চোরা চাউনির জোরটাও খুব কম নয়। আমি জানি, একদিন না একদিন হয়তো ওর কাছেই আমাকে ঠাঁই নিতে হবে। ওই কেবল আমাকে ঘর দিতে পারে, শিশু দিতে পারে। ওর ধৈর্য দেখে আমার মায়া হয়, শ্রদ্ধা হয়। কিন্তু প্রণয় আসে না।

ঙ সেদিন আসেনি। ওর ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছিল। শুয়ে শুয়ে একটা দীর্ঘ চিঠি লিখেছিল আমাকে। দু'দিন পরে ডাকে এসেছিল সেই চিঠি। ঙ পাগল নয়, সে কবি। যথাসাধ্য সংহত, সংযত, মার্জিত, কাব্যিক ভাষায়, নানা রসিকতা, নানা নৈর্ব্যক্তিক আলোচনার ফাঁকে মূলভাব—'বৃষ্টিতে তোমার জন্য একা লাগছে—' তার বলার কথা ছিল এইটুকুই। কিছু চায়নি। সে যে চায় প্রাণটাই। হয় সর্বস্ব, নতুবা কিছুই নয়, এই হলো তার বাজি। একটু সুদূর, একটু বিধুর আমার ঙ। বড়ো একলা। তার কৈশোর-যৌবনের পীড়িত সন্ধিস্থলে আমি বোধহয় জরাসন্ধের মতো জোড়া দেওয়ার কাজ করছি।

আর ঘ? ঘ-এর কথা ভাবতেও আমার বুক কাঁপে। ঘ-এর কখনো মনে পড়ে কি আমাকে? একটা সময় ছিল যখন আমরা এমনি বৃষ্টি পড়লে দুজনে মিলে খালি পায়ে পথে বেরুতাম। কেবল জল ভাঙবো বলেই। মফঃস্বল শহর থেকে পালিয়ে দুজনে চলে এলাম কলকাতায়। ঘ একটা কাপড়ের দোকানে কাজ পেয়ে গেল। চেতলার সেই টিনের চালের ঘরে যখন বৃষ্টি পড়তো—সারা রাত তার বাজনা শুনতাম, যেন অপ্সরীদের ঘুঙুর বাজতো ছাদে—আমরা ঘরে বসে তেলমুড়ি খেতাম আর ঘন ঘন চা, আর জড়াজড়ি, হুড়োহুড়ি ফুরোতে চাইত না। দেশে ওর মা বলতেন এমনি একটা বাদলা-দিনে আষাঢ় মাসে ঘ-র জন্ম। আঁতুড় ঘরে নাকি প্রদীপ নিবে গিয়েছিলো ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটায়, আর সঙ্গে সঙ্গে ট্যাঁ শব্দে ঘ এক অন্ধকার পৃথিবীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সকলকে চমকে দিয়েছিলো। ঘ-এর মধ্যে ছিল সেই ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা, সেই রাতি-নেবা ঘরের নিবিড় অন্ধকার। —অসহ্য, উন্মত্ত সুখে কেটেছিল কয়েকটা মাস—তারপর ঘ-র বাবা তাকে খুঁজে বের করে ধরে নিয়ে গেলেন।—আমি ফিরতে পারিনি। আর ফিরতে পারিনি পিসিমার আশ্রয়ে। শুনতে পাই ঘ এখন মস্ত অফিসার হয়েছে। তার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বৃষ্টির ঝমঝমানি পৌঁছয় না। টিনের চালের ওপর মেনকা-বস্তার নূপুর নিক্কণ সে আর শুনতে পায় না। তার কানে এখন কেবল হিম-যন্ত্রের গোঙানি, কাৎরানি। ঘ, তুমি এখন কী করছো? তুমি কি এখন বৌয়ের কোলে মাথা রেখে সেই কথাগুলো বলছো, যা আমার এখনও কণ্ঠস্থ? সেই আদরগুলো পেয়ে তোমার বৌ কি এখন গদগদ হচ্ছে, আমাকে যা ঘরছাড়া করে এনেছিল, কলকাতার অজানা ভিড়ের মধ্যে

BanglaBook.org

ছুঁড়ে দিয়েছিল? তুমি এখন কী করছো গো? এই ঝড়ে, এই বৃষ্টিতে? আমার যে মন-কেমন করছে। আমার যে ঝড়-বৃষ্টিতে কান্না পায়, সোনা, আমার সোনা, আমার মণি!

আজ সেইরকম বর্ষা। আজ আমি কাঁদছি—ঘ-এর সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া আমার প্রথম যৌবনের জন্যে কাঁদছি। তোমার জন্যও কাঁদছি। তোমাকে যা দিতে পারিনি, তার জন্য কাঁদছি। কাঁদছি গ-এর জন্য—ইচ্ছে করছে, ফোন বেজে উঠুক—ওপাশ থেকে শুনতে পাই—"কী করছিলে সোনা? নিশ্চয় আমার কথা ভাবছিলে না? দেখি, চিবুকটা তোলো তো, দেখি কার কথা ভাবছো?" ইচ্ছে করছে ডাকবাক্স খুলে ঙ-র একটা বাদামী খাম পাই—"তোমার জন্য একা লাগছে"—ইচ্ছে করছে খ এসে চুপচাপ তাকিয়ে থাকুক—তার সেই প্রায় রমণীসুলভ প্রতীক্ষার চোখে। খ-র শান্ত চাহনি আমার মনে বল দেয়, ঙ-র চিঠির শিল্প আমার শিরায় শিরায় আগুন ধরায়, গ-এর দৃপ্ত আত্মবিশ্বাস, তার চতুরালি রোমে রোমে শিরশিরিয়ে খেলে বেড়ায়, তোমার উচ্ছ্বাস, তোমার লক্ষ্মীছাড়া হিসেবছাড়া আবেগ আমার চোখে জল আনে,—আর ঘ-এর সেই স্পর্শ, ওর হাতে যেন তার বাঁধা, যন্তরের মতো শত তারে সুরেলা বেজে উঠতো আমার অণু পরমাণু, ঘ-এর সেই মাতাল-করা ছোঁওয়া আমাকে স্মৃতিতে পাগল করে দেয়, খ-রেচারীর এসব কিছুই নেই, তার আছে শুধু দুর্বলের প্রধান অস্ত্র, বলহীনতার বল। কিন্তু বলহীনের তো আত্মায় অধিকার নেই! সে পেতে পারে স্বপ্ন। সে পেতে পারে শুধু দু'একটি খণ্ড মুহূর্তই। কিন্তু চিরকালের উপর অধিকার বর্তায় না বলহীনের। আমার আত্মার পূর্ণ অধিকার, আমার চিরকাল, আমি তাই দিয়ে দিয়েছি যীশুকে—যীশুই একমাত্র বলীয়ান পুরুষ, যীশুই প্রকৃত শক্তিমান, আমি কেবল তাঁরই।

কিন্তু তোমরা আমার নিয়ত সঙ্গী, আমার স্বপ্নে, আমার স্মৃতিতে, আমার ইচ্ছায় তোমাদের নিত্য রাজত্ব—এমনি বর্ষা হলে মনে হয় ঙ-র ঝাঁকড়া চুলে ভরা মাথাটা টেনে নিই বুকের মধ্যে, ইচ্ছে করে গ-এর সব ছিঁচকে চুরিকে আজ লাইসেন্স দিয়ে দিই, ইচ্ছে করে তোমার তৃষ্ণার্ত, লোভী ঠোঁটের মধ্যে উষ্ণ পানীয় হয়ে গলে যাই, ইচ্ছে করে খ-এর ভীরু হাতটা পাখির মতো আশ্রয় নিক আমার আবৃত শরীরের কোথাও, মনে হয় ঘ-এর ভারি ওজনের তলায় পিষে যাক আমার সর্বস্ব, আর টিনের ছাদে নূপুর বাজুক..নূপুর বাজুক, অনন্তকাল... এ ভালোবাসায় পাপ নেই, শুধুই পুণ্য... শুধু পুণ্যস্নান। আমার শরীর আমি তুলে রেখেছি, এবং আমার আত্মাও, পবিত্র যীশুর সম্পত্তি তারা, আমি আছি মাত্র প্রহরায়।

সকালে এই এক ঘণ্টা আমাদের নানারি-তে কেউ কথা বলে না। এটা সন্ন্যাসিনীদের মৌন ধ্যানের সময়। ওই যে ঘণ্টা পড়ছে, মঠের মেডিটেশন আওয়ার শেষ। এবার যাবো গির্জেতে, এখন মন্দির বসবে। এখন উপাসনা। এখন যীশুর কাছে যাওয়া। এই লগ্ন যীশুর লগ্ন। Husband, I come, I am fire and air/the

baser elements I give to baser life... হে প্রভু, হে পরমপতি, হে পরমাগতি। আমি তোমারই, কেবল তোমারই!

এই একান্ত শরণাপন্ন, নিতান্ত অবলা প্রাণীর পাপতাপ তুমি হরণ করো প্রভু। বিভ্রান্তি ও বিনষ্টি থেকে আমার আত্মাকে তুমি রক্ষা করো প্রভু। তোমার পবিত্র প্রণয়ের আকাঙ্ক্ষায় আমি পিপাসার্ত, আমায় তোমার কৃপাদৃষ্টির প্রাণজল দাও! এই শরণাগত এই দীনার্তের প্রতি প্রসন্ন হও। প্রভু, প্রসীদ, প্রসীদ, প্রসীদ।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

গল্পসমগ্র

৩

নবনীতা দেবসেন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সুপ্রকাশিনী
৮বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

সূ চি

খগেনবাবুর পৃথিবী এবং অন্যান্য

নিমন্ত্রণরক্ষা	১১
উত্তরাধিকার	৪১
হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ	৫৪
ধর্মভাই	৬৫
নোরার বাড়ি	৬৯
স্বপ্নের মতো	৭২
খগেনবাবুর পড়শী	৮৩
পত্রোত্তর	৯২
বামুন-মুচি-রাজা	৯৭
বারোজ 555	১০৪
কে. পি. ন্যানডি ফ্রম ক্রাইস্টচার্চ	১১০
ভরতকথা	১১৮
দেশে যাওয়া	১২৫
বঁ ভোয়াইয়াজ	১৩৫
খগেনবাবুর পৃথিবী	১৫৯

জরা হটকে এবং অন্যান্য

জরা হটকে জরা বঁচকে ইয়ে হ্যায় নোবেল, মেরি জান!	১৭৯
খুদা-ঈ-খিদমতগার	২০৬
ছোটবাবুর জমিদারী পরিদর্শন	২২৩
MRIয়মাণ	২৩০
কান্যকুব্জের রাত্রি	২৪৪
দেশের চিঠি	২৪৯
বাপ রে বাপ!	২৫৫

খগেনবাবুর পৃথিবী এবং অন্যান্য

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

নিমন্ত্রণরক্ষা

পরম পূজনীয়াসু দিদিভাই,

প্রথমেই আপনি ও মাসিমা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। পরে জানাই যে, আগামী ফাল্গুন মাসে আপনার এই ভাইয়ের বিবাহ স্থির হইয়াছে। এই উপলক্ষে শেষ পর্যন্ত আমরা সেই সেপটিক ট্যাঙ্কটি বানাইয়াছি, যাহার অভাবে অত্যন্ত প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এতকাল আপনাকে আমাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতে পারি নাই। ইহাই আমাদের অঞ্চলের পাঁচটি গ্রামের মধ্যে সর্বপ্রথম বিলাতী অর্থাৎ স্যানিটারি প্রিভি। আমাদের একান্ত ইচ্ছা যে আপনিই আসিয়া ফিতা কাটিয়া ইহার শুভ উদ্বোধন করেন। ফাল্গুনের ২৮শে আমি বিবাহ করিতে ষাঁড়াষাঁড়ি গ্রামে যাইব। ২৯শে বউ লইয়া আসিব, ঐদিন পাকস্পর্শ। ৩০শে ফুলশয্যা। আপনি তিনদিনই থাকিবেন। আমাদের গ্রামের বিবাহে যদিও বরযাত্রীতে সাধারণত মেয়েছেলেদের যাইবার চলন নাই, কিন্তু আধুনিক ব্যবস্থায় বরের ভগ্নীরা ও ছোটমেয়েরা বরযাত্রী যায়। আপনিও যাইতে পারিবেন। এখন আর কেহ কিছু বলে না। সবই চলিতেছে।

অতএব দিদিভাই, ২৭শে ফাল্গুন আপনি তুফানে আসিলে বরযাত্রী যাইতে পারিবেন। আপনাকে লইতে ২৭শে দুপুরে আমার কাকাবাবু শ্রী সর্বজয় সরকার গাড়ি লইয়া দুর্গাপুর স্টেশনে হাজির থাকিবেন। যদিও তিনি আপনাকে দেখেন নাই তবুও আমার বর্ণনা মাফিক চিনিয়া লইতে রাজি হইয়াছেন, গাড়ির ড্রাইভারের নাম দিলীপ মণ্ডল, গাড়ির নম্বর 4444। যদি আপনি অন্য কোন ট্রেনে আসিয়া কাকাকে দেখিতে না পান তাহা হইলে ট্যাক্সিস্টাণ্ডে যাইয়া দিলীপের খোঁজ করিবেন। বাবার নাম করিলেই (শ্রী ধনঞ্জয় সরকার) সে আপনাকে বাই-কার সরকারবাড়ি লইয়া আসিবে। উহা আমাদের গ্রামেরই গাড়ি। দিলীপ আমাদের প্রতিবেশী। অতএব দিদিভাই, আপনি চলিয়া আসিবেন, আপনার কোনোই অসুবিধা হইবে না। আমি সকলকে বলিয়া রাখিয়াছি আপনি এই বিবাহে স্বয়ং আসিবেন, সবাই আপনাকে দেখিতে ব্যাকুল। আর দিদিভাই, মাসিমাকে বলিবেন, মাসিমার কথামতোই আমি বরপণ লইতেছি না। নমস্কারী পঁচাত্তরটির স্থলে মাত্র পঁচিশটিতে নামানো গিয়াছে। কন্যাপক্ষ স্বেচ্ছায় কিঞ্চিৎ যৌতুক দিতেছেন। ঘড়ি, আংটি, বোতাম, ধুতি, চাদর, জুতা, ছাতা, লেপ, তোষক, খাট, আলমারি ইত্যাদি। বিজলীবাতি আসিলে রঙিন টিভি ও ফ্রিজ দিবে। এখন দিতে মানা করিয়াছি। বিজলীবাতি ঘরে এখনও আছে বটে কিন্তু তাহা ট্রেনলাইন হইতে টানিয়া আনা। উহাতেই আলো-পাখা চলে। টিভিও চলে। কিন্তু উহা আইনসম্মত নহে। গ্রামের লাইনটি এইবার আসিয়া পড়িবে।

আপনার পত্রের অপেক্ষায় রহিলাম। কাকাবাবু ২৭শে-র তুফান ধরিবেন। ২৭শে বিশ্রাম লইয়া ২৮শে আমাদের সহিত বরযাত্রী হইয়া ষাঁড়াষাঁড়ি যাইতে হইবে। কিন্তু দিদিভাই, খবর লইয়াছি যে ঐ গ্রামে কিন্তু স্যানিটারি প্রিভি নাই। সেক্ষেত্রে আপনি যদি বরযাত্রী যাইতে রাজি না হন, আমরা তাহা লইয়া জোরজবরদস্তি করিব না। কেননা, দিদিভাই, দেহের সুব্যবস্থা সর্বাগ্রে। আপনি আসিয়া ২৮শে আমাদের নূতন প্রিভির শুভ উদ্বোধন করিবেন বলিয়া, উহা কেহই ব্যবহার করি নাই। ২৭, ২৮ উভয়দিনেই ভাল লগ্ন আছে। আপনার যেদিন সুবিধা।

আর দিদি, কন্যার বিষয় বলি। স্কুল ফাইনাল পাশ করিতে পারে নাই বটে কিন্তু আরেকবার বসিতে রাজি আছে। আমি নিজ চোখে দেখি নাই, কিন্তু শুনিয়াছি, মন্দ নহে। আর কী লিখিব। বিনাপণে বিবাহ করার জন্য আপনার এই ভাইয়ের এই অঞ্চলে নিজ মুখে বলিতে নাই খুবই সুনাম হইয়াছে। বাড়িতে গুরুজনেরা অবশ্য প্রথমটা কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণমনা হইলেও যেহেতু ভগ্নীদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং শেষ পর্যন্ত অমত করেন নাই। যৌতুক কন্যাপক্ষ অবশ্য ভালই দিতেছে, আমরা ক্যাশ লইব না শুনিয়া। অবশেষে, দিদিভাই, কাকাবাবু দুর্গাপুর স্টেশনে নিশ্চয় থাকিবেন। কোনো কারণে সাক্ষাৎ না হইলে, দিলীপ ড্রাইভারকে ধরিবেন, 4444 নং ট্যাক্সি। সরকারবাড়ি বলিবেন। আপনি ও মাসিমা ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন। যদি দীপু, রঞ্জন ও ভাগ্নী দুইজনকে সঙ্গে আনিতে পারেন তবে তাহারাও বরযাত্রী যাইতে পারিবে। আমরা পাঁচজনকেই নিমন্ত্রণ করিতেছি অতএব পাঁচজনেরই বন্দোবস্ত থাকিবে। মাসিমা তো এই বিবাহে আসিতে পারিবেন না। উহা আমাদের সকলেরই দুর্ভাগ্য। পরে মাসিমার আশীর্বাদ লইতে উহার বৌমাকেই লইয়া কলিকাতা যাইতে হইবে। অবশেষে দিদিভাই, আপনারই জন্য স্যানিটারি প্রিভিটি তৈয়ারি হইল। দীপু ও রঞ্জনকে বলিবেন গ্রামে বরযাত্রী যাইবার অনেক মজা আছে। যেন উহারা অতি অবশ্যই আসে। ভাগ্নীরাও দুইজনাই ইস্কুলের ছুটি লইয়া অবশ্যই যেন আসে। দীপু, রঞ্জনকে প্রীতি ও ভাগ্নীদের স্নেহাশীর্বাদ জানাইবেন। মাসিমা ও আপনি প্রণাম লইবেন। ইতি আপনার স্নেহধন্য ছোটভাই, বিজয়।

হঠাৎ বিজয়ের চিঠি পেয়েই মনস্থির করে ফেলি। বিজয়ের বাড়ি যাব-যাব করে বছর দশেক কেটে গেছে। এবার যাওয়াটা হচ্ছে তা হলে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করতে থাকি। দীপু সদ্য চাকরি পেয়েছে, শনিবারের আগে ছুটি নিতে পারবে না। রঞ্জন যাবে সঙ্গে। পিকো-টুম্পার শুক্রবার ক্লাস টেস্ট না থাকলে সঙ্গেই যেত। কিন্তু ক্লাস টেস্ট না দিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। ওদের মন খুব খারাপ। বেনারসী শাড়ি কিনে আনলুম বিজয়ের বউয়ের জন্যে। মা বললেন, মা'র আশীর্বাদী বউ এলে মুখ দেখে দেবেন। এখন না। বাকীরা শুক্রবার সন্ধ্যায় যাবে।

তুফানেই রওনা হলুম দুর্গাপুর, ২৭শে বেস্পতিবার। মা পইপই করে বলে দিলেন, "গাড়িটা স্টেশনে যদি না থাকে, বাসে করে ঠেঙিয়ে দু'বার বাস-বদলি

করে সেই অজ পাড়াগাঁয়ে যাবে না। বাড়ি ফিরে আসবে।" আচ্ছা, গাড়িটা যে কেন থাকবে না, তা তো জানি না। মা'র যতো বিদঘুটে উদ্বেগ। দিলীপ ড্রাইভার। গাড়ির নম্বর 4444; কাকার নাম সর্বজয় সরকার। তুফানে যাচ্ছি। দেখা হবে না কেন? আলবৎ হবে। রঞ্জনটা বিশেষ কথা বলে না, খুব শান্ত ছেলে, দীপুর বিপরীত। রঞ্জন বললে, "সঙ্গে কিছু টাকাকড়ি আছে তো দিদি? বিজয়ের তো বিয়ের জন্যে ব্যস্ততা থাকবে—যদি কোনো ঝামেলায় পড়ো—"

"—যেমন আমার মা, তেমনি তুই। ঝামেলার প্রশ্ন ওঠে কেন? ঠিক যেমন ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে তেমনিই তো যাচ্ছি—এক যদি তুফান লেট হয়—তবু তো গাড়ি থাকবে।"

মা বললেন, "থাকলেই ভালো!"

দুর্গাপুরে নেমে রঞ্জন আর আমি হাসিহাসি মুখে আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইলুম। প্রথমে প্ল্যাটফর্মে, তারপর স্টেশনের সদরে সিঁড়ির মাথায়। সরকারবাড়ি থেকে কেউ মালাচন্দন নিয়ে এগিয়ে এলো না। ইতিমধ্যে আমি আর রঞ্জন অবশ্য মোট এগারোজন ভদ্রলোককে—

—"আপনিই বুঝি বিজয়ের কাকা?"

—"আচ্ছা, আপনার নাম কি সর্বজয় সরকার?"

—"আজ্ঞে, এই যে, আমরা এসে পড়েছি—"

—"নমস্কার, আমিই বিজয়ের দিদি, কলকাতা থেকে—" ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষাতে ও ভঙ্গিতে অ্যাপ্রোচ ও সলিসিট করেছি। এবং উত্তরে কখনো দুর্বিনীত— "না মশাই", কখনও বিনীত— "আজ্ঞে না", কখনও বিস্মিত—"তার মানে?" কখনও নির্বিকার নিরুত্তর অবজ্ঞা ইত্যাদি লাভ হয়েছে।

[কেউই অবশ্য বলেনি— "তাই বুঝি? বিজয়ের দিদি! বাঃ। বেশ তো, আমি কী করব?" বাঙালি খুব সভ্যজাতি।]

শেষে আমি নেমে স্টেশনের সামনের ট্যাক্সিস্ট্যাণ্ডে যাই। "এখানে দিলীপ মণ্ডলের গাড়ি আছে?"

অসামান্য উপকার হলো। "দিলীপ। দিলীপ। প্যাসেঞ্জার!" দিলীপ এসে পড়ে। কিন্তু মুখে মধুর অভ্যর্থনার হাসি কই? রাগী রাগী চোখ।

—"নমস্কার। আপনার গাড়ির নম্বর 4444?"

—"হ্যাঁ। তাতে কী হয়েছে?" কোমরে দুই হাত, চিবুক শূন্যে তোলা।

—"বড়গোঁসাইপুর গ্রামের গাড়ি তো?"

—"কে বলেছে?"

—"ও। বড়গোঁসাইপুরের গাড়ি নয়?"

"আমি কি নয় বলেছি?"

—"সরকারবাড়িতে বিয়ে আছে না—সেইখানে যাব।"

—" চারশো টাকা।"

BanglaBook.org

—"আজ্ঞে?"

—"চারশো।"

—"মানে?"

—"ওটাই রেট।"

এবারে রঞ্জন ফেটে পড়ে। "—বাজে কথা বলবেন না। চারশো টাকাতে আগ্রা যাওয়া যায়। বড়োগোঁসাইপুর, চারশো হুঃ—লোভের একটা সীমা থাকে।"

—"তা, যান না আগ্রা। বড়গোঁসাইপুর যাবার কী দরকার?"

—"আপনার গাড়ি সরকারবাড়িতে আমাকে নিয়ে যাবে বলে আমাকে জানানো হয়েছিল। সর্বজয় সরকারের স্টেশনে থাকার কথা ছিল। তুফান ধরতে।"

—আছে কি সে স্টেশনে?"

—"দেখছি না তো।"

—"আমিও দেখিনি।"

—"আপনার সঙ্গে ওঁদের কোন কথা হয়নি?"

—"হবে না কেন? অনেক কথাই হয়েছিল।"

—"যেমন?"

—"ওরা বলছে তিনশো। আমি চারশোর কমে করব না। আমি ওঁদের বরযাত্রীও নিয়ে যাচ্ছি।"

—"সে তিনশো/চারশো তো সারাদিনের জন্যে। বার বার যাতায়াতের জন্যে। আমাকে একবারটি শুধু বড়গোঁসাইপুরে নিয়ে যাবেন—আপনাকে তো যেতেই হবে ভাই সেখানে। আপনার বাড়িই তো বড়গোঁসাইপুরে?"

—"চারশো।"

—"ঠিক আছে। বাসে যাব।"

—"তাই যান। ঐ যে, বাসস্টাণ্ড।" দিলীপ বিড়ি ধরাতে-ধরাতে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দেন।

—"বড়গোঁসাইপুরের বাস কখন ছাড়বে?"

—"দু ঘণ্টা পরে। এই একটা গেল। ঐ যে, যাচ্ছে।"

—আর কোন বাস নেই?"

—"থাকবে না কেন? অনেক আছে? বড়গোঁসাইপুরের ডিরেক্ট নেই। বড়জোড়ায় চেঞ্জ করে আছে। বেলেতোড়ে চেঞ্জ করে আছে। বিষ্টুপুরে—"

—"ঠিক আছে। চেঞ্জ করে যেতে কতক্ষণ লাগবে?"

—"তা বলা শক্ত। কোন বাস কখন ছাড়ে।"

—"এখানে বাসের টাইমটেবিল নেই?"

—"এখানকার বাসের আছে। অন্য জায়গার বাস কখন ছাড়ে কী করে জানব? দেশসুদ্ধ সব বাসের টাইম আমরা জেনে কী করব?" কিন্তু এবারে রঞ্জন বাগড়া দিল। মাথা নেড়ে বলল, "উঁহু। দিদি, মাসিমা কী বলেছিলেন? গাড়ি না থাকলে

BanglaBook.org

বাসে চড়ে যাবে না। সোজা বাড়ি ফিরে যাবে। স্টেশনে ওদের একটা লোক পর্যন্ত নেই।" সত্যি, মা জানতে পারলেন কেমন করে? বাসে যে চেঞ্জ করে যেতে হবে তাও বলেছিলেন। মা কী করে আন্দাজ করলেন গাড়ি নাও থাকতে পারে? আমি যে-চিঠি পড়েছি, তিনিও সেই চিঠিই পড়েছেন। কিন্তু আমি যে তিনদিন ছুটি নিয়ে এসেছি। প্লাস রবিবার?—আমি বাড়ি যাব না। অতএব—"রঞ্জন, তুই ফিরে যাবি?"

—"তা তো যাবই। শনি রবিবার ফ্যাক্টরিতে যেতে পারব। দু দিন ছুটি বাঁচবে। তুমিও যাবে। দেখি, রাতের কী ট্রেন আছে।"

—"আজই? কাল গেলে হয় না?"

—"আজ না তো কি? এখানে দুর্গাপুর স্টেশনে রাত্তিরেও থাকতে ইচ্ছে নাকি তোমার? যদি বিজয়ের কাকা আসেন? পরের ট্রেনগুলো সব দেখবে?"

—"তা না। বন্দিতা সুনন্দারা আছে তো—অনেক করে আসতে বলে, আসা আর হয় না। চল, ওদের কাছেই ঘুরে যাই—কাল ফিরবো। কাল তো তোর ছুটি।"

—"বাঃ, কাল ফিরলে দীপু চলে আসবে না, পিকো-টুম্পাকে নিয়ে?" শুক্রবার ক্লাস টেস্ট হয়ে যাবার পর ওরাও আসছে দীপুর সঙ্গে। বিকেলবেলার ট্রেনে। গ্রামবাংলার উৎসব তো দেখা হয় না ওদের। বিয়েটা মিস হয়ে গেলেও, পাকস্পর্শে আর ফুলশয্যায় থাকতে পারবে। পিকো-টুম্পার ভীষণ উৎসাহ —সত্যিই একটা মূল্যবান অভিজ্ঞতা হবে ওদের। দীপুর ইচ্ছে ছিল বরযাত্রীও যাবার, ছুটি নেই অত। আমি মনে করেছিলুম বড়গোঁসাইপুরের সরকারবাড়িতে একবার পৌঁছে গেলেই হলো। ওদের জন্য আরেকবার দুর্গাপুর ইস্টিশনে লোক, কিংবা গাড়ি পাঠানো জলবৎ তরলং হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে কেস্ অত সহজ নয়। আগামীকাল রাত্তিরবেলা দুর্গাপুর পৌঁছে ওদের স্ট্যাণ্ডেড হয়ে যাবারই সম্ভাবনা, যদি চলে আসে।

—"আমি বরং থেকেই যাই রে, বন্দিতারা খুব খুশি হবে।"

—"হবে তো? তুমি ঠিক জানো? আমি বাবা চলে যাব।"

—"তুই যা। আমি থাকি। কাল বাচ্চারা এলে ওদের নিয়ে দু দিন হলিডে করে ফিরব।" রঞ্জন অতি সাবধানী।

—"কিন্তু সুনন্দাদিরা তো জানেন না, তুমি আসছ। যদি না থাকেন?"

—"থাকবে, থাকবে। ইস্কুল খোলা। যাবে কোথায় বড় দিদিমণি? থাকবে নিশ্চয়। ইস্কুলেই চলে যাব।"

—"চলো তবে, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।" রিকশাওলাদের অভিমুখে ধাবিত হই দুজনে। পিছনে শুনি দিলীপ ড্রাইভার টিপ্পনী কাটছেন—

—"রিকশা করে বড়গোঁসাইপুর চললেন? সামনের মাসে পৌঁছোবেন।"

রিকশাওলাকে বলি—"গার্ড ইশকুল।" চামেলিদি বন্দিতারা বলে দিয়েছে, দুর্গাপুরে বিভিন্ন মেয়েদের বিদ্যালয় আছে। ওদেরটাকে রিকশাওলারা বলে—"গার্ড ইশকুল"।

যেতে যেতে রিকশাওলা বলে—"ইশকুলেই যাবেন, নাকি দিদিমণিদের বাড়ি—?"

অবশ্যই এটা রঞ্জন এবং আমার কথোপকথন মন দিয়ে শোনার ফল।

—"বাড়ি গিয়ে কী হবে? দিদিমণিরা তো ইশকুলে, তার চেয়ে ইশকুলেই যাই।"

—"আজ গার্ড ইশকুলে বেজায় গণ্ডগোল।"

—"মানে?"

—"কি জানি কী হয়েছে। এস্তার ভিড়, চেঁচামেচি। দিদিমণিরা ঘেরাও হয়ে আছে।"

—"সে কি? কারা ঘেরাও করল? ইশকুলের মেয়েরা?"

—"এসবও হয় নাকি এখানে?"

—"মেয়েরা কেন করবে? ওখানকার মেয়েগুলোন অমন ধারা লয়। ও কম্মো কইলকেতার মেইয়েরা।"

—"তবে কে ঘেরাও করল?"

—"অতশত জানি না। মেইয়েরা লয়। ব্যাটাছেলে সব।"

—রিকশা পৌঁছোলো। সত্যি, ইশকুল শত শত পুরুষমানুষের দ্বারা ঘেরাও। ইশকুলের দিদিমণিদের এমন একাগ্র একচ্ছত্র অ্যাটেনশন এমন গুচ্ছ গুচ্ছ পুরুষমানুষ দিয়েছে কি আগে?

—"দেখি দাদা, একটু ভেতরে যাব"—আমি এগিয়ে যাই। রঞ্জন বসে থাকে রিকশায়। বেনারসীর পুঁটলি নিয়ে।

—"এখন ঘেরাও চলছে দিদিমণি, এখন আপনাদের ভেতরে যাওয়া বন্ধ। বাইরে আসাও বন্ধ।" বিনীত একটি ভদ্রলোক জানায়।

—"আমি এখানকার দিদিমণি নই। আমাকে যেতে দিন। এই ঘেরাওটা কী জন্যে হচ্ছে?"

"অ্যাডমিশন। জুনিয়ার থেকে হাইস্কুলে উঠতে নতুন করে অ্যাডমিশান টেস্ট নেওয়া চলবে না।"

—"অ। তা আমাকে যেতে দিন।"

"আপনি—?"

যথাবিনীত হেসে বলি—"রাইটার"...

—"ওরে, ওরে, ছেড়ে দে—রাইটার্স থেকে, রাইটার্স থেকে—" ভাগ্যিস মহাকরণের অন্য নামটি "রাইটার্স"।

ইংরিজি ব্যাকরণ একটু ভুলভাল হলো ঠিকই, নীতিগতভাবে সত্য-মিথ্যের ব্যাকরণও একটু গোলমাল হলো, ঠিকই। কিন্তু ঐ অশ্বত্থামা হত-ইতি গজটা তো হলো। অশ্বত্থামা নামে গজটি না থাকলে তো সেটা সম্ভব হতো না? লং লিভ "রাইটার্স বিল্ডিং"। "মহাকরণ"-এর দ্বারা এটি হতো না। একটি শব্দে ঠিক মন্ত্রের মতো কাজ হলো। (যদিও নেহাতই অপরিকল্পিত!)

BanglaBook.org

ভিড় সরে গিয়ে জনসমুদ্রের মধ্যে সরু পথ বেরুলো। আমি জিজ্ঞেস করলুম দরোয়ানকে—ফিসফিস করে— "সুনন্দাদি? চামেলিদি? বড়দিদিমণি?" দরোয়ানকে রীতিমতো বিচলিত দেখাচ্ছিল। সে তার টুলে না বসে, স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর ক'জন বেয়ারার সঙ্গে মিটিং করছে বলে মনে হলো। ঘেরাওটা বারান্দায় ওঠেনি। নীচের মাঠেই গিসগিস করছে। কোথাও কোনো ছাত্রী চোখে পড়ল না। দরোয়ান চোখ দিয়ে বারান্দার একদিকে দেখিয়ে দিল। আমি গুটিগুটি অনিশ্চিত পায়ে সেদিকে যেতে থাকি। ধুৎ—কোথায় গোঁসাইপুরে গিয়ে বরযাত্রীর নেমন্তন্ন খাবো, না দুগ্গাপুর গার্ড ইশকুলের বারান্দায় হাঁটি হাঁটি পা পা করছি। নিজের ওপর বেজায় রাগ হতে থাকে। মার ওপরেও। মা-ই তো আন্দাজ করতে পেরেছিলেন বিজয়ের বিয়েতে যাওয়া শেষ পর্যন্ত নাও হতে পারে। উপহার-টুপহার দেননি। গাড়ি না থাকলে কী করতে হবে বারবার বলে দিয়েছেন। যদি এতই জানতেন তবে আমাকে আসতে বারণ করলেন না কেন?

আর বিজয়ের ওপরে রাগ? থাক। দিলীপ ড্রাইভার যা বলল, তা যদি সত্যি হয়—

বন্দিতাদের দেখা গেল। একটা লম্বা ঘরের মধ্যে সবাই মিলে বসে আছে। সব টীচাররা একসঙ্গে। এইটেই বোধহয় টীচার্স কমনরুম। নাকি লাইব্রেরি? যাই হোক। কাচের দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে। সব দিদিমণিরই মুখ গোমড়া, কেউ হাসছে না। কথাবার্তা চলছে।

হঠাৎ করিডরে আমার আবির্ভাবে ঘরে সাড়া পড়ে গেল। গোমড়া মুখগুলি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বিস্মিত হাসিতে।

—ওঁরা আমাকে চেনেন। একবার এখানে পুরস্কার বিতরণের কুকর্মটি করতে এসেছিলাম। দেখি পেছনে পেছনে দরোয়ানও এসেছে। সে একটা দরজা খুলে আমাকে ঢুকিয়ে দিল। আমি ব্যাকুল হয়ে তাকে বললাম—"আমি কিন্তু আবার এক্ষুনি বেরুবো!" দরোয়ান বোদ্ধার মতো মাথা নেড়ে চলে গেল বলেই মনে হলো। ঘর থেকে তাকে দেখা গেল না। এদিকে কমনরুমে জীয়নকাঠির ছোঁওয়া—অকস্মাৎ একজন বাইরের লোকের অঘোষিত আবির্ভাবে। বন্দিতা ছুটে এল—"কিরে? কি কাণ্ড! কী ব্যাপার?"

—"তোদেরই তো কী কাণ্ড, কী ব্যাপার। কী হচ্ছে এখানে?"

—"দেখতেই পাচ্ছ, দিদিমণিরা ঘেরাও হচ্ছেন। তোকে ঢুকতে দিল যে?"

—"বললাম, রাইটার। ওরা শুনল রাইটার্স।"

—"রাইটার্স? সব্বোনাশ করেছে। এরপর আমাদের ধরবে যে, রাইটার্সের অনুমতি এসে গেছে কিনা"—

—"ট্যাক্সো-অফিসার অ্যাডমিশানের কী জানে?" ওদিক থেকে চামেলিদির গলা।

—"অ। তুমি অ্যাকাউন্টস দেখতে এয়েচো?" সুনন্দা হেসে ওঠে।

—"আমি তোমার বাড়ির চাবিটা চাইতে এসেছি—বড় টায়ার্ড"—

BanglaBook.org

—"আমরাও"—

—"তোদের কী উপায়ে মুক্তি দিতে পারি বলতো? লেটস থিঙ্ক আপ সামথিং ওদের বুঝিয়ে-সুজিয়ে—"

—"পারবে না। ওরা সবাই বাবা।"

—"বাবা?"

"মেয়েদের বাবা। যে মেয়েরা সিক্স থেকে হাইস্কুলে যাবে কিন্তু ভালো রেজাল্ট করেনি। তাদের বাবা।"

—"কতক্ষণ এটা চলবে?"

—"যতক্ষণ প্রোমোশান না দেয়া হয়।"

—"দেবেই যদি, তো দিয়ে দাও, চুকে যাবে ঝামেলা।"

—"সেটাই তো অক্ষমতা। আমাদের হাতে তো আর বোর্ডের আইনকানুন নেই। আমরা কি স্বেচ্ছায় নিয়ম ভেঙে নিয়ম তৈরি করতে পারি? বাবারা বুঝছেন না।"

"এ-ঘেরাও অন্যত্র করতে হবে। আমরা রং টার্গেট।"

—"সেটাও ওদের বলে দিলেই হয়।"

—"তুমি ভাবছো বলিনি?"

—"শুনছেন না?"

—"বিশ্বাস করছেন না।"

—"জলটল, চা-টা টিফিন-ঠিপিন আছে তো সঙ্গে?" মেলা চারিদিকে জলের বোতল, ফ্লাস্ক, টিফিনবাক্স টেবিলের ওপর ছড়ানো। এখনও তেমন বেলা বাড়েনি।

—"সব শেষ। আর আনাতে দেবে না।"

—"কী করছো তোমরা? এইখানে বন্দী হয়ে বসে বসে?"

—"এই—গল্পস্বল্প। মিটিং। বিতর্ক। যা যা করা হয়।"

—"দেখুন বড়দি—আমি এখানে থাকি না। আপনি জানেন আমি বাস ধরে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে যাবো—আমাকে এখুনি বেরুতে হবে, নইলে বাসটাস পাবো না -আপনি তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দিন এসব ঝঞ্ঝাট—", অন্য একটি কণ্ঠ ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে হঠাৎ।

"—ঐ যে। দ্যাখো, এই সব করছি।" তাপ্তী জানালো।

—"আপনিও চলুন না আমার সঙ্গে বেরিয়ে?" বন্দিতা ইতিমধ্যে হাতব্যাগ থেকে বাড়ির চাবি আমাকে দিয়ে দিয়েছে। আমি ভদ্রমহিলাকে বলি।

—"যেতে দিলে তো যাবো? বাবারা তো আমাকে চেনে। বিশ বছর পড়াচ্ছি এখেনে। যেতে দেবে কেন? ঘেরাও না-তোলা অবধি সবাই জেলে-পোরা।"

—"এটা তো অন্যায্য ঘেরাও, যা বুঝছি।" আমি বিচলিত হয়ে বলি।

—"ন্যায্য-ঘেরাওটা কী জিনিস, শুনি?" ধীরস্থির এক দিদিমণি গোল গোল চশমার ওপর দিয়ে তাকিয়ে আমাকে প্রশ্ন করলেন। সব চুল শাদা। এঁরা বিপাকে পড়েছেন সন্দেহ নেই, কোনো উদ্ধারের উপায়ও ভেবে পাননি। অথচ চেহারাতে বিন্দুমাত্র বিপন্নতা নেই। বেশ ডিগনিফায়েড।

BanglaBook.org

—"আমি কিছু করতে পারি? কাউকে ফোন-টোন?"

—"করা হয়েছে। ফোন লাইন বাবারা কেটে দেননি।"

—"সাহায্য আসছে?"

—"সেক্রেটারি আসছেন। চেয়ারম্যানকেও ধরার চেষ্টা হচ্ছে। দেখা যাক। চেষ্টাপাতি চলছে, চলবে।"

—"মিটে যাবে তা হলে শিগগিরই।" আমি 'আশার বাণী' শোনাতে চেষ্টা করি। অনিশ্চিত কণ্ঠে।

—"মিটে তো যাবেই। শিগগির হোক না হোক। এসব কি চিরকাল চলে? ওদের ঘরবাড়ি নেই? খিদে নেই?"

—"ধৈর্যের পরীক্ষা! দিদি! ধৈর্যের পরীক্ষা চলছে। কার কতক্ষণ সহ্য-ধৈর্য।" আরেক দিদিমণি বলেন মুখে পান গুঁজতে গুঁজতে—"আর, জেনে রাখবেন, মেয়েরা এতে পুরুষদের হারিয়ে দেবেই দেবে, এনি টাইম এনি প্লেস।" পান গোঁজার পর বাক্যটি সমাপ্ত করেন। —"আমরা চুপচাপ বসে থাকবো। দেখি কতক্ষণ চালাবে।"

—"থাকা ছাড়া কিছু করারও নেই। কোনোরকম যৌক্তিক আদানপ্রদান সম্ভব নয়। ওঁরা কিছুই শুনবেন না।"

—"কিন্তু আপনাদের শিক্ষক-অভিভাবক সম্মিলন হয় না?"

—"অতি নিয়মিতই হয়।" বড়দিদিমণি, বন্দিতা বলেন।

—"তবে?"

—"প্রথমত, এটা নিয়মবহির্ভূত। দ্বিতীয়ত, এটা ঠিক মিলনসভা নয়।" বড়দিদিমণির সুরটা বেঁকে যাচ্ছে।

—"তৃতীয়ত, এর নাম জুলুমবাজি—", বললেন ধীরস্থির শুভ্রকেশিনী। গোলগোল চশমার ওপর দিয়ে। তারপর, হেসে—

—"শিক্ষিকাদের মধ্যে এখানে কোনো রেষারেষি দলাদলি অনৈক্য নেই—এই রক্ষে। বন্ধ ঘরে ঝগড়াঝাঁটি অন্তত হচ্ছে না। আলোচনাই হচ্ছে।" যোগ করলেন।

—"অনেক জায়গায় দেখেছি এই সময়ে খুব অশান্তি হয় নিজেদের মধ্যেও। আমরা ফরচুনেট।" হঠাৎ ব্যস্তসুরে বন্দিতা বলে— "যাকগে, তুই বাড়ি যা। গিয়ে চা-টা তৈরি করে খা। এখানে আর থেকে কাজ নেই। হঠাৎ যে দুর্গাপুরে চলে এলি বড়? না বলে কয়ে? ছুটি নাকি?"

—"নাঃ। সে খুব্ লম্বা গল্প। তুই বাড়ি এলে বলব। রিকশাতে রঞ্জনটা বসে আছে। চলি।"

বেরিয়ে দেখি দরোয়ান দাঁড়িয়ে।

—"কুছু হলো, দিদিমণি?"

—"নাঃ, সেক্রেটারি আসুন আগে"—বেশ জানিয়ে শুনিয়ে, 'ভেতরের লোকের' মতো বলি।

BanglaBook.org

—"আপনি এখুন সেক্রেটারিবাবুর কাছে যাইবেন?"

—"দেখি, কী করা যায়।"

—"কী হলো, দিদি, কী হলো?" বাবারা ঘিরে ধরেন।

—"কী আর হবে? কিছুই হলো না। আপনারা তো ঘেরাও করে রেখেছেন। এর মধ্যে কি কাজকর্ম কিছু হয়? আবার একদিন আসতে হবে। আমি অ্যাকাউন্টসের লোক।"

—"অঃ। অ্যাকাউন্টস।"—"কেন, কেন, তাতেও গোলমাল নাকি?" হিসেব গোলমালের সম্ভাবনায় বাবারা যেন উৎসাহিত।

—"না। গোলমাল তো কিছু শুনিনি।" আমি ওঁদের উনুনে জল ঢেলে দি। "এমনি রেগুলার ভিজিটেই এসেছিলাম—"

বাবাদের ইন্টারেস্ট চলে গেল।

রিক্সাওলার অবিরাম পঁক পঁক পঁক পঁক হংসধ্বনি সত্ত্বেও মনে হলো রঞ্জন ঘুমোচ্ছে।

বন্দিতার বাড়িতে গিয়ে ফ্যান খুলে চায়ের জল বসালুম।

ওরা ফিরলো সন্ধ্যাবেলায়।

সেক্রেটারি এসেছিলেন। চেয়ারম্যান আসেননি। যা হোক, একটা কথাবার্তা হয়েছে। বাবারা যে যাঁর বাড়ি চলে গেছেন। চামেলিদি, বন্দিতা, সুনন্দা, তাপ্তী—চারজনেই ক্লান্ত। উত্তেজিতও। অনেক রাত অবধি এই ঘেরাও নিয়ে গভীর আলোচনা হলো। বিজয়ের বিয়ে, দিলীপের গাড়ি নং 4444, এসব যেন খানিকটা অনুজ্জ্বল হয়ে পড়ল। রঞ্জন ফিরে গেল পরদিন বিকেলের গাড়িতে। ওদের ফ্যাক্টরি শনি-রবি খোলা। ছুটি নিতে হবে না মিছিমিছি। ইতিমধ্যে বন্দিতাদের জানিয়েছি আগামীকাল পিকো-টুম্পা-দীপু আসবে। সন্ধ্যার ট্রেনে। আমিই স্টেশন থেকে ওদের নিয়ে আসবো। সুনন্দা বললো, সেও যাবে। বড়দিদিমণির যদিও কাজকর্ম থাকে, সুনন্দার অত কাজ নেই।

তাপ্তীর একটা ছাত্রী আসবে, সার্টিফিকেট নিতে। চামেলিদি রান্না করে খাওয়াতে ভালোবাসেন—চামেলিদি রান্না করবেন। পিকো-টুম্পা-দীপু আসবে শুনে সবাই উল্লসিত। চার বন্ধুর চার চারটে কোয়ার্টার। উটকো অতিথিকে ঠাঁই দিতে তাদের অঢেল জায়গা।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা সুনন্দা আর আমি স্টেশনে গিয়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি। আছি তো আছিই, ট্রেনের আর আগমনের লক্ষণ নেই। আমি বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারি না। বেঞ্চি-টেঞ্চি নেই। একটা লম্বা চ্যাপ্টা লোহার গাড়ি-মতন রয়েছে। তার ওপরে বসে রইলুম। দুজনে। দিব্যি সন্ধ্যা নামিছে মন্দ্র মন্থরে। স্টেশনটাকে মন্দ লাগছে না—প্ল্যাটফর্মের এখানটাতে একদম প্রাণচাঞ্চল্য নেই। আরও একজন লোক এই গাড়িটার উল্টোদিকে বসে আছেন। তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন—"এবার একটু উঠতে

BanglaBook.org

হবে—গাড়িটা লোডিং হবে। এতে মেলব্যাগ উঠবে কিনা?"— আমরা তড়িঘড়ি লাফিয়ে উঠে পড়ি। উনি বলেন, "না না, অত তাড়া নেই। গাড়ি লেট আছে।" আমার স্বভাব রাস্তার লোকের সঙ্গে সেধে সেধে গল্প করা। ছোটবেলা থেকে বকুনি খাচ্ছি এ জন্যে, এখনও সারেনি বদভ্যাস।

—"আপনি বুঝি পোস্টাপিসে কাজ করেন? নাকি রেলে?"

—"ঐ দুটোতেই বলতে পারেন। এই ইস্টিশনের পোস্টাপিসে। আপনি বুঝি গার্ড ইশকুলে নতুন এলেন?"

আমি চমকে উঠি। গার্ড ইশকুলের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ইনি জানেন কী উপায়ে? উনিও বোধহয় বুঝলেন।

—"ওই সঙ্গে সুনন্দাদি আছেন কিনা? উনি তো অনেকদিন গার্ড ইশকুলে।" সুনন্দা হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে আমার পরিচয় দিতে শুরু করে দেয়—

—"না না, উনি তো লেখক। উনি কলকাতায় থাকেন। আমাদের এখানে প্রাইজ দিতে এঁকে এনেছিলাম একবার—অমুক সালে, যে বছর তিন বছরের প্রাইজ একসঙ্গে দেওয়া হলো? তিনদিন ধরে প্যাণ্ডাল বেঁধে খুব উৎসব"—

—"সেবার তো নবনীতা দেবসেন এসেছিলেন? ওই কুম্ভমেলার লেখিকা? জাহ্নবী যমুনা?"

আমি নিজের নাম শুনে কী খুশি। আহা! (একে বলে স্বনাম-ধন্য! হলেই বা বইয়ের নাম ভুল।) আহ্লাদে গলে গিয়ে বলি—"আজ্ঞে, আমিই তখন এসেছিলাম। কুম্ভমেলার বইটার নাম জাহ্নবী যমুনা নয়, করুণা—"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। "বিগলিত করুণা!"

—"আজ্ঞে না। নামটা হচ্ছে করুণা—"

—"স্যরি স্যরি, 'করুণাধারায় এসো' তো? শারদীয় দেশে বেরিয়েছিল, আমি তখনই পড়েছিলাম। দারুণ লেখা। আপনিই সেই নবনীতা দেবসেন। মহাসৌভাগ্য! —আমি আপনার ফ্যান—" (আরে, সৌভাগ্যটা তো আসলে আমারই! কে জানতো দুর্গাপুর ইস্টিশানের প্ল্যাটফর্মে সূর্যাস্তের গোলাপী হলুদ মায়াবী আভায়, লোহার মেল-ট্রলির ওপরে একজন এমন আস্ত ফ্যান বসে আছে?) সুনন্দার গর্বোদ্ভাসিত মুখটি দেখে মন ভরে গেল। আমি, "এ আর এমন কি—এমন ফ্যান তো আকচার মেল-ট্রলিতে বসেই থাকে",—এমনি মুখে দূরে সিগন্যাল পোস্টের দিকে চেয়ে থাকি। উদাস-উদাস। লেখক-লেখক ভাব করে।

—"আমার নাম শ্যামসুন্দর গাঙ্গুলি, আমি নিজেও একটু লিখি-টিখি। তবে সে কিছু না। পড়িই বেশি। আপনার সঙ্গে আলাপ হবে কখনো ভাবিনি। সেবার এসেছিলেন শুনেছিলাম, আমাদের মাস্টারমশায়ের মেয়ে ওখানে পড়ে তো—কিন্তু আমরা কেউ যাইনি। কপালে আছে, চেনাশুনো হওয়া, ঠেকাবে কে?"—শ্যামসুন্দর গাঙ্গুলি বেশ খোলা গলায় হাসেন। আমি এসব ভাল ভাল কথা স্বকর্ণে শুনে যদিও মনে মনে খুশি হচ্ছি, কিন্তু আবার খুব অস্বস্তিও হচ্ছে। তাই কথা ঘোরাতে বলি—

BanglaBook.org

—"আপনি বুঝি দুর্গাপুরেরই লোক?"

—"নাঃ, আমরা দুর্গাপুরের নই। দুর্গাপুরে যারা কাজ করে তারা প্রায় কেউই দুর্গাপুরের নয়। এ তো একটা নতুন, উটকো জায়গা। আমাদের গ্রাম বহু পুরনো। সেই গ্রামের টেরাকোটা মন্দিরের কথা অমিয়বাবুর বইতে আছে। আপনি নিশ্চয় পড়েছেন অমিয়বাবুর বই। এক সাহেবও গিয়েছিলেন আমাদের গ্রামে, মন্দিরের অনেক ফটো তুলেছিলেন, ইতিহাস জেনেছিলেন। নামটা ঠিক মনে করতে পারছি না, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর।"

—"ডেভিড ম্যাকাচ্চিওন? তিনি যাদবপুরের অধ্যাপক ছিলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নয়।"

—"ওই হলো। মোট কথা বিলেতের নয়, কলকাতাতেই কোনো ইউনিভার্সিটিতে কাজ করতেন। ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি। খুব সিম্পল লোক।"

—"আপনাদের গ্রামটা কোথায়?"

—"এই তো, বেশি দূরে নয়, বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট নয় অবশ্য। বাঁকুড়া যাবেন নাকি, মন্দির দেখতে? প্রচুর টুরিস্ট আসে আমাদের গ্রামে।"

—শ্যামসুন্দরবাবু একটা বিড়ি ধরান।

আমি একটু সরে বসি।

শ্যামসুন্দরবাবু খেয়াল করেন না। মহা উৎসাহে বলতে থাকেন।

—"আপনি তো খুব অ্যাডভেঞ্চারাস লেডি, যেভাবে কুম্ভমেলায় গেছেন—আমাদের গ্রামে আসা তো জলভাত। আমি তো প্রতিদিনই যাতায়াত করি।"

—"কীভাবে যেতে হয়?"

—"আমি তো সাইকেলে বাসস্ট্যাণ্ডে আসি। একটা দোকানে সাইকেলটি রেখে, বাসে করে সোজা দুর্গাপুর ইস্টিশান। ব্যাস। নো প্রবলেম। আপনাদের তো তা হবে না। আপনাকে রিকশা নিতে হবে। বড়জোড়া থেকে আসুড়ে দিয়েও যেতে পারেন আমাদের গ্রাম দুর্জয়পুরে—আবার জামবনী থেকে গোদারডি দিয়েও যেতে পারেন—দধিমুখা-দুর্জয়পুর সবাই চেনে। শ্যামডাঙার গায়েই। মস্ত মন্দির আছে দুর্জয়পুরে। দধিমুখার রাসমন্দিরের তো মেলার জন্যে নাম। দুর্জয়পুরের শিবমন্দির আর্টের জন্যে বিখ্যাত। এই দুর্জয়লিঙ্গ হিমালয়ের দুর্জয়লিঙ্গের সঙ্গে অবিকল একরকম। অথচ কোথায় সেই হিমালয়, আর কোথায় আমাদের বাঁকুড়া। টেরাকোটার যা কাজ না দিদি, একেবারে একসেপশনাল। ওটা না দেখে আপনার ফিরে যাওয়া উচিত নয়। জগন্নাথপুরের শিবমন্দিরের নাম সব্বাই জানে, পাতাল থেকে নাকি পুকুরসুদ্ধ মন্দিরটা উঠেছিল সত্যযুগে—কিংবদন্তিতে বলে—(অর্থাৎ গুল আর কি)— মনে হয় আসলে দ্বাদশ শতাব্দীর তৈরি। আমাদের দুর্জয়পুরের মন্দির আরও প্রাচীন। নবম কি দশম শতাব্দীর হবে—অতটা সূক্ষ্ম কাজ নয়। আরো প্রাচীন তো, আরেকটু রাফ। মোটা কাজ। নষ্ট হয়েছে ওয়্যার অ্যাণ্ড টেয়ারে, জলবায়ুর অত্যাচারে। ছবিসুদ্ধ ডিটেল পাবেন অমিয়বাবুর বইতে। মন্দিরময় বাংলার প্রামাণ্য গ্রন্থে।"

BanglaBook.org

সুনন্দা হাঁপিয়ে উঠেছে। দেখতে পাচ্ছি ইতিহাসের দিদিমণির এসব এলোমেলো তারিখ উল্লেখ করা একদমই সহ্য হচ্ছে না। শ্যামসুন্দরের অনির্বাণ উদ্দীপনা—

—"চলুন না দিদি, এই রবিবার? আমার ছুটি আছে—আমি বাড়িতেই থাকবো। আপনি যদি যান, পুকুরে জাল ফেলবো। যত ইচ্ছে মাছ খাবেন। আমাদের তো ঐ জমির চাল, আর পুকুরের মাছ। ফসল বলতে কেবল এই। ভগবানের দয়ায় না ধান না মাছ—আমাদের কিনে খেতে হয় না। ঠাকুর আমাদের মাছ-ভাতে রেখেছেন। বাঁকুড়ায় লোকে বলে পোস্ত দিয়ে ভাত খায়, আমরা খাই মাছ দিয়ে। রবিবার যাবেন দিদি? নিজের চোখেই দেখে আসবেন— মন্দিরও দেখা হবে—মাছভাজা দিয়ে গরম গরম দুটি ভাতও খেয়ে নেবেন ছোট ভাইয়ের বাড়িতে।"

"থাক। আর অমন করে বলবেন না মশাই। এ মেয়ে এক্ষুনি যাবার জন্যে নেচে উঠবে।— অত মাছভাজার লোভ দেখালে আমরাও চলে আসবো।" সুনন্দা বলে। "উঃ। ট্রেনটা আর কত লেট করবে?" শ্যামসুন্দরবাবুকে ওর পছন্দ হচ্ছে না।

—"আচ্ছা কেমন করে যেতে হয় আপনাদের বাড়ি? আমাকে ডিরেকশনটা দিয়ে দিন। তো, আমি ভাবছি চলেই যাবো রবিবার। আপনার বাড়ির মাছ খেতে। কিন্তু একা নয়, তিন-চারজনকে মাছ খাওয়াতে পারবেন তো?" অট্টহাস্য করেন একথা শুনে শ্যামসুন্দরবাবু। "চা-র-ঝ-ন। এটা একটা সংখ্যা হলো? সেদিন শ্যামডাঙার মুখুজ্যেদের বিয়েতে দেড় কুইন্টাল মাছ সাপ্লাই করেছি। চলে আসুন রবিবার।"

—"কী করে যেতে হয় বলে দিন। ক'টার সময় যাবো?"

"—যতটা সকাল সকাল পারেন চলে আসবেন দিদি। অনেক পথ মাঠ ভেঙে রিকশো করে যেতে হবে তো রোদের মধ্যে? সে জামবেদে দিয়েই যান আর বড়জোড়া দিয়েই যান, মাঠ পেরিয়ে যেতে হবে। দু'খানা গাঁ বাদে দুর্জয়পুর। রিকশোওলাদের আপনি বলবেন দুর্জয়পুরে সুবোধ ডাক্তারের ডিসপেনসারি। সেইখানটা সবাই চেনে। সুবোধ ডাক্তারের ওখানে জিজ্ঞেস করলেই আমাদের বাড়ি পৌঁছে দেবে। আমার নাম করবেন। দুর্গাপুর স্টেশন থেকে বড়জোড়ার বাস নেবেন, কিংবা জামবেদের —ওই একই রুট—নেবেই রিকশো পাবেন। জামবেদে দিয়ে, গোদারডি পেরিয়ে, গোদারডির গোঁসাইবাড়ি খুব প্রসিদ্ধ, ওখানে গোঁসাইদের মুখের কথা নাকি সব ফলে যেতো, যা বলত, তাই সত্য হতো—ঠাকুরের বর ছিল। সে আমাদের বাপজ্যাঠারা স্বচক্ষে দেখেছেন। আমরা অবিশ্যি দেখিনি। গোঁসাইবাড়ির রাধাগোবিন্দ মন্দিরও দেখবার মত। সেটাও পথে থেমে দেখে নিতে পারেন। দধিমুখার রাসমন্দিরের মেলার কথা তো জানেনই। দধিমুখা দিয়ে ঘুরে এলে একটু ঘুর হবে ঠিকই, কিন্তু প্রসিদ্ধ রাসমন্দিরটা দেখা হবে। নইলে শ্যামডাঙা দিয়ে শর্টকার্ট। শ্যামডাঙ্গা দিয়ে দুর্জয়পুরে সুবোধ ডাক্তারের ডিসপেনসারি। তারপর আমি আপনাদের চার্জ নিয়ে নেবো। এককাজ করুন—সোজা দুর্জয়পুরেই চলে আসুন, গোদারডি শ্যামডাঙা হয়ে। গোঁসাইবাড়িটা

BanglaBook.org

দেখে। ফেরার সময় আমিই আপনাদের দধিমুখার রাসমন্দির দেখিয়ে দেবো, বেলা পড়লে। দুপুরের মধ্যে সব হবে না। দুপুরে ভাত-মাছ খেয়ে একটু গড়িয়ে নেবেন গরীবের বাড়িতে। আপনাদের সেবা করতে পেলে বৌমা খুব খুশি হবে। বৌমা ক্লাস টেন অবধি পড়েছে। শ্যামডাঙা, গোদারডির লাইব্রেরি থেকে বই এনে দিতে হয় ওকে। বড় লক্ষ্মী মেয়েটি।"

—"আপনার ছেলের বিয়ে হয়ে গেছে?" একটু অবাক হই।

—"ছোট ভায়ের বউ। আমি বিয়ে থা করিনি দিদি। এই দিব্যি আছি। বুড়ো বাপ-মা অবিশ্যি এখন পেছনে লেগে আছেন—আমাদের দেশে তো ব্যাটাছেলের বিয়ের বয়স পেরোয় না। কিন্তু আমার ইচ্ছে নেই সংসার করতে।" ইতিমধ্যে কুলিরা এসে শ্যামসুন্দরবাবুকে তাড়া দেয়। সিগন্যাল পড়েছে। ট্রেন আসছে। মেলব্যাগগুলো ভরতে হবে, ট্রলি চাই। আমরা উঠে পড়ি।

—"ঠিক আছে। রোববার দেখা হচ্ছে তাহলে।"

—"আমি সবাইকে বলে রাখব। কিন্তু আপনারা হচ্ছেন কলকাতার নামকরা লোক, আপনারা কি আর কথা রাখবেন?"

—"দেখতেই পাবেন রোববার দিন দুপুরে।"

হৈ হৈ করে পিকো টুম্পা দীপু এসে পড়ল। বিয়েবাড়ির জন্যে রেডি। স্টেশনে আমাকে দেখে ভূত দেখার মতো। অবাক। তেমনি খুশিও সবাই।

—"আরে! মা! তুমি? তুমি যাওনি বরযাত্রী?"

—"অ, দিদি বুঝি ষাঁড়াষাঁড়ি গ্রামে স্যানিটারি ইন্সপেক্টর বলিয়া দুর্গাপুরেই বসিয়া আছেন? রঞ্জন গেছে?সুনন্দাদি—আপনারা বুঝি দিদিকে ছাড়েননি, সুনন্দাদি—"

—"চল চল বাড়ি চল, সব বলছি।"

—"বাড়ি? এখন আপনাদের বাড়ি গেলে আর বিয়েবাড়ি যাব কখন? বিজয়দের গাড়ি এসেছে? না এলে বাসেই মেরে দেব।" দীপুর উৎসাহের শেষ নেই। কিন্তু টুম্পা টুকটুক করে বলল—"দিম্মা বলে দিয়েছেন গাড়ি না থাকলে আমরাও যাব না। মাও যাবেন না।"

পিকো বলল—"বাসে আমার ভীষণ কার-সিকনেস হয়। দিম্মা সেজন্যেই বারণ করেছেন। মারও হয়। আমরা পারব না।" টুম্পা ঠিক জানে না ওরও কার-সিকনেস হয় কি হয় না। ও মাত্র ক্লাস থ্রিতে পড়ে। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল। দীপুর তাতে কুছ পরোয়া নেই।

—"তোরা থাকবি। আমার ওসব হয় না। আমি বাসে করেই যাব। রঞ্জন কী করে গেল? ও তো বরযাত্রী গেছে নিশ্চয়।" দীপুর গলায় একটু হিংসের ছোঁয়া।

—"বাড়ি চল, সব শুনবি"— সুনন্দা আবার বলে। এতক্ষণে আমরা রিকশা স্ট্যাণ্ডে এসে গেছি। দীপু চলল সোজা বাসের দিকে।—"ও ভাই, কোন বাসটা

BanglaBook.org

বড়গোঁসাইপুর যাবে?"— একটু পরে এসে জানালো, কোনো বাসই বড়গোঁসাইপুর যাবে না। হয় বড়জোড়া দিয়ে, নয় বেলেতোড় দিয়ে যেতে হবে বাকুলিয়াতে। সেখান থেকে বড়গোঁসাইপুরের বাস ধরতে হয়।"

—"বেশ তো, তাই যা।" আমরা বলি।

—"রঞ্জন কলকাতা ফিরে গেছে।"

—"সে কী? তোমরা সেই কথাটাই এতক্ষণ বলনি আমাকে? আশ্চর্য।"

—"বলবটা কখন? সময় দিয়েছিস? এসেই তো বাস-বাস করে লাফাতে শুরু করেছিস। বলছি বাড়ি চল, সব বলব—যাচ্ছিস কি বাড়ির দিকে?" সুনন্দা শান্তভাবে ধমক দেয়। আমরা প্রসেশন করে দুটো রিকশায় পাঁচজন রওনা হই। পিকো টুম্পা এসেই মার সঙ্গে সেঁটে গেল। সুনন্দা বাড়ি পৌঁছবার পথেই দীপুকে সর্বজয় সরকার, দিলীপ মণ্ডল, তিনশো টাকা ও চারশো টাকা বিষয়ে পুরো ওয়াকিবহাল করে দিল। এবং গার্ড ইশকুল ঘেরাওতে রাইটার্সের অ্যাকাউন্টেন্ট দিদিমণির আগমন—কিছুই বাদ গেল না।

বাড়িতে পৌঁছে ভালো করে চা-সিঙাড়া খাওয়া হচ্ছে, চামেলিদি ডিমের সিঙাড়া বানিয়েছেন, বন্দিতা দারুণ একটা চা কিনে এনেছে। গন্ধে পাড়া ভুরভুর। সুনন্দা তাপ্তীকে বলল—"নবনীতা আবার একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে এসেছে।"

—"কিসের গণ্ডগোল? কিসের গণ্ডগোল?"

—"উনি রবিবার প্রথমে বাসে করে, তারপর রিকশায় করে মাঠ ভেঙে, তিনটে গ্রাম ডিঙিয়ে একটু মাছ-ভাত খেতে যাবেন ওঁর প্রাণের বন্ধুর বাড়িতে। মাছ-ভাত তো এখানে খেতে পাচ্ছেন না!"

—"কি আশ্চর্য। শুধু খাওয়াটার কথা বলনি? আসল কথাটা বললি না? টেরাকোটার মন্দির? দুর্জয়পুর গ্রামে দুর্জয়লিঙ্গের মন্দির আছে জানিস? অসামান্য মেডিঈভ্যাল মন্দির—তার কাছেই দধিমুখা গ্রামে রাসমন্দির আছে, বছরে দু'বার বিরাট মেলা বসে। আর গোদারডি গ্রামে গোঁসাইবাড়ি আছে, খুব প্রাচীন ভক্ত জমিদারবংশ। তাদের রাজপ্রাসাদ আর রাধাগোবিন্দ মন্দির, এইসব দেখতে যাবো। আরও আছে—জগন্নাথপুরের শিবমন্দির আর পুকুর—"

—"না। সেটা ওদিকে নয়। সেটা রোববার হবে না। এইরকম ক্লিয়ার সেন্স আর ডিরেকশন নিয়ে তুমি যাবে? জগন্নাথপুর একদিকে, দধিমুখা অন্য একদিকে। তোমার বন্ধুর বাড়িটা বলল শ্যামডাঙার কাছে, সেটা দধিমুখার দিকে। জগন্নাথপুর পিকচারে নেই।" সুনন্দা বলে। "আবার মেয়েগুলোকেও নিয়ে যাবার ইচ্ছে।"

—"আমরাও যাঁবো, আঁমরাও যাঁবো।" মেয়েরা নেচে উঠল। "একটা গাড়ি ভাড়া করা যায় না?"—দীপু।

—"গাড়ি?" আমি আঁতকে উঠি। "এই শুনলি চারশো টাকা। গাড়ির নাম করবি না। গাড়ি ভাড়া করতে পারলে তো আমি বড়গোঁসাইপুরেই চলে যেতুম। কিংবা ষাঁড়াষাঁড়ি। না—আমি বাসে করেই যাবো। ভদ্রলোককে কথা দিয়েছি। উনি বাড়িতে

বলে রাখবেন। না গেলে ওঁর মুখ ছোট হবে না? তোমরা কেউ না যাও আমাকে তো যেতেই হবে।"

—"এটা ব্যক্তিগত নীতির প্রশ্ন।" বন্দিতা বলে। "তুই শেষ পর্যন্ত যাবি কিনা, তোরই সিদ্ধান্ত। আমাদের অভিমত আমরা জানাচ্ছি। নেগেটিভ।" পিকোটুম্পার কিন্তু পজিটিভ মত দেখা গেল। আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে আড্ডায় মজে গেলুম।

বিজয়ের বিয়েবাড়িতে যেতে না পারার দুঃখ কিছুটা ভুলতে শেষ পর্যন্ত রবিবারের এক্সপিডিশনে যেতে দীপুও রাজী হলো। সুনন্দা, বন্দিতাদের কিছুতেই দলে টানা গেল না।—"না বাবু, আমরা চামেলিদির হাতের রান্না খেয়ে রবিবার মজাসে আড্ডা মারব, নিদ্রা দেবো, তোমরা যাও এই চোতমাসের রোদে মাঠে মাঠে ঘোরো গে।" —বন্দিতার সোজা কথা।

—"চোত কোথায়? আজও পর্যন্ত ফাল্গুন।"

—"কাল থেকে চৈত্রমাস। ক্যালেণ্ডার দেখে রোদ উঠবে তো?"

রবিবার সকালবেলা রিকশার সারিতে রীতিমতো শোভাযাত্রা করে রওনা হলুম। বন্দিতা, সুনন্দা, চামেলিদিও এলেন বাসে তুলে দিতে। বাসস্টাণ্ডে পৌঁছে দেখি জামবেদের বাস ছাড়তে দেরি আছে কিন্তু বড়োজোড়ার বাস ছাড়বার মুখে। বন্দিতা বললে— "জামবেদে দিয়েই যা, বাসে অনেক জায়গা, লোকজন ওঠেনি।" সুনন্দা বললে-- "কখন ছাড়বে, রোদ্দুর বেড়ে যাবে, তার চেয়ে চলে যাওয়াটাই ভালো, রোদে কষ্ট কম হবে।" আমরা চলে যাওয়াই স্থির করে বড়জোড়ার বাসে উঠে পড়ি। কী ভিড়।

আমি তবু টুম্পাকে কোলে নিয়ে বসে পড়লুম, পিকো আর দীপু দাঁড়িয়ে। দীপু অবশ্য ওঠার আগে আবার বেশ গাঁইগুঁই শুরু করেছিল। বন্দিতাদের সঙ্গে দুর্গাপুরে ফিরেই যেতে চাইছিল। কিন্তু জোর জবরদস্তি করে চামেলিদি ওকে সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। "কোথায় না কোথায়, কার না কার বাড়ি যাচ্ছে, একদম চেনে না, শোনে না, বাচ্চাদুটো বগলে নিয়ে—তুই তবু তো একটা ছেলে, সঙ্গে থাকলে গাঁ-গঞ্জে মান্য করবে—একা মেয়েদের গাঁ-গঞ্জে মানতেই চায় না। এ তো দিল্লি বম্বে না।"

—"তুই তবু তো একটা ছেলে" যে দারুণ কোনও "মাচো" কমপ্লিমেন্ট নয় তা জেনেও দীপু যেতে বাধ্য হলো, যেহেতু বন্দিতা, সুনন্দা সবাই চামেলিদির দলে। অতএব পুং-গার্জেনের ভূমিকায় বাধ্যকরী অবতীর্ণ হলো সেই বেচারা, যে-পার্টে একদম অভ্যস্ত নয় সে। তার গার্জেন, তার ভয়ঙ্করী দিদি সঙ্গেই আছে। তবে নাকি গাঁ-গঞ্জের ব্যাপার আলাদা। দেখা যাক। বাস চললো। বাসের অতি প্রবল ঝাঁকুনি এবং ভিড় সত্ত্বেও সকালের বাতাস আসছে জানলা দিয়ে। দুর্গাপুর ব্যারাজ পেরিয়ে দামোদরের অন্য পারে উপস্থিত হলো বাস ঝক্কড় ঝক্কড় করতে করতে। নদীর হাওয়া তবু লেগেছিল গায়ে। টুম্পা কোলে বসে ঘুমোচ্ছে। পিকো ঝুঁকে জানলা

দিয়ে দেখছে। দীপুকে দেখা যাচ্ছে না। সে আমাদের কাছাকাছি নেই। আমরা জেনেছি, বড়জোড়া দিয়ে গেলে, ঘুসতোড়া, শালডিহি, পালামপুর হয়ে দুর্জয়পুরে যাওয়া যাবে। অথবা বাঁধকানা দিয়েও যাওয়া যায়—সেই গোদারডি, দধিমুখা, শ্যামডাঙা।

কিন্তু দুর্লভপুর বলে একটা জায়গায় পৌঁছে বাস আমাদের সব্বাইকে ঘাড় ধরে নামিয়ে দিলে। সে নাকি খারাপ হয়ে গেছে। পরের বাসে উঠিয়ে দেবে। কপালে আছে জামবেদের বাস। সেই বাসটাই এল, অনেকক্ষণ পরে। ততক্ষণে রোদ্দুর চড়ে গেছে। আমরা একবাস লোক সেই আর একবাস লোকের ঘাড়ে মরণ-বাঁচন ঝাঁপ ঝাঁপিয়ে পড়লুম। আমি আর ছাতা আর ব্যাগ একত্রেই আছি—কিন্তু টুম্পা-পিকো-দীপু কে যে কোথায় গেল—আমার আগেই মেয়েদের উঠিয়ে দিয়েছি—দীপু অন্য দরজা দিয়ে উঠেছে—ওঠার আগে প্রত্যেককে বলে দিয়েছি—"দেখো, জামবেদে এলেই নেমে পড়বে কিন্তু, নইলে বাঁকুড়া চলে যাবে"—

ভিড়ে কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না—বগলের ছাতা, কাঁধের ব্যাগ চেপে ধরে চেঁচাই—"টু-ম-পা...?" কচি গলার উত্তর আসে—"হ্যাঁ-মা?" এবার "পি-কো—?" চাপা গলার জবাব আসে, "Relax!" মার অসভ্যতায় সে যথেষ্ট লজ্জিত। তারপর চেঁচাই—"দী-পু...?" ডবলজোরে চেঁচিয়ে হেঁড়ে গলায় জবাব আসে—"আরে, আছি। আছি।" যাক সবাই আছি।

এ বাসটা তো এক্সপ্রেস নয়। থামে। চলে। লোকজন নামে। ওঠে। আমি অস্থির হয়ে পড়ি। কিছুক্ষণ পরে আবার শুরু করি—

—"টু-ম-পা...?" একসঙ্গে তিনদিক থেকে তিনটে গলা আসে—"হ্যাঁ-মা?" —"আরে আছি রে বাবা!" "এভ্রিথিং ওকে, বস"—আরেকবার নিশ্চিন্ত।

এরপরে অন্য প্রোগ্রাম।

আশেপাশে যত লোক দাঁড়িয়ে আছেন আমি সবাইকে দু' মিনিট অন্তর অন্তর —"জামবেদে এল?" জিজ্ঞেস করতে থাকি। "দেরি আছে", উত্তর পাই।

—"এলেই বলে দেব দিদি—" অবশেষে বলেন পাশের ভদ্রলোক।

—"একটু আগে থেকে বলবেন ভাই" —"বলব।"

হঠাৎ একসময়ে বাসসুদ্ধ ছেলে-বুড়ো-মেয়ে-পুরুষ নানারকম ভাষায়, "...অ-দিদি, জামবেদে..." "...এবার নাবুন, জামবেদে" ..."নেবে পড়ুন, জামবেদে" "জামবেদে এসে গেছে", "মা গো, জামবেদে!" অ মা, নেমে এসো"—"দিদি কুইক, কুইক, আ গিয়া জামবেদে"—"পিকো, টুম্পা, দীপু"—ভয়ানক একটা শোরগোল পাকিয়ে গেল বাসের ভেতর। বাস থামল। সবাই মিলে আমাকে ব্যাগ আর ছাতা সমেত নামিয়ে দিলে। টুম্পা, পিকো, দীপু সকলেই দেখি টুপটাপ বাস থেকে খসে পড়ল। তারপর বাস দিব্যি দাঁড়িয়েই রইল। অত হুড়েহুড়ির কোনোই দরকার ছিল না। প্রত্যেকের চুল উস্কোখুস্কো, আমার চশমা ব্যাঁকা, দীপুর প্যান্টে গোঁজা শার্ট বেরিয়ে পড়েছে—টুম্পার চুলের রিবন খুলে এসেছে। ফ্রকের হাতা বাঁ কাঁধ থেকে ঝুলছে একধারে। পিঠের বোতাম খোলা। সর্বাঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন আমাদের—কেবল

BanglaBook.org

পিকোরই সবচেয়ে কম বিধ্বস্ত মূর্তি। ওর চুলে বয়েজ কাট, পরনে জীনসের ওপর টী শার্ট। অক্ষয় অজর। যার ধ্বংস হয় না। আমরা রিকশাস্টাণ্ডের দিকে এগোই। পথে একটা দোকানে কিছু লোক দেখি ভাত খেতে বসেছে। এই সকাল দশটায় ভাত? হাত গুটিয়ে দিব্যি তৃপ্তি করে, শালপাতার থালায় চুড়ো করে ভাত, ডাল, চচ্চড়ি, লেবু, লংকা খাচ্ছে। প্লেটে মাছের ঝোল। দেখে লোভী দীপুটা বলল—"দিদি, ওখানে কী দেবে না দেবে, চল না, আমরা খেয়ে-দেয়ে যাই?" পিকো এক ধমক দিল—"দিপুমামা, আমরা নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছি—ওরা পুকুর থেকে মাছ ধরে রাখবে আমাদের জন্যে"—টুম্পাও ফোড়ন কাটল—"তখন যত খুশি খেও, সব মাছ ফ্রী তো"—সত্যি, শ্যামসুন্দরবাবু আশ্চর্য মানুষ। স্টেশন প্ল্যাটফরমে দেখা, অমনি ভাত-মাছ খাবার ঢালাও নেমন্তন্ন করে দিলেন। এমন অতিথিপরায়ণতা এক ভারতবর্ষেই সম্ভব। এই আর্থিক অনটনের দিনেও হৃদয়ের অনটন নেই। আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াই, বারবার মানুষের এই উদারতার, চরিত্রের মহৎ দিকটা দেখতে পেয়েছি। অচেনা অজানা লোকের জন্যে কত ঝক্কি পোহাতে দেখেছি মানুষকে।

রিকশাকে বললুম গোদারডি, শ্যামডাঙা দিয়ে দুর্জয়পুরে নিয়ে যেতে, সুবোধ ডাক্তারের ডিসপেনসারি। পিকো জিজ্ঞেস করল দধিমুখা দিয়ে গেলে কতক্ষণ বেশি সময় লাগবে। উত্তরে রিকশা বললে—"দুর্জয়পুরে যাবেন, নাকি গোদারডি?" আমি তো অবাক। একটা তো অন্যটার পথে পড়বে। রিকশা বললে—"পথে পড়ালেই পড়বে। না পড়ালে পড়বে না।" অর্থাৎ সোজাই শ্যামডাঙা দুর্জয়পুর চলে যাওয়া যাবে। দধিমুখাও যেমন ঘুরপথ, গোদারডিও ঠিক তেমনি। ও দুটো পরস্পরের কাছাকাছি, কিন্তু দুর্জয়পুরের কাছাকাছি নয়। মাঠ পেরিয়ে শ্যামডাঙা দিয়ে দুর্জয়পুর যাওয়াই শর্টকাট। গাঁয়ের ভেতর দিয়ে নয়। "—বরং ফেরার পথে দধিমুখা, গোদারডি হয়ে ফিরবেন। তখন সঙ্গে আপনাদের বন্ধুকে নিয়ে আসবেন। তিনি যা দেখানোর দেখিয়ে দেবেন। আমাদের কথামতন গোঁসাইবাড়িতে মন্দির খুলবে না। আর দধিমুখা এখন বন্ধ।"

—"বেশ, তাই চল। একেবারে আমাদের ফেরৎ এনে দেবে বাসস্ট্যাণ্ডে।" দশ টাকা করে ঠিক হলো। দুটো রিকশা। একজন বয়স্ক, একজন প্রায় বালক। আমি আর পিকো। দিপু আর টুম্পা। রিকশা চলল, ভঁপ্পর ভঁপ্পর। এ আমাদের ঠুনঠুন রিকশা নয়।

প্রচণ্ড রোদে মাঠ পার হচ্ছি।

খুব অপরাধী লাগছে। আমাদের মাথায় 'হুডের' ছাতা তোলা। এ-রিকশাওলাদের মাথায় শান্তিনিকেতনের মতো টোকা নেই। গামছা বাঁধা। দরদর ঘামছে। রিকশা হঠাৎ থেমে গেল।

চেন কেটে গেছে। আমরা বালকের রিকশায়। আমরা থেমে আছি। ওদিকে অন্য রিকশা আপন মনে চলেই যাচ্ছে। আমি আর পিকো ঠিকমতো সাহায্য করতে পারছি না। পিকো চেঁচাল এবং প্রচুর হর্ন বাজানো হলো। আগের রিকশা অবশেষে

থামল এবং ফিরে এল। দুই রিকশাওলা চেন সারাতে থাকে। আমরাও নেমে রোদের মধ্যে গুলতানি করতে থাকি। চেন সারানো হতে বেশ সময় লাগছে।

—"মা, তোমার বন্ধু এতক্ষণে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। দেখলে না, দোকানে সবাই দশটায় ভাত খাচ্ছিল?" পিকোকে জবাব দিলুম—"গ্রামের লোকে খুব ভোরে ওঠে তো—চারটে-পাঁচটায় ওঠে। তাই তাড়াতাড়ি খায়। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে রাত্রে। গ্রামের রুটিন আলাদা। বিদ্যুৎ নেই তো। সব দিনে দিনে—"

—"আমাদের আজ জার্নির লাকটাই খারাপ"— দীপু বলল একটা সিগারেট ধরিয়ে। "প্রথমে দুর্লভপুরে নামিয়ে দিলে। গোটা বাসটাই কেতরে পড়ল। তারপর প্রচণ্ড ভিড়ভর্তি বাসে মাঝপথে ঠেলে উঠতে হলো। গরমে সারাটা রাস্তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এখন শালা সাইকেলের চেনটাও খুলে গেল? যে-পথে যাচ্ছিলুম তার বদলে অন্য বাসে অন্য পথে অন্য গ্রাম দিয়ে এসে দ্যাখো এখন অন্যলোকের বাড়িতে না পৌঁছে দেয়।"

পিকো, টুম্পা মন দিয়ে চেন লাগানো দেখছে। আমি দেখছি রোদ্দুরে ঝাঁ ঝাঁ মাঠ, শুকনো ঘাস, বৃক্ষলতাহীন। দিগন্তে কয়েকটা ছোট্ট কুটির, কয়েকটি আবছা গাছের ছায়ায়। ওই কি তবে শ্যামডাঙা? কতদূর এখান থেকে? ক' ক্রোশ? ঝাঁ-ঝাঁ আকাশে চিল চক্কর দিচ্ছে, রোদের রঙে মনে হয় বারোটা-একটা বেজে গেছে, ঘড়িতে যদিও এগারোটা। সত্যি—এটা চোতমাসের রোদই বটে।

বাসন্তী রোদ নয়।— "কেবল আমাদের আজকের জার্নিটার লাক খারাপ বলছ কেন দীপুমামা?" পিকো হঠাৎ বলল—"আমাদের এ যাত্রার গোটা জার্নিটাই তো গুবলেট— আজ আমাদের এখানে আসার কথা? না বিজয়মামার ফুলশয্যায় বৌভাতের নেমন্তন্ন খাবার কথা? না হয়েছে মার যাওয়া, না আমাদের। বরং এটা একটা মন্দের ভালো, অন্যরকম কিছু অ্যাডভেঞ্চার হচ্ছে। বিজয়মামাদের চেয়ে তো এ লোকটা ভালো। মাকে নিয়ে যাবে বলে কলেজ ছুটি করে দুর্গাপুরে আনিয়ে, বড়গোঁসাইপুরে আর নিয়ে গেল না। মাত্র একশো টাকার জন্যে। গাড়িটা মোটে ভাড়াই করল না। অথচ নাকি মারই জন্যে স্যানিটারি—"

—"থাক, থাক। ওসব কথা থাক।" আমার জন্যেই যে 'স্পেশাল অনার' 'সানিটারি প্রিভি' প্রস্তুত করা হয়েছে এবং সেটারই 'উদ্বোধন' করতে আমার নিজের উদ্যোগে পয়সা খরচ করে, ছুটি খরচ করে এই দৌড়ে আসা, সবটাই এত লজ্জাকর লাগছে যে এ বিষয়টা ভাবতেই পারছি না আর। অথচ বিজয় ছেলেটিকে জানি, সে সত্যিই চমৎকার ছেলে। গোটা পরিবারটিই সৎ ও ধর্মভীরু। ওদের কি জানি কী হলো? ইচ্ছে সত্ত্বেও সংসারে কত কিছু অসুবিধে ঘটে যায়। মুখে বলি—"দ্যাখ, একশো টাকা অনেক টাকা, একের পিঠে দুটো শূন্য। তোরা সেটা বুঝিস না, টাকার দাম কমে যাচ্ছে বলে। হঠাৎ কেউ 'মাত্র একশোটা টাকা' বললে, বুকে চড়াৎ করে লাগে। এভাবে কথা বলবি না তো—ওতে লক্ষ্মীর অপমান হয়।" একসঙ্গে হেসে ওঠে তিন ফচকে—"আহামরি আমাদের মা লক্ষ্মীর মানসম্মান রক্ষাকরনেওয়ালা,

খেপে খেপে টাকা হারিয়ে যাচ্ছে, ক্যামরা হারিয়ে যাচ্ছে, সুটকেশ হারিয়ে যাচ্ছে, হ্যাণ্ডব্যাগ হারিয়ে যাচ্ছে, ছাতা, রুমাল, চশমা, ঘড়ি, শাল, পরনের শাড়ি ব্লাউজটা বাদে সর্বস্ব যার হারিয়ে যায়, সে বলছে লক্ষ্মীর অপমান করিস না।" পুরোটা যেন আগে থেকে রিহার্সাল দেওয়া ছিল। সমস্বরে বলতে থাকে ওরা। ইতিমধ্যে চেন লেগে গেছে। আমার যে-যার রিকশায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হই। রিকশা চলে ওই কুটিরগুলোর দিকে।

সুবোধ ডাক্তারের ডিসপেনসারি বন্ধ। দুর্জয়পুর ছোট্ট গ্রাম, সবই কাঁচাবাড়ি, সুবোধ ডাক্তারের বাড়িটা ছাড়া, একতলা হলেও পাকা গাঁথনির। চুনকাম, সবুজ খড়খড়ি, লোহার গেট। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করতে, এক ছোকরা বেরুল। "শ্যামসুন্দর গাঙ্গুলি" শুনে আঙুল দিয়ে ঠিক সামনের বাড়িটা দেখিয়ে দিল। বাড়ি মানে, উঁচু দীর্ঘ, মাটির দেয়াল। দেয়ালের মাঝখানে একটা নীচু কাঠের দরজা। কোন বাড়ি দেখা যাচ্ছে না বাইরে থেকে। দরজাটা বন্ধ। কিন্তু ঠেলা দিতে খুলে গেল। ছোকরাকেই বলি—"শ্যামসুন্দরবাবুকে একটু ডেকে দেবেন? বলবেন, আমরা এসে গেছি।" ছোকরা ভেতরে গেল।— একটু বাদেই খুব সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাতে তাকাতে বেরিয়ে এসে, সিধে নিজেদের বাড়িতে ঢুকে পড়ল। আমাকে কোনই মেসেজ দিল না। শ্যামসুন্দরবাবুর বিষয়ে প্রশ্ন করারও সুযোগ দিল না।

খানিক পরে একটি বউ এসে দরজা ফাঁক করে উঁকি দিল। ঘোমটা বেশ দীর্ঘ।

—"কাকে চাই?"

—"শ্যামসুন্দরবাবু আমাদের আসতে বলেছিলেন। একটু দেরি হয়ে গেল। বাসটা ভেঙে গেল প্রথমে, দুর্লভপুরে। তারপরে রিকশাটা মাঠের মধ্যে। যাই হোক, পৌঁছে গেছি—এবার নিশ্চিন্তি।" একগাল নিশ্চিন্তের হাসি হাসলুম। বউটি আমাদের দিকে এক এক করে তাকাল। টুম্পা। পিকো। দাড়ি-গোঁপভরা দীপু, রাঁচি থেকে পালানো পাগলের মতন দেখতে। ব্যাগ, ছাতা, আমি। ক্লান্তিটা মেপে নিল। তারপর ইঙ্গিত করে বলল—"আসুন।"

ভেতরে উঠোনে অনেক ইতস্তত মাটির ঘর ছড়ানো। কিছু টালির, কিছু খড়ের। ছোট ছোট গাছপালা, গাঁদা, জবা, টগর, কুল, পেয়ারা। তুলসীমঞ্চ। একটা ধানের গোলাও আছে পিছনদিকে। পুকুর চোখে পড়ল না। পড়বেও না। পুকুর তো উঠোনের বাউণ্ডারির বাইরে। বীরভূমেও এমনি উঠোনের ঘেরাওর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাইদের ঘর হয় দেখেছি। রান্নাঘর, গোয়ালঘরও থাকে। খিড়কি দিয়ে পুকুরে নামা যায়। গোয়াল দেখা গেল না। বউটি আমাদের একটা ঘরে ঢুকিয়ে মেঝেয় খেজুরপাতার পাটি পেতে দিল। "বসুন। ডেকে দিচ্ছি।" এ ঘরে কোন আসবাবপত্র নেই। একটা বিরাট বড়ো তোরঙ্গ আছে। কুলুঙ্গিতে কালীর ছবি। দেয়ালে ভারতসমুদ্রতীরে বিবেকানন্দের ছবিওয়ালা বিরাট ক্যালেণ্ডার। একগুচ্ছ ধানের শীষ। একটা উত্তমকুমারের হাসিমুখ। উল্টোদিকের দেয়ালে কয়েকটা তাক। তাতে কাগজপত্র, পত্রপত্রিকা। দু-একটা বই। দীপু উঠে গিয়ে বইগুলো নাড়তে চাড়তে শুরু করে।

BanglaBook.org

পিকো খুব 'প্রপার'।—ধমক দেয়—"হাত দিও না, দীপুমামা" "অন্যের জিনিসে হাত দিতে নেই"— টুম্পা অমনি দিদির পোঁ ধরে। "বেশ করব, হাত দেব। অন্যের বইতে হাত খুব দিতে আছে। চুরি তো করছি না?" তারপর— "এসব যাচ্ছেতাই বইতে কে হাত দিতে চায়? ছোঃ"— বলে একটা হাফ-পাঁজি নিয়ে এসে বসল। শ্যামসুন্দরবাবু কি বাড়িতে নেই? একটি দীর্ঘশ্বাস—

—"নমস্কার দিদি। সত্যি সত্যিই এসে গেলেন তা হলে।" সামনেই শ্যামসুন্দরবাবু। পরনে ধুতি, খুঁটটি গায়ে জড়ানো। সেদিনকার গোলাপী শার্ট আর ব্রাউন ট্রাউজার্স নয়। খালি গা। অনুজ্জ্বল চোখেমুখে স্পষ্ট অস্বস্তি। আমরা কি তবে এসে ভালো করিনি? বাড়িতে কি অসুখবিসুখ? আমি ঘাবড়ে গিয়েও যথাসাধ্য সোৎসাহে শুরু করি।—"আমাদের আগেই আসার কথা, কিন্তু দুর্লভপুরেই বাস নষ্ট হয়ে গেল তো, তারপর বড়জোড়ার বদলে জামবেদে দিয়ে, আর রিকশার চেনটা মাঠের মাঝখানে খুলে পড়ল, অনেক সময় গেল সেটা লাগাতে, তাই—", কিন্তু...কই, শ্যামসুন্দরবাবুর সেদিনের উৎসাহ, আবেগ, উদ্দীপনা গেল কোথায়? মলিন হাসি হেসে আমতা আমতা আলাপ শুরু করেন— "পৌঁছতে কোন অসুবিধা টসুবিধা হয়নি তাহলে?"—(গলায় যেন হতাশা?)

—"না, না, রিকশাওলারা শর্টকাটে নিয়ে এসেছে। সোজা শ্যামডাঙা দিয়ে সুবোধ ডাক্তারের ডিসপেনসারি।"

—"অ। তা, বেশ বেশ।" তারপর—দীপু আর পিকোকে দেখিয়ে বলেন—

"এই দুটি বুঝি দিদির ছেলে? আর কোলেরটি হলো মেয়ে? এস ভাই, এস।"

দীপু বলে—"না। আমার দিদি। আর এরা দুজন হলো আমার ভাগ্নী। দিদির দুই মেয়ে।" টী শার্ট, জীনস, বয়েজকাট নিয়ে পিকো কথা ঘোরায়—" কই, চলো মা, মন্দির দেখতে যাবো না?" দীপু বলল—" দাঁড়া, আগে এককাপ চা খেয়ে নিই?" আমি বাধা দিই—"এখন আর চা-টা নয়, দেরি হয়ে যাবে। রোদ চড়া হয়ে উঠেছে এখনই। চল আগে মন্দিরটা ঘুরে আসি। ফিরে এসে চা খাবি।" এই প্রস্তাবে শ্যামসুন্দরবাবুর কিছুটা উৎসাহ দেখা গেল। "সেই ভাল। মন্দিরটা তো ঘুরে আসি। তারপর চা। যাই, স্যাণ্ডালটা পরে আসি।"

হাওয়াই স্যাণ্ডাল এবং একটি শার্ট পরে এলেন শ্যামসুন্দর গাঙ্গুলি। দোরে দাঁড়িয়ে বললেন, "চলুন, যাওয়া যাক।"—রিকশাওলারা ছায়াতে বসে বিড়ি খাচ্ছে। আমাদের দেখে থোকা রিকশাওলা উঠে দাঁড়াল।

—"নেহি নেহি। এখন পায়দল যায়গা।" ওকে বললেন, শ্যামসুন্দরবাবু। এরা কি বিহারী? কি জানি। দিব্যি তো বাংলা বলছিল। আমরা গ্রামের পথে পথে শোভাযাত্রা করে অনেকটা হাঁটলুম। গাঁ ফাঁকা। বেশি লোকজন চোখে পড়ল না। খুবই দরিদ্র গ্রাম বলে মনে হলো। ওই ডাক্তারের বাড়িটাই যা পাকা বাড়ি।

—"ইশকুলবাড়ি নেই এ গ্রামে?"

—"শ্যামডাঙায় আছে। হাইস্কুল পর্যন্ত।"

—"আর কতদূরে মন্দির?"

—"এই তো, এসে গেছে।"

একটা বটগাছতলায় বাঁধানো বেদীতে কিছু বয়স্ক গ্রাম্য লোক জটলা করছেন, ঠিক যেমন বাংলা সিনেমায় দেখা যায়। হুঁকো-টুকো সমেত কমপ্লিট। কিন্তু একটু খেয়াল করেই বুঝতে পারি, এ-হুঁকো তো সে-হুঁকো নয়। হুঁকোই নয়। এ হলো ছিলিম। হুঁকো নেই, শুধু কলকেটাই আছে। কলকাতার রকেও এমন আড্ডা অনেক দেখেছি। ছিলিমধারীদের বয়েস সেখানে অল্প। বটগাছের ছায়া থেকে অনেকরকম মন্তব্য এল। এতক্ষণ গ্রামে যে দু'-একটি গরু বাছুর কুকুর বেড়াল কাকপক্ষী এবং মানুষজন চোখে পড়েছে কেউই শ্যামসুন্দরবাবুর অতিথিদের প্রতি কৌতূহল দেখাননি, একটি নিরীহ বাদামী কুকুরছানা ছাড়া। তিনি পিকো-টুম্পার কাছে "লাই" নামক কুকুরদের প্রাপ্য খাজনা পেয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মরাজের মতো চলেছেন সরু ল্যাজ টিকটিকিয়ে নাচাতে নাচাতে। পিকো-টুম্পাও খুব খুশি, তার সঙ্গে খেলতে খেলতে আসছে। রোদে হাঁটাটা গায়ে লাগছে না। বটতলার বাবুরা বললেন—"কিরে শ্যামা, এরা আবার কারা?" যথাসাধ্য গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠে শ্যামা বললেন, "ইনি খুব ফেমাস রাইটার, চক্কোত্তিমশাই; কলকাতা থেকে আজ এসেছেন আমাদের মন্দির দেখতে—ইনিই লেখিকা নবনীতা দেবসেন।"

—"অঃ।" চক্কোত্তিমশাই বিশেষ ইমপ্রেসড হলেন বলে মনে হলো না। "আর এরা? ওঁরই ফ্যামিলি বুঝি?"

—"হ্যাঁ।" শ্যামসুন্দর আরেকবার ট্রাই নেন—"সোদারডিতে, শ্যামডাঙার লাইব্রেরিতে এঁর লেখা বই আছে, দাদু। সেই যে কুম্ভমেলার বইটা—"

—"অমৃতকুম্ভের সন্ধানে? অ, বুঝেছি। নমস্কার।" শ্যামসুন্দরবাবুও ভ্রম সংশোধনের চেষ্টা করেন না, আমিও না। দিব্যি নমস্কারের উত্তরে হেসে 'নমস্কার' বলে দিই আমি। পিকো-টুম্পা হাঁ করে চেয়ে থাকে।

বটগাছের পাশেই একটা হেলে-পড়া অতি সাধারণ চেহারার চুনকামকরা মন্দির। তার গায়ে অবশ্য কিছু কিছু কারুকার্য আছে,চুনের প্রলেপের দরুণ অস্পষ্ট। দরজা বন্ধ। দুটো তালা। দরজায় বেশ কারুকার্য করা।

—"ঠাকুরমশাই কোথায় গেলেন? মন্দির এখনই বন্ধ যে?" শ্যামসুন্দরবাবু একটু বিচলিত। চক্কোত্তি অ্যাণ্ড কোং জবাব দেন— "ঠাকুরমশাই তো কলকাতায়, কাল মামলা পড়েছিল। সন্ধেবেলায় হয়তো মন্দির খুলবে।" শ্যামসুন্দরবাবু করুণ চোখে তাকান। তারপর বলেন, "চলুন—আমাদের এখানে খুব জাগ্রত একটা আহারবুড়ির থান আছে—সেইটে দেখিয়ে দিই। দূর থেকে লোকে মানতে করতে আসে।"

—"চলুন, চলুন, সেটাই ভাল।"

—"আগে নাকি ওইখানে একটা কালীমন্দির ছিল, নরবলি হতো, বলি না দিলে গাঁ-কে-গাঁ খেয়ে নিত ঠাকুরাণী, তাই নাম আহারবুড়ি। কিন্তু সে-মন্দির আর নেই। সেখানে এখন ঘোর জঙ্গল। এই যে এদিকে"—বলে শ্যামসুন্দর একটি গলিপথে এগোলেন।

BanglaBook.org

দুদিকে ঘনঘন গায়ে গায়ে লাগা মাটির কুটির, মাঝখানে একটা সরু পথ। পথটা পচা জলে, কাদায় ("কর্দমাক্ত" যাকে বলে) ভর্তি। উনি চটি হাতে নিয়ে ধুতি গুটিয়ে সাবধানে পা ফেলে জলের মধ্যে হাঁটতে লাগলেন। পথটা অবশ্য ছায়াচ্ছন্ন--বড় বড় আমজাম গাছ আছে। আমার অবাক লাগল, চারিদিকে ধা-ধা শুষ্কতা--এখানে এই পথে এত জলকাদা জমল কী উপায়ে? কলকাতাতে ঠিক এরকম পচা জল বৃষ্টির পর বস্তিতে বস্তিতে জমে থাকে। শ্যাওলা পড়া, নোংরা, ছাতাধরা অনড় অচল জল। এটা কেমন করে একটা রাস্তা হয়? দরজা খুললে এই জল তো ঘরে ঢুকে পড়বে? তারপর? হঠাৎ খেয়াল করি, বাড়িগুলোর কোনওটাতেই দরজার বালাই নেই। লোকে ঢোকে কোথা দিয়ে? ও—তার মানে এগুলো সবই বাড়িদের পৃষ্ঠদেশ। সারি বেঁধে সব বাড়িগুলো উঁচুতে, আর রাস্তাটা নিচু, খালের মতো। খিড়কি পথ হবে কোন। কদাচ পরিষ্কার হয় না। কিন্তু জলটা আসছে কোথা থেকে? শ্যাওলাভরা, স্থির জল। দীপু হঠাৎ বলল—"অ দিদি। এসব তো দেখি কুঁড়েঘরের পশ্চাদ্দেশ—এটা খাটা—ইয়ের লাইন নয় তো? এই জলটা কিসের?"

তাড়াতাড়ি আমি বলি—"দূর। তার তো চেহারাই একদম অন্য। এসবই তো সলিড দেয়াল,—মাচা কই?" কিন্তু পিকো অকস্মাৎ বেঁকে বসে। যাবে না আর সে ওই রাস্তা দিয়ে। "—রাস্তাই নয় মোটে! আসলে এটা তো খালি ড্রেন—ময়লা জল চলাচলের নালা—আমি নর্দমা দিয়ে হাঁটব না।" টুম্পা দিদির ভক্ত হনুমতী। সেও দিদির সঙ্গে সঙ্গে—"অ্যাঃ ছিঃ ইয়াক—নদ্দমা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—আমি যাব না—", শুরু করে দিল। শ্যামসুন্দর যত বলেন, "এই গ্রামে কোনও খাটা-ইয়েই নেই, আর এটা সত্যিই রাস্তাই। শর্টকাটের জন্য লোকে এই পথই ধরে—"

কে শোনে কার কথা।—কথায় কথায় প্রকাশ পেল, এও সত্যি যে একটা উদ্বৃত্ত জল চলাচলেরও পথ। এই জল জমে আছে বটে। সেই একবার পানা পুকুর থেকে সেচের জন্য পুকুরের পাড় কেটে জল টেনেছিল—সেই জল এখান দিয়ে ধান খেতে গিয়েছিল—নিচু, খালমতো জায়গা. সব সময়েই ছায়া ঢাকা থাকে, তাই জলটা শুকিয়েও শুকোয় না—চোতমাসের রোদটা বাড়লে মাটি অনেকটাই শুকনো হয়ে যাবে।

—"হোক খটখটে, তখন আসব—এক্ষুনি এই নোংরা নালা নর্দমা থেকে আমাদের বের করে দিন—", পিকো গোঁ ধরে থাকে। পথের জমা জলে সত্যি কিছু পানাও ভেসে আছে শ্যাওলার সঙ্গে। পিকো, দীপু প্যান্ট গুটিয়ে গজরগজর করছে। আমি শাড়ি হাঁটু পর্যন্ত তুলে অপরাধী অপরাধী মুখে। প্রত্যেকেরই হাতে জুতো এবং নাক কোঁচকানো। আমার শাড়ি চেপে ধরে টুম্পার— "মাঁ বাঁড়ি চলো"—একক সঙ্গীত হচ্ছে। শ্যামসুন্দরবাবু বললেন, "এখন ফিরে যাওয়াও অনেকটা, তার চেয়ে চলেই যাই।"

কিন্তু ঐ নালানর্দমার রাস্তা দিয়ে হাঁটাচলায় সত্যিই যাদের অভ্যেস নেই, তাদের এই পথচলাতে কোনো আনন্দ তো নেইই বরং প্রচণ্ড পরিশ্রম। ওই কাদাজলের

মধ্যে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ শুধু বিতৃষ্ণায়ই নয়, অতি সাবধানেও। কেননা মাটিটাও বেশ পিছল, পচা পাতায়, শ্যাওলায় হড়হড়ে। অন্যমনস্ক হলেই হড়কে পড়ে যেতে পারি। কেবলই যে নোংরা ময়লা জল মাড়িয়ে হাঁটছি তাই নয়, তার মধ্যে আকস্মিক অবগাহনের সম্ভাবনাও প্রতি পদে।

—"কলকাতার রাস্তায় বৃষ্টির জল জমলে তাতে ময়লা বুঝি ভাসে না? মরা ইঁদুর, আস্তাকুঁড়ের অকথ্য আবর্জনা।, কী না থাকে তাতে? তার মধ্যে হাঁটতে হয় না?"— আমিই শ্যামসুন্দরবাবুর পক্ষ নিয়ে বক্তৃতা দিই।

—"এসব তো বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক দূষণ—নিছক অরগ্যানিক ম্যাটার—শহরেরটা হচ্ছে অনেক বেশি খারাপ টাইপের দূষণ"—

—"থাক থাক—দিদি—অত জ্ঞানবিজ্ঞানে কাজ নেই আর!— এই ধরো, খাটা-ইয়ের ব্যাপারটাও কি নিছক প্রাকৃতিক, অরগ্যানিক আবর্জনা নয়? তা বলে তুমি তার মধ্যে দিয়ে হাঁট?"

—"মাগোঁ—পাঁ পিছলে পঁড়ে যাঁচ্ছি যেঁ"—

—"ওকে, মা। আমি জাগ্রত ঠাকুর দেখতে চাই না, লেটস গেট আউট অফ দিস হেল"—পিকোর সাফ কথায় শ্যামসুন্দরবাবু চমকে তাকালেন। কী ভাবলেন উনি কে জানে? অতি অসভ্য ছেলেমেয়েরা, সবাই বিদ্রোহ ঘোষণা করছে, যে যার মতন। এমন সময়ে হঠাৎ একটা অভাবনীয় মুক্তির সুযোগ এল।

দুটো বাড়ির মধ্যে একটু ফাঁক। চমৎকার হাইজাম্প দিয়ে একে একে আমরা সবাই অচেনা লোকের উঁচু উঠোনে উঠে পড়েছি নির্বিঘ্নে। বিনা বাক্যব্যয়ে, বিনা মিটিং-এ, বিনা শলা-পরামর্শে। শুকনো ডাঙা তো বটে। ঈশ! আমাদের পায়ের চেহারা কহতব্য নয়। ভিজে প্রায় তুঁতে রংয়ের কাদা আর পচা ঘাস-পাতা-শ্যাওলায় জড়ানো মোজার মতন ময়লা এঁটে আছে, প্রত্যেকের পায়ের গোছের ওধার পর্যন্ত।

—"এই যে, দিদি, পায়ের অরগ্যানিক মোজাটা কেমন লাগছে? কলকাতায় নিয়ে যাবে নাকি?"

—"না ধোঁবো।" টুম্পাকে শ্যামসুন্দর বুঝিয়ে বলেন।

—"এখানে তো ভাই জলের ব্যবস্থা নেই, ওদিকে মাঠে শ্যালোর জল ছাড়ছে, পরিষ্কার জল আছে"—

—"কোনদিকে সেটা?" পিকোর মিলিটারি অ্যাপ্রোচ। আমরা উঠোন পেরিয়ে ওদিকে দিব্যি সুন্দর পরিচ্ছন্ন শুষ্ক চওড়া গ্রাম্য 'রাঙামাটির পথে' নামি। মনে হচ্ছে এটা ওই নর্দমারই যেন প্যারালাল—তবে? কি আশ্চর্য?

—"মশাই, এমন রাস্তা থাকতে হঠাৎ অমন পূতিগন্ধময় কর্দমাক্ত নারকীয় পথে আমাদের নিয়ে যাচ্ছিলেন কেন?" দীপুর প্রশ্নে মনে হয় শ্যামসুন্দরবাবু এবার একটু বিরক্ত হয়েছেন।

—"এ-রাস্তা সেখানে যায় না। এটা শ্যামডাঙার রাস্তা। আপনাদের আহারবুড়িতে, জঙ্গলে নিয়ে যাচ্ছিলাম। শর্টকাটে।"

BanglaBook.org

একটু বাদে দেখি পথের ওপর দিয়েই দিব্যি তোড়ে পরিষ্কার জল যাচ্ছে, এদিকের ক্ষেতের শ্যালো টিউবওয়েল থেকে ওদিকের ক্ষেতে। আমরা গিয়ে মনের আনন্দে পা ধুতে থাকি—চমৎকার জল। তবে মাথার ওপরে রোদ চড়ে গেছে। আমার ছাতাতে তো চারজন আঁটবো না? শ্যামবাবুদের না হয় এ রোদে অভ্যেস আছে। —বেলা বেড়ে যাচ্ছে। মন্দির দেখা এ-যাত্রায় কপালে নেই। আসার পথে শর্টকাট না করে দধিমুখার ফেমাস রাসমন্দিরটা অন্তত দেখে এলেই হতো।

—"আচ্ছা, এখন একবার দধিমুখা যাওয়া যায় না?" আমি সাহস করে বলেই ফেলি।—"কতক্ষণ লাগবে? যদি রিকশা করে যাই?" দীপুর সব কথায় কথা কওয়া চাই।

—"কেন, রিকশাওলা তো বলেইছে ফেরার পথে যেতে। আগে চলো তো খেয়ে নেওয়া যাক।— কি বলিস পিকোটুম্পা? এখনই যাবি, না আগে—"

—"খাওয়াটা তাহলে আগে মিটিয়ে নেওয়াই ভালো—", আমি বলি শ্যামসুন্দরের মুখের দিকে তাকিয়ে। দুই মেয়েই তাতে সায় দেয়—

—"হ্যাঁ, খিদে পেয়ে গেছে।" পাবেই তো।

—"চলুন শ্যামসুন্দরবাবু, আপনাদের বাড়িতেই তবে আগে যাই—তারপর আপনার কথামতন একটু বিশ্রাম করে, বেরুনো যাবে। দধিমুখা গেলেরডিতে তো আপনি আমাদের সঙ্গেই আসতে পারবেন।"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই চলুন, তাই চলুন—", লীডার শ্যামসুন্দরবাবু অ্যাবাউট টার্ন করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রেজিমেন্টও। পেটে খিদেটা চনমন করছে। এবার গরম গরম পুকুরের টাটকা মাছভাজা! আর ক্ষেতের চালের ভাত। আঃ। এ সুযোগ কি পাই আমরা কলকাতা শহরে? পথেঘাটে আমাদের কত আশ্চর্য বন্ধুই জোটে।

শ্যামসুন্দরবাবু বাড়িতে এসে, আবার সেই ঘরটাতেই খেজুরপাতার পাটি পেতে বসতে দিলেন। দুটো তালপাতার পাখাও এনে দিলেন। তালপাতা দিয়ে বুনে-বুনে খুবই সুন্দর চৌকো পাখা। বললেন ঘরে তৈরি। তারপর চলে গেলেন, একটু হেসে, "চাবিটা আনি", বলে।

কিসের চাবি? কে জানে? আমরা চোখে-চোখে চাওয়া চাওয়ি করলুম।

খানিক বাদে শ্যামসুন্দরবাবুর সঙ্গে আরেকটি ভদ্রলোক এ ঘরে এলেন। বৃদ্ধ। এবং সেই বউটি। দেখা গেল বৃদ্ধ ভদ্রলোকের পৈতেতে চাবি আঁটা। তিনি সেই বিশাল তোরঙ্গটার কাছে গিয়ে নিচু হয়ে বসে, তোরঙ্গের দুটো তালা খুলে দিলেন। তারপর তার ডালা খোলা হলো। শ্যামসুন্দরবাবু ভেতর থেকে বের করতে শুরু করলেন নানাধরনের জিনিসপত্তর। শীতের কাপড়চোপড়, লেপ, কম্বল, পদ্মকাঁথা, কাঁসার বাসন, ঘটি পিলসুজ, পাথরের থালা, কিছু জাবদা খাতা,—তাঁর হাত ক্রমশই গভীরে। কাঁধ পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে, আর নানারকম ধনরত্ন তুলে আনছে। আমরাও সবাই একদৃষ্টে মন দিয়ে ওঁদের যাবতীয় গোপন তুলে রাখা বিষয় সম্পত্তি দেখে ফেলছি। হঠাৎ দীপু উপদেশ দিল—"শুনুন, কাপড় চোপড় আর খাতাপত্তর একসঙ্গে

রাখবেন না, দুটোতেই পোকা ধরবে। সব নষ্ট হবে। এগুলো আলাদা আলাদা ট্রাংকে রাখা উচিত।" —জিনিসপত্র বের করতে করতে শ্যামসুন্দর বললেন—"ওষুধ দেওয়া আছে এতে পোকা মারার। সেসব ভয় নেই মশাই। বাবা এসবে খুব পাট্রিকুলার। ও, ইনিই আমার বাবা। শ্রীশ্যামবিলাস গাঙ্গুলি।" বাবা মিষ্টি করে ফোকলা হেসে নমস্কার করলেন দীপুকে। আমাদের দিকে দৃকপাত করলেন না। শ্যামসুন্দর হঠাৎ থেমে বললেন—"বাবা, তবে কি এতে নেই? অন্য ঘরেরটাতে দেখবো?" বাবা বললেন—"না, এইয়াতেই আছে। তুমি খোঁজ—ঠিক বাইরাবে।"

তারপর হঠাৎ শ্যামসুন্দর 'ইউরেকা' বলার সুরে "পাওয়া গেছে।" বলে উঠলেন। এবং একটি কাচের পেয়ালা বের করলেন। তারপর আরও একটি, আরও একটি। আরও একটি। তারপর পিরীচ। আরেকটি পিরীচ। আরেকটি পিরীচ। কিন্তু চতুর্থ পিরীচটা আর বেরুলই না। নো-পাত্তা।

—"বোধহয় ভেঙে গেছে।" বাবা বললেন।

—"ওতেই হবে"—আমি তাড়াতাড়ি বলি। "কিন্তু এখন আর চা-টা কেন? এখন তো বেশ বেলা হয়ে গেছে।"—কিন্তু বাবা বলে ওঠেন— "তা কি হয়? একটু চা না খেলে চলে? আমাদিগের তো অজ পাড়াগাঁয়ে ঘর—ঘরে কিছুই নেই। বিস্কুট আনা করাতেও শ্যামডাঙা যেইতে হয়—নইলে গোদারডি। মেয়াটার হাতে একটু যে বিস্কুট দিব, তাও নাই। বউমা, মুড়ি দাও।" আবার প্রত্যেকটি জিনিস তোলা হলো, পদ্মকাঁথা, লেপকম্বল, জাবদা খাতা, পাঁজি, শারদীয় পত্রিকা, চটে বোনা আসন, পাথরের থালা, কাঁসার বাসন, পিলসুজ, ঘটি। ডালাবন্ধ করে দুটো তালা লাগানো হলো। কাঁসার থালাবাটি গেলাসগুলো দেখলুম সবই ঝকঝকে নতুন। বোধহয় কারুর বিয়ের যৌতুকে পাওয়া। বউটি চলে গেল কাপড়িশ নিয়ে। এবং শ্যামসুন্দর তার পেছুপেছু। বাবাও চলে যান। আমাদের প্রতি কোনো কৌতূহলই দেখা গেল না পরিবারের বড়দের। কেবল দরজার বাইরে কয়েকটি শিশু ভিড় করে আছে। কেউ আঙুল চুষছে। কেউ চুষছে না। কারুর নাকে সর্দি। কারুর সর্দি নেই। সকলেই সমান কৌতূহলী। পিকো প্রকৃতপক্ষে ছেলে, না মেয়ে, প্রধানত সেটা জানা তাদের আগ্রহ ও আলোচনার বিষয়। আলোচনার গোপনীয়তা রক্ষার বিন্দুমাত্র চেষ্টা নেই।

চা এলো থালায় করে। কাপডিশে। একটু শুধু দুঃখী কাপ একলা। সেটা টুম্পাকে দেওয়া হলো। টুম্পা চা দেখেই মহা উল্লসিত। ডিশ নেই তো কি হয়েছে। কলকাতাতে কোনো বাড়িতে বেড়াতে গেলে তাকে কেউ চা খাইয়ে অভ্যর্থনা করে কি? টুম্পার আহ্লাদ স্পষ্ট। চা পেয়ে পিকোও খুশি। বাড়িতে মাঝে-মধ্যে জোর করে চা খেয়ে নেয় বটে সে—কিন্তু লোকের বাড়িতে গেলে তাকেও কেউ চা করে খাওয়ায় না।

এই 'রেকগনিশান' পেয়ে দুই বোনই খুব খুশি। আমি এতে তত খুশি নই। দীপুটা চা-তাল। দীপু তো খুশি হবেই। আমি চা খাই, কিন্তু দেরিতে শিখেছি, তাই ঠাণ্ডা করে জুড়িয়ে খাই। একটা খালি গেলাশ চাইলুম। চা ঢালাঢালি করে জুড়োতে হবে তো? মেয়েদেরও চা খাওয়া অভ্যেস নেই। জুড়িয়ে দিতে হবে। একপো কাঁসার

গেলাস নিয়ে বউমার পুনঃপ্রবেশ। সঙ্গে একটা বাচ্চা মেয়ে, পিকোর মতোই হবে বয়েস, ফ্রকপরা। একপিঠ কোঁকড়া ভিজে চুল খোলা। দুজনের হাতে বড় বড় কাঁসি। তাতে পাহাড়ের মতো মুড়ি। চারজনের সামনে যত্ন করে চারটে কাঁসি নামিয়ে দেওয়া হলো। —রোদের তাত বাড়ছে। দুর্জয়পুর প্রচণ্ড গরম হচ্ছে। মুড়ি দেখে মনে হলো না সেটা মাখা হয়েছে কিছু দিয়ে। না আছে তেলনুন পেঁয়াজলঙ্কা, না চিনি-নারকোল, না ডালমুট, না তেলেভাজা, শুধুই মুড়ির পাহাড়। খিদে পেয়েছে দারুণ। খিদের মুখে এখন চা-মুড়ি খেলে ভাত-মাছটা আর খাবো কখন? কী করেই বা খাবো? বাচ্চাদের তো খিদে একেবারে মরে যাবে। ভেবেচিন্তে আমি বলি—"থাক থাক, —এখন ভাত খাবার আগে আর মুড়িটুড়ি কেন? ওদের খিদে মরে যাবে।"—শুনে, রীতিমতো উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বউটি বল্লে—"ভাত এখন কখন খাবে, কোথায় খাবে, তার আগে পেটে তো কিছু পড়ুক? ভাতের হোটেল তো সেই-সে-কত ধুর। বাস রাস্তায়। খেতে হবে সেই বড়জোড়ায়, নয় জামবেদেয়। এসব গাঁ-ঘরের দিকে তো কোন সুবেবস্থাই নাই দিদি। দুটি মুড়ি-চা অন্তত মুখে দিয়ে যান? অনেক বেলা হইয়েছে।"

মস্তিষ্কে প্রচণ্ড বজ্রপাতের মতো এতক্ষণে আমার টনক নড়লো। তাহলে এটাই লাঞ্চ? এই হচ্ছে শ্যামসুন্দরের—"ছোটভায়ের কাছে দুমুঠো গরম গরম মাছ ভাত? —ক্ষেতের চালের ভাত—আর পুকুরের মাছের ঝোল?"

—আমরা এলেই না পুকুরে জাল ফেলবার কথা?

শ্যামসুন্দরবাবু কিন্তু আর দেখা দিলেন না। সেই যে কাপড়িশের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, তারপর থেকে কেবল ওই বউমা আর তার ননদ—যার নাম সাবি।

"সাবি, পাখাটা নিয়ে একটু বাতাস কর, দিদি কী ভীষণ ঘামাইছে"—সাবি বাতাস করতে থাকে আমাকে। আমার সমস্যাটা আসলে অন্যত্র। কাঁসার গেলাসে চা ঢেলে ফেলে, আর সেটা হাতে ধরতে পারছি না। গেলাস আগুন হয়ে উঠেছে। কাচের গেলাসে এটা হয় না। সমস্যাটা বুঝতে পেরে বউমা খিলখিলিয়ে হেসে, অনায়াসে আগুন-গরম গেলাস ধরে ঢালা-পড়া করে চা জুড়িয়ে দেয়। সাবাস বউ।

ইতিমধ্যে নজর করা গেল বহুক্ষণ ধরেও আমাদের মুড়ির পাহাড়ের ভার বিশেষ লাঘব হয়নি। যদিও মুঠো মুঠো চিবোচ্ছি তো চিবোচ্ছিই। তবুও কমছে বলে মনে হচ্ছে না। এক সময়ে টুম্পা বলল—"মা, মুখ ব্যথা করছে।" অমনি পিকো এক ধমক লাগায়—"মুখ ব্যথা করছে তো খাচ্ছিস কেন?"

দীপু জ্ঞান দেয়—"কই আমি তো খাচ্ছি না? খেতেই হবে এমন কোন কথা নেই, চোয়াল-ব্যথা করেও।"

সাবি হঠাৎ হেসে গড়িয়ে পড়ল।

বউমা তাকে টিপে দিলেও, সে থামে না।

পিকো গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করে—"কী হলো? হাসছো কেন? হাসির কী আছে?"

BanglaBook.org

—"হাসবো নাই? তুমরা টাউনের লোক মুড়ি খেতে জানো নাই। মুড়ি কেউ শুকনো শুকনো চিবায়? শুকনো মুড়িতে মুখ ধরে যাবেক নাই? মুড়িতে জলটা ঢেলে দাও। তারপর চপুটো। চপুটে চপুটে এমনি মুঠা করে মউলিয়ে লিতে হয় —আবার মুড়িতে চা-টা ঢেইলেও খেতে পারো। ভিজাইল্যে তবে তো মুড়ি লরম হবেক? গরম গরম চা ঢেইল্যে খাও না? গাল বেথা করবেক নাই।" সাবির উপদেশামৃত ফুরোতে না ফুরোতেই পিকো, টুম্পা, আমি মুড়িতে চা ঢেলেছি। দীপুর চায়ের কাপ শেষ। জল ঢেলে মুড়ি সে খাবে না। ("আরে ধ্যোৎ—যত্তো"...)। দুর্গম দুর্জয়পুরের পুকুরের টাটকা মাছ-ভাতের সম্ভাবনা যে বিগত, সেটা যে অলীক, তা পিকোটুম্পাকে বলতে হলো না—ওদের মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, প্রাণপণে চেষ্টা করছে মুড়ি মুঠোয় 'মউলিয়ে' নিতে।

হঠাৎ দীপু বলল—"আর খেতে হবে না, ঢের হয়েছে, উঠে পড়। জামতোড়া, না বাঁশবেদে, কোথায় যেন বাসস্টপটা? সেখানে দিদি তোদের ভাতের হোটেলে লাঞ্চ খাইয়ে দেবে। ওঠ ওঠ—যতো মুড়ি ঘাঁটবি ততো যেতে দেরি হবে, এসব ছোট ছোট হোটেলে আর কিছুই বাকি থাকবে না। এখন কি কম দূরের পথ যেতে হবে, মাঠ পার হয়ে",—কেবল যেন নির্দেশটুকুর অপেক্ষায় ছিল। দুই মেয়ে এমন লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, যেন আর্মির ট্রেনিং। দীপু আমার দিকে তাকিয়ে বলেই ফেলল—"খুব ভাল বন্ধু তোমার, দিদি, পুকুরের টাটকা মাছ খাওয়াবে, ক্ষেতের ভাত, —হুঁঃ। তখনই বলেছিলাম—ধাপ্পা দিচ্ছে—প্রথম থেকে তোমাকে সবাই মিলে বারণ করেছিল। তুমি নিজেও ঝামেলায় পড়লে, আমাদেরও টেনে আনলে, বাচ্চাগুলোকেও, ছি ছি—", আমি "চুপ! চুপ!" বলেও আর লাভ হবে না। সাবি, বউমা বজ্রাহত।

ততক্ষণে উঠোনে গিয়ে পিকো কাঁসার গেলাসের জলে নিজের হাত ধুচ্ছে, বোনেরও হাতে জল ঢেলে দিচ্ছে।

বউটি বলল—"দিদি? আপনাদিগের কি এখানেই ভাত খাবার কথা ছিল?"

সাবি বলল—"বড়দা নিমন্ত্রণ করেছিল?" আমি আমতা আমতা করি। দীপু বলে—"করেছিলেন বলেই তো এত কষ্ট করে সেই দুর্গাপুর থেকে দু'বার বাস বদলে রিকশা ভাড়া করে আমরা এখানে এসেছি। ওঁরই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। আমার দিদির মাথাটা খারাপ। রাস্তার লোকের কথায় বিশ্বাস করে দিব্যি ছেলেপুলে নিয়ে এতদূর চলে এসেছেন। পুকুরে জাল ফেলবে। টাটকা মাছ খাওয়াবে! হুঃ। যতো গুলগাপ্পা!"

সাবি হেসে ফ্যালে।

—"পুকুর? পুকুর তো কবেই বন্দক দেওয়া হইয়ে গেছে। শ্যামডাঙার মুখুজ্যেবাড়ির বাবুরা বন্দক লিয়েছে। মাছের ব্যবসা ধরেছে। আমাদেরকে জাল ফেলতেই দেয় না। কখনও সখনও ছিপ দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে দু-একটা ধরি অবশ্যি। তবে মাছ ঢের—সত্যি সেদিনকে ওরা জাল ফেলেছিল, দেড় কুইন্টাল মাছ তুলেছে।" বউমা আস্তে আস্তে বলে—"আমাদিগের পূর্বেকার সেই অবস্থা আর তো

নাই দিদি। সম্বচ্ছরের চালটাই এখনও তবু ওঠে ঘরে। দয়া কইরে দুটি গরম ভাত খেইয়ে যান। আপনারা যখন এসেছিলেন, বড়দাদা তখন বললেও এতক্ষণে ভাত ডাল আলুসিদ্ধ পোস্তর বড়া হইয়ে যেত। কিন্তু দাদা তো আমাদেরকে বলেননি কিছুই। সক্কলের খাওয়াদাওয়া শেষ। এখন ঘরে তো কিছুই নাই যে বেড়ে দিব। ছি ছি, কী লজ্জা।"

বউটির বয়স বছর আঠারো-উনিশের বেশি না। পিকো হঠাৎ বলল— "তুমি টেন পর্যন্ত পড়েছো?" বউ একটা চমকে গিয়ে বলল, "না, সিক্স পর্যন্ত।"

—"তুমি লাইব্রেরি থেকে বই আনিয়ে পড়?" একমুখ হাসি নিয়ে বউমা ঘাড় নাড়ে। "হ্যাঁ। বই পড়তে খুব ভাল লাগে। বড়দাদা গোদারডি লাইব্রেরি থেকে অনেক বই আনা করান।" সাবি বলল— "আমিও! আমাদের শ্যামডাঙা ইসকুলের লাইব্রেরি আছে। আমি ক্লাস ফাইভে পড়ি।

দীপুর এসব সংবাদ জানা হলো না—কেননা সে একটা সিগারেট ধরিয়ে বেরিয়ে চলে গেছে রিকশাওলাদের খোঁজ করতে। হঠাৎ বউমা আমার হাতদুটো চেপে ধরে। —"দিদিভাই, মনে কিছু দোষ লিবেন না—বড়দাদা কেনে যে আমাদিগে কিছু বলেন নাই জানি না—উনার এমনতারা স্বভাব নয় কিন্তু।" সাবি হেসে উঠে হাল্কা করে দেয়— "লাজে তাই পালিয়ে বেড়াচ্চে দ্যাখো—মোটে এই ঘরেই আসা করচে না। হি হি।"

রিকশায় উঠে বললুম—"দধিমুখা নয়। গোদারডি নয়। সোজা বড়জোড়া কিংবা জামবেদে। যেটা কাছে হবে।"

পিকো বলল—"যেখানে ভাতের হোটেল আছে।"

টুম্পা মহোৎসাহে বলল, "আমরা ওই রাস্তার হোটেলে খাব? হ্যাঁ মা? ভাত খাব? কি মজা।"

রিকশাওলা বলল—"রাসমন্দিরটাও দেখে যাবেন না?" সমস্বরে দীপু, পিকো টুম্পা বলল, "ন্না।"

গাড়িতে চড়ে বসে রওনা হচ্ছি—হাওয়া থেকে আবির্ভূত হলো একটি ছায়ামূর্তি। জোড়হাত শ্যামসুন্দরবাবু। মুখের দিকে চাওয়া যাচ্ছে না। ধরা গলায় কোনোরকমে বললেন—"যে অপরাধ করেছি দিদি, তার মার্জনা নেই। তবে সত্যি কথাটা জানাই আপনাকে দিদি, আমি কিন্তু কল্পনাও করতে পারিনি যে আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন, আর সত্যি সত্যি এত কষ্ট করে ছেলেপুলে নিয়ে এই তুচ্ছ লোকের নিমন্ত্রণ রাখতে এতদূরে চলে আসবেন। কলকাতার শহরে লোকও যে এমন হয়, আমরা গাঁয়ে ঘরে কিন্তু ভাবতে পারি না। আমি একদম বুঝতে পারিনি।" অসহিষ্ণু গলায় দীপু তাড়া দিল—"ঠিক আছে দাদা, ঢের হয়েছে। যা করেছেন, করেছেন। এখন ছেড়ে দিন, আমরা হোটেলে যাই। পেটে ছুঁচোর কেত্তন হচ্ছে"—

টুম্পা হঠাৎ আপত্তি করে ওঠে—"মোটেই না, তুমি মুড়ি খাওনি, তাই। আমরা

BanglaBook.org

কি সুন্দর চা-মুড়ি খেয়েছি, আমাদের পেটে ছুঁচোর কেত্তন হচ্ছে না।" পিকোও হেসে বলল—"হ্যাঁ, বেশ একটা নতুন জিনিস শেখা হলো, 'মউলিয়ে' মুড়ি খাওয়া।" যাক, ওরা শ্যামসুন্দরবাবুকে মাপ করেছে। ওরা যে পুকুর-ইজারার গল্পটা শুনেছে। দীপু তো দ্যাখেনি বউমার হাতদুটো জড়িয়ে ধরা। শ্যামসুন্দরবাবু হঠাৎ বললেন—"আমার বাড়িতে আসা নিয়েও কি গল্প লিখবেন?" আমি চুপ করে থাকি।

রিকশা ফিরল সেই জামবেদেতেই। ভাতের হোটেল তখনও খোলা। খুব আরামসে গরমভাতে মাছে ঝোলে, ডালে, লেবু-লঙ্কা মেখে, মাছ-ভাজা দিয়ে দারুণ খাওয়া হলো। ক্ষেতের মোটা চালের স্বাদু ভাত। মাছটাও টাটকা, পুকুরের পাকা রুই।

—"কোথাকার মাছ দাদা?" দীপু জিজ্ঞেস করে।

—"এই কাছেপিঠেরই। মাছটা এদিকে একটু কমই বটে, কিন্তু এটা একটা পুরনো পুকুরের, শ্যামডাঙার দিকের।" বুকটা ধড়াস করে উঠল। দুর্জয়পুরের সরকারবাড়ির পুকুরের মাছ নয় তো? এতটা নাটকীয়তা অবশ্য জীবনে আশাতীত। কিন্তু ওদের বেড়াতে এনে যা যা খাওয়ানোর কথা ছিল, আশ্চর্য যোগাযোগে তার সবই কিন্তু খাওয়াতে পারা গেল। জামবেদের বড়রাস্তার বাসস্ট্যাণ্ডে, টিনের ছাদওয়ালা নামহীন ভাতের হোটেল আমার মুখরক্ষা করল। পিকোটুম্পার মহা আহ্লাদ। একটু পরেই এসে গেল দুর্গাপুরের বাস। কিমাশ্চর্যম। বাসে প্রত্যেকেই বসার জায়গা পেলুম। এবং দুর্লভপুরে এসে বাসটা ভেঙেও গেল না। দিব্যি বিনা দুর্ঘটে সন্ধের আগেই বন্দিতাদের বাড়িতে এসে পৌঁছে যাই। কিন্তু আসার পরে যা যা ঘটল অর্থাৎ চামেলিদি, সুনন্দা, বন্দিতা, তাপ্তী—একযোগে সবাই মিলে, দীপুর প্রত্যক্ষ সহায়তায় আমার যে পরম হেনস্থাটা করলে, সারাদিন ঘেরাও করেও সেদিনকার বিদ্রোহী বাবাগণ দিদিমণিদের তার একশতাংশও হেনস্থা করেননি।

—"কি গো নবনীতা, তোমার ভায়ের গাড়ির ড্রাইভার এসে তোমাদের বরযাত্রী নিয়ে গেল না তাহলে? আহাহা—"

—"তবে কি ওদের প্রিভি কাউন্সিলের আর কোনোদিনও 'শুভ উদ্বোধন' হবেই না? আহা, অমন স্পেশাল সেরিমনিটা!"

—"আসলে দোষটা মিস্তিরিদের। ওঁরা ভেবেছিলেন এর মধ্যে প্রিভি কমপ্লিট হয়ে যাবে—আসলে হয়ে ওঠেনি, তাই—"

—"আহা, তাতেই বাকী? কোনোদিন না কোনোদিন তো ওটা কমপ্লিট হবেই, তখন দিদি, আরেকবার ট্রাই নিতে পারো—বিয়েবাড়িটা অবশ্য পাবে না—"

—"সে হবে না। প্ল্যান চেঞ্জড। কবি ক্যানসেলড। এবার ইন্দিরা গান্ধীকে আনা হবে। না পেলে, রেখাকে!"

—"আচ্ছা, শ্যামসুন্দরবাবুর পুকুর থেকে দেড় কুইন্টাল মাছের আধ কুইন্টাল তো অন্তত আমাদের জন্যে আনতে হতো?"

—"তারপর? মামাবাড়িটা ভাল? তোদের মা, তোদের নতুন মামার বাড়িতে

কেমন নেমন্তন্ন খাওয়াল রে টুম্পা?"

—"দীপুরে, তোর আর ভাবনা নেই, তোর বৌভাতের সব মাছ দুর্জয়পুরের পুকুর থেকে ফ্রী সাপ্লাই করবে তোর দিদি—"

—"আর পিকোর বিয়েতে আমরা এখান থেকেই সোজা দিলীপ ড্রাইভারের ট্যাক্সিতে টানা 'বাই-কার' কলকাতা চলে যাব, No. 4444 তো? খুব মনে থাকবে—"

—"আরে, তোদের মায়ের মতো এতো এতো ভাইরত্ন জগতে আর কার আছে? দুঃশলারও এতগুলো ছিল না। মাসিমার কেন যে মেয়ের জন্য ভাবনা?"

এ তো কেবল দুর্গাপুর! এখনও কলকাতার হেনস্তা পুরো বাকি! বেনারসীর পুঁটলি-বগলে ফিরতে হবে তো কাল সকালে।

দেশ, শারদীয় ১৩৯৯

উত্তরাধিকার

—ও কি। ও কি। মেঝেয় বসলি যে? ওঠ্-ওঠ্। সোফাতে উঠে বোস। এই ভুটু, ঠাণ্ডা লাগবে।

—ধ্যাৎ তেরি। ঠাণ্ডা লাগে না এতে। মেয়েদের পায়ের কাছেই ছেলেদের বসতে হয়। এটাই নিয়ম। এও জানিস না? ভাট।

—সেসব তো বড় মেয়েদের বেলায়। তারা শাড়িপরা মেয়ে। ছোট মেয়েদের পায়ের কাছে বসবার নিয়মটিয়ম নেই। ওঠ্ উঠে পড় শিগগির। আমার বিশ্রী লাগছে।

—কী যে বলিস না তুই? ছেলেদের মাটিতে বসাটাই নিয়ম, এতে ছোটবড় নেই। মেয়ে, মেয়েই। ব্যাস্।

—হ্যাঁ। তোমাকে বলেছে! মুণ্ডু। ফ্রকপরা মেয়ে আর শাড়িপরা মেয়েতে আকাশপাতাল তফাৎ। বেশ, তুই যদি মেঝে থেকে না উঠিস, তবে আমিও নেমে বসছি। সর, সরে বোস। অ্যাই। হ্যাট, হ্যাট। তারপর চেয়ার ঠেলার শব্দ। ধুপ করে কেউ মাটিতে বসে পড়ল।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হ'ব হ'ব। পাশের বাড়ির দেয়ালটায় সেই আশ্চর্য গোলাপী রঙ বুলিয়ে দিয়েছে আকাশ—সেই চিরকেলে মন কেমন-করা কনে-দেখা আলো। প্রবন্ধ লেখার পক্ষে এই গোধূলি লগ্নটি খুব অনুকূল নয়। মন কেবলই জানলা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে আকাশ-বাতাসের দিকে। বুদ্ধিটা খোলতাই হচ্ছে না। কেন যে প্রত্যেকটা দিন, প্রত্যেকটা মুহূর্ত, এরকম অফিসটাইমের ট্রামবাসের মতো জরুরি কর্তব্যে ঠাশা? অথচ এমনও তো দিন ছিল, যখন... হঠাৎ কানে এলো পাশের

BanglaBook.org

ঘরের কথাবার্তা। ত্রয়োদশী রিংকির কাছে তার ইশকুলের একজন বন্ধু এসেছে। গলাটা সদ্য ভেঙেছে ছেলেটার, রহস্য-মধুর হয়ে উঠেছে।

—খুবই স্টুপিডের মতো দেখাচ্ছে তোকে রিংকি। জেনে রাখ। ঘরভর্তি সোফাকোচ সব খালি, আর তুই মেঝের ওপর বসে আছিস। কী দৃশ্য। ভাল ফ্রকে ধুলো লেগে যাচ্ছে।

লাগুক। আমাকে একাই স্টুপিডের মতো দেখাচ্ছে, না? তোকে বুঝি লাগছে না? তুইই তো আগে বসলি মাটিতে। সীনটা তো তুই করলি।

—সে তো তোর পায়ের কাছে বসব বলে। আমার মাটিতে বসার একটা পয়েন্ট আছে। তোর পয়েন্টটা কী শুনি?

—আমার খুবই অস্বস্তি হয় কেউ পায়ের কাছে ওৎ পেতে থাকলে।

—ওটা কোনো পয়েন্ট নয়। কেউ ওৎ পাতেনি।

—খুবই জরুরি পয়েন্ট। তোরটাই কোনো পয়েন্ট নয়।

—তুই কিছু সাহিত্য পড়িসনি।

—খুব পড়েছি। উঠে বোস। চল, দুজনেই সোফায় উঠে বসি। প্লীজ, ভুটু? আমার ঠাণ্ডা লাগছে কিন্তু।

—ওঃ। বড্ড জেদী তুই রিংকি। আর গুলবাজ। ঠাণ্ডা লাগছে না আরো কিছু। খুক খুক হাসি। ফের চেয়ার টানাটানির শব্দ। বোধহয় উঠে সোফায় বসা হলো।

—আচ্ছা, রিংকু, তুই গানফান শিখতিস না?

—হ্যাঁ, শিখি তো? অবশ্য গাইতে পারি না একটুও। গান গাইতে পারব না কিন্তু বলে দিলুম। হ্যাঁ। খবর্দার।

—কে বলেছে, তোকে গান গাইতে? তুই যে এই নেড়ার মতন শুরু করলিরে, —'আমাকে তোমরা গাইতে বোলো না'।

—তুইই তো জিগ্যেস করলি গানের কথা। আমি সেধে বলেছি?

—সে তো অন্য কারণে। রবীন্দ্রসংগীত আমার ভালোই লাগে না। কোথায় শিখিস? গানের ইশকুলটা কোন জায়গায়? সেইটে আমার জানা খুব দরকার।

—ইশকুল? ইশকুলে শিখি না তো? বাড়িতেই। মাস্টারমশাইয়ের কাছে শিখি।

—বা—ড়িৎ-তে? ধু—উ—শ। একদম বাজে সিস্টেম।

—কেন? বাজে বললি কেন?

—বাড়িফাড়িতে গান শেখা, ওসব এখন আর চলে না, বুঝলি? গানের ইশকুলে যাওয়াটাই নিয়ম।

—কেন, চলে না কেন? নিয়ম আবার কিসের? কত লোকেই তো বাড়িতে গান শেখে। গিমুদিদি, পিকো-টুমপা, মৌ-পিউ, তিস্তা, টোটো—

—ওরা সবাই বাজে। আউটডেটেড যত সিস্টেম। গানের মাস্টারমশাইদের সঙ্গে ইলোপ করা এখন আউট। ও আর চলে না।

—ইলোপ? এ—মা—। কী অসভ্য। আমি চললুম।

BanglaBook.org

—চললি? কোথায়? তুই কি ইলোপ করবি বলেছি? বলছি আগেকার দিনে ওসব করতো। ওটাই তখনকার সিস্টেম ছিল।

—আর এখন?

এখন? এখন কেউ ইলোপ করে না। গা ধুয়ে, চুলে বিনুনী বেঁধে, ডুরে শাড়ি পরে মেয়েরা গানের ইশকুলে যাবে। আর ছেলেরা ইশকুলের সামনে ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাবে। অস্থিরভাবে তাকাবে। ওয়েট করবে আর কি। তারপর মেয়েটা বেরুলে ফলো করবে, কিংবা একসঙ্গে চীনেবাদাম খেতে খেতে হাঁটতে হাঁটতে মেয়েটাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে। এখন এইরকম সিস্টেম হয়েছে। বুঝলি স্টুপিড?

—অ। বুঝেছি। কথায় কথায় স্টুপিড বলচিস যে বড়? নিজে যেন কত বুদ্ধিমান।

—নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান। বাড়ি বসে স্যারের কাছে সাঁ-রেঁ-গাঁ-মাঁ সাধলে এসব হয় না। বুঝলি?

—বুঝলুম। যত্তো বাজে কথা।

—মোটেই বাজে কথা নয়। বইপত্তর তো পড়িস না, জানবি কী করে? পড়বি তো কেবল টিনটিন আর ইনিড ব্লাইটন।

—তোমাকে বলেছে! আমি টিনটিনের চেয়ে অ্যাস্টারিক্স বেশি পড়ি। হিচকক পড়ি না? আগাথা ক্রিস্টি? ইনিড ব্লাইটনের চেয়ে এরিশ কোসনার ঢের ভাল। আর আমি বড়দের বইও, বঙ্কিমচন্দ্র, চার্লস ডিকেন্স, ভিক্টর হুগো, ড্যানিয়েল ডিফো, এরিশ ক্যেসনার।

—এরিশ কী? কী নাম বললি? কোয়েসলার?

—ওই তো। নামই শুনিসনি। কত বিদ্বান, বুদ্ধিমান আঁতেল ব্যক্তি! অন্যকে বলেন স্টুপিড। আহা, মরে যাই। কোসনার শিশু সাহিত্যিক। খুব ফেমাস।

—ওসব শিশু সাহিত্যিক-ফাহিত্যিক আমি পড়ি না। ছোটদের বই লেখে তো?

—বারে মশাই। ছোটদের বই না পড়েই সোজা বড়দের বই পড়বি? অ-আ না শিখেই কয়ে মূর্ধণ্য খয়ে ক্ষ?

—তোর মতো? এখনও কচি খুকি? ছোটদের বই পড়ব না কেন? ঢের পড়েছি। চাঁদের পাহাড় পড়েছিস? পৃথিবী ছাড়িয়ে? তোরা তো মেমসায়েব। খু—কি! কিছুই পড়াশুনো করিসনি।

—খুকি খুকি করবি না বলছি ভুটে। চাঁদের পাহাড় আমাদের বাড়িতেও আছে। মিসমিদের কবচ, যখের ধন, আবার যখের ধন, সব পড়েছি। তুই পড়েছিস, রক্তমুখী নীলা?

—ওসব বই আজকাল কেউ পড়ে না চাঁদু। ওসব আউট, জেনে রাখ।

—তুমি পড়নি মানেই কেউ পড়ে না নয়। অনেকেই পড়ে।

—ই-ইস—বাড়িতে গান শেখে, রক্তমুখী নীলা পড়ে, একটা গানের ইশকুলে পর্যন্ত যায় না—কী মেয়ে রে বাবা! কচি খুকি।

BanglaBook.org

—খুকির কী আছে? গানের ইশকুলে না হোক, নাচের ইশকুলে তো যাই?

—কী! কী বললি? নাচের ইশকুলে যাস? আগে বলবি তো? ওতেই হবে। নাচের হলেও হবে। কোথায় সেই ইশকুলটা। ভবানীপুরে?

—ভবানীপুরে কেন হবে—এই তো পাশেই দুটো গলি পরেই। মোড় থেকেই দেখা যায়।

—ধু—উ—শ। অ্যাতো কাছে? কোনো মানে হয়। যমুনার গানের ইশকুল ভবানীপুরে ছিল।

—যমুনা কে?

—একটা উপন্যাসে আছে অত কাছে ইশকুল হলে সব নষ্ট।

—অ। উপন্যাসের মেয়ে। কেন? কাছে ইশকুল হলে সব নষ্ট কেন? কী নষ্ট? ভবানীপুরে ছাড়া গান শেখানো হয় না?

—গানের কথা কে বলছে? আমি বলছি ইশকুলের কথা। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না? তোকে বাড়ি পৌঁছে-টৌঁছে দিতে হবে না? এত কাছে হলে আর মজাটা কোথায়? একদম নাকের ডগায় হলে? সবাই তো সবটা দেখতে পাবে। মাসিমাটাসিমা।

—সে তো দূরের ইশকুল হলেও দেখতে পাবেন। মা-ই তো আমাকে পৌঁছে দেন, আবার নিয়ে আসেন।

—পৌঁছে? এত কাছেও পৌঁছে দেন? সে কিরে?

—বাঃ, ট্রামলাইনের ওপারে না?

—তো কী হয়েছে? তুমি পারবে না বুঝি একা একা ট্রামলাইন পার হতে? ক্লাস টুতে পড়? ন্যাকা! তোকে পাঁচ ক্লাস নামিয়ে দেবে ইশকুলে জানতে পারলে কচি খুকু।

—ইশ। দিলেই হলো। পারবো না কেন? রাস্তা পার হতে? মা যেতে দেন না, তাই। দিলেই পারবো। তুই কিন্তু আমাকে ন্যাকা বললি, কচি খুকু বললি। ভুটে। আমি সব নোটিশ করেছি। মারবো টেনে এক থাপ্পড় ফের বললে।

—থাপ্পড়? ফুঃ। মেরেই দ্যাখ না। এই তো, গাল বাড়িয়ে দিচ্ছি। হুঁঃ—কত ক্যালি, জানা আছে।

—মারামারি করলে মা নেহাৎ খচে যাবেন, তাই। নইলে সত্যি সত্যি শিক্ষা দিয়ে দিতুম তোকে আজ।

—তোর মা-টা হেভি বোর কিন্তু। পাশের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবেন, ইচ্ছেমতন মারামারিও করতে দেবেন না, মাসিমা সত্যি যা-তা। কিছু যেন মনে করিস না। ফ্যাক্ট ইজ ফ্যাক্ট।

—না, না, মনে করবো কেন? মা-রা সত্যি খুব বোরিং হয়। তোর মাও নিশ্চয় একই রকম। তোর মাও নিশ্চয়ই হেভি বোর। না রে?

—আমার মা? আমার মা, হ্যাঁ। আমার মাও একটি বোর, ঠিকই, তবে মা অন্যরকমের কায়দা করে। কোথা পৌঁছেটৌঁছে দেয় না, কিন্তু সাইকেল নিয়ে রাস্তায়

BanglaBook.org

বেরুতেই দেবে না। জবরদস্তি দুধ গেলাবে, পকেট হাতড়ে দেশলাই আছে কিনা চেক করবে, এইসব কাণ্ডকারখানা করেই বোর করে আর কি। ডিফারেন্ট ওয়েজ অ্যানড মীনজ আছে ওর বোর করার।

—নাথিং স্পেশাল, সব মায়েরাই ঐরকম করে।

—ওদের কথা থাকগে। যত বোরিং টপিক। এই রিংকু বল তো, তোর ক'টায় ইশকুল। কালকে?

—কেন? রোজ যটায় থাকে। তোর যটায় ইশকুল, তখনই। তুই সত্যি একটা ইডিয়ট। ভুটে।

—আজ্ঞে না। আমি জানতে চাইছি তুই ক'টার সময়ে বাসস্টপে গিয়ে দাঁড়াস।

কেন? দশটা নাগাদ যাই। মিনিট পনরো লাগে সব মিলিয়ে। তুই ক'টায় যাস?

—কালকে দশটা বাজতে তিনে যাবি। বুঝলি? বাসস্টপে আমি থাকব।

—আমাদের বাসস্টপে? কেন? তোর তো বাড়ি উল্টোদিকে। তুই এতদূর উজিয়ে আসবি কী করতে?

—আঃ রিংকি, তোকে নিয়ে একদম পারি না। দশটা বাজতে তিনে যাবি। ব্যাস। তর্ক করিস না।

—কিন্তু কেন যাব, তা তো বলবি?

—বাসস্টপে তিন মিনিট, স্বপ্নে বহুক্ষণ। ওসব তুই বুঝবি না। বাসস্টপে তিন মিনিট দাঁড়াতে হয়। তাহলে বহুক্ষণ স্বপ্নে দেখা হয়। বুঝলি?

—তাই বুঝি? ও। তা বাসস্টপে কেউ সঙ্গে থাকলে ক্ষতি নেই তো? কিছু হবে না তো? নাচের ইশকুলের মতন?

—ওফ্। গুডনেস। সেখানেও মাদার? জগজ্জননী, ভবতারিণী, ব্রহ্মময়ী মা? দি অমনিপ্রেজেন্ট মাদার। বাসস্টপেও মা? ধন্যি মেয়ে।

—অ্যাই, আমার মাকে ওরকম বলবি না। আমি খুব রেগে যাচ্ছি কিন্তু। মার মোটেই বাসস্টপে যাবার সময় নেই। দিদিমণিদি যায় আমার সঙ্গে।

—সেটা আবার কে? ক'টা গার্জেন তোর?

—য'টাই হোক। তোর কি?

—বাসস্টপ তো ট্রামলাইনের এপারেই। তবে কেন...

—বাঃ রে? বাসে করে একা একা ইশকুলে যাব নাকি?

—না। তোর দ্বারা হবে না।

—কী হবে না?

—কিছু হবে না। দেখি—দেখি তো, চোখ তুলে তাকা তো ভাল করে আমার দিকে? চশমাটা খুলে? বেশ ভালো করে তাকা একবার? আঃ! অমনি করে নয়। ও কী? ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছিস কেন? বেশ নরম করে তাকাতে জানিস না?

—চশমা খুললে ভুরু কুঁচকে যাবেই। আমার পাওয়ার কত, জানিস?

—তবে চশমা খুলে কাজ নেই। ভ্রূকুটি-কুটিল চাউনিকেই বরং বলা যাবে

BanglaBook.org

'ভূপল্লবে ডাক দিলে দেখা হবে চন্দনের বনে'। শুনছিস তো? নরম, চন্দনের মতন মোলায়েম করে তাকাতে হয়। অমনি করে তাকাতে শেখ।

—সুনীল গাঙ্গুলির কবিতা মশাই। টিভিতে আমিও শুনেছি সেদিন। —সেই চন্দন-চন্দন-টা তো?

—ছাই শুনেছো। ঈশ! অমন কুণ্ঠিত ক'রে নামতা পড়বার মতন ক'রে অমন লাইনটা বলতে হয়? শোন, এমনি করে বলবি—"দৃষ্টিতে কী শান্তি দিলে, চন্দ--ন, চন্দ—ন!"

আধোভাঙা গলাটি ভাবগভীর হলো। সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল হাসি শোনা গেল মেয়ের। লুটিয়ে পড়ছে হেসে।

—আ-হা-হা। চন্দো—ওন। চন্দো—ওন। চান্দো-ওন। সত্যি সত্যি যে এবার চন্দনদাদা ছুটে আসবে রে সামনের বাড়ি থেকে? আর সুনীল গাঙ্গুলি শুনতে পেলে নির্ঘাৎ কেঁদে ফেলবেন। তুই কী রে ভুটু? তুই কি শান্তিগোপাল? না স্বপনকুমার?

—আজ্ঞে না। শম্ভু মিত্র। তুই আবৃত্তির কী বুঝিস?

—কী? আমি পারি না বুঝি আবৃত্তি করতে? শুনবি তুই? শোন—ইংরিজি না বাংলা? বাংলাই আগে বলি—

পঞ্চনদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে
জাগিয়া উঠিল শিখ
নির্মম নির্ভীক।

এবার ভাঙাচোরা গলায় ভীষণ হাসি শোনা গেল—ধু—উ—শ। তুই সত্যি একটা বুদ্ধু রে রিংকি। ওটা আবার কবিতা নাকি? ওটা তো পদ্য রে। এরপর 'বা, বা, ব্ল্যাক শীপ' আবৃত্তি করবি বোধহয়?

—ও, সুনীলেরটাই শুধু কবিতা, আর রবীন্দ্রনাথেরটা পদ্য? তুই বরং এখন বাড়ি যা ভুটে। আর আসতে হবে না আমাদের বাড়িতে। তোকে আমার আর একদম ভাল্লাগছে না রে। এখুনিই পড়তে না বসলে মা বকবেন। আমি পড়তে চললুম। চেয়ার ঠেলার শব্দ। ফাইনাল ফাইনাল শুনতে। আধ মিনিট মৌন। তারপর করুণ স্বর—

—আহা, যাচ্ছিস কোথায়? চটে যাচ্ছিস কেন শুধু শুধু? বোস বোস। ঐটে পদ্য বলে কি রবীন্দ্রনাথের সব কবিতাই পদ্য? কত সুন্দর সুন্দর কবিতাও আছে। এত চটছিস কেন? দে, দে, তোর পা-টা দে তো এদিকে। পা-টা দেখি!

—আহ্। ভুটে। ন্যাকার মতো ফের মাটিতে বসছিস? দুদ্দুর—ও কী হচ্ছে? পা ছেড়ে দে বলছি, ছাড়। ছাড় পা! ভাল হবে না ভুটে—

—আহা, অত রাগ করছিস কেন রিংকি? বড্ড চট করে রাগ হয়ে যায় তোর। শশধর স্যারের মতো হবি বুড়ো হলে। দে, পা-টা দেখি—লাথি ঝাড়বি না কিন্তু।

—আঃ! পা-টা খামচে ধরছিস কেন বার বার? পা ছেড়ে দে শিগগির।

BanglaBook.org

—পা-টাই তো ধরবার কথা এখন। "দেহি পদপল্লবমুদারম"-টা বলতে হয় ঠিক এমনি সময়েই। বুঝলি? মেয়েরা রেগে গেলে, ওদের পায়ে ধরে মাপ চাওয়াই নিয়ম। এরই নাম হলো 'মানভঞ্জন', জেনে রাখবি। আগে চটিটা খোল। চটিফটি পরলে এসব ঠিক হয় না। নূপুর পরলে আরো ভালো হয়। জয়দেব পড়েছিস? এটা তাঁর কবিতা।

—জ্বালাস না ভুটে। স্টুপিড কোথাকার। আমি কি স্যাংসক্রিট জানি? আমার হিন্দি না?

—জয়দেবের বইটার নাম—

—'গীতগোবিন্দ'। সবাই জানে। তার জন্য স্যাংসক্রিট জানতে হয় না। একটাই বই লিখেছেন জয়দেব।

—খুব তো চাল মারছিস, পরের লাইনটা শুনেছিস?

—আমি না হয় শুনিনি। তুই নিজেই কি শুনেছিস? বল না, শুনি পরের লাইনটা? হুঁ হুঁ বাবা। তার বেলায় সাইলেন্স ইজ দ্য বেস্ট পলিসি। মুদারম মানে কী?

—তুই বড্ড ফ্যাচফ্যাচ করিস রিংকি। এইজন্যেই তোর দ্বারা হবে না। নূপুরও পরিস না। চটিটাও খুললি না। মুদারম নয়। উদারম। ইডিয়ট। নাঃ, তোকে দিয়ে হবে না। কিসসু না। কিসসু হবে না। ইউজলেস মেয়ে। তোর জন্যে শুধু শুধুই নতুন কর্ডের প্যান্টটায় ধুলো লেগে গেল। তোদের বাড়ি কি ঝাঁট দেয় না কেউ?

—ঝাঁট দেবে না কেন? এই ধুলো তো তুইই পায়ে করে আনলি। জুতো পরে ঢুকলি ঘরে। তারপর সেই ধুলোর ওপরেই খালি খালি থেবড়ে বসে পড়তে লাগলি। তখন একশোবার বারণ করেছিলুম। শুনেছিলি?

—ধু—উ—শ। তুই কিস্‌সু বুঝিস না রিংকু, নাথিং।

—কী বুঝি না?

—কিস্‌সুই না। ইডিয়ট, এক নম্বরের। বাজে একদম।

—অ্যাই ভুটে। আমি বাজে? না তুই বাজে? ফের ইডিয়ট বললে মাকে বলে দেবো কিন্তু।

—কী? কী বলে দিবি? দে না বলে। বলে দেবার আছেটা কী? আমি ভয় পাই নাকি তোর মাকে?

—বলবো যে ভুটে আমাকে "দেখা হবে চন্দনের বনে" কবিতা শোনাচ্ছিল। ওতেই দেখবে মা-জননী তোমার কী অবস্থা করেন।

—কী আবার করবেন? তোর মা আমার ঘেঁচু করবেন। ঘণ্টা করবেন। আমি কি চোর? না ডাকাত? কবিতা আবৃত্তির রাইট প্রত্যেকের আছে। ইটস অ্যা ফ্রী কান্ট্রি। এটা গণতান্ত্রিক দেশ। তোর মা কি আমাকে পুলিসে দেবেন? আমি কি ক্রিমিনাল?

—কিছুই দোষ করিসনি তো ভয় পাচ্ছিস কেন?

—কে [illegible] পাচ্ছে?

—ভয় পাচ্ছিস না তো উঠে পড়লি কেন?

—আমার বুঝি পড়াশুনো নেই? বাবা-মা নেই? তোমার মতো ন্যাকামো করি না বলে? ম্যা-ম্যা না করলে বুঝি মা-বাবাকে মান্য করা হয় না? ন্যাকা।

—ভুটে। ভালো হবে না বলছি। ন্যাকা ন্যাকা বলবি না বলছি। ন্যাকা কে? কথায় কথায় কবিতা কে বলে? চন্দোও—ন, চন্দোও—ন, কে বলে? কথায় কথায় পা খামচে কে ধরে? আমি? না তুই? আবার অন্যকে ন্যাকা বলা হচ্ছে। ন্যাকা ভুটে কোথাকার।

আধমিনিট নৈঃশব্দ।

—আমি চললাম রিংকি।

—যা।

—আর আসব না কিন্তু।

—আসিস না।

—চলি তাহলে।

—যাবি তো যা না। খালি যাই যাই করিস কেন। চলে যা।

—বেশ যাচ্ছি। আসবো না কিন্তু আর কোনোদিন।

—কেমন না-আসিস সে পরে দেখা যাবে।

—আচ্ছা, কচি খুকি, গুড নাইট।

—আচ্ছা, ন্যাকাভুটে, স্লীপ টাইট।

—ভূপল্লবে ডাক দিলে—

—দেখা হবে পিটি স্যারের সঙ্গে।

—তোর সবটাতেই ইয়ার্কি। ফাজিল কোথাকার।

—স্যরি। স্যরি। বাসস্টপের কথাটা কী ঠিক হলো?

—তুই তো সব ভেবড়ে দিলি।

—তো কী করব? আমি বাবা ওরকমে একা একা যেতে পারব না। মা সঙ্গে দেবেনই কাউকে না কাউকে। লক্ষ্মীদি না হলে ছোটমামু।

—ওকে। ওকে। লক্ষ্মীদিই থাকুক। কিছু হবে না। বেটার দ্যান ছোটমামু। দ্যাট বডি বিলডার?

—হুঁ (মৃদু দুষ্ট হাসি।)

—বাসস্টপে তো কতই লোকজন থাকে। লক্ষ্মীদিও থাকবে।

—আমিও তো সেটাই ভাবছিলুম। বাসস্টপে কত লোক, বাসেও কত লোক, রাস্তায় শতশত লোক, তারা কেউই তোকে ডিস্টার্ব করছে না, শুধু লক্ষ্মীদি থাকলেই যত দোষ? কী রে বাবা। লক্ষ্মীদি কি বাঘ? না ভাল্লুক?

—তুই বুঝবি না। তুই যে কিছুতেই কিছু বুঝিস না। তুই বেজায় বোকা রিংকু। আবার ইডিয়ট বললেও খেপে যাবি। এইটের অ্যানুয়ালে তোকে নামিয়ে দেওয়া উচিত সেভ্‌নে। নাইনে না তুলে। তোর বুদ্ধি বড় কাঁচা।

BanglaBook.org

—তোর তো পাকাবুদ্ধি? তাহলেই হবে। আমি বোকা হই আর যাই হই তাতে তোর কী?

—আমার কী? আমার অনেক কিছু। সেও তুই বুঝবি না। তুই একদম অবোধ বালিকা, রিংকু। একটা কবিতা শুনবি? তাহলেই বুঝতে পারা উচিত। অবশ্য তুই যা, কবিতা তোর মগজের ভেতরে ঢুকলে হয়। কংক্রীটের তৈরি স্কাল তোর।

—বেশ। ঢের হয়েছে। আমি খুব মোটাবুদ্ধি, বোকা, তুই মহান ফিনফিনে সূক্ষ্ম মগজবান ব্যক্তি। তাও তো ফার্স্ট হোস না। প্রত্যেকবার সেকেণ্ড। নে বল, কী কবিতা। শুনি তো আগে। বোঝা না বোঝা পরের কথা। ইংরেজি? না বাংলা?

—ইংরেজিতে। কী যে বলিস তুই? এসব কথা কখনও ইংরেজিতে বলা যায়? পাগল নাকি? (ভাঙা গলা শিউরে ওঠে। তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে কবিতা সুরু হয়।)—শোন মন দিয়ে।

—সর্ব অঙ্গে শিহরণ। কাঙালের মতো আমি
হৃদয় পেতেছি। দুই চোখে দাবানলে
আগুন জ্বেলেছি, জল দাও, জল দাও
বলে, পিপাসার্ত হৃদয় মেলেছি।
শোননি আমার ডাক? আমি একা,
নিঃসঙ্গ, একাকী চিরদিন। দাবানল
বুকে জ্বেলে উড়ে পুড়ে যাই, আমি শুধু
দূরে চলে যাই। রেফ্ আর
র'য়ের ফুটকিসুদ্ধু, ঙ, আর ক'য়ের
পুঁটলিসুদ্ধু, থাকো তুমি মর্মরপ্রাসাদে
আমি শুধু দূর বনপ্রান্তে চলে যাই,—
বিপন্ন, বিষণ্ণ, একা, উটের মতন জন্তুটিন।
নারী, নীরা, এই যে, এসেছি দ্বারে।
পেতেছি হৃদয়, দুঃখতাপে দৃষ্টি বৃষ্টি দাও।

কেমন কবিতা? ভালো না দৃষ্টি বৃষ্টিটা?

—হ্যাঁ। বেশ ভালো। মিষ্টিমিষ্টির সঙ্গে মেলে।

—কার লেখা বল তো?

—তোর সুনীল গাঙ্গুলির নিশ্চয়ই।

—নো স্যার। স্যরি। ম্যাডাম। মিস। ইউ আর রং। আমার লেখা। আমি নিজে লিখেছি।

—তুই? তুই লিখেছিস? এই কবিতাটা তোর নিজের লেখা?

—ইয়েস। একদম নিজে নিজে। তোর জন্যে লিখেছি। আ পোয়েম ফর ইউ। ফ্রম মি। মানস চ্যাটার্জি।

—আমার কেমন যেন মনে হলো ঠিক সুনীল গাঙ্গুলির লেখা। কেমন পড়াপড়া লাগলো।

BanglaBook.org

—অমন যাতা লাগলেই তো হলো না? এটা পড়া সম্ভবই নয়। পরশু লিখেছি আমি।

—তার মানে এককেবারে তোর ফেবারিট কবির নকল করেছিস।

—নকল? মোটেই না। নকল করব কেন? সুনীল লিখুক না আমার মতো 'দৃষ্টি বৃষ্টি দাও'।

—বাব্বাঃ। কি অহংকার! ভাল কবিতা লিখে মাটিতে যে পা-ই পড়ছে না। দেড় ইঞ্চি হাইট বেড়ে গেছে মনে হয়।

—রিংকু, তোর সত্যিই ভালো লেগেছে কবিতাটা?

—তা লেগেছে। সত্যিই বেশ সত্যিকার কবিতার মতন। কিন্তু নীরা লিখেছিস কেন? বললি যে আমার জন্যে লেখা? আমার নাম তো কোথাও নেই? নীরা তো সুনীল গাঙ্গুলির—

—ধ্যাৎ নীরা মানে কবির প্রেমিকা। আধুনিক কবিতায় সব মেয়েকেই অমন নীরা-নীরা করে অ্যাড্রেস করা নিয়ম। বুঝলি তো? কবিতায় ওরকম রিংকি-পিংকি, টুটু-ভুটু চলে না। তবু তো তোর রেফারেন্স আছে র'য়ের ফুটকি, ঙ আর ক'য়ের পুঁটলি? লিখিনি?

—অ। ওইটা? এই নে। চিকলেট খা। তোর প্রাইজ। কিন্তু রেফ কেন লিখলি? আমার নামে তো কোথাও রেফ নেই।

—তুই আমাকে কোনোকালেই বুঝবি না রিংকু। রেফটা কিছু না। ওটা এমনি লিখতে হয়, পোয়েটিক এক্সপ্রেশন একটা। হসন্তের কিছু মানে আছে? অনেকটা তেমনি।

—বুঝে কাজ নেই আমার।

—অমন বিশ্রী আওয়াজ না-করে কি চিকলেটটা চিবুনো যেত না? ওতে কবিতার মুডটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, রিংকু। একটু গোলফুলি খা।

—ওহো! কবিতার মুড। কত বড় কবি রে। শেক্সপীয়র? না, মহাকবি কালিদাস? অবিশ্যি কবিতাটা সত্যিই খারাপ না। 'দেশে' পাঠিয়ে দিয়ে দেখতে পারিস কিন্তু।

—আগের দুটো ফেরত এসেছে রে। আবার পাঠাবো?

—তার মানে পাঠিয়েছিলি? সত্যি? এত সাহস তোর?

—আমার যে কত সাহস তুই সেটা কোনোদিনই বুঝলি না রিংকু। তোর জন্যে আমি সব পারি। স-ব।

—স—ব? ওরে ব্বাবা।

—সব। এনিথিং। এভরিথিং। চিকলেটটা অত শব্দ করে খেতে হয় না রিংকু। —তুই আমাকে কিছুই জানলিও না, বুঝলিও না।

—না ভাই। ওসব কবি-টবিদের ব্যাপার আমার বুঝে দরকার নেই। কই দেখি, তোর কবিতার খাতাটা দেখি? ঐ ব্যাগে আছে? দেখি, দেখি।

BanglaBook.org

—আরে! না, না। টানাটানি করিস না, ছিঁড়ে যাবে। ওটা কবিতার খাতা নয়, ট্রিগনোমেট্রি খাতা—অংক স্যারের কাছ থেকে আসছি বললাম না?

—ট্রিগানোমেট্রি আমাদেরও করতে হবে, না রে?

—হবে না? ঠেলা বুঝবি শিগগিরই।

—তোর কবিতার খাতাটা একদিন দেখাবি?

—সত্যি পড়বি? আমার কবিতা তোর ভাল্লেগেছে? সত্যি ভালো? আমি তো ভেবেছিলাম কবিতা টবিতা তুই মোটে বুঝবিই না। শুনবিই না হয়তো। কবিতা টবিতা আমি তো সত্যিই বুঝি না। তবে পড়ে দেখতে আপত্তি নেই। এ বাড়িতে কবিতার বই ভর্তি তো। তোর অংক স্যার কেমন পড়ান রে? আমারও এবার থেকে অংকে একটু হেলপ লাগবে। মাকে বলেছি টিউটরের কথা।

—আমি ওঁকে জিগ্যেস করে দেখতে পারি। স্যার খুব ভালো পড়ান। বেশ একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

—কিন্তু হয় লক্ষ্মীদি, নইলে মা। নইলে ছোটমামু। তোর কোনোই সুবিধে হচ্ছে না কিন্তু ভুটু।

—ক্লাসের মধ্যে তো ওরা থাকবে না।

—স্যার তো থাকবেন। কী বুদ্ধি। কেউ না থাক, ট্রিগনোমেট্রি তো থাকবে।

—তা থাকুক। তবু কিছু তো একটা করা হবে বেশ একসঙ্গে। "খেলা যখন" পড়েছিস? বুদ্ধদেব গুহ-র? ওখানে দু'জনে একসঙ্গে গান শিখতো। আমরা না হয় অংক শিখবো।

—অংকের চেয়ে গানটা একটু কম স্ট্রেনুয়াস।

—তা যা বলেছিস। অংকটা বড্ড আনরোমান্টিক। গানটা বেশি ঐ লাইনে ফিট করে। না রে?

—জানি না বাপু। কোন লাইনে কী ফিট করে বলছিস? রোমান্টিক ফোমান্টিক আমার বাজে লাগে। মিলস অ্যাণ্ড বুন আমি ছুঁয়েও দেখি না ঐজন্যে। তার চেয়ে থ্রিলারও ভাল।

—দূর দূর। রোমান্টিক না হলে আবার সাহিত্য। সব ভালো ভালো লেখকই রোমান্টিক রাইটার। বিভূতিভূষণ, রবীন্দ্রনাথ এরা কী?

—রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক? উনি না মিস্টিক পোয়েট? আর বিভূতিভূষণ বুঝি মিলস অ্যাণ্ড বুনের মতো? একটুও না।

—রোমান্স আলাদা। তুই কিসসু বুঝিস না, রিংকি, চুপ করে থাক। রবিঠাকুরের মতো অস্থিমজ্জায় রোমান্টিক আর কে? অতগুলো প্রেমের গান—

—তোর না রবীন্দ্রসঙ্গীত একদম পছন্দ হয় না বলেছিলি? লাইফলেস, বোরিং, মিনমিনে—

—সবই সত্যি। পছন্দ তো করিই না। তা বলে শুনতে পাই না তা তো নয়? দিবারাত্র শুনছি—যে লোকে রবীন্দ্রসঙ্গীত পছন্দ করে না, সেই বাঙালিকে দেশদ্রোহী

BanglaBook.org

মনে করি আমি। জানিস, বাংলাদেশ যুদ্ধের সময়ে মুক্তিযোদ্ধা সৈন্যরা—

—সব জানি। থাক। বোর করিস না তো? কতটুকু ছিলি তুই তখন? যত শোনা কথা।

—অন্য একটা জরুরি কথা বলি, শোন। তোর নকশাপাড় শাড়ি আছে রে? নকশাপাড় সাদা শাড়ি?

—সাদা শাড়ি? নকশাপাড়? নকশাপাড় আবার কিরকম শাড়ি? আমি জানি না। মার থাকতে পারে। কেন? কী হবে?

—একদিন বিকেলে পরবি? এইরকম গোধূলি আলোয় শাড়ি পরে দালানে বসবি মোড়া পেতে, এই বন্ধ ড্রইংরুমে নয়, এমনি সোফাকৌচে নয়, শাড়ির নকশাপাড় কুঁচিটা ফুলের মতো মেঝেয় ছড়িয়ে পড়বে, পাড়ের তলা দিয়ে শুধু তোর ফরসা আঙুলগুলো বেরিয়ে থাকবে, পরিষ্কার নখে রংচং থাকবে না, আর আমি, আমি তখন তোর—

—ওরে বাবা। এটা কে? সুনীল গাঙ্গুলি? না বুদ্ধদেব গুহ? জয়দেব নিশ্চয় নয়?

—যেই হোক। তুই ঐরকম করে বসবি তো একদিন? প্লীজ?

—বসব না। কোনোদিন না। নেভার। তুই কী রে ভুটু? তোর একদম অরিজিনালিটি নেই? নিজে নিজে কিছুই ভাবতে পারিস না? আমাকে শাড়ি-ফাড়ি পরতে বলে লাভ নেই। আমি জীবনেও শাড়ি পরব না। আমার একদম ভাল্লাগে না শাড়ি। আর ওসব গা ধুয়ে চুল বেঁধে স্টাফ, লং আউট হয়ে গেছে। চুলই নেই কারুর যে বাঁধবে। তুই জানিস না। চোখে তো কিছু দেখিস না। বিশ বছর আগের বই পড়ে পড়ে যা কিছু। আমার দ্বারা হবে না—হবে না বলিস, তোর দ্বারাই কিস্‌সু হবে না। কপি-ক্যাট কোথাকার।

—তুই চিরকাল ফ্রকই পরবি? তুই কি মেম? শাড়ি কত সুন্দর।

—ঐ ওল্ড ফ্যাশনড নকশাপাড় লম্বা বিনুনী-ফিনুনী দিয়ে আর চলবে না রে ভুটু। বলছি, শোন, ওসব কবিতা ফেলে দে। নতুন করে ভাবতে শুরু কর। জীনস-গেঞ্জি কুর্তাচোস্ত, মিনি মিডি এসব নিয়ে কাব্য কর। তুই এখনও "পরণে ঢাকাই শাড়ি কপালে সিঁদুর" লাইনে আছিস। ফসিল কোথাকার।

—দ্যাখ রিংকু। সব ব্যাপারে ইয়ার্কি ফাজলামি ঠিক নয় কিন্তু। এটা একটা সীরিয়স কথা। একটুখানি গম্ভীর হ!

—বেশ বাবা। এই গম্ভীর হলুম। বল কী সীরিয়স কথা বলবি বল। শক্তি চাটুজ্যে? সুভাষ মুখুজ্যে। শঙ্খ ঘোষ? বলে যা ব্যাটা কপি-ক্যাট।

—রিংকু, আমি যে তোকে ভালোবাসি, সেটা তুই কোনোদিনই বুঝতে পারলি না।

—কেন পারব না? সবাই কি তোর মতন ইডিয়ট?

—বুঝিস? বুঝতে পারিস? মানে, আমার ইনার ফীলিংসগুলো তুই মনে মনে বুঝিস? সব বুঝেও...

—আ—হাহা। মরে যাই ন্যাকা ভুটুবাবুর ইনার ফীলিংস আউটার ফীলিংসয়ে কত যেন তফাৎ—

—রিংকু। তুই সত্যি বুঝতে পারিস?

—কী কথাই বললেন একখানা। দেশসুদ্ধু লোকের বুঝতে কারুর বাকি রইলো না, দেয়ালের টিকটিকিটাও যা বুঝতে পারে, আমি সেটা বুঝব না? আমি কি তোর মতন বিশ্ববোকা? যা যা বাড়ি যা। এই যে বলছিলি মা-বাবা ভাববেন। কী রে? ডাকবো নাকি?

—মাসিমাকে? ডাক না, ডাক। কী করবেন উনি আমার? তোর মা কি সি আর পি?

—মাকে না। ছোটমামুকে। সেই যে, বডি-বিলডার? ওকেই তোর কবিতাটা শোনা। যা অ্যাপ্রিশিয়েট তোকে করবে না ছোটমামু? খ্যাপাতে খ্যাপাতে তোকে সত্যি সত্যি দূর বনবাসে পাঠিয়ে দেবে, হ্যাঁ—দেখবি মজা—

—রিংকু! তুই সমানেই এভাবে লাইট করে দিবি? তুই কি কোনোদিনই আমার...

—দ্যাখ ভুটু, আমি বুঝি আর নাই বুঝি তাতে তোর কবিতার কিছুই এসে যাবে না রে, বিশ্বাস কর। লোকেরা পড়লেই হলো। সম্পাদকরা বুঝতে পারলেই হলো। তুই বরং ঐটে 'দেশে' পাঠিয়েই দে। আরেকবার। অন্যগুলো হয়তো বাজে হয়েছিল। বয়েসটাও লিখে দিস।

—কিন্তু ছাপার জন্যে তো নয়, আমি তো ওটা তোর জন্যেই—শুধু তোরই জন্যে—

—আরে? ধ্যাৎ তেরিকা। অত "তোর জন্যে—তোর জন্যে" করবি না তো, বোর ছেলে কোথাকার। যাঃ, বাড়ি যা। মোরোগে একটা।

—কিন্তু, রিংকু...

—কী বল?

—আমি তোকে—

—জানি, জানি। আর বলতে হবে না। এখন বাড়ি গিয়ে পড়তে বোসগে।

—কিন্তু তুই কি আমাকে—

—এসব আবার কি? আমি আবার কী করব? একদম আলটু-বালটু কথা বলবি না ভুটে—তার বেলা রাত বাড়ছে না বুঝি? যা বাড়ি যা।

—হোক রাত, তুই কি আমাকে একটুও—

—যাব্বাবা। এ তো আচ্ছা ফ্যাশাদ? বলছি, ভুটু বাড়ি যা— আমাকে প্লীজ এসব বলিস না। আমি সত্যি এসব বুঝি না—মা শুনলে—

—কিন্তু তুই তো আমার মনটা বুঝতে পারিস বললি—

—পারিই তো। তাতে কী?

—তোর কি আমার জন্যে একটুও, মানে কখনোও কি মনে মনে—একবারও—

BanglaBook.org

এবারে গভীর জলের আহ্বান জেগে উঠেছে অস্ফুট আধোভাঙা অভিমানী গলায়, না, আর আড়ি পাতা অনুচিত। সশব্দে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়ি —জাননার বাইরের গোলাপী আলোটায় এখন নীল-বেগুনী ঘোর।

—রিংকি। রিংকু? আছিস নাকি এদিকে?

—এই যে, মা। এ ঘরে আমি।

—দ্যাখ তো লক্ষ্মীকে বলে আরেক কাপ চা ম্যানেজ করতে পারিস কিনা?

—দেখছি মা। ভুটু, তুই আজ বাড়ি যা ভাই। অংক স্যারকে জিগ্যেস করতে ভুলে যাস না আমার কথাটা।

সে তো নেক্সট বুধবার। কাল বাসস্টপে দশটা বাজতে তিনে—

—লক্ষ্মীদি কিন্তু থাকবে—

—দ্যাটস ও কে, লক্ষ্মীদি ইজ ও কে বলছি তো—

—ঠিক আছে, গুডনাইট। শ্লীপ টাইট।

—শুভরাত্রি, রিংকু, মধুস্বপ্ন।

—আহাহা ন্যাকাভুটু। এটা আবার কোন বই?

—চিনতে পারলি না তো? খুঁজে বের কর দিকি।

আনন্দবাজার বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৮৯

BanglaBook.org

হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ

যে মুহূর্তে পরিচয় হলো মহিলার সঙ্গে অভিজিতের, মুখ থেকে মোলায়েম হাসিটুকু উবে গেল। কেমন অদ্ভুত একটা সৌজন্যের কৃত্রিম হাসি হেসে সে চটপট সরে পড়ল। আমি খুব অবাক হয় গেলুম। এটা হিসেবে মিলছে না। অভিজিৎ থিয়েটার মহলে ঘোরাফেরা করে—কিম্বার্লি মেসনের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে তার ধন্য হয়ে যাওয়া উচিত এবং অভিজিতের যে স্বভাব তাতে কিম্বার্লির সঙ্গে বেশ দহরম মহরম শুরু করে দেওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল তার পক্ষে। কিম্বার্লি মেসনের বেশ কয়েকটা নাটক ব্রডওয়েতে জমজমাট অভিনয় হয়েছে—টিভিতেও তার লেখা সিরিয়াল চলেছে দিনের পর দিন। অভিজিৎও থিয়েটারী জগতের মানুষ। কেন সে যে সুযোগ পেয়েও এঁর সঙ্গে ভাব না জমিয়ে ছুটে পালাবে, এটা ঠিক বুঝতে পারলুম না। মহিলা যেই অভিজিতের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, আমার প্রথমে মনে হলো অভিজিৎ যেন নিজের বাড়ানো হাতটা সরিয়ে নিতে চাইলো, তারপর কোনোরকমে হ্যাণ্ডশেকটা সেরে ফেললো। কিম্বার্লি নিজেই অভিজিৎকে বললে, তার কারেন ম্যাকইউয়েনের ওপর লেখাটা উনি পড়েছেন টি. ডি. আর-এ। সম্প্রতি যেটা বেরিয়েছে। অভিজিৎ

শুনে শুধু শুকনো ধন্যবাদ দিল, জিজ্ঞেসই করলো না ডিটেল অভিমত। এবং সারাটা সন্ধে যেন কিম্বার্লি মেসনের নাগাল এড়িয়ে পালিয়ে বেড়ালো ছেলেটা। আমি নিজেও একজন নিমন্ত্রিত মাত্র, নিমন্ত্রণকর্ত্রী নই, দুজনের ভাবসাব করিয়ে দেবার দায়িত্বও আমার নয়। অভিজিৎ থিয়েটার-ক্রিটিক; নিউইয়র্ক শহরে এই কাজে সাফল্য অর্জন সোজা নয়। কিম্বার্লি মেসনের সঙ্গে চেনাশুনো ওরই কেরিয়ারের কাজে লাগতো।

অভিজিৎ প্রায় বছর দশেক এদেশে আছে, ইয়েল ড্রামা স্কুল থেকে পাশ করে এখানেই থিয়েটার ক্রিটিক হয়ে উঠেছে। তবু প্রতিষ্ঠিত লোকজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় থাকাটা এই লাইনে খুব জরুরী। বেশ দলাদলি চুলোচুলি আছে এখানেও। কিম্বার্লি ওর লেখার প্রশংসা করলেন শুনে আমিই উৎসাহিত হয়ে উঠলুম, অথচ অভিজিৎকে বিন্দুমাত্র আগ্রহী বলে মনে হলো না। ভদ্রমহিলাকে আমার বেশ লাগলো। চমৎকার কথা বলেন, রঙ্গ-রসিকতার ক্ষমতা আছে, হাসিখুশি। এবং সুন্দরী হলেও আত্মসচেতনতার ছাপ নেই তাঁর আচরণে। কিম্বার্লি মেসনের বয়েস পঞ্চাশের ওপরে, কিন্তু তন্বী তরুণীর মতো দেখায়। একমাথা গনগনে লাল ঝাঁকড়া চুল (এদেশে অবিশ্যি কোনটা যে সত্যি, আর কোনটা যে রং করা, আমি বুঝতে পারি না) --যাই হোক, মানিয়েছে ভালো। সবুজ পার্টিফ্রকের ওপর হাল্কা একটা সবুজ শিফনের স্কার্ফ জড়িয়েছেন--গলায়, কানে মুক্তো। পায়ে সবুজ হিলতোলা জুতো, হাতে ম্যাচিং ব্যাগ, চোখে চুলের সঙ্গে ম্যাচ করা লাল ফ্রেমের চশমা। এদেশে বেশির ভাগ মেয়ে কনট্যাক্ট লেন্স পরা পছন্দ করে। কিম্বার্লির চশমায় হাল্কা ধোঁয়াটে রঙের কাচ। দূর থেকে হঠাৎ দেখলে ভদ্রমহিলাকে তিরিশের মধ্যে বলে মনে হবে। কাছে গিয়ে কথা কইলে তবেই বয়স্ক দাঁত, নাকের ধারের, চোখের পাশের রেখাগুলি চোখে পড়ে। হাসিখুশি মহিলার আচরণের মধ্যে দম্ভও নেই, লাস্যও নেই। বুদ্ধিমতী, রীতিমতো চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব—কী হলো কি অভিজিতের, এমন একজন মানুষের সঙ্গ এড়িয়ে বেড়ালো সারা সন্ধে? যেন ভূত দেখেছে? এমনি করলে কি বিদেশে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়?

BanglaBook.org

ফেরবার সময়ে অভিজিৎই আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিলে। আমি জিজ্ঞেসই করে ফেললুম, আর ধৈর্য ধরতে পারিনি।

"ব্যাপার কি অভিজিৎ? তুই কিম্বার্লি মেসনকে দেখে যেন ভূত দেখার মতন ভয় পেলি বলে মনে হলো? সারা সন্ধে মহিলাকে এড়িয়ে বেড়ালি? আমি অবাক হয়ে গেছি। অমন চার্মিং মহিলা, তোর কেরিয়ারের পক্ষেও ওর সঙ্গে চেনাশুনো থাকাটা—"

"থামো তো দিদি। আমার কোনো দরকার নেই। অমন ভয়ংকর মহিলা" —অভিজিৎ হঠাৎ বাক্যটা থামিয়ে দিল।

"ভয়ংকর মহিলা কি রে? আমার তো খুব ভালো লাগলো। চমৎকার সেন্স অব হিউমার, কী সুন্দর কথা বলেন—"

"চমৎকার? না ম্যাকাবার? ওকে তুমি চেনো না।"

"আমি তো চিনিই না। তুইও তো চিনিস বলে মনে হয় না। আগে কখনও আলাপ হয়নি বলেই মনে হলো।"

"হয়নি। হবার দরকারও নেই। কিন্তু চিনতে বাকী নেই। বাব্বাঃ, যা চীজ।"

"তোর হয়েছেটা কী? উনি তোর কী পাকা ধানে মই দিয়েছেন যে এমন কচ্চিস?"

"সে এক লম্বা গল্প। তুমি বললে বিশ্বাস করবে না। বলে লাভ নেই। অন্য কথা বলো।"

"কেন? বিশ্বাস করবো না কেন? ব্যাপারটা কী?"

"বলছি তো প্রায় অবিশ্বাস্য শুনতে। বলে লাভ নেই।"

"লাভক্ষতির প্রশ্ন উঠছে কেন? গল্পটা বলেই ফ্যাল না, দেখি, বিশ্বাস করতে পারি কিনা?"

"না। আমি জানি...আমি জানি কেউই বিশ্বাস করবে না। আমিও ভিত্তোরিওর কথা প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস করিনি।"

"ভিত্তোরিওটা কে?"

"ভিত্তোরিও মাসিনি। আমার এক পুরনো বন্ধু। মহিলাকে বিদুষিকা বললে কম বলা হয়। মহিলা একদম হরর স্টোরি থেকে উঠে এসেছেন। হরর মিস্ট্রি, ব্ল্যাক হিউমার—কোন ছাপটা যে মারবো ঘটনাটার গায়ে আমিও জানি না।"

"বলেই ফ্যাল আগে। ওঁকে নবরসের কোন বসে ফেলে সেদ্ধ করা হবে, সেটা পরে ঠিক হবে। অদ্ভুতরস তো আছেই।"

"সত্যিই অদ্ভুত, দিদি। এত নাম করেছেন নাট্যকার হিসেবে এত রমরমা, অথচ মানুষটি অত্যন্ত পিকিউলিয়ার। বিচিত্র প্রকৃতির মানুষ।"

"বিয়ে-থা করেননি?"

"করেছিলেন।"

"স্বামী গেল কোথায়? আসেনি তো?"

"বিয়েটা ভেঙে গেছে। বর এদেশে থাকে না। ইতালীতে আছে।"

"ইতালীতে? কী করে সেখানে?"

"এই আমারই মতন। ড্রামা ক্রিটিক। তবে ও ফ্লিম, অপেরা, অনেক কিছু নিয়ে লেখে। খুব গুণী ছেলে ভিত্তোরিও।"

"তোর বন্ধু হয় ওর স্বামী?"

'হ্যাঁ। স্বামীকে চিনতাম। ওকেও হাড়ে হাড়ে চিনি, যদিও চোখে দেখিনি এর আগে।"

"অভিজিৎ, এই রহস্য আর ভালো লাগছে না রে। ভিত্তোরিও, ইতালীয়ান ছেলে, তুই তাকে চিনলি কেমন করে?"

"ও তো নিউইয়র্কের ইতালীয়ান। আমি যেমন বাংলাদেশি, কিম্বার্লি মেসন যেমন

BanglaBook.org

জার্মানীর, ও-ও তেমনি ইতালীর। নর্থ আমেরিকার সবাই তো প্রায় ইমিগ্র্যান্ট। বিদেশী, প্রবাসী।"

"ধ্যুৎ, কিম্বার্লি মেসন ভীষণ ইংরেজ নাম। ও কখনো জার্মান হতে পারে?"

"কিম্বার্লি মেসন নামটা জার্মান নয়, কিন্তু মানুষটা জার্মানীর। ওর আসল নাম তো কিম্বার্লিও নয়, মেসনও নয়, লুডভিগা। লুডভিগা হিমলার। ওর লিটেরারি এজেন্ট ওর নাম পালটে দিয়েছিল।"

"হ্যাঁ, হিমলার। তাইজন্যেই বদলাতে হয়েছে। ওই নাম তো পৃথিবীর সাংস্কৃতিক জগতেও আর সহজে চলবে না। অচল নাম। হিটলার, গোয়েবেলস-এর মতো ঐ নামও আস্তাকুঁড়ে চলে গেছে।"

"লুডভিগা হিমলার থেকে কিম্বার্লি মেসন? অদ্ভুত তো। কিছুই মিল নেই কোথাও।"

"একদমই অদ্ভুত নয়। এদেশে এরকম নামকরণ আকছার হচ্ছে। লুডভিগা খুব ভারী নাম। তাই কেবল এই অদ্ভুত হিমলার বদলালেই চলবে না, লুডভিগা বদলাতে হবে। একটা হালকা কিন্তু নতুন ধরনের নাম চাই। কিম্বার্লি যথেষ্ট হাল্কা, অথচ খুব সাধারণ নাম নয়। অথচ ট্রাডিশনাল। অনেক ভেবেচিন্তেই এরা প্রফেশনাল নাম নেয়।"

"তুই এতসব জানলি কী করে?"

"ও জানা হয়ে যায়। দশ বছর এ লাইনে আছি। বললাম না—ওঁকে হাড়ে হাড়ে চিনি। উনি যদিও আমাকে চেনেন না। থ্যাংক গড!"

"তুই ওর বরের বন্ধু। অথচ ও তোকে চেনে না, এটা কেমন করে হয়?"

"হয় হয়"—অভিজিৎ অধৈর্য হয়ে পড়ে, "উনি অতি ভয়ংকরী। বলছি তো, হাসতে হাসতে একজনের সমস্ত জীবনটা লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারেন—এত আত্মকেন্দ্রিক, কোনো মমতা নেই। বিবেক বলে বস্তু নেই। এমন স্ত্রীলোক আমি জীবনে দেখিনি।"

"ওকে তেমন 'ফাম ফাতাল' বলে তো মনে হলো না? যদিও লালচুল, রূপসী, তন্বী, কিন্তু আচরণ তো দিব্যি সভ্যভব্য? বয়সোচিত ধীরতা আছে—"

"দিদি, তুমি ওকে দেখে কিছু বুঝতে পারবে না। ওই 'ফাম ফাতাল' অন্য লাইনের গাড়ি। ওর পথ রোমান্সের পথ নয়। এ হচ্ছে রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজ। অনেক জটিল, অনেক বন্ধুর পন্থা। বললাম না—সব শুনলে তোমার মনে হবে আমি বানিয়ে বলছি।"

"ঘটনাটা বলো তো আগে? পরে মন্তব্য শুনবো। আগে ঘটনা শুনি। কী করেছিলেন উনি?"

"আমি আর ভিত্তোরিও একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে ম্যানহাটানে থাকতুম, দুজনেই থিয়েটার পাড়ায় ঘুরি। ভিত্তোরিও তখন বেশ দাঁড়িয়ে গেছে, নিউইয়র্ক টাইমসের জন্যে রেগুলারলি থিয়েটার রিভিউ লেখে। আমি ওর জুনিয়র। সবে পাশ করে

BanglaBook.org

পায়ের নিচে যা হোক একটা জমি খুঁজছি। ভিত্তোরিও সাহায্য করে, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যায়, কাজটাজ জুটিয়ে দেয়। এমন সময়ে ওঁর একটা নাটক ব্রডওয়েতে খুললো। ভিত্তোরিও সেটার রিভিউ লিখলো টাইমসের পাতায়। প্রশংসা করতে পারেনি। ওর প্রথম নাটক, 'ডেভিলস ড্রীম' খুবই সাফল্য অর্জন করেছিল। এটা ছিল দ্বিতীয় নাটক 'লস্ট অ্যাণ্ড ফাউণ্ড'। ভিত্তোরিও লিখেছিল, 'ভালো অভিনয়, ভালো পরিচালনা দিয়েও যে একটা কাঁচা নাটককে ঠেলে চালানো যায় না এই নাটক তারই প্রমাণ। নাটকটি অতি দুর্বল, এ চলবে না।' ভুল বলেনি ও, ব্রডওয়েতে খুললেও সত্যিই নাটকটা বেশিদিন চলেনি। চতুর্দিকেই বাজে রিভিউ বেরিয়েছিল, কিন্তু কিম্বার্লি ক্ষেপে উঠলেন ভিত্তোরিওর ওপরে। ওর রিভিউটাই প্রথম বেরিয়েছিল। উনি ধরে নিলেন ভিত্তোরিওর অভিমতটাই পথনির্দেশ দিয়েছে। নাটকের সমস্ত বাজে রিভিউগুলোর জন্যে তাই উনি ভিত্তোরিওকেই মনে মনে দোষী সাব্যস্ত করলেন।"

"কেন? ভিত্তোরিওকে খুব গালমন্দ করেছিলেন বুঝি মহিলা? রাগ তো ভাই হতেই পারে। দুটো গাল দিয়েছে বলেই সে একেবারে বিভীষিকা হয়ে গেল?"

"গালিগালাজ করলে তো বোঝা যেত। তা তো করেনি। কোনো কথাই বলেনি। যা করেছিল তা এতই কিম্ভূতকিমাকার কাণ্ড, নেপথ্য থেকে পরিচালিত এক রিয়্যাল লাইফ ড্রামা—যে কেউই বললে বিশ্বাস করবে না। ব্রডওয়ে থেকে ওর নাটক উঠে গেল, আর আমাদের ফ্ল্যাটে এক নবীন নাটক আরম্ভ হয়ে গেল, ব্লীকার স্ট্রীটে। ভিত্তোরিওর নামে নেওয়া ফ্ল্যাট ছিল ওটা। ভিলেজের কাছেই।

"একদিন রাত্রে ডিনার খাচ্ছি, হঠাৎ ফোন। একটি মেয়ে ভিত্তোরিওকে ডাকছে। মেয়েটি খুব আহ্লাদের সঙ্গে ভিত্তোরিওকে ধন্যবাদ দিল, বলল, চিঠি দিয়ে হারানো ছাতার সংবাদটা ওকে জানানোর জন্যে ও খুবই কৃতজ্ঞ। কবে আসবে ছাতা নিতে সে? ভিত্তোরিও যে যত্ন করে ছাতাটা তুলে রেখেছে, এজন্যে সত্যিই সে যার-পরনাই ধন্য।

"ছাতা? কোথায় ছাতা? ভিত্তোরিও তো আকাশ থেকে পড়ল। কই? কোনো ছাতা তো সে খুঁজে পায়নি?

"মেয়েটি এবারে চটে উঠলো। পায়নি তবে চিঠি দিয়েছে কেন? বিজ্ঞাপনের উত্তর দিয়েছে কেন? ছাতা ফেরৎ নিয়ে যেতে বলেছে কেন? মেয়েমানুষের সঙ্গে ইয়ার্কি মারবে বলে? এটা কি ইভ-টিজিং হচ্ছে? পুলিশে খবর দেবে সে? ভিত্তোরিও তো প্রায় কেঁদে ফেললে। তাকে আপ্রাণ বোঝাতে লাগলো, সে এরকম কোনো বিজ্ঞাপন দেখেওনি, উত্তরও দেয়নি, এ-বিষয়ে সে কিছুই জানে না। মেয়েটিকে চিঠি, নিজের ফোন নম্বর, ঠিকানা এসব ভিত্তোরিও দেয়নি মোটেই, নিশ্চয়ই তার কোনো বন্ধুর নিষ্ঠুর রসিকতা এটা। ভিত্তোরিও খুবই দুঃখিত এবং লজ্জিত এবং অনিচ্ছাকৃত বিরক্তি উৎপাদনের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। মেয়েটিকে তো কোনোরকমে ঠাণ্ডা করা গেল, কিন্তু তার পরেই ফোন করলেন এক বৃদ্ধ। তিনি যারপরনাই আনন্দিত যে ভিত্তোরিও তাঁর ড্রাইভিং লাইসেন্সটা কুড়িয়ে পেয়েছে। বৃদ্ধ হয়েছেন বলে যদিও

BanglaBook.org

তিনি গাড়ি চালান না, তবু লাইসেন্সটা আই. ডি. হিসেবে অনেক কাজে লাগে এখনও। তাঁর ওই মুদির দোকানের দেওয়ালে সাঁটা সামান্য বিজ্ঞাপনটি যে ভিত্তোরিও দেখেছে এবং মনে করে চিঠি লিখেছে, এজন্য তাঁর অসীম কৃতজ্ঞতা। এবার অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে তাঁকেও জানালো ভিত্তোরিও যে, সে এমন কোনো বিজ্ঞাপন দেখতে পায়নি, তাঁকে চিঠিও লেখেনি। ড্রাইভিং লাইসেন্সের খোঁজ সে দিতে পারছে না। বৃদ্ধ অত্যন্ত আহতস্বরে জানালেন, এ ধরনের কুশ্রী রসিকতা কোনো ভদ্রসন্তানের কাছে তিনি আশা করেননি।

"এর পরে ভিত্তোরিওকে ফোন করলেন অত্যন্ত বিব্রত ওয়াল স্ট্রিটের এক দালাল। প্রচুর জরুরি কাগজপত্র সমেত তাঁর ব্রীফকেসটা ভিত্তোরিও যে ট্যাক্সিতে পেয়েছে এজন্য তাঁর প্রাণ বেঁচেছে। তিনি ভিত্তোরিওকে এক হাজার ডলার পুরস্কার দিয়ে ব্রীফকেসটা ফেরৎ নিয়ে যেতে চান। কখন আসবেন?

"তারপরে একজন বিনয়ে বিগলিত নম্র জাপানী টুরিস্ট, অত্যন্ত বিপন্ন হয়েও তাঁর ভদ্রতাজ্ঞান অসীম, তাঁর হারানো পাশপোর্ট-টিকিট-ট্রাভেলার্স চেক সমেত ফোল্ডারটির জন্য টেলিফোন করলেন। তারপরে এক ভারতীয় ছাত্র। তার সব ভিসার কাগজপত্র সমেত খামটা সে সাবওয়ে রেলগাড়িতে ফেলে এসেছিল। এখন ভিত্তোরিওর চিঠি পেয়ে নির্ভাবনা হয়েছে। তার কাছে কবে আসবে সে সেগুলি ফিরিয়ে নিতে? তারপর একজন মহিলা যাঁর যাবতীয় ব্যাংককার্ড, চেকবই, আই. ডি., এবং বেশ কিছু কাঁচা টাকা ও ছোট্ট ক্যামেরাসুদ্ধ হাতব্যাগ তিনি কোনখানে যে ফেলে এলেন? তিনি ভেবেছিলেন চোরে তুলে নিয়েছে, কিন্তু সবই ভিত্তোরিওর কাছে আছে জেনে এখন তিনি নিশ্চিন্ত। ভিত্তোরিও প্রায় পাগল হয়ে উঠলো। এক সন্ধ্যাবেলাতেই এতগুলো ভূতুড়ে টেলিফোন—এ এক অদ্ভুত সাজানো শত্রুতার কাণ্ড। কে করছে এই যাচ্ছেতাই, বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ডটা? নিউইয়র্ক শহরে জ্ঞানত তার কোনো এমন শত্রু বা বন্ধু নেই এ ধরনের রসিকতা যে করতে পারে। ভিত্তোরিওর দৃঢ় ধারণা হলো তাকে ভূতে পেয়েছে। যার যেখানে যা কিছু হারিয়েছে সবাই ভিত্তোরিওর কাছে খোঁজ করছে। ফোনে, চিঠিতে। সমস্ত হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ বিজ্ঞাপনের সে নাকি উত্তর দিচ্ছে, যেখানে যা কিছু হারানোর বিজ্ঞপ্তি বেরুচ্ছে কেউ তাদের চিঠিতে বা ফোনে সান্ত্বনা দিয়ে ভিত্তোরিওর নাম ঠিকানা জানাচ্ছে। চিঠি পেয়ে আকুলচিত্তে হারানো বস্তু উদ্ধারের আসায় তাঁরা ফোন করেছেন, এবং ভিত্তোরিওর 'না-তো' শুনেই ক্ষেপে উঠছেন। হতাশ হয়ে এবং ঠকে গিয়ে ভিত্তোরিওকে প্রচণ্ড গালাগালি করছেন। ভিত্তোরিওর কাজকর্ম চুলোয় গেল। দু' তিনদিনের মধ্যে তার মুখ-চোখের চেহারা পালটে গেল। বিভ্রান্ত অসুস্থ মূর্তি হলো তার। আমিও পাগল হয়ে উঠলুম। অস্থির হয়ে টেলিফোনের প্লাগটা খুলে ফেললুম আমরা, যাতে কোনো ফোনই ধরতে না হয়। কিন্তু চিঠি? চিঠিতে চিঠিতে ঐ একই বক্তব্য। চিঠি খোলাই বন্ধ করে দিল ভিত্তোরিও। জরুরী চিঠিপত্র না পড়া অবস্থায় পড়ে রইল। ভিত্তোরিও রেকর্ড চালিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকে সারাদিন। টেলিফোন খুলে রাখায় বন্ধুবান্ধবের

সঙ্গেও সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেল, কাজকর্মের যোগাযোগও বিঘ্নিত হলো। আমাদের দু'জনেরই জীবন লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়লো— আমি তবু বেরিয়ে যাই বাড়ি থেকে, ভিত্তোরিওর কী যে হলো দিনরাত শুয়ে থাকে, ওর মাথার মধ্যে ওই একটা ছাড়া অন্য কোনো ভাবনা নেই। ফোন তো চিরকাল তুলে রেখে দেওয়া যায় না? আমার নতুন কর্মজীবন সদ্য শুরু হচ্ছে, এভাবে যোগাযোগশূন্য হয়ে জার্নালিজমের কাজে টিকে থাকা যায় না। ওই বাড়িতে থাকতে থাকতে আমিও যেন পাগল হয়ে যাচ্ছি। ফোন আবার একদিন লাগাতেই হলো, অমনি শুরু হয়ে গেল হাজার হাজার কাকের মতন ঝাঁকে ঝাঁকে ফোন। চিঠি তো জমছিলই। আশ্চর্য, অসংখ্য অচেনা ব্যক্তি যাদের কাউকেই ভিত্তোরিও চেনে না, তারাও চেনে না ভিত্তোরিওকে—ভিত্তোরিওর জীবন ওষ্ঠাগত করে তুললো। অবুঝ অত্যাচারটা সংঘবদ্ধ আক্রমণের চেহারা নিচ্ছে। আমি যে কী করব বুঝতে পারছি না। কে এভাবে পেছনে লেগেছে ওর? উথাল-পাথাল করে তুলেছে জীবন?

"ক্যাথলিক ছেলে ভিত্তোরিও ঠিক করলো চার্চে যাবে, ফাদারকে বলবে ভূত বিতাড়নের স্বস্ত্যয়ন করতে। এ ভূতুড়ে আক্রমণ ছাড়া আর কী? কার কী ক্ষতি সে করেছে?

"হঠাৎ একসময়ে দেখা গেল টেলিফোনের ধরনটা পালটেছে। এবার কেবল হারানো পোষা কুকুরের মালিকেরাই ফোন করছে। কার কোথায় অ্যালসেশিয়ান হারিয়েছে, কার ডালমেশিয়ান ছানা, কার লাব্রাডর, কার বক্সার, কার স্কাট, কার পুডল্। ভিত্তোরিও কুকুর পোষে না, কুকুর পছন্দও করে না। পালে পালে যত অন্যদের হারানো কুকুরের জন্যে ক্রমাগত জবাবদিহি করতে করতে সে হয়রান তো হয়ে পড়লোই, ক্ষেপেও উঠতে লাগলো। ক্রমশ তার কথাবার্তা রুক্ষ অভব্য হয়ে উঠলো। আমি দেখতে পাচ্ছি চোখের ওপর প্রচণ্ড মানসিক চাপে ভিত্তোরিও পাগল হবার যোগাড় হয়েছে। যার যেখানে কুকুর হারাচ্ছে—এমনকী নিউইয়র্কের বাইরে থেকেও ভিত্তোরিওর কাছে চিঠি আসছে।

"আমার ভেবে ভেবে মনে হলো এ কোনো বদ মানুষের সুপরিকল্পিত, অতি পরিপক্ক প্ল্যানিং—ভিত্তোরিওর ওপর কোনো ধরনের প্রতিশোধ নেওয়া। কিন্তু কে হতে পারে সে? বিজ্ঞাপন দেখে দেখে ভিত্তোরিওর সেই অজ্ঞাত শত্রু ভিত্তোরিওর নামে পরিচয় দিয়ে সেইসব কুকুর হারানোর বিজ্ঞাপনদাতাদের চিঠি দিচ্ছে, যেন আমাদের বাড়ির ঠিকানাতে একটা হারানো কুকুর জমা পড়ার এজেন্সি আছে, সেইখানেই তাদের হারামানিকগুলি জমা পড়েছে। অমনি কুকুরপ্রেমিক মালিক-মালকিনরা উন্মত্ত হয়ে ফোন করছেন ভিত্তোরিওকে। সত্যি সত্যি এবার আমিও অস্থির হয়ে উঠেছি। ভিত্তোরিওর আচার-ব্যবহার সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতন নেই। আমি ওকে সাইকিয়াট্রিক হেলপ নিতে বলছি, কাউনসেলিং নিতে বলছি—কিন্তু ভিত্তোরিও কথা শুনছে না। অথচ নিরবচ্ছিন্ন মানসিক চাপে সে স্নায়বিক ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে, চার্চেও যাচ্ছে না। স্পষ্ট বুঝতে পারছি সমস্যা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। পরিস্থিতি

অতি কঠিন। ভিত্তোরিও মেনিক ডিপ্রেসিভ হয়ে পড়ছে। আমি চেষ্টা করেও কিছু করতে পারছি না।

"ইতিমধ্যে ভূতের ধারণা পালটে গিয়ে হঠাৎ দেখি ভিত্তোরিওর ধারণা হয়েছে এই কুকীর্তির মূলে শ্রীমতী কিম্বার্লি মেসন। কিন্তু ওর এই ধারণার কোনোই প্রামাণিক ভিত্তি নেই। নিউইয়র্ক মেনিয়াকের রাজ্য। কে জানে কোন পাগলে পিছনে লেগেছে হঠাৎ ভিত্তোরিওর? এদেশে বিনা অপরাধে বিনা কারণে মানুষ মানুষকে খুন করে দেয়। এখানে কী না সম্ভব? একদিন সকালে আমি বেরুবো বলে পোশাক পরছি, ভিত্তোরিও কফি বানাচ্ছে। শুয়ে থাকা ছাড়া ওই আর একটিই কাজ সে করতো। দরজায় হঠাৎ খুব অভদ্রের মতো সজোরে তিনবার ঘণ্টি বেজে উঠলো। বেজায় রেগেমেগে উঠে তো ভিত্তোরিও গরগর করতে করতে দরজা খুললো। খুলেই দ্যাখে পুলিশ।

"এক ভদ্রলোকের অত্যন্ত মূল্যবান কুকুর চুরি গেছে। তিনি তাঁর বিজ্ঞাপনের উত্তরে চিঠি পেয়েছেন যে এই ঠিকানাতে সেই কুকুরছানাটিতে দেখা গেছে। চিঠি নিয়ে তিনি কালবিলম্ব না করে থানায় গেছেন এবং পুলিশ সমেত কুকুর উদ্ধার করতে এসে পড়েছেন। ভদ্রলোক মাঝবয়সী, তাঁর কাজই পুলিশের কুকুর ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করে বিক্রি করা। সেই কুকুর চুরি গেছে—এটা হাস্যকরও, দুঃখেরও। কিন্তু ভদ্রলোক ক্ষেপে টং হয়ে আছেন—'কই আমার কুকুর? বের করো আমার কুকুর বলে চেঁচাচ্ছেন।' পুলিশ তো ঘরে ঘরে ঘুরতে চায়—টেবিলের তলায়, ক্লজেটের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে। ভিত্তোরিও একেবারেই চুপ করে গেল। পুলিশ দেখে একটাও কথা বলছে না। নির্বাক। যেন বোবা। কোনো উত্তর না পেয়ে পুলিশ ক্রমে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে।

"শেষ অবধি পুলিশের সঙ্গে কথা বলার দায়িত্ব আমাকেই নিতে হলো। অভিযোগে যদিও আমার নাম ছিল না, কিন্তু আমিও যেহেতু ওই বাড়িতেই থাকি অতএব ভিত্তোরিওর সঙ্গে আমিও কুকুর চুরির দায়ে পড়লুম। পুলিশের কাছে যে চিঠিটি ছিল তাতে বলা হয়েছে যে এ-বাড়িতে পরপর প্রায়ই বিভিন্ন জাতের কুকুর দেখা যায়। অল্পদিন পরেই অন্য কুকুর আসে এবং রীতিমতো বর্ণনা দেওয়া আছে, আগেকার যেসব হারানো কুকুরদের খোঁজ করেছিলেন বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের মালিকরা সেইসব কুকুরদের। এবং এটিই সবচেয়ে অধুনা চুরি যাওয়া দামী কুকুরছানা, যাকে পুলিশী ট্রেনিং দেওয়া যাবে। চিঠি হাতে নিয়ে আমিও বসে রইলুম। বললুম পুলিশকে, 'তোমারই খুঁজে দ্যাখো, কুকুরছানা পাও কিনা। তারপর আমাদের প্রতিবেশীদের জিজ্ঞেস করো তাঁরা ওইসব কুকুর দেখেছেন কিনা। আমরা তো একটাও দেখিনি। এই ছোট ফ্ল্যাটবাড়িতে মাত্র বারোটি ফ্ল্যাট আছে—কে কোথায় কী রেখেছে তা সম্পূর্ণ জানি না, তবে আমরা কোনোটাই কিন্তু দেখিনি।' পুলিশ ঘুরেফিরে দেখলো। আমাদের বিল্ডিঙের দারোয়ানকে এবং প্রতিবেশীদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত করলো। তারা প্রত্যেকেই আকাশ থেকে পড়ে জানালো দশ নম্বরের বৃদ্ধার দুটো কুকুর আর সাত

নম্বরের বাচ্চা ছেলেটার একটা বেড়াল আছে বটে, এ ছাড়া তো এ-বাড়িতে কারুরই কুকুর বেড়াল নেই। ভিত্তোরিও, অভিজিৎ এদের কোনোকালেই কোনো পুষ্যি ছিল না। না, না, ওরা কুকুর বেচাকেনার ব্যবসা করে না—থিয়েটার ক্রিটিক। তখন আমি ইয়েল ড্রামা স্কুল থেকে পাশ করেছি সদ্য, সেটারও যে মূল্য ছিল না তা নয়। পুলিশের সঙ্গে ভিত্তোরিও তো কথাই বলছিলো না—আমিই তার নিউইয়র্ক টাইমসের রিভিউয়ের ফাইল বের করে দেখালুম। পুলিশ ও কুকুরের মালিকটি অবশেষে আমাদের মতোই বিভ্রান্ত ও বিচলিত হয়ে ফিরে গেল। আমরা জেলে গেলুম না।"

"তোমরা পুলিশের কাছে ডায়েরি করলে না কেন?"

"ডায়েরি কীভাবে করবো? কার নামে? সেদিন পুলিশকে সব খুলে বললুম তো। নিত্যি নিত্যি আমাদের ফোনে যে হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে, এবং গুচ্ছের চিঠিপত্রও দেখালুম। হারানো জিনিসপত্তর ফেরৎ চেয়ে নানান ব্যক্তি নানান চিঠি দিয়েছেন। আমি সে সবই ফাইল করে রেখেছিলুম—পুলিশ দেখলো। ফাইলটা নিয়েও গেল। খোঁজখবর করব বলল, কিন্তু কিছুই করল না। নিউইয়র্কের পুলিশ খুন-খারাপি রেপকেস নিয়ে এত ব্যস্ত যে এমন তুচ্ছ কেসে মাথা ঘামানোর তাদের সময় নেই।"

"তোমাদের তবুও অভিযোগ ফলো-আপ করা উচিত ছিল অভিজিৎ। এ তো খুনের চেয়ে কম মন্দ কাজ নয়। মনের রোগ বাধিয়ে দিচ্ছে।"

"হলে কী হবে। সেটা তো এথিকাল লেভেলে। মহিলাকে তো ধরা যেতো না। তিনি বিভিন্ন কম্পিউটারে, বিভিন্ন প্রিন্টারে, বিভিন্ন টাইপরাইটারে চিঠিগুলো লিখতেন এবং বিভিন্ন পোস্টাপিশে ডাকে ফেলতেন। যারা আসতো তাদের হাতে দেখেছি চিঠিগুলো—কোনোটা নিউ জার্সিতে কোনোটা বং আইল্যাণ্ডে, কোনোটা কুইনসে, কোনাটা ব্রুকলিনে—উনি নিজে থাকেন গ্রেট নেক-এ। সেখানে কিচ্ছু ডাকে দিতেন না। অতীব চালু পার্টি। আটঘাঁট বেঁধেই নেমেছিলেন, ক্রিমিনালদের যা নিয়ম।"

"শেষ পর্যন্ত কী হলো? ব্যাপারটা বন্ধ করলে কী উপায়ে? পুলিশ তো কিছুই করলো না বললে।"

"কীভাবে বন্ধ হলো? সে আরেক নাটক। ওঃ, সাধে আমি মহিলাকে এড়িয়ে চলেছি আজ? বিষকন্যা বলে না? উনি তাই। স্পর্শমাত্র মৃত্যু। উনি পারেন না এমন কাজ নেই। অসীম ক্ষমতা ওঁর। সেদিন তো আমরা পুলিশের হাত থেকে বাঁচলুম। কিন্তু ফোনও থামলো না, চিঠিও বন্ধ হলো না। ফোনের প্লাগ খুলে রাখলে আবার আমার চলে না—আমার কাজকর্মের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়।

"ইতিমধ্যে ভিত্তোরিওর নিশ্চিত বিশ্বাস হয়েছিল এই প্রচণ্ড বিচিত্র অত্যাচার মাস্টারমাইনড করছেন লুডভিগা হিমলার। তাঁর নাটকের নাম 'লস্ট অ্যাণ্ড ফাউণ্ড' যেটার ও নিন্দে করেছিল। তিনিই নাটকীয় প্রতিশোধ নিচ্ছেন—তিনি যে কতবড় শক্তিমতী নাট্যকার সেইটে প্রমাণ করে দিচ্ছেন। শেষকালে ভিত্তোরিও একদিন বললো, 'অভিজিৎ, আমি আর পারছি না। এ স্নায়ুর যুদ্ধে আমি হার মেনে নিচ্ছি। আমি

ভদ্রমহিলার কাছে সোজাসুজি গিয়ে বলবো—ডাইনী, আমাকে মুক্তি দাও। আমাকে ছেড়ে দাও। এই জটিল নাটকের কবল থেকে আমাকে মুক্ত করো। আমি স্বীকার করছি আমার ভুল হয়েছিল। তুমি যে কতবড়ো নাট্যকার এবং কত দক্ষ নাট্য পরিচালনা করতে পারো এখন তা আমি জানতে পেরেছি— তোমার অ্যাবসার্ড নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে আমি প্রকৃতপক্ষে জীবনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। আমি স্নায়বিক অবসাদে ক্লান্ত, আমাকে সুস্থ মস্তিষ্কে বাঁচতে দাও, টেলিফোনে আর পত্রাঘাতে আমি মানসিকভাবে ক্ষতবিক্ষত, আমাকে ব্যাধিমুক্ত করো, আমার কেরিয়ার চুলোয় গেছে, আমার বন্ধুবান্ধব, স্বাভাবিক সামাজিক জীবন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, আমাকে দয়া করো। তোমার নিষ্ঠুরতার নাটকে এবার যবনিকাপতন হোক। এই নাটকের নায়কের ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করিয়ে নিয়েছো তুমি আমাকে দিয়ে, এমনকী পুলিশকে দিয়েও। শতশত মানুষকে তুমি তোমার এই খোলা মঞ্চের নাটকে চমৎকার ব্যবহার করেছো, এবার সকলকেই মুক্তি দাও। এ রসিকতা থামাও। তোমার নাট্যকৃতিত্ব বিষয়ে আমার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।' আমি ভিত্তোরিওকে বাধা দিলুম না। বললুম—'দ্যাখো চেষ্টা করে।' কেননা আমারও কাজকর্ম শিকেয় উঠেছিল। এবং ভিত্তোরিও চোখের সামনে মানসিক ব্যধিগ্রস্ত হয়ে পড়ছিল। আমার এই ব্যাখ্যাটা অসম্ভব বলে মনে হলো না। এটা ছাড়া আর কী হতে পারে?

"ভিত্তোরিও তো গেল উদ্ধার চাইতে। কিন্তু দেখা হলো না। আবার গেল। নো লাক। আবার গেল। আবার গেল। আবার গেল। অবশেষে একদিন দর্শন দিলেন কিম্বার্লি মেসন। ভিত্তোরিওর কাহিনী শুনে আকাশ থেকে পড়লেন। পাগল নাকি? এমন কেউ পারে? অবশ্যই এসব কীর্তি ওঁর নয়। সীমাহীন সহানুভূতি জানালেন এবং সম্পূর্ণই অস্বীকার করলেন যে এ কাজের মূল হোতা তিনি নিজে। ভিত্তোরিও কিন্তু ছাড়লো না—প্রত্যেকদিন ওর সঙ্গে দেখা করতে লাগলো। সেটাই ওর নেশা হয়ে দাঁড়ালো। উনি ওকে বোঝালেন যে নিউইয়র্ক না ছাড়লে এই চিঠিভূত ফোনভূত ওকে ছাড়বে না। ক'দিনের জন্যে ও শহরের বাইরে যাক। ভূতের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতেই ভিত্তোরিও রোমে চলে গেল। কিন্তু একা নয়। সঙ্গে গেলেন কিম্বার্লি মেসন। ওখানেই তাঁদের বিয়ে হলো। ভিত্তোরিওর গদগদ চিঠি পেয়ে মনে হলো ও এখন সত্যিই বিশ্বাস করছে যে ঐ চিঠি, টেলিফোন কিম্বার্লির পরিকল্পিত নিষ্ঠুর প্রতিশোধের অত্যাচার নয়। কোনো অজানা রহস্যময় ঘটনা। কোনো ম্যানিয়াকের কীর্তি। গ্রীক ট্র্যাজিডিতে অপরাধী নায়ককে যেমন তাড়া করে বেড়ায় প্রতিশোধের প্রেতেরা, ভিত্তোরিওর অবস্থা যেন অবিকল তাই হয়েছিল নিউইয়র্কে। কিন্তু রোমে গিয়ে ও সেরে উঠলো। কিম্বার্লিও একটা নতুন টিভি সিরিয়াল লিখলেন ওখানে বসে।

"কিম্বার্লি খুব ভুল বলেননি। ভিত্তোরিও সঙ্গে উনি যেই দেশ ছাড়লেন অমনি সব ঠাণ্ডা। উনিও গেলেন, এখানেও চিঠিপত্র ফোনটোন সবই বন্ধ হয়ে গেল। কিম্বার্লির ওই সিরিয়ালটা এখানে হিট হয়েছিলে টিভিতে—মনে আছে, সেই 'রোমান্সিং রোম'? আর ভিত্তোরিওটা নিষ্কর্মা বেকার হয়ে পড়লো। জার্নালিজমের জগৎটা জানো তো

কিরকম কমপিটিটিভ? কাড়াকাড়ি, কামড়াকামড়ির জগৎ। একবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পিছিয়ে পড়লে আবার মাথা তুলে দাঁড়ানো শক্ত। যোগাযোগগুলো নষ্ট হয়ে যায়। মুক্তি দেবার ছল করে মহিলা ভিত্তোরিওর জীবনটা ধ্বংস করে দিলেন—সেটাই ওর প্ল্যান ছিল। বছর তিনেক বাদে যখন ওঁরা ফিরলেন, উনি ওঁর নতুন কনট্যাক্ট সই করতে এলেন। ভিত্তোরিও কিন্তু কিছুতেই আগের জায়গায় ফিরতে পারলো না। এখানে এসে উনি এন বি সি'র টিমথি রাইনহার্টের সঙ্গে থাকতে শুরু করলেন। কাজেও বিফল, প্রেমেও বিফল ভিত্তোরিও বেচারা ভাঙা মন নিয়ে আবার সেই রোমেই ফিরে গেল। এইসময়ে ওর ঠাকুর্দা মারা গেলেন রোমে। কিছু সম্পত্তি পেল ভিত্তোরিও। কপালগুণে ইতালীয় ভাষাতে অপেরা রিভিউ লিখতে শুরু করে ভিত্তোরিও আবার দাঁড়িয়ে গেছে, ইতালীতে ভিত্তোরিও মাজিনি এখন রীতিমতো চেনা নাম। ফিল্মি দুনিয়াতেও পা রেখেছে এখন। কিন্তু ভিত্তোরিওর এমন চমৎকার নিউইয়র্ক টাইমসের কেরিয়ারটা ভদ্রমহিলা কেমন অনায়াসে ধ্বংস করে দিলেন, কেবলমাত্র একটা ব্যাড রিভিউ-এর জন্যে। এঁকে তুমি ডাইনী বলবে না? মন্ত্রতন্ত্র তো নয়, নিষ্ঠুরতা আর কুবুদ্ধি লাগে ডাইনী হবার জন্যে। উইচ আর কাকে বলে?"

আমি চুপ করে থাকি। কী উত্তর দেবো? অভিজিৎ একটা ক্যাসেট চালিয়ে দেয়—সুব্রহ্মণ্যমের বেহালা বেজে ওঠে। ওঁ শান্তি।—

"এত ক্রোধ, এত নারকীয় ঘৃণা মানুষকে জব্দ করবার, মানুষকে শেষ করে ফেলবার এই জেদ, প্রতিশোধস্পৃহার এমন নাটকীয় চেহারা এতকাল আমি বইপত্তরেই পড়েছিলুম শুধু। এই মহিলার মধ্যে স্বচক্ষে দেখলুম দিদি। একটা যুবকের উঠতি জীবন ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার শক্তি এবং ইচ্ছে যাঁর আছে তাঁকে ভয় করবো না?"

অভিজিৎ গাড়িটা থামালো। জেব্রা ক্রসিং দিয়ে একটা ছোট্ট কুকুর নাচতে নাচতে রাস্তা পার হচ্ছে। পিছু পিছু এক বৃদ্ধা।

পকেট থেকে লাইটার বের করতে করতে ঠোঁটের সিগারেটটা চেপে অভিজিৎ বললো—"বাপরে। এখনও আমার কুকুর দেখলে গা-ছমছম করে ওঠে। হেইল হিমলার! কী উত্ত্যক্তই করেছিলেন মহিলাটি আমাদের।"

আমি চোখ বন্ধ করে কিম্বার্লি মেসনের চেহারাটার সঙ্গে অভিজিতের গল্পটা মেলানোর চেষ্টা করলুম।

নবকল্লোল, শারদীয় ১৪০০

BanglaBook.org

ধর্মভাই

জায়গা না পেয়ে ফিরেই যাচ্ছিলুম আমরা। সন্ধে হয়ে গেছে। পরের ডাকবাংলোটা কোথায় ঠিক জানি না, জেনে নিয়ে পথ খুঁজে যেতে হবে।

—"এরকম যা-তা করে বেরিয়ে পড়লে এরকমই হয়" বলে বার বার খোঁটা দিচ্ছে রঞ্জনা। এইখানেই থাকা হবে বলে মনে মনে ঠিক করে বেরিয়েছি। সন্ধে নাগাদ ঠিকঠাক পৌঁছেছি, সব হিসেব মাফিক, কেবল আগে বুক করাটা হয়নি। বাংলোতে একজন পুলিশ অফিসার রয়েছেন। একটা মার্ডার কেস ধরতে এসেছেন। আমাদের জায়গা দিল না। গাড়িটা কম্পাউণ্ড থেকে বেরুবার মুখেই পুলিশের গাড়িটা ঢুকলো। জীপের ভিতরে যে অফিসারটি বসে আছেন তাঁর মুখখানা খুব চেনা-চেনা। তিনিও গলা বাড়িয়ে নজর তীক্ষ্ণ করে আমাকে দেখতে লাগলেন এবং তারপর হঠাৎ একসঙ্গে দুজনে চিনতে পারলুম দুজনকে। সোমেশ!

—"দীপেন।" লাফিয়ে জীপ থেকে নেমে পড়লো সোমেশ।

—"যাচ্ছিস কোথায়? কদ্দিন পরে দেখা।" সোমেশ একেবারে জড়িয়ে ধরলো আমাকে।

—"যাচ্ছি পরের ডাকবাংলো খুঁজতে। এখানে যে পুলিশ সুপার সাহেব..." চোখ পাকিয়ে বলি।

—"আরে ধ্যাৎ, চল চল ঢের জায়গা আছে।"

প্রচণ্ড হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিল সোমেশ। স্বভাব একটুও বদলায়নি। সেই কলেজের ছেলেটাই লুকিয়ে আছে পুলিশের পোশাকের পেছনে। প্রচণ্ড হৈ চৈ বাধিয়ে দিল। রঞ্জনার সঙ্গে দুমিনিটে জমিয়ে নিল। একসঙ্গে খেয়ে-দেয়ে আমরা গল্প করতে বসলুম। কাজটা সারা হয়ে গেছে। সোমেশের তাই অত ফুর্তি। সকালে এলে পুলিশকর্তাসাহেবের ঠিক এই চেহারাটা দেখা যেত বলে মনে হয় না।

—"গাঁ-গঞ্জের লোকগুলো কিন্তু খুব একটা পোক্ত-পাকা ক্রিমিনাল হয় না। ঠিক ধরা পড়ে যায়।"

কফিতে মৌজ করে চুমুক দিয়ে সোমেশ বললো। দারুণ মোরগমুসল্লম রাঁধতে পারে এই বাংলোর বেয়ারা। খাইয়ে মুড জমিয়ে দিয়েছে সকলের। রঞ্জনা আবার শিখেও নিয়েছে রেসিপিটা। সোমেশ আরাম করে টেবিলে পা তুলে দিয়েছে, রিভলবারটা পাশেই খুলে রাখা।

—"খুনের মামলার জন্যে এলে সবসময়ে ওটা রাখা ভাল—", হেসে রঞ্জনাকে বলল সোমেশ, "ভয় পাবেন না যেন। অবশ্য এ কেসটা খুব সিম্পল, আর খুনী ডেনজারাসও নয়।"

—"কী কেস? কী হয়েছিল?"

—"খুন। আবার কি। মাঠের মধ্যে রক্তমাখা ডেডবডি পড়ে আছে মালটিপল স্ট্যাব উণ্ডস নিয়ে। ওদিকে গাঁয়ে যাত্রা হচ্ছিল সে রাত্রে। সকালে বাড়ি ফেরার

BanglaBook.org

সময়ে সবাই বডিটা আবিষ্কার করেছে। তারপর থানা পুলিশ মর্গ।"

—"খুনী পাওয়া গেছে।?"

—"এই তো আজই সেটা সেটেলড হলো। সেইটে করেই ঢুকছি, আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ক'দিন ধরেই ঘুরছি এই কেসটার পেছনে। আজই হিল্লে হলো।"

—"আমাকে আপনি আপনি বলছেন কেন। আমি তো পুরো পাঁচ বছরের জুনিয়ার।" রঞ্জনা বললো সোমেশকে।

—"তা হোক। বন্ধুর বউ তো হাজার হোক? বন্ধুর ডিরেক্ট পারমিশন ছাড়া তুমি-টুমি বলতে নেই। শেষকালে দীপেন দিলে হয়তো ঘ্যাচাৎ করে মুণ্ডুটা কেটে। বলা যায় না। কার মনে কী আছে?"

—"কেন, এখানে কি তাই হয়েছে?"

—"ঠিক তাই নয়; তবে সেই ধরনেরই। যে লোকটা মরেছে, সেটা অবিশ্যি হাড়পাজি ছিল। মরেছে, গাঁয়ের লোকের প্রাণ জুড়িয়েছে। খুনী ধরা পড়েছে, অথচ কেউ সাক্ষী দিচ্ছে না। সবাই খুশি, যেন উচিত শাস্তি হয়েছে। গ্রামের লোকদের মর‍্যাল অ্যাটিচ্যুডটা এখনও ঠিক পশ্চিমী সভ্যতার আইনকানুন অনুযায়ী গড়ে ওঠেনি তো? একটু বুনো আছে।"

—"ব্যাপারটা কী হয়েছিল সোমেশ? বল না বাবা ভাল করে গপ্পোটা। বেশ করে জমিয়ে ডিটেকটিভ স্টোরির মতন করে। তুই তো গল্প বলার রাজা ছিলি কলেজে।"

—"এখনও পারি। শুনবি? শোন, তবে। কত শুনবি? আমি তো এরকম গল্পের গাছ রে।"

সোমেশ একটা চুরুট ধরিয়ে গল্প শুরু করে।

—"আমার আসবার কথা নয়। ও-সি এলেই চলতো। তবে এই অঞ্চলে নতুন বদলি হয়েছি, তাই নিজেরই ইন্টারেস্ট হলো, যাই দেখে আসি অঞ্চলটা কেমন। লোকগুলো কীরকম।

"বডি দেখেই বোঝা গেল খুব ক্ষেপে উঠে খুন করেছে। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যত্রতত্র মেরেছে। ফর্সা ধুতি ফর্সা শার্ট আর ডোরাকাটা চাদর গায়ে লোকটা যাত্রা দেখতে এসেছিল বলেই মনে হয়। পাশের গাঁয়ের লোক। এইভাবে কেউ মরলে, খুনী ধরার আসল টেকনিকটা হলো, কে মেরেছে জানার আগে, ঠিক কে মরেছে, সেইটে জানা। মৃতব্যক্তির বিষয়ে খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর নিলেই, লোকটা কেন মরেছে, বোঝা যায়। এবং মারবার মোটিভটা বোঝা যায়। তখন কে যে মেরেছে বোঝা তত শক্ত হয় না।

"খবর নিতে গিয়ে দেখি লোকটার অবস্থা ভাল। একটাই দোষ। আগেকার যুগের কুলীন জামাই সেজে ছ'সাতখানা বিয়ে করেছে। কিছুদিন পরে আর পুরনো বউদের খবরও নেয় না, খরচও দেয় না। সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করা দূরে থাক।

BanglaBook.org

এদিকে ছেলেপুলে হয়েছে ডজনখানেক। যাত্রা দেখে বেড়ায়, গানফান গেয়ে বেড়ায়, আর নতুন নতুন বিয়ের সন্ধানে থাকে। এই গ্রামেও এর একটা শ্বশুরবাড়ি আছে। কিন্তু তারা কেউ গ্রামে নেই। ওর শ্বশুর ঘরবাড়ি বন্ধ করে সপরিবারে তার শালার বাড়িতে বেড়াতে গেছে। গ্রামে কেবল ওই একঘর বাসিন্দাই অনুপস্থিত। লোকটার এই স্ত্রী এখানে বাপের বাড়িতেই থাকে। সেও নেই। মহা মুশকিল হলো। কোনো সাক্ষী নেই। গ্রামসুদ্ধ লোক কেউ দেখেনি খুন হওয়া। আমি রটিয়ে দিলুম—যে খুন করেছে তার বর্ণনা এইরকম—পরনে আধময়লা ধুতি, গায়ে রঙীন মোটা চাদর, পায়ের গোড়ালি ফাটা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, রুক্ষু চুল। চাদরের তলায় লুকোনো ছিল হাঁসুয়া। মাঝবয়েসী পুরুষমানুষ। নখে ময়লা।

"পুলিশ গোড়াতেই পুকুরে জাল ফেলেছিলো হাঁসুয়া উদ্ধারের জন্যে। হাঁসুয়া উদ্ধার হলো না। এই সুযোগে বেশ মাছ খেয়ে নিল পুলিশ, পেট ভরে। গাছে উঠিয়ে ডাব পাড়ালো, যদিও শীতকাল, ক্ষেতের মুলোটা কপিটা তুলে নিলো। পুলিশের ভয়ে সারা গ্রাম কাঁটা। এবার আমি বললুম হাঁসুয়া আছে চালের বাতায়। গোয়ালে। গ্রামসুদ্ধ অবাক। গোয়ালগুলো সার্চ করতেই হাঁসুয়া বেরুল। হারুমাজি, যার গোয়াল, ছুটে এসে কেঁদে পড়লো আমার পায়ে। 'সাহেব, আমি করিনি। বিশ্বাস করুন, আমি করিনি।' পরনে আধময়লা ধুতি, গায়ে সবুজ চাদর, ফাটা গোড়ালি, রুক্ষু চুল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাঝবয়সী পুরুষমানুষ। ঠিক যেমন বর্ণনা।

—"তুমি করোনি তবে কে করেছে?

—যার হাঁসুয়া সে করেছে। ও হাঁসুয়াটা আমার নয় সাহেব। আমার হাঁসুয়া আমার বাড়িতেই আছে, এক্ষুনি দেখিয়ে দিচ্ছি, চলেন।

—কার হাঁসুয়া ওটা তবে?

—সাহেব—আমি জানি না সাহেব—

—না বললে তুমিই মরবে—

—সাহেব ধম্মের দোহাই আছে—

—ওতে কিস্যু হয় না, সবাই খুন করে অমন বলে। 'আমি করিনি, অন্যের অস্তর।' তোমার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে খুনীর বর্ণনা।

এবার হারু ডুকরে কেঁদে ওঠে—যে মেরেছে তাকে আমি ধরিয়ে দিতে পারবো না সায়েব, সে যে আমার ধম্মোভাই!

পাড়ায় খোঁজ নিয়ে জানা গেল এর ধম্মোভাইটি কে। যে লোকটা খুন হয়েছে তার শ্বশুরই এর ধম্মোভাই। পালান মাজি।

শালার বাড়ি থেকে ধরে আনা হয়েছে পালানকে।

—ব্যাপার কী? কেন মেরেছে? নিজের মেয়েকেই বিধবা করলে শেষটা?

লোকটা হাউমাউ করে কেঁদেই অস্থির।

অবিলম্বেই জানা গেল ব্যাপারটা কী। জামাইবাবু আবার একটু বিয়ের ধান্দা করছিলেন। এই গাঁয়েই। যার গোয়ালে হাঁসুয়াটা পাওয়া গেছে, সেই হারুরই বয়স্থা

BanglaBook.org

বোকাসোকা হাবা বোনটিকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে কিছু করবার ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন তিনি। এ ব্যাপারে গাঁয়ের কারুরই মত ছিল না, তাই লুকিয়ে লুকিয়ে লোকটা আসতো, সুযোগ বুঝে মেয়েটিকে এটা-ওটা উপহার দিয়ে ভুলিয়ে ফেলতো। সেদিন যাত্রা দেখতে কাছাকাছি গ্রামের সবাই গেছে। পাশের গাঁ থেকে এই লোকটাও এসেছে। হারুও যাত্রার মাঠে গেছে। কিন্তু হাবা বোনকে নিয়ে যায়নি। বোনের বেচালের শাস্তি দিতে তাকে ঘরে বন্ধ করে রেখে গেছে।

বদ লোকটা যেই দেখেছে হারু যাত্রা দেখতে এসেছে, অমনি বেরিয়ে পড়ে রওনা হয়েছে হারুর বাড়িতে। আর হারুও ছুটে গেছে পালানের কাছে। পরামর্শ করতে। পালান শুনেই হাঁসুয়া নিয়ে ছুটেছে—ক্ষ্যাপা মোষের মতন। —'আমার মেইয়্যাটার সব্বোনাশ কইরেও উয়ার হয় নাই বাবু, আবার হতভাগা নেগেছে বোকাহাবা এট্টা সরল মেইয়্যার সব্বোনাশ করতি। আমি আর থাকতি পারলমনি বাবুমশায়—আর থাকতি পারলমনি—', দোষ স্বীকার করে পালান কেঁদে গড়িয়ে পড়ল আমার পায়ের ওপরে।"

—"তাহলে এখন কী হবে? পালানের ফাঁসি হবে? না যাবজ্জীবন?"

—"কিন্তু ও তো ঠিকই করেছে,", রঞ্জনা ব্যাকুল হয়ে বললে, "ওকে বাঁচানোর কোনো পথ নেই?"

—"শাস্তি হওয়াটাই বড় মুশকিল এক্ষেত্রে। সাক্ষী দিচ্ছে না যে গ্রামের কেউ—ওদিকে হাঁসুয়াতেও কোনো হাতের ছাপটাপ লেগে নেই—বাটা ধুয়ে মুছেই রেখে গেছে অস্ত্রটা। চাষীর বড্ড জরুরি জিনিস তো, আবার কাজে লাগবে। পালানের নিজের মুখের কথা ছাড়া দ্বিতীয় সাক্ষ্য নেই। পুলিশের কাছে দেওয়া সাক্ষ্য আবার কোর্টে সব সময় গ্রাহ্য হয় না—মেরে ধরে স্বীকারোক্তি আদায় করি তো আমরা—" মৃদু হেসে সোমেশ বলে।

—"খুনীর বর্ণনাটা কী করে ধরলি রে?"

হা হা করে হেসে ওঠে সোমেশ। "বর্ণনা? গাঁয়ের প্রত্যেকটা লোককেই শীতকালে ঐভাবে বর্ণনা করা যায়। কিন্তু ওরা ওতেই ভয় পেয়ে সব বলে ফেলে।"

—"পালান মাজির কি ঠিক হলো? শাস্তি হবে, না হবে না?"

—"হবে না তো? যাক বাবা—বাঁচা গেল। ওর শাস্তি হওয়া উচিত নয় মোটেই।"—রঞ্জনার নিশ্চিত হাসি দেখে কিন্তু সোমেশের ভুরু কুঁচকে যায়।

—"মুশকিলটা কী জানেন? আমিও স্বীকার করছি এক্ষেত্রে পালানের তেমন দোষ নেই। যে তার মেয়ের সর্বনাশ করেছে, আরও ছ'সাতটা মেয়ের সর্বনাশ করেছে, এবং আরেকটাও মেয়ের সর্বনাশ করতে যাচ্ছিল, পালান তার অপরাধটা আটকে দিয়ে সমাজের উপকার বই অপকার করেনি। কিন্তু আইন তো তা বুঝবে না? আইন দৃষ্টিহীন। দোষীকে শাস্তি দিতে হলে দেবে কোর্ট। পালানের তো সে অধিকার নেই। তাই আধুনিক আইনের চোখে সে-ই অপরাধী। মনুষ্যত্বের বিচারে নিরপরাধ হলেও।"

BanglaBook.org

—"কী হবে তাহলে শেষ অবধি?" রঞ্জনার হাসি ফের শুকিয়ে গেছে।

—"কী আবার হবে?" এবার সোমেশ খোলা হাসি হেসে উঠলো। —"কিছুই না। আইনের নিজের ফাঁদেই তো আইন এখানে আটকে গেছে। সাক্ষী কই?"

শারদীয় যুগান্তর

নোরার বাড়ি

—"নোরা আর এ-বাড়িতে থাকে না।"

দরজা খুলে রডারিক বলল। এক সেকেণ্ড বাদেই চিনতে পারল। —"রুবি না? রুবিই তো। বারে কত বদলে গেছো। এসো, এসো, ভেতরে এসো।"—রডারিক একটুও বদলায়নি। একেবারে তেমনিই রোগা, কুচকুচে কালো চুল। রুবি ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে ভাবলো নোরা আর এ-বাড়িতে থাকে না। অথচ রডারিক থাকে। আশ্চর্য। বাড়িটা তো নোরার দিদিমার। "নোরা থাকে না, অথচ আমি আছি। অবাক হচ্ছো। না?" দরজা বন্ধ করতে করতে রডারিক বলে।

রডারিক কি মনের কথা পড়তে শিখেছে?

—"কী খাবে? কফি? চা? হুইস্কি? বীয়ার? তুমি তো বীয়ারেরই ভক্ত ছিলে। ক' বছর বাদে এলে আবার নিউ ইয়র্কে? সাত আট বছর তো হবেই?"

—"ঠিকই বলেছো। তা, প্রায় দশবছর বাদে। বীয়ার দিও।" দুটো প্রশ্নের দুটো জবাব দিয়ে রুবি নীল ডোরাকাটা সোফাটায় বসলো। এটা ওরা দুই বন্ধুতে মিলে সেণ্ট জনস চার্চের সেল থেকে কিনেছিল। খুবই গরীব ছিল ওরা তখন। ছাত্রজীবন বলে কথা। এ ঘরের একটা জিনিসও নতুন নয়, মায় পর্দাগুলো পর্যন্ত সেকেণ্ড হ্যাণ্ড। রুবি চোখ তুলেই অবাক হয়ে যায়। সেই বড় বড় মেরুন লতাপাতা আঁকা পর্দা।—ওঃ! এখনও চলছে? ভগবান। কত বছর আয়ু ছিল এগুলোর? রডারিক কিছুই বদল করেনি দেখছি। ঘরের কোণে ফ্রিজটা ছিল—গোলাপী রঙের। এখনও কি সেটাই?

—ঠাশ করে শব্দ হয়। রুবি তাকায়। রডারিক ফ্রিজের গোলাপী দরজাটা বন্ধ করল। হাতে দুটো বীয়ার ক্যান। দেয়ালের হুক থেকে দু'খানা মাগ পেড়ে নিয়ে রডারিক এসে হলুদ সোফায় বসে। হলুদ সোফাটা এই ফ্ল্যাটে আগের বাসিন্দারা ফেলে গিয়েছিল। ঠিক তেমনি আছে। ময়লা বাড়েনি, ছেঁড়েওনি। বিয়ার মাগগুলোও কি তখনকার? একমুহূর্ত রুবি ভাবলো। নাঃ। হতে পারে না। এরকম বিয়ার মাগ অজস্র পাওয়া যায়।

—"তোমাকে দেখে খুব ভাল লাগছে রুবি।" বিয়ারটা ঢেলে হাতে দিয়ে রডারিক

বলল। —"দশবছ-র। ওঃ। সময় যে কোথা দিয়ে বয়ে যায়।"

—"নোরা এখন কোথায় থাকে?"

—"সেই তো মুশকিল। ঠিকানা জানিয়ে যায়নি। কোনো যোগাযোগও রাখেনি। স্রেফ মিলিয়ে গেছে। বাতাসে মিশে গেছে। বায়ুভূত মহাপ্রাণের মতন আর কি।"

—"কী যে বল রডারিক।" রুবি বিরক্ত হয়,—"সেদিনও এই ঠিকানা থেকে নোরা আমাকে চিঠি লিখেছে।"

—"সত্যি?" রডারিক উঠে বসে। "—কবে?"

—"এই তো, গেল ক্রিসমাসেই। কার্ড পাঠিয়েছে।"

—"আবার তো ক্রিসমাস এসে গেল। এবার দেখো তো কোথা থেকে কার্ড পাঠায়?"

—"তোমাদের ঝগড়া হয়ে গেছে বুঝতেই পারছি। ব্যাপারটা কী?"

—"ঝগড়া? মোটেই ঝগড়া হয়নি। নোরা যা তা দেখতে শুরু করেছিল।"

—"মানে?"

—"মানে মাঝরাত্রে লাফিয়ে উঠে নোরা পরিত্রাহি চীৎকার করত, তারপর গোঁ গোঁ করে অজ্ঞান হয়ে যেত। দরজা খুলে ঘর থেকে পালিয়েও যেতে চেষ্টা করত। রাস্তায় নেমে পড়ে ছুটত—আরেকটু হলেই ট্রাক চাপা পড়ে যাচ্ছিল একদিন—"

—"কিন্তু কেন? কেন ডাক্তার দেখাওনি?"

"ডাক্তার কী করবে? সে তো ভূত দেখছে। ওঝা দেখানো উচিত ছিল।—"

—"কিসের ভূত?"

—"জন, জন। জনের ভূত। আমাকে পাশে পাশে দেখলেই তার মনে হতো ওটা আমি নই, জন। জন শুয়ে আছে চোখ ওল্টানো, গলায় ফাঁস। পরনে বিজনেস সুট। যেভাবে জনকে পাওয়া গিয়েছিল ওর অফিসে।"

—"কি আশ্চর্য।"

—"জনের ভূতই ওকে তাড়িয়েছে এ বাড়ি থেকে। ওর তো ভূতের ভয় ভীষণ, তাই ইদানীং সন্ধে থেকেই প্রচণ্ড ডিংক করত। মদের ঘোরে রাত্তির বেলায় আমাকে জন ভেবে ভয় পেয়ে পালাতে চেষ্টা করত। ওর ধারণা জনকে ছেড়ে আমাকে বিয়ে করেছে বলে জন রুষ্ট হয়ে প্রতিশোধ নিতে আসছে। প্রবল একটা অপরাধবোধ ছিল নোরা।—মনে মনে অপরাধবোধ থাকলেই লোকে ভূতের ভয় পায়।"

—"কিন্তু নোরা—ও তো জানতো জনের আত্মহত্যার কারণ ছিল ব্যবসার অসাফল্য, প্রেম প্রণয় নয়। ওর মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে যে এভাবে—"

—"ধ্যেৎ—জানলে কি হবে? মানুষ নিজেকেই সব সময় বেশি জরুরি মনে করতে ভালবাসে, এমনকী তার জন্য অপরাধবোধে ভুগতে হলেও। নোরা ভাবতো জনের ব্যবসা ফেল পড়েছিল ওর মন খারাপ ছিল বলে। আর মন খারাপ ছিল নোরা ওকে ছেড়ে এসেছিল বলে।"

—"হতে পারে, কিন্তু নোরা তো তোমার জন্যে জনকে ছাড়িনি। ছেড়েছিল

BanglaBook.org

বনছিল না বলে। তুমি তো অনেক পরে ঢুকেছো এসে ওর জীবনে। এই বাড়িতে আমার সঙ্গে যখন নোরা থাকতো, তখন তো কই এসব দুঃস্বপ্ন টুঃস্বপ্ন দেখতো না। জনের মৃত্যু কি আজকের কথা? বারো তেরো বছর"—

—"কিন্তু তখন তো নোরা হাফ আ মিলিয়ন ডলার পুরস্কারটা পায়নি। ওতেই তো মাথাটা খারাপ হয়ে গেল!"

—"হাফ মিলিয়ন ডলার? কবে পেল?"

—"ওটা পাবার পর থেকেই তো দুঃস্বপ্ন।"

—"কি আশ্চর্য। পেল কবে ওটা? কই—কিছুই জানায়নি তো? গত ক্রিসমাসে—"

—"জানাবার চান্স পায়নি হয়তো—তার আগেই যে ভূত দেখা শুরু হয়ে গেল —জনের ভূত... জনের ভূত... জনের ভূত..."

রুবির বুকের মধ্যে প্রাণটা চমকে ওঠে। এ গলা কার? কোথা থেকে ভেসে আসছে? ঘরে কোনো শব্দ নেই, অথচ রুবির কানের মধ্যে, নাকি বুকেরই মধ্যে হিসহিস করে সাপের মতন ফণা তুলছে প্রতিধ্বনির মতো কিছু ছায়াশব্দ...

—"কে?" রুবি চেঁচিয়ে উঠতেই ঘরের বড় আলোটা দু'বার দপ্ দপ্ করে উঠে একেবারে নিবে গেল। আলো নিবতেই মনে হলে ঘরে নেমে এসেছে অদ্ভুত স্যাঁতসেঁতে একটা হিমেল শীত, সঙ্গে সঙ্গে দড়িবাঁধা বুনো ঘোড়ার মতন ঘরের লম্বা পর্দাগুলো উথাল-পাথাল হতে থাকে। প্রচণ্ড কনকনে একটা ঝোড়ো বাতাস দানবের মতো ঘরময় দাপিয়ে বেড়াতে শুরু করে, অথচ একটুও শব্দ হয় না। বীয়ারের মাগদুটো উল্টে পড়ে বীয়ারের ফেণায় মেঝেয় খান ডাকতে থাকে। এত বীয়ার আসছে কোত্থেকে—রডারিক? রডারিক, তুমি কই? কী অদ্ভুত ঠাণ্ডা একটা কনকনে হাত রুবির খোলা ঘাড়ে পিঠে নেমে আসে, আর তীব্র পচা গলিত মাংসের দুর্গন্ধে ঘর ভরে যায়। দমবন্ধ হয়ে আসার মুহূর্তেও রুবি বুকের ভেতরে শুনতে পায় হিসহিস করে নোরা বলছে—

—"আমার সঙ্গে চল রুবি, সব বলব তোকে, স-ব বলব, চল রুবি, চল রুবি, চল—"

রুবির জ্ঞান ফিরল নোরার দিদিমার খাটে। দশ বছরে যেন বিশ বছর বয়েস বেড়ে গেছে তাঁর। আয়ুর শেষ প্রান্তে এসে পৌঁচেছেন।

—"কেমন করে ঢুকলে তুমি ওই ফ্ল্যাটে? অতবড় তালাটা খুললে কী করে?"

—"তালা? তালা ছিল না তো? বেলটা বাজাতে রডারিকই দরজা খুলে দিল।"

—"রডারিক।"

"হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করুন না ওকেই।"

—"ঠিক দেখেছিলে?"

—"আহা, ভুল দেখব কি করে? রডারিক তো বদলায়নি একটুও। তেমনই কালো চুল, হিলহিলে রোগা। আমাকে ওই তো বীয়ারটা দিল!—কী যে ছিল ওই

BanglaBook.org

বীয়ারে—খেয়েই হঠাৎ আমার কেমন যেন—মানে—"

নোরার দিদিমা হঠাৎ জড়িয়ে ধরলেন রুবিকে।—"যীসাস ক্রাইস্ট।" মহিলার চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে।

—"ভগবানই তোমাকে রক্ষা করেছেন রুবি ডিয়ার। যীশুর করুণার অন্ত নেই। ওঃ।"

মিসেস রবিনসনের মুখেই সবটা শোনা গেল।

—"খুবই দুঃখের ব্যাপার। নোরা অকস্মাৎ একটা টি ভি প্রোগ্রামে হাফ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার পাবার আগে থেকেই নোরাতে রডারিকে ঝগড়া চলছিল, রডারিক অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছিল বলে। তারপর এই টাকা পেয়েই নোরা খেপে উঠলো ডিভোর্সের জন্যে। রডারিকও এদিকে টাকার লোভে পাগল। ডিভোর্স করতে দেবে না কিছুতেই। নোরা ঠিক এই সময়েই ভূত দেখতে শুরু করল। ইদানিং অশান্তির চোটে সন্ধে থেকেই তো ড্রিংক শুরু করত, তারপর বেশি রাত্রে ঘুমের ঘোরে দেখতে পেত জন এসে ওর খাটে শুয়ে আছে, গলায় নাইলনের ফাঁস, চোখ উল্টানো, পরনে ডার্ক বিজনেস সুট। ভয়ে গোঁ গোঁ করত। রডারিক এই অবস্থায় একাধিক দিন আমাকে ডেকে নিয়ে গেছে। একদিন নোরা অজ্ঞান না হয়ে হঠাৎ রাস্তায় ছুটে পালাতে গিয়েছিল।—অন্ধের মতো পথে বেরিয়ে এসেই ট্রাকচাপা পড়ল। পুলিশ পরে খোঁড়াখুড়ি করে বাগানের মাটি থেকে বিজনেস সুট আর সোনালী পরচুলো বের করলো। রডারিক গ্যাস চেম্বারে মরেছে, সেও প্রায় বছর চারেক হতে চললো। নোরার ফ্ল্যাটটা সেই থেকে খালি পড়ে আছে।"

নোরার দিদিমা জপ করতে করতে বললেন—

—"আমি কেবল ভাবছি, এই রোগা মেয়ে তুমি, অতবড় তালাটা ভেঙে ভেতরে ঢুকলে কেমন করে? ওটা তো মনের ভুলে হতে পারে না।"

শারদীয় রূপসা, ১৩৮৯

BanglaBook.org

স্বপ্নের মতো

গাড়ি থেকে নেমেই মনটা ভালো হয়ে গেল। এত চমৎকার একটা বাসস্থান আমি কল্পনাও করিনি। যখন থেকে গাড়ি এই সবুজের ঢেউখেলানো পাহাড়ে চড়ছে তখন থেকেই মনে একটা খুশি ছড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে বাড়িতে এসে গাড়ি থামলো সেটার মতো অপূর্ব আর কোনো বাংলো এতটা পথে আমার চোখে পড়েনি। দক্ষিণে থাকে থাকে নেমে গেছে নানারকমের ফুল আর বাহারী পাতার গাছে সাজানো বাগান। পশ্চিমে বড় বড় গাছের মধ্য দিয়ে প্রবেশ-পথ এসে

গাড়িবারান্দায় শেষ। এইসব চা-বাগান অঞ্চলে যেমন হয়, কাঠের তৈরি খাস বিলিতি সায়েবি বাংলো।

দুটি তালায় বিশাল বিশাল দুটি চওড়া বারান্দা বাংলোর তিনদিক ঘিরে; আরো পিছনদিকে খানিক দূরত্বে গ্যারাজ ও তার মাথায় সার্ভেন্টস কোয়ার্টার। সামনের বাগান ধাপে ধাপে নেমে হঠাৎ এক জায়গায় শেষ হয়েছে। সেখানে খাড়াই পাহাড় নেমে গেছে উপত্যকার দিকে।

"কী ডক্টর দেবসেন, বাংলো পছন্দ?"

"অপূর্ব!"

দূরে পুতুলের ঘরবাড়ির মতো অসমীয়া গ্রাম, খেলনার রেলগাড়ি চলে গেল ভূগোলের মডেলের মতো টোকো গাছের ফাঁক দিয়ে। আমি নড়তে পারছি না।

"চলুন, ওপরে চলুন, আপনার কামরাটা দেখে নেবেন।"

ওপর থেকে আরো—আরো সুন্দর। ঘরে ঢুকতেই ইচ্ছে করছে না। একটা মস্ত গাছ ফুলে ফুলে গোলাপী।

"আপনার যা দরকার চেয়ে নেবেন। এই বেয়ারা, এই বাবুর্চি, আর গাড়ি ড্রাইভার সবই আপনার সার্ভিস রইল। এই হচ্ছে এয়ারকণ্ডিশনের সুইচ। এই কলিং বেল। আর ফোন—"

মিঃ আখতার হোসেন এদিক-ওদিক তাকালেন—"ফোন নেই এই ঘরে?"

"এখন নাই।" বেয়ারা অম্লানবদনে জানালো, "কলিং বেলেরও লাইন নাই।"

"কেন?" বেয়ারা এ-কথার জবাব দেওয়ার দরকার মনে করল না।

"ওপরে কোনো ফোনই নেই?"

"মাস্টার বেডরুমে আছে।"

"কলিং বেল আছে ওখানে?" বেয়ারা মাথা নাড়ে। নঞর্থক। ওখানেও বেল নেই।"তাহলে মেমসাহেব তোমাদের ডাকবেন কেমন করে?"

"জানালা হতে হাঁক দিবেন, বড়ুয়া, বাবুর্চি হোক, মালী হোক, আমি হই —যে কেউ ঠিক চলে আসবো।"

কফি এসে গেল। বারান্দায় চেয়ার টেবিলে বসে আরামে কফিতে চুমুক দিতে দিতে বাইরে তাকাই— আঃ, এমন বাংলোতে তিনদিন থাকতে পারবো, ফ্রি!

"ওপাশে নাগা হিলস, বুঝলেন? অরুণাচল প্রদেশ, আর এপাশে বার্মা বর্ডার। এই গাছটার নাম হলং। কী বড় গাছ, দেখেছেন? বেস্ট টিম্বার দেয়।"

"এত চমৎকার বাড়িটাকে ম্যানেজার-ট্যানেজারের বাংলো না করে গেস্ট-হাউস করলেন কেন? বেশিরভাগ সময়েই তো ব্যবহার হয় না?"

বেয়ারার দিকে তাকালেন মিঃ হোসেন—"কী বড়ুয়া, লোকজনটন আসে কেমন?"

বেয়ারাকে দেখলেই বোঝা যায় ব্রিটিশ আমলের লোক। হাবভাবই আলাদা। যেমন গম্ভীর, তেমনি রাশভারি। ধপধপে সাদা উর্দি, মোজাবিহীন শু-জুতো চকচক

BanglaBook.org

করছে। মাথায় পাগড়ি। বড়ুয়া বলে—"এইটা তো ভি আই পি বাংলো, এইখানে সারা বৎসরে আর কয়টা লোকই বা আসে। ওই সাতাশ নম্বর বাংলো বেশ ভরা থাকে। ঘরে ঘরে লোক। ঐটাই মেন গেস্ট-হাউস তো।"

"আর এত সুন্দর বাংলোটা—"

"ভি আই পি আর কয়জন আসেন বলুন? সেই যে পেট্রো-কেমিকেলের মিনিস্টার একবেলার জন্য এসেছিলেন, তারপর তো এই মেমসাহেব এলেন, এর মধ্যে কেউই আসেন নাই।"

"তোমার তাহলে কর কি?" হোসেনের চোখ কপালে উঠেছে।

প্রশ্নটা বড়ুয়ার পছন্দ হলো না। তাচ্ছিল্যের মুখভঙ্গি করে বললে,—"এই ঝাড়াপোছা করি, পেতল পালিশ করি। বাগবাগিচা সামলাই। আর কি!"

"সরকারি চাকরি, কাজ কর না-কর যাবে না! মজায় আছো বেশ।"

হোসেন সাহেবের এ কথায় কোনো উত্তর দেয় না বড়ুয়া। "আর কিছু লাগবে? ঘরে ফ্লাস্কে ঠাণ্ডাপানি দিয়েছি, মেশিন আছে। ডিনার কি এইখানে হবে?"

"আরে না না, এখানে একা একা খাবেন কি? ওঁর ডিনার আছে ক্লাবে"—

হোসেন তরুণ অফিসার। উৎসাহে টগবগ করছেন। রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনে তাঁর ভূমিকাই বোধহয় প্রধান। আমাকে খুব যত্নআত্তি করেছেন এঁরা—সত্যি সত্যি যাকে বলে ভি আই পি ট্রীটমেন্ট, তা পাচ্ছি। হোসেন বললেন, "এখন যদি একটু বেড়িয়ে আসতে চান, গাড়ি আছে, যেতে পারেন যেদিকে খুশি। আমরা তো আপনাকে নিতে আসবো ৬টার সময়।"

"এখানটাই এত সুন্দর যে আর কোথাও যেতে ইচ্ছেই করছে না। সত্যি, ঠিক যেন স্বপ্নের মতো।" বড়ুয়ার মুখে একটুখানি হাসি ফুটলো। এ-কথাটি তার মনের মতো হয়েছে বোধহয়। কফি হাতে বসে বসে কোম্পানির গল্প করতে লাগলেন মিঃ হোসেন। তিনি খুব পুরনো নন এখানে, বড়ুয়া বহুদিনের। তাঁর বাংলো খানিক দূরে। আরেকটা সবুজ টিলার মাথায়।

"কিছু চাইলে হাঁক দেবেন"—বলে বড়ুয়া নেমে যায়।

হোসেন বললেন "এটা অদ্ভুত যে কোনো কলিং বেল নেই!" বলতে বলতেই দেয়ালে চোখ যায়। পাখা আলোর সুইচবোর্ডে কলিং বেল।

"আরে, এই তো!" হোসেন উঠে গিয়ে বেল টিপলেন। কোনোই শব্দ শুনতে পেলুম না, আমি অন্তত। "ডিসকনেকটেড, মনে হয়।" নিজেই মন্তব্য করেন তিনি। বাইরে চমৎকার বর্ষার মেঘমেদুর আকাশ। পাহাড়ী সবুজের ওপর তার ছায়া যে কী মোহময়, পশ্চিমবঙ্গে বসে কোনোদিন তা জানা যাবে না। চোখের মুগ্ধতা আর কাটেই না।

"সেরা বাংলোটাই রেখেছে আর কি ভি আই পিদের জন্য। আগে তো সরকারি কোম্পানি ছিল না—প্রাইভেট কোম্পানিতে বাইরে থেকে যারা আসে-টাসে তাদের যত্ন করাটা খুব জরুরি তো? বিজনেস ট্যাকটিকস!" হোসেনের কথায় আমার মনে

BanglaBook.org

হলো, আমার ঠিক এটা প্রাপ্য নয়। তা হোক। মাঝখান থেকে আমার মতন অব্যবসায়ীও এমন মজায় থেকে গেলুম। ভালোই হয়েছে, সেরা বাড়িকে অতিথিশালা করেছে এরা। পুজোর লেখার মূল্যবান সময়টা খরচা করেও এসেছি যে, সেটা সার্থক। নিজের খরচে জীবনেও এ-রকম একটা বাংলো ভাড়া করে থাকতে পারতুম না আমি। বেঁচে থাকুন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। হোসেন চলে যাবার পরেও মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকি। উপত্যকার ওপারে পাহাড়ের পরে পাহাড়ে আবছা হয়ে যাওয়া ঢেউয়ের পরে ঢেউ, চোখ যেন টেনে ধরে রেখেছে। বাগানের দিকে তাকাই। একটি জাপানী স্টাইলের ছোট্ট বাগান চোখে পড়ল এবার, খানিক নিচে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। একটা ছোট্ট ল্যাম্পপোস্ট, ছোট্ট একটা আঁকাবাঁকা নীল টালি বাঁধানো নকল নদী, তার ওপরে খুদে খুদে লাল টুকটুকে সেতু। ওমা গো, কী সুন্দর। আমি কিছুই চিনি শুনি না। হঠাৎ মনে হলো টেলিফোন বাজছে। যে ঘরে ফোনের শব্দ হচ্ছে সেই ঘরের দিকে ধেয়ে যাই। ঘরে ঢুকতেই ফোন থেমে গেল। এ-ঘরটায় আমার ঘরের চেয়েও বড় বিশাল এক বিছানা পাতা। এক কোণে আবার এর নিজস্ব ব্রেকফাস্ট-রুম রয়েছে কাঁচের জানলা ঘেরা। এগিয়ে যাই। এক্সপ্লোর করতে হবে তো? এত সুন্দর বাংলোতে আর কেউ নেই, একলা আমি! আই অ্যাম দ্য মনার্ক অব অল আই সার্ভে। আঃ! বাথরুম ভেবে যে দোরটা ঠেলি, সেটা ড্রেসিং রুম। তার ওপাশে বাথরুম। ড্রেসিংরুমে ঢুকতেই সুন্দর একটা হাল্কা সুগন্ধ নাকে এলো।

আরেকটা দোর ঠেলতেই অন্য একটা বেডরুমে ঢুকে পড়ি। এটাই মাঝখানের ঘর। ভারি সুন্দর। এখানেও দ্বৈতশয্যা। এখানে কোনো সিংগল বেডওয়ালা ঘরই নেই দেখছি। এর সঙ্গে কেবল বাথরুম। পাশের যে দরজাটা আধখোলা, তার ফাঁক দিয়ে আমার ঘরটাই দেখা যাচ্ছে, সব দরজায় ভারি ভারি পর্দা, কিন্তু লক করার ব্যবস্থা নেই। তিনটে ঘরের মধ্যে অবাধে যাতায়াত করা যায়। আমার খুব আহ্লাদ হলো। যখন যে ঘরে খুশি ঘুরেফিরে থাকা যাবে। সব ঘরেই দিব্যি আলো জ্বলে, পাখা চলে, এয়ারকণ্ডিশনিং আছে। খানিক সুইচ টেপাটেপি করে আবার বারান্দায় যাই। সার্ভেন্টস কোয়ার্টার আর বাংলোর মাঝে একফালি উপল-বিছানো জমি। খুব বেশি দূর নয়, ডাকলেই ওরা শুনতে পাবে। যেমন অতল নিঃশব্দ এই বাংলো, বাগানে শুকনো পাতা উড়লে বারান্দায় তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। সর্বক্ষণ একটা ঝিম-ধরানো ঝিঁঝির ডাকে ঘেরা এই বাংলো। ঘরে এসে খাটে চিৎপটাং হতেই আবার ফোন। এবার আমি উঠি না। তিনখানা কামরা ইন্সপেকশনের ফলে এখন ভি আই পি পরিশ্রান্ত। বিশ্রাম নিচ্ছেন। দরজা নক করে বড়ুয়া বললে : "মেমসাহেব, টেলিফোন এসেছে নিচে।"

বড়ুয়া ফোনটা নিচেই ধরেছে। আমি ওর সঙ্গে নিচে যাই। খাবার ঘরে ফোন। হোসেন বলছেন ৬টার একটু আগেই তৈরি থাকতে।

বারান্দার প্রেমে পড়ে গিয়ে ঘরটাকে ভালো করে দেখা হয়নি। এবার খুঁটিয়ে

BanglaBook.org

দেখি। দেয়ালে বিলিতি গ্রামের শান্ত রঙিন দুটি দৃশ্য ফ্রেমে বাঁধাই অয়েলপেন্টিং। কোণে নাম সই করা আছে—টেড। বাঁ-ধারে বিশাল একটা শাদা আলমারি, তাতে তালা ঝুলছে। অন্য ধারে ছোট একটি আধুনিক স্টাইলের পালিশ-করা ওয়াড্রোব এ ঘরের সঙ্গে ঠিক মানাচ্ছে না। ওটাই আমার ব্যবহার্য। এদিকে ড্রেসিং টেবিল। বিশাল প্রমাণ সাইজের বেলজিয়াম গ্লাসের আয়নাটা ওপর-নিচে বেশ দোলানো যায়। বাঃ। বাথরুমে ঢুকি। গা ধুয়ে তৈরি হয়ে নিতে হবে। ঝকঝকে বাথটব। তাতে জল ভরতে শুরু করে দিই। ইঃ, কি জোরেই জলের শব্দ হচ্ছে। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আওয়াজ একটু কমাই। তালাবন্ধ আলমারিতে কী আছে? তালা কেন? সেই 'কঙ্কাল' সিনেমার মতো হঠাৎ খুলে যাবে না তো মাঝরাত্তিরে—আর, এক কোণে ঘাড় গুঁজে বসে থাকা মলয়ার মৃতদেহ দেখা যাবে। ওরে বাবা রে।

অন্য ঘরগুলোতে ঢুকে পরীক্ষা করে আসবো নাকি? সব ঘরেই কি তালাবন্ধ আলমারি থাকে? যেমন ভাবা তেমনি কাজ। হ্যাঁ, আটকোনা ঘরেও রয়েছে। আর উত্তর দক্ষিণ পূর্বদিকে খোলা মাস্টার বেডরুমে? নেই। কোনো আলমারিই নেই। ড্রেসিংরুমে? হ্যাঁ, এখানে আছে। এই তো তালা নেই। টানতেই খুলে গেল। ভেতরে সেই সুন্দর গন্ধ। কিছু কাচা তোয়ালে ভাঁজ করা আছে। ভূতটুত নেই। যাক, নিশ্চিন্ত হয়ে স্নান করতে ঢুকে পড়ি।

দারুণ ক্লাব। দারুণ ডিনার। সবই দারুণ। নামেই সরকারি—এখনও বেশ দাপট আছে, প্রাইভেট কোম্পানির দিনগুলো সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। ফিরে এলুম, রাত তখন খুব বেশি হয়নি। এসব পার্টি থেকে বারোটার মধ্যেই ফিরতে পারাটা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু এখানে যে কাজ শুরু হয় ভোর ৬টায়, শেষ হয়ে যায় দুপুর তিনটেয়। রাত্রে বেশিক্ষণ তাই পার্টি চলে না। গাড়ি থেকে নেমে দেখি বড়ুয়া বসে ঝিমুচ্ছে। উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করে বললো: "বিছানা তৈরি। স্নান করবেন? জল তৈরি। কিছু লাগবে?"

"এক পট কফি দিয়ে যেও ঘরে।" এবারে তো কালকের বক্তৃতাটা তৈরি করতে হবে, যে জন্যে এতদূর আসা।

আমি রাতপাখি—আমার কাজকর্ম সব রাত্রে। দিনের বেলায় মাথায় কিছু ঢোকে না। রাত্রিজাগরণে আমার বিন্দুমাত্র কষ্ট নেই।

"কফি? এক প—ট? ঠাণ্ডা বীয়ারও আছে কিন্তু মেশিনে, মেমসাব।"

নাঃ, সত্যি সত্যি মেমসাবকে ভি আই পি ট্রীটমেন্টই দিচ্ছে বটে বড়ুয়া! এর আগে হয়তো সারা রাত কফি-খেকো কোন ভি আই পি ওঠেননি এখানে এসে।

"না, না, বীয়ার আমি খাই না বড়ুয়া, কফিই দাও। থ্যাঙ্ক ইউ।"

"ঘুমটা হতো। কফিতে কি ঘুম হবে?"

"আমি তো ঘুমুতে চাই না। আমার কাজকর্ম আছে কিনা? কফিটা খেলে সুবিধে হবে রাত জাগতে।"

BanglaBook.org

"যা বলেন।" বড়ুয়া চলে গেল। আমি আবার বারান্দায় যাই। বাতাসে বনের গন্ধ, বনের শব্দ। কতরকম আশ্চর্য শব্দই যে শোনা যাচ্ছে—আমার খুব ভালো লাগতে থাকে। দূর—কে এখন রবীন্দ্রনাথ ও আন্তর্জাতিকতা নিয়ে ভাবতে চায়? আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকি। বাইরে ঘন অন্ধকার। এ বারান্দার প্রত্যেকটা আলো জ্বলছে। নিচেরও। এত আলোয় কি রাত্রির রূপ দেখা সম্ভব? সুইচবোর্ডের দিকে হাত বাড়াই। একটা একটা করে আলো নেবাতে থাকি।

"মেমসাব, ও কি করছেন, লাইটগুলো সব জ্বালা থাকবে।"

"কেন? সারারাত্তিরই জ্বলবে?"

বড়ুয়া নিচে থেকে চেঁচিয়ে বলে। "তাই এখানকার নিয়ম। সিকিউরিটির নিয়ম।"

অ।—সত্যিই তো। জঙ্গলের মাঝখানে বাংলো। চারপাশে কিছুই নেই। ঐ রাস্তাটি দিয়েই শুধু সভ্য জগতের সঙ্গে যোগ। বাঘ-ভাল্লুকের কৌতূহল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বাগানটা ঘোর অন্ধকার।

বড়ুয়া কফির ট্রে নিয়ে আসে। বলে, "আমরা এবার শুতে যাচ্ছি, মেমসাব। কিছু কি লাগবে?"

"কিছু না।"

"দরকার হলে ডাকবেন জানলা খুলে। কোয়ার্টার পাশেই।"

"ডাকবো। গুড নাইট, বড়ুয়া।"

"ও, ক'টায় চা দেবো?

"ছটায় দিও।"

"ব্রেকফাস্ট?"

"সাতটায়।"

"গুড নাইট, মেমসাব।"

বড়ুয়া চলে গেল, নিচে দরজায় চাবি দেবার শব্দ হলো। তারপর চারিদিকের স্তব্ধতা যেন চীৎকার করে উঠল। এত বড় বাড়িটায় আর কোনো দ্বিতীয় প্রাণী নেই। একটা কুকুর পর্যন্ত না।

ঘরে লেখার টেবিল চেয়ার নেই। বিছানায় গুছিয়ে বসি কাগজপত্তর নিয়ে। এয়ারকণ্ডিশনারের গুঞ্জন ছাড়া কোনো শব্দ নেই ভিতরে। বাইরের বনের আওয়াজ এ-ঘরে আসে না। লেখায় মন দিই। লেখা এগুতে থাকে কফির গুঁতোয়। হঠাৎ একবার মনে হলো—যাই, বাইরে গিয়ে অরণ্য পর্বতের নৈশ শোভা পরিদর্শন করে আসি গে। আদেখলের ন্যায় কর্ম হচ্ছে জেনেও গুটি গুটি যাই। এমন সুযোগ ক'বার আসে জীবনে?

বারান্দায় যেতে যেতে বাগানের দিকে একঝলক তাকিয়েই মনে হলো জাপানী বাগানের ছোট্ট ল্যাম্পপোস্টগুলোয় সব আলো জ্বলছে—ভারি সুন্দর তো। ভালো করে দেখবো বলে রেলিঙে ভর দিয়ে যেই তাকিয়েছি, দেখি সব নিভে গেছে।

BanglaBook.org

কই জ্বলছে না তো? অথচ স্পষ্ট দেখলুম খুদে আলো জ্বলছে ; S গড়নের নদীর ধারে ধারে—নাকি চোখের ভুল? রাত খুব কি বেশি হয়েছে? সেই ভোর চারটেয় গাড়ি আসবে, দমদমে গিয়ে প্লেন ধরতে হবে সাড়ে পাঁচটায়, সেই তাড়ায় রাত্রে শুতেই যাইনি কাল—যদিও রাত্রিজাগরণে আমার কষ্ট নেই, তবু একেবারেই না শুলে স্নায়ুর একটু ক্লান্তি তো...আরে আরে, ঐ—ঐ তো আবার জ্বলে উঠেছে আলোগুলো। টালির নদীতে নীল জলের আভা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে—মুহূর্তের অন্যমনস্কতা ঘুচে যেতেই দেখি ফের আকাশ, বাগান, অন্ধকার। নীল জল মুছে গেছে। বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝির করে।

জলের ওপরে কী সুন্দরই দেখাচ্ছিল আলোটা এক্ষুনি। ইচ্ছে করতে লাগলো বাগানে বেরুতে, কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে। ভিজতে সাহস হলো না। ব্যাপারটা সশরীরে পরীক্ষার প্রচণ্ড ইচ্ছে সত্ত্বেও নিজেকে সামলে রাখলুম : ছাতা যখন নেই তখন এখান থেকেই দ্যাখা। তাছাড়া জীবজন্তুও আসতে পারে বাগানে রাত্তির বেলায়। দূরের উপত্যকাতে মাঝে মাঝে মিটিমিটি আলোর সারি জ্বলছে, বাস-রাস্তা আছে ওখানে। সেটাই দেখেছি হয়তো। চোখের ভুল—কবির কল্পনা। সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের সামনে এত বড় একটা আলো! বেশ জন্তু জানোয়ারের ভয় আছে এখানে, তাই কোনো অফিসার এ বাংলো নেয়নি। রোজ রোজ কে আর জ্বালিয়ে থাকতে চায়?

এমন সময়ে হঠাৎ কোথায় একটা মেশিন চলতে শুরু হলো ঘর্ঘর শব্দে। আমি তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে যাই। এয়ারকণ্ডিশনারটা বিগড়োলো নাকি? নাঃ, ঘরের শব্দ তো যেমনকে তেমনই। কান পেতে বুঝতে পারি শব্দটা অন্যত্র—আরেকটি এয়ারকণ্ডিশনারের চালু হবার। তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে যাই। কী রে বাবা, কোথাও লুজ কানেকশন ছিল নিশ্চয়। না তো, এটা তো বন্ধ। তবে কি মাস্টার বেডরুমে? পর্দা সরিয়ে দরজা খুলে দেখি আলো জ্বলছে। অর্থাৎ বিকেলে আমি আলো নেবাতে ভুলে গেছি। কিন্তু এয়ারকণ্ডিশনার চলছে না। আলোটা নেবাতে ঘরে ঢুকতেই মনে হলো একবার ফোনটা বেজে উঠলো। এগিয়ে গিয়ে ফোনটা ধরি। মাউথপিসের মধ্যে একটা অদ্ভুত ঝিমধরানো সুগন্ধ। কলকাতাতেও এমনি একটা সার্ভিস আছে, হপ্তায় হপ্তায় এসে ফোনে আতর মাখিয়ে যায়।

"হ্যালো?" ওদিকে শব্দ নেই। "হ্যালো?" "হ্যালো?" কই, কেউ তো কিছু বলছে না? ফোনটা বাজলো বলেই মনে হলো। নাকি বাজেনি? কোনো জবাব নেই। বার কয়েক হ্যালো হ্যালো করে নামিয়ে রাখি। নিশ্চয়ই কোনো মাতালের কাণ্ড। আলো নিবিয়ে দিয়ে ফিরে আসি। আমার ঘরের আলোটা পরদার ফাঁক দিয়ে আটকোনা ঘরের মেঝেয় এসে পড়েছে, পথ দেখতে অসুবিধা নেই। আলোটাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে, মেঝের ওপরে যেন একটা আলোর তৈরি ক্রুশচিহ্ন। ফিরে যেতে যেতে মনে হলো টেলিফোনের সুগন্ধটা সারা ঘরেই ছড়িয়ে পড়েছে। ফোনটা কি বেজেছিলো? না বাজেইনি?

যেই লিখতে বসা, অমনি মনে হলো ঝনঝন্ শব্দে জঙ্গলের বিচিত্র গুঞ্জন

আর রাত্রির স্তব্ধতা ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে আবার টেলিফোন বেজে উঠলো। তাড়াতাড়ি দৌড়োই ও-ঘরে। পর্দা তুলে, আলো জ্বেলে দেখি—কই, ঘর তো নিঃশব্দ। এঘরে ফোন বাজছিলো বলে তো মনেই হচ্ছে না। কিন্তু ঘরটা খুব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে মনে হলো, এয়ারকণ্ডিশনারটা কি চলছে? আগেও একবার দেখে গেছি অবশ্য। পাহাড়ি বৃষ্টিতে এমনি বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা পড়ে গেছে আর কি। তবুও 'সাবধানের মার নেই' পন্থায় এয়ারকণ্ডিশনার যন্ত্রটার দিকে ভালো করে আরেকবার নজর করে দেখি। নাঃ, অফ করাই তো আছে। অথচ ঘর্ঘর শব্দও হচ্ছে কোথাও একটা। সম্ভবত এখানে অন্য কোনোরকম যন্ত্র আছে, যেটা রাত্রে আটোমেটিক্যালি চালু হয়। বাগানের পাম্প, কি বিজলির ডাইনামো এ-জাতীয় কিছু হতে পারে। ছাদের ওপরে ইঁদুরের ছুটোছুটি ক্রমশই বাড়ছে। খুটখাট খুটুর খুটুর থেকে ঠাস-ঠকাশের দিকে। কাঠের বাড়ির এই দোষ। ছাদভর্তি ইঁদুরের রাজত্ব। টেলিফোনটা সত্যি জ্বালালে। লিখতে দেবে না। বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে জল দেবো ভাবি, কেমন ঘুম ঘুম পাচ্ছে। বাথরুমের দরজা খুলতেই সেই মিষ্টি গন্ধটা নাকে আসে। ভগবান জানেন, কোন এয়ার ফ্রেশনার ব্যবহার করে এরা। ঘরে ঘরে স্প্রে করে গেছে কখন এসে। ভালো করে প্রত্যেকটা ঘরের দরজা টেনে বন্ধ করে এসেছি এবারে, যাতে ফোনটা বাজলেও শুনতে না পাই। বেশ পুরু পুরু বার্মাটীকের দরজা। এবারে লেখাটায় একটা হিল্লে করতেই হবে। এমন সুযোগ আর কবে পাবো? উচিত ছিল এবার পুজোর লেখা-টেখা এইখানে বসেই লিখব। এত নির্জনতা তো কলকাতায় তপস্যা করেও পাওয়া যাবে না। কিন্তু যেই খানিকটা এগিয়েছি অমনি মাথার মধ্যে ঝনঝন করে টেলিফোনের বাদ্যি শুরু হয়ে যায়। এবারে আমি মন ঠিক করেই যাই, রিসিভারটা নামিয়ে রেখে আসবো। গেলে তো একবারও দেখছি না ফোন বাজছে। অথচ লিখতে বসলেই কানের মধ্যে ক্রিং ক্রিং। এইরকম টিলার ওপর নির্জন বাংলোবাড়িতে মধ্যরাত্রে ফোনটা বেজে ওঠাই তো উচিৎ—ছেলেবেলা থেকে যত ভূতের গল্প পড়েছি তাতে তাই-ই হয়—অথবা দোতলার জানলার কাঁচে শুধু ঠকঠক—ওরে বাবা। কাঠে ঠকঠকটা এখনো অন্তত হয়নি—শুরু হয়ে যাবে না তো এবারে? কখন কাজ রেখে উঠে পড়ি—বন্ধ দোর ঠেলতে ঠেলতে আলো জ্বালতে জ্বালতে বড় ঘরে যাই—ঢুকতে গিয়েই মনে হয়, ওদিক থেকে কেউ এগিয়ে আসছে। কোনোরকমে আলোটা জ্বেলে ফেলি, অস্থির কাঁপা হাতে। উল্টোদিকের মস্ত দেয়াল-আয়নায় দেখতে পাই, আমিই আমাকে সন্ত্রস্ত অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। ঘর নিঃশব্দ। এই সুগন্ধেই মাথাটা ঝিম-ঝিম করছে কি? টেবিলে রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ঘরে ফিরে আসি। শব্দ জব্দ। ফোন আর বাজবে না। সশব্দে নিঃশব্দে, কোনো প্রকারেই না। ঘরে ফিরতে ফিরতে টের পাই, এই এয়ার ফ্রেশনারের গন্ধটায় কেমন যেন গা গুলোতে শুরু করেছে আমার। বাঙালি ঘ্রাণে এতসব সায়েবি কায়দা কি হজম হবার? গন্ধ বন্ধ করি কি উপায়ে?

রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক সত্তাটিকে না চিনলে তাঁর চিরকাতর বাঙালি হৃদয়কেও আমরা চিনতে ভুল করবো। তাঁর বুকের মধ্যে—ওঃ—ওই যে এবারে বুঝি নিচেয়

ফোন বাজাতে সুরু করেছে। দরজা খুলে রেগেমেগে নামতে থাকি। দু'পা নেমেই দেখতে পাই, খাবার ঘরের দরজায় দুটি তালা ঝুলছে। আবার উঠে আসি। ও ফোন সারারাতই বাজবে। বাজুক। বারান্দা দিয়ে তাকিয়ে অবাক হয়ে যাই। জাপানী উদ্যানের মৃদু আলোগুলো দপ দপ করে জ্বলছে নিবছে। দেওয়ালীর টুনি-বালবের মতো ব্যবস্থা আর কি! আলোগুলো জ্বলে-নিবে জ্বলে-নিবে কাউকে যেন কিছু সংকেত দিচ্ছে। আমার পা-দুটোকে সজোরে বাগানের দিকে টানছে ওরা। এই পাহাড়ী বৃষ্টিতে তা বলে কিছুতেই বেরুচ্ছি না আমি, যতই ডাকো না তুমি আমাকে। ভিজে শেষে হাঁপানি হয়ে যাক আর কি। শক্ত পায়ে ঘরে এসে শুয়ে পড়ি। আলোটালো সব নিবিয়ে দিই। লিখতে মন নেই।

ইঁদুররা ছাদের ওপরে যত লাফায় এবারে, আমার তত আনন্দ হয়। ঐ তো বাবা, জ্যান্ত প্রাণী সব কত রয়েছে। আমি মোটেই এখানে একা নই। কেন জানি না, একা একা এত বড় বাড়ি বাগান উপভোগ করার উৎকট এবং গরীবী আহ্লাদটা হঠাৎ উবে গিয়ে কেমন একটা গা-ছমছম ভয়-ভয় ব্যাপারে এসে দাঁড়িয়েছে। বাথরুমের সুগন্ধটা বড্ড যেন বেড়েছে। এ ঘরটাকেও ছেয়ে ফেলেছে। অদৃশ্য এয়ারকণ্ডিশনারটি নির্ঘাৎ নিচেই চলছে কোনো তালাবন্ধ ঘরে। ফোনটা কি বাজছে? নিচে না পাশের ঘরেই? ফোনটা কোথায় বাজছে, বেজেই যাচ্ছে—প্রাচোড় ঘণ্টার শব্দ আমার তন্দ্রালস অর্ধচেতনার মধ্যে সাবানের ফেনার মত বেড়ে বেড়ে চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে—মাঝে মাঝে তারই মধ্যে কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করছি, জানলার সার্সিতে খট-খট। তালাবন্ধ বড় আলমারিটা হঠাৎ খুলে যাবে না তো ঠাশ করে? আর এক কোণে সেই 'কঙ্কাল' সিনেমার মতন—? আজ কফিটা না খেলেই হতো কালকের নিদ্রাহীন স্নায়ুর ওপরে। এতদূর প্লেনে এসেছি, ট্রেনে এলে তো তিনদিন লাগতো—তারও স্ট্রেন আছে—ওই, ওই তো খট-খট—না, ওটা ছাদে, ওটা সিলিঙের ফাঁকে ইঁদুরের নৈশভোজ—কিন্তু মাথার মধ্যে ফোনের শব্দটা যে থামছে না—বাড়তে বাড়তে দমকলের ঘণ্টির মতো ভয়ংকর, আরো বাড়তে বাড়তে মার্কিন অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনের মতো প্রচণ্ড মরিয়া শোনাতে থাকে—আমি দাঁতে দাঁত চেপে কম্বলের নিচে ঢুকে পড়ি, কান-মাথা-মুখ কম্বল-মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার আপ্রাণ দমবন্ধ চেষ্টায় ইষ্টনাম জপ করতে থাকি। এটাই আমার প্রাত্যহিক নিদ্রাকর্ষণের প্রকৃষ্টতম পন্থা—(জীবনে শেষ পর্যন্ত দুশো আটবারও ইষ্টনাম গুণতে পেরেছি কিনা সন্দেহ!) মাথার মধ্যে ওই শব্দ আমি আর শুনতে পারছি না, হে ভগবান, আমার শ্রবণে তুমি শান্তি দাও।

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল পাখিদের ডাকাডাকিতে। জঙ্গলে যে কতরকমের পাখিই থাকে, আর কতই মনোমোহিনী তাদের কলকাকলি! তারই সঙ্গে এখনও ঝিঁঝি ডাকছে বনের ভেতরে—এই তো দিন হয়ে-এল-বলে! মাথাটা ভার ভার লাগছে। বারান্দায় বেরিয়েই মাথা হাল্কা হয়ে গেল। বৃষ্টি থেমে গেছে। কী সুন্দর সেজেগুজেই না সূর্যের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে শৈলশ্রেণী।

বারান্দা থেকে একদিকের বাকি দুটো ঘরেই বাইরের দরজায় বড় বড় তালা মারা—একমাত্র হৃদয়-হৃদয়েই যাওয়া-আসা করা যায়—যেটা আমি প্রায় গুরুকৃত্যের মতো নিষ্ঠার সঙ্গে সারারাত ধরে করেছি। কী মনে হলো আবার, আমার ঘর দিয়ে মাঝের আটকোনা ঘর পার হয়ে বড় ঘরে যাই—ওই তো রিসিভারটা পাশে নামানো রয়েছে! ঘরে ঢোকার সময়ে দেওয়াল-আয়নায় আবার নিজেকে দেখতে পাই। খাটটা সত্যি মস্ত বড়—মাথার কাছে একটা টানা তাক। কী যেন নেই—কী যেন নেই—মনে হতে থাকে—ঠিক বুঝতে পারি না। খাটের মাথার কাছে ওই তাকে কী থাকার কথা ছিল—এখনি হঠাৎ খেয়াল হয়, বাইবেল। হ্যাঁ, খাটের মাথার ধারে একটা বাইবেল থাকতো নিশ্চয়—ওটা কি কালও ছিল? গন্ধটা এবারে হঠাৎ চিনতে পারি। না আতরের নয়, বিলিতি ইনসেন্সের গন্ধ। গির্জেতে যে ধূপ জ্বলে সেই ধূপের। ঘরটায় গির্জের গন্ধ। কফিনের বাক্সে যে ধূপ জ্বলে, সেরকম। মনে কেমন একটা ভার নিয়ে পিছু হেঁটে বেরিয়ে আসি। ফোনের রিসিভারটাকে ক্রেডলে তুলে রাখা আর হয় না।

বড়ুয়া চা নিয়ে আসে ট্রে সাজিয়ে।—"গুড মর্নিং মেমসাব। আপনার চা।"

"গুড মর্নিং বড়ুয়া। কাল রাত্রে বার বার একটা ফোন আসছিল।"

বড়ুয়া চুপ করে থাকে। ওর এই অভ্যেসটা আমার খুব খারাপ লাগছে।

"তোমাদের কোয়ার্টার থেকে শোনা যায় না রিং? রাত্তিরে?"

"না, মেমসাব।"

"ফোনটা খুলে রাখার কোনো ব্যবস্থা নেই?"

"উপরেরটা খোলা যায়, নিচেরটা যায় না।"

"আজ রাত্রে বরং রিসিভারটা নামিয়ে রেখে যেও নিচে-ওপরে দু'জায়গাতেই।"

"ঠিক আছে। ব্রেকফাস্ট সাতটায় দেব তো?"

"হ্যাঁ। আচ্ছা বড়ুয়া, ওই জাপানী বাগিচার আলোয় কি টুনি-বালব লাগানো নাকি? আপনা-আপনিই জ্বলে-নেবে?"

"বলতে পারি না মেমসাব, ওসব ব্যাপার মালী জানে।"

"আচ্ছা, কাল রাত্রিবেলায় নিচের তলায় কিসের একটা মেশিন চালু হলো বলো তো?"

বড়ুয়া চলে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়ায়। ভুরু কুঁচকে বলে—"কই, কোনো মেশিন তো চালানো হয়নি রাত্রে?"

"হয়নি? কিসের আওয়াজ হচ্ছিল তবে? কোনো এয়ারকণ্ডিশনারে লুজ কনেকশন হয়ে নেই তো?"

"না, মেমসাব।"

"কিম্বা আর কিছু? পাম্প সেট-টেট? ডায়নামো?"

"না, মেমসাব।" বড়ুয়া মাথা নেড়েই চলে।

কিন্তু আমি যে স্পষ্ট শুনলুম, সারারাত—খুব স্পষ্ট শুনলুম—

"যাই হোক, জাপানী বাগিচার বাতিগুলো রাত্রে কিন্তু ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল!"

BanglaBook.org

"জ্বলছিল নাকি বাতিগুলো? ঠিক দেখেছেন?" এবার বড়ুয়ার নির্বিকার মুখে স্পষ্টই চমক লাগে।

"কেন, তুমি জ্বেলে দাওনি?"

"না, মেমসাব। ওসব মালী জানে।"

পাগড়ি বাঁধা মালী বাগানে উবু হয়ে বসে খুরপি হাতে কাজ করছে। চায়ের কাপ হাতে বাগানে নেমে যাই।

"জাপানী বাগিচাটা ভারি সুন্দর করেছো।"

"হম্ নহী বনায়া মেমসাব, ও অংগ্রেজসাহাব আপনা হাথসে বনওয়ায়া থা। উধরমে মৎ যানা মেমসাব—মিট্টি গিলা হ্যায় বারিশসে—"

"জাপানী বাগিচার বাতি কি তুমি জ্বালিয়ে গিয়েছিলে কাল?"

বুড়ো মালী ঘোলাটে চোখ তুলে তাকিয়ে ফোকলা মুখে মিষ্টি করে হাসে। মাথা নাড়তে নাড়তে বলে—"বাত্তি হ্যায় নেহী মেমসাব, উয়ো ছোটা ছোটা বালব ইধর মিলতা হী নহী, জ্বলাউঙ্গা কৈসে?"

আমার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা বরফের বাতাস নেমে গেল। ইচ্ছে করল চীৎকার করে উঠি, সারা রাত্তিরই তো বাতি জ্বলেছে ওখানে! জ্বলেছে, নিবেছে, জ্বলেছে। কিন্তু মুখে কিছুই বলি না।

আমি বুঝতে পারছি, এখন যদি বড়ুয়াকে জিগ্যেস করি, "বড়ুয়া, তুমি ঘরে ঘরে কোন এয়ার ফ্রেশনার স্প্রে করেছিলে বলো তো, গন্ধটা বড্ড কড়া ছিল।"—বড়ুয়া নিশ্চয় বলবে—"স্যরি মেমসাব, কিন্তু আমি তো কোনো স্প্রে লাগাইনি?" যথাসাধ্য ঘ্রাণশক্তিকে তীক্ষ্ণ করে আবেকবার গন্ধটা খুঁজতে চেষ্টা করি বাতাসে। পাওয়া যাচ্ছে না। জাপানী বাগানটি আজ সকালের আলোয় কেমন যেন ম্রিয়মাণ দেখাচ্ছে। রাত্রে যে -এই মোহিনী মায়ায় পরীর দেশ হয়ে আমাকে ডাকছিল, তা কে বলবে।

"সুপ্রভাত। সুপ্রভাত। কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?" ব্রেকফাস্টে হোসেনের সঙ্গে চলে এলেন স্বয়ং ম্যানেজার মিস্টার চ্যাটার্জি এবং ফিনান্স অফিসার শ্রীনিবাসন।

"আরে আসুন,আসুন। না না, খুবই কমফর্টেবল—"

"রাত্রে ঘুমটুম হয়েছিল তো?"

"খুব ভালো, খুব ভালো, থ্যাংকিউ"—

"বাংলোটা পছন্দ হয়েছে তো আপনার? মিঃ হোসেন অবিশ্যি বলেছিলেন, আপনি এখানে স্যাটিসফায়েড—আমি তবুও এসেছিলাম অন্য একটু সাজেশান নিয়ে —আমার স্ত্রীর খুব শখ আপনাকে একটু আমাদের বাংলো—এই বাংলোর ধারে-কাছে লাগে না, তবু সেটাও একটা অন্যরকম—টিলার ওপরে একটা ঝর্ণা আছে, একটা ছোট লেক মতনও আছে সামনে—চলুন না, যাবেন নাকি? আমার স্ত্রীর একান্ত অনুরোধ"—

"অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু কেন মিছিমিছি ঝামেলা বাড়াবেন, বেশ তো আছি?

—আচ্ছা মিস্টার চ্যাটার্জি, এটাকে ম্যানেজারের বাংলো না করে গেস্ট হাউস করা হলো কেন? এত সুন্দর বাগানটা।"

"মানে—" একটু গলাখাঁকারি দিয়ে নিয়ে বৃদ্ধ শ্রীনিবাসনই উত্তর দেন, "এটাই আগে ম্যানেজারের বাংলো ছিল, একটা রাদার আনফরচুনেট ব্যাপারের পর থেকে আর ম্যানেজারেরা কেউ এখানে থাকেন না।"

"তার মানে?"

"টেড ম্যাথায়াস নামে এক অল্পবয়সী ইংরেজ ম্যানেজার এ-বাড়িতে মারা গিয়েছিল। তারই তৈরি এই টেরাসড গারডেন, তার নিজের হাতে করে গড়া ওই মডেল জাপানী বাগিচা, তার বাগদত্তা বউয়ের জন্যে উপহার। ছুটি নিয়েছিল, বিয়ে করতে দেশে যাবে বলে। এক রাত্তিরে ট্রাংককলে হঠাৎ খবর এল—বউ অন্যের সঙ্গে ফ্রান্সে পালিয়ে গেছে। ম্যাথায়াস সাহেব খবরটা পেয়ে নিজের রগে গুলি চালায়। সেই থেকে অপয়া বাড়ি বলে কেউ এখানে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বসবাস করতে চায় না আর কি। আর যত আজেবাজে গল্প-গুজবও লোকে রটিয়েছে এই ফাঁকে, সেসব অবিশ্যি কিছু না।"

চ্যাটার্জি বলেন—"কিছু নয় ঠিকই, তবু শুনে-টুনে ভয়ও তো পায় দেখি লোকে। বয়-বাবুর্চিরাও ঐ অজুহাতে এখানে রাত্রিবাসটা করতে চায় না। সেবার এক ভদ্রলোক তো ভয়ংকর ভয় টয় পেয়ে কেলেংকারি করে ফেলেছিলেন। কীসব শব্দটব্দ শুনেছেন, আলো-ফালো দেখেছেন, তাঁর সারারাত ঘুম হয়নি। হাইপারটেনশনের রুগী, সকালবেলায় সোজা ডাক্তার ডাকতে হলো। সে এক কাণ্ড! সেই থেকে আমরা আর এটা তেমন ইউজ করি না।"

"যতসব ফার্টাইল ইমাজিনেশনের লোক—" মহোৎসাহে বললেন হোসেনসাহেব, এই তো ডক্টর দেবসেন দিব্যি ঘুমোলেন, কিছু ডিস্টারবড হয়নি। ওসব গল্পসল্প কাউকে বলাই উচিত নয় আগে থেকে।"

"কী, আমাদের কথাটা ভাবছেন একটু?" চ্যাটার্জি বললেন—"গিন্নির আবেদনটা মঞ্জুর হবে তো? আজ রাত্রে?"

আশা করি ওঁরা খেয়াল করেননি কখন আমার হাতের কাঁটা-চামচ স্থির হয়ে গেছে, অভুক্ত ডিম-বেকনের প্লেটে।

কথাসাহিত্য, কার্তিক ১৪০২

খগেনবাবুর পড়শী

বড্ড জ্বালাতন করেন দেবু মজুমদার। একদম পছন্দ নয় ওঁকে খগেনবাবুর। রোজ ভোরবেলা রাস্তার ধারের দাওয়ায় বসে বাংলা খবরের কাগজটা পড়া খগেনবাবুর

BanglaBook.org

দীর্ঘদিনের অভ্যাস। বাসি লুঙ্গি-গেঞ্জি পরে, দাঁতন করতে করতে। টাটকা নিমের দাঁতন দিয়ে। নিজের গাছের দাঁতন। নিজের দাঁত। নিজের দাওয়া। নিজের পয়সায় কেনা কাগজ। তোর তাতে কী? কিন্তু না। দেবুবাবুর সহ্য হবে না।

তিনি গিলেকরা পাঞ্জাবী গায় দিয়ে, কোঁচানো ধুতি পরে, অ্যালসেশিয়ান কুকুরের চেন ধরে বেড়াতে যাবেন, আর পথে দাঁড়িয়ে পড়ে ডেকে বলবেন—"ওখানা কি একটা কাগজ হলো মশাই? অ্যাঁ, খগেনবাবু? পড়তে হলে, হ্যাঁ, পড়ুন স্টেটসম্যান। ইংরিজি কাগজেই যা কিছু খবর থাকে। বাংলা কাগজে কেবল যত আজেবাজে গসিপ।" খগেনবাবুর আজকাল, বেশ কিছুদিন হলো, দেবুবাবুর চালিয়াতি আর সহ্য হয় না। হ্যাঁ, খগেনবাবু স্টেটসম্যানও পড়েন—তবে সেটা চা খেয়ে উঠে। এই বাংলা কাগজটা বহুকাল পড়ছেন। কত শত শত নতুন বাংলা কাগজ উঠেছে, তাও এখানা ছাড়তে পারেননি। এর নামে দেবুবাবুর নিন্দে উনি সইতে পারেন না। কিন্তু মুখে বলেন না কিছু। দেবুবাবুকে বলে লাভ নেই। উনি অন্যের কথায় কান দেন না। নিজের কণ্ঠস্বরটাই তাঁর কানে সবচেয়ে মিষ্টি লাগে। খগেনবাবু এই তিরিশ বছর ধরে সেটা দেখছেন। তিনিও দেবুবাবুকে মনে মনে গ্রাহ্য করেন না। হোক না তাঁর চারতলা প্রাসাদ। খগেনবাবুর ভারী বয়ে গেল। তাছাড়া দেবুবাবুর ওই অ্যালসেশিয়ান কুকুরটাকেও তাঁর পছন্দ হয় না। ধেড়ে শেয়ালের মতো লেজ, খ্যাঁকশেয়ালের মতো মুখ আর বাঘের মতো গলা। ওর বাদামী চোখদুটোও কেমন হাসিহাসি, ঠাট্টা-ঠাট্টা, খগেনবাবুর মতো লোককে ওর হিংসুটির যোগ্য বলেও ও মনে করে না। রোজ ওঁর বাড়ির সামনের ল্যাম্পপোস্টটাতে একটা ঠ্যাং তুলে হিসি করে যায়। দেবুবাবু কোথায় চেন টেনে সরিয়ে নেবেন, তা নয়, তিনি বরং দাঁড়িয়ে যান। কুকুরের এই অসামাজিক আচরণকে আত্মাদেনা করে প্রশ্রয় দেন।

নাঃ, খগেনবাবু কিছুই বলতে পারেন না। এটাই খগেনবাবুর মুশকিল। তিনি বেজায় ভদ্রলোক। পরনে লুঙ্গি। হাতাওলা ফর্সা গেঞ্জী, হাতে নিমের দাঁতন, বসে আছেন, লাল সিমেন্টের চকচকে মসৃণ দাওয়াতে, পা ঝুলিয়ে। পায়ে বিদ্যেসাগরী চটি, মাথায় অল্প-অল্প টাক, চোখে মোটা কাচের চশমা। খুব নিরীহ ভালমানুষ। পাড়াসুদ্ধ সবাই সেটা জানে। গিন্নিটি বরং অনেক বেশি শক্তপোক্ত, পাড়ার লোকে তাঁকে একটু সমঝে চলে। কিন্তু দেবুবাবুর সঙ্গে গিন্নিমার তো দেখা হয় না। তিনি তখন থাকেন পুজোর ঘরে।

দেবুবাবুর কুকুর হাঁটানোর গ্রীষ্মের পোশাক এটা। আর শীতের পোশাক অন্য। খগেনবাবুরও। খগেনবাবুর তখন পরনে থাকে মোটা খদ্দরের পাজামা, গিন্নির হাতেবোনা সোয়েটারের ওপরে নস্যি রঙের আলোয়ান, পায়ে উলের মোজার ওপর এই বিদ্যেসাগরী চটিটাই।

আর দেবুবাবু? একেবারে ফিটফাট সাহেব। জুতো-মোজা কোট-প্যান্ট-শার্ট সোয়েটার-মাফলার। মাথায় একখানা কাশ্মীরী টুপি পর্যন্ত। বেশি ঠাণ্ডা পড়লে, একটা কমলারঙের বাঁদুরে টুপি পরতে খগেনবাবুকে বাধ্য করেন গিন্নি, কেননা খগেনবাবুর

টাকে চট করে ঠাণ্ডা লেগে সর্দি-কাশি বেধে যায়। ওই বাঁদুরে টুপিটা পরলে আর রক্ষে নেই। দেবুবাবু তাঁকে খ্যাপাবেনই।

—"কী মশাই? ব্যাপার কী? অমরনাথ যাচ্ছেন বুঝি? হিমালয় ভ্রমণে বেরুচ্ছেন? ও বস্তুটি তো কলকাতায় ইস্তেমাল করবার জন্যে তৈরি হয়নি, ও হচ্ছে খাঁটি হিমালয়ান উই'টারের জন্যে। তা, কবে যাচ্ছেন?"

খগেনবাবুও মনে মনে বলেন—

—"আপনি কি লণ্ডনে যাচ্ছেন? আপনার পোশাকও কলকাতার জন্যে তৈরি হয়নি, ও খাঁটি ব্রিটিশ ওয়েদারের জন্যে।" কিন্তু ঐ মনে মনেই। মুখে কেবল মৃদু মৃদু হাসেন। দেবুবাবুকে বলে লাভ নেই। উনি কানে তুলবেন না। অন্যের কথা উনি শোনেন না। চারতলা বাড়িতে থাকেন, গেটে একটা ড্রাইভার আর একটা দারোয়ান বসে থাকে। দুজনে খৈনি খায়। সামনে একখানা গাড়ি সর্বদা দাঁড়িয়ে থাকে। আরেকটা সারাদিন নাতি-নাতনীদের ইস্কুলে, কলেজে নিয়ে যাচ্ছে, আর নিয়ে আসছে। আর দেবুবাবুর মেয়েকে আর মিসেসকে নিউমার্কেটে নিয়ে যাচ্ছে, আর নিয়ে আসছে। দেবুবাবু দিনের বেলা কোথাও যান না। তাঁর ব্যবসার অফিস বাড়িতেই। কিন্তু তিনি বিকেলে গাড়ি চড়ে, কুকুর নিয়ে বোধহয় গড়ের মাঠের দিকে কোথাও হাওয়া খেতে যান। মিসেসকেও মাঝে মাঝে সঙ্গে নিয়ে যান। মিসেস গেলে, সঙ্গে তাঁর খুদে নাতনীটাও যায়, আয়া সুদ্ধু। খগেনবাবুর গিন্নির সঙ্গে দেবুবাবুর গিন্নির ভাবসাব নেই। যদিও পাশাপাশি বাড়ি। দেবুবাবুর উঁচু বাড়িতে বাগান নেই, খগেনবাবুদের দেড়তলা, পুরনো দিনের বাড়ি। তাতে বাঁধানো উঠোন আছে। সামনে ছোট্ট ফুলের বাগান আছে। পেছনে বেশ খানিকটা জমি আছে। খগেনবাবুর বাবার গাছের শখ ছিল, নিম, আম, লিচু, পেয়ারা, জামরুল, কাঁঠাল, অনেকরকমের ফলের গাছ লাগিয়েছিলেন। কলাবাগানও আছে ছোট্ট একটু। গিন্নিমা কাকভোরে উঠে সামনের ফুলবাগান থেকে পুজোর ফুল তোলেন। না, পাড়ার ছেলেরা ঢুকতে পারে না। উঁচু উঁচু বর্শার ফলার মতন লোহার রড লাগানো বেড়া আছে। রাস্তা দেখা যায় দিব্যি ফাঁক দিয়ে, কিন্তু পেরিয়ে ঢোকা যায় না। খগেনবাবুর গিন্নিও দেবুবাবুদের দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। ওঁদের বাড়িটা ছিল দোতলা, দেখতে দেখতে চারতলা হলো। দেবুবাবুদের মাত্র সাড়ে তিনকাঠা জমিতে ওই বিশাল প্রাসাদ। কথায় বলে, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। দেবুবাবুই তার প্রমাণ। আর খগেনবাবুদের ফলের বাগানটাই ন'কাঠা জমিতে। উঠোন বাগান এইসব করে, বাড়িটা মাত্রই দেড়তলা বানিয়ে গেছেন খগেনবাবুর বাবা। খগেনবাবু কেরানীর চাকরী করে বাড়ি বাড়াতে পারেননি। দরকারও হয়নি। তাঁর মাত্র একটা ছেলে, একটা মেয়ে। বিয়ে-থা হয়ে গেছে। তাদের নিজেদের ঘরদোর সবই আছে। কিন্তু এখানে এলে থাকবার জায়গা যথেষ্ট। ইঞ্জিনিয়ার ছেলে তো অফিসের ফ্ল্যাটে বৌ নিয়ে চলে গেছে। মেয়ের সল্টলেকে শ্বশুরের নিজের বাড়ি। দেবুবাবুর ছেলে নেই। দুই মেয়েরই বিয়ে হয়েছে। নাতি-নাতনী হয়েছে। বড় জামাই-মেয়ে এখানেই থাকে। তাদের ছেলেমেয়ে তিনটি। দেবুবাবুদের বাড়িতে

দিবারাত্র ঝিনচাক রণবাদ্যি বাজছে। খগেনবাবু রেডিও, তাঁর গিন্নি টিভি দিয়ে সে আওয়াজ আটকাতে পারেন না। দেবুবাবুদের মার্বেল বসানো সাদা বাড়িটাকে খগেনবাবুর ইঁটের লাল বাড়ির পাশে একদম বেমানান বলে মনে হয় খগেনবাবুর। এই পুরনো পাড়ায় এই গলির মধ্যে না হয়ে ওটাকে অন্য কোথাও মানাতো ভালো।

দিন তো সমান যায় না। খগেনবাবুর গিন্নি হঠাৎ তিনদিনের জ্বরে মারা গেলেন। ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া, ধরা পড়তে না পড়তেই খতম। খগেনবাবু সদ্য রিটায়ার করেছেন। গিন্নির সঙ্গে নতুন করে ভাব হচ্ছিল তাঁর। ঠিক এই সময়ে গিন্নির চলে যাওয়াটা খগেনবাবুকে ভয়ানক একটা ধাক্কা দিল।

প্রথম প্রথম পাড়ার লোকে রোজ রোজ আসা-যাওয়া করতো। মেয়ে এসে কাছে রইল কিছুদিন। ছেলে-বৌমাও এসে রইল কিছুদিন। দুজনেই তারপরে পালা করে খগেনবাবুকে তাদের কাছে নিয়ে গেল কদিন। কিন্তু খগেনবাবুর এই চিরকেলে বাড়িটা ছেড়ে অন্যত্র বেশিদিন মন টেঁকে না। খগেনবাবুর ঠাকুরঘরটার দিকে তাকাতে পারেন না। রোজ ঝগড়া হতো এই নিয়ে।

"এত বেশিক্ষণ ধরে পুজো করবার কী দরকার?" গিন্নির মত সময় কাটে পুজো করে, টিভি দেখে, আর যমুনার ওপর খবরদারি করে। রান্নাবান্না করতে যমুনা আছে বিশ বছর। ঘরসংসার সেই দ্যাখে, খগেনবাবুর কোনো অসুবিধে নেই। গিন্নি থাকতেও তাঁর দিনের রুটিন যেটি ছিল, গিন্নি না থাকতেও তাঁর দিনের রুটিন ঠিক সেইটি আছে। মোটামুটি নাওয়া-খাওয়া পোশাক-আশাকের অসুবিধে নেই। সেবা যত্নটা "বাবা" "বাবা" করে যমুনা যথেষ্টই করে। বাংলাদেশ থেকে এসেছিল সেই ১৫/১৬ বছর বয়সে। বরটা ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিল একটা মেয়ে হবার পরেই। সেই মেয়েও বড় হয়েছে এখানেই। জবা এখন থাকে তাঁর ছেলে-বৌমার কাছে, বালিগঞ্জে। স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে জবা। বৌমাকে পাত্র খুঁজতে বলেছেন খগেনবাবু। বৌমা গা করে বলে মনে হয় না। পড়বে একদিন ঝামেলায় তখন বুঝবে। এখন স্বার্থপরতা করে বিয়ে দিচ্ছে না। গিন্নি থাকলে ঠিকই ওর একটা ব্যবস্থা করতেন।

খগেনবাবু এখনও কাগজ নিয়ে, দাঁতন নিয়ে বসেন দালানে। বাগান ভর্তি হয়ে বেল, জুঁই, জবা, করবী ফুটে থাকে। আগে এই ফুলগুলো উনি দেখতে পেতেন না। যমুনা একটু বেলায় ফুল তোলে। তার রান্নাঘরের কাজকর্ম থাকে। ফুলগুলো দেখতে দেখতে খগেনবাবুর চোখ জ্বালা করে।

একটা নতুন ব্যাপার হয়েছে, দেবুবাবু আজকাল প্রায়ই এসে খগেনবাবুর সঙ্গে গল্পসল্প করেন।—"কী মশাই, আজকের জবর খবরটা দেখেছেন? ঠনঠনেতে ডবল মার্ডার?

—"কী মশাই? দেখেছেন? দিল্লির মসনদ তো টলোমলো।"

—"যাই বলুন মশাই, দিল্লি বম্বেতে যেমন রোজ রোজ খুন-খারাপী হচ্ছে

কলকাতা তার চেয়ে অনেক Safe"—এমনকী মাঝে মাঝে বিকেলবেলাতেও এসে বসেন বাইরের ঘরে। যমুনাকে বলেন এককাপ চা করে দিতে। গিন্নির মৃত্যুতে পাড়ার লোকেরা এসেছে, চলে গেছে, ছেলেমেয়েরাও এসেছে, চলে গেছে। দেবুবাবুই যা যাতায়াতটা বাড়িয়ে দিয়েছেন। খগেনবাবুর আজকাল দেবুবাবুকে একটু একটু সহ্য হতে শুরু করেছে। হঠাৎ বড়লোকদের অমন একটু হয়। ও নিয়ে ভেবে লাভ নেই।

কিন্তু গিন্নির থাকা আর না থাকাতে এমনি আকাশ-পাতাল তফাৎ হবে জীবনে, সেটা খগেনবাবু ভাবতে পারেননি। এমনকী দেবুবাবুকেও সহ্য হয়ে যাবে। একটু কৃতজ্ঞতার বোধও যেন গোপনে জন্মাচ্ছে। উনি অন্তত চেষ্টা তো করেন খগেনবাবুর সঙ্গে সময় কাটাতে। ওঁর ব্যবসাটা এখন প্রধানত জামাইরা দ্যাখে, বড়জামাই এ-বাড়িতেই থাকে; ছোট দ্যাখে বম্বের অফিস। দেবুবাবুর ব্যবসা খুব জমে উঠেছে। প্রোমোটার তো? বাঙালি প্রোমোটার আর কটা আছে? দেবুবাবুর জামাই শ্বশুরের বিজনেসের অনেক উন্নতি করে দিয়েছে। সৌরভ বুদ্ধিমান ছেলে, প্রচুর গায়ে খেটে পরিশ্রম করতে পারে। দেবুবাবু আজকাল মাঝে মাঝে ব্যবসার গল্পও করেন খগেনবাবুর কাছে। গাঙ্গুলিদের বস্তিটা কিনে নিয়েছেন দেবুবাবু, সেখানে দশতলা বাড়ি তৈরি হতো, এখন হঠাৎ সরকার অত উঁচু বাড়ি বেআইনী করে অত লোকসান করে দিয়েছে। সবাই কি আর কুন্দলিয়া হতো? গাঙ্গুলিদের বসতবাড়িটাও কেনার কথা চলছে, বাড়িটা কর্নার প্লট, দুটো মুখ আছে। ওখানে বাড়ি তুলতে পারলে আয় দেবে। খগেনবাবুর বাড়িটা কর্নারপ্লট না হলেও প্রায় একই সুবিধে আছে ওটারও। লাগোয়া জমিটা একদম পিছনের গলি পর্যন্ত ছড়ানো। গাঙ্গুলিদের বাড়ির একটা মুখ গলিতে, আরেকটা মুখ বড় রাস্তায়। খগেনবাবুও ইচ্ছে করলে একটা খিড়কির দরজা করতে পারতেন পেছনের রাস্তায়।—দেবুবাবুর কথাবার্তা খগেনবাবুর যে শুনতে খুব ভাল লাগে তা নয়। খগেনবাবু আদর্শ ব্যাপারী, দেবুবাবুর জাহাজের খবরে তাঁর কী কাজ? তবু শোনেন। সময় তো কাটে। একটা অচেনা রহস্যময় জগতের ঝলক দেখতে পান। কিন্তু লোকসান, মুনাফা, ব্যবসা-বাণিজ্য, এসবের ভাষা তাঁর নতুন করে আর শিখতে ইচ্ছে করে না। তবু চুপচাপ শুনে যান খগেনবাবু। বিনা মন্তব্যে। দেবুবাবুও জানেন এসব বিষয়ে খগেনবাবুর বলবার কিছু নেই। কিছুই বলবার নেই বটে, কিন্তু শুনতে শুনতে খগেনবাবুর মনে বিরক্তির উৎপাদন হতে থাকে। শরীরে অ্যাড্রিনালিনের প্রবাহ বৃদ্ধি পায়, মাথার মধ্যে বিজবিজ করে রাগ জমতে থাকে। অথচ খগেনবাবু জানেন অকারণে রেগে যাওয়া এ বয়সে ভালো নয়। রাগী বলে অবশ্য নামও নেই খগেনবাবুর। তিনি সংযত প্রকৃতির মানুষ। এই যে দেবুবাবুর অ্যালসেশিয়ানটা। খগেনবাবুর দিকে সমানে ঠাট্টা-ঠাট্টা চোখে তাকিয়ে থাকে, আর তামাশা করে ল্যাজ নাচায়। সেটাও তো খগেনবাবুর একেবারেই পছন্দ হয় না। আর বাড়ির সামনের ল্যাম্পপোস্টটাতে প্রত্যেকদিন ইয়ে করা,—সেটাই কি তিনি মনে মনে সহ্য করতে পারেন? পারেন না। কিন্তু সেইসব অপছন্দর কথা কি

খগেনবাবু প্রকাশ করেছেন কোনোদিন? করেননি। তেমনি, দেবুবাবুর ব্যবসাপাতির গল্পেও খগেনবাবুর নিতান্ত অরুচি। গল্প করতে করতে দেবুবাবু যখন খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েন, তখন খগেনবাবু মনে মনে কানের সুইচটা অফ করে দিয়ে গিন্নির কথা ভাবেন।

এই বিকেলের দিকটায় গিন্নি রোজ গা ধুয়ে, চুলটি বেঁধে, কপালে বড় করে সিঁদুরটিপটি এঁকে, পাটভাঙা শাড়ি পরে, একবাটি মুড়ি মাখা, কি দুটি চিড়ে-ভাজা, কি একটু সুজির মোহনভোগ—কিছু না হোক দুটো বেগুনী আর নাড়ু দিয়েই হাল্কা একটু জলখাবার করে দিতেন খগেনবাবুকে। আপিশ থেকে এসে জলখাবার খাওয়ার অভ্যেস ছিল তো? রিটায়ারের পরেও সেইমতোই চলছিল। আর নিজেও এক গেলাশ চা নিয়ে পাশে এসে বসতেন এই সময়টায়। আঁচলের চাবির মৃদু রিনরিন থেকেই টের পাওয়া যেত, চা জলখাবার আসছে। খাটের ওপর পা তুলে বসে কর্তাগিন্নির বিকেলবেলার চা-পর্ব। সামনের জানলাটার পাশ দিয়ে মোটা যুঁইফুলের লতাটা উঠে গেছে, সুগন্ধে ঘর ভরে যায়। অবশ্য এখন যুঁইফুলের সময় নয়, গিন্নির বড় প্রিয় ফুল। গন্ধে গন্ধে একসময়ে বাগানে ছায়া ঘনিয়ে আসে, টুক করে সূয্যি ডুবে যায়।

এইসময়ে গিন্নি শশব্যস্ত হয়ে ছাদে উঠে যেতেন ঠাকুরঘরে। সন্ধে দিতে হবে না? খগেনবাবুদের এত সুন্দর বাঁধানো উঠোন, তুলসীতলাটা কিন্তু ছাদের ওপরে। ঠিক ঠাকুরঘরের সামনে। এটা ওঁর মায়ের ব্যবস্থা। উঠোনে যেই টিউবওয়েল বসানো হলো, মার মনে হলো তুলসীতলা ছাদে ট্রান্সফার করা দরকার। খগেনবাবুর গিন্নি তাঁর মায়ের নিয়ম কানুন বজায় রেখেছিলেন। পুজো আহ্নিক সন্ধে দেওয়া। বৌমা তাদের ফ্ল্যাটবাড়িতে কী করে, কিছু করে কিনা, খগেনবাবুর জানা নেই। আর যমুনাই এখন এ-বাড়িতে ঠাকুরঘরে ফুলজল দেয়। সন্ধে দেয়। খগেনবাবুর ঠাকুরঘরে অ্যালার্জি। ওটা গিন্নির ডিপার্টমেন্ট। গিন্নি এত কম কথার মানুষ ছিলেন যে খগেনবাবুর এখন মাঝে মাঝে মনে হয় গিন্নির সঙ্গে তাঁর বুঝি ভাল করে চেনাশোনাই হয়নি। খগেনবাবু নিজেও চুপচাপ মানুষ, কথা বেশি বলেন না। সংসারের প্রয়োজনীয় কথাবার্তা ছাড়া তাঁদের মধ্যে খুব একটা কথা হতো কি? ওই ছেলেমেয়েদের কথা। খগেনবাবুই মাঝে মাঝে এটা ওটা বলতেন, কথা বলার লোক বলতে তো এখন বাড়িতে কেবল গিন্নিই ছিলেন। গিন্নি মন দিয়ে খগেনবাবুর কথাগুলো শুনতেন। কখনও হয়তো কিছু বলতেন না। পরনিন্দা পরচর্চা গিন্নির স্বভাবে ছিল না, বিনা দরকারে কথা বলাও না। কিন্তু মুখে সবসময় একটা হাসি লেগে থাকতো। গিন্নির এই হঠাৎ চলে যাওয়াটার জন্যে খগেনবাবু প্রস্তুত ছিলেন না। প্রস্তুতির সময় পাননি।

দেবুবাবু যতক্ষণ তাঁর জামাইয়ের প্রোমোটারির গল্প করেন, খগেনবাবু অন্যমনস্ক চোখে সদ্য দেয়ালে টাঙানো বাঁধানো ছবিটার দিকে চেয়ে থাকেন। ঘোমটা দেওয়া, সামান্য হাসি ছুঁয়ে আছে মুখে। যমুনা রোজ সকালে বাগান থেকে তোলা ফুলে একটা মালা গেঁথে পরিয়ে দেয়। হাজার হোক মেয়েটা অকৃতজ্ঞ নয়। গিন্নি ওর

মেয়ে জবার বিয়ের জন্যে হাল্কা কিছু গয়না গড়িয়ে রেখে গেছেন। জবাটা খুব কাজের মেয়ে। সেটাই হয়েছে মুস্কিল। বৌমা ওর বিয়ের জন্যে গা করছে না মোটে। খগেনবাবু স্বার্থপরতাটা টের পান ঠিকই কিন্তু ছেলেকে ভরসা করে যে মুখে কিছু বলবেন, সে সাহস তাঁর নেই। গিন্নি থাকলে ঠিক ম্যানেজ করতেন। কথা কম বললে কি হবে, কাজে যেটা করার গিন্নি সেটা ঠিকই করে ফেলতেন। প্রায় চল্লিশ বছরের কাছাকাছি তো ঘর করা হলো, অথচ—। এখন মাঝে মাঝেই কেমন মাথার মধ্যেটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে খগেনবাবুর। চাকরি-বাকরি নিয়েই সময়টা চলে গেল। দুজনের ঠিক চেনাশুনো সবটা হবার আগেই যেন গিন্নি হঠাৎ উবে গেলেন। ঠিকঠাক ভাবটা জমতে শুরু হয়েছিল। এই সবে, এই রিটায়ার করবার পরে।

হঠাৎ দেববাবুর একটা কথায় খগেনবাবুর কানখাড়া হয়ে গেল। "—ছেলেমেয়েরা কেউই তো আর আপনার এই নোনাধরা বাড়িতে বসবাস করতে আসবে না মশাই। বরং বুড়ো বয়সে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে আরাম করে বাঁচুন, খগেনবাবু, পেছনের বাগানটাতেই কতখানি জমি পড়ে আছে বলুন তো? সানবাঁধানো উঠোন রয়েছে ভেতরে, সামনেও এই বাগানটুকু আছে, আপনার এখানে মোট জমি কতটা হবে, বাড়িটাড়ি সুদ্ধু? কাঠা দশেক তো হবেই, না?"

খগেনবাবু অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেন, "বাগান উঠোন মিলিয়ে ওদিকে ছ'কাঠা, আর বাড়িটা আমাদের ছোট্টই, সামনের এই জমিটুকুসুদ্ধু সোয়া দু'কাঠার মতন হবে—", "—সব মিলিয়ে তাহলে সোয়া আট কাঠা? ওরে বাব্বা, ভবানীপুর পাতালরেল স্টেশনের কাছেই এই এতখানি জমি? এ আপনি সোনার খনির ওপরে বসে আছেন মশাই, সোনার খনি।" খগেনবাবুর আবোধ চোখে তাকিয়ে থাকা দেখে দেবুবাবু আরও উৎসাহে বলতে থাকেন—"রাজার হালে থাকতে পারবেন বুঝলেন, রাজার হালে। এই জমির এখন দর কত জানেন?" খগেনবাবু মাথা নাড়েন। জানেন না। জেনে দরকারও নেই তাঁর। দেবুবাবু এখন উঠে গেলেই পারেন। পৈত্রিক ভিটে বেচে রাজার হালে থাকার কোনো ইচ্ছে নেই খগেনবাবুর। এখনও তাঁর হাল কিন্তু ভিখিরির মতন নয়। পেনশনের টাকায় তাঁর শেষ ক'টা দিন স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে। রানী কোথায়। কিসের লোভে রাজা হবেন হঠাৎ বুড়ো বয়সে? তাঁর ছেলে-বউ আছে, মেয়ে-জামাই আছে, নাতি হয়েছে, যমুনাটা আছে, তার মেয়েটা আছে—অন্তত মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের অভাব হবে না ওদের কোনোদিন। দেবুবাবুর বাকী কথাগুলো আর খগেনবাবুর কানে ঢোকে না।

কিন্তু দেবুবাবু হাল ছাড়লেন না।

তাঁর যাতায়াত বেড়েই যেতে লাগলো। এবার আর শুধু হাতে নয়। কখনো ল্যাংড়া আম নিয়ে আসছেন, কখনো লিচু নিয়ে, কিছু না হোক এক ভাঁড় রসগোল্লা হাতে করে হাজির হচ্ছেন। এ এক নতুন উৎপাত—খগেনবাবু খুবই সঙ্কুচিত বোধ করছেন। এবং ততোধিক বিরক্ত। এসবে খুশি কেবল যমুনা। কিন্তু যমুনাকেও কিছু বুঝিয়ে বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, আর দেবুবাবুকে বারণ করার ক্ষমতাও খগেনবাবুকে দেননি ভগবান।

বড়োলোকের বড়লোকী চালের সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে চলবার ইচ্ছে নেই খগেনবাবুর, ক্ষমতা থাক, না থাক। একদিন বিকেলে দেবুবাবু এলেন, সঙ্গে বড় জামাইটিকে নিয়ে। একদম শরীরটা ভাল ছিল না খগেনবাবুর সেদিন। গায়ে বেশ জ্বর। যমুনা জোর করে শুইয়ে রেখেছে। কিন্তু বেচারী যমুনার সাধ্যি কি জামাই-শ্বশুরকে আটকাবে? সে তক্ষুণি বেরুচ্ছিল বার্লি কিনতে। দরজার খিলটি লাগিয়ে, তাঁরা সোজা শোবার ঘরে ঢুকে এলেন, জুতো পায়ে মসমসিয়ে। দোকানে যাবার মুখে, অত্যন্ত বিরক্ত হলেও, যমুনা কিছুই বলতে পারলে না। গিন্নিমা থাকলে এটা সম্ভব হতো না। কথা তিনি কম বলতেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছেটা ফেলতে পারত না কেউই। তাঁর মৃত্যুর দিনে ছাড়া, এই শোবার ঘরে ডাক্তার ভিন্ন পাড়ার পুরুষমানুষদের কাউকে কখনো ঢুকতে দেখা যায়নি। লোকজন সবাই বসতো হয় ওই বাইরের দালানে, নয় মাঝের ঘরে। ওইটেই বাইরের ঘর। শোবার ঘর গিন্নির এলাকা। সেখানে বাইরের পুরুষমানুষদের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু, আজ শ্বশুর-জামাই শোবার ঘরে ঢুকে এলেন, খগেনবাবুকে দেখতে।

দেবুবাবু বললেন—"খগেনবাবু, আপনার শরীরটা যদিও আজ ভাল নেই, কিন্তু আপনাকে একটা সুখবর দিতে না এসেই পারলাম না। সৌরভ বলছে আপনার এই গলির মধ্যেকার বাড়ি-জমিরই বাজারদর এখন নাকি আট লাখ থেকে দশ লাখ পর্যন্ত উঠতে পারে। সৌরভ তার চেয়েও বেশি দিতে রাজী। আপনি ছেলেমেয়ের জন্য দুটো চোদ্দশো স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাট রেখে দিতে পারবেন, তা ছাড়াও দশলাখ ক্যাশ হাতে পাবেন। চার/ছয়ভাগ। চার আপনি ডিক্লেয়ার করবেন, ক্যাপিটাল গেন, আর ছয় ব্ল্যাকে। এমন অফার সত্যিই আর পাবেন না। সৌরভ তার লোকজন নিয়েই এসেছে, আপনি একটু মত দিলেই ওরা জমিটা মেপে দেখে, ঠিকঠাক দরদাম বলে দিতে পারবে। ওরা বাইরের বাগান, দালান আর বাইরের ঘরটা মাপছে। এবারে আপনাদের শোবার ঘর তিনটে, রান্নাঘর, বাথরুম, ভেতরের দালান এসবগুলো মাপবে। আর ছাদের ওপরে কী কী আছে বলুন তো? ঠাকুরঘর, ছেলেমেয়েদের পড়ার ঘর, আর ঐ চিলেকুঠুরী? এই তো? সেখানেও যাবে। যমুনা আসুক। নিয়েও যাবেখন সঙ্গে করে। তাড়া নেই কিছু।

"আপনি যদি তাড়াতাড়ি রাজী হয়ে যান, সামনের বছর এমনি সময়ে আপনার ছেলেমেয়ের ঝকঝকে নতুন ফ্ল্যাটে গৃহপ্রবেশ হয়ে যাবে। আর ভেবে দেখুন, এসব ছাড়াও দশলাখ টাকা ব্যাঙ্কে রেখে আপনি গাড়ি-ড্রাইভার রেখে, এয়ারকণ্ডিশনার চালিয়ে আরাম করে জীবনের শেষ কটা দিন নিশ্চিন্তে, রাজার হালে কাটিয়ে যেতে পারবেন—এ হলো সাধালক্ষ্মী"—

খগেনবাবুর হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরুলো—

—"দাঁড়ান—গিন্নিকে আগে জিজ্ঞেস করে নিই। বসতবাড়ি বলে কথা। ভিটেমাটি বিক্রি করে দেবার আগে তো একটু কর্তাগিন্নিতে পরামর্শ করা দরকার।"

হাহা হেসে উঠে দেবুবাবু বললেন—

—"কী যে বলেন খগেনবাবু। আজ মিসেস চক্রবর্তী থাকলে কি আর আপনাকে বিরক্ত করতুম? এতখানি জায়গা নিয়ে এরকম ফেলাছড়া হচ্ছে, একখানা ঘরে একা একা পড়ে আছেন—সেইজন্যেই তো—"

—"কে বললে, একা একা পড়ে আছি?" খগেনবাবু শুনতে পেলেন তিনি স্পষ্ট বলছেন—

—"মোটেই একা একা পড়ে নেই। আমার গিন্নি না পেরেছেন তাঁর ঠাকুরঘরের মায়া কাটাতে, না তাঁর বুড়ো কত্তাটির। এই তো একটু পরেই তিনি নামবেন, ছাদে সন্ধে দিয়ে। রোজই তো এই সময়ে উনি নিজে এসে সন্ধে দিয়ে যান—কেন, আপনারা শুনতে পান না? আমার গিন্নির টিপিক্যাল শাঁখের আওয়াজ? শুধুকি তাই? আবার নিজের হাতে প্রসাদটুকুও দেওয়া চাই! কথায় বলে না, 'স্বভাব যায় না মলে?'" এই তো সূয্যি পাটে নেমেছে, গিন্নি এক্ষুনি সন্ধে দিয়ে দেবেন, দু'খানা বাতাসা অন্তত মুখে দিয়ে যান, এতবড় সুখবরটা আনলেন", —বলতে না বলতেই ঠাকুরঘরে শাঁক বেজে উঠল। একবার দু'বার তিনবার, সাড়ে তিনবার। দেবুবাবুর সঙ্গে সঙ্গে খগেনবাবু নিজেও চমকে উঠলেন। সৌরভ জামাই বললে—"যমুনা ফিরলো কখন? ওকে দরজা খুলে দিলে কে?"

—"যমুনা তো ফেরেনি?" খগেনবাবু শুনতে পেলেন, তিনিই উত্তর দিচ্ছেন—

—"যমুনা বার্লি কিনে একটু বাজার করে ফিরবে। দু'কাপ চা তো? সে আমার গিন্নিই করে দেবেন'খন।"

এইসময়ে খগেনবাবুর সেই অতিপরিচিত শব্দ, আঁচলের চাবির গোছার আর হাতের চুড়ি-নোয়ার ঝিনঝিন স্পষ্ট শোনা গেল। দেবুবাবুর ঘাড়ের ঠিক পিছনে। চমকে উঠে পেছন ফিরতেই দেবুবাবু দেখলেন দেয়ালের গা থেকে ভেসে বেরিয়ে এলেন স্বচ্ছ কাচের মতন খগেনবাবুর গিন্নি। গা ধুয়ে চুলটি বেঁধেছেন, পরনে পাটভাঙা লালপেড়ে তাঁতের শাড়ি, কপালে বড় করে সিঁদুরটিপটি পরেছেন, খগেনবাবুর শরীর ভেদ করে ভাসতে ভাসতে তিনি সৌরভের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, হাতে ঝকঝকে রেকাবীতে প্রসাদী বাতাসা, সপ্রতিভ হাসিখুশি মুখ। ঘরটা যুঁইফুলের সুগন্ধে ভরে উঠল।

দেবুবাবু আর সৌরভ যখন পাগলের মতন সদর দরজাটা খুলতে চেষ্টা করছেন কিন্তু খিলটা খুঁজে পাচ্ছেন না, ঠিক তক্ষুনি জোরে কড়া নাড়লো কেউ, আর খিলটাও দেখতে পাওয়া গেলন। কোনোরকমে ঠাশ করে দোরটা খুলেই শ্বশুর-জামাই হুড়মুড় করে দৌড়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেলেন। বার্লি মুসুদ্বি নিয়ে ঘরে ঢুকে, যমুনা হাঁ করে ওঁদের যাবার পথের দিকে তাকিয়ে রইলো।

খগেনবাবুর ছেলে আর জামাই এখন প্রোমোটারের ব্যবসায় নেমেছে। প্রথম এক্সপেরিমেন্টটা করছে খগেনবাবুর পেছনের ফলবাগানের জমিটাতে। একুশটা ফ্ল্যাট হবে। বাড়ি ওঠার আগেই দশ থেকে চোদ্দলাখে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে ফ্ল্যাটগুলো। না, খগেনবাবু কোনো আপত্তি করেননি। 'প্রসাদী অ্যাপার্টমেন্টস'-এর সদর গেট

amarboi.com

ওপাশে বড় রাস্তাতে হচ্ছে। খগেনবাবুর দেড়তলা বাড়িতে হাত পড়েনি। তিনি এখনও তেমনি গলির দিকে দাওয়ায় বসে দাঁতন করেন। সামনের ছোট্ট বাগান থেকে আসা যুঁইফুলের গন্ধে শোবার ঘর ভেসে যায়। যমুনা ছাদে উঠে তুলসীতলায় সন্ধে দেয়। ও হাঁ, জবার বিয়েটাও যমুনা ঠিক করে ফেলেছে, ওই ঠিকেদারদের মধ্যেই একজন অল্পবয়সী ছেলের সঙ্গে।

শারদীয় সংবাদ প্রতিদিন, ১৪০২

পত্রোত্তর

সোমদেব চক্রবর্তী লিখছিলেন। উঠে গিয়ে ফোন ধরলেন। কবিতাটি অসমাপ্ত রইলো, এবং মনটা বিক্ষিপ্ত।

"কবি সোমদেব চক্রবর্তী আছেন?"

"কথা বলছি।"

"আমি চন্দ্রশেখর সান্যাল। চিনতে পেরেছেন তো?"

সোমদেব একমুহূর্ত চুপ করে রইলেন। ভাবতে চেষ্টা করলেন নামটা কোথায় শুনেছেন। চন্দ্রশেখর ...চন্দ্রশেখর...মনে করতে পারলেন না।

"চন্দ্রশেখর সান্যাল বলছি। চিনতে পারলেন না।"

সোমদেব লজ্জা পেয়ে গেলেন। তিনি স্বভাবে বিনয়ী, চেনা মানুষকে চিনতে না পারার লজ্জা তাঁকে বিদ্ধ করে।

"মানে... ঠিক...কোথায় আলাপ হয়েছিল, সেটা একটু যদি দয়া করে মনে করিয়ে দেন, এই মুহূর্তে ঠিক মনে পড়ছে না।"

"আলাপ হয়নি কোনোদিন। মানে আপনি কখনো আমাকে দেখেননি। আমি অবিশ্যি আপনাকে অনেকবার দেখেছি। কবি-সম্মেলনে, টিভিতে।"

"তাহলে..মানে, নামটা আমি ঠিক...আমার নিশ্চয়ই চিনতে পারা উচিত ছিল, কিন্তু—"

"তা ছিল। কেননা গত পয়লা জুন তারিখে আমি আপনাকে একটা চিঠি লিখেছি। আজ পনেরই।"

চিঠি। মানে, লেখার জন্যে কি? সোমদেবের মুখটা মলিন হয়ে যায়। আবার লিটল ম্যাগাজিন। সামনে বিরাট পুজোর লেখা পড়ে আছে। এরই মধ্যে কত যে লিটল ম্যাগাজিনের হুকুম তামিল করতে হয়। কবির একটা দুর্বলতা আছে ছোট পত্রিকার প্রতি। পারতপক্ষ 'না' বলতে প্রাণ চায় না। নিজের কৈশোর তিনি বিস্মৃত হননি এখনো। কিন্তু চন্দ্রশেখর সান্যাল বলে কোনো সম্পাদকের চিঠি মনে পড়লো

BanglaBook.org

না। কাগজটার নাম বললে হয়তো মনে পড়বে। জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছেন—"কাগজটার নামটা কী বলুন তো", এমন সময়ে চন্দ্রশেখর বলে উঠলেন : "হ্যাঁ হ্যাঁ, লেখার জন্যেই তো। আপনার সেই কেদারবদ্রী ভ্রমণের অপূর্ব কাহিনীটি পড়ে এত ভালো লেগেছে—কবির চোখ দিয়ে ছাড়া এমনভাবে হিমালয়কে দেখা যায় না। কী সুমহান, কী সৌন্দর্যময়, আমিও তো গেছি কেদারবদ্রী, কিন্তু আপনার লেখাটি পড়বার পর আমার যাওয়াটা যেন আরো অর্থপূর্ণ হয়ে উঠল। এইসব কথাই আপনাকে লিখেছি অবিশ্যি। সে চিঠি আপনি নিশ্চয় পেয়েছেন?"

সোমনাথের কেদারবদ্রী নিয়ে অনেক চিঠিই আসছে পত্রিকা অফিসে, অথচ চন্দ্রশেখরের চিঠি পেয়েছেন বলে মনে করতে পারলেন না। কিন্তু মুখোমুখি এত প্রশংসায় অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে গেলেন এবং আনন্দিতও হলেন সন্দেহ নেই। ফলে বলেও ফেললেন, "ও! হ্যাঁ-হ্যাঁ, অনেক ধন্যবাদ।"

"আপনার মতো এমন সুন্দর, সহৃদয়, অথচ সুমহান সাহিত্যরস-সমৃদ্ধ—"

"থ্যাংকিউ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, প্লীজ আর বলবেন না—আপনার যে ভাল লেগেছে এজন্যে আমিই কৃতার্থ বোধ করছি—"

"কিন্তু আমাকে তো কৃতার্থ করলেন না?"

"তার মানে?" সোমদেবের গলায় চমকে-যাওয়া।

"চিঠির উত্তর তো দিলেন না।"

"চিঠির উত্তর?" সোমদেব কথা খুঁজে পান না। এখন আর "চিঠি পাইনি" কথাটাও বলতে পারা যাচ্ছে না। "ও-হ্যাঁ-হ্যাঁ থ্যাংকিউ" বলা হয়ে গেছে। সোমদেব মহা মুশকিলে পড়লেন।

"চিঠির উত্তর?" বলে কথা খুঁজতে লাগলেন তিনি। এ সময়ে মা সরস্বতী যেন মুখ ফিরিয়ে, কানে তুলো গুঁজে বসে থাকেন। শত প্রার্থনায় সাড়া দেন না। মুখে বাক্যি যোগাচ্ছেন না সোমদেবের। চন্দ্রশেখর সান্যালই উদ্ধার করলেন।

"শুনেছিলুম আপনি চিঠির উত্তর দেন। তাইজন্যেই লেখা।"

"ওঃ। তা—ই—জ—ন্যেই লিখে—ছিলেন।" কণ্ঠের হতাশা লুকোতে পারলেন না কবি সোমদেব। চন্দ্রশেখরের কানেও সেটুকু ধরা পড়লো।

"না, না, শুধু সেইজন্যে নয়। ভালো লাগার জন্যেই। কিন্তু ভালো তো কত লেখাই লাগে। সকলকে কি চিঠি দেই?"

"তা বটে।" সোমদেব আবার কিছুটা ফুল্ল হন।

"আগে আগে অবিশ্যি দিতুম। আগে আগে সব্বাইকেই চিঠি দিতুম, সব্বাই চিঠির জবাব দিতেন। আমার কাছে এই তাড়া-তাড়া সাহিত্যিকদের চিঠি আছে। তবে কি জানেন, তাঁরা ছিলেন সব প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। আর আজকালকার লিখিয়েরা, মানে কী আর বলব, আপনি তো নিজেই বোঝেন। যা মাল সব।"

সোমদেবের কান গরম হয়ে উঠল। তাঁর বয়স চল্লিশের কোঠায়। আজকালকারই বলা যেতে পারে পরের জেনারেশনটা তো এখনও স্থিতি পায়নি। অতএব ওঁদের

কথাই বলা হচ্ছে।—"যা মাল", মানে সোমদেব ও তাঁর সতীর্থরা।

সোমদেব ভেবে পেলেন না কী বলবেন। কিন্তু চন্দ্রশেখরের আরো বক্তব্য ছিল।

"কেউ জবাব দেয় না, বুঝলেন, কে-উ না। এই গোটা জেনারেশনটাই পোকাধরা। গাছে না উঠতেই এককাঁদি অহংকারে টৈ-টুম্বুর।"

"না, মানে", সোমদেব নিজের জেনারেশনের পক্ষ সমর্থন করে কিছু জোরালো বক্তব্য রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন—"মানে, সবাই তো বড় ব্যস্ত থাকেন, আজকালকার জীবন আর আগেকার জীবন।...এখন সবারই কাজের চাপ বড্ড বেড়ে গেছে"—

চন্দ্রশেখর যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন কথাগুলোর ওপরে—"সবারই কাজ বড্ড বেড়ে গেছে, আর আমারই কেবল কাজ কমে গেছে, না? সবার মুখেই এককথা। বড় ব্যস্ত, বড় ব্যস্ত, বড্ড কাজের চাপ—আপনিও তাই বললেন শুনেছিলুম। আপনি নিরহংকারী মানুষ"—

"না, না, না," নিরহংকার মনুষ্যত্ব প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর হয়ে সোমদেব ভয়ানক বাধা দিয়ে ওঠেন—"আমি তো ব্যস্ত থাকি বলিনি? বলেছিলুম সবাই বড় ব্যস্ত থাকেন, তাই হয়তো সময়মতো চিঠির উত্তর দিয়ে উঠতে পারেন না।"

"সবাই এত ব্যস্ত যে চিঠির উত্তর দিতে পারে না? আর আমিই কেবল অনন্ত সময় হাতে করে বসে রয়েছি? কেন, রিটায়ার করেছি বলে? সকলেই মনে করে হাতে অন্তহীন সময়—আমার সময়ের কোনো মূল্য নেই—যেহেতু আমি রিটায়ার করেছি—তাই সময় কাটছে না বলে বসে বসে চিঠি লিখছি। আপনাদেরই একজন তো আমাকে বলেই দিলেন একথা সেদিন। আপনারা যা জানেন না তা হলো আমি যখন জুট করপোরেশনে ছিলুম, তখনও সাহিত্যিকদের চিঠি লেখবার মতো সময় আমার যথেষ্টই হতো।"

কবি সোমদেবের মনের মধ্যে দ্রুত অনেক রংয়ের ক্যালাইডোস্কোপিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়ে চলছিল।

একসময়ে তিনি বলে উঠলেন—"রিটায়ার করলে হাতে সময় বাড়ে একথা আপনাকে কে বললে? রিটায়ার করলে মানুষের বরং বিশ্রাম কমে যায়, আমার বাবার বেলায় দেখেছি, রুটিন লাইফে তবু রুটিন মাফিক বিশ্রাম থাকে—"

"তবে? বলুন তো একবার কথাটা আপনার বন্ধুদের। আমি তো দেখছি রিটায়ার করে বাড়ির চাকর হয়ে গেছি। 'ও-ব্যাটার কোনো কাজ নেই—ওকে দিয়ে করাও। ও-ব্যাটা কেন বসে আছে? ওই বরং ওটা করে আসুক।' গিন্নি, ছেলেমেয়ে, মায় নাতি-নাতনীগুলোর পর্যন্ত এই অ্যাটিচ্যুড। যেন আমি বাড়ির বেকার প্যারাসাইট একটা।"

একটু চুপ করে থেকে, সোমদেব বললেন—"চন্দ্রশেখরবাবু, আপনার চিঠিটা খুবই সুন্দর। আমি অনেকবার পড়েছি। কী আর বলবো, আপনাদের মতো পাঠক আছেন বলেই আমাদের লেখা সার্থক।"

চন্দ্রশেখর সান্যালের কণ্ঠস্বর মুহূর্তেই পালটে গেল।

BanglaBook.org

"ভালো লেগেছে আপনার? থ্যাংকিউ। থ্যাংকিউ। ভালো লিখে আপনারা আমাদের এত আমোদ দেন, পরিবর্তে আমরা পাঠকরা তো আপনাদের কিছুই দিতে পারি না। সামান্য একটা চিঠি দিয়ে যদি আপনাদের আনন্দবর্ধন করতে পারি—।" "কী যে বলেন!" চন্দ্রশেখরের উচ্ছ্বাসে স্বভাব-বিনীত সোমদেব সত্যি লজ্জা পান।

"কিন্তু কি জানেন, তিরিশ পয়সা খরচ করে যদি একটা দুপাতা চিঠি লিখি, এটুকুতো আশা করতে পারি যে পনেরো পয়সা খরচ করে আপনারা তার একটা দু'লাইন উত্তরও দেবেন? কী বলব মশাই—কে-উ দেয় না। কেউ না।"

সোমদেব একটু ইতস্তত করে বলেন—"একটা কথা বলব চন্দ্রশেখরবাবু? বলতে খুবই লজ্জা করছে, কিন্তু বলে ফেলাই ভালো। মানে, আপনার চিঠিটা আমি—"

"এবার বলবেন 'পাইনি', এই তো?"

"না, না, তা কি করে বলব? এই তো বললাম খুব সুন্দর চিঠি"—

"তবুও বলতে পারেন, আপনাদের সাহিত্যিকদের ব্যাপার তো বোঝা যায় না। সত্যি-মিথ্যে মিশিয়েই আপনাদের কারবার। বলে ফেলুন, কি বলতে চান—আমি বাধা দিয়ে ফেললুম।"

"বলছিলুম যে"—সোমদেবের জিব আটকে যায়।

পুনরায় মনে মনে শক্তি সংগ্রহ করে নিয়ে লাজুক সোমদেব কথা আরম্ভ করেন—"বলছিলুম যে, আমি তো বড্ড অগোছালো মানুষ। আমার জিনিসপত্র সব কী কোথায় যায়, কিচ্ছু খুঁজে পাই না—আপনার চিঠিটা আমি কোনখানে যে রেখেছি... মিসপ্লেসড হয়ে গিয়েছে, আর কি।"

"অঃ। খুঁজে পাচ্ছেন না, মানে হারিয়ে ফেলেছেন, কবি-মানুষদের তো অমন ভুলভ্রান্তি হতেই পারে। তার জন্যে আপনাদের পোয়েটিক লাইসেন্স দেওয়া আছে। হা হা।"

তারপরেই হাসি থামিয়ে সন্দিগ্ধ সুরে প্রশ্ন করেন চন্দ্রশেখর সান্যাল—"নাকি ছিঁড়ে কুটকুটি করে ময়লা কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিয়েছেন, বাজে লোকের বাজে চিঠি বলে। আমার সইটার তো কোনো দাম নেই—এ তো আপনার সই না, যে লোকে তুলে রাখবে—একজন রিটায়ার্ড কেরানি—"

ভয়ানক লজ্জা পেয়ে সোমদেব বলেন, "আরে না মশাই, না। আপনি সাহিত্যিকদের যতটা মন্দ মনে করছেন, ততটা মন্দ তাঁরা নন। অমন সুন্দর চিঠি, ও কি কেউ ছিঁড়ে ফেলে। আমি ওটা তুলে রাখবো বলেই কোথায় যে যত্ন করে রাখলুম। ভেবেছিলুম, বইটার নেক্সট বিজ্ঞাপনে ওটা থেকে কয়েকটা লাইন ব্যবহার করব, আপনার আপত্তি নেই তো।"

এবার ওদিক নিস্তব্ধ। তারপর চন্দ্রশেখরের ধরা ধরা গলা শোনা যায়, "আপনার বিজ্ঞাপনে আমার লাইন? কী বলছেন আপনি? আমি তাতে কখনো আপত্তি করতে পারি। আমার এত সৌভাগ্য হবে এ ভাবা যায়? আমি. আমি—মানে—"

BanglaBook.org

সোমদেব বললেন—"আপনার চিঠিটা হঠাৎ হারিয়ে ফেলেই তো গোলমালটা হয়েছে। ঠিকানাটাও পাচ্ছি না যে উত্তর দেব। আচ্ছা, আপনার ঠিকানাটা একবার বলবেন? আমি লিখে নিই। নাকি টেলিফোন ডিরেকটরিতে পাবো? চন্দ্রশেখর সান্যাল তো?"

"না মশাই না। আমার কি টেলিফোন আছে? এ ফোন আমি করছি আমার ভগ্নিপোতের বাড়ি থেকে। ঠিকানাটা বলছি বরং লিখেই নিন। চব্বিশের দুই চন্দ্রমাধব সান্যাল লেন। আমার ঠাকুরদাদার নামেই গলি। লিখে নিয়েছেন? কলকাতা বাষট্টি।"

ডিক্টেশন লেখনরত ছত্রের মতো সোমদেব তখন তাড়াহুড়ো করে লিখে নিচ্ছেন—তাঁর অসমাপ্ত কবিতাটির তলায়—"চন্দ্রশেখর সান্যাল, চব্বিশের দুই চন্দ্রমাধব সান্যাল লেন—কলকাতা বাষট্টি।"

"লেখা হলো মশাই?" চন্দ্রশেখর তাড়া দেন।

"হ্যাঁ, হয়েছে।"

"জবাব পাবো তো?"

"নিশ্চয়ই। আজই জবাব দেবো আপনার চিঠির।"

"বেশ, বেশ। ওই একখানা পোস্টকার্ড হলেই হবে। ওই সইটুকুর জন্যে আর কি। মানে আপনার কাছে ওই দু' লাইন লেখা কিছুই নয়। কিন্তু আমার কাছে ওটার মূল্য—"

"চন্দ্রশেখরবাবু, প্লীজ আপনি ওভাবে বলবেন না। জবাব না দেওয়া আমার খুব অন্যায় হয়ে গিয়েছে। ঠিকানাটা না হারালে আমি নিশ্চয়ই—"

"আরে তা জানি, তা জানি। বললুম না, আমি শুনেছি আপনি চিঠির জবাব দেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আপনার কলম দিনকে-দিন জোরালো হয়ে উঠুক, আমাদের আরো আনন্দ দিক—আচ্ছা, আজ তবে আসি? কিছু মনে করবেন না যেন, অনেকক্ষণ সময় নিয়ে নিলুম আপনার—আমরা রিটায়ার্ড লোক, আমাদের তো অঢেল সময় কিনা—ঠিক খেয়াল থাকে না, আর বয়সও তো হলো মন্দ নয়। আচ্ছা, নমস্কার ভাই, নমস্কার। বড় আনন্দ পেলুম।"

"নমস্কার, চন্দ্রশেখরবাবু।"

টেলিফোন নামিয়ে রেখে সোমদেব লেটারপ্যাডটা টেনে নেন। না-পাওয়া চিঠির জবাব লেখা শুরু হয়ে যায়—"মাননীয় চন্দ্রশেখরবাবু, আপনার অতি সুন্দর চিঠিটা পেয়ে একই সঙ্গে কৃতার্থ ও লজ্জিত বোধ করছি...।"

শারদীয় যুগান্তর, ১৩৮৬

BanglaBook.org

বামুন-মুচি-রাজা

প্রিয় তমসা,

শোনো, তুমি আমার ওপরে রাগ কোরো না। জানি এই বাক্যটি বলা বৃথা। জানি তুমি রাগ করেছ এবং এখন থেকে যা যা ঘটবে তাও জানি। তুমি বলবে, "অভিষেক, তুমি প্রথম থেকেই আমাকে নিয়ে খেলছিলে।" জয়াকেও একদিন এই একই বাক্যটি লিখেছি তমসা, আর হাশমৎকেও। হাশমৎ আরা বেগম—কী সুন্দর নাম। হাসি হাসি, ওড়না পরা, মণি-মুক্তো-ঝলসানো নাম। কিন্তু হাশমৎ তোমার চেয়েও রাগী। জয়া রাগী মেয়ে নয়, হাশমতের মতো দুঃসাহসীও নয় সে। ধর্মভীরু ক্যাথলিক মেয়ে হয়েও আমাকে বিয়ে করেছিল, এটাই তার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু বিশ্বাস করো তমসা—জয়া, হাশমৎ আর তমসা, আমার কাছে তিনজনেই অমোঘ, তিনজনেই প্রচণ্ড জরুরী। আমি তোমাদের কাছ থেকে প্রাণরস সঞ্চয় করে বেঁচে থেকেছি। কিন্তু আমি ঠগ নই। প্রতারণা, প্রবঞ্চনা—এসব আমার উদ্দেশ্য ছিল না, প্রতারণা আমার স্বভাবেও যে নেই, সেটা তুমি জানো। তোমাদের তিনজনের সঙ্গে তিনটে জীবন কাটানো যুবক অভিষেক কিন্তু একজনই। সে নিরীশ্বর, কিন্তু পাপপুণ্যে অবিশ্বাসী নয়। শুধু মানুষকে ব্যবহার করতেই দ্যাখো তাকে তোমরা, কিন্তু নিজেকে ব্যবহৃত হতে দিতেও যে তার সমান আগ্রহ, সেটা দেখতে পাও না? মানুষকে মনোবেদনা দেওয়ায়, আর দৈহিক অত্যাচার করায় যে একই পাপ—তা সে বোঝে। তবুও, অনিচ্ছাসত্ত্বেও যে চারজন মানুষ সে সবচেয়ে ভালবাসে, যাদের কাছে এই মাতৃহীন পিতৃহীন জীবনে সে সবচেয়ে নিবিড় আশ্রয় পেয়েছে, ভাগ্যদোষে তারা চারজনেই নারী এবং অভিষেক তাদের সঙ্গে, তাদের প্রত্যেকেরই সঙ্গে, প্রেমে পড়ে গেছে। এই প্রেম রাহুর প্রেম, এ থেকে অভিষেকের মুক্তি না পেলে চলবে না। এ প্রেম তোমাদের তিনজনের পক্ষেই অশুভ, তমসা। তোমাদের প্রত্যেকের জীবনেই 'অভিষেক' একটা ট্রাজিক বিন্দুর মতো—আমার ওপর রাগ কোরো না তমসা, আমি আজ যা করেছি তা নিষ্ঠুরতা নয়, তঞ্চকতা নয়। এটাই সততা।

'অভিষেক' মানুষটা প্রকৃতপক্ষে যে কী বা কে, সেই খবরটা তাকে আগে জানতে হবে। জীবনে প্রথম কাজ আমার এখন এইটিই। আমাকে জানতেই হবে আমি কে।

একটা গল্প পড়েছিলুম, তমসা। গল্পটা যে কোথায় পড়েছিলুম আজ মনে নেই, কিন্তু হঠাৎ সেটা আমার মনে পড়েছে, আর মনে পড়া অবধি ভীষণ জ্বালাচ্ছে। ছেলেবেলায় যখন পড়েছিলুম, তখন কিছুই মনে হয়নি। অথচ এখন? আমাকে গল্পটা যেন পাগল করে দিচ্ছে। একটা আয়না এনে ধরে দিচ্ছে আমার সামনে। আর বলছে—"এই যে 'অভিষেক', এই যে তুমি। এই দ্যাখো তোমার জীবন।" আমি জানি না তমসা—আমার জীবনটা আসলে কার জীবন। কার জীবন যে কখন আমি যাপন করি। শোনো তোমাকে গল্পটা বলি। শুনলেই তুমি বুঝতে পারবে আমি

কী বলছি। আর হয়তো বুঝতে পারবে আমি কেন এমন করেছি। কেন আমার এমনভাবে সব গোল পাকিয়ে যায়। পারলে আমায় মার্জনা কোরো, তমসা। আমি অপরাধ করেছি, খুবই কষ্ট দিয়েছি তোমাকে, তোমাদের তিনজনকেই। কিন্তু সত্যিই এটা আমার ইচ্ছাকৃত নয়। আমার ইচ্ছের ওপরে আরও কারুর একই ইচ্ছে কাজ করে, যার ওপরে আমার কোনো হাত নেই। সে-ই আমাদের চারজনের নাকি পাঁচজন? না ছ'জন?—এই অতি আশ্চর্য হৃদয়পথের ট্রাফিক জ্যামটি প্রস্তুত করে ফেলেছে। বিশ্বাস করো, দায়ী আমি নই। আমি নিজেই কষ্ট পাচ্ছি সবচেয়ে বেশি।

গল্পটা এইরকম ছিল, যতদূর মনে পড়ছে,—"এক দেশে এক বামুন ছিল। বামুনের জীবনে সখ সাধ কিছুই পূর্ণ হয়নি, এমন সময় সন্ধ্যা-আহ্নিকের মধ্যে নদীর ঘাটে আছাড় খেয়ে হঠাৎ তার মৃত্যু হলো। সেই সময়েই অন্য এক গ্রামে এক মুচির বৌয়ের মরা ছেলে জন্মেছিল। বামুনের আত্মা করলে কি তার শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়ে, মুচির ঘরে বড় হতে লাগলো। বামুন বড় হয়ে জুতো সেলাই করে, বিয়েও করল এক মুচির মেয়েকে। ছেলেপুলে নিয়ে সুখে ঘর সংসার করতে লাগলো বামুন-মুচি।

একদিন সে নদীর ঘাটে গিয়ে জুতো সেলাই করতে বসেছে। আর হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল সেই অন্য গ্রামের নদীতীরে আছাড় খেয়ে পড়ে যাবার কথাটা। জলে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা আহ্নিক করতে করতে মরে যাবার কথাটা। সে যে আসলে বামুন ছিল, বুঝতে পেরে, সে আর ঘরে না ফিরে বনেই চলে গেল বাণপ্রস্থে।

কিন্তু বলে গেলে হবে কি, কপাল যায় সঙ্গে। বামুন তো বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে অনেক দূরে অন্য এক রাজ্যে চলে এসেছে। সেই নতুন দেশের রাজামশাইয়ের সদ্য সদ্য মৃত্যু হয়েছিল, অথচ তিনি নিঃসন্তান। নতুন রাজা চাই, রাজ্য শাসন করবে কে? তাই রাজার হাতি বেরিয়েছে নতুন রাজা খুঁজে আনতে। বনের মধ্যে বামুন-মুচিকে দেখেই সেই হাতি করলে কি হাঁটু মুড়ে তার ঠিক সামনেটিতে বসে, প্রণাম ঠুকে দিলে। আর তারপরেই শুঁড়ে জড়িয়ে তাকেই পিঠে তুলে, রাজসিংহাসনের তুলা জাওদায় যত্ন করে বসিয়ে দিলে।

অতএব বামুন-মুচি এখন রাজা হয়ে গেল। রাজ্যশাসন, প্রজাপালন—সে ভালোই করতে লাগল। বামুন-মুচি-রাজার খুব প্রশংসা হলো। দেশের রানী বিধবা, অল্পবয়সী। এবারে রাজ্য আর রাজসিংহাসনের সঙ্গে তার রানীটিও ফাউ হিসেবে জুটে গেল। কপালগুণে বামন-মুচি-রাজা হয়ে রানীকে নিয়ে সুখে রাজত্ব করতে লাগলো।

কিন্তু তার মুচি-বউ এদিকে তাকে খুঁজতে পথে বেরিয়েছে। কী করবে? ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে সে বেচারীর অবস্থা কাহিল। খুঁজতে খুঁজতে মুচি-বউ বামুন-মুচির রাজ্যে এসে শুনলো এখানে একজন অচেনা মানুষকে হাতি তুলে এনে রাজা করেছে। মুচি-বউ ছেলেমেয়েদের হাত ধরে রাজসভায় হাজির। সিংহাসনে রাজাকে দেখেই মুচির বাচ্চারা আনন্দে "বাবা, বাবা," বলে চেঁচিয়ে উঠেছে। আর মুচি-বউও ঘোমটা টেনে, পেন্নামটি ঠুকেই তীক্ষ্ণ গলায় এক মোক্ষম মুখঝামটা লাগিয়েছে।

কাণ্ড দেখে শুনে তো রাজসভায় সবাই অবাক। আরে, এটা তাহলে একটা মুচি—ছিঃ ছিঃ! মুচিটা কিনা মহারানীকে বিয়ে করে পবিত্র রাজসিংহাসনটাকে অশুচি করেছে? এমন কী আমাদের রাজপুত্তুরের বাবাও হয়েছে? রাজত্ব যে মুচি খুব ভালই চালাচ্ছে, রাজপুত্রও যে খুব সুন্দর হয়েছে, শত্রুদের যে কড়া শাসনে রেখেছে আর গরীবদের অসহ্য দারিদ্র্যও বামুন-মুচি-রাজা অনেকখানি দূর করেছে—সেসব কথা আর কারুরই মনে রইল না। গাঁয়ের সব্বাই মিলে—"মার ব্যাটাকে মার ব্যাটা ঠগ-জোচ্চারকে"—বলে পিটিয়ে-পিটিয়ে তাকে মেরে নদীর ঘাটে ফেলে দিয়ে এল।

এখন হয়েছে কি, ঠিক সেই ঘাটের ধারেই তার বামুন-শরীরটা তখনও পড়ে আছে। বামুন-মুচি-রাজা তার নিজের দেহ চিনে নিয়ে, পুনরায় ব্রাহ্মণ শরীরে প্রবেশ করে, তার বামনীর কাছে ফিরে গেল। বামনী বললে—"কী গো, আজকে আহ্নিক না সেরেই ফিরে এলে বুঝি? এত তাড়াতাড়ি যে?" বামুন তো তাজ্জব বনে গেল। তার মাথা ঘুরে গেল।—"এ কীরে বাবা? ছিলুম বামুন, মরে হলুম মুচি। মুচি হয়ে সংসার পাতলুম। তারপর কপালে জুটে গেল রাজরানী, আর রাজ্যপাট। সেখানেও রাজপুত্রের বাবা হয়েছি। তারপর আবার মরে, বামুন হয়েছি। তিন জন্ম কাটল। অথচ বামনী বলছে আমি নাকি আহ্নিক না সেরেই খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছি? বামনীকে দেখেশুনেও মনে হচ্ছে না ইতিমধ্যে এতগুলো বছর কেটে গেছে। আমার ছেলেটাও তেমনিই পাঁচ বছরেরই আছে। তবে কি স্বপ্ন না মায়া?"

আমার হয়েছে ওই ব্রাহ্মণের অবস্থা, তমসা। তোমাকে বোঝাতে পারব না। তোমার সঙ্গে আলাপ হবার অনেক আগে থেকে আমার হাশমৎ-এর সঙ্গে প্রেম। আর হাশমৎ-এরও আগে থেকে আমার স্ত্রী ছিল জয়া। জয়া ডেভিড। আমার কলেজ জীবনের মানসিক চাপ, আর্থিক বিপন্নতা, বিভিন্ন জীবনের নানান ঝামেলা, সব কিছু থেকে জয়াই আমাকে আগলে রেখেছিল। সে আর তার মাসি,—আন্টি।

ছোট মফঃস্বল শহরে ইসকুলের পিতৃমাতৃহীন অনাথ কিশোর মিশনারীদের দয়ায় হঠাৎ এসে পড়লুম বড় শহরের বড় মিশনারী কলেজে। সেখানে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়ছে। আশৈশব বিভিন্ন আত্মীয়ের বাড়িতে দয়া-ঘেন্নার মধ্যে মানুষ হয়েছি। নিজের ইচ্ছেটা ভরসা করে কখনোই প্রকাশ করতে পারিনি। একেই বাপে-খ্যাদানো পরাশ্রয়া মায়ের ছেলে। সেই মা আবার পাঁচ বছরের ছেলেটাকে একলা ঘরে ফেলে রেখে, গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ে কোথায় পালিয়ে গেল। আমি ঘুম ভেঙে উঠে সেই দৃশ্য দেখে, ভয়ে, বিস্ময়ে, যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে মামা-মামিকে ডেকে এনেছিলুম। পাঁচ বছরের সেই আমি—এখনো রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে উঠি, তমসা। মাকে দেখি। সেই কড়িকাঠ থেকে ঝুলন্ত হলুদ শাড়ি পরা মা কোনোদিন আমাকে মুক্তি দেবে না। আমার প্রতি লোমকূপে দগদগে উল্কি-ছাপ হয়ে রয়েছে সেই দৃশ্য।

শহরে এসে মিশনারী কলেজের হস্টেলে স্বাধীনভাবে থাকতে পেয়ে আমার আর আহ্লাদের সীমা ছিল না। জয়ার সঙ্গে সেইখানেই আলাপ, সেই প্রথম বছরে। জয়ার মাসি আমাকে পরম স্নেহে কোলে টেনে নিয়েছিলেন। মামারবাড়িতে বিনা

মাইনের চাকর হয়েছিলুম। পড়াশুনো করাটা যেন আমার অপরাধ, একটা অনধিকারচর্চার মধ্যে পড়ত। কলেজে এসে ছাত্র হয়ে উঠলুম—যার অধ্যয়নই তপস্যা। এবং আবিষ্কার করলুম আমিও খুব ভাল ছাত্র হয়ে উঠতে পারি। স্কুল ফাইনালের রেজাল্টটা গ্রামের ইসকুলের তুলনায় আশার অতীত হলেও, আমার ক্ষমতার তুলনায় অত্যন্তই নিম্নমানের হয়েছিল। জয়া এবং জয়ার মাসির অকৃপণ উৎসাহ, স্নেহে মমতায়, আমি বর্ষাকালের লতার মতন বেড়ে উঠতে লাগলুম। লতা তো নয়, স্বর্ণলতা-—জয়া আর জয়ার মাসিকে সর্বগ্রাসীভাবে আঁকড়ে ধরে জড়িয়ে ধরে, আমার বেড়ে-ওঠা। জয়ার বিধবা মাসিমাই জয়া আর জিৎ দুই ভাইবোনের অভিভাবক ছিলেন। নিজে সরকারি চাকরি করতেন। জিৎ তখন চলে গেছে আই. আই. টি. খড়গপুরে পড়তে। আমি আর জয়া ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লুম। এবং তমসা, আমাকে ঘৃণা কোরো না। তুমি 'গ্রাজুয়েট' সিনেমাটা দেখেছিলে? মনে আছে? আন্টির শুষ্ক, একাকী নারীজীবনেও আমি হঠাৎ কেমনভাবে যেন জড়িয়ে গেলুম, যে-জড়ানোটা আমাদের তিনজনের পক্ষেই যারপরনাই ক্ষতিকারক হয়েছিল। জয়া বুঝতে পারেনি বটে, কিন্তু আন্টির পক্ষে যে সম্পর্কটা কতদূর যন্ত্রণাদায়ক আমি তা ভালই জানতুম। সেই 'পরমা' সিনেমার মতনই অবস্থা। জয়ার মাসি, আমাদের আন্টির সঙ্গে আমার অত্যাশ্চর্য এক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, একেবারেই অতর্কিতে। অপরিকল্পিত এক স্পর্শ থেকে তার আকস্মিক জন্ম, তারপর সেটা বেড়েই চলল। অবিশ্বাস্য গতিতে। তাকে প্রেম বলব, না কাম বলব, জানি না। তাকে সুখ বলব, না দুঃখ বলব, জানি না। চরম সুখ, যাতে চোখে জল এসে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই চরম অপরাধ বোধ, যাতে বেঁচে থাকতেও লজ্জা করে। কিছুতেই সেই সম্পর্কের ধারা টিপে ধরতে পারলুম না আমরা। অথচ কম চেষ্টা করেননি আন্টি। কী জানো তমসা, ঠিক তোমার সঙ্গে আমার যেমন, কিম্বা তার চেয়েও বেশি, আগুন জ্বলে উঠতো আমার শরীরে একটু চোখে চোখ পড়লেই, একটু গায়ে গা ঠেকলেই অগ্নিকাণ্ড। অথচ জয়ার সঙ্গে আমার বিয়ে তখন ঠিক হয়ে গেছে। জয়ারা ক্যাথলিক, আমি হিন্দু, রেজিস্ট্রি বিয়ের নোটিশ দিয়ে দিয়েছি। "ঝড়ের মুখে খড়কুটোর" সেই পুরোনো তুলনাটাই সবচেয়ে মানায়, কামনার সেই তাণ্ডবে আন্টি আর আমি কোথায় যে ভেসে যেতাম। জয়া কিছু জানতো না। জানতে পারেনি। বড় ভালো মেয়ে সে। ঈশ্বর তাকে এই ধাক্কা থেকে রক্ষা করেছেন। ধাক্কাটা নিয়েছেন আন্টিই। শরীরের কাছে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়ে আত্মসমর্পণ করেছিলুম আমরা। এত পরিপূর্ণ তৃপ্তি আর কখনও জোটেনি আমার জীবনে। তমসা, আমাকে তুমি ঘৃণা কোরো না, প্লীজ। আন্টিকেও না। ছোট ছেলে পেয়ে আমাকে তিনি সিডিউস করেননি। আমারই চাপের কাছে হার মেনেছিলেন। শেষ পর্যন্ত আন্টিই হঠাৎ বদলির চাকরি নিয়ে চলে গেলেন এক মফঃস্বল শহরে। জয়ার সঙ্গে আমার বিয়ে হলো। আমি চাকরি পেলুম হায়দ্রাবাদে।

এবং সেইখানেই আলাপ হাশমৎ-এর সঙ্গে। হাশমৎ ছিল এক ছেলের মা, বিবাহিত জীবনে সুখী, সুপ্রতিষ্ঠিত লোকের স্ত্রী। আমার বন্ধু আনোয়ার হোসেনের

স্ত্রী ছিল সে। আমার সঙ্গে প্রেম হবার পরে তার আরেকটি ছেলে হয়েছে। সেটি যে কার সন্তান, আমি জানি না। হাশমৎ বলে সে নিজেও জানে না। আনোয়ার আমার বন্ধুই ছিল না—নতুন, অচেনা শহরে সেই ছিল আমাদের আত্মীয়। আমাদের 'থিতু' হতে সবরকম সাহায্য করেছিল আনোয়ার। আর তার সহায়তার প্রতিদানে আমি তার স্ত্রীর প্রণয়ী হয়ে দাঁড়ালুম।

একটা গোপন প্রেম না হলে আমি বোধহয় বাঁচতে পারি না, তমসা। জয়ার প্রতি আমার ভালবাসায় কোনো খাদ ছিল না। জয়া ছিল আমার প্রাণবায়ু। কিন্তু ওর শরীরে আমি কোনো সুস্বাদ পাইনি। ও বড় ঠাণ্ডা। বড় নরমসরম। জয়া তো শুধু আমার ছেলের মা-ই হয়নি, যেন আমারও মা হয়ে উঠেছিল। সেই যে সুনীল গাঙ্গুলির লাইন—"আমার যৌবনে তুমি স্পর্ধা এনে দিলে"—সে শক্তি ছিল না জয়ার। আন্টির ঠিক সেটাই ছিল। আমার পৌরুষের আত্মবিশ্বাস যুগিয়েছিলেন আন্টি। "শরীর, শরীর, তোমার মন নাই, অভিষেক?" আছে ! আর সেইটেই তো মুশকিল, তমসা। না থাকলে তো মিটেই যেত।

বুঝতে পারছ না? পারবে, পারবে। একজন বয়স্ক পুরুষ প্রেমিকের কথা মনে করো। যিনি এক কিশোরীর প্রেমে পড়লেন। কিশোরী তাঁর কাছে পেল পিতৃস্নেহ, তিনি যেমন তার ফাদার-ফিগার হয়ে উঠলেন, তেমনিই হলেন তার জীবনের প্রথম পুরুষ। এবং দোর্দণ্ড প্রণয়ী কী? ভাবতে পারছো তো? হ্যাঁ, এরকম সহস্র ঘটনা তোমার নিশ্চয় জানা।

এবার এটাকেই উল্টেপাল্টে নাও, ধরো, এক বয়স্কা নারী আর একটি কিশোর। সম্পর্কটা সেই একই। সেই পিতৃপ্রতিম প্রণয়ী ছাড়াও ঐ কিশোরীর জীবনে ধরে নাও, ছিল একটি তরুণ প্রেমিক, তার হবু স্বামী। যেমন ছিল আমার জীবনে কিশোরী প্রেমিকা, জয়া। বম্বের ফ্লিম মহলে এরকম সত্য ঘটনা তো আকছার ঘটেই থাকে। তোমার আমার জানা কতই নাম এক্ষুনি মনে পড়বে। আমার গল্পে বয়স্ক প্রণয়ীটি নারী বলেই এই গল্প যত গোলমাল। আমাদের জীবনটা তো বম্বের টিনসেল টাউনে নয়।

আমাদের বিয়ের পর থেকেই আন্টি নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে, সরিয়ে নিয়েছিলেন। এমনকী হায়দ্রাবাদে আসেননি কখনও। পুরোনো সম্পর্কটা ছিন্ন করে দিলেন আশ্চর্যভাবে। পারোও বাবা তোমরা মেয়েরা। আন্টির সরে যাওয়াটা আমার যৌবনের জায়গাটাতে একটা মস্ত ফাঁক তৈরি করেছিল। সেখানেই এসে পড়ল হাশমৎ। খানদানি মুসলমান পরিবারে তার জন্ম। যেমন দুরন্ত জীবনতৃষ্ণা, তেমনি তার সাহস।

অবশেষে একদিন তার পুত্রদের স্বামীর কাছেই ছেড়ে, হাশমৎ আরা বেগম এসে উঠলো আমার বাড়িতে। জয়ার কাছেই আশ্রয় চাইলো সে। জয়াকে সব কথা খুলে বলবে হাশমৎ ভেবেছিল। জয়া তাকে মেনে নেবে। ইসলামে একাধিক পত্নী নিয়ে বসবাস সমাজ-সম্মত হাশমৎ স্পষ্ট জানালো জয়াকে—জয়ার কোনো ভয় নেই,

BanglaBook.org

আমি তাকে বিয়ে না করলেও হাশমৎ-এর কিছু এসে যাচ্ছে না। তার যথেষ্ট বিষয় সম্পত্তি আছে, নিজস্ব মাতৃধন। সে শুধু আমাকেই চায়। কিন্তু জয়াকে বাদ দিয়ে নয়। জয়াও থাকুক, হাশমৎও থাকবে। শর্ত কেবল একটিমাত্রই। আমার সঙ্গে অবিবাহিত হাশমৎ-এর যদি কোনো সন্তান হয়, তবে সেই সন্তান জয়াকে গ্রহণ করতে হবে। আইনসঙ্গত পরিচয়টুকু সমাজে তাকে দিতে হবে। হাশমৎ বিশ্বাস করে একজন মানুষের—তা সে নারীই হোক, আর পুরুষই হোক, একাধিক নরনারীকে প্রকৃতই ভালবাসার ক্ষমতা দিয়েছেন ভগবান। ঈর্ষা অর্থহীন। পরস্পরকে শুধু বুঝলেই হলো। জয়াকে হাশমৎ নিজের কানের হীরের দুলটি উপহার দিল। ঘুষ নয়, তার সখিত্বের বন্ধুত্বের নিদর্শন।

হাশমৎ-এর কথাবার্তা চুপটি করে সব শুনলো জয়া। চা জলখাবার তৈরি করে দিল। বিছানা করে দিলে গেস্টরুমে। আমাকে কিছুই বললো না। হীরের দুলও লোহার আলমারিতে তুলে রাখলো। রাত্রে ডিনারের পর দেখলাম জয়া নিজেই গেস্টরুমের আলাদা বিছানাতে বাচ্চা অভিজাতকে নিয়ে শুতে গেছে, আমাদের শোবার ঘরটা হাশমৎকে ছেড়ে দিয়ে এবং তার বালিশের ওপরে আলমারীর চাবির গোছা। আমি গিয়ে বন্ধ দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলতে পারলাম না—উদ্বিগ্ন, উন্মত্ত মর্মাহত হাশমৎ বললে—"ভেঙে ফেলো, দরজা ভেঙে ফেলো, জয়া ওধারে যা খুশি করে ফেলতে পারে।" জয়া শুনতে পেয়ে দরজা খুলে দিল। ঠাণ্ডা, শান্ত গলায় বলল—"কিছুই করবে না জয়া, অভিজাত ঘুমোচ্ছে, নাটকের দরকার নেই। এই সংসারটা তুমি নাও। আমার স্বামী কেন, ছেলেকেও নিতে পারো। অভিষেকের কাছে আমি কিছুই চাই না। কেবল যতদিন না আমি অন্য কোনো ব্যবস্থা করতে পারছি—আমি এখানেই থাকবো, ভয় নেই। অভিষেকের মায়ের আত্মহত্যার কথাটা আমি ভুলিনি।" কেঁদে কেঁদে চোখমুখ ফুলে উঠেছিল ওর। এত ঠাণ্ডা গলা সুস্থতার লক্ষণ বলে মনে হচ্ছিল না। দরজা বন্ধ করে দিল জয়া।

জয়া অন্য ব্যবস্থা করে উঠতে পারার আগেই হাশমৎ-এর কাকার কল্যাণে আমরা দুজনে শিকাগোতে চলে গেলাম। হাশমৎ-এর বিরাট সুবিধা, সে জন্মেছিল আমেরিকাতে। তখনও ইউনিফর্ম সিভিল কোড তৈরি হয়নি। আমি রাতারাতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ওর সাক্ষাৎ স্বামীদেবতা হয়ে ওর সঙ্গেই সাগর পাড়ি দিলাম। গ্রীন কার্ড হয়ে গিয়েছিল ঝটপট, চাকরি সংগ্রহ করতে খুব বেশিদিন লাগলো না। জয়ার কী হলো? সে কথা তখন ভাবার সময় ছিল না। ছেলে অভিজাতকে নিয়ে প্রথমে ওখানেই কী একটা মিশনারী হস্টেলে উঠেছিল, তারপর ওর মাসির কাছেই ফিরে গিয়েছিলো শুনেছিলাম। না, আমাদের ফরম্যাল ডিভোর্স হয়নি। কিন্তু স্বামী বা স্ত্রী, যে কেউ একজন ধর্মান্তরিত হলে, আপনিই একতরফা ডিভোর্সের ডিক্রি পাওয়া যায়। যদিও আমরা দু'জনে দুই ধর্মের ছিলুম।

তমসা, তোমার সঙ্গে দেখা যখন হলো ওয়াশিংটনে, তখন আর হাশমৎ নয়, আমি বাস করছি জুডি গ্রেহামের সঙ্গে। হাশমৎ ফিরে গেছে হায়দ্রাবাদে। তার স্বামী-

পুত্রের কাছে। বিনা আপত্তিতেই আনোয়ার গ্রহণ করেছিল তার খামখেয়ালী অনুতপ্ত ধনী পত্নীকে—যদিও ততদিনে তার ঘরে এসে গেছিল সেলিনা। সেলিনা আর হাশমৎ এখনও মিলেমিশে ছেলেপুলে নিয়ে সুখেই আনোয়ারের সঙ্গে ঘর করছে, যতদূর জানি।

কলকাতাতে এবার এসেছিলাম তোমার বাবামায়ের সঙ্গে কথা বলবো বলে। পাত্র হিসেবে সামনে উপস্থিত হবো বলে। আমি কী? আমি একজন মাঝবয়সী, মার্জিতরুচি, সুশিক্ষিত, সুদর্শন, সু-উপায়ী, এন. আর. আই.। একমাত্র দোষ, ডিভোর্সী। কিন্তু সেখানেও সেভিং গ্রেস আছে। কেননা সামাজিক দায়িত্বের দিক থেকে অভিজাত তার মায়েরই ছেলে। আমি সব দায়মুক্ত একক পুরুষ—অ্যাজ গুড অ্যাজ নিউ।

কিন্তু আমি তোমার বাবা-মার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি তমসা। তার আগেই যে নদীর ঘাটে পড়ে থাকা সেই মরা বামুনের শবদেহটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। যে পাঁচতারা হোটেলে আমি উঠেছি, জয়া এখন সেখানেই চাকরি করে।

তমসা, আমি তোমার বাবা-মার কাছে মিথ্যা বলতে পারবো না। আমি অবিবাহিত নই। আমার স্ত্রী আছে। আমার পুত্র আছে। সেন্ট জেমসে অভিজাত এখন ক্লাস সিক্সে পড়ে। আমার বিধর্মী হওয়া জয়া গ্রাহ্য করেনি। সে ডিভোর্স নেয়নি। অথচ ক্রিশ্চান মেয়ে সে— তার পক্ষে আবার বিয়ে করাটা অসামাজিক হতো না। আন্টি অসময়ে মারা গেছেন। জিৎ বিয়ে করে এখন দিল্লিতে। জয়া তেমনি রোগা-রোগা দেখতে রয়েছে। একটু কেবল ক্লান্ত দেখায় এক একটা সময়ে। বড্ড একা।

আইনত, আমি সেই তথাকথিত 'সুপাত্র'টি আর নেই। তমসা, আমি বড়ই দুর্বল চরিত্র, বড়ই অস্থির মতি। আমার ওপরে বিশ্বাসী, বিশ্বস্ত সঙ্গিনী জুডিকে ছেড়ে দিয়ে নির্লজ্জভাবে তোমার প্রতি ধাবিত হবার মতন কোনো অপরাধই তো জুডি করেনি। শুধু সে ছিল সাধারণী। আমারই অধীনস্থ সেক্রেটারি। আর তুমি এলে আমার ওপরওয়ালা হয়ে। তুমি আমার অন্তরাত্মাতে চমক লাগিয়ে দিয়েছিলে। তোমার মতো মেয়ে আমি দেখিনি।

আমি বড় লোভী। বড় দায়িত্বহীন। তোমার প্রেমের যোগ্য নই আমি, তমসা। জয়াকে দেখতে পাবার পরে—তোমার মা-বাবার সামনে গিয়ে আমি দাঁড়াইনি, দাঁড়াবো না। জয়ার আর অভিজাতের পাসপোর্ট-ভিসা করাতে দিয়েছি। তমসা, তুমি তো জেনেছো, আমি ছুটি এক্সটেণ্ড করেছি। সামনের মাসে আশা করছি জয়াদের নিয়েই ওয়াশিংটনে ফিরতে পারবো। জয়াকে দেখে সত্যি সত্যিই মনে হলো বুঝি এইমাত্র নদীর ঘাটে স্নানে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যা-আহ্নিক না করেই হঠাৎ ঘরে ফিরে এসেছি। যেন সময় স্থির হয়ে ছিল। তমসা, আমাকে ক্ষমা করো। আমি নিজেকে খুঁজতে চেষ্টা করছি। বুঝতে পারছো না?

বস, তুমি আমাকে অনেক প্রশ্রয় তো দিয়েছো। আর একটু দাও? আমাকে সুস্থ হতে সাহায্য করো, তমসা। তোমরা মেয়েরা মেয়েদের গভীর বন্ধু হতে পারো, হতে চাইলে। জয়াকে তোমার বন্ধু করে নেবে তমসা, সে বড়ই দুর্ভাগা। আমার

BanglaBook.org

মতো শয়তান তার স্বামী। তমসা, জয়া তোমার মতো মেধাবিনী নয়, এত উচ্চশিক্ষা তার নেই, ও বড় ঠাণ্ডা, বড় নরমসরম। ওকে মায়া হবে তোমার—জয়া তোমার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীই নয়।

আমার কাছ থেকে এই মুক্তি পাওয়া, এটা যে তোমার পক্ষে কত মঙ্গলের হলো, তা তুমি কিছুদিন পরেই বুঝতে পারবে। আমরা কি বাকী জীবন এমনিই বন্ধু হয়ে বাঁচতে পারি না তমসা? তোমাকে যে আমি ভালবাসি, জীবনে যাই ঘটুক, সেটা তো মিথ্যে হয়ে যায়নি? জটিলতার নাম অভিষেক। তোমার দুর্ভাগ্য তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছ তুমি। আর আমার মহা সৌভাগ্য তোমার দেখা পেয়েছি এই জীবনে। আমাকে একটু কৃপার চোখে দ্যাখো তমসা, রাগ কোরো না, আমাকে একটু বুঝতে চেষ্টা করো। আমি নিজেই এখনও নিজেকে বুঝে উঠতে পারিনি। এ চিঠি সেই চেষ্টা।

মধ্য বয়সে পৌঁছে হঠাৎ ছেড়ে আসা স্ত্রী-পুত্রকে যেন বনপথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আমার এই বিচিত্র জীবন অভিযান, এ আমার নিজেকে খোঁজার যাত্রা, তমসা। আমি যে সত্যি সত্যি জানি না আমি কে? সেই বামুন? না ওই মুচি? নাকি রাজামশাই? নাকি শুধুই একটা সুযোগ-সন্ধানী শয়তান? অথবা হতভাগ্য, বিভ্রান্ত একলা একজন মানুষ? আমি যে কে সেইটে আগে আমাকে চিনে নিতে হবে। তুমি আমার হাত ধরবে, তমসা? আমাকে আলো দেখাবে? আমাকে ক্ষমা করবে? উজ্জ্বলা তমসা?

—ইতি
তোমার চিরকৃপার্থী,
অভিষেক।

শারদীয়া দক্ষিণীবার্তা, ১৪০২

BanglaBook.org

বারোজ 555

আর বলিস না তোদের শহরের কথা—ছোড়দা প্রায় মারতে উঠলো রিনিকে।

বেচারি ছোট শালী, আদর পেতেই অভ্যস্ত, হঠাৎ এই মেজাজের জন্যে প্রস্তুত ছিল না।—কেন জামাইবাবু?

—কেন, তোমার দিদিকে জিজ্ঞেস করো না? সে জানে। জীবনে আর যদি কখনো গেছি তোদের শহরে—

—হল কী? ব্যাপার কী রে দিদি? রিনিও নিজের শহর ছাড়া অনেকদিন, বম্বের টাটা ইনস্টিট্যুটে পড়াশুনো করছে। মিনি বললো

—তোমার সবটাতেই বাড়াবাড়ি। এমন কিছুই হয়নি।

—কিছুই হয়নি? তবে শোন।

তোর দিদিকে বললুম, বাপের বাড়ি যাবে? তোমাদের শহরে প্রথম কম্পিউটার বসছে—আমাদের কোম্পানিকে বলেছে ইনস্টল করে দিয়ে আসতে। কোম্পানি আমাকেই পাঠাচ্ছে—যাবে তো চলো। দিদি তো এক পায়ে খাড়া। কিন্তু বলতে লাগলো, প্রথম কম্পিউটার বসছে মানে? তুমি কি বলতে চাও আমাদের শহরে আগে কম্পিউটার ছিল না? তাও কখনো হতে পাবে? যত বলি এ তোমার শিকাগো, নিউইয়র্ক নয় যে ঘরে-ঘরে ছেলেরা কম্পিউটার নিয়ে খেলা করছে, এ-দেশে এখনও মোট ক'টা কম্পিউটার আছে তার হিসেব আছে।

মিনি তত বলে,—তাহলে মোটে একটাও ছিল না?

ছিল না মানে? এখনও নেই। আমি গিয়ে বসিয়ে দেবো, তারপরে থাকবে। তবে বিশ্বাস হলো।

যাই হোক, তোমাদের শহরে পৌঁছে মিনিকে তোমাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আমি গেলুম সেই ইনস্টিট্যুটে, যেখানে যন্ত্রটা বসবে। যদিও আগেই সব কিছু ডিটেলড স্পেসিফিক ইনস্ট্রাকশন দিয়ে পাঠানো হয়েছে, এয়ারকনডিশনড ঘরের ব্যবস্থা কী রকমের হবে—তবু একটা দায়িত্ব আছে তো? ফার্স্ট হ্যাণ্ড ইনফরমেশন নিতে গেলুম। দেখি মোটামুটি সেসব ডিরেকশন ঠিকঠাকই মান্য করেছে। বেরবার সময়ে দেখি গেটে তিনটে গরুর গাড়ি। একজন পুরুত খালি গায়ে টিকিতে ফুল বেঁধে আরতি প্রদীপ নিয়ে সেই গরুদের অথবা গাড়িদের পুজো করছে। গরুদের মাথায় সিঁদুর, গলায় গাঁদাফুলের মালা, চাকাতেও সিঁদুর, চাকাতেও মালা। বেশ মজা লাগলো, বাড়ি এসে মিনিকে যেই বলেছি,— বলো তো আজ কী দেখলুম তোমাদের দেশে? —দেখলুম একটা পুরুত তিনটে গরুর গাড়িকে পুজো করছে। বলদপুজোও দেখে এলুম।

মিনি ক্ষেপে উঠে বললো—তাতে কী হয়েছে? বিয়ে থা আছে হয়তো, তার জন্যে ওরকম যাত্রা করানো হয়।

বেশ বাবা, হয় তো হয়। কলকাতায় তো কেউ গরুর গাড়ি চেপে বিয়ে করতে যায় না? তাই দেখিনি। তারপর তো গেছি এয়ারপোর্টে। কম্পিউটার ঠাকরুণ আসছেন আমেরিকা থেকে। দিল্লিতে কাস্টমস ক্লিয়ার করিয়ে, এই খুদে শহরে এরোপ্লেনে চড়ে এসে পৌঁছুবেন। আমরা গিয়ে তাঁকে রিসিভ করবো, হাত, পা, কান, মাথা, সব ঠিকঠাক এসেছে কিনা লিস্টি মিলিয়ে গুণে-গেঁথে নেবো, তারপরে ইনস্টিট্যুটের শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত আরামপ্রদ বহুমূল্য ঠাণ্ডা কামরায় তিনি অধিষ্ঠিত হবেন।

সব ঠিকঠাক এসেছে কিনা দেখতে, পেপারস মিলিয়ে ডেলিভারি নিতে খানিকটা সময় নিল। অন্য যাত্রীরা সবাই ততক্ষণে চলে গেছে মালপত্র নিয়ে। হিন্দ কম্পিউটার্সের ভ্যান নিয়েই আমি গেছি শ্রীমতী কম্পিউটারকে তাতে করে নিয়ে আসবো বলে। যেখানে ডেলিভারি নিলুম তার পাশেই রেখেছি ভ্যানটা, যাতে ক্রেটগুলো তুলতে সুবিধে হয়। কাজকর্ম মিটে যেতে, যেই কুলি দিয়ে ক্রেটগুলো

BanglaBook.org

তুলতে গেছি—হঠাৎ একদঙ্গল লোক আমার ওপরে হাই-হাই করে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

প্রথম থেকেই দলটাকে আমি দেখেছিলুম লাউঞ্জে অপেক্ষা করছে কোনো ভি. আই. পি'র জন্যে। দিল্লির প্লেন তো। মোটা মোটা জরি রাংতার মালা, গাঁদাফুলের গোড়ে নিয়ে এরা অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে আমি তো হতভম্ব। আমাকে আবার কোন ভি. আই. পি. ভাবল? একজন টাক-মাথা ভদ্রলোক, পরনে চকচকে ব্রাউন স্যুট, মাথায় চকচকে ঢাউস টাক, কপালে সিঁদুর টিপ এবং চন্দনের ফোঁটা, দৌড়ে এসে আমার দু'হাত ধরে বললেন—স্টপ, স্টপ। কাঁহা যাতে হে স্যার? থোড়া সবুর কীজিয়ে—

দেখি আমি, আমার ক্রেটগুলো সমেত ঘেরাও হয়ে গেছি। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে থেকে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে এল সকালবেলার সেই টিকিওলা চাদর জড়ানো পুরোহিত। যে বলদপূজো করছিল। জোরে জোরে কী সব আজেবাজে মন্তর পড়ে ক্রেটগুলোকে প্রদক্ষিণ করে ফুল-তুলসীপাতা ছুঁড়তে লাগলো। সিঁদুর-টিদুর মাখিয়ে, মালা-চন্দন পরিয়ে, ধূপদীপ জ্বেলে ক্রেটের পূজারতি হলো, যাক বাবা, বাঁচা গেছে। প্রথমে আমি ভয়ই পেয়ে গেছি, আমাকেই বোধহয় কোনো ভি. আই. পি. ভেবে ভুল করেছে ওরা। তা নয়, ওরা ভি. আই. পি. চিনতে ভুল করেনি। ওই লোকটা ইনস্টিট্যুটের ডেপুটি ডিরেক্টার। ভাবতে পারিস? ক্রেটপূজো ফুরোতে আমি যেই আবার ক্রেটগুলো নিয়ে কুলিদের বলেছি ভ্যানে তুলে দিতে, অমনি তিনি আর্তনাদ করে উঠেছেন—উধার নেহি, ইধার লাও, গাড্ডি ইধার।

শিহরিত হয়ে আমি কী দেখলুম বল তো? সে-ই চিনটে গরুর গাড়ি, কাগজের মালায়, লাল-নীল পতাকায় সেজেগুজে মালাচন্দন পরে এয়ারপোর্টে চলে এসেছে। একটাতে সানাইপার্টি। তারপর এই দুটো চোখ দিয়ে আমি দেখলুম এই দশকের দ্রুততম গতিসম্পন্ন কম্পিউটারের অংশগুলো সব তিনখানা গরুর গাড়িতে তোলা হচ্ছে। ঠিক যেমন গরুর গাড়ির খেলনা মূর্তি পাওয়া গেছে মহেঞ্জোদারোতে না হরপ্পায়। সানাই বাজিয়ে, দমাদ্দম পটকা ফাটিয়ে তো গাড়িগুলো রওনা হলো। সানাই সামনে আপনমনে পিলু বাজাচ্ছে, আর পেছনে বেগুনী আর সোনালী পোশাকপরা ব্যাণ্ডপার্টি মার্চ করতে করতে যাচ্ছে। 'যিসকি বিবি মোটি' বাজিয়ে। তাদের পেছনে অনেক ছোকরা সব নানারকম ব্যাপার নিয়ে হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে চলেছে। কোনো ব্যানারে লেখা অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু, কোনোটিতে শহরে প্রথম কম্পিউটারের শুভাগমন, কোনোটাতে স্বাগত বারোজ 555. এইসব। নাচে গানে বাজনায় শহর মাতোয়ারা করে তো জুলুস চলতে লাগলো তিন গরুর গাড়ির পেছনে পেছনে। সেই ডেপুটি ডিরেক্টার এসে বললেন—ডাক্তার বানার্জি, আপনিও চলুন, এ তো আপনারই ব্যাপার।

অতএব গাড়ি থেকে নেমে আমিও ওদের সঙ্গে গোমড়ামুখে হাঁটি হাঁটি পা পা। হিন্দ কম্পিউটার্সের শূন্য ভ্যান আমার পেছু পেছু হামাগুড়ি দিতে দিতে আসতে লাগলো। সব্বার পেছনে একটা সাইকেল রিকশায় মুখে মাইক লাগিয়ে বসেছে

এক ছোকরা—ভোটের ক্যাম্পেনের মতো চেঁচাচ্ছে—শহরে সর্বপ্রথম কম্পিউটার। এই কম্পিউটার বারোজ 555 আগমন উপলক্ষে ময়দানে মহতী জনসভা। মাননীয় কৃষ্টিমন্ত্রী ও মাননীয় কৃষিমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন ও উদ্বোধনী বক্তৃতা দেবেন। সভা শেষে হোলনাইট কালচারাল প্রোগ্রাম আর 'শোলে' ফিলিম-শো—দলে দলে যোগ দিন। দলে দলে যোগ দিন!!

কী বলবো তোকে, রিনি, আমি যেন একটা ঘোরের মধ্যে হাঁটছি। এ যেন মফঃস্বল শহরে বোম্বাই সার্কাসের আগমন, হাতির নাচ হবে—বাঁদরে সাইকেল চালাবে—তার বিজ্ঞাপন।

এয়ারপোর্ট থেকে পায়ে হেঁটে—নেচেকুঁদে তো বলদগাড়ির শোভাযাত্রা পৌঁছে গেল ইনস্টিট্যুটে। আমি আবার তাড়াতাড়ি ব্যবস্থাপনায় লেগে যাচ্ছি দেখে সেই 'ডেপুটি ডায়রেক্টর' এসে বললেন—কিন্তু আজ তো বসানো যাবে না, স্যার। আমি বললুম, না না, কোনোই মুশকিল নেই, সব ঠিক হয়ে আছে—তিনি শুধু মৃদু হাসেন। আর মাথা নাড়েন। আজ হবে না!—কেন হবে না? আজ লগ্ন নেই। বনারস থেকে বড়া পণ্ডিতজী যে লগন ঠিক করে দিয়েছেন। ওর তো নড়চড় হতে পারে না। মুশকিল এই যে উদ্বোধনের সভা অ্যানাউন্সড হয়ে গেছে তার আগেই মিনিস্টারদের তো শিডিউল পালটানো যাবে না। তাই আজকের মিটিংটা হয়েই থাক, উদ্বোধন পরশুদিন হবে। কী বলেন?

আমি আর কী বলবো? তিনিই আবার বললেন—আজ পাবলিক প্রোগ্রাম হোক, রাতভর কালচারাল শো চলুক—কালকে রাতে কম্পিউটার বসবে, পরশু সকালে শাস্ত্রীজী মন্ত্র পড়ে উদ্বোধন করে দেবেন আর ডায়রেক্টর সাহাবই ফিতেটা কেটে দেবেন। কী বলেন?

আমি হাঁ করে আছি দেখে উনি তাড়াতাড়ি যোগ করলেন, কাল রাত দুটো থেকে শুভ লগ্ন পড়ছে। পরশু সকাল দশটা পর্যন্ত আছে। সেই সময়ে কম্পিউটার বসবে। পণ্ডিতজী টাইম ঠিক করে দিয়েছেন। আগে উদ্বোধনী সভা, তারপর মেশিন বসবে, তারপর উদ্বোধন। আমি আর কী বলবো? চুপ করে বসে আছি দেখে উনি আমাকে সান্ত্বনা দিলেন।—আজ তো মিটিংটা হচ্ছে? কালচারাল প্রোগ্রামটাও হোলনাইট। ফিল্ম-শো আছে, ভজন আছে—আপনি তো আজ ক্লান্ত থাকবেন। কাল দিনভর বেশ আরাম করে নিন, তারপর রাত্রে দুটোর পরে বরং কাজকর্ম শুরু করবো, যন্ত্রপাতি বসানোর। যতক্ষণ লাগে, লাগুক না। ডিরেকটর সাহাবকে তো সব সময়েই পাওয়া যাবে। পাবলিক ফাংশন তো আগেই হয়ে যাচ্ছে—ওইদিন কেবল প্রাইভেট গেস্টদের ডাকা হবে। প্রসাদ খাবার জন্যে। মন্দিরের ভোগ আসবে—

লোকটার কথাবার্তা যত শুনি, রিনি, আমার যেন ততই মাথা গুলিয়ে যেতে থাকে। ভোগ? মন্দির? কম্পিউটারের দিন নেই, রাত নেই, সে চল্লিশ ঘণ্টার শ্রমিক, তাই রাত জেগে কাজ করা অভ্যেস আছে আমারও। নাইট শিফটে জরুরি কাজকর্ম পড়ে না তা নয়। কিন্তু যন্ত্রটা বসানো হবে রাত্তিরে! এমন কিম্ভুত ব্যবস্থার কথা

কেউ জন্মেও শোনেনি। কখন লোকেরা কাজকর্ম করে এ-ধরনের? যখন বে-আইনি ভাবে কিছু করা হয়। কিন্তু এ তো অকারণে ঝামেলা! ইনস্টিট্যুটটা খোদ সরকারের। কিন্তু আমি তো ভাড়াটে একস্পার্ট। যাদের কম্পিউটার তাদেরই কথামতো চলতে হবে আমাকে। আমি তো হিন্দ কম্পিউটার্সের লোক, আমার মতামতের এ-ক্ষেত্রে কোনোই মূল্য নেই।

লোকটা বলতেই লাগলো—বিকেলবেলা মিটিংয়ে নিশ্চয় আসবেন স্যার—নাইটের প্রোগ্রামেও নিশ্চয় থাকবেন—বিকেলে দুজন ভারি ভারি মিনিস্টার আসছেন, কালচার আর এগ্রিকালচার—দারুণ সভা জমবে মনে হয়—শহরে প্রথম কম্পিউটার তো? বক্তৃতা দিতে মেয়র সাহেবও আসছেন। নেহাৎ মুখ্যমন্ত্রী শহরে নেই তাই—

রিনি, তুই তো জানিস বারোজ 555 কীরকম যন্ত্র? ধর, তুই একটা অঙ্ক কষবি যার জন্যে পৃথিবী থেকে চন্দ্র পর্যন্ত দীর্ঘ একখানা কাগজ লাগবে—ভেবে দ্যাখ ডিসট্যান্সখানা। পৃথিবী থেকে চাঁদ পর্যন্ত—বারোজ 555 সেই অঙ্ক এক মিনিটে কষে দেবে।

মন খারাপ করে বাড়ি ফিরে এসে মিনিকে বললাম—যাচ্ছেতাই শহর বাপু তোমাদের। এত দামী, একটা যন্ত্র তোমরা ডিজার্ভ করো না। আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি, পরশুদিন সকালে যখন কম্পিউটারটির উদ্বোধন করা হবে, তারপরে দলে দলে হলদে পাগড়ি বাঁধা পুরুষ আর লাল উড়নিপরা ঘোমটা দেওয়া মেয়েরা ফুল-মিষ্টি হাতে করে দেহাতী গান গাইতে গাইতে ভক্তিভরে গদ-গদ হয়ে আসছে—কম্পিউটারজীউকীর দর্শনলাভ করতে, তার মন্দিরে পুজো দিতে।

মিনি বললে, তোমার সবটাতেই বাড়াবাড়ি। একটা যন্ত্র বসছে—সেটার প্রতিষ্ঠা-পুজো তো করতেই পারে।

আমি যত বলি, এ ব্যাপারটা অনেক অন্যরকম—মিনি, তুমি বুঝতে পারছো না—তোর দিদি বল্লে—যাকগে যাক। দ্যাখো বিকেলের মিটিংটা নিশ্চয়ই সেনসিবল হবে। মন্ত্রীটন্ত্রী আসছে সব। তাছাড়া আমার বাপু খুব যেতে ইচ্ছে করছে।

বেশ বাবা, চলো তবে। —আমি বললুম।

বেদগান দিয়ে জনসভা আরম্ভ হলো। প্রথমেই কালচার। কৃষিমন্ত্রীর বক্তৃতা। —তাঁর আরেকটা ফাংশান আছে—তিনি আগেই চলে যাবেন। তিনি বললেন—কম্পিউটার-কালচার পৃথিবীর সবচেয়ে মডার্ণ কালচার। আর পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন কালচার বৈদিক কালচার। ভারতবর্ষ যে কতদূর সামনে এগিয়েছে, তার প্রমাণ বৈদিক কালচার থেকে আরম্ভ করে ভারতবর্ষ আজ কম্পিউটার-কালচারের পর্যায়ে পৌঁছেছে। পৃথিবীর যাবতীয় ইনফরমেশন এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার এখন অফুরন্ত—! কম্পিউটার আধুনিকতার প্রতীকস্বরূপ, প্রগতিশীলতার মূল লক্ষণ। প্রগতির প্রাণকেন্দ্রে আছে জগতের সব কম্পিউটার সেন্টারগুলি। আমাদের শহরও আজ থেকে এ পৃথিবীর সবচাইতে প্রগতিশীল সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলির অন্যতম হলো। আর আমাদের ভাবনা নেই। দেহলি-মুম্বাই-কলকাতা-মান্দারসের চেয়ে আমরা আর

কোনো অংশেই কম নই। এমনকী লণ্ডন-নিউইয়র্ক-টোকিওর চেয়েও নয়। আজ থেকে এই শহর আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বলে গণ্য হলো।

তাঁর এই ঘোষণায় জনতা একেবারে উদ্বেল হয়ে উঠল, যেন মেসমেরাইজড —এতসব ভাল কথা শুনে। কৃষিমন্ত্রীর বক্তৃতায় সভা মন্ত্রমুগ্ধ। চটকা ভাঙতেই প্রচণ্ড জয়ধ্বনি।

বিপুল হাততালির মধ্যে এবার কৃষিমন্ত্রী উঠলেন। কালচার হয়ে গেল। এবার এগ্রিকালচার। তিনি বললেন—ট্র্যাকটর, ট্রানজিস্টর আর কম্পিউটর—এই তিন 'টর' নিয়েই আধুনিক জীবন। এগুলি সব ছিল বলেই কিছু কিছু প্রদেশ আমাদের ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিল। সব কো আব হাম দেখ লেঙ্গে। পাঞ্জাবে যে সবুজ বিপ্লব হয়েছে, তা এই তিন 'টর'-এর জন্যে, হরিয়ানায় যে হয়েছে, তাও এই তিন 'টর'-এর জন্যে, এবার আমাদেরও তাই হবে। এবার কম্পিউটার এসে গেছে—আর গরীবের ভাবনা নেই। আপনা-আপনিই সব সমস্যার জলদি সমাধান হয়ে যাবে। ওর কোই বি মুসীবৎ রহেগী। গরীবি বি হট যায়েগী, আমীরী বি হট যায়েগী—অব সব বিলকুল ব্যালান্স ইকনমি হো যায়েগী। গ্রীন রেবোলিউশন কেন—ব্লু গ্রীন ইয়োলা সবরকমের রেভোলিউশনই এবার হতে হবে এখানে—আমাদের আর কেউ রুখতে পারবে না। —কেবল আমাদের কম্পিউটার ছিল না বলেই আমরা এতদিন যা পিছিয়ে ছিলাম—

এবার সেই শক্তি আমাদের পকেটে এসে গেছে— আমরা আফ্রিকা জার্মানী রাশিয়া চায়না পাকিস্তান সবাইকে হারিয়ে দেব—আমার পিঠে টোকা মেরে এইখানে মিনি বললে—চলো, চলো, ঢের হয়েছে—ঘুম পাচ্ছে। আমি বলি, আমার বক্তৃতা এখনো শেষ হয়নি—

—আর তখন তোর জামাইবাবু কী বললেন বল তো? বল্লেন—"দাঁড়াও এখনই কী?" সবে তো শুরু—প্রোগ্রাম তো সবই বাকি—এর পরে নিশ্চয় মহামান্য মেয়র আসছেন শহরের প্রথম কম্পিউটারের হাতে শহরের চাবিটা তুলে দিতে—বুঝলি? এত পাজী।

কৃত্রিম গাম্ভীর্য নিয়ে রিনি বললো—আগে—গানের অনুষ্ঠান কেমন হলো রে দিদি?

উদাস গলায় ছোড়দা বললো—আরে দূর, আমাদের কি আর গানে মন ছিল রে? ওইরকম আনসায়েন্টিফিক পরিবেশ, এই ইনক্রেডিবল ওয়ার্কিং কণ্ডিশনে? বসাচ্ছে বারোজ 555, স্মার্টেস্ট কম্পিউটার অব দি ডেকেড— আর তাঁর কর্তারা পড়ে আছে হরপ্পার যুগে—

বলতে না বলতেই হঠাৎ অন্ধকারে একটা গরু কোত্থেকে গম্ভীর সুরে ডিগনিফায়েজ গলায় 'হাম্বাআ'—বলে ছোড়দার কথায় সায় দিল।

"আরে, ওই যে, আপনার একজন হরপ্পান সাক্ষী"—বলে রিনি হেসে গড়িয়ে পড়লো দিদির গায়ে।

শারদীয় যুগান্তর

BanglaBook.org

কে. পি. ন্যান্‌ডি ফ্রম ক্রাইস্টচার্চ

তুলি কেমব্রিজে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্সি থেকে পাশ করেছে, আর সে এ-দেশে পড়বে না। তুলির বন্ধুরাও যে যেখানে পারে এদিক ওদিক বিদেশে পালাচ্ছে। কেউ শিকাগো, কেউ হস্টন। শম্পা তো যাচ্ছে ফ্রান্সে। বুবাই যাচ্ছে জার্মানিতে। সত্যি, এই পৃথিবীটা কত ছোটো হয়ে এসেছে। বুবাইয়ের বড়দি গেছে অস্ট্রেলিয়াতে; সে ডাক্তার। বুবাই কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট। লছমীর দিদি গেছে আর একটু কাছাকাছি—জে. এন. ইউতে, যেমন কম্বি আর অভিক যাচ্ছে দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্সে। দিল্লি, দিল্লিই সই। তারপর সাগরপারের কথা ভাবা যাবে। আপাতত কলকাতা থেকে তো বেরিয়ে পড়ো। কলকাতা শহরের এম. এ.-এম. এসসি'র চাকরির বাজারে দাম পড়ে যাচ্ছে—দাম আছে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং। কিংবা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের। আজকাল যেন আই.সি.এস.-আই.পি.এসেরও ঝলকানিটা কমে এসেছে।

আমেরিকা যাত্রীরা সবাই অগস্টের মধ্যেই বেরিয়ে যাবে দেশ ছেড়ে, ইংলণ্ড যাত্রীর হাতে একটু সময় বেশি। তুলির অত তাড়া নেই। মিকেলমাস টার্ম শুরু হতে দেরি আছে। তুলি আস্তে আস্তে গোছাচ্ছে। দর্জিকে দিয়ে জামাকাপড় তৈরি করাচ্ছে। বই কিনছে, সুন্দর সুন্দর নকল গয়না কিনছে। জুতো কিনছে। সোয়েটার কিনতে দিল্লি যাবে ভাবছে। একটা চামড়ার কোট কিনেছে মিস্ট মার্কেট থেকে।

তুলিকে দেখে তো তার বাবা মুগ্ধ। কেমন স্ব-স্থ। তুলির বাবাও কেমব্রিজে পড়েছেন। কিন্তু সেসব দিন ছিল অন্য। তখন সমুদ্রপারে পড়তে যাওয়া এমন জলভাত হয়ে যায়নি। ভীষণ কাণ্ডকারখানা ছিল সব। কত নেমন্তন্ন, কত কান্নাকাটি, কত বিলি বন্দোবস্ত, কত বিদায় সম্বর্ধনা, কত উপহারপ্রাপ্তি, কত স্মারক বিনিময়। যেন জন্মের মতো বিদায়। অথচ আজকালই যারা বিদেশ যায় নব্বুইভাগ জন্মের মতো চলে যায়। তখনকার দিনে নব্বুইভাগ দেশে ফিরে আসতো। কিন্তু ওই যে প্রথম তিন বছর দেখা হতো না? সেই বিচ্ছেদটা ছিল খুব বড়। এখন তো ফি-বছর মাইগ্রেটরি বার্ডদের মতোই বিদেশী ছাত্রছাত্রীরা দেশে আসে ফুচকা খেতে। এখন দিল্লি-বম্বেও যা, ইংল্যাণ্ড-আমেরিকাতে প্রায় তাই। বছরে একবার কলকাতায় আসা হয়। তুলিও আসবে। তুলির বাবার বেলায় তা সম্ভব হয়নি। একেবারে ডিগ্রি শেষ না-করে কেউ দেশে ফেরার কথা সে-যুগে ভাবতেই পারতো না। মাঝপথে আবার রাহা খরচ? দু'বার করে বিলেতে যাওয়ার খরচা? অচিন্ত্যনীয়।

তুলির বাবা যখন গেলেন, সবাই জাহাজে বিলেতে যেত। স্যুট তৈরি করাতে হতো মহম্মদ আলি থেকে। জুতো তৈরি করাতে হতো চীনেবাজার থেকে। সোয়েটার বোনাতে হতো, মোজামাফলার বোনাতে হতো, মাসিপিসি বৌদিদিদের দিয়ে। শার্টের জন্য লুজ আলাদা শক্ত কলার লাগতো। শার্টের গলায় সেটি আটকানোর জন্যে উঁচু লম্বা 'স্টাড' বোতাম লাগতো। জামার হাতায় লাগাতে হতো কাফলিঙ্কস। ঠাণ্ডার জন্যে মোটা ইণ্টারলক গেঞ্জি লাগতো, আর লম্বা পা পর্যন্ত উলের আণ্ডারওয়্যার।

তার আবার আহ্লাদী একটা নাম ছিল, লং জন। হাতের জন্যে দস্তানা বুনে দিতেন মাসিমা পিসিমারা। তারপর বিলেত গিয়ে সেসব কোথায় হারিয়ে যেতো। কিনতে হতো চামড়ার দস্তানা; ফারের লাইনিং দেওয়া। কমলারঙের উলের কুটকুটে মাংকিক্যাপ কেউই কখনো পরেনি কেমব্রিজে। কিন্তু সবারই ট্রাংকে ছিল একটা করে।

উঃ। কী ঠাণ্ডাই লেগেছিলো কেমব্রিজ পৌঁছে। তুলির বাবা, কুণাল, চোখ বন্ধ করতেই দেখতে পেলেন কে. পি. ন্যানডির মুখটা। গম্ভীর, গোলগাল, সোনালি ফ্রেমের চশমা, কালো কালো আহ্লাদে চেহারা, টিপটপ থ্রিপিস স্যুট পরনে, তার ওপর আণ্ডারগ্রাজুয়েটের কালো আলখাল্লা গাউন চড়ানো। পায়ের জুতো চকচক করছে। মাথায় হ্যাট। গলায় কলেজের মাফলার। কুণালের মনে হয়েছিল ওর ওই সাজগোছের মধ্যে স্পষ্টত হ্যাটটা রীতিমতো স্পেশাল—অন্য ছাত্ররা টুপি পরলে ক্যাপ পরে, 'বেরে' পরে। হ্যাটটা ছাত্রদের প্রিয় নয়। আর থ্রি পিস স্যুটটাও তোলাই থাকে, ছেলেরা খুব কমই পরে। লেকচারে যেতে তো পরেই না। ইনি পরে আছেন।

—"হ্যাল্লো, আয়্যাম কে. পি. ন্যানডি ফ্রম ক্রাইস্টচার্চ কলেজ—ইউ?" হাত বাড়িয়ে দিল গোলগাল কালোকোলো ছেলেটি। পরনে থ্রি পিস সুট। আর আণ্ডারগ্রাজুয়েটের গাউন। হ্যাণ্ডশেক করতে পেয়ে কুণাল যেন ধন্য হয়ে গেল। কী করে যে কৃতজ্ঞতা জানাবে ভেবে পেল না। ইংরিজিতে বলবে? না বাংলায়? কে. পি. ন্যানডিকে তো বাঙালিই মনে হচ্ছে। পুরো পাঁচদিন হয়ে গেল এসেছে কেমব্রিজে —এই প্রথম বাঙালি দেখল কুণাল।

—"আয়্যাম কুণাল ঘোষ ফ্রম ট্রিনিটি কলেজ।"

—"ওয়েলকাম টু কেমব্রিজ। ফ্রম ক্যালকাটা?" কুণাল আবার থমকে গেল। না, সে খাস কলকাতার ছেলে নয়। মফঃস্বলের। যদিও প্রেসিডেন্সির ছাত্র।

—"ফ্রম প্রেসিডেন্সি কলেজ।" বলে দুদিক সামাল দেয় কুণাল। "আপনি?" বলে ফেলেই মনে মনে জিব কাটে।

—"আয়্যাম ফ্রম জেভিয়ার্স। ক্যালকাটা।"

—"আপনি বুঝি বাংলা জানেন না?"

—"জানব না কেন? বলি না।"

—"বলেন না?" কুণাল হাঁ করে থাকে। "কেন বলেন না?"

—"এদেশে এসেছি, এদেশের ভাষাই তো বলা উচিত। নয় কি? হোয়েন ইন রোম বি আ রোমান। তুমিও ডোন্ট স্পিক ইন বেংগলী, চেঞ্জ দ্য হ্যাবিট—", কুণালের এটা পছন্দ হলো না। তার যে বাংলা বলবার জন্যে প্রাণ ছটফট করছে। "এখানে আর বাঙালি ছাত্র নেই? কলকাতা থেকে আরও অনেকে আছে নিশ্চয়ই? প্রেসিডেন্সি থেকেই তো বেশ ক'জন এসেছে গত কয়েক বছরর মধ্যে।"

কুণালের কথার কোনো উত্তর না দিয়ে পকেটে দু হাত থাবড়ে থাবড়ে কুণালের দিকে কিছুক্ষণ চোখ সরু সরু করে চেয়ে থাকলেন কে. পি. ন্যানডি। "প্রেসিডেন্সি? উঁহু প্রেসিডেন্সি বলে তো মনে হচ্ছে না। কী পড়তে এদেশে এসেছ?"

BanglaBook.org

—"ফিজিক্স।"

—"নিউটনের কলেজ বলেই বুঝি ফিজিক্স পড়তে হবে?"

—"না, ঠিক তা নয়—ট্রিনিটিতে নেহরু পড়েছেন, তাছাড়া"—হঠাৎ কুণাল কথা ঘোরায়—"আপনি? আপনি কী পড়েন?"

—"আমি পড়ি হিস্ট্রি।"

—"অক্সফোর্ডে গেলেন না কেন? হিস্ট্রি তো শুনেছি..."

—"ওসব শোনা কথা রেখে দাও তো?" কে. পি. ন্যানডি দিব্যি বাংলা বলতে লাগলেন।

—"এখানেই কি কম পণ্ডিত আছেন ইংরিজি ভাষা ও সাহিত্যের? যত মর্ডান স্কলারশিপ সব এখানেই হচ্ছে, বুঝলে? অক্সফোর্ড ইজ স্টিল মেডিঈভ্যাল—এখনও। বস্তাপচা—" বলে কে. পি. এতক্ষণে সিগারট কেস বের করলেন পকেট থেকে। সোনার। এবং লাইটারও বেরুল। রনসনের। কিন্তু কুণালকে অফার না করে নিজেই ধরিয়ে, সিগারেট কেস পকেটে ভরে ফেললেন কে. পি. ন্যানডি, এবং লাইটারও। কুণাল অসম্ভব বিরক্ত হলো। একি অসভ্যতা রে বাবা? কলকাতার ছেলেরা তো কখনো এরকম করে না? কুণাল কলকাতাতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে এসেছে। এই মালটিকে একটু সাবধানে নজরে রেখে মেপে নিতে হবে—ভেবে নিল সে। এতটা কৃপণ চট করে দেখা যায় না। সদ্য আলাপ হওয়া কুণালকে, একটা সিগারেট পর্যন্ত অফার করল না? আশ্চর্য তো। একলা একলা খাচ্ছে। একটা হিন্ট দিতে কুণাল দু হাতু পকেটে গুঁজে কাঁধ গোল করে বলল

—"ওফ কী প্রচণ্ড ঠাণ্ডাটাই পড়েছে।"

—"আরো পড়বে। নদীটা জমে যাবে। এ তো কিছুই না।" ধোঁয়া ছাড়ল কে. পি.।

—"ওরে বাবা। তার মানে? ঠাণ্ডা নদী জমে বরফ হয়ে যাবে?"

একগাল ধোঁয়া ছেড়ে কে. পি. বললেন—"একদম বরফ হয়ে যাবে। সলিডিফাই করবে।"

—"নৌকো আর চলবে না? পাল্টিং হবে না?"

—"নাঃ, পাল্টিং-ফাল্টিং সব বন্ধ। হেঁটে মেরে দেওয়া যাবে এপার ওপার। ব্রিজেও চড়তে হবে না।"

—"যাঃ। সত্যি? সাইকেল নিয়েও যাওয়া যাবে?"

—"যাবে। কত লোক সাইকেল চালাবে নদীতে।"

—"দেখতে পাবো?"

—"অবশ্যই। কেন পাবে না? চালাতেও পারবে।" দয়ার হাসি হেসে কে. পি. ন্যানডি বললেন—"আমি তোমাকে ডেকে নিয়ে যাবো। প্রতিবছরই ক্যাম নদী জমে যায়। স্রোতও বেশি নেই, গভীরও নয়, জমবে নাই বা কেন? অলমোস্ট স্টিল ওয়াটার তো? নামেই নদী। হুঃ।" তাচ্ছিল্যের হাসি হাসেন কে. পি. ন্যানডি। "হতো যদি গঙ্গা।"

BanglaBook.org

—"অত যে হাঁস—হাঁসগুলোর কী হবে? নদী জমে গেলে?" বোকার মতো বলে ফেলে কুণাল। কে. পি. ন্যানডি হেসে ওঠেন।

—"সিলি বয়। ঐ হাঁস? ওরা তো উড়ে যায় অন্যত্র। কলকাতার ওই জুগার্ডেনেই যায় তো? কত হাঁস আসে যে ওখানে শীতকালে, মনে নেই?"— "কিন্তু সে তো সাইবিরিয়া থেকে।" কুণালের অবাক স্বরের উত্তরে—"ওই একই হাঁস সব"—বলেন কে. পি. ন্যানডি।

তার কলেজ এসে গেছে—দুজনে কথা বলতে বলতে হাঁটছিল। কে. পি. সিগারেট খাচ্ছেন। কুণাল খাচ্ছে না। সিগারেটের অনেক দাম। কে. পি. স্পষ্টই রীতিমতো ধনীর সন্তান। কুণাল তা নয়। স্কলারশিপের টাকার অঙ্কটা খুব বেশি নয়। মাঝে মাঝে বাবুগিরি করা যাবে। কিন্তু সর্বদা যাবে না। সিগারেটটা অন্যের পয়সায় হলেই ভালো হতো। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই ছুটতে শুরু করলেন কে. পি.।

—"ও কী? ও কী? ছুটছেন কেন? ও দাদা—"

—"দশটা বাজে যে—দশটা! টেন-ও-ক্লক—"

—"তাতে কী?"

—"গেট বন্ধ হয়ে যাবে যে, তুমিও ছোটো। রান্-রান, কুইক্, নইলে পাঁচিল ডিঙোতে হবে, প্রকটর ধরে ফেললেই হেভী কেলেঙ্কারি"—ছুটতে ছুটতে গলির মোড়ে মিলিয়ে যান কে. পি.।

তুলির বাবা হঠাৎ আপন মনে হেসে ফেলেন।

—"বাবা, হাসছো কেন?" তুলি সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরে।

—"একটা কথা মনে পড়ে গেল।"

—"কী কথা?"

—"ওই, আমি যখন কেমব্রিজে যাই। তখন আমার একজন বাঙালি বন্ধু হয়েছিল, তার কথা। তোর মাকে জিজ্ঞেস করিস, তোর মা জানে তার গল্প।"

—"কী গল্প? আমি তো শুনিনি?"

—"সে শোনবার মতন এমন কিছু নয়।"

—"তবু শুনি? একা একা হাসবার মতন কিছু তো?"

—"কে. পি. ন্যানডি বলে একজন কলকাতার ছেলে ছিল, আমাদের চেয়ে দু'বছরের সিনিয়ার। সেই আমাকে কেমব্রিজ চেনাবার ভার নিয়ে নিয়েছিল নিজে নিজে—তারপর"—বলতে বলতে কুণাল আবার হেসে ফেলে।

—"তারপর? তারপর কী হলো? বাবা?" তুলি ছাড়ে না।

—"কে. পি. লোকটা ভালোই ছিল, কিন্তু বড়লোকের আদুরে ছেলে তো, বিশ্ব পৃথিবীর, বাইরের জগতের নিয়মকানুনগুলো ঠিক শেখেনি। একটু নিজের মধ্যেই নিজে, মানে নিজেকে কেন্দ্র করেই যত তার ভাবনাচিন্তার কাজকর্মের অভ্যাসটা ছিল—যদিও অন্যকে সাহায্য করার ইচ্ছেও কে. পি.-র কম ছিল না। কিন্তু তার

BanglaBook.org

ধরন-ধারণটা সবই একটু গুলিয়ে যেতো। একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল, তাই হাসছি। তবে কে. পি.-র কি একটা ঘটনা? কত্তো। প্রায়ই নানা গোলমালে পড়ে যেতো ছেলেটা। কামাক্ষীপ্রসাদ নন্দী নামটাকে সে সহজ করে কে. পি. ন্যানডি করে নিয়েছিল। এখন তার বিশাল ব্যবসা, কলকাতা-বম্বে-দিল্লিই করছে না কেবল, জাপান-হংকং-সিঙাপুর সর্বত্র উড়ে বেড়াচ্ছে। দু'খানা এক্সপোর্টের ব্যবসা, একটা নাকি চিংড়ি মাছ, একটা হচ্ছে ব্যাঙের ঠ্যাং। আর ফ্যামিলি বিজনেস তো আছেই। ছেলে দুটোকে এম. বি. এ. পাশ করিয়েছে আমেরিকা থেকে।"—"এরমধ্যেই তার ছেলেরা সব এম. বি. এ. পাশ করে গেল? তাদের বয়েস কত, বাবা?" তুলি ভুরু কুঁচকোয়। কিন্তু বাবার মুখে উত্তর ছিল রেডি।

—"ঠিক কত তা তো বলতে পারবো না। তবে হ্যাঁ, তোমাদের চেয়ে বড়ো। কে. পি. যখন ইংলণ্ডে পড়ত গেল তার আগেই তার বাবা মা বিয়ে দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। সম্ভবত শ্বশুরেরই খরচে পড়তে এসেছিলো কে. পি.। তখন এটার খুব চল ছিল না? শ্বশুরই বিলেত পাঠাত, পণের একটা ধরন ছিল ওটা। কে. পি. যখন কেমব্রিজে, তখন দেশে ওর একটি ছেলে হয়েছিল ও বিলেতে আসার পরে পরেই। আমার সঙ্গে আলাপের সময়ে প্রায় দু'বছর বয়েস সেই ছেলের। আর আমি তো সবে কলেজ থেকে বেরিয়েছি। তোমার মা তখন দেশেই এম. এ. পড়তে ভর্তি হলেন।" কুণালের মনে পড়ে কে. পি.-র স্ত্রী গ্রাজুয়েট নয় কিন্তু ডাকসাইটে সুন্দরী—আর কে. পি.-র চেয়ে ঢের বেশি বুদ্ধি রাখে বলেই মনে হয়। মাঝে মাঝে কুণালের দেখা হয় ওদের সঙ্গে। কখনও ক্যালকাটা ক্লাবে। কখনও এয়ারপোর্টে। আজকাল টাকপড়া কে. পি.-কে বেশ বয়স্ক, ভারিক্কি দেখায়, কিন্তু ওর বউটা, চন্দনা, তেমনিই চনমনে আছে। দুটো বড় বড় ছেলের যে সে মা —বড়ছেলের তো বিয়েও হয়ে গেল সম্প্রতি—তাকে দেখে মনেই হয় না। আরামের জীবন তো?

"ব্যবসায় সাফল্যই আজকের যুগে বেস্ট কেরিয়ার।" হঠাৎ বলে বসে কুণাল। —"এসব কথা থাক, বাবা। তুমি কেমব্রিজের গল্পটাই বল।" তুলি খেই ধরিয়ে দেয়। তুলির বাবার এই এক দোষ হয়েছে, গল্প করতে করতে খেই হারিয়ে ফেলেন, অনেকটা দিদুর মতোই।

"হ্যাঁ, কেমব্রিজে তো গেলাম। দিদির ওখানে এক বান্ধবী ছিলেন। তাকেই দিদি লিখে দিয়েছিল আমার জন্যে দস্তানা,স্নো-বুট, ওভারকোট, মোটা সোয়েটার, এইসব কিনে দিতে। ইন্দুদি গুজরাটি মেয়ে, ওখানে রিসার্চ করছিলেন। আমাকে নিয়ে যত্ন করে সব কিনে টিনে দিলেন। ইন্দুদিই আমাকে মোটামুটি দেখাশোনা করতেন লোকাল গার্জেনের মতো। কে. পি.-কে তিনি চিনতেন না। আমিই একদিন আলাপ করিয়ে দিলাম। কে. পি. বলল, "গুজরাটি? গুজরাটিজ আর অল বানিয়াজ। আই অ্যাম অলসো আ বানিয়া, বেঙ্গলি বানিয়া। উই আর কলড গোলড বানিয়াজ; উই ডিল উইথ গোলড।"

BanglaBook.org

তাতে ইন্দুদির খুব আহ্লাদ হলো বলে মনে হলো না। তিনি কলেজে থাকেন না, বাইরে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকেন রান্না করে খেতে সুবিধে হয় বলে—নিরামিষাশী থালা তখনও এমন সহজে চালু হয়নি ইংলণ্ডে। কে. পি. বলল—"ভেজিটেরিয়ান? হাঃ হাঃ হাঃ, ওনলি কাউজ আর ভেজিটেরিয়ান। উই, প্রপার বেঙ্গলিজ আর স্ট্রিক্টলি ননভেজিটেরিয়ান।" শুনে ইন্দুদি আরো রেগে গেলেন। ইন্দুদিরা মোটেই বানিয়া নন। তাঁরা আর্যসমাজী। বাবা পুণায় সংস্কৃতের পণ্ডিত। নিরামিষাশী হলেও এসব জাত-পাতের বিরুদ্ধে ইন্দুদির মতামত খুব প্রবল। পরের দিন ইন্দুদি আমাকে একা ধরে বলেই দিলেন, "কে. পি. ভালো সঙ্গী নয়। ওর সঙ্গে বেশি মিশবে না। ওর ভুলভাল মূল্যবোধ তোমার মধ্যেও ঢুকবে। কুকথা, কুসঙ্গী—কুকাজে প্রবৃত্ত করে। অ্যাভয়েড হিম।" আমি ইন্দুদিকে বলতে চাইলুম যে কে. পি. খুব বুদ্ধিমান নয় বলেই ওরকম উলটোপালটা কথা বলে বোধহয়— কিন্তু নিজেও তো তখনও ওকে ভালো চিনি না, তাই বলা আর হলো না।

"ইতিমধ্যে কে. পি. তার কলেজের রুমে একদিন আমাকে চায়ের জন্যে নেমন্তন্ন করেছে। বিকেলে চায়ে নেমন্তন্ন, বা আফটার ডিনার কফিতে ডাকার খুব চল ছিল কেমব্রিজে। আমি পৌঁছেছি, কিন্তু কে. পি.-র ঘরের দরজাই আর খোলে না। অথচ ভেতরে ধুপধাপ শব্দ হচ্ছে। বার বার নক করে লাভ হচ্ছে না। অভ্যন্তরীণ বিষম আওয়াজের ফলে তা শোনা যাচ্ছে না। শেষে খুব জোরে দরজায় থাপড়-ধাঁই করতে লাগলুম। ইতিমধ্যে দেখি আরও একটি ছেলে এসে দরজা ধাক্কা দিচ্ছে আমার সঙ্গে। এও কি চা খেতে এসেছে? চেহারা দেখে মনে হলো না। মনে হলো বরং ঘুমোতে ঘুমোতে উঠে এসেছে। এদিকে দুদ্দাড় শব্দ হচ্ছে প্রচণ্ড দরজা ধাক্কার আর ভিতর থেকে ছন্দে ছন্দে ধপাস ধপাস করে বেদম শব্দ আসছে। সে এক তুমুল কাণ্ড।" কুণালের সঙ্গে সঙ্গে তুলিও হেসে ফেলে।—"তারপর?"

—"এখনই হাসছিস কি? হঠাৎ দরজা খুলে গেল। কে. পি.-র পরনে গেঞ্জি, হাফপ্যান্ট। তখন এমন 'ট্রাকস্যুট'-ট্যুট ছিল না। অন্তত স্পোর্টসওয়ার্ল্ডের বাইরে তো চল ছিলই না। লোকে গেঞ্জি-হাফপ্যান্ট পরে ব্যায়াম করত। কে. পি.-র সর্বাঙ্গ ঐ শীতে ঘর্মাক্ত। সে দোর খুলেই বলল—'সেভেন্টি নাইন। ওয়েট প্লিজ। অলমোস্ট ডান।' বলেই দৌড়ে ফিরে গেল। মস্ত এক লাফে একটা সোফা, তারপর আরেকটা, তারপর আরেকটা—পেরিয়ে, ছুটে গিয়ে ফায়ারপ্লেসের ম্যান্টলপিসই ছুঁল। ফের এদিক ফিরে দৌড়ে এল—'এইটি-থ্রি' বলতে বলতে। তিনটে সোফা পার হয়েই যেই এইটি ফাইভ বলেছে অমনি অন্য ছেলেটা গিয়ে ওকে জাপ্টে ধরল। বলল, 'ইনাফ ইজ ইনাফ। হচ্ছেটা কী? এমন শব্দ করছো, বাড়ি কাঁপছে, নিচের ঘরে আমি ঘুমোতে পারছি না? আমার শরীর খারাপ। এক্ষুণি লাফঝাঁপ বন্ধ করো নইলে আমি কিন্তু কমপ্লেন করব।' কে. পি. অবাক হয়ে বললো—'এত শীতের মধ্যে আমি বাইরে ব্যায়াম করব কীভাবে? তাই ঘরের মধ্যেই প্র্যাকটিস করছি। কী সুন্দর করে সাজিয়ে নিয়েছি দ্যাখো সোফাগুলোকে? আমি তো দেশে চ্যাম্পিয়ন ছিলাম এই রেসটার

—প্রাকটিস না থাকলে হয়?' সাহেবটি খুব রাগী টাইপের ছোকরা ছিল—সে বলল, 'হয় কি হয় না সেটা প্রকটরই ঠিক করে দেবে তাহলে? আমার অনুরোধ যখন তুমি শুনবে না—আমাকে অসুস্থ শরীরে বিশ্রাম নিতে দেবে না। পাঁচশো বছরের পুরনো বাড়ির মধ্যে এমন লাফাচ্ছ, কখন কোন অংশ ভেঙে পড়ে তার ঠিক নেই। এক্ষুনি বন্ধ করো ইয়ারকি। ব্যায়াম করতে হলে জিমন্যাশিয়ামে যাও।' বকুনি খেয়ে কে. পি.-র মুখ চুণ হয়ে গেল। সে বারবার দুঃখ প্রকাশ করল। এবং আমাকে দেখে হাসি হাসি মুখে বলল, 'ভেতরে এসো।' কিন্তু চায়ের কথা কোনো উঠলোই না। আমিও নতুন গেছি, লজ্জায় মনে করিয়ে দিলুম না যে আমার চা খাবার নেমন্তন্ন আছে। বললুম উলটে—'চল না, আমরা কফি খেয়ে আসি একটু?' কে. পি. মহানন্দে থ্রি পিস স্যুট পরে তৈরি হয়ে নিল, আমিই তাকে উলটে কফি খাওয়ালুম বাইরে। তার মনেই পড়ল না আজ সে আমাকে চা খেতে নেমন্তন্ন করেছিল। কিন্তু আমিও তো প্রেসিডেন্সির ছেলে। ফেরার সময়ে বললাম—'কে. পি., এটাই কি কেমব্রিজের নিয়ম? কেউ যদি চায়ে আমাকে নেমন্তন্ন করে, তার মানে আমিই তাকে গিয়ে বাইরে খাওয়াবো?' কে. পি. খুব সরল। সে বুঝলই না কী বলছি। শেষে ভেঙে বললুম—'এই যে তুমি আমাকে চা খেতে ডেকেছিলে, কিন্তু খাওয়ালে না—এটাই কি এখানকার রকমসকম?' তখন কে. পি. খুবই লজ্জিত।

"—'আরে না না—এঃ ছি ছি—ছেলেটা এতই চেঁচাল, সব ভুলে মেরে দিয়েছি। তুমি কাল চা খেতে এসো।' আমি আর যাইনি বটে কিন্তু প্রশ্ন করেছিলুম ঘরের মধ্যে কেন অমন সোফার ওপর দিয়ে ঝাঁপ দিচ্ছিল। ও নাকি অবস্ট্যাকল রেস প্র্যাকটিস করছিল, শীতে বাইরে দৌড়োদৌড়ি হচ্ছে না তো, মাটি বরফে পিচ্ছিল, তাই। এদেশে অবস্ট্যাকল রেসটা তেমন বড় হয়ে কেউ খেলে না। কিন্তু কে. পি.-র খুব পছন্দ। ওর মধ্যে নাকি একটা জীবনদর্শনের ছাপ পায় ও। বিঘ্নের পর বিঘ্ন অতিক্রম করার আনন্দ।"

এরপরে একদিন ওর সঙ্গে দেখা হলো সন্ধ্যাবেলায়। কে. পি.-র মুখটা বিরক্ত।

—"কী ব্যাপার, কে. পি.?"

—আর বোলো না। আজ লণ্ডন যাচ্ছিলুম, একটা ইন্টারভিউ ছিল। জানোই তো আমি নানা কোম্পানীতে কভেনেন্টেড সার্ভিসের চেষ্টা করছি। এখান থেকে চাকরি নিয়েই দেশে ফিরবো—তা এমনই একটা বাজে টাইপের লোকের সামনে বসেছিলুম, ইন্টারভিউটাই মাটি করে দিলে।"

—"তার মানে?"

—"মানে আর কি। আমি ট্রেনে বসে বসে ইন্টারভিউ প্র্যাকটিস করছি—'গুড আফটার নুন।' ঘরে ঢুকেই বলবো তো? সামনের লোকটা অমনি উল্টে বললে 'গুড আফটার নুন।' যতবার আমি বলছি ততবার। সে তো গেল। তারপর আমি বলছি, 'আয়্যাম কে. পি. ন্যানডি ফ্রম ক্রাইস্টচার্চ', অমনি সেও বলল—'আয়্যাম এ ডাবলু বোলটন—মিসেলফ ফ্রম রেডিং'—উঃ সে এক জ্বালা। আমি যতই নিজের

BanglaBook.org

মনে প্র্যাকটিস করতে চাই সে ততই বাগড়া দ্যায়। ব্যাপার চরম হলো সিগারেট অফারে। যতবারই পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে নিজের মনে আমি মনে মনে ইন্টারভিউয়ার-এর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলছি, 'প্লীজ উড ইউ লাইক টু হ্যাভ ওয়ান?' অমনি লোকটা সবিনয়ে বলে—'নো থ্যাংক ইউ।' শেষে একবার হঠাৎ বেজায় ক্ষেপে উঠে বলল—'তোমাকে অন্তত সাতবার বলেছি গত দশ মিনিটে যে আমি সিগারেট চাই না, তবু তুমি একই জিনিস অফার করছ—প্রাণপণে আমি চাইছিলাম স্মোকিং ছাড়তে—কিন্তু তুমি জ্যান্ত ডেভিল হয়ে এসেছ, দাও দাও একটা দাও তাহলে—', বলে আমার অত দামী সিগারেট একটা তুলে নিল? অথচ সত্যি তো আমি ওকে অফার করিনি? মনে মনে প্র্যাকটিস করছি মাত্র। তুই তা বলে আমার দামী সিগারেট নিয়ে নিবি? কী অন্যায় বলো তো?" আমি তো কে. পি.-র দুঃখে হেসেই বাঁচি না। ট্রেনে ওর উলটোদিকের লোকটির জন্যে আমার অসীম করুণা হতে লাগলো।

ওদিকে তুলি হেসে গড়িয়ে পড়েছে।

—"বাবা, নিশ্চয় তুমি বানাচ্ছো। এরকম হতেই পারে না।"

—"পারে। সরল এবং আত্মকেন্দ্রিক হলে, খুবই পারে। কে. পি. ছেলে খারাপ তো নয়, অত্যন্ত ইমপ্র্যাকটিক্যাল, আর আত্মকেন্দ্রিক। অন্যের জায়গায় নিজেকে বসিয়ে ভাবতেই শেখেনি কোনোদিন। ওর বড় শালার জন্যেই ছেলেগুলো এমন দাঁড়িয়ে গেছে। কে. পি.-র হাতে পড়লে আর দেখতে হতো না। সেই ক্যাম নদীতে কী কাণ্ড করেছিল কে. পি.?"

—"বল না বাবা, ক্যাম নদীতে কী কাণ্ড করেছিল কে. পি.?"

—"কী কাণ্ড। আমি যে বেঁচে আছি আর কে. পি. যে বেঁচে আছে দুটোই মিরাকল।"

—"মানে? মিরাকুল মানে?"

—"ভীষণ শীত পড়ে গেছে তখনো। একদিন কে. পি. এসে বলল, 'চলো দেখবে ক্যাম নদী জমে গেছে।' নদী যে জমে বরফ হয়ে যেতে পারে তা কল্পনাও করতে পারি না তখন। তাড়াতাড়ি টুপি মাফলার দস্তানা-টস্তানা সেঁটে ওভারকোট পরে শীতে হিহি করতে করতে চললুম কে. পি.-র সঙ্গে। ক্যাম নদীর ধারে এক জায়গায় একটা সেতুর কাছাকাছি এসে কে. পি. আমাকে দেখালে—'ওই দ্যাখো।' দেখি সত্যি সত্যি কিছু ছোট ছোট বাচ্চা ছেলে নদীতে বরফের ওপর খেলা করছে। বরফ হয়ে জমে গেছে নদী। কে. পি. আমার মুগ্ধতা দেখে খুব তৃপ্তি পেল। বলল—'দেখবে? দ্যাখ তবে,' বলে দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল বরফের ওপর। এবং বরফ ফুটো করে সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমশ নীচে নেমে যেতে লাগলো। আমি ভেবেছি বুঝি এটা কোনো কায়দা দেখাচ্ছে। আমি দেখছি, হাসছি। হঠাৎ দেখি কে. পি. চেঁচাচ্ছে দু'হাত তুলে, 'দেখছো কী? আমি ডুবে যাচ্ছি, মরে যাচ্ছি, আই অ্যাম ডাইং! হেলপ! হেলপ!' আমিও ভীষণ ভয় পেয়ে বরফের ওপর

BanglaBook.org

নেমে পড়লুম, এবং সেই পাতলা বরফ ফেটে গেল, এবং আমি জলে পড়ে যেতে লাগলুম। কিন্তু পাড়ের লোকেরা আমার হাত ধরে টেনে তুলে ফেললো। কিন্তু কে. পি. দূরে! এমনই জোরে ঝাঁপিয়েছে কে. পি. যে নরম পাৎলা বরফের স্তর ফেটে গেছে। বাচ্চা ছেলেগুলো ভাগ্যিস ছিল? কোথা থেকে দড়ি ছুঁড়ে দিল, সেই দড়ি ধরে কে. পি. উঠে এল, সম্পূর্ণ ভিজে, ঠকঠক করে কাঁপছে। আমি ফাটা বরফের ওপর থেকে পাড়ের লোকজনদের গুণে চট করেই উঠে পড়েছিলুম ডুবে যাবার আগেই। কে. পি.-র সর্বাঙ্গে ক্যাম নদীর বরফ জল ঝরছে—সে উঠেই বলল—'দেখছ কি? গরম গরম জলে ব্রাণ্ডি গুলে আমাকে খাওয়াও দিকি এক্ষুনি, নইলে তো আমি নিউমোনিয়া হয়ে মরে যাবো।' লজ্জাশরমের প্রশ্নই নেই। ভাবটা যেন আমিই দায়ী। যেন আমিই ওকে জলে ঠেলে ফেলে দিয়েছি। অনেক লোকজন ছিল নদীর পাড়ে, কে. পি.-র কথা শুনে সবাই হেসে ফেলেছিল। কিন্তু কে. পি.-র বোকা বনে যাওয়ার লজ্জা তো তাতে ঢাকেনি?"

তুলি বলল, "ভাগ্যিস বলে দিলে। আমি বাবা কিন্তু কখনো জমে যাওয়া ক্যামনদীর ওপর শখ করে হেঁটে বেড়াতে যাবো না। অত সুন্দর পাড় থাকতে উইপিং উইলোর পাশ দিয়ে সবুজ ঘাসে না হেঁটে বেড়িয়ে বরফের ওপর কেনই-বা বেড়াব?" কুণাল বলল—"দেখিস! সাবধানে। সব জায়গায় ঘাস কিন্তু পাবলিকের জন্যে নয়। কেবল ফেলোরাই ওই ঘাসে চরে বেড়াতে অ্যালাউড। পাবলিকের জন্যে আছে পায়ে-চলার পথ। পাথর বাঁধানো নুড়ি বিছোনো রাস্তা। তোরা সেই পথে হাঁটবি, যখন তখন সবুজ ঘাসের মধ্যে নেমে পড়বি না কিন্তু। নিষিদ্ধ।"

—"যদি না নিজেই একদিন ফেলো হই"—বাক্যে গুছোতে গুছোতে মুখ ফিরিয়ে হেসে বলল তুলি—"অথবা কে. পি. ন্যানডি হই।"

নন্দন

BanglaBook.org

ভরতকথা

সন্ধ্যাবেলা, আলমারি খুলে বাজারের টাকা বের করে দিচ্ছি কাজের মেয়েটিকে। শোবার ঘরে বাইরের লোক কেউই আসে না। কানের কাছে হঠাৎ মোটা গলায় 'দিদি'। শুনে পেছন ফিরেই একটি উদ্যত চীৎকার গিলে ফেলি। কাজের মেয়ে রেণু "ও বাবা গো"—বলে আমাকে জাপটে ধরে। তার দোষ নেই।

ঘরের মধ্যে একটি মানুষ। নোংরা সবুজ চৌখুপি লুঙ্গি ঝুলছে হাঁটু অবধি, স্কার্টের মতো। বুক পেট হাঁ করে আছে। লোমশ হাত। বোতামহীন বুশশার্টটার একটা হাতা কাঁধ থেকে ছিঁড়ে ঝুলছে কনুইয়ের কাছে। এলোমেলো চুল, মুখময়

দাড়ি-গোঁফ। চোখে অত্যন্ত মিষ্টি একটি হাসি। সেই হাসি ঠোঁটেও ছুঁয়েছে। খালি পা। কর্দমাক্ত। গুণ্ডাকে লজ্জা-দেওয়া স্বাস্থ্য। আমি একে আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

গুণ্ডা? চোর? কী করে ঢুকল? ঠাস করে আলমারি বন্ধ করে বললাম—

"আপনি বাইরে গিয়ে বসুন, আমি আসছি। রেণু, তুমি ওকে বাইরে নিয়ে বসাও। এটা বসার ঘর নয়।"

"ওঃ, পার্দোঁ! এটা বেড়রুম? আই অ্যাম স্যরি।" লোকটি পর্দা তুলে বেরিয়ে গেল। রেণুও গেল পেছু পেছু। ভয় কেটেছে মনে হলো।

চাবিটা লুকিয়ে রেখে আমিও গেলুম।

"কী চাই?" লোকটি বসেছে। সোফাতে। আমার চা হাতে রেণু এ-ঘরের মধ্যে পর্দার পেছনে লুকোলো। অর্ধভুক্ত চা-টা শেষ করতে বলে রেণু নানান ইঙ্গিত করতে লাগলো। আমি কাপটা হাতে করে নিয়ে ফিরে এলাম। লোকটি বলল—"কী খাচ্ছেন দিদি? কফি?"

"না, চা। আপনি চা খাবেন?"

"অঃ। চাঃ। নাঃ, আমি ঢের খেইচি। এইমাত্র হাওড়া থেকে চা খেয়ে এলুম। আমি ভাবলুম কফি। ক্যাফে-ও-ল্যে। কফি আছে?"

রেণু পর্দা তুলে মাথা নেড়ে জানাল, নেই।

ভদ্রলোক বললেন—"ও, নেই? থাক। তবে কিছুই খাব না। খান, আপনি চা খান।"

"আপনি কোত্থেকে আসছেন?" রেণু পর্দার ওপার থেকে কর্তব্য করলো। সাহস পেয়েছে।

"হাওড়া থেকে।"

"আপনার নাম কী?"

"দিদি আমাকে চেনেন। আমি আসতুম দিদির কাছে দশ বছর আগে। তাই না, দিদি?"

মুখটি খুবই মিষ্টি। হাসিটা চেনা চেনা। কথার সুর ঠিক ৪/৫ বছরের শিশুর মতো। ঢোক গিলে এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে। ফলে ভুলভাল জায়গায় শ্বাস ফেলে। যেখানে সেখানে যতি। আমার দিকে চেয়ে আছে। আমি চিনি? আমি চিনি না। কিন্তু ও তো দেখছি চেনে।

"দিদি, আমার সঙ্গে একটু গল্প করবেন?"

"আজ্ঞে?"

"মানে অনেকদিন পরে আপনার কথা মনে পড়লো। পড়তেই আমি বেরিয়ে চলে এলুম হাওড়া থেকে। রাস্তা চিনতে একটুও অসুবিধে হয়নি। যদিও দশ বছর আসিনি। কিংবা পাঁচ বছর। ঠিক মনে নেই।"

"আপনি কিছু খাবেন?"

BanglaBook.org

"আজ্ঞে না। খেয়েদেয়েই বেরিয়েছি। আমার খাদ্যের প্রয়োজন নেই। মের্সি বোক্যু। আমার দরকার আছে অবশ্য অন্য তিনটি। বলবো? দেবেন?"

"বলুন না। দেখি, যদি পারি।"

"আমাকে তিনটি জিনিস দিতে হবে। এক, দেড় মিটার শক্ত দড়ি। সোয়া মিটার হলেও হবে। দুই, বাথরুমে ১৫ মিনিট সময়। তখন দরজা ধাক্কা দিলে চলবে না। আর তিন নম্বর, একজোড়া চটি। খালি পায়ে আসতে খুব কষ্ট হয়েছে। খালি পায়ে ফিরতে পারবো না। এই তিন নম্বর জিনিসটা ধার নিচ্ছি। ফেরত দেব। ব্যাস। নাথিং মোর। বিয়্যাঁ। ফিনি।" মিষ্টি হাসলো।

কথার শেষে বুকের সামনে দুটি হাত দরজা খোলার ভঙ্গিতে দুদিকে সরানো —এতে, আর কথায় কথায় ফরাসি বলায় কার কথা যেন মনে পড়ে যাচ্ছে—খুব চেনা কেউ—

"আপনি কি একটা ইশকুলে পড়াতেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। চন্দননগরে। ফ্রেঞ্চ শেখার ইন্টারেস্ট সেইজন্যেই হয়েছিল। মনে নেই? ওই থেকেই তো ফ্রেঞ্চ ক্লাসে ভর্তি হওয়া। আপনার ভায়ের সঙ্গে যেখানে আলাপ।"

"আর আপনি পড়ান না?"

"না, পাঁচ বছর বেকার। দে ফাউণ্ড মি আনফিট ফর এনি রেগুলার জব।"

"তাই? শরীর খারাপ হয়েছিল বোধহয়?"

"শরীর? নাঃ। শরীর খারাপ হয়নি।"

ডান হাত দিয়ে নিজের মাথায় টোকা মারলো—"মাথা।" সঙ্গে মধুর হাস্য।

"ও!" কয়েক মুহূর্ত কথার খোঁজে বেবাক বাতাস হাতড়ানো।

"আপনি ফ্রেঞ্চ-চর্চাটা রেখেছেন?"

"কোথায় আর? আপনার কাছ থেকে মোসে মাশির বইটি নিয়ে গেলাম তারপর থেকেই—"

"দিদিমণি—", রেণু পর্দার আড়াল থেকে নিঃশব্দে ইঙ্গিত করে, "খেদিয়ে দিন। খেদিয়ে দিন।" হাত নেড়ে নেড়ে দেখায় রেণু।

"উনি কী বলছেন আপনাকে? দিদি?"

"কিচ্ছু না। আপনি কি বলছিলেন?"

"বলছি যে, আমি কিছুই পড়ছি না। আপনার ভাই ফ্রেঞ্চ পড়ছে?"

"পড়ছে। মাঝে সেও ছেড়ে দিয়েছিল প্রায় ছ' সাত বছর।"

"ফাউণ্ড আনফিট?"—চোখে সিরিয়স উদ্বেগ।

"ওইরকমই বলতে পারেন।"

"ফ্রেঞ্চ ইজ আ ডেঞ্জারাস গেম।"

"তা বটে।"

BanglaBook.org

"দিদি, আপনার সঙ্গে একসঙ্গে বসে আজকে আমি একটা কবিতা পড়বো বলে এসেছি।" সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একটা ছেঁড়া ঠোঙার মতো কিছু বের হয়।

"কিন্তু এখন আমি খুব ব্যস্ত যে—"

ছেঁড়া কাগজটা টেবিলের ওপর বিছিয়ে মন দিয়ে পরিষ্কার করে টেনে টেনে সোজা করতে করতে ছেলেটা বলে—"ব্যস্ত হলেই বা—এটা তো আর রোমাঁ নয়। ছোট্ট কবিতা। বেশি সময় নেবে না।" কাগজটা সমান হলে, আমার দিকে বাড়িয়ে দেয়—

"এই কবিতাটা আপনি কি পড়েছেন? রনে শার-এর—"

তাকিয়ে দেখি গুজি গুজি অক্ষরে খুবই অস্পষ্ট জড়ানো হাতের লেখায় সত্যি সত্যি লেখা আছ—লা ত্রিসতেস দেজ ইললেৎরে দঁলে তেনেব্র দে বুতেই। ল্যাঁ কিয়ে ত্যুদ আঁপের সে পতিব্ল দে শাররোঁ। লে পিয়েস দ্য মনেই দঁ লা ভাস প্রফঁদ।...ছ'টা লাইন।

এমন সময় দরজা খুলে শিবুর প্রবেশ। পরনে সাফারি স্যুট। হাতে ব্রিফকেস। অফিস ফেরৎ। ওপরে উঠেই চমৎকৃত। সোফায় সেই ছেলেটা বসে আছে। আমি এপাশে দণ্ডায়মান। পাহারাদারের ভূমিকায় পর্দার ওপাশে রেণু উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। শিবু দৃশ্যটা দেখল। তারপর বলল, "এটা কে—?" ছেলেটি শংকিত হয়ে ওঠে।

"আমি? আমি তো দিদির চেনা লোক। আমি তো হাওড়া থেকে প্রায়ই আসি দিদির কাছে। দিদির সঙ্গে আমার দরকার আছে। তাই না দিদি?"

"দিদি, আপনি একে চেনেন?" শিবু চ্যালেঞ্জ জানায়। আমি যারপরনাই লজ্জিত। তোতলামি করছি। ছেলেটি কাঁদো-কাঁদো।

"বলুন তো? বলুন তো ওঁকে দিদি। উঃ, দেখুন না কেমন কচ্ছে!" শিবু কিছুই করেনি। শুধু তাকিয়ে আছে।

"চিনি, চিনি।" আমি বলে ফেলি।

"চেনেন?" শিবু অবিশ্বাসের ভ্রূভঙ্গী করে। "চেনেন, তো ওর নাম কী?"

"নাম? উনি চন্দননগরে একটা ইশকুলে পড়াতেন। আর ফ্রেঞ্চ পড়তেন দীপংকরের সঙ্গে। হাওড়ায় ওঁদের বাড়ি—"

"হাওড়ায় কোথায়? শালকে? রামকেষ্টপুর? কদমতলা? পঞ্চাননতলা? বল্লেই হলো হাওড়া?"

"বেলিলিয়াস রোডের কাছে—এম. সি. ঘোষ লেনে থাকি। তাই না দিদি?"

"দিদি জানেন না। আমি জানলেই হবে। আপনি উঠুন। উঠে পড়ুন।"

"সে কি? আমার কবিতা?"

"কবি-তা?" শিবুর আত্মবিশ্বাস এবারে একটু স্খলিত।

BanglaBook.org

"দিদির হাতে।"

"দিয়ে দিন, দিয়ে দিন।"

আমি তাড়াতাড়ি দিয়ে দিই। রেণুও পর্দার আড়াল থেকে হাত নেড়ে দিয়ে-দিতে উপদেশ দেয়।

"এবার যান।"

"যাব কেন? আমার জিনিসগুলো?"

"কিসের জিনিস?" শিবু অবাক।

"দিদি জানেন। দিদি দেবেন। হ্যাঁ।"

"কি দেবেন দিদি আপনাকে?"

"একটুকরো দড়ি—একজোড়া চটি—আর বাথরুমে পনেরো মিনিট।" শিবু শুনেই শিউরে ওঠে—

"দড়ি? না না, ওসব দড়ি-ফড়ি হবে না—দিদি। দড়ি-ফড়ি দেবেন না। যেন—"

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো ছেলেটি। তারপর সেই ছোট শিশুর মতো ঢোঁক গিলে গিলেই বলতে লাগলো—"কেন? ভয় পাচ্ছেন? গলায় দড়ি দেব? দূর। বি লজিক্যাল। যে সুইসাইড করবে, সে চটি চাইবে কেন? চটি পায়ে দিয়ে স্বর্গে যাবার কোনো দরকার হয় না। তাছাড়া, যে সুইসাইড করবে, সে ধারও চায় না। ধার শোধ করবে কখন তাহলে? আমি সুইসাইড করব না। অন্য দরকার আছে। ভয় পাবার কিছু নেই।" সান্ত্বনার অভয় মুদ্রা ছেলেটির হাতে। চোখে হাসি। শিবু এবার একটু থতমত। আমি বলে ফেলি—

"আচ্ছা—শায়ার দড়ি হলেই হবে?" লজ্জায় ঘেন্নায় মাথা নত করে ফেলে ছেলেটি—বলে—"এঃ ছি ছি! শায়ার দড়ি? কেউ ভদ্রলোককে ওসব দেয়? বেশ ভালো দেখে লাকলাইন দড়ি নেই?"

রেণু ছুটে গিয়ে সন্দেশের বাক্স বাঁধা দড়ি এনে পর্দার পেছন থেকে অফার করে।

"এতে হবে?"

"এঃ ছি ছি। একে কি দড়ি বলে? এ তো সুতলি। ওতে হবে না। দেখি, বরং ওই পাজামার দড়িই দেখি।"

লক্ষ্য করলাম 'শায়া'টা 'পাজামা' হয়ে তবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। ঘর থেকে একটা পেটিকোট এনে তার দড়িটা খুলতে চেষ্টা করছি, দেখি দড়িতে গিঁট দেওয়া, খুলছে না—

"ব্লেড দেবো? না কাঁচি?"—বলে ওঠে ছেলেটি।

"আছে, সঙ্গে?" ততোধিক দ্রুত শিবু বলে।

"না। ঘর থেকে খুঁজে এনে দিতাম।"

"থাক। তার দরকার নেই।"—ইতিমধ্যে রেণু কাঁচি এনেছে। পেটিকোট দড়িশূন্য

BanglaBook.org

হয়েছে। ছেলেটি বললো—"ভেরি স্যরি। আপনার কত অসুবিধে করলাম। ওই পাজামাটা আপনি এখন কিছুদিন পরতে পারবেন না। কিন্তু আমার খুব উপকার হলো। জামার বুকটা খোলা থাকলে ঠাণ্ডা লাগবে। ফাল্গুন মাসেও হিম পড়ে। নিমোনিয়া হয়।"

"আপনি জামা আটকাবেন? তবে দড়ি দিয়ে কেন? সেফ্‌টিপিন দিচ্ছি। এঁটে নিন।"

জামাটি বুকের ওপর টেনে, দুই কপাট জুড়ে সমান করে, খিল তুলে দেবার মতো, দড়িটি বগলের নিচ দিয়ে বুক-পিঠে এক প্যাঁচ ঘুরিয়ে এনে ঠিক সামনে বাঁধলো।

"ও কি? ও কি? ওটা বুকে বাঁধা থাকবে কেন? সেফ্‌টিপিন—"

"থাকবে, থাকবে। আমার যে কিমোনো পরা অভ্যাস আছে। আমি তো মাঝে মাঝেই জাপান যাই, তখন খুব কিমোনো পরি। এবার বাথরুমে।" ছেলেটি বাথরুমের দিকে দৃষ্টিপাত করে।

"নিচে ইনডিয়ান আছে—এটা ওয়েস্টার্ন—আপনার যেটা প্রয়োজন?"

"আমার কোনোটাই প্রয়োজন নেই। আমি তো স্নান করবো। বেশ করে দিনের শেষে একবার স্নান না করলে—", ছেলেটা হাসতে থাকে।

"চলুন, চলুন, সামনেই টিউবেল আছে। আমি টিপে দিচ্ছি।" শিবু ধমক দেয়।

"ওতেই চলবে। চটি চাই এবারে। চটি কই?"

"চটি? আপনার পায়ের চটি কোথায় পাব? দীপংকরের একটাই চটি। সেটা পায়ে সে বেরিয়ে গেছে। আমারও একটাই চটি, সেটা পরে রোজ আমি চাকরিতে যাই।"

"ওটা কার? ওই যে—?"

একটা আনকোরা নতুন নিচু হাইহীল চটি—কোলাপুরী—মেয়ের জন্য এনেছি সদ্য পঁয়ত্রিশ টাকা দিয়ে—দিল্লি থেকে কিনে। বেচারা একদিনই পরেছে।

"আমার ছোটো মেয়ের। ওটা হাইহীল।"

"হোকগে। এখন ইউনিসেকস পোশাক।"

পা গলাতে শুরু করে দিয়েছে। প্রাণপণে শিবু বোঝাচ্ছে। ওটা তার মাপের নয়, পায়ে ঢুকবে না। পা কেটে ছিঁড়ে যাবে, আরো কষ্ট হবে—সে বুঝবে না। পরবেই। অবশেষে শুধু আঙুলগুলো ঢুকলো। ব্যাজার হয়ে শিবু বলল, "সিঁড়ি দিয়ে পড়ে যাবেন। চটি খুলে ফেলুন। এখানে আছাড় খেয়ে পড়লে, কে আপনাকে হাসপাতালে দেবে?"

"বেশ।" মুহূর্তে চটি খুলে দুহাতে করে বুকের কাছে তুলে নেয় ছেলেটি। ছেঁড়া বুশশার্টের বুকে শায়ার দড়ি বাঁধা। হাঁটু পর্যন্ত লুঙ্গি। মুখে মিষ্টি হাসি। গোঁফ দাড়ি। আমার ভয়ানক মায়া হয়।

"কীভাব যাবেন? দাঁড়ান, একটু আপনার বাসভাড়াটা দিয়ে দিই"—

BanglaBook.org

"আছে। আছে। প্ল্যাঁ দরজঁ।"

"তবু নিন। দুটো টাকা রাখুন। বাসে করে বাড়ি চলে যান। আর কোথাও যাবেন না।"

"চটি পরে যেন বাসে উঠবেন না। চাপা পড়ে যাবেন।" শিবুর উপদেশ, "বরং চটিটা রেখে যান।"

"মের্সি ব্যকু"—টাকাটা মুঠো করে নিয়ে অবহেলায় পকেটে রাখে। রনে শার-এর কবিতার সঙ্গে।

"চলুন, চলুন।" শিবু তাড়া দেয়।

"দিদি, মোসে-মাশির সেই বইটা—"

"মাসি-পিসি কিচ্ছু দরকার নেই—আগে বাড়ুন দিকি।"

"দেখুন এই চটিদুটো আমি নেকসট উইকেই ফেরৎ দিয়ে যাব—"

"থাক থাক, ও-চটি আর ফিইরে দিতে হবেনি—ও আপনি নে যান গে—আর এসোনি বাবু ইদিগে—" হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে রেণু পর্দা ছেড়ে বেরিয়ে এসে আমার মেয়ের নতুন চটিটা ওকে দাতব্য করে দেয়। এই উদারতার কারণ খুঁজতে অসুবিধা হয় না। যাতে সে আর না আসে। অনেকেই পাগল ভয় পায়। রেণুও তাদের অন্যতম। এটা ভয়ের মহত্ত্ব।

"সত্যি দিদি? দিয়ে দিচ্ছেন? এ চটিজোড়া তো আনইউজড। একেবারে নতুন।"

"তা হোগ্গে, যাগ্গে।" রেণু বলে। কিন্তু তার কথায় পাগল ভোলে না।

"দিদি দিচ্ছেন কি? দিদি?"

"হ্যাঁ ভাই। আপনি রেখে দিন।

হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে উঠে ছেলেটি মাটিতে হাঁটুজানু হয়ে বসে পড়ে। "দিদি। এই করুণা আমি জীবনে ভুলবো না।" চটিজোড়া মাথার ওপরে ধরে বলে—"আমি ভরত। আপনি রামচন্দ্র। আমি আপনার পদাশ্রিত ছোটোভাই। এই চটি আমি মাথায় করে রেখে দেব। আমার দিদির স্নেহের দান বলে। এ আমি কোনোদিন পায়ে দেব না। এই কাইনডনেস-এর কোনো তুলনা হয় না—যা চেয়েছি সব পেলাম। স--ব। দড়ি, চটি,—উঃ-কী সৌভাগ্য—"

"এবার চলুন। টিউবেল টিপে দিচ্ছি, মুখ হাত ধুয়ে নিন। চানটা বাড়ি গিয়েই সারবেন—"

শিবু তাগাদা দেয়। চটি মাথার ওপরে দুহাতে ধরে এক-পা এক-পা করে সিঁড়ি দিয়ে ছেলেটি শিবুসমেত রাস্তায় নেমে যায়।—দরজা বন্ধ হতে রেণু বেরিয়ে আসে। বলে—"উফ! দিদির ভায়েদের জ্বালায় তো আর পারিনে। কোথাকার উদমাদ পাগোল—সেও বলে, দিদি আমারে চেনে। বাজার যেতে যেতে আত হয়ে গেল। আর কিছু থাকবে?"

আমার এবারে সত্যি সত্যিই মনে পড়ে গেছে ছেলেটার নাম। প্রদীপ।

BanglaBook.org

প্রদীপ গুইন। এই প্রত্যহের চাকরির রুক্ষ পৃথিবী ওর জন্য নয়। ওর জন্য ফুল, কবিতা, ঝর্ণার অবসর। ঠিকই হয়েছে। ও এখন ফুল, কবিতা, ঝর্ণাধারার অনিঃশেষ ছুটির চাকরি পেয়ে গিয়েছে। আমরা কেউ ওকে বিরক্ত করতে পারব না। শিবু শত চেষ্টাতেও ওকে ঠেকাতে পারবে না। আজ সন্ধ্যায় সে ভরত। হাওড়া আজ অযোধ্যাপুরী।

আলোকপাত, ১৯৮৬

দেশে যাওয়া

১

আগে তিন বছরে একবার। এখন প্রতি বছরেই একবার করে দেশে যাই। অথচ এখন মাও নেই, বাবাও নেই, শাশুড়িও নেই। শ্বশুরকে তো চোখেই দেখিনি, যেমন দেখিনি ভাসুরকেও। বড়জা ছিলেন, তা তিনিও চলে গেছেন। যাঁরা পথ চেয়ে বসে থাকতেন, তাঁরা যতদিন ছিলেন ততদিন ক্ষমতা ছিল না। এতদিনে বছর বছর যাবার মতো অবস্থা হয়েছে, সস্তা টিকিটপাতিও হয়েছে নানারকমের, অথচ এখন আর কাদের কাছে যাবো। তবুও যাই। কলকাতার কাছে যাই।

সেটা ছিল চিঠি লেখার যুগ। তখন এত কথায় কথায় টেলিফোনের ব্যাপার ছিল না। বিদেশে ফোন করাকে বলতো ট্রাংককল। কেউ মারা গেলে কিংবা চাকরির ইন্টারভিউ থাকলে লোকে ট্রাংককল করতো। টেলিগ্রামের চেয়েও জরুরি কিছু হলে। আর এখন? কথায় কথায়। ওয়ার্ল্ড কাপে ক্রিকেট জিতেছে, তো ফোন করে বন্ধুদের সঙ্গে আহ্লাদ কর। এমনটি আগে ভাবাই যেত না। লোকের হাতে এখন কত টাকা। আর কারুরই কোনো সময় নেই আর। দেশেও সবাই হঠাৎ যেন খুব বড়লোক হয়ে গেছে। ছোটদের হাতেও ক্যাশ থাকে। আমাদের ছোটবেলায়, যখন এদেশে পড়তে এলুম তিরিশ বছর আগে, তখন এমন কাঁচা টাকার ছড়াছড়ি দেখিনি। যখনই দেশে যাই দেখি গয়নার দোকানে ভিড় উপচে পড়ছে—সেটা বিয়ের মাস হোক, বা না-হোক। আগে কোনোকালে স্যাকরার দোকানে এমন ভিড় হতো না, দুপুরে স্যাকরারা বসে বসে মাছি তাড়াত। অথচ এদিকে সোনার দর দুশো টাকা ভরি থেকে চার হাজার টাকা ভরি হয়েছে। এবং খুন-রাহাজানি-ডাকাতি-ছিনতাই এসব অপরাধ এমনই বেড়েছে যে কেউ আর সোনাদানা গায়ে দেয় না। ঘরেও রাখে না। তবে এরা এত গয়না-গাঁটি গড়াচ্ছে কেন? রাখছেই বা কোথায়? ব্যাংকের ভল্টে রাখবার জন্যে গয়নার কী দরকার—সোনার বাট রাখলেই হয়। মজুরি বেঁচে যাবে। আজকাল যখন দেশে যাই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে পারি না, এত ভিড়। চারিদিকে

দোকান। চারিদিকেই ক্রেতা আর বিক্রেতা। সবাই দর কষছে। দরাদরি চলছে। পুরো কলকাতা শহরটাই যেন একটা বিরাট বাজার। কলেজ স্ট্রীট থেকে দর করতে-করতে গড়িয়াহাট অবধি পৌঁছে যাবো। খুড়োর কলের মতো। অথচ আমাদের কলকাতা এরকম ছিল না। আমি সেই কলকাতাটাতে যতই ফিরতে চেষ্টা করি, সেটা আমার কাছ থেকে ততই দূরে সরে যায়।

"শ্রীচরণেষু বাবা" বলে এখন বিলেত থেকে কেউ চিঠি লেখে না। যদিও "কল্যাণীয় খোকা" বলে কলকাতা থেকে বিলেতে এখনও চিঠি যায়। "প্রিয়তমাসু" বলে কি এখন সাগরপার থেকে নীল খাম আসে কলকাতাতে? নাকি ফোনে "হ্যালো", "হাই" হয়েই ফুরিয়ে যায়?

প্রতি বছর ছুটে যাই। ছেলেমেয়েদের অন্তত দশটা দিনের জন্যেও নিয়ে যেতে চেষ্টা করি, চার হপ্তা যদি না পারি। দাদু দিদিমা ঠাকুর্দা-ঠাকুরমা আর কেউ নেই যাঁরা আদর করবেন, বুকে জড়াবেন—তবু নিয়ে যাই। আত্মীয়স্বজন তো অনেকে আছেন। সবাই ডাকেন। সবাই আসেন। কিন্তু আমার আজকাল দেশে যেতে ভালো লাগে না। জয়ন্তকে বলেছি পঁচানব্বইতে ওরা যায় যাক, আমি কিন্তু আর যাচ্ছি না। আমি বরং অন্য কোথাও পরে ছুটি করতে যাবো। গ্রীণ আইল্যাণ্ডে। কিংবা কাছে, মেক্সিকোয়। দেশে? না, আর নয়।

যে-জন্যে ছুটে যাই, সেটা তো পাই না। যা পাই, সেটা একদম চাই না। কত কী যে শিখলুম। কত কিছুই যে বুঝলুম। মানুষেরা একদম পালটে গেছে কলকাতাতে। অন্য জাতের মানুষ হয়ে গেছে। আমরা সেই তিরিশ বছর আগে চলে এসেছি বলে আর পালটাইনি। তিরিশ বছর আগের কলকাতাটাই আমরা বুকের মধ্যে যত্ন করে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। সেটাই টাইম ক্যাপসুলের মতো সীলড হয়ে তোলা রয়েছে স্মৃতির সিন্দুকে। আর সেই ছবির সঙ্গে আজকের কলকাতার কোথাও একফোঁটা মিল নেই। ওইসব ১৯-শতকী সাহেবদের হাতে আঁকা কলকাতার-দিল্লীর সব ছবির মতন। আবছা একটা প্রতিচ্ছবির কাঠামো আছে মাত্র।

আগে যখন তিন বছরে একবার দেখা হতো, কলকাতার লোকেরা বলতো, "কী যে করছিস তোরা, সাতসমুদ্দুর তেরো নদীর পারে পড়ে আছিস। কী হবে ওখানে থেকে, ঘরের ছেলে-মেয়ে ঘরে ফিরে আয়। বুড়ো বাপ-মা পড়ে আছে —এত লেখাপড়া শিখলি, ডাক্তারি পড়লি, দেশের কাজে লাগাবি না?" তখন খুব রাগ হতো। কে বলেছে সর্দারি করতে? আমাদের মা-বাবা, আমরা বুঝবো। তোমাদের পয়সায় ডাক্তারি পড়েছি? আসলে হিংসে, হিংসে। আমরা বিলেতে আছি তো, তোমরা দেশে পড়ে আছো, তাই চাও সবাই দেশে মুখ গুঁজে ছোটো হয়েই থাকুক। বাইরে খোলামেলায় গিয়ে বেড়ে উঠছে, তা প্রাণে আর সইছে না। দেশে আমাদের এই রোজগার হতো? এমনি স্ট্যানডার্ড অব লিভিং হতো? বাবা-মাকে যে এত টাকা পাঠাতে পারছি, একসঙ্গে থাকলে সেটা সম্ভব হতো? মনে মনে এইসব কুকথা

BanglaBook.org

বলে উত্তর দিতুম। মুখে বলতুম—"এই তো একটা ভালো কাজ পেলেই তো ফিরবো।" এমনি করতে করতেই ক্যানাডা। ব্যস। আর ফেরা হলো না। বড্ড ভালো চাকরি। কিন্তু প্রতি বছর যাবার সুযোগ হলো। হলে কি হবে, ততদিনে মা-বাবা চলে গেছেন। শাশুড়িকে মাত্র একবারই ক্যানাডাতে এনেছিলাম অবশ্য—তারপর তিনিও। অবশ্য তিনি অন্তত ছেলের বাড়ি গাড়ি সুইমিংপুল চোখে দেখে গেছেন। এখন যখন দেশে যাই—আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সবাই একবাক্যে বলে—"খুউব ভালো আছো ভাই, বাইরে আছো বেঁচে গেছ।" কারুর ছেলে এবার S A T দিচ্ছে, কি মেয়েটা G R E দিচ্ছে, কি M A T T দিচ্ছে, কিছু না কিছু দিচ্ছেই, যাতে তারা স্বর্গে আসতে পারে। আমেরিকাতে পড়তে পারে। ডলারে রোজগার করতে পারে। তারপর তারা দেশে ফিরল কি না-ফিরল, বুড়ো মা-বাপকে দেখল কি না-দেখল সেসব নিয়ে ভাবনা নেই। ছেলেমেয়েরা আমেরিকায় পড়তে না-গেলে মা-বাপের সমাজে স্টেটাস থাকে না। দেশে যারা থাকে, তারা যেন কেবল নিরুপায় বলেই থাকে, মনেপ্রাণে তারা সাহেব হতে চায়। ছেলেমেয়েরা বাংলা পড়ে না, যদিও কলকাতা শহরে জন্মেছে এবং অন্তত ষোলোবছর ধরে হয়েছে—বাংলা বলে ঠেকে ঠেকে, ভাঙা ভাঙা সুরে, যেন অজানা ভাষায় কাজ চালাচ্ছে। আমরা মাঝে মাঝে বলি, রিটায়ার করে শান্তিনিকেতনে বাড়ি কিনে থাকবো। কিংবা নরেন্দ্রপুরে বাড়ি বানিয়ে থাকবো। বন্ধু-বান্ধবই বলো, আত্মীয়স্বজনই বলো সকলেই চমকে ওঠেন—হাঁ হাঁ করে বারণ করেন। "পাগল হয়েছো? পাগল হয়েছো? সুখে থাকতে ভূতে কিলোচ্ছে তোমাদের? অমন সুন্দর বাড়ি, ফুলের বাগান, সুইমিংপুল-টুল ছেড়ে এই ধুলো ময়লা রোগের ডিপোর মধ্যে এসে থাকবে কেন?"—অথচ এই কলকাতা শহরেরই তিনশো বছরের জন্ম-জয়ন্তী উৎসব হলো, মালুম—কলকাতাকে ভালোবাসে তবে কারা? যারা থাকে না, তারাই কি?

সত্যি বলছি কলকাতায় আসতে এখন আমার কান্না পায়। না, ধুলো নয়, লোডশেডিং নয়, ফ্লু-ডায়ারিয়া-ম্যালেরিয়া নয়। মানুষ।

BanglaBook.org

২

কেন? কান্না পায় কেন? শুনি কান্না অমন পেলেই হলো? বাবা-মা কি কারুর চিরকাল থাকে? না, শাশুড়ির চিরকাল বেঁচে থাকাটাই ভালো? কেন, আমরা কি নেই? মাসি, পিসি, খুড়ী, দাদা, বউদি? বোন, বোনাই? ভাই, ভাজ? ননদ, নন্দাই? ভাগ্নে-ভাগ্নী, ভাইপো-ভাইঝি, বোনপো-বোনঝি, নাতি-নাতনী, জা-দেওর, দেওরপো-দেওরঝি?—বড়জা-ভাসুর নাই থাকুন, তা বলে ভাসুরপো-ভাসুরঝিও কি মরে গেছে? বলি, যত্ন-আত্তি কি পাও না? কেন, কোনটা করতে বাকী রেখেছি আমরা, আর সবাইকে যখন কাঁসার থালাবাসনে খেতে দিই, তোমাদের জন্যে কি সেই বিয়েতে পাওয়া জার্মান ডিনার সেটটা বের করি না? তোমাদের পাছে আহ্লাদী বিলিতি শরীরে ধকল লাগে, সেজন্যে কি ঝালমশলা সব বাদ দিয়ে দিনের পর দিন সিদ্ধিমাছের

স্টু, আর চিকেনের রোস্ট খাই না বাড়িসুদ্ধ সকলে? হতে পারে শুকনো, কিন্তু অসময়ের চোদ্দ টাকা কেজির টোমাটো দিয়ে সুপ তৈরি করে ধরে দিই না সামনে? তোমাদের ছেলেপুলের মুখে দিশি খাবার রুচবে কিনা কে জানে। তাই সকালবেলার জলখাবার (ব্রেকফাস্ট) করে দিই হোটেলের মতন করে। কেন, দুধ, কর্নফ্লেক কলা ডিম পাঁউরুটি মাখন সাজিয়ে দিই না টেবিলে? আর বিকেলবেলার জলখাবার পরোটা আলুর চচ্চড়ি ধরে দিই কি? আজ্ঞে না। কেক প্যাটিস বিস্কিট স্যাণ্ডউইচ আজ শশার, কাল ডিমের, পরশু কলার। এক-একদিনে এক একরকম। রাত্তিরে বৌমা রকম রকমের বিলিতি রান্না করে খাওয়ায়। রুটি বেগুনপোড়া ডিমের কালিয়া দিই কি আমাদের মতন? ফিশ অ্যাণ্ড চীপস, সুপ, স্যালাড, পুডিং—সমস্ত বিলিতি খানা। তোমাদের কল্যাণে আমাদেরও আর শুকতো ডাঁটাচচ্চড়ি মুড়িঘণ্ট খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। কোনো রান্নায় ঝাল পড়ে না, মশলা পড়ে না। দিশি মিষ্টি নাকি বেশি মিষ্টি, রোজ রোজ কেক কিনে আনে না আমার ছেলে তোমাদের জন্যে? দেশটাকে যতখানি সাধ্যি বিলেত বানিয়ে ফেলতে চেষ্টা করি তোমাদের যাতে আরাম হয়।

রোজ রোজ জল ফোটানো কি মুখের কথা? খাবার জলে সর্বদা খানিকটা অন্তত ফোটানো গরমজল মিশিয়ে দিই—কাঁচা জল কক্ষনো দিই না। তোমরা ওদেশে চায়ের চাইতে কফি বেশি খাও বলে আগুনের মতো দাম দিয়ে নেসকাফে কিনে এনে যত্ন করে চিনি ঘুঁটে ঘুঁটে এসপ্রেসো কফি তৈরি করে দিই—ঘুঁটতে ঘুঁটতে নড়া ধরে যায়, তবু ফেনা না তুলে ছাড়ি না কী জন্যে? না, তোমরা খুশি হবে। কিন্তু খুশি কি আর আছে বাপু তোমাদের শরীরে? পাবেতেই বোঁচা নাক উঁচিয়ে আছো। বললে কিনা, "ওটা আর দিও না, আমরা কফিতে দুধচিনি খাই না।" শোনো কথা? যাই করি, মন আর ভরাতে পারি না। ওদেশে ধোপাটোপা নেই, ইস্তিরি করার সময় হয় না, সবাই নাইলনের কাপড় পরে। ডাক্তার মানুষ তোমার তো আরও সময় নেই। তাই গার্ডেন ভ্যারিটি, ওনলি বিমল এইসব দামী দামী চমৎকার নাইলন সিলকের শাড়ি কিনে দিই পুজোর জন্যে—এত সুন্দর যে দেখে টেরও পাবে না শাড়িটা দিশি না বিলিতি—তবু হাঁড়ি মুখে হাসি ফোটে না। যদ্দিন থাকে, মায়ের বস্তাপচা সব ধনেখালি আর টাঙ্গাইল। সুতোর শাড়িগুলো পরে পরে বেড়াবে, চক্ষুশূল হয়ে। নতুনগুলো পরবে না। তারপর দ্যাখো, মাঝে মাঝে বাচ্চাদের ভালো লাগবে বলে বাইরে খাওয়াতে নিয়ে যাই, বিলিতি খাবার, হট ডগ, হ্যামবার্গার, পিজা। কিন্তু মন কি ওঠে? এমনই অসভ্য ছেলেটা, আমাকে তো বড়টা বলেই বসলো—"দিস ইজ নট আওয়ার কাইণ্ড অব হট ডগ—সামথিং এলস।" আর ছোটটা তার মাকে বলল—"ইজ দিস ভেজিটেবল বার্গার, মা?"—কী বলবো বলো, এত করার পরে যদি এমনটি শুনতে হয়। তোমরা বিলেতে নাকি রাম খাও না, হুইস্কি খাও—সেই শুনে উনি ওঁর অভ্যেসের জিনিস রাম না কিনে বেশি দাম দিয়ে হুইস্কি কিনে আনছেন। অথচ তোমরা ওটা মুখেও তোলো না, উনি একাই খেয়ে

মাতাল হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। তোমরা শুধু বিয়ার খাও। কী বলবো ভাই, যে-কটা দিন তোমরা দেশে বেড়াতে আসো, তোমাদের তো বেড়ানো, আমাদের কাজ বেড়ে যায়। তোমাদের আসা তো নয়, আমাদের সকলের সংসারেই তোলঘোল,—সে যেন এক পর্ব। পান থেকে চুনটুকুনি খসতে দিইনি—আজ এ-বাড়িতে নেমন্তন্ন খাচ্ছো, তো কাল ও-বাড়িতে। সব আত্মীয়স্বজনে মিলে কাড়াকাড়ি করে তোমাদের যত্নআত্তি করি আমরা। দূরে থাকো, মা-বাপ, শ্বশুর-শাশুড়ি কেউ আর এ জগতে নেই, আমরা না আদর করলে করবে কে? তা তোমাদের কি সে বোধটুকুও আর বাকি আছে?

শুনি তো লাখ লাখ টাকা প্রতি মাসে উপায় করছো, স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে ডাক্তারখানা খুলে বসেছো, একজন দাঁতের ডাক্তার, একজন মেয়েদের ডাক্তার —কালো টাকার নাকি হিসেব নেই। অথচ আসো তো দেখি খালি হাতে। একজনের জন্যে একটা এইটুকুন লিপস্টিক, আরেকজনের জন্যে এক শিশি আতর, আরেকজনের জন্যে একটা হাত-আয়না, কারুকে কলম, কাউকে কাঁচি, একটা শার্ট, বড়জোর একটা ওয়াকম্যান, তার বেশি তো কাউকে কিছু দিতে দেখি না। কত তো ইলেকট্রিকের জিনিস পাওয়া যায়—রেডিওগ্রাম, টু-ইন-ওয়ান, ভালো ভালো ঘড়ি, ভি-সি-আর, ছোট্টো ছোট্টো টিভিও হয়েছে আজকাল, গাড়ির জন্যে কার-টেলিফোন, কর্ডলেস, কত কী আছে। আনো তোমরা আমাদের জন্যে? বাচ্চাদের হাতে দুটো চকলেটের বেশি কিছুই ধরে দাও না, অথচ ইচ্ছে করলেই কী না পারতে। চারজনে বড় বড় আটটা স্যুটকেস ভর্তি করে কতকিছুই আনতে পারতে।

আমরা আমাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত করে করি। আর তোমরা যেটুকু নেহাৎ না করলেই নয়, সেইটুকুনি কর। কেউ যদি তোমাদের একটু হেলপ চায় তো অমনি হাত গুটিয়ে নাও। বড়দির ছেলেটা আমেরিকায় পড়তে যাবে, অ্যাডমিশান পেয়েছে, স্কলারশিপ পায়নি। এত ব্রিলিয়ান্ট ছেলে, একবার ঢুকে পড়লে ঠিক স্কলারশিপ পেয়ে যেত—বললুম তোমরা প্রথম বছরটা পড়াও, ও পরে চাকরিবাকরি করে তোমার টাকাটা শুধে দেবে। তা এমনই হৃদয়হীন চামার, স্পষ্ট বলে দিলে —"না বৌদি, সেটা সম্ভব নয়। ওকে বলো অন্য জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে, কোথাও না কোথাও ঠিক পেয়ে যাবে।" কেন, সম্ভব নয়, কেন শুনি? কিপ্টে বলে—আবার কেন? ছেলেটার ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিলি, তবু টাকাটা দিলি না।

এদিকে চালিয়াতি কত! আজ তাজ বেঙ্গলে একে খাওয়াচ্ছে তো কাল গ্র্যাণ্ড হোটেলে তাকে খাওয়াচ্ছে। আত্মীয়দের প্রত্যেককে একবার করে দামী হোটেলে খাইয়ে দেয়—যেন আমরা গরিব, ভিখিরি, কোনোদিন দামী হোটেলে খাইনি। মুখে বলে, "এখানে তো আমাদের ঘরবাড়ি নেই, ক্যালগেরিতে যেও, রান্নাঘরে বসিয়ে কুমড়োফুল ভাজা আর পুঁইশাকের চচ্চড়ি খাওয়াবো, বাগানের সব্জী।" আহা, বয়েই গেছে আমাদের হাজার হাজার টাকা খরচা করে পুঁইডাঁটা আর কুমড়োফুল খেতে ক্যানাডা যেতে। এখানে বসে যেন পাই না?— ওর নিজের ভাগ্নে নাকি বলেছিল

—"বালিগঞ্জে একটা ভাল ফ্ল্যাট আছে মামা, দশ লাখে দেবে বলেছে, টাকাটা দিয়ে দাও, তোমার কাছে তো কিছুই না, কিনে ফেলি।"

মামী নাকি তাকে বলেছে—"কেন সৌম্য, তুমি তো আর্লি রিটায়ারমেন্টে গোল্ডেন হ্যাণ্ডশেক প্ল্যানে চাকরি ছেড়েছো, তোমার হাতে টাকা নেই?"

ভাগ্নে বেচারার বয়সে হয়েছে, মামীর চেয়ে বয়সে বড়ই হবে, বিয়ে-থা করেনি, শ্যামবাজারের এঁদো গলিতে তার মন টেঁকে না। বিশাল বাড়ি—হোক না সাতপুরুষের ভিটে, ভাড়াটে গিজগিজ করছে। মামা-মামী এলে থিয়েটার দেখাতে নিয়ে যায় প্রত্যেক বছর। আইসক্রীম খাইয়ে আনে কোয়ালিটিতে। অথচ একটা পয়সাও দিল না। ছেলের পড়াশুনোর জন্যে, কি নিজের বসতবাড়ির জন্যে টাকা চাইবো না তো কি ঘোড়া খেলবার জন্যে টাকা চাইবো? এদিকে বিদেশে ওদের কত্তাগিন্নির রোজগারের টাকায় ছাতা পড়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকবার মোটা মোটা সোনার গয়না গড়িয়ে নিয়ে যায় এ. সরকার থেকে। ওসব দেশে এখনও গয়নাগাঁটি পরার চল আছে, কলকাতার মতন উঠে যায়নি। কিপটেমির কথা কত বলবো? ভাসুরঝির বিয়েয় ওরা বললে ছেলের টিভি আর ভি.সি আর-টা তুমি কিনে দাও। তা দিল কি? নাঃ। জামাইকে আশীর্বাদ বলে পাঁচশো-এক ডলারের চেক পাঠালে, তাতে শুধুই কালার টিভি হলো। কেন, হাজার ডলার দিতে পারতো না? তাতে টি ভি, ভি. সি. আর, ফ্রিজ তিনটেই হয়ে যেত। মেয়েটাকে অবিশ্যি আলাদা একটা আশীর্বাদ করেছিল। সোনার হার দিয়েছিল একটা—পাথর বসানো। তা সে তো দেবেই, কাকা-কাকী বলে কথা। তা হারটা ভারী আছে, মন্দ না।

'দেশে আসতে কান্না পায়।' মরে যাই। ন্যাকা কথা শুনলে গা জ্বালা করে। এত ভি আই পি ট্রিটমেন্ট আমাদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে আর কেউ পায়নি কোনোদিন। অন্তত আমি তো দেখিনি। সবাই যেন, ওদের কে কত বেশি আদরযত্ন করতে পারে—তারই কম্পিটিশান দিচ্ছে। অলকা তার নেমন্তন্নের দিন আটরকম পদ করেছিল। তাই সুমিতা তার নেমন্তন্নে বারোটা পদ করলে। আর মুনমুন তো চার রকমের শুধু মিষ্টিই করেছিল, পাঁচ রকমের মাছ। ওরা যখনই আসে দেশে, তখন আমাদের মধ্যে যেন পার্টি দেওয়ার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। কে কতজনকে ডেকেছে, কে কতগুলো পদ করেছে, কে ক' বোতল মদ খাইয়েছে—ওরা আবার ন্যাকামো করে কেবল বীয়ার খায়। এদেশের ওয়াইন নাকি ওদের মুখে রোচে না। আর জিন রাম হুইস্কি ভদকা ওরা খায় না। আর কেউ একটু সিগ্রেট খেয়েছে কি রক্ষে নেই—পাগলের মতো সেই তল্লাট থেকে অমনি ওদের বাচ্চা ছেলেদুটোকে সরিয়ে দেবে। ধারেকাছে নিজেরাও থাকবে না। অন্য লোকের মুখের সিগ্রেটের ধোঁওয়া নাক দিয়ে বুকে গেলেও নাকি ক্যানসার হয়ে যাবে। সিগ্রেটের ধোঁওয়া মানুষ-মারা বিষ। রাতদিন দেখতে পাচ্ছি কত লোক বিড়ি সিগ্রেট খাচ্ছে, আমরা মরে যাচ্ছি নাকি? হুঁঃ। রোগ-রোগ বাতিকও আছে বাবা ওদের। সত্যি। কেবলই জল ফোটাও, আর জিওলিন গেলো।

৩

কান্না পায় কেন? সকলেই তো আদর করে। রোজ রোজই নেমন্তন্ন, বন্ধুদের বাড়িতে একরকমের আড্ডা, আত্মীয়দের বাড়িতে আর একরকমের খাওনদাওন। তবু কেন কান্না পায়? বাড়াবাড়ি আমার? হতে পারে। কিন্তু যতবার যাচ্ছি ততবার আমার নিজের চেনা কলকাতাটা টুকরো টুকরো হয়ে, ধোঁওয়া হয়ে, বাষ্প হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমি না গিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে চাই যেটুকুনি এখনও আছে বুকের মধ্যে ভরা, সেই কৌটোর মধ্যে ভোমরা-ভূমরীর মতো।

এটা একটা অন্য কলকাতা।

এখানে বন্ধুদের বাড়িতে বেড়াতে গেলে চা সিঙাড়া ডিমভাজা আসে না—"কী নিবি? হুইস্কি, জিন, রাম?" এখানে সাধারণ সৌজন্য প্রকাশের ধরনটাই পালটে গেছে। 'বাঙালিবাড়ি' বলে বিশেষ কিছু বাকী নেই। উত্তরপাড়ায় মামাশ্বশুর-বাড়িতে তবু কিছুটা আছে—কিন্তু সেখানে বাথরুমের সমস্যা—তাই ওখানে থাকা যায় না। যেখানেই যাই, সবাই আপ্রাণ চেষ্টায় সাহেব হচ্ছে। আমরা থাকি বিদেশে বটে কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টায় বাঙালিয়ানা বজায় রাখতে চেষ্টা করি। ছেলেদুটো বাংলা শিখছিল না বলে বাংলা ইস্কুলে দিয়েছি। বনানীদির কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতও শিখছে ছোটটা—বড়টা তবল্য শিখছে জিম ব্রায়ানের কাছে। আর এখানে এসে দেখি এরা সবাই এম টিভি দেখছে। হার্ড রক আর হেভি মেট্যাল শুনছে। নিজেরা ব্যাণ্ডপার্টি বানাচ্ছে—উন্মত্তের মতো ওয়েস্টার্ন আধুনিক নিয়ে ব্যস্ত। ভারতীয় সঙ্গীতে কোনো উৎসাহ নেই। অবশ্য মেয়েরা রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখে, নাচ শেখে, আবার ইংরিজি গানও গায়, ইংরেজি নাচও নাচে। মেয়েরা দিব্যি দুরকম শিখছে। শাড়িও পরে, আবার মেমসাহেবের মতো সেজে বেরুলে চিনতেই পারবে না যে এ মেয়ে কালীঘাটের মহিম হালদার লেনে মানুষ হয়েছে। না, কলকাতার মেয়েরা খুবই আশ্চর্যরকম উন্নতি করেছে। বাড়িতে দোকান দিচ্ছেন আমাদের মা-মাসিরা, কোনোদিন ভাবতে পেরেছি? আজকের মা-মাসিরা ঘরে ঘরে দোকান খুলছেন। কাপড় বেচছেন, সালোয়ার কামিজ বেচছেন, রুপোর গয়না বেচছেন, এমনকী সিকিওরিটি সার্ভিস খুলে দরোয়ান ভাড়া দিচ্ছেন। মেয়েদের যেমন উন্নতি হয়েছে, ছেলেদের তেমনি অবনতি। পাছাপেড়ে ধাক্কা দেওয়া মুগার ধুতি পরনে, বুকে রেশমী দড়ি বাঁধা কাঁথার কাজ করা পিরান, জরীর কাজ করা নাগরা পায়ে, আর মদের বোতল বগলে। বেড়ালের বিয়ে দেওয়া, পায়রা ওড়ানো, এইসবই মানাবে ওদের এবার। বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে গেলে অবশ্য তবু দিশি খাবারটা মেলে, আত্মীয়স্বজনরা সর্বদাই "বিলিতি খানা" বানাচ্ছেন। এখানে সবাই কুকিং ক্লাসে যায়, আর "বিলিতি" রান্না শেখে। প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে গেল থার্ডক্লাস তথাকথিত বিলিতি রান্না খেতে খেতে। কোথায় একটু ডাঁটা-চচ্চড়ি চিবুবো, একটু সর্ষেমাছ খাবো, মুড়িঘণ্ট, ছ্যাঁচড়া, শুকতো, তা নয় স্টু, আর রোস্ট, বেকড় ফিশ, ফিশ অ্যাণ্ড চীপস। সকালে কোথায় একটু পরোটা আলুচচ্চড়ি জলখাবার খাবো, তা নয় কর্নফ্লেক্স, ডিম, রুটি এইসব যাচ্ছেতাই জিনিস। কি করবো, বলতেও পারি না, চোখেই দেখতে

পাচ্ছি কত কষ্ট করে এইসব বিলিতি খানার ব্যবস্থা হচ্ছে। ক্যানডায় অনেককাল হলো আমরা আর ইনস্ট্যান্ট কফি খাই না—ফ্রেশ কফি বানিয়ে নিই মেশিনে। এখানে নেসকাফেতে চিনি ঘুঁটে একঘন্টা খেটে ঠাণ্ডা একটা মিল্ক শেকের মতো জিনিস বানিয়ে দেন। না খেলেও খারাপ, খেতেও কষ্ট। দুধ-চিনি খাই না যে কফিতে আমরা আজকাল। শেষে বলতেই হলো—আর অমনি মুখ ভার হয়ে গেলো বৌদির।

বাইরে খাওয়াতে নিয়ে গিয়ে এমনই তেলেভাজা-হটডগ আর হ্যামবার্গার খাওয়ালেন যে দুদিন ধরে চোঁয়া ঢেকুর উঠে কষ্ট পেলুম। ববি তো খেয়ে বললে —"মা, এটা বুঝি ভেজিটেবল-বারগার?" এদেশে তো ভেজাল দেবেই—একটু মাংস, বাকিটা মোচা আর ব্রেডক্রাম্ব—কিন্তু দাম মাংসের নেবে। বাচ্চা ছেলের কথা হলে কি হবে, তার মামীর পছন্দ হয়নি। দোষও দিতে পারি না।

কিন্তু সমস্যা অন্যত্র। কেন যাবো দেশে? সন্ধ্যাবেলা কেউ কথা বলে না। সবাই তো টিভির সামনে আঠা দিয়ে আঁটা। মনে হয় গেলে বিরক্তই হয় লোকে। অন্য কোন সময়েই বা তাদের পাবো? রবিবার সকালেও টিভি, দুপুরেও টিভি—কলকাতায় কারুর আর বন্ধুবান্ধব দরকার নেই। আর যদি বা কথা বলবার সময় হলো (হয় না তাও নয়)। খাবার সময়ে খুবই গল্পগাছা হয়, মেয়েরা বলে কেবল কাজের লোকের সমস্যা, ছেলেমেয়েদের ইস্কুল-কলেজে ভর্তি হবার সমস্যা, আর শাশুড়ি-সমস্যা (শাশুড়িরা বলেন বউ-সমস্যা)। ছেলেরা বলে ফ্ল্যাট কেনার গল্প। কার কোথায় জমি কেনা হলো, কার ফ্ল্যাট কীভাবে উঠছে, বা উঠছে না, প্রোমোটারদের বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা, কার কত খরচ হচ্ছে, কোথায় সস্তায় জমি আছে, এইসব। এখন কলকাতা শহরে একটা ফ্ল্যাট, আর বাড়িনিকেতনে একটা বাড়ি। নতুবা কল্যাণীতে। এখন দেখছি আধুনিকতম প্ল্যানিং হচ্ছে দিল্লিতে একটা ফ্ল্যাট রাখা। কী টাকা সকলের হাতে। আগে কেবল স্বামীর রোজগারে সংসারে চলতো, এখন তো স্বামী-স্ত্রী দুজনেই রোজগার করে অধিকাংশ পরিবারে। হয় বৌ চাকরি করে, নয় ব্যবসা করে। কিছু না হোক গান শেখায়, গীটার শেখায়, বাড়িতে বাচ্চাদের ক্রেশ খোলে, কয়েকজনে মিলে "কিণ্ডারগারটেন" ইস্কুল অর্থাৎ নার্সারি খোলে। এম এ, এম এস-সি, পাস-করা বউ সকলের ঘরে, বাড়িতে বসে তারা টুইশানি করছে। হাজার হাজার টাকা ঘরে আসছে। ট্যাক্স ফ্রী। কেউ বসে বসে খায় না।

কিন্তু এত টাকা দিয়ে কী হচ্ছে? মেয়েরা দামী দামী কাপড় কিনছে। আজকাল গয়না দিয়ে তো ঐশ্বর্য বোঝানোর সুযোগ নেই, তাই পাঁচ হাজার টাকার শাড়ি, সাত হাজারী সালোয়ার কামিজ বিক্রি হচ্ছে। সেগুলো গায়ে চড়িয়ে যে যার নিজস্ব মূল্য জাহির করছে। আমি যত দেখছি ততই হাঁ হয়ে যাচ্ছি। এ তো কৃত্রিমভাবে বাড়ানো দাম। অথচ আমার মতন যারা আসছে নর্থ আমেরিকা থেকে, তারা ডলারে ঐসব দামী দামী জিনিস অনায়সেই কিনে নিচ্ছে—ফলে ওটাই ন্যায্য দাম স্থির হয়ে যাচ্ছে। দেশের লোকও তাই ওই দামেই কিনছে—পারছে কী করে?

আমাদের খানিকটা জমি আছে নরেন্দ্রপুরের ওদিকে। শ্বশুর নেই, ভাসুর নেই, দেওররা-ননদরা আছে—সব্বাই জোর করছে আমাদের ভাগের জমিটা ওদের ছেলেদের নামে লিখে দিতে।— "তোমারা তো ফিরবে না—ওই জমিটুকু মাত্র ন'কাঠা, কতটুকুই বা দাম হবে ডলারে, ওটা খোকনের নামে লিখে দাও। তোমার শ্বশুরের বড় নাতি। হলেই বা দৌত্তুর।" বড় ননদ বললেন। জা-ভাসুর নেই, ভাসুরপোরা আছে। তারা তো ধরেই পড়েছে—তাদের জমির লাগোয়াই আমার জমি, যদি দিয়ে দিই তবে আঠারো কাঠা হয়ে যায়, প্রায় বিঘেখানেক—ওরা চার ভাসুরপোয় ভাগ করে নেবে। তিনজন দেওরও আছে। তারা বলছে জমিটা তাদের দিয়ে দিতে। আমার স্বামীকে সবাই মিলে পাগল করে দিচ্ছে। আর বন্ধুরা বলছে—"কাউকে দিও না, পাগল? প্রোমোটারকে দাও। ফ্ল্যাটবাড়ি বানাবে। ন'কাঠা অনেকখানি জমি, ওতে বিরাট অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং হবে। তাতে করে যা তোমার রোজগার হবে, বুড়ো বয়সে দেশে এসে পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকতে পারবে। অবশ্য তোমরা তো দুজনেই ডাক্তার, ডাক্তারদের তো আমরণ রোজগার বন্ধ হয় না।"

এ এক নতুন কলকাতা, এখানে খালি কার কী নতুন গাড়ি হলো, কার কোথায় কতগুলো ফ্ল্যাট হলো, শাড়ি-গয়না, কাজের লোক—এ কী রে বাবা? এই নাকি কালাচারাল ক্যাপিটাল অব ইন্ডিয়া? দূর দূর—আর আসবো না। মাঝে মাঝে একটু থিয়েটার দেখি—উষা গাঙ্গুলি, কুমার রায়, রুদ্রপ্রসাদ,—একটু সিনেমা দেখি, একটু গান শুনি, একটু কবিতা পাঠের আসরে যাই—সে আর কতটুকু? একদিন "লেখকদের আড্ডা" বলে পরিচিত একটা আড্ডায় গেলুম, অনেক আশা নিয়ে। ও হরি, সেখানেও সেই রাম না হইস্কি, মারুতি না কনটেসা, টাটার কী একটা নতুন দারুণ গাড়ি করেছে, তার আলোচনা—সল্টলেকে ফ্ল্যাট, না কসবা কালিকাপুরের দিকে ফ্ল্যাট—শান্তিনিকেতনে বাড়ি, না কল্যাণীতে বাড়ি,— ছেলে আমেরিকায় পড়তে যাচ্ছে না মেয়ে আমেরিকায় পড়তে যাচ্ছে। আর ওই না এক ফ্যাশান হয়েছে ক্যানাডায় আর আমেরিকায় ছেলেমেয়ে পড়ানো—প্রত্যেকেরই ধারণা আমরা তাদের ছেলেমেয়ের যার যেটুকু টাকাকড়ি কম পড়ছে, সেটা পুরিয়ে দিতে পারবো। তারা কেউ অবশ্য বলে, কলকাতাতে রুপিতে এখনই পে করে দেবে,—কেউ আবার বলে, ছেলে পাশ করে, উপার্জন করে ধার শোধ করবে। যেন সবটাই সোজা পথ। পাশ করাও যত সোজা, চাকরি জোটাও তত সোজা। ধার শোধ করার মহৎ প্রবৃত্তি হওয়া তো আরো সোজা। আর না দিলেই বলবে—স্বার্থপর, কৃপণ। আমাদেরও দুটো ছেলে আছে, প্রাইভেট স্কুলে পড়ছে, ওরাও আজ বাদে কাল কলেজে ঢুকবে—সামনে খরচ নেই? সেটা বুঝলে তো?

দেখলে লজ্জা করে। যেভাবে সবাই মিলে নির্লজ্জের মতো নেমন্তন্ন খাওয়ানোর কম্পিটিশান দেয়, রীতিমতো লজ্জা করে। আমাদের ছোটবেলায় এটা ছিল না। বড়কাকা দিল্লি থেকে দুবছরে একবার আসতেন ঠাকুরমা সঙ্গে দেখা করতে। বাড়িতে উৎসবের বান ডাকতো। সবাই আসতো মিষ্টি নিয়ে, কাপড় নিয়ে। নেমন্তন্নও খাওয়াতো বড়কাকা-বড়কাকীমাকে। কিন্তু তার ধরনটাই আলাদা ছিল। সেটা 'কর্তব্য' ছিল না।

লোক-দেখানিপনাও ছিল না তাতে। আমরা যখন তিন বছরে একবার আসতুম তখনও আমাদের অভ্যর্থনা অনেকটা বড়কাকাদের নিয়ে আনন্দ করার মতনই ছিল। সবাই মিলে সারি সারি ট্যাক্সি করে পনেরোটা সীটে হিন্দি সিনেমা দেখতে যেতুম। এখন সেসব ভাবাই যায় না। সবাই ঘরে গোঁজ হয়ে বসে ভি সি আর-এ সিনেমা দেখছে, নইলে কেবল্ টিভিতে।

কান্না পাবে না? আত্মীয়স্বজন যখন যত্নআত্তির নামে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি করে, কে আমাদের কতটা বেশি খাতির করতে পারে, তাতে কার কাছে আমরা কতটা বেশি ঋণী থাকবো—এইসব ভেবেচিন্তে খাওয়ায়, কাপড়-চোপড় দেয়— তখন আর ওসব যত্ন নিতে ইচ্ছে করে? কোথায় দেবে বাংলা তাঁতের শাড়ি, সুতী হোক, সিল্ক হোক, তা নয়—এমনই সিনথেটিক কাপড় দেবে, যেন ড্রেস মেটিরিয়াল। এ দেশটা আর আমার ছেড়ে আসা সেই দেশটা নেই। লোকজনগুলো পালটে গেছে। তাদের মনের হদিস পাই না। সবাই ওরা আমেরিকান হয়ে গেছে মনে মনে। শুধু বিষয়-সম্পত্তি বোঝে, টাকাকড়ি দিয়েই মানুষকে বিচার করে। এই কলকাতা আমার চেনা কলকাতা নয়। বাঙালিরা আগে বলতো মারোয়াড়িরা ব্যবসায়ী জাত। আমি তো দেখছি বাঙালিরাও ব্যবসায়ী জাত—শুধু ব্যবসায় সুবিধে করতে পারে না বলে চাকরি-বাকরি করে। ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার প্রোফেসর এইসব হয়, কিন্তু মনে মনে কেবলই ব্যবসাদারির স্বপ্ন দ্যাখে। টাকা, টাকা, আরো টাকা। আর আমরা হচ্ছি সেই অশেষ টাকার উৎস নর্থ আমেরিকার বাসিন্দা। আমাদের কাছাকাছি এলেও হয়তো টাকার গন্ধ পাওয়া যায়।

আমাদের টাকাতে আমরা সকলের জীবনের সব সাধ-আহ্লাদ কেন মেটাচ্ছি না, এটা আমাদের অপরাধ। আমার ভাগ্নে কিরণ শ্যামবাজারের বাড়ি ছেড়ে নিউ আলিপুরে আধুনিক ফ্ল্যাট কিনতে চায়। বাড়ি বেচবে না, ভাড়াটে-সুদ্ধু বাড়ি কেউ কিনতেও চায় না। "মামু, তুমি ন'লাখ টাকা দাও।" ধারও নয়, দাও। অথচ আমরা যখন পড়তে যাই বিলেতে, বাবা-মার টাকা নিইনি। কিছুদিন চাকরি করে, প্যাসেজ মানি জমিয়ে তবে গেছি। ভাগ্নে কিরণ আমার চেয়ে বয়সে বড়, অথচ মামার কাছে টাকা চাইতে লজ্জা পাচ্ছে না। কি অদ্ভুত। কি আর বলবো—চারদিকে কেবল দাও দাও দাও। ওই নরেন্দ্রপুরের জমির দিকে সবার নজর।

ক্যানাডাতে বরং কাজকর্মের মধ্যে থাকি। সংসারেও কাজ থাকে, হাসপাতালেও কাজ থাকে। ব্যস্ততায় দিন কেটে যায় ঠিকই, কিন্তু এমন আত্মার পক্ষে অস্বস্তিকর আলোচনায় সময় কাটাই না। দেশে গেল আমার সত্যি কান্না পায়।

তাই বলছি, সামনের বছর দেশে যাবো না। মেক্সিকো, মরক্কো—যেখানে হোক একটা কোনো অচেনা জায়গায় বেড়াতে যাবো। যেখানে আমার দেশের লোক কেউ থাকবে না, যেখানে আমার কলকাতা নেই, যেখানে গেলে আমার কান্না পাবে না।

শারদীয় নবকল্লোল, ১৪০১

BanglaBook.org

বঁ ভোয়াইয়াজ
Bon Voyage!

'Riverview', Cambridge, USA

মাননীয় সম্পাদকমশাই,

পুজোর লেখা দিয়ে আসা হয়নি, দেখাও করে আসিনি, যদিও জানি আপনি ম্যালেরিয়া জ্বরে অত্যন্ত অসুস্থ—আপনি যদি জানতেন কী পরিস্থিতিতে আমি রওনা হয়েছি তাহলেই বুঝতেন কেন এ-বছরে এমনধারা হলো।

প্রথমত, খুব জল পড়ছিল পড়ার ঘরের ছাদ ফুটো হয়ে। কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না, কেউ বললে, "গোবর-সিমেন্ট গুলে ঝাঁটা দিয়ে বেশ করে লেপে দাও।" কেউ বললে, "পিচের কাপড় চাপা দাও।" কেউ বললে, "মেঝে খুঁড়ে ফেলে আবার তৈরি করো।" কেউ বললে, "টালি লাগিয়ে দাও ছাদের মেঝেয়।" গত কয়েক বছর ধরে আমি প্রত্যেকটাই করে দেখেছি। এবং প্রত্যেকটাই কিছুদিন কাজ করেছে। এখন তো সিঁড়ির নিচে সেইসব টালিই জড়ো করা আছে। (তারই মধ্যে কাঁকড়াবিছে বেরিয়েছিল)। টালিগুলো সব তুলে ফেলে আবার নতুন করে জলছাদ করেছিলুম কিনা বছর দুই আগে? তো পড়ার ঘরে জল পড়ে প্রচুর ক্ষতি হয়ে গেছে। অনেক কাগজপত্তর ভিজে গেছে। কিছুই পড়া যাচ্ছে না।

এ বছরে বাইরে যাব বলে গুছিয়ে-গাছিয়ে পুজোর লেখা অনেকগুলো শুরু করেছিলুম আগে থেকেই। যাবার সময়ে যাতে তাড়াহুড়ো না হয়। কিন্তু মারে হরি তো রাখে কে। এমনই জল পড়ল, গেল সব ধুয়ে মুছে—ফের শাদা পাতা হয়ে। বলে না, খোদা যব দেতা ছপ্পড় ফাড়কে দেতা। খোদা যখন শিক্ষা দেয়, সেটাও ছপ্পড় ফাড়কেই দেন, অন্তত আমার ক্ষেত্রে। ছাদ ফুটো হয়ে খাতাবই লেখাজোকা চিঠিপত্তর সব গেছে নষ্ট হয়। ওগুলো যত্ন করে লোহার সিন্দুকে রাখা উচিত ছিল ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির মতন। কি ভাগ্যি, দু'খানা থিসিস ছিল অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের—সেগুলো যে-তাকে ছিল সেই তাকটা ভেজেনি। সেই তাকের বইখাতাগুলো বেঁচে গেছে। সাধারণত যেসব বইপত্তর আমি রক্ষণীয় মনে করি না, সেগুলোই ওখানে রাখি। থিসিস তো ফেরৎ পাঠানোর জিনিস। হাহাকার-টাহাকার হয়ে যাবার পরে ভাবলুম যথাসাধ্য রক্ষা করি—অতএব যা যা ভিজেছিল, রোদে শুকিয়ে নিই। কিন্তু কাগজপত্তর তো কাঁথা নয়, যে রোদে দিলেই শুকিয়ে যেমন-কে-তেমন হয়ে যাবে? বইপত্তর প্রচুর ভিজেছিল, রোদে দিতেই পাঁপড়ভাজা হয়ে গেছে। পড়তে গেলে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেঙে আসছে। মন মেজাজ ভালো ছিল না। টাইপরাইটারটার ভেতরে কবে থেকে জল জমেছিল যে, কিছুই জানি না। এত ভারি ঢাকনাওলা রেমিংটন—তাতে জল ঢুকলোই বা কী করে—? সমস্ত হরফ জং ধরে নষ্ট হয়ে গেছে। মেকানিক বলে দিল, ওটা নাকি আর সারানো যাবে না।

কিন্তু রাখে হরি তো মারে কে? আমাকে চিরকালই হরি রক্ষা করে আসছেন। —একটি ভাই আছে আমার, কমল বলে, সে অনেকদিন পরে হঠাৎ এসে পড়ল তার দিদির খবর নিতে। এসে দ্যাখে জল-টল নিয়ে দিদি তো অকূল পাথারে। সান্ত্বনা দিয়ে কমল বলল: "কিচ্ছু চিন্তা নেই, আমার লোক দিয়ে সারিয়ে দেব দিদি। ওই ছাদের ফাঁকে ফাঁকে ইনজেকশন দিয়ে জল পড়া বন্ধ করে দেব—হাওড়ার সাবওয়েতে যেমন করেছিলাম।"

—"সাবওয়েতে? এটা তো ছাদ—"

—"সাবওয়েরও তো ছাদ থাকে? থাকে না?"

—"তা বটে। তো, কী যেন বললে, ইনজেকশান দেবে? ছাদকে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। ইনট্রাভিনাস ইনজেকশান।"

—"ছাদের আবার ভেইন আছে নাকি? না নর্দমার কথা বলছ?"

—"দূর। নর্দমা কেন হবে? ভেইন তৈরি করা হবে, পাইপ ঢুকিয়ে তার ভিতরে ওষুধ ইনজেকশন দেওয়া হবে—ব্যাস জল-টল পড়া সব বন্ধ। ও দেখতে হবে না, আপনি ওসব নিয়ে কিচ্ছু ভাববেন না দিদি, ওটা আমার কাজ। আপনি আপনার কাজ করুন।" কমল সাহস দিয়ে চলে গেল। তার লোক আসবে, আমাকে আমার কাজ করতে বলে গেল।

—কিন্তু আমার কাজ কি একটা?

আপনি বলবেন—"পুজোর লেখা", ডিপার্টমেন্ট বলবে—"খাতা? প্রশ্ন? টিউটোরিয়্যালের নম্বর?" আরও চারটে বিশ্ববিদ্যালয় বলবে— "থিসিস রিপোর্ট?" মাদ্রাজের পাবলিশার বলবে—"ইনট্রো কোথায়?" দিল্লির বলবে—"কমেন্ট কোথায়?" আর কলকাতা বলবে—কলকাতার তো বলার কথা শেষ নেই—আহা শেষ যেন হয় না কোনোদিন।

—মা বলতেন, "'লোক না পোক' বলতে নেই, 'লোক, না লক্ষ্মী'"—কলকাতার লক্ষ্মীশ্রী উথলে পড়ছে আমার বাড়িতে। অমুক ক্লাবের পঁচিশ বছর, অমুক গার্লস স্কুলের একশো পঁচিশ, অমুক লিটিল ম্যাগাজিনের চৌতিরিশ পূর্ণ, অমুকের পঞ্চান্ন বছর ধরে গান, গাওয়া হলো, তমুকের পঁয়তিরিশ বছর ধরে নভেল লেখা হলো, সব কিছুতেই কলকাতার আনন্দ, সব কিছু নিয়েই কলকাতার উৎসব। আর সবেতেই লেখকদের মাতব্বরি করা চাই। কিছু-না-কিছু বলা চাই। হয় টিভির সামনে গিয়ে বসে ধরনা দাও, নয় গড়িয়াহাটের মোড়ে খাটিয়া পেতে বসে চেঁচাও, নয় তো গড়ের মাঠে শালু খাটিয়ে—সর্বদাই কোনো-না-কোনো সৎ উদ্দেশ্য আছে, কত ফ্যাক্টরি বন্ধ হচ্ছে, কত পত্রপত্রিকা উঠে যাচ্ছে (আবার কত ফ্যাক্টরি শুরু হচ্ছে, কত নতুন কাগজ বেরুচ্ছে) সব ব্যাপারে নাক গলাও, প্রত্যেকটার জন্যে মতামত দাও —কাজের কি শেষ আছে? দিনরাত ঘন্টি বাজছে। হয় টেলিফোনের, নয় দরজার। মা বলতেন, "শ্যামের বাঁশি"—"তুই তো সারাদিন ঐ ঘন্টির ডাকেই আথালিপাথালি শ্রীরাধা।" সত্যি সত্যিই তাই শ্যাম রাখি না কুল। আপনি ভাবছেন এখন আমার

BanglaBook.org

হাতে অজস্র সময়, কেননা আপনি ভাবছেন এখন আমাদের ছুটি? উহুঁঃ। এ তো ছুটি নয়, ছুটোছুটি চলছেই। আজ পরীক্ষা, কাল ধর্মঘট, পরশু জনসভা। গরমের ছুটি মানে শুধু ক্লাসটাই বন্ধ, আর সমস্ত অ্যাকটিভিটিই খোলা।

বাড়িতেও প্রচুর অ্যাকটিভিটি—কমলের মিস্ত্রি লেগে গেল—বাঁশ-দড়ি, বালতি-কড়া, সিমেন্ট-বালি, সবই এল দেখলাম। ভেবেছিলাম কেবল বুঝি ছুঁচ, সিরিঞ্জ আর নল—আর ওষুধের ফাইল আসবে। ছাদের পলেস্তারা ফাটিয়ে ফেলা হলো। কিন্তু তাতে কোনোই শব্দ হলো না। অন্তত শোনা গেল না। কেননা পাশের বাড়িতে ভীষণ শব্দ হচ্ছে।

হ্যাঁ, পাশের বাড়িটা ভাঙা হচ্ছে। সামনের বাড়ি অলরেডি ভেঙে ফেলে দুটো হাইরাইজ উঠে গেছে। এবার পাশেও উঠবে। পাশের বাড়ি ভাঙাটা আমার আবেগপ্রবণ স্বভাবের পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হয়েছিল ঠিকই—একটা করে ঘা পড়ছে ওদের ছাদে, ছাদে তো নয়, যেন আমার বুকের মধ্যে—আমার বাল্যকালের যত্নে জমানো স্মৃতির পুঁজির ওপরে, —মা আর রাঙামামুর সারাদিনের কাজের শেষে রাত্তির বেলায় এ-বাড়ি ও-বাড়িতে জানলা ধরে দাঁড়িয়ে গল্প—আমার আর রত্নার দুটো ছাদে দাঁড়িয়ে ছুটির দুপুরে ঘন্টার পর ঘন্টা গোপন কথা—আস্তে আস্তে সহ্য হয়ে গেল শব্দটা। তারপর নতুন সমস্যা।

ইঁটপাটকেলগুলো ছিটকে পড়তে লাগল আমাদের গ্যারেজের ভাঙা টিনের ছাদের ওপর। বুড়ো গ্যারেজে একটা কচি গাড়ির বাস। অনেক সাধ্যসাধনা করছি, অতি মিষ্টভাষে (যতটা আমার ভাঙা গলায় ও রুক্ষ স্বভাবের পক্ষে সাধ্য) মিস্ত্রিদের অনুরোধ উপরোধ করছি একটা মোটাসোটা দেখে ত্রিপল চাপা দাও ভাইরা, যাতে ইঁট ছিটকে এদিকে না আসে। কে-কার কথা শোনে? হ্যাঁ, থাকতেন আমার মা, বাপবাপ বলে শুনত। আমি একটু ফ্যালনা টাইপের। আমিও যতই মিষ্টি করে ওদের বলি, ওরা ততই মিষ্টি হেসে আমাকে বলে—

—"না দিদি, পড়বে না, কিচ্ছু পড়বে না।"

—"পড়বে না মানে? পড়েছে তো?"

—"কে, কোথায় পড়েছে?"

—"ঐ যে। ওগুলো কী?"

নিজেই আকাশ থেকে পড়ে এবার অতি-সরল মিস্ত্রি-খাটানো তরুণটি।

—"ওগুলো? কী ওগুলো?"—তার চোখে অপার বিস্ময়।

—"ভাঙা ইঁট।"

—"আমাদের এখান থেকে তো পড়েনি দিদি, ওগুলো ওখানেই ছিল।"

—"ছিল? কোত্থেকে এল? অত চুনসুরকি সুদ্ধু? অত ইঁট বালি সিমেন্ট সুদ্ধু? এল কোত্থেকে?"

—"কোত্থেকে এল? তা আমি কী করে জানব বলুন? ওটা আপনারই বাড়ি।" খুবই যুক্তিযুক্তি কথা।

BanglaBook.org

তুমি কি করে জানবে। নিষ্পাপ হেসে ছেলেটি অন্যত্র চলে গেছে। সন্ত্রাসে পুনরায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। আমাদের বাড়িতে কারুর কোনো কথা শোনা যাচ্ছে না। এমনিতেই এ বাড়িতে একতলা চারতলা ভীষণ হাঁকডাক করে কথাবার্তা বলতে হয়—এখন আরও চেঁচামেচিটা বেড়েছে। প্রবল না চেঁচালে কেউই কোনো কথার উত্তর দেয় না। ডাকলে কেউ আসে না। বকলে বলে—"আওয়াজ হচ্ছে তো, শুনতে পাইনি।" আমিও তাই বলি। আমিও কারুর কথার উত্তর দিচ্ছি না। ফোন বেজে যায়। সত্যিই শোনা যায় না। এই অতি-ভদ্র ইলেকট্রনিক ফোনের ভ্রমরগুঞ্জন না নূপুরশিঞ্জিনী শুনতে হলে চব্বিশ ঘণ্টার ডিউটি চাই। একজনকে কান পেতে রইতে হবে। আর এই বাড়িভাঙার তুমুল শব্দের মধ্যে কানে তুলো গুঁজে না রাখলে মাথা ধরে যাবেই। আর যত শাবল পড়ছে, ততই ভুটানী চেঁচাচ্ছে। টাঁই টাঁই ভৌ, ভৌ; যেন সঙ্গত করছে। ইত্যবস্থা অবিশ্রান্ত। "শব্দদূষণ" আর কাকে বলে।

ইতিমধ্যে আমেরিকা থেকে আমার বান্ধবী মিত্রা এসেছে। মিত্রা খুব চটপটে আর মিশুক। লোকজনদের চেনেশোনে। আমেরিকাতে থাকলে কী হবে, কলকাতার রকমসকম আমার চেয়ে তার ঢের বেশি নখদর্পণে। মিত্রার তো ঘুম হচ্ছে না শব্দ সংঘাতে। ও-বাড়িতে রোজ ভোর পাঁচটায় মিস্ত্রি লাগে। ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় কাজ ভালো হয়।

—"অ নবনীতাদি। এ কিসের মধ্যে আছো তুমি?"

—"কি আবার? এরকম হয়।"

—"এই শব্দ আমাদের মিস্তিরিরা করছে, না ওদের?" মিত্রার চোখ ঘুমে জড়ানো।

—"আমাদের মিস্ত্রি তো আটটায় আসবে।"

—"পুলিশ ডাকো।"

—"পাগল হয়েছিস? পাড়ার মধ্যে?"

—"তুমিই পাগল হয়ে গেছ। পুলিশ ডাকো।"

—"এই তুচ্ছ ব্যাপারে ওদের ঘাঁটাতে নেই। তাহলে বড় ব্যাপারে আসবে না।"

—"খুব আসবে। ডাকলেই আসবে। পুলিশ ডাকো।"

—"এটা আমেরিকা নয়।"

মিত্রা বারান্দায় বেরুল। এবং হঠাৎ বিকট জোরে প্রচণ্ড স্বরে চেঁচিয়ে, উত্তর কলকাতার বাছা বাছা শব্দ প্রয়োগ করে মিস্ত্রিদের গাল পাড়তে শুরু করল। মিস্ত্রিদের শাবলের শব্দ থেমে গেল। থেমে গেল রাস্তায় ছাগলদের গলার ঘণ্টা, পেপার হকারদের সাইকেলের ঘন্টি। কে যে কাকে গালি দিচ্ছে, কেন দিচ্ছে, বুঝতে না পেরে রাস্তাঘাটে যে যেখানে ছিল সবাই স্ট্যাচু। উষার শান্ত আবহাওয়ায় যাঁরা কেডস পরে লেকে হাঁটতে বেরিয়েছিলেন তাঁরাও থমকে গেলেন। ঘন্টি গলায় ছাগল-দুধের গয়লারা দাঁড়িয়ে পড়ল। পেপার বেচতে বেরুনো হকাররাও স্তম্ভিত। আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছি।

BanglaBook.org

ওকে তো আর দেখা যাচ্ছে না রাস্তা থেকে, কেবল ভয়ংকর শব্দ-বোমা শুনতে পাচ্ছে সবাই। লোকে ভাবছে আমিই চেঁচাচ্ছি। সুপারভাইজার সেই নিষ্পাপ তরুণও দৌড়ে এল।

মিত্রা বলল—"শুনে রাখুন, আটটার আগে যদি টুঁ শব্দ করেছেন পুলিশ ডাকব। আর ভেবেছেন কী? গ্যারেজের ছাদে উঠোনে, সর্বত্র এত ইঁটপাটকেল ছড়িয়েছেন কেন? রোজ পাঁচটাকা দিয়ে দিদি যে জমাদার ডেকে ঝাঁট দেওয়াচ্ছেন, বলি টাকাটা কে দেবে? অ্যাঁ? আপনার মুটেমজুররা কী করছে? আজই ত্রিপল কিনে পর্দা টাঙিয়ে ফেলুন, আর উঠোন, টিনের চাল ঝাঁট দিয়ে ফেলুন। পর্দা না টাঙালে কাজ বন্ধ। ইনজাংশন জারি করিয়ে দেব। বুয়েচেন? আমাকে নবনীতা দেব Sen পাননি। হ্যাঁ, এ অন্য জিনিস।" নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে মিত্রা এক হাড়-হিম করা হাসি হাসে। —"আটটার আগে টুঁ শব্দ হলেই, সোওজা থান-ন-না। মনে থাকে যেন?"

কি বলব, সম্পাদক মশাই, সেদিন সত্যিই সারাদিন কাজ হলো না। শব্দ বন্ধ। পরদিন বেলা আটটার সময়ে ভাঙা শুরু হলো। মিত্রা বলল:

—"দিদি, দেখেছো। অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে?" কিন্তু মজুররা এল না, ঝাঁটও দিল না, ত্রিপলও টাঙাল না। টিনের চালে ধপাধপ ইঁট পাটকেল বৃষ্টি চলতেই থাকল। এ যদি বিন্দু থাকত, দিত মিস্ত্রিদের মজা দেখিয়ে। সে মিত্রার ওপরে আরও এক কাঠি ভাষাবিদ কিনা?

মুশকিল তো সেখানেই। ডানহাত বাঁহাত দুটোই নেই—কানাই গেছে দেশে ভাইঝির বিয়ে দিতে, তারপর নিরুদ্দেশ। বিন্দু গেছে ওর বাড়িটা তৈরি করতে। বিন্দুর আসলে একটা চমৎকার কাঠের দরজা আছে। অনেকদিন আগে ওদের পাশের গাঁয়ে একটা পোড়োবাড়িতে আগুন লেগেছিল। সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে যে যা পেরেছে উদ্ধার করে নিয়ে নিয়েছে। বিন্দু ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে এসেছিল একটা আস্ত ফ্রেমসুদ্ধ কাঠের দরজা। সেটা সেই থেকে সসম্ভ্রমে তার বাপের বাড়িতে তোলা আছে। কিন্তু বাবার বয়স হয়েছে, ভাইরা যে-যার জমিজমা এখনই ভাগবখরা করে লিখিয়ে নিচ্ছে যাতে পরে অশান্তি না হয়। সবাই এবার বাড়ি তুলবে, ভাগাভাগি হয়ে যাবে ভাইরা। বিন্দুর দুশ্চিন্তা ওর দরজা যদি কারুর বাড়িতে লাগিয়ে ফ্যালে? দরজাটা লাগানোর জন্যে বিন্দুরও একটা বাড়ি চাই। বাড়ির জন্য আগে বিন্দুর একটা জমি চাই। তাই সে দেশে গেছে। দেশে গিয়ে বাবাকে চেপে ধরবে, "আমাকে আমার ভাগের জমি দাও। মেয়েদেরও এখন সম্পত্তিতে ভাগ আছে। ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দাও। আমিও বাড়ি তুলব।" (এতে আমারও যথেষ্ট সায় আছে)। বিন্দু তাই লম্বা ছুটিতে। জবরদস্তি পৈতৃক সম্পত্তি আদায় করে, আইনত লিখিয়ে নিয়ে, তাতে বাড়ি তুলে, বাড়িতে দরজা লাগিয়ে, তবে ফিরবে। কানাই-বিন্দুর বদলে দুটো ষোলো-সতেরো বছরের মেয়ে আছে। নিওনের জায়গায় মোমবাতি। গীতা আর শান্তা। দু'জনে কেবলই এ ওর গা ঠেলাঠেলি করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাসে। গীতার বিয়ে স্থির। সামনেই যে-

বাড়িটা উঠছে, সেই প্রোমাটারের কাছে মিস্ত্রি খাটায় প্রদীপ, তার সঙ্গে। আর শান্তা? সে বলেছে—"দুদ্দুর—ওসব ভালোবাসার বিয়ে আবার টেঁকে নাকি? আমার দিদিদের সব সম্বন্ধ করে বিয়ে। মা বারণ করে দিয়েছে—আমাদের বাড়িতে ওসব চলে না।" কিন্তু শান্তা দোকানে গেলে আর ফেরে না। ওর প্রতিটি রাস্তার মোড়ে মোড়ে অগুন্তি বন্ধু। ওদের নিয়েই সংসার-সমুদ্রে ভেসে আছি। পুজোর লেখার সময় কোথায়।

ঝক্কি কি একটা? ভোর ছ'টার সময়ে ও-বাড়ি থেকে বড়কার ফোন এল।

—"খুকু, I am dying. I may die any minute."

—"কেন বড়কা? কী হয়েছে তোমার?"

—"I am ninety three. আমার কাছে কেউ নেই। Nobody home—কেউ বাড়িতে নেই—I'm alone."

—"সেকি বড়কা? নার্স ছিল যে? সে কই?"

—"আছে। সে আছে। সে ঘুমোচ্ছে। এদিকে আমি মরে যাচ্ছি। I'm dying."

—"কী কষ্ট হচ্ছে তোমার? আমি এক্ষুনি ডাক্তারকে খবর দিচ্ছি—কিন্তু নার্সকে ডাকো? ও ঘুমোবে কেন? ডাকো, ডাকো"—আমিই চীৎকার করতে থাকি। যদি এতে নার্সটি শুনতে পায়।

—"চেঁচিও না। You are hurting my ears. অনেক ডেকেছি। রেগে যাচ্ছে। বলছে—'ডোনট ডিস্টার্ব—আমি রেস্ট নিচ্ছি।'"

—"সেকি কথা? তোমার ঠিক কী কষ্ট হচ্ছে বলবে না তো? ডাক্তারকে কী বলব?"

—"I am dying."

—"ডাক্তারকে খবর দিয়েই আমি আসছি বড়কা।"

—"ডাক্তার সাতটার আগে ফোন ধরে না।"

—"তবে আমিই আসছি, এনিওয়ে।"

বলা যত সোজা, যাওয়া তত সোজা নয়। প্রথমে ড্রাইভওয়ে ঝাঁটপাট দিয়ে ইঁটপাটকেল সাফসুতরো করে জায়গাটা ফাঁকা করতে হবে। তারপর তিনটে তালা খোলা। তারপর গাড়ির ঘোমটা তোলা। এই ঘোমটা তোলাটা কি কম ঝক্কির ব্যাপার? যাদের গ্যারাজ নেই তারা চাঁদনি থেকে গাড়ির বোরখা কিনে আনে, এক এক গাড়ির জন্যে এক এক সাইজের রেডি-মেড বোরখা। গাড়িচোরের হাত থেকে নাও যদি হয়, ছিঁচকে চোরের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে এই বোরখা। তার দড়িদড়া খুলতে অনেক সময় লাগে। তাছাড়া রোদবৃষ্টি থেকেও রক্ষা করে। আমাকে সেই জিনিস একটা কিনতে হয়েছে। ধর্মতলায় গিয়ে। সাড়ে তিনশো টাকা দিয়ে। যদিও গাড়ি গ্যারাজে থাকে। চারদিক বন্ধ। তালা-মারা। তিনটে। সম্পাদকমশাই, আপনি ভাবছেন আমার মাথা খারাপ? আজ্ঞে না, টিনের চালটা খারাপ। এখানে-সেখানে ফেটে গেছে। তার মধ্যে দিয়ে চুন-সুরকি-বালি-সিমেন্টের ফাইন পাউডার সারাদিন

BanglaBook.org

ঝরছে আমার নতুন শাদা গাড়ির গায়ে। সেই পাউডার মেখে আমার গাড়ি গোলাপী, গাড়ির কাচ গোলাপী। এবং পাউডার সমান ফাইন নয় বলে দু'একটা স্ক্র্যাচও পড়েছে। তাই ছুটতে হয়েছিল চাঁদনির বাজারে। প্রথমে খোঁজ করেছিলুম তিনতলা দেয়াল ঢাকবার জন্যে ত্রিপল কিনতে কত লাগবে। ভেবেছিলুম ওদের জন্যে কিনে দেব। বললে ক'হাজার টাকা যেন—তাই চামড়া দিয়ে মাটি না ঢেকে পায়ে জুতো পরেছি। কিন্তু টিনের চালটা প্রত্যেকদিন আরেকটু আরেকটু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেই। ছাদের টিন বদলাতে হবে। কিন্তু এখন বদলে লাভ নেই—আবার তো ইঁট বালি চুন সুরকি সবই পড়বে? আবার যদি ফেটে যায়? আগে বাড়ি ভাঙা, বাড়ি গড়া সব চুকে যাক। অত কাণ্ড করে গাড়ি বের করার চেয়ে দৌড়ে চলে যাওয়া সোজা। তাই-ই যাই।

বড়কার ঘরে ঢুকে দেখি ও-বাড়ির প্রত্যেকটি কাজের লোক সেই ঘরে জড়ো হয়েছে। লক্ষ্মণঠাকুর থেকে পরেশমালী পর্যন্ত লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। বড়কাকাকে দেখে মনে হলো না তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক।—"বাড়িতে কেউ নেই"—কথার অর্থ তাঁর পুত্রবধূ একদিনের জন্যই বাপের বাড়িতে গেছেন—ছেলে বিদেশে। তবে হ্যাঁ, এই নার্স যে কোনো পরিস্থিতিকেই আশঙ্কাজনক করে ফেলার ক্ষমতা রাখেন। ঘরে তুমুল কাণ্ড চলছে। না, বদমেজাজি, রাগী বলে যাঁর দুর্নাম, সেই বড়কা চেঁচামেচি করছেন না। দু'হাতে দু'কান ঢেকে, চোখ বুজে, বাবু হয়ে খাটের ওপর বসে আছেন। চেঁচাচ্ছেন তাঁর সেবিকা। কাজের লোকেরা তটস্থ। সিনিয়রিটির খাতিরে লক্ষ্মণঠাকুর ওঁকে শান্ত করতে চেষ্টা করছে, জুনিয়াররা স্তম্ভিত।

বড়কার ঠোঁট নড়ছে। বিড়বিড় করে কী বলছেন? ইষ্টমন্ত্র জপ? মুখের কাছে কান নিয়ে যাই—শুনি, বলছেন—"দূর করে দে, দূর করে দে"—অনতিবিলম্বে ঘটল নাটকে যবনিকা পতন। নার্সকে দূরীকরণ হলো। সাতটা প্রায় বেজেই গেছে। আটটায় দিনের নার্স এসে যাবেন। ততক্ষণ আমি বসছি। মার দীর্ঘ রোগভোগের কল্যাণে সেবিকাদের সংশ্রবে থেকেছি দশবারো বছরের বেশি। কদাচ এ দৃশ্য কিন্তু দেখিনি। নাইট নার্সেরা প্রায়শই বসে ঘুমোন বটে—কিন্তু কান খোলা থাকে। ডাকলেই সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেন। কাউকে কদাচ ডিউটির সময়ে ঘুমের ডিস্টার্বেন্স হয়েছে বলে চেঁচাতে দেখিনি। দিনে দিনে সবই চলছে। নাকি ইনিই বিশিষ্ট? ওরই মধ্যে দেখলুম বড়কার গা-ময় গরমে ঘামাচি বেরিয়েছে, চুলকোচ্ছেন। আমারও গরমে একটা হিট র‍্যাশ বেরিয়েছে গা-ময়। এমনকী মাথার মধ্যেও। চুলকে চুলকে সারা হচ্ছি। কাকার অন্তত মাথায় বেরোয়নি, চকচকে টাক থাকার সুবিধে। নার্স চলে যেতেই "আশঙ্কাজনক" পরিস্থিতি সরল হয়ে গেল। সকলের মুখে হাসি। বড়কা বললেন —"খুকু? চা খেয়েছিস? আমার সঙ্গে চা খেয়ে যা।"

চা খেয়ে কাগজ পড়তে পড়তেই আটটার নার্স এসে গেলেন, আমিও ফ্রী —আমি ছুটলুম রেশনের দোকানে। হ্যাঁ। কে বলল আমি রেশনের দোকানে যাই না? আমাদের কার্ডগুলোর প্রচণ্ড দুরবস্থা, একটাও নাম পড়া যাচ্ছে না। নতুন

করে কার্ড লেখাতে হবে, তার জন্যে কী কী করণীয় জানতে রেশন দোকানে যাওয়া দরকার।

র‍্যাশনের দোকান থেকে এসে যেতে হবে ব্যাংকে, চ্যাটার্জী ইন্টারন্যাশনালে ফরেন এক্সচেঞ্জ চাই, নিউইয়র্ক আর বার্কলিতে দুটো কনফারেন্স আছে, যার জন্যে এত প্রচণ্ড তাড়ার মধ্যে আছি—যেতে তিনটে দিন বাকী, এখনও সব কাজ ছড়িয়ে আছে। একটা একটা দিন চলে যাচ্ছে, যেন বুকের ওপর রোলার। খাতায় লিস্টি বানাই। এক একটা করে কেটে দিচ্ছি। ডেন্টিস্ট?—Done,

র‍্যাশনকার্ড?—মঙ্গলবার।

ফরেন এক্সচেঞ্জ— মঙ্গলবার।

টিকিট—?

পাসপোর্ট রিনিউয়্যাল—Done

টিউটোরিয়ালস—Done

খাতা—Done

প্রশ্ন—Done

ছুটির অ্যাপ্লিকেশন—Done

থিসিস ফেরৎ পাঠানো—NY. এবং বার্কলতে Fax করা—

জলপড়া বন্ধ করা—

করপোরেশন ট্যাক্স হিয়ারিং—বেস্পতিবার/শিবুকে authorization letter.

টেলিফোন বিল সংশোধন—চিঠি—

ইলেকট্রিক বিল—ঐ—চিঠি—

লাইনগ্যাস বিল— এরিয়ার পেমেন্ট—Done

LPG বুকিং—শিবুকে বল—

শাড়িতে ফলস্ বসানো—নীলুকে বল

ঐ ম্যাচিং ব্লাউজ—ঐ

ছোট মেয়ের জন্যে কালোজিরে, রাঁধুনী ফোড়ন—

বড় মেয়ের গয়না ব্যাংকে রাখা—Immediate!

কনফারেন্সের পেপার জেরক্স করা—

বাড়ি পাহারার বন্দোবস্ত—Security Service Agency?

ট্যাক্সের ব্যবস্থা—

সুটকেস গোছানো—

পুজোর লেখা—

ম্যাকমিলান—

এন বি টি—

গীতা-শান্তা কোথায় যাবে?—

ফরেন এক্সচেঞ্জের ওখানে যাবার কিছুতেই সময় হলো না সেদিন—কনফারেন্স

BanglaBook.org

পেপারের জেরক্স করাকরি, ফ্যাক্স করাকরিতেই সকালটা কেটে গেল। কানাই ফেরেনি। দীপুকে রেখে যাওয়া অসম্ভব। সব সময় গেট খোলা থাকবে। পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে ভুটানী গাড়ি চাপা পড়ে মরে যাবে। বাড়িতে চোর ডাকাত মহানন্দে আসবে। দরজা খোলা, ভুটানী নেই। কুতুলটা খেতে না পেয়ে মরে থাকবে। সমস্ত দরজা-জানলাগুলো কালবৈশাখী ঝড়ে আছড়ে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে থাকবে, এবং সমস্ত আলো, পাখা, টিভি, রেডিও, এবং পাম্পটাও চব্বিশঘণ্টা চলে-চলে জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে থাকবে। টেলিফোনের বিল সেবারের মতো আবার দশ হাজার টাকা হয়ে যাবে। এবং সম্ভবত জ্বলন্ত সিগারেট থেকে তোষকে, তোষক থেকে বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড হয়ে দীপুও নিজেই পুড়ে বসে থাকবে। না বাপু। আমার অত সাহস হয় না।—তার চেয়ে কাজের লোকরা বরং—কিন্তু শাস্ত্র-গীতার বয়েসটা ভালো না। কী যে করি? Security Service তো কুকুরদের খাওয়াবে না, ঘোরাবে না, সমস্যা কি একটা?

লিখব কখন? এখন হাতে মোটে দুটো দিন। সুধাকর এসে বলল টিউটোরিয়াল হোম খুলবে। যেহেতু আমার বাড়ি খালিই থাকে, তাই সেখানেই খুলবে বলে ঠিক করেছে। কেন হবে না এখানে বিদ্যাচর্চার মন্দির? অনেক যুক্তি দিয়ে বোঝানোর পরে, যখন বজ্র-গর্জনে ধমকে বলি—"হবে না। আমার খুশি।" তখনি সুধাকর বুঝল। খুব বুঝদার ছেলে। কিন্তু দু ঘণ্টা তর্কাতর্কিতে গেল। ইতিপূর্বে শিবুকে অনেক ঘণ্টা ধরে বুঝিয়েছি, কেন এখানে ডাক্তারখানা করা যাবে না। এবং অমিতকে বুঝিয়েছি, কেন বাড়িটা বিয়েবাড়ি করে ভাড়া দিতে চাই না। যাচ্ছি বলে যেন ওদের আরও তাড়া, "বাড়ির একটা ব্যবস্থা" করা চাই তো? আর—টেলিফোন। যখন আমার খুব দরকার, তখন খারাপ থাকে। যখন সময়াভাব, তখন একদম ফিটফাট। সবাই লাইন পাচ্ছে।

ফোন।— "হ্যালো, দিদি? আমি রাতুল বলছি। সেই যে ইন্টারভিউটা দেবার কথা ছিল, নিঃসঙ্গ নারী"—

—"রাতুল, আমার একদম সময় নেই ভাই, বড্ড ব্যস্ত, ঘরে অনেক লোকজন"—

—"তাহলে কবে একটু সময় হবে আপনার? 'নিঃসঙ্গ নারী'"—

—"হবে, হবে, নিঃসঙ্গতার সময়ের অভাব হয় না ভাই, ভিড় মানেই কি সঙ্গ? এই মুহূর্তে সময় নেই"—

—"তবে কবে আসব?"

—"আগস্ট। আগস্ট—তখন আবার 'নিঃসঙ্গ নারী' হবো"—

ফোন।—"দিদি বলছেন? আমি সুরূপা, 'অনুপমা' থেকে বলছি। আপনি এবার পুজোয় কী কী শাড়ি—"

—"এই তো সবে নববর্ষ গেল ভাই, এখন পুজোর ঢের দেরি—এখনও কিছু ভাবিনি—তুমি বরং আগস্ট মাসে"—

BanglaBook.org

ফোন। "মিসেস দেবসেন আছেন? নমস্কার নমস্কার। আমি বলছি বৃহৎ বঙ্গ মিলন মহোৎসব থেকে। এবার উটিতে হচ্ছে। শংকর, সুভাষ, শক্তি, সুনীল, তসলিমা নাসরিন, শামসুর রাহমান, সুচিত্রা, কণিকা, বন্যা, ফিরোজা, রূপা, দেবশ্রী, মুনমুন, তাপস—মানে সকলেই আরকি—হ্যাঁ, মৃণাল সেন, গৌতম ঘোষ আর রবিশংকরকেও আনছি—আপনি যদি—"

"বেশ তো, কবে নাগাদ হচ্ছে?" (উটিতে যাইনি কখনো)

—"এই ধরুন সাতুই জুলাইয়ের মধ্যে দিলেই হবে।"

—"কী দিলেই হবে?"

—"ওই আর কি আমাদের সুভেনিরের জন্যে একটা মিনি উপন্যাস। ভাল করে সুভেনিরটা করতে চাই কিনা, তাই যাদের আমরা আনছি না, তাদের কাছে লেখা নিচ্ছি—"

—"অ! আমি বাইরে যাচ্ছি, সময় নেই লেখার—"

—"একটা ছোট্ট করে, পাঁচ-ছ' পাতার উপন্যাস?"

—"দুঃখিত। পরের বছর চেষ্টা করবো, কেমন?"

এখন পাড়ায় পাড়ায় গিন্নিরা শাড়ির দোকান আর সিকিউরিটি সার্ভিসের এজেন্সি খুলেছেন। সেখানে রিটায়ার্ড মিলিটারি, রিটায়ার্ড চোরডাকাত, সবই পাওয়া যায়। কেবল টেলিফোন ডিরেকটারিটা ১৯৮৯-এর বলে তাঁদের ফোন নম্বর জানা খুব কঠিন। ভাগ্যিস আমার ভাইপোর একটা এজেন্সি আছে। ওদের যোগাযোগ করতে হবে। দরোয়ান চাই।

জলপড়ার ইনজেকশন দেওয়া হলো, যেদিন যাব তার ঠিক তিনদিন আগে। অসামান্য ব্যাপার,সত্যিই ছাদের শরীরে গোটা পঁচিশেক নল ঢুকিয়ে শিরা উপশিরা তৈরি করা হলো, তারপরে তার মধ্যে বিশেষ যান্ত্রিক সিরিঞ্জে করে ওষুধ ইনজেক্ট করা হলো,যাতে জল আর পড়বে না। ভয় করে কেবল এটাই দেখলুম মুগ্ধনয়নে, সেদিন আর কোনো কাজ হলো না। কমলের কি অসামান্য ডাক্তারি!

মেয়ে তার গয়নাগুলো রেখে গেছে দিদিমার ভল্টে ভরে রাখবার জন্যে। (আমার কল্যাণে আমার, মায়ের ভল্ট ফাঁকা)। কিন্তু দিনের পর দিন আকুল হয়ে খুঁজেও মার ভল্টের চাবিটা খুঁজে পেলুম না। কত কি বেরুল—আমার সাঁতারের লাইফসেভিং সার্টিফিকেট, নীরোর সময়ের রোমান কয়েন। প্রথম কাটা চুলের গুচ্ছ। মাকে লেখা বাবার পোস্টকার্ড। ভল্টের চাবিটি কোথাও নেই। দুটো দিন পরেই যাওয়া। মেয়ে ফিরে গেছে দিল্লিতে। তার শাশুড়ির ভল্টে জায়গা নেই। পরের গয়না, এখন জিম্মা করে যাই কোথায়? মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। মিত্রা এগিয়ে এল যথা নিয়মে মুশকিল আসান হয়ে—

—"এ আর কি কঠিন ব্যাপার? শান্তনুদাকে বলে দাও, একটা নতুন ভল্ট দিয়ে দেবেন। দাঁড়াও, আমিই বলে দিচ্ছি।"—শান্তনুদা কথাটা ফেললেন না, বললেন

চেষ্টা করবেন। যাবার দিন সকালেই ফোন এল, ভল্ট পাওয়া গেছে। গয়না জমা দিয়ে এস। টাকা নিয়ে যেও। সময় কোথায়? সময়? এর মধ্যে কি পুজোর লেখা হয়? সম্পাদকমশাই?

আর হাতে দু'দিন। সুটকেস গোছাতে বসেছি শেষ মুহূর্তে। যা হয় কিছু জামাকাপড় যাহোক-তাহোক করে ভরে নিচ্ছি। কেবল "মিটিংকা কাপড়া" থাকলেই হলো, বাকী সময় তো মেয়ের কাছে। শার্ট প্যান্টুলুন পরেই চলে যাবে। সত্যি, এককালে পুরুষমানুষ হবার এইটেই বড় সুবিধে ছিল। সাজসজ্জাটা সহজসরল ছিল। কিন্তু এখন আর নেই। এখন পুরুষরা মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই সাজে, ওদেরও নিশ্চয় বড় বড় সুটকেস লাগে। একটাই বাক্স নেবো ভেবেছিলুম—কিন্তু, ওমা তা কখনও সম্ভব? দুটো যখন অ্যালাউড? আমার চেনাশুনো প্রত্যেকেরই কেউ না কেউ আছেন এখন আমেরিকাতে। এবং প্রত্যেকেরই তো কিছু না কিছু একটু পাঠাতে ইচ্ছে করে? একবার করে ফোন আসে, একবার করে বেল বাজে, আর একটা করে বাণ্ডিল বাড়ে। বাণ্ডিলে নামঠিকানা ফোন নম্বর। সবই পরিচ্ছন্নভাবে লেখা। পৌঁছে কিছু ডাকে দিতে হবে, কিছু কালেক্ট করে নেবে। ফোনে খবর দিলেই হবে। কেউ খুব চেনা, কাউকে মোটেই চিনি না। নিচে রিং হলো। আমিই বাঞ্ছিত ব্যক্তি।

—"আপনি নবনীতাদি? আমি রূপালী। আমার দিদি সোনালী ১৯৮৫-এ আপনার ছাত্রী ছিল। এখন ওরা বার্টনের কাছে থাকে। আমার মা ওর বাচ্চার জন্য কিছু পাঠাতে চান, যদি আপনি দয়া করে"—

—"হ্যাঁ হ্যাঁ" বলবার আগেই ওপরতলায় একটা প্রচণ্ড তুলকালাম কাণ্ড বেঁধে গেল— কুতুল ককিয়ে মরণ-কাঁদন কাঁদতে শুরু করে দিল, গীতা, শান্তা কোরাসে চীৎকার করতে লাগল: "অ দিদি। অ দিদি! অ দিদি।" একনিশ্বাসে ওপরে দৌড়োই —গিয়ে দেখি ভূটানী কুতুলের টুঁটি কামড়ে ধরেছে। অতি কষ্টে ছাড়াই। রক্তগঙ্গা। কুতুল মৃতপ্রায়। ভূটানীকে বেঁধে রেখে "ইলাবাসে" শ্যামল জামাইবাবুকে S. O. S. কল দিই,—খুব বড় জীবজন্তুর চিকিৎসক তিনি। জামাইবাবু তক্ষুনি দৌড়ে এলেন, কুতুলের চিকিৎসা করলেন, ইনজেকশন দিলেন, তার থরথর কাঁপুনি থামেই না। ভূটানীকেও একটা নার্ভ শান্তির বড়ি দিলেন। জামাইবাবু বললেন, ভূটানীও খুব নার্ভাস হয়ে গেছে। সম্ভবত পাশের বাড়ি ভাঙবার একটানা আওয়াজেই ওর নার্ভ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শব্দের স্ট্রেন তো কম না। ভূটানী ফ্রাস্ট্রেটেড বোধ করছে, শব্দ থামাতে পারছে না। পাহারাদার জীব তো? শান্তা সায় দিল—"সত্যি কথা, সারাদিন ভূটানী ও-বাড়ির মিস্ত্রিরিদের দিকে চোখ পাকিয়ে একটানা ভৌ ভৌ করে। কিন্তু ওদের বাড়িতে গিয়ে তো কামড়াতে পারে না? সেই রাগটা ভালোমানুষ কুতুলের ওপর ঝেড়ে দিয়েছে।" কুতুলটা কুকুর কেবল নামে, আসলে প্রায় পুতুলই। তিব্বতী কুকুর, আমার মায়ের পুষ্যি ছিল সে, জীবনে কাউকে কামড়ায়নি, সন্দেশ-রসগোল্লা খেয়ে মানুষ। আর ভূটানীকে ভূটানের রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছিল আমার মেয়ে। সে

হাউণ্ড। প্রচণ্ড বিক্রমে বাড়ি পাহারা দেয়। যেমন হিংসুটে তেমনি আহ্লাদী। আমার বড় মেয়ের পুষ্যি। মেয়ে দিল্লিতে। মা স্বর্গে। পুষ্যিদের রক্ষা করতে আছি আমিই। জামাইবাবু বলে গেলেন দুজনকেই চোখে চোখে রাখতে হবে। দশদিন সিরিঞ্জে করে অল্প অল্প গ্লুকোজ ওয়াটার খাওয়াতে হবে কুতুলকে, সে হয়তো কয়েকদিন খেতে চাইবে না। আর ভূটানীকে তিনদিন রোজ একটা করে শান্তির বড়ি। আমি চলে গেলে কে করবে এসব? কে খাওয়াবে কুকুরকে সিরিঞ্জে করে গ্লুকোজ? মাথায় নতুন ভাবনা চাপল। গীতা, শান্তা পারবে তো? জামাইবাবু চলে যাবার পর বাক্স গোছাতে যাচ্ছি, শুনি নিচে কে যেন কথা বলছে। কুণ্ঠিত গলায়।

"নবনীতাদি? আমি কি চলে যাবো? প্যাকেটটা"—ওহো। সোনালীর বোন রূপালী। সে এখনও বসে আছে।—ছি ছি—প্যাকেট নিয়ে ওপরে আসছি, ধমাস করে টিনের চালে ইঁট খসে পড়ল, বাড়ি কেঁপে উঠল। মিত্রা ছুটে এল— "পুলিশ। দিদি, পুলিশ। দিস ইজ ক্রিমিনাল! গাড়িটাও ভেঙে যাবে এবারে চাল ফুটো হয়ে। তুমি না ডাকলে আমিই ডাকছি।" তৎক্ষণাৎ মিত্রা গিয়ে ফোন করতে শুরু করে দেয়। আমি যত বারণ করি, কেবল মাথা নাড়ে। অর্থাৎ "কোনো কথাই শুনব না। যা করবার তাই করব।" মিত্রার দোষ যা, গুণও তাই। ওর যা করবার ও তা করবেই। দুনিয়ার কেউ ওকে ঠেকাতে পারবে না। কখনও তাতে ভালো হয়, কখনও মন্দ।

এটা কী করলি মিত্রা? প্রোমোটার ছেলেটি খুব ভদ্র।

—"খুব ভদ্র? ভদ্র তো ত্রিপল টাঙাচ্ছে না কেন? ঝাঁট দেওয়াচ্ছে না কেন? ভোর পাঁচটায় মজুর লাগাচ্ছিল কেন? বিন্দুমাত্র কনসিডারেশন নেই কেন?"

—"এ ভাঙাচোরার কাজটা ও করছে না। অন্যলোকে কন্ট্রাক্ট নিয়েছে। আমি চাই না প্রোমোটার ছেলেটিকে পুলিশ বিরক্ত করে। বড় ভালো ছেলে।"

—"করবে না। ঐ 'অন্যলোক'দের করবে। কন্ট্রাক্ট যারা নিয়েছে। এত ভালোছেলেমির কী করল প্রোমোটার? ও ওর হয়ে ওকালতি করছ?"

—"এক হাঁড়ি রসগোল্লা পাঠিয়েছিল নববর্ষে।"

—"এইজন্যেই পাঠিয়েছিল। মুখ বন্ধ করতে। আর তুমিও গলে গেলে। সত্যি, দিদি! তুমি না?" মিত্রা একটা অধৈর্যের ভঙ্গি করে ঘর থেকে চলে গেল, রান্নাঘরের দিকে।

একটু বাদেই গীতা কাঁদো কাঁদো মুখে ছুটে আসে। "দিদি, দেখবেন আসুন, দুটো ষণ্ডাগুণ্ডা মতন লোক এসে ভীষণ ধমকি দিচ্ছে প্রতাপদাকে আর মিস্তিরিদের।"

—"সে কি রে?" আমি আর মিত্রা বারান্দায় ছুটি। মোটরবাইকে দুটি আত্মবিশ্বাসী যুবক—নির্মীয়মাণ বাড়িটির প্রতাপের মনিব প্রোমোটারবাবু হাতজোড় করে তাঁদের বলছেন, "আর এরকম হবে না। দিদিকে বলুন গে, আমি নিজে কথা দিচ্ছি।"

মিত্রা বারান্দা থেকেই চেঁচায়, "আপনারা বুঝি থানা থেকে?"

—"হ্যাঁ। কেন?"

—"ও-বাড়ি নয়, ও-বাড়ি নয়—উনি ভুল প্রোমোটার। ওঁকে বকবেন না। এপাশে, এপাশে। এ বাড়িটা ভাঙা হচ্ছে, ইঁটপাটকেলের বৃষ্টি হচ্ছে। ওটা তো রাস্তার ওদিকের ফুটপাতে, ওখানে নয়—এপাশে আসুন"—

ঘোঁওৎ করে মোটরবাইকের মুখ ঘুরে যায়। উল্টো বাগে এসে, এবার ঠিক জায়গায় থামে। যুবক দুজন নেমে, কোমরে দুটো হাত রেখে, শুধু ওপরদিকে চোখ তুলে তাকালো। শুধুই দাঁড়ানো। শুধুই চাহনি। কোনো বাক্যব্যয়ের দরকার ছিল বলে মনে হলো না। যে-তরুণটি আমার কথায় হাসত, সে দৌড়ে ওদের কাছে নেমে গেল। পুলিশেরা তাকে কী বললে জানি না, সে তো খুব ঘাড় নাড়ছিল। পুলিশরা মিত্রাকে বলে গেল:—"কিছু ভাবনা নেই দিদি—দরকার হলেই খবর দেবেন।" মিস্ত্রি-খাটানো যুবকটি মিত্রাকে বলল—"দিদি, দরজা খুলে দিন। ছাদ-উঠোন ঝাঁট দেওয়াবো।" এ-বেলা অন্য কাজ বন্ধ। ও-বেলা ও-বাড়ির গায়ে তিনতলা ঢাকা দীর্ঘ ত্রিপলের পর্দা চড়ল, ছাদ থেকে বাগান পর্যন্ত। শব্দ বন্ধ হলো না বটে কিন্তু ধুলোটা কমে গেল, এবং ইঁটপাটকেল পড়াও থেমে গেল। গাড়িকেও আর বোরখা পরাতে হবে না। মিত্রা বলল—"দেখলে? আমাদের পুলিশ কত কাজ করে? শুধু বলতে হবে।"

হাতে মোটে একটা দিন। এখনও প্রচুর কাজ বাকী। কলেজের কাজ মিটেছে—এবার বাড়ির কাজ। বাক্সো গুছোনো। কী কী যাবে? সুটকেসে কী কী যাবে, তার একটা তালিকা বানাই। আর একটা একটা করে গোছাই। কোনো কিছুই ইস্ত্রি নেই। শাড়ির কোনোটার ফলস লাগানো নেই। কোনো কোনো ব্লাউজের হুক নেই। এখন সেলাই করার সময় নেই রুমাল কোথায়? শাল কোনটা? সোয়েটার? ও হো সেসব তো তুলে ফেলা হয়েছে শীত ফুরোতেই। কাঁথাতলায় ওঠো—পুঁটলি খোলো। জুতো? জুতো চাই। একজোড়া কেবল চটিতে চলবে না। টিপের পাতার গোছা। ছাতা। চুলের কাঁটা। ফিতে, ক্লিপ। লিপস্টিক। ক্রিম। হাউস কোট। নাইটি। আর কী চাই? আর কী চাই? কনফারেন্সের কাগজপত্তর, এবং ওষুধপত্তর। কিনতে হবে। আমার তো গাদা গাদা রোগের গুচ্ছ গুচ্ছ ওষুধ। যতই বিদেশযাত্রার ইনশিওরেন্সের টাকা দিই না কেন, এইসব হাঁপানি, বাত, প্রেশার এ তো ওরা কভার করবে না। ওষুধ কিনতে প্রাণ বেরুবে। Pre-existing condition! মাথায় বাজ পড়লে সেটা কভার করবে। কিম্বা প্লেনে চাপা পড়লে।

মিত্রাটাকে ফাঁকে ফাঁকে দেখে আসছি। সে বেটি আবার কাল থেকে বিছানায় পড়েছে। বার্লি। গ্লুকোজ ওয়াটার। মাথা তুলতে পারছে না, এত মাথার যন্ত্রণা। বমি, পেটব্যথা। অত হম্বিতম্বির পরে এই করুণ চেহারা দেখে খুব মায়া হচ্ছে।

মিত্রা খুব জাঁদরেল মেয়ে, যা করবে মনে করে সেটাই করে ফ্যালে। আমার মতন সারাক্ষণ দোটানায় ভোগে না। লোকদ্যাখানি ভদ্রতারও ধার ধারে না, রীতিমতো

amarboi.org

কটকটি। ব্যাংকের সমস্যা, বাড়ি ভাঙার সমস্যা মুহূর্তে মিটিয়ে ফেলল। আরও অনেক সমস্যাই ও মিটিয়ে ফেলতে পারে। নিত্য নতুন সমস্যা সৃষ্টি করতেও ওর জুড়ি মেলা ভার।

এদেশে এসে অবধি মিত্রার শরীর ভাল নেই। কেবলই জ্বর হচ্ছে, কেবলই বমি। একবার সারছে তো আবার পড়ছে। পুলিশ-টুলিশ করবার পরেই সে কোঁ-কোঁ করে শুয়ে পড়ল। খুব জ্বর। বমি। পেটের যন্ত্রণা। ওর আবার আলসার আছে। সঙ্গে সঙ্গে ওর ডাক্তারবাবুকে ফোন করলাম। তিনি এসেই ওষুধ, ইনজেকশান, মাথা ধোওয়া, বমি বন্ধ হবে। শান্তা আর গীতা পালা করে ওর কাছে থাকছে। এই তো মাত্র তিনচার দিন আগেই ফুড পয়েজনিং, জ্বর, বমি হয়েছিল। আবার উলটে পড়ল বিছানায়। আমার খুব মন খারাপ। বাড়িতে দেখছি ওকে রেখেই যেতে হবে—কাছে কে থাকবে? এত অসুস্থ। ওর বন্ধু নন্দাকে ফোন করে দেখি। গীতা-শান্তার দায়িত্বে তো রাখা যাবে না। গেটে দরওয়ান থাকাটা রুগী দেখার জন্য যথেষ্ট নয়। অথচ এই অবস্থায় ওকে পাঠাই বা কোথায়?

মিত্রার জন্য মাথায় দুশ্চিন্তা চাপলো, কিন্তু যতই দুর্ভাবনা হোক তার মধ্যেই যাত্রার প্রস্তুতি চাই। মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকলে হবে না। হাতব্যাগে কী কী যাবে? টিকিট, পাসপোর্ট, হেলথ ইনশিওরেন্স! চশমা, কলম, মানিব্যাগ, এয়ারপোর্ট ট্যাক্স তিনশো টাকা, ট্যাক্সিভাড়া শ' তিনেক। চেকবইটা যদিও বিদেশে অকেজো, তবু থাকা ভালো। যেমন ভারতীয় ড্রাইভিং লাইসেন্সটা। চাটার্জী ইন্টারন্যাশনালের ব্যাংকটায় কাল যাওয়া হয়নি। ফরেন এক্সচেঞ্জ নিতে হবে হাতে আর শুধু যাবার দিনটা ছাড়া সময় নেই। কত আছে হাতে? সব ছড়িয়ে বাড়িয়ে একমনে টাকা গুনছি, নীলু এসে দাঁড়াল। ট্যাঁকে খোঁকা, মুখে হাসি।

—"দিদি, কাল যাচ্ছেন?"

—নীলুকে দেখেই যেন হাতে চাঁদ সূর্য। বিশাল সমস্যার সমাধান হতে পারে এক্ষুনি, যদি নীলু রাজী হয়।

—"নীলু, তোরা ক'মাস এ বাড়িতে থাকবি? আমি যতদিন না ফিরি? এদের হাতে বাড়ি রেখে যাওয়া যাবে না। তুই, অমিত আর বাবুসোনা থাকবি। বাইরের কাউকে ঢোকাসনি যেন। মিত্রাদিদিকে একটু দেখবি আর কুতুল-ভুটানীর ওপর নজর রাখবি। কুতুলকে গ্লুকোজ ওয়াটার খাওয়াতে হবে—পারবি তো রে? গতবারে যেমন ছিলি, তেমনিই থাকবি?"

—"হ্যাঁ-অ্যা...", নীলু সঙ্গে সঙ্গে রাজি। এ কর্ম সে আগেও বহুবার করেছে। এ বাড়িতে এমনিতেই ওর একটা ঘর আছে। থাকে। বাড়িতে মানুষ থাকবে। বাঃ, চমৎকার বন্দোবস্ত হয়ে গেল। নীলু বলল—"দিদি? আপনি অত মাথা চুলকোচ্ছেন কেন?"

—"হীট র‍্যাশ হয়েছে। মানে গরমে ফুস্কুড়ি মতন বেরিয়েছিল। গায়েরগুলো সেরে গেছে, মাথার মধ্যে ঘাম বসে তো? সারছে না।"

BanglaBook.org

—"দিদি?" নীলু ভুরু কুঁচকে তাকাল—"আপনার মাথায় উকুন হয়নি তো? মনে হচ্ছে উকুনের মতো?"

—"পাগল। উকুন কী করে হবে? মেয়েরা যখন ইশকুলে যেত, সেই তখন হয়েছিল।"

—"গীতা, শান্তা দুজনেরই মাথায় উকুন আছে দিদি। ওরা বারান্দায় বসে রোজ দুপুরে উকুন বাছে"—

—"সেকি রে? অ্যাঁ? এই বয়েসে আমার কিনা—দ্যাখতো মাথাটা? ছি ছি—"

—"ও আর দেখতে হবে না। লাইসিল কিনে আনছি, পয়সা দিন। আজই লাগিয়ে ফেলুন। কালই তো যাওয়া।"

ঘরে সদ্য জামাই এসেছে। টাটকা টাটকা শাশুড়ি হয়েছি। অহংকারে মাটিতে পা পড়ছে না পদোন্নতিতে—এমন সময়ে কিনা...এই? কোন গুরুজন আমাকে পাকা চুলে উকুন পরবার আশীর্বাদ দিয়েছিলেন কে জানে? এ যে কী মনোবেদনা, কী আত্মধিক্কার সেটা যে শাশুড়ির মাথায় উকুন হয়েছে তিনি ছাড়া আর কেউ টের পাবেন না। গীতা আর শান্তাকে কুচি কুচি করে কুটে ঝাল চাটনি বানিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। নিশ্চয় আমার চিরুনিতে চুল আঁচড়িয়েছে ওরা। নীলু হাসল —"না দিদি, উকুন ওড়ে।" বললেই হল। তা হলে ট্রামেবাসে উকুন উড়ত। নীলু ছুটল লাইসিল আনতে। এক্ষুনি লাগাব কী করে? অনবরত লোকজন আসছে। গামছা বেঁধে থাকতে হবে তো। কিন্তু অপেক্ষা করার সময় কই? নীলু যত্ন করে ওষুধ লাগিয়ে গামছা বেঁধে দেয়। ততক্ষণ চিঠিপত্তরগুলো দেখি। কী কী জবাব দিয়ে যেতে হবে। বিল জমে আছে একগাদা, চেক লিখে রেখে যেতে হবে।

বেল বাজল।

—"দিদি, কে একটা লোক এসেচে। এতবড় একঝুড়ি গোলাপফুল এনেচে। তোমাকে ডাকচে।"

—"কে লোক? নাম কী?"

—"বলচে নাম বললে চিনবে না। ডাকচে, নিচে।" আমার মাথায় গামছা বাঁধা। 'ডাকছে নিচে' বললেই নিচে যাওয়া না।

—"কিছু সই করতে ডাকছে কি? তাহলে কাগজটা নিয়ে আয়।"

—"সই-টই করতে বলেনিকো। কাগজটাগজ নেই। এমনি একটা ভদ্দরলোক।"

আমার রাগ হয়ে যেতে থাকে। এমনি একটা ভদ্দরলোক?

—"তাকে বললি না, আমি এখন খুব ব্যস্ত রয়েছি?"

—"বললুম তো। দিদি কাল বাইরে যাবে, এখন খুব ব্যস্ত।—ভদ্দরলোক বললে একবার শুধু দেখা করেই চলে যাবে।"

—"তবু যা। জেনে আয় কী দরকার।"

BanglaBook.org

শান্তা ঘুরে এল—"বলচে কোনো দরকার নেই।" এ তো ভারি মজা? দরকার নেই তো এসেছে কেন? একটু কৌতূহল হয়—আর একটু রাগও। গামছার ওপরেই তোয়ালে জড়িয়ে বিশাল এক বিবেকানন্দী পাগড়ী বাঁধি। যেন এক্ষুনি স্নান সেরে বেরুচ্ছি। পরনে তো গায়ের চামড়ার মতন আজন্মের হাউসকোট চড়ানো আছে —কেবল একটা ব্যাপার—

—"হ্যাঁরে নীলু, আমার কপালে টিপের চাদ্দিকে উকুন-টুকুন ঘুরে বেড়াচ্ছে না তো? ওষুধের তাড়ায়—"

—"কই দেখা যাচ্ছে না তো কিছু"—নীলু কাছে এসে চোখ পাকিয়ে নিরীক্ষণ করে দেখল—"কিন্তু বলা যায় না। হয়তো ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলার সময়েও বেরিয়ে আসতে পারে।" নীলুর সান্ত্বনা,—"খুব কড়া ওষুধ তো।" গীতা প্রশ্ন করে—

—"খুব কড়া তো এতক্ষণ কেন বেরুল না?" শান্তা তার জবাব দেয়।

—"সব মরেই গেচে, তো বেরুবে কি? যান, এঁচড়ে ফেলুন।"

—"কি জানি? আজকাল তো সব কিছুতেই ভেজাল"—গীতার আর সংশয় যায় না। আমি অন্যমনে আবার কাগজপত্র ঘাঁটতে থাকি।

—"কই, দিদি, নিচে যাবেন না? সেই যে, গোলাপফুল?" নীলু মনে করিয়ে দিল। ছোটবেলার একটা খেলা মনে পড়ে গেল—"আয় তো রে আমার গোলাপফুল"। ক'দিন ধরে সমানেই অনেক রকমের উপহার আসছে। আমি যার বাহক মাত্র। নানান পুঁটলি, প্যাকেট, বাণ্ডিল, প্লাস্টিকের ব্যাগে করে করে স্নেহ মমতা আসছে, সাগরপারে পাড়ি জমাবে বলে। আমাকে একটা এক্সট্রা আস্ত স্যুটকেসই নিতে হচ্ছে এসব বস্তুর জন্য। কিন্তু গোলাপফুল আসেনি। ওটা অবিশ্যি নিয়ে যাওয়া যাবে না। যুক্তরাষ্ট্রে ফুলফল, শস্যকণা ঢোকানো নিষিদ্ধ। কেন এনেছে ফুল? আজ তো কোনো বিশেষ দিন নয়। যাই। দরকার নেই—অথচ এসেছে কেন, সেটা ইনভেস্টিগেট করে আসি। কেমন লোক দেখা দরকার।

এক সুদর্শন মাঝবয়িসী যুবক। একসাজি হলুদ গোলাপ হাতে করে খুবই অস্বস্তি ভোগ করছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। চোখেমুখে সঙ্কোচ।

—"কী ব্যাপার?" ভদ্রলোকের উপস্থিতিতে একটা মোহময় রহস্য—ওই ফুলের সাজির জন্যে।

—"নমস্কার—জানি খুব ব্যস্ত আছেন, কাল যাচ্ছেন, বেশি সময় নেব না, আমি টুটুল মজুমদার। আপনার প্রবন্ধ পড়ে চিঠি লিখেছিলাম?"

—টুটুল মজুমদার? হ্যাঁ। চিঠি পেয়েছিলাম। সে মেয়ে নয়? পুরুষ?

—"আজকে আসব বলে আগেই খবর দিয়েছিলাম।—"

—"হ্যাঁ। একজন মিস্টার মজুমদার আসবেন বলে জানিয়েছিলেন বটে গীতাকে। উদ্দেশ্য জানাননি।"

—"বসুন, বসুন", বলতে বলতে নিজেই বসে পড়ি। মাথায় মস্ত পাগড়ী। গায়ে

ছেঁড়া হাউস-কোট। মেয়েরা বলে—"মা, তুমি সবসময়ে ওই কাফতান আর হাউসকোট পরেই বাঁচো যখন, তখন ওইগুলোই ভালো দেখে, দামী দেখে পরবে। লোকজন তোমাকে ওই পোশাকেই দেখে সবচেয়ে বেশি।" কেন যে ওদের সৎ উপদেশগুলো কানে তুলি না। টুটুল মজুমদারের আপাদমস্তক মার্জিত। ভদ্রলোকের যেমন চেহারা হওয়া উচিত। একটু পশ্চিমী শিক্ষার ছাপটা যেন হাবভাবে বেশি —কিন্তু চিঠি তো লেখেন পরিচ্ছন্ন বাংলায়। আমাকে এই মুহূর্তে বড়ই অসংস্কৃত দেখাচ্ছে। অথচ ভদ্রলোকের দৃষ্টিতে সমীহ। কে জানে টিপ ঠিক আছে কিনা, একটু লিপস্টিক অন্তত বুলিয়ে নেওয়া উচিত ছিল নিচে আসার আগে। ভদ্রলোকেদের সঙ্গে সহজ ভব্যতাটুকুও করতে ভুলে গেছি। শেষ পর্যন্ত বলি, "নমস্কার।" উনি নমস্কার করে ফুলের গুচ্ছটি এগিয়ে দেন।

"থ্যাংক ইউ। কি সুন্দর হলুদ গোলাপ। আমার ছোটবেলাতে বেশি দেখা যেত না। 'আংকল টমস কেবিন' বইতে লতানে হলুদ গোলাপের ছবি ছিল, দেখে অবাক হয়ে যেতুম।"

—"আপনার পছন্দ?" —"বাঃ, পছন্দ হবে না? আপনার জন্যে কী করতে পারি বলুন।"

—"লিখুন। আরো লিখুন। লেখা পড়ে আপনাকে খুব দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল। মার্চ মাসে এশিয়াটিক সোসাইটির সভায় আপনার বক্তৃতা ছিল, সেদিন আপনি অসুস্থ ছিলেন। পরশুর সাহিত্যসভায় বিজ্ঞাপনে আপনার নাম ছিল। সেখানেও আপনি যাননি। এর আগেও কয়েকবার দেখতে চেষ্টা করে বিফল হয়েছি। তাই মনে জোর করে চলেই এলাম। কিছু মনে করেননি তো?"

মনের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন। "দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল?" "দেখতে চেষ্টা করে বিফল" হয়েছেন? আর আমি এই অপরূপ রূপে ওঁকে "দেখা" দিলাম? আচ্ছা ঐ "দেখতে ইচ্ছে" কথাটা কি বিশ্বাসযোগ্য? ইনি কৌতূহলী পাঠক, ভক্তও বলা যেতে পারে। "অ্যাডমায়ারার" বললে ইংরেজি করে বেশি ভদ্রস্থ শোনায় অবশ্য। হয় "অ্যাডমায়ারার" নইলে এল আই সি-র এজেন্ট। নতুবা প্রোমোটার। এবার ১লা বৈশাখে পাড়ার দুই প্রোমোটারের কাছেই দু' হাঁড়ি মিষ্টি পেয়েছি। পৈতৃক ভিটেবাড়িটা তবু বেচব কিনা মনস্থির করতে পারছি না। ইনি মিষ্টি আনেননি, কিন্তু হলুদ গোলাপ এনেছেন। এঁকে ঠিক চেনা যাচ্ছে না। আমি দেখেছি—এল আই সি এজেন্টদেরও অসীম ধৈর্য, অসীম নিষ্ঠা আর অসীমতর মায়াজাল রচনার শক্তি থাকে। ইনি কিছুই চান না, শুধুই দেখতে এসেছেন, এটা ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। এবং এ ক্ষেত্রে "বেণীর সঙ্গে মাথা"র মতো কবির সঙ্গে উকুনও দেখে ফেললেন কি না কে জানে? স্বভাবটা তো আর সরল নেই। প্রথমেই মনে হয় লোকটার কোনো দরকার আছে।

—বিনা দরকারে আমার কাছে আজকাল আর কেউ আসে না। হয় লেখা দাও, নয় রেকমেনডেশন দাও, নয় অ্যাডমিশন করিয়ে দাও, নইলে চাঁদা দাও,

নয় সময় দাও (সভাপতি হও, পুরস্কার প্রদায়িনী হও, বিচারক হও, বক্তৃতাদাত্রী হও), নিদেনপক্ষে পিটিশনে সই দাও, অভিমত দাও, পরামর্শ দাও, সাক্ষাৎকার দাও, শুভেচ্ছাবাণী দাও। কেউ বলে না, হৃদয় দাও। এবং কেউই বলে না, "এই নাও"। এই টুটুল মজুমদারটি কিছুই চাইছে না, বরং গোলাপফুল দিচ্ছে। হয় গভীর জলের মৎস্য, অতীব ঘোড়েল, নইলে এই পৃথিবীতে, এই সময়ে অতি বেমানান কেউ একজন। দাঁড়াও, দিচ্ছি তোমাকে ঠিক করে। রোমান্টিক হচ্ছ?

—"আচ্ছা, টুটুলবাবু, আপনার তো আমাকে দেখা হয়ে গেছে? ফুলও দেওয়া হয়ে গেল। আর কিছু দরকার আছে কি? আমি কাল বিদেশে যাচ্ছি, আপাতত প্রচণ্ড ব্যস্ত। অনেকগুলো কাজ"—

—"বাক্সো গুছোচ্ছেন? আমি এসে বিরক্ত করলাম?" খুব ব্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন ভদ্রলোক।

—"না না, বিরক্তির কী আছে? বাক্স এখনও গোছানো হয়নি। বিলগুলো পে করছিলাম আর কিছু চিঠিপত্রের জবাব দিচ্ছিলাম।—আর, আমার মাথায় উকুন হয়েছে কিনা জানার চেষ্টা করছিলাম।—এই আর কি...।"

—"আজ্ঞে?"—ভদ্রলোকের চোখ হঠাৎ উদভ্রান্ত দেখাল কি?

—"এই যে পাগড়ি দেখছেন না? এর কারণটা হচ্ছে মাথায় উকুন মারা ওষুধ লাগিয়েছি। কাজের মেয়েদুটির মাথায় আছে শুনলাম। যদি আমারও হয়ে থাকে?" টুটুল প্রকাশ্যভাবেই চুপসে গেলেন। মুখ দেখে মনে হচ্ছে মনে খুবই ধাক্কা পেয়েছেন। তারপর সামলে নিলেন।—ফরসা করে হেসে বললেন—

—"তা, সাবধানের মার নেই। হয়নি নিশ্চয়। কিন্তু... হয়ে থাকলে, তাকে নিধন করাই ভালো। আপনার লেখা পড়ে মুগ্ধ ছিলাম। এত সহজে কথা বলে ফেলতে পারেন দেখে—এখন সামনাসামনি আরও মুগ্ধ হলাম। কোনো নারী যে এভাবে...ইয়ের কথা বলতে পারেন, সত্যিই খুব আশ্চর্য।"

"উকুন" শব্দটা উচ্চারণ করতে গিয়ে একটু অসুবিধে হচ্ছে মনে হলো। কিন্তু—যাঃ ব্বাবা। ভেবেছিলুম রোমান্টিক প্রকৃতির ভদ্রলোককে ঘাবড়ে দেওয়া যাবে, উনি ঘেন্নায় পালিয়ে যাবেন, তা নয়, এ যে দেখি উলটো হলো? আমিই এবার লজ্জা পেয়ে যাই। মুখের ওপর এত প্রশংসা হজম করা যায়? আমি কি নেহরু পরিবার? একটু ত-ত করে বলেই দেখি—

—"টুটুলবাবু, আমি ফিরে আসি, তারপর আপনার সঙ্গে গল্প করব একদিন। আজকে সত্যিই সময় নেই। কিছু মনে করবেন না—ফুলগুলো খুব চমৎকার—প্রভূত ধন্যবাদ"—বলতে বলতেই উঠে পড়ি। মাথায় ভীষণ উকুন কামড়াচ্ছে। মরণ কামড়। এবারে কপালে চলে আসবে। তাড়াতাড়ি টুটুলবাবুকে নমস্কার করি। হাতে ফুলের গুচ্ছ। তিনি প্রতিনমস্কার করেন। দৌড়েই পালিয়ে আসি ওপরে।

এও প্রোমোটারই। বাপের ভিটেটা কিনতে চায় না। আমি মানুষটা যে-জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছি, সেইটেই কেনার দিকে নজর। টুটুল মজুমদারের ফুলের গুচ্ছে

একটা কার্ড আঁটা আছে। নামঠিকানা ফোন নম্বর। পাসপোর্ট টিকিটের সঙ্গে সেটাও ব্যাগে ভরে নিই। জরুরি জিনিসপত্তরের মধ্যে থাকুক।

আবার বেল বাজল। জনস্রোত শুরু হয়েছে আজ। আরো টুটুল মজুমদার নিশ্চয়ই নয়।

নীলু দৌড়তে দৌড়তে আসে। মুখে আদিগন্ত হাসি।

—"দিদি! কানাইদা! কানাইদা এসে গেছে—ঠিক আপনি যাবার মুখেই এসে গেছে।"

—"আসুক। কানাই ভেবেছে কি? একটা খবর না দিয়ে দু'মাস বেশি বাড়িতে বসে রইল? থাকগে আবার বাড়িতে গিয়ে। কালই বাড়ি চলে যাক।"

—"ওকি দিদি! আমরাও থাকি, কানাইদাও থাক। মিছে রাগ করবেন না, এসে তো পড়েইছে সময় মতন।"

—"সময় মতন? শেষ মুহূর্তে? এটা সময় মতন?" কানাই এসে প্রণাম করে। আমি মাথা ছুঁই, কিন্তু একটাও কথা বলি না। কানাই বিনা ভণিতায় বলে:

—"আপনি তো সাতাশে যাচ্ছেন, দিদি?"

—"তাতে তোমার কী?"

—"দিদি তো আজকেই যাচ্ছেন।" নীলু জানায়।

—"আ...জই? সেকি? সাতাশে শুনেছিলাম না?"

—"সেদিন আমার পেপার পড়া কনফারেন্সে।"

—"ওঃ হো।" কানাই একটু দুঃখিত মুখ করার চেষ্টা করে। তারপরেই বলে, "দিদি, এরা সব কারা?"

—"গীতা আর, শান্তা। তোমার আর বিন্দুর বদলে এরাই এ-বাড়িতে থাকবে।"

—"থাকবে?"

—"না তো কি? তুমি ছ'মাস দেশে, বিন্দু ছ'মাস দেশে থাকবে—বাড়ি ঘরদোর দেখবে কে? ভুটানী-কুতুলকে দেখবে কে?"

এই সময়ে বৃষ্টিটা খুব জোরে শুরু হলো, কাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে—এখন রীতিমতো শীত করছে। গোলাপফুলগুলো দেখলেই যা একটু উষ্ণতার বোধ হচ্ছে। টুটুল মজুমদার। কী রকম আশ্চর্য লোকও থাকে জগতে। প্রবন্ধ পরে এত মুগ্ধ কেউ হয়? লোকটির বিষয়ে কিছুই জানা হয়নি। তিনি ভবঘুরে, না চাকুরে, ব্যবসাদার, না মাস্টার-শিল্পী, না পাগল, না ঠক-জোচ্চার, কিছুর খবরই রাখি না। ঠিক বয়স কত, পড়াশুনো কী, বৌ-বাচ্চা আছে কি না, হিন্দু না মুসলমান, ঘটি না বাঙাল? ভালো লোক, না মন্দ লোক? সরল, না প্যাঁচালো? বন্ধু, না শত্রু?

নীলু হঠাৎ ছাদ থেকে খুব বিচলিত হয়ে নেমে এল। বৃষ্টির ছাঁট থেকে কাচা কাপড়চোপড় বাঁচাতে ছাদে গিয়েছিল—দ্যাখে, পুরনো খবরের কাগজের বাণ্ডিল, যা

BanglaBook.org

কানাই যত্ন করে বেঁধে রেখেছে বিক্রির জন্যে, বৃষ্টিতে সব ভিজে যাচ্ছে। যেই কাগজ সরানো, তার নিচে থেকে বেরিয়ে পড়েছে এই প্লাস্টিকের থলেটা। থলেতে দুটি জরিপাড় সিল্কের শাড়ি। আমার মেয়ে তার বিয়েতে পেয়েছে। নতুন। একগাদা কাপড়চোপড় নিয়ে কীসব গোছগাছ করছিল বটে মেয়ে, এক ট্রাংক শ্বশুরবাড়িতে যাবে, এক সুটকেস দিল্লিতে যাবে। এ-বাড়িতে থাকবে এক ট্রাংক—তখন এই গীতা আর শান্তা দুই সখী বড়দির ডানহাত-বাঁহাত হয়ে সাহায্য করছিল। সেই সময়েই ঘটেছে। দু'জনের জন্যে মাত্র দুটোই নিয়েছে, বেশি না। চাইলে কি দিতুম এত দামি কাপড়দুটো? দিতুম না। এটা ঠিকই। তবু—ওদের হাতে বাড়ি রেখে আর যাওয়া যাবে না। ওদের রাখা যাবে না। সে পথ বন্ধ।

—"কানাই।"

—"বলুন দিদি।"

—"গীতা আর শান্তার জন্যে দুটো কাজ দ্যাখো।"

—"না দিদি, ওদের কোথাও দিয়ে কাজ নেই। চুরি-চামারির দায়ে পড়বেন।" কানাই সুচিন্তিত অভিমত দেয়। নীলুও সায় দেয়।

—"বড়দি তোদের কি সুন্দর সালোয়ার কামিজ কিনে দিল, তবু তার কাপড় চুরি করলি? কী রে তোরা?"

—"কে বলল চুরি করেছি?"—শান্তা ফোঁস করে ওঠে।

—"চুরি করিনি দিদি।"—গীতার শান্ত গলা।

—"তাহলে ওখানে গেল কী করে?"

—"তা আমরা কী করে জানব?"—শান্তা।

—"আমরা জানি না দিদি।"—গীতা।

—"বাড়িতে তখন আর কে ছিল বল, তোরা ছাড়া?"

—কেউ ছিল না, দিদি।"—গীতা।

—"কেন আপনি ছিলেন। মিত্রাদিদি ছিল। বড়দি ছিল। জামাইবাবু ছিল। নীলুদিদি ছিল।"—শান্তা।

—"বাঃ বাঃ, আমরাই আমাদের শাড়ি লুকিয়ে রেখেছি ছাদে নিয়ে গিয়ে?"

—"কে রেখেছে কী করে জানব? কেউ কি দেখেছে?"

—"চোরের মায়ের বড় গলা।" নীলুর মন্তব্যে এবার শান্তা নীলুকে মুখ ভেংচে দেয়।

কানাই তাহলে যাচ্ছে না ফিরে।

শেষ মুহূর্তে হলেও ধরা পড়ে ভাল হলো। এবার মাইনের হিসেব কষতে হবে—দুজনকেই ছেড়ে দিতে হবে—কানাইয়ের ওপর রাগ করার সুযোগটা আর হলো না। এই যা ক্ষতি।

প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। স্নান করতে হবে। কাল থেকে চুলে ওষুধ দেওয়া আছে,

BanglaBook.org

শ্যাম্পু করা দরকার। "গরমজল চড়িয়ে দাও তো, স্নান করব।" এই বৃষ্টিতে, গরমজল লাগবে। কটা কাজ আরো বাকি? লিস্টটা দেখে দেখে কাজগুলো চেক করতে থাকি।

—"দিদি ভাত খাবেন না? বেলা হয়ে গেছে"—

—"আজ থাক। মিত্রাদিদির বার্লি হয়েছে?"

—"আজ থাক মানে?" কানাই বকুনি দেয়। "ভাত আবার থাকবে কি? খেয়ে নিন—পরে স্নান করবেন। মিত্রাদি বার্লি খায়নি। বমি পাচ্ছে বলছে।"

—"ডাক্তার তো ইনজেকশান দিয়ে গেল। তবুও?"

—"ইঞ্জেকশান? খুব বেশি অসুখ বুঝি মিত্রাদির?"

—নীলু মুচকি হেসে বলে—

—"ওই ইঞ্জেকশানে কিছু হবে না। হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ে যা। এ-বাড়িতে রেখে গেলে বমি সারবে না।"

—"কেন? কেন সারবে না? তুমি তো থাকবে। কানাইও এসে গেছে। ওর বন্ধু নন্দাকে খবর দিয়েছি, সে খবর নেবে, যতদিন না মিত্রা সারছে"—

—"সারবে না। আবার তো তেলেভাজা খাবে।"

—"তে-লে-ভা-জা?"

—"রোজ খায়।"

—"শুয়েই ছিল তো ক'দিন। জ্বর তো।"

—"শুয়ে শুয়েই খায়। শান্তা, গীতাকে দিয়ে আনিয়ে নেয়। আমাদের সকলকে খাওয়ায়। হ্যাঁ। তা, মনটা ভালো আছে। একা খায় না। দিয়ে-থুয়ে খায়।"

—"দিয়ে-থুয়ে খায়? কই, আমাকে তো দেয় না?"

—"আপনাকে দেবে কেন? আপনাকেই তো লুকিয়ে খায়। বলতে মানা।"

—"তবে বললি যে?"

"অত দূরে চলে যাচ্ছেন, রুগীর দায় কে সামলাবে? এখন তো শান্তা-গীতাও থাকবে না। কোনো নিয়ম মানে না মিত্রাদি, খালি খালি সিগ্রেট খাচ্ছে।"

—"বার্লি না খেয়ে সিগারেট খাচ্ছে? বললেই হলো? এইমাত্র দেখে এলাম মাথা তুলতে পারছে না, ১০৩° জ্বর"—

—"জ্বরের সঙ্গে সিগ্রেটের কী যোগ? জ্বরের মধ্যেই আমাকে বলেছিল, 'মাই কেলাব থেকে চিংড়ির কাটলেট এনে দে, বড্ড মুখটা তেতো হয়ে আছে'—আমি দিইনি, কে জানে বাবা কী হয়ে যাবে?"

—"বাঃ, খুব চিন্তাশীলা তুমি। যতদিন না আধমরা হলো, ততদিন তো এ জ্ঞানটা হয়নি।"

—"আপনি ওঁকে সেবাশ্রমে ভর্তি করে দিন। বাড়িতে আমি রাখতে পারব না, উনি খুব টেঁটিয়া রুগী।" মনস্থির করতে সময় লাগল না। মরিয়া হয়ে গিয়ে যত্রতত্র ফোন করতে থাকি। ঘণ্টা দুয়েক ধরে কলকাতার প্রায় সব ক'জন চেনাশুনো বন্ধুবান্ধবদের ধরাধরি করবার পরে অবশেষে একটি সীট মিলল। আজই হেস্তনেস্তটা

BanglaBook.org

করা প্রয়োজন, কেননা আজ বিকেল পাঁচটায় আমি রওনা হচ্ছি। সম্পাদকমশাই —আপনি ভাবছেন পুজোর লেখায় অবহেলা করেছি? একবার দেখুন অবস্থাটা। নন্দা এসে পড়ল। কানাই ট্যাক্সি ডাকতে গেল। আমি এদিকে দুটো বাক্স নিয়ে বসেছি। একটা আমার আমেরিকার হাতব্যাগ—তাতে গুনে গুনে ভরেছি—পাসপোর্ট, টিকিট, শাল, মোজা, ওষুধপত্তর, এই রে—ফরেন এক্সচেঞ্জটা আর নেওয়াই হলো না—নোটবই, পেপারের কপি—বাঁদিকে আর একটা। মিত্রার ছোট কিটব্যাগ। তাতে গুনে গুনে ভরছি—হাসপাতালে যাবার জিনিসপত্তর। নাইটি, হাউসকোট, ঘরের চটি, বুরুশ, টুথপেস্ট, তোয়ালে, সাবান, ক্রিম, ট্যালকাম, একবাক্সো লেবুসন্দেশ, এক প্যাকেট বিস্কুট। ওর হাতব্যাগটা—। খুবই মন কেমন করছে—যাবার আগে ওকে হাসপাতালে পাঠিয়ে যেতে হচ্ছে বলে। অথচ আমার কোনোই গত্যন্তর ছিল না। ওকে সুস্থ করতে হবে। আমি ঘরে থাকতেই যে এত অত্যাচার করেছে নিজের স্বাস্থ্যের ওপরে, আমি দেশে না থাকলে সে না-জানি কতদূর কী করবে। হাসপাতালে বাধ্যকরী নিয়ম মেনে বাঁচবে। অবশ্য মিত্রা যা মোহিনী, ওখানেও জমাদারকে পয়সা দিয়ে তেলেভাজা আনিয়ে খেলে আশ্চর্য হব না। অথচ এমনিতে মোটেই খাইয়ে নয়। ভাজাভুজি খাবার লোভটা অন্য জিনিস। চকোলেট খাবার লোভের মতো আলসার রুগীর সমস্যা। হে ভগবান, আরো কী কী তুমি শেষমুহূর্তে আমার সামনে উদ্ঘাটন করবে?

নন্দা এসে পড়েছে, মিত্রাকে তৈরি করছে, আমার মস্ত সাহায্য হয়েছে। আর দু' ঘণ্টাও নেই আমার রওনা হবার। কাজ পড়ে আছে সংখ্যার অতীত।

—"মিত্রাদিদির ট্যাক্সি এসে গেছে।"

"আমি যাচ্ছি এক্ষুনি।"

—"নন্দাদিদি বলছেন আপনাকে যেতে হবে না, উনিই ভর্তি করে দেবেন। আপনার তো বলা রয়েছে"—দৌড়ে নিচে যাই। মিত্রার শরীরটা দুমড়ে যেন দু'ভাঁজ হয়ে গেছে, দাঁড়াতে পারছে না। এর ওপর—তেলেভাজা? আমেরিকা, হে ভুবনমোহিনী, হে অপার রহস্যশালিনী, নিঃসীম শক্তিময়ী, এই একটি ব্যাপারে তুমি তাহলে কলকাতার কাছে হার মানলে? তেলেভাজাকে তোমার আওতায় আনতে পারনি।

•

মিত্রা চলে যাবার পর খেয়াল হলো বেলা চারটে বাজে, পাঁচটায় বেরুনোর কথা। স্নান হয়নি, খাওয়া হয়নি, সকাল থেকে যেন ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে উড়ছি শুকনো পাতার মতন। একবার ডাক্তার, একবার চুরি, একবার তেলেভাজা, তারই মধ্যে ভল্ট-প্রাপ্তির সংবাদ। ব্যাংকে দৌড়োনো, গয়না রেখে আসা (এ-কাজে অজস্র সময় গেছে।) না, গামছা বেঁধে যাইনি, সিল্কের স্কার্ফ বেঁধে। আজ তো দ্বিতীয় দিন ওষুধের।

—"কীরে, গরম জলটা হলো? আর কখন সাবান দেব মাথায়?" বৃষ্টির জোর কমেনি।

—"এই যে দিদি, গরমজল দিয়েছি বাথরুমে।"

—"কলটা খুলে দে, আমি যাচ্ছি।" তাড়াতাড়ি গিয়ে জলটার উষ্ণতা চেক

BanglaBook.org

করে নিয়ে মাথা ভেজাই। শ্যাম্পু ঘষতে ঘষতে খেয়াল হলো। এ কি? এ কিসের গন্ধ? এ তো শ্যাম্পুর নয়? চোখ মেলে দেখি বালতির জল দুধের মতো শাদা। আমার মাথা থেকে সেই দুগ্ধধবল ধারা ঝরছে,—যেন আমি শিবরাত্রির শিবঠাকুরটি।

ফিনাইলের জলে চোখ জ্বলছে।

এই মগের মধ্যেই নিশ্চয় ফিনাইল ছিল। কে রাখল মগে ফিনাইল? এখন আর নতুন করে বড় বালতি ভর্তি গরম জল তৈরির সময় নেই, মাথায় সাবান মাখা হয়ে গেছে। সবটা জলেই ফিনাইল গুলে ফেলেছি—যা থাকে কপালে। এখন আর গত্যন্তর নেই। দিব্যি আরাম করে ফিনাইলের জলে মাথা ঘষে, স্নান সেরে, চমৎকার জীবাণুমুক্ত, কীটনাশিত, পবিত্র, অ্যান্টিসেপটিক নবনীতা হয়ে বেরিয়ে এলাম। (আমাদের এক বন্ধু, সুস্নাত, নামেই 'সুস্নাত', এমন সুস্নান তিনি জীবনে করেছেন?) মনে মনে একটা ফিনাইলের জন্য টি. ভি. বিজ্ঞাপনও ভেবে ফেললাম তারই মধ্যে, অনেকটা লিরিলের মেয়েটির ঝর্ণাস্নানের মতো—মন্দ হবে কি?

স্নানঘর থেকে বেরিয়ে দু'পা গেছি, নীলু। বাড়ির সকলেই ক্রমশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে। যাবার সময় ঘনিয়ে আসছে। আমার প্রস্তুতি অসম্পূর্ণ। নীলু কী একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু আমি কাছাকাছি আসামাত্র তার চোখেমুখে একটা সন্দিগ্ধভাব ফুটে উঠল। নাক কুঁচকে, মুখ ভেটকে নীলু বললে—"এঃ ম্যাগোঃ দিদির গায়ে কিসের গন্ধ?"

—"ফিনাইলের। আবার কিসের?" আমার সহজ উত্তর।

—"দিদি কি ফিনাইলের জলে নাইলেন?" কানাই।

—"কেন? উকুনের জন্যে ভালো বুঝি?" নীলু যুক্তি খোঁজে।

—"উ-কুন?" কানাই ব্যাপারটা এখনও শোনেনি।

—"কিসের জন্যে ভালো গীতাকে জিজ্ঞেস করো। কেন সে আমার স্নানের মগে আধ মগ ফিনাইল ফেলে রেখেছিল"—

—"ওঃ হো, বারান্দা ধোবো বলে। একেবারে ভুলে গেছি, ঐ নীলুদিটা শাড়ি-শাড়ি করে এমন"—

—"দিদির সমস্ত চুলই এবার উঠে যাবে মনে হয়।" নীলুর এই শুভেচ্ছাবাণী আমার সহ্য হলো না—

—"কেন? কেন উঠবে আমার চুল? ভালোই হলো, পরিষ্কার হয়ে গেল", আমি পজিটিভ থিংকিংয়ে বিশ্বাস করি, সম্পাদকমশাই।

চুল বেঁধে, কাপড় পরে, সুটকেসে তালা দিচ্ছি। ক্রিশ্চিয়ান ডিয়র ফিনাইলের পারফিউমটা ঢাকতে পারেনি। শিবু এসেছে, দমদমে নিয়ে যাবে।

—"দিদি, ট্রাভলার্স চেকগুলো"—

—"একদম সময় হয়নি। এয়ারপোর্টে যতটা দেবে—তাই।"

—"ক্যাশ তুলে রেখেছেন তো? চেক চলবে না"—

—"ওই যাঃ, একদম মনে ছিল না"—

—"যাকগে যাকগে, দেখি আমাদের সবার কাছে কুড়িয়ে বাড়িয়ে যতটা হয়—" শিবু সান্ত্বনা দেয়।

—তাই ভালো—তারপর ওখানে গিয়ে দেদার ধারকর্জ করা যাবে—মেয়ে আছে, ভাগ্নে আছে, ভাবনা কী? আমার ভাণ্ডার আছে ভরে, তোমা সবাকার ঘরে-ঘরে।

ঘর থেকে বেরুচ্ছি, ফোন বাজল।

আবার? এখনও ছাড়ান নেই?

—"ধরবেন না দিদি, ছেড়ে দিন"—শিবুর উপদেশটা শোনবার আগেই "হ্যালো" বলে ফেলেছি।

—"আমি টুটুল মজুমদার বলছি।"

—"বলুন। আমি এক্ষুনি বেরুচ্ছি।"

—"আপনার যাত্রা শুভ হোক।"

—"থ্যাংক ইউ।"

—"ওখানে গিয়ে অনেক লিখবেন। আপনার লেখা অনেক দেখতে চাই। বড্ড কম লেখেন আজকাল।"

—"দিদি, ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।"

—"সুটকেসগুলো তোলো আগে।"

—"আমি চলি টুটুলবাবু, ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।"

—"তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন। কলকাতাতে।"

—"আপনার ফুলগুলো ফুটে গেছে—খুব সুন্দর গন্ধ।"

—"ভালো থাকবেন।"

—"ভালো থাকা কি সোজা? আপনি যতই গোলাপফুল এনে দিন না কেন, আমার গায়ে তো সেই ফিনাইলের জল।"

—"আজ্ঞে?"

—"ও কিছু না। আপনিও ভালো থাকবেন টুটুলবাবু।"

—"Bon Voyage!"

—"দিদি। সুটকেস তোলা হয়ে গেছে।"

—"যাচ্ছি, বাবা, যাচ্ছি।"

—"চলি, টুটুলবাবু। দেখা হবে। ফিরে এসে।"

সম্পাদকমশাই, এই তো ছিল অবস্থা আমার।

খুব চেষ্টা করছি যথাশীঘ্র সম্ভব একটা ভদ্রস্থ গল্প খাড়া করতে। এখানে আজ খুব বৃষ্টি। মেঘ ডাকছে। কলকাতাতেও তো এটা আষাঢ় মাস?

প্রীতি নমস্কার নেবেন।

—নবনীতা দেবসেন।

দেশ, শারদীয় ১৪০১

BanglaBook.org

খগেনবাবুর পৃথিবী

আপনারও কি সকালবেলা উঠে মনে হয়, হে সূর্য্যি তুমি উঠো না, হে সকাল তুমি হোয়ো না, হে বাজার তুমি বসো না, হে আপিশ তুমি খুলো না? খগেনবাবুর হয়। খগেনবাবুর রোজ সকালে উঠে মন খারাপ হয়। আবার একটা দিন। আবার বেঁচে থাকা। খগেনবাবুর মনে হয় বেঁচে থাকার কোন অধিকার তাঁর নেই। মনে হয়, এই সুন্দর পৃথিবী বলহীনের লভ্য নয়। আমি বলহীন। এ পৃথিবী আমার নয়। আমিও এর কেউ নই। তবে আমি কী করছি এখানে? কেন দাঁত মাজছি, কেন ভাবছি কী কী বাজার করতে হবে, কী কী ঘরে আছে, দিল্লিতে কে কোন্ মন্ত্রিত্বের দপ্তর পাবে, কলকাতা করপোরশনের ভবিষ্যৎ কী—কেন ভাবছি ন'টা কুড়ির স্পেশাল ধরতে হবে, কেন ভাবছি আপিশে আজ কী কী কাজ আছে, কী কী প্রস্তুতি নেওয়া দরকার, কার কার চিঠির জবাব দিতে হবে, কোন কোন ফাইল ছাড়া হয়নি। কেন ভাবছি কলের মিস্ত্রিকে ধরতে হবে। ছাদের কলটা বন্ধ হচ্ছে না, কেন ঘড়ি দেখছি, কেন চান করতে যাচ্ছি, কেন দাড়ি কামাচ্ছি, কেন ও-ঘরের ফ্যানটা বন্ধ করছি। কেন? কেন? কেন বাঁচতে ইচ্ছে করছে না। কেন তবুও বাঁচছি। বাজারে যেতে ইচ্ছে করছে না, কেন তবুও বাজারে যাচ্ছি। চাকরি করতে ইচ্ছে করছে না, কেন তবুও চাকরি করছি। রোজ সকালে উঠে খগেনবাবুর এইরকম মনে হয়। এ পৃথিবী আমার নয়, আমি একে জয় করে নিতে পারিনি। আমি ট্রেসপাসার। প্রত্যেককে তার নিজের জন্য তার নিজস্ব পৃথিবীকে জয় করে নিতে হয়। আমার দ্বারা সেটি সম্ভবপর হয়নি। খগেনবাবু স্পষ্ট দেখতে পান অশ্বিনী ঘোড়ার মতো এই গ্রহটা খগেনবাবুর নিচে থেকে যেন পিছলে বেরিয়ে যেতে চাইছে। খগেনবাবু তাকে রাশ টেনে ধরে রাখতে পারছেন না। তিনি যেন শূন্যে ভাসছেন। আমি অক্ষম। আমি অপটু। আমি অযোগ্য। খগেনবাবুর মতো আপনারও কি এরকম মনে হয়? অনৈপুণ্যের, অদক্ষতার, অযোগ্যতার দুঃখ আছে কি আপনার? নাকি আপনি "ওদের" মতন? "ওদের" দলের? যাদের অসীম দক্ষতা, নিটোল নৈপুণ্য, যাদের যোগ্যতা প্রশ্নাতীত। আপনি কি সেইসব "করিৎকর্মা" মানুষদের একজন?

তাহলে এ কাহিনী আপনার পড়ার দরকার নেই। এসব ভাষাই বুঝতে পারবেন না। খগেনবাবুর সমস্যা আপনার কাছে নেহাৎ বানানো আজগুবি, উদ্ভট ভাবনা বলে মনে হবে। এবং এসব সমস্যা কোনো সমস্যাই নয়, এমন ধারা মনে হবে। কেননা আপনি এর সহজ মীমাংসা করে ফেলবেন চকিতেই। কেননা আপনি খগেনবাবুর মতো নন; সদাশঙ্কিত, "আকামা" নন। আপনি করিৎকর্মা, অর্থাৎ আপনি ফাঁকা স্বপ্ন দেখেন না, পরিকল্পনামাফিক কাজ করেন। আপনার স্বপ্নও তাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সাফল্যলাভ করে। খগেনবাবুর স্বপ্ন "কেবলই স্বপ্ন" থেকে যায়। কেননা কল্পনা থেকে তা কদাচ পরিকল্পনার স্তরে ওঠে না। "বপন" করারও প্রশ্ন নেই। আপনার সাহস আছে, আত্মবিশ্বাস আছে। জুয়াড়ির জেদ আছে। আপনার পাওনা আপনি

কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নিতে জানেন। আপনার সেবার জন্যই এই পৃথিবী ঘূর্ণ্যমান। আপনি বরং অন্য কোনো লেখা পড়ুন। বেশিরভাগ লেখাই আপনার জন্য।

এটা খগেনবাবুর মতো অসক্ষম, ভীতুদের জন্য। যারা পাওনা-গণ্ডার হিসেব কষে খাতা ভরায় বটে, কিন্তু সাহস করে সেটা আদায় করে নিতে এগোয় না। যারা জেনেশুনে ঠকে। তারা আকাট ভালমানুষী করে জীবনটা কাটিয়ে দেয় বটে, কিন্তু ভালমানুষ বলে মোটেই নয়, নেহাৎ ভীরুতাবশত। এ ধরনের মানুষ, খগেনবাবুও জানেন, তিনি ছাড়া আরো অনেকেই আছে। তিনিও তো আমাদের দেখতে পান, চতুর্দিকে ভয়ে ভয়ে পা টিপে টিপে পা ফেলছি। খগেনবাবু জানেন পৃথিবীতে খগেনবাবুর মতো লোকজনের সংখ্যা খুব কম নয়, যারা পৃথিবীতে হোঁচট খেতে খেতে আন্দাজে বিচরণ করছে, কিন্তু যাদের এখানে 'প্রবেশ নিষেধ' হওয়া উচিত ছিল।

বিলেত-টিলেতে "হোমলেস" বলে একদল লোক গজিয়েছে। আগেও তারা ছিল —কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল কম। আর তাদের নাম ছিল, "ট্র্যাম্প"। যাদের আমরা চার্লি চ্যাপলিনের ছবিতে দেখেছি। ছেঁড়া কাপড় পরে পথেঘাটে ঘুরে বেড়াতো, আঁস্তাকুড় থেকেও খুঁটে খাবার খেতো, ছিঁচকে চুরি আর ভিক্ষেটিক্ষে করতো, আর বাঘ পালানো শীতের চোটে বরফের মধ্যে পথের ধারে মরে, জমে পড়ে থাকতো। এখনো একটু গরমের আশায় ঢাকনিওলা ডাস্টবিনের মধ্যে ঢুকে বসে থাকে। তাদের বরফজমা শরীর কুড়িয়ে পাওয়া যায় এখানে সেখানে। ঘরবাড়ি—চাকরিবাকরি—আত্মীয়স্বজন—বন্ধুবান্ধব—শুভ অশুভ এসব কোনো কিছুরই বালাই তাদের থাকে না। 'হোমলেস' তাদেরই নয়া নাম। কিন্তু এরা সংখ্যায় এখন অত্যন্ত বেড়ে গেছে। সেই একই জীবন, তবে আরেকটু মন্দ হয়েছে। মদ ছাড়া, এরা ড্রাগও খায়। চাহিদা বেড়েছে, তাই চুরি-ডাকাতিও বেশি করতে বাধ্য হয়। এদের পরিবার পরিজন থেকেও নেই। সমাজ এদের সর্পদষ্ট অঙ্গুলিবৎ পরিত্যাগ করেছে। কেউ এদের চাকরি দেয় না। কেউ এদের ঘরে নেয় না। করিৎকর্মারা মনে করে পৃথিবীর এরা কেউ নয়। জীবনের শরীরে এরা দুষ্টক্ষত, কুষ্ঠব্যাধি। যেন এরা মরে গেলেই পৃথিবী ভারমুক্ত হন। এই গ্রহে এদের কোনো অধিকার নেই।

না। খগেনবাবু কিন্তু এদের কেউ নন। এদের সঙ্গে তাঁর জীবনে কোথাও মিল নেই। বালাই ষাট। খগেনবাবু সম্ভ্রান্ত, মধ্যবিত্ত, ভদ্রলোক। পাশটাশ করেছেন, একটানা একটাই ভদ্রগোছের চাকরি করছেন, বিয়ে থা করেছেন, ছেলেপুলেদের মানুষ করেছেন, জীবনের সকল দায়দায়িত্ব পালন করেছেন, পিতামাতাকে তাঁদের বার্ধক্যে আশ্রয় দিয়েছেন। পৈতৃক বাড়ি না থাক, ভবানীপুরের ভাড়াবাড়িটা তো আছে, খগেনবাবুর মাথা গোঁজবার ঠাঁইয়ের অভাব নেই। চাকরি ফুরোলে পেনশন পাবেন, জলে পড়বেন না। সত্যি বলতে কি—খগেনবাবুর যে কেন এত মন খারাপ হয়

সেটা বোঝা বড়ই কঠিন। তিনি তো দেখতে শুনতে "সাবধানী পথিক"দের মতোই —"পথভোলা" টাইপ নন মোটেই। অথচ ঐ "হোমলেস"দের সঙ্গে তাঁর কোথাও যেন একটা মিল রয়েছে। বাইরে থেকে আপনি কিন্তু সেটা কিছুতেই বুঝতে পারবেন না। মিলটা ভিতরে ভিতরে—খগেনবাবুর মনে হয় তাঁর ভিতরটা "হোমলেস"। "হায় পথবাসী হয়ে গৃহহারা" শুনলেই তাঁর বুকটা হা-হা করে ওঠে—মনে হয় তাঁরই জন্য লেখা হয়েছিল বেছে বেছে ওই বুকফাটা শব্দগুলো। সময় থাকতে "বাড়ি", "জমি", এসব শব্দগুলো তাঁর কখনও মনে পড়েনি। যথাসময়ে 'ওরা' সকলেই ফ্ল্যাট কিনে ফেলেছে। তিনি ছাড়া। 'ওদের' মতো তিনি ঠিক সময়ে টাকা জমাতে পারেননি, টাকা খাটাতেও পারেননি, ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় ফ্ল্যাট কেনার চেষ্টাও করেননি। এখন জমির দাম ভীষণ বেড়ে গেছে। খগেনবাবুর নাগালের অনেক বাইরে। এখনকার প্রোমোটারগুলো উটকো, জোচ্চোর, যেখানে-সেখানে হুড়মুড় করে বাড়িঘরদোর ভেঙে পড়ছে। এখন আর কলকাতায় কি তার আশপাশে ফ্ল্যাট কেনা হবে না খগেনবাবুর। বেহালা সরশুনা ছেড়ে ইদানীং জোকার দিকেও খুঁজেছেন। পাননি। হয়তো বর্ধমানেই চেষ্টা করবেন এবার। স্ত্রী তো তাই বলছেন। তাঁর বাপের বাড়ি বর্ধমানে। সেখানে তাঁর করিৎকর্মা ভায়েরা আছেন।

খগেনবাবুর জীবনটাতে পড়াশুনো, চাকরিবাকরি, বিয়ে থা, ছেলেপুলে, তাদের পড়াশুনা, তাদের চাকরি-বাকরি, তাদের বিয়ে থা, সবই তো দিব্যি চলছিল গড়গড়িয়ে। ঠিকঠাকই এগোচ্ছিল খগেনবাবুর জীবনটা, যেমনটি এগোনো উচিত। কোথাও কোনো বড়সড় গোল পাকায়নি কখনও—চাকরিতেও উন্নতি হচ্ছে, স্ত্রী বদমেজাজী নন, ছেলেমেয়েরা জীবনে অসফল নয়, বাড়িওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া নেই—হঠাৎ কোথা দিয়ে যে কী হয়ে গেল। মনে হচ্ছে সবই ফসকে গেছে। মনে হচ্ছে কোনোদিন কিছুই করে ওঠা হয়নি। কিছুই ঠিকঠাক করতে পারিনি, কিছুই নিখুঁত হয়নি, কিছুই হয়নি। কী যে হলো তা খগেনবাবুও বুঝতে পারছেন না। শুধু রোজ সকালে উঠে এই মন খারাপ। কোথায় যেন একটা কবিতার লাইন পড়েছিলেন, "বাড়ির বিষয়ে আমি খুব কম জানি।" কি আশ্চর্য লাইনটা।... বাইরে থেকে দেখলে কিছুই হয়নি। কিছু না। অথচ ভেতরে ভেতরে কি সব যেন চুর চুর হয়ে যাচ্ছে। কি সব যেন ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে আসছে। ভেতরে ভেতরেই, একটা বাক্য তৈরি হয়ে, ঠিক স্লোগানের মতো খগেনবাবুর কানে বাজছে, বারবার, বারবার। খগেনবাবু ওটা শুনতে চান না, কিন্তু না চাইলে কি হবে। নিঃশব্দ স্লোগান বলছে, "অনধিকারী তফাৎ যাও।" দু'হাতে কান চাপা দিলেও তো সে আওয়াজ বন্ধ করা যাবে না। কবে যে শুরু হলো? ভেতরে ভেতরে খগেনবাবু কেবলই শুনতে পাচ্ছেন তাঁর এই জীবনটার কোনো মূল্য নেই। এভাবে অনধিকারী হয়ে বাঁচার মানে নেই। মনে হচ্ছে তাত মাত ভ্রাত কেউ না আপনা। মনে হচ্ছে ত্রিভুবনে তাঁর নিজের বলতে কেউ নেই। মহাসিন্ধুর এপারে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন একা। সময়টা রাত্রি। সমুদ্রের রং কালো। আকাশের রং কালো। সমুদ্রে ফসফরাসের ঝিকিমিকি, আকাশে তারার। বাতাস বইছে না।

না, ঠিক কন্যাকুমারীর পাথরে বিবেকানন্দের মতন নয়। এ অন্যরকম। আলাদা। অনেকটা হয়তো আন্দামানের সেলুলার জেলের মধ্যে দাঁড়ানোর মতন হতে পারে। খগেনবাবু সেখানে যাননি। বাপ-মা? ভাই-বোন? স্বামী-স্ত্রী? পুত্রকন্যা? বন্ধুবান্ধব? পাড়াপ্রতিবেশী? ধ্যাৎতেরিকা। তবে প্রেমপ্রণয়? প্রণয়িণীট্রনয়িনী? আরে দূর মশাই। আজ বাদে কাল রিটায়ারমেন্ট। তবে গুরু? গুরুভজনা? ওঃ। জ্বালালেন মশাই, গুরু আবার কী? গিন্নির গুরুভজনার চোটেই খগেনবাবুর প্রাণান্ত। গুরু মানে ঈশ্বরের দালাল। আর ঈশ্বর তো সেই সৃষ্টিকর্তা, যিনি স্বয়ং খগেনবাবুকে এই প্যাঁচে ফেলেছেন। এই ফাঁদ তো তাঁরই হাতে গড়া—এই মনুষ্যজন্ম, যেখানে "মরণ বলে আমি তোমার জীবনতরী বাই।" সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে খগেনবাবু খবর পান চারিদিকে কেবল মৃত্যু আর মৃত্যু। কেবল হানাহানি, খুনোখুনি। যেমনি মানুষের, তেমনি প্রকৃতির। যেন সংহারমূর্তি ভিন্ন আর কোনো চেহারা নেই। এখানে তুফান, বন্যা, প্রলয়। ওখানে আগ্নেয়গিরিতে অগ্ন্যুৎপাত, দাবানল, ভূমিকম্প। জল, যা প্রাণ দেয়, তাই মৃত্যু আনছে। আগুন, যা সভ্যতার জন্ম দেয়, তাই সভ্যতার ধ্বংস ডেকে আনছে। কাগজ খুললেই ছবি দেখবেন, মড়ায় মড়ায় জলস্থল ছেয়ে আছে। মানুষের মড়া, পশুপাখির মড়া। পালাবেনটা কোথায় খগেনবাবু? মন্দিরে যুদ্ধ, মসজিদে যুদ্ধ, গুরুদ্বারে যুদ্ধ, গির্জেয় যুদ্ধ। শান্তিটা আছে কোথায় শুনি?

আপিশেও যুদ্ধ।

সংসারেও যুদ্ধ।

একদিকে যারা সহযোদ্ধা হয়ে সংগ্রামী সেলাম দিচ্ছে, অন্যদিকে তারাই শত্রুপক্ষ হয়ে কামান দাগছে। যখন যেমন। মুশকিল এই যে, খগেনবাবু বেচারী সবসময়ে বুঝে উঠতে পারেন না কে কখন কেমন। প্রতিদিনই ফ্লোর ক্রসিং হচ্ছে—কি ঘরে, কি বাইরে। ঐখানেই তো খগেনবাবুর নৈপুণ্যের অভাব। খগেনবাবু টের পান না। খগেনবাবু চির অপ্রস্তুত, লেটলতিফ, অনেক দেরিতে টের পান। তখন আর কিছু করার থাকে না। ক্ষতে প্রলেপ লাগানোর চেষ্টা ছাড়া। পূর্বাহ্নে আত্মরক্ষার প্রণালীগুলি তাঁর ব্যবহার করার কদাচ সুযোগ হয় না। জানেন না তা নয়, তাত্ত্বিকভাবে সবই জানেন বৈকি। অর্ধশতাব্দী ধরে একটানা বেঁচেই তো আছেন—("লাগাতার" বেঁচে আছেন) দেখেছেন, শুনেছেন, পড়েছেন।

খগেনবাবু তাই জানেন, তাঁর এ সমস্যা "সর্বজনীন" নয়। এ ওঁরই নিজস্ব। এবং ওঁরই মতো আরো যারা এ পৃথিবীতে ট্রেসপাস করেছে, তাদের। 'ওদের' এরকম সমস্যা হয় না। কেননা "ওরা" করিৎকর্মা। "ওদের" অ্যানটেনা ছড়ানো থাকে বাতাসে, পিঁপড়ে কিংবা কেবল্ টিভির মতো। ওরা টের পায়। ওরা অন্যের ওপর নির্ভর করে বসে থাকে না, নিজেরাই সর্বদা অগ্রণী হয়। ওরা একমুহূর্তে বন্ধু, পরমুহূর্তে শত্রু হতে পারে। এই আপনাকে সলাপরামর্শ দিচ্ছে, এই আপনার পিছনে ডালকুত্তা লেলিয়ে দিচ্ছে। আপনি জানতেও পারছেন না। এতে "ওদের" চিত্তে কোনো অপরাধবোধ নেই, কেননা ওরা জানে, ওরা যা করছে তা নিজেদের

amarboi.org

ভালোর জন্যই করছে সর্বদাই এবং সেটাই জীবমাত্রের চরিত্র। খগেনবাবু আবার সেটাও ঠিকমতো জানেন না আজকাল। কোনটা যে সত্যি সত্যি তাঁর নিজের পক্ষে ভালো, সেটা তাঁকে কে বলে দেবে? মাঝে মাঝেই খগেনবাবু বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন ভিতরে ভিতরে—যখন মনে হয় পৃথিবীটা পায়ের নিচ থেকে পিছলে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ওঁর "লয়্যালটি"র ধারণাটা "ওদের" থেকে আলাদা।

"ওদের"ও লয়্যালটি আছে বইকি। তবে তা ক্ষুদ্র ব্যক্তিনির্ভর নয়, মহত্তর বৃহত্তর। আদর্শের প্রতি, আরব্ধ কর্মের প্রতি। ব্যক্তি আসে, ব্যক্তি যায়। কিন্তু উদ্দিষ্ট লক্ষ্য, আরব্ধ কর্ম, মহৎ আদর্শ একই থাকে। "আত্মোন্নয়ন"। যার যার পুণ্য কর্মক্ষেত্রেই উচ্চতম আসনে পৌঁছোনোই, 'ওদের' আরব্ধ কাজ—ওদের যা আদর্শ, মনুষ্যজন্মের সেটাই মূল লক্ষ্য। "ওরা" অর্জুনের মতো। ঐকান্তিক একাগ্রতায় ওরা লক্ষ্যভেদী তীর ছুঁড়তে শিখে যায়। ওরা পাখি দেখে না, শুধু চোখটুকুই দেখতে পায়। খগেনবাবু এতে অবাক বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে যান। চোখ? হায়রে। তিনি দেখেন গোটা পাখিটা, তার লেজ, তার ঝুঁটি, তার ডানা, এসব তো দেখেনই, তায় গাছপাতা, ফুলটুল, মৌমাছি, কাঠবেড়ালী, আকাশ-টাকাশ, মেঘটেঘ, সবই যে স্পষ্ট দেখতে পান। এবং সবই তাঁকে টানে। লক্ষ্যভেদ আর হবে কী করে?

ঈশ্বর যাকে যে ক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়েছেন তার পূর্ণ ব্যবহার না করাটা ঈশ্বরের প্রতি অবিচার। কথার খেলাপ। বিশ্বাসভঙ্গ। খগেনবাবু তা অস্বীকার করেন না। "ওরা" বিশ্বাসভঙ্গ করে না। কিন্তু খগেনবাবু করেন। খগেনবাবু ভো জানেনই না ঈশ্বর তাঁকে কতটা কী ক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়েছেন। মানুষের মগজের ওজন নাকি ষোলো আউন্স। তার মধ্যে পাঁচ পারসেন্ট কোষও নাকি আমরা ব্যবহার করি না। ঈশ্বরদত্ত অমেয় ওজনরহিত করুণাধারার এক কণাও, আধ পারসেন্টও যদি সদ্ব্যবহার করতে পেরে থাকেন, খগেনবাবুর তো সুখী হওয়া উচিত। আগে তাই-ই ছিলেন। হঠাৎ তাঁর কী যে হলো। "ওরা"ই করে মগজকোষের প্রকৃত সদ্ব্যবহার। এবং ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার কণামাত্রও অপচয় করে না। ওরা তার একশো পার্সেন্টই ব্যবহার করে। মাথা খাটিয়ে। পরিশ্রম করে। নির্ভয়ে। নির্দ্বিধায়। কোনোদিকে না তাকিয়ে।

তাই পৃথিবীটা "ওদের"। খগেনবাবু ভালো করেই জনেন এ নিয়ে হিংসে করা বৃথা, শ্রদ্ধা করা উচিত। হাহুতোশে সময় নষ্ট না করে পরিশ্রম করা উচিত। "স্বপ্নকথায়" না ডুবে থেকে, "পবিকল্পনা" করা উচিত। গল্পগুজবে না মেতে, আলাপ-আলোচনায় মন দেওয়া উচিত। একথা-সেকথা না পেড়ে, ঠিক জায়গামতো একটা কোনো "প্রস্তাব রাখতে" পারলে কাজে দেবে। খগেনবাবু জানেন এসব। তিনি জানেন অনবরত নিজেকে বলতে হয় "নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন হবেই হবে।" হবে তো, কিন্তু ভিতরে তো মালমশলা থাকা চাই? "বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি"। "প্রতিভা" বস্তুটি অনেকের ভেতরেই গুটিসুটি হয়ে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। টের পেতে সময় লাগে। আজকাল অবশ্য "প্রতিভা"র সংজ্ঞাটা সর্বদা জীবনীবইতে যা দেখতে পাওয়া যায় তাতেই সীমায়িত নয়। নানা নতুন নতুন "প্রতিভা"র এলাকা

গজিয়ে উঠছে প্রত্যহ। নতুন সংজ্ঞায়। কিন্তু দেরিতে জেগে-ওঠা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মতন "সুপ্ত প্রতিভা"র সহসা-জাগরণও অতি ভীষণ দৃশ্য। খগেনবাবু তাও দেখেছেন। এখন চাপা পড়া উচ্চাকাঙ্ক্ষার মরিয়া অধীনতা, উদ্ধত আত্মবিশ্বাসের প্রচণ্ডতা, ক্ষমতার লুব্ধতা আর দম্ভের উগ্রতা—গরম লাভাস্রোতের মতন নেমে আসে, ছাই, আগুন, গরম পাথর ছুঁড়তে থাকে চারিদিকে। খগেনবাবু জানেন, তখন "সুপ্ত প্রতিভা"র চৌহদ্দি থেকে পোঁ-পাঁ ছুটে পালিয়ে যাওয়াই মঙ্গল। নইলে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। নেহাৎ ছ্যাঁকা তো খাবেনই। তার চেয়ে ভাল দূর থেকে চেয়ে দেখা, আর মোহিত হওয়া। আহা, এত আগুনও ছিল ভিতরে? এত দীপ্তি? খেত খামার ছেয়ে ফেলেছে। এত বড় বড় পাথর? ঘরদোরের চাল ভেঙে ফেলেছে। খগেনবাবু ঢের দেখেছেন। সুপ্ত প্রতিভার অগ্ন্যুৎপাত। অনেকটা শেষ যৌবনের চক্ষুলজ্জাহীন কামুকতার মতনই কুশ্রী সেই ক্ষমতার লোভ। পুরুষের মধ্যে এই যৌবনান্তিক লুব্ধতা খগেনবাবুর শান্ত চোখ এড়ায়নি। শুনেছেন ইদানীং নারীদের মধ্যেও এই রোগ এসেছে। অফিসে এ নিয়ে নানা রসিকতা হয়—"মিসেস ব্যানার্জীর লাস্টবাস"— "অবস্থা কাহিল"—"এখন ডেসপারেট"—"চল্লিশ পেরিয়েছে, হবে না?" "তুইও ট্রাই নিতে পারিস"। কি জানি মিসেস ব্যানার্জীর মধ্যে খগেনবাবু তো নতুন কিছুই লক্ষণ দেখতে পান না। তবে হাঁ, লুব্ধতার মধ্যে অসম্ভ্রম আছেই। যে-কোনো লুব্ধতায়।

কে জানে, আপনিও একজন "সুপ্ত" প্রতিভা হতেই পারেন। না "জাগলে" তো বোঝা যাবে না। তবে খগেনবাবু নন। খগেনবাবু জানেন। অনেকবার পরীক্ষা হয়ে গেছে। খগেনবাবু নিজের কাছে নিজে স্বীকার করেন—আমি ভীতু, আমি আমার বসকে ভয় পাই, আমার গিন্নিকে ভয় পাই, আমার বেয়ারাকেও ভয় পাই, আমার ছেলেকে এবং মেয়েকে ভয় পাই, ছেলের বউকে ভয় পাই, জামাইকে ভয় পাই, কাজের লোকদের ভয় পাই, পাড়াপ্রতিবেশীকে ভয় পাই, আত্মীয়কুটুম্বকে ভয় পাই। প্রত্যেকের কাছেই কোনো না কোনোভাবে যে আমার টিকি বাঁধা। এ জগতে এসেছি—কোথায় রসেরশে থাকবো—তা না, ভয়ে ভয়ে কোনোরকমে টিকে আছি। এবার যেতে পারলে বাঁচি। বয়স যত বাড়ছে, ভয়ের এলাকা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এত ভয়ে শিঁটিয়ে কোঁচো হয়ে সংসারে বেঁচে থেকে কার কী লাভ? খগেনবাবুর রোজ সকালে এইসব ভাবনা মাথায় আসে। আর মনটা বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে "ওদের" চিন্তা উনি মন থেকে তাড়াতে পারেন না।

কেন, "ওরা" তো কাউকে ভয় পায় না? ওরা কেমন নির্ভীক। কেননা, ওদের কাছেই অন্যদের টিকি বাঁধা। ওরা সবার হাঁড়ির খবর রাখে। ওরা ওপরতলার প্রত্যেককে চেনে। যেই যখন সিংহাসনে আসীন থাকুক না কেন। "ওদের" সুড়ঙ্গ যায় প্রত্যেকের হেঁসেলে। কে কী ভালবাসে, কার কী দরকার, কে কাকে দেখতে পারে না, কার কোথায় দুর্বলতা—"ওরা" সব জানে। এই "জ্ঞান" ওদের শক্তিমান করে। যে কোনো সংগ্রামে, তা "সম্মুখ সমর" যদি নাও হয়, ওদের বিজয় নিশ্চিত।

ওরা করিৎকর্মা। ওরা সাফল্যমনস্ক। ওরা আত্মস্থ। ওরা ধাতস্থ। ওরা কাজ গুছোতে জানে। ওরা যাবতীয় আইনকানুন বিষয়ে ওয়াকিবহাল, দাবি, অধিকার, অনুমতি, সম্মতি এসবের এলাকা ওদের নখাগ্রে। নিজেদের ন্যায্য পাওয়া সম্বন্ধে ওরা সচেতন। ট্যাক্সো বাঁচাতে আইনত কী কী কিনতে হয়, কত তারিখের মধ্যে কিনতে হয়, কী কী কিনতে হয় না, ওরা বিশ বছর বয়েস থেকেই জানে। খগেনবাবুর এখনও ব্যাপারটা রপ্ত হলো না। কেন যে, খগেনবাবু বুঝে উঠতে পারেন না। ওরা যে অনাদ্যন্ত কাল ধরে জীবনে উন্নতি করে যাবার জন্য জানপ্রাণ লড়িয়ে দিয়েছে। ওরা মরিয়া। ওরা জীবনটাকেই বাজি ধরেছে। এ পৃথিবীকে ওরা জিতে নেবেই। জীবনসংগ্রামের জন্য ওদের বিনিদ্র প্রস্তুতি নিশ্ছিদ্র। মনোবল অটুট। খগেনবাবুর...

থাক। ওদের কথা খগেনবাবুর আর ভেবে কাজ নেই। আপনি-আমিই বা ওদের কথা ভেবে কী করব? খগেনবাবুর মতোই আমাদেরও মনোবল যে জিরো। প্রস্তুতি জিরো। বাজি ধরতে ভয় পাই। হাতের কাছে কোলের কাছে যা আছে তাই অনেক আছে। আরো চাইতে গেলে বিপদে পড়বো। থাক। দরকার নেই। চলে তো যাচ্ছে। ওরা অন্যজাতের মানুষ। ওদের শিরায় অন্য রক্ত বয়। ওদের কথা আলাদা। ওরা সফল হবেই। টাকা ব্যাপারটা ওরা জলের মতো বুঝতে পারে। আর কবিতার ব্যাপারটা ওদের কাছে বাতাসের মতো স্বচ্ছ। আর সামাজিক মানসম্ভ্রমের ব্যাপারটা? সূর্য্যির আলোর মতো স্পষ্ট। ওরা আসলে সবই ঠিকঠিক বুঝতে পেরে যায়। হিসেবের মধ্যে আনতে পারে সব কিছু। দাড়ি কামাতে গিয়ে খগেনবাবু বন্ধ দরজার পিছনে বাথরুমের আয়নাটার সঙ্গে মনে মনে কথা বলেন। মাঝেমাঝে বিড়বিড় করে ফেলেই চুপ করে যান। কে জানে বাবা এটাই পাগল হবার পূর্বলক্ষণ কিনা? লাগাম ছাড়লে তো চলবে না? বোধ ছাড়া আর কী আছে তাঁর নিজস্ব সম্বল? বুদ্ধি বিশেষ নেই, সে তো গিন্নি রোজই বলেন। বাবা-মা কিন্তু এটা কখন বলেননি। খগেনবাবু সন্তান হিসেবে বেশ ভালই ছিলেন বোধহয়, বাবা হিসেবে তেমন ভাল হননি মনে হচ্ছে —কেননা ছেলেমেয়েরা বলে তাঁর অনুভূতিও নেই। বুদ্ধি তো নেই —অনুভূতিও না? কে জানে? হবে বোধহয়। তবে হ্যাঁ। ছিল। একদিন ছিল বৈকি। বুদ্ধিও ছিল। অনুভূতিও কি ছিল না? এখন তবে তাঁর হলোটা কী? "মধ্যজীবনের সংকট" কি একেই বলে? এই কি তবে মধ্যজীবন? নাকি এটা শেষ? মধ্য মানে তো ঠিক যতটা এসেছ, ততটাই পথ বাকি। না—সায়েবসুবোরা যাই বলুন হিসেবটা অত সোজা নয়। মধ্যজীবনের সংকট নয়। সারা জীবনের সংকট। "ওরা" অন্যজাতের মানুষ। খগেনবাবু ওদের পানে মুগ্ধনেত্রে চেয়ে চেয়ে দেখেন আর ছোটবেলাতে দেখা একটা দৃশ্য ওঁর মনে পড়ে যায়। সেই ছেলেবয়সের গ্যাসবাতি জ্বালানোর লোকটিকে। ঠিক তারই মতো এই বিরাট বিশ্বভুবনের অলিতে গলিতে ওরা একটা মস্ত মই ঘাড়ে করে ছুটছে। এক লক্ষ্য থেকে আর এক লক্ষ্যে। জ্বলে উঠবে একের পরে এক বাতিস্তম্ভ। মইটা চর্মচক্ষে দেখা যায় না কিন্তু মর্মচক্ষে বেশ প্রকট। বেশ

ভারি, ওজন আছে মইটার। ঐ বস্তু কাঁধে নিয়ে জীবনভোর ছোটাছুটি, ও খগেনবাবুর দ্বারা হবে না। তার চেয়ে, "জীবনের পরম লগনগুলি" হেলায় বয়ে যেতে দেওয়াই বরং সুবিধে। খগেনবাবু পত্রিকায় পড়েছেন, জগতে আরো অনেকের স্বভাবে এই দোষ আছে, এটার নাম "সাফল্য ভীরুতা"; এও একরকমের "মনোরোগ"। সফলতার ক্ষমতা না থাকা এক জিনিস, আর পাছে সফল হই সে ভয়ে কুঁকড়ে থাকা আরেক ধরনের অপটুতা। গিন্নি যা বলেন, তাতে তো খগেনবাবুর মনে হয় কি জানি, হয়তো তাঁরও এইটাই? "মনোরোগ" তো মনের ডাক্তার দেখালে সেরে যায়। "সাফল্য ভীরুতা" নিশ্চয় সারে। আর "ওদের" ওই যে "সাফল্য সাহসিকতা"? সেটাও কি ডাক্তার দেখালে সারবার? এই যে "সাফল্যমত্ততা", এই যে মই বয়ে বেড়ানো? যেদিকে চেয়ে চেয়েই খগেনবাবুর ক্লান্তি বোধ হতে থাকে।

তা বলে সাফল্য ভীরু মাত্রেই কি অন্যের সাফল্যে সন্তুষ্ট? না, তাও ঠিক হলো না, মনের মধ্যে কেমন একা গাঁই-গুঁই গজর-গজর অস্বোয়াস্তি হতে থাকে। আপনারও কি হয় না মাঝে মধ্যে? (যথা ওর কোন জিনিসটা আছে শুনি, যেটা আমার ছিল না, যে ওর হয়ে গেল, আর আমার হলো না?) তবে সদাসর্বদা নয়। সদাসর্বদা যাদের এরকম মনের ভাব, তারা তো হিংসুটে। খগেনবাবু কি হিংসুটে? তাহলে তাঁরও যে মাঝে মধ্যে কখনও কদাচ গোপনে সঙ্গোপনে এমন ধারাটি মনে হয়নি, তা নয়। হয়েছে। অথচ সেই গুপ্তকথাটি জানতে পেরে গিয়ে যদি কোনো সন্ন্যাসী এসে একদিন খগেনবাবুকে বলেন, "ছি বাছা খগেন, পরশ্রীকাতর হতে নেই, পরশ্রীকাতরতা বড়ই নোংরা জিনিস"—তাহলে খগেনবাবু যে খগেনবাবু, তাঁরও রাগ হয়ে যাবে। কেননা এটা তাঁরও ভালমতোই জানা আছে যে পরশ্রীকাতরতা অতি মন্দ জিনিস এবং এটা একটা মানহানিকর অভিযোগ। যতই অপটু হোন, অযোগ্য হোন, খগেনবাবু দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে পরের শ্রীতে তিনি কদাচ কাতর হন না। ঠিক যেমন কাতর হন না পরের স্ত্রীতেও। এগুলো ভদ্রসমাজের গোড়ার কথা। অভ্যাসের ব্যাপার। সংযমের ব্যাপার। শুধু কখনও কখনও যখন দেখতে পেয়েছেন যে চোখের সামনে খোলাখুলিভাবে যোগ্যতর (অর্থাৎ খগেনবাবুদের) ব্যক্তির উচিত উন্নতি ঠেকিয়ে দিয়ে, স্রেফ তাদের ডিঙি মেরে নিম্নস্থ ব্যক্তিদের অনুচিত উন্নতি হয়ে যাচ্ছে তখনই মনে একটু যা অসন্তোষের উদ্ভব হয়েছে। সেটা তো ওপরতলার বিচার বিচক্ষণতার অভাবে, জগতের ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্নে। "পরশ্রীকাতরতা" শব্দটা ওঠে কেন? খগেনবাবুরা কি তাদের নিন্দে করছেন? না, প্রতিবাদ করছেন? না, আপত্তি যে জানাননি, তারও কারণ আছে বইকি। সেই কারণটা আপনিও জানেন।

কারণটা অবশ্য একটু গোলমেলে।

ব্যাপার হচ্ছে এই যে তলিয়ে ভেবে দেখলে, "ওরা" আদৌ "অযোগ্য" নয়। পদোন্নতি ঘটলে ওদের মনের কোণেও কদাচ এমনধারা প্রশ্ন জাগবেই না যে—

-"আমি এই পদের যোগ্য তো?" হায়রে, খগেনবাবুদের মনে যে এই প্রশ্নটাই সবার আগে উঠে পড়ে। "ওদের" এটা ওঠে না, কেননা অনেক চেষ্টাচরিত্রের পরে, "ঠিক পথটি" আবিষ্কার করে নিয়ে, সেই পথে বরাবর অগ্রসর হয়ে ঠিক লোকদের ধরাধরি করে, রীতিমতো খেটেখুটে এই পদোন্নতি ওরা যোগাড় করে। "শ্রমার্জিত" নয়, একথা বলতে পারা যাবে না। "যোগ্য" বলেই না যোগাড় করতে পারে, অযোগ্য হলে ওরাও তো বিকেলবেলার সোনালি আলোয় মাঠে বসে বসে বাচ্চাদের খেলাধুলো করা দেখত আর চীনেবাদাম ভেঙে ভেঙে খেতো, খগেনবাবু যেমন করেন। ঐ সময়টা ওরা ছুটোছুটি করেছে, ধরাধরি করেছে, সাধ্যসাধনা করেছে, তার দাম নেই? খগেনবাবুর ধারণা সারাদিন ধরে নিজের কাজটি উনি মনপ্রাণ দিয়ে যখন করেছেন তখন উন্নতি বা লক্ষ্মী নিজেই নিশ্চয় হাঁটি হাঁটি পা পা করে ওঁর কোলে এসে উঠবেন। এককালে তো তাই হতো। এখন কেন জানি আর হয় না। খগেনবাবু সব কিছুই দেরিতে টের পান। তখন আর কিছু করার থাকে না। খগেনবাবু শুধু জুলজুল করে চেয়ে চেয়ে "ওদের" নিপুণ কর্মপদ্ধতিটি লক্ষ্য করেন, কিন্তু অনুসরণ করেন না। তাঁর ধারণা তাঁর পক্ষে দেরি হয়ে গেছে। ওসব তাঁর পোষাবে না।

কিন্তু আপনি চেষ্টা করতে পারেন। আজকাল দেরি হয়ে যাওয়া বলে কিছু নেই। লোকের বয়সটুকুই যা ডাক্তারের খাতাপত্তরে বেড়ে যায়, কিন্তু কারুরই "বয়েস হয়ে" যায় না। চেনাশুনার মধ্যে কাউকে বুড়ো হতে দেখেছেন? কেউ "বুড়ো হচ্ছে" বলে শুনেছেন? শোনেননি। কেননা এখন আর কেউ বুড়ো হয় না। বুড়ো হওয়ার ব্যাপারটা সংসার থেকে উঠিয়ে দেবার একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। হ্যাঁ বুড়ো হয়, সে খুব গরিব লোকেরা। চল্লিশ না পেরুতেই তারা বুড়োবুড়ি। গাঁ-গঞ্জেও বুড়ো-হওয়াটা এখনও আছে।

কিন্তু শহরে? খগেনবাবু কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছেন একেবারে মরে-হেজে যাবার আগে অবধি কেউ আর বুড়ো হয় না। রোগে না পড়লে মরার আগে বুড়ো হবার ব্যাপারটা এখন অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে শহুরে ভদ্রসমাজে। খগেনবাবু জানেন, বোঝেন যে বুড়ো হয়ে যাওয়াটা একদম উচিত নয়। "ওরা" বুড়ো হয় না। এখনকার যে পৃথিবীটাতে খগেনবাবুর বসবাস, সেখানে বুড়োদের জন্যে জায়গা নেই। সেখানে সবাই ছোঁড়া আমাদের এই ছোঁড়ার রাজত্বে, কিন্তু খগেনবাবু নাচার, কি করে যে বুড়ো হওয়াটা রুখতে হয় তিনি শিখে ওঠার আগেই অন্যলোকে ওঁকে ট্রামে-বাসে দাদু ডাকতে লাগলো। উনিও সাড়া দিতে থাকলেন।— ভদ্রসমাজে কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে বুড়ো তাদেরই বলা যেতে পারে যাদের বয়েস একশোর কাছাকাছি, জন্মশতবার্ষিকীর দিন এসে গেল বলে। বাকিদের আশি পঁচাশি পর্যন্ত নওলকিশোরী, তরুণ তুর্কী এইসব বলে যৌবনের কোঠায় টেনে রাখা যায়। যৌবনের পরের ধাপই জরাজীর্ণতা। যৌবনের সংজ্ঞা পালটাচ্ছে, জীবনের সংজ্ঞা পালটাচ্ছে, অথচ খগেনবাবু পালটাচ্ছেন না। এই কারণেই খগেনবাবুদের বিপদ হয়েছে। আপনি বরং এইবেলা সচেতন হোন, পালটে ফেলুন নিজেকে। বদলে যান, বদলে যান। সময়ের সঙ্গে

তাল মিলিয়ে চলুন দিকি? আরে মশাই, চল্লিশ-পঞ্চাশ কোনো বয়েসই নয়। মই ঘাড়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট সময় আছে আপনার। খগেনবাবু পারেন না বলে আপনি কেন পারবেন না?

খগেনবাবুর মনে হয়েছে "ওরা" নির্বিবেক, নিঃসময়, নিদায়, নির্বন্ধন। খগেনবাবুর মনে হয় ওদের অন্তরে অতীতের স্মৃতির ঘরে শূন্য কিন্তু বর্তমানে অনুভূতি তীব্র, পরিকল্পনা সুচারু। ওদের স্বভাব গুছোনো, ওদের আকস্মিক কিছুই ভুল হয়ে যায় না। বিস্মৃতি যখন ঘটে, সেটাও পূর্ব-নির্ধারিত। সুপরিকল্পিতভাবেই ঘটে। খগেনবাবুর স্থির ধারণা তিনি চেষ্টা করলেও "ওদের" সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবেন না। ওদের চলার পথের সামনে পড়লে উনি চূর্ণ চূর্ণ হয়ে যাবেন। ডিমলিশান ট্রাকের মতো, বুলডোজারের মতো, অমোঘ, দুর্ধর্ষ ওদের অগ্রগতি। আফ্রিকার সেই সেপাই পিঁপড়ের দল, যে-পথ বেয়ে মার্চ করে যায়, সর্বস্ব খেয়ে খাঁ খাঁ করে দিয়ে নিজস্ব গন্তব্যে চলে যায়। এই উঠতি করিৎকর্মার দলও, খগেনবাবুর চোখে সেই রকম। উনি নিজেকে সাবধানে সরিয়ে রাখেন ওদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথ থেকে। চাচা, আপন প্রাণ ইত্যাদি।

খগেনবাবু জানেন, সব জেনারেশনের দ্বারা সব কিছু হয় না। আপনার ঠাকুরদাদা যা পেরেছেন বাপ-খুড়ো তা পারেননি। আবার বাপ-খুড়ো যা পেরেছেন, আপনি তা পারেননি। আবার উল্টোদিক থেকে ভাবলে, আপনি যা যা পেরেছেন আপনার বাপ-জ্যাঠা তা পারেননি। আপনার বাপ-জ্যাঠা যা যা পেরেছেন আপনারা ঠাকুরদাদা তা পারেননি। এটাই স্বাভাবিক। এটাই প্রাকৃতিক সত্য। অতএব এরা যা পারছে, পারবে, আপনি কেন সেটা কিছুতেই পারছেন না তা নিয়ে বৃথা উদ্বেগ করবেন না, খগেনবাবুর মতো। ওই কবিতাটা ভুলে যান—ঐ যে ছোটবেলায় মা শিখিয়েছিলেন, "পাঁচজনে পারে যাহা তুমিও পারিবে তাহা"—ভুল। ডাঁহা মিথ্যে বলে খগেনবাবুর মনে হয়। বরং পরের পংক্তিটি স্মরণীয়, "কেন পারিবে না তাহা ভাবো বারবার"। এইখানে একটু ভাবলেই বুঝতে পারবেন "না-পারিবার" সপক্ষে অন্তত শ'খানেক অমোঘ কারণ খগেনবাবুর আছে।

খগেনবাবু অন্য ধাতের, অন্য জাতের, অন্য জগতের জীব। এ প্রজন্ম যেন অন্য গ্রহের প্রাণ। "ওরা" অন্য পৃথিবীর জন্য তৈরি হয়েছে। খগেনবাবুর ডাইনোসরের মতো বোধ হয় নিজেকে। রেপটাইল মনস্টারের মতো, মনে হয় তিনি ভুল সময়ে, ভুল জায়গায় বেঁচে আছেন। এ তাঁর গ্রহ নয়, তাঁর আকাশ বাতাস নয়। এখানে তাঁর নড়ন চড়নের ঠাঁই নেই।

নিজের সন্তানদের মুখ তিনি আর চিনতে পারেন না। বার বার তাদের মুখচ্ছবিতে চেনা শিশুগুলিকে খোঁজেন। দেখা মেলে না। নিজের স্ত্রীকেও আজকাল যেন মাঝে মাঝেই হেমন্তের ভোরের কুয়াশার পর্দার পিছন থেকে দেখতে চান, আবছাভাবে, আচ্ছন্নভাবে। বুঝতে অসুবিধে হয় তাঁকেও। নিজেকে মনে হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বহিরাগত

BanglaBook.org

একটি কিম্ভূতকিমাকার একস্ট্রা-টেরিটোরিয়াল প্রাণী। বিদঘুটে, মুণ্ডুসর্বস্ব, চোখসর্বস্ব, লিকলিকে তারের মতন হাত পা, গলার স্বর নেই, মুখে ভাষা নেই, বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস করছে অ্যালার্ম ক্লকের মতো একটা বিশাল হৃৎপিণ্ড— সবাই বাইরে থেকে সেই শব্দ শুনতে পাচ্ছে। খগেনবাবুর মাঝে মাঝে মনে হয় তাঁর বুকটা স্বচ্ছ প্ল্যাস্টিকের তৈরি ঘড়ির পিছনের মতন। ভিতরের যন্ত্রপাতির কার্যকলাপ সব বাইরের থেকে দেখা যাচ্ছে। তিনি লুকোতে চেষ্টা করেন। লুকোবেন কোথায়। আড়াল কোথায়।

পরবর্তী প্রজন্মের তীব্র গতিবেগ, উদ্দাম উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তীক্ষ্ণ বাকপটুত্ব, দুর্দান্ত সাফল্য, সবই প্রবল, সবই প্রচণ্ড। খগেনবাবু ওদের দেখে দেখেই হতচকিত, স্তম্ভিত বোধ করেন। তাঁর শরীরে-মনে বোধে-বুদ্ধিতে অপরিসীম ক্লান্তি জমে, চোখ বুজে আসে, পা ধরে আসে, নিজেকে নির্জীব নিঃশেষিত শক্তি বলে বোধ হয়। সমস্ত জীবনবোধেই যেন ঝিঁঝিঁ ধরে যায়। খগেনবাবু হাতের খবরের কাগজটা টেবিলে নামিয়ে রেখে চোখ বোজেন।

"তোমার যত উদ্ভট চিন্তা"; বলেন খগেনবাবুর স্ত্রী। তা হবে। খগেনবাবু ভাবেন কেমন করে তাঁর সমবয়সীরা এখনও চুল গোঁফ কাঁচা রেখেছেন। তাঁর স্ত্রী গিন্নিগিন্নি হয়ে গেছেন, অথচ "ওদের" স্ত্রীরা এখন তন্বী-তরুণী, খগেনবাবুর মেয়ে-বউয়ের মতন আছেন কী উপায়ে? খগেনবাবুর স্ত্রী অনেক খবর রাখেন। যোগেনবাবুর স্ত্রী বাড়িতে "বুটিক" খুলেছেন। বালুচরী থেকে ছাপাশাড়ি। কাঁথার কাজ থেকে রাজস্থানী। দ্বিজেনবাবুর মা বাড়িতে 'কুকারি ক্লাস' খুলেছেন। পুরনো বাঙালি রান্না, আচার, বড়ি, থোড়, মোচা, শুকতো, চচ্চড়ি। সবাই তো জানে আর বিলিতি রান্না শিখছে, ভাত খাবে কী দিয়ে? খগেনবাবুর স্ত্রীও চান। প্রথমে ছাত্রী হতে চান। পরে শিক্ষিকা। কিছু একটা করা উচিত। ছেলেপুলে বড় হয়ে গেছে। গুরুভজনা কতক্ষণ? খগেনবাবু স্ত্রীর কোনো কথাতেই "না" করেন না। ছোটোখাটো নানারকম টুকটাক যন্ত্রপাতি এসেছে এখন সংসারে—খগেনবাবু তাদের নামটামও ঠিক জানেন না। তার ফলে গিন্নি এখন ঘর সংসার দেখেও বাইরে বেরুতে সময় পান। পাশের বাড়ির প্রফেসর গিন্নিটি খুব আধুনিকা। তাঁর সঙ্গে বেরোন। মিটিং-টিটিং-এও যান মাঝে মাঝে। একটা ক্লাসে পুডিং আর কেক বানানো শিখছেন—এর পরে নাকি তার জন্যে একটা আলাদা যন্তর কিনতে হবে। তাতে নাকি ক্ষতি নেই, কেননা পরে ওতে করে "ক্লাসও খোলা" চলবে। ঘরে আর দু'পয়সা হলে ক্ষতি কি? খগেনবাবুর দিন তো ফুরিয়ে এল। পেনশন আর মাইনে তো এক কথা হলো না। এদিকে ডাক্তারবদ্যির খরচা বাড়বে। ওদিকে মেডিকেলটাও বন্ধ হয়ে যাবে। সত্যি, গিন্নি কত ভাবে। সুযোগ পাননি তাই। নইলে গিন্নি হয়তো "ওদের" মতো হতে পারতেন। খগেনবাবুর মাঝে মাঝেই মনে হয়। ছিল। ছিল। গিন্নির মধ্যে "ওদের" মেটিরিয়াল ছিল। আদ্দিন বোঝা যায়নি। বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে, মেধারও শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, আত্মবিশ্বাস পেখম

মেলেছে। গিন্নি এই যে পেখম মেলছেন, খগেনবাবুর তা দেখে আনন্দ হচ্ছে কি? মমম...ঠিক বুঝতে পারেন না যেন। এইটে ভাল, নাকি সেইটে ভাল ছিল? বুদ্ধি বলে, এই তো ভাল। পেখম যদি থাকে, সেটা তো মেলবারই কথা। তবু ধাঁধা কাটে না। বোধের মধ্যে কেমন একটা ঝিঁঝিঁপোকা ডাকতে থাকে। ঝিঁঝিঁপোকাটাকে খগেনবাবু চেনেন। কিন্তু ঠিক বোঝেন না। এর ডাক মাঝে মাঝেই কানের গভীরে বাজতে থাকে। ঝিম ধরিয়ে দেয়। পৃথিবী ঝাপসা করে দেয়। ঝিন ঝিন ঝিন ঝিন—

সমাজ সংসার মিছে, সব মিছে, এ জীবনের কলরব। এ পর্যন্ত খগেনবাবুর মনের কথা, মনের মনের কথা। গোল হয়ে সার্কুলার ট্রেনের মতো মাথার মধ্যে ঘুরছে অফিসে। বাসে। মেট্রোয়। খাবার টেবিলে। স্নানঘরে। টিভির সামনে। সহকর্মীদের টিফিনের আড্ডায়। মিটিঙে। কিন্তু পরবর্তী লাইনগুলো? একঘরেও মনেমনেও, সঙ্গোপনেও, নিঃশব্দেও উচ্চারণ করেন না খগেনবাবু। দূর-হৃদয় দিয়ে যদি অনুভব কেউ করতোই তাহলে আর—তাহলে ওই ঝিঁঝিঁপোকা—আর ওই আঁখির সুধা-টুধা? ওটা রবিঠাকুরকেই মানায়, কিম্বা দেবানন্দ-উত্তমকুমারদের। ওসব লাইন খগেনবাবুদের জন্য নয়। খগেনবাবুর লাইন তবে কি তোমার কর্ম তুমি কর মা? তাও নয়। লোকে বলে করি আমি—বলতে পারলে তো বাঁচাই যেত। খগেনবাবু আর সেটা ভাবতে পারেন কই? তাঁর মনে হয় ঠিক উলটোটা। সবই তাঁর দোষ। তাঁর অক্ষমতা। তাঁর অযোগ্যতা। তাঁর অপটুতা।

খগেনবাবু প্রায়ই খবরের কাগজ হাতে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকেন। পাতা ওলটান না। চোখের চশমাটা যে পড়ার চশমা নয়, দূরে দেখার চশমা তাও টের পান না। বুঝতে পারেন না অক্ষরগুলো কেন এত ঝাপসা ঠেকছে। মনে করেন চোখ নির্ঘাৎ আরো খারাপ হয়েছে। অনেকদিন যাব যাব করেও যাওয়া হচ্ছে না ডাক্তার মিত্তিরের কাছে। দোষটা তাঁরই। খগেনবাবুর প্রধান সমস্যা, তাঁর মনে হয় সব দোষ তাঁরই। "ওরে ভীরু তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার", তাঁর অতি প্রিয় মন্ত্র, অথচ দোষটা যে ঠিক কী, কেমন করে সেটা সংশোধন করা যাবে, সেটা উনি বুঝে উঠতে পারেন না। গিন্নির দেওয়া দোষের লিস্টি আছে। ছেলেমেয়ের দেওয়া দোষের লিস্টি আছে। সেসব অন্যরকম। ত্রিগুণাতীত না হলে সেসব দোষ মর্ত্যলোকে খারিজ হবে না। কিন্তু চশমাটা?

ঠিক চশমাটা কিন্তু পাশের টেবিলেই রয়েছে। খগেনবাবু খেয়াল করছেন না। আপনারও কি এরকম হয়। খগেনবাবু মনে মনে দিনক্ষণ ঠিক করতে থাকেন, চোখ দেখাতে যেতে হবে। ডাক্তার মিত্তিরকে ফোন করা দরকার। আচ্ছা বাবার সেই ম্যাগনিফায়িং গ্লাসখানা গেল কোথায়? গিন্নি তুলে রেখেছেন? নাকি ছেলে-মেয়েরা কেউ নিয়ে গেছে? বয়েস হয়েছে ঢের নরনারীদের। তাঁকে যে বাবার ম্যাগনিফায়িং গ্লাসের খোঁজ কখনও করতে হবে কে তা ভেবেছিল?

BanglaBook.org

তাঁর বাবাই কি ভাবতে পেরেছিলেন তাঁর নাতবউটি এরকম হবে? বিজ্ঞাপন কোম্পানির বড় অফিসার। এরোপ্লেনে আজ দিল্লি কাল বম্বে ঘুরছে। পাঁচ ছ'হাজার টাকা এক একবারের প্লেনভাড়া। খগেনবাবু অবাক হয়ে দেখেন তাঁর বউমাকে। বাচ্চাটা আয়ার কাছে ভালই থাকে। ছেলে প্রফেসর মানুষ। বউমা যে স্বামীর চেয়ে ঢের বেশি মাইনে পায়, তাতে তার কোনো রেষারেষি নেই, বরং স্ত্রীগর্বে রীতিমতো গর্বিত। ছেলেরই কি সময় আছে? এ আগেকার দিন নয় যখন প্রফেসরদের হাতে সময় থাকতো। তার কনসালটেন্সি থাকে, আর থাকে আজ এই কনফারেন্স, কাল সেই সেমিনার। এদিকে লোকের ভাত-কাপড় জোটে না, দুধে যত জল মিশছে তত তার দর বাড়ছে—ডাবল টোনড,ডাবল প্রাইসড। বিদ্যুতেরও একই দশা, যত লোডশেডিং, তত দিনকে-দিন ইউনিটের দাম বেড়েই যাচ্ছে। খগেনবাবু ভেবে পান না এত এত সেমিনার, কনফারেন্সের টাকা আসে কোথা থেকে। এসব করেই বা কী হয়? সত্যি, কি উপকার হয় দেশের লোকের? কোনটে যে সত্যি আর কোনটে সত্যি নয়, কোনটে ভেজাল, কোনটে আসল তাই বা কে বলতে পারে। ছেলে কত পেপার লেখে, দেশ-বিদেশের কত জার্নালে সেসব ছেপে বেরুচ্ছে। আজ রেডিওতে বক্তৃতা, কাল টিভিতে আলোচনা। আগে আগে মাস্টারির চাকরিতে এত গ্ল্যামার ছিল না। এত ব্যস্ততাও ছিল না। ছেলে গোড়ায় গোড়ায় টুইশান করত। তাতে প্রচুর রোজগার হতো। এখন ঠিক সময় পায় না। ছেলে বউমা, ওরা "ওদের" দলে ঢুকে পড়েছে। খগেনবাবুদের সময়ে অধ্যাপকরা এই উদ্দাম দুর্বার অগ্রগতির উচ্চাভিলাষের নিষ্পেষণ থেকে মুক্ত ছিলেন, কেবলমাত্র উকিল-ব্যারিস্টার ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারদের আর ব্যবসায়ীদের জীবন এরকম অতিরিক্ত ব্যতিব্যস্ত হতো। তাদেরই ছিল প্রতিযোগিতামূলক পেশা। মেয়েরাও মোটামুটি মুক্ত ছিল, কেননা তাদের বাড়ির বাইরে কোনো পেশাই ছিল না বড় একটা, পড়ানো ছাড়া। লেডী ডাক্তার ক'টাই বা হতো? এখন গণ্ডায় গণ্ডায়। খগেনবাবু কাগজে দেখতেন পাত্রীর বাবারা এইসব পাত্রই চায়। অথবা ওদের জীবনে কোনো স্বস্তি নেই, শান্তি নেই, কেবল দৌড়, কেবল দৌড়। পারিবারিক জীবনে গণ্ডি পেতে চাইলে দৌড়ে কমতি দিতেই হবে। দুটো চলবে না। নিজের মেয়ের জন্য খগেনবাবু কখনও এমন পাত্র খোঁজেননি। ছেলেকেও অনেক শখ করেই অধ্যাপনায় উৎসাহিত করেছিলেন। ভাবতে পারেননি যুগটা বদলে যাবে কতদূর। বসদের জীবনেও প্রচণ্ড চাপ, খগেনবাবু দেখেছেন। তাদেরও যেন ছুটি নেই। কিন্তু এখন? এখন ছুটি কেউ চায় না। ছুটির কোনো দাম নেই। সবাই চায় ব্যস্ততা। ব্যস্ততাই মানুষের দাম ঠিক করে। কে কত ব্যস্ত —সে তত দামী। খগেনবাবু এই পৃথিবীর কেউ নন, বেশ টের পান তিনি। "মর্মরিত মর্ম" এমন সব শব্দ যদি কেউ লেখে, এখনকার ব্যস্ত মানুষেরা কি তার মানে বুঝবে? "অধরা মাধুরী"? সে আবার কি? ধরতেই না পারলে আর তা মধুর হলো কী করে? ঈশপ সাহেব কবেই বলে গেছেন, যা ধরা গেল না, তা টক। খগেনবাবু চাননি তাঁর বসের চেয়ার। তিনি চাননি তাঁর ছেলের জীবন প্রতিযোগিতায় বিদীর্ণ

হোক। শিক্ষাক্ষেত্র পবিত্র ক্ষেত্র। সর্বশুক্লা সরস্বতীর পাদপীঠ। খগেনবাবু নিজে ছিলেন ইস্কুল টীচারের ছেলে, তখন তাতে মানসম্মান প্রচুর ছিল, টাকা ছিল না। মাস্টারিতে এখন অনেক টাকা। কিন্তু মানসম্মান নেই। ছাত্রছাত্রীরা নিজেরা তো বোঝে। হাজার হাজার টাকা ট্যাক্স-ফ্রী ক্যাশ রোজগার করছে ইস্কুল মাস্টারি করে তাঁর মেয়ে। ঘরে বসে গ্রুপ কোচিং দেয় যে! ইনডিভিজুয়ালি টিউশানি দিয়ে তেমন লাভ নেই নাকি—মেয়ে বলে। এই কোচিং করে খগেনবাবুর মেয়ে-জামাই তো ফ্ল্যাটই কিনে ফেলেছে সল্ট লেকে। ছেলের তবু ত্রিশ পার হয়েছে, মেয়ে তো তিরিশের ঘরে পা দেয়নি এখনও। এখনই নিজস্ব বাড়ি। কি আশ্চর্য ক্ষমতা ওদের। ছেলে বাড়ি করেনি। বউমার দারুণ ফ্ল্যাট আছে আপিসের। তাছাড়া বউমার বাপের বাড়িটাই তো ওরা পাবে। ছেলে গাড়ি করেছে। চকোলেটের মতন দেখতে। যেন এক্ষুনি পাৎলা কাগজ ছাড়িয়ে বের করেছে, টপ করে গালে ফেলে দিলেই হলো। খগেনবাবুর গাড়িও নেই, বাড়িও নেই। স্ত্রী বলেন বুদ্ধিও নেই। মেয়ে বলে, "মায়ের কথাটা ভাবো না। সত্যি, তোমার অনুভূতি নেই।" ছেলে বলে না কিছু। অনুকম্পা করে। খগেনবাবু টের পান। ছেলে যে-ভাবে যে-চোখে তাঁর দিকে তাকায়, তিনি কখনও সেই চোখ বাবার মুখে তুলতে পারেননি। বিজয়ায় নিয়ম করে আসে। পুজোর আগে এসে কাপড় দিয়ে যায় বৌমাও। মেয়েও। কর্তব্যে ঘাটতি নেই। এই জেনারেশনের চোখ-কান সবদিকে খোলা। কেউ কিছু বলতে পারবে না বাবা। সবদিকে সামাল দিতে পারে এরা। কী করে যে পারে? খগেনবাবু কি নিজের ছেলে-বউ, নিজের মেয়ে-জামাইকে হিংসে করছেন? খগেনবাবুর পক্ষে কি সেটা সম্ভব?

টাকা নেই টাকা নেই সরকার মুখে বললে কি হবে, খগেনবাবু তো দেখতে পান বাতাসে টাকা উড়ছে। লোকে খপাখপ টাকা লুফে নিচ্ছে। বেয়ারা থেকে কেরানি থেকে বড়বাবু থেকে—থাকগে। খগেনবাবুর চোখ বুজে আসে। ঝিঁঝিঁপোকাটা কানের মধ্যে ভীষণ জোরে ডাকতে থাকে।

স্বদেশী রাজনীতিবিদরা একদা ছিলেন শ্রোতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। আত্মত্যাগের আদর্শ। ঘরে ঘরে সাধারণ মানুষ ঠাকুর-দেবতার পাশে তাঁদের ফটো বাঁধিয়ে, টাঙিয়ে রাখতো। আর এখন? রাজনীতিতে, শিক্ষায়, গুণ্ডামিতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, চোরাবাজারিতে, সরকারি চাকরিতে, দোকানদারিতে, শিল্প-সাহিত্য, কোম্পানির অফিসারিতে—কোথাও কোনো তফাৎ দেখতে পান না খগেনবাবু। খগেনবাবুরই দোষ নিশ্চয়। কেননা তফাৎ নেই, এটা তো সত্যি সত্যি হতে পারে না? উনিই ভুল দেখেন তাতে সন্দেহ নেই।

খগেনবাবু বুঝতে পারছেন সমস্যাটা জগতে আর কারুরই যখন হয়নি, তখন সম্ভবত এটা তাঁর মন-গড়া। তাঁরই কেবল মনে হচ্ছে, চারিদিকে সাজানো পোশাকপরা নট-নটীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, যাকে যে ভূমিকাতে দেখা যাচ্ছে আসল জীবনে সে তা নয়। সাজানো পলিটিশ্যান, সাজানো কবি, সাজানো দেশপ্রেমিক, সাজানো শিক্ষক, সাজানো ছাত্র। সাজানো সংসার। অতীব বিচিত্র এই সংসার। এখানে কে তোমার

BanglaBook.org

কর্তা, কে তোমার পুত্র, কিছুই ঠিক ঠাহর হয় না। কে তোমার মিত্র কে অমিত্র তাও না। ক্ষণে ক্ষণে না হোক, দিন থেকে দিনে পালটে যায়। তাদের কামরা, ফ্লোর ক্রসিং পার্লামেন্টে বন্ধ করলে কি হবে? জগতে জীবনে তো বন্ধ করা যাবে না। খগেনবাবুরা কিচ্ছুটি করতে পারেন না, কেবল জুলজুল করে চেয়ে থাকতে পারেন। শেক্সপীয়ার বলেছিলেন জগৎটা মঞ্চ। আমরা প্রকৃতই নট-নটী—তিনি নিশ্চয় একথা বলেননি। এই যে নাটক, খগেনবাবু যার মুক্তিহীন দর্শক। যে নাটকের বিরতি নেই। এর এখানে যাকে যা ভাবা যাচ্ছে, সে তা নয়। যাকে ভাবছি দেশপ্রেমিক, সে প্রকৃতপক্ষে ব্যবসা করে, যাকে ভাবছি বড়সড় ব্যবসায়ী, সে আসলে ধর্মীয় নেতা, যাকে ভাবছি পুলিশ, সে আসলে চোর, যাকে ভেবেছি কবি, সে আসলে উকিল। এইরকম অনিশ্চয়তার মধ্যে খগেনবাবু বড় অসহায় বোধ করেন। সব সময়ে বুঝতে পারেন যে তিনি সবটা স্পষ্ট বুঝতে পারছেন না। এই না-বোঝাটা কেন, কেন, ভাবার চেষ্টা করলেই ঝিঁঝিপোকাটা ডেকে ওঠে—ঝিন ঝিন ঝিন। খগেনবাবু টেরিয়ে ভুরু কুঁচকে বিনা চশমায় গিন্নিকে খোঁজেন। ঐ যে গিন্নি দালানে তরকারি কুটছেন বঁটিতে। মেয়ে কোটে ছুরি দিয়ে। টেবিলে দাঁড়িয়ে। ওভাবে ছুরি দিয়ে কি এঁচোড়ও কোটা যায়?

মোচা। এঁচোড়। থোড়। খগেনবাবুর পৃথিবীটা গেল কোথায়? এই পৃথিবীতে সবাই ওই মই ঘাড়ে করে একলা একলা ছুটে বেড়াচ্ছে, থাম থেকে থামে। শেষ থামটা আছে এম্পায়ার স্টেট বিলডিংয়ের ছাদে। এখন নাকি তার চেয়েও উঁচু-উঁচু বাড়ি হয়েছে আমেরিকাতে। শিল্পীরাও মই ঘাড়ে দৌড়োচ্ছেন। কী দুঃখেই যে রবিঠাকুর নোবেল পুরস্কারটা পেলেন। সেই থেকে যে পুরস্কারের লোভে লেখালিখির হিড়িক পড়ল, চিত্তরঞ্জন দাশ থেকে শুরু করে, সে আর থামেনি। কি জানি গজদন্তমিনার-ই কি ছিল ভাল? নাকি এই দীন-দুনিয়ার হট্টমেলায় দোকান দেওয়াটা?

খগেনবাবুর ঘাড় শক্ত হয়ে আসে। ফের বোধহয় প্রেশারটা বাড়ছে। সেও তাঁর দোষ। অনেকদিন চেক করাননি। বিজয়ার এত মিষ্টি খাওয়াটাও কি ঠিক হয়েছে? সুগারও চেক করার বয়েস হয়েছে। কিছুই ঠিকঠাক করে উঠতে পারেন না খগেনবাবু। জ্ঞানপাপী খগেনবাবুর যদি স্ট্রোক হয়, তার দোষ আর কারুরই নয়, তাঁরই। অজ্ঞান তো নন তিনি? সমরাঙ্গনে নিজেরটা নিজে না দেখলে কে আর দেখবে? এই যে খগেনবাবুর চোখ মেলেই সকালবেলায় মনে হয় "ওঃ। এসে গেল আরো একটা সকাল!" এটা যে ভীতু সৈনিকের লক্ষণ, সেটা কি তিনি জানেন না? জীবনযুদ্ধে তিনি সুবিধে করতে পারেননি। অথচ খগেনবাবু তো অনেকের চেয়েই হাজার গুণে ভালো আছেন। খগেনবাবুর সঙ্গে একদিন কৌশল্যার দেখা হয়েছিল। কৌশল্যার এক হাতে বাজারের থলি, কাঁখে পেতলের ঘড়া। নীল ঘষা কাচের মতো বাঁ চোখটা দেখে চিনতে পেরেছিলেন। "বাবু, ভাল আছ?"—"হ্যাঁ, কৌশল্যা, তুমি?" কৌশল্যা কাঁধে মুখটা ঘুরিয়ে যেন ঘাম মুছে নিল। তারপর বলল, "ওই, চলে যাচ্ছে। মেয়েটা মরে গেল।" কৌশল্যা যখন খগেনবাবুর বাড়িতে ঠিকে কাজ করত, সঙ্গে সঙ্গে

ওর ফুটফুটে মেয়েটা আসত বটে। সেই মেয়েটা? কৌশল্যা চলে যাবার পর ভারতী। ভারতীর পর ছবি। ছবির পর...? খগেনবাবুর অত মনে নেই। কৌশল্যা কাজ ছেড়ে দিলেও আসত মাঝে মাঝে। ও কেবল দোকানে দোকানে খাবার জল দেবে আর ঝাঁটপাট দেবে বলে একসঙ্গে সব গৃহস্থবাড়ির কাজ ছেড়ে দিয়েছিল। তাই ওকে মনে আছে খগেনবাবুর। এখন কী বলা উচিত?—"কী হয়েছিল?" বলেই খগেনবাবুর মনে হলো, প্রশ্নটা বড্ড ব্যক্তিগত হয়ে গেল না কি? কিন্তু সহজভাবেই কৌশল্যা বলল—"কিচ্ছুই হয়নে বাবু। ফলিডল খেয়ে— ওর শ্বশুরবাড়িটা বড্ড—।" কৌশল্যা আরেকবার কাঁধের শাড়িতে ঘাম মুছে নিয়ে বলল, "দিদিমণি? দাদা-বউদি? মা?" খগেনবাবুর নিজেকে ভয়ানক অপরাধী লাগছিল—"সব ঠিকঠাক", বলে পালিয়ে বাঁচলেন, "আহা, চুকচুক" বলারও শক্তি ছিল না তাঁর। খগেনবাবুর দিব্যি সব ঠিকঠাক। অথচ কৌশল্যার কিছুই আর ঠিকঠাক নেই। ওই একটা মেয়ে ছাড়া কেউ ছিল না ওর। তবু ও তো কাজ করে বেড়াচ্ছে। খগেনবাবুকে ডেকে কুশল প্রশ্ন করছে। খগেনবাবু কি পারতেন? পারবেন? যদি কখনও—কল্পনাতেও আর অগ্রসর হতে পারলেন না। বেচারি খগেনবাবু। প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়ালো বুকের ভেতরে কেউ।

কিংকং-এর মতো বিশাল বাহু এক অজ্ঞাত পরিচয় ভয় আবির্ভূত হয়ে মুঠোয় চিন্তাটার গলা টিপে ধরল। খগেনবাবু ভিতু মানুষ। অকথা কুকথা ভাবতে নেই, মনের কোণেও ঠাঁই দিতে নেই। আচ্ছা, কৌশল্যা কোন দলে? "ওদের"? না, "আমাদের"? খগেনবাবু খানিক ভেবে ঠিক করলেন—কোনোটাই না। কৌশল্যা, কৌশল্যাদের একটা আলাদা দল আছে। সেটাকে বলা যেতে পারে "তাদের"। "তারা" অন্যরকমের। খগেনবাবুদের সমস্যা "তাদের" সমস্যা নয়। তাদের যন্ত্রণার ধরনটা খগেনবাবুদের সহ্য হবার নয়। কৌশল্যাদের অবশ্য কোনোদিনই তিনি ভাল করে চেয়ে দেখেননি। কাজের মেয়েদের নিজে থেকে ডেকে কথা বলার অভ্যেস নেই তাঁর। কিছু বললে উত্তর দিয়েছেন মাত্র। ওটা গিন্নির ডিপার্টমেন্ট। কৌশল্যাকে আর প্রশ্ন করতে পারেননি তিনি। কিন্তু অকারণেই অপরাধবোধ করেছেন অনেকদিন পর্যন্ত। এখন কৌশল্যার "পৃথিবী"-তে কৌশল্যা একাই। এতদিন পর্যন্ত কৌশল্যা ভাবতো সে বাঁচে তার মেয়েটার জন্যে। এখন কৌশল্যা কী ভাবে? কৌশল্যা কিছু ভাবে কি? খগেনবাবু বাঁচে কার জন্যে। খগেনবাবুকে কার প্রয়োজন? খগেনবাবুর উপার্জনে প্রয়োজন আছে গিন্নির। কিন্তু খগেনবাবুকে নেই। গিন্নি বেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। অথচ খগেনবাবু স্বয়ংসম্পূর্ণ নন। তাঁর গিন্নিকে সদাসর্বদাই প্রয়োজন। গত বত্রিশ বছর ধরে খগেনবাবু বড়ই পত্নীনির্ভর—কিন্তু পত্নীকে তাঁর খগেনবাবু-নির্ভর বলে মনে হয় না। খগেনবাবু একা। তাঁর স্ত্রী তো একা নন। স্ত্রীর দল আছে। দলে সবাই আছে। করিৎকর্মা ভাইরা আছে, করিৎকর্মা ছেলে-বউ, করিৎকর্মা মেয়ে-জামাই। খগেনবাবুর স্ত্রী এদের প্রত্যেকের গুণকীর্তনে মুখর। দল না থাকলে পৃথিবীতে মানুষের আজকাল কোনো দাম থাকে না। আচ্ছা, কৌশল্যার কি কখনও সকালে উঠে মনে হয় আজ ট্রেন ধরব না? আজ কাজে যাব না? ও কোথা থেকে যেন ট্রেনে করে

আসে প্রত্যেকদিন। কৌশল্যার কি মনে হয় জলের কলসিটা ছুঁড়ে ফেলে দিই —খগেনবাবুর যেমন মাঝে মাঝে ফাইলগুলো ফেলে দিতে দুর্দম বাসনা হয় আজকাল? অথচ, আগে তো হতো না? এখন মনে হয় কার ফাইল, কে গোছাচ্ছে! মনে হয়, এ সবই সাজানো কাজ, অফিসের আসল কাজকর্মটা হয় অন্যত্র। অন্যভাবে। খগেনবাবুর আওতার অনেক বাইরে। খগেনবাবু জানেন তিনি যতই আন্তরিকভাবে তাঁর কর্তব্য পালন করুন, অফিসের তিনি কেউ নন। তাঁর কোনো দল নেই। না পেরেছেন নিজের বাড়িতে দল গড়তে, না পেরেছেন কর্মস্থলে দলে ঢুকতে। নির্দলের কোনো দর নেই এই বাজারে। খগেনবাবু জানেন তাঁর হয়ে কেউ কথা বলবে না। লোকে কথা বলে দলের হয়ে। তাঁর স্ত্রী ঘরসংসার করেও একথাটা ভালোই বুঝেছেন। "পাওয়ার গেম", "ক্ষমতার খেলা" কি কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যে আর রাজনীতিতেই চলে? ঘরসংসারে চলে না? খুব চলে। তবে খগেনবাবু ও-খেলায় নেই। তিনি হেরো, হেরেই আছেন। পারেননি। তিনি জিততে পারেননি। এ পৃথিবী তাঁর জন্যে নয়। এই পৃথিবী হেরোদের জন্যে নয়। খগেনবাবু এখন প্রত্নজীব। খগেনবাবুরা সবাই ডায়নোসর। টিরানোসরাস। এত প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এই নয়া দুনিয়াতে লড়াই চলে না। যাদুঘরই তাঁদের জন্য প্রশস্ত।

যাদুঘর প্রসঙ্গে দিদিকে মনে পড়ে গেল। দিদি খগেনবাবুকে ডাকেন 'যাদুমণি'। দিদির বিয়ের পর খগেনবাবুর জন্ম। এখনও ভাইফোঁটা নিতে ভাইকে নেমন্তন্ন করেন শ্যামপুকুরে। ভাইফোঁটাও তো এসে গেল। দিদি মেজদির থানধুতি। ছোড়দির কস্তাপেড়ে। তিন বোনে একসঙ্গে ফোঁটা দেবে। তিন তিনবার ন'বার বলবে—"যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা"। ন'বার ব্যারিকেড গড়া হবে যম দুয়ারে। কেবল এই খগেনবাবুকেই আটকাতে। ওই একটা দিন খগেনবাবু রাজাধিরাজ। বোনেরা ভাইকে নিয়ে প্রচুর আদিখ্যেতা করেন আজও। ভাইফোঁটা শব্দটা আশৈশব খগেনবাবুর মনে চাঁদের আলোর মতো একটা নরম আহ্লাদ হয়ে ছড়িয়ে পড়ত। এখন পড়ে না। কেন পড়ে না? বোনেদের তিনি তো যথেষ্ট ভালোবাসেন। দিদি যে এখনও আছেন, এ ঈশ্বরের দয়া। মায়ের পরে তো ঐ দিদি। তবে? তবে কেন ভাইফোঁটার কথায় মন আঁধার হয়ে আসছে? ওই যে, ওঁরা যে দীর্ঘায়ু কামনা করবেন। আরো আয়ু? মানে, আরো সকাল। আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ। আরো পৃথিবী। আরো পুনরাবর্তন। আরো দৈন্য প্রকাশ। আরো আয়ু মানেই খগেনবাবুদের বলহীনতা আর অযোগ্যতা প্রমাণ করার আরো সুযোগ। না। খগেনবাবুর আর এই পৃথিবীতে দরকার নেই, এই পৃথিবীটায় খগেনবাবুর আর কোনো কাজ নেই। নো মোর ভাইফোঁটা। দিদিদের আগেই একবার প্রণাম করে আসবেন খগেনবাবু। তারপর... পুরী? পুরী না হোক, দীঘা? দীঘাও না হোক, গিন্নির আঁচল ধরে বর্ধমান তো যাওয়া যাবে। করিৎকর্মা শালাদের কাছে। আমলকি ফলের মতো পৃথিবীটাকে যারা নিজেদের মুঠোতে পুরে রেখেছে। গিন্নি যেমন ধরে আছেন পায়ের দুটো আঙুলে অতবড় ধারালো লোহার বঁটিটাকে। "পূর্ণ ক্ষমতা আসীন"। ওরা পারে। পারুক। পারবেই তো। এটা তো ওদেরই পৃথিবী।

দুটো লাইন তাঁর মাথায় খুব ঘোরে—কলেজ জীবনে কোথায় যেন পড়েছিলেন: "তোমাকে আমি বলতে চেয়েছিলাম জীবন নয় জীবন সংগ্রাম।" কথাটা ঠিক নয়।

খগেনবাবু এবার না-পড়া খবরের কাগজটা নামিয়ে রেখে চশমা খুঁজতে ড্রয়ার খোলেন। তারপর হাঁচোড় পাঁচোড় ড্রয়ার ঘাঁটা চলতে থাকে। পুরনো বিল, হারানো চিঠি, চুরি-যাওয়া নস্যির ডিবে, অজ্ঞাত-পরিচয় চাবির গোছা—খগেনবাবু ড্রয়ার-রহস্যে ডুবে যান।

আর চশমাটা, পাশের টেবিলের বাঁদিকে, খবরের তলায় চাপা না-পড়ে, শুয়ে শুয়ে চোখ টিপে হাসে।

শারদীয় নন্দন, ১৩৯৯

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

জরা হটকে এবং অন্যান্য

জরা হট্‌কে জরা বঁচ্‌কে ইয়ে হ্যায় নোবেল, মেরি জান্‌!

অ্যায় দিল্‌ হ্যায় মুশকিল জীনা যহাঁ
জরা হট্‌কে জরা বঁচ্‌কে
ইয়ে হ্যায় নোবেল
মেরি জান!

ওই দ্যাখ্‌

—"ওই দ্যাখ ওই দ্যাখ নবনীতা দেবসেন। কে, বুঝলি? বুঝলি না? ওই তো, অমর্ত্য সেনের ফার্স্ট ওয়াইফ।" দুটো ছেলেই ফিরে তাকাল। পানওলাও। যিনি কোকাকোলা খাচ্ছিলেন, বোতল নামিয়ে তিনিও। সিগারেট কিনতে লাগল ছেলেগুলো। এইদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে, চিন্তামণির দোকানে। আমার কিন্তু টিপের পাতাটা আর কেনা হলো না। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সরে পড়ি। কান ঝিমঝিম করছে। পাঞ্জাবির দোকানের সামনে আসতেই—

—এই যে দিদি। নমস্কার।

ভদ্রমহিলাকে চিনতে পারলুম না। বগলে প্যাকেট।

—টিভিতে আপনাকে দেখলাম। ইন্টারভিউ দিচ্ছিলেন। ওই ওনার নোবেল প্রাইজ পাওয়ার খবরে। সত্যি, আমাদেরও প্রচণ্ড গর্বের বিষয়।

—সে তো ঠিকই।

খুবই আনন্দ পেয়েছি, বাঙালির এত বড় সম্মানে।

—হ্যাঁ। সত্যি। তাড়াতাড়ি ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাই—মিষ্টি করে হাসবার চেষ্টা করি। কিন্তু রাস্তাটা রাসবিহারী, জায়গাটা গড়িয়াহাট— উপায় কি এগোতে পারি? টাকমাথা ধুতি-পাঞ্জাবি ভদ্রলোক।

—নমস্কার। আপনি তো নবনীতা দেবী?

—হুঁ (সহাস্য)...

—আমরা আপনার লেখা-টেখা পড়তাম বটে, এখন আরও বড় পরিচয় জানলাম। এতবড় মানুষের স্ত্রী আপনি। অজস্র অভিনন্দন জানাচ্ছি। দেশের গর্ব।

—স্ত্রী নই। স্ত্রী ছিলাম।

BanglaBook.org

—ওই একই হল আমাদের কাছে। বাঙালির গৌরব। বাঙালির সম্মান।

—(হাস্য)

—টিভিতে দেখে খুব ভাল লাগল।

—(হাস্য)

—আজকাল কী লিখছেন? ওনার ওপরে কিছু লিখুন এবারে।

—হ্যাঁ ভাবছি।...চলি?

তুমিও বিখ্যাত হলে? সেই দুঃখে—

একটা বিয়েবাড়িতে সেদিন সেন্টুদার সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্র উনি হই হই করে ওঠেন।

—আরে আরে, কাকে দেখছি? অ্যাঁ? নবনীতা যে? কী? এখানে আসতে সময় পেলি? তুইও তো আজকাল দারুণ ফেমাস হয় গেছিস—অ্যাঁ? প্রচণ্ড মিডিয়া কভারেজ পাচ্ছিস, বিশাল পাবলিসিটি হয়ে গেল বটে তোদের! এদিকে তোর, আর ওদিকে অমিতাদির। রীতিমতো মিডিয়া ফেবারিট হয়ে গেছিস তোরা দুজনে—রেডিও খুললে তুই, টিভি চালালে তুই, কাগজ পড়তে গেলে তুই—হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ—

হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ আমিও হাসি।

স্যরি সেন্টুদা, আমি কিন্তু অনেকদিনই একটু একটু মিডিয়া ফেবারিট—এই ছোট্ট নিরীহ বাক্যটা বার কয়েক মনের মধ্যেই গুনগুন করে। মুখ ফুটে আর বেরোয় না।

বউদি অবশ্য আমাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেন তাড়াতাড়ি—

কী যে বলো! নবনীতা বুঝি আজ ফেমাস? ওর বাবা-মার নামেই তো ওকে সবাই চেনে সেই ছোট্ট থেকে।

যাব্বাবা। ভালো ডিফেন্স। আমার তবে নিজে নিজে ফেমাস হওয়া আর হল না? হয় আমার বাবার নামে, নয় আমার মেয়েদের বাবার নামে। কেন, আমি যে অ্যাদ্দিন ধরে লেখালেখি করছি, তাতে বুঝি একটুও 'ফেম' হতে পারত না? কিন্তু এই বিতর্কও মনের মধ্যেই ঘুরে চলে। মুখে সৌম্যভাব, আর কাষ্ঠ হাসি ফোটাতে চেষ্টা করি। এদিকে রাগ মাথায় চড়ে যাচ্ছে।

"পলকহারা আলোকদিঠি মরমপরে"— লেজার বিমের মতো বিদ্ধ হচ্ছে। চারিদিকে এত চোখ, কোনও পর্দা নেই। আব্রু নেই। এসেছি বিয়েবাড়িতে, বর-কনে যতটা মনোযোগ পাচ্ছে, আমিও প্রায় অতটাই। যেন আমিই বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করেছি। ব্যাপারটা যখন শুরু হয়েছিল, প্রথম প্রথম মন্দ লাগছিল না। এখন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। যা 'নয়', তাই এখন 'হয়' হয়েছে। আমি আছি

BanglaBook.org

আয়নার ভূমিকায়। একটি অনুপস্থিতির প্রতিবিম্ব হয়ে। আমার নিজের আর কোনও আকৃতি নেই।

অথচ ব্যাপারটা তো সত্যিই দারুণ। কত আহ্লাদই হয়েছিল—কজন *বাঙালি মা* তার মেয়েদের বাবার নোবেল প্রাইজ পাওয়া দেখতে পেয়েছে?

—একজনও না।

কিন্তু আনন্দের তাণ্ডব নৃত্যে মানুষের মন ধাঁধিয়ে গেছে। ছিল দারুণ, হয়ে গেছে নিদারুণ।

সিলভার কার্প

—এই যে দিদি, আপনার তো আজকাল, খুব... হেঁঃ হেঁঃ হেঁঃ—ইঙ্গিতপূর্ণভাবে ভুরু নাচিয়েই বাক্য শেষ করলেন। হাতে বাজারের থলি। ডাঁটা বেরিয়ে আছে। স্ট্রাইপড্ শার্ট। নস্যি রং ট্রাউজার্স। চিনি কি? চিনি? নাঃ, চিনি না। আজকাল চারিদিকে এত লোক...

—খুব টিভিতে দেখা যাচ্ছে আপনাকে।

—... (হাস্য)।

—বিশেষ করে স্যারের নোবেল প্রাইজ পাবার পর থেকে আর কি। চতুর্দিকে ছবি উঠছে। দেশের লোক আপনাকেও চিনে গেছে। হেঁ হেঁ।

—হেঁ হেঁ।

—কত বড় সম্মান!

—"..."

—পৃথিবীর কাছে বাংলাদেশের, মানে বাঙালির মানে পশ্চিমবঙ্গের নাম পৌঁছে দিয়েছেন স্যার।

—তা ঠিক।

রবীন্দ্রনাথের পরেই অমর্ত্য সেন।

—বাজার করে ফিরছেন বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই গড়িয়াহাটে—

—কী মাছ কিনলেন?

—মাছ? মানে আজ খুব ভাল ইলিশ উঠেছে কিন্তু যা দাম!

—আমি তো সিলভার কার্প কিনি। পঁয়ত্রিশ-চল্লিশের মধ্যে টাটকা মাছ পাই। জলে থাকে। জ্যান্ত।

—সিলভার কার্প? নাঃ, ও মাছ আবার আমাদের চলে না।

—কেন? খুব টেস্টি মাছ তো? কোপ্তা করে খাবেন, চপ হয় দারুণ—

—স্যার সি-লভার কার্প খান?

—ঠিক জানি না। তখনও তো এসব নতুন মাছ বাজারে ওঠেনি।

BanglaBook.org

বড়দিদি মেজদিদি

—এক প্যাকেট গুডরিক চা দেখি। আড়াই শো।

—নমস্কার বউদি। ভালো আছেন?

—হ্যাঁ। আপনি ভালো?

—আপনাদের তো সব সময়ে দেখছি। কাগজে। টিভিতে। আপনার মেয়েরা চলে গেছে— ওদেরও দেখলাম।

—হ্যাঁ, ওরা তো অনেকদিনই—

—জামাইটি বেশ হয়েছে।

—হ্যাঁ [সহাস্য]

—শ্বশুরের বেশ ন্যাওটা।

—সে কি? না তো? কে বলল? [No হাস্য]

—ছবি দেখলাম কাগজে। শান্তিনিকেতনে।

—সেটা তো গ্রুপ ফটো। ফ্যামিলির বহুলোকই ছিল তাতে। আশ্চর্য।

—কই, আপনাকে তো দেখলাম না?

—দেখবার কথা ছিল নাকি?

—না এমনিই। দেখতে ইচ্ছা করে তো? দেখলাম না, তাই বলছিলাম। দাদার সঙ্গে একটাও ছবি দেখতে পেলাম না।

—এক প্যাকেট ক্রিমক্র্যাকারও দেবেন। জলদি করুন।

—দাদার ছবি দেখলাম, একপাশে ছেলে হাসছে, একপাশে মেয়ে। ছেলেকে দেখিনি তো পাড়াতে?

—ও বিলেতেই থাকে কিনা।

—ছেলেটা বুঝি আপনার নয়?

—না।

—ওর মা আসেননি?

—তিনি স্বর্গে। তাড়াতাড়ি করুন।

—একি? ক্রাকজ্যাক কেন? আমি তো ক্রিমক্র্যাকার বললুম।

—সরি বউদি, দিন, ঠিক করে দিচ্ছি।

—এই যে, ক্রিমক্র্যাকার— আচ্ছা বউদি কে আগে?

—মানে? খুচরোটা দিয়ে দিন, যেতে হবে।

—পঞ্চান্ন, ষাট, দুশো। মানে, কে ফার্স্ট? বউদিদের মধ্যে কে বড়? উনি না আপনি?

—ফার্স্ট-সেকেণ্ড-বড়-মেজো দিয়ে আপনার তো কোনও প্রয়োজন দেখি না। এই পাঁচ টাকার নোটটা গলে গেছে! থাক, আর বদলে কাজ নেই, আমি চলি —মাইন্ড করলেন? বউদি? স্যরি। ভেরি ভেরি স্যরি, বউদি মাইন্ড করলেন?

BanglaBook.org

শাক দিয়ে মাছ

—এই যে নবনীতা, শান্তিনিকেতনে যাচ্ছ বুঝি? অমিতাদির কাছে?

—না—শান্তিনিকেতনে আমার এক বন্ধু যাচ্ছেন, তুলে দিতে এসেছিলুম।

—অমিতাদি ভালো আছেন এখন? যা হুজ্জুতি গেল!

—সত্যি। বড্ড ধকল চলছে।

—এই বয়সে, এত বিশাল একটা ঘটনা সামাল দিচ্ছেন, একলা হাতে। চব্বিশ ঘণ্টাই বাইরের লোক, খবরের কাগজ টিভি, বিরক্ত করছে, ফোটো তুলছে, ইন্টারভিউ নিচ্ছে, পুলিশ আর কত আটকাবে!

—তাই তো। অবশ্য আনন্দটাও বিরাট।

—সে আর বলতে? রত্নগর্ভা! ওঁর জন্যেই তো হলো। মা গুণী না হলে ছেলে অত গুণের হয়? ক্ষিতিমোহন সেনের কন্যা—তাঁর প্রজ্ঞা, তাঁর বিদ্যা, তাঁর বুদ্ধি, সবই তো পুত্রের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন, অমন মা নইলে,...

—অমর্ত্যর বাবাও খুব বড় সায়েন্টিস্ট ছিলেন, ডঃ এ টি সেন, তিনি—

—জানি জানি। UPSC-তে যখন ছিলেন আমার ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন—চাকরিটা হয়নি। দুর্ভাগ্য তাঁরও। দেখে গেলেন না ছেলের এত গৌরব! তবে মা তো দেখলেন। এমন মাতৃভক্ত সন্তানও আজকের যুগে বিরল। কতবার যে ছুটে ছুটে আসেন মাকে দেখতে। মার কথাটা তাই সর্বত্র খুব বেরুচ্ছে। তোমার কথাও অবশ্য বেরুচ্ছে। ছবিটবি —হেঃ হেঃ—ইন্টারভিউটিউ। অ্যাঁ? খু—ব? কে না ইন্টারভিউ দিচ্ছে ভাই আজকাল? রাম-শ্যাম-যদু-মধু সবাই অমর্ত্য-স্পেশালিস্ট হয়ে গেছে! হাঃ হাঃ

—হাঃ হাঃ

—তোমার মেয়েরা এসেছিল বাপের সঙ্গে। চমৎকার মেয়েগুলি। বাপের কাছেই থাকে?

—না তো? ওরা তো বড় হয়ে গেছে। যে যার মতো নিজেরা নিজেরা থাকে।

—অমন বাবা অনেক কপাল করলে পায়। বুঝলে? খুব সৌভাগ্যবতী তোমার মেয়েরা। জেনে রেখো!

—জানি।

—সুইডেনে পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল মেয়েদের। মা-বোনকেও নিতে চেয়েছিল। শেষ মুহূর্তে ওরা যেতে পারেনি। লাস্ট মোমেন্টে টিকিট ক্যানসেল করতে হল। তা তুমি গেলে না যে?

—কোথায়?

—সুইডেনে?

—হঠাৎ সুইডেনে? আমি কেন যাব?

—না। এমনি। মানে তোমার মেয়েরা গেল তো? তাই বললাম।

BanglaBook.org

—ওদের কথা তো আলাদা।

—আমরা সবাই আশা করছিলাম তুমিও যাবে। এই যে এতবার মিছিমিছি বাইরে যাও, আর এবারেই গেলে না। এতবড় আনন্দে যোগ দিলে না।

—আমি মিছিমিছি বাইরে যাই? কাজে যাই না?

—কাজ কি নয় এটা? ভাল দেখায়নি কিন্তু।

—কী ভাল দেখায়নি?

—এই তোমার রাগ করে না-যাওয়াটা খুবই দৃষ্টিকটু দেখিয়েছে। সারামাগোর সঙ্গে সমস্ত গ্রামসুদ্ধ গিয়েছিল শুনলাম।

—রাগ করে না যাওয়া মানে! কে রাগ করল? আমার কি নেমন্তন্ন ছিল?

—মেয়েদের নেমন্তন্ন ছিল?

—নিশ্চয়ই। বিনা নিমন্ত্রণে গেছে নাকি।

—ওদের টিকিট কে দিল? নোবেল কমিটি, না ওদের বাবা?

—আরে আমি কী করে জানব? আমি দিইনি। বাবাই বোধ হয়।

—আমরা ভাবলাম নোবেল কমিটি।

—হতেও পারে বা। জানি না আমি।

—এই যে তুমি গেলে না আনন্দে যোগ দিতে, এতে মনে হল তুমি বুঝি খুশি হওনি।

—মনে হলে আর কী করা।

—লোকের মতামতকে তুমি যে গ্রাহ্য কর না সে তোমার টিভিতে বসে মদ খাওয়া থেকেই বোঝা গেছে। পুরুষমানুষও অমন ক্যামেরার সামনে মদ-গাঁজা খায় না।

—মদ গাঁজা কে খেল আবার?

—ওই যে তুমি! শ্যাম্পেন খেলে? দশ তারিখে? খাটের ওপরে বাবু হয়ে বসে, কয়েকজন বয়স্কা বাঙালি ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে নিয়ে দিব্যি মদের বোতলটি খুললে, সবাই টিভিতে দেখলাম?

—ওফ্! ঐ কথা! ছাড়ুন তো সোমেনদা, কতবার বলব, ওতে অ্যালকোহল ছিল না। ওটা ফ্রুট জুস। ওই নিয়ে ঢের হয়ে গেছে।

—অমন সবাই বলে ভাই! ওটা যে কেমন ফ্রুট জুস, তা তো আমাদের জানা আছে!

—এই তো আপনাদের মতো মানুষরাই তো শিলিগুড়িতে একটা সেমিনারে এক মন্ত্রীর সামনে আমাকে অবিকল এই প্রশ্নই করেছিল। মিডিয়া ও আধুনিক জীবন নিয়ে জরুরি সেমিনার—অডিটোরিয়াম থেকে প্রশ্ন এল হঠাৎ—

—"আপনি টিভি ক্যামেরার সামনে মদ খেলেন কেন? ওটার কি প্রয়োজন ছিল?" আমার ব্যক্তিগত জীবন এখন পাবলিক অ্যাফেয়ার হয়ে গেছে। যার যা খুশি বলে নেয়। শুনতে হয়।

BanglaBook.org

—সত্যি, কেন খেলে, বল তো? আমিও তাই ভাবি।

—(ধমকে) বলছি খাইনি। ওটা 'অ্যামব্রোজিয়া' নামক একটা পীচফলের পানীয়। "অমৃত"। অমর্ত্যর সঙ্গে ওটার নামের এত মিল বলেই আমার দিদিভাই আর ছোট ননদকে নিয়ে মজা করলুম ওইদিন। ওটা বেবিশ্যাম, নকল শ্যাম্পেন, ছোটদের জন্য —কতবার বলব? দিদিভাই, বুড়ু ওরা কেউই তো মদ খায় না! অকারণে ওদের—

—আরে, অমন সবাই-ই বলে। আজকাল মেয়েরা সব ঘরে ঘরে মদ্যপান করছে। আড়ালে যত খুশি খাও না বাপু? কে দেখতে যাচ্ছে? তা বলে এইভাবে খোলাখুলি, টিভিতে?—ওটা চলে না।

সে যাক। খেয়েছ, খেয়েছ! হয়ে গেছে যা হবার। এখন শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যাবে না। নো ইয়ুজ ট্রায়িং। তার চেয়ে অন্য কথা বলি। হ্যাঁ, অমিতাদিকে বলবে, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ঠিক পাঁচবার চেষ্টা করেছি। পাঁচবারই আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে ওঁর পুলিশরা। অবশেষে চিঠি দিলাম। পেলেন কিনা জানি না।

—বড্ড বেশি চিঠিপত্র আসছে—ঝাঁকামুটের মাথায় করে চিঠি আসছে প্রতীচীতে।

—এটা ফ্যাক্ট— কিলো কিলো মণ মণ সে যাই আসুক, অমিতাদি আমার চিঠির উত্তরটা দেবেনই। তুমি জানো না। অন্য সম্পর্ক আমাদের। বহুদিনের।

—তবে তো ভাবনা নেই।

—তুমি তাড়া দিও। মনে করিয়ে দিও। "সোমেনদা" বলো না, চিনবেন না। বলবে "সুমুর চিঠির উত্তরটা"—

—ঠিক আছে।

—কী বলবে?

—সুমুর চিঠির উত্তরটা।

—রাইট। থ্যাংক ইউ।

—কিন্তু আমি তো এখন শান্তিনিকেতনে যাচ্ছি না সোমেনদা!

BanglaBook.org

জবাব চাই। জবাব দাও

—"দিদি, অ দিদি! দিদি!" হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়তে দৌড়তে এসে পথ আগলে দাঁড়ালেন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোকটি। দাড়ি-চুলে বেশ পাক ধরেছে। আমি চিরদিন লেট, সর্বত্র দেরি করে যাই। এখনও তাই—দৌড়চ্ছি। কেউ পথে দাঁড় করালে ভীষণ অসুবিধে। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি। নন্দনচত্বরে। বাংলা অ্যাকাডেমিতে মিটিং। শুরু হয়ে গেছে।

—আপনাকে সেই তখন থেকে ফলো করছি।

—কেন বলুন তো? কিছু দরকার আছে?

—আজ্ঞো হ্যাঁ। দাদার ঠিকানাটা।

—দাদা? কোন দাদা?

—ওই যে, অমর্ত্য সেন।

—ও। ওই দাদা। ঠিকানা দিয়ে কী করবেন?

—চিঠি লিখবো। অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি—

—ট্রিনিটি কলেজ, কেমব্রিজ, ইংল্যান্ড।

—ব্যস? রাস্তার নাম? বাড়ি নম্বর? পিনকোড?

—ছুটতে ছুটতেই বলি—লাগবে না, নেই।

—নেই!!

—ওইটেই কমপ্লিট? ধন্যবাদ, দিদি...

—অ দিদি! অ দিদি। প্লিজ আরেকটা কথা!

—আবার কী হলো? থেমে পড়ি। মুখ খিঁচোই।

—বলি উত্তর দেবেন তো? দাদা উত্তর টুত্তর দেন?

—এমনিতে তো দেন। তবে এখন এই হাজার হাজার অভিনন্দন, জানি না ঠিক কতটা কি পেরে উঠছেন।

—ঠাকুমা দেবেন?

—ঠাকুমা?

—ঠাকুমাকে চিঠি দিলে উনি উত্তর দেবেন কি? যদি লিখি? 'প্রতীচী'তে দাদার মা আর কি! তাঁকে চিঠি দিলে উত্তর পাব না? দাদার মা আবার ঠাকুমা কবে হয়?—এখন সবই তালগোল! ছুটতে ছুটতে বলি—

—তিনিও ব্যস্ত। অসুস্থও। কি দরকার তাঁকে চিঠি দেবার?

—আহা দিদি, অ—দিদি—শুনুন এই দেখা।

—??

—আপনি? আপনি উত্তর দেবেন তো? মানে ওঁদের যখন সময় নেই, তাহলে আর কী করা? আপনাকেই তাহলে চিঠি দিই? "ভালোবাসা" হিন্দুস্থান পার্কে? আপনি উত্তর দিলেও কাজ চলে যাবে।

—আবার আমাকে কেন?

—ওই যে, অভিনন্দন। দাদার জন্য। উত্তর দেবেন তো? আমার শুধু একটা উত্তর চাই দিদি, যে কেউ একজন উত্তর দিলেই হবে। অন্তরা, নন্দনা, যে-কেউ প্লিজ। সেটা তুলে রাখব। মেমেন্টো। নোবেল প্রাইজের স্মৃতি। আমার বংশধরদের জন্যে। একটা রিপ্লাই।

—আমি না। আমি না। আমি চিঠিপত্র হারিয়ে ফেলি। আপনার চিঠি হারিয়ে ফেলব...

—সে কি কথা? তবে তো...

—খুবই মুশকিল...

banglabook.org

সামান্য কাজ

প্রচণ্ড তাড়ায় একটা লেখা শেষ করছি, কানাই এল।

—দিদি, জামাইবাবুর এক বন্ধু এসেছেন দেখা করতে।

—কী নাম?

—বললেন, চিনবেন না। জরুরি দরকার। উঠতেই হলো লেখা বন্ধ করে।

—নমস্কার। এখন আমি বাটানগরে থাকি। আগে সেন্ট গ্রেগরিজ ইস্কুলে বাবলুর সঙ্গে পড়েছি ঢাকা শহরে। বাবলু আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। ইদানীং খুব কম মানুষকেই আমি দেখছি অমর্ত্যর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন না। এখন ওঁকে 'অমর্ত্য' নামে খুব কম জনেই ডাকে, সবারই দেখছি তিনি হয় 'বাবলু', নয় তো 'বাবলুদা।' ওঁর মা আমজনতার 'অমিতাদি' বা 'অমিতামাসি'। অথচ গত চল্লিশ বছরে ওঁদের কাছাকাছি এঁদের দেখিনি। ঘনিষ্ঠতা যেন হঠাৎ ম্যাজিক শিমগাছ! আমার মুখে কী ভাব ফুটল কে জানে! ভাষা ফুটল না। এইজন্যে উঠে এলাম, লেখা ছেড়ে?

—অমিতামাসির একটু 'দর্শন' চাই।

—উনি শান্তিনিকেতনেই আছেন।

—ঠিকানাটা?

—ওই তো, প্রতীচী, শান্তিনিকেতন?

—অ্যাপয়ন্টমেন্ট লাগবে কি?

—করে গেলেই ভালো তো।

—বেশ। তাহলে আপনি অমিতামাসির সঙ্গে আমার একটা অ্যাপো করেই দিন। আমার ফোন নম্বরটা আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি। অমিতামাসির ডেট ও টাইমটা পেলেই আপনি আমাকে জানাবেন। একটা খেয়াল রাখবেন শুধু।

—আমার কিন্তু উইক এন্ড ছাড়া সময় হবে না। উইক ডেজ-এ ব্যস্ত থাকি।

—পকেট থেকে ছোট্ট নোটপ্যাড বের করে ভদ্রলোক খসখস্ করে কীসব লিখতে শুরু করলেন। লেখা হয়ে গেলে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন।

—উনি কবে, কখন আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন, সেটা জানতে পারলেই এই নম্বরে আমাকে একটা ফোন করে দেবেন। সেইমতো আমি শান্তিনিকেতনের টিকিট কাটব।

আমি যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলুম।— আপনি আমাকে বলছেন? আপনার জন্যে শান্তিনিকেতনে ট্রাঙ্কল করে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফিক্স করে দিতে? না ভাই, পারবো না, স্যরি। ওটা আপনাকেই নিজে নিজে করতে হবে। নিন, লিখুন টেলিফোন নম্বরটা লিখে নিন—

—কিন্তু উনি তো আমাকে চিনবেন না। অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবেন কেন? ভাল হতো, যদি আপনার মাধ্যমে—

BanglaBook.org

—আমি তো আপনাকে চিনি না। এই তো দিব্যি চলে এসেছেন? এমনি করেই যাবেন। কিন্তু কেন যেতে চান শান্তিনিকেতনে?

—প্রণাম করতে। আর অটোগ্রাফ নিতে। দু'জনেরই অটোগ্রাফ চাই। হঠাৎ তাঁর মুখে হ্যালোজেন বাল্ব জ্বলে উঠল।

—আচ্ছা, একটা কাজ তো করাই যায়। ধরুন, আপনার কাছেই অটোগ্রাফ খাতাটা রেখে গেলাম। আর আপনিই শান্তিনিকেতন থেকে ওঁদের মা-ছেলের দুটো অটোগ্রাফ সংগ্রহ করে এনে রাখলেন। তারপরে আমাকে ফোন করে দিলেই আমি সুবিধে মতন এসে নিয়ে যাব। এইটুকুনি নিশ্চয়ই পারবেন? সামান্য কাজ! বলুন তাহলে, কবে নাগাদ পাব?

—প্রণাম করার কী হবে?

—ওটা পরে কখনও—

কী ভাল আমার লাগল আজ এই সকালবেলায়

শীতশীত ভোর হচ্ছে। রাস্তা যানশূন্য কিন্তু জনশূন্য নয়। দ্রুতগতি মনুষ্যের ভিড় লেকমুখী রাস্তায়। সকলেই যেতে যেতে যেন কেমন টেরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে যাচ্ছে। ওই দোতলাবাড়ির বারান্দায় নাইটি পরা এক মহিলা আমাকে দেখেই ভূত দেখার মতন চমকে উঠে, দৌড়ে ঘরের মধ্যে পালিয়ে গেলেন। কী হল? যেতে যেতে পেছন ফিরে ওই বারান্দার দিকে আর একবার তাকিয়ে দেখি, উনি ঘর থেকে আলোয়ান-জড়ানো এক ঘুমন্ত ভদ্রলোককে ধরে এনেছেন—দু'জনে মিলে আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে আছেন। এমন আগেও হয়েছে। ক'দিন আগে হলেও খুশি হয়ে ভাবতুম এঁরা নবনীতাকেই দেখছেন। দিব্যি গদগদ হতুম আহ্লাদে। এখন গা সিরসির করে উঠল। ওঁরা নিশ্চয়ই নোবেল লরিয়েটের প্রথমা পত্নীকে দেখছেন।

[কত বড় মানুষের সঙ্গে ঘর করেছে ষোলো-সতেরো বছর! আহা কী কপাল! রাখতে পারল না।]

দুটি মেয়ে চলে গেল পাশ দিয়ে। গা ঘেঁষে। ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। কী এত দেখার আছে? চুল আঁচড়াইনি? টিপ পরতে ভুলে গেছি? মর্নিং ওয়াকের আগে সাজসজ্জা ঠিক হয় না। কী মুশকিল। মেয়েগুলো এতবার তাকাচ্ছে কেন? আমি এই ডানদিকের গলিতে ঢুকে পড়ব?

—দিদি, নমস্কার।—চলেই এসেছে!

—নমস্কার।

—আমরা, মানে, আপনি আমাদের চেনেন না, কিন্তু আমরা আপনাকে চিনি।

এবার আমার মুখে একগাল হাসি। কেননা এই বাক্যবন্ধ দিয়ে যে-আলাপ শুরু হয়—তার পরবর্তী বাক্যটা আমি জানি।

এবার ওরা বলবে, "আমরা আপনার লেখা পড়তে খুব ভালবাসি।" আমি

খুশি মনে দাঁড়িয়ে পড়ি। লেখকের আসল পুরস্কার তো এখানেই। পাঠক-পাঠিকার ভালোবাসায়। আমার কাছে এই বাক্যের মূল্য অপরিসীম। এর চেয়ে ভালো সকাল কী হতে পারত?

মেয়েদুটি বলল—আপনাকে আমরা চিনি। টিভিতে কত দেখেছি। কাগজে ইন্টারভিউ পড়েছি। আমরা দুজনেই ইকনমিক্স পড়ি। আমরা স্যারের ভীষণ ভক্ত। আপনাকে দেখে তাই আলাপ করতে এলাম।

ন—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই...

ক, খ—উনি অত বড়ো, ওঁর কাছে তো পৌঁছতে পারব না, তাই আমাদের অভিনন্দন আপনাকেই জানিয়ে দিই। অভিনন্দন আর প্রণাম।

—মেয়েদুটো টিপ্ করে প্রণাম করল। "থাক থাক।"

ক—আপনাদের মেয়েরা কেউ তো ইকনমিক্স পড়েনি। না?

ন—নাঃ।

খ—একজন তো নন্দনা, সিনেমা স্টার। টিভিতে "গুড়িয়া" দেখেছি। মুখখানা অনেকটা আপনারই মতন।

ক—অন্যজনের কিন্তু বাবার মতন মুখ—কাগজে ছবি দেখেছি বাবার সঙ্গে। অন্তরা। জার্নালিস্ট। তাই না?

খ—ওর তো স্বামীও জার্নালিস্ট। প্রতীক। সেও কি ইকনমিক্স পড়েনি?

ন—নাঃ, সেও ইংরিজি। তোমরা তো সব্বাইকেই চেনো দেখছি।

ক—আপনার তো অ্যাজমা। তাই কি মর্নিং ওয়াকে যাচ্ছেন?

ন—তাও জানো?

ক, খ—আপনাদের বিষয়ে স—ব জানি।

—ওরে বাবা। ভেরি গুড। রোজই হাঁটতে যাও?

ক খ—এই, মাত্র কদিন হল যাচ্ছি।

ন—ভালো অভ্যেস, চালিয়ে যাও।

দু'পাও যাইনি। উল্টোদিক থেকে পরমাসুন্দরী দু'জন মধ্যবয়স্কা, সালোয়ারকামিজ-সুশোভিতা, হাস্যবদনা এসে আমারই সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। পথ জুড়ে।

ক—আপনি তো নবনীতা দেবসেন?

ন—আজ্ঞে হ্যাঁ...

খ—হাঁটতে যাচ্ছেন বুঝি?

ন—হ্যাঁ।

ক—আমরা ফিরছি।

ন—তাই তো দেখছি।

খ—আপনাকে তো আগে দেখিনি?

ন—না। এই সদ্য শুরু করেছি...

BanglaBook.org

ক—হাঁপানির জন্য? না বাত? আপনার তো দুটোই আছে, আপনার লেখাতে পড়েছি।

খ—আপনাকে তো আজকাল খুব দেখা যায়। টিভিতে। কাগজে। এখন তো সকলেই আপনাকে চেনে। আমরাও চিনে গেছি এই সুযোগে। হি হি হি...

ক—সে কি? আপনি ওঁকে আগে চিনতেন না?

খ—আগে? মানে? মানে নোবেল প্রাইজেরও আগে?

ক—কি আশ্চর্য, নোবেল প্রাইজের সঙ্গে ওঁর কী?

খ—কিছু না, কিন্তু অতবড় মানুষটার সঙ্গে অতদিন ঘর করেছেন—সেইজন্যই তো কাগজে টিভিতে সর্বত্র আজ ওঁর এত নামডাক...

ক—আপনাকে বলেছে! আমি ওঁর লেখার দারুণ ভক্ত। তাই দাঁড় করিয়েছি। আপনিই তো বললেন, ওই যে নবনীতা দেবসেন আসছেন।!

খ—আমি তো বললাম অমর্ত্য সেনের কথা মনে করেই।

ন—আপনারা ক্লান্ত—বাড়ি যান, আমি বরং একটু হেঁটে আসি।

ক—কিছু মনে করবেন না, সকলে তো বই পড়ে না। আমি কিন্তু আপনার জন্যই

খ—কেন। স্বামীর নামে পরিচিতিটা কি খারাপ?

ন—আপনারা কোন্ দিকটাতে হাঁটেন?

ক, খ—ঠিক হাঁটি না, আমরা লাফিং ক্লাবের মেম্বার। এক্সারসাইজ করি।

ক—লাফিং ক্লাবে আপনারাও গেলে ভাল। হাঁপানি আর দুটোর পক্ষেই ধন্বন্তরি।

ন—লাফিং ক্লাব? নাম শুনেছি, বাইরে থেকে হাহা হোহো শুনেছি—যেতে সাহস হয়নি...

ক—আসুন না, আপনার অসুখটসুখ সব ভালো হয়ে যাবে, ফিট্ থাকবেন—

খ—সকলে আপনাকে পেলে কত খুশি হবে—সবাই তো আপনাদের চেনে...

ন—একটু ভেবে দেখতে হবে। আজকে থাক, এ নিয়ে বরং আরেক দিন কথা হবে।

BanglaBook.org

মাস কমিউনিকেশন সেন্টার

(১)

—হ্যাঁ, বলছি, বলুন?

—দিদি অমর্ত্যদার কেমব্রিজের ফ্যাক্স নম্বরটা কত?

—কেন ভাই?

—মিনিস্টার একটা জরুরি মেসেজ পাঠাবেন...

—বেশ। বলছি লিখে নাও 0044...

—থ্যাংক ইউ দিদি।

—ওয়েলকাম। অমর্ত্য কিন্তু এখন কেমব্রিজে নেই। বস্টনে।

—অ্যাঁ, বস্টনে? কবে ফিরবেন?

—সে তো জানি না ভাই।

—ওখানে কি কোনও ফ্যাক্স-ট্যাক্স—

—আছে। ফ্যাক্স নম্বরটা লেখো, 001...

—থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ দিদি, মেনি মেনি থ্যাংক্স...

(২)

—বলছি, বলুন?

—দিদি, অমর্ত্যদার বস্টনের ফোন নম্বরটা কত? ওই ফ্যাক্স নম্বরটাই কি?

—না- না, অন্য। ফোন নম্বর হচ্ছে...

—থ্যাংক ইউ দিদি, আমরা আপনাকে বড্ড জ্বালাচ্ছি...

—না না তাতে কী হয়েছে...

(৩)

—হ্যাঁ, বলছি, বলুন—

—আচ্ছা নবনীতাদি, বাবলুদার অ্যাকচুয়াল জন্মস্থানটা কোনখানে বলতে পারেন? একটা বই বেরুবে—তাতে যাবে। বাংলাদেশে কাগজে বেরিয়েছে ওঁর জন্ম ঢাকাতে, আর এখানে বেরিয়েছে শান্তিনিকেতনে। আরও শুনলাম কলকাতাতে, অমিতা সেনের মামার বাড়িতে। আজ শুনছি নাকি ওঁর বাবা যখন বর্মাতে চাকরি করেন উনি, তখন রেঙ্গুনে জন্মেছেন। হয় উনি, নয়তো ওঁর ছোট বোন সুপর্ণা—

—অমর্ত্যের জন্ম গুরুপল্লীতে, ক্ষিতিমোহন সেনের বাড়িতে। বর্মায় কেউ জন্মায়নি।

—ঠিক তো? বাঁচালেন নবনীতাদি। কী যে কনফিউশন সৃষ্টি হয়েছে...

—কনফিউশনের কী আছে, ওঁর মাকে জিজ্ঞেস করলেই তো জানতে পারতে।

—অমিতাদি বেচারিকে আর বিরক্ত করতে চাই না। এমনিতেই তো এত ঝামেলা পোয়াচ্ছেন—তা ছাড়া শান্তিনিকেতনে ফোনে লাইন পাওয়াও শক্ত।

—আমাকে ধরা সহজ—আমাকে বিরক্ত করলে ক্ষতি নেই—

—আরে না-না, আপনি তো আমাদেরই নিজেদের লোক, আপনার ওপর একটু আধটু অত্যাচার তো আমরা করতেই পারি—পারি না? আচ্ছা তাহলে জন্মস্থানটা হচ্ছে গুরুপল্লী, শান্তিনিকেতন, ৩রা নবেম্বর, ১৯৩৩, এই তো? ঠি-ক আছে। রাখছি তবে...

(৪)

—হ্যালো নবনীতাদি? স্যরি আপনাকে একটু বিরক্ত করতে হচ্ছে। আচ্ছা, আমরা না অমর্ত্যদার জন্য একটা কার্ড করাচ্ছি, তার জন্য ওঁর ব্লাড গ্রুপটা একটু জানা দরকার ছিল। কার্ডে থাকবে। ওঁর ব্লাড গ্রুপটা কী? আপনার কি মনে আছে?

—ব্লাড গ্রুপ? অমর্ত্যর? ও বাবা। সে তো অনেকদিন হয়ে গেল। পূর্বজন্মের কাহিনী। প্রথমবার বাচ্চা হবার সময়ে ওঁর, আমার দুজনের ব্লাড গ্রুপ টেস্ট করানো হয়েছিল কেমব্রিজে। সবই ঠিকঠাক ছিল, তাই অত খেয়াল রাখিনি। এখন নিজেরই ব্লাড গ্রুপ মনে নেই তো অমর্ত্যর। কী যে ভাবো না আমাকে তোমরা। ব্লাড গ্রুপ।

—তবে কে, কে বলতে পারবেন? সুপূর্ণাদি?

তিনি আমেরিকাতে থাকলেও বলতে পারতেন না।

—অমর্ত্যদা এখন কোথায়?

—ঠিক জানি না, কোথায় যেন লেকচার দিতে গেছেন।

—অমিতাদি জানতে পারেন কি?

—বলতে পারব না ভাই। তুমি কেমব্রিজে অমর্ত্যর স্ত্রীকে ফোন করে জেনে নাও। উনি হয়তো জানবেন?

—ওঁকে কি বিরক্ত করাটা ঠিক হবে?

—আমাকে কি বিরক্ত করাটা ঠিক হচ্ছে?

—ছিঃ ছিঃ, নবনীতাদি, কী যে বলেন! এতে আপনি বিরক্ত হচ্ছেন? ছোট-ভাই হিসেবে এটুকু অধিকার তো আমাদের আছেই। তাই না? বলুন?

(৫)

—হ্যালো, স্যরি বেশি রাত হয়ে গেল না তো? নবনীতাদি? যাদবপুর ছেড়ে অমর্ত্যদা ফের ট্রিনিটি কলেজে গেলেন, না অক্সফোর্ড, না লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সে?

—ট্রিনিটি। এল এস ইতে অনেক পরে।—একাত্তর সালে। —তারও পরে, LSE থেকে গেছেন অক্সফোর্ডে।

—আর হার্ভার্ডে?

—ওখানে তো দুবার গেছেন। আটষট্টিতে প্রথমে। তারপর সাতাশি থেকে একটানা ছিলেন। তোমরা ওঁর একটা বায়োডেটা দেখে নাও না? 'হু' 'জ হু'-তেই পাবে।

—এই একটুখানি দিদি, কেউ কেউ বলছে উনি স্ট্যানফোর্ডে ছিলেন, আবার কেউ বলছে বার্কলিতে। কোনটাতে?...

—একষট্টিতে স্ট্যানফোর্ড। চৌষট্টিতে বার্কলিতে। শোন 'ইন্টারন্যাশনল হু'জ হু'টা বরং তুমি দেখে নাও—এভাবে হয় না।

জামাই-আদর

—খুকু, অমর্ত্য তো কলকাতাতে আসছে?

—হ্যাঁ আসছেন।

BanglaBook.org

—একদিন আমরা ওকে খেতে বলতে চাই। তুই ব্যবস্থাটা করে দে। মেয়েদের নিয়ে তুইও আসবি।

—না গো মীলুমাসি, খেতে টেতে বোলো না, ওঁর সময় হবে না।

—তাই তো এত আগে থেকে বলে রাখছি।

—কেনই বা বলতে চাও? কই, এত বছর তো কতবারই কলকাতায় এসেছেন, কখনও তো খেতে বলোনি।

—তোদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, অমর্ত্য আবার বিয়ে করল। সে অবস্থায় কি জামাইকে আর খেতে ডাকা যায়? তুইই বল্? ইচ্ছে করে?

—তা, এখন কি অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে? খেতে ডাকছ যে! হঠাৎ ইচ্ছে করল কেন?

—হাজার হোক, এতবড় সম্মানটা পেল তো? ছিল তো আমাদেরই জামাই একদিন।

—ছিলেন, কিন্তু এখন তো নেই? আপনমনে আনন্দ করছ, করো।—ওসব সম্মানে ভাগ-টাগ যেন বসাতে যেও না।

—বড্ড কড়া কড়া করে কথা বলিস আজকাল।

—কড়া নয়। বাস্তব। বি প্র্যাকটিক্যাল।

উদ্‌ভ্রান্ত শ্বশুরকুল

—আরে ফুলকাকা। রাঙাকাকা! এসো এসো। এত সেজেগুজে? গিলে করা পাঞ্জাবি, কোঁচানো ধুতিটা, গলায় চাদর, শ্রাদ্ধবাড়ি গিয়েছিলে বুঝি?

—তোর এখানেই এলুম।

—কি আনন্দ! কী ব্যাপারে? কতদিন পরে এলে!

—শোন বাপের বাড়ির কেউ এলে "কী ব্যাপারে" বলতে হয় না। এমনিই এসেছি। চা বল।

—স্যরি, স্যরি—তারপরে? বলো, কারুর বিয়ের ব্যাপারে? নেমন্তন্ন বুঝি?

—নেমন্তন্ন নয়।

দুই সুদর্শন সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। মনে হল মুশকিলে পড়েছেন। তারপর গলা ঝেড়ে নিয়ে একটু নড়েচড়ে বসে ফুলকাকা বললেন,

—প্রাইজের খবরটা পেয়ে অবধি ভাবছি তোর কাছে একবার যাই।

—খুব ভালো করেছ কিন্তু মুখ এমন গোমড়া কেন? এত কিন্তু-কিন্তু কীসের—

—সত্যি বলব খুকু? ঠিক বুঝতে পারছি না এতে আমাদের খুশি হওয়া উচিত, না বুক ভেঙে যাওয়া উচিত। দুটোই হচ্ছে।

রাঙাকাকা এবার গলা ঝাড়লেন।

BanglaBook.org

—ধর্ যদি সব কিছু আগের মতনই থাকত, আজ তাহলে তোর অবস্থাটা, আমাদের বাড়ির অবস্থাটা কেমন হত, ভাবতে পারিস? সেই উদ্দাম আহ্লাদের পরিমাণও আন্দাজ করতে পারছি না। কিন্তু এখন? কাগজে, টিভিতে আমাদের জামাইয়ের ছবি দেখি, বুকের মধ্যে যেন কেটে কেটে বসে। পুরনো দিনগুলো সব মনে পড়ে যাচ্ছে। তোদের এনগেজমেন্টের খবর এলো। তোর বিয়ে-বউভাতে সব্বাই দল বেঁধে শান্তিনিকেতনে গেলুম—এই তো, নতুনদার শ্রাদ্ধে ওর কত খাটাখাটনি—

—সেবার লন্ডনে তোদের বাড়িতে—

—ওইসব কথা একদম ভুলে যাও তো বাপু তোমরা! একেবারে মনেই রেখো না—ওই পুরনো অ্যালবাম ক্যানসেলড— ওই দিনগুলো নিয়ে মনে একটুও দুঃখ করো না, তাহলেই আজকের মুহূর্তটাকে এনজয় করতে পারবে—

—কী যে বলিস। দুঃখু করবো না? জানিস খবরের কাগজে ওর সঙ্গে ওর বউয়ের হাসি-মুখ ছবি দেখে তোর ফুলকাকি কেঁদে ফেলেছে?

—প্লিজ তোমরা একটু চেষ্টা করে মন ভালো করো—জগতে আজ সবাই আনন্দ করছে, কেবল এই আমাদের একটা বাড়িতেই মন খারাপ থাকবে। এটা কি ভালো? চিয়ার আপ, চিয়ার আপ, মন খারাপ করে থাকলে নিজেদেরই ঠকে যাওয়া হবে।

—মন ভালো করব? গুড। ভেরি গুড। তাহলে নোবেল প্রাইজের খবরে আমরা আনন্দই করবো, বলছিস?

—নিশ্চয়ই। আমার কথা ভেবে তোমরা মুখ হাঁড়ি করে থাকবে নাকি সারা দেশ যখন আনন্দ করছে?

—নতুনদিদি-নতুনদা থাকলে কি আজ আনন্দ করতেন ? তাঁদের বুক ফেটে যেত রে।

—কি জানি? কিছু বলা যায় না। এই তো আমিই তো খুব আনন্দে আছি।

—তাই তো দেখছি!

—কেবল কিঞ্চিৎ ব্যতিব্যস্ত এবং বিব্রত। বড্ড ঝমেলা করছে বাইরের লোকে। খালি খালি ফোন আর লোক। লোক আর ফোন। নিজস্ব সময় বলে কিছু বাকি নেই। নিজের কাজকর্ম চুলোয় গেছে। সারাদিন ফোন ধরছি আর বৈঠকখানাতে বসছি। কথা বলতে বলতে ভাঙা গলা আরও ভেঙে গেছে। পুরস্কারপ্রাপক এ বাড়ির কেউ নন, তবুও সবাই এসে মিষ্টি খেতে চাইছে, মিষ্টিমুখ করাতে করাতে পকেট গড়ের মাঠ হয়ে যাচ্ছে।

—খুকু, এক্সকিউজ মি! পুরস্কারপ্রাপক এ বাড়ির কেউ নয় বললি? পিকো টুম্পার বাবা নয়? ওটা বলিস না। ওদের বাবার জন্যে তুই মিষ্টি খাওয়াবি না তো কে খাওয়াবে এ বাড়িতে?

—হঠাৎ বাড়িটা "অমর্ত্য সেনের শ্বশুরবাড়ি" হয়ে গেছে। রাস্তার লোকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। বারান্দায় দাঁড়াবার উপায় নেই। আমার পথেঘাটে দোকানপাটে

BanglaBook.org

স্বচ্ছন্দ বিহার বন্ধ হয়ে গেছে। দু মিনিট হাঁটি, আর কেউ না কেউ দাঁড় করিয়ে অমর্ত্যর কথা বলবেই। পথেঘাটে ফোনে সাক্ষাতে চিঠিতে আমার জীবনটা একখানা অ্যাবসার্ড নাটক হয়ে উঠেছে ফুলকাকা। ফোন বেজে উঠল।

—ওই যে তোমার শ্যামের বাঁশি! যাও।

—বলুন? হ্যাঁ হ্যাঁ, পেয়েছি। অনেক ধন্যবাদ। ছবিগুলো কোথায় পৌঁছে দিতে হবে? শান্তিনিকেতনে? নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেব। হ্যাঁ হ্যাঁ। নমস্কার।

—উফ্। এই চলছে সমানে! 'না' বলার জো নেই!

—আমরা উঠি এবার। কথা বলে ভালো হলো। শক্ত করে রেখেছিস দেখে ভালো লাগছে। মেয়েগুলোও তো কাছে নেই। তোর ওপরেই সবটা ধকল পড়ে গেছে।

—মেয়েরা আসবে। সিভিক রিসেপশনে যাবে।

—তুই যাবি, সিভিক রিসেপশনে?

—নেমন্তন্ন করলে নিশ্চয়ই যাব।

—তুই যদি যাস, তবে আমাদের জন্যেও খান কয়েক কার্ড জোগাড় করতে পারবি?

—নিশ্চয়ই। যাবে তোমরা? মনে কষ্ট হবে না তো আবার? ওর বউ থাকবে কিন্তু সশরীরে।

BanglaBook.org

গ্রীনরুম

—মাগো তুমি কী পরবে? কিছু ঠিক করেছ?

—হ্যাঁ। ওই যে নতুন লাল পাড় গাধাওয়ালটা।

—অ্যাঁ? লালপেড়ে শাদা শাড়ি? সতী সাধ্বী সধবা হিন্দু নারীর ইউনিফর্ম? না দিদি, নো ইউ কান্ট ডু দ্যাট। কালারফুল কিছু পরো। লালপেড়ে ইজ আ হরিবল আইডিয়া।

—ঠিকই। ওটা চলবে না— মেয়েরা মুহূর্তে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। খাটভর্তি শাড়ি ঢেলে ফেলে।

—কালো কাঁথারটা?—বড্ড জমকালো...।

—জামরঙা বালুচরী?— সেম প্রবলেম...

—গ্রে পোচমপল্লী?—চলবে—

—হলদে বোমকাই?—চলবে—

—সবুজে ঢাকাই?— চলবে—

—লালপেড়ে ঢাকাই?—জরি বেশি...

—লাল-সাদা ঘট চোলি? জরি বেশি...

—সবুজপাড় ঢাকাই?—বড্ড ড্যাব...

বেস। হলুদ বোমকাই?—নো ব্লাউজ...

—সবজে ঢাকাই?—নো পেটিকোট...

—তাহলে?...

ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত মেয়েরা গুছিয়ে রাখল কী? না টুম্পার কালোপাড় মেরুন সিল্কের বাটিক। সেটা নাকি কালারফুল—কিন্তু সিম্‌পল, আর খুব ডিগনিফায়েড। এবং কালো ব্লাউজ আছে। ম্যাচিং পেটিকোটও খুঁজে পেয়েছে। এরপরে আর কথা নেই। ফাইনাল।

—মেয়েরা কী পরবে ঠিক করলে?

—ওই তো, তোমার সাদা ঢাকাই বেনারসিটাই টুম্পা পরবে, সাদা-লাল ঘটচোলিটা, আমি পরব—দুজনেরই ম্যাচিং লাল ব্লাউজ আছে—

—ঠিক ছোটবেলার মতো। মায়ের শাড়ি না পরলে ওদের ঠিক "সাজা-সাজা" মনে হয় না। যদিও দুজনেরই প্রচুর নিজস্ব শাড়ি ও ব্লাউজ আছে এখন! সেসব পড়ে রইল। আমার অবশ্য চোখ জুড়িয়ে গেল। অতএব মা পরলেন ছোট মেয়ের মেরুন শাড়ি। মেয়েরা পরল মায়ের সাদা-লাল জরির শাড়ি।

—মা, শাড়িতে পিন লাগাবে? তোমার তো ভীষণ শাড়ি খসে যায়। এখানে কিন্তু সর্বক্ষণ টিভি ক্যামেরা থাকবে।

—টিভি ক্যামেরাটা আমার ওপরে থাকবে না।

—মাগো, প্লিজ নতুন টিপ পরো। কৃপণতা করে পুরনো পরবে না, খসে পড়ে যাবে, সেই বইমেলার মতন!

—দিদি, প্লিজ বিশাল নোংরা ওই তোমার ঠাকুমার ঝুলিটা নিও না। একটা ব্যাগেই কাজ চালাও। কী যে ক্যাবলকান্ত দ্যাখায়, তা যদি জানতে, পঞ্চাশটা থলে নিয়ে—

—আচ্ছা সিভিক রিসেপশনটা কি আমাকেই দেওয়া হচ্ছে? তোরা কী শুরু করলি? আজ আমার দিকে কেউ তাকাবেই না, রেস্ট অ্যাশিওরড্—

—তা—ই? তবেই হয়েছে। তুমি বাঙালি চেনোনি। সব্বাই তোমার দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকবে। বারো হাজার লোক।

—কই রে? কই রে? নবনীতা দেবসেন কই রে? দেখতে পাচ্ছিস?—'ওই যে ওই যে, অমর্ত্য সেনের প্রথম পক্ষের বউটা? পাগলির মতন তিনটে থলে নিয়ে, হাঁটুর কাছে কাপড় তুলে যাচ্ছে,—ওইটে!' এমনি বলবে।

—থ্যাংক ইউ। তোরা যা। আমি যাব না।

—আহা আহা সত্যি নাকি? আমরা তোমাকে একটু খ্যাপাচ্ছিলুম। জাস্ট টিজিং ইউ।

—তুমি খুব স্মার্ট, মা। বাইরে থেকে বোঝাই যায় না কতটা ক্যাবলাকান্ত। খুব ডিসেপটিভ অ্যাপিয়ারেন্স তোমার।

BanglaBook.org

—বারো হাজার লোক কিন্তু তোমার দিকেও নজর রাখছে, মনে রাখবে মা, সচেতন হয়ে থাকবে—

—বারো হাজার ? সে তো শুধু আডিটোরিয়ামেই! আর টিভিতে ? পুরো পশ্চিমবঙ্গ দেখবে। দিদি! হঠাৎ 'নাকে-কী-ঢুকলো?' বলে যেন নাক-টাক খুঁটে ফেলো না, কেলেংকারি হয়ে যাবে কিন্তু।

—কিংবা ঘাড়টা কাত করে মা হয়তো খোঁপা থেকে কাঁটা বের করে বাঁ কানটা চুলকোতে লাগলেন হঠাৎ, ক্যামেরার মধ্যে!

আমাকে তোরা কী মনে করেছিস বল তো ? দেহাতি আদ্‌মি? পাবলিক প্লেসে যাইনি? শোনরে বোকারা, আজ আমি কেউ না, সমস্ত ক্যামেরার অন্যদিকে নজর থাকবে— "তাই ভেবে আনন্দে থাকো আর কি! ক্যামেরার gaze টার gossip interest থাকবে, বুঝলে দিদি ? সেটাই খেয়াল রাখতে বলছি। স্ত্রী তো স্ত্রী। তার চেয়ে প্রাক্তনী ঢের বেশি গসিপগন্ধী!"

যাবার আনন্দ শুকিয়ে গেল ছোটদের উপদেশের ঠেলায়। অবশেষে সদলবলে তাজ বেঙ্গলে। পিকো টুম্পা প্রতীক কবীর সব রেডি। শাশুড়িমাও রেডি। হঠাৎ আমার বাহুটা জড়িয়ে ধরলেন—"তুই আমার সঙ্গে যাবি। আমার আলাদা কনভয়। ছেলেমেয়েরা তো বাপের সঙ্গে যাবে। আমার সঙ্গে কে তবে যাবে? একা একা যাব না। তুই সঙ্গে চল্।" বেশ। আমার এতে ভালোই হলো। মূল কনভয়ের সঙ্গে যেতে যথেষ্ট সঙ্কোচ হচ্ছিল, ওঁরা আদর করে ডেকেছেন বলে এসেছি। আমিও তো শাশুড়ি ? ব্যস্ আমিও খপ করে আমার জামাইয়ের হাতটা পাকড়ে ফেলি। —"তুই তাহলে আমার সঙ্গে যাবি। আমিও একা একা যাব না!" আমরা তিন প্রজন্মের তিনজন— যে যার শাশুড়ির সঙ্গে চললুম। আলাও পান্‌সি নেতাজী ইনডোর!

কনভয়

সামনে পাইলট কার...সোঁ...পোঁ...পোঁ করে সাইরেন বাজিয়ে। ছটা সাদা অ্যাম্বাসডার একসঙ্গে ছুটল। মাঝখানের একটাতে আমরা তিনজন, আর একজন পুলিশ অফিসার। বাকি সব গাড়িতে শুধুই নিরাপত্তারক্ষীরা।

সারাপথ মানুষে মানুষে সুসজ্জিত। আবালবৃদ্ধবনিতা। কাতারে কাতারে দর্শনপ্রার্থী, প্রীয়মাণ জনতা। আমি। আমি যেমন দাঁড়িয়েছিলুম ছোটবেলায়, ধীলন শাহনওয়াজকে দেখব বলে। আরেকটু বড় হয়ে ক্রুশ্চভ বুলগানিনকে দেখব বলে। কোনোদিন কি ভেবেছি এমনভাবে মানুষ দাঁড়াবে আমার পিকো টুম্পার বাবাকে দেখবার জন্যে ?

সাইরেন শুনে ঝিমন্ত জনতা মুহূর্তে জেগে উঠলো "মায়ের কনভয়" গুটি গুটি নেতাজী ইনডোরে ঢুকছে যখন, স্পষ্ট দেখলুম ফুটপাতে দাঁড়ানো লোকজন উৎসাহে নিচু হয়ে জানলা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে যাত্রীদের দেখার চেষ্টা করছে, তারপর

BanglaBook.org

আশাহত, ব্যাজার মুখে উঠে দাঁড়াচ্ছে। আশাভঙ্গের দুটো কারণ থাকতে পারে। এক হতে পারে তারা কালো কাচ দিয়ে কিছুই দেখতে পায়নি। আর দুই—দেখেছে দূর যতো আজেবাজে ফালতু পার্টি। আসল মানুষটা নেই।

মন যারপরনাই বিষাদে ছেয়ে গেল। ওদের জন্য তো বটেই। নিজের জন্যও। ফালতু পার্টি হয়ে গেছি। ফল্‌স কনভয়। দূরে আসল কনভয়ের সাইরেন শোনা যাচ্ছে। এসে পড়ল বলে।

সখি-সংবাদ

—তোকে সেদিন দেখলাম। শাশুড়িকে ধরে ধরে সিটে নিয়ে এলি। সিভিক রিসেপশনে।

—তুই গিয়েছিলি?

—না। টিভিতে দেখলাম।

—বাব্বা, কী মরণ ফাঁদ না ওখানে, ইলেকট্রিক তারে পা জড়িয়ে আরেকটু হলেই আছাড় খাচ্ছিলেন।

—কিন্তু তোকে যে কী খারাপ দেখাল টিভিতে, সেটা কি তুই ভেবে দেখেছিস একবারও?

—খারাপ দেখাল? কেন?

—মনে হল তুই তোর এক্স-শাশুড়িকে তেল দিচ্ছিস।

—কীসের তেল? পড়ে যাবেন, ধরব না?

—তুই কিন্তু বারবার রং স্টেপ নিস। মিডিয়া রেসপন্সটা মাথায় রেখে কাজ করতে হয়।

—কী আবার করলুম? কী বলতে চাস তুই?

—বলতে চাই যে তোমাকে দেখে যারপরনাই লজ্জা করেছে আমাদের। হেসে হেসে ঘেঁষে ঘেঁষে কী সব বলছিলে অমর্ত্যর স্ত্রীকে? কাগজে লিখল বাংলা থেকে ইংরিজি অনুবাদ করে দিচ্ছিলে।

—ঠিক ভাই। কাগজেও তা হলে ঠিক কথা লেখে মাঝে মাঝে? গুড!

—তোকে কি ইন্টারপ্রেটরের চাকরি দিয়েছিল রে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার?

—কেন, কী হলো?

—খুব খারাপ দেখিয়েছে। লজ্জা করল না তোর?

—যা বাব্বা। লজ্জা কেন করবে?

—মনে হলো তুই গায়ে পড়ে অমর্ত্যর বউয়ের সঙ্গে ভাব জমাচ্ছিস।

—ওকে তো ওদের বিয়ের আগে থেকেই চিনি—এখন নতুন করে ভাব জমাব?

—মহিলাটিও তেমনি। কী রকম ঢলে ঢলে পড়ছিল তোর ঘাড়ের ওপরে।

—কী করব? শুনতে পাচ্ছিল না যে?

BanglaBook.org

—যাত্রা থিয়েটারের মতো দেখালি বাবা তোরা। দুজনে পাশাপাশি বসে বসে কী ভাব-বিনিময়।

—এতে তোর এত রাগারাগির কী আছে?

—আর কিছু নয় প্রগতিবাদী নারী হিসেবে তোমার আরেকটু আত্মসম্ভ্রম থাকা উচিত ছিল। ওর স্ত্রীর ঠিক পাশে গিয়ে না বসলেই তোমার কি চলছিল না?

—আমরা বসেছি কি স্ব-ইচ্ছায়? চেয়ারে প্রত্যেকেরই নাম লিখে সাঁটা ছিল না?

—তাই বল! সিটে নাম লেখা ছিল? বাঁচালি। তবে তো আমরা সব ভুল ভেবেছি। আমি ভাবলাম তুইই বুঝি সেধে ওর গা ঘেঁষে বসতে গেছিস—তা নয়? তবে তো ঠিকই আছে, এটা একদিক থেকে ভালই হয়েছে—কারেক্ট ডিসিশন—

—থাক। ঢের হয়েছে উল্টোপাল্টা কথা! ঢের বাজে বকেছিস—আমি নিজে বসলে ভুল ডিসিশন হতো—আর সরকার বসালেই কারেক্ট ডিসিশন!—প্লীজ বোর করিস না, এবার অন্য কথা বল—তোর মেয়ের শরীরটরির একটু সেরেছে?

—মেয়ে ভালো আছে, থ্যাংক ইউ। নাতনিটাও সুস্থ হয়ে উঠেছে। এখন সব ঠিকঠাক। বাই দি ওয়ে 'অন্য কথা' বলাতে মনে পড়ল, মেয়ে কী বলছিল জানিস? বলছিল—মাগো, নবনীতামাসির কি আর শাড়ি নেই? প্রত্যেকটা কাগজে ওই একটাই শাড়ি পরা? টেলিগ্রাফ, স্টেটসম্যান, এশিয়ান এজ, সর্বত্র—আবার এই মাসের 'ভ্রমণ' এল। সেখানে 'গঙ্গাবক্ষে নৌকাবিহার' করছেন, সেও ওই কাপড়টা পরে। তুমি ওঁকে একটা শাড়ি প্রেজেন্ট করো।

—দূর বোকা। সব ছবিই তো একই দিনে তোলা, সকালবেলা গাদিয়াড়াতে নৌকো চড়বার জন্যে যে কাপড়টা পরলুম সেটা কি আর বদলাতে চান্স পেয়েছিলাম, মিডিয়া তখন প্রবল আকার গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার। গাদিয়াড়াতেই শুরু হলো, 'আজকাল' পত্রিকা দিয়ে। তারপর ফিরে এসে দেখি বিধ্বস্ত কানাই লিখে রেখেছে নামের সুদীর্ঘ ফিরিস্তি, এক সন্ধ্যা ও এক সকালের মধ্যে দুশো তেতাল্লিশজন ফোন করেছে, পঁচিশজন চলে এসেছে। তার মধ্যে কে নেই। পি টি আই, ইউ এন আই, বি বি সি, জি টিভি, ইন্টারনেট, আজতক, স্টার টিভি, দুরদর্শন, আকাশবাণী সব্বাই — প্রত্যেকটা খবরের কাগজ এবং অগুনতি ব্যক্তিগত শুভানুধ্যায়ী। মিডিয়ার অনেকেই পরে আবার ঘুরে ঘুরে এলেন—একেবারে পরের দিন সকালের আগে শাড়িটা বদলাবার সুযোগ হলো না। রাত্রে এত ক্লান্ত লাগল, ওটা পরেই ঘুমিয়ে পড়লুম। নাওয়া-খাওয়া সব কয়েকদিন মাথায় উঠেছিল। কয়েকদিন ধরে তাণ্ডব চলল, বাড়িতেই যেন প্রিভেসি বলে কিছু ছিল না। আর আমি লোকটা যে এতদিন ধরে কষ্ট করে লেখালিখি করলাম, বাঙালির মনে একটা ছোট্টখাট্টো জায়গা তৈরি করলুম নিজের জন্য— একটা অ্যালফ্রেড নোবেলের ঢেউ লেগে সে সমস্তই ধুয়ে মুছে গেল!— ব্যাক টু স্কোয়ার ওয়ান।

জরা হট্‌কে, জরা বঁচ্‌কে, ইয়ে হ্যায় নোবেল, মেরি জান্‌!

কির। কির্‌র্‌র্‌। কির্‌র্‌র্‌!!

—কে রে, এত জোরে বেল বাজাচ্ছে কে?

—দিদি পুলিশ। কানাই ভীত।

—পুলিশ? কেন? কী ব্যাপার। বারান্দায় বেরিয়ে পড়ি রণরঙ্গিণী মূর্তি ধারণ করে। নীচে পুলিশ মুখ তুলে ওপর দিকে চেয়ে। কোমরে দুই হাত। ইশারা করে আঙুল উলটে—

—গাড়িটা সরিয়ে নিন। মারুতি গাড়ি আপনার?

—হ্যাঁ। কেন সরাব?

—আজ বিকেল পাঁচটার সময় অমর্ত্য সেন এ বাড়িতে আসবেন।

—তার জন্য আমাকে গাড়ি সরাতে হবে কেন?

—সিকুরিটি।

—আমার গাড়িটা আমার বাড়ির সামনেই থাকে। থাকবেও। পারলে আপনিই সরিয়ে দিন।

—এবার পুলিশটি চিৎকার করে পাড়া কাঁপিয়ে ঘোষণাটি করেন, সে ভাবে, আমি বোধহয় শুনতে পাচ্ছি না।

—"আজ পাঁচটার সময়ে অমর্ত্য সেন এই বাড়িতে আসবেন। রাস্তা ক্লিয়ার করতে হবে। গাড়ি হটান্‌। সিকুরিটি!" এখন বেলা তিনটে। অমর্ত্য বলেছেন ৬টার সময়ে এমাকে নিয়ে বেড়াতে আসবেন। এ যাত্রায় আর কোথাও যাচ্ছেন না, কোনও লোক-লৌকিকতা করতে পারছেন না, প্রবল নোবেল-তরঙ্গ বিক্ষোভে বিপর্যস্ত। আজ সন্ধ্যাটা নিজেদের মধ্যে থাকতে চান। তাই কারুকে খবর দেওয়া বারণ। কিন্তু এই পুলিশের তো গলায় মাইক লাগানো আছে। একে থামানো দরকার।— "ঠিক আছে, দেখছি। আপনি যান।" চারটের সময় শিবু এসে বলল—"দিদি, গড়িয়াহাটের মোড় থেকে লোক দাঁড়িয়ে গেছে। জামাইবাবু আসছেন নাকি ৫টার সময়? সব বাড়ির ছাদে লোক। বারান্দায় লোক। কি ভিড়!"

—অ্যাঁ? কী বলচিস শিবু?

—তাই তো দেখলাম।

পরদিন সকালে একের পর এক ফোন আসা শুরু হল।

—খুকু, অমর্ত্যরা এলো, আমাকে একটা খবর দিলি না?

—বৌদি। বাবলুদারা আসবে আমাকে একবারও বল্লে না?

—মিনুমা, আমাদের একটিবার জানালে না?

—নবনীতা, এটা কি ঠিক হলো? আমাকে পর্যন্ত জানালে না বাড়িতে অমর্ত্য আসছে।

—তোমরা কেমন করে জানলে?

—কাগজে ছবি দেখলাম তো।

—কাগজে? কি ছবি দেখলে?

—"ভালোবাসা" বাড়ি থেকে অমর্ত্য সেন বেরুচ্ছেন সস্ত্রীক ওখানে ভোজন সেরে—তিন ছেলেমেয়ে সমেত—

—এত খবর কে দিল ওদের?

—তা তো জানি না?

টুম্পা চেঁচিয়ে ওঠে "পুলিশ। পুলিশ সব খবর দিয়ে দিচ্ছে, মা! 'অমর্ত্য সেন আসছেন রাস্তা ফাঁকা করো' স্লোগান বোধহয় সেই গড়িয়াহাট থেকেই শুরু করেছিল।" যে জানে তেমন লোকের গলাতে পিকো বলল:—এটা রুটিন। কাগজের লোকেরা পুলিশকে তাদের দিনের প্রোগ্রামটা জিজ্ঞেস করে—"আজ কোথায় ডিউটি?" তাই থেকেই মুভমেন্টস জেনে যায়। তারপর প্রেসও। সেইখানেই 'ডিউটি'-তে চলে যায়।

—বাড়ির ভিতরে রিপোর্টাররা ধেয়ে আসেনি ভাগ্যিস!

—আসবে কি? পুলিশে পুলিশে তো বাড়ি ঘেরাও ছিল। তুমি তো বেরোওনি, জানবে কেমন করে। আমরা তো বাবাকে গাড়িতে তুলতে গিয়ে দেখলাম—প্রেস ফটোগ্রাফার, আর পুলিশের ভিড়— বাড়ির সামনে রাস্তা ভর্তি অজস্র মানুষ। সাইরেন বাজিয়ে বাবার গাড়ি চলে গেল। জ্যোতিবাবুর মতো।

[এই দৃশ্য নরেন্দ্র দেব কি কখনও কল্পনায় ভেবেছিলেন, তাঁর 'ভালোবাসা' বাড়িতে?]

দ্য রাইট পার্সন

—"হ্যাল্লো নাভানীথা। হাউ ইজ লাইফ? আফটার সাচ আ লং টাইম।" ঘরে ঢুকলেন হাস্যবদন, দীর্ঘদেহী, পক্ককেশ এক বৃদ্ধ দক্ষিণী। আগে দেখেছি বলে মনে হলো না। চমৎকার ডার্ক স্যুট পরা। লাল টাই।

—"কেশভন। শিওরলি ইউ রেকগনাইজ মি? সেই যে পঁচাশি সালে ব্যাঙ্গালোরে কনফারেন্সে—", হাতের ব্রিফকেসটাকে টেবিলে রাখলেন। বললেন, ওতে করে কয়েকটি বই এনেছেন আমাকে দেবার জন্যে। কিন্তু ব্রিফকেস আর খুলছে না। আমি হাত বাড়াই—"দিন, আমি খুলে দিচ্ছি—" কিন্তু তার আগেই উনি ঝাঁপিয়ে পড়ে টেবিল থেকে আমার হাতঘড়িটা তুলে নিয়েছেন। এবং তার স্টিল ব্যান্ডের খিলটাকে ব্যবহার করে চাড় দিয়ে ব্রিফকেসের লকটা খুলতে চেষ্টা করছেন। আমি হাঁ হাঁ করে উঠি, আর কেশভন আমাকে সান্ত্বনা দেন—"এই তো, এই হয়ে গেল!" বলতে বলতেই বাক্সের ডালা খুলে গেল। আহ্লাদে নেচে উঠে কেশভন বলেন, —"কেবল একটু স্কিল চাই!" যত্ন করে বইগুলি বের করলেন। দুটি উপন্যাস। একটি গল্পসংকলন। তিনটিই ইংরিজিতে লেখা। এবং একটি পাণ্ডুলিপি। নতুন

BanglaBook.org

উপন্যাসের কম্পিউটার প্রিন্ট আউট। উল্টেপাল্টে দেখলাম লেখা খারাপ নয়। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কাছে বইগুলি পেয়ে আমি অভিভূত। "ধন্যবাদ, প্রভূত ধন্যবাদ!"

—"কাগজে আপনার প্রবন্ধ পড়লাম, আপনি লিখেছেন স্বদেশে প্রকাশিত ইংরিজি ভাষাতে রচিত ভারতীয় সাহিত্য আর বিদেশে প্রকাশিত ইংরিজি ভাষাতে লেখা ভারতীয় সাহিত্য কৌলীন্য বিচারে আলাদা। তাদের প্রচারের জাতই আলাদা, পাঠকের সংখ্যাও আলাদা, সাহিত্যের চরিত্রও তাতে আলাদা হয়ে যায়। কতদূর যে যথার্থ মন্তব্য, কি বলব! কেউই এ ব্যাপারটা বোঝে না। আপনিই প্রথম লিখলেন।"

প্রশংসা পেয়ে আমি যারপরনাই পরিতৃপ্ত। কিন্তু একটু তাড়া আছে। বেরুব। উঠে পড়ি।

—থ্যাংক ইউ ডঃ কেশভন। নিশ্চয়ই পড়ব আমি আপনার বই। এখন একটু—

—অফ কোর্স। পড়বে বইকি! আপনিও পড়বেন। আগে আপনি পড়ে নেবেন, তারপরে ডক্টর সেনকে দিলেই হবে।

—ডক্টর সেনকে?

—"আপনি তো সবই বোঝেন। বিদেশে যদি ছাপা না হয়, তাহলে ইংরিজিতে বই লেখার আজ আর কোনও মূল্যই নেই। তাই ডক্টর সেনকে একটু বলতে চাই —যদি—

—ডক্টর সেন কী করবেন? এ তো অর্থনীতি নয়, উপন্যাস—

—আমার একজন লিটেরারি এজেন্ট দরকার বিলেতে। ডঃ সেনের তো সব বই-ই বিলেত থেকে বেরোয়। উনি নিশ্চয় একজন লিটেরারি এজেন্ট জোগাড় করে দিতে পারবেন। পারবেন না!— আমি স্তম্ভিত হয়ে চুপ করে থাকি।

—আমার পাণ্ডুলিপিটা উনি পড়ুন, এটা আমি চাই। আপনি নিশ্চয়ই ওকে এটা পড়াতে পারবেন? এতে উনি যা যা চান, সবই আছে— দুর্ভিক্ষ আছে, ক্ষুধা আছে, নির্যাতিতা নারী আছে। ওঁর খুব পছন্দ হবে। ওঁরই গবেষণার বিষয় নিয়ে উপন্যাসটি লেখা। যদি একটু বিলেত থেকে বইটা উনি ছাপিয়ে দিতে পারেন, আপনি ওঁকে বলুন।

—ডঃ কেশভন, বইটি আপনি পোস্টে ওঁকে পাঠিয়ে দিন, চিঠি লিখে। এসব কাজে ডিরেক্ট কনট্যাক্টই ভালো!

—কিন্তু আমি তো ওঁকে চিনি না। যদি আপনি বইটি ওঁর কাছে রেকমেন্ড করে দেন—

—শুনুন, অন্য বইগুলোও আপনি ফেরত নিয়ে যেতে পারেন, আপনার কাজ যখন সিদ্ধ হলো না।

—ছিঃ ছিঃ ও কি কথা? আপনি আগে পড়ে নেবেন, তারপরে ডঃ সেনকে

BanglaBook.org

পৌঁছে দেবেন। তাড়া নেই। অরুন্ধতী রায়কে তো তার এজেন্টই এত বড় করেছে। ডঃ সেন ইজ দ্য রাইট পার্সন। উনি যদি আমাকে হেল্‌প করেন, কোথায় লাগবে অরুন্ধতী। আর কোথায় বিক্রম শেঠ। ইফ হি কুড গেট মি আ লিটেরারি এজেন্ট অ্যাব্রড—

...কেশভনের পুরু চশমার পিছনে বৃদ্ধ চোখের মণি স্বপ্নময় হয়ে উঠল—হঠাৎ আমার হাত দুটি চেপে ধরলেন—"ইউ উইল রিকোয়েস্ট হিম অন মাই বিহাফ, ওন্ট ইউ?"—

কেশভন্ চলে যাওয়ার পরে দেখি ঘড়িতে তখনও এগারোটা বেজে পাঁচ। তাঁর ব্রিফকেসটি যে মুহূর্তে খুলে গেছে, আমার ঘড়িটিও সেই মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেছে।

দাঁড়াও, সুন্দর মুহূর্ত!

শোননি কানে, হঠাৎ গানে কহিল "আহা আহা" সকল বনভূমি

একটানা প্রবল গর্জন করে চলেছে মেট্রো রেল। যথেষ্ট ভিড়। তার মধ্যেই দণ্ডায়মান দুই ভদ্রলোক গল্প জুড়েছেন। মুখ দেখতে পাচ্ছি না।

—"কি বলব মশাই, কাগজ খুললেই শুধু অমর্ত্য সেন আর অমর্ত্য সেন। অথচ সেই মানুষটা যে কী বলছে, সেদিকে কান দিচ্ছে কেউ? খাদ্য বলুন, শিক্ষা বলুন, স্বাস্থ্য বলুন— যেদিকটাতেই তাকান, না রাজ্য, না কেন্দ্র, কেউই এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। কেবল 'ভারতরত্ন' আর 'নাগরিক সম্মান' দিয়েই কাজ ফুরল? লোকটার জ্ঞানটা দেশের কাজে লাগাবি না?" অত্যন্ত বিচলিত কণ্ঠস্বর। মোটা গলায় থমথমে উত্তর এল—

—এইটে যা বললেন। একেবারে খাঁটি কথা। অমর্ত্য সেনকে নিয়েই নাচানাচি, তাঁর কাজটাকে মূল্য দিচ্ছে না কেউ। জাতীয় জীবনে তার কোনও ইমপ্যাক্টই পড়ল না। শুধু হাঁকডাক, শুধু হাঁকডাক। কোনো পরিবর্তনই হল না রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে।

পাশের বৃদ্ধ ভদ্রমহিলা হঠাৎ আমাকে কনুইয়ের গোঁতা মেরে, উটের গ্রীবার মতো গলা লম্বা করে দিলেন আলোচকদের মধ্যে—

—কিন্তু জিনিসপত্তরের দাম যে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে বাবারা? আমি তো কোনো "উন্নয়ন" দেখছি না। কী লাভ হলো বাঙালির নোবেল পেয়ে? অমর্ত্য সেন কি বাজারের আগুনে জল ঢালতে পেরেছে?

—ঠিক কথা! কেউ সমর্থন করলেন বৃদ্ধাকে— যে লোক জিনিসের দর কমাতে জানে না, সে আবার কীরকম বড় ইকনমিস্ট?

অল্পবয়সী গলা ভেসে এলো—

—আরে মাসিমা, ওসব বাজারদর-টর অমর্ত্য সেনেদের দেখার কথা নয়।

BanglaBook.org

খাদ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, এঁদের বলুন। ওঁকে প্রাইজটা কেন দিয়েছে, তা কি আমরা জানি না?

—কেন? কেন? কেন দিয়েছে?

—গেল বছরে ইকনমিকসের প্রাইজটা ভুল করে দুটো মার্কিন জোচ্চোর ব্যাটাদের দিয়ে দেওয়া হয়ে গিয়েছিল তাইতে বিশাল নিন্দে হয়েছে নোবেল কমিটির। সেইটেই মেক-আপ করল, একজন সজ্জন, পণ্ডিত মানুষকে পুরস্কার দিয়ে সবাই যাঁকে একবাক্যে মেনে নেবে।

কামরাটা রীতিমতো অমর্ত্য সেন স্পেশাল সেমিনারে পরিণত হয়েছে। যাত্রীরা সবাই মহোৎসাহে অংশগ্রহণ করছেন। আবহাওয়া যত সরগরম হচ্ছে আমার বুক ততই ধুকপুক করছে। ভিড়ের মধ্যে এখনও অদৃশ্য রয়েছি বটে, কিন্তু হঠাৎ এর মধ্যে যদি কোনও বহুদর্শীর প্রাজ্ঞ চোখে পড়ে যায় অমর্ত্য সেনের ফার্স্ট ওয়াইফের মুখখানা? সহ্য হয় না, আর সহ্য হয় না।

ইতিমধ্যে সভয়ে নজর করলুম আমার বাঁদিকে চশমাপরা ভদ্রমহিলাটি ঘুরেঘুরে আমার দিকেই তাকাচ্ছেন। হ্যাঁ, সন্দেহ নেই। আমাকেই। রীতিমত ডেনজারাস দৃষ্টি। না, থাকা যাবে না। সামনের স্টেশনেই নেমে পড়ব। এই প্রবল অমর্ত্য-সেমিনারের মধ্যে যদি হঠাৎ আমি আবিষ্কৃত হয়ে পড়ি—

মার্ক্সিস্ট ইকনমিস্ট তো নামেই, আসলে তত্ত্বে, কাজকর্মে হাঁটা কতদূর বামপন্থী সেটা একটা জরুরি প্রশ্ন।

—নাঃ, বামপন্থী তো বটেই—

—কিন্তু কতটা?

—দেখিনি। আমার মনে হয় ওঁকে হয়তো সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট বলে ধরাই উচিত হবে—

—সরকার ওকে নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করছে কেন বলতে পারেন? স্টেট গেস্ট। সেলুন কার—

—করছে, কিছু নিশ্চয় তার পিছনে মোটিভ আছে? ওঁকে কাজে লাগাবে ঠিকই সরকার কোনও না কোনভাবে—

—না না। অসীমবাবুর শিক্ষক, তাই একটু গুরুদক্ষিণা,—আর কিছুই না।

সেই মহিলা এখন একদৃষ্টে আমার পানে মুগ্ধ নয়নে চেয়ে আছেন।—"কেন চেয়ে আছো গো মা?"

নাঃ, গিরিশ পার্ক অবধি যাওয়া হল না।

—যাই বলুন, লোকটা ভাল। গরিবের জন্যে ভাবে।

—নতুন গলা। নবদ্বীপটাইপের।

—বাজারে আগুন লেগেছে। গরিবের জন্যে ভাবে, তো দামটা কন্ট্রোল করুক আগে?

BanglaBook.org

বৃদ্ধার সেই একই সুর। আমারও সেই একই বুক ধুকপুক। নেমেই যাব। গাড়ি থামুক। এই উদ্বেগ ভাল লাগছে না।

এই সময়ে আমার বাঁ হাতে মৃদু চাপ পড়ল। তাকিয়ে দেখি সেই ভদ্রমহিলা। এক মুখ হাসি।

—আপনিই তো নবনীতা?

আজ্ঞে না।—আমি মরীয়া। আর পারছি না।

—না? খ্যি আশ্চর্য। ভদ্রমহিলার উজ্জ্বল হাসি দপ্ করে নিবে গেল। নিবিড় আঁধার ঘনিয়ে এল মুখে চোখে।

—অথচ আমি একদমই নিশ্চিত ছিলাম। অবিকল নবনীতা দেবসেনের মতোই দেখতে কিন্তু আপনাকে। ডাবল বলে চালানো যায়।

—জানি। অনেকেই আগে বলেছে। কথাটা প্রায়ই শুনতে হয়।

—ইশ্ কি ভীষণ মিল আপনাদের হাবভাবেও! আমি ওঁকে দেখেছি তো বইমেলায়। অবশ্য দূর থেকেই। কিছু মনে করবেন না ভাই। বিরক্ত করলাম।

—আরে না। তাতে কী হয়েছে? কতই তো শুনি। সাধ্যমতো মিষ্টি করে হাসি। এবং খুবই ভুল স্ট্র্যাটেজি হয়। মহিলা শিউরে ওঠেন।

—"আপনাদের হাসিতেও কি প্রচণ্ড মিল। কি অদ্ভুত। আমার গা সিরসির করছে।"

—"..."

—আসলে কি জানেন? আমি ওঁর লেখার পরম ভক্ত। পড়তে এত ভালো লাগে। ভদ্রমহিলা আপন মনেই বলতে থাকেন। "প্রত্যেকটা বই বেরুলেই কিনে ফেলি। আমার মা-ও খুব ভালোবাসেন নবনীতা দেবসেনের লেখা। প্রায়ই ভাবি একদিন গিয়ে আলাপ করে আসব, সাহস হয় না। আজ আপনাকে দেখে আমি তো হাতে চাঁদ পেয়ে গেলাম।" মহিলা একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

—ভাবলাম, হে ঈশ্বর। আজকে কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছিলাম যে আমার প্রিয় লেখক আমারই পাশে। এত কাছে!

—"..."

—এতক্ষণ ধরে মনের জোর সংগ্রহ করলাম। তারপরে দেখুন তো কী বিশ্রী রকম ভুল করে ফেলেছি?

—ভুল আমাদের সকলেরই হয়ে যায়— আমার গলাও বুজে এসেছে।

—সত্যি বলছি, আপনি নবনীতা নন জেনে খুবই মনটা খারাপ হয়ে গেল। এর চেয়ে মনে ভাবতাম দেখা হয়েছিল।

—সেটাই ভেবে নিন না কেন?

—সে আর হয় না। আমার সঙ্গে ওঁর নতুন বইটা ছিল, ভাবলাম সই করিয়ে নেব,—সত্যি এমন আশ্চর্য মিলও হয় মানুষে মানুষে?

BanglaBook.org

—একদিন চলেই যান না ওঁর বাড়িতে, বইটা নিয়ে? গলা ঝেড়ে নিয়ে বলে ফেলি।

—"এতদিন হয়নি, সে কি আর হবে?" ভদ্রমহিলা বিধুর হাসি হাসেন—আমার যেমন কপাল।

গিরিশ পার্ক অবধি থাকতে পারিনি। পরের স্টেশনেই পালিয়ে গেলুম।

আমারও কপাল বটে একখানা।

শারদীয় দেশ, ১৯৯৯

খুদা-ঈ-খিদমতগার

"কমিউনিজম কেন ফেইল করল বল তো? সোবিয়েত ইউনিয়নটা গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে গেল কেন?"

অপু মাথা নাড়ল। জানে না।

"বিকজ ইট ডিড নট হ্যাভ আ প্রপার মার্কেটিং সিস্টেম। আরে বাবা একটা জিনিস তুমি বাজারে ছাড়বে, তার প্রপার মার্কেটিং চাই তো! কমিউনিজমের একটা ঠিকমতো U.S.P-ই ঠিক করতে পারল না সোবিয়েত ইউনিয়ন। ওয়ার্লড মার্কেট ধরতে হলে একটা ইউনিক সেলিং পয়েন্ট দেখাতে হবে তো? একটা U.S.P? যে কোনও একটা কনসেপ্ট বাজারে সেল করতে হলে মার্কেটিং ম্যানেজমেন্টটা এফিশিয়েন্ট হওয়া দরকার। অমনি অমনি শুধু বিপ্লব বাধিয়েই ওসব কম্মো হয় না। বুঝলি? পৃথিবীটা খুব কঠিন জায়গা। এভরিওয়ান নিডস আ গুড মার্কেটিং ম্যানেজার। কমিউনিজম ডিড নট হ্যাভ ওয়ান।"

অপুটা হাঁ করে তাকিয়ে আছে শ্যামলদার মুখের দিকে।

এমন আশ্চর্য সব কথা বলে শ্যামলদা। আর কথাগুলো যখন বলে, তখন ওর সমস্ত চেহারাটা যেন বদলে যায়। এমনিতেই সুন্দর। আরও সুন্দর দেখায় ওকে তখন, চোখমুখ থেকে একটা জ্যোতি ঠিকরে বেরোয়। লম্বা বাদামি চুল টেনে পিছনে একটা ঝুঁটি বাঁধা রবারব্যাণ্ড দিয়ে। হাল্কা দাড়ি গোঁফে যিশু যিশু ভাব। জিনসের ওপরে রঙিন কুর্তা চড়িয়ে চকচকে একটা বেগুনিরঙের সাইকেলে চড়ে আসে —অপু মুগ্ধ হয়ে যায়। দীপু বলছিল—"শ্যামলদা ওয়াল স্ট্রীটে দালালি করে কেমন করে রে? ওইরকম লম্বা চুল দাড়ি গোঁফ নিয়ে? শুনেছি ওয়াল স্ট্রিট খুব কনজারভেটিভ জায়গা, বিজনেস স্যুট পরে টিপটপ হয়ে থাকতে হয়, জুতোয় পালিশ,

BanglaBook.org

চুলে তেল, হাতে দামি ব্রিফকেস—শ্যামলদা তো একদম সেরকম না? কবি-কবি, প্রফেসর-প্রফেসর দেখতে।" অপুর মনে ধরল কথাটা। জিজ্ঞেস করতে হবে শ্যামলদাকে। সত্যিই তো শ্যামলদা আমেরিকা থেকে এসে অবধি পাড়াটায় নতুন প্রাণ এসেছে। সারাক্ষণ হইহই। গলা খুলে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে গাইতে গলি দিয়ে যায়। সকলকে ডেকে কথা বলে। অপু দীপুরা শ্যামলদাকে দেখেছে খুব ছোটবেলাতে। দিদিদের হিরো ছিল শ্যামলদা। দিদি তো এখন শ্বশুরবাড়িতে। শ্যামলদা খোঁজ নিয়েছিল।

"রুপুর কী খবর? কাজকর্ম কিছু করে, না রান্নবান্না বাচ্চাকাচ্চা নিয়েই কাটিয়ে দিচ্ছে?"

দিদি কলেজে পড়ায় শুনে খুশি হয়েছিল। শ্যামলদার নিজের কলেজের পড়াশুনো শেষ হয়নি। সে নিয়ে তার কোনও দুঃখ আছে বলে মনে হয় না। যা অসীম পড়াশুনো শ্যামলদার! চিরদিনের বইপাগলা ছেলে।

"ওয়াল স্ট্রিট তো খুব ফর্ম্যাল জায়গা বলে শুনেছি, তোমার লম্বা চুল নিয়ে অসুবিধে হয় না শ্যামলদা?"

"কথাটা খুব ভুল বলিসনি, আগে ওইরকমই ছিল। এখনও আছে। কনজারভেটিভ জায়গা তো বটেই। এখনও স্যুট পরে অফিসে বসতে হয়। কিন্তু লম্বা চুল এখন চালু হয়ে গেছে, এলোমেলো না হলেই হল। বড় বড় বিজনেসম্যানদের ছবি দেখিস না? দাড়িগোঁফ লম্বা চুল এখন ফ্যাশন। ভার্জিন এয়ারলাইনসের কর্তা ব্র্যানসনের ছবি দেখিসনি কাগজে? আমেরিকা বদলাচ্ছে। ইয়ং এক্সিকিউটিভরাও তো অনেকেই এরকম ঝুঁটি বাঁধে। আর শেয়ার মার্কেটে এখন অনেক অ্যাকাডেমিক্‌সও আসছে, অ্যাণ্ড ইউ নো, হাউ দে ড্রেস!"

"শেয়ার মার্কেটে তুমি গেলে কেমন করে শ্যামলদা?"

"খেলাধুলোয়। খেলাধুলোয়। কাজ করতাম একটা গারমেন্টস্ ফ্যাক্টরিতে, ডেলি ওয়েজের কুলি। ফ্যাক্টরির বন্ধুদের সঙ্গে খেলায় খেলায় অঙ্ক কষে শেয়ারের হালচাল বলে দিতাম। সেই ছেলেগুলো এমনই জিততে লাগল শেয়ার মার্কেটে, যে বস্-এর কানে আমার সুনাম পৌঁছে গেল। বস্-এর যাতায়াত ছিল শেয়ার মার্কেটে। হতে হতে একদিন দেখলাম ওয়াল স্ট্রিটে আমারও একটা অফিস হয়ে গেছে। একেবারে র‍্যাগ্‌স-টু-রিচেস স্টোরি।"

শ্যামলদা কখনও ওয়াল স্ট্রিটের দালাল হয়ে যাবে এটা বাড়ির কেউ ভাবতে পারেনি। বইমুখো খ্যাপাটে গানপাগল ছেলেটা যে হঠাৎ বিপ্লবী হয়ে যাবে, সশস্ত্র রাজনীতি করে জেলে যাবে, তাতে বাড়ির লোক তত অবাক হয়নি। অবাক হল যখন শুনল প্রেসিডেন্সি জেল ভেঙে যে বারোটা ছেলে পালিয়েছে তাদের মধ্যে শ্যামলদাও ছিল। পালাল এবং ধরাও পড়ল না কোনওদিন। বাড়ির লোকে ধরে নিয়েছিল গুমখুন হয়ে গিয়েছে। মাসিমা শয্যা নিয়েছিলেন, মেসোমশাইয়ের একটা স্ট্রোক হয়ে গেল। শোভনদা রাজনীতি করত না। সে আই আই টিতে মন দিয়ে

পড়াশুনো করত। শোভনদা দারুণ রেজাল্ট করে অভাবনীয় চাকরি জোগাড় করে ফেলল। কিন্তু হিরো হয়ে রইল উধাও হয়ে যাওয়া শ্যামলদাই। চার বছর বাদে নিউইয়র্ক থেকে চিঠি এল।

"মাগো, ভাল আছি, ভাবনা কোরো না, দেশের অবস্থা আর-একটু ভাল হলেই ফিরব।"

জেল ভেঙে পালানো দুর্দান্ত বিপ্লবী শ্যামলদা আমাদের কল্পনার হিরো হয়ে উঠেছিল, আমেরিকা অভিবাসী শ্যামলদা হচ্ছেন বাস্তবের হিরো। কিন্তু শ্যামলদা ফেরেনি। চিঠি লিখত। টাকা পাঠাত। শ্যামলদার টাকাতে একতলা ভাঙাচোরা বাড়িটা আস্তে আস্তে তেতলা হল। ক্রমশ মাসিমা মেসোমশাই বুড়ো হয়ে গেছেন, শোভনদা আরও ভাল কাজ করছে, বিয়ে করেছে, টুকুবৌদি ইস্কুলে পড়ায়, শ্বশুরশাশুড়ির যত্ন করে, দুটো বাচ্চাকে মানুষ করে।

এত বছর বাদে হঠাৎ পাড়াসুদ্ধ চমকে দিয়ে শ্যামলদার পুনরাবির্ভাব কোনও খবর না দিয়ে—মেসোমশাইয়ের আশি বছরের জন্মদিনটি মনে করে জ্যেষ্ঠপুত্র এসে উপস্থিত। রোগা কিন্তু সুপুরুষ শ্যামলদাকে যেন শোভনদার চেয়েও ছোট দেখাচ্ছে, হাঁটাচলা, নড়াচড়া, হাবভাব। এমনকী চেহারাও অনেকটা আগের মতনই রয়ে গেছে। রোগা পাতলা, ছটফটে, অন্যমনস্ক, স্বপ্নচারী শ্যামলদা।

মাসিমার মুখে পরিতৃপ্তি, আর শান্তি যেন চাঁদের আলোর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। হাতে মুখে খরচও করছে শ্যামলদা। আপন-পর ভেদ নেই। পাড়াপড়শির জন্যেও তার ওয়ালেটে প্রচুর মমতা উপচে পড়ছে। মেসোমশাইয়ের মনে কিন্তু সুখ নেই। হায়ার সেকেন্ডারিতে ফার্স্ট হওয়া ছেলে গ্রাজুয়েশন পর্যন্ত করল না, এ দুঃখু তাঁর যাবার নয়। শোভনদা যে এত ভাল রেজাল্ট করে এমন দারুণ চাকরি করছে, তাতেও তাঁর হতাশা ঘোচেনি। কিন্তু শ্যামলদার বর্তমান কেরিয়ার মেসোমশাইকে মর্মাহত করেছে। যে-ছেলের অঙ্কে মাথা ছিল দৈবশক্তির মতন, যার দ্বিতীয় আইনস্টাইন হবার কথা, সে কিনা হয়েছে নিউইয়র্কের শেয়ারবাজারের দালাল! মেসোমশাইয়ের মুখে হাসি নেই।

শোভনদা বোঝায়, "শেয়ার মার্কেটের দালালি বলতে তোমরা যেটা বুঝতে, 'ফিনান্‌শিয়াল অ্যানালিস্ট'রা কিন্তু তা নয়। এটা অনেক বেশি সায়েন্টিফিক কাজ বাবা, খুব ডিগনিফায়েড প্রফেশন, এখন—প্রচুর রোজগার এতে"—মেসোমশাই চুপ করে থাকেন।

শ্যামলদাকে দেখেশুনে "শেয়ার মার্কেটের দালাল" মনে করা শক্ত। ব্লু জিন্‌স, কারুকাজ করা পাঞ্জাবি, পিছনে ঝুঁটি, কচিবেলার রবিঠাকুরের মতন গোঁফদাড়ি, আর স্বপ্ন স্বপ্ন চোখ করে ঘুরে বেড়ায়, গা থেকে দামি সুগন্ধ বেরোয়, পেটমোটা ওয়ালেট থেকে যখন তখন পাড়াসুদ্ধ সকলের জন্যে কোকাকোলা, চা, চিকলেট, সিগারেট, চলে আসে। বিশেষত অপুর জন্যে। অপু শ্যামলদার সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে পড়েছে। যেটুকু সময় কলেজে না গেলেই নয়, সেটুকু বাদে। দীপু একদিন "রামভক্ত হনুমান"

BanglaBook.org

বলে খ্যাপাতে গিয়ে বিনুনিতে হ্যাঁচকা টান খেয়ে চুপ করে গেছে।

শ্যামলদার প্রতি অপুর ভক্তি খুব সিরিয়াস ব্যাপার। যে-লোকটা হায়ার সেকেন্ডারিতে ফার্স্ট হয়েও লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে জেলে যেতে পারে, জেল ভেঙে শূন্যহাতে পালাতে পারে একেবারে সাতসাগরের ওপারে আমেরিকায় এবং ফিনান্‌শিয়াল অ্যানালিস্ট হয়ে নিউইয়র্কে বাড়ি গাড়ি করতে পারে—যার প্রত্যেকটা রবীন্দ্রসঙ্গীত মুখস্থ, এবং সেই সঙ্গে বিট্‌লদের গান, সাইমন গারফুংকেলের গানও, যে এমন আশ্চর্য সব ভাবনা ভাবতে পারে এবং বুঝিয়ে বলতে পারে, তাকে ভক্তি না করলে কাকে করবে অপু?

"কমিউনিজম ফেইল করবার আর একটা কারণ, সেকেন্ড পয়েন্টটা কি বলত অপু?"

"কী কারণ? তুমিই বলো।"

"এই জায়গাটাতে স্ট্যালিনের সঙ্গে গাঁধীজির কোনও তফাত নেই। কী? পারবি বলতে?"

"দরিদ্রনারায়ণ?"

"দূর দূর! স্ট্যালিনের আবার 'নারায়ণ' কী? আবার ভাব। কোনখানে মিল দুজনের?" অপু মাথা নাড়ে। অপু জানে না কোনখানে মিল স্ট্যালিনের সঙ্গে গাঁধীর।

"তবে শোন্। সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বুঝতে পারলি তো? দু'জনেরই উদ্দেশ্য ছিল সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং করবার। নতুন সমাজব্যবস্থার প্রবর্তনের পরিকল্পনা এবং প্রযুক্তি। স্ট্যালিন করছিলেন স্ট্যালিনের স্টাইলে, গাঁধী করছিলেন গাঁধী স্টাইলে। কিন্তু কাজটা একই, সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। পরিকল্পনা দুটো আলাদা। প্রযুক্তিও আলাদা। দুজনেই নতুন পরিকাঠামো গড়তে চেয়েছিলেন। বুঝলি তো, তাকেই বলে সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং।"

অপু মুগ্ধ।

শ্যামলদা মিটিমিটি হাসতে হাসতে বলে—"জগতের গ্রেটেস্ট সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারের নাম কী? বল? বলতে পারবি তুই। জানিস নামটা। তোর চেনা লোক।" কোকে চুমুক দিয়ে সিগারেটে টান মেরে, ভুরু কুঁচকে, চুলে হাত বুলিয়ে, শেষে বোকা হেসে অপু বলল—"মাও সে তুং?"

"হল না, হল না!" শ্যামলদা মাথা নাড়ে।

"রং অ্যানসার। ইতিহাসে মাও আর ক'দিন। ওর ওই লালবই এবার সাদাবই হল বলে। ওদেরও তো কোনও মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট বলে পদার্থ ছিল না। প্লেটো, মার্ক্স, কাগজকলমে চেষ্টা করেছিল। হিটলার হাতেকলমে। কোনও না কোনও উপায়ে ইতিহাসে দেখবি মানুষ কিন্তু চিরটা কালই সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রচেষ্টা করে আসছে। ভুল পথে, ঠিক পথে, ভালোয় মন্দয়। অতি বিচিত্র মানুষের ইম্যাজিনেশন। কিন্তু সাকসেসফুল হয়েছে কেবল একজন, তার কথাই বলছি। সে আমাদেরই স্বদেশবাসী—রামমোহন তাকে একটু হটাতে চেষ্টা করেছিলেন, বিদ্যাসাগর আর-একটু।

কেউই ঠিক পেরে ওঠেননি। ড্যাংডেঙিয়ে রাজত্ব করে চলেছে সে এখনও। এবার বল? কে? আরে আমরা সকলে তো তারই ইঞ্জিনিয়ার্ড সোশ্যাল স্ট্রাকচারের মধ্যে আজও বসবাস করছি! এখনও ধরতে পারলি না? মনু রে, মনু! একমেবাদ্বিতীয়ম্ মনু!"

"তুমি, তুমি মনুকে শ্রদ্ধা করো!" হঠাৎ অপুর গলা চিরে আর্তনাদ বেরুল।

"শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধার কথা হচ্ছে না। প্র্যাকটিসের কথা, এফেকটিভনেসের কথা হচ্ছে। টিঁকে তো আছে! একমেবাদ্বিতীয়ম্। ওর মতোই অ্যাগ্রেসিভ একটা অলটারনেটিভ যদ্দিন না কেউ দিচ্ছে, তদ্দিন ওরই রাজত্ব চলবে। মনু অবশ্য জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়েও বিশ্বাস করত। ওইসব জাতিভেদ বর্ণভেদ ওই কারণেই। এসব ব্যবস্থা গুড় না ব্যাড়, পরের কথা। দি গ্রেটেস্ট সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ার অফ দি ওয়ার্লড, তাতে তো সংশয় নেই!"

দীপু শুনে শিউরে উঠল—"এ কথা শুনলে ভাজপা তো হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে বিলি করবে রে। শিগগির বারণ কর তোর শ্যামলদাকে পাবলিককে এসব কথা বলতে। ওর তো কোনওই প্র্যাকটিক্যাল সেন্স নেই দেখছি। রাজনীতি ফাজনীতি করত কেমন করে?"

—"নেইই তো প্র্যাকটিক্যাল সেন্স"—অপু বলল মাথা ঝাঁকিয়ে। "থাকবার দরকারই বা কী? হি ইজ আ ড্রিমার। স্বপ্ন নিয়েই আছে— আর দেখছিসই তো কেমন সন্ন্যাসীর মতন স্বভাব। প্র্যাকটিক্যাল হলে কি হরিকে নতুন রিকশা কিনে দিত? না কৌশল্যার মেয়ের বিয়ের জন্যে পাঁচ হাজার টাকা দিত? না বটতলার নাপিত মনসুরের ছেলের টিউমার অপারেশনের পুরো খরচটা দিয়ে দিত? শ্যামলদা এই পৃথিবীর মানুষ না রে দীপু—এই পৃথিবীতে ওর মতো কাউকে আমি দেখিনি।"

দীপু মুখ বেঁকিয়ে বলল—"আমিও না।"

"অপু। দেবতারা সর্বশক্তিমান, তবু তারা মহাকাব্যের হিরো হয় না কেন বলতে পারিস? কেননা তাদের মৃত্যু নেই। মৃত্যুর মূল্যেই মানুষ হিরো হয়। জীবনের কাছে দাম পায়। বুঝলি? যে মরে না, মরবে না, তার তো শোক যন্ত্রণা বিরহ বেদনা কিছুই নেই। সে ইন্টারেস্টিং পার্সনালিটি হবে কেন? ঋষিরা কেন যে অমরত্বের বর চাইত, তপস্যা করে অমর হতে চাইত, আমি বুঝতে পারি না। মৃত্যুই মানুষকে মহত্ত্ব দেয়। অমরত্ব জীবনকে বড় খেলো করে দেয়। তাই না? চিরজীবী হওয়াটা কোনও কাজের নয়!" অপু শ্যামলদার কথাগুলো রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে ভাবে। কি অদ্ভুত ভাবনাগুলো শ্যামলদার।

"আমি অমরত্ব চাই না, আমি জীবন চাই, বাঁচতে চাই। আমি কী চাই জানিস অপু? যতদিন তার আয়ু আছে প্রতিটি মানুষ স্বাস্থ্যে, আনন্দে, কর্মে পরিপূর্ণ হয়ে বাঁচুক। ঈশ্বরের তাই ইচ্ছে। আমি তো ঈশ্বরের ইচ্ছের বাহন মাত্র। খোদা ঈ-

BanglaBook.org

খিদ্‌মতগার। আমি খোদার খিদ্‌মত খাটি। আমার নিজের কোনও ইচ্ছে নেই।" শ্যামলদার সব কথা অপু ঠিক বুঝতে পারে না তবু শুনতে ভাল লাগে।

"অপু আমি হাজারিবাগে পঞ্চাশ একর জমি কিনেছি। কমলই সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে। আশ্রম করব। ছোট ছোট থ্যাচ্‌ড কটেজ। কুটির আর কী, বারান্দা, কিচেনেট, টয়লেট। যে কেউ চাইবে ওখানে গিয়ে থাকত পারবে আপটু তিন মাস। ধ্যানকেন্দ্র, মেডিটেশনের সেন্টার। ফ্রি। তুইও যেতে পারিস। কিন্তু বউবাচ্চা নিয়ে সপরিবারে হল্লা করতে যেতে পারবে না কেউ। এটা আশ্রম। সাধনার স্থান। হলিডে রিসর্ট নয়। সংসারী মানুষের যখন দুদণ্ড সংসার থেকে ছুটি নিতে ইচ্ছে করবে, ঈশ্বরের কথা ভাবতে ইচ্ছে করবে—সে তখন ওই আশ্রমে চলে আসবে। ধ্যান করবে। নির্জনে বিজনে অরণ্যে নদীকূলে নিজের সাহচর্যে একা কিছুটা সময় কাটাতে পারবে। নিজের সঙ্গে নিজের আত্মিক সংযোগ পুনঃস্থাপন করবে। সুন্দর এই পৃথিবীর সঙ্গে নিজের সম্পর্ক পুনরাবিষ্কার করবে। টু গেট ইন টাচ উইথ ইওর সেলফ অ্যাণ্ড উইথ দ্য ওয়ার্লড আগেইন। আমি আর নিউইয়র্কে ফিরব না ভাবছি। আমার আর টাকার দরকার নেই। আমি এবার হাজারিবাগে গিয়ে ওদের সঙ্গে মাদল বাজাব, বাঁশি বাজাব। বনেই বাস করব। বাণপ্রস্থ নেব ঠিক করেছি।"

"কেন শ্যামলদা? তুমি বনে বাস করবে কোন্ দুঃখে? তোমার তো স্ত্রীপুত্র রয়েছে, ঘরসংসার সবই রয়েছে।"

"দুঃখেই কি লোকে বনে যায়? সুখেও তো যায়। আমি মনের সুখে বনে যাব। মানুষের 'ঘর' এক জিনিস, আর 'সংসার' আর একটা। নিউইয়র্কে আমার 'ঘর' আছে যেমন এই এখানেও। এ-'ঘরে' থাকব, ও-ঘর' স্ত্রীপুত্র। কিন্তু সংসারটা আরও বড়। তার ভেতরে অনেক মানুষ। অনেক প্রাণী। তাদের প্রবল স্থানাভাব। তাদের আশ্রয় চাই। আমার আশ্রমে তারা সবাই গিয়ে থাকবে। তাদের সকলকে আমি রাখব। তোকেও রাখব।

"প্ল্যান তো এইটে। কিন্তু করতে দিলে তো। যারা বাধা দেবার তারা ঠিকই বিঘ্ন ঘটাবে। তারা ঠিকই নজর রেখেছে। আমি খুদা-ঈ-খিদ্‌মতগার। ওরা যে যাই বলুক যে যতই বাধা দিক, আমি ওদের বাধা মানব না। আমি যে খোদার খিদ্‌মত খাটি, সেটা ওদের মনে নেই।"

অপু দ্যাখে শ্যামলদার চোখ চকচক করছে।

—"ওরা কারা? কারা? শ্যামলদা।"

—"ওরা ? ওরা হচ্ছে ডবলু ডবলু আই বি, ওদের নেটওয়ার্ক প্রচণ্ড। সি বি আই, এফ বি আই, কে জি বি, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড, সব্বাই আছে ওদের মধ্যে। ওরা হল মাদার বডি। *বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ কেমনে দিই ফাঁকি?* যাতেই পৃথিবীর উপকার হয়, তাকেই ওরা ক্রাইম বলে। আমার পিছনে কি আজ লেগেছে? নাঃ, এবার ইউ এন হিউম্যান রাইটস কমিশনকে ইনফর্ম না করলেই নয়—এবার অবস্থা

BanglaBook.org

বিপজ্জনক হয়ে উঠছে।"

অপু অবাক চোখে চেয়ে চেয়ে শোনে। শ্যামলদার সব কথা অপু সব সময়ে ঠিকমতন বুঝে উঠতে পারে না। এরপরেই শ্যামলদা অন্যরকম চোখে তাকাল, অন্যরকম গলায় বলল—

"জানিস অপু, ঘুম ভেঙে উঠে আমি রোজ কী করি? রোজ মনে করি আঃ। আরও একটি সূর্যোদয়; আহা, আরও একটা দিন। মনে করি কত ভাল ভাগ্য আমার, এত সুন্দর পৃথিবীতে আরও একদিন রয়েছি। ইউ মাস্ট কাউন্ট ইয়োর ব্লেসিংস, অপু। নেভার টেক লাইফ ফর গ্রান্টেড।

"এমন তো হতেই পারে একদিন সকালবেলা আর ঘুম ভাঙল না। নিদ্রা তো একরকমের সাময়িক মৃত্যুই। জীবন যদি মায়াই হয় তবে—আমাদের ঠিক ঠিক বিশ্বাসের সূতোটা ধরে রাখতে হবে, যাতে এই বিপুল ল্যাবিরিন্থে হারিয়ে না যাই। মৃত্যু সীমাহীন। শূন্যতার একটা বিষম ভীতি আছে—সীমাহীনতার প্রতি ভয় আছে আমাদের, তাই মৃত্যুকে ভয় করি। জীবনই নিরাপদ, জীবনে পূর্ণতা। কেননা জীবন সীমিত।" শ্যামলদা বলে,—"রবীন্দ্রনাথের কথা ভাববি। প্রতিদিন সকালে উঠে উনি জীবনকে সেলিব্রেট করতেন। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত, সব সময়ে। এভরি ডে। এভরি আওয়ার অফ দ্য ডে। এভরি মোমেন্ট। আমিও করি। রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে আই সেলিব্রেট লাইফ। বিকজ আই অ্যাম অ্যালাইভ। বিজক দ্য ওয়ার্লড ইজ স্টিল হিয়ার। মা যেটা করেন ঠাকুরঘরে গিয়ে ফুলচন্দন দিয়ে। সেই একই ব্যাপার। এক কাজ, সেলিব্রেটিং লাইফ।

"ভক্তিতে আর যুক্তিতে কতটুকু তফাত? এই যুক্তি ব্যাপারটা নিজে কতদূর যুক্তিযুক্ত? আমি প্রায়ই ভাবি। হাউ র‍্যাশনাল ইজ র‍্যাশনালিটি?

"আফটার অল মৃত্যুই বেঁচে থাকার শেষ যুক্তি। একমাত্র যুক্তি। তাই উপনিষদ বলে আনন্দেই জীবের জন্ম, জীবের প্রাণধারণ, এবং জীবের বিনাশ। বেঁচে যে আছি, এটাই মহা আনন্দের কারণ। অন্য কোনও কারণের প্রয়োজন নেই। সুফী কবিদের কিছু পড়েছিস? মিস্টিক সেইন্টরা এসব তত্ত্ব বুঝতেন। পড়েছিস?" অপু পড়েনি।

"কী। বইটই কিছু পড়িস তোরা আজকাল?"

"পড়ি তো। এই তো এই বইটা কাল শেষ করেছি।" ব্যাগ থেকে অপু বইটা বের করে ফ্যালে। মারিও ভার্গাস লোসা-এর "আন্ট হুলিয়া অ্যান্ড দি স্ক্রিপট-রাইটার।" উল্টেপাল্টে দেখে শ্যামলদা বলল, "তোর পড়া হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ, অভীককে ফেরত দিতে যাচ্ছি।"

"আজকের দিনটা আমাকে ধার দিবি?"

অপু তো সানন্দে রাজী। তার কাছে বই ধার নিচ্ছে শ্যামলদা।

"অপু, র‍্যাশনালিটিটাকেই শেষ কথা জেনে আমরা ভীষণ ভুল করে ফেলেছি। সায়েন্সের ছাত্রদের ওটাই প্রথম ফলস স্টেপ। তোরাও এই একই ফাঁদে পা দিবি

—ইকনমিকস পড়ছিস তো? ভয়ংকর সত্য দর্শন ঘটবে একদিন।"

"তার মানে।"

"মানে একদিন জানতে পারবি র‍্যাশনালিটির দৌড় কতদূর। একদিন দেখবি সব দেওয়ালগুলো ভেঙে পড়ছে, ঘুম ভেঙে চোখ মেলে দেখবি খাঁ খাঁ ফাঁকা মাঠের মধ্যে তুই একা দাঁড়িয়ে আছিস, তোর পাশে কেউ নেই।—মা নেই বাবা নেই ভাই নেই বোন নেই বন্ধু নেই প্রেমিকা নেই—"

"শ্যামলদা!"

"স্ত্রী নেই, সন্তান নেই, দেখবি তোর মাথার ওপরে ছাদ নেই, ভীষণ উঁচু আকাশ —চারিপাশে দেয়াল নেই, শন্‌শন্‌ করে ঝোড়ো বাতাস বইছে, এই হচ্ছে তোর র‍্যাশনালিটির আসল চেহারা। সকলের জীবনেই এমন মুহূর্ত একদিন না একদিন আসে। আসতে বাধ্য। তখন কী করবি?"

"শ্যামলদা তুমি এসব কথা ভেবো না তো।"

"ভাববো না কি রে। এই কথাই তো ভাবব। সকলেরই শান্ত মাথায় ভাবা উচিত হাউ র‍্যাশনাল ইজ র‍্যাশনালিটি? ইট ইজ ইমপর্ট্যান্ট ফর আওয়ার সারভাইভ্যাল।"

"তুমি তাহলে এসব ভাবনাগুলো লেখ না কেন? যদি ইকনমিক্স ভাবনা হয় তবে তো লিখে ফেলা উচিত।"

"উচিত তো। কিন্তু কেউ ছাপাবে না। ওরা আটকে দেবে। তোকে একটা কথা বলছি শোন, তোরা তো ইকনমিক্সে ম্যাক্রো-মাইক্রো করিস। মনুষ্যসমাজেরও মাইক্রো-ম্যাক্রো আছে। একটা মাইক্রো সোসাইটি রয়েছে তাতে যত সেনসিটিভ সোলগুলো বিলং করে— যাদের চিত্তে গভীরতা আছে, অন্তরে স্পর্শকাতরতা আছে, ভাবনায় সূক্ষ্মতা আছে, যারা অন্যের কথা ভাবে। এদের মধ্যে অন্তরের কথার আদান-প্রদান হয়, ইনার থটস্‌, ফিলিংস সব কিছুর প্রপার কমিউনিকেশন হয় এদের নিজেদের মধ্যে। সেই ডেলিকেট, ক্ষুদ্র মাইক্রো সমাজে হিংসা নেই, ঘৃণা নেই, শ্রদ্ধা আছে, প্রেম আছে। মানুষের পাশে এসে দাঁড়ানো আছে, হাতে হাত ধরা আছে। একটা ইনার মিউজিক বাজতে থাকে তাদের মধ্যে, তাল কাটে না— সুন্দর হয়ে বিকশিত হতে থাকে সব কিছু—তারা ডেলিকেট, কোমলপ্রাণ। দে বিলীভ ইন হিউম্যানিটি। কিন্তু বাইরের ম্যাক্রো সমাজটা আছে না। যারা স্থূল, হিংস্র, ভায়োলেন্ট, ক্রুড, হার্টলেস, সোললেশ, ভীষণ নৃশংস। তাদের চেষ্টা কেবল এই মাইক্রো সমাজটাকে গিলে খাবার, তার তাল কেটে দেবার, যাতে তাদের স্পেশিও-টেম্পোরাল সূক্ষ্ম ব্যালান্সটা ভেঙে চুরে যায়, তাতে ওদের ইনার মিউজিকটা স্তব্ধ হয়ে যায়। কেউ যাতে কারও পাশে দাঁড়াতে না পারে, সব যোগসূত্র যাতে ছিন্ন হয়ে যায়—ওই প্রচণ্ড প্রতাপশালী হিংস্র হিংসুক ম্যানলেস-মুনলেস-উওম্যানলেস ম্যাক্রো ওয়ার্লড চায় আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে ওদের বেঁধে দেওয়া হিংসা আর লোভের উন্মাদ ইগো-ফিউডাল অরবিটে ওদেরই মতন চির একাকী হয়ে চির-দুঃখী হয়ে চিরকাল ঘুরে ঘুরে মরি। ওরা জানে আমরা

আনন্দের খোঁজ পেয়েছি। ওরা পায়নি, তাই ওরা আমাদের কাছ থেকে আনন্দ কেড়ে নিতে চায়। ওরা তাই তো চতুর্দিকে স্পাই লাগিয়ে রেখেছে"—হঠাৎ গলা নামিয়ে শ্যামলদা ফিসফিস করেন, "দেয়ার আইজ আর এভরিহোয়্যার। অ্যান্ড দোজ আর কিলার আইজ।"

অপুর কেমন গা শিরশির করতে থাকে। ভাল করে শ্যামলদার দিকে তাকায়, স্বপ্নে ভেসে থাকা চোখগুলো এখন কেমন কুঁচকে আছে।

"এসব কথা তুমি লেখ না কেন শ্যামলদা?"

"বললাম তো কেউ ছাপবে না। আমি খোদার খিদমত খাটছি, আমি তো ছাপতেই চাইব। কিন্তু চাদ্দিকে যে চারশো চোখ! লিখতে কি আমাকে দেবে কেউ। এই ধর না, হাজারিবাগের আশ্রমটা। যেদিন থেকে ঠিক করলুম জমিটা কিনব, সেইদিন থেকেই পিছনে লেগে গেছে স্পাই। কমলকে যে চিঠিটা লিখলাম, সেটা ডাকঘর থেকেই চুরি করে নিল, যাতে আশ্রমটা বানাতে না পারি। যাতে নিরাশ্রয় মানুষগুলোর আশ্রয় না জোটে।" শ্যামলদা ফিসফিস করে বলতে লাগল—"যেদিন থেকে আমি লিখতে শুরু করব সেদিন থেকেই ওদেরও অপারেশন আরম্ভ হয়ে যাবে। একটার পর একটা বাধা সৃষ্টি করবে ওরা—হাতের কাজের কাগজটা কেউ উড়িয়ে নেবে—কলমের কালিটা কেউ শুকিয়ে দেবে—টেবিলে বসতে যাচ্ছি, টেবিলের ওপরে কেউ একগাদা খাবার-দাবার রেখে যাবে—এই ধর তোর কাছে আসব বলে বেরুচ্ছি —কেউ এসে বেল বাজাবে। যদি তা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত লেখাটা হয়ে যায়, এডিটরের কাছে মেসেজ পৌঁছে যাবে আমি একজন একটা লেখা লিখছি। ব্যস আগে থেকেই এডিটর 'না' করে দেবে। আমার লেখা ছাপতে দেবে না ওরা।" শ্যামলদার চোখের ওপর চুল এসে পড়েছে—চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। শ্যামলদার দাড়ি, গোঁফগুলো ছাঁটা হয়নি অনেকদিন।

দীপু শুনে বলল "খুব খারাপ লক্ষণ। এটা শুনে ভাল লাগছে না রে দাদা। একেই বোধ হয় বলে প্যারানইয়া।"

অপু বলল "তোমার মাথা।" বলল বটে, কিন্তু মনে মনে উদ্বিগ্ন হল। সত্যি শ্যামলদার কথাবার্তা ইদানীং কেমন যেন অন্যরকম শোনাচ্ছে। কেবলই বলছে ইউনাইটেড নেশান্সে হিউম্যান রাইটস্ কমিশনের কাছে চিঠি লিখবে।

'আন্ট হুলিয়া' বইটা পড়ে ফেরত দিয়েছে বটে, কিন্তু— দীপুকে বলেই ফেলল কথাটা—"শ্যামলদা একটা নভেল লিখছে। মহা মুশকিলের ব্যাপার হয়েছে।"

"নভেল লেখা তো ভাল কথা। মুশকিলের আবার কী হয়েছে?"

"লিখছে, কিন্তু পড়ছে না তো।"

"মানে।"

"মানে শ্যামলদা ওই বইটার চরিত্র, ওই স্ক্রিপ্ট রাইটার হয়ে গেছে। যে শুধুই লেখে। পড়ে না কিছু। শ্যামলদা এমনকি নিজের লেখাটাও পড়ছে না।"

"কী হয়েছে তাতে?"

"ভীষণ কেলেংকারি কাণ্ড হচ্ছে তো, উপন্যাসে যা তা ঘটছে। যে ছিল খলনায়িকা সে হঠাৎ বাচ্চা মেয়ে হয়ে যাচ্ছে, মরা লোক বেঁচে উঠছে, হিরোইনের নামেই চার-পাঁচটা বিভিন্ন ক্যারেক্টার চলে আসছে—হিরো নিজেই হিরোর বাবা হয়ে যাচ্ছে।"

দীপু খিলখিলিয়ে হেসে ফ্যালে।

"চুপ কর দাদা, বাজে বকিস না—"

"বাজে নয়, সত্যি এইরকমই তো হচ্ছে, কিছুই মনে থাকছে না শ্যামলদার।"

—"তুই কেমন করে জানলি? তোকে দেখিয়েছে?"

"মুখে মুখে বলে তো গল্পটা। অনবরত পালটে পালটে যাচ্ছে—"

"তুই খাতাটা চেয়ে নিয়ে সব ঠিকঠাক করে দে না দাদা।" দীপু মায়ামায়া চোখে তাকায় দাদার দিকে।

"ইচ্ছে করেই সব নাকি পালটে পালটে ফেলেছে, যাতে স্পাইরা ধরতে না পারে। বলছে, বাড়ির সামনে সব সময়ে অচেনা লোকেরা ঘোরাফেরা করছে, ওকে লিখতে দেবে না বলে। তারা সেধে সেধে ওঁকে জিজ্ঞেস করে, 'কী শ্যামলদা কেমন আছেন–', আসল উদ্দেশ্য ওর পরে নজরদারি।"

দীপু বলল— "এসব ভাল কথা নয়। লক্ষ করেছিস, শ্যামলদার চেহারাটা একটু বদলে গেছে ইদানীং? পান খাচ্ছিল, ঠোঁট থেকে চিবুক বেয়ে পানের রস গড়াচ্ছে দেখলাম। কোনও খেয়াল নেই। টিকি বাঁধা আছে তো বাঁধাই আছে, কদ্দিন চুলে চিরুনি পড়ে না—উস্কোখুস্কো।"

"জানি।" অপু বলল, "স্ট্র্যাপ ছেঁড়া চটি। সত্যি আজকাল একদম নিজের যত্ন নিচ্ছে না শ্যামলদা।"

"কবে ফিরবে নিউ ইয়র্কে? কী সুন্দর এল, এখানে এসে কেমন যেন আলুথালু হয়ে যাচ্ছে।"

সত্যি শ্যামলদার চেহারায়, হাবভাবে নিউ ইয়র্কে ফেরবার কোনও তাড়া নেই। কাঁধের ঝোলা ব্যাগে একগাদা বই নিয়ে ঘোরে। হঠাৎ এক একটা বের করবে, —"এ বইটা পড়েছিস অপু? দারুণ! পড়ে দ্যাখ।" বলে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের একটা কঠিন টেক্সটবই পড়তে দেবে, তাতে দাঁত ফোটানোর শক্তি নেই অপুর।

রোববার সকালে নিধুর চায়ের দোকানে অপুকে শ্যামলদা যেসব কথা বলল, অপু বাড়ি ফিরে এসেই দীপুকে সব না জানিয়ে পারল না।

"বাড়িতে আর টেকা যাচ্ছে না অপু। শোভনের সঙ্গে চোখাচোখি হলেই সে হঠাৎ সাইকেলটা টেনে নিয়ে টিংটিং করে গলিতে বেরিয়ে যায়। শোভনের বউ টেবিলে ভাতের থালা নামিয়ে রেখেই রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে ঠুং ঠাং খুন্তি নাড়াতে থাকে। বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই বাবা নাকে চশমা এঁটে খবরের কাগজ পড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। মার কাছে গেলে পর্যন্ত মা চোখ বুজে জপ করতে শুরু করে দেয়। আমার বাড়িসুদ্ধ প্রত্যেকটা লোক এখন ওদের দলে যোগ দিয়েছে।"

BanglaBook.org

পাড়া প্রতিবেশীরা তো আগেই দিয়েছিল। ওদের সকলের একটাই সম্মিলিত উদ্দেশ্য। ওরা চায় শ্যামলদাকে দেশ থেকে উৎখাত করতে। ওকে নিউ ইয়র্কে ফেরত পাঠাতে।

"কেননা ওরা জানে আমি খতমের রাজনীতি মানতে পারিনি। ওই 'পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাটো' আর 'কুপিয়ে মারো' আমার সহ্য হয়নি। আমার জন্যে ওরা তাই বোমা বানাচ্ছে। আমাকে মারবে বলেই পোখরানে বম্ব ব্লাস্ট—আমার আকাশ-বাতাস বিষিয়ে দেবার জন্যে, আমার জল আমার মাটি শুকিয়ে দেবার জন্যে এদের এই অ্যাটম বোমা।" হঠাৎ গলা খুলে গেয়ে উঠল শ্যামলদা—"আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ/ তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান/ বিস্ময়ে তাই জাগে জাগে আমার প্রাণ"—বিশ্বাস কর অপু এই বিপুল সৌরজগতের পেছনে এই গ্রহনক্ষত্রের পেছনে একটা কসমিক প্ল্যান আছে—সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিকল্পনার মধ্যে কিন্তু খতমের নীতি নেই। শুধুই সৃজনের! সৃষ্টি, পুনঃসৃষ্টি, পৌনঃপুনিক সৃষ্টি—এই হলো ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা। আর আমি ওই ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসী। আমি যে তোদেরও আমার ব্রহ্মাণ্ডে টেনে নিচ্ছি, ওরা তাই আমাকে উৎখাত করতে চায়। ওরা তাড়াতে চায় আমাকে। তুই বরং তাড়াতাড়ি ইউ এন-এর হিউম্যান রাইটস কমিশনে একটা চিঠি লিখে দে অপু। আই নিড দেয়ার প্রোটেকশন।"

"পোখরানের বোমা, শ্যামলদা বলল তোকে, শ্যামলদাকে মারবার জন্য? য্যাঃ।" দীপু বিশ্বাস করল না।

"তুমি ভুল বুঝেছ।"

"তাইই তো বলছে শ্যামলদা, বলছে ওটা ওকেই শেষ করবার অস্ত্র, যেহেতু ও প্রাণবাদী, যেহেতু ও যুদ্ধবিরোধী, হত্যাবিরোধী।"

"চিরদিনই যেসব মানুষ পৃথিবীকে উদ্ভিদকে, প্রাণীদের ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছে, ম্যাক্রো সমাজ তাদের পিষে মেরেছে। অপু, বোমা ম্যাক্রো সমাজের ভাষা। এই ভাষা আমরা বুঝব না। মাইক্রো সমাজের ভাষা, সবই মননের আর হৃদয়ের। তার শক্তি চিন্তায় আর প্রেমে। ম্যাক্রো সমাজের ভাষা পেশির। ওদের শক্তি সংখ্যার আর ধনের। সেই যখন অন্তরের ছন্দ দিয়ে, নিসর্গের মন্ত্র দিয়ে মানুষকে পবিত্র করতে চেয়েছে ম্যাক্রো সমাজের প্রবল চাপ তার ওপরে এসে পড়েছে—তোর কি মনে নেই অপু ট্রটস্কির কথা? কেন খুন করা হল ওকে? ও তো কাউকে মারছিল না, ও তো কেবল লিখত। শুধু ট্রটস্কিই পারত সোবিয়েত রাশিয়ার অধঃপতন রুখতে। ট্রটস্কি পারত কমিউনিজমের জন্য একটা ঠিকঠাক USP তৈরি করে দিতে। স্ট্যালিনের বদলে যদি ট্রটস্কি যেত মস্কোতে আজ জগতের দরিদ্র মানুষের মুক্তি ঘটে যেত। ট্রটস্কি যে আসলে ছিল মরমিয়াবাদী। ও ছিল ভক্তপুরুষ, গোপনে সুফী কাল্টের লোক ছিল ও। মৃত্যু আর প্রেম দুটোকে এক করে দেখেছিল। যেমন দেখেছিল চে গুয়েভারা। ওরা সন্তপুরুষ, শান্তির দূত, মুক্তির দূত। হাতে বন্দুক ছিল? তা থাকুক, ভক্তের হাতে যখন বন্দুক থাকে, সেই বন্দুক

BanglaBook.org

কারওকে মারে না। তবু হাতে থাকাই হয় তো দরকার। সেই যে রামকৃষ্ণদেব সাপকে বলেছিলেন, 'তোকে কামড়াতে বারণ করেছি। ফোঁস করতে তো মানা করিনি?' বন্দুক হচ্ছে ফোঁস। গুলি হল ছোবল। অপু তুই বড্ড ভালমানুষ, তুইও একটা বন্দুক রাখবি হাতে, নইলে লোকে পিষে ফেলতে আসবে।

"আমার ভয় নেই, আমি তো খোদার খিদমত খাটছি। তবু, ওরা আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলছে, অপু, তুই দেরি করিস না আর, উঠে হিউম্যান রাইটস কমিশনের চিঠিটা লিখে ফ্যাক্স ভাই। বাংলায় লিখলেই হবে—ওখানে পৃথিবীর সব ভাষা পড়বার লোক আছে। চিঠিটা লিখে ফ্যাক্স করে দে, ওরা যেন আমাকে গার্ড করতে লোকজন পাঠায় আর উকিল ঠিক করে। আমি নজরবন্দি হয়ে রয়েছি। স্পাইরা ঘিরে ফেলেছে আমাকে— স্থূলতা আর হীনতা দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে—তা বলে আমি হার মানিনি। তুই লিখে দে, আই অ্যাম ফাইটিং। আমি চারদিকের এই দৈন্য, এই শ্রীহীনতা, এই আবর্জনা, কখনও বরদাস্ত করব না। কিছুতেই এতে অভ্যস্ত হয়ে যাব না, আমি কিছুতেই মেনে নেব না যে এটাই স্বাভাবিক, এত ঔদাসীন্য স্বাভাবিক, এই হিংস্রতা স্বাভাবিক। স্থূলতার গোদা প্রলেপ আমার সর্বাঙ্গে মাখিয়ে দিয়েও ওদের স্যাটিসফ্যাকশন হয়নি, ওরা এখন আমার বুদ্ধি লোপ করে দিতে চায়। মনের ভেতরটাকে থোঁতা-ভোঁতা করে দিতে খ্যাঁদা-বোঁচা করে দিতে চায়। তুই জেনে রাখ অপু, বোমা বানাতে আমি দেব না। এটা একটা পার্সোনাল অ্যাসল্ট। বোমা ফাটাচ্ছে কেননা ওটাই আলটিমেট। বোমা যদি সহ্য করতে পারি—তবে রাস্তাভরা আবর্জনা, মাছিবসা-মিষ্টি, ওষুধে ভেজাল, ন্যাংটা শিশু—সবই সয়ে যাবে ভেবেছে। ভেবেছে আমি ভয় পেয়ে যাব? নেভার!"

"চলো তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি শ্যামলদা, মাসিমা মেসোমশাই অপেক্ষা করছেন, দেড়টা বেজে গেছে।"

আলুথালু চুল ঝাঁকিয়ে শ্যামলদা হঠাৎ চটে উঠল—দু'হাতের বুড়ো আঙুল নাড়াতে নাড়াতে স্বভাব-বিরুদ্ধ ভঙ্গিতে ভেংচি কেটে বলল— "অপেক্ষা করছেন, না ছাই। ওঁরা ডিফেন্স মিনিস্ট্রির সঙ্গে পরামর্শ করছেন যাতে বাড়িটা বেচে দিতে পারেন, ওখানে তো নিউক্লিয়ার রিসার্চ ল্যাব হচ্ছে শুনিসনি তুই?"

চোখ কুঁচকে মুখ গম্ভীর করে শ্যামলদা বলল—"কেউ থাকে না, বুঝলি অপু, খুদা-ই-খিদমতগারদের পৃথিবীতে কেউ থাকে না। না বাবা, না মা, আই অ্যাম অল আলোন অন দিস প্ল্যানেট।

"সেইজন্যেই তো তোকে বলছি হিউম্যান রাইটস কমিশনে ফ্যাক্সটা পাঠিয়ে দিতে। যত দেরি করছিস তত বেশি বেড়ে যাচ্ছে আমার ভালনারেবিলিটি।"

শুনে রাত্রিবেলায় দীপু বলল, "দাদা, ব্যাপার খুবই সঙ্গীন—তুই কালকেই যা, শোভনদা অফিস থেকে ফিরলে সব বলে আয়। আমার একদম ভাল লাগছে না।"

পরদিন সন্ধ্যাবেলাতে অপু গিয়ে দ্যাখে মাসিমা কান্নাকাটি করে চোখমুখ ফুলিয়ে ফেলেছেন। মেসোমশাই পাথর। টুকুবউদি ওঁদের কাছে চুপ করে বসে রয়েছে। বাচ্চা দুটোকে দেখা গেল না। বাড়িটা থমথম করছে।

"শোভনদা আছে?"

"শ্যামলদাকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছে।"

"কী হয়েছে?"

"শোভন এলেই শুনো।"

রাত্রে শোভনদা ফিরল। একেবারে ক্লান্ত বিধ্বস্ত। শ্যামলদা একটা বিশাল ছোরা হাতে পাড়াতে ঘোরাঘুরি করছিল। মিনিবাসেও উঠেছিল। সৌভাগ্যবশত কন্ডাক্টর আমাদেরই পাড়ার ছেলে স্বপন থাকায়, ভুলিয়ে ভালিয়ে নামিয়ে দিয়েছে, বাড়িতে খবরও পাঠিয়েছে। এরপর শ্যামলদা ছোরা হাতে নিধুর দোকানে গিয়ে চার কাপ চা, চারটে অমলেট অর্ডার দিয়েছে। ছোরা হাতেই সিগারেট দেশলাই কিনে এনেছে। এ পাড়ায় ছুরিছোরা হাতে মানুষ ঘোরাফেরা করে না, তাই পাড়ার ছেলেরা জিজ্ঞেস করছে—

"শ্যামলদা, হাতে ছোরা কেন?"

"একজনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।"

"তা ছোরা নিয়ে কেন?"

"পুরনো হিসেব।"

আমেরিকা ফেরত বড়লোক ছোকরার আবার 'পুরনো হিসেব' কী? কত বছরের পুরনো হিসেব সেটা? পাড়ার ছেলেরা ছুটে গেছে শোভনদার কাছে। খবর পেয়ে শোভনদাও দৌড়ে এসেছে নিধুর দোকানে।

শ্যামলদা একাই একটা টেবিলে বসে আছে। পরনে কোরা ধুতি। নোংরা গরদের পাঞ্জাবি। খালি পায়ে জুতো নেই। চিরুনি না পড়া চুলে একটা শুকনো হলুদ পাতা আটকে আছে। দাড়ি গোঁফ ঝাঁকড়া। টেবিলের ওপর উন্মুক্ত ছোরা, শ্যামলদা চা খাচ্ছে। টেবিলে সারি সারি কাপ। আধ কাপ খেয়েই আর এক কাপ চাইছে। চারটে প্লেটে ছেঁড়া ছেঁড়া চারটে ওমলেট। কোনওটাই খায়নি। চারদিকে সিগারেটের স্তূপ। সবই আধখানা খাওয়া। হাতে একটা বিস্কুটের প্যাকেট। তা থেকে নিধুর দোকানের রোগা রোঁয়া-ওঠা বাদামি কুকুরটাকে যত্ন করে একটার পর একটা বিস্কুট খাওয়াচ্ছে। আরও একটা বিস্কুটের প্যাকেট রয়েছে টেবিলে। দূরে দূরে অন্যান্য টেবিলের খদ্দেররা উৎসুক নয়নে দুরুদুরু বুকে শ্যামলদার কাণ্ডকারখানা দেখছে।

শোভনদা আকুল হয়ে শ্যামলদার পাশে বসে পড়ল।

"কী হলো, দাদা? ছোরাটা কার?"

"তাতে তোর কী?"

"কোথা থেকে পেলি?"

BanglaBook.org

"ও তুমিও তাহলে দলে আছ। শুরু হয়ে গেছে আমাকে আটকান? শেষকালে পাড়ার লোকদের আমার পেছনে লাগিয়ে দিলি। তোর লজ্জা করল না।"

"লোক আমি লাগাব কেন, ওরাই তো গিয়ে আমাকে ডেকে আনল।"

"ডেকে আনল। না তুইই ওদের অ্যাপয়েন্ট করেছিস আমার গতিবিধির ওপর নজর রাখতে? আমিও ইউনাইটেড নেশনসে হিউম্যান রাইটস কমিশনে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি, ভেবো না আমি তোমাদের ছেড়ে দেব।"

"এ তুই কি বলছিস দাদা?"

"ঠিকই বলছি। তোরা আমাকে বাড়ি ছাড়া দেশছাড়া করতে চাস, আমাকে নিউইয়র্কের হাসপাতালটাতে ফেরত পাঠাতে চাস, আমাকে না তাড়ালে বাড়িটা অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনকে বিক্রি করতে পারছিস না, নিউক্লিয়ার রিসার্চ ল্যাবরেটরি বসাতে পারছিস না, বোমা তৈরির বন্দোবস্ত এগোতে পারছিস না। আমি কি জানি না ভেবেছিস।"

"দাদা, এসব তোমাকে কে বলেছে? সব ভুল বলেছে। একদম ভুল।"

"পঁয়ত্রিশ লক্ষ অলরেডি নিয়ে নিয়েছিস। আরও পঁচিশ দেবে আমি চলে গেলে। আমি যাব না। আই অ্যাম নট বাজিং ফ্রম হিয়ার।" এসব সত্ত্বেও দাদাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে কথা কইতে কইতে বাড়িতে এনে ফেলেছিল শোভনদা। পৌঁছেই ধুন্দুমার কাণ্ড। ভাঙচুর, চেঁচামেচি।

"অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের সঙ্গে ষড় করে তোরা আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাস, বিকজ আই নো ইওর সিক্রেট্‌স, তোদের গোপন কথা সব আমি জেনে ফেলেছি — ইউ আর এগেইনস্ট অল লাইফ অফ আর্থ—ইউ আর অ্যান্টি-লাইফ, ইয়েস অন্য অন্য গ্রহকে প্রাণশূন্য করেছ, জলশূন্য করেছ, বায়ুহীন করেছ। তাতে তোদের শখ মেটেনি, তোরা এবার এই গ্রহটাকে খেতে এসেছিস—বোমা মেরে মেরে জলহীন বায়ুহীন করে দিচ্ছিস—আমি তা করতে দেব না—আই অ্যাম গোইং টু ফাইট টু দি এণ্ড। আমি খুদা-ই-খিদমতগার, হিউম্যান রাইটস কমিশনে চিঠি—" শ্যামলদাকে জবরদস্তি ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মানসিক হাসপাতাল থেকে নার্স-ডাক্তার আনিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে।

তারপর নিউ ইয়র্কে খবর গেছে, শ্যামলদার মার্কিনী স্ত্রী বেটসি বউদি এসেছেন। তার কাছে শুনলাম শ্যামলদা ডিপ্‌সোমেনিয়ার চিকিৎসার জন্যে ওখানে হাসপাতলে ছিল। অনেক কড়া কড়া ওষুধ খেতে হয়, হয়তো সেইজন্যেই এই নার্ভাস ব্রেকডাউন —আগেও এমন হয়েছিল একবার। মাস দেড়েক বাদে শ্যামলদা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরল। অপু ছুটল খবর পেয়েই। দীপু টিপ্পনী কাটল, "দেখিস দাদা, একটু রয়ে-সয়ে—হোঁচট খাস না আবার।"

গিয়েই মনটা আলো আলো হয়ে গেল অপুর। মাসিমা মেসোমশাই খাটের ওপরে বসে আছেন, টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে মা বাবাকে কাপে চা ঢেলে দিচ্ছে শ্যামলদা। টুকু বউদি স্কুলে, শোভনদা অফিসে। অপু ঢুকতেই মহা খুশি

শ্যামলদা— "বেট্‌সি। আরেকটা কাপ দাও অপুর জন্যে।"

—"কী খবর বস? লংটাইম, নো সি মাসী? এতদিন কোথায় ছিলেন? পরীক্ষা ওভার?"

ঠিক আগের মতন।

ফেডেড ব্লু জিনস্‌, গাঢ় সবুজ খাদির কুর্তা থেকে সুগন্ধ আসছে। একটু তফাত, পরিষ্কার করে দাড়ি কামানো, চকচকে করে আঁচড়ানো চুলে সেই ঝুঁটিটা আর নেই। আগের চেয়েও সুন্দর দেখাচ্ছে। সুন্দর আর স্মার্ট। স্মার্ট আর কনফিডেন্ট। তরতাজা আর ঝকঝকে।

মাসিমা মেসোমশাইকেও খুশি খুশি লাগছে। চা খেতে খেতে গল্প। বেট্‌সি বউদিও এসে যোগ দিয়েছে— ফলে আড্ডার মাধ্যম হয়ে গেছে ইংরাজি।

"অপু তুই অরুন্ধতী রায় পড়লি? আমিও পড়লাম। তবে বেট্‌সির যত আহামরি লেগেছে, আমার তা লাগেনি। শ্যাডোলাইন্‌স অনেক অনেক ভাল—অমিতাভ ঘোষের একটা আলাদা অন্তর্জগৎ আছে, যেটা অরুন্ধতীতে মিসিং— অরুন্ধতীর অনেক গিমিক রয়েছে যা অমিতাভর নেই, শ্যাডোলাইনসের মতন বাঙালি উপন্যাস বাংলাতেও বেশি নেই—

"বিক্রম চন্দ্র, না বিক্রম শেঠ? শোভা দে কি লেখক? ইংরেজিতে ভারতীয় সাহিত্য কি ভারতীয়? বুকার প্রাইজ যারাই পায় তারাই কি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক? শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কেমন করে মাপব?"

নিউইয়র্কের অনেক গল্প। সুনীলের গল্প। সুনীল এখন একা রয়েছে। বেট্‌সি বউদিকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। সুনীল ওদের ছেলে। মাসিমা মেসোমশাই এখনোও এই প্রথম নাতিটির মুখ দেখেননি। এ বছরে হাই স্কুল শেষ করেছে সুনীল। ও কলেজে চলে গেলে, শ্যামলদারা দুজনে কলকাতাতে ফিরবে। আমেরিকাতে শ্যামলদার আর ভাল লাগছে না। বেট্‌সি বউদির ইণ্ডিয়াতে এই প্রথম। উনিশ বছর বিয়ে হয়েছে যদিও। এবার এসে খুব আপসোস হচ্ছে, আহা এতদিন কেন আসিনি। এত উষ্ণতা এত স্নেহ মমতা এই কলকাতায়! বেট্‌সি বউদি নিউইয়র্কে একটা লইয়ারের ফার্মে কাজ করে। তার মা-বাবা থাকে ফ্লোরিডায়। বুড়ো হলে না, ফ্লোরিডা খুব ভাল —না ঠাণ্ডা না গরম। শ্যামলদা বলল—"যদি না কুমিরে খেয়ে ফ্যালে।"

তার মানে ফ্লোরিডাতে বেট্‌সি বউদির বাপের বাড়ির বাগানের নর্দমাতে একটা কুমির ভেসে এসেছিল। এমন নাকি আকছার হচ্ছে ফ্লোরিডায়। নালা-নর্দমাতে শহরের মধ্যে কুমির পাওয়া যায়। মাছ-খেকো কুমিরই তারা প্রধানত, কিন্তু মানুষ পেলে ছাড়ে না।

"ও বাবা! আমেরিকা এমন?"

"এ আবার কেমন ধারা আমেরিকা?"

"আমাদের বরিশালেও তো এমন কথা শুনিনি। বাড়ির নর্দমাতে কুমির?" মাসিমা মেসোমশাই আর অপু একসঙ্গে অবাক।

"এবার যদি কমোডের মধ্যে কুমিরছানা ঢুকে আসে?"

"আসতেই পারে!"

"তা-র-প-র?"

সবাই মিলে হেসে উঠল।

আসবার আগে টাকা জমাতে হবে কিছু। সুনীলের ইউনিভার্সিটিতে পড়ার খরচপাতি অনেক, ওদেশে কলেজের মাইনে আমাদের মতন না। ঠিকমতন ইনভেস্ট করতে পারলে অসুবিধে হয় না, শ্যামলদা সে সব ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু আরেকটু হিসেব করা দরকার। কেননা এ দেশে থাকতে হলে ওখানে এমনভাবে ইনভেস্ট করে আসতে হবে যাতে সুদের টাকাতেই রাজার হালে থাকা যায়। এজন্যে আপাতত ফিরে গিয়েও শ্যামলদা ফের ওয়াল স্ট্রিটের অফিসে বসবে। মুম্বইয়ের শেয়ার মার্কেট নিয়েও কথা বলল শ্যামলদা। বোমার দাপটে মুম্বইয়ের যে কাহিল অবস্থাটা হয়েছিল, এখন তার থেকে সামলে গেছে অনেকটা। শ্যামলদা খোঁজ খবর রাখছে। আঁক কষছে।

"এখানে এসেও তুমি ফিনানশিয়াল অ্যানালিসিস করবে, শ্যমলদা?"

"করতেও পারি। দেখি, সুযোগসুবিধে অনুযায়ী। বেটসি এখানে কাজকর্ম করবে না—বাগান করবে। বলে দিয়েছে।"

হাসিতে গল্পে সুন্দর কাটছিল সময়টা। পুরনো কথা শ্যামলদার কিছুই মনে নেই। কোনও প্রসঙ্গ উঠল না। অসুখের সময়টা ওর চৈতন্যে, স্মৃতিতে কোনও ছাপই রাখেনি। পূর্বকালের গন্ধ লেগে নেই কোনওখানে। অপুর বুক থেকে একটা বোঝা নেমে গেল। খোদা তাহলে তার খিদমতগারকে দয়া করেছেন।

এতক্ষণ ধরে ইংরিজি বলতে বলতে অপু যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল শ্যামলদা যখন বলল—"চল অপু, নিধুর দোকানে যাই—বাড়িতে চা খেয়ে ঠিক জুত হয় না।"

আগের মতন নিধুর দোকানে গিয়ে বসল অপু আর শ্যমলদা। সেই দুটো অমলেট, দু'কাপ চা। পানের দোকান থেকে দু'প্যাকেট ক্লাসিক। শ্যামলদার উপহার। নিধুর দোকানে তো উৎসব পড়ে গেল।

"এই যে শ্যামলদা। ওয়েলকাম ব্যাক।"

"দারুণ দেখাচ্ছে কিন্তু।"

"কবে আমেরিকা যাচ্ছেন? আপনাদের নাকি সময় হয়ে এল। তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন কিন্তু।"

"শ্যামলদা, বউদিকে একদিন নিয়ে আসুন!"

হাজারটা কথা। ভালোবাসার কথা।

শ্যামলদা সকলের কথার উত্তর দিচ্ছে হাসিঠাট্টা করে। রোঁয়া ওঠা বাদামি কুকুরটা গা-ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়ে পত পত করে খুব লেজ নাড়ছে। শ্যামলদা নিজের অমলেট পুরোটাই ওকে দিয়ে দিল।

BanglaBook.org

"শ্যামলদা, একখানা গান হয়ে যাক।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, একখানা গান।" ছেলেদের হাঁক উঠল। বিনা ভণিতায় শ্যামলদা খোলা গলায় গান ধরল—'*কেন যে মন ভোলে, আমার মন জানে না। তারে মানা করে কে আমার মন মানে না—*" এমনি একটার পর আর একটা। একসময়ে থেমে শ্যামলদা বলল, "বেটসি কেন নিধুর দোকানে চা খায় না জানিস অপু? শোভনটা ওকে বুঝিয়েছে এখানে নেড়ি কুকুরের দুধে চা হয়। খেলেই জলাতঙ্ক।"

—"য্যাঃ। বউদি ওসব বিশ্বাস করেছে নাকি?"

"করতেই পারে। কিছুই তো জানত না এ দেশের কথা।"

"তুমি বলতে না?"

কথা ঘুরিয়ে শ্যামলদা বলে, "অপু তুই মহাভারত পড়েছিস?"

"হ্যাঁ—কেন?"

"শেষ দিকটা মনে আছে? ওই যে যেখানে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী সকলেই তাদের মৃত পুত্রদের মুখ দেখতে চাইছে?"

"মনে আছে।"

"যখন ব্যাসদেব তাদের পুত্রমুখ দর্শন করালেন, মৃত পুত্রেরা সকলেই ভাগীরথীর জল থেকে উঠে এলেন যুদ্ধের বেশে সেজে, যেন চকচকে নতুন টাকার মতন, শরীরে কোনও ক্ষত নেই, কোনও রক্ত নেই, যন্ত্রণার লক্ষণ নেই, অস্ত্রের চিহ্ন পর্যন্ত নেই—সকলেই সুখী, সুন্দর সম্পূর্ণ, যুদ্ধ শুরু হবার আগে যে যেমন ছিল। মনে পড়ছে সেখানটা?" অপু ঘাড় নাড়ে। মনে পড়ছে।

"ধৃতরাষ্ট্র অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। দুর্যোধনের উরু ভগ্ন নয়, দুঃশাসনের বক্ষ অবিদীর্ণ, কারণটা কী জানতে চাইলে ব্যাসদেব কী কারণ বলেছিলেন তোর মনে আছে?" অপু একটু ভেবে নিতে চেষ্টা করল।

"একটু একটু মনে আছে বোধহয়।"

"কী মনে আছে, বল শুনি?"

"বোধহয় বলেছিল সবই মায়া। যুদ্ধ তো মোটে হয়ইনি। কেউ কারুর উরু ভাঙেনি, কেউ কারুর বুক চেরেনি, নশ্বর জীবনের সব কিছু অভিজ্ঞতাই মায়া, কোনওটাই সত্য নয়।—এরকমই কিছু বলেছিল মনে হয়।"

"ওই ব্যাখ্যাটা তোর বিশ্বাস হয়? আমার তো হয় না। আমার মনে ওর অন্য ব্যাখ্যা আছে। ধৃতরাষ্ট্রেরা যাদের দেখেছিলেন তারাই মায়ামূর্তি, তারা পিতামাতার স্নেহে গড়া, আকাঙ্ক্ষায় গড়া সন্তানের রূপ, তাতে কোনও খুঁত থাকতে পারে না। ওটাই আসলে মায়া ছিল। কেননা ওটা মৃত্যু-উত্তীর্ণ রূপ।"

আগের শ্যামলদা। চিরদিনের শ্যামলদা। অপুর দু' চোখে মুগ্ধতা। অন্য টেবিল থেকে আবার রিকোয়েস্ট আসে— "শ্যামলদা, শ্যামলদা এবার একটা ইংরেজি গান হোক—"

শ্যামলদা হেসে অপুর দিকে তাকায়।

BanglaBook.org

অপু বলে—"বিটলস গাও।"

—"হি ওয়াজ জাস্ট অফ নোহোয়্যার ম্যান, সিটিং অন হিজ নোহোয়্যার ল্যান্ড, মেকিং অল হিজ নোহোয়্যার প্ল্যান্স—ফর নোবডি... ডাজ নট হ্যাভ আ পয়েন্ট অফ ভিউ, নোজ নট হোয়াট হিজ গোইং টু ডু। ইজ নট হি আ বিট লাইক ইউ—অ্যান্ড মি..."

নিধুর দোকান যেন ম্যাজিক স্তব্ধ।

অপু হঠাৎ দেখল দীপু এসে দাঁড়িয়ে আছে পেছনে। গান শুনছে।

"দাদা, বাড়ি চল, ছোটকাকু এসেছে।"

"আরে আরে দীপু মেমসাব যে। কেমন আছ? শ্যামলদাকে যে দেখতেই পাচ্ছ না।— ইয়ং লেডি হয়ে গেছ কিনা।"

দীপু লজ্জা লজ্জা খুশি মুখে হাসে শুধু। অপু উঠে দাঁড়ায়।— "চলি শ্যামলদা। কালকে আবার দেখা হবে। এক্ষুনি তো চলে যাচ্ছ না নিউ ইয়র্ক?"

—"নো, নেক্সট উইক। ঠিক হ্যায়, ফির মিলেঙ্গে—সি ইউ টুমরো—চা-ও।" দু'জনেই হাত নাড়ল। ওরা বেরিয়ে যাচ্ছে, শ্যামলদা পিছু ডাকল।

"অপু, একটা জরুরি কথা ছিল। বলতে ভুলে গেলাম।" শ্যামলদা উঠে দাঁড়িয়েছে। অপু ফিরে এল।

শ্যামলদার ভুরু কুঁচকে গিয়েছে। অপুর পিঠে হাত রেখে কানের কাছে মুখ নামিয়ে নিয়ে শ্যামলদা ফিসফিসে গলায় বলল—"সেই হিউম্যান রাইটস কমিশনকে চিঠিটা ফ্যাক্স করে দিয়েছিলি তো? উই মাস্ট বি রেডি—দে আর ওয়েটিং ফর মি।"

অপু দেখল শ্যামলদার চোখের মধ্যে অন্য একটা চোখ, পরিষ্কার কামানো গালে ঝাঁকড়া দাড়ি, চকচকে আঁচড়ানো চুলে একটা হেমন্তের হলুদ পাতা আটকে আছে।

শারদীয় দেশ, ১৯৯৮

BanglaBook.org

ছোটবাবুর জমিদারী পরিদর্শন

খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে ঠাকুদ্দা বললেন, "হাঁপানিয়া গ্রামে একটা ইশকুল করে দিয়েছি, সেটার উদ্বোধন হচ্ছে রোববার—আমি যেতে পারছি না, তোমার বাবাও যেতে পারছেন না, বাড়ি থেকে তো কাউকে একবার যেতে হয়। খোকা, তুমি আজ বাদে কাল কলেজে পড়বে, আমার ইচ্ছে তুমি যাও। একটু একটু করে বেরুতে থাকো, জমিদারীগুলো তো চিনে-টিনেও নেওয়া দরকার।"

ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে বসে রয়েছি। মন দিয়ে 'স্বাধীনতা' পড়ি আর 'সোভিয়েত

দেশ' পড়ি। বাড়িতে নয়, মেজ জামাইবাবুর বাড়িতে। 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'টা পড়া হয়ে গেছে, কিন্তু 'ডাস ক্যাপিটাল'টা কিছুতেই শেষ করতে পারছি না। ঠাকুদ্দার কথায় উৎসাহিত হয়ে উঠলুম। গ্রাম-ট্রামে আমাদের যাওয়াই হয় না একেবারে —জমিদারী-টারি দেখাশুনো করা দূরে থাক। সঙ্গে সঙ্গেই মা অ্যাটাচিকেস গুছিয়ে দিলেন।

শনিবার সকালে আমীনবাবু এসে আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। রবিবার মিটিং করে ফিরব। ট্রেন যখন মাঝে একটা স্টেশনে দাঁড়িয়েছে, আমীনবাবু ব্যস্ত হয়ে দরজা দিয়ে উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা ঝাঁকায় করে কয়েক হাঁড়ি মিষ্টি উঠল গাড়িতে। আমীনবাবু একটি হাঁড়ি খুলে মিষ্টির সাইজটা পরীক্ষা করে নিলেন, তারপর ময়রা নেমে গেল। আহা কী অপরূপ সেই মিষ্টান্নের চেহারা! আমার তো বেজায় লোভ হয়ে গেল। কিন্তু আমি যে হচ্ছি ছোটদাদাবাবু, আমীনবাবুর সামনে আমার লোভটা প্রকাশ করা মানায় না। আমীন বুড়ো মানুষ। তাঁর অনেক ছোট ছেলে দেখা আছে। আমীন মিষ্টি হেসে বললেন- —"আজ থাক? কালকে খাবে'খন। এখনও রস ঢোকেনি।" একটু লজ্জা পেয়ে, তাড়াতাড়ি কোলে 'সোভিয়েত দেশ' পত্রিকা খুলে বসি। সুন্দর করে মেঠাইতে গোলাপজল ছিটিয়েছে। সুগন্ধে সারা কামরা 'ম' 'ম' করছে। রস ঢুকছে। ঢুকুক রসটা।

পূর্বস্থলী নামে একটি স্টেশনে আমীনবাবু মিষ্টির ঝাঁকাটি নামালেন, খোকাবাবুকেও। স্টেশনে গাড়ি আসার কথা গ্রাম থেকে। হাঁপানিয়া এখান থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে। একটা ছোকরা দাঁড়িয়ে আছে। আর একজন রোগামতন লোক। আমীনবাবুকে দুজনেই পেন্নাম করল খুব খাতির করে। আমীন আমাকে দেখিয়ে দিলেন—"ইনিই এসেছেন জমিদারমশায়ের প্রতিনিধি, তাঁর সাক্ষাৎ নাতি। বাপ-ঠাকুদ্দার জমিদারীর খোঁজখবর নেয়া এখন থেকেই শুরু করা দরকার।"—শুনে রোগা লোক আর ছোকরা আমাকে ভক্তিসহকারে 'শতকোটি প্রণাম' জানাল পা ছুঁয়ে। আমি তো লাফিয়ে সরে আসি। রোগা লোকটার সব চুল প্রায় পাকা। আমাকে প্রণাম করবে কি? আমীন বললেন, "জগু, গাড়োয়ান কই?"

লোকটা তখন আঙুল দিয়ে ছোকরাকে দেখিয়ে দিল। ছোকরাকে আপাদমস্তক লক্ষ্য করে আমীনবাবু বললেন, "এ তো কচি ছেলে। এ পারবে? দশ মাইল আমাদের গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে?" ছেলে তখন মন দিয়ে নাক খুঁটছিল—সে-কর্ম ছেড়ে, ঘাড় কাৎ করে, ধবধবে হেসে বললে—"হিঁ কত্তা। খুব পারব।" প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে দেখা গেল বিছানা পাতা, ছই ঢাকা দেয়া চমৎকার গরুর গাড়ি নিয়ে হৃষ্টপুষ্ট দুটি বলদ দাঁড়িয়ে আছে। গাড়োয়ানের খুব পৈটিক গোলযোগ সে তাই ছেলেকে পাঠিয়েছে। ছেলেটার পরনে ফর্সা গেঞ্জি আর খাটো ধুতি। আমি পরে আছি নীল শার্ট আর সাদা প্যান্ট। শহরে অতটুকু ছেলেরা ধুতি পরে না। কিন্তু কোনো অনুষ্ঠানে

BanglaBook.org

ধুতি শার্ট পরার রেওয়াজ ছিল যুবকদের। পাঞ্জাবি পরাটা বেশি সাজগোজ করা হয়ে যেত, বিয়েবাড়ির যোগ্য। অন্যান্য অনুষ্ঠানে ধুতি-শার্ট। সেই ফ্যাশানটাই হেমন্ত, দ্বিজেন, সাগর, সুবীরের মধ্যে দেখা গেছে। কালকের উদ্বোধনীতে পরবার জন্যে বাক্সে আছে ঘি-রঙের সিল্কের শার্ট আর সোনার বোতাম। এ ধুতি পরা ছোকরার বয়েস আমার থেকে কম। ছোকরা আর জগুকে নিয়ে মিষ্টির ঝাঁকা গাড়িতে তুলে, রওনা দিলুম হাঁপানিয়া গ্রামের দিকে। শীতের বেলা বুঝি এখনই পড়ে এসেছে। কাল সকালে সুধারানী মেমোরিয়াল গার্লস প্রাইমারি ও জুনিয়ার স্কুল খোলা হবে। ঠাকুদ্দা বলেছেন তিন বছরের মধ্যে হাইস্কুল করে দেবেন।

গাড়ি চলতে চলতে একটা বাঁক নিল। আমীনবাবু আর জগু দুজনেই হাঁহাঁ করে উঠলেন, "এ কী? এটা আবার কোন রাস্তা?" ছোকরা বললে, "শটকাট পথ।" জগু বললে, "কিন্তু এই পথটা যে একদম ভালো নয় রে। বড্ডো এবড়ো-খেবড়ো হয়ে রয়েছে। সাইকেল পর্যন্ত চালাতে পারি না এটাতে। ঘুর হয় হোক, ওই বড় রাস্তা দিয়ে চল। এ পথে অত ঝাঁকুনিতে ছোটবাবুর হাড়পাঁজরা ঝরঝর করবে, গায়ে বেদনা হয়ে যাবে।" শুনেই আমার গায়ে ব্যথা হবার যোগাড়। কিন্তু গাড়ি আর বাঁকানো গেল না। ছোকরা গাড়োয়ানটি অতি অবাধ্য। সে কারুর কথাই শুনলে না। ওই শর্টকাটেই চলল। "বাবা বলে দিয়েচে, এই রাস্তা ভাল"—তার মুখে এই এক বাক্যি। পথের মধ্যে বড় বড় গর্ত উঁচু-নিচু খাদ-খোন্দল, যেন মধ্যপ্রদেশের সেই বেহড়ের মিনি সংস্করণ। দুপাশে বড় বড় ঘাসের বন। নাকি নলখাগড়া একেই বলে? কে জানে। জগুর মুখে আর বাক্যি নেই, সে চুপচাপ ছোকরার পাশে বসে আছে। যে-সে রাস্তা তো নয়, যেন চন্দ্রগ্রহের রাস্তা। তখনও অবশ্য চাঁদে মানুষ যায়নি, চাঁদ কেমন দেখতে আমরা জানি না। এখন ভাবতে গেলে মনে হচ্ছে। ভয়ংকর বন্ধুর পথে, গাড়ি টালমাটাল হয়ে চলল। মাঝে মাঝে আমরা আর আমীনবাবুর মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে যাচ্ছে। গর্তে ভরা, কত উপত্যকা, কত মালভূমি। আমাদের গরুরা তার ওপর দিয়ে সার্কাসের কসরৎ করতে করতে চলেছে। আর আমীনবাবু সমানেই বিড়বিড় করে গাল দিয়ে চলেছেন।

বিড়বিড়টা চীৎকারে পরিণত হলো যখন হঠাৎ একটা বিশাল টাল খেয়ে গাড়িটা উলটে পড়ল ঘাসবনের ভেতরে, ঝপাৎ করে জল-কাদার মধ্যে। মহাভাগ্যি আমার, আমি পড়লুম রাস্তার ওপর, শুকনো ডাঙাতে। জগু, সেই রোগা লোকটি আর আমীনবাবু ঘাসবনে। ঘাসবন এতই ঘন যে গাড়ি তাতে আটকে রইল। ওঁরাও। গাড়োয়ান ছোকরার কী হলো কে জানে। সে ছুটে পালাল, আর সঙ্গে সঙ্গে দড়িদড়া ছিঁড়ে পালিয়ে গেল বলদ দুটোও। ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালুম। আমার সর্বাঙ্গে এখন গোলাপজলের গন্ধ, গায়ে মাথায় রস চট্‌চট্‌ করছে। আমার চারিদিকে সেই সমস্ত বড় বড়, চমৎকার, অতি লোভনীয়, গজমোতির মতন মেঠাই ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে। ট্রেনে আমার অত ইচ্ছে করেছিল খেতে, তখন কেন যে আমীনবাবু খেতে দিলেন না। আহা, এখন তো সবটাই নষ্ট।

জগু নামে রোগা লোকটাই আগে উঠল, তারপর আমীনবাবুকে তৃণশয্যা থেকে উৎপাটন করল। গা ঝেড়েঝুড়ে আমার কাছে এসে আমার অবস্থা ভাল করে নিরীক্ষণ করে আমীনবাবু বললেন, "শীতকাল। সন্ধ্যাবেলায় তো ডোবার জলে খোকাবাবুর চান করা চলবে না। দেখি যদি ভিজে গামছা দিয়ে ভাল করে রগড়ে রগড়ে গা মুছিয়ে দিলে রসটা ওঠে। নইলে তো পিঁপড়েতে ছিঁড়ে ফেলবে। এখেনে আবার কাঠপিঁপড়ের রাজত্ব।" একেই আমার সারা গায়ে রসে চিটচিটে, তার চতুর্দিকে ভাল ভাল রাজভোগ গড়াগড়ি খাচ্ছে এবং আমাদের গাড়ি দয়ে পড়েছে, গাড়োয়ানও নেই, বলদও নেই। এর মধ্যে লাল পিঁপড়ে ? হা ভগবান। এখন কী হবে ? আমীনবাবু কাছাকোঁচা গুছিয়ে বেরিয়ে পড়লেন লোকের খোঁজে সেই রোগা লোকটার সঙ্গে।

একটু পরে লোকজন এবং আরেকটা গরুর গাড়ি নিয়ে ওঁরা ফিরলেন। গ্রামে বিরাট সম্বর্ধনা অপেক্ষা করছিল। কিন্তু ছোটবাবুর রসালো মূর্তি দেখে সবাই ঘাবড়ে গেল। ততক্ষণে রসটি শুকিয়ে চুল সব খোঁচা খোঁচা। আমি তো এদিকে পিঁপড়ের ভয়ে মরছি। "যা থাকে কপালে" বলে ডোবার মধ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়লুম। "শীতের সন্ধ্যে" বললে তো কাঠপিঁপড়ে শুনবে না। ওফ্। হাড় হিমকরা ঠাণ্ডা জল। হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে উঠে এসে দেখি মস্ত এক গেলাস গরম দুধ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আমীনবাবু। "ছোটবাবুর" স্বাস্থ্য তাঁর জিম্মায়। আমীনবাবুর ভিজে গামছার সাজেশন আমি গ্রহণ করলাম না বলে তিনি ক্ষুণ্ণ এবং উদ্বিগ্ন। গরম দুধের পরে এবার তো ভাত খেতে বসতে হবে। স্কুলের হেডমাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে আমরা উঠেছি, কিন্তু সেখানে ভাত খাওয়া হবে না। কেননা তিনি অব্রাহ্মণ। আমীনবাবু আমার ভাত খাবার ব্যবস্থা করেছেন এক বামুনবাড়িতে। তখন ভারত স্বাধীন হয়েছে। তবুও বাংলার গ্রামে এরকম কানুন চলত। আমি নেহাৎ ছেলেমানুষ নই কিন্তু জমিদারের নাতি বলে কথা! তাই আমাকে অতগুলি চাল, আর কাঁচা আনাজ ধরে দিয়ে "ঠাকুর, স্বপাকে অন্ন রেঁধে নিন" বলতে পারছে না প্রজারা।

বামুনবাড়িটি মাটির, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দাওয়ায় সুন্দর করে একটি কার্পেটের কাজকরা আসন পেতে, একলা আমাকে সোনার মতন ঝকঝকে কাঁসার থালাতে বামুনগিন্নি ভাত বেড়ে দিলেন। এদিকে ডোবায় চান করে গায়ের রসে টইটুম্বুর ভাবটা কমে গেলেও, শীতের দিব্যি কাঁপুনি লাগছে, গরম দুধেও কমেনি, শালমুড়ি দিয়েও কমছে না। গরম গরম ভাতে ঘি, সাতরকম ভাজা, আর গোল করে থালার ধারে বাটির সারি, তাতে সব তরিতরকারি। একটা মস্ত বড় বাটি থেকে মনে হলো যেন দুটি চোখ আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বেশ সকাতর, করুণ চাউনি। নিশ্চয় মনের ভুল। আঁধার নেমে গেছে, শীতের রাত, দাওয়ায় লণ্ঠন জ্বলছে, তার আবছায়া, গা-ছমছমে আলোর মধ্যে নিশ্চয় ভুলভাল দেখছি। ডোবার জলে ঠাণ্ডা লেগে জ্বরটর এসে গেল না তো ? জ্বরে লোকে প্রলাপ বকে। প্রলাপ দ্যাখেও কি ? যতবার ভাবি আর তাকাবো না, ঠিক ততবারই ওই বাটিটার দিকে চোখ চলে যায়। আর দুটি কাতর চোখের প্রার্থনা নজরে আসে। শেষে মনে হলো এটা

ভুল হতে পারে না।

—"ওই বাটিতে যেন দুটো চোখের মতন কী যেন?"

—"ওঃ ওই চোখ? ও তো পাঁঠার মুড়োর। পাঁঠার মুড়ো চমৎকার রান্না করেন যে আপনাদের বামুনজেঠিমা। খেয়ে দেখবেন, ভালো লাগবে।"

ওরে বাবা! পাঁঠার চোখ? আর সেই পাঁঠা আমাকে সমানে বলছে—"ওগো, আমাকে খেয়ো না, আমাকে ছেড়ে দাও।" ওই বাটি আমি ছুঁলুম না, আর অন্যান্য বাটিও প্রায় না ছুঁয়েই খাওয়া সেরে উঠে পড়লুম, চমৎকার ক্ষীর আর পাটালি দিয়ে খাওয়া শেষ করে। বামুন আর বামুনগিন্নি খুব দুঃখিত। শহরের ছেলেরা কিছুই খায় না। ওদের পেট এইটুকুনি। যেন চড়াইপাখির পেট। হতো একটা গ্রামের ছেলে, ঠিক ওই বয়সের? দেখিয়ে দিত, খাওয়া কাকে বলে। আমিও দেখিয়ে দিতে পারতুম, তবে ওই দুটি চোখকে নয়।

এদিকে আমীনবাবু পথ থেকে কুড়িয়ে সবকটা মিষ্টি তুলে এনেছেন। তারপর সেগুলো ভালো করে মুছে, ঝেড়ে, তাতে বেশ করে ধোয়া ক্ষীরের গুঁড়ো মাখানো হয়েছে। পরদিন সকালে ইস্কুলের উদ্বোধনে ওই মেঠাই বিলি হবে। শুনে তো আমি হাঁ হাঁ করে আছড়ে পড়ি। ও কী কথা? ও কী কথা? সে কখনো হয়? যেই না বলা, অমনি আমীনবাবু খেপে লাল—"ছোটবাবু, সবকথায় কথা বলতে হয় না। তোমাদের হাতে পড়লে জমিদারী আর টিকবে না। সব উড়ে-পুড়ে যাবে। সম্পত্তি রাখা তোমার কম্মো নয়। পঞ্চাশ টাকার মিষ্টি। সব ফেলে দেবো? আমি কি পাগল হয়েছি না আমি বেইমান?"

সকালে উঠে দেখি সেই গাড়োয়ানের ছেলেটা, যে গাড়ি উলটে দিয়ে পালিয়েছিল, বিশাল এক গেলাস দুধ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে করে নিয়ে দেখি গেলাসটা ঠাণ্ডা। মুখে দিয়ে দেখি ব্যাপারটা দুধ না তালের রস। মানে তালগাছের রস। যেমন খেজুরের রস হয়। রোজ সকালে এখানে টাটকা তালের রস খাওয়া অভ্যেস। একটু বেলা পড়লেই সেটা আর রস থাকে না, তাড়ি হয়ে যায়। এরকম খেজুর রস খাবার কথা জানতুম। তালের রস খেয়ে দেখলুম চমৎকার খেতে। গ্রামে বাথরুমের বালাই নেই। ছোকরা আমার সঙ্গে চলল মাঠে, পেতলের গাড়ু করে জল নিয়ে। এক জায়গায় একটা গাছের কাছে এসে বললে—"ছোটবাবু। এই যে, আমরা ব্যাটাছেলেরা এখন যাব ডানদিকে। আর ওই বাঁদিকে ওপাশে মেয়েছেলেরা মাঠে যায়।" শুনেই তো আমার হয়ে গেল। ডাইনে-বাঁয়ে কোনোদিকেই না গিয়ে "থাক। আজ আমার দরকার নেই" বলে আবার সোজা পালিয়ে এলুম। সেখানে এলো লুচি হালুয়া। এটা নাকি খেতে পারি। অন্নটা শুধু ব্রাহ্মণবাড়িতে। তারপর এক গেলাস চা নিয়ে আমি বসে আছি, রোদে পা ছড়িয়ে, একটিমাত্র আরামকেদারায়। কে যেন আমার পায়ের কাছে একটা খালি থালা রেখে গেল। তাতে কিন্তু খাবার-দাবার কিচ্ছু নেই। এখানে সকালে কাগজ আসে না। রীডিং মেটিরিয়াল বলতে সঙ্গে এনেছি 'ডাস ক্যাপিটাল'—ইঁটের মতন বইটা কিছুতেই এগোচ্ছে না। সেটা

নিয়েই বসেছি। হঠাৎ মনে হলো নিচে থালায় টং টং শব্দ হচ্ছে। একটু পরে টের পেলুম গাঁয়ের লোকেরা ওইখানে আমাকে দূর থেকে প্রণাম করছে, আর দু'এক টাকা করে প্রণামী দিয়ে যাচ্ছে। এই তো প্রথম আমাকে তারা চোখে দেখছে। মুখ দেখানি দেবে না? আমি প্রচণ্ড লজ্জিত। আমীনবাবু ধারেকাছে নেই। আমি কোঁচানো ধুতি, সিল্কের শার্ট, সোনার বোতাম পরে, শাল জড়িয়ে বসে আছি। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আসছেন, তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছি। জেলার গণ্যমান্যরা সকলেই এসে গেছেন। গান্ধীটুপি মাথায় জেলা কংগ্রেসের প্রতিনিধি এসেছেন।। আমীনবাবু বললেন —"ইশকুল ওপেন করবেন ডি. এম. সাহেব। তাঁর পরেই তুমি।"

—"আমি মানে?"

—"মানে তুমি বক্তৃতা দেবে।"

—"আমি বক্তৃতা দেবো?"

—"নিশ্চয়ই। তোমার গ্রাম। তোমারই ঠাকুর্দাদার তাতে তৈরি করে দেওয়া গার্লস ইশকুল তোমারই ঠাকমার নামে। তুমি তাতে বক্তৃতা না দিলে মানায়? তোমাকে দু'চার কথা কিছু বলতেই হবে। শিক্ষিত ছেলে তোমরা।"

ম্যাজিস্ট্রেট বাঙালী। তিনি এসে গেলেন। লাল ফিতে কাঁচি দিয়ে কেটে ইশকুল ওপেন করলেন। গ্রামের মেয়েরা শাঁখ বাজাল। সাত-আটটি ছোট্টো বড়ো মেয়ে পরিষ্কার, খাটো লালপেড়ে শাড়ি পরে এসেছিল। তারাই এ ইশকুলের প্রথম ছাত্রী হবে। তারা একপাশে লাইন করে দাঁড়িয়ে ছিল। হেডমাস্টারমশাই তাদের নিয়ে একটা ক্লাসরুমে ঢুকবেন, চকখড়ি, ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড, সবই সাজানো আছে সেই ঘরে। ডি. এম.-এর বক্তৃতার পরই আমাকে কিছু বলতে হবে। ঠাকুদ্দার হয়ে ডি. এম. বেশ সুন্দর করে বললেন স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে মিনিট পনেরো। তারপর আমি। মাইক ম্যাজিক জানে। মাইক দু'হাতে মুঠো করে ধরে আমি উদ্দীপ্ত কণ্ঠে একখানা যা বক্তৃতা দিয়ে ফেললুম, আমি নিজে তাতে হতবাক, উপস্থিত ব্যক্তিবর্গেরও তাতে অপার বিস্ময়। শুধু আমীনবাবু আমাকে হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিয়েছিলেন। আর ডি. এম.ও ফিস্‌ফিস করে ধমকে বলেছিলেন—"সব কথার একটা জায়গা আছে। স্থান, কাল, পাত্র ভুলে গেলে তো চলবে না?" অথচ কথাগুলো আমি যা বলেছিলুম, তাতে শ্রোতাদের উদ্বুদ্ধ, অনুপ্রেরিত হওয়া উচিত ছিল। আপত্তিকর কিছুই বলিনি। আমি বলেছিলাম অবিকল 'স্বাধীনতা'র ভাষায়—"বন্ধুগণ, আমার কিষাণ মজদুর ভাইরা, যুগ যুগ ধরে যারা তোমাদের লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, বঞ্চনা ছাড়া কিছুই দেয়নি, যারা তোমাদের শাসনের নামে শোষণ করেছে, তোমাদের রক্তঢালা ধান কেড়ে নিয়ে যারা শহরে চারতলা বাড়ি তুলেছে, তোমাদেরই মাথার ঘাম পায়ে ফেলা টাকায় যারা শহরের রাস্তায় মোটরগাড়ি হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছে, তোমরা তাদের এত সহজেই ক্ষমা করে দিলে? জমিদারমশাই একটা ইশকুল করেই না হয় দিয়েছেন গাঁয়ের মেয়েদের জন্যে—এটা তো বহুবছর আগেই করা উচিত ছিল। অন্তত একশো বছর আগে। আজ ভারত স্বাধীন হয়েছে। সরকারই এবার গ্রামে গ্রামে ইশকুল গড়ে দেবে।

জমিদারের কৃপার মুখ চেয়ে আর তোমাদের বসে থাকতে হবে না। শাসক ইংরেজ চলে গেছে, কিন্তু তোমাদের শোষণ ঘোচেনি। নিজেদের প্রাপ্য জোর করে দখল করে নিতে হবে।" এতদূর বলেছি, আমীনবাবু জোরে জোরে আমার কাঁধে টোকা দিলেন। আমি গ্রাহ্য না করে বক্তৃতা চালিয়ে যাই।

"জমিদারমশাই ইশকুল করে দিয়েছেন বলেই যেন তোমরা ভুলে যেও না যে জমিদার শোষকশ্রেণী। আর শোষকশ্রেণী কখনোই কিষাণ মজদুরের বন্ধু হয় না, হতে পারে না—" বক্তৃতা শেষ করা হলো না। কনুই ধরে হ্যাঁচকা এক টান মেরে "এবার থামো" বলে আমীনবাবু আমাকে বসিয়ে দিলেন। তখন জেলা কংগ্রেসের সেই ভদ্রলোক উঠে জলদগম্ভীর কণ্ঠে অপূর্ব এক ভাষণ শুরু করলেন। তাতে ঠাকুদ্দার প্রশংসা, ঠাকুদ্দার বাবার প্রশংসা। অজস্র হাততালি পড়ল। তারপরে সেই ক্ষীরের গুঁড়ো মাখানো ধূলিধূসরিত পথে গড়াগড়ি মেঠাই সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে বিতরিত হলো। লোকে বেশ খুশি হয়েই খেল। তাদের পরে কিছু হয়েছিল কিনা জানতে পারিনি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরেই আবার ভাত খেতে বামুনবাড়ি যাওয়া। আজকে সবাই কেমন গম্ভীর। তারপর সেই গরুর গাড়ি চড়ে পূর্বস্থলীর দিকে রওনা। আমি বারবার একটা সাইকেল চাইলুম। গরুর গাড়ির চেয়ে বরং সাইকেলে চলে গেলে সুবিধে বেশি। কিন্তু "ছোটোবাবুকে" সাইকেলে পাঠানোর কথা কেউ কানেই তুলল না। এবার ছোকরা নয়, তার বাবা, আসল গাড়োয়ানই গাড়ি নিয়ে চলল, তার অসুখ সেরেছে। বড় রাস্তা দিয়েই যাওয়া হলো। 'শটকাটে' নয়।

কলকাতায় এসে আমীনবাবু ঠাকুদ্দাকে কী বলেছিলেন জানি না, ঠাকুদ্দা আমাকে বললেন—"ছিঃ, ছিঃ, ওইরকম যাচ্ছেতাই বক্তৃতা দিয়ে এসেছ? আমাদের বাড়ির ছেলে হয়ে? আর কোনোদিন তোমায় কোনওখানে পাঠাবো না।" ঠাকুদ্দা বললেন—

—সেলামীগুলো কৈ?

—সেলামী? সে আবার কী?

—কেন, ওরা থালা রাখেনি? তোমার চেয়ারের সামনে?

—রেখেছিল তো।

—তাতে টাকা পড়েনি?

—হ্যাঁ—টং টং করে অনেক টাকা পড়েছিল।

—সেগুলো গেল কোথায়?

—সে তো আমি জানি না।

—কে জানবে তাহলে?

—থালার কথা আমীনবাবু জানেন।

BanglaBook.org

—ছিঃ ছিঃ তুমি সেলামীটুকুও সামলাতে পারোনি? সেও আমীন জানে? নাঃ। জমিদারী তুমি রাখতে পারবে না। এই তোমার শেষ যাওয়া। আর তোমাকে কখনো পাঠাব না।

ঠাকুদ্দা তাঁর কথা রেখেছিলেন, আমাকে আর সেলামী কুড়োতে কোথাও যেতে হয়নি। কেননা ঠিক তারপরেই, আমারই ভবিষ্যদ্বাণী সফল করে, জমিদারী প্রথা উঠে গেল। কিন্তু সুধারানী মেমোরিয়্যাল গার্লস এখন হাই স্কুল। সম্প্রতি তার পঞ্চাশ বছরের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধনের আমন্ত্রণ এসেছে আমার কাছে। এই আমন্ত্রণ, এক ঔপন্যাসিকের কাছে তাঁর প্রিয় পাঠকদের দাবি। ওরা কি জানে, ওঁদের এই সুধারাণী আমার ঠাকুমা?

নবকল্লোল, এপ্রিল ১৯৯৮

MRIয়মাণ

মেয়ের আমার মেজাজ ভালো নেই।

কেন নেই? না সে চোদ্দোর বদলে আঠারো ঘণ্টা অফিসে থাকতে পারছে না। ওই যে কী একটা বিশ্রি রকম মাথা ঝিন্ ঝিন্, কান রিন্ রিন্, ঘাড় কন্ কন্, হাত-কেমন কেমন, মুখ শিরশির, চোখে ফুলঝুরি, আর এটা ভুলে যাচ্ছি, সেটা ভুলে যাচ্ছি।

—চোখে ফুলঝুরি? ডাক্তার কী বলছে?

—ডাক্তার? হুঁ, আমার বলে মরবার সময় নেই, দেখছো না চটিতে সেপ্টিপিন? মুচির কাছে যাবার পর্যন্ত সময় হচ্ছে না—অর্ধেকদাম ঠোঁট উলটে মেয়ে হেঁট হয়ে চটির সেপ্টিপিনটা ঠিক করে নেয়।

—তুই তো কালাপানির পারে পাঠানো পাথরভাঙা কয়েদিদেরও দুদুভাতু করে ছেড়ে দিলি রে? ঢের ঢের চাকরি দেখেছি ভাই, এমন জিনিস তো—

—আহা, এটা কি পার্মানেন্ট অবস্থা? এখন সেকশনে লোক কম। আরও চারজন এসে গেলেই সব নরম্যাল হয়ে যাবে—

—চা-র-জন? তদ্দিনে তো তুই অক্কা পেয়ে যাবি রে?

উত্তর দেবার প্রয়োজন নেই। ছেঁড়া চটি পায়ে মেমসাব গম্ভীরসে লেংচে লেংচে, খুব ডিগনিফায়েড মাপামাপা পদক্ষেপে, অফিসে বেরিয়ে যান। কখন ফিরবেন কিছুই ঠিক নেই। মাঝে মাঝে ফোন করে অবশ্য মাকে মনোবল সাপ্লাই করবেন। প্রচণ্ড ঘ্যানর ঘ্যানর করে, ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে, অবশেষে জবরদস্তি ধরে

BanglaBook.org

নিয়ে গেলুম। মন দিয়ে কমপ্লেন শুনলেন ডাক্তার। যত্ন করে আপাদমস্তক পরীক্ষা করলেন। তারপরে শুরু করলেন গল্পসল্প।

তুমি কী করো? ক'টা থেকে ক'টা আপিসে থাকতে হয়? উইক এনডে কী করো? শেষ কবে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলে? কবে নতুন শাড়ি, পোশাক কিনেছ? বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডাটাড্ডা কতক্ষণ মারো? উইনডোশপিং-এ যাও? গানটান শুনতে যাও, কনসর্ট-টনসর্টে? তোমার হবি কী? ঘরের কাজ, রান্নাবান্না কে করে? তুমিই? কখন এসব করো?—ডাক্তারের প্রশ্নের চোটে মেয়ের মুখ তন্দুরি হচ্ছে। কিন্তু ভদ্রভাবে জবাব দিয়ে যাচ্ছে। দেখে-শুনে ডাক্তার বললেন, তিনরকম সম্ভাবনা। এক stress at work, দুই চোখের ভেতরে কিছু গ্রোথ পাকিয়ে থাকতে পারে, তিন, নার্ভের বান্ডিলে জট হওয়াও সম্ভব। চোখ এবং স্নায়ু আগে পরীক্ষা করে দুটোই যদি নিষ্কলঙ্ক অপাপবিদ্ধ প্রমাণিত হয়, তবে নিঃসন্দেহে কাজের চাপই এজন্যে দায়ী।

—কারণ যাই হোক, তোমার কিন্তু লাইফস্টাইল বদলাতেই হবে। 'অল ওয়ার্ক নো প্লে' জীবনে কেউ সুস্থ থাকতে পারে না। জীবনযাত্রার প্রণালী বদল করতেই হবে। যদি চোখ বা নার্ভের জন্য এসব না হয়, তবে ওষুধে এর উপশম হবে না। বিশ্রাম চাই। এসব এ যুগের বিশেষত্ব, stress related aches pains, অতএব change your life-style, take it easy, learn to relax, take time off, সিনেমা দ্যাখো, বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে যাও তাদের নেমন্তন্ন করো, গান বাজনা শুনতে যাও, উইক এন্ডে পিকনিকে যাও। Enjoy life. স্মৃতিকে ওভারলোড করলে তার কী দোষ? কাজ কমাও, রিল্যাক্স করো, স্মৃতিও ফিরে আসবে। ব্যথা বেদনা, ঝিন্ ঝিন্ করাও কমবে, অতিরিক্ত ক্লান্তির ফুলঝুরিও চোখ থেকে মুছে যাবে। একটু শরীর মনকে বিশ্রাম দাও, আরাম দাও, ছুটি দাও। Give yourself some rest.—চুপচাপ, ভদ্র, সভ্য, হাসিমুখে বসে মেয়ে বড় বড় চোখ মেলে বয়স্ক ডাক্তারের উপদেশ শ্রবণ করছে। আর আমি তো টের পাচ্ছি, মনে মনে বলছে, রাবিশ্। কিন্তু আমি ডাক্তারের প্রতি অতীব প্রসন্ন। এই কথাগুলোই এতদিন আমি বলছি, কানে তুলছে না। এবার যদি তোলে!

প্রথমে চোখ।

চোখের ডাক্তারের কাছে যেতে গোলমাল করেনি, চোখটা খুবই খারাপ, মাঝে মাঝে যেতেই হয়। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা হলো। না, চোখের জন্যে নয়। কিন্তু স্নায়ু-চিকিৎসকের কাছে যেতে তুলকালাম বাধাল।—কেন, আমি কি নিউরোটিক, যে নিউরোলজিস্টের কাছে যেতে হবে?

—নিউরোটিক হতে হবে কেন? মিগ্রেনের জন্যে কি তুমি যাওনি কলকাতাতে অনুপমবাবুর কাছে? তোমার যে এত ব্যথাবেদনা, ঝিন্ ঝিন্ শির শির, সেসব তো নার্ভের কারণে হতেই পারে? চিকিৎসা হবে না? গেল বটে, কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শটা শুনে বেঁকে বসল।

—ক্ষেপেছ তোমরা? পাঁচ-ছ হাজার টাকা? কেন আমি শুধু শুধু এম আর

আই করাতে যাব? আমার কি ব্রেন টিউমর সন্দেহ করছে?

—ষাট্ ষাট! ও কি কথা ? বলে মনে হল এটা ভুল স্টেপ। অন্য পথ চাই।

—সন্দেহ করছে কি করছে না কেমন করে জানব? এম. আর. আই. সেই-জন্যেই তো করা? যদি না হয়, ওয়েল অ্যাণ্ড গুড। কিন্তু নিশ্চিত হতে হবে তো?

মেয়ে গজ গজ করে বলল—মশা মারতে কামান দাগা! স্ক্যানিং করলেই তো হয়? সেটা অনেক কম খরচ। কিন্তু ততক্ষণে ব্যাপারটা জামাইবাবাজির মাথায় পাকাপাকি ঢুকে গেছে। সে ফিল্‌ডে নেমে পড়ল।

—স্ক্যানিং অতটা ডিটেইল্‌ড হয় না, এম. আর. আই. যত পারফেক্ট। চোখটা এলিমিনেটেড হয়েছে, এবারে নার্ভটা এলিমিনেট করা দরকার—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, চোখমুখ, হাত-পা যা পারিস, সবকিছুই এলিমিনেট করে দে—মার সঙ্গে তুইও আর জুটিস না!

কিন্তু ততক্ষণে জুটে গেছি দুজনে। একদিকে বরের আর একদিকে মায়ের সাঁড়াশি আক্রমণের সামনে বীর নারী শেষ পর্যন্ত দাঁড়াতে পারলে না। তাকে 'আনডার প্রোটেস্ট' ধরে নিয়ে যাওয়া হল এম. আর. আই. ক্লিনিকে।

মেয়ে চুপ।

—কি রে? ভয়-ভয় করছে না তো?

—কী যে বলো না মা? মেয়ের স্বরে ধিক্কার ফুটে উঠল। ভয়? ভয়ের কোনও কারণ আছে? রাগ হচ্ছে আমার। টোটাল ওয়েস্ট কি না! বড়মেয়ের আমার জাঁদরেল বলে নাম আছে। তার দিদিমারই মতন। (মার বড়ই বা নয় কেন?) মেয়ে বাঁ হাত নেড়ে মায়ের বোকা বোকা কথা উড়িয়ে দিয়ে বললে—এটা তো আমার শরীরে স্পর্শই করছে না—ভয় কিসের? কাটা-ছেঁড়া নেই, নল পুরে দেওয়া নেই, অনেকটা এক্স-রে-র মতই, ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স। মেয়ের বাগ্মিতা এক সেকেন্ড আটকে গেল।

—আইটা কিসের জন্যে যেন, মা?

মাকে জিজ্ঞেস করায় অবশ্য মা ধন্য। আজকাল তো মা-ই ওদের সব সময় জিজ্ঞেস করে—জ্ঞান অর্জন করেন। জীবনে আমাদের 'রোল' পালটে গেছে, নতুন জগতে অজস্র নতুন ইনফরমেশন—এই ইনফরমেশন এক্সপ্লোশনের যুগে আমি বেশ পিছিয়ে পড়ছি স্বীকার না করে উপায় নেই। ছোটবেলায় ওরা প্রশ্নে প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুলত আমাকে—এখন আমি প্রশ্নে প্রশ্নে উত্ত্যক্ত করি ওদের। এই একটা জ্ঞান দেবার চান্স পেয়েও হায়, গ্রহণ করতে পারলুম না।

—'আই' কিসের জন্যে আমি কি জানি? 'এম. আর', যে 'ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স' সেটাও তোর মুখেই এই জানলুম। 'আই' বোধহয় 'ইনভেস্টিগেশন'।

ভুল। 'আই মানে 'ইমেজিং'—সেটা জানা গেল ক্লিনিকে ঢুকে।

ওরা মেয়েটাকে একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে চলে গেল। দরজার ওপরে বড়

BanglaBook.org

বড় হরফে লেখা—"MAGNATOM" ...আর হরেক রকমের ছবি আঁকা। ছুরি, কাঁচি, নেলক্লিনার, ঘড়ি, গয়না। এসব বস্তু বাইরে খুলে রেখে দিয়ে যেতে হবে। 'ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স' নইলে সব গুবলেট হয়ে যাবে।

জামাইবাবাজি গটগটিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল যে ঘরে ডাক্তারেরা গুলতানি করছে। রাজপুত্তুর যেমন তলোয়ার নিয়ে রাজকন্যেকে রক্ষা করে, তেমনি এক অদৃশ্য তরবারি বুঝি তার চোখে চমকাচ্ছে। ওই ঘরটাতে তাঁর বউয়ের মগজের অন্দরমহলের চলচ্চিত্র দেখবেন, আর তাই নিয়ে খোসগল্প করবেন ছোকরা ডাক্তারের ঝাঁক, বরমশাই সেখানেই পাহারা দিতে গেলেন। গাড়িতে একবার বউকে ভয় দেখিয়ে বলেছিল—এবারে এক্কেবারে সব ধরে ফেলব। তোর ব্রেনটার ভেতরে যে কী কেলেংকারি কাণ্ড হয়। 'ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগনেটিক ওয়েভে' স-ব আমরা দেখতে পেয়ে যাব। আর তোর উপায় নেই— বউ তখন চুপ করে ছিল। এখন ক্লিনিকে এসে দেখছি বরের মুখটাই যেন বউয়ের চেয়ে বেশি শুকনো।—কী জানি কী দেখব, এই ভয়ে কাঁটা।

অনন্তকাল পরে তো মেয়ে উদয় হলেন। কিঞ্চিৎ পরিশ্রান্ত কিঞ্চিৎ বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। এটা তো মোটামুটি সরল ব্যবস্থা, স্ক্যানিংয়ের চেয়েও সোজা। শিরায় শিরায় রং ভরে দেয় না, যে বিভ্রান্ত দেখাবে। একবার আমাকে সি. টি. স্ক্যান করা হয়েছিল 'ডাই' ঢুকিয়ে শিরাতে। ও বাবা সে কী নেশা! চব্বিশ ঘণ্টা ধরে 'আতাল' হয়েছিলুম। না পারছিলুম নিজে নিজে হাঁটতে, না যুক্তিযুক্ত বাক্যালাপ করতে। চোখেও আবছা দেখছিলুম, মনেও আবছা। রং যেন মোর মর্মে লাগে, আমার সকল কর্মে লাগে —মর্মে মর্মে রং লেগেছিল বটে। কিন্তু মেয়ের তো হবার কথা ছিল না! ওর রক্তে তো রং মেশানো হয়নি ? অবশ্য পিকো নিজে হেঁটেই বেরুল। বেশ স্বাভাবিক। একটু বেশিই গম্ভীর। মা বলেই বোধহয় টের পাচ্ছি, ভেতরে ভেতরে মেয়ে বিচলিত। এমনিতেই রাশভারি। দিম্মার মতন, এখন একটু ভারটা বেশি বলে মনে হচ্ছে।

উদ্বেগ তো হবারই কথা।

যতক্ষণ না রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে, শান্তি নেই। মুখে এতক্ষণ যতই উড়িয়ে দিক, ভাবনা তো হওয়াটাই স্বাভাবিক। ব্রেন বলে কথা। মূল ধরে টান।

এতক্ষণ ধরে 'সোসাইটি' 'স্টারডাস্ট' পড়েছি বলে কি আমারই উদ্বেগ চাপা পড়েছে ?

—কি রে ? কেমন লাগছে ?

—ভালো।

—কেমন হল তোর পরীক্ষানিরীক্ষা ?

—ভালো।

—কী করল ওরা তোকে নিয়ে ঘরের মধ্যে ?

—কিচ্ছু করেনি।

—তা হলে এতক্ষণ কী করছিলি ?

BanglaBook.org

—শুয়েছিলাম।

—কোথায় শুলি আবার? খাট আছে?

—একটা টেবিলে।

—এক্স-রে টেবিলের মতন?

—অনেকটা, একটু আলাদা।

গাড়িতে উঠে বসেছি কথা বলতে বলতে। মেয়ের কথা বলার উৎসাহ খুবই কম মনে হচ্ছে, কিন্তু আমার কৌতূহল প্রচুর।

—বলেছিল কুড়ি মিনিট—লাগিয়ে দিল দেড় ঘণ্টা। ব্যাপার কী?

—অনেকবার করে করল যে।

—কেন, ভুলভাল হয়ে যাচ্ছিল নাকি বারবার?

—কি জানি ?

—কিছু বলল নাকি?

—কি আবার বলবে?

—এই কী দেখল-টেখল?

—কিছু বলেনি।

—রিপোর্ট কবে দেবে?

—কাল।

এবারে বরের মুখ ফুটল।

—তোর ব্রেনে কিছু নেই।

—মানে?

—মানে ছবিতে দেখলাম তো। পুরো ফাঁকা, নো গ্রে ম্যাটার।

—আমিও তো দেখলুম। একটা সরু মতন, লম্বা মতন জিনিস তো ?

—সেটা তোর ব্রেন নয়। ব্রেনের কেমন চেহারা হয় জানিস না? তুই যেটা দেখেছিস সেটা তোর গলা।

—গলা?

—তোর ব্রেনটা অবশ্য গলাতেই। তুই ঠিকই দেখেছিস।

—বাজে বকিস না। মেয়ে এবার জাগ্রত হচ্ছেন।

—কী দেখলি ও ঘরে, সত্যি করে বল।

—বললাম তো? মনিটরে তোর ব্রেনটা খুঁজে পাচ্ছিল না ওরা। ক্রেনিয়মে কিছু নেই। ডানদিকেও ফাঁকা বাঁদিকেও ফাঁকা। তাই তো অতবার করে এম. আর. আই. করল। পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ বার উসুল হয়ে গেছে। খুঁজে বের করতে হবে তো ? সত্যিই নেই, নাকি displaced হয়ে ব্রেনটা ঘাড়ে টাড়ে নেমে এসেছে, —তা সত্যি কোথাও কিচ্ছু নেই। একটা ধ্যাবড়া মতন empty space তোর ব্রেন। নো গ্রে ম্যাটার। রিম ঝিম তো করবেই।

—চুপ কর। ভাল লাগছে না।

BanglaBook.org

ভালো যে লাগছে না সে তো আমিও টের পাচ্ছি। তবে জামাইয়ের ঠাট্টা ইয়ার্কি থেকে আমার মনটা হালকা হয়ে গেছে। নিশ্চয় ভয়ের কিছু নেই মগজে। সাবধানে কথা ঘোরাই।

—শরীর ভালো লাগছে না? টায়ার্ড লাগছে?

—ওই আর কি।

—কেন, ব্যাপারটা কী রকম রে? কষ্টকর? ব্যথা ট্যাথা লাগে নাকি?

—ব্যথা লাগে না তবে খুবই কষ্টকর। চাইনিজ টর্চার টাইপের।

—সে কি রে?

—ওই রকম অবস্থায় রেখে দিলে কারুর ব্রেনই নর্মালি ফাংশন করবে না মা। মোস্ট আনকমফর্টেবল। আমি আর জীবনে এম. আর. আই. করাচ্ছি না। এই শেষ।

—শেষ মানে? এই তো প্রথম। জামাই টিপ্পনি কাটে। —আনকমফার্টেবল কেন? দিব্যি তো চিৎপটাং হয়ে শুয়েছিলি দেড় ঘন্টা। ঘুমিয়ে নিলেই পারতিস।

—ঘু—ম...? গাঁক করে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে পিকো, আমরা কেঁপে উঠি।

—ঘুমুব? কী ভীষণ শব্দ হয় ওর ভেতরে, জানিস? ভয়ংকর সব আওয়াজ হয় কানের মধ্যে খুব জোরে জোরে দারুণ যন্ত্রণাদায়ক, অতি আনপ্লেজেন্ট অভিজ্ঞতা, খুবই স্ট্রেসফুল—আমি শুধু ভাবছিলুম অন্য কেউ হলে কী হত? কোনও বয়স্ক হার্টের রুগী-টুগি হলে বোধহয় মরেই যেত। টেরিফায়িং এক্সপিরিয়েন্স, আই টেল য়ু।

আমার বীরাঙ্গনা কন্যা হঠাৎ টেরিফায়িং বলবে একটা মেডিক্যাল-চেক-আপ-কে? নিজেই বলেছিল কাটা নেই ছেঁড়া নেই স্পর্শ পর্যন্ত করবে না। সবটাই তো যন্ত্র করছে। ছবি তুলছে মগজের কারিকুরির। আর কিছু নিরীহ মনুষ্য পাশের ঘরে কাচের জানলার ওপাশে বসে বসে মনিটরের পর্দায় সেইসব ছবি দেখতে দেখতে গভীর বৈজ্ঞানিক আলোচনা করছে, আর এ বোতাম সে বোতাম টিপছে। এতে ভয় পাবার আছেটা কী? টেরিফায়িং কেন বলল? ঠিক করে সবটা জানা দরকার।

বাড়ি ফিরে ভালো করে এক কাপ চা নিয়ে গুছিয়ে বসলুম। —এবার আমাকে সব খুলে বল দিকিনি, কী কী ঘটল ওই ঘরে? যন্ত্রটা কেমন ধারা? কেন টেরিফায়িং? কিসের ভয়?

চায়ে চুমুক দিয়েই মেয়ে সুস্থ স্বাভাবিক। সহজ গলায় বলল—ভয় কি একটা? এক রকমের ভয়? ভয় নানা রকমের—একটার পর একটা, নতুন নতুন ভীতিপ্রদ, চমকদার সিচুয়েশন—সে ঠিক বর্ণনা করা যায় না। অনুভব করবার জিনিস।

—ও বাবা, শুনে তো মনে হচ্ছে তুই ডিজনিল্যান্ডের টানেল অফ হররসে ঢুকেছিলি। অন্ধকার সরু টানেলের মধ্যে জলস্রোতে ভেসে যাচ্ছিস নৌকোতে চড়ে, হঠাৎ কোথাও হাঁ করে কুমীর মাথা তুলছে, কোথাও হালুম করে বন থেকে বাঘ লাফ দিচ্ছে, কোথাও কঙ্কালের নাচ হচ্ছে, মৃতদেহ খল খল করে হাসছে।

—ঠিক! ঠিক! অবিকল তাই মা! ইট ইজ ইন ফ্যাক্ট আ টানেল। আমাকে

BanglaBook.org

একটা টানেলের মধ্যেই তো শুইয়ে দিল, ভীষণ সরু টানেলটা—আর বুক-চাপা নিচু সিলিং —শুইয়ে দিয়ে আমার মুণ্ডুটাকে একটা শক্তমতন ফ্রেমের মধ্যে আটকে দিল। মুণ্ডুর আর নট-নড়নচড়ন নট কিচ্ছু। ধর যদি উড়ো চুল পড়ে আমার গালে সুড়সুড়ি দেয়, আমি মাথা নাড়তে পারব না। কী ভয়াবহ অবস্থা, ভেবে দ্যাখো মা? আমার তবু তো বয়েসটা কম, বাই নেচার ভীতু নই, সাহসী, বুদ্ধিশুদ্ধিও যথেষ্ট আছে (এখানে আমার জামাই খুক্ খুক্ করে একটা হাড়-জ্বালান হাসি হাসল), হার্ট ঠিক, প্রেসার ঠিক, হাঁপানি নেই, ক্লসট্রোফোবিয়া নেই, মোটামুটি ইন্‌ফর্মড, র‍্যাশনাল লোক—আর মোটাও নই। নর্মাল চেহারা-স্বাস্থ্য, নর্মাল শিক্ষা, নর্মাল স্বভাবচরিত্র—আমারই যদি এই অবস্থা হয় তা হলে অন্যদের কী হবে ভাবো? ধর যদি কেউ মোটা হয় তার তো ভুঁড়ি আটকে যাবে সিলিংয়ে, আর হাতটা ঘষটে যাবে দুধারের দেয়ালে, কারুর যদি ক্লসট্রোফোবিয়া থাকে, তার কথা ছেড়েই দিচ্ছি—হাঁপানি যার নেই তারও হাঁপ ধরবে, হার্ট, প্রেশার সব গোলমেলে হয়ে যাবে—হয়তো অ্যাংজাইটি অ্যাটাক হয়ে মরেই যাবে। কী জানি কেন, সম্ভবত ওই মুণ্ডুটাকে চেপে ধরে গারদবন্দী করে রাখার জন্যেই—দারুণ ইনসিকিয়োর আর হেল্‌পলেস লাগে। বুক ধুকপুক করা শুরু হয়ে যায়। মানে, ভয় পেলে যে রকম হয়, তেমনি আর কি। জানি অকারণ, কিন্তু নার্ভের অটোম্যাটিক রেসপন্স তো যুক্তিতর্কের কারণ মেনে হয় না?

—শরীর বিপদের সংকেত জানায় নিশ্চয়ই তাই ওরকম বুক ধুকপুকুনি—

—আমারই যদি এরকম স্ট্রেন হয়, সব জেনে, সব বুঝে, তা হলে ছোটদের কিংবা বুড়োদের কিংবা সিরিয়াস রুগীদের কিংবা অজ্ঞ মানুষদের, পাড়াগাঁয়ের লোকেদের কী অবস্থা হবে?

—গ্রামের লোকদের নিয়ে ভাবিস না, ওদের আর এম. আর. আই. করতে হয় না, ওরা এম. আর. আইয়ের হেল্‌প বিনাই দিব্যি মরে যায়। জামাই উত্তর যুগিয়ে দেয়। আমি মূল আলোচনার সূত্রে ফেরত যাই।

—তোর মুণ্ডুটাকে তো ফ্রেমে আটকে দিল, তারপর? হাত-পাগুলো বেঁধে দিল নাকি?

—না। তা বাঁধেনি, কিন্তু ওই যে পাশবালিশের ওয়াড়ের মতন একটা টানেলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে, নড়াচড়া তো সবই বন্ধ। সব মুভমেন্ট্‌স রেস্ট্রিকটেড হয়ে গেছে, হাতদুটো ভাঁজ করে দিয়েছে, কোলের ওপর আর হাতের মধ্যে একটা রবারের বল ধরিয়ে দিয়েছে লক্ষ্মণের ফলের মতন। সেটা নাকি অ্যালার্ম বেল। টিপলেই ভ্যাঁপ্পো ভ্যাঁপ্পো করে বেজে উঠবে ওদের ঘরে। কোনও কারণে ওদের ডাকতে হলে ওইটে টিপলেই হল। ওই অত সফিস্টিকেটেড ব্যাপারস্যাপারের মধ্যে এটা ঠিক যেন একটা সাইকেল রিকশার হর্ন।

—যাক, তবু ভালো। একটা যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল। অতটা নিরাপত্তাহীন লাগা উচিত নয়।

BanglaBook.org

—হ্যাঁ, বন্দিনী অবস্থায় জেলের ওয়ার্ডেনকে ডাকবার জন্যে কলিং বেল দিয়েছিল তোকে—জামাইয়ের মন্তব্য চাপা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলি, —তুই তো শুয়ে আছিস টানেলের ভেতরে, হাতে রিকশার হর্ন। ওরা তারপরে কী করল?

—ওরা মানে? ঘরে তো কেউ নেই। সকলেই পাশের ঘরে। কাচের জানলা দিয়ে আমি ওদের দেখতে পাচ্ছি। ওরা মনিটরে আমার ব্রেনটা দেখছে। সেইটেই তো আসল ভয়।

—ভয় মানে কিসের ভয়?

—স্ক্রিনে তো আমার ব্রেনের রিঅ্যাকশনগুলো সব ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ওয়েভে আঁকা হয়ে যাচ্ছে, মা?

—তাতে কী হয়েছে? সেটাই তো টেস্ট করছে।

—ঈশ, এটা কেন বুঝছ না? ফর এগজাম্পল, ধরো যদি আমার ভয় করত? মানে, করতেও তো পারত? একটা স্ট্রেঞ্জ, আনফ্যামিলিয়ার সিচুয়েশনে, কনফাইন্ড অবস্থায়, বিশ্রি একটা যন্ত্রের মধ্যে পরাধীন হয়ে, ভয়-টয় তো করতেই পারে মানুষের? ধরো যদি আমার ভয় করত, তবে তো ডাক্তারগুলো মনিটরের স্ক্রিনে সেই ভয়টা দেখতে পেয়ে যেত। তাই না? সবুজ আলোর কিরিকিরি খোঁচা খোঁচা লাইনে আমার ইলেকট্রনিক ফিয়ার-ওয়েভসগুলো স্পষ্ট স্পষ্ট সব ফুটে উঠছে, আর সবাই সব দেখে ফেলছে—ঈ-শ। কী লজ্জার ব্যাপার, ভাবতে পারছ?

—বাঃ, ভয় যদি করেই, সেটা তুই আটকাবি কেমন করে? সেটা তো কারুর হাতের মধ্যে নয়?

—নয়, কিন্তু একটা চেষ্টা তো অন্তত করা উচিত? যাতে ভয় না করে? ভয়টা জমাতেই যাতে না পারে? আমি সেই চেষ্টাটা করছিলুম।

এবার সত্যি খুব ইমপ্রেসড হই—আজকালকার ছেলেমেয়েরা কত কী জানে। আগে থেকেই ভয়ের গোড়া কেটে রাখছে। অপূর্ব। গর্বে আমার বুক ফুলে উঠল।

—কেমন করে চেষ্টা করলি? ভয়টা রুখতে পারলি?

—হুঁ, তা পারছিলুম বইকি। একদম গোড়াতে ছাড়া। মেশিনের মধ্যে দিল তো ঢুকিয়ে, তারপর কী বীভৎসই সব আওয়াজ শুরু হল মা! পিলে চমকানো শব্দ। আমি ঠিক করে নিলুম আমি একটা শব্দেও ভয় পাবো না। শব্দগুলো যতক্ষণ অপরিচিত, রহস্যময় থাকবে, ততক্ষণই হয়তো ওই ওরে বাবা রেসপন্সটা আসবে। কিন্তু শব্দগুলোকে আমি যদি আইডেনটিফাই করতে পারি কোনও ফ্যামিলিয়র সাউন্ড হিসেবে, তা হলে আর ওই ভয়ের প্রতিক্রিয়া হবে না। পরিচিত পৃথিবীর বহু চেনা শব্দে তো আশ্চর্যের কিছু নেই, ভীতিরও নয়। এবার যত শব্দ হবে, আমি আমার কোনও একটা বহু পরিচিত আওয়াজের সঙ্গে সেটাকে মিলিয়ে নেব।

প্রথমেই 'গাঁক' করে বিকট জোরে একটা শব্দ হতেই ভয়ে চমকে উঠেছিলুম। তারপর এই প্ল্যানটা ঠিক করে নিলুম। মনে মনে তৈরি হয়ে গেলুম ওই রকমের

শব্দ আরও অনেক হবে। ওটাই হয়ে থাকে। এটা 'মাইক টেস্টিং' হচ্ছে। তারপর অন্য এক রকমের শব্দ হবে। সেটা হয় তো ছন্দোময় হবে, সুরেলাও হতে পারে। 'মাইক টেস্টিং'টা গাঁক গাঁক্ করে বার কয়েক হল। তৈরি থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেকবারই বুক ধড়াস করে উঠছিল। তারপর এল ট্রেন। ট্রেনের মতন ছন্দে ছন্দে ঝিক্‌ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্...আমি ধরে নিলুম লম্বা একটা রেলগাড়ি যাচ্ছে। যাচ্ছে, যাচ্ছে, ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্... হঠাৎ শব্দটা বদলে গেল, একটা গড় গড় গড় ...শব্দ হতে লাগল। আমি ভেবে নিলুম রেলগাড়িটা ব্রিজের ওপর উঠেছে। খানিক গড় গড় —তারপরই হঠাৎ নিঃশব্দ। সব সুনসান। কোনও শব্দ নেই। একটু পরে শুরু হল। টুং টাং টুং টাং ... আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি পিংপং বল লাফাচ্ছে, অন্ধকারের মধ্যে শূন্যে একটা ফ্লুওরেসেন্ট শাদা বল হঠাৎ শব্দটা থেমে গেল। পিংপং বল নেই, শুধু অন্ধকার।

—অন্ধকার? ঘরে আলো ছিল না?

—আমি তো চোখ বুজে শুয়ে আছি। তাই অন্ধকার। চোখ খুললে তো দেখব চোখের পাতা সিলিংয়ে ঠেকছে। আর চারিদিকে গোল হয়ে ছাদ গড়িয়ে নেমে এসে আমাকে ঘিরে ফেলেছে। এটা কি চোখ মেলে দেখবার বস্তু?

—তা অবশ্য নয়। হ্যাঁ—পিংপং বলের নৃত্য তো থেমে গেল। এবারে? এর পরে কী হল?

—তারপরে জেনারেটর চলল।

—সে কি? অ্যাঁ? এতবড় জটিল ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, সেসব লোডশেডিংয়ে আটকে যায়? জেনারেটরে যে টেস্টের রেজাল্ট ভুল হয়ে যাবে না তার কী গ্যারান্টি? দিল্লি বিদ্যুৎ নিগমের কিনা এই অবস্থা খোদ রাজধানীতে? ছি ছি, পাঁচ হাজার—

—"আঃ হা, মা, সত্যি সত্যি কি জেনারেটর চলল না কি? তুমি কী হয়ে যাচ্ছ, মাগো? তোমার সঙ্গে তো কথা বলাই কঠিন। পিংপং বল কি সত্যি লাফাচ্ছিল?"

—তা কেন, ওটা তোর ভিজুয়াল ইম্যাজিনেশন—

—সেটা মাথায় ঢুকল, তো জেনারেটরটা কেন ঢুকল না? জেনারেটর চলেনি, একটা নতুন ঘট ঘট ঘট ঘট শব্দ হচ্ছিল, আমি সেটাকে মনে মনে ধরে নিলুম —এটা বেশ জেনারেটর চলবার চেনা আওয়াজ। এইভাবে প্রত্যেকটা শব্দকে আমি আমার চেনা কোনও শব্দের সঙ্গে আইডেন্টিফাই করে ফ্যামিলিয়ারাইজ করে নিচ্ছি আর কি! যাতে করে অপরিচয়ের ভয়টা কেটে যায়—সিম্পল। বুঝতে পারছ না?

—কেন পারব না? সত্যি সত্যি কি ঘরের মধ্যে ট্রেন ঢুকেছিল ভেবেছিলুম? তবে তোদের দিল্লিতে এমনই অতিরিক্ত লোডশেডিং হয় (আহা, তোদের তো ডঃ শঙ্কর সেন নেই) তাই ভেবেছি জেনারেটরের কথাটা বুঝি তোর গল্পের বাইরে। তা বেশ, ঘট ঘট ঘট ঘট করে জেনারেটর চলছে—

BanglaBook.org

—বেশ অনেকক্ষণ চলবার পরে সেটা বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ বিরতি। আমি ভেবেছি কুড়ি মিনিট বোধহয় হয়ে গেছে—অমনি একটা গিরিগিরিগিরিগিরি'—

—গিরি-গিরি-গিরি-গিরি ?

—হ্যাঁ অনেকটা পুরনো এ.সি. চলবার মতন শব্দ। পুরনো এসিগুলোয় এক-রকমের শব্দ হয় না ?

—একরকম কেন ? পুরনো এ. সি. থেকে তো রকম বেরকমের শব্দ হয়। মার সুরফ্রিজটা শেষ জীবনে ঢম্ ঢম্ করত, ডাক্তার পালেরটা ঘটাং ঘটাং করে, ভেতরের ফ্যানটা বোধহয়— এ বিষয়ে আমার অনেক বক্তব্য ছিল, মেয়ে থামিয়ে দেয়। —সেও হয়েছিল। টেবিল ফ্যানের ব্লেড যদি বেঁকে গিয়ে ফ্রেমটার সঙ্গে ধাক্কা খায় তা হলে একটা খটাং খটাং হয় না ? গিরি-গিরির পরে ওইটে হয়েছিল। বেশ রেগুলার ইন্টারভ্যালে হচ্ছিল, কিন্তু ওটা চলবার সময়েই আর একটা আওয়াজ আরম্ভ হয়ে গেল, আর গোলমাল বাধল সেইটেই।

—গোলমাল ?

—হ্যাঁ, মানে খটাং খটাং বন্ধ হয়ে গেল কিন্তু চিড়-চিড়-চিড়-চিড় বন্ধ হল না। শব্দটা কেমন জানো মা, ওই যে ইলেকট্রিক ড্রিল কিম্বা ইলেকট্রিক করাত চালানোর সময়ে যে নীল স্পার্কস বেরোয়, আর তখন একটা চিড়িক্ চিড়িক্ শব্দ হয় ? বুঝতে পেরেছ ? ঠিক সেইরকম। আমি তো টের পেয়ে গেছি নির্ঘাৎ শর্ট সার্কিট—শর্ট সার্কিট হলেও ওরকম চিড়-চিড় শব্দ হতে দেখেছি। এবার আগুন লেগে যাবে, আর আমি এখানে বন্ধনদশায় পুড়ে মরব, পড়তে চড়তে পারব না। আমি কি ওদের জানিয়ে দেব, যে শর্ট সার্কিট হয়েছে ? প্যাঁক প্যাঁক হর্নটা বাজিয়ে দেব ? ওরা আসবে। এসে জিজ্ঞেস করবে—'ইয়েস ম্যাডাম ? হোয়াট ইজ ইট ?' আমি বলব—'নো রীজন টু প্যানিক, বাট দেয়ার্স আ শর্ট সার্কিট সামহোয়্যার' —লোকটা মৃদু হাসবে। হেসে বলবে,—'নট টু ওয়ারি ম্যাডাম, এভরিথিং ইজ আলরাইট।' বলে কৃপাদৃষ্টি হানবে। কেননা ওরাই তো সব ব্যাপারটা কন্ট্রোল করছে, শর্ট সার্কিট হলে ওরাও টের পেত। অতএব সম্ভবতই শর্ট সার্কিট হয়নি। সম্ভবতই এই চিড়্-চিড়্ও ওদের 'স্বাভাবিক' আওয়াজ। ওরই মধ্যে আমার এটাও খেয়াল হল, যে যদি সত্যি সত্যিই ভয়ংকর কিছু ঘটে, ধরো আমার যদি শরীরটরির খারাপ লাগে, তখন বেল বাজালে ওরা ভাববে প্যানিক করছি, হেলেদুলে ধীরে সুস্থে আসবে। পালে বাঘ পড়বার কাহিনী রিপিটেড হবে। তার চেয়ে বাবা চুপচাপ শুয়ে থাকাই ভালো। বুকের ওপর ভাঁজ করা দুটো হাত, মাথার চারপাশ আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা ফ্রেম, নাকের ডগায় ছাদ ঠেকে যাচ্ছে। এই চমৎকার অবস্থায় শুয়ে শুয়ে ভালো কিছু ভাববার চেষ্টা করি বরং। চিড়্ চিড়্ শব্দটা অভ্যেস হয়ে গেছে। এতক্ষণে অফিসে থাকলে কী কী কাজ করা হয়ে যেত—ভাবছি, হঠাৎ ট্যাঁ— করে তীব্র একটা হুইসিল, পিলে চমকান শব্দ। হুইসিল দেওয়া কেটলিগুলো যেমন আওয়াজ করে—তেমনি। একবার নয়, বারবার প্রত্যেকবারই মনে করি 'এই শেষ'— আবার— ট্যাঁ—! যেবার

মনে মনে রেডি হয়েছি, ওয়েট করছি কখন ট্যাঁ হবে, আর হল না। সব নিস্তব্ধ নিশুতি। একটুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে শুরু হল ছোট্ট একটা শব্দ। মৃদু, স্পষ্ট। টুক্ টুক্...টুক্ টুক্...এই মনে কর মার্বেলের গুলি যদি কেউ মেঝেয় বাউন্স করে, তা হলে যেমন আওয়াজ হবে, তেমনি।

দিব্যি চলছিল, টুকটুক...বেশ সুদিং আওয়াজ, হঠাৎ কান ফাটিয়ে বিকট শব্দ ঘ্যাঁ-অ্যাঁ-চ্ ভীষণ জোরে ব্রেক কষবার মতন। ভাবলুম যাক বাবা মেশিনটা এবার অফ্ হয়ে গেল। তা নয়, তক্ষুণি আবার ঘাঁক্ করে হেঁচকি তুলে মেশিন শুরু হবার লক্ষণ। বিশ্রি জোরে। হয়েই বন্ধ। অনেকক্ষণ কোনও শব্দ হচ্ছে না। কানের ভেতরে আমি নিজেরই শরীরের ভাইব্রেশেনের শব্দ ন-ন-ন-ন-ন-ন শুনতে পাচ্ছি। সর্বক্ষণই আমি দেহে মনে, অর্থাৎ কানে-মনে, বীভৎস, অশ্রুতপূর্ব কোনও আওয়াজ শোনবার জন্যে প্রস্তুত, এবং শোনবামাত্র সেটাকে কোনও চেনা আওয়াজে শব্দান্তরিত করে ফেলতে রেডি।—ভয়ের কিছু নেই, এটা একটা এম.আর.আই করবার মেশিন মাত্র —আমি স্বেচ্ছায় এর মধ্যে ঢুকেছি, কেউ জবরদস্তি আমাকে বন্দী করে এখানে পুরে দেয়নি, এই যন্তরটা মধ্যযুগীয় নৃশংস শাস্তির কোনও বর্বর কলকব্জা নয়, আধুনিক বিজ্ঞানের মানব হিতৈষণার দীপ্ত উদাহরণ, একটু আধটু শব্দটব্দ তো হবেই, একটাই মাত্র ইন্দ্রিয়ের ওপর চাপ দিচ্ছে, বাকি চারটেকে তো শান্তিতে রেখেছে —আর কতক্ষণই বা?

এমনি সময়ে আমার মনে একটা ভয়াবহ সম্ভাবনা উদয় হল।

রোজ রোজ কাগজে পড়ছি দিল্লিতে দিনে দুপুরে সশস্ত্র ডাকাতি হচ্ছে—ব্যাংকে, বাড়িতে, দোকানে। ডাক্তারের ক্লিনিকেই বা হবে না কেন? এখানেও তো প্রচুর কাঁচা টাকার লেনদেন হচ্ছে রোজ। কত মূল্যবান যন্ত্রপাতির ছড়াছড়ি। ধর যদি এখন ডাকাতেরা এসে ও ঘরের লোকজনগুলোকে বন্দুক দেখিয়ে বন্দী করে ফেলে, দিস ইজ আ হোল্ড আপ বলে ? আমার কী হবে তখন? কেউ তো জনতেও পারবে না এই ঘরে এই সরু টানেলের মধ্যে আমি শুয়ে রয়েছি। এইখানেই আমি আটকে থাকব, থেকেই যাব। ইনডেফিনিটলি যতক্ষণ না আমার বর ছাড়া পাচ্ছে কোনও রকমে, এবং এসে আমাকে এই যন্ত্র থেকে উদ্ধার করছে। এই ভেবে আমার ভয় ভয় করতে শুরু করেছিল, এমন সময়ে একটা হাড় হিম করা চাপা টিক-টিক-টিক-টিক শব্দ শুরু হলো। সিনেমায় দেখেছি, এই শব্দটা টাইম বোমার। শব্দটা চলতে লাগল...এই ক্লিনিকটা কাদের? আমরা কি তবে সাবোটাজের শিকার হয়েছি?

—কোনও টেররিস্ট অ্যাকটিভিটি চলছে কি এখানে? কে জানে কারা কোথায় কী রেখে গেছে—শব্দটা বাড়তে থাকে—ঠিক ঘড়ির মতন শব্দ—কিন্তু ঘড়ি নেই —মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে শব্দটা পাল্টে গেল। ঝিনি ঝিনি ঝিনি ঝিনি করে একটা মৃদু মেটালিক সাউন্ড, কাঁসার বাসনে ধাক্কা লাগলে যেমন একটা ঝঙ্কার বাতাসে লেগে থাকে, তেমনি একটা কাঁপন আমার মাথার ভেতরে

বাজতে লাগল। বাজতে বাজতে অকস্মাৎ একটা সিরিয়াস সমস্যা আমার মনে এল। রীতিমত উদ্বেগজনক—এতক্ষণ যেসব কথা মন হচ্ছিল এটার কাছে সেসব কিছুই নয়। মনে হল, এই যে এতক্ষণ ধরে আমি আমার ব্রেনটাকে ম্যাগনেটিক ফিল্‌ডের সামনে পেতে দিয়েছি এর ফল তো পরে নিদারুণ হতে পারে।

—অ্যাঁ ? কী বললি ? নিদারুণ ফল হতে পারে ?

এতক্ষণ চুপচাপ মুগ্ধ হয়ে মেয়ের অসাধারণ শব্দকল্পদ্রুম শুনছিলুম আর মনে মনে তারিফ করছিলুম। —'কী দারুণ কল্পনাশক্তি মেয়েটার—শব্দ আর দৃশ্যকে কি চমৎকার মেলাতে পারে—আর বর্ণনার ক্ষমতাই বা কেমন তুলনাহীন।' এবারে বুকের মধ্যে ছাঁৎ করে উঠেছে।

—কী আবার নিদারুণ ফল হতে পারে রে ?

—ব্রেন-ড্যামেজ। ব্রেন-ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে। একটা ম্যাগনেট কাছে নিয়ে গেলে কম্পিউটর পর্যন্ত গোলমাল হয়ে যায়, ঘড়ি নষ্ট হয়ে যায়, ইলেকট্রনিক জিনিসপত্তর সব ধ্বংস করে দিতে পারে ম্যাগনেট—আর ব্রেনের মত এমন একটা সূক্ষ্ম, ডেলিকেট মেকানিজম কি আর অ্যাফেকটেড হবে না ? চুম্বকের টানে পড়ে ব্রেনের ভেতর কে জানে কী হচ্ছে ? একেবারে পার্মানেন্ট ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে ব্রেন-সেল্‌সের।

—রি-ল্যাক্স, পিকো, তোর ব্রেনের ওই ভয়টা নেই। ও যা ড্যামেজড হবার আগেই হয়ে গেছে— বরের মুখের সান্ত্বনা বাক্য শেষ হল না, বউয়ের ড্যামেজড ব্রেন থেকে বুলেটের মত উত্তর ছিটকে এল— তা নইলে গাধা তোকে বিয়ে করেছি ? আমি তাড়াতাড়ি অন্য কথা বলি:

—'আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। কী বলছিলি তুই, ব্রেন ড্যামেজের কথাটা ?

—বলছি। অন্য যেসব ডেনজার, মানে ওই চিড় চিড়, অর্থাৎ শর্ট সার্কিট, কিম্বা ডাকাতের স্টিক আপের ভাবনা, কিম্বা টিক টিক, মানে টেররিস্টদের টাইম বম্ব—এগুলো তো কেবল পসিবিলিটিজ, সম্ভাবনা মাত্র, বিভিন্ন যুক্তিযুক্ত কল্পনা। কিন্তু ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং করাতে গিয়ে মুণ্ডুটাকে যে ম্যাগনেটিক ফিল্‌ডের সামনে ধরে দিয়েছি সেটা তো কল্পনা নয়, সম্ভাবনাও নয়, বাস্তব ঘটনা। এখন আমার মস্তিষ্ক কোষের ওপরে, ব্রেন সেল্‌সের ওপরে, চুম্বকের এফেক্ট নিশ্চয়ই হচ্ছে, এবং তা থেকে রক্ষা পাবার কোনও উপায়ও আমার জানা নেই। এখন যদি এইজন্যে আমার মগজের যাবতীয় পজিটিভ নেগেটিভ ব্যালান্স গড়বড় হয়ে যায়,

—তোর মগজের যন্ত্রপাতি আবার কবে ঠিকঠাক ব্যালান্স ছিল ?—স্বামী সন্দেশ।

—তুই থাম—তুই আর কথা বলিস না। তোর জন্যেই তো হল। মার কথায় নেচে উঠে তুইই তো এইখানে ধরে আনলি আমাকে! আগামী দশ বছরের মধ্যেই যদি আমি সিনাইল হয়ে যাই তা হলে তুমি দায়ী, বুঝেছ অপু ? আমার ব্রেন সেল্‌সের যদি প্রি-ম্যাচিওর এজিং শুরু হয়, তা হলে তো আর্লি সেনিলিটি সেট-ইন করতেই পারে ? এই ম্যাগনেটিক ফিলডের কতখানি ক্ষতি করবার ক্ষমতা কেউ তা জানে ?

—শুধু শুধু অত ভয় পাসনি মা। কত লোকের তো এম.আর. আই. হচ্ছে, কই ব্রেন ড্যামেজের কথা ত শুনিনি?

—এত আগে শুনবে কেমন করে? ছোটবেলাতে কি তোমরা জানতে যে বারবার এক্সরে করলে রেডিয়াম এক্সপোজারে মানুষের শরীরে ক্যানসারের ভয় আছে? আস্তে আস্তে জানা যাবে, সময়কালে জানতে পারবে। ততদিনে হয়তো আমি আলজাইমার, কি পার্কিনসনে ভুগছি।

—চুপ কর পিকো! ছিঃ ছিঃ, যা মুখে আসে তাই বলবি? সত্যি তোর মাথাটা বেশ বিগড়েছে দেখছি, ব্রেনটি ভালই অ্যাফেকটেড হয়েছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দিব্যি টের পাওয়া যাচ্ছে।

—কিছুই টের পাচ্ছ না তোমরা। আমিই কি সবটা বুঝিয়ে বলতে পারছি? ...যখন ওই ট্রামের ঘন্টির মতন টিং টিং টিংটা চলেইছে, চলেইছে, আর আমার মনে হচ্ছে আমি ট্রামের মধ্যে শুয়ে শুয়ে এসপ্ল্যানেড-টু-জোকা, আর জোকা টু-এসপ্ল্যানেড, যাচ্ছি-আর-আসছি —হঠাৎ আমার দিব্যজ্ঞানের উদয় হল।

—আবার দিব্যজ্ঞান? অনেকবার তো বিভিন্ন পার্থিব-অপার্থিব জ্ঞানের উদয় হল তোর—আর জ্ঞান দিসনি পিকো, চা খা...

বরের কথা পুরো ইগনোর করে পিকো বলল—আমি বুঝলাম, এতক্ষণ ধরে আমার যা যা ভয় করছিল সবই ভুল। অত ড্রামাটিক কিছুই ঘটবে না। টাইম বোমাটা ফাটেনি, জলে ডুবে গেছে, ডিটোনেটেড হয়ে গেছে। ডাকাতদের বয়ে গেছে এম. আর. আই. ক্লিনিকে আসতে, আর শর্ট সার্কিট হলেও এরা সেটা টের পাবে আমার অনেক আগেই। ব্রেন ড্যামেজের দুর্ঘটনাটা ঘটে যাচ্ছে, এবং ইররিভার্সিব্ল, —কিন্তু ওটার ফলাফল জানতে হলে বেঁচে থাকতে হবে দূর ভবিষ্যতে। সম্ভবত তার আর সুযোগ আসবে না। এই যে আমার মাথাখানাকে মোস্ট আনকম্ফর্টেবল পজিশনে চাদ্দিকে ফ্রেম দিয়ে এঁটে রেখেছে, বিভীষিকাবক্সে আসামির মাথা পুরে দেওয়ার মতন, কিংবা গিলোটিনে,—কেবল ওখানে লোকেরা হেঁটমুণ্ডে থাকে, আমি এখানে উটমুখো হয়ে আছি। এবং সেইটেই বিপজ্জনক। এই যে আমি কাশতে পারছি না, হাঁচতে পারছি না, এটাই তো ফেটাল হতে পারে। এখন যদি আমার শ্বাসনালীতে বে-মক্কায় থুতু আটকে যায়? আমি কী করব? না পারব গিলে ফেলতে না পারব তুলে ফেলতে। হঠাৎ যদি বিষম লেগে যায়, আর বিষম লাগার সময়ে আমার যদি হাতের প্যাঁক প্যাঁকটার কথা মনে না পড়ে? তা হলে তো অমি গলায় থুতু আটকেই মরে যাব? থুতু গিলতে বিষম লেগে মরে যাওয়াটা কোনও হিরোয়িক ডেথ নয়, ট্রাজিক ডেথও নয়, গ্রোটেস্ক। লোকে বলবে, 'আনফরচুনেট', বলবে 'টু ব্যাড', মনে মনে হাসি পাবে, কিন্তু হাসবে না। সেই টোকিওতে ডিনার টেবিলে গলায় হাড় আটকে বাঙালি এয়ার মারশ্যাল প্রাণত্যাগ করেছিলেন—আর এই এম. আর. আই. টেবিলে গলায় থুতু আটকে আমি প্রাণত্যাগ করব—তিনি বন্দী ছিলেন এটিকেটের ফ্রেমে, আমি বন্দী বিজ্ঞানের ফ্রেমে। থুতু গিলতে গিয়ে মরেছে—শুনলে লোকে বলবে কী? এরা কেউ দোষী হবে না। এভাবে মরে যাওয়াটা হবে, নট

উইথ আ ব্যাঙ্ বাট আ হুইস্পার—যত এসব ভাবছি ততই গলা যাচ্ছে শুকিয়ে আর ক্রমশ মুখে থুতু জমে উঠছে—এমন অবস্থায় একজন লোক টানেলের ওদিকে হাসিহাসি মুণ্ডু বাড়িয়ে বলল—

—থ্যাংকিউ ম্যাডাম, ইটস ওভার। তারপর আমাকে বের করে নিল ট্রে সুদ্ধ টেনে। ব্যস। হয়ে গেল। বাঁচা গেল। এতক্ষণে মেয়ে হাসল। আজকের দিনের প্রথম হাসি।

—ট্রে-সুদ্ধ টেনে? ট্রে মানে?

—আহা, আমাকে তো একটা ট্রেতে শুইয়েছিল প্রথমে?

—ট্রে-তে শুইয়েছিল? কী রকম ট্রে? স্ট্রেচার বল?

—ধুৎ, স্ট্রেচার কেন হবে, ট্রে। ট্রে। প্লাস্টিকের ট্রে। লম্বা মতন। একটা মানুষের মাপে। ওটা ট্রে-ই।

আমার মাথায় বিদ্যুৎচমকের মত একটা দৃশ্য ঝলসে উঠল। খুব পরিচিত দৃশ্য।

—লম্বা মতন ট্রেতে শুইয়ে, তোকে একটা সরু মতন টানেলের মধ্যে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল?

—হ্যাঁ, টানেলটার ভেতরে আলো জ্বলছে—দেখা যাচ্ছিল—

—আবার আলোও দেখা যাচ্ছিল? বলিস কী রে? অ্যাঁ? আমি আঁতকে উঠি। —ওরে পিকো। তোকে ওরা একটা ট্রেতে শুইয়ে হাতদুটো কোলের ওপর ভাঁজ করে দিয়ে সরু বন্ধ টানেলের ভেতরে পুরে দিল? টানেলের মধ্যে আলো জ্বলছিল। ওরে বাবা রে কী ভয়ংকর কাণ্ড!

এতে কার না আতঙ্কে হাত পা শিঁটিয়ে যাবে। শুধু ঢোকালেই তো আমি ভয়ে মরে যাব—অত শব্দ টব্দ শুনতে হবে না, কেবল প্রণালীটাই যথেষ্ট। এ যে হুবহু বিদ্যুৎচুল্লিতে বডি পুরে দেবার প্রসেস রে। ট্রেতে শুইয়ে, বুকের ওপর হাত দুটো সরু টানেলের ভেতরে ঠেলে দেওয়া, টানেলের ভেতরে আগুনের আভা...এ তো ক্রিমিনাল। এ তুলনা যার মনে আসবে, তক্ষুনি সে হার্ট ফেল করবে। আমি লাফ দিয়ে গিয়ে আমার একমাত্র বড় মেয়েটাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরি।

—ষাট ষাট... ওরে আমার সোনা রে, ভাগ্যিস তুলনাটা তোর মাথায় আসেনি? এতই উর্বর কল্পনাশক্তি তোর মগজে গিজগিজ করছে, এটা মনে পড়লে মরেই যেতিস।—মেয়ের বদলে জামাই মন্তব্য করল:

—হয় তো সাবকনশাসে এটাই মনে পড়েছিল, তাই অত রকমের কনফিউজড ডেনজার সিগন্যাল দিচ্ছিল ওর ড্যামেজড ব্রেন সেলস—এইসব কারিকুরি তো দেখছিলাম আমরা মনিটরের স্ক্রীনে—ব্রেনটা তো গড়ের মাঠ, যেটুকু গ্রে ম্যাটার আছে, তা সবটা ভয়ে বরফ হয়ে গেছে—সবুজ রঙের খোঁচা খোঁচা, কিরিকিরি লাইনে আমরা সবাই মিলে ওটাই তো দেখছিলাম, পর্দায় তোর ইলেকট্রনিক ফিয়ার ওয়েভস-এর লম্ফঝম্ফ—এবার সত্যি সত্যি মেয়ে তেড়ে গেল তার বরের দিকে, বর ছুটে পালাল তার পড়ার ঘরে।

আর আমারও এতক্ষণে খেয়াল হল: ওই ঘরের দরজায় লেখা ছিল

MAGNATOM— ওটা MAGNATOMB এর মতো শুনতে, এবং 'M.R.I. ম্'হয়।

শারদীয় দেশ, ১৯৯৭

কান্যকুব্জের রাত্রি

[এই গল্পটি আমার দিল্লির জার্নালিস্ট বান্ধবী মাহ্‌মুদা আমাকে বলেছিল। বছর দশেক আগেকার কথা। মাহ্‌মুদার গল্প আমি তারই মুখে বসিয়ে দিলাম।]

মাহ্‌মুদার গল্প

আমরা কয়েকজন সাংবাদিক সেবারে গিয়েছি উত্তরপ্রদেশের ইলেকশন কভার করতে। আমরা যাবো লখনৌ থেকে ফারুকাবাদ। পথে চারটে মীটিং হবে। রাত্রিবাস কনৌজে। তিন ঘন্টার স্টপ। নেতারা যাচ্ছেন হেলিকপ্টার করে। পেছু পেছু আমরা। ওঁরা আগে আগে পৌঁছে যাচ্ছেন, আমরা ঘন্টাখানেক, ঘন্টা দেড়েক বাদে। তারপর মীটিং হচ্ছে, সাংবাদিকরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে এক একটা গাড়ি ভাড়া করে যাচ্ছি, দু'তিনজন করে এক একটা গাড়িতে। আমি, আর ফোটোগ্রাফার প্রদীপ বাসু, আমরা একসঙ্গে যাচ্ছি। আমাদের গাড়ির ড্রাইভার আব্দুর রহমানের বয়েস ত্রিশ-বত্রিশ হবে, খুব চমৎকার ছেলে। আমাদের সঙ্গে দিব্যি জমে গেছে। ঠিক ঠিক ধাবাতে গাড়ি থামাচ্ছে, আমার জন্যে সুন্দর চা, প্রদীপের ঠাণ্ডা বীয়ার, সব ঠিকঠাক পাওয়া যাচ্ছে, আর রহমান তো গল্প করেই আমাদের জমিয়ে দিচ্ছে। রহমান বলছে আজকাল এত হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা কেন হয়। হিন্দু-মুসলমান তো সত্যিই ভাই ভাই হয়ে বাস করে আসছে জন্ম জন্ম ধরে। হিন্দু-মুসলমানের প্রেমপ্রীতির প্রয়োজন নিয়ে সর্বত্র নেতারা এত লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিচ্ছেন, অথচ এই যে প্রেমপ্রীতির অভাব আজকাল দেখা দিয়েছে সে তো ঐ নেতাদের জন্যেই। রাজনীতির চাল চেলে মানুষের বুকে ঘৃণা বিদ্বেষ ঢুকিয়ে দিয়েছিল এই নেতারাই—নিজেদের সুবিধে হবে বলে। এখন সেই বিদ্বেষ এমনই মরণবাড় বেড়েছে, যে নেতারা নিজেরাই আর সামাল দিতে পারছে না। নিজেদেরও যখন ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে, তখনই এসেছে "প্যার করো" বলতে। অথচ প্যারের কোনো অভাব ছিল না একদিন। রহমান বলল—"এই যে গাড়িটা আমি চালাই, এ এক লখনৌয়ের হিন্দু রাজাবাবুর গাড়ি। তাঁর দয়াতেই আমি মানুষ। আমার যা কিছু সব তাঁর জন্যে। আমার বাবা তাঁর বাবার ঘোড়ার সহিস ছিলেন। আমার মা যখন অন্য একজনকে নিকাহ করে চলে যান লখনৌ ছেড়ে, আমি বাবার কাছেই বড় হচ্ছিলাম। সেই বাবাও হঠাৎ মারা গেলেন। গলায় ক্যানসার হয়েছিল বাবার। আমি তখনও নেহাৎ ছেলেমানুষ। রাজাবাবুই

আমায় ছেলের মতো করে মানুষ করেছেন। ইস্কুলে দিয়ে পড়াশুনো শিখিয়েছেন, গাড়ি চালানো শিখিয়েছেন, এই গাড়িটা পর্যন্ত উনিই আমাকে দিয়েছেন। উনি আমার মা-বাপ-মনিব সব কিছু ছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের ফারাক কোনোদিন বুঝিনি, ওঁর কাছে সবাই সমান ছিল। এই যে আপনি মুসলিম, আর স্যার যে হিন্দু, আপনাদের কি কোনও অসুবিধে হচ্ছে, ম্যাডাম?"

আমি তাড়াতাড়ি বলি, "আমি মুসলিম মেয়ে, প্রদীপ হিন্দু ছেলে কিন্তু আমরা কেউ কারোর আত্মীয় নই। আমরা সহকর্মী মাত্র। দিল্লিতে আমার স্বামী আছেন, তিনি শিখ পাঞ্জাবী, আর প্রদীপের এক বৌ আর দুটো ছেলে।"

—"তবে? তবে?" রহমান মহা উৎসাহে বলে উঠল—"ওই তো একই হলো! আপনার স্বামী তো শিখ, সে ঐ হিন্দুই হলো—মুসলমান স্বামী তো নয়? এই তো আপনারা দিব্যি মিলেমিশে ঘর-সংসার করছেন? দেশটাও তো একটা বড় সংসারই ম্যাডাম—দেশের মানুষ মিলেমিশে ঘর করতে কেন পারবে না? দেশের মানুষের মধ্যে প্রেমপ্রীতির অভাব আসলে নেই। দরকার শুধু এই রাজনীতির নেতাদের মেরে ধরে তাড়িয়ে দেওয়া। এরাই যত নষ্টের মূলে।"

কথা বলতে বলতে পথ ফুরিয়ে যাচ্ছে। রাত হয়েছে, কনৌজ এখনো আসেনি। ক্লান্তিতে, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। প্রদীপ একথা-ওকথা বলে বলে রহমানকে প্রাণপণ চেষ্টায় জাগিয়ে রাখছে। আমি মাঝে মাঝেই ঘুমিয়ে পড়ছি। হঠাৎ শুনি হাসতে হাসতে রহমান বলছে—"স্যার, অপ ভি জরাসা সো যাইয়ে না? মুঝপর পুরা ভরোসা রাখিয়ে, মুঝে নিন্দ নহী আয়েগী ম্যাঁয় যবতক স্টিয়ারিং মে হুঁ—"

প্রদীপ বললে—"বাঃ, এত রাত্রি হয়েছে, আপনি সারাদিন একটানা গাড়ি চালাচ্ছেন, ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, ঘুমিয়ে যে পড়বেন না, তার নিশ্চয়তা কী?"

রহমান একটু চুপ করে থেকে গম্ভীর গলায় বললে—"স্যার, এর উত্তরে আমি যা বলতে পারি, আপনি তা বিশ্বাস করবেন না। আপনি কেন, আজকালকার কোনও মানুষই একথা মানতে চাইবে না। আমি সেটা বুঝি। যে কথার প্রমাণ দেওয়া যায় না, দুনিয়াতে সে কথার কোনো মূল্য নেই। তাই নিশ্চয়তা যে কী, আপনাকে তা বোঝানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

আমার কৌতূহল হলো, আমি বলে উঠি,—"আমায় বলুন, আমায় বলুন, আমার কোনও প্রমাণ চাই না। আপনার মুখের কথাটাই যথেষ্ট।"

রহমান খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—"রাত্তিরবেলায় ঘুম পায় না ম্যাডাম, রাত্তিরে হেডলাইটের আলো চোখে বিঁধে যায়, সাবধানে গাড়ি চালাতে হয়। ঘুম আসে ঠিক সকালের দিকে। ভোরের দিকে যখন একটা আলগা হাওয়া দেয়, আঁধারটা কেটে যায়, ফর্সা হয়ে আসে চারিদিক, মুখে-চোখে ঠাণ্ডা বাতাসটা যেই লাগে, শরীরটা রিল্যাক্স করে যায়, রাত্রের অন্ধকারের টেনশনটা কেটে যায়, অমনি দু'চোখ ঘুমে ভারী হয়ে ওঠে—চোখের পাতা জড়িয়ে আসতে থাকে। ঐ সময়টাতেই বেশির ভাগ অ্যাকসিডেন্ট হয় এইসব হাইওয়েতে। ঐ সময়টায় খুব সাবধান থাকতে হয়। একবার আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল। লখনৌ থেকে এই গাড়িতে কিছু মাল নিয়ে

তিনজন বিজনেসমেনকে নিয়ে গিয়েছিলাম মেরঠে। ওদের আমি পৌঁছে দিলাম, মালপত্র নামিয়ে দিলাম, দিয়ে ফেরৎ রওনা হয়েছি। পথে ভোর হয়ে এল, আমার চোখও ঘুমে জুড়ে আসতে লাগল। সামনের ধাবাটা এলেই থামতে হবে, চা খেতে হবে, এই ভাবছি, আর ভাবতে ভাবতে ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ করছি, হঠাৎ মনে হলো আমাকে দু'হাতে ধরে কে যেন ভীষণ জোরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে আমার শরীর থেকে ঘুম ছেড়ে গেল, আমি চেয়ে দেখি একটা প্রকাণ্ড গাছ ঠিক আমার গাড়ির দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে। প্রাণপণ জোরে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে তো কোনোরকমে বেঁচে গেলাম, ম্যাডাম, আপনি বললে বিশ্বাস করবেন না, স্পষ্ট শুনলাম রাজাবাবুর গলা—বলছেন, 'শাবাশ রহমান বেটা, জীতা রহো।' রাজাবাবু তার অল্প কিছুদিন আগেই মারা গেছেন। এখনও তাঁরই বাড়ির কোয়ার্টারে আমার বিবি, বাচ্চারা, সবাই আছে। রাজাবাবুর তো বালবাচ্চা ছিল না। আমি কানে স্পষ্ট রাজাবাবুর গলা শুনেছিলাম ম্যাডাম। আমার বিশ্বাস রাজাবাবুই সেদিন আমাকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছিলেন, বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকেই আমার ভোররাত্রে ঘুম পায় না আর। কি স্যার, বিশ্বাস হলো?"

প্রদীপ বলল—"আমি আরও এরকম কহানী শুনেছি রহমানসাব, যাঁরা হাইওয়েতে গাড়ি চালান তাঁদের সত্যিই নানা ধরনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়।"

আমিও চুপ করে থাকি না। আমি এবার বলি—"এরকম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ভূতের কথা আমি শুনেছি আগে, আপনার কথা আমার খুবই বিশ্বাস হয়। আপনি মিছিমিছিই ভাবছিলেন যে আমরা বিশ্বাস করব না। পৃথিবীতে কত কিছুই তো ঘটে, আমরা যার সবটা বুঝি না।"

রহমান খুশি হয়ে বললে—"যাক, তবু ভালো আপনারা যে আমার কথাটা বুঝতে পারলেন! ওই যে কনৌজ এসে গেছে, চমৎকার একটা ডাকবাংলো জানি আমি এখানে—চলুন দেখি যদি ফাঁকা থাকে।"

ডাকবাংলো ফাঁকাই ছিল। দুটি মাত্র কামরা। একটায় আমি, একটাতে প্রদীপ। রহমান গাড়িতে থাকবে। গাড়ির পার্টস-টার্টসের জন্যে উদ্বেগে কিনা জানি না, সে গাড়িতেই শোবে। খালি কামরা না থাকলেও, ড্রয়িংরুমটা তো ছিল, সেখানে বড় একটা সোফাও আছে, তাতে দিব্যি একজন মানুষ শুয়ে থাকতে পারে। কিন্তু রহমান রাত্রে গাড়ি ছেড়ে থাকবে না। ডাকবাংলোর কেয়ারটেকার আমাদের অতি চমৎকার রান্না করে দিল অত রাত্রে। লম্বা লম্বা দেরাদুন রাইসের ভাত, সরু সরু আলুভাজা, পেঁয়াজ-লংকা দিয়ে ফার্স্টক্লাস ডিমের কারি। খেয়েদেয়ে শুতে না শুতেই ঘুম!

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। বাথরুমে কিসের শব্দ হচ্ছে। বাথরুমের ওপাশে প্রদীপের ঘর, এপাশে আমার। দুদিকে দুটো দরজা। যে যখন বাথরুমে যাবে, তখন অন্যদিকের দরজাতে ছিটকিনি লাগাবে, ফের বেরুবার সময়ে খুলে দেবে। এখানে এই নিয়ম। কেয়ারটেকার ভাল করে দেখিয়ে দিয়েছে। বাথরুমের তো আলো জ্বলছে না, অথচ দিব্যি জল পড়ার শব্দ হচ্ছে। আমার বাথরুমে কী হচ্ছে জানা দরকার।

BanglaBook.org

ঘরের আলোটা জ্বেলে, বাথরুমের দরজাটা ঠেলে হাট করে খুলে ফেলে, আলো জ্বেলে ঢুকে দেখি কেউ নেই। বেসিনের কল থেকে জল পড়ছে। কল বন্ধ করে দিয়ে এসে শুয়ে পড়ি। বুকের মধ্যেটা অদ্ভুত ছমছম্ করতে থাকে।

আবার আমার ঘুম ভেঙে গেল। আবার বাথরুমে জল পড়ার শব্দ। এবার আরো জোরে। আবার ঘরময় আলো জ্বেলে, বাথরুমের আলো জ্বেলে ঢুকে দেখি এবারে স্নানের কল থেকে মোটা ধারায় জল পড়ছে বালতিতে। বালতি প্রায় ভরে এসেছে। কল বন্ধ করে এসে শুয়ে পড়ি। এবার বেশ ভয় ভয় করছে। গা ছম্ ছমের চেয়ে বেশি।

বাথরুমে জলের আওয়াজে ফের ঘুম ভেঙে গেল। তৃতীয়বার। এবার যেন খুব জোরে শব্দ হচ্ছে। ঢুকে দেখি বেসিনের কল, স্নানের কল, দুটো থেকেই জল পড়ছে তোড়ে। বালতি উপচে জল পড়ছে মেঝেতে। জোরে দুটো কলই বন্ধ করে দিই, আমার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিচ্ছে। আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি এত জোর শব্দ হচ্ছে আর প্রদীপ কিছু শুনতে পাচ্ছে না? ঘর থেকে বেরিয়ে যেই আলোটা নিবিয়েছি, অমনি স্পষ্ট শুনলাম—আবার জোরে জল পড়া শুরু হয়ে গেল। আমার বুকের মধ্যের ধড়ফড়ানি আর থামানো যাচ্ছে না, আমি আর এ-ঘরে শুতে পারলাম না। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম ড্রয়িংরুমে আলো জ্বলছে। এবার দরজা খুলে ড্রয়িংরুমে যাই। দেখি যদি কেয়ারটেকারকে পাওয়া যায়—ওকে বড়ো দরকার। নইলে প্রদীপকে ডাকতে হবে। এ জিনিস আমি একা একা আর সইতে পারছি না।

ড্রয়িংরুমে ঢুকে আমি অবাক। এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক সোফাতে বসে আছেন। ঘরভর্তি দামী চুরুটের গন্ধ। ভদ্রলোকের পাশে একগাদা ম্যাগাজিন—পুরনো ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের একটা কপি পড়ছেন। ইনডিয়া সেপ্টেম্বর নাম্বার। ১৯৬৬-র। বলিষ্ঠ চেহারা, কাঁচাপাকা চুল, কাঁচাপাকা গোঁফ, টকটকে রং, কাটাকাটা নাক-চোখ, অত্যন্ত সুপুরুষ। আমার পরনে সালোয়ার কুর্তা ছিল, ভাগ্যিস নাইটি নয়! আমাকে দেখে উনি উঠে দাঁড়ালেন—ছ'ফুটের এক সেন্টিমিটারও কম হবেন না। পরনে সিল্কের শার্ট, কালো ট্রাউজার্স। যারপরনাই ভদ্র, সম্ভ্রান্ত চেহারা। ভদ্রলোক আমাকে দেখে সপ্রতিভ সুরে বললেন—"গুড মরনিং ম্যাডাম—তিনটে বেজে গেছে —আপনি কি রোজ এত ভোরবেলাতেই ওঠেন?" হঠাৎ ওঁকে দেখে তো আমি বেশ ঘাবড়ে গেছি। এ আবার কে? এল কখন?

—"আপনি কখন এলেন—", বলেই ফেলি।

—"এই তো সাড়ে বারোটা নাগাদ। আপনারা তখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘর ছিল না বলে এখানেই বিশ্রাম নিচ্ছি। কেয়ারটেকারটি সত্যিই খুব ভালমানুষ—রামফল। রামফল আমাকে এখানে বিশ্রাম করতে অ্যালাও করে গেছে।"

—"আপনি তো বড় সোফাটায় শুয়ে ততক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নিতে পারতেন। হাত-পা ছড়িয়ে।"

ভদ্রলোক হেসে বললেন—"থ্যাংকিউ। কিন্তু সত্যিই আমার ঘুম পায়নি। আমি একটু পত্রিকাটত্রিকাগুলো দেখছি। এখুনিতো সকাল হয়ে যাবে। বসুন?"

হঠাৎ খেয়াল হলো ভদ্রলোক এতক্ষণ দাঁড়িয়েই রয়েছেন। "আপনি বসুন" বলে আমিও একটু বসি। ওঁর পাশেই একগাদা পুরনো ম্যাগাজিন। ১৯৬৪-র টাইম ম্যাগাজিন, মলাটে কেনেডির ছবি। ১৯৬৮-র টাইম ম্যাগাজিন, মলাটে মার্টিন লুথার কিং।

—"কোথায় যাচ্ছেন?"

—"এই এদিকেই একটু কাজ ছিল। সকাল হলে কনৌজে যাব। শহরে।"

—"কোথা থেকে আসছেন?"

—"লখনৌ।"

ভদ্রলোক বিজনেস করেন, ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা আছে লখনৌতে। পুরোপুরি গল্পের বইয়ের "লখনৌয়ি সৌজন্যের" প্রতিমূর্তি যেন, অভিজাত পরিবারের মানুষ সন্দেহ নেই। ওঁকে বাথরুমে জলপড়ার সমস্যাটা বলা যায়। শুনে হেসে ফেললেন মিস্টার দুবে। "এসব তো খুব পুরনো দিনের বাংলো, সেই সাহেবদের তৈরি। এখানে ওরকম হয়। ভয়ের কিছু নেই, ওসব ভৌতিক কাণ্ড নয়, নিশ্চয়ই ওয়াশারগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, তাই কল যতবারই বন্ধ করছেন, ততবারই খুলে যাচ্ছে। নিস্তব্ধ রাত্রে জল পড়ার শব্দ বড় ভয়ংকর শোনায়। জায়গাটা তো অপরিচিত।"

মিস্টার দুবের কথায় মনে ভরসা পেলাম। উনিও যেন আমার মনের কথাটা বুঝে বললেন, "যান, এবার শুয়ে পড়ুন গে, ওই জলের শব্দটব্দ স্রেফ ইগনোর করে ঘুমিয়ে পড়ুন। সকালে তো আবার বেরুবেন।" মিষ্টি হেসে আমার মনে বল যোগালেন মিস্টার দুবে। এবার গিয়ে শুয়ে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লাম, যদিও তখনও বাথরুমে জলের অবিশ্রাম শব্দ।

সকালে উঠে দেখি মিস্টার দুবে নেই। প্রদীপ আমার আগে উঠে পড়েছে, কিন্তু সে ওঠার আগেই উনি চলে গেছেন। প্রদীপের সঙ্গে দেখা হয়নি ওঁর। উনি যেখানে বসেছিলেন সেখানে পুরনো ম্যাগাজিনগুলো খুঁজতে গিয়ে দেখি ম্যাগাজিনগুলো আর নেই। কি আশ্চর্য। ডাকবাংলোর ম্যাগাজিনগুলো মেরে দিলেন। এমন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক? সত্যি, মানুষ বড় আশ্চর্য জীব। ভাবতেও পারিনি!

আমরা বেরিয়ে পড়লাম। যেতে যেতে রহমানকেই বলি—"রাত্রে এক ভদ্রলোক যে এসেছিলেন, তিনি কখন চলে গেলেন?"

রহমান বলল, "কই কেউ তো আসেনি? আর কোনও গাড়ি তো ঢোকেনি বাংলোর কম্পাউণ্ডে?" আমি বুঝলুম সব। প্রদীপ যেজন্যে জলের শব্দ শুনতে পায়নি, রহমানও সেইজন্যেই নিশ্চয় মিস্টার দুবের গাড়ি দেখেনি। সবই মদিরা দেবীর মায়া। রাত্রে ফিরে খুব মদ্যপান করা হয়েছে নিশ্চয়। গাড়ি যতক্ষণ হাইওয়েতে থাকে ততক্ষণ ড্রাইভাররা সব টীটোটলার। আর গাড়ি থামলেই অকূলে ঝাঁপ, অসীম তৃষ্ণা।

রহমান বলছে—"ফারুকাবাদের মীটিং ক'টার সময়ে ম্যাডাম?" কথা ছিল ভোর তিনটেয় হবে, সেটা এখন পেছিয়ে গেছে সকাল সাতটায়। মক্ষিরানীর পাখায় গোলমাল হয়েছে, নেতাদের থেমে পড়তে হয়েছে মাঝপথে। হেলিকপ্টার বিগড়েছে।

অতিরিক্ত যাত্রীর ভার চাপিয়েছিল বোধহয়—ভক্তবৃন্দ সকলেই যে হেলিকপ্টারে চড়ে সঙ্গে যেতে চায়! ফলে দুটো মীটিং ক্যানসেল হলো, হোলনাইট প্রোগ্রামটা করা চলল না, আর আমরাও একটু বিশ্রাম পেলাম।

—"আমরা যখন মীটিং করি, আপনি তখন কী করেন রহমানসাব?"

প্রদীপের কথার জবাবে রহমান হেসে ওঠে—"আমিও তো মীটিং শুনলাম দু'একটা। তারপর দেখি ওঁরা একই কথা বলছেন সর্বত্র। তখন বোরড হয়ে ম্যাগাজিনগুলো পড়ি। আমার গাড়িতে অনেক পুরনো ম্যাগাজিন আছে, ভাল ভাল। সবই রাজাবাবুর ম্যাগাজিন।"

প্রদীপ বলল, "পুরনো ম্যাগাজিন?" কই, কই, দেখি?"

—"এই তো এখানেই কয়েকটা আছে"—বলতে বলতে বাঁহাতে গ্লাভ কম্পার্টমেন্টটা খুলে রহমান দু'একটা বই এগিয়ে দেয়। ১৯৬৪-র টাইম ম্যাগাজিন, মলাটে কেনেডির ছবি, ১৯৬৬-র ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, ইনডিয়া স্পেশাল নাম্বার, ১৯৬৮-র টাইম ম্যাগাজিন,মলাটে মার্টিন লুথার কিং।

—"রহমানসাব—", আমি শুনতে পেলাম আমি বলছি, "আপনার রাজাবাবুর নাম কি মিস্টার দুবে?"

একগাল আহ্লাদ নিয়ে রহমান বলে উঠল—"আপনি ওঁকে চিনতেন নাকি, ম্যাডাম?"

নবকল্লোল, ডিসেম্বর ১৯৯৭

BanglaBook.org

দেশের চিঠি

মামনি সোনামণি

নববর্ষের অনেক আশীর্বাদ, তোমাকে আর তোমার রবার্টবাবুকে। ঠাণ্ডা একটু কমেছে? ফুলটুসি টুসটুসি কী আছে—"ও বাবাগো মার এত বড় চিঠি? কখন পড়ব? কিন্তু মা এত কথা ফোনে বলতে হলে কত খরচা হত সেটা ভাব? যদিও হবুজামাই পড়তে পারবে না, কিন্তু চিঠি কি ইংরিজিতে লিখতে ইচ্ছে করে? দূর। আর আমাদের সব ব্যাপারে তো তার উৎসাহ থাকার কথাও নয়। পরিবারটি তো ছোট নয় আমাদের, ভগবানের ইচ্ছেয়? সমস্যাও বিচিত্র।

তোমার বাবার শরীর ভালই আছে এখন। মার্কিনী জামাই প্রাপ্তির দু'পাচ্য সংবাদটি এতদিনে হজম হয়েছে বলেই মনে হয়। তোমরা তো জুন মাসেই আসছ। সামনাসামনি দেখা হলেই অনেক অকারণ দুর্ভাবনা ঘুচে যায়। তুমি তোমার বাবামাকে যে কত ভালবাস তা আমি জানি। মার্কিনী ছেলেই হোক, আর বাঙালি ছেলেই হোক জামাই

হল জামাই, সে এসে ঘর থেকে মেয়েকে কেড়ে নিয়ে চলে যাবেই অন্য এক ঘরে। এটাই নিয়ম। জগতে চিরটাকাল এইই চলছে। বাঙালি পাত্র, পালটি ঘর, অনেক দেখেশুনে বাড়ির কাছাকাছি বিয়ে দিলে, সে জামাই যদি তারপরে মেয়েকে বগলদাবা করে টিম্বাক্টু কিংবা দক্ষিণ মেরুতে বিপুল মাইনের চাকরি নিয়ে চিরদিনের মতন চলে যায়, পাঁচ বছরে একবার দেশে আসে, তার বেলায় বাবারা মনের দুঃখে ভয়ে ভাবনায় উদ্বেগে শয্যাশায়ী হল বলে কদাচ শুনিনি। অথচ এই যে ছেলেটি ভারতীয় ইতিহাস নিয়েই গবেষণা করে, কয়েক বছর কর্মসূত্রেই ভারতবর্ষে আসবে যাবে, সে মার্কিনী বলেই তোমার বাবার কেন যে এত উদ্বেগ তা আমার মাথায় ঢুকছে না। হ্যাঁ, যদি তোমার দাদু কি দিদিমা, কি ঠাকুমা এমন ছটফট করতেন আমি বুঝতাম। কিন্তু তোমার ঠাকুমা তো দেখি দিব্যি সাহেব নাত-জামাইয়ের পাঞ্জাবী পাজামা পরা চটি পায়ে ঝোলা কাঁধে ফোটো সবাইকে ফোকলা হাসি সহ গর্বভরে দেখাচ্ছেন এবং তোমরা এলে কীভাবে কী কী অনুষ্ঠান হবে তারই জল্পনা-কল্পনা করছেন পুরুতমশাই আর তোমার পিসিদের সঙ্গে। আমি অবশ্যই আউট। বলা বাহুল্য। আর আমার মা-বাবা? সে-বছর তোমার মেজমামার কাছে ওঁরা যখন গিয়েছিলেন তুমি তো ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলে রবার্টের—শিকাগোয় বঙ্গ সম্মেলনে যখন দেখা হয়েছিল। গর্ব করায় তাঁরা সবার ওপরে এককাঠি বাড়া, যেহেতু হবু নাতজামাই স্বচক্ষে অ্যাডভান্স দেখে এসেছেন, চেনেন। যদিও জানতেন না সে জামাই হবে, শুধু জানতেন তোমার মাস্টারমশাই। তোমার "সায়েন্টিস্ট" বাবাটি কিছুতেই "বিধর্মী", "বিদেশী", "বিভাষী" এবং যে তোমাকে চিরদিন প্রবাসে ধরে রেখে দেবে এমন জামাতাকে দিল খুলে পছন্দ করতে পারছেন না যা বুঝছি। আমি অনেক বোঝাচ্ছি যে ছেলেটি ব্রিলিয়াণ্ট, ভাল ইউনিভার্সিটিতে পাকা কাজ করছে, দিব্যি সুদর্শন, অল্প বয়স, এই প্রথমবার বিয়ে করছে (সাহেবরা সব্বাই ডিভোর্সী, বহুবিবাহিত এবং/অথবা দুশ্চরিত্র হয় বলেই আমাদের দেশে অনেকের ধারণা?) হিন্দুধর্ম ও ভারতবর্ষ বিষয়ে তার জ্ঞান হয় আমাদের চেয়ে বেশি, সংস্কৃত জানে, ভাঙা ভাঙা বাংলা বলে (আমাদের খাঁটি বাঙালি সুপাত্ররাও আজকাল ভাঙা ভাঙা বাংলাই বলে, কিন্তু তারা সংস্কৃতটা শেখেনি) ভাল রান্নাবান্না জানে (বাঙালি জামাইরা সাধারণত রান্না জানে না, একটু জানলেও বিয়ের পর ভুলে যায়), সিগারেট খায় না মাংস খায় না, কড়া মদ্যপান করে না (এটা তোর মেজমামা আমায় ফোনে বলেছেন, বাবা তো শুনে অবাক। 'কী আশ্চর্য সাহেব, অথচ স্কচ খায় না?' তোর দাদু মুগ্ধ এমন সৎপাত্রটিকে তাঁর নাতনি সংগ্রহ করেছে বলে। এখানে তরুণ সৎ-পাত্ররা সবাই মদের পিপে হয়ে যায় চল্লিশে পৌঁছোবার আগে)। তাও তো কেউই জানেন না যে রবার্ট তোকে কত যত্ন-আত্তি করে। বাসন ধুয়ে দেয়, ঘর পরিষ্কার করে দেয়। কাপড় কেচে আনে। আমি তো বাপু হাজার সম্বন্ধ করেও এমন জামাই যোগাড় করতে পারতুম না।

তার ওপর তোমাকে শ্বশুর শাশুড়ি ননদভাজ নিয়ে ঘর করতে হবে না। আমার সংসার তো কানে শুনতেই "স্বামী-স্ত্রী একটি সন্তান"—কিন্তু কার্যত? বাড়িতে

প্রথমত শাশুড়ি আছেন, তবুও বলতে নেই তোমার ঠাকুমা আমায় যতই অগ্রাহ্য করুন, যতই চার মেয়ের দ্বারা মন্ত্রী-পরিবৃতা হয়ে থাকুন, তেমন জব্দ করতে পারেননি। বোবার শত্রুতা করবে কে? তোমার চার পিসি, পিসেমশাই বৃদ্ধ এবং তাঁদের ছেলেমেয়েরা, তোমার কাকু কাকীমা এবং আমার গুণবান দেওরপোদ্বয়কে (বড়ই জ্বালাচ্ছেন বাপু তাঁরা! পল্টনকে তো ড্রাগের কারণে হস্টেল থেকে রাস্টিকেট করেছে। তবুও পাটনা ছেড়ে তোমার কাকিমা এখনও কাকার সঙ্গে জামসেদপুরে আসবে না।) নিয়েই তো আমার শ্বশুরবাড়ি? তোমার বাপের বাড়ির সংসারের extended familyটি কি ছোট হল? তোমার এ ধরনের অতিরিক্ত অথচ জরুরী সমস্যা আশা করি থাকবে না, বাড়ির বড় বউ হলে এদেশে যেসব ঝঞ্ঝাট ঝেড়ে ফেলা তোমার-আমার পক্ষে শক্ত।

সত্যি কথা বলতে কী, তোমার সিদ্ধান্তে আমি বেশ নিশ্চিন্ত হয়েছি। সম্বন্ধ করে তোমার বিয়ে দিলে কেরিয়ার-এর ক্ষতি হবে বলে ভয় ছিল, এক্ষেত্রে তোমাদের দু'জনের যেহেতু joint research, সেই হেতু তোমার কাজ বন্ধ হয়ে যাবার ভয় নেই (তাহলে জামাইবাবাজীরও কাজ বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকতে পারে) এবং তোমার কাজের যথার্থ সমঝদারিও ঘরেই তুমি পাবে। যেটা অমূল্য।

তোমার মন শক্ত রেখো—"বাবা শুয়ে পড়েছেন বিয়ের খবর শুনে"—এই কথা ভেবে মুষড়ে পোড়ো না। এখানে বাবার শুয়ে পড়াটা তাঁরই ভুল চিন্তার ফল। একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে এই শোকেই হোক, সাহেবজামাই হবে ভেবেই হোক, অথবা জামাইকে তুমি স্বয়ং পছন্দ করেছ শুনেই হোক, হয়তো নানা কারণেই তোমার বাবার এই প্রতিক্রিয়া হয়েছে। তাছাড়া উনি নিজেই এ বাড়ির সর্বময় কর্তা। যাবতীয় সিদ্ধান্তই সব একা একা নিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। হঠাৎ তুমি তাতে বাগড়া দিলে। নিজের জীবন নিয়ে দিব্যি নিজে নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে। তাঁর সঙ্গে একটা পরামর্শও করলে না,—অনুমতি চাইলে না, কেবল শুভ সংবাদটি পরিবেশন করলে, এজন্যও তাঁর মনমেজাজ বিগড়ে থাকতে পারে। তুমি বা রবার্ট এ নিয়ে মন খারাপ কোরো না। এটা ওঁর অহং-এর প্রশ্নে ঘটেছে। তোমাদের কোনও ত্রুটির কারণে নয়। ওঁর শুয়ে পড়াটা শারীরিক কোনও দুর্যোগের ফলে হয়নি, হয়েছে মানসিক দুর্যোগে।

সামলে উঠবেন, তোমাকে বলেছিলাম। এবং এখন উনি দিব্যি সুস্থ। তোমার ঠাকুমা, আমার বাবা-মা আর বড়দা তো বোঝাচ্ছেনই, বলতে নেই, তোমার পিসিরাও। প্রথমে তাঁরা দু'ভাগে বিভক্ত ছিলেন মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলের মতো। বড় এবং সেজ তোমার বাবার দলে, মেজ এবং ছোট তোমার (অর্থাৎ আমারও) পক্ষে। আপাতত দেখছি তোমার বুদ্ধিমতী ঠাকুমার কল্যাণে সম্ভবত চার ভগ্নীতে একজোট হয়ে ভাইকে বোঝাচ্ছেন কেন ফুলটুসির ওপর তাঁর রাগ করা উচিত নয়। তোমরা আষাঢ় মাসেই তো আসছ— শ্রাবণে বিয়ের লগ্ন, তারিখ, ও বিবাহ বাসরের ব্যবস্থা পাঁজিটাজি নিয়ে তোমার ঠাকুমা-পিসিমারাই স্থির করছেন। যথাকালে অবশ্যই আমিও জানতে পারব। ক্যাটারার স্থির হয়ে গেছে শুনেছি। চৌত্রিশ বছর পূর্ণ হল বাড়ির

বড় বউ হয়ে এ বাড়িতে এসেছি, এখনও আমি সেই "পরের মেয়ে"। তোমার কাকী তো বটেই। চার পিসি যে যাঁর নিজের বাড়িতে বসবাস করেন, কিন্তু তাঁরাই এখনও "এ বাড়ির" প্রধান সদস্য। মেনুটা স্থির করার সময়ও ডাকবেন কি না, জানি না।

তোমার সংসারে এই ঝামেলা হবে না অন্তত। আর মিল-অমিল? তোমার ছোটপিসির বিয়ে কি সাহেবের সঙ্গে হয়েছিল? না প্রেম করে? সে বিয়ে কেন ভেঙে গেল? অথচ অনেক দেখে শুনেই তোমার বাবা ছোট বোনের সম্বন্ধটি করেছিলেন। চোখে দেখেও যদি কেউ জীবন বিষয় শিক্ষা না গ্রহণ করেন তো তাঁর শোক দুঃখু তো অন্যের চেয়ে বেশি হবেই। বাবা বড্ড বাঁধাধরা কতগুলো সোজা লাইনে জোর করে জীবনকে চালাতে চান। কিন্তু জীবন তো জ্যান্ত, তার গতিপ্রকৃতি তার নিজস্ব, আমাদের ভবিষ্যদ্বাণীর বাইরে সে কেন রেলগাড়ি হবে? ছোটপিসির বেলায় তোমার বাবার অমন সেকেলেপনা না থাকলে এতদিনে ডিভোর্স হয়ে কবেই সব চুকে বুকে যেত, এমন বিশ্রীভাবে ঝুলে থাকত না পুরো পরিবারটা। আর তোমার কাকাকাকীমার বিয়ের ব্যাপারেও তোমার বাবাকে তো দেখেছ? আমি যে হাসিখুশি থাকি সবাই ভাবে "আহা, স্বামী-স্ত্রীতে কী মিল!" কিন্তু মা-মণি, তুমি তো জানো, আমরা দু'জনে দুটো ভিন্ন জগতের প্রাণী। তোমার বাবা অবিশ্যি সেটা না-ও জানতে পারেন। তোমার আর রবার্টের প্রসঙ্গে আমরা দ্বিমত হয়েছি বটে, কিন্তু সাধারণ নিয়মে আমি ওঁর প্রায় সব মতামতই সারা জীবন মেনে চলেছি "সংসারে শান্তি"র মুখ চেয়ে। তার চেয়ে বড় লক্ষ্য আমার চেষ্টাকৃত আয়ত্তের মধ্যে আর ছিল না। কিন্তু ফুলটুসি, ধন আমার, তোমার জীবনের কাছে প্রাপ্য আরও অনেক অনেক কিছু থাকবে—আছে। তোমার ক্ষমতা, মেধা, কৃতিত্ব শুধু ঘরেই নয়, বহির্জগতেও তোমাকে প্রমাণ করতে হবে। আমার নিজেকে প্রমাণ করার ক্ষেত্রে ছিল শুধুই সংসার। শুধু অন্দরমহল। আর ছিল তুমি। যতদূর মনে হয় সেখানে আমি সফল হয়েছি। আজ তুমি যে Ph.D শেষ করেই post-doctoral fellow হতে পেরেছ, পড়ানোর কাজ পেয়েছ এবং এক পণ্ডিত ব্যক্তিকে স্বামিত্বে বরণ করার স্বাধীন সিদ্ধান্তে, আমাদের সাহায্য ছাড়াই পৌঁছতে পেরেছ, এতেই প্রমাণ হচ্ছে যে সংসার ক্ষেত্রে অন্তত আমি সফল হয়েছি। তোমার আত্মবিশ্বাসের এবং মূল্যবোধের কোটায় ফাঁক নেই। এবং আমাদের ওপরেও যথেষ্ট বিশ্বাস রাখো, আশা রাখো, যে তোমার পছন্দকে আমরা নিশ্চয়ই সম্মান করব।

এত কথা জামাইয়ের জানার দরকার নেই। তাই বাংলাতেই লিখছি। তোমার সঙ্গে ওখানে কি চামেলির ফোনে কথা হয়েছে? চামেলিরা শীতে দেশে এসেছিল মেয়ের জন্য পাত্রের খোঁজে। ওদেশেই জন্মেছে, বড় হয়েছে মেয়েটা, অথচ আমেরিকায় চামেলি ওর জন্য ছেলে পেল না। ওদেশের বাঙালি ছেলেরা এসে দেশের মেয়েদের বউ করে নিয়ে যাচ্ছে। তারা ওদেশের বাঙালি মেয়েদের বিয়ে করা পছন্দ করে না নাকি, কেননা তারা সব dating করে, নাচতে যায়, তাদের বড্ড মেমসায়েবিআনা। আর তোরা ছেলেরা বুঝি dating করিস্ না? তোরা বুঝি

নাচতে যাস না? সায়েবিয়ানার 'স' করিস না– কিন্তু চামেলি বলল, ওদেশের দিশি ছেলেরা (এবং তাদের মা-বাবারাও, কি আশ্চর্য!) ওভাবে ভাবে না। আমি ভাবছি ওইসব NRI ছেলেদের কি ঘরে বোন নেই? তাদেরও তো বিয়ে থা দিতে পাত্র খুঁজতে দেশে আসতে হবে। দেশের ভাল ছেলেরা অবশ্য গ্রিনকার্ডের লোভে NRI বিয়ে করতে সর্বদাই এক পায়ে খাড়া। আর এখানে বাঙালি ছেলেমেয়েরা এদেশে নেচেকুঁদে date-এর বাবা করছে। সেটা কি ওরা ওদেশে অত হিন্দি সিনেমা দেখেও টের পায় না? তারপর যা হোক-তা হোক চামেলীর মেয়ের সঙ্গে একজনদের পাকা কথা হয়ে গেছে। কী আশ্চর্য ড্রাই কমার্শিয়াল অ্যাটিচ্যুড জীবনের প্রতি। ভেবে অবাক লাগে। ওদেশে জন্মানো বাঙালি মেয়েদের অবস্থা এদেশের মেয়েদের চেয়ে খারাপ বলেই মনে হয় ব্যাপারস্যাপার দেখে।

একটা কথা।

ফুলটুসি, আমি একটা মিথ্যে বলেছি। তোরা যে বিয়ে না-করে কেবল engaged অবস্থাতেই একসঙ্গে ঘর সংসার করছিস, বিয়েটা হবে পরে, দেশে এসে, আর ঘর সংসারটা শুরু হয়ে গেল আগেই, এটা তোর পিসিরা, ঠাকুমা কিম্বা দাদু দিদিমা কেউই মেনে নিতে পারবেন না। (বাবার শুয়ে পড়ার প্রকৃত কারণ সেটাও হতে পারে)। ওদের চোখে এটাই দুশ্চরিত্র স্ত্রী-পুরুষের লক্ষণ। (যদি ওই ছেলেটি তোমায় বিয়ে না-করে ল্যাজ গুটিয়ে ছুট দেয়?) আমি আর তোর বাবা তাই কাউকে জানাইনি যে তোর ফ্ল্যাটের কনট্রাক্ট রিনিউ না করে তুই এখনই রবার্টের অ্যাপার্টমেন্টে উঠে গেছিস। দুটো ফ্ল্যাটের ভাড়া গুণে যে লাভ নেই, কৃত্রিম সতীত্বের ছবি সাজিয়ে রেখে লাভ নেই, যার সঙ্গে সারা জীবন কাটাবি, তাকে ছ'মাস আগে বিশ্বাস না করে লাভ নেই, এসব কথা অন্যকে বোঝানো খুব মুশকিল।

আমাদের কান মন প্রাণ, তিনটেকেই যে আমরা সংস্কারের গামছা জড়িয়ে "কানামাছি ভোঁ ভোঁ" করে বেঁধে রেখেছি। তুই যেন "সততার খাতিরে" এই খবরটা কাউকে লিখে ফেলিস না বাছা, কিম্বা বাঙালি বন্ধুদের ফোন করে জানিয়ে দিস না। ওখান থেকে ফোনে টোনেও সবাই কিন্তু সব কথাই কলকাতায় সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেয়, পরনিন্দা পরচর্চা বিলেতে গিয়েও ছাড়ে না কেউ, খেয়াল রাখবি। জীবন এমনিতেই এদেশে আর একটুও সহজ নেই। আনন্দের মুহূর্তে, সম্মানের মুহূর্তে মানুষের শুভেচ্ছা পাওয়া কঠিন। কিন্তু দুঃখে, অপমানে সহানুভূতি করার লোক অনেক। অযথা ঘোঁট পাকাতে মুখরোচক সংবাদ যুগিয়ে লাভ নেই। মাগো, আমাকে তোরা ভুল বুঝিস না। এটা "কপটতা" নয়। আমরা আসলে এখনও অতটা "সত্যনিষ্ঠ" হবার সাহস পাই না। সমাজে বাস করতে হয় তো? শুনেছি নাকি বম্বে দিল্লিতে এরকম "লিভ-টুগেদার" আকছার হচ্ছে। খবরের কাগজে, মেয়েদের ম্যাগাজিনে তো বাঙালি মেয়েদেরও সাক্ষাৎকার পড়েছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কলকাতাতে ব্যাপারটা এখনও বলতে গেলে কেচ্ছা কেলেঙ্কারির পর্যায়েই আছে। তবে আশা করছি দিনে দিনে জীবন আরেকটু যুক্তিযুক্ত, আরেকটু সরল হবে। সংস্কার মুক্তি, আর উচ্ছৃঙ্খলতা এক নয়। আশা করি সেটাও খেয়াল করে

চলতে পারবে তোমরা। তোমরা তো জানো মা, সংস্কার মাত্রেই 'কু' নয়। কিছু কিছু সংস্কার মানুষকে মাটির সঙ্গে বেঁধে রাখে। জল বাদ দিয়ে, দুধটুকু খেতে শিখতে হবে তোমাদের। কিছু সংস্কারকে আমাদের জীবনে ধরে রাখা জরুরী। আর কিছু সংস্কার ফেলে দিতে হয়। তোমাকে আর কী বলব ফুলটুসি, তুমি আমার বুঝদার মেয়ে। বলবার কথা তো আরও কত আছে কিন্তু তাহলে এত টাকার স্ট্যাম্প লাগবে, যে ফোনেরই সমান হয়ে যাবে। তাছাড়া তোর বাবারও ফেরার সময় হল, আজ ভেবেছি ওঁর জন্যে আলুর পরোটা করব। এখন না উঠলেই নয়। আদর নিও। —আং— তোদের মা।

পুনশ্চ: ফেরবার সময়ে গুষ্টিশুদ্ধ সব্বার জন্যে অত প্রেজেন্ট কিনে সময় আর ডলার নষ্ট করতে হবে না। কেবল তত্ত্বে দেবার জন্যে কিছু ভাল কসমেটিক্স তোর জন্যে আর জামাইয়ের জন্যে আনবি। তোকে টাকায় দাম শোধ করে দোব; নিতেই হবে। এটা তত্ত্বের ব্যাপার। জামাইয়ের জন্যে যথারীতি আংটি বোতাম গড়ানো হয়েছে, ঘড়িটা কিনিনি। তোর জন্যে আমিই নোয়া গড়িয়ে রেখেছি, (তোর মেম শাশুড়ি তো জানবে না।) তবে দামটা বলিস রবার্ট যেন দিয়ে দেয় স্যাকরাকে। (ওটা বাপের বাড়ি থেকে যাবার কথা নয়)। মহানন্দে বিয়ের বাজার করছি। মাঝে তো মাত্র একটা মাস। কার্ড ছাপতে গেছে, বুধবার আসবে। শরীরের যত্ন নিবি দু'জনে। বাবার জন্যে ভাবিস না, আজ তো অফিস যাবার সময়ে খাওয়া-দাওয়াটা ঠিকমতোই করলেন। ওঁর জন্যে বরং একটা কালো-শাদা স্ট্রাইপ শার্ট আনিস। আমার জন্যে খবদ্দার কিছু আনবে না। দয়া করে শুধু নিজেদের শরীর-স্বাস্থ্য ভাল রেখো। এখানে গরম। ঠাকুরের কাছে এটুকুই প্রার্থনা, শুভ কাজটা ভালয় ভালয় হয়ে যাক। ভগবান তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন।

—মা।

বর্তমান, শারদ সংখ্যা ১৯৯৩

BanglaBook.org

বাপ রে বাপ!

শুভ বুধবার দিনে, বিকেলবেলায়, অশ্লেষা নয়, মঘা নয়, ত্র্যহস্পর্শ নয়, সোমেশবাবু হঠাৎ উধাও হয়ে গেলেন। রহস্যঘন অন্তর্ধান। ইন্দ্রাণী খোঁজ করতে করতে প্রায় পাগল। জানা গেল অফিসে নাকি তিন মাসের ছুটি নিয়েছেন। মেডিক্যাল লীভ। অথচ ওঁকে কেউ অসুস্থ দেখেনি। বেশ ফুর্তিতে ছিলেন ছুটি নেবার সময়ে। বেরোনোর পথে স্টেনো মেয়ে জেনিফারের চুল টেনে দিয়ে গেছেন। অফিস থেকে বেরিয়ে প্রথমেই একটা মিঠে পান খেয়েছেন— তারপর কোনদিকে যে গেছেন সেটা আর কেউ বলতে পারছেন না। অফিসের গাড়ি নেননি। বাড়িতে একটা হেঁয়ালি চিঠি লিখে গেছেন—"ইন্দ্রণী আই হ্যাড নো চয়েস। এক্সক্যুজ মি—ক্যে সেরা সেরা—

হোয়াট উইল বি উইল বি, দ্য ফিউচার'স নট আওয়ার্স টু সী''— আর ডায়েরিতে গোটা গোটা হরফে লিখে গেছেন—উৎকণ্ঠ আমার লাগি যদি কেহ প্রতীক্ষিয়া থাকে, সেই ধন্য করিবে আমারে। আর অফিসের ড্রয়ারে ঠিক জহরলাল নেহরুর মত করে প্যাডের পাতায় গোটা গোটা অক্ষরে লিখে রেখেছেন—'The woods are lovely, dark and deep. But I have promises to keep, and miles to go before I leap.' শেষ শব্দটা ভুল লিখেছেন; সেটা নিয়েও ইন্দ্রাণী অত্যন্ত চিন্তিত। ব্যাংকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে গেছেন। ড্রয়ারে জয়েন্ট এ্যাকাউন্টের চেকবই পাশবই রেখে গেছেন। ছুটির মাইনে নেবার জন্য তিনটি অথরিটি পত্র সই-করা। সঙ্গে আরেকটি খাম—ওপরে লেখা—ফর ক্যালকাটা পুলিশ—ভিতরে নোট—"প্লীজ ডু নট লুক ফর মি। রাদার লুক আফটার মাই ফ্যামিলি। আই'ল বি ব্যাক ইন টাইম।" পুলিশে ইন্দ্রাণীর দাদা কাজ করেন—তিনি গম্ভীর মুখে নোটটি নিয়ে পকেটে পুরেছেন। তারপর অফিসের ডিরেক্টর ঘোষদা, চৌহা আর রনু ব্যানার্জীর সঙ্গে ইন্দ্রাণীর দাদার একটা পরামর্শ সভা হয়েছে। মাস ঘুরতে চলল, পুলিশ কিছুই মীমাংসা করতে পারছে না। আপন বড় সম্বন্ধী থাকা সত্ত্বেও? ইন্দ্রাণী দাদাকে যাচ্ছেতাই করছেন। দাদা কেবলই বলেন —'চেষ্টা তো করছি রে। খোঁজ তো করছি রে। এখন তোর কপাল আর আমার হাতযশ!'

তা, দুটোর কোনোটাই বিশেষ কাজে দিচ্ছে না। দু'মাস হয়ে গেছে।

ইন্দ্রাণী এখন কেবলই ভাবেন আর হা-হুতাশ করেন আহা, তখন মতটা দিলেই হোতো। তবু ঘরেই থাকতো লোকটা। অত করে হাতে পায়ে ধরে বললেও, ইন্দ্রাণী কিছুতেই রাজী হতে পারেননি। ওঃ, কী বোকামিই হয়েছে। সোমেশ যাই বলুন, ইন্দ্রাণী কেবলই হাউ মাউ করে কেঁদেছেন আর বলেছেন—'ওরে বাপ রে। সে কি হয়— মা বাবা কী ভাববেন!—বান্টু মিন্টু, সন্টুর কী হবে?—পাড়ার লোকে কী বলবে?—না, না, না, খব্বদার না। এ কী সব্বোনেশে কথা— জন্মেও শুনিনি—ছিঃ'—

সোমেশ একের পর এক বই এনে রাত জেগে পড়েন আর একটা বই শেষ হলেই ইন্দ্রাণীকে পড়ানোর চেষ্টা করেন—পঁচিশ বছরে জগতে কতোবারই তো এমনটি হয়েছে। এই ভারতবর্ষেই কি হয়নি? 'এই তো বম্বেতেই ফ্যারা রুস্তম আছে'—

একটা করে বই এনে সোমেশ ইন্দ্রাণীকে দেন, আর ইন্দ্রাণী টান মেরে সেই বইটি তক্ষুনি জানলা গলিয়ে ফেলে দেন। বই গিয়ে সোজা পড়ে পাশের বাড়ির সদ্য খোঁড়া গর্তের ক্ষেতে। সোমেশ ডাকেন—

'বান্টু-মিন্টু-সন্টু।'

—'যাই বাবা!'

—'পাশের বাড়ি বাগানে একবার যাও তো।'

—'এক্ষুনি নিয়ে আসছি বাবা!'

সোমেশ কাদা ঝেড়েঝুড়ে বই আবার তাকে তোলেন। ইন্দ্রাণী কিছুতেই পড়তেন না।

BanglaBook.org

—'না, না, না—ওসব কেলেঙ্কারি কাণ্ড আমি কিছুতেই হতে দেব না— মরে গেলেও না। না, না, না।'

সোমেশবাবু কত বুঝিয়েছেন—'তোমার বাবা-মার ভাবনার কী আছে? তাঁদের মেয়ে তো জলে পড়বে না? আমরা যেমন আছি তেমনই তো থাকবো? আর পাড়ার লোকে যা খুশি বলুক, ক্ষতি নেই, দু'দিন বাদে পরিবর্তন আসছে না। তাদের ছেলেমেয়ের জীবনে তো কোনও মৌলিক পরিবর্তন আসছে না। তাদের যত্নআত্তি দেখাশুনো শিক্ষাদীক্ষা সবই যেমনকে তেমনই থাকবে তো। ক্ষতি যদি জগতে কারুর হয় ইন্দু, সে কেবল তোমারই। তা আমার জন্য এইটুকু স্যাক্রিফাইস করতে পারবে না? সতী-সাবিত্রীর দেশের মেয়ে তুমি, স্ত্রীরা এখানে স্বামীর জন্যে কী না করেছে?'

—'যে যাই করুক। এমনধারা অন্যায় আব্দার তো বাবা কস্মিনকালেও শুনিনি। না, ওতে মত দিতে পারবো না—না, না।' ইন্দ্রাণীর সেই এক জেদ।

—"প্লীজ ইন্দু, দেখতে পাচ্ছ না, কী রকম বকচ্ছপ মূর্তি হচ্ছে তোমার স্বামীর। গেঞ্জি পরে লোকের সামনে বেরুতে পারি না, সাঁতারের ক্লাবে যাওয়া তো কবেই বন্ধ হয়েছে—একবার হ্যাঁ বল, লক্ষ্মীটি, বুঝতে পারছো না কী কষ্ট আমার?'

হ্যাঁ, এইবারে বুঝতে পারছেন বটে ইন্দ্রাণী। তখন বোঝেননি। দু'য়ে দু'য়ে চার দিব্যি মিলে যাচ্ছে এতদিনে।

চিরকালই সোমেশের চেহারায় সেই মেয়েলি মিষ্টতাটা আছে, 'লালিমা পাল (পুং)' গোছের একটা লাবণ্য, যাকে বলে লালিত্য। আবার স্বভাবেও ইদানীং কেমন-কেমন একটা বিতিকিচ্ছিরি ভাব দেখা দিয়েছিল, 'দিন দিন যেন পদিপিসি টাইপের স্বভাব হচ্ছে তোমার'— গাল দিচ্ছিলেন স্বামীকে ইন্দ্রাণী। একেই তো ভাঁটাচচ্চড়ি খেতে ভয়ানক লোভ হয়েছিল, প্লেটের পাশে ভাঁটা চিবিয়ে পাহাড় করছিলেন, শরৎচন্দ্রের স্ত্রী চরিত্ররা যেমন করে থাকেন, যার জন্যে মাঝেমাঝে অফিসে দেরিও হয়ে যাচ্ছিল তাঁর—আর তার চেয়েও ভয়ংকর কথা, বাড়িতে মেয়েরা এলেই আর রক্ষে নেই! অমনি সোমেশবাবু এসে হাজির পড়বেন, 'বাঃ, বাঃ, কী শাড়ি এটা; অ্যাঁ? মিসেস গুলাটি? দেখি! দেখি! অর্গানজা প্রিন্ট বুঝি? দারুণ তো?'—কিম্বা —'আরে? বালাজোড়া কবে গড়ালেন মিসেস রয়? আগে দেখিনি তো? দারুণ কাজটা করেছে কিন্তু! ক'ভরি সোনায় হলো?' ইন্দ্রাণীর গা জ্বলে যেত স্বামীর এই মেয়েলিপনায়। গলার স্বরটি তো ঠিক মুখশ্রীর মতনই মধুমাখা, ইদানীং যেন আরো মিষ্টি হচ্ছিল, ফোনে মাঝেমাঝে ওঁকে ওঁদের রিসেপশনিস্ট জেনিফারের সঙ্গে গোলমাল করে ফেলেছেন ইন্দ্রাণী। এ ছাড়া ইদানীং যে কথায় কথায় চোখে জল এসে যাচ্ছিল সোমেশবাবুর, সে ব্যাপার তো বাড়িশুদ্ধ সকলেরই নজরে পড়ছে।

ভয়ংকর আপশোস হতে থাকে ইন্দ্রাণীর। ইন্দ্রাণী কিছুতেই রক্ত পরীক্ষা করানোর পাগলামিতে সায় দেননি। সোমেশ ক্ষেপে উঠেছিলেন নিজের রক্তের ক্রোমোজোম টেস্ট করাতে। প্রায়ই খবরের কাগজ পড়তে পড়তে মার্জিনে লিখে ফেলতেন X+Y Y+Y X+X! ইন্দ্রাণী বলতেন, 'তোমার নতুন করে কিসের এতো প্রমাণ দরকার?

বাণ্টি-মিণ্টু-সণ্টু তো ঘুরে বেড়াচ্ছে জগৎ সমক্ষে—', কিন্তু সোমেশের তাতে শান্তি ছিল না।

—'ওটা তো অতীত। আমি জানতে চাই ভবিষ্যতের কথাটা—'

—'তবে জ্যোতিষীর কাছে চলো।'

—'জ্যোতিষ নয়, ডাক্তার। ইন্দু, ডাক্তার! আমাকে জানতেই হবে— বুঝতে পারছো না, এটা তো ইচ্ছাকৃত ঘটনা নয়, যা ঘটে যাচ্ছে, যা ঘটতে চলেছে —বি সায়েনটিফিক—'

ভেবে ভেবে ইন্দ্রাণীর বুক ফেটে যাচ্ছে। সত্যিই তো ওঁর এতে হাত ছিল না। ভগবানের মার। কেন যে তখন ইন্দ্রাণী রাজী হলেন না? 'কেন যে মত না দিয়ে গোঁয়ারের মতন জেদ ধরে রইলুম! এতোবড় সর্বনাশটা আর হতো না তা হলে!' এই দু' নৌকোয় পা রেখে চলা সইতে না পেরে, হয় হিমালয়েই চলে গেছেন, নয়ত আত্মঘাতী হয়েছেন, সোমেশবাবু। হিমালয়ের সম্ভাবনাটা কম নয়, কেননা বুটজোড়া, ওভারকোট আর দস্তানাগুলোও পাওয়া যাচ্ছে না। চিন্তায় চিন্তায় আর কান্নায়-কান্নায়ই বোধহয় অসময়ে চোখে চালশে চশমা হয়ে গেল ইন্দ্রাণীর। তিন মাস হয়ে ঘুরতে চলল, সোমেশের খোঁজ নেই। ক্রমশ তিনি পাশের বাড়ির গাজর ক্ষেতের মাটিকাদামাখা বইগুলো তাক থেকে নামিয়ে আঁচল দিয়ে ঝেড়েমুছে পড়তে শুরু করলেন—ক্রিস্টিন জর্গেনসেন্-এর আত্মজীবনী, ক্যান্ডিসের আত্মকথা, ফ্যারা রুস্তমের বিবরণী—পড়তে পড়তে প্রায় স্থির করে ফেলেছেন, দাদার সঙ্গে পরামর্শ করে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেন,—'সোমেশ ফ্রম ব্যাক। ব্লাড টেস্টিং পারমিটেড'· এমন সময়ে একটা টেলিগ্রাম এল—'সোমেশ চৌধুরী এক্সপায়ার্ড থ্রি মান্থস্ এগো অ্যাট ডক্টর চেঞ্জিংকরস্ নার্সিংহোম—সোমা।'

ইন্দ্রাণী ধড়াস করে আছাড় খেয়ে পড়লেন সোফার উপরে। তারপরে শুরু হলো হাহাকার—সে কি আছাড়ি পিছাড়ি কান্না—ঔরদাসী, গঙ্গাঠাকুর হার মেনে গেল; ডাক্তারবাবু এসে ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে অজ্ঞান করে ফেললেন, তবে নিশ্চিন্তি। অজ্ঞান হবার আগে ইন্দ্রাণী কেবল বলতে পারলেন, 'ঐ সোমাটা আবার কে?'

জ্ঞান ফিরতে ইন্দ্রাণী চোখ মেলেই দেখলেন পাশের খাটে তার ফ্যাশনেবল ছোট ননদ শুয়ে শুয়ে 'ফেমিনা' পড়ছে। সোহিনী এয়ারহোসটেস, থাকে প্রধানত বম্বেতে। মাঝে মাঝে হুট হাট করে চলেও আসে কলকাতাতে, হিল্লিদিল্লি ঘুরতে ঘুরতে। ইন্দ্রাণী খুশি হয়ে বলেন, 'তুই এখানে? কবে এলি?'

প্লাক করা ভুরুর ধনুক বেঁকিয়ে নীল রঙ করা চোখের পাতা কাঁপিয়ে ভ্রমরকালো পল্লবের ছায়ায় তিরস্কার ঘনিয়ে এনে সুন্দরী ননদ বললে, 'ছিঃ ইন্দু, ''তুই'' বলে না! যাঃ!'

—'আরেঃ! তুমি!' ইন্দ্রাণী তো হাঁ।

অভিমানে মুচকি হেসে সোমেশ বলল ঠোঁট ফুলিয়ে, 'আ-হা! আমি না তো আবার কে?' সে হাসিতে তার ঠোঁটের শকিং পিংক লিপস্টিক থিরথিরিয়ে কেঁপে

উঠলো। কেঁপে উঠলো ইন্দ্রাণীর বুকও। এ কে? সরু ভুরুর মাঝখানে নীল টিপ, শ্যাম্পু করা বয়জ-কাট চুল কপাল উড়ে পড়ছে, দু হাতের দশটা নোখে ম্যাচিং শকিং পিংক নেল পলিশ, সেই আঙুল দিয়ে খুব ডেলিকেটলি 'ফেমিনা'টা ধরে আছেন সোমেশবাবু। পাশের বেডসাইড টেবিলে লম্বা গেলাশে কুয়াশা অরেঞ্জ স্কোয়াশ। কপালের উড়ো চুল আস্তে করে সরিয়ে সোমেশ বললেন, 'কেমন দেখছো? আমার নাম এখন সোমা।'

—'তাই বলো! তুমিই সোমা। আর আমি ভাবছি—' ইন্দ্রাণীর ভয়টা কেটে গেছে। বাঃ। বেশ তো? তেমন তো কিছু নয়। রাস্তায় হাত-তালি দিয়ে ঢোল বাজিয়ে নাচগান করে বেড়ায় যারা, তাদের মতন তো একটুও দেখাচ্ছে না সোমেশকে? ঠিক সোহিনীর মতো দেখাচ্ছে, যে ছোট ননদটিকে ইন্দ্রাণীর খুবই পছন্দ।

চিরদিনকার মেয়েলি সোমেশ এখন পরমাসুন্দরী হয়ে উঠেছেন। নীল নাইলনের ট্রান্সপ্যারেন্ট নাইটির তলায় সোমেশের ভাইট্যাল স্ট্যাটিসটিকস দেখে তিন ছেলেমেয়ের মা ইন্দ্রাণী রীতিমতো লজ্জা পেলেন। রূপসী বলেও ইন্দ্রাণীর খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তিনিও ঠিক এতটা রূপসী নন। ইশ্ কী সরু কোমর! যেন মাছিটি। ঈশ্ কী ফিগার! অনায়াসে যে কোনো বিউটি কনটেস্টে নামতে পারবেন সোমেশ। বয়স কুড়ি বছর কমে গেছে। ইন্দ্রাণীর রীতিমতো ঈর্ষাই হয়। রাগী গলায় বলে ওঠেন, 'ছিলে কোথায় এ্যাদ্দিন, শুনি?'

—'কেন টেলিগ্রামেই তো জানিয়েছি। ডক্টর চেঞ্জিংকর-এর নার্সিংহোমে। সেখানে কেবল অপারেশনই হয় না, আফটার-কেয়ার ক্লাসেসও হয়। বড় বড় বিউটিশিয়নরা এসে আমাকে চলতে, ফিরতে, বলতে, কইতে, সাজতে, গুজতে শিক্ষা দিয়েছেন। আমাকে কেমন লাগছে? ভালো না? মাত্র তিন মাসে?'

ইন্দ্রাণী এ কথাটার উত্তর না দিয়ে বললেন—'তারপর?'

—'তারপর মানে?'

—'কী করবে ভাবছো এবার? বোনের মতন উড়োজাহাজের গিন্নিপনা? নাকি তেল সাবানের বিজ্ঞাপন?'

—'দূর দূর। এ বয়সে ওসব কি আর হয় গো? আমার লীভও তো শেষ। সোমবারই জয়েন করতে হবে।'

—'তার মানে?'

—'মানে তিন মাসের ছুটিতে গেছলুম। ছুটি ফুরিয়েছে, আবার অফিস যেতে হবে। পুনর্মূষিকো!'

—'মানে, ওই চাকরিতেই—?'

—'হ্যাঁ, ওই চাকরিতেই তো। চাকরি বদলানোর কোনো কারণ আছে কি? ইন্ডিয়ান কনস্টিট্যুশানে স্ত্রীপুরুষের ইকোয়াল রাইট এসব ক্ষেত্রে।'

ইন্দ্রাণী চমৎকৃত হলো।

সত্যিই তো। মেয়েমানুষ যদি দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারে, তবে কোনো অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সির একজন সিনিয়র একজিকিউটিভ মেয়ে হয়ে গেলেই বা

BanglaBook.org

কার কী? বরং যা চেহারা খুলেছে সোমেশের তাতে একটা লিফটই উল্টে পাওনা হওয়া উচিত। পাবলিক রিলেশনস অফিসারের কাজে এফিসিয়েন্সি বাড়বে বই কমবে বলে তো মনে হচ্ছে না। মনে মনে ভরসা পেয়ে আদুরে গলায় ইন্দ্রাণী বলেন, 'হ্যাঁ গো, তোমাকে আমি কী বলে ডাকবো তবে এবার থেকে?'

'কেন? যা বললে এক্ষুনি, তাই বলবে। অবিশ্যি সোমাও বলতে পারো।' গালে টোল ফেলে হাসলেন সোমেশবাবু। ইন্দ্রাণীর অতিপরিচিত—অতিপ্রিয় সেই পুরনো হাসি, শকিং পিংক লিপস্টিকের রেশমী চাদর মোড়া হয়ে কেমন যেন অচেনা দেখাল।

'তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কিছুই বদলাবে না ইন্দু, ভয় পেও না তুমি—' হাসলেন সোমা চৌধুরী, 'আসলে প্রবলেম অন্যত্র। প্রবলেম হবে লীগ্যালি সেকশুয়াল আইডেনটিটি চেঞ্জ করবার সব হ্যাপা পোয়ানো। চাকরিতে, পাসপোর্টে —সর্বত্র নাম বদল, তারপর আগেকার সব সার্টিফিকেটগুলিতে কোর্ট এ্যাফিডেভিট করো—নতুন সিগনেচার করো—চল্লিশ বছরের আইডেনটিটি হঠাৎ বদল করা কি সহজ? উঃ, মা গো!'

—'আমি কি এখন তবে মিসেস সোমা চৌধুরী? মেয়েতে মেয়েতে বিয়ে কি এদেশে আইনসিদ্ধ হয়?' ইন্দ্রাণীর প্রশ্নে সোমেশের মুখের হাসি শুকিয়ে গেল।

—'বোধহয় তুমি আমাকে ডিভোর্স করতে পারো এই গ্রাউন্ডে কিন্তু সেটা কমপালসরি কিনা সে খোঁজটা নেওয়া হয়নি। ইন্দু, আমাকে তুমি ছেড়ে যাবে না তো ভাই?' সোমেশের মিঠে সরু গলায় আন্তরিক উদ্বেগ ছলছলাৎ করছে দেখে ইন্দ্রাণীর ধড়ে প্রাণ এলো। যাক্ প্রাণের টানটা আছে তাহলে। 'বান্টি-মিন্টু-সন্টু কই?'—সোমেশ প্রশ্ন করেন।

ছেলেমেয়েগুলোকে মামাবাড়িতে নিয়ে গিয়েছে শনি-রবিবারের ছুটিতে। ইন্দ্রাণীর বৃদ্ধ বাবা মাকে সান্ত্বনা দিতেই গেছে তারা, এমন বললেও খুব ভুল হবে না।

'ট্রাঙ্ককল করতে হবে না, সোমবারই ওরা এসে পড়বে। বোলপুর গেছে।' মনের ভেতরে হালকা একটা বাতাস বয়ে গেল ইন্দ্রাণীর। যাক!

—'তোমার মা-বাবার শরীর ভালো তো? বাবার ছানি কাটার কি হলো?'

আঃ! আরেকবার আরাম পেলেন ইন্দ্রাণী। পারিবারিক দায়িত্ববোধটোধগুলোও সব ঠিকঠাক আছে।

—'কাটাবেন এবারে। তোমার জন্য ভেবে ভেবে দুটো ছানিই পেকে উঠেছে। অমন করে পালাতে হয়?'

—'তা হ'লে তো উপকারই হয়েছে বলতে হবে।' কনুই দিয়ে ইন্দ্রাণীকে একটা মেয়েলি ধাক্কা দিয়ে মুচকি হাসলেন সোমেশ।

সোমবার দিনে নতুন নামে অফিসে জয়েন করলেন মজ সোমা চৌধুরী। মিস কিংবা মিসেস কিছুই লেখবার দরকার নেই, এই মস্ত সুবিধা হয়েছে আজকাল। সোমেশের পক্ষে আইডিয়াল বন্দোবস্ত। মিসও নন, মিসেসও নন, আর মিস্টার তো ননই।

সোমবার অফিসে হৈ হৈ পড়ে গেল। একমাত্র অফিসের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান

BanglaBook.org

রিসেপশনিস্ট, যার সঙ্গে তাঁর মিষ্টি মিষ্টি ভাব ছিল, সেই জেনিফারই কেবল অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল। আর সবাই ফ্ল্যাট। গোলাপি শিফনের আঁচল উড়িয়ে মজ এস চৌধুরী তাঁর মার্ক ফোর অ্যাম্বাসাডার থেকে নামলেন, গায়ের মৃদুল ফরাসি সৌরভে, চোখের চটুল কটাক্ষে ভুরুতে-চুলেতে-আঁখিপল্লবে ভুবনমোহিনী হয়ে। গেটে বাহাদুর প্রথমে আটকে দিয়েছিল। পরে গাড়ির নম্বর দেখে ছেড়ে দিল। আলগোছে একটা সেলামও ঠুকে দিয়েছিল নেহাৎ অভ্যাসের বশে। সোমেশের অভ্যাস সেলামের উত্তরে কপালে ডান হাতটা আলতো করে ঠেকানো। অভ্যাসমতো সেটা করতেই বাহাদুরের চোয়াল ঝুলে পড়লো।

—'হায় রাম! চাউধ্রি সা'ব।' চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। ততক্ষণে সোমেশ লিফটে।

বুড়ো লিফটম্যান ইব্রাহিম সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো 'কৌনসী ফ্লোর—', সোমেশ বললেন, 'ভালো আছো, ইব্রাহিম?'

সড়াৎ করে শ্বাস টেনে ইব্রাহিম তার টুলের ওপর বসে পড়লো, তার হাত লিফটের বোতামে না গিয়ে পড়ল গিয়ে নিজের কপালে হিজিবিজিকাটা ছকে।

—'ইন্-শাল্লা। চাউধ্রি সাহাব! তৌবা! তৌবা!'

—'এখন থেকে আর চৌধুরী সায়েব না, ম্যাডাম চৌধুরী বলবে, বুঝলে তো ইব্রাহিম?' সোমেশ মিষ্টি হেসে বলেন—'কই লিফট চালাও?'

লিফট থেকে নেমে নিজের ঘরে ঢুকলেন বিনা বাধায়। চুলে নিধিরাম ছিল না। একটু পরেই বেল বাজালেন মজ চৌধুরী। নিধিরাম পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে সাহেবের সিটে এক অপরিচিতা সুন্দরীকে দেখে এতদূর অবাক, যে আপত্তি পর্যন্ত করার কথা মনে পড়ল না তার। অনেক ফাইল জমেছে তিন মাসে। ফাইলে চোখ রেখেই অভ্যাসমাফিক সোমেশ বলে, 'জল।'

—'জগড়নাথ।' নিধিরাম শব্দ করে ওঠে।

—'এ-কড়ও হলা? সাহাব-অর-স-র-ব-নাশ হই গলা রে—হায়, হায়!' হাহাকার করে ওঠে নিধিরাম। মুহূর্তের মধ্যে ঘরভর্তি দর্শক জড়ো হয়ে যায়। লাফিয়ে উঠে চৌহান বলল, 'গুড গ্রেশাস! হোয়াট্ লাক। চাউধ্রি সাবনে তো দিল্ ধড়কা দিয়া। একদম জিনৎ আমন, সায়রা বানু—সোমেশ চাউধ্রি ইজ গন্, লং লিভ সোমা চাউধ্রি—'

ঘোষদা বলল, 'বড্ডই আপশোস হচ্ছে কেন যে তোর বৌদিকে বিয়েটা করে ফেলেছিলুম!'

চালু ছোকরা রণু ব্যানার্জী বললে, 'অ্যাবসলুটলি র‍্যাভিশিং এস কে! মে আই হ্যাভ আ ডেট উইথ ইউ দিস স্যাটারডে নাইট? লেটস গো ডান্সিং। শ্যাল উই?'

গোলাপি স্লিভলেসে ভূমিকম্প তুলে সোমেশ বললেন, 'থ্যাংক্য রণু! আই'ল থিংক অ্যাবাউট ইট!'

কেবল তাঁর বয়স্ক পি.এ. রাধাকৃষ্ণণ খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক। দক্ষিণের মানুষ তিনি, চট করে অবাক হন না বড় একটা। আগে সাদা সাহেবের কাছে কাজ করেছেন,

BanglaBook.org

তার বদলে এলেন কালো সাহেব। এমন পুং সাহেবের বদলে না হয় স্ত্রী সাহেব। রাধাকৃষ্ণণের তাতে কি? গম্ভীর মুখে খাতা পেন্সিল নিয়ে বসলেন এসে, চোখেমুখে কোনো বিস্ময় নেই।

'ইয়েস স্যার? সরি, ইয়েস ম্যাডাম? শ্যাল উই বিগিন?' ওদিকে অফিসময় ততক্ষণে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সকলেই উত্তেজিত, শশব্যস্ত, সোমেশ চৌধুরী ছাড়া কারুর মুখে কোনো কথা নেই।

হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে বাড়ি ফিরলেন সোমা চৌধুরী। ইন্দ্রাণীও আজ অপ্রস্তুত। প্রতিযোগিতার উচিত স্পিরিটে বিউটি পারলারে গিয়ে মাথার চুলের ডগা থেকে নোখের আগা পর্যন্ত নতুন করিয়ে এনেছেন। একমাত্র প্রবলেম, কোমরটাকে কিছু করা যায়নি। ওখানে সোমেশের একচ্ছত্র জয়। দরজা খুলে এক রূপসী আরেক রূপসীকে রিসিভ করলেন। ঠিক সোহিনী এলে যেমন দোরগোড়াতেই ইন্দ্রাণীকে 'বউদি ভাই' বলে জড়িয়ে ধরে, সোমেশ একেবারে তেমনি ঢঙে দরজাতেই ইন্দ্রাণীকে জড়িয়ে ধরে গালে গাল ঘষে, 'হ্যালো ডার্লিং' বলে ঘরে পা দিলেন।

—'ছি! ছি! ও কী হচ্ছে?' আপনার অজান্তেই বকে ফেলেছেন ইন্দ্রাণী। চোখ টিপে সোমা চৌধুরী বলেন, 'ওতে কিছু হবে না।' তারপরেই ভুরু উঁচিয়ে ঠোঁট গোল করে কমপ্লিমেন্ট দেন, 'ঈ-ঈ-শ্-শ্—কী-ই দারুণ দেখাচ্ছে তোমাকে ইন্দু। চুলটা কোথায় করালে? ফেশিয়ালও করিয়েছ না? বেশ ভালো কাজ তো ওদের।'

এসব কথায় কান না দিয়ে চায়ের কাপে চিনি গুলতে গুলতে ইন্দ্রাণী বললেন, 'তারপর? আপিসে সবাই তোমায় দেখে কী বললে?'

হাত মুখ ধুয়ে, কাপড় বদলে, হাভানা সিগারেট ধরিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে বসে গায়ে সুতি ডুরের আঁচলটি জড়িয়ে নিয়ে, চায়ের কাপ হাতে সোমেশ গল্প জুড়ে দেন—আপিশে আজ কত কী হলো। বাহাদুর, ইব্রাহিম, নিধিরাম, চৌহান, ঘোষদা, রাধাকৃষ্ণণ, রণু ব্যানার্জী—কেউ বাদ যায় না। কেবল জেনিফারের মুখ ভার করার কথাটা বলেন না। রণু ব্যানার্জীর অফার শুনে চমকে ওঠেন ইন্দ্রাণী।

—'সে কি গো, যাবে নাকি তুমি নাচতে? অ্যাঁ? হায় রে পোড়াকপাল আমার —শেষে কিনা—'

—'দূরদূর! তুমিও যেমন!' বলে সোমেশ প্রবল একটি কটাক্ষ হানেন, 'থ্যাংক্যু বলাটা কার্টসি, বুঝলে না?'

এমন সময়ে হরিদাসী এসে বললে, 'বাবুর কাছে ঘনশ্যামবাবু এয়েচেন।' গঙ্গাঠাকুর ও হরিদাসী যথাসাধ্য বাবুর সঙ্গে সোজাসুজি কথোপকথন এড়িয়ে চলেছে। তারা একটু বিব্রত বোধ করছে। বোঝাই যাচ্ছে, পাড়ার ভৃত্যকুলের কাছে তাদের মুখ দেখানোর উপায় নেই। বাড়ির কর্তা মেয়েমানুষ হয়ে গেছেন, এমন ধারা অনাচ্ছিষ্টি কাণ্ড কেউ কি বাপের জন্মেও শুনেছে? চোখে দেখা তো দূরস্থান। দু'জনই খুব পুরোনো, ইন্দ্রাণীর শ্বশুর-শাশুড়ির টাইমের লোক। এই সংসারে অপরিহার্য দুজনেই। এই গঙ্গাঠাকুর, এই হরিদাসী, ইন্দ্রাণীর বিয়েতে গায়ে হলুদের তত্ত্ব নিয়ে তাঁর বাপের বাড়ি গিয়েছিল।

—'আঃ! হরিদাসী, ফের। বলেছি না দু'দিন ধরে বাবু বাবু করবি না?' সোমেশবাবু খিঁচিয়ে ওঠেন। প্লাক্‌ড ভুরুতে জট পাকিয়ে যায়।

—'কী বলব তবে? মা? আর মাকে তবে কি বলব? আগেকার মতন, বৌদিদি?' ছানিপড়া চোখ হরিদাসী খুবই সরলভাবে তাকায়। ইন্দ্রাণীর শ্বশুর-শাশুড়ির মৃত্যুর পর থেকে সোমেশ-ইন্দ্রাণী বাবু-মা ডাকে প্রমোশন পেয়েছেন।

—'তা তো বটে?' এক মিনিট ভুরু কুঁচকে সিগার কামড়ে চুপ করে থাকেন সোমেশ। তারপরেই মুখ থেকে চুরুট সরিয়ে বলেন, 'মাকে মা আর আমাকে মেমসাহেব বলবে। বাবু-টাবু বলবে না।'

হরিদাসী একনজরে মুখের পানে চায়—এই সেই লোক, যাকে সে বহুবৎসর কাল 'দাদাবাবু' বলবার পর সম্প্রতি 'বাবু' বলতে শুরু করেছিল। তারপর ফোকলা গালের গর্তে টোল ফেলে কেমন-কেমন হাসে। হেসে বলে, 'বেশ। তাই বলব। মেমসায়েবের কাছে ঘনশ্যামবাবু এয়েছেন। হলো তো?'

ঘনশ্যাম সোমেশের ইস্কুলের বন্ধু। রোজ সন্ধ্যেবেলায়, রাতে খাবার আগে পর্যন্ত দাবা খেলাটা তাঁদের কলেজ যুগ থেকেই নেশা। এক পাড়ায় বাড়ি হওয়ার দরুণ এই নেশাটি বিয়ের পরেও ভাঙেনি।

ফরাসী সুগন্ধ বিলিয়ে, আঁচল এলিয়ে, চুল ফুলিয়ে সোমেশ-হাস্য বদনে ঘরে ঢুকতেই ঘনশ্যাম চমকে উঠলেন। তারপরেই মুখ ভেংচে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'এ্যাঃ! ছিছিছি—ই-কী করিচিস রে ব্যাটা সোমা? এ্যাত্তো করে তোকে বারণ কল্লুম—বল্লুম, এটা অ্যামেরিকা বিলেত নয়, ওসব কীর্তি করতে যাসনি, সর্বনাশ হবে—শুনলিনি? সেই, যা জেদ ধরবি, তাই?'

—'কেন রে ঘনা? বেশ ভালো দেখাচ্ছে না?' একটু দমে গিয়ে প্রশ্ন করেন সোমেশ। চোখে অনিশ্চয়তা।

—'তোমার মাথা। ঠিক বাঁদরের মতন দেখাচ্ছে।' মাথা নিচু করে বোর্ড থেকে ঘুঁটিগুলো বাক্সে তুলে ফেলতে থাকেন ঘনশ্যাম।

—'ঘুঁটি তুলে ফেলছিস যে? খেলবি না?'

—'কী খেলব?'

—'ন্যাকামো রাখ।'

—'বলি ন্যাকামোটা কে কচ্চে? রোজ রোজ এসে তোমার সঙ্গে দাবা খেলি, আর পাড়ার লোকে নিন্দে করুক। না রে সোমা, ও কম্মোটি আমি আর পারবো না। গিন্নি এ্যালাউ করবে না। ছেলেপুলে বড় হচ্ছে, তারাই বা কী ভাববে। আমা দ্বারা লীলাখেলা হবে না ভাই।'

—'ঘনা!' কাতর আর্তনাদ বেরোয় সোমেশের গলা চিরে। 'এ তুই কী বলছিস ভাই ঘনা? তুই কি পাগল হলি? এ যে আমাদের বিশ বছরের নেশা রে! কে আবার কী বলবে এতে?'

—'ওসব কথা থাক। দ্য পাস্ট ইজ পাস্ট। তুমি বরং এখন থেকে আমার বৌয়ের সঙ্গে সাপলুডো খেলতে যেও রোজ দুপুরবেলায়—আমি কিছু বলব

না।' ঘনশ্যামের গলা অভিমানে বুজে এল, 'শালা! বিশ্বাসঘাতক! ইস্টুপিড কোথাকার! এতো করে বারণ করলুম।'

সোমেশের চোখের জল আর বাঁধ মানে না। চোখে আঁচল তুলে দেন তিনি। আর 'ছিঃ ছিঃ' বলতে বলতে বেরিয়ে যান ঘনশ্যমবাবু। প্রায় দৌড়ে পালালেন।

ঠিক এমনি সময়ে নিচে ভঁক ভঁক করে হর্ন বেজে ওঠে। 'ছেলেমেয়েরা এসে গেছে' বলতে বলতে ছুটে এলেন ইন্দ্রাণী। ডুরে শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে, সর্বাঙ্গে অপরূপ ঢেউ খেলিয়ে সোৎসাহে উঠে দাঁড়ালেন সোমেশ, সদ্য হারানো বন্ধুর দুঃখু ভুলে। হাতে জ্বলন্ত সিগার, গায়ে কমলাডুরের আঁচল। মাস্কারা-ঘন চোখে অপত্য স্নেহের অমৃতধারা। সারপ্রাইজ।— ছেলেমেয়েরা জানে না বাবা ফিরে এসেছেন।

—'বাবা!'

—'বাবা!'

—'বাবা!' দুড়দাড় দৌড়তে দৌড়তে সিঁড়ি থেকেই চেঁচাতে চেঁচাতে, উল্লাসে নাচতে নাচতে ঘরে ঢুকল বাণ্টি-মিণ্টু-সণ্টু। গেটের কাছ বাবার প্রিয় চুরুটের গন্ধটি পেয়েই তাদের মন নেচে উঠেছে। খবর পৌঁছে গেছে প্রাণে। বাবার গন্ধ। বাবা এসে গেছেন। ঘরে ঢুকেই স্ট্যাচু। বজ্রাহত। নিশ্চুপ।

নিবাত নিষ্কম্প তিনটি স্তব্ধতা। তারপরেই পাঁচ বছরের সণ্টুটা কেঁদে ফেললে, 'বাবা কই?' ডুরে শাড়ির আঁচল সামলাতে সামলাতে সণ্টুকে কোলে তুলতে যান সোমেশ। তার আগেই সে ছুটে গিয়ে ইন্দ্রাণীর হাঁটুতে মুখ গুঁজেছে। ছোট ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে আঙুল দিয়ে মা দেখান ঐ গ্ল্যামারাস তরুণীটির দিকে—

—'এই তো বাবা।'

—'ন্না ন্না ও বাবা না।' সণ্টু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেই থাকে। ছোট্ট শরীরটা গুটিয়ে আরো ছোট দেখায়। বাণ্টি এখন ক্লাস্ এইটে, সদ্য গোঁফের রেখার ছায়া পড়েছে ঠোঁটের ওপরে। মিণ্টুরাণী পড়ছেন ক্লাস সিক্সে, একটা হালকা প্রজাপতির মতন দেখতে।

গেটে বাবার সিগারের পরিচিত গন্ধটি তাদের তিন মাস ধরে হারানো বাবার পুনরাগমনের খবর দিয়েছিল, কিন্তু এ কে এসে বসে আছে বাবার ইজিচেয়ারে। বাবা কই? এ যে ছোটপিসি! আবার ঠিক ছোটপিসিও নয়। অন্য কেউ। এ কে?

নেলপলিশচিত্রিত দশ আঙুল বাড়িয়ে মিষ্টি আদুরে গলায় সোমেশ ডাকলেন, 'ছি, সণ্টু কাঁদে না বাবা। এসো, কোলে এসো—এই দেখ, দেখ না, তোমাদের জন্যে কী সুন্দর ক্যাডবেরি এনেছি—'

সণ্টু নড়ল না। বাণ্টিও নড়ল না। মিণ্টুই শুধু পায়ে পায়ে একটু এগোল। সোমেশ ডাকলেন, 'কই রে আয়? এই দ্যাখ আরেকটা কী মজার সারপ্রাইজ আছে তোমাদের জন্যে'—পাশের ভ্যানিটি ব্যাগটা হাতে নেন সোমেশ। সণ্টু নড়ল না।

—'যাও, কাছে যাও—' ইন্দ্রাণী এবার সণ্টু-বাণ্টি দুই অবাধ্য পুত্রের পিঠে দুই ঠেলা মেরে বললেন, 'ছিঃ। ও কী হচ্ছে কি? অসভ্যতা?'

—'অমন করতে নেই, সণ্টু-বাণ্টু, বাবা ডাকলে যেতে হয়।' ছেলে মেয়েদের

BanglaBook.org

পেছু পেছু, ঘনশ্যামবাবুও আবার কখন ওপরে উঠে এসেছিলেন। এবার টের পাওয়া গেল। ঘনশ্যামবাবু বললেন, 'যা, বাবা ডাকছে, অমন কোর না। কাছে যাও। বাবা বলে কথা—ধুতিই পরুক আর শাড়িই পরুক। বাবা, বাবাই। যাও, কাছে যাও—'

—'বাবা বাবাই মানে?' নেপথ্যে হরিদাসীর গলা পাওয়া গেল। 'বাবা ডাকছে মানে? এখন কি আর বাবা বলে ডাকলে চলবে নাকি? এখন বলতে হবে মা। কী বলে ডাকবে তোমাকে তোমার ছেলেমেয়েরা, বাবু? এই য্যাঃ, কী যেন বলে, মেমসায়েব? তোমার ছেলেমেয়েরা তোমায় বাবার বদলে কী নাম ধরে ডাকবে? মেমসায়েব, না মা? ঘরের বাইরে থেকে বোমা ফেলতে লাগল হরিদাসী। সোমেশের মনে পড়ল জন মরিস যখন জ্যান মরিস হলেন, তাঁরও তখন বড় বড় সন্তান ছিল। জ্যানের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী-পরিবারের ভাবভালোবাসা তো এতটুকুও নষ্ট হয়নি। কী যোগাযোগে, কী উষ্ণতায়, কোথাও কিছু কম পড়েনি। কিন্তু জ্যানের ছেলেমেয়েরা এখন তাঁকে কী বলে ডাকে? জ্যান বলে? না ড্যাডি বলে? আত্মজীবনীতে কি সেটার উল্লেখ ছিল না? ভাবতে ভাবতে সোমেশের নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে বেরুল। নাকটি তিনি থুপে থুপে মুছে দিলেন। তবুও মনে পড়ল না।

সন্টু এবার স্পষ্ট গলায় বলল, ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে, 'না, বাবার কাছে যাব না।' বান্টি কিছুই বলল না। টেবিলের ওধার থেকে কেবল তাকিয়ে বাবাকে দেখতে লাগল। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, কব্জীতে সোনার বালা, আঙুলে জ্বলন্ত হাভানা সিগার, কমলা ধনেখালির ডুরে, কপালে ম্যাচ-করা কুমকুমের টিপ, প্লাক-করা ভুরু, মাস্কারা মাখান আঁখিপল্লব, স্লিভলেস ব্লাউজ, ফর্সা পেট—বান্টি শক্ত করে চোখটা বুজে ফেলল। ঠোঁটটা একটু কুঁচকে গেল। বান্টি নড়ল না। কেবল মিন্টু আরও এক পা এগোল। মাকে বলল, 'বাপিয়া এটা কি পারফিউম মেখেছে গো মা? কী মিষ্টি গন্ধটা—', মিন্টুটা চিরকালের ন্যাকা, এক নম্বরের বাপ-সোহাগী মেয়ে। বাবা না ডেকে ওই বাপিয়া ডাকটি সে নিজেই বানিয়ে নিয়েছে।

হরিদাসী জলখাবারের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকছিল। দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়িয়ে একগাল ফোকলা হাসি দিল। যেন দিব্যকর্ণ খুলে গেছে তার—এমন উজ্জ্বল হাসিতে কাঁধের ওপর মাথাটি হেলিয়ে বল্লে, 'বাঃ! এই তো দিব্যি হিল্লে হয়ে গেছে! বাপিয়া! মিন্টুরাণীর ডাকটিই অ্যাদ্দিনে মানিয়েছে সব চে' ভালো! বাপিয়া! যা বাবা যা, সন্টুবাবু, মিন্টুরাণী, বান্টু, বাবুর কাছে যাও বাছারা। অমনধারা করতিনি, বাপিয়ারা ডাকলি যেতি হয়—বাপ বলে কথা।'

শারদীয় যুগান্তর, ১৯৮১

গল্পসমগ্র

৪

নবনীতা দেবসেন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সুপ্রকাশনী
৮বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

সূচি

পলাশপুরের পিকনিক

বোনটি ১১
স্বপনের মুক্তি ফৌজ আর কালীপদ ১৭
আষাঢ়ে গল্প ২২
পলাশপুরের পিকনিক ২৭
সেই অবোধ শহীদ ৪১
দুলালের গল্প ৪৫
কায়াক ৪৯
রঞ্জনের গল্প ৫৯
অরুবাবু গপ্পো ৬৮

সপ্তকাণ্ড

বসুমতীর কেরামতি ৭৭
লক্ষ্মণের হাসি ৮৮
উর্মিলা-নিদ্রা ৯৫
লক্ষ্মণের নরকদর্শন ১০৫
মৎস্যমুখী ১১০
অথ গঙ্গা-সত্যবতী কথা অথবা সতীন সংবাদ ১১৪
উত্তরকাণ্ড ১২০

রাগ-অনুরাগ এবং অন্যান্য গল্প

তামাশা ১৩৩
শিশুকন্যা দশক ১৩৪
প্রন-ককটেল ১৩৬
বাস-বাসর ১৩৮
ভাসানির মা ১৪০
রাগ-অনুরাগ অথবা গুস্‌সার কিস্‌সা ১৪২
পরিণয়ে প্রগতি ১৫৯
ডাব্লু ডাব্লু ডাব্লু. প্রজাপতি. ডট্ কম্ ১৮০
ঠাকুমার গল্প ১৯৫
মিস্টার পত্রনবীশ, রাইটার ২০৭
বিমাতা ২১৩
পরীর মা ২১৯
মাটুর সঙ্গে দেখা ২২৬
বিন্ধ্যবাসিনী ২৩৬

পলাশপুরের পিকনিক

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বোনটি

ছোট্ট বাবু মুঠো ভর্তি টফি নিয়েই অন্য হাতটা বাড়ায়—'অনীতের জন্যে?' ও-মুঠোয় টফি ভরতে ভরতে মামু বলেন—'অনীতটি কে?' শুনে মা আর দিদিভাইয়ে চোখাচোখি হয়। একটু হেসে মা বলেন—'অনীত? অনীত বাবুর বেস্ট ফ্রেণ্ড।'

বাবু এক মিনিট দাঁড়িয়ে উত্তরটা শুনে নেয়। তারপরেই একগাল কচি হেসে ছুট লাগায়। মামু ঘরে বসেই শুনতে পান, বারান্দায় অনীতের সঙ্গে গল্প করছে বাবু।

'—জানিস অনীত, দিল্লি থেকে আমার মামু কলকাতায় চলে এসেছেন। এই দ্যাখ, আমাকে কত্তো টফি দিয়েছেন—তোকেও। নিবি? এই নে।' কিন্তু অনীতটা আচ্ছা অসভ্য ছেলে তো? কিছুই বলে না। একটা থ্যাংকিউ পর্যন্ত না। বাবুই আবার বলে—'পকেটে ভরে রাখ। রেখে, চল আমরা ক্রিকেট খেলি। আমি কিন্তু এম. সি. সি., তুমি ইণ্ডিয়া। আচ্ছা? হেড, অর টেইল? টেইল। হলো না, হলো না, হলো না। বেশ। তুমিই তবে ওপন করো।'

সারাদিনই বাবু অনীতের সঙ্গে খেলা করে। সারাটা দুপুর। যতক্ষণ না দিদিভাই ইস্কুল থেকে ফিরছে। যতক্ষণ না জগন্নাথদাদা এসে বলছে—'চলো বাবু গা মুছবে, দুধ খাবে চলো।' বাবুর যে সকালে ইস্কুল। তারপরে সারাটা দিন পড়ে থাকে লম্বা হয়ে। বিকেল যেন আসতেই চায় না। বাবু ঘরের মধ্যে করবেটা কী? মা তো রোদে বেরুতে দেবেন না। ভাগ্যিস অনীত ছিল! ভাগ্যিস অনীত আসে! অনীতেরও দিদি ইস্কুল থেকে ফেরে বিকেলবেলায়, ততক্ষণ সে খেলা করে বাবুর সঙ্গে। বাবু আর অনীনে খুব ভাব। বাবুই বরং মাঝে-মধ্যে অনীতকে একটু বকাঝকা করে। মা যদি বাবুকে বকেন, বাবুর মন-মেজোজ ভালো থাকে না, সেদিন বাবু গিয়ে অনীতকে একটু বকে দেয়। অনীত কিন্তু খুব লক্ষ্মী ছেলে। বকুনি খেয়ে উলটে ঝগড়া করে না। মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলে এই যা, তখন আবার বাবুকেই তো সান্ত্বনা দিতে হয়, ভোলাতে হয়। আবার অনীতও বাবুকে ভোলায় মাঝে মাঝে। এই তো সেদিন বাবু নীল কাচের ফুলদানিটা ভেঙে ফেলে খুব ধমক খেল। বাবু গিয়ে অনীতের কাছেই তো দুঃখু করলো, 'জানিস ভাই অনীত, আমার কী দোষ? জগন্নাথভাই ফুলদানিটা একদম টেবিলের ধার ঘেঁষে রেখেছে, আমি ছুটে যাচ্ছি, ফুলটুলগুলো শার্টের কোণে লেগে জড়িয়ে গিয়ে ব্যাস ফুলদানিসুদ্ধ মাটিতে পড়ে ফটাস। আমি কি ইচ্ছে করে ভেঙেছি? বল? মার কি আমাকে অত বকুনি দেওয়া ঠিক হয়েছে?'

অনীত বলে—'না ভাই বাবু। তোমাকে সত্যি অত বকা উচিত হয়নি। ইচ্ছে

করে তো আর ওটা ভাঙোনি তুমি? অমন কত হয়। মাসিমারই তো সেদিন হাত থেকে চায়ের প্লেটটা পড়ে গেল, কই মাসিমাকে কি কেউ বকেছিল? বড়রা অমন অন্যায় কাজ করেই থাকে। এসো আমরা খেলা করি। তুমি ও নিয়ে আর মন খারাপ করো না।'

—বাবু আর অনীত ফোনেও গল্প করে। দিনে চোদ্দবার ফোন করছে বাবু অনীতকে। যখন-তখন। অনীত অবিশ্যি মাঝে মাঝে বাড়িতে থাকে না। পিসিমণির বাড়িতে যায়। কিংবা পার্কে। কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই থাকে।—'অনীত, জানিস, আমাকে একটা এয়ারগান কিনে দিয়েছেন কাকু। দেখবি? সত্যি সত্যি এয়ারগান।'

অনীত বলে—'দেখি, দেখি!'

—'তবে আয় আমাদের বাড়িতে।'

—'দাঁড়া, আগে মাকে জিজ্ঞেস করে নি।'

অনীতের মা খুব ভালো। কক্ষনো বারণ করেন না। বাবু ডাকলেই অনীত চলে আসে। যতক্ষণ খুশি থাকে। বাবুকে যখন মা ঘুম পাড়ান, অনীতও শুয়ে পড়ে বাবুর পাশটিতে, বাবুর বালিশে মাথা দিয়ে। দুজনে গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে। কত গল্প। পিসিমণির বাড়ির গল্প। ইস্কুলের গল্প। মামাবাড়ির গল্প।

অনীত বেশি গল্প বলে না। অনীত গল্প শোনে। অনীতকে গল্প বলে বলে ফুরোতে পারে না বাবু। ভূতের গল্প, চোরের গল্প, বাঘশিকারের গল্প। সব গল্পই অনীতের কাছে নতুন। সব গল্পই সে হাঁ করে শোনে। মাঝে অবশ্য ওর ইস্কুলের গল্প বাবুকে শোনায় অনীত। ওদের ইস্কুলটা অন্য হলেও অনেকটা বাবুদেরই মতো। অনীতের আন্টিরা ঠিক যেন বাবুর আন্টিদের মতো।

কিন্তু দিদিভাইয়ের সামনে অনীত একদম যেতে চায় না। দিদিভাইকে ও ভীষণ লজ্জা পায়। একদিন ওদের গল্প শুনে দিদিভাই ফিকফিক করে হেসে দিয়েছিল, সেই থেকে অনীত দিদিকে দেখলেই লুকিয়ে পড়ে। খাটের নীচে, টেবিলের তলায়, কিংবা আলমারির কোণে, যেখানে হোক। কিছুতেই যাবে না দিদির সামনে। মার কাছে অবিশ্যি যায়। মা তো হাসেন না। অনীতের সঙ্গে বাবু যখন গল্প করে, মা চুপ করে শোনেন। শুনতে শুনতে মা নিজেই ঘুমিয়ে পড়েন কখনো কখনো।

শুধু তো গল্প নয়। হুড়াহুড়িও কম করে বাবু অনীতের সঙ্গে? এই ঘরটাই ওদের খেলার জায়গা। এই ঘরের আধখানা জুড়ে আছে দাদু-ঠাকুমার বিশাল খাট। আর সেই খাটের পুরোটা জুড়ে বাবু-অনীতের বিপুল রাজত্ব। এ খাটটা কি এমনি এমনি অন্য অন্য খাটের মতো? মোটেই না। এতবড় খাট, এত উঁচু খাট, পৃথিবীতে আর কোথাও আছে? কী সুন্দর, কত চওড়া, কত উঁচু। বাবু অনীতকে নিয়ে সারাদিন এখানে খেলে। মস্ত মস্ত থামের মতন পায়া, তাতে আবার থাবার মতন নখ খোদাই করা আছে, মাথার ওপরে চারটে ছত্রি বাঁধা আছে বারোমাস, সেখানে মশারি টাঙানো হয়। খাটের দুদিকে ইয়া চওড়া, ইয়া উঁচু আঙুরলতা পদ্মলতা কারুকার্য করা কাঠের পাঁচিলের মতন হাতল। তার ওপর দিয়ে বাবু দিব্যি হাঁটতে পারে, মাথার ওপরে

ছত্রিতে হাতও পৌঁছে যায় সেখানে উঠলে। খাটটাতেই কত খেলা জমে। তার নীচে অন্ধকারে ঢুকে খেলো, তার ওপরে উঠে বালিশ বিছানা নিয়ে খেলো, মশারিটাকে নামিয়ে নিয়ে খেলো। মশারি কখনো তাঁবু, কখনো পাল, কখনো জঙ্গল, কখনো রাজবাড়ি। অনীত আর বাবু সব খেলা জানে। তারপর খাটের চারদিকে ঘুরে ঘুরে দৌড়ে দৌড়ে, তারপর খাট থেকে ধুপধাপ লাফিয়ে মেঝেয় পড়ে, তারপর খাটের পায়া বেয়ে গাছের মতন উঠে উঠে—ক-ত খেলা। খাটটা নিয়ে বাবুর ভয়ানক গর্ব। সে অনীতকে প্রায়ই গর্ব করে বলে—'জানিস অনীত, এটা না, আমার দাদু-ঠাকুমার বিয়ের খাট। ওই যে ঐখানে, ঐ দ্যাখ, আমার দাদু-ঠাকুমা!' দেয়ালে চন্দন-পরানো ফ্রেমের ভেতরে তখন দাদু-ঠাকুমা অনীতের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসেন। —'দেখেছিস? দাদু না মস্তবড় শিকারী ছিলেন। ওই দ্যাখ, যত হরিণের শিং দেয়ালে, যত বাঘের মুণ্ডু, স-ব একলা দাদুর শিকার। বাবা! আমিও বড় হলে দাদুর মতন মস্ত শিকারী হব।' অনীত বড় বড় চোখে চেয়ে চেয়ে বাবুর মধ্যে এখনই দাদুর মতন মস্তবড় শিকারীটাকে দেখতে পায়। বাবুও নতুন এয়ারগানটা হাতে করে আয়নার সামনে দাঁড়ালে সেই মস্ত শিকারী সাহেবকে দেখতে পায়, অনীত যাকে মুগ্ধ চোখে দ্যোখে।

বাবু-অনীতের দস্যুপনার শেষ নেই। দুপুরবেলায় এই ঘরটার ভেতর তারাই রাজা। সেদিন কলম্বাস-কলম্বাস খেলবার সময়ে মা দুধের ডেকচি হাতে ঘরে ঢুকে পড়লেন। অমনি বাবু চীৎকার করে উঠেছে—'ওকি। ওকি! মা।—সাবধান। ডুবে যাবে যে! এটা তো গভীর সমুদ্র, অ্যাটলান্টিক ওশ্যান। অনীত—শিগগির মাকে একটা জেলেডিঙি ফেলে দাও—মা, মা, চট করে উঠে পড়ো, এই লাইফবোট।'—শুনেই মার সামনে একটা বালিশ এসে ধুপ করে মেঝেয় পড়ে।—'ওই যে, মা, লাইফবোট!'—শুনেই মা এক জবর ধমক লাগান। 'কী হচ্ছে বাবু? দেখছো না হাতে গরম দুধ। অমন করে চমকে দিতে হয়? যদি পড়ে যেত? পুড়ে যেতুম না আমি? সবসময়ে খেলা।'—সেদিন একটু লজ্জা পেয়েছিল অনীত। বাবুকে পরে বকেছিল—'সত্যি বাবু, তুমি বড্ড বেশি হুড়োহুড়ি করো। গরম দুধের ডেকচিটা খেয়াল করতে হয় তো? যদি মা পুড়ে যেতেন?'—বাবু অবিশ্যি মার বকুনিতে দমে না গিয়ে তক্ষুনি মাকে বলেছিল—'আচ্ছা মা, আচ্ছা এখন আর কলম্বাস-কলম্বাস খেলা হচ্ছে না। এখন বেশ সমুদ্রমন্থন খেলা হচ্ছে। বালিশটা হলো মৈনাক পর্বত আর ঘরটা সমুদ্র—আর তুমি হচ্ছো মোহিনী, তোমার হাতে ওটা অমৃতের কলসি, আচ্ছা? অনীত হচ্ছে অসুরদের রাজা, আমি দেবতাদের রাজা। কেমন?' মা হেসে ফেলে বলেন—'সত্যি বাবু। পারিসও বাবা তুই!' বাবু কঁকিয়ে ওঠে—'বাবু আবার কে? আমি তো ইন্দ্র।' এই ঘর কখনো সাহারা, কখনো সমুদ্র, কখনো মহাকাশ। এখানে অনীত আর বাবুর অন্তহীন হুল্লোড় লেগেই আছে। যতক্ষণ দিদিভাই না ফিরছে। মা বলেন বাব্বাঃ—ঘরের কী হাল করেছে ছেলে। খাটের ওপরে দিনভর যেন যুদ্ধ হচ্ছে।'

সব সময়ে কি আর গল্প করা ভালো লাগে! কখনো খাটটা হয় বেদুইনদের

তাঁবু, কখনো হয় জাহাজ, কখনো এরোপ্লেন। কখনো সত্যি সত্যি যুদ্ধক্ষেত্র। বালিশ দিয়ে ভয়ংকর যুদ্ধ হয় বাবুতে আর অনীতে। অনীত খুব বাধ্য ছেলে, কেবল একটাই তার দোষ। যখন ট্রাইসাইকেলটা নিয়ে ঘরের ভেতরে সাইকেল-রিকশা চালানো হয়, অনীত কিছুতেই রিকশাওলা হবে না। সে কেবলই প্যাসেঞ্জার। বাবু বেচারি কোনোদিনই প্যাসেঞ্জার হতে পায় না। সে রোজ-রোজই রিকশাওলা। অথচ বাবু যখন বেদুইন হয়, অনীত তখন কখনো কখনো উট হয়েছে। তাছাড়া অনীত কোনোদিন কলম্বাস হতে চায় না, বাবুকে কলম্বাস হতে দিয়ে অনীত কেবল একজন নাবিক হয়েই খুশি। কিংবা চাঁদে গেলে অনীত কেবল রকেটটার ড্রাইভার হয়ে চাঁদের পথের চারিপাশে চক্কর দেয়, বাবু গিয়ে চাঁদের পাথর কুড়িয়ে আনে। সেসব দিকে অনীত সত্যি খুব ভালো। শিকার-শিকার খেললে বাবুকে বাঘ, গণ্ডার, গরিলা মারতে দিয়ে সে মারে হাঁসজারু, ওরাংওটাং, খেঁকশিয়ালি। অসভ্য বর্বরদের দেশে যখন বাবু অভিযান চালায়, অনীত সবসময়ে তার দেহরক্ষী অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়। বাবু হয় ফেলুদা, অনীত কখনা তোপসে, কখনো জটায়ু।

আগে বাবু যখন ইস্টবেঙ্গলের প্লেয়ার ছিল, তখন অনীত ছিল মোহনবাগান। আর মোহনবাগান প্রত্যেকবার হেরে যেত। এখন শ্যাম থাপা ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে চলে গেছে বলে বাবুও ইস্টবেঙ্গলে নেই। শ্যাম থাপা নাকি কাকুর বন্ধু, তাই বাবু শ্যাম থাপার দলেই থাকতে ভালোবাসে। এখন বাবু নিজে মোহনবাগানের পক্ষে কেবলই ফটাফট গোল দিয় দেয় তো আর অনীত বেচারা ইস্টবেঙ্গল হয়ে গিয়ে অনবরতই গোল খায়। সব খেলাতেই এমনি। খাট থেকে লাফ দিয়ে ধপাধপ মাটিতে পড়বার খেলাটায়। তাতেও সে বেচারা সবসময়েই খাটের কাছাকাছি পড়ে। কখনো বাবুর মতো একেবারে হনুমানের মতো একলাফে সেই আয়না আলমারির কাছে পৌঁছতে পারে না। খাটের হাতলে উঠে যখন মাথার ওপরের মশারি টাঙানোর ছত্রি ধরে ধরে ওরা ট্রাম হয়ে হাঁটে, তখন অনীত হয় প্যাসেঞ্জার, বাবুকে কণ্ডাক্টর হতে দিয়ে। খাটের নীচে ঢুকে যখন ওরা ইস্কুল-ইস্কুল খেলে, অনীতই সবসময়ে ছাত্র হয়, টিচার হয় বাবু। সেদিক থেকে অনীতের মতো ভালো বন্ধু আর হয় না।

তবু বাবুর আজকাল মন ভালো নেই। এবার পুজোয় মা বলেছেন বাবুকে একটা ভাই প্রেজেন্ট দেবেন। সেই নিয়ে বাবু ভয়ানক উদ্বিগ্ন। অনীতকে বলে —'দ্যাখ অনীত, আমার জন্য একটা ভাই আনা হচ্ছে। কে জানে কেমন হবে ভাইটা? রুন্টুর ভাইয়ের মতো দুষ্টু-মুষ্টু হবে কিনা কে জানে? রুন্টুর ভাইটা এমনই সাংঘাতিক বাচ্চা, রুন্টুর স্কুলের বইখাতা সব ছিঁড়ে ফেলেছে, রবার-টবার চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছে, পেন্সিল তো হাতে পেলেই হলো, ঠুকে ঠুকে শীষ ভাঙবে। কিছুটি বলবার যো নেই। বললেই এমন চ্যাঁচাবে, ঠিক যেন বুথসাহেবের বাচ্চা, অমনি রুন্টুর মা এসে বকবেন—রুন্টু, আবার ভাইকে কাঁদাচ্ছো। ভাই অনীত। আমার বড্ড ভয় করছে। আমার কিছু ভালো লাগছে না। ভাই-টাই আমি চাই না।'— অনীত চুপটি করে সব শোনে। তারপরে বলে—'কিন্তু বাবু, সব ভাইই যে অমন দুষ্টু হবেই, তার তো মানে নেই? লক্ষ্মী ভাইও তো হয়? তোমার ভাইটা তো ভালো ভাই হতে পারে?

তোমাকে দাদা-দাদা বলে ডাকবে, তোমার সব কথা মন দিয়ে শুনবে, তোমার সঙ্গে সব সময়ে খেলা করবে, এমনও তো ভাই হতে পারে?'—হ্যাঁ, তা যদি হয়, তবে অবশ্য বাবুর আপত্তি নেই। তবু মনে শান্তি নেই, কে জানে, ভাইটা কেমন স্বভাবের হবে। ভালো, না, দুষ্টু। বাড়িতে না আসা অবধি জানবার তো উপায় নেই।

মা যখন নার্সিংহোম ভাইকে আনতে গেলেন, অনীত তখন বাবুর কাছে সারাক্ষণ থাকল এসে। সারাক্ষণ ওকে সান্ত্বনা দিলো—'দেখিস বাবু, তোর একটা খুব লক্ষ্মীসোনা ভাই হবে।' ভগবানও নিশ্চয় বাবুর মনের কথা শুনতে পেয়েছিলেন। বাবু ভাই চায় না শুনে ভগবান তার জন্য একটা বোন পাঠিয়ে দিলেন। বোনকে নিয়ে মা যখন বাড়িতে এলেন, বাবুর আনন্দের শেষ রইল না। ও মা! অ্যাত্তোটুকুনি বোনটি? এ যে একটা ডলপুতুল? বাবু দৌড়ে গিয়ে বারান্দার কোণে ভাঙা ইঁটটার ফোকরে মুখ গলিয়ে ডাকে—'অনীত, অনীত।' অনীত আসে।—'জানিস, আমার কী সুন্দর একটা বোন হয়েছ, ঠিক একটা বিলিতি ডলপুতুলের মতন। গোলাপফুলের মতন হাত-পা-মুখ—কী ছোট্ট ছোট্ট আঙুল, যেন প্রদীপের সলতে! আবার তাতে নখ আছে! আরো ছোট্ট, সাদা, যেন ঝিনুকের কুচি বসানো। কত্তটুকুনি একফোঁটা নাক, ছোট্ট ছোট্ট ঠোঁট, আর একখানাও দাঁত নেই। মুখটা একদম ফেকিলা, আমাদের ঘুঁটেউলি বুড়ির মতন। আর ভুরুও নেই, জানিস? কেবল মাঝ কপালে এই বড় বড় দুটো কালো কালো চোখ।' অনীত অবাক হয়ে শোনে।—'চল, দেখবি চল। কী সুন্দর।' বোনটি কিন্তু একদম কাঁদে না, কেবল খিদে পেলে একটু ওঁয়াও ওঁয়াও করে ডাকে—ঠিক বেড়ালছানাদের মতন।

বোনের গল্প শুনে অনীত কিছুই বলে না। চুপ করে বোনকে দ্যাখে। বাবু উচ্ছ্বসিত, বলে—'কিন্তু বাপরে। ঘুমটি যদি ভেঙে যায়, অমনি সাংঘাতিক কাণ্ড হয়ে যাবে।' বোনও যে বুথসাহেবের বাচ্চা হতে জানে। মা তাই বারণ করেছেন, দুপুরবেলায় একদম হুড়োহুড়ি করা চলবে না। খাটের খেলা বন্ধ। খাট থেকে লাফানোও বন্ধ। বোন চমকে চমকে ওঠে কিনা। বাবু-অনীত আর খেলতে পারে না। দাদু-ঠাকুমার বিয়ের খাটে। ওদের খেলবার জায়গার ঠিক মধ্যিখানে দুদিকে দুটো পাশবালিশের পাঁচিল ঘিরে তার মাঝখানে রাজকন্যের মতন শুয়ে আছে তুলতুলে ফুরফুরে বোনটি। মা বলেন—'বাবু, বোনের দিকে একটু নজর রেখো তো। দুষ্টুমি কোরো না। যেন দুপুরবেলাতে! বোন যেন কাঁদে না।'

আর বাবু কী বলে? বাবু হাঁটু ভাঁজ করে, পেছন উঁচু করে, কনুইয়ের ওপরে ভর দিয়ে দুই হাতের পাতায় মুখ রেখে ডেঁয়ো পিঁপড়ের মতো হয়ে খাটে বোনের পাশে বসে। বসে বলে—'ও আমার বোন বোনিয়া, ধনধনিয়া, মনমনিয়া, টুনটুনিয়া, ও আমার কুতুর-কাতুর-পাতুর, ইল্লু বিল্লু গুল্লু, ও আমার সুন্টি বোনটি', তার আদরের ঘটা শুনে মা হাসুন না, বাবুর তাতে ভারী বয়েই গেল। বাবুর এখন একদম অনীতের সঙ্গে খেলা করবার সময় হয় না। খেলবে কখন? বোনের দিকে নজর রাখতে হবে না? বাবু না দেখলে বোনটিকে কে দেখবে? দিদিভাই তো ইস্কুলে। মার কত কাজ। বাবু বোনের পাশ থেকে নড়ে না। বোনকে সে কত গল্প শোনায়।

BanglaBook.org

বলে—'বোনটি সোনা, চাঁদের কোণা, জানো কি তুমি কে? তুমি আমাদের "স্নো হোয়াইট!" কিন্তু তোমার গল্পটা একটু আলাদা। তোমার গল্পে কোনো দুঃখু নেই। কেবল ভালো ভালো জিনিস। তোমার তো সৎমা নেই। আর আমার মতন একটা বড় দাদাই আছে যখন তোমার, তখন তোমার আর ভাবনা কী? জগতের কোনো ডাইনির সাধ্যিই নেই তোমার একটুও ক্ষতি করে দেয়। আসুক না দেখি একটা ডাইনি! এয়ারগান দিয়ে এক মিনিটেই তাকে দেব শেষ করে। তুমি ভয় পেও না বোনটি? ঘুঁটেউলিকে অবিশ্যি একটু ডাইনি-ডাইনি দেখতে, কিন্তু সে আসলে খুব ভালো লোক। তোমারই মতন ফোকলা মুখে সে যেই হাসবে, অমনি তুমি বুঝতে পারবে যে ও একটুও ডাইনি না। বোনটি, জানো, যেই তুমি একটু বড় হবে না, অমনি তোমাকে আমি ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে সাইবেরিয়ায় বেড়িয়ে নিয়ে আসবো। সা-ই-বে-রি-য়া—উড়ো হাঁসেরা যেখান থেকে আসে—সেই অনে—ক দূরে।' বোনটি কিছুই বলে না। কেবল ফিকফিক করে হাসে, আর গোল গোল মুঠো নেড়ে বাবুর ঝাঁকড়া চুলের ঝুঁটি ধরে অন্যমনস্কভাবে হ্যাঁচকা টান মারে। —বাবু কাতরে ওঠে—'উ হু হু হু—বোনটি। ওকি ভাই, ওকি ভাই, চুল টানে না, ছিঃ!' কিন্তু রাগ করবে কি করে? বোনটি ঠিক যে একটা রসগোল্লার মতো। গোল গোল হয়ে শুয়ে থাকে, চার হাত-পা একসঙ্গে শূন্যে তুলে। নাকের সামনে দু'পা দুই মুঠোয় ধরে ট্যারা হয়ে সে কী গম্ভীর তাকানো। দেখে বাবু হেসে কূল পায় না।

—'ও বোনটি, ও পুন্টি-মুন্টি, কুন্তি-খুন্তি, ও কতর-মতর-ফতর—বড় হও না একবার, তোমাকে আমি আমার রিকশায় প্যাসেঞ্জার করে ফেলবো, দেখো না। আর রকেট চালানোর সময়ে তুমি হবে কো-পাইলট—কেমন? আর যখন তুমি ক্রিকেট খেলতে শিখবে, তখন মাঝে মাঝে তুমিও এম. সি. সি., আবার মাঝে মাঝে আমিও এম. সি. সি., পালা করে,—কেমন?' বোনটি সব কথাতেই হাত-পা ছুঁড়ে হাসে। কিছুই বলে না।

মামু আসেন বোনকে দেখতে। বাবুর মুঠো ভরে টফি দিয়ে বলেন—'কই ও-হাত দেখি, অনীতের টফি—'

বাবু একগাল লাজুক হেসে বলে—'অনীত? অনীত আর আসে না মামু।'

—'সেকি? কী হলো তার?' মামু জিজ্ঞেস করেন ব্যস্ত হয়ে।

বাবু অম্লানবদনে জানায়—'ওরও একটা বোনটি হয়েছে কিনা। খেলবে কখন? বোনের দিকে নজর রাখতে হবে তো? তুমি বরং বোনের জন্যেই একটা টফি দাও। দাঁত উঠলে খাবে।'

সন্দেশ, বৈশাখ ১৩৮৪

BanglaBook.org

স্বপনের মুক্তিফৌজ আর কালীপদ

সেবার ছুটিতে স্বপন মার সঙ্গে দাদুদিম্মার বাড়ি বেড়াতে গেছে, সোনাফুলি গ্রামে। দাদুদিম্মার বাড়িতে একটা মস্ত বাগান আছে। এখন সেই বাগান আসলে পোড়ো জায়গাই, আগাছায় ভর্তি, কিছু ফলফুলুরির গাছ আছে বটে, কিন্তু ফুলগাছের বাহার নেই। ফুল বলতে ঐ শিউলি, টগর, সন্ধ্যামালতি আর একটা সুন্দর চামেলির লতা, রান্নাঘরের চালে কুমড়োর পাশাপাশি হয়েছে। স্বপনের কিন্তু বাগানটা খুব ভালো লাগে। দাদুদিম্মা বুড়ো মানুষ, তাঁদের বাড়িতে কোনো বাচ্চাটাচ্চা নেই। স্বপনের খেলার কোনো সঙ্গী হয়নি, মা কেবলই দিম্মার সঙ্গে গল্প করেন, আর দাদু তো পুরুত ঠাকুর, গাঁয়ের রাধাগোবিন্দ ঠাকুরের দেখাশুনো করতেই তাঁর দিন যায়। স্বপন সর্বদা একটা ছড়ি হাতে একা একা বাগানে ঘোরে। একবার ধরো উত্তর থেকে দক্ষিণে দৌড়ে গেল সব টগরগাছগুলোর গায়ে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে, ফুল ঝরাতে ঝরাতে —তারপরেই মনে পড়ল জগদীশ বসুর আবিষ্কার—গাছেদেরও বোধশক্তি আছে। —কে জান ছড়ি মারলেও ওদের ব্যথা লাগে কিনা? অমনি স্বপন দক্ষিণ থেকে উত্তরে ছুটল গাছগুলোর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে। এমনি আর কি। বাগান নেই, কিন্তু একটা পাথর-বাঁধানো পথ আছে বাগানের মধ্যে—বড় বড় চৌকোমতন সাদা পাথর পাশাপাশি বসানো, ফাঁকে ফাঁকে ঘাস আর শ্যাওলা জমে উঠে সবুজ রঙের আউটলাইন তৈরি হয়েছে প্রত্যেকটায়, ভারি সুন্দর দেখতে লাগে স্বপনের। পাথরগুলোতে স্বপন এমনি হাঁটে না, এক্কাদোক্কা খেলার মতন লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটে। একটা বাদ দিয়ে একটা আরেকটা বাদ দিয়ে আরেকটা—এমনি। আর গোনে, ক'বার হলো। দুই, তিন, চার। ও দেখেছে টগরগাছ থেকে পেয়ারাগাছে যেতে পনেরোবার লাফাতে হয়। কখনো কখনো লাফায় না, হিসেব করে হাঁটে। একটা পাথরে একবারই মাত্র পা দিতে হবে। দুবার কিন্তু পা দিয়ে ফেলা চলবে না। এ খেলার জন্যে অবশ্য খুব লম্বা লম্বা পা ফেলতে হয়। ঐভাবে হাঁটলে, তিরিশবার পা ফেলা দরকার। অবশ্য তিরিশবার লাফানো যায়। সেটাই বরং সোজা। মাঝে দু-একটা পাথর ভাঙা মতন, ছোট মতন, সেখানে পা ফেলা শক্ত নয়। তেমনি আবার যেগুলো বেশি চওড়া মতন, সেগুলো ডিঙোতে বেশ কষ্ট। স্বপন কেবলই নিজে নিজে খেলা তৈরি করে নেয়। যেমন ওই পেয়ারাগাছের নিচু ডালটা—যাতে বসে দিব্যি দোল খাওয়া যায়, স্বপন তাতে বসে ভাবে—এটা হচ্ছে ব্যাবিলনের হ্যাঙিঙ গার্ডেন—ঝুলন্ত উদ্যান—কী অপরূপ সব নাম-না-জানা ফুল ফুটে আছে, কত বার্ড অব প্যারাডাইস ডালে ডালে লেজ ঝলমলিয়ে বাগান আলো করে বসে আছে, কত রঙিন প্রজাপতি উড়ছে ফুলে ফুলে। আহ! কী সুন্দর ফুলের গন্ধ —চোখ বন্ধ করে স্বপন সত্যি সত্যি গন্ধ পায়। তারপর লাফ দিয়ে নেমে বাড়িতে ছোটে—'দিম্মা, দুটো নাড়ু দাও তো!'

কখনো বা সবচেয়ে উঁচু জামগাছটার ওপরের ডালে উঠে পড়ে স্বপন। এই গাছটাই বাগানের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু। এর ওপর থেকে পুরো গাঁ-টা দেখা যায়।

স্বপন ভাবে—এটা যেন বেশ নিউইয়র্ক। উঁচু গাছগুলো সব এক একটা স্কাইস্ক্রেপার বাড়ি। আর এই জামগাছটা হচ্ছে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং।—ঈশ। কী ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিঙের মাথায়। স্বপন গুটিশুটি হয়ে বসে, ডানহাতে ডাল ধরে বাঁ হাতটা গোল মুঠো পাকিয়ে চোখের ওপর ধরে ঠিক দূরবীনের মতন করে —আর বলে, 'ওই যে দেখা যাচ্ছে ওয়াশিংটন।' বলে বাদলদের বাড়িটাকে দেখে। তারপর মুখটা আরো ছুঁচলো করে বলে, 'আরে কী ক্লিয়ার ওয়েদার, শিকাগো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে!' বলে একদৃষ্টে মাখনদের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে। ওদের লাউমাচায় বেশ বড় বড় লাউ হয়েছে। তারপর আরো দূরে দেখবে বলে সনাতনদের ধানজমিতে কাকতাড়ুয়ার দিকে চেয়ে বলে—'আর ওই যে, দিব্যি দেখা যাচ্ছে হলিউড।' একদম সত্যির মতন সুরে বলে, তারপর নিজই খুব খানিকটা হেসে নেয়। তরতরিয়ে নেমে আসতে আসতে ভাবে—একটা বেশ হেলিকপ্টারে চড়ে নামছি। নাকি লিফট এটা? ভাবতে ভাবতে পা মাটিতে ঠেকে যায়—স্বপন ফের বাড়িতে ছোটে—দিম্মা, মুড়ি মাখো।'

একটা পলাশগাছ আছে, একদম পাতাটাতা নেই, কাঠখোট্টা দেখতে, চড়া অবশ্য সোজাই। সেটার শক্ত মগডালে উঠে স্বপন সোজা হয়ে শুয়ে পড়ে। ডালটা আঁকড়ে উপুড় হয়ে। আর ভাবে, এটা কেপ কেনেডি। এটা একটা স্পেশ রকেট—চাঁদে যাবার—এখুনি ছাড়ব—'হ্যালো, রেডি—টেন, নাইন, এইট, সিক্স, ফাইভ ফোর থ্রি, টু, ওয়ান, জিরো—' Zoooommm, ঠিক যেমন কমিকে লেখা থাকে। ডালটা যেন ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে শূন্যে—আকাশে—উঠছে—উঠছে—উঠছে—উঠে গেল—উঠে গেল—মেঘ ফুটো করে—পৃথিবীটা ঐ যে নিচে সাদাকালো মার্বেল পাথরের থালায় মতন পড়ে রইল অন্ধকার কালোপাথরের মেঝেতে। ফুট করে একটা ডেয়েঁ পিঁপড়ে ঠিক এই সময়ে স্বপনের বাঁ পায়ের ডিমে দিল কামড়ে। উঃ হু হু হু—ধ্যুৎ—দিলে স্বপনের রকেট অভিযানটা বিগড়ে! এবার বরং দিম্মার কাছে যাওয়া যাক—যদি পিঠেগুলো তৈরি হয়ে গিয়ে থাকে। গাদুর বাড়িতে স্বপনের কাজ শুধু এই। বাগান আর রান্নাঘর। রান্নাঘর আর বাগান।

এছাড়া বাগানের ঠিক পিছনে একটা ঝুড়ি-দোলানো বটগাছ আছে। কে জানে কত বয়েস গাছটার। শিবপুর বটানিকসের সেই অরণ্যপ্রমাণ বটগাছটার চেয়ে বড় নয় অবশ্যই। এরও অনেক অনেক ঝুরি বটে, কিন্তু বিরাট পেটমোটা মা-গাছটার ডালগুলো থেকেই নেমেছে সব। প্রথম দিন এসেই স্বপন গুনে ফেলেছে, মোট উনতিরিশটা বড় ঝুরি—মানে যেগুলো মাটি অবধি পৌঁছে গেছে। শেকড় গেড়েছে আর ছোট ছোট ক'টা, স্বপন গুনে শেষ করতে পারেনি। কয়েকটা গোনবার পরেই তার মাথা গুলিয়ে যায়। স্বপন এই গাছটার সঙ্গে খুব ভাব করে ফেলেছে। এখানে ও একটা চমৎকার খেলা করে। মোটা গুঁড়িটার গায়ে একটা পরিষ্কার ফোকর আছে, তাতে সাপখোপ থাকতেই পারে না, দিব্যি তার ভেতরটা দেখা যায়—ধুলো মাটি শুকনো পাতা ভর্তি মেঝে ওপরের নিচু ছাদের দিকটাও দেখা যায়। ওখানে একটু মাকড়সার জাল ছিল, স্বপন ডালপাতার ঝাড়ন দিয়ে সাফ করে নিয়েছে। কখনো

কখনো স্বপন সেই ফোকরটায় উঠে ঢুকে, উবু হয়ে বসে। বাসে কলকাতার পান-বিড়ির দোকান দেয়। ভিড় করা ঝুরি হয় তার ক্রেতা। স্বপন নিজেই বলে—'দুটো জর্দাপান দেখি।'—

—'দাঁড়ান বাবু, আগে মিঠে খিলিটা দিয়ে নেই'—

—'দেখি ভাজির এক প্যাকেট—'

—'এই যে তিনটে চারমিনার আর একটা দেশলাই—কোথায় গেলেন বাবুরা?'

—'দুটো বিড়ি দিন তো—'

—'এই যে দুটো বিড়ি।'

পানের দোকান পানের দোকান খেলাটা দিব্যি জমে।

আরেকটা খেলাও আছে বটগাছের। ওইখানেই খেলতে হয়—তবে ফোকরটা তাতে লাগে না। বটগাছতলায় যে টিলামতন উঁচু জায়গাটা আছে, সেখানে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চোখদুটো সরু সরু করে, ছোট ছোট করে চারিদিকে তাকিয়ে, স্বপন মনে করে নেয়—এটা হলো গড়ের মাঠ। অদ্য ময়দানে মহতী জনসভা। দলে দলে যোগদান করুন। ঝুরিগুলো সব হাজার হাজার লোক, এরা শ্রোতা। আর টিলাটা মঞ্চ। স্বপন হচ্ছে প্রধান বক্তা। স্বপন একটু গলা ঝেড়ে নিয়ে বলতে শুরু করে —'ভাইয়োঁ ঔর বেহেনোঁ আজকা তারিখ পন্দরা অগস্ট হ্যায়। ইস শুভদিন মে হম সব ইয়ে হি কসম করঙ্গে, কি জিস রোজ তক জিন্দগী হ্যায়—উস রোজ তক ভারতকে লিয়ে হম সবকো জান কবুল হো চুকা হ্যায়।'

—'জান কবুল। জান কবুল।'

—'ভাইয়োঁ ঔর বেহেনোঁ, বোলো—জয় হিন্দ।'

—'জয় হিন্দ!' 'বোলো—ভারতমাতাকী জয়।'

—ভারতমাতাকী জয়।' বোলো বন্দেমাতরম'—

—'ব—ন্দে—মা—ত—র—ম'— একবার একা, আর তার পরের বারে গলা মোটা করে একা একাই পঞ্চাশ হাজার লোকের আওয়াজ তুলতে গিয়ে স্বপন ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ওর খুব তেষ্টা পেয়ে যায়। স্বপন ছুটে যায় রান্নাঘরের দাওয়ায়—যেখানে ডাবের কাঁদি নামানো থাকে, সেদিকে।

এমনি খেলা রোজ। সারাদিন ধরে। সকালবেলায় মা সঙ্গে করে কারুর বাড়ি বেড়াতে নিয়ে যান।

সন্ধেবেলা দাদু রোজ গল্প বলেন। দুপুরটাই বাজে। দাদু ঘুমোন। মা-দিদ্মা হয় ঘুমোন, নয় গল্প করেন। আর স্বপনকে বাগে পেলেই ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করেন। তাই স্বপন সারা দুপুর বাগানে কাটায়। কলকাতায় তারা ফ্ল্যাটে থাকে, জমির সঙ্গে মুখ দেখাদেখি নেই। এখানে এত গাছপালা, ধুলো-মাটি পেয়ে স্বপনের আহ্লাদের অন্ত নেই। প্রথম প্রথম বন্ধুদের জন্য মন কেমন করত, সুমন, অনিন্দ্য, সব্যসাচী, সৌম্যদেবর মুখগুলো মনে পড়ত,—আর চোখে জল এসে যেত। এখানে খেলা করবার কেউ নেই। বাদল-মাখনবা ওর চেয়ে অনেক বড়। আবার সন্টু, বাচ্চু,

করিমরা ওর চেয়ে ছোট ছোট। কিন্তু এখন আর মন খারাপ করে না। এইসব নতুন নতুন খেলা করতে খুব ভালো লাগছে স্বপনের। কলকাতায় এসব করাই যায় না। কেউ না কেউ দেখে ফেলবে। আর দেখলেই খ্যাপাবে। তাছাড়া খেলবেই বা কোথায়।

সেদিন দুপুরবেলা স্বপন 'মুক্তিফৌজ আর খান-সেনা' খেলছিল। রান্নাঘরের পিছনটাতে যে একগাদা বনতুলসীর ঝোপ আছে, সেইখানে। বনতুলসীর ঝোপগুলো হচ্ছে গেরিলাবাহিনী, আর রান্নাঘরটা খান-সেনাদের ঘাঁটি, স্বপন হলো সেনাপতি —অবশ্যই মুক্তিফৌজের! জীবন হাতে করে ওরা যুদ্ধ করতে চলেছে—স্বপন তুলসীবনকে নির্দেশ দিচ্ছে—'করিম, তুমি এখানে থাকো, একদম নোড়ো না, ছোরাটা তৈরি আছে তো—আমি বলছি, শত্রু এই ঘরেই লুকিয়েছে—চুপ চুপ অনিন্দ্য, একটাও কথা বোলো না, মাখনদা, যেন নিশ্বাসের শব্দও না হয়, লাঠিটা বাগিয়ে রেখো —আস্তে আস্তে ডানদিক থেকে তোমরা ঘাঁটি ঘিরে ফেলো—আর সৌম্যদের—তুই সুমনকে নিয়ে বাঁ দিক দিয়ে এগোতে থাক—একদম আওয়াজ করবি না—বন্দুক রেডি রাখবি—আমি গিয়ে দরজাটা খুলে ফেলে সিগন্যাল দিলেই তোরা একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বি—আর সঙ্গে সঙ্গে দে-মার দে-মার! বুঝেছিস? ভাইসব, অনেকদিন সয়েছি—আজ শোধ নেবার দিন এসেছে—শত্রুর শেষ রাখতে নেই—বাদলদা, মন্টু, বাচ্চু, আজিজ—সবাই তৈরি থাকো—...ছয়, পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক—ঝপাং—' এক ধাক্কায় স্বপন ভেজানো দরজাটা খুলে ফেললে রান্নাঘরের, আর সঙ্গে সঙ্গেই কী যেন একটা হয়ে গেল!

রোগা-রোগা, নেড়া মাথা, কোত্থেকে একটা গামছাপরা ছেলে উদয় হয়ে একবার স্বপনের পায়ের উপরে শুয়ে পড়েছে। শুয়ে পড়েই ক্ষান্ত নেই—দুহাতে স্বপনের পা দুখানা জাপটে ধরেছে, আর ডুকরে ডুকরে কাঁদছে—'বাবু গো, আমাকে মেরোনি বাবু, আমাকে মেরোনি গো, আমি আর চুরি করবুনি গো বাবু, এই মা কালীর দিব্যি—বাবু গো আমাকে মেরোনি—তোমার দলবলকে বারণ করে এসো বাবু—আমি আর জেবনে এমনিধারা অপকম্মো করবুনি।'

স্বপন প্রথটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেও এক মুহূর্তেই বুঝে নিল ব্যাপারটা কি হয়েছে। সাধে কি সে ফার্স্ট হয়ে ক্লাস সিক্সে উঠেছে? হাতের ছড়ি নাচিয়ে স্বপন বললে—'ঠিক আছে। তুমি আমার পা ছাড়ো, আমি ওদের বারণ করে দিচ্ছি, তোমাকে মারবে না, কিন্তু তুমি সত্যি সত্যি আর চুরি করবে না তো?' ছেলেটা পা ছেড়ে হঠাৎ দৌড়ে উনুনটার কাছে গিয়ে উনুনে দু'হাত রেখে বললে—'এই দ্যাখো, চুলো ছুঁয়ে পিতিজ্ঞে কচ্চি আর কক্ষনো চুরি করবুনি—' স্বপন দেখলে ছেলেটার চোখ দিয়ে সত্যি ঝরঝর করে জল পড়ছে। দেখ তার মনে খুব কষ্ট হলো। আহা রে! কত গরীব কে জানে। গরীব নইলে কেউ চুরি করতে আসে?

টুক করে বেরিয়ে গিয়ে, ঝপ করে দরজা বন্ধ করে স্বপন বাইরে থেকে শিকলি তুলে, হাতের ছড়িটা তাত গুঁজে দিলে শক্ত করে। চোর বাছাধন আর বেরতে পারবেন না। তারপরে বলতে লাগল—'আচ্ছা, সুমন, সোমদেব, অনিন্দ্য, সব্যসাচী

—তোরা ভাই এবারকার মতন চোরটাকে ছেড়ে দে—ওর মনে খুব অনুতাপ হয়েছে, আর কক্ষনো করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে। ওকে ছেড়েই দিই, কি বলিস? আমরা ওকে মেরেই ফেলতাম, কিন্তু আর মারব না। দোষ স্বীকার করে মাপ চাইছে যখন, তখন দোষীকে ক্ষমা করাই রীতি। আমরা সব P.O.W.-দের মুক্তি দিয়ে দিলাম, জয় হিন্দ। তোমরা যে যার বাড়ি চলে যাও। স্কোয়াড ডিসমিস!' বলে স্বপন ছুটল ঘরে—মা আর দিম্মা যেখানে মাদুর পেতে শুয়ে পান মুখে দিয়ে গল্প করছেন।—'মা গো, দিম্মা গো, রান্নাঘরে একজন চোরকে বন্ধ করে রেখেছি। চোর কাঁদছে।'—মা বললেন—'স্বপন, এই ভরদুপুরে তোমার সঙ্গে খেলা করবার সময় আমার নেই।' স্বপন বললে 'ওমা, খেলা কেন হবে? সত্যি চোর। কাঁদছে। গামছা-পরা নেড়া মাথা। একটা বস্তার মধ্যে সমস্ত বাসনগুলো ভরেছে।'

'—অ্যাঁ? বাসনগুলো? বস্তার মধ্যে?'

সমস্বরে চেঁচিয়েই মা আর দিম্মা তড়াক করে উঠে বসলেন। তারপরেই ছুটলেন রান্নাঘরে। ঢোকবার সময়ে দিম্মা মাকে বাঁ-হাত দিয়ে পেছনে ঠেল দিয়ে বললেন, ছেলেমানুষরা এ ব্যাপারে এসো না।' স্বপনের এত গোলমালেও হাসি পেয়ে গেল। মা নাকি ছেলেমানুষ। দিম্মা সেকল খুলেই পেল্লায় হাঁক দিলেন, 'কে রা?' ছেলেটা কেন, স্বপনেরই তাতে পিলে চমকে গেল। চোর বললে—'আমি কালীপদ।'—'তুই কোন গাঁয়ের চোর?'—'এজ্ঞে, রাসমণিহাটের।' দিম্মা বললেন—'ইদিগে আয়।' ছেলেটা কাঁপত কাঁপতে এলো। দিম্মা বললেন—'মাজা বাসনগুলো সব ছুঁয়ে দিলি তো—ফের ধুতে হবে। আগে সব বের করে দে থলে থেকে।' গামছায় চোখ মুছে, যত্ন করে বাসন বার করতে করতে চোর বললে, 'এজ্ঞে আমি ভটচায্যি বামুনের পো, আমি তোমাদের বাসন ছুঁলে কিছু হবেনিং' বলেই গামছার নিচে থেকে টেনে বের করলে কোমরে জড়ানো ফর্সা পৈতে।—দিম্মা আর মা অমনি গালে হাত। 'কী! বামুনের ছেলে হয়ে চুরি? লজ্জা করে না? এর চেয় থুতু ফেলে ডুবে মরাও যে ভালো ছিল।'

এমন সময়ে খড়ম খটখট করে দাদু এসে পড়লেন।—'কি ব্যাপার?' তখন কালীপদ চোর বলছে—'কী করি গো মা, কেউ খেতে দেয় না—পেটের জ্বালায় চুরকত্তি এইচি—'। স্বপন বললে—'কেন তোমার মা-বাবা নেই?—'তেনারা কবেই স্বগগে গেচেন। মা-বাবা কেউ কোথাউ নি।' দিম্মা বললেন, 'আহা গো! বাছার আমার কেউ নেই গা? তাই মুখখানা অমন শুকনো, দুটা মুড়ি-নারকেলে মেখে দি।' দাদু বললেন, 'গায়ত্রী জানো?' চোর পৈতে ছুঁয়ে বললে—'জানি। ওঁ ভূর্ভুবস্য তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গদেবস্য ধীমহি'—গড়গড় করে চোর গায়ত্রী আওড়ালে দিম্মা নরম গলায় বললেন, 'আগে হাত পা ধোও বাছা, তারপরে ঠাকুরঘরে একবারটি চল দিকি—।' পুকুরে ডুব দিয়ে এসে দাদু-দিম্মার প্রেসক্রিপশনে ঠাকুরঘরে পৈতে ছুঁয়ে, গোপালের পা ছুঁয়ে গায়ত্রী জপ করে তিনসত্যি প্রতিজ্ঞা করলে, আর সে চুরি করবে না। এবার থেকে লক্ষ্মী ছেল হয়ে দিম্মার বাড়িতেই থাকবে। জল তুলবে, বাগান পরিষ্কার করবে আর দাদুর সঙ্গে পূজা করতে শিখবে। এ-গাঁয় মোটে বামুন

BanglaBook.org

নেই, দাদুর পরে রাধাগোবিন্দের পুরোহিত পাওয়া ভার হবে। চোর তাই এখন থেকে পুরতগিরির অ্যাপ্রেন্টিসশিপ করবে।

তারপরে মুক্তোর মতন ফর্সা দাঁতে লাজুক লাজুক হেসে এক ধামা মুড়ি নিয়ে কালীপদ দাওয়ায় বসল, আর স্বপনেরও দাদুর বাগানে ইচ্ছমতন খেলা করা সেই থেকে ফুরুলো। দুদিনেই তুলসীবন কেটে সাফ করে ফেলল কালীপদ।

স্বপনের একটাই ভারী দুঃখু, স্বপন যে ছোটোছেলে হয়েও একলাই একটা আস্ত-সমস্ত চোর ধর ফেললে—এতবড় কথাটা নিয়ে গাঁয়ে কেউ কিছু জানতেই পারলে না। দাদু কি-না বললেন, আগে চোর ছিল শুনলে কেউ ওকে পুজো করতে ডাকবে না। তাই এতবড় খবরটাও ওঁদের চেপেই থাকতে হলে, সবাই শুধু শুনলে —একজন গরীব বামুনের ছেলকে পুরুতঠাকুর আশ্রয় দিয়েছেন।

কালীপদ কিন্তু স্বপনদাদা বলতে অজ্ঞান। জীবনদাতা বলে সে স্বপনকে ভীষণ ভক্তিশ্রদ্ধা করে। সেও যে কোনোদিনও জানতে পারেনি—সেদিন দুপুরে বাগানে স্বপনের বন্ধুরা কে কে ছিল।

সন্দেশ

BanglaBook.org

আষাঢ়ে গল্প

গোবরজলে ধুইয়ে দিয়ে
বাকিংহামের বারান্দা
সেইখানেতে আঙুল চোষেন
শ্যামবাজারের হাঁদারাম।।

—ছড়া : অমিতাভ চৌধুরী
(কলকাতা দূরদর্শন, ২৪ ফেব্রুয়ারি, রবিবার, ১৯৮০)

সূচনা :

একদিন টেলিভিশনে একটা আষাঢ়ে গল্পের আসর বসেছিল। এই যে ছড়াটা অমিতদা বানালেন, এরকম তিনটে-চারটে ছড়া তিনি এক-এক মুহূর্তের মধ্যে বানিয়ে ফেলছিলেন, আর সেখানে বসে-বসে সেই ছড়ার ওপরে ভিত্তি করে সঙ্গে সঙ্গে মুখে-মুখে আষাঢ়ে গল্প বানিয়ে বলছিলেন তিনজন গল্পলিখিয়ে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় আর নবনীতা দেবসেন। [অর্থাৎ আমি]। শুধু তাই নয়, সেই ছড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝটপট ছবি এঁকে দিচ্ছিলেন তোমাদের প্রিয় কার্টুনিস্ট চন্ত্রী লাহিড়ী। আষাঢ়ে ছড়ার সঙ্গে আষাঢ়ে ছবি, তার সঙ্গে আষাঢ়ে গল্প। আমার বানানো গল্পটা তোমাদের সম্পাদক মশায়ের এত পছন্দ হয়েছে যে তিনি গল্পটা তোমাদেরও শোনাতে চান।

এদিকে, টিভিতে তো বানিয়ে বললুম, তারপর গল্পটা এখন আমার হুবহু আর মনেই নেই। তাইজন্যে এখন করেছি কি, এর-ওর-তার থেকে কয়েকবার করে শুনে নিয়েছি। কী কী বলছিলুম সেদিন। তাও এটা একটু অন্যরকম হতে পারে —লিখতে গেলেই বদলে যায়। সাত মিনিটের মধ্যে বানাতে হয়েছিল গল্পটাই।

এখন তোমরা বরং এই নতুন খেলাটা শিখে নাও। একজন ছড়া বানাবে, আর একজন তার ওপরে গল্প বানাবে, আর একজন আঁকবে ছবি। আষাঢ়েই যে হতে হবে তার কোনো মানে নেই। ভূতের, রাজারাণীর, চোরডাকাতের, অ্যাডভেঞ্চারের, বাঘের, দত্যিদানার, পরীর, কতকিছুরই তো ছড়া-ছবি-গপ্পো বানানো যায়। কিন্তু সময়টা বেঁধে দেবে। পাঁচ মিনিট, কি দশ মিনিট। যার যেদিন যতটা সময় হাতে থাকবে। খুব ভালো খেলা, বুদ্ধি, কল্পনা দুটোরই দ্রুত অনুশীলন হয়। মজাও লাগে খুব।

'আষাঢ়ে গল্প' মানে জানো তো? মানে, যে গল্পের মানে নেই। অর্থাৎ যা আজগুবি, অ্যাবসার্ড, অবাস্তব গুলগাপ্পা, যুক্তিহীন, অসম্ভব।

এবার তবে গল্প শুরু করি? প্রথমেই যে ছড়াটা দেখেছ, সেইটে আরেকবার মন দিয়ে পড়ে নাও। তাতে যা যা বলা আছে তাই দিয়ে গল্প বানাতে হবে। এক কাজ করবে? বরং আমারটা পড়বার আগেই—তোমরা নিজেরা প্রত্যেকে এক-একটা গল্প বানাও। ঐ ছড়ার ওপরে, সময় সাত মিনিট। তারপর আমার গল্পটা পড়ো। মিলিয়ে দ্যাখো, কারটা বেশি আষাঢ়ে হলো; তোমার গুলটা বেশি জোরালো, না আমার গুলটা?

যারা কুঁড়ে, তারা তো গল্প বানাবে না, আগেই পড়ে ফেলবে। তাদের জন্যে আমি শেষে অন্য একটা ছড়া দেবো। তার ওপরে গল্প বানিয়ে পক্ষীরাজে পাঠিয়ে দাও। যারটা সবচেয়ে ভালো হবে, সেইটে ছাপা হবে। যদি কয়েকজনেরই খুব ভালো হয়, তবে প্রথম তিনটেই ছাপা হবে। মোট শব্দের মধ্যে হওয়া চাই কিন্তু। বড় হলে চলবে না।

আষাঢ়ে গল্প :

বাকিংহাম প্যালেস তো লণ্ডনে, ব্রিটিশরাজরাণীর বসতবাড়ি কে না জানে। কিন্তু তোমরা কি জানতে সেটা আমারও বসতবাড়ি? একটি খাঁটি বাঙালি ঘটি পরিবার ওখানে বসবাস করছে বেশ কয়েক জেনারেশন ধরে। মহামান্য পঞ্চম জর্জ যখন কলকাতায় এসেছিলেন, আমার ঠাকুর্দাদার ঠাকুর্দাদাদার বাবা তাঁকে অ্যায়সা হুঁকো সেজে খাইয়েছিলেন যে সেই হুঁকো টেনে পঞ্চম জর্জ পাগল। এতই খুশি হলেন, যে ঠাকুর্দাদার ঠাকুর্দাদার বাবাকে সপরিবারে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন বিলেতে —আশি মণ অম্বুরী তামাক, দুশো মণ কাঠকয়লার টিকে আর দেড়শো মণ চিটেগুড় সমেত। সেই থেকে আমরা ওই বাকিংহামেই থাকি, আলাদা একটা স্পেশাল মহলে —(সেটার নাম সার্ভেন্টস প্যালেস)। বংশানুক্রমে আমাদের বাপঠাকুর্দা রাজবাড়ির

BanglaBook.org

হুঁকোবরদার। তবে আমার ঠাকুমার ঠাকুমা হুঁকোকলকে সাজতে পারতেন না বলে তিনি রাণীমাদের জুতোবরদার হয়েছিলেন। সেই থেকে মেয়েদের কাজ সেইটেই। রাণীদের শতশত জুতো তো? তার হিসেবপত্তর রাখা, সেসব ঝাড়ানো, মোছানো, নিয়মিত পালিশ করানো, ছিঁড়ে গেলে সেলাই করানো, গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখা—এইসব করতেন। আমার ও-বাড়িতেই জন্ম। আমার নাড়ী কেটেছিলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়া নিজে। তিনি আসলে রাণীগিরি করতে মোটেই ভালোবাসতেন না, ধাইমাগিরি করতেই ভালোবাসতেন। বাকিংহাম প্যালেসের মধ্যে যত বাচ্চা হয়েছে, সব ভিক্টোরিয়া মাইজীকা হাতকা বেবি। আমি তাই।

আমার উনি, অর্থাৎ ঐ যাঁর কথা এক্ষুনি শুনলে, মানে তোমাদের শ্যামবাজারের হারাণদা, উনি ছিলেন বিলেতে রয়্যাল স্কটিশ ব্যাণ্ডের হর্তাকর্তা। তখনকার দিনে অতসব কালো সাদা তফাৎ করার বাতিক ছিল না—স্কটিশ ব্যাণ্ডে বাঙালি প্রচুর নিত। উনি দারুণ ব্যাগপাইপ বাজাতে পারেন, এই তো সেদিনও বাজালেন কলকাতায় পাতাল রেলের উদ্বোধনী সভায়। আমাদের বিয়েতে সেদিন বাকিংহাম প্যালেসে কত যে বড় বড় লোক গিয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ বললেন—'বাঃ কী সুন্দর, made for each other'—পণ্ডিত নেহরু বললেন—'you have a tryst with destiny' নেহরু খুব ভালো জ্যোতিষ জানতেন (তাই তো ইন্দিরা এত জ্যোতিষে বিশ্বাসী)। এমনকী শ্রীরামকৃষ্ণও আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের হাতে—'টাকা মাটি মাটি টাকা' লিখে একঢেলা গঙ্গামাটি পাঠিয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের সিঁদুর মাখিয়ে। ঐ হারাণদাকে দেখেই তো ওদের মহাকবি শেক্সপীয়র লিখেছিলেন, What a piece or work is man!' আর আমাদের রবীন্দ্রনাথ? নোবেল প্রাইজ নিয়ে ক্লান্ত হয়ে যখন বাকিংহাম প্যালেসে নিমের শরবৎ খেতে এলেন তখন আমার স্বামীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন—'হেথায় দাঁড়ায়ে দুবাহু বাড়ায়ে নমি নর দেবতারে।' (সেই নিমের শরবৎটা আমিই নিজে তৈরি করে দিয়েছিলুম)।

বাকিংহামে আমিও প্রথমে জুতোবরদারের কাজই করতুম, কিন্তু ঝামেলা বাধালো এলি। ওর মা ওকে একদম দেখতো না; মেরীর কেবলই উড়ুউড়ু মন, রাজ্যের হিন্দি সিনেমা দেখবে দিনরাত্তির, বম্বে ফিল্মের গান ওর প্রাণ। অগত্যা আমিই এলুকে নাওয়াতুম খাওয়াতুম, কোলেপিঠে করে মানুষ তো করিচি আমিই। ওকে এ বি সি ডি কে শেখালে? আমি। কাঁটাচামচ ধরতে কে শেখালে? আমি। সত্যি এলুর মতন মেয়ে হয় না। যেমন শান্ত, তেমনি বাধ্য, তেমনি ঘরমুখো। একটু ঘোড়ায় চড়ার বাতিক আছে, এই যা। তাছাড়া এক ফোঁটাও বেয়াড়াপনা পাবে না। সেই বাতিকও তোমাদের হারাণদারই দোষে। ছেলেবেলায় এলুকে পিঠে চড়িয়ে বাকিংহামের বারান্দা চষে বেড়াতেন। 'হেট-হেট-হেই-হেই' করে এলি হাসতো, আর হামাগুড়ি দিতে দিতে উনি ওকে পিঠে নিয়ে ঘুরতেন। বড় হয়ে এলু ঠিকই সত্যিকারের ঘোড়া চাইলে। চাইবে না? শুধু শুধু মেয়েটার অভ্যেস নষ্ট করে দেওয়া হলো।

তোমাদের হারাণদার তো কোনো কাজই নেই কিনা তেমন। স্কটিশ ব্যাণ্ড তো

রোজ বাজে না, ন'মাসে ছ'মাসে কোনো উৎসবে-আচারে, পালপার্বণ হলে তখন! ওদিকে এলুর স্বামী ফিলুবাবাজী, মানে ওই প্রিন্স কনসর্ট, প্রিন্স ফি-লি-প আর কি। ওঃ হোঃ, এলিকে চিনতে পেরেছ তো? পারনি? এলিজাবেথ গো, তোমাদের কুইন এলিজাবেথ দ্য সেকেণ্ড। ওর স্বামী ফিলুবাবাজীবনের মতো সৎ ঘরজামাই হয় না। যেমন স্ত্রৈণ, তেমনি ভালো রাঁধে, আর খুব সভ্যভব্য; সাতচড়ে রা কাড়েনা। চোখ তুলে চায় না। তোমাদের হারাণদার সঙ্গে খুব ভাব। দুজনেরই হাতে কাজের অভাব তো, তাই দুপুরবেলায় বাকিংহামের উঠোনে খড়ি দিয়ে ঘর কেটে সোনার গিনি দিয়ে এক্কাদোক্কা খেলেন দুজনে। এলুমা আমার যেমন লক্ষ্মী, ওর বোন মারগারেটটা তেমনি দুষ্টু। তোমাদের হারাণদাকেই বিয়ে করবে বলে এমনি ক্ষেপেছিল, যে তিরিশবছর বয়স অবধি বিয়েই করলে না। আপ্রাণ চেঁচিয়ে—'হ্যার‍্যানডা। হ্যার‍্যানডা।' করতে করতে বারান্দা থেকে উঠোনে, উঠোন থেকে বারান্দা দাপিয়ে বেড়ালো। সে যাইহোক, এখন মতি ফিরেছে। দেখতে দেখতে এসে গেল ১৯৫৩, অভিষেকের আনন্দের দিন। এলুমা আজ সিংহাসনে চড়বে। রাণী হবে। সেই ভোর ৪টেয় উঠেছি, সারা প্যালেস আলপনা দিয়েছি, হলুদ জলে নাইয়েছি এলুকে। এমন সময়ে কী যে হলো, মেয়ে হঠাৎ থথর করে কাঁপতে শুরু করলে। ব্রেকফাস্ট খেতে গিয়ে দেখি সব গোলমাল করে ফেলেছে। এতদিনের শিক্ষা গোল্লায় গেল, কাঁটা দিয়ে চা খাচ্ছে, ছুরি দিয়ে ডিম খাচ্ছে, চামচে দিয়ে পাঁউরুটি খাচ্ছে। হায়। হায়। হায়। কী সর্বনাশ। তুই না ইংলন্ডেশ্বরী হবি। তুই না ব্রিটিশ সাম্রাজ্ঞী হবি। কত লোকের প্রাণদণ্ড দিতে হবে, কত দেশের সর্বনাশ করতে হবে, মুকুট পরতেই এত ভয়? তোর না আজ রাজ্যাভিষেক? তোকে এমন নার্ভাস হলে তোর চলবে কেন? যত বলি—'মা এলু, অমন করতে নেই, ছিঃ। শক্ত হও,—', ততই সে বলে—'আই কান্ট গো থ্রু ইট।' কী যে করি, ঠকঠক করে তার হাঁটু কাঁপছে, মেয়ে কিছুতেই করোনেশনে যাবে না। খালি বলছে—'লুক, আই কানট টেক আস্টেন।' ফিলুবাবাজীবন যত বলে—'আমি তো আছি ইলাইজা, আমার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে থাকো', তত এলু বলে—'নবনীতা মাসি, তুমি হাত ধরো। আমি হাঁটতে পারছি না।'

আহা, তা তো আর হয় না? কোন রাণী কবে তার বরের হাত না ধরে আয়ার হাত ধরে সিংহাসনে চড়েছে? ফিলু বললে—'লেটস কল হ্যারি—একবার হ্যারিকে ডাকো।' ঐ তোমাদের হারাণদাকে আর কি। ওরা তো ওঁকে হ্যারি বলেই ডাকে—'হ্যারি উইল ফাইন্ড আ ওয়ে।' ভীষণ বন্ধু তো দুজনে? উনি তখন ওদিকে সেজেগুজে রেডি, স্কটিশ ব্যাণ্ড বাজবে। গেটের সামনেই সবাই সারি বেঁধে দাঁড়াচ্ছে।

ছুটে এসে উনি কাণ্ড দেখে বললেন—'ডোন্ট ওয়ারি'—কিছু ভেবো না এলু, সব ঠিক হয়ে যাচ্ছে এক্ষুনি। হয়েছে কি, আমার শ্বশুরমশাই বশিষ্ট মুনির ডিরেক্ট বংশধর, ওদের বাড়িরই পোষা গাই ছিল কামধেনু নন্দিনী—তার সেই সর্বসিদ্ধিদাতা গোবরের একটি মঙ্গলময় বটিকা আমাদের বাড়িতে একটা রূপার সিঁদুরকৌটোয়

ভরা আছে। উনি বললেন—'দৌড়ে কোয়ার্টারে যাও, কামধেনু বটিকা নিয়ে এসো, একটুখানি জলে গুলে বেশ করে বারান্দাটা ধুয়ে ফ্যালো দিকি, দেখি এলু কেমন না হাঁটে?' কত্তা যা বলেন আমি তাই করি, চিরকেলে স্বভাব। ছুটে গিয়ে একটিমাত্র কামধেনু বটিকা এনে ডিসটিলড ওয়াটারে গুলে রুপার বালতি ভরে গোবরজল করে বাকিংহাম প্যালেসের বারান্দাটা বেশ করে ধুইয়ে দিলুম। তার ওপরে লাল কার্পেট পেতে দেওয়া হলো। ছোট্ট হীরের মুকুটটি মাথায় পরে এলুমা এবার উঠে দাঁড়ালো—দিব্যি পা ফেললো গালচেতে। টিক টক...টিক টক...গট মট...গট মট—ঘাস বিচালি...ঘাস বিচালি...চমৎকার হেঁটে চলো ফিলু বাপধনের বাঁ-হাতটি ধরে। যেই না গেটের কাছে আসা, হঠাৎ এলুকে কেমন যেন দেখালো, সে হঠাৎ দু'আঙুলে নাকটা চেপে ধরে ঢলে পড়লো জামাইবাবাজীর গায়ে। জামাই পড়লো লোহার গেটে আছড়ে। গেট পড়লো গিয়ে পড়বি তো পড় ঠিক দোরের সামনে দাঁড়ানো তোমাদের হারাণদার হাতের ওপরে।

কামধেনু বটিকা কি আজকের? অত পুরানো গোবর, একটু গন্ধ তো হবেই। এলি তো মেম, গোবরের গন্ধ আগে শোঁকেনি, তাই—

উনি ঠিক তক্ষুনি ব্যাগপাইপের বাঁশিটি মুখে তুলতে যাচ্ছিলেন। চতুর্দিকে লক্ষ লক্ষ ডকুমেন্টারি ফিল্মের ক্যামেরা সেট করা, কোটি কোটি টি. ভি. ক্যামেরা ফোকাস করা, সব ঐ একই দিকে লক্ষ্য—গেট থেকে রাণী বেরুবেন, অমনি বেজে উঠবে অভিষেকের বাজনা, বাজবে রণডঙ্কা, বাজবে কাড়ানাকাড়া, বাজবে বিসমিল্লার সানাই, রবিশঙ্করের সেতার, আল্লারাখার তবলা, আর তোমাদের হারাণদা অ্যান্ড কোম্পানির রয়্যাল স্কটিশ ব্যান্ড। দোরের কাছে সেজেগুজে লাইন বেঁধে স্কটিশ ব্যান্ড দাঁড়িয়ে আছে, ওঁর পিঠে ভিস্তির মশকের মতো ইয়া বড় চামড়ার হাওয়া-ভরা ব্যাগ, তা থেকে খোঁচা খোঁচা পাইপ উঁচিয়ে আছে—কী তেজস্বী দৃশ্য, যেন তূণীর থেকে তীরের উঁকি। ঠিক এমন সময়টিতে গন্ধের চোটে রাণী টলে পড়লো ফিলিপের পায়ে, ফিলিপ পড়লো গেটের ওপর, আর অমন ভারী লোহার গেটটা আছড়ে পড়লো গিয়ে আমার কত্তার আঙুলের ওপর। আমি ব্যথার চোটে লাফিয়ে উঠে, 'বাপরে! গেছি! গেছি!' বলে বাঁশির বদলে আঙুলটাই মুখে পুরে দিয়েছেন তোমাদের হারাণদা, আর অমনি ভঁপ্পর ভঁপ্পর করে বেজে উঠেছে অভিষেকের বাজনা, রয়্যাল ব্যান্ড। (তবু, এটা এমন কিছু নয়, যা নিয়ে অমিতদাকে আজ ছড়া বানাতে হবে!) ওদিকে প্রিন্স ফিলিপ তো ভীষণ ঝাল খায়, ওসব সায়েবি সেদ্দমেদ্দ রান্না ওর পছন্দ নয়, পকেটে সর্বদা শুকনো লঙ্কা নিয়ে ঘোরে, রয়্যাল ডিনারে চটকে নেয়। ঝট করে দুটো লঙ্কা বের করে লাইটার জ্বেলে পুড়িয়ে এলুমার নাকের কাছে ধরতেই ফ্যাঁচফ্যাঁচ করে হেঁচে দিয়ে এলু সোজা হয়ে দাঁড়ালো, গটগট করে গিয়ে সোনার ফিটন গাড়িতে চেপে বসলো, বাজনার তালে তালে পা ফেলে।

তবে হ্যাঁ, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল। ওই যে সব টিভি, মুভি যতরাজ্যের দেশবিদেশের ক্যামেরা ওদিকে তাক করছিল, এলুমার ফিট হয়ে পড়ার দৃশ্য, আর

সেইসঙ্গে তোমাদের হারাণদার তুড়িলাফ মেরে আঙুল চোষার দৃশ্যটি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। পার্লামেন্টে এই নিয়ে ঝড় উঠলো। শেষটা এলুমাকে চোখের জলে বিদেয় করতে হলো আমাদের দুজনকে, পার্লামেন্টের নির্দেশে।

সেই থেকেই স্কটিশ ব্যান্ডে বাঙালি নেয় না। নইলে তোমাদের হারাণদার কি আজ শ্যামবাজারে পড়ে থাকবার কথা রে ভাই। আর হিন্দুস্তানী বিয়েতে ব্যান্ড বাজানোর কথা!

তবে হ্যাঁ, এলুমা আসে। এই রামধন মিত্তির লেনেই আসে। দোতলার ছাদে একটা হেলিপ্যাড বানিয়ে দিয়েছে, মন কেমন করলেই রয়্যাল এয়ারফোর্সের হেলিকপ্টার চালিয়ে চলে আসে। দুপুরের দিকে তেমন রাজকার্য থাকে না তো? এসে কাঁচা আমের টকটা, তেঁতুলের আচারটা চেয়ে খায়। খেতে খেতে দুটো সুখদুখের কথা বলে। সে ইংলন্ডেশ্বরীই হোক আর জগদীশ্বরই হোক, আজন্মের অভ্যেস তো যাবার নয়?

তোমাদের গল্প বানানোর জন্যে নতুন ছড়া :

হাঁটছিলো সাপ বাগানে, দৌড়ে এলো বেদে
ব্যাং পালালো জাপানে, সাপ বলে : আজ মে-ডে।

শারদীয় পক্ষীরাজ, ১৩৮৭

পলাশপুরের পিকনিক

এই পলাশপুরে এসে অবধি গুগগুলের আহ্লাদের শেষ নেই। একেই তো অ্যানুয়াল পরীক্ষা হয়ে গেছে। পড়াশুনোর বালাই নেই। তার ওপরে দাদা সঙ্গে আসেনি। সর্দারি করছে না কেউ চব্বিশ ঘণ্টা। বাবা মা—কাকু কাকিমা নিজের মনেই দিনরাত চা খাচ্ছেন, তাস খেলছেন, হাটতে যাচ্ছেন, মিতুল-গুগগুলকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না অত। মিতুল আর গুগগুল মনের সুখ আছে। রাস্তায় গাড়ি বলতে গরুর গাড়ি। আর ঘোড়ায় টানা টাঙা মাঝে মাঝে স্টেশন থেকে লোক আনে। সামনের মাঠের ঝোপঝাড়ে জীবজন্তু বলতে মিতুল-গুগগুল তো ছাগল, মুরগী আর গিরগিটি ছাড়া কিছুই দেখেনি। খরগোশ পর্যন্ত নেই। আর ছাগল-মুরগীগুলো কারুর না কারুর পোষা। বুনো জীবজন্তু কিছুই নেই পলাশপুরে, এক শেয়াল ছাড়া। তবে শেয়ালদের দেখা যায় না। কিন্তু রোজ রাত্তিরবেলা তাদের কালোয়াতি গান, কোরাসে 'হুক্কাহুয়া' শুনে দারুণ মজা পায় গুগগুল-মিতুলরা। এতদিন নামেই জানত 'হুক্কাহুয়া', এবার টের পেল ব্যাপারটা কী! মিতুলদের বাড়িটা একতলা, ধবধবে সাদা, বাগানঘেরা। বাগানে ইঁদারা আছে। আর মিতুল-গুগগুল ঐ ইঁদারার পাড়ে দাঁড়িয়ে রোজ রোদের

BanglaBook.org

মধ্যে চান করে। মালী বালতি করে জল তুলে গায়ে ঢেলে ঢেলে দেয়। ওঃ, কী মজা। ওরা লাফিয়ে লাফিয়ে চান করে নেয়। মা কাকিমা তাড়াতাড়ি করে গা মুছিয়ে দেন রোদ্দুরে।

পৃথিবীতে পলাশপুর বলে এত সুন্দর একটা জায়গা ছিল কে জানত? দাদার এবার ফাইন্যাল। সে তাই বাড়িতেই আছে। ছুটিতে বেড়াতে আসা হয়নি তার। মিতুলটা গুগ্‌গুলের চেয়েও ছোট, যা বলে তাই শোনে। মিতুল অ্যাসিস্ট্যান্ট, গুগ্‌গুল লীডার। সব কাজে। এখানে দাদা থাকলে এসব হতো?

বাড়ির সামনে তো মস্তবড় মাঠ, রোজ মিতুলের সঙ্গে সেই মাঠে রেস দেয় গুগ্‌গুল, আর রোজই 'ফার্স্ট' হয়। মিতুল তো ছোট, সে অত জোরে ছুটতে পারবে কেমন করে? গুগ্‌গুল তাই ওকে প্রথমে কিছুটা 'হ্যান্ডিক্যাপ' দেয়। তবুও মিতুল 'ফার্স্ট' হতে পারেনি একদিনও। রোজ 'সেকেণ্ড' হয়। একদিন এমনি রেস দিতে দিতেই গুগ্‌গুল ঠিক করলে, দূরে যে কালোমতন পাথরটা দেখা যায় সেইটে পর্যন্ত যাবে। মিতুল বললে, 'অত দূর কি দৌড়োতে পারবো? বরং চলো, আমরা হেঁটে হেঁটেই যাই—ওখানে গিয়ে পিকনিক করি।' গুগ্‌গুলের সেটা খুব মনে ধরলো। বাঃ, ভালো বলেছে তো মিতুলটা।—'মা। কাকিমা। পিকনিক লাঞ্চ তৈরি করে দাও। আমরা ঐ কালো পাথরের কাছে গিয়ে পিকনিক করবো।' পাথরটার কাছে এদিক-ওদিক কয়েকটা ছড়ানো কিছু গাছপালাও আছে, দেখা যায়। হয়তো বেশ পিকনিক স্পট। এমনিতে তো মাঠটা ফাঁকা, গাছপালা বিশেষ নেই। মানসাকাঁটা, শেয়ালকাঁটা, বুনোফুলের ঝোপ। আর ঘাস। বড় বড় ঘাস। এটা গরু চরার মাঠ। এখানে কোনোদিন বাড়ি হবে না। ওই দূরে কালো পাথরটার কাছেই বড় বড় কয়েকটা গাছ আছে, এখান থেকেই দেখা যায়।

মা বললেন—'ও বাবা, ঐ পাথরটা কি এখানে? ওটা কত মাইল দূরে কে জানে? আমরাই কখনো যাইনি ওদিকে। ওখানে যেতে হবে না, পিকনিক করতে চাও পেছনের আমবাগানে করগে যাও।' মিতুল-গুগ্‌গুলের খুব মন খারাপ হয়ে গেল। মা এটা ভালো করলেন না, পিকনিক কি বাড়িতে হয়?

ছোট হলে কি হবে, মাঝে মাঝে কিন্তু মিতুলটার খুব বুদ্ধি হয়। হঠাৎ বললে —'বেশ, যদি মালীভাই সঙ্গে যায়?'

—'মালীর কত কাজ, তোদের সঙ্গে গেলেই হলো?' মা নস্যাৎ করে দিলেন। গুগ্‌গুলের তখন মনে পড়লো মঙ্গলের কথা। বেশ, মালী না, যাক, মঙ্গল তো যেতে পার? মঙ্গলের তো সারাদিন মুরগী দেখা ছাড়া কোনোই কাজ নেই। মঙ্গল তো এসব মাঠঘাট চেনে। মঙ্গল সঙ্গে গেলে হারিয়ে যাবার প্রশ্ন ওঠে না। যদিও মঙ্গল ছোট ছেলেই, গুগ্‌গুল-মিতুলদের মতোই। কিন্তু গুগ্‌গুল কি কক্ষনো হারিয়ে যাবে হিন্দুস্থান পার্কে? মঙ্গলেরও তেমনি এইটেই পাড়া। গোটা পলাশপুরটাই ওর চেনা। পলাশপুর জায়গাটা খুব ছোট্ট।—'হারাবো কেমন করে? মাঠে তো সর্বক্ষণই আমাদের দেখতে পাবে তোমরা—এই বারান্দায় বসে বসেই। পাথরের কাছে পৌঁছনো পর্যন্ত সবই তো দেখা যাবে। মাঠ তো ফাঁকা ধূ ধূ করছে।'

—'না। রে, তোরা ছোট্ট ছোট্ট মানুষ তো? একটু পরেই তোদের আর দেখাই যাবে না। মাঠের মধ্যে মিলিয়ে যাবি। তাই হয়।' মা বোঝান।

—'ওই পাথরটা পাথর কি আর? নিশ্চয় ছোট্ট একটা পাহাড় হবে। আর ওই গাছগুলো বোধহয় একটা শালবন। দূর থেকে অমন দেখাচ্ছে।' কাকিমা আদর করে বলেন। মঙ্গলকে ডেকে আনা হলো। 'ওটা কি পাহাড়?'

মঙ্গল বললে—'হ্যাঁ, ওখানে একটা ছোট্ট নদীও আছে। মউল নদী। খুব সুন্দর ঝর্ণা নদী। তাতে অনেক ছোট্ট ছোট্ট রুপুলী মাছও আছে। ওই পাহাড় থেকেই বেরিয়েছে। পাহাড়টা ছোট্ট। তার চুড়োয় ওঠা খুব সোজা। শালগাছগুলো সব নিচে। পাহাড়ের গায় বিশেষ গাছ নেই। মউল নদীর ওপারে ওরকম আরো অনেক পাঁথুরে পাহাড় ছিটিয়ে আছে। আর আছে শালবন, মহুয়া বন, সোনাঝুরি বন, কাজুবাদামের বন—কত কি!' মঙ্গল শুনেছে ওখানে একটা মস্তবড় নদীও আছে, ডাহুক নদী, অবশ্য ও দেখেনি। ডাহুক নদী নাকি সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে, এত লম্বা। তাতে চর আছে। চরে হাজার হাজার পাখি আসে। এই তো, এখনই আসে, এই শীতকালে। মঙ্গল অবশ্য এসব কিছুই দেখেনি। দাদুর কাছে শুনেছে। মঙ্গলের দাদু দেখেছিল। সে গরু-মহিষ চরাত। হারানো গরু খুঁজতে খুঁজতে অতদূর চলে গিয়েছিল একবার।

—'ওই পাহাড়ে বাঘ-ভাল্লুক নেই তো রে?' কাকিমা জিজ্ঞেস করলেন।

মঙ্গল হেসে ওঠে—'দূর দূর, বাঘ-ভাল্লুক তো সব সেই কলকাতার চিড়িয়াখানাতে থাকে! এই পলাশপুরে বাঘ-ভাল্লুক থাকবে কেমন করে? এখানে ছোটখাটো নেকড়ের মতন একরকম জন্তু অবিশ্যি রাত্তিরবেলা বেরোয় মাঝে-মাঝে, মুরগী-ছাগল ধরে নিয়ে যায়, তবে সে খুবই কম। মানুষকে তো কক্ষনো কিছু বলেনি। আর দিনের বেলায় তো বেরুবেই না।' মালীও বললে, 'মঙ্গলের কথা ঠিক। পলাশপুরে কোনো হিংস্র জীবজন্তু নেই। বুনো জীবজন্তুই নেই কোনো। হরিণ, কিংবা খরগোশই কি আছে, কিংবা বাঁদর? কিচ্ছু নেই। শুধু কুকুর-বেড়াল, গরু-মহিষ, ছাগল-ভেড়া, এই তো জানোয়ারের তালিকা। সবই পোষা। তবে হ্যাঁ, পাখি আছে। অনেক রকমের পাখি। তারা মনের সুখে বাগান নষ্ট করে।'

মালী মোটেই পছন্দ করে না পাখিদের। ফল খেয়ে ফ্যালে, ফুল ছিঁড়ে ফ্যালে, চারাগাছ উপড়ে দেয় পর্যন্ত, এত পাজী হয় পাখিরা! মা-কাকিমা নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, আজ বেলা হয় গেছে। থাক। কাল তোরা পিকনিকে যাস। মঙ্গলকে কিন্তু সঙ্গে নিয়ে যাবি। ও লোকাল ছেলে, পথঘাট চেনে। এত বড় মাঠে যদি হারিয়ে যাস? মঙ্গল হারাবে না।'

পরদিন ভোর চারটে না বাজতে মঙ্গল এসে চেঁচামেচি করে, জানলায় ঠোক্কর মেরে গুগগুলকে তুলে দিলে। 'উঠ যাইহ দিদিভাই, উঠ যাইহ!' মঙ্গলের মুখখানি মিষ্টি, গলায় কালো সুতোয় একটা চৌকো রুপোর মাদুলি বাঁধা আর কোমরের গামছায় একটি বাঁশের বাঁশি গোঁজা। এইটুকুতেই সে যা রাখাল ছেলে। এমনিতে পরনে শার্টপ্যান্ট, পায়ে হাওয়াই চটি, গায়ে সোয়েটার, ওই গুগগুলের মতোই বয়স হবে, তবে মাথায় কিছুটা লম্বা। ওদিকে মিতুল তো কিছুতেই বিছানা ছাড়বে না। কাকিমা

অতিকষ্টে তাকে তুলে মুখ ধুইয়ে ডিম-দুধ খাইয়ে রেডি করে দিলেন। টিফিনবাক্স, জলের বোতল, তুলো-ডেটল-ব্যান্ড-এইড, সবকিছু তিনটে ঝোলায় আলাদা করে গুছিয়ে দিয়েছেন মা, যাতে কাউকেই বেশি বোঝা না বইতে হয়।

—'কতক্ষণ লাগবে রে মঙ্গল, ঐ পাথরটার কাছে যেতে?' মিতুল ঘুমঘুম গলায় জিজ্ঞেস করলে। তখনই, অত অন্ধকার-থাকা ভোরবেলাতেই পুবদিক ফিকে লালচে হয়ে এসেছে।

—'সুয্যি বেশ খানিকটা উঠে যাবে,' মঙ্গল গম্ভীরভাবে আকাশের দিকে চেয়ে বললে। মুরগীদের ভার মালীই আজকের মতন নিয়ে নেবে। মঙ্গলেরই বাবা তো সে! 'বিকেলবেলা বাড়ি ফিরবে চারটের মধ্যে'—গম্ভীর গলায় শুয়ে শুয়েই বাবা বলে দিলেন।—'খবর্দার যেন অন্ধকার না হয়ে যায়'—কাকু বিছানা থেকে যোগ করে দিলেন।

—'চারটে? মাঠের মধ্যে ততক্ষণ কী করবে?' কাকিমার চটপট উল্টো কথা। 'দুটোর মধ্যে ফিরে এসে, দুপুরে ঘুমুবি। অত হটর হটর করলে আর চেঞ্জ লাগবে কেন! আরো শরীর খারাপ হয়ে যাবে।'—'ঠিক বলেছে কণা! বেলা একটার মধ্যে ফিরতে চেষ্টা করবি'—মা আবার আরো এক কাঠি।—'এখন মোটে পাঁচটা। এখন থেকে বেলা একটা, মানেই টানা আটঘণ্টা! তোরা পারবি কেন? ওরা চেয়ে বেশি ঘুরতে? যেমন তোর বাবা বুদ্ধি। বড্ড না-ভেবেচিন্তে কথা বলেন। বলে কিনা চারটের মধ্যে ফিরবি? অত দেরি করলে হয়? খিদে তেষ্টা না হয়? টিফিনে মিটলো। অত হাঁটার ক্লান্তি আছে না? ঐ পাথরটা কি "হেথা"? অনেক দূরে!'

—'কী টিফিন দিয়েছে গো মা?' মিতুলটা একটু পেটুক আছে। কাকিমাও তেমনি!

—'বলবো কেন? তোদের দুটো করে টিফিন আছে। একটা খাবি আটটার সময়ে, আরেকটা বারোটায়। তারপর বাড়ি এসে চান করে ভাতটাত যা খাবার খাবি, যদি খিদে পায়।'

মা-বাবা কাকু-কাকিমা মালীভাই আর সুশীলাদিকে হাসিমুখে গুডবাই করে মঙ্গলের সঙ্গে লাফাতে লাফাতে মাঠের মধ্যে দৌড়ে পিকনিকে চলে গেল গুগ্‌গুল আর মিতুল।

যেতে যেতে যেতে যেতে একসময়ে গুগ্‌গুলের মনে হলো, পাথরটা মরীচিকা নয়তো? নইলে একটুও কাছে আসছে না কেন? গুগ্‌গুলের হাতের ঘড়িটা দাদাই পনেরো টাকা দিয়ে কিনে দিয়েছিল, মেট্রো সিনেমার সামনে থেকে। দিব্যি চলছে, এখনো বন্ধ হয়নি, দম-টম কিছু দিতে হয় না। সেই ঘড়িতে প্রায় সাড়ে ছটা বাজে—অথচ মাঠও যেমনকে সেই, আর পাথরও যতদূরে ছিল ততদূরেই বসে আছে বলে মনে হচ্ছে।—'এখানেই কিছু খেয়ে নিলে হয়।' মিতুল বললে। গুগ্‌গুলেরও মনে সেইরকম ইচ্ছে। অন্তত একটু বসলে হতো। খাই, না খাই। মঙ্গল বললে, ওই তো ওখানে একটা বড় পাথর আছে। তার ওপরেই বসা যাবে।' একটু বসে কলা, কমলালেবু, আর জল খেয়ে ওরা ফের হাঁটতে শুরু করে। মঙ্গল কেবলই বলে, 'বেশি দেরি নেই। এই তো ওই কালো পাথরটা এসে গেল বলে! আ গিয়া!'

সত্যি সত্যিই এক সময়ে ওরা পৌঁছে গেল। পাথরটা পাথর নয়, একটা ছোটোখাটো পাহাড়, সত্যিই। টিলা? নাকি একেই বলে শৈল? শিলা দিয়ে তৈরি তো? ভারি সুন্দর জায়গাটা। শালগাছ ছড়িয়ে আছে এদিক ওদিক, ছায়া ছায়া মতন লাল মাটি, এখানটা তেমন ঘাসের মাঠ নেই, ওদের বাড়ির কাছে মাঠটা যেমন, সেটা তো গরু চরবার জমি—গোচারণ। তাই ঘাস হয়। এখানে কেউ কোথাও নেই। লাল কালো দু'রঙা পাথুরে ঝুরো মাটি। মাটিতে বড় বড় ফাটল—শান্তিনিকেতনে যেরকম খোয়াই হয় ঠিক তেমনি। সুরকির মতো মাটি। কাঁকর-ভরা। মাঝে মাঝে কচ্ছপের পিঠের মতো গোল নিচু কালো কালো ঢিবি। তারই ফাঁকে ফাঁকে শালগাছ আর সোনাঝুরি গাছ। আর খুব সুন্দর একটা পাতলা ফিন্‌ফিনে শিফন শাড়ির মতন বালি-চকচকে নদী। তাতে বালির পরে ঝিরঝিরে ওড়নার মতো স্বচ্ছ জল বয়ে যাচ্ছে। সেই জলে আবার কত রঙিন নুড়ি। নীল, সবুজ, হলুদ, লাল। মিতুল-গুগ্‌গুলের তো আহ্লাদের শেষ নেই। এত সুন্দর নুড়ি তারা জীবনে দেখেনি। আর নুড়িগুলোতে প্রায়ই সাদার আলপনা আঁকা, কিংবা দু'তিন রঙের স্যান্ডুইচ করা এক একটা পাথর। ওরা তো কুড়িয়ে কুড়িয়ে একটা ছোট ঢিবিই বানিয়ে ফেললে। মাঝে মাঝে জলের মধ্যেই গর্ত মতন হয়ে আছে, যেখানে কালো বড়ো পাথর ডুবে আছে, আর সেই গর্তের ছায়ার মধ্যে পোকার মতন ছোট্ট ছোট্ট খুদে মাছের ঝাঁক সাঁতরে বেড়াচ্ছে। কি সুন্দর দেখাচ্ছে। ভোরের রোদ্দুর পড়ে তাদের রং এখন কালচে সোনালি। পোকার চেয়ে বড় অবিশ্যি, মাছ বলে চেনা যায়। লেজ আছে, পাখনা আছে। ওরই মধ্যে ইচ্ছে করলেই ধরা যায়।

—'নদীটা কোথা থেকে বেরুচ্ছে দেখবে না?' মঙ্গল জিজ্ঞেস করে। 'সেখানে আরো মহলি আছে।'

—'আগে তো খেয়ে নিই'—মিতুলের সব শেষে সেইদিকেই নজর। খিদেটা পেয়েওছে জব্বর এতক্ষণে। ব্যাগ খোলা হলো।

'এক নম্বর' লেখা আছে টিফিন-বাক্সের গায়ে। প্রত্যেকের জন্যে আছে দুটো করে মাছের চপ, সন্দেশ, আর চীজ স্যান্ডুইচ। এছাড়া কলা, কমলালেবু, এক বাক্স ব্রিটানিয়া বিস্কুট তো আছেই। খেয়ে-দেয়ে ঠাণ্ডা হলো শরীর।—'আটটা এখনো বাজেনি—মাত্র সাড়ে সাতটায় পৌঁছে গেছি! পাহাড়ে চড়তে ধরো একঘণ্টা। তারপর আমরা ডাহুক নদী দেখতে যেতে পারি। পারি না? মঙ্গল? ন'টা নাগাদ?'

একটু চিন্তা করে মঙ্গল বললে—'কিন্তু ডাহুক নদী তো অমিও চিনি না। শুনেছি এই শালবন পেরিয়ে গেলে তার পরে। বাবা চেনে। আমরা কি যেতে পারবো?'

মিতুল বললে—'ওসব পরে ভাবা যাবে। শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি এই কালো পাথরে আসা হয়েছে, এই শালবন, সোনাঝুরি বন, মউল নদী দেখা হলো। এবার মউল নদীর উৎস সন্ধানে যাচ্ছি। এই নতুন পাহাড়ের "শিখর দেশের সর্বপ্রথম আরোহী" হচ্ছি আমরা—এতেও শখ মিটছে না দিদিভাইয়ের, আবার ডাহুক নদীও দেখা চাই! চলো তো আমরা এই "পর্বতচূড়ায় জয় পতাকা" লাগিয়ে আসি আগে।'

BanglaBook.org

—'পতাকা কোথায় পাবি?'

—'নোটবইয়ের পাতাতে লিখবো, লিখবো : মিতুল, গুগগুল, মঙ্গল আমরা এই তিন পর্বতারোহী আজ বৃহস্পতিবার, ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৮৭, এই পর্বতে আরোহণ করিলাম এবং ইহার নাম দিলাম—কী? কী নাম দেওয়া হবে? মঙ্গল, কিছু নাম-টাম বলবি? "ডুংরি" তো তোদের ভাষায় পাহাড়ের নাম। না?'

মঙ্গল লাজুক হেসে মাথা নাড়লো।

—'ডুংরি না—কালাপাহাড় নাম দে।' গুগগুল বলে। 'একজন রাজার নাম ছিল। সে উড়িষ্যার সব হিন্দুমন্দির ধ্বংস করেছিল। কিন্তু তার নামটা আমার বেশ লাগে। কালাপাহাড়।'

—'বেশ, তাই হবে। তাহলে লিখে ফেলি?' মিতুল ডাইরিটা বের করে ব্যাগ থেকে।

—'আগে তো চড়? যদি চড়তেই না পারি? যদি পড়ে যাই?' গুগগুলের সংশয় হয়।

—'ধ্যাৎ, পড়ে যাবো কেন? ছোট্ট পাহাড়, এত খাঁজখোন্দল আছে। ওটা খুব সোজা।'

—'সোজাই হবে। আলগা পাথরে যদি পা না দাও'—মঙ্গল জ্ঞান দেয়—'প্রত্যেকটা পাথর পা দিয়ে নেড়ে দেখবে। আমি আগে আগে যাই। আমি পাথর চিনি। তোমরা তো শহরের লোক।'

—'খাবার-দাবার, ব্যাগট্যাগগুলো পাহাড়ের নিচেই রেখে থাকুক, কে আর নেবে? কেউ তো নেই। শুধু শুধু বয়ে ক্লান্তি বাড়ানো।'

মঙ্গল তবু বললে—'ব্যাগট্যাগ নিয়ে যাওয়াই ভালো, যদি জলতেষ্টা পায়? যদি হাত-পা কেটে যায়?'

মিতুল বললে—'আবার যদি খিদে পেয়ে যায়?'

এবার মিতুলকে মঙ্গল, গুগগুল দুজনেই বকে দেয়—'এই তো খেলে, এক্ষুনি খিদে পাবে কেন?'

—'তবে একটা অন্তত ব্যাগ নেয়াই ভালো, জল আর ওষুধের জন্যে। বাকি দুটো নিচ থাকুক।' তবু ব্যাগ মঙ্গল মাটিতে রাখতে দিল না, গাছের গায়ে টাঙিয়ে দিল, হুক ঝোলানোর মতন। গুগগুলের চেয়ে মঙ্গল বেশ কিছুটা লম্বা, যেমন মিতুলের চেয়ে গুগগুল। বয়সেও খানিকটা বড়ই হতে পারে। তবে, গুগগুলের সর্দারির কাছে হার মানবে না, দাদা ছাড়া এমন আর কে আছে?

পাহাড়ে চড়তে খুব মজা।

তিনজনে মিলে হৈ হৈ করে ছায়া ছায়া পথে উঠতে লাগলে পাথরের গা বেয়ে। মঙ্গল যে খাঁজে পা রেখে উঠছে, মিতুল-গুগগুলও প্রধানত সেই পথেই —যদিও মাঝে মাঝে নিজেরা অন্য অন্য রাস্তাও বের করে নিচ্ছে খুব মজা হচ্ছে। এমন সময় মঙ্গল বললে—'সাবধান, বাঁয়ে দেখো।'

BanglaBook.org

মিতুল চেয়ে দ্যাখে, মস্তবড় দুটো গোল গোল চোখ হাঁ করে তাকেই দেখছে। চোখের পেছু পেছু দেখা গেল কাঁটা-ওঠা পিঠ, ল্যাজ লম্বা একটা টিকটিকির মতো প্রাণী, তার সামনের পা দুটো বেশ উঁচু, মাথা উঁচু করে ছোট্টখাট্টো ডায়নোসরের মতন তাকিয়ে আছে। যেই চোখাচোখি, অমনি সরসর করে কোন পাথরের খাঁজে ঢুকে পড়লো কে জানে?

মিতুল থমকে আছে দেখে গুগ্‌গুল বললে—'ও কিছু নয় গিরগিটি রে। গিরগিটি কিছু করে না। পার্কে কত আছে—দেখিসনি?'

—'কি জানি বাপু? এ পাহাড়ের গিরগিটি, যদি কামড়ে দেয়? যদি বিষ থাকে? গোসাপ না তক্ষক কোন গিরগিটির যেন বিষ আছে না?' তক্ষকের কামড়ে কে যেন মরে গিয়েছিল না রামায়ণে, না মহাভারতে? এইসব ভেবে মিতুলের বেশ ভয় ভয় করলো। সে বললো—'যদি তক্ষক হয়? সে তো কামড়ে দিলে মানুষ মরে যায়, তাই না দিদিভাই?' গুগ্‌গুলেরও একটু ভয় হলো।—'কি জানি তক্ষক কেমন দেখতে। গিরগিটির মতোই, যতদূর ধারণা। হতেও পারে এটা তক্ষক। যাক, পালিয়ে তো গেছে। আর ভেবে কি হবে।'

মঙ্গল এই সময়ে খুব উৎসাহভরে বলল—'এই যে, গুহা এসে গেছে, আওয়াজ আ রহা হ্যায় পানিকা—'

ওরাও শুনতে পেল, ঝরঝর করে ঝর্ণার শব্দ হচ্ছে। কিন্তু দেখতে পেল না কিছুই। মঙ্গল একটা পাথরের ওপাশ দিয়ে বেঁকে চুরে পাহাড়ের ওদিকে চলে গেল। তাকে আর দেখা গেল না। গুগ্‌গুল-মিতুলও ঠিক সেইভাবে পাহাড়ের ওপাশে গিয়ে উপস্থিত হলো। পৌঁছেই দ্যাখে, অপূর্ব দৃশ্য। একটা গুহার ভেতর থেকে জল বেরুচ্ছে, সামনেই খানিকটা গর্ত মতন, যেন চৌবাচ্চা তৈরি হয়ে গেছে আপনাআপনি। তাতে জমা হচ্ছে জল, সেখান থেকে সোজা ঝরে পড়ছে পাহাড়ের গা বেয়ে, পাথর বেয়ে নিচের জমিতে। বেশি উঁচু থেকে তো নয়, তাই খুব জোর শব্দ নয়, খুব বড় কিছু এটা জলপ্রপাতও নয়, তবু কারি সুন্দর ঝর্ণা তো আবিষ্কার করা গেল একটা।

—'এটার নাম কী দেয়া হবে দিদিভাই?'

—'মউল নদীর উৎস তো, এর নাম মউলোত্রী হওয়া উচিত। গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী যেমন।'

—'য্যাঃ। বিশ্রী শুনতে। গোদাবরীর উৎসের নাম কী দিদিভাই? কিংবা নর্মদার?'

—'জানি না, যাঃ।'

—'এর নাম বেশ মউলী। মউলী ঝর্ণা। ভালো না? মউল নদীর উৎস, মউলী।'

—'তোর কোনো অরিজিনালিটি নেই রে মিতুল।'

—'তবে মিতুল নাম দাও। মিতুল ঝর্ণা।'

—'ঐ তো বললুম, কোনো অরিজিনলিটি নেই। তবু "মঙ্গলা" বললেও বুঝতুম। সেই যখন পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছ।'

—'বেশ তো, "মঙ্গলা" বেশ সুন্দর নাম, আমার পছন্দ।' মিতুল এককথায় রাজি। ছোট্ট ঝর্ণার নাম দেওয়া হলো 'মঙ্গলা'। ছোট্ট পাহাড়ের নাম 'কালাপাহাড়'। —'আর বন? বনটারও তো কোনো নাম নেই। বেচারী বন। ছোট্ট বলে কি সে কেউই না? নাম থাকবে না তার?"

—'বনটার নাম দেয়া হোক, "বনানী"—', আবার মিতুল বলে। বলেই লজ্জা পায়। নাঃ, এটাও অরিজিন্যাল শোনাচ্ছে না। বনের নাম বনানী? বড্ড সোজা! কিন্তু কি জানি কেন, গুগ্‌গুলের এটা পছন্দ হয়ে যায়।—'বাঃ, এটা তো দারুণ ভেবেছিস।' এই অ্যাপ্রিসিয়েশানটা মিতুল একেবারেই আশা করেনি। মঙ্গল এসব কিছুই শুনছিল না। সে আপন মনে জলে গামছা ডুবিয়ে খেলা করছিল। মাছের ঝাঁকগুলোকে ধরতে চেষ্টা করছিল। এই মাছগুলোকে কেউ ধরে না বলে এরা পালাতে শেখেনি। মঙ্গল হঠাৎ গামছায় ভর্তি করে মাছ তুলে ফেললে —'দেখো। দেখো, দিদিভাই। দেখো, মিতুল। কিতনা মছলি!' বলে চেঁচিয়ে উঠলো।

মঙ্গলের লাল গামছা যেন একমুঠো রুপোর টুকরোয় ভরে গেছে। ভীষণ ছটফট করছে মাছগুলো। মিতুল বলে উঠলো—'ছেড়ে দাও মঙ্গল, ছেড়ে দাও'—

মঙ্গলেরও মনের ইচ্ছে সেটাই ছিল মনে হয় সেও তক্ষুনি ছেড়ে দিলে। রুপোর টুকরোগুলো আবার আপনমনে মাছ হয়ে ল্যাজ নেড়ে নেড়ে খেলে বেড়াতে লাগলো —যেন কিছুই হয়নি, এমনিভাবে, সেই কালো পাথরের জোবাচ্চায়, সবুজ শ্যাওলার মধ্যে। জলে শ্যাওলা আছে বটে, কিন্তু বাইরে একদম শ্যাওলা নেই। পাথর সব একদম শুকনো। মোটে পিছল নয়। এই গুহার মাথায় যে ছাদ মতন জায়গাটা সেটাই এই ছোট্ট পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু জায়গা। শৈলশিখর যাকে বলে। কিন্তু মোটেই শিখরের মতো ছুঁচলো দেখতে নয়। চ্যাপ্টা। সেখানে উঠে, পা ঝুলিয়ে বসে রইল তিনজনে। কোনখানে টাঙাবে পতাকা? সেই যে ডাইরির পাতায় যা লেখার কথা? না আছে একটা গাছ, না একটা কাঠ-কুটো, ডালপালা। খটখটে রোদ্দুরে বসে থাকতে ইচ্ছেও করছে না।

—'চলো ঝর্ণায় গিয়ে খেলা করি।' বললো মিতুল। মঙ্গল কথা বেশি বলে না। ভিজে গামছাটা সে মেলে দিয়েছিল পাথরে, আর কোমর থেকে বাঁশিটা নিয়ে ফুঁ দিয়েছিল।

—'এই কাঠখোট্টা রোদ্দুরে বাঁশি না বাজিয়ে, চলো না "বনানী"তে গিয়ে ছায়ায় বসি? সেখানে বাজবে?' গুগ্‌গুল বললে।

—'সেই ভালো।'

তিনজনে মিলে শুরু হলো নামার পালা। ঝর্ণার পাশ দিয়ে দিয়েই নামার ইচ্ছে, কিন্তু এদিকের পাথরগুলো ভিজে ভিজে স্যাঁৎসেতে, শ্যাওলা-ধরা, পা পিছলে যেতে পারে। গুগ্‌গুল বললে, 'কাজ নেই, চল, ওপাশ দিয়েই নামি। তারপর ঘুরে এসে ঝর্ণার কাছে গাছতলায় বসে মঙ্গলের বাঁশি শুনবো। এতক্ষণে মাত্র দশটা বাজে।'

নামাটা যত সোজা হবে ভেবেছিল মিতুল-গুগ্‌গুল, ততটা সোজা হলো না। তবু, হাত-পাগুলো ছড়ে গেলেও, নেমে পড়ে যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো ওরা। জলতেষ্টা পেয়েছে খুব। সঙ্গের বোতলটা তো ওপরে উঠেই খেয়ে ফেলেছে। আরো এক বোতল আছে, কিন্তু মিতুলের খুব ঝর্ণার জল খেতে ইচ্ছে ছিল। গুগ্‌গুল দেয়নি। কী জানি বাবা জলে কী আছে! কেউ খায় না যে ঝর্ণার জল সেটা কি খাওয়া উচিত? কোথা থেকে আসছে জলটা কে জানে? সেখানে ওই গুহার মধ্যে যদি একটা বিষাক্ত কেউটে কি অজগর সাপ লুকিয়ে থাকে, আর তার বিষ যদি ওই জলে মিশে গিয়ে থাকে, এতটা বলতেই মঙ্গল তাকে থামিয়ে দেয়।

—'তব্ তো ও মছলি ভি মর যাতা থা।' বলেই ঠাণ্ডা ঝর্ণার জল খানিকটা খেয়ে নেয় মঙ্গল। মিতুলও মঙ্গলের দেখাদেখি আঁজলা পাতে।

—আঃ, কি ঠাণ্ডা দিদিভাই। ঠিক যেন ফ্রিজের জল! খা, খেয়ে দ্যাখো?'

নিচে নেমে ওরা দ্যাখে ব্যাগদুটো যেমন ঝুলছিল, তেমনি ঝুলছে। খাবার দাবার সবই ঠিকঠাক আছে। এই বনে একটা বাঁদর পর্যন্ত নেই। কাঠপিঁপড়েও না? কেবল গিরগিটি আর মাছ? গুগ্‌গুল অবাক হয়ে ভাবে। এ আবার কেমন বন রে বাবা? হঠাৎ ঠিক তক্ষুনি মাথায় টুপ করে কী যেন পড়লো! সঙ্গে সঙ্গে তার খেয়াল হয়, বাঃ! পাখি আছে বই কি। তখন থেকে কিচিরমিচির কিচিরমিচির করছে। ওড়াউড়ি করছে এ-ডাল থেকে ও-ডালে। এখন তো যা কুকীর্তি করবার তাও করে দিল মাথায়। মউল নদীর জলের কাছে নুইয়ে ধরে মিতুল গুগ্‌গুলের মাথাটা, আর জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয় মঙ্গল। জলের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে গুগ্‌গুল হঠাৎ দ্যাখে তার মাথার ওপর আর একটা ছায়া। মস্তবড় দুটো চোখ যেন ঝাঁপ দিয়ে পড়বে—সেই গিরগিটির চোখ। হঠাৎ ভয় পেয়ে সরে যায় সে। এক হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে নেয় মিতুল আর মঙ্গলকেও। তক্ষুণি ঠিক সেখানে গাছ থেকে ঝুপ করে খসে পড়লো একটা গিরগিটি, পড়েই সরসর করে জলে না বালিতে কোথায় লুকিয়ে পড়লো, কে জানে?—মিতুল-গুগ্‌গুলের ভয় দেখে হেসে মঙ্গল বললে—'ওর কোনো বিষ নেই। ওরাই তো ভয়ে রং বদলায়।' বহুরূপী? শুধু নামই শুনেছে বহুরূপীর। এতদিনে চোখে দেখা হলো।

কিন্তু এত বড়ো হয় বহুরূপী? কলকাতায় যে গিরগিটি দেখেছে গুগ্‌গুল, এ তার চেয়ে অনেক বড়। গোসাপ নয় তো? গোসাপ মোটেই বহুরূপী নয়। মঙ্গলও কিছু জানে না, তার মানে। তাদের মতোই ছোট ছেলে তো? গাঁয়ের ছেলেরা অনেক কিছু জানে, এই ধারণা সর্বদা ঠিক নয়। শহরের ছেলেমেয়েও বই পড়ে অনেক কিছু জেনে যায়। গুগ্‌গুল এখন পড়ে ক্লাস সেভেনে, মুড়তুতো ভাই মিতুল ফাইভে পড়ে। দাদার ফাইনাল ইয়ার, ক্লাস টেন। দাদা সর্দারি করে বটে, তবে জানেও অনেক কিছু। দাদাটা আজ সঙ্গে থাকলে ভালোই হতো। গুগ্‌গুলের একটু একটু মন কেমন করতে থাকে।

—'চল্ মিতুল, ফিরে যাই।'

—'ডাহুক নদী দেখবে না?'

—'ফিরতে ঝাড়া আড়াই ঘণ্টা লাগবে, মনে রেখো। এখনই এগারোটা বাজে।'

—'তাহলে দু'নম্বর টিফিনটা খেয়ে নিই?'

ঠিক সেই সময়ে পাহাড়ের পিছন থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক। তার পরনে সাধুদের মতন ময়লা আলখাল্লা, কিন্তু খুব ছেঁড়াখোঁড়া, মাথাভর্তি জটা দাড়ি-গোঁফ চুল সবই জট পাকানো, শুধু চোখদুটো ছাড়া মুখের কিছুই দেখা যাচ্ছে না, সেই চোখদুটোও বন্ধ। লোকটার হাতে একটা লাঠি। লাঠি ঠুকে ঠুকেই সে এগোচ্ছে। লোকটা অন্ধ। একজন অন্ধ লোক, একা, এতদূরে এই জনশূন্য শালবনের মধ্যে কী করে এল?

ভয় না করে গুগ্‌গুলের মায়াই হলো। সে এগিয়ে গিয়ে লোকটাকে বলল 'আপনি কোথায় যাবেন?'

লোকটির দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল ফাঁক হয়ে এবার খুব মিষ্টি একটা ফোকলা হাসি ফুটলো। বুড়োমানুষ। চুল-দাড়ি সবই আধপাকা। সে বললে একগাল হেসে —'কোথাও যাবো না তো? এটাই আমার ঘর।'

—'এখানে তো কোনো ঘর দেখিনি?'

—'ঘর মানে কি ঘর? গুহা। গুহারই মধ্যে থাকি। আমি গুহামানব।'

—'দূর। গুহামানব এখন হয় নাকি? তারা কবেই খোঁয়া হয়ে গেছে। আপনি তো সাধুমশাই বলে মনে হচ্ছে।' মিতুল জবাব দেয়।

—'আপকো তো হম্ কভী নেহী দেখা?' মঙ্গল অবাক হয়ে বলে—'আমি তো এখানে অনেকবার এসেছি।'

—'আমি তো আগে এখানে থাকতাম না। আগে থাকতাম ডাহুক নদীর ওপারে। এখন থাকি এখানে। মউল নদীর এপারে।'

—'আপনি খান কী?' মঙ্গল হঠাৎ প্রশ্ন করে।—'ইধর তো খানেকা ফল কুছ নেহী মিলতা!'

লোকটির মুখ একটু গম্ভীর হয়। সে বলে—'আমি তো ফল খাই না। মাংস খাই।'

—'মাংস? কিসের মাংস? এখানে তো কোনো জীবজন্তুও নেই। শুধু পাখি আর গিরগিটি।'

—'আছে। মাঝে মাঝে আসে।' বলেই লোকটা কেমন একরকম হাসে। অমনি ভয়ে বুকের মধ্যে শুকিয়ে যায় মিতুল-গুগ্‌গুলের। নরখাদক? ও আগেই বলেছিল কিন্তু: 'আমি গুহামানব!'

হঠাৎ মিতুলের হাত ধরে, মঙ্গলের জামা ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে দৌড় লাগায় গুগ্‌গুল। ব্যাগগুলো পড়েই থাকে গাছের গায়ে, অত শখের দু'নম্বর টিফিনসুদ্ধু। ওরা পালাচ্ছে বুঝতে পেরে প্রথমে লোকটি লাঠিটা বাড়িয়ে দেয়। এবং তারপর পায়ের আওয়াজ আন্দাজ করে মিতুলদের পেছন পেছন ধাওয়া করে ছুটতে শুরু

BanglaBook.org

করে—সঙ্গে সঙ্গে চেঁচায়—'আরে যেও না, যেও না—থামো—আমি নরখাদক নই—আমি রাক্ষস নই—শোনো, শোনো—'

কে শোনে কার কথা? দে ছুট, দে ছুট। অনেক দূর এসে, কী মনে করে হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে গুগ্‌গুল চেঁচিয়ে বলে—'ওখানে খুঁজে দেখবেন, আমাদের ব্যাগগুলো ঝুলছে। তাতে আমাদের তিনটে টিফিন আছে। আপনি সব খেয়ে নিন।'

এবার লোকটা হঠাৎ মাটিতে বসে পড়ে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। কান্নার শব্দ পেয়ে মঙ্গল দাঁড়িয়ে পড়ে। চুপ করে দাঁড়িয়েই থাকে। লোকটার কান্না দ্যাখে। যেন পাথরের মূর্তি। কী যেন ভাবে। তারপর ফেরে। আস্তে হেঁটে ফিরে যেতে থাকে লোকটার কাছে মঙ্গল। মঙ্গলের পিছু পিছু গুগ্‌গুল গুগ্‌গুলের পেছনে মিতুল

লোকটা কাঁদছে।

আস্তে আস্তে গিয়ে ওকে ঘিরে দাঁড়ায় তিনজনে। লাঠিটা আস্তে করে সরিয়ে দেয় মঙ্গল। বেশ দূরে। লোকটার বন্ধ চোখ বেয়ে জল ঝরছে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে। গুগ্‌গুল ওর পিঠে হাত রাখে। লোকটা আরো ডুকরে কেঁদে ওঠে। এবারে মিতুল তার রিনরিনে গলায় বলে—'এখনো তুমি কাঁদছো কেন? আমরা তো আর ভয় পাইনি? এই তো ফিরে এসছি তোমার কাছে। এই দ্যাখো, এই তো আমরা—', বলে লোকটির নোংরা হাতটা ধরে নিজের হাতে। লোকটি অন্য হাত দিয়ে এবার চোখ মুছতে মুছতে আপনমনেই কাঁদতে থাকে। আর কথা বলত থাকে।—'ঠিকই হয়েছে। আমার উচিত শাস্তিই হয়েছে। আমাকে কেউ নরখাদক রাক্ষস কেন ভাববে না? আমি তো খাই ঝলসানো পাখির মাংস, গিরগিটি-গোসাপের মাংস, যা পাই তাই খাই—বিনা নুনে চিবিয়ে খাই, বনের পশু প্রাণীর মতোই বাঁচি—মানুষ খেতেই বা কী?'

গুগ্‌গুলেরা কেউ কোনো কথা বলে না।

একটু পরে মঙ্গল বলে—'লেকিন, সাধুজী, আপ ইধর কিউ রহতেঁ হেঁ? গাঁওমে যাইয়ে না, খানাপিনা সবকুছ মিলেগা?'—'সত্যিই তো অন্ধ মানুষ। একা একা বনে-বাদাড়ে থাকাই বা কেন?' গুগ্‌গুলও বলে মঙ্গলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে।

—'প্রাণের মায়া বড় মায়া ভাই। তাই তো এভাবে মরে বেঁচে আছি। বেঁচে থেকে আমার কী লাভ হচ্ছে বলো? আমার কে আছে? কে আমাকে চায়? আমি না থাকলে জগতে কার ক্ষতি? তবু তো আছি প্রাণের মায়ায়, পাখি খেয়ে, গোসাপ খেয়ে—'

—'পাখি ধরেন কেমন করে? গোসাপই বা—'

—'পল্টু ধরে দেয় যে। পল্টু! পল্টু!'

মুহূর্তের মধ্যে একটা চকচকে লোমওলা ছাইরঙা বাঘের ছানার মতন জন্তু ঝাঁপ দিল গাছ থেকে। সাধুজীর সামনে।—'বনবিড়াল।' বললেন সাধুজী।—'অ্যাতটুকু বাচ্চা ছিল। চোখ ফোটেনি। আমার তখনো একটা চোখে অল্প দৃষ্টি ছিল। আমি ওকে বাঁচিয়ে তুলেছিলুম। এখন ওই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। জীবজন্তু ধরে এনে

BanglaBook.org

আমায় দেয়। আমি পুড়িয়ে খাই। আমি অন্ধ মানুষ। জীবজন্তু কি ধরতে পারি? না ফলগাছ চিনে ফল পাড়তে পারি? তাই তো মাংস খেয়ে থাকি। পল্টু যে ফল পাড়তে জানে না।'

পল্টু ঝাঁপ দিতেই মিতুল-গুগ্‌গলরা সাধুজীকে ছেড়ে অনেকটা দূরে সরে গিয়েছে।

সাধুজী বললেন—'ভয় নেই, ভয় নেই। পল্টু খুব মিষ্টি স্বভাবের লক্ষ্মী মেয়ে। আদর করো। কিছু বলবে না। পল্টু, এই দ্যাখ আমার বন্ধুরা তোর সঙ্গে খেলা করতে এসেছে।'

মঙ্গলের খুব সাহস। সেই প্রথমে গিয়ে পল্টুর মাথায় হাত বুলোতে শুরু করলে। সঙ্গে সঙ্গে একেবারে কলকাতার বাড়ির পুষির মতন সুরে পল্টু গুরগুর শব্দ করে চোখ বন্ধ করে গলা তুলে আরাম খেতে শুরু করে দিলে। সেই দেখে মিতুল ও গুগ্‌গুলও সাহস পেয়ে এগিয়ে যায়। আদর করে। সাধুজী বলেন—'বুঝলি পল্টু, এরা তোর বন্ধু।'

হঠাৎ মিতুল বললে—'সাধুজী, এবার তবে আমরা টিফিনটা খাই?'

মঙ্গল আর গুগ্‌গুল চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে। কতটুকুই বা টিফিন? মঙ্গলকে একধারে ডেকে নিয় গিয়ে গুগ্‌গুল বলে—'ভাই মঙ্গল, তোমার আর আমার টিফিন দুটো আমরা বরং সাধুজীকে খাইয়ে দিই মিতুলটা যা পেটুক, ও দেবে না। আমরা বাড়ি গিয়ে ভাত খাবো।'

মঙ্গলটা সত্যি বড় ভালো ছেলে—ও বললে—'হমভি ওহি বাত বোলনে চাহতা থা।' কৌটো খুলে দেখা গেল লুচি, আলুর দম, ডিমসেদ্ধ, আর শোনপাপড়ি—

মিতুল বললে—'আমার ডিমসেদ্ধটা আমি পল্টুকে দিয়ে দিতে পারি। সকালবেলায় দুটো ডিমসেদ্ধ খেয়ে বেরিয়েছিলাম—এই নে, পল্টু, ডিমসেদ্ধ খাবি?

বলেই পল্টুর সামনে তার ডিমসেদ্ধটা ফেলে দিলে।

গুগ্‌গুল আর মঙ্গল তখন তাদের টিফিন কৌটো থেকে বের করে চেষ্টা করছে ধোয়া শালপাতায় করে সাজিয়ে গুছিয়ে অন্ধ সাধুজীকে খাওয়াবার। পেটুক মিতুলটা যে কী! ডিমের খোসাটা পর্যন্ত ছাড়ালে না!

পল্টু ডিমটা শুঁকলো। শুঁকে শুঁকে ঘুরে ঘুরে দেখলো, তারপর আলতো করে মুখে তুলে নিয়ে গিয়ে সাধুজীর সামনে রাখলো। আর সাধুজীর হাতটা কামড়ে নিয়ে ডিমের ওপর রাখলো। সাধুজী ডিমটা তুলে নিলে। নিয়ে হাসলেন, পল্টুর মাথায় হাত বুলিয়ে।—'দেখলে তো? দেখলে তো তোমরা? পল্টু আমাকে কত ভালোবাসে? এটা তোর, পল্টু, তুই খা। এটা তোকেই দিয়েছে।' বলে ডিমের খোসাটা ছাড়িয়ে সাধুজী যত্ন করে পল্টুর মুখে তুলে দেন। পল্টু খায়।—'আমাকে না খাইয়ে পল্টু খাবে? ও কি মানুষ? ও নেমকহারামী জানেই না। আমারই বরং লজ্জা করে ওর যত্ন দেখে।'

—'এই যে সাধুজী, আপনার টিফিন।' শালপাতা নদীর জলে ধুয়ে কাঠি দিয়ে সেলাই করে, মঙ্গল কি সুন্দর পাতার থালা তৈরি করে ফেলেছে। তার ওপরে

BanglaBook.org

গুগ্‌গুল সমস্ত খাবার সাজিয়ে সাধুজীর সামনে রাখলে। তারপর তাঁর হাতটি ধরে, 'এই যে লুচি। এটা আলুর দম। এ দুটো আপনার ডিমসেদ্ধ। এটা শোনপাপড়ি। এটা কলা। এটা কমলালেবু' বলতে লাগলো।

সাধুজীর চোখ দিয়ে আবার জল পড়তে লাগলো।—'বেঁচে থাকো বাবা, বেঁচে থাকো তোমরা। তোমাদের নাম পর্যন্ত জানি না। অথচ আমায় এত যত্ন করছো, কতদিন যে এসব খাদ্য খাইনি, তার আর হিসেব নেই।' সাধুজী খেতে শুরু করেই থমকে দাঁড়ালেন।—'কিন্তু তোমরা? এটা তোমাদের মুখের খাবার। আমাকে খাইয়ে দিলে?'

—'এই তো আমরা কলা, বিস্কুট, কমলালেবু খাচ্ছি। এক্ষুনি বাড়ি গিয়ে ভাত খাবো। বাকি বিস্কুটগুলো আপনার কাছে রেখে দিয়ে যাচ্ছি, আপনি ইচ্ছেমতন খাবেন।' গুগ্‌গুল তাড়াতড়ি জানালো।

—'আমরা মাঝে মাঝে এসে আপনাকে খাবার দিয়ে যাবো। এ মাসটা পুরোই আমরা আছি। ইস্কুল খুলবে সেই জানুয়ারির শেষে।' মিতুল উদারভাবে বলে—'আমরা চেঞ্জার।'

—'লেকিন আপ ইধর কিঁউ রহতেঁ হেঁ?' মঙ্গলের সেই একই প্রশ্ন। 'গাঁও মে যাইয়ে না? সাধুলোগকো সবকোঈ খিলায়গা—'

একটু চুপ করে থেকে সাধুজী বললেন—'আমি গ্রামে থাকতে পারি না, আমার অসুবিধে আছে। আমাকে তোমরা সাধুজী বলে ডেকো না বাবা, আমি সাধু-সন্ন্যাসী নই। আমি জেল-পালানো চোর। বছরের পর বছর ধরে বনে-জঙ্গলে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। নিজেও জানিনে কত বছর হয়ে গেছে।'

—'অ্যাঁ? আপনি চো-র?' মিতুল বড় বড় চোখে বলেই ফেললে। শত চোখ টিপেও গুগ্‌গুল তাকে থামাতে পারলে না।—'কী চুরি করেছিলেন আপনি?' লুচি খেতে খেতে মিতুলের পরবর্তী প্রশ্ন।

—'সে অনেক কথা। চুরিটা করতে পারিনি ঠিকমতন। ধরা পড়ে গেলাম সাতজনেই। সাত বন্ধুতে মিলে ব্যাঙ্ক লুট করেছিলাম। উদ্দেশ্যটা ছিল মহৎ। গরিব আর বড়লোকের মধ্যে তফাৎ রাখা হবে না, দেশে সশস্ত্র বিপ্লব এনে দেশের উন্নতি করবো।'

—'চুরি-ডাকাতি করে উন্নতি?' মিতুলের মন্তব্য।

—'ঠিকই বলেছো বাবা। অন্যায় কাজ করে, অসৎ পথে কোনো সৎ, মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করা যায় না। গান্ধীজীর এই কথা এখন আমি মানি। তখন বয়েস ছিল অল্প, আমরা বিশ্বাস করতুম বন্দুকের নলেই উড়বে বিপ্লবের জয়নিশান। হিংসার পথটা ভুল পথ ছিল। সাত বন্ধুই ধরা পড়ে গেলুম। নকশালবাড়ি আন্দোলন কি এখনো চলছে? না শেষ হয়ে গেছে? দেশের কোনো কাজেই লাগলো না আমাদের সেই প্রাণপাত করা চেষ্টা।'

—'পালালেন কেন? অন্যায় কাজ করেছেন, ধরা পড়েছেন, জেল খাটাই তো উচিত ছিল।' পুনরপি মিতুলের জ্ঞানীর মতন বাক্য।

BanglaBook.org

—'তা ছিল বটে। তবে এও কি তার চেয়ে কম কষ্টের জীবন ভাই? এই একা একা চোরের মতো এই বনবাদাড়ে লুকিয়ে থাকা? জেল থেকে পালিয়েছিলুম, সেও দলে পড়ে। সাতজনে একসঙ্গে বিছানার চাদর দিয়ে দড়ি তৈরি করে, জেলের পাঁচিল ডিঙিয়েছিলুম। পুলিশের অত্যাচারে আমার চোখ তখনই প্রায় অন্ধ, আরেক বন্ধুর পায়ে গুলি লেগে খোঁড়া, আমাদের সুদ্ধু নিয়ে পালিয়েছিল আমাদের বন্ধুরা। সে কি আজকের কথা? সেটা ১৯৭২ সাল। প্রেসিডেন্সি জেল থেকে পালাই আমরা।'

—'ও বাবা! সে তো আমরা কেউই তখন জন্মাইনি।'

—'খালি দাদা জন্মেছে। '৭২-এই ওর বার্থডেট।'

—'তার মানে, এটা তো নাইনটিন এইটি সেভেন, পনের বছর ধরে আপনি জঙ্গলে-জঙ্গলে?' মিতুল হিসেব করে ফেলেছে আঙুলে কর গুনে।

—'অ্যাঁ? অ্যা-তো দিন হয়ে গেছে বুঝি? পনের বছর? মিসেস গান্ধী এখনো কি—'

—'মিসেস গান্ধী কবেই খতম! এখন তো রাজীব গান্ধীর রাজত্ব।'

—'মানে?'

—'মানে তিনি মারা গেছেন, এখন তাঁর ছেলে মন্ত্রী।'

'কী আশ্চর্য! এ কি রূপকথা শুনছি?'

—'আপনি এবার আত্মপ্রকাশ করে ফেলুন, অনেক দিন হয়ে গেছে, আর হয়তো পুলিশ আপনাকে ধরবেই না। শুধু শুধু লুকিয়ে আছেন।'

—'আইনটা ঠিক জানি না ভাই, সাহস পাই না। এই বুড়ো বয়সে জেল খাটার উৎসাহ নেই।'

—'কাকুই তো উকিল। সব খবর এনে দেবো আমরা আপনাকে। নিয়ম-কানুন, আইন-টাইন, সব! আপনি কিছু ভাববেন না'—গুগ্‌গুল আশ্বাস দেয়।

—'পনের বছর আগে আপনার কত বয়েস ছিল?' মিতুল হঠাৎ প্রশ্ন করে 'স্টুডেন্ট ছিলেন তো তখন? নকশালরা তো সবাই স্টুডেন্ট ছিল। তাই না দিদিভাই?'

—'স্টুডেন্ট? নাঃ। তখন আমি একটা ছোটো কলেজে পড়াই। আমার বয়েস পঁচিশ বছর ছিল।'

—'অ্যাঁ? প্রফেসররাও ডাকাত হয়?' মিতুল হাঁ!

—'স্টুডেন্টরা ডাকাত হলে আর প্রফেসররা হবে না কেন?'

—'আপনি কিছু ভাববেন না কাকাবাবু,' হঠাৎ গুগ্‌গুল যেন ঠিক শব্দটা খুঁজে পেয়ে গেছে—'আমরা কাকুর কাছ থেকে সব ইনফরমেশন নিয়ে আসবো। আপনি এইখানেই অপেক্ষা করুন। পরশু-তরশু নাগাদ ঠিক আসবো। অনেকটা দূর তো?'

—'খাবারও নিয়ে আসবো আপনার জন্যে'—মিতুল বললে।

—'অব ঘর চলো।' এবার তাড়া লাগালো মঙ্গল।

BanglaBook.org

—'বাড়ি পৌঁছোতে সেই চারটেই ঠিক বেজে যাবে'—গুগ্‌গুল বলে।

—'কিন্তু অন্ধকারের আগেই পৌঁছে যাবো'—বললে মিতুল।

—'গুডবাই পল্টু, গুডবাই কাকাবাবু, বিস্কুটটা খাবেন'—বলতে বলতে মিতুল ছুটলো মাঠ পেরিয়ে। পিছন পিছন গুগ্‌গুল, তার পিছনে মঙ্গল।

আর 'বনানী' নামের ছোট্ট একটুখানি শালবনের ছায়াতে মউল নদীর ঝিরিঝিরি জোলো হাওয়ায় ছোট্ট 'কালাপাহাড়' পাহাড়ের তলায়, 'মঙ্গলা' ঝর্ণার ধারে, একটি ময়লা কাপড়পরা অন্ধ মানুষ অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বলল—'চল পল্টু, এবার আমরা বাড়ি যাই। ওরা পরশুদিন আসবে। ততদিন ধৈর্য ধর।'

শারদীয়া শুকতারা, ১৩৯৫

সেই অবোধ শহীদ

দোষটা আমাদের এই বাড়ির। বড্ড এলোমেলো লণ্ডভণ্ড কাণ্ড-কারখানা এখানে। একটা-না-একটা লাগাতার কনফিউশন চলবেই চলবে। সেদিনও একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেল। আসল কথা এ-বাড়িটা তো কেবল মানুষদের নিয়েই নয়, নানারকম জীবজন্তু, পশুপক্ষী নিয়ে আমাদের বিরাট সংসার। আর এই আমার পৃথ্যির দল কেউ না কেউ, কিছু না কিছু একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটাবেই ঘটাবে। সব মিলিয়ে আমাদের প্রত্যেকটি দিন বড্ডই জটিল হয়ে ওঠে।

এই যে আছেন বিন্দু-বিসর্গ নামে দুই ডেঁপোকটা, লেজ-উঁচোনো, গোঁফ-নাচানো ওস্তাদ—তাদের মস্তানীর জ্বালায় মার মেজাজ দিনরাত টঙে চড়ে থাকে। আর থাকবেই বা না কেন? পিসিমা বেচারী শুদ্ধাচারী বিধবা মানুষ, ছ'মাসে ন'মাসে একদিন আসেন। সেদিন পিসিমা এসেছেন, মা মেঝেতে আসন পেতে, শ্বেতপাথরের থালায় খেতে দিয়ে সামনে বসে আছেন—লাফাতে লাফাতে বিসর্গ এসে হাজির। এসেই কথা নেই বার্তা নেই সোজা পিসিমার পাতের ধারে একটি চমৎকার নৈবদ্য সাজিয়ে রেখে আসনের উল্টোদিকে, মার পাশে গিয়ে তদারকিতে বসলো। সগৌরবে। মা হাঁউ হাঁউ করে চেঁচিয়ে উঠলেন, পিসিমা আঁতকে উঠলেন, রান্নাঘর থেকে ঠাকুর ছুটে এলো, ছাদ থেকে লক্ষ্মীর মা, আর পড়ার ঘর থেকে আমি। আমি এসেই ভয়ে কাঠ! আর লক্ষ্মীর মা এসেই যাচ্ছেতাই গাল দিতে শুরু করলো— 'ওই হতভাগা বজ্জাত বেড়ালদুটোর যন্ত্রণায় এই বাড়িটা মানুষের থাকার অযুগ্যি হয়ে গেল গো?' মা বললেন—'দোষ তো ওদের নয়, দোষ খুকুর। ওরা তো জানোয়ার মাত্র—', বলতে বলতেই লক্ষ্মীর মা মরা টিকটিকিটা সরিয়ে নিল বটে পিসিমার পাতের পাশ থেকে—কিন্তু পিসিমার আর খাওয়াই হলো না। মার মেজাজের আর দোষ কী?

বিন্দু আবার আরেক রকমের। সে শিকার করে এনে আমাদের খাওয়াতে চেষ্টা করে না। আমাদের পাত থেকেই শিকার করবার চেষ্টা করে। সেবার ভাইফোঁটার দিনে, আমার দুই মামা ভাত খেতে বসেছেন। বিন্দু হঠাৎ শূন্য থেকে উদয় হয়ে সেজমামার পাত থেকে সন্তর্পণে থাবা বাড়িয়ে বেগুনভাজাটা নিয়ে পালিয়ে গেল। সেজমামা তো অবাক।—'ও রাধারানি। তোদের বেড়াল যে দেখছি বেগুনভাজা খায়?' মা লজ্জায়, ক্ষোভে কাঁদোকাঁদো হয়ে বললেন—'খায় না সেজদা, মোটেই খায় না, মাছ-দুধই খায়। ও বেগুনভাজা ও নিজেও খাবে না, তোমাকেও খেতে দেবে না। অতি বদ হিংসুটে বেড়াল ও!' সেজমামা হৈ হৈ কর হেসে উঠলেন—'তাই বল! এই তাহলে হচ্ছে ক্যাট-অ্যান্ড-দি-বেগুনভাজা-সিচুয়েশন? যেমন জাবনার বালতিতে কুকুর?'

আমি কিন্তু ঠিকই বুঝেছি, ব্যাপারটা অত সূক্ষ্ম নয়। আসলে শিকারী হিসেবে বিন্দুর টিপটা খুব বাজে। নিতে চেষ্টা করেছিল মাছের চপটা, কিন্তু নুলো গিয়ে পড়লো বেগুনভাজাতে। ভুল জিনিস শিকার করার লজ্জায় বিন্দু আর খাবার ঘর মাড়ালো না সেদিন। তা বলে, বেগুনভাজা কি নষ্ট হয়েছে? মোটেই না। তাওয়াং আছে না? আমার তিব্বত বর্ডার থেকে বয়ে আনা মেষ জাতীয় বোকা বুদ্ধুটা? কুকুরের বইতে বলে Dog is a scavenger animal—তাওয়াং তারই জ্বলন্ত প্রমাণ। বাড়ির সব আবর্জনা চেটেপুটে সাফ করে দেয়। আর একটা কথা কুকুরের বইতে বলে না, সেটা এই Dog is an avenger animal—তাওয়াংকে বেঁধে রাখলেই সে রাগের চোটে দাঁতের কাছে যা কিছু জরুরি জিনিস পাবে, খবরের কাগজ, ইলেকট্রিক তার, হাতপাখা, স্কুলব্যাগ—যাই হোক না, তাই কামড়ে কুচিয়ে আবর্জনায় পরিণত করবে। তাওয়াং কুকুরদের মধ্যে ইডিয়ট। অত্যন্ত নিম্নস্তরের বুদ্ধিসম্পন্ন সারমেয়। চিরটাকাল শুনেছি কুকুরদের অসম্ভব প্রিয় খাদ্য হচ্ছে হাড্ডি। আমাদের যেমন ফুচকা কিংবা আইসক্রিম। কিন্তু নট ফর তাওয়াং। সে মাংসের হাড়ের চেয়ে মাংসের আলু খেতে বেশি পছন্দ করে। সবচেয়ে পছন্দ করে স্যাটিনের তাকিয়া, কাশ্মীরী শাল, সিল্কের শাড়ি, নাইলনের শার্ট, টার্কিশ তোয়ালে, জয়পুরী বেডকভার, সম্বলপুরী পর্দা—এইসব। অর্থাৎ বৈচিত্র্যময় টেক্সটাইল চিবোতে সে হাড়ের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। এতই আলসে। (অথবা রুচিবান!) অন্যান্য কুকুরদের মতো সে চটি চাটে না, জুতো কাটে না, ফার্নিচার চিবোয় না। আমাদের কুকুর পোষার অভ্যেস বহুদিনের। তাই নানান স্বভাবের নানান রুচির কুকুর দেখা আছে। আমাদের 'দুষ্টু' (কানঝোলা গোলডেন ককার-স্প্যানিয়েল) ভীষণ কাঠ চিবুতে ভালোবাসতো। চেয়ারের পায়াগুলো চিবিয়ে চিবিয়ে এমনি সরু গলা করে দিয়েছিল যে পায়াগুলোকে ঠিক বড় বড় কোকাকোলার বোতলের মতন দেখাত। বসাও ছিল রীতিমতো বিপজ্জনক।

আর 'মিঠু' (বাদামী বেঁটে গুড়গুড়ে ডাখসহুন্ট—যাকে আমরা ইংরিজি করে বলি ড্যাশহাউন্ড) ভালবাসতো শুকনো চামড়া। বাড়িতে যিনিই আসতেন, তাঁরই এক পাটি জুতো সবিনয়ে চিবিয়ে খেয়ে রেখে দিতো, যাতে কেউ আর এ-বাড়ি ছেড়ে ফিরতে না পারেন।

এমন করলে বাড়িতে আর লোকজন আসবে কেন? চেয়ারে বসলেই চেয়ার টলোমলো করে, উলটে পড়ে যায়, জুতো খুলে ঘরে ঢুকলে শেষটা খালিপায়ে বাড়ি ফিরতে হয়, এতদ্রূপ গৃহে কদাচ ভদ্রব্যক্তিরা গমন করেন কি? কদাপি না। অতএব কেবল ভিখিরিরা, চাঁদাওয়ালারা, ঠাকুরের, লক্ষ্মীর মার আর আমার নির্লজ্জ খালিপায় বন্ধুরা ছাড়া যখন তখন কেউই আর আসতো না এ বাড়িতে। শেষকালে বাবাকে লোহার চেয়ার আর অতিথিদের মাননীয় জুতো তুলে রাখবার জন্য উঁচু শেলফ কিনে আনতে হলো। নইলে লোক-লৌকিকতা বন্ধই হতে চলেছিল প্রায় পোষ্যপ্রাণীদের উৎপাতে।

মা বলেন—'দোষ তো ওদের নয়, সব দোষ তো খুকুর।' আর আমি বলি —'দোষ তোমার আমার নয়, যত দোষ এই বাড়িটার।' এই এলোপাথাড়ি আলটু-বালটু বাড়িটার। যে আসে লঙ্কায় সে হয় রাবণ। এ-বাড়ির অবাধ আহ্লাদে কুকুর-বেড়াল তো দূরের কথা (তারা যে 'লাই পেলে মাথায় চড়বে', এটা শাস্ত্রসম্মত তত্ত্ব) খরগোশগুলো পর্যন্ত স্বেচ্ছাচারী দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে।

বাড়ির যারা কাজের লোক, যেমন রাঁধুনীবামুন, ঠিকে ঝি, ধোপা, এরা সব তো বংশানুক্রমেই আমাদের প্রভু, কেননা এদের কৃপা ভিন্ন আমাদের নিয়মিত 'অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান' হতো না। এদের ওপর আমরা নির্ভরশীল। কিন্তু পোষা প্রাণী কুকুর-বেড়াল-খরগোশ, কাঠ-বিড়ালি, কিংবা বদ্রীগর-চন্দনা, চামচিকে-শালিক—আপাতনজরে অন্তত এরা তো আমাদের প্রভু বলে মানবে? কিন্তু তারাও আমাদের বাড়িতে এলে মানুষকে মানে না। দুদিনেই বুঝে নেয় কারা প্রভু, আর কে তাদের ভৃত্য। আমিই এদের (ঠাকুর, ঠিকে ঝি, মেথর, আয়া, ধোপা, নাপিত, পুরুত)—খেতে দিই, বাসন ধুই, ময়লা সাফ করি, স্নান করছি, পাউডার মাখাই, বিছানা কাচি, বিয়ে দিই, (নখ কেটে দিই)—ফলে আমার পোষা জন্তুরা আমাদের মোটেই প্রভু বলে মানে না। এতে আমাদেরও যথেষ্ট ক্ষতি হয় এবং ওদেরও নিজেদেরও। অনেক সময়ে জন্তুদের এই অবুঝপনাতে অনেক বড় বড় ক্ষতিও হয়ে যায়। একটা লোভী খরগোশ যেমন বৌদির বোনের বিয়ের সম্বন্ধটা ভেঙে দিল, পাত্রের কাকার চায়ের কাপে মুখ দিয়ে ফেলে। আরো ক্ষতিও হয় অনেক সময়। ট্রাজেডিও বলা যায়। যেমন আমাদের বোকা শালিকপাখির বীরত্বের কাহিনী।

আমাদের এই এলোপাথাড়ি বাড়িতে এসে একটা ডানাভাঙা নিরীহ শালিকপাখিও দুর্দান্ত হয়ে উঠেছিল, কিছুতেই সে খাঁচায় থাকবে না। ডানা মেলে উড়বেও না। দুই ঠ্যাঙে নেচে নেচে সারা বাড়ি লাফিয়ে বেড়াবে—মানুষের মতন। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে নিচে উঠবে-নামবে, আমি বেরুলেই সঙ্গে সঙ্গে পথে বেরিয়ে পড়বে। শেষকালে অস্থির হয়ে আমাকে একটা বেতের ছোট্ট ঝুড়ি-ব্যাগ কিনতে হলো, যার মধ্যে ঢুকে চুপটি করে বসে থাকত শালিক, আর ট্রামেবাসে চড়ে কলকাতা চষে বেড়াতে আমার সঙ্গে। আমার বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চা-বিস্কুট খেতো। কেবল কলেজে আর সিনেমায় যাবার বেলায় ওকে বাড়িতে বন্দী রেখে যেতুম। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড, বাড়িভর্তি অতগুলো হিংস্র পশু (অর্থাৎ কুকুর-বেড়াল) ঘুরে বেড়াচ্ছে,

কিন্তু সেই একবগগা শালিকপাখিকে তারা কেউ কিচ্ছুটি বলতো না। এদিকে নির্ঝঞ্ঝাট গেরস্থ চড়াইপাখিরা কত্তাগিন্নিতে দুটো সুখ-দুঃখের কথা বললেই আর রক্ষে নেই, অমনি সেই ঘুলঘুলির নিচে গিয়ে ওঁৎ পেতে বসে আকাশমুখো হয়ে অন্তহীন কাল ধরে ভেউ ভেউ করেই যাবে হিংসুটে তাওয়াং। চড়াই ফ্যামিলিকে ধমকানো তার আর শেষ হয় না। অথচ পোষা শালিকটা তার মাথার কাছেই বসে বসে কটর কটর-কিঁচ কিঁচ করে যায়, তাওয়াং ভ্রূক্ষেপমাত্র করে না।

বিন্দু-বিসর্গকে দেখতে অত মিষ্টি হলে কি হবে, স্বভাবচরিত্রে ওদের মোটেই মমতা নেই। একটা কচিকাঁচা পাখির ছানা উড়তে গিয়ে একটু পড়ে গিয়েছিল বারান্দায়, সঙ্গে সঙ্গেই দুই মাস্তান দুদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঝপাং করে তাকে শিকার করে ফেললো আধ সেকেণ্ডে। অথচ এই শালিকবাবাজী যখন সামনে দিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়, ওরা ঘুমঘুম চোখ ফাঁক করে তাকিয়ে দ্যাখে, কিচ্ছু বলে না।

সকলের কাছে প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে ছোট্ট অবোলা শালিক ক্রমশ প্রবলা, বলশালীক হয়ে উঠলো। ধরাকে সে সরা জ্ঞান করে।

খাবার টেবিলের পাশে গম্ভীর হয়ে বসে থাকে। মা পাত থেকে ভাত দেন, খুঁটে খায়, ফল দেন, খুঁটে খায়। এবং ক্ষুদ্রপ্রাণীর অতিবাড় বাড়লে যা হয়, তারও তাই-ই হলো। অর্থাৎ অকাল মৃত্যু।

নির্মম হত্যাকাণ্ডই বটে। না কুকুর-বেড়াল-মানুষ—এমন কী খরগোশের হাতেও নয়। তারই স্বজাতি, পাখির হাতেই প্রাণ দিলে সে।

সেদিন ভাদ্রমাসের দুপুর বেলা, চাঁদি-ফাটানো রোদ্দুর ধাধা করছে। মা বড়ি শুকোতে দিয়েছেন বারান্দায়। কিন্তু ঢাকা দিতে ভুলে গেছেন। ঝাঁকে ঝাঁকে কাক এসে বড়িতে মুখ দিচ্ছে। কোথায় বিন্দু-বিসর্গ, কোথায়ই বা তাওয়াং—কেউ তাদের তাড়াচ্ছে না। পাকাগিন্নি শালিকের এ দৃশ্য সইলো না। অগত্যা সে চললো কাক-তাড়াবার রোল নিতে। দু'পেয়ে বলে সে সম্ভবত নিজেকে মানুষই ভাবতো। প্রাণে ভয়-ডর বলে কিছুই তো নেই, পক্ষীসুলভ ইনটুইশনগুলোও (সহজাত বোধশক্তিগুলো) নষ্ট হয়ে গিয়েছে তার এই এলোমেলো পশুপ্রাণীর সংসারে এসে। যেই কটর-কটর করে তেড়ে গিয়ে একটা কাককে ঠুকরেছে—অমনি ডজন ডজন কাক তাকেই ঠুকরে দিলে শেষ করে। আমরা জানতেও পারলুম না। লক্ষ্মীর মা জানতে পেরে যখন হাঁ-হাঁ করে ছুটে এলো, তখন ছোট্ট বীর শালিকপাখি বড়ির থালার পাশটিতে কাত হয়ে শুয়ে আছে একলা। কাকেরা উড়ে গেছে।

শালিকের এই আত্মবিসর্জন, এই মহান মৃত্যু নিশ্চয় তাকে শহীদ করবে। বড়ির জন্য জীবনত্যাগ হয়তো ত্রিভুবনে এই প্রথম ঘটনা। জটায়ু-সম্পাতির পরেই পাখিদের মধ্যে শহীদ বোধহয় এই ছোট্ট শালিকপাখিই। শালিকের জন্যে আমার এখনো বুকের মধ্যে খুব কষ্ট হয়, ছোট্ট ছোট্ট পায়ে নিঃশব্দে লাফিয়ে বেড়াতো, কাঁধে চড়ে বসতো, টেবিলের ওপরে বসে ঘাড় বাঁকা করে আমাদের খাওয়া দেখাশুনা করত। আমারই পুষ্যি, আমার তো মন কেমন করতেই পারে। কিন্তু আমার মায়েরও

খুব মন কেমন করেছিল। মা তো আমার পুষ্যিদের ভক্ত নন, মা তাদের বলেন, 'শত্তুর'। সেই মা বললেন—'ওই রাক্কুসে বড়ি আর খেয়ে কাজ নেই, যে বড়ির জন্যে নিরীহ পাখিটা প্রাণ দিলে, সে জিনিস আমি আর করবো না।' সেই যে থালাসুদ্দু বড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মা, আর বড়িই দেন না সেই থেকে। মামণি, ছোটপিসিমা, এঁরা বড়ি দান করলে তবে আমরা খেতে পাই।'

অথচ সেই শালিকই সারাদিন ধরে মায়ের পায়ে পায়ে ঘুরতো, শাড়ির ফাঁকে জড়িয়ে যেতো বলে মার কী বিরক্তি!—'এই বুঝি হোঁচট খেয়ে উলটে পড়লুম —বাবা গো—পায়ে পায়ে একটা পাখি ঘুরছে, এ কী অমুঙ্গুলে কাণ্ড বলো দেখি? এমন তো জন্মে দেখিনি। আরো কত কী যে দেখতে হবে খুকুটার জ্বালায়—'বলে গজগজ করতেন সারাদিন।

দ্যাখ—দ্যাখ—গেল—গেল করে যাকে সযত্নে বাঁচিয়ে চলতে হতো দিনভর, সন্ধে হলে আপনিই খাঁচায় গিয়ে ঢুকতো সে। তখন তাকে টাঙিয়ে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত। সেই শালিক যখন জন্মের শোধ খাঁচায় ঢুকে পড়লো, সেদিন বাড়িসুদ্দু প্রত্যেকটি জনপ্রাণী জীবজন্তুর কী মন খারাপ। লক্ষ্মীর মায়ের মুখে ঝগড়া নেই। ঠাকুরের মুখে উত্তর নেই—বিন্দু-বিসর্গ পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগলো। তাওয়াং পর্যন্ত খাটের তলায় ঢুকে লম্বা হয়ে শুয়ে রইলো, চড়াইগিন্নি আর তার কাচ্চাবাচ্চাদের শাসন করলো না।

এই এলোপাথাড়ি আনতাবড়ি আলটু-বালটু বাড়ির দোষেই যে শালিকটাকে শহীদ হতে হলো, তাতে আমার সন্দেহ নেই। অতিরিক্ত আদরে, অতি প্রশ্রয়ে সে বেচারী বুঝতেই পারেনি, যে সে আসলে একটি শালিকপাখি মাত্র। সেই আত্মজ্ঞানটুকু যদি থাকত, তাহলে কি ও একথালা বড়িরর জন্যে একা কুম্ভ হয়ে একঝাঁক কাকের সঙ্গে লড়তে যেত? আসলে দোষটা এই বাড়িই। এলোমেলো আদর দিয়ে সবকিছু গণ্ডগোল করে দেয়। কেউই আর টের পায় না সে আসলে কী, বা কে। আমিই কি আর জানি, তাওয়াং আমাকে পুষছে, না আমি তাওয়াংকে?

BanglaBook.org

দুলালের গল্প

দুলালকে সবাই 'দুলাল চোর' বলে ডাকে। অথচ বেচারা দুলাল যে চোর, তা কিন্তু নয়। দুলালের মা নেই, বাবা আবার বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ে উঠে গেছেন। দুলাল তাই বুড়োবুড়ি দাদু-দিদিমার কাছেই থাকে। দুলালকে 'দুলাল চোর' বলে ডাকায় দুলালের মনে কত কষ্ট। ওর দাদু অন্ধ, ঘুঁটেকুড়ুনী দিদিমার পরিশ্রমের অন্ত নেই, আবার মনেও খুব কষ্ট। দুলাল দুষ্টু, ওর চুরির ধরনটা নতুন কিছুই নয়। গাঁসুদ্ধ সব ছেলেপুলেই অমনটা করে থাকে। আম পাকলো তো আমগাছে ঢিল মারছে, পেয়ারাগাছে উঠে ডাঁসা পেয়ারা খাচ্ছে। কে না করে এ কম্মো? তা বলে

তাদের কেউ তো চোর বলে না। বলে দুলালকে। কেননা পিন্টুকে চোর বললেই পিন্টুর পিসি কোমর বেঁধে তেড়ে এসে ঝগড়া করবে; গাবুকে চোর বললে গাবুর বাবা লাঠি নিয়ে মারতে আসবে; কানাইকে চোর বললে কানাইয়ের দিদি বঁটি নিয়ে তেড়ে আসবে। দুলালের বুড়ো দাদু-দিদিমার ঝগড়াটে স্বভাব নয়। তাঁরা জানেন তাঁদের দুলাল চোর নয়। দুলাল বাগাল। মানে রাখাল। মিত্তিরবাড়ির গরু চরায়। ওই মিত্তিরবাড়িই অমন বিচ্ছিরি নাম দিয়েছে ওর, অথচ মিত্তিরবাড়ির যে-কোনো ফাইফরমাস খাটতে হলেই চাই দুলালকে। 'অ্যাই দুলাল চোর', ওদের ডাকই এই —'যা তো, হাট থেকে একজোড়া লাল গামছা কিনে আনবি। এই নে চোদ্দ টাকা।' দুলাল এসে দু'টাকা ফেরৎ দেয়, বহুৎ দর-কষাকষি করে বারো টাকাতে কিনেছে। তবু কেন সে চোর? যে জন্যে কেষ্টঠাকুর মাখনচোর। যখন খুব ছোট ছিল, কী মনে করে একবার গরুর বাঁট থেকে দুধ চুষে খেয়েছিল দুলাল। মিত্তিরদের পুকুরঘাটে তখন বাসন মাজছিল বুড়ো বাসনাদি, সে দেখতে পেয়েই চীৎকার শুরু করে দিলে—'কী চোর ছেলে রে বাবা। গরুর বাঁট থেকে দুধ চুরি করে খাচ্ছে? কী লুভিষ্টি। কী চোর।' সেই শেষ। দুলাল জীবনে তার মায়ের দুধও খায়নি, জন্ম দিতে গিয়েই তো মা স্বর্গে চলে গেলেন। গরুর দুধ সেই ছোট্ট বয়েসে খেয়েছে কিনা মনে নেই। হঠাৎ কী যে খেয়াল হলে, পুকুরধারে মাঠের মধ্যে বাসনাদির সামনেই তো দুলাল মজা করে দুধটা খেয়েছিল, ব্যাপারটা যে এত মন্দ, তা বোঝেনি। চোর কি লোকজন সাক্ষী রেখে চুরি করে? তবু সেই থেকে দুলালের নাম হয়ে গেল 'দুলাল চোর'। বাসনাদি বললে—'সাপে এসে বাঁট থেকে দুধ চুরি করে খায় শুনেছি, তা বলে মানুষে খায় জন্মে শুনিনি বাবা। এ ছেলে কি মানুষ, না সাপ?' মিত্তিরবাড়ির বড়মা বাসনাদির মুখে একথা শুনেও দুলালকে ছাড়িয়ে দেননি। কেবল বললেন—'আর অমন করিসনি বাবা। দুধ খাবি, তা আমাকে বললেই পারতিস? চাঁদি গরুর বাঁটটা এঁটো করে দিলি? ভাগ্যিস তোকে চাট মারেনি।' বাঃ বাঃ—বাছুরে খেলে বাঁট এঁটো হয় না, আর দুলাল খেলেই হয়? আর চাঁদি গরু চাট মারবেই বা কেন? দুলালকে সে খুবই ভালোবাসে। কিন্তু লাজুক দুলাল এসব কথা কিছুই বলেনি। মা জননীর কথার উত্তরে চুপ করে ছিল। বাসনাদি সেই থেকে 'দুলাল চোর' নামটা চালু করে দিলে। আর দুলালের ভীষণ অভিমান হলো কেউ তাতে কোনো আপত্তি করলে না দেখে। উলটে যেন একটা মজার কথা বলেছে এমনি ভাব। দুলালের মুখখানা দেখলেই মায়া হয়। মিত্তিরগিন্নি ওকে মোটামুটি স্নেহ করেন তা দুলালও জানে। কথায় কথায় মুড়িটা চিড়েটা দেন। কিন্তু দুধ তো কোনোদিন দেননি। তাছাড়া 'দুলাল চোর' নামটা? কৈ আপত্তি তো করলেন না?

মিত্তিরবাড়ির মেজছেলের বিয়ে। মহাধুমধাম। সাত দিন ধরে বাজি পুড়েছে। ভিয়েন বসেছে। গাঁয়ের লোকের বাড়ি রান্না বন্ধ। মিত্তিরবাড়ির ঘরে ঘরে লোক। মেয়েরা সব এসেছে শ্বশুরবাড়ি থেকে। জামাইরা এসেছে। আত্মীয়-কুটুম্বে বাড়ি ভরপুর। বাসনাদি একা বাসন মেজে পারে না, সঙ্গে সঙ্গে এখন তার অনেক অ্যাসিসট্যান্ট।

কাঞ্চনদি, বীণাদি, মনুদি, বিন্দুদি, লক্ষ্মীদি। দুলালেরও কাজ বেড়েছে। জামাইবাবুদের ফরমাশ, দিদিমণিদের ফরমাশ, দুলালের ছোট ছোট পা দুটোই যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে ছুটোছুটি করতে করতে। নতুবা আনন্দের ঢেউ। হঠাৎ একটা ভীষণ গণ্ডগোল শুরু হয়েছে বলে মনে হলো। কী ব্যাপার? বড়বৌদির বোন এসেছে কলকাতা শহর থেকে, বিলেতফেরত বড়দাদাবাবুর ভায়রাভাই সমেত। তাদেরই কী একটা গণ্ডগোল বেধেছে! দুলাল অত বোঝে না, তার অত ভাবনাচিন্তা করবার সময়ও নেই। সে শুধু দেখল বাসনাদির ওপর খুব চোটপাট হচ্ছে। নতুন লোকেরা অন্য অন্য বাসন মাজছে, রুপোর বাসন সবই বাসনাদির হেপাজতে। তারই মধ্যে কী যেন একটা হারিয়েছে।

সবাই বলছে হারায়নি, বাসনা চুরি করেছে। ওটা মাজবার কী ছিল? ওটা তো বাসন নয়, তাছাড়া ওটা রুপোরও নয়। ওটা সোনার তৈরি সিগারেট কেস। বড়দাদাবাবুর সেই বিলেতফেরত ভায়রাভাইয়ের জিনিস। রুপোর থালাভর্তি পান-সিগারেট রাখা ছিল, বড়দাদাবাবুর ভায়রাভাই নাকি মনের ভুলে ঐ থালার ওপরেই রেখে দিয়েছেন নিজের সিগারেট কেসটা। তারপর সেটি হাওয়া।

বিয়েবাড়িসুদ্ধু ভীষণ ফিসফাস। দুলাল পর্যন্ত জেনে গেল যে সবাই বলছে বাসনাদিই কিছু একটা করেছে। ওই পান-সিগারেটের রুপোর বড় থালাটা তো বাসনাদিই মেজেছিল।

বাসনাদি কিন্তু কেবল কাঁদছে, আর মাথা কুটছে, আর বলছে, অমন কৌটো সে চোখেও দ্যাখেনি। খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ, বাড়িসুদ্ধু তোলপাড়। চৌকির তলা, সিন্দুকের পেছন, কিছু বাদ পড়ল না। কিন্তু সোনার সিগারেটের কৌটো হাওয়া তো হাওয়াই। সে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। এত গয়নাগাঁটি থাকতে কিনা কুটুমের একটা সৌখিন জিনিসে লোভ? বাসনার যদি চুরি করারই ইচ্ছে ছিল, তা গয়নার কি অভাব ছিল ঘরে? বড়দাদাবাবুর ভায়রাভায়ের জিনিসটা চুরি করলে? বিয়েবাড়িসুদ্ধু লোক বাসনাদিকে ছি ছি করতে লাগলো। বড়মা বললেন, 'বাসনা, ব্যাপার যাই হোক না কেন, এরপর তোমাকে রাখা চলে না। লোক ভয় পাচ্ছে।' বাসনাদি কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। বিয়েবাড়ির মজাটাই তার মাটি।

দুলালের মনে কষ্ট হলো। যদি বাসনাদি চুরি না করে থাকে? তাহলে মিছিমিছি চোর বদনামের যে কত দুঃখু তা দুলাল জানে। বিয়েবাড়ির হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে বাসনাদির কথা কারুর মনেই রইলো না। বড়দাদাবাবুর ভায়রাভাই বাসনাদিকে পুলিশে দিতে চাইছিলেন, বড়মা বললেন, 'ওসব হবে না। আমি বাবা তোমার ওই কৌটোটা ফের গড়িয়ে দেব।'

দুলাল গাবু আর পিন্টু গরু চরায়। রোজ ভোরে উঠে ওরা মাঠে যায়। গরু চরাতে গিয়ে হঠাৎ কী একটা সাদামতন জিনিস দেখতে পেল দুলাল। ঝোপের মধ্যে। একখানা রুমাল পড়ে আছে। কেউ হয়তো সকালে পুকুরপাড়ে মাঠে এসেছিল?

রুমালটা তুলে নিয়েই দুলাল তাতে সুন্দর একটা গন্ধ পেল। তারপরই দ্যাখে একটা চৌকোচ্যাপ্টা সোনার বাক্স ঘাসের ওপর পড়ে আছে। আর শিশিরভেজা একটা দেশলাই। আরে? এইটেই বড়দাদাবাবুর সেই ভায়রাভায়ের কৌটোটা নয় তো? বাসনাদি সেই যেটা চুরি করেছে?

—'গাবু! পিন্টু, দুলাল চেঁচায় তক্ষুণি। 'দেখে যা!' গাবু, পিন্টু এসে পড়ল। 'দ্যাখ তো এটা কী?' সত্যিই তো? সোনার কৌটোই তো বটে। ভোমরাভুমরী কি এমন কৌটোতে থাকে? আহা, কী সুন্দর দেখতে।

—'চল্ চল্ মিত্তিরবাড়ি চল, রুমালসুদ্ধু কৌটোটা ফিরিয়ে দিইগে। মাঠে জল ফিরতে এসে নিশ্চয় উনি বাক্স, রুমাল, দেশলাই-টেশলাই সমস্ত ফেলে গেছেন। শহুরে মানুষ তো, মাঠে যাওয়া তো অমন অভ্যেস নেই।' রুমালে জড়ানো দেশলাই আর সোনার বাক্স নিয়ে দুলাল রাজার মতো পা ফেলে ফেলে হাজির হলো সোজা বড়মার কাছে। 'বড়মা, বড়মা, এই দ্যাখোদিকিনি আমরা মাঠে কী কুড়িয়ে পেয়েছি!' বিয়েবাড়ি যদিও শেষ, তবু আত্মীয় কুটুম্ব সবাই তখনো যায়নি। বড়মার তো গালে হাত। বললেন—'হ্যাঁরে দুলাল, তোরা এসব কোথায় পেলি?' দুলাল, গাবু, আর পিন্টু একটু মুখ চাওয়াচাওয়ি করে শেষে বলেই ফেললো, মাঠে প্রাতঃকৃত্য করতে গিয়ে কেউ এগুলো ফেলে এসেছিলেন মনে হয়। দেশলাই, রুমাল, সোনার সিগারেট কৌটো সবই কদিন ধরে পড়েছিল নিশ্চয় মাঠে, শিশিরভেজা হয়ে ওরা আজ দেখতে পেয়েছে।

বড়দাদাবাবুরা তখনো আছেন, সোনার সিগারেট কৌটো হারিয়ে রাগে মটমট করতে করতে ভায়রাভাইমশাই কলকাতায় চলে গেলে কি হবে। বৌদিদিমণি বললেন, 'হ্যাঁ, এই রুমালও তারই, আর ঐ কৌটোও তারই।' বৌদিদি তো হেসেই অস্থির। 'সাহেব মানুষ, মাঠে গিয়ে ক'টা জিনিস সামলাবে বলো তো? তার কি ওসব অভ্যেস আছে?' বড়মা বললেন, 'দশটা জিনিস সামলাতে পারেনি, সেটা দোষের নয়। তা বলে পানের থালাতে সোনার কৌটো রেখেছি বলে বাড়ি মাথায় করলে, আমরা মিছিমিছি বাসনাকে ছাড়িয়ে দিলুম। কুটুমভরা বাড়িতে—চোর বদনাম দিয়ে। বিনা অপরাধে একটা লোককে চোর বদনাম দেওয়াটা কি ঠিক হলো?'

দুলাল মনে মনে ভাবলে, কৈ তার বেলায় তো বড়মার এ-কথাটা মনে হয়নি। বড়মা দুলালকেই পাঠালেন বাসনাদির বাড়িতে।

ক'দিনে মনের দুঃখ চোর অপবাদে বাসনাদির চেহারা খুব করুণ হয়ে গেছে। দুলাল গাবু পিন্টুর সঙ্গে বড়মার কাছে এলো। কৌটোটা দেখলো। কোনো কথাই বললে না।

বড়মা বললেন—'তোমাকে অন্যায় অপবাদ দিয়ে ছাড়িয়ে দিয়েছিলুম বাসনা, মনে দুঃখু নিও না—তুমি আবার আজ থেকে যেমন ছিলে তেমনি থাকবে।' বাসনাদি এবার হঠাৎ দুলালকে বুকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লে।

'এ আমারই দোষ মা। আমার অন্যায়ের ফল ক'দিন ধরেই আমার দুলালের কথা মনে পড়েছে। মা-মরা ছেলেটা একটু দুধের বাঁটে মুখ দেছলো, সেই থেকে

"দুলাল চোর" নাম চালু হয়ে গেল। ভগবান আমাকে শিক্ষা দিয়ে দিলেন বড়মা। আমার মস্ত অপরাধ হয়েছিল।'

দুলালও বাসনাদির বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে এই ফাঁক একটু কেঁদে নিলে। এটা অবিশ্যি দুঃখের কান্না নয়, আহ্লাদের।

শারদীয় শুকতারা, ১৪০০

কায়াক

কৌশিকী বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। নৌকো দেখছিল। পরশুদিন সে যখনই এখানে এসে পৌঁছল, তখনই টুকুদির মা বললেন, 'ওই যে! ওই যে! দ্যাখো কৌশিকী, কত নৌকো যায় এখান দিয়ে! দেখে-দেখে যেন আমার আশ মেটে না?'

টুকুদিদির মা একটু আদেখলে টাইপের। নৌকো দেখার শখ মিটছে না তাঁর। বয়েস তো কম হলো না?

টুকুদিদি এ-দেশে কলজে পড়ছে। কৌশিকী এই প্রথম এসেছে আমেরিকাতে, যদিও তার কিছুই খুব একটা অচনা মনে হচ্ছে না, সবই যেন সিনেমায় দেখেছে আগে। তবে রাস্তাঘাটে সকলেই যে শুধু সাহেব-মেম, এটা বেশ অস্বস্তিকর। হঠাৎ মাকে ভীষণ কালো মনে হচ্ছে, অথচ মা তো এমন কিছু কালো নন, কৌশিকীর মতো ফরসা না হলেও। অবশ্য সাহেবদের গায়ের রঙের তুলনায় কৌশিকীও বোধ হয় কালোই হবে? কে জানে! নিজে তো নিজেকে দেখতে পাচ্ছে না সে রাস্তাঘাটে।

দেশ বটে একটা! পথের লোকজন শুধু ফুটপাথ দিয়ে হাঁটে! ঠিকমতো দাগ দেওয়া জায়গা দিয়েই রাস্তা পার হয়, এমনকী কুকুরগুলো পর্যন্ত আলোর সংকেত জানে বলে মনে হচ্ছে। কাল একটা কুকুর রাস্তার আলোয় দাঁড়িয়ে ছিল। এখানে মানুষদের জন্যও ট্রাফিক লাইট আছে, লাল রঙের আলোয় লেখা থাকে, 'DONT WALK,' তারপর সাদা রঙে ফের আলোর লেখা জ্বলে ওঠে : 'WALK' কুকুরটার সঙ্গে একজন অন্ধ মানুষ ছিলেন সাদা ছড়ি হাতে আর কালো চশমা চোখে। কুকুরই তাঁকে দিব্যি রাস্তা ক্রশ করিয়ে নিয়ে গেল। নৌকোর চেয়ে কৌশিকীর ওটা বেশি ভালো লেগেছে।

এমন সময় টুকুদিদির মা বললেন, 'কৌশিকী, ওই দ্যাখো রোয়িং করছে।'

কৌশিকী ফিরে তাকিয়ে, মাথা নেড়ে তাঁকে জবাব দিল, 'ওটা রো-বোট নয়। ওটা তো কায়াক।'

তিনি চোখ গোল-গোল করে বললেন, 'কায়াক? কায়াক আবার কী? সে তো এস্কিমোদের থাকে শুনেছি।'

কৌশিকী গম্ভীর মুখে জ্ঞান দিতে লাগল, 'কায়াকে কেবল একজনই যাত্রী থাকে,

ব্যস। ক্যানোতে একাধিক থাকতে পারে কিন্তু চারজনের বেশি নয়, রো-বোটে ছ'জন-আটজন মিলে রোয়িং করে।' কৌশিকী যা-যা বলল, সেগুলো কিন্তু সব ঠিকঠাক কি না, তা সে জানে না। কিন্তু তার মনে-মনে এরকম একটা ধারণা বদ্ধমূল, সেইটেই সে টুকুদিদির মাকে জানায়। টুকুদিদির মা যদিও প্রোফেসারি করেন, তারই মায়ের মতো, তবু এসব খবর জানতেন বলে মনে হলো না। বড়-বড় চোখ করে বললেন, 'সত্যি? তোরা আজকাল কত কী জানিস রে! আমরা তো ওই বয়েসে এর আদ্ধেকও জানতুম না।'

কৌশিকী মনে-মনে বলে, 'এই বয়েসও জানো না!' কিন্তু মুখে কিছু না বলে শুধু হাসে।

মা কোথায় গেলেন? চা করতে নিশ্চয়। মায়ের সব তাতে বাড়াবাড়ি। অন্যের বাড়িতে এসে তোমাকে চা করতে হবে কেন? শুধু কি চা? কাল তো জোর করে বাসন মাজতে গিয়েছিলেন। টুকুদিদির মা হেসে বললেন, 'মেশিনেই মেজে দেবে, ডিশওয়াশার আছে। রেখে দাও।'

কৌশিকীর খুব ইচ্ছে করল ডিশওয়াশার কীভাবে বাসনগুলোকে মাজে, সেটা দেখতে। মেশিনে তো কাপ-ডিশ সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে, সোংরা পরিষ্কার হবে কেমন করে? ভেতরে কি ব্রাশ আছে? ন্যাতা আছে? হাত আছে নকি দুটো? ইচ্ছে করলেও কৌশিকী সেটা মুখে কখনোই বলবে না, সে তো আদেখলে নয় টুকুদিদির মায়ের মতো।

এবারে কৌশিকীর মা বললেন, 'ডিশওয়াশার যে কেমন করে ডিশ ওয়াশ করে, আমি কিছুতই ভেবে পাই না, মেশিনে কাপড় কাচা তবু বুঝতে পারি, কিন্তু বাসন মাজা?'

'এই তো', বলে টুকুদিদির মা মেশিনটা খুলে দেখালেন কীভাবে বাসনগুলো সাজিয়ে ভরতে হয়, তারপর সাবান দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আর কিছুই দেখা গেল না ভেতরে কী কাজকর্ম চলছে। কেবল খুব ঘষঘষ শব্দটব্দ হতে লাগল। মেশিন যে চলছে, সেটা বুঝতে দিতে হবে তো? দূর, কিছুই বোঝা গেল না ওতে। তবে ওরই মধ্যে কৌশিকী দেখতে পেল, প্রথমে প্রত্যেকটা জিনিস থেকে ভালো করে সব এঁটো খাবারদাবার ধুয়ে ফেলা হলো গরম জল দিয়ে। তবে আর সাবান দিয়ে মেজে নিতেই বা কষ্টটা কী ছিল? জল আর এঁটো বাসন তো ঘাটতেই হচ্ছে, এ-মেশিনের মানে কী?

কৌশিকী বেড়াতে এসেছে। না, বেড়াতে ঠিক নয়। বাবার কাছে থাকতে এসেছে। এখান থেকে ওরা এক সপ্তাহ পরেই কানাডাতে চলে যাবে। সেখানেই থাকবে কৌশিকীরা। বাবা, দু'বছর আগে কানাডায় চলে এসেছেন। মা এতদিনে দেশের সব ব্যবস্থা করে এলেন। ঠাকুমাকে ভালো দেখে একটা বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসতে হলো তো? বাড়িটা তো বিক্রি করে দিয়ে এসছে কৌশিকীরা। ঠাকুরমাকে এ-দেশে এই বয়েসে আনা সুবিধের হবে না। তাঁর পুজোআচ্চা আছে, ছোঁয়ানাপা আছে।

BanglaBook.org

(মা বলেন, 'ছোয়ান্যাপা' মানে আর কি, শুচিবাই!) এখানে লোকে গোরু খায়, শুয়োর খায়। (আহা, দেশে যেন খায় না। হ্যাম খায়নি কৌশিকী? আর কাবাব রোল? কিন্তু ঠাকুমা জানেন না।)

চা হাতে সকলে বারান্দায় এসে বসল। টুকুদিদির মা গরম-গরম চপ ভেজেছেন, টুনাফিশের চপ, ঠিক দেশের মাছের চপের মতোই মন হচ্ছে, তবে একটু আঁশটে গন্ধ। আর ডালমুটও বানিয়েছেন, এখানকারই নানারকম মিশেল। মুড়ির মতন ব্রেকফাস্ট সিরিয়াল, আর কুচো-কুচো নোনতা বিস্কুট, আর চিনেবাদাম, কাজুবাদাম, কিশমিশ, নুন, হলুদ, লঙ্কা, সর্ষে ফোড়ন দিয়ে কী সুন্দর ডালমুট তৈরি হয়ে গেল। মা ভালো দার্জিলিং চা এনেছেন দেশ থেকে, তাই দিয়ে খাওয়া হবে।

কৌশিকী চা খেতে ভালোবাসে না, যদি বারণ নেই, তেরো বছর বয়েস তো কম নয়? চা খায় তার বন্ধুরা অনেকেই! কৌশিকীর জন্য চকোলেট মিশিয়ে ঠাণ্ডা দুধ, আঃ! কী সুন্দর খেতে! মিল্ক শেক-এর মতো অনেকটা। ডালমুটটা খেতে গিয়ে কৌশিকীর ঠাকুমার জন্য একটু মন কেমন করল। ছোঁয়ান্যাপা যতই থাক, ঠাকুমা এখনো ডালমুট দিয়ে চা খেতে ভালোবাসেন। শক্ত ডাল খেতে পারেন না বলে তাঁর জন্য মা ঝুরিভাজা কিনে আনেন, ডালমুঠের বদলে। সেটা খাওয়া সহজ। নামকরা দোকান থেকে আনলে ঠাকুমা খান। বৃদ্ধাশ্রমে ঠাকুমার জন্য কে এনে দেব ঝুরিভাজা?

'বারান্দাটা সত্যি ভারী চমৎকার', মা বললেন, 'বিশ্বাস হয় না ঘরে বসে এইসব দৃশ্য দেখছি—নদীতে নৌকো ভেসে যাচ্ছে, লোকজন নদীর ধারে বেড়াচ্ছে!'

'আশ্চর্য বাবা!' কৌশিকী মনে-মনে বলে। মা আবার লোকজনকে বেড়াতে দেখলেন কোথায়? সবাই তো দৌড়োচ্ছে। কৌশিকী এসে অবধি বারান্দায়। আর খুবই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে চারধার। একজন লোকও হাঁটছে না। লেকের ধারে কত লোকে হেঁটে বেড়ায়, কত লোক বসে থাকে। এরা সবাই শুধু ছুটছে। প্রথমে ভেবেছিল কোনো রেসের জন্য প্র্যাকটিস করছে বুঝি। তারপর দেখছে দৌড়বীরদের সীমাসংখ্যা নেই। তখন জিজ্ঞেস করতেই হলো, ওই টুকুদিদির মাকেই। আবার কাকে?

উনি বললেন, 'ওরা সব জগিং করছে। এখানে সকলে এখন ভীষণ স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন, শরীর-শরীর করে ব্যতিব্যস্ত সে ষোলো বছরে ছেলেমেয়ে যেমন, ছিয়াত্তর বছরের বুড়োবুড়িও তেমনই। আবার "বুড়োবুড়ি" বলা কিন্তু চলবে না, কানা-খোঁড়াকে যেমন কানা-খোঁড়া বলা চলবে না, জানো তো? খবর্দার যেন এখানে কালা-বোবাদের প্রসঙ্গে "ডেফ-মিউট" এসব বলে ফেলবে না, সে-সমস্ত ভাষা এখন একবারে অচল হয়ে গেছে। "পোলিটিক্যালি ইনকরেক্ট" বুঝেছ? বুড়োবুড়ি বলবে, "সিনিয়ার সিটিজেন"। বোবাকে বোবা বলবে না, বলবে, "স্পিচ ইমপেয়ারড"। কালাকে বলবে, "হিয়ারিং ইমপেয়ারড"।'

আর অন্ধকে? ব্লাইণ্ড বলা বারণ? তবে 'ব্লাইণ্ড স্কুল'কে কী বলে এরা? কৌশিকীর ভীষণ অবাক লেগেছিল। কী আশ্চর্য দেশ রে বাবা! সামনাসামনি না হয় কালাকে

কালা, বোবাকে বোবা বলে না, তাই বলে শব্দগুলো মোটে ব্যবহারই হবে না? ইংরজি ভাষার ডিকশনারি থেকে উঠেই যাবে? দৌড়ে দৌড়ে শরীর সারাচ্ছে। হুঁ। এত সুন্দর নদীটা, একজন লোকও দাঁড়িয়ে দৃশ্য দেখছে না? সবাই বিশুদ্ধ বায়ুতে ব্যায়াম করছে কেবল? সত্যি! কতরকমের দৌড়। বেশিরভাগই ছুটছে নিজের পায়ে। কেউ আবার পায়ে চাকা বেঁধেছে। কেউ একটা কাঠের তক্তার ওপর দু'পায়ে দাঁড়িয়ে ছুটছে, তাতে চারটে চাকা আছে। তাতে চড়েই দিব্যি হুশ-হুশ করে রাস্তা পার হচ্ছে। দেখে ভয় করছে কৌশিকীর। যদি পড়ে যায়? আর একদল দু' পায়ে সরু-সরু দুটো জিনিসে চারটে করে চাকা বেঁধে ব্যালান্স করে ছুটছে। তার নাম 'রোলার ব্লেড'। এগুলো শাঁ-শাঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। স্পিড কী! দেশে 'রোলার স্কেট' দেখেছে কৌশিকী। পায়ে বাঁধার চাকাওলা ছোট্ট-ছোট্ট গাড়ির মতো, এটা অন্য জিনিস। পাশাপাশি চারটে চাকা এক সারিতে। আগের দিনে ডাকাতরা রনপা বেঁধে ডাকাতি করতে যেত, এরা তো দিব্যি রোলার ব্লেড বেঁধে ছিনতাই করতে পারে? সন্ধেবেলা নদীর ধারটা বেশ সুনসান হয়ে আসে।

আর সন্ধে? বাবাঃ। এ-দেশে সন্ধে হতেই চায় না। সূর্য ডুবতে-ডুবতে সাতটা বেজে যায়। আর আলো কমতে-কমতে সাড়ে ন'টা-দশটা। রাত দশটায় মনে হবে বুঝি সন্ধে ছ'টা বাজে। অতএব, সন্ধে বলে কৌশিকীর কাল যেটা মনে হয়েছিল, সেটা, তার মানে বেশ গভীর রাত্রিই হবে আসলে। তাই সুনন্দাও। ও, একটু তো সময় লাগবেই ব্যাপারস্যাপার বুঝতে। নতুন জায়গা, নতুন দেশ।

কানাডাতে গিয়ে স্কুলে ভর্তি হবে কৌশিকী। এখানে নাকি স্কুলে ভর্তি হওয়ায় দেশের মতো 'ভজকট' নেই। দেশে তো কোথাও অ্যাডমিশান পাওয়া মানে হাতে-স্বর্গ-পাওয়ার মতো। (এই 'হাতে-স্বর্গ-পাওয়া' কথাটা কী বাজে, না? কোনো মানে হয় না। স্বর্গ কি একশোয় একশো? আর স্বর্গে যাওয়াটাও কিছু কাজের কথা নয়, কেউ সেধে স্বর্গে যেতে চায় কি? ওটা মোটেও একটা বেড়াতে যাওয়ার মতো জায়গা নয়। বাংলায় বড্ড স্বর্গ-স্বর্গ বলার বাতিক আছে। যেন ওটাই সবচেয়ে ভালো জিনিস। অথচ কেউই তো যেচে তাঁদের প্রিয়জনদের স্বর্গে পাঠাতে চায় না)।

এই স্বর্গ-টর্গ নিয়ে ভাবতে গিয়ে ঠাকুমার মুখটা মনে পড়ল। দাদুভাই স্বর্গে যাওয়ার পর থেকেই ঠাকুমার এইসব পুজোআচ্চা আর ছোঁয়ান্যাপা বেড়েছে। আর করবেনটাই-বা কী? দাদুভাইকে দেখাশোনা করা ছাড়া তাঁর কি কোনো কাজ ছিল।

কৌশিকীর মা-বাবা ব্যস্ত মানুষ, কিন্তু বিন্দুদি সবই করতে পারে। দু'বেলা ভারতী এসে বাসন মেজে, কাপড় কেচে, মেঝে পরিষ্কার করে দিয়ে যায়, বিন্দুদি রান্না করে, খেতে দেয়, ঘরদোর গুছিয়ে রাখে। কাপড়-জামা গুছিয়ে রাখে। ইস্ত্রি করিয়ে আনে। কৌশিকীর টিফিন তৈরি করে দেয়। মাকে ও খুব যত্ন করে। বিন্দুদি এখন অন্যদের বাড়িতে কাজ করতে চলে গেছে। কৌশিকীদের আর বাড়িই নেই, তো বিন্দুদি! ঠাকুমাকে বৃদ্ধাশ্রমে রাখতে কৌশিকীও গিয়েছিল। আরো অনেক বৃদ্ধা আছেন সেখানে। আলাপ হলো। অনেকেরই ছেলেমেয়েরা আমেরিকায়, কানাডায়। তাঁরা নিয়মিত টাকাকড়ি পাঠান, যাতে মায়ের কোনো অসুবিধা না হয়। কেউ-কেউ মাঝে-মাঝে আবার বেড়াতেও নিয়ে যান মাকে দু-চার মাসের জন্য।

কৌশিকীর মায়েরাও ইচ্ছে আছে, কানাডাতে প্রথমে 'গুছিয়ে বসে' নিয়ে তারপর ঠাকুমাকেও নিয়ে আসবেন, যদি সম্ভব হয়। মাও তো আগে এ-দেশে আসেননি? নিজে দেখেশুনে, ব্যাপারটা বুঝে, তারপর। ঠাকুমা থাকতে পারবেন কি না, সেটা তো বুজতে হবে? বাবা তো কিছুই বোঝেন না। কেবলই বলছেন, 'মার পক্ষে এ-দেশ বাস করা অসম্ভব।'

কৌশিকীর মায়ের কিন্তু অন্য ধারণা। তাঁর ধারণা, এখানে এসে পড়লে ঠাকুমার মতি-গতি পালটে যাবে। ওই যে দাদুভাইয়ের জন্য মনে মনে কাঁদেন, সেটা অনেকটা কমবে। কৌশিকীর মা ঠাকুমাকে বৃদ্ধাশ্রমে রাখতে চাননি। বাবা জোর করে বললেন, 'ওটাই সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দোবস্ত। ডাক্তার, নার্স, সব হাতের কাছে, অসুখ-বিসুক করলে দেখার লোক আছে। নিজস্ব আলাদা ঘর অ্যাটাচড বাথরুম, যতখুশি পুজোআচ্চা করো। একটা ছোট্ট কিচেনেট মতো আছে, কিন্তু খাবারদাবার ওরাই সাপ্লাই করে। ডাইনিং রুমে গিয়েও খেতে পারো, অন্য সবার সঙ্গে মিলেমিশে; আবার একলা ঘরেও খাবার নিতে পারো। ব্যবস্থা খুব ভালো।'

কৌশিকীর তবু কেমন ধারণা হয়েছে ওখানে কেউই তত আনন্দে নেই। বাড়ি বিক্রির থেকে কত টাকা যেন জমা দিতে হয়েছে বৃদ্ধাশ্রমে ঠাকুমার জন্য। অবশ্য বাড়িটাও তো ঠাকুমারই ছিল। ঠাকুমার সই না হলে বিক্রি হতো না। বাবা গিয়ে তো সেইসব ব্যবস্থা করেই ওদের নিয়ে এলেন।

রোজ এইরকম সময়ে, যখন সূয্যি ডোবে, ঠাকুমা তখন আবার গিয়ে পুজোর ঘরে ঢোকেন সন্ধ্যা-আহ্নিক করতে। দিনে তিনবার করে পুজোর ঘরে ঢুকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যে কী করেন ঠাকুমা। অথচ অন্য সময়ে খুব হাসিখুশি। কৌশিকী চলে আসছে বলে যতই মনখারাপ হোক, একবারও মুখের হাসি মিলিয়ে যায়নি ঠাকুমার। একবারও কেঁদে ফেলেননি।

টুকুদিদির মায়ের কাছে গল্প করছিলেন কৌশিকীর মা, 'আমার শাশুড়ি খুব শক্ত মানুষ। ভাঙবেন, তবু মচকাবেন না। একমাত্র সন্তান, একমাত্র নাতনি, সবাই দূরে চলে যাচ্ছে, একফোঁটা চোখের জল ফেললেন না।'

টুকুদিদির মা শুনে বললেন, 'সত্যি? খুবই আত্মসংযম আছে বলতে হবে। কেননা কষ্ট হচ্ছে না, তা তো হতে পারে না?'

কৌশিকীও জানে সেটা। ঠাকুমার মুখের ভাষাই হচ্ছে, 'আমরা মেয়ে, বুঝলি? আমাদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। খবর্দার, অত খলবল করে কথা বলবি না! সবাই তোর মনের কথা জেনে গেলে তোরই ক্ষতি!'

কৌশিকী তবুও বেশি কথা বলে ফেলে। ঠাকুমাও খুব কম কথা বলেন বলে তো মনে হয় না, তবে হয়তো মনের কথাগুলো বলেন না। যেমন, এই চলে আসার ব্যাপারে। বিন্দুদিকে নিয়ে একা-একাই বাড়িতে থাকতে চেয়েছিলেন ঠাকুমা। বাবা রাজি হলেন না। ওটা সেফটির প্রশ্ন। একা বাড়িতে বুড়োমানুষ, দু'জন মেয়ে কীভাবে থাকবেন? আজ না হয় শরীর ভালো আছে। কাল? কাল যদি শরীর খারাপ

BanglaBook.org

হয়ে যায়? বিন্দুদির ওপর তো ভার দেওয়া যায় না। ঠাকুমার দাদারা তো আরো বুড়ো। কে দেখবে তাঁকে? সেইজন্যই—

'কৃশি? কী ভাবছিস? ঠাণ্ডা দুধ তো গরম হয়ে গেল।' মায়ের তাড়ায় সংবিৎ ফিরল কৌশিকীর। চোঁ-চোঁ করে খেয়ে ফেলল চকোলেট মিল্কের গেলাস।

ঠাকুমাও খুব চকোলেট খেতে ভালোবাসতেন। তারপর কে যেন বলল ঠাট্টা করে, চকোলেটে নাকি ডিম থাকে। ব্যস, সেই থেকে বন্ধ। মা কত করে বললেন, 'ওতে থাকে না ডিম।' কে শোনে কার কথা।

'কী দেখছ, কৌশিকী? গাছগুলোর কীরকম পাতার রং পালটাচ্ছে, তাই দেখছ বুঝি? সত্যি আশ্চর্য লাগে—ঠিক যেন ফুল ফুটেছে। লাল, সোনালি কতরকম রঙের পাতা। না?'

টুকুদিদির মায়ের কথা শুনে কৌশিকী নজর করল, সত্যি তো। সামনের গাছগুলোর সব পাতার রং হলুদ, লাল। মাত্র কয়েকটা সবুজ রঙের পাতা আছে। আর মাটিভর্তি ঝরাপাতার স্তূপ। এতক্ষণ লক্ষই করেনি? তিনদিন হয়ে গেল এসেছে। প্রথম দিনটা তো ঘুম-ঘুমই হয়ে ছিল। এই দু'দিনও ঠিক ফিটফাট হয়নি শরীর, রাত্তিরে ঘুম হচ্ছে না, আর দিনের বেলায় চোখ জড়িয়ে আসছে।

টুকুদিদির মা বললেন, 'জেট-ল্যাগ। অমন সবার হয়। সময়ের অনেকটা তফাত হয়ে গেছে কিনা? দেশে যখন দিনের বেলা, এখানে তখন রাত্রির। তাই ঠিক সময়ে ঘুম পায় না। ও ঠিক অভ্যেস হয়ে যাবে। প্রথম-প্রথম এমনই লাগবে।'

ঠাকুমা খুব ভোরে ওঠেন বলে কি অনেক সময় যখন-তখন একটা ঘুমিয়ে পড়েন? ওঁরও ওটা কি একরকমের জেট-ল্যাগ? বুড়ো হলে কি সকলেরই ওরকম হয়? কৌশিকীরও হবে? বুড়ো হলে—হঠাৎ কৌশিকীর মনে হয় ঠাকুমারও তো তেরো বছর বয়েস ছিল। তখন কি বৃদ্ধাশ্রম বলে কিছু ছিল? আর যখন কৌশিকী বুড়ো হবে?

নদীতে নৌকোরা দ্রুতবেগে জল কেটে চলে যাচ্ছে, পেছনে জলের ওপর জাপানি পাখার মতো রেখা ছড়িয়ে পড়ছে। কৌশিকী দেখল, নদীর ধারে ছুটন্ত মানুষদের ফাঁকে একটি বেঞ্চিতে একজন বসে আছেন। পেছন থেকে কেবল থোপা-থোপা একমাথা সাদা চুল দেখা যাচ্ছে। পরনে কোট। যারা ছুটছে তাদের সকলেরই পরনে গেঞ্জি, হাফপ্যান্ট। পায়ে মোটা রানিং-শু, মোজা। এঁর মুখটা দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আশেপাশে পাখিরা উড়ে এসে বসছে। উনি মুঠো করে পকেট থেকে কী যেন নিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। পাখিরা খুঁটে-খুঁটে খাচ্ছে। তাঁর পাশেই একটা মোটা সাদা ঝুমরো-ঝুমরো লোমে ঢাকা কুকুরও বসে আছে একবারে বেঞ্চির ওপরে উঠে! কী গম্ভীর! পাখিদের কিচ্ছু বলছে না। পাখিরাও কই, কুকুরটাকে ভয় পাচ্ছে না তো?

ইনি একজন বুড়ো মানুষ। ইনি বেড়াতেই বেরিয়েছেন। ব্যায়াম করতে নয়। ছুটতে নয়। তা হলে এ-দেশে এখনো কিছু-কিছু লোকে বেড়াতে বের হয়? কেউ-কেউ পাখিদের কথা ভাবে? ঠাকুমা দুপুরে রোজ খাবার পরে ছাদে গিয়ে কাকেদের একমুঠো ভাত দিতেন, উঃ, কত কাক আসত তখন ছাদে! সেই কাকগুলো এখন

কী করে? ঠাকুমা কি বৃদ্ধাশ্রমেও কাকেদের ভাত খাওয়াবেন? কাকেদের ভাত খাওয়ানো ওরা অ্যালাও করবে তো?

কৌশিকী নিজেই কখনো বোর্ডিংয়ে থাকেনি, ঠাকুমা তো ননই। ঠাকুমার নাকি সতেরো বছর বয়েসে বিয়ে হয়েছিল, এখন উনসত্তর। এতদিন ধরে, সারা জীবন ধরে যে-বাড়িটাতে ছিলেন সেটাকে ছেড়ে দিয়ে বৃদ্ধদের বোর্ডিংয়ে চলে যেতে তার নিশ্চয়ই ভালো লাগেনি। কিন্তু ঠাকুমা কিছুই বলেননি। বাবা যা করেছেন সেটাই মেনে নিয়েছেন। বাবাকে যদি কৌশিকী একদিন বৃদ্ধদের আশ্রমে রেখে দিয়ে ভেনেজুয়েলার চলে যায়?

'চপটা ভালো হয়েছে, কৌশিকী?'

'খুব ভালো। ডালমুটটাও খুব ভালো হয়েছে।'

'আর-একটু চকোলেট মিল্ক খাবে? আইসক্রিম ভাসিয়ে দিয়ে?' 'টুকুদিদির মা লোভ দেখান।—'দুধ না। শুধু-শুধু আইসক্রিম খেতে পারি।' কৌশিকীও চালাক মেয়ে।

চা খেতে-খেতেই টুকুদিদির মা বলেন, 'চলো কৌশিকী, তোমার বাবা আসার আগেই তোমাকে আমার বন্ধু রুথের বাড়িতে নিয়ে যাই। রুথ বাচ্চাদের জন্য অনেক বই লিখেছে।'

কৌশিকীর কাছে এই প্রস্তাব খুব মনের মতো লাগল, বাচ্চাদের জন্য বই লেখেন এমন লোকের সঙ্গে দেখা করতে নিশ্চয় ভালো লাগবে।

'যাবে, মা?' কৌশিকীর প্রশ্নে মা এত চটপট ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন যে, মারও বেশ উৎসাহ আছে বলে বোঝা গেল।—বাব্বা! পাশের বাড়িতে যাব একটু বেড়াতে, তার জন্যও আগে থেকে ফোন করা চাই। টুকুদিদির মা রুথের কাছে ফোনে জেনে নিলেন তাঁর অসুবিধে আছে কিনা। এ-দেশে নাকি এটাই নিয়ম। কেউ দুম করে চলে যায় না কারো বাড়িতে। আগে অনুমতি নিতে হয়। আর কলকাতায়? দিনরাত্তির কত লোক আসছে। কেউ কখনো অনুমতি নিয়ে আসে না। মা-বাবার কত সময়ে তো রীতিমতো অসুবিধে হয়। তবু কাউকে কিছু বলেন না।

ঘণ্টি টিপতেই রুথ বেরিয়ে এলেন। লাল চুল, চোখে চশমা, পরনে গেঞ্জি আর ব্লু জিনস। ছোট-ছোট চুল। ছেলে, না মেয়ে হঠাৎ দেখলে বোঝা যায় না, তবে হ্যাঁ, ঠোঁটে লিপস্টিক আছে। 'হাই, শমিতা! কাম অন, ইন!' রুথ ওদের হাসিমুখে ভেতরে নিয়ে গেলেন। যেতে-যেতেই বললেন, 'আর বোলো না। আমার মা এসেছেন!' কথাটায় রাজ্যের বিরক্তি যেন ঝরে পড়ল। 'কিছু মনে কোরো না, যদি উনি তোমাদের বোর করেন। আমাকে তো পাগল করে দিচ্ছেন।'

কেউ যে নিজের মায়ের সম্পর্কে এভাবে কথা বলতে পারে, কৌশিকী তা ভাবতে পারে না। সে থ' হয়ে গেল। মার দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল, মা কী মনে করছেন। বোঝা গেল না কিছু। মায়ের মুখে হাসি-হাসি সেই ভদ্রতার মুখোশটা এঁটে আছে। যার পেছনে কী হচ্ছে, তা বোঝা কৌশিকীর পক্ষেও সহজ

নয়। রুথের বসার ঘরে এক বৃদ্ধা মহিলা বসে উল বুনছেন। কৌশিকীদের দেখেই বললেন, 'ও, এরাই বুঝি তোমার সেই ইণ্ডিয়ান প্রতিবেশী, রুথ? এসো, এসো।'

রুথ বললেন, 'আঃ, মা। একটু ধৈর্য ধরো। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি, এই আমার মা। ফ্লোরিডাতে থাকতেন। এখন আমাদের কাছাকাছি নিয়ে এসেছি।'

টুকুদিদির মা বললেন, 'আমি শমিতা, এ হলো আমার বন্ধু রূপশ্রী, আর এ তার মেয়ে কৌশিকী।'

রুথের মা বললেন, 'আমার তো একটাও নাম মনে থাকবে না, অচেনা নাম আমার মনে থাকে না। আর তোমাদের নামগুলো বড্ড কঠিন।'

রুথ অমনই ধমকে উঠলেন, 'ওদের নাম কঠিন? না, তোমার স্মৃতি চুলোয় গেছে? এ হচ্ছে শমিতা, আর এ হলো...কী যেন বললে? রূপ—রূপ—...'

'রূপা বললেই হবে।' কৌশিকীর মা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আর এর নাম, কুশি।'

মা'র দিক চেয়ে রুথ খিঁচিয়ে ওঠেন, 'রূপা, কুশি। শক্ত নাম কোথায়? তোমার তো সবই অচেনা ঠেকে। আগে ভালো করে শোনো—'

ওঁর মা এবার খুব অবাক সুরে বললেন, 'রূপা? কুশি? আমি যেন শুনলাম অনেক লম্বা-লম্বা নাম বলছ। সত্যি, কী শুনতে যে কী শুনি আজকাল।'

কৌশিকীর ভীষণ মায়া হলো। সে তাড়াতাড়ি বলল, 'ঠিকই শুনেছিলেন। লম্বা-লম্বা নামই তো প্রথমে বলছিলেন মাসি। মায়ের নাম হলো রূ-প-শ্রী। মার ছোট নাম: রূপা। আর আমি কৌ-শি-কী। আমার ছোট নাম: কুশি।' হাসতে-হাসতে শমিতামাসি বললেন, 'আমরা বাঙালি তো? আমাদের দুটো করে নাম থাকে। একটা শক্ত, একটা সোজা।'

এবার রুথের মা হেসে উঠলেন, 'দেখলে তো? আমি ঠিকই বলেছিলাম। প্রথমে শক্ত নামটা বলেছিল, পরে সোজা নামটা বলেছে। তাই না?'

রুথ আবার একটা ধমক দিলেন তাঁর মাকে, 'তুমি তোমার নিজের কাজ করো। ওদের নাম নিয়ে অত রিসার্চ করে কাজ নেই তোমার।'

কৌশিকী হতবাক! এ কেমন মেয়ে রে বাবা! এইভাবে কেউ মায়ের সঙ্গে কথা বলে?

মা কি দিদিমার সঙ্গে কখনো এভাবে কথা বলবেন? 'চলো, আমরা বরং ও ঘরে যাই। এ-ঘরে থাকলেই মা কথা বলবেন।'

এবার শমিতামাসিও অবাক হয়ে রুথকে বললেন, 'তাতে কী হয়েছে? বলুন না? ভালোই তো!'

'বুড়ো হয়ে বকবক করা স্বভাব হয়েছে মায়ের। ওইজন্যই তো মোটে পছন্দ নয় ওঁর এই বয়স্ক-কলোনিটা। সেখানে যে যার নিজের মতো থাকে, মার তাতে খুবই আপত্তি। মোটে পছন্দ নয়।'

'পছন্দ তো নয়ই। আমি কি সুন্দর ফ্লোরিডার খোলামেলা উষ্ণ আবহাওয়ায়

কুড়ি বছর কাটিয়েছি, সবার সঙ্গে সবার ভাব আছে সেখানে। তোমার বাবা মারা যাওয়ার পরেও আমি ফ্লোরিডাতেই থাকতে চেয়েছিলাম প্রতিবেশীদের মধ্যে, তুমিই—'

'আমার পক্ষে সম্ভব হয় না ফ্লোরিডাতে দৌড়ে-দৌড়ে তোমার দেখাশোনা করা। এখানে থাকলে সেটা সম্ভব। আর যে-কলোনিতে তোমাকে রেখেছি, সেটা শ্রেষ্ঠ কলোনিগুলোর মধ্যে একটা।'

'অত টাকা দিলে শ্রেষ্ঠ হওয়াই উচিত। ফ্লোরিডার বাড়ি বিক্রি করে টাকা তো কম পাওনি, আমি আর ক'টা দিনই বা, নব্বই চলছে আমার।'

'আমারও বাষট্টি হয়েছে ভুলো না, আমিও দিদিমা,' রুথের কথা শুনে কৌশিকী অবাক। বাষট্টি? দিদিমা? ও তো ভেবেছিল মারই বয়সী হবেন রুথ।

নাঃ, এ বড় অদ্ভুত দেশ! কারো বয়েস বোঝা যায় না।

রুথের মা ঠিক ওর দিদিমা-ঠাকুমার মতো, কিন্তু রুথ ওর মা-মাসিদের মতো নয়। রুথ চেনা কারো মতোই নয়। হঠাৎ কৌশিকীর মনে হলো, হুঁ রুথ, না রুথলেস। তবে কি 'রুথ' মানে দয়া? করুণা? মায়া-মমতা? কী জানি?

রুথের মা চুপ করে আছেন দেখে শমিতামাসি কথা ঘোরালেন, 'ওটা কী বুনছেন? সোয়েটার?'

তিনি বললেন, 'না, এটা একটা স্টোল বুনছি।'

'কার জন্য বুনছেন? ভারী সুন্দর হচ্ছে।'

'থ্যাঙ্কিউ, দেখি কাকে দিই?' বলে মিষ্টি হাসেন রুথের মা, রুথের দিকে তাকিয়ে।

'সম্ভবত তাঁর আহ্লাদি নাতনির জন্য।' রুথ বললেন, প্রায় মুখ ভেঙচে।

'আবার কাকে দেব, তোমার মেয়েকে ছাড়া? সত্যি, রুথের মেয়েটা আমাকে খুব ভালোবাসে। ছবি পাঠায় কত।'

'জন্মে তো দেখা করতে যায় না একদিনও।'

'এই তো গিয়েছিল, হলিডে হোমে।'

'সে কেপকডে বেড়াতে যাওয়ার জন্য যাওয়া, তোমাকে দেখার জন্য গিয়েছিল ভেবো না।'

এবার রুথের মা চুপ করে থাকেন। দুঃখিত দেখায় তাঁকে, এ কীরকম কথাবার্তা? কৌশিকী অবাক হয়ে ভাবে। কেবল বুড়ো মাকে কষ্ট দিয়ে কথা বলছে। ব্যাপার কী? ওরই মেয়েকে যদি উনি ভালোবসেন, তাতে তো রুথেরও খুশিই হওয়া উচিত, হিংসে-হিংসে শোনাচ্ছে কেন কথাগুলো? আবার মায়ের মুখের দিকে তাকাল কৌশিকী। মা মাটির দিকে তাকিয়ে আছেন।

এই নিষ্ঠুর মহিলা বাচ্চাদের জন্য লেখেন? বুড়োদের যে কষ্ট দেয়, বাচ্চাদের সে ভালোবাসবে কেমন করে? নিজের মাকে, নিজের মেয়েকে যে ভালোবাসে না, অন্যের ছেলেমেয়েকে সে আনন্দ দেবে? আর এই দেশেই থাকবে কৌশিকী আর তার মা-বাবা?

সামনে একটা ছবির অ্যালবাম ছিল। অন্য কথা ভাবতে-ভাবতে কৌশিকী কখন সেটা হাতে তুলে নিয়েছে।

BanglaBook.org

রুথের মা বললেন, 'এটা আমাকে আমার নাতনি দিয়েছে। দ্যাখো, দ্যাখো, ওর নিজের সব ছবি, ওর কলেজের ছবি, ক্যাম্পিং-এর ছবি, বয়ফ্রেণ্ডের ছবি, আমি ফ্লোরিডায় থাকতাম তো? তাই আমাকে সবসময়ে ও ছবি পাঠাত, সব খবর জানাত, প্রতি হপ্তায় টেলিফোন করত—এখনো করে।' তাঁর গলার স্বরই পালটে গেছে।

কৌশিকী চোখ তুলে দেখল, নাতনির কথা বলতে গিয়ে তাঁর মুখ জ্বলজ্বল করছে আনন্দে। হ্যাঁ, কৌশিকী ঠিক বুঝতে পেরেছে রুথ যাই বলুন। 'কী সুন্দর অ্যালবাম, ওর জীবনের সব খবর আছে এতে, আমার জন্য তৈরি। এই ওর হাই স্কুল, গ্র্যাজুয়েশনের ছবি। আর এটা কলেজের। তোমাকে আরো একটা জিনিস দেখাই,' ফিসফিস করে উনি বললেন। তারপর ও-পাশের টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা লাল খাতা বের করে দেখালেন, 'আর এইটে দিয়েছে। যখন আমার ওকে কিছু বলতে ইচ্ছে করবে, এই খাতাতে লিখে রাখতে বলেছে। ও যখন আমার কাছে আসবে, তখন যাতে একটাও মনের কথা হারিয়ে না যায়। কত ভালোবাসে আমাকে, তাই না?'

কৌশিকী। রুথের মায়ের চোখের দিকে চেয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

রুথ বলেছিলেন, 'মা বড্ড বকবক করেন', আর নাতনি বলে, 'দিদিমার একটাও মনের কথা যেন হারিয়ে না যায়।' কিছুই না বুঝে রুথ লেখেন কী করে?

'বাড়ি ফিরতে হবে এবারে', মা হঠাৎ কৌশিকীর মনের কথাটা বলে ওঠেন।

'সে কী? একটু শরবত খেয়ে যাও।' কিন্তু ওরা ফেরত রওনা হয়। বাবা, মেসোমশাই এতক্ষণে ফিরেছেন।

ফিরতে-ফিরতেই কৌশিকী বলে ফেলে, 'এই রুথ তোমার বন্ধু? নিজের মায়ের সঙ্গে কথা বলতে জানেন না। মাকেও ভালোবাসেন না, মেয়েকেও ভালোবাসেন না, কী করে লেখেন উনি ছোটদের জন্য? কী অদ্ভুত ব্যবহার!'

আস্তে গলায় শমিতামাসি বলেন, 'এটা তেমন খারাপ ব্যবহার হলো কোথায়? রুথ তো অনেকের চেয়ে ভালো। সামারে মাকে কেপকডের হলিডে হোমে রেখেছিল, শীত আসছে বলে খুব তোড়জোড় করে গরম জামাটামা গুছিয়ে দিচ্ছে, ওর মায়ের অবশ্য ধারণা এই শীতের দেশে এসে উনি আর বাঁচবেন না। লোকেরা বুড়ো হয়ে ফ্লোরিডায় গিয়েই রিটায়ার্ড জীবন যাপন করে। উনি বিধবা হয়ে নব্বই বছর বয়েসে আবার নতুন করে এখানে এসে পড়লেন, ফ্লেরিডা থেকে। রুথ মাকে দেখতে যায় প্রায়ই, খাবারদাবার তৈরি করেও নিয়ে যায়; ওর ব্যবহার আসলে খুব খারাপ নয়। অন্যরা তো বাবা-মাকে সেই যে ওল্ড-এজ-হোমে ফেলে দিয়ে চলে আসে, আর সে-মুখো হয় না। মাঝে-মাঝে কার্ড পাঠায়। ফুল পাঠায় জন্মদিনে, ক্রিসমাসে চকোলেট। আর মাদার্স ডে, ফাদার্স ডে-তে গ্রিটিং কার্ড। এই তো। গ্রীষ্মে হলিডে হোমে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করা মানেই সেই বুড়ো-বুড়িকে খুব যত্নআত্তি করা হচ্ছে বুঝলে? এ বড় কঠিন জায়গা, এদের হিসেবগুলোই অন্যরকম।'

হঠাৎ কৌশিকীর মনে হলো, এমন কী আর অন্যরকমের? ঠাকুমা এখন বৃদ্ধাশ্রমে। এমন কিছু আলাদা নয় তো? বাবা-মা আর কতবারই বা কানাডা থেকে দেখতে যাবেন ঠাকুমাকে? ওই তো চিঠিই লিখবেন। ফুল নয়, চকোলেট নয়, শুধু চিঠি। পিকচার পোস্টাকার্ড। একদিন তার ঠাকুমাও বলবেন অচেনা লোকেদের ডেকে, 'আমার নাতনি সত্যি আমাকে খুব ভালোবাসে। দ্যাখো, কত ছবি পাঠিয়েছে।'

গলার মধ্যে দলা পাকিয়ে উঠল কৌশিকীর। ইচ্ছে করল, একছুটে দেশে ফিরে যায়। কৌশিকী থাকবে না। যেই বড় হয়ে যাবে, একা-একা বাঁচতে পারার মতো বড়, তক্ষুনি দেশে ফিরে যাবে কৌশিকী। ঠাকুমাকে নিয়ে নিজে-নিজে একটা বাড়িতে থাকবে।

সামনে তাকিয়ে কৌশিকী দেখল নৌকো যাচ্ছে। এটা একটা স্টিমার। তার আলোর সারির ছায়া পড়েছে নদীর কাঁপা জলে। কৌশিকীর মনে হলো, এই যে তারা এখন টুকুদিদিদের বাড়িতে এসে আছে, এটা একটা স্টিমার। কলকাতায় ওরা যে-বাড়িতে থাকত, সেটা ছিল একটা রো-বোট। সেখানে দাদুভাই, ঠাকুমা, বাবা, মা, কৌশিকী, বিন্দুদি—ছ'জন। তারপর? এখন? এখন কৌশিকী, মা, বাবা কানাডাতে তিনজনে থাকবে, একটা ক্যানো। আর ঠাকুমা একলা, একটা কায়াক।

কৌশিকীর চোখে ভেসে উঠল, খুব দ্রুতগতি একটা পাহাড়ি নদী, পাথুরে নদী, যেরকম দেখেছে ও সিনেমায় অনেকবার, খুব জোরে-জোরে তাতে দু' হাতে দাঁড় বেয়ে কায়াক চলিয়ে একা-একা ঠাকুমা স্রোত বেয়ে চলে যাচ্ছেন, দূরে।

শারদীয়া আনন্দমেলা, ১৪০১

BanglaBook.org

রঞ্জনের গল্প

কিছুতেই অঙ্কটা মাথায় ঢোকে না রঞ্জনের। প্রতিদিন মাস্টারমশাই মার লাগান, বেতের ছপটি, রঞ্জনের পিঠে ছড়া-ছড়া দাগ ফুটে ওঠে, অথচ মাথার মধ্যে অঙ্কটা ফুটে ওঠে না। অঙ্কের জন্য ক্লাস সিক্স থেকে সেভেনে ওঠাই হলো না। দু'বার ফেল করে রঞ্জন পালিয়ে গেল কলকাতায়, বড়দার কাছে। বড়দা ওখানে কলেজে পড়েছে ব্যানার্জিবাবুদের বাড়িতে থেকে। বড়দা তো রঞ্জনকে দেখে অবাক। 'ফেল করেছিস? আবার?'

দাদার মাথায় অঙ্কটা ভালো খেলে। দাদা সায়েন্স পড়ছে। গাঁয়ে কলেজে সায়েন্স নেই। প্রচণ্ড বকুনি দিয়ে রঞ্জনকে দাদা বাড়িতে ফেরত নিয়ে এল ঠিক দু'দিনের মধ্যে। বাড়িতে এসে, আবার বকুনি।

বাবা বললেন, 'কুলাঙ্গার! দু'বার ফেল করা? তাও একই ক্লাসে?' মেজদাও

স্কুল ফাইনাল পাস করে যাবে এ-বছর। টেস্ট পরীক্ষায় পাস করেছে। লক্ষ্মীকান্তপুরে রঞ্জনদের বাড়িটা একটা মাঠের মধ্যে, বাবার অনেক জমিজমা আছে, একটা বিশ বিঘের পুকুর আছে, তাত মাছের চাষ হয়। বাবার খুব শখ, পাঁচ ছেলেকে পঞ্চপাণ্ডবের মতো তৈরি করবেন। পড়াশোনাতে ঝকমক, গাঁয়ের সব্বার চেয়ে ভালো করবে। বাবার নিজের খুব বেশিদূর পড়া হয়নি, কিন্তু কাকাকে পড়িয়েছিলেন। কাকা চলে গেছেন বি. এ. পাশ করার পরেই, গ্রামের প্রথম গ্র্যাজুয়েট, গ্রামের গৌরব বোম্বাই চলে গেছেন কী জানি কী চাকরি নিয়ে। প্রথম-প্রথম টাকা পাঠাতেন, ঠাকুমা মারা যাওয়ার আগেই টাকা পাঠানো বন্ধ হয়ে গেছে। কেউ বলে বম্বেতে কাকার রমরমা ব্যবসা, কেউ বলে কাকা ফিল্মে কাজ করেন, কেউ বলে অন্যকিছু করেন। যাই করুন, রঞ্জনদের কেনো খোঁজখবর রাখেন না। কেউ মুখ ফুটে না বললে রঞ্জনের বাড়িতে অন্য একটা ধারণা আছে যে, কাকা সম্ভবত অন্যায় করে জেলে গেছেন। তাই চুপচাপ।

বাবা রঞ্জনকে স্কুলে ফেরত পাঠাবেনই আর রঞ্জন কিছুতেই যাবে না, এই ঘটনা যখন চরমে উঠল, রঞ্জনের মা তখন যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন। মা বললেন, 'তুমি তো ভাইকে লেখাপড়া করালে। আরো চারটে তো ছেলে আছে তোমার? তাদের তুমি লেখাপড়া শেখাও। এইটে মাঝখানের ছেলে, দুটো বড়, দুটো ছোটর ঠিক মধ্যিখানে। এটাকে আমায় দাও, একে আমি আমার শিক্ষাটাই শেখাই। তারপরে এ যা রোজগার করবে, আমাকে এনে দেবে। তোমার চার ছেলের রোজগার তুমি নিয়ো। এটা কেমন ব্যবস্থা?'

বাবার পছন্দ হলো না বটে ব্যবস্থাটা, কিন্তু আপত্তিও করলেন না। তিনি চাষবাস, জমিজমা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তাঁর খুব শখ ছেলেরা ডাক্তার হবে, উকিল হবে, জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হবে। চাষী বাবার চাষী স্ত্রী রঞ্জনের মা, কী আর শিক্ষা তিনি দিতে পারবেন তাঁর ছেলেকে? কিন্তু রঞ্জন খুব একগুঁয়ে ছেলে, সে শুনবে না কথা। বাবা মনে মনে জানেন ওই স্কুলে ওকে ফেরত পাঠানো অসাধ্য। নিজের গ্রামের স্কুলে না পাঠিয়ে, অন্য কোথাও, দূরের গ্রামের স্কুলে পাঠানোর চেষ্টাও বাবা করেছিলেন, রঞ্জন সেখানেও যাবে না। মা বললেন, 'আমার একটাও মেয়ে নেই। রঞ্জনকে আমায় দাও, আমি ওকে আমি যা জানি, তাই শেখাই। তোমার বাকি চার ছেলেকে তুমি তোমার মতন করে তৈরি করো।'

রঞ্জন তো মহাখুশি। মায়ের সঙ্গে সে শিখতে লাগল বড়ি দিতে, পাঁপড় তৈরি করতে, আচার বানাতে, আস্তে-আস্তে ভাতের মাড় গালতে, দুধ জ্বাল দিতে, গুড় জ্বাল দিতে। মা আস্তে-আস্তে রঞ্জনকে রান্না শেখাতে লাগলেন। তারপর বললেন, 'গাঁয়ের রান্না তো সবই শিখিয়ে দিয়েছি তোকে, পিঠেপুলি, ঝোলঝাল, টক-অম্বল, চচ্চড়ি, শুক্তো—সব শেখা হলো, এবার শহরের রান্না শিখতে হবে তোকে। দাদার কাছে ব্যানার্জিবাবুদের বাড়িতে যা।'

দাদা তখনো ব্যানার্জিবাবুদের ওখানে। গ্রামের ডাক্তারির জন্য কি একটা কোর্স

BanglaBook.org

পড়ছিল, Barefoot Doctors না কী যেন বলে, পুরোপুরি ডাক্তারি নয়, কিন্তু মোটামুটি কাজ চালানোর মতো। ব্যানার্জিবাবুরা স্বামী-স্ত্রী একা থাকেন, মেয়ের বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। রঞ্জনের দাদা তারাপদকে খুব ভালবাসেন। রঞ্জনকে আনন্দের সঙ্গেই ঠাঁই দিলেন বাড়িতে। গিন্নিমা খুব যত্ন করে রান্না শেখাতে শুরু করে দিলেন রঞ্জনকে। রঞ্জন তাঁকে গাঁয়ের রান্নাবান্না কিছু রেঁধেবেড়ে খাওয়ায়, আর মা ওকে শেখান পোলাও-কালিয়া, চপ-কাটলেট, সুপ-পুডিং, শিঙাড়া-কচুরি। বেশিদিন লাগল না, রঞ্জন এক্সপার্ট রাঁধুনি হয়ে গেল। মা আর রান্নাবান্না করেন না, রঞ্জনই রাঁধে। ওঁরা ওকে হাত খরচ যেটা দেন, রঞ্জন সবটা মায়ের হাতে দিয়ে আসে; সেরকমই কথা ছিল। চার ছেলে যা রোজগার করবে, বাবাকে দেবে। বাবা তাদের পড়শোনার খরচ জোগাচ্ছেন। আর রঞ্জন যা রোজগার করবে, তা হবে মায়ের সম্পত্তি।

এরকমই চলছিল। হঠাৎ একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। ব্যানার্জিবাবুর জামাইটি চলে যাচ্ছে সানফ্রান্সিসকোতে, চাকরি নিয়ে। মস্ত বড় চাকরি, সঙ্গে বউ যাচ্ছে, বাচ্চা যাচ্ছে। তারা নাকি একজন রান্নার লোকও নিতে পরে। লোকের জন্য খোঁজখবর করছে। রঞ্জন গিন্নিমাকে বলল, 'মা, আমি যাই? আপনার অসুবিধে হবে কি?

মা বললেন, 'তুই গেলে তো আমি সবচেয়ে নিশ্চিন্ত হই রে রঞ্জন, আমার মেয়েটা বাচ্চা নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে, সেও তো নতুন জায়গায় গেছে, ওর কাছে তুই থাকলে আমার মনে কত আরাম হবে।'

আর দ্বিতীয় কথা নয়, রঞ্জন নাচতে নাচতে দেশে এসে মাকে বলল, 'মা, আমি আমেরিকায় যাচ্ছি।'

মা বললেন, 'পাগল? আমার ছেলেকে আমি মোটেই ওসব বিলেত-আমেরিকায় যেতে দেব না।'

বাবা বললেন, 'খেপেছিস? ওখানে নিয়ে গেলে তারপর যদি তোকে টাকাকড়ি না দেয়? না পারবি পালিয়ে আসতে, না পারবি টিকে থাকতে। খবরদার, যাবি না।'

দাদা বললে, 'একবর্ণ ইংরিজি জানিস না, তুই যাবি কিনা আমেরিকা? হুঁঃ!'

মেজদা বলল, 'রান্না করতে আমেরিকা যাচ্ছিস? বাঃ। কেন, এদেশে বুঝি রান্নাঘর ছিল না?'

ছোট ভাইদুটো স্কুলে পড়ছে, ওরা ম্যাপ এনে বসে গেল সানফ্রান্সিসকো কোথায়, বের করতে। 'বাব্বাঃ, অনে-ক দূর রে সেজদা, লন্ডন-টন্ডনের থেকে আরো অনেক দূরে। এখানে যখন দিন, ওখানে তখন রাত্তির হওয়ার কথা।'

'ওখানে নিশ্চয় ভীষণ শীত করবে রে সেজদা, বরফ পড়ে শুনেছি আমেরিকাতে।'

'সানফ্রান্সিসকো শহরটা তো ক্যালিফার্নিয়াতে। ওইখানে হলিউড, যেখানে সব সিনেমা তৈরি হয়। তুই পথেঘাটে কেবল সব ফিল্মের নায়ক-নায়িকাদের দেখতে পাবি। দেখে চিনতে পারবি?'

'কী করে পারব? আমি কি ইংরিজি ছবি দেখি, না ইংরিজি বুঝি?' রঞ্জনের

BanglaBook.org

উত্তরে একদম খুশি হলো না ছোটভাইরা। তারাও অবশ্য ইংরিজি সিনেমা দ্যাখে না। ওই সিনেমার পত্রপত্রিকা থেকে হলিউড আর ক্যালিফোর্নিয়ার কথা জেনেছে মাত্র। ওদের খুব উৎসাহ যে সেজদা আমেরিকাতে যায়। কলকাতাতে সাত বছর হয়ে গেছে, মেজদারও বিয়ে হয়ে গেছে। রঞ্জনের এবার বিয়ে হওয়ার কথা। রঞ্জনের পরের ভাই হায়ার সেকেন্ডারি ইলেভেন ক্লাসে পড়ছে, আর ছোটটা ক্লাস এইটে। রঞ্জনের বিয়ের কথা নিয়ে মা-বাবা আজকাল খুব আলোচনা করেন। দাদা, মেজদা দু'জনেরই বাচ্চাকাচ্চা হয়ে গেছে। দাদার ডাক্তারি কাজ জোটেনি, সে অন্য কোনো কাজ করতেও রাজি হয়নি। কাজের আশায় ঘরে বসে বাবার অন্ন ধ্বংস করছে। মেজদা মুদির দোকানে খাতা লিখে দিনে কুড়ি টাকা করে পায় কিন্তু মাত্র হপ্তায় তিনদিন কাজ। রঞ্জনই মাকে মাস গেলে চারশো টাকা এনে দেয়। বাবার চাষবাস, মাছের ব্যবসাতেই এখনো সংসারের মূল আয়। মা সেটা মাঝে-মাঝেই বলতে ছাড়েন না, 'তোমার ভাইকে লেখাপড়া শেখালে, সে তো কত দেখল তোমার মা-বাপকে। তোমার ছেলেদের লেখাপড়া শেখালে, দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত ছেলেরা বাপকে দেখে, না বাপকেই ছেলেদের দেখতে হবে। আমার মুখ্যু মায়ের মুখ্যু ছেলে হাতের কাজ শিখে মাস গেলে হাতে কিছু এনে দিচ্ছে।'

আমেরিকায় গেলে, মাসে দেড় হাজার টাকা মাইনে পাবে রঞ্জন। মাইনে ওই জামাইবাবুর কোম্পানিই দেবে। দিদি, জামাইবাবু খুব ভালোমানুষ। রঞ্জনকে খুবই স্নেহ করেন, আর বাচ্চা মেয়েটা, সোনা, তো 'জনজনদাদা' বলতে অজ্ঞান। ওদের কাছে থাকতে ভালোই লাগবে রঞ্জনের। রঞ্জন যাওয়ার জন্য তৈরি। কিন্তু বাবা-মা কিছুতেই মত দিচ্ছেন না। দিদি, জামাইবাবু, সোনাকে চলে যেতে হলো। রঞ্জনের ভিসা, টিকিট সব কোম্পানি করে দেবে, প্লেনে তুলে দেবে, কেবল মতামতের অপেক্ষা। ঠাকুমা বললেন, 'কবে ফিরবি, কে জানে, ততদিন আমি বাঁচব কি না। দেখা হবে কি না। আমেরিকা কি বোম্বাইয়ের চেয়েও দূরে?'

বাবা বললেন, 'পাঁচ ভাই একসঙ্গে থাকো আমি চাই, ওই বিদেশ-বিভুঁইয়ের চাকরির লোভ ভালো নয়।' বাবার মনে কাকার বোম্বাই চলে যাওয়ার দুর্ভাবনা আছে। মা বললেন,. 'যাবে তো যাও, কিন্তু বিয়ে করে যাও। আমি বরং মেয়ে দেখি। অতবড় ছেলেকে বিয়ে না দিয়ে কেউ বিলেতে পাঠায় না। ও-দেশের সব মেমেদের নাকি ঠিক কামিখ্যের মতন তুকতাক জানা আছে।'

রঞ্জন হেসে ফেলল এতক্ষণে । 'মাগো, মেমেরাও আমাদের মেয়েদের মতনই। তারা কি ডাইনি? তাদেরও তো ঘর-সংসার আছে, স্বামীপুত্তুর আছে? তোমার ছেলের দিকে তাদের নজর না দিলেও চলবে।'

'কেন, আমার ছেলে কি ফ্যালনা?' মা সগর্বে রঞ্জনের দিকে তাকান। কালো কুচকুচে রং কিন্তু ভারী সুশ্রী। রঞ্জনের মুখের মধ্যে একটা মিষ্টি কোমল বাঙালিয়ানা আছে, আর দুটো বড়-বড় চোখে বুদ্ধি ঝকঝক করছে। কেন যে অঙ্ক ঢুকত না ওর মাথায়, তা ওর মা এখনো বুঝতে পারেন না।

BanglaBook.org

রঞ্জন বলল, 'মা, বিয়ে করে যাওয়া হবে না। আমি তিন বছরের জন্যে যাচ্ছি, জামাইবাবুর তিন বছরের চাকরি। ফিরে এসে বিয়ে করব।'

'এখন বউ ছেড়ে যেতে মন চাইবে কেন?'

বড়বউদি ফোড়ন কাটল। রঞ্জন বলল, 'সত্যিই তো।'

বাবা বললেন, 'না, বাবা, যদি আর দেখা না হয়? এরোপ্লেনে করে যেতে হবে। যদি পথে পড়ে-টড়ে যায়? এরোপ্লেনের ব্যাপার। না, আমার মত নেই।'

রঞ্জন বলল, 'দেখুন বাবা, যদি মরেও যাই, যাব। একদিন তো মরতে হবেই, তবু প্লেনে তো চড়া হবে। এমনিতে লোকে কত চেষ্টা করে আমেরিকা যায়। কত পড়ালেখাতে ভালো হতে হয়, তবে স্কলারশিপ জোটে, তবেই লোকে যায়। আমার বিনা-চেষ্টাতেই জুটে গেছে সুযোগ। আমি ছাড়ব না। আপনারা যে যাই বলুন, আমি যাবই। মরলে মরব, কিন্তু প্লেনে চড়ে মরব।'

রঞ্জন আমেরিকাতে যাচ্ছে। এতবড় খবর, গ্রামে-গ্রামে রটে গেছে। অন্য-অন্য গ্রাম থেকে লোকেরা এসে রঞ্জনের মা-বাপকে ভয় দেখিয়ে যাচ্ছে। বেশিরভাগ লোকই বলছে, 'এই ছেলে তোমার জন্মের শোধ চলে গেল। বোম্বাই গিয়েই ভাইটা ফেরেনি। বিলেত-আমেরিকায় গেলে কেউই ফেরে না। সেখানে কত আরাম, কত সুখ। আর কত টাকা। তার ওপর মেমসায়েবদের কত ছলাকলা। তোমাদের অতটুকুনি ছেলে, এখনো চব্বিশ হয়নি, ওকে ইচ্ছে করে টাকার লোভে জলাঞ্জলি দিলে? বিসর্জন দিলে? বাপ হয়ে ছেলেকে আটকাতে পারলে না?'

বাবা রেগে যাচ্ছেন, কিন্তু কিছুই বলছেন না। মা কেবলই কাঁদছেন। ঠাকুমা কেবল জপ করছেন, আর মাঝে মাঝে চেঁচাচ্ছেন, 'ঠাকুর সব ভালো করবে। তোরা চুক্করতো? যত হিংসের কথা। তোদের ছেলেরা আমেরিকা যেতে পায়নি কিনা? তাই—'

জামাইবাবুর আপিশ থকে সব তৈরি হয়ে গেল। রঞ্জনের পাশপোর্ট, ভিসা, এরোপ্লেনের টিকিট, সুটকেস, পোশাকপত্তর, জুতো পর্যন্ত। একজন মারোয়াড়ি ভদ্রলোক, 'পূর্ণ' সিনেমার পাশে থাকেন, তিনি যাচ্ছেন টোকিও পর্যন্ত, তিনি রঞ্জনের দেখাশোনা করবেন টোকিও অবধি। তারপর সানফ্রান্সিসকো পর্যন্ত রঞ্জন একলা।

সানফ্রান্সিসকো এয়ারপোর্টে অবশ্য দিদি-জামাইবাবু থাকবেন।

দমদমে রঞ্জনকে তুলে দিতে শুধু তার চার ভাই গেল না, গাঁসুদ্ধ অল্পবয়সী প্রায় সকলেই এসে হাজির হলো। এয়ারপোর্ট কেমন, তা কেউ দেখেনি, এরোপ্লেনই দেখেনি কেউ। মা গেলেন, পিসিমা গেলেন, ঠাকুমা পর্যন্ত এলেন। কেবল বাবা এলেন না। বাবার অমতটা বাবা শেষ পর্যন্ত জানান দিলেন। এইভাবে।

কোট, প্যান্ট, জুতো, মোজা পরে রঞ্জনকে দেখাচ্ছিলও চমৎকার। রঞ্জনকে তুলে দিতে যতজন লোক এসেছিল, জামাইবাবুর অফিসের বাবুরা হাসাহাসি করে বলল,

BanglaBook.org

'এ যে দেখি ভি আই পি-র মতো অবস্থা। সত্যিই প্রায় সেই কাণ্ড। গোটা লক্ষ্মীকান্তপুর অঞ্চলের কেউ আগে আমেরিকা গেছে বলে জানা নেই, রঞ্জনের যাত্রা দেখতে, ওকে রওনা করাতে, শত্রুমিত্র যে যেখানে ছিল, সকলেই ছুটেছে দমদম পর্যন্ত। 'কপাল করেছিল বটে রঞ্জন।' বলতে বাধ্য হলো গ্রামের লোকেরা। হ্যাঁ, উড়ে গেল বটে হুই-ইশ করে আকাশ দিয়ে মস্ত বড় এরোপ্লেনটা রঞ্জনকে পেটের মধ্যে নিয়ে। মা, পিসিমা, ঠাকুমা কেঁদে ভেঙে পড়লেন। দাদারা, গাঁয়ের লোকেরা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁদের নিয়ে বাসে তুলল। ব্যানার্জিবাবু আর গিন্নিমা এসেছিলেন, তাঁরা অনেক বোঝালেন। 'আমার মেয়েটাও তো ওখানে, আমার একটাই সন্তান। তোমার তো চারটে আরো ছেলে কাছে রইল।' গিন্নিমার কথা শুনে রঞ্জনের মা একটু শান্ত হলেন। 'তিনটে বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তারপর তোমার ছেলেও ফিরবে, আমার মেয়ে, জামাই, নাতনি, সবাই ফিরবে, সেই দিনটার কথাই আমারা ভাবি, এসো।' গিন্নিমা আদর করে বোঝালেন রঞ্জনের মাকে।

রঞ্জন প্লেনে উঠে বসল। সিটবেল্ট বেঁধে নিল। মাড়োয়ারি ভদ্রলোক পাশের সিটেই আছেন, তিনি থাকায় খুব সুবিধে। সব বুঝিয়ে দিচ্ছেন। রঞ্জনের হিন্দি তত ভালো নয়, তাঁর বাংলা তথৈবচ। তবু দু'জনের কথাবর্তা চালাতে কোনোই অসুবিধে হচ্ছে না। প্রথমে প্লেনের এয়ারহস্টেস দিদিরা ছিল সবাই শাড়ি-পরা। রঞ্জনের জলতেষ্টা পেল, সে বোতাম টিপে দিতেই একজন দিদি এলেন। রঞ্জন বলল, 'এক গ্লাস জল খাব দিদি।'

'নিশ্চয়ই।' বলে তিনি এক গ্লাস জল এনে দিলেন। হাসিমুখে, পাতলা প্লাস্টিকের গেলাস, বরফ দেওয়া ঠাণ্ডা জল। আঃ। গলাটা শুকিয়ে গিয়েছিল রঞ্জনের। কী আশ্চর্যভাবে শূন্যে উঠে গেল প্লেনটা। নীচে ছোট্ট-ছোট্ট হয়ে গেল কলকাতার সব বাড়িঘর, গাছপালা, নদী, পুকুর, খেত। রঞ্জনের চোখ জলে ভরে উঠছিল। এখান থেকে নিশ্চয়ই লক্ষ্মীকান্তপুর দেখা যাচ্ছে। কে জানে কোনখানে ওদের গ্রামটা! বাবা যেখানে বসে-বসে হুঁকো টানছেন একা-একা। বাড়িতে কেউ নেই, সবাই আজ কলকাতাতে। বউদিরা আছে অবশ্য। ভাইপো-ভাইঝিরাও আছে। ওইসব সবুজ গাছপালা, খেত, পুকুরের মধ্যেই কোথাও রয়ে গেছে রঞ্জনের গাঁ, ওদের বাড়িটা।

আস্তে-আস্তে আরো ওপরে উঠে এল প্লেন, নীচে কেবল সাদা-সাদা মেঘ। নীচের দিকে তাকিয়ে মেঘ দেখা যায়, জীবনে এই প্রথম দেখল রঞ্জন।

মেঘ দেখতে তো লোকে ওপরদিকে ঘাড় তোলে। প্লেনে সবই উলটো। এ তো মাটি দিয়ে যাওয়া নয়, এ হচ্ছে পুষ্পকরথে চড়া। শূন্যে ভেসে যাওয়া।

রঞ্জনের কপাল ভালো। তার গা গুলোয়নি, মাথা ঘোরেনি। অফিসের লোকেরা একটা ওষুধ দিয়ে দিয়েছিল প্লেনে উঠেই খাওয়ার জন্য। তাতে ঘুম পাবে, আর গা গুলোবে না। কিন্তু রঞ্জন ওষুধটার কথা একেবারে ভুলে মেরে দিয়েছে প্লেনে চড়ার উত্তেজনায়। জীবনে কখনো প্লেনে চড়া হবে, কে ভেবেছিল?

'একদম নামবে সেই টোকিওতে গিয়ে' রঞ্জনকে বলে দিয়েছেন ব্যানার্জিবাবু।

'টোকিওতে তোমার ছ'ঘণ্টা ওয়েট করতে হবে, কোথাও নড়বে না, ওখানে তুমি কোথায় ওয়েট করবে, এই খেমকাবাবুই তোমাকে দেখিয়ে দেবেন। সেইখানে বসে থাকবে। ভাবনার কিছু নেই, প্লেনের নম্বরটা তো জানো, যখন সেই নম্বরটাকে ডাকবে তখন যাবে।'

রঞ্জনের সামনে এসে দিদিমণি জিজ্ঞেস করছে, ডিম খাবে কিনা? ভেজ, না ননভেজ?

ব্যানার্জিবাবু বলে দিয়েছেন ননভেজ মানে কিন্তু নিরামিষ নয়। ভেজ মানেই নিরামিষ।

'তুমি বলবে ননভেজ।'

যেই দিদি জিজ্ঞেস করেছে, রঞ্জন বলেছে 'ননভেজ।'

সুন্দর ডিমের অমলেট এল। চা না কফি? চা, বাবা, চা।

চা, অমলেট খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল একটু রঞ্জন। সিটগুলো একটুখানি হেলে যায় পেছনদিকে। শোওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। শুনেছে ফার্স্টক্লাসে নাকি খাটবিছানা থাকে। কে জানে ফার্স্টক্লাস কেমন?

হঠাৎ ঘুম ভেঙে রঞ্জনের মনে হলো প্লেনটা পড়ে যাচ্ছে। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল, হ্যাঁ, ঠিকই। তেরছা হয়ে বেঁকে কেমন যেন বাঁকাভাবে নেমে যাচ্ছে প্লেনটা, নীচে জমি, ঘরবাড়ি ঘুরে যাচ্ছে, ভীষণ ভয়ে বুক কেঁপে উঠল রঞ্জনের।

দু'হাতে সিটের হাতলদুটো চেপে ধরল। মায়ের মুখটা, বাবার মুখটা, ঠাকুমার মুখটা, ছোট ভাইদুটোর মুখ। হাতলদুটো চেপে ধরে কী লাভ? প্লেন যদি পড়ে, সিটসুদ্ধুই তো পড়বে। ঠাকুরের নাম করাই ভালো। ওই যে বলছিল একদিন তো মরতেই হবে, না হয় প্লেনে চড়েই মরব। ঠাকুর ওই কথাটাই শুনলেন।

'প্লেনটা কি পড়ে যাচ্ছে?' রঞ্জন জিজ্ঞেস করল খেমকাবাবুকে। খেমকাবাবুকে দেখে মনে হচ্ছিল না ভয়ের কিছু হয়েছে। রঞ্জনের কথা শুনে তিনি হেসে ফেললেন। 'না, না, পড়বে কেন? নামছে! ব্যাঙ্ককে নামবে, যাত্রী তুলবে তো? বাস যেমন স্টপে থামে, ট্রেন যেমন ইস্টিশনে থামে, প্লেনও তেমনই দেশে-দেশে নামে তো? টোকিওর আগে ব্যাঙ্ককে একবার থামার কথা। তোমাকে কেউ বলে দেয়নি?' অভিমানে এবার চোখ প্রায় জল আসে রঞ্জনের। প্রাণের ভয়েও তার কান্না আসেনি এতক্ষণ। কেউ তাকে একবারও বলেনি যে, টোকিওর আগেও প্লেন একবার নামবে। আর টোকিও যে এটা নয়, সেটা সময়ের হিসেব থেকেই টের পেয়েছে রঞ্জন। যাক, এবার ভয় কাটল। খেমকাবাবু বললে, 'আবার বেল্ট বাঁধো।' কানে তুলোটা গোঁজাই ছিল।

ব্যাঙ্ককের পরে শাড়িপরা দিদিরা নেমে গেলেন, ফ্রকপরা মেমদিদিরা উঠলেন। এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভেজ? অর ননভেজ?'

এরা বাংলা জানে না, রঞ্জন দেখেই বুঝতে পারছে, 'ননভেজ।'

'চিকেন, অর বিফ?'

বিফ খেতে ঠাকুমা ভীষণ বারণ করে দিয়েছেন। বিফ মানে গোরুর মাংস, রঞ্জন জানে। 'যাই করিস দাদা, ওদেশে গিয়ে গোরুর মাংসটা, শূকরের মাংসটা খাসনি যেন—'

রঞ্জন ভেবে দেখেছে, মাংস সবই এক। সে খাসি মারলে খাসিরও ব্যথা লাগে। যে-জন্তুই মেরে খাও, সেটা জীব হিংসার ব্যাপার। হয় অহিংসা প্র্যাকটিস করে নিরামিষ খাওয়া উচিত, নইলে যে মাংস হোক সবই খাওয়া এক। রঞ্জনের নিজের এমন মনে হয় বটে, কিন্তু মা-ঠাকুমার কথাটা শুনতে হবে তো।

খেমকা বললেন, 'ভেজ!'

'চিকেন!' বলে দিল রঞ্জন।

তারপর এল খাবার।

খেমকার জন্য কীসব সেদ্ধ-সেদ্ধ, শাকসবজি, গাজর, শিম, আলু-মটর—আর রঞ্জনের জন্য সাদা রঙের চিকেন। সাদা জলের মধ্যে সাদা মতন চামড়া ছাড়ানো মাংস। আর কিছু সবজিসেদ্ধ।

রঞ্জনের দেখেই মনে পড়ল বাবুঘাটে গঙ্গার জলে মরা জীবজন্তু ভেসে যায়। একবার একটা মরা কুকুর দেখেছিল, তার গা কেমন সাদা-সাদা, জলে ভিজে ফোলা-ফোলা, মনে পড়া মাত্র রঞ্জনের খাওয়ার ইচ্ছে চলে গেল। রুটি, মাখন, পুডিং স্যালাড, এইসবও ছিল, সেগুলো খেয়ে আসল মাংসের ডিশটা আর ছুঁতেই পারল না রঞ্জন। ওই সাদা রঙের মাংস! দেশের চিকেন কী সুন্দর। রঞ্জন নিজেই কী চমৎকার রাঁধতে পারে চিকেন, আর এই! ওদেশে গিয়ে কি এমনই সাদা-সাদা চিকেন খেতে হবে? তার চেয়ে নিরামিষ খাওয়া ঢের ভালো বাবা।

ঘুম ভাঙতেই টোকিও। খেমকাবাবু নেমে গেলেন রঞ্জনকে নিয়ে। এখানে তাকে বাক্স বের করতে হবে না। যেখানে সানফ্রান্সিসকোর প্লেন ধরতে হবে সেইখানে রঞ্জনকে নিয়ে গেলেন খেমকাবাবু। আর খোঁজ করতে লাগলেন, বাঙালি কেউ সানফ্রান্সিসকো যাচ্ছে কিনা? নাঃ। কেউ না।

রঞ্জন একবর্ণ ইংরিজি জানে না, একবর্ণ জাপানিও জানে না। টোকিওতে অদ্ভুত সুরে কেবল জাপানি ভাষাতে কীসব ঘোষণা হচ্ছে মাইকে, মাঝে-মাঝে ইংরিজিতেও। রঞ্জন কিছুই বুঝতে পারছে না। এদিকে খেমকাবাবুকে জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে, তাঁকে নিতে এসেছে। তাঁর কাস্টমস আছে। তাঁর আর দেরি করলে চলবে না।

রঞ্জনের হঠাৎ ভীষণ ভয় করল। যদি ওকে ছেড়ে প্লেনটা চলে যায়? এই টোকিও এয়ারপোর্টেই কি তবে সারা জীবন? কী করে কাউকে বোঝাবে রঞ্জন সে কী চায়, কোথায় যাবে? কোন ভাষাতে বোঝাবে? শুণ্ডি রাজার দেশে 'আমরা বাংলাদেশের থেকে এলাম' বলা যেত, এখানে চলবে না। খেমকাবাবু খুব দুঃখিত হয়ে 'গুডবাই' করে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে রঞ্জন যে কোম্পানির প্লেনে

যাবে তার একজন কর্মচারীকে ধরে এনে রঞ্জনকে চিনিয়ে দিয়ে গেলেন, কিন্তু সেই লোক তাঁকে বলল, সে ছ'ঘণ্টা পরে ডিউটিতে থাকবে না। কিন্তু আরেকজনকে বলে দিয়ে যাবে। এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে রঞ্জন টোকিও এয়ারপোর্টে বসে রইল।

হঠাৎ সে শুনতে পেল এক বৃদ্ধ পঞ্জাবি, শিখ ভদ্রলোক 'সানফ্রোন্সিসকো' শব্দটা বলছেন। অমনই রঞ্জন দৌড়ে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'আপ সানফ্রান্সিসকো যায়েগা?'

ভদ্রলোক বললে, 'ক্যায়া বলতে হ্যায়?'

রঞ্জন বুঝল উনি কানে কম শোনেন। রঞ্জন চেঁচিয়ে বলল, 'আপ সানফ্রান্সিসকো যাতা হ্যায়?' একে রঞ্জনের অপূর্ব হিন্দি, তায় উনি কানে শোনেন না। সাদা দাড়ি সাদা পাগড়ি ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, 'নহি, হাম সানফ্রান্সিসকো যায়েগা।'

রঞ্জন আবার চিৎকার করল, 'হামভি উহাঁই যাতা হ্যায়। একসাথ যায়েগা?'

ভদ্রলোকও বেশ চেঁচিয়ে বললেন, 'হাম সানফ্রান্সিসকো যায়েগা।'

এই সময়ে রঞ্জন দেখল ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে তারা দু'জনে মিলে, আর সবাই তাদের দিকে তাকিয়ে দেখছে। যা বোঝবার তা বোঝা হয়ে গিয়েছে। এখন ভদ্রলোক যা করবেন, যেভাবে যাবেন, রঞ্জন অবিকল তাঁর পিছু-পিছু যাবে।

সেইভাবেই টোকিওর ছ'ঘণ্টা কেটে গেল রঞ্জনের। সেই শিখ ভদ্রলোকের পিছু ধরে ঠিকঠাক প্লেনে উঠে পড়ল সে। সানফ্রান্সিসকোতে কাস্টমসে কেউই কিছু বলল না ওকে, আর বেরিয়েই দ্যাখে দিদি, জামাইবাবু, সোনা সুদ্ধু এসে খুব হাত নাড়ছে বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে।

আঃ। এই তাহলে আমেরিকা। সানফ্রান্সিসকো শহরটা কী সুন্দর! উঁচু-নিচু সব পাহাড়ি রাস্তা, এক-একটা পাড়া এক-এক রকমের। খুব উঁচু-উঁচু বিশ-পঁচিশতলা বাড়িও রয়েছে, আবার দোতলা, তিনতলা, একতলা বাড়িও আছে। দিদিদের পাড়াটা খুব সুন্দর। সমুদ্র দেখা যায় বারান্দা থেকে। গোল্ডেন গেট ব্রিজ বলে একটা ব্রিজ দেখা যায়। যেটা দেখেই রঞ্জনের হাওড়া ব্রিজের জন্য মন কেমন করতে লাগল।

রঞ্জন এসে দিদি-জামাইবাবুর বাড়িতে ক'দিনের মধ্যে জমিয়ে বসল। আস্তে-আস্তে অভ্যাস হয়ে গেল বিলিতি রান্নাঘরে রান্না করা, বিলিতি বাথরুমে স্নান, টেবিলে খাওয়া, ঘরে চটি-পরা।

তিন বছর হয়ে গেছে। রঞ্জনের ফেরার দিন এসে গেছে। রঞ্জনের দিদি-জামাইবাবু, রঞ্জন, সোনা, সবাই ফিরছে। কিন্তু রঞ্জন আবার ফিরে আসছে।

রঞ্জনের আর-একটা চাকরি হয়েছে। সানফ্রান্সিসকোতে যে ইন্ডিয়ান রেস্তরাঁতে দিদি-জামাইবাবুরা মাঝে-মাঝে খেতে যেতেন, সেইখানে, বাংলাদেশের মানুষ গৌরভাইয়ের সেই রেস্তরাঁতে। ইদানীং গৌরভাইয়ের ব্যবসা অনেক বেড়েছে, একটা নতুন দোকান খুলছেন সাউসালিতোতে, সেখানে নতুন লোক দরকার। ভালো বাংলা

BanglaBook.org

রান্না জানে এমন লোক। রঞ্জনকে গৌরভাইয়ের খুব পছন্দ। রঞ্জন দেশে গিয়ে বাবা, মা, ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করে আবার ফিরে আসছে সানফ্রান্সিসকোতে, রেস্তরাঁতে চাকরি নিয়ে।

গৌরভাই বলেছেন, বউকেও আনতে পারবে, সীতাবউদির একটা সঙ্গী হবে। দেখা যাক, মা কী বলেন। দিদি, জামাইবাবু মনে করছেন এটা খুব ভালোই ব্যবস্থা। আস্তে-আস্তে ওর নিজস্ব ব্যবসা শুরু করতে পারবে রঞ্জন একদিন। মা ওকে তাঁর নিজের হাতর কাজটা শিখিয়েছিলেন, ভাগ্যিস। মাকে রঞ্জন গিয়ে বলবে, 'দ্যাখো মা, তোমার শেখানো বিদ্যেয় তোমার ছেলে আজ...।' আর বাবা কী বলবেন? প্লেন ভেসে যাচ্ছে প্রশান্তমহাসাগরের ওপর দিয়ে। রঞ্জন এখন খুব সুন্দর ইংরিজি বলতে পারে। ওর কলেজে পড়া ভাইদের চেয়ে ভালোই নিশ্চয়।

এয়ারহস্টেস জিজ্ঞেস করলে, 'ভেজ, অর ননভেজ?'

'ননভেজ।' রঞ্জন একমুখ হেসে বলল, 'বাট নট চিকেন, থ্যাংকইয়ু! ফিস প্লিজ!'

শারদীয় আনন্দমেলা, ১৪০২

অরুবাবু গপ্পো

অরুবাবু থাকে আমেরিকাতে, সমুদ্রের ধারে, ফুলের বাগানওলা একটা বাড়িতে, মা আর বাবার সঙ্গে। অরুবাবু মাঝে মাঝে কলকাতায়ও থাকে। বাবার মস্ত ব্যবসা আছে, মাঝে মাঝে তাই তাঁদের কলকাতাতে থাকতে হয়, আর মাঝে মাঝে আমেরিকাতে। অরুবাবু মাঝে মাঝে বাংলা বলে, আর মাঝে মাঝে ইংরিজি। মাঝে মাঝে ভাত-মাছের ঝোল, পুঁইশাকের চচ্চড়ি খায়, পটোলটা আলুভাজা, আর মাঝে মাঝে খায় চিকেন মাশরুম স্যুপ, বেকড হ্যালিবাট, কোলস্র্য, স্ট্রবেরিজ অ্যান্ড ক্রীম। চিকেনের ঝোলভাত খেতেও ভালোবাসে, তবে সবচেয়ে তার পছন্দ মাছ। যে মাছে কাঁটা বাছতে হয় না সেই মাছ। অরুবাবু কখনো পাঞ্জাবি-পায়জামা পরে, কখনো টী-শার্ট আর ট্রাউজার্স। সে কখনো বাঙালি ছেলে, কখনো আমেরিকান ছেলে হয়ে যায়। অরুবাবুর বয়স এখন প্রায় পাঁচ বছর পূর্ণ, তার অনেক বন্ধুবান্ধব হয়েছে। কলকাতাতে গেলেও সে একটা ইস্কুলে যায়, আন্টিরা আছেন, আবার আমেরিকাতেও একটা ইস্কুলে যায়, ক্লাসটীচাররা আছেন। দেশে অরুর বন্ধুরা সবাই বাংলা বলে, আর ওদেশে তারা বলে ইংরিজি। অরু আগে আগে মাঝে মাঝে কলকাতার বন্ধুদের সঙ্গে ইংরিজিতে, আর আমেরিকার বন্ধুদের সঙ্গে বাংলাতে কথা বলে ফেলতো, আর খুব মুশকিল হতো। এখন আর ওরকম ভুল হয় না। কলকাতায় সে কলকাতার ভাষায় কথা বলে, আমেরিকাতে আমেরিকার কথা।

আর বাড়িতে? কলকাতার বাড়িতেও আমেরিকার বাড়িতেও অরুবাবু কখনো ইংরিজি বলে, কখনো বাংলা। মা-বাবা দুজনেই দুটো ভাষাতে কথা বলেন অরুর সঙ্গে, মা'ই বেশি বাংলা বলেন, মার ভয় অরু বাংলা যদি ভুলে যায়? কী হবে তাহলে? অরু তো আর সত্যি সত্যি সাহেব নয়, সে তো বাঙালিই। তাকে তো সাহেবদের মতন দেখতে নয়, তার হরিণের মতন কালো কালো বড় বড় চোখ। শ্বেতচন্দনের মতন গায়ের চামড়ার রং। ওরকম শ্বেতপাথরের মতন নয়। নরম কালো চুল অরুর, খড়ের মতন হলুদ সোনালী চুল নয়। অরু জানে, 'অ-এ অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাবো পেড়ে।' একদম ও ঐ পর্যন্ত। 'ঔষধ খেতে মিছে বলা' পর্যন্ত শিখে ফেলেছে অরু। আমেরিকাতেও এসব তাকে মা শেখান বাড়িতে, পড়া-পড়া খেলার ক্লাসে। আমেরিকাতে অরুর একজন ছোট্টমতো দিদি আছে, তনয়াদিদি। অরুবাবুর সঙ্গে তনয়ার খুব ভাব, ছোট্ট ভাই অরুবাবুকে নিয়ে খেলাধুলো হৈ-হল্লোড়ের অন্ত নেই তার। মাঝে মাঝে একটু একটু যে ঝগড়াও হয়ে যায় না, তা নয়। তনয়াদিদির চকোলেটটা বেশি বড়, না অরুবাবুরটা? তনয়াদিদির সাইকেলের লাল রংটা বেশি সুন্দর, না অরুবাবুর সবুজ রংটা? তনয়াদিদির বড় বড় চারটে টেডি বেয়ার, অরুবাবুর কেন মোটে দুটো? আবার অরুবাবুর যে অজস্র এরোপ্লেনে ঘর বোঝাই তনয়াদিদির মোটে একটা? এইরকম আর কি—তা সে ঝগড়া ওদের মায়েরা এসে মিটিয়ে ফ্যালেন। অরুবাবুর মায়ের নাম রিনিমা, আর তনয়াদিদির মায়ের নাম গিনিমা। ওঁরাও তো বোন, ওঁরা নিজেরা কিন্তু একদমই ঝগড়া করেন না। ওঁদের খুব ভাব। রিনিমার চুল লম্বা, গিনিমার চুল ছোটো, রিনিমা দিব্যি গোলগাল, গিনিমা ফিনফিনে রোগা, এ নিয়ে কিন্তু তাঁদের কোনোই ঝগড়া নেই, অথচ তনয়াদিদি কেন লম্বা, অরুবাবু কেন অত লম্বা নয়, এ নিয়ে অরুবাবুর মাঝে মাঝেই রাগ হয়। অরুবাবু যে তাকে হাত পায় না, তনয়াদিদি হাত পায়। তনয়াদিদির তো সাত বছর পূর্ণ কিনা? অরুবাবুর মতন মাত্র 'ট্রানজিশনে' পড়ে না সে। প্রাইমারী স্কুলে পড়ছে। ছয় পূর্ণ হলেই অরুবাবুও ফার্স্ট গ্রেডে ভর্তি হবে। কলকাতাতে বলে ক্লাস ওয়ান, আমেরিকাতে বলে ফার্স্ট গ্রেড।

কলকাতার ইস্কুলে মাত্র ন'টা থেকে বারোটা থাকতে হয়, আর তার মধ্যে একটা খেলার ক্লাশ, একটাই ছবি আঁকার ক্লাশ। আমেরিকাতে? ন'টা থেকে তিনটে পর্যন্ত থাকতে হয়। তাতে দুটো খেলার ক্লাশ, আর প্রত্যেকটা ক্লাশেই ছবি আঁকা থাকে। এমনকী বানানের বেলাতেও। এই তো গতকাল বানান করতে হয়েছিল একটি লাল কুটির এঁকে। তার সামনের রাস্তায় প্রত্যেকটা পাথরে একটা বানান লিখতে হলো। আরেক দিনের বানানের ক্লাশে (আমেরিকাতে বলে 'স্পেলিং) একটা বাগান এঁকে, ফুলগাছ এঁকে তাতে বেড়া আঁকতে হলো। সেই বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে একটা করে বানান! অরুবাবুর খুব মজা লাগে স্পেলিং করতে। কিন্তু তনয়াদিদিদের স্পেলিং ক্লাস এখন আর ওরকম ছবি এঁকে হয় না। ছবি আঁকলে কী হবে, ইংরিজি বানানের কোনো মাথা-মুণ্ডু খুঁজে পায় না অরুবাবু। সেদিন শিখেছে 'কুড'—COULD, আবার 'গুড'—GOOD আবার 'পুট'—PUT. আবার 'রুড'—RUDE—এ কী রে বাবা? কেন

রে বাবা? রিনিমা বলেন, 'আছে, আছে, সবের নিয়ম আছে, পরে জানবে।' 'কুডে'র মধ্যে 'L' কেন? সেটা রিনিমাও জানেন না, টীচার অ্যানাও জানেন না, বাবাও জানেন না। কেউ জানে না! এমনই আশ্চর্য কাণ্ড স্পেলিং! কেন, যদি অরু 'L' টা নাই লেখে, তো কী হয়? যদি KUD লেখে তবু তো কুড হবে? যদি COOD লেখে, তবু তো কুড-ই হবে? তবে অত ঝামেলা কেন করা? টীচার অ্যানা হেসে ফেলেন। বলেন, 'উঃ, অরু কত ভাবনা-চিন্তা করে! থাক, অত ভেবে আর কাজ নেই। এখন তো শিখে নাও, পরে অদলবদলের কথা ভাবা যাবে।'

এমনিতে অরুর ইস্কুলে অনেক বন্ধু আছে। কেউ মেয়ে, কেউ ছেলে, কেউ দিশী, কেউ বিদেশী। একজন আছে জাপানি মেয়ে, তার নাম কাজুকো। আর একজন আছে শিখ ছেলে, তার নাম সুরিন্দর। আর আছে মেক্সিকান মেয়ে একজন, তার নাম মারিয়ার। মারিয়ার মাকে অনেকটা রিনিমা-গিনিমাদের মতনই দেখতে, মারিয়ার মাথায় তনয়াদিদির মতন লম্বা কালো চুল। কাজুকোর মাথাতেও কী সুন্দর লম্বা কালো চুল আর কাজুকোকে ঠিক ওই বৈঠকখানা ঘরে কাচের বাক্সোর জাপানি পুতুলের মতন দেখতে। শিখ ছেলের মাথায় পাগড়ি বাঁধা, ওর নাকি চুলে ঝুঁটিখোঁপা বাঁধা আছে। কিন্তু অরুর আমেরিকান বন্ধুরা—গ্রেগ, রব, ডীন, ড্যানি—কারুর চুলই কালো নয়। চোখের মণিরও নানারকম রং। কারুর বাদামী, কারুর নীল, কারুর সবুজ রং। গ্রেগের যেমন সোনালী চুল—ব্লন্ড হেয়ার। নীল চোখ। ড্যানিকে বলে 'রেড-হেড', ওর চুলের রং কিন্তু টকটকে লাল নয়, কমলা মতন। ইস্কুলে অরুর খুব ভালো লাগে। ইস্কুল থেকে রোজ যেতে হয় ওকে সুইমিং ক্লাশে। জল থেকে মোটেই উঠতে ইচ্ছে করে না অরুর। যতক্ষণ খুশি যদি থাকা যেত জলের মধ্যে? কী ভালোই না হতো! কিন্তু মা থাকতে দিলে তো? ঠিক এক ঘণ্টা পরেই টেনে তুলে নিয়ে যাবেন আবার শাওয়ারে চান করাতে, গা মোছাতে।

অরুবাবুর সুইমিং ক্লাশ হয় সুইমিং স্কুলের মধ্যে। সমুদ্রে কেন যে হয় না? অরুবাবুর সমুদ্র খুব পছন্দ। সাঁতারটা ভালো করে শেখা হয়ে গেলেই ও যাবে সমুদ্রে সাঁতার কাটতে। এখনো যায় মা-বাবার হাত ধরে, বীচ দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে। কত লোক সাঁতার কাটে। মাঝে মাঝে মা-বাবার সঙ্গে অরু জলে নেমে বালির ধারে ধারে ঝাপুসঝুপুস করে বটে, কিন্তু সেটা তো সাঁতারকাটা হলো না। জলে খেলা করা হলো। এই সমুদ্রটার নাম প্রশান্ত মহাসাগর, প্যাসিফিক ওশান। এখানে অরু দেখেছে দূরে বড় বড় কালো তিমিমাছেরা ভেসে যাচ্ছে, ডিগবাজি খাচ্ছে, কখনো জলের ফোয়ারা তুলছে নাক দিয়ে। বাবা কখনো দেখান ডেকে, কখনো মা। অরু নিজে নিজে অবশ্য অনেকবার বাবাকে ডেকে বলেছে, 'বাবা, ওই যে, ওই যে, দ্যাখো নিশ্চয় ওটা সাবমেরিন!' বাবা হাসেন, 'দূর বোকা, সাবমেরিন এখন কোথায়?' অরুর একটা বই আছে, তাতে কেবল ছবিতে আর লেখাতে সাবমেরিনের গল্প। অরু মাঝে মাঝে দূরে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট দেখতে পায় একটা সাবমেরিন জলের তলায় ডুব দিল। পেরিস্কোপটা উঁচু হয়ে আছে। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে ঢেউয়ের তলায় হারিয়ে যাচ্ছে, আবার ভেসে উঠছে।

বাবা হাসেন, বলেন, 'দূর পাগলা, ওটা সাবমেরিন নয়। একটা সীগাল জলের ঢেউয়ে ভাসছে।' অরুবাবুর মন খারাপ হয়ে যায়। ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ওটা 'পেরিস্কোপ', বাবা ওটাকে 'সীগাল' বলে দিলেই হলো?

মা কিন্তু অমন নন। মাকে যদি অরু সাবমেরিনটা দেখায়, মা সেটা ঠিক দেখতে পান। মাকে সেদিন দূরে একটা হাঙরও দেখিয়েছিল অরুবাবু—'মা, লুক। লুক, মা! আ শার্ক! মাগো, দ্যাখো দ্যাখো, হাঙর। হাঙরটা আমাকে তাড়া করেছে, ঐ দ্যাখো মা, আমার দিকেই আসছে'—চোখ গোল করে মা বলেন, 'ওমা! সত্যি নাকি? হাঙর? বাপ রে, কী কাণ্ড! কিন্তু তুমি ভয় পেও না, আসবে না ও তোমার দিকে। হাঙররা এদিকে আসে না।' মা হাঙর-টাঙর, সাবমেরিন-টেরিন সবই দেখতে পান, বাবা কিন্তু পান না।

কিন্তু মাঝে মাঝে মাও কেমন যেন হয়ে যান। এই সেদিন অরুবাবু, মা, তনয়াদিদি আর গিনিমা দুপুরবেলা মস্ত বড় কিংসাইজ খাটটাতে শুয়ে আছে, তনয়দিদিকে আর অরুবাবুকে ঘুম পাড়াচ্ছেন ওদের মায়েরা—অরুবাবু মায়ের গায়ের ওপর পা তুলে দিয়েছে। মা আদর করে বললেন, 'কার এমন ছোট্ট ছোট্ট পা রে?' অরুবাবুই কি কম? সেও তক্ষুনি বলেছে, 'আর কার এমন ধুমসো ধুমসো গা রে?' কী সুন্দর বলেছে, ঠিক কবিতার মতন শোনালো না?

ও মা। গিনিমা আর রিনিমা দু'জনেই হো হো হেসে গড়িয়ে খাট থেকে পড়ে যায় আর কি। তনয়াদিদিও ফিকফিক করে হাসতে শুরু করে শেষে খিলখিল করে হাসতে লেগে গেল। এতে এত হাসির কী আছে? তনয়াদিদির টেডি বেয়ারটাকে, সবচেয়ে বড় গোবদাটাকে ও যখনই সঙ্গে করে নিয়ে আসতে চায়, গিনিমা বলেন, —'ওই ধুমসো পুতুলটা আর নিয়ে যেতে হবে না।' ওটাই সবচেয়ে সুন্দর, গাবদা-গোবদা, নরম তুলতুলে, ঠিক অরুর মার গায়ের মতন। কী অন্যায় কথাটা বলেছে অরুবাবু? কিন্তু বাড়িতে কেউ এলেই মা ওই গল্পটা বলেন আর সবাই হাসে। গিনিমাও এলেই জিজ্ঞেস করেন, 'কিরে অরুবাবু, কার ধুমসো ধুমসো গা রে?'—আর অমনি তনয়াদিদিটা হাসতে শুরু করে দেয়। মা-বাবাও হেসে গড়াগড়ি যান।

ছোটবেলা থেকে এরোপ্লেনে চড়ে চড়ে দেশে গিয়ে অরুবাবুর এরোপ্লেন ব্যাপারটাই খুব ভালো লাগে। ওকে বাবা অনেক এরোপ্লেন কিনে দিয়েছেন। একটাতে ককপিট থেকে শুরু করে সীটবেল্ট পর্যন্ত—সব, সবই আছে। এমারজেনসি একজিট আছে, ছোট ছোট বাথরুম, বাথরুমর বেসিন, কল, কমোড, আয়না সবকিছুই রয়েছে। প্রায় পাঁচ দিন লেগেছিল বাবাতে-মাতে আর অরুবাবুতে মিলে ওই প্লেনটার সব পার্টসগুলো একত্রে জোড়া দিতে। জেট এঞ্জিনের পার্টসগুলোও তো জোড়া দিতে হয়েছিল? বাবা আর মা-ই বেশি-বেশিটা করে দিয়েছিলেন। ওই প্লেনটা, মা বলেন, ঠিক অরুবাবুর জন্যে নয়, তনয়াদিদির জন্যেও নয়, আরো বড়ো বড়ো বাচ্চাদের জন্যে ঠিক হবে। বাবা-মার মতন বড়দের জন্যেও। সত্যিই তো, ওটা খুবই শক্ত খেলনা ছিল। কিন্তু এখন এত সুন্দর দেখতে লাগে! অরুবাবুর ঘরের ছাদ থেকে কি সুন্দর ঝুলে আছে, ঠিক যেন আকাশে একটা সত্যিকারের এরোপ্লেন। বাবাকে

বলেছে অরুববু বড় হলে এরোপ্লেন তৈরি করবে। এরোপ্লেনের পাইলটও হবে। বাবা বললেন, 'এরোপ্লেন তৈরি করবে, না এরোপ্লেনের পাইলট হবে, ঠিক করে নাও। একসঙ্গে দুটো তো হতে পারবে না।' মা বললেন, 'একসঙ্গে প্যাসেঞ্জার আর পাইলট কি হওয়া যায়?' এইখানে অরুবাবুর খুব মুশকিল হয়েছে। প্লেনের পাইলট হতেও তার খুব লোভ। আবার এরোপ্লেন তৈরি করতেও খুব ইচ্ছে। মা বলেছেন এখনই ঠিক করতে হবে না। আরো দশ-বারো বছর টাইম আছে।

'দশ-বারো বছর কি অনেক সময়? মা? না, অল্প সময়?' মা বললেন, 'তোমার জন্যে অনেক সময়।' এ কথাটাও ঠিক বোঝা গেল না। সময় কি এক একজন লোকের জন্যে এক একরকমের হয়? কম হয়, বেশি হয়? এক ঘণ্টা তো এক ঘণ্টাই। ওয়ান আওয়ার। সেটা বেশি সময়। ওয়ান মিনিট। সেটা কম সময়। তবে? দশ বছর, বারো বছর যদি অরুর জন্যে অনেক সময় হয়, তবে মা, বাবা, তনয়াদিদি, সকলের জন্যেই অনেক সময়। তাই না? তবে?

দেশে, কলকাতাতে, ইনডিয়াতে অরুবাবুর দিম্মা-দাদু আছেন। তাঁরা কেবল বলেন অরুবাবুকে ওঁদের কাছে কলকাতাতেই থেকে যেতে। কিন্তু মা-বাবাকে ছেড়ে যে অরুবাবু কোথাওই থাকতে পারবে না! কলকাতাতেও না। আমেরিকাতেও না। একবার আমেরিকাতে ইস্কুলে কী অদ্ভুত একটা কাণ্ড হয়েছিল। ক্লাসটীচার অ্যানার মস্ত বড় ভুঁড়ি হয়েছিল বলে, একদিন ওকে মারিয়া জিজ্ঞেস করেছিল, 'অ্যানা, তোমার এত বড় ভুঁড়ি কেন? তুমি তো এত মোটা ছিলে না?'

অ্যানা তখন হেসে হেসে বললে, 'আমার পেটের মধ্যে একটা বাচ্চা মেয়ে আছে যে, ঠিক তোমার মতন। সে যতই বড় হচ্ছে আমার পেটটাও তত বড় হচ্ছে। পেট থেকে সে যেই এই মাটিতে বেরিয়ে আসবে, অমনি ভুঁড়িও চুপসে ছোট্ট হয়ে যাবে। সব বাচ্চারাই মায়ের পেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। তোমরা প্রত্যেকেই এমনিভাবে এসেছিলে। তোমাদের মায়েদের ভুঁড়ির মধ্যে গুঁড়ি মেরে বসেছিলে তোমরা, যতক্ষণ না তোমাদের জন্মদিনের তারিখটা চলে এলো। তখন "হ্যাপি বার্থডে" গান গাইল বাবা-মায়েরা, আর তোমরাও সবাই বেরিয়ে এলে পেট থেকে, বাইরের আলোবাতাসে।'

অরুর গল্পটা শুনে খুব ভালো লাগলো। ও বাড়িতে গিয়ে মাকে বলল, 'মা, আমি কি তোমার ভুঁড়ির ভেতরে গুঁড়ি মেরে বসেছিলুম, যতদিন না বার্থডে-টা চলে এলো? তারপর আমি তোমার পেট থেকে হুস কর বেরিয়ে পড়লুম?'—রিনিমা তখন ওকে কোলে তুলে চুমু খেয়ে বাগানে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'এই যে দেখছো, আমাদের কেমন সুন্দর গোলাপবাগান? ভগবানের ঠিক এমনি একটা বাগান আছে। ইচ্ছের বাগান। সেখানে এক একটা ফুল এক একটা বাচ্চা। বাচ্চারা এই দুভাবেই মায়ের কোলে আসে। একজনরা আসে পেটের মধ্যে। আরেকজনরা আসে ওই ভগবানের বাগান থেকে। ইচ্ছের মধ্যে। যে ফুলটা দেখে খুব ভালো লাগে, মায়েরা সেই ফুলটাই বেছে তুলে নেন, আর সেই ফুলটা একটা বাচ্চা হয়ে যায়। তুমি এসেছ সেই ভগবানের বাগান থেকে। খুব সুন্দর, আর সুগন্ধী একটা ফুল ছিলে

তুমি। তুমি আমার পেটের মধ্যে ফুটে ওঠোনি, ভগবানের বাগানে, আমার ইচ্ছের মধ্যে ফুটেছিল। আমি তোমাকে তুলে এনেছি কোলের ভেতরে।'

পরদিন অরু ইস্কুলে গিয়ে অ্যানাকে বললে, 'অ্যানা, তুমি কাল আমাদের ঠিক কথা বলোনি তো? সব বাচ্চারা তো মায়ের পেটের মধ্যে ফুটে ওঠে না, কেউ কেউ তৈরি হয় ভগবানের বাগানে। মায়ের ইচ্ছের ফুল হয়ে ফুটে থাকে। সেখান থেকেই মা আমাকে তুলে এনেছেন। আমার জন্ম মার পেটের মধ্যে হয়নি, ভগবানের বাগানে। মা বলেছেন।'

অ্যানা শুনে অরুবাবুকে কোলে নিয়ে অনেক, অনেক আদর করে দিলে, আর বললে, 'সত্যি কথাই তো! আমারই কাল বলতে ভুল হয়ে গিয়েছিল। মায়ের কোলে বাচ্চারা সত্যিই দু'ভাবে আসে। এক, পেটের ভেতরের ম্যাজিক হয়ে, আর এক ইচ্ছের বাগানের ম্যাজিক হয়ে। দুটোই খুব আশ্চর্য, আর খুব ম্যাজিক্যাল কাণ্ড। অরুবাবু ইচ্ছের বাগানের ফুল। ও খুবই স্পেশাল। ভগবানের দেওয়া উপহার।' শুনে আনন্দে অরুবাবু নাচতে নাচতে বাড়িতে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে একথা বললে, 'মা, জানো, হোল ক্লাশের মধ্যে, পুরো ক্লাশটার মধ্যে আমিই স্পেশাল। একজনই মাত্র ভগবানের বাগান থেকে এসেছি! আমিই একা; কেবল আমার মায়ের ইচ্ছের ফুল হয়ে ফুটেছি!' এই অহংকারের কথা শুনে মার কেন যে কান্না পেয়ে গেল, তা অরুবাবুর মাথায় ঢোকে না। মা অরুবাবুকে কোলে করে কত আদর করলেন, 'আমার সোনা, আমার ধন, আমার সাতরাজার ধন মানিক' বলে, আর চোখ থেকে জল পড়তে লাগলো।

কেন যে সেদিন 'ধুমসো ধুমসো গা' শুনে মা হেসেছিলেন তাও অরুর মাথায় ঢোকেনি, আর এদিন কেন যে চোখে জল এসে গেল মায়ের, তাও অরুবাবু বুঝতে পারে না। আবার পরে আর একদিন, অরুবাবুরা তখন কলকাতাতে, ওখানে বাবুদাদার বিয়ে হচ্ছিল, অরুবাবু ধুতি-পাঞ্জাবি, মালা-চন্দন পরে নিতবর সেজেছে, বাবুদাদার সঙ্গে ময়ূরপঙ্খী মোটরে চড়ে বিয়েবাড়িতে যাবে। যখন সবাই রেডি, অরুবাবু হঠাৎ বলল, 'বাবুদাদা, বিয়ের পর তোমার পেট থেকে বেবি বেরুবে কবে? আমার সঙ্গে এসে খেলা করবে? নাকি তুমি ভগবানের বাগানে ফুল তুলতে যাবে?' সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। এতেই বা এত হাসির কী ছিল? নাঃ, বড়দের ব্যাপার-স্যাপার অরু সবসময় ঠিক ঠিক ধরতে পারে না। ভুরু কুঁচকে কত ভাবে, ভাবে...ভেবে আর কূল পায় না।

অরুবাবুদের দোতলার বারান্দা থেকে সমুদ্রে সূর্য-ডোবা দেখা যায়। ওদের বাড়ির কাছেই একটা জায়গার নাম 'সানসেট পয়েন্ট'। সেখানে অনেক লোকে দূর দূর থেকে গাড়ি করে সূর্য-ডোবা দেখতে আসে। আর অরুবাবু? মার সঙ্গে বারান্দায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই দেখতে পায় রোজ সূর্য কেমন আস্তে আস্তে গড়িয়ে গড়িয়ে সাঁতারের ইস্কুলের মস্ত বড় লাল বলটার মতন আকাশ থেকে সমুদ্রের জলের ওপর এসে পড়ে। ভেসে থাকে। বাবা বলেছেন, এখানে যখন রাত্রি হয়, ইনডিয়াতে তখন দিন। আর ইনডিয়াতে যখন সানসেট হয়, এখানে তখন সূর্য ওঠে।

ভোরবেলায় অরুবাবু যখন ওঠে, তখন সূর্য উঠছে কিনা দেখবার সময় থাকে না, ইস্কুলে বেরুবার তাড়া থাকে। তাই সন্ধ্যাবেলায় মা যখন বারান্দায় বসে চা খান, অরুবাবু তখনই ডিনার খায়, আর সানসেট দ্যাখে। অরুবাবু বলে, 'গুড নাইট, সূয্যিমামা। হ্যাভ এ নাইস ডে ইন ইনডিয়া। সে "হাই" ফর মি টু দিম্মা অ্যাণ্ড দাদু।'

দাদু-দিম্মা রোজ ভোরবেলা উঠে লেকে হাঁটতে যান। তাঁরা নিশ্চয় তখনই সূয্যিমামাকে 'গুড মর্নিং' বলেন, ঠিক যখন অরুবাবু বলে 'গুড় নাইট'। কেননা সমুদ্রের মধ্যে যখন একটু একটু করে নেমে যাচ্ছেন লাল টুকটুকে সূয্যিঠাকুর, ঠিক তক্ষুনি নিশ্চয় কলকাতাতে লেকের জলের ওপর তিনি একটু একটু করে ভেসে উঠছেন দাদু-দিম্মার চোখের সামনে। ভাবতেই এত ভালো লাগে অরুর। এই তো এক্ষুনি ওর কাছে 'গুড নাইট' করেই সূয্যিমামা টুক করে চলে গেল কলকাতাকে 'গুড মর্নিং' করবার জন্যে। চুষে-খাওয়া লাল লজেঞ্চুসের মতন অল্প-অল্প ছোট হতে হতে জলের মধ্যে হঠাৎ যেই ফুরিয়ে যায় সূর্যটা, অরু তক্ষুনি বলে ওঠে, 'মা, দাদু-দিম্মাকে এখন গিয়ে "হ্যালো, গুড মর্নিং" বলছে সূয্যিমামা, না গো?' মা বলেন, 'হ্যাঁ, বাবা, তাই তো।'

'সূয্যিমামা কক্ষণো ঘুমায় না, না মা?'

'না, বাবা, সূর্যকে কি ঘুমোলে চলে? সারা পৃথিবীকে প্রাণের যোগান দেবে কে? রোদ্দুরই তো প্রাণ।'

'তবে যেদিন বিষ্টি পড়ে, সূর্য ওঠে না, সেদিন কী হয়? সেদিন কি সূয্যিমামার জ্বর হয়, মা? তাই মেঘের লেপ চাপা দিয়ে শুয়ে থাকে?'

মা এবারে হেসে ফেলেন। 'ওরে ব্বাবা! এ যে আমার কবি-ছেলে হবে। তুমি প্লেন বানাবে, না প্লেন চালাবে, নাকি কবিতা লিখবে?'

অরুবাবু হাসতে হাসতে মারই কোলে মুখ লুকোয়, 'ধ্যুৎ।'

শারদীয় শুকতারা, ১৪০২

BanglaBook.org

সপ্তকাণ্ড

বসুমতীর কেরামতি

সীতা বেচারীর মনটা বড় বিষণ্ণ। রামের ওপরে রেগেমেগে তো হুট করে মায়ের কোলে চড়ে পাতালে চলে এসেছেন, ওদিকে ছোট ছোট ছেলেদুটো যে রয়ে গেল মর্ত্যধামে। তাদের কী হবে? বাপের তো ওই স্বভাব। ছেলেপুলের দিকে নজর দেবে না। সীতার চোখে ঘুম নেই।

মা বসুমতী চরের মুখে অযোধ্যার খবর পাচ্ছেন। শুনছেন সেখানেও শান্তি নেই। যদিও প্রজাদের কাছে রামচন্দ্রের মুখরক্ষে হয়েছে। লবকুশকে দেখবার পর থেকে প্রজারা আর তাঁকে গোপনে গোপনে আঁটকুড়ো রাজা বলে মনে করছে না। অযোধ্যায় গুজগুজ ফুসফুস তো কম চলত না? রামের রকমসকম প্রজাদের সুবিধের মনে হত না। সোনার প্রতিমা বউকে তাড়িয়ে দিয়ে, যে-লোক সোনার তৈরি পুতুল নিয়েই দিব্যি ঘর করতে পারে, তার মধ্যে বিলকুল কুছ না কুছ গড়বড় হ্যায়। নইলে যার পূজনীয় বাবার ঘরে তিনশো পঞ্চাশজন পত্নী ছিল; তার ঘরে কিনা একটাও নারী নেই? গতিক সুবিধের লাগত না। প্রজাদের ভাবনাচিন্তা রাজার কানেও এসে পৌঁছেছিল বলেই না বাল্মীকির আশ্রমে দূত পাঠানো? এখন জগজ্জনে জেনে গেছে যে, হ্যাঁ রামচন্দ্র দু'দুটো ব্যাটার বাপ বটে।

সত্যি বলতে কি, বসুমতী জানেন, এই লবকুশ যে জন্মেছিল, তা নেহাৎ তাঁর সখী মা-ষষ্ঠীর কৃপায়। সীতার প্রতি, তাঁর মমতার জন্যে। নইলে রামচন্দ্রের তো যত প্রেম মুখেই! লম্বা লম্বা অলংকার শাস্ত্রসম্মত কাব্যময় প্রণয়বাক্য রচনায় তিনি যত এক্সপার্ট, বিশুদ্ধ প্রণয়-কেলিতে তাঁর তত নৈপুণ্য নেই। রামচন্দ্রের চেয়ে এ-ব্যাপারে শ্মশানবাসী শিব ঢের ভালো। জটাজুটে গঙ্গাদেবীকে লুকিয়ে রেখে, বাম কোলে পার্বতীকে বসিয়ে, গাঁজাভাঙ করে দিব্যি মৌজে আছেন। বউ-অন্ত প্রাণ। তবে হ্যাঁ, ছেলেপুলের ব্যাপারে দেবদেবীদের ব্যবস্থাটা একটু আলাদা। পার্বতীর দুই ছেলে, গণেশ, কার্তিক, কেউই তাঁর গর্ভে জাত নয়। সেদিক থেকে লবকুশের কপাল ভালো। সীতা প্রকৃত অর্থেই তাঁদের গর্ভে ধারণ করেছেন। আর একবার দেখলে কাউকে বলে দিতে হবে না সীতার সন্তানদুটি কার মহান কীর্তি। অবিকল দুটি আরশির মতো। ছেলেরা বাপের ছায়া। তাদের চাঁদমুখ দু'খানি দেখেই প্রজাদের সব সন্দেহ দূর হয়েছিল। কিন্তু তারা শান্ত হলে হবে কি, রামচন্দ্রের যে শান্তি নেই। রামচন্দ্রের সন্দেহ বাতিকের জ্বালায় সীতা অতিষ্ঠ! কেবল কি একা রাবণকে? রামের যে সবাইকেই সন্দেহ। লক্ষ্মণের প্রতি তো চিরদিনের সন্দেহ ছিলই—এখন ভরত, শত্রুঘ্ন, মায় সুমন্ত্র পর্যন্ত কেউ ব যাচ্ছে না। সীতা লজ্জায় ঘেন্নায় কমপ্লেন

পর্যন্ত করতে পারছেন না শাশুড়িদের কাছে। এ-হেন অবস্থায় রাম আরেকদফা অগ্নিপরীক্ষার দিন স্থির করলেন।

বারবার পৃথিবীর মানুষের সামনে সিংহের সার্কাস দেখানোর মতন সীতাকে দিয়ে আগুনে ঝাঁপ দেওয়াতে রামের খুব ভালো লাগে। সীতা ঝাঁপ দেবেন, ম্যাজিকের মতন আগুন নিবে যাবে, অগ্নিদেব সশরীরে সীতাকে কোলে করে উঠে আসবেন —"এই মেয়ে দেবীতুল্যা, অপাপবিদ্ধা" বলে রামের হাতে তুলে দেবেন—এ দৃশ্য যারাই দেখবে তারা বিমোহিত হতে বাধ্য। অযোধ্যাতে কেউ এ ম্যাজিক-শোটা দেখেনি। ওটা হয়েছিল লঙ্কাপুরীতে।

রামরাজ্যে একবার এই পারফর্ম্যান্‌স্‌টা হওয়া দরকার। একটু যেন রাজভক্তিতে ভাঁটা পড়েছে ইদানীং। সদাসর্বদা সুখেস্বাচ্ছন্দ্যে থাকলে যা হয় আর কি—রামরাজ্যে লোকেদের অভ্যেস হয়ে গেছে। লোকে ভুলেই গেছে রামচন্দ্রের লঙ্কাবিজয়ের বৃত্তান্ত। হাজার হোক, যুদ্ধটা তো অযোধ্যাতে হয়নি? প্রজাদের গায়ে লাগেনি যুদ্ধের আঁচ —কাউকে আঙুলটিও নাড়তে হয়নি সীতা উদ্ধারের জন্যে। এ যুদ্ধে অযোধ্যাবাসীর রক্তপাত হয়নি, স্বজনবিচ্ছেদ ঘটেনি, অন্নসংকট হয়নি, ধর্মসংকট হয়নি যুদ্ধবিগ্রহে একটা দেশের যা যা লোকসান হয়, যা যা সমস্যা হয়, তার কিছুই হয়নি। এখানে। যে যুদ্ধের কোনো স্মৃতিই নেই, কেবল শোনা কথা, তাই নিয়ে আর কতদিন গর্ব করা পোষায়? হ্যাঁ 'যুদ্ধ' বুঝেছিল লঙ্কাবাসী, ধনেপ্রাণে ধ্বংস হয়ে গেছে তারা। অযোধ্যাবাসীরা তাদের নগরের নামের গুণে বেচে গেছে। অযোদ্ধা = যে ভূমিতে যুদ্ধ হয় না। কিন্তু সেই ভূমিতে নীচতা, কুটিলতা, হীনতা, দীনতা হয় না, অন্তর্দ্বন্দ্ব হয় না, গোপনে বিষ ঢালাঢালি হয় না, এমন তো নয়? সে সমস্তই হচ্ছিল।

প্রজারা যতই সুখে থাক, রামচন্দ্রের মনে না ছিল সুখ, না শান্তি। অনেক ভেবেচিন্তেই লক্ষ্মণকে পাঠিয়েছিলেন বাল্মীকির আশ্রমে যজ্ঞসভার নিমন্ত্রণপত্র দিয়ে। সবই প্ল্যান মতন ঠিকঠাক হচ্ছিল, হঠাৎ সীতা যে কী ছেলেমানুষী করে ফেললেন। কথা ছিল দৈব দৃশ্যের— সেটা অবশ্য ঘটেছে, কিন্তু তার ফল হল বিপরীত। ধরিত্রীকন্যা সীতারও ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলো—তিনি কেঁদে উঠে মায়ের কাছে ফিরে গেলেন। হবি তো হ' প্রজারাও সব কিনা সীতারই পক্ষে? তারা বলছে, "সীতার আবার সতীত্ব পরীক্ষা কী? পরীক্ষার রেজাল্ট তো দুই ছেলের মুখেই ছেপে বেরিয়ে গেছে!"

তারা বলছে—"মহারাজ রামচন্দ্রের বাপু সবতাতেই বাড়াবাড়ি।"

প্রজাদের দাবি—"সীতাদেবীকে ফেরৎ চাই। রাজ্যের রাজ্যলক্ষ্মীকে ফেরৎ চাই।"

এদিকে রামচন্দ্রকে ঠিক 'নিরহংকার পুরুষ' বলা যায় না। যে বৌ রাগ দেখিয়ে চলে গেছে, তার মান ভাঙাতে যাবেন রাম? নো স্যার! তিনি কেষ্টঠাকুর নন। তাঁর জীবনে মানভঞ্জনের পালা নেই।

কিন্তু প্রজারা সেকথা মানলে তো? মহা অশান্তি চলেছে সীতাকে নিয়ে অযোধ্যারাজ্যে।

বসুমতী শুনতে পান সবই।

এদিকে সীতারও পাতালে মন বসছে না। যদিও তাঁকে নাগরাজ্যে ব্রতেশ্বরী দেবী বলে পুজো করা হচ্ছে, যত্নআত্তির অ্যাটেনশনের কোনো অভাব নেই, জীবনে এত আদর জোটেনি আগে সীতার। কিছু চাইবার আগেই মা বসুমতী আদুরে মেয়ের জন্যে সেই জিনিসটি আনিয়ে রাখছেন। এমন মনোযোগ সীতা পাননি জীবনে, এক রাবণরাজার লঙ্কাদ্বীপে ছাড়া। তা সে তো মনোযোগ নয়, সে ছিলো গোলযোগ। ব্রতেশ্বরী হয়ে সীতার মন্দ লাগছে না। পাতালবাসীরা তাঁকে দেবী বলে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছে, নৈবেদ্য দেয়, পুজো দেয়, প্রার্থনা জানায়, ভজন শোনায়। সীতার গুণগান করে তাঁর মন ভালো রাখে। সীতাও যথাসাধ্য ভক্তদের প্রার্থনা পূরণ করেন তাঁর লক্ষ্মীর ঝাঁপি থেকে। মায়ের সংসারে আনন্দের বান ডেকেছে—এমনভাবে সীতাকে কোনোদিনই কোলে পাননি বসুমতী। মেয়ে মায়ের বাড়ি এসেছে, আহা কত, কত, কতকাল পরে।

সবই তো ভালো, এদিকে সীতার মন যে কিছুতেই বাগ মানে না? তাঁর হয়েছে এক জ্বালা! তাঁর ঘাস দেখলেও 'লবকুশ', ফল দেখলেও 'লবকুশ', নাগেদের ছেলেপুলেরা ইশকুলে যাচ্ছে বই-শেলেট নিয়ে, সেই দৃশ্য দেখলেও হায় 'লবকুশ'। এমনি করলে চলবে কেন? শরীর যে ভেঙে পড়বে। মা বসুমতী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। হাতে করে মিষ্টান্ন ধরে বসেই থাকবে সীতা, মুখে তুলতে পারবে না। "লবটা বড্ড মিঠাই খেতে ভালোবাসে।" মাছের মুড়োটি পাতের একপাশে ঠেলে দেবে। "আহা মুড়ো খেতে কুশ দারুণ এক্সপার্ট!" সূয্যি উঠছে, "আহা কেমন সুন্দর মিঠে গোলাপী আকাশটা, ঠিক যেন লব সোনার গালদুটি!" ফালি চাঁদ উঠলে, "আহা, আজ চাঁদের মুখখানি ঠিক যেন আমার কুশের কপালটির মতন।"

মা বসুমতীর আর সহ্য হল না। তিনি বাসুকী নাগকে ডেকে পাঠালেন। মহাবলী, মহাতেজা বাসুকী এলেন। "—বাসুকী, বাছা, একটা ব্যবস্থা তো করতে হয়। সীতা তো দেখছি আস্তে আস্তে ক্ষেপে উঠছে। ছেলেদের কাছে না পেয়ে মেয়েটার মাথার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তুমি যাও, যেমন করে পারো অযোধ্যার রাজপুরী থেকে আমার নাতিদুটিকে এখানে ধরে নিয়ে এসো। রাম যেন আবার দেখে-টেখে না ফেলেন! একদম চুপচাপ ছেলেদুটিকে সরিয়ে ফেলে—সিধে আমার কাছে এনে দেবে। কী? পারবে তো?" বাসুকী হেসে বললেন—"কী যে বলেন মা, এটুকু পারবো না? আমি হচ্ছি বাসুকী, দুটো বাচ্চা ছেলেকে কিডন্যাপ করতে পারবো না? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" বসুমতী হাসলেন। মর্ত্যের ঘাসে বকুলফুল, কামিনীফুল ঝরে পড়ল। সুবাসে পরিপূর্ণ হল দশদিক।

বাসুকী চললেন অযোধ্যানগরীতে। সীতার মন ভালো করে দিতে হবে। সন্তান বিহনে কি মায়ের মনে আনন্দ থাকে? দিনে একশোবার পুজো পেলেই কি তাতে শান্তি পাওয়া যায়? ব্রতেশ্বরীর বুকের মধ্যে যে আরেকটা ব্রত আছে। পুত্রেষ্টিব্রত।

অযোধ্যায় লবকুশ ছাড়া-গরু হয়ে ঘুরে বেড়ায়। রামচন্দ্রের ওদের দিকে নজর দেবার

সময় কই? ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করা তাঁর অভ্যেসও নেই। আশ্রমে কঠোর ডিসিপ্লিন ছিল—বাল্মীকির নিয়মকানুনের এদিক-উদিক হবার যো ছিল না। তার ওপরে সীতার চব্বিশ ঘণ্টার কড়া নজর।

এখানে বাল্মীকি নেই, সীতাও নেই, রাজবাড়িতে মহারাজের আদুরে দুলাল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দুজনে। তাদের শাসন করবার কেউ নেই। তাদের কোনো বাঁধন নেই। তারা যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছে, যেখানে খুশি যাচ্ছে, যা ইচ্ছে তাই খাচ্ছে। পড়ে না। কারুর কথা শোনে না। যাকে বলে ঐ "এ-য় চড়ে নাচছে দু'ভাই", অবিকল তাই। সাঁতরে সরযূনদী এপার ওপার করছে, নারকোলগাছে উঠে ডাব পেড়ে খাচ্ছে, ভরদুপুরে খাঁ খাঁ তেপান্তরে ঘোড়দৌড় প্র্যাকটিস করছে। মা চলে গিয়ে অবধি ওরা কেমন জেদী, আর একগুঁয়ে প্রকৃতির হয়ে উঠছে দিন-কে-দিন। সুমন্ত্র তো সেদিন রাজপুত্তুরদের বকুনিই দিয়ে ফেললেন। রথ ছুটিয়ে দুই ভাই চলে গেছে সেই শতযোজন দূরে ক্ষুধাজিৎ রাজার রাজ্যে। ফিরল যখন ঘোড়াদের অবস্থাও কাহিল, নিজেদেরও তাই। ভয়ডর বলে তো কিছু নেই প্রাণে। সেই আশ্রমবাস থেকেই অসম সাহসী দু'জনে, আর অস্ত্রবিদ্যায় অতটা পারদর্শিতা এ বয়সে রামলক্ষ্মণেরও আর নেই। তবু বয়স আর কতটুকু? বিচারবুদ্ধি তো পাকেনি?

তবু লক্ষ্মণকে মানে একটু আধটু, আর ভালোবাসে কেবল হনুমানকে। বাপের কোনো কথায় তারা কান দেয় না। রাম কিছু বললে, অন্যদিকে তাকিয়ে থেকে গুনগুন করে রামায়ণ গান ভাঁজে।

—প্রাসাদসুদ্ধ সবাই টের পাচ্ছে, হ্যাঁ এ রামচন্দ্রের রক্ত! রামও বুঝেছেন, বুঝেছেন এরা বাপের ব্যাটা হয়েছে, জেদীর চূড়ামণি। সীতারই ওপরে রাগ হয়ে যাচ্ছে—সে এখানে থাকলে ওরা এমন হ'ত না। কে সীতা থাকতে তো এরকম মূর্তি বেরোয়নি? এমন বদরাগী হয়ে গেছে মেয়েটা বনবাসে থেকে থেকে, যে কিছু বলতে না বলতেই একেবারে বিস্ফোরণ! চটেমটে জন্মের শোধ যে চলে গেলি, কচি ছেলেদুটোর কথাও একবার ভাবলি না? সত্যি, মেয়েমানুষের অত রাগ ভালো নয়।

একদিকে ছেলেগুলোর এই দশা, অন্যদিকে প্রজারা চাপ দিচ্ছে "আমাদের রাণী ফেরৎ চাই।" রাম মুশকিলে পড়েছেন। ভাবছেন, বাল্মীকিকে ডেকে পাঠাবেন, একটু পরামর্শ করতে। সীতাকে যদি ফিরিয়ে আনতে পারেন।

বাসুকী খেলার মাঠের একটা গর্ত থেকে সাবধানে একটুখানি মুখ বাড়ালেন।

উঁকি মেরে দেখলেন, লবকুশ মাঠে নেট প্র্যাকটিস করছে। লব বল করছে, কুশ ব্যাটে। শত্রুঘ্নর ছেলেরা ফিলডিং করছে। লক্ষ্মণের ছেলেরা ব্যাট করবে বলে অপেক্ষায় আছে। ভরতের ছেলেরা, তাদের বাবার মতন, মামার বাড়িতে গেছে।

বাসুকী টুক করে রূপ বদলে ফেললেন। হৃষ্টপুষ্ট একটি মেঠো ইঁদুর হয়ে তিনি গর্ত থেকে বেরিয়ে এলেন, পুট করে বলটি নিয়ে এক দৌড়ে গর্তের মধ্যে সেঁদিয়ে গেলেন।

অমনি "ধর ধর" করে লব তো ধাওয়া করে তেড়ে গেল একেবারে ইঁদুরের

গর্তের ভেতরে। তার পেছু পেছু গর্তের ভেতরে ঢুকে পড়েছে কুশও। অন্যান্য ভাইয়েরা হঠাৎ অমন গর্তের ভেতর ঢুকে পড়বার ঝুঁকি নিতে সাহস করলে না।

বাসুকীর প্ল্যান কমপ্লিট সাকসেস, দুটো বাচ্চাকে কিডন্যাপ করতে তাঁর কোনো পরিশ্রমই হোলো না। লবকুশ নিজেরাই সুড়ঙ্গপথে শোঁও-ও-ও করে নেমে এসে ঝুপ করে একেবারে দিদিমার কোলের মধ্যিখানটিতে পড়লেন। বাসুকী এবারে নিজরূপ ধারণ করে বলটি লবকে ফিরিয়ে দিলেন। আর হাসি হাসি মুখে বললেন—"তোমাদের মামার বাড়িতে নিয়ে এলুম। ইনি তোমাদের দিদিমা।"

লবকুশ বললে—"চিনি, চিনি, আমার মাকে তো ইনিই নিয়ে এসেছেন।" বসুমতী দুই নাতি কোলে পাতালের সিংহাসন আলো করে বসলেন। দাসীদের বললেন —"যাও মা, তোমরা শিগগির দিদিমণিকে খবর দাওগে। বলো আমি ডেকেছি।"

দিদিমার কোলে বসামাত্র লবকুশের অন্তর যেন শীতল জলে ধুয়ে গেল। তাদের সব জ্বালা জুড়িয়ে গেল। সব দুঃখু গলে গেল। সব দুষ্টুমি শান্ত হয়ে গেল। সব জেদীপনা বাতাসে উবে গেল। বসুমতীর আদরে তাদের ঘুমে চোখ জড়িয়ে এলো।

—"মা কই?" তারই মধ্যে লবকুশ বললে।

—"দিদিমা, আমাদের মা কই?"

—"ঐ যে, তোমাদের মা আসছেন।"

বিষাদপ্রতিমা সীতা মায়ের ঘরে ঢুকলেন। লঙ্কার বাগিচাতেও তাঁকে এত ম্রিয়মাণ লাগেনি। স্বামীবিরহ কষ্টের, কিন্তু সন্তানবিরহ আরও কষ্টের। ঘরে ঢুকে তো সীতার চক্ষুস্থির। এ কি সত্য? না মা বসুমতীর মায়া? এ কি পাতালে একসঙ্গে চাঁদসূর্যির উদয়?

—"মা! মা মা!"

—"আমার সোনামণি! আমার ধনমণি!"

—"মা! মা! মা!"

—"আমার লবুয়াই! আমার কুশুয়াই!"

—"মা! মা! মা!" তিনজন তিনজনকে জড়িয়ে ধরেছে।

—"থাক। মা তো রইলেন। তোমরা দাদাভাইরা এখন যাও তো ছুট্টে গিয়ে পাতালগঙ্গার মিষ্টিজলে হাতপামুখ ধুয়ে আচমন করে এসো, তোমাদের জলখাবার দিচ্ছি। খেতে খেতে গপ্পো করবে মায়ের সঙ্গে।" বসুমতী অর্ডার করলেন। নাগেদের দেশের জলখাবার! সে তো ত্রিভুবন-বিখ্যাত। লবকুশ ছুটল হাতপা ধুয়ে আসতে। সীতা গিয়ে বসুমতীকে জড়িয়ে ধরলেন।

—"মা, তুমি সব বোঝো। তুমি সব পারো।"

বসুমতী হাসলেন।

মর্ত্যধামে স্বর্ণচাঁপা ফুটলো। গন্ধে ভরে গেল আকাশ বাতাস।

লবকুশকে পেয়ে অবধি সীতার চোখেমুখে হাসি উপছে পড়ছে। ব্রতেশ্বরীর মন্দিরে

BanglaBook.org

দেবীর ঐজ্জ্বল্য শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে এসে লবকুশেরও অন্য মূর্তি। নাগেদের মধ্যে প্রচণ্ড কড়া ডিসিপ্লিন—নাগশিশুরা যথেচ্ছ বিহার করে না। তারা সুশৃঙ্খল জীবনে অভ্যস্থ। লবকুশ এখানে এসে তাদেরই মতন হয়েছে। নাগ-বালকদের সঙ্গে তারা কত কি শিখছে। কঠিন অস্ত্রবিদ্যা তো তারা জানতই, আর জানত রামায়ণ গান করতে। এখানে শিখল সেবা শুশ্রূষা, সেলাই ফোঁড়াই, রান্নাবান্না, নৃত্যগীত, নাট্যাভিনয়, যোগাসন, কুংফু, ক্যারাটে। এমনিভাবে লবকুশ নাগলোকে থেকেই অযোধ্যার রাজসিংহাসনের জন্য প্রস্তুত হতে থাকল। সীতার মনে যত আহ্লাদ, বসুমতীর প্রাণে তত শান্তি। রামচন্দ্রের ওপর মান-অভিমানের কথা মনেই রইল না যেন তাঁদের।

অযোধ্যানগরী উথালপাথাল।

প্রজারা ক্ষেপে উঠেছে।

লবকুশকে পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রথমে সীতাদেবী। তারপরে লবকুশ। নিশ্চয় রামচন্দ্রই কোথাও সরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর তো যত মায়ামমতা সব কেবল লক্ষ্মণ আর ভরত-শত্রুঘ্নর ছেলেগুলির ওপরে। তাই তো এতদিন লবকুশকে আনেনইনি প্রাসাদে। লবকুশ ওঁর চোখের বালি। রামই নিশ্চয় কিছুমিছু করেটরেছেন।

এতদিন তারা "সীতা চাই। সীতা চাই!" শ্লোগান দিয়ে শোভাযাত্রা বের করছিল, এবার অন্য পথ ধরল।

লাগাতার অযোধ্যা বনধ চলবে যদ্দিন না লবকুশকে পাওয়া যাচ্ছে। সীতাসমেত লবকুশকে ফিরিয়ে দিতে হবে অযোধ্যাবাসীদের কাছে। প্রজাদের মেজাজের গরমে রামরাজ্য গলে যায় আর কি। দোকানপাট বাজারহাট সব বন্ধ। বিদেশ থেকে ব্যাপারীরা বাণিজ্য করতে এসে ফিরে যাচ্ছে। ভ্রমণকারীরা বেড়াতে এসে না পাচ্ছে রথ, না অশ্ব, না সরাইখানা। সব বন্ধ। তারা উপবনে বসে ক্যাম্পিং করে উপবনগুলোর বারোটা বাজিয়ে দিয়ে ফিরে যাচ্ছে। সরযূনদীতে নৌকা চলাচল বন্ধ। জেলেরা মাছ ধরছে না। চাষীরা ক্ষেতে যাচ্ছে না। সর্বাত্মক বনধ। এভাবে চললে সবাই ধনেপ্রাণে মারা পড়বে।

রামচন্দ্রের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

ভাবছিলেন· যৌবরাজ্যে অভিষেকের দিন স্থির করবেন—সব রাজপুত্রদের এক একটি রাজ্যের যুবরাজ ঘোষণা করে দেবেন—এরই মধ্যে এই কাণ্ড।

গেলই বা কোথায় দুরন্ত ছেলেদুটো?

রামচন্দ্র চতুর্দিকে চর পাঠালেন। দূরে দূরে। ওদের যেমন বেপরোয়া স্বভাব, কে জানে কোন্ সুদূর পরদেশে চলে গেছে?

কিন্তু না। অশ্বশালে সবগুলি ঘোড়া মজুত। রথও নেয়নি। ঘোড়াও না, নৌকাও না। পায়ে হেঁটে কত দূরে যাবে?

চরেরা ফিরে এল। লবকুশ কোথাও নেই। শুনে প্রজারা আরো ক্ষেপে উঠছে।

কোথায় তাদের শেষবার দেখা গেছে?

BanglaBook.org

খেলার মাঠে।

কে দেখেছে?

লক্ষ্মণের ছেলেরা, শত্রুঘ্নের ছেলেরা।

ডাকো তাদের।

কোথায় গেল লবকুশ?

—"বল খুঁজতে খুঁজতে ইঁদুরের গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে হারিয়ে গেছে।"

—"ইয়ার্কি মারার সময় এটা না, সত্য বলো।"

—"সত্যই বলছি। বল খুঁজতে খুঁজতে"—

—"ইঁদুরের গর্তের মধ্যে ঢুকে হারিয়ে গেল।"

রাজা রামচন্দ্র বজ্রনির্ঘোষে ভেঙচি কাটেন প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রদের। তাঁর ধৈর্য থাকছে না।

—"সত্য বলো! তোমরা না ইক্ষ্বাকু বংশের রাজপুত্র? তোমাদের আত্মসম্মান কই?"

—"সত্যই তো বলছি। তাত মহারাজ।"

রাজপুত্তুর বেচারীরা কেঁদে ফেলল। সেই কান্না দেখে, মাঠের ইঁদুরদের আর কেঁচোদের মনে দুঃখু হোলো। রামরাজ্য বলে কথা! তক্ষুনি ইঁদুর আর কেঁচো সেধে সেধে রাজসভাতে এসে সাক্ষী দিলে।

—"রাজপুত্রেরা সত্যিকথাই বলছেন। আমরাও দেখেছি, লবকুশ দুজনেই বিবরে প্রবেশ করেছেন লালরঙের ডিউসবলের পিছু পিছু। আর নিষ্ক্রান্ত হননি। বিবরেও তাঁরা নেই।"

রামচন্দ্র বুঝতে পারলেন এ তাহলে মা বসুমতীর কারসাজি।

তখন মন্ত্রীসভা ডেকে পরামর্শ চাইলেন রাম। কী করা? মন্ত্রীরা বললেন—

—দূত পাঠানো হোক। বসুমতী মায়ের কাছে সবিনয়ে রামচন্দ্র তাঁর পুত্রদের ফেরৎ চান। বলুন, যৌবরাজ্য ঘোষণার দিন এসে যাচ্ছে। বসুমতী নিশ্চয়ই ছেলেদের আটকে রাখবেন না।

কিন্তু পাতালরাজ্যে যাবে কে?

দূতেরা কেউই নাগরাজ্যে যেতে রাজী নয়। ও বাবা! সাপের রাজ্যে কে যাবে? অগত্যা রাম সুমন্ত্রকেই বললেন।

কিন্তু রথ তো বিবরে প্রবেশ করবে না। সুমন্ত্র বুদ্ধি দিলেন—"মহারাজ। সর্বত্রগামী কেবল একজনই। তিনি পবনপুত্র মহাবলী হনুমান। আপনি তাঁকেই অনুরোধ করে দেখুন।" হনুমান তো এককথায় রাজী। ল্যাজ খাড়া করে রেডি। মুহূর্তের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ক্ষুদ্র হয়ে বিবরে প্রবিষ্ট হয়ে পাতালরাজ্যের স্বর্ণতোরণের দরজার সামনে হাজির।

কিন্তু বসুমতীও চরের মুখে সংবাদ পেয়ে, তোরণ বন্ধ করে দিয়ে, নিজেই গিয়ে দরজায় দাঁড়ালেন। হনুমান এবার পড়লেন মুশকিলে। এ তো আর লঙ্কাদেবীর কেস নয়। ইনি সসাগরা বসুন্ধরা। সীতার মা। রামের শাশুড়ি। এঁকে থাবড়া মারবার

BanglaBook.org

চিন্তাই করা যায় না। হনুমান সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে প্রণাম করলেন বসুমতীকে। তাঁর শ্রীচরণে রামচন্দ্রের পাঠানো উপঢৌকন, হীরামাণিক্যের মালাটি নিবেদন করলেন। আশীর্বাদ করে বসুমতী বললেন— "থাক থাক। বল, শুনি, কী বার্তা এনেছ, বাছা?" হনুমান করযোড়ে নিবেদন করলেন রামচন্দ্রের যা কিছু বক্তব্য। সীতাকে ফিরিয়ে নিতেই এসেছেন। সীতার বিহনে রামচন্দ্র বিশেষ দুঃখী হয়ে রয়েছেন। বড্ড একাকী হয়ে আছেন। উপযুক্ত কথা বলার মতো সঙ্গী নেই। তাছাড়া বাচ্চাদের কষ্ট হচ্ছিল। মা না হলে কি শিশুর লালন পালন অন্যে পারে?

বসুমতী আবার হাসলেন। বললেন—"বুঝেছি। সীতার মতামতটাও তো চাই? তিনি ব্রতেশ্বরীর মন্দিরে দেবীমূর্তির অভ্যন্তরে বসবাস করেন। কারুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেন না আর।"

হনুমান বললেন—"দেবী, তবে আমাকে সেই মন্দিরেই নিয়ে চলুন, সীতামায়ী আমার জননী। আমি তাঁর পুত্র।" বলে গলায় সীতার আশীর্বাদী চন্দ্রমণির হারটি দেখালেন।

হার দেখেও বসুমতী বললেন—"বুঝলাম। কিন্তু বাছা, আমি তো তোমাকে কখনো দেখিনি। আমি তোমার অনুরোধ রাখতে পারলুম না। আমাকে মার্জনা করো।" বলে তিনি তোরণদ্বার বন্ধ করে দিলেন। হনুমান তো অথৈ জলে। এবার? তিনি রাজপথের ধারে একটি বৃক্ষে চড়ে বসে রইলেন। হঠাৎ দেখেন একদল মেয়ে ছোট গেটটি খুলে ভিতরে ঢুকছে। তারা কলসিতে করে পাতালগঙ্গার জল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ব্রতেশ্বরীর মন্দিরে। এক বৃদ্ধা একটু পিছিয়ে পড়েছেন। হনুমান সন্ন্যাসীর রূপ ধরে গাছ থেকে নেমে এসে বৃদ্ধাকে বললেন—"মা, আপনি যখন মন্দিরে জল ঢালবেন, আমার এই আংটিটি মায়ের পায়ে দয়া করে নিবেদন করবেন কি?"

বৃদ্ধা তাতে রাজী হয়ে আংটি নিয়ে গেলেন।

সীতাদেবী ব্রতেশ্বরী হয়ে ভক্তের পুজো নিচ্ছেন, হঠাৎ দেখেন পায়ের ওপরে পড়েছে রামচন্দ্রের মোহর দেওয়া অঙ্গুরীয়।

সীতার অঙ্গ রোমাঞ্চিত হল। তিনি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এ আংটি তুমি কোথায় পেলে?"

বৃদ্ধা জানালেন, তোরণের বাইরে এক গাছ থেকে নেমে একজন সন্ন্যাসী তাকে এই আংটিটা দিয়েছেন পুজোতে দেবার জন্যে। শুনেই সীতা দেবীকে ছেড়ে ছুট এলেন প্রাসাদে। বসুমতী বড়ি দিচ্ছিলেন। চমৎকার রোদ।

—"মা! মাগো, মহাবীর হনুমান তোরণদ্বারে এসেছেন, তাঁকে ভিতরে নিয়ে এসো? তিনি আমার পুত্রতুল্য, অতি আপনজন।"

"পুত্রতুল্যই তো?" বসুমতী বললেন, "পুত্র তো নয়? আমি ভালো বুঝেছি বলেই তাকে ঢুকতে দিইনি। মুখে, সে তোমাকে ফিরিয়ে নিতে চাইছে, প্রকৃতপক্ষে তার ইচ্ছা লবকুশকে হাতানো। তোমার এতে আপত্তি না থাকে তো বলো, তাকে ডেকে আনছি।" সীতা ম্লানমুখে বললেন—"না মা। তবে থাক্।" তোরণদ্বার খুলল না। হনুমান বুঝলেন, তাঁর দৌত্য অসফল। অগত্যা তিনি ভগ্নহৃদয়ে রামের কাছে ফিরে গেলেন।

মহাবীর হনুমান যে কোনো কার্যে ব্যর্থ হতে পারেন, এ রামের অকল্পনীয়। কিন্তু এ ব্যর্থতার কারণ আলাদা। হনুমান তো মোটে সংগ্রামে বলপ্রয়োগ করেননি, কৌশলও করেননি। সীতামায়ীর তিনি সন্তানতুল্য। সেখানে এসবের প্রশ্ন নেই। হার-জিতেরও প্রশ্ন নেই। কী হবে তবে? লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন রামচন্দ্র।

লক্ষ্মণ বললেন, "ঠিক আছে। আপনি যখন বলছেন। কিন্তু হনুমান যখন পারেননি তখন আমি কি পারব? হাইলি আনলাইকলি। প্রথম কথা, আমি গর্তে ঢুকব কেমন করে?" হনুমান বললেন—"সেটা কোনও ব্যাপার নয়। আমিই আপনাকে পিঠে করে নিয়ে যাব—আমি অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ হলে আপনিও অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ হয়ে যাবেন। কুছ প্রবলেম নেহি হ্যায়।" তাই হোলো। হনুমানের ম্যাজিক অপ্রতিরোধ্য। এবার হনুমান আর লক্ষ্মণ দুজনে গিয়ে পাতাল-তোরণে কড়া নাড়লেন। এবারও দরজা খুললেন মা বসুমতী নিজে। দেবর লক্ষ্মণকে দেখে তাঁর আর না করার উপায় রইল না। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে দুজনকে যত্ন করে নিয়ে গেলেন, অন্দরমহলে। আদর করে বসালেন সাতপুরু রেশমী শয্যায়। শীতল বাদাম-পেস্তার শরবৎ, ক্ষীর কমলা, সাতরকমের মিষ্টান্ন সোনার থালায় পরিবেশন করে, খবর পাঠালেন সীতাকে।

সীতা এলেন।

—"এসো ভাই লক্ষ্মণ, এসো বৎস হনুমন্ত, তারপর? অযোধ্যার খবর কী? আর্যপুত্রের কুশল তো? মায়েরা কেমন আছেন? আমার বোনেরা ভালো তো? ভরত-শত্রুঘ্ন?"

প্রণাম করে হনুমান বললেন—"মা, আপনার আশীর্বাদে সকলেই কুশলে আছেন। কিন্তু রামচন্দ্রের মন ভালো নেই। লবকুশের কুশল তো?"

প্রণাম করে লক্ষ্মণ বললেন—"চলুন বৌদি, আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি। প্রজারা মহা গণ্ডগোল বাধিয়েছে। আপনি না গেলে শান্ত হবে না।"

সীতা মৃদু হেসে বললেন—"অন্য কথা বলো ভাই ঠাকুরপো। ও কথাটি বোলো না।"

লক্ষ্মণ, হনুমান দুই বীর, সীতার দুই প্রিয়জন, আপ্রাণ চেষ্টা করেও সীতাকে রাজী করাতে পারলেন না।

তখন লক্ষ্মণ লবকুশকে দেখার অনুমতি চাইলেন। তারা তখন পাঠাগারে। লক্ষ্মণ জানলা দিয়ে দেখলেন দুই ভাই নিবিষ্টমনে পড়াশুনো করছে। মণিময় দীপের আলোয় তাদের মুখে মনোনিবেশের রেখাগুলি স্পষ্ট।

সেই দৃশ্যে লক্ষ্মণের চোখ, মন ভরে গেল।

লক্ষ্মণের তাদের ধ্যানভঙ্গের ইচ্ছে হলো না। এই বালকেরাই তো অযোধ্যানগরীতে প্রায় দুর্বৃত্ত হয়ে ওঠার পথে গিয়েছিল। এখানে তাদের চিন্তামগ্নমূর্তি লক্ষ্মণকে মোহিত করল। তিনি ওদের ডাকতে পারলেন না। পা টিপে টিপে চলে এলেন।

সাহস করে কি লক্ষ্মণ কি হনুমান কেউই সীতার কাছে লবকুশকে নিয়ে যাবার প্রসঙ্গটা পাড়তেই পারলেন না। সীতা বললেন

BanglaBook.org

—"আবার এমনি করে মাঝে মাঝে এসো ঠাকুরপো, এসো বাছা হনুমন্ত, তোমাদের বাক্য শুনলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়, মুখ দেখলে আয়ু বাড়ে। তোমাদের কল্যাণ হোক।"

অগত্যা, মুখ ফুটে বার্তাটা বলতেই না পেরে, বসুমতীকে প্রণাম করে, সীতাকে প্রণাম করে দুই বীর শূন্যহাতে অযোধ্যায় ফিরে এলেন। লক্ষ্মণকেও ব্যর্থকাম হয়ে ফিরতে দেখে রামচন্দ্র তো খাপ্পা। এদিকে প্রজাদের সামলে রাখা যাচ্ছে না। লাগাতার অযোধ্যা বন্ধ চলেছেই। মরীয়া হয়ে রামচন্দ্র বললেন—"ঠিক আছে, হনুমানের সঙ্গে এবারে আমি যাচ্ছি। দেখি কেমন সীতা না আসেন?" অহংকারের মাথা খেয়ে, রাগ করে চলে যাওয়া বউকে ফিরিয়ে আনতে এবার রাঘবকুলরত্ন রাজা রামচন্দ্র অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ হয়ে হনুমানের পিঠে চড়ে পাতালরাজ্যে এসে নামলেন। সঙ্গে সঙ্গে আপনাআপনি তোরণদ্বারের একশোটা সোনার ঘণ্টা বাজতে লাগলো। ভেরী, তূর্য, কাড়া, নাকাড়া সব নিনাদিত হোলো, বাসুকী বসুমতী, লবকুশ, আর নাগরাজ্যের যত বাসিন্দা, সবাই যে যেখানে ছিলেন, ছুটে বেরিয়ে এলেন তোরণদ্বারে। নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্র রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, তাঁদের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন।

অভ্যর্থনার অভাব হল না। লবকুশ দৌড়ে এসে, "বাবা!" বলে প্রণাম করল হাসিমুখে। রাম বললেন, "দীর্ঘজীবী হও।" মা বসুমতী এসে ধূপদীপ দিয়ে রামকে বরণ করলেন। রাম আভূমি প্রণত হলেন। যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে বসুমতী রামচন্দ্র এবং হনুমানকে অন্দরমহলে নিয়ে গেলেন। লবকুশকে দেখে মনে হোলো ওরা রামের চেয়েও হনুমানকে দেখে অনেক বেশি খুশি। গতবারে তো দেখা হয়নি। তার আগের বারে তো ঢুকতেই পাননি হনুমান। লবকুশ হনুমানকে ধরে টানতে টানতে কুঞ্জবনে নিয়ে খেলতে চলে গেল লাফাতে লাফাতে। হনুমান ছোটদের সঙ্গে খেলতে ওস্তাদ। বাসুকীকে রামের সেবায় বসিয়ে রেখে বসুমতী গেলেন রান্নাঘরের বন্দোবস্ত করতে। রাজ্যিশুদ্ধু সবাই এলো, শুধু সীতা এলেন না। ব্রতেশ্বরীর মন্দিরে খবর পাঠিয়ে, সোনার থালায় জামাই আদর সজিয়ে নিয়ে এসে বসুমতী দেখলেন রামচন্দ্র গোমড়ামুখে দক্ষিণের জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছেন। বাসুকী বাঁয়ের জানলা দিয়ে। কী ব্যাপার?

রামচন্দ্রের সামনে রাজভোগ, নাগভোগ, দেবভোগ ধরে দিতে দিতে বসুমতী বললেন—"কি হোলো? সীতা আসেনি?" রামচন্দ্র মাথা দোলালেন। সীতা আসেননি। বসুমতী এবার আসলকথায় চলে এলেন। তিনি অধিক বাক্যের মানুষ নন।

—"তুমি কি লবকুশকে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছ বাবাজীবন?" হাঁহাঁ করে উঠে রাম বললেন—"আজ্ঞে না, না, না, না। তিনজনকেই ফিরিয়ে নিতে এসেছি। প্রজারা যে লাগাতার বনধ ডেকেছে। রামরাজ্য বুঝি ছারখার হওয়ার পথে। অযোধ্যা তচনচ। 'সীতা চাই! সীতা চাই!' শ্লোগান দিচ্ছে 'লবকুশকে ফেরৎ আনো'—'যৌবরাজ্য ঘোষণা করো' এইসব শ্লোগান তালপাতাতে লিখে ঝাণ্ডা তুলে শোভাযাত্রা করছে। এরপরে হয়তো— 'রাজা রাম নিপাত যাও' বলতে পারে। বড়ো দুর্বিপাকে পড়েই আপনাদের কাছে এসেছি দেবী।"

বসুন্ধরা বাসুকীর দিকে তাকালেন। বাসুকী বেরিয়ে গেলেন।

বসুমতীর সঙ্গে রামচন্দ্রের কী কথা যে হোলো তাঁরাই জানেন।

তারপরেই হনুমানের দুই কাঁধে চড়ে দুই ভাই আনন্দে ভাসতে ভাসতে সেইখানে এসে পড়লেন। সবাই মিলে গল্প শুরু হোলো। সীতা এলেন না।

সেদিন রাত্রে আকাশে শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ। বাতাসে ফাল্গুন। নাগকেশরের সুবাসে নাগরাজ্য মাতাল।

—সীতার দোরে টোকা পড়ল।

—"আমি রাম। দরজা খোল।"

—দরজা খুলল না।

—একটু ইতস্তত করে গলা ঝেড়ে নিয়ে রামচন্দ্র বললেন—"একটা কথা ছিল তোমার সঙ্গে খুব জরুরি, দরজা খোলো।"

—দরজা খুলল না।

—উলটে ভিতরের দীপটিও নিবে গেল।

পরের দিন ভোরবেলা হনুমান এসে বসুমতীকে প্রণাম করে সীতা আর লবকুশকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

বসুমতী বললেন—"বাবাজীবন, আমি নাচার। তোমার প্রার্থনার শুধু আধখানাই আমি পূরণ করতে পারি। বাকী আধখানা পারবো না। সীতা স্বাধীন মেয়ে। তার নিজের বোধ-বুদ্ধি মতন চলে। এখানে ব্রতেশ্বরীর মন্দিরে বহু সম্মানে অধিষ্ঠাত্রী দেবী হয়ে আছে সে। ভক্তদের এত আদর, ভালোবাসা, এত শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ছেড়ে সে কেমন করে চলে যাবে? আর কেনই বা যাবে? সে তো তোমার কাছে এমন প্রতিষ্ঠা পায়নি? সীতাকে তুমি আর অযোধ্যায় ফেরত পাবে বলে মনে হয় না। কিন্তু বালক যুবরাজদের কথা আলাদা। তাদের প্রাপ্য সিংহাসন থেকে তাদের আমরা বঞ্চিত করব না। তুমি লবকুশকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারো, যদি আমার শর্তদুটি মানো। তা নইলে নয়।"

—"শর্তদুটি কী-কী?" রাম সাবধানে জিজ্ঞেস করলেন।

—"প্রথম শর্ত, হনুমানকে ওদের সর্বক্ষণের গার্জেন করে দেবে। তোমার অযত্নে, অবহেলায় ওরা নষ্ট হবার পথে যাচ্ছিল। তেমন দেখলে আবার নিয়ে আসব, আর ছাড়ব না। তবে হনুমানকে ভার দিলে, ওরা আনন্দে থাকবে, যত্নে থাকবে। সুশিক্ষা পাবে।

"দ্বিতীয় শর্ত, প্রতি বেস্পতিবার ব্রতেশ্বরীর মন্দির সাফসুতরোর জন্যে বন্ধ থাকে। তাই ওই দিনটি হয়ে যায় সীতামায়ের মন কেমন করার দিন। শর্ত এই যে, সপ্তাহে ঐ একটা দিন লবকুশকে ছুটি দিতে হবে। ওরা সেদিন বেড়াতে আসবে পাতালরাজ্যে, ওদের মায়ের কোলে খেলা করবে। তা নইলে সীতার মন ভালো থাকবে না। কী, রাজী?"

একটু থেমে বসুমতী হালকা গলায় জুড়ে দিলেন—"ইচ্ছে করলে অবিশ্যি ওদের বাবাও হপ্তায় হপ্তায় আসতে পরেন, কিম্বা মাঝে-মধ্যে। তাতে কোনো বাধা নেই।"

শুনবামাত্র আহ্লাদে আটশোখানা হয়ে মহাবীর হনুমান একটি বিপুল লাফ দিয়ে 'হুউপ্' করে ঘরের মণিময় স্তম্ভের মাথায় উঠে পড়লেন। পরমুহূর্তেই আর একটি ঝাঁপ মেরে 'ঝুউপ' করে মর্মর মেঝের ওপরে পড়লেন। রামচন্দ্র সেই দৃশ্য দেখে মৃদু হেসে বললেন, —"আমি রাজী।"

সঙ্গে সঙ্গে ব্রতেশ্বরীর মন্দিরের উঠোনে নাগকেশর ফুলের রাশ ঝরে পড়লো, আর মর্ত্যভূমি মেতে উঠলো তার সৌরভে।

লক্ষ্মণের হাসি

আহা, আমার এতদিন বেঁচে থাকাটা তবে সার্থক হল।—মুখে পানটা দিয়ে, বললেন জননী কৌশল্যা। কৈকেয়ী জোরে জোরে সুপুরি কুচোতে লাগলেন কেবল। আর সুমিত্রা পানের খিলি করতে করতে মুখ তুলে একগাল হাসলেন। আজ অযোধ্যানগরী আহ্লাদে উছলে উঠেছে। পথে পথে পুষ্পপত্রের তোরণ। রাস্তার দু'পাশে রংবেরঙের সিল্কের পতাকা উড়ছে, মোড়ে মোড়ে গীতবাদ্য, নাটা-নৃত্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজ শহরের মানুষেরা সকলেই ছেলেপুলের হাত ধরে পথে নেমে পড়েছে, সারা শহর পুষ্পসৌরভে, ধূপের গন্ধে, আতরের সুবাসে ম ম করছে। আনন্দ যেন ধরে না।

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক ভালয় ভালয় হয়ে গেল। রাজপুরোহিত বশিষ্ঠমুনি মন্ত্র পড়ে রামের মাথায় ইক্ষ্বাকুবংশের মর্যাদামণ্ডিত রাজমুকুটটি পরিয়ে দিয়েছেন। হাতে তুলে দিয়েছেন রত্নখচিত রাজদণ্ড। আর চোদ্দবছর অধীর প্রতীক্ষার পর ভরত নিজের হাতে দাদার পায়ে পরিয়ে দিয়েছেন তাঁর পাদুকাদুটি, সিংহাসন থেকে তুলে নিয়ে। পতিগরবিনী সীতাকে সাদরে বাম অঙ্কে বসিয়ে, তবেই রামচন্দ্র সিংহাসন গ্রহণ করেছেন। সালংকারা, পট্টবস্ত্রশোভিতা সীতার বরতনুটি এতদিনের ধকলে বেশ কৃশ, কিন্তু তাঁর মুখে সদ্য ফোটা স্থলপদ্মের মতো লাজুক গোলাপী আভা। রামচন্দ্রকে চামর দোলাচ্ছেন ভরত, শত্রুঘ্ন। লক্ষ্মণ বসে আছেন পায়ের কাছে। এতদিন অনেক সেবা করেছেন। রাম আজ বলেছেন, "আর করতে হবে না, একটু বিশ্রাম করো এবারে।" সভাগৃহ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মুনিঋষিদের আগমনে, আকাশ থেকে দেবতারা পুষ্পবর্ষণ করেছেন, কেবল শিবঠাকুরটি সশরীরে চলেই এসেছেন সভাস্থলে। রামচন্দ্রের পট্টাভিষেকে তাঁর দুঃখদিনের সাথীরা সবাই উপস্থিত হয়েছেন, হনুমান, জাম্বুবান, সুগ্রীব, অঙ্গদ, বিভীষণ, কেউ বাদ নেই। গুণিজন সমাবেশে সভার দ্যুতি বেড়ে গিয়েছে। রামের প্রশস্তি-বাক্য পাঠ করছেন এক এক করে মুনিঋষিরা—হঠাৎ যেন "খুঁক খুঁক" করে একটা হাসির শব্দ হল। কেউ হাসি চাপতে চেষ্টা করছে।

দেখা গেল রামের পদতলে বসে থাকা লক্ষ্মণ মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসি চাপছেন। হাসি তো নয়, সভায় যেন বোমা পড়ল—এত অসময়ে এমন বিদঘুটে হাস্য! এই প্রশান্ত, গম্ভীর মুহূর্তে, যখন শ্রীরামচন্দ্র তাঁর পূর্বপুরুষের গুরুদায়িত্ব বুঝে নেবার ইচ্ছায় মনঃসংযোগ করেছেন, সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ সর্বান্তঃকরণে তাঁর মঙ্গল প্রার্থনা করছেন, ঠিক তখনই এই বেসুরো বেআক্কেলে হাসি? আবার কিনা তাও স্বয়ং লক্ষ্মণের মুখে? সভা স্তব্ধ হয়ে গেল। যে পুণ্যমুহূর্তটির প্রতীক্ষায় অযোধ্যাবাসীর কত দুঃখ, কত যন্ত্রণা গেছে, কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু কত ধ্বংসের পথ পার হয়ে এসেছে সেই আকাঙ্ক্ষিত শুভক্ষণ—এই মহালগ্নে লক্ষ্মণ কিনা খুক খুক করে হেসে ফেললেন? কী নিদারুণ পরিহাস? ফালা ফালা হয়ে গেল সভার মন্ত্রপূত, শুদ্ধ সম্ভ্রান্ত আবহাওয়া। ভয়ানক চমকে উঠলেন সভাস্থ সকলে। রাম, সীতা, দু'জনেই শিহরিত হয়ে লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। রামের পদ্মপলাশলোচন রোষ-কোপায়িত হয়ে উঠেছে, সীতার হরিণনয়ন দুটি সন্ত্রস্ত, সচকিত। রামচন্দ্র মনে মনে চিন্তা করলেন— "ও, বুঝেছি। রাক্ষসের ঘর থেকে তুলে এনে অপহৃতা সীতাকে আমি রাজ্ঞীর মর্যাদা দিয়েছি, তাই লক্ষ্মণের অত হাসি পেয়েছে। দাঁড়াও, হাসি বের করছি।" নিঃশব্দে তাঁর হাত তরবারির হাতলে মুষ্টিবদ্ধ হল। সীতা সেই দেখে শিউরে উঠলেন। তাঁরও মনে হয়েছে, সভাতে সবার মধ্যে রাম তাঁকে যে কোলে বসিয়েছেন আদর করে,—অনুজ লক্ষ্মণের বোধ হয় এতেই হাসি পেয়ে গেছে। শুধু কি রাম আর সীতা? সভাস্থ প্রতিটি জনের মনেই প্রশ্ন জেগেছে। জেগেছে বিস্ময়, এটা কেমন কাণ্ড হল। সীতার মন খুব খারাপ—"ছি ছি, আমার এত আদরের দেওর, সেও কিনা আমাকে দেখে হাসছে? কী লজ্জা!"

শিবঠাকুর ভাবলেন, "আমি কিনা জটাজুটের মধ্যে লুকিয়ে গঙ্গাদেবীকে নিয়ে এসেছি, লক্ষ্মণব্যাটা নির্ঘাৎ ওঁকে দেখতে পেয়ে হাসছে। তা, হাসে হাসুক সে, আমার ভারী বয়েই গেল।" শিবের তো বয়েই গেল, কিন্তু মা-গঙ্গারও যে অবিকল তাই মনে হচ্ছে। "—আমি কিনা লুকিয়ে লুকিয়ে বিনা নেমন্তন্নেই রামের রাজ্যাভিষেক দেখতে এসেছি সরযূর তীরে, লক্ষ্মণ তাই হাসছে," গঙ্গার মুখটি মলিন হয়ে গেল, তাঁর স্ফটিকস্বচ্ছ জল গেরুয়া রং দেখাতে লাগল, তাঁর খরস্রোত ধীরগতি হয়ে গেল, তাঁর কুলুকুলু ধ্বনিটি স্তব্ধ হয়ে গেল।

মন বিভীষণেরও খুব খারাপ। লক্ষ্মণ যেমন দাদা রামের ভক্ত, বিভীষণ তো তেমন দাদা রাবণের ভক্ত নন? বরং তিনিই রামকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে রাবণের প্রাণ তাঁর নাভিতে, অমৃতভাণ্ডে গচ্ছিত আছে। রাম সেই অমৃতভাণ্ডে শরনিক্ষেপ করে রাবণবধ করেছেন। লক্ষ্মণ নিশ্চয় ভাবছেন রাজ্যলোভে আর রাজ্ঞী মন্দোদরীকে ভার্য্যা হিসেবে পাবার লোভে, বিভীষণ ভ্রাতৃহত্যায় সহায় হয়েছেন। 'বিশ্বাসঘাতক' মনে করে লক্ষ্মণ তাঁর প্রতিই বিদ্রূপ করে ওভাবে হাসলেন। বিভীষণের চোখ বুজে এল, লজ্জায়, ক্ষোভে। লক্ষ্মণ জানেন না কি, হায়, বিভীষণ কেন রামের ভক্ত?

সুগ্রীবের এদিকে ঠিক বিভীষণের মতো অবস্থা। তিনি রামের সাহায্যে বালিবধ করিয়েছেন। তিনি অবশ্য বিভীষণের মতো নীতিবাগীশ নন, ক্ষমতালোভের কূট

কারণেই বালিহত্যা। আর তারাসুন্দরীর প্রতি লোভও তাঁর ছিলই। লক্ষ্মণ তাঁর বৌদিকে মাতৃসমা দ্যাখেন। সুগ্রীব ঠিক তার উলটো। সুগ্রীবেরও লক্ষ্মণের কাছে খুব লজ্জা করতে লাগল। লক্ষ্মণ নিশ্চয় সুগ্রীবের দিকে চেয়েই হেসেছেন, রাজ্যলোভী, পরদারলোভী, ভ্রাতৃহন্তা সুগ্রীবের প্রতি শ্লেষের হাসি। সুগ্রীবের কালো মুখটিও আরও কালো হয়ে গেল। তাঁর পাশেই ছিলেন বালির পুত্র বীর অঙ্গদ। অঙ্গদের মনে হল, লক্ষ্মণের হাস্যটি বুঝি তাঁকেই উদ্দেশ্য করে। যে রামচন্দ্র তাঁর পিতার হন্তারক, সেই রামের পত্নী উদ্ধার করতেই অঙ্গদ নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে লড়াই করে এসেছেন। তাঁর মাকে সুগ্রীব বিবাহ করেছেন, তাঁর পিতার সিংহাসনেও সুগ্রীব—অথচ তিনি সেই রাম-সুগ্রীবের মিত্র। এজন্য উপহাস করেছেন তাঁকে লক্ষ্মণ। অঙ্গদের মুখ সুগ্রীবের চেয়েও কালো দেখাতে লাগল।

আর বীর হনুমান কী ভাবলেন? তিনিও হাসিটা লক্ষ্য করেছেন। তিনি ভাবলেন, "আমি যতই বলশালী, যতই বিক্রমশালী হই না কেন, আলাদা করে সঞ্জীবনীসুধাটি তো চিনতে পারিনি। সমগ্র বিশল্যকরণীর ভেষজের পাহাড়সুদ্ধ উপড়ে এনেছিলাম —লক্ষ্মণেরই জীবন রক্ষা করতে। সেই অজ্ঞতার কথা ভেবেই লক্ষ্মণ হাসছে নিশ্চয়। তাছাড়া আমাদের ল্যাজ নিয়ে চিরদিনই খ্যাপায়।—তা হাসে হাসুক। আমি না বাঁচালে, বাছাধনকে আজ আর হাসতে হত না।" শিবঠাকুরের মতোই পবনপুত্র হাসিটা হেসে উড়িয়ে দিলেন।

আর জাম্বুবান ভাবলেন, "আমি কিনা একটু মোটাসোটা গাব্দাগোব্দা ভাল্লুকমানুষ, একটু হেলেদুলে হাঁটি, পা'গুলো আঁকাবাঁকা পড়ে, সেই ভেবেই লক্ষ্মণের হাসি পেয়েছে। তা এতদিন পরে আজই এত খ্যাকখ্যাক করে হেসে ওঠার আছেটা কী?"—জাম্বুবানের মুখে বিরক্তি ফুটল মাত্র। শেষনাগ ছিলেন শিবের গলায় মাফলারের মতন জড়িয়ে। তাঁর মনে হল লক্ষ্মণ তাঁকে দেখে হাসছেন। "বিষ্ণু যখন অনন্তশয়নে ছিলেন, তখন তো আমিই ছাতা হয়ে তাঁর মাথা রক্ষে করেছিলাম। আজ শিবের গলায় মাফলার হয়ে তাঁর ওই বিষে ডামেজড গলাটা রক্ষা করছি।—লক্ষ্মণ তার অসম্পূর্ণ জ্ঞানে ভাবছে আমি বুঝি ক্রোস ক্রসিং করে একবার শৈব, আর একবার বৈষ্ণব হচ্ছি।" ফোঁস করে শিবের কানের মধ্যে এক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন উনি। পৃথিবী একটু কেঁপে উঠল কি? ভরত, শত্রুঘ্ন চামর দোলাতে দোলাতে লক্ষ্মণের হাসি দেখলেন, আর ভরতের মুখটি মলিন হয়ে গেল। ভরত ভাবলেন—"আমাকে চামর দোলাতে দেখেই লক্ষ্মণ হাসছে। কেননা আমারই কুচক্রী মা কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রে এতকাল জ্বালাযন্ত্রণা ভোগ গেল সক্কলের। আজই আমার মায়ের পরিকল্পিত আমার জন্য সেই রাজত্ব খতম। সেইজন্যেই লক্ষ্মণ হাসছে।" শত্রুঘ্নও একইরকম চিন্তা করলেন, আর সহোদর লক্ষ্মণ নয়, ভরতের মা কৈকেয়ীর ওপর ভীষণ চটে উঠলেন। রাগে তাঁর দাঁত কড়মড় করে উঠল। তাঁকে তাঁর বোম্বাইয়ের ফিল্মী নেমসেক 'বিহারীবাবু'র মতন দেখাতে লাগল।

মুহূর্তের মধ্যে অভিষেক সভায় অন্ধকার নেমে এল। যেন সহস্রদীপ কেউ একসঙ্গে নিবিয়ে দিয়েছে। মানুষের হৃদয়ের আনন্দের দীপ্তিই যে ঘরকে প্রধানত

আলো করে রাখে—তা আরও একবার প্রমাণ হল। রামচন্দ্র দেখলেন, সকলের মুখ অন্ধকার। তিনি ভাবলেন, সকলেই বুঝি 'লক্ষ্মণের মতো' করে ভাবছে। "রাক্ষসের কবলে দীর্ঘদিন বন্দিনী নারীকে আবার ফিরিয়ে এনে আহ্লাদ করে কোলে বসিয়ে রানী করা হচ্ছে। কত অসৈরণই সইতে হবে।" রামের তখন সদ্য মাথায় রাজ-মুকুট, হাতে রাজদণ্ড। তাঁর চট্ করে বেজায় রাগ হয়ে গেল। রাজারাজড়ার যেমন ধারা মেজাজ গরম হবার কথা। হট করে তিনি কোষ থেকে তরবারি টানতে গেলেন। "এক্ষুণি ওর গলা কাটব, —আমার ভাইই হোক, আর যেই হোক, ওরই প্রশ্রয়ে সভাসুদ্ধ পার্ষদগণ নিঃশব্দে আমাকে উপহাস করছে।" ঠিক এই সময়ে রামের উত্তেজিত মুঠোর ওপরে একগুচ্ছ যুঁইফুলের মালার মতন টুক করে এসে পড়ল সীতার নরম একটি করপল্লব। রামচন্দ্র আর তাঁর তরবারি কোষমুক্ত করতে পারলেন না।

আর তখনই লক্ষ্মণ উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মাথায় তখনও বনবাসের জটাজুট —পরনে যদিও রাজপুত্রবেশ। লক্ষ্মণ সভাস্থ সকল গণ্যমান্য সজ্জনদের প্রণতি জানিয়ে তাঁদের কাছে ক্ষমাভিক্ষা করলেন। তিনি স্বীকার করলেন—হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, অমন বিনা নোটিসে হেসে ওঠাটা মোটেই সামাজিকভাবে শুভঙ্কর নয়। বিনা কারণের হাস্য ভীষণ বিপজ্জনক। তা থেকে নানান বিভ্রান্তি সম্ভব, নানান ভুল বোঝাবুঝি ঘটতেই পারে। কিন্তু লক্ষ্মণ এই সভায় সর্বসমক্ষে এখনই নিবেদন করতে চান, তিনি কেন হাসি সংবরণ করতে পারেননি। তারপর লক্ষ্মণ ভক্তিভরে নতজানু হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। রামচন্দ্রের সামনে নতজানু হয়ে বসে লক্ষ্মণ বললেন—"দাদাভাই, মহামান্য রাজামশাই, আপনারা আমাকে মার্জনা করুন। ওই গুরুগম্ভীর পুণ্যলগ্নে অমন খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে ফেলা আমার প্রবল অপরাধ হয়েছে, কিন্তু আমার কোনও উপায় ছিল না। অপরাধ নেবেন না, কিন্তু দোষ আমার নয়, দোষ আমার দুই চোখের। এই আনন্দে চোখ ভরে দেখার জন্যে আমি দুটি চোখ যে মেলে রাখব, তাই পারছি না। আপনাদের অসাক্ষাতে নিদ্রাদেবী তেড়ে এসে আমার জাগরণ-পরিশ্রান্ত নেত্রপক্ষ্মে ভর করেছেন। আর কি তিনি সময় পেলেন না? চোদ্দ বছর অপেক্ষার পরে মাত্র একটা দিনও তাঁর তর সইল না? কী অপ্রাজ্ঞ, কী বিচিত্র এই অধীরতা।—আমি হেসে ফেলেছি কেননা ঘুমে আমার দুই চোখের পাতা জড়িয়ে এক হয়ে যাচ্ছিল। দুর্দান্ত বন্যার মতো নিদ্রা এসে আমার চেতনাকে গ্রাস করছে। একসময়ে জলদগম্ভীর মেঘগর্জনের মতই খুড়ুক খুড়ুক নাক ডেকে ফেলেছিলাম সেই গাঢ় তন্দ্রার মধ্যেই। ভাগ্যিস মহাত্মা বশিষ্ঠ তখন সংস্কৃতে স্তোত্রপাঠ করছিলেন, সকলের কান ওদিকেই ছিল, তাই আপনারা সেই প্রাকৃতধ্বনি শুনতে পাননি। কিন্তু আমি নিজে তো শুনে ফেলেছি, সেই শুনেই তন্দ্রাটা ভাঙল। তাই না-হেসে পারিনি, চোদ্দ বছরই যদি অপেক্ষা করলি, দু'ঘণ্টা বেশি করলে কী ক্ষতি হত?" "—চোদ্দ বছর অপেক্ষা মানে?" সভাসুদ্ধ সকলে সমস্বরে কোরাসে প্রশ্ন করেন। লক্ষ্মণের কথার মাথামুণ্ডু তাঁরা বুঝতে পারেন না। কী বলছেন লক্ষ্মণ? লক্ষ্মণ একে-একে প্রত্যেকের মুখপানে দৃষ্টিপাত করলেন, দেখলেন, রাম, সীতা,

ভরত, শত্রুঘ্ন সকলের চোখেই এক প্রশ্ন। তখন করজোড়ে সবিনয়ে লক্ষ্মণ সভাস্থ সকলকে এক আশ্চর্য কাহিনী শোনালেন। লক্ষ্মণ বললেন—

"চোদ্দবছর বনবাসের সময়ে আমি দিবানিশি জাগ্রত থেকে শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীকে পাহারা দিতাম। প্রথম প্রথম নিদ্রাদেবীর সঙ্গে প্রতি রাত্রে আমার তুমুল সংগ্রাম বেধে যেত। শেষকালে একরাত্রে দেখি, বারংবার আমার সঙ্গে ইচ্ছার দ্বন্দ্বে পরাজিত হয়ে কোমলহৃদয়া, কোমলাঙ্গী, মৃদুস্বভাবা নিদ্রাদেবী তাঁর পদ্মফুলের মতো দুটি পা চোরকাঁটাতে ভরা ঘাসের ওপর ছড়িয়ে কাঁদতে বসেছেন। তাঁর আশপাশে ফণিমনসার জঙ্গল। তাতে উত্তরীয় আটকে গেছে, আর শেয়ালকাঁটার ঝোপ, তাতে পায়ের নূপুর বেধে গেছে, সেসব কিছুই তাঁর খেয়াল নেই। কেঁদে কেঁদে টানাটানা কাজলনয়ন দুটি পলাশফুল হয়ে উঠেছে। দেবীর মুখটি দেখে আমার তখন খুব মায়া হল। আমি তাঁকে বললাম—'হে দেবি! প্রতিদিন এই যুদ্ধ করে কী লাভ? আমি এখন চোদ্দ বছর ঘুমোবোই না। আপনি আমায় ছেড়ে দিন।' নিদ্রাদেবী কাঁদতে কাঁদতে বললেন—'ছেড়ে কী করে দেব? তারপর বছর শেষে হিসেব মেলাবো কেমন করে? অত এক্সট্রা ঘুম কেমন করে আমার ভাঁড়ারে বাকি থেকে গেল? তার মানে আমি ঠিকমতন বরাদ্দ বিলি করিনি। কাজে ফাঁকি দিয়েছি।' বলেই তিনি আবার কেঁদে ফেললেন।"— লক্ষ্মণের কথা শুনতে শুনতে রাজসভায় একটু একটু করে আলো ফিরছে। তিনি বললেন, "তখন আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। আমি বললাম, 'দেবি! আপনি বরং অযোধ্যাপুরীতে যান, সেখানে আমার বউ ঊর্মিলা আছে।' অমনি নিদ্রাদেবী বলে উঠলেন—'সেও তো ঘুমোচ্ছে না। কেঁদে কেঁদে, জেগে-জেগেই রাত কাবার করে দিচ্ছে। তোমরা দুজনেই আমাকে ডোবালে।' আমি ঊর্মিলার খবর শুনে দুঃখ পেয়ে বললাম, 'দেবি! আপনাকে ভালো বুদ্ধি দিচ্ছি। আপনি ঊর্মিলাকে গিয়ে বলুন আমিই আপনাকে পাঠিয়েছি—সে যেন আর কাঁদে না। তার বরাদ্দ ঘুম আর আমার বরাদ্দ ঘুম, এই ডবল ঘুমই আপনি ঊর্মিলার দুই চোখে ভরে দিন। তাহলে সে দিনে-রাতে চব্বিশ ঘণ্টাই ঘুমোবে। চোদ্দ বছর পরে আমি নিজে গিয়ে তার ঘুমটি ভাঙাব। এই ব্যবস্থায় ঊর্মিলার বিরহব্যথাও থাকবে না, আর শ্বশুরবাড়ির ডিউটি করার ঝামেলাও চুকে যাবে। এতে আপনার হিসেবও মিলে যাবে, আমিও হিংস্র পশু, দত্যিদানোর আক্রমণ থেকে দাদা বৌদিকে রক্ষা করতে পারব। আমি চোদ্দ বছর বিনিদ্র থাকি, ঊর্মিলা চোদ্দ বছর নিদ্রিতা থাকুক। রামরাজ্য এলে, দু'জনে ঠিক নিয়মমতো ঘুমোব। আমার নাম করে বললেই ঊর্মিলা আপনার কথা শুনবে, ঠিক ঘুমিয়ে পড়বে।' শুনে নিদ্রাদেবী 'তথাস্তু' বলে চলে গেলেন অযোধ্যায়। আর তাঁকে দেখিনি, আজ এই সভাস্থলে তিনি উড়ে এসে আমার চক্ষু জুড়ে বসেছেন, আজ আমি যুদ্ধে পেরে উঠছি না, দেহ-মন আমার রণক্লান্ত—তাই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তখন অল্প একটু নাকও ডেকে ফেলেছি,—আপনারা প্লীজ কিছু মনে করবেন না, হেসে ফেলেছি বলে।"

সকলেই এবার হেসে উঠলেন। মুহূর্তে সহস্র হীরকের দ্যুতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সভাগৃহ। শিবের জটায় গঙ্গা কুলুকুলু শব্দে নেচে উঠলেন। হনুমান, সুগ্রীব

আর অঙ্গদ, পরস্পরকে লেজের ঝাপটা মেরে অট্ট হাসলেন। শিবের কানে একটু মৃদু সুড়সুড়ি দিয়ে দিলেন শেষনাগ, যাতে শিবও খলখল হাস্য করলেন। মনে মনে ভরত-শত্রুঘ্ন মুখ চাওয়াচাওয়ি করে একসঙ্গে বলে উঠলেন— "লক্ষ্মণকে এবার বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দিলে হত না? বৌদি?" সীতা বললেন, "ওকে উর্মিলার মহলে নিয়ে যাও, আহা ও কি ঘাড় মুখ গুঁজে রামচন্দ্রের পায়ের কাছেই ঘুমিয়ে পড়ল?"

সকলেই খুশি, কেবল রামচন্দ্রের মুখের দূর্বাদলশ্যাম রংটি অমাবস্যার মতো ঘন নীল হয়ে এল। সীতা প্রমাদ গুনলেন। নির্ঘাৎ বড় কোনও গড়বড় হয়েছে। সীতার কথামতন ভরত-শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণকে ধরে টেনে তুলতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু লক্ষ্মণ ঘুমে এলিয়ে পড়ছেন। সভাস্থল প্রকম্পিত করে তাঁর প্রবল নাসিকা গর্জন হচ্ছে। তাতে কেউই হাসছেন না, সকলেই মনে মনে লজ্জিত। শ্রদ্ধায় মায়ায় সবার হৃদয় পরিপূর্ণ। এমন একনিষ্ঠ ভ্রাতৃপ্রেম জগতে কেউ আর দেখেনি। সুগ্রীব মরমে মরে যাচ্ছেন। বুঝি বিভীষণও কিছুটা লজ্জিত।

শ্রীরামচন্দ্র এবার চোখ তুললেন। যে দুটি কমলনয়ন ক্রোধে রক্তিম হয়েছিল, এখন সেখানে দুটি নীল দীঘি টলমল করছে। অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে রামচন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "সভা ভঙ্গ হল। আমরা এখন লক্ষ্মণকে উর্মিলার কাছে পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।" ভরত-শত্রুঘ্ন-হনুমান-জাম্বুবান হ্যাঁচকা টানে লক্ষ্মণকে মেঝে থেকে তুলে দাঁড় করিয়ে, বলতে লাগলেন, "জাগো, ভাই লক্ষ্মণ, এই কি ঘুমের সময়? সুন্দরী উর্মিলার কাছে যেতে হবে না? আহা, বিরহিনী উর্মিলা চোদ্দ বছর তোমার মুখ দেখেনি—এখন এ-সভায় তুমি কী করছ, ওঠো, ঘরে চলো"—হেসে সীতা বললেন—"নিদ্রাদেবীকে বরং লঙ্কায় পাঠিয়ে দাও, একটুখানির জন্য তোমাদের দু'জনেরই চোখ থেকে নিদ্রা দূর হোক"—রাম চুপ করে রইলেন। ভরত-শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণকে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন দেখে রাম আর গেলেন না—তিনি উদ্যানের দিকে হাঁটা দিলেন। সীতা টের পেলেন স্বামীর মন অত্যন্ত উতলা হয়েছে। তিনি রামের হাতদুটি জড়িয়ে ধরে একটু অন্তরালে নিয়ে গিয়ে বললেন— "কী হয়েছে নাথ? কেন আপনি এত বিচলিত বোধ করছেন? সবই তো ভালোয় ভালোয় হয়ে গেল।" রামচন্দ্র আর থাকতে পারলেন না। তাঁর চোখ থেকে টপ্ টপ্ করে মুক্তাফলের মতো অশ্রু ঝরে পড়ল। "কোথায় ভাল?—সীতা। সীতা। আমি যে রাবণের চেয়েও মন্দ লোক। আমার দেবতুল্য ভাই লক্ষ্মণ, আমি তাকেই জবাই করব বলে তরোয়াল তুলছিলুম। তোমার লক্ষ্মী হাতটি এসেই আমাকে বাঁচাল। এত নীচমনা এত পাপাত্মা আমি, —আমার যে নরকেও স্থান হবে না সীতা?" সীতা রামের কথায় খুব ভয় পেয়ে গেলেন। জবাই? লক্ষ্মণকে? অতি দুঃখে যেমন, অতি সুখেও কি তবে মানুষের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে? এতদিন পরে আজকের পূর্ণ আনন্দের চাপ কি তবে রামচন্দ্র সহ্য করতে পারছেন না? মাথাটা বিগড়েই গেছে ওঁর। এই চোখ গরম করছিলেন, এই চোখের জল ফেলছেন। আবার বলেন কি না লক্ষ্মণকে কাটব? তবু যদি না সীতা স্বকর্ণে শুনতেন লক্ষ্মণের শক্তিশেল হতে রামের ভ্রাতৃশোক : "সীতা গেলে

ফের সীতা হবে। ভাই গেলে ভাই হবে না", বলে সুর করে গান গেয়ে কাঁদছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রের সেই চেহারা আর সভাগৃহের এই চেহারায় মিল নেই। দুটোই সীতার অবশ্য খুব অপছন্দের। সীতা বললেন—"স্বামী। মহারাজ, আপনার কথায় কিছু ভুল হচ্ছে। আপনি কক্ষণও আপনার স্নেহের ভাই লক্ষ্মণকে কেটে ফেলতে চাননি। কেনই বা হঠাৎ এমন দুর্বুদ্ধি আপনার মনে আসবে? না, না—এ যে হতেই পারে না প্রভু।" এবারে রাম ডুকরে কেঁদে উঠলেন। রামচন্দ্র বললেন—"যা হতে পারে না, তাই হয়েছে সীতা। আমি লক্ষ্মণকে অবিশ্বাস করেছিলাম। ওই যে ও হেসে উঠল, আমার মনে প্রশ্ন জাগল। কেন, হাসছে কেন লক্ষ্মণ? তবে কি রাক্ষসপুরীবাসিনী সীতাকে অযোধ্যার রাজসিংহাসনে স্থাপন করেছি, তাই হাসছে? তোমার মুখের দিকে চেয়ে দেখি তোমার চোখের দীপ্তি নিবে গেছে, সেখানে ভীত-চকিত এক মৃগীর দৃষ্টি। বুঝলাম তোমার মনেও হয়তো একই ভাবনা। তোমার মলিন মুখখানি দেখে আমি আর বুদ্ধি-যুক্তির বশে ছিলাম না। তোমার চোখ আমাকে ক্ষেপিয়ে দিল। আমি লক্ষ্মণকে হত্যা করতে তরোয়ালে হাত দিয়েছিলাম। সেই ভয়ংকর মহাপাপ থেকে আমাকে রক্ষা করলে তুমিই। আর পরমুহূর্তেই লক্ষ্মণ স্বয়ং কথা কয়ে উঠল। লক্ষ্মণ জানে না, কিন্তু মনে মনে আমি তো নিজের কাছে চির অপরাধী হয়ে রইলাম। সীতা? আর কি আমার লক্ষ্মণের সঙ্গে মুখ তুলে কথা কইবার অধিকার আছে?"

সীতাদেবী চোখ মুদে, গালে হাত রেখে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিটি বাক্য খুব মন দিয়ে শুনলেন। তারপর, রামচন্দ্রের অশ্রু নিজের সোনার শাড়ির আঁচলে মুছিয়ে দিয়ে, তাঁর সিক্ত মুখটি নিজের দুই হাতে ধরে ধীরে ধীরে বললেন—"স্বামিন। সত্যিই আপনার মহাপাপ হয়েছে। দণ্ডকারণ্যে আমিও একবার লক্ষ্মণকে অবিশ্বাস করেছিলাম —তারই ফলে আমাকে গভীর দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে। আমি শুধু তাকে পরুষবাক্যই বলেছিলাম, তার প্রাণ নিতে চাইনি। আপনি যে আরও বেশি অপরাধী প্রভু। জানি না। এ পাপের জন্য কোন শাস্তি আমাদের ভাগ্যে লেখা আছে। নাথ, একটিমাত্র পথই এখন খোলা। অপরাধ স্বীকার করে মার্জনা প্রার্থনা করুন। চলুন আমরা উর্মিলার প্রাসাদে যাই, সেখানে ভাইদের সামনে আপনি লক্ষ্মণের কাছে নতজানু হয়ে ক্ষমা চান। জানি, সেই কনিষ্ঠ, কিন্তু পাপী যে সবার চেয়ে ছোট, মহারাজ। অহং বিসর্জন দিন, বিনয় সহকারে, লক্ষ্মণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তা হলে নিশ্চয় সব ঠিক হয়ে যাবে।"

রাজা রামচন্দ্রের একটুও পছন্দ হল না সীতার সদুপদেশ। ছোট ভাইয়ের পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে মাপ চাইতে হবে। কাকে, না সদ্য রাজ্যাভিষিক্ত মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রকে! আবার বলতেও হবে, গোপন অপরাধের কাহিনী, উচ্চারণ করতে হবে নিজের মুখে। যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর? সীতার মলিন মুখটি দেখেই না রাগে লক্ষ্মণের মুণ্ডচ্ছেদ করতে ইচ্ছে হয়েছিল? যত নষ্টের মূল এই সীতা। এই ধরিত্রীপুত্রী।

"কই, যাবেন না? চলুন উর্মিলার মহলে যাই।"

BanglaBook.org

সীতার তাড়ায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও রামচন্দ্র পা বাড়ালেন। তিনি নির্বোধ নন, নিরক্ষরও নন, রাজা হলেও পাপ-পুণ্যের ধারণা এখনও তাঁর মাথায় খানিকটা আছে। তিনি গুটিগুটি সীতার পিছু পিছু উর্মিলার প্রাসাদে চললেন।

লক্ষ্মণের প্রাসাদে না পৌঁছতেই আরেক কাণ্ড। ভরত শত্রুঘ্নর সঙ্গে পথেই দেখা হয়ে গেল। "সে কি দাদাবৌদি, আপনারা? ওকে দোরগোড়ায় ছেড়ে দিয়েই চলে এসেছি, চোদ্দ বছর পরে স্বামীস্ত্রীর সাক্ষাৎ হবে তো? এখন কি আমাদের সেখানে উপস্থিত থাকা উচিৎ?" ভরত কাঁচুমাচু হয়ে ঘাড় চুলকে কথাটা বলেই ফেললেন।

সীতা বললেন, "কিন্তু আমাদের বিশেষ জরুরি একটা দরকার ছিল লক্ষ্মণের সঙ্গে—।" শত্রুঘ্ন বেশি কথার মানুষ নন, সোজাই বললেন, "এখন না। আপনাদের যাওয়াটা এখনই ঠিক হবে না। অপেক্ষা করুন।"

রাম যেন হাতে চাঁদ পেয়েছেন। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন তিনি। মধুর হেসে সীতার হাত ধরে টানলেন— "চলো সীতা, ওরা ঠিকই বলেছে—এই দিনে আমাদের ওখানে যাওয়াটা ঠিক নয়। হাজার হোক, গুরুজন হই তো।" কঠোর পরিস্থিতি থেকে হঠাৎ রক্ষা পেয়ে যাবার আহ্লাদ, মুক্তির হাঁফ ছাড়া স্বস্তি যেন রামচন্দ্রের কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়ছে।

সীতা তাঁর বঙ্কিম ভুরুর একটিকে শুধু অল্প তুলে, রামচন্দ্রের চোখের দিকে সোজাসুজি তাকালেন। রাম দ্রুত চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

সীতার বুক নিংড়ে বেরিয়ে এল ভারী এক দীর্ঘশ্বাস। বাতাসে গা মিলিয়ে সেই দীর্ঘশ্বাস ভেসে গেল দূরকালের সরযূ নদীর দিকে। নিয়তি কেন বাধ্যতে!

শ্রীরাম তখন হালকা পায়ে ভাইদের সঙ্গে গল্প করতে করতে এগিয়ে গেছেন।

দেশ, শারদীয় সংখ্যা, ১৪০৩

উর্মিলা-নিদ্রা

উর্মিলার কান্না আর থামে না। তাঁর কৈকেয়ীর ওপরে যত না রাগ, তার চেয়ে ঢের বেশি রাগ হচ্ছে লক্ষ্মণের ওপরে। কৈকেয়ী তো লক্ষ্মণকে বনবাসে যেতে বলেননি। সীতাদিদিকেও না। কিন্তু স্বামীর কাছাটি ধরে সীতাদিদিও ঘোর বনে চললেন। আর ওঁর দেখাদেখি,—"দাদাভাই। দাদাভাই! তোমাকে ছেড়ে আমি তো এক অণুপলও বাঁচবো না," বলে নাচতে নাচতে লক্ষ্মণও ছুটলেন বনে। হ্যাঁ ভাশুর মশাই অবিশ্যি বাধা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন বটে, "সেকি হয়? উর্মিলা বেচারী যে একা পড়ে যাবেন চোদ্দ বছর। ওঁকে তো সঙ্গ দিতে হবে তোমাকে? তিনজনকে তো বনে পাঠাননি পিতা দশরথ, মাত্র আমাকেই বনবাস দিয়েছেন।" কিন্তু কে শোনে কার

কথা। দাদা বৌদির সঙ্গে পোঁ ধরে সেই যে লক্ষ্মণ চলে গেছেন বনবাসে, আর তাঁর কোনো খবর নেই। অযোধ্যার নাগরিকেরা সবাই তাঁদের পাশাপাশি সঙ্গে সঙ্গে নদী অবধি হেঁটে গিয়েছিলেন, অশ্রু বিসর্জন করতে করতে সরযূ নদীর পাড় পর্যন্ত। ঊর্মিলা যাননি। মাণ্ডবী আর শ্রুতকীর্তির সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝরোকার ঢাকা বারান্দা থেকে দেখেছিলেন সেই মহাযাত্রা।

ছুটছেন মহারাণী কৌশল্যা, পাগলিনী প্রায়, আঁচল খসে পড়ে রাজপথের ধুলোয় লুটোচ্ছে,—"হায় রাম। হায় পুত্র। আমাকে পরিত্যাগ করে যেও না।" —আর্তনাদ করতে করতে। ছোটরাণী সুমিত্রাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছুটছেন, নিঃশব্দে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে। অযোধ্যার নরনারী বালক বৃদ্ধ এমন-কি কুকুর বেড়াল কাক চড়ুইটা পর্যন্ত রামচন্দ্রের জন্যে হাহাকার করতে করতে ওঁর সঙ্গে ছুটে চলেছে। কিন্তু সকলেই তো ফিরে এল। এলেন না কেবল সীতা। আর লক্ষ্মণ। সীতা না হয় গেছেন তাঁর স্বামীর সঙ্গে। সে তো যেতেই পারেন। কিন্তু লক্ষ্মণ? এটা কি একটা উচিত কর্ম হলো? কচি বৌটাকে শ্বশুরবাড়িতে একা একা ফেলে রেখে, এভাবে চোদ্দ বছরের জন্যে বনে বাদাড়ে ঘুরতে চলে যাওয়া? আরে বাবা, তোমাকে তো বনবাসে পাঠায়নি কেউ? না মাতা কৈকেয়ী, না পিতা দশরথ। তুমি কেন ন্যাংটা কাপড়টি পরে, ধনুর্বাণ, সড়কি বল্লম বাগিয়ে পাইক বরকন্দাজদের মতন সীতাকে পাহারা দিতে দাদাবৌদির পেছন পেছন পোষা কুকুরের মতো চললে? বলিহারি যাই তোমার বুদ্ধিকে। আর আমার দিদি সীতাকে বাহাদুরি দিতে হয়। কোথায় তুমি দিদি হয়ে বোনের কথাটা ভাববে, তা নয়। নিজে তো বরকে ছেড়ে থাকতে পারো না বলে বল্কল পরে জংলি ব্যাধেদের মেয়েদের মতন সেজে রাজপথে হেঁটে হেঁটে দিব্যি বরের সঙ্গে বনে চললে। এদিকে আমার বরটা যে আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে চোদ্দটা বছরের জন্যে? ততদিনে আমার বয়স কত বেড়ে যাবে? চোদ্দ দুগুণে আঠাশ হয়ে যাবে। আমি নিঃসন্তান থাকবো। কে জানে ততদিনে আমি হয়ত বৃদ্ধাই হয়ে যাবো। আমার এই নবীন যৌবন, যা সদ্য সদ্য তার আগমনবার্তার জানান দিচ্ছে, আমার শরীরে মনে উপবাসী হয়ে শুকিয়ে যাবে। চোদ্দ বছরের অকারণ ব্রহ্মচর্য আমার বর না হয় সেধে গ্রহণ করলেন। কিন্তু একবারও আমার কথাটা ভাবলেন না। আমি তো সেটা মোটেই চাইনি? আমার ওপরে কেন চাপিয়ে দিলেন স্বগৃহে প্রবাসের এই দীর্ঘ কঠোর বিনা দোষের শাস্তি? এই নাকি মহামতি রামচন্দ্রের সুবিচার? তিনি নিজের সুবিধের জন্য, সীতার শুশ্রূষার জন্য নিতান্ত সেবাদাসের মতনই সঙ্গে করে নিয়ে চললেন অনুগত ভাইকে। ছি! আর সীতা? তুমি তো আমার আপন দিদি? দিদি হয়ে বোনের ওপর এই দীর্ঘ প্রিয় বিরহের যন্ত্রণা চাপিয়ে গেলে? তোমার মন কেমন করল না, "ঊর্মির কি হবে?" দিদি, আমার দুঃখুটা তোমার মনে হলো না একবারও?

ঊর্মিলার লক্ষ্মণের ওপরে যত অভিমান, সীতার ওপরেও ততই। এঁরা তাঁর অতি আপনার জন, অথচ কেউই তাঁর কথাটা ভাবলেন না। ঊর্মিলার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে

কান্না আর ফুরোয় না। মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্তি যত সান্ত্বনা দেন— "ভরত, শত্রুঘ্নও তো এখানে নেই, দুই ভাই ভরতের মামার বাড়িতে নন্দীগ্রামে গিয়ে মাসের পর মাস বসে আছেন তো বসেই আছেন, মামাবাড়ির আদর খাচ্ছেন, কৈ, নতুন বৌদের তো সঙ্গে নিয়ে যাননি?" উর্মিলা ভাবেন, ওঁরা তো আর চোদ্দ বছরের জন্যে যাননি? এই তো এবারে ফিরে এলেন বলে। ওঁদের তো আনতে দূত পাঠিয়েছেন কৈকেয়ী। এই যে কৌশল্যা মা কতবার কেঁদে কেঁদে হাতে পায়ে ধরে রামচন্দ্রকে বনে যেতে বারণ করলেন, রামচন্দ্র দিব্যি মায়ের কথার অবাধ্য হয়ে দুখিনী মাকে দুই ধমক দিয়ে থামিয়ে, ভিমরতি ধরা পিতার সুপুত্তুর সেজে নাচতে নাচতে বনে চললেন বৌ, ভাই সর্বসমেত। কেন মার কথা বুঝি গেরাহ্যির মধ্যে আনতে নেই? কিন্তু সুমিত্রা? একবারও তো তিনি বলেননি, "লক্ষ্মণ, বাবা, যেও না তুমি বনে, আমার বুক জুড়িয়ে এইখানে অযোধ্যায় থাকো।" উল্টে বললেন—"যাও বাছা যাও, রামের যেন কষ্ট না হয়। রামের দিকে সদাসর্বদা নজর রেখো, আর মাতৃজ্ঞানে সীতাকে সেবা কোরো"— এ আবার কী কথা? তোমার ছেলে কি রঘুবংশের সন্তান, নাকি রঘুবংশের ক্রীতদাস? স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকায় থাকার জন্যই যার স্বামীর জন্ম সেই স্ত্রীর জীবিত থেকে কী লাভ? আমার জীবন তো দাস-পত্নীর জীবন, রাজপুত্রীর নয়। মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্তি কী আর বলবেন। তাঁদের নিজেদের মধ্যেও এখন কিছু কিঞ্চিৎ টেনশান হচ্ছে। শত্রুঘ্নও তো ভরতের সেবকের ভূমিকায়। ঠিক লক্ষ্মণ যেমন রামচন্দ্রের। ভরত এখন রাজা হবেন, মাণ্ডবী হবেন তাঁর যুবরাণী, কিন্তু শত্রুঘ্নের পত্নী হয়ে শ্রুতকীর্তি তো থাকবেন সেবক-পত্নীই। উর্মিলা জনকরাজার ছোট মেয়ে, সীতাই বড়। আর মাণ্ডবী শ্রুতকীর্তি তাঁদের খুড়তুতো বোন, রাজা কুশধ্বজের মেয়ে তাঁরা। চারবোন ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে, আবার চারবোন একই শ্বশুরবাড়িতে বৌ হয়ে এসেছেন—এর চেয়ে আনন্দের ব্যবস্থা কী হতে পারতো? এ যেন আধখানা বাপের বাড়িই চলে এসেছে শ্বশুরবাড়িতে। কী আনন্দেই চার বোনের বিয়ে হলো। রাজগুরু বশিষ্ঠের পৌরোহিত্যে জনক একে একে চার ভগ্নীকে চার ভ্রাতার হাতে সম্প্রদান করলেন, স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হলো। দুন্দুভি নিনাদে, শঙ্খধ্বনিতে, কত গীতবাদ্যে, অপ্সরীদের নৃত্যে, হোমাগ্নি আর লজ্জার রক্তিম আভায়, ধূপের ধোঁয়ায়, ফুলের সুবাসে, চন্দনের সৌরভে, রত্নাভরণে সজ্জিত সৌভাগ্যবতী চার বোন ইক্ষ্বাকু বংশের পুত্রবধূ হয়ে গেলেন। তখন কি ঘুণাক্ষরেও আন্দাজ করা গিয়েছিল, এমন একটি ভয়ংকর দিন আসবে? যখন চার বোনের মনের মধ্যে চার রকমের ভাবনা ঘুরপাক খাবে? এতদিন চার বোনের অন্তঃকরণ অবিকল একই স্রোতে বইছিল। আর আজ? কৈকেয়ীর দোষে সেই শান্তি, সেই প্রীতি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। এ জিনিস কি আর জোড়া লাগবার? তালি দিয়ে, রিপু করে, থুতু দিয়ে চেটে, আঠা দিয়ে এঁটে বিশ্বাসকে কি জোড়া লাগানো যায়? ঈর্ষাকে কি কুলোর বাতাস দিয়ে দূর করা যায়? বোনের সঙ্গে বোনের এই যে রেষারেষি শুরু হয়ে গেল, এর শেষ কোথায়? এই যে উর্মিলা ঠোঁট ফোলালেন সীতার ওপর অভিমানে, আর শ্রুতকীর্তি

মুখে কিছু না বললেও, মনে মনে যথেষ্টই ঠোঁট ফুলিয়েছেন। জানেন মাণ্ডবী নির্দোষ, তবু তাঁর প্রতি সামান্য ঈর্ষা যে হয়নি তা নয়। রাজা হবার কথা ছিল রামচন্দ্রের। রাণী হবার কথা বড়দিদি জানকীর। এটা তাঁরা বিয়ের লগ্ন থেকেই জানেন। এ নিয়ে ঈর্ষাদ্বেষের প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু ভরত আর মাণ্ডবী এঁদের তো কথা ছিল না লক্ষ্মণ-উর্মিলা, শত্রুঘ্ন-শ্রুতকীর্তির চেয়ে একটা আলাদা জীবন গড়বার। এখন ভরত যুবরাজ হবেন। শত্রুঘ্ন হবেন তাঁর ডানহাত। মাণ্ডবী যুবরাণী, শ্রুতকীর্তি তাঁর সখীমাত্র। আর উর্মিলা? তিনি তো কেউই নন। তাঁর দিদি চলে গেছেন অরণ্যে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বামীও। এখন এই বিশাল অযোধ্যা নগরীর মধ্যে লক্ষ্মণের মর্মরপ্রাসাদে, নিজস্ব অন্দরমহলে উর্মিলা একদম একলা। চোদ্দ বছর তাঁর তো বন্দীদশায় কাটবে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে একাকিনী স্ত্রীর শ্বশুরালয়ে যে যত্ন হয় না, এ সত্য কে না জানে? এ ব্যাপারে প্রাকৃতজনের সঙ্গে রাজবংশীয়ের পার্থক্য নেই। জনকরাজার এই ছোট মেয়েটি, আবার একটু আহ্লাদী আছেন। সীতা বড়, চিরদিনই অনেকটা শক্তপোক্ত। বুঝদার। সীতা তো নিজের মায়ের কোলে মানুষ হননি। ভূদেবী তাঁকে জন্ম দিয়েই খালাস। এই একটা অভিমান সীতার মধ্যে ছিলই। কিন্তু উর্মিলার জন্ম রাজপুরীতে, মহারাণীর কোলে, রাজবাড়ির ধাত্রীর হাতে, তাঁর ধরনধারণটা তাই একটু আলাদা। লক্ষ্মণের এই অবহেলা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। কেন? সীতার মতো তাঁকে তো স্বামী সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারতেন? কি সুন্দর বনে বনে বেড়াতেন উর্মিলা আর লক্ষ্মণ? তা তো নয়ই, যাবার আগে স্ত্রীর কাছে বিদায় নিয়েও যাননি লক্ষ্মণ। দাসীদের মুখে সংবাদ পাঠিয়েছেন —"চললাম।" এ ধাক্কা কি সহজে মেটাবার? এটা একরকম পলায়নই হলো তো। উর্মিলাকে ঠকিয়ে পালানো? উর্মিলা মনে মনে এইসব ভাবছেন, তাঁর ক্ষুধাতৃষ্ণা ঘুচে গেছে। চোখে ঘুম নেই। অবিরল অশ্রুপাত সংবরণ করতে পারছেন না তিনি। মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্তি একটু মুদ্গ যূষনিও দিয়ে ফেলেছেন, কিছুতেই যখন উর্মিলাকে অন্নস্পর্শ করানো গেল না। এমনকি সুমিত্রাও বললেন,—"হ্যাঁ বৌমা, তুমি কি চোদ্দ বছর না খেয়ে না ঘুমিয়ে, কেবল কেঁদেই কাটাবে? কৈ আমি তো তোমার মতো ভেঙে পড়িনি? আমারও তো সন্তানের মুখখানি আমি চোদ্দ বছর দেখতে পাবো না? হয়তো তার মধ্যে আমার আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে যেতে পারে।" উর্মিলা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন— "তাতে কি? আপনার তো আরেকটাও ছেলে আছে। তার মুখখানা দেখবেন। কিন্তু আমার কি আরেকটা বর আছে?"

সুমিত্রা আর কী বলবেন? এমনিতেই অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে প্রবল বিষাদ নেমে এসেছে। রাজা দশরথ সেই যে শয্যাগ্রহণ করেছেন, তাঁর চক্ষু সেই যে নিমীলিত হয়েছে, তিনি কৌশল্যার প্রাসাদে শুয়ে শুয়ে কেবল ঠোঁট নেড়ে বিড়বিড় করে 'রাম। রাম।' প্রলাপ বকছেন। দশরথের শয্যাপার্শ্বে থাকবেন, না উর্মিলার কাছে থাকবেন সুমিত্রা? মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্তির দায়িত্বে উর্মিলাকে রেখে সুমিত্রা তাঁর বৃদ্ধ স্বামীর কাছে ছুটে গেলেন। দশরথের তখন শেষ অবস্থা।

এদিকে দণ্ডকারণ্যে পৌঁছে লক্ষ্মণ রাতভর ধনুর্বাণ হাতে সড়কি বল্লম সমেত ভয়ানক গোমড়া মুখে দাদাবৌদির পর্ণকুটীর পাহারা দিচ্ছেন। দিনের বেলা তাঁর আরো কাজ, ফলমূল সংগ্রহ করে আনেন, আবার কখনও মৃগ-বরাহ শিকার করেও আনেন, সবরকমেই তিনি রামসীতার সেবা করেন। আর রাত্রে যখন রামের বাম বাহুতে মাথা রেখে সীতাদেবী নিদ্রা যান, লক্ষ্মণ তখন দাওয়ার সামনে খাড়া থাকেন। চতুর্দিকে জঙ্গলের ভেতর কতরকম শব্দ ওঠে। তখন সরোবরে জলপান করতে আসে হিংস্র পশুরা। রাতপাখিরা কর্কশ চীৎকার করে উড়ে যায়, রাক্ষসেরা খাদ্যের সন্ধানে বনে বনে বিচরণ করে। আর তারা এলে, ভয় পেয়ে পাখ্‌পাখালিরা ঘুম ভেঙে ওড়াওড়ি, চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। ছোট জন্তুরা ছুটোছুটি আরম্ভ করে। লক্ষ্মণ সারারাত্রি জেগে জেগে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এইসব ঘটনা লক্ষ্য করেন। ধনুকে শরযোজনা করাই থাকে —কখন কী হয়। এই কারণে তাঁকে দিবারাত্র বিনিদ্র থাকতে হচ্ছে। নিদ্রাদেবী যতই চেষ্টা চরিত্র করুন, চোখের পাতায় ছোট্ট ছোট্ট পিঁড়ি পেতে বসতে চেষ্টা করুন, লক্ষ্মণ একগুঁয়ে, কিছুতেই নিদ্রাদেবীকে এক তিল ঠাঁইও ছেড়ে দেবেন না নিজের চোখে। শেষে নিদ্রাদেবী হাল ছেড়ে দিয়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে বসে গেলেন দু'পা ছড়িয়ে বনের মাঝখানে ফণিমনসা শেয়ালকাঁটার ঝোপের পাশে। সেই দেখে লক্ষ্মণের খুব দুঃখু হলো। একে দেবী বলে কথা, তায় মানুষটি সত্যি বড়ো ভালো। লোকের শরীরে মনে শান্তি দেওয়াই তাঁর কাজ। নিদ্রাদেবীকে কাঁদতে দেখে লক্ষ্মণের বেশ লজ্জা করলো। তিনি এগিয়ে গিয়ে বললেন, "হে দেবী, তুমি কেঁদো না। আমাকে ঘুম পাড়াতে পারছো না বলে তোমার এত কিসের মনোকষ্ট? আমাকে তো এখন চোদ্দ বছর জেগে থাকতেই হবে মা জননী? দেখেছো না কেমন পাহারাদারের বেশ পরেছি?" শুনে নিদ্রাদেবীর হু হু কান্না আর থামে না। বরং আরো বেড়ে গেল।

—"চোদ্দ বচ্ছ-র?" নিদ্রাদেবী শিউরে উঠলেন—"আমি হিসেব মেলাবো কেমন করে? আমাকে হিসেব রাখতে হয় না? এই চোদ্দ বছরের একস্টা ঘুম আমার ভাঁড়ারে জমে গেলে আমাকেই দোষ দেবেন দেবরাজ? বলবেন, 'তুমি ফাঁকি দিয়েছ, যার যেটা পাওনা, র‍্যাশন করা বরাদ্দ ঘুম, তা ঠিকঠাক বিলি করোনি।' তখন আমার কী হবে? ওদিকে তোমার বউও তো ঘুমোচ্ছে না, সেও তো কেঁদে কেঁদে বিছানা বালিশ ভাসাচ্ছে। রাতের পর রাত জেগে কাটাচ্ছে। এখন এই দুজনের চোদ্দ প্লাস চোদ্দ, মানে আঠাশ বছরের বরাদ্দ ঘুম যদি আমার ভাঁড়ারে জমা থাকে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, ইন্দ্রদেবরাজকে আমি কী কৈফিয়ত দেব?' লক্ষ্মণের যে অ্যাদ্দিন ঊর্মিলার কথা একেবারে মনেই পড়েনি, তা নয়। রোজ রাত্রে জেগে জেগে যখন অদৃশ্য শত্রুদের পদধ্বনি শোনার চেষ্টায় কান খাড়া করে রাখেন, হঠাৎ হঠাৎ চমকে ওঠেন, মনে হয় ঊর্মিলার চেনা চুড়িবালার ঝুমুর ঝুম শোনা গেল বুঝি। তারপরই বুঝতে পেরে যান,—না। এটা ঐ শিশুগাছের পাতার বাতাস। আবার কখনও লক্ষ্মণের হৃদস্পন্দন থেমে থেমে যায়— ঐ শুনতে পেলেন বুঝি ঊর্মিলার প্রিয় ঠাট্টার হাসির

খিলখিল? এক লহমার মধ্যেই চিনে ফেলেন—না। ওটা ঝরণার জলের কুলুকুলু। এ তো ঘোর দণ্ডকারণ্য। উর্মিলা কোথায়— সেই অযোধ্যাপুরীতে। প্রাসাদে একাকিনী। লক্ষ্মণ উর্মিলাকে ভালোবাসেন। কিন্তু রামকে ভালোবাসেন তার চেয়ে বেশি। কিন্তু নিদ্রাদেবীর মুখে হঠাৎ উর্মিলার অতন্দ্র নিশিযাপনের বিবরণ শুনে, লক্ষ্মণের খুব মন খারাপ হয়ে গেল। তিনি না হয় স্বেচ্ছায় জেগে আছেন একটা জরুরি কাজে। সে মেয়েটির বেলায় তো তা নয়। সে জেগে আছে শুধু তাঁরই জন্যে মনোকষ্টে, ঘুমুতে পারছে না বলে। লক্ষ্মণের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। তিনি বল্লেন—"হে দেবী, তুমি স্বভাবেই মহীয়সী, তাছাড়া তুমি তো নারী, বেচারী উর্মিলার তুমিই একটা গতি করে দাও। আমার চোদ্দ বছরের ঘুমের চেষ্টা তুমি উর্মিলার চোখে চাপিয়ে দাও। ওর নিজের বরাদ্দ ঘুম, আর আমার বরাদ্দ ঘুম, দুটো মিলিয়ে চোদ্দ বছর উর্মিলাকে দিনে-রাতে ঘুম পাড়িয়ে রাখো। তাহলে ওকে বিরহ-ব্যথায় কষ্ট পেতে হবে না। শ্বশুরবাড়ির কর্তব্যকর্ম করা থেকেও রেহাই পাবে। আমি যখন ফিরে যাবো, তখন ওকে জাগিয়ে দেবো। তারপর দুজনেই নিয়মমাফিক, তোমার অংক অনুযায়ী, মাপমতন ঘুমুবো? কেমন? এতে তোমার ভাঁড়ারের অংক মিলে যাবে। যদি উর্মিলা ঘুমুতে না চায়; তুমি বরং মিষ্টি ভাষায় ওকে বুঝিয়ে বোলো, যে ওটা লক্ষ্মণেরই ব্যবস্থা। এতে ওর ভালোই হবে। এমনি আছাড়ি পিছাড়ি হয়ে বিরহদশায় জর্জরিত হলে, ওর স্বাস্থ্যও যে ভেঙে যাবে। এখনও তার সন্তানধারণ করা বাকি।" লক্ষ্মণের গলায় এবার সত্যি সত্যি একটু দুর্ভাবনা ফুটলো। নিদ্রাদেবীও ব্যাপারটা ভেবেচিন্তে বুঝেসুজে দেখলেন ব্যবস্থাটি ভালোই হবে। উর্মিলাকে নিয়ে রাজা দশরথের বাড়িতে হুলুস্থুল চলছে। একে তো বড় তিনরানী বিধবা হয়েছেন। উর্মিলাও বেচারী চোদ্দ বছরের জন্যে স্বামীহারা। মাণ্ডবী শ্রুতকীর্তিরই হয়েছে জ্বালা। তারা শাশুড়িদের সান্ত্বনা দেবে, না বোনকে? নিদ্রাদেবী ফটাফট ঘুম পাড়িয়ে ফেললেন উর্মিলাকে। 'লক্ষ্মণের ব্যবস্থা' শুনেই উর্মিলার প্রাণ গলে গেল। আর মাণ্ডবী শ্রুতকীর্তিরা বলে উঠলেন—"দ্যাখ তো, ঠাকুরপো কত চিন্তা করে তোর জন্যে? একেবারে স্বয়ং নিদ্রাদেবীকেই পাঠিয়ে দিয়েছেন তোকে সান্ত্বনা দিতে। স্বামী বিরহ তুই আর জানতেই পারবি না। এই যে ঘুমিয়ে পড়বি, জাগবি সেই চোদ্দ বছর বাদে, লক্ষ্মণের ফেরার পরে। ততদিন তো বয়েসও বাড়বে না। আর আমরা চোদ্দ বছরে বুড়িয়ে যাবো। দ্যাখ তোর কত ভালো হলো।" উর্মিলা ঘুমিয়ে রইলেন। ইতিমধ্যে কত কী ঘটে গেল, সাতকাণ্ড রামায়ণই ঘটে গেল—উর্মিলা ঘুমোচ্ছেন।

তারপর রামরাবণের যুদ্ধ শেষ হলে রামচন্দ্র সদলবলে রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করলেন রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক শেষ হবারমাত্রই লক্ষ্মণ দৌড়োতে দৌড়োতে উর্মিলার মহলে এসে হাজির হলেন। পরনে সভার রাজবস্ত্র, মাথায় রাজপুত্রের সোনার মুকুট, পায়ে মুক্তোর নাগরা, কোমরে তরবারি।

ওদিকে, যেই অভিষেক উৎসব সমাপ্ত হলো, রামচন্দ্র বললেন—"যাক। এবারে

চলো হে লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন আমরা নিজেরা একটু গল্পগুজব করি। কতদিন ভাইরা একসঙ্গে হইনি, একসঙ্গে বসিনি। কতদিন একটু আড্ডা মারা হয়নি। রাণীরা অন্দরমহলে চলে যান। আমরা চলো একসঙ্গে আলাদা কোথাও একটু বসি। মৈরেয় সুরা আর তাম্রকুট আনা হোক—আমরা চার ভাই মিলে আনন্দ করিগে যাই। কই লক্ষ্মণ ভাইটি গেল কোথায়?" শুনেই সীতা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্তি একযোগে সমস্বরে বলে উঠলেন—"সেকি কথা মহারাজ? লক্ষ্মণের সঙ্গে এখনও উর্মিলার দেখাই হয়নি। উর্মিলা তো ঝরোকা থেকে অভিষেক দেখতে আসেননি। তিনি এখনও নিদ্রিত। চোদ্দ বছর ধরে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে আছেন। লক্ষ্মণ এলে তাঁরই পদশব্দে উর্মিলার এই দীর্ঘ ঘুম ভাঙবে। লক্ষ্মণকে আপনি ছেড়ে দিন একটু এখন। চোদ্দ বছর তো ও ছিলই আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে। আপনি ভরত-শত্রুঘ্নকে নিয়েই বরং আহ্লাদ উৎসব করুন। লক্ষ্মণ এখন ছুটে গেছেন উর্মিলার কাছে। চোদ্দ বছর পরে দেখা হবে।"—"তাই তো? ঠিক কথাই তো বলেছো তোমরা। তথাস্তু! বেশ, আমরা বরং তবে তিনজনেই ফুর্তি করিগে এখন।" এই বলে রামচন্দ্রেরা তিনভাই রাজকীয় ঠেকের দিকে ধাবিত হলেন।

কিন্তু উর্মিলার প্রাসাদে তো প্রথমেই বাধা। কোমরে তরোয়াল আছে, সিকিওরিটি চেকিংয়ে আটকে দিল। প্রহরীটি মাত্র দশ বছরে এসেছে, সে লক্ষ্মণকে জীবনে দেখেনি। পরিধানে যতই রাজবস্ত্র থাকুক, বনবাসে তাঁর গায়ের রং তাম্রবর্ণ হয়েছে, মাথায় তখনো জটাজুট, যুদ্ধবিগ্রহে তাঁর সর্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্নগুলি তখনো শুকোয়নি। পরনে যতই রাজবস্ত্র আর মাথায় মুকুট থাকুক না কেন—কোমরে তরোয়াল থাকা খুব সংশয়জনক। তিনি আকুলস্বরে বলছেন, "তাড়াতাড়ি ফটক খোলো, আমি আমার পত্নী উর্মিলার কাছে এসেছি, যেতে দাও।" প্রহরী তাঁকে সঙ্গে সঙ্গেই জাপটে ধরে বন্দী করে ফেলছিল। কিন্তু লক্ষ্মণ এক ঝটকায় ফেলে দিলেন এবং মুহূর্তেই কোমরের তরবারিটি সূর্যের আলোয় টেনে বের করে তাঁর আঙুলে সুমিত্রার নামাঙ্কিত আংটিটি দেখালেন। "আমিই সৌমিত্রি।" এবার প্রহরী সেলাম করে তাঁকে ছেড়ে দিল। লক্ষ্মণ তাকে বললেন, "যাও। তোমাদের সকলের এখন ছুটি।" কত দুষ্টুমি করে, কত আদর করে, তিনি উর্মিলার ঘুম ভাঙাবেন, মনে মনে সব কল্পনা করে এসেছেন। শয়নকক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন, আরে যাঃ, সব মাটি। উর্মিলা অলসভাবে শয্যায় উঠে বসেছেন—এক তরুণী দাসী তাঁর শ্রাবণমেঘের মতো আলুলায়িত কেশপাশে চিরুণি চালাতে চেষ্টা করছে আর আম্রপল্লবের মতো পায়ে আলতা পরাচ্ছে আরেক তরুণী কিংকরী। লক্ষ্মণকে দেখেই দুজন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো, তারাও আগে কখনো দেখেনি লক্ষ্মণকে। এবং লক্ষ্মণের যে মন-ভোলানো রূপটি ছিল তাঁর বনবাসের আগে, সেই কচি বয়সও আর নেই, সেই ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণিও নেই। উর্মিলাও কি তাঁকে চিনতে পারলেন না? তবে কেন তাঁর চোখে আনন্দ ফুটলো না? এমন-কি বিস্ময়? কিংবা ভয়ও না? ফুটলো কেবল বিরক্তি। উর্মিলা ভ্রূকুটি করে ধমকে উঠলেন—"কে? কে? কে এই স্পর্ধিত রাজপুরুষ? কী করে প্রবেশ করলেন ইনি এই অন্দরমহলে?" তারপরেই চেঁচিয়ে ডেকে উঠলেন, "প্রহরী। প্রহরী।"

ঊর্মিলার কাণ্ড দেখে লক্ষ্মণ হতবাক। এ কে? একি সেই ঊর্মিলা, যাকে উনি দিবস রজনী স্মরণ করতেন বনবাসে, যুদ্ধক্ষেত্রে, যাঁর সরল নির্মল মুখচ্ছবিটি লক্ষ্মণের অন্তরে ঠিক অক্ষয়কবচের মতো বলপ্রদান করতো। এই ঊর্মিলার কাছে তাঁকে ফিরতেই হবে, শেষ ব্রত তাঁর ছিল এটাই। যে ঊর্মিলা লক্ষ্মণের সুদীর্ঘ বিরহে জীবন থেকে ছুটি নিয়ে ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিচ্ছেন চোদ্দটি বছর।— যে ঘুম মৃত্যুরই নামান্তর—সেই ঊর্মিলার সামনে অবশেষে আজ তিনি উপস্থিত হয়েছেন। রাজকর্তব্য, ভ্রাতৃকর্তব্য সমাপন করে, এবার এসেছেন তাঁর একান্ত নিজের ঘরে। এই কি তার অভ্যর্থনা?... এই বিস্মৃতি?

অথচ ঊর্মিলার তো কোনোই বদল হয়নি। এই তো সেই ঊর্মিলা, ঠিক যেমনটি রেখে গেছেন তাকে চোদ্দ বছর আগে। চোদ্দ বছরে লক্ষ্মণের বয়স অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, তাঁকে বারবার মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছে, শঠতা, নিষ্ঠুরতা, তঞ্চকতার মুখোমুখি হতে হয়েছে— চোদ্দ বছর আগের সেই নওলকিশোর প্রায় তরুণ বীরপুরুষটি তিনি নেই। কিন্তু একেবারেই কি চেনা যাচ্ছে না তাঁকে? ঊর্মিলা কিন্তু চোদ্দ বছর পরেও সেই কচি কিশোরীটিই রয়ে গিয়েছেন। সীতা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্তি, সকলেই পরিপূর্ণ যৌবনা নারী হয়ে উঠেছেন, স্বামী সাহচর্যে তাঁরা পরিণত হয়েছেন, কিন্তু নিদ্রাদেবীর কোলে আরামে ঘুমিয়ে থেকে স্বামীসঙ্গহীনা ঊর্মিলা সেই অস্ফুট-যৌবনা রূপসী কন্যাটি রয়ে গেছেন। লক্ষ্মণের চোখ ফিরছে না—তাঁর চোখের মণিতে একে একে ফুটে উঠতে লাগলো বিস্ময়, প্রণয়, মমতা, মোহ, স্নেহ, বাসনা—একের পর এক যেমন পাপড়ি মেলে পদ্ম, তেমনিভাবে পূর্ণতায় বিকশিত হলো লক্ষ্মণের প্রেম। সখীদের চোখ এড়ায় না সেই মাদকতাময় দৃষ্টির ম্যাজিক, তারা সঙ্কোচে চোখ সরিয়ে নিল। ঊর্মিলা কিন্তু দেখতে পেলেন না। বিরক্তকণ্ঠে ঊর্মিলা বললেন, "হে রাজপুরুষ। দেখে তো আপনাকে ভদ্রবংশীয় বলেই মনে হচ্ছে, তাহলে কোন সাহসে, কোন উদ্দেশ্যে আপনি আমার শয়নগৃহে অনধিকার প্রবেশ করেছেন? জানেন, এখন অযোধ্যাবাসীরা সকলে শ্রীরামচন্দ্রের সিংহাসন আরোহণের উৎসবে গেছেন, তাই বুঝি মনে করেছেন আমি অরক্ষিতা? খুব ভুল করেছেন। এ গৃহ থেকে আপনি আর প্রাণ নিয়ে বের হতে পারবেন না। জেনে রাখুন, আমি যদিও চোদ্দ বৎসর যাবৎ স্বামীর দ্বারা অরক্ষিতা, তা বলে আমার রক্ষাকর্তা নেই এমন নয়। রাজা জনক আমার পিতা। আর রাজা দশরথ আমার শ্বশুর ছিলেন, ভুলে যাবেন না। শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং ফিরে এসেছেন, তিনিই আমার ভাসুর। আর শ্রীরামচন্দ্রের দাসানুদাস ও আমার দিদি সীতাদেবীর পদসেবী, মহাবীর এক ব্যক্তি আমার স্বামী। যদিও চোদ্দ বছর তাঁর খবর আমি পাই না, তবু সদ্বংশজাত বলে আমি এখনও তাঁরই একান্ত সাধ্বী স্ত্রী—কোনও দ্বিতীয় রাজপুরুষের মুখদর্শনে আমার রুচি নেই। এই চোদ্দ বছর পরে, দুঃখের বিষয়, অনিচ্ছাকৃতভাবে আপনার মুখ আমাকে দেখতে হল। ব্রতভঙ্গের এই অপরাধের শাস্তি দিতে প্রহরীরা এখনই এসে আপনাকে গ্রেপ্তার করবে,

এবং যথাক্রম নিয়ে গিয়ে শিরচ্ছেদ করবে।" হতভম্ব লক্ষ্মণ বললেন—"ঊর্মিলা। ঊর্মিলা। তুমি কি সত্যিই আমাকে চিনতে পারছো না? আমি কি এতই পরিবর্তিত হয়েছি? নাকি আমিই ভুল শুনছি? হয় তোমার মস্তিষ্কবিকৃতি হয়েছে, না তো আমার! আমার স্ত্রী হয়ে তুমি নিজের স্বামীকে চিনতে পারছো না? ঊর্মিলা তুমি বোধ হয় এখনও ঘুমঘোরে আছ। সখীদের বলো, স্বর্ণপাত্রে তোমাকে কিছু সুরভিত জল এনে দিক, তুমি মুখেচোখে ভালো করে জলছড়া দাও। ভালো করে চোখ চেয়ে দ্যাখো, আমিই তো সেই মানুষ যে রামচন্দ্রের দাসানুদাস, সীতাদেবীর অনুগত দেওর, —ঊর্মিলার স্বামী লক্ষ্মণ।"

লক্ষ্মণের এই বাক্য শ্রবণে শান্ত হওয়া দূরে থাক, ঊর্মিলা দুই কানে হাত চাপা দিয়ে অধীর স্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন—"থামুন। অনেক হয়েছে। আর মিথ্যায় কাজ নেই। আপনাকে আমি চিনি না, চিনি না, চিনি না। আপনি যদি বেরিয়ে না যান তবে আপনার নিশ্চিত প্রাণ সংশয়। আমার প্রহরীরা এসে—"

"প্রহরীরা কেউ আসবে না ঊর্মিলা, আমি যে আজ তাদের সবাইকে ছুটি দিয়ে দিয়েছি।"

এবারে ফোঁস করে ওঠেন ঊর্মিলা—"আমার প্রহরীদের ছুটি দেবার আপনি কে?"

—"আরে আমিই তো ওদের প্রভু, লক্ষ্মণ। সেই যে আমি রামের সঙ্গে তাড়কাবধ করেছিলাম? যখন রাম হরধনু ভঙ্গ করে সীতা লাভ করলেন মিথিলায়, তখনই তো তোমার সঙ্গে আমার ফাউ হিসেবে বিবাহ হয়েছিল—মনে নেই?"

—"সেকথা আপনার মুখে নতুন করে শুনতে চাই না মহাশয়, বিশ্বসুদ্ধ সকলেই জানে।"

—"আমিই সেই লক্ষ্মণ, ঊর্মিলা, এতদিন রামচন্দ্র আর সীতাকে ঘোর অরণ্যে অতন্দ্র হয়ে আমিই সমস্ত বিপদ থেকে প্রাণপণে রক্ষা করছিলাম। তোমার জেদী দিদিটি আমার নিষেধ অমান্য করে গণ্ডি পেরিয়েছিলেন বলেই তো দুষ্ট রাবণ ওকে ধরে নিল। আর সীতাকে উদ্ধার করতে করতেই বনবাসের শেষদিনগুলো কেটে গেল হানাহানিতে। রক্তারক্তিতে। বড় ক্লান্ত আমি ঊর্মিলা।"

"মহাশয়, আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি প্লিজ বেরিয়ে যান। আমার শয়নগৃহে অপরিচিত পুরুষ দেখা গেলে নগরময় আমার চরিত্রদোষ রটে যাবে। সবাই জানে আমার স্বামী এখানে নেই। আমি আপনার কী ক্ষতি করেছি মশাই, যে আপনি জোর করে আমার শয়নকক্ষে ঢুকে এসব কল্পকাহিনী শোনাচ্ছেন? যান রাজসভায় গিয়ে বলুন। এসব কথা সেখানেই মানাবে।" ঊর্মিলা উঠে বেরিয়ে গেলেন।—লক্ষ্মণ আরও অস্থির হয়ে ছুটলেন তাঁর পিছু পিছু। আকুলস্বরে বলতে লাগলেন—"ঊর্মিলা, শোনো, আমি তোমার দিদিকে এতদিন মাতৃজ্ঞানে সেবা করেছি, তাঁর কমলচরণদুটি ভিন্ন মুখের পানে চাইনি, আর রামচন্দ্রকে পিতৃজ্ঞানে। চোদ্দ বছর আমি বিনিদ্র ছিলুম—দুই চোখের পাতা এক করিনি।" ততক্ষণে পিছনে ফিরে

উর্মিলা বাতায়নে দাঁড়িয়েছেন। সেখান থেকেই বললেন, "বেশ তো, এখন যান তবে, সেই মাতাপিতার কোলে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। এখানে কী করতে এসেছেন?

লক্ষ্মণ বললেন—"তুমি জানো তুমি কী বলছো। উর্মিলা জানো, আমি মরেই গিয়েছিলাম? তুমি তো ঘুমোচ্ছিলে, তুমি কিছুই জানো না।" এতক্ষণে উর্মিলা এদিকে ফিরলেন। উৎসাহ পেয়ে লক্ষ্মণ বলতে থাকেন, "আমাকে এসে নাগপাশে বেধেছিল, আর এমন শক্তিশেল মেরেছিল—আমি তো মরেই গিয়েছিলাম, নেহাত তোমার কপাল ভালো—হনুমানজী বিশল্যকরণী এনে আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছেন। তোমার শাঁখা সিঁদুরের জোর আছে। তাই আমি তোমার কাছে ফিরে এসেছি।" এবার উর্মিলা থেমে ঘুরে দাঁড়িয়ে কটাক্ষ করলেন। "তাই নাকি? তা না এলেই তো পারতেন। অত কষ্ট করে এতক্ষণ ছিলেন কোথায়? স্বর্গে বুঝি?" লক্ষ্মণের মুখে বেদনার রেখা ফুটে উঠল। "উর্মিলা। প্রিয়তমা। আমি যে তোমার কঠিন বাক্যের আঘাতে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ছি। এ ব্যথা সহ্যের শক্তি আমার নেই। এ যে শক্তিশেলের আঘাতের চেয়েও কঠোর। চোদ্দ বছর পরে একটা যুদ্ধক্লান্ত মানুষ ঘরে ফিরলো —তাকে কি না—"

—"ঘরে তো ফেরেনি। সে গিয়েছিল প্রথমে তার মা—সৎমাদের পায়ে পায়ে প্রণাম করতে। তারপরে দাদার রাজ্যাভিষেকের উৎসবে রাজসভায়, আহ্লাদ করতে। সবার পরে, সবার শেষে উর্মিলা।—অমন পচা স্বামীতে আমার কাজ নেই। চোদ্দটা বছর যেমন ছিলাম, বাকি জীবনটাও আমি তেমনিই থাকতে পারব। নো, থ্যাংকিউ।"— "উর্মিলা। তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করছ। আমি কিন্তু এই উর্মিলাকে একটুও চিনতে পারছি না—অথচ চেহারা তোমার অবিকল সেই তেরো বছরের কিশোরীটির মতোই রয়েছে। কথাবার্তা কেমন করে এমন নির্মম, এত রুক্ষ হলো? তোমার কি মনে পড়ে না, প্রিয়তমা, অমেয়া চাঁদনিরাতে কেমন সাঁতার কাটতুম ওই স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো দীঘিতে? তোমার মনে পড়ে না, উর্মিলা, আমি তোমার বুকে কেমন স্বর্ণচাঁপার মালা দুলিয়ে দিয়ে তোমায় বলতুম—" উর্মিলা আবার ধমকে ওঠেন—"চোপ, আজেবাজে বকবেন না তো? আপনি ভালোয় ভালোয় কেটে পড়ুন" —এবার লক্ষ্মণ আর পারলেন না। উর্মিলার পায়ে উপুড় হয়ে পড়ে কেঁদে ফেললেন।

—"উর্মিলা, আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় সখী, এমন পরুষবাক্য তোমার কোমল ঠোঁটে মানায় না। প্রিয়তমা, আমাকে তুমি এভাবে ফিরিয়ে দিও না। এই চোদ্দ বছর ধরে তুমি তো আরামসে ঘুমিয়েছো। কিন্তু আমি? আমি যে দিনরাত্র জাগ্রত থেকে তোমার বিরহযন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছি? এক মুহূর্ত ঘুমিয়ে তোমাকে স্বপ্নেও ধরতে পারিনি? আমার যন্ত্রণা তুমি অনুভব করতে পারছো না? যখন শ্রীরাম সীতাকে আদর করতেন, তখন আমি অন্যদিকে তাকিয়ে থাকলেও তোমার জন্য মন কেমন করত না কি? অরণ্যে যখন পশুপাখি পতঙ্গরা প্রণয়কাতর হয়ে পরস্পরকে আহ্বান জানাতো, তখন যে মনে মনে আমিও তোমাকে অস্থির হয়ে ডাকতুম উর্মিলা? নিদ্রিত তোমার কানে সে ডাক পৌঁছোতো না। শিশুগাছের পাতায় পাতায় দুপুরবেলা

বাতাস বইলে আমি শিউরে উঠতুম, 'ঐ বুঝি উর্মিলা আসছে, ঐ তার নূপুরের শব্দ, তার কঙ্কনকিঙ্কিনী?'—ঝরণার কুলুকুলু শব্দ শুনে আমি ভুল করতুম, 'ঐ বুঝি উর্মিলা আমার সঙ্গে রঙ্গকৌতুক করতে করতে খিলখিল হেসে উঠেছে'—উর্মিলা, তুমি তো জানো, আমি কঠোর ব্রহ্মচর্য সাধনা করেছি চোদ্দ বছর। তুমি ছাড়া কোন নারীকে আমি চিনি না, জানি না,—তুমিই আমার প্রাণ, মন, জীবন। শ্রীরামকে ঈর্ষা কোর না, আমি যে তাঁর দাস হয়েই জন্মেছি, তাঁকে ভালোবাসাটা আমার কর্তব্যকর্ম —কিন্তু তোমাকে আমি ভালোবাসি স্বেচ্ছায়, শুধু তুমি উর্মিলা বলেই। তুমি ছাড়া পৃথিবীতে কেন, ত্রিভুবনে আর কাউকেই এ ভালোবাসা আমি দিতে পারি না—এ কি তুমি সত্যিই বোঝো না। তোমার জন্যে চোদ্দ বছর কত কষ্ট পেয়েছি তা কাউকে প্রকাশ করিনি, আজ প্রথম তোমাকে জানাবো, আর তুমি কিনা আমাকে অনেকক্ষণ ধরে মোটে চিনতেই পারলে না! তারপরে যদি বা চিনলে, চিনেও নিষ্ঠুর ভাষায় প্রত্যাখ্যান করছো—তবে আমি অযোধ্যায় কেন ফিরলাম? আমার চোখে নিঃসীম নিদ্রা নেমে আসছে—আর হৃদয়ে নিঃসীম বেদনা। রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে, আমি এখন অতিরিক্ত, এ প্রাণ সরযূতে বিসর্জন দেয়াই ভালো"— বলতে বলতে লক্ষ্মণ ছুটে বেরিয়ে যেতে গেলেন। অধীর কান্নায় লক্ষ্মণের গলা বুজে গেল, কথা জড়িয়ে গেল। এবার উর্মিলা দৌড়ে গিয়ে পিছন থেকে দুই মৃণালবাহুতে লক্ষ্মণের গলাটি জড়িয়ে ধরে, নিজের দিকে মুখটি ফেরালেন। নরম আঁচলে চোখ মুছিয়ে দিয়ে, লক্ষ্মণের অশ্রুসিক্ত মুখটি চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দিলেন, একটু আড়চোখে দেখেও নিলেন, নাঃ, দাসীরা অনেকক্ষণ আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। লক্ষ্মণের জলভরা চোখে এতক্ষণে ধরা পড়লো উর্মিলার কচি মুখের দুষ্টু হাসিটি। সোনার খাঁচায় ফাজিল শুকপাখি শিস দিয়ে গেয়ে উঠল "পিয়া দরশনকে পিয়াসা"—

সংবাদ প্রতিদিন, শারদীয় সংখ্যা ১৪০৩

BanglaBook.org

লক্ষ্মণের নরকদর্শন

স্বর্গের উদ্যানে বসে বসে গল্পগুজব করছিলেন তিন সখী; ত্রিজটা, শূর্পণখা আর অয়োমুখী।

—"তুই যাই বলিস অয়োমুখী, তাড়কাদিকে মেরে ফেলেই মুক্তি দিয়েছিল ওরা। আমার মত কাননাক কেটে রেখে দিলে আরও খারাপ হত।"

—"খারাপ বলে খারাপ? তোমার তো শুধু নাসাকর্ণ ছেদন করেই তৃপ্ত হয়েছিল। বেচারি আমার বেলায়? শুধু তো নাককানই নয়, আমার পাকা আমের মতো স্তনদুটিও দুর্বৃত্ত লক্ষ্মণ তীর মেরে তার টুকরো করে ফেলেছিল। এত নির্মমতা হিংস্র মানুষকেই

শোভা পায়। বনের পশুরা কখনও এমনি আচরণের কথা ভাবতেই পারত? তুমিই বল?"

বহুদর্শিনী ত্রিজটা শুনে বললেন, "যেমন গেছলে তোমরা। বনে বাদাড়ে যেসব শহুরে মানুষগুলো ঘুরে বেড়ায়, তাদের কক্ষনো বিশ্বাস করতে আছে? ওই মাথায় ঝুঁটি, পিঠে ধনুক, কোমরে ছোরাছুরি সব কটা গুণ্ডা। তারা নানান ছলাকলা জানে, মিথ্যেবাদীর একশেষ, শরীরে দুর্বুদ্ধিগুলি পাকিয়ে আছে। একফোঁটা মায়াদয়া নেই। এক যারা বনবাসী, বনেই যাদের ঘরসংসার, সেই বন্যজাতি, আর যাদের গাঁয়েগঞ্জে বসবাস, বৌ-বাচ্চা আছে, তারাই ভাল। ওদের তবু মায়াদয়ার প্র্যাকটিস থাকে। প্রেমে পড়বি তো পড় তাদের সঙ্গে। প্রেম যদি নাও করে, তারা অমন কেটে কুচিয়ে কুটনো কুটে ফেলবে না। ছুটে পালিয়ে যাবে। বড়জোর বৌ থাকলে ঝ্যাঁটা মেরে বিদেয় করে দিতে আসবে। আমাদের তো কোনও ক্ষতি করার ক্ষ্যামতাই তাদের নেই। আমরা রাক্ষসিনী, একটা মানুষকে যখন খুশি কুপ করে গিলেই ফেলতে পারি বেশি বেগড়বাঁই করলে। জি চাহে তো বাস্—কাপুৎ। কিন্তু ওই বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো ক্ষত্রিয়গুলো? ওগুলো ভারি বদ। কাউকে ভয় পায় না। বহোৎ খতরনাক চিজ—"

"—আর ওই যে মুনি ঋষি ব্রহ্মচারীরা, ওরাও বড্ড বদ হয় ত্রিজটামাসি, —উনকো খুনমে হি গুস্সা হ্যায়। ওফ কী রাগ। বামুন যা ছাই। আসলে চণ্ডাল সব। রাগ নাকি চণ্ডাল? তবে তো প্রত্যেকটা তপস্বীই চণ্ডাল। শ্মশানের কোনও রিঅ্যাল চণ্ডালকে কেউ দেখেছে শুধু শুধু রাগের চোটে কাউকে ছাই করে দিচ্ছে? যক্ষকে রাক্ষস বানাচ্ছে, দেবতাকে বাঁদর করে দিচ্ছে আর সুন্দরী অপ্সরাকে যমুনা নদীতে পেটমোটা রুইমাছ বানিয়ে ফেলছে? এসব যতরকমের কেচ্ছা কুকীর্তি সমস্ত ওই বামুনগুলোর কাজ। কথায় কথায় শাপশাপান্ত।"

—"আরে দূর, গেছলি কেন তোরা প্রেম করতে? রাক্ষসে-মানুষে গাঁট-বন্ধন? ইয়ে তো কভি নহি হোনা চাহিয়ে। রাজা রাবণকে দেখলি না, কী সর্বনাশ করলেন?"

—"রাবণকা বাত অলগ্ হ্যায়—উসকো ভি শাপ থা", অয়োমুখী তর্ক জুড়ে দেন। স্বর্গে এলেই সবায়ের স্বর্গের ভাষা। রাষ্ট্রভাষাটা রপ্ত হয়ে যায়। "কেন ভীমের সঙ্গে কি হিড়িম্বামাসির বিয়ে হয়নি? ভীমমেসোও তো তখন বনেবনেই ঘুরছিলেন।"

শূর্পণখা ঠোঁট উল্টোল, "ঈইশ। বনেবনে ঘুরছিল না আরও কিছু। পাঁচশরিকের বৌটাকে সুদ্ধু ল্যাজে বেঁধে নিয়ে বনেবনে পিকনিক করে বেড়াচ্ছিল মা আর পাঁচ ভাইতে মিলে। লক্ষ্মীছেলের মতো আগে মায়ের পারমিশান নিয়ে তবেই না ভীমমেসো বিয়েটা করল?"

অয়োমুখী ছাড়েন না—"কিন্তু মা তো ভীমকে অনুমতি দিয়েছিলেন। কুন্তিদিদা তো রামের মতো শিখিয়ে দেননি, —'যা বাছা, ওই রাক্ষসদের মেয়েটার নাককানগুলো

ঘ্যাচ্‌ঘ্যাচ করে কুচিয়ে কেটে আনগে যা!' দৌপদীও তো বাপু হিড়িম্বামাসিকে কিছুই গালমন্দ করেনি? অথচ কে না জানে দ্রৌপদীর মুখ? বাব্—বা!"

ত্রিজটা এবার দুপক্ষকে শান্ত করতে বলেন— "ওদের কথা ছেড়ে দে। ওরা এই ইক্ষ্বাকু বংশীয়দের চেয়ে ঢের ভদ্র। দিব্যি যাজ্ঞসেনীটাকে পাঁচ ভাইতে কী সুন্দর ভাগ করে নিলে, বল্ দিকিনি, কেবল মায়ের একটা কথায়? তবে ওর পেছনেও কাণ্ড আছে। বলি শোন্। সবাই জানে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী তো? আর কুন্তির জীবনে কটা? শুনে দ্যাখ্ না ওরও জীবনে পাঁচ-পাঁচটা পুরুষ এসেছিল, ঠিক দ্রৌপদীরই মতন, তবে একসঙ্গে নয়, কিউ দিয়ে। ওয়ান বাই ওয়ান। সূর্য, পাণ্ডু, ধর্ম, পবন, ইন্দ্র। সোদর ভাইও নয়, পাঁচ জাতের পুরুষ পাঁচজন। একজন গ্রহ, একজন মানুষ একজন কিছুই নয়, শুধু মানুষের তৈরি করা তত্ত্ব, একজন পঞ্চভূতের একভূত, আর একজন একদিকে যেমন দেবতাদের রাজা, আরেকদিকে ঝড়-বৃষ্টির কন্ট্রোলার। পাঁচটি পুরুষের পাঁচমূর্তি বটে। মজাটা কিন্তু অন্য জায়গায়। বিয়েটা হয়েছে যার সঙ্গে, তার সঙ্গে কুন্তির ছেলেপুলে কিস্‌সু হয়নি। আর যাদের সঙ্গে পটাপট্ একের পর এক ছেলে হয়েছে, তাদের সঙ্গে মোটে বিয়েই হয়নি। কুন্তির ব্যাপারটা একেবারে ইস্পেশাল—বহোৎ জবরদস্ত ঔরত থি না? সতীনের ছেলেদুটোকেও ট্যাঁকে গুঁজে রেখেছিল। ও তো মত দেবেই। না দিলে ভীম কি শুনত? ভীম তো যুধিষ্ঠির য্যায়সা ওইসা লড়কা থোড়াই থা। ও অনেকটাই আমাদের মতো। যা ট্রাইসেপ!"

অয়োমুখী আর শূর্পণখা হেসে ওঠেন, "তা যা বলেছ মাসি—দারুণ মাসল! তবে যুধিষ্ঠিরই বা কী এমন? দ্রৌপদী যদি দ্রৌপদী না হয়ে হিড়িম্বা হত, আমাদের মতো একটু বড়সড় দেখতে, কুলোর মত কান দুখানা, মুলোর মতো দাঁত ও আর তালগাছের মতো লম্বা— তা হলে যুধিষ্ঠির কত লক্ষ্মীছেলে হয়ে মায়ের কথা শুনত জানা আছে, হ্যাঁ। দূর, পেঁচো জুয়াড়ি একটা। সে একবার জেলখানা থেকে ছাড়িয়ে দিল, লজ্জা নেই? তক্ষুনি আবার জুয়ো খেলে বনে গেল। যাচ্ছেতাই। কেন যে লোকে ওকে ধর্মপুত্তুর বলে?"

—"ধর্মের পুত্তুর তাই।" অয়োমুখী বলেন, —"তবে হ্যাঁ, দ্রৌপদী অত রূপবতী বলেই সবকটা ছেলে সেদিন মাতৃভক্ত হয়ে উঠেছিল।"

ত্রিজটা হাত নেড়ে বলেন,—"আর কুন্তিও কি জানত না ভেবেছিস? কুঁড়েঘরের ফাঁক দিয়ে সব দেখা যায়। ইচ্ছে করেই অমন একটা অদ্ভুত কথা বলে দিল —'তোমরা পাঁচজনে ভাগ করে খাও।' কেন, তুমিও তো ভিক্ষা-অন্নেই খাওয়া-দাওয়া কর বাছা? দ্রৌপদীর বেলায় ছেলেদের সঙ্গে তুমিও কেন সেদিন ভাগ করে ভিক্ষাদ্রব্যটি খেলে না? ফলমিষ্টি কি হরিণের মাংস হলে তো খেতে?"

—"তা যাই বল ত্রিজটামাসি, কুন্তিটা খুব দায়িত্বহীন কাজ করেছিল কিন্তু—"

"দায়িত্বহীন না ছাই। খুব চালুপুরিয়া ওই কুন্তি। উও ভি রাজনীতিকা এক কূটচাল থা—চাল! বুঝলি না? ভায়ে ভায়ে পাছে অশান্তি হয়, বনেবনে ঘুরছে সব, মনে শান্তি নেই এমনিতেই, তায় ওই আগুনের টুকরো মেয়েকে নিয়ে এল ঘরের

মধ্যে। তাই ওই ব্যবস্থা। এককথায় সবাই খুশি, সবাই ঠাণ্ডা। দরজার ফুটো দিয়ে দ্রৌপদীকে দেখেই তো অমন ন্যাকার মতন কথাটি বলেছিল। পাঁচছেলে যাতে এককাট্টা থাকবে। ঘরে শান্তি থাকবে। সবাই ভাগ পাবে।"

—"আর তাছাড়া বৌ-ও বেশ নিজের মতোই পাঁচজন পুরুষের ভোগে লাগবে, —আর তাহলে শাশুড়ির চরিত্র নিয়ে কথা শোনাতে পারবে না। সে বুদ্ধিটাও ছিল নিশ্চয় ভিতরে ভিতরে। কি বলিস শূর্পণখা?"

—"'ভোগে লাগবে' আবার কী কথা অয়োমুখী? রাক্ষসবংশীয়দের মুখে তো এমন মানুষের মতন ইতর কথা মানায় না? 'ভোগ করবে' বল। দ্রৌপদীও কুন্তির মতোই পাঁচজন পুরুষকে ভোগ করবে। ফলে শাশুড়িকে হিংসে করতে পারবে না। এই বলতে চাস তো?" শূর্পণখার কথা শেষ হওয়ার আগেই দেখা গেল উদ্যানপথে হর্ষিতচরণে লক্ষ্মণ আসছেন। যক্ষ-রক্ষ, নর-বানর স্বর্গে তো সকলকেই যেতে হয়। সবার সঙ্গে তখন দেখা হয়। পুনর্মিলনের উৎসব হয়। পুরনো দিনের গল্পগাছা হয়। পুরনো ক্রোধ ক্ষোভ সবই স্মরণপথে মুহূর্তের জন্য ভেসে ওঠে, উদয় হয়েই আবার মিলিয়ে যায়। আর ওই মুহূর্তটিতে ঘটে সেই ব্যক্তির নরকদর্শন। একটিই মোটে মুহূর্ত,—কিন্তু তার মনে হয় বুঝি সহস্র বৎসর—সময় যেন কাটতে চায় না।

এদিকে লক্ষ্মণকে দেখামাত্রই তো অয়োমুখী ও শূর্পণখার রাগে দাঁত কিড়মিড় করে উঠল। স্বর্গে সকলেই কামরূপিণী। কি রাক্ষসী কি বানরী, সবাই সুন্দরী। যার যেমন চেহারা পাওয়ার ইচ্ছে ছিল, সে ঠিক তেমনই দেখতে হয়ে যায়। স্বর্গে কেউ বৃদ্ধ, রুগ্ন, বিকলাঙ্গ, শ্রীহীন থাকে না। বৃদ্ধা ত্রিজটা তাঁর যৌবনের রূপ ফিরে পেয়েছেন। অয়োমুখী আবার পূর্ণাঙ্গী, পূর্ণস্তনী হয়েছেন। শূর্পণখার গজিয়েছে একটি তিলফুল জিনি নাসা। আর বোগেনভিলিয়ার ফুলের মতো কানদুটি। লক্ষ্মণ ওঁদের দেখে চিনতে পারলেন না, চেনবার কথাও নয়। কিন্তু যারা চেনবার তারা লক্ষ্মণকে ঠিকই চিনেছে। লক্ষ্মণ তিন সুন্দরীকে দেখে আরেকবার ঘুরে তাকালেন। ত্রিজটা বিপদ বুঝে তাড়াতাড়ি বললেন, "রাজকুমার, এ পথটুকু দ্রুত পায়ে পেরিয়ে যান। পিছনে তাকাবেন না। পিছনে তাকালেই বিপদ।"

লক্ষ্মণ চিরকেলে জেদী। তিনি অন্যের কথা শুনবেন কেন? এদিকে রাক্ষসীদের সেই এক মুহূর্তের জিঘাংসা তাদের স্বর্গীয় সৌন্দর্য নষ্ট করে দিয়েছিল—রাগের সময়টুকুর জন্য তারা সেই বিকলাঙ্গ বিকৃত রাক্ষসীরূপ ফিরে পেয়েছিল। জ্ঞানবতী, বুদ্ধিমতী ত্রিজটার বারণ সত্ত্বেও চট করে গোঁয়ার লক্ষ্মণ একবার পিছনে তাকালেন তিন সুন্দরীকে আরেকটিবার দেখতে। আর ঠিক যেন দুঃস্বপ্নের মতন লক্ষ্মণ স্পষ্ট দেখতে পেলেন বিশালবপু, বিকটা, বিকৃতদর্শনা নাসিকাকর্ণস্তন ছিন্নভিন্ন, অশ্রু ও রক্তে মাখামাখি দু'জন রাক্ষসী গর্জন করতে করতে হাত বাড়িয়ে প্রচণ্ড মুখব্যাদান করে, হাঁয়ের মধ্যে লকলকে আগুনজিভ ও তীক্ষ্ণদাঁতের শূল বের করে, তাঁকেই চিবিয়ে খেতে আসছে।

স্বর্গে কারুর তীরধনুক থাকে না। লক্ষ্মণেরও নেই। আত্মরক্ষার একটিমাত্রই উপায় আছে, দে ছুট, দে ছুট। পাঁই পাঁই করে লক্ষ্মণ দৌড় লাগালেন। তাঁর মনেই রইল না যে এটা স্বর্গ। এখানে হিংসাদ্বেষ চলে না, এখানে ভয়ভাবনা নেই, এখানে কেউ কাউকে মারতে কাটতে পারে না—তিনি ভুলেই গেলেন যে তিনি অলরেডি মৃত, আবার নতুন করে রাক্ষসের পেটে যাওয়ার বা ভয়ে মরে যাওয়ার কোনও আশঙ্কাই তাঁর নেই। তীব্র প্রাণভয়ে আকুল হয়ে লক্ষ্মণ আথালিবিথালি ছুট লাগালেন। যেন অনন্তকাল ধরে মৃত্যু তাঁকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। কত গিরিপর্বত, কত অরণ্য মরুভূমি, কত নদনদী, কত তেপান্তরের মাঠ পার হয়ে প্রলম্বিত হল সেই প্রচণ্ড পলায়ন—শেষে হাঁপাতে হাঁপাতে ক্লান্ত বিধ্বস্ত লক্ষ্মণ উর্মিলার পায়ের কাছে এসে ধপাস করে পড়ে গেলেন। উর্মিলা পারিজাতের ফলের বিচি বাদ দিয়ে আচার তৈরি করছিলেন। খুব অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন—"কী ব্যাপার স্বামী? এত ছুটছেন কেন?" "বাঁচাও, উর্মিলা, বাঁচাও, সেই সব রাক্ষুসীরা আমাকে খেতে আসছে।" মহাবীর লক্ষ্মণের মুখে বালকোচিত কথা শুনে উর্মিলা হেসেই গড়িয়ে পড়লেন। —"আপনি নিশ্চয়ই দুঃস্বপ্ন দেখেছিলেন আর্যপুত্র—এখানে রাক্ষুসী কোথায়? এ তো স্বর্গ। এখানে দেব-দানবে, নর-রাক্ষসে তো তফাত নেই। সবাই স্বর্গত আত্মা। সবাই অমৃত পান করেছেন, কেউ আপনাকে খেতে আসবেন না।"

লক্ষ্মণের তখনও তীব্র ভয়ে বুক ধুকপুক করছে, পা টলছে, মাথার মধ্যে টালমাটাল। ধীরে ধীরে, শান্ত হয়ে তিনি ব্যাপারটা সম্যক অভিধাবন করতে সক্ষম হলেন।—"এই তবে আমার নরকদর্শনের পালা চুকে গেল।"

মাত্র একলহমার ব্যাপার, কিন্তু মনে হয়েছিল, যেন অন্তহীন পথ, অন্তহীন দৌড়, অন্তহীন মৃত্যুভয়। এবার লক্ষ্মণ চিনতে পারলেন— ওরা অয়োমুখী আর শূর্পণখা। এতদিনে টের পেলেন যে তিনি মহাপাপ করেছিলেন। ছোট ছেলেরা যেমন গঙ্গাফড়িঙের পা ছিঁড়ে দেয়, প্রজাপতির ডানা ছিঁড়ে ফেলে। এ তার চেয়েও বেশি। উনি একটি স্ত্রীলোকের নাসাকর্ণ ও একজনের নাসাকর্ণ, স্তনযুগল টুকরো করে কেটে ফেলে দিয়েছিলেন। ওদের অপরাধ, ওরা লক্ষ্মণকে প্রণয়নিবেদন করেছিল। লঘুপাপে গুরুদণ্ড দেওয়া হয়ে গেছে। লক্ষ্মণ নিজে নিজেই বুঝতে পারলেন, যেখানে ক্ষমা প্রার্থনা করে প্রত্যাখ্যানই হত যথেষ্ট, সেখানে তিনি তাদের আক্রমণ করে কুরূপা, বিকটা, অঙ্গহীনা করে দিয়েছিলেন। এ অন্যায়ের স্বপক্ষে কোনও যুক্তি নেই।

স্বর্গে গেলে সকলেরই সত্যদৃষ্টি খুলে যায়। লক্ষ্মণের সত্যদর্শন হল। তিনি তখন উর্মিলার সামনে নতজানু হয়ে বসে অয়োমুখী ও শূর্পণখার কাহিনী তাঁকে বলে, নিজের অপরাধ স্বীকার করলেন। উর্মিলা শুনে যারপরনাই দুঃখিত হয়ে বললেন —"যাও, তুমি আবার ওঁদের খুঁজে বের করে মার্জনাভিক্ষা করগে।" লক্ষ্মণ বললেন, "উর্মিলা, আমি এখন কোথায় ওঁদের খুঁজে পাব? স্বর্গ যে বড্ড বেশি বড়—এর সীমা নেই, প্রান্ত নেই—বিপুল বিস্তারিত এলাকা। কিন্তু আমি খুবই দুঃখিত। যদি কখনও অয়োমুখী, শূর্পণখার সঙ্গে আবার দেখা হয়, তবে ওদের নিশ্চয়ই বলব,

BanglaBook.org

'আমাকে তোমরা ক্ষমা করে দাও। আমার মহা অন্যায় হয়েছিল।' তখুনি স্বর্গের মৃদুমলয় বায়ু সেই মার্জনাভিক্ষাটি বয়ে নিয়ে গিয়ে অয়োমুখী আর শূর্পণখার কানে কানে পৌঁছে দিল। আসলে লক্ষ্মণ তো বেশিদূরে যাননি। অয়োমুখীদের ঠিক পাশের কুঞ্জবনটিতেই, ঊর্মিলা ফল পাড়ছিলেন। নরকদর্শনের উদ্দেশ্যে লক্ষ্মণের ওই ঊর্ধ্বশ্বাস প্রাণভয়ে দীর্ঘ দৌড়টি সম্পূর্ণ মায়ার ঘোরে সৃষ্ট একলহমার চিত্তবিভ্রম মাত্র।

লক্ষ্মণকে দেখে রাগত হয়ে, নরকদর্শন হয়ে গিয়েছে রাক্ষসীদেরও। মার্জনাভিক্ষা কানে আসামাত্র লক্ষ্মণকে প্রাণ থেকে ক্ষমা করে দিলেন শূর্পণখা আর অয়োমুখী। অমনি তাঁদের দেহের স্বর্গীয় সৌন্দর্য, অন্তরের অক্ষয় সৌন্দর্য হয়ে উঠল। তাঁদেরও সত্যদৃষ্টি খুলে গেল ক্ষমামৃতের স্বাদ পেয়ে।—"এইবার তোদের বিউটিটার পার্মানেন্ট ট্রিটমেন্ট হয়ে গেল। শতবার লক্ষ্মণের সঙ্গে দেখা হলেও আর কিন্তু আগের বিকৃত রূপটি তোদের স্পর্শই করতে পারবে না"—বলতে বলতে রূপসী ত্রিজটার মুখখানি আহ্লাদে জ্যোতির্ময় হয়ে যায়।

ভাগ্যিস স্বর্গে বিউটি কনটেস্ট হয় না, হলে কিন্তু সেই মুহূর্তে তিনজনেই 'মিস্ স্বর্গ ফরএভার' হয়ে যেতেন।

আজকাল, শারদীয় সংখ্যা, ১৪০৩

মৎস্যমুখী

সীতার মনটা বড়ই খারাপ।

রামচন্দ্রকে কথাটা বলে দেওয়া একদম উচিত হয়নি লক্ষ্মণের। কিন্তু বলে দিয়েছেন।

সীতা আহ্লাদ করে বলতে গেলেন, "ঠাকুরপো, পম্পা সরোবরে জল আনতে গিয়ে দেখে এলুম কী চমৎকার নাদুসনুদুস সব মাছ গিজগিজ করছে। কাচের মতন জলে। মুনিঋষিরা মাংস খেলে কী হবে, মাছটা বোধহয় তেমন খান না। যাও না ভাই, ছিপ নিয়ে একটুখানি বসলেই হবে। আর ছিপও চাই না—খ্যাপলাজাল পাতলেই ধরা পড়বে। তা অনেক তো বেণুবন রয়েছে, তুমি একটা খ্যাপলাজাল বুনে নিয়ে যদি সরোবরে একবারটি পেতে দাও—ওঃ! সে যা দারুণ কালিয়া আমি রেঁধে দেব না?"

অনেকদিন মাছ খাননি, কৌশল্যা যত্ন করে এয়োস্ত্রী বলে সীতাকে রোজই মৎস্যমুখ করাতেন, বিশেষ করে একাদশীতেও। কিন্তু বনে এসে রামচন্দ্র হঠাৎ নিরামিষাশী টাইপের হয়ে গেছেন। মৃগয়া করেন না, মাংসও খান না। লক্ষ্মণ তবু মাঝে মধ্যে দু'একটা ছোটোখাটো পাখি-টাখি গুলতি দিয়ে মেরে আনেন, বৌদি আর দেওরে মিলে ভোজ হয়। রামচন্দ্র অবশ্য পাতে দিলে, মুখে যে দেন না,

BanglaBook.org

তা নয়। কিন্তু জন্তু-জানোয়ার মারবার প্রশ্ন নেই। বনে আছি, ওদেরই রাজত্বে, ওদের মারব কী?

সীতার মাছ খেতে ইচ্ছে হয়েছে, আদরের দেওরকে বলেছেন। লক্ষ্মণ গেছেন বেত কাটতে, খ্যাপ্‌লাজাল বানাতে হবে। রামচন্দ্র ভাইকে ডেকে পাননি। কিছু ফরমাশ ছিল হয়তো "জল দাও", কিংবা "পা টিপে দাও",—লক্ষ্মণের তো ওই কাজ। দাদার সেবা, বৌদির সেবা। তবে বৌদি বেশি কিছু বলেন-টলেন না,—নিজে হাতেই জল গড়িয়ে নেন। রান্নাবান্না করেন, খাবার বেড়ে দেন—সীতার সারাদিনই ঘরের কাজকর্ম থাকে। বনে এসেও কি রেহাই আছে? সংসার এসেছে সঙ্গে। লক্ষ্মণকে ডেকে না পেয়ে শ্রীরামচন্দ্র বললেন—"লক্ষ্মণ কোথায়? সীতা, এক গেলাস জল দাও তো।" সীতা জল নিয়ে বললেন লক্ষ্মণ কোথায় উনি জানেন না। (সত্যিই তো সীতা জানেন না, কোন বেণুবনে তিনি বেত কাটতে গেছেন?)

লক্ষ্মণই একটু পরে ফিরে এসে দাদাকে বলে দিলেন

—"বেত কাটতে গিয়েছিলাম দাদা।"

—"বেত। কেন? কাকে মারবে?"

—"মারব না, ধরব। মাছ ধরব। বৌদিদির আদেশ।"

—"মাছ ধরবার আদেশ? কিন্তু আমরা তো এখানে মাছ খাচ্ছি না।"

—"কিন্তু বৌদিদি যে মাছ খেতে চান, এয়োস্ত্রী মানুষ, একটু মাছই তো খেতে চেয়েছেন, আর পম্পা সরোবরে মাছের ছড়াছড়ি। স্নানই করা যায় না মাছের গায়ে ধাক্কা না খেয়ে। তাই খ্যাপ্‌লাজাল বানাচ্ছি।"

—এ কী! মেয়েমানুষের এত নোলা। ব্যাস্, রামচন্দ্র গেলেন ক্ষেপে। মাছটাছ ধরতে হবে না। খ্যাপ্‌লাজাল বোনার কোনো দরকার নেই। আর যাবে কোথায়? অমনি সীতারও গোঁসা হয়ে গেল। বরের সঙ্গে ঝগড়া করে সীতা ঠোঁট ফুলিয়ে বনের মধ্যে চলে গেলেন।

গেলেন তো গেলেনই। সীতা বন থেকে আর ফিরলেন না। রামচন্দ্রের ভীষণ ভাবনা হল। তিনি লক্ষ্মণকে নিয়ে বউ খুঁজতে বেরুলেন ঝোপেঝাড়ে, পাহাড়ে-কন্দরে, নদীতে-সরোবরে। নাঃ, কোথাও সীতার চিহ্ন নেই। এমনি সময়ে এক বিশালকায় হনুমানের সঙ্গে দেখা। বীর হনুমান এক কলাবাগানে বসে, ইয়া বড় বড় মর্তমান কলার দুটি কাঁদি নিয়ে মনোযোগ সহকারে জলখাবার সারছেন। রামচন্দ্রকে দেখবামাত্র ভক্ত হনুমানের সারা গায়ে কাঁটা দিল। ভক্তিভরে তাঁর সবগুলো লোম খাড়া খাড়া হয়ে উঠল। হনুমান টের পেয়ে গেলেন, এই ঋষিবেশী, শ্যামবর্ণ পুরুষটিই নির্ঘাৎ শ্রীহরি। তিনি তো কলাটলা ফেলে ধপাস করে রামচন্দ্রের পদতলে আছাড় খেয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বসলেন। রাম বললেন—"শুভমস্তু। আপনি কে?" হনুমান বললেন, —"আমি পবনপুত্র আঞ্জনেয়। লোকে আমাকে বীর হনুমান বলে ডাকে। আমি আপনার সেবায় নিযুক্ত হতে চাই। আপনি নিশ্চয় বিষ্ণুর অবতার শ্রী রামচন্দ্র?"

রাম বললেন, —"কে কার অবতার সেসব জানি না বাপু, তবে আমার নাম

BanglaBook.org

রামচন্দ্র। আমার বাবার নাম রাজা দশরথ, আর ইনি আমার ভাই লক্ষ্মণ। আমরা বড় দুর্বিপাকে পড়েছি। আমার স্ত্রী সীতাদেবী রাগ করে হঠাৎ কোথায় যেন চলে গেছেন, আমরা তাঁকে খুজে পাচ্ছি না। আপনি কি তাঁকে দেখেছেন?"

হনুমান বললেন,—"দেখিনি।—কিন্তু"—বলে ভুরু কুঁচকে একটু ভাবলেন। তারপর বললেন—"আমি খুব উঁচু একটা পর্বত জানি। তার চুড়ো থেকে সবকিছুই দেখা যায়। সেই গন্ধমাদন পর্বতে উঠে আমি দেখি যদি পূজনীয়া সীতাদেবীর খোঁজ মেলে।"

বলেই হনুমান হু-উ-প্ করে ওপরদিকে বিশাল লম্ফ দিলেন। আর শোঁও করে সঙ্গে সঙ্গে আকাশে উড়ে গিয়ে একেবারে গন্ধমাদন পর্বতের চুড়োয় গিয়ে নামলেন। পর্বতচুড়োয় উঠে হনুমান দ্যাখেন কি, দূরে রাক্ষসদের রাজ্যে রাক্ষসী-পরিবৃত হয়ে সীতা বসে আছেন। কান্নাকাটি করছেন। লাইন দিয়ে রাক্ষসীরা তাঁকে নানারকমের খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করছে। তিনি কিছুই ছুঁচ্ছেন না। হনুমান ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলেন রাক্ষসীদের হাতে থালা ভরা-ভরা নানারকমের মাছের রান্না। মাছভাজা, মাছের ডাল, মাছের কালিয়া, মাছের শুকতো, মাছের ঝোল, মাছের ঝাল, মাছের দমপোক্ত, মাছের চচ্চড়ি, মাছের পোলাও, মাছের বিরিয়ানি, মাছের চপ, মাছের কাটলেট, এমনকি মাছের লবঙ্গলতিকা, মাছের পায়েস পর্যন্ত। হনুমান ফলমূলভোজী —তবু তিনিও এতরকমের বিচিত্র মৎস্য-মেনু দেখে হতবাক! সীতা কিন্তু তাকিয়েও দেখছেন না। হাত নেড়ে নেড়ে সব ফেলে দিচ্ছেন, আর কেঁদেই চলেছেন।

হনুমান ভালো করে দেখে নিলেন রাক্ষসদের জায়গাটা। তারপরে নেমে এসে রামকে বললেন, তিনি সীতাকে খুঁজে পেয়েছেন। অনুমতি করলেই ফেরৎ এনে দেবেন এখানে। শ্রীরামচন্দ্রের ধড়ে প্রাণ এল। তিনি বললেন—"যান যান মশাই, এক্ষুনি যান, আমি সর্বান্তঃকরণে অনুমতি দিচ্ছি।" হনুমান তক্ষুনি হু-উ-শ করে সামনের দিকে লাফ দিয়ে শোঁ-ও-ও উড়ে গিয়ে রাক্ষসদের রাজ্যে পৌঁছে একেবারে সীতার সামনে নেমে পড়লেন, ধু-প। রাক্ষসীরা ভয়ে এদিক সেদিক ছিটকে গেল।

সীতাদেবী নিজেও উলটে পড়েছিলেন,—হনুমান চট করে তাঁকে ধরে ফেলে, দুহাতে করে মাথার ওপরে ঠিক মুকুটের মতন করে বসিয়ে, আবার "হু-উ-শ্" করে আর একটা লাফ মারলেন। এবারে একেবারে রামচন্দ্রের সামনে।

সীতাকে দেখে রামচন্দ্র যত খুশি, লক্ষ্মণও তত। ইতিমধ্যে খ্যাপলাজাল বোনা হয়ে গেছে লক্ষ্মণের। তাতে জ্যান্ত চারটে কালবোষমাছও খলবল করছে। রামচন্দ্র দেখেও কিছু বলেননি। লক্ষ্মণ শুধু বললেন—"বৌদিদি! কোথায় চলে গিয়েছিলেন? দাদা আর আমি কত খুঁজলাম—মাছগুলো রান্না করতে হবে না বুঝি?"

হনুমানের এবারে অবাক হবার পালা। রাক্ষসদের রাজ্যে রান্না করা অত মাছ যে লোক ছুঁয়েও দেখেনি সে-ই কিনা লোভে চকচকে চোখ করে বলল—"সত্যি ঠাকুরপো? মাছ ধরেছ? কই, কই দেখি?" হনুমানকে চমকে দিয়ে সীতাদেবী মাছ রান্না করতে ছুট্টে চলে গেলেন। হনুমান রামের কাছে গল্প করতে বসলেন, সীতা কেমন অশোকবনে বন্দিনী হয়ে ছিলেন, আর রাক্ষসীরা ভালো ভালো মাছের রান্না ওঁকে খেতে সাধাসাধি করছিল, সীতা ছুঁয়েও দেখছিলেন না। অথচ এখানে এসেই মাছ রাঁধতে বসে গেলেন। কোমর বেঁধে। ব্যাপার কী?

খাওয়াদাওয়া সারা হলে, রামই হনুমানকে লক্ষ্মণের মাছ ধরার কথাটা সব খুলে বললেন। রাম আর হনুমান শাকভাত খেলেন, লক্ষ্মণ আর সীতা মাছভাত। রামচন্দ্র আপত্তি করলেন না। বাপ্‌রে। আর আপত্তি করে। বৌ যদি আবার পালিয়ে যায়? এবারে না হয় রাক্ষসরা খেয়ে ফেলেনি। পরের বারে কি ছাড়বে? হনুমান শুনেটুনে বললেন— "প্রভু, যদিও এই ছোটমুখে বড়ো কথা মানায় না, তবুও বলি, আপনার কিন্তু আপত্তি করাটা ঠিক হয়নি। কথায় বলে, আপ্‌রুচি খানা। মা জননীর খাওয়াদাওয়া নিয়ে আপনার কথা কওয়াটা ঠিক নয়।" সেই থেকে লক্ষ্মণ মাছ ধরেন, সীতা রান্না করেন, আর দেওরে-বৌদিতে আরাম করে মাছভাত খান। রাম সোনামুখ করে কচুসেদ্ধ কুমড়োভাজা দিয়েই খাওয়া সারেন।

সীতার মুখে জানা গেল, উনি রেগেমেগে হাঁটতে হাঁটতে ভুল করে রাক্ষসদের রাজ্যে ঢুকে পড়েছিলেন, তাই রাবণরাজা ওঁকে বন্দী করে ফেলেছিলেন।

মাছ খেতে না পেয়ে সীতা ঘর ছেড়ে এসেছেন শুনে রাবণের মনে খুব মায়া হল। তিনি বললেন— "আমাকে বিয়ে করলে তোমাকে যত খুশি মাছ খাওয়াব।" সীতার মন জয় করতেই রকম-বেরকমের মাছ রান্না করে ভেট পাঠাচ্ছিলেন রাবণরাজা। "কিন্তু আমার তখন ভয়ের চোটে মাছের খিদে উবে গেছে। রাক্ষসীদের আনা ভালো ভালো রান্নার গন্ধেও আমার একটুও লোভ হচ্ছিল না। কেবল আপনাদের জন্যে মন কেমন করছিল। ভাগ্যিস সময় মতন বীর হনুমান আমায় উদ্ধার করে এনেছেন? না আনলে কে জানে রাবণ হয়তো জোর করে বিয়েই করে ফেলতেন আমাকে? কিংবা চিবিয়ে খেয়ে ফেলতেন রেগে গিয়ে। কোনোটাই সুবিধের হত না তেমন।"

সীতার কথা শুনে শ্রীরাম মনে একটু দুঃখু পেলেন হনুমানের প্রতি সীতার এত কৃতজ্ঞতা দেখে। "হনুমান গিয়ে নিয়ে এসেছেন, তাই। না আনলে কি আর আমরা তোমাকে উদ্ধার করতুম না? কি বল লক্ষ্মণ?" লক্ষ্মণ সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলেন।—"অবশ্যই। সে আর বলতে?"

চোদ্দ বছর প্রায় শেষ। সীতা সেদিন চমৎকার গরগরে করে তেল-কৈ রান্না করেছেন। রামচন্দ্র হঠাৎ দেখেন, তাঁর পাতেও একটা মাছ। আর যাবে কোথায়? রেগে আগুন, তেলে বেগুনে ক্ষেপে বলেন তিনি—"এবার সীতার আর রক্ষে নেই। আমার পাতেও কিনা মাছ। নিজে খাচ্ছো, দেওরকে খাওয়াচ্ছ, আমি কিছু বলছি না। এবার আমাকেও ..."? সীতা ভয়ে হাতজোড় করে বললেন... "স্বামী, মাছটা আপনি-আপনিই লাফিয়ে কড়াই থেকে আপনার পাতে গিয়ে পড়ল। বিশ্বাস করুন। কৈ-মাছের প্রাণ তো। রান্না হবার পরেও একটু একটু প্রাণ থাকে। এই মাছটার বড্ড নাছোড়বান্দা স্বভাব। খাবার জলের সঙ্গে আপনিই চলে এসেছিল কলসির মধ্যে—তারপর কলসি থেকে লাফ দিয়ে কড়ার মধ্যে পড়েছে। আর তারও পরে কড়াই থেকে ঝাঁপ দিয়ে সোজা আপনার পাতে। আমার কোনো দোষ নেই। মাছেরই দোষ।"

তখন একটু চিন্তা করে রামচন্দ্র বললেন—"তাই যদি হয়, তবে তো এই মাছ নির্ঘাৎ আমার একজন ভক্ত। এত কষ্ট করে যখন সে এসেছে, তার মানে সেধেই নিজেকে আমার প্রতি উৎসর্গ করেছে। একে তো আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। এই অসামান্য আত্মনিবেদন আমাকে গ্রহণ করতেই হবে।"—বলে রামচন্দ্র তেল-কৈতে হাত দিলেন।

আঁচিয়ে উঠে ঢেকুর তুলে রামচন্দ্র বললেন—"বাঃ—সীতা, তোমার কিন্তু রান্নার হাতটি সত্যিই ভালো। লোকে যে কেন শুধুই রান্নায় দ্রৌপদীকে প্রশংসা করে, বুঝিনে।"

তাড়াতাড়ি ওদিক থেকে লক্ষ্মণ বলে উঠলেন—"ও দাদা, আপনি সর্বকালজ্ঞ কিনা, তাই একটু ভুলে যাচ্ছেন,—দ্রৌপদী তো সেই দ্বাপরে জন্মাবেন — এখন মাত্র ত্রেতাকাল। এখনও দ্রৌপদীর টাইম হয়নি।"

(গুজরাটি উপকথা অবলম্বনে)

তথ্যকেন্দ্র, রম্য সাহিত্য সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯৭

BanglaBook.org

অথ গঙ্গা-সত্যবতী কথা : অথবা অতীন সংবাদ

সত্যবতী মুখে এক খিলি সুগন্ধ জর্দাপান গুঁজে গঙ্গাদেবীকে বললেন, "একেলে ছেলেমেয়েগুলোর ব্যাপার বুঝিনে দিদি। দ্বৈপায়নও তো আমার কানীনপুত্রই ছিল, কৈ তাকে তো জলে ভাসিয়ে দেইনি আমি? দিলে কি আর আজ অতবড় 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন' ব্যাসরচিত মহাভারতখানা লেখা হোতো? কুন্তীবৌমার এটা কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি, যাই বলো, হ্যাঁ, বোঝা দায়।"

"ঠিকই বলেছো, পুথার ব্যাপারটা তুমি হয়তো বুঝবে না—তাছাড়া সত্যবতী, তুমি ছিলে বাছা মৎস্যগন্ধা; হয়ে গেলে পদ্মগন্ধা; তোমার ব্যাপারটা আলাদা কিনা?"

—এই কথাটা শুনলেই সত্যবতীর রাগের চোটে মনে হয় গলায় বুঝি বঁড়শী ফুটে গেছে।

—"কেবল মৎস্যগন্ধা, মৎস্যগন্ধা! তো হয়েছেটা কী শুনি? জেলের মেয়ের গায়ে মাছের গন্ধ হবে না তো কি বাঘের গন্ধ হবে? আমার তো জন্মই মাছের পেটে। পদ্মগন্ধা হতে কে চেয়েছিল?"

মৎস্যগন্ধা থাকতে বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না সত্যবতীর। এসব তো ওই কামুক পরাশর মুনির খুঁৎখুঁতনি। আর গঙ্গাদেবী এমনভাবে কথা কইছেন, যেন উনিই এই গন্ধবদলের কর্ত্রী। হুঁ?। অহংকারে মাটিতে পা পড়ে না—শিবঠাকুরের মাথায় চড়ে

বসে আছেন বলেই কি সত্যবতীরও মাথায় পা দিয়ে চলবেন নাকি গঙ্গা? না মশাই, সেটি হচ্ছে না, সত্যবতী জেলের মেয়ে। জাল বুনতে জানেন, জাল ছুঁড়তেও জানেন, জাল গুটোতেও জানেন। আর গঙ্গা তাঁর জন্মকর্মের নদীও নন, সত্যবতীর যা কিছু সব মা যমুনার বুকে। দেবব্রতর মা গঙ্গাদেবী তো আসলে সত্যবতীর সতীন বৈ কিছু নন? এখন না হয় দু'খিলি পান মুখে দিয়ে দুজনে একটু বিশ্রাম করছেন। গঙ্গার যত চ্যাটাং চ্যাটাং কথা।—"অমন মৎস্যগন্ধা-মৎস্যগন্ধা কোর না তো দিদি? যোজনগন্ধা হ'তে কি আমি চেয়েছিলুম? ওসব বামনাই ঢং আমার নেই।" "তা অবিশ্যি চাওনি। ঠিক কথা। কিন্তু আমার কোলের ছেলেটার আমার দুধের বাছা দেবব্রতর জীবনটা ধ্বংস করে দিতে তুমিই চেয়েছিলে। তোমার জ্বালায় জ্বলে ওর জীবনটা শেষকালে ছাইভস্ম হয়ে গেল।"

দুষ্টুমিতে সত্যবতীর চোখ চিক্‌চিক্ করে।

—"ভস্ম হল, না ভীষ্ম হল? দিদি?"

—"ঠাট্টা রাখো সত্যবতী, এটা গুরুগম্ভীর বিষয়। এই স্বার্থপরতাটা করে তোমার লাভটা হলো কী? যাই বল বাপু, শান্তনুকে দিয়ে অতবড় অন্যায় শর্তটা বাঁধিয়ে নেওয়া তোমার উচিত হয়নি। আজ দেবব্রত সংসারী হলে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধই হতো না।"

—"আমি তো না? আমি আবার কী শর্ত করালুম? ও তো আমার বাবার ব্যাপার, দিদি।"—

সত্যবতী আকাশ থেকে পড়লেন।

—"ওই, তুমিও যা, তোমার বাবাও তাই।"—গঙ্গার স্বরে গভীর অধীরতা—"তুমিও তো আপত্তি করনি? তাই বলি বড্ড নিষ্ঠুর, নিলাজ মেয়ে বাছা তুমি, মৎস্যগন্ধা।" "কিন্তু মহারাজই বা রাজী হলেন কেন? আমার বাবা তো তাঁকে হাত-পা বেঁধে শর্ত করিয়ে নেয়নি দিদি? বাবার কী দোষ? বাবা নিজের মেয়ের দিকটা ভেবেছেন। মহারাজ তাঁর নিজের ছেলের কথাটা ভাবলেই পারতেন।" সত্যবতী হীরের নথ ঝলসিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

গঙ্গাদেবী উদাসনয়নে বাতায়ন পথে দূরে চেয়ে চুপ করে রইলেন। একটু পরে ধরা গলায় উত্তর দিলেন।

—"কামার্ত পুরুষকে দিয়ে মাতৃহত্যা-পিতৃহত্যা পর্যন্ত করিয়ে নেওয়া যায়, পুত্রের স্বার্থনাশ তো তুচ্ছ! যযাতির কথা মনে নেই?" গঙ্গা এবার সস্নেহে সত্যবতীর গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন,

—"সত্যি, পুরুষমানুষের স্বভাবটাই বড্ড আত্মকেন্দ্রিক—বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভাবেই না তারা। কিন্তু তুমি তো স্ত্রীলোক, তুমি একটু ভাবলে পারতে আমার ছেলের দিকটা। আমরা মেয়েরা মায়ের জাত, আমরা পারি। মহত্ত্ব মাতৃত্বের একটি সহজাত গুণ। যেমন ধৈর্য-সহ্যও।"

গঙ্গা আরো কথা বলছিলেন, কিন্তু সত্যবতী অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, রূপোর

BanglaBook.org

পিকদানে পিচ্ করে সুগন্ধী পানের পিক ফেললেন। ঘরের হাওয়া সুবাসিত হয়ে উঠলো। একটি হাত কোমর রেখে আরেকটি হাত গঙ্গাদেবীর মুখের সামনে নাড়তে নাড়তে হাতভর্তি কাঁকনবালা চুড়ির ঝঙ্কার বাজিয়ে সত্যবতী বলে ওঠেন, "থাক থাক আর মাতৃত্বের মহত্ত্ব নিয়ে বেশি বোলচাল দিও না দিদি, তুমি নিজে কী? অ্যাঁ? আমার বাবা তো মাছ মারা মানুষ, তোমাদের ভদ্দরলোকেদের কতটুকু বোঝেন। কিন্তু স্বয়ং দেবী হয়েও তুমি কি শান্তনুর কথাটা ভেবেছিলে? শান্তনুকে বিয়ের আগে আরো কঠিন একটা শর্ত কি তুমিও বেঁধে দাওনি? পরের পর সাত সাতটি সোনার টুকরো পুত্রসন্তানকে টপাটপ নদীর জলে ফেলে দেয় যে মা, সে কেমনধারা মা-জননী? শুনি? আর ফেলে-দেওয়া তো ফেলেই দেওয়া। ছেলেগুলো জলে পড়ল, আর মরল। পট্‌পট্ করে সাতটা ছেলে সটান স্বর্গেই চলে গেল। কুন্তী তো জলে ভাসিয়েছিল মোটে একটাই ছেলেকে। তাও কত যত্ন করে, পেটিকায় ভরে, তবে না ভাসিয়েছিল, যাতে ছেলেটা বেঁচেবর্তে থাকে। তাছাড়া ওর বড় একটা লজ্জার কারণও তো ছিল। কুমারীকালের সন্তান। আর তুমি? রীতিমতো মন্তর পড়ে বিয়ে করা স্বামীর সাত সাতটা দেবতার মতো পুত্রসন্তানকে ইচ্ছে করে ছুঁড়ে ছুঁড়ে গঙ্গার জলে বিসর্জন দিলে কেন? না শর্ত পূরণ হচ্ছে। নেহাৎ ঝামেলা পোয়াতে পারবে না বলেই তো? ছেলেপুলে মানুষ করা কি এতই কঠিন কম্মো? একশোটা দাসদাসী তো ছিল তোমার। তোমার বুঝি স্বভাবটা নিষ্ঠুর, নিলাজ নয়? কেবল আমারি? ঝামেলা এড়াতে খুন করবে?"

—"ঝামেলা নয়, আমার ব্যাপারটা একদম আলাদা সত্যবতী। এমন কি তুমিও একটু চেষ্টা করলেই বুঝবে। অষ্টবসুর সঙ্গে আমার আগেই চুক্তি ছিল, আমি তাদের মর্ত্যে জন্মদান ও মুক্তিদান করব। তাদেরই শাপমুক্তির উদ্দেশ্যে ওই কঠোর কাজটি করা। এতে আমার নিজের স্বার্থের প্রশ্ন নেই, বরং নিজের ক্ষতি করেই পরের উদ্ধার। কুন্তীর তো ইনস্ট্যান্ট গর্ভ, ইনস্ট্যান্ট প্রসব—ওকে তো দশমাস ধরে শরীরের মধ্যে পালন করতে হয়নি প্রতিটি ভ্রূণকে? কর্ণের জন্ম দৈবদুর্যোগে, মুহূর্ত-প্রসূত শিশু সে। জননীর গর্ভে দশমাস ধরে তিলে তিলে বাড়েনি। তার সঙ্গে আমার ছেলেদের কি তুলনা"—

—"কেউ করেনি। তুমিই তো প্রসঙ্গ তুললে। কিন্তু", সত্যবতী মুচকি হেসে বলেন—"যাই বল দিদি, কুন্তীর ঐ মন্ত্র পড়ে যখন খুশি ছেলে হওয়াটি কিন্তু বেশ। কর্ণকে দিয়ে তো সবে খেলার শুরু। তারপরে একে একে পঞ্চপাণ্ডবের জন্মও তো ঐ ছু-মন্তরে। নিজের পেটে তিনটে, আবার কিনা মাদ্রীর পেটেও দুটো। সব ঐ ইনস্ট্যান্ট বেবি। এই গর্ভসঞ্চার, আর এই প্রসব, সবই সঙ্গে সঙ্গে। সুবিধেটা ভেবে দ্যাখো একবার। হাঁসফাঁস দশমাস বয়ে বেড়ানোর যন্ত্রণা নেই— গা বমিবমি নেই—অক্ষিদে-কুক্ষিদে নেই—"

গঙ্গা কিন্তু সহমত হতে পারেন না। "তা হোক। তবু—সন্তান হবে সুলগ্ন দেখে, স্বগৃহে।" গঙ্গা ভ্রূ কুঁচকোন,—"তার একটা রকম-সকম আছে। বংশরক্ষা, ধর্মরক্ষা এসব তো মুখের কথা নয়। কুন্তীর ছেলেগুলি তো কেউই তেমনভাবে ভূমিষ্ঠ হয়নি?

রাজপুত্রের মতো করে নয়, মঙ্গলাচারের মধ্য দিয়ে নয়, এরা তো সবাই দৈব দুর্যোগে বাড়ির বাইরে নির্জনে বিজনে জন্ম নিতে বাধ্য হয়েছে"—সত্যবতী অধৈর্যভাবে বলে ওঠেন ;

"ওটা দৈব— 'দুর্যোগ' বোলো না গঙ্গাদিদি, বলো দৈব সুযোগ। কুন্তীর এবং তার পাঁচজন পুত্রেরই।"

"তা তো বটেই। নতুবা পাণ্ডুর বংশরক্ষা হতো কী করে? দেবব্রতের সঙ্গে সঙ্গেই সমাপ্ত হতো সূর্যবংশ"—

"আর গঙ্গাদিদি—দ্যাখো আট-আটটা বারের প্রসব যন্ত্রণার পরেও তুমি কেমন দিব্যি চিরসুন্দরী, চিরযৌবনা রয়ে গেছো। এটা কেমন করে করলে? তোমার তলপেটে কি উরুতে একটা স্ট্রেচমার্ক পর্যন্ত নেই। একফোঁটা মেদ জমেনি শরীরে? সত্যি বলছি দিদিভাই, আমি তো অবাক হয়ে তোমার পলিমাটির মতো মসৃণ চামড়া চেয়ে চেয়ে দেখি।"

গঙ্গাদেবী লজ্জা পেয়ে বকেই দিলেন সত্যবতীকে, (খুশি খুশি গলায় যদিও) —"আজেবাজে বকিস না তো যোজনগন্ধা। আমি তো সর্বদা প্রবহমানা, আমি থামছি কখন, যে স্ট্রেচমার্ক হবে? তার মেদটাই বা জমবে কোথায়? আমি তো—"

—"তুমি, তুমি। এই তো? মানছি, তুমি শিবঠাকুরের মাথায় পা দিয়ে চলো। তোমার ব্যাপারই আলাদা। কিন্তু দিদি, কুন্তীর কথাটা ভেবে দেখেছো? দা-রুণ চালু মেয়ে বটে কুন্তী। হাতের পাঁচটা আঙুল সমান হয় না, আর কুন্তী পাঁচ পাঁচটা দেবতার কাছে কী চমৎকার সমান ব্যাভার আদায় করে নিলে? নিজে নিয়ে হোল না, আবার সতীনকেও ভাগ দেওয়া চাই। করিৎকর্মা মেয়ে বটে কুন্তী। হ্যাঁ।"

—"তা সতীনকে ভাগ না-দেওয়াটাকেই বুঝি ভালো বলতে তুমি?"

—"ছিছি! বালাই ষাট! তা কেন বলবো। দেখেছি তো, পাঁচটা ছেলেকেই কেমন নিজের পেটের ছেলের মতন করে মানুষ করলে পৃথা। একলাটি পাঁচটা ছেলে ম্যানেজ করা সোজা?"

—"কেন, দ্রৌপদী যদি পাঁচ-পাঁচটা শক্ত সমর্থ জোয়ান পুরুষকে দিব্যি ম্যানেজ করতে পারে একা একাই, তাহলে কুন্তী মা হয়ে পাঁচটা শিশুকে কেনই বা ম্যানেজ করতে পারবে না? তুমিই তো বললে এক্ষুনি, মায়েরা সব করতে পারে, মায়েদের অসীম ক্ষমতা।" একটু থেমে, সত্যবতী সোনার পিকদানিতে ফুচুৎ করে আরেক প্রস্থ সুগন্ধে ভুরভুর পিক ফেলে চোখ ঘুরিয়ে বললেন—"তুমি কিনা জগজ্জনের গঙ্গামাঈ, তাই মায়ের কোলে তো ঝোল টানবেই। আসলে কি জানো? কুন্তী বড্ড চতুর, আর স্বভাবটা অতিরিক্ত পজেসিভ। না-দিলে নিজের ছেলেগুলোকে বৌ নিয়ে সুখী হতে, না-দিলে পাঞ্চালীকে স্বামীসুখ। লোকে 'হা কুন্তী, হো-কুন্তী' করে বটে, —বলে, বটে 'আহাহা, কুন্তীর মতন মা হয় না,' আমি কিন্তু দিদি মোটেই তা বলি না। কুচুটে, গভীর গোপন দুর্বুদ্ধি ওর; বড্ড হিংসুটে শাশুড়ি বাপু ওই কুন্তী। এক মিনিটে কচি বৌটার সারাটা জীবন ধ্বংস করে দিলে গো? একটা আস্ত জ্যান্ত সোমত্থ

মেয়েকে পাঁচ পাঁচটা ছেলের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিলে কী অনায়াসে—আহারে—মেয়েটা যেন মেয়ে নয়, ভিক্ষের চাল? নিজের পেটে তো মেয়েসন্তান ধরেনি তাই পেরেছে, বৌটার যেন নিজস্ব একটা মন নেই, ইচ্ছে নেই, রুচি-অভিরুচি নেই। সে যেন মনিষ্যি নয়, শুধুই ছেলেদের ভোগের পুতুল।" সত্যবতীর কথায় বাধা দেন গঙ্গাদেবী,—"কৈ দেবপুত্তুর ছেলেরাও তো কেউ কিছুই বলেনি? দ্রৌপদীও না।" গঙ্গার আপত্তিটুকু এককথায় ভাসিয়ে দিলেন সত্যবতী। "দ্রৌপদী তো বৌমানুষ, দিদি, সে আবার কী হ্যাঁ-না বলবে? তার বলার রাইটই ছিল না। তুমিই বলো? দ্রৌপদী কী বা বলতে পারতো কুন্তীর কথার ওপরে?"

গঙ্গা এবার অন্যমনস্ক হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন—"আমি বুঝি না, ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির যে কেন রাজী হলেন—এতবড় অধর্মে?" সত্যবতী হেসে ফেলেন। "কী যে বল না তুমি? কুন্তীর ছেলেরা মার মুখের ওপর কথা বলবে? কলির বিদ্যেসাগরকেও যে মাতৃভক্তিতে হার মানিয়ে রেখেছিল এই দ্বাপর কালের পাঁচপুত্তুর। দ্রৌপদীর কি ওটা একটা জীবন হলো? এক এক বছরে এক একটা স্বামী! ধ্যুৎ।"

—"ওই মাস / বছরের হিসেব তো অন্যকারণে!" গঙ্গার মনে পড়ে যায়—"ও তো ফসল তোলার ব্যাপার, কোন্ বছরের ফসলটা কার গোলায় উঠবে—যাতে জানা যায়। একসঙ্গে সবাই মিলে স্বামিত্ব জাহির করতে গেলে পিতৃত্বেরও খেয়াল থাকতো না।" গঙ্গা অঙ্কের মাস্টারের মতো প্রবলেমটা বুঝিয়ে বলেন, "আহা, অত জেনেশুনে দরকারটাই বা কী? যারই ঔরসে হোক না কেন, সে তো পাণ্ডব বংশেরই সন্তান হবে। তার ওপরে সবাই তো সহোদর— গড়টা একই থাকছে —সেই গোড়ার হিসেবটায় তো আর গড়বড় হবে না? যেমন ধরো, কুন্তীর নিজের বেলাতেই। তারও তো সর্বমোট পাঁচ পাঁচটি স্বামী?" এতটা বলে সত্যবতী গঙ্গাদেবীর দিকে প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে তাকালেন। গঙ্গাদেবীরও অঙ্কের মাস্টারের ভূমিকাটি ফিরে এল। তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে আপনমনে আঙুলের কর গুনতে আরম্ভ করে দিলেন।

—"পাঁচটি কি? দাঁড়া, গুনে দেখছি। অত নয়। বোধহয়। সূয্যিকে দিয়ে শুরু। আর পাণ্ডুকে দিয়ে সারা। মাঝখানটাতে একটু দৈব মাহাত্ম্য ঘটে গেছে, ধর্ম, পবন, ইন্দ্র তিনজনে পর পর ঘুরে গেছেন, কুন্তীর অতিথি হয়ে। মন্দ নয়, ওই পাঁচটিই জুটি হোলো। তুই ঠিকই বলেছিস তো যোজনগন্ধা? আমি এ্যাদ্দিন কুন্তীর এদিকটা ভাবিনি। তোর তো খুব নজর? লোকে। এ নিয়ে কোনো কথাই বলে না তো?"

"লোকে তো অতশত দৈবকৃপার রহস্য গুনে গেঁথে দেখেনি দিদি, তাই একা মানুষী দ্রৌপদীরই কুখ্যাতি রটে গেছে হিন্দু সমাজে—"

—"তার মানে, বৌমাটিকে শাশুড়ি নিজে যে পথের যাত্রী হয়েছেন সেই পন্থাতেই পাঠিয়েছিলেন কুন্তী—এতে তেমন দোষের কিছু নেই বাপু তাহলে—", গঙ্গাদেবীর ক্ষমাসুন্দর গলাটি ডুবে গেল সত্যবতীর হুঙ্কারে—

—"ওসব বোলো না দিদি। মোটেই তুলনীয় নয় দুজনে। কুন্তী তো ছিলেন serially monogamous—একই সঙ্গে এতজনের জীবনসঙ্গিনী হননি তিনি। ইন ফ্যাকট পাণ্ডু ভিন্ন কারুরই পত্নীত্ব স্বীকার করতে হয়নি তাঁকে। আর তাছাড়া একমাত্র পাণ্ডু ভিন্ন বাকি চারজনই অসাধারণ শয্যাসঙ্গী। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন দেবতা-পুরুষ তাঁরা, প্রত্যেকটি পুরুষই কুন্তীর স্বনির্বাচিত সঙ্গী। তাঁরই আমন্ত্রণে এঁরা এসেছিলেন। দ্রৌপদীর বেলাতে কি স্বনির্বাচন ছিল না? ছিল। স্বয়ংবর সভাতে যিনি তাঁকে জয় করেছিলেন তিনিই দ্রৌপদীর স্বয়ংবৃত স্বামী, নির্বাচিত পুরুষ। অথচ জীবনের বেলায় কী ঘটল দ্যাখো দিদি? দ্রৌপদীর ফ্রী উইল, কিম্বা পার্সোনাল চয়েসের প্রশ্নটা একবারও কি তুলেছিল কেউ? কোনো স্বাধীনতাই প্রকৃতপক্ষে ছিল না দ্রৌপদীর। যা যা ঘটেছে সবকিছু তো জোর করে ওর ওপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এবং সেই চাপানোর দুষ্কর্মটি করেছিলেন কুন্তী নিজেই।" সত্যবতীর ভুরু কুঁচকে উঠেছে, গলা ধরে এসেছে, উত্তেজনায় নাকে ঘাম ফুটেছে বিন্দু বিন্দু। সত্যবতী বললেন—"কুন্তীকে আমি কোর্টে নিয়ে যাব। দ্রৌপদী ইজ বিইং হেভিলি অ্যাবিউজড্ বাই হার ইন্‌ল'জ।" গঙ্গাদেবী একঢাল চুল হাতে প্যাঁচ ঘুরিয়ে খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে অন্যদিকে চেয়ে চেয়েই বললেন —"ও কোর্টে-ফোর্টে গিয়ে আমাদের কাজ নেই ভাই পদ্মগন্ধা, পুলিশ এলে কি তোমাকেই ছেড়ে দেবে? নিজের দিকে একটু তাকিয়ে দেখেছো কি? তুমি কেমন শাশুড়ি? ছেলেরা অকম্মা বলে কুলরক্ষা করতে যেভাবে ধরে বেঁধে তোমার বৌদুটোকে বাধ্য করেছিল অন্য পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হতে, আজকে হলে কিন্তু হিউম্যান রাইট্‌স কমিশন তোমাকে ছেড়ে দিত না। গ্রেপ্তার করতেই পারতো। উইমেন্স গ্রুপগুলোও ধরতো।" মিটিমিটি হেসে পানের বাটাটি খুলে গঙ্গাদেবীর সামনে মেলে ধরে সত্যবতী বললেন—

—"সেকথাই যদি তোলো, তবে দেশের আইন তো তোমাকে ছেড়ে দিত না দিদিভাই? একটা নয় দুটো নয়, পরপর সাতটা সুস্থ বাচ্চাকে তুমি যেভাবে"—সত্যবতীর চিবিয়ে চিবিয়ে বলা বাক্যটি শেষ করতে দিলেন না মা গঙ্গা। বাটাটি কোলের কাছে টেনে নিয়ে পানের দুটি খিলি তুলতে তুলতে বলে উঠলেন—

—"আরে, জন্ম-জন্মান্তর, শাপমুক্তি, ওসব কি এই মর্ত্যের আইনবিদ্‌দের মোটা মাথায় ঢুকবে? আর জ্বালাসনি বাপু মৎস্যগন্ধা! তুইও যেমন। কয়লার যেমন কালি ঘুচবে না ধুলে, তেমনি মেছুনীর স্বভাব কি রানী হলেই ঘুচে যায় রে?" বলেই তিনি পানের বাটাটি ঠেলে ফেরৎ দিয়ে পানদুটি মুখে গুঁজে ফেলেন। সত্যবতী এবারে জর্দার কৌটোটি সযত্নে গঙ্গার দিকে এগিয়ে ধরে, মৃদু, অচপল হাসি হেসে বললেন—

—"এঃহে! দিদিভাই, এসব কী কথা! তুমি যে একবারে আউটডেটেড হয়ে গেছো দেখছি? পলিটিক্যালি ইনকারেক্ট কথাবার্তা বলছো। একই বাক্যে ক্লাস আর কাস্ট, দুই পাখি? দু'রকমের ঠেশ? নাঃ গঙ্গাদিদি, তোমার এ্যাদ্দিনে বয়স হয়েছে —বোঝা যাচ্ছে পলিউশনের দৌড়টা। যতই গঙ্গাদূষণ প্রতিরোধমঞ্চ গড়া হোক, ওসব

প্রজেক্টে কাজ কিছুই এগুচ্ছে না, গঙ্গা আর সেই গঙ্গা নেই—দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গের দিন ফুরিয়েছে মনে হচ্ছে"—

পানের সঙ্গে তরিবৎ করে এক চিমটি জর্দা আলগোছে মুখে পুরে, গঙ্গাদেবী লজ্জা চেপে গিয়ে চোখের ভেতরে হেসে বললেন :—"তাই? দুঃখিত— কিন্তু তরল তরঙ্গের দিন? সেটা কি ফুরোলে চলবে? তুইই বল্ না, মৎস্যগন্ধা?"

পত্রপাঠ, বইমেলা সংখ্যা, ২০০১

উত্তরকাণ্ড

॥ সর্গ : ১ ॥

রামচন্দ্র আর লক্ষ্মণ লঙ্কাবিজয় করে অযোধ্যায় ফিরে এলেন, সীতাদেবীকে উদ্ধার করে নিয়ে। অযোধ্যায় আনন্দের বান ডাকলো। কৌশল্যার মুখে হাসি ফুটলো, চোদ্দ বছর পরে। কৈকেয়ীর চোখের জল শুকোলো, চোদ্দ বছর পরে। উর্মিলা ঘুম ভেঙে চোখ মেলে উঠে বসলেন, চোদ্দ বছর পরে। ভরত, রাজদণ্ডটি হাত থেকে নামিয়ে রামচন্দ্রের পদতলে রেখে দিলেন, চোদ্দ বছর পরে। অযোধ্যা নগরীতে উৎসব শুরু হয়ে গেল। পথে পথে নানান রংবেরঙের সিল্কের পতাকা উড়ছে, দেবদারু তোরণ থেকে কমলালেবুর আর আঙুরগুচ্ছের মালা ঝুলছে, ব্যান্ডপার্টি মার্চ করছে পথে পথে, মোড়ে মোড়ে নাচগানের আসর বসেছে, ছোট-বড় নানান বয়সের বাচ্চারা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা চমৎকার নতুন পোশাকে সেজেগুজে রাস্তায় বেড়াচ্ছে, মেয়েরা তাদের উৎকৃষ্টতম অলঙ্কারগুলি পরে সেজে, সুরভিত হয়ে, নির্ভয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে, পুরুষরা বিনা অস্ত্রে, ফুলের মালা, চন্দনের তিলকে সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রতিটি পথের মোড়ে রুপোর থালায় রাজভোগ মণ্ডা-মেঠাই, শ্বেতপাথরের গেলাসে বাদামের সরবৎ, বেতের পাত্রে মেওয়া, পাতার গেলাসে ফলের রস বিলি হচ্ছে সকলের জন্যে। যার যত খুশি নাও। গানের সুরে বাতাসে নাচের ছন্দ ভাসছে। প্রজাদের প্রাণে আশা আর আনন্দের সীমা নেই, রামরাজ্য শুরু হলো এবারে। দেশে শোক-দুঃখু থাকবে না, চুরি-ডাকাতি, রোগ-বালাই থাকবে না, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কষ্ট পাবে না কেউ, ক্রোধে-ঈর্ষায় কষ্ট পাবে না কেউ, এখন থেকেই গাছে গাছে প্রচুর ফল ধরেছে, মাঠে মাঠে প্রচুর ফসল। নদী-দীঘি জলে পরিপূর্ণ। ঘরে ঘরে শিশুর হাসি শোনা যায়। আনন্দে উল্লাসে অযোধ্যা যেন বৈকুণ্ঠধাম হয়ে উঠেছে।

রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন চার ভাই একসঙ্গে রাজবেশে সুসজ্জিত হয়ে চোদ্দ ঘোড়ার রাজরথে চড়ে শোভাযাত্রায় বেরিয়েছেন। প্রজাদের সঙ্গে যোগাযোগ হবে,

রাম তো অনেকদিন পরে এসেছেন। চার রাজপুত্র যেখান দিয়ে যাচ্ছেন, প্রজারা ফুল ছুঁড়ে জয়গান গাইছে। একটি রাস্তা দিয়ে যাবার সময়ে অতি অপরূপ এক মনোহরণকারী সুঘ্রাণ তাঁদের নাকে এলো। সঙ্গে সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের শরীরের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেল। রামচন্দ্র সুমন্ত্রকে ডাক দিলেন, "সুমন্ত্র, এ কিসের স্বর্গীয় সুবাস?" সুমন্ত্র তো সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ায় চাবুক হাঁকড়ে বলে উঠলেন, "ছি ছি, মহারাজ। ও কেমন কথা? এর সঙ্গে স্বর্গের তুলনা কেন? এ গন্ধ মোটেই ভালো গন্ধ নয়। শীগগির নাকে রুমাল চাপা দিন। এটা ম্লেচ্ছপাড়া, ও গন্ধ ম্লেচ্ছদের রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছে। ওই বাতাস নাকে গেলেও আত্মার ক্ষতি।"

ভরত রাম-লক্ষ্মণকে বোঝালেন, যে চোদ্দ বছর ওঁরা বনে ছিলেন তার মধ্যে দেশে অনেক অর্থনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার হয়েছে, স্থলপথেই বণিকরা এসেছে ভিনদেশ থেকে সওদাগরী করতে। তারা কোনো ঝুটঝামেলা করে না, নিজের মনে ব্যবসা-বাণিজ্য চালায়। দেশে কত নতুন জিনিসপত্তর এসেছে। নতুন ধরনের কাপড়চোপড়, বাসনপত্র, এমন-কি অন্য ডিজাইনের ঘরবাড়ি পর্যন্ত তৈরি হচ্ছে। ওদের সব ভালো, কেবল ওরা নবধর্মী। ওদের পুজো-আচ্চা অন্যরকম। দিনে তিনবারের বদলে পাঁচবার আহ্নিক করে। ওদের খাওয়া-দাওয়া অন্যরকম। ওই গন্ধ পেঁয়াজ-রসুনের। ও বস্তু ইক্ষ্বাকু বংশের রান্নাঘরে ঢোকে না। ও বস্তুর গন্ধও শুঁকতে নেই, কেননা ঘ্রাণেন অর্ধভোজনম্। আর ওদের খাদ্য ভোজন করলেই ধর্মনাশ!

—"সর্বনাশ!" রাম বললেন, "চলো চলো সুমন্ত্র, চটপট এ পল্লী থেকে বেরিয়ে পড়া যাক। নবধর্মী প্রজাদের আমার আশীর্বাদ দিয়ে দিও।"

(দুই)

॥ সর্গ : ২ ॥

সে সুঘ্রাণ সকলেই ভুলে গেলেন, ভুলতে পারলেন না কেবল লক্ষ্মণ। তাঁকে হিপ্নোটাইজ করে ফেলেছে ওই অপরূপ গন্ধ, স্মৃতিতে আসামাত্রই তাঁর জিবে জল এসে পড়ছে। লক্ষ্মণ ঠিক করলেন ওই রান্না না খেলে তাঁর জীবন বৃথা। চোদ্দ বছর না খেয়ে, না ঘুমিয়ে সহজেই কাটিয়ে দিয়েছেন লক্ষ্মণ। এখন আর সংযম নয়। ঢের হয়েছে। এবার রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত, রামচন্দ্র যা চেয়েছেন, পেয়েছেন। এবার লক্ষ্মণ যা চান, তাঁর সেটা পেতে কী ক্ষতি? লক্ষ্মণ যা মনে করেন তাই করে ফেলেন। হাঁটতে হাঁটতে একদিন ম্লেচ্ছপল্লীতে চলে গেলেন। তারপরে গন্ধে গন্ধে পথ চিনে একটা শাদা বাড়ির নীল দরজায় কড়া নাড়লেন। সিল্কের শাদা পাজামা আর আলখাল্লা পরা এক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ ভদ্রলোক বেরুলেন, তাঁর দাড়িতে আতর, চুলে মেহেন্দীর আগুন রং। লক্ষ্মণকে দেখেই চিনলেন—সবিনয়ে সালাম আলায়কুম করে তাঁকে বাড়ির মধ্যে স্বাগত জানালেন, এবং বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে ফরাসে তাকিয়ায় বসালেন। তারপর তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়ে বিবিকে সরবৎ বানিয়ে

BanglaBook.org

দিতে বললেন। বিবি তখন মাংস রান্না করছেন। সেই সুঘ্রাণই লক্ষ্মণের নাকে পৌঁছেছিল। সরবৎ খেতে খেতে লক্ষ্মণ বেশ খুলেই বললেন তাঁর আগমনের কী উদ্দেশ্য। শুনে মিঞাবিবি দুজনেই মহা খুশি।

পরম যত্ন-আত্তি করে লক্ষ্মণকে দাওয়াৎ দিলেন। পরোটা আর মাংস। কতরকমের কাবাব! এত চমৎকার রান্না লক্ষ্মণ জীবনে কখনো আস্বাদন করেননি। বিবি বললেন, "এত সুস্বাদু কেননা কচি বাছুরের গোশতের মতো স্বাদু মাংস জগতে খুব কমই আছে।" শুনে লক্ষ্মণ হাততালি বাজিয়ে বলে উঠলেন— "তাই তো। এতদিনে বোঝা গেল, বৈদিক যুগে মুনি-ঋষিরা আশ্রমে অতিথি এলেই কেন কচি বাছুর কাটতেন। তাই তো অতিথির আরেক নাম গোঘ্ন। 'অ-তিথি' অর্থাৎ যার আসার কোনো দিনক্ষণ নেই, আর 'গো-ঘ্ন', যে গোরু মারে। এইবার কথাদুটোর মানে স্পষ্ট হলো।" একটু ভেবে লক্ষ্মণ বললেন—"হলে কি হবে, ঐ গো-ঘ্ন শব্দ আর চলবে না। এখন তো হিন্দুদের গোরু খাওয়া বারণ হয়ে গেছে। আশ্চর্য, পূর্বপুরুষদের বেলায় যে কাজে ধর্মরক্ষা হতো, আমাদের বেলায় সেই কাজেই ধর্মনাশ হয়। ইতিহাসের হেঁয়ালি কে বুঝবে!" বলতে বলতেই লক্ষ্মণের মুখের চেহারা পালটে গেল, গলার স্বর পালট গেল, তিনি তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠলেন—"ঐ য্যাঃ। আমারও তো তাহলে ধর্মনাশ হয়ে গেল! অ্যাঁ?"

শিউরে উঠে বৃদ্ধ বললেন—"কী সর্বনাশ। ধর্মনষ্ট হওয়া কি অত সোজা রাজপুত্র? আতিথ্য স্বীকার পাপ হয় না, তাহলে কি বুদ্ধদেব ভক্তের বাড়িতে মাংস খেতেন? না না, ওসব নিয়ে একদম মাথা ঘামাবেন না—ধর্মকর্ম বড়ই জটিল, কঠিন বিষয়। ওসব আমি আপনি বুঝতে পারব না। আপনি বরং একটি মিঠেপান খেয়ে, আরেকটি মিঠেপান হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিশ্চিন্ত মনে প্রাসাদে ফিরে যান। কেবল একটিই অনুরোধ, এই দাওয়াৎ-এর কথাটা যেন কাউকে বলবেন না। কেউ না জানলেই হলো।"

BanglaBook.org

(তিন)

।। সর্গ : ৩ ।।

কিন্তু এ কি রাম? ইনি হচ্ছেন লক্ষ্মণ। এঁর মনে-মুখে এক। লক্ষ্মণ গোপন করার পাত্রই নন। তিনি জনে জনে মানুষ ডেকে ম্লেচ্ছরান্নার ভূয়সী প্রশংসা শুরু করলেন। এবং ঊর্মিলাকে "গোঘ্ন" শব্দের মানেটা বুঝিয়ে দিলেন। ঊর্মিলা ভয় পেয়ে করজোড়ে, কম্পিত কলেবরে বললেন—"আর্য্যপুত্র। আমার মনে হচ্ছে আপনি বীফ খেয়ে এসেছেন। বীফ খেলে হিন্দুদের জাত যায়। অতএব আপনার জাত গেছে। আমি বিধর্মীর ঘর করতে পারবো না প্রভু, আমায় ছুটি দিন।" বলেই ঊর্মিলা চোখে আঁচল দিলেন।

লক্ষ্মণ তো ঊর্মিলার কথা অট্টহেসেই উড়িয়ে দিলেন।—"আচ্ছা বোকা মেয়ে

তো? চোদ্দ বছর বাদে ঘরে ফিরেছি, কোথায় দুজনে একটু মজা করবো তা নয়, বিধর্মী আর স্বধর্মী করছো। চোদ্দ বছর ধরে যে সতীলক্ষ্মী হয়ে ঘুমিয়ে রয়েছো, সে কি এইজন্যে? আরে ধুৎ! তুমি আমার অর্ধাঙ্গিনী। আমি যদি বা বিধর্মী হয়ে গিয়েই থাকি— তবে তো বাপু তুমিও আধখানা বিধর্মী হয়ে পড়েছো। ওসব ছুটিফুটি ছাড়ো, বরং যাও, নিজে গিয়ে ফরিদাবিবির রান্নাঘর থেকে গোশ্‌ত রান্না করা শিখে এসো। সুমন্ত্রকে বলে দিচ্ছি, তোমাকে নিয়ে যাবে।"

উর্মিলা তো আগে ছুটলেন সুমিত্রার কাছে। শাশুড়ির মত না নিয়ে কী করে ম্লেচ্ছপল্লীতে যাবেন? খবর শুনে কৌশল্যা-কৈকেয়ী-সুমিত্রা, তিন রানীর মাথায় বাজ পড়লো। ফিস্‌ফাস্ লোকের মুখে আগেই শুনেছিলেন, কিন্তু কৌশল্যা একদম এসবে কান পাততে দেন না। তাহলে এখন উর্মিলাকে কী বলা হবে?

দশরথের মৃত্যুর পর—রামের বনবাস, ভরতের পাদুকাভক্তি, লক্ষ্মণের রামভক্তি, এসব নিয়ে তিন রানীরই মন চোদ্দ বছর ধরেই খারাপ। তাঁরা ক্রমশ পুজো-আচ্চায় বড় বেশি মন দিয়ে ফেলেছেন। কৈকেয়ী তো প্রায় সন্ন্যাসিনী হয়ে গেছেন। সংসার-টংসার তবু কৌশল্যাই যা দেখাশুনো করেন। সুমিত্রার বেজায় শুচিবাই ধরেছে। উর্মিলার কথা শুনেই সুমিত্রা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন— "ওই ছেলে আমাকে চিরটাকাল কষ্ট দেবে। আমার শত্রুঘ্ন বেঁচে থাকুক, লক্ষ্মণের মতন অমন অলুক্ষুণে ছেলেতে আমার কাজ নেই। নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করে এসে এতটুকু লজ্জা নেই, আপসোস নেই, গোবর গঙ্গাজল খেয়ে পুরুত ডেকে কোথায় প্রায়শ্চিত্ত করবে তা নয়, উল্টে বউকে পাঠাচ্ছে ম্লেচ্ছবাড়িতে, গোরু রান্না করা শিখতে। আজ ও-ছেলেরই একদিন, কি আমারই একদিন। ডাকো তো দেখি রাজগুরু বশিষ্ঠকে।"

BanglaBook.org

(চার)

॥ নাঃ ৪ ॥

রাজসভা থেকে ফিরে এসে রামচন্দ্র দ্যাখেন অন্তঃপুরে কেলোর কীর্তি! রাম প্রমাদ গুণলেন। মা সুমিত্রা পুরুত বশিষ্ঠকে ডেকে এনে তাঁবা-তুলসী হাতে নিয়ে লক্ষ্মণকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন। ম্লেচ্ছপল্লীতে গিয়ে স্বেচ্ছায় গোমাংস খেয়ে বিধর্মী হয়ে এসেছে সে। তার গর্ভধারিণী তাকে ত্যাগ করেছেন সেই কারণে। রামচন্দ্র মুষড়ে পড়লেন। আজন্ম লক্ষ্মণের মতো লেজুড় ভক্ত তাঁর কেউ নেই, তাই লক্ষ্মণের চেয়ে প্রিয়তরও তাঁর কেউ নেই। শক্তিশেলের সময়েই সেটা বুকের ভেতরে টের পেয়েছেন। রামচন্দ্র এখন সিংহাসনে। রামরাজ্য চলছে। এরই মধ্যে গোমাংস খেয়ে লক্ষ্মণটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড করেছে। আরো কেলেঙ্কারি করলেন মা সুমিত্রা। যদি বা চেপেচুপে রাখা যেতো, ভুলিয়ে ভালিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করানো যেতো, এখন সে গুড়ে বালি। লক্ষ্মণ যা জেদী-গোঁয়ার ছেলে, মার সিদ্ধান্ত শুনলে সে গৃহত্যাগী হবেই। তাকে আটকানো যাবে না।

সীতা বললেন—"সত্যি। সুমিত্রা মায়ের এতটা করা উচিত হয়নি। লক্ষ্মণকে ডেকে বকে দিলেই হতো? কেউ কিছু বলত না। রামরাজ্য বলে কথা। এখানে কেউ কারুর পিছনে লাগে না। কেউ কারুর নিন্দে করে না, কে কী খেলো, কে কোথায় গেল।"

রাম একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, "না সীতা, সেটা ঠিক নয়। এই তো সেদিনই একটা ধোপা তার বউয়ের কাছে তোমার নিন্দে করছিল। চর এসে আমাকে জানালো না?"

সীতা ঠোঁট উলটে বললেন—"ভারী তো নিন্দে। চুপিচুপি কে তার ঘরের মধ্যে বৌকে কী বলছে, সেটা কি তোমার চরের শুনতে যাওয়াটা উচিত হয়েছে? আর কৌশল্যা মা কী বললেন সে কথা শুনে? বললেন না, ওসব ছোটো কথায় কান দিতে নেই। ধোপার কথায় আমাদের কী এল গেল? তুমি কি আমাকে ত্যাগ করেছ? ওসব অকথা-কুকথা অগ্‌গেরাহ্যি করতে হয়। মা কৌশল্যার কথাটা মনে রেখো —'বড় কাজ করতে নামলে ছোট কথায় কান দিতে নেই'।"

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রামচন্দ্র বললেন— "মা কৌশল্যা তো সুমিত্রা মাকে আটকাতে পারলেন না।"

সীতা বললেন—"যাই বলো, সুমিত্রা মায়ের এটা ঠিক হয়নি। ঠাকুরপোকে যে ত্যাজ্যপুত্তুর করলেন, আমার বোন উর্মিলার কথাটা একবার ভাবলেন না? উর্মিলার এখন পাঁচ মাস চলছে।" বলেই সীতা নিজের পেটের দিকে এক নজর তাকিয়ে নিলেন। তাঁর নিজের এখন ছয় চলছে।

রামচন্দ্রের মনের সব শান্তি গত। রামরাজ্যের দায় পোহাতে তাঁকে লক্ষ্মণকে ত্যাগ করতে হবেই। এই ঘটনার পরেও একে রাজপুরীতে ঠাঁই দিলে প্রজারা রামচন্দ্রকে মানতে না চাইতে পারে। প্রজাদের ভক্তি বড় ভঙ্গুর।

BanglaBook.org

(পাঁচ)

।। সর্গ : ৫ ।।

অগত্যা রামচন্দ্র লক্ষ্মণ আর উর্মিলাকে ডেকে বলেন, তাঁদের সঙ্গে অনেক সৈন্যসামন্ত, ধনরত্ন, দাসদাসী দিয়ে তাঁদের পাশের রাজ্য কারুপথে পাঠিয়ে দেবেন। সেখানে সিংহাসন শূন্য হয়ে আছে।

মহাড়ম্বরে সেই রাজ্যে লক্ষ্মণের রাজ্যাভিষেক হয়ে গেল। কারুপথের নাম হলো লক্ষ্মণাবতী। রাজধানীকে লক্ষ্ণৌনগরী বলে ডাকা হতে লাগলো। আর লক্ষ্মণের নাম হয়ে গেল নবাব লছমনুল্লা, উর্মিলা হলেন উম্রাও বেগম। নবাব লছমনুল্লা আর উম্রাও বেগমের যথাকালে টুকটুক দুটি পুত্রসন্তান হলো, হাসান আর হোসেন। যমজ ভাই। ওদিকে সীতা আর রামেরও কোল জুড়ে দুটি যমজ ছেলে এসেছে, লব আর কুশ। সুমিত্রার কড়া নিষেধে দু'রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগ নেই। রাম-লক্ষ্মণ

কেউ কারুর মুখ দ্যাখেন না। মন পোড়ে গোপনে। চরের মুখে খবর পান, ছেলেরা বড় হচ্ছে। কুশলে আছে।

(ছয়)

॥ সর্গ : ৬ ॥

ষোলো বছরের জন্মদিনের পরে লব আর কুশ ঠিক করলো তারা হরিণ শিকারে যাবে। মৃগয়া করতে বেরুনো রাজপুত্রদের ধর্ম। শুভ তিথি দেখে তারা বেরিয়ে পড়ল। দুজনে দুটি লাল ঘোড়ায় চড়ে। তীর ধনুক বর্শা তলোয়ার নিয়ে। সীতা সঙ্গে পিকনিক বাস্কেটে করে ভালোরকম লাঞ্চ দিয়ে দিলেন। যদিও হরিণ শিকারে ছেলেদের পাঠানোয় তাঁর মত ছিল না।

অযোধ্যা আর লক্ষ্মণাবতীর মাঝখানে এক মহারণ্য আছে। আগেকার কালে, রত্নাকরের সময়ে, সেখানে ডাকাতদের রাজত্ব ছিল। এখন রামরাজ্য বলে আর চোর ডাকাত নেই, তবে হরেকরকমের পশু-পক্ষী আছে। রামরাজ্যে পশুপাখিও সুখে থাকে। মহারণ্যের মাঝখান দিয়ে সরযূ নদী বয়ে যাচ্ছেন। হরিণরা সেখানে জল খেতে আসে। আর বাঘেরা আসে হরিণ খাবে বলে। হোগলার বনে ওঁৎ পেতে থাকে চুপিসাড়ে জলের ধারে। আর লোকেরা এটাকেই মিষ্টি করে বলে—"রামরাজ্যে বাঘে হরিণে এক ঘাটে জল খায়।"

এদিকে লক্ষ্ণৌনগরীতে হাসান-হোসেনও বেড়ে উঠেছে। তাদেরও ষোলো বছর পূর্ণ হয়েছে। তাদের শখ, বাঘ মারতে যাবে। শের বাহাদুর হতে চায় তারা। হাসান-হোসেন দুজনে দুটি শাদা ঘোড়ায় চড়ে তীর ধনুক বর্শা তলোয়ার নিয়ে মহারণ্যে বেরিয়ে পড়ল। উর্মিলা তাদের সঙ্গে লাঞ্চ বাস্কেট ভর্তি করে দিয়ে দিলেন ভালো ভালো খাবারদাবার।

মহারণ্যের গভীরে, সরযূ নদীর পারে, লব-কুশ আর হাসান-হোসেন তো ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে বসে আছে। দুই ভাইয়ের চোখ হরিণ খুঁজছে। আর দু'ভাইয়ের চোখ বাঘ খুঁজছে। জল খেতে হরিণ যেই এলো, হরিণ খেতে বাঘও অমনি ঝাঁপিয়ে পড়লো। আর সঙ্গে সঙ্গে শন্-শন্ তীর ছুটে এলো আকাশ অন্ধকার করে। বাঘও অক্কা, হরিণও খতম্। বাঃ। বাঃ। লব-কুশ, হাসান-হোসেন দৌড়ে এলো শিকার তুলতে। এসে দ্যাখে, বাঘ হরিণ দুইই মরেছে বটে, কিন্তু লব-কুশের বানে বাঘ মরেছে আর হাসান-হোসেনের তীরে হরিণ। এখন এটাকে তবে কী বলা হবে? লক্ষ্যভেদ? না লক্ষ্য হারানো? এই শিকার কি সার্থক? নাকি ব্যর্থ? লক্ষ্যভেদ হয়েছে বটে, তবে যেটাকে লক্ষ্য করা হয়েছিল, সেটা নয়। না পেরেছে লব-কুশ হরিণ মারতে, না পেরেছে হাসান-হোসেন বাঘ মারতে। চার কিশোরেরই মুখ ম্লান হয়ে গেছে। যদিও সামনে দুটি নিহত শিকার। লব-কুশ বললো —"আমরা রামপুত্র লব-কুশ, অযোধ্যা নগরীতে থাকি। আমরা হরিণটা মারতে চেয়েছিলাম। সবাই জানে আমরা হরিণ মারতে এসেছি। এখন বাঘ নিয়ে ফিরলে লোকে বুঝে যাবে এটা কাকতালীয়

BanglaBook.org

হয়েছে।" হাসান-হোসেন বললো—"আমরা লক্ষ্মণপুত্র হাসান ও হোসেন। লক্ষ্ণৌ শহরে থাকি। বাঘ মারতে এসে হরিণ নিয়ে ফিরলে আমাদের দেখেও লোকে হাসবে।" লব-কুশ আর হাসান-হোসেন তারপরে সমস্বরে বলে উঠলো— "তার চেয়ে এসো না কেন আমরা শিকার বদলাবদলি করে নিই? তোমরা নাও তোমাদের যেটা চাই, আমরা নিয়ে যাই আমাদের যেটা লক্ষ্য। তাতে সবারই মুখ থাকবে।"

এই ব্যবস্থা চার ভাইয়েরই মনের মতন হলো। আহ্লাদে আটখানা হয়ে তারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করলো।

(সাত)

॥ সর্গ : ৭ ॥

এদিকে হবি তো হ ঠিক তক্ষুনি নারদমুনি ঢেঁকিতে চড়ে, বীণা বগলে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে আকাশপথে যাচ্ছিলেন। ছায়াশীতল মহারণ্যে সরযূতীরে তাঁর একটু বিহার করবার ইচ্ছে হলো। নামতে নামতে দেখতে পেলেন চার ভাইতে গলাগলি করে শিকার বদলাবদলি হচ্ছে।

আর যাবে কোথায়? নারদ বলে কথা। চট করে অদৃশ্য হয়ে আড়ি পাতলেন। কী দেখলেন? দেখলেন লব-কুশ আর হাসান-হোসেন মিলে বনভোজন করছে। রঙিন শতরঞ্চি পেতে বসে ঝুড়ি খুলে খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় করছে। কী সর্বনাশ। এরা যে এ-ওর টিফিন ভাগাভাগি করে খাচ্ছে। লব-কুশের পিঠেপুলি লুচি-পায়েস খেয়ে হাসান-হোসেন মুগ্ধ। আর হাসান-হোসেনের কাবাব তন্দুরী রুটি, বিরিয়ানি খেয়ে লব-কুশ কাৎ। নারদ অনশ্বর। তিনি ভাই স্থির হয়েই এসব দেখলেন। চার ভাই যেন পরস্পরের প্রতিবিম্ব—একই ছাঁচের চেহারা। সেটা ওরা নিজেরাও ধরতে পেরে অবাক। বনের মধ্যে চার ভাইতে পরম বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

খাওয়া সেরে, তারা পরস্পরের কাছে প্রতিজ্ঞা করলো, যে এই দেখা হওয়ার কথাটা কেউই রাজ্যে ফিরে বলবে না। আর প্রতি মাসের পূর্ণিমায় এইখানে এসে তারা পিকনিক করবে। তারপর আবার কোলাকুলি করে, চারজনে যে যার ঘোড়ায় চড়ে রওনা দিল। লব-কুশ নিল হরিণ, হাসান-হোসেন নিল বাঘ।

লব-কুশকে হরিণ নিয়ে ফিরতে দেখে সীতা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। সীতার মন 'কু' গাইছিল গোড়া থেকেই। এই "হরিণ শিকার" ব্যাপারটায় তাঁর সায় ছিল না। একবার ঠেকে শিখেছেন। অন্য মায়েরা হলে ঠাকুরঘরে হত্যে দিয়ে পড়তো, সীতা যে নিজেই লক্ষ্মী ঠাকরুণ। তাঁর সে সুবিধেটাও নেই। মৃগয়া সেরে ছেলেরা ফিরেছে দেখে রামও খুব খুশি। যদিও সামনে প্রশংসা করা তাঁর স্বভাব নয়।

উৎসব লেগে গেছে লক্ষ্মণাবতীতেও। বালক কিশোর হাসান-হোসেন ফিরেছে এতবড় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার নিয়ে। উর্মিলা তো প্রার্থনা-কামরাতে পড়েছিলেন।

তিনি হাফ্-বিধর্মী হলেও হাফ্-হিন্দুই আছেন। লক্ষ্মণাবতীতে প্রজারা সবাই যে যার নিজের মনের মতো ধর্ম পালন করে, নবাব লছমনুল্লার কোনো বাধা নেই। উর্মিলা বাঁচলেন। যাক, বনবিবি রক্ষে করেছেন। বাঘেরা তাঁর ছেলেদের শিকার করে ফেলেনি।

(আট)

।। সর্গ : ৮ ।।

এদিকে নারদের মনে প্রবল অশান্তি। এত আনন্দ-আহ্লাদ চারদিকে, অথচ ছেলেগুলো স্রেফ ঠগ্। যে যা করেনি, সে তার জন্যে প্রশংসা পাচ্ছে। এ নারদের সহ্য হচ্ছে না। তায় ওই খাওয়া-দাওয়ার ঘোর অনাচারটারও একটা ব্যবস্থা করা দরকার। প্রথমে তিনি গেলেন লক্ষ্মণাবতীতে।

বীণা হাতে পিড়িং পিড়িং করতে করতে নারদকে আসতে দেখে নবাব লছমনুল্লার আহ্লাদের অন্ত রইলো না। তিনি তখন উজীর-নাজিরদের নিয়ে দরবারে বসেছিলেন। নারদ দেখলেন, নবাবের পাগড়ীর ঐ মণিটা যেন চেনা চেনা লাগছে? কোহিনূর না? নারদকে সেলাম জানিয়ে লছমনুল্লা বললেন,—"আসুন, আসুন। আসতে আজ্ঞা হোক, আজ আমাদের বড়ো আনন্দের দিনে আপনার আগমন হলো।"

নারদ বললেন—"নবাব লছমন, আজ আপনার মহা লজ্জার দিন। কেয়া শরম-কী বাত হ্যায়—আপনার ছেলেদুটি জোচ্চোর। মেরেছে হরিণ, বলছে বাঘ। বাঘ মারা কি ওদের কাজ? বাঘ মেরেছে রামচন্দ্রের ছেলেরা। ওরা মিথ্যেবাদী।"

এদিকে লক্ষ্মণ তো রাম নন। তাঁর কথায় কথায় রাগ হয়ে যায়। তিনি তক্ষুণি নারদকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলেন।—"তবে রে? এতবড় আস্পদ্দা? আমার দরবারে এসে আমরাই ছেলেদের যা নয় তাই বলে নিন্দে করা? আবার আমি যাতে আমার দাদা রামচন্দ্রের ওপরে রেগে যাই, সেজন্যে বলা হচ্ছে আসলে বাঘটা মেরেছে তাঁর ছেলেরা? ভেবেছেন আপনার শয়তানি আমি বুঝতে পারিনি? ওসব ফুটুনি এখানে চলবে না, আপনিই ফুটে যান, আমি আপনার স্বর্গের আশায় বসে নেই। আমার বেহেশ্‌তে সীট রিজার্ভ করা আছে, আমি স্বেচ্ছায় ম্লেচ্ছ হয়েছি। আপনার ব্রহ্মশাপ আমার লাগবে না, এই মুহূর্তে কেটে পড়ুন দিকি?"

লক্ষ্মণের রাগারাগি দেখে নারদের বাক্‌রোধ হয়ে গেল। প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে বীণার কাঠে ঠক ঠক ঠক করে তিনবার টোকা মেরে আঙুল মট্‌কে নারদমুনি অভিসম্পাত দিলেন, —"ব্যাটা লক্ষ্মণ, তুমি লছমনুল্লা হয়েছো বলেই আমার কোপ থেকে রক্ষে পাবে ভেবেছো? তোকে জব্দ করতে না পারি, তোর দাদাকে তো জব্দ করতে পারবো? নারদ, নারদ!" তাঁর চোখ দু'খানি আগুনের ভাঁটা হয়ে গেল, নাক দিয়ে আগুনের হল্কা বেরুতে লাগলো, নারদকে ঠিক ড্রাগনের মতন দেখতে হয়ে গেল। তিনি হুউশ করে ঢেঁকি চড়ে উড়ে গেলেন মহারণ্য পার হয়ে অযোধ্যার দিকে।

(নয়)

॥ সর্গ : ৯ ॥

পথে "নারায়ণ-নারায়ণ" জপতে জপতে ক্রোধটা কিঞ্চিৎ সামলে নিয়ে, নারদ হাসি হাসি মুখ করে রামচন্দ্রের রাজসভায় এসে অবতীর্ণ হলেন। রামচন্দ্র নারদকে দেখে ঠিক অতটা খুশি হলেন না, লক্ষ্মণ যতটা হয়েছিলেন। কেননা রাম জানেন, নারদের দর্শন পাওয়া সর্বদা সুলক্ষণ নয়। তবু উঠে দাঁড়িয়ে প্রণতি জানালেন। দেবর্ষি বলে কথা। নারদ সোজাকথার লোক। আশীর্বাদ করেই বললেন—"এসব কী হচ্ছে মহারাজ রামচন্দ্র? রাজপুত্রেরা নাকি হরিণ শিকার করেছেন?"

রামচন্দ্র একগাল হেসে ঘাড় কাৎ করে বললেন—"তা করেছে বটে, ঠাকুর। বিরাট এক সম্বর হরিণ। দেড়-দু'মণ মাংস হবে!" পুত্রগর্বে রামচন্দ্র গদগদ। গম্ভীর হয়ে নারদ বললেন—"মহারাজ বনে বাঘও ছিল, হরিণও ছিল। তা, রাজা রামচন্দ্রের পুত্রেরা কি বাঘ ছেড়ে দিয়ে হরিণ মারবে? আপনার কী মনে হয়?"

রাম ঘাবড়ে গেলেন, কিছুই বুঝলেন না, হাত জোড় করেই দাঁড়িয়ে রইলেন আর মনে মনে ভাবতে থাকলেন—"হরিণ? না বাঘ? বাঘ? না হরিণ? ব্যাপারটা কী? বাঘ শিকারও মৃগয়া, হরিণ শিকারও মৃগয়া। ছেলেরা বাঘ মারলে হরিণ আনবে কেন? দুটোই তো শিকার করা বারণ। রামচন্দ্র সসঙ্কোচে এবার বললেন, "ঠাকুর, বুঝেছি। ব্যাঘ্র সংরক্ষিত প্রাণী। সম্বর হরিণও কিন্তু এখন সংরক্ষিত প্রাণীরই পর্যায়ে পড়ে। দুটোই নিষিদ্ধ। ছেলেরা আইন ভেঙেছে। ওদের জরিমানা করব।"

—"আরে ধুৎ।" নারদ অধীর হয়ে বলে ওঠেন—"আইন ভাঙার, জরিমানা করার কথা কে বলছে? মর্ত্যে কবে কী নতুন আইন হচ্ছে, স্বর্গে আমরা তার হিসেব রাখি না। যা ঘটেছে, আমি সেইটে বলছি। আপনার ছেলেরা হরিণ মারেনি। ওরা মেরেছে বাঘ। আমি স্বচক্ষে দেখেছি।"

রাম এবার বোকারাম হয়ে গেলেন।

—"বাঘ মেরেছে? তবে হরিণ এলো কোত্থেকে?"

—"সেটা বরং ছেলেদেরই জিজ্ঞেস করুন।"

রাম ছেলেদের ডেকে পাঠালেন সভাতে। জিজ্ঞেস করতেই লব-কুশের মাথা হেঁট। আর রামচন্দ্রের মাথায় হাত।

—"কী বোকা ছেলে রে বাবা? বাল্মীকির বোর্ডিং স্কুলে এই শিক্ষা? বনের মধ্যে ওই ছেলেগুলোই বা এল কোত্থেকে? ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাঘ নিয়ে সটকে পড়লো?"

লব-কুশ বলে উঠলো—"ওরা ভুলিয়ে-ভালিয়ে নেয়নি বাবা। আমরা চারজনে মিলে পরামর্শ করেই এটা করেছি। এই তো সবচেয়ে সুব্যবস্থা, আমরা যে যেটি চাই সে সেটাই পেয়েছি। এতে অসুবিধের কী হয়েছে? দোষ যদি হয়ে থাকে, সেটা সত্য গোপনের। তার জন্যে মার্জনা চাইছি।"

রামচন্দ্র মহাখুশি হয়ে ছেলেদের মার্জনা করে দিলেন। সত্যিই তো, ছেলেরা

বেশ সুবন্দোবস্ত করেছে। লব-কুশ আরও জানালো, "ওই ছেলেরা লক্ষ্মণাবতীর রাজপুত্র, হাসান আর হোসেন।"

রামচন্দ্র এবার স্নেহে গলে গেলেন।

—"বেশ করেছিস, বেশ করেছিস। বাঘ দিয়ে তোদের কী হবে? হরিণটা বেশ ভোজে লাগবে।"

নারদ রামচন্দ্রের কাজকর্ম দেখে আরো রেগে গেলেন। তিনি বললেন—"সে কি কথা মহারাজ? আপনি মহাজ্ঞানী, আপনার মুখে এমন স্নেহান্ধ বাক্য একান্তই বেমানান। বালকপুত্রদের কথা শুনে কি আপনি রাজ্য চালাবেন? প্রজারাই বা কী বলবে। এখনই লক্ষ্মণাবতীতে দূত পাঠান, ওরা বাঘ ফেরৎ দিক।"

বিনয়ের অবতার হয়ে রামচন্দ্র বললেন—"ঠাকুর, আমাকে চিন্তা করতে দু'মিনিট সময় দিন।" দু'মিনিটের মধ্যেই রামচন্দ্র গোপনে মন্ত্রণাসভা ডাকলেন। মন্ত্রীরা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেলেন। একদল বলেন—"বাঘ ওরা ফেরৎ দিক।" আরেকদল বলেন — "কী দরকার ঝামেলা করে?" আর রামের মন বলছে—"আহা, বাঘ তো লক্ষ্মণের ছেলের কাছেই আছে, থাক না।" আলোচনা চলছে, এমন সময়ে বাইরে প্রবল চেঁচামেচি হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। প্রহরীরা ছুটে এসে বললো—প্রজারা দলে দলে রাজপ্রাসাদ ঘিরে ফেলেছে। তারা স্লোগান দিচ্ছে—"হরিণ চাই না, বাঘ চাই! হরিণ চাই না, বাঘ চাই।"

এই সময়ে পিড়িং পিড়িং শব্দ হলো নারদের বীণার। নারদ মন্ত্রণাসভায় এসে, রামকে একটু আলাদা করে আড়ালে ডাকলেন। নারদ বললেন—"রামচন্দ্র, ওদের আমি শুধু শিকার বদলা-বদলির কথাটুকুনি বলেছি। আমি কিন্তু বলিনি এখনও যে লব-কুশ আর হাসান-হোসেন একাসনে বসে একপাত্রে জলপান করেছে। পরস্পরের খাদ্য একত্রে গ্রহণ করেছে। লব-কুশ বিরিয়ানি এবং কাবাব খেয়ে গদগদ হয়েছে। এসব কথা প্রজাদের এখনও বলিনি। আপনি যদি বাঘ ফেরৎ না চেয়ে পাঠান তাহলে বলে দিতে বাধ্য হবো। পুত্রদের ত্যাগ না করে তখন আপনার উপায় থাকবে না।"

এমন সময়ে প্রজাদের চাপে রাজপ্রাসাদের দেবদারু তোরণ ভেঙে পড়লো। রামচন্দ্র দৌড়ে গেলেন।

(দশ)

॥ সর্গ : ১০ ॥

তারপর?

তারপর একদিকে রামের সৈন্য, আরেকদিকে লক্ষ্মণের সৈন্য। একদিকে মরা বাঘ, আরেকদিকে মরা হরিণ। প্রবল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। অস্থির হয়ে বালক হাসান-হোসেন তাদের শাদা ঘোড়ায়, আর বালক লব-কুশ তাদের লাল ঘোড়ায়

চড়ে শূন্যে হাত তুলে "থামো। থামো!" বলতে বলতে দু'দিক থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে এলো। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে কে শোনে কার কথা? শনশনিয়ে ছুটে এলো লক্ষ লক্ষ তীর, মুহূর্তের মধ্যে চারজন শান্তিপ্রেমী নিরস্ত্র কিশোর মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। নিষ্পাপ রক্তে সরযূ কলঙ্কিত হয়ে ফুলে ফেঁপে উঠলেন। রামচন্দ্র আর লছমনুল্লা উন্মাদ হয়ে সেই ঘুরন্ত, ফুটন্ত, রাগন্ত রক্তবর্ণ সরযূ নদীর দুরন্ত স্রোতে ঝাঁপ দিয়ে যুগলে প্রাণত্যাগ করলেন। আর সেই মহাশোক সহ্য করতে না পেরে সরযূ নদী মুহূর্তের মধ্যে নির্জলা বালির সোঁতা হয়ে গেলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ কিন্তু চলতেই থাকলো, রাগ আর রক্তের ঝাঁঝ লেগে মহারণ্যের প্রতিটি বৃক্ষ শুকিয়ে পাথর হয়ে গড়িয়ে পড়লো, প্রতিটি তৃণ শুকিয়ে রেণু রেণু বালি হয়ে গেল, মহারণ্য মহামরুতে পরিণত হলো, রক্তঝরানো যুদ্ধ কিন্তু ফুরোলো না। নারদ এখনও আকাশপথে চক্কর মেরে সেই যুদ্ধ দেখে যাচ্ছেন আর মিটিমিটি হাসছেন মিনিটে তেত্রিশবার। লোকে তাঁকে U.F.O. মনে করে নিয়েছে।

আর বাতাসপুত্র হনুমান, মহাবীর হনুমানজী, শোকবিহ্বল, মৃত্যুহীন, নিরুপায়, হাওয়ায়-হাওয়ায় হাহাকার করে বুক চাপড়ে কেঁদে বেড়াচ্ছে—"হা হাসান! হো হোসেন! হায় রে লব! হায় রে কুশ!"

।। ইতি উত্তরকাণ্ড সমাপ্ত ।।

টীকা : এই কাহিনীর বীজ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের 'মেচ' উপজাতির লোকগাথা রামকথা থেকে নেওয়া। সেখানে লক্ষ্মণ গোমাংস খেয়ে মুসলমান হয়ে যান, তাঁর হাসান-হোসেন নামে দুই পুত্র জন্মায়। লব-কুশ তাদের আক্রমণ করলে হাসান-হোসেন যুদ্ধে নিহত হয়। এখানে দ্রষ্টব্য যে, এই লক্ষ্মণপুত্র হাসান-হোসেন কিন্তু হজরত নবীর দৌহিত্রদ্বয় নয়। এরা লৌকিক কল্পনায় সৃষ্ট চরিত্রমাত্র। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, এই লক্ষ্মণ রামায়ণের সহধর্ম হলেও লক্ষ্মণের দুই পুত্রের সঙ্গে কোনওক্রমেই হজরত নবীর দৌহিত্রদ্বয়ের যোগ নেই।

১১ই মে, ১৯৯৮, নিউ ইয়র্ক
(ভারতে আণবিক বিস্ফোরণ ঘটানোর দিন)।

BanglaBook.org

রাগ-অনুরাগ এবং অন্যান্য গল্প

তামাশা

আজকাল হরিধ্বনি তো তেমন কানে আসে না। সেদিন সন্ধেবেলায় ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মধ্যে ট্রাফিক বাতিতে আটকে আছি, চমকে উঠলুম। পাশেই হঠাৎ "রামনাম সৎ হ্যায়" —আছড়ে পড়েছে। সহসা সেই শব্দে বহু যুগ আগেকার এক সন্ধেবেলার ছবি ঝলসে উঠলো জানলার কাচে।

বাড়িটার সামনেই টলটলে এক দীঘি। তার মধ্যিখানে এক জংলা দ্বীপ। সকালসন্ধে হরেক রকমের পাখি উড়ে যায় সেই দ্বীপ থেকে। আমি দ্বিতীয়বার মা হতে চলেছি, কিন্তু শরীর ঠিক নেই। সারাদিন শুয়ে শুয়ে জানলা দিয়ে পাখিদের ওড়াউড়ি, আর জলের রং বদল দেখি। আর দিন গুনি, কবে সংকট কাটবে। নট নড়ন চড়ন নট্ কিছু কিনা? একদম শয্যাবন্দী! একদিন জানলা দিয়ে দেখতে পেলুম আমার দুষ্টু মেয়েটা, আড়াই বছরও হয়নি তার, বাগানের গেট ডিঙিয়ে ওধারে লরীর রাস্তায় নেমে গেল। সামনেই দীঘি। আর ডাক্তারী নিষেধ। ছুট-ছুট্-ধর্-ধর্—এক লাফে দৌড়ুই। জলের কিনারা থেকে ধরে আনলুম মেয়েকে। পা ছুঁড়ছে। লাল ফুল তুলতে যাচ্ছিল সে।

এদিকে আমার যেমন কর্ম, তেমনি ফল! অত দৌড়োদৌড়ি সইবে কেন? অসুস্থতা শতগুণ বেড়ে গেল, আর মেয়ের নেপালী আয়া তাকে বকুনি দিতেই থাকল। —"তোমার জন্যেই মার এত কষ্ট!" বেচারী মুখ শুকনো করে চোরের মতন ঘুরছে। সন্ধের দিকে আর উপায় রইল না, ডাক্তার এসে আমাকে নার্সিংহোমে নেবার ব্যবস্থা করলেন। ট্যাক্সি ডাকা হলো।

এত কাণ্ড হচ্ছে, গৃহস্বামীটি কিন্তু কিছু টেরও পাচ্ছেন না। তিনি ভোরবেলা বেরিয়ে গেছেন, কনফারেন্স। আমি চললুম হাসপাতালে, উনি জানতেও পারলেন না।

মন খুব বিষণ্ণ। এত চেষ্টা করলুম। দেড় মিনিটও চুপ করে থাকতে পারি না, সেই মানুষ দেড় মাস লক্ষ্মীমেয়েটি হয়ে ঠায় শুয়ে আছি অবিশ্বাস্য ধৈর্য ধরে। তবু শেষ রক্ষা হলো না।

ডাক্তারের নির্দেশে বিছানার চাদরটার চারকোণা স্ট্রেচারের মতো ধরে আমাকে চ্যাংদোলা করে ট্যাক্সিতে তোলা হচ্ছে। দালান, বাগান, পার হয়ে তবে ট্যাক্সি। ব্যাপার দেখে ভীষণ ঘাবড়ে গেছে মেয়ে আমার। ভীতু, জলভর্তি চোখে, চাদরের একধার খামচে ধরে হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করে সঙ্গে আসছে। মুখখানা ভয়ে এতটুকু। ওর মনটা

BanglaBook.org

কেমন করে ভালো করি? হঠাৎ বুদ্ধি এল মগজে। "—পিকো, একটা মজা করবি? আমার সঙ্গে সঙ্গে জোরে জোরে বল তো দেখি, রা-ম-না-ম-সৎ-হ্যায়!" খেলার গন্ধ পেয়েই মেয়ের মুখ ঝলমল। আমরা মায়েতে-মেয়েতে মুহূর্তের মধ্যে পাড়া কাঁপিয়ে "রামনাম সৎ হ্যায়"....বলতে বলতে বাগানটুকু পেরুতে থাকি। পিকো লাফাতে লাফাতে, আমি চিৎপটাং, দুলতে দুলতে। হা ঈশ্বর! কে ভেবেছিল এক মুহূর্তেই গেটে এত লোক জড়ো হয়ে যাবে? এত মানুষ ছিল কোথায়? এ যে শব্দকল্পগুড়ুম্ হয়ে গেছে! সর্বনাশ।

হবি তো হ' ঠিক তখুনি দুটি গাড়ি এসে থামলো। আমার কর্তামশাই। অন্যটি থেকে গুরুজনস্থানীয় এক বন্ধু আর তাঁর স্ত্রী নামলেন। গেটের ভিড়ে, রক্ত হিম করা "রামনাম সৎ হ্যায়" ধ্বনিতে, আর চ্যাংদোলার মনোরম দৃশ্যে নেমেই তাঁরা স্ট্যাচু। তারপর পায়ে পায়ে গুটিগুটি এগিয়ে এসে, ব্যাপারটার আঁচ পেলেন। ধড়ে প্রাণ, ও প্রাণে রাগ এলো। একেই দুঃসময়, তার মধ্যে নবনীতার খ্যাপামি। আবার খুদে মেয়েটাকে সঙ্গে দোহার জুটিয়েছে! দেখেশুনে জবরদস্ত বন্ধুগিন্নিটী যারপরনাই ক্ষিপ্ত! তিনি কড়া কেরালিনী ডাক্তার! প্রথমেই তো এক ধমকে পিকোকে চুপ করিয়ে দিলেন। তারপরে শুরু হলো আমাকে আড়ং ধোলাই। অবশ্য সবই সুস্থ মস্তিষ্কের ন্যায্য কথা। "—আচ্ছা নবনীতা, জীবনে একটা মুহূর্তের জন্যেও কি তোমাকে সিরিয়াস হতে নেই? এতটা লঘু চরিত্রও মানুষের হয়? কোনো অবস্থারই কি গুরুত্ব বোঝার বোধ নেই তোমার? এই নিয়েও হাসাহাসি? আজব মেয়ে বটে। এই মুহূর্তেও ঠাট্টা তামাশা? এটাও কি তোমাকে বলে বুঝিয়ে দিতে হবে? ছি ছি ছি অকারণে রামনাম বলছ! এতটুকু গভীরতা নেই?"

আর গাড়িতে শুয়ে আমি ভাবি—গভীরতা, গভীরতা। তামাশাই বটে! বিসর্জনের বাজনাও চেনে না?

জুলাই ১৯৯৯

BanglaBook.org

শিশুকন্যা দশক

জুলিয়াস সীজারকে তাঁহার ধাত্রী কেমনভাবে মাতৃদেবীর পেট কাটিয়া ভূমিষ্ঠ করাইয়াছিলেন কখনো দেখিবার সুযোগ হইবে, ভাবি নাই। কিন্তু ললাটে লিখিত লিপি অনুযায়ী উহাও দেখিলাম। জন্ম দিতে সাহায্য করিলেন একটি প্রথম শ্রেণীর সুনিপুণা ডাক্তার, জন্ম লইলেন একটি দরিদ্র শিশু, তাঁহার যে সাম্রাজ্য জুটিবে না, তাহা জন্মমুহূর্তেই স্পষ্ট ছিল।

স্থান ভাগলপুরের একটি নার্সিংহোম, সীজারিয়ান সেকশন প্রত্যক্ষ করিব বলিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া ও.টি-তে দাঁড়াইয়াছি ; দেহাতী বউটি অজ্ঞান। তাহার পেট কাটিয়া অনায়াসেই দুই ঠ্যাং ধরিয়া ছোট্ট সুন্দর একটি মানবশিশু টানিয়া বাহির করিলেন ড. মিসেস রায়। বাহির করিয়াই তাঁহার চশমা পরিহিত চক্ষুযুগল বাষ্পাচ্ছন্ন হইল। মুখের তো বাকিটুকু মুখোশে ঢাকা। ড. মিসেস রায় উদ্বিগ্ন, ভারী গলায় আপন মনেই বলিলেন, "তিন নম্বর মেয়ে। এটার কপাল ভালো নয়।" মায়ের পেট সেলাই করিয়া দেওয়া হইল, শিশুকে স্নান করাইতে লইয়া গেলেন নার্স। শিশুটি 'মা' বলিয়া ট্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া জগতে আপনার প্রবেশ সংবাদ ঘোষণা করিল। আমরা ও.টি. পরিত্যাগ করিলাম।

দ্বিপ্রহরে ডাক্তার সমেত আমরা একটু বাহিরে গিয়াছিলাম, যাইবার পূর্বে ডাক্তার দিদিমণি অপেক্ষমাণ ওই বউটির পরিবারের লোকজনকে দুধ, গ্লুকোজ, হরলিক্স, আরও কী কী সব আনিতে তালিকা করিয়া দিলেন।

সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া প্রথমেই ডাক্তার দিদিমণি নার্সিংহোমে ঢুকিলেন, মা-টি কেমন আছে? জ্ঞান ফিরিয়াছে কি? হরলিক্স খাইয়াছে? বাচ্চা কেমন আছে? বাড়ির লোকে দুধ-টুধ দিয়া গিয়াছে তো? নার্স দিদিমণি সসংকোচে উত্তর দিলেন, মায়ের জ্ঞান ফিরিয়াছে। শিশু সুস্থ আছে। কিন্তু বাড়ির লোকেরা সেই যে চলিয়া গিয়াছে তো গিয়াছেই, আর ফিরিয়া আসে নাই। নার্সিংহোম হইতেই মাকে ও শিশুকে যথাযথ শুশ্রূষা করা হইয়াছে, হরলিক্স, গ্লুকোজ জল ইত্যাদি তাঁহারা খাওয়াইয়াছেন। কিন্তু মহামুশকিল হইয়াছে মা-কে লইয়া, জ্ঞান ফিরিবার পরেই সে ভয়ানক কান্নাকাটি বাধাইয়া দিয়াছে। বলিতেছে গ্রামে ফিরিলে তাহাকে বেদম প্রহার করা হইবে, তিন নম্বর কন্যাসন্তান উহারা সহিবে না। এদিকে এত কাঁদিলে তো সেলাইয়ের ক্ষতি হইবে, মা অসুস্থ হইয়া পড়িবে। ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া উদ্বিগ্ন ডাক্তার-দিদি রোগিণীর ঘরে ঢুকিলেন।

আমি তো ভাগলপুর ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি। ডাক্তার দিদিমণির সহিত যখন দেখা হইল, জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই মা ও মেয়ের কী সংবাদ? ডাক্তারের মুখ কালো হইয়া গেল। তিনদিন পরেও যখন বাড়ির লোক কেহই আসে নাই, খোঁজও করে নাই, মা তখন উন্মাদ হইয়া কন্যার গলায় ডেটলের শিশি উপুড় করিয়া দিয়াছে। অতি কষ্টে পুলিশকেস ঢাকিতে হইয়াছে। কিন্তু গ্রামের বাড়িতে শিশুকন্যার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছাবামাত্রই স্বামী-শ্বশুর আসিয়া সানন্দে প্রসূতিকে ঘরে লইয়া গিয়াছে। পুরা সপ্তাহ ধরিয়াই প্রসূতি মা-টি প্রায় পাগলের মতো ছিল। খাওয়া দাওয়া করিত না। কথা কহিত না। কেবলই কাঁদিত।

পরের বার যখন দেখা হইল, ডাক্তার দিদিমণি নিজেই জানাইলেন, দিদি, সেই বউটার এ বছরে আবার একটা মেয়ে হয়েছিল। মেয়েটাকে এখানেই ফেলে রেখে এবারে

BanglaBook.org

মা পালিয়ে গিয়েছে। কেউ বাচ্চা নিতে আসেনি। আমরা মেয়েটাকে অনাথ আশ্রমে দিয়ে দিয়েছি।

আর মা?

কে জানে কোথায় পালালো প্রাণের ভয়ে? গ্রামে গেলে প্রচণ্ড মার খেতো তো? স্বামীটা আবার বিয়ে করেছে। এরপর একটুক্ষণ থামিয়া, বলিলেন, বারবার সীজারের পরে শরীরের যা অবস্থা, ও মেয়ে বাঁচলে হয়।

রাস্তা দিয়া গর্জন করিয়া শোভাযাত্রা যাইতেছে—ভোট দিন, ভোট দিন। ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের আরও একটি সুযোগ আমাদিগের জীবনে সমাগত। ক্যালেন্ডারে সহস্রাব্দ শেষ হইতে চলিল। একবিংশ শতক দুয়ারে কড়া নাড়িতেছে। নারীবর্ষ, নারীদশক কবেই শেষ। কন্যাশিশুবর্ষ, কন্যাশিশুর দশকও ফুরাইতে চলিল। পৃথিবী জুড়িয়া কন্যাশিশুদের লইয়া আলোচনা, উৎসব, চিন্তাভাবনা চলিতেছে, কত পরিকল্পনা। সেই বউটার খোঁজ পাই নাই আর।

প্রন-ককটেল

মিক্সড চলবে না, চিকেন ফ্রায়েড রাইস বল্—মিক্সডে শ্রিম্প থাকে।...

না না, প্লীজ ফ্রায়েড প্রন অর্ডার দিস্ না, দিলেই শমিতা ঠিক খেয়ে ফেলবে।...

সে কী। শমিতা কি বাচ্চা মেয়ে নাকি? 'খেয়ে ফেলবে' মানে?

ওর ভীষণ অ্যালার্জি যে—

ওর অ্যালার্জি, ও খাবে না। তা বলে অন্যেরা খেলে কী দোষ?

আহা, ও যে ভীষণ ভালোবাসে প্রন খেতে? অথচ খেতে পারে না! ওর সামনে আমরা সবাই প্রন খাবো—

শমিতার আর সহ্য হয় না। নতুন বউয়ের ভূমিকা বিস্মৃত হয়ে টেবিলের তলা দিয়ে সে সজোরে চাপ দেয় বরের জুতোয়।

আর বিস্ফারিত নয়নের ভাষায় জানিয়ে দিতে চায়—আবার? বলেছিলাম না লোকের সামনে কখখনো এরকম করবে না?

কিন্তু শুভেন্দুর বয়ে গেছে সেই ভাষা পড়তে। রবি তো বলেই ফেললো—বাড়াবাড়ি করিস না শুভেন্দু, বউ যেন কারুর থাকে না!

শমিতা রেগেই অস্থির, দেখুন তো রবিদা, আমি কি বাচ্চা মেয়ে, লোভে পড়ে খেয়ে ফেলবো? সবাই মিলে খেতে এসেছি—এরকম পাগলামি করলে হয়? আপনি নিন, নিশ্চয়ই, মিক্সড ফ্রায়েড রাইস নিতেই হবে।

BanglaBook.org

শমিতার প্লেট থেকে মিক্সড ফ্রায়েড রাইসের প্রত্যেকটি কুঁচো চিংড়ি সযত্নে বেছে বেছে নিজের প্লেটে তুলে নিলো শুভেন্দু। শার্কস-ফিন স্যুপ নিতে দিলো না কিছুতেই —সবাইকে ওয়ান-টান স্যুপ খেতে হলো।

বাড়িতেও চিংড়ি, কাঁকড়া ঢুকতে দেবে না শুভেন্দু। এই নিয়ে কম লজ্জায় পড়তে হয় শমিতাকে? এই সেদিন ওর ভাগ্নী কুকারি ক্লাসে প্রন ককটেল বানাতে শিখে এসে খুব এক্সাইটেড—তার মামার জন্মদিনের পার্টিতে প্রন ককটেল বানাবে। মেনু শুনেই শুভেন্দু চেঁচালো, প্রনটা চলবে না। ফ্রুট ককটেল বানাও।

ঠিক আছে বাবা, একদিন বৌমা না হয় একটা আইটেম কমই খাবে—বলেই ফেললেন শুভেন্দুর মা। শমিতার কান্না পেয়ে যায়—শুভেন্দুর এই বাড়াবাড়িতে যে কত শত্রু তৈরি হচ্ছে তার শ্বশুরবাড়িতে, সে জ্ঞান যদি ওর থাকতো! ডাক্তার বর যেন মানুষের হয় না। অসুখটা একটু কি ভুলেও যেতে নেই?

শমিতা আর রাজনের একটু দেরি হয়ে গেলো রেস্তরাঁয় পৌঁছাতে। আজ রাজনের জন্মদিন। তেরো বছর পূর্ণ হচ্ছে। ভাগ্যক্রমে এই সময়েই শুভেন্দু এসে পড়েছে বিদেশ থেকে, ওর বর্তমান বৌ প্যামও আছে সঙ্গে। রাজন খুব খুশি, বাবা-মা দু'জনের সঙ্গে একসঙ্গে জন্মদিনের ডিনার খাবে রাজন আজ, অনেক বছর পরে। শুভেন্দুরা আগেই এসে পড়েছে। শমিতা ঢুকতেই হৈহৈ করে বলে উঠলো, এত দেরি করে ফেললে, সী ফুড প্ল্যাটারটা অর্ডার না দিয়ে দিলে পরের দিকে ভালো পাওয়া যায় না। এটাই এদের বেস্ট ডিশ। আমি অবশ্য চার প্লেট অর্ডার দিয়েই দিলাম, আর ওয়েট না করে—

হি ইজ সো এফিশিয়েন্ট! হেসে হাত বাড়িয়ে দিলো প্যাম, হ্যাপি বার্থ-ডে রাজন!

হ্যাপি বার্থ-ডে'র পালা ফুরোলে, গুছিয়ে নিজের চেয়ারে বসতে বসতে রাজন জিজ্ঞেস করলো, কী কী থাকে সী ফুড প্ল্যাটারে, বাবা?

কী থাকে না তাই বলো। স-ব! এভ্রিথিং। কী চাও তুমি? বলো? ক্র্যাব? প্রন? মাসলস? স্ক্যাম্পি? অক্টোপাস? সব আছে—

বাঃ বাঃ! ক্র্যাব, প্রন দুটোই? কী মজা, আবার অক্টোপাসও? কিন্তু বাবা, চারটে প্লেট কেন বললে? মা তো এর একটাও খেতে পারবেন না। মার না অ্যালার্জি?

মুহূর্তে কী যেন ঘটে গেলো। ঘরের বাতাসে শব্দহীন প্রলয়।

সরি, আমি... মানে... সহসা বাকরুদ্ধ শুভেন্দুর মুখের চেহারা দেখে উদ্বিগ্ন গলায় প্যাম বলে ওঠে, হোয়াটস দ্য ম্যাটার, হানি? আর ইউ ফীলিং ওকে? আরে, কিচ্ছু হয়-নি, ওদের ডেকে একটা অর্ডার বদলে দিলেই চলবে—খুব সহজ সুরে বলল শমিতা, রাজন, বেয়ারাকে ডাকো তো।

BanglaBook.org

অথচ একদিন তো এটাই চেয়েছিলো সে।

এইটাই কি চেয়েছিলো?

বাস-বাসর

দিদিভাই এসেই কাঁদো কাঁদো মুখে টিভিটা বন্ধ করে দিলো। আর বললো—

যা বিশ্রী একটা কাণ্ড করেছি না মা, এক্ষুণি।

কী করলি আবার? মা ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

বাসের মধ্যে লজ্জার একশেষ!

কেন? ভাড়া ছিলো না বুঝি ব্যাগে?

ছিলো, সেটাই তো মুশকিল হলো।

বাসভাড়া থাকাটাই মুশকিল? কী সব যাতা বকছিস? আয় তো, হাত ধুয়ে খেতে বসে যা আগে। অনেক রাত করে ফেলেছিস।

খেতে বসে বললো দিদিভাই—

মামিমা সেই পাঁচহাজার টাকাটা আজ পাঠিয়ে দিয়েছেন মা, স্যাকরাকে কালই জমা দিয়ে দিও। ওই টাকাটার জন্যেই আমার আজ সব গণ্ডগোল হয়ে গেলো। মামিমাকে তখুনি বলেছিলুম, এখন থাক, আজ অনেক রাত হয়ে গেছে—

মানে? টাকাটা কোথায়? আর্তকণ্ঠ অনেকগুলি।

ঐ তো, ঐ ব্যাগের মধ্যে আছে, অতগুলো টাকা নিয়ে, রাত্তিরবেলা—বাসের মধ্যে ভয় করে না? যা দিনকাল—ছিনতাই তো আছেই, ব্যাগ কেটেও নেয়—

তা তো ঠিকই, ভয় তো করবেই, ভয় পাবার কথা—

টাকাটা যথাস্থানে আছে, হারিয়ে যায়নি জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে সমস্বরে আমরা সমবেদনা জানাই।

ঐ জন্যেই তো ভুলভাল হয়ে গেলো।

কী আবার ভুলভাল করলি?

ব্যাগে একগাদা নোট, ব্যাগ খুলতে গিয়ে পাছে বাসে বেরিয়ে পড়ে? সেই ভয়ে বাসের মধ্যে ব্যাগটা আর খুলবোই না ঠিক করেছিলাম—তাই একটা দু'টাকার নোট বাইরে হাতে ধরে রেখেছি। আর সেটাই হলো কাল!

সে কী দিদিভাই? তোমার দু'টাকার নোটটা ছিনতাই হয়ে গেলো বুঝি?

ইয়ার্কি মারিস না বাবু! প্রায় তাইই—হঠাৎ হাত থেকে উড়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলো নোটটা, আর আমিও চেঁচিয়ে উঠেছি—আমার টাকা পড়ে গেলো! ওরে আমার টাকা পড়ে গেলো! সবাই তখন চেঁচিয়ে উঠলো—

কত টাকা? কত টাকা? আমার মাথায় তো ঘুরছে মামিমার ঐ পাঁচ হাজার—মুখে ফস করে বেরিয়ে গেলো 'অনে-ক'।

তারপর? তারপর?

তারপর যা কখনো হয় না, তাই হলো।

কনডাক্টর ঘণ্টি বাজিয়ে বাসটা থামালো।

তারপর?

রাস্তায় নামলো। আর হবি-তো-হ তক্ষুণি ওপাশের অন্য একটা গাড়ির হেডলাইটে দেখা গেলো আমার দু'টাকার নোটটি প্রজাপতির মতন পতপত করে উড়ছেন রাস্তার ওপরে।

তারপর?

তারপর কনডাক্টর নোটটাকে ধরে নিয়ে এলো, এসে একগাল হেসে বললো, এই যে দিদি, আপনার অনে-ক টাকা, আর বাসসুদ্ধ মানুষ হো হো করে হেসে উঠলো! ছি ছি ছি—

আমরাও খাওয়া বন্ধ করে ততক্ষণ অট্টহাসি হাসতে শুরু করেছি—মা সুদ্দু। তারপরেই অবশ্য—

সরি দিদিভাই, সরি—

সবচে' যন্ত্রণার ব্যাপারটা কী বলতো? আমি তো আর সত্যি কথাটা ওদের বলতেও পারছি না! নেমে, একা একা হেঁটে বাড়িতে আসতে হবে তো এতটা রাস্তা? ও মশাইরা শুনুন। আমার কাছে যে সত্যি সত্যিই অনেকগুলো টাকা রয়েছে। সেইজন্যেই এমন ভুল কথা বলে ফেলেছি উদ্বেগে, সেটা এক্সপ্লেইন করে দেবার উপায় নেই কোনো। 'বেঁধে-মার' যাকে বলে। আর সবাই হাসছে! আমার চোখে জল এসে গিয়েছিলো।

দিদিভাইয়ের বড় বড় চোখদুটো এখনই জলে ডুবে গেছে দেখে, বাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, দিদিভাই, বাসের মধ্যে কত কী হয়, এটা নিয়ে মন খারাপ করিস না। এই তো সেদিন আমি কী দেখলুম বলতো? আমার সামনের সীটে দুই চালউলি বসে গল্প করছিলো, হাতে চালের পুঁটলি। একজন বললো, দিদি, গীতার নাকি তুমি আবার বে' দিয়েচো?

হ্যাঁ, তা দিইচি। একগাল হেসে সেই গীতার মা বললো, ঠাকুরের দয়ায়! বলেই নমস্কার করলো।

এবার ভালো দেখে পাত্তর খুঁজেচো তো?

খুব ভালো পাত্তর। আমার ছেলে তাকে ভালোরকম চেনে। গেলবারেরটা রঙ-মিস্তিরি ছেলো, বেশিরভাগ সময় ঘরে বসে বসে ঘুমুতো, কাজকম্ম পেতো না। আর মাঝে মাঝে যখন রোজগার করতো, ঠেসে মদ গিলে এসে গীতাকে ধরে পিটতো। ওফ্ কী মারটাই মেরেচে আমার মেয়েটাকে! ভাগ্যিস পাইলে এয়েছেলো? তাই না পরানে বেঁচে গেছে!

এই নতুন বরটাকে বেশ দেখেশুনে নিয়েছো তো দিদি? নেশা ভাঙ-টাঙ—-না না, সে সব দোষ কিচ্ছু নেই। মদ-গাঁজা ছোঁয় না, ওই একটু যা বিড়ি-ছিগ্রেট খায়। গীতাকে খুব ভালোবাসে জামাই। সিনেমা দেখাতে নে যায়, এক্কেবারে বেলাকের টিকিট কিনে! এই তো সিদিনকে কী চমৎকার একছড়া হার গইড়ে দেছে—কোন

BanglaBook.org

না দেড় ভরি সোনা তো হবেই।

মা কালীর দয়া দিদি! আ-হাহা, নইলে আজকালকার দিনে এমনি জামাই পাওয়া। শুনেই আমারও বুকখানা এতখানি চওড়া হয়ে গেলো দিদি। তা মেয়ে তোমার আছে কোথায়?

ওই তো সল্ লেকে শ্বশুরবাড়ি।

বাঃ সল্ লেকে? ভালো, ভালো। তা, জামাইটি তোমার করে কী?

এবার শাশুড়ির গলা অহঙ্কারে মোটা হয়ে গেলো, ওখানে ওদের বাপ-ব্যাটার বিজনেছ আছে।

বা বাঃ। কীসের বিজনেস গো দিদি?

গলা এবার আরও অহঙ্কারী হলো—ওই, ছেনতাইয়ের বিজনেছ।

এবারে দিদিভাই হেসে গড়িয়ে পড়েছে।

তোর ভাগ্যি ভালো দিদিভাই, বিজনেসম্যানরা ছিলো না আজ তোর বাসটাতে।

অন্যদিন, ঈদসংখ্যা ২০০০ (এই তিনটি অণুগল্প একই পত্রিকায় প্রকাশিত)

BanglaBook.org

ভাসানির মা

নতুন বউ আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র মা-বাপ-মরা ভাইপো শানু-বিধুকে কোলে তুলিয়া দিয়াছিল কালীপদ। আহা বউটার কী রূপই খুলিয়াছিল, দুই কোলে দুই ভাই, যেন কার্তিক-গণেশ। লক্ষ্মীরাণী যেমন শানু-বিধু-অন্ত প্রাণ, ছেলে দুইটাও তেমনি হইয়াছে, 'খুড়িমা' বলিতে অজ্ঞান। সে সবই তো হইল, কিন্তু লক্ষ্মীরাণীর কোলে ছেলেপুলে যে আর আসে না। লক্ষ্মীর ইহা লইয়া বিন্দুমাত্রও দুঃখ আছে বলিয়া মনে হয় না। দুই ভাসুরপোকে বুকে লইয়া ভরা সংসার তাহার।

কিন্তু কালীপদর প্রাণে শান্তি নাই। আজ এই পীরের দরগায়, কাল সেই দেবীর মন্দিরে, পরশু কোন সন্ন্যাসীর ঠেকে, সে সন্তানের খোঁজে ঘুরিয়া মরে। কঠিন কঠিন মানত করিয়া আসে। একবার কার্তিক সংক্রান্তির এক মেলায় যাইয়া কোন গঙ্গামন্দিরে কঠিন এক মানত করিয়া আসিল। পুত্রসন্তান হইলে তাহাকে গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিতে হইবে। তারপরে মা গঙ্গার দয়া হইলে তিনিই পুত্র প্রত্যর্পণ করিবেন। যাহাই হউক, আঁটকুড়ো নামটা তো ঘুচিবে? কালীপদ তাহাতেও রাজি। সংসারে সব ধাঁধারই সমাধান আছে। গঙ্গামন্দিরের সন্ন্যাসীর চেলাটি বলিয়া দিল, মা গঙ্গার কৃপা পাইতে হইলে কী কী করিতে হইবে। ছেলেকে ভালো করিয়া মুড়িয়া-সুড়িয়া ঝুড়ির মধ্যে বসাইয়া নৌকা করিয়া ঘাট হইতে অল্প একটু দূরে লইয়া ঝুড়ি ভাসাইয়া দিতে হইবে। আগেই মৎস্যজীবীগণকে পয়সা দিয়া, জলে প্রস্তুত রাখিবে, তাহারা ঝুড়ি ধরিয়া ঘাটে টানিয়া আনিবে। আরও একবার গর্চা যাইবে—পুত্রের মূল্য ধরিয়া

দিয়া সেই ঝুড়ি হইতে পুত্রকে ক্রয় করিয়া লইতে হইবে। এই উপায়ে দয়াময়ী মা গঙ্গা পুত্র প্রত্যর্পণ করিবেন। পুত্রের আয়ুও বৃদ্ধি পাইবে। ভাসান না-দিলে ওই মানত করা সন্তানকে কিন্তু বাঁচানো যাইবে না। আটঘাট বাঁধিয়া লইলেই হইল।

ভাসানির যখন জন্ম হইল, শানুর তখন মুখমণ্ডলে কচি কচি তৃণের ন্যায় দাড়ি ও গুম্ফের শ্যামল রেখাটি ফুটিতেছে, বিধুর বিকট স্বরভঙ্গ হইয়াছে। আদর করিয়া ভাইয়ের নাম তাহারা রাখিয়াছিল সুধন্য। কিন্তু কালীপদর এক গোঁ। ভাসানি। ভাসান-দেওয়া ছেলের নাম, ভাসানি। শানু-বিধুর যখন বিবাহ হইল, ভাসানি তখনও নেহাৎ শিশু, দুই বউদিদির কোলেপিঠে চড়িয়া দাদাদের শিশুদের সঙ্গে খেলা করিয়াই ভাসানি বড়ো হইতেছিল, যখন কালীপদর স্বর্গলাভ ঘটিল। লক্ষ্মীরাণীকে দুই বধূ দুই পুত্র দেবীজ্ঞানে সেবা করে। শান্তির সংসারে লক্ষ্মীশ্রীর অভাব নাই। সময়কালে ভাসানিরও বধূ আসিল। কচি বধূটি বড়ো জায়েদের পায়ে পায়ে ঘোরে। সময়মতো ভাসানিও বাপ হইল। ছোটো বউমার ক্রোড়ে পুত্রকন্যা আসিল। কালক্রমে দেখা গেল, ছোটো বউমার দুই দাদাই ভাসানির প্রধান মন্ত্রণাদাতা হইয়া উঠিয়াছে, শানু-বিধুকে সে আর তেমন গ্রাহ্য করিতেছে না। ইহা লক্ষ্মীরাণীর দৃষ্টি এড়াইল না। এবং তাহার যারপরনাই দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইল। রাত্রে নিদ্রা হয় না। অবশেষে যাহা ভয় পাইয়াছিল তাহাই ঘটিল। ভাসানি বলিল—সম্পত্তি সবই তাহার একার। তাহার পিতা ব্যবসা করিয়া এই জমিজমা, ক্ষেত-পুষ্করিণী করিয়াছেন। কেবল বসতবাটিটি ছিল ঠাকুর্দার। বসতবাটিতে ভাগাভাগি করিয়া অর্ধেকটা শানু-বিধুদেরকে বাঁটিয়া দেওয়া হউক। বাকি সকল কিছুই একা ভাসানির প্রাপ্য—পিতার মৃত্যুতে সেই অধিকারী। একথা শুনিয়া গ্রামসুদ্ধ ছি ছি করিল। ভাসানির গ্রাহ্য নাই। লক্ষ্মীরাণী এবার মনস্থির করিল। পুরা গ্রামের লোক ডাকিয়া ভাসানিকে সর্বসমক্ষে বলিল, —"কিছুই তো বাছা তোমার নহে। সব সম্পত্তিই আমার একার। তোমার পিতা না থাকুন, আমি অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছি। আমার জীবৎকালে সম্পত্তির কোনো ভাগীদার নাই। ভাগবাঁটোয়ারা করিতে হইলে তাহা আমিই করিব। পঞ্চায়েতকে ডাকিয়া যথাসর্বস্ব তিনভাগে ভাগ করিয়া দিব। কে না জানে, মার তিনটি পুত্র। তিনটি বধূ।"

তারপর কী হইল, সেই সংবাদ আমরা সকলেই গত ১০ জুন, ১৯৯৯-এর আনন্দবাজার পত্রিকায় পড়িয়াছি—

শিলিগুড়ির মাটিগাড়া গ্রামে সম্পত্তির লোভে পুত্রের ছুরিতে জননী নিহত। কাকিমাকে রক্ষা করিতে গিয়া খুনি যুবক ভাসানি রায়ের দুই দাদা শান্তিগোপাল ও বিধান গুরুতর আহত হইয়া হাসপাতালে ভর্তি। শান্তিগোপালের অবস্থা সংকটজনক। মা লক্ষ্মীরাণী ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।

এই প্রাচীন কাহিনীটি গত সপ্তাহেই ঘটিয়াছে।

দিশা সাহিত্য, শারদসংখ্যা ১৪০৬

পর্ব ২

রাগ-অনুরাগ অথবা গুস্‌সার কিস্‌সা

ভাবলুম জয়াকে একটা ফোন করে দিই—ওদের বাড়িতে যাবার কথা ছিল, কিন্তু কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি। আমাদের বাড়ির সামনে এক হাঁটু জল। ফোন করতেই জয়া কেঁদে ফেলল।

—"শমিতা, এ কোথায় এসে পড়লুম রে! এখানে ভীষণ কাণ্ড হচ্ছে।"

—"কী ভীষণ কাণ্ড?"

—"জানি না। আমি বাক্স প্যাক করছি।"

—"কিসের বাক্স? কোথায় যাচ্ছিস?"

—"বাড়ি।"

—"বাড়ি? কেন?"

—"এখানে কী করে থাকি? ও তো চলে গেছে। একা একা থাকব।"

—"চলে গেছে মানে! কোথায় চলে গেছেন?"

—"বলে যায়নি। শিবঠাকুর ভেঙে গেছে।"

—"কী বললি! শিবঠাকুর ভেগে গেছে।"

—"না না, ভেগে যায়নি, শিবঠাকুর ভেঙে গেছে।"

—"নবীনবাবু চলে গেছেন না শিবঠাকুর ভেঙে গেছে? ঠিক করে বল।"

—"দুটোই। ও-ও নেই। শিবঠাকুরও নেই।"

—"ও-ও নেই, শিবঠাকুরও নেই, মানে! কী যা তা বলছিস পাগলের মতন!"

—"পাগল নয়, পাগল নয়, সত্যি। সত্যি কথা। শিবঠাকুর ভেঙে ফেলেছে। ফেলে গটগট করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে গেছে। বলে যায়নি কিচ্ছু। কী হবে শমিতা?"

—"কোন্ শিবঠাকুরটা ভেঙেছে?"

—"ওই তো যেটা তুই কাশী থেকে এনে দিয়েছিলি। রুপোলি রঙের। মাথায় চাঁদটা মেটালের। চাঁদটা ভাঙেনি। সাপগুলোও মেটালের। ওগুলোও আছে আনহার্ট। কেবল ঠাকুরটাই যা গুঁড়ো গুঁড়ো। খাটের তলাটা শিবঠাকুরের গুঁড়োয় ভর্তি হয়ে গেছে।"

—"কেমন করে ভাঙল? কে ভাঙল?"

—"ওই তো ভাঙল। রাগ করে ভাঙল। বলল, নিকুচি করেছে তোমার বলদা শিবঠাকুরের। শিবঠাকুরকে ও বলদা বলল, শমিতা।"

—"তা বলুক গে: ওতে কিছু হবে না। কিন্তু ভাঙল কীভাবে?"

BanglaBook.org

—"তবে আর বলছি কী? ও তো ইচ্ছে করেই ভেঙে দিল। মাটিতে ছুঁড়ে ভেঙে দিল। পাপ হবে না!"

আমি এবার স্তম্ভিত। সেক্যুলার স্পিরিট আমি খুবই অ্যাপ্রিশিয়েট করি—কিন্তু এ আবার কী। মূর্তি ভাঙার এ কোন নয়া কালাপাহাড় এল জয়ার বর হয়ে!

—"শান্ত হয়ে সব বল তো শুনি। কী হয়েছিল? কেন ভেঙে দিল অত সুন্দর মূর্তিটা? কোথায় রেখেছিলি?"

—"ওই তো, ম্যান্টলপিসের ওপরেই ছিল। ওখান থেকে তুলে নিয়ে মাটিতে ছুঁউ-ড়ে ফেলে দিল—" বলেই আবার হুহু করে কেঁদে ওঠে জয়া।

—"চুপ কর!" এক ধমক লাগাই, "কী করছিলি তুই, যে ওরকম খ্যাপামি করলেন নবীনবাবু?"

—"ইয়োর সিগারেট স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু এভরিওয়ানস হেলথ—শুধু এই বলেছিলাম। বলেছিলাম প্লিজ স্মোকিং ছেড়ে দাও। আমার শিবঠাকুরের গায়ে হাত ছুঁইয়ে এর আগে একদিন ওকে প্রমিস করিয়েছিলাম, 'আর কোনওদিন সিগারেট খাব না।' কয়েকদিন দিব্যি খাচ্ছিল না। গুড বয়। ওমা! তারপরে দেখি আবার লুকিয়ে লুকিয়ে খাচ্ছে। বাথরুমে ধোঁয়ার গন্ধ। তখন ওকে ধরে এনে বলেছি, তুমি না আমার এই শিবঠাকুরকে ছুঁয়ে প্রমিস করেছিলে। তোমার ডিভাইন প্রমিস ভঙ্গ করছ? ব্যস্ অমনি বাবুর রাগ হয়ে গেল। চিৎকার করে 'বেশ করসি যা করসি, ঠিক করসি, তোমাগো বলদা শিবঠাকুরের নিকুসি করসে—সে নিজে কিনা স্মোক করে গাঁজা থিকা চরস অবদি।' বলে শিবঠাকুরকে তুলে মেঝেয় ধমাস করে আছাড় দিয়ে ফেলল। গুঁড়িয়ে গেছে দেখেই তাড়াতাড়ি নিজের ব্রিফকেসে কীসব জামাকাপড় ভরে নিল, নিয়ে ঝটপট লিফটে উঠে নেমে চলে গেল পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঠিক যেমনভাবে মার্ডারারেরা পালিয়ে যায়।"

—"কতক্ষণ আগে গেছেন?"

—"সে অনেকক্ষণ। সাড়ে পাঁচটার সময়। তক্ষুনি আমরা চা খেয়েছিলাম।"

—"এখন তো সাড়ে সাতটা বাজে। ফোনটোনও করেনি?"

জয়া কাঁদতে থাকে।

—"আমিও প্যাক করে ফেলেছি। এক্ষুনি মা-র কাছে চলে যাচ্ছি। এ কেমন বাড়িতে এসে পড়েছি রে বাবা। আমি এখানে থাকব না শমিতা। আই ক্যাননট স্টে হিয়ার।"

—"দাঁড়া দাঁড়া অত কাঁদিস না। কোথাও চলে টলে যাস না, আমি আসছি। এখানে এক হাঁটু জল। তোদের ওখানেও তো প্রচণ্ড জল জমে। কেমন করে যে যাই—তা হোক, তুমি কোথাও বেরিও না। ওখানে চুপচাপ বসে থাক। আমি আসছি।"

বীরপুরুষ রিকশাওলার কল্যাণে (কলকাতার আসলি হিরো), কোনওরকমে জল ডিঙিয়ে তো পৌঁছনো গেল জয়াদের বাড়ি। ওখানেও রাস্তায় ঢেউ খেলছে। অতিকষ্টে

BanglaBook.org

সার্কাসের খেলুড়ির মতো কায়দা করে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ঢুকে পড়লুম। ফ্ল্যাটবাড়ির সিঁড়ি তো জলে ডুবে আছে। দালানেও জলধারা বইছে। লিফটের কাছে পৌঁছতে হয় একটা আধো অন্ধকার করিডোর পেরিয়ে। সিঁড়ির নীচে বিল্ডিংয়ের অফিস। তবে বন্ধ দরজার সামনে টুল পেতে দারোয়ান বসে আছে। যেতে যেতে কেমন যেন একটা অস্বস্তি হল আমার। আর একবার ফিরে চাইলুম দারোয়ানের দিকে। আবছা আঁধারে ওপাশে মুখ ঘুরিয়ে বসে আছে। টুলের ওপরে। ও কে। পাশে বিলিতি চামড়ার ব্রিফকেস নামিয়ে রাখা। পায়ে দামি জুতো-মোজা। পরনে স্যুট। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।"

—"কে? নবীনবাবু না? এখানে কী করছেন? অন্ধকারে?"

—"প্রবল বৃষ্টি। ছাতা, রেনকোট, কিসুই তো লই নাই সাথে, বাইরাইতে পারসি না।"

—"এখন আটটা বাজে। চলুন ওপরে চলুন। অনেকক্ষণ অন্ধকারে বসে আছেন।"

—"ভীষণ মশা।"

—"হবেই তো, ঘুপচি জায়গা। উঠুন উঠুন—প্রচণ্ড ফ্যালসিপেরামের উপদ্রব এখানে এখন—ভীষণ ডেঞ্জারাস—"

ওপরে গিয়ে ডোরবেল বাজালেন নবীনবাবু নিজেই। মহাজ সুরে বলে উঠলেন —"এই যে জয়া, শমিতা আসসে—ভালো কইরা একটা কফি কইরা দ্যাও দেহি, এই বৃষ্টির মধ্যে আসা তো সহজ না।" দরজা খুলেই প্রথমে জয়া বাক্যহারা। আনন্দে ঝলমল করে উঠল পরমুহূর্তেই। বরের দিকে নজর না দিয়ে আমাকে নিয়ে পড়ল, গদগদ আহ্লাদে।

—"কোথা থেকে ধরে নিয়ে এলি রে শমিতা?"

যেন আমি পি. সি. সরকার জুনিয়ার।

আমাকে কফি খাইয়ে নিজে হুইস্কি নিয়ে বসে খুশি গলায় নবীনবাবু বউকে বললেন —"চাঁদটা আর সাপটা রাইখ্যা দিছ তো জয়া? তোমারে আমি সিলভারের শিবঠাকুর বানাইয়া দিমু—আনব্রেকেব্‌ল।"

সেই থেকেই জয়া সোমবার নিয়ম করে নিরিমিষ্যি খায়, পাছে শিবঠাকুর রাগ করেন। আর নবীনবাবু বলেন—"শিবঠাকুরেরই লাভ হইল, একটা এক্সট্রা ভক্ত, প্লাস একটা সিলভারের মূর্তি। মন্দ কী!"

২

বাড়িতে পা দেওয়া মাত্র উদ্বিগ্ন গলায় জয়া বলল—"রাস্তায় ওর সঙ্গে দেখা হলো?" জয়ার পিছনে অনেকগুলো কাঁচা-পাকা মুখ উদগ্রীব হয়ে অর্থাৎ গ্রীবা বাড়িয়ে রয়েছে —বাংলাদেশ থেকে আসা ভাসুর, জা এবং ভাসুরঝি, কানপুর থেকে আসা

ননদ, আবার সুদূর সিডনি থেকে এসে পড়া মামা মামিমা। এদের সঙ্গেই আমার আজ লাঞ্চ খাবার নেমন্তন্ন। দেরি হয়ে গেছে বলে দৌড়ে দৌড়ে আসছি কলেজ থেকে। ওরা এতক্ষণে খেতে বসে গেল বোধহয়। এখন, এই এত বেলায়, খাবার ঠিক মুখে মুখে সবাইকে বসিয়ে রেখে নবীনবাবু আবার কোথায় বেরুলেন। নিশ্চয় সিগারেট কিনতে।

—"আমি তো দেখলুম না! ওদিকের অন্য পানের দোকানটায় গেছেন হয়তো —খাবার আগেই সিগারেট?"

—"সিগারেট নয়। সিগারেট নয়, চিচিঙে। উনি তার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন।"

"চিচিঙের জন্যে গৃহত্যাগ? এ যে গিনেস বুক অফ রেকর্ডস-এ ওঠবার মতন কথা। এত বেলায় চিচিঙে দিয়ে কী হবে? চল তো ভেতরে গিয়ে বসি, তারপর শুনি—"

চিচিঙের জন্যেই গৃহত্যাগ বটে। কিন্তু ব্যাপার আর একটু জটিল। নবীনবাবু যারপরনাই মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে গৃহত্যাগ করেছেন। তিনি চিংড়ি মাছ দিয়ে চিচিঙে খাবার গোপন বাসনা একান্তে প্রকাশ করেছিলেন স্ত্রীর কাছে এবং তাজা চিচিঙে ও টাটকা কুচো চিংড়ি সাপ্লাইও দিয়েছিলেন জগুবাবুর বাজার থেকে। কিন্তু এক্ষুনি খেতে বসবার ঠিক আগে রান্নাঘরে ঢুকে জানতে পেরেছেন ওই পদটি আজ রান্না করা হয়নি। নবীনবাবু আরও তেলেবেগুনে হয়ে গেলেন যখন শুনলেন চিচিঙেটা পাঁচমিশেলি সবজিতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

—"আর কুচা চিংড়িটা কোথায় দ্যাওয়া হইল শুনি?" ফেটে পড়েছেন নবীনবাবু। জয়া শান্ত মেয়ে, কিন্তু তারও আর সহ্য হয়নি, একেই বাড়িতে প্রচুর অতিথি, তাঁদের নানারকমের রান্না সামলাতে হচ্ছে, দোষের মধ্যে জয়া বলে ফেলেছে টুক করে- —"আমার বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি।" আর যাবে কোথায়? ব্যস, অমনি অ্যাবাউট টার্ন, নো লীভ টেকিং, নো গুড বাইজ, ওন্‌লি আ শর্ট স্পিচ। মুহূর্তের মধ্যে তিনি বৃহৎ বিশ্বের নাগরিক। নবীনবাবু আর এ সংসারের কেউ নন। এইরকম হৃদয়হীনা পত্নীদের জন্যই যুগে যুগে মহান পুরুষেরা গৃহত্যাগ করেছেন, এই জাতীয় অবহেলাই তাঁদের ঠাকুরের পায়ে পৌঁছে দিয়েছে। নবীনবাবু খাবারঘরে আর ঢোকেননি। পায়ে ঘরের চপ্পল, পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি, সোজা রাস্তায়।

—"ব্রিফকেস নেয়নি, কাপড়চোপড় সঙ্গে নেই, টাকাও বের করেনি আলমারি থেকে। বেশি দূরে যেতে পারবে না।" এই পর্যন্ত বলে জয়া ফিক করে একটু হাসল, "লাঞ্চটা খেয়ে নিয়ে খুঁজতে বেরুলেই হবে, ভাসুর ঠাকুরের ইনসুলিন ইঞ্জেকশন নেওয়া হয়ে গেছে। আর অপেক্ষা করা মুশকিল।" সবাই খেতে বসলুম।

—"করলেই পারতিস কুচো চিংড়ি-চিচিঙের চচ্চড়িটা! কী আর বেশি খাটনি হতো?" উত্তরেই সব ব্যাপারটা স্পষ্ট হলো। মাঝেমধ্যে বাজার করতে নবীনবাবু ভালোই-বাসেন, সেইমতো মেনু ঠিক করে দেন। এই সপ্তাহে নবীনবাবুর বাজার

করাটা বাধ্যকরী হয়ে পড়েছে, বাড়িতে প্রচুর অতিথি সমাগম—বিভিন্ন লোকের ভিন্ন রুচির রান্নাবান্নার প্রয়োজন, রান্নাঘরে তুমুল কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে জয়ার। ননদ নিরামিষ খান, ভাসুরের চাই স্পেশাল ডায়াবেটিক ডায়েট, জয়ার মামার হার্টের জন্য লো-কোলেস্টেরল ডায়েট লাগে। সবদিক দেখেশুনেই ভেবেচিন্তে নবীনবাবু মহানন্দে বাজার করে এনেছেন। তার মধ্যে ছিল শখের চিচিঙে, কুচো চিংড়িও। কিন্তু বাড়িতে এতগুলো মানুষ প্লাস আমি, কাজের লোকজনও কম নয়। সংখ্যায় অনেকগুলি মুখ। রাঁধলে তো চিচিঙে এই এত্তোটুকুনি হয়ে যাবে। কুলোবে কেন? ওদিকে মামিমার আবার চিংড়িমাছে অ্যালার্জি। এইসব ভেবেই জয়া সবরকমের সবজি দিয়ে বড় করে একটা চচ্চড়ি করেছে। তাতেই চিচিঙে দিয়ে দিয়েছে। কুচো চিংড়ি তুলে রেখেছে ফ্রিজে। পরদিন মামা-মামিমা পুরীতে যাচ্ছেন, তখন রাঁধবে, আর একটু চিচিঙে আনিয়ে নিলেই হবে। ইতিমধ্যে এই কাণ্ড।

—"সাধুসন্ন্যাসী হতে চাইলে সামনেই রামকৃষ্ণ মিশন আছে"—আমি সাজেস্ট করি।

—ওখানে ওঁরা ওঁকে ভালোরকম চেনেন। ওখানে যাবে না—"

—"আর একটু এগোলে ভারত সেবাশ্রম সংঘ—"

—"দক্ষিণে গেলে রামঠাকুরের আশ্রম, আরও দক্ষিণে গেলে পরমানন্দ স্বামীর আশ্রম—", আলোচনা জমে উঠছিল, বাধা দেন জয়ার মাথাশাশুর। "ছাড়ো তো। লোটাকম্বল নিয়ে বেরয়নি ও। চিচিঙে দিয়ে কুচো চিংড়ি খাওয়া হলো না বলে কেউ সন্নেসী হয়ে যায় না। কাছাকাছি কী কী হোটেল আছে তোমাদের?" জয়া গড়গড় করে বলে গেল—"ওই তো, সপ্তর্ষি আছে, ব্লিস আছে, হ্যাপি হোম আছে, ব্লু বেল আছে। আমার কাছে সব লেখা আছে। ফোন নম্বর বলব?" সপ্তর্ষিতে ফোন করা হলো। নেই। ব্লিসেও নেই। হ্যাপি হোমেও না। তবে? "অনেকগুলো গেস্টহাউস গজিয়েছে এ পাড়ায়। তাদের তো নাম জানি না।"

—"চল তো বেরই। খুঁজি গে যাই। ধরে আনা যাক। পায়ে হেঁটে যাওয়া যাবে, এমন জায়গাতেই গেছে।"

খেয়ে উঠে বেরনো হলো, একটু পানও খেয়ে আসা যাবে অমনি। মামা, মামিমা, জা, ভাসুর, ভাসুরঝি, ননদ, আমি। জয়া লিডারশিপ দিচ্ছে। হইহই করতে করতে নবীনবাবুর সার্চ-পার্টি বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। রীতিমতো শোভাযাত্রা করে।

প্রথমেই মোড়ের মাথায় রঘুদার পানের দোকানে খবর নেওয়া হলো। কপাল ভালো, রঘুদা বলল, ঘন্টাখানেক আগে ব্যানার্জিবাবুকে সামনের গলিতে ঢুকতে দেখেছে, খুব হন্তদন্ত হয়ে হাঁটছিলেন—এখনও বেরননি। মহানন্দে শোভাযাত্রা ঢুকল গলিতে। ওই তো। সামনেই সাউথস্টার হোটেল।

—"ওখানেই লুকিয়েছেন। নিশ্চিত। মনের সুখে মশালাদোসা আর মাদ্রাজি কফি খাচ্ছেন। ওঁর প্রিয় খাদ্য।" জয়া লাফিয়ে উঠল আহ্লাদে।

দল বেঁধে আক্রমণ করবার দরকার নেই, আমরা বাইরে অপেক্ষা করি। জয়াই

যাক ভেতরে। একটু বাদে কাঁদো-কাঁদো মুখে জয়া বেরিয়ে এল।

—"নেই। ব্যানার্জি নামে কেউ নেই। একঘণ্টা আগে কোনও গেস্টই আসেনি এখানে। লাস্ট গেস্ট কাল ঢুকেছে বলল।"

—"চলো তো আমি যাই।" জয়ার ভাসুর ভিতরে চললেন জয়াকে নিয়ে।

একটু পরেই ভিতরে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে আমরা পিলপিল করে ঢুকে পড়ি —ভবেনবাবু চেঁচাচ্ছেন, "আই শ্যাল কল দি পুলিশ—"

আর হাতজোড় করে দক্ষিণী কর্মচারিটি বলছেন—"নো নিড সার। সার, হি টোলড মি নট টু লেট হিজ ওয়াইফ নো! হি ওয়াণ্টেড সাম পিস অ্যান্ড কোয়ায়েট-—সার।" বোঝা গেল ব্যাপারটা।

এই হোটেলের সঙ্গে যে সাউথ ইন্ডিয়ান ভোজনশালাটি রয়েছে, তারই কারণে এদের সঙ্গে নবীনবাবুর রীতিমতো ভাবসাব। তিনি এঁদের এসে বলেছেন স্ত্রীর সঙ্গে কলহ হয়েছে। দু' দিনের শান্তি চাই। স্ত্রীকে যেন খবরটা জানিয়ে দিও না। এঁরাও যথাসাধ্য সাহায্য করেছিলেন পুরনো খদ্দেরকে, কিন্তু পুলিশের নাম করেই সব গোলমাল করে দিয়েছেন নবীনবাবুর দাদা।

নবীনবাবু তৈরি হয়ে বসেই ছিলেন। হাতে শুধু সিগারেট-দেশলাই। পায়ে চটি। জয়া ঢুকতেই উঠে দাঁড়িয়ে সুড়সুড় করে বেরিয়ে এলেন। টেবিলে পড়ে রইল মশালা দোসা, কফির ভুক্তাবশেষ। শোভাযাত্রা ফেরার পথে একটু ঘুরে এলু, কেননা মামিমা বললেন মোড়ের দোকান থেকে ভাগ্নের জন্যে টোটিঙে কিনে তবে বাড়ি ফিরবেন।

BanglaBook.org

৩

জয়া ডেকেছিল ওর আলমারি গোছাতে। ভাদ্রমাসের রোদ—শাড়িগুলো রোদে দেওয়া দরকার, কতদিন নাড়াচাড়া পড়েনি। সিলভার ফিশ হয়ে গেলো কিনা কে জানে। শাড়ি বের করে থাকে-থাকে সাজিয়ে রাখছি জোড়া খাটের ওপরে। বারান্দার রোদে মাদুর আর শতরঞ্চি বিছোনো হয়েছে। আমরা তাতে একটা একটা করে শাড়ি মেলে দিচ্ছি। আর গল্প করছি। নানা ধরনের, নানা রঙের, নানান দামের শাড়ি। প্রতিটা শাড়ি কি শুধু শাড়ি। তাতে কত সুখদুঃখের গন্ধ মাখানো থাকে। প্রতিটি শাড়ির ইতিহাস আমাদের দু'জনেরই মুখস্থ। এই টাঙ্গাইলটা সেবার পুজোয় পেলি—এই কাঞ্চিভরমটা কিনে দিলেন সেই যে রুনুর বিয়েতে পরবি বলে—ওই প্রিন্টেড সিল্কটা তোর জন্মদিনে নবীনবাবুর সারপ্রাইজ। আর ওই ঢাকাইখানা বুল্টি যখন পেটে, তখন ঢাকা থেকে এনে দিলেন নবীনবাবু—এইরকম সুখস্মৃতির গল্পে মুগ্ধ হয়ে মগ্ন হয়ে একেবারে মজে আছি দু'জনে, সরল মনে নবীনবাবুর অকুস্থলে প্রবেশ। এবং কাতর আর্তনাদ।

—"অ্যা—তো শা—ড়ি! আরিব্বাস্। অ্যাতো শাড়ি কার?"

আমি তো হাসি হাসি গলায় বলেছি—

—"কার বলুন তো? দেখুন তো একটু চেনা চেনা লাগছে শাড়িগুলো?"

নবীনবাবু এক পা এগিয়ে এলেন। তারপরে স্থির। বিষাক্ত সাপ দেখলে ভয়ে আমাদের পা যেমন সেঁটে যায় মাটিতে।

—"অ্যাত্তোগুলি শাড়ি হইল কবে? কি সব্বনাশ!"

—"কেন সর্বনাশের কী হয়েছে?"

—"হয় নাই? ক্রিমিনাল মিসইউজ অব রিসোর্সেস। অর্থের গর্হিত অপব্যয়। অ্যারে তো পুলিশে দ্যাওয়া উচিত হইত। ছি ছি।"

—"কাকে পুলিশে দেবেন নবীনবাবু? বউকে? কেন? ও কি আপনার তহবিল তছরূপ করেছে? বেশিরভাগ তো আপনি নিজেই কিনে দিয়েছেন। জয়া নিজে তো শাড়ি কেনেই না—"

"সে যেই দিউক না ক্যান্—এত শাড়ি, মাত্র একজনের হোর্ড করাই অপরাধ। ক্রিমিনাল গ্রিড। এইসব শাড়ি সার্কুলেট করানো উচিত হয়। এই দিয়া তো মার্কেট খুলা যায়। দিয়া দ্যাও দিয়া দ্যাও, গরীবদুঃখীদিগে ডাইক্যা ডিস্ট্রিবিউট কইরা দ্যাও।"

জয়া ফোঁস করে উঠল, "বাঃ বাঃ। ডিস্ট্রিবিউট কইরা দাও মানে? কেন দেব? এসব শাড়ি কি ফ্যাল্না? প্রত্যেকটা শাড়ির সেন্টিমেন্টাল হিস্ট্রি আছে"—

—"সেন্টিমেন্টাল জিওগ্রাফিও আছে"—আমি ফোড়ন কাটি—"কোনওটা ওর জন্য আপনি ঢাকা থেকে এনে দিয়েছেন, কোনওটা টোকিও থেকে, কোনওটা লখ্নৌ, কোনওটা চেন্নাই—"

—"মাত্র একজন মানুষের জন্য, ফর ওনলি ওয়ান পার্সন, এই অ্যাত্তোগুলি শাড়ি! ছিঃ ছিঃ ছি"—নবীনবাবুর কানে কিছুই ঢুকছে না, মুখে বিজাতীয় বিতৃষ্ণা। "এই যে হোর্ডিংয়ের নেশা, এইডা এট্টা বিষম খারাপ অসুখ। এ ভেরি ডেনজারাস ডিজিজ।"

—"আরে আরে নবীনবাবু, শাড়ির নেশা সকলেরই আছে, সব মেয়েদের আছে, এটা কোনও অসুখই না—"

—"আলবৎ অসুখ। দ্যাশের মানুষে খাইতে পায় না, বন্যার্তদের পরনের কাপড় নাই—আর তুমি কিনা বাণ্ডিল বাণ্ডিল ইউজলেস কাপড় বুকে লইয়া বইস্যা আছো। শেম। শেম! অনিলা, অনিলা, এইদিকে আসো তো দেখি একবার"—

অনিলা এসে দাঁড়াল।

—"এই যে অনিলা আসছ? দ্যাখছ? বউদির কত শাড়ি? তোমার যেই কটা ইচ্ছা লইয়া যাও তো মণি। লজ্জার কিস্যু নাই—এত শাড়ি বৌদির চাই না।"

অনিলার ভুরু কুঁচকে গেল। সে নবীনবাবুকে আগাপাস্তলা ভালো করে চেয়ে দেখে মেপে নিল। সময়টা নেহাত সকালবেলা, যদিও রবিবার। এখনই? নাঃ। এবার চোখ আমার দিকে। সর্বশেষে জয়ার দিকে। জয়ার দিকে তাকিয়েই মুখে কাপড় চাপা।

BanglaBook.org

—"কই, নিবা না? কোন্ কোন্ শাড়ি নিবা তুমি? লইয়া যাও।"

—"এই যে নিচ্ছি।" বলে অনিলা গম্ভীরভাবে আঁচলে ভালো করে হাত পুঁছতে থাকে। তারপর এগিয়ে এসে এক থাক কাপড় কোলে তুলে নিয়ে বারান্দায় চলে যায়। মাদুরের ওপরে মেলে দিতে শুরু করে।

—"আরে, আরে—কর কী? তোমারে কী কইলাম।"

—"নেব, নেব। পরে নেব। আগে তো রোদে দিয়ে নিই। আমাদের বস্তিতে রোদ কোথায়?"

—"তা বটে। দ্যাখো জয়া, দ্যাখো। জীবনে তো দুঃখকষ্ট কিস্সুই জানলা না। বড়লোকের স্পয়েন্ট ওয়াইফ হইয়া গোটা লাইফটা সুখেই কাইট্যা গেল তোমার—"

—"এবার আমি সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাব। রোজ রোজ এই পাগলামি আর সহ্য হয় না—", কান্নাভরা গলায় কথাগুলো বলতে বলতে একথাক কাপড় ঠেলে মেঝেতে ফেলে দিল জয়া। কাপড়গুলো ছড়িয়ে পড়লো নবীনবাবুর পায়ের কাছে।

—"না কি? সহ্য হয় না? রাগ দ্যাখাইতাসো? ও. কে.। ঠিক হ্যায়।—" বলতে বলতে নবীনবাবু আলমারি খুলে ফেললেন। ব্রিফকেসে জামাকাপড় ভরা হয়ে গেলো। ক্রেডিটকার্ড তো আছেই। নবীনবাবু বেরিয়ে গেলেন। রবিবার তো অফিসে যাবেন না।

জয়া বলল—"যান। যেখানে খুশি চলে যান। আমি আর পারি না। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। আজ বাদে কাল নাতি-নাতনি হবে। এখনও এই জিনিস চলছে। কালকে যদি না ফেরেন, তখন খোঁজ করবো। ভালো জায়গাতেই যাবেন।"

রাগ করে বেরিয়ে গিয়ে কলকাতার সব হোটেলেই আশ্রয় নেওয়া হয়ে গিয়েছে নবীনবাবুর। বড় রাস্তার মোড় অবধি পৌঁছেই রাগটা পড়ে যায়।

কিন্তু তখন ফিরবেন কোন্ মুখে। কোনও বড় হোটেলে গিয়ে বসে থাকেন। কখন দরজায় নক পড়বে। দরজা খুললেই জয়ার হাসিহাসি মুখখানা। (রেগে গেলেও ওর মুখটা হাসিহাসি থেকেই যায়) দেখতে পাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠে বাড়ি চলে যাবেন। সাধতেও হয় না। নবীনবাবুর সেভেনস্টার কমফর্ট সেখানে বাঁধা। এসব ফাইভস্টারেরা তাঁকে কী সার্ভিস দেবে? দু'তিনমাস অন্তর অন্তরই এমন ঘটে। বাড়ির কাজের লোকেরা জানে। ড্রাইভার মুকেশ জানে সবচেয়ে বেশি করে। অফিসেও সবাই জানে। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন তো জানেই। এখন বেয়াইবাড়িতেও জানাজানি হয়ে গেছে। জয়া বলল —"না শমিতা, আমি আর খুঁজতে বেরুব না। সবাই হাসে। —এই যে বউদি, দাদার জন্য তো? না, এবার এখানে আসেননি। হ্যাপিহোমে দেখুন তো। বলবে সাউথস্টার।" আবার ওদিকে—'নো ম্যাডাম, মিস্টার ব্যানার্জি ডিডিন্ট কাম টু আস দিস টাইম—ট্রাই দি 'তাজ'। বলবে গ্রাণ্ড। ও যখন ফিরবে ফিরুক। নিজের খুশি মতন।" জয়ার গজগজ আর শেষ হয় না। গজগজ করতে করতেই আমরা শাড়ি রোদে দিলুম। আমাদের কফি দিতে দিতে অনিলাও বলল—"দাদাবাবুর

BanglaBook.org

যে কী কথা! হ্যাঁ মানছি বটে, বউদির মতন এত কাপড়ের গাদা কারও বাড়িতে দেখিনি। তা বলে বিলিয়ে দেবে? একটু ভোগ করবে না? আরে ক'টা দিন যাক--পরে তো দিয়েই দিতে হবে। কি বল? এখনও বউদি তো সধবা আছে, শাড়িগুলো দিয়ে দেবে কেন? যত অলুক্ষুণে কথাবার্তা।"

সেদিন জয়া খোঁজ করল না। পরদিন সোমবার। নিশ্চয় অফিসে যাবেন। ফোন করে জানল, ঠিকই। অফিসে এসেছেন। অফিস থেকে বাড়িই ফিরবেন। চায়ের সঙ্গে দেবে বলে বরের জন্য মাছের চপ বানাতে বসল। কিন্তু অফিস থেকে ফেরার সময় পার হয়ে গেল। নবীনবাবু ফিরলেন না। মাছের চপ গড়া অবস্থায় ফ্রিজে ঢুকে গেল। ভাজা হলো না। জয়া ফোন নিয়ে বসল।

ডিরেক্টরি দেখে দেখে সব হোটেলের ফোন নম্বর ওর কাছে আলাদা ডায়রিতে তোলাই আছে। ফাইভ-স্টার, থ্রি-স্টার, সবই। এবং পাড়ার যাবতীয় আবাসস্থলের হদিশও।

সেই ডায়রি দেখে দেখে ফোন শুরু হলো। গ্র্যাণ্ড। তাজ। হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনাল। পার্ক। এয়ারপোর্ট হোটেল। রিটজ্। শেষে ছোট হোটেলে খোঁজ করতে গিয়েই খবর মিলল। অ্যাস্টর থেকে বলল, হ্যাঁ, মিস্টার ব্যানার্জি ওখানেই ছিলেন রবিবার। কিন্তু আজ সকালে চেক আউট করেছেন। জয়া আর আমি ইতিমধ্যে যাবতীয় বন্ধুবান্ধবকে ফোন করে ফেলেছি। এমন কি চন্দননগরে ওঁদের বেয়াইবাড়িতেও। মেয়ে-জামাই তো দুর্গাপুরে। সেখানেও একবার খবর নেওয়া হলো। যদিও জামাইয়ের ওপর তাঁর অভিমান-অভিযোগের লম্বা ফিরিস্তি, তবুও হঠাৎ দুর্গাপুরে চলে যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। সব জায়গায় 'না' শুনতে শুনতে জয়া ভয় পেয়ে গেল। আমিও। কী করি। পুলিশকে জানাব? পুলিশকে আবার নবীনবাবুর ভীষণ ভয়।

—"থাক। এখনই পুলিশে নয়," জয়া বলল, "আর একটু দেখি।" তাছাড়া, পুলিশ তো বলেই দিয়েছে, ইচ্ছে করে যদি কোনও পূর্ণবয়স্ক, নিরপরাধ মানুষ লুকিয়ে থাকতে চায়, তাকে ধরা পুলিশের সাধ্যি নয়। এটাও আমার মনে পড়ল।

কী করা? দ্বিতীয় দিনও তো ফুরিয়ে এসেছে। রাত আটটা বেজে গেছে।

সাড়ে আটটায় একটা ফোন এল।

—"মেমসাব হোঙ্গে? হম তিওয়ারি বোলতা হুঁণ। ব্যানার্জি সাবকো বেয়ারা।"

—"সাহেবের কিছু খবর পেলে তিওয়ারি?"

—"জি হাঁ। বহোৎ মুশকিল হো গিয়া।"

—"অ্যাঁ। কী হয়েছে? কী হয়েছে তিওয়ারি?"

—"সাব তো হমারা কোয়ার্টার মে আকর বৈঠে হেঁ। ছাপরা জিলা জানে মাঙতে হেঁ, বোলতে হেঁ—'তিওয়ারি ম্যাঁয় তুমহারা ঘর যাউঙ্গা—মুঝকো ছাপরা জিলা লে চলো —ম্যাঁয় উহাঁহী রহুঙ্গা।' অব হাম ক্যা করুঁ জি মেমসাব?"

BanglaBook.org

—"অ্যাঁ, ছাপরা? খবরদার নিয়ে যেও না। কোথাও যেতে দিও না ওকে-—তুমি সাহেবকে ওখানেই আটকে রাখো। মুকেশ তোমার কোয়ার্টার চেনে তো? ঠিক আছে, আমি আসছি। আচ্ছা, সাহেব এখন কী করছেন?"

—"অব তো সাব হমারো বচ্চোঁকে সাথ বাতচিত করতে হেঁ—ঔর রোটি খাতেঁ হেঁ। হম্ দৌড়কে ফোন বুথমে আ গয়া—"

তিওয়ারির কোয়ার্টার থেকে নবীনবাবু বেরিয়ে এলেন খুব সহজ, হাসিখুশি। যেন কিছুই হয়নি। যেন অফিস থেকেই ফিরছেন। জয়াও কিছুই বলল না।

পরের দিন অফিস থেকে ফিরে দুটো প্যাকেট খাটের ওপরে রেখে বাথরুমে ঢুকলেন।

প্যাকেট খুলে জয়া দেখল, দু'খানা নতুন সিল্কের শাড়ি।

৪

—"আমি বুথ থেকে ফোন করছি।" উদ্বিগ্ন স্বরে জয়া বলল—"আমাদের সব ক'টা ফোন নষ্ট। আমাদের তোরা ফোনে পাবি না। মাকে একটু খবরটা দিয়ে দিবি রে?"

—"নিশ্চয়ই। কিন্তু কমপ্লেন করেছিস? একটা নাম্বার আছে, লিখে নে—"

—"নো নাম্বার উইল ওয়র্ক, শমিতা। ফোনগুলো ভেঙে ফেলেছে। অল অব দেম। মাটিতে আছাড় মেরে।"

—"ভে-ঙে? কে ভাঙলো?"

—"কে আবার? যে ভাঙে। শিবঠাকুরটা ভেঙেছিল কে?"

—"সে তো পঁচিশ বছর আগের কথা। এখন কী হলো?"

—"যা হয়। রাগ হলো।"

—"আঃ, রাগটা কেন হলো সেটা তো বলবি।"

—"আমি বেশি বেশি ফোন করি, তাই।"

—"তা বলে ভেঙে ফেলবেন? সবগুলো টেলিফোন?"

—"প্রত্যেকটা।" প্রথমেই তো ছুঁড়ে ফেলে দিল কর্ডলেসটাকে। ওটাই হাতের কাছে ছিল। তা ওটা তো পড়বামাত্র ঢাকনা খুলে গিয়ে ব্যাটারিগুলো বের হয়ে চারদিকে ছত্রখান হয়ে ছিটিয়ে পড়ল। কিন্তু যন্ত্রটা ভাঙলো না। ও তখন রিসিভারটাকে দেয়ালে ঠুকে ঠুকে ভেঙে ফেলল। দেয়ালেরও প্লাস্টিক রং চটে গেল, সিমেন্ট বালি খসে পড়ল।"

—"ঈস—"

—"তারপরে মনে পড়েছে আসল যন্ত্রটা ও-ঘরে রয়ে গেছে। ছুটে গিয়ে সেটা তুলে মেঝেয় আছড়ে ফেলে ভাঙলো। মেঝের মার্বেলেও স্ক্র্যাচ পড়ে গেছে।"

—"আহাহাহা—"

BanglaBook.org

—"তারপরেই ব্রিফকেসে জামাকাপড় নিয়ে, দৌড়ে বেরিয়ে গেছে। প্রথমে অফিসেই গিয়েছিল। সেখান থেকে যে কোথায় গেল কেউ জানে না। গাড়িও নেয়নি। বাড়িতে তো ফোনও নেই, খোঁজ নেওয়াও কী ঝামেলা হয়ে গেছে। কী করি বল তো এমন বরকে নিয়ে?"

—"কি আর করবি। পঁচিশ বছর তো কাটালি—মুকেশকে নিয়ে বেরিয়ে পড়। ইউজুয়াল রাউণ্ডে। জানিসই তো কোথায় কোথায় যেতে পারেন। কিন্তু হঠাৎ ফোনের ওপর এত রাগ? বিল বুঝি অতিরিক্ত হেভি এসেছে?"

—"না না। বিলটিল নিয়ে ও মাথাই ঘামায় না। এ অন্য কাণ্ড। আমার ওপর রাগ, কেন ওর লিস্টিটা তৈরি করে দিইনি।"

—"কীসের লিস্টি?"

—"ওর জামাইয়ের কী কী দোষ। জামাইয়ের নামে ওর কমপ্লেন্টস-এর দীর্ঘ তালিকা আছে। আমাকে সেগুলো সমানেই শুনতে হয়। সেই তালিকার ফেয়ার কপি প্রস্তুত করে দিতে হবে আমাকে কম্পিউটারে ফেলে। আমি করে দিইনি, তাই রাগ।"

—"দোষের লিস্ট। কিসের দোষ?"

—"সে অনেক। প্রথম দোষ, তার নাম সে কেন জোজো লেখে, জ্যোতিষ্ক কেন লেখে না। দ্বিতীয় দোষ কেন সে ইংরিজিতে রবিঠাকুর পড়েছে। বাংলা হরফ কেন পড়তে শেখেনি। তৃতীয় দোষ, সে আই. এ. এস. হওয়া সত্ত্বেও কেন কমার্শিয়াল ফার্মে চাকরি করছে—পুরো সরকারি ট্রেনিংটা ওয়েস্টেড। চার নম্বর, দেশের সেবা না করে কেন সে টাকার লোভে... ইত্যাদি— ইত্যাদি অনেক। আচ্ছা, তোমার জামাইয়ের নামে কমপ্লেন করবার হয় তুমি নিজেই কর। আমাকে দিয়ে কেন? ওই যেসব কারণে ওর এ বিয়েতে আপত্তি ছিল, সেইসব—যদিও বেয়াইমশাই ওর ক্লাসমেট। যাদবপুরে একসঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে দুজনে। বেয়াইকে খুবই পছন্দ। অথচ তারই ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়েতে কী ভীষণ আপত্তি করেছিল। তা তো জানিসই।"

—"তুই লিস্টি করিসনি তাতে ফোনের দোষ কী?"

—"ওই যে মুখের ওপর 'আমি করতে পারব না' তো বলা চলবে না—রেগে আগুন হয়ে যাবে—তাই বলেছিলাম, 'আমার এখনও সময় হয়নি'। ব্যস খেপে গেল। বলল —'এত কাজের মধ্যে আমি সেই মূর্খ জামাইটাকে শিক্ষিত করব বলে পুরো 'সঞ্চয়িতা'টা রোমান হরফে ট্রান্সক্রাইব করতে সময় পাচ্ছি, প্রায় শেষ করে এনেছি, আর তুমি একটু ভেবেচিন্তে দোষের লিস্টিটা বানাতে পারলে না!' ভাব একবার।"

—"দাঁড়া দাঁড়া এক সেকেণ্ড—'সঞ্চয়িতা'-টা নিয়ে কী বললি? কী করেছেন নবীনবাবু? আর একবার বল।"

—"ট্রান্সক্রাইব করছেন। পুরোটা রোমান স্ক্রিপ্টে লিখছেন। জামাইয়ের দোষ

বাইরে মানুষ। বাংলা হরফ পড়তে পারে না। ইংরিজি অনুবাদে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েছে কেন? উনি তাকে আসল রবীন্দ্রনাথ পড়াবেনই। তাই কম্পিউটারে বসে পুরোটা সঞ্চয়িতা রোমান হরফে টুকছেন। জামাই যাতে বাংলায় রবীন্দ্রনাথ পড়তে পারে।"

—"বাঃ দারুণ প্রজেক্ট তো। ভারতের অন্য ভাষাভাষীরাও পড়তে পারবে। এক্সেলেন্ট আইডিয়া। তার বেলায় তো পেশেন্সের অভাব নেই? আশ্চর্য মানুষ কিন্তু।"

—"আশ্চর্য মানে। অত্যাশ্চর্য প্রাণী। যাক সে কথা। আসল কথা হচ্ছে, আমি কেন বলেছি আমার সময় হয়নি। আমি কিনা সারাদিন টেলিফোন নিয়ে পড়ে থাকি, তাই নাকি আমার সময় হয় না। মেয়ের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, মায়ের সঙ্গেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তারপর তুই আছিস, বউদি আছে, অন্যান্য বন্ধুরা—ও হিসেব করেছে, দিনে আঠারো ঘণ্টাই নাকি আমি ফোন করতে ব্যস্ত থাকি। তাই ও টেলিফোন ভেঙে দেবে যাতে আমার সময় হয়। —'লও! এইবারে তুমি লিস্টি বানাইতে কেমন সময় না পাও দেহি!' তারপরে তো জানিসই।"

—"ওই লিস্টি দিয়ে উনি কী করবেন?"

—"সেটাই তো সবচেয়ে খারাপ কথা। বেয়াইকে দেবেন। কম্পিউটার থেকে পরিচ্ছন্ন প্রিন্ট-আউট বের করে দিতে হবে। উনি ওঁর বন্ধুকে দেখাবেন, তাঁর ছেলে কত খারাপ। শমিতা, তুই হাসছিস?"

—"না না, হাসছি না। তুই বরং বুথ থেকে আমার কাছে চলে আয়। এখান থেকে ফোনটোনগুলো করা যাক।"

—"আর ফোন করে কী হবে। যখন আসবার, আসবে। আমি আর উদ্বেগ করতে পারি না।"

—"সেকি রে, উদ্বেগ হবে না? আজ মানুষটা গেল কোথায়?"

—"আর উদ্বেগ। এবার আমিই কোথাও চলে যাব যেদিকে দু' চক্ষু যায়।"

—"মুকেশ সর্বত্র খোঁজ নিয়ে এসেছে?"

—"অফিস থেকে ফোন করিয়েছিল, বড় বড় হোটেলগুলোতে নেই। বন্ধুবান্ধবের বাড়ি বাড়ি খুঁজতে যেতে হবে এবার।"

পাওয়া গেল চন্দননগরে। যে জামাইকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই জোজোরই বাবার কাছে। বেয়াইবাড়ি গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে দিব্যি দু' দিন আরাম করে এলেন। তাঁদের বলেননি তো, ফোন ভেঙে রেখেছেন, বেচারা বেয়াই-বেয়ান ফোন করে করে জয়াকে না পেয়ে হয়রান, অবশেষে ওর মাকে জানিয়েছেন। গাড়ি নিয়ে জয়া ছুটেছে চন্দননগরে।

বিকেলবেলা জয়ার কাছে গেলুম চন্দননগর ফেরতা নবীনবাবুকে দেখতে। জয়া বলল, "ছেলে-ধরা হয়, পাখি-ধরা হয়, বর-ধরা হয় বলে তো কখনও শুনিনি। আমিই প্রথম।"

BanglaBook.org

বউয়ের হাতে তৈরি গরম গরম ফুলকপির সিঙাড়া দিয়ে চা খেতে খেতে নবীনবাবু সলজ্জ মৃদু হাসলেন। তারপর পকেট থেকে একটি রঙিন রাংতার মোড়ক বের করে জয়াকে দিলেন। চকোলেট?

—"কী আছে এতে?"

—"খুইল্যাই দ্যাহো না।"

প্যাকেট খুলতে দেখা গেল ছোট্ট সুশ্রী, মিষ্টি, স্মার্ট একটি সেল-ফোন ঝিকমিক করে হাসছে। আনন্দে, বিস্ময়ে উদ্ভাসিত মুখেও জয়া বলতে ছাড়লো না—"এটা আনব্রেকেবল মেটিরিয়াল তো?"

গরম চায়ে চুমুক দিয়ে নবীনবাবু নায়কোচিত কায়দায় নিজের বুকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ঠেকিয়ে বললেন,—"ওইডা হইলেই বা কী, এইডা তো আনব্রেকেবল না—অলরেডি ব্রোকেন—কি বলেন, শমিতা?"

৫

যেতেই জয়া হেসে গড়িয়ে পড়ল—"দ্যাখ তোদের নবীনবাবুর কাণ্ড। আজ কী কাণ্ডটাই করেছে! অফিসে সবাই আমাকে এসে কমপ্লেন করে গেছে। বম্বে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে একজন ক্লায়েন্ট এসেছিল আজ। দুজনে মিলে অফিসঘরে বসেছে, সেই ক্লায়েন্ট টেবিলের ওপরে একটা যন্ত্রের চারখানা ডিজাইন পেতে ওকে দেখিয়েছে। —একটা জার্মান, একটা জাপানি, একটা আমেরিকান, আর একটা কোরিয়ান। তারপর বলেছে, 'এখানে এই চারটে ডিজাইন আছে, চারটে দারুণ, আমি চাই এই চারটের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাই মিলিয়ে একটা যন্ত্র হোক, আপনি কি পারবেন ডিজাইনটা বানাতে? ইণ্ডিয়াতে অবশ্য এ ধরনের যন্ত্রপাতি কিছুই হয় না, মেশিনটুলস ঠিক ততটা ভালো করে বানাতে পারে না তো ইণ্ডিয়া—' এত অবধি শুনেই ওর রাগ হয়ে গেছে। ও তাকে বলেছে—'ইণ্ডিয়াতে বানাতে পারে না তো এসেছেন কেন আমার এখানে? বেরোন। বেরোন। কোরিয়ায় যান, জার্মানিতে যান, আউট! আউট।' বলে ঠেলে বের করে দিয়েছে বম্বে থেকে আসা সেই ক্লায়েন্টকে। কত লক্ষ টাকার বিশাল কন্ট্রাক্ট এনেছিল। অফিসে সব হাহুতাশ করতে লাগল।

"এদিকে সেই লোকটা চালু পার্টি। সে করেছে কি, বেরিয়ে গিয়ে বাইরে সিকিউরিটির ছোট্ট গুমটিটাতে বসে দরওয়ানদের সঙ্গে সাহেবের স্বভাব-চরিত্র বিষয়ে কথা বলেছে। ঘন্টাখানেক বাদে আবার ফিরে এসেছে। ততক্ষণে ওর রাগও পড়ে গেছে। কনট্রাক্টটা সই হয়ে গেল। কিন্তু ভেবে দ্যাখ শমিতা, এইভাবে কেউ বিজনেস চালায়? সবাই তো এই ক্লায়েন্টের মতো ঝানু লোক হয় না। আর একটু হলেই এতবড় কন্ট্রাক্টটা হাতছাড়া করে ফেলছিল। এই মেজাজ নিয়ে ব্যবসায় নামে কেউ!" বড় কন্ট্রাক্ট সই করে নবীনবাবুর মেজাজ বহোৎ খোশ—আমাদের নিয়ে গ্র্যাণ্ডে চললেন,

নৈশভোজের প্রকল্প নিয়ে। বেরোবার মুখে মেয়ের টেলিফোন এল বম্বে থেকে। স্পিকার-ফোনটা চালু করে দিলেন যাতে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কথা কইতে পারেন মেয়ের সঙ্গে।

—কী খবর, মামণি?

—বাবা? আমরা কাল বিকেলের ফ্লাইটে আসছি। ম্যাটাডোরটা একটু পাঠাবে দমদমে?

—অবশ্যই, অবশ্যই, পাঠামু না ক্যান? মামণি? ম্যাটাডোর কেন, সিয়েলো যাবে। কোন ফ্লাইট?

—সিয়েলোতে আঁটবে না বাবা। প্রচুর মালপত্তর রয়েছে সঙ্গে। ম্যাটাডোরটা না হলে ভারি মুশকিল হবে।

—ও। এইডা কি তাহলে একটা প্রবলেম?

—হ্যাঁ তো। প্রবলেম নয়? এত লাগেজ। নবীনবাবুর স্নেহাতুর পিতৃকণ্ঠ মুহূর্তে পাল্টে গেল। ফর্ম্যাল। কঠোর। ইস্পাতশীতল।

—তোমারে তো আমি পূর্বেই কইয়া দিসি, বুলটি, ডোন্ট কাম টু মি উইথ এনি প্রবলেম। কই নাই? তুমি বিয়া করস স্বেচ্ছায়। এগেনস্ট মাই উইল। তৎক্ষণাৎ কইয়া দিসি। ইউ বিলং টু দেয়ার ফেমিলি নাউ—তোমার প্রবলেম আমি শুনতেই চাই না, ইটস নট মাই প্রবলেম। অহন থিক্যা তোমার যা কিসু সমস্যা অগোই সল্‌ভ করন লাগবো। প্রবলেমের কথা আর বাবারে কইবা না। শ্বশুরমশয়রে কও। কল হিম। লেট হিম সল্‌ভ ইওর প্রবলেম। অগো পুত্র-পুত্রবধূর সমস্যা, বিশুরে ডাইক্যা কও। সল্‌ভ কইরা দিউক। হোয়াই মি? আইচ্ছা, অহন আমরা গ্র্যাণ্ডে ডিনার খাইতে যাইতাসি। তুমি মিস্ করলা। গুডনাইট।

পরদিন উদ্বিগ্ন হয়ে আমিই খবর নিলুম জয়ার কাছে।—"কী ব্যবস্থা হলো রে বুলটিদের?"

—"কি আবার হবে? ম্যাটাডোর যাচ্ছে।"

—"নবীনবাবু পাঠাচ্ছেন? কেন তবে শুধু শুধু মেয়েটাকে অত বকাবকি—"

—"বকাবকি তো নয়। ওটাই নিয়ম। আর বলিস না শমিতা। পাগলের পাল্লায় পড়েছিলাম, সারাটা জীবন জ্বালিয়ে খেল। বুলটি ফোন করল তার শ্বশুরকে। শ্বশুর মানে বিশুবাবু ফোন করলেন তাঁর বেয়াইকে। অর্থাৎ ওকেই। —'নবু, তোর ম্যাটাডরটা একটু এয়ারপোর্টের জন্য আজ ধার দিবি? আমার ছেলে-বউ আসছে—সঙ্গে প্রচুর মালপত্র নিয়ে। আমার গাড়িতে ধরবে না।' উনি বললেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়, এ আবার একটা কথা হইল বিশু? নো প্রবলেম। কখন চাই?' আমি এইসব দেখেশুনে যখন রেগেমেগে বললুম, এত ঘোরপ্যাঁচের কী দরকার ছিল, ও কী বলল বল তো? বলল, এভরিথিং শুড কাম থ্রু দি প্রপার চ্যানেল! ভেবে দ্যাখ, একমাত্র সন্তানের সঙ্গে 'প্রপার চ্যানেল' করছে লোকটা। কী করব আমি? সত্যি সত্যি পাগল হয়ে

BanglaBook.org

যাব এবারে। তিরিশ বছর এই লোকটার ঘর করলুম বলে আমাকে একটা পরমবীরচক্র দেওয়া উচিত ছিল তোদের।"

৬

বেলা দেড়টা হবে, বাড়িতে ঢুকছি, ফোনটা বেজে উঠল।

—"শমিতা নাকি? কলেজ থিক্যা ফিরছেন? গুড। অনেকবার ট্রাই করসি।"

—"কি কাণ্ড। নবীনবাবু যে। নিজে ফোন করছেন, বউকে দিয়ে না করিয়ে? ব্যাপার কী?"

—"জয়া কি গেসে নাকি আপনার ওখানে?"

—"আমার এখানে। না তো। কেন?"

—"অরে পাওয়া যাইতাসে না। স্ত্রীলোকের এমুন চণ্ডালক্রোধ ভালো না।"

—"আর পুরুষমানুষের চণ্ডালক্রোধ বুঝি খুব ভালো? জয়া আর কোথায় যাবে, মায়ের কাছেই গেছে বোধহয়।"

—"যায় নাই। আই কলড দেয়ার। আপনারেই লাস্ট।"

—"তবে বউদি?"

—"নো। মামাবাড়ি না, কাকাবাবুর কাছে না, চিত্রা, পুতুল, রণিতা, মহুয়া, আই ট্রায়েড দেম অল্। আই অ্যাম এক্সট্রিমলি ওয়রিড।"

—"সব ঠিক হয়ে যাবে। পুলিশে খবর দিয়েছেন?"

—"ও নো। নো। নেভার। পুলিশ না। পুলিশের প্রশ্নই নাই। আর কোথায় কোথায় যাইতে পারে? এনি আইডিয়া?"

—"নিক্কোপার্কে দেখেছেন?"

—"মানে!"

—"জয়ার খুব নিক্কোপার্কে বেড়াতে যাবার শখ ছিল। হয়তো সেইখানে—"

—"নিক্কোপার্ক?"

—"আর সায়েন্স সিটিতে।"

—"কী যে কন! বাইরাইয়া গেল রাগ কইর‍্যা। রাগ হইলে কেও নিক্কোপার্কে বেড়াইতে চায়? সুটকেস প্যাকট্যাক কইরা লইয়া কি পার্কে যায়?...শি সেইড শি ওয়জ লীভিং. ফর গুড। ইটস সিরিয়াস।"

—"দুর্গাপুরে?"

—"যায় নাই। ফোন করসিলাম। বুলটিই আইতাসে।"

—"শান্তিনিকেতনে যায়নি তো? মঞ্জুর কাছে?"

—"মঞ্জু? তারে তো ফোন করি নাই?"

—"করে ফেলুন।"

আমিও বসে গেলুম ফোন নিয়ে। এই বস্তুটি যে সভ্যতার কতবড় অবদান।

BanglaBook.org

যেমন দূরকে নিকট করে, তেমনই ঘরকেও বাজার করে ফেলতে পারে। সেও ঠিক।

একটু বাদে বেল বাজলো দরজায়।

এবার নবীনবাবু সশরীরে উপস্থিত।

ঝোড়োকাকেদের নিশ্চয় এই নবীনবাবুর মতো দেখায়। উদ্ভ্রান্ত। সকরুণ। ছন্নছাড়া। শ্রীহীন। ধপ্ করে বসে পড়লেন সোফায়।

—"শান্তিনিকেতনের কানেক্শন তো মেলে না দেখি। চইল্যাই যাই?"

—"সে কি! যাবেন কি? বরং অন্য কাউকে পাঠানোর কথা ভাবা যেতে পারে। অফিসের কেউ?"

নবীনবাবু ভাবতে থাকেন।

—"কী হয়েছিল বলুন তো আপনাদের?"

—"অই যেমুন হয়। অই আমিই একটু ইরিটেটেড হইসিলাম আর কি। অ্যাজ ইউজুয়াল। সেইটা হইল গিয়া গত পরশুদিন। স্যাটারডে ছিল। তো আইজ রিটার্ন কইরা দ্যাখলাম জয়া বাসায় নাই। কাইল ত ফিরি নাই। জয়াও খোঁজ লয় নাই। শুনসি, আইজ সক্কালবেলায় উইঠ্যাই চইল্যা গেসে। ট্যাক্সি ধইরা উধাও। 'আর ফিরুম না' কইয়া গেসে।" দীর্ঘশ্বাসে কেঁপে উঠলেন নবীনবাবু। এমন বিধ্বস্ত, এত করুণ মূর্তি তো কখনওই হতো না জয়ার? অথচ নবীনবাবু তো মাসে মাসেই উধাও হয়েছেন। নবীনবাবুকে কিন্তু রীতিমতো অসুস্থ দেখাচ্ছে। চা দিলুম। পড়েই রইল।

—"কোথাও যায় নাই। সর্বত্র খবর করসি। চন্দননগরেও যায় নাই। দুর্গাপুরেও না। কী করি কন দেহি!" চা জুড়িয়ে গেল।

ভয়-ভয় করা শুরু হয়েছে, এমন সময়ে শেষ পর্যন্ত খবর আনলো মুকেশ ড্রাইভার। কৃষ্ণমূর্তি সাহেবের ড্রাইভার আজ সকালেই ব্যানার্জি মেমসাবকে দেখেছে। এয়ারপোর্টে। হাতে এয়ারব্যাগ ছিল। ট্যাক্সি থেকে নামলেন। ট্যাক্সিতে সঙ্গে কেউ ছিল না। মেমসাব একা। আঃ। প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল। অমনি বসে গেল আমাদের মন্ত্রণাপরিষদ।

—"কোন্ কোন্ প্লেন থাকে সকালের দিকে? দেখি, গ্রাফিটিটা দেন তো!"

—"এই তো। বলব? দিল্লি। মুম্বই। লখনউ। পটনা। পোর্টব্লেয়ার। শিলচর। তেজপুর। গুয়াহাটি। আইজল। ডিমাপুর—"

—"থাক থাক। অহন এতগুলি এয়ারপোর্টের মধ্যে কোথায় কোথায় অর জানাশুনা মানুষ আছে, ভাইব্যা দ্যাখেন।"

—"দিল্লিতে আছে সুনন্দা, কৃষ্ণা, অর্জুন। মুম্বইতে অর্চনা। লখনউতে তিমির। পটনায় সান্ত্বনাদি। পোর্টব্লেয়ারে গোপাল। গুয়াহাটিতে নবকান্তদা। শিলচরে মিষ্টু। তেজপুরে আলোদি। আইজলে আর ডিমাপুরে কাউকে ঠিক মনে করতে পারছি না এক্ষুনি। তবে—"

—"এনাদের মধ্যে কার কার কাছে ও যাইতে পারে?"

—"প্রত্যেকের কাছেই।"

—"যাঃ ববাবা! গ্যাসে গিয়া।"

—"সকলেরই ফোন নম্বর আছে। আপনি বসে বসে ধীরেসুস্থে ফোন করুন। ঠিক পেয়ে যাবেন কোথাও না কোথাও। ও তো হোটেলে উঠবে না আপনার মতন।"

নবীনবাবু স্বহস্তে ফোন করতে অভ্যস্ত নন। এসব ম্যানুয়াল লেবর তাঁকে অফিসে সেক্রেটারি, আর বাড়িতে পত্নীই সাপ্লাই দেন।

লং-ডিস্ট্যান্স ফোন নিয়ে বসেছেন। ধৈর্য থাকছে না। একবারে হলো না। দুবার। তিনবার! "ড্যাম্ ইট!" বলে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়েও ছুঁড়ছেন না রিসিভারটা। পূর্বে শিক্ষা হয়েছে এই সাবজেক্টে। আমার দিকে বার-বার অর্থপূর্ণভাবে তাকালেও আমি ডায়াল করে দিচ্ছি না। ওঁর বউ। উনিই করুন যা করবার। এবার দেখুন একজন পালিয়ে গেলে অন্যজনের কেমন লাগে। কিন্তু জয়া মেয়েটাই বা কেমন? তোর বরকে তুই শিক্ষা দিচ্ছিস দে, কিন্তু আমাদের খবরটা দিয়ে যাবি তো? মা-কেও শুধু শুধু দুর্ভাবনায় ফেলা। প্রথমে সিঙ্গল-পসিবিলিটির শহরগুলো ট্রাই করি।

বম্বেতে নেই।

পটনাতে নেই।

গুয়াহাটিতেও নেই।

দিল্লিতে তিন-চারজন বন্ধু। এক এক করে ধরব। কিন্তু ভীষণ লাকি—পাওয়া গেল প্রথম চেষ্টাতেই। কৃষ্ণার বাড়িতে গিয়ে বসে আছেন। কৃষ্ণার অবস্থা সঙ্গীন।

—"কোনও কথাই শুনছে না—কিছুতেই ফিরবে না আর কলকাতাতে। বলছে ঢের হয়েছে সংসারসুখ। এখন সে হরিদ্বারে যাবে। আশ্রমে থাকবে। হরিদ্বার যাবার জন্য গাড়ি ভাড়া করতে বলেছে। এখন সেই চেষ্টা চলছে।"

ছকটা এরকম হলো "হরিদ্বারের জন্য গাড়ি এসেছে" বলে জয়াকে তুলে সোজা এয়ারপোর্ট। তারপর—"এই যে তোমার টিকিট," বলে কলকাতার প্লেনে উঠিয়ে দেওয়া হবে। তুলে দিয়েই কৃষ্ণা আমাদের ফোনে জানাবে। আমরা ওকে এয়ারপোর্টে গিয়ে রিসিভ করে নেবো।

মুহূর্তের মধ্যে জাদুমন্ত্রে রূপান্তর ঘটল নবীনবাবুর। হাঁকডাক শুরু করে দিলেন —"মুকেশ তেল ভরো—বিকেলে দমদমে যেতে হবে। মেমসায়েব আসছেন।" ইতিমধ্যে দুর্গাপুর থেকে বুলটি এসে গেছে। জামাইয়েরও এসে পড়ার কথা। এ তো আর নবীনবাবুর উধাও হওয়া নয়, এটা একটা ফ্যামিলি-ক্রাইসিস।

আই. সি. টু সিক্স ফোরের জন্যে উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় দমদম আলো করে আছি আমরা। নবীনবাবু, বুলটি, জোজো, আমি, দাদা-বউদি, চিত্রা, পুতুল, রণিতা এবং কাকাবাবু। আমাদের হাতে গাঁদাফুলের মালা, দেবদারুপাতায় মোড়া সিজন ফ্লাওয়ারের তোড়া, আর কিছু তেমন পাওয়া গেল না পথে, কিন্তু বুলটি এনেছে দারুণ একটা গোলাপফুলের বাস্কেট। আর জামাই ব্যানার লিখে এনেছে—"ওয়েলকাম ব্যাক",

BanglaBook.org

কাকাবাবু আর জোজো সেটা ধরে আছেন। সেদিকে দৃষ্টিপাত না করেই লাজুক-লাজুক, চোর-চোর মুখে জয়া এগিয়ে এল। হাতে ক্যারি-অন সুটকেশ।

আমরা ঝাঁপিয়ে পড়লুম ফুল নিয়ে মালা নিয়ে—আমাদের পাত্তা না দিয়ে জয়া নবীনবাবুর দিকে এগোলো। এমন সময়ে বুলটি গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে, হাতে গোলাপ-ফুলের বাস্কেটটা তুলে দিয়ে বললো—"মা। উই আর সো প্রাউড অফ ইউ। ইউ হ্যাভ ডান দ্য রাইট থিং। এটা তোমার অনেক আগেই করা উচিত ছিল।" এবারে জয়া হেসে ফেলল আর সেই হাসি দেখে সবাই হেসে উঠলুম। মেঘ সরে গেল।

শুধু নবীনবাবু হাসেননি। জয়া পায়ে পায়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেল, তারপর বাংলা সিনেমার চিরন্তন নায়িকার নিয়মে নবীনবাবুর শার্টের উলটোপালটা লাগানো বোতামগুলো ঠিকঠাক লাগাতে শুরু করল। নবীনবাবু এক ঝটকায় জামাটামা ছাড়িয়ে নিয়ে গেটের দিকে হাঁটা শুরু করলেন। পিছু পিছু চলল ওয়েলকাম পার্টির শোভাযাত্রা। এবং জয়া।

গাড়িতে পৌঁছেই নবীনবাবু বললেন—"মুকেশ, আমি এয়ারপোর্ট হোটেলে নেমে যাবো।"

—"কেন বাবা? আমরা তো এখন হোটেলেই আছি," বুলটি বলে ওঠে,—"তুমি ওখানেই থাকবে। তুমি আর মা। গ্র্যাণ্ডে হনিমুন সুইট বুক করে রেখেছে যে তোমার জামাই। মায়ের রিটার্ন সেলিব্রেট করতে হবে না?"

আমরা হই হই করে উঠলুম। জয়া নবীনবাবুর কাছে ঘেঁষটে গিয়ে কনুইতে মৃদু ঠেলা মেরে বলল,—"এটাও অ্যাড করে দিতে হবে কিন্তু সেই কুকর্মের লিস্টিতে।"

দেশ, প্রেমের গল্প সংখ্যা, ২০০০

পরিণয়ে প্রগতি

লাফাতে লাফাতে মুনিয়া এল, "মা, ফোনটা ধরো, ছোট্টু মাসি!" হাতে কর্ডলেস। ছোট্টু মাসির ফোন মানেই সময় নষ্ট করা যাবে না, সেই বস্টন থেকে ফোন করছে তো? সুচরিতা গ্যাস নিবিয়ে ফেলে ফোনটা ধরে।

—"কি রে? কি খবর? পুজোর সময়ে আসবি বললি—পুজো তো—"

—"পুজোয় হবে না, কিন্তু আর্লি ডিসেম্বরে চলে আসছি। শোন সুচরিতা, তোকে যেজন্যে ফোন করছি, ৩১ ডিসেম্বর, ১ জানুয়ারি, ২রা, ৩রা চারদিন কোলকাতা থেকে কোথাও যাবি না, চারদিন দু'বেলাই ফ্রী রাখবি। বুঝলি? টোটোর বিয়ে।"

BanglaBook.org

—"তা-ই, বাঃ! নিশ্চয়ই ফ্রী রাখবো, এ আর বলতে? তা, মেয়ে—"

—"শোন্। তোকে সব প্ল্যানটা বলে দিচ্ছি। আজকাল তো পোষ মাসে বিয়েটিয়ে হচ্ছে, ৩১শে ডিসেম্বর টোটোর আইবুড়ো ভাত, ১লা জানুয়ারি ২০০২ বিয়ে। নববর্ষে সবসময়ে শুভদিন, তায় মিলেনিয়ামের দ্বিতীয় বর্ষ শুরু। এর চেয়ে শুভদিন আর কোথায় পাবো? আর মা বলতেন গোধূলিলগ্ন সবসময়ে শুভকাজের জন্য প্রশস্ত। তাই ১লা জানুয়ারি গোধূলিলগ্নে বিয়ে ঠিক করেছি। তোদের পাড়াতেই বাড়ি ভাড়া নিয়েছি, ওই যে রে নূরপুরের রাজবাড়িটা, যেটা ভাড়া দেয়? দারুণ সুন্দর। চারদিনের জন্যে নিয়েছি। ১লাই প্রধান নিমন্ত্রণটা হচ্ছে, বিয়ে তো সন্ধ্যা-সন্ধ্যা, মেয়ের বাড়ি, ছেলের বাড়ি, একসঙ্গেই বড় খাওয়া দাওয়াটা সেরে দেব ভেবেছি, হাফ্ অ্যাণ্ড হাফ্ খরচে। চারদিনের জন্যে বাড়িটা যে নিয়েছি, সেও ওই হাফ্ অ্যাণ্ড হাফ্ খরচ ধরা হবে। ২রা দুপুরে ওদের বাসি বিয়ের খাওয়া। ৩রা দুপুরে আত্মীয়স্বজনদের ডাকব আমরা। আর ৩রা রাতে একটা ককটেল ডিনার দেব ফর আওয়ার ফ্রেণ্ডস অ্যাণ্ড কোলীগস্। তোদের তিনজনের প্রত্যেকটাতেই নেমন্তন্ন। কেবল ককটেল ডিনারে,—আচ্ছা মুনিয়ার কি আঠারো হয়েছে?"

—"তা তো হলো—ওর তো কুড়ি চলছে।"

—"গ্র্যাণ্ড। তবে ওর ককটেলে নেমন্তন্ন আর আটকাচ্ছে না—তোরা প্রত্যেকটাতেই আসবি, বুঝলি? আর, যদি তখন তোর কর্তামশাই দুবাইতে বসে থাকেন, তাহলে তাঁকে খুন করে ফেলব।"

—"ঈশ্! কী আনন্দ হচ্ছে রে! এখনই। যদিও এটা মোটে অক্টোবর"...

—"দেখতে দেখতে এসে যাবে দিন। আমি সামে আগেই চলে যাব। বাজারহাট করতে হবে, গয়নাপত্তর গড়ানো, বৌয়ের জন্য ম্যাচিং ব্লাউস-ফ্লাউস বানাতে হবে, চটি-ফটি কিনতে হবে, কাজ কি একটা? গুণ্ডামীর কাপড় আছে—"

"ছোট্টু? মেয়েটা কী করে? বয়েস কত? কেমন দেখতে? আসল কথাগুলো কিছুই তো শুনলুম না এখনও।"

—"ওমা! ওটাই শুধু আসল কথা নাকি? আর এগুলো? এই যে ঘরবাড়ি ভাড়া করা। তাদের সঙ্গে রাস্তার মধ্যে রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে দর কষাকষি, হাজারটা প্রশ্নের জবাব দেওয়া—এতসব অ্যারেঞ্জমেণ্ট দাদা করেছে—তারপর কেটারিং আছে, ফ্লাওয়ার্স আছে, ডেকরেটর্স আছে, পুলিশ আছে, 'এ-এ' আছে, জলের ব্যবস্থা আছে, কাশী বিশ্বনাথকে—"

—"দূর এখন কেউ কাশী বিশ্বনাথকে বিয়েতে ডাকে না। বিসলেরি, স্প্রিং ওয়াটার, মিনারেল ওয়াটার, এসবের বড় বড় জার পাওয়া যায় এদেশেও। কেটারার্সই দেবে তোকে —ভাবিস না। এবার মেয়ের কথাটা বল। শুনি।"

—"টিনা? সে তো দাদার বিয়ে বলে দুহাত তুলে নাচছে। মাঝে মাঝেই আমার শাড়িগুলো নামিয়ে স্কার্টের ওপরে পরে দেখছে, বিয়েবাড়ির জন্য প্র্যাকটিস চলছে!"

—"বাঃ বাঃ বেশ। শাড়িটাড়ি পরছে তাহলে? টিনার কথা শুনে খুবই

BanglaBook.org

ভালো লাগল। কিন্তু ওর কথা বলছিলাম না রে, আমি তো পাত্রীর কথাই বলছিলুম"—

—"পাত্রীর কথা কী বলছিলি?"

—"কেমন পাত্রী ঠিক করলি? মেয়েটা কী করে? কোথায় পড়েছে? কেমন দেখতে? বাবা কী করে? এইসব খবরগুলো বলবি তো এবার?"

—"সেসব গিয়ে বলব। এখনও ওসব কিছু ঠিক হয়নি। আমাদের basic requirements জানিয়ে একটা মোটামুটি ঠিক করেছি আমরা কেমন পাত্রী চাই,—কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি সেইমতো। প্রচুর রেসপন্স পাচ্ছি। বৌদি আর ছোটমাসীই দেখছে ওইদিকটা। ছেলে চলে আসবে ক্রিসমাস ডে-তেই। হাতে তো সাতদিন থাকছে। ওর বাবা ওর আগেই চলে আসছেন। ডোন্ট ওয়ারি, মেয়ে-টেয়ে সব দেখেশুনে শর্ট লিস্ট বানিয়ে রাখব, ছেলে এসে কেবল ওই ক'জনকেই শুধু নিজে দেখবে। স্যো, ফোর অর ফাইভ। নট মোর। আমরাও অনেক মেয়ে দেখব না— ছোটমামী আর বৌদি মিলে পাত্রীদের ছবি আর বায়োডেটা দেখে দেখে ফার্স্ট লিস্টটা তৈরি করে ফেলবে আমাদের জন্য। আমরা সেইমতোই দেখব। দেখে, আমরা যাদের যাদের পছন্দ করব, তাদের আরও খবর নিয়ে প্রত্যেকের জন্য ছোট্ট করে Information কার্ড সাজিয়ে সাজিয়ে ফাইল তৈরি করে রাখব। টোটো এসে প্রথমে ফাইলগুলো পরীক্ষা করবে, তারপর যেসব মেয়েদের ওর ইন্টারেস্টিং মনে হবে, দেখবে।"

—"আর তাদের মা-বাবা অত অল্প সময়ে বিয়ের ব্যবস্থা—"

—"সেসব তোকে ভাবতে হবে না তো? তুই তো বরের বাড়ির? শোন, বৌদির দারুণ দর্জি আছে। ওভারনাইট সমস্ত ম্যাচিং ব্লাউস বানিয়ে দেবে বলেছে, কেবল একটা ফিটিং স্যাম্পল্ পেলেই হবে। নো প্রবলেম।" আর জুতো? সে আর কিনতে কতক্ষণ? সালোয়ার সুটের জন্য তো বুটিকগুলোই আছে। আমরা সাজগোজের কসমেটিক্স-এর জিনিসপত্তর সব নিয়েই যাব এখান থেকে। মেয়ের বাপের কাছ থেকে তো আমাদের কোনোই দাবি নেই? তবে, আর এতো প্রস্তুতির কি আছে? দু'চারটে গয়না? দে ক্যান অলওয়েজ বায় দ্যাট অফ্ দ্য শেলফ। তাই না?"

সুচরিতার মুখে ভাষা যোগাচ্ছিল না। ছোট্টুর এমন অপরূপ সুবন্দোবস্ত শুনে। ছোট্টুই বলল—"লুক। এভ্রিথিং উইল ওয়ার্ক আউট ফাইন। আমি চলে আসছি ফার্স্ট উইকেই। তুমি এখনই যাও, ডাইরিতে ডিসেম্বর ৩১শে, জানুয়ারি ১, ২, ৩ দাগ দিয়ে রাখো। টোটোর বিয়ে। মেনুও রেডি, পুরো চারদিনেরই। দারুণ মেনু তৈরি হয়েছে। সেই আমার বিয়ের প্রজাপতি কেটারার্স।"

২

ফোন রেখে দেবার পরেও মাথা ঘুরছিল সুচরিতার। মেয়ে ঠিক হয়নি, আর সবকিছুই স্থির। দিনক্ষণ, স্থান, কাল, পাত্র, নিমন্ত্রিত তালিকা, খাদ্যতালিকা—সবই প্রস্তুত। ছোট্টু

আরও বলল, ওদের ঠিকমতো হানিমুনের সময় হবে না বলে নবদম্পতি ফেরার পথে সিঙ্গাপুরেই দুটোদিন কাটিয়ে যাবে। পাঁচতারা হোটেলের হানিমুন সুইট ভাড়া করে ফেলেছেন ৫/৬ তারিখে ছোট্টুর স্বামী তাঁর আদরের ছেলে-বউয়ের জন্য। ওখান থেকে একটা লাক্সারি জাহাজ কুয়ালালামপুরে বেড়াতে যায়, প্রথমে ওদের সেখানেই পাঠাতে চেয়েছিলেন তিনদিনের ট্রিপে, কিন্তু হাতে তিনদিন নেই। তাই রওনা হয়ে যাবে—৮ই। ছেলেকে কিনা আবার কাজে জয়েন করতে হবে। বাকীরা সবাই সোজা ফিরে যাবে ৭ই। ছোট্টুর উত্তেজনার শেষ নেই। ছোট্টুর স্বামীও দু'সপ্তাহের ছুটিতে আসছেন, ছেলের মতোই। ছোট্টু যেহেতু সেলফ এমপ্লয়েড, সে ইচ্ছেমতন একমাস আগে এসে বসে থাকবে। মেয়ে দেখে বেড়াবে। টোটোর কয়েকটি বন্ধুবান্ধবীও ইণ্ডিয়া দেখতে এবং বিয়ে অ্যাটেণ্ড করতে আসছে। তারাও টিকিট কিনে ফেলেছে। তারা একটা কোম্পানির গেস্ট-হাউসে থাকবে, সেটাও বুকড। সব ব্যবস্থা কমপ্লিট, শুধু পাত্রীটা হলেই হলো।

ঐ কারণেই শুধু নিমন্ত্রণপত্রটা ছাপানো যাচ্ছে না। ছেলে যতক্ষণ না মেয়ে দেখা শেষ করছে, মেয়ের নাম জানা সম্ভব নয়। ছোট্টু একবার ভেবেছিল পাত্রীর নাম, পাত্রীর মা-বাবার নাম এসব জায়গা ছেড়ে রেখেই কার্ড ছেপে দেবে। পরে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাংকস করবে। কিন্তু টিনা, টোটো দুজনেই বলেছে ওটা হয় না। ওরা বলছে ওটা নাকি খুব পুয়োর টেস্ট হবে। কি আর কথা? ধরো লাস্ট মোমেন্টে কার্ড ছাপা হলো, বিলিও না হয় হলো কুরিয়ার সার্ভিস দিয়ে। কিন্তু মানুষজন তো ফ্রী থাকবে না! তাই আমেরিকা থেকে ফোন করে করে ছোট্টু তার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনকে জানিয়েই রাখছে। তারিখগুলি ফাঁকা রাখতে অনুরোধ করছে। ছোট্টুর আহ্লাদ উপছে পড়ছে দেখে সুচরিতা আর ওকে বিচলিত করতে চাইছিল না। কিন্তু এ যে গাছে-কাঁঠাল-গোঁফে-তেল! বিয়ে কি অমন এককথায় হয়? বৌ-ই ঠিক হলো না, মেনু ঠিক। হানিমুনের পর্যন্ত বিলিব্যবস্থা হয়ে গেল? আশ্চর্য। একেবারে পাগলী ছোট্টুটা সেই কলেজের মতনই রয়ে গেছে। তার ওপর আমেরিকা ওকে আরো পাগলা করে দিয়েছে।

৩

—"বাপ রে বাপ!" ছোট্টু এসে ধপাস করে বসে পড়ল সোফার ওপরে।

—"কি কাণ্ডটাই বাধিয়ে ফেললে তোমরা বৌদি? প্রত্যেকদিন মেয়ে দেখা? এত মেয়েও ছিল এই কলকাতা শহরে? সব্বাই কি তাদের মেয়েকে সাগরপারে পাঠিয়ে দিতে চায়? আমার মা-বাবার মতন? আমারই তো দেখেশুনে অবাক লাগছে। ওফ! টোটো এসে তো আরেক রাউণ্ড হবে।"

চা ডালমুট এগিয়ে দিয়ে গৌরী বলে ওঠে

"আ হা হা! অমন এককথায় বিয়ে হয়ে যাবে নাকি? তোরও যেমন কথা!

অ্যাডটা দেখেই এতগুলো মেয়ের ছবি আর বায়োডেটা এসে গেছে, সবগুলোই কি যোগ্য পাত্রী নাকি? তাও তো আমরা তোর আসার আগেই ছবি দেখে বায়ো পড়ে, প্রাইমারি সিলেকশন করে রেখেছি। কম্পিউটারে কী সুন্দর একটা চার্ট বানিয়ে ফেলেছে সুপ্রিয়। ফোটো আর বায়োডেটা মিলিয়ে মিলিয়ে। দেখলেই জিনিসটা পুরোপুরি মাথার মধ্যে চলে আসবে, তোর দাদা তো ছেলের গুণপণায় মুগ্ধ। বলে কি, 'দে তো, এটা অফিসে দেখাতে নিয়ে যাব! একটা আনপ্রিসিডেন্ট ব্যাপার।' সেই চার্টে সবকিছু information দেওয়া রয়েছে। যা যা দরকারী—যা যা চাই।"

—"যেমন?" সুচরিতা প্রশ্ন করে ফেলে। এবার দাদা নিজেই যোগ দেন—"যেমন, মেয়ের নাম/জন্ম তারিখ/বাসস্থান/বাবা কী করেন/মা কী করেন/কার কত ইনকাম/বাড়ি/গাড়ি/ওয়াশিং মেশিন/কম্প্যুটার/কালারটিভি/মোবাইল ফোন/মিউজিক সিস্টেম/এ.সি./অ্যাড্রেস কী/মেয়ের শিক্ষা/চাকরি/স্যালারি/হাইট/ওয়েট/কমপ্লেকশন/হবি কী/ট্রাভল/গান/নাচ/বাজনা/ল্যাঙ্গুয়েজেস/টেস্ট ইন মিউজিক/ফিল্ম/স্পোর্টস/থিয়েটার/অ্যাম্বিশন কী/আদর্শ নারী কে/আদর্শ পুরুষ কে/ফুলফিগার ফোটো/ফেসের ক্লোজ আপ/ভাইবোন/ফ্যামিলির সঙ্গে একটা ফোটো এইসব দিয়ে, এক একটা ফাইল বানিয়েছে এক একটা মেয়ের। নেহাৎ সুপ্রিয়টা এখনও ছাত্র, নইলে ওর জন্যেও পাত্রী বেছে ফেলা যেত এই থেকে। দারুণ একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট কিন্তু। আমি তো ঠিক করেছি মিতুলের জন্য পাত্র দেখার বেলায় —এইবার যেটা শুরু করা হবে,—এমনিই পাত্রের চার্ট বানিয়ে নেব। দেখার মতো ব্যাপার। কম্প্যুটারে ফেলে যা একখানা তৈরি করে দিয়েছে সুপ্রিয়।"

—"মিতুল কী বলছে?"

"কিছু জানে না, ও তো হস্টেলে। ঠিক বিয়ের মুখে মুখে চলে আসবে। ওদের পরীক্ষা চলছে এখন।"

"কিন্তু দাদা, এভাবে পাত্রী দেখাটা কি ঠিক?" বলতেই গৌরী ধমকে উঠল—

"—বাঃ ঠিক নয়?"

—"একে NRI পাত্র, তাতে বিনাপণের বিয়ে, এবং কোথাও কোনো গোঁজামিল নেই। এভাবে চার্ট করে সাবধানে না এগোলে টোটো এলে পাত্রীর বাপেরা ছেঁকে ধরবে যে? আমরা সামলাবো কি করে? তোমরা প্রথমে এক রাউণ্ড পাত্রী দেখে নিয়ে শর্ট লিস্টটা বানিয়ে ফ্যালো। আর প্রিলিমিনারি লিস্ট তো এইখানে আমরাই বানিয়ে রেখেছি। ছোট্টুর কাজ কত কমিয়ে রেখেছি? দেখো?"

গৌরীকে দেখে সুচরিতা তো অবাক। এই নাকি ছোট্টুর কনভেন্টে পড়া বৌদি, কলেজে যে স্টুডেন্টস ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হয়েছিল। চারিদিকে এত উইমেন্স লিব-এর ঢাকঢোল অথচ ছোট্টু, ছোট্টুর দাদাবৌদি, কেউই কি শোনেননি কিছুই। ওদেশেও না?

BanglaBook.org

ছোট্টু পাগলি বিশবছর বিদেশে। আগে আগে ৪/৫ বছর বাদে বাদে দেশে আসত, গত কয়েকবছর প্রতিবছরই আসছে। টোটোর বয়েস মোটে ২৫ বছর—ভালো চাকরিতে ঢুকে গেছে বলে এখুনি বিয়ে দিতে চায় ছোট্টু। দেশটা তো ভালো না। কিন্তু টোটো 'দেশের মেয়ে' বিয়ে করবে কেন? ওদেশে কি মেয়ে নেই? কত তো বাঙালি পরিবার থাকেন—তাঁদের ছেলে আছে যেমন, মেয়েও তো আছে। এই তো ২০০০ সালের বিশ্ববঙ্গ সম্মেলনে পাঁচহাজার বাঙালি পরিযায়ী পাখি উড়ে এসেছিল বিদেশ থেকে। বাংলার মাটির মায়া এখনও তাদের ডানা জড়িয়ে রয়েছে। কত ধরনের মায়া; মায়ার কি আর শেষ আছে? মা-বাবা আত্মীয়স্বজন শাকসব্জী মাছ মিষ্টি এসব তো আছেই, তদুপরি আছে এই এক ছেলেমেয়ের সম্বন্ধ দেখা। সেও সেই অসীম অচ্ছেদ্য মায়াজালের এক কঠিন বন্ধন। ওদেশের ছেলেরা ওদেশের মতন। ওদেশের মেয়েরা ওদেশের মতন। ওরা বাঙালি হলে কী হবে, ছোট থেকে ডেট করেছে। নেকিং পেটিং ডেটিং জীবনের অঙ্গ। অমন মেয়েকে বৌ করে ঘরে আনব? অমন ছেলের হাতে মেয়ে দেব? কতরকম ভাবনা, কতরকমের উদ্বেগ। যত দেখি তত ভাবি, আমি অনাবাসী বাঙালি। আমি কী চাই? গাছেরও খাবো, তলারও কুড়োবো। এই কি চাই আমরা? তাই বিদেশে সন্তান প্রসব করে, দেশে এসে সেই সন্তানের জুটি খুঁজি। কিন্তু ওদেশেই তো মিলতো আসল জুটি। বাল্য-কৈশোর যাদের একইরকম। দ্বিজাতির সমস্যা যাদের দুজনেরই আছে। কিন্তু ছেলে চাইবে মায়ের মতো বৌ। সে কিন্তু নিজে বাবার মতন ছেলে হয়নি। বাবা তো কলকাতার ছেলে। কলোরাডোর নন। বস্টনের নন। এই দুদিনের জন্যে সুচরিতাকেও ছোট্টু চেপে ধরেছে, তার সঙ্গী হতে। চার্টে একটি মেয়ে আছে, যার জন্ম, বসবাস ইংলণ্ডে। দেখা যাক, এদের সাংস্কৃতিক পটভূমি কতখানিকটা মিলতে পারে। ভাগ্যগুণে তাঁরাও কলকাতায় এসেছেন সপরিবারে এখনই। ছোট্টুর দাদা তাদের ক্লাবে ডাকলেন ড্রিংকসে, বেলা এগারোটা নাগাদ। চার্ট দেখে মনে হল বাংলা সংস্কৃতির প্রতি মেয়েটির যথেষ্ট টান আছে, জন্মকর্ম যদিও ইংলণ্ডে। বিখ্যাত ওষুধের দোকানে চাকরি করছে।

৪

—"টিংকি? তুমি কী খাবা? কও দিনি? কুক? না জুস? জুস খাবা? না কুক খাবা? তোমার জুস খাওনই ভাল। তার জইন্য একখান ফ্রেশ মেঙ্গো জুস? নাকি ফ্রেশ অরেঞ্জ? আর অঞ্জলি? তুমি নিবা কী? তোমার তো রাম এনড কুক। আর আমি একটা আর এস। বাস। হইয়া গেল। সিম্পুল। আমি সর্বদাই আর এস। আর আমার মিসেস সর্বদাই রাম-এনড কুক। ক্যাবল টিংকিটারই ফিক্সড কিস্যু নাই। কখনও জুস, কখনও ফিজি জিংক। তাও জুসেরও ঠিক নাই, ড্রিংকেরও না। কুক, না বিটার লেমুন, না ফ্যান্টা তারও ঠিক নাই। আপনে কী নিলেন? বিয়ার? এই দুপুরে নাকি বিয়ার। ঘুমাইয়া পরবেন না তো? দ্যাখবেন হাঃ হাঃ হাঃ বিয়ারের সতে হুইডা

কি খান? লিমকা? স্যাণ্ডি? খান, স্যাণ্ডি খান। আর আপনে? এপেল্ জুস? ধু-র ওইসব আমাগো চলে না? টিংকির তো ড্যান্সার বইলা দারুণ নামযশ হইসে, ম্যাঞ্চেস্টারে দারুণ ফেমাস টিংকি—ব্যালেডান্স করে ও। ওইখানে ইনডিয়ান ব্যালে কইরা এট্টা ট্রুপ আছে না? হেই ওগোরই সতে, আছে টিংকি। আপনের পুত্রটি শোনলাম এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করসে? বাস। আর ভাবনা নাই। উয়ারে আর চাকুরি কইরা খাইতে হইব না। এই শুইন্যা রাখেন। আমার যা যা আছে তা ওরা দুইজনায় ত' খাইয়া ফুরাইতে পারবো না, ফ্যালাইয়া ছড়াইয়াও ফুরাইব না। আমি অগো লণ্ডনে এট্টা বাড়ি দিয়ে দিমু যৌতুক। আর ম্যাঞ্চেস্টারে এট্টা, আর কইলকাতাতে কয়খানা বাড়ি চাই? হাউ মেনি? ইংলণ্ডে আমাগো সাতখানা বাড়ি, বোঝলেন? সেভেন হাউসেস, তার দুইটা তো বিশাল ম্যানসন। আর কইলকাতায় আটাশখান বাড়ি আছে আমার। টুয়েন্টি এইট হাউসেস। বাংলাদ্যাশেই শুধু আইজ আমার কিসুই নাই। নাথিং লেফট। কি? কইয়াই দ্যান, কুন পাড়াতে বাড়ি নিবেন? শুধু ছেলেরে ক্যান? বেহান, এই শোনেন আপনাগো লগেও... আমি একটা বাড়ি দিয়া দিমুখনে। আমার হকলই তো টিংকির, অনলি চাইলড, এব্রিথিং টিংকির—তাই আরও একখান—ঐ গিফট আরকি, বেহাইনের নামে, আপনাগো ভবিষ্যতেরও ভাবনা নাই—কোন অঞ্চলে চাই কইয়া দ্যান, নর্থ? সাউথ? না সল্টলেইক?"

ভদ্রলোক কথা বলছেন, সুচরিতা আর ছোট্টু হাঁ করে ওঁদের দেখছে। গৌরী সঙ্গে আসেনি। দাদা চুপচাপ বিয়ার খাচ্ছেন। মেয়েকে অবিকল তার মায়ের মতন দেখতে। কেন জানি না হঠাৎ পাঁচ নম্বর ফুটবলের কথা মনে পড়ল। স্বাস্থ্যবতী কন্যা বটে। গৌরবর্ণাও। ফর্সা ফটফটে। মুখ চোখের বালাই নেই, সবই মেদের তলায় লুকিয়ে আছে। এই মেয়ে ব্যালে নাচে? পায়ের আঙুল থেকে চুল পর্যন্ত সোনায় মোড়া, পায়ে সোনার আঙট, সোনার নূপুর, হাতের মুঠিদুটি নাচের মুদ্রায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মেয়েটি কেবলই তার অরেঞ্জ জুসের গেলাসটা দুহাতে মুখে তুলছে আর নামাচ্ছে। হাতের পিঠে রতনচুড় ঝলমল করছে। গরমে সোনালী জরিদার ঘোর বেগুনি সিল্ক বালুচরী, পার্ম করে কোঁচকানো শ্যাম্পুতে ফোলানো চুল কানের দু'পাশে দুখানি ভারি সোনার চিরুনী দিয়ে আটকানো। দুহাতে ভর্তি মোটা মোটা সোনার চুড়ি প্রায় কনুই পর্যন্ত। গলায় তিন থাক সোনার হার। মায়ের সাজও অবিকল এক। শুধু রতনচুড় নেই। আর চওড়া সিঁথেয় সিঁদুর লেপাটা এক্সট্রা। এর বালুচরিটা শকিং পিংক গোলাপী। তাতে নীল রুপোলী মিলের কাজ। মায়ের গলায় মেদেরও তিনটি সুদৃশ্য লহরী। এই শীতকালেও তিনি ঘামছেন, হাতে মাদুরের পাখা। মেয়েটি বয়েস হলে কেমন হবে, মা নিজেই তার আগাম পরোয়ানা।

সুচরিতা উঠি উঠি করছে, ছোট্টুরও ভাবখানা তাই। টের পেয়েই দাদা উঠে দাঁড়ালেন—বললেন,

—"আমাদের একটু উঠতে হচ্ছে, একটা কাজ আছে।"

ভদ্রলোক হাসি মুখে উদার সুরে বললেন, "বেশ তো, বেশ তো, তাইলে আমরা আরও একটু বসি?"

—"নিশ্চয়, নিশ্চয়, বসুন না। আরেক রাউণ্ড করে ড্রিংকস বলে যাই?"

—"অর্ডার দিয়া যাইবেন? তা দ্যান—আর এস দুইটা, একটা রাম এনড কুক আর টিংকির লাইগ্যা একটা ফ্রেশ অরেঞ্জ। আর দুই প্লেট চিকেন টিক্কা। আমাগো আইজ লাঞ্চে যাইতে অহনও দেরি আছে কিনা? এইখানেই সময়টুকু কাটাইয়া যাই। থ্যাংক ইয়ু ফর ইওর হসপিটালিটি।" হাতের গ্লাস খালি করে নামিয়ে রেখে অভয়মুদ্রায় হাত তুলে ভদ্রলোক ছোট্টুকে বললেন—"ছেলের জইন্য আপনের কুন্ ভাবনাই নাই—এইটা কইয়া দিলাম। ফিউচার ফিক্সড। অঞ্জলি, টিংকি, উনাদের বাই বাই কইর‍্যা দ্যাও, উনারা যাইতে আছেন!"

৫

নেক্সট পাত্রী বিকেলবেলা। এই দুটোদিনই সুচরিতাকে 'বুক' করে ফেলেছে ছোট্টু, উইক এণ্ড, কলেজ ছুটি। ওর সঙ্গে মেয়ে দেখতে যেতে হবে। এমন অশ্লীল কর্মে সহযোগিতা করতে সুচরিতা রাজী হচ্ছিল না প্রথমে। তারপরে, সমাজতত্ত্বের অধ্যাপকের কানে কানে একটা কৌতূহলী স্বর বলল, "যাও না, ব্যাপারটা দেখেই এসো।" প্রথম অভিজ্ঞতা স্যাটারডে ক্লাবের দুঃস্বপ্ন। দেখা যাক এটি কেমন হয়। চার্ট বলছে, মেয়ের বাবার মৃত্যুর পর মেয়েই ব্যবসা দেখছে। সংসারে শুধু মেয়ে আর মা। কনভেন্টে-পড়া মেয়ে। "মেয়েটি নিজেই অ্যাড-এর উত্তর দিয়েছে। বয়েস অনুপাতে রীতিমতো মেচিওর, বেশ রেসপনসিবল বলে মনে হয়"—ছোট্টুর দাদার খুব উৎসাহ। ছোট্টুরও। বাড়িতেই দেখতে যাওয়া হচ্ছে। ওঁরা তাই বলেছেন।

সুচরিতারা ঘরে ঢুকছে, অভ্যর্থনা করতে মেয়েটি নিজেই এগিয়ে এলো। একমুখ হাসি দেখেই মনটা ভরে গেল। ঠিক আছে। দিব্যি সহজ আচরণ। সুশ্রী মুখ, চমৎকার ফিগার। একগুচ্ছ অবাধ্য চুল কেবলই চোখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, এই যা। কিছুতেই ভালো করে দুটো চোখ একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে না। মেয়ে অবশ্য মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে অলকচূর্ণটিকে অনবরত যথাস্থানে ফেরৎ পাঠাচ্ছে। বেশ লম্বা। পিঠে এলো চুল খোলা, আজকাল টিভিতে শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপনে যেমন চুল দেখায়, ঠিক তেমনি সুন্দর। পরনে পার্কস্ট্রীটের ফ্যাশনেবল বুটিক-এর দামী ডিজাইনার সালোয়ার স্যুট। মেরুন সিল্কে জরির বুটির কাজ। শিফনের ওড়না গলায় জড়ানো। আমাদের যত্ন করে সোফাতে বসিয়েই মেয়ে হাঁক পাড়লো "মা! মা! ওরা এসে গেছে।" জবরদস্ত গলার স্বরটি মোলায়েম চেহারার সঙ্গে বুঝি একটু বেমানান। কানে দুটি হীরে। নাকেও একটি। মা এলেন।

মিনমিনে চেহারা। সোনালি ফ্রেমের চশমা। সোফার এক কোণে সরু হয়ে বসলেন। গুটিসুটি। গরদ। মেয়ে বসলো পায়ের ওপর পা তুলে। সোনালি রঙের স্টিলেটো হীলের জুতোসুদ্ধু বাঁ-পাটি সিধে ছোট্টুর নাকের ডগার দিকে, বন্দুকের

নলের মতন তাক করে। ছোট্টু স্তব্ধ। সুচরিতাও। গলা খাঁকারি দিয়ে দাদাই কথা শুরু করলেন।

—"তুমিই তোমার বাবার বিজনেস দেখছো শুনলাম।" মেয়ে দাদার মুখের কথা কেড়ে নেয়—

—"আর বলবেন না! বিজনেসের যা অবস্থা। বাবা যে কী করে রেখে গেছে! সব লণ্ডভণ্ড হয়ে রয়েছে। ভয়ানক পরিশ্রম যাচ্ছে টু পুট এভ্রিথিং ইন অর্ডার। তার ওপরে জানেনই তো ওয়েস্টবেঙ্গলের লেবার প্রবলেম—আ টোটালি স্পয়েল্ট লট, ওয়ার্ক এথিকস্ বলে কিস্যু নেই—কী করে যে বাবা কাজ চালাতো এদের দিয়ে...। দে শুড বি হুইপড এভ্রি ডে, প্রত্যেকদিন ওদের স্রেফ চাবকানো উচিত, তাহলে যদি দু' ফোঁটা কাজ পাওয়া যায়। ডিসিপ্লিনের ধার ধারে না কেউ, কারখানা চালানো ইজ বিকামিং ইমপসিবল..." —এই সময়ে হঠাৎ দাদা প্রবল সমব্যথীর সুরে বলে ওঠেন—"কোয়াইট! আমি তো নিজেও দুটো কোম্পানি দেখি? আপনার কাছে কত লোক কাজ করে? ইউনিয়নটা কাদের?"

—দাদা দেখি অতটুকু মেয়েটাকে "আপনি" বললেন। আশ্চর্য! কী মেয়ে, কী তার মা, কেউই তাতে আপত্তি করলেন না।

—"ইউনিয়ন নেই। থাকলে বরং ভালোই হতো। কিন্তু ছ'জন এমপ্লয়িতে ইউনিয়ন হয় না। ইউনিয়ন থাকলে একটা পলিসি থাকত, কথা বলার একটা জায়গা থাকত। এখন ছ'জনের ছ'রকমের মতি-গতি। হাউ টু ডিল উইথ সিক্স ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচেস? বুঝি না বাবা ম্যানেজ করতো কেমন করে—", বলতে বলতে মেয়ের স্বর পাল্টে যায়। সে হঠাৎ গর্জে ওঠে—"বেয়ারা! বেয়ারা?" অমনি ঘরের দুদিকের দু'খানা দরজা দিয়ে দু'জন বেয়ারা দৌড়ে এলো, উর্দি-টুর্দি পরা।

—"রিফ্রেশমেন্টস্ লাও। চা, না কফি?" দাদা কফি চাইলেন। ছোট্টু চা বলে ফেলে আবার ফেরৎ নিয়ে নিল, কফিই হোক। একরকমই হোক। সুচরিতা শুধু এক গ্লাস জল।

—"মা, ভেতরে যাও, খাবারটা গুছিয়ে পাঠিয়ে দাও।" মেয়ের আদেশ পালন করতে মা বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে চলে গেলেন। এতক্ষণে মায়ের সঙ্গে আমাদের কোনো কথাই হতে পারেনি। এবারে মেয়ে বলল—

—"জানেন, আমি সব ঠিক ঠিক হওয়া পছন্দ করি। আমার জেঠু আর্মিতে ছিলেন (নো মোর), তাঁর কাছ থেকে আমি এটা পেয়েছি। যেটা যেমন, সেটা তেমনই হওয়া চাই। ফর এগজামপল—মাছ খাবে অথচ মাছের কাঁটাচামচ নেই, এ আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না, আই লাইক প্রপার ডিশেস, প্রপার কাটলারি, প্রপার টেবল ম্যানার্স" —বলতে বলতেই ছোট্টুর নাকের ডগা থেকে পা-টা এবার নামিয়ে নিল মেয়েটা। কেননা তখন রুপোর ট্রেতে করে পেস্ট্রি ও কফি এসে গেছে ঘরে। সেদিকে মন দিতে হবে তাকে।

সুচরিতা ট্রের দিকে তাকিয়ে দেখে, পেস্ট্রির সঙ্গে যে কাঁটা এসেছে, তা পেস্ট্রি

ফর্কস নয়, এমনি বড় কাঁটাই। প্রথমেই তার জলের গেলাশ। তারপর কাপে কাপে সব কফি। কাপ ঢালা। দুধ-চিনি দেওয়া। যেমন আমাদের সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়িতে হয়। কফি পটের ব্যবস্থা নেই। মা এসে কফির কাপ হতে করে এগিয়ে দিচ্ছেন। এক ঝাঁকুনিতে চোখ থেকে চুল সরিয়ে পাত্রী বলল—

—"আমারটা আলাদা। আমি তো ব্ল্যাক-ই খাই। নো মিল্ক, নো সুগার। কী করে যে লোকে সারাদিন ধরে চা-কফিতে এত দুধ-চিনি খায় এখানে!" এবার ছোট্টু বললে, —"আমিও ব্ল্যাক খাই।" মেয়ে একটু চমকালো। সঙ্গে সঙ্গে গর্জন—"বেয়ারা! ঔর এক ব্ল্যাক লাও।" এবার দাদা বলেন,—"আমি চিনি খাই না। এতে কি চিনি আছে?" মেয়ে পুনর্বার গর্জে ওঠে—"বেয়ারা! ইয়ে সব অলগ্ লাও।" তারপর মায়ের দিকে যে দৃষ্টি নিক্ষেপ হলো, তাতে মা তাড়াতাড়ি উঠে ভেতরে চলে গেলেন কফির সঙ্গে সঙ্গে। মেয়ে কফিতে চুমুক দিয়ে (যেহেতু তার একারই কফি আছে, অন্য দুটো ফেরৎ গেছে) কথা শুরু করে—

—"আমি কিন্তু আপনাদের ছেলের সঙ্গে বিদেশ যেতে পারছি না, হি উইল হ্যাভ টু স্টে ব্যাক উইথ মি। উই নিড আ ম্যান হিয়ার টু টেক কেয়ার অফ মাই ফ্যাক্টরি —ইলেক্ট্রনিক এনজিনিয়ার দেখেই আমি কনট্যাক্ট করেছি—উই নিড হিম হিয়ার। অফ কোর্স ফিফটি-ফিফটি শেয়ার থাকবে, উই'ল মেক হিম আ পার্টনার, ইন অল ফেয়ারনেস"—

৬

সুচরিতা বলল,—"ছোট্টু, এই সার্কাস দেখা ছেড়ে দে এবার! প্লিজ!"

ছোট্টু বলল—"বৌদি! এ তোমাদের কীরকম চার্ট? কীরকম প্রিলিমিনারি লিস্ট? সবাইকে দেখতে হলে তো! ...মাথা যে এখনই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। একটু কাট-ছাঁট করো। আমি মেজকাকীকে দেখে আসি ক'দিন, দিল্লিতে—কাকা চলে যাবার পরে তো দেখা হয়নি। মাথাটাও ঠাণ্ডা করে আসি।"

—"ফাইন! অমনি দিল্লির দুটোও দেখে আসিস।" গৌরী মহোৎসাহে বলে।

—"দিল্লির দুটো মানে?"

—"আছে দু'জন পাত্রী। একজন নয়ডায়, আরেকজন চিত্তরঞ্জন পার্কে। দুটোই বেশ ভালো। নয়ডা নাচে ডিগ্রি করেছে। সি আর পার্ক বি এস-সি পড়ছে। ওদের ফাইল রেডি আছে—ঠিকুজী সমেত। সুপ্রিয় দিয়ে দেবে।"

চিত্তরঞ্জন পার্কেই ছোট্টু আগে গেল, কেননা মেজকাকীও ওখানেই থাকেন। নয়ডা অন্যদিকে। তাছাড়া সে মেয়ে এখন তার ট্রুপের সঙ্গে নাচতে গিয়েছে ইয়োরোপে। এমনই কপাল। চিত্তরঞ্জন পার্কের মেয়ের বাবাও বেরিয়ে গেছেন ট্যুরে। দিল্লিতে আছেন পাত্রীর মা। তিনি ফোনে খুব যত্ন করেই আমন্ত্রণ জানালেন। মেজকাকীই নিয়ে গেলেন।

BanglaBook.org

—কাছেই বাড়ি। সুন্দর ঘর-দোর, মেয়ের মায়ের চেহারাটিও লক্ষ্মীমন্ত, গিন্নিবান্নি। ঘরোয়া করে আঁচলে চাবি বেঁধে চওড়া কালাপাড় তাঁতের শাড়ি পরনে, সাদা খোলে সরু সরু হলুদ কালো খড়কের ডুরে, মুখে পান, জর্দার সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে কথার সঙ্গে। হাতে ছোট রুপোর ডিবে, তাতেই বোধহয় পানজর্দা আছে। এমন শ্রীময়ী মূর্তি আজকাল সহজে চোখে পড়ে না। ছোট্টুর খুব ভালো লাগল। মেজকাকীর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে তিনি মুগ্ধ। বসতেই গরম চা এলো। কড়াইশুটির কচুরি, রসগোল্লা। "ঠিক যেন কলকাতাতেই বসে আছি।" ছোট্টুও এই প্রবাসী বাঙালির মনটা খুব বুঝতে পারে। নিজেও তো তাই। মা এবারে মেয়ের কথা বলতে শুরু করে। "খুকির পড়াশুনো কলকাতাতেই, পেরথমে পড়েছে লরেটো ইশকুলে। তারপরে পিসিডিন্‌সি কলেজে। ফাসকেলাস পেয়ে পাশ করলে। শুদুমুদু বসে থেকে কী করবে, তাই ওর বাবা ওকে এম এ পড়তে দিল্লিতে পাঠিয়ে দিলে। এখেনে কী একটা ইস্কুল আচে না, ইকনমিক্স পড়বার? সেই ইস্কুলে এম এ পড়েচে। খুকি তো সেখেনেও ফাসকেলাস। পাশ করে বসে থেকে কী করবে, ওর বাবা বললে তুমি এম ফিল পড়ো। ওই যে জহরলাল নেহেরুর বাড়ি থেকে ওঁর নামে যে কলেজ করে দিয়েছে দিল্লিতে, খুকি সেইখেনে এম ফিল পড়লে। পড়ে একখানা বই নিকে ফেলল। সেই বই আবার ছাবাও হয়েচে। তাপ্পর ওর মাস্টারেরাই বললে ডক্টরেট কত্তে। ওকে এস্কলারশিপ দিলে। এখন তাই ডক্টরেট কচ্চে। কলেজেও পড়াচ্চে। ডক্টরেটেরও বই নিকচে, সেও প্রায় শেষ হয়ে এয়েচে, শুনিচি তো এবারে জমা দেবার সময় হয়ে গেচে। খুকির তো ওই দোষ। কেবল বই মুয়ে করেই পড়ে আচে—দিনরাত্তির শুদু নেকাপড়া। শুদু নেকাপড়া। ধ্যানজ্ঞান সব ওই বই। তাই বলে রান্নাবান্না জানে না তা নয় কিন্তু। আমার চার মেয়েই রান্নায় দ্রৌপদী। এই যে কচুরিটা খাচ্চেন, এ কিন্তু আমি করিনি। আজ রোববার, আজ খুকি নিজেই করেচে। রোববার শক করে ওটা রাঁদে। গানও শিকচে। সুধীর ছেলের কাচে। ভালোই গায়। রবিঠাকুরের গান, রজনীকান্তর গান—"

ফাইলের কথা স্মরণ করে বিচলিত স্বরে ছোট্টু বলে ওঠে, "আপনার মেয়ের ডেট অব বার্থটা কত, বলবেন?"

—"কেন, ওর ঠিকুজী তো পাঠিয়ে দিইচি। নাইন্টিন-সিক্সটি সেভেনে জন্ম—হ্যাঁ, বিয়ের বয়েসটা একটু বেশিই হয়ে গেচে, পড়াশুনো কত্তে কত্তে—"

ছোট্টু বাধা দেয়—"না না বয়েসটা কিছুই নয়, কিন্তু আমার ছেলের জন্ম সেভেন্টি সিক্সে। অনেকখানি তফাৎ হয়ে যায় তো? ছেলে ন' বছরের ছোট—"

সব্বাইকে চমকে দিয়ে খিলখিলিয়ে হেসে উঠলেন মেয়ের মা। —"ওঃ হো! বুজিচি, বুজিচি। আপনারা এয়েচেন টুকটুকির জন্যে। ওর এখন উনিশ চলছে, বি এসসি পড়চে জয়পুরের রাণীর কলেজে। খুকি, বুবু, মুনু, আর টুকি—আমরা তো চার মেয়ের চারখানা পঞ্জিকা তৈরি করে চাদ্দিকে পাঠিয়ে দিইচি। যার যখন সম্বন্দো আসবে, দিয়ে দেবো। খুকি আমাদের বড় মেয়ে, ওর বিয়েতে মন নেই। ওর জন্য

বয়স্ক পাত্র চাই। আর টুকটুকিটা একদম কোলের, এইট্টি টু-তে জন্ম। আপনাদের কাচে ওরই পত্রিকাপত্তর পাটিইচি। ছিছি, আমারই ভুল হয়ে গেচে। খুকিরও একটা সম্বন্দো এয়েচে কিনা, ছেলেটির বয়েস হয়েচে, অ্যামেরিকাতে পড়ায়। আমি ভেবিচি সেই তারা বুজি। আজ কিনা তাদেরও আসবার কতা আচে?"

ছোট্টুর বুক থেকে পাষাণ নামল। মহিলা বললেন, "কিচ্ছু ভাববেন না দিদি। জয়পুর তো এই পাশেই। কালই আমি ঠাকুরপোকে পাঠিয়ে টুকিকে আনিয়ে দোব, আপনাদের দেকিয়ে দোব। মুনুও মন্দ নয় কিন্তু! যদি চান ওকেও দেখে যেতে পারেন, মুনু আজ বাড়িতেই আচে, ও এইট্টিতে জন্মেচে। ডাকবো মুনুকে? মুনুও গান গায় ভালো, আর হোটেলের ম্যানেজারদের কী একটা কলেজ আচে না, সেখানে পড়চে। ওর অবিশ্যি আর এক জায়গায় কতা চলচে—প্রায় পাকাপাকি হয়ে গিয়েচে--তাই ওর কাগজপত্তর আপনাদের আর পাটাইনি—তবু, দেকতে তো ক্ষেতি নেইকো--বিয়ে মানেই হাজার কতা —আপনার ছেলের সঙ্গে দিব্যি বয়েসে মানিয়ে যাবে--মুনু? অ মুনু—"

ছোট্টু বাড়ি এসে এক গ্লাস জল খেলো ঢকঢক করে। মেজকাকী বললেন, "তোর কাকা মোটে একবারই মেয়ে দেখেছিলেন। আমি কিন্তু ডানাকাটা পরী ছিলুম না। তবুও আর দ্যাখেননি। জীবনের এ ব্যাপারটা আসলে লটারী। লাক।" ছোট্টু মাথা নাড়লো।

—"ঠিক, মেজকাকী। আমি মত বদল করেছি।" একটু নড়েচড়ে বসলো ছোট্টু। —"আর মেয়ে দেখবো না। এবার লটারী লিস্টের সব নাম এক একটা করে কাগজের স্লিপে লিখে, একটা কলসীতে ভরে দেবো। টোটো এলে বলবো, 'হাত পুরে দিয়ে একটা কাগজ বের করে নেও' যে মেয়েটির নাম উঠবে, সেই সম্বন্ধই পাকা। সাতদিনে বিয়ে। আফটার অল, সত্যি তো এটা ফাইনালি আমাদের হাতে থাকে না। থাকে কি? কতদূর আর অ্যারেঞ্জ করা যায়?"

মেজকাকী হাসলেন। ওপর দিকে চেয়ে বললেন—"সব অ্যারেঞ্জমেন্ট ওইখানেই হয়ে রয়েছে।"

৭

বিয়েবাড়ি ক্রমে ক্রমে জমে উঠেছে, একমাত্র পাত্রীটুকু বাদে সবই ঠিকঠাক, কাল টোটোর আসার কথা। টোটোর বাবা আজই রাত্রে পৌঁছোচ্ছেন। মিতুলও এসে পড়েছে। মিতুল হস্টেল থেকে এসেই নিদারুণ গণ্ডগোল বাধিয়ে দিল। পরিবারশুদ্ধু যে যতই নাচানাচি করুক ছোট্টুর সায়েন্টিফিক প্ল্যানিং আর সুপ্রিয়র চার্ট নিয়ে, মিতুল একেবারে উলটো গাইতে শুরু করে দিল। সে খেপেই একশা। —"পিসিমণির না হয় ভিমরতি ধরতে পারে যেহেতু বেচারী বহুদিন এগজাইলে আছেন। আর আমেরিকা তো একটা

ফেক, আনরিয়্যাল দেশ, স্বপ্ন তৈরিরই জায়গা। —কিন্তু দাদাভাই, তুই কি বলে এতে যোগ দিলি?"

মা-বাবাকেও বলতে ছাড়ছে না।

—"ছি, ছি, কী করে তোমরা এমন মেয়ে-দেখাদেখি করে বেড়াচ্ছো বলো তো?"

গৌরীও ছাড়বার পাত্রী নয়।

—"কেন? পণ তো নিচ্ছি না। এত ছি-ছির কি হয়েছে? পণ নেওয়া বারণ, কিন্তু মেয়ে-দেখা তো বেআইনি নয়?"

—"আইনের কথা হচ্ছে না মা, সৌজন্যের কথা হচ্ছে। সভ্যতার কথা হচ্ছে। দিস ইজ আনসিভিলাইজড।"

—"উলটো। এটাই সিভিলিজেশনের দান। বুনোরা ইনস্টিংকটে চলে। প্ল্যানমাফিক নয়।" ছোট্টু মধ্যস্থতার চেষ্টা করে।

—"আমরা তো দূরে থাকি? সাতসমুদ্দুরের পারে।"

—"তোর মা-বাবা আমাকেই হেলপ করছে।"

গৌরী থেমে থাকবে?

—"তুই যা, গিয়ে পাত্রীদের বাড়িতে বাড়িতে বলে আয়। তারা কেন মেয়ে দেখাচ্ছে? তাদেরই উচিত নয় মেয়ে-দেখানো।"

—"মা, এটা তর্কের বিষয় নয়। আমি নিজেকে ওই জায়গায় বসিয়ে ভাবি—অচেনা লোকজনেরা আমাকে দেখতে আসছে, দে আর জাজিং মি, মনে মনে মেপে-জুকে দেখছে, ইশ্‌শ্‌। আই কান্ট ইভন থিংক অফ ইট—তোমরা আমার বেলায় যেটা পারবে না, অন্যের মেয়ের বেলাতে—"

—"তোমার বেলায় পারবো না, কে বললে?"

—"সে কথা পরে ভাবা হবে—"

আবার ছোট্টু মা-মেয়ের মধ্যে ঢোকে।

—"তোর বেলায় হাতে অনেক সময় থাকে যাতে, সেইটে দেখা হবে—এভাবে তাড়াহুড়োয়—"

দাদাও যোগ দেন—

—"তোমার বেলায় এরকম হবে না, ইট উইল বি দি আদার ওয়ে রাউনড—আগেই আলাপ করিয়ে দেওয়া হবে, তুমি নিজেই স্থির করবে হু ইজ দ্য স্যুটেবল বয়"—

সুপ্রিয়ও বুকে বল পেয়ে যোগ দেয়—

—"আমি স্যুটেবল বয়দের চার্ট বানিয়ে ফেলবো তোর জন্যে।"

—মিতুল সব বিকল্প পরিকল্পনা বন্ধ করে দিয়ে বলল—

—"থ্যাংকিউ, আমার বন্দোবস্ত আমি নিজেই করে নিতে পারবো, তোমাদের মোটেই ভাবতে হবে না। আমি তো টোটোদাদার মতো ইউজলেস নই? বাট দিস

BanglaBook.org

ইজ মোস্ট অবজেকশনেবল—দ্য ওয়ে ইউ আর গোইং অ্যাবাউট ইট—"

—"কেন? কি আশ্চর্য। এতে এত মন্দটা তুই কী দেখলি মিতুল?"

—"যেভাবে তোমরা ফার্নিচার কেনার মতো, ফ্ল্যাট কেনার মতন, মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছ, তাদের দোষগুণ যেভাবে আলোচনা করছ, সবটাই খুব আপত্তিকর—"

—"কিন্তু সম্বন্ধ করা ব্যাপারটাই তো তাই। আর সম্বন্ধ না করলে দেশের আদ্দেক ছেলে-মেয়ে আইবুড়ো থেকে যাবে যে?"

ছোট্টু বললে—"দেশেরই কথা শুধু নয়, বিদেশেরও অবস্থা তথৈবচ। ওখানেও কাগজে রেগুলার ম্যাট্রিমোনিয়াল কলামের বিজ্ঞাপন বেরোয়, সিংগলস ক্লাব আছে, সিংগলস ম্যাগাজিন আছে, ম্যাট্রিমোনিয়াল এজেন্সিজ আছে—কত কষ্টেসৃষ্টে, কত চেষ্টাচরিত্র করে যে ওদেশের পাত্র-পাত্রীদের নিজেরাই নিজেদের সম্বন্ধ স্থির করতে হয়, তার জানিস কিছু? কিছুই জানিস না, আগে থেকে আগডুম বাগডুম! মা-বাবার সম্বন্ধ করে দেওয়া একটা বিরাট ব্লেসিং—বুঝলি?"

—"বুঝেছি। আর বুঝতে চাই না।"

—"তা চাইবে কেন? ভাবছো বুঝি আমরাই ওল্ড ফ্যাশনড। জেনে রেখো আমরা অনেক রিল্যাক্সড, ঢের বেশি মানবিক। পাত্র-পাত্রীর এতে স্ট্রেস অনেক কম পড়ে। ওখানে সব নিজে নিজে করতে হয়। প্রথমে এজেন্সিতে নাম ফিলাপ, তারপরে কম্পিউটারজী স্থির করে দেবেন তোমার যোগ্য পার্টনার কে। তখন ডেটিং করে করে মনস্থির করা। সেটা কেন বেটার তা জানতে পারি? এখানে কাজটা গুরুজনেরা করে দিচ্ছে। ক্ষতি আছে কিছু?"

মিতুল চুপ করে শুনল। তারপর বলল—

—"ওদের দেশে যা হয় হোক। আমি তো কী করব? আমি আমার দেশের কথা বলছি। যে দেশে রোজ ব্রাইড বার্নিং হয়, রোজ ডাউরি-ডেথ হয়, এখনও সতী হয়, সেই দেশের কথা বলছি। উই আর আ বিট ডিফারেন্ট।"

—"দ্যাখ মিতুল," ছোট্টু সবিনয়ে মিতুলের শীতল কঠিন কণ্ঠস্বরের মোকাবিলা করে,—"ডাউরির প্রশ্ন কেন উঠছে? আমরা পণ দুরস্থান, যৌতুকও তো নিচ্ছি না? জাতপাতও মানছি না। বামুন-কায়েত বদ্যি যা হয় একটা হলেই হল। শুধু, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউণ্ড, আর চেহারাটা দেখছি।" গৌরী এখানে যোগ দেয়।

—"চেহারা মানে রং নয়, রং যাই হোক, শুধু লক্ষ্মীশ্রীটুকু, হাইট, আর ফিগার। এটুকুও দেখবো না? টোটোর পাশে মানানসই হওয়া চাই তো?"

—"দ্যাখো না তোমরা যার যা খুশি। মা, তোমাদের বোঝানো আমার সাধ্যি নয়, আমি হার মানছি—শুধু আমার আপত্তিটা রেজিস্টার করে রাখতে চাই। দাদাভাইয়ের এই চার্ট বানানোয় আমার তো সবচেয়ে বেশি আপত্তি।"

—"ঠিক আছে বাবা। তোমার বেলায় আমি যে পাত্র দেখার চার্ট বানানো ভেবে রেখেছিলাম, বাবা আর আমি সবটা ছকেও ফেলেছি, তুই সেই চার্ট থেকে বাড়ি বসে ছেলে চুজ করবি। আর পাত্র দেখবি—এমনি প্ল্যান ছিল। কিন্তু, পিটি, তোর

কপালে নেই।" সুপ্রিয় বুড়ো আঙুলটা নেড়ে দেখালো মিতুলকে। মিতুল চটলো না। সেও বুড়ো আঙুল দোলাতে দোলাতে বললো—

—"Sorry, দাদাভাই। তোমার কপালেও নেই! আমি হতেই দেবো না। নো ওয়ে! এবারটা টোটোদার বেলায় যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, বাট নট আগেইন!"

—"ধ্যাৎ! এত খেটেখুটে একটা জিনিস তৈরি করলাম, তুই সেটা অ্যাপ্রিশিয়েটও করতে পারলি না।"

—"ওহো, এই জিনিস তৈরি করবে বলেই বুঝি তুমি কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচা করে মালটিমিডিয়া শিখেছিলে? পাত্র-পাত্রীর চার্ট তৈরি করবার জন্যে সফটওয়্যার বানাও এবারে। নিজেই একটা ম্যাট্রিমোনিয়াল এজেন্সি খুলে বসতে পারবে, ইউ হ্যাভ ইনাফ র'মেটেরিয়াল।"

৮

রুদ্ধশ্বাসে সবাই দমদমে দাঁড়িয়ে। অবশেষে এলো টোটোর প্লেন। সাড়ে ছ'ঘণ্টা লেটে। কাস্টমস সেরে টোটো বেরুলো, সঙ্গে সঙ্গে তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো সকলে। "সাড়ে ছ'ঘণ্টা কমে গেল, সাতদিন মাত্র সময়!" বলেই ফেললো টিনা। "নট টু ওয়ারি।" লাজুক হাসি ফুটে উঠলো টোটোর মুখে। ওর ঠিক আগে আগেই ঠেলাগাড়ির সুটকেস ঠেলতে ঠেলতে যে সুন্দর মতন মেয়েটা বেরিয়েছিল, সে একপাশে দাঁড়িয়ে এদিকে তাকিয়ে রয়েছে। বোধহয় তার বাড়ির লোকদের জন্যে অপেক্ষা করছে। সকলকে প্রণাম-ট্রনাম করা হয়ে গেলে টোটো ইশারা করে ওই মেয়েটাকে ডাকলো। মালপত্তর সমেত মেয়েটি এসে দাঁড়ায়—একমাথা ঝাঁকড়া চুল আলু-থালু হয়ে আছে, পরনে কালো জীন্স আর একটা ক্রীমরঙের শার্ট, পায়ে রানিং শুজ, শ্বেতচন্দনের মতন গায়ের রং, রোগা, লম্বা, রিমলেস চশমার নিচে বড় বড় হাসি হাসি ঝকঝকে চোখ। টোটো বলল—"মীট শোহিনী, এম. আই. টি. তে পড়ছে। শোহিনী বড়ুয়া। উই ট্রাভেলড টুগেদার।"

"শোহিনী, এই আমার মা, বাবা, বড়মামী, সুপ্রিয় আমার ভাই, মিতুল আমার বোন। জানো মা, আমরা প্রতিদিন এক শহরে থাকলে কী হবে, এই প্লেনে উঠে তবে চেনা হলো। ওর মা থাকেন আসামে, চা বাগানের ডাক্তার, ওকে নিতে আসতে পারেননি। কাল সকালে শোহিনীর গৌহাটির প্লেন। আমি বলেছি ওকে আজকে আমাদের বাড়িতে থাকতে। নইলে একা একা হোটেলে থাকত।"

—"নিশ্চয়, নিশ্চয়। হোটেলে থাকবে কি?" সমস্বরে সাড়া দেয় টিনা, সুপ্রিয়, মিতুল টোটোর বাবা, টোটোর মা। এবং তার মামা মামী। মেয়েটার মুখে এমন একটা মায়া মাখানো আছে, দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। মেধা আর কমনীয়তা একসঙ্গে।

বাড়ি যেতে যেতে অনেক কিছু জানা গেল শোহিনী বড়ুয়ার বিষয়ে। খুব ব্রিলিয়াণ্ট

মেয়ে। বাবা মায়ের এক সন্তান। বাবা আর্মিতে ছিলেন, কিছুদিন আগে হার্ট অ্যাটাকে গত হয়েছেন। শোহিনী খড়গপুর আই আই টি-তে পড়ত, স্কলারশিপ নিয়ে এম আই টিতে গেছে। টোটোর চেয়ে বছর দুয়েকের সিনিয়র। দেখে অবিশ্যি টের পাবার উপায় নেই, টোটোর একমুখ গোঁফ-দাড়ি দেখে বয়েস বোঝা কঠিন।

"শোহিনী দারুণ গজল গাইতে পারে রে মিতুল,—আমরা যখন আটকে ছিলাম না, আম্মানে, তখন শি স্যাং সো মেনি সংস, টেকিং আওয়ার মাইনডস অফ দ্য টেনশন—"

—"বাববা, সায়েন্টিস্ট, আবার গাইয়েও?" দাদা বলেই ফেলেন সপ্রশংস গলায়। "বিকেলে শোনাবে এখন। কাল তো সকালে ওর প্লেন টু গৌহাটি।"

—"কাল সকালেই যেতে হবে? পরশু গেলে হয় না?" টোটো জিজ্ঞেস করে।

—"মা বসে আছেন"—শোহিনী লজ্জা গলায় বলে।

"মাকে আমরা ফোন করে দেব।" হঠাৎ বলে ওঠে ছোট্টু।

সুপ্রিয় আর চুপ করে থাকতে পারে না,

—"টোটোদা। তোমার জন্যে যে দারুণ একটা জিনিস বানিয়ে রেখেছি না। দেখামাত্র একদম ফ্ল্যাট হয়ে যাবে!"

—"কী রে? কী রে?"

—"চার্ট। একটা চার্ট বানিয়েছি। উইথ অল রেলেভেন্ট ইনফরমেশন, নাম, বয়েস, হাইট, ওয়েট, ফ্যামিলি, ইনকাম, এডুকেশন, হবি, দ্য হোল ওয়ার্কস। চলো না, দেখবে।"

টোটো জানলা দিয়ে বাইরে কী যেন দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শুনতে পায়নি ভেবে সুপ্রিয় আবার বলতে শুরু করে—"বাবা, মা, পিসিমণি মিলে একটা প্রিলিমিনারি সিলেকশান করেই ফেলেছেন, তার থেকে কয়েকজনকে ইনভেস্টিগেটও করা হয়েছে —পিসিমণি এখন শর্ট লিস্ট বানাচ্ছেন, বাবার তো চার্টটা এত পছন্দ, যে অফিসে দেখাতে চাইছিলেন—", বলতে বলতে থমকে গেল সুপ্রিয়—প্রচণ্ড রাগী রাগী চোখ করে সুপ্রিয়র দিকে তাকিয়ে রয়েছে মিতুল। এবার একটা ধিক্কার-জাতীয় শব্দ করে এক ঝাঁকিতে জানলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। —"মিতুলের খুব রাগ," সুপ্রিয় হাসি হাসি মুখে বলে, "মিতুল, আর ওর বন্ধুরা তো সবাই ফেমিনিস্ট, তাই এই মেয়ে দেখাদেখি ওর পছন্দ নয়।"

—"চার্ট বানানোটা আরও অপছন্দ।" মিতুল বলে ওঠে, "মানুষগুলোকে কোন্ লেভেলে নিয়ে যাচ্ছিস বল্ তো? 'পাত্রী' কি একটা বাজারী কোমোডিটি? আমার বিশ্রী লাগছে—।" গৌরী তাড়াতাড়ি মেয়েকে থামায় ধমক লাগিয়ে। —"থাম দিকিনি? তোদের দুজনের খিটির মিটির এখন একটু বন্ধ কর। জরুরি কথাটা বলে নিতে দে আমাকে! শোন বাবা টোটো, তোর সময় একদম বাঁচিয়ে দিয়েছি আমরা। দু'দিনেই তোর কাজ চুকে যাবে। কলকাতায় যে এতগুলো সুপাত্রী ছিলো, কে জানতো? তবে ছোট্টুটা বড্ড পার্টিকুলার হয়ে পড়েছে, তাই ওর শর্ট লিস্টে—"

BanglaBook.org

শোহিনীর দিকে এক লহমা তাকিয়ে নিয়েই টোটো তার মামীকে শান্ত করতে চেষ্টা করে—

—"ঠিক আছে ঠিক আছে..., ওঃ,...এসব কথা বাড়ি গিয়ে হবে' খন, ...থ্যাংকিউ, থ্যাংকিউ ফর অল দ্য হার্ড ওয়ার্ক—বাট লেট্স টক অ্যাবাউট সামথিং এলস নাউ, ও কে?"

—"সত্যিই তো, এক্ষুনি ওসব কথা কেন?" দাদা বাধা দেন। গাড়িতে অন্য একটি অচেনা মেয়ে, তার সামনে এসব কথা বললে তো লজ্জা পেতেই পারে টোটো। "বাড়ি গিয়ে হবে'খন চার্ট দেখানো। এখন বল্ টোটো, তোদের খুব কষ্ট হলো পথে আসতে, নারে? ঈশ সন্তার তিন অবস্থা। ন' দশঘণ্টা আটকে-থাকা! অচেনা এয়ারপোর্টে।"—"ওরা কিন্তু খুব যত্ন করেছিল বড়মামা। কোনো কষ্ট হয়নি সেদিক থেকে। আর ওই যে বললাম শোহিনী গান গেয়ে মাতিয়ে রেখেছিল।"-—"কিসের চার্ট?" শোহিনী এতক্ষণে প্রশ্ন করল সুপ্রিয়কে। স্বর বেশ স্পষ্ট। চোখে মুখে রহস্য এনে সুপ্রিয় বলে—"সে একটা মিস্ট্রি! চলো, বাড়িতে গিয়ে দেখবে, তোমাকেও দেখাব।"

—"স্না!" টোটো হঠাৎ গর্জন করে ওঠে—

—"তোদের ওসব চার্ট ফার্ট ওকে আর দেখাতে হবে না। রাখ্ তো?"

—"ন্যাচারলি। সুপ্রিয়টা এত বোকা।"

ছোট্টু বলে ওঠে—"নানা ওসব এক্ষুণি দেখিয়ে কাজ নেই—শোহিনী কেন, ওটা কাউকেই দেখানো হবে না। তুই ভাবিস না টোটো, ওটা তোর প্রাইভেট ভিউয়িং-এর জন্য বানানো হয়েছে, টু হেলপ ইয়ু মেক আপ ইওর মাইন্ড।"

মিষ্টি গলায় শোহিনী বলল—"এটা কোন রাস্তা দিয়ে আমরা যাচ্ছি এখন? আন্টি? আমি তো গৌহাটির মেয়ে, কলকাতা একদম চিনি না।"

BanglaBook.org

৯

বাড়ি গিয়ে সবাই বিশ্রাম-টিশ্রাম করে একটু চা-টা খেয়ে স্নান করতে গেল। টোটো বেরুল তার বাবার সাদা ধবধবে পাঞ্জাবী আর ঢোলা পায়জামাতে আরাম করে। খেতে বসে অনেক মজার মজার গল্প বলছিল শোহিনী, ওর প্রথম প্রথম মার্কিন দেশে গিয়ে বোকা বনবার গল্প। টিনা, মিতুল-সুপ্রিয় তো হেসে কুটিপাটি। গৌরী ওকে আনপ্যাক করতে দেয়নি, কালই তো সকাল দশটায় প্লেন, বাক্স খুলে আর কী হবে।

তাই স্নান করে বেরিয়ে মিতুলের একটা সুতী কাফতান গায়ে দিয়ে আরামসে বসে ওদের সঙ্গে ভাত খেল শোহিনী। খেতে খেতে বলল, "ডালে আদার সঙ্গে মৌরী ফোড়ন দিয়েছেন, তাই না আন্টি?" শুনেই গৌরী-ছোট্টুর মুখ চাওয়া চাওয়ি।

—"তুমি রান্না জানো?"

—"এমন কিছু না। খেতে ভালোবাসি তো, তাই।"

বিকেলে সবাই মিলে চেপে ধরলো—"কৈ? গান করো? গান করতেই হবে।"

এই জুলুমে সুপ্রিয়, মিতুল, টিনা শামিল হল বড়রা সবাই।

শোহিনী গাইল। গৌরীর জন্য রফির গান, সুচরিতার জন্য গীতা দত্ত, ছোট্টুর জন্য সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আবার দাদার জন্য বেগম আখতার। মিতুলের জন্য সুচিত্রা মিত্র। আর টোটোর জন্য সুমনের 'তোমাকে চাই'। টিনার বিদেশে জন্ম, সে বলল, "তুমি ইংরেজি গান পারো?" শোহিনী গাইল। জ্যানিস জপলিন।

আজ দুপুরের খাওয়ায় সুচরিতা এসেছে মুনিয়া সমেত। মুনিয়া তো শোহিনীকে দেখে মুগ্ধ মোহিত। —সে চাইল আশা ভোঁসলে। সুপ্রিয়র ফরমাসে কিশোরকুমারও আসরে এলেন। তারপর নিজের খুশিতে শোহিনী গাইল বিহুর গান। একটার পর একটা। রাত্রে শুয়ে ছোট্টু বলল টোটোর বাবাকে—

—"শুনছো? যদি মেয়েটা দু'বছরের বড়ো না হতো? ইশ কী ভালোই না হতো। না গো?"

স্বামী ওপাশ ফিরে বললেন—

—"দু'বছরে কী এসে যায়? সত্যজিৎ রায়ের স্ত্রী তাঁর চেয়ে আট বছরের সিনিয়র ছিলেন। তাতে আটকেছে কিছু?"

ছোট্টু প্রায় লাফিয়ে ওঠে।

—"তোমারও—? তোমার আপত্তি নেই তো? তাহলেই হলো। আমি তো তোমার কথাই"— তারপরেই আবার ঝিমিয়ে পড়ল গলা। —"ওরা তো বাঙালিও না। অসমিয়া বড়ুয়া বলল। আমি ভেবেছিলাম বাঙালি বুঝি।"

—"ওসব কে অসমিয়া কে বাঙালি, ও নিয়ে আজকাল কেউ কিস্যু ভাবে না ছোট্টু। ওরা তো থাকবে স্টেটসে, সেখানে ওরা শুধু ইনডিয়ান—।"

—"তাহলে অবশ্য ঠিকই বলেছো, মেয়েটা সত্যিই বড় চমৎকার...আর মনে হচ্ছে টোটোর ওকে খুবই...।"

বাক্য শেষ করতে না দিয়ে স্বামী বলেন,—"দ্যাখো খবর নিয়ে, কোথাও হয়তো বয়ফ্রেণ্ড রয়েছে। আগেই নেচে উঠো না।"

—"বলি তবে টোটোকে কাল?"

—"বলবে আর কখন? কাল তো চলেই যাচ্ছে।"

—"প্লেন তো দশটায়। সাতটায় ওকে তুলে দিতে বলেছে, আটটায় বেরুবে। তার মধ্যে যথেষ্ট সময়।"

—"দ্যাখো, বলে।" টোটোর বাবাও মাত্র দুদিন আগে এসেছেন। জেট ল্যাগ কাটেনি। ঘুমিয়ে পড়তে চাইছেন।

—"ডাকবো টোটোকে? একটু কথা বলে জেনে নেবো ওর মতামতটা

BanglaBook.org

কি?" উৎসাহের চোটে ছোট্টু উঠে বসেছে খাটের ওপর।

তার হাত ধরে টেনে শুইয়ে দিলেন কর্তামশাই।

—"টোটোর মতামতটা আমিই তোমায় জানিয়ে দিতে পারি। নো নীড টু ডিস্টার্ব দ্য বয় নাউ। ওটাই ওর ইচ্ছে। হি ইজ ইন লাভ উইথ হার।"

—"সত্যি বলছ।"

—"আরে, হাবভাবে টের পাচ্ছ না? কেমন মা তুমি? ইটস ক্লিয়ার অ্যাজ ডে-লাইট।"

—"বলব তবে?"

—"বোলো। নাউ লেট মি স্লীপ।"

—"ভোরে ওদের ডাকতে হবে।"

—"নো নীড। ডেকো না। না ডাকলেই ওরা দশটা অবধি সব ঘুমোবে। আমিই ওর টিকিটটা পসপোন করে দেব।"

—"আর ওর মাকে ফোন?"

—"সে ও উঠে করবে।"

রাত্রের খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে চার্ট নিয়ে সুপ্রিয় গেল টোটোর ঘরে। টোটো চার্টের খুব প্রশংসা করে বলল—"আচ্ছা এইটে দিয়ে একটা ওয়েব সাইট খোলা যায় না? এত চমৎকার কাজটা নষ্ট হয়ে যাবে? দেখি কী করা যায়।"

—"নষ্ট কী? মেয়ে পছন্দ করো?"

এবার টোটো সুপ্রিয়কে চুপি চুপি বলেই ফেলে—"মেয়ে যে পছন্দ হয়েই গ্যাছে রে? ভেরি ভেরি সরি। তোর চার্টটা কাজে লাগলো না। প্লেনেই পাত্রী মিলে গেল যে। কেন, শোহিনীকে তোদের পছন্দ হয়?"

সুপ্রিয় লাফিয়ে উঠল।

—"দারুন। খুব পছন্দ। শোহিনীদি বলছিল জেনেটিক এঞ্জিনিয়ারিংয়ে কাজ করবে। আমারও তো সেটাই ইচ্ছে। আঃ কিশোরকুমার কী গায়। আমি শোহিনীদিকে হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট মার্কস দেব।"

—"তুইই কথাটা আগে বড়মামীকে বল। তারপর মাকে। বুঝলি? সাবধানে, রইয়ে সইয়ে। কাল সকালেই বলবি। আর ওর গৌহাটি যাওয়াটা কেঁচিয়ে দিতে হবে।"

১০

সকালবেলায় কেলেংকারি। কেউ ডেকে দেয়নি শোহিনীকে। ন'টা অবধি ঘুমিয়ে বেচারীর গৌহাটির প্লেন মিস হয়ে গেছে। মা'কে ফোন করে দেওয়া হলো। কাল যাবে। প্লেন মিস করে টোটো এবং শোহিনী দুজনেই বেশ ফুর্তি অনুভব করছে

বলে মনে হলো। বেরিয়ে গেল শপিংয়ে। শোহিনীর কাছে কলকাতার চেয়ে বড় শহর বস্টনও নয়।

শপিং করে ফিরে এসে টোটোর মুখ চোখ যেন একটু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দেখাতে লাগলো। খাবার টেবিলে আবার সবাই জড়ো হয়েছে। টোটো ভাত মাখতে মাখতে একবার চোখ তুলে মার দিকে চট করে তাকালো। তারপর লজ্জা-লজ্জা গলায় বললো—"আমার একটা কথা বলবার আছে। আয়্যাম এক্সট্রীমলি স্যরি। তোমরা এতদিন ধরে এত কষ্ট করলে, ছুটোছুটি করলে, চার্ট তৈরি করলে, আয়্যাম আফ্রেইড, আমি সেটাকে ঠিকমতন অনার করতে পারিনি, মা, বড়মামী।"

—"মানে? মানে?"

—"মানে, আমি একটা কাণ্ড করে বসে আছি। শোহিনীকে প্রোপোজ করে ফেলেছি। আর শোহিনীও সেটা অ্যাকসেপ্ট করে ফেলেছে।"

নাঃ, বজ্রপাত ঘটলো না।

কেননা সুপ্রিয় অলরেডি বলে রেখেছিল গৌরীকে, গৌরী বলেছিল দাদাকে আর ছোট্টুকে, ছোট্টু তার কত্তাকে, আর সুচরিতাকে, আর মিতুল, মুনিয়া, টিনা তো জানতই। বাড়িতে কারুরই জানতে বাকি ছিল না। কেবল সুপ্রিয়-মারফৎ সম্প্রচারিত এই সুসংবাদটি সকলে টোটোর শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী হিসেবে শুনতে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল। দুরুদুরু বক্ষে। কী জানি আজকালকার ছেলেদের মতিগতি!

—"এক্সেলেন্ট!" সমস্বরে উল্লাসে গর্জন করে উঠলেন গার্জেনবর্গ।

—"কিন্তু একটা মুশকিল আছে। দেয়ার্স আ স্ল্যাগ—", টোটো মুখ নিচু করে।

—"মানে? কিসের স্ল্যাগ?" গার্জেনদের মিলিত কণ্ঠে এবারে ঝঙ্কৃত হয় উদ্বেগ।

—"মানে, ওই ও আমার চেয়ে দু'বছরের সিনিয়র তো? তোমাদের তাতে কোনো—"

—"আরে ধ্যুৎ!" এবারে বজ্রগর্জনে গর্জে ওঠেন অভিভাবকের দল। টোটোকেই ধমকে দেন—

—"দু'বছরের বড়ো আবার বড়ো নাকি আজকাল? কোন্ যুগে তুই বসে আছিস, টোটো?"

—"ইয়েঃ" বলে চেঁচিয়ে ওঠে ছোটোদের দল—"উই ওয়ান্ট শোহিনীদি। উই ওয়ান্ট শোহিনীদি।" এখানে মিতুলের গলাটা বেশ জোরেই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

—"বাট দেয়ার্স অ্যানাদার প্রবলেম।" টোটো বলে।

—"কি এত প্রবলেম রের করছিস তুই?"

—"শোহিনীরা তো বাঙালি নয়, অসমিয়া।"

—"তাতে কি হয়েছে? অসমিয়া কালচার কি বাঙালির চেয়ে কোনো অংশে কম?" ঘোষণা করলো ছোট্টু। —"কী সুন্দর টেক্সটাইল, মুগা, কী সুন্দর নাচগান!"

—"আমরা ওসব সংকীর্ণ প্রভিনশিয়াল মনোভাব মানি না। বাংলা বলে তো সুন্দর। ওতেই হবে। কমিউনিকেশন ইজ অল!"

BanglaBook.org

—"আরো একটা সমস্যা আছে মা।" টোটো কিন্তু-কিন্তু করে। —"ওরা কিন্তু বৌদ্ধ বড়ুয়া। দে আর নট হিন্দুজ। লাইক আস।"

—"হ্যাঁ। হিন্দু নয়। তো?" প্রচণ্ড হস্টাইল একটা আওয়াজ শোনা গেল টেবিলের অন্য প্রান্ত থেকে। —"কি বলতে চাও তুমি? এ যে দেখি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ভাষা শুনছি! কি শুরু করে দিলি, অ্যাঁ? ছি ছি। বুদ্ধদেবের ধর্মটা কি হিন্দুধর্মের চেয়ে কম পাওয়ারফুল? সারা পৃথিবীতে হিন্দু বেশি, না বৌদ্ধ বেশি? জানিস, বুদ্ধের কী শিক্ষা? ইকোয়ালিটির, পীস-এর, মানবতার শিক্ষা—পুতুলপুজোর নয়।"

না। মিতুল নয়।

এবার তর্ক জুড়েছেন মিতুলের বাবা।

টোটোর বড়মামা।

কোথায় গেল চার্ট।

কোথায় গেল শর্ট লিস্ট।

অত যত্নের চার্টের প্রতি বিন্দুমাত্রও মমতা দেখা গেল না সুপ্রিয়র। ছোটদের দল আহ্লাদে ভাসতে শুরু করে দিয়েছে, মিতুল সুপ্রিয় তাদের নেতৃত্বে। বড়দের দলও আহ্লাদে সমপরিমাণেই ভাসমান—এতক্ষণে সত্যি সত্যি বিয়েবাড়ির আনন্দটা সানাইয়ের মতন বেজে উঠেছে বুকের ভেতরে। টোটো এখন এলেবেলে, শোহিনীকে নিয়েই মত্ত সকলে।

এই অভিনব পরিস্থিতির সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে নিয়েছে শোহিনীও। সারাবাড়িতে যেন হাজার হাজার অদৃশ্য টুনিবাল্ব জ্বলে উঠেছে।

কয়েকঘণ্টার আকাশপথের চেনায় সারাজীবনের সঙ্গী, পাত্রী স্থির হয়ে গেল টোটোর। নিমন্ত্রণপত্র তো তৈরিই ছিল, ছাপতে চলে গেল এবারে। পাত্রীপক্ষের নামধাম সমেত। ফোনেই অনুমতি এসে গেল শোহিনীর মায়ের—যদিও তাঁর বিস্ময়ের শেষ ছিল না, তবু মেয়ের পছন্দকে তাঁর গভীর বিশ্বাস আছে। সাত পা একসঙ্গে হাঁটলেই বন্ধু। এরা তো হাজার হাজার মাইল একসঙ্গে উড়ে এসেছে। জীবনসাথী হবে না কেন? সবই রেডি, সবই প্রস্তুত, কেবল শোহিনীর মায়ের অফিসে এমার্জেন্সি লীভ-টাই অর্গানাইজ করা যা বাকী।

সাতদিনেই সব সামলাতে হবে তো তাঁকে? তিনি তো মেয়ের বিয়ের জন্য মনে মনেও তৈরি ছিলেন না। এইটে হিসেবের মধ্যে ধরা ছিল না ছোট্টুর।

শারদীয় সংবাদ প্রতিদিন, ১৪০৮

BanglaBook.org

ডাব্লু ডাব্লু ডাব্লু. প্রজাপতি. ডট্ কম্

হঠাৎ একটা দারুণ সুযোগ হয়ে গেলো মিনির—ওর ছোটবেলার বন্ধু গুড্ডির বিয়ে হচ্ছে জাকার্তায়। সেখানে নেমন্তন্ন। মিনি লণ্ডনের বাসিন্দা, ওদের জন্মকর্ম সেখানেই। হলে কি হবে, মা বাবা ধরে করে বাংলা লিখতে পড়তে শিখিয়েছেন, মিনিকে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে এবং টুনিকে ভারতনাট্যম নাচতেও শিখিয়েছেন। তার সঙ্গে টুনি আবার দারুণ অপেরা সঙ্গীত গাইতে পারে। অর্থাৎ গুণের সীমা নেই দুই বোনের। টুনি আইন পড়েছে। লণ্ডনেই প্র্যাকটিস করে। মিনি কেম্ব্রিজে বায়োকেমিস্ট্রিতে রিসার্চ করছে। টুনির বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে এক গুজরাটি ছেলের সঙ্গে ; সঞ্জীবও লণ্ডনে থাকে, মস্তবড় ব্যবসা আছে তাদের। টুনি বলিয়ে কইয়ে, সাকসেসফুল উঠতি ল-ইয়ার বলে কথা! তাকে নিয়ে বাবা মার ভাবনা ছিল না। মিনিটাই অমিশুক। ব্রিলিয়ান্ট সায়েন্টিস্ট। মেয়েটা আপনমনে ঘাড় গুঁজে ল্যাবে পড়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অতটা সহজে মানুষের সঙ্গে মিশতে পারে না, যতটা সহজে মিলতে মিশতে পারে নানারকমের ভাইরাস আর ব্যাকটিরিয়াদের সঙ্গে। মা বাবার চিন্তা এই বিলেত-দেশে কেমন করে বিয়ে হবে মিনির! অবশেষে পিসিমণি কলকাতা থেকে সম্বন্ধ করা শুরু করলেন।

মিনি শুনতে পেয়ে টুনিকে বললো—"না দিদি, বারণ করা তা হবে না। সম্বন্ধ করে বিয়েতে আমার ভারী ভয় করে। যদি নিজে নিজেই কোনোদিন বিয়ে করতে পারি, তো করবো, নইলে করবো না।"

না হয় বিয়ে নাই হবে, কিন্তু সম্বন্ধ করা চলবে না। মিনির সাফ কথা! ওরে বাবা! ভীষণ রিস্ক ফ্যাক্টরটা বেশি ওতে! মানুষ কি গাইবলদ? যে অন্য লোকে দেখে শুনে জোড় মিলিয়ে দেবে? মিনির খুব অপমান লাগবে, ভীষণ লজ্জা করবে।

"আমার যখন ইচ্ছে করবে তখন আমি নিজেই চেষ্টা করবো। আই অ্যাম নট রেডি ইয়েট।" "কী-চেষ্টা তুই করবি? কখনই বা করবি?" টুনি মোটেই নিশ্চিন্ত হলো না মিনির সান্ত্বনাবাক্য শুনে। "আর রেডি হয়েছিস! —এতবড় হয়ে গেলি, একটা ডেট্ করলি না পর্যন্ত। তুই ধরবি বর?" হেসে মিনি বললো—"আহা—এতদিন তো চেষ্টাই করিনি? একবার ট্রাই তো করতে দিবি? দেখাই যাবে না হয় একটা এক্সপেরিমেন্ট করে। একেবারে পারফেক্ট সায়েন্টিফিক স্পিরিটে, প্রপারলি চেষ্টা করব, তাতে বিয়ে হলে হবে, না হলে হবে না। বাট নো সম্বন্ধ করা। প্লীজ।"

টুনি মা-বাবাকে জানালো। মা-বাবার ভুরু কুঁচকে গেল—মিনি যে এবার কী এক্সপেরিমেন্ট করবে, কিচ্ছুটি তাঁরা ভেবে পেলেন না। ল্যাবে বর থাকলে এতোদিনে বেরিয়ে পড়তো। ভেবেচিন্তে বাবা বললেন—"আজকাল তো আকছার দেখতে পাই পাত্রপাত্রীরা নিজেরাই সিংগলস কাগজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। সেটা একরকম মন্দ নয় কিন্তু। দুজনেই সমান সমান।" গম্ভীরভাবে শুনে মিনি বললো—"বিজ্ঞাপন? কি

জানি। দেখি কী করি। আই হ্যাভ টু থিংক অ্যাবাইট ইট।"

বেশি থিংকিংয়ের আগেই জাকার্তায় বেড়াতে যাবার নেমন্তন্নটা পেয়ে মিনি মহাখুশি। একা তো নয়, ওরা ছোটবেলার তিনবন্ধুতে তিন জায়গা থেকে যাচ্ছে। জুডিথ আসছে কর্নেল থেকে। কমলা যাচ্ছে টোকিওতে বরের কাছ থেকে। ওরা বড় হয়ে চারদিকে চারজনে ছড়িয়ে পড়েছে। জাকার্তায় গুড্ডির বিয়েতে সবার সঙ্গে দেখা হবে ভেবেই মিনির মন খুশিতে ভরপুর। বিয়ে-টিয়ের এক্সপেরিমেন্ট বিষয়ে যে-উৎসাহটুকু জেগেছিল, সেটা আপাতত বন্ধুর বিয়ের আহ্লাদে মিইয়ে গেল। কিন্তু মা বাবা ভাবলেন, যাক তো জাকার্তায়। বন্ধুদের বিয়ে হলে, উৎসব-টুৎসব দেখে শুনে নিজেরও বিয়ের কিঞ্চিৎ শখ হতে পারে। দেখা যাক মিনির যদি মনটা ফেরে। বড়ই উদাস মেয়েটা এই সব বিষয়ে।

গুড্ডি শুধু যে টিকিট পাঠিয়েছে তাই নয়, রাজকীয় কাণ্ডকারখানা। গুড্ডির বাবা ওখানে ব্যবসায়ী, ইলাহী খরচ করেছেন ওঁরা, মিনি তো দেখে অবাক। ওরে বাবা, এমনভাবে বিয়ে করা ওর একটুও পছন্দ নয়, তার চেয়ে ওরা কলকাতায় দেখে এসেছে কি সুন্দর শামিয়ানা টাঙিয়ে লম্বা লম্বা টেবিলে কলাপাতায় আর মাটির গেলাসে বিয়েবাড়ির নেমন্তন্নের খাওয়া দাওয়া হয়, তাতে বেশি মজা। কমলার বিয়ে লণ্ডনেই হয়েছিল, তাতেও খুব আনন্দ করেছে সবাই। একটা সুন্দর বাগানবাড়িতে, দুপুরবেলায়, বাগানেই খাওয়া দাওয়া, বিয়ে থা, সব হলো। ওদের দুপুরে বিয়ে হয়। জুডিথ ডিভোর্সের পর এখনও বিয়ে করেনি, সেও পড়ছে। মিনির মতন গবেষণা করছে। তবে বিজ্ঞানে নয়, উইমেনস্ স্টাডিজ নিয়ে। অবিলম্বেই মিনি আর জুডিথের বিয়ে নিয়ে কমলা আর গুড্ডি খুব ভাবিত হয়ে পড়ল। জুডিথ বলল, "মা ভৈঃ। আমি যে ছেলেটির সঙ্গে বসবাস করছি, সে কর্নেলে পড়ায়। চমৎকার পাত্র। গবেষণাটা শেষ হয়ে গেলেই আমরা বিয়ে করব। ডেভিড ইস্রায়েলের ছেলে, যেমন সুশ্রী তেমনি বুদ্ধিমান। আর খুব হাসতে পারে। আমার বিয়েতেও তোমরা যাবে কিন্তু—এখন থেকে টাকা জমাও। গুড্ডির বাবার মতো আমার বাবা কিন্তু টিকিট দেবেন না,—শুধুই হসপিটালিটি!" —"ছবি দেখা! ছবি দেখা!" বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাকী তিনবন্ধু। পার্স খুলে একগাদা ছবি দেখালো জুডিথ। সত্যি ডেভিড বড়ো সুশ্রী, যীশু-যীশু দেখতে। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক।

এবার মিনি? মিনির কী ব্যাপার? মিনি বললে তার বিড়ম্বনার কাহিনী। ডেটিং-পেটিং তার ভাল্লাগে না। তার এখনো বয়ফ্রেণ্ড হয়নি। সময়ই পায়নি খুঁজতে। বাবা-মা সম্বন্ধ করতে শুরু করেছিলেন, কোনওরকমে বন্ধ করা গেছে। "নিজেই চেষ্টা করবো বলে কথা দিয়েছি। কিন্তু আই হ্যাভ নট থট অ্যাবাউট ইট অ্যাজ ইয়েট।" জুডিথ বলল, "কুছ পরোয়া নেই, এবার বরং চল, আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে ভাবি। ভালো ছেলে পেলেই তোকে ই-মেইলে আলাপ করিয়ে দেবো। আমার ভেনেজুয়েলান বন্ধু মারিয়া-এলেনার তো দিব্যি একটা কারাকাসের ছেলের

সঙ্গেই বিয়ে হলো, কর্নেল থেকে ই-মেইলে আলাপ হয়ে। তোর জন্যেও খোঁজ করব। কেমন ছেলে চাই তোর?" মিনি একটু ভেবে বলল —"সায়েন্টিস্ট হলেই ভালো—।"

—"তোর কি ইণ্ডিয়ান-ওয়েস্টার্ন বাছাবাছি আছে?"

কমলা সাহেব বিয়ে করেছে। গুড্ডি অবশ্য পাঞ্জাবীই বিয়ে করেছে। ছেলে কাছেই মালয়েশিয়াতে ভালো চাকরি করে। গুড্ডির বিয়েটা প্রায় সম্বন্ধ করেই। মুখে অবশ্য বলছে না সেটা খুলে, কিন্তু বোঝা গেল দুপক্ষের বাবা-মাই আলাপ করিয়ে দিয়েছেন। তারপর একবছর প্রেম। গুড্ডি বলল—"মিনি, তোর সম্বন্ধ করা বিয়েতে এত ভয় কিসের বুঝি না। সব বিয়েতেই রিস্ক ফ্যাক্টর সমান প্রায়। মানুষের সঙ্গে বসবাস ঘরকন্না না-করলে কি মানুষকে চেনা যায়?" জুডিথ বলল—"ঘরকন্না করলেও কি চেনা যায়? মানুষ তো বদলে যায়। এক মানুষকে বিয়ে করলুম, আরেক মানুষের সঙ্গে ডিভোর্স হলো।" জুডিথের প্রথমবার বিয়ে হয়েছিল ইংলণ্ডে ব্রিটিশ ছেলের সঙ্গেই। ছোট্টবেলার প্রেম, চাইল্ডহুড সুইটহার্ট—ওদের সকলের চেনা ছেলে মাইকেল ও-কনেল। সে-ছেলের সঙ্গে বিয়ে টিঁকলো না। বিয়ের পর মাইকেলের স্বভাব চরিত্র পালটে যেতে লাগল, মদ খেয়ে এসে মারপিট শুরু করল। জুডিথের চলে না এসে উপায় রইল না। মাইক আবার একটা বিয়ে করে ফেলেছে এর মধ্যেই। জুডিথ আরেকটু অপেক্ষা করছে—ডেভিডকে আরেকটু চিনে নিচ্ছে। যদিও বোঝাই যাচ্ছে ওদের ঢলঢল প্রেম। প্রতিদিন ডেভিডের টেলিফোন আসছে। কমলার স্বামীও রোজই মেইলে খবর দিচ্ছে যে বাচ্চাটা দিব্যি আছে, ভাবনা নেই। মজা কর। কমলার দেখা গেল স্বামীর চেয়ে খুদে মেয়েটার জন্যেই মন কেমন করছে বেশি।

—"ভারী তো এক হপ্তার জন্যে বেড়াতে বিয়েবাড়ি আসা। তার মধ্যেই এদের বাচ্চা নিয়ে আর বয়ফ্রেণ্ড নিয়ে কী আদিখ্যেতা।" ভাবলো মিনি, "বিয়ে করলে আমারও নিশ্চয় এমনি অবস্থা হবে।" আপাতত মিনির ভাবনা ল্যাবের মাইক্রোবগুলোকে নিয়ে। আশা করা যাচ্ছে ওর সহযোগী মার্টিন ওদের যত্ন করবে, মেরে ফেলবে না। সাতদিন কি কম সময় এদের পক্ষে? বড্ড ডেলিকেট। "সায়েন্টিস্ট চাই" ছাড়া—"কেমন ছেলে চাই" —এর জবাবে মিনি কিছুই ভেবে পেল না। পাবে কী করে, ভাবেইনি তো এ বিষয়ে এখনও কিছু। একটুখানি চিন্তা করে বলে ফেলল,- —"আর বাঙালি ছেলে পেলেই ভালো।"—"বাঙালি ছেলে?" লাফিয়ে উঠলো কমলা। —"দেয়ার স্ ওয়ান! আমার দাদার বেস্ট ফ্রেণ্ডই তো একজন বাঙালি ছেলে বার্কলেতে থাকে। চাকরি করে। এয়ারোস্পেস এঞ্জিনিয়ার। আলাপ করবি?" —"ওর কোনো গার্লফ্রেণ্ড নেই তো?"—জুডিথ প্রশ্ন করল ভুরু কুঁচকে। "দেখিস,—না জেনেশুনে যার-তার সঙ্গে আলাপ করাবি না মিনি! আগে দাদার কাছে সবরকম খবর-টবর নিয়ে নাও।"

—"সেটা অবশ্য ঠিক কথা। নো প্রবলেম।" —তক্ষুনি ল্যাপটপ নিয়ে বসে গেল কমলা। দাদাকে ই-মেল। এই ইলেকট্রনিক পোস্টাপিসটা দারুণ হয়েছে। মুহূর্তের

মধ্যে কথা চালাচালি হয়ে যায়। দাদা উত্তর দিল—"না। আপাতত নেই। হলে তো ভালোই হয়। উনত্রিশ বছর বয়েস হলো। হাই টাইম।"

গুড্ডি শুনে বলল—"গার্লফ্রেণ্ড না থাক, বয়ফ্রেণ্ড নেই তো রে? খবর নে। তাহলে কিন্তু কেলো হয়ে যাবে। মনে থাকে যেন নন্দিনীর কথা।" বিয়ের পর জানা গিয়েছিল নন্দিনীর বর সমকামী। কমলার দাদা বলজিৎ খবর দিল "নো, নো। রিল্যাক্স। ওসব কিছু না। যদিও সানফ্রান্সিসকো এজন্যে বিখ্যাত মুক্তাঞ্চল, আর আমাদের অনেক বন্ধুই গে, বাট রাণা ইজ এ স্ট্রেট গায়।" আর কী? দাও দেখি রানার ই-মেল অ্যাড্রেসটা। আর এই নাও মিনির ই-মেল অ্যাড্রেস।

এবার কথা গানে গানে।

কিন্তু মিনি অত সহজ পাত্রী নয়। বলজিৎ-এর অনুপ্রেরণায়, কমলার অনুরোধে, নিজের পরিচয় দিয়ে প্রথম ই-মেইলটা করেই ফেলল রানা, কমলার ঠিকানায়। সেই ই-মেইল পেয়ে বন্ধুরা উল্লাসে তুবড়ী, কিন্তু মিনিটা বেরসিক। "ধু-উৎ"—বলে হেসেই উড়িয়ে দিল। তা বলে বন্ধুরা ছাড়বে কেন? তিনজনে মিলে একজোট হয়ে মিনির বকলমে উত্তর দিয়ে দিল কমলার ঠিকানা থেকেই। ঝটপট রানার জবাবীপত্র এসে গেল। বন্ধুদের প্রত্যুত্তর যেতেও দেরি হলো না। একদিকে বিয়েবাড়ির হৈ হল্লা চলছে, তারই মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে বান্ধবীদের প্রাইভেট কর্মকাণ্ড চলেছে। মনে হচ্ছে কনেবউ তার নিজের বিয়েতে যত ব্যস্ত, তার চেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহিত এই সলা-পরামর্শের কারবারে। একমাত্র নিঃশব্দ উদাস মিনি নিজে। চিঠিগুলো সবই পড়ছে, কিন্তু নো কমেন্টস।—"পারিসও বাবা এত কোলড থাকতে।" বকে দিল গুড্ডি। মোটামুটি ফরম্যাল আলাপ পরিচয় কমলার মাধ্যমেই সারা হয়ে গেল ই-মেইলে, জাকার্তায়। "প্রাথমিক পর্যায়" যাকে বলে।

গুড্ডির বিয়ে হয়ে গেছে। বন্ধুদের এবারে বাড়ি ফিরে যাবার পালা। মিনির ভাবসাব দেখে বন্ধুরা রীতিমতো উদ্বিগ্ন।

—"মিনি, প্লীজ বোকামি কোর না। অনেকটা এগিয়ে দিয়েছি আমরা, এখান থেকে তুমি চালিয়ে যাও।" কমলা খোলাখুলি বলে দিল, "এবার বল কিন্তু তোমার কোর্টে।"

জুডিথ্ বলল—"আমাদের নেক্সট মিটিং কিন্তু তোমার বিয়েতে, ক্যালকাটায়। দ্যাটস ফিক্সড। রিমেম্বার, ইউ মাস্ট ট্রাই ফর ইট। বিনা চেষ্টায় জগতে কিছুই হয় না, প্রেম তো নয়ই। হি ইজ আ গ্রেট ক্যাচ!"

গুড্ডি বলল—"হ্যাঁ বাপু, ওকে কিন্তু আটকে ফেলতে হবে! ফ্রী ছেলে, কখন কোন মেয়ে পাকড়ে ফেলে কে বলতে পারে? মোটেই তোমাকে এরকম গা-ছেড়ে থাকলে চলবে না! প্লীজ উঠে পড়ে লেগে যাও, ঠিক তোমার ল্যাবে যেমন কাজ করো মন দিয়ে, তেমনি।"

BanglaBook.org

গাল ফুলিয়ে মিনি বল্লে—"যে-ছেলেকে যখন তখন যে কেউ পাকড়ে ফেলতে পারে, তেমনি ছেলে আমার সারা জীবনের জন্যে চাই না ভাই, থ্যাংক ইউ!" তবুও ফিরে যাবার সময়ে পই পই করে মিনিকে বলে দিল তিন বন্ধু—"সম্পর্কটা এখন দারুণ সম্ভাবনাপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে, দেখিস বাছা, আলস্য করে নষ্ট করিস না কিন্তু! ছেলেটা দারুণ ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছে, যেমন করে সাবধানে তোর ল্যাবের মাইক্রোবদের যত্ন করিস, তেমনি করেই নতুন এই সম্পর্কটাকে গ্রো করাবি। খুব যত্নে, সাবধানে, আস্তে আস্তে, বুঝলি? গেট টু নো হিম ফার্স্ট। দেয়ার্স নো হারি। বাট দেয়ার্স নট মাচ টাইম টু লুজ, আইদার।"

মিনি ঠাণ্ডা গলায় বল্ল—"আই হ্যাভ বেটার থিংস টু ডু।"

"ওসব ছাড় তো? বি সিরিয়াস। ইট্‌স হাই টাইম য়ু ফাউণ্ড সামওয়ান। উই'ল মীট আগেইন ইন ক্যালকাটা।" বলে হাই-ফাইভ করে শূন্যে হাত তুলে পাঞ্জা মেলালো চারজনে, সেই ছোটোবেলার মতো।

বিয়েবাড়ির উত্তেজনার মধ্যে এটা একটা রোমাঞ্চকর ফাউ। যে-গোপন কথাটি জানে কেবল চার বন্ধুই। —"আমরা তোকে ই-মেইলে তাগাদা দেবো কিন্তু, এবারে বাকি কাজটুকু তোমাকেই করতে হবে মিনি।"

লণ্ডনে ফিরলো মিনি আহ্লাদে ভাসতে ভাসতে। ল্যাবে গিয়ে দেখে তার পোষা প্যারাসাইটেরা আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটাকে একটা সুলক্ষণ বলেই ধরে নিল মিনি। প্রথমেই টুনিকে জানালো জাকার্তার কর্মকাণ্ড।

—"বাবা-মাকে কিন্তু এখনি কিছু বলিস না। কিছুই তো এগোয়নি। আগে একটু চেনা জানা হোক, যখন বুঝবি ঠিকঠাক, তারপরে বলবি। আমিই বলে দেব তখন।" মিনির কথা শুনে টুনি হতবাক। মেয়েটা পারল? সত্যি সত্যি? ইলেকট্রনিক প্রেমপত্র লিখতে সুরু করে দিল? গ্রে-টু—"প্রেম কোথায় পেলি? সবে তো আলাপ হচ্ছে। মাত্র দু'দিনে ছ'বার কথা হয়েছে, ই-মেইলে।"

—"দু'দিনে ছ'বার?...সে কি রে? এত কথা কী লিখেছিস রে?"

—"আমি তো লিখিনি। ওরাই লিখেছে। আর, ও।"

—"ও কী লিখেছে?"

—"ঐ তো, কোথায় কী পড়েছে, কী কী কাজ করেছে, কোথায় চাকরি করে।"

—"কত মাইনে পায়, বলেনি?"

—"না বোধহয়। কি জানি।"

—"কোথায় কোথায় পড়েছে রে?"

—"প্রথমে খড়্গপুর আই আই টিতে, তারপর ক্যালটেকে পি এইচ ডি, তারপর হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলে এম. বি. এ. করেছে।"

BanglaBook.org

—"বাব্বাঃ দা-রুণ কোয়ালিফায়েড ছেলে পেয়েছিস তো? আর তুই কী লিখলি?"

—"আমি কিছুই লিখিনি। বললাম না তোকে? ওরাই লিখে দিয়েছে আমার হয়ে, আমার স্কুল, কলেজ, আমার ল্যাব, আমার গানের কথাও লিখে দিয়েছে কমলা।"

—"ওর ফ্যামিলির কথা কিছু লেখেনি?"

—"ভাইবোন চারজন।"

—"আমাদের ডবল!"

—"তিন দিদি। তিনজনেরই বিয়ে হয়ে গেছে।"

—"ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স? হাইট? ওয়েট?"

—"লেখেনি।"

—"তোরটা জানিয়ে দিয়েছিস?"

—"নাঃ। আমি কেন বলব?"

—"কারেক্ট। ওকে কিচ্ছু এক্সট্রা ইনফরফেশন দেওয়া চলবে না। হবি? হবি কী, কিছু জানিয়েছে? মিউজিক হলে কী ধরনের মিউজিক' স্পোর্টস হলে কোন কোন স্পোর্টস, ফিল্ম না থিয়েটার, না রীডিং? কিছু খবর বলেছে? ডান্সিং ভালোবাসে?"

—"এখনও অত বলাবলির সময় হয়নি। বললাম তো, দু'দিন! হবে, হবে। ধৈর্য ধরবি তো?"

—মিনি ধীর স্থির। টুনিরই ধৈর্য ধরছে না।

—"জানবি, জানবি, অল ইন গুড টাইম।"

—"তুই যে এতটা পারবি মিনি, আমি কিন্তু সত্যি ভাবতে পারিনি!"

—"আরে? এটা প্রিম্যাচিওর কমপ্লিমেন্ট হয়ে গেল! আমি এখনও করিইনি কিছু। আমার কোনই ক্রেডিট নেই। সব চিঠিপত্র ওরাই লিখেছে।"

—"তাহলে দয়া করে এবার তুমি নিজে নিজে চিঠি লেখো?"

—"লিখব, লিখব।"

—"মিনি, ডোন্ট বি লেজী। একটা জিনিস যখন শুরু হয়েই গিয়েছে—"

—"ও ইয়েস, আই'ল ক্যারি ইট থ্রু—"

—"বাট হোয়েন?"

—"বলছি তো অল ইন গুড টাইম।"

—"ছেলেটাকে কেমন মনে হচ্ছে রে?"

—"এখনই আর কী বুঝব? মনে তো হচ্ছে ভালোই।"

—"লেটস কীপ আওয়ার ফিংগারস ক্রসড। তুই বরং আজই তোর প্রথম চিঠিটা লিখে ফ্যাল।"

"আঃ-হা! দিদি! ডোন্ট বাগ মি। প্লীজ! অত তাড়া কিসের? লিখব, লিখব।"

BanglaBook.org

মিনির লণ্ডনে এসে কী যে হলো! টুনির ঐ বিপুল উৎসাহ, উদ্যোগ সত্ত্বেও কিছুতেই আর রাণাকে ই-মেইলে চিঠির উত্তরটা দেওয়া তার দ্বারা হয়ে উঠছে না। ইতিমধ্যে পরপর রাণার অনেকগুলো ই-মেইল চলে এলো।

—"কেমন আছো? ভালোভাবে পৌঁছেছো তো?"

—"কী ব্যাপার? ল্যাবের সব কুশল আশা করি।"

—"চিঠি নেই কেন? শরীর ঠিকঠাক তো?"

—"বন্ধুরা বাড়ি চলে গেল বলে কি আমার প্রতি তোমার আগ্রহও বাড়ি চলে গেল?" টুনি খবর শোনে আর খেপে যায়।

—"মিনি, য়ু মাস্ট বি ক্রেজী। এভাবে কেউ একটা ইন্টারেস্টেড পার্টিকে ধ্বংস করে দেয়? তুই না দিলে তোর হয়ে আমিই উত্তর দিয়ে দেব কিন্তু!"

—"য়ু আর মোস্ট ওয়েলকাম!" একটু থেমে মিনি বল্ল, "ওনলি সঞ্জীব একটুও খুশি হবে না তাতে।"

এবার টুনির সুর পালটালো।

—"তবে তুই ওকে উত্তর দিয়ে দে একটা। প্লীজ। হি সীমস টু বি সাফারিং।"

—"তোর তাতে কী?"

—"নাঃ, আমার আর কী। মিনি! আই কান্ট স্ট্যাণ্ড ইট। ইয়োর স্টুপিডিটি ইজ আন্-বেয়ারেবল।"

—"কাম ডাউন, দিদি, কাম ডাউন। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ। লিখব। কিন্তু কী লিখি বল্ তো?"

—"বাঃ? তোর কি কিছুই বলার নেই ওকে?"

—"কী বলব?"

—"আরে তোর ল্যাবের কথাই বল্। তার চেয়ে ইন্টারেস্টিং কিছুই যদি তোমার মাথায় না আসে।"

—"ধুৎ। ল্যাবের কথা ও কী বুঝবে?"

—"না বুঝুক। সামথিং ইজ বেটার দ্যান নাথিং"—টুনি অস্থির। টুনি মরিয়া। কিন্তু মিনির নৈঃশব্দ্য আর ভাঙে না।

—"ওদের এতটা এফর্ট তাহলে পুরোটা জলে যাবে?"

—"ব্যাড লাক। কান্ট হেল্প ইট। এসব আমার দ্বারা হবে নারে দিদি। আয়াম নট কাট আউট ফর দিস সর্ট অফ থিং।"

এমনি সময়ে আবার একটা ই-মেইল এলো রাণার কাছ থেকে। একটা অ্যাটাচমেন্ট-এর পুঁটলি পাঠিয়েছে। সঙ্গে সেটা খুলতে কাতর অনুরোধ।

টুনির আদেশে অ্যাটাচমেন্টটা খুলল মিনি। সঙ্গে সঙ্গে তার কম্পিউটারে সাইমন আর গারফুংকেলের দ্বৈত স্বরের ঝংকার বেজে উঠল—

BanglaBook.org

...“Hello darkness my old friend
I've come to talk with you again
Because a vision softly creeping
Left its seeds while I was sleeping
And the vision
That was planted in my brain
Still remains
Within the sound of silence...
In restless dreams I walk alone...”

দুই বোন স্তব্ধ।

সাউণ্ড অফ সাইলেন্স বেজে যাচ্ছে কম্পিউটারে।

...“People writing songs that voices never share
And no one dare
Disturb the sound of silence...”

টুনি মিনির দিকে তাকালো। মিনি চোখ সরিয়ে নিলো।

—“Fools!” Said I, “you do not know,
Silence like a cancer grows!
Hear my words that I might teach you
Take my arms that I might reach you”...
But my words like silent rain drops fell
And echoed in the well of silence.”

গান থেমে যাবার পরেও অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো দুই বোন। তারপর ধরা গলায় টুনি বললো,—“নাউ হোঅট?”

—“আই'ল রাইট টু হিম।”

—“গুড ফর য়ু।”

সেদিনই ই-মেইলে বসলো মিনি।

অবশেষে রাণারও একটি অ্যাটাচমেন্ট এলো। অধীর আগ্রহে সেটি খোলবামাত্র দেবব্রতর নিচু গলা গমগম্ করে উঠলো ওর ক্যালিফর্নিয়ার. ঘরে—

—“যখন এসেছিলে, অন্ধকারে চাঁদ ওঠেনি সিন্ধুপারে চাঁদ ওঠেনি
হে অজানা তোমায় তবে জেনেছিলেম অনুভবে জেনেছিলেম
গানে তোমার পরশখানি লেগেছিল প্রাণের পরে...চাঁদ ওঠেনি...”

এখন ইনস্ট্যান্ট মেসেজ সিস্টেমের মাধ্যমে কথাবার্তা হচ্ছে। রোজ রাত্রে শুয়ে দুই বোনে প্রগ্রেস রিপোর্ট পর্যালোচনা হয়।

—“আজ কী বললি?”

—“বললাম ওখানে ল্যাবে কাজ করার সুবিধে টুবিধে কীরকম। ফেলোশিপ পাওয়া যায় কিনা।”

—“এইসব বললি?”

BanglaBook.org

—"আবার কী বলব? দিস ইজ ইমপর্ট্যান্ট। কাজ-টাজ কেমন হবে। কাজ করতে দেবে কিনা। আদারওয়াইজ আই'ল কল ইট আ ডে।"

—"কী বলল ও?"

—"বলল দারুণ ল্যাব। সব ব্যবস্থা করে দেবে। অনেক ফেলোশিপ আছে। তবে কি জানিস, গোড়ায় গোড়ায় তো ঐরকমই বলবে।"

—"অত জ্ঞানীর মতো কথা বলতে হবে না, যাঃ।"

—"বাঃ, আমি না বিগ্-জ্ঞানী? তোর মতন কি ইয়ার? সে ল' হোক আর যাই হোক ইয়ার তো।"

মিনি টুকুস টুকুস করে কথা বলে দিব্যি, কিন্তু লোকজনের সামনে চুপচাপ। টুনি ওকে বলে মিট্‌মিটে।

চ্যাটরুম থেকে ওদের এখন টেলিফোনে উন্নতি হয়েছে।

—"আজ কী বললি তোরা?"

—"বললাম এখানে দিনরাত বৃষ্টি, বিলেত দেশটা খুব গ্লুমি। তিনটে থেকে অন্ধকার নেমে যাচ্ছে, শীত শীত, কুয়াশা কুয়াশা, বিচ্ছিরি দিন। ও বলল, ওখানে ঝকঝকে রোদ্দুর, নাইস অ্যাণ্ড ওঅর্ম, রাত সাড়ে দশটা অবধি আলোয় আলো জীবন, লাইফ ইজ অলওয়েজ চীয়ারফুল ইন ক্যালিফর্নিয়া।"

—"হোপ সো! আচ্ছা মিনি, ওর দিদিরা তিনজন কিছু করে?"

—"একজন পড়ায়, একজন ডাক্তার, সবচেয়ে বড় দিদি হাউসওয়াইফ।"

—"বাড়িতে তাহলে চাকরির ট্রাডিশন আছে।"

—"বাঃ, ওর মা-ই তো একটা স্কুলের হেডমিস্ট্রেস ছিল। শি ওঅজ আ ওয়ার্কিং উওম্যান লাইক আওয়ার মম।"

—"দ্যাটস গুড নিউজ। তোকে চাকরি করতে দিতে হেজিটেট করবে না।"

—"আজ তোদের কী কথা হলো রে?"

—"জিজ্ঞেস করছিল কী কী খেতে আমি ভালোবাসি।"

—"সে কি?"

—"ও খুব ভালো রাঁধে। রান্না করে ওই আমাকে খাওয়াবে। সারা জীবন।"

—"তা-ই? তুইও তো খুব ভালো রাঁধিস।"

"সেটা বলিনি। ও রাঁধলে রাঁধুক না। নো হার্ম।"

—"রাঁধবে না। এখন বলছে।"

—"আই নো দ্যাট। বাবাও তো ভালো রাঁধে। কিন্তু রাঁধে কি? ওনলি ফর পার্টিজ। এও তাই করবে। মেন!"

BanglaBook.org

—"বাট হি মীনস্ ওয়েল।"

—"লুক্স লাইক ইট।"

—"আর কিছু বলেনি?"

—"স্মোক করি কিনা জিজ্ঞেস করল। বললাম করি না। ব্যাড নিউজ। ও কিন্তু স্মোক করে।"

—"ওটা ছাড়াতে হবে।"

—"রাইট। দ্যাটস আ মাস্ট।"

—"হবি কী কী জিজ্ঞেস করলি? কী বল্ল?"

—"স্পোর্টসে বলল, ক্রিকেট আর টেনিস। তো, আমেরিকায় তো কেউ ক্রিকেট খেলে না। দেশে নাকি টেনিস ব্লু হয়েছিল। এখনও খেলে।"

—"মিউজিক কী ভালোবাসে?"

—"গজল, আর জ্যাজ। আর আর্বান ফোক।"

—"গুড। আর রবীন্দ্রসঙ্গীত?"

—"বলল সব গানগুলো ওর মুখস্থ। দিদিরা ভীষণ গাইতো। হবি আর অতোটা ভালোবাসে না। কিন্তু আমার মনে হয় বাসে।"

—"কেন, তোর ওরকম মনে হলো কেন?"

—"শাপমোচনের কথা বলছিল।"

—"হঠাৎ?"

—"ছবি চাইছিলাম, তখন বলল, কেন? আমি তো তোমার ছবি চাইনি, আই'ল অ্যাকসেপ্ট ইউ অ্যাজ ইউ আর। বল্ল, 'শাপমোচনে'র রাজার কথা ভাবো। বাইরের রূপটা জরুরি নয়। অন্তরের রূপটাই আসল।"

—"তার মানে ওকে দেখতে ভালো না!"

—"তাই তো বল্ল। বল্ল আমি দারুণ ভালো ছেলে, তোমাকে লাইফ লং গ্যারান্টি দিতে পারি। বাট আই অ্যাম নট আ গুড লুকিং ফেলো। আগে থাকতে ছবি-টবি না দেখাই মঙ্গল।"

টুনি মিনির মনটা একটু খারাপ। কত মজার মজার কথা বলে। কি সুন্দর গভীর, উষ্ণ গলার স্বর। যাকে বলে, চার্মিং অ্যাণ্ড সেক্সি। চমৎকার সেন্স্ অব হিউমার আছে, হি ক্যান মেক ইউ লাফ। অথচ দেখতে ভালো হলো না। যাকগে। জীবনে তো আর সবকিছু পাওয়া যায় না। ইউ হ্যাভ টু মেক কমপ্রোমাইজেজ।

—"দিদি? ওর একটা খুঁত আছে কিন্তু!"

—"কী খুঁত আবার?"

—"বল্ল হি হ্যাজ আ স্লাইট লিমপ। একটা পা একটু ছোটো। ছবিতে বোঝা যাবে না।"

—"পা ছোটো? কোনটা?"

BanglaBook.org

—"জিজ্ঞেস করিনি।"

—"যাঃ, বাজে কথা বলেছে।"

—"কী করে জানলি?"

—"বলেছিল না টেনিস-ব্লু হয়েছিল? দেশে ক্রিকেট খেলত? সেসব কি করেছিল লিম্প করতে করতে? পা ছোট হলে সেটা আমাদের কম্‌লা আগেই জানাত। বুঝলি? তোকে খেপিয়েছে। তুইও যেমন!"

—"নো!"

—"ইয়্যাপ্।"

—"সত্যি বলছিস ঠাট্টা করেছে?"

—"নয় তো কী? স্টুপিড!"

—"আমার ওর জন্যে মনে খুব মায়া হচ্ছিলরে—এখন রাগ হচ্ছে।"

—"রাগের কী আছে? তোকে টেস্ট করছিল। তুই পাশ করে গেছিস।"

—"কেন টেস্ট করবে?"

—"ওটা কিছু না। মজা করছিল।"

—"বাট হি লায়েড টু মি—আমায় মিথ্যে কথা বলেছে।"

—"দূর ওটাকে লাইং বলে না। হি ওঅজ ওন্‌লি জোকিং।"

মিনি সামনা-সামনি একটু লাজুক একটু অমিশুক, এবার কিন্তু সুবিধে হয়েছে, ই-মেইলে, ফোনে তো মুখ-দেখাদেখির ঝামেলা নেই। তাই ওদের ভাবটা সহজে এগোচ্ছে। ক্রমে মাইনে জানা গেল।

—"হোঅট্ আ ফ্যাট পে-প্যাকেট! সত্যিকথা বলছে তো মিনি? ঠিক জানিস?" এবারে টুনিরই সংশয়ের পালা, মিনি নির্ভাবনা।

—"হোয়াই শুড হি লাই? জানে তো বাড়িতে ল' ইয়ার আছে—কাগজপত্তর দেখতে চাইবি তো তুই।"

—"আমার কথা জানে?"

—"জানবে না? বাঃ! মা-বাবার কথাও তো সব বলি। হি ইজ কোয়াইট ক্লোজ টু হিজ পেরেন্টস টু, যদিও দূরে দূরে আছে।"

—"ঐ ফিজিক্যালি দূরে থাকলেই বাপ-মার সঙ্গে ইমোশনালি সম্পর্ক ক্লোজ থাকে, বুঝলি?"

—"কেন আমরা কিছু খারাপ আছি, মা-বাবার সঙ্গে?"

—"আমাদের মা-বাবা স্পেশ্যাল।"

টুনি বলল, "এবার তো বাবা-মাকে বলতে হয়। তার আগে আরও কিছু ডিটেইলস জেনে নিতে হবে। বিয়ের পরে ওয়েস্টার্ন ক্লোদস পরতে দেবে তো? না রোজ

BanglaBook.org

রোজ শাড়ি পরে ল্যাবে যেতে বলবে? এ বিষয়ে কথা বলে নিতে হবে। খুব জরুরি।"

—"কথা হয়েছে," মিনি বলল,—"রাণা একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, আমি কী পোশাক পরতে পছন্দ করি। —আমি বললাম, ট্রাউজার্স। জিজ্ঞেস করল, শাড়ি পরতে পারি কিনা। আমি বললাম, ওনলি ইন পার্টিজ।"

—"কী বলল শুনে?"

—"বলল, তাতেই হবে। উইল ডু।"

—"ও কী পরতে ভালোবাসে জিজ্ঞেস করলি না?"

—"নিজে থেকেই বল্ল, হি লিভ্‌স ইন ব্লু জীন্‌স। বাট অফিসে বিজনেস স্যুট পরতে হয়।"

—"কী ড্রিংক করতে ভালোবাসে?"

—"বিয়ার খায়, ওয়াইন ভালোবাসে, নো হার্ড ড্রিংকস। মাঝে মাঝে কক্‌টেল্‌স ভালোবাসে। মার্গারিটা, ব্লাডি মেরি, এইসব।"

—"লাইক আস।"

—"লাইক আস।"

—"গুড। কিন্তু ছবি দিচ্ছে না কেন বল তো?"

—"কি জানি। বুঝছি না।"

—"তোর ছবিও তো দেখতে চাইল না। আশ্চর্য, ওর কি কিউরিয়সিটিও হয় না? মিস্ট্রি কিন্তু এটা আমার কাছে।"

—"আমাকে বলল, 'লুক্‌স্ আর কোয়াইট ইম্‌মেটিরিয়াল টু মি। আই ওয়াণ্ট টু নো দ্য পার্সন বিহাইন্‌ড দ্য লুক্‌স।'"

—"যত্তো পাকা পাকা কথা। লুক্‌স্ আর ইম্‌পর্ট্যাণ্ট। ছবি পাঠাতে জোর কর্।" মিনি এবারে জিজ্ঞেস করল রাণাকে "নট আ গুডলুকিং গায় মানে কী? মোটা, না বেঁটে? ট্যারা, না টেকো? ফল্‌স টীথ? উইগ পরো? আমাকে বাপু দেখতে ভালোই। ইউ আর নট টেকিং এনি রিস্ক। আমার ছবি না দেখলেও তোমার ক্ষতি নেই। কিন্তু তুমি যখন খারাপ দেখতে, তখন ডিটেইলস জানা দরকার। কেন খারাপ। কী কী খারাপ!" গভীর গলা সঘন করে রাণা উত্তর দিল—

—"বিউটি অ্যাণ্ড দ্য বীস্ট-এর চেয়ে রোমান্টিক রূপকথা কি আর হয়? ধরে নাও না আমাদের গল্পটাও তাই? বীস্ট-এর ডিটেইল্‌স চাও? শোনো তবে, শিং নেই। খড়্গ নেই। ল্যাজ নেই। খুর নেই। গজদন্ত নেই। গায়ে ডোরা ডোরা নেই। গলায় গলকম্বল নেই। গায়ে উলও নেই। আর কী জানতে চাও?"

খবর পৌঁছে গেল কলকাতাতে। রাণা তার মা-বাবাকে জানিয়েছে, তার সঙ্গে একটি বাঙালি মেয়ের ভাব হয়েছে। তারা থাকে লণ্ডনে। ভাবছে বিয়েটা সেরেই ফেলবে এবারে। শুনে মা-বাবা তো আহ্লাদে আশি খণ্ড! ভয় ছিলই প্রাণে, ছেলে যদি মার্কিনি

BanglaBook.org

বৌমা ঘরে আনে, তাঁরা তাহলে ঠিকঠাক তার উপযুক্ত হতে পারবেন তো? বাঙালি মেয়ে শুনেই বরিষে ধরা মাঝে শান্তির বারি।

বিধাতা পুরুষ সপক্ষে থাকলে যা হয় আর কি। টুনি-মিনির মা ঠিক ওই সপ্তাহেই কলকাতায় গেলেন হঠাৎ—দিদিমার শরীরটা খারাপ হয়েছে শুনে। যাবার আগে সুখবরটা তাঁকে দেওয়া হয়নি। রাণা মা-বাবাকে বলে দিয়েছে শুনেই টুনি তাড়াতাড়ি খবরটা বাবাকে জানালো আর কলকাতাতে ফোন করে মিনির সুসংবাদ এবং রাণার মা-বাবার টেলিফোন নম্বরটি মাকেও জানিয়ে দিল।

অবিলম্বেই কলকাতা সক্রিয়। দু'পক্ষের মধ্যে কথাবার্তা জমে উঠলো। আর নাতনীর শুভসংবাদ শুনেই দিদিমা অচিরে সুস্থ হয়ে গিয়ে বিয়ের বাজার বিষয়ে উপদেশ দিতে শুরু করলেন। আনন্দের হিল্লোল বইতে লাগলো। মেট্রো রেলে দু'বেলা টালিগঞ্জ-দমদম দৌড়োতে লাগলেন দু'পক্ষের হবু বেয়াই আর বেয়ান। একটা মোটামুটি তারিখও ঠিক হলো। পয়লা মাঘ। কিন্তু মিনির মা স্বচক্ষে পাত্র না দেখে ফাইনাল কথা দিতে রাজী নন। পাত্রপক্ষ ইতিমধ্যে লণ্ডনে স্পাই লাগিয়ে পাত্রীর ঠিকুজী কুলুজী জেনে নিয়ে স্যাটিস্‌ফায়েড। গণ্ডায় গণ্ডায় চেনা পরিচিত বেরিয়ে পড়েছে এঁদেরও। তবু মিনির মা ছেলে না দেখে তারিখ ফাইনাল করবেন না।

লণ্ডনে ফিরেই মা চললেন উড়ে ক্যালিফর্নিয়ায়, মিনি-সমেত, পাত্র দেখতে। অনেক বলা কওয়ার পরে একটা ই-মেইল ছবি পাঠিয়েছে রানা, একমুখ চুলদাড়ি গোঁফের জঙ্গলের মধ্যে গোল গোল সোনালি ফ্রেমের চশমা পরা দুটো হাসিহাসি দুষ্টু চোখ। পুলিশের হুলিয়ার মতো শুধু মুণ্ডুর ছবি। তবু ছবি দেখে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে দুই বোন। আহামরি না হোক, কুচ্ছিতও নয়। টেকো নয়, ট্যারাও নয়। এখন বেঁটে আর মোটা কিনা জানা বাকি রইল। ফর্সাকালো নিয়ে ওদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। ওটা মা-বাবাদের পাগলামি।

মিনি রাণাকে জিজ্ঞেস করল—"এয়ারপোর্টে তুমি কী পরে' আসবে? আমরা তোমাকে চিনবো কেমন করে?"

—"ছাপা শার্ট আর হাফপ্যান্ট। শর্টস।"

—"হাফপ্যান্ট?"

—"যা গরম!"

—"তুমি লম্বা, না বেঁটে?"

—"মাঝারি।"

—"মা প্রথম দেখবেন, হাফপ্যান্টে?"

—"তাতে কি? বিভিন্ন পোশাকে দেখবার জন্যে তো সারাটা জীবনই পড়ে আছে।"

প্লেন নামলো। শেষ মুহূর্তে লোভ সামলাতে না পেরে টুনিও ছুটি নিয়ে চলে এসেছে। বাবাই বেচারী কেবল আসতে পারেনি।

রাণা বলেছিল মাল নেবার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে। সেখানে ওইরকম কোনো মূর্তি দেখা গেল না। ওদের নিতে অবিশ্যি মিনির মামা মামী এসেছিলেন ওকল্যাণ্ড থেকে। ঠেলাগাড়িতে মাল তুলে, সবাই মিলে আকুল নয়নে ছাপা শার্ট আর হাফপ্যান্ট খুঁজছে। আশেপাশে যত হাফপ্যান্ট ঘোরাফেরা করছে, তারা কেউ ললিপপ চুষছে, কেউ মার হাত ধরে ঝুলছে। একমুখ দাড়িগোঁফ, গোল গোল চশমা, হাসি হাসি চোখদুটো কোথাও নেই।

টুনি হঠাৎ বল্ল—"মিনি! লুক্!" মিনি দেখলো। এবং বল্ল—

—"দিদি! কী হবে?"

—"কী আবার হবে। লেটস চেক্।" ওইদিকে হাফপ্যান্ট আর ছাপা শার্ট পরা, মাথা-কামানো চক্‌চকে, আফ্রিকান টাইপের দেখতে একটা ছেলে উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দাড়ি গোঁফ চশমা-টশমা কিছুই নেই। কিঞ্চিৎ ঘাড়ে-গর্দানে। খুব স্বাস্থ্যবান। ঢ্যাঙা। সেই ব্যক্তিও কাউকে খুঁজছে। মামা সাহস করে এগিয়ে গেলেন।

—"আপনি কি কাউকে খুঁজছেন?" খাস দক্ষিণী, জড়ানো, ধীর উচ্চারণে ছেলেটি বললো,—"হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার বৌ আর ছেলের আসার কথা।"

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল টুনি, মিনি, অ্যাণ্ড কোং। কিন্তু কেমন ছেলে রাণা? কথা দিয়ে কথা রাখে না?

এমন সময়ে দেখা গেল হাফপ্যান্ট, ছাপা শার্ট, চোখে কালো চশমা, কচি রবিঠাকুর টাইপের দাড়ি গোঁফ, আর পিঠে সরু লম্বা টিকটিকির ল্যাজের মতো একটা বিনুনী ঝুলছে, মাঝারি লম্বা, তামাটে রঙের এক ছোকরা চঞ্চলভাবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। ঘুরে ফিরে টুনি, মিনির দিকেই চোখ পড়ছে তার। মন্দ নয়, মোটামুটি সুদর্শনই। বাঙালি বলেই মনে হচ্ছে, ই-মেইলের ছবির সঙ্গে যদিও মুখের মিল নেই। সে অনেক সময়েই থাকে না। তাছাড়া দাড়িগোঁপের স্টাইল পালটে ফেলেছে। টুনি দৌড়ে গেল।

—"এক্সক্যুজ মি। আর য়ু ওয়েটিং ফর সামবডি?"

ছেলেটা গলে গেল। একগাল হেসে স্প্যানিশ ভাষায় গড়গড়িয়ে জবাব দিয়ে গেল খুব হাত-পা নেড়ে। ধুত্তোর। মেক্সিকান ছেলে। এই ক্যালিফর্ণিয়া মেক্সিকোর মানুষে ভর্তি। টুনি ফিরে এল।

রাণা তবে এল না।

মিনির বুক স্তব্ধ হয়ে এল।

—"এল না?" মার মনটা ভেঙে গেল। "আমরা এতদূর থেকে এলাম। শেষ মুহূর্তে ঘাবড়ে গেল? ভয় পেল কি বিয়ের দায়িত্ব নিতে? হে ভগবান!"

দিদি বলল—"কোলড ফীট! উইকলিং! হোঅট্ আ শেম!"

মিনি কিছুই বলল না। তার বুকের ভিতরে কী হচ্ছিল তা শুধু সেই জানে।

রাণাকে মামাবাড়ির ফোননম্বর দেওয়া হয়েছে। দেখি কী করে।

বাড়ি পৌঁছনোর খানিকবাদেই ফোন এল।

—"এসেছো? যাক—বাঁচা গেল! কিন্তু এয়ারপোর্টে তো খুঁজে পেলাম না তোমাদের? কোথায় ছিলে?"

—"তুমি গিয়েছিলে?"

—"নিশ্চয়। কোথাও কোনো মহিলা ও যুবতীকে তো দেখলাম না। দিশি পরিবার তো কম ছিল না এয়ারপোর্টে? গুচ্ছ গুচ্ছ!"

—"তুমি আমাদের দেখতেই পাওনি? দিদিও তো এসেছে। মামা-মামীমা ভাগ্যিস নিতে গিয়েছিলেন! নইলে শুধু তোমার ওপর ডিপেণ্ড করলে পথে বসতে হতো। প্রথম সাক্ষাতেই এই।"

"ওঃ! মামা-মামীমা-মা-দিদি-তুমি। আ গ্রুপ অফ ফাইভ? আমি তো অতবড় গ্রুপ দেখছিলাম না! আই ওঅজ লুকিং ফর দ্য টু অফ য়ু। আমি তো কেবল দু'জন মাত্র মা-মেয়ে খুঁজছি, তাই মিস্ করে গেছি।"

—"কিন্তু আমরা তো হাফপ্যান্ট দেখলেই দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছিলাম। তোমাকে তো দেখলাম না?"

ওদিক থেকে অট্টহাসি ভেসে এল।

—"আমি কি পাগল? ভাবী বউয়ের সঙ্গে প্রথম শুভদৃষ্টি হবে—ভাবী শাশুড়ী প্রথম জামাই সন্দর্শন করবেন—আর আমি হাফপ্যান্ট পরে যাব? আই ওয়াজ ইন মাই বেস্ট স্যুট। ন্যাচরালি!"

"অ্যাঁ? তবে কেন ওরকম বলেছিলে?"

—"ঠাট্টাও বোঝ না?"

—"ওটা ঠাট্টা?"

—"আবার কী?"

—"আজ তো অনেক রাত হয়ে গেছে। কাল আসবো।"

—"কখন? ব্রেকফাস্টে?"

—"ঠিক হ্যায়, চলা আয়েগা।"

—"ন'টা?"

—"ডান্।"

সকাল থেকে বাড়িতে প্রবল চাপা উত্তেজনা। কখন ঘণ্টি বাজবে? মামীমার লুচি আলুরদম তৈরি। ঘণ্টি আর বাজে না। ন'টাও আর বাজে না। দোতলার জানলার পর্দার আড়াল থেকে অস্থির হয়ে মা আর মামীমা ঘনঘন রাস্তা দেখছেন। হঠাৎ দেখলেন—ঐ ফুটপাথে অত্যন্ত সুপুরুষ, ছ'ফুটের ওপর লম্বা, নুন-গোলমরিচ রং একমাথা ঝাঁকড়া চুলের একটা ছেলে, ব্লু জীনস আর শাদা শার্টপরা, মাথা নিচু

BanglaBook.org

করে, সিগারেট হাতে, ভীষণ উদ্বিগ্ন-ভাবে জোরে জোরে পায়চারি করছে। ভারতীয় বলেই তো মনে হয়? ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সাহেবও হতে পারে। চোখে গোল গোল সোনালী ফ্রেমের চশমা আছে বটে, কিন্তু দাড়ি গোঁফের চিহ্ন নেই।

"ঐ কি?"

"কে জানে?"

শেষটায় বেল বাজলো। দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলল টুনি।

এবং স্তব্ধ হয়ে গেল।

ততক্ষণে দুড়দুড় করে মা-মামীমা নিচের তলায় হাজির। ঐ ছেলেই। হ্যাঁ, ঐ তো সেই ছেলেটিই।

ঘরে পা দিয়েই নিজের কাঁচাপাকা ঘন চুলের গোছার ভিতর আঙুল চালাতে চালাতে ছেলেটা বলল—"ওফ্‌ফ, কী যে করলেন না কাল আপনারা। সত্যি একটা হেভি কেলেংকারি। দেখুন তো কাণ্ড? এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনাদের খুঁজতে খুঁজতে দু'ঘণ্টার মধ্যে আমার সব চুলগুলো শুধু টেনশনেই পেকে শাদা হয়ে গেল?" বলতে বলতেই প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে ঝলমলে হাসিতে ঘর ঝলসে দিয়ে রাণা সোজা মিনির চোখে চোখে তাকিয়ে মিটিমিটি হেসে বলল—"কী? বেঁটে, না মোটা?" মিনি ঝরঝরিয়ে হেসে ফেললো। টুনি উত্তর দিল গম্ভীর হয়ে,—"ওটা কার ছবি পাঠিয়েছিলে?"

—"আমারই। ক্যালটেকে যখন পড়তাম। পি. এইচ. ডি ফাইনালের সময়কার আইডি কার্ডের মূর্তি।" আবার মিনি হেসে ফেললো। হাসি আর ধরে না। এবার টুনির দিকে তাকিয়ে, একটা চোখ টিপে, ভুরু নাচিয়ে, গলা নামিয়ে ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে রাণা বললো, "কী? একেবারে সোনার টুকরো ছেলে! তাই না?"

এতক্ষণে মিনি কথা কইল। বেশ স্পষ্ট গলাতেই বলল—"আমি কিন্তু হীরের টুকরো চেয়েছিলাম।"

ঘরভরা আহ্লাদী হাসির হুল্লোড়ের মধ্যে প্লেটে লুচি সাজাতে সাজাতেই মা চুপিচুপি মামীমাকে বললেন—"ঐ পয়লা মাঘই ঠিক করে ফেলতে হবে, আজই কলকাতায় ফোন করব আমরা। কি বল্?"

দেশ, শারদীয়া ২০০০

ঠাকুমার গল্প

রঞ্জন বিমর্ষ মুখে উস্কোখুস্কো চুলে দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে এসে ঘরে ঢুকল।

—"নবনীতাদি, ঠাকুমার—"

—"কী হয়েছে ঠাকুমার?" হাতের কাজ ঠেলে দিয়ে খাড়া হয়ে বসি।

BanglaBook.org

রঞ্জনের ঠাকুমাটি আমাদের বড় প্রিয়জন। নব্বই ছুঁয়েছেন—এই বয়েসে তো একটু ভয়-ভয় করেই।

—"শরীর খারাপ করেছে? কী হয়েছে ঠাকুমার?"

—"শরীর না। মাথাটা।"

—"সে আর নতুন কী! মাথা তো অনেকদিনই নিজের খেয়ালখুশিতে চলছে।"

—"এ অন্য পরিচ্ছেদ—ভিমরতি এখন ভয়াল পরিণতির দিকে! শনৈঃ শনৈঃ--" রঞ্জনটাকে নিয়ে বড্ড ঝামেলা। দুটো কথা বিশ্বাস করি, তো পরের তিনটে করি না। মুখচোখ দেখলে কিছুতেই টের পাওয়া যাবে না সত্যি বলছে না গুল মারছে। দুটোই তো অবিকল একরকমভাবে পরিবেশিত হয়। সত্যিটাকে মনে হবে গুল, আর গুলটা সত্যি! বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে হয় না, আবার বিশ্বাস না-করলেও ঠকে যেতে পারি!

—"ঠিক করে বল্ তো দেখি কী হয়েছে।" ঠাকুমার আমার প্রিয় মানুষ হবার বহু কারণ রয়েছে। তার কয়েকটা বলতে পারি। ধরুন, আপনি বনের মধ্যে হঠাৎ, একা, রাত্রিবাস করতে বাধ্য হয়েছেন। আপনার ভয় করছে। তখন যদি ঠাকুমা থাকতেন আপনার কাছে তিনি আপনার বালিশে তিনবার থাবড়া মেরে একটা মন্ত্র পড়ে দিতেন। মন্ত্রটা জরুরি। শিখে রাখুন! আমার তো যাযাবর স্বভাব, এখানে সেখানে হট্টমন্দিরে শয়ন করার সময়ে এই মন্ত্রটা খুবই কাজে লাগে।

বালিশে তিন থাবড়ার পর, বলুন

—"কপ্ ফোল। কপ্ ফোল। কপ্ ফোল।
সাপা-চোরা-বাঘা তিনে নিষ্ফল! নিষ্ফল! নিষ্ফল!
যদ্দুর যায় কপ্ ফোলের এই রা, ও
সাপ-চোরা-বাঘা তিনে না বাড়াও পাও,
যদি বাড়াও পাও, দোহাই আমার ওস্তাদের মাথা খাও
মন আমার গুরুদেবের পায়!!
ওম্ গুরু দেবঃ শিবঃ/গুরুদেবঃ শিবঃ/গুরুদেবঃ শিবঃ, ওঁ...ম্ ম্ ম!"

পরবর্তী স্টেপ, তিনবার, তিনদিকে ঘুরে ঘুরে ভক্তিভরে নমস্কার নিবেদন।

সেই মন্তর অবশ্যই শুনতে পাবে জগতের যত সাপ, চোর আর বাঘের দল। তিন গুষ্টির কেউই আর পা বাড়াবে না এদিকে—ওস্তাদের বাঁধন দেওয়া আছে না? একেবারে নিশ্চিন্দি! —শুধু আরশোলা আর মাকড়সার জন্যে ঠাকুমার কোনও মন্তর আছে কিনা জেনে নিতে হবে। এইটেই বাকি।

ঠাকুমার কীর্তিকাহিনী কি অল্প? খুব বিশিষ্ট মহিলা। এই সেদিন নীল আর্মস্ট্রং যে চাঁদে বেড়াতে গিয়েছিল, সেটাই টিভিতে আবার করে দেখাচ্ছিল। নাতিরা গিয়ে ঠাকুমাকে বলল—

BanglaBook.org

—"ঠাকুমা শুনেছ, কী হয়েছে? কী দেখলাম টিভিতে? চাঁদে মানুষ নেমেছে।"

—"কী? তুমি কী কইলা মনু? চান্দের কথাডা কী কইলা?"

—"চান্দে গিয়া মানুষ নামসে ঠাকুমা—চান্দ আর দূরে নাই—"

—"নামসে কও ক্যান? ওঠসে কইতে হয়। মানুষ আকাশে নামে কী কইর‍্যা? চান্দে ত ওঠা লাগে। এইয়া কি পুষ্করিণী? তা, সেই মানুষ করসে কীডা, চান্দে যাইয়া?"

—"ওই তো, হাঁটাচলা করছে, মানে ভেসে বেড়াচ্ছে আর-কি, পা ডুবে ডুবে যাচ্ছে তো, ভালো করে হাঁটা যায় না চাঁদের মাটিতে—"

—"আহা রে। পাও তো ডুইব্যা যাইবই। বর্ষাকাল না? এক্কেরে ভাইস্যা বেড়াইতাসে বেচারা? আহা হা। তা অহন না যাইয়া শুখা সিজনে যায় নাই ক্যান? অহন তো আকাশেও ম্যাঘ বিদ্যুৎ—চান্দে যাওন কি সহজ ভ্রমণ? পথখান কি কম? দেইখ্যা মনে হয় কাছেই —চান্দ কিন্তু বহুদূর। কতদূর জান? এক্কেরে হিমালয় পর্বত-টর্বত পার হইয়া কৈলাস পর্বতের কাছে"...বলেই হাত জোড় করে নমস্কার!

ঠাকুমার অভিনবত্ব বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। সবাই মিলে গুলতানি করছে নাতিরা। ঠাকুমা গুটিগুটি উপস্থিত।

—"ও মনু তোমরা কর কী? সাড়ে তিনটার অ্যারোপ্লেনেম উইড়্যা গেল, অহন তরা চা খাইবি না? এইডা তো তগো চা খাওনের টাইম। খ্যাল করায়া দিতাসি।" ঠাকুমা নিজে চা খান না।

বেলা সাড়ে তিনটের এরোপ্লেন! এরকমও হয় নাকি? আটটার মেল ট্রেন, দশটা পনেরোর প্যাসেঞ্জার, বড়জোর সাড়ে ন'টায় পাশের বাড়ির খুকুর স্কুলবাস—এসব হিসেব রাখতে পারে মানুষ। —তাই বলে সাড়ে তিনটের এরোপ্লেন দেখে ঘরের কাজকর্মের টাইম শিডিউল বানানো! হ্যাঁ, সাড়ে তিনটের সময়ে আকাশ দিয়ে একটা জেট প্লেন যায় এবং ঠাকুমা তাই দিয়ে বিকেলটা শুরু করেন। "লও লও সব তাস গুছাও এইবারে —চায়ের টাইম—সাড়ে তিনটার অ্যারোপ্লেনেন উইড়্যা গেসে গিয়া, সে-ই কখন...।"

সেই ঠাকুমার কি ভিমরিত হয়? তবে হ্যাঁ, ওঁর মাঝে মাঝে খেয়াল চাপে। নানারকমের উদ্ভট খেয়াল। নাতিরাও তার মোকাবিলার জন্য সদাসর্বদা প্রস্তুত। ওই ঠাকুমারই নাতি তো তারা!

যেমন, একদিন ঠাকুমার মনে হলো সকলেই তাঁকে গঙ্গাস্নান করাবে বলে কথা দিয়েছিল। কিন্তু কেউ কথা রাখেনি। যেমনই মনে হওয়া অমনই অ্যাকশন শুরু। একই কথা ননস্টপ রিপিট করে যাবার অদম্য ক্ষমতা অনেক ঠাকুমারই থাকে। ওঁরও আছে। সকাল থেকে যাকেই পাচ্ছেন তাকেই কথাটা একবার বলে নিচ্ছেন।

—"ও মনু তপন? ও বাপধন চন্দন? আরে আরে রঞ্জুইন্যা, পলাও কোথায়—তরা যে কইসিলা 'তোমারে গঙ্গাচ্ছান করাইতে লইয়া যামু ঠাকুমা', ত কই লয়্যা গেলি না তো?"

BanglaBook.org

—"ও বউমা। একবারডি গঙ্গাচ্ছানে লইয়া যাবা আমারে?"

—"ও তারাপদ, তোমার মায়েরে একবার গঙ্গাচ্ছান করাইয়া আনবা না তুমি? লয়্যা চল না বাবা—গঙ্গায় দুইডা ডুব দিয়া আসি গা? বড় প্রাণে লয়—"

অবশেষে নাতিরা ঠাকুমাকে পাঁজাকোলা করে কোলে তুলে দুটো ঘর পার করে দাওয়ায় নিয়ে এসে সিঁড়ি দিয়ে উঠোনে নামিয়ে এনে বলল—

—"এই তো, গঙ্গা। গঙ্গায় এসে গেছি ঠাকুমা, স্নানটা তবে সেরে নাও চটপট।"

ঠাকুমা চোখ বড় বড় করে রোদে খটখটে উঠোনের দিকে তাকিয়ে বললেন,

—"বাপ রে! জোয়ার আইছে! ঈস...কী বড় বড় ঢেউ! সমুদ্রের মতো লাগে।"

তারপর নাতিদের বললেন,—"আ-রে, তরা আমারে ধইর‍্যা থাক। ...আমি তো স্রোতে ভাইস্যা যাইতাসি—গায়ে তো শক্তি নাই—ওঃ জলের কী টান...!"

নাতিরা ঠাকুমাকে ধরে রইল। ঠাকুমা চোখ বুজে, নাক টিপে ধরে, গুনে গুনে তিনটি ডুব দিয়ে উঠলেন বিড় বিড় করে মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে। তিন নম্বর ডুবের পরেই হাত বাড়িয়ে দিলেন—"গামছাখান দেহি—", গামছা দেওয়া হলো। তারপর 'জয় জয় দেবি সুরধুনীগঙ্গে' গাইতে গাইতে গা মাথা মুছে ঠাকুমা আবার মহানন্দে নাতিদের কোলে চড়ে খাটে ফিরে এলেন। পুণ্যস্নান সারা!

—"আহ্! কী আরাম! শরীলখান য্যান্ জুড়াইয়া গেল। গঙ্গাচ্ছান বলিয়া কথা।"

এইটেকে যদি ভিমরতি বলে ধরা হয়, তবে এরকমটা তো নতুন কিছুই ঘটনা নয়। আজ তাহলে রঞ্জনের এত বিচলিত হবার কারণ কী?

—"কেন, ঠাকুমা নতুন করে কী করলেন আবার? এবার কি সমুদ্রস্নান? পুরীতে যাবেন?"

রঞ্জন গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল,—"জ্যাঠামশাইকে মেরে ফেলেছেন।"

—"সে...কী...!" আমার মাথাটা ঘুরে গেল। বিলেতের কাগজেই এসব পড়েছি কেবল। কী ভয়ানক!

—"সকালে উঠে দেখি ঠাকুমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। কাপড়ের খুঁটে নাকচোখ মুছছেন আর কাঁদছেন।" রঞ্জন বলতে শুরু করল।

—"ক্যান, ঠাকুমা কান্দো ক্যানে?"

—"আমার অমূল্যাডা আর নাই!"

—"হ্যাট! যততো বাজে চিন্তা! কে কইল নাই! জ্যাঠা এক্কেরে ফিটফাট। ঠিকঠাক।"

—"না। নাই। আমি জানি। সে নাই। তরা আমারে মিছা কথা কস। হা...রে...অমূল্যা...!"

BanglaBook.org

ঠাকুমা নাইবেন না, খাবেন না, কথা বলবেন না, একনাগাড়ে, হাপুস নয়নে, জ্বলজ্যান্ত জ্যাঠামশাইয়ের জন্য পুত্রশোকে কাঁদবেন। কার আর সেটা বরদাস্ত হয়! বাড়িসুদ্দু লোকে তাঁকে বোঝাচ্ছি জ্যাঠা দিব্যি আছেন, ফুর্তিতেই আছেন। কোন্নগর থেকে তেমন ঘনঘন গড়িয়া এসে উঠতে হয়তো পারছেন না ইদানীং—তাই বলে এমন অমঙ্গুলে কান্না কাঁদতে হবে?

ঠাকুমা কারুর কথাই বিশ্বাস করছেন না। "আমি জানি। তরা আমারে ভুলাস।"

প্রত্যেকে চেষ্টা করে হার মেনে গেলাম। এদিকে ফোনে ঠাকুমা কথাবার্তা কিছুই শুনতে পান না। জ্যাঠার সঙ্গে ফোনে যে কথা বলিয়ে দেব, তার উপায় নেই। কিছুতেই বুঝ মানানো যাচ্ছে না ঠাকুমাকে। অথচ মায়ের চোখের জলে নাকি সন্তানদের অকল্যাণ হয়—এ অশ্রু অবিলম্বে থামানো দরকার। সমূহ বিপত্তির শান্তি করতে জ্যাঠামশাইকে কোন্নগর থেকে সোজা ট্যাক্সি ভাড়া করে গড়িয়াতে নিয়ে আসা হলো। এবার ছেলেকে সশরীরে মায়ের সম্মুখে উপস্থিত করে দেওয়া হবে।

রবিবার সকালে জ্যাঠামশাই এলেন—হাসিখুশি। ট্যাকসি ভাড়াটা এখান থেকেই দেওয়া হয়েছে—জ্যাঠামশাই হাতে করে কোন্নগর থেকে চমৎকার মাখা সন্দেশ এনেছেন ঠাকুমার জন্য। এবারে সমস্যার অবসান।

আমরা নাচতে নাচতে গিয়ে বলি

—"ঠাকুমা, জ্যাঠামশাই এসেছেন।"

—"কে আইল?"

—"জ্যাঠামশাই।"

—"কার জ্যাঠা?"

—"আমাদের জ্যাঠামশাই।"

—"হেইডা কেডা?"

—"কেডা মানে? তোমার বড় ছেলে!"

—"সে তো অমূল্যা আছিল।"

—"হ্যাঁ, সেই তো। 'আছিল' আবার কী কথা? জ্যাঠামশাই এসেছেন তোমার কাছে।"

—"অমূল্যা আইছে?"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি তো।"

—"অমূল্যা এই বাসাতে আইছে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে আর বলছি কী? এই বাসাতে আইছেন। আমাদের জ্যাঠামশাই। তোমার অমূল্য।"

—"আইল কেমনে?"

—"ট্যাকসি করে।"

—"টেকশি কইরা? বা-পরে! খাড়াও দিনি, কাপড়খানা পালটায়্যা লই।"

BanglaBook.org

তাড়াতাড়ি তোরঙ্গ থেকে একটা তসরের কাপড় বের করেন। হুড়োহুড়ি করে সেটি গায়ে জড়িয়ে, সুতির কাপড়টা খুলে রেখে ঠাকুমা বললেন—

—"কই, কই গ্যাল অমূল্যা? দাও অরে ডাইক্যা দ্যাও। ঠিক কথা কও তো মনু?"

জ্যাঠামশাই ঘরে ঢুকে যেই নিচু হয়েছেন প্রণাম করতে, ঠাকুমা ঠিকরে সরে গিয়ে হাঁ হাঁ করে উঠলেন।

—"আহাহা থাউকগ্যা, থাউকগ্যা, পরনামে কাজ নাই—এই যে হাত তুইল্যা এমনি এমনি করিয়া নমো নমো কর, নমো নমো কর"—বলতে বলতে নিজের বুকের কাছে দুই হাত জড়ো করে ঠাকুমাও জ্যাঠামশাইকে ভক্তিভরে নমস্কার করলেন। প্রণাম করা, আশীর্বাদ করা, যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম বাদ। ঠাকুমার এহেন আধুনিকতা দেখে জ্যাঠামশাই একটু ঘাবড়ে গেলেন মনে হলো। বিজয়ার সময়েও তো এটা ছিল না। জ্যাঠামশাই চেয়ারে বসলেন। ঠাকুমা চুপচাপ তাঁকে মেপে যাচ্ছেন। কথা নেই। জ্যাঠার অস্বস্তি হলো। সাধারণত ঠাকুমার অনেক প্রশ্ন থাকে।

—"তা মা ভালো আছ তো?"

—"হ। আমি তো আছি ভালোই। তুমি কেমন আছ শুনি।"

—"ভালোই আছি।"

—"আইলা কী করিয়া?"

—"ট্যাকসিতে।"

—"টেকশি চলাচল করে?"

—"তা করে। খরচা আছে।"

—"খরচা তো থাকবই। এই পার-ওই পার বইলা কথা।

জ্যাঠা এবারে সন্দেশের বাক্স এগিয়ে দ্যান,—

—"মা, তোমার লাইগ্যা সন্দেশ আনছি।"

—"থাউক। ওইখানেই রাইখ্যা দাও। সন্দেশও নাকি বানায়? বা-ব্বাঃ।"

—"কেন বানাবে না? বেশ ভালো সন্দেশ—। অন্যরকম। একটু খেয়ে দ্যাখো।"

—থাউক। খাইয়া কাম নাই। ভালো না হইয়া পারে! কইখিক্যা আনছ। সহজ কথা? এক্কেরে ওইপার থিক্যা!"

—"ওই নামেই এপার-ওপার। সবই এক, মা।"

ঠাকুমা একটুখন চুপ করে থাকেন।

—"তা, খাও কী?"

—"মানে?"

—"মানে ভাতটাত খাইতে পার?"

—"হ্যাঁ...ভাতটাত খেতে পারব না কেন?"

—"রান্ধিয়া দ্যায় কে?"

BanglaBook.org

—"কেন, তোমার বউমা?"

—"আ-হাঃ! এইডা তুমি কী কইলা অমূল্যা! বউ-মা-ও?"

ঠাকুমা ডুকরে ওঠেন।

—"বউমাও? হায় হায় রে, আমারে এই খবরডাও কেও দেয় নাই? আমারে কেও কিসসুই কয় না, বউমার খবরখান আমারে দিলই না—", ঠাকুমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে দেন। জ্যাঠা এবারে মৃদু লাঠিচার্জের মতো মৃদু ধমক লাগান।

—"কী আবার খবর দিব? শুধু শুধু কাইন্দো না তো মা। তার যদি খবর কিছু হইত, তোমারে দিতই।"

ছেলের বকুনি খেয়েই ঠাকুমার কান্না বন্ধ। নাক চোখ মুছে,—"তা কও, বউমা আছে কই?"

—"ঘরেই? যাইব কনে?"

—"তা ভালো, তা ভালো। লগে লগেই আছ দুইজনায়। সেই ভালো। রান্ধিয়া বাড়িয়া দিতাসে। হেইখানে যাইয়াও সেবাযত্ন পাইতাসো বউমার। শুইন্যাও শান্তি।"

জ্যাঠামশাই দিশাহারা। কিছুতেই ঠাহর পাচ্ছেন না। ঠাকুমার আসল সমস্যাটি তাঁকে জানান হয়নি। ছেলেকে দেখতে চান, মন কেমন করছে ছেলের জন্য—এটুকুই বলা হয়েছে তাঁকে। জ্যাঠামশাইয়েরও নয় নয় করেও তো বয়েস পঁচাত্তরের ওপরে। ওসব অলুক্ষুণে কথা তাঁকে খুলে বলা যায় না। জ্যাঠামশায়ের মনে মনে নানারকম হোঁচট লাগছে, কিন্তু একটা জিনিস তিনি গিলতে পারছেন না।

—"মা, কও দেহি তুমি আমারে প্রণাম করতে দিলা না ক্যান? ঠিক কইরা কও—"

জিভ কেটে মাথা নেড়ে ঠাকুমা বললেন, "ছি, ছি, পরনাম করতে হয় নাকি। ওইপার থিক্যা আইস্যা তুমিই তো সক্কলের পরনাম নিবা। তা ভালো, আইছ আমারে দেখনের লেইগ্যাই আইছ, সন্দেশ লইয়া আইছ। খুব ভালো, কিন্তু তাও এট্টা কথা বুঝি না। তুমি আইলা কীভাবে?"

"তুমিই পরনাম—নিবা"-টা জ্যাঠামশাই বুঝতে না পারলেও আলোচনা চালিয়ে যান —মুখখানা যার পর নাই বিভ্রান্ত দেখাতে থাকে যদিও।

—"কইতাসি ত, ট্যাকসি কইরা! কয়বার কমু? শোন নাই?"

—"টেকসি ওইপারেও যায়?"

—"যাইব না ক্যান? যাইতে তো মানা নাই?"

—"না, মানে...আচ্ছা তুমি নীচে আইলা কীভাবে? হেইডা কও। নাকি, টেকসি এককেরে উপর অবধি চলিয়া যায়?"

জ্যাঠা এবার উদভ্রান্ত।

—"এইডা তুমি কী কইলা মা? ট্যাকসি তিনতলার উপ্রে উঠে নাকি? আমিই সিঁড়ি দিয়া নাইমা আইসা বড় রাস্তা থিক্যা ট্যাকসি ধরি।"

—"সিঁড়ি! সিঁড়ি দিয়া উপর-নীচ কর?"

—"না তো কি? তিনতালা বাসায় কি লিফট বানায় নাকি।"

—"অসুবিধা হয় না?"

—"না অহন পর্যন্ত তো হয় নাই। তবে ফিউচারের কথা কওন যায় না।"

—"তাহলে মনে হয় সিঁড়িডা কমপ্লিট করসিল রাবণে? আমি তো জানি, আধা-খ্যাঁচরা হইয়া পইরা আছে, কমপ্লিট হয় নাই—তাই জিগাইসি, নীচে আইলা কেমনে?"

—"রা-ব-ণের সিঁড়ি! আমি কি স্বর্গে আছি মা?"

এই কথাটায় মা ফোঁস করে উঠলেন।—

—"স্বর্গ না তো কী? তুমি হইলা গিয়া তোমার বাবার বড় পোলা। তুমি স্বর্গে যাবা না তো কি নরকে যাবা! তুমিই কও অমূল্যা—"

জ্যাঠার আর ধৈর্য থাকে না।

—"কিন্তু মা, হেইডা তো বহু পরের কথা, আগে তো মরি? অহন তো আমি বাইচ্যা আছি, স্বর্গে যামু, না নরকে যামু, এই প্রশ্নটা কেও করে নাই আমারে। তুমিই কইলা ক্যাবল।"

—"কী কইল্যা? তুমি বাইচ্যা আছ? অমূল্যা তুমি বাইচ্যা আছ? তুমি জীবিত? তুমি স্বর্গে যাও নাই? ওঃ হো-হো...আমার অমূল্যা মরে নাই রে—...আমার অমূল্যা বাইচ্যা আছে রে—...ওঃ হো হো—"...ঠাকুমার আনন্দাশ্রু ঝোরধারায় ঝরতে লাগল। এবং গলা ছেড়ে ওঃ হো-হো-কান্নাটা অবিকল মড়াকান্নার মতো শোনাতে লাগল। এর চাইতে সেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে—"অমূল্যা আর নাই"—কান্নাটাই ছিল ভালো।

জ্যাঠামশাই এতক্ষণে সবটা বুঝতে পারেন। ঠাকুমাকে জড়িয়ে ধরে জ্যাঠামশাই বললেন,

—"মাগো, আসো, তাইলে প্রণামডা অহন কইরা লই?"

—"লও, লও, কর না পরনাম তোমার যত ইচ্ছা। তখন কি জানি? আমি তো জানি তুমি ওইপার থিক্যা...তাই তো হড়বড় করিয়া শুদ্ধা কাপড়খানা পরিয়া আইলাম।"

জ্যাঠামশাইয়ের চিবুক ছুঁয়ে চুমু খেয়ে ঠাকুমা মিষ্টি করে হাসেন। তারপরে হাত বাড়ালেন,

—"কই দ্যাও তো দেহি সন্দেশডা যে আনছিলা? জিনিসখান কেমুন, দেখি খাইয়া—"

আমি হাঁপ ছেড়ে বলি, "যাক! সব ভালো যার শেষ ভালো!"

—"কিন্তু শেষটা ভালো কিনা সেটাই তো সংশয়। সেদিন, ঘন্টেশ্বরের পৈতের দিনে, সিরিয়াস কেলো করেছেন।" রঞ্জন গুছিয়ে বসেছে।

এতক্ষণে আমার চায়ের কথা মনে পড়ল। "চা খাবি তো? রঞ্জন?"

BanglaBook.org

—"আর কী আছে, সঙ্গে কী দেবে?"

—"আজকে হয়েছে মাংসের ঘুগনি।"

—"গ্রেট! লাগাও চা। ঘন্টের পৈতের দিনে বাড়িতে অত লোক, তার মধ্যে ঠাকুমা, বাবা, জ্যাঠা, কাকামণি প্রত্যেকের প্রেস্টিজ পাংচার করে দিয়েছেন। ব্যাপক কেলো।"

ঠাকুমার কেলোর কীর্তিগুলো শুনতে আমি সর্বদাই আগ্রহী।

—"কী কেলো রে? কী কেলো?"

"বাড়িতে উৎসব, সবাই জড়ো হয়েছেন। জড়ো হওয়া মানেই সবার আগে ঠাকুমার কাছে যাওয়া। তিন ছেলেই একত্রে উপস্থিত। জ্যাঠামশাই বেচারি তখনও স্বর্গের সিঁড়ির স্মৃতির দ্বারা তাড়িত—তাই তিনিই ঠাকুমাকে প্রণাম করে বললেন:

—"মা, আমারে চিনো?"

—"চিনুম না ক্যান?"

—"আমার নাম কী? কও দেহি।"

ঠাকুমা হঠাৎ জিব কেটে সলজ্জ ঘোমটা টেনে দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। তারপর চোখের কোণ দিয়ে মিটিরমিটির হেসে, ফিসফিস করে জ্যাঠামশাইকে প্রায় কানে কানে বললেন—

—"কমু কী কইরা? তোমার নাম যে আমারে লইতে নাই মনু? ভাসুরঠাকুরের নামে তোমার নাম দিসি কিনা! তুমি হইলা আমাগো বড় পোলা! সক্কলের আগে তুমি।"

শুনে তো সকলেই স্তব্ধ।

তাঁর ভাসুরের নামে নাম? মোটেই না। তাঁর ভাসুরঠাকুর তো ঠাকুর্দার দাদা-বাবাদের জ্যেঠামশাই হন, তাঁর নাম তো ক্ষেত্রপ্রসাদ। জ্যেঠুর নাম অমূল্য। কেসটা কী হলো! ঠাকুমাই বললেন—"আইচ্ছা, নামের গোড়ার অক্ষর কইয়া দিতাসি—স-য়ে ফ-য়ে আস্ফ দিয়া নাম শুরু! বাস! অইসে?" ঘরসুদ্ধ মানুষ বজ্রাহত। ক্ষেত্রপ্রসাদে স-য়ে-ফ-য়ে আস্ফ কই? সে তো কেবল স্ফটিকেই থাকা সম্ভব এ পরিবারে তো ওই নামের কোনও পূর্বসূরী আছেন বলে এখনও শুনিনি।

এই "স-য়ে-ফ-য়ে-আস্ফ" শুনে অবধি চেয়ারের পিঠ ধরে সেই যে দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন, জ্যাঠা আর বসেননি।

এবারে জ্যাঠা একা নন—বাবা, কাকা সকলেই বিচলিত হয়ে ঠাকুমাকে চেপে ধরলেন।

—"ঠিক কইর‍্যা কও দিনি মা? তোমার কয়ডা পোলা? তাদের নাম কী কী?"

কাকু বললেন, "মা, আমার পানে চাইয়া দ্যাখো! —কও তো আমি কে? আমার নাম কী?" কাকুর চ্যালেঞ্জের সামনে পড়ে ঠাকুমাও মরিয়া। আর চালাকি চলছে না। এবার ঠাকুমা পুত্রের চোখে চোখে সোজাসুজি তাকালেন।

BanglaBook.org

—"হঃ! তোমারে চিনি না? আমার পোলা, আমি চিনুম না। নাম শোনবা? ক্যান মনু, আপন আপন নামগুলো তগো মনে নাই? তবে শুইন্যা লও এই আমি কইয়া দিলাম।"

তারপরেই হঠাৎ নামতা পড়বার মতো গড়গড় করে একঝাঁক নাম আবৃত্তি করে গেলেন—

—"বনবিহারী-বিনোদবিহারী-বিমানবিহারী-পুলিনবিহারী-রাসবিহারী-তপন-স্বপন-চন্দন-রঞ্জন-কাঞ্চন। লও। আমার সব কয়ডা পোলা-পাইনের নাম। গইন্যা লও।"

ঘরসুদ্ধ শ্রোতা নির্বাক।

ঠাকুমার তিন সন্তান। অমূল্য, তারাপদ, সদানন্দ। কেউ এই লিস্টে নেই। তাদের পুত্রেরা অবশ্য আছে। কিন্তু বাকি পাঁচজন "বিহারী"বাবুরা যে কারা, পরিবারের কেউই বলতে পারল না। ঠাকুমা নামগুলি পেলেন কোথায়? নাতিদের নাম না হয় বোঝা গেল, —ছেলেদের নাম বিস্মরণ, সেও না হয় কষ্টেসৃষ্টে বোধগম্য হলো, কিন্তু ওই পাঁচটা উটকো নাম কাদের? ঠাকুমা যে ইষ্টমন্ত্রের মতো মুখস্থ আউড়ে গেলেন। বিরাট এক রহস্য সৃষ্টি করল ওই অচেনা নামাবলি। ওরা কারা?

রহস্যের মীমাংসা করলেন ঠাকুমারই ছোটভাই, আমাদের মামাদাদু। ঠাকুমার ওই একটিমাত্র ভাই। মামাদাদু বললেন, ওই পাঁচটিই তাঁদের পাঁচ দাদার নাম। মামাদাদুর জন্মের আগেই তাঁরা গত হয়েছেন মা শীতলার কৃপায়। ঠাকুমার বয়স তখন চার বছর। এই কারণেই মামাদাদুর নাম হয়েছে শীতলাচরণ। ঠাকুমার বিয়ে হয়েছে ন' বছরে। ঠাকুর্দাও দেখেননি এই সম্বন্ধীদের। কোথা থেকে যে তুলে এনেছেন ঠাকুমা শৈশবের বিস্মৃত নামগুলি, বসিয়ে দিয়েছেন নিজের সন্তানদের নামের সারিতে, তাঁর অতিপ্রিয়জনদের তালিকায়। কিন্তু "স-রে-ফ-রে-আস্ফ"টার সমাধান মামাদাদুও জানেন না। ওটার কিনারা হলো না।

এই ঘটনার উপসংহার বাকি আছে দিদি। এখানেই শেষ নয়। পরদিন সকালে উঠে ঠাকুমা মাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "বউমা, আমি কেডা?" এ-হেন অস্তিত্ববাদী প্রশ্নে মা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে স্থাণুবৎ। "কও দিনি? আমি কেডা?"

প্রায় গোপন কথা বলাবলির মতো ফিসফিস করে মাকে জিজ্ঞেস করলেন ঠাকুমা, ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে। অগত্যা তাঁর বউমা বললেন, "মা, আপনি আমার শাশুড়ি, এই বাড়ির কর্তামা, আনন্দমোহিনী।"

ঠাকুমা মন দিয়ে শুনলেন। তারপর ভুরু কুঁচকে, সন্দিগ্ধ সুরে বললেন, "আ—নন্দ মোহি—নী? হেইডা আবার কেডা? বউমা? ওই নামখান কার?"

মার প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা। তখন আমরা গেলাম অভয় দিতে। ওই লাইনেই নয়। ট্র্যাক বদল।

—"আরে! তুমি তো আমাদের ঠাকুমা, আমাদের চিনতে পারছ না?"

BanglaBook.org

—"আঃহা। তাই ক'। আমি তো রঞ্জন-চন্দনের ঠাকুমা। বাস্ বাস্ আর কইতে লাগব না। বুঝছি!"

রঞ্জন থামল। এই গল্পের টীকা হয় না। আমি শুধু চায়ের কাপটা এগিয়ে দিই। রঞ্জন চা-টা শেষ করে আবার শুরু করল।

—"মেজদির নাতি হয়েছে। তাকে নিয়ে এসেছে ঠাকুমার কাছে। ঠাকুমা বসে আছেন বিছানায়, তাঁর কোলে দেওয়া হলো। ঠাকুমা তো পুতিকে কোলে করে খুব খুশি। অনেক আদর করছেন, ছড়া কাটছেন। ফরসা ধবধবে ছোট্ট বাচ্চাটা, মাসখানেক, মাস দেড়েকের হবে,—তার পরনে কিছু নেই। কেবল কোমরে কালো ঘুনসিতে একটা তামার পয়সা বাঁধা। ঠাকুমা আদর করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন, "ভারি সোন্দর। এইডা কিডা হইসে? পোলা, না মাইয়া?"

সবাই সমস্বরে বলে উঠেছি, "কেন ঠাকুমা? ও তো তোমার কোলেই আছে; ছেলে না মেয়ে দ্যাখাই তো যাচ্ছে সেটা"—

ঠাকুমা কেমন লজ্জা পেয়ে গেলেন। আস্তে করে মাথা নেড়ে মৃদুস্বরে বললেন —"অতশত আমার মনে নাই, তরাই কইয়া দে আমারে—"

আমি এবারেও কী বলব, ভেবে পাই না, শেষে রঞ্জনই কথা বলে।

—"এ তো একরকম। কিন্তু গতকাল যা ঘটলো সেটা অন্যরকম। দুপুরের দিবানিদ্রার পর উঠে ঠাকুমার বেজায় ফুর্তি। ব্যাপক চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন। সারা মুখ উল্লাসে ঝলমল্ করছে, কণ্ঠস্বরে বিয়েবাড়ির ব্যস্ততা।

—"কই রে তপইন্যা, রঞ্জইন্যা, আমার চন্দনরঙটা, কই গেলি তরা সব? আয়, আয়, শীঘ্র আইস্যা আমারে তোল, আমারে তোল, আমারে পুড়া—ও সদানন্দ, ও তারাপদ, ও অমূল্যা, দৌড়িয়া আসো বাবারা, আমারে পুড়াও!" আমরাই দৌড়ে যাই।

—"ও ঠাকুমা, হলো কী তোমার? ও কী আকথা-কুকথা বলছ?"

—"আহা, আমারে পুড়াইবি আর কখন? আমি ত' মরসি। রাইতেই মইরা গিসি, তরা কেউ বোঝ নাই। আর বিলম্ব না, জল্দি জল্দি পুড়া আমারে—রাইত হইলে তো মোশকিল,—দিনে দিনেই লইয়া চল্"—

—"ছিঃ ঠাকুমা, অমন বলে না, তুমি মরবে কেন! ষাট! তুমি মরনি।"

—"হ, হ, আমি মরসি, আমি মরসি। আমার পোলাগুলা গেল কই? ডাইক্যা দে, পুড়াইতে ক' আমারে।"

—"আরে না, ঠাকুমা, মরনি তুমি। এই দ্যাখো, মরলে কি ব্যথা লাগে?" বলেই সাবধানে ঠাকুমার পায়ে এক রামচিমটি।

—"উঃ হ হ হ... ঈ... শ কী পাজি! মরা মানুষেরে ব্যথা দেয়। মরসি, তবু জ্বালাস? তগো লজ্জাশরম নাই?"

—"আহা, মরা মানুষকে কি ব্যথা দেওয়া যায়। তাহলে তো পোড়ালেও তুমি

BanglaBook.org

ব্যথা পাবে। পাবে না? তুমি বেঁচেই আছো ঠাকুমা। জিন্দা মানুষ তুমি।"

—"তরা পোলাপাইন, তরা কিসু বোঝো না। আমি বাসি য্যান মরসি। আর তরা কও মরি নাই। ল' ল' আমারে পুড়াইতে ল'।"

—"না গো ঠাকুমা। সত্যি বলছি, তুমি মরনি। তুমি স্বপ্ন দেখেছ। স্বপ্ন। চিমটিতে ব্যথা পেলে, দেখলে না?"

—"স্বপন ছিল ওইটা?"

—"হ্যাঁ ঠাকুমা। স্বপ্ন।"

—"মরি নাই?"

—"না, না, মরবে কেন?"

—"ঠিকঠাক কইতাসো তোমরা?"

—"ঠিকঠাকই কইতাসি ঠাকুমা, মর নাই তুমি। বাইচ্যা আছো। জিন্দা আছো। শ্বাসপ্রশ্বাস পড়তাসে তোমার। স্বপ্নই দেখসিলা তুমি।"

তৃপ্ত, উজ্জ্বল মুখখানি মুহূর্তের মধ্যে বিবর্ণ, নিষ্প্রভ, মলিন হয়ে গেল ঠাকুমার।

—"যাঃ, খোয়াবই দ্যাখতাসি ক্যাবল? এইবারেও মরণ হইল না তাইলে?"

খুব দুঃখী মুখে ঠাকুমা চোখ বুজে জপের মালা নাড়াচাড়া শুরু করে দিলেন। আপন মনেই বললেন,—"মরি নাই? দু—র ছাই।"

রঞ্জন চুপ করে গেল। স্তব্ধতা ভেঙে আমি বলি,—"ঘুগনিটা খা। ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। তারপর? আজকে কী বলছেন ঠাকুমা? আজ কেমন মুড?"

—"আজ? আজ যখন আমি বেরুচ্ছি আমাকে বললেন, 'রঞ্জইন্যা, তুমি কি নয়াপাড়ায় যাও? নয়াপাড়ার দাদুরে একবার দেইখ্যা আইস। ঘরদুয়ার সব বানের জলে ভাইস্যা গেসে, শিবমন্দিরের উচা চাতালে পইড়্যা আছে স্ত্রীপুত্র লইয়া গরুছাগলের লগে।' আমি বললাম, 'হ্যাঁ দেখে আসবো'।"

—"নয়াপাড়াটা কোথায়, রঞ্জন?"

—"ঠাকুমার ভেসে যাওয়া বাপের বাড়ি। বিরাশি বছর আগেকার বন্যার খবর নিতে পাঠিয়েছেন আমাকে।"

দেশ, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০০২

BanglaBook.org

পর্ব ৩

মিস্টার পত্রনবীশ, রাইটার

কাজ নিয়ে বসেছি সবে, দরজায় নক। বিরক্ত হলেও মুখ থেকে বেরিয়ে গেল ভদ্র সম্ভাষণ, সৌজন্যের অভ্যাস দুর্জনেরও থাকে। —"আসুন!"

হাতজোড় করে বিনম্র প্রবেশ ঘটল মিস্টার পত্রনবীশের।

মিস্টার পত্রনবীশ অনেকদিন ধরেই লেখালেখির চেষ্টা চালাচ্ছেন, আমার কাছে তাঁর যাতায়াত সেই সূত্রেই। তাঁর ধারণা আমি ওঁকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সমান রাইটার বানিয়ে দিতে পারতাম, ইচ্ছে করেই দিচ্ছি না। একটু এডিটিংয়ের অপেক্ষা। অনেকবারই তাঁকে জানিয়েছি সুনীলকে বড় লেখক বানানোর ক্রেডিটটা সম্পাদিকার নয়, খানিকটা ঈশ্বরের আর বাকিটা সুনীলের। নিজের বিষয়ে মিস্টার পত্রনবীশের প্রচুর বিশ্বাস—শুধু এতকাল একটা জরুরি সরকারি পোস্টে কাজ করছিলেন বলে যথেষ্ট মনোনিয়োগ করতে পারেননি। এবার অবসর নিয়ে পূর্ণ উদ্যমে লেখায় নেমে পড়েছেন। অর্থাৎ আমার কাছে ঘনঘন আসা শুরু হয়ে গেছে। নিত্যনতুন লেখা নিয়ে চলে আসছেন। পারেনও বাবা! অবসর নেবার পরে তাঁর হাত থেকে এত প্রেমের গল্প কেমন করে বেরুচ্ছে, সেটাও বিস্ময়কর।

মিস্টার পত্রনবীশের প্রধান সমস্যা তিনি বড্ড বেশি কথা বলেন। পত্রনবীশ না হয়ে তাঁর নাম হওয়া উচিত ছিল বাক্যবাগীশ। আপাতত তিনি প্রবল প্রয়াসে গল্পনবীশ হচ্ছেন। কিন্তু আমাদের কাগজে অতবার করে তাঁর গল্প ছাপানো সম্ভব হয় না, যদিও মাঝে মাঝে 'মনোনীত' ছাপাটা পড়েছে তাঁর রচিত লেখায়। মিস্টার পত্রনবীশের বাক্যের ছটায় তাঁকে সবিনয় অনুরোধ জানিয়েছিলাম, অফিসটাইমে না আসতে। বড্ড ডিস্টার্বেন্স হয় কাজের। ঘরসুদ্ধ হাত গুটিয়ে গল্প শোনে।

এখন মুশকিল হয়েছে।

আমার একলার কামরায় আমি কাজ করি। ডিস্টার্ব করলে একা আমাকেই করছেন। তাতে তাঁর সঙ্কোচ নেই। কেননা তিনি নিজেকে কুটুম্বজ্ঞান করেন—যেহেতু দুর্গাপুরে থাকাকালীন তিনি আমার ননদাইয়ের সহকর্মী ছিলেন, পাশাপাশি কোয়ার্টারে বসবাস ছিল তাঁদের।

চেয়ার টেনে নিয়ে নিজেই বসে পড়েন মিস্টার পত্রনবীশ।

—"নমস্কার, মিসেস ঘোষ। জানেন তো আমি আজকাল খুব কম কথা বলি।"

—"তাই নাকি?"

অবাক না হয়ে পারি না, এটাই যদি কারুর ওপেনিং সেনটেন্স হয়।

—"দেখবেন। এই তো এলাম? একদম, খু-ব অল্প কথা বলব। আগের সেই বাচালতা আর নেই। বয়সের একটা ওজন এসেছে স্বভাবে। আসবেই তো, আফটার অল আই অ্যাম আ রিটায়ার্ড পার্সন নাউ। কী? বলুন?"

—কি আর বলব। অল্প কথার তো নমুনা পেয়েই গেছি। আমি কলম তুলে নিই। সামনের ফাইলটা খোলাই ছিল।

—"কাজ করছেন?"

—"হ্যাঁ।"

চুপচাপ বসে বসে পেপারওয়েটটা নিয়ে খেলা করেন মিস্টার পত্রনবীশ। নিঃশব্দে খানিকক্ষণ সময় কেটে যায়।

তারপরে একটু খুকখুক কাশি।

—"মিসেস ঘোষ?"

—"বলুন?"

—"খুব জরুরি কাজ করছেন?"

—"কেন?"

—"একটা প্রশ্ন করতাম।"

—"কী প্রশ্ন?"

—"করব?"

—"প্রশ্নটা কী বিষয়ে?"

—"বলছিলাম...আপনার আমাকে দেখে কী মনে হয়?"

—"মানে?"

এবার কলম নামিয়ে রাখতেই হয়।

—"কী আবার মনে হবে?"

—"মানে, আমাকে দেখলে কি মনে হয় যে আমি চরিত্রহীন?"

আমার মস্তকে বজ্রপাত। ফর্সা মানুষ, টাক ঘিরে সাদা চুল, যাকে বলে সৌম্যকান্তি, মোটা ফ্রেমের চশমা, বেশ বেশিই পাওয়ার। আর পরনে যা আজকাল দেখাই যায় না সেই প্রাগৈতিহাসিক কাঁচিপাড় ধুতি, সাদা কেমব্রিকের কারুকার্যবিহীন পাঞ্জাবি, পায়ে পামশু, বর্ষাকাল, তাই হয়তো একটি মহেন্দ্র দত্তর ছাতা। এই চেহারাটায় চট করে "চরিত্রহীন" ছাপ লাগানো যায় না। "পয়লা দর্শনধারী"—নাঃ, দর্শনে অসচ্চরিত্রতার ইশারা নেই। নেহাৎ দুদুভাতু-টাইপ।

যারপরনাই করুণ চোখে চেয়ে আছেন।

—"কী বুঝছেন, মিসেস ঘোষ?"

নড়েচড়ে বসে বলি,

—"নাঃ। মনে হয় না।"

মুহূর্তেই দৃশ্যবদল। লাফিয়ে উঠলেন প্রায় মিস্টার পত্রনবীশ। মুখ উজ্জ্বল।

BanglaBook.org

—"হয় না তো? হয় না তো? আমার ছেলেমেয়েরাও তাই বলে। ওরা যতই বলে, 'না, না, বাবাকে মোটেই দুশ্চরিত্র দেখায় না,' ওদের মা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না। আপনাদের মিসেস পত্রনবীশের দৃঢ় ধারণা, তাঁর ফার্ম বিলিফ, যে আমার চেহারাখানা টিপিক্যাল চরিত্রহীনের চেহারা। 'ডার্টি ওল্ড ম্যান'-এর চেহারা। আমি নাকি গোপনে যত মন্দ কর্ম করি। আর মুখে তার ছাপ পড়ে যায়। এটা কি সত্যি? বলুন তো মিসেস ঘোষ?"

—"আপনার মুখে? গোপন কুকর্মের ছাপ? দাঁড়ান, দেখি।"

খানিকক্ষণ মন দিয়ে ওঁর মুখখানি নিরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, পরিদর্শন করি। নাঃ, ছাপ-টাপ দেখা যাচ্ছে না। বেশ নিপাট ভালোমানুষীর একখানা ছাপ আছে বরং। মৃণাল সেনের ছবিতে উদ্বিগ্ন, মধ্যবিত্ত বাবার পার্টে বেশ মানাবে।

—"নাঃ। একটুও না। আপনার ছেলেমেয়েরা ঠিকই বলে। আপনার স্ত্রীর কথায় কান দেবেন না"—বাক্যটা মুখে বলতে বলতেই কানে শুনতে পাই। কী ভয়ংকর বাক্য! "স্ত্রীর কথায় কান দেবেন না?" —নিজে একজন স্ত্রী হয়ে এমন দুর্বাক্য উচ্চারণ করছি কী করে? স্ত্রীমুক্তির মন্ত্র যে সব ধ্বংস করে দেবে এধরনের চিন্তাশূন্য দায়িত্বহীন আলাপন।

—"মানে, আপনার স্ত্রী নিশ্চয়ই ঠাট্টা করে ওরকম বলেন। সিরিয়াসলি মীন করেন না। ওকথাটা নিয়ে অত ভেবে কাজ নেই। অন্য কথা বলুন, শুনি। কিছু লিখলেন সম্প্রতি?" বলছি, বলতে বলতেই আবার মনে মনে জিব কাটছি এবং নিজের গালে নিজেই থাবড়া কষাচ্ছি। 'বাঁশ। তুমি কেন ঝাড়ে? এসো আমার ঘাড়ে।' এবার তো সেই লেখা আসবে আমারই টেবিলে।

—"লেখা?" আবার ঝলমল করে উঠলেন মিস্টার পত্রনবীশ।

—"সেই লেখার জন্যেই তো চরিত্রহীনতার অভিযোগ। আমি তো প্রেমের গল্প লিখতে ভালোবাসি, গিন্নির সেটা পছন্দ নয়। তাঁর ধারণা আমি লুকিয়ে প্রেম করি। প্রত্যেকটা গল্পের নায়ক আসলে আমিই, নায়িকারা সব বিভিন্ন মেয়ে। গিন্নির প্রবল রাগ, কেবল চেঁচান, বলেন কাগজ নষ্ট করছি কালি নষ্ট করছি সময় নষ্ট করছি। ওসব কিছুই সাহিত্য হচ্ছে না, কেবল আমার দুশ্চরিত্র স্বভাবের প্রতিফলন। ওগুলি বিনষ্ট করে দেওয়া উচিত। এবং আমার ছেলে-বৌ, মেয়ে-জামাই, প্রত্যেককে সেইসব কথা বলেন। বলুন তো মিসেস ঘোষ, এসব করা কি ঠিক?"

—'না, কক্ষনো ঠিক নয়। নিজেরা যাই করুন, ছেলে-বৌ, মেয়ে-জামাইকে এর মধ্যে টানা উচিত নয়। ওরা নিশ্চয় এসবে কান দেয় না?"

—"না, আজকালকার ছেলেমেয়েরা এসব ব্যাপারে খুব ঝরঝরে।"

মিস্টার পত্রনবীশ সায় দিলেন। "আমার ছেলেমেয়েরা এ ব্যাপারে মায়ের সঙ্গে সহমত হয় না বটে, কিন্তু আমার সাহিত্যজীবনে তাদেরও কোনও আগ্রহ নেই।"

কী আর বলব? ওঁর সাহিত্যজীবনে তো আমারও বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। সেই

কবেকার পুরনো স্টাইলে যত বস্তাপচা প্রেমের গল্প লিখে নিয়ে আসেন, আজকের যুগে প্রত্যেকটা অচল। ছাপা যায় না। দু'একবার ভ্রমণকাহিনী লিখেছিলেন, দিব্যি হয়েছিল, ছেপেছিলাম।

—"সাহিত্যজীবন ছাড়া আপনার জীবনে আর কী আছে, তাই বলুন! একটু চা?"

—"চা? অতি অবশ্যই। চা।" হঠাৎ চায়ের নামে এমন স্বপ্নিল চোখ হয়ে গেল কেন ভদ্রলোকের? আমাদের আপিসের লিকার-চা এমন কিছু আহামরিও নয়। আমি আর কিছু ভাববার আগেই মিস্টার পত্রনবীশ বলে ওঠেন—

—"অন্যের হাতের চা কতদিন খাইনি!"

—"মানে?"

—"মানে—আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন না সাহিত্য ছাড়া জীবনে আর কী আছে আমার? শুনবেন আমার দিনপঞ্জী? শুনুন তবে। একটু সময় আছে তো হাতে?

"আমার জীবন এখন চাকরের জীবন। আমি রিটায়ার করে রি-এমপ্লয়মেন্ট নিয়েছি। চাকরের পোস্টে। আমারই সংসারে আমি এখন চাকরি করি, চা-কর কথাটার যথার্থ অর্থেই। রোজ ভোরে উঠে গ্যাস জ্বালিয়ে চা করি।

"চা তৈরি করে প্লেটে বিস্কুট নিয়ে কাপে কাপে ঢেলে দুটো ট্রেতে নিয়ে প্রথমে দিই গিন্নিকে, তারপরে দিয়ে আসি ছেলে-বৌকে, তিন নম্বর ট্রে-টা তৈরি থাকে, চা ফ্লাস্কে ঢেলে রাখি। ছোট মেয়ে পরে উঠলে তখন খাবে। তারপরে টিভিটা খুব আস্তে চালিয়ে নিজের চা-টা নিয়ে বসি। কেননা তখনও কাগজ আসে না।

"একটু পরে কাগজ আসে, তখন কাগজ নিয়ে বাথরুমে যাই। কিন্তু সে সুখ বেশিক্ষণ নয়, কেননা বাজারে যাওয়া আছে। বাজার এলে তবে আপিসের রান্না হবে, গিন্নির আপিস আছে, ছেলের আপিস আছে, বৌমা কলেজে যাবে, নাতি-নাতনিরা ইস্কুলে যাবে। সকালে নাতি-নাতনিদের ব্যাপারটা বৌমাই দেখে, ওদের সাজিয়ে-গুজিয়ে পাঠিয়ে দিয়ে, বৌমা কলেজে বেরোয়। আমার ডিউটি থাকে দুপুরবেলায়। স্নান করে খেয়ে নিয়ে রেডি হয়ে থাকি। নাতি-নাতনিদের স্কুলবাস নামিয়ে দেবে বাড়ির কাছেই, কিন্তু ঠিক সামনে নয়। সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। ওদের হাত ধরে বাড়িতে নিয়ে আসা দরকার। গাড়িঘোড়ার রাস্তা। সেই থেকে ফ্রেশ রোল—নতুন ভূমিকা। চাকর থেকে উন্নীত বেবি সিটারে। নাতি-নাতনির ব্যাগ খুলে জলের বোতল, টিফিনবাক্স বের করে রান্নাঘরে রাখা। স্কুলের ইউনিফর্ম খুলে যথাস্থানে টাঙিয়ে রাখা। জুতোমোজা খোলা, তারপর তাদের একগ্লাস করে জল খাইয়ে স্নান করিয়ে দেওয়া। স্নানের পরে ভাত খাওয়ার পর্ব। এই স্নানপর্বে ও লাঞ্চপর্বে দাদুর প্রভূত আয়ুক্ষয়। নাতিটা কিছুতেই নাইতে যাবে না, টিভি খুলে বসে থাকবে। তাকে নাইয়ে দিতে হয় না, নিজে নিজেই পারে, কিন্তু সে নাইতে চায় না। নাতনির স্নানে অনিচ্ছে নেই, লক্ষ্মী মেয়ে। তার আবার যত দুষ্টুমি খেতে

বসে। নাতিটা দিব্যি লক্ষ্মী হয়ে চেটেপুটে খেয়ে নেয়। আর নাতনিকে গল্প বলে, টিভি দেখিয়ে, নানারকম প্রলোভনে ভুলিয়ে, দু'গরস খাওয়াতে পারলেই মনে হয় বুঝি এভারেস্ট বিজয় করেছি। একেবারে খেতে চায় না। বৌমা এসে রোজ রিপোর্ট নেয় ক'গরস ভাত খাওয়াতে পেরেছি। তারপর তাদের একজনকে ঘুম পাড়ানো চাই, আরেকজনের হোমওয়ার্ক করতে হয়। দু'জনের দু'রকম চাহিদা। নেক্সট ডিউটি তাদের নিয়ে বেড়াতে যাওয়া। একজন বলে এ পার্কে বল খেলতে যাবে, আর একজন বলে অন্য পার্কে দোলনায় দুলতে যাবে। সে এক কঠিন সমস্যা। বৌমা এসে যায় পাঁচটা নাগাদ, চার্জ হ্যাণ্ড ওভার করে দিয়ে, আমার ছুটি।"

"ছুটি মানে—?" আমিও মুগ্ধ হয়ে ওঁর দৈনিক কর্মসূচি শুনতে শুনতে এতই গভীরে প্রবিষ্ট হয়েছি যে প্রশ্ন পর্যন্ত করে ফেলেছি,—"ছুটি মানে?" চা শেষ করে বেঁটে গেলাশটি নামিয়ে রেখে মিস্টার পত্রনবীশ বললেন—"ছুটি মানে বেবি সিটারের ডিউটি থেকে ছুটি। ডিউটি বদল। পুনর্মূষিক। এবার ছোকরা চাকরের রোলে। গিন্নি এসে পড়বেন। ছেলে আসবে। চা, চিনি ফুরিয়েছে, দুধ আনো, কেউ হয়তো সিঙারা খাবে —এই রোল। ঐ একটু দোকানে ছোটাছুটি, একটু ফাইফরমাস। বাড়ির কর্তা যখন ছিলাম, ব্রেড উইনার যখন ছিলাম, তখন এই কাজকর্মগুলো কেমন করে হতো? তখন তো আমাকে কেউ কিছু করতে বলত না? গিন্নিই উঠে চা করতেন, ছেলে হাটবাজার করত। আমি যেহেতু রিটায়ার্ড, আমার অঢেল সময়, তাই আমার এখন অঢেল কাজ। সবাই আমার কর্মসংস্থান করতে ব্যাকুল।"

—"আরেকটা চা হবে নাকি?"

আমার সত্যি সত্যি মায়া হচ্ছে এবারে মিস্টার পত্রনবীশের প্রতি। কি জীবন সত্যি! আমি রিটায়ার করলে আমারও কি এমনি জীবন হবে নাকি? ফুলটাইম ডোমেস্টিক সার্ভিস?

—"হোক আরেকটা চা। চা-টা অনেক করে দিচ্ছে তো?" মলিন হাসেন মিস্টার পত্রনবীশ।

"তারপর? সন্ধেবেলায় কী করেন?" আফটার সিক্স, আফটার এইটের অভ্যেস আছে কিনা কে জানে—কেন মরতে এই প্রশ্নটা করতে গেলাম। কিন্তু না, যেমন ভেবেছিলাম তেমনিই।

—"ওই সন্ধেবেলাটাই আমার ছুটি মেলে বলতে পারেন। একটু টিভি দেখি। তারপর রাতে খেয়ে দেয়ে গিন্নি নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়লে, তখন আমার রিয়্যাল ফ্রীডম হয়। আমি তখন পাগল! আমি তখন শিল্পী। আমি তখন ইনসমনিয়ার রুগী। সারারাত ধরে লিখি। লিখি! লিখি! হোলনাইট প্রোগ্রাম। প্রতিদিন রাত্রে আমি কিছু না কিছু লিখবই। গিন্নি রাগ করেন। বলেন ভীষণ বেশি ইলেকট্রিক বিল ওঠে শুধু আমার এই রাত জেগে লেখার জন্যে। কিন্তু কী করব? ইনসমনিয়ার রুগীকে কিছু তো করতে হবে? গিন্নি বোঝেন না। লেখাগুলো হাতে পড়লে, ছুঁড়ে ওয়েস্ট বাস্কেটে ফেলে দেন। বলেন কিস্যু হয়নি! আমি তো লেখাগুলো লুকিয়ে লুকিয়ে রাখি, ডেস্কে

BanglaBook.org

তালাচাবি দিয়ে রাখি। আমার লেখালেখির ওপর মিসেসের কী যে রাগ, আমি বুঝি না। কেবল বলেন—'আমার সারাটা জীবন-যৌবন ধ্বংস করে দিয়েছে আমার এই নেশা।' নেশা? নেশা? নেশা ছাড়া আর কিছু নয়? যেমন মদ, যেমন জুয়া, যেমন রেস খেলা, তেমনিই নাকি আমার এই লেখার বাতিক। এরজন্যেই নাকি উনি জীবনে সুখ পাননি। আশ্চর্য কথা। সারাজীবন উনি চাকরি করলেন, যখন খুশি ইচ্ছেমতো বাপের বাড়ি গেলেন, শ্যালককে নিজের কাছে রেখে পড়াশুনো করালেন, যা চেয়েছেন তা-ই পেয়েছেন, তবু বলেন কিছু পাইনি। এই লেখালেখির জন্যেই নাকি ওঁর সুখ-বঞ্চিত জীবন কেটেছে। জানেন? এইসব কথা সর্বসমক্ষে আমাকে দিবারাত্র বলেন। আর বলেন আমার কোনদিনই স্বভাবচরিত্র ভালো নয়। গুপ্ত প্রেমে মজে আছি, যার প্রকাশ শুধু আমার গল্পেই। উনি নাকি সব বুঝতে পারেন। কী বলবেন বলুন? এত বয়েস হয়েছে সন্দেহবাতিক এখনও গেল না? ঐ জন্যে কবিতা লেখা ছেড়েছি, প্রেমের কবিতা লিখলেই বলবেন—'এ তো আমি নই? এ তবে কে?' মনটা এত ক্ষুদ্র, এত নীচ, এত গণ্ডীবদ্ধ, শিল্পের মূল্যই নেই ওঁর কাছে। আমি সারাজীবন যাঁর কাছে বিকিয়ে রইলাম, সেই সাহিত্যসাধনা ওঁর কাছে 'হিজিবিজি লেখালিখি' ছাড়া কিছু নয়। কত লেখাই যে আমার ছিঁড়ে ফেলেছেন, ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন, নুটি পাকিয়ে জানলা দিয়ে রাস্তায়। ছেলেমেয়েরা বড় হবার পরেও এগুলো করেছেন। বৌমা আসার পরে আর করেন না, কিন্তু করার ইচ্ছেটা আছে ষোলো আনা।" মিস্টার পত্রনবীশ রুমাল বের করে চশমা খোলেন।

—"যাক। এসব কথা থাক। ভ্রমণকাহিনী-টাহিনী লিখলেন নাকি আর কিছু?"

—"ভ্রমণ করলে তো কাহিনী হবে?"

—"বেশ তো, যান না, কোথাও ঘুরে আসুন, এখন অফিস নেই, কত তো ট্রিপস দিচ্ছে, সিনিয়র সিটিজেনদের কনসেশনও রয়েছে, রোজ কাগজে দেখি—আচ্ছা, আপনার সমুদ্র ভালো লাগে, না পাহাড়? নাকি তীর্থভ্রমণ পছন্দ?"

—"আচ্ছা মিসেস ঘোষ—এগুলো কি প্রশ্ন হলো? একলা আমার পক্ষে বেরুনোই সম্ভব নয়, প্রচুর সংসারের কাজ থাকে। যখন সকলের ছুটি হবে, সবাই মিলে যাওয়া যাবে, তখনই বেরুনো সম্ভব হবে।" উদাস চোখে মিস্টার পত্রনবীশ জানলা দিয়ে বাইরের কাকটাকে নিরীক্ষণ করেন।

—"নতুন লেখাটেখা বেরুলো নাকি আর কোথাও? কোনও কাগজে?"

খুব চকচকে চোখে ফিরে তাকালেন এবারে মিস্টার পত্রনবীশ।

—"বেরিয়েছে। দুটো বেরিয়েছে। একটা রানাঘাটের 'বিতংস'তে, আরেকটা 'হলদিয়া সমাচারে'র রবিবাসরীয়তে। হলদিয়াতে আমি কিছুদিন ছিলাম তো, ওখানে চেনাশুনো আছে। আর ঐ রানাঘাটে আমার বড় মেয়ে-জামাই থাকে। মেয়েটার খুব মায়া। ও প্রায়ই লিটিল ম্যাগাজিনে আমার লেখা পাঠায়। মেয়ের জন্যে আরও অনেক লিটিল ম্যাগাজিনে আমার লেখা বেরিয়েছে জানেন? 'শুভসন্ধ্যা' বলে একটা

BanglaBook.org

খবর কাগজ আছে, সন্ধেবেলায় বেরোয়, তার সাহিত্যপৃষ্ঠায় একটা—'ঐন্দ্রিলা' বলে ত্রৈমাসিকের নববর্ষ সংখ্যায়, 'সারস্বত' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষে, ওটা বার্ষিক পত্রিকা--বহরমপুর থেকে বের হয়। সবই আমার মেয়ে পাঠিয়েছে। ও নিজেও লেখে একটু আধটু। আর যখনই 'মনোনীত হয়েছে' বলে সম্পাদকের চিঠি আসে, আমি সেই চিঠিটা নিয়ে টেলিফোনের সামনে রেখে দিই। তাহলে গিন্নির ঠিক চোখে পড়ে। ছেলে-বৌ সকলেরই নজরে পড়ে। ঐখানটাই ম্যাক্সিমাম অ্যাটেনশান যায় বাড়িতে--ঐ টেবিলেই সবারই মেসেজ-টেসেজ, বিল-টিল রেখে দিই। তাই লেখার অ্যাকসেপটেন্স লেটার এলেই সোজা ওই টেলিফোনের সামনে, ব্যস! ফর ওয়ান অ্যাণ্ড অল টু সী!" একগাল হাসলেন ভদ্রলোক,—"তা, মিসেস পত্রনবীশ সে চিঠিও নিয়ে গুল্লি পাকিয়ে ওয়েস্ট বাস্কেটে ফেলে দিয়েছিলেন সেদিন। ঐ যে ঐ হলদিয়ার চিঠিটা যখন এল। খানিক পরে দেখি, সেটি ওখান থেকে বের করে, কোঁচকানো কাগজটাকে আবার টেনে টেনে যথাসাধ্য সোজা করে, আমার বৌমা কাগজটা আমাকে ফেরত এনে দিলে, 'বাবা, যত্ন করে এটা রেখে দিন, জরুরি কাগজ'—বলে। আজকালকার ছেলেমেয়েরা এসব ব্যাপারে বেশ ঝরঝরে। আফটার অল ওরা তো সব টোয়েন্টিফার্স্ট সেঞ্চুরির—। আমার মিসেস চাকরি করলে কী হবে, আধুনিকা হতে পারেননি মোটেই, আমাকে এতটুকু বিশ্বাস করেন না। আর আমার লেখার ওপরে তাঁর কী যে জাতক্রোধ। বলেন ওই লেখাই তাঁর সতীন।

"অথচ বলুন তো মিসেস ঘোষ, বিট্যুইন ইউ অ্যাণ্ড মি, সত্যি বলতে কি আমি তো মোটে রাইটার হতেই পারলুম না—চেষ্টা করতে করতে বয়েস পেরিয়ে গেল, আর চান্স নেই—নিজের মনে মনে তো বুঝি সবই—অথচ তাতেই ওঁর এত ঈর্ষা। এত ঈর্ষা।

"আর সত্যি সত্যিই যদি রাইটার হয়ে যেতাম? লোকে যদি আমাকে চাইত? মেয়েরা চিঠি লিখত? তাহলে উনি কী করতেন? ভাবতে পারেন মিসেস ঘোষ?"

আমার দিকে আকুল চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে রয়েছেন মিস্টার পত্রনবীশ। পেপারওয়েট নিয়ে নিঃশব্দে নাড়াচাড়া করার পালাটা এবারে আমার।

বিনোদন বিচিত্রা, শারদ সংখ্যা ২০০২

বিমাতা

ছোড়দিভাই খুব বিচলিত অবস্থায় এলেন। এক গ্লাস জল খেয়ে পাখা খুলে খাটে গা এলিয়ে দিয়ে বললেন—"কি রে? বাস্তু?"

—"এই তো, পুজোর লেখা।"

—"কী আর লিখবি খুকু। জীবনে যা দেখছি তা তোরা যদি লিখিস, পাঠক বিশ্বাস করবে না। বলবে বাড়াবাড়ি। শেকসপিয়র কি সাধে বলেছিলেন—স্বর্গে-মর্ত্যে অনেক কিছু আছে যা হোরাশিওর বুদ্ধির নাগালের বাইরে?"

—"ভূত দেখে এলে নাকি ছোড়দিভাই?"

—"ভূত হলে তো বোঝা যেত। মানুষ দেখে এলুম।"

—"ও বাবা! কীরকম মানুষ?"

—"শুনবি গপ্পোটা? এখন তো ব্যস্ত আছিস, পরে বলব। ঘটনাটা আমাকে ফ্ল্যাট করে দিয়েছে।"

—"আরে বাবা এত কৌতূহল সৃষ্টির পরে 'পরে বলব' বলে না। এক্ষুনি বলো। গপ্পোটা না শুনলে কিছু লিখতেই পারব না।"

—"তোকে বলেছিলুম না আমার বন্ধু শিপ্রার মেয়ের বিয়ে? সেই বিয়ে নিয়ে কদিন ব্যস্ত থাকব? সেই বিয়েবাড়ির গল্প।"

শুনেছিলুম শিপ্রার মেয়ের দারুণ ভালো বিয়ে হচ্ছে। জামাইটি সবদিক থেকে মনের মতো। ব্রিলিয়ান্ট ফিজিসিস্ট—আমেরিকা থেকে এসে টাটা ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চের ওখানে সায়েন্টিস্ট হিসেবে কাজ করছে। শিপ্রার মেয়ে মিত্রাও ফিজিসিস্ট। ওখানেই চাকরি করে। সেখানেই দুজনের আলাপ পরিচয়। ছেলেটা যেমন গুণী, তেমনি বাড়ির অবস্থাও খুব ভালো। দাদামশাইয়ের সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী—উত্তর কলকাতায় বাড়িঘর, বারুইপুরে পুকুরসুদ্ধ বাগানবাড়ি, কী নেই? আবার ঠাকুমারও একই নাতি—ভবানীপুরে সম্পত্তি পেয়েছে। এলগিন রোডের কাছে। বাবা ডাক্তার, বাইরে প্র্যাকটিস করেন। মা প্রফেসর, তিনি কলকাতায় থেকে ছেলের ঠাকুমা-দিদিমার দেখাশুনো করেন। দাদুটি সম্প্রতি মারা গেছেন। ছেলে মামাবাড়িতেই মানুষ। মা একমাত্র সন্তান কিনা বড়লোক দাদুর। বিদেশে চলে যেতে দেয়নি বোধহয় একমাত্র সবেধন নীলমণিটিকে। শিপ্রার মেয়ে মিত্রাও যথেষ্ট ব্রিলিয়ান্ট—তার যে বিয়ের পরেও রিসার্চ করতে অসুবিধা হবে না, এটা মস্ত কথা। বিয়ে তার কেরিয়ারে বাধা দেবে না। আর সবচেয়ে বড় কথা, দুজনে একই জায়গায় থেকে ঘরসংসার কাজকর্ম দুটোই করতে পারবে। ছেলের বাবা-মার বেলায় যেটা হয়নি। দুজন থেকেছে দুটো দেশে। মা কলকাতায়, বাবা ম্যাঞ্চেস্টারে।

বিয়েবাড়িতে গিয়ে চোখ ছানাবড়া। বরের রূপ যেন ফেটে পড়ছে, যাকে বলে দিব্য-কান্তি কন্দর্পনিন্দিত কান্তি, তাই। এমনকী চুলগুলো পর্যন্ত সোনালি ঘেঁষা—রংটা কাশ্মীরীদের মতন ফর্সা, বাঙালি ফর্সা নয়, খাড়া নাক, ঝাঁকড়া সোনালি চুল, চশমার তলায় নীল নীল চোখের তারা। সকলেই মুগ্ধ। মিত্রাও সুন্দরী—কিন্তু এমন ফিল্মস্টারের মতো নয়। ছেলের বাবা, মা, ঠাকুমা, দিদিমা সবাই এসেছিলেন, সকলেরই বেশ রূপবান চেহারা, এত বয়সেও ঠাকুমা সুন্দরী, কিন্তু ছেলের কাছে তারা কেউ লাগে না। পূর্বপুরুষের রক্ত কখন কীভাবে যে প্রকাশ পায়। সকলেই শিপ্রাকে জামাইয়ের

রূপ নিয়ে অভিনন্দন জানাতে লাগল, বেচারির গুণপনা যেন নিষ্প্রভ হয়ে পড়ল রূপের ঝলসানিতে। আমিও বলে ফেলি—"শিপ্রা, আমাদের জামাই যে সায়েবদের হার মানিয়ে দেয়।" শিপ্রা ফিসফিস করে বললে—"ছেলের মামারবাড়ি সোনার বেনে না? সোনার বেনেদের মধ্যে নীলচোখ খুব পাওয়া যায়—মহারাষ্ট্রের চিৎপাবন ব্রাহ্মণদের মতো। বেনেরা এককালে প্রচুর সাহেব-সেবা করেছে।"

দিন দুয়েক পরে, আমি আর শিপ্রা ফুলশয্যার তত্ত্বের ট্রেগুলো নাম্বারিং করছি। লিস্ট বানাচ্ছি। ফাঁকা ঘরে কেবল আমরা দুজন। দুপুরবেলা। শিপ্রা বলল,—"তোকে একটা গল্প বলি, শোন্। কাউকে না বললে আমার মনে শান্তি হচ্ছে না। এটাও আরেকটা গল্প। একটি বাঙালি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হলো এক সদ্য পাশকরা ডাক্তার ছেলের। ছেলেটি বিধবা মায়ের এক সন্তান। ভালো ছাত্র। কনেটি ব্যবসায়ী বাপের একমাত্র সন্তান। সুন্দরী, আই এ পাশ করেছে সদ্য। বিয়ের পরে ছেলেটি শ্বশুরের পয়সায় বিলেতে গেল FRCS পরীক্ষা দিতে। দু-একবার বুঝি পাশ করতে পারেনি প্রথমে। তারপরে পাশ করে চাকরিও পেয়ে গেল। কিন্তু দেশেও আসে না, বৌকে নিয়েও যায় না, মাকে টাকাও পাঠায় না, যদিও চাকরি করছে। তারপর চিঠিপত্র দেওয়াও বন্ধ করে দিল। মেয়ে ইতিমধ্যে বি এ পাশ করে গেছে।

চিঠিপত্রও বন্ধ করায় শ্বশুরমশাই খুব বিচলিত, নানাভাবে খোঁজ নিতে শুরু করলেন —তার কোনও খবরই পাওয়া গেল না লণ্ডন শহরে। হঠাৎ একটা উড়ো খবর এল। সেই ছেলে এখন আমেরিকাতে গিয়ে বিয়ে-থা করে সংসার করছে। ওখানেই কাজকর্ম করছে। কিন্তু কোথায়, কেউই বলতে পারল না—অনেক লোক লাগিয়েও জামাইয়ের সন্ধান পেলেন না শ্বশুরমশাই। মেয়েকে এবার তিনি নিজের কাছে ফেরত নিয়ে আসাই স্থির করলেন। মেয়ে বললে, "শাশুড়িমাকে ফাঁকা বাড়িতে একলা ফেলে কী করে যাই? তাঁর একমাত্র সন্তান হারিয়ে গেছে। আমি তাহলে মাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাব। ওঁকে দেখার কেউ নেই।" শাশুড়িটি খুব ভালোমানুষ। বৌমাকে যত্ন করেছেন, মেয়ের মতন ভালোবেসেছেন এতদিন, বৌমারও মনে ভালোবাসা জন্মেছে। তো, শাশুড়িকে ট্যাকে গুঁজে মেয়ে তো বাপের বাড়ি ফিরে এল।

ভবানীপুরের পুরোনো বাড়িতে একা একা থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু, তিনি বেয়াইবাড়িতে থাকতে আসার আগেই গোড়াতেই একটা অদ্ভুত কাজ করে বসলেন। তাঁর স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি অর্থাৎ তিনপুরুষের ভিটেবাড়ি, এবং নিজের যা কিছু স্ত্রীধন ছিল, সর্বস্ব বৌমার নামে লিখে দিয়ে নিজে নিঃস্ব হয়ে গেলেন। ক্যাশ বলতে তাঁর ছিল না কিছুই। এবার বৌমাটি এবং তার মা-বাবা, তিনজনেই শাশুড়ি ভদ্রমহিলার এই অবিমৃষ্যকারিতার মূল্য দিতে, তাঁকে রাণীর মতন সমাদরে রাখলেন। এই বিশ্বাসের মর্যাদা যাতে কখনও মলিন না হয় সেদিকে কড়া নজর ছিল তাঁদের। মেয়েটি এম এ পড়তে শুরু করেছে। স্বামীর খোঁজ নেই। বৌমা শাশুড়ির মেয়ে হয়ে উঠেছে—বেয়ান তাঁকে সহোদরার সমান সম্মান করেন।

এমন সময়ে খবর এল, জামাইকে ইংলণ্ডে দেখা গেছে। ওয়েলসের একটি হাসপাতালে চাকরি করছে সে, তার সঙ্গে থাকে বিদেশিনী পত্নী এবং দুটি সন্তান। ওদের পরিচিত, অতি ঘনিষ্ঠ একজন তাকে দেখতে পেয়েছে। অবিলম্বে ঠিকানাও পাঠিয়ে দিল।

ঠিকানা পেয়ে শ্বশুরমশাই বুঝতে পারলেন না কী করবেন। যে মানুষ স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘরকন্না করছে, তাকে ফিরিয়ে এনে লাভ নেই। তিনি ব্যবসায়ী, মামলা-মোকদ্দমা তাঁর অতি অভ্যস্ত ব্যাপার। বিগ্যামি আর চিটিং-এর কেস ঠুকে দিলেন জামাইয়ের নামে। বিলেতের ঠিকানায় চলে গেল উকিলের চিঠি।

সেই চিঠির উত্তর এল বিলেত থেকে—কিন্তু উকিলের বয়ানে নয়। লিখেছে টেরেসা বলে একটি মেয়ে। আইরিশ মেয়ে সে—জামাই তারই সঙ্গে ঘরকন্না করছে। টেরেসা লিখেছে, সে ঘুণাক্ষরেও জানত না একটি মেয়েকে জীবনে বঞ্চিত করে সে এই সংসার করছে—সুবিমল তাকে একবারও জানায়নি সে বিবাহিত। কিন্তু বিগ্যামির কেসে শাস্তি ওকে দেওয়া যাবে না, যেহেতু কোনও বেআইনি সম্পর্ক এটি নয়। যদিও এটি আইন-বহির্ভূত সম্পর্ক। তাদের বিয়ে হয়নি। লিভ টুগেদার করছে। টেরেসাও পূর্ব-বিবাহিতা, তার দুটি সন্তানও রয়েছে পূর্ববর্তী বিবাহের চিহ্ন। কিন্তু ক্যাথলিক বলে ওদের ফর্মাল ডিভোর্স হয়নি। বাচ্চা আছে বলে বিয়ে 'নাল অ্যাণ্ড ভয়েড' করাও সম্ভব নয়। তাই বিনা মন্ত্রেই শুধু ভালোবাসার বন্ধনেই টেরেসা এতদিন সুবিমলের ঘরনি হয়ে ছিল। কিন্তু এই খবর শোনবার পরে একদিনও আর সেই সংসারে থাকেনি সে। সন্তানদের নিয়ে চলে গিয়েছে অন্যত্র। প্রবঞ্চক প্রণয়ীতে কাজ নেই টেরেসার। সে মুক্তি চায়। শুধু মুশকিল এই যে, টেরেসা এখন সন্তানসম্ভবা। শিগগিরই শিশুর জন্ম হবে। কিন্তু সুবিমলের সন্তানও টেরেসা রাখতে চায় না। অনাথ আশ্রমে দান করে দেবে। কোনও স্মৃতিই চায় না সে এই তঞ্চক প্রেমিকের। প্রাণ খুলে কথা বলে, টেরেসা ক্ষমা চেয়েছে। সে ইচ্ছে করে অন্য একটি নারীর জীবন নষ্ট করেনি।

চিঠি পেয়ে শ্বশুরমশাই বললেন, "চল। আমরা চলে যাই ওয়েলস। সুবিমলকে ধরে আনা যাক এইবার।"

দুই মা-কে রেখে, বাপেতে-মেয়েতে পাড়ি দিলেন সাগর—টেরেসার উদ্দেশে। সুবিমল বা তার উকিল কেউই চিঠির উত্তর দেয়নি। টেরেসাই তো জবাব দিয়েছে। ওর সঙ্গে দেখা করে, অবস্থাটা বুঝে নেওয়া যাক। তারপরে সুবিমল।

টেরেসার কাছে গিয়ে দ্যাখে তার প্রসবকাল উপস্থিত। হাসপাতালে যাচ্ছে। বাচ্চা অনাথ আশ্রমে দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। দু-তিনদিনের মধ্যেই বাচ্চা হবে। হলেই তাকে নিয়ে যাবেন অনাথ আশ্রমের সন্ন্যাসিনীরা। টেরেসা শুধু শুধু তাকে স্তন্য দিয়ে মায়া বাড়াতে রাজি নয়। টেরেসার সঙ্গে দেখা হলো, কথা হলো তাপসীর।

তাপসীর চেয়ে টেরেসা বয়েসেও বড়, অভিজ্ঞতাও তার বেশি। আইরিশ

মেয়েদের মধ্যে খানিকটা দিশি-দিশি ভাব আছে, তাপসীর দুই হাত জড়িয়ে ধরে টেরেসা ক্ষমা চাইল। সুবিমলকে সে আসতেই দিচ্ছে না হাসপাতালে দেখা করতে। বাচ্চার অধিকার তার নয়। সুবিমলও জোর করেনি, বাচ্চা পায়নি। সে কী করবে বাচ্চাটিকে নিয়ে? শ্বশুরমশাই কারডিফে হাজির হয়েছেন শুনেছে সুবিমল। তাপসী এসেছে, তাও। নিশ্চয়ই অবাক হয়ে গেল যখন তাঁরা কেউই সুবিমলের খোঁজ নিলেন না। আরও অবাক হবার ছিল।

তাপসী হঠাৎ বলে বসল টেরেসাকে—"তোমার যে শিশুটি জন্মাবে, তাকে যদি আমি নিয়ে যাই, মানুষ করি। তুমি দেবে? আমি তো নিঃসন্তান। একটি শিশু আমার জীবনকেও পূর্ণতা দেবে।"

টেরেসা আশ্চর্য হয়ে চুপ করে থাকল—"ওই সুবিমলের বাচ্চাকে তুমি মানুষ করবে? তোমার রাগ হবে না?"

—"রাগের কী আছে? সব শিশুই তো পবিত্র। সব শিশুই তো শুভঙ্কর। অপাপবিদ্ধ। ওর ওপরে রাগ করব কেন? তাছাড়া বাড়িতে তো ওর ঠাকুমা আছেন। আমার কেউ নয় বটে, কিন্তু ওর বাঙালি ঠাকুমার তো নাতি হয় এই শিশুটি। ও নিজের বাড়িতেই বড় হবে তাহলে। অনাথ হয়ে নয়। ওর ঠাকুমাও আমার কাছেই থাকেন।"

এই সুসংবাদে আরও বিস্মিত হয়ে গেল টেরেসা। "যে স্বামীর খোঁজ নেই বছরের পর বছর, তার মা-কে যত্ন করছ তুমি? এমনও হয়?"

টেরেসার ছেলে হলো। তখনও অ্যামনিওসেন্টেসিস করে আগে আগে জেনে নেবার স্টাইলটা শুরু হয়নি, শিশুর আবির্ভাবে বিস্ময় ছিল। ছেলের নাম তাপসী রাখল—সাগর। সাগরকে নিয়ে ফিরে এল দেশে। এই সাগরই আমার জামাই। তাপসী আমার বেয়ান। তোমরা সকলে মিলে যে সোনালি চুল আর নীল চোখের গুণগান করছো, সেজন্য ধন্যবাদ প্রাপ্য টেরেসার।"

—"আমি, সত্যি খুব, শিপ্রার গল্প শুনে একেবারে বাকরুদ্ধ।" ছোড়দিভাই বলেন।

—"তবে যে সেখানে সাগরের বাবাকে দেখছিলাম, সে কে? তাপসী আবার বিয়ে করেছে?"

শিপ্রা হাসল।

—"যাকে দেখেছো, সেই সাগরের বাবা। ছেলের বিয়েতে তাঁকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি এখন দেশেই। রিটায়ার করে দেশে ফিরে এসেছেন। মাকে যোগাযোগ করে জানতে পেরেছেন পৈতৃক ভিটে আর নেই। এবারে তিনি মাকে নিজের কাছে নিয়েও যেতে চেয়েছিলেন। তাপসীকে শুদ্ধ। একটা দারুণ ফ্ল্যাট কিনেছেন আলিপুর পার্কে। সেইখানে রাখতে।"

—"তাপসী যাচ্ছে?"

—"পাগল? তাপসীও যাচ্ছে না, আর তাপসীর শাশুড়িও যাননি ছেলের কাছে। তাঁদের ভবানীপুরের বাড়ি ভেঙে প্রোমোটাররা ফ্ল্যাট বানিয়েছে। সাগরেরই তো সব।

BanglaBook.org

শ্যামবাজারের দাদামশাইয়ের বাড়িও তার, ভবানীপুরের ঠাকুরদার বাড়িও তার। ভবানীপুরের ওই ফ্ল্যাট তৈরি হয়ে গেলে, ওরা নাকি এদিকেই উঠে আসবে। মা, বৌ, দিদিমা, ঠাকুমা, সর্বসমেত। শ্যামবাজারে আর থাকবে না শুনছি।"

—"আর নিউ আলিপুরের বাবা?"

—"বাবার প্রসঙ্গটা ওদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে পড়ে না। বিয়ের উৎসবেই ছেলের সঙ্গে প্রথম দেখা হলো বাবার।"

—"তাপসী হঠাৎ ডাকল কেন ওকে?"

—"ডাকল? —দেখতে শুনতেও তো ভালো লাগে, বাবা দাঁড়িয়ে বিয়েটা দিলে। সারা জীবন ছেলের আছে, মা, দিদিমা আর ঠাকুমা। তবু দাদামশাই ছিলেন মাথার ওপর—এখন তিনিও নেই। বাবা বরকর্তা হয়ে দাঁড়ালে দেখায় ভালো। সামাজিক ক্রিয়াকর্মে একটু-আধটু পেট্রিয়ার্কি মন্দ কি? নাঃ, তোরা বড্ড বেশি বেশি ফেমিনিস্ট হয়েছিস। বাবার তো কোনও ক্ষমতা ছিল না সিদ্ধান্ত গ্রহণের—শুধু 'আসুন-বসুন' করলেন। বৌভাতে আর বিয়ের দিনে মুখ দেখালেন।"

—"বাস এইটুকুই তো?"

—"আবার কী? সম্প্রদানের ঝামেলা তো ছিল না।"

—"তাপসীকে ফিরিয়ে নিতে চাইল না? ওর বর্তমানে বউ-টউ নেই যখন।"

—"চেয়েছিল কিনা জানি না। অত সাহস করবে কি? তাপসী তো ওকে আর চেনেই না—সাগরের মতোই প্রায় অবস্থা। কদিন দেখেছিল স্বামীকে?"

—"এখন কী পরিস্থিতি?"

—"কী আবার? ছেলেবউ অষ্টমঙ্গলার পরেই বম্বে চলে যাবে। সাগরের বাবার প্রসঙ্গও ওখানেই খতম। পাতা শেষ। আবার যদি নাতি-নাতনি হয় তখন পাতা খোলা হবে। নেক্সট চ্যাপটার। লৌকিকতার অধ্যায়।"

—"তাপসীর কীরকম লাগছে কে জানে।" এতদূর শুনে আমি বলে ফেলি- – 'কীরকম গা ছমছম করে। নারে? সেই স্বামীই ফিরেছে। একাই ফিরেছে। ওকে ডাকছে। তবু তার কাছে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। সেটা ওর সাধ্যের মধ্যে নেই। মনের ভেতরে সব দরজা-জানলাগুলোর ছিটকিনি বন্ধ হয়ে গেছে।"

শিপ্রা কথাটা উড়িয়ে দিল।

—"তুই যতটা ইমোশনালি, সেন্টিমেন্টালি এটা দেখছিস, ব্যাপারটা হয়তো আর তেমন নেই। ওই যে লোকটি ফিরেছে, নাম যাই হোক, তাকে তাপসীর নিশ্চয়ই একবারও নিজের সেই চলে-যাওয়া স্বামী বলে মনে হচ্ছে না। একে তো এর বয়েস তিরিশ বছর বেশি, এর হাবভাবে স্মার্ট সায়েবিয়ানা, মাথায় টাক, পেটে ভুঁড়ি—এর সঙ্গে তাপসীর বিয়ে হয়নি। সে ছিল রোগা-পাতলা, লাজুক একটা ছেলে। বিলেতে পড়তে যাবার আগের রাত্রে যে খুব কেঁদেছিল তার মায়ের জন্যে—আর বৌয়ের জন্যেও। এই বয়স্ক সুবিমল স্মার্ট, সুয়াভ, ধনী, চালিয়াৎ, দায়িত্বজ্ঞানহীন, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এবং মা ও তাপসীর কাছে চির অপরাধী। এমন

একটা লোকের স্ত্রী হয়ে বাঁচতে তাপসীর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে হতে পারে না। বহু পরিশ্রমে সে তিল তিল করে নিজেকে গড়েছে, নিজের জীবন, নিজের চরিত্রকে তৈরি করেছে। ওর যৌবনের ফুরিয়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়ার মুহূর্তগুলোকে ফিরিয়ে এনে দেবার ক্ষমতা এই সুবিমলের নেই।" শিপ্রা খুব জোর দিয়েই কথাগুলো বলল।

—"তাপসীর এত মনপ্রাণের কথা তুই জানলি কী করে", শিপ্রাকে আমি জিজ্ঞেস না করেই পারিনি—ছোড়দিভাই বলেন, "তোর মেয়ে তো সবে গেছে সেই পরিবারে নতুন বউ হয়ে। এর মধ্যে এত খবর দিয়ে দিল? শাশুড়ির প্রাণের কথা?"

শিপ্রা উত্তরে বলেছিল—"মিত্রা বলবে কেন, তাপসীই বলেছে। আমাদের দুই বেয়ানে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে যে! দুজনেই তো একা গিন্নি, কর্তা নেই। বিয়ের কথা উঠতেই প্রথমে সাগরের বিষয়ে সবকিছুই তাপসী আমাকে খুলে বলেছিল। তারপরে তো ভদ্রলোক হঠাৎ আবির্ভূত হলেন শূন্য থেকে!"

—"আশ্চর্য মেয়ে এই তাপসী", আমি বলেই ফেলি, "না, ছোড়দিভাই? শাশুড়িকে পকেটে করে বাপের বাড়িতে নিয়ে এসেছে!"

—"তুই-ই বল? শুধু কি শাশুড়ি? সতীনপুত্তুরকেও কি ট্যাঁকে গুঁজে তুলে আনেনি সে, একেবারে সেই সাতসমুদ্দুর পার করে?"

—"না, ছোড়দিভাই, এইখানে আই বেগ টু ডিফার। সাগর যদি তাপসীর সতীনপুত্তুর হবে, তাহলে তাপসীও সাগরের সৎমা। তাপসীকে যদি সৎমা বলি, মা তবে আর কাকে বলব?"

www.banglalive.com, *শারদীয়া i পত্রিকা*, ২০০২

পরীর মা

ললিতা স্পষ্ট দেখেছিল কালো-কোলো লালচে বাচ্চাটাকে, কচি পুরুষাঙ্গটা চোখ এড়ায়নি তার। নার্স একগাল হেসে এসে বলেছিল, "এই যে দেখুন, এবারে আপনার ছেলে! বখশিস চাই কিন্তুক", তারপরে আরেকটা নার্স খাটে দুধ খাওয়াতে নিয়ে এল যাকে, সেই ফুটফুটে সুন্দর বাচ্চাটা একটা মেয়ে। ললিতার সব মেয়েদের চেয়ে ঢের ঢের সুন্দর। সোনালী সোনালী চুল, গোলাপী গোলাপী গাল, একটা মেয়ে। ঠিক ডলপুতুলের মতন।

—"ওমা? এই বাচ্চাটা আবার কার? কী সুন্দর।"

—"কার আবার? আপনার! চিনতেও পারছেন না? দিন দিন, দুধ দিন।"

—"ওমা সে কী? এতো মেয়ে—এতো আমার নয়? আমার তো ছেলে, এমন গোরা ফর্সা নয়, এই তো দেখলুম এক্ষুণি—কালোকোলো ছেলে। না না, এটা আমার

বাচ্চা নয়। ওই যে যাকে দেখিয়ে নিয়ে গেল—"

—"পাগলামি করবেন না তো? 'দেখিয়ে নিয়ে গেল'", এক ধমক দিলো নতুন সিস্টার—"দিন দুধ দিন—তিনটে মেয়ের পরে অমন সকলেই বলে, 'আমার ছেলে হয়েছিল, হাসপাতালে বদলে দিয়েছে'—ওসব বাজেকথা ছাড়ুন দিকি? যততোসব-—ওই তো ওদিকে আরেকজনও চেঁচাচ্ছেন—আমার ছেলে কই, ছেলে কই—"

এমন সময়ে কচি মেয়েটা কেঁদে উঠলো, আর ললিতাও হাত বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি ওকে বুকে নিয়ে নিল। ললিতার ভরা বুকে দুধ উথলে পড়ছে, ব্যথা করবে এবারে। নার্সটা বলল,—"এই তো কি সুন্দর মেয়ে, দিব্যি মানিয়েছে দুজনকে, দেখুন তো? আজকাল কি আর ছেলেতে-মেয়েতে তফাৎ আছে? সব এক—শুধু শুধু ঝামেলা করছিলেন—"

—"এ বাচ্চাটাকে দুধ খাইয়েই এখান থেকে নিয়ে যান দিদি—আমার খোকাটাকে এবার দিয়ে দিন আমার কাছে? আমি তো জানেই ছিলুম, স্বচক্ষে দেখেছি কালোকোলো একটা রোগা পাতলা ছেলে হলো আমার, কালীর দিব্যি, ব্যাটাছেলে হয়েছে দিদিমণি, মেয়ে হয়নি—সিস্টার, আমি ভুল দেখিনি—ওই দিদিকে ডাকুন-—উনি বলতে পারবেন" —দুধ খাওয়াতে খাওয়াতেই বলছিল ললিতা। সদ্যোজাত শিশু ঠিকমতন দুধ খেতেও পারে না। তাকে শিখিয়ে দিতে হয়। বেঁচে থাকার প্রথম ধাপ।

এক ধমক দিয়ে উঠল নার্স—"ফের বাজে কথা? ছেলে মেয়ে বেবি, কোলে নিয়ে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতেও ডিনাই করবেন? ছিঃ! কী মা বাবু?"

"দিদি, আমার মেয়ের দিব্যি, আমি বলছি আপনাকে—একে আমি নেব না, এটা আমার না—কোন মায়ের কোল খালি করে একে নিয়ে এসেছে।"

কিন্তু গোলমালটাই কেবল বেড়ে গেল, কেউ শুনল না ললিতার কথা, পুরো হাসপাতালের সকলে বললে রুগী ভুল বকছে, ছেলে হয়নি। এমনকি সেই যে নার্সটি মিষ্টি খেতে চেয়েছিল, সেও বললে, "কই, ছেলে তো দেখাইনি? সুন্দরী মেয়ে হয়েছে, তাই মিষ্টি খেতে চেয়েছি।" ললিতা জানে মিথ্যেকথা। সবাই মিথ্যেকথা বলছে। মায় খোদ ডাক্তারসুদ্ধু। খাতায় লেখা হলো, মেয়ে-সন্তান। অথচ ভগবান পাঠালেন ছেলে। মানুষের অবিচারে ভগবানের দায় মাঠে মারা গেল।

চারনম্বর মেয়েকে ঘরে নেয়নি ওর বাবা। তার মাকেও না। মেয়ে দেখে যাবার পরে হাসপাতাল থেকে ফিরিয়ে নিতে আসেনি তাকে কেউ। হাসপাতালে কি চিরকাল থাকতে দেবে? সুস্থ হয়ে উঠতে ওরা তাদের দুজনকেই লিলুয়ার হোমে পাঠিয়ে দিয়েছে। সরকারি খরচে দেখাশুনো হচ্ছে ললিতার, আর তার মেয়ের। মেয়েটার এখন প্রায় দু'বছর বয়েস। ছুটে বেড়ায় দুলে দুলে এ-ঘর ও-ঘর। বড্ড সুন্দর হয়েছে, সে যারই বাচ্চা হোক। ললিতার যে নয় সেটা এখন যে দেখে সেই বুঝতে পারে। সাহেবের রক্ত আছে এ মেয়ের শরীরে। অথচ ললিতার সঙ্গে তার স্বামী খগেনের ছাড়া আর কারুর সম্পর্ক হয়নি। মেয়ের চোখ নীল, চুল সোনালী, রং

গোলাপফুল। নামও দেওয়া হয়েছে তেমনি। পরী। 'পরীর মা' বলেই ডাকে সবাই ললিতাকে—অথচ ললিতার নিজের তিনটে মেয়ে ছিল, তার নিজের পেটের মেয়ে তিনটে, যাদের জন্যে খুব মন কেমন করে ললিতার, সেই আমু, মামু, আর চামুর সঙ্গে তার আর দেখাই হয়নি কোনোদিন। নার্সরাই বলেছে, ওরা নিশ্চয় মেয়েদের বুঝিয়েছে—"তোদের মা হাসপাতালেই মারা গেছে।" কিংবা বলেছে—"তোদের মা পালিয়ে গেছে তোদের ফেলে।"

ললিতা মনে মনে হিসেব কষে। আমুর এখন দশ, চামুর পাঁচ, মামুর সাত। আর পরীর দুই। পরীর বাপ কে জানে না ললিতা। মা কে, তাও জানে না। এটুকুই জানে, যে তার কালোকোলো রোগা পাতলা ছেলেটাকে কেউ চুরি করে নিয়েছিল হাসপাতালে। আর তার সঙ্গে ললিতার ঘর সংসার, তার স্বামী সন্তান, সব। কাগজে পড়ছে বিদ্যুৎ আর কেয়া ভট্টাচার্য বলে একজনদের ঠিক এমনি কেস। তারা স্বামী-স্ত্রী একত্রে লড়ছে। বাচ্চাদের রক্তপরীক্ষা করে জানা গেছে ওই বাচ্চাটা ওদের নয়, কিন্তু কোনটা যে ওদের বাচ্চা সেইটা এখনও জানা যায়নি।

ললিতা আর রক্তপরীক্ষা চায় না। কিন্তু পরীকেও চায় না। ও জানে পরী ওর কেউ নয়। যখন অসহায় ছিল, বুকের দুধ দিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে। সে তো কত ধাইরাই করে থাকে। তা বলে ওকে মেনে নিতে হবে নিজের পেটের সন্তান বলে? যার জন্যে ওর ঘর গেল, বর গেল, মাথার ওপর থেকে ছাদ সব গেল, যার জন্যে ওর তিন তিনটে সন্তান জন্মের মতো হারিয়ে গেল—কোলে টেনে নিয়ে আদর করতে হবে? কখনও নয়।

ললিতারও মা-বাবা নেই। মামাবাড়িতে মানুষ। মামা গরিব ছিল। বিয়েতে দান দিতে পারেনি। দোজবরে বিয়ে দিয়েছিল তাই। ললিতার বুড়ো বর হলে কি হবে, দু'বছর অন্তর বাচ্চা হচ্ছিল তার। এই তো এখন সময় হয়ে গেছে আরেকটা বাচ্চা জন্মাবার। যদ্দিন একটা বাচ্চা দুধ খাচ্ছে তদ্দিন রক্ষে। বাচ্চা যেই বুকের দুধ ছাড়বে, তখনই পেটের মধ্যে আরেকটা বাচ্চা ঢুকে পড়বে। এমনি নিয়ম।

এবারে নিয়মটাতে ছেদ পড়েছে। পরী বুকের দুধ খায় না এখন, কিন্তু ললিতার পেট খালি আছে। খগেন তাকে নিতে আসেনি। কে যেন বলছিল পরীর বাপ আবার বিয়ে করেছে। কিন্তু এখনও আর বাচ্চাকাচ্চা হয়নি। সে যাই হোক, কেস চলছিল। মাঝে মাঝে কোর্টে যেতে হয় ললিতাকে। সরকার কেস করেছে। পরীকে ললিতা নেয়নি, জোর করে কতবার পুলিশে ডায়েরি করতে চেয়েছে ওর ছেলে চুরি গিয়েছে বলে, কিন্তু কেউ ওর কথায় কান দেয়নি।

তবু, তারই সন্ধানে এতদিন পরে পুলিশ এল। পরীর রক্ত নিয়েছে, ললিতারও রক্ত নিয়েছে। উত্তর তো ললিতা জানেই। রক্তে কোনো মিল থাকবে না পরীর সঙ্গে পরীর মায়ের। যদি থাকে, ললিতা রেললাইনে মাথা দেবে। আর যদি না থাকে, ললিতা পুলিশকে বলবে আগে খগেনের বাড়িতে দিয়ে আসতে। পরী থাকুক না এখানেই, এই অনাথাশ্রমে। পরীকে সে খগেনের বাড়িতে নিয়ে তুলতে পারবে

BanglaBook.org

না। সেখানে তার নিজের তিন-তিনটে মেয়ে রয়েছে। তারাই বা কী মনে করবে?

এতদিন পরে এত মানত করে যদি ছেলে হলো, ঠাকুর তাকে ভোগ করতে দিলে না? নিষ্ঠুর ঠাকুরের লীলা যে বোঝে বুঝুক, ললিতা বোঝে না। বুঝতে চায়ও না। পরীকে ঘাড়ে ফেলে দিয়ে গেল উল্টে।

সে-বেটি মা-মা করে বিশ্বভুবন মাত করছে, এতদিনে হোমসুদ্ধ সবাইকে হাত করে ফেলেছে। আর সবচেয়ে মন্দ হলো, ললিতার নামটা ঘুচিয়ে দিয়ে, সেখানে নিজের নামটা বসিয়েছে। এখানে সবার কাছেই ললিতা 'পরীর-মা'।

কিন্তু পুলিশ তো খবর আনবে, 'পরীব-মা' পরীর মা নয়। তখন? তখন তোরা কী করবি? সেই তো 'ললিতা'কে ফিরতেই হবে?

কালকে রেজাল্ট আসবে পুলিশের কাছে। থানায় যেতে হবে ললিতাকে। কোর্টে ডেট আছে পাঁচিশে। সেইজন্যে কোর্টে যেতেই হবে। পরীকে রেখে যাওয়া যায় না, টলে টলে দৌড়চ্ছে এখন, সবখানে যায়, সবটাতে হাত দেয়। এটা ফেলে দিচ্ছে ওটা খেয়ে ফেলছে—দরকারী কোন একটা কাগজ সেদিন হারিয়ে ফেলেছে পরী। ললিতার বিশ্বাস, "হারিয়েছে" মানে সেটা গুলি পাকিয়ে থুতুর সঙ্গে চর্বিতচর্বণ করা হয়ে গেছে।

পরীর যখন জন্ম হলো, ঠিক সেদিনই হাসপাতালে আরও চারটে বাচ্চা জন্মেছিল। দুটো মেয়ে, দুটো ছেলে। একটা বাচ্চা ছেলে মরে গেছে। তার মা মেনেও নিয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে একটা বাচ্চা মেয়ের মা অবিকল ললিতার মতোই ভীষণ আপত্তি করেছে, বলেছে ওই মেয়ে-বাচ্চাটা তার নয়। তার হয়েছিল ছেলে। সেই ছেলে কেউ বদলে দিয়েছে। সেই মেয়েটার স্বামী পুলিশে ডায়েরি করেছে, কেস করেছে হাসপাতালের বিরুদ্ধে। তারই কেসের প্রমাণ হিসেবে এখন সবকটা বাচ্চার রক্তপরীক্ষা হচ্ছে তাদের, মায়ের রক্তের সঙ্গে মেলানো হচ্ছে। সরকারি হুকুমে।

ললিতা জেনেছে সেই মেয়েটার তিনটে নয়, পাঁচটা মেয়ে আছে, এতদিনে প্রথম ছেলে হয়েছিল। সেই ছেলে ওরা বলছে চুরি গেছে। পাগলের মতন হয়ে গেছে মেয়েটা। হাসপাতালে সবাই হেসে হেসে বলাবলি করেছিল মেয়েটা পাগলই। গতবারেও বলেছিল মেয়ে হয়নি। কিন্তু এবারে ওর স্বামী কেস করেছে।

প্রত্যেকটা বাচ্চাকে এক এক করে খুঁজে বের করছে পুলিশ। তাদের রক্তপরীক্ষা করা হচ্ছে, তাদের মায়েদেরও রক্তপরীক্ষা করা হচ্ছে। তাহলেই নাকি বোঝা যাবে কোন মায়ের কোন বাচ্চা। কিন্তু সমস্যা হয়েছে, দুটো মেয়ের মা-ই যদিও রক্তপরীক্ষা করতে রাজি, ছেলেটার মা রাজি হয়নি। কিন্তু রাজি না হলেও উপায় নেই। এমনকি সেই মরা বাচ্চাকেও খুঁজে বের করে তারও পরীক্ষা হচ্ছে সে ছেলে কার ছিল! ললিতা বলছে ছেলেটা তার। পরী তার নয়। সুগুণাও বলছে ছেলেটা তার। মেয়ে তার না। সুগুণা মারোয়াড়ি মেয়ে। আর ছেলে যার, সেই মহিলা গুজরাটি। তার

BanglaBook.org

নাম ভবানী। ভবানী বলছে তার ছেলেরও ডি এন এ টেস্ট করাবে না সে, তার নিজেরও না। এসব কাণ্ডকারখানা তার খুব অমঙ্গলজনক বলে মনে হচ্ছে।

মুণ্ডবী দেশাই কিন্তু ছাড়ল না। পুলিশের কাছে হার মানতে হলো ভবানীকে। তার ছেলের এবং তারও ডি এন এ ফিঙ্গার প্রিন্টিং করাতেই হলো। সি আই টি রোডে ফরেনসিক ল্যাবরেটারীর ডাঃ কাশ্যপের কাছে তিন মা, এবং তিন শিশুর রক্তপরীক্ষা হতে গিয়েছে। এখন পরীক্ষার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করে আছে আদালত।

ললিতা কিন্তু খুব একটা ব্যাকুল হয়ে নেই। সুগুণার কেমন লাগছে সে জানে না, ভবানীর এটা অপছন্দ, সেটা সবাই জানে।

ললিতা একপক্ষে খুশি, এবার প্রমাণ হবে পরী ওর মেয়ে নয়। ছেলেটা ওরই ছিল। বুকের দুধ দিয়ে মানুষ করেছে বলে সে পরীর দুধ-মা নিশ্চয়ই, কিন্তু জন্ম-মা তো নয়।

জন্ম-মা যে-ছেলের, সে তো বসে আছে ভবানীর বাড়িতে। বড়লোকের বাড়িতে দুধে-ভাতে আছে।

যথাসময়ে ডি এন এ টেস্টের ফলাফল জানা গেল। অবাক হবার কিছু ছিল না। জানা গেল ভবানীই পরীর মা, ভবানীর ছেলেটি আসলে ললিতার ছেলে, আর সুগুণার মেয়েটি সুগুণারই নিজের মেয়ে। সুগুণার ছেলে হয়নি। টাকার খেলায় হাসপাতালে হাত সাফাই করে ললিতার ছেলেটিকেই পাঠানো হয়েছিল ভবানীর কোলে।

ভবানী তো রক্তপরীক্ষার মুহূর্ত থেকেই শয্যা নিয়েছিল—কেননা রেজাল্ট কী হবে সে জানত। সুগুণা খুব আনন্দের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছিল। কেননা তার সত্যি সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। কল্পনাজগতে বাস করছে সে।

আর পরীর মা?

একটুও অবাক হয়নি ললিতা। সেও তো জানত।

এত পরীক্ষা-টরীক্ষার কিছু দরকারই ছিল না। সে তো সমানেই বলছে পরী তার মেয়ে নয়।

ওই ফরসা ভবানীর ফরসা মেয়ে।

ছেলে ফেরৎ দেবার প্রশ্ন উঠল এবারে। খবরের কাগজে বেরুল ললিতার নাম। খগেন দৌড়ে এল কলকাতায়, ছেলে-বউ ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। সত্যি সত্যিই তাহলে ললিতা 'ছেলের মা' হয়েছিল। আর দুবছর ধরে লিলুয়ার হোমে পড়ে আছে। খগেন হাসিহাসি মুখে লিলুয়ার হোমে এসে দাঁড়ালো। সঙ্গে মেয়েরা আসতে চেয়েছিল, কিন্তু খগেন নেয়নি। চারটে টিকিট কাটতে হবে। দরকার হলে খগেন একা যেখানে

BanglaBook.org

হয় রাত্রের মতো মাথা গুঁজে থাকতে পারবে। তিনটে মেয়ে ল্যাজে বেঁধে নিয়ে গেলে সেটা হবে না। ভবানী শুয়ে পড়েছে। আমৃত্যু অনশন। সে খোকনকে ছেড়ে বাঁচবে না। পুলিশ যাই বলুক, ছেলেকে ছেড়ে দেবে না সে। যত টাকা চাইবে, তত টাকা দেবে ওই লিলুয়া হোমের মেয়েটাকে। অগত্যা মিস্টার কাপাডিয়া চললেন ললিতার সঙ্গে দেখা করে কথাটা বলতে।

ললিতার সঙ্গে খগেনের দেখা হলো। ললিতাকে সবাই হোমে 'পরীর মা' বলে ডাকছে।

পরীকে ট্যাঁকে গুঁজে ললিতা এলো খগেনের কাছে। খগেন বললো—"এ-আপদটেকে এবার বিদেয় কর—চল আমরা ছেলেটাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাই।"

ললিতা তাকালো পরীর দিকে। পরী কী বুঝেছে কে জানে, সেও মুখ তুলে ললিতার মুখের দিকে তাকাচ্ছে আর ললিতার ছেঁড়া শাড়ির আঁচলটা মুঠো করে ধরে আছে ছোট্ট ছোট্ট ফর্সা আঙুলে।

—"চল বউ অফিসে বলবি চল। তিনটের ট্রেনটা ধরে ফেলব আমরা।"

—"অফিসে? কী বলব অফিসে?"

—"যে তোর ছেলেটাকে ফেরৎ চাই। তোর সোয়ামী তোদের নিতে এয়েছে। ব্যাস এইটুকু বলবি। আর মেয়েটাকে তার মা-বাপ এইসে লিয়ে যাক।"

আদালতে সব প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। পাঁচটার পরে ছ'নম্বরটিও মেয়ে হয়েছিল এই সংবাদ জেনে সুগুণার শ্বশুরবাড়িতে এবার স্বামীও যোগ দিলেন। এমন অত্যাচার শুরু হলো, যে সুগুণার মাথা খারাপ সেরে গেল। সুস্থতার প্রমাণস্বরূপ সুগুণা বিষ খেল।

অফিসে এসেছে ললিতা আর খগেন। ললিতার আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে আছে দু'বছরের পরী। কেবলই ললিতার হাত ধরে টানছে "মা। মা।" বলে বিরক্ত করছে। খগেন বলল —"দূর করে দে ওকে, এইখেনেও ওকে লিয়ে এলি?"

অফিসের বাবু বলল, এসব আদালতের ব্যাপার না মিটলে ললিতার যাওয়া হবে না। পরী তার মা-বাবার কাছে যাবে, কি যাবে না, সেটা অফিস ঠিক করবে না। পরীর বাবা মা আর ললিতা-খগেন নিজেদের মধ্যে কথা বলুক। মিটমাট না হলে আবার আদালতে যাক। ললিতার ছেলেকে উদ্ধার করে দেওয়া আশ্রমের অফিসের কাজ নয়। তাছাড়া খগেন এসেছে বলেই ললিতা যেতে পারবে, তাও নয়। ওকে আগে 'রিলিজ' করতে হবে। এই ছেলে-মেয়ের হ্যাপা না মিটলে 'রিলিজ' করা হবে না।

খগেন বলল, "ঠিক আছে, চল যাই কাপাডিয়াদের বাড়ি। ঠিকানা কী?" অফিস থেকেই ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর দিয়ে দিল। পরীকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে রেডি হলো ললিতা। মেয়ে রেখে, ছেলে নিয়ে ফিরবে।—বাসেই ঘুমিয়ে পড়েছে পরী

BanglaBook.org

ললিতার কোলে। ফর্সা ছোট্ট মুখখানি যেন দেবদূতের ছবি। ললিতার বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে, একহাতে ললিতারই শাড়ির পাশটা মুঠো করে ধরা।

বাস থেকে নেমে খগেন জিজ্ঞেস করে জেনে নিল কাপাডিয়া হাউসটা কোনদিকে। ললিতা হঠাৎ বলে ওঠে, "আমি যাব না।"

—"সে কি? এতটা রাস্তা এলে, এখন বলছ? ছেলেটাকে তো নিতে হবে।"

—"এসেছি, ছেলের মুখখানা দেখে যাব বলে। মেয়েটাকে দান করে দেব বলে তো নয়। সেই ছেলেটাকে তার মায়ের কোল থেকে কেড়েও নেব না।"

"মানে? সেই ছেলেটার মা তো তুই।"

—"মানে পরীকে আমি ছাড়তে পারব না।" —"ছাড়বি না তো কী করবি? ওদের মেয়ে ওরা নিয়ে যাবে।"

—"পরীকে ওর মা নেবে না জানিয়ে দিয়েছে।"

—"নেবে না, তো তোর কী? থাকুক পড়ে এখানে। আমাদের ছেলে নিয়ে আমরা চলে যাব।"

—"ছেলেকে সেই মা দেবে কেন?"

—"মা দেবে না? হুঁ—বাপ দেবে। আদালত আছে কী করছে? পুলিশে হুকুম দিয়েছে না। দিতেই হবে।"

—"বাপ? বাপ কেঁদে পড়ছে—বলছে দশহাজার টাকা দিচ্ছি, তাই নিয়ে ছেলেকে ছেড়ে দাও।"

—"কাকে বলেচে? কাকে বলেচে?"

অকস্মাৎ খগেনের গলার স্বর পালটে গেল।

"কই আমাকে তো তুই বলিসনি?"

—"আমাকে বলেচে?"

—"কখন বললে?"

—"এসেছিল। মা-টা মুখে জল দিচ্ছে না, ছেলের শোকে। শুয়ে পড়েচে।"

—"তুই কী বললি?"

—"চাইনে টাকা। ছেলে চাই।"

—"এ ছি ছি! এটা কী করলি?"

—"মানে?"

—"বলবি তো, দশে হবে না—পঁচিশ ধরে দাও, ছেলে দিয়ে দিচ্ছি।"

—"মানে, ছেলে বেচে দেব?"

—"বেচবি কেন? ওরা তো নিয়েই নিয়েচে। এটা তার খেসারৎ দিচ্ছে। বুঝলি না? ফাইন দিতে চাইছে।"

—"ফাইন কাকে দেবে? আদালতকে?"

—"দূর। আমাদের দেবে। ছেলেটা তো আমাদের।"

—"কিন্তু মায়ের কোল থেকে ছেলে কেড়ে নিতে আমি পারব না।"

BanglaBook.org

—"আরে ফের উল্টো কথা?"

—"কে তোকে বলেচে ছেলে কাড়তে? ছেলে থাকুক, টাকাটা তুই নিয়ে নে।"

—"ছেলে চাই না? এই যে ছেলে-ছেলে করে আমাকে ত্যাগ করেছিলে?"

—"বোকা, অত গুলো টাকা কেউ ছাড়ে? জানাতো গেল তোর পেটে ছেলে আসে —এর পরেরটা ছেলে হবে'খন। চল চল, ওদের বাড়িতে যাই।"

এমন সময় ঘুম ভেঙে উঠে পরী কান্না শুরু করে দিল।

—"আমি যাবনি। পরীর খিদে লেগেছে।"

—"আরে দূর, তোর পরীর নিকুচি করেচে। ওকে তো হোমে রেখে যাবি, এত আতুপুতু করার কী আছে?"

—"কাকে হোমে রেখে যাব?"

—"ওদের মেয়েটাকে ওরা যদি ঘরে না নেয়, তাহলে তো হোমেই রেখে যেতে হবে? আমি বাপু পারব না পরের মেয়েকে খাইয়ে পরিয়ে পুষতে। গরিব মানুষ।"

—"ওই টাকাটা তাহলে কী জন্যে হাত পেতে নিচ্ছ? পরীরই তো খাই খরচা ওটা! ওর বাপ দিতে চাইছে। আমু চামুর মতন ভিকিরির মেয়ে নয় পরী।"

—"কী যা তা বলছিস বউ? ওটা তো আমাদের ছেলেটাকে ওরা রেখে দিচ্ছে, তাই খেসারতির টাকা দিতে চাইছে—"

—"ছেলে বেচার টাকায় তুমি খাবে? তাই খাও। আমি মেয়ে নিয়ে তবে এইখেনেই থাকব।"

—"মেয়ে নিয়ে? মেয়েটা কি তোর? তোর মেয়েগুলো তো ঘরে।"

—"ঘরে তুমি আমাকে যেতে দিলে কই? এই দেড়বছর কী করছিলে?"

—"সে যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে—এখন তোকে নিতেই তো এসেছি।"

—"পরীকে না নিয়ে পরীর মা ঘরে যাবে কেমন করে?"

—"পরীর মা কি তুই?"

—"নয় তো কে? পরী আমার মেয়ে নয় ঠিকই, কিন্তু আমি তো ওর মা?"

প্রসাদ, অক্টোবর ২০০২

মাটুর সঙ্গে দেখা

কই যাস, সুমিত? কইলকাতায় যাস নাকি?

হ্যাঁ দাদু, কোলকাতায় যাচ্ছি...

সাউথে, না নর্থে?

সাউথেই, দাদু—

BanglaBook.org

বেহালার দিকে যাইবা নাকি? বেহালা সখেরবাজার?

বেহালাই, তবে সখেরবাজার নয়, পর্ণশ্রী।

ওই একই হইল। বেহালা চৌরাস্তার নিকটেই তো বটে? থানাটা চিনো?

থানা? না তো! কোনটা? মানে বেহালা থানা?

থানা চিনাটা কুনু কঠিন কর্ম না মণি, যারেই জিগাইবা সেই কইয়া দিব'খনে—এট্টু কষ্ট কইরা যাইও থানায়। জরুরি প্রয়োজন।

থানায়? কেন দাদু?

ঐ মাটুর খোঁজটার লাইগ্যা থানাই ঠিকঠাক জাগা—অরাই জানে।

কিন্তু খোঁজ কি এখন পাওয়া যাবে দাদু? দেরি হয়ে গেছে না?

ক্যান? পাইবা না ক্যান? আর না-ই যদি পাও, ট্রামে-বাসে তো ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইবা। এট্টু খ্যাল কইরা দ্যাখবা—মাটুর সাথে দেখাই হইয়া যাইতে পারে তোমার। বড়ই পাড়াবেড়ানি স্বভাব আছিল কিনা মাইয়াটার—রাস্তাঘাটেই অর সাক্ষাৎ পাইবা তুমি —তাই কইতাসি এট্টু খ্যাল রাখবা।

অ বুবুন। বুবুনী!

হ্যাঁ, দাদু?

তরা ত কইলকাতায় যাস। মাটুরে দ্যাখছস?

মাটুপিসি-কে? এই তো সেদিনই দেখলাম।

দ্যাখছস তাইলে? আ-হাহা! কী খবরই দিলা তুমি আমারে! আশীর্বাদ করি ঠাকুর তোমারে দুই হাত ভইরা দিউক! তা দ্যাখলা যে, কী কইলা? কিছু কইলা অরে?

ওই তো, বললাম, মাটুপিসি, কেমন আছ? মাটুপিসি বলল, খুব ভালো আছি, বুবুন। ওরা বেহালাতেই আছে।

আহ হা, আমিও তো তাইই কই, বেহালাতেই না নারানবাবুর বাসা আছিল? মাটুর বাবার বাড়ি। তা, বিয়া হইসে? পোলাপান দ্যাখলা নাকি কোলে?

কোলে ছিল না, ছেলেদুটো কলেজে পড়ছে, আর মেয়েদুটো ইস্কুলে। বলল, অঙ্কের জন্য টিউটর খুঁজছে মেয়েদের জন্য।

তাইলে তুমিই যাও না কেন মণি, তুমি তো অঙ্কের টিউশনি দ্যাও ছাত্র-ছাত্রীদিগে।

মাটুর বাচ্চা দুইটা তো তোমারই বুন হয়, তুমিই পড়াটা বুঝাইয়া দ্যাও না ক্যান।

দেব, দেব, তাই তো বললাম।

বলসো? বাহ। বড় ভালো কাজ করসো তুমি মণি, কিন্তু মাটুর লগে পয়সা নিবা না! আমিই তরে পয়সাটা দিয়া দিমু'খনি—মাটুটার লাইগ্যা বড় মন পোড়ে। ...নেক্সট যেইদিন অর সাথে গিট করবা, মাটুরে আমার কথা কইও।

নিশ্চয় বলব। কিন্তু কী বলব দাদু?

কইবা, মাটুপিসি, তোমার মামাবাবু আইজও মরে নাই, পঁচানব্বই পার কইরাও

BanglaBook.org

বাইচ্যা আছে। মাথাডা দিব্য পরিষ্কার। তুমি তারে একখান চিঠি দিবা—তোমার মামাবাবুরে একখান পত্র দিও তুমি—সকলপ্রকার খোঁজখবর দিয়া, স্পষ্ট কইরা ঠিকানা লিখ্যা, পত্র দিবা—তোমার মামাবাবু তোমারে একবার চোক্ষের দেখা দ্যাখতে চায়।

কী? হইতাসেডা কী? কারে এত চোক্ষের দেখা দ্যাখনের শক হইল তোমার? শুনি? ছেলেবউ নাতি নাতনি সকলেই তোমার চক্ষুর সম্মুখে—আবার কারে দ্যাখনের লেইগ্যা হুতোশ হয়? ঠাকুমা এসে পড়েছেন, দাদু গোপন করার চেষ্টা করেন।

ও কিস্যু না, তোমারে আর এইডা লইয়া চিন্তা করতে লাগব না, যাও যাও আপনার কাজকামে মন দাও না—আমি বুবুনের সাথে কথাটা কইয়া লই—জরুরি কথা।

কী আবার এত জরুরি কথা? মাটুর কথাই কইতাসো নিঘঘাৎ।

চোরের মতো মুখ করে দাদু অম্লান বদনে মিথ্যে কথা বলেন—

আররেহ্ না, না, খামাখা মাটুর কথা কমু ক্যান? আমাগো এট্টা সিরিয়াস ডিসকাশান চলতাসে—কি না, বুবুন?

ঠাকুমা অবিশ্বাসী মাথা নেড়ে চলে যান।

অ বুবুন। বুবুন দিদিমুণি? কই গেলা?

এই যে দাদু।

তুমিই না কইসিলা, মাটুর বিয়া হইয়া গেসে?

হ্যাঁ দাদু।

স্বামী করে কী?

স্বামী? এঞ্জিনিয়ার।

ও হোঃ। তা-ই? বাহ! সে তো খুব ভালো, খুব ভালো, ইঞ্জিনিয়ারের সাথে বিয়া হইসে মাটুর। বাহ, তা, পাত্রের বাবা কী করে?

পা-ত্রের বা-বা? বাবা ডাক্তার।

ডাক্তার? নাকি? বাহ, সে তো আরো ভালো। যাক। মাটু তাইলে সুখেই আছে। কী বল?

তা আছে, মাটুপিসি খুব ভালো আছে।

পোলাপান কয়ডা? হইসে ত? নাকি?

দুটি ছেলে বড়। ডাক্তারি আর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। মণিপালে। দু'জনেই। আর মেয়েদুটি ছোট। যমজ। ইস্কুলে পড়ে। লোরেটো হাউজে। ওদের জন্যেই তো অঙ্কের টিচার চাইছিল মাটুপিসি।

ওহো। অঙ্কে কাঁচা হইসে বলো। তা আমি ত এখন আর টিউশনি দেই না—তাও আমার কাছে আসলে, আমি অঙ্কটা দ্যাহাইয়া দিমু খনে।

বলব। বলব তোমার কাছে পাঠিয়ে দিতে।

কিন্তু কইলকাতা থিক্যা আসা সহজ নাকি?

এখন খুব সোজা হয়ে গেছে দাদু। এখন এটাও প্রায় কোলকাতাই হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

যা ভিড় রাস্তায়। রিকশায় ট্রাফিকজ্যাম হচ্ছে সর্বত্র।

রিকশা? রিকশা কইরা কইলকাতায় যাবা?

না না, সেকথা বলিনি, বলছিলাম—

থাউক গিয়া অন্য কথা। আগে বল মাটুরে কেমুন দেখলি? শরীর কেমন তার?

শরীর তো ভালোই মনে হলো। রোগাও না, মোটাও না। লম্বা লম্বা চুল, শামলা রঙ আর মুখখানা মা দুর্গার মতো। খুব রূপসী।

তরে কইসিলাম না, মাটু বড় সুন্দর?

থাক! ঢের হয়েছে! মাটুর রূপের কাহিনী আজ আর শুনে কাজ নেই ; বুবুনের কলেজ আছে—তুমি যাও তো বুবুন। ঠাকুমার আজ আর রণরঙ্গিণী মূর্তি নেই, যেহেতু দাদুর আজ একটু জ্বর-জ্বর ভাব হয়েছে।

ঠাকুমাকে নরম দেখেই দাদুর স্বর পালটে গেল।

রও, রও। সক্কলের সক্কল ব্যাপারে তোমার কথা কইবার লাগে। না? কখন থিক্যা আমার যে ক্ষুদা লাগসে তার খ্যাল নাই—ভাতই হইল না অহনও। আমি আইজ আর ভাত খামুই না, তোমরা খাও গা।

আরে? কও কী? এই যে সইদ্য জলখাবার খাইলা। আধা ঘণ্টাও হয় নাই। সকাল সাড়ে নয়টা বাজছে—ভাত খাওনের টাইম হইল এইডা? ক্ষুদা অমনি পাইলেই হইল? দাদুর জ্বরভাব ভুলে ঠাকুমা বাড়ি মাথায় করতে থাকেন।

দাদু আজকাল খেয়ে বলেন খাইনি, পেয়ে বলেন পাইনি। আবার দুবার করে পুজোর পারবুনীও দিয়ে ফ্যালেন আমাদের। এই একটাই যা গোলমাল হয়েছে—দাদুর কিছুতেই কিছু ঠিকঠাক মনে থাকছে না আজকাল। অথচ এই পঁচানব্বইতেও নিজেই নিজের যাবতীয় কাজকর্ম সেরে নেন, বাথরুমেও একা যান। বশংবদ শরীর আয়ত্তে আছে। কিন্তু স্মৃতি কুহকিনীকে আয়ত্তে রাখতে পারছেন না। সেদিন ছোটপিসির মেয়ে মুনুদিদিকে ছোটপিসি ভেবে নিয়ে খুব ললিতা, ললিতা করে ডেকে কথাবার্তা বলছিলেন। আবার মেজজেঠু অনেকদিন পরে দিল্লি থেকে এসে প্রণাম করার পরে, চিনতে না পেরে তাঁকে নমস্কার টমস্কার করে, সোফাতে বসালেন। অথচ মেজজেঠিকে ঠিক চিনেছেন—কী মেজ-বউমা, কবে আইলা বাপের বাড়ি থিক্যা? একবার যাইলে আর আসার নাম কর না। দিল্লিটাকেই বাপের বাড়ি ধরে নিয়েছেন দাদু।

দাদুর এই ভুল হওয়া নিয়ে আমরা যত হাসাহাসি করি ঠাকুমা ততই রাগারাগি করেন। তাঁর ধারণা দাদু মাঝে মাঝে ইচ্ছে করেই ভুলে যাবার ভান করেন। চারটের সময়ে চা-বিস্কুট খেয়ে, পাঁচটা বাজলে দাদু কমপ্লেন করেন—কী গো বউমা, সন্ধ্যা হইয়া গেল, তোমাগো ঘুমও ভাঙে না আর আমার চা-ও হয় না! মা হাসেন, হয়তো আরেক কাপ চা বানিয়ে দেন। কিন্তু ঠাকুমা তেলে-বেগুন! দশবার কইরা চা খাইয়া আর কাজ নাই, রাইতে তো এমনিতেই চক্ষে ঘুম আসে না—আর দুধ-চিনিও অত সস্তা না!

দাদুর এই জরাগ্রাসে অনায়াস আত্মসমর্পণ ঠাকুমার সহ্য হচ্ছে না। দাদু বাড়ির

BanglaBook.org

কর্তা, তাঁর হুকুমেই সবাই চলেছে এতকাল! এখন তাঁকে নিয়ে ছোটরা হাসছে, বড়রা করুণা করছে—এ দৃশ্য ঠাকুমার সইছে না। এই জরাগ্রস্ত গৃহকর্তাকে বরদাস্ত হচ্ছে না ঠাকুমার, কোথায় গেলেন তাঁর সেই পুরুষসিংহ পতিদেবতা?

অবশ্য এমন কিছুই দুরবস্থা হয়নি দাদুর। স্নানের পরে গামছাটা নিজেই কেচে রোদে মেলে দেন, নিজেরটুকু নিজে করে নিতে পারেন এখনো। সেদিন অবধি বাজার করেছেন, আজকাল বাজারটা না করলেও, হাঁটতে বেরোলেই কলাটা মুলোটা কিনে আনেন। পয়সার হিসেব-টিসেব মাথায় পরিষ্কার। পেনশনের তারিখ ভুলে যান না কোনো মাসেই।

অথচ সকালের কথা বিকেলে মনে থাকছে না। আরো একটা নতুন ব্যাপার হয়েছে। দাদু ইদানীং উদ্যোগী হয়ে সংসারের খরচ কমাতে নানারকমের সুবন্দোবস্ত করেন। যেমন, গ্রীষ্মের দুপুর, ঠাকুমা ঘুমিয়ে, মাও ঘুমোচ্ছেন। দাদু এসে মাকে সযত্নে ঠেলতে লাগলেন। ঠেলে ঠেলে তুললেন।

বৌমা। অ বৌমা। বৌমা, ঘুমাইলা নাকি?

অ্যাঁ? সাড়া দ্যাও না ক্যান? ঘুমাও নাকি, বৌমা?

মা ধড়ফড় করে উঠে বসে ঘোমটা টেনে বলেন—হ্যাঁ বাবা, বলুন?

কইতাসিলাম কী, আইজ আর আমার লাইগ্যা চা বানাইবা না। বোঝলা? আমি আইজ বৈকালে আর চা খামু না। সকালে দুইবার খাইসি। তাই কইয়া দিলাম, চা বানাইতে না।

ঠিক আছে বাবা। মা শুয়ে পড়লেন।

চটি ফটর ফটর করতে করতে দাদু নিশ্চিন্ত মনে নিজের ঘরে বসে গেলেন।

বিকেলবেলা ঠিক সময়ে মা দাদুকে চা দিয়ে এলেন। দাদু চা খেলেন। এবং ঘণ্টাখানেক পরে বললেন—বৌমা! তোমরা অবি এই বুড়ামানুষটার কথা মনেই কর না। নিজেরা নিজেরা চা খাইলা, টুংটাং শুনিতে পাইলাম, আমারে দিবার কথাডা মনেও নাই কারুর। বুড়া হইলে এই হয়!

মা তো চুপচাপ হাসেন, কিন্তু ঠাকুমা ফেটে পড়েন।

মাঝে মাঝে মাঝে সত্যিই খুব মুশকিলে ফেলেন দাদু। একবার, ঠাকুমা তখন মেজজেঠুর কাছে গেছেন, দাদু বললেন সকালে আধখানা ডিম সিদ্ধ করে দিতে হবে তাঁকে। বাকি আধখানা পরদিন সকালে সিদ্ধ করা হবে। হাফ কাঁচা ডিম ফ্রিজে রেখে দিতে হবে।

বৌমা মন দিয়া শুন, কাইল সকালে ফের ফ্রেশ হাফ-ডিম সিদ্ধ কইরা খামু। আইজ হাফ-ডিম, কাইল হাফ। আগে থিক্যা ফুল ডিমটা সিদ্ধ কইরা ফ্রিজে রাইখ্যা, বাসি ডিমসিদ্ধ দিবা না। তাইলে কিন্তু আমি আর ডিমই খামু না... হ, ফ্যালাইয়া দিমু। কইয়া দিলাম। দাদুকে ম্যানেজ করার কায়দা ভাগ্যিস মা জানেন! কিংবা, দুপুরে খেতে বসেই, বৌমা, আইজ কিন্তু রাত্রে আমার রুটিখানা বানাইবা না, আইজ আমার ক্ষুধা নাই, আটা নষ্ট কইরা লাভ নাই। রাইতে ক্যাবল হাফ কাপ দুধ দিবা।

BanglaBook.org

বাস। শুইন্যা রাখলা ত? আইজ আমি রুটি তরকারি খামু না, আমার রুটিখানা বানাইবা না। মানা কইরা দিলাম।

রাত্রে দাদু দেড়খানা রুটি খেলেন, এক কাপ দুধ সমেত। রুটি না বানানোর জরুরি বিষয়টি উত্থাপিতই হলো না আর।

সেই দাদু উঠতে বসতে মাটুর খবর নিচ্ছেন। ছেলের কাছে না। বৌমার কাছে না, স্ত্রীর কাছেও না। আমাদের কাছে। দাদা সত্যবাদী যুধিষ্ঠির, গোলমাল বুঝে আগেই মাটুর ফিলড থেকে সরে পড়েছে। এখন আমাকে দেখলেই শুধু একই কথা।

মাটুরে আর দ্যাখলা নাকি, বুবুন?

মাটুপিসিকে? হ্যাঁ... এই তো সেদিন দেখা হলো?

সেইদিনই? কোথায়? ট্রামে?

না দাদু, ঢাকেশ্বরীতে শাড়ি কিনছিল। গড়িয়াহাটে।

শাড়ি কিনতাছিল? ঢাকেশ্বরীতে? ওইটা আমাগো দ্যাশের লোকের দুকান কিনা, নারানবাবুও ওইখানেই কেনাকাটা করে।

মাটুপিসি সিল্কের শাড়ি কিনছিল।

সিল্ক? নাকি? টাকাপয়সা তাইলে আছে হাতে?

মনে তো হলো তাই। গায়ে বেশ গয়নাগাঁটিও ছিল, দেখলাম।

বাহ, বাহ, গহনাও পইরাছিল মাটু? স্বামীরে দেখছিলা সাথে?

কই, স্বামীকে তো দেখলাম না? একাই ছিল।

মাটু কিছু কইছিল নাকি? তরে কিছু জিগায় নাই?

তেমন কিছু বলেনি। শুধু বলল, ভালো আছ তো বুবুন? বাড়ির সবাই ভালো?

আর তুমি কী কইলা? আমাগো কথাটা কইসিলা তো অরে?

হ্যাঁ... বললাম তো, দাদুকে একটা চিঠি দিও। কিন্তু অ্যাড্রেস? অ্যাড্রেসটা দিসিলা? এই নতুন বাড়ির অ্যাড্রেস ত নাই মাটুর কাছে। কল্যাণীর অ্যাড্রেসটা অরে লিখ্যা দিছস ত? আহা, কতকাল দেখি না। এট্টা খবর পর্যন্ত নাই।

আর মাটুর খবরে কাজ নাই তোমার। এদিকে ভাত খাইসে কিনা স্মরণে নাই মানুষটার, ওদিকে, মাটুরে কইও য্যান পত্র দ্যায়। ঈ ঈ ঈ শ শ! ঠাকুমার কানে ঠিক পৌঁছে গেছে মাটুর নাম। উচ্চারণ করলে রক্ষে নেই। দাদু তখনকার মতো চুপসে যান।

দাদা রণে ভঙ্গ দিলে কী হবে, মাটুপিসির সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হয়। হতেই হয়। দেখা না হয়ে উপায় কী? দাদু গল্প শুনতে চান। মাটুর গল্প। আমি তাঁকে সেই গল্প শোনাই।

কী গো বুবুনসোনা? মাটুর সাক্ষাৎ পাইলা নাকি? পথেঘাটে?

হ্যাঁ দাদু, গত শুক্রবারেই দেখা হলো।

তা-ই? বাহ। কিছু কইল নাকি?

আমি তো ট্রামে ছিলাম। মাটুপিসি রাস্তা ক্রস করছিলেন। কথাবার্তা হয়নি।

BoiRboi.org

একাই? সাথে আছিল নাকি কেউ?

একটা মেয়ে ছিল সঙ্গে। আমাদেরই বয়সী হবে। দেখতে খুব সুন্দর—

বাস! বাস! আর কথাই নাই। ওই! ওই হইল গিয়া মাটুর মাইয়া—সুন্দরী হইব না? মাটু আমাদের কি কম সুন্দরী? ওই রূপই ত মাইয়াটার কাল হইল!

দাদু এবার আপনা থেকেই চুপ করে যান। আর কথা কন না। ঘোলাটে চোখের দৃষ্টিতে বহুদূরের ছায়া এসে পড়ে। একটা দীর্ঘশ্বাসও বেরিয়ে আসে, পাঁজর কাঁপিয়ে ফোঁস শব্দ হয়। আমি পালাই। এবারে কোঁচার খুঁটে চোখ মোছার পালা।

হঠাৎ যেদিন দাদু বললেন—তরা ত কইলকাতায় যাস। মাটুরে দ্যাখস? আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, মাটু? মাটু আবার কে? দাদু?

মাটু রে মাটু! আমার বড়দির মাইয়া মাটু। তগো মাটুপিসি হয়। ওই যে, লম্বা লম্বা চুল, এট্টু মনে কইরা দ্যাখ, রঙটুকু চাপা, অপূর্ব মুখশ্রী, ঠিক শ্যামামায়ের রূপ—ঠাকুমাকে গিয়ে ধরলাম।

ঠাকুমা, মাটু কে? মাটুপিসি? লম্বা লম্বা চুল?

ঠাকুমা মহাশূন্য থেকে ভূপাতিত হলেন।

মা-টু! মাটুর কথা তোদের বলল কে?

স্বপ্নোত্থিতের স্বর ঠাকুমার।

দাদু বলছিলেন কোলকাতায় গেলে মাটুপিসির খোঁজ নিতে।

দাদু বলছিলেন! তোর ঠাকুর্দার সইত্য সইত্যই ভীমরথি ধইরা গেসে এইবার। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যে-মাইয়া ঘর ছাইড়্যা চইল্যা গেল, আর কুনুদিন ফিরা আইল না, এট্টা চিঠি পর্যন্ত দিল না—তার খোঁজ করবে নাতি নাতনিরা? বুড়ার কথা কানে লইতে হইব না—ও কি আর বাইচ্যা আছে? থাকেও যদি সে কি আর খবর দ্যাওনের অবস্থায় আছে?

কী কাণ্ড! পঞ্চাশ বৎসর যারে মনেও পড়ে নাই, যার নামও করে নাই কেউ, আইজ সেই মাটুর খোঁজ পড়সে?

ঠাকুমার কাছে সেই প্রথম শুনতে পেলাম মাটুর গল্প।

মাটুপিসি যদি বেঁচে থাকতেন, বয়েস হতো আটষট্টি/উনসত্তর বছর। বাবার চেয়ে আঠারো বছরের বড় ছিলেন। কিন্তু দাদুর কাছে সেই যুবতীকালেই প্রস্ফুটিত হয়ে রয়েছে। মাটু দাদুর ভাগ্নি।

ঠাকুর্দার বড়দিদির মেয়ে সে। বেহালায় তাদের বসতবাড়ি। মা-মরা মেয়ে মাটুকে তার বাবা নারানবাবু মোটে সামলাতে পারছিলেন না, চোদ্দয় পা দিতে না দিতে সে পাড়ায় মক্ষিরাণী হয়ে বসেছিল। ছেলেবুড়ো সবাইকেই ঘায়েল করে ফেলছিল মাটু। কিন্তু পাশের বাড়ির কাকাবাবুর সঙ্গে যেদিন পালিয়ে গেল এবং তিনদিন বাদে সিঁদুর পরে ফিরেও এলো কাকাবাবু সমেত, কালীঘাটে বিয়ে হয়েছে বলে—সেদিন নারানবাবুকে পাড়ার লোকে বাধ্য করল মাটুকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতে। পাড়ার

BanglaBook.org

লোক বলতে কাকাবাবুর স্ত্রী কাকিমা, এবং মাটুর তরুণী সৎমা-ই প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন। অগত্যা নারানবাবু মাটুকে মামাবাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। কোলকাতার বাইরে। দ্বীপান্তরে। দাদু তখন বালুরঘাটে, দাদুর মা, মাটুর দিদিমাও সেইখানে। দিদিমা তো মরা-মেয়ের সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মাটুপিসির সে বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া আর হলো না।

মাটুকে যখন বালুরঘাটে পাঠিয়ে দেওয়া হলো, তার দিদিমার কাছে, তার মামা, অর্থাৎ আমাদের দাদু তখন নেহাৎ যুবক, ঠাকুমারও কচি বয়স, দুই কোলে দুই জ্যাঠামশাই দুরন্তপনা করছেন, আর বাবা সদ্য ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। মাটুপিসির দিদিমা তো ঠাকুমার শাশুড়ি। তিনি চেষ্টা করলেন মাটুপিসি যাতে সংসারে বোঝা না হয়ে ওঠেন, সংসারের কাজে লাগেন। তিনি মাটুপিসিকে ঠাকুমার কাজে সাহায্য করতে লাগিয়ে দিলেন। কিন্তু মাটুপিসির সংসারের কাজ পছন্দ ছিল না। কয়লা ভাঙা, কী বাসন মাজা, উনুন ধরানো, কী বাটনা বাটা, যেটাই করতে বলি না কেন, মাটুর তাতেই মুখ গোমড়া হয়ে যেত। কোনোরকমে হাতের কাজটুকু সেরেই সেজেগুজে রঙিন ফিতের ফুল বেঁধে লম্বা দুটো বেণী ঝুলিয়ে মাটুবিবি বেরিয়ে পড়তেন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতে। ঘরে মনই টিকত না ওর। বাচ্চাগুলোকে ধরতে বললে, বাচ্চা কোলে করেই পাড়া বেড়াতে চলে যেত। এর বাড়ি তার বাড়ি ঘুরে ঘুরেই মাটু দিন কাটাত। ঠাকুমা বললেন।

আর নজর ছিল ঠাকুর্দার উপর।

বাবা, সেদিকে আলস্য নাই। মামাবাবু, আপনারে কেট্টু বাতাস করি? মামাবাবু, এট্টু চা কইরা দেই?

মামাবাবু, আপনের লাইগ্যা লুচি মোহনভোগ বানাইতাসি—দ্যাহেন খাইয়া, কেমন হইসে?

ন্যাকামির শেষ ছিল না। মামাবাবু অফিস থেকে ফিরলে আর রক্ষা নাই। লজ্জা শরমের ধার ধারত না তো? খালি মামাবাবু আর মামাবাবু। বাচ্চাগুলো একটু ধরলেই আমি নিজেই জলখাবারটা বানাতে পারি। তা নয়। সে-ই বানাবে! কত গুণ, দেখাবে না? ছেলেকে যত্ন করছে দেখে শাশুড়িও খুশি। সরল মানুষ ওরা, কী জন্য কী করছে মাটু, সেটা ওরা তো বুঝতেই পারছিল না—না তার মামা, না দিদিমা। ওসব মেয়ের কি সংসারে মন টেকে? ওদের ধরে বিয়ে থা দিলেও লাভ হয় না—বারোমুখো মেয়েরা সংসার করে না—মাটু ছিল বারোমুখো মেয়ে।

ঠাকুমার মুখেই যা জানার জেনেছি।

কিন্তু মাটুপিসির অন্তর্ধানের ব্যাপারটা ঠাকুমা ঠিকমতো বলতে পারেননি। ওটা আজও রহস্যময়। হ্যাঁ ঠাকুমা যে মাটুপিসিকে দিয়ে সংসারের ভারি ভারি খাটুনির কাজগুলো করাতেন, সে ব্যাপারটা টের পেয়েছি। কিন্তু সেই কারণে কি কোনো মেয়ে গৃহত্যাগ করে? না হয় ঠাকুমার মাটুপিসিকে পছন্দ ছিল না। কিন্তু দাদু? তার দাদুর মা? বিয়ে-থা হবে না, ও-মেয়ের হাতে অন্নগ্রহণ করবে না কেউ, পাড়ায়

BanglaBook.org

টি টি পড়ে যাবে, মুখ দেখানো যাবে না, পরের মেয়েদুটোর বিয়ে হবে না।

নাহ্, নারানবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশুরমশাই বললেন, না, বাবাজীবন, পুলিশে খবর দিয়ে কাজ নেই, ওতে বংশে চুনকালি পড়বে। ও মেয়ে যেখানে গেছে যাক। ধরে নাও মেয়ে তোমার ছিল না।

বাবার অমতে মামাবাবু আর পুলিশে খবর দেবেন কী করে? অতএব, জলজ্যান্ত মানুষটা, টুপ করে, পানাপুকুরে ঢিল মারলে যেমন ডুবে যায়, কোনো দাগ থাকে না জলের গায়ে, তেমনি করেই কালসমুদ্রে ডুবে গেল। আর উঠল না।

মাটুপিসি যখন এক রাত্রে বাইরে যাবে বলে উঠেছিল, ঠাকুমা ওর সঙ্গে সঙ্গে আলো নিয়ে খিড়কি পুকুরে গিয়েছিলেন, তখন দেখেছিলেন একটা চাদর-গায়ে-দেওয়া লোক সড়াৎ করে সরে গিয়েছিল কলাবাগানের অন্ধকারে। ঠাকুমার নিশ্চিত ধারণা মাটুপিসি সেই লোকটার সঙ্গেই পালিয়েছিল। কিন্তু লোকটা যে কে, তা কেউ জানে না। কেউ চিনত না ওকে, মাটুপিসি একদিন হারিয়ে গিয়েছিল।

সকালে উঠে মাটুকে খুঁজে পায়নি বাড়ির লোকে। ঘরে নেই, উঠোনে নেই, পুকুর-ঘাটে নেই, গোয়ালঘরে নেই; ঢেঁকিশালে নেই, রান্নাঘরে নেই, আমবাগানে নেই, ঠাকুরবাড়িতে নেই, নদীর পাড়েও নেই।

তবে মাটু গেল কোথায়? পাড়ায়-পাড়ায় খুঁজে, বাড়ি-বাড়ি খুঁজেও মাটুকে আর পাওয়া গেল না। মাটুর কোনো চিহ্ন নেই। পুলিশে খবর না দিয়ে মাটুর বাবাকে খবর দিলেন দাদু।

নারানবাবু দাদুকে পুলিশকেস করতে নিষেধ করলেন। দাদুর মতোই তিনিও বিশ্বাস করতেন ভদ্রঘরের মেয়েদের নিয়ে পুলিশের ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভালো। সম্ভ্রান্ত ঘরের বয়স্থা মেয়েরা অমন হুটহাট ঘর থেকে হারিয়ে যায় না। রাত পোহালে উঠে যায় না। আঠারো বছরের সোমত্ত জোয়ান মেয়েকে বাড়ি থেকে গায়ের জোরে হরণ করে নিয়ে যায়নি কেউ। এ তো অন্ধকারাজার যুগ নয়। সে-মেয়ে রাত থাকতে আগল খুলে নিজে নিজেই বেরিয়ে গেছে। যে-মেয়ে অমন চুপচাপ রাস্তায় বেরিয়ে যায়, তার বাকি জীবনটা ওই রাস্তায় পড়ে থাকাই ভালো। ওকে আর ঘরে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন নেই। পুলিশে খবর দিয়ে কী হবে? তারা হয়তো ওকে ধরে আনবে। তারপর? তখন ওকে নিয়ে কী করা? ও-মেয়ের আর এ অঞ্চলের কেউ ছিল না সেই লোক। আর তার মুখখানাও দেখতে পাননি ঠাকুমা।

ঠাকুমার মুখে মাটুপিসির প্রসঙ্গ এই প্রথম শুনলাম। আর বিগত পঞ্চাশ বছরে নাকি দাদু কোনোদিনই মাটুপিসির বিষয়ে বাক্যব্যয় করেননি। এতবড় একটা ঘটনা কেমন করে ভুলে ছিলেন তাঁরা?

দাদু কোনোদিনই গল্পে লোক নন। তবু তাঁর মুড এলে দু'চারটে প্রিয় কাহিনী আমাদের জীবনভর শুনতে হয়েছে, একটা বিশ কিলো মাছ ধরবার কাহিনীটিই সবচেয়ে প্রিয় ছিল তার মধ্যে। এখন হঠাৎ পঁচানব্বই পেরিয়ে দাদুর স্মৃতিতে মাটুর আবির্ভাব ঘটেছে। এতকাল মাটুর চিহ্ন ছিল না।

BanglaBook.org

পঞ্চাশ বছর আগে যে অষ্টাদশীটি হঠাৎ শেষরাতে গৃহত্যাগ করেছিল, আর কোনোদিনও ফিরে আসেনি, চিঠিও লেখেনি একটিও, তারই জন্য দাদুর প্রাণ এখন সদা উচাটন। এদিকে নিজের ছেলেমেয়েদের চিনতে ভুল হয়ে যায়।

আর মাটুর নাম উচ্চারণ হতে শুনলেই ঠাকুমার মধ্যে কী যেন একটা বিস্ফোরক পদার্থে আগুন লাগে।

এ এক আশ্চর্য রহস্যজালে জড়িয়ে পড়েছি আমরা। ঠিক কী ঘটেছিল সেই রাতে? সবটা কেন, কিছুই জানা নেই। বুঝি না কেন যে, কী যে ঠিক ঘটে গিয়েছিল, যে ঘটনার এই বিচিত্র বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখতে পাচ্ছি। এই পঞ্চাশ বছর বাদেও যে সমস্যার সমাধান হয়নি। দুটি বার্ধক্যপীড়িত মানুষের মাঝখানে বিপুল এক ব্যবধান হয়ে জেগে রয়েছে একটি হারিয়ে যাওয়া নাম। মাটু।

কাগজে একটা 'নিরুদ্দেশ' বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখলে হয়। না, দাদা? পিসিমণির নামে একটা বিজ্ঞাপন—কত তো অসাধ্য সাধন করেছে বিজ্ঞাপন।

কী হবে বিজ্ঞাপন দিয়ে? হয় সে-মেয়ে বেঁচে নেই, নয় এমনভাবেই তার বেঁচে-থাকা, যে তার আর ঘরে-ফেরার পথ নেই।

ঘরে ফেরার পথ সব সময়েই আছে। আমরা তো আছিই। নেই? দাদু-ঠাকুমা তো ছিলেন।

ছিলেন কি? আমার তো মনে হয় না। ধরো, যদি দাদুর ভাগ্নি না হয়ে মাটু দাদুর নিজের মেয়েই হতো, তাহলে কি বংশের মুখে চুনকালির কথা ভেবে পুলিশে খবর দিতেন না দাদু?

কিংবা ধরো, যদি মাটুপিসির মা বেঁচে থাকতেন—তাহলে কি ওর বাবা পুলিশে খবর না দিয়ে পারতেন? সৎমা বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। আশ্চর্য বাবা কিন্তু। ভেবে দেখ বুবুন—মেয়েটার কী হলো, বাঁচল না মরল, গুণ্ডা-বদমাশের পাল্লায় পড়ল কিনা, কোনো খবরই জানতে চাইলেন না তোরা? মামাও তেমনি। মামাবাড়ি থেকেই হারিয়ে গেল, অথচ মামাও কোনো দায়িত্ব নিলেন না। অমন উধাও হয়ে যেতে পারে কখনো একখানা আস্ত মানুষ?

দাদার আর আমার কথার মধ্যে হঠাৎ কথা বলে উঠলেন সাবিপিসি। পান সাজছিলেন ওপাশের তক্তপোশে বসে।

দূরে কোথাও যদি তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তো উধাও হয়ে যেতেই পারে যে-কেউ। ধরো, যদি তাকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, সেই সময়ে বাঙালি মেয়েদের খুব চাহিদা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে—দালালরা আসত নিয়মিত বাঙালি মেয়ে কিনে নিয়ে যেতে।

মাটুর বেলায় ঠিক কী যে ঘটেছিল তা তো কেউই জানে না। আমরা সকালে উঠে দেখলুম মাটু নেই, দোর হাট করে খোলা—কিন্তু মাটু নিজেই দোর খুলে রেখে চলে গেছে, নাকি কেউ তাকে দোর খুলে পথে বের করে দিয়েছে, বাড়ির চৌকাঠ পার করে দিয়েছে, তা কি আমরা জানি? অমন না জেনেও যে একটা মেয়ের

BanglaBook.org

নামে কেচ্ছা রটানো ঠিক নয়—পঞ্চাশ বছর ধরে শুনে আসছি মাটু পালিয়েছে। কে কে দেখেছে সেটা? কার সঙ্গে পালাল সে? কৈ, গ্রামের কারুর সঙ্গেই তো যায়নি সে? তবে লোকটা কে? কোথা থেকে এসেছিল? পুলিশে একবার খবর দিলে না কেন? ধুর! যেমন বাপটা তেমনি ওর মামা। দুজনেই ভীতু আর স্বার্থপর। একটা গরু-ছাগল হারালেও তো মানুষ খুঁজতে বেরোয়? মাটুকে খুঁজতে বেরোয়নি কেউ।

অ বুবুন। বুবুনধন! কইলকাতায় যাও নাকি মণি? সাউথে যাবা? একটু খ্যাল কইরা দ্যাখবা তো ট্রামে বাসে যদি মাটুর সাথে সাক্ষাৎ হইয়া যায় অ্যাকসিডেন্টালি—তাইলে কিন্তু মনে কইরা উয়ারে কইবা, আমারে য্যান অতি অবশ্যই কইরা পত্র দ্যায় একখান। কইবা, তোমার মামাবাবু বাইচ্যা আছে, মাটুরে দেখনের লাইগ্যা বড় প্রাণ কান্দে তার।

অন্যদিন, ঈদসংখ্যা ২০০২

বিন্ধ্যবাসিনী

"মিসেস দত্তদের বাড়িতে কি সুন্দর কাজের মেয়ে দেখে এলাম"—আমার যোগের দিদি বললেন। —"যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি হাতের রান্না। বাঙালদেশের মেয়ে তো? ওদের রান্নার হাতটাই আলাদা!"

যোগের দিদি খেতে-টেতে একটু ভালোবাসেন। কিন্তু তাবলে আমরা ঘটি বলে রাঁধতে বাড়তে জানি না, এমন কথাও তো বলা যায় না।

—"সেই মেয়েটাকে কোথা থেকে এনেছেন মিসেস দত্ত?"

—"কোন একটা আশ্রম থেকে এনেছেন, ওর কেউ নেই।"

—বাঃ। এরকম একজন মেয়ে যদি আমিও পেতাম? যার কেউ কোথাও নেই (খবরের কাগজের ভাষায় বলে 'পিছুটান নেই'), যাকে দেশে যেতে হবে না, যার ছেলের বিয়ে, মায়ের অসুখ, কাকার মৃত্যু, জ্যাঠার অপারেশন লেগেই থাকবে না। যাকে দেখতে সুশ্রী, (ঘরে ঘুরেফিরে বেড়ালে দেখে মন খুশি লাগবে) এবং যার হাতের রান্না খেলে ভুলতে পারা যাবে না—এমন কাজের মেয়ে কোন সে আশ্রমে তপস্যা করছে, ভালো আশ্রয়ের জন্যে? এই তো আমি আছি! আমার সংসার ছোটই। শাশুড়ীমা আছেন, আমরা দুজন, আর আমার জা। দেওর আছে দুবাইতে। এই চারজন পূর্ণবয়স্কা, আমার মেয়ে কলেজে যাচ্ছে, দেওরের ছেলে স্কুলে পড়ছে। ব্যাস এই তো? আমি, আর শুভা দুজনেই রান্না করি, শুভা সকালে কলেজে পড়াতে যায়। ও রাত্রেরটা রাঁধে। শাশুড়ীর বয়েস হয়েছে। একটা দিনরাত্রের মেয়ের খোঁজ করছি; বিশ্বাসী লোক পাওয়া এত কঠিন! এইসব আশ্রম-টাশ্রম থেকেই লোক

BanglaBook.org

নেওয়া ভালো, বেশ জামিন পাওয়া যায়। যোগের দিদি বললেন, আশ্রমের ঠিকানা এসে দেবেন। আজ দিচ্ছেন, কাল দিচ্ছেন, ইতিমধ্যে একদিন একেবারে অবাক কাণ্ড। যোগের দিদিমণি অসময়ে এসে বেল বাজালেন দুপুরবেলায়।

দুপুরবেলায় হঠাৎ? কি ব্যাপার? দিদির সঙ্গে একটি সুন্দরী মেয়ে এসেছে, বছর পঁচিশ ছাব্বিশ হবে, হাতে একটা পুঁটলি।

—"এই যে, এরই নাম বিন্দু।"

—"বিন্দু না, বিন্ধ্য। বিন্ধ্যবাসিনী।"

—"ঐ হলো। বিন্ধ্য, তুমি কি একটু জল খাবে?" যোগের দিদি বলেন,

—"খুব ক্লান্ত তুমি। আমিও একটু জল খাব।"

—"খামু।"

দিদি বললেন—"আমি যাচ্ছি মিসেস সেনের বাড়িতে, হঠাৎ দেখি ট্রামলাইনে কয়েকজনের ভিড়। ট্রামলাইনের ওপরে এই মেয়েটা বসে আছে। উঠবে না। আমি তো দেখে চিনতে পেরেছি, একেই মিসেস দত্তর বাড়িতে দেখেছিলাম। আমাকে দেখে মেয়েটা কেঁদে ফেললো। —কী ব্যাপার? এখানে ট্রামলাইনে কেন বসে আছো?"

—"লাইনে মাথা দিমু।"

—"সেকি? কেন?"

—"আমারে বাইর কইর‍্যা দিসে, আমি কারেও চিনি না, কই যামু? মরুম। মরণের লইগ্যাই বইস্যা আছি।" এমনসময়ে টিংটিং করে ট্রাম এল, আমি ওর হাত ধরে টেনে তুলে আনলাম। বললাম, 'চল, অন্য একজায়গায় নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে তুমি ভালো থাকবে।' —আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছি, আপনারা ওকে দেখাশুনো করুন। ও খুব কাজের।"

—"কিন্তু ওকে তাড়িয়ে দিলো কেন, সেটা তো জানা দরকার। শুধু শুধু কেউ কি কাউকে পথে বের করে দেয়? আজকের দিনে যখন রাতদিনের লোকের এত অভাব?" বিন্ধ্যবাসিনীকেই জিজ্ঞেস করে যেটা জানা গেল সেটা খুব সুখকর নয়। সুন্দরী যুবতীদের পক্ষে নিরাপদ ঘর পাওয়া মধ্যবিত্ত সংসারেও সহজ নয়। কোনোদিনই ছিল না, এখনও নেই। মিস্টার দত্ত এতই যত্ন করছিলেন, যে মিসেস দত্ত ওকে রাস্তায় বের করে দিয়েছেন। মাথা খারাপ করে আশ্রমেও পৌঁছে দেননি। আশ্রমের ঠিকানা ওর পুঁটলি থেকেই বেরুলো যদিও। আমি বললাম, "দেখি, দু'চারদিন তো থাকুক। কেমন কাজকর্ম করে, মন বসে কিনা, হাবভাব কেমন সব দেখি, তারপর মাইনে ঠিক হবে। ওখানে কত পাচ্ছিল?"

বিন্ধ্যবাসিনী হাসলো। নিপাট এক হাসি। —"মায়না? মায়না নাই। ঘরের মানুষ হইয়া থাকুম, আবার মায়না দিয়া কী হইব? যখন যা লাগে আপনে আইন্যা দিয়েন। পয়সা দিয়ে আমার কী কাম? আমার ত কেওই নাই।"

এ তো বড় ঝামেলা। পয়সা দিয়ে এর কোনও কাজ নেই? এমন লোক রেখেও আমার কাজ নেই বাবা—এর তো মাথা খারাপ, কিম্বা এ সন্ন্যাস নিয়েছে।

BanglaBook.org

টাকাপয়সা চায় না, এমন মানুষ এই বাজারে কলকাতা শহরে নিশ্বাস নিচ্ছে? দিদিও একটু মুশকিলে পড়েছেন, বিনা মাইনের দাসী রেখে পুলিশকেসে পড়ে যাব কিনা কে জানে। অত্যাচার, শোষণ, কত কি। তবে মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস দত্ত অ্যাণ্ড কোং ভালো কাজ করেননি। দত্তবাবু যদি দুর্ব্যবহার করেও থাকেন, মিসেস দত্ত অনেক বেশি অসদ্ব্যবহার করেছেন অবলা মেয়েটিকে পথে বের করে দিয়ে। হাতে অবশ্য একশোটা টাকা গুঁজে দিয়েছেন। সেই নোটটা এখনও হাতে ঘামছে। দিদি বললেন, "নোটটা এবার তুমি আঁচলে বাঁধো, কিম্বা কিছু একটা করো। ওটা যে পচে যাবে।" বিন্ধ্যবাসিনী পুঁটুলি খুললো। জামাকাপড় ছাড়া তাতে আরো একটা লালশালুর পুঁটলি আছে। সেটা খুলে দেখা গেল চুলের ফিতে কাঁটা ক্লিপ, একটা ছোট কাঁচি, দু'পাতা টিপ, কয়েকটা প্লাস্টিকের চুড়ি, একটা ছোট হাত আয়না, কয়েকটা লজেন্স, আর দুটো পাঁচটাকার কয়েন রয়েছে। নোটটা তারই সঙ্গে রেখে পুঁটলি বেঁধে ফেলল বিন্ধ্য। লজ্জা লজ্জা হেসে বললো—

—"আমার জিনিসপত্র।"

—"তোমার পয়সা রাখার ব্যাগ নেই? মানি ব্যাগ?" শুভা জিজ্ঞেস করে।

—"না।" মাথা দুলিয়ে না বললো বিন্ধ্য। শাশুড়ীমা বললেন—"যাও, চানটান করে এসে ভাত খেয়ে নাও। বিকেলবেলায় কাজের কথা হবে।"

২

দেখা গেল বিন্ধ্যবাসিনী সত্যিই খুব কাজের মেয়ে। আধা আধা লেখাপড়াও জানে। বাংলা পড়তে লিখতে পারে ভালোই। ইংরেজি অঙ্কের পরিচয় আছে, সংখ্যা চেনে। রান্না চমৎকার। ঘরদোর খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে, বাসন কোসন ঝকঝকে। ঘরের কাজের জন্যে ঠিকে লোক আছে, বিন্ধ্যর কাজ হলো শাশুড়ীমাকে দেখা, আর রান্না। আমাদের একটু ছুটি দেওয়া আর কি।

বিন্ধ্যর বয়েস কত সে জানে না, দেশ কোথায় তাও জানে না, মা-বাবার নামও জানে না। এত না-জানা যেহেতু স্বাভাবিক নয় এবং মেয়েটাকে ওরকম ঘোর মিথ্যেবাদী বলে মনে হয় না, দেখেশুনে আমার স্বামী ঠিক করলেন ওর অ্যামনিশিয়া হয়েছে নিশ্চয়।

—"তোমার কি কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল?" আমরা অনেকবার জিজ্ঞেস করলাম। বিন্ধ্য বলে, "না তো?"

—"আশ্রমে এলে কেমন করে?"

—"কি জানি? মামায় আনসিল।"

—"মামা? তোমার মামা আছে নাকি?"

—"আছিল তো। আর নাই। আসে নাই আর।"

বিন্ধ্যর কাছ থেকে আর কোনও খবর পাওয়া গেল না। আমার মেয়ের সঙ্গে ওর খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল। চেহারা দেখে বয়েস যা মনে হয়, তার চেয়ে ঢের

BanglaBook.org

কম মনে হয় আচার আচরণ দেখলে। খুব ছেলেমানুষ স্বভাব। আর অসম্ভব ভুলো। এই শুনছে, এই ভুলে যাচ্ছে। কিছুতেই কোনও নির্দেশ মনে রাখতে পারে না। "বিকেলবেলায় পাঁচটার সময়ে পাম্পটা খুলো" বলে লাভ নেই। ওর মনে থাকবে না। পাঁচটায় বলতে হবে, "যাও পাম্পটা খোলো", আবার সাড়ে পাঁচটায় বলতে হবে, "বন্ধ করো" নইলে ওর পাম্পটা বন্ধ করার কথা মনে পড়বে না। এসব দেখতে দেখতে বুঝতে পারছি যে ওর সত্যিই স্মৃতিবিভ্রমের রোগ একটা আছে বেশ বড়সড়। এদিকে কিন্তু ঠিক টের পায় কে কখন বাড়ি ফিরবে। আমার মেয়ে শুচি কখন বাড়ি ফিরবে তার জন্যে ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করে। শুভা কখন আসবে কলেজ থেকে, জানে, "ছোটমা ছোটমা" করে দৌড়ে যাবে ঠিক ঠাণ্ডাজলের গেলাশটি নিয়ে। বাবুসোনা স্কুল থেকে ফিরবে, তার জন্যে টিফিন তৈরি। চকলেট দুধ রেডি হয়ে ফ্রিজে-ভরা। বাবুসোনাও বিন্ধ্যদিদিকে বেশ পছন্দ করেছে। বিন্ধ্য নিজের খুশিমতন নাম ঠিক করেছে। ঠাকুমা, বড়বাবা, বড়মা, ছোটমা, বোনটি আর ভাইটি। শুধু ছোটবাবা বাইরে থাকেন, এটা বিন্ধ্যর অমনোমতো। প্রায়ই বিরক্ত করে শুভাকে-—"ছোটবাবা কবে দেশে ফিরবে, ছোটমা? পোলা-বউ ছাড়িয়ে দূরে দূরে কিসের কাম এত? এইখানে অফিস হয় না?" শুভা হাসে, বলে, "এই তো এসে যাবে, ভাইটির ছুটিটা পড়ুক।"

BanglaBook.org

৩

আমার কর্তা ওর জন্য মাইনে স্থির করেছেন। সেটার নাম অবশ্য মাইনে নয়, হাতখরচ। সেটা জমা রাখার জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়া হলো বিন্ধ্যর নামে দু'মাস যাবার পরেই। ব্যাঙ্ক কী বস্তু বিন্ধ্য জানে না। কিন্তু সেখানে ওর নামে টাকা জমানো হচ্ছে, সেটা শুচি ওকে বুঝিয়ে দিয়েছে। সেই টাকা নিয়ে বিন্ধ্য বলেছে একটা ভালো ঢাকাই শাড়ি কিনবে। শুভা বলেছে, "না, আগে গয়না গড়াও। কানের দুটো কানপাশা হোক। তারপর হাতের চুড়ি। তারপর গলার হার। শাড়িতে খরচ পরে। শাড়ি তোমাকে আমরাই দেব।" দিব্য পরিচ্ছন্ন সই করলো, বিন্ধ্যবাসিনী চক্রবর্তী। শাশুড়ীমা তো আরও খুশি—বামুনের মেয়ের হাতেই রান্না খাচ্ছেন। বলবামাত্র নাতনীর কাছে বকুনি খেলেন—"ছিঃ ঠাম, ও কি মন্দ কথা? বামুন-কায়েত-টায়েত আবার কী? কাকুন তো মুসলমানদের রান্না খাচ্ছে, কাকুন কি একটু কমকম বামুন হয়ে গেল?" তারপরেই—"বিন্ধ্যদি। তোমার বিয়ে দেবেন ঠাম্মা, ব্রাহ্মণ পাত্র খুঁজছেন—"

বিন্ধ্য আবার তার সেই ভুবনমোহিনী হাসিটা হাসে। লজ্জায় মুখ লাল।

—"আমার আবার বিয়া! দূর ঠাকুমা যে কী কয়।"

আমরা আড়ালে আলোচনা করি, কত বয়েস হবে বিন্ধ্যবাসিনীর? ওর কি বিয়ে হয়েছিল কোনোদিন? বিধবা? সধবা? স্বামী-পরিত্যক্তা? কুমারী? ওর বৈবাহিক অবস্থান-বিষয়ে আমাদের সকলের সমান কৌতূহল। কিছুদিন দেখে, মনে হলো, মেয়েটার বিয়ে হয়নি কোনোদিনই।

যেমন নিরামিষ রান্নার হাত মিঠে, তেমনি মাছ রান্না করে বিন্ধ্য। ভাদ্রমাসের তালের বড়া, তালক্ষীর, পৌষমাসের পিঠে-পায়েস, কোনওটাই বাদ দেয় না বিন্ধ্যবাসিনী। কেবল মাঝে মাঝে বড্ড বেশি ভুলোপনা করে ফেলে। উনুনে রান্না চড়িয়ে মাথায় সাবান দিতে চলে যায়। কাপড় শুকুতে দিয়ে আসে ক্লিপ না লাগিয়ে। ঠাকুমার ত্রিফলা ভিজোতে ভুলে যায়। সবসময়ে ওর ওপরে নজর রাখলে, ও দারুণ কাজ করে। কাপড় নিয়ে ছাদে উঠছে দেখলেই ডেকে ক্লিপগুলো হাতে গুঁজে দিতে হবে। উনুনে রান্না থাকলে তাকে রান্নাঘর ছাড়তে দেওয়া চলবে না। নজরদারী ছাড়া বিন্ধ্য অচল। মাঝে মাঝে ওর ডিপ্রেশন হয়। তখন হাসে না, গম্ভীর, উদাস হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে। ডাকলে সাড়া দেয় না। তখন ওর সেই পুঁটলিটা চোদ্দবার খোলে আর চোদ্দবার বন্ধ করে। কী খোঁজে, কে জানে। তখন ওর খাওয়ায় রুচি থাকে না, রান্নাতেও মন থাকে না। আমার, শুভার মন কেমন করে ওর জন্যে—তখন আমরাই রান্নাঘরটা সামলাই। এখন যার কোথাও কেউ নেই, তার নিশ্চয় এককালে কোথাও কেউ না কেউ ছিল। তারা সব গেল কোথায়? মন খারাপ হবে না বিন্ধ্যর? হবেই তো। শুভা বলে, "বিন্ধ্যর বিষয়ে কিছুই খোঁজ-খবর পাইনি আমরা।"

টাকাকড়ি, গয়নাগাঁটি চারিদিকে ছড়িয়ে রাখলেও বিন্ধ্য ছোঁবে না এটা বোঝা গেছে। তার অর্থলোভ নেই। ভালোবাসে খেতে। একথালা মিষ্টি বানিয়ে নিজেই তা থেকে আগেভাগে দুটো খেয়ে ফেলবে। চিতলমাছের মুড়ি বানিয়ে ঝোলে দেওয়ার আগে দু'খানা ভাজা মুঠি নিজে নিজেই খেয়ে নেবে। কোথাও থেকে কিছু খাবার এলে, ওকে না-দিয়ে খেলে এত দুঃখ পায়, যে আর কদাচিৎ সে-কর্ম করার কথা আমরা ভাবতেই পারি না বাড়িতে কেউ। শুচি, বাবুসোনার চকোলেটেরও ভাগ বিন্ধ্যর।

—"বড্ড ছেলেমানুষ।" আমার শাশুড়ি বলেন। সত্যিই তাই। কথাবার্তাগুলো শুনলেই বোঝা যায় কাজে যতই পাকাপোক্ত হোক না, মেয়েটার মনের ভেতরটা একদম কাঁচা। সবচেয়ে খুশি হয় ওর বিয়ের কথা হচ্ছে, এই প্রসঙ্গটা উঠলে। শুচি আর বাবুসোনা মাঝে মাঝে খ্যাপায়।

শুভা একদিন বারণ করল ওদের। ঠাট্টা যে বোঝে না, সত্যি সত্যি ভেবে খুশি হয়, তাকে ওইরকম ঠাট্টা করাটা উচিত নয়।

—"সত্যিই তো ওর বিয়ের বয়েস হয়েছে, বিয়ে থা একটা হওয়াই উচিত ছিল। ওই নিয়ে ওকে ঠাট্টাতামাশা কোরো না।"

ঠাট্টা বন্ধ হলো। কিন্তু নতুন উৎপাত শুরু হলো। বাবু maurimonial columns দেখতে শুরু করে দিল। "বিন্ধ্যদির জন্যে একটা সম্বন্ধ খুঁজছি।"

—"ওরে তোর বিন্ধ্যদিকে কেউ সম্বন্ধ করে বিয়ে করবে না রে—ওর কোনও পরিচয় নেই, মা-বাবার নাম পর্যন্ত জানে না, গ্রামের নাম জানে না। ওকে কে বিয়ে করবে?"

শুনে ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল বাবুর।

৪

বিয়ের ঠাট্টা বন্ধ হয়ে গিয়ে মনে হচ্ছে বিন্ধ্যবাসিনীর একটু মন বিষণ্ণ। ঠাট্টা করাটাই ভালো ছিল—নিষ্ঠুরতা ভেবে ভুলই করেছি আমরা। দুধের স্বাদ ঘোলে। বিয়ের স্বাদ বিয়ের ঠাট্টায়—সেটাই বা মন্দ কী ছিল? কিন্তু একবার বন্ধ করে আবার কেমন করে বলি, "ওরে তোরা ওকে ঠাট্টা করবি তো কর, যেমন চলছিল চলুক—?"

এই সময় শাশুড়িমা একটা প্রস্তাব দিলেন। দারুণ প্রস্তাব। আমাদের বাড়ির পুরনো ড্রাইভার মহাদেবের বউ মারা গেছে। মেয়েরা বড়, তাদের বিয়ে থা হয়ে গেছে, মহাদেব একাই থাকে গ্যারেজের পাশের ঘরে। মহাদেবরা বিহারী ব্রাহ্মণ। মাথায় টিকি আছে, গলায় পৈতে আছে। খুবই সৎ স্বভাব। আমরা ওকে একুশ বছর দেখছি। কোনও বেচাল চোখে পড়েনি। মহাদেব বেশ দেখতে-শুনতেও ভালো। ভদ্র চেহারা, বেমানান হবে না —শুধু বয়স একটু বেশি। সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ হবে। শাশুড়িমা বললেন, "না। মহাদেব যখন কাজে ঢুকলো, তখন ওর বয়েস ছিল বাইশ বছর। মহাদেবের তিনটে মেয়ে। মহাদেবের বয়েস তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশের বেশি হবে না। পুরুষ মানুষের ওটা কোনও বয়েসই নয়।"

প্রসঙ্গটা চুপি চুপিই গোপনে আলোচনা হতে লাগলো মহিলামহলে। শাশুড়ি আর বৌমাদের মধ্যে। তারপর কর্তার কাছে প্রস্তাবটি রাখা হলো। কর্তামশাই শুনে বললেন —"বেশ কথা, কিন্তু মহাদেব রাজি হবে কে বলল? আর তোমরা ধরেই নিচ্ছো কেন, যে বিন্ধ্যবাসিনী হিন্দুস্থানী বর হলে খুশি হবে? সেও তো বাঙালদেশের বর চাইতে পারে? তার কোথাও চয়েস নেই, এটা কেন ভাবছো?"

সত্যি কথা।

এত উইমেন্স লিব করছে শুভা, ওদের কলেজে—অথচ এই বেলায় খেয়াল হয়নি। ধরেই নিয়েছি আমরা, বিয়ে হলেই কর্তে যাবে মেয়েটা। শুচি, বাবুসোনাকে ঘুণাক্ষরেও জানানো হয়নি ব্যাপারটা। বাবুসোনার বয়েস এখন চোদ্দ বছর, সে একটা মুশকিলের সময় দিয়ে যাচ্ছে। আজ তার মুড ভালো, কাল তার মেজাজ ক্ষিপ্ত। শুচির সঙ্গে চার বছরের তফাৎ, শুচি ভাই-অন্ত-প্রাণ। ভাইও দিদি বলতে অজ্ঞান। ভাই-বোনে ঝগড়া নেই, পিঠোপিঠি না হওয়ার গুণ।

ওদের সঙ্গে বিন্ধ্যবাসিনীর ভাব হয়েছে খুব সুন্দর। ওরা বিন্ধ্যকে টিভি দেখতে ডাকে। আইসক্রিম খেতে ডাকে। বিন্ধ্য আনন্দে আছে। তার ব্যাঙ্কে টাকা জমছে, শুচি তার কানের গয়না গড়িয়ে দিয়েছে। এবারে নাকছাবি চেয়েছে সাদা পাথরের। —সেটা কিনতে গেল যেদিন ওরা, ফিরে এসেই জ্বরে পড়ল বিন্ধ্য।

নাকছাবিটি পরে বড়ই লক্ষ্মীশ্রী খুলে গেছে, সত্যি বৌ-বৌ দেখাচ্ছে যেন মেয়েটাকে। মহাদেবের কাছে এবার প্রসঙ্গটা পাড়তে হবে, কর্তা নিজে বললেই ভালো। চট করে না করতে পারবে না। অবশেষে উনি মহাদেবকে বললেন। এবং সঙ্গে সঙ্গেই মহাদেব রাজি!

—"বাবু যখন বলছেন তার উপরে আমার আর কী বলার থাকতে পারে?"

এবারে বিন্ধ্য।

কিন্তু বিন্ধ্যকে বলব কি, সে তো প্রবল জ্বরে ঠকঠক করে কাঁপছে। রক্তপরীক্ষা করে জানা গেল ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া। জ্বর বেশি দেখে ডাক্তারবাবু আগেই কিছু ওষুধপত্র দিয়েছিলেন, অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ। এবার ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার জন্য চিকিৎসা শুরু হলো, অন্যান্য সব ওষুধ বন্ধ। দু'দিন গেল, তিনদিনের দিন জ্বর কমলো। কিন্তু বিন্ধ্যর মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছে বলে মনে হলো। জ্বর কমে গেছে, শীত করছে না। বিন্ধ্য প্রথমে কাঁথা-কম্বল ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলল, তারপর শাড়ি, তারপর ব্লাউজ, তারপর পেটিকোট—আমরা দৌড়ে গিয়ে ওকে আটকাই—জানলা-দরজা বন্ধ করি—বিন্ধ্য আমাদের চিনতে পারছে না—চোখের চাউনিতে বন্য ভাব, হাত-পা ছুঁড়ছে—কিছুতেই গায়ে কোনও কাপড় রাখবে না—এবং খাবার থালা দিলেই উল্টে ফেলে দিচ্ছে—জলের গেলাশ দিলে গায়ে ঢেলে দিচ্ছে—ডাক্তারবাবু এলেন—ওকে জোর করে চেপে ধরা হলো —ঘুমের ওষুধ-ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়ানো হলো বিন্ধ্যকে। প্রচণ্ড এক চাপ গেল বাড়ির ওপর দিয়ে। ডাক্তারবাবু বললেন, ঘুম ভাঙলে আবার হয়ত ওরকম করবে। কেন এমন হলো তিনি বলতে পারলেন না। আমরা ধরে নিলাম দু'রকমের ওষুধে একটা কোনও বিপুল গোলমাল হয়ে গেছে, যেটার ফল এই উন্মত্ততা। জ্বর ছাড়লো না। ঘুমের ওষুধ চলতেই লাগল। ওর পাগলামিটাও চলতেই থাকল। কখনও বাড়ে, কখনও কমে। কাজ করার মতো অবস্থায় আসছিল না বিন্ধ্য। খাবার খাওয়ানো দুঃসাধ্য, স্নান করতে চায় না, স্নান করতে গেলে বেরুতে চায় না, জামাকাপড় কেবলই খুলে ফেলে, এবং পরিয়ে দিতে গেলে মুখে বিশ্রি গালিগালাজের তুবড়ি ছোটে, গাঙালভাষায় বলেই রক্ষে, শুচি-বাবুসোনা সবটা বোঝে না। গালির ভয়ে তাকে কাপড় পরাতে যেতে চায় না কাজের মেয়েটা, শুভা আর আমিও ভয় পাই। ডাক্তার বললেন, বাড়িতে চিকিৎসায় চলবে না, হাসপাতালে পাঠাতে হবে। ব্যবস্থা হলো। গাড়ি এল, সঙ্গে লোক এল। বিন্ধ্যবাসিনীকে ধরে-বেঁধে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো।

বাড়ি ফাঁকা।

সকলেরই মন কেমন করে।

আমরা নিয়মিত যাই। খোঁজখবর করি।

একমাস গেল।

দু'মাস গেল।

আর অতটা নিয়মিত যাওয়া হয় না, তবে মাঝে মধ্যে যাই। ফোনে খোঁজ নিই ডাক্তারের কাছে।

তিন মাস।

চার মাস। অনেকদিন যাওয়া হলো না বিন্ধ্যর কাছে। শুভা ব্যস্ত, ওর কলেজে পরীক্ষা চলছে।

শুচিরও কলেজে পরীক্ষা। আমি গেলাম একদিন খোঁজ নিতে। উন্মাদ আশ্রমে ছোটদের নিতে নেই তাই বাবুসোনাকে নিয়ে যাই না।

এবারে অনেকদিন পরে দেখা।

BanglaBook.org

আমাকে দেখেই 'বড়মা' বলে ডুকরে কেঁদে উঠল বিন্ধ্য। "বড়মা, আমারে বাড়ি নিয়ে চলেন"—আমি তো মুশকিলে পড়েছি। যদি মেয়েটা সুস্থ হয়ে গিয়ে থাকে তবে তো ওকে বাড়ি নিয়ে যাওয়াই উচিত।

—"ডাক্তার যদি বলেন, তাহলে তোকে নিয়ে যাব। আজ তো হবে না, আগে তোকে রিলিজ করে দিক?"

ডাক্তার ছিলেন না। অ্যাটেনডেন্টরা বলল, দিব্যি ভালো আছে বিন্ধ্য।

ডাক্তারকে ফোনে জিজ্ঞেস করতে হবে কবে রিলিজ করবে। বিন্ধ্যর কত যে প্রশ্ন। বড়বাবা কেমন আছেন? ঠাকুমা কী করছেন? বোনটি, ছোটমা, ওরা কেন আসেনি? ভাইটিকে তোমরা একদিনও আনলে না কেন? ছোটবাবা কি বিদেশ থেকে ফিরেছেন?—আর কতদিন থাকবেন বউ-পোলা ছেড়ে? আমার মনে কোনই সন্দেহ রইলো না বিন্ধ্যকে ফিরিয়ে নেওয়ার সময় হয়েছে। ওষুধের কারণে অসুস্থতা এখন বিগত। ডাক্তার বললেন, আর একটা মাস দেখতে। এখন ভালো আছে, কিন্তু সে তো ওষুধের ওপর।

—"কিন্তু এখানে থেকে মন খারাপ করলে তো আরও অসুস্থ হয়ে যাবে?"

—"তাহলে নিয়ে যান।"

আমরা নিয়ে এলাম বিন্ধ্যকে।

BanglaBook.org

৫

এ কিন্তু অন্য এক বিন্ধ্যবাসিনী। ডাক্তারের কাছে জেনে এলাম। হাসপাতালে বিন্ধ্যবাসিনীকে যে বৈদ্যুতিক শক দেওয়া হয়েছিল, তার গভীরতর ফসল ফলেছে। বিন্ধ্যর অ্যামনিশিয়া কেটে গিয়ে লুপ্ত স্মৃতির পুনর্বাসন ঘটেছে। বিন্ধ্য ডাক্তারকে তার জীবনকাহিনী বলেছে। ভয়ানক সেই কাহিনী। খানসেনাদের দ্বারা ধর্ষিত, অত্যাচারিত হয়েছিল বারো বছরের বালিকা। তার মামা-মামীর সঙ্গে পালিয়ে আসছিল গ্রাম ছেড়ে, চোখের সামনে বাবাকে, জ্যাঠাকে, ভাইকে কেটে কুচি-কুচি করেছে খানসেনারা, মাকে ধরে নিয়ে গেছে কোথায় কে জানে?

মামা লুকিয়ে পালাচ্ছিল মামীকে আর বিন্ধ্যকে নিয়ে, রাতের অন্ধকারে, বনবাদাড়ের পথ ধরে—খানসেনারা তাদের ধরে ফেলেছিল। মামাকে বেঁধে রেখে তার চোখের সামনে মামীকে আর বিন্ধ্যকে দল-বেঁধে ধর্ষণ করছিল খানসেনারা। মামীর কী হয়েছে বিন্ধ্য জানে না। মামাকেও আর দেখেনি। বিন্ধ্যকে খানসেনাদের হাতেই ছেড়ে চলে গিয়েছিল মামা—এমনি একটা অভিমান পুষে রেখেছে সে। খানসেনাদের ক্যাম্পে দিনের পর দিন রেপড হয়েছে বালিকা বিন্ধ্য—ভারতীয় সেনারা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে দিয়েছিল। হাসপাতাল থেকে উদ্ধার আশ্রমে। হিসেব করে দেখা গেল বিন্ধ্যবাসিনীর বয়েস বত্রিশ।

পূর্বস্মৃতি সমস্ত ফিরে এসেছে বিন্ধ্যর। এই ফেরাটা ভালো হলো না খারাপ, সেটাই

পরবর্তী ভাবনা। বাবা গ্রামের পুরোহিত হরিপ্রসন্ন চক্রবর্তী, মা দাক্ষায়ণী, দুই ভাই ছিল, শিবপ্রসন্ন, সত্যপ্রসন্ন। তারা কে কোথায়? কেউ জানে না। বিন্ধ্য মাথা নাড়ে। বলে—"নাই। তারা আর নাই।"

বিন্ধ্য আর সেই উজ্জ্বল হাসিখুশি বালিকাটি নেই। করুণ, সঙ্কুচিত যুবতী সে এখন। তার সামগ্রিক চরিত্র পাল্টে গেছে। গম্ভীর। নীরব। আসল সমস্যা বাধল বাড়িতে ফিরে।

৬

কাজ করতে গিয়েই সমস্যা দেখা দিল। শাশুড়িমাকে এসব গল্প করবার কোনও প্রয়োজন ছিল না আমাদের। কিন্তু কেমন করে জানি না তাঁর কানে পৌঁছে গেল বিন্ধ্য খানসেনাদের দ্বারা ধর্ষিত মেয়ে। শাশুড়ি বললেন, ওর হাতে তো খাওয়া যায় না তাহলে। রান্নার কাজে ওকে দেওয়া যাবে না। বাসন ধুক, ঘর মুছুক, কাপড় কাচুক। থাকুক একপাশে পড়ে —যাবে আর কোথায়। বিন্ধ্য শুনলো।

—"ঠাকুমা আমার হাতে খাবেন না কইছেন। বড়মা? বলেন তো, আমি কী করসি?"

—আমি তো ভাষা খুঁজে পেলাম না।

—"যা না। তুই যা, রান্নাঘরে ঢোক।"—এটাও বলতে পারলাম না। শাশুড়িরই তো সংসার। এ বাড়ি তাঁরই। তাঁর ইচ্ছেটা আগে। মহাদেবের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার প্রশ্ন তো মুছেই গেছে শ্লেট থেকে। ও-নষ্ট মেয়েকে আবার বিয়ে করবে কে?

মহাদেবও শুনেছে।

সুখের বিষয়, বিন্ধ্য শোনেনি বিয়ের প্রসঙ্গটা। হ্যাঁও জানত না, নাও জানল না।

প্রচণ্ড মুশকিল বাধালেন আমার স্ত্রী। আজ বলেন, বিন্ধ্যকে বল চিতলমাছের মুঠা বানাতে, কাল বলেন বিন্ধ্যকে বল নারকেলের বরফী বানাতে, পরশু বলেন আলু-বড়ির ঝোল বানাক বিন্ধ্য।

বিন্ধ্যর রান্নাঘরে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে শুনে কর্তা স্তব্ধ।

আরেকটা রান্নাঘর তৈরি করানো ঠিক হলো ছাদের ওধারে। বিন্ধ্য রান্না করবে বলে।

শাশুড়ির কানে সেকথা পৌঁছে দেওয়ার লোকের অভাব ছিল না—ঠিকে লোকটি আছে। শাশুড়ি বেঁকে বসলেন। এ বাড়ির কোনও রান্নাঘরেই খানসেনার এঁটো মেয়ে ঢুকবে না। কাউকে এক গ্লাস জল দেওয়া, চা করে দেওয়া, সবই বারণ হয়ে গেল বিন্ধ্যবাসিনীর।

শুভা অসম্ভব রেগে গেলেও শাশুড়ির ওপরে কথা বলল না। শুচিই শুধু চেঁচাতে লাগল, "ঠাম, তুমি এত মীন-মীন কাজ করতে পার? ঠাম, দিস ইজ জাস্ট নট ডান! ঠাম, উই লাভ বিন্ধ্যদি।"

BanglaBook.org

বিন্ধ্য কিন্তু কিছুই বলছে না।

একদিন দেখি বিন্ধ্য তার পুঁটলিটা খুলে কী খুঁজছে। খুলছে আর বন্ধ করছে। খুলছে আর বন্ধ করছে। দেখে আমার শরীর হিম হয়ে গেল।

আবার?

—বিন্ধ্য মুখ তুলল। সেই মিষ্টি হাসি ভুবন ভোলানো।

—"কী করছিস?"

—"চুলের ফিতাডা, বেনী বানানোর লাইগ্যা—"

—"বিন্ধ্য?"

—"হাঁ বড়মা কী?"

—"বাবুসোনা স্কুল থেকে আসছে"—

—"বানাইয়া রাখসি—চক্‌লেট দুধ"।

ফ্রিজে গিয়ে দেখি চকলেট দুধটুধ কিছুই নেই। থাকার কি, দুধের কড়ায় তো হাত দেওয়া বারণ।

তাহলে কি আবার মাথাটা গেল?

"বিন্ধ্য?"

—"বড়মা? বড়বাবা অহনও আইলেন না ক্যান? ছয়টা কখন বাইজ্যা গেছে।" বড়মা বড়বাবা করে আমাদের ভীষণ জড়িয়েছে মেয়েটা। কর্তার স্নেহ যেন আরও বেড়েছে ওর কষ্টের কাহিনী জানার পরে। ঠাকুমা-ঠাকুমা করে ভীষণ আহ্লাদেপনা করত বিন্ধ্য। ঠাকুমার কাছে গল্প শুনত। তাঁর পান সেজে দিত, ছেঁকে দিত তাঁর ত্রিফলা, তাঁর ফলার সব তৈরি করে দিত—এখন সেসব কাজ আবার আমার ওপরেই বর্তেছে। আগে তো আমিই দিতাম। বিন্ধ্য এসে একটা বছর বড় সুখে রেখেছিল।

বিন্ধ্যর মাথা সত্যি ঠিক নেই।

শুচি পরীক্ষা করতে জিজ্ঞেস করল

—"তোমার গ্রামের নামটা যেন কী?"

স্মৃতি ফিরে পেয়ে বিন্ধ্যবাসিনী আমাদের বলেছিল গ্রামের নাম পায়রাডাঙা। হাসপাতালেও বলেছিল, পায়রাডাঙা।

এখন বলল—"গ্রামের নাম?"

ভুরু কুঁচকে খানিক ভেবে নিল। তারপর মিষ্টি হেসে বলল, "মনে নাই!"

শুচি প্রায় কেঁদে ফেলল—"মা।"

ঠাকুমার কাছে দৌড়ে গিয়ে চেঁচাল

—"দ্যাখো দ্যাখো তুমি কী করলে! কী করলে তুমি। আবার ওকে অসুস্থ করে দিলে।"

শাশুড়িমা চোখ বুজে মালা জপছিলেন। তাঁর কোনও হেলদোল হলো না।

বিন্ধ্য এবারে অন্যরকম।

কাজে মন নেই।

কাজও তো নেই।

BanglaBook.org

ঘর মুছতে কাপড় কাচতে তো ঠিকে লোকটি ছিলই।

বিন্ধ্য টিভি দ্যাখে না।

বাবুসোনা আইসক্রিম খাওয়াতে গেল, খেল না।

বিন্ধ্য বারান্দাতে দাঁড়িয়ে, ট্রামরাস্তা দ্যাখে।

আমার মনে দারুণ ভয় হলো।

ট্রামরাস্তা?

ট্রামলাইনে মাথা দিতে গিয়েছিল না এই মেয়ে?

না। ওকে আবার হাসপাতালে পাঠাই বরং। সেখানে নিরাপদ। কিন্তু ডাক্তার বললেন দরকার নেই। ঘরে থাক, বিশ্রামে থেকেই সেরে যাবে। ডাক্তারকে আমি লজ্জায় বলতে পারলাম না। ঘরে মনোকষ্টে থেকেই এ দুর্ঘটনা ঘটেছে।

শুভা চিঠি লিখল মাদার টেরেসাকে, বিন্ধ্যবাসিনীকে গ্রহণ করুন। শুভা চিঠি লিখল আরও দু'তিনটি আশ্রমে। লিলুয়া হোমের মতো কুখ্যাতি নেই এমনধারা আশ্রমও আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, কোথাও স্থান সঙ্কুলান হলো না। মাদার টেরেসার আশ্রম থেকে তো জবাবই এল না।

বিন্ধ্যকে শেষে বলা হয়, "বিন্ধ্য, চল, তোমাকে তোমার আশ্রমেই রেখে আসি। ঠাকুমা এখানে তোমাকে বড্ড দুঃখ দিচ্ছেন। তোমার মন খারাপ সব সময়ে।"

বিন্ধ্য একমুখ হেসে বলল

—"মন খারাপ না তো? ঠাকুমা বুড়া হইসেন, কী কইতে কী কন, আমি মনেই লই নাই—বড়মা, ছোটমা, বড়বাবার এত ভালোবাসা পাই, তোমাগো ছাইড়্যা আমি কই যামু? ভাইটিরে বোনটিরে ছাইড়্যা আমি যামুই না।"

এ তো বড় মুশকিল।

মেয়েটা ভীষণ আঁকড়েছে আমাদের। আমরা ওকে যতটা ভালোবেসেছি, ও তার চেয়ে তিনগুণ বেশি ভালোবেসেছে আমাদের। কিন্তু মুশকিল আছে। সামনেই ছুটিতে শুভা দুবাই যাচ্ছে, তার স্বামীর কাছে। শুচিও কাকীর সঙ্গে যাবে। বাবুসোনার জেদ। ওরা থাকবে না। এর মধ্যে যদি বিন্ধ্যর পাগলামি বেড়ে ওঠে, একা আমি সামাল দিতে পারব না। ওরা না থাকলে বিন্ধ্য আরও বেশি ডিপ্রেসড হয়ে পড়বেই।

৭

শুভাদের যাত্রার দিন ঘনিয়ে আসছে, মাদার টেরেসার উত্তর আজও এল না। আমরা স্থির করলাম ওকে যেখান থেকে এনেছিলেন মিসেস দত্ত, সেই আশ্রমেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে, পাশবই-টই সমেত। এখন ওর কিছু টাকা আছে, কিছু সোনাদানাও আছে। পুঁটলির বদলে শুচি ওকে একটা জিপ দেওয়া ব্যাগ কিনে দিল, তাতে ওর কাপড়-চোপড়, ছোট্ট একটা পার্সে খুচরো টাকা-পয়সা, ওর গয়না তো নাকে-কানেই, হাতের চুড়ি তো হালকা। হাতে প্লাস্টিকের আর স্টিলের চুড়ি কিনে দিয়েছে শুভা আর শুচি। ভারি সুশ্রী দেখায় আজকাল বিন্ধ্যবাসিনীকে।

বিন্ধ্যকে আজ পৌঁছে দেওয়া হবে আশ্রমে, সাজিয়ে-গুছিয়ে ওকে নিয়ে বেরুনো হলো। শুভা আর আমি দু'জনেই গেলাম গাড়িতে। বিন্ধ্য চুপচাপ। আশ্রমে পৌঁছে দেখি গেট বন্ধ। গেটে দারোয়ান বসে আছে। সে বিন্ধ্যবাসিনীকে চিনতে পারল না। বিন্ধ্যর মুখে রা নেই। সে ওকে চেনে কি না জানা গেল না।

দরোয়ান দরজা খুললো না।

—"অন্দর যানা মানা হ্যায়।"

—"আরে, এই মেয়েটা এখানেই থাকত।"

—"সুপারিনটেনডেন্ট নেহী হ্যায়। উসকা পারমিশন লাইয়ে।"

—"কখন আসবেন সুপারিনটেনডেন্ট?"

—"পাতা নেই।"

আমরা বসেই থাকি গাড়িতে। বেলা দুটো বাজে। সেই এগারোটায় এসেছি। মহাদেব ছটফট করছে। শুভার পরশু যাত্রা—বাড়িতে প্রচুর কাজ। শাশুড়িকে খেতে দেওয়া হয়নি। শুচি যদি বাড়ি এসে থাকে, হয়ত দিয়ে দেবে। বাবুসোনার আসার সময় হয়ে এল। আজ তিনটেয় বাড়ি ফেরে। আমাদের এবার যেতে হবে।

দারোয়ানের পাশে, দালানের ওপরে ব্যাগ সমেত বসিয়ে দিই বিন্ধ্যবাসিনীকে। ও বোঝে। কোনও কথা বলে না।

চুপ করে বসে পড়ে।

চোখে চোখ মেলায় না।

দারোয়ানকে বলি, "সুপারিনটেনডেন্ট না আসা অবধি তুমি একে বসতে দাও। তিনি একে চেনেন। এখানে ও অনেক বছর ধরে ছিল। সবাই ওকে চেনে। তুমিই নতুন। তাই চেনো না।"

দারোয়ান মেনে নিল।

হ্যাঁ। সে নতুন এসেছে। আমি বলি,

—"সুপারিনটেনডেন্ট এবার এসে যাবেন—অনেকক্ষণ গেছেন।"

দারোয়ান সায় দেয়।

—"হ্যাঁ, আব তো আনাই চাইয়ে।"

—"বিন্ধ্য, তুমি বসো। উনি এলে ভেতরে যেও। কোথাও চলে যেও না যেন। আমরা কাল খবর নেব কী হলো। কেমন?"

বিন্ধ্য অন্যদিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকে।

দারোয়ানের হাতে দশটা টাকা দিয়ে শুভা বলে—"ওকে একটু দেখ।"

৮

মন ভারী করে বাড়ি আসি। ঢুকতেই শুচি লাফাতে লাফাতে আসে—

—"মা, গুড নিউজ। মাদার টেরেসা থেকে চিঠি এসেছে। ওরা বিন্ধ্যদিকে নেবে।"

BanglaBook.org

শুভা আর আমি এক মুহূর্ত মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি।

আমাদের চোখ পরস্পরকে কী বলে তা আমাদের চোখই জানে।

"ঠাকুমাকে খেতে দিয়েছিস?"

—"বাবুসোনার জলখাবারটা ঠিক করে দিস। নিজে কিছু খেলি?"

—"এ কি? তোমরা যাচ্ছো কোথায়? ভাত খেয়ে যাও!"

শুচি পথ আগলায়।

শাশুড়িও বলছে—"মুখে দুটি গুঁজে যা তোরা? বিন্ধ্য বিন্ধ্য করে তো পাগল হয়ে গেলি দুই জা-য়ে!"

ভাত খেতে বসতেই হলো।

তাছাড়া মহাদেবকেও তো খাবার সময়টুকু দিতে হবে। বিন্ধ্য?

বিন্ধ্য কী খাচ্ছে? ও তো খেতে পাবে না—ওর জন্য তো আজ রান্না হয়নি আশ্রমে। টিফিন বাক্সে ওর জন্যে কিছু খাবার নিয়ে আমরা আবার রওনা হই। ওকে তুলে নেব, মাদার টেরেসার আশ্রমেই রাখা হবে, সেখানেই বেশি ভালো থাকবে বিন্ধ্য। সুপারিনটেনডেন্টকে বললে নিশ্চয় ছেড়ে দেবেন।

গিয়ে দেখি দারোয়ান বসে আছে। বিন্ধ্য নেই।

যাক। ভিতরে গেছে তাহলে।

—"একটু খোলো। ভিতরে যাব। সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে কথা আছে।"

—"ও তো আয়াই নেহী!"

সে কী? আসেনি? তবে বিন্ধ্য?

—"বিন্ধ্যবাসিনীকে কে ঢুকিয়ে নিল ভিতরে?"

—"ও তো চলা গিয়া। উধার সে।"

হাত তুলে বড় রাস্তার দিকে দেখিয়ে দিল দারোয়ান।

শত শত গাড়ি, ট্রাম, বাস, রিকশা, লরি, ঠেলাগাড়ির ভিড়ের দিকে চেয়ে চোখ অন্ধ হয়ে গেল আমার।

—"কব গিয়া?"

—"আপলোগ জব চলা গিয়া। ও ঔরৎভি তবহি উঠকে চলা গিয়া। ও বৈঠা নেহী সুপারিনটেনডেন্টকে লিয়ে। ফির ঘুমঘামকে আয়েগা, হোগা? খানা খানেকো গিয়া শায়দ..."

দারোয়ান অনেকরকম সম্ভাবনা একে একে জানাতে থাকে—আমার কানে সেগুলো আর পৌঁছয় না।

শারদীয় সংবাদ প্রতিদিন, ১৪০৯

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG